নারী ও পরশু

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

শান্তিপুর হইতে সোমবারের সকালে যে ট্রেনটা কলিকাতায় আসে তাহাতে সপ্তাহান্তিক টিকিটধারীর সংখ্যাই বেশী। যাত্রীর ভিড় বেশী হইলেও ট্রেনে কোলাহল থাকে কম। কারণ রবিবারে সাংসারিক বহু কর্ম্ম শেষ করিতে, বন্ধুবান্ধব আত্মীয়স্বজনের সঙ্গে আলাপ ও পরিচয় ঝালাইয়া লইতে, পরিজনের কাহাকেও আদর, কাহাকেও নূতন জিনিষ কিনিয়া দিবার প্রতিশ্রুতি, আগামী শনিবার বাড়ী আসিবার কালে শহর হইতে যে-সব জিনিষ আসিবে তাহার ফর্দ্দ তৈয়ার ইত্যাদিতে রাত্রি একটু গভীর হইয়াই পড়ে; অতঃপর শয়ন মাত্রই যে নিদ্রা আসে না, এ কথা বলাই বাহুল্য। কিন্তু নিজের হক সীমানায় অনধিকারপ্রবেশ নিদ্রাদেবী পছন্দ করেন না। ট্রেনে আসিয়া বসিলেই তিনিও দুটি চোখে চাপিয়া বসেন, সুতরাং কোলাহলের পরিবর্ত্তে শান্তিই বিরাজ করে ট্রেনখানিতে। ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ মাইল ধরিয়া নিদ্রাদেবীর একাধিপত্য থাকে, তার পর দৈনিক যাত্রীদের কোলাহলে সপ্তাহগামীদের সঙ্কুচিত হইয়া বসিতে হয়; নিদ্রা যায়, থাকে আলস্য। খানিক চাহিয়া, খানিক চোখ বুজিয়া, খানিক পা তুলিয়া, খানিক বা বেঙ্কে দেহ এলাইয়া সেই নিদ্রাজড়িত আলস্য-উপভোগ দেখিবারই জিনিষ। কিন্তু নিষ্করুণ হালিশহর ষ্টেশনে পৌঁছিতেই—সেটুকুরও শেষ হইল। গাড়ীর দুয়ার খুলিয়া জন-তিনেক লোক দুটি স্ত্রীলোককে উঠিবার জন্য পুনঃ পুনঃ তাড়া দিতে লাগিল।

এই সব ছোটখাট ষ্টেশনে অল্পদূর হইতে আগত ট্রেনও এক মিনিটের বেশী থামে না, অথচ স্ত্রীলোক দুটির প্ল্যাটফরম ত্যাগ করিবার বিশেষ তাড়া দেখা গেল না। আহ্বানকারী লোক তিনটি স্ত্রীলোক দুটির গজেন্দ্রগমনে যেন ক্ষেপিয়া গেল এবং উহারই মধ্যে জন-দুই গাড়ী হইতে নামিয়া ছুটিয়া স্ত্রীলোক দুটির নিকটে গেল ও কোন কথা না বলিয়া তাহাদের হাত ধরিয়া হিড়হিড় করিয়া টানিয়া আনিয়া ট্রেনে তুলিল।

ট্রেনে ত তুলিল, স্ত্রীলোক দুটিও তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল। সে চীৎকারে যাহার চোখে যতটুকু তন্দ্রা লাগিয়া ছিল এক নিমেষে দূর হইয়া গেল এবং সকলেই খাড়া হইয়া বসিয়া প্রশ্ন করিতে লাগিলেন,—কি, কি, ব্যাপার কি?

লোকগুলির চেহারা কাল। কাল হইলেই তাহারা যে মজুরশ্রেণীর হইবে এমন কথা নহে, কিন্তু সত্য বলিতে কি তাহারা ওই শ্রেণীরই। কেহ চাষী, কেহ হয়ত পাটকলে মজুর খাটিয়াও থাকে। কাল, বেঁটে এবং কথাবার্ত্তায় গ্রাম্যসুলভ কর্কশত্বও যথেষ্ট। স্ত্রীলোক দুটির মধ্যে একটির বয়স পঞ্চাশ পার হইয়াছে, আর একটি যুবতী—কোলে তার মাস-ছয়েকের একটি শীর্ণ শিশু—কোলাহলে ও ক্রন্দনে হয়ত ভীত হইয়া মায়ের বুকে মুখ লুকাইয়া স্তন্যপান করিতেছে। দু-জনেরই কাপড় অত্যন্ত ময়লা, মাথার চুলগুলিরও তেমন যত্ন নাই। অভাবে ও অপরিষ্কারে দেহের লালিত্য ত নাই-ই—বয়স অনুমান করাও দুঃসাধ্য। কাঁদিতেছিল দুই জনেই। বুড়ী কাঁদিতেছিল—তাহাকে টানিয়া ট্রেনে তোলা হইয়াছে—হাতে পায়ে সামান্য চোট লাগিয়াছে সেই জন্য, বউটির কান্না অন্য ধরণের। বুড়ী কিছুক্ষণ কাঁদিয়া সঙ্গীদের গালি দিয়া চুপ করিল, বউটি কিন্তু কাঁদিতেই লাগিল। যত ক্ষণ নৈহাটী ষ্টেশন না আসিল, তত ক্ষণ সে রোদনের মর্ম্মার্থ কেহ গ্রহণ করিতে পারিলেন না।

নৈহাটী আসিতেই সন্দেহের নিরসন হইল। লোক তিনটি নামিল, বুড়ীও বিনা আপত্তিতে নামিল ও বউটিকে নামিতে বলিল। কিন্তু ছেলে কোলে চাপিয়া বউ এবার তারস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল,—ওগো আমায় কেটে ফেলবে গো, আমায় কেটে ফেলবে।

আর একবার ট্রেনের সকলে সচকিত হইয়া উঠিলেন। বউটির চীৎকারে তিনটি লোকই অস্থির হইয়া উঠিল, কেহ বউটির হাত ধরিয়া নামাইবার চেষ্টা করিল, কেহ বা কণ্ঠস্বর যথাসম্ভব কোমল করিয়া বউটিকে সান্ত্বনা দিবার ছলেই যেন কহিল, ভয় কি, নেমে এস না।

বউ কিন্তু এক ভাবে জানালার কাঠ চাপিয়া ধরিয়া তারস্বরে চীৎকার করিতে লাগিল, ওগো আমায় কেটে ফেলবে গো, আমায় কেটে ফেলবে।

প্লাটফরমে লোক জমিয়া গেল, অদূরে রেলওয়ে পুলিসের লাল পাগড়ি দেখা গেল—কামরার লোকগুলিও সমস্বরে প্রশ্ন করিতে লাগিলেন—কি, ব্যাপার কি?

লোক তিনটি বউয়ের চীৎকারে স্তম্ভিত হইয়া গেল এবং মনে মনে যথেষ্ট ক্রুদ্ধ হইলেও সে ক্রোধ প্রকাশ করিল না। একবার হালিশহর হইতে টানিয়া বউটিকে উহারা ট্রেনে তুলিয়াছে, পুনরায় বল প্রকাশ না করিলে সাধ্য কি উহাকে নামায়। চারি দিকের গোলমালের মধ্যে শেষ চেষ্টা স্বরূপ বউটির হাতে উহারা হেঁচকা টান দিল। বউ তখন প্রাণপণ শক্তিতে জানালার কাঠ চাপিয়া ধরিয়াছে—গর্তের মধ্যে মুখ লুকাইলে সাপের যে অবস্থা হয়, সেইরূপ। যদিও উহাদের টানাটানিতে বউয়ের ডান হাতখানি ছিড়িয়া যায় তথাপি ট্রেন হইতে বউকে যে নামাইতে পারিবে সে ভরসা কম। এদিকে দর্শকেরা লোকগুলির উপর রুখিয়া উঠিতেই উহারা বউটির হাত ছাড়িয়া পুনরায় অনুনয়-বিনয় সুরু করিল,—ওগো বাছা, তোমার পায়ে পড়ি নাম। ব্যগ্রতা করি নাম।

বউ কাঁদিতে কাঁদিতে বলিতে লাগিল—ওগো কেটে ফেলবে গো, কেটে ফেলবে।

এক জন বলিল, তবে একটু চুপ করে ব'স, আমি তোমার টিকিট নিয়ে আসি।—বলিয়া সে সরিয়া পড়িল। দেখা গেল, তাহার সঙ্গীরাও তাহার অনুবর্ত্তী হইয়াছে।

বলা বাহুল্য, টিকিট লইয়া কেহ ফিরিল না।

যথাসময়ে ঘণ্টা বাজাইয়া গাড়ী ছাড়িল এবং কামরার মধ্যে বউ পুনরায় ঘোমটা টানিয়া নিশ্চিন্ত মনে ছেলেকে স্তন্যপান করাইতে লাগিল।

এত বড় একটা ঘটনার পর বউ নিশ্চিন্ত হইতে পারে, ট্রেন-যাত্রীরা চোখ বুজিয়া থাকেন কি করিয়া? কি করিয়া পরম আরামে পান চিবাইতে চিবাইতে তাহারা ছিন্ন কাহিনীর সূত্র ধরিয়া অগ্রসর হন বা তাস পাতিয়া 'সেতু' রচনায় মনোনিবেশ করেন? সকলেই বউটির মুখের পানে চাহিয়া সকাতরে, সবিনয়ে ও সনির্ব্বন্ধে জিজ্ঞাসাবাদ আরম্ভ করিলেন।

বউ কাহারও প্রশ্নরাশির প্রতি কটাক্ষপাত না করিয়া পাশের বর্ষীয়সী হিন্দুস্থানী মহিলার সঙ্গে মাঝে মাঝে কথা বলিতে লাগিল।

বোঝা গেল হিন্দুস্থানী মহিলাটি বাংলা বোঝেন ভাল এবং অন্যান্য যাত্রীর মত এই ঘটনা সম্বন্ধে তাঁহারও কৌতূহল কিছুমাত্র কম নহে।

হিন্দুস্থানী রমণীর পানে বউ যখন মুখ ফিরাইয়া বসিয়াছে ও ঘোমটা অল্প নামাইয়া অসংখ্য প্রশ্নের জবাব দিয়া চলিয়াছে, তখন আসল খবর বাহির হইতে মিনিটখানেকও বিলম্ব হইবে না। প্রবল জলোচ্ছ্বাস বাঁধ বাঁধিয়া কতক্ষণ রাখা যায়। প্রথমে বাঁধের তলদেশ চোয়াইয়া জল গড়াইতে থাকে, তার পর হুহু শব্দে বন্যা আসে। ট্রেনস্থ লোকগুলির কৌতূহলের ফসল—বন্যাবেগ-নিবৃত্তির সঙ্গে সঙ্গে যে আশাতীত রূপে সমৃদ্ধিশালী হইয়া উঠিবে, সে-বিষয়ে নিঃসন্দেহ।

হিন্দুস্থানী রমণী বউয়ের কাহিনী শুনিয়া ট্রেনস্থ সকলের প্রশ্নের যে-ভাবে উত্তর দিলেন, তাহাতে বোঝা গেল, বাংলা বলার ক্ষমতা উহার আছে এবং স্ত্রীলোক হইয়া স্ত্রী-হৃদয়ের মনস্তত্ত্ব বিশ্লেষণের দক্ষতাও কোন বঙ্গরমণীর চেয়ে কম নহে।

বউয়ের নাম সুশীলা। বাপের বাড়ী সোদপুর। বাপের অবস্থা মোটেই সচ্ছল নহে। পাটের কলে কাজ করিয়া যাহা পায় তাহাতে বৃহৎ পরিবারের কোনক্রমে দিন-গুজরান হয়। মেয়েরাও কিছু কিছু শারীরিক পরিশ্রম করিয়া থাকে। না করিলে এক বেলা উপবাস সুনিশ্চিত। যেমন অন্যের বাড়ী ধান ভানা, ডাল তৈয়ারী করা, গোবর কুড়াইয়া ঘুঁটে তৈয়ার ও বিক্রয়, কোন গৃহস্থবাড়ীতে কলসী করিয়া গঙ্গাজল যোগানো ইত্যাদি। দিন না চলিলেও

মেয়ের বিবাহ না দিলে চলে না। সুতরাং নৈহাটী-নিবাসী পাটকলের মজুর ঘনশ্যামের সঙ্গে বিনা-পণে সুশীলার বিবাহ হইয়া গেল। বিবাহ হইবার পর জানা গেল, ঘনশ্যাম ইতিমধ্যে দুটি পত্নীর পাণিপীড়ন করিয়াছে। একটি মরিয়াছে—আর একটি বর্ত্তমান। যেটি বর্ত্তমান সেটির সঙ্গে বনিবনাও না হওয়ায়—তৃতীয় দারগ্রহণ।

কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, ঘরবসত করিতে গিয়া সুশীলা দেখিল, দ্বিতীয়া হাজির হইয়াছে। হয়ত সপত্নীর হাতে সংসার-সাম্রাজ্য ছাড়িয়া দিয়া বনবাসিনী হইতে সে একান্ত অনিচ্ছুক।

পাটকলের মজুর—সংসার তার সাম্রাজ্যই বটে। তবু বহুজনপরিবৃত সুশীলার পিত্রালয়ে যে-অভাব অহরহ লাগিয়া আছে, এখানে তার তীব্রতা কিছু কম। সংসারে একপাল ছেলেমেয়ে নাই, নারী-গোষ্ঠির কোলাহল নাই, কলহ নাই, দুই বেলা কি রান্না হইবে বলিয়া মাথা ঘামাইতে হয় না।

ঘনশ্যাম লোকটি নেহাৎ মন্দ নহে, সুশীলাকে আদরযত্ন যথেষ্টই করিল, এমন কি নিজের পকেট হইতে চাবির গোছা বাহির করিয়া বউয়ের আঁচলে বাঁধিয়া দিয়া কহিল—আজ থেকে নিজের সংসার বুঝেসুজে নাও।

সুশীলা নেহাৎ বালিকাবধূ নহে, বলিল—দিদি যদি কেড়ে নেয়?

ঘনশ্যাম হাসিয়া দেওয়ালের পানে অঙ্গুলি নির্দ্দেশ করিল—কোন কথা কহিল না।

লণ্ঠনের আলোয় দেখা গেল—একখানা চকচকে জিনিষ সেখানে টাঙানো রহিয়াছে—অনেকটা কুড়ুলের মত।

সুশীলা সভয়ে জিজ্ঞাসা করিল, ওটা কি?

ঘনশ্যাম হাসিয়া বলিল—ওই দিয়ে পরশুরাম মাতৃহত্যা করেছিলেন—ওর নাম টাঙ্গি। বেজায় ধার ওতে। তোমার দিদি যদি কথা না শোনে ত···বুঝলে—বলিয়া নিজের রসিকতায় টানিয়া টানিয়া হাসিতে লাগিল।

ভয়ে সুশীলার মুখ এতটুকু হইয়া গেল। সপত্নীকে সে সহ্য করিতে পারিবে না সত্য, তাই বলিয়া টাঙ্গির ঘা খাইয়া সে বেচারী প্রাণ দিবে! ঘনশ্যামের মনে কি একটুও মায়া নাই, ভয় নাই?

কিন্তু ভাবনার অবসর ঘনশ্যাম তাহাকে দিল না। এমন ভাবে সুশীলাকে আদর করিতে লাগিল—যাহাতে ঐ সব চিন্তার কণামাত্রও আর তাহার মনে অবশিষ্ট রহিল না।

সপত্নীর নাম কাদু—ভাল নাম কাদম্বিনী। সকালে মিলের বাঁশী শুনিয়া ঘনশ্যাম যাই বাহিরে গিয়াছে—অমনই হাসিতে হাসিতে সে সুশীলার ঘরে ঢুকিল। বলিল, কি লো, আদরিণী রাধা, বলি সারা নিশি কাটল কেমন?

স্বামীর আদর পাইয়া সুশীলা তখন সত্যকার সম্রাজ্ঞী হইয়াছে; হাসিয়াই বলিল, মন্দ কি!

কাদু বলিল—মন্দ নয় তা জানি। তৃতীয় পক্ষের কিনা! কিন্তু আমাদের বেলায়ও অমনি আদর, অমনি হাতে চাঁদ তুলে দেওয়া ছিল। তার পর এক দিন—

সে সহসা চুপ করিল।

কৌতূহলী সুশীলা বিছানার উপর উঠিয়া বসিয়া জিজ্ঞাসা করিল—এক দিন কি?

—সে পরে বুঝবে'খন, এখন বলে লাভ কি!

সুশীলার শত অনুরোধেও কাদু মুখ খুলিল না। হাসিয়া বলিল—চাবিটা দে দেখি, দুখানা পরোটা ভাজি। বড় খিদে পেয়েছে!

সুশীলা সবিস্ময়ে বলিল—এত সাত-সকালে পরোটা খাবে?

কাদু বলিল—কি করি বল, আদর পেয়ে ত পেট ভরাই নি—পরোটা দিয়েই পেট ভরাতে হবে। গুণনিধি ঘণ্টা-দুই পরে ফিরবেন, তখন মাথা কুটলেও মুড়ির আধলা মিলবে না।

সুশীলা বলিল—তা যাই হোক, মেয়েমানুষের এত সকালে খাওয়া অলক্ষণ।

হিহি করিয়া কাদু হাসিয়া উঠিল। কহিল, অলক্ষণ! অলক্ষণই ত! এ বাড়ীতে সুলক্ষণ করবে কে লো? তুমি? ওরে আমার গিন্নি রে! দেখা যাক কদিন গিন্নীপনা চলে। আর একটি এলে তুমিও জুলজুল্ ক'রে পরোটার জন্যে চেয়ে থাকবে আর হাত পাতবে। চাবি গিয়ে উঠবে তাঁর আঁচলে।

বিস্ময়ে চোখ কপালে তুলিয়া সুশীলা কি বলিতে যাইতে-

ছিল বাধা দিয়া কাদু বলিল—আমার দিকে চেয়ে দেখ দিকি, সত্যি বল—আমি তোমার চেয়ে কুচ্ছিত কি? সত্য বলিতে কি, কাদু সুন্দরী। বয়সে সুশীলার চেয়ে কিছু বড় হইলেও তেমন বড় দেখায় না। রং ফরসা, অঙ্গসৌষ্ঠব আছে, পান খাইয়া ঠোঁট দুখানি তার লাল টুকটুকে। ফরসা কাপড় পরে, হাসিয়া কথা বলে। পাটকলের মজুরের স্ত্রী হইলেও কাদু সুন্দরী বটে।

সুশীলার উত্তর না পাইয়া কাদু দেওয়াল হইতে আরসী টানিয়া মুখের সম্মুখে নাচাইতে নাচাইতে বলিল, তোমার চেয়ে আমার রং শুধু ফরসা নয়, নাক টিকলো, চোখ বড়, কপাল ছোট, ঠোঁট পাতলা, চুল কোঁকড়া। তোমার চেয়ে আমার কথা অবশ্য এক দিন মিষ্টি ছিল, আজ নয়। গড়ন? দাঁড়াও ত ভাই, দাঁড়াও না?—বলিয়া আরসী বিছানার উপর রাখিয়া সুশীলাকে সে দুই হাতে বেষ্টন করিয়া ধরিল।

অগত্যা সুশীলা উঠিল।

সে উঠিতেই কাদু হিহি করিয়া হাসিয়া কহিল, হা—তুমি একচ ঢেঙা। অন্ধকারে যদি চালের বাতা ধ'রে দাঁড়াও—হি—হি—হি।

সুশীলা বিরক্ত হইয়া বসিয়া পড়িল ও ঝাঁঝালো স্বরে বলিল, যাও।

কাদু হাসি থামাইল না, বলিল, যাবই ত। এ বাড়ীর মজা কি জান? যেমন খ্যাবা তেমনি দেবী না হ'লে মানায় না—দুঃখি নেই। দিদি ছিল আমার চেয়ে সুন্দরী, আমি এলাম এক কাঠি নিরেস, আর তুমি? যেমন খ্যাবা তেমনি দেবী!

সুশীলার বিরক্তির বদলে পুনরায় বিস্ময় জাগিল। কহিল, দিদি কে?

কাদু বলিল, দিদি—দিদি। তোমার—আমার। যিনি পাটরাণী গো। আমি যখন নতুন বৌ এলাম, তখন দিদির আঁচল থেকে চাবি উঠল আমার আঁচলে, আর লুকিয়ে দুখানা পরোটা খাবার জন্যে দিদি এমনি ক'রেই আমার কাছে হাত পাতল! আমি তখন সুয়োরাণী কিনা—তোমার মত গাধারে ভুঁয়ে পা পড়ে না। বললাম,—এই তুমি যা ব'ললে গো—'সাত সকালে খিদে—কি অলক্ষণ!' তার পর এক দিন ঘুম থেকে উঠে দেখি চাবি নেই আঁচলে। খোঁজ—খোঁজ। রান্নাঘরে গিয়ে দেখি, পরোটা তৈরি হ'চ্ছে, তরকারী নেই। শুধু পরোটাগুলো সে সেঁকছে আর গরম গরম খাচ্ছে। কি অলক্ষণ বল ত!

এতক্ষণে কাদুর হাসি থামিল, মুখখানি কেমন যেন থমথমে হইল, গলার হাল্কা সুরটি ক্রমশ মৃদু হইয়া আসিল। বলিল, কর্তা বাড়ী এলেন—অমনি বললাম সব কথা। কর্তা খানিক চুপ ক'রে থেকে হাসলে। তার পর দেওয়াল থেকে ওই সন্নেসে অস্ত্রখানা হাতে নিয়ে আঙুল ঠেকিয়ে ধার দেখতে লাগল। মুখে শুধু বললে, নষ্ট স্বভাবের মেয়েরা চুরি করে শুনেছিলাম—আজ চোখে দেখলাম। আচ্ছা, কাল এর ব্যবস্থা হবে।

—কেমন ভয়ে গা কেঁপে উঠল। অনেক ক্ষণ ঘুমুতে পারি নি। সকালে উঠে দেখি, ও কলে কাজ করতে গেছে, দিদি নেই। বাড়ী এলে জিজ্ঞাসা করলাম, দিদিকে দেখছি না। হেসে বললে, তাকে আর দেখতেও পাবে না। ওই দেখ—ব'লে দেওয়ালে টাঙানো চকচকে অস্ত্রখানা দেখিয়ে দিলে। বেশী নয়, দুটি ফোঁটা রক্ত ওর গায়ে লেগে ছিল, ভয়ে হয়ত চীৎকার করতে যাচ্ছিলাম, ও মুখ চেপে ধ'রে শাসনের স্বরে বললে, চুপ, চেঁচিয়েছ কি দিদির সাথী হ'তে হবে। চুরি করার ফল।

কাদু চুপ করিল, সুশীলা পাথরের মতই বসিয়া রহিল। ভয়ে তার নিশ্বাস পর্যন্ত বন্ধ হইয়া আসিতেছিল। কাদুই সে নীরবতা ভঙ্গ করিয়া পুনরায় হাসিয়া উঠিল, কাজ কি ভাই চুরি ক'রে, ওর শাস্তি ত জানি!

সুশীলা ভয়ে ভয়ে বলিল, তুমি পরোটা খাবে, উনি যদি জানতে পারেন? সে-ও ত চুরি করা!

কাদু বলিল—চুরির সাক্ষী কে? তুমি নিশ্চয়ই বলবে না?

মৃদুস্বরে ভয়ে ভয়ে সুশীলা বলিল, না।

—তবে? বলিয়া কাদু কি ভাবিতে লাগিল।

সুশীলা ভয়ে ভয়ে প্রশ্ন করিল, তোমাকে ত উনি অত ভালবাসতেন, তোমার এ-দশা হ'ল কেন?

কাদু বলিল—দশা মানে—হতশ্রদ্ধা ত? তা কেন হবে না? আমিও ত কম সুন্দরী নই, দিদির স্বভাব যে আমাকেও পাবে না, তা কে বলতে পারে!

ঘনশ্যাম আষাঢ়ের মেঘের মত থমথমে চোখে দেওয়ালের পানে চাহিল ; খানিক আগাইয়া আসিয়া টাঙ্গিখানি হাতে তুলিয়া আঙুল দিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিল, অতঃপর যেন কিছু হয় নাই এমন ভাবে সেখানা যথাস্থানে রাখিয়া বলিল—যাও, উঠে রান্না করগে। আজ সকাল-সকাল খেয়ে একটু ঘুমুবো। কাল ভোরবেলায় ডিউটি আছে।

রান্না যা করিল সে সুশীলাই জানে। কোনটায় নুন পড়িল না, কোনটায় ঝাল দিল বেশী ; ডাল ধরিয়া একটু গন্ধও বাহির হইয়াছিল বইকি !

কিন্তু খাইতে বসিয়া ঘনশ্যাম অণুমাত্র অনুযোগ করিল না। অন্য দিন খুঁত ধরিয়া অনেক জিনিষ পাতে ফেলিয়া রাখে, আজ পরিতোষ সহকারে ডাল, তরকারি, ভাত চাহিয়া চাহিয়া খাইল। খাওয়া শেষ হইলে সুশীলাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—ঘরে এসে আলো জেল না যেন, আমি ঘুমুব।

ইতিমধ্যে কাদুর সঙ্গে সুশীলার কয়েক বার চোখাচোখি হইয়াছে, কিন্তু সুশীলা ভয়ে কি লজ্জায় কথা কহিতে পারে নাই। তাহাকে মুহূর্তের জন্যও সাবধান করিয়া দিতে পারে নাই যে আজ আবার ঘনশ্যাম টাঙ্গিতে হাত দিয়া তাহার ধার পরীক্ষা করিয়াছে। ভাবিল, একই বাড়ীতে এত কাণ্ড হইয়া গেল—কাদু কি কিছুই শোনে নাই ? কিছুই বোঝে নাই ?

পরদিন প্রাতঃকালে সুশীলা বুঝিতে পারিল, কাদু সবই শুনিয়াছে ও বুঝিয়াছে। না বুঝিলে এতক্ষণ সে হাসিতে হাসিতে আসিয়া হয়ত বলিত, কি লো সুয়ো, কাল রাত্তিরে মানের পালা জমল কেমন ? বলি, দুয়োরাণীর কি ঘুঁটে-কাটা ওপরে কাঁটা ?

যাক, বাঁচা গিয়েছে কাদু পলাইয়াছে। না পলাইলে...

হঠাৎ সুশীলার বুকখানা গুর গুর করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। মনে পড়িল কাদুর কথা, সকালে উঠে দেখি ও কলে কাজ করতে গেছে, দিদি নেই।...আর টাঙ্গিতে দু-ফোঁটা রক্ত !

ছুটিয়া সুশীলা শোবার ঘরে গেল ও হিড় হিড় করিয়া টুলখানা টানিয়া যে-দেওয়ালে টাঙ্গি টাঙান ছিল—সেইখানে আনিল। তার পর টুলের উপর উঠিয়া সে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে টাঙ্গির পানে চাহিল। না, চকচকে অস্ত্রখানির কোথাও শোণিতচিহ্ন নাই। প্রভাতের আলোয় সে যেন পূর্ব্বাপেক্ষা নিষ্কলঙ্ক শোভায় দীপ্যমান।

তবু বুকের স্পন্দন থামিতে চাহে না, মনের সন্দেহ ঘোচে না। কম্পিত হাতে অস্ত্রখানি তুলিতে গিয়াই সুশীলার নজর পড়িল তার বাঁটের দিকে। প্রভাতের উজ্জ্বল আলোয় দৃষ্টি তাহার প্রতারিত হইল না। অদৃশ্য জীবাণু যেমন অণুবীক্ষণের সাহায্যে স্পষ্টতর হইয়া উঠে তেমনই শুষ্ক দু-ফোঁটা ফ্যাকাসে রক্ত পরশুর কাঠের বাঁটে লাগিয়া আছে। কাদুর রক্ত ! হতভাগিনী কাদুর রক্ত !

চীৎকার করিয়া সুশীলা টুল হইতে পড়িয়া গেল।

* * *

কতক্ষণ পরে জানে না, জ্ঞান হইতেই সে চোখ মেলিয়া দেখিল সারা ঘরখানি লালে লাল হইয়া গিয়াছে। কপাল গা বহিয়া রক্ত ঝরিতেছে, টুল রক্তে মাখা। সুশীলার কাপড়, কেশ, হাত ও গহনা সবই লাল। আকাশের কোণে আরক্ত সূর্য্য গাছের মাথা ও বাড়ীর ভাঙা প্রাচীর রাঙাইয়া আকাশেও যেন আগুন ধরাইয়া দিয়াছে।

কাদুর দিদি গিয়াছে, কাদু নাই—এবার পালা সুশীলার। ওই নারী-শোণিত-লোলুপ পরশু অতৃপ্ত ক্ষুধায় শাণিত দৃষ্টিতে যেন সুশীলার পানে চাহিয়া আছে ! যুগ-যুগান্তরের তৃষ্ণা উহার নিষ্ঠুর রক্তপাত-পিচ্ছিল ঝকঝকে দেহে দ্বাদশ সূর্য্যের জ্যোতিতে জ্বলিতেছে।

সুশীলা আর অপেক্ষা করিল না। দুই বাহু বাড়াইয়া সুপ্ত শিশুকে কোলে টানিয়া লইল ও তাহার অকাল-নিদ্রাভঙ্গজনিত চীৎকারে কর্ণপাত না করিয়া ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটিতে লাগিল।

সেকালের ছাত্রসমাজ

শ্রীযোগেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়

সেকালের ছাত্রসমাজের সহিত একালের ছাত্রসমাজের যে কত প্রভেদ, তাহা আমার মত বৃদ্ধেরা সহজেই বুঝিতে পারিবেন। এই প্রভেদ বিশেষরূপে বুঝিতে পারা যায় ছাত্রদের বেশ-ভূষায় এবং আচার-ব্যবহারে।

আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলে পড়িতাম তখন বাইসিকেল ছিল না। সকল ছাত্রই পদব্রজে স্কুলে যাতায়াত করিত, দুই-চারি জন ধনবানের সন্তান ঘরের গাড়ীতে যাতায়াত করিত। আমাদের বাটী হইতে হুগলী কলেজ প্রায় তিন মাইল। কিন্তু আমাদিগকে প্রত্যহ দুই বেলা এই তিন মাইল তিন মাইল ছয় মাইল পথ পদব্রজে অতিক্রম করিতে হইত না। আমাদের সময়ে কলেজে ও স্কুলে ছাত্র লইয়া যাইবার জন্য অনেকগুলি নৌকা ছিল। প্রত্যেক নৌকায় বার-চৌদ্দ জন করিয়া ছাত্র যাইত। হুগলী কলেজ গঙ্গার উপরেই অবস্থিত, গঙ্গার পশ্চিম কূলে, উত্তরে বাঁশবেড়ে হইতে দক্ষিণে ভদ্রেশ্বর তেলিনীপাড়া এবং গঙ্গার পূর্ব্ব তীরে উত্তরে কাঁচড়াপাড়া হইতে দক্ষিণে শ্যামনগর মূলাযোড় পর্য্যন্ত সকল জনপদ হইতেই শত শত ছাত্র নৌকাযোগে যাতায়াত করিত। এইরূপ প্রায় পঁচিশ-ত্রিশ খানা নৌকা ছিল। বলা বাহুল্য যে, প্রত্যেক নৌকাতেই ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীর ছাত্র থাকিত। আমাদের নৌকাতে, আমাদের উপরি শ্রেণীস্থ এবং কলেজেরও কয়েক জন ছাত্র যাতায়াত করিতেন। তাঁহাদের সম্মুখে আমরা কখনও চপলতা বা বাচালতা করিতে সাহস করিতাম না, করিলেও তাঁহারা কখনও তাহা উপেক্ষা করিতেন না, কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে চপলতা করিতে দেখিলে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা যেরূপ শাসন করেন, উচ্চশ্রেণীস্থ ছাত্রগণ আমাদের সময়ে সেইরূপ নিম্নশ্রেণীস্থ ছাত্রগণের অশিষ্ট ব্যবহার দেখিলে শাসন করিতেন, এমন কি কর্ণমর্দ্দন পর্য্যন্ত করিতেন। আমরা আমাদের এক ক্লাস বা দুই ক্লাস উপরের ছাত্রদিগকেও অগ্রজের মতই সম্মান ও শ্রদ্ধা প্রকাশ করিতাম। আমাদের কোন ত্রুটি দেখিয়া তাঁহারা শাসন করিলে আমরা বিনা প্রতিবাদে তাঁহাদের শাসন মানিয়া লইতাম।

আমরা যখন ছাত্র ছিলাম, তখন কলিকাতার ছাত্রসমাজ কিরূপ ছিল জানি না, কারণ সে-সময় আমি কদাচিৎ কলিকাতায় আসিতাম, কলিকাতার ছাত্রসমাজের সহিত আমার কোন পরিচয় ছিল না। কিন্তু সেকালের চন্দননগর, চুঁচুড়া, হুগলী প্রভৃতি স্থানের ছাত্রসমাজের সহিত, এ কালের স্থানীয় ছাত্রসমাজের তুলনা করিলে স্পষ্টই বুঝিতে পারা যায় যে, গত পঞ্চাশ-ষাট বৎসরে, ছাত্রসমাজে শিষ্টাচার সম্বন্ধে কি ঘোরতর পরিবর্ত্তন হইয়াছে। এখন দেখিতে পাই যে, নিম্নশ্রেণীর ছাত্রগণের অধিকাংশই তিন-চারি ক্লাস উপরের ছাত্রগণের সহিত সমকক্ষভাবে "ইয়ার্কি" দিতে কিছুমাত্র ইতস্ততঃ করে না, কিন্তু আমাদের সময়ে আমরা এক ক্লাস উপরের ছাত্রদিগের সহিত সমান ভাবে মিশিতে কুণ্ঠা বোধ করিতাম। খেলার সময় উচ্চতর বা নিম্নতর ক্লাসের ছাত্রদিগের সহিত মিলিত হইয়া খেলা করিতাম বটে, কিন্তু ক্রীড়াক্ষেত্রেও দুই এক বৎসরের বয়োজ্যেষ্ঠ বা দুই এক ক্লাস উপরের ছাত্রদিগকে যথোচিত সম্মান করিতাম। যাহারা সেরূপ সম্মান করিত না, তাহাদিগকে আমরা অভদ্র মনে করিতাম।

আমরা যখন হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের প্রথম শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন আমাদের ক্লাসের যে-সকল ছাত্র বোর্ডিঙে থাকিত, তাহারা মধ্যে মধ্যে চন্দননগরে বেড়াইতে আসিত। সে-সময় চন্দননগরের মসিয়ে কুর্জন নামক এক জন ফরাসী ভদ্রলোক নিজের বাড়ীতে একটা ছোটখাট পশুশালা করিয়াছিলেন। তাহাতে সিংহ, বাঘ, হায়না, গণ্ডার, জিরাফ, বনমানুষ এবং নানা জাতীয় পশু এবং কয়েক প্রকার বানর ছিল। ঐ সাহেব নিজের নবনির্ম্মিত অট্টালিকাও নানা প্রকার বহুমূল্য সাজসজ্জায় সজ্জিত করিয়াছিলেন। তাঁহার সুসজ্জিত আবাস ও পশুশালা দেখিবার জন্য প্রত্যহ বহু

লোকের সমাগম হইত। আমাদের সতীর্থদিগের মধ্যে প্রায় সকলেই উহা দেখিবার জন্য অবকাশ পাইলেই চন্দননগরে আসিত এবং আমাদের বাটী কুজন সাহেবের বাটীর অদূরে ছিল বলিয়া প্রায়ই আমাদের বাটীতে আসিত। উহারা আমাদের বাটীতে আসিলে আমার জননী তাহাদিগকে জল-যোগ না করাইয়া ছাড়িতেন না। দূরবর্ত্তী স্থানের যে-সকল ছাত্র বোর্ডিঙে থাকিত তাহাদের পক্ষে প্রতি শনিবারে বাটী যাওয়া ঘটিয়া উঠিত না। তাহাদের মধ্যে কেহ কেহ "মুখ বদলাইবার জন্য" মাঝে মাঝে আমাদের বাটীতে আহার করিত। তাহারা শনিবারে স্কুলের ছুটির পর আমাদের সঙ্গে নৌকা করিয়া চন্দননগরে আসিত এবং সোমবার প্রাতে আহারাদি করিয়া আমাদের সঙ্গেই আবার স্কুলে যাইত। আমার যে-সকল সতীর্থ আমাদের বাটীতে আসিত, তাহারা সকলেই আমার মাকে মা বলিয়া ডাকিত, মাও তাহাদিগকে "তুই" বলিয়া সম্বোধন করিতেন। আমার ছোট ভাই ও ভগিনীরা তাহাদিগকে "দাদা" বলিয়া ডাকিত। ভ্রাতৃদ্বিতীয়ার পরের রবিবারে আমার মা তাহাদিগকে নিমন্ত্রণ করিয়া খাওয়াইতেন।

সেকালে ছাত্রসমাজে ধূমপান ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আমার বয়স যখন চৌদ্দ কি পনর বৎসর, সেই সময় আমার কোন সহপাঠীর অগ্রজকে আমি চুরুট খাইতে দেখিয়া অতিমাত্রায় বিস্মিত হইয়াছিলাম। তিনি তখন বোধ হয় কলেজে সেকেণ্ড ইয়ারে পড়িতেন। তাহার পূর্ব্বে আমি কোন ছাত্রকে ধূমপান করিতে দেখি নাই। আমাদের ধারণা ছিল যে বয়োবৃদ্ধ লোকেই ধূমপান করে, ছাত্রজীবনে উহা অস্পৃশ্য। আমাদের ছাত্রাবস্থায় সিগারেটের প্রচলন ছিল না। যাহারা ধূমপান করিত, তাহারা হুঁকা কলিকার সাহায্যে সম্পূর্ণ দেশীয় ভাবেই ধূমপান করিত; বাঙালীদের মধ্যে কদাচিৎ চুরুট ব্যবহৃত হইত, আমরা জানিতাম চুরুটটা সাহেবদিগেরই ব্যবহার্য্য। আজকাল দেখিতে পাই সিগারেট ও বিড়ি ছাত্রসমাজে পান ও চায়ের মত বহুল প্রচলিত হইয়াছে। আমি দেখিয়াছি সেকালে স্কুলের ছাত্রগণের মধ্যে তাম্বুলের ব্যবহারও খুব অল্পই ছিল। পান খাইলে জিব মোটা হয়, ইংরেজী শব্দের ঠিক উচ্চারণ হয় না, বোধ হয় এই ধারণা সেকালে ছাত্রসমাজে বদ্ধমূল থাকাতেই স্কুলের ছাত্রদের মধ্যে তাম্বুলচর্ব্বণের প্রথা খুব অল্প ছিল।

আমাদের ছাত্রাবস্থায় মফস্বলের কোথাও ফুটবল খেলা ছিল না। কলিকাতাতেও তখন বোধ হয় অতি অল্প লোকেই ফুটবলের সঙ্গে পরিচিত ছিলেন। সেকালে জিমন্যাষ্টিকেরই প্রচলন ছিল। প্রায় প্রত্যেক বড় বড় স্কুলে ছাত্রদের শরীরচর্চ্চার জন্য প্যারালাল বার, হোরাইজণ্টাল বার এবং ট্রাপিজ বার ছিল। স্কুলের বাহিরে প্রায় প্রতি পাড়াতেই একটা করিয়া জিমনাষ্টিক গ্রাউণ্ড বা আখড়া ছিল, সেখানে দশ-পনর জন বালক ও যুবক বৈকালে মিলিত হইয়া জিমন্যাষ্টিক করিত। জিমন্যাষ্টিক ব্যতীত কুস্তি, লাঠিখেলা প্রভৃতির আখড়াও ছিল। ভেলদিগ্‌দিগ্‌ বা কপাটীখেলা বাঙালী বালক ও যুবকগণের সর্ব্বাপেক্ষা প্রিয় ক্রীড়া ছিল। কিন্তু সেকালে আমাদের এই জাতীয় ক্রীড়াতে প্রতিযোগিতা ছিল না। স্থানীয় বালক ও যুবকগণ আপনাদের মধ্যেই এই খেলা করিত, অন্য স্থানের ছেলেদের সহিত প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইত না। পচিশ কি ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে আমি 'দৈনিক হিতবাদী'তে বাংলার জাতীয় ক্রীড়া সম্বন্ধে একটি প্রবন্ধ লিখিয়াছিলাম। তাহাতে আমি বলিয়াছিলাম যে, কি সভ্য কি অসভ্য সকল সমাজেই কোন-না-কোন প্রকার জাতীয় ক্রীড়া আছে। এই কপাটীখেলা বাংলার জাতীয় ক্রীড়া; অতি প্রাচীন কাল হইতে বাংলার বালক এবং যুবক সমাজে কপাটী খেলার প্রচলন আছে। ঐ প্রবন্ধ প্রকাশের কিছু দিন পরে, চন্দননগর প্রবর্ত্তক সঙ্ঘের প্রতিষ্ঠাতা এবং 'প্রবর্ত্তক' নামক মাসিক কাগজের সম্পাদক, আমার স্নেহভাজন শ্রীযুক্ত মতিলাল রায় তাঁহার সংস্থাপিত বিদ্যাপীঠের ছাত্রগণের মধ্যে কপাটী খেলা উন্নত প্রণালীতে প্রবর্ত্তিত করেন এবং ঐ খেলার কতকগুলি নিয়ম-কানুন প্রণয়ন করিয়া একখানি ক্ষুদ্র পুস্তিকা প্রকাশ করেন ও সেই পুস্তিকার মুখবন্ধ স্বরূপ, 'হিতবাদী'তে প্রকাশিত আমার সেই প্রবন্ধটি উদ্ধৃত করেন। মতিবাবুই প্রথমে ভেলদিগ্‌দিগ্‌ খেলার প্রতিযোগিতায় বিজয়ী দলকে একটি "শীল্ড" বা ঢাল প্রদান করিবার ব্যবস্থা করেন। ইহার পর প্রতিযোগিতায় অবতীর্ণ হইবার জন্য চন্দননগরের পালপাড়া,

গোন্দলপাড়া প্রভৃতি পল্লীর ছাত্রগণের দ্বারা কয়েকটি ভেলদিগ দিগ্ সমিতি গঠিত হয়। আজকাল কলিকাতা, বালী, কোন্নগর, শ্রীরামপুর, হাওড়া, হুগলী, চুঁচুড়া প্রভৃতি স্থানে বহু কপাটী বা ভেলদিগ দিগ্ সমিতি গঠিত হইয়াছে এবং বেশ সমারোহের সহিত ঐ খেলার প্রতিযোগিতা হয়। মতিবাবু আমাদের এই জাতীয় ক্রীড়াকে "ফুটবল" "ক্রিকেট" "টেনিস" প্রভৃতি বৈদেশিক ক্রীড়ার সমান মর্য্যাদা প্রদান করিয়া দেশবাসীর ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন, সন্দেহ নাই। জাতীয় খেলাধুলার প্রতি অনুরাগ আত্মমর্য্যাদাজ্ঞানেরই পরিচায়ক।

আমার মনে হয় যে, সেকাল অপেক্ষা একালের ছাত্রসমাজে আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান প্রবল হইয়াছে। সেকালে ছাত্রসমাজে দেশাত্মবোধ ছিল না বলিলে বোধ হয় অত্যুক্তি হয় না। আমাদের সমসাময়িক ছাত্রসমাজে স্বদেশপ্রেম বা স্বদেশানুরাগের সূত্রপাত হইয়াছিল কবিবর হেমচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভারতসঙ্গীত হইতে। তাঁহার সেই :—

বাজ রে শিঙ্গা বাজ এই রবে
সবাই স্বাধীন এ বিপুল ভবে
সবাই জাগ্রত মানের গৌরবে
ভারত শুধুই ঘুমায়ে রয়

আবৃত্তি করিতে করিতে সেকালের যুবকদের হৃদয় উৎসাহে স্ফীত হইয়া উঠিত। কিন্তু সেই উৎসাহ ঐ কবিতার আবৃত্তিতেই শেষ হইত। সেকালে কোন বাঙালী কোন শ্বেতাঙ্গের সহিত যে মারামারি করিতে পারে, তাহা আমরা ধারণাই করিতে পারিতাম না। কোন শ্বেতাঙ্গ কোন অন্যায় কার্য্য বা অত্যাচার করিলে তাহার প্রতিকার আমরা অসম্ভব বলিয়াই মনে করিতাম। সেকালের বাঙালীর এই ভীরুতা দর্শনে স্বর্গীয় কবি রাজকৃষ্ণ রায় লিখিয়াছিলেন—

একটা সাহেব যদি রেগে ওঠে
শতেক বাঙ্গালী প্রাণভয়ে ছোটে
'দে রে জল' বলি ভূমিতলে লোটে
ঘুষির প্রহারে কাতর হয়।

সত্যই এখনকার পঞ্চাশ-ষাট বৎসর পূর্ব্বে বাঙালীর ভীরুতা ও কাপুরুষতা এইরূপই ছিল। সেই জন্য আমরা বাল্যকালে যখন গল্প শুনিতাম যে, সর্ সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়ের কনিষ্ঠ ভ্রাতা জিতেন্দ্রনাথ একাকী চার-পাঁচটা গোরাকে মল্লযুদ্ধে হটাইয়া দিয়াছেন, বিলাতে গিয়া সেখানে সাহেবের সঙ্গে মারামারি করিয়া নাম কিনিয়াছেন, তখন আমরা জিতেন্দ্রনাথকে অতিমানব বলিয়া মনে করিতাম। আমরা বাল্যকালে দেখিয়াছি, হয়ত এক জন ফিরিঙ্গী, কি একটা কাবুলী রেলের গাড়ীর একটা কক্ষ একাকী অধিকার করিয়া বসিয়া আছে, অন্যান্য কক্ষে যাত্রীর খুব ভিড় হইয়াছে অথচ কোন যাত্রী সাহস করিয়া সেই ফিরিঙ্গী বা কাবুলীর অধিকৃত কক্ষে প্রবেশ করিতেছে না, কি জানি পাছে সে অপমান করে। এই অপমানের ভয়ে ন্যায্য অধিকার পরিত্যাগ যে কত বড় অপমান, সেকালের অতি অল্প বাঙালী তাহা হৃদয়ঙ্গম করিতে পারিত। একালের ছাত্রসমাজের তুলনায় যে সেকালের ছাত্রসমাজ অত্যন্ত ভীরু ও কাপুরুষ ছিল তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই।

মনে পড়ে ১৮৮৭ কি '৮৮ খ্রীষ্টাব্দে একবার ফরাসী গবর্ণমেন্ট ফরাসী ভারতে conscription বা বাধ্যতা-মূলক যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা প্রবর্ত্তনের চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে চন্দননগরে জনসাধারণের মধ্যে বিষম আতঙ্কের সঞ্চার হইয়াছিল। কনস্ক্রিপশন আইন অনুসারে যাহারা যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা করে, তাহাদিগকে বিদেশে গিয়া যুদ্ধ করিতে হয় না, যদি কখনও শত্রুপক্ষ তাহাদের দেশ আক্রমণ করে, তবে তাহাদিগকে দেশরক্ষার জন্য যুদ্ধ করিতে হয়। ফরাসী ভারতে ঐ আইন প্রবর্ত্তিত হইলে কোন ভারতীয় ফরাসী প্রজাকে ভারতের বাহিরে গিয়া যুদ্ধ করিতে হইত না, যদি কোন শত্রুপক্ষ ভারতে ফরাসী অধিকার আক্রমণ করিত তাহা হইলেই সেই শত্রুপক্ষের সহিত যুদ্ধ করিতে হইত। ফরাসী ভারতে সেরূপ যুদ্ধের কোন সম্ভাবনা ছিল না এবং ভবিষ্যতেও থাকিবে না, সুতরাং চন্দননগরের কোন যুবক কনস্ক্রিপশন তালিকাভুক্ত হইলেও তাহাকে কখনও কোন রণক্ষেত্রে পদার্পণ করিতে হইবে না, ইহা জানিয়াও লোকে ভয়ে অস্থির হইয়াছিল এবং যাহাতে ফরাসী ভারতে বাধ্যতামূলক সমর-শিক্ষা প্রবর্ত্তিত না-হয়, সেজন্য কর্তৃপক্ষের নিকট আবেদন করা হইয়াছিল। ঐ আবেদনের ফলেই হউক বা অন্য যে

কারণেই হউক, ফ্রান্সের কর্ত্তৃপক্ষ ফরাসী ভারতে কন্‌স্ক্রিপ্‌শনের আইন প্রবর্ত্তিত করেন নাই। যে চন্দননগর সেকালে কনস্ক্রিপ্‌শনের ভয়ে অস্থির হইয়াছিল, সেই চন্দননগরই ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দে, ইউরোপীয় মহাসমরে সর্ব্বাগ্রে স্বেচ্ছায় বাঙালী যুবকদলকে সৈনিকরূপে প্রেরণ করিয়াছিল। চন্দননগরের যুবকগণকে স্বেচ্ছায় সৈনিকবৃত্তি অবলম্বন করিতে দেখিয়া পণ্ডিচেরী, কারিকল, মাহে প্রভৃতি ফরাসী উপনিবেশের যুবকগণ যুদ্ধে অগ্রসর হইয়াছিল। ভাদ্দুনের রণক্ষেত্রে বাঙালী গোলন্দাজ সেনার সাহস ও রণকৌশল দর্শন করিয়া এক জন প্রবীণ ফরাসী সেনাপতি তাহাদের অশেষ প্রশংসা করিয়া বলিয়াছিলেন যে, ভাদ্দুনের রণক্ষেত্রে যদি এক রেজিমেণ্ট বাঙালী গোলন্দাজ সেনা থাকিত তাহা হইলে বহু পূর্ব্বেই জর্ম্মণ সেনাকে ভাদ্দুন পরিত্যাগ করিতে হইত। এখন যদি ফরাসী গবর্ণমেণ্ট ধাকায় ফরাসী ভারতে বাধ্যতামূলক সমরশিক্ষার ব্যবস্থার প্রবর্ত্তন করেন, তাহা হইলে চন্দননগরের শত শত বাঙালী যুবা স্বেচ্ছায় সমর-বিদ্যা শিক্ষায় অগ্রসর হইবে, তাহাতে কণামাত্র সন্দেহ নাই। পঁচিশ-ত্রিশ বৎসরের মধ্যে চন্দননগরের যুবক-সমাজের মনোভাবের এই প্রবর্ত্তন বিস্ময়কর নহে কি?

আজকাল আমরা দেখিতে পাই, জলপ্লাবন, দুর্ভিক্ষ, ভূমিকম্প প্রভৃতি দৈব রোষে বিপন্ন জনগণকে রক্ষা ও সাহায্য করিবার জন্য ছাত্রসমাজই অগ্রণী হয়। দেশহিতকর কার্য্যে অর্থের প্রয়োজন হইলে, ছাত্রগণই সর্ব্বাগ্রে অর্থসংগ্রহে প্রবৃত্ত হয়। এরূপ কার্য্য সেকালের ছাত্রসমাজে অজ্ঞাত, এমন কি ধারণারও অতীত ছিল। আমাদের বয়স যখন আট বৎসর কি নয় বৎসর, সেই সময়ে মান্দ্রাজে ভীষণ দুর্ভিক্ষ হইয়াছিল। সে-যুগে ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত 'সুলভ সমাচার' ছাত্রসমাজের বিশেষ প্রিয় ছিল। সেই 'সুলভ সমাচারে' মান্দ্রাজ দুর্ভিক্ষের এক-খানি চিত্র প্রকাশিত হইয়াছিল এবং সকলকে আর্থিক সাহায্য প্রেরণ করিবার জন্য আবেদন করা হইয়াছিল। বোধ হয় সেই চিত্র দর্শন ও আবেদন পাঠ করিয়া আমাদের স্কুলের শিক্ষকদিগের হৃদয় বিচলিত হইয়াছিল, তাই তাঁহারা এক দিন প্রত্যেক ক্লাসের ছাত্রদিগকে দুই আনা বা এক আনা করিয়া চাঁদা দিতে বলিয়াছিলেন। আমরাও চাঁদা দিয়াছিলাম। কিন্তু সেই দুর্ভিক্ষক্লিষ্টদিগকে সাহায্য করিবার জন্য স্কুলের উচ্চতর শ্রেণীর বা কলেজের ছাত্রদিগকে লোকের দ্বারে দ্বারে ঘুরিয়া পৃথক্ ভিক্ষা করিতে দেখি নাই। এই সকল ব্যাপারে যে সেকালের ছাত্রসমাজ অপেক্ষা একালের ছাত্রসমাজে কর্ত্তব্যজ্ঞান যথেষ্ট বৃদ্ধি পাইয়াছে তাহাতে সন্দেহ নাই।

সেকালের ছাত্রদের তুলনায় একালের ছাত্রগণ অত্যধিক বিলাসী হইয়াছে। একালের ছাত্রগণ ফুটবল প্রভৃতি ক্রীড়ার জন্য যৎপরোনাস্তি পরিশ্রম করিতে পারে বটে, কিন্তু সাংসারিক কার্য্যে তাহারা অত্যন্ত বাবু হইয়া পড়িয়াছে। এখনও পল্লীগ্রামে অনেক স্কুলের ছাত্রসমাজে শহরের ছাত্রদের মত বিলাসিতা প্রবেশ করে নাই সত্য, কিন্তু বালক ও যুবকগণ যেরূপ অনুকরণপ্রবণ, তাহাতে আর কিছু দিন পরে পল্লীগ্রামের ছাত্রসমাজেও বিলাসিতা প্রবেশ করিবে সন্দেহ নাই। সকল দেশেই রাজধানীই বিলাসিতার কেন্দ্রস্থল। রাজধানীর ফ্যাশান্ বন্যার জলের মত ধীরে ধীরে দেশের সর্ব্বত্র পরিব্যাপ্ত হইয়া পড়ে। কলিকাতার ছাত্রসমাজের অনুকরণ করে পল্লীগ্রাম অঞ্চলের ছাত্রগণ। সুতরাং কলিকাতার ছাত্রসমাজের সকল বিষয়ে বিশেষ সাবধান হওয়া উচিত।

আমরা বাল্যকালে, চন্দননগর গড়ের স্কুলে পড়িতাম। গড়বাটী নামক পল্লীতে ঐ স্কুলটি অবস্থিত বলিয়া লোকে সংক্ষেপতঃ উহাকে গড়ের স্কুল বলিত। ঐ স্কুল আমাদের বাটী হইতে অন্যূন দেড় মাইল বা তিন পোয়া দূরে। আমার বয়স যখন সাত বৎসর কি আট বৎসর তখন আমি ঐ স্কুলে প্রবেশ করি। আমাদের বাটীর নিকটে, ফরাসী মিশনরীদের "সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন" নামে আর একটি স্কুল ছিল কিন্তু তাহাতে ইংরেজী ও বাংলা শিক্ষার সুব্যবস্থা ছিল না, ফরাসী শিক্ষার প্রতি মিশনরীদের ঝোঁক ছিল বলিয়া তথায় ফরাসী শিক্ষাটাই ভালরূপ হইত। ঐ স্কুলে ফরাসী-বিভাগে ছাত্রদের বেতন ছিল না, সেজন্য ঐ স্কুলে ফরাসী-বিভাগে দরিদ্র ছাত্রগণই অধ্যয়ন করিত। যাঁহারা বাংলা এবং ইংরেজী শিক্ষা প্রয়োজনীয় বলিয়া মনে করিতেন, তাঁহারা পুত্রদিগকে গড়ের স্কুলেই ভর্ত্তি করিয়া দিতেন। সেই জন্য আমরা বাটীর কাছে সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশন

থাকিতেও দেড় মাইল দূরবর্ত্তী গড়ের স্কুলেই ভর্ত্তি হইয়াছিলাম। অন্যূন পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে, ফরাসী গবর্ণমেণ্ট মিশনরীদিগের হাত হইতে লোকশিক্ষার ভার স্বহস্তে গ্রহণ করাতে সেণ্ট মেরিজ ইনষ্টিটিউশনের মিশনরী শিক্ষকগণ চন্দননগর হইতে প্রস্থান করেন। গবর্ণমেণ্ট ঐ স্কুলের নাম পরিবর্ত্তন করিয়া উহাকে "ডুপ্লে কলেজ" নামে অভিহিত করিলেন, কিন্তু তখন উহাতে কলেজ বিভাগ ছিল না, এণ্ট্রান্স ক্লাস পর্য্যন্ত ছিল। কয়েক বৎসর পরে উহাতে কলেজ ক্লাস খোলা হয়। গবর্ণমেণ্টের হাতে আসিবার পর হইতেই ডুপ্লে কলেজে ইংরেজী শিক্ষার সুব্যবস্থা হয়।

সেকালের ছাত্রসমাজের প্রসঙ্গে ডুপ্লে কলেজের ইতিহাস অবান্তর হইলেও, বাটীর কাছে স্কুল থাকিতেও কেন আমরা গড়ের স্কুলে ভর্ত্তি হইয়াছিলাম, পাঠকগণ তাহা বুঝিতে পারিবেন। চন্দননগরের পশ্চিমে, বেজড়, নবগ্রাম, আলতাড়া প্রভৃতি গ্রামের বহু ছাত্রও গড়ের স্কুলে পড়িত। গড়ের স্কুল হইতে ঐ সকল গ্রামের দূরত্ব দুই ক্রোশ, আড়াই ক্রোশ হইবে। সুতরাং ঐ সকল গ্রামের ছাত্রগণকে গড়ের স্কুলে পড়িবার জন্য প্রত্যহ চার-পাঁচ ক্রোশ পদব্রজে যাতায়াত করিতে হইত। গ্রীষ্মের প্রখর রৌদ্র, বর্ষার বৃষ্টিধারা মাথায় করিয়া দশ-বার বৎসর বয়স্ক বালকগণ দুই ক্রোশ আড়াই ক্রোশ দূরবর্ত্তী স্কুলে পড়িতে যাইত, ইহা একালের কলিকাতা বা মফস্বলের শহরবাসী ছাত্রগণ বোধ হয় ধারণাই করিতে পারে না। তাহারা ফুটবল গ্রাউণ্ডে খেলার সময় বোধ হয় সাত-আট মাইল দৌড়াদৌড়ি করিতে পারে, কিন্তু এক মাইল দূরবর্ত্তী স্কুল বা কলেজে যাইতে হইলে ট্রাম কিংবা বাস্ না হইলে যাইতে পারে না। একদিন এক জন ভদ্রলোক দুঃখ করিয়া বলিতেছিলেন, "আজকালকার ছেলেরা ফুটবল খেলিবার সময় এক ঘণ্টা ধরিয়া দৌড়াদৌড়ি করিতে কষ্টবোধ করে না, কিন্তু বাজারে বা দোকানে যাইতে বলিলেই তাহাদের মাথায় বজ্রাঘাত হয়। সেদিন আমার ছেলেকে বাজারে যাইতে বলাতে সে উত্তর করিল সাইকেলে লিক্ হয়েছে, কি ক'রে যাব?" বলা বাহুল্য যে একালের অধিকাংশ ছেলেরই সাংসারিক কার্য্যে কোথাও যাইতে হইলেই বাইসিকেলে লিক্ হয়।

আমরা বাল্যকালে বোধ হয় মাসের মধ্যে পনর কি কুড়ি দিন জুতা না পরিয়াই স্কুলে যাইতাম। আমাদের যে জুতা ছিল না তাহা নহে, 'দেড় মাইল পথ যাইব, নাইবা জুতা পায়ে দিলাম' এই কথাটাই মনে হইত। আমাদের সময়ে স্কুলের বোধ হয় অর্দ্ধেক ছাত্র নগ্নপদেই স্কুলে যাইত আর আজকাল সেই গড়ের স্কুলে শতকরা পাঁচ জন ছেলে নগ্নপদে যায় কিনা সন্দেহ। সেকালের ছাত্রসমাজে বেশ-ভূষার পারিপাট্য ছিল না বলিলেই হয়। একখানা পরিধেয় কাপড় এবং গায়ে একটা জামা—তা সেই জামায় বোতাম থাকুক আর নাই থাকুক, ইহাই ছিল সাধারণ ছাত্রের বেশ। শীতকালে সেই জামার উপর একখানা মোটা চাদর অথবা দোলাই। যাহারা একটু সাজসজ্জা করিয়া যাইত তাহাদিগকে সকলে ,বাবু বলিয়া লজ্জা দিত। স্কুলে কোন ছাত্রের মাথায় 'সিঁতা' বা 'টেরি' ছিল না। আমরা যখন হুগলী কালজিয়েট স্কুলে এণ্ট্রান্স ক্লাসে পড়িতাম, তখন শিবচন্দ্র সোম মহাশয় হেড মাষ্টার ছিলেন। কোন ছাত্র সিঁতা কাটিয়া স্কুলে গেলে তিনি সেই ছাত্রের মাথায় হাত বুলাইতে বুলাইতে চুল এলোমেলো করিয়া দিতেন এবং বলিতেন, cultivate the inner part of your head, not the outer part. একালের ছাত্রদের বেশভূষার পারিপাট্য সম্বন্ধে অধিক বলা নিষ্প্রয়োজন, সকলেই তাহা দেখিতে পাইতেছেন। একদিন এক জন বৃদ্ধ ভদ্রলোক ট্রামে কয়েক জন স্কুলগামী ছাত্রকে দেখিয়া বলিয়াছিলেন, "এখনকার ছেলেরা সেজেগুজে শ্বশুরবাড়ী যাইতেছে কি স্কুলে যাইতেছে তাহা বলা কঠিন।" কথাটা মিথ্যা নহে।

পুত্রকন্যাদের স্কুলের বেশভূষা জোগান একালের দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত গৃহস্থদিগের পক্ষে একটা দায় হইয়াছে। এই দায় আরও বাড়াইয়াছে বর্ত্তমান শিক্ষাপ্রণালী। সেকালে একখানা কথামালা, বোধোদয়, আখ্যানমঞ্জরী, চরিতাবলী, পদ্যপাঠ প্রথমভাগ ও দ্বিতীয় ভাগ, লোহারামের ব্যাকরণ, শশিভূষণ বন্দ্যোপাধ্যায়ের ভূগোলসূত্র, প্রসন্নকুমার সর্ব্বাধিকারীর পাটীগণিত বহু বৎসর ধরিয়া স্কুলে চলিত। গৃহস্থ একবার কয়েকখানা পুস্তক কিনিয়া কিছু দিনের জন্য নিশ্চিন্ত হইতেন, সেই পুস্তক তাঁহার জ্যেষ্ঠ পুত্র, মধ্যম পুত্র, তৃতীয় পুত্র প্রভৃতি পরে পরে অধ্যয়ন করিত। ইংরেজী

স্কুলেও ঐরূপ ছিল, বার্ণার্ড স্মিথের বা পি. ঘোষের এলজেব্রা, এরিথ্‌মেটিক, ইউক্লিডের জিয়মেট্রি, লেনিজ গ্রামার, লেথ্‌ব্রিজের সিলেকশন্‌স্‌ প্রভৃতি পুস্তক বহু বৎসর ধরিয়া বিদ্যালয়ে পঠিত হইত। দরিদ্র ছাত্রেরা উপর ক্লাসের ছাত্রদের নিকট হইতে পুরাতন পুস্তক চাহিয়া লইয়া পড়িত। ছাত্রগণ প্রথমে শ্লেটে অঙ্ক কষিয়া পরে সেই অঙ্ক খাতাতে তুলিত। গড়ের স্কুলে তৃতীয় শ্রেণীর ছাত্রগণ পর্য্যন্ত স্কুলে শ্লেট লইয়া যাইত। আজকাল প্রতিবৎসর নূতন নূতন পাঠ্যপুস্তকের ব্যবস্থা হওয়াতে দরিদ্র ছাত্রদের অভিভাবকবর্গ অস্থির হইয়া উঠিয়াছেন। কেবল পাঠ্যপুস্তকে নিস্তার নাই, সঙ্গে সঙ্গে তাহার অর্থ-পুস্তকও চাই। আমাদের সময়ে এত অর্থ-পুস্তকের ছড়াছড়ি ছিল না। আমরা দুর্ব্বোধ্য শব্দের অর্থ ডিক্‌শনারি বা অভিধান দেখিয়া বাহির করিতাম ও খাতাতে লিখিয়া লইতাম। আমরা এণ্ট্রান্স ক্লাসে উঠিয়া প্রথমে ইংরেজী সাহিত্যের অর্থ-পুস্তক ক্রয় করিয়াছিলাম। সংস্কৃতের অর্থ-পুস্তক দ্বিতীয় শ্রেণীতে কিনিয়াছিলাম। আজকাল নিম্নশ্রেণীর ছাত্রদের হাতে বড়-একটা শ্লেট দেখিতে পাই না; অঙ্ক, শ্রুতিলিখন প্রভৃতি সমস্ত বিষয়ই কাগজে কলমে করিতে হয়। আমরা যখন নিম্ন শ্রেণীতে পড়িতাম, তখন "এক্সারসাইজ বুক" নামক খাতা কিনিতে পাওয়া যাইত না, অন্ততঃ মফস্বলে ছিল না, কলিকাতায় ছিল কি না বলিতে পারি না। আমরা ডিক্‌শনারি বা অভিধান দেখিয়া যে-খাতায় শব্দের অর্থ লিখিতাম, সে-খাতা আমরা নিজেরাই তৈয়ারী করিতাম। সুতরাং সকল ছাত্রের খাতা ঠিক একই আকারের হইত না।

আমাদের সময়ে ষ্টীল পেনের প্রচলন খুব অল্প ছিল। বাংলা হস্তাক্ষরের জন্য কঞ্চি, শর, খাগড়া বা পাহাড়ে কলমীলতার কলম ব্যবহার করিতাম, ইংরেজী হস্তাক্ষরের জন্য কুইল পেন বা হংসপুচ্ছ লেখনী ব্যবহার করিতাম। বালকবালিকারা প্রথমেই ষ্টীল পেনে লিখিতে আরম্ভ করিলে হাতের লেখা পাকিতে বিলম্ব হয় এবং নিবের খোঁচাতে অনেক সময় কাগজ ছিঁড়িয়া যায়। আমরা বোধ হয় স্কুলে তিন-চারি বৎসর পরে ষ্টীল পেনে হাত দিয়াছিলাম। কুইল পেনের ব্যবহার আজকাল নাই বলিলেই হয়। ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষ এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কয়েক বৎসর আমি কলিকাতায় কোন সওদাগরী আপিসে কর্ম্ম করিয়াছিলাম। সেই আপিসের বড়সাহেব কখনও ষ্টিল পেন ব্যবহার করিতেন না, তিনি সর্ব্বদাই কুইল পেন ব্যবহার করিতেন, অনেক সময় খাগড়ার কলমেও লিখিতেন। তিনি অবসর লইয়া স্বদেশে যাইবার সময় আফিসের বড়বাবুকে বলিয়া গিয়াছিলেন যে তাঁহার জন্য যেন মধ্যে মধ্যে কিছু খাগড়ার কলম কাটিয়া তাঁহার কাছে পাঠান হয়। বড়সাহেব যত দিন জীবিত ছিলেন, তত দিন বড় বাবু প্রতি বৎসর বড়দিনের উপহারস্বরূপ পাঁচ-ছয় ডজন খাগড়ার কলম কাটিয়া তাঁহার কাছে পাঠাইয়া দিতেন।

আমরা যে-বৎসর হুগলী কলিজিয়েট স্কুলের তৃতীয় শ্রেণীতে পড়ি, সেই বৎসর স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বিরুদ্ধে আদালত-অবমাননার অভিযোগ ও বিচারে তাঁহার কারাদণ্ড হয়। এই ঘটনাই বোধ হয়, বাঙালী ছাত্রজীবনে রাজনীতিক আলোচনার সূত্রপাত করে। সুরেন্দ্র বাবুর কারাদণ্ড হইবার পর, কলিকাতার অধিকাংশ স্কুল কলেজের ছাত্রেরা কয়েক দিনের জন্য পাদুকা ত্যাগ করিয়া শুধু পায়ে বিদ্যালয়ে গিয়াছিল। হুগলী কলেজেও কলিকাতার সেই তরঙ্গ লাগিয়াছিল; কলেজ ক্লাসের অনেক ছাত্র পাদুকা ত্যাগ করিয়াছিল, কিন্তু আমাদের হেডমাষ্টার মহাশয় স্কুল-বিভাগের ছাত্রদিগকে পাদুকা ত্যাগ করিতে নিষেধ করাতে আমরা পাদুকা ত্যাগ করি নাই। বঙ্গ-ব্যবচ্ছেদ উপলক্ষেই আমাদের দেশের ছাত্রগণের মধ্যে রাজনৈতিক আন্দোলন প্রবর্ত্তিত হইয়াছিল। বিলাতী বর্জ্জন ও স্বদেশী গ্রহণ সম্বন্ধে সুরেন্দ্র বাবু প্রমুখ নেতৃবৃন্দ দেশে দেশে বক্তৃতা করিয়া ছাত্রসমাজে দেশাত্মবোধের সঞ্চার করিয়াছিলেন, ছাত্রগণ পিকেটিং প্রভৃতি দ্বারা সেই দেশাত্মবোধ কার্য্যে পরিণত করিয়াছিল। তাহার পূর্ব্বে ছাত্রসমাজকে দলবদ্ধভাবে অনুরূপ কোন কার্য্য করিতে বড় দেখা যাইত না। ভূতপূর্ব্ব বড়লাট লর্ড কার্জ্জন বঙ্গ ব্যবচ্ছেদ করিয়া বাঙালীর তথা বাংলার ছাত্রসমাজে, জাগরণ আনয়ন করিয়াছিলেন, তাহাতে সন্দেহ নাই।

একালের ছাত্রসমাজে যেমন অনেক গুণ আছে, সেইরূপ অনেক দোষও প্রবেশ করিয়াছে। সেকালের ছাত্রসমাজও দোষেগুণে মিশ্রিত ছিল। যাঁহারা সেকালের ছাত্রসমাজ দেখিয়াছেন, এবং একালেরও ছাত্রসমাজ দেখিতেছেন, তাঁহারা সহজেই উভয় কালের ছাত্রসমাজের পার্থক্য বুঝিতে পারিবেন। সেকালের ছাত্রসমাজের স্বদেশ ও স্বজাতির প্রতি আকর্ষণ এবং আত্মমর্য্যাদাজ্ঞান কম ছিল, একালের ছাত্রসমাজে অবিনয়, অশিষ্টতা, বিলাসিতা এবং সাংসারিক ব্যাপারে ঔদাস্য বৃদ্ধি পাইয়াছে, ইহা আমরা অর্থাৎ বৃদ্ধের দল বেশ সুস্পষ্টরূপে দেখিতে পাই।

রাঁচির কথা

শ্রীশরৎচন্দ্র রায়, রাঁচি

সকলেই জানেন যে রাঁচি ছোটনাগপুরের প্রধান শহর, এবং বিহার প্রদেশের দ্বিতীয় রাজধানী ও বিহারের লাটসাহেবের গ্রীষ্মাবাস। কলিকাতা হইতে আড়াই শত মাইল দূরে, এবং প্রায় ২২০০ ফুট উচ্চে অবস্থিত।

স্বাস্থ্যোন্নতি ও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য উপভোগের জন্য প্রতিবৎসর বহুসংখ্যক বাঙালী রাঁচিতে আগমন করেন। রাঁচির স্থায়ী বাঙালী অধিবাসীর সংখ্যাও অল্প নহে। কিন্তু এখানকার দ্রষ্টব্য স্থান ও জ্ঞাতব্য তথ্যগুলির পরিচয় অনেকেরই নাই। এই প্রবন্ধে সে সম্বন্ধে স্থূলতঃ দুই-এক কথা বলিতেছি।



দশমঘাঘ। ইহা রাঁচি জেলায় অন্যতম প্রসিদ্ধ জলপ্রপাত

প্রথমতঃ, এই অঞ্চলের প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের কথা। প্রকৃতিদেবী এই পার্ব্বত্য মালভূমিতে সৌন্দর্য্য বিতরণে বিশেষ কার্পণ্য করেন নাই। স্থানে স্থানে সুদূরবিস্তৃত ফলফুল-শোভিত বনরাজি, ইতস্ততঃ ক্ষুদ্র-বৃহৎ পাহাড় ও তাহার সানুদেশে ও উপত্যকার স্থানে স্থানে ধাপে ধাপে শ্যামল শস্যক্ষেত্র, মধ্যে মধ্যে আঁকাবাঁকা পার্ব্বত্য স্রোতস্বতী খরবেগে প্রবাহিতা, কোথাও নদীগর্ভে ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রস্তরখণ্ডসমূহ মস্তকোত্তোলন করিয়া দণ্ডায়মান, কোথাও বৃক্ষলতাসমাচ্ছন্ন গিরিগাত্রে শীর্ণকায়া ঝরণার জল প্রবহমান ও স্থানে স্থানে আদিম অধিবাসীদের সরল শান্ত নিভৃত পল্লী। বস্তুতঃ পরিমিত, অনুগ্র স্বাভাবিক সৌন্দর্য্যে এই অরণ্যবহুল মালভূমি নয়নাভিরাম। স্থানে স্থানে কচিৎ মহান্ ভাবগম্ভীর ভীমকান্ত নৈসর্গিক দৃশ্যও বর্ত্তমান। এই মালভূমিতে উৎপন্ন সুবর্ণরেখা, শঙ্খ, কাঞ্চী প্রভৃতি কয়েকটি নদী কোনও কোনও সমুন্নত পাহাড় উল্লঙ্ঘন করিয়া সমতলভূমিতে পতনকালে মনোমুগ্ধকর জলপ্রপাতের সৃষ্টি করিয়াছে, ও নিম্নে পতিত হইয়া অরণ্যাবৃত সঙ্কীর্ণ গিরিবর্ত্মের মধ্য দিয়া মনোহর সর্পিল গতিতে খরস্রোতে প্রবাহিত হইয়াছে।



দশমঘাঘ জলপ্রপাতের সন্নিকটে আদিম-নিবাসী খ্রীষ্টান ছাত্রগণ তাহাদের পাদ্রী শিক্ষকের সহিত তাঁবুতে অবস্থান করিতেছে

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য সম্পদে এ প্রদেশ অল্পবিস্তর সমৃদ্ধ হইলেও এখানে মনুষ্যকৃত সৌধ-শিল্প, কারু-শিল্প ও মূর্ত্তি-শিল্পের নিদর্শন অপেক্ষাকৃত বিরল। প্রাচীন স্থাপত্য ও ভাস্কর্য্যের যে কয়েকটি সামান্য নিদর্শন এখানে বর্ত্তমান, তাহার কোনটিই আনুমানিক চারি-পাঁচ শত বর্ষের পূর্ব্ববর্ত্তী নহে। রাঁচি হইতে ৪০ মাইল দূরস্থ 'ডোএসা' বা নগরের



শঙ্খ নদী। নদীগর্ভে ও তীরে ক্ষুদ্রবৃহৎ প্রস্তরসমূহ মস্তকোত্তলন করিয়া দণ্ডায়মান



গ্রাম্য (ডিহি-) কোড়োয়া জাতির কুটীর

'নওরতন' প্রাসাদ ও মন্দিরগুলির ভগ্নাবশেষ এবং রাঁচির সন্নিকটস্থ চুটিয়া, বোড়েয়া, ও জগন্নাথপুর গ্রামের মন্দিরগুলি খ্রীষ্টীয় সপ্তদশ ও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত। রাঁচি হইতে ৩০ মাইল পূর্ব্বে বুড়াডিহি গ্রামের প্রাচীন দেউলের ধ্বংসাবশেষ ও সুন্দর দেবীমূর্ত্তি আরও দুই-তিন শত বৎসরের পুরাতন বলিয়া মনে হয়।

আরও পূর্ব্ববর্ত্তী কালের দিকে দৃষ্টিপাত করিলে দেখা যায় যে, খ্রীষ্টীয় যুগের প্রারম্ভ হইতেই বাহিরের সহিত এ প্রদেশের যোগাযোগ আদান-প্রদান চলিত। প্রমাণস্বরূপ রাঁচি জেলায় খ্রীষ্টীয় প্রথম ও দ্বিতীয় শতাব্দীর কুশান সম্রাটদের কয়েকটি মুদ্রা ও আনুমানিক তৃতীয় হইতে ষষ্ঠ শতাব্দীর মধ্যবর্ত্তী অনেকগুলি "পুরীকুশান" মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, পরবর্ত্তী গুপ্ত, পাল ও সেনবংশীয় রাজাদের কিংবা উড়িষ্যার ভৌম অথবা গঙ্গবংশের রাজাদের কোনও মুদ্রা এ পর্য্যন্ত এখানে আবিষ্কৃত হয় নাই। কিন্তু কয়েকটি মোগল সম্রাটের এবং জৌনপুরের পঞ্চদশ শতাব্দীর মুসলমান সার্কি রাজাদের অনেকগুলি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, "পুরীকুশান" মুদ্রার বিশেষত্ব এই যে এ পর্য্যন্ত কেবল ছোটনাগপুর ও উড়িষ্যাতেই এই মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। রাঁচি, মানভূম,



হস্তে তীরধনু ও পৃষ্ঠে লাউয়ের জলপাত্র লইয়া একটি মুণ্ডা যুবক ও তাহার স্ত্রী-পুত্র। স্ত্রীর হস্তে ধান্য কুটিবার মুষল। পুরুষটির মস্তকে লম্বা টিকি



একটি হো যুবক



হো জাতির পুরুষ

(বরাহভূম) সিংভূম (রাখা-খনি), ময়ূরভঞ্জ, বালেশ্বর, পুরী ও গাঞ্জামে প্রাপ্ত এই সমস্ত পুরীকুশান মুদ্রায় কোনও রাজার নাম খোদিত নাই। বস্তুতঃ কেবলমাত্র কয়েকটি মুদ্রায় 'টঙ্ক' শব্দ ব্যতীত অন্য কোনও লেখ এ পর্য্যন্ত পাওয়া যায় নাই।

আর একটি অনুধাবনযোগ্য বিষয় এই যে, এই সব প্রদেশের ও তৎসন্নিকটস্থ কোনও কোনও স্থানের নামের অন্তে 'ভূম' প্রত্যয়ের ব্যবহার দৃষ্ট হয়, যেমন 'মানভূম' 'বরাহভূম' 'সিংভূম' 'ধলভূম' 'শিখরভূম' 'ভঞ্জভূম' (ময়ূরভঞ্জ), 'মল্লভূম' (বিষ্ণুপুর) 'তুঙ্গভূম' (মেদিনীপুর), 'বীরভূম' প্রভৃতি। সপ্তদশ শতাব্দীতে রচিত 'রসিক-মঙ্গল' পুস্তকে ছোটনাগপুরও 'নাগভূম' নামে আখ্যাত হইয়াছে। এই সমস্ত ভৌমান্ত প্রদেশের সহিত 'পুরীকুশান' মুদ্রার রাজাদের কিরূপ সম্বন্ধ ছিল এবং 'ভূম' শব্দটি কোনও বিশেষ কৃষ্টি সংজ্ঞিত করে কি না এ সম্বন্ধে গবেষণার প্রয়োজন আছে বলিয়া মনে হয়। এই প্রসঙ্গে উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, সমুদ্রতীরস্থ বালেশ্বর জেলা ও তৎসংলগ্ন মেদিনীপুর জেলার অনেকগুলি স্থানের নামের



তিনটি সাঁওতাল গ্রামনেতা

অন্তে 'চর' প্রত্যয় প্রযুক্ত হয়, যেমন মেদিনীপুর জেলার 'ককড়াচর', 'ময়নাচর', 'বরাইচর', 'কুরুলচর', 'দাতনচর', ইত্যাদি;—উত্তর বালেশ্বরে 'ভেলোরাচর', 'সবধাচর', 'কোমরদাচর', 'মূলদাচর', 'বংশদাচর' (বস্তা), 'আগ্রাচর', 'নাথোচর' ইত্যাদি। হয়ত যেমন সমুদ্রতীরস্থ ও নদীগর্ভস্থ পলিপড়া ভূখণ্ডকে 'চর' আখ্যা দেওয়া হয়, তেমনি এই



একটি বীরহোড় রমণী উদুখল ও মুষলে ধান কুটিতেছে। পিছে [illegible] কুলা



দুইটি খাড়িয়া গ্রামনেতা

সমস্ত পার্ব্বত্য অঞ্চল একবাক্যে 'ভূম' নামে অভিহিত হইত এবং ঐ নাম অবিচ্ছিন্ন একটি বিশেষ কৃষ্টির (Highland culture-এর) পরিচায়ক ছিল।

ছোটনাগপুরের কোনও স্থানে অশোক-স্তম্ভ বা অশোকের শিলালিপি নাই ও সমুদ্রগুপ্ত, খারবেল প্রভৃতি দিগ্বিজয়ী রাজাদের অভিযানের কোনও প্রমাণ বা কিম্বদন্তী নাই। মহাভারতের পাণ্ডবদিগ্বিজয়ের বিবরণে পাণ্ডবদের এ প্রদেশে আগমনের ইঙ্গিত পাওয়া যায় না, এজন্য ছোটনাগপুর 'পাণ্ডব-বর্জ্জিত' দেশের মধ্যে পরিগণিত হয়। তবে স্থানীয় কিম্বদন্তী এ প্রদেশকেই জরাসন্ধের কারাগার বলিয়া নির্দ্দেশ করে এবং প্রমাণস্বরূপ বলিয়া থাকে যে এখানকার কাকের স্বর অপেক্ষাকৃত মৃদু, এবং এখানকার টিকটিকি আদৌ টিক্‌টিক্ শব্দ করে না।

ঐতিহাসিক কাল ছাড়িয়া সুদূর প্রাগৈতিহাসিক কালের বিস্মৃত অতীতের সন্ধান করিলে দেখা যায় যে, মানবসভ্যতার উন্মেষ যুগ হইতে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত এ প্রদেশের ধরিত্রীর স্তরে স্তরে প্রত্নমানব নানা প্রকার চিহ্ন রাখিয়া গিয়াছে। পুরাতন প্রস্তর (Palaeolithic) যুগ, নব-প্রস্তর (Neolithic) যুগ, প্রস্তর-তাম্রমিশ্র (Chalcolithic) যুগ ও তাম্র যুগের অস্ত্রশস্ত্র ও অলঙ্কারাদি এ-প্রদেশে কোথাও কোথাও যাহা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহার কিছু নমুনা পাটনার যাদুঘরে রক্ষিত আছে। অপেক্ষাকৃত অল্প হইলেও তাহা হইতেই ছোটনাগপুরকে প্রাগৈতিহাসিক প্রত্নতত্ত্বের অনুশীলনের পক্ষে ভারতের অন্যতম আদি পীঠস্থান বলিয়া নির্দ্দেশ করা যাইতে পারে। কিন্তু পরিতাপের বিষয় এই যে এই পীঠস্থানে সাফল্যকামী তীর্থযাত্রীর অভাব। নব-প্রস্তর যুগের ও তাম্র যুগের প্রবর্ত্তিত শব-সমাধিকরণ ও সমাধিস্তম্ভ নির্ম্মাণ আজ পর্য্যন্ত অনেক মুণ্ডা, হো প্রভৃতি দু-একটি জাতির মধ্যে প্রচলিত।



তিনটি খ্রীষ্টান ওঁরাও ছাত্র



ওরাওঁ গ্রাম-বিদ্যালয়ের সম্মুখে ওরাওঁ শিক্ষক ও ছাত্রগণ



গ্রাম পূজাকালে ওরাওঁ রমণীর নৃত্য



একটি বৃদ্ধা ওঝাইন (ভূত-চিকিৎসক রমণী) মন্ত্র-তন্ত্র প্রয়োগের পূর্ব্বে পূজা করিতেছে

এখানকার প্রাগৈতিহাসিক প্রস্তর-তাম্র যুগের "অসুর" সভ্যতার নিদর্শনগুলি বিশেষ প্রণিধানযোগ্য।*

তার পর, এখানকার বর্ত্তমান কালের অধিবাসী ও বিশেষতঃ আদিম অধিবাসীদের কথা। এ সম্বন্ধেও ছোটনাগপুরের বৈশিষ্ট্য বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। এ প্রদেশ মানব-সভ্যতার বিভিন্ন স্তরের—বিশেষতঃ নানা অসভ্য ও অর্দ্ধসভ্য আদিম জাতিদের—আবাস-ভূমি।

মানবের ক্রমশঃ উদ্বুদ্ধমান ও নিত্য-প্রসারমান সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা কিরূপে মানবজাতিকে সভ্যতার নিম্নতম স্তর হইতে ক্রমিক উচ্চতর স্তরে লইয়া গিয়াছে, তাহার ধারাবাহিক ইতিহাস অনুশীলনের পক্ষেও ছোটনাগপুর নৃতত্ত্ববিদের একটি স্বর্ণভূমি (El Dorado)।

এখানে ওরাওঁ, মুণ্ডা, খাড়িয়া, বীরহোড়, হো, সাঁওতাল প্রভৃতি অনেকগুলি জাতি সভ্যতার শৈশব যুগের জীবন্ত নিদর্শনস্বরূপ বহু শতাব্দীর নির্যাতন ও বেদনার ভার বহন করিয়া "মূঢ়-ম্লান মূক মুখে" নতশিরে অবস্থান করিতেছে। ছোটনাগপুরের অনুর্ব্বর বন্ধুর ভূমিতে বহুযুগব্যাপী প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক অবস্থার প্রভাবে তাহাদের সভ্যতার গতি বহুকাল যাবৎ রুদ্ধ থাকায় এই সমস্ত জাতির পক্ষে বিশেষ বিপত্তির কারণ হইলেও, ইহারাই এতাবৎকাল সভ্যতার নিম্নতর স্তরগুলির প্রতিকৃতি সংরক্ষণ করিয়া মানবসভ্যতার ক্রমবিকাশের ইতিহাস অনুশীলনের পথ সুগম করিয়া রাখিয়াছে। এজন্য ইতিহাস, নৃতত্ত্ব, সমাজ-তত্ত্ব ও ভাষা-তত্ত্ব এমন কি সুকুমার সাহিত্য অনুশীলনের পক্ষেও এই সমস্ত পশ্চাৎপদ জাতির অস্তিত্ব নিরর্থক নহে; বস্তুতঃ বিশেষ সার্থক। কবির ভাষায় ইহাদের সম্বন্ধেও বলা যাইতে পারে—

যে নদী মরুপথে হারালো ধারা
জানি হে জানি তাও হয় নি হারা।
জীবনে আজও যাহা রয়েছে পিছে
জানি হে জানি তাও হয় নি মিছে।

* *Journal of the Bihar and Orissa Research Society*, September, 1920, দ্রষ্টব্য।



ওঁরাও-মুণ্ডা-শিক্ষাসভায় পরিচালিত রাঁচির ছাত্রাবাসের ছাত্র ও পরিচালকগণ। ইঁহারা খ্রীষ্টান নহে। ইঁহারা সকলেই স্বধর্ম্মনিরত

ছোটনাগপুরের আদিম জাতিগুলি সভ্যতার নিম্নতর স্তরবিন্যাসের কিরূপ জীবন্ত পরিচায়ক সে সম্বন্ধে স্থূলভাবে দুই-এক কথা বলিতেছি।

এখানকার পার্ব্বত্য কোড়োয়া, বীরহোড়, পহিড়া, খেঁড়ে প্রভৃতি মৃগয়াজীবী ও বন্যফলমূলভোজী কয়েকটি যাযাবর জাতি সভ্যতা-সোপানের প্রায় নিম্নতম-স্তরের উদাহরণস্থল। খাদ্যান্বেষণে লাঠি, কুঠার ও তীর-ধনুক লইয়া বন হইতে বনান্তরে—খণ্ডভাবে না হউক দুই-চারিটি বা ততোধিক পরিবার একত্রে—ঘুরিয়া বেড়ায়। অদ্যাবধি দুইটি কাষ্ঠখণ্ড পরস্পরের সহিত ঘর্ষণ করিয়া অগ্নি উৎপাদন করে। মূষিক বা পক্ষী প্রভৃতি ক্ষুদ্র শিকার দুই খণ্ড তাপরক্ত প্রস্তরের মধ্যদেশে রাখিয়া ঝলসাইয়া আহার করে। মৃগয়ালব্ধ হরিণ প্রভৃতি বৃহত্তর জন্তুর মাংস জলে সিদ্ধ করিয়া ভক্ষণ করে। ইহাদের মধ্যে অবস্থান করিয়া দেখিয়াছি যে, কখনও কখনও কয়েকটি পরিবার দুই-তিন দিন যাবৎ ক্ষুদ্র বা বৃহৎ কোন প্রকার শিকার না পাইয়া প্রায় অনশনে আছে এবং পরে শিকার হস্তগত হইলে লোলুপভাবে অর্দ্ধসিদ্ধ মাংস আকণ্ঠ ভোজন করিতেছে। ইহাদের কোনও কোনও জাতি অনতিপূর্ব্বে আম-মাংস ভক্ষণ করিত বলিয়া কিম্বদন্তী আছে। ইহাদের বালক-বালিকারা ক্ষুদ্র কীট-পতঙ্গ ধরিয়া সানন্দে গলাধঃকরণ করে। এখন পর্য্যন্ত কোনও কোনও পরিবার সময় সময় বস্ত্রের অভাবে বৃক্ষপত্র বা বল্কলের পরিচ্ছদ পরিধান করিতে বাধ্য হয়। ইহাদের পত্রকুটীরগুলি এত অনুচ্চ যে, হামাগুড়ি দিয়া তন্মধ্যে প্রবেশ করিতে হয়;



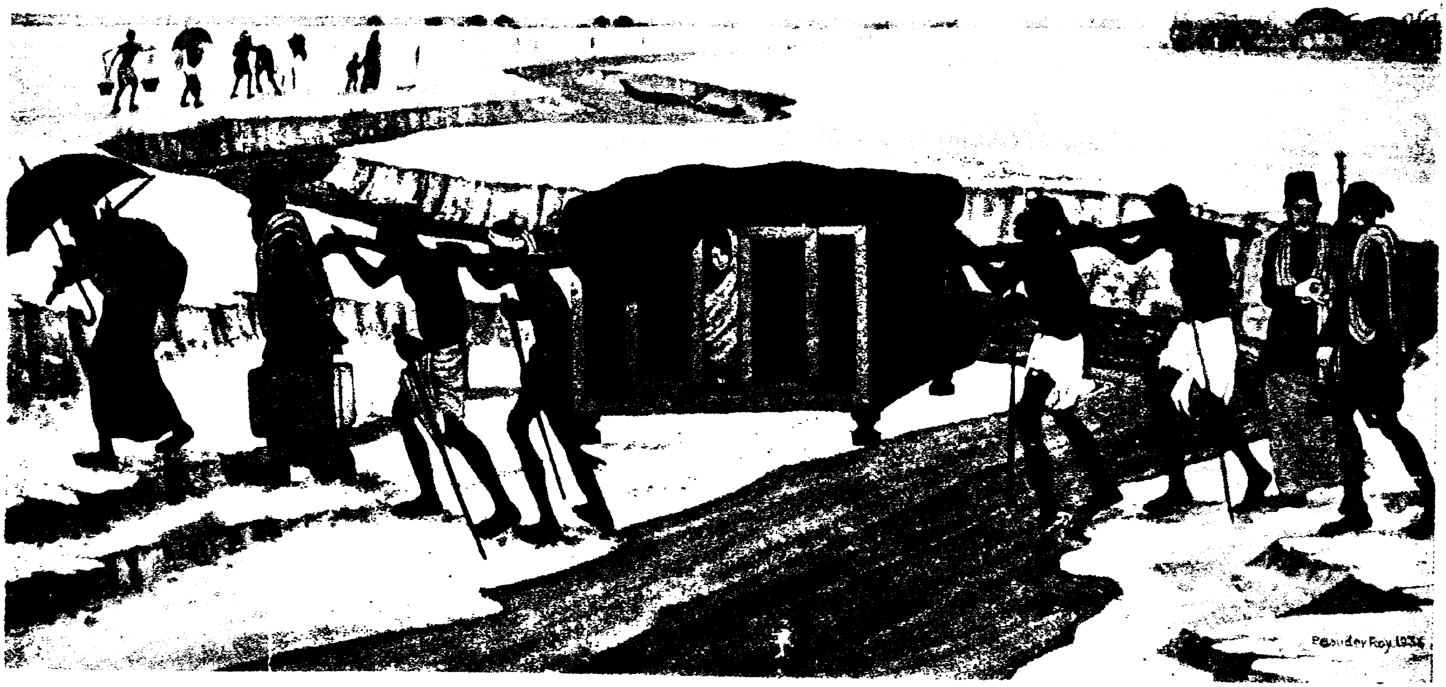
একটি শিক্ষিত খাড়িয়া পরিবার

কিন্তু এমন সুনিপুণভাবে নির্ম্মিত যে বর্ষার সময় তন্মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিয়াছি, যে, ভিতরে বিন্দুমাত্র বৃষ্টির জল প্রবেশ করিতে পারে না এবং তাহার অভ্যন্তরদেশ বেশ গরম থাকে।

এইরূপে এই সমস্ত অসভ্য জাতিরাও প্রকৃতির সঙ্গে কতকটা সংগ্রাম করিয়া ও আংশিকভাবে সামঞ্জস্য সাধন করিয়া লইয়া খাদ্য, আবাসস্থান ও পরিচ্ছদাদির সমস্যা এক প্রকার সমাধান করিয়া লইয়াছে।

ক্রয়-বিক্রয়ের পরিবর্ত্তে দ্রব্যবিনিময় (barter) প্রথা উহাদের মধ্যে সমধিক প্রচলিত। ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করে মাত্র, উৎপাদন করে না। যথেষ্ট খাদ্য সংগ্রহের জন্য বিস্তীর্ণ অরণ্যভূমির প্রয়োজন হয়। এজন্য বহু-সংখ্যক পরিবার একত্র দলবদ্ধ হইয়া এক স্থানে বাস করিতে পারে না।

যদিও খাদ্যসংগ্রহে ইহাদের প্রায় সমস্ত শক্তিই নিয়োজিত হয়, তথাপি এই নিরক্ষর ও প্রায় নিরন্ন জাতিদের মধ্যেও পারিবারিক ও সামাজিক বিধি বিধান ও নীতি-ধর্ম্মের সূত্রপাত হইয়াছে; বিবাহ, জাতকর্ম্ম ও অন্ত্যেষ্টিক্রিয়ার সরল পদ্ধতি নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে এবং দেবতার নিকট বলিদানের ও মানতের প্রথাও দৃষ্ট হয়। প্রত্যেক দল এক বা একাধিক দলপতি মনোনীত করিয়া সমাজবন্ধনের সূত্রপাত করিয়াছে। বুদ্ধিবলে বাহ্য প্রকৃতির উপর কর্ত্তৃত্ব স্থাপনের এবং নৃত্য-গীতাদির দ্বারা



ভাবরাজ্যের মধ্য দিয়া আত্মপ্রসারের যে প্রয়াস প্রাণী-জগতে মানব-জাতির বৈশিষ্ট্যের পরিচায়ক তাহার উন্মেষ ও কিঞ্চিৎ বিকাশ সভ্যতার এই নিম্নতম স্তরের জাতিদের মধ্যেও প্রকটিত।

ইহাদের প্রায় সমস্তরে এ-প্রদেশের গোড়াইত, ঘাসী, তুরি, ডোম, ভুঁইয়া প্রভৃতি 'দাস' জাতির স্থান। ইহারা প্রকৃতির সহিত সংগ্রামে এবং অধিকতর উদ্যমশীল জাতিদের সহিত জীবনসংগ্রামে পরাস্ত হইয়া ক্ষেতমজুর (field-labourer), ধীবর, বাদ্যকর প্রভৃতি রূপে ও নানা উঞ্ছবৃত্তি ও বিভিন্ন অমার্জিত হস্তশিল্প (rude handicrafts) দ্বারা কথঞ্চিৎ জীবিকা অর্জন করে। আত্মনির্ভরতা ও আত্ম-সম্মান হারাইয়া এই সমস্ত অন্ত্যজ-জাতি স্বীয় বিশেষ কোনও কৃষ্টি ফুটাইয়া তুলিতে চেষ্টা করে নাই। কিন্তু হিন্দু ধর্ম্মের প্রভাবে ইহাদের আচার-ব্যবহারে যৎসামান্য হিন্দু ভাব প্রবিষ্ট হইয়াছে। ইহা নামমাত্র। ইহাদের মধ্যে কোনও কোনও জাতি এখনও গো-মহিষাদি ও মৃত পশুমাংস ভক্ষণ করে এবং সে জন্য ইহারা হিন্দুদের 'অস্পৃশ্য'। যাহা হউক, ইহাদের মধ্যেও বৌদ্ধ ও বৈষ্ণব প্রভৃতি ধর্ম্মের প্রভাবে কচিৎ কখনও ব্যক্তিগত জাগরণ, তপস্যা ও মনুষ্যত্বের অভিব্যক্তি দেখা গিয়াছে। আর বর্ত্তমান কালে শিক্ষার প্রভাবে ও মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি মহানুভব ব্যক্তিদের প্রেরণার ফলে এই সমস্ত জাতি সভ্যতা-সোপানের উচ্চতর স্তরে আরোহণ করিবার জন্য যত্নবান হইতেছে।

যাযাবর আদিম জাতিদের অব্যবহিত উচ্চতর স্তরে এ প্রদেশের বিরজিয়া, অসুর, ডিহিকোড়োয়া প্রভৃতি কয়েকটি জাতি। ইহারা 'ঝুম' বা 'দাহি' প্রথায় আদিম ভাবে ভূমিকর্ষণ দ্বারা খাদ্য উৎপাদন করিতে চেষ্টা করে। জঙ্গলের এক অংশ অগ্নিসংযোগে দগ্ধ করিয়া তাহার ভস্ম-সারযুক্ত ভূমিতে সূক্ষ্মাগ্র কাষ্ঠদণ্ড কিংবা লৌহফলকযুক্ত আদিম 'খোন্তা' দ্বারা সামান্য কর্ষণ করিয়া বীজ বপন করে ও ভুট্টা, লাউ, কুমড়া প্রভৃতি উৎপাদন করে। দুই-তিন বৎসর এক স্থানে এইরূপ 'ঝুম' চাষ করিয়া উহা পরিত্যাগ করে ও জঙ্গলের অপর এক অংশে সেই প্রথায় চাষ করে। অধুনা ক্রমে জঙ্গল বিলুপ্ত হইবার আশঙ্কায় সর্ব্বত্র এ-প্রথা রহিত হইতেছে। এইরূপ আদিম ভাবের কৃষির দ্বারা খাদ্য সংগ্রহের পথ অপেক্ষাকৃত সুগম ও খাদ্যদ্রব্যের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য হওয়ায় ঐ সব জাতির সংখ্যা বৃদ্ধি, ও অবকাশ ও স্বাচ্ছন্দ্যের কিঞ্চিৎ বৃদ্ধি হইয়াছে, এবং গৃহ ও গৃহসজ্জা, বস্ত্রালঙ্কার ও যন্ত্রপাতির অপেক্ষাকৃত শ্রীবৃদ্ধি হইয়াছে। কতিপয় পরিবার একত্র দলবদ্ধ হইয়া গ্রাম স্থাপন করে। এরূপ সংযুক্ত শক্তির সাহায্যে সমাজবন্ধন অপেক্ষাকৃত দৃঢ় হইয়াছে এবং পরস্পরের সহযোগিতায় ইহারা প্রকৃতির উপর অপেক্ষাকৃত অধিকতর আধিপত্য স্থাপন করিতে সমর্থ হইয়াছে।

যদিও মৃগয়া ইহাদের উপজীব্য নহে, তবুও ইহারা অবসর বা প্রয়োজন মত কখনও কখনও বন্য পশুপক্ষী শিকার করিয়া ভক্ষণ করে। নিম্নতর যাযাবর জাতিদের অপেক্ষা অধিকতর অবসর ও স্বাচ্ছন্দ্য লাভের ফলস্বরূপ অবসরবিনোদন ও জীবনের সৌকুমার্য্য সাধনের পক্ষে ইহাদের অধিকতর সুবিধা ঘটিয়াছে। ইহাদের নৃত্যগীতাদি সামাজিক ক্রিয়াকাণ্ড ও পূজা-পার্ব্বণে ইহার পরিচয় পাওয়া যায়।

ইহাদের পরবর্ত্তী উচ্চতর স্তরে স্থায়ী কৃষিজীবী ওরাও, মুণ্ডা, খড়িয়া প্রভৃতি আদিম জাতি। অনেকগুলি পরিবার একত্র সম্মিলিত হইয়া বহুকাল হইতে স্থায়ী ভাবে একই গ্রামে বাস করিতেছে ও কৃষিকার্য্যে পরস্পরের সহযোগিতায় বিভিন্ন প্রকারের ফসল উৎপাদন করিতেছে। খাদ্যের ও লোকবলের অপেক্ষাকৃত প্রাচুর্য্য, আর্থিক সাচ্ছল্য ও অবসরবহুলতাপ্রযুক্ত ইহারা স্ব স্ব গ্রামের মাতব্বরদিগের নেতৃত্বে সুনিয়ন্ত্রিত গ্রাম-শাসন প্রতিষ্ঠিত করিতে সমর্থ হইয়াছে। সুখে-দুঃখে, ধর্ম্মকর্ম্মে, পূজা-পার্ব্বণে, নৃত্যে-গীতে সমস্ত গ্রামের মন-প্রাণ একতায় সম্মিলিত হইয়া পল্লীজীবনের আদর্শস্থানীয় হইয়াছিল। প্রতিকূল পারিপার্শ্বিক সামাজিক অবস্থার মধ্যেও এখনও পর্য্যন্ত ইহাদের অনেক পল্লীর অধিবাসীরা নিবিড় সংহতিবদ্ধ। ইহা আমাদের আধুনিক পল্লী-সংস্কারকদের প্রণিধানযোগ্য। এইরূপ মিলনে যেমন ইহাদের বাহ্য-সম্পদ বৃদ্ধির সাহায্য করিয়াছিল, তেমনই সামাজিক ও ব্যক্তিগত আত্ম-প্রসার ও মানসিক সম্পদও বর্দ্ধিত হইয়াছিল।

মানবের "নিত্য প্রসার্য্যমান সম্পূর্ণতার আকাঙ্ক্ষা"

এই সব জাতির স্বগ্রামেই পর্য্যবসিত হয় নাই। ক্রমে অনেকগুলি গ্রাম একত্র সম্মিলিত হইয়া এক একটি বৃহত্তর সঙ্ঘ (confederacy) স্থাপন করিয়াছিল। এগুলির নাম 'পারহা' বা পীড়। পারহাস্থ প্রত্যেক গ্রামের গ্রাম-মুখ্য বা মুণ্ডা (মণ্ডল) ও গ্রাম-পুরোহিত (পাহান) সম্মিলিত হইয়া একটি "পারহা-পঞ্চায়ত" গঠিত হইয়াছিল। এগুলি এখনও বর্ত্তমান। ইহারা গ্রাম্য-পঞ্চায়তের রায়ের বিরুদ্ধে আপীল বিচার করিত ও এখনও করে। কোনও কোনও গুরুতর বিষয়ের মীমাংসা গ্রাম্য-পঞ্চায়েতের বিচার-ক্ষমতার বহির্ভূত, সেইগুলিও "পারহা-পঞ্চায়তের" নিকট বিচারের জন্য প্রেরিত হইত ও এখনও হয়।

পারহার প্রত্যেক গ্রামের বিশেষ পদ নির্ণীত ছিল ও নামতঃ এখনও আছে। বিভিন্ন গ্রামকে 'রাজা', 'দেওয়ান', 'লাল', 'ঠাকুর', 'কোটোয়ার' প্রভৃতি বিভিন্ন আখ্যায় অভিহিত করা হয়। এইরূপ পদবী-বিশেষে প্রত্যেক গ্রামের ক্ষমতা ও কর্ত্তব্য নির্দ্দিষ্ট ছিল ও এখনও অল্পবিস্তর আছে। প্রত্যেক গ্রামের নির্দ্দিষ্ট চিহ্নযুক্ত পতাকা ছিল ও এখনও আছে। এক গ্রামের পতাকা-চিহ্ন অপর গ্রাম স্বেচ্ছায় অনুকরণ করিলে পূর্ব্বে যুদ্ধ হইত এবং এখনও দাঙ্গাহাঙ্গামা হয়। এখনও এক পারহার সঙ্গে অপর পারহা বা পারহাস্থ কোনও গ্রাম আনুষ্ঠানিক মিত্রতা বন্ধনে আবদ্ধ হয় ও গ্রাম-পতাকার আদান-প্রদান করে। ইহাদের কোনও কোনও জাতির মধ্যে কিম্বদন্তী আছে যে, বিভিন্ন গ্রাম-সঙ্ঘ বা পারহা এইরূপে একত্র সংযুক্ত হইয়া বিশেষ বিশেষ শক্তিমান গ্রাম-নেতার নেতৃত্বে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রজাতন্ত্র রাজ্য স্থাপিত করিয়াছিল।

ইহাতেও ইহাদের আত্ম-প্রসারের প্রয়াস নিরস্ত হয় নাই। বিভিন্ন পারহাগুলিও একত্র সম্মিলিত হইয়া নির্দ্দিষ্ট সময়ে বৎসরে এক বা একাধিক বার একত্র মৃগয়া করিত ও এখনও করে এবং নৃত্য-গীত উৎসবে সম্মিলিত হইত ও এখনও হয়। এইরূপ জাতীয় (tribal) সম্মেলন "পারহা-যাত্রা" নামে এ প্রদেশে খ্যাত।

এই "পারহা-যাত্রা"গুলি কেবল নৃত্য-গীতের উৎসব-স্থল নহে। ইহাদের সামাজিক ও ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় তাৎপর্য্য, উপকারিতা ও গুরুত্ব প্রণিধানযোগ্য। স্থানাভাবে এখানে সে সম্বন্ধে আর কিছু বলা সম্ভব নয়।

এই ওঁরাও, মুণ্ডা, সাঁওতাল, হো, খাড়িয়া প্রভৃতি জাতি-গুলি যেমন এক কালে অর্থনৈতিক, সামাজিক এবং রাষ্ট্রীয় সভ্যতায় উন্নতির পথে কিয়দ্দুর অগ্রসর হইয়াছিল, তেমনই ইহাদের সুন্দরের অনুভূতিও কিয়ৎ পরিমাণে পরিস্ফুট হইয়াছিল। গীতি-কবিতায় তাহাদের জীবন-বাণীর ও হৃদয়-ভাবের প্রকাশ একেবারে উপেক্ষণীয় নহে।

সভ্যতর জাতিদের গান ও কবিতায় যেমন তাহাদের সুখ-দুঃখ, আশা-নিরাশা, প্রেম-ভক্তি, রোষ-করুণা প্রভৃতি হৃদয়ের ভাববৈচিত্র্যের প্রকাশ দেখা যায়, এই নিরক্ষর আদিম জাতিদের গানেও তেমনি ভাবের উচ্ছ্বাস প্রাণস্পর্শী ধ্বনিতে ফুটিয়া উঠিতে চেষ্টা করে। সুন্দরের রূপ অনুভব করিয়া ইহাদের প্রাণেও ভাবের তরঙ্গ উত্থিত হয় এবং অজ্ঞাত ও অজ্ঞেয় অসীমের দিকে ধাবিত হয়। ভাবের নিবিড়তায় তাহারা মন্ত্র-জপের ন্যায় একই শব্দ ও বাক্য তাহাদের গানে পুনরাবৃত্তি করিয়া রসরূপের অনুভূতি স্থায়ী করিতে প্রয়াস পায়; ভাবের আতিশয্যে তাহাদের শরীরে স্পন্দন আসে এবং নৃত্যের দ্বারা অপরিস্ফুট হৃদয়ভাব ও রসানুভূতি স্ফুটিত হয়।

এ সম্বন্ধে একটি বিশেষ অবধানযোগ্য কথা এই যে, বর্ত্তমান সভ্যতর জাতিদের এক শ্রেণীর বস্তুতান্ত্রিক লেখক-দের রচনার ন্যায় এই আদিম জাতিদের গীতি-কবিতা ভোগলিপ্সার পরিপোষক নহে। যদিও এই সকল জাতির জীবনের আদর্শ সবিশেষ উচ্চ নহে বরং তাহারা স্বভাবতঃ জড়বাদী, তথাপি ইহারা সাধারণতঃ গীতি-কবিতায় জীবনের নিকৃষ্ট দিক্ বর্জ্জন করিয়া বিশুদ্ধ রস ও ভাবের প্রকাশ দ্বারা নিত্য সৌন্দর্য্য সৃষ্টির প্রয়াস পায়,—আধুনিকতা ও অতি-বাস্তবিকতার দোহাই দিয়া মনুষ্য-জীবনের পঙ্কিল গ্লানিময় দিক্ উজ্জ্বল বর্ণে চিত্রিত করে না।

আর একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য বিষয় এই যে, এই নিরক্ষর অসভ্য জাতিগুলির কোনও কোনও গানে পার্থিব সুখের ও মানব-জীবনের নশ্বরতা ও মৃত্যুর পরপারের প্রহেলিকা প্রভৃতি জীবনের যে-সমস্ত সমস্যা আবহমান কাল হইতে সর্ব্বদেশে কবি-হৃদয়কে উদ্বেলিত করিয়াছে, সেই সব ভাব ও চিন্তাধারারও আভাস বর্ত্তমান।

এই শ্রেণীর গীতেই বঙ্গদেশের সহিত ছোটনাগপুরের

ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধের প্রথম পরিচয় পাওয়া যায়। এই শ্রেণীর কোন কোন গীতের শেষ কলিতে বৈষ্ণব-পদাবলীর "বিদ্যাপতি ভনে" প্রথায় রচয়িতার নামোল্লেখ আছে। কোনও কোনও গীতের বিষয়বস্তু ও ভাবেও বাঙালী বৈষ্ণব-কবিদের প্রভাব লক্ষিত হয়। কোনও কোনও গীত-রচয়িতার বিনন্দ দাস প্রভৃতি কয়েকটি নাম দেখিয়া তাহাদিগকে বাঙালী বৈষ্ণব-কবি বলিয়া মনে হয়। কোনও কোনও মুণ্ডা-গীতে রাধাকৃষ্ণের লীলা বর্ণিত হইয়াছে।

বৈষ্ণব-ধর্ম এক সময় অত্রত্য অসভ্য মুণ্ডা, খাড়িয়া প্রভৃতি জাতির মধ্যে সমধিক প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল ইহার প্রমাণ তাহাদের কোনও কোনও আচার অনুষ্ঠানে এখনও বিদ্যমান। মুণ্ডা জাতির বিবাহের প্রধান অনুষ্ঠান "সিন্দরি-রাকাব" বা "সিন্দুর-দান"। অদ্যাবধি মুণ্ডা জাতির বিবাহে "সিন্দুর-দানে"র অন্তে "রাধে রাধে" ধ্বনি, এবং খাড়িয়া জাতির বিবাহের অন্তে "হরিবোল" ধ্বনি, করিবার প্রথা প্রচলিত। কিন্তু এই ধ্বনির অর্থ উহারা এখন সম্পূর্ণ বিস্মৃত হইয়াছে। আধুনিক মুণ্ডারা বলে "রাধে রাধে" ধ্বনির অর্থ "বিবাহ সমাপ্ত হইল" (আড়ান্দি টুড়ুখানা) এবং খাড়িয়ারা বলে "হরিবোল" শব্দের অর্থ "হার-বএল" অর্থাৎ "লাঙ্গল ও বলদ"।

এই সমস্ত আদিম জাতির মধ্যে যে সমস্ত কৃষ্ণ-রাধা বিষয়ক সঙ্গীত এখন পর্য্যন্ত প্রচলিত আছে, তাহারও মূল-অর্থ ও ইঙ্গিত ইহারা এখন বিস্মৃত হইয়াছে। কোনও কোনও স্থলে যুবক-যুবতীর প্রেম-সঙ্গীতে "কদম্ব দারু", "রাধা-কৃষ্ণ" প্রভৃতি বাক্যগুলি স্থান পাইয়াছে।

নিম্নে এইরূপ একটি গান উদ্ধৃত করিতেছি। একটি মুণ্ডা-যুবতীর প্রেমাস্পদ গরু চরাইতে মাঠে ও বনে ঘুরিতেছে। যুবতী যুঁই ও চামেলী ফুলের মালা গাঁথিয়া তাহার প্রেমাস্পদের অপেক্ষা করিতেছে ও দীর্ঘ অদর্শনে ব্যাকুল হইয়া প্রেমাশ্রু মোচন করিতে করিতে এই গীত গাহিতেছে :—

"গাড়া যাপা কদম্ব সুবা,
হেণ্ডে হেণ্ডে ডুতি তাদায়,
'রাধা রাধা' মেন্তে রুতুই ওড়োঙ্গকেনা,
মুরিগিগো গুপিতানা।
যুঁই-চামেলি গুতুতানা, নোকোরে তাইঙ্গা
গাতিম ডুবাকানা।
বা' তাদায় ভালা ভালা, স্বপিদ তাদায়
হালা হালা,
কাইঙ্গ লেলতে মেদ-দা জোরোতানা।
ওকোরে তাইঙ্গা গাতিং ডুবাকানা ?
তেমন মেদ-দা জোরেতোনা,
যেমন গাড়-দা সিঙ্গিতানা।
ইচা-বারে রসি জোরোতানা,
ওকোরে তাইঙ্গা গাতিঙ্গ ডুবাকানা ?"

[কথায় কথায় (literal) অনুবাদ]

"নদীকূলে কদম মূলে,
পরে কালো পাড়ের ধুতি,
বাঁশীতে পুরি 'রাধা রাধা' ধ্বনি
বঁধু মোর গোধন চরায়।
হেথা বসে গাঁথি আমি যুঁই-চামেলির মালা।
বঁধু মোর কোথা আছে বসে ?
সাজায়ে রাখিয়াছি সুন্দর ফুলের সাজ
বেঁধেছি সুন্দর সুঠাম বেণী।
চোখে আমার অশ্রু ঝরে বঁধুর অদর্শনে।
বঁধু মোর কোথা আছে বসে ?
স্রোতের জলের মত আঁখিজল বহে অবিরাম
ইচা ফুলের মধু যেমন অবিশ্রান্ত ঝরে,
আঁখিজল মোর ঝরিছে তেমনি।
হায় বঁধু মোর এতক্ষণ কোথা বসি রয় ?"

রাঁচি জেলার পূর্ব্বভাগে বুণ্ডু, তামাড় প্রভৃতি পাঁচ পরগণার কোনও কোনও মুণ্ডা-পরিবার এখনও বৈষ্ণব-মত অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে এবং তত্রত্য কুড়মী প্রভৃতি কোনও কোনও জাতির মধ্যে বৈষ্ণব-মত এবং রাধাকৃষ্ণ বিষয়ক অসংখ্য "ঝুমুর" প্রভৃতি গীত প্রচলিত আছে ও এখনও রচিত হইতেছে। বুণ্ডু পরগণায় কিম্বদন্তী আছে যে, শ্রীচৈতন্যদেব খ্রীষ্টীয় যোড়শ শতাব্দীর প্রারম্ভে পুরী হইতে মথুরা গমনকালে রাঁচি হইতে ২১ মাইল দূরবর্ত্তী বুণ্ডু গ্রামে বিশ্রাম করিয়াছিলেন ও কৃষ্ণনাম প্রচার করিয়াছিলেন। এখনও প্রতি বৎসর মহাপ্রভুর জন্ম-তিথিতে সেখানে বাৎসরিক উৎসব হয় ও মেলা বসে। এখানকার বৈষ্ণবদের বিশ্বাস যে, এই প্রদেশের সম্বন্ধেই "শ্রীচৈতন্যচরিতামৃতে" বলা হইয়াছে :—

প্রসিদ্ধ পথ ছাড়ি প্রভু উপপথে চলিলা,
কটক ডাহিনে করি বনে প্রবেশিলা।
* * * *
মথুরা যাবার ছলে আসি ঝারিখণ্ড,
[ভিল্লপ্রায় লোক তাহা পরম পাষণ্ড]

আমরা বঙ্গবাসীই ছিলাম। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে এখন "প্রবাসী" বলিয়া গণ্য হইতেছি।

এই দুর্ভোগ আপাততঃ অনিবার্য্য। এ জন্য এখন অনুশোচনা বৃথা। এক্ষণে অত্রত্য "প্রবাসী" বাঙ্গালীর প্রথম কর্ত্তব্য বাংলার কৃষ্টির সহিত আমাদের সাংস্কৃতিক যোগ অক্ষুণ্ণ রাখা এবং দ্বিতীয় কর্ত্তব্য আমাদের জাতীয় সংস্কৃতি ও বৈশিষ্ট্য অব্যাহত রাখিয়া স্থানীয় সমাজের সহিত যোগসূত্র রচনা করা। এই যোগসূত্র রচনার ও সৌহার্দ্য বর্দ্ধনের জন্য বিবিধ উপায় অবলম্বন করিতে হইবে, যথা—উভয় সমাজের সাহিত্যিকদের সংসদে সম্মিলন; সাধারণ লোকহিতকর অনুষ্ঠানে উভয় সমাজের নেতাদের সহযোগিতা; উভয় সমাজের পরহিত-ব্রতীদের সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া জাতিনির্ব্বিশেষে লোক-সেবা, ইত্যাদি। ইহা দ্বারা উভয় সমাজের মধ্যে ভাবগত ঐক্য ঘনীভূত হইয়া মনের ও আত্মার প্রসার বৃদ্ধি হইবার সম্ভাবনা। ঐক্য-সাধনের আর একটি প্রকৃষ্ট উপায়—বস্তুতঃ আমাদের একটি বিশেষ কর্ত্তব্য—স্থানীয় পূর্ব্বতন অধিবাসীদের মধ্যে বাঙালীর সংস্কৃতি প্রচার এবং স্থানীয় সমাজের সাহিত্য ও অন্যান্য সংস্কৃতির পর্য্যালোচনা করিয়া তাহাতে যাহা কিছু গ্রহণোপযোগী কল্যাণকর উপাদান আছে তাহা সমাহরণ ও যথাযোগ্য সমীকরণের প্রচেষ্টা। এইরূপে ভাব ও চিন্তার আদান প্রদানের দ্বারা বঙ্গসাহিত্যের সম্পদ বৃদ্ধি ও স্থানীয় লোকদের এবং তথাকথিত "প্রবাসী" বাঙালীর হৃদয়-মনের প্রসার বৃদ্ধি অবশ্যম্ভাবী।

আমাদের এই সমস্ত কর্ত্তব্য পালনের জন্য ও বাঙালীর গৌরবমণ্ডিত সংস্কৃতি প্রবাসেও অক্ষুণ্ণ রাখিবার জন্য এবং সেই সংস্কৃতির ক্রমিক উন্নতির সহিত সমগতিতে চলিবার জন্য, বাংলা দেশের চিন্তানেতা ও কর্ম্মবীর মনীষীদিগের সাহায্য ও সহযোগিতা, উপদেশ ও প্রেরণা আমাদের অবশ্য প্রয়োজনীয়।

সাথী

শ্রীইলারাণী মুখোপাধ্যায়

আঁধার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে,
তুমি কি মোর সেই রজনীর
হবে সাথী তবে?

পরাণে মোর অভয় ভরি
আসবে কি হে প্রদীপ ধরি?
আমার আকুল আঁখি কি গো
তোমার পানেই রবে,—
আঁধার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে?

সেদিন যখন আসবে আমার,
ঘনিয়ে শুধু উঠবে আঁধার;
হাতটি ধরি সোহাগ ভরে
বঁধু কি মোর লবে?—
আঁধার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে?

আপন যারা রইবে দূরে,
কাঁদবে না প্রাণ ব্যথার সুরে;
তুমি কি নাথ শ্রবণে মোর
আশার বাণী কবে—
আঁধার রাতের বিজন পথে
চলতে যেদিন হবে?

প্রভাত-রবি

শ্রীপ্রভাতচন্দ্র গুপ্ত

[প্রবন্ধটি সম্বন্ধে একটু ভূমিকার প্রয়োজন। এক দিন গল্পগুজবের ভিতর দিয়ে রবীন্দ্রনাথের মুখে তাঁর পদ্মা-জীবনের এমন একটি সুনিবিড় চিত্র পেয়েছিলাম যে, পরে তাকে লেখায় ফুটিয়ে তোলবার লোভ সম্বরণ করতে পারি নি। কিন্তু স্মৃতির উপর নির্ভর ক'রে অন্যের বক্তব্যের বিষয়বস্তুকে যদি-বা অনেকাংশে রক্ষা করা যায়, তার ভাষাগত প্রাণশক্তিকে অধিকৃত রাখা সাধ্যাতীত। তথ্যাংশের পারম্পর্য এবং পুঙ্খানুপুঙ্খতা সম্বন্ধেও শ্রবণশক্তির উপর অত্যধিক আস্থা রাখা বিপজ্জনক। প্রবন্ধটি তাঁকে দেখাতে গিয়ে এই দুটো দিকেই তার যথেষ্ট প্রমাণ পেয়েছি। সঙ্কটে না পড়লে তাঁর সম্বন্ধে অন্যকৃত আলোচনায় হস্তক্ষেপ করতে তিনি চান না। এবার দায়ে ফেলে এই প্রবন্ধে তাঁকে কথোপকথনের অংশগুলি তাঁর নিজের ভাষাতেই লিখে দিতে বাধ্য করেছি।

সেদিন আমাদের সঙ্গে আলাপ-উপলক্ষ্যে পশ্চিমতীর্থ-গামীর চিত্তপটে পূর্ব্বদিগন্তবর্ত্তী প্রভাত-রবির যে চিত্রটুক সহসা প্রতিফলিত হয়েছিল সেটি পাঠকদের কাছে উপস্থিত ক'রে তাঁদের কৃতজ্ঞতা প্রত্যাশা করতে পারি।

আমাদের আশা আছে যে, "জীবন-স্মৃতি"তে জীবনের যে-পর্ব্বে এসে তাঁর কলম থেমেছে, সেখান থেকে তাঁর পরবর্ত্তী জীবনের মর্ম্মলোকের রসাস্বাদ তিনিই আবার এক দিন আমাদের দিতে কার্পণ্য করবেন না।—লেখক]

মাটির বাড়ী "শ্যামলী" ভেঙে পড়ার পর রবীন্দ্রনাথ এখন তার পাশে একটি ছোট বাড়ীতে বাস করছেন। একখানি মাত্র ঘর, তিন দিকে খোলা বারান্দা, পিছনে স্নানাগার। অনেক দিন থেকেই তাঁর ইচ্ছে, বাহুল্যবর্জ্জিত এই ধরণের একখানি ছোট বাড়ীতে তিনি থাকবেন। তাই এই নতুন বাড়ীটি সম্প্রতি তৈরি হয়েছে। একখানি পুরোপুরি মাটির বাড়ী হ'লেই তাঁর আন্তরিক অভিলাষ পূর্ণ হ'ত, কিন্তু 'শ্যামলী'তে মাটির ছাদের পরীক্ষা যখন সফল হ'ল না,* তখন অগত্যা কংক্রিটের ছাদই তৈরি করতে হয়েছে, কিন্তু দেয়ালগুলো মাটির। ঘরের ভিতরে একখানি খাট, একটা টেবিল, খানকয়েক চেয়ার, মোড়া এবং বই রাখবার একটা তাক। বারান্দায় দু-একটি লেখবার টেবিল এবং কতকগুলি চেয়ার। এই তাঁর জীবনযাত্রার আয়োজন।

সন্ধ্যার পর অধ্যাপকবন্ধু শ্রীযুক্ত শৈলজারঞ্জন মজুমদার মহাশয়কে নিয়ে গিয়েছি তাঁর সঙ্গে দেখা করতে। ফটকের কাছে যেতেই দেখলাম, একলা বসে আছেন ঘরে. চাকর একটা ছোট টেবিল এগিয়ে দিল সামনে, তিনি একখানি বই খুলে পড়তে বসলেন। একটু ইতস্তত বোধ করলাম, এই সময়ে গিয়ে পড়ার ব্যাঘাত জন্মান উচিত কি না। কিন্তু বিকেলবেলা তিনি ব্যস্ত ছিলেন বলে দেখা করতে পারি নি, তখনই খবর দিয়ে গিয়েছিলাম যে, সন্ধ্যার পর আসব। তাই সাহস ক'রে দুজনে ঢুকলাম ঘরে। তিনি আসন দেখিয়ে দিলেন বসতে। বললেন—"এই দেখ, একখানা neo-physicsএর (নব-পদার্থবিজ্ঞানের) বই নিয়ে পড়তে বসেছিলাম। আমাদের মায়াবাদের বৈজ্ঞানিক ব্যাখ্যা চলছে যেন। আধুনিক কালের মানুষ আমি। বিজ্ঞানেই এই যুগের সর্ব্বপ্রধান প্রকাশ। এই প্রকাশধারার সঙ্গে যোগ না রাখতে পারলে এই কালের আশ্রয় থেকে বঞ্চিত হতে হয়। আমি ত অবসর পেলে সাহিত্যের বইয়ের চেয়ে বিজ্ঞানের বই-ই বেশি পড়ি। তাই mathematics (গণিত) না জেনে

---

* কবির মন্তব্য—আবার চেষ্টা হবে মাটির ঘরের পুনঃসংস্করণ। যে অভিজ্ঞতা সঞ্চয় হয়েছে তা ব্যবহারে না লাগানোই যথার্থ লোকসান,—ঘর পড়ে যাওয়াটা নয়।

neo-physics (নব-পদার্থবিজ্ঞান) যতখানি বোঝা যায়, বুঝতে চেষ্টা করছি। কিন্তু এখন বয়স হয়েছে, সব সময় পেরে উঠি না। তার উপর তোমরা সবাই মিলে আমাকে আরও মূর্খ বানিয়ে দিচ্ছ, একটু বসে পড়াশোনা করার অবসরই পাই না। কর্ম্ম-কোলাহলের অভ্যন্তরে আসার পর থেকে সহস্র রকমের দাবী মেটাতেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছি। এককালে সমস্ত শক্তি দিয়ে যা হোক একটু কিছু কাজ করতে পেরেছি বলে যে হঠাৎ একদিন আপিসের সাজ পরে মাঝ রাস্তায় মুখ থুবড়ে পড়ে অন্তিম নিশ্বাস টানতে হবে, এ কখনই আদর্শ হতে পারে না। তাই ঠিক্ করেছি, যখন-তখন আর তোমাদের আসতে দেব না। একটা বাঁধা সময় ঠিক করে দেব, ঐ সময় তোমাদের সকলের সঙ্গে দেখা সাক্ষাৎ করব, এ ছাড়া অন্য সময়ে নয়। আমার অনুচরেরাও যে যখন-তখন এসে ঘুর ঘুর করবে, তাও চলবে না। একটা ঘণ্টা কাছে, রাখব, যখন কিছু দরকার হবে, আমিই ডেকে পাঠাব।"

আমরা মনে মনে কুণ্ঠিত হয়ে পড়লাম এই অসময়ে আসার জন্য। কিন্তু তিনি যে ব্যক্তিবিশেষকে সম্বোধন ক'রে কিছু বলছিলেন, ঠিক তা নয়; নিজের মনকে নিয়েই যেন নাড়াচাড়া করছিলেন। রবীন্দ্রনাথের তারুণ্যের কথা অনেকেই অনেকবার বলেছেন। ব'সে ব'সে তখন শুধু ভাবছিলাম, ছিয়াত্তর বৎসর বয়সে নব নব জ্ঞানলাভের এই বিশ্বগ্রাসী ক্ষুধা এবং জীবনকে নতুন শৃঙ্খলার মধ্যে গড়ে তোলার এই যে সাধনা, বার্দ্ধক্য একে লেশমাত্র ম্লান করতে পারে নি, জরা কাছেও ঘেঁসতে পারে নি, এই ত মনের চিরনবীন সজীবতা, যেখানে আজও কবি জেগে আছেন আপন আনন্দের পরিপূর্ণতায়।

আমরা ভাবছিলাম, কিন্তু তিনি কথা বন্ধ করেন নি। আস্তে আস্তে বলতে লাগলেন—"ভেবো না চিরকাল আমি এই ভাবে ফাঁকি দিয়ে কাটিয়ে এসেছি। তোমাদের ইস্কুল কলেজে গিয়ে বিদ্যা অর্জ্জন করার সৌভাগ্য ত জীবনে ঘটল না, তবুও আজ শিক্ষিত সমাজে আমি যে হরিজন শ্রেণীতে গণ্য হই নি, বিদ্যাজীবীদের জাতে উঠতে পেরেছি, সেটা অমনি হয় নি। আমার ইস্কুল পালানোর যে পরিমাণ ওজন, অন্য পাল্লায় পড়াশোনা চর্চ্চার বাটখারা চাপিয়েছি সেই পরিমাণেই। সেটা ইচ্ছাপূর্ব্বক। সে-সব দিনের কথা মনে পড়ে, যখন ইংরেজীতে কাঁচা অধিকার থাকতেও এক সল্‌তে জ্বালা রেড়ির তেলের লণ্ঠন জ্বেলে রাত আড়াইটা পর্য্যন্ত বই পড়েছি। এই যুগের পট পরিবর্ত্তন হ'ল শিলাইদহে পদ্মার বোটের উপর।"

বলতে বলতে তাঁর কণ্ঠস্বরে যেন এক অনির্ব্বচনীয়ের স্পর্শ লাগল, মনে হ'ল, তাঁর গভীর দৃষ্টির সম্মুখে জেগে উঠছে কতকাল আগেকার পিছনে-ফেলে-আসা অতীত জীবনের ছবি। অধীর আগ্রহে তাকিয়ে রইলাম, যে-সাধনার অন্তরালে কবি থাকেন আত্মগোপন ক'রে, আজ তার ইতিবৃত্ত শুনব তাঁরই মুখ থেকে।

তিনি তখন আপন মনে বলে যাচ্ছেন—"বোটে ছিলাম আমি একলা, সঙ্গে ছিল এক বুড়ো মাঝি, আমার মত চুপচাপ প্রকৃতির, আর ছিল এক চাকর, ফটিক তার নাম। সেও স্ফটিকের মতই নিঃশব্দ। নির্জ্জনে নদীর বুকে দিন বয়ে যেত নদীর ধারারই মত সহজে। বোট বাঁধা থাকত পদ্মার চরে। সেদিকে ধূ-ধূ করত দিগন্ত পর্য্যন্ত পাণ্ডুবর্ণ বালুরাশি, জনহীন, তৃণশস্যহীন। মাঝে মাঝে জল বেধে আছে, সেখানে শীত ঋতুর আমন্ত্রিত জলচর পাখীর দল। নদীর ওপারে গাছপালার ঘন ছায়ায় গ্রামের জীবন-যাত্রা। মেয়েরা জল নিয়ে যায়, ছেলেরা জলে ঝাঁপ দিয়ে সাঁতার কাটে—চাষীরা গোরু মোষ নিয়ে পার হয়ে চলে অন্য তীরের চাষের ক্ষেতে, মহাজনী নৌকা গুণের টানে মন্থর গতিতে চলতে থাকে, ডিঙি নৌকা পাটকিলে রঙের পাল উড়িয়ে হু হু করে জল চিরে যায়, জেলে নৌকা জাল বাচ করতে থাকে, যেন সে কাজ নয়, যেন সে খেলা, এর মধ্যে প্রজাদের প্রাত্যহিক সুখ দুঃখ আমার গোচরে এসে পড়ত তাদের নানা প্রকার নালিশ নিয়ে, আলোচনা নিয়ে। পোষ্টমাষ্টার গল্প শুনিয়ে যেত গ্রামের সদ্য ঘটনা এবং তার নিজের সঙ্কট সমস্যা নিয়ে, বোষ্টমী এসে আশ্চর্য্য লাগিয়ে যেত তার রহস্যময় জীবনবৃত্তান্ত বর্ণনা ক'রে। বোট ভাসিয়ে চলে যেতুম, পদ্মা থেকে পাবনার কোলের ইছামতীতে, ইছামতী থেকে বড়লে হুড়ো সাগরে, চলনবিলে, আত্রাইয়ে, নাগর নদীতে, যমুনা পেরিয়ে সাজাদপুরের খাল বেয়ে সাজাদপুরে। দুই ধারে কত টিনের ছাদওয়ালা গঞ্জ,

কত মহাজনী নৌকার ভিড়ের কিনারায় হাট, কত ভাঙনধরা তট, কত বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম। ছেলেদের দলপতি ব্রাহ্মণ-বালক, গোচারণের মাঠে রাখাল-ছেলের জটলা, বনঝাউ-আচ্ছন্ন পদ্মাতীরের উঁচু পাড়ির কোটরে কোটরে গাঙ-শালিকের উপনিবেশ। আমার গল্পগুচ্ছের ফসল ফলেছে আমার গ্রাম-গ্রামান্তরের পথে-ফেরা এই বিচিত্র অভিজ্ঞতার ভূমিকায়। সেদিন দেখলুম একজন সমালোচক লিখেছেন, আমার গল্প অভিজাত সম্প্রদায়ের গল্প, সে তাঁদের হৃদয় স্পর্শ করে না। গল্পগুচ্ছের গল্প বোধ হয় তিনি আমার ব'লে মানেন না। সেদিন গভীর আনন্দে আমি যে কেবল পল্লীর ছবি এঁকেছি তা নয়, পল্লীসংস্কারের কাজ আরম্ভ করেছি তখন থেকেই—সে সময়ে আজকের দিনের পল্লীদরদী লেখকেরা 'দরিদ্র-নারায়ণ' শব্দটার সৃষ্টিও করেন নি। সেদিন গল্পও চলেছে, তারই সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে বাঁধা জীবনও চলেছে এই নদীমাতৃক বাংলা দেশের আতিথ্যে। লোকসমাজের বাইরে কত দিন নিঃসঙ্গ অবস্থায় সময় কাটিয়েছি, হয়ত বহুকাল একটি কথাও বলি নি কারো সঙ্গে, মাঝি এবং চাকরের সঙ্গেও না, এমন কি, গান গাওয়ারও প্রয়োজন বোধ করি নি, অথচ কোন অভাব, কোন আকাঙ্ক্ষাই অনুভব করি নি, যথার্থই তখন আপনার মধ্যে আপনি ছিলাম সম্পূর্ণ।"

উৎসুকভাবে জিজ্ঞেস ক'রে উঠলাম,—এইভাবে কথা না ব'লে নির্জ্জনে কত দিন ছিলেন, বছর খানেক, না, তারও বেশী? এই আকস্মিক প্রশ্ন যেন তাঁকে বিব্রত করে তুলল, অসহায়ভাবে বললেন—'দেখ আমি বাস করি eternity'র (অনাদ্যনন্তকালের) মধ্যে, সময়ের জ্ঞান আমার কিছুমাত্র থাকে না।"

আমাদের চোখের সামনে যেন জেগে উঠল, কবি ব'সে আছেন মহাকালের গলার মালায় প্রদীপ্ত মণির অম্লান জ্যোতিতে। বুঝলাম, যিনি মৃত্যুর পর অমরতা লাভ করেন, তিনি পার্থিব জীবনেও থাকেন অসীম কালেরই অনুভূতি নিয়ে। আস্তে আস্তে আবার জিজ্ঞেস করলাম—এই ভাবে একটানা ছিলেন বোধ হয় অনেক দিনই?

—"তা নিশ্চয়ই ছিলাম। কারণ মনে আছে, পদ্মার কোলে বসে দেখেছি, ঋতুর পর ঋতুর পরিবর্ত্তন। গ্রীষ্মকালে দুপুরবেলায় আকাশ থেকে রোদ্দুর বালুর কণায় কণায় স্ফুলিঙ্গ ছড়াত। চোখ যেত ঝলসে। আমি বোটের ছাদে বিচিলি বিছিয়ে কলসী কলসী জল ঢালাতুম। বোটের জানালায় খসখসের পর্দ্দা থাকত ঝোলানো। কিন্তু যখন হাওয়া উঠত, তার সঙ্গে সঙ্গে সূক্ষ্ম বালি সমস্ত বাধা কাটিয়ে উড়ে এসে পর্দ্দার ফাঁকে ফাঁকে ঢুকে বিছানা, চেয়ার, টেবিল, বইয়ের উপর ছড়িয়ে পড়ত। গ্রীষ্মের রুদ্রমূর্ত্তি আমি উপভোগ করতাম, কোন নালিশ আমার মনে জাগত না। যখন কাজ থাকত ওপারে কাছারিতে, দিন কাটত সেখানে। সন্ধ্যার সময় একটি ছোট ডিঙি বেয়ে ফিরতি পথে পার হতুম। অন্ধকারে মসৃণ কালো তরঙ্গহীন নদীর উপর দিয়ে যখন খেয়া দিতুম তখন, কোথাও একটিও নৌকা নেই—আকাশে সন্ধ্যাতারা আর দূরে আমার নির্জ্জন বোটের জানালার ভিতর দিয়ে দেখা যেত সন্ধ্যাদীপ। যে সব বুনো হাঁস দিনের বেলায় কুমোরখালির বিলে চরতে গিয়েছিল, সব ফিরে এসেছে চরের জলাশয়ে, কোথাও একটু শব্দমাত্র নেই। সন্ধ্যার পর ছাদের উপর চেয়ারে বসতাম, ঝিরঝিরে বাতাস এসে শরীর জুড়িয়ে দিত। প্রায়ই সেখানেই ঘুমিয়ে পড়তাম, হঠাৎ গভীর রাতে জেগে দেখেছি, তারাভরা আকাশ বিস্মিত চোখে তাকিয়ে আছে সহস্র দৃষ্টি মেলে। মাঝে মাঝে কোন খবর না দিয়ে উঠেছে কালবৈশাখী। বালি উড়ত তার পথ বেয়ে, মেঘের পিছনে মেঘ ছুটত আকাশে, হি হি ক'রে উঠত নদীর জল একটা ফ্যাকাসে আলোয়। কাক চিল বাসায় ফেরবার পথে ঝড়ের সঙ্গে পাল্লা দিতে পারত না, নেমে পড়ত চরে, বালুর মধ্যে ঠোঁট গুঁজতে গুঁজতে পাখা ঝটপট করত। শুনতে পেতুম কোথায় নদীর পাড় ভেঙে পড়ছে। নৌকোগুলি তাড়াতাড়ি কোনো-মতে নদীর কোলের মধ্যে ঢুকে পড়েই খুঁটো গেড়ে নোঙর ফেলে টিকে যেত। মনে আছে, একবার শরতের ঝড়ে পড়েছিলুম। হাওয়ার বেগ নোঙরসুদ্ধ নৌকো ঠেলে নিয়ে যেতে চায় মাঝ দরিয়ায়। মাঝি মোটে একজন, দাঁড়ি নেই। ঝোলা ঝোলা পোষাক সুদ্ধ ঝাঁপিয়ে পড়লাম নদীতে। সাঁতারে ছিলুম নিপুণ। ডাঙায় এসে যখন উঠলাম, পকেট হাতড়ে দেখি, চাবিগুলো গেছে কখন জলের নীচে তলিয়ে। হঠাৎ হাওয়া গেল উল্টিয়ে, নদীর দিক থেকে তীরের দিকে। বোটটাকে ঠেলে তুলে দিল ডাঙায়।

এই পরিহাসের শেষ পর্য্যন্ত অপেক্ষা করলে চাবিও বাঁচত, কাপড়ও ভিজত না।”

কথার স্রোতে একটু বাধা পড়ল, ক্ষিতিমোহন বাবুর স্ত্রী শ্রীযুক্তা কিরণবালা দেবী এলেন। তিনি আসন গ্রহণ করার পর আবার চলল সেই কাহিনীর অনুবৃত্তি। নিঃশব্দ রাত্রি, ঘরের মধ্যে বসে আমরা তিনজন শ্রোতা মন্ত্রমুগ্ধের মত শুনছি সেই অপূর্ব্ব কাহিনী।

—“নদীতে কীট-পতঙ্গের উপদ্রব ছিল অত্যন্ত বেশী। তাদের অত্যাচার থেকে আত্মরক্ষার জন্য একটা বড় মশারি বানিয়ে নিয়েছিলাম, সমস্ত বোট জুড়ে খাটানো যেত। রাত্রে জানালা খুলে শুতাম, শেষরাত্রে জেগে উঠে সেই জানালা দিয়ে প্রতিদিন দেখতাম, ভোরবেলাকার শুকতারা আপাণ্ডুর আকাশে আমার শিওরের কাছে নিস্তব্ধ। মনে হ'ত, একটি স্বচ্ছ, নির্ম্মল দিন আমাকে অভিনন্দিত করতে এল, আজ যে একটা কিছু পাবই, এ সম্বন্ধে বিন্দুমাত্র সংশয় জাগত না মনে। ঘুম থেকে উঠেই মুখ ধুয়ে যেতাম চরের দিকে, মাইল দুয়েক হেঁটে আসতাম, দৌড়তামও কখনো। বোটে ফিরে এলে ফটিক নিয়ে আসত এক বাটি ডালের সূপ, সেটুকু খেয়ে বসতাম লিখতে। কি লিখব, আগে থেকে কিছুই জানতাম না, শুধু জানতাম যে, একটা কিছু হবেই। হ'তও তাই।

“প্রথম যৌবনে যখন পা দিয়েছি, বিবাহও হয়েছে। সংসারযাত্রায় কোন সমারোহ ছিল না। মাসহারা পেতুম প্রথমে দেড় শো, তার পরে দুশো। তখন ছাত্রদের সম্বন্ধে আমার দাক্ষিণ্য ছিল নির্ব্বিচার। তাদের সকলকে আমি চিনতামও না, পড়াশোনা কি রকম করছে কিম্বা আদৌ করছে কি না, এ সব সংবাদ দেওয়ার কোন দায়িত্বই তাদের ছিল না। বুঝতে পারতাম, অনেক স্থলেই ঠকছি, কিন্তু ঠকায় নি এমন পাত্রও ত ছিল। মনে আছে, একটি বরিশালের ছেলে তিন বছর ধরে ব্যর্থ অধ্যবসায়ে বি-এ পরীক্ষা দিয়েছে। কিন্তু অর্থ হিসেবে তার দুশ্চেষ্টা ব্যর্থ হয় নি। অপব্যয়ের জন্য গৌরব দাবী করা উচিত নয়, কৃতজ্ঞতা দাবী করাও মূঢ়তা। একটি ছাত্রের কথা শুধু মনে আছে। সে এল আমার সঙ্গে দেখা করতে, বলল—আপনার হয় ত মনে নেই, কিন্তু আপনি ছ বছর মেডিক্যাল কলেজে আমার পড়ার খরচার সাহায্য করে এসেছেন। আপনার আশীর্ব্বাদে আমি ডাক্তারি পাস করেছি এবং সম্প্রতি আয়ুর্ব্বেদের বই একখানা তর্জ্জমা করেছি, তারই এক কপি আপনাকে দিতে এলাম। যাই হোক, বলছিলাম, আর্থিক সচ্ছলতা যাকে বলে, প্রথম বয়সে তা আমার ছিল না। বই পড়বার সখ ছিল, অনেক সময় এক সেট কিনে পড়া হয়ে গেলে হকারকে বেচে আর এক সেট কিনতুম। গ্রন্থলোলুপ বন্ধু ভালো দরে বেচে দেবেন লোভ দেখিয়ে গাড়ি বোঝাই করে বই নিয়ে গেলেন। মূল্য পাব আশা করেছিলুম ব'লে ভাগ্যদেবী হেসেছিলেন। বোধ করি উত্তরাধিকারীদের কাছে চেষ্টা করলে কিনে নেওয়া সম্ভব হতে পারে।

“'সাধনা'র যুগে প্রধানত শিলাইদহেই কাটিয়েছি। কলকাতা থেকে বলুর (বলেন্দ্রনাথ ঠাকুর) ফরমাস আসত, গল্প চাই। গ্রামজীবনের পথ-চলতি কুড়িয়ে পাওয়া অভিজ্ঞতার সঞ্চয় সাজিয়ে লিখেছি গল্প। তখন ভাবতাম কলম বাগিয়ে বসলেই গল্প লেখা যায়। তার পরে প্রমাণ হয়েছে কথাটা সত্য নয়। অর্থাৎ, মাছ তখন ভেবেছিল, যেহেতু জলে সাঁতার দিতে বাধে না, শুকনো ডাঙাতেও বাধবে না। শুকনো ডাঙার ধারণাটা তখন অস্পষ্ট ছিল। 'সাধনা'র যুগে শুধু গল্প নিয়ে নিষ্কৃতি ছিল না, কবিতা, প্রবন্ধ, সমালোচনা, সম্পাদকীয় মন্তব্য, সবই লিখতে হোত। সুতরাং একদা 'সাধনা' বন্ধ ক'রে দিয়ে তবে ছুটি নিতে হ'ল।”

জিজ্ঞেস করলাম—আপনার আহারটা কি ডালের সূপ দিয়েই যেত।

—“না। সাত্ত্বিকতার অহঙ্কার করব না। তখন মাংস খাওয়া অভ্যাস ছিল, ফটিক সন্ধ্যার পর এনে দিত কাটলেট-জাতীয় খাদ্য লুচির সহযোগে। তার পরে অধ্যয়নের মশারি থেকে নিদ্রায়নের মশারিতে ঢুকতেম। পরের দিন সকালে আবার উঠত শুকতারা, তার সঙ্গে শুভদৃষ্টি বিনিময় ক'রে শাপমোচিত দৈনন্দিন জীবনের সুরু হোত। সেকালে বাংলা দেশে লেখকজীবন ছিল অপেক্ষাকৃত নিষ্কণ্টক। পাঠকও ছিল অল্প, বিচারকও ছিল তথৈবচ। বিচারক জাতটা হিংস্র স্বভাবের। তবু তাদের দাঁত নখ তখন এত

করে গজায় নি। তখনো বঙ্কিমের যুগ, কবি বলতে নবীন সেন ও হেম বন্দ্যোপাধ্যায়। আমি সহজেই ছিলাম লোকচক্ষুর অন্তরালে। বাংলা দেশে সে-যুগে পথে ঘাটে ক্ষুদে ক্ষুদে কাগজের কুশাঙ্কুর গজিয়ে ওঠে নি। তা ছাড়া যাঁরা ছিলেন খ্যাতনামা লেখক, তাঁদের লোকে সম্ভ্রম করত। ফস্ ক'রে বঙ্কিমের সঙ্গে হৃদ্যতার দাবী করা তখন যার-তার সাহসে কুলোত না—সেই দুর্গমতার আড়ালে তাঁরা মান রক্ষা করতে পেরেছেন। তখন আমার নিত্য ব্যবহারের পোষাক ছিল ধুতি, গায়ে শুধু চাদর এবং পায়ে চটি জুতো। প্রাতঃকালে বেলফুল তুলে সেই চাদরের খুঁটে বাঁধতুম। চুল রেখেছিলেম লম্বা, এই কবিত্বের ভেক ধারণের জন্যে আজ আমি অত্যন্ত লজ্জিত।

"'সাধনা'র যুগের পর আমি প্রথম উপন্যাস লিখি 'চোখের বালি'। বইখানি যত্ন ক'রে লিখেছিলুম এবং ভালই হয়েছে ব'লে আজও আমার বিশ্বাস। 'নৌকাডুবি'র মধ্যে অনেক গলদ রয়ে গেছে। এরই কিছুকাল পরে একদিন রামানন্দ বাবু আমাকে কোনো অনিশ্চিত গল্পের আগাম মূল্যের স্বরূপ পাঠালেন তিনশো টাকা। বললেন, যখন পারবেন লিখবেন, নাও যদি পারেন আমি কোনো দাবী করব না। এত বড়ো প্রস্তাব নিষ্ক্রিয় ভাবে হজম করা চলে না। লিখতে বসলুম 'গোরা'—আড়াই বছর ধরে মাসে মাসে নিয়মিত লিখেছি, কোনো কারণে একবারো ফাঁক দিই নি। যেমন লিখতুম তেমনি পাঠাতুম। যে সব অংশ বাহুল্য মনে করতুম, কালির রেখায় কেটে দিতুম, সে সব অংশের পরিমাণ অল্প ছিল না। নিজের লেখার প্রতি অবিচার করা আমার অভ্যাস। তাই ভাবি সেই বর্জ্জিত কাপিগুলি আজ যদি পাওয়া যেত, তবে হয়ত সেদিনকার অনাদরের প্রতিকার করতুম।

"এই ভাবে কেটেছে জীবনের এক পর্ব্ব। তার পরে এসেছি জনতার মধ্যে। সমাজের সঙ্গে, মানুষের সঙ্গে ব্যবহারের সম্বন্ধ স্থাপিত হয়েছে, খ্যাতি বেড়েছে, সেই সঙ্গে লোকের অজস্র রকম দাবীও বেড়েছে। তার পরে আছে বিশ্বভারতী এবং সময়ে অসময়ে মাঝে মাঝে তার জন্য অর্থ সংগ্রহের চেষ্টা। তোমাদের মধ্যেও সময়ে সময়ে ঘটছে মতভেদ এবং মনান্তর, তারও ঢেউ এসে লাগে। নানাদিক দিয়ে সহস্র জটিল বন্ধনে আবদ্ধ হয়ে পড়েছি। কিন্তু এরও প্রয়োজন ছিল, জীবনের পর্ব্বে পর্ব্বে কত বিচিত্র অভিজ্ঞতা সঞ্চিত হ'ল। আজ জীবনের সায়াহ্নে বসে বসে ভাবি, আর একবার পদ্মার বুকে সেই নির্জ্জনচারী জীবনে ফিরে যাব। ঠিক সেই স্পর্শ হয়ত পাব না, কিন্তু জীবনের চক্রগতি পূর্ণ হবে, গ্রামের স্নেহচ্ছায়ায়, প্রকৃতির উন্মুক্ত সৌন্দর্য্যের মধ্যে নদীতীরে একদা যে জীবনের সূত্রপাত হয়েছিল, আজ তারই অবসানবেলায় আবার ফিরে যাব সেই নদীরই কোলে।"

শেষ হ'ল তাঁর কাহিনী। আমরা খানিকক্ষণ চুপ করে বসে রইলাম। তরুণ তাপসের যে সাধনামগ্ন মূর্ত্তি এতকাল শুধু কল্পনাতেই সমুজ্জ্বল ছিল, হয়ত মনে মনে তারই সঙ্গে মিলিয়ে দেখছিলাম আজকেকার কাহিনীর এই নব পরিচিত রবীন্দ্রনাথকে। কিছুক্ষণ পরে তাঁর কাছ থেকে বিদায় নিয়ে চলে এলাম পদ্মাচরের সেই আপনভোলা, ভাবোন্মত্ত রবীন্দ্রনাথেরই কথা ভাবতে ভাবতে।

বিরহে

"বনফুল"

মেঘেতে ঢাকা গগনতল
নীরব দশ দিশি
হৃদয় আছে অনর্গল
গভীর ঘন নিশি।

মুক্ত করি হৃদ্বিদ্বার

সে আসে যায় বারম্বার
ধরিতে গেলে থাকে না আর
আঁধারে যায় মিশি

হৃদয় থাকে স্বপ্নাতুর
ঘনায় ঘন নিশি।

ভারতীয় ব্যাঙ্কিং

শ্রীঅনাথগোপাল সেন

১

ইহার প্রাচীনত্ব

দেশব্যাপী প্রতিষ্ঠাসম্পন্ন ভারতীয় যৌথ ব্যাঙ্কের সংখ্যা আজ পর্য্যন্ত নিতান্ত নগণ্য হইলেও ইংরেজ রাজত্বের পূর্ব্বে ব্যাঙ্কিং প্রথা এদেশে প্রচলিত ছিল না ইহা মনে করিলে গুরুতর ভুল করা হইবে। তিন সহস্র বৎসর পূর্ব্বে, মনুর সময় হইতে আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের প্রায় অধিকাংশ রীতি-নীতিই বিস্তৃতভাবে ভারতবর্ষে প্রচলিত ছিল। সর্ব্বসাধারণের অর্থ ও তৈজসাদি গচ্ছিত রাখা, সাধারণ বা চক্রবৃদ্ধি হারে সুদ ধরিয়া টাকা ধার দেওয়া, হুণ্ডি কাটা, চালানী মাল বীমা করা, জাবেদা খাতা (day book), নগদান খাতা (cash book) ও খতিয়ান (ledger) সাহায্যে অতি পুঙ্খানুপুঙ্খ-রূপে শৃঙ্খলার সহিত হিসাব রাখা, এই সবই তাহারা জানিত ও করিত। এতদ্ভিন্ন ভারতের বিভিন্ন স্বাধীন রাজন্যবর্গের স্বতন্ত্র মুদ্রা থাকায় ঐ সব মুদ্রার বিনিময় ও মূল্য নির্দ্ধারণ করাও দেশীয় মহাজন বা সাহুকরদের একটি প্রধান কাজ ছিল—যেমন অধুনা আন্তর্জ্জাতিক মুদ্রা বিনিময়ের কাজ পাশ্চাত্য একস্চেঞ্জ ব্যাঙ্কগুলি করিয়া থাকে। খ্রীষ্টের তিন শত বৎসর পূর্ব্বে লিখিত চাণক্যের অর্থশাস্ত্রেও আমরা আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের প্রায় সর্ব্ববিধ কার্য্যবিবরণ দেখিতে পাই। ইহা জাতীয় গর্ব্বপ্রসূত মিথ্যা অহঙ্কার নহে, ইংরেজ পণ্ডিতগণই ইহা লিপিবদ্ধ করিয়া গিয়াছেন।

মুসলমান আক্রমণের সূচনায় ভারতে যে অরাজকতার সৃষ্টি হয়, সেই সময়ে ব্যাঙ্কিংয়ের প্রতিপত্তি ও প্রসার স্বভাবতই কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হইয়াছিল। জনসাধারণ তখন মহাজন ও বণিকদের নিকট ধনসম্পত্তি গচ্ছিত না রাখিয়া নিজেদের নিকটে নানা গোপন উপায়ে সঞ্চিত রাখাই অধিকতর নিরাপদ মনে করিত। অবশ্য, সেই সময়েও বিভিন্ন রাষ্ট্র-সমূহকে প্রয়োজনমত অর্থ সাহায্য করিবার জন্য তাহাদের প্রত্যেকের সহিত কোন মহাজন- বা শেঠ-পরিবারের সংশ্রব থাকিত এবং তাহারাই ঐ সব রাজ্যে অর্থসচিবের পদ অধিকার করিতেন। বাংলার নবাবগণের বংশানুক্রমিক ব্যাঙ্কার ছিলেন জগৎ শেঠের পরিবার। এজেন্সী হাউসের সৃষ্টি না হওয়া পর্য্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীকেও ইহাদের নিকটই টাকা ধার করিতে হইত।

পাশ্চাত্য ও ভারতীয় ব্যাঙ্কিংএ পার্থক্য

আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের সহিত ভারতীয় ব্যাঙ্কিংয়ের পার্থক্য এইখানে সংক্ষেপে আলোচনা করা যাইতে পারে।

(ক) আধুনিক ব্যাঙ্কগুলির পুঁজি সর্ব্বসাধারণের নিকট হইতে অংশ বিক্রয় ও আমানত গ্রহণ করিয়া তোলা হয় এবং অংশীদারগণের দেনা বা দায়িত্ব তাহাদের অংশের পরিমাণ অবধি সীমাবদ্ধ। কিন্তু পুরাতনপন্থী মহাজন ও "বাণিয়া"গণ বেশীর ভাগ নিজের অর্থ দ্বারাই মহাজনী ও ব্যাঙ্কিং কাজ-কারবার পরিচালনা করিয়া থাকে এবং তাহার দায়িত্বও ঐরূপ সীমাবদ্ধ নহে।

(খ) দেশীয় মহাজনদের আর একটি বৈশিষ্ট্য এই যে, ইহারা শুধু ব্যাঙ্কিংয়ের কাজই করে না, সঙ্গে সঙ্গে আমদানি, রপ্তানি, 'রাখি' কারবার এবং অন্যান্য ব্যবসা-বাণিজ্যেও লিপ্ত হইয়া থাকে। ইহা আধুনিক ব্যাঙ্কিংয়ের সাধারণ নীতিবিরুদ্ধ হইলেও 'টমাস্ কুক,' 'পি এণ্ড ও' ব্যাঙ্কগুলির প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে আমরা দেখিতে পাইব যে, ব্যাঙ্কিংয়ের সহিত অন্যান্য নিরাপদ ব্যবসা, কিংবা ব্যবসার সহিত ব্যাঙ্কিং পাশ্চাত্য দেশেও খানিকটা আছে।

(গ) দেশীয় সাহুকরদের কাজকর্ম্মের সহিত পাশ্চাত্য ব্যাঙ্করীতির আরও দুইটি উল্লেখযোগ্য ব্যাপারে প্রভেদ রহিয়াছে। আইনতঃ কোন বিধিনিষেধ না থাকিলেও এই সব দেশীয় সাহুকর, অষ্টাদশ শতাব্দীর ইংরেজ স্বর্ণকার ব্যাঙ্কারদের মত কখনও নোট প্রচলন করে নাই। চেকের সাহায্যে ক্লিয়ারিং হাউস মারফতে দেনা-পাওনা মিটাইবার

সহজ ব্যবস্থাও ইহাদের নাই। অবশ্য, হুণ্ডিদ্বারা বহুকাল হইতে ইহারা আংশিকভাবে চেকের কার্য্য সম্পাদন করিয়া আসিতেছে; কিন্তু আধুনিক কালে চেকের সহায়তায় অর্থের প্রয়োজন যে ভাবে সংসাধিত হইতেছে, দেশীয় হুণ্ডিদ্বারা সেই উদ্দেশ্য সমপরিমাণে কখনও সাধিত হইতে পারে না। এই জন্যই দুই-চারিটি চেট্টি বা শেঠজীর নাম বাদ দিলে আর সকলে বহির্জগৎ হইতে বিচ্ছিন্ন এবং ভারতের বহির্বাণিজ্যের কর্তৃত্ব আজ পরহস্তগত।

বর্ত্তমান সময়ে যদিও ভারতের বড় বড় নগরে ও বন্দরে বৃহৎ আধুনিক ব্যাঙ্ক ও তাহাদের শাখা-প্রশাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং ইহাদিগকে জাঁকজমকের সহিত বহু টাকার কাজকর্ম্ম করিতে আমরা দেখিতে পাই, তথাপি এখনও ভারতের অন্তর্বাণিজ্যে দেশীয় মহাজনদের প্রভাব প্রতিপত্তি নিতান্ত নগণ্য নহে। বিদেশীয় যৌথ ব্যাঙ্কগুলি ভারতের বহির্বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থ প্রায় ষোল আনাই যোগাইয়া থাকে। কিন্তু আমাদের দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের সহিত ইহাদের সম্পর্ক আজ তেমন ঘনিষ্ঠ হইয়া উঠিতে পারে নাই। ভারতের ন্যায় পল্লী-প্রধান মহাদেশের অগণিত কাজ কারবারের পক্ষে ইহাদের আয়োজন এবং ব্যবস্থা মোটেই প্রচুর ও যথেষ্ট নহে। কারণ বড় বড় নগর ও বন্দর ব্যতীত ভারতের অসংখ্য জনপদের সহিত ইহাদের কোনরূপ সংস্রব নাই। তাই দেশের আভ্যন্তরীণ ব্যবসা-বাণিজ্যের জন্য প্রয়োজনীয় অর্থের দাবী এই সব দেশীয় মহাজনই আজও পূরণ করিয়া আসিতেছে। কৃষক, কারিগর, ক্ষুদ্র দোকানদার বা ব্যবসায়িগণকে ইহারাই প্রয়োজনমত অর্থ দাদন দিয়া থাকে। কৃষিপ্রধান দেশের কৃষিজাত পণ্য ক্রয় করিয়া ইহারাই শহরে বন্দরে চালান দিয়া থাকে এবং দেশীয় ও বিদেশীয় শিল্পজাত দ্রব্য পল্লী গ্রামের হাটে গঞ্জে ইহাদের অর্থানুকূল্যেই আমদানী হইয়া থাকে। কৃষকের চাষের খরচ ইহারাই যোগাইয়া থাকে এবং ফসলের সময় উপস্থিত হইলে উহা খরিদ ও চালানের জন্য ইহারাই নগদ টাকা সহ গ্রামে গ্রামে উপস্থিত হয়। আজকাল ইহাদের অনেকে নগদ টাকার পরিবর্ত্তে সরকারী হুণ্ডি খরিদ করিয়া রাখিতে শিখিয়াছে; কারণ দাদন বা মাল খরিদের জন্য নগদ অর্থের প্রয়োজন হইলে ইম্পিরিয়াল কিংবা অন্য কোন যৌথ ব্যাঙ্কে উহা সহজেই ভাঙাইয়া লওয়া চলে। শহরে ... বড় ব্যাঙ্কগুলির পক্ষে মফঃস্বলের অসংখ্য ব্যবসায়ীর সম্পর্কে আসিবার এবং তাহাদের অবস্থা জানিবার সুযোগ বা সুবিধা হয় না। সেই জন্যই ব্যবসাক্ষেত্রে বিশেষ পরিচিত বড় কারবারী ভিন্ন অপর কাহাকেও টাকা দাদন দেওয়া ইহাদের পক্ষে তেমন সহজ ও সম্ভবপর নয়। এতদ্ভিন্ন দেশীয় মহাজনগণ আমানতের জন্য উচ্চতর হারে সুদ দেয় এবং অপেক্ষাকৃত সহজ সর্ত্তে টাকা ধার দেয়। এই সব কারণে ইহাদের কর্ম্মক্ষেত্র নিতান্ত কম প্রশস্ত নহে এবং বড় বড় যৌথ ব্যাঙ্কের ইহারা নিতান্ত নগণ্য প্রতিদ্বন্দ্বী নহে।

আবার অন্য ভাবে দেখিতে গেলে, রাজধানীর টাকার বাজার এবং পল্লীগ্রামের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অসংখ্য ব্যবসায়ী ও চাষীর মধ্যে ইহারাই যোগ স্থাপন করিয়া রাখিয়াছে। সুদূর পল্লী-জমির ফসল কোন্ পথে কি উপায়ে শহরে চালান হয় তাহার অনুসন্ধান লইলেই এই কথার সত্যতা বুঝিতে পারা যাইবে। এইরূপ অনুসন্ধান করিলে আমরা দেখিতে পাইব, গ্রাম্য ছোট ব্যাপারী প্রথমতঃ তাহার সামান্য পুঁজি হইতে নগদ অর্থ দ্বারা পণ্য খরিদ করিতেছে। যখন তাহার পুঁজি নিঃশেষিত হইয়া আসে, তখন সে তাহার ক্রীত পণ্যের মালকবিতে নির্দ্দিষ্ট একটা সময় মধ্যে পরিশোধ করিবার কড়ারে (সাধারণতঃ ত্রিশ কিংবা ষাট দিন) গঞ্জের মহাজন হইতে টাকা ধার করে। আবার গঞ্জের মহাজন, টাকার প্রয়োজন হইলে, তাহার অপেক্ষা বড় মহাজনের নিকট তাহার খরিদা পণ্য জিম্মা রাখিয়া এবং গ্রাম্য মহাজনের হুণ্ডি বিক্রয় করিয়া টাকা সংগ্রহ করিয়া থাকে। এই মহাজন আবার ঐ হুণ্ডিতে স্বাক্ষর করিয়া উহার দায়িত্ব গ্রহণ করিয়া শহরের ব্যাঙ্কে তাহা বিক্রয় করতঃ নগদ অর্থ পাইতে পারে। এই উপায়ে ব্যবসা-বাণিজ্যক্ষেত্রে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র ব্যাপারী বা মহাজনের সহিত শহরের আধুনিক ব্যাঙ্কের যোগসূত্র গৌণভাবে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। এক হিসাবে পাশ্চাত্য ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হওয়ার ফলে দেশীয় মহাজনী কারবারের বিশেষ ক্ষতি হয় নাই। বরঞ্চ, অনেক ক্ষেত্রে নগদ টাকাকড়ি পাঠাইবার হাঙ্গামা হইতে ইহারা রক্ষা পাইয়াছে। শুধু তাহাই নয়, প্রয়োজনমত অতিরিক্ত টাকা সংগ্রহের সহজ সুযোগও

ইহারা অনেকটা লাভ করিয়াছে। ব্যবসাদারদের হুণ্ডি ক্রয় করিবার সময় ইহারা "ব্যাঙ্ক রেট" অপেক্ষা শতকরা দুই-তিন টাকা অধিক বাট্টা ধরিয়া লয় এবং উহা পুনরায় ব্যাঙ্কের নিকট "ব্যাঙ্ক রেটে" বিক্রয় করিয়া থাকে। এইভাবে মাঝ হইতে ইহাদের শতকরা দুই-তিন টাকা লাভ থাকিয়া যায়। গ্রাম্য ব্যবসায়ীর হুণ্ডি সোজাসুজি শহরের ব্যাঙ্ক গ্রহণ করিতে রাজী হয় না, ধনী ও পরিচিত মহাজন ঐ সব হুণ্ডি স্বাক্ষর করিয়া টাকার দায়িত্ব গ্রহণ করিলে তবেই শহরের ব্যাঙ্ক উহা গ্রহণ করে। সেই জন্যই এইসব মহাজনের পক্ষে হুণ্ডি ক্রয়বিক্রয় দ্বারা এই লাভের পথ উন্মুক্ত হইয়াছে। সনাতনপন্থী অনেক মহাজন আজকাল তাহাদের ব্যবসাকে আধুনিক ছাঁচে রূপান্তরিত করিতেছে এবং অনেকে চেকের প্রচলন পর্য্যন্ত সুরু করিয়াছে।

ভারতে আধুনিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার ইতিহাস এক্ষণে আমরা যথাসাধ্য সংক্ষেপে আলোচনা করিব। ব্যবসা করিবার জন্য যে সব "এজেন্সী হাউস" এদেশে প্রতিষ্ঠিত হয়, তাহারা ব্যবসা-বাণিজ্যের সঙ্গে সঙ্গে কাজকর্ম্মের সুবিধার জন্য কলিকাতায় সর্ব্বপ্রথম একটি ব্যাঙ্কিং বিভাগ খোলেন। নীলকুঠি, অন্যান্য ফ্যাক্টরী, পণ্যবাহী জাহাজ ইত্যাদি জামিন রাখিয়া ইহারা ইংরেজ ও দেশীয় কুঠিয়াল ও ব্যবসায়ীদিগকে টাকা দাদন করিতেন। আদালতী সুদের হার উচ্চ হওয়ায় ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কর্ম্মচারী ও ইংরেজ বণিকগণ তাহাদের সঞ্চিত অর্থ এই সব এজেন্সী হাউসে গচ্ছিত রাখিতেন। কিন্তু ইহারা অধিক লাভের আশায় নানাবিধ দুঃসাহসিক কর্ম্মে প্রবৃত্ত হইয়া ক্ষতিগ্রস্ত হয় এবং ১৮৩০-৩১ সালে ব্যবসাসঙ্কট উপস্থিত হইলে উহাদের অস্তিত্ব লোপ পায়। "ব্যাঙ্ক অব হিন্দুস্থান" নামে কলিকাতা শহরে ভারতের যে সর্ব্বপ্রথম বেসরকারী যৌথব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, উহাও ১৮৩০-৩২ সালের দুঃসময়ে উঠিয়া যায়। তৎপর কলিকাতার কতকগুলি বড় বড় ব্যবসায়ীর সহযোগিতায় "ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক" নামে আর একটি বেসরকারী ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল, কিন্তু ১৮৪৮ সালে তাহার অস্তিত্বও লোপ পায়। এদিকে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর সনদমূলে ১৮০৬ সালে ভারতের প্রাচীনতম প্রাদেশিক যৌথ ব্যাঙ্ক, "ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গল" প্রতিষ্ঠিত হয়। ইহার ৫০ লক্ষ টাকার মূলধন মধ্যে ১০ লক্ষ টাকা ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগাইয়াছিলেন। "ব্যাঙ্ক অব্ বোম্বে"র প্রতিষ্ঠা হয় ১৮৪০ সালে—৫২ লক্ষ টাকা মূলধন লইয়া। কিন্তু শেয়ার স্পেকুলেশনের ফলে ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া ১৮৬৮ সালে ইহা উঠিয়া যায়। তৎপর ঐ বৎসরই এক কোটি টাকা মূলধন লইয়া "ব্যাঙ্ক অব বোম্বে"র দ্বিতীয়বার গোড়াপত্তন হয়। ১৮৪৩ সালে ৩৬ লক্ষ টাকা মূলধনে মান্দ্রাজের প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ঐ সব প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের অবস্থা অনেকটা আধা-সরকারী প্রতিষ্ঠানের মত ছিল। প্রথমতঃ ইহাদের মূলধন আংশিকভাবে ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী যোগাইয়াছিলেন; দ্বিতীয়তঃ ১৮৫৭ সাল পর্য্যন্ত ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর পদস্থ কর্ম্মচারী এই সব ব্যাঙ্কে সম্পাদক (সেক্রেটারী) ও কোষাধ্যক্ষের পদ অধিকার করিতেন এবং ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী কতিপয় পরিচালকও (ডিরেক্টার) মনোনয়ন করিতেন। ব্যাঙ্কিং-সংক্রান্ত যাবতীয় সরকারী কাজকর্ম্ম এই সব প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক মারফতে সম্পন্ন হইত।

১৮৬২ সাল পর্য্যন্ত নোট প্রচলনের অধিকারও এই সব প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের হাতেই ছিল। কিন্তু এই সময়ে ঐ অধিকার গবর্ণমেণ্ট স্বহস্তে গ্রহণ করেন। কিন্তু তদ্বিনিময়ে সরকারী তহবিল এই সব প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে রক্ষিত হইতে থাকে।

"প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক আইন"মূলে ১৮৭৬ সালে গবর্ণমেণ্ট এই সব ব্যাঙ্ক হইতে তাহাদের প্রদত্ত মূলধন তুলিয়া লয়েন এবং পরিচালক, সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ মনোনয়ন বা নিয়োগের অধিকার পরিত্যাগ করেন। ইহার ফলে সরকারী সংস্রব অনেকটা হ্রাসপ্রাপ্ত হইলেও গবর্ণমেণ্টের পক্ষে সাময়িক ঋণগ্রহণের বন্দোবস্ত করা, সরকারী তহবিলের একটা নির্দ্দিষ্ট ন্যূনতম অংশ গচ্ছিত রাখা ইত্যাদি কর্ম্মভার তখনও ইহাদের উপর ছিল। এতদ্ভিন্ন ইহাদের হিসাব পরীক্ষা করা, কোন বিষয়ের সংবাদ বা তথ্য দাবী করা, সাপ্তাহিক হিসাব প্রকাশে ইহাদিগকে বাধ্য করা, ১৮৭৬ সালের আইনমূলে সরকারী অধিকারের অন্তর্ভুক্ত ছিল।

১৮৭৬ সাল পর্য্যন্ত দশ বৎসর কাল, কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ—এই তিন প্রাদেশিক রাজধানীর সরকারী তহবিল

প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কেই থাকিত। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্ক হইতে প্রয়োজনমত মফঃস্বলে টাকা পাঠাইতে নানারূপ অসুবিধা ঘটিতে থাকায়, ১৮৭৬ সালে কলিকাতা, বোম্বাই ও মান্দ্রাজ নগরীতে গবর্ণমেণ্ট নিজেদের রিজার্ভ ট্রেজারী (খাজনাখানা) স্থাপন করেন। এই সময় হইতে সরকারী তহবিলের অধিকাংশ অর্থই এই সব খাজনাখানায় রক্ষিত হইত— দৈনন্দিন কাজকর্ম্মের জন্য আবশ্যকীয় সামান্য তহবিল মাত্র জেলা ট্রেজারীতে (খাজনাখানায়) থাকিত। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কে সরকারী তহবিল গচ্ছিত রাখিবার যে ন্যূন পরিমাণ নির্দ্ধারিত হইয়াছিল, তদপেক্ষা কম অর্থ এ সব ব্যাঙ্কে রাখিলে গবর্ণমেণ্ট তজ্জন্য ঘাটতি তহবিলের উপর একটা সুদ দিতে স্বীকৃত হন। কার্য্য ক্ষেত্রে নির্দ্দিষ্ট ন্যূন পরিমাণ অপেক্ষা অধিক অর্থই এই সব ব্যাঙ্কে গবর্ণমেণ্টের গচ্ছিত থাকিত। কলিকাতা ব্যতীত ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে পৌষ হইতে জ্যৈষ্ঠ এই ছয় মাস কেনাবেচার কাজ জোরের সহিত চলিয়া থাকে এবং অর্থের প্রয়োজনও এই সময়েই বেশী হয়। বাংলা দেশে শ্রাবণ, ভাদ্র, আশ্বিন, কার্ত্তিক এই চারি মাসই কৃষিজাত পণ্য ও অন্যান্য জিনিষের কেনা-বেচার মরশুম। আবার অন্যদিকে সরকারী রাজস্বের বেশীর ভাগ আদায় হয় পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন, চৈত্র ও বৈশাখ মাসে। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে যে, ব্যবসার মরশুমের সময়, যখন টাকার বাজারে অধিক অর্থের প্রয়োজন, সেই সময়ে বহু অর্থ রাজস্ব বাবদ সরকারী তহবিলে আসিয়া জমা হইতে থাকে। এই অর্থ সারা বৎসরের খরচ বাবদ গবর্ণমেণ্ট ধরিয়া রাখেন। ফলে টাকার বাজারে ব্যবসার জন্য অর্থের অনটন ঘটে।

ব্যাঙ্কিং ও সরকারী তহবিল

এই অবস্থার প্রতিকারের জন্য স্বল্প দিনের মেয়াদে সরকারী তহবিল হইতে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কের মারফতে জনসাধারণকে টাকা ধার দিবার একটি প্রস্তাব উত্থাপিত করা হয়। গবর্ণমেণ্ট এই প্রস্তাবে প্রথমতঃ সম্মত হন নাই। কর্ত্তৃপক্ষ হইতে এই কথা বলা হয় যে, আকস্মিক কোন কারণে টাকার প্রয়োজন হইলে গবর্ণমেণ্টকে বিপদে পড়িতে হইবে এবং ভারতের রাজনৈতিক অবস্থায় এরূপ সম্ভাবনা সর্ব্বদাই বিদ্যমান। দ্বিতীয়তঃ, জনসাধারণ তাহাদের নিজ সঞ্চিত অর্থদ্বারা ব্যবসা না করিয়া যদি সহজলভ্য ধারের টাকায় ব্যবসা করিবার সুবিধা পায়, তাহা হইলে ব্যবসার পক্ষেও ইহা পরিণামে মঙ্গলজনক হইবে না। অনেক আন্দোলনের পর ভারতসচিব এই প্রস্তাব অনুমোদন করিলেন বটে; কিন্তু সরকারী টাকার জন্য প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে ব্যাঙ্ক রেটে সুদ দিতে হইবে এরূপ নির্দ্দেশ করিলেন। গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে ব্যাঙ্ক রেটে টাকা ধার করিয়া আনিয়া উহা পুনরায় ব্যবসায়ী-মহলে ধার দিয়া সুবিধা হইবে না মনে করিয়া প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলি এই সর্ত্তে সরকারী টাকা লইতে অসম্মত হয়। চেম্বারলেন কমিশন (১৯১২-১৩ সালে) এই অবস্থার প্রতিকার কল্পে দুইটি প্রস্তাব উপস্থিত করেন। তাঁহারা বলেন: হয় সরকারী খাজানা-খানা (Reserve Treasury) উঠাইয়া দিয়া সরকারী তহবিল এই সব প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কে রাখা হউক, নয়ত "ব্যাঙ্ক রেট" অপেক্ষা শতকরা এক কিংবা দুই টাকা কম সুদে প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্কগুলিকে সরকারী অর্থ ধার দেওয়া হউক। সাধারণ অবস্থায় গবর্ণমেণ্ট জনমতকে পুনঃ পুনঃ উপেক্ষা করিলেও বিগত লড়াইয়ের সময় নিজ স্বার্থের জন্য অর্থের পরিমাণ বৃদ্ধি করিবার আবশ্যক হইলে, গবর্ণমেণ্ট সরকারী তহবিল হইতে বহু টাকা প্রেসিডেন্সি ব্যাঙ্ক-সমূহের হস্তে অর্পণ করেন—উদ্দেশ্য ক্রেডিট-মূলে এই টাকা জনসাধারণের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িলে তাহারা অনায়াসে গবর্ণমেণ্টকে সমর-ঋণ বাবদ টাকা ধার দিতে পারিবে। বহু আন্দোলনে যাহা সম্ভব হয় নাই, বিগত যুদ্ধের ফলে তাহা সম্ভবপর হইয়াছিল। অবশেষে ১৯২১ সাল হইতে রিজার্ভ ট্রেজারী তুলিয়া দিয়া নবপ্রতিষ্ঠিত ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্কেই সরকারী টাকা গচ্ছিত রাখা হয়।

সর্ব্বসাধারণের অর্থ গচ্ছিত রাখা, গবর্ণমেণ্টের, মিউনি-সিপ্যালিটির কিংবা অন্যান্য কতকগুলি নির্ভরযোগ্য নির্দ্দিষ্ট প্রতিষ্ঠানের ঋণপত্র মূলে টাকা ধার দেওয়া, হুণ্ডি ক্রয় বিক্রয় করা, নিরাপত্তার জন্য মূল্যবান সিকিউরিটি গচ্ছিত রাখা, গবর্ণমেণ্ট ও কতকগুলি বড় বড় মিউনিসিপ্যালিটির পক্ষে ধারের বন্দোবস্ত করা ইত্যাদি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কসমূহের নির্দ্দিষ্ট কার্য্য ছিল। কিন্তু এই সব ব্যাঙ্কের বিদেশী অর্থ কেনা বেচা কারবার কিংবা বিদেশ হইতে টাকা ধার করিবার

অধিকার ছিল না। এমন কি, কি পরিমাণ অর্থ দাদন দেওয়া হইবে, কত দিনের মেয়াদে দেওয়া হইবে, কি জাতীয় জামিন-মূলে দেওয়া হইবে, তৎসম্বন্ধে ইহাদের উপর নানারূপ বিধিনিষেধ ছিল। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কগুলির সহিত গবর্ন-মেণ্টের একটি ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক থাকায় ইহাদের প্রতিপত্তি ও মর্য্যাদা জনসাধারণের নিকট খুবই উঁচু ছিল। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, সরকারী তহবিলের একটা বড় নির্দ্ধারিত অংশ প্রায় সর্ব্বদাই এই সব ব্যাঙ্কে আমানত থাকিত। গবর্ণমেণ্টের পক্ষে ব্যাঙ্ক-সংক্রান্ত যাবতীয় কার্য্যাদি এই সব ব্যাঙ্কই সম্পন্ন করিত। এই সব কারণে ইহাদের পক্ষে ব্যাঙ্কিং ক্ষেত্রে ভারতবর্ষে একাধিপত্য লাভ করা সহজ হইয়াছিল।

কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব

কিন্তু নোট প্রচলন ও মুদ্রা সম্পর্কীয় অন্যান্য যাবতীয় বিলি ব্যবস্থার ভার গবর্ণমেণ্টের হাতে থাকায় এবং প্রাদেশিক আধা সরকারী ব্যাঙ্কগুলির সহিত অন্যান্য যৌথ-ব্যাঙ্কের ও মফঃস্বলের মহাজনগণের তেমন ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক না থাকায় টাকার বাজারে একটা অনিশ্চিত ও বিশৃঙ্খল অবস্থা চলিয়া আসিতেছিল। কোন সময়ে ব্যবসার অনুপাতে টাকার বাজারে অর্থাভাব ঘটিতেছিল, আবার কোন সময়ে প্রয়োজনের অতিরিক্ত অর্থ বাজারে ছড়াইয়া পড়িয়া জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ও আনুষঙ্গিক অসুবিধা ঘটাইতে-ছিল। এমন কোন কেন্দ্রীয় শক্তি ছিল না যাহা ধার (ক্রেডিট) বা মুদ্রার পরিমাণ নিয়ন্ত্রণ করিয়া প্রয়োজন অনুযায়ী অর্থের ব্যবস্থা করিতে পারে। লড়াইয়ের পর ১৯২০ সালে ব্রুসেলস্ নগরে যে আন্তর্জাতিক আর্থিক বৈঠক বসে তাহাতে যে-সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক নাই সেই সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার জন্য একটি প্রস্তাব গৃহীত হয়। এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের সহযোগিতা ভিন্ন কোন দেশের আর্থিক ব্যবস্থা সুনিয়ন্ত্রিত হওয়া সম্ভবপর নহে, ইহাও ঐ বৈঠকে স্বীকৃত হয়। ইহার ফলে আমেরিকার ও য়ুরোপের যে সব দেশে কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের অভাব ছিল সেই সব দেশে কয়েক বৎসরের মধ্যে ঐরূপ ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষেও এইরূপ ব্যাঙ্কের অভাব বহুদিন হইতে অনুভূত হইয়া আসিতেছিল। এক দিকে গবর্ণমেণ্টের হাতে ছিল সরকারী তহবিল, নোট প্রচলনের ক্ষমতা ও বিদেশের সহিত অর্থ আদান-প্রদানের বিশেষ ব্যবস্থা, অন্য দিকে ব্যাঙ্কগুলির হাতে ছিল তাহাদের স্বতন্ত্র তহবিল। এই দুইটি বিভিন্ন আর্থিক শক্তির মধ্যে কোনরূপ সুনির্দ্দিষ্ট সম্পর্ক না থাকায় টাকার বাজারে উল্লিখিত অনিশ্চয়তার উদ্ভব হইতেছিল এই সহযোগিতার অভাবে অনেক ব্যাঙ্কের নগদ তহবিল আকস্মিক প্রয়োজনের পক্ষে প্রচুর না হওয়ায় উহাদের বিপদের সম্ভাবনা থাকিয়া যাইতেছিল। ১৯১৩-১৪ সালে কতকগুলি ব্যাঙ্ক দেউলিয়া হওয়ায় এবং আর্থিক ব্যাপারে সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের যথোচিত অভিজ্ঞতা ও সহানুভূতি না থাকায়, বিশেষজ্ঞ-পরিচালিত একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা অধিকতর অনুভূত হয়। এইরূপ একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক অন্যান্য ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের সহযোগিতায় একটা সুনির্দ্দিষ্ট পরিকল্পনার ভিতর দিয়া দেশের যাবতীয় আর্থিক বিলিব্যবস্থা করিতে পারিবে; ফলে সরকারী ও বেসরকারী ধনভাণ্ডার দেশের কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যে অধিকতর পরিমাণে ব্যবহৃত হইতে পারিবে; জিনিষের মূল্য স্থির রাখার যে অত্যধিক আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছে তাহা সুসাধ্য হইবে; বেসরকারী ব্যাঙ্ক ও মহাজনদের টাকার প্রয়োজন হইলে কিংবা আকস্মিক বিপদ উপস্থিত হইলে তাহাদের একটা আশ্রয়স্থল মিলিবে—ইহাই ছিল ভারত-বাসীর এই দাবীর গোড়ার কথা।

এক শত বৎসর পূর্ব্বে ১৮০৬ সালে সর্ব্বপ্রথম এইরূপ কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব কয়েকজন ব্যবসায়ী উপস্থিত করিয়া-ছিলেন। তৎপর ১৮৬৭ সালে তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ককে একত্র করিয়া একটি নিখিল ভারতীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠার প্রস্তাব ব্যাঙ্ক অব বেঙ্গলের তৎকালীন সম্পাদক ও কোষাধ্যক্ষ ডিক্‌সন সাহেব করিয়াছিলেন। কিন্তু ফল কিছুই হয় নাই। ১৮৯৮ সালে ফাউলার কমিটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রস্তাব সম্বন্ধে আলোচনা করেন। ১৯০১ সালে লর্ড কর্জ্জন এই বিষয়টি পুনরায় বিশেষভাবে বিবেচনা করেন। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের প্রয়োজনীয়তা গবর্ণমেণ্ট স্বীকার করিলেও কার্য্যতঃ কিছুই হইয়া উঠে নাই। ১৯১২-১৩ সালে চেম্বারলেন কমিশনের স্বনামখ্যাত সদস্য কেইন্‌স্ সাহেব তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্ক

একত্র করিয়া একটি কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্ক প্রতিষ্ঠা করাই সর্ব্বাপেক্ষা সহজ ও সুবিধাজনক এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন এবং এইরূপ ব্যাঙ্কের একটি খসড়া পর্য্যন্ত প্রস্তুত করেন। প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ নিজেদের স্বাধীন সত্তা এইভাবে লোপ করিয়া সরকারী কর্ত্তৃত্বাধীনে আসিতে সম্মত হন নাই এবং প্রথম হইতেই এই প্রস্তাবের বিরোধিতা করিয়া আসিতে-ছিলেন। কিন্তু ইঁহারা অসম্মত হইলে পাছে গবর্ণমেণ্ট একটি নূতন পুরাদস্তুর সরকারী ব্যাঙ্ক স্থাপন করেন এবং ইঁহারা গবর্ণমেণ্ট হইতে --যাবৎ যে সব সুযোগ ও সুবিধা ভোগ করিয়া কাঁপিয়া উঠিয়াছেন তাহা একেবারে নষ্ট হইয়া যায়, এই আশঙ্কায় তাঁহারা অবশেষে তিনটি ব্যাঙ্কের সম্মিলনে ও অন্যান্য সর্ত্তে সম্মত হন। তাহারই ফলে যুদ্ধাবসানের পর ১৯২১ সালে মিঃ কেইন্‌সের প্রস্তাবানুযায়ী তিনটি প্রাদেশিক ব্যাঙ্কের সমন্বয়ে ইম্পিরিয়াল ব্যাঙ্ক অব ইণ্ডিয়া প্রতিষ্ঠিত হয়। কিন্তু তাহা দ্বারাও কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের উদ্দেশ্য মোটেই সাধিত হয় নাই; কেমন করিয়া তাহা পরে প্রকাশ পাইবে।

প্রশস্তি

শ্রীঅমিয়া দেবী

চিরন্তন আসে নবরূপে ; —
মানস-মন্দির মাঝে নৈবেদ্য-সম্ভারে গন্ধধূপে
জাগায়ে প্রাণের আলো, মুরতিও রহে বসি
প্রতীক্ষার বাতায়নতলে,
আপনারে অভিষিক্ত করি গত বরষের আনন্দ-বেদনার
অশ্রুজলে।

পথে ভুলে চাহি ঊর্দ্ধপানে
চলেছে মানবযাত্রী অনাগত ভবিষ্যের অপূর্ব সন্ধানে
দিনে দিনে নব নব বাধি ;
কোন্ দূর-দুরান্তের লক্ষ্য অবধি ;
চিরন্তন যারা তারা দিনে দিনে পায়ে পায়ে
প্রতিপদে হারানো অতীতে,
যারা শুধু চলে সরণিতে।

ধূলার এ ধরণীতে যাহাদের প্রাণের পরশ
মন্দাকিনী-ধারা আনি ঊষর জীবনপথ করিল সরস,
যারা মোর জীবনের বক্ষে বহে এনে দিল
রিক্ত এই প্রাণশাখা ভরি
স্নিগ্ধ শ্যামলতা রাশি, বর্ণে গন্ধে অপরূপ পত্রপুষ্প
কোরক-মঞ্জরী ;
পরাণের রন্ধ্রে রন্ধ্রে দুয়ারে দুয়ারে
যার ফুৎকারি বাঁশী নবজীবনের মন্ত্রে
ডাক দিল বারে বারে বারে,
পথশ্রান্ত দেহ-মনে তারুণ্যের আনিল সম্বাদ,
অমৃতের বাণী আনি মুছে দিল অন্তরের সর্ব্বগ্লানি
সর্ব্ব অবসাদ,
পরম পাথেয় দানে যারা মোর যাত্রাপথে
প্রাণশক্তি করিল সঞ্চার,
আজ এ নবীন বর্ষে তাহাদের করি নমস্কার!

যারা দিল বাধা,
নিবিড় বেদনাভারে পরিম্লান ভুলের ব্যথায়
বিরহের মালা ভারে গাঁথি দিল দূরান্তরে যারা গেল চলে
ক্রন্দনে চিত্ত মোর অবহেলে ফেলে দিয়ে
পদধূলিতলে,
পরিপূর্ণ প্রাণে
তাদেরো বরণ করি আজ মোর অন্তরের গানে।

যাহাদের নিমগ্ন চেতন
আপন অজ্ঞাতে মোর সুখদুঃখ অহর্নিশি করেছে বহন,
জানা ও অজানা মোর বন্ধু যত নিকট দূরের
এনেছি তাদেরি লাগি সুগভীর ভালবাসা বহু দিবসের,
যাহাদের প্রাণতাপে চিত্ত মোর মুহূর্ত্তেরো লভেছে আশ্রয়
গাহি আজ তাহাদের জয়।



শ্রীমনোজ বসু

ঘাটে নৌকা। সতীশ মহা তাড়াহুড়ো লাগিয়েছে—ও মাসীমা, এখনও হ'ল না ? যেতে যেতে বর এসে যাবে যে—

গিন্নি তাড়াতাড়ি দালানে ঢুকলেন ; পথের সম্বল কিছু পান-স্থপারি বেঁধে নিতে হবে। গিয়ে দেখেন, অবাক কাণ্ড! খাটের উপর একরাশ কাপড়চোপড় ছড়ানো, অনুপমা তার মাঝখানে চুপচাপ ব'সে আছে।

এক মুহূর্ত্ত তাকিয়ে রইলেন, তার পর ধীরে ধীরে কাছে এসে তিনি মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখতে অনু ঝুপ করে উপুড় হয়ে পড়ল।

—যাবি নে ?

অনুপমা ঘাড় নাড়ল।



ধীরে ধীরে কাছে এসে তিনি মেয়ের পিঠের উপর হাত রাখলেন

অথচ ঘণ্টাখানেক আগে সে এখানে এসেছে, তখন তার এ মত ছিল না। এ খেয়ালী মেয়ের অন্ত পাওয়া ভার। বাড়ীর মধ্যে জোর খাটাতে পারেন এক কর্ত্তা। তিনি আজ চার দিন বাড়ীছাড়া, বিয়েবাড়ী কন্যাকর্ত্তা হয়ে বসেছেন।

সতীশ এসে বলল—অনু, তোর মতলবটা কি, বল দিকি—

—মাথা ধরেছে—

—তা হ'লে এক্ষুনি ওঠ্। নৌকোয় গিয়ে ব'স ; গাঙের হাওয়ায় মাথা ছেড়ে যাবে···

অনুপমা সে কথার জবাব দিল না ; মাথা তুলে মায়ের দিকে তাকিয়ে বলল—আর দেরী ক'রো না মা, তোমরা চলে যাও—

হুকুমের স্বর, এর উপর কিছু বলা যায় না ; কোন দিন গিন্নি বলেনও না। কিন্তু আজকের ব্যাপারটা যে মোটেই সামান্য নয়। একটু ইতস্তত ক'রে তাই একবার শেষ চেষ্টা করলেন—তুই চল, নয়ত আমি যাব না—

অনু শান্ত স্বরে বলল—মাথা ধরেছে ; এখুনি হয়ত জ্বর আসবে। সেখানে গিয়ে একটা গোলমাল ঘটিয়ে বসব, সে কি ঠিক হবে ? তুমি চ'লে যাও মা, মালতীর বিয়ে···না গেলে চলে কখনও—ছিঃ—

সতীশ ব্যথিত স্বরে বলল—তুমি যাচ্ছ না অনু, মালতী কিন্তু এ জন্মে তোমার সঙ্গে কথা বলবে না, তা ব'লে দিচ্ছি—

কথাটা ঠিক, মালতী বড় দুঃখ পাবে। এই বছর দুই

আগে তার বিয়ের দিন মালতী কত আমোদ-আহ্লাদ করেছিল, কবিতা ছাপিয়েছিল, হেসে ঠাট্টা ক'রে তর্ক ক'রে সে-মানুষটিকে একেবারে নাকানি-চোবানি খাইয়েছিল। অনুপমার চোখে জল আসবার মত হ'ল। চমৎকার লোক কিন্তু যা হোক—দিব্য নির্ব্বিকার ভাবে কলকাতায় বসে আছেন, অথচ দুই-দুখানা চিঠিতে বিয়ের তারিখ জানানো হয়েছে, সমস্ত কথা লেখা হয়েছে, কিছু জানাতে বাকি নেই ভরসা ছিল, নিতান্ত পক্ষে আজকের ডাকে পার্শেল এসে পড়বে। কিন্তু পিওন এসে চলে গেল। শুধু হাতে এখন সে যায় কি ক'রে ?

দু-হাতে মুখ ঢেকে ঠোঁটে ঠোঁট চেপে অনেক কষ্টে অনুপমা কান্না সামলাল। কাতর কণ্ঠে বলল—আমি পারছি না সতীশদা, সত্যি বড় কষ্ট হচ্ছে। যদি ভাল থাকি একটা নৌকো নিয়ে মাধব-কাকার সঙ্গে যাব। তোমরা এখন যাও—

মাধব প্রতিবেশী—এদের বাড়ীর গোমস্তা।

অগত্যা তাই ঠিক হ'ল। মাধবকে ব'লে-কয়ে গিন্নি রওনা হয়ে গেলেন।

প্রায় ঘণ্টা-দুই কেটেছে। অনুপমা তেমনি শুয়ে। চোখের জল গৌর মুখের উপর শুকিয়ে আছে। একটুখানি সে ঘুমিয়ে পড়েছিল। হঠাৎ কে-একজন যেন বাহুবেষ্টনে তাকে ঘিরে ফেলল। ধড়মড় ক'রে উঠে দেখে, কলকাতার আসামীটি স্বয়ং এসে হাজির।

অনুপমা মুখ ফিরিয়ে উঠে দাঁড়াল। প্রভাত ছাড়বার পাত্র নয়, ঘুরে অনুর সামনে গিয়েই—যেন কত ভয় পেয়ে গেছে—শশব্যস্তে আবার পিছিয়ে দাঁড়াল।

রাগ করলেও মানবে না, এই জন্য লোকটির 'পরে আরও রাগ হয়! হাসলে ত এখনি একেবারে পেয়ে বসবে,—অনু অনেক কষ্টে মুখ গম্ভীর করে রইল।

মৃদুকণ্ঠে প্রভাত বলল—মাথা ছাড়ল ?

—কে বলেছে ? তোমার কলকাতায় তারে খবর গেল বুঝি !

—তারে নয়, অন্তরে। তার পর মাধব-কাকার মুখে সেটা যাচাই হয়ে গেল। একটু থেমে অনুর মুখের দিকে চেয়ে অবস্থাটা আন্দাজ ক'রে নিল। বলতে লাগল—দোষ ছাপাখানার—তারা দেরী ক'রে দিল—ডাকে পাঠান গেল না।...না না কৈফিয়ৎ দিচ্ছি না—ওতে দোষ কাটে না জানি, তাই ত কলেজ পালিয়ে ট্রেন ধরলাম। আবার মুস্কিল কি রকম!—ষ্টেশনের ঘাটে নৌকা নেই—এই ছ-মাইল ছুটতে ছুটতে এসেছি।

জোরে নিঃশ্বাস ফেলে প্রভাত চুপ করল। ঘাট থেকে হাতমুখ ধুয়েই এসেছে, চেহারায় কথাবার্ত্তায় বুঝবার জো নেই যে সে ক্লান্ত। কিন্তু ও মানুষটির ধরণই ঐ রকম। অনু ব্যস্ত হয়ে উঠল; তাড়াতাড়ি বেরিয়ে যাচ্ছিল, প্রভাত এসে পথ আটকে দাঁড়াল।

—ঐ দেখে নাও তোমার প্রীতি-উপহারের বাণ্ডিল... আর এই কানের দুল। ভেলভেটের কেসটি সে অনুর হাতে দিল। বলল—যাচ্ছ কোথায় গো?...এক্ষুনি রওনা হয়ে পড়—বিয়ের আগে পৌঁছে যাবে।

আনন্দে অনুর মুখ উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল, রাগ-টাগ কোথায় উড়ে গেছে। বলল—যাব—তুমি ব্যস্ত হয়ো না। কোন্ সকালে বেরিয়েছ—তোমার ঠিক খিদে পেয়েছে—পায় নি ?

ঘাড় নেড়ে প্রভাত বলল—হাঁ, আকণ্ঠ খিদে—তোমাকেই খেয়ে ফেলতে ইচ্ছে হচ্ছে। যেতে দিচ্ছি না—জান ত কথামালায় বলেছে, উপস্থিত ছাড়তে নেই।

মুখ টিপে হাসতে হাসতে এগিয়ে এল। অনুপমা বলে উঠল—সরো,—ছি-ছি... ঐ হাসছেন ওঁরা দেখে দেখে—

অপ্রতিভ হয়ে প্রভাত চারিদিকে তাকাল।—কই ? কারা ?

দুষ্ট অনু তত ক্ষণে দরজা অবধি চলে গেছে। দেয়ালের উপর দিকে দেখিয়ে চঞ্চল পায়ে সে বেরিয়ে গেল। দেয়ালে বিদ্যাসাগর ও দেশবন্ধুর ছবি। প্রভাত উদ্দেশে প্রণাম ক'রে হাসিমুখে খাটের উপর বসল।

ক্ষুধার সম্বন্ধে প্রভাত অত্যুক্তি করে নি। ভুলোর মা লুচি ভাজছে, অনু পরিবেশন করতে লাগল। থালাটা একদম নিঃশেষ ক'রে পুরো একটি গ্লাস জল খেয়ে তবে সে

কথা কইল। বলল—কাল চ'লে যেতে হবে, থাকবার জো নেই—

অনুপমা ভালমানুষের মত বলল—খাওয়ার হাঙ্গামা ত থাকল না—ভুলোর মাকে বলে যাব, বিছানা-টিছানা করে দেবে।···অসুবিধে হবে না।

প্রভাত প্রশ্ন করল—বিয়েবাড়ী সমস্ত রাত কাটাবে নাকি?

অনুপমা বলল—আজ ত চোখের পাতা এক করতে দেবে না। তার পর কালকে মাসীমার চিলেকোঠা দখল করব। সেখানে কাউকে ঢুকতে দিচ্ছি নে।

গম্ভীর হয়ে প্রভাত উঠে পড়ল।

একটু পরে অনু তৈরী হ'য়ে এসে দাঁড়িয়েছে। প্রভাত বলল—দেখ, একটা কথা ভাবছি, কাজ যখন হয়েই গেল, রাতে রাতে রওনা হয়ে পড়ি। অনর্থক কালকের কলেজটা কামাই ক'রে ফল কি?

অনুপমা মাথা দুলিয়ে সায় দিল—তা ঠিক, রবিবারের কলেজ কিছুতে কামাই করা যায় না।

বার দিন ক্ষণ হিসাব ক'রে মানুষ সব সময় কথা বলে না। কিন্তু প্রভাত ঠকবার ছেলে নয়। একটু উষ্ণভাবে বলল—যায়ই না ত। আমাদের প্র্যাকটিকাল ক্লাস সমস্ত রবিবারে—

অনুপমা নিরুত্তরে জুতোজোড়া এনে প্রভাতের সামনে রাখল।—তবে এইটা পরতে আজ্ঞা হোক—

—তোমার সঙ্গে যাব নাকি?

হেসে উঠে অনু বলল—সেটা কি ভাল হবে? নেমন্তন্ন একলা আমার,—তোমায় ত বলেনি। বিনি-নেমন্তন্নে যাওয়া—ছিঃ—

প্রভাত মন্তব্য করল—যেতে আমার বয়ে গেছে—

অনু বলল—ঘাটে সতীশ-দা আমার জন্য নৌকা নিয়ে আছেন; তোমাকে ঐখান থেকে আর একটা ঠিক ক'রে দেওয়া যাবে। রবিবারের ভয়ানক কলেজ—সে ত কিছুতে কামাই করা যাবে না···

রাগে রাগে প্রভাত জুতো পরল; নিজের ব্যাগটা নিয়ে এগিয়ে চলল।

এটা সেটা দিয়ে অনুপমাও একটি মোট বেঁধেছে কম নয়। আঙুল দিয়ে দেখিয়ে আবদারের সুরে বলল—বা-রে, ওটা?

প্রভাত বলল—লোকজন কেউ নেই নাকি?

—কোথায়? নীলমণিকে বাবা নিয়ে গেছেন। ভুলোর মা মেয়েমানুষ—সে ত পারবে না। মাধব-কাকাকেই বা বলি কি ক'রে?

প্রভাত বিরক্ত গলায় বলল—তবে ঘাট থেকে মাঝিরা এসে নিয়ে যাবে। মুটেগিরি করা আমার ব্যবসা নয়।

অনুপমা ব'লে উঠল—সমস্ত রাত ধরে তবে ঐ হোক্? বললে কেন আমায় যেতে? বিয়ে দেখে আমার কাজ নেই, আমি যাব না।

মুখ ভার ক'রে সে ফিরে দাঁড়াল।

অতএব নিজের ব্যাগ বাঁ-হাতে নিয়ে সেই মোট টেনে তুলতে হ'ল। দস্তুরমত ওজন আছে; কাপড়চোপড়, বালিশ, তোষক, শতরঞ্চি—গোটা সংসারই যেন সঙ্গে চলেছে।

প্রভাত বলল—মতলব কি? মাসীমার বাড়ী পাকাপাকি বসত করবে নাকি?

অনু অভয় দিল—না, বুধবার নাগাদ চলে আসব। তার বেশী নয়। মাসীমার সঙ্গে সেই রকম কথা। কাজের বাড়ীতে কত মানুষ-জন এসেছে—কোথায় বিছানা, কোথায় কি,···আমার আবার পরের বিছানায় ঘুম হয় না—তাই গুছিয়ে নিয়ে যাচ্ছি—

ঘাট খুব কাছেই; কিন্তু প্রভাতের মনে হ'তে লাগল, কত যুগ চলেছে—পথ আর ফুরোয় না। বোঝার ভারে হাতের কব্জি অবধি ছিঁড়ে পড়ছে। অনু প্রস্তাব করল—আহা, মাথায় কর না কেন। জামাই আছ—আছ; রাতে কে দেখছে, কে-ই বা চিনবে—

তা ছাড়া উপায়ও কিছু ছিল না। সিল্কের পাঞ্জাবীর উপর দুই কাঁধে সে দু-হাতের বোঝা চাপাল। বর্ষাকাল—রাস্তায় জলকাদা; চিকচিকে জ্যোৎস্না পড়ে কোন্‌টা জল, কোন্‌টা মাটি ঠিক করবার জো নেই। জলের উপর পাম্পসু সমেত পা পড়ে, জল কাদা ছিটকে উঠে মুখ চোখ ভাসিয়ে দেয়। অনু ঠাট্টা ক'রে ওঠে—দেখো দেখো—বিছানায় লাগে না যেন। বিয়েবাড়ী কত কুটুম্ব এসেছে তারা বলবে কি!

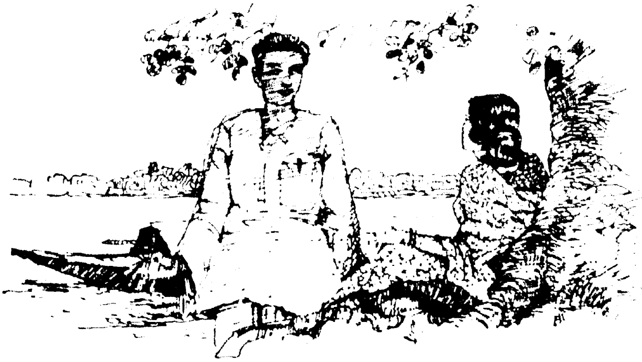
অনেক দুঃখে ঘাটে পৌছান গেল। কিন্তু কোথায় নৌকা, কোথায় বা সতীশ-দা! ভাঁটার টানে জল নেমে গেছে, নদীর বুকে অনেক দূর অবধি নোনা কাদা কে যেন যত্ন ক'রে নিকিয়ে রেখেছে।

অনু বিবেচনা ক'রে বলল—তা হ'লে ওঁরা ঠিক বাঁওড়ের মুখে নৌকো বেঁধে আছেন।—

অতএব আবার সেই বাঁওড় অবধি। প্রকাণ্ড এক বটগাছ—মাঝ নদী পর্য্যন্ত গাছপালা ছড়িয়ে দিয়েছে; ফাঁকে ফাঁকে জ্যোৎস্না পড়েছে। দেখা গেল, রয়েছে বটে একখানা ছোট পানসী। প্রভাত ডাকতে লাগল—মাঝি, মাঝি!

কারও সাড়া নেই। বিরক্ত হয়ে সে নেমে পড়ল। নৌকোয় পৌছে গলুয়ের উপর বোঝা নামিয়ে নিঃশ্বাস ছেড়ে বাঁচল। নৌকার দাঁড় বোঠে সমস্ত রয়েছে—কিন্তু মানুষ নেই। জিজ্ঞাসা করল—এই নৌকো ত বটে?

অনু বলল—না-রে এদূর থেকে বোঝা যায় বুঝি!



বটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে অনু নিশ্চিন্ত হয়ে ব'সে পড়েছে···

বটের গুঁড়িতে ঠেস দিয়ে দুই পা ছড়িয়ে দিব্য নিশ্চিন্ত ভাবে সে ব'সে পড়েছে। প্রভাত বলল—ওখানে থাকলে চলবে না কি? আসতে হবে না?

—আলতা ধুয়ে যাবে যে!

ঝাঁজের সঙ্গে প্রভাত বলল—তবে কি করতে হবে, অনুমতি হোক্?—

বেহায়া অনু ফস্ করে ব'লে উঠল,—হাগো, তুমি একটু নিয়ে যাও না? এক ফালি জ্যোৎস্না পড়েছে তার মুখে; তরল কণ্ঠে সে বলতে লাগল—অত বড় বোঝা দুটো নিয়ে গেলে—আর আমার বেলাতেই পারবে না?

প্রভাতও বোধ করি মনে মনে সেই তুলনা করে দেখল; নিরুত্তরে ফুলে উঠল। তার পর এদিক ওদিক চেয়ে—যেন পালকের তৈরি মানুষ—অনুকে সে স্বচ্ছন্দে কাঁধের উপর ফেলে আবার কাদায় নেমে পড়ল।

মাঝামাঝি পর্য্যন্ত বীর বিক্রমে এসে হঠাৎ প্রভাত থমকে দাঁড়াল। 'ফেলে দিলাম—'

অনু ভয়ে আঁকড়ে ধরল।—না, না, পায়ে পড়ি—আমার কাপড়চোপড় সমস্ত নষ্ট হয়ে যাবে—

—তবে কথা দাও।

—কি?

—রাত্রেই ফিরে চলে আসবে—

অনু তৎক্ষণাৎ স্বীকার করল—হ্যাঁ।

—হ্যাঁ বললে শুনি নে। পা ছুঁয়ে দিব্যি ক'রে বল, যা হয় একটা কিছু বলে যেমন করে পার চলে আসবে—

এবার অনু খিল খিল করে হেসে উঠল।—হ্যাঁ গো মশাই, হ্যাঁ। আপনি না বললেও তাই করা হ'ত। পদগুলো মা'র জিম্মায় ফেলে দিয়ে তক্ষুনি আবার এই নৌকোতে ফিরে আসব। মশাইকেও তাই টেনে নিয়ে যাওয়া হচ্ছে। ভেবেছিলাম, আগে কিছু বলব না, তা হবার জো আছে?

নৌকোয় উঠে অনু সতরঞ্চি বিছিয়ে গড়িয়ে পড়ল। দু' আঙুলে রগ চেপে ধরে বলল—উহুঁ-হুঁ—ছিঁড়ে পড়ছে মাথা। ওগো, বসে বসে কি করছ,—একটু টিপে দাও না গো—বলেই আবার হেসে উঠল। আজ যেন তার কি হয়েছে, কেবলই হাসি পাচ্ছে।

প্রভাত হাসল না; চিন্তিত স্বরে বলল,—কিন্তু মাথা ধরা বললে সতীশ-দা ভুলবেন না, অন্য একটা মতলব বের কর। কোথায় সতীশ-দা?

অনুপমা বলল—বোনের বিয়ে, বাড়ীতে কত কাজকর্ম্ম—তিনি কি এখানে বসে রয়েছেন ?

—বললে যে, তিনি নৌকো নিয়ে আছেন। এ পানসী কার তবে ?

অনুপমা তাচ্ছিলের সঙ্গে বলল—জেলেদের কারও হবে বোধ হয়।

—চমৎকার! কিন্তু ঠিক নেই এদিকে ত বিছানা-পত্তর পেতে ঘরসংসার সাজিয়ে বসেছ। প্রভাত চীৎকার করল—মাঝি! মাঝি!

ভাঁটার জলের কল কল শব্দ, পাড়ের উপর ঝিঁঝির ডাক, বটের পাকা ফল খেতে এসে বাদুড় পাখা ঝটপট করছে···তা ছাড়া কোন দিকে আর কোন সাড়াশব্দ নেই।

অনুপমা বলল—জেলেপাড়া কি এখানে? এক ক্রোশ দু ক্রোশ পথ। সমস্ত রাত চেঁচালেও কেউ শুনতে পাবে না। দরকার কি—এ রাইচরণের নৌকো—সে ভাল লোক, বাবার প্রজা—কতবার গিয়েছি এই নৌকোয়—ডাকতে হবে না, তুমি চল।

প্রভাত এবার সত্যই চটে উঠল।—হ্যাঁ, ঐটে বাকি আছে, মাঝি হ'য়ে নৌকো বেয়ে তোমায় নিয়ে যাই,—লোকে ধন্য ধন্য করবে—

অনুপমা অনুনয়ের স্বরে বলল—তা আর কি করবে বল। উপায় ত নেই। রাত্রে কেউ দেখতে পাবে না। আড়ালে আবডালে লোকে অমন কত কি ক'রে থাকে। তুমি এত করলে—কলকাতা থেকে ছুটে এলে—আর মালতীর বিয়ে দেখা হবে না, তাত হয় না।

প্রভাত রাজী নয়।—তোমার মাধব কাকাকে ডাক গিয়ে। পারেন ত তিনি পৌঁছে দিন—

অনু বলল—তুমি জোয়ান যুবো, রোয়িং ক'রে মেডেল পাও, তুমি বড় দিলে—আর বুড়ো মানুষ মাধব-কাকা দেবেন পৌঁছে? জানি, যাওয়া হবে না—মাথা-ধরার উপর অনর্থক এই রাত্রে হাঁটাহাঁটি—

নৌকোর গলুয়ে প্রভাত চুপচাপ বসে আছে, ওদিকে ছইয়ের মধ্যে অনুপমা শুয়ে পড়েছে কি কি করছে কিছুই বোঝা যাচ্ছে না। খানিক পরে 'ঝপ্‌পাস্' ক'রে দিল বোঠের এক টান।

চারি দিক জ্যোৎস্নায় ডুবে আছে; হাটখোলায় দোকানের আলো দেখা যাচ্ছিল, দেখতে দেখতে তাও পিছনে পড়ে গেল। অনুপমা বাইরে এসে বসেছে। প্রভাত বলল—কোথায় খালে ঢুকতে হবে, বলে দিও। পথ চেন ত সত্যি?

অনু বলল—খুব, খুব—এক বাঁক আগের থেকে ব'লে দেব। আর বলতেও হবে না—বাজনাই বলে দেবে। একটুখানি রাখ ত বোঠে—

মুহূর্ত্তকাল দু-জনে উৎকর্ণ হয়ে শুনল। অনুপমা চোখ বড় বড় ক'রে উজ্জ্বল মুখে বলল—শুনতে পাচ্ছ না? ঐ যে বাজনা—শোন—

অনেক দূর থেকে ঢোলের অস্পষ্ট আওয়াজ আসছিল। অনু বলল—আর কি? পৌঁছে ত গেলাম। খুব মজা লাগছে কিন্তু—আমার মাথাধরা ছেড়ে গেছে। আঃ তোমার এই বোঠে বাওয়ার জ্বালায় আমি যাই কোথায়—

প্রভাত বলল—না বাইলে নৌকো চলবে কেন—

অনু রাগ ক'রে বলল—চ'লে কাজ নেই। সব তাতে তুমি ব্যস্তবাগীশ। এত সকাল সকাল বিয়েবাড়ী গিয়ে কি করব শুনি। আস্তে আস্তে চালাও—

এ প্রস্তাবে প্রভাতেরও খুব মত আছে। আলগোছে সে বোঠে ধরে রইল। পানসীর গতি মন্থর হল।

অনুপমা বলতে লাগল—এই রকম যদি যেতে থাকি—কেবলই যেতে থাকি—

প্রভাত বলল—তা ত হবে না। জোয়ার এলে নৌকো উল্টো মুখো ফিরবে—

অনু জেদ ধরল—ধরো, জোয়ার যদি না-ই আসে—

অতএব জোয়ার না আসাই সাব্যস্ত হ'ল। প্রভাত বলল—তা হ'লে বে অব্ বেঙ্গলে পড়ব—

—তার পর?

—তার পর সাগারের মাঝখানে। চারি দিকে কালো জল, কূলকিনারা নেই—পাহাড়ের মতো ঢেউ...

—উঃ, কি চমৎকার? আহ্লাদে অনু হাততালি দিয়ে

উঠল।—কেমন নাগরদোলার মত দোলা যাবে। কি সুন্দর!

প্রভাত বলল—সুন্দর না হওয়াই সম্ভব। পানসী ভুস ক'রে অথই জলে ডুব দিয়ে বসতে পারে—

—বাঃ বাঃ—তার পর?

প্রভাত বলতে লাগল—বড় বড় হাঙর, কুমীর—

অনু প্রতিবাদ ক'রে উঠল—না, তুমি কিচ্ছু জান না—হাঙর-কুমীর না আরও কিছু। কত মণি-মুক্তো-প্রবাল সেখানে—মস্ত বড় রাজবাড়ী—সোনার পালঙ্ক—

প্রভাত বলল—বাজনা স্পষ্ট শোনা যাচ্ছে কিন্তু; এসে পড়েছি। তার পর হেসে উঠে বলল—এইবার ঠিক ক'রে বল অনু, পাতালের রাজবাড়ী সোনার পালঙ্কে শুতে যাবে না বিয়েবাড়ীর বাসর জাগবে?...

অনুপমা গম্ভীর হয়ে গেল। বলল—সত্যি, বিয়ে দেখার লোভ আমার নেই তেমন। তুমি এক কাজ করবে—

আবার একটু ভেবে নিয়ে বলল—মাসীমাদের ঘাটে উঠে চট ক'রে পদ্যর কাগজগুলো কারো কাছে দিয়ে এস—বাবার হাতে যেন পৌঁছে দেয়—ব্যস। তার পর নৌকোয় ক'রে খুব ঘোরা যাবে।

কৈফিয়তের সুরে বলতে লাগল—মানে, আর কিছু নয়...ভাবছি, অত ভিড়ের মধ্যে মাথাধরা আবার হয়ত বেড়ে যাবে।...তুমি হাসছ কেন বল ত? মিছে কথা বলছি না কি?

প্রভাত ঘাড় নেড়ে বলল—হাসি নি ত। কি সর্ব্বনাশ—হাসি কোথায় দেখলে? ঠিক কথাই ত বলেছ—নৌকোয় বেড়ানো—শিরঃপীড়ার ভাল অষুধ।...কিন্তু পদ্য দিতে গিয়ে আমায় যদি ও-বাড়ীর কেউ চিনে ফেলে—তখন?

অনু বলল—আর আমিও একলাটি বুঝি নৌকোয় বসে থাকব—যা আমার ভয়...হি-হি-হি—

তার পর বলল—যাচ্ছ কোথায় গো? ডাইনে ঘোরাও—এই যে খাল—

খালের জল নদীতে পড়ছে, উজান ঠেলে নৌকো উঠবে। অনু ধাঁ ক'রে কোমরে আঁচল জড়িয়ে লগি হাতে উঠে দাঁড়াল। বলল—একা তোমার ক্ষমতায় কুলোবে না, নৌকোর মাথা ঘুরিয়ে দাও এইবার—

প্রভাত সকাতরে বলল—ও মূর্ত্তি দেখে আমারই মাথা ঘুরে পড়বার জোগাড়—নৌকো ঘুরোবো কি। স্থিরো ভব, অনু লক্ষ্মিটি,—

ষষ্ঠীর চাঁদ উঁচু বাঁধের আড়ালে ঢলে পড়ল। অস্পষ্ট আঁধারে চারিদিক রহস্যময় হয়ে উঠেছে। জোয়ারে খালের জল কূলের উপর অল্প অল্প আঘাত দিতে সুরু করেছে। দু-জনে কত গল্প চলেছে—গল্পের শেষ নেই।

মাঝে একবার প্রভাত বলে উঠল—ঠিক যাচ্ছি ত?

অনু বলল,—হ্যাঁ-হ্যাঁ—ঐ যে বাজনা—

—কিন্তু আঁধার হয়ে পড়ল যে—

অনু বলল—ফেরবার সময় একটা আলো জোগাড় ক'রে আনতে হবে—

জোয়ারের জল ফেঁপে উঠেছে, চেঁচো ও শোলার জঙ্গলের মধ্যে খালের সীমা মিলিয়ে আসছে। সেই জঙ্গলের দিক থেকে একটা তালের ডোঙা সন সন করে বেরিয়ে এল। ডোঙার লোক হাঁক দিল—কারা?

—বিয়েবাড়ী যাচ্ছি।

কিছু না বলে ডোঙা পাশ কাটিয়ে বেরিয়ে গেল।

প্রভাত সন্দিগ্ধ ভাবে বলল—এত সময় ত লাগবার কথা নয়।

অনুপমা বলল—আর ত এসে গেছি। বিলটা ছাড়িয়ে সারি সারি তিনটে তাল গাছ—মাসীমাদের ঘাট সেই খানটায়—

চলেছে—চলেছে—তালগাছ আর আসে না। রাত কত হয়েছে, কে জানে? অন্ধকার গাঢ় হয়েছে। প্রভাত হাত-ঘড়ি দেখবার চেষ্টা করল, নজরে এল না। ক্লান্ত হয়ে প্রভাত বোঠে রেখে দিল।—নিশ্চয় ভুল পথে এসেছি। কোথায় ঘাট?—ধানবনে এসে পড়ছি যে—

অনুপমা বলল—ঐ যে ঢোল বাজছে—

বিরক্তির সুরে প্রভাত বলল—ঢোল কেবল তোমার মাসীমার বাড়ী বাজছে—তা ত নয়। আজ বিয়ের দিন—

বিয়ে আরও কত জায়গায় হচ্ছে। তিন চার ঘণ্টা বেয়ে মরছি—বিলের শেষ হয় না, এ কি রকম ?

শুনে অনুর গা ছমছম ক'রে উঠল। শুকনো মুখে বলল—তা হ'লে, গ্রাম যেদিকে সেই মুখো চালাও। কাউকে জিজ্ঞাসা করে নেওয়া যাবে—

অনেক দূরে অস্পষ্ট আলোর রেখা—সেই আলো লক্ষ্য ক'রে প্রভাত প্রাণপণে লগি ঠেলতে লাগল। খাল আর নেই—একগলা ধানবন। তারই মধ্য দিয়ে চলল। আরও খানিক গিয়ে নৌকো নড়ে না। কাদার মধ্যে আটকে গেছে ; লগি ব'সে যায়—জোর পাওয়া যায় না।

অনুপমা বলল—ডাকাতের বিলে এসে পড়িনি ত ?

প্রভাত নামল। একটু একটু জল আছে ; জলকাদায় প্রায় কোমর অবধি ডুবে গেল। কুয়োর মধ্যে পাট পচছে, দুর্গন্ধে নিশ্বাস বন্ধ হয়ে আসে। গায়ের সমস্ত শক্তি দিয়ে নৌকো টেনে চলেছে—কিন্তু কোথায় গ্রাম, কোথায়ই বা খাল !

দূরে আবার খটখট শব্দ পাওয়া গেল ; লগি ঠেলে ডোঙা বা নৌকো নিয়ে কেউ চলেছে। প্রভাত চেঁচিয়ে পথ জিজ্ঞাসা করবে, কিন্তু তার আগেই অনু খুব ব্যাকুল হয়ে মুখে হাত চাপা দিয়ে টেনে তাকে নৌকোয় তুলে নিল।

—ব্যাপার কি ?

অনু বললে—চুপ, চুপ ! কানের কাছে মুখ দিয়ে বলতে লাগল—ঠিক ডাকাতের বিলে এসে পড়েছি। বড্ড ভয়ানক জায়গা—মানুষ মেরে কাদার নীচে পুঁতে রাখে। আমার গায়ে গয়না রয়েছে—

চোখের জল হঠাৎ ঝর ঝর ক'রে গড়িয়ে পড়ল। নিঃশব্দে দু'জনে পাশাপাশি বসে রইল। ধানবনের মশা ঝাঁকে ঝাঁকে এসে পড়ছে,—কিন্তু পাছে শব্দ হয়, নড়াচড়ার জো নেই। মাথার উপর তারা ঝিলমিল করছে। এক-এক বার জোরে হাওয়া দেয়, ধানগাছ খস খস করে, ···শত সহস্র মানুষ যেন চুপি চুপি কথা ব'লে ওঠে। ডাকাতের বিলের অনেক গল্প অনু আশৈশব শুনে এসেছে···হাজার হাজার মানুষ খুন হয়েছে এখানে—কত শিশু, কত বুড়ো, কত কুলবধূ...। নিশুতি রাতে ধানবনের মধ্য দিয়ে কঙ্কালগুলো যদি একের পর এক বেরিয়ে আসে—এসে নৌকো ঘিরে সারবন্দী সব জামাই মেয়ে দেখতে দাঁড়িয়ে যায় ! অনু চোখ বুজে প্রভাতের কোলের উপর মুখ ঢেকে পড়ল।

এরকম ভাবেই বা চলে কতক্ষণ। আস্তে আস্তে মাথাটা নামিয়ে আবার প্রভাত নেমে পড়ল। নৌকো অবিশ্রান্ত টেনে চলেছে, রাত্রির হিমের মধ্যে গা দিয়ে দরদর ক'রে ঘাম ঝরছে···মাঝে মাঝে আর যেন পেরে ওঠে না—দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে হাঁপায়। অনেক ক্ষণ চুপ ক'রে দেখে অনু আর পারল না—কাতর কণ্ঠে বলল—ওঠো—যা-হয় হোক—নৌকো থাক এখানে—

প্রভাত নাছোড়বান্দা ; মাথা নেড়ে বলল—আর একটু—

অনু বলল—জোর নাকি ? তুমি উঠবে কিনা বলো—প্রভাতের হাত টানতে গিয়ে নিজেই নেমে পড়ল।

প্রভাত রাগ করে বলল—শরীর খারাপ তার উপর জল বসানো ঠিক হচ্ছে কি ?

—নৌকো-বাওয়া মাঝি, ডাক্তারীর তুমি জান কি ?

ব'লেই অনু খিল খিল করে হেসে উঠল। হাসি তার একটা রোগ,—যত দুঃখ হোক, না হেসে সে বেশীক্ষণ থাকতে পারে না।

প্রভাত বলল—জল বাড়ছে, তুমি ওঠো—এইবার খাল পেয়ে যাব বোধ হয়—

খালই বটে। অনেক কষ্টের পর ভগবান মুখ তুলে চেয়েছেন। ভরা জোয়ারে কূল ছাপিয়ে বিলের অনেক দূর অবধি জল এসেছে। হাঁটুজলে দাঁড়িয়ে দু-জনে গা হাত পা ধুয়ে নৌকোয় উঠল। প্রভাত লগি ধরে খালের কূলে কূলে উজান বেয়ে চলল। তার পর নদীতে এসে পড়ল।

নিশ্বাস ফেলে বলে উঠল—রক্ষে পাওয়া গেল। যে ভয় তুমি দেখিয়েছিলে।

অনু বলল—উঃ, আমরা কত এগিয়ে এসে পড়েছি। এমন মানুষ তুমি, গল্প করতে গেলে আর জ্ঞান থাকে না—

প্রভাত বলল—আর গল্প করছি না, তুমি নজর রেখো। ফিরতি পথে চলেছি—বাড়ী ছেড়ে আবার এগিয়ে না পড়ি—

অনুপমা বলল—সে রকম আনাড়ী নই ? এক বাঁক আগের থেকে বলে দেবো—দেখো।

সেখানটায় নদী বড় সরু, দু-পারের গাছপালা ঝুঁকে পড়ে ভয়ানক আঁধার করেছে। ক্লান্ত প্রভাত চুপচাপ বোঠে ধরে বসে আছে, স্রোতের টানে নৌকো আপনি চলেছে। ওপারের দিক থেকে হঠাৎ কর্কশ কণ্ঠের আওয়াজ এল—নৌকো নিয়ে গেল কোন্ সমুন্দি গো? দেখ ত কি জালা।

আর একজন বলল—আজকাল বড্ড উৎপাত আরম্ভ হয়েছে। একটা বিহিত হওয়া দরকার—

—বিহিত আজই হবে। যাবে কোথায়? উড়ে যেতে পারবে না ত। পেতে পেলে দাঁড়ের ঘায়ে মাথা দু'ফাঁক করে দেবো। চল দিকি—

পাড়ের কাছে জঙ্গল, প্রভাত লগির ধাক্কা দিয়ে প্রাণপণ বলে নৌকোর মাথা তার মধ্যে ঢুকিয়ে দিল। অনু বলল—উ হু-হু—কেয়াবন—আমার হাত ছড়ে গেছে—

প্রভাত বলল—কোন্ নৌকোর কথা বলছে, আমাদের এটা নয়ত?

—কি জানি।

নিচু কণ্ঠে প্রভাত বলল—বেশ লোক তুমি! এই যে বলছিলে, ও তোমাদের প্রজার নৌকো—



—হারিকেন উঁচু ক'রে দেখছে—

আবার একটা ধাক্কা দিয়ে প্রভাত নৌকোর আর খানিকটা কেয়া-ঝাড়ের নীচে ঢুকিয়ে দিল। অনু শিউরে উঠল—কেয়াবনে সাপ থাকে—

প্রভাত বলল—সাপের বিষের চিকিৎসা আছে, মাথা দু-ফাঁক হলে আর জোড়া দেওয়া যাবে না। ঐ ওরা খুঁজে বেড়াচ্ছে—

ঝপ্ ঝপ্ ক'রে তিন-চারটা দাঁড় ফেলে খুব জোরে একখানা নৌকো আসছে—কাছে এসে পড়ল—একেবারে হাত দুই তিনের মধ্যে। প্রভাত বলল—চুপ, চুপ!—ওদের নিশ্বাস পড়ছে কিনা সন্দেহ। হঠাৎ বিপুল বেগে দাঁড় এসে লাগল এ-নৌকোর গায়ে—অনুপমা যেখানে বসে আছে, প্রায় সেই জায়গাটায়।

বাবা গো—অনু আর্তনাদ ক'রে উঠল। এমন কাঁপছে, বুঝি বা জলেই পড়ে যায়।

কি? কি? কারা?

অপর নৌকো দাঁড় থামিয়েছে। হারিকেন উঁচু ক'রে দেখছে—আলোয় প্রথমটা চোখে ধাঁধা লাগে—তার পর দেখা গেল, যাক মাথা দু-ফাঁক করার মানুষ—সতীশ-দাদা।

অনু বলল—সতীশ-দা, আমি—আমি—

ছইয়ের মধ্যে থেকে অনুর মা তাড়াতাড়ি বেরিয়ে এলেন।

—খুকী নাকি? ঘাটে কি করিস? তিনি অবাক হয়ে গেছেন, বলতে লাগলেন—একলাটি প'ড়ে আছিস—বর ঘরে ঢুকতেই তাই তাড়াতাড়ি সতীশকে নিয়ে চলে এলাম।... তোরা বুঝি এখন রওনা হচ্ছিস্! মাধব কোথায়? ও মাধব!

অনু বলল—মাধব-কাকা নেই—

সতীশ বলল—তবে কার সঙ্গে যাচ্ছ? কার নৌকো? মাঝি কোথায়?

নৌকোর মাঝি অগত্যা বোঠে রেখে এসে দর্শন দিলেন।

—বাবাজী?

সতীশের দিকে তাকিয়ে প্রভাত আমতা-আমতা ক'রে বলতে লাগল—কি করা যায়, বলুন। মাথাধরায় ছটফট করছিল—বলল, জলো হাওয়ায় নৌকোয় গিয়ে বসব।

সতীশ উদ্বিগ্ন স্বরে জিজ্ঞাসা করল—এখন আছে কেমন?

—সেরেছে। কি রকম কাদার প্রলেপ লাগিয়েছে দেখছেন না, ও বড্ড ভাল ওষুধ—

অনুপমার দামী শাড়ীতে চুলের উপর কপালে নোনাকাদায় অপরূপ শ্রী খুলেছে। আঁধারে এতক্ষণ নজরে আসে নি। সেদিকে তাকিয়ে মৃদু হেসে প্রভাত মুখ ফিরিয়ে নিল।

রবীন্দ্র-প্রসঙ্গ

শ্রীকিরণবালা সেন

৩রা কার্ত্তিক, হেমন্তের শুক্লসন্ধ্যা। আশ্রমের হিমঝুরী গাছগুলিতে থাকে-থাকে ফুলের ঝরণা নেমেছে। গাছগুলির তলাও সাদা ফুলে ছেয়ে আছে। এই সন্ধ্যায়, গুরুদেবকে প্রণাম করতে তাঁর গাছপালাঘেরা মাটির ঘরের দিকে গেলাম। ঘরে গিয়ে দেখি, ঘরখানি আলোতে উজ্জ্বল আর তার মধ্যে বসে আছেন শুভ্র সুন্দর তাপসমূর্ত্তি। তাঁর চোখদুটিতে ফুটে আছে শিশুর মত সরলতা আর একটা ব্যাকুল ভাব। এ ব্যাকুলতা কিসের? সামনে একখানি মোটা বই খোলা রয়েছে। পড়ছিলেন মনে হ'ল। এখন ছোট্ট একটা টেবিলের সামনে, চেয়ারে সোজা হয়ে ব'সে, অধ্যাপক প্রভাত গুপ্ত ও অধ্যাপক শৈলজা বাবুর সঙ্গে কথা বলছেন। পড়ায় ওঁর যে কি প্রীতি সেই কথা বলছিলেন, অথচ এখন সময় পান না এই দুঃখ। এখন বুঝলাম এই ব্যাকুলতা প্রবল জ্ঞানতৃষ্ণার। স্রোতের ধারার মত কথা চলেছিল, তাই আমিও ব'সে পড়লাম সেইখানে।

বই পড়তে চিরকালই কি আনন্দ পেয়েছেন সেই কথা বলছিলেন। সকল রকম বিষয়েরই বই পড়বার একান্ত আগ্রহ ছিল। কবি তিনি, কিন্তু শুধু সাহিত্য প'ড়েই যে ওঁর পিপাসা মেটে তা নয়। বিজ্ঞানও খুব পড়েন। কঠিন নীরস বিষয় আমরা যাকে ব'লে থাকি, তাতেও তাঁর কৌতূহল কম নয়। কবি হ'লেও তিনি নানা বিষয়েই রীতিমত অভিজ্ঞ। পৃথিবীতে যত রকম চিন্তার ধারা প্রাচীন কাল থেকে আধুনিক কাল পর্য্যন্ত চলে এসেছে, কোনটাতে বঞ্চিত হ'তে তাঁর ইচ্ছা নেই। তার পর সেই সব চিন্তার সঙ্গে তাঁর চিন্তাও মিলিত হয়।

পড়বার এত আকাঙ্ক্ষা ছিল, অথচ প্রথম বয়সে এমন সময়ও গিয়েছে যে এই পড়া ওঁকে কষ্ট ক'রে পড়তে হয়েছে। ইচ্ছানুযায়ী বই কিনে পড়বার মত অর্থের সচ্ছলতা তখন ছিল না। তাই হয়ত এক প্রস্থ বই কিনতেন, পড়া হ'লে সেই বই বিক্রী ক'রে সেই অর্থ দিয়ে আবার অন্য বই কিনে পড়তেন।

পড়ার আনন্দের কথায় বলেছিলেন, এক সময়ে তিনি বোটে নির্জ্জনে থাকতেন। সারাদিন বিস্তর কাজ থাকত, সময় পেতেন না, রাত্রে আবার পোকার উপদ্রব ছিল। তাই বোটের কামরা-জোড়া একটা মস্ত মশারি ছিল। সন্ধ্যার পরে সেই মশারিটা ফেলে তার মধ্যে আলো জ্বেলে রাত দুপুর অবধি পড়তেন। কোন কোন দিন দুপুর রাতও পার হয়ে যেত।

এখনও পড়বার প্রবল আকাঙ্ক্ষা রয়েছে, পড়তে আনন্দও খুব পান, কিন্তু সময় কোথায়? এখন কাজের বোঝা কত! তার সঙ্গে নানা জটিলতার বন্ধন, নানারূপ দায়িত্ব চারদিকে। তাই এক এক সময় ওঁর মনে হয়, আর একবার যদি অতীতের সেই দায়মুক্ত আনন্দের দিনগুলির মধ্যে ফিরে যেতে পারতেন। অবকাশ-সময়ও তবে পূর্ণ ক'রে নিতে পারতেন, নিরালায় চুপ ক'রে ব'সে থেকে। এই জন্যই এক এক সময় ব্যাকুল হয়ে ওঠেন।

এই কথা প্রসঙ্গে অতীতের স্মৃতি ভেসে উঠল তাঁর মনে। ব'লে যেতে লাগলেন, বোটে এক সময়ে কি রকম নির্জ্জনে ছিলেন। এমন একলা কি ক'রে দিনের পর দিন তিনি কাটিয়েছেন, ভাবলে অবাক হই। থাকতেন নির্জ্জন পদ্মার চরে, বোটে। কোন লোকের সঙ্গে দেখা-সাক্ষাৎ ছিল না। এমন হ'ত যে, দিনে একটি কথা বলবারও কারণ ঘটত না। গান তো একা গাওয়া চলে, তাও গাইতেন না। তাঁর সঙ্গে একজন বুড়ো মাঝি আর একজন অনুচর থাকত। অনুচরটির নাম ছিল ফটিক। সেও কথা কইত না, তার নাম সার্থক ক'রে স্ফটিকের মতই নীরব থাকত শুধু সময়মত প্রয়োজনীয় জিনিষটি সামনে দিয়ে যেত প্রয়োজনেরও কোন বাহুল্য ছিল না। সমস্ত দিনে শু

এক বাটি ডালের স্যুপ খেতেন। সকালে খানিকটা হেঁটে বেড়াতেন, যখন ফিরতেন তখন স্যুপের বাটি ফটিক ওঁর সামনে দিয়ে যেত। তিনি খেয়ে কাজ আরম্ভ করতেন। সারাদিন আর কিছু খেতেন না। তাঁর খাওয়া ছিল সন্ধ্যার সময়। তাতেও কোন রাজসিকতা বা বাহুল্য থাকত না। শরীর তখন তাঁর খুব ভাল ছিল। শক্তি ছিল অসাধারণ, শরীরে তখন সবই সহ্য হ'ত। খুব ভাল সাঁতার জানতেন। শুনেছি সাঁতরে পদ্মাও পার হতেন। পদ্মার এই নির্জ্জনবাসের সময়টি ছিল সাধনার যুগ। ওঁকে খুব খাটতে হ'ত তখন। সমস্ত দিন লিখতে হ'ত। গল্পের পর গল্প, প্রবন্ধ, কবিতা, কত লিখতেন। সম্পাদকীয় মন্তব্য লিখতে হ'ত। লেখা বেছে নিতে হ'ত। এত কাজ, কিন্তু ক্লান্তি ছিল না কিছুতে। মনে ছিল সে-সময়ে অসাধারণ বল, নিজের শক্তির উপর এতটুকু অবিশ্বাস ছিল না। সব করতে পারেন; মানুষের যোগ্য কোন কাজ না-করবার মত আছে, এমন মনেই হ'ত না। "সব কিছু পারি" এমন একটা ভাব ছিল। 'নির্ঝরের স্বপ্নভঙ্গ' যদিও এই সময়ের অনেক পূর্ব্বে লেখা তবু তার কয়েকটি লাইন এখানে মনে হয়।

একটি লাইন—

"এত কথা আছে এত গান আছে, এত প্রাণ আছে মোর।"

পরের কয়েকটি লাইন—

"যত প্রাণ আছে ঢালিতে পারি,
যত কাল আছে বহিতে পারি,
যত দেশ আছে ডুবাতে পারি।"

তাই বলছিলেন, এত যে লিখতেন, তাতে একটুও বেগ পেতে হ'ত না, অতি অনায়াসে লিখে যেতেন। পত্রিকায় গল্প চাই, তাগিদ আসত। তখনই লিখতে বসতেন। লেখা হু, হু করে এগোতে থাকত। গল্প লেখা তখন কোন কঠিন ব্যাপার বলে মনে হ'ত না, বরং লিখতে আনন্দ বোধ করতেন। "সাধনা"র সম্পাদক ছিলেন তখন, কিন্তু শুধু সম্পাদকের কাজ করেই তখন রেহাই পেতেন না। পুরো কাগজই তখন এক রকম তাঁকে চালাতে হ'ত।

"সাধনা"র লেখা পড়তে আমাদের এত ভাল লাগে কেন বুঝি। "সাধনা"র বিষয়গুলি আর তার সহজ সরল প্রকাশের ধরণ, সব মিলে পড়তে ভাল লাগে। ঐ সময়ের ওঁর নিজের লেখা আর ওঁরই বাছাই করা লেখকদের লেখায় পত্রিকা ভরা; তাই এত সুন্দর হয়েছে।

দিনের পর দিন, কত কাল এই রকম নির্জ্জনে কাটিয়েছেন, কিন্তু এ-জন্য কোন অভাব বোধ করেন নি। ক্রমাগত লিখেছেন, রচনা করেছেন, পড়েছেন আর অবসর-সময়ে চুপ ক'রে ব'সে উপলব্ধির গভীর আনন্দে ডুবে গিয়েছেন।

কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখার বিরাম ছিল না; মুগ্ধচোখে চেয়ে দেখেছেন প্রকৃতির সৌন্দর্য্য, আর অন্তর দিয়ে অনুভব করেছেন পাশের সব গ্রামের সাধারণ মানুষের সুখদুঃখ।

গ্রামের জীবনযাত্রা, নিস্তব্ধ দুপুরে গ্রামের শান্ত কাজের ধারা, সকাল-সন্ধ্যার রূপ, ঘাটের কত বিচিত্র রূপ, এ সবই তাঁর হৃদয়কে স্পর্শ করেছে। নদীর চর, ধানের ক্ষেত, নদীর সুন্দর পারের ঘন বনশ্রেণীর অন্তরালে গ্রামের অস্পষ্ট ছবি, চারি দিকের এই অসংখ্য রূপ ওঁর চোখ এড়ায় নি। এই সব দেখার আনন্দ অনুভবের অভিজ্ঞতা ওঁর লেখায় কত দেখতে পাই। কত সুন্দর ক'রে নদীর কথা কত গল্পে, কত প্রবন্ধে, কত কবিতায় লিখেছেন। নানা ঋতুতে পদ্মার রূপের কত বর্ণনা তাঁর লেখায় দেখি। সে-সব যখন পড়ি, মনে হয় যেন সেই ছবি চোখের সামনে দেখছি। "নিশীথে" গল্পটিতে হেমন্তের সন্ধ্যার আর রাত্রির জ্যোৎস্নাপ্লাবিত চরের কি সুন্দর বর্ণনা। ওঁর "ছিন্নপত্র" বইখানি পড়লে নদীর আর তার দুই তীরের অশেষ সৌন্দর্য্যের রস পেতে আর কিছু বাকি থাকে না।

"গল্পগুচ্ছের" গল্পে গ্রামের অতি সাধারণ ঘরের কথা যখন পড়ি, আশ্চর্য্য হয়ে যাই। কি ক'রে তিনি এদের কথা এমন ভাবে জানলেন। বাইরের থেকে দেখতে গেলে তাঁর পক্ষে এটা কঠিন ব'লেই মনে হয়। কিন্তু তাঁর হৃদয় কতখানি এই সব প্রাকৃতজনের মধ্যে প্রবেশ করেছিল, তাই ভাবি।

তিনি কতদিন এরূপ নির্জ্জনে বোটে ছিলেন আর বছরের কোন্ কোন্ ঋতু পদ্মায় কাটিয়েছেন, জানতে ইচ্ছা হয়। অবশ্য, ওঁর লেখাতেই সেটা অনেকখানি অনুমান হয়। ওঁর "পদ্মা" কবিতাটিতে দুটি লাইনে আছে,

"নিভৃতে শরতে গ্রীষ্মে শীতে বরষায়
কতবার দেখা শুনা তোমায় আমায়।"

সমস্ত দিন কাজ করতেন কিন্তু সন্ধ্যের পর আর লিখতেন া। কোন দিন ঐ সময়ে পড়তেন। কোন কোন দিন াবার সন্ধ্যায় বোটের ছাদে গিয়ে চেয়ারে বসতেন। তখন ারি দিকে অন্ধকার ঘনিয়ে আসত। শরীরের উপর দিয়ে ীরে ধীরে হাওয়া বয়ে যেত। নীচে জলের শব্দ, উপরে ারা আকাশ ভরে যেত তারায়। তিনি তার মধ্যে নিমগ্ন য়ে যেতেন। তাঁর "ছিন্ন পত্রে" এক জায়গায় লিখেছেন—

"যখন সন্ধ্যাবেলা বোটের উপর চুপ ক'রে বসে থাকি তখন আমার র্বাঙ্গে এবং সমস্ত মনের উপর নিস্তব্ধ নতনেত্র প্রকৃতির কী কটা বৃহৎ উদার বাক্যহীন স্পর্শ অনুভব করি! কী শান্তি কী স্নেহ! কী মহত্ত্ব! কী অসীম করুণাপূর্ণ বিষাদ; এই লোকনিলয় স্যক্ষেত্র থেকে ওই নির্জ্জন নক্ষত্রলোক পর্য্যন্ত একটা স্তম্ভিত হৃদয় াশিতে আকাশ কানায় কানায় পরিপূর্ণ হয়ে ওঠে; আমি তার মধ্যে বগাহন ক'রে অসীম মানসলোকে একলা ব'সে থাকি।"

এই রকম ছাদে ব'সে থেকে কোন দিন বা ঘুমিয়ে াড়তেন। জেগে দেখতেন দুটো কি আড়াইটে বেজেছে, তখন নমে গিয়ে শুয়ে পড়তেন। একদিন নির্জ্জন অপরাহ্ণে তিনি বিছানায় পড়ে 'মানসসুন্দরী' কবিতাটি লিখেছিলেন। সে-দিনের কথা বললেন। যখন বলছিলেন তখন তাঁর চোখে এমন একটি স্মৃতিমগ্ন ভাব ফুটে উঠল যে মনে হচ্ছিল সেই দিনটির ছবি বর্ত্তমানের মত আজ তাঁর চোখের সামনে ভেসে উঠেছে। বাইরের অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে বললেন, "বেশ মনে আছে 'মানসী' কবিতাটি লিখছি, লেখা যখন শেষ হ'ল তখন সন্ধ্যা ঘনিয়ে এল পদ্মার উপর। সন্ধ্যাতারাটি উঠল কালো জলে তার জ্বলন্ত কিরণরেখা বিদ্ধ ক'রে। ওপারে গ্রামের কুটীরে জ্বলে উঠল সন্ধ্যার প্রদীপ।"

অনেক রাত্রে বিছানায় গিয়ে শুতেন। যেই ঘুম ভাঙত, পাশের খোলা জানালা দিয়ে দেখতেন শুকতারাটি জ্বল জ্বল করছে। ঐদিকে তাকিয়ে মন আনন্দে ভরে যেত। মনে হ'ত, যে-দিনটি আজ ওঁর সামনে উদ্‌ঘাটিত হচ্ছে, সেটি স্বচ্ছ, উজ্জ্বল, নির্ম্মল—দিনটি ওঁর সার্থক হবে। এই নির্ম্মল উষায় নিজেকেও অমল শুভ্র একটি তরুণ তাপসের মত মনে হ'ত। তখনকার এক কবিতায় তরুণ তাপসের এক মূর্ত্তি দেখতে পাই। তার ক'টি লাইন মনে পড়ছে—

"সেদিন নদীর নিকষে অরুণ
আঁকিল প্রথম সোনার লেখা
স্নানের লাগিয়া তরুণ তাপস
নদীতীরে ধীরে দিলেন দেখা।"

এই কবিতাটি সব পড়লে নির্ম্মল উষার অপরূপ একটি স্পর্শ পাওয়া যায়।

এক সময়ে তাঁর বেশ ছিল কাপড়ের উপর খালি গায়ে একখানি চাদর আর পায়ে চটিজুতা। এই বেশে তিনি সর্ব্বত্রই ঘুরে বেড়াতেন, কোন কুণ্ঠা ছিল না।

সেই সময়ে ভোরবেলা উঠে এক মুঠো বেলফুল তুলে তাঁর চাদরের কোণায় বেঁধে নিতেন। অন্য গন্ধদ্রব্য বা সেণ্ট কিছু ব্যবহার করতেন না। বললেন, সেই এক যুগ গেছে। তার পর পর্ব্বের পর পর্ব্ব কত এল গেল। সাহিত্যেরও যেমন এক এক পর্ব্ব এক এক ধারায় চলেছে, জীবনের সুখ-দুঃখেরও তাই—পর্ব্বের পর পর্ব্ব নানা ধারায় চলেছে।

ক্রমশঃ তিনি এসে পড়লেন কর্ম্মের মধ্যে। তার পর এপর্য্যন্ত কত লোকের কত রকম দাবী মিটিয়ে আসতে হয়েছে, এখনও তার অবসান হয় নি। কত দায়িত্ব, কত জটিলতা তাও বলেছেন, এ-সকলেরও প্রয়োজন ছিল জীবনে।

সেদিন যতটা বলেছিলেন তাতে আরও লিখবার ছিল। যোগ্য লোক যাঁরা সেখানে ছিলেন তাঁরা সেটা লিখেছেন। যতটুকু আমার অন্তরকে স্পর্শ করেছে ও আমার ক্ষমতায় কুলিয়েছে তাই আমি লিখলাম। কবির সুখদুঃখকে অন্তরালে রেখে তাঁর সৃষ্টি অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যে ও ঐশ্বর্য্যে বিকশিত হয়েছে। বিশ্বের লোক আজ তাই মুগ্ধ। এখন তাঁরই লেখা একটি কবিতার কয়েকটি লাইন দিয়ে শেষ করি,

"তবু সে সবার ঊর্দ্ধে নির্লিপ্ত নির্ম্মল
ফুটিয়াছে কাব্য তব সৌন্দর্য্য-কমল
আনন্দের সূর্য্য পানে। তার কোনো ঠাঁই
দুঃখ দৈন্য দুর্দ্দিনের কোনো চিহ্ন নাই।"

রেশমী সুতো

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

গ্রামের পথ যেখানে ঢালু হয়ে মাঠের বুকে মিশেছে, তারই দু-পাশে ভিজে বালির মঠ তৈরি করত অর্দ্ধ-উলঙ্গ রাখালের দল ; পল্লীর জীবন্ত দারিদ্র্যের কয়েকটি নগ্ন মূর্ত্তি।

আঁচল-ভরা পদ্মের মৃণাল আর গলায়-জড়ানো সাপলার গোছা দুলিয়ে সোনা রোজ দুপুরে সেই পথে বাড়ী ফিরত তার বাপের সঙ্গে। সোনার বাবা প্রতাপের জীবিকা ছিল মাছ-ধরা। ভোরে উঠে কোমরে খালুইটি বেঁধে, জালখানি ঘাড়ে নিয়ে প্রতাপ কাজে যেত ; আর সোনা প্রতিদিন দুপুরে রান্না সেরে তাকে ডেকে আনত বিল থেকে। একটি দিনের জন্যেও সে-নিয়মের ব্যতিক্রম হ'ত না। সোনার মা নেই ; তাই প্রতাপ তাকে পালন করেছে বাপ ও মায়ের সবটুকু দাবী সমানে মিটিয়ে।

লোকে বলে—বাপের কাছে মানুষ হয়েছে ব'লে সোনা মেয়েদের মত চলতে শেখে নি। পনর বছরের মেয়ে, তবু এতটুকু লজ্জা নেই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে এখনও সে চাঁদ-ছোঁয়া-ছুঁয়ি খেলা করে ; গাছে উঠে ঝালঝিল্লা দেয়, ছোটাছুটি, লাফালাফি—আরও কত কি।

লজ্জা হয়ত সোনার সত্যি নেই। পাহাড়ী ঝরণার মত গতি তার অবাধ উন্মুক্ত। তবে মাঝে মাঝে সে-গতি রুদ্ধ হয়,—লজ্জায় নয়, কিসের অভাবে। তখন আর সোনাকে খেলাধুলোর ত্রিসীমানায় পাওয়া যায় না। গ্রামের পূবে, নদীর বাঁকে যেখানে নুইয়ে-পড়া মাদার গাছটির ডালপালাগুলি জলের বুকে আঁচড় কেটে ঝির্ ঝির্ ক'রে দোলে, সেইখানে ব'সে সোনা আনমনে ভাবে তার মায়ের কথা। ওই ওপারে, বাঁশবনের উত্তরে—খেজুর গাছটার বাঁয়ে তার মা আগুনের বিছানায় শুয়েছে। সা—ত বছর আগেকার কথা, তবুও সোনার বেশ মনে আছে।

নাওয়া-খাওয়া সব ভুলে সোনা সকাল থেকে দুপুর অবধি তেমনি উদাস মনে ব'সে থাকে নদীর ধারে। হয়ত আচম্বিতে তার চমক ভাঙে, যখন ললিত পিছন থেকে ডাক দিয়ে ওঠে—সোনা,—সোনামণি!

লম্বা ঘাড়টি ফিরিয়ে সোনা মুখ তুলে চায়। ললিত হাত-তালি দিয়ে এগিয়ে আসে ; গুন্‌গুন্ সুরে বলে—'সোনামণি লক্ষ্মী আমার ফিরে এস ঘর। রাঙা চেলি পরিয়ে দেব, আনব রাঙা বর।'

সোনার বিষণ্ণ মুখ হঠাৎ একটু উজ্জ্বল হয়ে ওঠে। সলজ্জ তিরস্কারের সঙ্গে বলে—'ধ্যেৎ'। ললিত হাসে।

সোনা চোখ রাঙিয়ে বলবার চেষ্টা করে—'ভাল হবে না বলছি ললতে। কাদা দেব গায়ে।'

সোনার লজ্জা নেই। কিন্তু লজ্জাহীন যে কৌপীনধারীর দল সেদিন বালি নিয়ে খেলা করত পথের পাশে ব'সে, আজ তারা কাপড় পরে। সোনাই তাদের সম্ভ্রম শিখিয়েছে। শুধু তাই নয়, সোনার মন জোগাবার নেশায় তারা আজ সভ্য হবার চেষ্টা করে পরস্পরকে ডিঙিয়ে।

ললিত এখনও মাথালি-মাথায় গরু নিয়ে যায় মাঠে ; কিন্তু ভিজে বালির মঠ তৈরি করে না। চাতর দীঘির বাগানে বুড়ো বটগাছটার ডালে ব'সে বাঁশী বাজায়।

সোনা যখন বাপকে ডেকে নিয়ে বিল থেকে ফিরে আসে, ললিত নিবিষ্ট মনে বাঁশীতে ফুঁ দেয়—"আজ কেন সখি হ'ল এত বেলা, জলকে যাবি নে?"

বেশ লাগে। জনবিরল মাঠের পথে চলতে সোনা মাঝে মাঝে থমকে দাঁড়ায় ; এক মনে বাঁশী শোনে।

ললিত যেন সোনার সেই সময়টুকু মুখস্থ ক'রে রাখে। কোন কোন দিন বাঁশীটি পথে ফেলে রেখে সে আড়ালে লুকিয়ে থাকে। বাঁশের বাঁশী ; এক দিকে খানিকটা পিতলের সরু তার জড়ানো, অন্য দিকে রেশমী সুতোর থোপনা-বাঁধা ঝালট। সোনা দেখেই চিনতে পারে। পায়ের আঙুল

জড়িয়ে নিমেষে সে বাঁশীটি কুড়িয়ে নেয়। দেখে ললিতের হাসি পায়, বুকের ভিতর কেমন একটা আনন্দের ছোঁয়া লাগে। কিন্তু ভয়ে সে চুপ ক'রে থাকে। ইচ্ছা হয়—চীৎকার ক'রে ওঠে, ছুটে গিয়ে সোনার হাত থেকে বাঁশীটি নিয়ে আবার একটা নতুন গান বাজিয়ে তাকে শোনায়; কিন্তু পারে না। সোনার মেজাজ তার বেশ জানা আছে।

প্রতাপ গরীব হ'লেও পাড়ায় তার প্রতিপত্তি কম ছিল না। আর সোনার দুরন্তপনা অপ্রতিহতভাবে বেড়ে উঠেছিল শুধু প্রতাপের সেই খাতিরের সুযোগ নিয়ে। প্রতাপের মেয়ে, তার ওপর মাতৃহীন; তাই প্রতিবেশীরা সোনার দোষত্রুটি সয়েই এসেছে। কিন্তু এবার যেন সোনা ক্রমেই তাদের মনে অশান্তির ছায়াপাত করতে লাগল।

শেষ পর্য্যন্ত প্রতিবেশীরা উত্যক্ত হয়ে উঠল আপন আপন ছেলে নিয়ে। গরীবের ছেলে; এতকাল ছোট একখানি কাপড় আর লাল গামছাখানি নিয়ে তারা সন্তুষ্ট ছিল। কিন্তু সোনা পছন্দ করে না, এই মন্ত্র যখন তাদের পরিচ্ছদের কোঠা পর্য্যন্ত পৌঁছল, তখন মা-বাপ চঞ্চল না হ'য়ে পারলে না।

ললিতের বাপ নেই। বিধবা মা ছোট ভাই বোনের ভরণপোষণ সে-ই করে রাখালী ক'রে। কিন্তু এখন সেই সামান্য আয়ে তার চলে না। আগের মত ললিত ময়লা ছোট কাপড় প'রে গামছা ঘাড়ে বেরতে লজ্জা পায়। একটা গেঞ্জি ও পরিষ্কার একখানা কাপড় তার চাই-ই। নইলে সোনা বলে—'নোংরা,—অসভ্য।'

ললিত ভাবতে পারে না সোনার আক্রোশ শুধু তার উপর কেন? বিশু, বলাই, কেনারাম—এদের ত সোনা কোন কথা বলে না। মাঝে মাঝে মনে হয় সোনা হয়ত তাকে দেখতে পারে না। ভাবতে ললিতের দুঃখ হয়।

ললিতের কিন্তু সোনাকে খুব ভাল লাগে। সোনা বেশ। যেমন তার গায়ের রং, তেমনি বড় বড় দুটো চোখ। সোনার অগোচরে, সে কত দিন দেখেছে—মেয়েদের আগে আগে সোনা চলে কলসীটি কাঁখে নিয়ে। হাত-ভরা রেশমী-চুড়ি চপল গতির তালে তালে রুনুঠুনু শব্দে গায়ে গায়ে ঢলে পড়ে। কলসীর জল ছলকে পড়ে মসৃণ বাহুর উপর।

সোনা ও ললিত হয়ত তখনও আপন আপন মনের অবস্থা বুঝতে পারে নি। কিন্তু প্রতিবেশীরা বুঝেছিল অনেকখানি। কেনারামের পিসি সৌদামিনী আর সহ্য করতে পারলে না। স্নানের ঘাটে একদিন বৌ-ঝি সবারই সামনে সৌদামিনী সোনাকে নানান্ কথা শুনিয়ে দিলে। 'এত বড় বিঙ্গী মেয়ে সে, তবুও লজ্জাসরম নেই। পাড়ার ছেলেদের সঙ্গে অত ভাব, ললতের সঙ্গে অমন মাখামাখি; কে না বোঝে? ও মেয়ে যদি উচ্ছন্ন না যায়, তোরা নুনুতি পুড়িয়ে আমার পিঠে দাগ দিস।'

সোনা দুরন্ত ছিল, কিন্তু মুখরা ছিল না। সৌদামিনীর কথায় তার আপাদমস্তক জলে উঠল; কিন্তু কোন উত্তর না দিয়ে সে স্নান সেরে গম্ভীর মুখে উঠে গেল।

প্রতাপ তখনও বিল থেকে ফেরে নি। জলের কলসীটা নামিয়ে রেখে সোনা ঘরের মেঝেয় লুটিয়ে পড়ল; বুক জুড়ে জেগে উঠলো মায়ের অভাব। সোনা বোধ হয় জীবনে সেই প্রথম ভাবল নিজের কথা। অসহায় জীবনের সব দুঃখ সজীব হয়ে উঠল চোখের জলে। মা থাকলে কখনই এমন কথা সৌদামিনী-পিসি বলতে পারত না।

সোনা ভাবতে পারে না—কি অন্যায় সে করেছে। ছেলেবেলা থেকে ওদের সঙ্গে সে খেলা করে। ললিত তার চেয়ে মাত্র চার বছরের বড়। ললিতের মা সোনাকে কত ভালবাসে। ওপাড়ার হারু পণ্ডিত যখন পাঠশালা করেছিল, তখন ললিত রোজ তাকে সঙ্গে ক'রে নিয়ে যেত পাঠশালায়। ইস্কুল থেকে ফেরবার সময় ললিতের মা তাকে কিছু না খাইয়ে ছাড়ত না।

ছেলেবেলার কত কথা সোনার মনে ছবির মত ভেসে ওঠে। ললিতের বাপ যখন মরে, তখন ললিত তৃতীয় মানে পড়ে। হারু পণ্ডিত অনেক ক'রে বুঝিয়েছিল যে, পড়া ছেড়ে দিলে ললিতের বোকামি হবে। কিন্তু উপায় কি? অতবড় সংসারটার ভার পড়ল পনর বছরের ললিতের ওপর। ললিত ন-কড়ি চাটুজ্যের বাড়ীতে তিন টাকা মাইনের রাখালী নিলে। সোনা তখনও পাঠশালায় যায়।

পাঠশালা ছাড়তে ললিতের কম দুঃখ হয় নি, কিন্তু মুখ

ফুটে সে কোন কথা বলে নি, পাছে তার মায়ের মনে কষ্ট হয়। ঐটুকু বয়সেই ললিত সংসারের দুঃখ-কষ্টের বোঝা মাথায় নিয়ে চাকরি করতে লাগল। মনের কথা সে একমাত্র সোনার কাছে খুলে বলেছিল।

চণ্ডীতলার মাঠে ললিত যখন গরু চরাতে যেত, রোজ আঁচল ভরে সে বনকুল আনত সোনার জন্যে, সোনা বনকুল ভালবাসে। পাকা পাকা কুলগুলি বেছে, ধনে পাতা, নুন আর কাঁচা লঙ্কা দিয়ে তারা কুলমনু মাখত। এক এক দিন লঙ্কার ঝালে সোনার মুখচোখ যখন লাল হয়ে উঠত, ললিত ব্যস্ত হয়ে হাঁড়ি কলসী খুঁজে বেড়াত একটু পাটালির জন্যে। দুপুর-বেলায় গরুগুলি বাথান দিয়ে ললিত জমির আলে আলে ধান কুড়িয়ে যা জমা করত, তাই দিয়ে রোজ সে সোনার জন্যে তিলে খাজা, গুড়-ছোলা, বেগুনী—কত কি নিয়ে আসত।

ভাবতে সোনার বুকের ভিতরটা মোচড় দিয়ে ওঠে। এই ত সেদিনও তার বাপের অসুখে ললিত কত করেছে। ঝড়বৃষ্টি মানামানি ছিল না; বেলায় অবেলায় সে কতবার হাঁটাহাঁটি করেছে শঙ্করপুরের গোবিন্দ ডাক্তারের বাড়ী। সেদিন ত সৌদামিনী-পিসিরা দেখতে আসে নি।

দুপুর গড়িয়ে যায়। প্রতাপ মাছ ধ'রে বাড়ী ফিরল; সঙ্গে আজ সোনা নেই। ললিতের বাঁশী কেঁদে কেঁদে থেমে গেল। বটগাছের ছায়ায় গরুগুলি দাঁড় করিয়ে রাখালেরা পাঁচনি দিয়ে ছলাছলি খেলা করে; ললিত অন্যমনে দূরে দাঁড়িয়ে ভাবে—হয়ত সোনার কথা। আজ সকালেও সে সোনাকে দেখেছে দুধকলমির শাক তুলতে, অথচ প্রতাপ বাড়ী ফিরল একা! এত দিনের বাঁধা-ধরা নিয়ম হঠাৎ আজ উল্টে গেল। ললিত কারণ খুঁজে পায় না।

ঘাটের কথাটা ঘাটেই শেষ হয় নি, পল্লবিত হয়ে ছড়িয়ে পড়ল অনেক দূর। প্রতাপ সন্ধ্যার পর হুঁকো-হাতে যখন মতি বাগদীর পরচালায় এসে বসল, তখন সৌদামিনী সেই কথাই বিনিয়ে বিনিয়ে বলছিল গিরি-বৌকে। প্রতাপকে দেখে তার উৎসাহ বাড়ল ছাড়া কমল না।

গরু বাছুর বেঁধে, গোয়ালে ধোঁয়ার জাগাল দিয়ে ললিত আজকাল যায় হরিনারাণের কাছে কবিগান শিখতে। হরিনারাণ বলেছে—'ছেলেটির যেমন বুদ্ধি আর গলার আওয়াজ, তাতে ক'রে বেশ বোঝা যায় যে, কালে সে এক জন মস্ত কবিওয়ালা হবে।' কথাটা নিজের কানে শুনে অবধি ললিতের বুকখানা ভবিষ্যতের স্বপ্নগৌরবে ভ'রে উঠেছে। যত বার সে ভেবেছে, তত বারই তার মনে হয়েছে সোনার কথা। সোনা যদি একথা হরিনারাণের মুখ থেকে শুনত তা হ'লে খুব বিশ্বাস হ'ত তার। অনেক বার ভেবেছে সোনাকে বলবে, কিন্তু পারে না। কেমন লজ্জা করে।

গানের আখড়ায় যাওয়ার পথে ললিত সোনাদের বাড়ী হয়ে গেল। সারাদিনের মধ্যে সেই সকালে একবার সে সোনাকে দেখেছে। দুপুর থেকে মনটা কেমন ফাঁকা ফাঁকা লাগে।

সোনা তখন উনানে ভাত বসিয়ে তালের শুকনো মোচাগুলো টুকরো করো ক'রে ভেঙে জ্বাল দিচ্ছিল। কুলুঙ্গীতে কেরোসিনের ডিবেটি মিটমিট ক'রে জ্বলছে। সোনার পায়ের কাছে দই-মুখী বিড়ালীটা পেটের ভিতর পা গুটিয়ে শুয়ে আছে। ললিত একদৃষ্টে চেয়ে রইল। বড়লোকদের মেয়ের চেয়ে সোনা কি কম রূপসী!

ললিত একটু ইতস্ততঃ ক'রে ডাকলে—সোনা!

সোনা উত্তর দিল না। তেমনি আনমনে ব'সে উনানে জ্বাল দিতে লাগল।

'তোমার কি কোন অসুখ ক'রেছে সোনা?'—ব'লে ললিত একটু এগিয়ে দাঁড়াল।

সোনার ঘাড়টা যেন আরও নুইয়ে পড়ল। ললিতের মুখপানে না চেয়ে সোনা এক নিঃশ্বাসে বললে—'ললিত-দা, তোমার কি কোন দরকার আছে? দরকার থাকে ত বাবা যখন থাকবে, তখন এস। বাড়ীতে কোন পুরুষ-মানুষ নেই; রাত ক'রে কেন বেড়াতে এলে তুমি?' বুকের ভিতর যেন তার নিঃশ্বাসগুলো অসম্ভব রকম দ্রুত হয়ে উঠল।

ললিত হতভম্ব হয়ে গেল। সোনার সামনে দাঁড়িয়ে তার কথাগুলো স্পষ্ট শুনেও যেন বিশ্বাস হ'ল না। এও কি সম্ভব? না-না; নিশ্চয়ই সোনা দুষ্টুমি ক'রে আজ তাকে শাস্তি দেবার জন্যে একথা বলছে। ললিত নির্বাক দাঁড়িয়ে রইল।

এবার সোনা মুখ তুলে ললিতের পানে চেয়ে বললে,

'দাঁড়িয়ে রইলে যে এখনও ? যাও—বাড়ী যাও,—' সোনার গলা যেন বন্ধ হ'য়ে আসে।

ললিত আর কোন কথা না ব'লে ধীরে ধীরে দাওয়া থেকে নেমে গেল। সাঁঝের অন্ধকার তখন গাঢ় হয়ে এসেছে।

পাথরের পুতুলের মত সোনা তেমনি নিশ্চল ব'সে রইল। তার চোখ দুটো হয়ত তখন জলে ভ'রে উঠেছে। ললিত উঠান পার হয়ে আর একবার সোনার দিকে ফিরে চাইলে। অন্ধকারে সোনার কপাল ও চুলগুলোর ওপর আগুনের লাল আভা ছড়িয়ে পড়েছে।

পাড়ার লোকের তাগিদে প্রতাপ সজাগ হয়ে উঠল—সোনার বিয়ে আর না দিলে নয়। আগে আগেও সে দু-একবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু সোনাই বাধা দিয়েছিল, বাবাকে ছেড়ে সে থাকতে পারবে না ব'লে। মেয়ে বড় হয়েছে, বিয়ে তার দিতেই হবে; বিশেষতঃ তাদের সমাজে এত বড় আইবুড়ো মেয়ে ঘরে রাখতে কেউ সাহস পায় না। প্রতাপকে দশ জনে ভালবাসে, তাই তার মুখ চেয়ে এত দিন কেউ কোন কথা বলে নি। কিন্তু এমনি ক'রে আর কত দিন চলে ?

সেদিন সোনা বলেছিল—বাপ ছেড়ে সে কোথাও থাকতে পারবে না; আর আজ প্রতাপ নিজেই ভাবে—সোনাকে ছেড়ে সে বাঁচবে কেমন ক'রে ? সোনার মা যখন তার কোলে ঐ একরত্তি মেয়েটি দিয়ে চ'লে গেল, প্রতাপ চোখের জল মুছেছিল তার জীবনের সম্বল ঐ মেয়েটিকে বুকে জড়িয়ে। প্রতাপ আর বিয়ে করে নি। জীবনের আট-দশটি বছর কেটে গেল শুধু সোনার সঙ্গে পুতুলখেলা ক'রে। কত নিশুতি রাতে প্রতাপের চোখে ঘুম ছিল না; সোনাকে বুকে ক'রে সে পথে পথে ঘুরেছে।

ললিত আর সোনাদের বাড়ী আসে না। সারাটি দিন থাকে মাঠে; সকাল আর সন্ধ্যায় কবিগান অভ্যাস করে। এক বছরের ভিতর ললিত হরিনারাণের এক জন প্রধান সাকরেদ হয়ে উঠেছে। ওস্তাদজী ছাত্রের প্রতিভায় মুগ্ধ হয়ে অকুণ্ঠ মনে তাঁর শিক্ষার ঝুলি নিঃশেষে ঢেলে দিয়েছেন ললিতের অঞ্জলিতে। জয়নগরের বাজারে সেদিন কবিগান গেয়ে ললিত খুব নাম কিনেছে। ললিতের কথা নিয়ে গাঁয়ে যে গর্ব্ব-আলোচনা সুরু হয়েছে, তা সোনার অগোচর নেই।

* * *

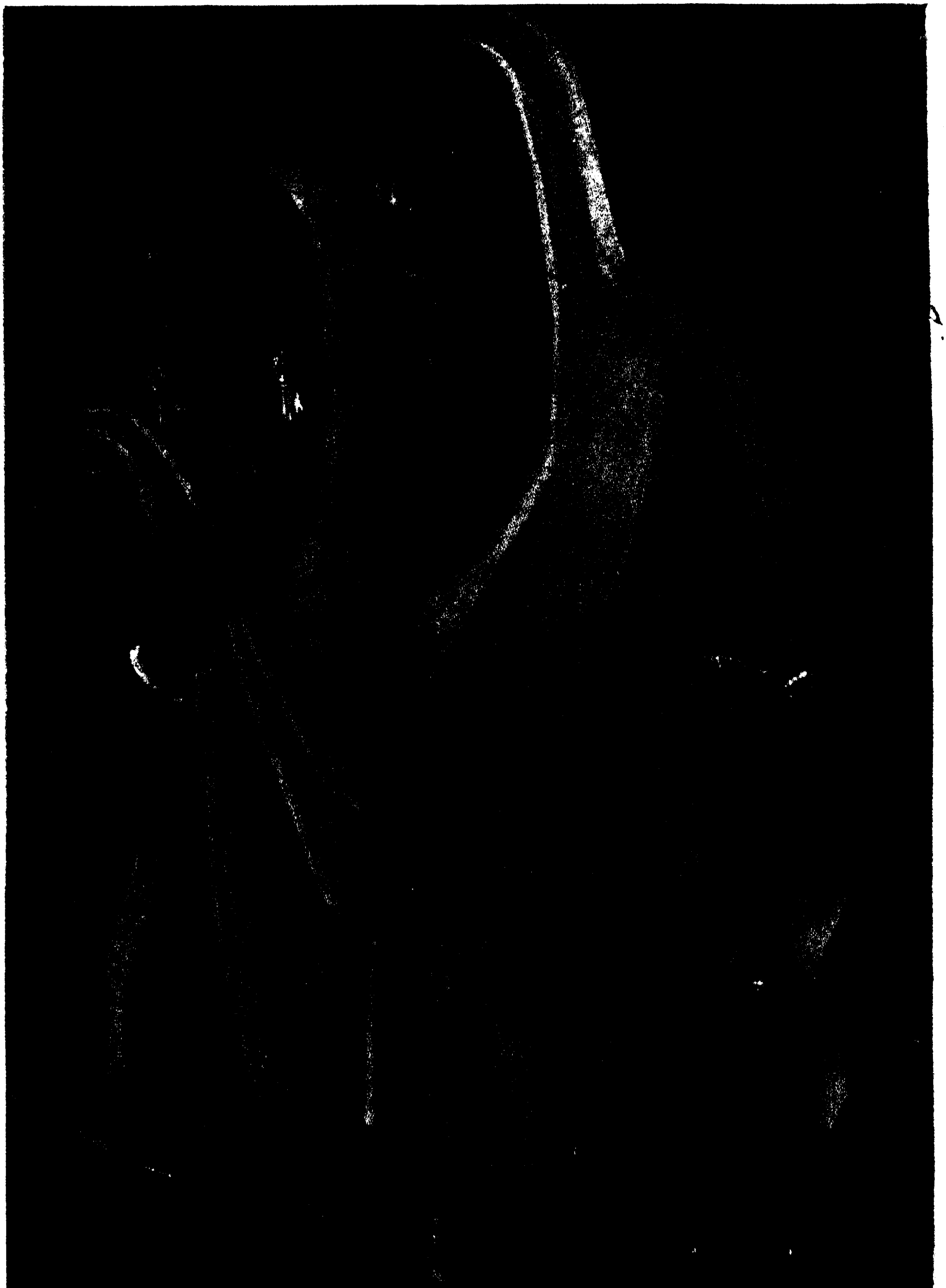
অনেক হাঁটাহাঁটির পর প্রতাপ সোনার বিয়ের সম্বন্ধ স্থির করেছে পলাশডাঙ্গার নিমাই মোড়লের ছেলের সঙ্গে। ছেলেটি ভাল; কলকাতায় কোন ছাতার কারখানায় কাজ করে। গ্রামে নিমাই মোড়লের বেশ খাতির আছে। বোশেখের মাঝামাঝি কাজটা মিটিয়ে ফেলতে পারলে প্রতাপ সোয়াস্তির নিঃশ্বাস ফেলবে। কিন্তু যত দিন যায়, সোনা যেন ততই মন-মরা হয়ে আসে। প্রতাপ অনেক চেষ্টা করেছে সোনার মনের কথা জানবার জন্যে; সোনা কিছুই প্রকাশ করে না।

আগে সোনা পথে-ঘাটে প্রায়ই ললিতের দেখা পেত, কিন্তু এই একটি মাস সে একদিনের জন্যও ললিতকে আর দেখে নি। ললিত এখন রাখালী ছেড়ে কবিগানের দল করেছে। সোনা ভাবে—সে এমন কি গুরুতর দোষ করেছে, যা ললিত মাপ করতে পারে না! ললিতকে যেদিন বাড়ী থেকে তাড়িয়ে দেয়, সেদিন যে সোনা নিজে কত বড় আঘাত সহ্য করেছে, তা ললিত ভাবতেও পারে না।

* * *

চৈত্রের শেষ। শিবের গাজন; সোনা সারাদিন উপোসী আছে। সেই শেষরাতে শিবের মাথায় দুধ-গঙ্গাজল দিয়ে তার পর একটু প্রসাদ মুখে দেবে। কাল ছিল সংযম আর মাস-ভক্তদের জাগরণের রাত। চন্দনপুরের বুড়ো শিবতলায় ললিতের কবিগানের বায়না ছিল। মস্তবড় আসর; বিখ্যাত কবিওয়ালা জব্বারির সঙ্গে ললিতের পাল্টাপাল্টি গান হয়েছে; ললিতের সুনাম রাতারাতি ছড়িয়ে পড়েছে তল্লাটময়। জব্বারির মত অত বড় কবিওয়ালার সঙ্গে পাল্লা দিয়ে মাত্র বিশ বছরের ছেলে ঐ ললিত সারারাত্রি সমানে গান চালিয়েছে।

রাত্রি তখন এক প্রহরের বেশী নয়। চণ্ডীমণ্ডপে গ্রামের কত লোক জমা হয়েছে। পাড়ার ছেলেরা কোলাহল ক'রে চারি দিকে ছোটাছুটি করে। অন্যদিন এতক্ষণে সারা গ্রাম নিশুতি হয়ে আসে; কিন্তু আজ আর শিশুর চোখেও ঘুম নেই। মাঝরাতে শ্মশান-ভৈরব আসবে; কাঁটা-ভাঙা, আগুন খেলা, তার পর হবে ভক্তদের ধূপবাণ নাচ।



সোনা পূজো দিয়ে বাড়ি ফিরছে, পথে কেনারামের সঙ্গে দেখা। কেনারাম এখন ললিতের দলে দোহারি করে। চন্দনপুরের মেলা থেকে তারা গান গেয়ে ফিরছিল। ওদের দেখে সোনা পাশ কাটিয়ে দাঁড়াল।

আজ ত সেখানে গান হবার কথা; তবে ওরা বাড়ী এল কেন? হঠাৎ একথা মনে হ'তেই সোনার বুকের ভিতরটা যেন কেমন পাক খেয়ে গেল। উপবাস-ক্লিষ্ট স্বরে যথাসাধ্য জোর দিয়ে সোনা ডাকলে—কেনারাম—

কেনারাম থমকে দাঁড়াল। একটু এগিয়ে এসে জিজ্ঞেস করলে—কে, সোনা?

—হ্যাঁ। তোমাদের যে আজ চন্দনপুরে গান হবার কথা ছিল!

—হবে না। বিকেল থেকে ললিতের ওলাওঠা হয়েছে। তার মাকে নিতে এসেছি।

সোনার পা থেকে মাথা পর্য্যন্ত অবশ হয়ে এল। নৈবেদ্যের থালা হাত থেকে ঝনঝন ক'রে গড়িয়ে পড়ল। আর সে দাঁড়িয়ে থাকতে পারে না।

কেনারামের হাতখানা ধ'রে বিহ্বল ভাবে সোনা জিজ্ঞেস করলে—বাঁচবে ত কেনারাম?

—সে বুড়ো শিবের দয়া বোন।

—আমি যাব কেনারাম। আমায় নিয়ে চল—

সোনা পথের মাঝখানে পঙ্গুর মত ব'সে পড়ল। মনে হ'ল পৃথিবীটা যেন প্রচণ্ড ভূমিকম্পে টলমল করে; এখনই প্রলয় হবে।

কেনারাম সোনার মাথায় হাতখানা রেখে বললে—তুই যাবি সেই চন্দনপুর? লোকে কি বলবে সোনা?

—লোকের বলায় আমার কি যায় আসে কেনারাম? সোনার সংজ্ঞা হয়ত লুপ্ত হ'য়ে আসছিল। চোখের সামনে অস্পষ্ট হ'য়ে ভাসে সেই বাঁশের বাঁশী আর রেশমী সুতোর ঝালর।

স্মৃতি

শ্রীরাজেন্দ্রকুমার ভৌমিক

অন্তহীন বিশাল আকাশে,
দৃষ্টি মোর খোঁজে কার ভাষা।
তন্দ্রা লাগে মৃদুল বাতাসে,
ভেসে আসে কার ভালবাসা॥

মেঘে ভাসে কার হাতছানি,
ডাকে মোরে কোন্ দূর দেশে।
ব্যথা জাগে কাঁপে বুকখানি,
কাঁদে আশা নিষ্ফল প্রয়াসে॥

মর্ম্মভাঙা স্বপনের রেখা,
ফেলে-আসা দিবসের স্মৃতি।
বার বার পিছু ফিরে দেখা,
তাই দিয়ে মালা মোর গাঁথি॥

বিস্মৃতির তলে ডুবে যাই,
সত্তা মোর হারায় চেতন,
সুখ দুঃখ অনুভূতি নাই,
তুমি আস মৃত্যুর মতন॥

পঞ্চশস্য

হুতোম-প্যাঁচার লুকোচুরি

প্যাঁচা একটি সর্ব্বজনপরিচিত নিশাচর পাখী। দিনের বেলায় কদাচিৎ ইহাদিগকে বাহিরে দেখিতে পাওয়া যায়। কাক, চিল, শকুনি প্রভৃতি পাখীদিগকে যেরূপ দলে দলে যেখানে-সেখানে দেখিতে পাওয়া যায় ইহাদের সংখ্যা সেরূপ বেশী নহে; মাঝে মাঝে এখানে-সেখানে দুই চারিটি দেখিতে পাওয়া যায় মাত্র। একে সংখ্যায় কম, তাহাতে রাত্রিবেলায় চরিয়া বেড়ায় বলিয়া ইহারা খুব কম লোকেরই নজরে পড়িয়া থাকে। তথাপি বালক-বৃদ্ধ সকলের নিকটেই প্যাঁচা বিশেষ পরিচিত। দেখিবামাত্রই প্যাঁচা বলিয়া চিনিয়া লইতে কাহারও অসুবিধা হয় না, অন্যান্য পাখীর মত



লতাপাতার ঝোপে বসিয়া হুতোম-প্যাঁচা অর্দ্ধনিমীলিত নেত্রে নিদ্রা যাইতেছে

চিনিবার জন্য বিশেষজ্ঞের প্রয়োজন হয় না। ইহার প্রধান কারণ—ইহাদের অদ্ভুত চেহারা। সাধারণ পক্ষিশ্রেণীভুক্ত হইলেও ইহাদের মুখাবয়ব অন্যান্য পাখী হইতে সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। মুখখানা গোলাকার—চেপ্টা থালার মত, মধ্যস্থলে শিকারী বিড়ালের চোখের মত দুইটি বড় বড় গোলাকার চোখ। উভয় চোখের মধ্যস্থিত পালকগুলি এমনভাবে সজ্জিত যে, মনে হয় যেন নাকের মত উঁচু হইয়া আছে; তাহার একটু নীচে হইতেই ঈষৎ বক্র ঠোঁটটি খাড়াভাবে নীচের দিকে চলিয়া গিয়াছে, ঠোঁটের অধিকাংশই প্রায় পালকে ঢাকা থাকে। হুতোম-প্যাঁচাদের মাথার দুই দিকে বিড়ালের কানের মত খাড়া খাড়া দুইটি পালকের কান আছে। এই কান দুইটিকে ইচ্ছামত শোয়াইয়া রাখিতে বা খাড়া করিতে পারে; প্যাঁচার শরীরের তুলনায় চোখ দুইটি এত বড় যে সহজেই ইহাদের প্রতি দৃষ্টি আকৃষ্ট হইয়া থাকে। কিন্তু এতবড় চোখ সত্ত্বেও ইহাদের দৃষ্টি প্রায়ই সম্মুখের দিকে নিবদ্ধ থাকে। দিনের আলো মোটেই পছন্দ করে না, প্রায়ই চোখ বুজিয়া থাকে। রাত্রিচর হইলেও ইহারা



হুতোম-প্যাঁচা শিকারের আশায় বসিয়া আছে

দিনের বেলায় যে কোন জিনিস দেখিতে পায় না তাহা নহে, তবে অনেকটা কম দেখে বলিয়াই মনে হয়।

প্যাঁচা রাত্রিচর পাখী হইলেও দিবাচর শিকারী পাখীর সঙ্গে ইহাদের যথেষ্ট সাদৃশ্য লক্ষিত হয়। পৃথিবীর বিভিন্ন দেশে সাধারণতঃ



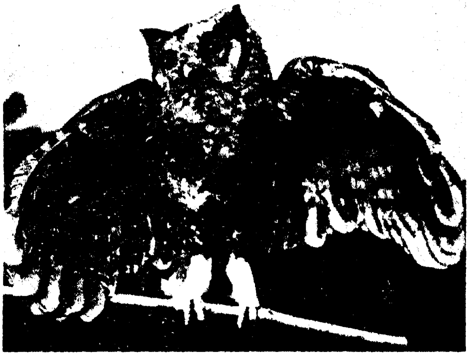
হুতোম-প্যাঁচা ঝোপের মধ্যে বসিয়া প্রসাধনে রত



লতাপাতার মধ্যে বসিয়া প্যাঁচা নিদ্রা যাইতেছে

দুই জাতীয় প্যাঁচা দেখিতে পাওয়া যায়, এক রকম কুনো-প্যাঁচা, আর এক রকম শিং বা লম্বা কান-ওয়ালা বুনো-প্যাঁচা। কুনো-প্যাঁচার বৈজ্ঞানিক নাম Strigidae, আর বুনো-প্যাঁচার নাম Bubonidae। এই দুই জাতীয় প্যাঁচার মধ্যে প্রায় দুই শতেরও অধিক বিভিন্ন শ্রেণীর প্যাঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। কুনো-প্যাঁচারা বেশীর ভাগই ঘরের কোণে পুরানো বাড়ীর কার্নিশে, নির্জন গুদাম বা আস্তাবলে বাস করিয়া থাকে। বুনো-প্যাঁচা অপেক্ষা আকারে ইহারা অনেক ছোট হইয়া থাকে। শিং-ওয়ালা বুনো প্যাঁচারা সাধারণতঃ বড় বড় গাছের কোটরে ভুক্তাবশেষ পাখীর পালক হাড়গোড়ের সহিত সামান্য খড়কুটা সংগ্রহ করিয়া বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। শীতপ্রধান মেরুপ্রদেশ হইতে গ্রীষ্মপ্রধান দেশ পর্য্যন্ত প্রায় সর্ব্বত্রই প্যাঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা ৮-৯ ইঞ্চি হইতে প্রায় দুই ফুট লম্বা হইয়া থাকে। অধিকাংশ প্যাঁচার গায়ের রংই ঈষৎ সাদা ও ধূসর রঙের মিশ্রণ। এতদ্ব্যতীত ধূসর, বাদামী, হল্‌দে, সোনালী ও সাদা রঙের প্যাঁচারও অভাব নাই। ইহাদের পাগুলি নখ পর্য্যন্ত পালকে ঢাকা থাকে। প্রত্যেক পায়ে চারটি করিয়া বাঁকানো শক্ত নখ আছে। নখগুলি এত তীক্ষ্ণ ও জোরালো যে, কোন জিনিষ একবার আঁকড়াইয়া ধরিলে অক্ষত অবস্থায় ছাড়াইয়া আনা দুষ্কর। নখ দিয়া আঁকড়াইয়া ধরিয়া ইহারা যে-কোন শত্রুকে সহজেই কাবু করিয়া ফেলিতে পারে। ইহারা পাখী, ইঁদুর, ব্যাং, মাছ ও নানাবিধ পোকামাকড় খাইয়া থাকে। পায়ের নখ দিয়াই শিকার ধরে এবং বাসায় আনিয়া নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া খাইবার আগে ঠোঁট ব্যবহার করে না, নখ দিয়াই ঠোঁটের কাজ হইয়া থাকে। ঠোঁটও ভয়ানক ধারালো এবং শক্ত। সাপ যেমন ফণা ধরিয়া দুলিয়া দুলিয়া থাকিয়া থাকিয়া ছোবল মারে, ইহারাও সেইরূপ থাকিয়া থাকিয়া অদ্ভুত এক প্রকার হিস্ হিস্ শব্দ করিতে করিতে শিকারকে ছিন্ন-ভিন্ন করিয়া খাইয়া থাকে। প্যাঁচার বাসার কাছে প্রায়ই ভুক্ত প্রাণীর হাড়গোড় স্তূপাকার হইয়া জমিয়া থাকে। অনেক সময় ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র প্রাণীর স্তূপাকার হাড়গোড় দেখিয়া সেই স্থানে প্যাঁচার বাসস্থানের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায়। ইহাদের বাসানির্ম্মাণে কৌশলের পরিচয় পাওয়া যায় না। অনেকে আবার অন্য পাখীর পরিত্যক্ত বাসাতেই আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। কোন কোন জাতের প্যাঁচা আবার মাটিতে গর্ত খুঁড়িয়া অথবা অন্যের পরিত্যক্ত গর্তে বাস করিয়া থাকে। ইহারা তিন-চার হইতে সাত-আট পর্য্যন্ত ডিম পাড়িয়া থাকে। সাধারণতঃ একসঙ্গে সবগুলি ডিম পাড়ে না। অনিয়মিতভাবে মাঝে মাঝে ডিম পাড়িয়া থাকে। কাজেই অনেক সময়ই দেখিতে পাওয়া যায়—বাসায় বাচ্চা থাকা সত্ত্বেও তাহাদের পাশে আরও কয়েকটি ডিম রহিয়াছে। বাচ্চার আহার যোগান ও ডিমে তা দেওয়া একসঙ্গেই চলিতে থাকে। এই জন্য স্ত্রী-পুরুষ উভয়কেই সর্ব্বদা ডিম ও বাচ্চা লইয়া ব্যতিব্যস্ত থাকিতে হয়। সময়ে সময়ে দেখা যায় স্ত্রী-পুরুষ উভয়ে মিলিয়া একসঙ্গেই ডিমে তা দিতেছে।

প্যাঁচা ইঁদুরের ভয়ানক শত্রু। যেখানে প্যাঁচা বাসা বাঁধে তাহার আশেপাশে নেংটি ইঁদুর প্রভৃতির উৎপাত খুবই কম হইয়া থাকে। বাসায় বাচ্চা থাকিলে প্রতি দশ-পনর মিনিট অন্তর



হুতোম-প্যাঁচা ডানা মেলিয়া আততায়ীকে ভয় দেখাইতেছে



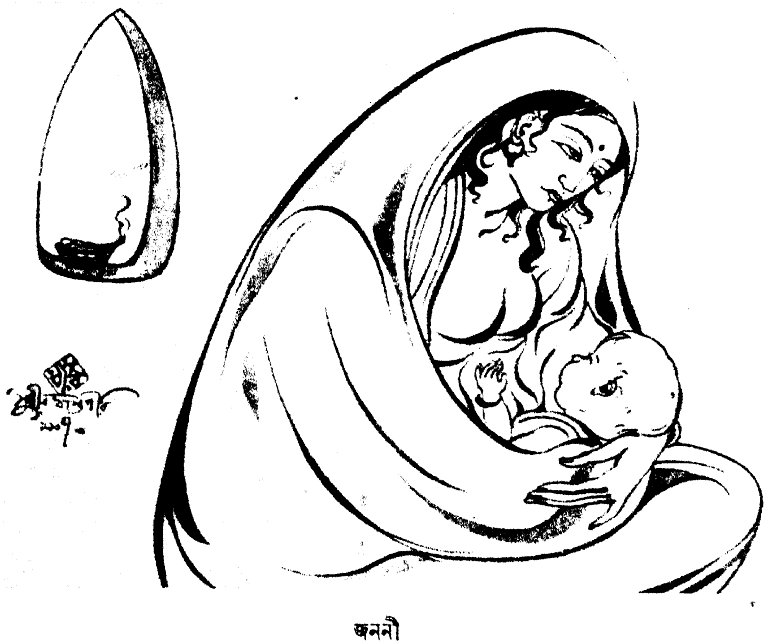
শিকার ধরিবার জন্য হুতোম-প্যাঁচা উড়িয়া আসিতেছে

এক-একটা শিকার ধরিয়া বাসায় লইয়া আসে. সূর্য্যাস্তের পর অন্ধকার হইবার সঙ্গে সঙ্গেই হুতোম-প্যাঁচারা বাসা ছাড়িয়া বাহির হয় এবং কোন উঁচু ডালে বসিয়া কিছুক্ষণ ধরিয়া গুরুগম্ভীর আওয়াজে ডাকিয়া থাকে. তাহার পর শিকারান্বেষণে বাহির হয়। অর্দ্ধ-নিমজ্জিত ভাসমান মৎস্যকেও ইহারা ছোঁ মারিয়া ধরিয়া লইয়া যায়। দুইটি প্যাঁচা একত্র হইলেই অনেক সময় ঝগড়াঝাঁটি করিয়া অতি কর্কশ কণ্ঠে ক্যাঁচম্যাঁচ শব্দ করিয়া থাকে। আততায়ীকে ভয় দেখাইবার সময় ঠোঁট দিয়া খট্ খট্ করিয়া এক প্রকার শব্দ করিয়া থাকে. কখন কখন বা উহাদিগকে ঘড়ঘড় শব্দ করিতে শোনা যায়। রাত্রির প্রহরে প্রহরে দুইটি প্যাঁচা একসঙ্গে কিচিরমিচির করিয়া ডাকিয়া ওঠে। কখন কখন বা বিড়ালের ন্যায় মিউ মিউ করিয়া ডাকে। ইহাদের ডানার পালক অত্যন্ত কোমল; ধূসর রঙের উপর কালো বা বাদামী দাগকাটা। শিকারী পাখীদের নিঃশব্দে উড়িয়া বেড়াইবার প্রয়োজন নতুবা একটুতেই শিকার ভড়কাইয়া যাইতে পারে। পালক কোমল বলিয়া প্যাঁচাদের উড়িবার সময় মোটেই শব্দ হয় না। ইউরোপের উত্তরাঞ্চলে ঈগল-প্যাঁচা নামে প্রায় দুই ফুট লম্বা এক প্রকার হুতোম-প্যাঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা নিঃশব্দে উড়িয়া গিয়া বড় বড় খরগোস হরিণ-শিশু, ছাগল-ছানা প্রভৃতি ছোঁ মারিয়া লইয়া যায়। উত্তরমেরুসন্নিহিত প্রদেশসমূহের তুষারাবৃত স্থানে এক প্রকার বড় বড় সাদা প্যাঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মস্তকে বিড়ালের কানের মত খাড়া খাড়া পালক নাই, ইহারাও বড় বড় জন্তুর বাচ্চা প্রভৃতি শিকার করিয়া থাকে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ দুই-তিন রকমের প্যাঁচা দেখিতে পাওয়া যায়। অপেক্ষাকৃত ছোট প্যাঁচাদের মধ্যে ধূসর রঙের প্যাঁচার সংখ্যাই বেশী। সাদা প্যাঁচাগুলিকে মাঝে মাঝে দেখিতে পাওয়া যায়। হুতোম-প্যাঁচারা আকারে প্রায় দেড় ফুটেরও অধিক বড় হইয়া থাকে। আমাদের দেশে সাদা প্যাঁচাকে লক্ষ্মীপ্যাঁচাও বলিয়া থাকে। হিন্দুদের বিশ্বাস—প্যাঁচা লক্ষ্মীদেবীর বাহন। যেখানে সাদা প্যাঁচা বসে বা বাস করে, সেখানেই লক্ষ্মীদেবী আনাগোনা করিয়া থাকেন—ইহাই সাধারণের ধারণা। কালো অথবা ধূসর রঙের ছোট ও বড় হুতোম-প্যাঁচাকে কাল-প্যাঁচা বা নিম-প্যাঁচা বলে। কাল-পুরুষকে লোকে যমরাজ বলিয়া জানে। হুতোম-প্যাঁচা ও কাকেরা নাকি যমের দূত। কাকেরা দিনের বেলায় ও প্যাঁচারা রাত্রিবেলায় দৌত্যকার্য্য চালাইয়া থাকে। এই জন্য হুতোম প্যাঁচা সম্বন্ধে সাধারণের মনে একটা ভীতিপূর্ণ ধারণা আছে। বিশেষতঃ ইহারা সময়ে সময়ে বিড়ালের মত মিউ মিউ বা নিম্ নিম্ শব্দে ডাকিয়া থাকে। এই নিম্ নিম্ শব্দের অর্থই নাকি কাহাকেও যমপুরীতে লইয়া যাইবার পূর্ব্বাভাস। আমাদের দেশীয় ছোট প্যাঁচাদিগকে জ্যোৎস্নারাত্রিতে কদাচিৎ দেখিতে পাওয়া যায় কিন্তু হুতোম-প্যাঁচারা প্রায়ই লোকের নজরে পড়িয়া থাকে। পাড়াগাঁয়ের অপেক্ষাকৃত নির্জ্জন স্থানে বা বনে জঙ্গলে বড় বড় গাছের উপর সূর্য্যাস্তের কিছুক্ষণ পরেই এই হুতোম-প্যাঁচাদিগকে দেখিতে পাওয়া যায় পূর্ব্বাঞ্চলের লোকেরা ইহাদিগকে ভুতুম বলিয়া থাকে। সন্ধ্যার প্রাক্কালে রোজই তাহারা প্রত্যেকে এক একটি নির্দ্দিষ্ট স্থানে বসিয়া গুরুগম্ভীর স্বরে "বুবুম বুম্" করিয়া ডাকিতে থাকে। নির্দ্দিষ্ট সময় অন্তর এই ডাক প্রায় আধ ঘণ্টা ধরিয়া চলিতে থাকে। এই ডাক কর্কশ নহে এবং বহুদূর হইতে শুনিতে পাওয়া যায়। ধীরে ধীরে চতুর্দ্দিকে আঁধার ঘনাইয়া আসিতেছে. পাখীরা বাসায় প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছে; চারিদিকেই যেন একটা গম্ভীর ভাব—এই অবস্থার সঙ্গে হুতোম-প্যাঁচার ডাকের গাম্ভীর্য্যের যেন পরিষ্কার একটা সঙ্গতি অনুভূত হয়। কেহ কেহ বলিয়া থাকেন—হুতোম-প্যাঁচা মগরেবের নামাজের 'আজান' দেয়। এই তথাকথিত 'আজান' দিবার সময় হুতোম-প্যাঁচাকে পরিষ্কার ভাবে দেখিতে পাওয়া যায়। ডাকিবার সময় ঠোঁটের নীচে হইতে গলা ও গাল দুইটা মস্তবড় একটা বলের মত উঁচু হইয়া ফুলিয়া ওঠে। তখন দেখিতে আরও ভয়ঙ্কর হইয়া থাকে। ভাঁটার মত বড় বড় দুইটা গোলাকার চোখ আর কান দুইটি তখন বিড়ালের কানের মত খাড়া হইয়া ওঠে। শরীরের বাকী অংশ দেখিতে না পাওয়া গেলে হঠাৎ একটা বড় রকমের বিড়ালের মুখ বলিয়াই ধারণা জন্মে। মুখের চেহারায়, ডাকে এবং ইঁদুর-শিকারে বিড়ালের সঙ্গে যেন অনেকটা সাদৃশ্য লক্ষিত হয়।

পূর্ব্বেই বলিয়াছি, গাছের তলায় বা নির্জ্জন স্থানে সঞ্চিত পাখীর পালক বা ছোট ছোট প্রাণীর স্তূপাকার হাড়গোড় দেখিয়া সেই স্থানে প্যাচার বাসার সন্ধান পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু এমনই ইহাদের গায়ের ডোরা-কাটা রং এবং নিঃশব্দে লুক্কায়িত ভাবে অবস্থান করিবার ক্ষমতা যে অতি নিকটে গেলেও সহজে ইহাদের অস্তিত্ব টের পাওয়া যায় না। আশেপাশের ডালপালার সঙ্গে এমন ভাবে মিলিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে যে, অতি সহজেই লোকের দৃষ্টিবিভ্রম ঘটিয়া থাকে। দিনের আলো ইহারা মোটেই সহ্য করিতে পারে না; চোখের পাতা বুজিয়া নিদ্রা গিয়া থাকে। শত্রুর আনাগোনা টের পাইলে ড্যাব্‌ড্যাবে চোখ মেলিয়া কানের পালক খাড়া করিয়া সাপের মত অদ্ভুত ধরণে হেলিয়া দুলিয়া এদিক-ওদিক নজর করিয়া দেখে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, চোখ বড় হইলেও ইহাদের নজর প্রায়ই সম্মুখের দিকে আবদ্ধ থাকে। এক পাশে সরিয়া দাড়াইলে সহজে ইহাদের নজর পড়ে না। আবার পাশের দিকে ঘাড় ফিরাইল ত সেই দিকেই হেলিয়া দুলিয়া একদৃষ্টে শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করিবার চেষ্টা করে। সেই সময় ইহাদের মুখভঙ্গী দেখিতে সত্যই অদ্ভুত। শত্রু অতি নিকটে আসিয়া পড়িলে ঠিক সাপের মত ফোঁস ফোঁস করিয়া ঠোঁট দিয়া খট্ খট্ করিতে থাকে। বেগতিক দেখিলে উড়িয়া গিয়া ঝোপঝাড়ের ভিতর আত্মগোপন করিয়া থাকে। চোখের সামনে উড়িয়া গিয়া অন্য স্থানে বসিলেও গায়ের ধূসর ও কালো রঙের ডোরার জন্য ডালপালার সঙ্গে যেন একত্র মিশিয়া যায়। লুকোচুরির এইরূপ অব্যর্থ কৌশল জানা থাকিলেও ইহাদের ড্যাব্‌ডেবে চোখ ও অদ্ভুত ফোঁস ফোঁস শব্দে শত্রুর কাছে ধরা পড়িয়া যায়। তবে তীক্ষ্ণ নখ ও ধারালো ঠোঁটের কামড়ের ভয়ে সহজে কেহ ইহাদিগকে আয়ত্ত করিতে পারে না। একবার ঠোঁট দিয়া কামড়াইয়া ধরিলে আর ছাড়ে না। কাক প্যাচার ভয়ানক শত্রু। একবার কোন রকমে দেখিলেই হয়। দলে দলে জুটিয়া পিছু তাড়া করে। পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে গায়ের রং মিলাইয়া লুকোচুরি করিতে পারে বলিয়াই, খোলা বাসায় অবস্থান করিলেও সন্ধানী কাকেরা পর্য্যন্ত ইহাদিগকে লক্ষ্য করিতে পারে না। তবে একবার কোন রকমে সন্দেহ হইলেই চীৎকার করিয়া অন্য সকলকে ডাকিয়া আনে। চীৎকারে ভয় পাইয়া প্যাচাও চোখ ঘুরাইয়া কান খাড়া করিয়া ফোঁস ফোঁস করিতে থাকে। তখন সকলে মিলিয়া ইহাকে ঠোকরাইয়া বাসা হইতে বাহির করিয়া আনে। পাখী ধরিবার জন্য প্যাচার কোটরে হাত ঢুকাইয়া ফোঁস ফোঁস শব্দে ও ঠোঁটের কামড়ে রক্তপাতের ফলে, সর্পাঘাত হইয়াছে মনে করিয়া সময়ে সময়ে আতঙ্কে অনেকে গাছ হইতে পড়িয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়।

[এই প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত]



জননী

শ্রীসুধীররঞ্জন খাস্তগীর

বোড়াল গ্রামে সেন-রাজার প্রাচীন কীর্ত্তি

শ্রীবিভূতিভূষণ মিত্র

জেলা ২৪-পরগণার অন্তর্গত বোড়াল গ্রাম টালিগঞ্জ হইতে প্রায় তিন মাইল দক্ষিণে অবস্থিত। ইহা একটি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ প্রাচীন গ্রাম। কালীঘাটতটবাহিনী আদিগঙ্গা এককালে এই গ্রামের প্রান্তভাগে প্রবাহিতা ছিলেন। পরে পঞ্চদশ শতাব্দীর শেষভাগে পর্ত্তুগীজ ব্যবসায়িগণের বাণিজ্যতরী গমনাগমনের সুবিধার জন্য এক জন ধনাঢ্য মোগল খিদিরপুর হইতে রাজগঞ্জ পর্য্যন্ত একটি খাল কাটাইয়া আদিগঙ্গাকে সরস্বতীর সহিত সংযুক্ত করাইয়া দেন। ফলে খিদিরপুর হইতে জয়নগর-মজিলপুর পর্য্যন্ত আদিগঙ্গার স্রোত ক্রমে রুদ্ধ হইয়া যায়। বর্ত্তমানে ঐ সকল স্থানে গঙ্গার বিশুষ্ক খাদরেখা পড়িয়া আছে ও মধ্যে মধ্যে ভগ্নাবশিষ্ট বড় বড় বাঁধাঘাট ও পতনোন্মুখ মন্দিরাদি অতীত কীর্ত্তির সাক্ষ্য দিতেছে। প্রাচীন পর্ত্তুগীজ মানচিত্রে গঙ্গার এই বিশুষ্ক অঞ্চলে অবস্থিত বোড়াল ও অন্যান্য প্রসিদ্ধ গ্রামসমূহের উল্লেখ আছে। সর্ যদুনাথ সরকার মহাশয় যাঁহাকে "ভারতে জাতীয়তার পিতামহ" বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন, সেই রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই



ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর বর্ত্তমান মন্দির



সাত শত বৎসর পূর্ব্বেকার সেন-রাজার আমলের ইট

বোড়াল গ্রামেই জন্মগ্রহণ করেন ও তাঁহার বাল্যজীবন এই স্থানেই যাপিত হয়। এই স্বনামধন্য মহাপুরুষের

বাস্তুভিটার ধ্বংসপ্রায় দৃশ্য আজিও এই গ্রাম ব্যথিত হৃদয়ে বহন করিতেছে।

স্বর্গীয় বসু মহাশয় তাঁহার "গ্রাম্য উপাখ্যান" নামক পুস্তকে বোড়াল গ্রামের আদ্যোপান্ত ইতিহাস এবং রাজার উল্লিখিত প্রাচীন বিবরণসমূহ বর্ণন করিয়াছেন। তিনি আরও লিখিয়াছেন, 'কায়স্থকৌস্তভ'-প্রণেতা রাজনারায়ণ মিত্র উদ্ভাবন করেন যে, বোড়াল গ্রাম সেন-বংশীয় রাজাদিগের মধ্যে শ্রীমান্ সুযোগ্য সেনের রাজধানী ছিল। এই রাজধানীতে তিনি এক মহাযজ্ঞ করেন। ইতিহাসে এই যজ্ঞের কথা উল্লিখিত আছে ('গ্রাম্য উপাখ্যান', পৃ. ২)।

বস্তুতঃ বোড়াল গ্রাম যে এক কালে কোন রাজার রাজধানী ছিল, তাহা অদ্যাপি বর্ত্তমান কতকগুলি ধ্বংসাবশিষ্ট কীর্ত্তির নিদর্শন হইতে প্রমাণিত হয়। এই গ্রামে একটি বিশাল দীঘিকা আছে যাহার জলকর ছিল ৪২॥ বিঘা। 'গ্রাম্য উপাখ্যানে' লিখিত আছে, "এই দীঘি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ বলিয়া ইহা কেবল দীঘি নামে খ্যাত—যেমন ইংরেজীতে বলে The *Dighi*"—পৃ. ৬। অধুনা এই বিশাল দীঘি মজিয়া গিয়া জমাট দামে ঢাকিয়া গিয়াছে, মাত্র মধ্যস্থলে কিছু জল আছে।



ত্রিপুরসুন্দরী দেবীর অষ্টধাতু মূর্ত্তি (ছয় শত বৎসর পূর্ব্বে সেন-রাজা কর্ত্তৃক প্রতিষ্ঠিত মূর্ত্তির অনুকরণে নির্ম্মিত)

এই বোড়াল গ্রামে রাজা সুযোগ্য সেনের অপর আর একটি কীর্ত্তি আছে। তিনি এই দীঘির পূর্ব্বকূলে এবং পূর্ব্বোক্ত আদিগঙ্গার বিশুষ্ক খাদের পশ্চিম তীরবর্ত্তী স্থানে ত্রিপুরসুন্দরী পীঠ নামক এক বৃহৎ দেবালয় স্থাপন করেন। এক বিরাট যজ্ঞের অনুষ্ঠান করিয়া এই মন্দিরে তিনি ত্রিপুরসুন্দরী মূর্ত্তি (ষোড়শী) প্রতিষ্ঠা করেন। ইহা আজ হইতে প্রায় সাত শত বৎসর পূর্ব্বের, অর্থাৎ ত্রয়োদশ শতাব্দীর মধ্যভাগের কথা। রাজনারায়ণ বসু মহাশয় এই দেবী সম্বন্ধে লিখিয়াছেন, "দীঘির উপকূলে ত্রিপুরসুন্দরী পীঠ নামে একটি মন্দির ছিল, এক্ষণে তাহার ভগ্নাবশেষ অতি অল্পই আছে।" 'গ্রাম্য উপাখ্যান', পৃ. ৭। দেবীর সেই সুবিশাল মন্দির



রাজনারায়ণ বসুর বাস্তুভিটার ধ্বংসাবশেষ



সেন-রাজার দীঘিকার বর্তমান অবস্থা

কালক্রমে ধ্বংসপ্রাপ্ত হয় ও বোড়ালের গ্রাম্যশ্রী নষ্ট হইয়া যায়।

পরে ৺জগদীশচন্দ্র ঘোষ এই গ্রামখানি আনুমানিক ২৫০ বৎসর পূর্ব্বে মুসলমান সুবেদারদের নিকট হইতে "জঙ্গল-কাটি পত্তনি" রূপে প্রাপ্ত হইয়া গ্রামের মধ্যে লোক বসতি বৃদ্ধি ও লুপ্ত কীর্ত্তিসমূহের পুনরুদ্ধার করিবার চেষ্টা করেন। তাঁহার তিরোধানের পর উক্ত কার্য্য মন্দীভূত হইয়া পড়ে। পরে শ্রীযুক্ত হীরালাল ঘোষ (৺জগদীশ ঘোষের অধস্তন নবম পুরুষ) উক্ত দেবালয়ের উন্নতি সাধনের জন্য চেষ্টা করিতে থাকেন ও ৺ত্রিপুরসুন্দরী মঠের স্তূপ খনন করাইতে আরম্ভ করেন। তবে একার অর্থ ও সামর্থ্যে উক্ত ব্যয়-বহুল কার্য্য বেশী দিন চালান সম্ভবপর হয় নাই। তবে যে-পর্য্যন্ত খনন করান হইয়াছিল (১৩০২-৩ সালে) তাহা দ্বারাই মন্দির ও মন্দিরসংলগ্ন অন্যান্য গৃহাদির সুদৃঢ় ও সুপ্রশস্ত ভিত্তি আবিষ্কৃত হয়, বিচিত্র ধরণের ও কারুকার্য্য-খচিত বহু ইট ও দেবীর একটি ধাতুনির্ম্মিত যন্ত্র পাওয়া যায়।

ভূগর্ভ হইতে উত্তোলিত ঐ সমস্ত ইষ্টকের একটি চিত্র এই স্থানে দেওয়া হইল। এই ইষ্টকগুলি এমন সুদৃঢ় যে দেখিলে মনে হয় যেন সদ্যোনির্ম্মিত। এই-গুলি আকৃতিতেও বিভিন্ন প্রকার। ইহার কতকগুলি গোল, কতকগুলি চতুষ্কোণ ও কতকগুলি ত্রিকোণ।

এই পীঠস্থানের উন্নতিকল্পে ১৩৪১ সাল হইতে "৺ত্রিপুরসুন্দরী সেবা সমিতি" নামক একটি সমিতি গঠিত হয় ও এই সমিতি উক্ত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ স্থানের উন্নতি-মূলক যাবতীয় কার্য্যের ভার গ্রহণ করেন। ইঁহাদের সমবেত চেষ্টার ফলে অতি অল্পদিনের মধ্যেই বহু উল্লেখযোগ্য কার্য্য সম্পাদিত হইয়াছে। দেবীর পুরাতন মূর্ত্তির অনুকরণে গত ২৩শে মাঘ ১৩৪১ সালে দেবীর একটি সুবৃহৎ অষ্টধাতুমূর্ত্তি নির্ম্মিত হইয়াছে ও নিত্য সেবার্চ্চনা চলিতেছে। এই অতি প্রাচীন পীঠস্থানে আসিয়া দূরাগত যাত্রীদের যাহাতে কোনরূপ অসুবিধা ভোগ করিতে না হয় সে ব্যবস্থাও এই সমিতি হইতে করা হইতেছে।

এত বড় অষ্টধাতুমূর্ত্তি ২৪-পরগণার কোন দেবালয়ে নাই। তবে অর্থাভাববশতঃ এই বিশাল মূর্ত্তির উপযুক্ত মন্দির অদ্যাপি পুনর্নির্ম্মিত হয় নাই। উপস্থিত একটি ক্ষুদ্র প্রকোষ্ঠে দেবীর পূজার্চ্চনা চলিতেছে।

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

পূর্ব্ব পরিচয়

[চন্দ্রকান্ত মিত্র নয়ানজোড় গ্রামে স্ত্রী মহামায়া, ভগিনী হৈমবতী ও পুত্রকন্যা শিবু ও সুধাকে লইয়া থাকেন। সুধা শিবু পূজার সময় মহামায়ার সঙ্গে মামার বাড়ী যায়। শালবনের ভিতর দিয়া লম্বা মাঝির গরুর গাড়ী চড়িয়া এবারেও তাহারা রতনজোড়ে দাদামহাশয় লক্ষ্মণচন্দ্র ও দিদিমা ভুবনেশ্বরীর নিকট গিয়াছিল। সেখানে মহামায়ার সহিত তাঁহার বিধবা দিদি সুরধুনীর খুব ভাব। সুরধুনী সংসারের কর্ত্রী কিন্তু অন্তরে বিরহিণী তরুণী। বাপের বাড়ীতে মহামায়ার খুব আদর, অনেক আত্মীয়বন্ধু। পূজার পূর্ব্বেই সেখানকার আনন্দ-উৎসবের মাঝখানে সুধার দিদিমা ভুবনেশ্বরীর অকস্মাৎ মৃত্যু হইল। তাঁহার মৃত্যুতে মহামায়া ও সুরধুনী চক্ষে অন্ধকার দেখিলেন। মহামায়া তখন অন্তঃসত্ত্বা, কিন্তু শোকের ঔদাসীন্যে ও অশৌচের নিয়ম পালনে তিনি আপনার অবস্থার কথা ভুলিয়াই গিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অত্যন্ত খারাপ হইয়া পড়িল। তিনি আপন গৃহে ফিরিয়া আসিলেন। মহামায়ার দ্বিতীয় পুত্রের জন্মের পর হইতে তাঁহার শরীরের একটা দিক অবশ হইয়া আসিতে লাগিল। শিশুটি ক্ষুদ্র দিদি সুধার হাতেই মানুষ হইতে লাগিল। চন্দ্রকান্ত কলিকাতায় গিয়া স্ত্রীর চিকিৎসা করাইবেন স্থির করিলেন। শৈশবের লীলা-ভূমি ছাড়িয়া অজানা কলিকাতায় আসিতে সুধার মন বিরহ-ব্যাকুল হইয়া উঠিল। পিসিমাকে ও চিরপরিচিত গৃহকে ছাড়িয়া ব্যথিত ও শঙ্কিত মনে সুধা মা বাবা ও উল্লসিত শিবুর সঙ্গে কলিকাতায় আসিল। অজানা কলিকাতার নূতনত্বের ভিতর সুধা কোনও আশ্রয় পাইল না। পীড়িতা মাতা ও সংসার লইয়াই তাহার দিন চলিতে লাগিল। শিবু নূতন নূতন আনন্দ খুঁজিয়া বেড়াইত। চন্দ্রকান্ত সুধাকে স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দিবার কিছুদিন পরে একটি নবাগতা মেয়েকে দেখিয়া অকস্মাৎ সুধার বন্ধুপ্রীতি উথলিয়া উঠিল। এ অনুভূতি তাহার জীবনে সম্পূর্ণ নূতন। স্কুলের মধ্যে থাকিয়াও সে ছিল এতদিন একলা. এইবার তাহার মন ভরিয়া উঠিল। হৈমন্তীর সঙ্গে অতিরিক্ত ভাব লইয়া স্কুলের অন্য মেয়েরা ঠাট্টা-তামাসা করে, তাহাতে সুধা লজ্জা পায়, কিন্তু বন্ধুপ্রীতি তাহার নিবিড়তর হইয়া উঠে। হৈমন্তীর চোখের ভিতর দিয়া সে নিজেকেও যেন নূতন করিয়া আবিষ্কার করিতেছে। পূজার সময় মাসিমা সুরধুনী কলিকাতায় বোনকে দেখিতে আসাতে, সুধা সেই ফাঁকে শিবুকে লইয়া একবার নয়ানজোড় ঘুরিয়া আসিল। মন কিন্তু যেন কলিকাতায় ফেলিয়া গেল। সুধা নিজের আসন্ন যৌবন সম্বন্ধে নিজে ততটা সচেতন নয়. কিন্তু মাসিমা পিসিমা হইতে আরম্ভ করিয়া পাশের বাড়ীর মণ্ডলগৃহিণী পর্য্যন্ত সকলেই তাহাকে সারাক্ষণ সাবধান করিয়া দিতেছে।

হৈমন্তীর কল্যাণে সুধা প্রথম নিঃসম্পর্কীয় যুবকদের সঙ্গেও মিশিতে আরম্ভ করিল। দক্ষিণেশ্বরে একদিন দল বাঁধিয়া অনেকে বেড়াইয়া আসিল। দলে চারজন যুবক ছিল, মহেন্দ্র, সুরেশ, তপন আর নিখিল। তপন অতিশয় সুপুরুষ, সুরেশ মোটা, কালো, ছোট-খাট মানুষ, বেশী কথা বলে না, তবে প্রখরদৃষ্টি ও তীক্ষ্ণধী। মহেন্দ্র কাঠখোট্টা গোছের মানুষ, সারাক্ষণ মানবজাতির গুরুগিরি করিতে ব্যস্ত। নিখিল দীর্ঘাকৃতি, শ্যামবর্ণ সদাহাস্যময়।

স্কুলে একদিন মেয়েমহলে মহাতর্ক হইয়া গেল। মেয়েদের স্বামী নির্ব্বাচন ভালবাসিয়া নিজে করা উচিত, না উচিত চোখ কান বুজিয়া মা বাপের হাতের পুতুলের মত পার হইয়া যাওয়া। মনীষা একদিকে, স্নেহলতা আর-একদিকে। সুধা এ বিষয়ে আগে কিছু ভাবে নাই, এখন ভাবিতে চেষ্টা করিয়াও কূল পাইল না। সনাতনপন্থী জীবনযাত্রা দেখিতেই সে অভ্যস্ত, কিন্তু এখন আবার মনে সংশয় জাগে হয়ত আর এক ধরণের জীবনও আছে, তাহাতে মানুষের নিজের মন তাহার একমাত্র কাণ্ডারী; এবং হয়ত সে পথে যাহারা চলে তাহারা সকলেই ভুল করে না।

যাহা ছিল তর্ক-আলোচনার বিষয়, মানুষের জীবনে তাহার পরিচয় পাইতে সুধার দেরী হইল না। হেমন্তীর জ্যাঠামহাশয় নরেশ্বর তাঁহার কন্যা মিলির বিবাহ দিবার জন্য ব্যস্ত; কিন্তু নিজের মনকে কাণ্ডারী করিয়া ইতিমধ্যে মিলি সুরেশকে অন্তরে বরণ করিয়াছে, বিমুখ আত্মীয়স্বজনের তর্জন-গর্জন, অনুনয় বিনয়, কিছুতেই সে টলিল না। অবশেষে এক বছরের জন্য মিলিকে রেঙ্গুনে পিসির কাছে পাঠাইয়া দেওয়া হইল, যদি স্থান-পরিবর্ত্তনে তাহার মত পরিবর্ত্তন ঘটে। মিলির যোগিনী মূর্ত্তি দেখিয়া কাব্যের অর্থ সুধার কাছে স্পষ্ট হইয়া উঠিল—কঠিন সঙ্কল্প লইয়া মিলি চলিয়া গেল, হৈমন্তী ও সুধার কৈশোর-নাট্যে যবনিকা পড়িয়া নূতন অঙ্কের আরম্ভ হইল।

২১

নদী ও সাগরের সঙ্গম দূর হইতে দেখিলে মনে হয় যেন একটি রেখাতে আসিয়া তাহারা যুক্ত হইয়াছে, রেখার এপারে এক রং ওপারে আর এক রং। কিন্তু যত কাছে আসা যায়, এই সীমারেখা আর খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। কোন্ খানে যে নদীর মাটিগোলা জল শেষ হইয়া সমুদ্রের পান্নার রং সুরু হইয়াছে কিছুতেই ধরা যায় না। এমন ধীরে ধীরে এক রং আর এক রঙের ভিতর মিশিয়া গিয়াছে যে, যে অপলকে তাকাইয়া থাকে তাহার কাছে দুই এক বলিয়া মনে হয়; কিছু ক্ষণের জন্য দৃষ্টি সরাইয়া লইলে তবে দুইটিকে ভিন্ন বলিয়া চিনিতে পারা সম্ভব।

মানুষের কৈশোর এবং যৌবনও তেমনই। তাহার সন্ধিক্ষণ যে কোন্‌টি বলা যায় না। কৈশোরের লীলা চপলতা কখন যে যৌবনবেদনার গভীরতার মধ্যে যৌবনস্বপ্নের

প্রাচুর্য্যের মধ্যে আত্ম-সমর্পণ করিয়া দেয় কেহ বলিতে পারে না। কোন্ রাত্রের অন্ধকারে কিশোর বালক বাল্যলীলার মাঝখানে ঘুমাইয়া কোন্ যৌবন-প্রাতে জীবনের নূতন রসের সন্ধানে ছুটিয়াছে কেহ কি জানে? কিন্তু দূর হইতে ইহাদেরও যেন একটা সীমারেখা দেখা যায়। সুধা কখন যে জীবনের পথে শৈশবকে পিছনে ফেলিয়া আসিল তাহা সে নিজে বলিতে পারে না, কিন্তু স্কুলের পর্ব্ব শেষ করিবার বৎসর খানিক পরে অনেক সময় সে দূর হইতে যেন কলিকাতায় নবাগতা সুধার দিকে মমতার সহিত তাকাইয়া দেখিত। আজিকার সুধা সে সুধা নয়। তাহার জীবনের গতি কোথায় যেন একটু মোড় ফিরিয়া গিয়াছে, তাহার প্রসার অনেকখানি বাড়িয়া গিয়াছে। শৈশবে ও কৈশোরে জীবনে যে সম্পদ সে অর্জ্জন করিয়াছিল তাহা হারাইয়া যায় নাই, কিন্তু নূতন জীবনের যাত্রাপথে অসংখ্য বৈচিত্র্যের অন্তরালে তাহারা যেন একটু চাপা পড়িয়া গিয়াছিল।

হৈমন্তীর প্রতি সুধার টানে কিন্তু কিছুমাত্র ভাঁটা পড়ে নাই। বরং তাহার মনে একটা অভিমান জমা হইয়া উঠিতেছিল যে মিলি-দিদি রেঙ্গুনে চলিয়া যাওয়ার পর হইতেই হৈমন্তী যেন ধীরে ধীরে কেমন একটু বদলাইয়া যাইতেছে। সেই স্বপ্নভরা চোখ, সেই ধ্যানমগ্ন ভাব সবই আছে, কিন্তু তাহার স্বপ্ন, তাহার ধ্যানের রূপ যেন পরিবর্ত্তিত হইয়া যাইতেছে। সে এখন স্বপ্নে ধ্যানে যে-লোকে বিহার করে সেখানে সুধা যেন প্রবেশপথ খুঁজিয়া পায় না; সুধাকে যেন পিছনে ফেলিয়া সেখানে সে ব্যাকুল আগ্রহে ছুটিয়া চলিয়া যাইতে চায়। সুধা তাহাকে দৈবাৎ সচেতন করিয়া দিলে হৈমন্তী মধুর হাসিয়া সুধার দুই হাত চাপিয়া ধরে, বলে, "সুধা, তুমি আমাকে কি ভাব? আমার উপর খুব রাগ কর তুমি, না?"

কেন যে সুধা তাহার উপর রাগ করিবে একথা হৈমন্তী স্পষ্ট করিয়া বলে না, তবু যেন স্বীকার করে কোন একটা কারণে সে তাহার বন্ধুত্বের মর্য্যাদা রক্ষা করিয়া চলিতে পারিতেছে না, বন্ধুর একাগ্রচিত্ততার প্রতিদান সে দিতে পারিতেছে না। সুধা কিছু বলিত না, কিন্তু ক্ষুণ্ণ হইত কেন হৈমন্তী তাহার কাছে মনের কথা বলে না, হৈমন্তীর মনে কি বেদনা, কি স্বপ্নের মায়া তাহাকে আপন-ভোলা করিয়াছে সুধাকে বলিলে সে ত খুশীই হইত, হৈমন্তীর দুঃখ সুখ সব কিছুকে আপনার করিয়া লইবার ক্ষমতাতেই ত তাহার বন্ধুত্বের মূল্য।

সন্ধ্যার পর হৈমন্তীদের বাড়ীতে গেলে হৈমন্তী সুধাকে লইয়া ছাদের উপর চলিয়া যাইত। সূর্য্যাস্তের সোনালী রং তখনও আকাশের গায়ে একটুখানি লাগিয়া আছে, পিছন হইতে রাত্রির অন্ধকার ছায়া অর্দ্ধেক আকাশ ঢাকিয়া ফেলিয়াছে। ছাদে বসিবার জন্য হৈমন্তী একটা সস্তা মাদুর সংগ্রহ করিয়া আনিত, কিন্তু সেখানে তাহাদের বসা হইত না। যেখানে ছাদের আলিসার উপর হৈমন্তীর জ্যাঠাইমা ঘিয়ের টিনে মাটি দিয়া বেল ও যুঁই ফুলের গাছ লাগাইয়া ছিলেন, হৈমন্তীও একটা রঙীন চীনা টবে রজনীগন্ধার ঝাড় বসাইয়াছিল, সেইখানে ফুলের গন্ধের মধ্যে আলিসার উপর হেলান দিয়া তাহারা দাঁড়াইত। হয়ত হৈমন্তী গুনগুন করিয়া গান ধরিত,

"মিলাব নয়ন তব নয়নের সাথে
রাখিব এ হাত তব দক্ষিণ হাতে
প্রিয়তম হে জাগ জাগ জাগ।"

তাহার হাত সুধার হাত দুখানির ভিতর থাকিত, কিন্তু তাহার দৃষ্টি কোন্ সুদূরের পথে চলিয়া যাইত, তাহার নিশ্বাস গভীর হইয়া ফুলের গন্ধের ভিতর মিলাইয়া যাইত। হৈমন্তী বলিত, 'তোমার মুখে ভাই ঐ গানটা ভারি সুন্দর লাগে, তুমি গাও না' —

"ওগো সুদূর বিপুল সুদূর তুমি যে বাজাও ব্যাকুল বাঁশরি।
মোর ডানা নাই, আছি এক ঠাঁই সে কথা যে যাই পাসরি।"

সুধা গাহিবার সঙ্গে সঙ্গে হৈমন্তী ধরিত,

"দিন চলে যায়, আমি আনমনে
তারি আশা চেয়ে থাকি বাতায়নে
ওগো প্রাণে মনে আমি যে তাহার পরশ পাবার প্রয়াসী।"

হৈমন্তীর দৃষ্টি সজল হইয়া উঠিত, তাহার চোখে এমন করিয়া জলকণা কাঁপিয়া উঠিতে সুধা কখনও দেখে নাই। কেন হৈমন্তী কোন কথা বলে না, সুধার মন ব্যথায় ভরিয়া উঠিত। কিন্তু সে ব্যথা সে বেদনা কি শুধু হৈমন্তীর জন্য? সুধা বুঝিতে পারিত, এ বেদনা শুধু হৈমন্তীর বেদনার সহানুভূতি নয়, কোন্ সুদূরের আকুল পিয়াসা তাহার বক্ষেও জাগিয়া উঠিয়াছে, সেও যেন কাহার আশা-পথ চাহিয়া

আছে, সেই অজানা-অতিথির মুখ যেন চেনা যায়, যেন চেনা যায় না; কিন্তু এই আধ-চেনার অন্তরাল হইতেও সুধাকে সে ডাকিতেছে, সুধা নাগাল পাইতেছে না। ফুলের গন্ধের মত তাহার একটুখানি আভাস পাওয়া যায়, কিন্তু তাহাকে ধরা যায় না, তাই এই বেদনার সৃষ্টি।

কোনদিন তাহাদের ছাদের সভায় ছেলেরা আসিয়া পড়িত। একটা মাদুরের পাশে আর একটা মাদুর পড়িত। আজ আর দাঁড়াইয়া সন্ধ্যা কাটানো চলিত না। হৈমন্তী সেতার ও কাব্যগ্রন্থ লইয়া আসিত, ছেলেদের হাতে এক এক খানা নূতন ইউরোপীয় নভেল। সম্প্রতি যাঁহারা নোবেল প্রাইজ পাইয়াছেন, তাঁহাদের রচনা কে কত বেশী পড়িয়াছে তাহা লইয়া আলোচনা ও তর্ক লাগিয়া যাইত। মহেন্দ্র প্রমাণ করিত যে সে সকলের চেয়ে বেশী পড়িয়াছে এবং ঔপন্যাসিকদের আদি-অন্ত সব তাহার নখ-দর্পণে।

একদিন নিখিল বলিল, "তুমি ক্যাটালগ দেখে কন্টিনেণ্টাল অথরদের নাম মুখস্থ কর, আর মলাটের উপরের সিনপসিস পড়ে এসেই সকলের আগে বক্তৃতা সুরু কর। আমরা বোকা মানুষ সব বইটা প'ড়ে তার পরে কথা বলব ঠিক করি, তাই সর্ব্বদাই তোমার পিছনে পড়ে থাকি।"

হৈমন্তী বলিল, "আপনি ওরকম ক'রে ভদ্রলোককে চটাবেন না, শেষে টোলের পণ্ডিতদের মত লড়াই লেগে যাবে।"

মহেন্দ্র এসব ঠাট্টা-তামাসা গায়ে মাখিত না, সে মেটারলিঙ্ক ও ইবসেনের তুলনামূলক সমালোচনা এবং বার্নার্ড শ ও অস্কার ওয়াইল্ডের রসবোধের মাপকাঠি লইয়া আরও দ্বিগুণ উৎসাহে কথা বলিতে থাকিত। থাকিয়া থাকিয়া সকলের অলক্ষ্যে আপনার চুলের পালিশে হাত বুলাইয়া লইত ও গলার চাদরটা যথাস্থানে টানিয়া বসাইত।

নিখিল বলিল, "এমন সুন্দর সন্ধ্যাটা বাজে রসচর্চ্চায় নষ্ট না ক'রে তরমুজের রস কি আমের রসের আস্বাদ নিলে ঢের কাজের হত।"

হৈমন্তীর হঠাৎ মনে পড়িয়া গেল সে আতিথ্য ভুলিয়া গিয়াছে। সুধাকে উপরে বসাইয়া সে নীচে ছুটিয়া গেল সরবৎ আনিতে। কাঠের একটা পালিশ-করা ট্রের উপর বেঁটে মোটা ছোট ছোট কাচের গেলাসে কোন দিন রক্তাভ তরমুজের সরবৎ, কোনদিন বা আমপোড়ার সোনালী সরবৎ লইয়া সে আধঘণ্টা খানিক পরে উঠিত।

স্বল্পভাষিণী সুধা ছেলেদের মাঝখানে বসিয়া কি কথা বলিবে খুঁজিয়া পাইল না, সময়টা কাটাইয়া দিবার জন্য তপনকে বলিল, "আপনাকে তত ক্ষণ একটা গান করতে হবে।" তপন কথা কম বলিলেও গানে তাহার কণ্ঠ সহজেই সবাক্ হইয়া উঠিত। সে গান ধরিল,

> "হাতখানি ঐ বাড়িয়ে আন দাও গো আমার হাতে,
> ধরব তারে ভরব তারে রাখ্‌ব তারে সাথে,
> এ আঁধার যে পূর্ণ তোমায় সেই কথা বলিও
> মাঝে মাঝে প্রাণে তোমার পরশ খানি দিও।"

নিখিল বলিল, "গানটি সুন্দর, কিন্তু বন্ধু কে? দেবতা, না মানবী?"

তপন বলিল,

> "আর পাব কোথা?
> দেবতারে প্রিয় করি প্রিয়েরে দেবতা।"

মহেন্দ্র বলিল, "তোমরা কি কবির ভাষায় ছাড়া কথা বলবে না? নিজেদের ভাষা ভুলে গিয়েছ? যদি কাব্য-চর্চ্চাই করতে চাও ত বই সামনে রয়েছে, খুলে আরম্ভ কর না। রোজ আধঘণ্টা পড়লেও অনেক এগিয়ে যাওয়া যায়। ইচ্ছা করলে সংস্কৃত কাব্যও ধরতে পার। আমার ঐদিকেই ঝোঁক বেশী। আমাদের কবিরা সকলেই ত ঋণী সংস্কৃত কবিদের কাছে।"

সুধার মন এদিকে যাইত না, গানের সুরের ভিতর তাহার মনটা ঘুরিয়া বেড়াইত। কি সুন্দর গলার স্বর তপনের, যেন ঝরণার জলের মত ঝরিয়া পড়িতেছে, যেন চার লাইন গানের ভিতর মানুষের প্রাণের সকল গভীরতম কামনার কথা উজাড় করিয়া ঢালিয়া দিতেছে। কিন্তু এ কি শুধু সুকণ্ঠের মোহ, এ কি শুধু কবির বাণীর অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্য যাহা সন্ধ্যার অকাশকে এমন করিয়া ভরিয়া তুলিয়াছে? অন্তরের তন্ত্রীতে যে কথার প্রতিধ্বনি ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে, তাহার পিছনে কি প্রাণের আহ্বান নাই? সুধার এত কথা জানিবার কি প্রয়োজন তাহা সে নিজেই জানে না ভাল করিয়া, তবু ইচ্ছা করে জানিতে এই গানের

সুরের অন্তরাল দিয়া ওই নবীন প্রাণ কাহাকে কি বলিতে চায়।

হৈমন্তী কোমরে আঁচল জড়াইয়া ট্রের ভারে ঈষৎ হেলিয়া উপরে আসিয়া পড়িলে ছেলেদের মধ্যে কোলাহল পড়িয়া যাইত, সুধার চিন্তার ধারা কাটিয়া যাইত। সরবতের পর সেতার বাজিত, হয়ত নূতন শেখা কোনও গানের সুর সকলের মুখে গুন গুন করিয়া ফুটিয়া উঠিত। এ-পাশের ও-পাশের বাড়ী হইতে মেয়েরা গানবাজনা শুনিবার জন্য জানালা কি ছাদের আলিশা হইতে মুখ বাড়াইত। তার পর আবার ইস্কুল কলেজ, স্বদেশী গানবাজনার কত ছোট ছোট কথা উঠিত, যাহার আয়ু এক মুহূর্ত্তের বেশী নয়। মহেন্দ্র অনেক সময় গম্ভীর সুরে বলিত, "মানুষের জীবন কি এই রকম ছোট কথার আলোচনাতেই নষ্ট করবার জন্য? জীবন ত খুব লম্বা জিনিষ নয়, দু-দিনেই ফুরিয়ে যাবে, তাকে হিসাব ক'রে খরচ করা দরকার।"

তপন বলিত, "কথা হাল্কা ব'লেই নিঃশ্বাসের বায়ুর মত মানুষের প্রাণকে বাঁচিয়ে রেখেছে। গুরুভার কথাকে পরিপাক করা যায় না। ভারী হাওয়ায় নিশ্বাস আটকে যায়, ভারী খাবারে বদ্‌হজম হয় একথা মান ত!"

মহেন্দ্র বলিত, "তাই বুঝি তুমি এত হাল্কা কথা বল যে কানে শোনা যায় না?"

নিখিল বলিত, "কেন, গানের সুরের চেয়ে সুমিষ্ট কথা কি আর কিছু আছে? ও কথা বলে গানে, কিন্তু কাজ করে কোদাল কুপিয়ে।"

মহেন্দ্র বলিত, "ও, আই বেগ ইওর পার্ডন, তুমি যে ব্যাক টু ভিলেজের বড় পাণ্ডা, তা ভুলে গিয়েছিলাম। বাস্তবিক এ-বিষয়ে আমাদের মধ্যে কখনও ভাল ক'রে আলোচনা হয় না, এটা বড় দুঃখের বিষয়। এক দিন একটা বন্ধু-সভা ডাকা যাক, কি বল? কার কি মত ঠিক জানা যাবে। আমার মনে হয় না এই উন্নতির যুগে মানুষের আবার পিছন ফেরা উচিত।"

হৈমন্তী বলিত, "মহেন্দ্র-দা, গাছের পরিণতি তার ফুলে ফলে, কিন্তু তাই ব'লে তার শিকড়গুলোকে কেটে ফেললে উন্নতির পরাকাষ্ঠা হয় না। গ্রাম যে আমাদের প্রথম ধাত্রী, তাকে এক গণ্ডূষ জল দিতেও যদি আমরা ভুলে যাই, তাহলে আমাদের প্রাণে রস জোগাবে কে?"

মহেন্দ্র বলিত, "কেন, গ্রামকেও কি ক্রমশ শহরের আদর্শে তুলে আনা যায় না? শহরের যা মন্দ তা বাদ যাবে, যদি প্রতি গ্রামই শহর হ'য়ে ওঠে। তাহ'লে শহরে মানুষের ভীড়ে স্বাস্থ্য খারাপ হবে না। রোজগারী পুরুষরা চলে আসাতে গ্রামে স্ত্রীলোক বেশী আর সহরে পুরুষ বেশী হয়ে ব্যালান্স নষ্ট, নীতি দুষ্ট হবে না। যে যার নিজের গ্রামে ব'সে নাগরিক সুখ সুবিধা ভোগ করবে।"

সুধা অনেক ক্ষণ পরে কথা বলিত, কারণ গ্রাম তাহার জন্মভূমি, শৈশবের লীলাভূমি। সে বলিত, "যদি গ্রামে ব'সে আমরা মিউনিসিপ্যাল মার্কেটে ফল কিনি, বাথ-টবে স্নান করি, মোটর চড়ে কাপড়ের দোকানে যাই, লণ্ড্রিতে কাপড় কাচাই, তা হ'লে যে-মাটির পৃথিবীতে আমরা জন্মেছি, তার স্পর্শ জীবনে কোনও দিন পাওয়া হবে না; আমরা কল হয়ে উঠব কিন্তু জীবনের শ্রেষ্ঠ আনন্দ ও সৌন্দর্য্য থেকে কতখানি যে বঞ্চিত হলাম সেটা জানবার সুযোগ পর্য্যন্ত পাব না। নিজের হাতে লঙ্কা গাছ লাগিয়ে তার সাদা ফুলগুলি ফোটা থেকে লাল টক্‌টকে পাকা লঙ্কাটি পাড়া পর্য্যন্ততে গ্রামের মেয়ে যে আনন্দ পায়, শহরে এক পয়সায় এক মুহূর্ত্তে এক ঠোঙা লঙ্কা কিনে শহরে মানুষ কি সে সুখ পায়? সে কেনে পয়সার বদলে শুধু মশলা, আর এ পায় প্রতি পায়ে পায়ে নূতন আনন্দ। আধ মাইল হেঁটে গিয়ে গ্রামের ছেলেমেয়েরা যখন রোদপোড়া শরীর নিয়ে নদীর জলে ঝাঁপিয়ে পড়ে তখন সেই স্রোতের শীতল জলের ভিতর যে স্নিগ্ধতা, সেই খোলা আকাশের নীচে জলধারার মধ্যে যে মুক্তি স্নানের ঘরে টবে বসে শহরের ছেলেমেয়ে কি কখনও তা কল্পনা করতে পারে? জীবনের অনেক নিবিড় আনন্দের সঙ্গে শহরের ছেলেমেয়ের কখন পরিচয়ই হয় না।"

মহেন্দ্র বলিল, "আপনি ত বেশ পয়েন্ট ধরে তর্ক করতে পারেন! আপনার কি ইচ্ছা যে আমরা আবার সব সেই বৈদিক যুগে ফিরে যাই? মেয়েরা ঘরে ঘরে দুধ দুইবে ছেলেরা লাঙল চালাবে আর গাছতলায় ব'সে বেদগান করবে!"

সুধা বলিল, "তা মেয়েরা ঘরে ঘরে বসে মোটা হওয়া আর ছেলেরা চোখে চশমা দিয়ে ডিস্‌পেপসিয়া করার চেয়ে তা অনেকটা ভাল বইকি!"

নিখিল বলিল, "ভাগ্যিস আমার চোখে চশমা নেই, না হ'লে আমি ত একেবারে ডিসকোয়ালিফায়েড হ'য়ে যেতাম। যাই হোক তপন তোমারই জয় জয়কার। বল দেখি তোমার আদর্শ গ্রামে কোন চাকরি খালি আছে কি না। তাহ'লে আমরাও সব সেখানে ঢুকে পড়ব!"

তপন বলিল, "আমার গ্রামের লোকেরা চাকরি করে না। তারা লাঙল চালায়, কোদাল কোপায়, চরকা কাটে, তাঁত বোনে।"

হৈমন্তী বলিল, "নিখিলদা'র ঠাট্টা শুনবেন না। আপনাদের গ্রামে কি রকম কাজ সব হয় সত্যি বলুননা!"

তপন খুব বেশী কথা বলে না। সে বলিল, "এই সাধারণ সব কাজ আর কি! তাই দলবদ্ধ হয়ে করা আর বুদ্ধি খাটিয়ে বিজ্ঞানকে কাজে লাগিয়ে একটু উন্নতি করা। আমি মুখে আর কি বলব? আপনারা একদিন গিয়ে দেখে এলে ত বেশ হয়।"

হৈমন্তী যাইতে তৎক্ষণাৎ রাজি। "বাবাকে বলি, যদি যেতে দেন নিশ্চয় যাব সবাই দল বেঁধে।"

নিখিল বলিল, "খালি মহেন্দ্রকে বাদ দেওয়া হবে। ও সেখানে কিনা কি চেয়ে বসবে তার ঠিক কি।"

নীচতলা হইতে ডাক আসিত, সেদিন সতু আসিয়া বলিল, "মহেন্দ্র-দা', জ্যাঠাইমা বললেন আজ আপনারা এখান থেকেই খেয়ে যাবেন।"

নিখিল বলিল, "আর আমরা?

হৈমন্তী হাসিয়া বলিল, "বোকা ছেলে, সকলের নাম বলতে পার না? প্রত্যেককে বল।"

সতু বলিল, "দিদি, সুধাদি, মহেন্দ্রদা, নিখিলদা, তপনদা আপনারা সবাই দয়া ক'রে আমাদের সঙ্গে দুটি শাক-ভাত খাবেন চলুন।"

সভা ভাঙিয়া গেলে দূরের ঘড়িতে ঢং ঢং করিয়া নয়টা বাজার শব্দ শুনিতে শুনিতে সকলে নীচে নামিত।

২২

হৈমন্তীদের বাড়ী হইতে রাত করিয়া ফিরিলে সুধার ভাল করিয়া ঘুম হইত না। মাথার ভিতর অনেক রাত পর্য্যন্ত কত কথা যে ঘুরপাক খাইত তাহার ঠিক নাই। মুখে সে সেখানে খুব কমই কথা বলিত; কিন্তু ফিরিয়া আসিয়া মনে মনে কাহারও বা যুক্তি খণ্ডন কাহারও বা পক্ষ সমর্থন অনেক রাত্রি পর্য্যন্ত চলিত। অপর পক্ষের হইয়া নূতন নূতন কথার অবতারণা সে আপনার মনেই করিত, আবার তাহার উত্তরও নিজেই দিত। কে যে কি রকম কথা বলিবে তাহার একটা খসড়া তাহার কাছে যেন লেখা থাকিত। প্রত্যেকের মুখে প্রত্যেকের মত কথা দিয়া এবং নিজে তাহার জবাব দিয়া যে নৈপুণ্য সে দেখাইত, তাহাতে তাহার মনটা খুশী হইত। কিন্তু এমন করিয়া একটা কথাও যে সে বলিতে পারে না, ইহাতে তাহার দুঃখও হইত। তাহার ইচ্ছা করিত মহেন্দ্রের সব কূট তর্ক ও নিখিলের রসিকতার জবাব সে বিছানায় শুইয়া নিজের মনে যেমন করিয়া দেয় তাহাদের সামনেও যেন তেমন করিয়াই দিতে পারে। কিন্তু সে জানিত কথা বলা সম্বন্ধে অহেতুক লজ্জাকে সে অল্প দিনে কাটাইয়া উঠিতে পারিবে না। তপন তাহারই মত কম কথা বলে, তাহার হইয়াও সুধা মহেন্দ্র ও নিখিলের অনেক কথার জবাব নিজের মনে দিয়া রাখিত। কিন্তু এ জবাব কখনও কাহারও কানে পৌঁছিত না।

সুধা কলেজে ঢোকার সঙ্গে সঙ্গে তাহার পড়াশুনা অনেক বাড়িয়া গিয়াছে, এখন কলেজে যাইবার আগে সকালে ও ফিরিবার পর সন্ধ্যায় যেটুকু সময় সে পায় তাহাতে তাহার সংসারের কাজ ও কলেজের কাজ হইয়া উঠে না। কাজেই সকালে তাহাকে উঠিতে হয় ভোর পাঁচটায়, রাত্রেও যখন শুইতে যায় তখন প্রায় এগারটা বাজে, পথে "কুলফি মালাই"এর ডাক থামিয়া গিয়াছে, শেষ ট্রামগুলা লোক-ভারের অভাবে ঘড়াং ঘড়াং আওয়াজ করিয়া নাচিয়া চলিয়াছে, ফুটপাথে ও বাড়ীর বাহির দিকের রোয়াকে ও বারান্দায় সারি সারি ছিন্নবাস কুলি মজুর শুইয়া পড়িয়াছে। হোলির দিনের আগে বাড়ীর সামনে হিন্দুস্থানী ফিরিওয়ালারা সারা দিনের কচুরি, ঘুগনি, গজা ইত্যাদির ফিরি সারিয়া পুকুরের ধারে ছারপোকা-ভর্ত্তি খাটোলা ও খাটিয়া পাতিয়া রাত্রি একটা দুটা পর্য্যন্ত খঞ্জনী ও ঢোল পিটাইয়া এক সুরে গান গাহিয়া চলিত। বিছানায় শুইলেও

সহজে ঘুমাইবার জো ছিল না। তাহার উপর যেদিন হৈমন্তীদের বাড়ী হইতে নানা কথা মাথায় লইয়া সুধা ফিরিত সেদিন প্রায় সারা রাত্রিই বিনিদ্র কাটিয়া যাইত।

সেদিন অনেক রাত জাগিয়া সুধা ভোরে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল, পাঁচটার বদলে ছ'টাও বাজিয়া গিয়াছে। মহামায়া দেয়াল ধরিয়া সুধার খাটের কাছে আসিয়া ডাকিতেছেন, "ও সুধা, ওঠ না রে, বেলা হ'ল যে! ওই দেখ সিঁড়িতে কে পাগড়ী মাথায় চিঠি হাতে ক'রে দাঁড়িয়ে আছে। দিদিমণিকে চিঠির জবাব দিতে হবে বল্‌ছে।"

সুধার ভোরবেলাকার আধ-ঘুমের মধুর স্বপ্ন ভাঙিয়া গেল। সে তাড়াতাড়ি উঠিয়া বসিয়া বলিল, "উঃ, ঘরে রোদ এসে পড়েছে যে!"

মুখ ধুইয়া চিঠি হাতে করিয়া দেখিল, হৈমন্তী লিখিয়াছে, "সুধা; আজ শনিবার তিনটার পর আমরা তপনবাবুর গ্রাম দেখতে যাব। আর কোনও সঙ্গী পেলাম না, তাই সুধীন বাবুকে ধরেছি সঙ্গে নিয়ে যাবার জন্যে। তোমাকে নিশ্চয় করে যেতে হবে। যদি শিবুকে নিয়ে যেতে চাও ত তাকেও তৈরি রেখো, ছেলেদের এসব কাজ এখন থেকে দেখা ভাল। তুমি আসবেই, জবাব দিও। ইতি তোমার হৈমন্তী।"

শিবুর তখনও প্রায় মাঝ রাত্রি। সুধা তাহাকে গিয়া একটা ঠেলা দিল। শিবু সত্যই বলিল, "আঃ, দুপুর রাত্রে জ্বালাতন করো না। আমি এখন তোমাদের ফরমাস খাটতে পারব না।" সুধা আবার ঠেলা দিয়া বলিল, "আমাদের জন্যে খেটে খেটে ত তোমার হাড়ে ঘুণ ধরে গেছে, এখন নিজের জন্যে একটু দয়া ক'রে খাট। তপন বাবুর গ্রাম দেখতে আমরা যাব, তুমি যাবে কি না বল।"

শিবু চোখ কচলাইয়া উঠিয়া বসিয়া খানিক কি ভাবিল, তাহার পর বলিল, "আচ্ছা, যেতে পারি।"

গ্রাম বেশী দূরে নয়, কলিকাতার বাহিরেই একটা নীচু ধরণের জায়গায়। কঞ্চির বেড়ার উপর মাটি লেপা খড়ের চাল কিম্বা হোগলার ছাউনি দেওয়া ছোট ছোট বাড়ী। খুব কাছে কাছে পানা-বোঝাই অসংখ্য ডোবা ও পুকুর; যে ডোবাগুলি বর্ষার আকস্মিক জলে সৃষ্ট হইয়া পথের মাঝখানে পড়িয়াছে, তাহার উপর দুই-তিনটা বাঁশ ফেলিয়া সরু সাঁকো তৈয়ারী হইয়াছে। গ্রামের ভিতরে পথ বলিতে তেমন কিছু নাই। মাঠের উপর ও ক্ষেতের আলের উপর দিয়া পায়ে-চলা পথ উঁচু নীচু হইয়া কখনও কাদায় নামিয়া কখনও খানা-খন্দ ডিঙাইয়া চলিয়াছে। পুরুষে কাঁধে বোঝা লইয়া, স্ত্রীলোকে ছেলে কোলে করিয়া, রাখাল বালক গরু তাড়াইয়া সব এই পথেই চলিয়াছে। মাঝে মাঝে চুণ বালি খসিয়া-পড়া নোনা-ধরা ফাটা দেয়ালের পাকা বাড়ী খিড়কির পুকুরের উপর ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে।

সুধাদের থার্ড ক্লাস গাড়ীতে চড়িয়া সকলকে একটা ষ্টেশন হইতে হাঁটিয়া যাইতে হইবে। তপন বলিয়াছে গ্রামে সে গ্রামের মানুষদের মত থার্ড ক্লাসেই যায়। কাজেই সকলেই তাই চলিল। শিবু ও সতু দুই বালকও ইহাদের সঙ্গ লইয়াছে, কারণ তাহারা পাড়াগাঁয়ে ছুটোপাটি করিতে ভালবাসে। হাওড়া ষ্টেশনে গিয়া দেখা গেল কোথা হইতে সুরেশও আসিয়া জুটিয়াছে। সুধা ও হৈমন্তী তাহাকে সচরাচর দেখিতে পায় না, আজ অনেক দিন পরে তাহাকে দেখিয়া দুই জনেই খুশী হইল।

তপনের পিতামাতা এই গ্রামেরই মানুষ। কার্য্য-উপলক্ষে নানা দেশ-বিদেশে বাস করিয়া এখন তাঁহারা কলিকাতার বাসিন্দাই হইয়াছেন। কিন্তু গ্রামে তাঁহাদের ঘরবাড়ী সমস্তই আছে। তিন চার বিঘা জমির উপর পাকা বাড়ী, গোয়াল, ঢেঁকিশাল, পুকুর, নারিকেল গাছের সারি, দুই দশটা আম কাঁঠাল, একোণে-ওকোণে বাঁশঝাড়—কিছুরই অভাব নাই। গ্রীষ্মকালে আম-কাঁঠালের সময় বৎসরে একবার করিয়া তাঁহারা গ্রামে আসেন। গরমের দিনে দুই বেলা পুকুরের জলে ডুব দিয়া স্নান করিতে, সকাল সন্ধ্যা গাছের ডাব কাটিয়া গেলাস ভর্ত্তি ভর্ত্তি জল খাইতে এবং প্রত্যহ নিজের হাতে ফল পাড়িয়া ফুল তুলিয়া টুকরী বোঝাই করিতে বাড়ীর ছেলে-বুড়া সকলেরই খুব ভাল লাগিত। কিন্তু বৃষ্টির দিনে গ্রামের পথে চলিতে গেলে এক হাঁটু কাদা না ভাঙিলে চলে না, গ্রামের তাঁতি কুমোর কামারেরা পেটের ভাতের অভাবে পরের বাগান রাতারাতি উজাড় করিয়া কিংবা পোড়োবাড়ীর দরজা জানালা আসবাব চুরি করিয়া অভাব মোচনের চেষ্টা করে দেখিয়া তপনের বড় কষ্ট হইত। প্রত্যেক বৎসরই দেশে আসিয়া দেখা যাইত বাড়ীর কাঠ-কাঠরা এটা ওটা সেটা কত

কি চুরি গিয়াছে। জিনিষ কিছুই মূল্যবান নয়, কিন্তু বার বার চুরি যাওয়ায় অসুবিধা আছে, মানুষের উপর বিশ্বাসও একেবারে চলিয়া যায়।

তপন এম-এ পাস করিবার পর এই গ্রামের কাজ লইয়াই থাকিবে ঠিক করিয়াছিল। গ্রামে একটা ইস্কুল খুলিয়া ও গোটা দুই-চার তাঁত বসাইয়া প্রথম সে কাজ আরম্ভ করে। উভয় কাজের জন্যই তাহাদের বাড়ীতে স্থান যথেষ্ট ছিল। তার পর ধীরে ধীরে লাইব্রেরী, পথ মেরামত, ঔষধ বিতরণ, বন্ধক রাখিয়া অতি সামান্য সুদে কর্জ্জ দেওয়া, কুস্তির আখড়া ইত্যাদি নানা জিনিষের ধীরে ধীরে সূত্রপাত হইতেছে। মানুষের উপার্জ্জনশক্তি ও সততার উন্নতির দিকেই তাহার সকলের চেয়ে নজর বেশী।

পড়ন্ত রৌদ্রে মাঠের পথ ভাঙিয়া তাহারা যখন গ্রামে পৌঁছিল তখন সারাদিনের রৌদ্রে মাটি তাতিয়া ঝাঁঝ উঠিতেছে। তপনের ইস্কুলের ছেলেরা অতিথিদের জন্য তাহার বাড়ীর বারান্দা ঘটীখানিক আগেই ধুইয়া রাখিয়াছিল। এখন তাহাতে শীতল পাটি পাতিয়া দিয়াছে। প্রত্যেকের পা ধুইবার জন্য একটি করিয়া মাজা গাড়ুতে জল ও তাহার উপর লাল গামছা দিয়া রাখিয়াছে। মেয়েদের জন্য বিছানার চাদরের পরদা টাঙাইয়া বাঁশের টাটের ঘেরা হাত মুখ ধুইবার স্থান করিয়াছে।

সকলের হাত পা ধোয়া হইলে তপন বলিল, "এবার তোমাদের আতিথ্যের আসল আয়োজন দেখি।"

বড় বড় পাথরের থালা হাতে ছেলেরা দেখা দিল। থালায় মুগের ডাল ভিজা, ছানার টুকরা, চিনি, পানফল, শাঁখআলুর টুকরা, পাকা কলা, আম, অল্প অল্প করিয়া সব সাজানো। একটি করিয়া পাথর-বাটিতে বেলের পানা, ও পাথরের গেলাসে ডাবের জল।

এক জন আধুনিক ভাবাপন্ন ছেলে একটা কাঁসার থালার উপর গুটি চার করিয়া পেয়ালা পিরিচ সাজাইয়া আনিয়া বলিল, "আমাদের চা ষ্টোভ সবই আছে, ক' পেয়ালা চা করব বলুন, ক'রে দিচ্ছি।" মেয়েদের লক্ষ্য করিয়াই বিশেষ ভাবে বলা হইতেছিল, কাজেই জবাব তাহাদেরই দিতে হইবে। সুধা বলিল, "আমার বেশী চা খাওয়া অভ্যাস নেই, আমার জন্যে চা করবেন না।"

ছেলেটি না দমিয়া বলিল, "আমি কোকোও ক'রে আনতে পারি, পাঁচ মিনিট মাত্র সময় লাগবে, বেশী দেরী হবে না।"

হৈমন্তী বলিল, "কোকোর প্রয়োজন নেই, বেলের পানা ডাবের জল খেয়ে আর কি কিছু খাওয়া যায়?"

ছেলেটি অগত্যা পেয়ালা পিরিচ লইয়া চলিয়া গেল।

নিখিল বলিল, "ওহে তপন, ছেলেদের শহর ও গ্রামের এমন সমন্বয় করতে শিখিও না। এতে ত মানুষের আয় বাড়বে না, ব্যয়ই বাড়বে।"

তপন বলিল, "সমস্ত বিদ্যাই গুরুর কাছ থেকে শেখা বলতে মানুষের আত্মসম্মানে একটু লাগে, তাদের স্বলব্ধ বিদ্যা এবং জ্ঞানও যে কিছু আছে, তাও ত তারা দেখাতে চাইবে।"

এই বাড়ীতেই স্কুলের ঘর, জলযোগের পর ছেলেরা দেখাইতে লইয়া চলিল। বেশ বড় বড় ঘর, কোন ঘরে মাদুর পাতিয়া ক্লাস হয়, কোন কোন ঘরে বেঞ্চি এবং ডেস্কও আছে।

নিখিল জিজ্ঞাসা করিল, "তোমাদের ইস্কুলে এমন জাতিভেদ কেন? কেউ বসে রাজাসনে আর কেউ বসে একেবারে মাটির কোলে?"

তপন বলিল, "ছেলেদের জিজ্ঞাসা কর কেন জাতিভেদ।"

একটি ছেলে রসিকতাটাকে গম্ভীরভাবে গ্রহণ করিয়া উত্তর দিল, "যে সব ছেলেদের বয়স কম তারা নিজেদের জন্যে বেঞ্চি তৈরি করতে পারে না, তাই তাদের মাদুর কিনে দেওয়া হয়। আমরা কাঠের কাজ শেখবার জন্যে নিজেদের জিনিষই আগে তৈরি করতে শিখি।"

মহেন্দ্র বেঞ্চিতে হাত বুলাইয়া বলিল, "কাপড়চোপড় ছেঁড়বার সম্ভাবনা অবশ্য আছে, কিন্তু তাহলেও এরা জিনিষ মন্দ করে নি। নিজেদেরই কাপড় ছিঁড়লে পরের বার সাবধান হয়ে খোঁচা পেরেকগুলোর উপর নজর দেবে।"

ছেলেদের ডেস্কের সঙ্গে দেরাজও ছিল। মহেন্দ্র একটা দেরাজ টানিয়া দেখিল চাবিবন্ধ। তপন বলিল, "চাবি ছেলেদের কাছে আছে। ওহে, আজকে কার চাবির পালা নিয়ে এস দেখি।"

হৈমন্তী বিস্মিত হইয়া বলিল, "চাবির পালা মানে?"

তপন বলিল, "ছেলেদের জিনিষপত্রের ভার প্রত্যেকের উপর আলাদা ক'রে নয়। এক এক দিন এক এক জন সকলের জিনিষপত্রের ভার নেয়। সেদিন সকলের চাবি তার কাছে থাকে। যদি কারুর কোন জিনিষ হারায় তার জন্য সে দায়ী হয়।"

নিখিল বলিল, "তুমি কি টেমট্ নট এর ('লোভে ফেলো না'র) উল্টা থিওরি প্রচার করছ?"

তপন বলিল, "একটু এক্সপেরিমেণ্ট করে দেখছি, মানুষ এই রকম ক'রে লোভ জয় করতে পারে কি না। পরকে ঠকানো আর পরের জিনিষ চুরি করা মানুষের যে সেকেণ্ড নেচার হয়ে দাঁড়াচ্ছে, এর কবল থেকে উদ্ধার না পেলে আর মুক্তি নেই।"

শিবু বলিল, "মুক্তি আছে তপন-দা, যদি সেই রকম মার মারা যায়, যাতে জীবনে আর কোনদিন গায়ের ব্যথা না সারে।"

সকলে হাসিয়া উঠিল। সতু বলিল, "তাহ'লে যাদের গায়ের জোর বেশী, তারা সব চেয়ে বেশী চুরি করবে।"

তপন বলিল, "মানুষের শক্তি আর সুযোগ থাকলেও সে যে নির্লোভ হতে পারে এবং সমাজগত ও ব্যক্তিগত ভাবে তাতেই যে মানুষ লাভবান্ হয়, এটা লোকে কবে শিখবে জানি না।"

মহেন্দ্র বলিল, "যে-দেশের শ্রীকৃষ্ণ বলে গিয়েছেন 'মা ফলেষু কদাচন' সে দেশের কাছে তোমার এ ফিলসফি ত অতি সামান্য জিনিষ।"

তপন বলিল, "সামান্য হতে পারে, কিন্তু বিরাটটা বোঝাবার বুদ্ধি পর্য্যন্ত যাদের লোপ পেয়ে গেছে, তারা সামান্যটা শিখলেও যে মুমূর্ষুর জল গণ্ডূষ হয়। ছোট হতে হতে আমরা ত মরতে বসেছি। বিদেশের লোকের কাছে মুখ দেখাতেও আমাদের লজ্জা করে যখন মনে করি আমার দেশের কত লোক স্ত্রীলোককে একলা পেলে তার মান মর্য্যাদা রাখে না, অসহায় দেখলে তার সর্ব্বস্ব কাড়তে পারে আর সামান্য দু-চার পয়সার জন্যেও চোর কি ঠগ নাম নিতে লজ্জা পায় না।"

স্কুল ঘর ছাড়িয়া সকলে বাগানে চলিল। বাগানে প্রত্যেক ছেলেকে ছোট ছোট জমি দেওয়া হইয়াছে তরকারির ক্ষেত করিবার জন্য।

তপন বলিল, "ছেলেরা নিজেদের বাড়ীতে এই তরকারী নিয়ে যেতে পারে, বিক্রীও করতে পারে। বিক্রীর লাভের পয়সা অর্দ্ধেক স্কুল পায়।"

হৈমন্তী বলিল, "বাড়ীর নাম ক'রে সব তরকারী বেচেও ত পয়সা ওরা নিজে নিতে পারে।"

তপন বলিল, "পারে বটে, কিন্তু এটা আমাদের স্কুলের ছেলের পক্ষে একটা ঘোরতর অন্যায়। কেউ ধরা পড়লে তাকে স্কুল থেকে বার ক'রে দেওয়া হয়। এমন কি কারুর বাড়ীর লোকে বাগানের জিনিষ চুরি করেছে জানা গেলে সে বাড়ীর ছেলেদের আর নেওয়া হয় না।"

সুধা বলিল, "আপনি ভয়ানক কড়া মাষ্টার। এ সব বিষয়ে এই রকম কড়াই কিন্তু হওয়া উচিত। 'আহা গরীব বেচারী' ব'লে আমরা যে ছেড়ে দি, সেটাই ওদের আরও মাটি করে।"

সুধার কথায় উৎসাহিত হইয়া তপন তাহার মুখের দিকে চাহিয়া বলিল, "এই একটা গ্রামের ছেলেগুলোকে যদি মানুষ ক'রে মরতে পারি, বুঝব পৃথিবীর কোন একটা কাজে লাগলাম।"

মহেন্দ্র বলিল, "বিলেত থেকে ঘুরে এসে যখন একটা সার্ভিসে ঢুকবে আর মাস গেলেই এক গোছা নোট পাবে, তখন কি তোমার এত কথা মনে থাকবে?"

তপন বলিল, "পরকে লোভ জয় করতে শেখাতে হ'লে নিজের লোভটা আগে জয় করতে হয়। ওসব সার্ভিস-টার্ভিসের কোন আশা আমি রাখি না, রাখতে চাইও না।"

শিবু বলিল, "আপনি যে কেবল বলেন, 'বিলেত যাব বিলেত যাব', তবে কি করতে যাবেন সেখানে?"

তপন হাসিয়া বলিল, "তোমারও কিউরিওসিটি (কৌতূহল) হয়েছে? যাব শুধু বিলেত নয়, য়ুরোপ, আমেরিকা, চীন, জাপান, সর্ব্বত্র পৃথিবীর আর সব মানুষ আমাদের চেয়ে কত উন্নত তাই দেখতে। শুনেছি অনেক, চোখেও ত দেখা দরকার!"

শিবু বলিল, "শুধু দেশ দেখতে আপনার বাবা এত পয়সা

দেবেন? আমাকে কেউ দিত ত আমি সারা পৃথিবী ঘুরে আসতাম।"

তপন হাসিয়া বলিল, "বাবা টাকা না দিলে কি আর যাওয়া যায় না? আমি নিজেই না হয় দেব। মাটি কুপিয়ে একলা মানুষের খরচ কি আর জমাতে পারব না?"

শিবুর আত্মসম্মানে ঘা লাগিল, বলিল, "অল রাইট, আমিও মাটি কুপিয়ে টাকা রোজগার করব। এই পড়াটা শেষ হোক না, দেখুন ঠিক আপনার চেলা হব।"

সুধীন্দ্র বাবু এতক্ষণ নীরবেই দলের সঙ্গে ঘুরিতে ছিলেন, তিনি বলিলেন, "গুটি কতক মেয়েকেও তোমার চেলা ক'রে নাও না হে তপন; মেয়েরা যদি কাজে না নামে ত মেয়েদের টেনে তুলবে কে?"

হৈমন্তী ও সুধা সাগ্রহে তপনের মুখের দিকে তাকাইল। সুধা কিছু বলিতে পারিল না; হৈমন্তী বলিল, "আমার পড়া শেষ হয়ে গেলে আমি আপনার গ্রামে কাজ করতে আসব।"

মহেন্দ্র বলিল, "আমাদের দেশ এখনও এতটা উন্নত হয় নি যে ঘর ছেড়ে অল্পবয়স্ক মেয়েরা বাইরে কাজ করতে এলে সেটাকে ভাল চোখে দেখবে। তোমার বাবা কখনই এ সব পছন্দ করবেন না।"

হৈমন্তী বলিল, "যখন যথেষ্ট বড় হব, তখন ভাল কাজে যদি বাবা বাধা দেন, তাহলেও কি বাবার কথা মেনেই চলতে হবে?"

মহেন্দ্র বলিল, "অবশ্য হবে। তুমি যে অন্ন বস্ত্র সব কিছুতেই তাঁর মুখাপেক্ষী।"

হৈমন্তী বলিল, "আচ্ছা, দিন আসুক, দেখা যাবে। বাবা বাধা দেবেন, আগে থেকে ধরে নিতে চাই না, আর দিই দেন তখন অন্য পন্থা আছে কি না সেই দিনই ভাবব।"

মহেন্দ্র সুধাকে জিজ্ঞাসা করিল, 'আপনি কি বলেন?"

তপনও যেন সুধার উত্তর শুনিবার জন্য সরিয়া তাহার কাছে আসিয়া দাঁড়াইল। সুধার মুখ লাল হইয়া উঠিল। স একটু থামিয়া একটু ঘামিয়া অনেক কষ্টে বলিল, "আমার এখনও জবাব দেবার সময় আসে নি। আমি এই পর্য্যন্ত লতে পারি যে ঘরে ব'সে যথাসাধ্য এই কাজে আমি আপনাদের সহায় হ'তে চেষ্টা করব।"

তপন যেন একটু নিরাশ ভাবে অন্যদিকে তাকাইল। সুধা ব্যথিত হইয়া বলিল, "আমার ঘরের কর্ত্তব্য বড় কি বাইরের কর্ত্তব্য বড়, আমি এখনও ভাল ক'রে ঠিক করতে পারি না। মন ত যুক্তিতর্কের ধার ধারে না, মন এখনও ঘরকেই বড় ক'রে রেখেছে।"

সুধীন্দ্র বাবু বলিলেন, "তুমি খুব ওজন ক'রে কথা বল দেখছি। মেয়েদের পক্ষে ঘরের কর্ত্তব্য ফেলে বাইরে চলে আসা সহজ নয়। তুমি যে উৎসাহের মুখে সে কথাটা ভুলে বড় কথা বলতে চেষ্টা কর নি, দেখে আশ্চর্য্য লাগছে।"

মহেন্দ্র বলিল, "কিন্তু ঘরকে ফেলে আস্‌বার শক্তিও এক দল মেয়ের থাকা চাই, না হ'লে দেশকে দেখবে কে? যুদ্ধের সময় স্বামী পুত্রের কর্ত্তব্য ভুলে যেমন পুরুষকে মরণের মুখে এগিয়ে যেতে হয়, আমাদের এই দুর্গতির দিনে মেয়েদেরও তেমনি ক'রে ঘর ভুলে পথে নেমে আসতে হবে।"

হৈমন্তী বলিল, "কথাটা সত্যি। ঘরকে ভোলার সাধনাও আমাদের করা দরকার। দেখি আমি পেরে উঠি কি না।"

বাগানের পর তিন-চারটা পুকুরের মাঝখানে বাঁকা বাঁকা আলের মত পথ দিয়া তাহারা ছেলেদের কুস্তির আখড়া দেখিতে চলিল। পুকুরগুলা এত কাছে কাছে যে মাঝের পথটুকু কাটিয়া দিলেই এক হইয়া যায়। পথে পাশাপাশি দুই জন চলা যায় না, একের পিছনে এক করিয়া চলিতে হয়। পুকুরের জলে মেয়েরা বাসন মাজিতে, কাপড় কাচিতে, গা ধুইতে নামিয়াছে, আবার কেহ ঘড়া ভরিয়া সেই জলই ঘরে তুলিয়া লইয়া যাইতেছে। নিখিল বলিল, "আমাদের দেশে মানুষ এত মরে কেন না ভেবে, এততেও বেঁচে আছে কি ক'রে তাই ভাবা উচিত। দেখছ ত কি খাচ্ছে আর কিসে মুখ ধুচ্ছে!"

তপন বলিল, "তবু ত এ গ্রামে খাবার জলের আমরা একটা আলাদা পুকুর রেখেছি!"

আখড়ার কাছে তেঁতুলতলায় বাঁধানো বেদীতে পাঁচ বৎসর হইতে পঁচিশ ত্রিশ বৎসরের নানা বয়সের মানুষ কাজকর্ম্ম ফেলিয়া জটলা পাকাইতেছে, আর গল্প করিতেছে, কেহ বা বসিয়া অবাক্ হইয়া শুধু শহরের মেয়ে দেখিতেছে।

নিখিল বলিল, "এদের কি কোন কাজ নেই ?"

তপন বলিল, "গ্রামের মানুষ কাজ করতে চায় না। যত ক্ষণ পেটে এক মুঠো ভাত আছে, তত ক্ষণ ওরা ব'সে থাকবে। তবু ত আমাদের পাল্লায় প'ড়ে অনেকে কাজে নেমেছে।"

অন্ধকার ঘনাইয়া আসিতেছিল, সুধারা বাড়ীর পথে ষ্টেশনে চলিল। গ্রাম দেখিয়া তাহার ভাল লাগিল বটে, কিন্তু মন অস্বাভাবিক বিষণ্ণ হইয়া গেল। জীবনে বড় আদর্শের প্রতি তাহার অদ্ভুত টান ছিল। আমাদের এই হতভাগ্য দেশেই আদর্শ বড় হওয়ার প্রয়োজন বেশী, ইহা সে বুঝিতে শিখিয়াছিল। ত্যাগের আনন্দ তাহার কাছে মস্ত আনন্দ ছিল, তাই তাহার দুঃখ হইতেছিল এই দুর্ভাগ্য দেশের জন্য সে ত কিছুই ত্যাগ করিতে পারিতেছে না। দুঃখ হইতেছিল ওই দেবমূর্ত্তির মত সুন্দর যুবাটির ত্যাগের আদর্শের কাছে সে ত পৌঁছিতে পারিতেছে না। মনে হইতেছিল ইহাকে তাহার প্রাণপ্রিয় কাজে একটুখানি সাহায্য করিতে পারিলে যেন সুধার নিজের জীবনটাও ধন্য হইয়া যায়, অথচ তাহার করিবার উপায় নাই। [ক্রমশঃ]

প্রণাম

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

তোমার কবিতা গানে ধ্বনিয়া উঠেছে প্রাণে
নব নব সুর ;
বেজেছে তোমার বাণী, খুলেছে গুণ্ঠনখানি
প্রকৃতি-বধূর।
তোমার সঙ্গীত-রাগে জীবনে জোয়ার জাগে
প্রখর দুর্ব্বার ;
ছুটি সাগরের পানে, উঠি আকাশের পানে,
এই ধরণীর ধূলি ভুলি বার বার।
তোমারি যে কাব্য ধরি' জীবনের অর্থ করি
তোমার গানের সুরে স্বর্গ ছোঁয় ভূমি।
বিশ্বের হৃদয় চেন, আমরা তোমারি জেনো,
আমাদের তুমি।

তোমার আনন্দচ্ছন্দ পুষ্পে আনে নব গন্ধ,
শস্পে শ্যামলতা,
সে সুর নারীর মনে একটি পরম ক্ষণে
আনে কোমলতা।
সে কবিতা কি যে কহে ! তীব্র স্রোতে রক্ত বহে
বীরের হৃদয়ে।
আর সব সাধারণ, আর সব পুরাতন,
তুমি তাহা নহে।
শুনি গাথা, শুনি গান, সে-সব তোমারি দান,
লই তব নাম ;
আছে তারা, তুমি রবি, ওগো জীবনের কবি,
তোমারে প্রণাম।

[রবীন্দ্রনাথের আহ্বানে শান্তিনিকেতনে 'রবি-বাসরে'র অধিবেশন উপলক্ষে পঠিত]

পুস্তক পরিচয়

বঙ্গীয় শব্দকোষ—শ্রীহরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সঙ্কলিত ও প্রকাশিত। শান্তিনিকেতন। প্রত্যেক খণ্ডের মূল্য ।০ আনা, ডাকমাশুল এক আনা।

এই উৎকৃষ্ট ও বৃহৎ বাংলা অভিধানখানির বিস্তারিত বিবরণ অধ্যাপক সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় পূর্ব্বে প্রবাসীতে দিয়াছেন এবং ইহার প্রশংসাও তিনি করিয়াছেন। আমরাও একাধিক বার ইহার পরিচয় দিয়াছি। ইহা যে কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে বাংলা দেশ ও আসামের সমুদয় কলেজের গ্রন্থাগারে এবং সমুদয় উচ্চ বিদ্যালয়ের গ্রন্থাগারে রাখা উচিত তাহাও একাধিক বার লিখিয়াছি। তদ্ভিন্ন জ্ঞানানুরাগী বাঙালী মাত্রেরই, সামর্থ্য থাকিলে পারিবারিক গ্রন্থাগারে যে ইহা রাখা আবশ্যক, তাহাও বলা বাহুল্য।

ইহার ৪১শ খণ্ড বাহির হইয়াছে। তাহার শেষ শব্দ 'জিজ্ঞাসা'। ইহা চারি ভাগে বিভক্ত এবং প্রায় ৪০০০ পৃষ্ঠায় শেষ হইবে। ১৩০৪ পৃষ্ঠা পর্য্যন্ত বাহির হইয়াছে। প্রথম ভাগ স্বরবর্ণ ২৩ খণ্ডে শেষ হইয়াছে। প্রতি মাসে এক এক খণ্ড বাহির হয়। প্রতি খণ্ড ৩২ পৃষ্ঠা পরিমিত। এক একটি পৃষ্ঠা দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে প্রবাসীর পৃষ্ঠা অপেক্ষা দেড় ইঞ্চি করিয়া বড়। ত্রৈমাসিক, ষাণ্মাষিক ও বার্ষিক তিন নিয়মে মূল্য গৃহীত হয়। যে খণ্ডগুলি বাহির হইয়াছে গ্রাহকগণ সুবিধা অনুসারে এক এক বারে কয়েক খণ্ড করিয়া কিনিতে পারেন। শ্রীযুত হরিচরণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে শান্তিনিকেতনে টাকা পাঠাইলে কিম্বা ভ্যালুপেয়েবল ডাকে পাঠাইতে বলিলে তদনুরূপ ব্যবস্থা করা হয়। যাহারা কলিকাতায় নগদ কিনিতে চান তাঁহারা কলেজ স্কোয়ারের বুক কোম্পানীর দোকানে ও ২১০ কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীটের বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়ে অভিধানখানি পাইবেন।

প্রাণিবিজ্ঞানের পরিভাষা—শ্রীজ্ঞানেন্দ্রলাল ভাদুড়ী, এম্-এস্‌সি, পি-আর-এস্ প্রণীত। প্রকৃতি কার্য্যালয়, ৫০ নং কৈলাস বোস ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য এক টাকা মাত্র।

এই বইখানি ২০১ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। ইহার পৃষ্ঠা লম্বায় প্রবাসীর সমান চৌড়ায় প্রবাসীর চেয়ে এক ইঞ্চি কম। ২০১ পৃষ্ঠার এত বড় বহির দাম এক টাকা অত্যন্ত কম।

পুস্তকখানি সাতিশয় প্রয়োজনীয়। বিজ্ঞানের অন্যান্য শাখারও পরিভাষার এইরূপ গ্রন্থ রচিত হওয়া আবশ্যক। গ্রন্থকার তাঁহার এই বহিখানি রচনা করিবার নিমিত্ত বিস্ময়কর পরিশ্রম করিয়াছেন। তিনি প্রাণিবিজ্ঞানের ইংরেজী শব্দগুলির কেবল নিজের গড়া কথা বা প্রতিশব্দ দিয়া কর্ত্তব্য সম্পন্ন হইয়াছে মনে করেন নাই। তিনি বিভিন্ন পত্রিকা ও পুস্তক হইতে বাংলা সমার্থবোধক পরিভাষা সঙ্কলন করিয়াছেন। নিরপেক্ষ ভাবে বিচার করিবার এবং অপরকে সেই সুযোগ দিবার অভিলাষে প্রকাশের বর্ণানুক্রমে পারিভাষিক শব্দগুলি সাজাইয়াছেন। সংক্ষেপে নিজের মন্তব্যও লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। প্রত্যেক ইংরেজী শব্দের প্রাণিবিজ্ঞানবিষয়ক ইংরেজী অর্থ চেম্বার্স্ নিবুগলের ইংরেজী অভিধান হইতে উদ্ধৃত হইয়াছে। বাংলা পরিভাষা-স্রষ্টাদের নামগুলি এবং কয়েকখানি দীর্ঘনাম মাসিকপত্রের নামসমূহ আদ্যক্ষর সঙ্কেতে নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। অধিকাংশ স্থলে জর্ম্মান, গ্রীক, ইতালীয় ও লাটিন শব্দও সন্নিবিষ্ট হইয়াছে।

এখন শুধু বাংলা বিদ্যালয়গুলির জন্য নহে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্যও বাংলা বহি লিখিত হইতেছে। মাসিকপত্রেও অনেকে বৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ লেখেন। অবৈজ্ঞানিক প্রবন্ধ এবং পুস্তকাদিতেও বৈজ্ঞানিক পারিভাষিক শব্দ ব্যবহার করা আবশ্যক হয়। তদ্ভিন্ন, প্রাণিবিজ্ঞানের ছাত্র ও শিক্ষক মেডিক্যাল কলেজ ও স্কুলগুলিতে এবং আয়ুর্ব্বেদীয় বিদ্যালয়ে বিস্তর আছেন। সুতরাং বহুসংখ্যক শিক্ষিত লোকের এইরূপ পরিভাষার বহি ব্যবহার করা আবশ্যক হইবে।

বঙ্গপরিচয়, প্রথম খণ্ড। হৃষীকেশ সীরিজ্। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ৯ নং পঞ্চানন ঘোষ লেনস্থ কলিকাতা ওরিয়েণ্টাল প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ২।০ টাকা। পৃষ্ঠার সংখ্যা প্রায় তিন শত। পৃষ্ঠার আকার প্রবাসীর চেয়ে লম্বায় এক ও চৌড়ায় প্রায় দুই ইঞ্চি কম।

গ্রন্থকার "ভারতপরিচয়" লিখিয়া ভারতবর্ষ সম্বন্ধে জ্ঞানলাভ যেরূপ সহজ করিয়া দিয়াছিলেন "বঙ্গপরিচয়" লিখিয়া বাংলা দেশ সম্বন্ধেও জ্ঞানলাভের সেইরূপ উপায় করিয়া দিয়াছেন। তিনি এই প্রকার অত্যন্ত দরকারী বহি লিখিয়া বাঙালীমাত্রেরই ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন।

গ্রন্থখানি তাড়াতাড়ি প্রকাশ করিবার জন্য তিনি প্রথমার্দ্ধ আগে ছাপাইয়াছেন। দ্বিতীয় খণ্ডও শীঘ্র বাহির হইবে।

প্রথম খণ্ডে ২৭টি পরিচ্ছেদে বাংলা দেশের নিম্নলিখিত বিষয়গুলির বিবরণ দেওয়া হইয়াছে :—

বাংলা দেশ ; তাহার ভূতত্ত্ব, জলবায়ু, উদ্ভিদ, জীবজন্তু, নৃতত্ত্ব, ভাষা, সীমান্ত, আয়তন ও জনসংখ্যা, বিবাহ-জন্ম-মৃত্যু, প্রবাসী ও 'পরদেশী', স্বাস্থ্য ও ব্যাধি, শহর ও গ্রাম, উপজীবিকা, অক্ষম ও অকর্ম্মণ্য, সমাজ ও বর্ণ, ইতিহাস জাতীয় জীবন, শিক্ষা সাহিত্য, শাসন ও ব্যবস্থাপক সভা, শাসন- ও বিচার- বিভাগ, পুলিস বিভাগ, পূর্ত্তবিভাগ, স্থানীয় স্বায়ত্তশাসন, মুনিসিপালিটি, এবং জমির বন্দোবস্ত ও রাজস্ব।

বাংলার শিক্ষা সম্বন্ধে গ্রন্থকার অন্যান্য বিষয় অপেক্ষা বিস্তৃততর বিবরণ লিখিয়াছেন। ঠিকই করিয়াছেন।

পুস্তকখানি লিখনপঠনক্ষম বাঙালী মাত্রেরই অবশ্যপাঠ্য।

আমরা বহিখানির ভূমিকার একটি কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই। গ্রন্থকার লিখিয়াছেন :—

"বাঙালী ষ্টাটিষ্টিক্স্ ঘাঁটিতে চায় না; অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার সম্পাদিত এবং ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা পরিচালিত 'আর্থিক উন্নতি' এ বিষয়ে বাঙালীকে অনেকটা তৈয়ারী করিয়াছে। বাঙালী উচ্চ সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনায় মন দিয়াছে—তাহার প্রমাণ অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশের চেষ্টায় Statistical Society স্থাপন। সংখ্যাতত্ত্বের দ্বারা দেশের অবস্থা যত বিশদরূপে জানা যায় এমন বোধ হয় আর কোনো বিজ্ঞানের দ্বারা হয় না।"

অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এবং ডক্টর নরেন্দ্রনাথ লাহা ষ্টাটিষ্টিক্স সম্বন্ধে যাহা করিয়াছেন তাহা নিশ্চয়ই খুব প্রশংসনীয়। কিন্তু তাঁহাদের পত্রিকাখানি বাহির হইবার আগে হইতেই অন্য কোন কোন মাসিকপত্র সংখ্যা দ্বারা ব্যক্ত অল্পস্বল্প তথ্য বাঙালী পাঠকদের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আসিতেছে না কি? অধ্যাপক প্রশান্তচন্দ্র মহলানবীশ, অধ্যাপক বিনয়কুমার সরকার এই বিষয়ে কিছু করার ফলে "উচ্চ সংখ্যাতত্ত্ব আলোচনায়" প্রবৃত্ত হইয়াছেন, এরূপ ধারণা জন্মান বোধ হয় গ্রন্থকারের অভিপ্রেত নহে।

রবীন্দ্র-জীবনী ও রবীন্দ্র-সাহিত্য-প্রবেশক—দ্বিতীয় খণ্ড। শ্রীপ্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য তিন টাকা। শান্তিনিকেতন হইতে গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠার সংখ্যা পাঁচ শতাধিক। পৃষ্ঠার আকার প্রবাসীর চেয়ে দৈর্ঘ্যে এক ও প্রস্থে দুই ইঞ্চি ছোট। এত বড় পুস্তকের তিন টাকা দাম বেশী নয়।

আমাদের মনে পড়িতেছে, এই গ্রন্থের প্রথম খণ্ডের পরিচয় দিবার সময় লিখিয়াছিলাম, যে ভবিষ্যতে যে-কেহ রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত লিখিবেন তাঁহাকে ইহার সাহায্য লইতে হইবে। দ্বিতীয় খণ্ড সম্বন্ধেও এই কথা বলিতেছি।

গ্রন্থকার কবির জীবন সম্বন্ধে বহু তথ্য পাইয়াছিলেন ও সংগ্রহও করিয়াছিলেন অনেক। বিস্তর তথ্য এই গ্রন্থে তিনি নিবদ্ধ করিয়াছেন। তাহার অধিকাংশ ঠিক বলিয়া মনে হইল। কিছু কিছু ভুলও কিন্তু আছে। সমুদয় দেখাইয়া দেওয়া এখানে সম্ভবপর হইল না। বর্ণাশুদ্ধি এবং শব্দের অপপ্রয়োগও আছে। তৎসমুদয়ের তালিকা দিতে পারিলাম না। শব্দের অপপ্রয়োগের তিনটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। চতুর্থ পৃষ্ঠায় আছে "মন তাঁহার আদর্শবাদে, সৌন্দর্য্যরসে তৃপ্তিতে পরিপূর্ণ।" এখানে আদর্শবাদ শব্দটির প্রয়োগ ঠিক হয় নাই। ১৪শ পৃষ্ঠায় আছে "সেটা ইঁহাদের মনের ক্ষিপ্রহস্ততা।" মনের কি হাত আছে? ৩১শ পৃষ্ঠায় আছে, "ইতিমধ্যে ম্যাকমিলান কর্তৃক 'গীতাঞ্জলি' প্রকাশিত হওয়ায় উহার ব্যাপ্তি খুবই হইয়াছিল।" এখানে ব্যাপ্তি শব্দটি অপপ্রযুক্ত হইয়াছে মনে হয়।

অনেক শব্দের বানানে বাংলায় যেখানে রেফের নীচে ব্যঞ্জন বর্ণের দ্বিত্ব হয় গ্রন্থকার সেখানে একটিমাত্র বর্ণ ব্যবহার করিয়াছেন। যেমন তিনি সর্ব্ব পূর্ব্ব কর্ত্তৃক, ধর্ম্ম, না লিখিয়া লিখিয়াছেন, সর্ব, পূর্ব, কর্তৃক, ধর্ম। কিন্তু বাঙালীরা ত উচ্চারণ করে না, সর্‌ব, পুর্‌ব কর্‌তৃক, ধর্‌ম; তাহারা দুটা ব, ত, ম উচ্চারণ করে—তাহা যত স্পষ্ট বা অস্পষ্টই হউক।

গ্রন্থকার রবীন্দ্রনাথের পুস্তকসমূহের এবং নানা কার্য্যের ও মতের নিরপেক্ষ আলোচনা করিবার চেষ্টা করিয়াছেন, ইহা প্রশংসনীয়। অবশ্য আমরা তাঁহার সব মন্তব্যের অনুমোদন করি না। কোন কোনটির পক্ষে যথেষ্ট প্রমাণ নাই। যেমন তিনি এক জায়গায় বলিয়াছেন, রবীন্দ্রনাথ রাজনীতির কূট ব্যাপার ভাল বুঝেন না (৪৩১ পৃষ্ঠা)। এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্ত।

গ্রন্থকার পুস্তকখানিকে জীবনী ভিন্ন 'রবীন্দ্র সাহিত্য-প্রবেশক'ও বলিয়াছেন। তাঁহার সাহিত্যবিষয়ক মন্তব্যগুলি কোন কোন স্থলে সাহিত্যরসসম্ভোগে পাঠকদিগকে সমর্থ করিবে, কিন্তু কোন কোন স্থলে তাহাদিগকে ভ্রমেও ফেলিবে। যাহা হউক আমাদের নিজেরও সাহিত্যসমালোচকের আসনে কোন দাবী নাই; সুতরাং এ-বিষয়ে অধিক কিছু লিখিব না।

এই গ্রন্থখানির দুই খণ্ড উপলক্ষ্য করিয়া পরে আমার একটি প্রবন্ধ লিখিবার ইচ্ছা আছে। তাহাতে কতকগুলি সামান্য কথা থাকিবে যেরূপ বা যাহা অপেক্ষা সামান্য বহু তথ্য এই গ্রন্থে আছে। এই জন্য আপাততঃ আর কিছু না লিখিয়া, গ্রন্থকারের পরিশ্রমের প্রশংসা করিয়া এবং রবীন্দ্রনাথের জীবনচরিত সম্বন্ধে জ্ঞানলাভের পক্ষে এই গ্রন্থের একান্ত আবশ্যকতা স্বেচ্ছায় স্বীকার করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করি।

প্রাক্তনী—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। শান্তিনিকেতনের আশ্রমিক সঙ্ঘের সম্পাদক শ্রীপুলিনবিহারী সেন কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় কলিকাতা। মূল্য ।০ আনা।

রবীন্দ্রনাথ শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীদের যে উপদেশ দিয়াছেন সেইগুলি এই পুস্তকে সংগৃহীত হইয়াছে। তিনি আশ্রমটিকে কিরূপ দিতে চাহিয়াছিলেন কিরূপ একটি সম্পূর্ণ জীবনের আদর্শ এখানে গড়িয়া তুলিতে চাহিয়াছিলেন কেমন করিয়া তিনি প্রথম প্রথম ইহার কাজ করিতেন কিরূপ পরিশ্রম করিতেন তাঁহার আর্থিক অসচ্ছলতা সত্ত্বেও কি করিতেন, সকলের মধ্যে কিরূপ একটি প্রীতির সূত্র ছিল—এবম্বিধ নানা বিষয় সম্বন্ধে এই পুস্তক হইতে জ্ঞানলাভ করিতে পারা যায়। পড়িতে পড়িতে কত মনোজ্ঞ চিত্র মানসচক্ষুর সম্মুখে ফুটিয়া উঠে। ইহা কেবল শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের নহে, অন্য বহু পাঠকপাঠিকারও সমাদর লাভ করিবে। ইহার চিত্রগুলিও আশ্রম সম্বন্ধে ধারণা স্পষ্টতর করিবে।

বিশ্বরাজনীতির কথা—ডাঃ তারকনাথ দাস, এম্-এ, পিএইচ্-ডি কর্তৃক লিখিত। সরস্বতী লাইব্রেরী ১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীট কলিকাতা। মূল্য এক টাকা আট আনা।

রেলওয়ে, ষ্টীমার ও এরোপ্লেনের কল্যাণে পৃথিবীটা ছোট হইয়া গিয়াছে। তারের সাহায্যে টেলিগ্রাফ ও বেতারবার্ত্তা দ্বারাও অন্য এক প্রকারে পৃথিবীটা ছোট হইয়াছে। ছাপাখানার, ফোটোগ্রাফীর এবং ফোটোগ্রাফের সাহায্যে ছবি প্রস্তুত করিবার প্রক্রিয়ার নানা উন্নতি হওয়ায় পৃথিবীর দূরতম স্থানের ও তথাকার

জীবজন্তু ও মানুষদের সম্বন্ধে কতকটা ধারণা হওয়া আগেকার চেয়ে খুব সহজ হইয়াছে। এইরূপ অবস্থায় সব দেশের সব জাতির মানুষের মধ্যে সদ্ভাব ও মৈত্রী স্থাপিত হইলে ও বাড়িলে সুখের বিষয় হইত। বিশ্বমৈত্রীর ইচ্ছা অনেকের মধ্যে জন্মিয়াছেও। কিন্তু দুঃখের বিষয় দেশে দেশে জাতিতে জাতিতে ভীষণ সংঘর্ষ ও যুদ্ধ এবং তাহার সম্ভাবনা অধিক হইয়াছে। এখন কেবল নিজের দেশের রাজনীতি বা রাষ্ট্রনীতি বুঝিলেই চলিবে না—সব দেশ ও জাতির ভাগ্য পরস্পরের সহিত জড়িত। এই জন্য, যেমন পাকা ব্যবসাদার হইতে হইলে পৃথিবীর প্রধান প্রধান বাণিজ্যকেন্দ্রের বাজারদর জানিতে হয় তেমনি সম্যক্ জ্ঞানবিশিষ্ট রাষ্ট্রনীতিবিৎ—বিশেষতঃ রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রের কর্মী—হইতে হইলে বিশ্বরাজনীতির খবরও রাখিতে হইবে। আমরা আদার ব্যাপারী জাহাজের খবরে আমাদের কি দরকার?—বলিয়া বসিয়া থাকিলে চলিবে না। শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস মহাশয়ের এই গ্রন্থখানি পাঠকদিগকে বিশ্বরাজনীতি জানিতে বুঝিতে সমর্থ করিবে। ইহার ভাষা সহজ।

র. চ.

দুনিয়াদারী—শ্রীচারুচন্দ্র দত্ত প্রণীত। প্রকাশক বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়।

বইখানি পড়িয়া আনন্দ পাইয়াছি। যদিও ছোটগল্পের বই আজকাল নাকি বাজারে অচল তবু পাঠককে খুশি করিবার ক্ষমতা ইহাদের কিছুমাত্র কমিয়া গিয়াছে বলিয়া বোধ হয় না। অবশ্য ছোটগল্পগুলি বাস্তবিক ছোটগল্প হওয়া চাই। উপন্যাসকে চাপিয়া ছোট করিয়া দিলেই ছোটগল্প হয় না। বীরবলের ভাষায় প্রথম তাহা ছোট হওয়া দরকার। দ্বিতীয় গল্প হওয়া প্রয়োজন। আলোচ্য বইখানিতে যে গল্পগুলি আছে তাহা ঐ মাপে মাপিলেও প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হয়। দত্ত-মহাশয় পাকা লেখক দুনিয়ার সহিত কারবার তাঁহার বহু দিনের। জীবনের ট্র্যাজিক বা কমিক্ কোন দিকটাই তাঁহার চোখ এড়ায় নাই। কেরাণী জীবনের দুঃখ আর বেকার-সমস্যার সমাধানের চেষ্টায় আজকাল অধিকাংশ বাংলা গল্প লেখক ব্যতিব্যস্ত দত্ত-মহাশয়ের কল্যাণে আমরা একটু মুখ বদল করিয়া বাঁচিলাম।

শ্রীসীতা দেবী

রবীন্দ্র-জীবনী ২য় খণ্ড—প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায় গ্রন্থাগারিক ও অধ্যাপক বিশ্বভারতী। ১৩৪৩। মূল্য ৩৲ পৃঃ ৪৯২। গ্রন্থকার কর্তৃক প্রকাশিত। ২১০ নং কর্ণওয়ালিশ ষ্ট্রীট কলিকাতা. ঠিকানায় বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়েও পাওয়া যায়।

'রবীন্দ্র-জীবনী'র বর্তমান খণ্ডে ১৩১৯ সালে ৫১ বৎসর বয়সে রবীন্দ্রনাথের বিলাত-যাত্রা হইতে আরম্ভ করিয়া ১৩৪৩ সালে ৭৫ বৎসর বয়সে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রতিবাদ-সভায় তাঁহার সভাপতিত্ব পর্য্যন্ত, রবীন্দ্রনাথের বিচিত্রমুখী কর্ম্মাবলী বিবৃত হইয়াছে। দেশে ও বিদেশে রবীন্দ্রনাথ যে অসামান্য শ্রদ্ধা ও প্রীতি লাভ করিয়াছেন, (সাময়িক এমন কি রূঢ় সমালোচনার সহিত অংশতঃ একাত্ম হইয়া থাকিলেও যে শ্রদ্ধা ও প্রীতি—নিবিড়, সত্য ও একান্ত)—শুধু সার্ব্বভৌম কবির নিকট তাহা নিবেদিত হয় নাই, সর্ব্ববিধ দৈন্য ভয় ও বন্ধন হইতে যিনি আমাদের মুক্তি চাহিয়াছেন, ও তাহার সাধনকল্পে নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছেন, সেই রবীন্দ্রনাথের উদ্দেশ্যেও তাহা নিবেদিত। রবীন্দ্রনাথের কাব্যের আলোচনা যথোচিত না হউক কথঞ্চিৎ হইয়াছে ও হইতেছে, কিন্তু তাঁহার কর্ম্ম ও মনীষার আলোচনা এখনও সম্যকরূপে কেহ লিপিবদ্ধ করেন নাই। সে-বিষয়ে যাঁহারা আলোচনা করিতে চাহেন, নিষ্ঠা- ও বহুশ্রম- প্রসূত এই তথ্য-গ্রন্থখানি তাঁহাদের নিকট সমাদর পাইবে।

কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ গ্রন্থকার তথ্য-সংগ্রহে যেরূপ প্রশংসনীয় নৈপুণ্য দেখাইয়াছেন গ্রন্থের আলোচ্য বিষয়ের গঠনসৌষ্ঠবে সেরূপ নৈপুণ্য দেখাইতে পারেন নাই; তথ্যের দিক দিয়াও মুখ্য ও গৌণ নির্ব্বাচন পূর্ব্বক তুচ্ছ ও অনাবশ্যক বিষয়ের পরিবর্জ্জনে সেরূপ পটুতা দেখাইতে পারেন নাই। এই বই পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের কোন ভাব-মূর্ত্তি পাঠকের মনে জাগ্রত ও বদ্ধমূল হয় না। গ্রন্থকার ভূমিকায় বলিয়াছেন "যাহা লিখিয়াছি তাহাকে ইতিহাস বলা যায় না, বলা উচিত ক্রনিকেল। পাঠকদের সম্মুখে তাঁহার বিচিত্র কর্ম্মময়, কাব্যময় জীবনের ঘটনাগুলি সাজাইয়া দিয়াছি।" কিন্তু মাত্র ক্রনিকেল কি "জীবনী" হইতে পারে? পূর্ব্বোল্লিখিত কারণে ও দ্রুতগতি বিবরণ-প্রণালীতে আলোচ্য বিষয়ের সত্য পরিচয়ের ধারা গ্রন্থের বহু স্থানে ব্যাহত হইয়াছে। ক্রনিকেল-রূপে বিচার করিলেও ঘটনাগুলি যথোচিত নৈপুণ্যের সহিত "সাজাইয়া" দেওয়া হইয়াছে কিনা সন্দেহ; কেবল ঘটনার পারম্পর্য্যরক্ষাকেই "সাজাইয়া" দেওয়া বলা চলে কি? আলোচ্য বিষয়ের সহিত মুখ্যতঃ বা গৌণতঃ সংশ্লিষ্ট কোন কোন বিষয়ের আলোচনা করিতে গিয়া গ্রন্থকার অনেক সময় দূরে সরিয়া গিয়াছেন, বহু সামান্য ও অবান্তর বিষয়েও প্রবেশ করিয়াছেন—তাহাতে মূল বিষয়ের প্রতি পাঠকের চিত্ত আকর্ষণের আনুকূল্য হয় নাই।

আর একটি কথা। সমসাময়িক জীবিত পর্বতন সহকর্মীদের সম্বন্ধে অপর এক জন সহকর্মীকে সগোর অনুরোধে বিরূপ মন্তব্য প্রকাশিত করিতে হইলেও তাহা শ্রদ্ধা ও প্রীতির সহিত করা বাঞ্ছনীয়। এই পুস্তকের অনেকস্থানে এই গুণটি লক্ষিত হয় না।

গ্রন্থখানি মূল্যবান বলিয়াই ইহার ত্রুটিগুলিও তুচ্ছ করা চলে না।

রবীন্দ্রনাথের জীবনের সাধারণতঃ বিস্মৃত ও অপরিজ্ঞাত বহু ঘটনা এই গ্রন্থে লিপিবদ্ধ হইয়াছে; এরূপ শ্রম ও নিষ্ঠার সহিত তাঁহার জীবনের ঘটনাবলী ইতিপূর্ব্বে একত্র সঙ্কলিত হয় নাই, গ্রন্থকারই এ-বিষয়ে পথপ্রদর্শক।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

বাংলা শব্দতত্ত্ব—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর; বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা হইতে প্রকাশিত।

এই গ্রন্থে বাংলা শব্দতত্ত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করা হইয়াছে। এই বাংলা ভাষা প্রাকৃত ভাষা। সুতরাং ইহার ব্যাকরণ সংস্কৃত ব্যাকরণ নয়, বাংলা ব্যাকরণ। বাংলা চলিত ভাষায় অর্থাৎ কলিকাতা অঞ্চলের শিক্ষিত লোকের ভাষায় সংস্কৃত শাসনের সীমা কত দূর স্বাভাবিক ভাবে আছে এবং কত দূর জোর করিয়া চালানো হইতেছে

তাহা এই বইখানির সাহায্যে ভাল করিয়া বোঝা যায়। বাংলা ভাষায় কথা আমরা সকলেই বলি, বাংলায় লিখিও আমরা অনেকে; কিন্তু এই ভাষাকে বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার অবসর আমাদের অল্প লোকেরই আছে। আমরা বাংলার নামে সংস্কৃত ব্যাকরণ চালাই আবার বাংলার নামে কখনও স্বরচিত ভাষাও চালাই কোন আইন আমরা মানি না। চলতি বাংলা আজকাল সাহিত্যের ভাষা হইয়া উঠিয়াছে কিন্তু প্রায় প্রত্যেক সাহিত্যিকই নিজের ইচ্ছামত মাতৃভাষাকে বাঁকাইয়া চুরাইয়া সাহিত্যের দরবারে দাঁড় করাইতেছেন। ইহাতে ভবিষ্যৎ বংশীয়দের বড়ই বিপদে পড়িতে হইবে। কাহার ভাষাকে বাংলা ভাষা বলিয়া যে তাহারা গ্রহণ করিবে ভাবিয়া পাইবে না। রবীন্দ্রনাথের "বাংলা শব্দতত্ত্ব" বাঙালী প্রত্যেক সাহিত্যিকের পড়া উচিত এবং তাঁহার সপক্ষে বা বিপক্ষে যাহার যাহা বলিবার আছে তাহাও স্পষ্ট করিয়া বলা উচিত।

এই বইখানিতে বাংলা ব্যাকরণের সমগ্র রূপ দেখিতে পাওয়া যায় না, কিন্তু ইহা বৈয়াকরণিকদের বাংলা ব্যাকরণ রচনায় বিশেষ সহায় হইবার অধিকারী।

'বাংলা কৃৎ ও তদ্ধিত' 'ভাষার ইঙ্গিত' ও 'অনুবাদ-চর্চা' এই প্রবন্ধগুলিতে সাহিত্যিকদের অনেক শিখিবার জিনিষ আছে। অন্যগুলিতেও অবশ্য আছে, তবে সবগুলির নাম এখানে করার প্রয়োজন নাই।

সাহিত্যের পথে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট হইতে প্রকাশিত।

ভূমিকায় রবীন্দ্রনাথ বলিতেছেন, "বিষয়কে জানার কাজে আছে বিজ্ঞান, মানুষের আপনাকে দেখার কাজে আছে সাহিত্য। তার সত্যতা মানুষের আপন উপলব্ধিতে, বিষয়ের যাথার্থ্যে নয়। সেটা অদ্ভুত হোক, অতথ্য হোক্‌ কিছুই আসে যায় না। মানুষ কল্পনার জগতে তোতে চায় নানা থানা, রামও হয় হনুমানও হয়, ঠিকমতো হোতে পারলেই খুসি।"

এই কথাগুলিই বার-বার নানা রকমে তিনি এই পুস্তকে বলিয়াছেন। কিন্তু এ ছাড়া আরও যা বলিয়াছেন সংক্ষেপে তাহার মর্ম্ম বলা আমাদের পক্ষে সহজ নয়। ভূমিকার শেষে তিনি যাহা বলিয়াছেন শুধু সেইটুকু তুলিয়া দিই, "মনস্তত্ত্বের কৌতূহল চরিতার্থ করা বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির কাজ। সেই বুদ্ধিতে মাংলামির অসংলগ্ন এলোমেলো অসংযম এবং অপ্রমত্ত আনন্দের গভীরতা প্রায় সমান আসন পায়। কিন্তু আনন্দ সম্ভোগে স্বভাবতই মানুষের বাছ-বিচার আছে। কখনো কখনো অতিতৃপ্তির অস্বাস্থ্য ঘটলে মানুষ এই সহজ কথাটা ভুলব ভুলব করে। তখন সে বিরক্ত হয়ে স্পর্দ্ধার সঙ্গে কুপথ্য দিয়ে মুখ বদলাতে চায়। কুপথ্যের ঝাঁজ বেশী, তাই মুখ যখন মরে তখন তাকেই মনে হয় ভোজের চরম আয়োজন। কিন্তু মন একদা সুস্থ হয়···তখনকার সাহিত্য ক্ষণিক আধুনিকতার ভঙ্গিমা ত্যাগ ক'রে চিরকালীন সাহিত্যের সঙ্গে সরলভাবে মিশে যায়।"

এই বইখানিতে ১২৯৮ হইতে ১৩৪১ পর্য্যন্ত বিভিন্ন সময়ের সাহিত্য বিষয়ক রচনা আছে। সকল সাহিত্যরসপিপাসু ও সাহিত্যব্যবসায়ীর ইহা পড়িয়া দেখা দরকার। শ্রীশান্তা দেবী

দুর্গাপূজা-চিত্রাবলী। শ্রীচৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও শ্রীবিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী প্রণীত। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়, ১৯৩৬। ক্রাউন চার পেজি ৭০+॥/০ পৃষ্ঠা।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখন কখন এমন একটা কাজ করিয়া বসেন যাহার কোন কারণ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। বিশ্ববিদ্যালয়ের আবহাওয়া পর্য্যালোচনা করিলে যে পরিমাণ কল্পনার অভাব ও অযৌক্তিক গতানুগতিকতার প্রভাব লক্ষিত হয়, তাতে চৈতন্যদেব চট্টোপাধ্যায় ও বিষ্ণুপদ রায়চৌধুরী মহাশয়দ্বয়ের এই পুস্তকটির প্রকাশ পুরাপুরি ব্যাখ্যাত হয় না। অতএব এই শিল্প, সাহিত্য, কল্পনার বহুকথাটি বিশ্ববিদ্যালয়ের কোন হঠাৎজাগ্রত শুভবুদ্ধির ফল বলিয়াই ধরিয়া লইতে হইবে। বহুকল্পিত অথবা কষ্ট-আহৃত 'থিসিস' প্রচার করিয়া পাণ্ডিত্য খ্যাতি অর্জ্জন না করিয়া যে-শক্তিতে এই চিরস্থায়ী আবেগ, তাঁহারা যে এই সরল, সুন্দর, চিত্রকথাটি প্রকাশ করিয়া বাংলার পাঠকসাধারণের মনোরঞ্জনে চেষ্টা করিলেন, ইহা আশ্চর্য্য হইলেও প্রশংসনীয়। পুস্তকটিতে কাহারও দুর্গোৎসবকে এতটা সহজ ও উপভোগ্য আকারে পাঠকের হৃদয়ে দেওয়া হইয়াছে, যাহা হিন্দুধর্ম্ম-প্রচারের ইতিহাসে বর্ত্তমান কালে আর কোথাও হয় নাই। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মে বিশ্বাস করেন না, তাঁহাদের নিকটও শুধু চিত্রসাহিত্যের দিক দিয়া ও পুরাণের সহজ ব্যাখ্যান হিসাবে পুস্তকটির আদর হইবে।

শিল্পাচার্য্য অবনীন্দ্রনাথের প্রতিকৃতিটি অপূর্ব্ব হইয়াছে। "ক্যামেরা" যে প্রাণের খবর কখনও পায় না এই চিত্রে চৈতন্যদেব সেই খবরটি পূর্ণ প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন।

আমরা আশা করি বিশ্ববিদ্যালয়ের এই জাতীয় প্রচেষ্টা এইখানেই শেষ হইবে না। যে মাটির আশ্রয়ে শস্য ও ফুল অবলম্ব প্রাণ পাইয়া ধরার বক্ষ অলঙ্কৃত করিয়া পৃথিবীবাসীকে আনন্দ দেয় সেই মাটিই আবার আগুনের স্পর্শে ইষ্টকের রূপ ধারণ করে। জ্ঞান ও বিদ্যাও তেমনই কখন বিদ্যার্থীকে পুষ্টি দান করে, আবার কখন অতিপাণ্ডিত্যের তেজে এমন রূপ ধারণ করে যাহাতে বিদ্যার্থী সে জ্ঞান ও বিদ্যার প্রভাবে শুধু আহতই হয়, মনের, প্রাণের, জীবনের কোন আশ্রয় তাহাতে পায় না। সুতরাং শুষ্ক কঠিন প্রাণহীন বিদ্যার আড়ত হইয়া থাকাটা কোন বিশ্ববিদ্যালয়ের পক্ষেই ভাল নহে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের তরুণ নেতা শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের মনে সম্ভবত কোন নূতনতর প্রেরণার সঞ্চার হইয়াছে। ইহা অতি আনন্দ ও আশার কথা।

শ্রীঅশোক চট্টোপাধ্যায়

লে মিজেরাব্‌ল্‌—শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত। কমলিনী সাহিত্য মন্দির, ১২০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য বার আনা মাত্র।

'নীলপাখী'র লেখক শ্রীপবিত্র গঙ্গোপাধ্যায় ইতিমধ্যেই শিশুসাহিত্যে যে প্রতিষ্ঠা অর্জ্জন করিয়াছেন ভিক্টর হুগোর বিখ্যাত উপন্যাস 'লে মিজেরাব্‌ল্‌' বইখানি বাংলা দেশের বালকবালিকাদের উপযোগী করিয়া প্রকাশ করিয়া তিনি সেই প্রতিষ্ঠা কায়েম করিয়া লইলেন। পৃথিবীর উপন্যাস-জগতে মহত্তম জীবনের যতগুলি আদর্শ আছে জাঁ ভালজাঁ (জাঁ ভালজাঁ) তাহাদের অন্যতম। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের শৈশবেই সেই আদর্শের সহিত পরিচয়ের সুযোগ করিয়া দিয়া গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয় অভিভাবকদের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। মূল পুস্তকখানি সুবৃহৎ, পৃথিবীর বৃহত্তম উপন্যাসের ইহা একটি, ইহার ঐতিহাসিক বর্ণনামূলক অংশ শিশুদের নিকট নীরস ঠেকিতে পারে। গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়

পুস্তকটির গদ্যাংশ অতি সহজ সরল ভাষায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। ভাষা ও ভাবের দিক দিয়া এই পুস্তকটি অভিভাবকেরা নির্বিঘ্নে তাঁহাদের ছেলেমেয়েদের হাতে দিতে পারেন; এই যুগে শিশুসাহিত্যের কোনও পুস্তক সম্বন্ধে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু বলিবার প্রয়োজন নাই। পুস্তকটির ছাপা বাঁধাই এবং প্রচ্ছদপটের ছবিটি সুন্দর। চিত্রসম্ভারে পুস্তকটির মূল্য বহুগুণে বৃদ্ধি পাইয়াছে।

তিন্তিড়ী—ছেলেদের সচিত্র কবিতা। শ্রীপ্রভাতমোহন বন্দ্যোপাধ্যায়। বুকুর লাইব্রেরী, ২২ নং ওয়েলিংটন ষ্ট্রীট, কলিকাতা, মূল্য ॥০

'মুক্তিপথের' কবি প্রভাত বন্দ্যোপাধ্যায়কে যাঁহারা এক সময়ে প্রবাসীর পৃষ্ঠায় দেখিয়া বাংলা সাহিত্যে নূতন ও শক্তিমানের আবির্ভাব সম্ভাবনায় পুলকিত হইয়াছিলেন বাহিরের চাপে নিরক্ষরাক প্রভাত বাবু অনেক দিন তাঁহাদের আশাপূর্ণ দেশে দায়ী ছিলেন। শিশুসাহিত্যপথে আবার তিনি যাত্রা সুরু করিলেন ইহা অত্যন্ত আশার কথা। মিল ও ছন্দের এমন মিষ্ট হাত দুই-এক জনের আছে, কিন্তু এই সরস ও সরল অনুভূতি অত্যন্ত দুর্লভ। তিন্তিড়ী যে ছেলেমেয়েদের আনন্দ দিবে তাহা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি। ছবিগুলিও খুব সুন্দর হইয়াছে। কবি লিখিয়াছেন,

তিন্তিড়ী তিনগুণ আজগুবি সৃষ্টি;
বুড়োদের টক লাগে, ছেলেদের মিষ্টি।

আমরা বুড়া হইয়াছি, কিন্তু তিন্তিড়ী মিষ্টই লাগিল।

শ্রীসজনীকান্ত দাস

আকাশের গল্প—শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম এস-সি প্রণীত। ভট্টাচার্য্য গুপ্ত এণ্ড কোং লিঃ প্রকাশিত। দাম সাড়ে বারো আনা।

ছেলেমেয়েদের বইখানি পড়িতে ভালই লাগিবে। লেখকের দৃষ্টি বৈজ্ঞানিকের,—লেখনী সাহিত্যিকের। তিনি গ্রহ তারকার বিষয়ে মূল কথাগুলি সোজা ভাষায় বেশ সরস করিয়াই বলিয়াছেন।

শ্রীকাননবিহারী মুখোপাধ্যায়

মেঘমল্লার—শ্রীভূপেন্দ্রকুমার শ্যাম প্রণীত। বিনার্ডী প্রেসে শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ দাস কর্তৃক মুদ্রিত। করিমগঞ্জ, শ্রীহট্ট। দাম আট আনা।

ইহা একখানি একাঙ্ক গীতি নাটিকা। আমাদের দেশে মনস্তত্ত্বের সঙ্গে বিশেষ বিশেষ সত্য এবং সৌন্দর্য্য মিশাইয়া যে সব শ্রেষ্ঠ গীতি নাটিকার এ পর্য্যন্ত সৃষ্টি হইয়াছে এই নাটিকাখানি যে তাহার অন্যতম ইহা দৃঢ়তার সঙ্গে বলা যাইতে পারে।

প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে সাকার এবং সজীব করিয়া তাহাকে বস্তুজগতে টানিয়া আনা এবং সেই অতিন্দ্রিয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে মূর্ত্তি দ্বারা নাটকে সজীব করিয়া বিভিন্ন রসানুভূতির সাহায্যে তাহাকে পাঠকসমাজে পরিবেশন করা সাধারণ গ্রন্থকারের দ্বারা সম্ভবপর নহে। বিশেষ প্রতিভা এবং সেই প্রতিভা কবিত্বমণ্ডিত হওয়া চাই। গ্রন্থকারের সেই প্রতিভা এবং কবিত্ব শক্তি দুইই আছে। তাঁহার হৃদয়ের সৌন্দর্য্য এই নাটিকার অপরূপ সৌন্দর্য্যের সঙ্গে মিশিয়া একাকার হইয়া গিয়াছে।

সত্যকার সৌন্দর্য্যবোধসম্পন্ন সাহিত্যসেবিগণের নিকটে এই 'মেঘমল্লার' আদৃত হইয়া থাকিবে।

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

লেখন

শ্রীসাধনা কর

রঙীন আবরণে ঢাকা নীলাভ কাগজে
এল তোমার দূতী,
দূরের পরশ রাঙিয়ে ওঠে মনে।
বসে আছি একা—
সামনে তোমার লেখা চিঠি,
আকাশে ফিকে মেঘের জটলা,
নীচে জনাকীর্ণ নগরী,
উড়ছে ধূলা,
হাঁকছে ফিরিওয়ালা,
ছুটে চলে চক্রযান;
বসন্ত যে এসেছে তার খবর দিল
গৃহস্থের খাঁচায় বাঁধা কোকিল
অতি কাতর কূজনে।
সমস্ত ছাপিয়ে ভেসে বেড়ায় কার ছবি।—
বিবশ দুপুর
ফাগুনে ধরেছে আমের বোল

একটা পথহারা ভ্রমর ভুল সন্ধানে
গুনগুনিয়ে বেড়াচ্ছে,
নির্জ্জন ঘরে
আলসে এলিয়ে দিয়েছে দেহ
খসেছে আঁচল,
কপালের উপর উড়ে পড়ছে
অশান্ত চুল।
সামনের টেবিলে চিঠি লিখবার কাগজ;
খুঁটিনাটি সরঞ্জাম,
—টাইমপিস্ বেজে চলেছে।
আনমনে মুখে ফুটে হাসির রেখা,
মনে অজানা ব্যথা বাজে,
ভরে গেল রঙীন পাতা লেখাতে।
যে বঁধু ঘর-ছোঁয়ার বাইরে
ধরা দিল তোমার সজল চোখে,
প্রবাসের পরশখানি তোমারি ঘরে।

সেতু

শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায়

হঠাৎ সদ্যোজাত শিশুকণ্ঠের কান্নার শব্দে ঘুম ভাঙিয়া গেল···পাশের ঘর হইতে কে যেন জলদমন্দ্র স্বরে বলিল,—'লিখে রাখ, ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে জন্ম'···

রাত্রে এক স্বপ্ন দেখিয়াছি। কিছুতেই ভুলিতে পারিতেছি না; এত স্পষ্ট, এত অদ্ভুত। আমার সমস্ত চেতনাকে আচ্ছন্ন করিয়া রাখিয়াছে। অহিদত্ত রঞ্জুল, বৃদ্ধ অসিধাবক তণ্ড, লালসাময়ী রল্লা—

এ কি স্বপ্ন? না—আমারই মগ্নচৈতন্যের স্মৃতিকন্দর হইতে বাহির হইয়া আসিল আমার পূর্ব্বতন জীবনের ইতিবৃত্ত! পূর্ব্বতন জীবন বলিয়া কিছু কি আছে? মৃত্যু হয় জানি, কিন্তু সেইখানেই ত সব শেষ। আবার সেই শেষটাকে সূত্র ধরিয়া নূতন কোনও জীবন আরম্ভ হয় নাকি?

আমার স্বপ্নটা যেন তাহারই ইঙ্গিত দিয়া গেল। একটা মানবের জীবন—সে মানুষটা কি আমি?—উল্টা দিক দিয়া দেখিতে পাইলাম; এক মৃত্যু হইতে অন্য জন্ম পর্য্যন্ত। বীজ হইতে অঙ্কুর, অঙ্কুর হইতে ফুল ফল আবার বীজ—ইহাই জীব-জগতের পূর্ণ চক্র। কিন্তু এই চক্র পরিপূর্ণ ভাবে আমাদের দৃশ্যমান নয়, মাঝখানে চক্রাংশ খানিকটা অব্যক্ত। মৃত্যুর পর আবার জন্ম—মাঝ দিয়া বিস্মরণের বৈতরণী বহিয়া গিয়াছে। আমার স্বপ্ন যেন সেই বৈতরণীর উপর সেতু বাঁধিয়া দিল।

সত্যই কি সেতু আছে? আমি বৈজ্ঞানিক, কল্পনার ধার ধারি না। আলোকরশ্মি ঋজু রেখায় চলে কি না, এই বিষয় লইয়া গত তিন বৎসর গবেষণা করিতেছি। কঠিন পরিশ্রম করিতে হইয়াছে; কিন্তু শেষ পর্য্যন্ত বোধ হয় সত্য সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছি। কাল আমার কাজ শেষ হইয়াছে। হাল্কা মন ও হাল্কা মস্তিষ্ক লইয়া শয়ন করিতে গিয়াছিলাম। তার পর ঐ স্বপ্ন! ভাবিতেছি, এ-স্বপ্ন যদি অলীক কল্পনাই হয়, তবে সে এই সকল অদ্ভুত উপাদান সংগ্রহ করিল কোথা হইতে? আমার জাগ্রত চেতনার মধ্যে ত এ-সকল অভিজ্ঞতা ছিল না! কল্পনা কি কেবল শূন্যকে আশ্রয় করিয়া পল্লবিত হয়? রক্তের মধ্যে সামান্য একটু কার্ব্বন-ডায়ক্সাইডের আধিক্য কি নিরবয়ব 'নাস্তি'কে মূর্ত্ত বাস্তব করিয়া তুলিতে পারে?

জানি না। আমার যুক্তি-বিধিবদ্ধ বুদ্ধি এই স্বপ্নের আঘাতে বিপর্য্যস্ত হইয়া গিয়াছে।

যে-শিশু কাঁদিয়া উঠিল, সে কে? আমি? আর সেই জলদমন্দ্র কণ্ঠস্বর!—পুরাতন ডায়েরী খুলিয়া দেখিতেছি, ৩৫ বৎসর পূর্ব্বে ৩রা চৈত্র রাত্রি ১টা ১৭ মিনিটে আমার জন্ম হইয়াছিল।

দেখিতেছি, আমার সম্মুখে অত্যুজ্জ্বল অঙ্গার-পিণ্ড জ্বলিতেছে। বৃহৎ অঙ্গার-চুল্লী, ভস্ত্রার ফুৎকারে উগ্র নির্ধূম প্রভায় উদ্ভাসিত হইয়া উঠিতেছে, আবার ভস্ত্রার বিরামকালে অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ রক্তিমবর্ণ ধারণ করিতেছে। এই অগ্নির মধ্যস্থলে প্রোথিত রহিয়াছে আমার অসি-ফলক।

কক্ষ ঈষদন্ধকার; চারি দিকে নানা আকৃতির লৌহ-ফলক বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। কোনটি খড়্গের আকার ধারণ করিতে করিতে সহসা থামিয়া গিয়াছে; কোনটি দণ্ডের আকারে শূল অথবা মুদ্গরে পরিণত হইবার আশায় অপেক্ষা করিতেছে। প্রাচীরগাত্রে সুসম্পূর্ণ ভল্ল অসি লৌহজালিক সজ্জিত রহিয়াছে। অঙ্গার-পিণ্ডের আলোকে ইহারা ঝলসিয়া উঠিতেছে, পুনরায় ম্লান অস্পষ্ট হইয়া যাইতেছে।

এই দৃশ্য দেখিতে দেখিতে স্বপ্নলোকে জাগিয়া উঠিলাম। জ্বলন্ত চুল্লীর অদূরে বেত্রাসনে বসিয়া আমি করলগ্ন কপোলে দেখিতেছি, আর অসিধাবক তণ্ডু অগ্নির সম্মুখে বসিয়া ভস্ত্রা চালাইতেছে।

এই দৃশ্য আমার কাছে একান্ত পরিচিত, তাই বিস্মিত হইতেছি না। চেতনার মধ্যে ইহার সমস্ত পূর্ব্ব-সংযোগ নিষ্ক্রিয় ভাবে সঞ্চিত রহিয়াছে। এই ছায়ান্ধকার কক্ষটি উজ্জয়িনীর প্রসিদ্ধ শস্ত্র-শিল্পী তণ্ডুর যন্ত্রাগার। আমি দক্ষিণ মণ্ডলে উপনিবিষ্ট শকবাহিনীর এক জন পত্তিনায়ক—আমার নাম অহিদত্ত রঙ্কুল। আমি তণ্ডুর যন্ত্রাগারে বসিয়া আছি কেন? অসি সংস্কার করিবার জন্য? তণ্ডুর মত এত বড় অসি-শিল্পী শুনিয়াছি শক-মণ্ডলে আর নাই, সে অসিতে এমন ধার দিতে পারে যে, নিপুণ শস্ত্রী তাহার দ্বারা আকাশে ভাসমান কাশ-পুষ্পকে দ্বিখণ্ডিত করিতে পারে। কিন্তু এই জন্যই কি গত বসন্তোৎসবের পর হইতে বার-বার তাহার গৃহে আসিতেছি?

চুল্লীর আলোকে তণ্ডুর মুখের প্রত্যেক রেখাটি দেখিতে পাইতেছি। শীর্ণ, রক্তহীন মুখ; গুম্ফ ও ভ্রূর রোম চুল্লীর দাহে দগ্ধ হইয়া গিয়াছে, গণ্ডের চর্ম্ম কুঞ্চিত হইয়া হনু-অস্থিকে প্রকট করিয়া তুলিয়াছে। ললাটের দুই প্রান্ত নিম্ন। অস্থিসার বক্র নাসিকা এই জরাবিধ্বস্ত মুখের চর্ম্মাবরণ ভেদ করিয়া বাহির হইবার প্রয়াস করিতেছে। মুখখানা দেখিলে মনে হয় মৃতের মুখ, শুধু সেই মৃত মুখের মধ্যে কোটরপ্রবিষ্ট চক্ষু দুটা অস্বাভাবিক রকম জীবিত,—ভগ্নমেরু মুমূর্ষু সর্পের চক্ষুর মত যেন একটা বিষাক্ত জিঘাংসা বিকীর্ণ করিতেছে।

তণ্ডু যন্ত্রচালিতের মত কাজ করিতেছে। আমার অসি-ফলক অঙ্গার হইতে বাহির করিয়া রসায়ন-মিশ্র জলে ডুবাইতেছে, সন্তর্পণে ফলকের ধার পরীক্ষা করিতেছে, আবার তাহা অঙ্গারমধ্যে প্রোথিত করিতেছে। তাহার মুখে কথা নাই, কখনও সেই সর্পচক্ষু আমার দিকে ফিরাইয়া অতর্কিতে আমাকে দেখিয়া লইতেছে, তাহার পীত-দন্ত মুখ ঈষৎ বিভক্ত হইয়া যাইতেছে, অধরোষ্ঠ একটু নড়িতেছে—যেন সে নিজ মনে কথা কহিল—তার পর আবার কর্ম্মে মন দিতেছে।

আমিও তাহার পানে চাহিয়া বসিয়া আছি, কিন্তু আমার মন তাহাকে দেখিতেছে না। মন দেখিতেছে—কাহাকে? —রল্লা! লালসাময়ী কুহকিনী রল্লা! আমার ঐ উত্তপ্ত অসি-ফলকের ন্যায় কামনার শিখারূপিণী রল্লা!

একটা তীক্ষ্ণ বেদনা সূচীর মত হৃদযন্ত্রকে বিদ্ধ করিল। তণ্ডুর দেহ ভাল করিয়া আপাদমস্তক দেখিলাম। এই জরাগলিত দেহ বৃদ্ধ রল্লার ভর্ত্তা। রল্লা আর তণ্ডু! বুকের মধ্যে একটা ঈর্ষা-ফেনিল হাসি তরঙ্গায়িত হইয়া উঠিল—ইহাদের দাম্পত্য জীবন কিরূপ? নিজের দেহের দিকে দৃষ্টি ফিরাইলাম। বক্ষে বাহুতে উদ্ধত পেশী আস্ফালন করিতেছে—পঁচিশ বৎসরের দর্পিত যৌবন! তপ্ত শক-রক্ত যেন শুভ্র চর্ম্ম ফাটিয়া বাহির হইতে চাহিতেছে। —আমি লোলুপ চোরের মত নানা ছলে তণ্ডুর গৃহে যাতায়াত করিতেছি, আর তণ্ডু—রল্লার স্বামী!

রল্লা কি কুহক জানে? নারী ত অনেক দেখিয়াছি,—তীব্রনয়না গর্ব্বিতা শক-দুহিতা মদালসনেত্রা স্ফুরিতাধরা অবন্তিকা, বিলাসভঙ্গিম গতি রতিকুশলা হাস্যময়ী লাট-ললনা। কিন্তু রল্লা—রল্লার জাতি নাই। তাহার তাম্র-কাঞ্চন দেহে নারীত্ব ছাড়া আর কিছু নাই। সে নারী। আমার সমস্ত সত্তাকে সে তাহার নারীত্বের কুহকে জয় করিয়াছে।

একবার মাত্র তাহাকে দেখিয়াছি, মদনোৎসবের কুঙ্কুম-অরুণিত সায়াহ্নে। উজ্জয়িনীর নগর-উদ্যানে মদনোৎসবে যোগ দিয়াছিলাম। এক দিনের জন্য প্রবীণতার শাসন শিথিল হইয়া গিয়াছে। অবরোধ নাই, অবগুণ্ঠন নাই—লজ্জা নাই। যৌবনের মহোৎসব। উদ্যানের গাছে গাছে হিন্দোলা দুলিতেছে, গুল্মে গুল্মে চটুলচরণা নাগরিকার মঞ্জীর বাজিতেছে, অসম্বৃত অঞ্চল উড়িতেছে, আসব-অরুণ নেত্র ঢুলুঢুলু হইয়া নিমীলিত হইয়া আসিতেছে। কলহাস্য করিয়া কুঙ্কুমপ্রলিপ্তদেহা নাগরী এক তরুগুল্ম হইতে গুল্মান্তরে ছুটিয়া পলাইতেছে, মধ্যপথে থমকিয়া দাঁড়াইয়া পিছু ফিরিয়া দেখিতেছে, আবার পলাইতেছে। পশ্চাতে পুষ্পের ক্রীড়া-ধনু হস্তে শবরবেশী নায়ক তাহার অনুসরণ করিতেছে। নিভৃত লতানিকুঞ্জে প্রণয়ী মিথুন কানে কানে কথা কহিতেছে—কোনও মৃগনয়না বিভ্রমচ্ছলে নিজ চক্ষু মার্জ্জনা করিয়া কহিতেছে—তুমি আমার চক্ষে কুঙ্কুম দিয়াছ! প্রণয়ী তরুণ সযত্নে তাহার চিবুক ধরিয়া তুলিয়া অরুণাভ নয়নের মধ্যে দৃষ্টি প্রেরণ করিতেছে, তার পর ফুৎকার দিবার ছলে গূঢ়-হাস্য-মুকুলিত রক্তাধর সহসা চুম্বন করিতেছে। সঙ্গে সঙ্গে

মিলিত কণ্ঠের বিগলিত হাস্য লতামণ্ডপের সুগন্ধি বায়ুতে শিহরণ তুলিতেছে।

শত শত নাগর নাগরিকা এইরূপ প্রমোদে মত্ত—নিজের সুখে সকলেই নিমজ্জিত, অন্যের প্রতি দৃষ্টিপাত করিবার অবসর নাই। যৌবন চঞ্চল—বসন্ত ক্ষণস্থায়ী; এই স্বল্পকাল মধ্যে বৎসরের আনন্দ ভরিয়া লইতে হইবে। বৃহৎ কিংশুক বৃক্ষমূলে বেদীর উপর স্নিগ্ধ সুরভিত আসব বিক্রয় হইতেছে—পৈষ্টী গৌড়ী মাধুক—নাগরিক নাগরিকা নির্ব্বিচারে তাহা পান করিতেছে; অবসন্ন উদ্দীপনাকে প্রজ্জ্বলিত করিয়া আবার উৎসবে মাতিতেছে। কঙ্কণ নূপুর কেয়ূরের ঝনৎকার, মাদলের নিক্কণ, লাস্য-আবর্ত্তিত নিচোলের বর্ণচ্ছটা, স্খলিত কণ্ঠের হাস্য-বিজড়িত সঙ্গীত;—নির্লজ্জ উন্মুক্ত ভাবে কন্দর্পের পূজা চলিয়াছে।

নগর-উপবনের বীথিপথে আমি একাকী ইতস্তত ঘুরিয়া বেড়াইতেছিলাম। মনের মধ্যে একটা নির্লিপ্ত সুখাবেশ ক্রীড়া করিতেছিল। এই সব রসোন্মত্ত নরনারী—ইহারা যেন নট-নটী; আমি দর্শক। সুরাপান করিয়াছিলাম, কিন্তু অধিক নয়। বসন্তের লঘু-আতপ্ত বাতাসের স্পর্শে বারুণী-জনিত উল্লাস যেন আমার চিত্তকে আত্মসুখ-লিপ্সার ঊর্দ্ধে ভাসাইয়া লইয়া চলিয়াছিল। চারি দিকে অধীর আনন্দ-বিহ্বলতা দেখিতেছিলাম; মনে আনন্দের স্পর্শ লাগিতেছিল, আপনা আপনি উচ্চকণ্ঠে হাসিতেছিলাম, কিন্তু তবু এই ফেনোচ্ছল নর্ম্ম-স্রোতে ঝাঁপাইয়া পড়িতে পারিতেছিলাম না। আমি সৈনিক, নাগরিক সাধারণ আমাকে কেহ চিনে না; তাই অপরিচয়ের সঙ্কোচও ছিল; উপরন্তু এই অপরূপ মধু-বাসরে বোধ করি নিজের অজ্ঞাতসারেই গাঢ়তর রসোপলব্ধির আকাঙ্ক্ষা করিতেছিলাম।

উপবনের মধ্যস্থলে কন্দর্পের মর্ম্মর-দেউল। স্মরবীথিকারা দেউল ঘিরিয়া নৃত্য করিতেছে, বাহুতে বাহু শৃঙ্খলিত করিয়া লীলায়িত ভঙ্গিমায় উপাস্য দেবতার অর্চ্চনা করিতেছে। তাহাদের স্বল্পবাস দেহের মদালস গতির সঙ্গে সঙ্গে বেণী-বিসর্পিত কুন্তল দুলিতেছে, চপল মেখলা নাচিতেছে। চোখে চোখে মদসিক্ত হাসির গূঢ় ইঙ্গিত, বিদ্যুৎস্ফুরণের ন্যায় অতর্কিত ভ্রূবিলাস, যেন মদনপূজার উপচার রূপে উৎসৃষ্ট হইতেছে।

আমি তাহাদের মধ্যে গিয়া দাঁড়াইলাম। পুষ্পধন্বা মদনবিগ্রহকে প্রণাম করিয়া মদনের কিঙ্করীদের প্রতি সহাস্য দৃষ্টি ফিরাইলাম। আমাকে দেখিয়া তাহাদের নৃত্য বন্ধ হইল, তাহারা পুষ্প-শৃঙ্খলের মত আমাকে আবেষ্টন করিয়া দাঁড়াইল। তার পর তাহাদের মধ্যে একটি বিম্বাধরা যুবতী দ্বিধা-মন্থর পদে আমার সম্মুখে আসিল। আমার মুখের পানে চাহিয়া সে চক্ষু নত করিল, তার পর আবার চক্ষু তুলিয়া একটি চম্পক-অঙ্গুলি দিয়া আমার উন্মুক্ত বক্ষ স্পর্শ করিল। দেখিলাম, তাহার কালো নয়নে কোন অজ্ঞাত আকাঙ্ক্ষার ছায়া পড়িয়াছে।

আমি কৌতুকভরে আমার কুঞ্চিত কেশ-বন্ধন হইতে একটি অশোকপুষ্প লইয়া তাহার চূড়া-পাশে পরাইয়া দিলাম,—তার পর হাসিতে হাসিতে নগরবধূদের বাহুরচিত নিগড় ভিন্ন করিয়া প্রস্থান করিলাম।

ক্ষণকালের জন্য সকলেই মূক হইয়া রহিল। তার পর আমার পশ্চাতে বহু কলকণ্ঠের হাস্য বিচ্ছুরিত হইয়া উঠিল। আমিও হাসিলাম, কিন্তু পিছু ফিরিয়া দেখিলাম না।

ক্রমে দিবা নিঃশেষ হইয়া আসিল। পশ্চিম গগনে আবীর-কুঙ্কুমের খেলা আরম্ভ হইল। দিগ্বধূরাও যেন মদন-মহোৎসবে মাতিয়াছে।

উদ্যানের এক প্রান্তে একটি মাধবীবিতানতলে প্রস্তর-বেদীর উপর গিয়া বসিলাম। স্থান নির্জ্জন; অদূরে একটি কৃত্রিম প্রস্রবণ হইতে বৃত্তাকার আধারে জল ঝরিয়া পড়িতেছে। মণি-মেখলাধৃত জলরাশি সায়াহ্নের স্বর্ণাভ আলোকে টলমল করিতেছে, কখনও রবিরশ্মিবিদ্ধ চূর্ণ জলকণা ইন্দ্রধনুর বর্ণ বিকীর্ণ করিতেছে। যেন সুন্দরী রমণীর অধীর চঞ্চল যৌবন।

আলস্যস্তিমিত অন্যমনে আলোকের এই জলক্রীড়া দেখিতেছি এমন সময় সহসা একটি কুঙ্কুম-গোলক আমার বক্ষে আসিয়া লাগিল; অভ্র-আবরণ ফাটিয়া সুগন্ধিচূর্ণ দেহে লিপ্ত হইল। সচকিতে মুখ তুলিয়া দেখিলাম, একটি নারী লতাবিতানের দ্বারে দাঁড়াইয়া আছে।

তাহাকে দেখিয়া ক্ষণকালের জন্য রুদ্ধবাক্ হইয়া গেলাম, বোধ করি হৃদ্‌যন্ত্রের স্পন্দনও কয়েক মুহূর্ত্তের জন্য থামিয়া গেল। তার পর হৃদয় উন্মত্তবেগে আবার স্পন্দিত হইতে

লাগিল। চমকিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলাম। বিস্ফারিত নেত্র তাহার দেহের উপর নিবদ্ধ রাখিয়া তাহার সম্মুখীন হইলাম।

তাম্রকাঞ্চনবর্ণা লোলযৌবনা তন্বী; কবরীতে মল্লী-মুকুলের মালা জড়িত, মুখে চূর্ণ মনঃশিলার প্রলেপ, কিংশুক-ফুল্ল ওষ্ঠাধর হইতে যেন রতি-মাদকতার মধু ক্ষরিয়া পড়িতেছে। কর্ণে কর্ণিকার কলি গণ্ডের উত্তাপে ম্লান হইয়া গিয়াছে। পত্রলেখা-চিত্রিত উরসে লূতা জালের ন্যায় সূক্ষ্ম কঞ্চুকী, তদুপরি স্বচ্ছতর উত্তরীয় যেন কাশ্মীরবর্ণ কুহেলী দ্বারা অপূর্ব চন্দ্রকলাকে আচ্ছাদন করিয়া রাখিয়াছে। নাভিতটে আকুঞ্চিত নিচোল; চরণ দুটি লাক্ষারস-নিষিক্ত।

এই বিমোহিনী মূর্তি কুটিল অপাঙ্গে চাহিয়া নিঃশব্দে মৃদু মৃদু হাসিতেছে। তাহাকে আপাদমস্তক দেখিয়া আমার বুকের মধ্যে ভয়ের মত একটা অনুভূতি গুরু গুরু করিতে লাগিল। সহসা আমার এ কি হইল? এই ত কিছুকাল পূর্ব্বে মদন-পূজারিণীদের নীরব সঙ্কেত হাসিমুখে উপেক্ষা করিয়া আসিয়াছি। কিন্তু এখন!

অবরুদ্ধ অস্পষ্ট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলাম—তুমি কে?

তাহার অধরোষ্ঠ ঈষৎ বিভক্ত হইল, দশনপংক্তিতে বিজলী খেলিয়া গেল। বঙ্কিম কটাক্ষে ভ্রূ-ধনু বিলসিত করিয়া সে বলিল—'আমি রম্ভা।'

রম্ভা! তাহার কণ্ঠস্বর ও নামোচ্চারণের ভঙ্গীতে আমার দেহে তীব্র বেদনার মত একটা নিপীড়ন অনুভব করিলাম। আমি তাহার দিকে আর এক পদ অগ্রসর হইয়া গেলাম। ইচ্ছা হইল—কি ইচ্ছা হইল জানি না। হাসিতে চেষ্টা করিলাম, কিন্তু হাসি আসিল না।

মদনোৎসবে অপরিচিত তরুণ-তরুণীর সাক্ষাৎকার ঘটিলে তাহারা কি করে? হাসিয়া পরস্পরের দেহে কুঙ্কুম নিক্ষেপ করে, দুই-চারিটা রঙ্গকৌতুকের কথা বলে, তার পর নিজ পথে চলিয়া যায়। কিন্তু আমি—মূঢ় গ্রামিকের মত তাহার সম্মুখে দাঁড়াইয়া রহিলাম। শেষে আবার প্রশ্ন করিলাম—'কে তুমি।'

এবার সে ভঙ্গুর কণ্ঠে কৌতুক ভরিয়া হাসিল, হাসিতে হাসিতে বেদীর উপর আসিয়া বসিল; অধর নয়ন এবং ভ্রূর একটি অপূর্ব্ব চটুল ভঙ্গিমা করিয়া বলিল—'দেখিয়াও বুঝিতে পারিতেছ না? আমি নারী।'

কথাগুলি যেন দৈহিক আঘাতের মত আমার বুকে আসিয়া লাগিল। নারী—হাঁ, নারীই বটে। ইহা ভিন্ন তাহার অন্য পরিচয় নাই। পুরুষের অন্তর-গুহায় যে অনির্ব্বাণ নারী-ক্ষুধা জ্বলিতেছে, এই নারীই বুঝি তাহাতে পূর্ণাহুতি দান করিতে পারে।

তার পর কতক্ষণ এই লতাবিতানতলে কাটিয়া গেল জানি না। রম্ভার লালসাময় যৌবনশ্রী, তাহার মাদক দেহ-সৌরভ অগ্নিময় সুরার মত আমার রক্তে সঞ্চারিত হইল। আমি উন্মত্ত হইয়া গেলাম। কিন্তু তবু—তাহাকে ধরিতে পারিলাম না। ধনুকের গুণ যেমন বাণকে নিজ বক্ষে টানিয়া লইয়াই দূরে নিক্ষেপ করে, রম্ভা তেমনি তাহার দেহের কুহকে বার-বার আমাকে কাছে টানিয়া আবার দূরে ঠেলিয়া দিল। আমি তাহাকে স্পর্শ করিতে গেলাম, সে চপল চরণে সরিয়া গেল—

বলিল 'তুমি বুঝি ব্যাধ? কিন্তু সুন্দর ব্যাধ, বল—হরিণীকে কি এত শীঘ্র ধরা যায়?'

তপ্তস্বরে বলিলাম, 'আমি ব্যাধ নই, তুমি নিষ্ঠুরা শবরী—আমাকে বধ করিয়াছ। তবু কাছে আসিতেছ না কেন?'

এবার সে কাছে আসিল। আমার স্পন্দমান বক্ষের উপর একটি উষ্ণ রক্তিম করতল রাখিয়া ছদ্ম গাম্ভীর্য্যে বলিল, 'দেখি।' তার পর যেন ত্রস্তভাবে দ্রুত সরিয়া গিয়া কহিল, 'কই বধ করিতে ত পারি নাই! বোধ হয় সামান্য আহত হইয়াছ মাত্র। তোমার কাছে যাইব না, শুনিয়াছি আহত ব্যাঘ্রের নিকটে যাইতে নাই।'

এই চটুলতার সম্মুখে আমি ব্যর্থ হইয়া রহিলাম।

তখন সে আবার আমার কাছে আসিল। কজ্জল-দূষিত চক্ষে আমার সর্ব্বাঙ্গ লেহন করিয়া একটা অর্দ্ধ-নিশ্বাস ত্যাগ করিল। অস্ফুট স্বরে কহিল, 'তুমি বোধ হয় ছদ্মবেশী কন্দর্প।'

আমি তাহার দুই বাহু চাপিয়া ধরিলাম; শরীরের ভিতর দিয়া বিদ্যুৎ শিহরিয়া গেল। তাহাকে নিজের দিকে আকর্ষণ করিয়া গাঢ় স্বরে বলিলাম, 'রম্ভা—'

এই সময় যেন আমার কথার প্রতিধ্বনি করিয়া লতাবিতানের বাহিরে কিয়দ্দূরে কর্কশ কণ্ঠে আহ্বান আসিল,—'রল্লা—! রল্লা—!'

উৎকণ্ঠ হইয়া রল্লা শুনিল; তার পর হাত ছাড়াইয়া লইল। আমার মুখের দিকে চাহিয়া এক অদ্ভুত হাসি তাহার কিংশুকফুল্ল অধরে খেলিয়া গেল। সে বলিল, 'আমার মদনোৎসব শেষ হইয়াছে। আমি গৃহে চলিলাম।'

'গৃহে চলিলে!—যে ডাকিল সে কে?'

রল্লা আবার নিদাঘ-বিদ্যুতের মত হাসিল, 'আমার—ভর্ত্তা।'

অকস্মাৎ মুদ্গরাঘাতের মত প্রচণ্ড আঘাত পাইয়া যেন বিমূঢ় হইয়া গেলাম—'ভর্ত্তা!'—

রল্লা লতাবিতানের দ্বারের দিকে চলিল। যাইতে যাইতে গ্রীবা ফিরাইয়া বলিল, 'আমার ভর্ত্তাকে দেখিবে? লতার অন্তরালে লুকাইয়া দেখিতে পার।' তীক্ষ্ণ বঙ্কিম হাসিয়া রল্লা সহসা অদৃশ্য হইয়া গেল।

মূঢ়বৎ কিছুক্ষণ দাঁড়াইয়া রহিলাম; তার পর লতামণ্ডপের পত্রান্তরাল সরাইয়া বাহিরে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিলাম।

রল্লা আর তণ্ডু মুখোমুখী দাঁড়াইয়া আছে। বৃদ্ধ তণ্ডুর সর্প চক্ষু সন্দেহে প্রখর; রল্লার রক্তাধরে বিচিত্র হাসি।

তণ্ডু কর্কশকণ্ঠে বলিল, 'উৎসব শেষ হইয়াছে, গৃহে চল।'

রল্লা ক্লান্তিবিজড়িত ভঙ্গীতে দুই বাহু ঊর্দ্ধে তুলিয়া দেহের আলস্য দূর করিল, তার পর বলিল, 'চল।'

তণ্ডু একবার লতাবিতানের দিকে কুটিল দৃষ্টিপাত করিল, একবার যেন একটু দ্বিধা করিল, তার পর বৃদ্ধ ভল্লুকের মত বিপরীত মুখে চলিতে আরম্ভ করিল। রল্লা মন্থর পদে তাহার পশ্চাতে চলিল।

যাইতে যাইতে রল্লা একবার নিজের কবরীতে হাত দিল; কবরী হইতে একটি রক্ত কুরুবক খসিয়া মাটিতে পড়িল।

আমি বাহিরে আসিয়া কুরুবকটি তুলিয়া লইলাম। রল্লা তখন দূরে চলিয়া গিয়াছে, দূর হইতে ফিরিয়া চাহিল। প্রদোষের ছায়াম্লান আলোক যেন তাহার সর্ব্বাঙ্গ নিঃশব্দ সঙ্কেত করিয়া আমাকে ডাকিল।

আমি দূরে থাকিয়া তাহার অনুসরণ করিলাম। জনাকীর্ণ নগরীর বহু সঙ্কীর্ণ পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে রল্লা নগর-প্রান্তের এই দীন গৃহের অভ্যন্তরে অদৃশ্য হইয়া গেল দেখিলাম, গৃহের প্রাচীরে দুইটি অসি চিত্রিত রহিয়াছে।

তার পর নানা ছুতা করিয়া অসিধাবক তণ্ডুর গৃহে আসিয়াছি। অধীর দুর্নিবার অন্তরে স্থির হইয়া বসিয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিয়াছি। তণ্ডুর যন্ত্রাগারের পশ্চাতে তাহার বাসগৃহ; সেখানে রল্লা আছে, দূর হইতে কচিৎ তাহার নূপুরশিঞ্জন শুনিয়া চমকিয়া উঠিয়াছি; চোখে মুখে উগ্র কামনা হয়ত প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। তণ্ডু কুটিল বক্র কটাক্ষে আমাকে নিরীক্ষণ করিয়াছে। কিন্তু রল্লাকে দেখিতে পাই নাই—একটা তুচ্ছ সঙ্কেত পর্য্যন্ত না—

তণ্ডুর কর্কশ নীরস কণ্ঠস্বরে স্মৃতিতন্দ্রা ভাঙিয়া গেল। সচেতন হইয়া দেখিলাম, সে শীর্ণ অঙ্গুলির প্রান্তে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিতেছে, আর কেশহীন ভ্রূ উত্থিত করিয়া শুষ্ক স্বরে কহিতেছে—'অসির ধার আর বনিতার লজ্জা পরের জন্য, কি বলেন পত্তি-নায়ক?'

বলিলাম,—'অসির ধার বটে। বনিতার লজ্জার কথা বলিতে পারি না, আমি অনূঢ়।'

'আমি বলিতে পারি, আমি অনূঢ় নহি—হা হা—' তণ্ডুর ওষ্ঠাধর তৃষ্ণার্ত্ত বায়সের মত বিভক্ত হইয়া গেল—'কিন্তু আপনি যদি অনূঢ়, তবে এত তন্ময় হইয়া কাহার ধ্যান করিতেছিলেন? পরস্ত্রীর?'

আকস্মিক প্রশ্নে নির্ব্বাক হইয়া গেলাম, সহসা উত্তর জোগাইল না। তণ্ডু কি সত্যই আমার মনের অভিপ্রায় বুঝিতে পারিয়াছে? আত্মসম্বরণ করিয়া তাচ্ছিল্যভরে বলিলাম—'কাহারও ধ্যান করি নাই, তোমার শিল্প-নৈপুণ্য দেখিতেছিলাম।'

বিকৃত হাস্য করিয়া তণ্ডু পুনশ্চ অসি অঙ্গার মধ্যে প্রোথিত করিল, বলিল—'অহিদত্ত রঙ্কুল, আপনি সুন্দর যুবাপুরুষ, এই দীন অসিধাবকের কারু-নৈপুণ্য দেখিয়া আপনার কি লাভ হইবে? বরং নগর-উদ্যানে গমন করুন, সেখানে বহু রসিকা নগর-নায়িকার কলা-নৈপুণ্য উপভোগ করিতে পারিবেন।'

আমার মনে একটু ক্রোধের সঞ্চার হইল। এই হীন-

জাত বৃদ্ধ আমাকে ব্যঙ্গ করিতেছে। ঈষৎ রুক্ষ স্বরে বলিলাম—'আমি কোথায় যাইব না-যাইব তাহা আমার ইচ্ছাধীন। তুমি সেজন্য ব্যস্ত হইও না।'

তণ্ডু আমার পানে একটা চকিত-গুপ্ত চাহনি হানিয়া আবার কার্য্যে মন দিল।

কিয়ৎকাল পরে বলিল—'ভাল কথা, পত্তি-নায়ক, আপনি ত যোদ্ধা; শত্রুর উপর অসির ধার নিশ্চয় পরীক্ষা করিয়াছেন!'

গম্ভীর হাসিয়া বলিলাম—'তা করিয়াছি। দুই বৎসর পূর্ব্বে দেবপাদ বাসুদেব কণিষ্ক যখন তোমাদের এই উজ্জয়িনী নগরী অধিকার করেন, তখন বহু নাগরিকের কণ্ঠে আমার অসির ধার পরীক্ষা করিয়াছি।'

তণ্ডুর চক্ষু দুটা ক্ষণেক আমার মুখের উপর নিষ্পলক হইয়া রহিল; তার পর শীৎকারের মত স্বর তাহার কণ্ঠ হইতে বাহির হইল—'পত্তি-নায়ক আপনি বীর বটে। কিন্তু সেজন্য কৃতিত্ব কাহার?'

'কাহার?'

'আমার—এই হীনজন্মা অসিধাবকের। কে আপনার অসিতে ধার দিয়াছে? আমারই মার্জ্জিত অস্ত্রের সাহায্যে আপনারা আমার ভ্রাতা-পুত্রকে হত্যা করিয়াছেন, স্ত্রী-কন্যাকে অপহরণ করিয়াছেন।'

আমার মুখ উত্তপ্ত হইয়া উঠিল। বলিলাম—'শক-জাতি বর্ব্বর নয়। তাহারা যুদ্ধ করিয়াছে কিন্তু নারীহরণ কদাপি করে নাই।'

তণ্ডু কণ্ঠে খলতার বিষ মিশাইয়া বলিল—'তা হইতে পারে। তবে বোধ হয় শকজাতি পরস্ত্রীকে চুরি করিতেই পটু।'

ক্রোধের শিখা আমার মাথায় জ্বলিয়া উঠিল। কিন্তু সঙ্গে সঙ্গে তণ্ডুর অভিপ্রায়ও বুঝিতে পারিলাম; সে আমার সহিত কলহ করিতে চাহে—যাহাতে আমি আর তাহার গৃহে না আসি। রল্লার লালসায় আমি তাহার গৃহে আসি ইহা সে বুঝিয়াছে। কিন্তু বুঝিল কি করিয়া?

কষ্টে ক্রোধ দমন করিয়া বলিলাম—তণ্ডু, তুমি বৃদ্ধ, তোমার সহিত বাগ্‌বিতণ্ডা করিতে চাহি না। আমার অসি যদি তৈয়ার হইয়া থাকে, দাও।'

সে অসি জলে ডুবাইয়া আবার অঙ্গুলির সাহায্যে ধার পরীক্ষা করিল। বলিল—'অসি তৈয়ার হইয়াছে।'

তণ্ডুর সহিত কলহ করিয়া আমার লাভ নাই। তাহাকে তুষ্ট করিবার অভিপ্রায়ে আমি পাঁচটি স্বর্ণমুদ্রা তাহার সম্মুখে ফেলিয়া দিয়া বলিলাম—'এই লও পঞ্চ নাণক—তোমার পুরস্কার।'

তণ্ডুর দুই চক্ষু সহসা তাহার অঙ্গারকুণ্ডের মতই জ্বলিয়া উঠিয়া আবার নিবিয়া গেল। সে চেষ্টাকৃত ধীর স্বরে বলিল, 'আমার পরিশ্রমের মূল্য এক নাণক মাত্র। বাকী চার নাণক আপনি রাখুন, অন্যত্র প্রমোদ ক্রয় করিতে পারিবেন।—কিন্তু অসির ধার পরীক্ষা করিবেন না?'

উদ্গত ক্রোধ গলাধঃকরণ করিয়া আমি বলিলাম, 'করিব, দাও।' বলিয়া হাত বাড়াইলাম।

তণ্ডু কিন্তু অসি দিবার কোনও চেষ্টাই করিল না, তির্য্যক চক্ষে চাহিয়া বলিল, 'পত্তি-নায়ক, নিজের উপর কখনও নিজের অসির ধার পরখ করিয়াছেন? করেন নাই! তবে এইবার করুন।'

বৃদ্ধের হস্তে আমার অসি একবার বিদ্যুতের মত ঝলসিয়া উঠিল। আমার শিরস্ত্রাণের উপর একটি শিখি-পুচ্ছ রোপিত ছিল, দ্বিখণ্ডিত হইয়া তাহা ভূতলে পড়িল।

এইবার আমার অবরুদ্ধ ক্রোধ একেবারে ফাটিয়া পড়িল। এক লম্ফে প্রাচীর হইতে খড়্গ তুলিয়া লইয়া বলিলাম, 'তণ্ডু, বৃদ্ধ শৃগাল, আজ তোর কর্ণচ্ছেদন করিব।' জ্বলন্ত ক্রোধের মধ্যে একটা চিন্তা অকস্মাৎ সূক্ষ্ম সূচীর মত মস্তিষ্ককে বিদ্ধ করিল—তণ্ডুকে যদি হত্যা করি তাহাতেই বা দোষ কি? বরং আমার পথ পরিষ্কার হইবে।

কিন্তু তাহাকে আক্রমণ করিতে গিয়া দেখিলাম—কঠিন ব্যাপার। বিস্ময়ে আমার ক্রোধ ডুবিয়া গেল। জরা-শীর্ণ তণ্ডুর হস্তে অসি ঘুরিতেছে রথ-নেমির মত, অসি দেখা যাইতেছে না, কেবল একটা ঘূর্ণ্যমান প্রভা তাহাকে বেষ্টন করিয়া রাখিয়াছে। আমি হটিয়া গেলাম।

গরলভরা স্বরে তণ্ডু বলিল, 'পত্তি-নায়ক অহিদত্ত রঞ্জুল, লতা-মণ্ডপে লুকাইয়া চপলা পরস্ত্রীর অঙ্গস্পর্শ করা সহজ, পুরুষের অঙ্গ স্পর্শ করা তত সহজ নয়।'

আবার তাহাকে আক্রমণ করিলাম। বুঝিতে বাকী

রহিল না, তণ্ডু আরম্ভ হইতেই আমার অভিপ্রায় জানে। লতাবিতানে চুরি করিয়া আমাদের দেখিয়াছিল। কিন্তু এত দিন প্রকাশ করে নাই কেন? আমাকে লইয়া খেলা করিতেছিল?

অসিতে অসি লাগিয়া স্ফুলিঙ্গ ঠিকরাইয়া পড়িতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য বৃদ্ধের কৌশল, সে একপদ হটিল না। আমি যোদ্ধা, অসিচালনাই আমার জীবন, আমি তাহার অসি-নৈপুণ্যের সম্মুখে বিষহীন উরগের ন্যায় নির্বীর্য্য হইয়া পড়িলাম। অপ্রত্যাশিতের বিস্ময় আমাকে আরও অভিভূত করিয়া ফেলিল।

অকস্মাৎ বজ্র-নির্ঘোষের মত তণ্ডুর স্বর আমার কর্ণে আসিল,—'অহিদত্ত রঞ্জুল, শক-লম্পট, এইবার নিজ অসির ধার নিজবক্ষে পরীক্ষা কর—'

তার পর—কি যেন একটা ঘটিয়া গেল।

অবাক হইয়া নিজের দিকে তাকাইলাম। দেখিলাম, অসির বাঁকা ফলক আমার বক্ষপঞ্জরে প্রোথিত হইয়া আছে!

তণ্ডু আমার পঞ্জর হইতে অসি টানিয়া বাহির করিয়া লইল। আমি মাটিতে পড়িয়া গেলাম। একটা তীব্র দৈহিক যন্ত্রণা যেন আমার চেতনাকে দেহ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া দিল। আর কোনও ক্লেশ অনুভব করিলাম না। স্বপ্নাচ্ছন্নের মত অনুভব করিলাম, তণ্ডু কর্কশ উল্লাসে বলিতেছে, 'অহিদত্ত রঞ্জুল, রল্লা তোমাকে বধ করে নাই, বধ করিয়াছে তণ্ডু—তণ্ডু—তণ্ডু—'

* * *

আমার দেহটার সহিত আমার যেন একটা দ্বন্দ্ব চলিতেছে। সে আমাকে ধরিয়া রাখিবার চেষ্টা করিতেছে, আমি বায়ুহীন কারা-কূপে আবদ্ধ বন্দীর মত প্রাণপণে মুক্ত হইবার জন্য ছটফট করিতেছি। এই টানাটানি ক্রমে অসহ্য হইয়া উঠিল। তার পর হঠাৎ মুক্তিলাভ করিলাম।

প্রথমটা কিছুই ধারণা করিতে পারিলাম না। তণ্ডুর যন্ত্রগৃহে আমি দাঁড়াইয়া আছি, আমার পায়ের কাছে একটা বলিষ্ঠ রক্তাক্ত মৃতদেহ পড়িয়া আছে। আর, তণ্ডু ঘরের কোণে খনিত্র দিয়া গর্ত্ত খুঁড়িতেছে এবং ভয়ার্ত্ত চোখে বার-বার মৃতদেহটার পানে ফিরিয়া তাকাইতেছে।

ক্রমে মননশক্তি ফিরিয়া আসিল। বুঝিলাম, তণ্ডু আমাকে হত্যা করিয়াছে। কিন্তু আশ্চর্য্য! আমি ত মরি নাই! ঠিক পূর্ব্বের মতই বাঁচিয়া আছি। অনির্ব্বচনীয় বিস্ময় ও হর্ষে মন ভরিয়া উঠিল।

অনুভব করিলাম, আরও কয়েক জন ঘরের মধ্যে আসিয়া দাঁড়াইয়াছে। তাহাদের মধ্যে কাহাকেও চিনিলাম, কাহাকেও বা চিনিতে পারিলাম না। এক জন আমার কাছে আসিয়া মৃদুহাস্যে বলিল, 'চল, এখানে থাকিয়া আর লাভ নাই।'

রল্লার কথা মনে পড়িয়া গেল। মুহূর্ত্তমধ্যে তাহার নিকটে গিয়া দাঁড়াইলাম। একটি বদ্ধ কক্ষে ক্ষুদ্র গবাক্ষপথে সে বাহিরের দিকে চাহিয়া আছে; শুষ্ক চোখে ছুরির ঝলক, ক্ষণে ক্ষণে তীক্ষ্ণ দশনে অধর দংশন করিতেছে। তাহাকে দেখিয়া, তাহার অত্যন্ত কাছে দাঁড়াইয়াও কিন্তু আমার লেশ মাত্র বিকার জন্মিল না। সেই তপ্ত লালসা-ফেনিল উন্মত্ততা আর নাই। দেহের সঙ্গে দেহ-জাত আবিলতাও যেন ঝরিয়া গিয়াছে।

অতঃপর আমার নূতন জীবন আরম্ভ হইল। পার্থিব সময়ের প্রায় দুই সহস্র বর্ষব্যাপী এই জীবন পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে বর্ণনা করা সহজ নয়। আমার স্বপ্নে আমি এই দু-হাজার বৎসরের জীবন বোধ হয় দুই ঘণ্টা বা আরও অল্প সময়ের মধ্যে যাপন করিয়াছিলাম; কিন্তু তাহা বর্ণনা করিতে গেলে দুই হাজার পৃষ্ঠাতেও কুলাইবে না।

জীবিত মানুষ স্থান এবং কালের আশ্রয়ে নিজের সত্তাকে প্রকট করে। কিন্তু প্রেতলোকে আত্মার স্থিতি কেবল কালের মধ্যে। নিরবয়ব বলিয়া বোধ করি তাহার স্থানের প্রয়োজন হয় না।

শরীর নাই; তাই রোগ কামনা ক্ষুধা তৃষ্ণাও নাই। দেহ-বোধ প্রথম কিছু দিন থাকে, ক্রমে ক্ষয় হইয়া যায়। গতির অবাধ স্বচ্ছন্দতা আছে, অভিলাষমাত্রেই যেখানে ইচ্ছা যাওয়া যায়। সূর্য্যের জলন্ত অগ্নি-বাষ্পের মধ্যে প্রবেশ করিয়াছি, লেশমাত্র তাপ অনুভব করি নাই। শৈত্য-উত্তাপের একান্ত অভাবই এ রাজ্যের স্বাভাবিক অবস্থা।

এখানকার কালের গতিও পার্থিব কালের গতি হইতে পৃথক। পৃথিবীর এক অহোরাত্রে এখানে এক অহোরাত্র

হয় না ; পার্থিব এক চান্দ্র মাসে আমাদের অহোরাত্র। এই কালের বিভিন্নতার জন্য পার্থিব ঘটনা আমাদের নিকট অতিশয় দ্রুত বলিয়া বোধ হয়।

অবাধ স্বচ্ছন্দতায় আমার সময় কাটিতে লাগিল। কোটি কোটি বিদেহ আত্মা এখানে আমারই মত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। নারী আছে, পুরুষ আছে ; সকলেই স্বেচ্ছানুসারে বিচরণ করিতেছে। আপাতদৃষ্টিতে কোনও প্রকার বিধি-নিষেধ লক্ষ্য করা যায় না। কিন্তু তবু, কোথায় যেন একটা অদৃশ্য শক্তি সমস্ত নিয়ন্ত্রণ করিতেছে। সেই শক্তির আধার কে, জানি না ; কিন্তু তাহার নিঃশব্দ অনুশাসন লঙ্ঘন করা অসাধ্য।

সময় কাটিয়া যাইতে লাগিল। এখানে জ্ঞানের পথে বাধা নাই ; যাহার মন স্বভাবতঃ জ্ঞানলিপ্সু সে যথেচ্ছ জ্ঞানলাভ করিতে পারে। মর্ত্যলোকে যে-জ্ঞান বহু সাধনায় অর্জ্জন করিতে পারা যায় না, এখানে তাহা সহজে অবলীলাক্রমে আসে। আমি আমার ক্ষুদ্র মানবজীবনে যে-সকল মানসিক সংস্কার ও সঙ্কীর্ণতা সঞ্চয় করিয়াছিলাম তাহা ক্রমশ ক্ষয় হইয়া গেল। অকলঙ্ক জ্ঞান ও প্রীতির এক আনন্দময় অবস্থার মধ্যে উপনীত হইলাম।

রবি চন্দ্র গ্রহ তারা ঘুরিতেছে, কাল অগ্রসর হইয়া চলিয়াছে। শনৈশ্চর শনিগ্রহ বোধ করি ষাট বারেরও অধিক সূর্য্যমণ্ডলকে পরিক্রমণ করিল। তার পর এক দিন আদেশ আসিল—ফিরিতে হইবে।

অদৃশ্য শক্তির প্রেরণায় চন্দ্রলোকে উপস্থিত হইলাম। সেখান হইতে সূক্ষ্ম চন্দ্রকর অবলম্বন করিয়া আলোকের বেগে ছুটিয়া চলিলাম।

পৃথিবীতে ফিরিয়া আসিলাম। হরিৎবর্ণ বিপুল শস্য-প্রান্তর চন্দ্রকরে দুলিতেছে ; পরমানন্দে তাহারই অঙ্গে মিলাইয়া গেলাম।

আমার সচেতন আত্মা কিন্তু অস্তিত্ব হারাইল না—একটি আনন্দের কণিকার মত জাগিয়া রহিল।

তার পর এক অন্ধকারলোকে প্রবেশ করিলাম। স্থাণুর মত নিশ্চল, আত্মগ্ন,—কিন্তু আনন্দময়।

সহসা একদিন এই যোগনিদ্রা ভাঙিয়া গেল। ব্যথা অনুভব করিলাম ; দেহানুভূতির যে যন্ত্রণা ভুলিয়া গিয়াছিলাম তাহাই নূতন করিয়া আমাকে বিদ্ধ করিল।

যন্ত্রণা বাড়িতে লাগিল ; সেই শ্বাসরোধকর কারাকূপের ব্যাকুল যন্ত্রণা! তার পর আমার কণ্ঠ বিদীর্ণ করিয়া এই যন্ত্রণা অভিব্যক্তি লাভ করিল—তীক্ষ্ণ ক্রন্দনের সুরে।

পাশের ঘর হইতে জলদমন্দ্র শব্দ শুনিলাম,—'লিখে রাখ। ৩রা চৈত্র রাত্রি ২টা ১৭ মিনিটে জন্ম।"

সঙ্গে সঙ্গে মনের উপর বিস্মরণের যবনিকা পড়িয়া গেল। আমি জাগিয়া উঠিলাম।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

পূর্ব্ব পরিচয়

ধনী জমিদার শচীন্দ্রনাথ প্রয়াগে ত্রিবেণীর কুম্ভমেলায় তার সুন্দরী পত্নী কমলা ও শিশুপুত্রকে হারিয়ে বহু অনুসন্ধানের পর হতাশভগ্নচিত্তে ইউরোপে বেড়াতে যায়। লণ্ডনে পৌঁছেই জ্বরে বেহুঁশ হয়ে পড়ে। লণ্ডনে পালিত পিতৃহীন চাকুরীজীবী পার্ব্বতী অক্লান্ত সেবায় তাকে সুস্থ করে এবং বিবাহিত না জেনে তাকে ভালবাসে। পরে শচীন্দ্রের অনুরোধে পার্ব্বতী ভারতবর্ষে ফিরে কমলার স্মৃতিকল্পে এক নারী-প্রতিষ্ঠান স্থাপন করে। প্রতিষ্ঠানের নাম কমলাপুরী।

এদিকে বৎসরের পর বৎসর নারীপ্রতিষ্ঠানের চক্রে আবর্ত্তিত কার্য্যপরম্পরায় পার্ব্বতীর মন এক এক সময় শ্রান্ত হয়ে পড়ে, তবু তার অন্তর্নিহিত প্রেমের মোহে শচীন্দ্রের এই প্রতিষ্ঠান ছেড়ে সে দূরে যেতে পারে না। শচীন্দ্রের অন্তরে কমলার স্মৃতি ক্রমে নিষ্প্রভ হয়ে আসে, তবু স্ত্রীর প্রতি একনিষ্ঠতায় অভ্যস্ত তার চিত্ত পার্ব্বতীর প্রত্যক্ষ জীবন্ত প্রেমের প্রভাবকে জোর ক'রে অস্বীকার করে অথচ পার্ব্বতার প্রতি কৃতজ্ঞত ও শ্রদ্ধার সূত্রে তার আকর্ষণ বেড়ে চলে। এই দ্বন্দ্বের আন্দোলনে তার চিত্ত দোলায়মান।

প্রয়াগ থেকে মাতাল উপেন্দ্রনাথ কমলাকে ফাঁকি দিয়ে কলকাতায় এনে তাকে বাড়ীতে বন্ধ করে এবং অত্যাচারে কমলা একদা পাশের বাড়ীতে নন্দলাল ও তার স্ত্রী মালতীর আশ্রয়ে ছুটে গিয়ে পড়ে। কঠিন পীড়ায় সমস্ত নামের স্মৃতি তার মন থেকে মুছে যায়। নন্দ কমলের রূপে আকৃষ্ট। কমলা এই দুর্দ্দৈব থেকে মালতী ও নিজেকে বাঁচাবার জন্যে এক হাসপাতালে নার্সের কাজ শিখতে যায়। সেখানে ডাক্তার নিখিলনাথের সহানুভূতি ও সাহায্য লাভ করে। এদিকে স্নেহময়ী সরলা মালতী কমলার পুত্র অজয়কে তার নিঃসন্তান মাতৃহৃদয়ের সব স্নেহটুকু উজাড় ক'রে ভালবেসেছে। এ-বাড়ীতে কমলাকে নাম দেওয় হয়েছে জ্যোৎস্না।

নিখিলনাথ জনহিতব্রতী। একদ বিপ্লবী মেয়ে সীমার আহ্বানে শ্রীরামপুরে গিয়ে তার পূর্ব্ব নায়ক সত্যবানকে এক পোড়ো বাড়ীতে মৃতকল্প অবস্থায় দেখে। প্রথম দর্শনেই মেয়েটিকে তার অসাধারণ ব'লে মনে হয়। সত্যবানের মুখে পুলিসের গুলিতে তাদের দলের সকলের মৃত্যু, নিজে আহত অবস্থায় সীমার সাহায্যে গ্রাম থেকে গ্রামান্তরে, এ বনে জঙ্গলে পরিত্যক্ত কুটীরে পালিয়ে বেড়ানোর ইতিহাস, সীমার বীরত্ব বেং দেশপ্রীতির কথা শুনে এবং নিজের চোখে তার শ্রান্তিহীন একনিষ্ঠতা দেখে তার প্রতি অনুরক্ত হয়।

বিপ্লবের আগুনে এতগুলি মহামূল্য প্রাণকে বিসর্জ্জন দেওয়ায় মৃত্যুকালে অনুতপ্ত সত্যবান সীমাকে এই আগুন থেকে বাঁচাবার জন্যে নিখিলনাথকে বলে।

নন্দলাল হাসপাতালে আত্মীয় হিসাবে কমলার সঙ্গে প্রায় দেখা করতে যায় এবং তার বিকৃত চিত্তের আক্রোশে একদা নিখিলনাথ সম্বন্ধে কমলাকে অপমান করে এবং তারই সঙ্কোচে কিছুদিন তাকে এড়িয়ে চলতে থাকে।

মালতীর বহু সাধ্যসাধনার পর মালতীর সঙ্গে সে কমলের হাসপাতালে গেল।

কমলা দুশ্চিন্তায় মাথার যন্ত্রণায় পীড়িত হয়ে পড়েছিল।

সত্যবানের মৃত্যু। পথ দেখিয়ে নিখিলকে নিয়ে সীমার পলায়ন এবং নিখিলের অনুনয় সত্ত্বেও কঠিন সুরে নিখিলকে ষ্টেশনের পথ দেখিয়ে উন্মুক্ত প্রান্তরে রেখে সীমার বনের মধ্যে প্রবেশ।

শচীন্দ্র মনে মনে বহু তোলাপাড়ার পর, পার্ব্বতীর প্রতি করুণাতেই বোধ করি, তার প্রতি তার উদভ্রান্ত চিত্তের প্রেম-নিবেদনের চেষ্টায় উচ্ছ্বাস প্রকাশ করতে উদ্যত হ'ল কিন্তু পার্ব্বতীর সামনে সে চপলতা করতে মনে বাধা পেয়ে নিবৃত্ত হ'ল।

লক্ষ্ণৌ ফিরে যাবার পথে পার্ব্বতী শচীন্দ্রকে স্পষ্ট করেই জানিয়ে দিলে যে তার প্রতি শচীন্দ্রের করুণাপরবশ আত্মনিবেদনকে সে প্রেম ব'লে গ্রহণ করতে পারে না। পত্নীর প্রতি তার প্রেম কমলাপুরী প্রতিষ্ঠানের মধ্যে মহাসমাধি লাভ করেছে এমন মিথ্যার দ্বারা শচীন্দ্র যেন নিজেকে এবং পার্ব্বতীকে ভোলাতে না চায়। কথার আঘাতে শচীন্দ্রের আত্মকেন্দ্রগত চিত্ত আহত হল—সে নিজের হৃদয়ের গতির দিক নির্ণয় করতে মনস্থ ক'রে ফিরে প্রয়াগে গিয়ে, ঠিকানা না দিয়ে পত্রে পার্ব্বতীকে নিজের সংকল্প জানালে। পার্ব্বতী নিজের বেদনা নিয়ে একাকী কমলাপুরীর কর্ম্মচক্রের মধ্যে নিজেকে বিস্মৃত হবার সাধনায় মন দিলে।

নিখিল সীমার ত্রাণকল্পে নিজে সম্পূর্ণ অবহিত থাকায় পীড়িত কমলার সংবাদ নিতে পারে নি। কমলা কঠিন শিরঃপীড়ায় আক্রান্ত হয়ে মালতীর অনুরোধে নন্দলালের বাড়ী ফিরে গেল। নন্দ এই পীড়ায় সেবার সুযোগে তার অবাধ্য চিত্তকে সংযত করতে না পেরে একদা রাত্রে অসহায় কমলাকে চুম্বন করলে। কমলার উত্তেজনাপূর্ণ কাতরোক্তিতে জেগে মালতী তার স্বামীকে ঐ অবস্থায় দেখতে পেলে এবং কিছুকাল স্বামীকে সে সহ্য করতে পারল না। ভীরু নন্দ নানা উপায়ে আবার স্নেহশীল মালতীর ক্ষমা লাভ করলে কিন্তু বহু চেষ্টাতেও অন্তরে নিজেকে সম্পূর্ণ শাসিত করতে পারলে না।

সত্যবানের মৃত্যুর পর বহু ক্লেশস্বীকার ক'রে সীমা পূর্ব্বপরিচিত রঙ্গলালের সাহায্যে বিপ্লবী দল গ'ড়ে দমদমের এক বাগানে আস্তানা করলে। নারীভবন ব'লে একটা প্রতিষ্ঠান ক'রে সে অনিন্দিত দেবী নাম নিয়ে কলকাতায় জমিয়ে বসল এবং নিখিলনাথকে দলে আনবার আগ্রহে এবং তার প্রতি গোপন আকর্ষণে তাকে নিজের কার্য্যকলাপের কথা ব্যক্ত করলে। নিখিলও নিজের সাধ্যমত সীমাকে এই বিপ্লবপন্থা ফেরাবার চেষ্টায় প্রায় হতাশ হ'য়ে নন্দলালের গৃহ হ'তে প্রত্যাগত অপমানিত কমলাকে নন্দের আক্রমণ থেকে রক্ষা এবং তার শান্তপ্রভাবে বিপ্লববিরোধী তর্কে তাকে শিক্ষিত ক'রে সীমার চিত্ত পরিবর্ত্তনের আশায় কমলাকে নারীভবনে রাখলে। কমলা নিখিলকে তার জীবনের ইতিহাস জানালে এবং নিখিলও সীমাকে সে-কথা বললে।

ইতিমধ্যে হাসপাতালের কোনো আত্মহত্যাসংক্রান্ত ব্যাপারে ইনসপেক্টর ভুলু দত্তের সঙ্গে তার দেখা হয়। পূর্ব্বকালে ভুলু দত্ত নিখিলের সে-কালের বিপ্লবী দলে ছিল। তাকে বুলডগ ব'লে ওরা ডাকত। সীমা

সংক্রান্ত পুলিসের খবর পাবার আশায় ভুলুদত্তের সঙ্গে নিখিল বন্ধুতা জমিয়ে নিলে।

সীমার সঙ্গে কমলার হৃদ্যতা হ'ল। নিখিলের শিক্ষানুযায়ী তর্কের মুখে কমলার কাছে পার্ব্বতীর কথা শুনে এতবড় নারী প্রতিষ্ঠানকে নিজের কাজে লাগাবার আশায় কমলাপুরী গেল। সেখানে শচীন্দ্রের কথা শুনে, তাকে দলভুক্ত করবার মতলবে বল্লভপুর ম্যানেজারের কাছ থেকে ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে সে শচীন্দ্রের সন্ধানে প্রয়াগে গেল।

নন্দলাল বহু অনুসন্ধানের পর কমলার ঠিকানা সংগ্রহ করে নারীভবনের আশে পাশে ঘোরাঘুরি করতে লাগল। অবশেষে রঙ্গলাল এবং তার সঙ্গীরা পুলিসের গোয়েন্দা মনে ক'রে একদা তাকে হত্যা করলে। কমল মালতীর কাছে গেল।

নিখিল নিশ্চয় ক'রে বুঝতে পেরেছিল যে সীমার দলের এই কাজ। তাই সীমাকে এই ঘটনা জানিয়ে সতর্ক ক'রে দেবার উদ্দেশে সীমার সন্ধানে কমলাপুরী ও বল্লভপুর গেল—কিন্তু ব্যর্থ হ'য়ে ফিরে আসতে হ'ল। পথে লক্ষ্মে সারেঙের কাছে এবং ভোলানাথের কাছে গল্পে এ কথা জানতে পারলে যে শচীন্দ্রনাথ জ্যোৎস্নার স্বামী।

নন্দের হত্যা কারীদের সে বাঁচাতে চেষ্টা ক'রে যে পরোক্ষ ভাবে হত্যার প্রশ্রয়ের পাপে লিপ্ত হচ্ছে এরূপ অনুতাপ মনে থাকলেও সীমার মোহে সে সেকথা সম্প্রতি আমল দিল না।

৫৩

সীমা পার্ব্বতীর চিঠি পেয়ে কিছু আশ্চর্য্য হ'ল। অকস্মাৎ এ মতি-পরিবর্ত্তনের কারণ সাব্যস্ত করতে না পেরে তার মনে একটা অস্বস্তিকর সন্দেহ প্রথমে তাকে একটু বিচলিত করেছিল—পার্ব্বতী কি কিছু সন্দেহ করেছে? ইতিমধ্যে তার সম্বন্ধে কোন গোপন তথ্য সংগ্রহ করেছে না কি! অনেক চিন্তা ক'রেও তার কোন সঙ্গত কারণ স্থির করতে না পেরে ভাবলে "ও আমারই চোরের মন তাই।"

তবু ট্রেনে উঠে পার্ব্বতী সম্বন্ধে চিন্তাই তাকে পেয়ে বসল। পার্ব্বতী যে এত অল্প বয়সে এ-রকম একটা প্রতিষ্ঠানের অন্তরালে সমস্ত বহিঃসংসার হ'তে সম্পূর্ণ বিচ্ছিন্ন হয়ে স্বেচ্ছায় বছরের পর বছর কাটিয়ে দিচ্ছে, এর রহস্যটুকু ট্রেনের অলস অবসরে, পার্ব্বতীর মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে তার মনকে অবহিত ক'রে রাখলে। যদিচ পার্ব্বতীর বিপুল কর্ম্মপ্রবাহের মধ্যে কোথাও সে শৃঙ্খলার অভাব এবং শৈথিল্য দেখতে পায় নি তবু তার কথায়, তার প্রতি পদবিক্ষেপে, তার নিজের প্রতি ঔদাসীন্যে এমন একটা শ্রান্তি এবং অবসাদের আভাস পাওয়া যায় যে এত বড় একটা প্রতিষ্ঠানের প্রাণদাত্রীর পক্ষে যা সম্পূর্ণ আশ্চর্য্য। য উৎসাহের আগুন, আবেগের বাষ্প বুকের ভিতর ভিতর জমে উঠলে পশ্চাতের বিপুল মৃতভারকে আনন্দময় গতি দান করা যায়, পার্ব্বতীর মধ্যে সেই প্রেরণার বাষ্পাবেগ যেন শ্রান্ত হয়ে এসেছে। কিন্তু কেন! তার অত্যাচার-পীড়িত মায়ের স্মৃতিমাত্র যদি তাকে এই নির্যাতিত বঙ্গবিধবাদের হিতসাধনে উৎসাহিত করত তবে অকারণে তা নিষ্প্রভ হয়ে আসবার কারণ ঘটত না। তা ছাড়া যে-শচীন্দ্রনাথের ইঙ্গিতে এই প্রতিষ্ঠান পরিচালিত হয় তার সামান্য ঠিকানা পর্য্যন্ত পার্ব্বতীর জানা ছিল না, এ কেমন ব্যাপার! অথচ তার ঠিকানার অনুসন্ধান ক'রে আমার সঙ্গে তার কাছে যাবার উৎসাহ-উদ্যোগের ত কোন অভাব দেখা যায় নি! এক মুহূর্ত্তেই সে সমস্ত কর্ত্তব্য অন্যের অসমর্থ দুর্ব্বল স্কন্ধে অর্পণ ক'রে, সমস্ত পরিত্যাগ ক'রে শচীন্দ্রের অনুসন্ধানের উদ্দেশ্যে আনন্দেই প্রস্তুত হয়ে নিয়েছিল। তখন, অকস্মাৎ তার মত-পরিবর্ত্তনের যে ক'টা কারণ সম্ভব তা সে মনে মনে বিচার ক'রে দেখতে লাগল, তার নিজের প্রতি পার্ব্বতীর হঠাৎ কোন সন্দেহ উপস্থিত হবার কারণ সে খুঁজে পেল না। ভাবলে তা হ'লে শচীন্দ্রের কাছে যাওয়ায় বাধা দেওয়ার কথাই সে সর্ব্বাগ্রে বিবেচনা করত এবং কোনপ্রকার ভদ্র আচরণ ক'রে পত্রে তার অক্ষমতা জ্ঞাপন করা অপেক্ষা পুলিসের সাহায্যে সংবাদ দেওয়াই সে সহজ পন্থা ব'লে বিবেচনা করত। দ্বিতীয় কারণ হ'তে পারে যে হঠাৎ কমলাপুরী থেকে তার জরুরী কাজের ডাক এসেছে। কিন্তু, সে কথা সীমার কাছে গোপন করবার কোন কারণ নাই, সে অনায়াসেই তাকে লিখে পাঠাতে পারত; বিশেষত যখন সে শচীন্দ্রের কাছেই যাচ্ছে এবং কমলাপুরী সম্বন্ধে সংবাদ শচীন্দ্রের নিকট পাঠানো তার পক্ষে স্বাভাবিক। তা ছাড়া সে যে শচীন্দ্রের সন্ধান নিয়ে তার কাছে যেতে যেতে মধ্যপথ থেকে ফিরে গেল কমলাপুরীরই বিশেষ কাজে, একথা শচীন্দ্রের কাছে না-জানাবার কোন সঙ্গত কারণ নেই। অর্থাৎ শচীন্দ্র যেমন তার কাছে আত্মগোপন ক'রে আছে সেও তার এই অনুসন্ধানের অকস্মাৎ উচ্ছ্বসিত উৎসাহ গোপন করতেই চায়। পূর্ব্বাপর চিন্তা ক'রে সে একটা জিনিষ মনে মনে আবিষ্কার করলে।

শচীন্দ্রের অজ্ঞাতবাস, পার্ব্বতীর উৎসাহ, এবং পরিশেষে

পার্ব্বতীর এই আকস্মিক ব্যবহারের সঙ্গে কমলাপুরীতে পার্ব্বতীর যে ক্লান্ত উদাস মূর্ত্তি সে দেখেছিল তার যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে। চিন্তা করতে করতে পার্ব্বতীর প্রত্যেকটি আচরণ, শচীন্দ্র-সংক্রান্ত পার্ব্বতীর সমস্ত কথা আলোচনা ক'রে তার কাছে ক্রমেই সব যেন পরিষ্কার হ'য়ে এল। শচীন্দ্র এবং পার্ব্বতীর মধ্যে যে একটা হৃদয়-ঘটিত ঘটনার অঘটন ঘটেছে এ সম্বন্ধে তার যেন আর সংশয় থাকতে চাইল না। ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিতে তার মুখটা ভরে উঠল। মনে মনে বললে, 'বাংলাদেশের এই সব নেড়ানেড়ীদের দিয়ে আবার দেশের স্বাধীনতা ফিরবে! যারা নিজেদের লীলা নিয়েই দিনরাত মত্ত তারা আবার প্রাণ দেবে দেশের জন্যে!' পার্ব্বতীকে আরও মূল্যহীন, বস্তুহীন ব'লে তার মনে হ'তে লাগল। ভাবলে, শচীন্দ্রকে দেশের কাজে ভজাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। এদের কাছে রঙ্গলালকেও তার মানুষের মত মানুষ বলে মনে হ'ল,—রঙ্গলালের মধ্যে অন্তত এই রঙ্গ ক'রে বেড়াবার ন্যাকামি নেই।

আসল কথা, নিখিলের প্রতি এই প্রকার সুকুমার মনোবৃত্তি অধুনা তার কঠোর চিত্তেও বোধ করি অন্তরে অন্তরে গোপনে দুর্ব্বলতার সঞ্চার করেছিল। নিজের সেই দুর্ব্বলতার আভাসকে তীব্র ঘৃণায় অস্বীকার করবার উত্তেজনায় কাউকে সে শান্তভাবে সহজভাবে বিচার করবার ধৈর্য্য মনে মনে রক্ষা করতে পারছিল না। তার নিজের চিত্তের অবজ্ঞাত, সদ্যজাগ্রত হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে তার নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অন্তরে তার সংগ্রাম চলছিল এবং সেই সংগ্রামে, তার মগ্ন অন্তরে তার পরাজয়ের চেতনায় তাকে নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি নিষ্ঠুর ক'রে তুলেছিল।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সে একখানি এক্কা ক'রে শহরটির ভূপরিচয়ের একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নিলে। শচীন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে যখন সে পৌঁছল, বেলা তখন পড়ে আসছে। ভগ্নপ্রাচীরবেষ্টিত নিস্তব্ধ বনাকীর্ণপ্রায় এই গৃহে প্রবেশ করতে সহসা সকলের সাহসে কুলত না। হঠাৎ দেখলে, বাড়ীটিতে লোক আছে বলে ধারণাই হয় না। বাটীর এক পাশের ঘর থেকে অল্প অল্প ধূমোদ্গীরণ-রেখা লক্ষ্য ক'রে সে গিয়ে ধীরে ধীরে কড়া নাড়া দিতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে দরজা খুলে একটি রুদ্রমূর্ত্তি হিন্দুস্থানী পাচক (মহারাজ) "কৌন হ্যয় রে" ব'লে সীমাকে দেখে অপরাধ-ভয়েই হোক বা স্ত্রীলোক-জ্ঞানে সমীহ ক'রেই হোক—এমন বিমূঢ় হ'য়ে পড়ল যে বাক্যব্যয়মাত্র না ক'রে পিছন ফিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ছাদে তার মনিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এবং অত্যন্ত উত্তেজিত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলতে লাগল, "মাইজি, আয়ী হ্যয়ে হুজুর। হামারা কুছ কসুর নহি হ্যয়। ময়নে সোঁচা কি কোই বদমাস⋯"

শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে বললে, "মাইজি কি রে? মাইজি কোত্থেকে এল?" হঠাৎ তার মনে হ'ল মৃত কমলা তার ধ্যানলোক থেকে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হ'য়েছে; কিংবা কমলা কি জীবিত? সে কি সত্যই ফিরতে পারে না?

"হাঁ হুজুর, মাইজি বেশক।"

"কি রকম দেখতে রে, খুব গোর?"

"হুঁ। নহি এতনা গোর নাহি।"

শচীন্দ্র বুঝতে পারলে কমলা নয়। কমলা হওয়া সম্ভবও নয়। যে মৃত তাকে জীবিত কল্পনা করার শিশুজনোচিত দুরাশা এখনও তাকে পরিত্যাগ করে নি মনে ক'রে তার হাসি পেল। মেয়েটি যে পার্ব্বতী এ-বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না, এবং পার্ব্বতীর স্নেহের এই নিদর্শনে তৎক্ষণাৎ মনটা তার কমলার চিন্তা থেকে পার্ব্বতীর প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

নীচে নেমে সে সীমাকে দেখবার পূর্ব্বেই "পার্ব্বতী" ব'লে ডেকে বেরিয়ে এল এবং একজন অপরিচিত তরুণীকে দেখে অকস্মাৎ যেন ভদ্রতা করবার ভাষাও খুঁজে পেল না।

শচীন্দ্রকে বিব্রত হ'য়ে পড়তে দেখে সীমা বললে, "আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, কিন্তু গত কয়েক দিন শুধু আপনার পরিচয়ই নিয়ে বেড়িয়েছি এবং অবশেষে আপনার গ্রামে গিয়ে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে এখানে এসেছি। পার্ব্বতী দেবীও আমার সঙ্গে আসতেন, কিন্তু কিছু বা[illegible] পড়ায় তিনি আসতে পারেন নি। আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করতে যে-বেগ পে[illegible] হয়েছে তাতেই বুঝছি এমন নির্জ্জনবাস আপনি ইচ্ছে ক'[illegible]

করেন নি এবং লোকে এখানেও আপনাকে এসে বিরক্ত করবে তা কখনই আপনি চান না।"

শচীন্দ্র এই মেয়েটির এই অসময় অকস্মাৎ একাকী আগমনে সত্যই এমন বিস্মিত হয়েছিল যে সহসা কি ভাবে তাকে সম্ভাষণ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সীমার বিরক্ত করার বারংবার উল্লেখে শচীন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললে, "না না, বিরক্ত কি, নির্জ্জন বাস আমার একটা খেয়াল। আসুন ভিতরে, হাত মুখ ধুয়ে একটু চা-টা খান, তার পর কথা হবে। ছি ছি আপনাকে অকারণে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।" ব'লে সীমার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ ক'রে বলতে লাগল, "কিন্তু এখানে আপনার খুব কষ্ট হবে। স্ত্রীলোক ত কেউ বাড়ীতে নেই—"

সীমা হেসে বললে "কেন! এই ত আমিই রয়েছি। অবিশ্যি যে-লোক সারা ভুবন ধাওয়া ক'রে আপনাকে এসে ধরেছে তাকে স্ত্রীলোক বলতে আপনার রুচিতে বাধবে—"

হিন্দুস্থানী ভৃত্য ও পাচকের সঙ্গে নির্জ্জনবাসে কাটিয়ে শচীন্দ্রের মনে মনে নিজের অজ্ঞাতে যে মার্জ্জিত জনের সঙ্গে আলাপের তৃষ্ণা জেগেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সীমার এই সহজ রহস্যালাপে সে খুশী হ'য়ে হেসে বললে, "আপনার উত্তর শুনে আমার একটা গল্প মনে হ'ল। প্যারিসে একটা দোকানে লেখা ছিল, 'ইংলিশ ইজ স্পোকন হিয়ার'। এক ইংরেজ সফরী অর্থাৎ টুরিষ্ট সেখানে গিয়ে যা বলে তা কেউ বোঝে না; সে ত চটেই খুন—শেষে প্রপ্রাইটারের পরিচিত একজন ইংরেজীনবীশ এলে সফরী বললে, 'এমন মিথ্যা কথা লিখে রাখার মানে কি? কেউ এখানে ইংরেজী বলে না, এমন কি বোঝেও না।' তখন সেই ইংরেজীবিদ্ ফরাসী ভদ্রলোকটি হেসে বললে, 'কেন মসিয়ে, আপনি কি এখানে ইংরেজী বলছেন না। ইংরেজী এখানে বলা হয় ছাড়া আর ত কিছু লেখা হয় নি?' ফরাসী জুয়াচুরির নমুনা দেখে ইংরেজটি তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে চটে চলে গেল। এটা অবশ্য জন-বুলের রসিকতাজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ফরাসী ঠাট্টা।"

"তাই ব'লে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাবেন না। আপনাকে আমার বড্ড দরকার। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনার চাকরকে দিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিচ্ছি। আপনি কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না।"

চাকরকে ডেকে "মা জীর" খেদমত করবার হুকুম দিয়ে সে ছাদে চলে গেল। সীমার এত সহজ সপ্রতিভ ভাবে তার মনটাও কি জানি কেন বেশ প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। পার্ব্বতীর সংবাদের জন্য তার মনের মধ্যে চঞ্চলতা থাকলেও সে সম্প্রতি তা প্রকাশ করলে না।

৫৪

সীমা ইচ্ছা ক'রেই প্রায় পরিচিত আত্মীয়ের মত সহজ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দিয়ে তার কাজ সুরু করেছিল। অল্প দু-এক দিনের মধ্যেই তার কার্য্য সাধন করতে হ'লে প্রথম থেকেই শচীন্দ্রের মনে আত্মীয়ের নিশ্চিন্ত সহজ বিশ্বাস উৎপাদন করা আবশ্যক। চাকর-বাকরের কাছে শচীন্দ্রের ছোট বোন বলে পরিচয় দিয়ে সে সহজেই তাদের আত্মীয়তা অর্জ্জন ক'রে নিয়েছিল; এবং শচীন্দ্রের সন্তপ্ত চিত্তে তার সহজ স্বচ্ছন্দ মনের স্নেহ-প্রভাব বিস্তার করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হয় নি।

কলকাতায় তখন অনিন্দিতা দেবীর নাম একেবারে অপরিচিত ছিল না। এক সময় শচীন্দ্রের মনেও নারী-ভবনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল। আজ সীমার সঙ্গে বসে তার নারীভবন সম্পর্কে সে বিস্তৃত আলোচনা সুরু ক'রে দিল।

সীমা তার অভ্যাস এবং নিয়ম অনুসারে তার সমস্ত আলোচনাকে যেমন ভারতবর্ষের মুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে উপস্থিত করে আজও তেমনি নিজেদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বললে, "কিন্তু এরকম কাজ হয়ত আরও দশজন বাংলাদেশে করছে, কিম্বা এর চেয়েও অনেক বিস্তৃত সুব্যবস্থিত সুপরিচালিত নারীপ্রতিষ্ঠান হয়ত আরও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর যেটা প্রধান কাম্য হওয়া উচিত সেই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। আপনার প্রতিষ্ঠিত কমলাপুরীর বিরাট ব্যবস্থার মধ্যেও সেই জিনিষটারই অভাব অনুভব ক'রে এসেছি। পার্ব্বতী দেবীর ত ও সম্বন্ধে কোন উৎসাহই নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু

পার্ব্বতীর এই আকস্মিক ব্যবহারের সঙ্গে কমলাপুরীতে পার্ব্বতীর যে ক্লান্ত উদাস মূর্ত্তি সে দেখেছিল তার যেন একটা নিগূঢ় যোগ আছে। চিন্তা করতে করতে পার্ব্বতীর প্রত্যেকটি আচরণ, শচীন্দ্র-সংক্রান্ত পার্ব্বতীর সমস্ত কথা আলোচনা ক'রে তার কাছে ক্রমেই সব যেন পরিষ্কার হ'য়ে এল। শচীন্দ্র এবং পার্ব্বতীর মধ্যে যে একটা হৃদয়-ঘটিত ঘটনার অঘটন ঘটেছে এ সম্বন্ধে তার যেন আর সংশয় থাকতে চাইল না। ব্যঙ্গপূর্ণ হাসিতে তার মুখটা ভরে উঠল। মনে মনে বললে, 'বাংলাদেশের এই সব নেড়ানেড়ীদের দিয়ে আবার দেশের স্বাধীনতা ফিরবে! যারা নিজেদের লীলা নিয়েই দিনরাত মত্ত তারা আবার প্রাণ দেবে দেশের জন্যে!' পার্ব্বতীকে আরও মূল্যহীন, বস্তুহীন ব'লে তার মনে হ'তে লাগল। ভাবলে, শচীন্দ্রকে দেশের কাজে ভজাবার চেষ্টা পণ্ডশ্রম হবে। এদের কাছে রঙ্গলালকেও তার মানুষের মত মানুষ বলে মনে হ'ল,—রঙ্গলালের মধ্যে অন্তত এই রঙ্গ ক'রে বেড়াবার ন্যাকামি নেই।

আসল কথা, নিখিলের প্রতি এই প্রকার সুকুমার মনোবৃত্তি অধুনা তার কঠোর চিত্তেও বোধ করি অন্তরে অন্তরে গোপনে দুর্ব্বলতার সঞ্চার করেছিল। নিজের সেই দুর্ব্বলতার আভাসকে তীব্র ঘৃণায় অস্বীকার করবার উত্তেজনায় কাউকে সে শান্তভাবে সহজভাবে বিচার করবার ধৈর্য্য মনে মনে রক্ষা করতে পারছিল না। তার নিজের চিত্তের অবজ্ঞাত, সদ্যজাগ্রত হৃদয়াবেগের বিরুদ্ধে তার নিজের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতে অন্তরে তার সংগ্রাম চলছিল এবং সেই সংগ্রামে, তার মগ্ন অন্তরে তার পরাজয়ের চেতনায় তাকে নিজের প্রতি এবং অপরের প্রতি নিষ্ঠুর ক'রে তুলেছিল।

ষ্টেশন থেকে বেরিয়ে সে একখানি এক্কা ক'রে শহরটির ভূপরিচয়ের একটা মোটামুটি ধারণা ক'রে নিলে। শচীন্দ্রের বাড়ীতে গিয়ে যখন সে পৌছল, বেলা তখন পড়ে আসছে। ভগ্নপ্রাচীরবেষ্টিত নিস্তব্ধ বনাকীর্ণপ্রায় এই গৃহে প্রবেশ করতে সহসা সকলের সাহসে কুলত না। হঠাৎ দেখলে, বাড়ীটিতে লোক আছে বলে ধারণাই হয় না। বাটীর এক পাশের ঘর থেকে অল্প অল্প ধূমোদ্গীরণ-রেখা লক্ষ্য ক'রে সে গিয়ে ধীরে ধীরে কড়া নাড়া দিতে লাগল।

মিনিট পাঁচেক পরে দরজা খুলে একটি রুদ্রমূর্ত্তি হিন্দুস্থানী পাচক (মহারাজ) "কৌন হ্যয় রে" ব'লে সীমাকে দেখে অপরাধ-ভয়েই হোক বা স্ত্রীলোক-জ্ঞানে সমীহ ক'রেই হোক—এমন বিমূঢ় হ'য়ে পড়ল যে বাক্যব্যয়মাত্র না ক'রে পিছন ফিরে ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটে ছাদে তার মনিবের কাছে গিয়ে উপস্থিত হ'ল। এবং অত্যন্ত উত্তেজিত সম্ভ্রমের সঙ্গে বলতে লাগল, "মাইজি, আয়ী হ্যয়ে হুজুর। হামারা কুছ কসুর নহি হ্যয়। ময়নে সোঁচা কি কোই বদমাস···"

শচীন্দ্র তাড়াতাড়ি উঠে বললে, "মাইজি কি রে? মাইজি কোত্থেকে এল?" হঠাৎ তার মনে হ'ল মৃত কমলা তার ধ্যানলোক থেকে অকস্মাৎ এসে উপস্থিত হ'য়েছে; কিংবা কমলা কি জীবিত? সে কি সত্যই ফিরতে পারে না?

"হাঁ হুজুর, মাইজি বেশক।"

"কি রকম দেখতে রে, খুব গোর?"

"হুঁ। নহি এত্‌না গোর নাহি।"

শচীন্দ্র বুঝতে পারলে কমলা নয়। কমলা হওয়া সম্ভবও নয়। যে মৃত তাকে জীবিত কল্পনা করার শিশুজনোচিত দুরাশা এখনও তাকে পরিত্যাগ করে নি মনে ক'রে তার হাসি পেল। মেয়েটি যে পার্ব্বতী এ-বিষয়ে তার সন্দেহ রইল না, এবং পার্ব্বতীর স্নেহের এই নিদর্শনে তৎক্ষণাৎ মনটা তার কমলার চিন্তা থেকে পার্ব্বতীর প্রতি করুণায় পূর্ণ হয়ে উঠল।

নীচে নেমে সে সীমাকে দেখবার পূর্ব্বেই "পার্ব্বতী" ব'লে ডেকে বেরিয়ে এল এবং একজন অপরিচিত তরুণীকে দেখে অকস্মাৎ যেন ভদ্রতা করবার ভাষাও খুঁজে পেল না।

শচীন্দ্রকে বিব্রত হ'য়ে পড়তে দেখে সীমা বললে, "আমার সঙ্গে আপনার পরিচয় নেই, কিন্তু গত কয়েক দিন শুধু আপনার পরিচয়ই নিয়ে বেড়িয়েছি এবং অবশেষে আপনার গ্রামে গিয়ে আপনার ঠিকানা সংগ্রহ ক'রে এখানে এসেছি। পার্ব্বতী দেবীও আমার সঙ্গে আসতেন, কিন্তু কিছু বাধা পড়ায় তিনি আসতে পারেন নি। আপনাকে বিরক্ত করতে এলাম। আপনার ঠিকানা সংগ্রহ করতে যে-বেগ পেতে হয়েছে তাতেই বুঝছি এমন নির্জ্জনবাস আপনি ইচ্ছে ক'রে

করেন নি এবং লোকে এখানেও আপনাকে এসে বিরক্ত করবে তা কখনই আপনি চান না।"

শচীন্দ্র এই মেয়েটির এই অসময় অকস্মাৎ একাকী আগমনে সত্যই এমন বিস্মিত হয়েছিল যে সহসা কি ভাবে তাকে সম্ভাষণ করবে ভেবে পাচ্ছিল না। সীমার বিরক্ত করার বারংবার উল্লেখে শচীন্দ্র লজ্জিত হয়ে বললে, "না না, বিরক্ত কি, নির্জ্জন বাস আমার একটা খেয়াল। আসুন ভিতরে, হাত মুখ ধুয়ে একটু চা-টা খান, তার পর কথা হবে। ছি ছি আপনাকে অকারণে বাইরে দাঁড় করিয়ে রেখেছি।" ব'লে সীমার সঙ্গে ভিতরে প্রবেশ ক'রে বলতে লাগল, "কিন্তু এখানে আপনার খুব কষ্ট হবে। স্ত্রীলোক ত কেউ বাড়ীতে নেই—"

সীমা হেসে বললে "কেন! এই ত আমিই রয়েছি। অবিশ্যি যে-লোক সারা ভুবন ধাওয়া ক'রে আপনাকে এসে ধরেছে তাকে স্ত্রীলোক বলতে আপনার রুচিতে বাধবে—"

হিন্দুস্থানী ভৃত্য ও পাচকের সঙ্গে নির্জ্জনবাসে কাটিয়ে শচীন্দ্রের মনে মনে নিজের অজ্ঞাতে যে মার্জ্জিত জনের সঙ্গে আলাপের তৃষ্ণা জেগেছিল তাতে আর সন্দেহ নেই। সীমার এই সহজ রহস্যালাপে সে খুশী হ'য়ে হেসে বললে, "আপনার উত্তর শুনে আমার একটা গল্প মনে হ'ল। প্যারিসে একটা দোকানে লেখা ছিল, 'ইংলিশ ইজ স্পোকন হিয়ার'। এক ইংরেজ সফরী অর্থাৎ টুরিষ্ট সেখানে গিয়ে যা বলে তা কেউ বোঝে না; সে ত চটেই খুন—শেষে প্রপ্রাইটারের পরিচিত একজন ইংরেজীনবীশ এলে সফরী বললে, 'এমন মিথ্যা কথা লিখে রাখার মানে কি? কেউ এখানে ইংরেজী বলে না, এমন কি বোঝেও না।' তখন সেই ইংরেজীবিদ্ ফরাসী ভদ্রলোকটি হেসে বললে, 'কেন মসিয়ে, আপনি কি এখানে ইংরেজী বলছেন না। ইংরেজী এখানে বলা হয় ছাড়া আর ত কিছু লেখা হয় নি?' ফরাসী জুয়াচুরির নমুনা দেখে ইংরেজটি তৎক্ষণাৎ ঘাড় ফিরিয়ে চটে চলে গেল। এটা অবশ্য জন-বুলের রসিকতাজ্ঞান সম্বন্ধে একটা ফরাসী গল্প।"

"তাই ব'লে আপনি ঘাড় ফিরিয়ে চলে যাবেন না। আপনাকে আমার বড্ড দরকার। না না, আপনি ব্যস্ত হবেন না। আমি আপনার চাকরকে দিয়ে সব ঠিকঠাক করিয়ে নিচ্ছি। আপনি কিছুমাত্র ব্যস্ত হবেন না।"

চাকরকে ডেকে "মা জীর" খেদমত করবার হুকুম দিয়ে সে ছাদে চলে গেল। সীমার এত সহজ সপ্রতিভ ভাবে তার মনটাও কি জানি কেন বেশ প্রসন্ন হ'য়ে উঠল। পার্ব্বতীর সংবাদের জন্য তার মনের মধ্যে চঞ্চলতা থাকলেও সে সম্প্রতি তা প্রকাশ করলে না।

৫৪

সীমা ইচ্ছা ক'রেই প্রায় পরিচিত আত্মীয়ের মত সহজ নিঃসঙ্কোচ ব্যবহার দিয়ে তার কাজ সুরু করেছিল। অল্প দু-এক দিনের মধ্যেই তার কার্য্য সাধন করতে হ'লে প্রথম থেকেই শচীন্দ্রের মনে আত্মীয়ের নিশ্চিন্ত সহজ বিশ্বাস উৎপাদন করা আবশ্যক। চাকর-বাকরের কাছে শচীন্দ্রের ছোট বোন বলে পরিচয় দিয়ে সে সহজেই তাদের আত্মীয়তা অর্জ্জন ক'রে নিয়েছিল; এবং শচীন্দ্রের সন্তপ্ত চিত্তে তার সহজ স্বচ্ছন্দ মনের স্নেহ-প্রভাব বিস্তার করতে তাকে বেশী বেগ পেতে হয় নি।

কলকাতায় তখন অনিন্দিতা দেবীর নাম একেবারে অপরিচিত ছিল না। এক সময় শচীন্দ্রের মনেও নারী-ভবনের কার্য্যকলাপ সম্বন্ধে কৌতূহল জেগেছিল। আজ সীমার সঙ্গে বসে তার নারীভবন সম্পর্কে সে বিস্তৃত আলোচনা সুরু ক'রে দিল।

সীমা তার অভ্যাস এবং নিয়ম অনুসারে তার সমস্ত আলোচনাকে যেমন ভারতবর্ষের মুক্তির প্রসঙ্গ নিয়ে উপস্থিত করে আজও তেমনি নিজেদের কার্য্যকলাপ সম্পর্কে বিস্তৃত বিবরণ দিয়ে বললে, "কিন্তু এরকম কাজ হয়ত আরও দশজন বাংলাদেশে করছে, কিম্বা এর চেয়েও অনেক বিস্তৃত সুব্যবস্থিত সুপরিচালিত নারীপ্রতিষ্ঠান হয়ত আরও গড়ে উঠতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক ভারতবাসীর যেটা প্রধান কাম্য হওয়া উচিত সেই স্বাধীনতার উদ্দেশ্য নিয়ে আমাদের প্রত্যেক প্রতিষ্ঠানের সমস্ত কাজকে নিয়ন্ত্রিত করার চেষ্টা তাদের মধ্যে নেই। আপনার প্রতিষ্ঠিত কমলাপুরীর বিরাট ব্যবস্থার মধ্যেও সেই জিনিষটারই অভাব অনুভব ক'রে এসেছি। পার্ব্বতী দেবীর ত ও সম্বন্ধে কোন উৎসাহই নেই, থাকার কথাও নয়। কিন্তু

কোন মানুষের মধ্যে এই স্বাধীনতার প্রেরণাকে নির্ব্বাপিত ক'রে লোকশিক্ষা দেবার রীতিটা ত আমার মনে হয় জীবনের মহত্তম উদ্দেশ্য থেকে বঞ্চিত ক'রে শুধু সঙ্কীর্ণ স্বার্থান্বেষী গ'ড়ে তোলারই তুল্য। এ-বিষয়ে আপনার মতটা স্পষ্ট ক'রে জানতে চাই।"

শচীন্দ্র হাল্কাভাবে হেসে বললে, "যে-মত নিজের কাছেই সুস্পষ্ট নয় তাকে অন্যের কাছে বলতে গেলে অধিকাংশ বানিয়ে বলাই হয়। জানেন ত, আমরা বাংলাদেশের জমিদার; দেশের সঙ্গে আমাদের যেটুকু সম্পর্ক সেটুকু জমিদারীসংক্রান্ত। সেই জমিদারীটুকুকে রক্ষা করতে হ'লে আমাদের তাকিয়ে থাকতে হয় সূর্য্যাস্ত-আইনের দিকে। সেই আইনের হাতে আত্মরক্ষা করতে, যাদের দেশ বলছেন, তাদেরই অস্থিপঞ্জরচূর্ণ না ক'রে আমাদের উপায় নেই। সুতরাং দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করবার মনোবৃত্তি কোন কালে আমাদের গ'ড়ে ওঠে না। ইংরেজী শিক্ষায় বড় জোর কেউ একটা হাই স্কুল, একটা চারিটেবল ডিসপেন্সারী, মেয়ে স্কুল এই ক'রেই বাহবা পেয়ে এসেছি। দেশের স্বাধীনতার কথা চিন্তা করতেও সর্ব্বনাশের ভয়ে মনে মনে চটে উঠি। স্বাধীনতার কথা আমাদের ভাবতে নেই, ভিতরে ভিতরে এমনি একটা সংস্কার দাঁড়িয়ে গেছে। ভারতবর্ষের স্বাধীনতা! ও দুটো পরস্পরবিরোধী কথা —কি বলেন, তাই না?"

নিখিলনাথের সঙ্গে তর্কে সীমা যে রকম অধৈর্য্য হ'য়ে পড়ত এ ক্ষেত্রে তা হবার কারণ ছিল না। নিখিলনাথের কাছে সে যে প্রকাণ্ড আশা নিয়ে উপস্থিত হ'ত এখানে তার বিপরীত ধারণা নিয়েই সে সুরু করেছিল। তাই শচীন্দ্রের পরিহাস-ছলেও নিজেদের এই আত্মবিশ্লেষণে বরং একটু খুশীই হ'ল মনে মনে। শচীন্দ্রকে যতটা ইংরেজপদবিলেহী হৃতপুষ্ট অপদার্থ শ্রেণীর ব'লে সে ভেবেছিল, সে দেখলে যে ঠিক সে-শ্রেণীর জীব সে নয়। তা ছাড়া, বোধ করি অমায়িক প্রসন্ন আচরণে শচীন্দ্রের বিশ্বাস এবং বন্ধুত্ব অর্জ্জন করার আবশ্যকও তার ছিল। তাই সে আলোচনাটা অন্য রাস্তায় পরিচালিত করবার চেষ্টা করলে। বললে, "কথাটা একরকম আপনি ঠিকই বলেছেন। স্বাধীনতা আনতে গেলে আপাতবিশৃঙ্খলা এবং সুখস্বাচ্ছন্দ্যশান্তি-বিপর্য্যয়ের যে ছবি আমাদের চিত্তে জেগে ওঠে আমাদের 'বোতাম-আঁটা জামার নীচে শান্তিতে শয়ান, পোষমানা প্রাণে' তা ধারণা করতেও আমরা আতঙ্কিত না হয়ে থাকতে পারি না। তবু দেখুন, মানুষের মধ্যে স্বাধীনতা-প্রবৃত্তি এমনি স্বাভাবিক যে ইচ্ছা ক'রেই হোক বা অজ্ঞাতসারেই হোক যে-বিধবাগুলির শিক্ষার ব্যবস্থা আপনি করেছেন তাদের মনে সেই পরাধীনতার শৃঙ্খল ছিন্ন করবার শক্তি দেবার জন্যেই তা করেছেন। তাই আপনি আপনার সমস্ত শক্তি, সমস্ত অর্থ, সমস্ত চিন্তা আনন্দে নিয়োগ ক'রে চলেছেন। আপনি ঠিক পথই নিয়েছেন। যে স্বাধীনতার বীজ তাদের মধ্যে আপনি ছড়াচ্ছেন একদিন তা—"

শচীন্দ্র তার নিজের প্রশংসাতেই হোক বা তার কমলাপুরীর নিগূঢ় ব্যাখ্যাতেই হোক একটু বিচলিত হ'য়ে বাধা দিয়ে সলজ্জ হেসে বললে, "দেখুন প্রশংসা শোনা পাপ, মিথ্যে প্রশংসা শোনা আরও পাপ। প্রথমত কমলাপুরী সম্বন্ধে কোন প্রশংসাই আমার প্রাপ্য নয়; এর প্রথম থেকে শেষ পর্য্যন্ত সমস্ত কৃতিত্ব পার্ব্বতী দেবীর। তিনি লক্ষ বার প্রশংসা পাবার যোগ্য—তিল তিল ক'রে নিজেকে দান ক'রে তিনিই এই প্রতিষ্ঠানের প্রাণ সঞ্চার করেছেন। (শচীন্দ্র সম্বন্ধে পার্ব্বতীর প্রায় অনুরূপ উক্তিগুলি স্মরণ ক'রে কিছু কৌতুক কিছু কৌতূহলে সে শচীন্দ্রের প্রতি একটা বক্র দৃষ্টি নিক্ষেপ ক'রে নিলে)। তাঁর মধ্যে জনহিতের গভীর প্রেরণা না থাকলে আজ এই প্রতিষ্ঠান সম্ভবই হ'ত না।—"

সীমা হাসি চেপে ভালমানুষের মত সুরে বললে, "পার্ব্বতী দেবীও আপনার সম্বন্ধে প্রায় ঐ কথাই বলছিলেন। বললেন, 'আমি ত কর্ম্মচারী বই ত নয়। শচীন বাবুই এর সব।'" সীমা ইচ্ছা ক'রেই কথাটাকে বিকৃত ক'রে বললে।

শচীন্দ্র আহত হ'য়ে জিজ্ঞেস করলে, "কর্ম্মচারী! তিনি বললেন?

"হুঁ, বললেন এর মধ্যে তাঁর কোন হাত নেই, কর্তৃত্বও নেই।"

"না না সে কি কথা! তিনিই সব। এর প্রত্যেকটি পরিকল্পনা, প্রত্যেকটি প্রত্যঙ্গ, প্রত্যেকটি অনুষ্ঠান তাঁরই প্রাণের প্রশ্বাসে সঞ্জীবিত। আমি এর কে! আমি

কিছুই না। মানবের হিতসাধন কোন দিন আমার চিত্তকে চঞ্চল ক'রে নি। দেশের সেবা এমন কি বাংলার সেবা কিংবা নারীজাতির মঙ্গলসাধন, কোন কালে আমার চিত্তে স্থান পায় নি। আমার পত্নীর স্মৃতিকল্পে যে-কোন একটা কিছু করতে পারলেই আমি তৃপ্ত হতাম। পার্ব্বতী, পার্ব্বতীই তাঁর প্রাণ দিয়ে হৃদয় দিয়ে এবং অক্লান্ত সেবা দিয়ে একে গড়ে তুলেছেন। তা নইলে জনহিতটিত ও-সব আমি কখনও চিন্তাও করি নি। কর্ম্মচারী! তিনিই কমলাপুরীর অধিষ্ঠাত্রী দেবী—"

কথাটা ব'লেই শচীন্দ্রের একটু বিসদৃশ বোধ হ'তে লাগল। সে লজ্জিত হয়ে চুপ ক'রে গেল। উচ্ছ্বাসের মুখে তার পত্নীর স্মৃতির প্রতি এ যেন একপ্রকার অবমাননা। সে অন্যদিকে ফিরে নিজের এই অপরাধ অনুভব করতে চেষ্টা করতে লাগল কিন্তু অল্পক্ষণের মধ্যেই সে-ভাব তার মন থেকে মুছে গিয়ে পার্ব্বতী যে নিজেকে 'কর্ম্মচারী মাত্র' ব'লে উল্লেখ ক'রেছে, পরিত্যক্ত পার্ব্বতীর সেই উক্তি অভিমানজনিত কল্পনা ক'রে, অনুতপ্ত চিত্তে মনে মনে সেই বিষয় আলোচনা করতে লাগল।

শচীন্দ্রের ও পার্ব্বতীর মনোভাব সম্বন্ধে সীমার আর কোন সন্দেহ রইল না। 'অধিষ্ঠাত্রী দেবী' কথাটা তার কানে কৌতুকাবহ বোধ হ'লেও কথাটাকে সে সম্পূর্ণ এড়িয়ে গেল। যদিও তার মনে আর সন্দেহ ছিল না যে শচীন্দ্র তার কথায় তাদের কাজে এসে যোগ দেবে না, তবু সে একবার শেষ চেষ্টা ক'রে দেখলে। নিজেকে গুছিয়ে নিয়ে মনে মনে একটা মোটামুটি রিহারস্যাল দিয়ে, সংযত অথচ ভাবালুতার আভাসে স্নিগ্ধ গভীর স্বরে সে বলতে লাগল "দেখুন, সত্যি কথা বলতে কি, জনহিতব্রত, অর্থাৎ নিছক লোকের মঙ্গলের জন্যে কিছু করা, মানুষের পক্ষে স্বাভাবিক নয়। ওটা সভ্যজগতে সুরু হ'য়েছিল আত্মরক্ষার্থে। ক্রমে মানুষ যত পাকা সামাজিক জীব হয়ে উঠতে লাগল ততই ও-জিনিষটার উপর একটা মহত্তর উদ্দেশ্য আরোপ করলে এবং পুণ্যলোভী মানুষকে পরহিতসাধনে প্রলুব্ধ ক'রে তুললে। কিন্তু স্বাধীনতার ইচ্ছা আমাদের জন্মগত, মজ্জাগত সুতরাং স্বাভাবিক। তাই মানুষ প্রতিনিয়ত ধর্ম্মের মধ্যে, সমাজের মধ্যে, রাষ্ট্রের মধ্যে কেবল মুক্তি কামনা ক'রে চলেছে। আর এক দল স্বার্থান্বেষী মানুষ যুগের পর যুগ এদের বাঁধতে চেয়েছে বৈরাগ্যের, সংযমের, শান্তির লোভ দেখিয়ে। কিন্তু পারে নি। মানুষ মানুষের চাপে মুক্তির নিশ্বাসের জন্যে হাঁপিয়ে উঠেছে। সেই আদিম তৃষ্ণা, সেই মহান চেষ্টা, কেউ টুঁটি চেপে মারতে পারে না। সেই তৃষ্ণা এই আমাদের মধ্যেও, জড় ব'লে নির্জ্জীব ব'লে, মৃত ব'লে যাদের জীবিতের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে—তাদের মধ্যেও তীব্র ব্যাকুল চিত্তপ্লাবী কান্নায় ফেটে পড়তে চাচ্ছে। স্বভাবের সেই শ্রেষ্ঠতম, মহত্তম, পবিত্রতম সম্পদলাভে কেন আমরা নিজেদের বঞ্চিত ক'রে রাখব?—আমরা মহাকাশের মূল্যে ক্রয় করা একমুষ্টি উচ্ছিষ্টের লোভে লৌহপিঞ্জরের মধ্যে ব'সে নিমীলিত নেত্রে ইষ্টনাম জপ করব কেন?"

বলতে বলতে সীমা উঠে এসে সহসা শচীন্দ্রের দুটো হাত ধরে বললে, "দেখুন, আপনার চাকরদের কাছে আপনার বোন ব'লে আমি পরিচয় দিয়েছি। এই প্রগলভা ছোট বোনটির কথা শুনুন। ঝেড়ে ফেলুন আপনার ভাববিলাসী মনের জড়তা। নেমে আসুন আপনার সমস্ত শক্তি নিয়ে যেখানে মানুষের চাপে মানুষ পিষে মারা যাচ্ছে, মানুষের দেবতা যেখানে লাঞ্ছিত হয়েছে। আপনার সমস্ত অর্ঘ্য দিয়ে সেই শ্মশানকে মুক্তিতীর্থে পরিণত করুন।" ব'লে সে ভাবাবেগে অভিভূত হয়েই যেন তার স্থির দৃষ্টি আকাশের দিকে তুলে চুপ ক'রে পাশে বসে পড়ল।

শচীন্দ্র অবাক হ'য়ে চাইল তার মুখের দিকে। ভাবলে এমনি ক'রে নিজেকে ভুলে একটা মহত্তর কাজের মধ্যে সম্পূর্ণ আত্মহারা হ'তে পারলে সে বেঁচে যেত। অপরিচিতা তন্বী মেয়েটির অপূর্ব্ব নিষ্ঠা, দেশের কাজে আত্মদানের মহত্ত্ব তাকে অভিভূত করতে লাগল। কি যে তার কাজের স্বরূপ তা সে ঠিকমত জানে না; কিন্তু এই নিঃসঙ্গ মেয়েটি যে তার গৃহ, তার সমাজ, তার ব্যক্তিগত সমস্ত সুখস্বাচ্ছন্দ্য আরাম-আনন্দ পরিত্যাগ ক'রে বেরিয়ে পড়েছে, সহায়-সহানুভূতিবিহীন নিষ্ঠুর সংসারের মধ্যে, তাদেরই জন্যে যারা তার আহ্বানকে বাতুলের প্রলাপ ব'লে অশ্রদ্ধা করবে,—এরই করুণা তার মনকে গভীর ভাবে স্পর্শ করলে। তবু তার বড় প্রিয় সেই স্মৃতি-মন্দিরের পবিত্রতা অন্য সাংসারিক বিক্ষোভের আঘাতে আবিল হয়ে উঠবে, এ সে ভাবতে পারে না।

সে ধীরে ধীরে বলতে লাগল, "দেখুন আপনার বাইরের পরিচয় আমি জানি নে; কিন্তু এই অল্পক্ষণের মধ্যে আপনার অন্তরের যে-পরিচয় আমি পেয়েছি তাকে তুচ্ছ করতে পারি এত স্পর্দ্ধা আমার নেই। আপনার বয়স অল্প কিন্তু আপনার ত্যাগে, আপনার নিষ্ঠায় আপনি আপনার বয়স এবং আপনার বন্ধনকে অতিক্রম ক'রে গিয়েছেন। সমস্ত বন্ধনকে অতিক্রম করতে না পারলে কেউ আপনার মত এমনি ক'রে বেরিয়ে পড়তে পারে না। সেই বন্ধনই আমাকে আমার ক্ষুদ্র প্রচেষ্টার মধ্যে এমন ক'রে আবদ্ধ ক'রে রেখেছে। শক্তি আমার কিছুই নাই, যা নিয়ে আপনার বিরাট মুক্তি-কামনার তীর্থে অর্ঘ্য দান করতে পারি।" ব'লে একটু থেমে বললে, "পার্ব্বতী দেবী ছাড়া আজ আমার পক্ষে এ-প্রতিষ্ঠানও গ'ড়ে তোলা অসম্ভব হ'ত। বাকী আমার যেটুকু শক্তি সে আমার পিতৃদত্ত অর্থ—তার যতটুকু আমি কমলাপুরীর কল্যাণে ব্যয় করি ততটুকুই আমার সান্ত্বনা এবং যতটুকু আমার নিরুদ্দিষ্ট পুত্রের স্মরণে সঞ্চিত রাখি সেইটুকুই আমার নিরাশ্রয় চিত্তের দুরাশা—বাকী আর আমার কিছুই নেই। আপনি আপনার নারীভবনকে আপনার মুক্তিমন্ত্রে গ'ড়ে তুলুন, কমলাপুরীর সমাধিমন্দিরকে সমাধিক্ষেত্র ব'লেই জানবেন—সে আমার ব্যক্তিগত জীবনের গোপন তীর্থ। আমাকে ক্ষমা করবেন, বাইরের জনতার মুক্তি-কোলাহল দিয়ে আমার সেই নির্জ্জনতাকে ক্ষুব্ধ করা আমার সম্ভব নয়।"

সীমা মনে মনে বিরক্ত হয়ে উঠল। ভাবলে রঞ্জ-দার কথাই ঠিক। এরা আবার জমিদারীর মায়া, টাকার মায়া ছাড়বে। বেশ মজার কথা; অর্দ্ধেক টাকা মৃতা পত্নীর জন্যে সমাধি আর বাকী টাকা পালানো ছেলের জন্যে জমা দি, আছে বেশ। এই সব প্যানপেনে লোকেরা কি ইচ্ছে ক'রে নাববে? গুঁতোর চোটে এরা বাবা বলে। দাঁড়াও তোমাকে একবার রঞ্জ-দার হাতে ফেলি, সেই তোমার ঠিক ওষুধ। ওসব নাকে কান্নার ভব্য চারুকলার সে ধার ধারে না। ভাবলে, দেশটা জুড়েই কি এই যাত্রার দলের নায়ক-নায়িকা ছাড়া আর মানুষ নেই? দাঁড়াও তোমাকে নিয়ে একবার খাঁচায় ত পুরি—তার পর।

মুখে অত্যন্ত সহৃদয় বন্ধুত্বের ভাব টেনে এনে সে বললে, "দেখুন, আমি না জেনে হয়ত আপনাকে অকারণে উত্যক্ত করেছি। আপনার নির্জ্জন-সাধনার পবিত্রতাকে আমার অশান্ত চিত্তের কোলাহল দিয়ে আমি নষ্ট করতে চাই না। আপনার কমলাপুরী দেখে আমার মনে হয়েছিল যে আমার দেশের মুক্তিকামনার পথে আপনি আমার কাজ অনেকখানি এগিয়ে রেখেছেন। তাই বড় আশা করেছিলাম যে আমার ক্ষুদ্র শক্তি দিয়ে যা সম্ভব হয় নি আপনার সাহায্যে তাকে সফল ক'রে তুলব। কিন্তু বুঝতে পারছি আপনার মন অন্য সুরে বাঁধা। আপনাকে আর বিরক্ত করব না। কালই আমাকে ফিরে যেতে হবে; আমার অনেক কাজ পড়ে আছে। তা ছাড়া—" ব'লে সে যেন চিন্তাকুল হ'য়েই একটু চুপ করলে।

শচীন্দ্র এই মেয়েটির হতাশ পীড়িত চিত্তের ব্যথিত কণ্ঠে একটু লজ্জিত হয়ে বলতে লাগল, "দেখুন, অকারণে আমার শক্তি সম্বন্ধে একটা আশা পোষণ করেছিলেন ব'লেই আজ হতাশার কথা বলছেন। আমাকে আর লজ্জা দেবেন না। যে তুষের শস্য কেটে নিঃশেষে করেছে তাকে আছাড় মারলে আর কি কিছু পাবেন? কিন্তু কি যেন বলতে গিয়ে আপনি চুপ ক'রে গেলেন; কেন? কোন কথা কোন ভর্ৎসনাই আমার পক্ষে অপ্রযুজ্য নয়। এই কথাই ত বলছিলেন যে, 'তা ছাড়া আপনার অপদার্থতা এত স্পষ্ট ক'রে আগে বুঝতে পারি নি'; অকারণে দেশের কাজের এতগুলো পয়সা এবং সময় আপনার অপব্যয় হ'ল। আপনি যদি কিছু না মনে করেন তবে আমার সামান্য শক্তি অনুসারে আপনাকে অল্প কিছু পাথেয়-স্বরূপ দেব, আর—"

সীমা বাধা দিয়ে বললে, "না না, ও-রকম কথা আপনার সম্বন্ধে আমার মনেই হয় না। আমি অন্য কথা ভাবছিলাম। কিন্তু আপনাকে সে-কথা জানালে আমার নবলব্ধ বন্ধুটি আমাকে ক্ষমা করবেন কি না, তাই ভাবছি।"

'নবলব্ধ বন্ধু' বলতে নিজের কথা মনে ক'রে শচীন বললে, "আমি কিছু মনে করব না। আপনি নিশ্চিন্ত মনে যা খুশী বলে যেতে পারেন। শক্তি আমার অবশ্য—"

"না না, আপনার কথা হচ্ছে না। আমি পার্ব্বতী দেবীর কথা বলছি।" ব'লে সে আবার চিন্তাশীল হয়ে পড়ল।

"পার্ব্বতী!" ব'লে শচীন্দ্র উৎকণ্ঠিত হয়ে সোজা হ'য়ে বসল। বলুন তিনি কি বারণ করেছেন নাকি বলতে?

মনে মনে কৌতুক অনুভব ক'রে নিরীহ কণ্ঠে সীমা বললে, "না ঠিক বারণ করেন নি। তবে তিনিও এখানে আমার সঙ্গেই আসছিলেন কি না। তা, হঠাৎ আসা বন্ধ হয়ে গেল।"

শচীন আরও উৎকণ্ঠা প্রকাশ ক'রে বললে, "কেন, তিনি কি অসুস্থ হ'য়ে পড়েছেন? কই এসে ত কিছু বলেন নি!"

"অসুস্থ হয়ে পড়েছেন বললে ঠিক হবে না। আমি ভেবেছিলাম আপনি জানেন। মানে—"

"আমি ঠিক বুঝতে পারছি না। আপনি দয়া ক'রে একটু খুলে বলুন।"

সীমা নিজের অভিনয়ে খুশী হ'য়ে একটু বেধে বেধে বললে, "তিনি ত আজ মাস দুই কি-একটা কলিক-পেনে ভুগছেন। আমার সঙ্গে আসার সব ঠিক। তা কলকাতায় এসে কাল এত ব্যথা হ'ল যে আর আসা সম্ভব হ'ল না। ডাক্তার ত বলছে য়্যাপেণ্ডিসাইটিস্। অপারেশন করা দরকার।"

"য়্যাপেণ্ডিসাইটিস্! তাঁকে ফেলে এলেন? মানে, তাঁকে দেখবার কে রইল? আমার বাড়ীতে ত কোন— একটা নার্স ঠিক ক'রে—"

সীমার হাসি বাধা মানতে চাইছিল না। অনেক সামলে কৌতুকের হাসিকে চেষ্টায় একটু সহানুভূতির হাসিতে পরিণত ক'রে সে বললে, "কিছু চিন্তা করবেন না। তাঁকে আমাদের বাড়ীতে মার কাছে, দাদার হেপাজতে রেখে এসেছি। বেলগাছিয়াতে আমার এক দাদা ডাক্তার আছেন, তাঁকে দিয়ে পরশু গিয়ে সব বন্দোবস্ত করব ব'লে পার্ব্বতী দেবীকে কথা দিয়ে এসেছি। তাই তাড়াতাড়ি করছি। আপনাকে বললে যে আপনি চিন্তিত হ'(পড়বেন এই আশঙ্কায় বোধ হয় তাঁর আপনাকে জানাতে আপত্তি ছিল। তা ছাড়া আপনার মন-টন ভাল নেই আপনার শান্তি নষ্ট করতে বোধ হয়—"

"শান্তি নষ্ট!" পার্ব্বতীর অভিমানের ধাক্কাটা মনে মনে অনুভব ক'রে বললে, "আমার ভারি অন্যায় হ'(গেছে। স্বার্থান্ধ হ'য়ে আমি এই দুমাস কারো সংবাদ নেই নি। ও:, তিনি আমার জন্যে যা করেছেন! জানেন বিলেতে আমি মরতেই বসেছিলাম। তিনি সেবা ক'(আমায় বাঁচিয়ে তুলেছিলেন। ছি ছি।" ব'লে (নিতান্ত অনুতপ্ত হয়েই চিন্তা করতে লাগল।

শিকার ফাঁদে পা রাখলে শিকারীর মনে যেমন উল্লা(উত্তেজনার সৃষ্টি হয়, অথচ স্তব্ধ নিষ্ঠুরতার জমাট মূর্ত্তি(মত তার দিকে সে স্থির উদ্‌গ্রীব হয়ে চেয়ে থাকে, সীম(ঠিক তেমনি ক'রে শচীন্দ্রের মনের গতিবিধি লক্ষ্য করছিল অল্প অপেক্ষা করতেই তার শেষ প্ল্যানটুকুও পূর্ণ হ'ল।

শচীন বললে, "আপনি আজই কলকাতা থেকে এসেছে(তাই বলতে লজ্জা হচ্ছে। দেখুন, শেষ-রাত্রে এক(ট্রেন আছে, কাল সন্ধ্যায় পৌঁছবে। আমি বরং তা(চলে যাই। আমাকে আপনার বাড়ীর ঠিকানাটা ব'লে দি(তা হ'লেই হবে। কিছু মনে করবেন না। কিছুমা(আতিথ্য করতে পারলুম না, আবার আপনাকে একলা—"

সীমা হেসে বললে, "আমার কিছু কষ্ট হবে না আমি সঙ্গেই যেতে পারব। ও রকম ট্রাভল্ করা আমা(অভ্যাস আছে। আমি গেলে দাদাকে দিয়ে সব ঠিক ক'(দেব। আপনি কিছু সঙ্কোচ করবেন না। দমদম(আমাদের বাড়ী—সেখান থেকে বন্দোবস্ত করা সোজা হবে।"

(ক্রমশঃ)



নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১২

বৌদ্ধধর্মে চারিটি প্রধান দার্শনিক মত বা "বাদ" প্রচলিত আছে; বৈভাষিক, সৌত্রান্তিক, যোগাচার ও মাধ্যমিক। বৈভাষিকদিগের প্রধান গ্রন্থ কাত্যায়নীপুত্র লিখিত 'জ্ঞান-প্রস্থান'। এই শাস্ত্রের ছয় অঙ্গ; এতদ্ব্যতীত বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষের উত্তরে লিখিত সঙ্ঘভদ্রের ন্যায়ানুসার গ্রন্থও ইঁহাদের শাস্ত্রের অন্তর্গত। সৌত্রান্তিকীদিগের প্রধান গ্রন্থ আচার্য্য বসুবন্ধু রচিত 'অভিধর্মকোষ'। বৈভাষিক দর্শনের পরিচয় চীন ভাষায় এবং চৈনিক লিপিতে মাত্র পাওয়া যায়। বসুবন্ধুর অভিধর্মকোষ কয়েকখানি টীকা ও ভাষ্য সহ ভোট ভাষায় বর্ত্তমান। যোগাচারিগণ বিজ্ঞানবাদী ও মাধ্যমিক শূন্যবাদী, যোগাচারের প্রধান আচার্য্য অসঙ্গ। তিনি বসুবন্ধুর জ্যেষ্ঠ ভ্রাতা; অসঙ্গ পেশওয়ার নগরে জন্মগ্রহণ করেন। শূন্যবাদের প্রধান আচার্য্য নাগার্জ্জুন। এই দুই মত মহাযানের অন্তর্ভুক্ত। চীন জাপানের বৌদ্ধেরা বিজ্ঞানবাদী ও ভোটিয়েরা শূন্যবাদী; শূন্যবাদ বজ্রযানের সহায়ক, সুতরাং ভোটদেশে তাহার প্রভাব স্বাভাবিক।

আচার্য্য শান্তরক্ষিত যদিও মাধ্যমিক সিদ্ধান্তের উপরে মধ্যমকালঙ্কাররূপ জ্ঞানগর্ভ গ্রন্থ লিখিয়াছিলেন, তথাপি তিনি বিজ্ঞানবাদীই ছিলেন। ভোট ভাষায় লিখিত তাঁহার জীবনীসংলগ্ন তত্ত্ব সংগ্রহের দ্বারা ইহা প্রমাণিত হয়। শান্তরক্ষিত তাঁহার সমসাময়িক ও পূর্ব্বকালের সর্ব্ববিধ দার্শনিক মতের গভীর বিচার-সংগ্রহ যে অপূর্ব্ব গ্রন্থে রাখিয়া গিয়াছেন, তাহা তাঁহার অগাধ পাণ্ডিত্যের পরিচায়ক। এই গ্রন্থে ৩৬৪৬ শ্লোক ষড়্‌বিংশ অধ্যায় বা 'পরীক্ষা" আছে।

* * *

ভোটদেশে ভারতীয় আচার্য্যদের মধ্যে শান্তরক্ষিত ও দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান সমধিক সম্মানিত। দীপঙ্করের তিব্বতীয় নাম "অতিশা", "জোবো" (স্বামী), বা "জোবো-জে" (স্বামী ভট্টারক)। ইঁহারা দুই জনেই সহোর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ 'অতিশা'কে বাঙালী প্রমাণ করেন। 'বৌদ্ধ গান ও দোঁহা' নামক পুস্তকের ভূমিকায় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী এইরূপে জালন্ধরী কাহ্ন সরজ আদি কবিদেরও বাঙালী দাঁড় করাইয়াছিলেন। যাহা হউক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে, বিক্রমাশিলার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে; মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে এ অঞ্চল 'ভাগল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল; উহার রাজধানী ছিল বর্ত্তমান কহল গ্রামের নিকটস্থ কোন স্থানে; দশম শতাব্দীতে রাজা কল্যাণশ্রী ইহার শাসক ছিলেন। ঐ সময় বঙ্গের পালবংশের বিজয়ধ্বজা বঙ্গ ও বিহার উভয় প্রদেশেই উড়িতেছিল, রাজা কল্যাণশ্রী তাঁহাদের অধীন ছিলেন। তাঁহার রাণী শ্রীপ্রভাবতী "কাঞ্চনধ্বজ" রাজ-প্রাসাদে ভোটীয় জল-পুরুষ-অশ্ব বর্ষে (৯৮২ খ্রীঃ) এক পুত্ররত্নের জন্মদান করেন, উত্তরকালে ইনিই ইতিহাসে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে প্রসিদ্ধ হন। রাজা কল্যাণশ্রীর পদ্মগর্ভ, চন্দ্রগর্ভ ও শ্রীগর্ভ নামক তিন পুত্রের মধ্যে ইনি মধ্যম। তিন বৎসর বয়সে কুমার চন্দ্রগর্ভ "নাতিদূর" বিক্রমশিলায় অধ্যয়ন করিতে গেলেন এবং এগার বৎসর বয়সে গণিত ও ব্যাকরণ উত্তমরূপে আয়ত্ত করিলেন।

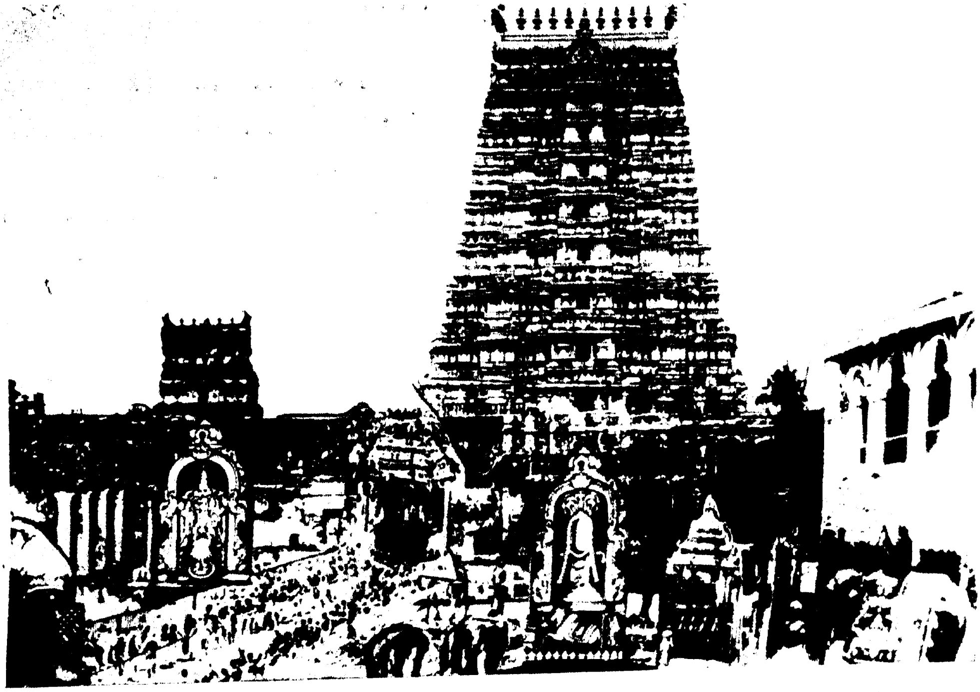
প্রারম্ভিক অধ্যয়ন সমাপ্ত হইলে কুমার ভিক্ষু হইয়া নিশ্চিন্ত মনে বিদ্যার্জ্জন করিতে সঙ্কল্প করিলেন। একদিন ভ্রমণকালে জঙ্গলের মধ্যে এক পাহাড়ে গিয়া শুনিলেন সেখানে মহাবৈয়াকরণ পণ্ডিত জেতারি বাস করেন। কুমার তাঁহার নিকট গেলে তিনি প্রশ্ন করিলেন, "তুমি কে?" কুমার উত্তর দিলেন, "আমি এই দেশের স্বামীর পুত্র।" জেতারির নিকট এই উত্তর অভিমানীর বাক্য



শান্তরক্ষিত [খ্রী: ৭৪০-৮৪০]



পণ্ডিত গয়াধর [খ্রী: ১০৬০]



বিখ্যাত তীর্থ রামেশ্বর। শিবরাত্রি উপলক্ষ্যে প্রতিবর্ষের ন্যায় এবারেও এখানে বহু জনসমাগম হইয়াছিল



বলিয়া মনে হওয়ায় তিনি বলিলেন, "আমার স্বামী নাই, দাস নাই, রক্ষকও নাই, তুই যদি ধরণীপতি তবে চলিয়া যা।" মহা[illegible] জেতারির কথা কুমার পূর্ব্বেই শুনিয়াছিলেন; সুতর[illegible]তি বিনয়ের সহিত নিজের সংকল্পের বিষয় তাঁহাকে নিবেদন করিয়া গৃহত্যাগের ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। জেতারি তাঁহাকে নালন্দা যাইতে উপদেশ দিলেন।

বৌদ্ধধর্ম্মে মাতাপিতার অনুমতি বিনা কেহ শ্রামণের অথবা ভিক্ষু হইতে পারে না। অতিকষ্টে অনুমতি লইয়া কয়েক জন অনুচর সহ কুমার চন্দ্রগর্ভ নালন্দা চলিলেন। বিহারে যাইবার পূর্ব্বে তথাকার রাজার নিকট গেলে তিনি কুমারের পরিচয় প্রাপ্তির পর বিক্রমশিলা ছাড়িয়া এতদূরে আসিবার কারণ জিজ্ঞাসা করিলেন। চন্দ্রগর্ভ নালন্দার প্রাচীনত্ব ও অন্যান্য গুণাবলী ব্যাখ্যা করায় রাজা পরম সমাদরের সহিত নালন্দায় কুমারের থাকিবার সুন্দর ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। বিংশ বৎসর বয়সের পূর্ব্বে ভিক্ষু হওয়া সম্ভব নহে, কুমার সে সময় দ্বাদশ বৎসর বয়স্ক বালক মাত্র; সুতরাং নালন্দায় স্থবির বোধিভদ্র কুমারকে শ্রামণের দীক্ষা দান করিলেন, পীত বস্ত্র ধারণের সহিত তাঁহার নাম হইল দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান। সে সময় আচার্য্য বোধিভদ্রের গুরু অবধূতী-পাদ (অন্য নাম অদ্বয়বজ্র, অবধূতীপা, মৈত্রীগুপ্ত বা মৈত্রীপা) রাজগৃহে কালশিলার দক্ষিণে নির্জ্জনবাস করিতে-ছিলেন। তিনি মহাপণ্ডিত ও সিদ্ধ ছিলেন। বোধিভদ্র দীপঙ্করকে লইয়া আচার্য্য অবধূতীপাদের নিকট লইয়া গিয়া তাঁহার অনুমতিক্রমে দীপঙ্করকে তাঁহার নিকট শিক্ষার জন্য ছাড়িয়া আসিলেন। ১২ হইতে ১৮ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত সেখানে থাকিয়া তিনি উত্তমরূপে শাস্ত্র অধ্যয়ন করিলেন।

অষ্টাদশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর মন্ত্র-শাস্ত্র শিক্ষার জন্য সে সময়ের বিখ্যাত তান্ত্রিক, চুরাশী সিদ্ধের অন্যতম ও বিক্রমশিলা বিহারের উত্তর দ্বারের দ্বারপণ্ডিত, নারোপার (নাড়পাদ) নিকট গেলেন এবং একুশ বৎসর বয়স পর্য্যন্ত তাঁহারই শিষ্যত্ব গ্রহণ করিলেন। দীপঙ্কর ছাড়া প্রজ্ঞারক্ষিত, কনকশ্রী ও মনকশ্রী (মাণিক্য) ইঁহারাও নারোপার প্রধান শিষ্য ছিলেন। তিব্বতের মহাসিদ্ধ মহাকবি জেচুন মিনা-রে-পার গুরু মর-রা লোচবাও নারোপার শিষ্য ছিলেন।

ঐ সময় বুদ্ধগয়ার মহাবিহারের প্রধান এক বিদ্বান ভিক্ষু ছিলেন। ইঁহার নাম অন্য ছিল, কিন্তু বজ্রাসন



দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান (তিব্বতী পট হইতে)

অর্থাৎ বুদ্ধগয়া-বাসী ছিলেন বলিয়া ইনি বজ্রাসনীয় বলিয়াই খ্যাত। নারোপার নিকট শিক্ষা সমাপ্ত করিয়া দীপঙ্কর বজ্রাসন-মতিবিহার-নিবাসী মহাস্থবির মহাবিনয়ধর শীল-রক্ষিতের সমীপে গিয়া তাঁহাকে গুরু করিয়া উপসম্পদা (ভিক্ষু-দীক্ষা) লাভ করিলেন।

একত্রিশ বৎসর বয়সে দীপঙ্কর তিন পিটক ও তন্ত্রে পণ্ডিত হইয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার জ্ঞানপিপাসা নিবৃত্ত হয় নাই। এখন সুবর্ণদ্বীপের (সুমাত্রা) আচার্য্য ধর্ম্মপালের সুখ্যাতি শুনিয়া শিক্ষালাভের আশায় তাঁহার নিকট যাইবার সংকল্প করিলেন। তখন ধর্ম্মপালের পাণ্ডিত্যগৌরবের খ্যাতি তাঁহার প্রসিদ্ধ ছাত্রবর্গ—রত্নাকরশান্তি, জ্ঞানশ্রীমিত্র, রত্নকীর্ত্তি—এদেশে যথেষ্ট প্রচার করিয়াছিলেন। দীপঙ্কর তাহার ফলে বুদ্ধগয়া ছাড়িয়া সমুদ্রতটে ও সেখান হইতে চৌদ্দ মাস ধরিয়া সমুদ্রপথে ভ্রমণের পর বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া সুবর্ণ-দ্বীপে উপস্থিত হইলেন। সেখানে শুনিলেন আচার্য্য-দেবের সম্মুখে পৌছানই সুকঠিন ব্যাপার, সুতরাং সে চেষ্টা না করিয়া দীপঙ্কর বর্ষকাল এক নির্জ্জন স্থানে

বাস করিতে লাগিলেন। ক্রমে ক্রমে দুই-এক জন করিয়া ভিক্ষু তাঁহার নিকট আসা-যাওয়া করাতে তাঁহার বিদ্যাবত্তার পরিচয় বিস্তৃত হইয়া পড়িল এবং শেষে সুবর্ণদ্বীপীয় আচার্য্যের শিষ্যপদবাচ্য হইতে কোন বাধা রহিল না। দ্বাদশ বর্ষকাল আচার্য্য মহীপালের নিকট সকল শাস্ত্র—বিশেষ ভাবে দর্শনশাস্ত্র, "অভিসময়ালঙ্কার" বোধিচর্য্যাবতার" প্রভৃতি—অধ্যয়ন করিয়া, পরে রত্নদ্বীপ ও নিকটস্থ অন্যান্য দেশ দেখিয়া দীপঙ্কর ভারতে প্রত্যাবর্ত্তন করিলেন। ভারতে আসিয়া তিনি বিক্রমশিলা বিহারে রহিলেন। তাঁহার বিশেষ যোগ্যতা দৃষ্টে তাঁহাকে ৫১ জন পণ্ডিতের উপর ১০৮টি দেবালয়ের তত্ত্বাবধায়কের কার্য্যে নিযুক্ত করা হইল। যাঁহাদের কথা বলা হইয়াছে তাঁহারা ছাড়াও তাঁহার আচার্য্যবর্গের মধ্যে সিদ্ধ ডোম্বী, ভূতিকোটিপাদ, প্রজ্ঞাভদ্র ও রত্নাকরশান্তির নাম করা যাইতে পারে। উঁহার গুরু অবধূতীপা সিদ্ধাচার্য্য ডমরুপার শিষ্য; ডমরুপা মহান সিদ্ধ ও কবি কহ্নপার (কৃষ্ণাচার্য্যপাদ, সিদ্ধাচার্য্য জলন্ধরীপার শিষ্য) শিষ্য ছিলেন। কহ্নপা তাঁহার সময়ে উচ্চশ্রেণীর ছায়াবাদী হিন্দী কবি ছিলেন।

গুপ্ত-সম্রাটগণের মধ্যে সমুদ্রগুপ্তের যে স্থান, পালরাজবংশে ধর্ম্মপালের নাম ও পদমর্য্যাদা তদ্রূপ ছিল। গঙ্গাতটে এক সুন্দর ছোট পাহাড় দেখিয়া মহারাজ ধর্ম্মপাল সেখানে বিক্রমশিলা বিহার স্থাপন করেন। এই পরাক্রান্ত নৃপতির কৃপাদৃষ্টি থাকায় এই বিহার অল্পদিনেই বিশাল রূপ ধারণ করে। নালন্দার ন্যায় ইহাকে বহুকালব্যাপী ক্রমোন্নতি-সোপান অতিক্রম করিতে হয় নাই। এখানে অষ্ট মহাপণ্ডিত ও এক শত আট পণ্ডিত এবং বহু দেশী বিদেশী বিদ্যার্থী থাকিত। দীপঙ্করের সময় সঙ্ঘস্থবির ছিলেন রত্নাকর, অষ্ট মহাপণ্ডিতদের মধ্যে ছিলেন শান্তিভদ্র, রত্নাকরশান্তি, মৈত্রীপা (অবধূতীপা) ডোম্বীপা, স্থবিরভদ্র, স্মৃত্যাকর সিদ্ধ (কাশ্মীরী) ও অতীশা (দীপঙ্কর স্বয়ং)। বিহারের ভিতরে অবলোকিতেশ্বরের মন্দির ও পরিক্রমায় ছোট বড় ৫৩টি তান্ত্রিক দেবালয় ছিল। যদিও পালরাজ্যের মধ্যেই নালন্দা, উড়ন্তপুরী ও বজ্রাসন (বুদ্ধগয়া)—অন্য এই তিনটি মহাবিহার ছিল, তথাপি বিক্রমশিলার উপরেই পালরাজাদের বিশেষ কৃপা বর্ষিত হইত। সেই ঘোর তান্ত্রিক যুগে ইহা তন্ত্র-মন্ত্রের বিরাট দুর্গবিশেষ ছিল। চুরাশী সিদ্ধের প্রায় সকলেই পালবংশের রাজত্বকালে উদ্ভূত এবং [illegible] অধিকাংশই এই বিক্রমশিলা বিহারের সহিত সংশ্লি[illegible]ন। তিব্বতী লেখকদিগের মতে এই বিহারের সিদ্ধগণ নিজেদের দেবতা যক্ষ প্রভৃতির সাহায্যে ও মন্ত্রতন্ত্র বলিপ্রদান আদি অস্ত্রের বলে বহুবার বিহার-আক্রমণকারী "তুরুস্ক"- (তুর্ক-মুসলমান) দিগকে বিতাড়িত করিয়াছিলেন।

* * *

তিব্বত-সম্রাট স্রোং-চন্-গম্বো, ঠি-স্রোং-দে-চন্ এবং তাঁহাদের বংশধরগণ তিব্বতে বৌদ্ধধর্ম্ম প্রচারের জন্য বহু যত্ন করিয়াছিলেন। প্রতিকূল অবস্থার ফলে উঁহাদেরই বংশধর ঠি-কি-দে-ঞীমা-গোন্ লাসা ছাড়িয়া ঙরী প্রদেশে (মানসসরোবর হইতে লদাখের সীমা পর্য্যন্ত) চলিয়া গিয়া সেখানে রাজ্যস্থাপন করেন। ইঁহারই পৌত্র ম্ ঙং-দগ্-পোরে নিজের দুই পুত্র (দেবরাজ ও নাগরাজ) সহ ভিক্ষু হইয়া ভ্রাতুষ্পুত্র ল্হ-লামা-যেশে-ওকে রাজত্ব প্রদান করেন (দশম শতাব্দী)। রাজা যেশে-ও (জ্ঞানপ্রভ) দেখিলেন দেশে বৌদ্ধধর্ম্ম শিথিল হইতেছে, লোকে ধর্ম্মতত্ত্ব ভুলিয়া যাইতেছে। তিনি অনুভব করিলেন যে ইহার প্রতিকার না করিলে পূর্ব্বজগণ-প্রজ্বলিত এই প্রদীপ নিবিয়া যাইবে। প্রতিকার-চেষ্টায় তিনি রত্নভদ্র (রিন্-ছেন-সঙ্-পো, পরে লো-ছেন-রিম্পো ছে) প্রভৃতি ২১টি সদ্বংশজাত ভোটীয় বালককে দশবর্ষ কাল স্বদেশে উত্তমরূপে শিক্ষা দান করিয়া পরে বিদ্যাধ্যয়নের জন্য কাশ্মীরে প্রেরণ করেন। সেখানে তাহারা পণ্ডিত রত্নবজ্রের নিকট শিক্ষালাভ করিতে থাকে, কিন্তু যখন ঐ ২১ জনের মধ্যে কেবলমাত্র দুই জন, রত্নভদ্র ও সুপ্রজ্ঞ (লগ্-প-শে-রব), জীবিত অবস্থায় ফিরিলেন তখন রাজা অতিশয় দুঃখিত ও নিরাশ হইলেন। কিন্তু তাহাতেও রাজা নিবৃত্ত হইলেন না। তিনি ভাবিলেন, যখন ভারতের ন্যায় গ্রীষ্মপ্রধান দেশে তিব্বতীয়দের বাঁচিয়া থাকা মুস্কিল, তখন ভারত হইতে কোনও উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিতকে এখানে আনাই শ্রেয়ঃ। তিনি ইহাও শুনিয়াছিলেন যে বিক্রমশিলায় দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান নামে এক মহাপণ্ডিত আছেন, তিনি ভোটদেশে আসিলে ধর্ম্মের স্রোত ফিরানো দুরূহ হইবে না। এই উদ্দেশ্যে তিনি কয়েক জন

লোককে প্রচুর স্বর্ণ দিয়া বিক্রমশিলা পাঠাইলেন। তাঁহারা সেখানে গিয়া দীপঙ্করকে সমস্ত জানাইল কিন্তু তিনি তিব্বত যাইতে [illegible]জী হইলেন না।

[illegible] তাহাতেও হতাশ হইলেন না। তিনি এবার প্রচুর [illegible] সঞ্চয় করিয়া ভারত হইতে কোনও মহাপা[illegible] আনিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। রাজকোষে [illegible] সোনা ছিল না, সুতরাং তাহা সংগ্রহ করিবার জন্য তিনি লোকজন লইয়া সীমান্ত দেশে গেলেন। সেখানে তাঁহার প্রতিবেশী গর্-লোগ দেশের রাজা তাঁহাকে বন্দী করিলেন।

পিতা বন্দী হইয়াছেন শুনিয়া ল্হা-লামা চং-ছুপ-ও (বোধি-প্রভ) তাঁহার মুক্তির চেষ্টায় গর্-লোগ দেশে গেলেন। কথিত আছে গর্-লোগ-রাজ ভোটরাজের মুক্তির পরিবর্তে বিস্তর স্বর্ণ চাহিয়াছিলেন। চং-ছুপ-ও যে-পরিমাণ স্বর্ণ একত্র করিয়াছিলেন তাহা যথেষ্ট নয় জানিয়া তিনি আরও স্বর্ণ সংগ্রহের জন্য দেশে ফিরিবার পূর্ব্বে একবার বন্দী পিতার সহিত দেখা করিয়া তাঁহাকে সকল কথা জানাইলেন। রাজা যেশে-ও তাঁহাকে স্বর্ণশুল্ক দিতে নিষেধ করিয়া বলিলেন, "তুমি জান আমি বৃদ্ধ, বড়জোর আর দশ বৎসর পরমায়ু আছে, যদি আমাকে উদ্ধার করিতে রাজকোষ শূন্য হয়, তবে ভারত হইতে পণ্ডিত আনা সম্ভব হইবে না এবং ধর্ম্মেরও সংস্কার হইবে না। ইহাপেক্ষা ধর্ম্মের জন্য যদি আমার দেহান্ত হয় এবং তুমি ঐ স্বর্ণ দিয়া ভারত হইতে পণ্ডিত আনাও তাহা অনেক ভাল। এই রাজাকেই বা বিশ্বাস কি, সে যদি স্বর্ণ লইয়া পরে আমাকে মুক্তি না দেয়? অতএব হে পুত্র, তুমি আমার চিন্তা ছাড় এবং সমস্ত সোনা দিয়া অতিশা-র নিকট দূত পাঠাও। আশা আছে আমার বন্দীদশার কথা শুনিয়া ভোটদেশে ধর্ম্মের চিরস্থিতির জন্যও তিনি আসিবেন। যদি তিনি একান্তই না আসেন, তবে উঁহার পরের শ্রেণীর কোনও পণ্ডিতকে আনাও।" এই বলিয়া ধর্ম্মবীর যেশে-ও পুত্রকে আশীর্ব্বাদ করিয়া বিদায় দিলেন। ইহাই পিতা-পুত্রের শেষ দেখা।

চং-ছুপ-ও দেশ-শাসনের সঙ্গে সঙ্গে পিতৃ আজ্ঞানুসারে ভারতে দূত পাঠাইবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। উপাসক গুং-থং-পা ইতিপূর্ব্বে ভারতে দুই বৎসর যাপন করিয়াছিলেন। তিনিই এই ভার লইলেন এবং তাঁহার সঙ্গী হিসাবে নগ্র-ছোনিবাসী ভিক্ষু ছুল্-ঠিম-গ্যল-বা (শিলবিজয়) ও অন্য কয়েক জনকে লইলেন। এইরূপে দশ জনে বিপুল স্বর্ণসম্ভার লইয়া নেপালের পথে বহু বাধাবিঘ্ন অতিক্রম করিয়া বিক্রমশিলায় পৌছাইলেন (ডোম্-তোন-রচিত গুরু-গুণ ধর্ম্মাকর ৭৭পৃঃ)। ইঁহারা বিক্রমশিলার সম্মুখের 'গঙ্গার ঘাটে যখন পৌছাইলেন তখন সূর্য্য অস্ত গিয়াছে। খেয়ার নৌকা লোকে পরিপূর্ণ, সুতরাং মাঝি ইঁহাদিগকে পরের ক্ষেপে লইয়া যাইবে এই আশ্বাস দিয়া চলিয়া গেল। ওপারে বিক্রমশিলার বিরাট প্রাকার ও দেউল দেখিয়াই তিব্বতীয় যাত্রীরা পথকষ্ট ভুলিয়াছিলেন, কিন্তু খেয়া নৌকার দেরীতে তাঁহাদের সন্দেহ হইল মাঝি আর সেদিন ফিরিবে না। নির্জ্জন নদীতটে বিরাট স্বর্ণরাজী লইয়া তাঁহাদের ভয় হইতে লাগিল, সুতরাং তাঁহারা বালুর তলায় স্বর্ণ লুকাইয়া রাত্রি যাপনের ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় মাঝি নৌকা লইয়া ফিরিয়া আসিল। যাত্রীরা তাহাকে দেরীর জন্য সন্দেহের কথা বলায় সে বলিল, "তোমাদের ঘাটে ফেলিয়া রাজাজ্ঞা লঙ্ঘন করিয়া কিরূপে আমি চলিয়া যাইতে পারি।"

নদীপথে তাঁহারা মাঝির নিকট শুনিলেন বিহারের দ্বার বন্ধ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং পশ্চিম দ্বারের সম্মুখস্থ ধর্ম্মশালায় রাত্রি যাপনের জন্য তাঁহারা ব্যবস্থা করিতেছেন এমন সময় বিহারের তোরণের উপরস্থ কক্ষবাসী ভোটভিক্ষু গ্যা-চোন্-সেং তাঁহাদের কথাবার্ত্তা শুনিয়া, স্বদেশবাসী জানিয়া তাঁহাদের নিকট খবরাখবর লইতে আসিলেন। কথাবার্ত্তায় তাঁহারা অতিশা-কে লইতে আসিয়াছেন জানিয়া তিনি পরামর্শ দিলেন যে ইঁহারা যেন প্রথমে বিদ্যার্থীরূপে বিহারে প্রবেশ করেন, কেন-না মূল উদ্দেশ্য সকলে জানিলে পরে অতিশা-কে লইয়া যাওয়া দুরূহ হইবে। তিনি আরও বলিলেন যে পরে সুযোগ বুঝিয়া তিনিই দূতের সহিত অতিশার সাক্ষাতের ব্যবস্থা করিবেন, তখন তাঁহারা তাঁহাদের বাসনা নিবেদন করিতে পারিবেন।

তিব্বতীয় দূতগণের পৌছিবার কিছুদিন পরেই বিক্রমশিলায় পণ্ডিত-সভা বসিল। গ্যা-চোন্ সকল বিখ্যাত পণ্ডিতের সহিত ইঁহাদের সাক্ষাৎ করাইলেন। বিখ্যাত

পণ্ডিতমণ্ডলীর সহিত আলাপের ফলে রাজদূত বুঝিলেন অতিশা-র স্থান কত উচ্চে।

আরও কিছুকাল পরে গ্যা-চোন্ সুযোগ বুঝিয়া তাঁহাদের অতিশার গৃহে লইয়া নিভৃতে আলাপ করাইলেন। তিব্বত-দূতগণ অতিশাকে প্রণাম করিয়া, তাঁহার সম্মুখে স্বর্ণরাশি নিবেদন করিয়া, ভোট-রাজ যেশে-ও কি-ভাবে বন্দী হইয়াছিলেন ও তাঁহার অন্তিম কামনা কি ছিল সকল কাহিনী শুনাইলেন। দীপঙ্কর এই বৃত্তান্ত শুনিয়া অতি বিচলিত হইয়া বলিলেন, "নিঃসন্দেহ ভোটরাজ যেশে-ও বোধিসত্ত্ব ছিলেন! আমি তাঁহার কামনা ভঙ্গ করিব না, কিন্তু তোমরা জান আমার উপর ১০৮ দেবালয়ের তত্ত্বাবধানের ও অন্য অনেক কার্য্যের ভার আছে। এ সকলের ব্যবস্থা করিতে আমার ১৮ মাস সময় লাগিবে। তাহার পর আমি যাইতে পারিব। এখন স্বর্ণরাশি তোমরা রাখ।"

ভোট-রাজদূতগণ ইহা শুনিয়া অধ্যয়নের ছুতা করিয়া বিহারে রহিয়া গেলেন। অতিশা যাত্রার উদ্যোগ আরম্ভ করিলেন। ইতিমধ্যে একদিন সময়মত তিনি সঙ্ঘস্থবির রত্নাকরপাদকে সমস্ত কথা বলিলেন। রত্নাকর দীপঙ্করের সহিত একমত হইতে পারিলেন না। তিনি এক দিন ভোটীয় সজ্জনদের ডাকিয়া বলিলেন, "ভোট আয়ুষ্মন্! আপনারা বিদ্যার্থীরূপে বিহারে প্রবেশ করিয়াছেন, কিন্তু ইহা কি সত্য যে আপনারা আসলে অতিশাকে লইয়া যাইবার জন্যই আসিয়াছেন? এ সময় অতিশা ভারতীয়দের চক্ষুস্বরূপ, দেখিতেছেন না পশ্চিম দিকে তুরস্কদের* উপদ্রব চলিতেছে। যদি এই সময় অতিশা দেশান্তরে চলিয়া যান তবে এখানে ভগবানের ধর্ম্মসূর্য্যও অস্ত যাইবে।"

অতিকষ্টে সঙ্ঘস্থবিরের অনুমতি পাওয়া গেল। অতিশা স্বর্ণ ভেট গ্রহণ করিয়া তাহা চার অংশে বিভক্ত করিলেন। এক অংশ পণ্ডিতদিগকে দান এবং দ্বিতীয় অংশ বজ্রাসনে (বুদ্ধগয়া) নিবেদন করিলেন; তৃতীয় অংশ রত্নাকরের হস্তে বিক্রমশিলা সঙ্ঘের জন্য ও শেষ চতুর্থাংশ রাজার অন্য ধর্ম্ম-কৃত্যের জন্য দান করিয়া নিজের লোকজনকে ভোট-দূতদিগের সহিত পুস্তক ও অন্যান্য আবশ্যক দ্রব্যসহ নেপালের পথে পাঠাইলেন। পরে তিনি স্বয়ং "লোচবা" (ভারতীয় পণ্ডিতের সহায়ক তিব্বতীয় দ্বিভাষী) ও অন্য লোকজন—সর্ব্বসমেত বার জন—লইয়া বুদ্ধগয়া যাত্রা করিলেন।

বজ্রাসন ও অন্যান্য তীর্থ দর্শন করিয়া পণ্ডিত ক্ষিতিগর্ভ আদি বিংশতি জনের মণ্ডল লইয়া আচার্য্য দীপঙ্কর ভারতসীমার নিকট এক ছোট বিহারে উপস্থিত হইলেন। দীপঙ্করের শিষ্য ডোম্-তোন্ তাঁহার গুরু-গুণ ধর্ম্মাকরে লিখিতেছেন,

"স্বামীর ভোট প্রস্থানের সময় ভারতে (বুদ্ধ) শাস- অস্তাচলগামী। ভারতের সীমার নিকট অতিশা দেখিলে- তিনটি ছোট অনাথ কুক্কুরশাবক পথের পাশে পড়িয়া আছে। ষষ্টি বৎসরের বৃদ্ধ সন্ন্যাসী কি এক ...নী- ভাবের প্রেরণায় নিজ মাতৃভূমির অন্তিম ... এই তিনটি কুক্কুরশাবককে নিজ চীবরে (...ধানবস্ত্র ... উঠাইয়া লইলেন!"

তিব্বতে প্রবাদ, আজও ঐ তিনটি কুকু...জাতি ডাঙ- প্রদেশে বর্ত্তমান আছে।

ভারতসীমা পার হইয়া অতিশার মণ্ডলী নেপাল-রাজে- প্রবেশ করিয়া ক্রমে নেপাল রাজধানীতে উপনীত হইলেন নেপালরাজ মহাসমাদরে তাঁহাদের রাজঅতিথিরূপে অভ্যর্থন- করিলেন এবং দীপঙ্করকে নেপালে থাকিবার জন্য অতি- আগ্রহের সহিত অনুনয় করিলেন। তাঁহার সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে অতিশাকে এক বৎসর কাল নেপালে থাকিতে হইল। সেখানে নানা ধর্ম্মাচরণের মধ্যে এক রাজকুমারকে তিনি ভিক্ষু-দীক্ষা দিয়াছিলেন। গৌড়েশ্বর মহারাজ- নেপালকে এক পত্রও লিখিয়াছিলেন, তাহার ভোটীয় অনুবা- এখনও তঞ্জুরে বর্ত্তমান।

নেপাল হইতে প্রস্থান করিয়া দীপঙ্কর যখন থুং বিহারে উপস্থিত হইলেন তখন ভিক্ষু গ্যা-চোন-সেং-এর পীড়ার জন্য তাঁহাকে সেখানে কিছুদিন থাকিতে হইল। বহু চেষ্টাতেও ভিক্ষু গ্যা-চোন্‌কে বাঁচাইতে পারা গেল না এবং তাঁহার স্থা- বিদ্বান বহুশ্রুত দ্বিভাষীর বিয়োগে অপার দুঃখে ও নিরাশা- দীপঙ্কর বলিলেন, "আমার ভোটযাত্রা বিফল হইল, আমি দ্বিভাষী-বিনা সেখানে কি করিতে পারিব?" শীলবিজয় ও অন্য দ্বিভাষীগণ তাঁহাকে অনেক কষ্টে প্রবোধ দিলেন।

বৃদ্ধ পণ্ডিতের পথকষ্ট নিবারণের জন্য ভোটরাজ চঙ্- ছুপ-ও নিজ রাজ্যে মহাযত্নে নানা ব্যবস্থা করিয়াছিলেন ভোটনিবাসী জনসাধারণ তখন এই সূর্য্যপ্রভ মহাপণ্ডিতের দর্শনের জন্য লালায়িত। এইরূপে পথে ভোট-জনসাধারণকে ধর্ম্মমার্গ দেখাইতে দেখাইতে তিব্বতীয় জন-পুরুষ-অশ্ব ব- (চিত্রভানু সম্বৎসর = ১০৪২ খ্রীঃ) আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান- ৬১ বৎসর বয়সে ঙরী অর্থাৎ পশ্চিম-তিব্বত প্রদেশে উপস্থিত হইলেন। রাজধানী থোলিঙ্ পৌঁছিবার পূর্ব্বেই ভোটরাজ অনেক পথ আগাইয়া তাঁহাকে লইতে আসিলেন এবং নানা স্তুতিসহকারে অভ্যর্থনা-সমারোহের মধ্যে তাঁহাকে থোলিঙ বিহারে লইয়া গেলেন। "স্বদেশে পূজ্যতে রাজা বিদ্বান্ সর্ব্বত্র পূজ্যতে।"

(ক্রমশঃ)

* তখন মহম্মদ গজনবীর মৃত্যু হইয়াছে কিন্তু মধ্য-এশিয়ায় ইসলাম ও বৌদ্ধধর্ম্মের সংঘাত চলিতেছে।



গুলমর্গের প্রধান বাজার—বরফ পড়িয়া দোকানের সাইনবোর্ড পর্য্যন্ত সব ঢাকিয়া গিয়াছে



তুষারপুরী গুলমর্গ



গুলমর্গের পথে—চারিদিক তুষারাবৃত



গাছের উপর বরফ পড়িয়া গুম্বজাকার ধারণ করিয়াছে



গুলমর্গের ডাকঘর—চারিদিক তুষারাবৃত



গ্রীষ্মকালে গুলমর্গের দৃশ্য



মহারাণী মন্দির — গুলমর্গ

তুষারের দেশ

শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার ও শ্রীধন্যকুমার জৈন

শীতকালে কাশ্মীর যাওয়ার মত মনের অবস্থা ইতিপূর্ব্বে কখনই হয় নাই, এবার তাহাই ঘটিল। দেখি, চারিদিক বরফে চাপা পড়িয়াছে। দিনের বেলা তাপমানযন্ত্র প্রায় শূন্যে গিয়া ঠেকিয়াছে।

ঝিলম নদীর ক্ষীণ জলধারা আঁকিয়া-বাঁকিয়া চলিয়াছে, মাঝে মাঝে বরফের চড়া। প্রথমেই গুলমর্গ হিল-ষ্টেশনে যাওয়া গেল। বলা বাহুল্য, এমন সুন্দর ও মনোরম দৃশ্য পৃথিবীতে অল্পই দেখা যায়। বার মাসের মধ্যে সাত মাস এ-স্থান বরফেই চাপা থাকে। কেবল পাঁচ মাসের জন্য এখানে ইলেট্রিক, ডাকঘর, টেলিফোন, টেলিগ্রাফ প্রভৃতি বর্ত্তমান যুগের আবিষ্কারগুলি কাজে লাগে।



গ্রীষ্মকালে গুলমর্গের পথের দৃশ্য

গুলমর্গ হইতে দুই হাজার ফুট উচ্চে খিলানমর্গ অবস্থিত। সেখানে পাহাড়ের উপরে 'আল-পথর' নামে একটি ঝিল আছে, সমুদ্র হইতে প্রায় ১৪৫০০ ফুট উচ্চে। এখানে বার মাসই বরফ জমিয়া থাকে। গ্রীষ্মকালে এখানে দূর-দূরান্তর হইতে অনেক লোক ভ্রমণ করিতে আসে। আশ্বিনের পর হইতেই এ-স্থান জনশূন্য হইয়া যায়।

টনমর্গের ডাক-বাংলো পর্য্যন্ত আমরা কোনমতে মোটর-যোগে গেলাম, তার পরেই গুলমর্গ যাইতে দুই হাজার ফুট চড়াই। পঁচিশ-ত্রিশ জন কুলির সাহায্যে আমরা উপরে উঠিতে আরম্ভ করিলাম। প্রায় তিন ঘণ্টা বরফের উপর দিয়া বহু কষ্টে ও যথেষ্ট উৎসাহের সহিত চলিয়া আমরা উপরে গিয়া পৌঁছিলাম।

উপর হইতে এক দিকে গুলমর্গের সম্পূর্ণ দৃশ্য ও অপর দিকে অনেক উচ্চে কাশ্মীরের মনোহর ঘাটির দৃশ্য দেখিয়া দেহ-মনের অবসাদ দূর হইয়া গেল। দেখিলাম, সেখানকার বাজার-হাট, হোটেল, বাড়ীঘর সবই বরফে চাপা।



গ্রীষ্মকালে গুলমর্গের দৃশ্য



গুলমর্গের একটি হোটেলের সম্মুখে লেখকের ভ্রমণসঙ্গী দল

সব বাড়ীরই নীচের তলা বরফে ডুবিয়া আছে, ছাদেও যথেষ্ট পরিমাণ বরফ, আবার চারি দিকে বরফ ঝুলিয়া আছে। প্রায় এক ঘণ্টা ভ্রমণের পর দেখিলাম যে, আধ মাইলের বেশী চলা হয় নাই। ইচ্ছা হইল কোথাও একটু বসিয়া বিশ্রাম করি, কিন্তু বসিলে আর রক্ষা নাই, জড়ভরতের অবস্থা প্রাপ্ত হইবার যথেষ্ট ভয় আছে।

সূর্য্যাস্তের পরই বরফের উপরিভাগ জমিয়া নিরেট হইয়া যায়। তখন সেখানে থাকিলে বিপদ হইতে পারে, তাই নীচে নামিতে আরম্ভ করিলাম। নামিতে অবশ্য খুব কম সময়ই লাগিয়াছিল।

[এই প্রবন্ধের সহিত মুদ্রিত চিত্রগুলি শ্রীচন্দ্রগুপ্ত বিদ্যালঙ্কার কর্তৃক গৃহীত

মহিলা-সংবাদ

নূতন ভারত-শাসন আইন অনুসারে গঠিত বিভিন্ন প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভাসমূহে অনেক মহিলা নির্ব্বাচিত হইয়াছেন। তন্মধ্যে যুক্তপ্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা শ্রীমতী উমা নেহরুর ফোটোগ্রাফ গত চৈত্র সংখ্যায় মুদ্রিত করিয়াছিলাম। এই সংখ্যায় মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যাদের ফোটোগ্রাফই প্রধানতঃ মুদ্রিত হইল। অন্যান্য প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার সদস্যাদের চিত্রও প্রবাসীতে ক্রমশঃ মুদ্রিত হইবে।



ডাঃ লক্ষ্মীদেবী আম্মা
মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা



শ্রীমতী অম্মুলয় আম্মল, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য



শ্রীমতী মণিলামণি আম্মল, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্য



শ্রীমতী বিজয়লক্ষ্মী পণ্ডিত, যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা



মিসেস ইয়াকুব হাসান, মাদ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা



কুমারী জি. আম্মনারাজু, মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা



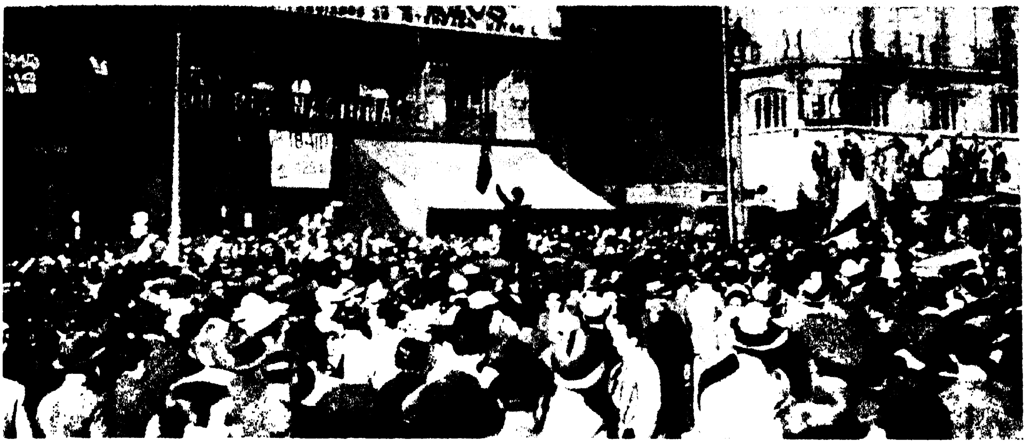
শ্রীমতী রুক্মিণী লক্ষ্মীপতি, মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা



শ্রীমতী লক্ষ্মী কৃষ্ণস্বামী ভারতী, মান্দ্রাজ ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা



সিংহল-নিবাসিনী কুমারী জি. এ. মুথুভাল পূর্ব্বে মান্দ্রাজ সরকারী শিল্পবিদ্যালয়ে ছাত্রী ছিলেন। বর্ত্তমানে তিনি শান্তিনিকেতন কলাভবনের ছাত্রী। তিনি মূর্ত্তিগঠনে বিশেষ পারদর্শিনী হইয়াছেন। মান্দ্রাজ শিল্পবিদ্যালয়ে তৎকর্ত্তৃক গঠিত একটি মূর্ত্তি সহ তাঁহার ফোটোগ্রাফ প্রকাশিত হইল।



১৪ই এপ্রিল, ১৯৩১। মাদ্রিদে গণতন্ত্রবাদের আরম্ভ উপলক্ষে জনসাধারণের আনন্দ-উৎসব,



স্পেনে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠার সময় এক পুষ্পোৎসবে তরুণদিগের শোভাযাত্রা। এই তরুণদিগের ছিন্ন শব হয়ত আজ মাদ্রিদে পড়িয়া আছে



মরক্কোতে স্পেন জয়ের জন্য মূর-সেনাকে শিক্ষাদান করা হইতেছে। ইহাদেরই পূর্ব্বপুরুষগণ এই বিদ্রোহী স্পেন-সেনাদের পূর্ব্বপুরুষ কর্ত্তৃক স্পেন হইতে বিতাড়িত হইয়াছিল



দক্ষিণ স্পেনের অভিমুখে বিদ্রোহীদলভুক্ত মূর সৈন্যদল



"গণতন্ত্র রক্ষার জন্য অস্ত্রধারণ কর!"
স্বেচ্ছাসেবিকার আহ্বান



স্বাধীন অবস্থায় আবিসিনীয়-কুমারী। দুই সহস্র বৎসর পরে ইহাদের দাসত্ব বরণ করিতে হইল।
ইয়োরোপীয় সভ্যতার জয়!



মাদ্রিদে বোমাবর্ষণ। এই নারীর সর্ব্বস্ব গিয়াছে



মাদ্রিদে বোমাবর্ষণ সময়ে গৃহীত চিত্র। ইহাদের সর্ব্বনাশ হইতেছে



বোমানিক্ষেপে বিধ্বস্ত মাদ্রিদ ষ্টেশন





মুসোলিনির লিবিয়া পরিদর্শন। মুসোলিনি ও লিবিয়ার গবর্নর মার্শাল বালবো একটি মসজিদ দর্শনে আসিয়াছেন



[illegible] বলিয়া ঘোষণা করিয়াছেন



লিবিয়া পরিদর্শনে মুসোলিনি। মুসোলিনি অভিবাদন জ্ঞাপন করিতেছেন



ইতালীয় রাজদূত স্পেনের বিদ্রোহী নায়কের [illegible]



ডেসিতে আবিসিনীয় সেনার দেশরক্ষার শেষ চেষ্টা

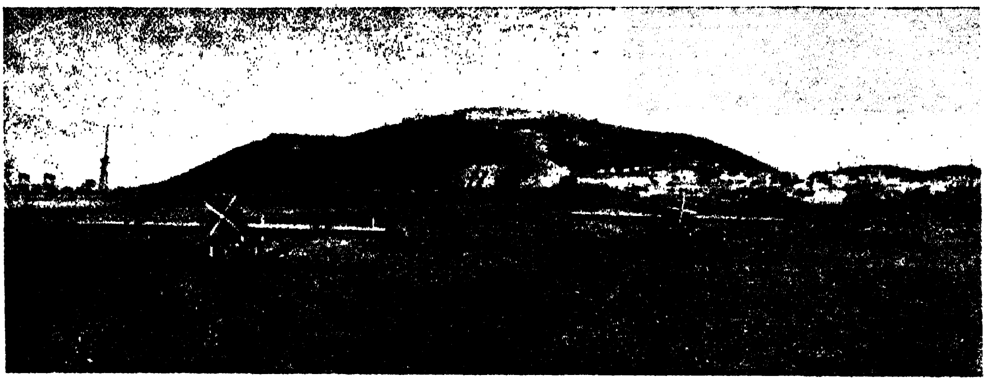




চিত্রে সাম্রাজ্যবাদ—প্রাচীন রোম সেনাধ্যক্ষ সিপিয়ো কর্তৃক আফ্রিকাজয়ের চিত্র সম্প্রতি সিনেমায় তোলা হইতেছে। এই চিত্র ফ্যাসিষ্ট-মণ্ডলীর সহায়তায় তোলা হইয়াছে



"সিপিয়োর আফ্রিকা জয়"—অন্য একটি দৃশ্য



মরক্কো, কিউটা বন্দর। ইহা জার্মানী বা ইটালী হস্তগত করিলে জিব্রাল্টারের কোনও মূল্য থাকিবে না।
বন্দরে বিদ্রোহী সৈন্যবাহক জার্মান স্টিমার হাইড্রোগেন রহিয়াছে

বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

বর্ত্তমানে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে একটা ভীষণ দুর্দ্দিনের আভাস পাওয়া যাইতেছে। স্পেনের অন্তর্বিপ্লবের পরিণতি ভাবিয়া সকলেই আজ চিন্তিত। বর্ত্তমানে যে-বৎসর শেষ হইতে চলিল তাহাতেই ইহার কারণগুলি সব উদ্ভূত হয় নাই, তবে এই সময় তাহা ক্রমশঃ পাকাইয়া উঠিয়া ইদানীং একটা অনিশ্চিত অবস্থায় দাঁড়াইয়া গিয়াছে। কাজেই এই সময়কার প্রধান ঘটনাগুলির আলোচনা এখন অপ্রাসঙ্গিক হইবে না।

ইদানীং অন্তর্জগতে যে-সব সমস্যার উদ্ভব হইয়াছে তাহার মূল অনুধাবন করিতে হইলে গত বিশ বৎসরের কতকগুলি প্রধান প্রধান সন্ধি, চুক্তি ও ব্যাপারের প্রতি আমাদের লক্ষ্য রাখিতে হইবে। ভের্সাই সন্ধি, রাষ্ট্রসঙ্ঘ, ওয়াশিংটন নৌচুক্তি, লোজান সন্ধি, লোকার্ণো চুক্তি, লণ্ডন নৌচুক্তি, নিরস্ত্রীকরণ সম্মেলন, কেলগ্ চুক্তি প্রভৃতি কয়েকটি প্রধান বিষয়ের এই সম্পর্কে উল্লেখ করা যাইতে পারে। জাপানের মাঞ্চুরিয়া অধিকার ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ, জার্মানীতে হিটলারের অভ্যুদয়, সোভিয়েট রুশিয়ার রাষ্ট্রসঙ্ঘে প্রবেশ প্রভৃতি বিষয়ের সঙ্গেও আমরা অল্পবিস্তর পরিচিত। বর্ত্তমানে আমরা যে-অবস্থার সম্মুখীন হইয়াছি প্রকৃত-প্রস্তাবে তাহা জার্মানীর রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগের সময় হইতে আরম্ভ হয়।

বিগত মহাসমরে জার্মানী পরাজিত হইলেও তাহার অন্তর্নিহিত শক্তির কথা বিজয়ী শক্তিবর্গ, বিশেষ করিয়া



ভূতপূর্ব্ব স্পেন-নৃপতি আলফন্সো



স্পেনের গণতন্ত্রের প্রেসিডেন্ট আজানা



গণতন্ত্রের সমর-সচিব লারগো কাবালেরো

ফ্রান্স, কখনও ভুলিতে পারে নাই। এই কারণ তাহাকে আষ্টেপৃষ্ঠে বাঁধিয়া রাখার জন্য কোন চেষ্টারই ত্রুটি হয় নাই। কিন্তু যখন সে হিটলারের অধীনে সঙ্ঘবদ্ধ হইয়া ও রাষ্ট্রসঙ্ঘ ত্যাগ করিয়া সমরশক্তি বাড়াইতে লাগিয়া গেল তখন সকলেই ভীতসন্ত্রস্ত হইয়া উঠিল, রাষ্ট্রসঙ্ঘের মারফত তাহাকে জব্দ করিবারও চেষ্টা চলিতে লাগিল। এমন সময় এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল যাহা পরবর্ত্তী যাবতীয় আলাপ-আলোচনার মোড় ফিরাইয়া দিল। এই ব্যাপারটি হইল ১৯৩৫ সনের ১৮ই মে অন্যনিরপেক্ষ ভাবে ব্রিটেন ও জার্ম্মানীর মধ্যে ১০০ : ৩৫ আনুপাতিক নৌচুক্তি। এই নৌচুক্তির কথা প্রকাশ হইবা মাত্র সকলেরই টনক নড়িল। জার্ম্মানীর চিরশত্রু ফ্রান্স বিচলিত হইল সকলের চেয়ে বেশী। যাহাকে সে এতকাল পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিয়াছে সেই ব্রিটেনকে ছাড়িয়া অতঃপর সে ইটালীর দিকে মুখ ফিরাইল, ইহার কর্ণধার মুসোলিনীকেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। ব্রিটেন-জার্ম্মানীর নৌচুক্তির বিরুদ্ধে এই যে ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত, এক কথায় বলিতে গেলে ইহাই ইটালীর আবিসীনিয়া বিজয়ের মূলে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিষ্ক্রিয়তা তথা ব্যর্থতার মূলে, আবার ইহাই পরবর্ত্তী স্পেন-বিদ্রোহ ও অন্যবিধ ব্যাপারগুলি সম্ভব করিয়া দিয়াছে।

মহাসমরের পর বিজিত জার্ম্মানীর ন্যায় বিজয়ী ইটালীও মিত্রশক্তিগুলির চক্রান্তে পড়িয়া কম নাজেহাল হয় নাই। মুসোলিনী ইটালীর কর্ণধার হইয়া বার-তের বৎসরের মধ্যে ইহাকে একটি প্রথম শ্রেণীর রাষ্ট্রে পরিণত করিলেন। তাঁহার শক্তি যতই বাড়িতে লাগিল ততই তিনি বিদেশে সাম্রাজ্য-প্রতিষ্ঠার জন্য উদ্‌গ্রীব হইলেন। এখন ফ্রান্সকে হাতে পাইয়া তাঁহার এই উদ্দেশ্য সাধন সহজ হইয়া গেল মুসোলিনী এই সুযোগে আবিসীনিয়া অভিযান আরম্ভ করিয়া দিলেন। এক দিকে ব্রিটেন ও অন্য দিকে ফ্রান্স—



১৫ই এপ্রিল ১৯৩১। গণতন্ত্রবাদের প্রতিষ্ঠা উপলক্ষে উল্লসিতা বালিকাদিগের শোভাযাত্রা



যুদ্ধক্ষেত্রে বিদ্রোহীদলভুক্ত মূর-সেন



লুণ্ঠনরত মূর-সেন

এই উভয়ের টানা-হেঁচড়ায় পড়িয়া রাষ্ট্রসঙ্ঘের ইটালীকে সায়েস্তা করিবার সকল ব্যবস্থাই ব্যর্থ হইল। ইটালী গত বৎসর এপ্রিল মাসে আবিসীনিয়া জয় করিয়াছে। তবে ইহাকে স্বায়ত্তে আনিতে এখনও আড়াই লক্ষ সৈন্য সেখানে মোতায়েন রাখিতে ইটালী বাধ্য হইয়াছে। আবিসীনিয়াবাসীরা যে নতমস্তকে ইটালীর আধিপত্য স্বীকার করিয়া লয় নাই, সম্প্রতি হাবসী-নেতা রাস দেস্তার ও আদ্দিস আবাবার বহু সংখ্যক অধিবাসীর হত্যা-ব্যাপারে তাহা প্রমাণিত হইয়াছে।

গত ১৯৩০ সনে স্পেনবাসীরা রাজা আলফন্সোকে তাড়াইয়া দিয়া স্পেনে একটি সাধারণতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করে। তখন হইতেই কিন্তু রাজার পক্ষপাতী এক প্রবল দল সেখানে অধিষ্ঠিত রহিয়াছে। ইহারা এই কয় বৎসর সাধারণ-তন্ত্রের উচ্ছেদে তৎপর থাকিলেও বিশেষ কিছুই করিয়া উঠিতে পারে নাই। ইটালীর আবিসীনিয়া বিজয়পর্ব্ব শেষ হইবার পূর্ব্বেই, গত বৎসর ফেব্রুয়ারী মাসে সেখানে সাধারণ নির্ব্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। এই নির্ব্বাচনে গণতন্ত্রের পক্ষপাতী দলগুলি প্রায় সর্ব্বত্রই জয় লাভ করে এবং নিয়মানুগ ভাবে



যুদ্ধাস্ত্র-ব্যবসায়ী সর্ বেসিল জাহারফ
ইহার মৃত্যুতে পৃথিবীতে শান্তির সম্ভাবনা কিছু বাড়িল। ইহার চক্রান্তে বহু যুদ্ধ ও লক্ষ লক্ষ লোকের প্রাণনাশ হইয়াছিল

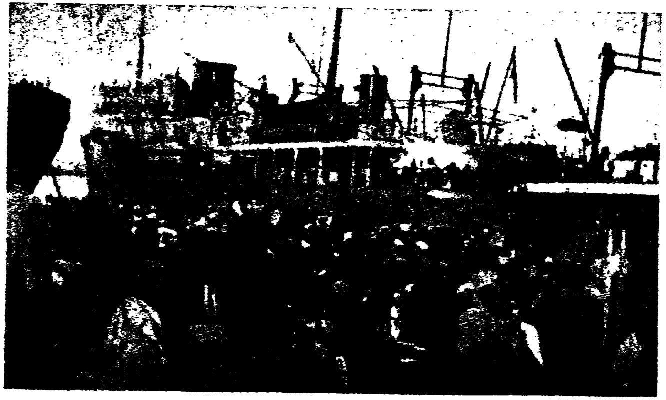
তাহাদের হস্তেই শাসনভার চলিয়া আসে। ইহাতে রাজতন্ত্রের পক্ষপাতী ধনী ও ধর্ম্মযাজকের দল অতিমাত্র



বিদ্রোহীহস্তে বন্দী গণতন্ত্রবাদী মিলিশিয়া সৈন্য।
গুলি করিয়া হত্যা করার পূর্ব্বে নামধাম লিখিয়া লওয়া হইতেছে। মৃত্যুভয়ের চিহ্নও নাই!



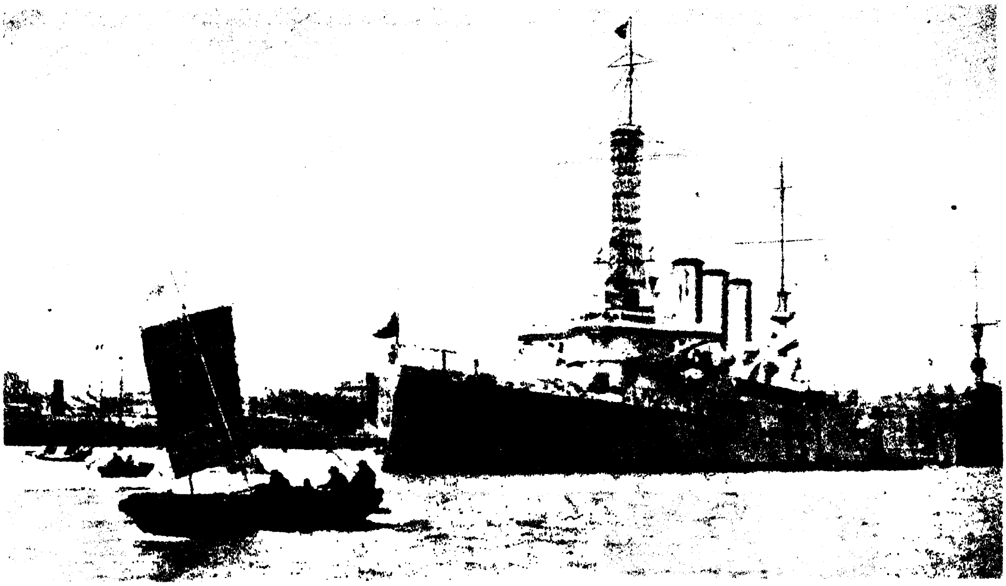
বিদ্রোহী মুর-সেনার হস্তে বন্দিনী গণতন্ত্রবাদিনী



গণতন্ত্রবাদ-সহায়ক "আন্তর্জাতিক" দলের স্পেনযাত্রা—ওরান বন্দর



গণতন্ত্রবাদের আন্তর্জাতিক সহায়ক সেনার স্পেনযাত্রা—পরপিনিয়ান, ফ্রান্স



সিঙ্গাপুর বন্দর



চীনের [illegible] সামরিক শিক্ষায় গড়িয়া উঠিতেছে



দার্দানেলিসে তুরস্কের অধিকার প্রতিষ্ঠা-চুক্তি-সম্পাদনান্তে প্রত্যাগত মন্ত্রীকে
অভ্যর্থনায় কামাল পাশা ও তাঁহার প্রধান মন্ত্রী





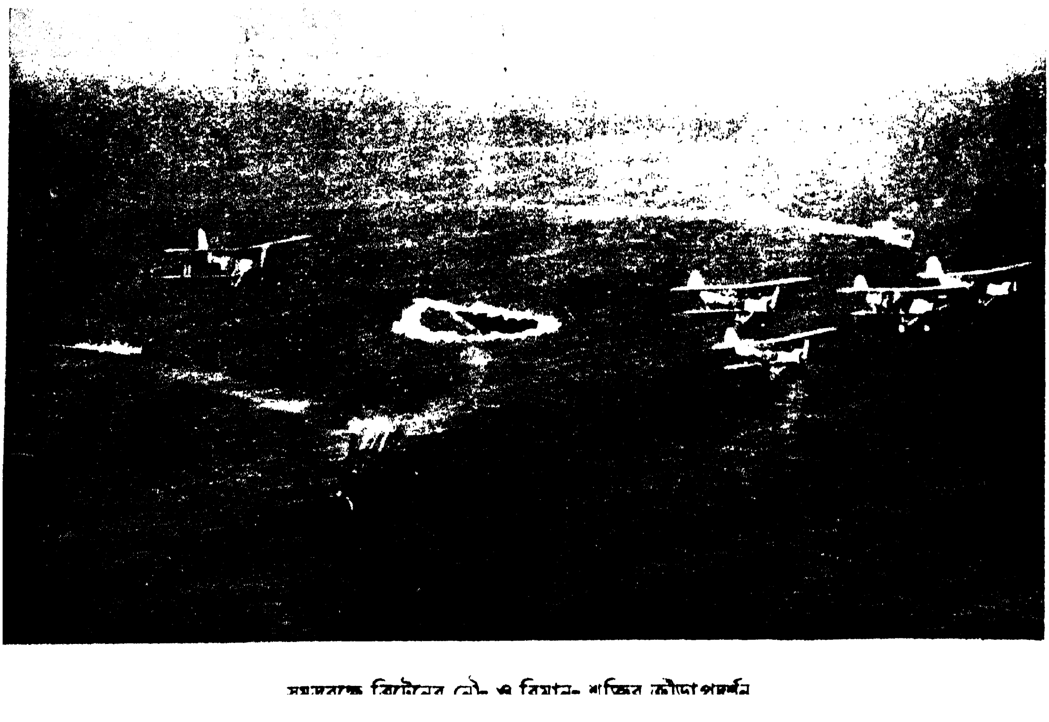
[সাম্য-মৈত্রীর দূত প্রেসিডেণ্ট রুসভেল্টের দক্ষিণ-আমেরিকায় দৌত্য। এই দৌত্যের ফলে আমেরিকায় যুদ্ধবিপ্লবের ভয় সুদূর-বিতাড়িত হইয়াছে। বন্দরে প্রেসিডেণ্ট জাহাজ হইতে অবতরণ করিতেছেন



[illegible]। মেক্সিকোতে জনবিক্ষোভের চিত্র



পৃথিবীর বৃহত্তম সেতু। আমেরিকার সান ফ্রান্সিস্কো এবং ওকলাণ্ড শহর এই সেতু দ্বারা যুক্ত হইল। ইহা দ্বিতল ও সাড়ে চারি মাইল লম্বা



সমুদ্রবক্ষে ব্রিটেনের নৌ- ও বিমান- শক্তির ক্রীড়াপ্রদর্শন



মাদ্রিদের অদম্য সাহস। সমূহ বিপদের মধ্যেও এই মিসিনিয় রক্ষী নিশ্চিন্ত নির্ভয়

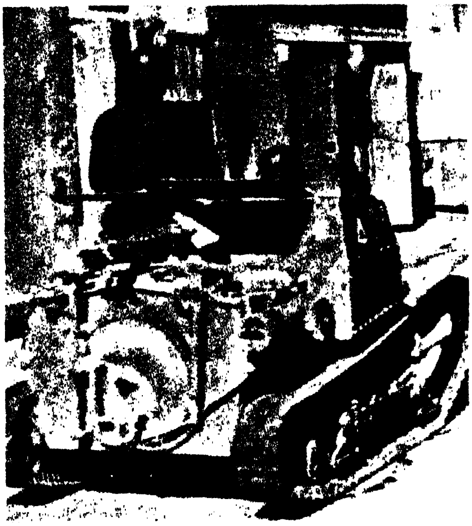
বিচলিত হইয়া পড়িল এবং সৈন্যদলকে হাত করিতে প্রয়াস পাইল। তাহারা এই কার্য্যে প্রথম হইতেই নাৎসী ও ফাসিষ্টদের সাহায্য লাভে সমর্থ হইয়াছে। ইহার পরিণতি কিরূপ ভীষণ হইয়া পড়িয়াছে তাহা পরে বলিতেছি।

ইহার পর মার্চ্চ মাসের প্রথমেই জার্ম্মানী রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করিয়া বিশ্ববাসীকে তাক্ লাগাইয়া দিল। ভের্সাই সন্ধির মুণ্ডপাত হইল, লোকার্ণো চুক্তি ধ্বসিয়া গেল, শান্তির ক্ষীণ আশাও লোপ পাইল—নানা স্থানে এই রব উঠিল। তবে জার্ম্মানী ইহার যে কারণ দেখাইল তাহা কিন্তু একেবারে হাসিয়া উড়াইয়া দেওয়া গেল না। ব্রিটেন-জার্ম্মানী নৌচুক্তির পর ফ্রান্স ইটালীর সঙ্গেই শুধু মিতালি করে নাই, সোভিয়েট রুশিয়ার সঙ্গেও পারস্পরিক সাহায্যমূলক একটি চুক্তি করিয়া বসিয়াছিল। এই চুক্তি ফ্রাঙ্কো-সোভিয়েট চুক্তি নামে পরিচিত হইয়াছে। পূর্ব্বেকার লোকার্ণো-চুক্তির নিরিখে এই চুক্তি একান্ত অনাবশ্যকই শুধু নহে, পরন্তু উহার সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এই কারণে জার্ম্মানী লোকার্ণো-চুক্তি ভঙ্গ করিয়া রাইনল্যাণ্ডে পুনঃপ্রবেশ করিল বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ব্রিটেন-জার্ম্মানী নৌচুক্তিতে যেমন বর্ত্তমান অনর্থের প্রথম পর্ব্বের সূচনা বলিয়াছি জার্ম্মানীর রাইনল্যাণ্ডে প্রবেশে তেমনই দ্বিতীয় পর্ব্বের আরম্ভ।

ব্রিটেন জার্ম্মানীর মিত্র হইতে পারে, তাহার সঙ্গে চুক্তিতে আবদ্ধ হইতে পারে, কিন্তু আত্মরক্ষা তাহার সর্ব্বপ্রথম কর্ত্তব্য, আর আত্মরক্ষা করিতে হইলে ফ্রান্সের সঙ্গেই তাহাকে বরাবর সহযোগিতা করিতে হইবে। ওদিকে



সভ্যতায় জার্ম্মানীর দান। নাৎসী গোলন্দাজ অধ্যক্ষ, মাদ্রিদে গোলাবর্ষণের ব্যবস্থা করিতেছেন



সভ্যতায় ইটালীর দান। মাদ্রিদ অভিমুখে ফ্যাসিষ্ট ট্যাঙ্ক-চালক,

আবিসীনিয়া সমরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের সঙ্গে যেরূপ মন-কষাকষি আরম্ভ হইয়াছিল, সমর শেষ হইবার দিকে তাহার তীব্রতা কমিয়া আসিতেছিল। জার্ম্মানী যখন কাহারও তোয়াক্কা না রাখিয়া রাইনল্যাণ্ডে সৈন্য সমাবেশ করিল তখন আর ব্রিটেন স্থির থাকিতে পারিল না, ফ্রান্স ও বেলজিয়মের সঙ্গে পুরাদস্তুর ইতিকর্ত্তব্যতা সম্বন্ধে আলোচনা সুরু করিয়া দিল। যদি একান্তই যুদ্ধ বাধে তাহা হইলে কি ভাবে অগ্রসর হইতে হইবে, পরস্পরের সৈন্য-বিভাগের মধ্যে তাহারও আলোচনা চলিল। এদিকে ফ্রান্সে নূতন নির্ব্বাচন আসিল। ইটালীর ভক্ত লাভালের পরিবর্ত্তে মঃ ব্লুমের অধীনে বিজয়ী সমাজতান্ত্রিক দলগুলি ফ্রান্সের শাসনভার গ্রহণ করিল। ইহারা ইটালীর আবিসীনিয়া-অভিযানের বিরোধী, ব্রিটেনের মতাবলম্বী। কাজেই পুনরায় ব্রিটেন ও ফ্রান্সে মিলন হইতে বিলম্ব হইল না। যদি-বা কিছু বাধা থাকিত জার্ম্মানীর হঠকারিতায় তাহাও কোথায় মিলাইয়া গেল।

এখন দেখা যাইতেছে, ইটালীর আবিসীনিয়া সংগ্রামে ফ্রান্সের সম্মতি থাকিলেও ঘটনাচক্রে শেষ পর্য্যন্ত সে আর ইহার মধ্যে থাকিতে পারিল না। ব্রিটেন ও ফ্রান্সে আঁতাত ঘনীভূত হইলে সোভিয়েট রুশিয়া যে তাহার সঙ্গে যুক্ত হইবে এমন আশঙ্কা হইতে লাগিল। স্পেনে সাম্যবাদ আড্ডা গাড়িয়াছে। ফ্রান্সেও ত সমাজতান্ত্রিকরা প্রবল। গত বৎসরের প্রারম্ভে যখন এই অবস্থা তখন ইটালী কিরূপে জার্ম্মানীর সঙ্গে সঙ্ঘবদ্ধ হইতে পারে রোমের কূটনীতিক-মহলে তাহারই আলোচনা সুরু হইল। এই রাষ্ট্র দুইটির মধ্যে একটি ঘনিষ্ঠ আঁতাত কি কি কারণে অত্যন্ত সহজ হইয়া পড়িল তাহাই এখন বলিব।

আবিসীনিয়া বিজয়ে ইটালী শক্তিমান হইয়াছে। কিন্তু তাহার শক্তিমত্তা প্রকাশের যে রূপ সভ্য জগৎ দেখিতে পাইল তাহাতে ভূমধ্যসাগরের তীরে স্বাধীন ও অর্দ্ধ-স্বাধীন রাষ্ট্রগুলির আতঙ্কের সীমা রহিল না। ফ্রান্স এবং ব্রিটেনও যে আতঙ্কিত হয় নাই তাহাও কেহ হলফ করিয়া বলিতে পারিবে না। ফ্রান্সের সমাজতান্ত্রিকদল শাসনভার লাভ করিয়াই তাহার তাঁবেদারিভুক্ত সিরিয়াকে স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিল। তুরস্ক ক্ষুদ্র হইলেও একটি স্বাধীন রাষ্ট্র। কিন্তু লোজান সন্ধি অনুসারে দার্দ্দেনেলিস প্রণালী প্রভৃতি তাহার কতকটা অঞ্চলও রাইনল্যাণ্ডের মত নিরস্ত্রী-

কৃত করিয়া রাখা হইয়াছিল। এখন কিন্তু ইটালীর শক্তি অত্যধিক বাড়িয়া গিয়াছে, সম্মুখস্থ ডোডেকানিজ দ্বীপাবলীতে



টেগস্ নদীর উপর টলিডো-আলকাজার

তাহার আড্ডা। কাজেই এ অবস্থায় তাহার ঐ অঞ্চল নিরস্ত্রীকৃত রাখা কোন মতেই সমীচীন নহে—তুরস্ক রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিকট এই প্রস্তাব পেশ করিল। অতি দ্রুতই এই প্রস্তাবের আলোচনা সুরু হইল। বর্ত্তমান বৎসরের প্রথম দিকে সুইজারল্যাণ্ডে মঁত্রোতে এই উদ্দেশ্যে রাষ্ট্রসঙ্ঘের আনুকূল্যে একটি বৈঠক বসে ও এ-বিষয় মীমাংসা হইয়া যায়। তুরস্ক অনুমতি পাইবা মাত্র দার্দ্দেনেলিস অঞ্চলে সৈন্য স্থাপন করিয়াছে, ঐ অঞ্চলে দুর্গাদি নির্ম্মাণেও সে এখন ব্যস্ত। মঁত্রো বৈঠকে তুরস্কের পররাষ্ট্র-সচিব মঃ আরাস যে কৃতিত্ব দেখাইয়াছেন তাহা তাঁহার স্বদেশবাসী কৃতজ্ঞ চিত্তে স্বীকার করিতেছে।

সিরিয়া ও তুরস্কের কথা বলিলাম। ব্রিটেনও কিন্তু বসিয়া রহিল না। ইটালী কর্ত্তৃক আবিসীনিয়া বিজয়ে ব্রিটেনের ত টনক নড়িয়াছেই, তাহার অধীনস্থ মিশরও কিন্তু কম চঞ্চল হয় নাই। মিশর ও ব্রিটেনের শোচনীয় দ্বন্দ্বের কাহিনীর পুনরাবৃত্তি করিবার প্রয়োজন নাই। কিন্তু যাহাদের মধ্যে দ্বন্দ্ব বহুদিনপুষ্ট তাহারাও যে সহসা একটা আপোষ-নিষ্পত্তির জন্য ব্যগ্র হইয়া পড়িল তাহাতে তাহাদের চাঞ্চল্যের ও আসন্ন বিপদের আশঙ্কার গভীরতাই সূচিত করে। গত বৎসর জুন-জুলাই মাসে উভয়ের মধ্যেই সন্ধি হইয়া গেল, মিশর স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকৃত হইল। দেশরক্ষা, সুয়েজ খাল প্রভৃতি বিষয়ে অবশ্য ইংরেজের সঙ্গেই তাহাকে চলিতে হইবে। মিশর এখন রাষ্ট্রসঙ্ঘের এক জন স্বাধীন সভ্য হইবার অধিকারও লাভ করিয়াছে।



নাহাশ পাশা। ইঁহারই নায়কত্বে ইঙ্গ-মিশর চুক্তি সম্পন্ন হয়

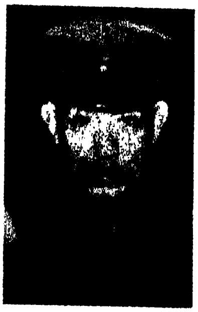
এই প্রসঙ্গে আর একটি ব্যাপারেরও উল্লেখ করা প্রয়োজন। সিরিয়া স্বাধীনতা লাভ করিয়াছে, মিশর স্বাধীন হইয়াছে, ইংরেজের আনুকূল্যে আরবভূমি আজ নূতন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়াছে। ইরাক, ট্রান্সজর্ডান, ইমেন, সৌদি আরব তুরস্কের নাগপাশ হইতে বিমুক্ত হইয়া আজ সবল স্বাধীন ও উন্নত হইতে চলিয়াছে। ইহারা এখন ইংরেজের সঙ্গে নানা সন্ধিতে আবদ্ধ। ইটালীর আবিসীনিয়া বিজয়ের পর হইতে তাহাদের ইংরেজপ্রীতি আরও যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। বিশেষজ্ঞগণ বলেন, বর্ত্তমানে প্রাচ্যে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ভিত্তিভূমি হইল এই আরব দেশ। কিন্তু সমগ্র আরবভূমিতে যখন ইংরেজরা এইরূপ অভিনন্দিত হইতেছে তখন ক্ষুদ্র প্যালেষ্টাইনে এত হাঙ্গামা কেন? প্রায় এক বৎসর হইতে চলিল, প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে হাঙ্গামা চলিয়াছে, কমিশন-কমিটি স্থাপনে, নানারূপ প্রলোভনে বা দমননীতির প্রবল প্রকাশেও কয়েক লক্ষ আরবের সঙ্কল্পচ্যুতি ঘটাইতে পারিল না। চারি দিকে যখন জাতভাইয়েরা দেশ শাসনের ক্ষমতা লাভ

করিয়াছে তখন উহারাও যে পরের হুকুমে চালিত বা শাসিত হইতে চাহিবে না ইহা বুঝা বিশেষ কঠিন নয়।

যাহা হউক, আবিসীনিয়া বিজয়ের পর যখন ফ্রান্স, ব্রিটেন, তুরস্ক, মিশর প্রভৃতি জোট পাকা য়া আত্মরক্ষার নানা কৌশল অবলম্বন করিতে লাগিয়া গেল তখন ইটালী নিজেকে নিতান্ত একাকী মনে করিতে লাগিল। আবার ফ্রান্স ও স্পেনে সমাজতন্ত্রীদের প্রাধান্য স্থাপিত হওয়ায় নিজের স্বৈরশাসনে বিঘ্ন জন্মিবে এই আশঙ্কাও দেখা দিল। জার্ম্মানীরও এই আশঙ্কা, কারণ সেখানকার নাৎসীবাদও ইটালীর ফাসিষ্ট-তন্ত্রের উপর প্রতিষ্ঠিত। ফ্রান্স ও ব্রিটেনের মধ্যে ঘনিষ্ঠতা বৃদ্ধি হওয়ায় তাহার আশঙ্কা আরও বাড়িয়া গেল। জার্ম্মানী ও ইটালীতে মিলন ঘটনা পরম্পরায় একান্তই স্বাভাবিক হইয়া পড়িল। এতদিন অষ্ট্রিয়া লইয়া ছিল ইটালী ও জার্ম্মানীর মধ্যে মতভেদ। মুসোলিনীর আগ্রহাতিশয্যে শীঘ্রই ইহা দূরীভূত হইল। গত ১১ই জুলাই মুসোলিনীর মধ্যস্থতায় জার্ম্মানী অষ্ট্রিয়ার সার্ব্বভৌমত্ব স্বীকার করিয়াছে।

ইটালী ও জার্ম্মানীর মধ্যে মিলন সংঘটিত হইবার পরই উভয়ের মনোগত অভিপ্রায় হইল ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের ক্ষমতা কিরূপে হ্রাস করা যায়। ইহারা সর্ব্বদা গণতন্ত্রের নিপাত কামনা করে, সমাজতন্ত্র বা সাম্যবাদকেও ইহারা বিষদৃষ্টিতে দেখে। স্পেনের ব্যাপারে কিন্তু গণতন্ত্র ধ্বংসের দোহাই দিল না। সেখানে সাম্যবাদ আড্ডা গাড়িতে চলিয়াছে এই অছিলায় তাহার বিরুদ্ধে প্রচার আরম্ভ করিল। পূর্ব্বে বলিয়াছি, স্পেনে একদল রাজতন্ত্র প্রতিষ্ঠা করিবার জন্য ষড়যন্ত্রে লিপ্ত হইয়াছিল, ইটালী ও জার্ম্মানী তাহাতে ইন্ধন জোগাইতেছিল। যাই ইটালী জার্ম্মানীর মধ্যে আঁতাত প্রতিষ্ঠিত হইল অমনি এই দল চাঙ্গা হইয়া উঠিল। গত ১৮ই জুলাই স্পেনে ইহারা বিদ্রোহ ঘোষণা করিল। এই রাষ্ট্র দুইটি প্রকাশ্যে বিদ্রোহী পক্ষকে সৈন্য ও অস্ত্রশস্ত্র দিয়া সাহায্য করিতে লাগিল। স্পেনের এই বিপ্লব আজ এপ্রিল মাসেও শেষ হইবার কোন লক্ষণ দেখা যাইতেছে না। এখন যেরূপ অবস্থা দাঁড়াইয়াছে তাহাতে ইহাকে ক্ষুদ্রাকারে একটি মহাসমর বলিলেও অসঙ্গত হইবে না। কারণ সরকার পক্ষে আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী নামে বিভিন্ন দেশের লোকেরা যুদ্ধ করিতেছে, বিদ্রোহী-পক্ষে লড়িতেছে জার্ম্মানী ও ইটালীর সুশিক্ষিত সেনানী। জার্ম্মানীর সৈন্য-সংখ্যা ক্রমশঃ হ্রাস পাইয়াছে। সে নাকি চেকোস্লোভাকিয়া-সীমান্তে সৈন্য-সমাবেশে ব্যস্ত। তবে ইটালীর সৈন্য এক লক্ষের উপরে দাঁড়াইয়াছে। আন্তর্জ্জাতিক বাহিনী ইহাদের তুলনায় নগণ্য। স্পেন বিপ্লবের একটা হেস্ত-নেস্ত করিতে এখন ইটালীই কেন লাগিয়া গিয়াছে তাহার রহস্য ভেদ করিবার জন্য আর একটি ব্যাপারের উল্লেখ পরে করিতেছি। এদিকে স্পেন-বিদ্রোহের আশু পরিসমাপ্তির জন্য রাষ্ট্রসঙ্ঘের আনুকূল্যে লণ্ডনে 'নন্-ইণ্টারভেনশন কমিটি' নামে একটি কমিটি বসানো হইয়াছে। তবে রাষ্ট্রসঙ্ঘের ন্যায় ইহার নিষ্ক্রিয়তাও সুপরিস্ফুট। অতঃপর আর যাহাতে স্পেনে অস্ত্রশস্ত্র কিম্বা সৈন্যসামন্ত বিদেশ হইতে প্রেরিত না হইতে পারে তাহার জন্য স্থলে ও জলে স্পেন-সীমান্তে পাহারাদার নিযুক্ত হইয়াছে। কিন্তু এই ব্যবস্থা কতটুকু সাফল্যলাভ করিবে বা আদৌ সাফল্যলাভ করিবে কি-না তাহা এখন বলা কঠিন।

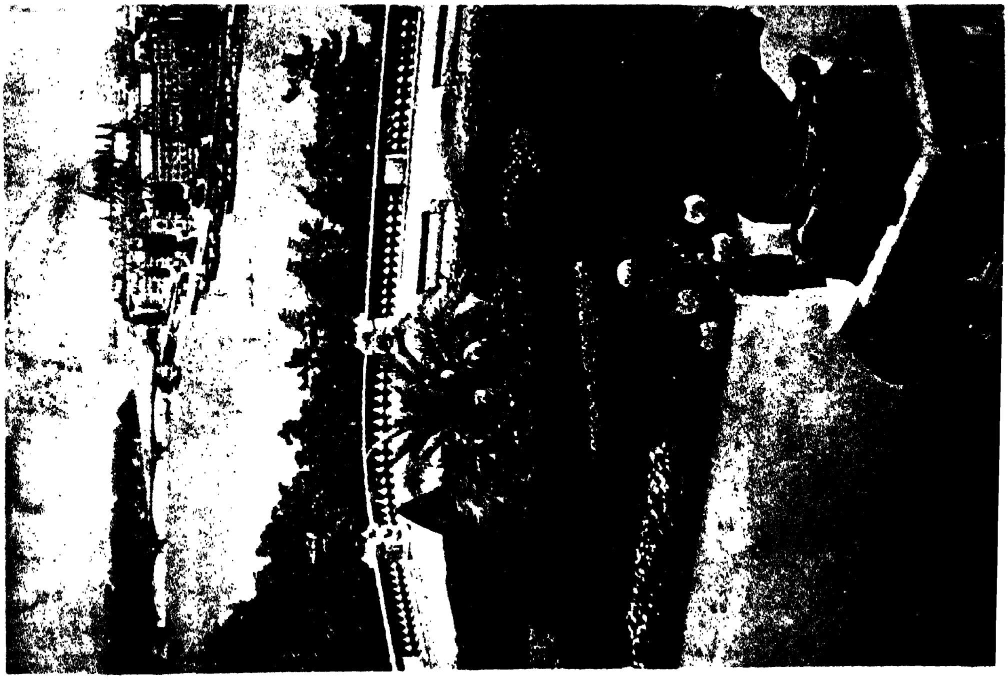
সোভিয়েট রুশিয়াও বর্ত্তমানে আমাদের কম দৃষ্টি আকর্ষণ করে নাই। তাহার ধনবল, জনবল, অস্ত্রবল প্রচুর। জার্ম্মানী ও ইটালীর মত সেখানেও ডিক্টেটরীয় শাসন,



জাপানের সমরযাত্রী নূতন কর্ণধার, প্রধান মন্ত্রী হায়াসী

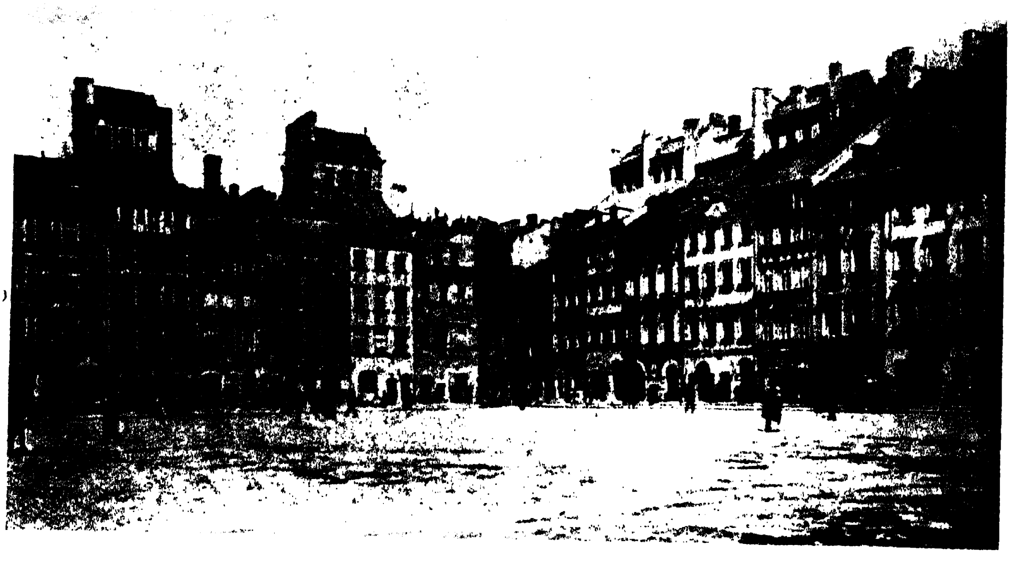
তবে ইহাদের সঙ্গে পার্থক্য এই যে, রুশিয়া সাধারণের মঙ্গলের জন্যই নিজেকে নিয়োজিত করিয়াছে। পর-রাজ্য হরণ করিবার বা সাম্রাজ্য স্থাপন করিবার কল্পনা ইহার নাই। গত নবেম্বর মাসে এখানেও গণতন্ত্রমূলক শাসন প্রবর্ত্তনের







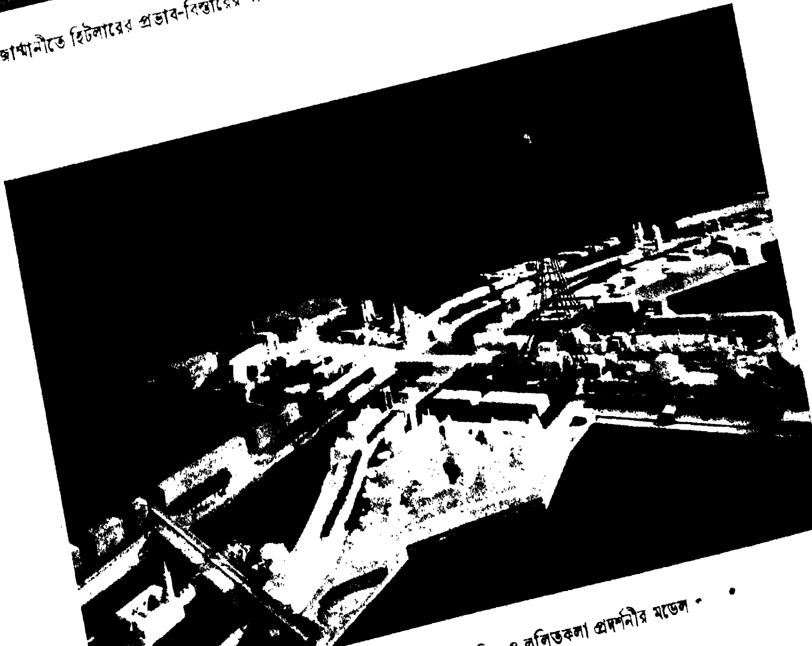
দক্ষিণ রোডেশিয়ার সুবিখ্যাত ভিক্টোরিয়া জলপ্রপাতের দৃশ্য



ওয়ারস-র বাজার



জার্ম্মানীতে হিটলারের প্রভাব-বিস্তারের বাৎসরিক উৎসব। বার্লিন ব্রাণ্ডেনবর্গ ফটকে মশালধারীদের শোভাযাত্রা



প্যারিসে আগামী আন্তর্জ্জাতিক শিল্প ও ললিতকলা প্রদর্শনীর মডেল



মাদ্রাজে নিখিল ভারত হিন্দী সাহিত্য-সম্মেলনে মহাত্মা গান্ধীর অভিভাষণ





ব্যবস্থা হইয়াছে। জার্ম্মানী ও ইটালী গণতন্ত্র বা সাম্যবাদ কোনটাই পছন্দ করে না। এই জন্য রুশিয়ার বিরুদ্ধে তাহাদের ভয়ানক কোপ। এই কোপের আর একটি কারণ হইল, রুশিয়া ভাবী আক্রমণ-আশঙ্কায় তাহার পশ্চিম সীমান্তে চেকোস্লোভাকিয়া ও পোল্যাণ্ডের পাশ দিয়া ঘাঁটি নির্ম্মাণ করিয়াছে, সেখানে বহু রুশ সৈন্য বর্ত্তমান।

সোভিয়েট রুশিয়ার পূর্ব্ব সীমান্তে রহিয়াছে জাপান। জাপানও কতকটা ফ্যাসিষ্ট মতাবলম্বী, সোভিয়েট সাম্যবাদের সে ঘোর শত্রু। পূর্ব্ব সীমান্তও রুশিয়া বেশ সুরক্ষিত করিয়াছে। জাপানের ইহা আদৌ কাম্য নহে। একারণ ইহার বিরুদ্ধে জাপানের ষড়যন্ত্র বেশ পাকিয়া উঠিয়াছে। গত ডিসেম্বর মাসে জাপান ও জার্ম্মানীর মধ্যে রুশিয়ার বর্ত্তমান শাসন-ব্যবস্থার বিরুদ্ধে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হইয়াছে। এই জাপ-জার্ম্মান চুক্তি আসন্ন অনর্থের তৃতীয় পর্ব্বের সূচনা করিতেছে বলিলে অত্যুক্তি হইবে না। এই চুক্তির দ্বারা পূর্ব্বে জাপান ও পশ্চিমে জার্ম্মানীর প্রাধান্য ও শক্তি পরস্পর স্বীকার করিয়া লইয়াছে। সমগ্র দক্ষিণ-পূর্ব্ব এশিয়া জাপানের আওতায় পড়িয়াছে। জেনেরল হায়াসির নেতৃত্বে সমরপন্থীরা জাপানে প্রবল হইয়া উঠিয়াছে। এতকাল ব্রিটেন যেন আন্তর্জ্জাতিক ব্যাপারে বিশেষ দৃঢ়তা দেখায় নাই। কিন্তু জাপ-জার্ম্মান চুক্তির পর সেও অত্যধিক তৎপর হইয়া নানারূপে সমরায়োজনে লাগিয়া গিয়াছে।

ইটালী কর্ত্তৃক আবিসীনিয়া অধিকারের পর ব্রিটেন যেরূপ ভূমধ্যসাগরীয় দেশগুলির সঙ্গে মোটামুটি সদয় ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিল সেইরূপ ভূমধ্যসাগর ছাড়াও প্রাচ্য-সাম্রাজ্যে যাতায়াতের পথ যাহাতে সুরক্ষিত হয় তাহার দিকে মন দিল। এক সময় দক্ষিণ-আফ্রিকা ব্রিটেনের হস্ত হইতে একেবারে মুক্ত হইতে চাহিয়াছিল, অষ্ট্রেলিয়ায়ও একটি দল পূর্ণ স্বাধীনতা ঘোষণা করিতেছিল। কিন্তু বর্ত্তমান বর্ষের প্রথম হইতেই যেন সব বদলাইয়া গেল। দক্ষিণ-আফ্রিকা আত্মরক্ষার উপায় সাধনের জন্য ব্রিটেনের শরণাপন্ন হইল। উত্তর-পূর্ব্ব আফ্রিকায় ইটালীর ক্ষমতা যতই বাড়িতেছে, জার্ম্মানীর উপনিবেশের দাবী যতই তীব্র হইয়া উঠিতেছে ততই, কি দক্ষিণ-আফ্রিকা, কি অষ্ট্রেলিয়া সকলেই ব্রিটেনের আশ্রয় চাহিতেছে। ব্রিটেনও হুঁসিয়ার হইয়া গিয়াছে, শতবর্ষ আগেকার মত এখন আবার পূর্ব্ব-আফ্রিকা ঘুরিয়া প্রাচ্য সাম্রাজ্যে যাইবার ব্যবস্থা করিতে তৎপর হইয়াছে। ইতিমধ্যে সে কিন্তু একটা কূট চালও চালিয়াছে। গত ১লা জানুয়ারী ইটালীর সঙ্গে একটা 'ভদ্রলোকের চুক্তিতে' আবদ্ধ হইয়াছে। এই চুক্তিতে ভূমধ্যসাগরে যাহাতে ব্রিটেনের স্বার্থ সংরক্ষিত হয় ইটালী তাহাতে স্বীকৃত হইয়াছে। স্পেনে কিন্তু ইটালীই প্রাধান্য লাভ করিয়াছে। আজ যে লক্ষাধিক সৈন্য সেখানে লড়াই করিতেছে তাহা কি তবে এই চুক্তিরই ফল?

ব্রিটেন সম্প্রতি তাহার রণসজ্জার একটি পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনা প্রকাশ করিয়াছে। বার্ষিক তিন শত মিলিয়ন পাউণ্ড হিসাবে পাঁচ বৎসরে পনর শত মিলিয়ন পাউণ্ড খরচ করা হইবে। জল, স্থল ও বিমান-বাহিনী প্রত্যেকটি এইরূপে বর্দ্ধিত হইবে। পূর্ব্ব-পশ্চিমের সকল ঘাঁটি পাকা করিয়া নির্ম্মাণ করা হইবে। সিঙ্গাপুর-ঘাঁটি নির্ম্মাণ প্রায় শেষ হইয়াছে। চীনের গাত্রে হংকঙে আর একটি বড় রকমের ঘাঁটি নির্ম্মিত হইবে। ইহাতে খরচ হইবে আশী লক্ষ পাউণ্ড। ব্রিটেনের কর্ণধারগণ এই বলিয়া আশ্বাস দিতেছেন যে, ইহা দ্বারা জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পথ সুগম হইবে। প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তিই কিন্তু ইহার পরিণাম ভাবিয়া চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছেন। আর একটি বৃহত্তর সমরের বুঝি আর বিলম্ব নাই। জগতে ধাতব ও অন্যান্য জিনিষের মূল্য বৃদ্ধি ইহাই সূচিত করিতেছে।

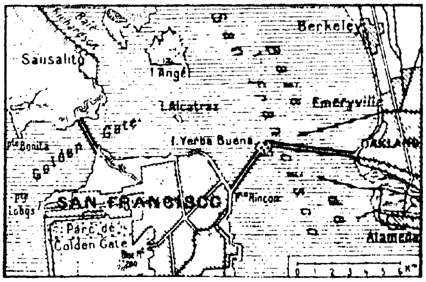
বর্ত্তমান বৎসরে অন্তর্জগতে কি কি প্রধান প্রধান ঘটনা সংঘটিত হইল তাহারই আলোচনা করিলাম। ইহার মধ্যে ব্যর্থতা ও নৈরাশ্যই আমরা দেখিয়াছি। কিন্তু কয়েকটি এমন ঘটনাও ঘটিয়াছে যাহার মধ্যে ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইবার কারণ নাই। সাম্রাজ্য যাঁহাদের আছে তাহাদের মধ্যে বিবাদ দ্বন্দ্ব কলহ লাগিয়াই থাকিবে। দুর্ব্বল যাহারা তাহারা সবল হইলে সাম্রাজ্যওয়ালাদের শিক্ষা হইতে পারে, উপযুক্ত শিক্ষা পাইয়া শুভবুদ্ধি হওয়াও সম্ভব। মহাচীন এতকাল সাম্রাজ্যবাদীদের লীলাভূমি হইলেও এ বৎসর যে-সমস্ত লক্ষণ প্রকাশ পাইতেছে তাহাতে তাহার সংহতিই ব্যক্ত করিতেছে। এ বৎসর দক্ষিণে ক্যাণ্টনে, উত্তর চীনে ও সেদিন সিয়ান প্রদেশে যে তিনটি

ঘটনা ঘটিয়া গেল তাহাতে বুঝা যায় চীন যুগ-যুগান্তের নিদ্রা হইতে যেন জাগিয়া উঠিয়াছে, বিদেশীর আক্রমণ-অত্যাচার আর সে সহ্য করিবে না। সেনাপতি চ্যাং সুয়ে লিয়াং চীন রাষ্ট্রনায়ক চিয়াং কাই-শেককে কয়েকদিনের জন্য আটক রাখিয়া জগদ্বাসীকে এই কথাই স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিয়াছেন। রাষ্ট্রপতি চিয়াং কাই-শেকের কর্ম্মকৌশলে মহাচীন আজ একটি প্রধান শক্তিতে পরিণত হইতে চলিয়াছে।

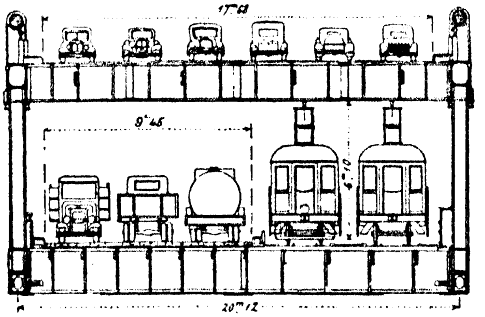
এ বৎসরকার আর একটি প্রধান ঘটনা মিঃ রুজভেল্টের দ্বিতীয়বার যুক্তরাষ্ট্রের সভাপতি পদে নির্ব্বাচন। তিনি আমেরিকা হইতে যুদ্ধ-নিবারণের জন্য অনুরোধ জানাইয়াছেন। সম্প্রতি সান্‌ফ্রান্সিস্‌কোতে উত্তর ও দক্ষিণ আমেরিকার রাষ্ট্রগুলির একটি শান্তি-বৈঠক হইয়া গিয়াছে। তাহাতে তিনি এই বাণী ঘোষণা করিয়াছেন যে, যুদ্ধই সব অনিষ্টের মূল, সুতরাং যুদ্ধের কারণগুলি বিদূরিত করিতে হইবে। এই প্রসঙ্গে তিনি প্রস্তাব করিয়াছেন যে, জগতের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে যুদ্ধের কারণগুলি লোপ করিতে হইলে রাষ্ট্রগুলির মধ্যে ব্যবসা-বাণিজ্যের সর্ব্ব প্রকার বাধা তুলিয়া দিতে হইবে। তাঁহার এই প্রস্তাব গৃহীত হইবার সম্ভাবনা বর্ত্তমানে কম দেখা যায় বটে, কিন্তু এইরূপ কোন ব্যবস্থা না হইলে যুদ্ধ বন্ধ হইবে না।

নানা দেশ সম্বন্ধে এত কথা বলিলাম, কিন্তু ভারতবর্ষ সম্বন্ধে কি বলিবার আছে? আন্তর্জাতিক ব্যাপার-গুলিতে ভারতবর্ষের কি কোনও স্থান নাই? ভারতবর্ষে ইদানীং স্বায়ত্তশাসনের নামে প্রদেশে প্রদেশে এক ভুয়া শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ইহার মধ্যে মুক্তির পথ আছে কি? ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমসীমান্তে আফ্রিদী, ওয়াজিরি ও মমন্দদের দমন করিতে বহু যুগ কাটিয়া গেল, গত কয়েক মাসাবধি গবর্ণমেণ্টের তরফ হইতে তাহাদের উপদ্রব দমন করিবার জন্য বিশেষভাবে চেষ্টা চলিতেছে। চীনের আত্মসংগঠন, আমেরিকার শান্তি স্থাপন প্রচেষ্টা বর্ত্তমান বৎসরে কিছু আশার সন্ধান দিতেছে বটে, কিন্তু কি বিশ্বের সর্ব্বত্রই যেরূপ ঘটনা-পরম্পরা লক্ষ্য করা যাইতেছে তাহাতে সর্ব্বত্রই একটা আসন্ন অনর্থপাতের আভাস পাওয়া যায়। ভের্সাই সন্ধির অ-বিচার আর তাহাকে ঢাকিয়া রাখিবার জন্য পরবর্ত্তী বিবিধ সন্ধি ও চুক্তি এবং সাম্রাজ্য-বাদী রাষ্ট্রগুলির চক্রান্ত ও রণসজ্জা—এ সকলের পরিসমাপ্তি হইবে আর একটি মহাসমরে—বিশেষজ্ঞগণ এইরূপ অনুমান করিতেছেন। ভবিতব্যের গর্ভে কি নিহিত আছে কে বলিতে পারে?

২৫এ চৈত্র, ১৩৪৩।



সানফ্রানসিস্কো এবং ওকলাণ্ড শহর। ইহার মধ্যের উপসাগর নূতন সেতুতে বন্ধন করা হইল



নূতন সেতুর উপরে ছয়টি মোটর গাড়ীর পথ; নীচের তলায় তিনটি লরীর ও দুইটি ট্রামের পথ

বিবিধ প্রসঙ্গ

"সর্ব্বনাশ" ও "পৌষ মাস"

কথায় বলে, 'কারো সর্ব্বনাশ, কারো পৌষ মাস।' ভারতবর্ষের নূতন শাসনবিধানের ফলে ইতিমধ্যেই দেশের সর্ব্বনাশ হইয়াছে, দেশ ছারখার হইয়াছে, বলিলে ঠিক সত্য কথা বলা হইবে না। যাহার অনুমান যাহাই হউক, সকলকেই ফলের জন্য অপেক্ষা করিয়া থাকিতে হইবে, এবং তাহা কি প্রকার, যথাসময়ে বলিতে হইবে। এখন ত শাসন-বিধানের শুধু প্রাদেশিক অংশ অনুসারে সবেমাত্র কাজের আরম্ভ হইয়াছে।

কিন্তু নূতন শাসন-বিধানে গণতান্ত্রিকতার ও নিয়মতান্ত্রিকতার সর্ব্বনাশ যে হইয়াছে, সে বিষয়ে বিন্দুমাত্রও সংশয় নাই। এই নূতন আইন দ্বারা গবর্ণর-জেনারাল ও প্রাদেশিক গবর্ণরদিগকে নামে নিয়মতান্ত্রিক শাসক কিন্তু কাজে স্বেচ্ছাকারী অর্থাৎ ডিক্টেটর করা হইয়াছে। তাঁহাদিগকে যত প্রকার ক্ষমতা যে পরিমাণে দেওয়া হইয়াছে তাহা কোন নিয়মতান্ত্রিক দেশের রাজা বা শাসকের নাই, কোন কালে ছিল না।

নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিকতার এই যে সর্ব্বনাশ, ইহাতে কতকগুলি লোকের 'পৌষ মাস' হইয়াছে। যাহাদের 'পৌষ মাস' হইয়াছে, তাহারা বিশেষ কোন একটিমাত্র ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক নহে, যদিও তাহাদের মধ্যে মুসলমানের আনুপাতিক সংখ্যা বেশী।

কিন্তু ধীরভাবে চিন্তা করিলে সকলেই বুঝিতে পারিবেন, যে, যাহার দ্বারা নিয়মতান্ত্রিকতা ও গণতান্ত্রিকতার সর্ব্বনাশ হইয়াছে এবং যাহার ফলে দেশের বিষম অনিষ্ট হইবে, তাহা হইতে কাহারও প্রকৃত 'পৌষ মাস' উদ্ভূত হইতে পারে না।

'পৌষ মাস'টা হইয়াছে কি প্রকার বলিতেছি। ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালা সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছিলেন। এই ছয়টি দলের নেতাদের ঐ ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিসভা গঠন করিবার আইনানুযায়ী অধিকার ছিল। গবর্ণরেরা তাঁহাদিগকে ডাকিয়াও ছিলেন। কিন্তু নিখিলভারতীয় কংগ্রেসকমিটির সিদ্ধান্ত অনুসারে তাঁহারা গবর্ণরদিগের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি চান, যে, গবর্ণরেরা মন্ত্রীদের শাসন-বিধান-সম্মত কাজ-কর্ম্মে বাধা দিবেন না, হস্তক্ষেপ করিবেন না। গবর্ণরেরা সেই প্রতিশ্রুতি দেন নাই; এবং পরে ঐ ছয়টি প্রদেশে তাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ কোন কোন দলের সদস্যদিগকে লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন। যে পাঁচটি প্রদেশে কংগ্রেসওয়ালা সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ হন নাই, তথায় পূর্ব্বেই মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছিল।

এই এগারটি প্রদেশে মোট যত জন মন্ত্রী হইয়াছেন, তাহার মধ্যে পঁচিশ জন মুসলমান, সাতাশ জন হিন্দু, দুই জন পারসী, দুই জন খ্রীষ্টিয়ান এবং এক জন শিখ। এই সকল মানুষের মনে হইতে পারে, যে, তাঁহাদের পৌষ মাস হইয়াছে। মুসলমান সম্প্রদায়েরও হয়ত তাহা মনে হইবে। হিন্দু-সমাজের, অন্ততঃ অধিকাংশের, নিশ্চয়ই তাহা মনে হইবে না। পারসীদের তাহা মনে না হইতেও পারে। খুব সম্ভব শিখদের তাহা হইবে না। খ্রীষ্টিয়ানদের কথা বলিতে পারি না।

এগারটি প্রদেশের এগার জন সরদার মন্ত্রীর মধ্যে সাত জন মুসলমান, তিন জন হিন্দু ও এক জন পারসী।

আমরা একাধিক বার দেখাইয়াছি, যে, স্বাধীন ইউরোপের স্বাধীন দেশসকলের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর দেশের সর্ব্বাপেক্ষা অনগ্রসর শ্রেণীর লোকেরাও পরাধীন ভারতবর্ষের সর্ব্বাপেক্ষা আমলাতন্ত্রানুগৃহীত সম্প্রদায় বা শ্রেণীর চেয়ে শিক্ষায়, জ্ঞানে, স্বাস্থ্যে, আর্থিক অবস্থায় এবং রাষ্ট্রীয় অধিকারশালিতায় শ্রেষ্ঠ, এবং রাজানুগ্রহনিরপেক্ষভাবে ভারতবর্ষের যে বিশাল হিন্দুসমাজ কতকটা অগ্রসর, তাহারাও সকল বিষয়ে ইউরোপের অনগ্রসরতম স্বাধীন দেশের অনগ্রসরতম শ্রেণীর লোকদের চেয়ে অনগ্রসর।

অতএব শাসকদের খেয়ালে পরাধীন দেশের কাহারও

কাহারও পৌষ মাস হইয়াছে বলিয়া ভ্রম হইলেও, সমগ্র দেশের ও জাতির পৌষ মাস কেবল নিয়মতান্ত্রিক ও গণতান্ত্রিক স্বাধীনতার ফলেই হইতে পারে।

সমগ্র ব্রিটিশ-ভারতের অধিবাসীর সংখ্যা, ১৯৩১ সালের সেন্সস অনুসারে, ২৫,৬৭,৮৪,০৫২। তাহার মধ্যে হিন্দু প্রায় ১৮ কোটি, মুসলমান সাত কোটির কিছু কম। উভয় সমাজের লোকসংখ্যা বিবেচনা করিলে মনে হইতে পারে, যে, মুসলমান সমাজের পৌষ মাসটাই বেশী রকম হইয়াছে। কিন্তু সমাজের সকল মানুষের মধ্যে স্বাধীনতাপ্রিয়তা, আত্মনির্ভরশীলতা ও স্বাধীন মনোবৃত্তির বিকাশ রূপ যে পরম মঙ্গল, তাহার কথা ছাড়িয়া দিয়া যদি কেবল আর্থিক উন্নতির দিকটাই দেখা যায় তাহা হইলে কয়েক জন সরদার মন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রী ৬,৭০,২০,৪৪৩ জন মুসলমানের কি সুবিধা করিয়া দিতে পারিবেন?

—

মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ও কংগ্রেস

কংগ্রেস বর্ত্তমান শাসনবিধি নষ্ট করিতে চাহেন, এই প্রতিজ্ঞা ঘোষণা করিবার পর, আমাদের মতে কংগ্রেসের পক্ষে মন্ত্রিত্ব-গ্রহণের সঙ্কল্প যে ঠিক্ হয় নাই তাহা আমরা আগে আগে যাহা লিখিয়াছি তাহা হইতে পাঠকেরা বুঝিয়া থাকিবেন। কোন দলের লোকদের পক্ষেই যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ ঠিক্ নয়, ইহাও আমাদের মত। তাহার কারণও আগে আগে যাহা লিখিয়াছি, তাহা হইতে বুঝা যাইবে। একটা কারণ এই, যে, নূতন ভারতশাসন মন্ত্রীদিগকে দায়িত্ব দিয়াছে, কিন্তু ক্ষমতা দেয় নাই। যে-কোন দিকে দেশের হিত হইবে না বা যথেষ্ট পরিমাণে হইবে না, তাহার জন্য ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদীরা সাক্ষাৎভাবে মন্ত্রীদিগকে ও পরোক্ষভাবে ভারতীয় জনগণকে দায়ী ও দোষী করিবে; কোন অনিষ্ট ও ক্ষতি হইলেও তাহাদিগকে দায়ী ও দোষী করিবে। কিন্তু বস্তুতঃ হিত করিবার ও অহিত নিবারণ করিবার মত যথেষ্ট ক্ষমতা নূতন আইন মন্ত্রীদিগকে দেয় নাই। তদ্ভিন্ন ইহাও বিশেষ ভাবে বিবেচ্য, যে, আইনটা রাজস্বের অধিকাংশ টাকা ব্যয়ের উপর ব্যবস্থাপক সভাকে ও মন্ত্রীদিগকে অধিকার দেয় নাই। কার্য্যতঃ টাকা সম্বন্ধে এবং আর সকল বিষয়েই গবর্ণরকে সর্ব্বেসর্ব্বা করা হইয়াছে। এরূপ অবস্থায় নিমিত্তের ভাগী হইবার জন্য মন্ত্রী হওয়া কাহারও পক্ষে উচিত হয় নাই। টাকার লোভে, মুরুব্বি হইয়া পোষ্য পোষণ করিবার লোভে, 'মান্যগণ্য' হইবার লোভে, দেশহিত করিতে পারিবার ভ্রান্ত বিশ্বাসে, বা অন্য অনির্দ্দিষ্ট কারণে যাঁহারা মন্ত্রী হইয়াছেন, আমাদের কথাগুলা তাঁহাদের ভাল লাগিবে না। মন্ত্রী হইয়া কেহ কোন ভাল কাজই করিতে পারিবেন না, ইহা আমাদের বক্তব্য নহে। ইচ্ছা থাকিলে অল্পস্বল্প ভাল কাজ কেহ কেহ করিতে পারিবেন। কিন্তু দেশের মহত্তর ও প্রধান হিত সাধনের উদ্দেশ্যে এই অল্পস্বল্প হিত সাধনের লোভ সংবরণ করা কর্ত্তব্য। সকল রাজনৈতিক দলের লোকই মন্ত্রিত্ব অস্বীকার করিলে ব্রিটিশ জাতি ও জগতের অন্যান্য জাতি বুঝিত, যে, নূতন শাসনবিধিটা একটা ফাঁকি—যাহা খাঁটি সত্য কথা। তাহা হইলে আমাদের স্বাধীনতাসংগ্রাম সফল হইবার, আমাদের স্বশাসন লাভ করিবার, সম্ভাবনা অধিকতর হইত। অবশ্য, কতকগুলি লোক মন্ত্রী হইয়াছে বলিয়াই যে স্বাধীনতাসংগ্রাম বিফল হইবে বা তাহা পরিত্যাগ করিতে হইবে, তাহা নহে। স্বাধীনতালাভপ্রচেষ্টা খুব জোরে চালাইতে হইবে।

এখন ইংলণ্ড ও ভারতে ইংরেজরা এবং ইংরেজভক্ত ভারতীয়েরা যে কংগ্রেস দ্বারা দরখাস্ত করাইয়া বড়লাটের সহিত গান্ধীজীর দেখাসাক্ষাৎ করাইয়া একটা রফার চেষ্টা করিতেছে, তাহা সফল হইলে দেশের পক্ষে তাহা অনিষ্টকর হইবে। নূতন শাসনবিধিটার সহিত কোন রফা হইতে পারে না। কংগ্রেস যদি রফা করে, তাহা হইলে উহা অশ্রদ্ধেয় হইবে। মহাত্মাজী রফা করিলে সমাজতন্ত্রী দলের বিদ্রোহিতা আরও বাড়িবে। কংগ্রেসের চাওয়া উচিত সম্পূর্ণ স্বশাসনের অধিকার—ন্যূনকল্পে কেবলমাত্র ভারতীয় লোকদেরই মত অনুসারে নির্দ্দিষ্ট অল্প কয়েক বৎসরে ক্রম-বিকাশ দ্বারা সম্পূর্ণ স্বশাসনের অধিকার লাভ করিবার ক্ষমতা।

[এই সমস্ত কথা হাউস অব লর্ডসে ভারতসচিবের বক্তৃতার আগে লেখা।]

—

কয়েকটি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সর্ত্ত

আমরা বলিয়াছি, কংগ্রেসের বা অন্য কোন দলেরই

ন্ত্রিত্ব গ্রহণ করা উচিত নয়। চৈত্রের 'প্রবাসী'তে আমরা দেখাইয়াছিলাম, যে, ছয়টি প্রদেশে মন্ত্রিত্ব লইলে দেশের সর্ব্বত্র কংগ্রেসের নীতি একবিধ না হইয়া দ্বিবিধ হইবে এবং তাহা অনিষ্টকর হইবে। যাহা হউক, যে কয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালারা সংখ্যাগরিষ্ঠ হইয়াছেন, কংগ্রেস তথায় একটি সর্ত্তে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের সঙ্কল্প করেন। সর্ত্তটি এই, যে, গবর্ণর প্রধান মন্ত্রীকে এই প্রতিশ্রুতি দিবেন, যে, তিনি মন্ত্রিসভার শাসন-বিধানসঙ্গত কোন কাজে বাধা দিবেন না বা হস্তক্ষেপ করিবেন না। কোন গবর্ণর এরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তাঁহাদের সকলের জবাব এক ছাঁচে ঢালা। তাহার কারণ, তাঁহাদিগকে উপরওয়ালা ভারতসচিবের হুকুম তামিল করিতে হইয়াছে। তাঁহাদের কৈফিয়ৎ এই, যে, তাঁহারা নূতন শাসনবিধিটা অনুসারে ওরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। এই কৈফিয়ৎটা ঠিক্ কিনা, তাহার বিস্তারিত বিচার ইংলণ্ডীয় ও ভারতীয় অনেকে করিয়াছেন। কেহ বলিয়াছেন উহা ঠিক্, কেহ বলিয়াছেন উহা ঠিক্ নয়। এরূপ আলোচনা যে একেবারেই মূল্যহীন, তাহা মনে করি না। আমরা যতটা জানি, আইনটার কোথাও এমন কোন ধারা নাই যেটা বলে, যে, গবর্ণর ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দিতে পারেন না। কিন্তু আমরা সংক্ষেপে ও সোজাসুজি ইহাই বুঝি, যে, আইনে এ-বিষয়ে স্পষ্ট কোন নির্দ্দেশ না-থাকিলেও, গবর্ণরদের এরূপ প্রতিশ্রুতি না দিবার (তাঁহাদের দিক্ হইতে) যথেষ্ট কারণ ছিল। নূতনশাসনবিধিটা তাঁহাদিগকে স্বেচ্ছাকারী হইবার ক্ষমতা দিয়াছে, তাঁহাদিগকে নামতঃ না হইলেও কার্য্যতঃ ডিক্টেটর করিয়াছে। সাম্রাজ্যবাদীদের নীতির অনুসরণ করিয়াই আইনটা এইরূপ করা হইয়াছে। গবর্ণরদের ক্ষমতার কোন সঙ্কোচ তাঁহারা স্বেচ্ছায় করিলেও তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি ব্যাহত হয়। সুতরাং স্বেচ্ছাতেও তাঁহারা নিজ নিজ ক্ষমতা সঙ্কোচ করিতে পারেন না। কংগ্রেসের দাবী অনুসারে তাঁহাদিগকে নিজ নিজ ক্ষমতার সঙ্কোচ করিতে হইলে তাহাতে সাম্রাজ্যবাদীদের নীতি ত ব্যাহত হইতই, অধিকন্তু তাঁহারা নিজ নিজ যে প্রেষ্টিজ বজায় রাখিবার নিমিত্ত সর্ব্বদা অবহিত, তাহারও হানি হইত।

কংগ্রেসের সর্ত্তের মধ্যে এই রকম একটা অনুচ্চারিত প্রতিশ্রুতি উহ্য ছিল, "আমরা বলছি, আমরা খুব লখ্‌খি ছেলে হব; অতএব, হে লাটসাহেব, তুমিও বল, তুমিও খুব লখ্‌খি ছেলে হবে।" কংগ্রেস চান, নূতন শাসনবিধি অচল করিতে, ধ্বংস করিতে। তাহার মধ্যে রহিয়াছে দুর্দ্দান্ত 'দস্যিপনা'। লখ্‌খি ছেলে সাজা তাঁহাদের পক্ষে বেমানান হইবে।

আমাদের মনে হয়, গবর্ণররা যে কংগ্রেসের সর্ত্তে রাজী হন নাই, তাহা কংগ্রেসের পক্ষে বিধাতার বর (godsend) বলিয়া গ্রহণ করা উচিত। বেগতিক দেখিয়া ব্রিটিশ-পক্ষ ও তাহাদের ভারতীয় ভক্তের দল কংগ্রেসকে ভজাইবার চেষ্টা করিতেছে বা করিবে। তাহাতে কংগ্রেস-নেতাদের হৃদয় গলিলে বা একটুও মন ভিজিলে কংগ্রেসের মূল ও প্রধান উদ্দেশ্য সিদ্ধির পথে কণ্টক রোপিত হইবে। [ভারতসচিবের বক্তৃতার পূর্ব্বে লিখিত।]

—

নূতন প্রাদেশিক মন্ত্রিসভাসমূহ

যে পাঁচটি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নহেন, সেখানে অকংগ্রেসী দলের মন্ত্রীদের নিয়োগে কোন প্রশ্ন উঠে নাই। কিন্তু যে-সব প্রদেশে কংগ্রেসী সদস্যেরাই সংখ্যাগরিষ্ঠ সেখানেও অন্যান্য দলের লোকদের দ্বারা, যাঁহারা সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের লোক তাঁহাদের দ্বারা, মন্ত্রিসভা গঠন করিবার নূতনআইনসঙ্গত ক্ষমতা গবর্ণরদের আছে কিনা এবং তাঁহারা যে এইরূপ মন্ত্রিসভা গঠন করিয়াছেন তাহা আইনসঙ্গত হইয়াছে কি না, এই প্রশ্ন উঠিয়াছে। এক কথায় এই প্রশ্নের হাঁ কিংবা না উত্তর দেওয়া যায় না। আমাদের যতটা মনে পড়িতেছে, সংখ্যাগরিষ্ঠ দল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে না চাহিলে গবর্ণর কি করিবেন, ১৯৩৫ সালের আইনে সে বিষয়ে কোন নির্দ্দেশ নাই। গবর্ণরদের কাছে যে রাজকীয় উপদেশ-পত্র (Instrument of Instructions) আসিয়াছে, তাহাতে সাধারণতঃ গবর্ণরের সংখ্যাগরিষ্ঠ দলের নেতাদের সহিত পরামর্শ করিয়া মন্ত্রিসভা গঠনের উপদেশ আছে। কিন্তু এরূপ দলের লোকেরা মন্ত্রী হইতে না চাহিলে সংখ্যালঘিষ্ঠদলের লোকদিগকে লইয়া গবর্ণর মন্ত্রিসভা গঠন করিতে পারিবেন না, এরূপ কোন নিষেধাত্মক ধারা নাই। তবে উপদেশ-পত্রে একটা খুব সান্ত্বনাদায়ক কথা আছে। আছে এই, যে, গবর্ণরের কোন

কাজ উপদেশ-পত্রানুযায়ী নহে এই অজুহাতে তাহা অবৈধ বিবেচিত হইবে না! অর্থাৎ নিরঙ্কুশাঃ গবর্ণরাঃ!

যাহা হউক, নূতন আইন অনুসারে গবর্ণররা যত দিন ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন না-করাইবার অধিকারী, তত দিন, কংগ্রেসের প্রভাব যে ছয়টি প্রদেশে অধিকতম প্রমাণিত হইয়াছে, সেখানেও গবর্ণররা আরামে থাকিবেন। ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন আরম্ভ হইলেই এই ছয়টি প্রদেশে গবর্মেণ্ট "পরাজিত" ও "তিরস্কৃত" হইতে থাকিবেন। তাহার যাহা অর্থ ও ফল, তাহা সুবিদিত। [ভারতসচিবের বক্তৃতার পূর্ব্বে লিখিত।]

—

সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের মন্ত্রিসভা সম্বন্ধে অধ্যাপক কীথ

বিলাতে মূলশাসনবিধিঘটিত (constitutional) প্রশ্ন সম্বন্ধে অধ্যাপক বেরিডেল কীথের মত খুব প্রামাণিক বিবেচিত হইয়া থাকে। কংগ্রেসী দল মন্ত্রিসভা গঠন করিতে সম্মত না-হওয়ায় যে অবস্থা দাঁড়াইয়াছে এবং সংখ্যালঘিষ্ঠ দলের লোক দিয়া যে-সব মন্ত্রিসভা গঠিত হইয়াছে, তৎসম্বন্ধে তিনি স্কটস্‌ম্যান নামক কাগজে যে চিঠি লিখিয়াছেন, তাহার মর্ম্ম নীচে মুদ্রিত হইল।

MADRAS, APRIL 6.

The London correspondent of the *Hindu* cables: Prof. Berriedale Keith, Britain's greatest constitutional authority, in a letter to the *Scotsman* declares that Mahatma Gandhi and the Congress at his initiative possess the essential merit of having studied the principles of responsible government and realized what Sir Samuel Hoare never grasped—that it is wholly incompatible with executive safeguards. The India Act has suffered from the outset from the grave defect that it made responsibility unreal by placing special responsibilities on the Governors.

Prof. Keith adds that to say, as Lord Erskine and Lord Brabourne have said, that they would give the ministers all help, sympathy and co-operation is meaningless, for the Act itself gives powers and imposes duties on the Governors which reduce the ministerial responsibility to a farce. It is regrettable that the Governors were not authorized to give much more definite pledges. Prof. Keith declares that the formation of minority ministries is a negation of responsible government and says that sooner the Governors take charge of the Government the better, for adds Prof. Keith, the forms of responsible government should not be used to conceal the breakdown.—*A. P. I.*

অধ্যাপক কীথের মন্তব্যের তাৎপর্য্য—

মিঃ গান্ধী এবং তাঁহার প্রারম্ভিক প্রেরণায় কংগ্রেস জনগণের নিকট দায়ী শাসনতন্ত্রের মূলনীতি অনুশীলন করিয়া তাহা বুঝিয়াছেন, এবং সর্ সামুয়েল হোর যাহা কখনও নিজের বুদ্ধিগম্য করিতে পারেন নাই তাহা তাঁহারা উপলব্ধি করিতে পারিয়াছেন। তাহা এই, যে, শাসকবর্গকে নিরাপদ প্রভুত্বশালী করার সহিত দায়িত্বশীল শাসন-তন্ত্রের কোন সঙ্গতি বা সামঞ্জস্য থাকিতে পারে না। ভারত-শাসন আইন গোড়া হইতেই এই গুরুতর গলদগ্রস্ত হইয়া আছে, যে, ইহা গবর্ণরদের উপর বিশেষ কতকগুলি দায়িত্বভার অর্পণ করিয়া এবং তাঁহাদিগকে তদুপযুক্ত ক্ষমতা দিয়া দায়িত্বমূলক শাসনব্যবস্থাকে অসার ও অবাস্তব করিয়াছে।

মান্দ্রাজ ও বোম্বাইয়ের লাটেরা যে বলিয়াছেন যে তাঁহারা মন্ত্রীদিগকে সব সাহায্য, সহানুভূতি ও সহযোগিতা দিবেন তাহা অর্থহীন; কারণ ভারতশাসন আইনটাই গবর্ণরদিগকে এরূপ সব ক্ষমতা দিয়াছে এবং এমন সব কর্ত্তব্যের ভার তাঁহাদের স্কন্ধে চাপাইয়াছে যাহার দ্বারা মন্ত্রীদের দায়িত্বকে প্রহসনে পরিণত করা হইয়াছে।

ইহা পরিতাপের বিষয় যে এতদপেক্ষা অধিকতর সুনির্দ্দিষ্ট প্রতিশ্রুতি দিবার ক্ষমতা গবর্ণরদিগকে (কর্ত্তৃপক্ষ কর্ত্তৃক) প্রদত্ত হয় নাই।

ব্যবস্থাপক সভাসমূহের কেবল সংখ্যালঘিষ্ঠ দলগুলি হইতে লোক লইয়া মন্ত্রিসভা গঠন দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্রের সম্পূর্ণ অস্বীকৃতি ও বিরুদ্ধাচরণ। গবর্ণররা শীঘ্র নিজের হাতেই সব রাষ্ট্রীয় কাজের ভার গ্রহণ করিলেই ভাল হয়; কারণ দায়িত্বমূলক শাসনতন্ত্রের বাহ্য আকৃতির দ্বারা ইহা গোপন করিবার চেষ্টা করা উচিত নহে, যে, শাসনবিধানটা ভাঙিয়া পড়িয়া বিকল ও অচল হইয়াছে।

শাসকবর্গের প্রভুত্ব ও ক্ষমতা নিরঙ্কুশ করিলে তাহা যে জনগণের নিকট দায়ী শাসনতন্ত্রের সহিত খাপ খায় না, এই সোজা কথাটা যে সর্ সামুয়েল হোরের মত ঝানু লোক বুঝেন নাই, ইহা আমরা বিশ্বাস করি না। তিনি এটা খুবই বুঝিতেন ও বুঝেন। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট ও তিনি শাসকবর্গের স্বৈরশাসন ভারতবর্ষকে গণতান্ত্রিকতার ছেঁড়া কাঁথায় মুড়িয়া দিতে চাহিয়াছিলেন ও দিয়াছেন।

মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের লোকেরা ছাড়া ভারতবর্ষের অন্য অনেক লোকও দায়িত্বপূর্ণ শাসনতন্ত্রের মূলনীতি বুঝে এবং তাহার সহিত শাসকবর্গের নিরঙ্কুশ প্রভুত্বের অসঙ্গতিও উপলব্ধি করিতে পারিয়াছে। [ভারতসচিবের বক্তৃতার পূর্ব্বে লিখিত।]

—

বঙ্গের মন্ত্রিসভা

ভারতবর্ষের এগারটি প্রদেশের মধ্যে সংখ্যায় সকলের চেয়ে বেশী মন্ত্রী নিযুক্ত হইয়াছেন বঙ্গে। সংখ্যার আধিক্য অনুসারে যদি কাজের উৎকর্ষ বাড়িত, তাহা হইলে এত জন

মন্ত্রীর নিয়োগ নিন্দার বিষয় হইত না। কিন্তু বঙ্গের মন্ত্রিসভা অন্য সব প্রদেশের মন্ত্রিসভার চেয়ে অধিকতর কার্য্যদক্ষ হইবে বা দেশের হিতসাধনে অধিকতর সমর্থ হইবে, এরূপ অনুমান করিবার কোন হেতু দেখিতেছি না। এই জন্য এতগুলি লোককে চাকরী দেওয়ার সমর্থন করিতে পারিতেছি না। বস্তুতঃ, মন্ত্রীরা যদি সকলেই খুব যোগ্য লোক হইতেন, তাহা হইলেও সকলকে কাজ দেওয়া ঠিক্ হইত না। বঙ্গে যোগ্য অথচ বেকার লোক অনেক আছেন, কিন্তু সকলকে ত সর্ব্বসাধারণের অর্থে কাজ দেওয়া যায় না ও হয় না। প্রকৃত বিবেচ্য এই, যে, মন্ত্রিসভার করণীয় কাজ যাহা, তাহা কয় জন লোকের দ্বারা হইতে পারে। অনেকে বলেন, চারি জনের দ্বারাই সব কাজ হইতে পারে। কিন্তু কাহারও অনুমানের উপর নির্ভর না করিয়া, যত জন লোকের দ্বারা বঙ্গের কাজ এত দিন চলিয়া আসিতেছিল, তত জন লোক নিযুক্ত করিলে নিশ্চয়ই কাজ চলিতে পারিত। এত দিন তিন জন মন্ত্রী এবং শাসনপরিষদের চারি জন সদস্য কাজ চালাইতেন। এখন সাত জন হইলেই নিশ্চয়ই যথেষ্ট হইত। উমেদারের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী হওয়ায় এবং কতকগুলি লোককে কাজ না-দিলে তাহাদের ও তাহাদের দলের লোকদের ভোট পাওয়া যাইবে না এইরূপ আশঙ্কা থাকায় সরদার মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হককে এগার জনের মন্ত্রিসভা গড়িতে হইয়াছে। অতএব, মন্ত্রীরা বাংলা দেশের সেবার জন্য নহে, বাংলা দেশ মন্ত্রীদের সেবার জন্য, এখন ইহাই মনে করিতে হইবে।

সরদার মন্ত্রীকে বাদ দিলে বাকী দশ জনের পাঁচ পাঁচ জন মুসলমান ও হিন্দু সমাজ হইতে লওয়া হইয়াছে বটে; কিন্তু আমরা যেমন ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচনে তেমনই মন্ত্রী মনোনয়নেও সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার বিরোধী। উভয় ক্ষেত্রেই আমরা যোগ্যতাকেই একমাত্র মাপকাঠি করিবার পক্ষপাতী। অন্য নানা দেশের মত বঙ্গে যদি সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার সভ্য নির্ব্বাচিত হইত, তাহা হইলে রাজনৈতিক দলের মধ্যে কংগ্রেস দলের সদস্যই বেশী নির্ব্বাচিত হইত এবং তাঁহাদের মধ্যে কংগ্রেসের জাতীয় উপদলের লোকই হয়ত সংখ্যায় বেশী হইত। ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে সদস্যদের মধ্যে হিন্দুর সংখ্যাই বেশী হইত। কিন্তু সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা এমনভাবে করা হইয়াছে যাহাতে হিন্দুর প্রভাব কমে এবং স্বাধীনতালিপ্সু শিক্ষিত জন-সমষ্টির প্রভাবও কমে।

সদস্য নির্ব্বাচনে সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রভাব স্পষ্ট অনুভূত হওয়ায় কেবলমাত্র যোগ্যতার বিচারে মন্ত্রী মনোনয়নের কোন সম্ভাবনা ছিল না। সুতরাং মন্ত্রীদের মধ্যে কাহার যোগ্যতা কতটুকু তাহার বিচার অনাবশ্যক। সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার ফলস্বরূপ যেমন ব্যবস্থাপক সভায় মুসলমানদের প্রাধান্য হইয়াছে, সেইরূপ সেই কারণেই মন্ত্রিসভাতেও মুসলমানদের প্রাধান্য হইয়াছে। তদ্ভিন্ন, নিজের বৈষয়িক, সাংসারিক ও ব্যক্তিগত কাজ চালাইবার সামর্থ্য না থাকিলেও এবং সেই অসামর্থ্য প্রকাশ্যভাবে বিদিত থাকিলেও, অন্য কারণে মানুষ রাষ্ট্রের এক-একটা বিভাগের কাজ চালাইবার যোগ্য বিবেচিত হইতে পারে, বঙ্গের মন্ত্রিসভা ইহাও সর্ব্বসাধারণকে জানাইয়া দিতেছে। গণতান্ত্রিক প্রথা অনুসারে ব্যবস্থাপক সভার সদস্য নির্ব্বাচন হইলে এবং মন্ত্রিসভাও তদনুসারে গঠিত হইলে এই প্রকার কোন মন্তব্য প্রকাশ করিবার কারণ ঘটিত না, ব্যবস্থাপক সভায় কত জন কোন্ সম্প্রদায়ের লোক তাহা গণনা করাও অনাবশ্যক হইত। বিচার কেবল যোগ্যতারই হইত, এবং তাহাই হওয়া উচিত।

চাষীদের হিতের জন্যই প্রথমে কৃষক, প্রজা বা রায়তের স্বার্থরক্ষার প্রচেষ্টা ১৯২১ সালে বঙ্গে আরব্ধ হয়। আরম্ভ করেন পরলোকগত কেশবচন্দ্র ঘোষ ও তাঁহার সহকর্ম্মীরা। ইহা তখন সম্পূর্ণ অসাম্প্রদায়িক ছিল। ইহাতে তখন পরলোকগত কৃষ্ণকুমার মিত্র ও প্রাণকৃষ্ণ আচার্য্য, সর্ প্রফুল্লচন্দ্র রায়, মৌলবী আবদুল করীম এবং মৌলবী ফজলল হক যোগ দিয়াছিলেন। পরে সর্ আবদুর রহিমও ইহাতে যোগ দেন। কিছুদিন পূর্ব্বে কিন্তু মৌলবী ফজলল হক প্রজাপার্টি নাম দিয়া যে দল গড়িয়াছেন, তাহা সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িয়াছে, তাহাতে হিন্দু সভ্যের সংখ্যা কমিয়া আসিতেছে—যদিও হিন্দু রায়ৎ এখনও বিস্তর আছে ও ভবিষ্যতেও থাকিবে।

মৌলবী ফজলল হক এই প্রজাপার্টির প্রতিনিধিরূপেই নির্ব্বাচন-দ্বন্দ্বে জয়ী হইয়াছিলেন। নির্ব্বাচিত হইবার পূর্ব্বে

তিনি প্রজাদের স্বার্থ রক্ষার জন্য কোন কোন কাজ করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার মন্ত্রিসভার দ্বারা প্রজাদের স্বার্থরক্ষা তিনি কি প্রকারে করিবেন বুঝা যায় না। এই মন্ত্রিসভায় কেহ বলেন দেড় গণ্ডা কেহ বলেন দুই গণ্ডা জমীদার আছেন। প্রজাপার্টীর প্রতিনিধি কেহ বলেন এক জন কেহ বলেন দুই জন আছেন। আমরা এরূপ মনে করি না, যে, জমীদার ও প্রজার স্বার্থ নিশ্চয়ই পরস্পর-বিরোধী। উভয়ের স্বার্থের সামঞ্জস্য হইতে পারে মনে করি। কিন্তু যে কারণেই হউক, উভয় পক্ষের মধ্যে বিরোধিতা জন্মিয়াছে। বিরোধের ক্ষেত্রে যে-কেহ প্রজার স্বার্থরক্ষা করিবেন বলিয়াছেন, তাঁহারই দেখা উচিত প্রজার দল পুরু কিনা। কিন্তু বঙ্গের মন্ত্রিসভায় জমীদারের দলই পুরু।

মৌলবী ফজলল হক প্রজাপার্টীর প্রতিনিধিরূপে প্রজাদের স্বার্থরক্ষার মনোযোগী হইতে পারিবেন না বলিয়া ঐ দ... ...চ জন সদস্য তাঁহাকে একটি খোলা চিঠিতে কিঞ্চিৎ স্পষ্ট কথা শুনাইয়াছেন।

শিক্ষা-বিভাগ সর্ব্বত্রই একটি অত্যাবশ্যক বিভাগ। বঙ্গে সাম্প্রদায়িকতার উপদ্রবে উহার দ্বারা মুসলমানদের প্রকৃত কল্যাণ হইতেছে না, অথচ হিন্দুদের শিক্ষা ও সংস্কৃতি ন্যায্য আর্থিক সাহায্য ও উৎসাহ পাইতেছে না। শুনা গিয়াছিল, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান ভাইস্-চ্যান্সেলার শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়কে শিক্ষামন্ত্রী করা হইবে। তাহা হইলে এক জন বাস্তবিক যোগ্য ব্যক্তির নিয়োগ হইত। কিন্তু বিশ্ববিদ্যালয়ের সেনেটে ও ভূতপূর্ব্ব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় তিনি হিন্দুর উপর আক্রমণ নীরবে সহ্য করেন নাই—যদিও মুসলমানের কোন অনিষ্টও করেন নাই। সুতরাং সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা তাঁহাকে পছন্দ করে না। সম্ভবতঃ এই কারণে তাঁহাকে মন্ত্রী করা হয় নাই। হয়ত লাটসাহেবও তাঁহার উপর খুব সন্তুষ্ট নহেন। গত কনভোকেশ্যনে তিনি দেশকে অপ্‌প্রেশ্যন (অত্যাচার) এবং সার্ভিলিটি (দাসত্ব) হইতে মুক্ত করা শিক্ষিত যুবকদের কাজ বলিয়াছিলেন। অবশ্য, এইরূপ কথার রাজনৈতিক অর্থই একমাত্র অর্থ নহে—অন্য অর্থও হইতে পারে; কিন্তু রাজনৈতিক অর্থও হইতে পারে। এবং সেরূপ অর্থ করিলে এরূপ কথা যিনি বলেন তাঁহার আ... তন্ত্রের প্রিয় না হইবার কথা।

নির্ব্বাচন যখন চলিতেছিল তখন প্রজাপার্টীর পক্ষ হইতে এইরূপ প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল, যে, বিনা বিচারে বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া হইবে। কিন্তু এই অঙ্গীকার পালন করা যে কর্ত্তব্য, তাহা বর্ত্তমান মন্ত্রিসভা মনে করিবেন বলিয়া মনে হয় না। বিনাবিচারে বন্দী হওয়াটা আমলাতন্ত্রের মত মুসলমানেরাও সাধারণতঃ একটা হিন্দু সমাজের সংক্রামক ব্যাধি মনে করেন। মন্ত্রিসভা প্রধানতঃ মুসলমান। বিনাবিচারে বন্দীদের মুক্তি বিশেষ করিয়া কংগ্রেস দলের একটি দাবী। কিন্তু বর্ত্তমান মন্ত্রিসভায় কংগ্রেস দলের কেহ নাই। শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার আগে কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন বটে এবং তাঁহার অর্থনৈতিক বিষয়ে যোগ্যতাও আছে; কিন্তু তিনি কংগ্রেস দলের অন্যতম লোকরূপে নির্ব্বাচিত হন নাই ও নির্ব্বাচিত হইবার পরে কংগ্রেসের সভ্যত্ব ত্যাগ করিয়াছেন। তাহা হইলেও তিনি বিনা-বিচারে বন্দীদের মুক্তিপ্রয়াসী হইতে পারেন। কিন্তু এক আধ জনের চেষ্টায় কি হইবে? বিশেষতঃ যখন আমলাতন্ত্র বিরোধী এবং ভূতপূর্ব্ব গবর্ন্মেণ্টের সহিত একাত্মতাসম্পন্ন খোআজা নাজিমুদ্দিন সাহেব আইন ও শৃঙ্খলা বিভাগের ভারপ্রাপ্ত মন্ত্রী।

—

বঙ্গের মন্ত্রিসভায় তফসিলভুক্ত জাতিদের প্রতিনিধি

বঙ্গের মন্ত্রিসভায় তফসিলভুক্ত জাতিদের দুই জন প্রতিনিধি আছেন। তাঁহারা শিক্ষায় অনগ্রসর জাতিদের শিক্ষার জন্য সরকারী টাকা বেশী করিয়া দেওয়াইতে পারিলে তাঁহাদের মন্ত্রী হওয়া কতকটা সার্থক হইবে।

—

পাটকল শ্রমিকদের ধর্ম্মঘট

পাটকলগুলার আশী হাজার শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিয়াছে। দরিদ্র শ্রমিকরা বিশেষ অসুবিধা অনুভব না করিলে অর্দ্ধাশন ও অনশনের সম্ভাবনা সত্ত্বেও ধর্ম্মঘট করে না। সুতরাং ব্যাপক ধর্ম্মঘট হইলেই সাধারণতঃ বুঝা উচিত যে শ্রমিকদের সত্য

আছে। গণতান্ত্রিক দেশসকলে শ্রমিকরা ধর্মঘ... হলে গবর্মেণ্ট ধনিক ও শ্রমিকদের মধ্যে সালিসী দ্বারা উভয় পক্ষের বিবাদ মিটাইয়া দিবার চেষ্টা করেন। কিন্তু এদেশে গবর্মেণ্ট সাধারণতঃ তাহা করেন না। তদ্ভিন্ন এক্ষেত্রে ধনিকরা ইংরেজ। পাটকল ধর্মঘট হওয়ায় গবর্মেণ্ট ১৪৪ ধারার প্রয়োগে শ্রমিকদের নেতাদিগের স্বচ্ছন্দ গমনাগমনে বাধা দিয়াছেন, যাঁহারা শ্রমিক নেতা নহেন এরূপ কোন কোন কংগ্রেস কর্ম্মীর উপরও উক্ত ধারা প্রযুক্ত হইয়াছে। শ্রমিকদিগকে দলবদ্ধভাবে প্রকাশ্য সভা করিবার ও মিছিল বাহির করিবার অধিকার হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে।

নূতন বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় শ্রীযুক্ত নলিনাক্ষ সান্যাল সভার অধিবেশন স্থগিত রাখিবার প্রস্তাব আনিয়া এই ধর্মঘটের প্রতি গবর্মেণ্টের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। ফলে সরদার মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব সরকারপক্ষ ও শ্রমিকপক্ষের প্রতিনিধিদের একটি পরামর্শ-সভা আহ্বান করিয়া বিবাদভঞ্জন করিবেন বলিয়াছেন। ফলে শ্রমিকদের অভিযোগের প্রতিকার হইলে তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে।

—

বঙ্গে সুভাষচন্দ্রের সম্বর্দ্ধনা

সাড়ে পাঁচ বৎসর বন্দী থাকিবার পর সুভাষচন্দ্র মুক্তি লাভ করায় আনন্দ প্রকাশ করিবার জন্য এবং তাঁহার সম্বর্দ্ধনা করিবার নিমিত্ত গত ২৩শে চৈত্র কলিকাতার শ্রদ্ধানন্দ পার্কে ভারতীয় অধিবাসীদের একটি সভা হয়। এরূপ বিরাট সভা কচিৎ দেখা যায়। অনুমিত হইয়াছে, যে, পঞ্চাশ হাজার লোক ইহাতে উপস্থিত ছিলেন। তদ্ভিন্ন চারি পার্শ্বের বাড়ীর বারান্দা ও ছাদে এবং বৃক্ষশাখাতেও বিস্তর লোক ছিলেন। সুভাষচন্দ্রকে ফুলের মালা এত দেওয়া হইয়াছিল, যে, যে-কোন মল্লযোদ্ধার পক্ষেও তাহা বহন করা দুঃসাধ্য। শান্তিনিকেতন হইতে রবীন্দ্রনাথ যে টেলিগ্রাম পাঠাইয়াছিলেন তাহার অর্থ, "সমগ্র জাতির কণ্ঠের সহিত কণ্ঠ মিলাইয়া আমি সুভাষকে স্বাগত সম্ভাষণ করিতেছি।" সভাপতি রামানন্দ চট্টোপাধ্যায় কর্তৃক নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাব দুটি উপস্থাপিত ও সভাকর্তৃক সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়:—

সরকারী নীতির নিন্দা

বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে অনি... কালের জন্য বঙ্গজননীর বহু সন্তানকে আটক রাখিবার যে অ... ও স্বেচ্ছাচারমূলক নীতি অবলম্বন করিয়াছেন এই সভা তাহার নিন্দা করিতেছে।

যাহাদিগকে বিনা অভিযোগে ও বিনা বিচারে বর্ত্তমানে অ... রাখা হইয়াছে তাহাদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার এবং বি... বিধিনিষেধ প্রত্যাহার করিবার জন্য বাংলার জনসাধারণের ... এই সভা জানাইতেছে।

ভারতের স্বাধীনতার জন্য যে সমস্ত রাজবন্দী নীরবে ও নি... সহিষ্ণুতার সহিত দুঃখভোগ করিতেছেন, এই সভা তাঁহাদি... আন্তরিক অভিনন্দন ও সমবেদনা জ্ঞাপন করিতেছে।

রাজবন্দীদের আত্মহত্যা

বাংলায় কতিপয় রাজবন্দী আত্মহত্যা করায় এই সভা ... শঙ্কা ও উদ্বেগ প্রকাশ করিতেছে। যেহেতু এইরূপ আত্ম... ঘটিয়াছে, সেই হেতু এই সভা মনে করে যে, যে-অবস্থায় রাজ... দের রাখা হয় তাহা অসহনীয়। যে-সব রাজবন্দী আত্ম... করিয়াছে তাহাদের বিষয়ে ও রাজবন্দীদিগ... অবস্থায় রাখ... তৎসম্পর্কে প্রকাশ্য তদন্ত করিবার জন্য এই সভা ... জানাইতে... এই সভা ঐ সব রাজবন্দীদের শোকসন্তপ্ত পরিবারবর্গের ... সমবেদনা জানাইতেছে।

প্রস্তাব দুটি উত্থাপন উপলক্ষ্যে সভাপতি যাহা ব... তাহা সংক্ষেপে এই:—

আমি নিশ্চয়ই জানি এই প্রস্তাব দুইটি সম্বন্ধে সভাস্থ কাহ... কোন আপত্তি থাকিতে পারে না এবং সকলেই ইহা সমর্থন ক... আমি জানি আমরা মৃদু ভাষায় যাহা বলিয়াছি তাহার চেয়ে ক... মন্তব্য সকলে অন্তরে পোষণ করেন।

গবর্মেণ্টের এই নীতিতে কেবল বিনা-বিচারে ব... ও তাঁহাদের আত্মীয়স্বজনেরাই যে দুঃখ পাইয়াছেন পাইতেছেন তাহা নহে, সমগ্র দেশের ক্ষতি হইয়া... গবর্মেণ্ট জগৎকে জানাইয়াছেন, এই নীতির উ... সন্ত্রাসনবাদের ও সন্ত্রাসক দলের উচ্ছেদ সাধন। ত... আলোচনা আমরা অনেক বার করিয়াছি। নূতন বলিবার নাই। গবর্মেণ্ট কর্ত্তৃক ব্যক্ত সন্ত্রাসনবাদ... সন্ত্রাসক দলের উচ্ছেদবিষয়ক উদ্দেশ্যের বিরুদ্ধেও আমা... কিছু বলিবার নাই। কিন্তু এই উদ্দেশ্য সিদ্ধির অবলম্বিত বিনা-বিচারে বন্দী করা রূপ উপায়টার আ... সম্পূর্ণ বিরোধী।

সুভাষ বাবুকে প্রদত্ত অভিনন্দন-পত্র পাঠ করিবার ...



সুভাষচন্দ্র বসুর সম্বর্দ্ধনা-সভায় "বন্দেমাতরম্" গীত হইবার সময় মাল্যভূষিত সুভাষচন্দ্র দণ্ডায়মান

র্বে সভাপত কিছু বলিয়াছিলেন। পাঠানন্তর যাহা াছিলেন, তাহা এই :—

আমাদের দেশের রাষ্ট্রীয় ক্ষমতা যাঁদের হাতে আছে, তাঁরা ষচন্দ্রকে কণ্টকের মুকুট পরিয়েছেন। আমরা ফুলের মালা তাঁকে আমাদের প্রীতি জানাচ্ছি।"

অভিনন্দনের উত্তর দিতে উঠিয়া আবেগে সুভাষবাবুর র মধ্যে মধ্যে বন্ধ হইয়া যাইতেছিল। তিনি নিজের ভাবের াস্ দমন করিতে পারিতেছিলেন না; মধ্যে মধ্যে তাঁহার সিক্ত হইয়া উঠিতেছিল। তিনি বক্তৃতা দিবার সময় অত বিরাট সভার বিপুল জনসমষ্টি মন্ত্রমুগ্ধবৎ নিস্তব্ধ হইয়া ছিল। তাঁহার আন্তরিকতাপূর্ণ আবেগময়ী ভাষার তাহাদের অন্তর স্পর্শ করিয়া তাহাদিগকেও অশ্রুসিক্ত া তুলিতেছিল।

সুভাষবাবু তাঁহার লিখিত বক্তৃতাটি সমস্তই দাঁড়াইয়া পড়িয়াছিলেন। দুঃখের বিষয়, তাহাতে তাঁহার পীড়া বৃদ্ধি পায়। আশা করি, এই অতিরিক্ত পরিশ্রমের কুফল অল্পকাল-স্থায়ী হইবে।

—

সুভাষবাবুর বক্তৃতা

সুভাষবাবুর বক্তৃতার সমস্ত কথাই অনুধাবনযোগ্য। আমরা কেবল তাঁহার দু-একটি কথার আলোচনা করিব। সুভাষবাবু বলিয়াছিলেন :—

ভারতবর্ষ একটা অখণ্ড সত্য; অতএব ভারতের মুক্তি সাধন করতে হ'লে সকল প্রদেশ ও সম্প্রদায়কে একযোগে এবং এক নীতি অনুসারে কাজ করতে হবে। প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িকতা পরাধীন জাতির উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী। তাই স্বাধীনতাকামী যারা, তাদের কর্তব্য এমন একটা উদার সামাজিক ও অর্থনৈতিক

...বন্ধ হওয়া—যার দ্বারা প্রাদেশিকতা ও সাম্প্রদায়িক... ত সমূলে ধ্বংস হ'তে পারে।

এই ... সত্য কথা। ভারতবর্ষ যে বার বার পরপদানত হইয়াছে, ভারতবর্ষের কোন কোন অংশ পরাধীনতাপাশ ছেদন করিয়া কখন কখন স্বাধীন হইলেও সমগ্র ভারতবর্ষ যে স্বাধীন থাকিতে বা হইতে পারে নাই, তাহার একটি কারণ এই, যে, সমগ্র ভারত ছোট ছোট স্বাধীন অংশে বিভক্ত ছিল, সমগ্র ভারত একটি অখণ্ড দেশ বলিয়া আপনার সত্তা অনুভব করিয়া সম্মিলিত চেষ্টা করিতে পারে নাই।

প্রাদেশিকতার আমরা বিরোধী। কিন্তু এখানে একটা কথা খুলিয়া বলা আবশ্যক। অনেক অবাঙালী নেতার কাজে ও কথায় এই ভাব প্রকাশ পায়, যে, বাঙালী যদি অন্যকর্তৃক বঙ্গশোষণ বন্ধ করিতে চায়, বাঙালী যদি বঙ্গের আভ্যন্তরীণ সব ব্যাপারে তেমনি কর্তা হইতে চায় যেমন অন্য প্রদেশের লোকেরা তাহাদের প্রদেশে কর্তা, তাহা হইলে সেটা বাঙালীর প্রাদেশিকতা! আমরা ইহা বাঙালীর প্রাদেশিকতা মনে করি না। এই তথাকথিত প্রাদেশিকতা বর্জন করিয়া নিখিলভারতীয় দেশভক্ত হওয়া যায় বা হইবার চেষ্টা করা উচিত, আমরা এরূপ মনে করি না। 'পর-জ্বালানে' হইতে হইলে 'ঘর-জ্বালানে' হওয়া একান্ত আবশ্যক, এরূপ মনে করি না। আমরা এরূপ ইঙ্গিত করিতেছি না, যে, উপরে যেরূপ অবাঞ্ছিত মনোভাবের আভাস দিলাম, সুভাষবাবুর মনে সেরূপ কোন ভাব আছে। তিনি নিজের কথা খুলিয়া বলিয়াছিলেন বলিয়া আমাদের কথাও খুলিয়া বলিতেছি।

বাংলা দেশের কংগ্রেসী গৃহবিবাদের দরুন যে নিখিল-ভারতীয় মন্ত্রণাসভায় বঙ্গ উপেক্ষিত হইয়া থাকে, তাহা আমরা জানি। কিন্তু বাঙালী বলিয়াই বাঙালীর কথা উপেক্ষিত হয়, বাঙালী বলিয়াই বাঙালীর স্বার্থ অবহেলিত হয়, এরূপ দৃষ্টান্ত ও প্রমাণও দেওয়া যায়। এই অবহেলা সহ্য না-করা প্রাদেশিকতা নহে।

একটা অবান্তর কথা এখানে বলি। বাঙালীর প্রতি বিরূপতার একটা দৃষ্টান্ত সুভাষবাবুর অবিদিত নহে। স্বর্গীয় বিঠলভাই পটেল সমগ্র ভারতবর্ষেরই কল্যাণার্থ সুভাষবাবুর পরিচালনায় বিদেশে প্রচারকার্যের নিমিত্ত এক লক্ষ টাকা তাঁহার উইলে রাখিয়া যান। এই টাকাটা কেন দাতার ইচ্ছানুসারে প্রদত্ত ও ব্যয়িত হইতেছে না তাহার আলোচনা বঙ্গের অন্য কোন কাগজে হইয়াছিল কিনা জানি না, কিন্তু প্রবাসী'তে হইয়াছিল।

সাম্প্রদায়িকতা পরাধীন জাতির উন্নতির বিশেষ পরিপন্থী, এবং তাহা স্বাধীন জাতিরও স্বাধীনতা রক্ষার সামর্থ্য কমাইয়া দিতে পারে, ইহা সত্য কথা। কিন্তু যাঁহারা অসাম্প্রদায়িক হইতে চান, কোন সম্প্রদায়েরই সাম্প্রদায়িকতা প্রশ্রয় দেওয়া তাঁহাদের উচিত নয়, কাহারও সাম্প্রদায়িকতার সঙ্গে র... করা তাঁহাদের উচিত নয়, এবং ছোট বা বড় কোন সম্প্র... বা উপসম্প্রদায়ের প্রতিই অবিচার বা জবরদস্তিতে ত... যোগ দেওয়া উচিত নয়। কংগ্রেস সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়া... সম্পর্কে যাহা বলিয়াছেন, করিয়াছেন, তাহাতে মুসলম... সাম্প্রদায়িকতাকে প্রশ্রয় দেওয়া হইয়াছে। শেষের দি... কংগ্রেস যে এ বিষয়ে কতকটা ঠিক কথা অন্ততঃ কথ... বলিয়াছেন, তাহা সাম্প্রদায়িক-বাঁটোয়ারা-বিরোধী লোকে... প্রভাবে এবং "কংগ্রেস জাতীয়" দলের উদ্ভবে ঘটিয়াছে।

গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে এক চুলও সরিয়া না-গি... অসাম্প্রদায়িক হইতে হইবে।

ভারতবর্ষের সকল সম্প্রদায়ের সব লোক স্বাধীনত... প্রচেষ্টায় যোগ না দিলে দেশকে স্বাধীন করা যাইবে না, ... রূপ মনে করা ও বলা আমরা ঠিক মনে করি না। হি... সমাজেরও বিস্তর লোক ত স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ দে... নাই; কিন্তু তাহার জন্য ত কখনও কোন কংগ্রেসনে... বলেন নাই, যে, হিন্দু মহাসভার সঙ্গে বা বর্ণাশ্রম স্বরা... সঙ্ঘের সঙ্গে একটা রফা করা যাক, নতুবা দেশ স্বাধীন হই... না। কিন্তু বিস্তর মুসলমান স্বাধীনতা-সংগ্রামে যোগ ন... দেওয়ায় সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানদের সঙ্গে রফা করিত... কংগ্রেস নেতারা পশ্চাৎপদ হইবেন না, এইরূপ লক্ষণ স্পষ্ট... আমরা ছোট বড় কোন সম্প্রদায়কেই উপেক্ষা করিতে... বলিতেছি না। সকলেরই জন্য কংগ্রেসের দ্বার মু... থাকা আবশ্যক। কংগ্রেস সকলকেই নিজের দ... আনিতে সর্বদা সচেষ্ট ও প্রস্তুত থাকিবেন—সংখ্যাবহু... সম্প্রদায়কে যেমন সংখ্যালঘু সম্প্রদায়কেও তেমনি... কিন্তু নিজের আদর্শকে হীন করিয়া, অংশতঃ ত্যাগ করি... বা আদর্শ হইতে কতকটা বিচ্যুত হইয়া কাহাকেও লইতে... গেলে কংগ্রেসের সেই শক্তিহীন দশা হইবে যে-দশা হয় ভূ... ঝাড়িবার সরিষার মধ্যেই ভূত ঢুকিলে।

কংগ্রেসের এই বিশ্বাস থাকা উচিত, যে, "আমরা স্বাধীনত... সংগ্রামে জয়ী হইবই। যদি সকল সম্প্রদায়ের লোক এ... সংগ্রামে যোগ দেন তাহা হইলে জয় অপেক্ষাকৃত সহজে... অল্প সময়ে হইবে। কিন্তু কেহ কেহ যোগ না-দিলেও... হইবে—যদিও তাহা কঠিনতর ও অধিকতর সময়সাপে... হইবে। অতএব আমরা সংগ্রামে লাগিয়া রহিলাম... সকলকেই আমাদের দুঃখের ও আনন্দের, লজ্জার... গৌরবের অংশী হইতে আহ্বান করিতেছি।" যদি ম... করা ও বলা হয়, যে, অমুকেরা না আসিলে স্বাধীনতা ল... হইবে না, তাহা হইলে সেই অমুকরা "আত্মবিক্রয়ের" খুব চড়... দাম হাঁকিতে থাকিবে।

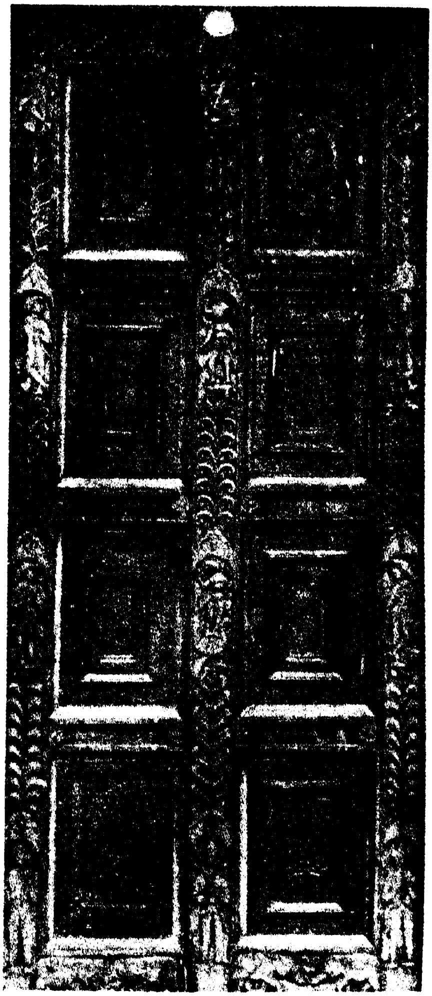
পৃথিবীতে যত দেশে যত জয়লাভান্ত স্বাধীনতা-সংগ্রা...

বিক্রমপুরের শিল্পসম্পদ্

শ্রীযোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত

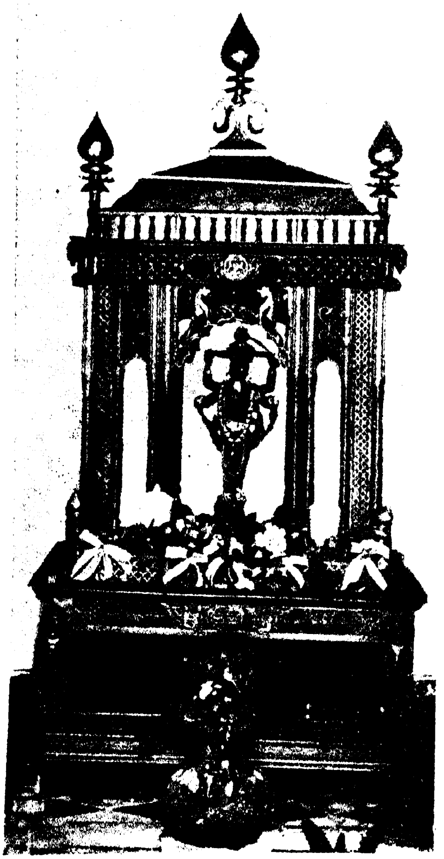
বিক্রমপুর অতি প্রাচীন কাল হইতেই শিল্পসম্পদে শ্রেষ্ঠ ছিল। বিক্রমপুরের শিল্পবিজ্ঞান নানা দিক্ দিয়া নানা ভাবে দেশ-বিদেশে প্রতিষ্ঠালাভ করিতে পারিয়াছিল। প্রাচীন বাংলার রাজধানী (বর্ত্তমান রামপাল নামে পরিচিত) বিক্রমপুরের চারি দিকে শিল্পীদের বাসপল্লী বর্ত্তমান ছিল, এখনও তাহার স্মৃতি সেই সকল পল্লীর নামের সহিত সংশ্লিষ্ট রহিয়াছে। ঢাকার প্রসিদ্ধ শঙ্খবণিকেরা এক সময়ে বিক্রম-পুরে বাস করিতেন। ঢাকার বিখ্যাত মসলিন নির্ম্মাণ করিবার কার্পাস বিক্রমপুরের অন্তর্গত পাঁচগাও গ্রামের নিকটবর্ত্তী মাঠে উৎপন্ন হইত।

সে বেশী দিনের কথা নয়, সত্তর-পঁচাত্তর বৎসর পূর্ব্বেও শিক্ষিত-অশিক্ষিত ভদ্র-অভদ্র বিক্রমপুরের প্রায় সকলের ঘরেই চরকা ঘুরিত। মহারাজ রাজবল্লভের রাজনগরের পিত্তলের বাসনের প্রকাণ্ড কারখানা ছিল। সেখানে নানা প্রকারের পিত্তলের বাসন প্রস্তুত হইত। রাজনগরের ঘটি প্রভৃতির বড় সমাদর ও সুনাম ছিল। এই বাসনের কারখানা যেখানে ছিল সেখানকার নিকটবর্ত্তী লোকেরা দিবারাত্রি শত শত হাতুড়ির ঠক্ ঠক্ ও ধাতু-দ্রব্যের ঝন্ ঝন্ শব্দে অস্থির হইয়া পড়িত। কীর্ত্তিনাশা রাজনগর গ্রাস করিবার পর সেই শিল্পসমৃদ্ধি হ্রাস পাইলেও বিলুপ্ত হয় নাই। দক্ষিণ-বিক্রমপুরে এই শিল্পটি শ্রীহীন হইয়া পড়িলেও বর্ত্তমান সময়ে বাইখা, হাঁসের কান্দী, পালং প্রভৃতি স্থানে এই কারবার চলিতেছে। উত্তর-বিক্রমপুরে এই শিল্পটির অবস্থা এখনও সন্তোষজনক। পূর্ব্বে ঢালা পিত্তল ও তামা পিটিয়া দেশীয় তৈজসাদি প্রস্তুত করা হইত; ইহাতে জিনিষগুলিও যেমন দীর্ঘকাল স্থায়ী হইত, দেশের অনেক অর্থও দেশেই থাকিয়া যাইত। যেমন বিদেশ হইতে পিত্তল ও তামার চাদরের (পাত) আমদানী হইল, অমনি পুরাতন প্রণালী পরিত্যাগ করিয়া পরিশ্রম লাঘবের জন্য একটু সুবিধার লোভে দেশীয় কারিগরগণ ঐ চাদর দ্বারা সমুদয় জিনিষ প্রস্তুত করিতে আরম্ভ করিল। এই ভাবে ধীরে ধীরে শিল্পের অবনতি হইতে আরম্ভ করিল।



কলমা গ্রামের বুড়াকালী মন্দিরের কাঠের কপাট
শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও চিত্রশিল্পী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের সৌজন্যে

বিক্রমপুরের ডুয়াল্লী গ্রাম এই অল্প কয়েক বৎসর হইল পদ্মাগর্ভে বিলীন হইয়াছে। ডুয়াল্লী একটি প্রসিদ্ধ পল্লী ছিল। আমি ঐতিহাসিক তথ্যানুসন্ধান উপলক্ষে কয়েক বার এই গ্রামে গমন করিয়াছি। একটি মারীচি-মূর্ত্তি (ভগ্ন) ডুয়াল্লী গ্রাম হইতে সংগৃহীত হইয়াছিল। পূর্ব্বে এই ডুয়াল্লী গ্রামে ধাতুনির্ম্মিত সুন্দর সুন্দর দেবদেবীর প্রতিমূর্ত্তি ও নানাবিধ ঢালাই জিনিষ বহুল পরিমাণে প্রস্তুত হইত। এই শিল্পটি এক সময়ে যথেষ্ট সমাদৃত ছিল। দেশেও যেমন প্রচুর পরিমাণে কাট্‌তি হইত, বিদেশেও তেমনি হইত। এক সময়ে এই শিল্পটি ডুয়াল্লীর ভদ্রলোকদের মধ্যেও প্রচলিত ছিল। এই ব্যবসায়টি তাঁহাদের অনেকের জীবনোপায়ের একমাত্র অবলম্বনস্বরূপ ছিল। কিন্তু সময়ের পরিবর্ত্তনের সহিত



কলমা গ্রামের বুড়াকালীর কাষ্ঠনির্ম্মিত সিংহাসন
শ্রীবিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত ও চিত্রশিল্পী শ্রীচিত্তরঞ্জন দাশের সৌজন্যে

ঐ গ্রামের ভদ্র-শিল্পীরা এই ব্যবসায়টি পরিত্যাগ করায় বিক্রমপুরের ধাতব মূর্ত্তি নির্ম্মাণের শিল্পটি বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছে।

আমাদের দেশের অনেক শিল্প লুপ্ত হইবার প্রধান কারণ সামাজিক নির্যাতন। প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে লৌহজঙ্গ হইতে প্রকাশিত 'বিক্রমপুর' নামক একখানি সাপ্তাহিক পত্রিকা বাহির হইত। সেই পত্রিকায় ডুয়াল্লী গ্রামের এই শিল্প সম্বন্ধে এইরূপ লিখিত হইয়াছিল—

"অনেকে এই শিল্প কার্য্যটিতে এতদূর নৈপুণ্য প্রদর্শন করিয়া গিয়াছেন যে, সকলেই তদ্দর্শনে বিমোহিত এবং নির্ম্মাতার যথেষ্ট প্রশংসা করিয়াছেন। আজ সমাজের ভয়ে ঐ গ্রামের কোনও ভদ্রলোক প্রকাশ্যভাবে এই কার্য্য করিতেছেন না। সকলেই শিল্পের এই অনুষ্ঠানকে এক্ষণে ঘৃণা ও লজ্জার বিষয় মনে করেন! অনেকে এই ব্যবসায় একেবারে পরিত্যাগ করিয়াছেন। তাঁহাদের এই ব্যবসায়টি পরিত্যাগের সঙ্গে সঙ্গে এই শিল্পটির উৎকর্ষেরও অনেক হ্রাস পাইয়াছে। এক্ষণে বলুন দেখি আমরাই কি এই শিল্পটির অবনতির কারণ নহি? আজ যদি সমাজ এই শিল্পানুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি এতদূর কঠোর ব্যবহার না করিতেন, তবে এই শিল্পটি আরও কত উন্নতি লাভ করিতে পারিত। তাই বলি—তুমি যদি ব্রাহ্মণ হইয়া চিকিৎসা ব্যবসায় করিতে পার, মসীজীবী হইতে পার, আরও কত কিছু হইতে পার, করিতে পার, ইহাতে যদি তোমার লজ্জা ও ঘৃণা বোধ না জন্মে, সমাজে তুমি উঁচুমুখে চলিতে পার, সমাজের নিপীড়ন সহ্য করিতে না হয়, শাস্ত্রীয়বিধি লঙ্ঘন জন্য দণ্ডার্হ হইতে না হয়, তবে এই স্বাধীন ব্যবসায়টির অনুষ্ঠানকারীদিগের প্রতি তোমার এত ঘৃণা কেন? সমাজই বা কেন ইহাদের প্রতি এরূপ ভ্রূকুটিকুটিল মুখ প্রদর্শন করিয়া থাকেন, তাই বলিতেছি দেশীয় শিল্পের অবনতির কারণ আমরাই বেশী। আমরা নিজের পায়ে কুঠার মারিয়া অন্যের কাঁধে দোষ চাপাইতেছি। (৮ই মাঘ, সন ১৩০০, ১ম ভাগ ৮ম সংখ্যা)

বিক্রমপুরের অনেক শিল্পই এইরূপ সামাজিক নির্যাতনে বিলুপ্ত হইয়াছে। এক সময় বিক্রমপুর কাঠের কাজের জন্য বিশেষ বিখ্যাত ছিল। গ্রামে গ্রামে সূত্রধরেরা বাস করিত। নৌকা ও জাহাজ প্রস্তুত করিতে তাহারা দক্ষ ছিল। যেদিন পর্ত্তুগীজ-বীর কার্ভালো তাঁহার ভগ্ন ও জীর্ণ রণতরীগুলি লইয়া বিপন্ন হইয়া বিক্রমপুরের বীরশ্রেষ্ঠ কেদার রায়ের আশ্রয়প্রার্থী হইয়াছিলেন, সেদিন বিক্রমপুরের রাজধানী শ্রীপুরের সূত্রধরেরা অল্প সময়ের মধ্যে সে সমুদয় রণতরী মেরামত করিয়া দিয়াছিল। সেকালে বিক্রমপুরের 'কোষ' নৌকা ও 'জেলিয়া' জলযুদ্ধে ব্যবহৃত হইত। আরাকান-রাজের সহিত এবং মোগলদের সহিত নৌযুদ্ধে

কেদার রায় কোষ ও জেলিয়ার সাহায্যে মগ ও মোগলকে পরাজিত ও সন্ত্রস্ত করিয়া তুলিয়াছিলেন। সেই কোষ ও জেলিয়া বিক্রমপুরেই নির্ম্মিত হইত। এখনও বিক্রমপুরের নদ নদী ও খালে বিলে নানা শ্রেণীর নৌকা দেখিতে পাওয়া যায়। কাজেই কাষ্ঠশিল্পের দিক্ দিয়া বিক্রমপুরবাসী সূত্রধরেরা কি কোষতরী নির্ম্মাণে, কি জেলিয়া তরী নির্ম্মাণে, কি বজরা ও ছিপ নির্ম্মাণে অতিশয় সুদক্ষ ছিল। ডক্টর নলিনীকান্ত ভট্টশালী সোনারঙ্গের দেউলবাড়ীর নিকটবর্ত্তী পুকুর হইতে প্রাপ্ত এবং রামপালের কাছাকাছি প্রাপ্ত কয়েকটি কাষ্ঠনির্ম্মিত স্তম্ভ এবং তাহার উর্দ্ধ ভাগের চিত্র প্রকাশ করিয়াছেন। তাহার একটিতে বিষ্ণুমূর্ত্তি অতি নিপুণভাবে খোদিত রহিয়াছে। কতদিন চলিয়া গিয়াছে, গভীর জলতলে কাদার মধ্যে পড়িয়া থাকা সত্ত্বেও কাঠের দৃঢ়তাও যেমন রহিয়াছে, তেমনি শিল্পীর শিল্পনৈপুণ্য প্রত্যেকটি কারু-নিদর্শনের মধ্য দিয়া দেদীপ্যমান রহিয়াছে। এমন করিয়া কাঠের গায়ে যাহারা শিল্পমাধুর্য্য ফুটাইয়া তুলিতে পারিয়াছিল, দেবতার সৌম্য শান্ত সৌন্দর্য্যের অপূর্ব্ব গাম্ভীর্য্য বিকশিত করিতে পারিয়াছিল, তাহারা যে কত বড় শিল্পী ছিল, তাহা প্রত্যক্ষ ভাবে অনুভব করিতেছি।

কলমা গ্রামে শ্রীযুক্ত বিনোদেশ্বর দাশগুপ্ত মহাশয়ের বাড়ীতে যে কালীমূর্ত্তি আছে তাহা বিক্রমপুরের 'দক্ষিণা কালী' নামে পরিচিতা। খুব প্রাচীন বিগ্রহ বলিয়া এতদঞ্চলে "বুড়া কালী" নামে খ্যাতি লাভ করিয়া আসিতেছেন। আনুমানিক ১৭৬০-১৭৭০ খ্রীষ্টাব্দ মধ্যে এই দেবীমূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিতা হইয়াছিলেন। দেবীর সিংহাসনটি কাষ্ঠনির্ম্মিত ও নানারূপ কারুকার্য্যশোভিত বলিয়া বিক্রমপুরের একটি দর্শনীয় বস্তু-মধ্যে পরিগণিত। ১৮৫১ খ্রীষ্টাব্দে এই সিংহাসন-নির্ম্মাণ শেষ হয়। বিক্রমপুরের শিল্পী কাশীনাথ মিস্ত্রী ইহা নির্ম্মাণ করেন। নির্ম্মাণকাল ও শিল্পীর নাম সিংহাসনের গায়ে খোদিত রহিয়াছে। এই বুড়া কালীর মন্দিরের সম্মুখের দরজার কপাটটিও সূক্ষ্ম কারুকার্য্যের নিদর্শন। ইহা ১৮৫২ খ্রীষ্টাব্দে তৈয়ারী হয়। ইহার শিল্পীও কাশীনাথ মিস্ত্রী। কপাটের উপরিভাগে দেবীপক্ষ ও অসুর-পক্ষের যুদ্ধের চিত্র খোদাই করা রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত গণেশ, কার্ত্তিক, হলধর, শ্রীকৃষ্ণ, লক্ষ্মী, সরস্বতী, বৃষবাহন শিব (মাথায় গঙ্গা) প্রভৃতি খোদিত চিত্র আছে। সর্ব্বনিম্নে তিনটি সিপাহী রহিয়াছে। ডক্টর সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায় মহাশয়ের মতে, এইরূপ সিপাহীর মূর্ত্তি খোদিত করিবার পদ্ধতি সিপাহী-বিদ্রোহের সমকালে বিদ্যমান ছিল।]

কাছে ও দূরে

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতি কাছে থাকি
রেখেছিলে ঢাকি
চেতনা মোর,
ঘুমে জাগরণে
যেন দু নয়নে
স্বপন-ঘোর।

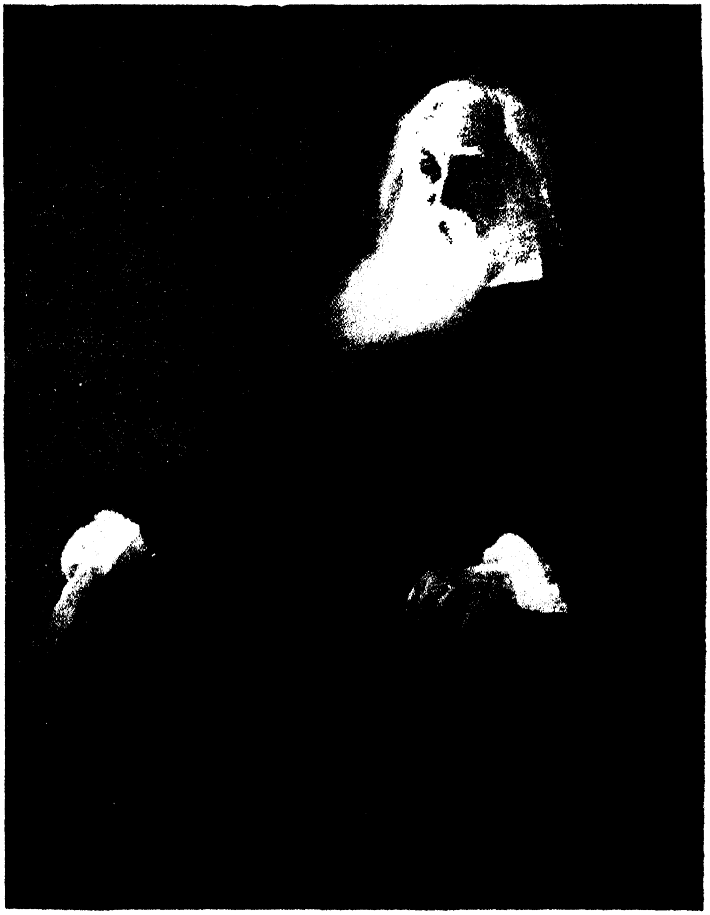
দূরে গেছ চলে,
প্রতি পলে পলে
এবার আমি
আপন মায়ায়
ঘিরেছি তোমায়
দিবসযামী।

হুইটম্যান

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

সাহিত্যের ইতিহাসে হুইটম্যানের আবির্ভাব একটি স্মরণীয় ঘটনা। কাব্যের জগতে এমন একটি সুর তিনি বাজালেন যা সম্পূর্ণ নূতন। তাঁর আবির্ভাবের পূর্ব্বে কাব্যসৃষ্টির উপাদান সংগৃহীত হ'ত রাজা-বাদশাহের অট্টালিকা থেকে; সাহিত্য তৈরির জন্য যেতে হ'ত পৌরাণিক দেবদেবীদের কাছে। হুইটম্যান আবির্ভূত হলেন একটা অভিনব দৃষ্টি নিয়ে। তিনি দেখলেন, কবিতা লিখবার প্রচুর উপাদান রয়েছে নিতান্ত কাছেই—আমাদের প্রতিদিনের জীবনের বিচিত্র অভিজ্ঞতার মধ্যে। আমাদের চোখের সম্মুখেই মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে মানুষের জীবনের রঙ্গমঞ্চে এমন সব ঘটনার অভিনয় হয়ে যাচ্ছে যা নিয়ে অনবদ্য বহু কবিতা লেখা একেবারেই অসম্ভব নয়। হুইটম্যানের আবির্ভাবের পূর্ব্বে কবিতালক্ষ্মীর বিচরণের ক্ষেত্র ছিল সুসজ্জিত প্রমোদশালায় নূপুরের নিক্কণ, পুষ্পমাল্যের সৌরভ, প্রেমিক-প্রেমিকার অস্ফুট প্রণয়-গুঞ্জন এবং বিলাসের বিচিত্র আয়োজনের মধ্যে। ওয়ার্ডস্‌ওয়ার্থ আর শেলীর কবিতায় গণতন্ত্রের সুর অবশ্যই বেজে উঠেছে—কিন্তু মাটির খাঁটি সুর এবং মানুষের সহজ গরিমাকে প্রকাশ করবার জন্য প্রয়োজন ছিল হুইটম্যানের মত অসাধারণ কবির আবির্ভাবের। তিনি বললেন কবি হ'তে চাও? বেরিয়ে এস আকাশের তলায় মানুষের বিশাল হাটে। ভোর না হ'তেই কৃষক চলেছে ভূমি কর্ষণ করতে; কচি ধানের সবুজ ক্ষেতে হাতে করে কাজ আর মুখে গায় গান। কবিতালক্ষ্মীর আনাগোনা ত ঐখানেই। ছোট্ট শিশুটি নিদ্রা যায় দোলনায়; হেমন্তের অপরাহ্ণে ধানের গাড়ী নিয়ে চাষী ফিরে যায় প্রান্তর থেকে পল্লীর বুকে; মুণ্ডাদের ছেলে আর মেয়েরা শুভ্র জ্যোৎস্নায় সারারাত ধ'রে মাদল বাজায় আর নাচে; ভরাগঙ্গার গৈরিক জলে জোয়ান জোয়ান ছেলেরা কাটে সাঁতার; বিলের কালো জলে পানকৌড়ি দেয় নিঃশব্দে ডুব; মেঠো পথের ধারে পাতার আড়ালে ফুটে আছে বনমল্লিকা; মশালের আলোয় রাজপথ আলোকিত ক'রে বর চলে বিবাহ করতে। রাজমিস্ত্রী বারে বারে হাঁক দেয় সুরকির জন্য; খেয়াঘাটের মাঝি সারাদিন ধ'রে করে যাত্রী-পারাপার; উকীলের চারি দিকে ভিড় ক'রে ব'সে আছে মক্কেলের দল; ডাক্তার গম্ভীর মুখে নাড়ী দেখে আর ঘন ঘন ঘড়ির দিকে চায়; নূতন বউ ঘোমটা টেনে ঘরের কোণে পান সাজে; গৃহস্থের বধূ তুলসীমঞ্চে রাখে সন্ধ্যার প্রদীপ; শয়নের আগে আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে কুমারী করে কেশবিন্যাস; শুভ্র-বস্ত্রে মৃতের দেহ ঢেকে দেয় আত্মীয়স্বজন আর তার উপরে রাখে রাশি রাশি পুষ্প; সদ্যবিধবা সাশ্রুনয়নে বহুকালের অলঙ্কার ফেলে খুলে আর সিঁদুরের দাগ ফেলে মুছে; পৌষের প্রভাতে গ্রামের ছেলেবুড়ো বন-ভোজনে যায় নদীর তীরে—যেখানে বটের তলায় সারা বেলা থাকে ছায়া; বিরাট জন-সভায় বক্তার গুরুগম্ভীর কণ্ঠ থেকে বেরিয়ে আসে অগ্নিগর্ভ বাক্যের স্রোত আর শ্রোতাদের ধমনীতে ধমনীতে চঞ্চল হয়ে ছোটে রক্তধারা; খেলোয়াড় ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে ফুটবল নিয়ে আর অপরাহ্ণের আকাশকে বারে বারে মুখরিত ক'রে উঠছে জনতার জয়ধ্বনি; ছয় ঘোড়ার গাড়ীতে চ'ড়ে জনাকীর্ণ রাজপথে পুষ্পবৃষ্টির মধ্যে আসে কংগ্রেসের প্রেসিডেণ্ট; গঙ্গার ঘাটে সদ্যস্নাতা পুরনারী নতমস্তকে করে সূর্য্যপ্রণাম; পবিত্র হোমাগ্নিকে ঘিরে নবীন পূজারীরা করে মন্ত্রোচ্চারণ আর বীণাপাণির চরণে দেয় পলাশ ফুলের অঞ্জলি; চাঁপার কলির মত আঙুলের ডগায় চন্দনের ফোঁটা নিয়ে বোন পরিয়ে দেয় ভায়ের কপালে ভাইফোঁটা। এমনি সহস্র সহস্র ঘটনা নিমেষে নিমেষে দিনরাত ঘটে যাচ্ছে আমাদের চক্ষুর সম্মুখে যা অনায়াসে কবিতার উপাদান হ'তে পারে।

The marvellous envelops us and we breathe it like the atmosphere; but we do not see it.



ওয়াল্ট হুইটম্যান

অপরূপের মহিমা রেখেছে আমাদের ঘিরে ; নিঃশ্বাস-প্রশ্বাসের সঙ্গে বাতাসকে যেমন গ্রহণ করি আমরা, তেমনি তাকেও গ্রহণ করছি নিমেষে নিমেষে ; কিন্তু তাকে দেখার মত চোখ নেই আমাদের।

হুইটম্যানের কবিতার ছত্রে ছত্রে আসন পেয়েছে যারা—তারা দুর্লভ নয়, অলৌকিক নয়। তারা নিতান্ত সাধারণ ব'লেই আমরা তাদের উপেক্ষা ক'রে চলি। কিন্তু দুর্লভ ছিল তাঁর দৃষ্টি। সাধারণের মধ্যে অসাধারণকে উপলব্ধি করতে হ'লে যে অন্তর্দৃষ্টির প্রয়োজন, সেই দৃষ্টি নিয়ে এসেছিলেন তিনি পৃথিবীতে। বাহিরের চোখ দিয়ে দেখতে পাই যাকে, তাকে ব্যক্তির বা বস্তুর সবটুকু মনে করা ঠিক নয়। রূপ থেকে সব কিছুর আরম্ভ মাত্র। কোথাও কি তাদের সমাপ্তি আছে? গভীর অনুরাগে যে-অধরে রাখি চুম্বনের স্পর্শ, সে-অধর কার? বাহুবন্ধনের মধ্যে রক্ত-মাংসের যে-স্থূলজীবটি ধরা দিয়েছে তার, না অপর কোন সত্তার যার অস্তিত্ব আমাদের ধরা-ছোঁয়ার ঊর্দ্ধে এবং সমস্ত মলিনতার ও দীনতার পরপারে? রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে যে বস্তুজগৎ বারম্বার আমার চেতনার দুয়ারে করে করাঘাত, তাকে চরম ব'লে স্বীকার ক'রে নিতে আমাদের কোথায়

যেন বাধে। ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য বস্তুর পিছনে আছে এমন-একটা-কিছু যার প্রকাশ আকাশের অনন্তকোটী সূর্য্য তারা থেকে আরম্ভ ক'রে সমুদ্রতীরের ক্ষুদ্রতম বালুকণা পর্য্যন্ত প্রত্যেকের মধ্যে, যার অপরিসীম পরিচর্য্যা প্রত্যেকটি মানুষ থেকে আরম্ভ ক'রে প্রত্যেকটি চড়ুই পাখী পর্য্যন্ত সমস্ত প্রাণি-জগতের পিছনে। এই এমন-একটা-কিছুকেই উপনিষদে বলা হয়েছে অণোরণীয়ান্ মহতোমহীয়ান্, অর্থাৎ অণু থেকেও সে অণু, বিরাট থেকেও সে বিরাট এবং এই অনির্ব্বচনীয় কিছুর মহিমাকেই সর্ব্বত্র উপলব্ধি ক'রে সর্ অলিভার লজ লিখেছেন তাঁর *Modern Scientific Ideas* নামক পুস্তকের শেষপৃষ্ঠায়,

Depend upon it that there is some Mind that really comprehends the whole, that can attend to the smallest detail—to every human being, to every bird, every sparrow—and can yet feel at home in the infinitude of space. Nothing too small, nothing too big, for that infinite Mind's understanding and fostering care.

"এমন কোন আত্মা আছেন যিনি সব কিছুকেই নিশ্চয় জানেন। প্রত্যেকটি মানুষ, প্রত্যেকটি পাখী, প্রত্যেকটি চড়াইয়ের উপরে এই আত্মার সজাগ দৃষ্টি। আকাশের অসীমতাও এই আত্মার বাহিরে নয়। ক্ষুদ্র থেকেও যা অতিক্ষুদ্র এবং বৃহৎ থেকেও যা অতি বৃহৎ—সবাইকে জানেন এই সীমাহীন আত্মা এবং সকলের পিছনেই আছে এই আত্মার পরিচর্য্যা।"

এই অসীম আত্মাকে আমরা যখন অনুভূতির আলোকে আবিষ্কার করি তখন সমস্ত জগৎ অকস্মাৎ অপার্থিব মহিমা নিয়ে আমাদের চেতনায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। ক্ষুদ্র আর ক্ষুদ্র থাকে না, তুচ্ছ হয়ে ওঠে অপরূপ। তখন আর আমরা করুণকণ্ঠে বারম্বার বলি না, জীবন দুঃখময় এবং জগৎ মিথ্যা। অনির্ব্বচনীয় আনন্দে আমাদের রসনা জয়ধ্বনি দিয়ে বলে,

বিশ্বরূপের খেলাঘরে
কতই গেলেম খেলে,
অপরূপকে দেখে গেলেম
দুটি নয়ন মেলে।—গীতাঞ্জলি

ওয়াল্ট হুইটম্যান রূপের মধ্যে দেখেছিলেন এই অপরূপকে আর সেই জন্যই পৃথিবীর সমস্ত কিছুই তাঁর কাছে দেখা দিয়েছিল বিপুল অর্থ নিয়ে। সকলের জীবনেই এমন এক-একটা অপূর্ব্ব মুহূর্ত্ত আসে যখন দুঃসহ কোন বেদনা বিদ্যুতের মত চকিতে অন্ধকারের পর্দ্দাকে দেয় বিদীর্ণ ক'রে। নব জাগরণের সেই ব্রাহ্মমুহূর্ত্তে আমাদের বিস্মিত নয়ন দেখে সীমার পশ্চাতে অসীমকে, জড়ের পশ্চাতে চেতনকে। এমন মানুষও আছেন যাঁদের দৃষ্টি সকল সময়ের জন্যই আবরণমুক্ত। পৃথিবীতে ছোট বড় যাই কিছু ঘটুক না, প্রত্যেকটি ঘটনার উপরে তাঁরা দেখেন অনন্তের পদচিহ্ন। বাতাসে ভেসে-আসা গানের একটি চরণ, আকাশের এক কোণে ছোট একটি নক্ষত্র, পাতার অন্তরালে ক্ষুদ্র একটি বনফুল, অপরিচিত হাতের লেখা একখানি চিঠি, প্রিয়তম বন্ধুর আঙুলের একটুখানি ছোঁয়া, পথে যেতে যেতে হঠাৎ দেখা বিষণ্ণ একটি মুখচ্ছবি, আপন জনের নয়নকোণে এক ফোঁটা আঁখিজল এক নিমেষে খুলে দেয় এমন একটি অপরূপ রাজ্যের তোরণদ্বার যেখানে সবই অদ্ভুত এবং সবই অনির্ব্বচনীয় আলোকে পরিপূর্ণ। যাঁদের কাছে জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত, প্রত্যেকটি অভিজ্ঞতা অজানার হাতের অঙ্গুরীকে বহন ক'রে আনে, তাঁদেরই আমরা বলি কবি আর ঋষি। এঁদের সংখ্যা কোন কালেই খুব বেশী নয়।

হুইটম্যানের আসন এই দুর্লভ পুরুষদের সভায়। তিনি লিখে গেছেন,

Each moment and whatever happens thrills me with joy.

জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত এবং প্রত্যেকটি ঘটনা আমার চেতনায় আনে পুলকের শিহরণ।

A morning glory at my window satisfies me more than the metaphysics of books.

পুঁথিতে দার্শনিক তত্ত্বের সূক্ষ্ম ব্যাখ্যার মধ্যে যে তৃপ্তি পায় না আমার অন্তর, বাতায়নপথে প্রভাতের শুভ্রজ্যোতি সেই তৃপ্তি আনে আমার চিত্তে।

Logic and sermons never convince,
The damp of the night drives deeper into my soul.

ধর্ম্মের উপদেশ শুনে আর ন্যায়শাস্ত্রের কচকচি প'ড়ে কে কবে সত্যকে উপলব্ধি করতে পেরেছে? রাতের স্নিগ্ধ স্পর্শ আমার অন্তরে আনে সত্যের গভীরতর অনুভূতি।

Why should I wish to see God better than this day?
I see something of God each hour of the twenty-four, and each moment then,
In the faces of men and women I see God, and in my own face in the glass,
I find letters from God dropt in the street, and every one is sign'd by God's name...

আর ভগবানকে যেমন ক'রে জানতে পারছি, এর চেয়ে ভাল ক'রে তাঁকে জানতে পারব আর একদিন—এ যুক্তি কেন?

চব্বিশটি ঘণ্টার প্রত্যেকটি ঘণ্টায় এবং প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তে আমি পাই ভগবানের আভাস নরনারীর মুখে আর দেখি ভগবানের ছবি, মুকুরে নিজের মুখেও দেখতে পাই তাঁকেই,

দেখতে পাই রাস্তায় রাস্তায় ছড়িয়ে আছে তাঁরই হাতের চিঠি আর প্রত্যেকটি পত্রে তাঁরই নামের স্বাক্ষর।

ঠিক এই দৃষ্টি নিয়েই তিনি লিখলেন,

And the cow crunching with depress'd head surpasses any statue,
And a mouse is miracle enough to stagger sextillions of infidels.

মাথা নীচু করে ঐ যে গরুটি ঘাস খায় ওর কাছে যে কোন মর্ম্মর-মূর্ত্তি ম্লান হয়ে যায়, ক্ষুদ্র একটি মূষিকের মধ্যেও অলৌকিক এমন কিছু আছে যা নাস্তিকের অবিশ্বাসকেও টলিয়ে দিতে পারে।

মেটারলিঙ্ক পড়বার সময় বারে বারে মনে হয়েছে—এ যেন হুইটম্যানেরই প্রতিধ্বনি।

Never for an instant does God cease to speak; but no one thinks of opening the doors.

তাঁর বাণীর তো বিরাম নেই। কিন্তু মন্দিরের দুয়ার খুলে সে বাণী শুনবার মত কান কোথায়?

সৌন্দর্য্য নেই কোথায়? মহিমা নেই কোথায়? নেই শুধু সেই কবির দৃষ্টি যা ক্ষণিকের পিছনে দেখে শাশ্বতকে, রূপের পিছনে দেখে অরূপকে, ক্ষুদ্রের পিছনে দেখে বিপুলকে। আমাদের ঘরের বাতায়ন যত ক্ষুদ্রই হোক না, সেই গবাক্ষপথে চোখ রাখলেই দেখতে পাওয়া যাবে অসীম আকাশে তারার প্রদীপ, সুদূর দিগন্তে কার যেন নীল নয়নের ছায়া। এই অসীমকে যত ক্ষণ না দেখি, তত ক্ষণ জীবনে আসে না রূপান্তর। যে অন্ধকারের মধ্যে অসহায় শিশুর মত আমরা কাঁদছি আলোকের দেখা পাবার জন্য, কলহ ক'রে ত তাকে বিতাড়িত করা যাবে না। যে মুহূর্ত্তটিতে আমরা উপলব্ধি করব বিশ্বের সব কিছুর মধ্যে তাঁরই প্রকাশ যিনি অনির্ব্বচনীয়—অমনি অন্ধকার মিলিয়ে যাবে জ্যোতির্ম্ময় পূর্ব্বদিগন্তে, জীবনবীণা বেজে উঠবে ঠিক সুরে, আপন অস্তিত্বের অর্থ পাব খুঁজে এবং আবিষ্কার করতে পারব সব কিছুর মধ্যে একটি অবর্ণনীয় সৌন্দর্য্য এবং মহিমাকে। নিরবচ্ছিন্ন তৈলধারার মত আমাদের চেতনায় এই অসীমের স্মৃতি যখন সর্ব্বক্ষণের জন্য জেগে থাকে, সকলের মধ্যে সত্য শিবসুন্দরকে অবলোকন করতে আমাদের নয়ন যখন অভ্যস্ত হয়, তখনই ত সেই অজানার সোনার কাঠির স্পর্শে আমাদের জীবন হয়ে যায় এক নিমেষে রূপান্তরিত। তখনই ত রবীন্দ্রনাথের ভাষায় আমাদের কণ্ঠ ব'লে ওঠে,

তোমার অসীমে প্রাণ মন লয়ে
যতদূরে আমি ধাই
কোথাও দুঃখ, কোথাও মৃত্যু,
কোথাও বিচ্ছেদ নাই।

অথবা হুইটম্যানের ভাষায় আমরা বলি,

চিরজীবী হোক তারা, বিফল হয়েছে যারা!
জয় হোক তাদের যাদের রণতরী ডুবেছে সমুদ্রে!
যারা নিজেরা হারিয়েছে সাগরগর্ভে প্রাণ, তারাও হোক চিরজীবী!
যত সেনাপতি যুদ্ধে হয়েছে পরাজিত, যত বীর হেরে গিয়েছে সংগ্রামে—
সকলের নামে দাও জয়ধ্বনি!

Have you heard that it was good to gain the day? I also say it is good to fall, battles are lost in the same spirit in which they are won.

যুদ্ধে জয়ী হওয়ার মধ্যে গৌরব আছে—এই কথাই কি এতকাল শুনে এস নি? আমি বলছি, যুদ্ধে পরাজিত হওয়ার মধ্যেও গৌরব আছে, জয় আর পরাজয়—এ দুয়ের মধ্যে মূলতঃ তফাৎ নেই কোন।

সত্যের যে শিখরদেশে আরোহণ করতে পারলে জীবনের সমস্ত কর্ম্ম এবং সমস্ত চিন্তা সার্থক হয়ে দেখা দেয় আমাদের অনুভূতির জগতে, যে জ্যোতির্ম্ময় শিখরদেশকে লক্ষ্য ক'রে মেটারলিঙ্ক লিখেছেন,

The heights whence we see that every act and every thought are infallibly bound up with some thing great and immortal.

যেখানে দাঁড়ালে আমরা নিশ্চয় ক'রে জানি—মরুপথে যে নদী বিলুপ্ত হ'ল এবং মুকুলে যে ফুল ঝরে পড়ল তাদের কারও মৃত্যু চরম নয়, সেই সত্যোপলব্ধির গিরিশৃঙ্গে দাঁড়িয়ে হুইটম্যান দেখেছিলেন জগৎকে আর জীবনকে। যখন যা ঘটবার প্রয়োজন থাকে, তাই ঘটে। ভুল যদি ক'রে থাকি জীবনে, তাও ঘটবার প্রয়োজন ছিল নিশ্চয়ই। জীবনের প্রত্যেকটি মুহূর্ত্তই হ'ল অনুপম। বহু যুগের ওপার থেকে এই যে মুহূর্ত্তটি এল আমার দ্বারে, এই মুহূর্ত্তে যা দেখলাম, যা শুনলাম তার সত্য সত্যই তুলনা নেই! হুইটম্যানের ভাষায়,

This minute that comes to me over the past decillions,
There is no better than it and now.

সর্ব্বপ্রকার পদার্থকে আত্মসাৎ ক'রে উর্ব্বর হবার ক্ষমতা যেমন মাটির মধ্যে আছে, জীবনের ভাল-মন্দ সমস্ত অভিজ্ঞতা থেকে শক্তি সঞ্চয় ক'রে আপনাকে ঐশ্বর্য্যশালী করবার একটি অদ্ভুত ক্ষমতা তেমনি আমাদের আত্মার মধ্যেও আছে। ভুলভ্রান্তি যতই গুরুতর হোক না কেন, আমাদের আত্মাকে তারা দান করে বহুমূল্য সম্পদ, আমাদের সাধুত্বের অভিমানে করে তারা কুঠারাঘাত, আমাদের শেখায় তারা নত হ'তে, আমাদের মিলিয়ে দেয় তারা সকলের সঙ্গে। এই বিপুল সত্যকে উপলব্ধি ক'রেই দুর্দ্দিনের অন্ধকারের মধ্যে অস্‌কার ওয়াইল্ড একদিন লিখেছিলেন,

To regret one's own experiences is to arrest one's own development.

জীবনে যা ঘটেছে তা নিয়ে অনুতাপ করার মানে হচ্ছে আত্মবিকাশের পথকে রুদ্ধ করা।

হুইটম্যানের কথাও এই একই কথা।

What blurt is this about virtue and about vice ?
Evil propels me and reform of evil propels me,
I stand indifferent,
My gait is no fault-finder's or rejector's gait,
I moisten the roots of all that has grown.

পাপ আর পুণ্য নিয়ে এই যে বাদানুবাদ এর কি কোন অর্থ আছে? ধর্ম্ম আর অধর্ম্ম আমার কাছে উভয়ই সমান, পাপে যেমন আমার প্রবৃত্তি, পুণ্যেও তেমনি আমার অনুরাগ,
ছিদ্র অন্বেষণের প্রবৃত্তি অথবা বর্জ্জন করবার প্রকৃতি আমার নয়, যা কিছু এসেছে—সকলের মূলে সলিল সিঞ্চন করি আমি।

সব কিছুকে স্বীকার করবার মত এই যে উদার দৃষ্টি, এই দৃষ্টিই হ'ল ওয়াল্ট হুইটম্যানের প্রতিভার একটি প্রধান বৈশিষ্ট্য।

Facts religions, improvements, politics, trades, are as real as before,
But the soul is also real, it too is positive and direct...

বাণিজ্য, রাজনীতি, ধর্ম্ম, প্রগতি আগেও ছিল যেমন সত্য, এখনও আছে তেমনি সত্য, কিন্তু আত্মাও সত্য, তারও অস্তিত্ব আছে এবং সে স্বয়ংসিদ্ধ।

I believe materialism is true and spiritualism is true,
I reject no part.

যে জ্যোতির্ম্ময় ভবিষ্যতের পানে আমরা অতি দ্রুত এগিয়ে চলেছি সেখানে বিরোধের সমস্ত কোলাহলের মধ্যে মানুষ শুনতে পাবে মিলনের গভীর বাণী। সেখানে দেহকে আমরা অস্বীকার করব না, আত্মাকেও নয়। নরের সেখানে যতখানি মূল্য, নারীরও মূল্য ঠিক ততখানি। বিজ্ঞান আর ধর্ম্ম হাত-ধরাধরি ক'রে সেখানে দাঁড়িয়ে আছে সহোদর দুটি ভাইভগ্নীর মত। মগজের জ্ঞান আর মর্ম্মের অনুভূতি—কারও মূল্য সেখানে কম নয়। সে হ'ল এমন একটা জগৎ যেখানে সব কিছুরই মূল্য আছে—কোন কিছুই যেখানে উপেক্ষার বস্তু নয়। মৃত্যু মানে সেখানে শূন্যতার মাঝে নিঃশেষে বিলীন হয়ে যাওয়া নয়—All goes onward and outward, nothing collapses—জীবন মানে সেখানে অফুরন্ত আনন্দের মধ্যে প্রাণের নিত্য বসন্তোৎসব। সুখ আর দুঃখ, জয় আর পরাজয়, যৌবন আর বার্দ্ধক্য, ঘর আর পথ, যুদ্ধ আর শান্তি, যুক্তি আর বিশ্বাস, রূপ এবং অরূপ—সব কিছুরই মূল্য আছে সেখানে। সে হ'ল সাম্যের জগৎ যেখানে কারও ললাটে নেই অস্পৃশ্যতার ছাপ। কারণ স্পৃশ্যতা আর অস্পৃশ্যতার প্রশ্ন ত সেইখানে—যেখানে নেই দৃষ্টি—সেই দৃষ্টি যা গভীর থেকেও গভীরে গিয়ে পৌঁছয় এবং দূর থেকে সুদূরকেও অনায়াসে দেখতে পারে। এই যে অনাগত সাম্যের জগৎ—এই জগতের পরিচয় পাই হুইটম্যানের কবিতায়। তাঁর কবিতায় কেবলই জয়ধ্বনি—স্বাধীনতার জয়ধ্বনি, সাম্যের জয়ধ্বনি, অতীতের জয়ধ্বনি, ভবিষ্যতের জয়ধ্বনি, মানুষের জয়ধ্বনি। যাকে বলছি মূল্যহীন—সে ত বাস্তবিক মূল্যহীন নয়। আমার দৃষ্টি ঝাপসা হয়ে আছে বলেই যাকে যা মূল্য দেওয়া উচিত ছিল, সে মূল্য তাকে দান করতে এত আমার কুণ্ঠা! জগতকে এবং জীবনকে দেখছি পুঁথির সঙ্গে মিলিয়ে; সমাজের দশ জনের কাছ থেকে ছেলেবেলা থেকে যা শিখে এসেছি তারই কষ্টিপাথরে যাচাই ক'রে সব কিছুর মূল্য বিচার করছি। সেই জন্যই ত এত সঙ্কীর্ণতা, এত সন্দেহ, এত গোঁড়ামির প্রাদুর্ভাব; সেই জন্যই ত যাকে স্বল্প মর্য্যাদা দান করা উচিত তাকে দান করি প্রচুর সম্মান এবং যাকে প্রচুর মর্য্যাদা দান করা উচিত তাকে দেখি অশ্রদ্ধার চোখে। সেই জন্যই ত প্রাচীনকে সম্মান করতে গিয়ে হই জীর্ণ আচারের কঙ্কালের পূজারী এবং নবীনকে গ্রহণ করতে গিয়ে হই হিতাহিতজ্ঞানশূন্য কালাপাহাড়, দেহকে স্বীকার করতে গিয়ে হই ইন্দ্রিয়াসক্ত ভোগসর্ব্বস্ব জীব এবং দেহকে অস্বীকার করতে

গিয়ে হই উৎকট বৈরাগ্য-পথের মায়াবাদী পথিক; যুক্তির নামে অতীন্দ্রিয়কে করি অবিশ্বাস এবং বিশ্বাসের নামে বিজ্ঞানকে করি অশ্রদ্ধা; সেই জন্যই ত এত বিদ্বেষ, এত অসহিষ্ণুতা, এত অনুদারতা, এত বিষোদ্গীরণ, এত হানাহানি, বাক্যের এত ঝড় এবং তর্কের এত ধূলি।

হুইটম্যান বললেন—

I have no chair, no church, no philosophy.

কোন বিশেষ ধর্মের অথবা দর্শনের ধ্বজা উড়িয়ে আমি আসি নি।

কারণ যা সত্য তাকে ত কোন একটা বিশেষ মতের গণ্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ করা যায় না। কোন অধ্যাপক, কোন ধর্মযাজক, কোন দার্শনিক, কোন্ পুঁথি সত্যের সঙ্গে আমাদের পরিচয় করিয়ে দিতে অক্ষম। তাকে জানা যায় অনুভূতির পথ দিয়ে, অন্তরের দৃষ্টি দিয়ে। সেই দৃষ্টি দিয়ে আমরা যা সত্য ব'লে জানি তার সঙ্গে শাস্ত্রের মিল নাও থাকতে পারে। হুইটম্যান বললেন, প্রশ্নের জবাব দিতে আমি আসি নি, আমি এসেছি মানুষের মনে প্রশ্নের পর প্রশ্ন জাগাতে। প্রশ্নের জবাব দেবে তারাই গুরুগিরি যাদের ব্যবসা।

Not I, not anyone else can travel that road for you,
You must travel it for yourself.

সত্যের পথে তোমার হয়ে আর কেউ চলবে—অসম্ভব।
তোমাকেই চলতে হবে তোমার নিজের জোরে।

আমরা জানি, এই স্বাধীনচেতা কবি পৃথিবীর একপ্রান্ত থেকে আর এক প্রান্ত পর্যন্ত অগণিত মানুষের মনে এমন সব মারাত্মক প্রশ্নের তরঙ্গ তুলেছেন যার উত্তর নেই পুঁথির পাতায়, সমাজপতিদের রসনায়, রাষ্ট্রপতিদের তৈরি আইনের গ্রন্থে, সুনীতি-প্রচারকদের বাঁধা বুলির মধ্যে। এই সব প্রশ্ন জাগাবার জন্য কবিকে জীবিতকালে কম ক্ষতি স্বীকার করতে হয় নি! *Leaves of Grass* যখন প্রথম প্রকাশিত হ'ল তখন আমেরিকা তার শ্রেষ্ঠ কবিকে কোন সম্মানই দান করে নি। এমার্সন প্রথম আবিষ্কার করলেন কবির অসামান্য প্রতিভাকে। সাহিত্যের ইতিহাসে যুগান্তর এনেছে যাদের লেখনী, তাদের অনেককেই প্রথম জীবনে সহ্য করতে হয়েছে দুঃসহ ক্ষতি আর লাঞ্ছনা। এর কারণ আছে। সমাজের দশের মতের যা প্রতিধ্বনি তাকে আইডিয়া বলা ঠিক নয়। আইডিয়ার মধ্যে থাকবে আগুনের শিখা যা জীর্ণকে পুড়িয়ে দিয়ে ঘটাবে নূতনের আবির্ভাব আইডিয়ার মধ্যে থাকবে কালবোশেখীর ঝড় যা পুরাতনকে ঝরিয়ে আনবে নববসন্তের গরিমা। যে আইডিয়া মিথ্যার আর অসুন্দরের বুকে ভীতির শিহরণ আনতে না পারে, যার আবির্ভাবে অত্যাচারী ডরিয়ে না ওঠে এবং ক্রীতদাসের বুকে আনন্দের শিহরণ না জাগে—সে ত অগ্নিস্ফুলিঙ্গ নয়, সে ত গতানুগতিকের ভস্মাবশেষ! প্রথম শ্রেণীর যারা ভাবুক, তাদের সাহিত্য এই আইডিয়ারই বাহন। বহুর মধ্যে যে একাকী, অরণ্যে যার রোদন, তারই কণ্ঠে বাজে অনাগত ভবিষ্যতের বিজয়শঙ্খ। ওয়াল্ট হুইটম্যানের কবিতায় এই নূতনের জয়ধ্বনি। নবযৌবনের অগ্রদূত তিনি। তাঁর সহচর যারা তাদের কটিদেশে পিস্তল আর কুঠার, তাদের দেহে অটুট স্বাস্থ্য আর মনে অসীম সাহস, তাদের চোখে বিদ্যুতের শিখা আর মুখে দৃঢ়তার ছাপ, আরাম আর গতানুগতিকতাকে তারা পশ্চাতে এসেছে ফেলে, তাদের সঙ্গে সঙ্গে ফেরে অনাহার আর দারিদ্র্য, শত্রুর ভ্রুকুটি আর মৃত্যুর ছায়া। নবজগতের এই নির্ভীক উদার কবিকে শ্রদ্ধা করতে শিখেছে যারা, তাদের সংখ্যা দিনে দিনে বেড়ে চলেছে, কারণ জগৎ অতিদ্রুত এগিয়ে চলেছে যে আদর্শের পানে সে আদর্শ সাম্যের আদর্শ, স্বাধীনতার আদর্শ, প্রেমের আদর্শ, মৈত্রীর আদর্শ, ঐক্যের আদর্শ। হুইটম্যানের মত আর কোন্ কবি এমন আবেগ-ভরা কণ্ঠে এই চিরজয়ী আদর্শের জয়গান গেয়েছেন?

ভেবেছিলাম এইখানে এসেই প্রবন্ধের উপসংহার করব। কিন্তু হুইটম্যানের কবিতার আসল বিষয়বস্তুটিই আমাদের আলোচনার বাহিরে থেকে গেছে। এই বিষয়বস্তুটি হ'ল মানুষ—সাধারণ পথের মানুষ। ফরাসী চিত্রশিল্পী দমিয়ের (Daumier) ছবির আলোচনা-প্রসঙ্গে সমালোচক লিখেছেন, He was content to possess the street and to conquer the future. ওয়াল্ট হুইটম্যানের সম্পর্কেও ঠিক এই কথা অসঙ্কোচে আমরা ব্যবহার করতে পারি। যাঁরা পণ্ডিত, যাঁরা ঐশ্বর্যশালী, যাঁরা আভিজাত্যগর্বে গর্বিত, যাঁরা পীরামীডের চূড়ায় আসীন,—হুইটম্যান তাঁদের কবি নন। পথের মানুষ যারা, যারা কাঠ কাটে আর হাল চষে, মাছ ধরে আর নৌকা বায়, শিকার করে

আর গাড়ী চালায়—সেই অশিক্ষিত, উপেক্ষিত জনসাধারণের কবি হলেন হুইটম্যান।

No shutter'd room or school can commune with me,
But roughs and little children better than they.

ঘরে বন্ধ থেকে অথবা ইস্কুলে পুঁথি প'ড়ে আমাকে বোঝা যাবে না। আমাকে বুঝতে পারে তারাই যাদের বলা হয়ে থাকে ছেলেমানুষ আর চাষাভুষো।

I am enamour'd of growing outdoors,
Of men that live among cattle or taste of the ocean or woods,
Of the builders and steerers of ships and the wielders of axes and mauls, and the drivers of horses,
I can eat and sleep with them week in week out.

আকাশের তলায় জীবন যাপনের একটি নিবিড় আকর্ষণ আছে আমার কাছে,
যারা রাখাল, যাদের মধ্যে পাই সাগরের অথবা অরণ্যের আস্বাদ,
যারা নৌকা বানায়, জাহাজ চালায়, কাঠ কাটে আর পাথর ভাঙে আর গাড়ী চালায় তারাই হ'ল আমার প্রিয়,
সপ্তাহের পর সপ্তাহ তাদের সঙ্গে আমি ঘুমোতে আর খেতে পারি কিছুমাত্র ক্লান্তি অনুভব না ক'রে।

এই ধরণের লাইন হুইটম্যানের লেখায় প্রচুর, আর এই সব লাইন পড়ে আমরা বুঝতে পারি, উপেক্ষিত অনাদৃত মহামানবকে কতখানি ভালবেসেছিলেন তিনি।

মানুষকে সত্যি সত্যি ভালবাসলে বিদ্রোহী না হয়ে উপায় নেই। হুইটম্যানের লেখার মধ্যে এই জন্যই বিদ্রোহের একটি প্রচণ্ড মনোহর সুরের অস্তিত্ব আমরা অনুভব করি। মানুষের দুঃখকে সমস্ত সত্তা দিয়ে অনুভব করেছিলেন তিনি অন্তরের শিরায় শিরায় আর এই জগদ্ব্যাপী দুঃখের মূলে দেখেছিলেন মানুষের প্রতি মানুষের অন্যায়। রাষ্ট্রের আর সমাজের নিষ্ঠুরতার বিরুদ্ধে তাঁর লেখনী তাই অক্লান্তভাবে অগ্নি উদ্গীরণ ক'রে চলেছে বিসুবিয়সের অগ্ন্যুৎপাতের মত। মনশ্চক্ষে তিনি দেখেছিলেন সেই অনাগত জগতের সুন্দর ছবি যেখানে মানুষ পেয়েছে সমস্ত শৃঙ্খল থেকে মুক্তি—man disenthrall'd—the conqueror at last. তিনি জানতেন মুক্ত মানুষের এই আনন্দময় জগৎ আসবে শান্তির পথে নয়, বীর্য্যের পথে—সংগ্রামের পথে, স্বাধীনতার পথে। তাঁর গানের মধ্যে তাই বেজে উঠেছে নটরাজের ডমরুধ্বনি। তাঁর আদর্শ নগরী হ'ল turbulent manly। সেখানে পুরুষ আর নারীরা সকলের আগে সাহসী—কোন প্রকার ঔদ্ধত্যকেই ক্ষমা করতে তারা প্রস্তুত নয়।

কিন্তু মনে রাখতে হবে—সব সময়ে মনে রাখতে হবে—হুইটম্যানের কবিতায় যে বিদ্রোহের সুর, তার মূলে প্রেম—যে প্রেমকে তিনি বলেছেন,

The dear love of man for his comrade, the attraction of friend to friend,
Of the well-married husband and wife, of children and parents,
Of city for city and land for land.

এই প্রেমের জগতকে সৃষ্টি করতে গিয়ে তিনি দেখেছিলেন—রাষ্ট্রের ঔদ্ধত্য, সমাজের নিষ্ঠুরতা নির্ম্মূল না হ'লে নূতন মানবতার জন্ম অসম্ভব। কবি হাতে তুলে নিলেন রুদ্রবীণা আর সে বীণায় যে দীপক রাগিণী তিনি বাজালেন তার প্রতিধ্বনি আজও শুনতে পাই সাত সাগরের তীরে তীরে। গণতন্ত্রের বিজয়-সঙ্গীত এমন ক'রে আর কারও বীণায় বাজে নি, মানুষের অন্তর্নিহিত গরিমাকে এমন ওজস্বিনী ভাষায় আর কেউ প্রকাশ করে নি। তাই বর্ত্তমান জগতের কবি বলতে হুইটম্যানের নামই সর্ব্বাগ্রে আমাদের মনে জাগে, এবং সেই জন্যই তাঁর ভক্তের সংখ্যা সোশ্যালিষ্টদের মত অতি দ্রুত বেড়ে চলেছে।



লক্ষ্মী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ মিত্র

লক্ষ্মীকে নিয়ে কিছুতেই আর পারা গেল না, ওকে এত ক'রে বলি, তুই আমাকে 'কাকা' বলে ডাক্‌বি, তা ও কিছুতেই শুন্‌বে না। ও আমার ছোট ভাই কান্তকে 'রাঙা কাকা' বলে, খুড়তুতো ভাই বাপ্পাকে বলে 'ছোট কাকা' কিন্তু আমাকে ডাক্‌বে 'ছেলে'। হয়ত বন্ধুদের সঙ্গে ব'সে গল্প করছি, ও ডাক্‌তে ডাক্‌তে এল, "ছেলে, ছেলে, ও ছেলে!" চটে গিয়ে ধমক দিয়ে বলি, "কি বাপু, ছেলে, ছেলে ক'রে ত মাথাটি খেলে, কি?" বন্ধুরা হেসে বলে, "ছেলে বললে তোমারই বা এত আপত্তি কেন পল্টু? যে মেয়েলী স্বভাব তোমার, তাতে মেয়ে ব'লে যে ডাকে না এই তোমার ভাগ্য।"

মা ওর সঙ্গে ঝগড়া করেন, "ঈস্, ছেলে বল্‌লেই হ'ল, ছেলে কার, তোর না আমার!"

লক্ষ্মীর এ সম্বন্ধে কোনই সংশয় নেই, অম্লান বদনে বলে, "আমার।"

"তোর? তুই পেটে ধরেছিস্ না কি? ছেলে যদি তোর হবে, কই তোকে ত মা বলে ডাকে না। মা ত আমাকেই বলে।"

ভাবি, লক্ষ্মী এইবার পরাজিত হ'ল, কিন্তু না, ও তৎক্ষণাৎ উত্তর দেয়, "আজ থেকে ছেলে তোমাকে আর মা বল্‌বে না, আমাকে বল্‌বে", পরে আমার হাত ধ'রে টেনে বলে, "ওকে মা বলে না, বিচ্ছিরি, জুজু, ভয়। আমাকে মা বলে, আমি কত চোন্দর।"

একে তো ছেলে বে-হাত হয়ে গেল, তার পরে আবার সৌন্দর্য্যের উপর কটাক্ষ! মা বলেন, "তুই আমার আর-জন্মের সতীন ছিলি, ছেলেও নিয়ে গেলি, আবার আমাকেও কুৎসিত বলিস্!"

বৌদি এদের ঝগড়া শুনে হেসে বলেন, "শুধু আর-জন্মের কেন মেজ খুড়ীমা, লক্ষ্মী আপনার এ জন্মেরও সতীন।"

বন্ধুরা মনস্তাত্ত্বিক গবেষণা করেন। 'মাতৃত্ব মেয়েদের সহজাত। প্রিয়া হয় তারা মা হবার জন্যই।' কিন্তু বিপদ আমার। ওর সামনে মাকে আমি মা ব'লে ডাক্‌তে পারব না। কি বলে ডাক্‌ব তাও লক্ষ্মী নিজে ঠিক ক'রে দিয়েছে। ডাক্‌তে হবে "জুজু বুড়ী" ব'লে, আর সব সময়ই লক্ষ্মীকে মা ব'লে ডাক্‌তে হবে। কোন সময় লক্ষ্মী বল্‌লে আর রক্ষা নেই।

শুধু কি এই! ও যতক্ষণ জেগে থাকবে আমাকে ওর কাছে কাছে থাকতে হবে। ও আমাকে চান করাবে তবে আমি চান করব। দুপুরে বৌদি ওকে ঘুম পাড়িয়ে না রাখলে আমি নদীতে গিয়ে চান ক'রে আসতে পারি নে, ভাতও খেতে পারি নে। ও আমাকে ওর খেলাঘরে ব'সে রান্না ক'রে দেয় ইঁদুরের মাটির ভাত, আমের পাতার মাছ, জলের সঙ্গে মাটি মিশিয়ে হয় ডাল, এই সব খেয়েই আমাকে ক্ষুন্নিবৃত্তি করতে হয়।

ছেলের এই যত্ন করা লক্ষ্মী মা'র কাছে শিখেছে একবার কি রকম ক'রে চোট লেগে আমার হাত দুটোতে ভয়ানক ব্যথা হ'ল। ঠাণ্ডা লেগে একটু সর্দ্দিজ্বরের মতও হ'ল। সবাই বিধান দিলেন, "ভাত বন্ধ।" আমি বিদ্রোহ করলাম। দয়া ক'রে চান না-হয় না-ই করব কিন্তু ভাত না খেয়ে থাকতে পারব না। গোপনে মা'র সঙ্গে সন্ধি করলাম অনেক বুঝিয়ে সুঝিয়ে, 'সর্দ্দিজ্বরে ভাত খেলে কিছু হয় না মা, আর ভাত যদি না দাও আমি তোমাদের সাগু বালি কিচ্ছু খাব না। একেবারে নির্জ্জলা উপবাস করব।' মা চান করতে দিলেন না। ঘটি ভ'রে ভ'রে জল নিয়ে মাথা ধুইয়ে দিলেন। খেতে ব'সে দেখি হাত দিয়ে ভাত খেতে পারি নে। মা বললেন, "কি আর করবি, আয় ছেলেবেলার মত আমিই না হয় খাইয়ে দি।"

চান করান, খাইয়ে দেওয়া, সব লক্ষ্মী কাছে ব'সে লক্ষ্য করলে। পরের দিনই আমার জ্বর সেরে গেল। হাতের ব্যথাও ক্রমে সেরে এল। কিন্তু লক্ষ্মীর কাছে জ্বর আমার কোন দিনই সারল না আর হাতের ব্যথাও ভাল হ'ল না, গায়ে হাত দিয়েই বলে, "উঃ গরম, আজ গাঙে যায় না। এস ছেলে তোমার মাথা ধুইয়ে দি।" ওর খেলবার ছোট্ট মাটির ঘটটায় ক'রে জল এনে এনে আমার মাথা ধুইয়ে দেয়. একদিন ত কানের মধ্যেই খানিকটা জল ঢেলে দিল। মহা মুস্কিল! ওর রান্না-করা অন্নব্যঞ্জন আমি নিজে হাত দিয়ে খেতে পারব না। বাঃ রে, আমার হাতে যে ব্যথা, আমি কি ক'রে খাব হাত দিয়ে? ও আমাকে নিজে খাইয়ে দেবে তবে হবে। ইঁদুরের মাটি হাতে ক'রে ও বলে, "সোনা, লক্ষ্মীছেলে হাঁ কর, হাঁ কর।"

মহা বিপদ! ওর ঐ পরমান্ন যদি হাঁ ক'রে গিলতে হয় তবেই হয়েছে! বন্ধুরা আমার পরম শত্রু। বলে, "একবার প্রাকৃটিস ক'রেই দেখ না, মাটি খেয়ে পেট ভরাতে শিখলে ভবিষ্যতে কোন দিন আর অন্নাভাব হবে না। শুনেছি কোন্ সাধু নাকি সাড়ে তিন-শ বছর বেঁচে ছিলেন শুধু মাটি খেয়ে।"

আমি বলি, "তোমরা তার চেয়েও দীর্ঘজীবী হবে তবে মাটি খেয়ে নয়, গাঁজা খেয়ে।"

আমাকে কাছে নিয়ে না শুলে ও কিছুতেই ঘুমবে না। কি দুপুরে কি রাত্রে আমাকে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে ও নিজে ঘুমিয়ে পড়ে।

বাড়ীর সবাই নিশ্চিন্তে মজা দেখে। লক্ষ্মীকে একটি মানুষ-পুতুল জুটিয়ে দিয়ে মাসে মাসে ওঁদের পুতুল-কেনার খরচ বেঁচে গেছে। তা ছাড়া ঝঞ্ঝাটও পোহাতে হয় না কিছু।

আমি মনে মনে বলি, "এ আর ক'দিন। আর দিন-পনরর মধ্যেই ত আমার স্কুল খুলবে, তখন এর মজা প্রত্যেকেই টের পাবে।"

সত্যি, লক্ষ্মীর আদর-যত্ন ক্রমশঃ এতই বেড়ে উঠতে লাগল যে আমি দিন গুনতে লাগলাম কবে আমাদের স্কুল খুলবে আর কবে পালাতে পারব। বাড়ীর আর সকলের কি, তাঁরা সব পরম আরামে, সকৌতুকে চেয়ে দেখছেন, লক্ষ্মীর ছেলেকে নিয়ে লক্ষ্মীর গৃহিণীপনা। শুধু আমারই প্রাণ রাখা কঠিন হয়ে পড়ছে।

বর্ষাকালে আমাকে ভাঙ্গায় থেকে পড়তে হ'ত। সদরদী থেকে ভাঙ্গা যেতে হ'লে বর্ষাকালে নৌকা ছাড়া কোন উপায় নেই। আমাদের গ্রাম থেকে ছাত্রদের নৌকা অবশ্য অনেকই যায়। কিন্তু সে-সব নৌকায় যেতে দিতে আমাদের বাড়ীর সবারই ভয়ানক আপত্তি। কখন ডুবেটুবে যাবে ঠিক কি! তাই আমি বর্ষার কয়েকটা মাস ভাঙ্গায় শ্যামাপদ বাবুর বাসায় থেকে স্কুলে যেতাম।

একদিন দুপুর বেলায় লক্ষ্মী তার ছেলেকে খাইয়ে-দাইয়ে ঘুম পাড়াতে পাড়াতে নিজে একটু ঘুমিয়ে নিচ্ছে, হঠাৎ লক্ষ্মীর ছেলের ঘুম ভেঙে গেল এবং বাড়ীর চাকরকে ডেকে বললে, "সতরঞ্চি, বিছানা আর বইয়ের বাক্‌সটা নৌকায় তোল, আমি জামাটা নিয়ে আসছি।"

আগে থেকেই সব প্রস্তুত ছিল। আর কার্ত্তিক দেউড়ীকে দিয়ে একটা বড় রকমের মাটির পুতুলও গড়িয়ে রাখা হয়েছিল আমার বদলী-স্বরূপ।

কান্ত একদিন ভাঙ্গায় হাট করতে এল। ওকে জিজ্ঞাসা করলাম, "লক্ষ্মী বুঝি খুব কেঁদেছিল সেদিন, না? আজকাল ওকি খুব কাঁদাকাটা করে আমার জন্য?" ও বললে, "সেদিন তোমরা হয়ত রাহাদের ঘাটও তখন ছাড়াও নি, ও পট্ ক'রে জেগে উঠল। একবার ডান পাশে হাত দিয়ে পরে বাঁ পাশে হাত বুলিয়ে গভীর বিস্ময়ে বললে, "বাঃ রে ছেলেটা গেল কোথায়!" আমি সেখানে দাঁড়িয়ে দাঁড়িয়ে ওর ভাবভঙ্গী দেখছিলাম, হঠাৎ আমার দিকে চেয়ে বললে, "দেখেছ রাঙা কাকা, ছেলেটা কি দুষ্টু, আমি একটু ঘুমিয়েছি অমনি উঠে পালিয়েছে; দেখি কোথায় গেল। রোদ্দুরে রোদ্দুরে শুধু ঘুরে বেড়াবে। এত দুষ্টু ছেলে!" আমি কোন রকমে হাসি চেপে বললাম, "না রে, ছেলে তোর খুবই শান্ত। মোটেই রৌদ্রে ঘুরে বেড়ায় না। দেখ্ গিয়ে দক্ষিণ ঘরের বারান্দার এক কোণে চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রয়েছে।" লক্ষ্মী তৎক্ষণাৎ ছুটে গেল। আমরা একটু শঙ্কিত হয়ে উঠলাম, হয়ত বা ফাঁকিটা ধরা পড়ে যায়। আর কেউ

সেখানে যেতে সাহস পেল না, আমি চুপি চুপি গিয়ে দেখলাম, না, আমাদের আশঙ্কা অমূলক। পুতুলটার সামনে দাঁড়িয়ে লক্ষ্মী বলছে, "দুষ্টু ছেলে, আমি একটু ঘুমিয়েছি অমনি উঠে পালিয়ে এসেছ!" মোটের উপর অধিকতর শান্ত ও সুন্দর ছেলে পেয়ে লক্ষ্মী খুশীই হয়েছে। ছেলের পিছনে ওকে আর ছোটাছুটি করতে হয় না। বারান্দার কোণটায় ব'সে ব'সে সাধ মিটিয়ে ও ছেলের আদরযত্ন করতে পারে।"

আমি বললাম, "দ্বিতীয় একলব্যের কাহিনী শুনছি ব'লে মনে হয়।"

কান্ত হেসে বললে, "আমাদের চাকলাদার ঠাকুরদাই বলেন ভাল, একটি পুতুলের পরিবর্তে লক্ষ্মী আর একটি পুতুল পেয়েছে। লক্ষ্মীর আপত্তি করবার তো কিছুই নেই, আর জান দাদা, লক্ষ্মী পুতুলটাকে শুধু ছেলেই বলে না, মাঝে মাঝে ডাকে পন্টু। দেখাদেখি বাড়ীর সকলেও পুতুলটিকে পন্টু ব'লে ডাকে।"

লক্ষ্মী তো শান্ত আর সুন্দর ছেলে পেয়ে ভুলে গেছে। কিন্তু মনে করি নি আমাকেও ভোলবার জন্যে প্রাণপণ চেষ্টা করতে হবে। কেশব বাবুর হোম-টাস্ক তৈরি করতে করতে বাড়ীর আর সকলের কথা মনে পড়বার আগে এমন কি মা'র কথাও মনে পড়বার আগে মনে পড়ে যায় আমার ছোট্ট মা-লক্ষ্মীর কথা। ওকে কিছুতেই ভুলতে পারি নে। ওর সঙ্গে 'ছেলে' 'ছেলে' খেলতে ভয়ানক উৎপাত ও বিরক্তি বোধ করেছি, অতীনবাবুর কঠিন প্রশ্নের অঙ্কগুলি কষতে কষতে আজ আবার ওর সেই খেলাঘরে ফিরে যেতে ইচ্ছা হয়।

এক শনিবার মনটা এতই বিশ্রী লাগতে লাগল যে বাড়ী না-গিয়ে থাকতে পারলাম না। কিন্তু গিয়ে দেখি বাড়ীতে না-আসাই ভাল ছিল। লক্ষ্মীর খেলাঘর থেকে আমি নির্ব্বাসিত হয়েছি, ওর মন থেকেও। আসল পন্টুর স্থান নকল পন্টু এমন ভাবে অধিকার করেছে যে লক্ষ্মী আমাকে যেন চিনতেই পারলে না। ভয়ানক ঈর্ষা করতে লাগলাম পুতুলটাকে।

কয়েকটা বছর পরে। ভাঙ্গা স্কুলের বেড়া ডিঙিয়ে কলেজে প্রবেশ করেছি বহুদিন, আর কয়েকটা মাস কাটলেই বি-এ ডিগ্রীটা লাভ ক'রে আপিসে আপিসে ঘুরে বেড়ান আরম্ভ করতে পারি। পূজার অবকাশে বাড়ী গেলাম ঠিক এই সময়টায়। কলেজের বন্ধুবান্ধব আর প্রোফেসাররা এতদিন লক্ষ্মীকে আড়াল ক'রে ছিলেন। আজ হঠাৎ ওর দিকে চেয়ে দেখি ওর পুতুলের বাক্স বহুদিন অন্তর্হিত হয়ে গেছে। তার স্থান অধিকার করেছে এম্পায়ার রীডার, কে. পি. বোসের এ্যালজেবরা, যাদববাবুর এ্যারিথমেটিক, সাহিত্য-চয়ন, সংস্কৃত-সোপান, এমনি আরও কত কি। ওর কথা-বার্ত্তায়, বেশেবাসে আধুনিকতা সুপরিস্ফুট। লক্ষ্মীকে ডেকে বললাম, "মা, এক গ্লাস জল নিয়ে আয় তো। খুব তেষ্টা পেয়েছে অনেক ক্ষণ ধ'রে।"

লক্ষ্মী যেতে যেতে বললে, "বুড়ো মানুষের মত কি সব সময় 'মা' 'মা' কর সোনা কাকা, আমার ভাল লাগে না। তোমার কথা শুনলে মনে হয় আমিও যেন মেজদির মত বুড়ী হয়ে গেছি। আমাকে লক্ষ্মী ব'লেই ডেকো। মা ত তোমার রয়েছেই, ওই বুড়ী মেজদি।"



ব্যায়ামচর্চ্চার সীমানা

শ্রীশচীন্দ্র মজুমদার

১

প্রত্যেক দেশের মানুষের সুস্থ ও সবল হবার অধিকার শুধু নয়, একান্ত প্রয়োজনও আছে। কারণ জনস্বাস্থ্য সমাজের একটি শ্রেষ্ঠ সম্পদ। যে-সমাজের মানুষ দেহের দিক দিয়ে যত দুর্ব্বল, সে-সমাজে যে শুধু রোগ-জরা-মৃত্যুর বাড়াবাড়ি থাকে তা নয়, সমাজ-মনের লক্ষ্যও ছোট ও রুগ্ন হয়ে যায়। জীবনের ভিত্তি এই রকম ঘুণ-ধরা হ'লে তার উৎকর্ষ যে কোন প্রকারেই হ'তে পারে না এ কথা স্বতঃসিদ্ধ। তাই শরীরপালন আদি সামাজিক ধর্ম্ম ব'লে নির্ণীত হয়েছে।

এই সামাজিক ধর্ম্ম পালন করার অনেক নিয়ম আছে, তার মধ্যে দৈনন্দিন স্বাস্থ্যরক্ষা করার নিয়ম ও আচারগুলি প্রধানতম। সেগুলি দেহের বল না বাড়ালেও স্বাস্থ্যলাভ সহজ ক'রে দেয়। ব্যায়ামচর্চ্চা করাও এই নিয়মের অন্তর্গত, কিন্তু শারীর-স্বাস্থ্য পালনের মোটা নিয়মগুলির মত অবশ্যকরণীয় নয়।

উন্নততম দেশেরও প্রত্যেক মানুষ ব্যায়ামচর্য্যাশীল নয়, কখনও তা হ'তেও পারে না। আমাদের দেশের সকল মানুষই যে উত্তরকালে ব্যায়ামানুরক্ত হয়ে উঠবে এ কথা মনে করা ভুল হবে, কারণ প্রত্যেক মানুষের আচার নিয়ন্ত্রিত করে তার মনের ভাব, সকল দেশে সকল সমাজেই তা হয়ে এসেছে। হাজার প্রয়োজন হ'লেও এই মানসিক নিয়মের ব্যতিক্রম সহজে ঘটতে পারে না। এই কথা যদি একান্ত সত্য হয় তাহলে বলা যেতে পারে যে কোন দেশেই স্বাস্থ্যচর্চ্চা ব্যাপকভাবে হ'তে পারে না, অথচ ইউরোপের ভিন্ন ভিন্ন দেশগুলিতে স্বাস্থ্যচর্চ্চা এমন কি বলচর্চ্চা ব্যাপকভাবে আছে, তার একটা বিশিষ্ট কারণও আছে। যে-দেশে ব্যক্তিগত ও সামাজিক স্বাধীনতা আছে, সে-দেশের মানুষের সকল প্রয়োজনীয় বস্তুর দাম নির্ণয় করার ক্ষমতা আমাদের চেয়ে বিভিন্ন। আমরা দাম কষে নিতে প্রথমতঃ সমর্থ নই, এবং যেখানে আমরা কোন বস্তুর দাম ঠিক ক'রে নিতে পারি সেটা গ্রহণ করবার ক্ষমতা অনেক ক্ষেত্রে সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় কারণে আমাদের নেই, কাজে কাজেই ইউরোপীয় জনগণের যে মানসিক ভাব সহজে গড়ে উঠতে পারে, আমাদের বেলায় তা হয় না। আমাদের জাতিগত স্বাস্থ্যহীনতার পারিপার্শ্বিক ও অন্য নানা অসুবিধার মত এটি একটি প্রধানতম কারণ। স্বাস্থ্য ও দৈহিক বল এক বস্তু নয়। একটি সঞ্চিত হ'লে অন্যটিও যে সঞ্চিত হবে এ কথা স্বাস্থ্যবিজ্ঞানবিরুদ্ধ। স্বাস্থ্য সম্পূর্ণরূপে আমাদের মানসিক ভাবের উপর নির্ভর করে। স্বাস্থ্য-সঞ্চয়ে মানসিক ভাব মুখ্য, ও নিয়মপালন করা গৌণ কথা। ইউরোপীয় জাতিগুলির প্রভূত স্বাস্থ্যের কারণ তাদের স্বাস্থ্যের মর্য্যাদাবোধ ও তজ্জনিত মানসিক ভাব। এই সুস্থ মনোভাব শ্বেতজাতিগুলির জীবনের লক্ষ্যের সঙ্গে ওতপ্রোতভাবে মিশে আছে। সংস্কারের তালিকায় এইটাই প্রথম ও প্রধানতম কথা।

বলচর্চ্চা করার নিয়মবদ্ধ ধারা ও সেই ধারানুবর্ত্তিতাও সকল দেশে আছে, কারণ দেশরক্ষা ও দেশজয় করার জন্য বলশালী, কর্ম্মঠ লোক দিয়ে সেনাবাহিনী গঠিত হয়ে থাকে। এই প্রধান কারণের জন্য ইউরোপীয় রাষ্ট্রপতিরা C3 মানুষের বিরুদ্ধে বিরাট অভিযান ক'রে থাকেন। উপরিউক্ত কথাগুলি রাজন্যশাসিত এবং গণতান্ত্রিক দেশ, উভয়ের পক্ষেই খাটে। মোট কথা, স্বাধীন দেশের লোকেদের সঞ্চারক্ষেত্র বৃহৎ, কাজেই রাষ্ট্র বলশালী ও সুস্থ জনসমাজ গড়ে নিতে ব্যগ্র। বৃহত্তর লক্ষ্য ও বৃহত্তমের কল্যাণের জন্য ব্যক্তিগত মতামত ওসকল দেশের লোক বলি দিয়ে থাকে।

সোভিয়েট রাশিয়ায় ৫,০০০,০০০ লোক শারীরিক পটুতার সরকারী তক্‌মা প'রে থাকে। নব্য জার্ম্মেনীতে

৭,০০০,০০০ নিপুণ ব্যায়ামী সরকারী তালিকাভুক্ত। নব্য ইতালী সংস্কার করবার সময়ে মন্দির প্রতিষ্ঠা করবার মত সারা দেশে ব্যায়ামাগার প্রতিষ্ঠা করেছিল।

সুস্থ শ্রমিক ধনীর বা কলকারখানার মালিকদের অন্যতম প্রধান বিত্ত। ফোর্ড-প্রমুখ ধনীদের প্রতিষ্ঠানে শ্রমিকদের স্বাস্থ্যকর ও চিত্তবিনোদনকারী প্রতিষ্ঠানের ব্যবস্থা আছে।

২

আমাদের দেশে জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলা বর্ত্তমান সময়ে সব চেয়ে বড় সামাজিক বা জাতীয় প্রয়োজন। যে-সব অন্তরায় বা যে-সকল অসুবিধা আছে এ স্থলে তার বিবৃতির কোন প্রয়োজন নেই, কারণ শিক্ষিত ব্যক্তি মাত্রেই সে-সব কথা জানেন।

আমাদের যুবক-সম্প্রদায়ের এক অংশের স্বাস্থ্য সঞ্চয় করবার উপযুক্ত মানসিক ভাব গ'ড়ে উঠেছে, এই ভাবটি নতুন। কিন্তু বৃহত্তর অংশটিতে এখনও পূর্ব্বের উদাসীনতা আছে। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানগুলিরও আজকাল কিছু উদ্যোগ দেখা যায়। আন্দোলনের যতটুকু বেসরকারী তাতে কিছু উৎকর্ষের চিহ্ন আছে, যতটুকু সরকারী তাতে উৎকর্ষ নেই।

প্রচলিত শিক্ষাপদ্ধতির যে-সব সমালোচনা হয়ে থাকে তার মধ্যে এইটাই প্রধান যে আমাদের শিক্ষার ধারার সঙ্গে জীবনের যোগ নেই, ব্যায়ামশিক্ষার বিষয়েও ঠিক সেই কথাটাই বলা চলে। মানসিক শিক্ষা শারীর শিক্ষার চেয়ে বড় জিনিষ, সেটার যেকালে আজকাল কোন মূল্য নেই, শারীর শিক্ষার মূল্য কি হ'তে পারে? এই কারণে দেশের চিন্তাশীল যুবকদের এতে মন নেই। আমাদের সমাজের কাছে সুস্থ দেহের কোন মূল্য নেই, রাষ্ট্র সুস্থদেহ-সম্পন্ন যুবকদের দেশরক্ষা করার কাজে লাগায় না। শ্রমিকেরা সুস্থ হ'লে কাজে পটুতা বাড়তে পারে বটে কিন্তু তাতে তাদের অর্থ বাড়ে না, কষ্টও ঘোচে না। কাজেই, স্বাস্থ্য-সম্পন্ন হ'লে আপাততঃ মাত্র দুটো সুবিধা হ'তে পারে; এক, জীবনযুদ্ধে যোগ দেবার জন্য অপেক্ষাকৃত বেশী বল পুঁজি করা, এবং দ্বিতীয়, জাতির স্বাস্থ্যের মাপকাঠিটাকে আরও একটু ভদ্র করা। এ ছাড়া আর কিছু দেখা যায় না। উদ্বৃত্ত শক্তি আমাদের কাজে লাগবার কথা নয়, কারণ আমাদের সঞ্চারক্ষেত্র অপরিসর, এবং কোথাও কোথাও সেই শক্তি বিঘ্ন ঘটিয়ে থাকে। একটা বস্তু থাকলেই তাকে ব্যবহার করতে হবে, দেশে লোকের স্বাস্থ্য গড়ে উঠলে জাতিকে সেটা কাজে লাগাতে হবে তার পূর্ণতম বিকাশের জন্য, তা না হ'লে সেটার অপচয় হয়ে লোপ পাবার সম্ভাবনা থাকে। বাংলা দেশের ইতিহাস বাঙালীর স্বাস্থ্যের বলাতে এই সাক্ষ্যই দেয়।

জীবন চার দিক দিয়ে খর্ব্ব হ'লে তার প্রথম প্রভাব পড়ে স্বাস্থ্যের ওপর। ধর্ম্মের গোঁড়ামি, শিক্ষার গোঁড়ামি এবং ধারানিবদ্ধ (organised) আমোদ-প্রমোদ আমাদের স্বাস্থ্যহীনতার মূলগত কারণ। পারিপার্শ্বিক হয়ত বদলানো যায়, বাহিরের নিবার্য্য যা-কিছু মন দিলে তা নিবারণ করা যায়, কিন্তু অন্তরের দারিদ্র্য ও রোগ নিবারণ করা যায় না। সভ্যতার এই যুগে সুখ ও আনন্দ কোথাও স্বতঃস্ফূর্ত্ত নয়, আমাদের ত নয়ই। মন আমাদের একান্ত আবশ্যক যা তা আহরণ করাতেই ব্যাপৃত ও ক্লান্ত, অবান্তর যা, তা সংগ্রহ করবার প্রেরণা আসবে কোথা থেকে?

৩

নিজের দেহ গড়া অত্যন্ত সোজা, অপরের দেহ গড়াও অপেক্ষাকৃত সহজ যদি গোটাকয়েক বস্তুর সমন্বয় ক'রে নেবার ক্ষমতা থাকে। আশাবাদী মানুষের স্বাস্থ্য ও বল সহজেই গ'ড়ে ওঠে, নিরাশাবাদীদের হাজার চেষ্টাতেও হয় না। মনের গড়ন দেহের গড়নের সঙ্গে সম্পর্ক রাখে। কিন্তু দেহগঠন করাই কি সামাজিক মানবের জীবনের শ্রেষ্ঠতম কথা? দেশের চিন্তাশীল ব্যক্তিরা শুধু এই কথাটাই জানেন যে যে-কোন উপায়েই হোক জনস্বাস্থ্য গড়ে তোলা দরকার, কিন্তু স্বাস্থ্যের এই লক্ষ্যের সীমানা কোথায়, তার দোষই বা কি এ কথা তাঁদের জানা নেই। আমি সেইগুলি নির্ণয় করব। আমার বিশ্বাস এই সীমানা নির্দ্দেশ করার প্রয়োজন আছে; কারণ বাংলা দেশের ব্যায়ামান্দোলনের এখনও শৈশব অতিক্রান্ত হয় নি, বিবেচক ব্যক্তিরা সাবধান হ'তে পারবেন।

ইউরোপের যাঁরা ব্যাপক ব্যায়ামচর্চ্চার বিরুদ্ধতা করেন

তাঁদের মত এই যে জনকয়েক গরজী ধনী ও রাষ্ট্রপতিরা নিজেদের বা একটা ক্ষুদ্র সমষ্টির সুবিধার জন্য মানুষকে তৈরি করেন কামানের খোরাক ক'রে, দেশের প্রতি বিশেষ কোন মমতার কারণে নয়।

গ্রীক-যুগে ব্যায়ামচর্চ্চার যে দোষ পরিলক্ষিত হয়েছিল সেটা যৌন। দোষ হ'লেও তাতে জাতিগত কোন ক্ষতি হয় নি কিন্তু ব্যক্তিগত ক্ষতি হ'ত প্রচুর।

যূথবদ্ধ সবল মানুষের শক্তি অন্যান্য শক্তির সঙ্গে মিলিত হয়ে প্রসারলাভ করতে যায়। মুসোলিনীর ব্যায়ামসংস্কারের সহিত আবিসীনিয়া গ্রাস করার যোগ আছে।

আমাদের দেশে অনেক স্থানে ব্যায়ামচর্চ্চার ও খেলা-ধুলার সরকারী ব্যবস্থা আছে। ব্যবস্থা প্রয়োজনানুরূপ কি না, এ ক্ষেত্রে সে-আলোচনা অবান্তর। এক দিকে সংঘবদ্ধ খেলার অনেক সামাজিক গুণ আছে, অন্য দিকে ক্রীড়পরায়ণ মন জীবনের গভীর সমস্যাগুলি অগ্রাহ্য না করলেও, উপলব্ধি করতে শেখে না। ক্রীড়াপরায়ণ মানুষ বিশেষ ক'রে রাজনীতি প্রভৃতি গভীর বিষয়ের সঙ্গে নিজের যোগস্থাপন করতে সমর্থ হয় না। আধুনিক জগতে জনসাধারণকে রাজনীতি থেকে দূরে রাখবার জন্য খেলা ব্যাপকভাবে ছড়ানো হচ্ছে। (কেপ টাউন বিশ্ববিদ্যালয়ে জর্জ্জ বার্ণার্ড শ'র অভিভাষণ দ্রষ্টব্য)। যেখানে শুধু ব্যায়াম ও খেলা আছে, গভীর কোন বিষয়ের, অর্থাৎ রাজনীতি, সমাজনীতি, সাহিত্য, চারুকলা প্রভৃতির অনুশীলন নেই, সেখানে মানুষ জীবন থেকে বিযুক্ত হয়ে পড়ে এবং লঘুচিত্ত হয়ে যায়।

ব্যায়াম যেখানে পেশা ব'লে গ্রাহ্য, সেখানেও আনুষঙ্গিক বৈজ্ঞানিক বা গভীর বিষয়ের চর্চ্চার সুযোগ আছে। অন্যথা কেবলমাত্র শারীরিক বল সংগ্রহ করা মানুষকে এক বলবান পশুর পর্য্যায়ভুক্ত করে এবং সমাজে অপাংক্তেয় ক'রে রাখে।

বাংলা দেশের চিন্তাশীল যুবক-সম্প্রদায় এই সকল কারণের জন্য ব্যায়ামান্দোলন থেকে দূরে থাকেন। রাজবন্দীদের বিষয়ে কর্ণেল বার্কলে হিল যে বিশ্লেষণ করেছিলেন, তাতে খেলা বা ব্যায়ামের দ্বারা চিত্তবিনোদন করেন এমন বন্দীর সংখ্যা নাম-মাত্র ছিল। সংবাদপত্রে এ কথাও আমরা পড়েছি যে, যেখানে ব্যায়ামচর্চ্চার সঙ্গে গভীর কোন বিষয়ের যোগস্থাপন করবার চেষ্টা হয়েছে, সেখানেই রাজনীতির চর্চ্চা এসে পড়েছে।

বৈজ্ঞানিক নিরিখে বাংলা দেশের ব্যায়ামচর্চ্চা দোষমুক্ত নয়, এ কথা সাধারণভাবে বলা যায়; দোষের যথেষ্ট বাহুল্য আছে। কিন্তু সে কথা বলা বর্ত্তমান প্রবন্ধের লক্ষ্য নয়। যুবক-মনের নানা প্রেরণা সকল দেশে আছে, বাঙালী যুবকেরও তা আছে। কিন্তু বিকাশের পথ আমাদের সুলভ বা সুগম নয়। আমাদের ব্যায়ামচর্চ্চা সাইকো-অ্যানালিসিসের ভাষায় একটা escape বা নিঃসরণপথ ছাড়া আর কিছু নয়। সাধারণ মননশক্তিবিহীন মানুষের অন্তরের প্রেরণার বিকাশ লাভের এটি সহজতম উপায়। এই কারণে অন্য কিছু করতে পেলে, অথবা অন্নচিন্তা উপস্থিত হ'লে ব্যায়ামের অভ্যাস ঝরে পড়া নিত্যকার ঘটনা।

কলিকাতায় ব্যায়ামশিক্ষা দিয়ে অল্প কিছু উপার্জ্জন করার সুযোগ আছে; ব্যায়ামচর্চ্চার এটিও একটি কারণ। বস্তুতপক্ষে এই উপার্জ্জনের মূল্য অত্যন্ত কম। এতে পরগাছাবৃত্তি বাড়ে।

যতগুলি ব্যায়াম-প্রতিষ্ঠান আমি দেখেছি, তাতে জীবনের বৃহত্তর সমস্যাগুলির সঙ্গে অথবা জাতীয় সংস্কৃতির সঙ্গে যোগসাধন করবার প্রয়াস দেখা যায় না। কোথাও কোথাও ব্যক্তিগত ব্যতিক্রম দেখা যায় মাত্র, এবং এই সকল ব্যক্তির সংখ্যাও বাস্তবিকই অত্যন্ত অল্প। কাজেই এই ভিত্তিহীন ও জীবনরসবঞ্চিত আন্দোলনকে স্থায়ী করা অত্যন্ত কঠিন কথা। বিদেশে অবস্থা অনুকূল; দেশের আভ্যন্তরিক শান্তিরক্ষার জন্য পুলিসবাহিনী ও সেনাবাহিনীর স্থায়িত্বের সঙ্গে এই আন্দোলনের যোগ আছে, সুস্থ কর্ম্মঠ ব্যক্তিদিগকে এই বাহিনীভুক্ত করার প্রয়োজনও চিরদিন আছে; আমাদের অনুরূপ কোন সুযোগ নেই, আন্দোলনটিকে বাঁচিয়ে রাখার উত্তেজনাও চিরদিন থাকবার কথা নয়।

অন্য দেশের অভিজ্ঞতায় যে দোষগুলি পরিস্ফুট হয়ে উঠেছে, আমাদের নব-আন্দোলনটিকে দোষমুক্ত করবার জন্য সেইগুলির আলোচনা করবার প্রয়োজন আছে। আমাদের বেলায় আন্দোলনটি রাষ্ট্রীয় কোন আকার নেবে না, এটি নিছক সামাজিক আন্দোলন হয়ে দাঁড়াবে বা হওয়া উচিত। এই দিক্ দিয়ে স্বাস্থ্যের অথবা দৈহিক বলের মূল্য কোন দিনই

কম হবে না। শুধু আন্দোলনের নেতাদের এইটুকু করা দরকার, যাতে ব্যায়ামের গুণগুলি স্ফূর্ত্তিলাভ করে। মানসিক ও দৈহিক উৎকর্ষের সমতা রক্ষিত হ'লেই আমাদের লক্ষ্য সাধিত হবে।

যে খেলা সাময়িক, সেটা চরিত্রের উপর দাগ দেয় না; যা সাধনাসাপেক্ষ, চরিত্রের সঙ্গে তার যোগ গভীর। সার্কাসী ব্যায়াম সাধনাসাপেক্ষ বটে, কিন্তু লঘুতা-দোষে দুষ্ট; এই ধরণের সাধনা মানুষকে লঘুচিত্ত করে। বাংলা দেশের ব্যায়ামে এই বিপদটাই সব চেয়ে বেশী।

খেলা ও ব্যায়ামের নামে বাঙালী মেয়েদের সর্ব্বনাশের সূচনা হয়েছে। মেয়েদের শারীর শিক্ষা দিতে হ'লে অত্যন্ত গভীর বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের প্রয়োজন আছে। ইউরোপীয় মেয়েদের খেলাধুলায় যোগ দেবার কারণে আমাদের দেশেও এই ধুয়া উঠেছে। আমরা ইউরোপীয় মেয়েদের জীবনের আমূল পরিবর্ত্তনের কথা না ধরে উল্টো পথে তাদের চলাটা সত্য ও কল্যাণকর ব'লে মেনে নিয়েছি। এ-বিষয়ে খুব সাবধান হবার প্রয়োজন আছে।

বিধবা

শ্রীজগদীশচন্দ্র ঘোষ

আজ নন্দরাণীর বিবাহ। শেষরাত্রে বিবাহের লগ্ন। নন্দরাণী সন্ধ্যাবেলায় মাকে বলিল, "মা, আমি যদি ঘুমিয়ে পড়ি তবে ডেকে দিও, আমি কিন্তু বিয়ে দেখব।"

মা হাসিয়া বলিলেন, "মর পোড়াকপালী, তোর বিয়ে, তুই দেখবি না?"

এক জন প্রতিবেশিনী বলিয়া উঠিল, "আজকের দিনে পোড়াকপালী বলতে নেই নন্দর মা!"

নন্দর মা রাগ করিয়া বলিল, "তোমার সব তাতেই খুঁত ধরা চাই বাছা!"

বলা বাহুল্য, নন্দরাণীর বয়স সবে সাত বৎসর! পঞ্চত্রিশ বৎসর বয়সের চিররুগ্ন শ্রীনাথ বিশ্বাস তাহাকে দুই শত টাকায় কিনিয়া লইতেছে। নির্ব্বিঘ্নে বিবাহ হইয়া গেল—নন্দরাণীও যথারীতি গেল তাহার স্বামীর ঘর করিতে।

* * *

দশ বৎসর পরের কথা। নন্দর ভাই চৈতন্য রান্নাঘরে বসিয়া চাট্টি ভাতে ভাত সিদ্ধ করিয়া লইতেছিল। এমন সময় তাহার এক দেবরকে সঙ্গে করিয়া ভরা যৌবনের পরিপূর্ণ রূপ লইয়া বিধবা নন্দ আসিয়া দাঁড়াইল তাহার উঠানে।

নন্দ চৈতন্যের পায়ের ধূলা লইতেই চৈতন্য একেবারে দুই চোখের জল ছাড়িয়া দিয়া কাঁদিয়া বলিল, "শেষকালে তোর কপালে এই হ'ল নন্দ?"

নন্দ কিন্তু বড়-একটা বিচলিত হইল না। দাদাকে ঠাণ্ডা করিয়া বলিল, "এ নিয়ে কান্নাকাটা ক'রে লাভ কি দাদা, বিধাতার ওপরে ত কারু হাত নেই! তবে এইটুকুই আমার ভাগ্যি যে, বিয়ের পরে সেই ভাঙা শরীর নিয়েও তিনি দশটা বছর কাটিয়ে গেলেন।"

চৈতন্য চোখ মুছিয়া বলিল, "লাভ কিছু নেই বোন, তা জানি, কিন্তু তোর এই মূর্ত্তি আমি দেখব কেমন ক'রে?"

—কিন্তু দাদা, ও কষ্টটা তোমাকে করতেই হবে—আমি আর শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাব না—সেখানকার সকল সম্পর্ক একেবারে চুকিয়ে এসেছি।"

—তা বোন বেশ করেছিস্। থাক্—আমার এখানেই থাক্।

—কিন্তু বউ কোথায় দাদা?

—তারা ত এখানে নেই রে—সব বাপের বাড়ী গিয়েছে।

—ওঃ এই মাসেই বুঝি ছেলেপিলে হবে?

—হ্যাঁ।

নন্দ চৈতন্যের সংসারে রহিয়া গেল। চৈতন্যের বউ

তিন বছরের ছেলে গৌরকে লইয়া বাপের-বাড়ী গিয়াছে—তাই বাড়ীটাও করিতেছিল খাঁ খাঁ। নন্দ আসিয়া পড়ায় চৈতন্য যেন কতকটা হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

২

চৈতন্য বরাবরই নন্দকে বড় ভালবাসিত। এতটুকু বয়সে নন্দর যে সংসারের সকল সাধ-আহ্লাদ শেষ হইয়া গেল, ইহা তাহার মনে বড় বিঁধিত। তাই যাহাতে নন্দ একটু সুখে থাকে, মনে কখনও কোন কষ্ট না পায়—সে চেষ্টা সে করিত।

সেদিন খাইতে বসিয়া চৈতন্য বাটির মাছগুলা কেবল নাড়াচাড়া করিয়া রাখিয়া উঠিয়া বলিল, "আজ তুই আমার পাতে খাবি নন্দ।"

নন্দ অবাক হইয়া বলিল, "সে কেমন ক'রে হবে দাদা? মাছের পাতে খাব কেমন ক'রে?"

—যেমন ক'রে খায়।

—না দাদা, তোমার পায়ে পড়ি—সে হবে না। মানুষে শুনলে কি বলবে?

—মানুষে কি বলবে? এই ত? তা বললেই বা। অন্যায় ত কিছু কচ্ছিস নে যে মানুষের কথায় ভয়।

—অন্যায় নয় তাই বা কে বলতে পারে? শাস্ত্রের নিষেধ। দোষ না থাকলে কি শাস্ত্রে নিষেধ করে, আর তাই দেশের লোক মানে? বামুন-কায়েতের বিধবাদের দেখ ত?

—তুই থাম নন্দ, তর্ক করিস নে। আমি তোর শাস্ত্রের কথা জানি নে, কিন্তু আমার চোখের ওপরে তুই দুটো আতপ চাল আর ঘাস সেদ্ধ ক'রে খাবি, আর আমি খাব দুধে মাছে—সে কখনও হবে না নন্দ, সে আমি সইতে পারব না। শাস্ত্র নিষেধ করতে পারে, কিন্তু আমার মত ভাইয়ের কাছে শাস্ত্র কি জবাব দেবে? কচি বিধবা বোনকে আতপ চাল খাইয়ে রেখে যে ভাই নিজে রুই মাছের মুড়ো নিয়ে খেতে বসতে পারে, সে দুনিয়ার সব পারে রে—তার মত পাষণ্ড নেই।

বলিতে বলিতে চৈতন্য কাঁদিয়া ফেলিল। নন্দ তবুও ধরা গলায় বলিল, "কিন্তু দাদা—"

—না আর কিন্তু নয়—তুই খেতে ব'স নন্দ, আমি দেখি।

দাদার প্রসাদ নন্দ দেবতার প্রসাদের মত খাইল। তাহার দেবতার মত দাদা—এমন দাদা কয় জনের হয়!

চৈতন্যের স্ত্রীর নাম নৃত্যকালী। চৈতন্যের স্বভাবটা যেমন নরম, নৃত্যকালীর মেজাজটা তেমনি একটু চড়া। তার উপরে নৃত্যকালীর বাবা শ-তিনেক টাকা দিয়া বছর-পাঁচেক আগে চৈতন্যকে একটা দোকান করিয়া দিয়াছেন, তাহাই খাটাইয়া চৈতন্য তাহার অবস্থাটা একরূপ ভালই করিয়া লইয়াছে। নৃত্যকালীর সেইটুকুই গর্ব্ব। তাহার বাপ যদি টাকা না দিত তাহা হইলে চৈতন্যকে যে আজ স্ত্রীপুত্রের হাত ধরিয়া পথে দাঁড়াইতে হইত—সেটা একেবারে নিশ্চিত; নৃত্যকালী ফাঁক পাইলে সময়ে-অসময়ে এ-কথাটি শুনাইয়া দিতে কখনও ভোলে না। কিন্তু চৈতন্যের সহজে কখনও ধৈর্য্যচ্যুতি হয় না, সে সহজ ভাবে ব্যাপারটা স্বীকার করিয়া লয়—ইহাই তাহার স্বভাব।

৩

তিন মাস পরে নৃত্যকালী কোলের মেয়ে ও গৌরকে লইয়া ফিরিয়া আসিয়া দেখিল, তাহার ঘরদোরে নন্দরাণী দিব্যি সংসার পাতিয়া বসিয়া আছে। এখানে সে যেন বরাবরই আছে, এমনই ভাব। নৃত্যকালী সেজন্য মনে কিছু করিল না—ভাবিল নন্দ দু-দিনের জন্য আসিয়াছে আবার দু-দিন বাদেই চলিয়া যাইবে। বরং তাহার অনুপস্থিতিতে সে থাকায় চৈতন্যের যে সুবিধা হইয়াছে তাই ভাবিয়া কতকটা সন্তুষ্টই হইল।

এদিকে মাস দুই পরেও যখন নন্দ যাইবার নাম করিল না, তখন নৃত্যকালী একদিন নন্দকে বলিল, "তোমার শ্বশুর-বাড়ীর লোকগুলার আক্কেল কেমন গা ঠাকুরঝি। আজ পাঁচ-ছয় মাস তুমি এসেছ—লোকটা ম'লো কি রইল একটা খোঁজ পর্য্যন্ত নিলে না? নিজেদের বৌ পরের বাড়ীতে এমনি ক'রে ফেলে রাখতে তাদের লজ্জা হয় না?"

নন্দ জবাব করিল, "তুমি হয়ত জান না বউ—খোঁজ তারা আর করবে না ব'লেই তো এখানে পাঠিয়েছে। আর আমিও ফিরে যাব না বলেই তো এসেছি। কিন্তু তুমি পরের বাড়ী বলছ কি বউ? আপনার ভাইয়ের বাড়ী কি পরের বাড়ী হ'ল?"

—না পর সত্যি নয়—তবে শ্বশুরবাড়ীর কাছে পর বইকি? সে যাই হোক—তুমি আমায় অবাক করলে ঠাকুরঝি—আর শ্বশুরবাড়ী ফিরে যাবে না! লোকে বলে—শ্বশুরের ভিটে মহা তেথ।

—আমার তেথে কাজ নেই বউ। যেখানে আপনার জন নেই—একটু সুখ-দুঃখ বোঝে এমন কেউ নেই—সেখানে যাব কোন্ সুখে? তারা আমায় ফেলতে পারে কিন্তু দাদা তো আর আমায় ফেলতে পারবে না।"

নৃত্যকালী আর কিছুই বলিল না—মুখ গম্ভীর করিয়া বসিয়া রহিল। নন্দ আর ফিরিয়া যাইবে না;—বলে কি? সেই তো একটুখানি দোকান, তাহার উপরেই সংসারের সব-কিছু নির্ভর। এই স্বল্প আয়ের উপরে নির্ভর করিয়া আবার একটা আপদ চিরকাল এই সংসারে ঢুকাইয়া রাখিতে চৈতন্য সাহস করে কেমন করিয়া?

ভাবিতে ভাবিতে চৈতন্যের উপরে তাহার অপরিসীম রাগ হইতে লাগিল। ঠিক করিল আজ বাড়ী আসিলে এজন্য ভাল করিয়া শুনাইয়া দিবে।

নন্দ তবু রহিয়াই গেল। নৃত্যকালীর আর আজকাল সঙ্কোচ নাই—প্রায়ই সংসারের কাজকর্ম্ম লইয়া খিটিমিটি করে—মুখের উপরে দুই-এক কথা শুনাইয়া দিতেও ছাড়ে না। নৃত্যকালী ভাবে, চিরটা কাল তাহার খাইয়া পরিয়া মানুষ হইবে—কাজকর্ম্মে ভুলচুক হইলে একটু-আধটু কথাও সহ্য করিবে না—এই বা কেমন! কিন্তু নন্দ সে-সব মুখ বুজিয়া অনায়াসেই সহ্য করে—এ-সব তাহার পাওনা বলিয়াই গ্রহণ করিয়া লয়। মাঝে মাঝে যদি নিতান্ত অসহ্য হয়, তবে দুই-এক বিন্দু চোখের জল হয়ত ফেলে—তাও আড়ালে লুকাইয়া।

সারাটা দিনের মাঝে নন্দ পথ চাহিয়া থাকে কখন চৈতন্য দোকান হইতে বাড়ী আসিবে। সেই সময়টা সে অন্ততঃ কিছু সুখে থাকে। তাহার দাদার কথা শুনিলে, মুখ পানে চাহিলে—সে সকল দুঃখ কষ্ট ভুলিয়া যায়।

নন্দ কাছে না বসিলে আজকাল চৈতন্যের ভাল করিয়া খাওয়া হয় না—তাহার সহিত অবসর সময়ে একটু কথাবার্ত্তা না বলিলে মনটা ভাল থাকে না। এজন্যও আবার নৃত্যকালীর নিকটে নন্দর কথা শুনিতে হয়।

নন্দর আজকাল আর একটা কাজ বাড়িয়াছে। গৌরটা তাহার বড় বাধ্য হইয়া পড়িয়াছে। নন্দকে সে বলে ছোটমা। এই ছোটমায়ের সঙ্গ পাইলে সে মায়ের কাছ দিয়াও ঘেঁষিতে চাহে না। তাহার খাওয়ান, ঘুম পাড়ান সকল কাজ নন্দকেই করিতে হয়। প্রথম প্রথম নৃত্যকালী গৌরকে আপনার কাছে টানিয়া রাখিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু গৌরের সহিত সে পারিয়া উঠে নাই—তাহার ছোটমা না হইলে এক দণ্ডও চলিবার উপায় নাই। দেখিয়া শুনিয়া নৃত্যকালী হাল ছাড়িয়া দিয়াছে।

চৈতন্য বলে, "নন্দ, গৌরকে তোকেই দিলাম রে।"

—ইস্ আমার ভারী দায়! তোমার ছেলে কি আমায় রোজগার ক'রে খাওয়াবে?

নিকটে দণ্ডায়মান গৌরকে চৈতন্য হাসিতে হাসিতে প্রশ্ন করে, "হাঁরে গৌর, তোর ছোটমাকে রোজগার ক'রে খাওয়াবি তো?"

গৌর তাহার ছোটমাকে জড়াইয়া ধরিয়া বলে, "আমি তোমায় রোজগার ক'রে খাওয়াব ছোতমা।"

নন্দ তাহাকে কোলে তুলিয়া লইয়া চুমুতে চুমুতে সারা মুখ ভরিয়া দেয়।

নন্দই বরাবর রান্না করে। কোন কোন দিন নৃত্যকালী আসিয়া স্বামীর পরিবেশন করিয়া যায়। সেদিন রাত্রে নৃত্যকালী পরিবেশন করিতেছিল। খাওয়া শেষে চৈতন্য নন্দকে ডাকিয়া বলিল, "মাছের মাথাটা রইল নন্দ — দেখিস, বেড়ালে খাবে—তুই খাস।"

নন্দ বাধা দিয়া বলিল, "না-না উঠো না দাদা, এত বড় রুই মাছের মাথাটা একটুও খেলে না তুমি? আমি ও ছাই মুখে তুলবো না তা ব'লে দিচ্ছি।"

চৈতন্য কথা বলিল না—উঠিয়াই গেল। নৃত্যকালী ব্যাপার দেখিয়া রাগে গুম্ হইয়া ছিল। মুখে একটিও কথা না বলিয়া ঘরে যে মাছগুলি ছিল প্রায় সবগুলাই চৈতন্যের উচ্ছিষ্ট পাতে ঢালিয়া দিয়া বলিল, "নাও ভাবছ কি ঠাকুরঝি, খেতে বসো—ও মাথাটুকু আর খেতে পারবে না!"

কিন্তু একটু পরেই বড় ঘর হইতে চেঁচাইয়া বলিতে লাগিল, "এমন তো দেখি নি বাপু কোনকালে! লজ্জাও কি নেই? এদিকে তো বিধবা মানুষ, বি

মাছ খাওয়ার বেলায় তিন হাত জিব। ছোটলোক আর বলে কাকে!"

কথাগুলি আত্মগত হইলেও বাড়ীর সকলেই শুনিতে পাইল। নন্দ পাতে বসিয়া ভাত লইয়া নাড়াচাড়া করিল—দুই চোখের জলে দৃষ্টি অন্ধকার হইয়া আসিল—একটা ভাতও মুখে গেল না। রাত্রে অভুক্ত নন্দ গৌরকে কোলে লইয়া সারারাত কাঁদিয়া কাটাইল। এ-বাড়ীতে আসার পর অনেক অপ্রিয় কথা সে শুনিয়াছে—সহ্যও করিয়াছে—কিন্তু এত বড় মর্ম্মান্তিক তাহার একটিও হয় নাই। হায় রে সংসার! এখানে এমন একটু ঠাঁইও কি তাহার নাই, যেখানে একটু সুখে স্বচ্ছন্দে সে তাহার জীবনটা কাটাইয়া দিতে পারে!

ব্যাপার আর বেশী দূর গড়াইল না বটে, কিন্তু পরের দিন হইতেই নন্দ মাছ ছাড়িয়া দিল। চৈতন্য এবার এজন্য পীড়াপীড়ি তো দূরের কথা—এ সম্বন্ধে আর একটি কথাও বলিল না।

চৈতন্যের বাপ-পিতামহ পরম বৈষ্ণব ছিলেন। তাঁহাদের গুরুবংশও পরম বৈষ্ণব। চৈতন্য নিজেও প্রত্যহ পূজা-আহ্নিক না করিয়া আহার করিত না। দিন-পনর পরে চৈতন্য এক দিন খবর দিয়া তাহার গুরুদেবকে আনিয়া হাজির করাইল। এবার সে দীক্ষা লইবে। যথারীতি দীক্ষা হইয়া গেল। গুরুদেব বিদায় লইয়া গেলেন। এদিকে চৈতন্য কিন্তু দীক্ষার দিন হইতেই মাছ খাওয়া ছাড়িয়া দিল। ব্যাপারটিকে ছল করিয়াই চৈতন্য ঢাকিতে চাহিয়াছিল, কিন্তু কাহারও বুঝিতে বাকী রহিল না যে ইহার মূল সেই দিনের ঘটনা—যাহার ফলে নন্দ মাছ ছাড়িয়াছে।

নৃত্যকালী সাধ্যমত চেঁচামেচি করিতে লাগিল কিন্তু চৈতন্য কিছুতেই টলিল না।

নন্দর কাজ আবার বাড়িল—নিজের জন্য যা হোক চাট্টি সিদ্ধ করিয়া লইলেই হইত, কিন্তু চৈতন্য আসিয়া তাহার হেঁসেলে ভর্ত্তি হইল—কাজেই অন্ততঃ একটা ডাল তরকারি রোজ তাহাকে করিতেই হইত।

কিন্তু ইহার ফল এই হইল যে, ইহার জন্য নৃত্যকালীর নিকটে তাহার গঞ্জনা বাড়িয়াই গেল। নৃত্যকালী এবার ঠিক বুঝিয়া লইয়াছিল যে, নন্দ যদি আরও কিছুদিন এ-সংসারে থাকে তবে স্বামী তাহার একেবারে আয়ত্তের বাহিরে চলিয়া যাইবে। সুতরাং বিষবৃক্ষ আর বাড়তে দেওয়া উচিত নয়!

৪

তিন বৎসর পরে নৃত্যকালীর আবার সন্তান হইবে—তাই মাস-তিনেক পূর্ব্ব হইতেই সে বাপের বাড়ী যাই-যাই করিতেছিল। কাজেই তাহার সঙ্কল্প আপাততঃ স্থগিত রাখিতে বাধ্য হইল। স্থির করিল বাপের বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া নন্দকে তাড়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। এদিকে হঠাৎ একদিন নন্দর ভাসুর আসিয়া হাজির। নন্দকে তিনি লইয়া যাইবার জন্য আসিয়াছেন।

কিছু দিন হইতে তাঁহার স্ত্রী নানা অসুখ-বিসুখে একেবারে অচল হইয়া আছেন—সংসারেও আর লোক নাই; এদিকে তিন চারটি ছেলে মেয়ে—তাহাদের তদারক করে এমন মানুষ নাই, কাজেই নন্দকে অন্ততঃ দু-চার মাসের জন্য একবার যাইতেই হইবে।

নন্দ জানিত বড়-জে'র দু-চার মাসের বেশী সে সেখানে কিছুতেই থাকিতে পারিবে না এটা ঠিক। কারণ তাহার প্রয়োজন যখনই শেষ হইবে, তখনই কোন-না-কোন অছিলা করিয়া তাহারা তাহাকে তাড়াইবেই। আর না-হয় ঝাঁটা-লাথি খাইয়া পড়িয়া থাকিতে হইবে।

তবু নন্দ ভাবিতেছিল—কি করিবে। চৈতন্য বলিল, "তাই তো, কি করবি নন্দ? লোকটা তো বড় বিপদেই পড়েছে। আমি বলি একটিবার যা—আমি না-হয় মাস দুই পরে গিয়ে আবার নিয়ে আসব।"

নন্দ বলিল, "আমিও ঠিক তাই ভাবছি দাদা—সেই ভাল।"

কিন্তু নৃত্যকালী কপালে চোখ তুলিয়া চেঁচাইতে সুরু করিয়া দিল, "কি, এখন যাবে শ্বশুরবাড়ী! এত দিন ব'সে ব'সে আমার পিণ্ডি গিললেন, আর এখন আমার অসময়ে যাবেন শ্বশুরবাড়ী! আমার গায়ে কি এক রত্তি বল আছে, না আমি কোন কাজ করতে পারি? তা দেখবে কে, আর বুঝবেই বা কে?"

বাস্তবিকই নৃত্যকালীর শরীর ইদানীং অনেকটা কাহিল হইয়াছিল—তাহার উপরে সাত-আট মাসের অন্তঃসত্ত্বা।

চৈতন্য চিন্তিত মুখে নন্দকে বলিল, "বউয়ের কথা শুনেছিস তো নন্দ, এখন কি করবি বল তো?"

নন্দ বলিল, "কথাটাও তো বড় মিথ্যে নয় দাদা—তা হ'লে নাই বা গেলাম।"

—কিন্তু তা হ'লে তোর ভাসুর যে বড় চটে যাবে রে।

—তা যাক্। সেখানে যে আমি তাদের প্রয়োজনের বেশী এক দিনও থাকতে পারব তা মনে ক'রো না। কথায় বলে 'কাজের বেলা কাজী, কাজ ফুরোলে পাজী'।—এও ঠিক তাই। তাদের রাগে আমার কি আসে যায়?

নন্দর ভাসুর যাইবার সময় শাসাইয়া গেল—এ-জীবনের মত আর কোন দিন সে শ্বশুরবাড়ীর দরজায় পা দিতে পারিবে না—এই শেষ।

নৃত্যকালী বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। কিন্তু গৌর কিছুতেই তাহার ছোটমাকে ছাড়িয়া যাইতে চাহিল না, কাজেই বাধ্য হইয়া তাহাকে রাখিয়াই যাইতে হইল।

নৃত্যকালীর ছেলে গৌর, সে যে কেমন করিয়া নন্দর এমন বাধ্য হইয়া গেল তাহা ভাবিয়া নন্দ একেবারে অবাক্ হইয়া যাইত। কিন্তু নিজের অন্তরের দিকে দৃষ্টি ফিরাইবার যদি তাহার ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে দেখিতে পাইত, দোষ শুধু একা গৌরের নয়—তাহার নিজের অন্তর অলক্ষিতে গৌরের জন্য যে কতখানি স্থান ছাড়িয়া দিয়াছে তাহা একবারও সে ভাবিয়া দেখে নাই। একমাত্র গৌরই বুঝি তাহার এ-জীবনের শ্রেষ্ঠ আকর্ষণ। গৌরকে যখন সে বুকে চাপিয়া ধরে, তখন সে তাহার ব্যর্থ জীবনের কথা, সংসারের সমস্ত অশান্তির কথা, এক নিমেষে ভুলিয়া যায়। সমস্ত ছাপাইয়া জাগিয়া উঠে যে মাতৃত্ব তাহা স্বার্থলেশহীন, নিষ্কলুষ!

আবার কয় মাস পরে নৃত্যকালী নূতন ছেলে কোলে লইয়া ফিরিয়া আসিল। এবার সঙ্গে আসিয়াছে তাহার পিতা ও বিধবা এক ভগ্নী।

পনর-বিশ দিন চলিয়া গেল—আবার সংসারে সেই কলহ—সেই রেষারেষি আরম্ভ হইল। নৃত্যকালী এবার ঠিক করিয়া আসিয়াছিল—বাপকে দিয়া কাজ সারিতে হইবে।

সেদিন চৈতন্যের শ্বশুর দোকানের হিসাবপত্র দেখিয়া গম্ভীর মুখে সকলকে শুনাইয়া বলিলেন, "ব্যাপার তো বড় সুবিধের নয় বাবাজী, দোকানের যা অবস্থা দেখছি তাতে তোমার সংসার যে কি ক'রে চলবে তাই ভাবছি। আর তার উপরে যদি এমনি বাড়তি লোক এনে সংসারে ঢুকাও, সেটা তো বড় ভাল কথা নয়!"

চৈতন্য শ্বশুরের ইঙ্গিত বুঝিতে পারিল—তাহার মেজাজটাও সেদিন বড় ভাল ছিল না—তাই শ্বশুরের উপদেশ সে নির্বিবাদে গ্রহণ না করিয়া কয়টি কড়া কড়া কথা তাঁহাকে শুনাইয়া দিল।

শ্বশুর-মহাশয় অপমানিত হইয়া, তাঁহার বিধবা মেয়ের হাত ধরিয়া বিদায় লইলেন। কিন্তু অধিক দূর না গিয়া চৈতন্যেরই অন্য সরিক তাহার খুড়তুতো ভাইয়ের বাড়ীতে উঠিলেন। তাহার পরে আরম্ভ হইল নৃত্যকালীর গালাগালি। এবার নন্দের এত দিনের অভ্যস্ত সংযমের বাঁধও ইহার নিকটে হার মানিল।

নৃত্যকালী বলিয়া বেড়াইতে লাগিল—সে বাপের সঙ্গে আবার চলিয়া যাইবে—চৈতন্য কেমন করিয়া সংসার করে সে দেখিতেও আসিবে না।

চৈতন্য বেচারী এই গণ্ডগোলের ভিতরে পড়িয়া একেবারে দিশাহারা হইয়া গেল।

নন্দ আসিয়া বলিল, "আমাকে দিনকয়েকের জন্য শ্বশুর-বাড়ী রেখে এস না দাদা।"

চৈতন্য বুঝিতে পারিল—ইহা নন্দের কম দুঃখের কথা নয়। কারণ তাহার ভাসুর যে ভয় দেখাইয়া গিয়াছে তাহাও ইহারই মধ্যে ভুলিবার কথা নয়।

প্রত্যুত্তরে চৈতন্য একটু ম্লান হাসি হাসিয়া বলিল, "কি যে বলিস নন্দ।"

আজকাল তাহার দাদার এই বিষণ্ণ ভাব—এই যে অশান্তি তাহারও মূল কারণ আবার সে-ই—ভাবিয়া নন্দর মন অত্যন্ত পীড়িত হইতেছিল।

নন্দর এক দূরসম্পর্কের জ্যেঠামশাই ও জ্যেঠাইমা কাশীতে থাকিতেন। তাঁহারা বহুদিন পরে সকলের সঙ্গে একবার দেখাশুনা করিতে গ্রামে ফিরিয়া আসিয়াছেন।

জ্যেঠাইমা নন্দকে বলিলেন, "এত লাথি-ঝাঁটা খেয়ে এখানে পড়ে আছিস কোন্ সুখে নন্দ? তার চেয়ে কাশী চল্

আমাদের সঙ্গে। সেখানে এটা-সেটা ক'রে কত ভদ্দর লোকের বিধবা দিন চালায়। কাশীর তুল্য কি আর স্থান আছে ?"

কথা শুনিয়া নন্দ তাহার জ্যেঠামশাই ও জ্যেঠাইমাকে চাপিয়া ধরিল—তাহাকে কাশী লইয়া যাইতেই হইবে।

নন্দের কাশী যাওয়া ঠিক্ হইয়া গিয়াছে। এবার কিন্তু চৈতন্য তাহাকে নিবৃত্ত করিতে পারে নাই।

সেদিন নন্দের বিদায়ের দিন। চৈতন্য আজ আর দোকানে যায় নাই—সারাটা দিন নির্ব্বাক, নিস্পন্দ হইয়া বসিয়া আছে। তাহার কাজকর্ম্মের সকল উৎসাহ যেন আজ নিবিয়া গিয়াছে।

নন্দ প্রস্তুত হইয়া নৃত্যকালীকে ডাকিয়া বলিল, "একটু বেরোও বউ, যাওয়ার সময় একটা প্রণাম ক'রে যাই।" কিন্তু নৃত্যকালীর ঘর হইতে বাহির হইবার কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

কোথা হইতে গৌর ছুটিয়া আসিয়া নন্দকে জড়াইয়া ধরিল। প্রশ্ন করিল, "তুই কোথায় যাবি ছোটমা ?" নন্দ এই ভয়ই করিতেছিল। তাহাকে কোলে লইয়া চুমু খাইয়া বলিল, "কোথাও যাব না বাবা– তুমি যাও খেলা করগে।" গৌর ভুলিল না—বলিল, "না ছোটমা আমি তোমার সঙ্গে যাব।"

গাড়ীর সময় হইয়া আসিল—জ্যেঠামশাই ডাকাডাকি সুরু করিয়া দিলেন। আর বিলম্ব হইলে হয়ত গাড়ী ধরা যাইবে না।

এদিকে গৌর কান্না সুরু করিয়া দিয়াছে—কিছুতেই কোল হইতে নামিবে না।

হঠাৎ ঘর হইতে নৃত্যকালী বাহির হইয়া, নন্দের কোল হইতে গৌরকে ছিনাইয়া লইয়া টানিতে টানিতে ঘরে গিয়া ঢুকিল।

চৈতন্য বাহিরের ঘরের দাওয়ায় গুম্ হইয়া বসিয়া ছিল। নন্দ কাছে আসিয়া পায়ের ধূলা লইয়া বলিল, "চললাম দাদা—মাঝে মাঝে খবর নিও। আমার গৌরকে দেখো।"

বলিয়া কাঁদিয়া ফেলিল। কিন্তু চৈতন্য একটা কথাও বলিল না। সেই যে কোন্ সময়ে ঘাড় হেঁট করিয়া বসিয়া ছিল—তেমনি ঠায় বসিয়াই রহিল।

ঘরের ভিতরে নৃত্যকালী তত ক্ষণ গৌরকে ঠেঙাইতে সুরু করিয়া দিয়াছে। গৌরের চীৎকারে কান পাতা দায়—"ছোটমা গো—আমায় মেরে ফেললে গো।"

তবু নন্দ এক পা, এক পা করিয়া বাড়ীর বাহির হইয়া আসিল। তাহার পা-দুখানিতে কে যেন পাষাণ চাপা দিয়া রাখিয়াছে !

জ্যেঠামশাই বলিলেন, "হেঁটে আয় নন্দ।"

চোখের জল মুছিয়া নন্দ বলিল, "যাচ্ছি—চলুন।"

পুণ্যাহ

শান্তিনিকেতনে চীন-সৌধের দ্বারোদ্ঘাটন উপলক্ষ্যে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মনে পড়ে দেখেছিনু বৈজ্ঞানিকী পুঁথির পৃষ্ঠায়
অপূর্ব্ব আলোকচিত্র, আঁকাবাঁকা প্রয়াণ-সরণী।
স্বতঃস্ফূর্ত্ত বিকিরণ-কণিকার চরণ-লিখনী।
সে পবনঘন মার্গে ক্ষিপ্র বেগে অণুকণা ধায়
বিজলী পরাগরাজি পদাঙ্কন-রেখায় বিতরি।
প্রবল আবেগভরে প্রাণস্পন্দ ওঠে যেন জাগি
জড়বাষ্পে। তেমনি যে হিমাচল জলধি উত্তরি'
সিদ্ধার্থের মৈত্রীমন্ত্র যাত্রা করেছিল চীন লাগি।
অগমের সেতুবন্ধ কি মহামিলন অভিসারে
রচিলেন শ্রমণেরা অন্তর্গূঢ় প্রেরণার বশে,
লুপ্তপ্রায় চিহ্ন তার এখনো বিকীর্ণ চারি ধারে।
সেই মরা গাঙে পুন নূতন প্লাবনধারা পশে,
প্রেমের তরণী আসে চীনাংশুক উড়ায়ে গগনে
বিশ্বভারতীর ঘাটে আজি এই মঙ্গল-লগনে।

চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্ধারকর্ত্তা প্রেসিডেণ্ট মাসারিক

শ্রীঅমূল্যচন্দ্র সেন, ডক্‌টর-ফিল্ (হামবুর্গ), এম-এ, বি-এল

মহাযুদ্ধের পর হইতে আজ পর্য্যন্ত ইউরোপে যে কয়জন রাষ্ট্রগঠনকারী জননেতার অভ্যুদয় হইয়াছে তাঁহাদের মধ্যে উল্লেখযোগ্য লেনিন, মুসসোলিনি, হিটলার ও মাসারিক। প্রথম তিন জনের কথা বাঙ্গালী পাঠকের কাছে অতি পরিচিত। ইঁহাদের চেয়ে চরিত্রে ও প্রকৃতিতে সম্পূর্ণ বিভিন্ন হইলেও মাসারিক নিজ বুদ্ধি ও চেষ্টায় অষ্ট্রিয়ার হাপ্‌সবুর্গ রাজবংশের অধীন চেকোস্লোভাকিয়ার স্বাধীনতাযজ্ঞে পৌরোহিত্য করিয়া এই দেশ ও জাতিকে স্বাধীনতা দান করেন; এই অসাধারণ কৃতকর্ম্মা পুরুষের কিছু পরিচয় দিব।

টোমাস্ মাসারিকের বয়স এখন প্রায় ৮৬। যুদ্ধের পর নবগঠিত গণতান্ত্রিক চেকোস্লোভাকিয়া রাজ্যের ন্যাশন্যাল অ্যাসেম্ব্লি তাঁহাকে প্রথম প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত করেন। কনষ্টিটিউশন অনুসারে প্রেসিডেণ্টের কার্য্যকাল ৭ বৎসর ধার্য্য হয় ও কনষ্টিটিউশনে স্পষ্ট নির্দ্দেশ থাকে যে একা মাসারিক ছাড়া আর কোন ভবিষ্যৎ প্রেসিডেণ্ট একাধিক বার নিযুক্ত হইতে পারিবেন না। মাসারিক কার্য্যভার গ্রহণ করিবার অব্যবহিত পরেই ন্যাশনাল অ্যাসেম্ব্লি এই হুকুমনামা জারি করেন—"টোমাস মাসারিক যে স্বাধীন গণতন্ত্রের নায়ক তাহার প্রত্যেক চেক প্রজা যেন আজীবন স্মরণ রাখেন যে এরূপ লোকের সামনে বাস করা, এরূপ লোকের মূর্ত্তি দেখা, তাঁহার জ্ঞানময়ী বাণী শ্রবণ করা আমাদের সকলের গৌরবের বিষয়।"

যুদ্ধের পর বিবর্ণ সাজসজ্জাহীন স্পেশাল ট্রেনে মাসারিক প্রাহা শহরে প্রথম প্রেসিডেণ্ট রূপে যখন পৌঁছিলেন, তখন রাজ্যের আবালবৃদ্ধবনিতা তাহাদের উদ্ধারকর্ত্তাকে অভিনন্দন করিয়াছিল। হাপস্‌বুর্গ রাজাদের ব্যবহৃত স্বর্ণরৌপ্যমণ্ডিত প্রকাণ্ড জুড়িগাড়ী ষ্টেশনের দরজায় দাঁড়াইয়া তাঁহাকে হাপস্‌বুর্গ রাজপ্রাসাদে (এখনকার প্রেসিডেণ্ট-আলয়) লইয়া যাইবার জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিল। মাসারিক ষ্টেশনে পৌঁছিয়া জুড়িগাড়ী বিদায় করিয়া দিয়া যুদ্ধের সময় ব্যবহৃত সামান্য একখানি মোটরে চড়িয়া শহরের মধ্য দিয়া জনতার জয়ধ্বনিতে অভিনন্দিত হইয়া প্রেসিডেণ্ট-ভবনে পৌঁছিলেন। মাসারিক দুইবার প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া অসাধারণ ন্যায়পরায়ণতা ও কর্ম্মঠতার সঙ্গে রাজ্যের কর্ণধারত্ব করেন; তৃতীয়বার তিনি বার্দ্ধক্যবশতঃ এই পদ পুনঃগ্রহণে অস্বীকৃত হইয়া তাঁহার সহকর্ম্মী ডাঃ বেনেশকে প্রেসিডেণ্টরূপে সুপারিশ করিয়া কর্ম্মক্ষেত্র হইতে অবসর গ্রহণ করেন।

মাসারিক গাড়োয়ানের ছেলে। তাঁহার পিতা হাপস্‌বুর্গ রাজবাড়ীর অধীনে মফস্বলে গাড়োয়ানের কাজ করিতেন; সেকালে এদেশে বড়লোকদের চাকরদের অবস্থা প্রায় ক্রীতদাসের মতই ছিল। মনিবের খেয়াল ও হুকুমমত তাঁহাকে সপরিবারে স্থান হইতে স্থানান্তরে গাড়ী লইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে হইত। তাঁহার মা আগে ভিয়েনার একটি বড়লোকের বাড়ীতে ঝি-গিরি করিতেন। বড়লোকের জীবনের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ পরিচয় থাকায় ও তাঁহাদের সংসর্গে ভদ্রজীবন সম্বন্ধে ধারণা হওয়ায় মা'র ইচ্ছা ছিল ছেলেকে লেখাপড়া শিখাইয়া ভদ্রলোক করেন। মা'র উচ্চাশা ও অপেক্ষাকৃত আলোকপ্রাপ্ত মন মাসারিককে জীবনে বহু সাহায্য করিয়াছিল। বহু বৎসর পরে প্রাহা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকরূপে মাসারিক একবার বলিয়াছিলেন, "আমার সব রকম উন্নতির জন্য আমি আমার পুণ্যবতী মাতার যত্ন, আত্মত্যাগী প্রেম ও নিপুণ শিক্ষার কাছে ঋণী; জীবনের বহু দুর্দ্দিনে মাতা-পিতা ও আমার দুই ভাইয়ের ভালবাসা আমার প্রাণে বল সঞ্চার করিয়াছে।"

মাসারিক গ্রামের ইস্কুলে সামান্য লেখাপড়া শেখেন। মা'র কাছে তিনি জার্ম্মান ভাষা শেখেন। সেকালে এদেশে

জার্মান ভাষা বিদেশীয় রাজার ভাষা ছিল, শুধু বিশিষ্ট ভদ্রলোকেরাই জার্মান জানিতেন, সাধারণ লোকের ভাষা ছিল চেক্। তাঁহাকে ইস্কুলে পাঠাইবার জন্য মাসারিকের পিতাকে মনিবের দ্বারে কাতর প্রার্থনা জানাইয়া অনুমতি লইতে হইয়াছিল। তাঁহার পিতা ও সেই জমিদারীর অন্য চাকররা কি ভাবে কঠিন পরিশ্রমে ও ঘোর দারিদ্র্যে মনিবের কাছে কুকুরের মত জীবন কাটাইতেন তাহাও মাসারিক বাল্যকালে প্রত্যহ দেখিতেন। অল্প একটু লিখিতে পড়িতে শিখিয়াই মাসারিক না বুঝিলেও নানারূপ বই লইয়া ঘাঁটিতেন। বিভিন্ন দেশের মানচিত্র তিনি ঘণ্টার পর ঘণ্টা তন্ময় হইয়া দেখিতেন, জ্যামিতির অঙ্ক কষায় আত্মবিস্মৃত হইয়া যাইতেন। চেক্ ও জার্মান বই ঘাঁটিতে ঘাঁটিতে লাটিন কথা পাইয়া না বুঝিলেও তাহাতে পুলকিত হইয়া সসম্ভ্রমে তাকাইয়া থাকিতেন, না জানি উহাতে কি রহস্য আছে! মাসারিক যে নিম্নপ্রাথমিক স্কুলে পড়িতেন সেখানে একবার এক জন বড় পাদরী স্কুল পরিদর্শন করিতে আসেন (সেকালে এদেশে প্রাথমিক স্কুলগুলি ক্যাথলিক পাদরীদের হাতে ছিল)। ছেলেদের পাদরীর সম্মুখে নানারূপ আবৃত্তি করিতে হইত। মাসারিকের মুখে আবৃত্তি শুনিয়া পাদরী বলিয়া গেলেন ইহাকে যেন মাধ্যমিক স্কুলে পাঠান হয়, এ ছেলেটি ভবিষ্যতে শিক্ষক হইবে। বলা যত সহজ, করা তত নয়; ছেকোভিটস্ গ্রামে (এখানে তখন মাসারিক-পরিবার বাস করিতেছিলেন) মাধ্যমিক স্কুল নাই, অন্যত্র পাঠাইবার তাঁহাদের সঙ্গতিই বা কোথায়? কিন্তু মাতার উচ্চাশা বাধার সীমা মানে না। দরিদ্র মাতা নিজের উদ্যমে বাধা দূর করিলেন। দূরবর্ত্তী হুস্‌টোপেট্স্ নামক এক গ্রামে তাঁহার এক ভগ্নী থাকিতেন। ভগ্নীপতির ছোট একটি দোকান ছিল, এই গ্রামে একটি মাধ্যমিক স্কুলও ছিল। ভগ্নীর বাড়ীতে গিয়া মাতা ব্যবস্থা করিলেন যে মাসারিক মাসীর বাড়ীতে থাকিবেন, মেসোর দোকানে সাহায্য করিবেন। ভগ্নীর একটি ছোট মেয়ে ছিল, মাতা তাহাকে আনিয়া নিজের বাড়ীতে রাখিয়া তাহার ভরণপোষণের ভার গ্রহণ করিবেন। এইরূপে মাসারিকের মাধ্যমিক স্কুলের পথ পরিষ্কার হইল। তাঁহার বাপের পুরাতন গাড়োয়ানের পোষাক কাটিয়া তাঁহার মা একটা "নূতন সুট" তৈরি করিয়া দিলেন। এই পোষাক পরিয়া মাসারিক নূতন স্কুলে ঢুকিলেন। সমপাঠীরা তাঁহার এই নূতন সুট দেখিয়া ঠাট্টা করিত। তাহাতে আবার মাসারিক কোথা হইতে "চেহারা হইতে চরিত্র নির্ণয়" সম্বন্ধে একটা বই সংগ্রহ করিয়াছিলেন, সমপাঠীদের নাক মুখ চোখ প্রভৃতি দেখিয়া সর্ব্বদাই তাহাদের চরিত্র সম্বন্ধে নানারূপ আবিষ্কার করিতেন। এই সব কারণে সঙ্গীরা তাঁহাকে একটু অদ্ভুত বলিয়া ঠিক করিয়া তাঁহাকে এড়াইয়া চলিত। এই স্কুলের ভাষা ছিল জার্মান, তাহাও মাসারিক ভাল রকম বুঝিতেন না, তাই প্রথম মাস-কয়েক তিনি প্রত্যেক বিষয়ের দৈনিক পাঠের প্রত্যেক লাইন মুখস্থ করিয়া ফেলিতেন। সমবয়সীদের সঙ্গ হইতে বিচ্ছিন্ন হইয়া মাসারিক শিক্ষকদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলেন। একটি তরুণ শিক্ষক তাঁহার বিশেষ বন্ধু হইলেন। স্কুলের শেষে অবকাশের সময় যখন অন্য ছেলেরা খেলায় মাতিত বা বীয়ারের দোকানে আড্ডা দিত, মাসারিক তখন বই লইয়া তন্ময় হইয়া থাকিতেন অথবা তরুণ শিক্ষকটির সঙ্গে নানা আলোচনায় ব্যাপৃত থাকিতেন।

মাধ্যমিক স্কুলে মাসারিক দুই বৎসর পড়িয়াছিলেন, ইহার মধ্যে একটি ঘটনা উল্লেখযোগ্য। সেকালে এদেশে ইহুদীদের সম্বন্ধে খ্রীষ্টানদের নানারূপ কুসংস্কার ও মিথ্যা ধারণা ছিল। লোকে ইহুদী-বাড়ীর সামনে দিয়া যাইবার সময় রাস্তার ওধার দিয়া যাইত! স্কুলে জন-কয়েক ইহুদী ছেলে থাকিলেও এবং তাহারা ভদ্র ব্যবহার করিলেও মাসারিক তাহাদের সঙ্গে মিশিবার ভরসা পাইতেন না। একবার ছেলেরা একটা চড়ুইভাতিতে গিয়াছিল. দলে এক জন ইহুদী ছেলেও ছিল। দুপুরে খাবার তৈরি দেখিয়া যখন সকলে হুড়াহুড়ি করিতেছে, তখন হঠাৎ ইহুদী ছেলেটির খোঁজ পাওয়া গেল না। ব্যাপার কি দেখিবার জন্য মাসারিক হৈ হৈ করিতে করিতে তাহার খোঁজে বাহির হইলেন। যাহা দেখিলেন তাহাতে কিন্তু মাসারিক একেবারে নির্ব্বাক হইয়া ফিরিয়া আসিলেন। ছেলেটি খামারের এক নিরালা কোণে দরজার পিছনে দাঁড়াইয়া দেওয়ালে মাথা রাখিয়া ইহুদীদের মাধ্যাহ্নিক উপাসনার মন্ত্র পড়িতেছে। এই ঘটনায় মাসারিক বুঝিলেন

যাহার সমাজ যাহাকে কাফের বলে তাহাদেরও ধর্মজ্ঞান আছে, তাহারাও ঈশ্বরের উপাসনা করে, তাহারাও দশ জন খ্রীষ্টানের মত মানুষ! ভবিষ্যতে চিরজীবন মাসারিক চেষ্টা করিয়াছিলেন যাহাতে ইহুদীদিগের প্রতি অন্যায় অবিচার না হয়। পরবর্ত্তী কালে তিনি একবার একটি নির্দ্দোষ ইহুদী বালকের প্রাণ বাঁচাইবার জন্য দলবদ্ধ সমাজের বিরুদ্ধে একাকী দাঁড়াইয়া সারা দেশের নিন্দা ও অত্যাচার সহ্য করিয়াছিলেন।

চৌদ্দ বৎসর বয়সে মাসারিক মাধ্যমিক স্কুলের পাঠক্রম শেষ করিলেন। কিন্তু ষোল বৎসর বয়সের আগে শিক্ষক হইবার স্কুলে ঢোকা যায় না। এই দুই বৎসর তিনি নিজ গ্রামের স্কুলের সহকারী শিক্ষকের কাজ করিবেন স্থির হইল। সহকারী শিক্ষকের কাজ ছিল ছেলেদের তত্ত্বাবধান করা, ক্লাসের আগে পরে শান্তি রক্ষা করা। আসলে কিন্তু অধিকাংশ সময়ই মাসারিককে স্কুল-পরিচালকের বাড়ীতে ও রান্নাঘরে চাকর-ঠাকুরের কাজ করিতে হইত। সহকারী শিক্ষকরূপে তাঁহাকে গীর্জ্জার কাজকর্ম্মেরও সহায়তা করিতে হইত। গীর্জ্জার কাজ করিবার সময়ে ধর্ম্ম সম্বন্ধে, বিশেষতঃ ক্যাথলিক মতবাদ সম্বন্ধে, তাঁহার মনে নানা প্রশ্ন জাগিত, পাদরীর সঙ্গে আলোচনা করিয়া তিনি কোন সদুত্তর পাইতেন না। ক্যাথলিকদের মধ্যে বা বিভিন্ন দেশে কেন এত বিভিন্ন মত ও প্রথা প্রচলিত, তাহারও যুক্তিযুক্ত কারণ পাইলেন না। খ্রীষ্টধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক বই তিনি পড়িয়া ফেলিলেন এবং সন্দেহ না ঘুচিলেও ক্যাথলিক ধর্ম্মে তখনও তাঁহার শ্রদ্ধা অটুট ছিল। একবার জেসুইটদের লেখা প্রোটেস্টাণ্ট-বাদের উপর একটি আক্রমণ তিনি পড়িয়া এতই উৎসাহিত হইয়াছিলেন যে প্রোটেস্টাণ্ট-বাদের বিরুদ্ধে তর্ক ও আলোচনা করিবার লোক খুঁজিতে লাগিলেন। দুঃখের বিষয় দেশময় ক্যাথলিক, কে প্রোটেস্টাণ্ট পক্ষ লইয়া তাঁহার সঙ্গে তর্ক করিবে? অবশেষে এক জন লোক মিলিল, সেই গ্রামের কামারের জার্ম্মান স্ত্রী। মাসারিক কামার-পত্নীর সঙ্গে আলোচনা প্রসঙ্গে জেসুইটদের বই হইতে শেখা তর্ক প্রমাণের সাহায্যে প্রোটেস্টাণ্ট-বাদের অসারতা এমনই স্পষ্ট প্রমাণ করিয়াছিলেন যে এই জার্ম্মান রমণী স্বধর্ম্ম ত্যাগ করিয়া অবশেষে ক্যাথলিক দীক্ষা লইয়াছিল। এই সময়ের আর দুটি ঘটনা তাঁহার জীবনে গভীর রেখাপাত করে। তাঁহাদের গ্রামের কাছে রাজাদের শিকারের জন্য রক্ষিত একটি জঙ্গল ছিল। এই বনের হরিণ প্রায়ই গ্রামের শস্য নষ্ট করিয়া যাইত, তবু তাহাদের বাধা দিবার অধিকার কাহারও ছিল না। এক জন বড়লোক শিকারী একবার তাঁর মা'র ছোট সব্জীর বাগানের উপর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া বাগানটি নষ্ট করিয়া দিয়া গেল। ইহাতে পিতার রুদ্ধ আক্রোশ তিনি বুঝিলেন। বনের মধ্যে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন রক্ষকের বাসার সামনে অনেক হরিণ, পাখী প্রভৃতি শিকার পড়িয়া রহিয়াছে, ভিতরে রান্নার গন্ধ ও বড়লোকদের হৈ-হল্লা শুনা যাইতেছে। এদিকে খিড়কীর কাছে দেখিলেন, তাঁহারই গ্রামের একদল লোক ছেলেপুলেসহ বড়লোকদের উচ্ছিষ্টের গ্রাস পাইবার জন্য নিজেদের মধ্যে কুকুরের মত কাড়াকাড়ি মারামারি করিতেছে। ধনী-দরিদ্রের এই নিদারুণ বৈষম্যে ক্রোধে তাঁহার হস্ত মুষ্টিবদ্ধ হইয়া উঠিল, অগ্নিবর্ষ চোখে তিনি সেখান হইতে চলিয়া আসিলেন। আর একবার আর একটি বড়লোকের শিকারী দল তাঁহাদের কুটীরের কাছে আসিয়া নিজেদের দামী পুরু পালকের ওভারকোট সেখানে রাখিয়া রূঢ়ভাবে তাঁহাকে সেগুলি পাহারা দিবার হুকুম করিয়া চলিয়া গেল। সেরূপ দামী ওভারকোট তিনি জীবনে কখনও দেখেন নাই, কিন্তু তাঁহার মনে ইচ্ছা হইয়াছিল ছুরি দিয়া কাটিয়া ছিন্নভিন্ন করিয়া তাঁহার নোংরা জুতা দিয়া সেগুলি মাড়াইয়া নষ্ট করেন। বহুকষ্টে তিনি সে-বার আত্মসংবরণ করেন। আবেগের আতিশয্য কাঁদিয়া ভাসাইয়া না দিয়া যে ন্যায্য ক্রোধ তিনি তখন দমন করিয়া হৃদয়ে পোষণ করিয়াছিলেন তাহারই প্রেরণায় পরে দেশে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল। প্রেসিডেণ্টরূপে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, "যাহারা খাঁটি কাজ করে তাহারা সবাই সমান—ভাল কামারের কাজ ভাল প্রেসিডেণ্টের কাজের চেয়ে কম প্রশংসনীয় নয়।" সেই সময়ে অর্থাৎ ১৮৬০ খ্রীষ্টাব্দে হাপসবুর্গ-বংশের রাজত্ব চালাত মিলিটারি পুলিস ও পাদরীদের দ্বারা। ইহারাই সব বিষয়ের হর্ত্তাকর্ত্তা ছিল; রাজত্বের সর্ব্বত্র সন্দেহ ও ভয়; রাস্তার মোড়ে, হাটে বাজারে, গীর্জ্জায়, সর্ব্বত্র গুপ্তচরেরা ঘুরিয়া বেড়াইত।

এক দিন মাসারিক স্কুলের ছেলেদের সঙ্গে আঙুরক্ষেতে আঙুর চুরি করিয়া ধরা পড়িয়া গেলেন। ছেলে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া আছে বলিয়াই দুষ্টামিতে যোগ দিয়াছে মনে করিয়া তাঁহার পিতা এক দিন ভোরে তাঁহাকে জাগাইয়া জানাইলেন, গাড়ী প্রস্তুত, তাহাকে এই মুহূর্ত্তেই ভিয়েনায় গিয়া কাজকর্ম্মের চেষ্টা দেখিতে হইবে। মাসারিককে দশ মিনিটের মধ্যে নিজ সম্পত্তি পুঁটুলিতে বাঁধিয়া লইয়া প্রস্তুত হইতে হইল। টুকিটাকি জিনিষ তাঁহার যা ছিল তার মধ্যে তিনি তাঁর প্রিয় অ্যাটলাসখানি লইতে ভুলেন নাই। ভিয়েনায় গিয়া এক কামারের দোকানে তাঁহার চাকরি মিলিল। এখানে সারাদিন তাঁহাকে খাটিতে হইত, কিন্তু ছুটি হইলে সন্ধ্যাবেলায় তিনি পথে পথে ঘুরিয়া বইয়ের দোকানের কাচের জানালায় বই দেখিয়া বেড়াইতেন। সামান্য উপার্জ্জনের পয়সা বাঁচাইয়া তিনি আবার একখানি "চেহারা দেখিয়া চরিত্র-নির্ণয়ের" বই কেনেন; অবসর-সময় অন্য ছোকরাদের সঙ্গে বাজে কথা বা স্ফূর্ত্তিতে যোগ না দিয়া তিনি বইয়ের মধ্যে ডুবিয়া থাকিতেন দেখিয়া ছোকরারা তাঁহাকে জব্দ করিবার জন্য তাঁহার এই বইখানি চুরি করিল। এই বইখানি চুরি হওয়াতে মাসারিক মর্ম্মান্তিক কষ্ট পাইয়াছিলেন। ভিয়েনাতে আরও কিছু দিন কাজ করিবার পর এই দিনব্যাপী যন্ত্রের মত কাজে তাঁহার বিরক্তি বোধ হইল, তিনি বাড়ী ফিরিয়া আসিলেন। কাজে তাঁহার আপত্তি ছিল না, তিনি প্রেসিডেন্টরূপে একবার বলিয়াছিলেন, 'জিনিয়স্ তাকেই বলি যে কর্ম্মে স্বাভাবিক অনিচ্ছাকে জয় করিতে পারে।' কিন্তু একঘেয়ে যন্ত্রের মত কাজে তাঁহার শ্রদ্ধা ছিল না। ভিয়েনার দুরন্ত খাটুনির ফলে তিনি আজীবন শ্রমিকদের বন্ধু হইয়াছিলেন ও তাহাদের অবস্থা-উন্নতির সহায়ক হইয়াছিলেন। বাড়ী ফিরিয়া কিন্তু আবার কামারের দোকানেই তাঁহার চাকরি মিলিল। এখানেও অবকাশের প্রত্যেক মুহূর্ত্তটি তিনি বই বা খবরের কাগজ পড়িয়া কাটাইতেন। তাঁহার শিক্ষার আগ্রহ দেখিয়া তাঁহার এক জন পূর্ব্বতন শিক্ষক তাঁহাকে আর একটি শহরে আবার সহকারী শিক্ষক করিয়া পাঠাইবার ব্যবস্থা করিলেন। এখানে মাসারিক ছেলেদের পৃথিবী সূর্য্যের চার দিকে ঘোরে শিক্ষা দিতেছেন জানিয়া ছেলেদের মা'রা প্রথমে গ্রামের পাদরীর কাছে ও পরে শহরের বড় পাদরীর কাছে নালিশ করিল যে ছোকরা মাষ্টার ছেলেদের বাইবেল-বিরুদ্ধ শিক্ষা দিতেছে। বড় পাদরী মাসারিককে ডাকাইয়া সব কথা শুনিয়া বলিলেন, ওশিক্ষা যখন বাইবেল-বিরুদ্ধ তখন উহা শিখাইয়া দরকার নাই। মাসারিক পাদরীর কথায় উহা শিখান বন্ধ করিলেন, কিন্তু নিজের বিশ্বাস ছাড়িলেন না। পরে এক দিন হাটবারে ছেলেদের বাপেরা (গ্রামের চাষারা) তাঁহাকে ধরিয়া ব্যাপার জিজ্ঞাসা করিল। মাসারিক তাহাদের কাছে কোপার্নিকসের তথ্য ব্যাখ্যা করিলে তাহারা বলিল, মেয়েদের কথায় কান না দিয়া তুমি যা শিখিয়াছ, ছেলেদেরও তাই শিখাইও!

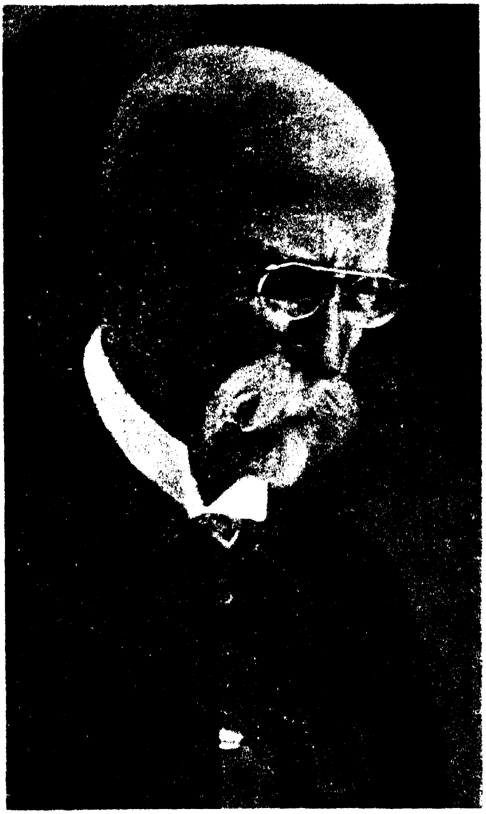
একবার মাসারিক বাড়ী হইতে শহরে ইস্কুলে যাইবার সময় তাঁহার মা তাঁহাকে এক রকম ময়দার কেক তৈরি করিয়া সঙ্গে দিয়াছিলেন। ইহার নাম এদেশে 'কোবলিহি'— খুবই সাধারণ জিনিষ, ফাঁপানো রুটির মধ্যে জ্যাম ভরা থাকে। এটি মাসারিকের প্রিয় খাদ্য ছিল। শহরে ঢুকিবার সময় কাষ্টমসের লোক বলিল, "তুমি এ জিনিষ শহরে বিক্রী করিবার জন্য লইয়া যাইতেছ, ট্যাক্‌স দিতে হইবে।" ট্যাক্‌স দিবার সামর্থ্য ছিল না, কারণ সঙ্গে মাত্র চারিটি পয়সা সম্বল লইয়া তিনি স্কুলে যাইতেছিলেন। ভবভোলা লোক হইলে কেকগুলি কাষ্টম্‌সকে ছাড়িয়া দিত, ভবিষ্যতে বুদ্ধ-খ্রীষ্ট হইবার সম্ভাবনা থাকিলে গরীবকে বিলাইয়া দিত, কিন্তু চেক্‌রা অত্যন্ত বিষয়লিপ্ট, মাসারিক পথের ধারে বসিয়া হপ্তা-দুয়েকের খোরাক সব কেকগুলি উদরসাৎ করিয়া শহরে ঢুকিয়াছিলেন। শহরে ছাত্র পড়াইয়া তাঁহার ইস্কুলের খরচ চলিত। ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশের ছাত্রদের কাছে ও বিদেশীয়দের সৈন্যদের সঙ্গে মিশিয়া মাসারিক নানা রকম ভাষাও শিখিতেন। স্বদেশীয়দের দুরবস্থা দেখিয়া তাঁহার জাতীয়তাবোধ প্রবল হইয়াছিল। তাঁহার ইস্কুলের গ্রীক ও লাটিনের শিক্ষক জার্ম্মান ছিলেন, তাঁহার গ্রীক উচ্চারণে জার্ম্মান টান ছিল। মাসারিক বলিলেন, জার্ম্মান শিক্ষক যদি জার্ম্মান টানে গ্রীক পড়িতে পারেন, তবে তিনিও চেক-টানে লাটিন পড়িবেন। ইহা লইয়া শিক্ষকের সঙ্গে তাঁর দ্বন্দ্ব হয় ও শিক্ষক তাঁহার শত্রু হইয়া দাঁড়ান।

এই সময়ে মাসারিক খ্রীষ্টধর্ম্মের সত্যতা সম্বন্ধেও চিন্তা

করিতে আরম্ভ করেন ও ক্যাথলিক মতবাদ সম্বন্ধে সন্দিহান হন। তখন পাদ্রীর কাছে গিয়া মাসারিক জানাইলেন যে তিনি আর পাদ্রীর কাছে পাপস্বীকার ও ক্ষমা প্রার্থনা করিতে পারিবেন না। পাদ্রী অনেক বুঝাইবার চেষ্টা করিয়া শেষে ছাড়িয়া দিলেন। ব্যাপার স্কুলের কর্ত্তার কানে উঠিল, তিনি মাসারিককে ডাকাইয়া হুকুম করিলেন, বিশ্বাস করুন না-করুন তাঁহাকে নিয়ম পালন করিতেই হইবে, কর্ত্তা নিজেও অনেক বিষয় বিশ্বাস করেন না, কিন্তু নিয়মের খাতিরে তাহা পালন করিয়া থাকেন। মাসারিক কর্ত্তাকে তৎক্ষণাৎ জানাইলেন, যে নিজ বিশ্বাসের বিরুদ্ধে কাজ করে তাহাকে তিনি অমানুষ মনে করেন। ইহার পর হইতে কর্ত্তা মাসারিককে নানা ভাবে নির্যাতন করিতে আরম্ভ করিলেন। এক দিন ক্লাসে জানালা দিয়া সূর্য্যালোক চোখে পড়ায় মাসারিক চোখ কুঁচকাইতেছিলেন; কর্ত্তা বলিলেন, "তুমি আমাকে ভ্যাঙাইতেছ!" মাসারিক অনেক তর্ক করার পর বলিলেন, "ভুল প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া অল্পবয়স্কের প্রতি বর্ষীয়ানের দোষারোপ করা আমি অন্যায় মনে করি, ন্যায়শাস্ত্রে ইহাকে মিথ্যা সিদ্ধান্ত বলে।"

এই স্কুলে পড়িবার সময়ে মাসারিক যে-বাড়ীতে থাকিতেন সেই বাড়ীর ল্যাণ্ডলেডীর বোনের সঙ্গে তাঁর প্রণয় হয়। তাঁহার সমবয়স্ক ছোকরারা প্রেমের ব্যাপার চালাইত গোপনে, কিন্তু সত্যপ্রিয় মাসারিক ইহাতে নিন্দনীয় কিছু নাই জানিয়া লুকাইবার প্রয়োজন বোধ করেন নাই। কিন্তু লোকের চক্ষে ইহা দূষণীয় মনে হওয়ায় তাঁহাকে বিশেষ নির্যাতন ভোগ করিতে হইল, শত্রু শিক্ষকেরা তাঁহাকে স্কুল-কর্ত্তৃপক্ষের সামনে অপরাধী হিসাবে হাজির করিলেন। মাসারিকের প্রেমে কৈশোরের বিশুদ্ধ আবেগ মাত্র ছিল, আর কোন কলুষচিন্তা তিনি জানিতেনও না, তিনি সোজাসুজি সব কথা কর্ত্তৃপক্ষের কাছে স্বীকার করিলেন ও ফলে সেই স্কুল হইতে বিতাড়িত হইলেন।

ইহার পর মাসারিক আবার ভিয়েনায় গিয়া গৃহ-শিক্ষকতা করিয়া ইস্কুলে পড়িতে লাগিলেন ও পরে ইউনিভার্সিটিতে ভর্ত্তি হইলেন। দর্শনশাস্ত্র তাঁহার পাঠ্য ছিল। বহু কষ্টে তাঁহার মাসিক খরচ চলিত, কিন্তু মাসারিক ভবিষ্যতের কথা ভাবিয়া সময় নষ্ট করিতেন না, হাতের কাছে যখন যে কাজ পাইতেন তাহাই লইতেন। "সর্ব্বদাই প্রথম হইবার চেষ্টা করিও না, অনেক সময় দ্বিতীয় বা তৃতীয় থাকাই যথেষ্ট!"—পরবর্ত্তী জীবনের তাঁহার এই কথা



চেকোস্লোভাকিয়ার উদ্ধারকর্ত্তা মাসারিক

তিনি প্রথম জীবনে ভুগিয়া শিখিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহার এই বিনয় অলসের চেষ্টাহীনতার ভদ্র আবরণ ছিল না, তিনি বলিতেন "পরে কি হইব, কেমন করিয়া হইব, ভাবিয়া আমি কখনও বেশী সময় নষ্ট করি নাই। কিন্তু বাল্যকাল হইতে আমার এই দৃঢ় ধারণা যে, যে-লোক বাস্তবিকই কাজ করিতে চায়, তাহার কাছে কি করিয়া, কোথায় বা কখন কাজ করিতে হইবে, তাহা স্বতঃই প্রতিভাত হইবে।" এ সম্পর্কে টমাস কার্লাইলের কথাও স্মরণযোগ্য—

"তোমার অতিসান্নিধ্যে যে কর্ত্তব্য তাহাই প্রথমে কর, দ্বিতীয় কর্ত্তব্য নিজেই পরিষ্কার হইবে।"

ভিয়েনার পাঠ শেষ করিয়া মাসারিক লাইপ্‌জিগ্‌ ইউনিভার্সিটিতে যান। লাইপ্‌জিগে তিনি যে ল্যাণ্ডলেডীর বাড়ীতে থাকিতেন তাহার কাছে শুনিলেন যে শার্ল্‌টি নাম্নী একটি আমেরিকান ছাত্রী সেই বাড়ীতে থাকিয়া পড়াশুনা করিয়া আবার দেশে ফিরিয়া গিয়াছেন। শার্ল্‌টির গল্প প্রায়ই বাসার লোকের মুখে শোনা যাইত। দিনকতক পরে চিঠি আসিল, শার্ল্‌টি আবার লাইপ্‌জিগে আসিতেছেন। অল্পে অল্পে মাসারিকের সঙ্গে ইঁহার প্রগাঢ় বন্ধুত্ব হইল। শার্ল্‌টি ধীরবুদ্ধি, চিন্তাশীল ও আনন্দময় প্রকৃতির মেয়ে



চেকোস্লোভাকিয়ার বর্ত্তমান রাষ্ট্রপতি বেনেশ

ছিলেন। তাঁহারা একত্র পড়াশুনা, ভ্রমণ-আলোচনা করিতেন, মধ্যে মধ্যে অপেরা থিয়েটার প্রভৃতি দেখিতেন। কিছু দিন লাইপজিগে থাকার পর শার্ল্‌টি জার্ম্মেনীর অন্যান্য স্থানে বেড়াইয়া আমেরিকায় ফিরিয়া গেলেন। সেখান হইতে চিঠিপত্রে তাঁহাদের বিবাহ-প্রস্তাব স্থির হইল ও শার্ল্‌টির অনুরোধে ভাবী শ্বশুরের সঙ্গে দেখা করিবার জন্য মাসারিক আমেরিকায় রওনা হইলেন। সেকালে আমেরিকা কন্টিনেন্ট হইতে সুদূরের পথ ছিল, মাসারিকের অর্থবলও ছিল অতি সামান্য। বহু কষ্টে উপার্জ্জিত অর্থ বাঁচাইয়া একখানা পুরাতন কয়লাবাহী জাহাজে মাসারিক আমেরিকায় পৌঁছিলেন। শার্ল্‌টির বাপ বড়লোক না হইলেও তাঁহার অবস্থা মন্দ ছিল না, তিনি মাসারিকের অধ্যাপক হইবার সংকল্প শুনিয়া ও তাঁহার কথাবার্ত্তায় আপত্তি করিবার কিছু না দেখিয়া বিবাহে মত দিলেন। সেকালে এদেশে লোকে বিবাহ করিলে শ্বশুরের কাছে যৌতুক পাইয়া থাকিত, মাসারিক শ্বশুরের কাছে সরলভাবে যৌতুকের পরিমাণ জানিতে চাহিলেন। আমেরিকান শ্বশুর ইহাতে আশ্চর্য্য ও ক্ষিপ্তপ্রায় হইয়া জানাইলেন, তিনি জানেন তাঁহার মেয়েকে যে বিবাহ করিবে সে তাঁহার মেয়েকেই বিবাহ করিবে, তাঁহাকে আবার সেজন্য যৌতুক দিতে হইবে এমন অদ্ভুত কথা তাঁহার কখনও মনে হয় নাই! দিনকতক মহা নিরানন্দে কাটিল, সরলপ্রাণ মাসারিকও যৌতুকের কথা ছাড়িবেন না, বাপও তাঁহার জেদ ছাড়িবেন না। মাসারিক শেষে হতাশ্বাস ও বিমর্ষ হইয়া পড়িলেন, তাঁহার সম্বল এক পয়সাও নাই, ফিরিবার জাহাজ-ভাড়া তিনি যৌতুক হইতে দিবেন সরলপ্রাণে ইহাই স্থির করিয়া আসিয়াছিলেন। শেষে শার্ল্‌টির মধ্যস্থতায় বাপ তাঁহাকে ফিরিবার জাহাজ ভাড়া দিয়া বিদায় করিলেন। স্থির হইল, বিবাহ করিয়া তিনি এখন একাই ফিরিয়া যাইবেন, পরে অবস্থায় কুলাইলে শার্ল্‌টি তাঁহার সঙ্গে যোগ দিবেন। মাসারিক একাই ফিরিলেন ও আরও কিছুদিন পড়াশুনা করিবার পর প্রাহা ইউনিভার্সিটিতে অধ্যাপকের কাজ পাইলেন। প্রথম প্রথম নবীন অধ্যাপকেরা এদেশে মাহিনা অতি অল্পই পাইয়া থাকেন, ছাত্ররা যে বেতন দেয় তাহাই তাঁহাদের জীবিকার উপায় হয়। পরে শার্ল্‌টি আসিয়া স্বামীর সঙ্গে যোগ দিয়াছিলেন ও চিরদিন তাঁহার সকল কাজে সহধর্ম্মিণীর ব্রত পালন করিয়াছিলেন। যাহারা সকলেই অক্ষম তাহাদের মধ্যে এক জন একটু সক্ষম হইলে অন্যেরা তাহার সামর্থ্যের মাত্রা বেশী করিয়া কল্পনা করে, বিশেষ যদি তাহাতে নিজেদেরও লাভের সম্ভাবনা থাকে;

গ্রামের গরীবের ছেলে কলিকাতায় সামান্য চাকরি পাইলে গ্রামের লোক মনে করে, ইহার সঙ্গে লাট-সাহেবের প্রায়ই দেখাশুনা হয়, ইহাকে ধরিলে নিশ্চয় চাকরি মিলিতে পারে। মাসারিক আমেরিকান মেয়ে বিবাহ করিয়াছেন শুনিয়া তাঁহার দেশের লোক মনে করিল, তিনি নিশ্চয় কোটিপতি শ্বশুর পাইয়াছেন; তাঁহার মোরাভিয়া প্রদেশের লোকে সমবেত হইয়া তাঁহার কাছে একখানি দরখাস্ত পাঠাইয়াছিল যে যৌতুকের টাকা হইতে মাসারিক যেন মোরাভিয়া প্রদেশের জন্য একটা রেল-রাস্তা তৈয়ার করাইয়া দেন।

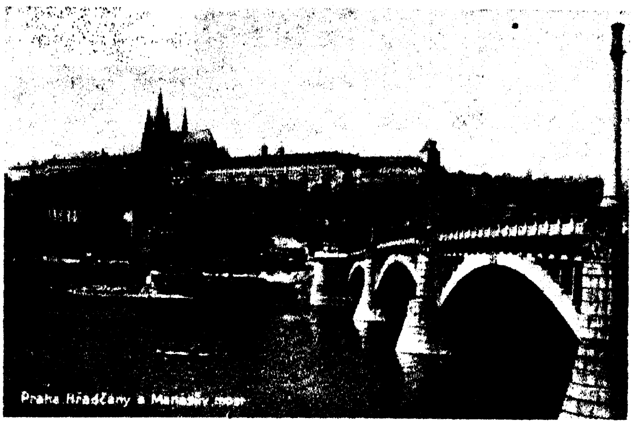
দরিদ্র হইলেও অধ্যাপকরূপে মাসারিক খ্যাতি অর্জ্জন করেন। ছাত্র-সম্প্রদায়ের মধ্যে তাঁহার বিশেষ প্রভাব ছিল। শুধু বিজ্ঞানের চর্চ্চা বা ছাত্র-পড়ানতেই তিনি তাঁহার অধ্যাপকের কর্ম্ম শেষ হইল মনে করিতেন না, ছাত্রদের সর্ব্ববিধ জ্ঞানচর্চ্চার তিনি সহায়ক ছিলেন, সকল প্রসঙ্গে তাহাদের সঙ্গে তর্ক করিতেন ও তাহাদের উদ্বুদ্ধ করিবার চেষ্টা করিতেন। শুধু নিজের বিষয় ছাড়া, মানুষের চিন্তনীয় যত বিষয় আছে, সব বিষয় সম্বন্ধে নিজের মতামত তিনি ছাত্রসমাজে প্রচার করিয়া তাহাদের চিন্তা ও বিতর্ক-বুদ্ধির সহায়তা করিতেন। এজন্য সহকর্ম্মী অনেক অধ্যাপক তাঁহার উপর অপ্রসন্ন ছিলেন। মাসারিকের এই দরিদ্র অধ্যাপক অবস্থাতে তাঁহার একটি ছাত্র মারা যায়; ছাত্রটি ধনী ছিল ও মাসারিককে তাহার সমস্ত অর্থের উত্তরাধিকারী নিয়োগ করিয়া যায়। মাসারিক এই উত্তরাধিকারসূত্রে অনেক অর্থ পাইয়া তাহা ব্যয় করিলেন এই ভাবে—বাপের অবস্থা উন্নতির জন্য তাঁহাকে গাড়োয়ানী ছাড়াইয়া একটি সরাইখানা কিনিয়া তাহার মালিক করিয়া দিলেন; ছোট ভাইকে একটি ছাপাখানা কিনিয়া তাহার মালিক করিয়া দিলেন; বাকী অর্থ দরিদ্র ছাত্রদের সাহায্যের জন্য বিতরণ করিলেন—নিজের জন্য এক পয়সাও রাখিলেন না। দর্শনের অধ্যাপক ও মানুষ, দুই রূপেই মাসারিক সত্যানুসন্ধিৎসা, সত্যনিষ্ঠা ও সত্য-প্রকাশকে চরম কর্ত্তব্য মনে করিতেন। "যাহা অসত্য তাহা কখনই মহৎ হইতে পারে না"—ইহাই ছিল তাঁহার মূলমন্ত্র। অসত্য ছিল তাঁহার কাছে অধর্ম্ম, সত্য বলিতে তিনি কাহাকেও ডরাইতেন না, কোন বাধা মানিতেন না, কোনও স্বার্থকে গ্রাহ্য করিতেন না; তাঁহার সকল শক্তি একমুখী করিয়াছিলেন অসত্য-দমন ও সত্য-প্রকাশের সাধনায়। ইহার জন্য লাঞ্ছনাও তাঁহাকে ভোগ করিতে হইয়াছিল কম নয়। সে-সময়ে চেক্-জাতীয়ত্বের বন্যা প্রবল হইয়া উঠিতেছিল, নবোদ্বুদ্ধ জাতীয়ত্বের মর্য্যাদায় চেকরা নিজেদের প্রাচীন ইতিহাস, সাহিত্য, কলা প্রভৃতির আবিষ্কার ও চর্চ্চা করিতেছিলেন। মাসারিকও এই দলে ছিলেন। এমন সময় এক জন খ্যাতনামা চেক্ অধ্যাপক কতকগুলি প্রাচীন পুঁথি আবিষ্কার করিয়া তাহার চেক্-উদ্ভব প্রমাণ করিলেন। চেক্-জাতি ইহাতে গৌরবে উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিল, চেক্-সংস্কৃতির প্রাচীনত্বের আর কোন সন্দেহ রহিল না। মাসারিক পুঁথিগুলি পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইলেন যে পুঁথিগুলি জাল করা, খাঁটি নয়; পুরাতন হইতে পারে, কিন্তু উহাতে জালিয়াতির লক্ষণ বর্ত্তমান, সুতরাং অবিশ্বাস্য। জাতীয়তাবাদীরা ইহাতে ক্ষেপিয়া উঠিল, মাসারিককে স্বজাতিদ্রোহী, মিথ্যাবাদী, ঝুটা অধ্যাপক প্রভৃতি বলিয়া গালাগালি করিল, পণ্ডিতে মূর্খে মিলিয়া তাঁহাকে আক্রমণ করিল। মাসারিক গ্রাহ্য করিলেন না, বৈজ্ঞানিক প্রমাণ, ভাষাতত্ত্ব, পুঁথিতত্ত্বের যে-সব প্রমাণের উপর নির্ভর করিয়া তিনি উহার বিশুদ্ধতায় সন্দিহান হইয়াছেন তাহাই লোকসমাজে প্রকাশ করিলেন। এই পুঁথিগুলি সম্বন্ধে আমি পণ্ডিতদের সঙ্গে আলোচনা করিয়াছি, বিশেষজ্ঞদের মতও শুনিয়াছি, এখন সকলেই বিশ্বাস করেন যে সম্পূর্ণ জাল না হইলেও পুঁথিগুলিতে সন্দেহজনক এমন অনেক জিনিষ আছে যাহাতে তাহার পূর্ণ প্রাচীনত্ব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে না। মাসারিক এ বিষয়ে দৃষ্টি আকর্ষণ না করিলে এ দিকটা অপ্রকাশিতই থাকিয়া যাইত, কিন্তু জাতীয় গৌরবের চেয়ে সত্য-প্রতিষ্ঠাকেই তিনি বড় মনে করিয়াছিলেন।

আর একটি ঘটনায় মাসারিকের সত্যনিষ্ঠা তাঁহার জীবন-সংশয়ের কারণ হইয়াছিল। একটি খ্রীষ্টান বালিকার মৃত্যু-সম্পর্কে একটি ইহুদী ছোকরা অভিযুক্ত হয়। ইহুদী-বিদ্বেষ শুধু হিটলারের আবিষ্কার নয়, সারা ইউরোপে ব্যাপকভাবে বর্ত্তমান। লোকে বলিল, ইহুদীদের মধ্যে আনুষ্ঠানিক নরহত্যা (ritual murder) প্রথা প্রচলিত, তাহারই ফলে

ছোকরা অন্যের প্ররোচনায় বালিকাকে হত্যা করিয়াছে। পুলিস আসামীর বিরুদ্ধে বহু প্রমাণ উপস্থিত করিল, প্রধান প্রমাণ ইহুদীদের আনুষ্ঠানিক নরহত্যা। ছোকরার প্রাণদণ্ডের জন্য দেশবাসী ক্ষেপিয়া উঠিল। মাসারিক এ-বিষয়ে অনুসন্ধান করিয়া প্রকাশ করিলেন যে পুলিসের আনীত অধিকাংশ প্রমাণই অবিশ্বাস্য এবং আনুষ্ঠানিক নরহত্যার কথা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বহুতর শাস্ত্রীয়, ঐতিহাসিক ও লৌকিক প্রমাণ দিয়া তিনি তাঁহার তর্কযুক্তি প্রকাশ করিলেন। দেশের লোক জ্বলিয়া উঠিল, খবরের কাগজে, পথে-ঘাটে, সভা-সমিতিতে লোকে তাঁহাকে দেশ-, সমাজ- ও ধর্ম্ম- দ্রোহী বলিয়া গালাগালি ও অপমান করিল। তাঁহার ছাত্রেরা পর্য্যন্ত তাঁহার বিপক্ষে দাঁড়াইল। অপরাধ নির্ভুল প্রমাণিত না হইলেও বিচারে লোকমতের খাতিরে ছোকরার প্রাণদণ্ড হইল। মাসারিক সমস্ত বিরুদ্ধতা অগ্রাহ্য করিয়া প্রাণদণ্ড রহিত করিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন। সকলেই বলিতে লাগিল তিনি ইহুদীদিগের কাছে বিস্তর ঘুষ খাইয়াছেন। যাহা হউক, শেষটা চরম বিচারপতিরা প্রাণদণ্ড রহিত করিয়া যাবজ্জীবন কারাবাসের ব্যবস্থা করেন।* কিন্তু মাসারিক যে ধনী ইহুদীদের কাছে বহু অর্থ লাভ করিয়াছেন ইহাতে লোকের কোন সন্দেহ রহিল না। এই সময় তাঁহার বুড়া বাপ গ্রাম হইতে প্রাহায় ছেলের বাড়ীতে আসিলেন। তাঁহার আগমনের উদ্দেশ্য কিছুই বুঝা গেল না, কিছুই বলিলেন না, দিনকয়েক শহর দেখিয়া বেড়াইলেন, বড়লোকদের বাড়ীর দরজায় চাকর-গাড়োয়ানদের সঙ্গে বসিয়া পাইপ টানিয়া আলাপ করিয়া বেড়াইতে লাগিলেন, অবশেষে একদিন নির্জ্জনে ছেলেকে বলিলেন, "বাপু হে, আমার সরাইখানাটা ভাল চলিতেছে না, তোমার ঐ ঘুষের টাকাটা হইতে কিছু যদি দাও তবে ব্যবসাটার আবার উন্নতি করিতে পারি, কিছু জমিজমাও কিনিতে ইচ্ছা হইয়াছে।" মাসারিক সব নির্যাতন অপবাদ লাঞ্ছনা খাড়া হইয়া সহিয়াছিলেন, কিন্তু তাঁহার নিজের পিতাও যে তাঁহাকে ঘুষখোর বলিয়া বিশ্বাস করিতে পারিলেন ইহাতে তাঁহার দৃঢ়তা একেবারে ভাঙিয়া গেল, ভগ্নোৎসাহ হইয়া তিনি চাকরি ছাড়িয়া প্রাহা ত্যাগের সংকল্প করিলেন। পত্নী শার্লটি তাঁহাকে বুঝাইয়া ও সান্ত্বনা-উৎসাহ দিয়া তাঁহাকে প্রাহা ত্যাগের সংকল্প হইতে নিরস্ত করেন।

যাহা হউক, সাধারণের স্মরণশক্তি কম, মিথ্যার শক্তিও বেশী দিন টিঁকে না। কিছু দিন পরে মাসারিক আবার পূর্ব্বপ্রতিষ্ঠা লাভ করিলেন। ক্রমে তিনি পার্লেমেণ্টের সভ্য নির্ব্বাচিত হইলেন। পার্লেমেণ্টের সভ্য হিসাবেও মাসারিকের প্রধান অবলম্বন ছিল খাঁটি তথ্য, প্রমাণ ও পূর্ণ সত্যবাদিতা। কেহ কেহ তাঁহাকে মাথাগরম গোঁয়ার মনে করিত, কিন্তু অধিকাংশ দেশবাসীরই তিনি বিশ্বাসের পাত্র হইলেন। দেশের মুক্তি ও স্বজাতীয়ের উন্নতির জন্য তিনি সর্ব্বদা প্রয়াসী ছিলেন। পার্লেমেণ্টের সদস্যরূপে একটি ঘটনায় তাঁহার হস্তক্ষেপ উল্লেখযোগ্য। অষ্ট্রিয়া ও সার্বিয়ার সঙ্গে সে সময়ে রেষারেষি চলিতেছিল। সার্বিয়াকে অপদস্থ করিবার জন্য একটা মিথ্যা মামলার আয়োজন করা হয় ও ঘুষ দিয়া সাজানো সাক্ষী আমদানি করা হয়। পার্লামেণ্টের সার্বিয়ান ও ক্রোটিয়ান সভ্যেরা অধ্যাপক ফ্রিডইয়ুং নামক এক জন সাক্ষীর বিরুদ্ধে মানহানির মামলা আনেন। মাসারিক এই মামলায় সাক্ষ্য দেন। অধ্যাপক ফ্রিডইয়ুং বলেন যে তাঁহার মন্তব্য তিনি হাপসবুর্গ রাজদপ্তরের দলিলের উপর নির্ভর করিয়া বলিয়াছেন। মাসারিক আদালতে সাক্ষ্য দিলেন যে, হাপসবুর্গ-বংশের প্ররোচনায় বেলগ্রেডস্থ অষ্ট্রিয়ান রাজদূত এই দলিল জাল করিয়াছেন। মাসারিকের এই সাক্ষ্যের ফলে, তদানীন্তন অষ্ট্রিয়ান সম্রাটের পররাষ্ট্রসচিব এহরেন্টাল লোকচক্ষে বিশেষ অপদস্থ হন। মাসারিক এই সময়ে বেলগ্রেডে গিয়া সাক্ষ্য-প্রমাণ সংগ্রহ করিতে থাকেন এবং ঐ দলিলগুলি সরকারী দপ্তর হইতে চুরি করান (যোগঃ কর্ম্মসু কৌশলং!)। ব্যাপার এতদূর গড়াইল যে শেষে এ-বিষয়ের সত্যতা নির্দ্ধারণের জন্য পার্লেমেণ্টের একটি কমিটি নিযুক্ত হয় ও মাসারিক এই কমিটির সম্মুখে অকাট্য যুক্তি প্রয়োগ করিয়া সাক্ষাৎ দলিল উপস্থিত করিয়া প্রমাণ করেন যে সেগুলি জাল। কমিটির অনুসন্ধানের সময় মাসারিকের প্রমাণের উত্তরে মন্ত্রী এহরেন্টাল বলেন,

* পরবর্ত্তী কালে প্রেসিডেণ্ট নিযুক্ত হইয়া মাসারিক এই ইহুদীকে কারামুক্ত করেন।



প্রাহার রাজপ্রাসাদ—বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতির বাসস্থান

ভাল আলাপ হইলে এদেশে পাঁচ জনের কাছে পরিচয় ও সুপারিশ মিলে। এক জন নামজাদা বা প্রতিষ্ঠাবান লোকের বিশ্বাস বা শ্রদ্ধার পাত্র হইতে পারিলে, সমশ্রেণীর দশ জনে স্বতঃই বিশ্বাস ও শ্রদ্ধা করে, ব্যক্তিগত পরিচয় নিকটতর হইলে সম্মানও গভীরতর ও বৃহত্তর হয়। অবশ্য, ইহা জুয়াচুরি ধাপ্পাবাজির দ্বারা হয় না, বাস্তবিক যোগ্যতা ও চরিত্রবল থাকা চাই এবং মাসারিকের ইহা খুবই ছিল। সেই জন্য তিনি পণ্ডিত-মহলে সর্ব্বত্র সুপরিচিত হইলেন।

"মশায়, রাজনৈতিক ব্যাপারে অনধিকারচর্চ্চা না করিয়া ভবিষ্যদ্বংশীয় ছোকরাদের ফিলসফি পড়ানই আপনার পক্ষে ভাল হইবে।" মাসারিক উত্তরে বলিয়াছিলেন, "ক্যাবিনেট-মন্ত্রীরূপে এরূপ মন্তব্য করা আপনার শোভা পায় না; আপনাকে আমি পলিটিক্সে যত নম্বর দিয়াছি, লজিকের পরীক্ষকরূপেও তার চেয়ে বেশী নম্বর দিতাম না।"

তার পর যুদ্ধ আরম্ভ হইল। এই মহাযুদ্ধের সহায়তায় মাসারিক তাঁহার দেশকে স্বাধীন করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার একটি কথায় তাঁহার এ সম্বন্ধীয় কার্য্যাবলীর মূলনীতি স্পষ্ট হইবে—"সাহস ও দৃঢ়প্রতিজ্ঞাই যথেষ্ট নয়, একটি সুচিন্তিত কার্য্যপ্রণালীই একান্ত আবশ্যক।" মাসারিকের কার্য্যপ্রণালী হইয়াছিল এইরূপ—মাসারিক অধ্যাপক হওয়ার পর প্রায় প্রত্যেক বৎসর দীর্ঘ ছুটিতে দেশভ্রমণে যাইতেন। চেকোস্লোভাকিয়ায় জাতীয় আন্দোলন খুব প্রবল ছিল, মাসারিক যে ইহার এক জন প্রধান পাণ্ডা তাহাও সকলে জানিত, অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট তাঁহার উপর সন্দিগ্ধ দৃষ্টিও রাখিতেন। কিন্তু মাসারিক যেন বিজ্ঞানচর্চ্চার জন্য বিদেশে যাইতেছেন এরূপ ভান করিতেন। দর্শনশাস্ত্র ও তৎসম্বন্ধে অন্যান্য বিষয়ের বড় বড় বিদেশীয় অধ্যাপকদের সঙ্গে তিনি বৈজ্ঞানিক বিষয়ে পত্রালাপ ও লেখা আদান-প্রদান করিতেন। তার পর সেই সব দেশে নিজে গিয়া এই পণ্ডিতদের সঙ্গে আলাপ করিতেন। এক জনের সঙ্গে

বিদেশ হইতে বক্তৃতার আহ্বান আসিতে লাগিল। দর্শন ছাড়া অন্য বিষয়ের পণ্ডিতদের সঙ্গে ও সেই সূত্রে অন্য বিদ্যাবিশিষ্ট ব্যক্তিদের সঙ্গে ঘনিষ্ঠতা হইল। এইরূপে বিজ্ঞানের সূত্রে বিদেশের যোগ্য লোকদের মধ্যে তিনি একটি বিশ্বস্ত হিতৈষী-চক্র সৃষ্টি করিলেন। তার পর বিজ্ঞান ছাড়িয়া কাজের কথা অর্থাৎ দেশ স্বাধীন করিবার কথা আলোচনা করিতে লাগিলেন। সর্ব্বোচ্চ রাষ্ট্রীয় মণ্ডলীর মধ্যে তাঁহার কাজ চলিতে লাগিল। যুদ্ধ আরম্ভের পর তিনি দেশত্যাগ করিয়া প্যারিসে গিয়া বাস করিতে লাগিলেন ও আমেরিকা, ইংলণ্ড, ইটালী, রুশিয়া প্রভৃতি ঘুরিয়া পূর্ব্বার্জ্জিত প্রতিষ্ঠার বলে উচ্চতম রাষ্ট্রচক্রে গতায়াত করিয়া নিজ দেশের স্বাধীনতায় সকলকে রাজি করাইলেন ও শেষে সকলের কাছে প্রতিশ্রুতি আদায় করিলেন যে, চেকোস্লোভাকিয়া যদি জার্ম্মানী ও অষ্ট্রিয়ার বিপক্ষে যুদ্ধ করে তবে যুদ্ধ সমাপ্তির পর মিত্রশক্তিরা (Allied Powers) চেক স্বাধীনতা গ্যারাণ্টি করিতেছেন। বিদেশে থাকিলেও তাঁহার এবং তাঁহার দলের সম্বন্ধে অষ্ট্রিয়ান সরকার সর্ব্বদা বড় সতর্ক থাকিতেন, তৎসত্বেও তিনি দেশস্থ দলের সহিত বড় চাতুর্য্যে নিরন্তর যোগসূত্র রক্ষা করিয়া, দেশের ভিতরের ব্যাপার সুকৌশলে পরিচালনা করাইয়া দেশে বিদ্রোহ প্রকাশ করাইলেন। অষ্ট্রিয়ান গবর্ণমেণ্ট ইহাতে বিপর্য্যস্ত হইবে

নিজেদের অধিকার ছাড়িলেন না, একটু বেশী ক্ষমতা দিয়া চেক্‌দের ঠাণ্ডা রাখিতে চেষ্টা করিতে লাগিলেন। মাসারিকের পরিচালনায় দেশবাসী এই নূতন ক্ষমতা অষ্ট্রিয়ার বিরুদ্ধে প্রয়োগ করিতে লাগিল। তার পর মাসারিক চেক্‌দের স্বাধীনতা ঘোষণা করিয়া অষ্ট্রিয়ান রাজত্ব অস্বীকার করিলেন ও প্যারিসে নিজেদের জাতীয় প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্ট স্থাপন করিলেন। বিদেশবাসী চেক্‌দের দলবদ্ধ করিয়া তাহাদের দ্বারা এই প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্ট তিনি স্বীকার করাইলেন, তাহাদের চাঁদায় এই গবর্ণমেণ্টের ও দেশের বিদ্রোহের খরচ চলিতে লাগিল। বিদেশবাসী চেকদের একটি রেজিমেণ্ট গঠন করিয়া ও তাহাদিগকে যুদ্ধ শিক্ষা দিয়া অষ্ট্রিয়া-জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে মিত্রশক্তির পক্ষে যুদ্ধে পাঠাইলেন। অষ্ট্রিয়ার অধীন ও অষ্ট্রিয়ার বেতনভোগী যে-সকল চেক সৈন্যে রুশিয়া, ফরাসী ও ইটালীয়ান সীমান্তে মিত্রশক্তিদের বিপক্ষে যুদ্ধ করিতেছিল তাহাদের অনেক রেজিমেণ্ট তাঁহার প্ররোচনায় নিজ দল ছাড়িয়া রাত্রে সীমান্ত পার হইয়া মিত্রশক্তিদের পক্ষে যোগ দিয়া অষ্ট্রিয়া ও জার্ম্মানীর বিরুদ্ধে লড়াই করিতে লাগিল। প্যারিসের প্রভিশনাল চেক-গবর্ণমেণ্ট মিত্রশক্তিরাও স্বীকার করিলেন ও যুদ্ধ-অবসানের পর পূর্ব্ব ব্যবস্থা মত মাসারিকের দেশ স্বাধীন হইল। মাসারিকের এই সব কাজে তাঁহার দক্ষিণহস্তস্বরূপ ছিলেন ডক্টর বেনেশ। বেনেশও চেক ইউনিভার্সিটিতে সমাজতত্ত্বের অধ্যাপক ছিলেন, যুদ্ধের সময় ফ্রান্সে ছিলেন প্যারিসের প্রভিশনাল গবর্ণমেণ্টে। পরে স্বাধীন চেকোস্লোভাকিয়ার মন্ত্রীসভায় মাসারিক বেনেশকে তাঁহার পররাষ্ট্রসচিব নিযুক্ত করেন। বেনেশ নিজে চাষার ছেলে।

যে দীর্ঘকাল মাসারিক প্রেসিডেণ্ট পদে ছিলেন সে সময়ে তাঁহার সত্যপ্রিয়তা, ন্যায়নিষ্ঠা ও কর্ত্তব্যপরায়ণতায় দেশের সকলের অচল শ্রদ্ধা ছিল। তাঁহার দীর্ঘ ঋজু দেহে, মুখের প্রত্যেক রেখায় তাঁহার সরলতা, দৃঢ়তা ও চরিত্রবত্তার পরিচয় পাওয়া যায়। আজ জীবনের সন্ধ্যায় তিনি কর্ম্ম হইতে অবসর গ্রহণ করিয়া শহরের বাহিরে বাস করেন, তাঁহার স্বাস্থ্য ও জরাধর্ম্মে ভাঙিয়া আসিতেছে। দেশে বাড়ীতে ঘরে ঘরে তাঁর মূর্ত্তি ও ছবি, ইহা ফাসিষ্ট ডিক্টেটরের প্রতি ভয়প্রসূত নয়, "আমাদের দেশের উদ্ধারকর্ত্তা ও প্রথম প্রেসিডেণ্টের" প্রতি দেশবাসীর সহজ শ্রদ্ধার পূজোপহার।

মাসারিকের প্রবাসকালে তাঁহার স্ত্রী দেশেই ছিলেন, স্বামী প্রেসিডেণ্টরূপে কাজ করিবার কিছু দিন পরে স্ত্রী মারা যান। ইঁহাদের দুটি ছেলে, দুটি মেয়ে। বড় ছেলেটি চিত্রকর ছিল, যুদ্ধের সময়ে লড়াইয়ে গিয়া টাইফয়েডে মারা যায়। ছোট ছেলেটি এখন লণ্ডনে চেকোস্লোভাকিয়ার রাজদূত। বড় মেয়েটি অবিবাহিতা, এখানকার রেড ক্রসের সভাপতি। ছোট মেয়েটির জেনিভাতে বিবাহ হইয়াছে।

চৈত্র-বেলা

শ্রীমণীশ ঘটক

আমার বাগানভরা প্যান্সি পপি ডালিয়ার মেলা,
আমার আকাশ'পরে করোজ্জ্বল অরুণের খেলা,
আমার বাতাসে কত জুঁই বেলা চামেলীর ঘ্রাণ,
আমার অপরাজিতা নিত্য আনে সুনীল আহ্বান।

আমার পাখীরা সব ভিড় ক'রে ওড়ে আশেপাশে,
ঝুঁটিওলা লক্কা দুটি আমারেই বেশী ভালবাসে।
লোবাজ, লোটন জোড়া, ঘাড়ফুলো মক্ষি তার সাথে,
আপন দেমাকে তারা আকাশে পাষাণ-কারা গাঁথে।

ও বাড়ীর বুলবুল, মাঝে মাঝে সেও আসে কাছে,
শপেদার ফাটলেতে যত ঝিঁঝিঁ বাসা বাঁধিয়াছে।
একঘেয়ে সারিগানে চৈত্র-বেলা করে স্বপ্নাতুর ;
থমকি দাঁড়ায়ে শোনে কাঠবেড়ালীরা সেই সুর।

আমিও চমকি চাহি। দিগন্তে দিনের চিতাধূম
নিবে আসে। নেমে আসে তোমার আঁচলঢাকা ঘুম।

রক্ষাকবচ

শ্রীসীতা দেবী

লক্ষ্মীদেবীর ও শনিঠাকুরের বিবাদ চিরপ্রসিদ্ধ। দেবী যাহার উপর কৃপা করেন, অল্পদিনের মধ্যেই শনির দৃষ্টি পড়ে তাহার উপর ; চতুর ঠাকুরটি সর্ব্বদাই ছিদ্র খুঁজিয়া বেড়াইতে আরম্ভ করেন কেমন করিয়া সেই মানুষটার সর্ব্বনাশ করিবেন।

মিত্র-বংশের উপর এত দিন কমলার সুদৃষ্টি অচলা হইয়া ছিল। ত্রিলোচন মিত্র নিজের চেষ্টায় বিষয়সম্পত্তি গড়িয়া তোলেন। তাঁহার তিন ছেলে—বংশলোচন, রামলোচন আর কমললোচন। তিন জনেই মানুষ হইয়া উঠিয়াছেন, এবং পৈতৃক সম্পত্তি উড়াইয়া না দিয়া বরং আরও ধন-ঐশ্বর্য্যে সংসার-তরণীটিকে বোঝাই করিয়া তুলিতেছেন। বংশলোচন পৈতৃক কারবারটি দেখাশুনা করেন, রামলোচন ওকালতী করিয়া বেশ দু-পয়সা ঘরে আনিতেছেন, গৃহিণীর নামে তেজারতির ব্যবসাটাতেও প্রচুর পয়সা উপায় হয়। কমললোচন ডাক্তার, তাঁহারও পসার-প্রতিপত্তি কিছুমাত্র কম নয়।

মা-ষষ্ঠীর কৃপা কিন্তু এ-বংশের উপর খুব বেশী নয়। বংশলোচনের একটি মাত্র ছেলে, রামলোচনের একটি ছেলে একটি মেয়ে, কমললোচনের নামে দুটি ছেলে বটে, তবে ছোটটি বিকলাঙ্গ, জন্মান্ধ। সে শুধু পিতামাতার মনস্তাপের কারণ হইয়া সংসারে বাঁচিয়া আছে।

হঠাৎ কোন্ ছিদ্রপথে শনিঠাকুর এই সংসারে প্রবেশ করিলেন বলা যায় না। রামলোচনের মেয়ে সুষমা ভরা-যৌবনে বিধবা হইয়া বাপের বাড়ী ফিরিয়া আসিল। বংশলোচনের ছেলে বিনয় ঘোড়া হইতে পড়িয়া গিয়া এমন সাংঘাতিক আঘাত পাইল যে তাহাকে আর রাখা গেল না।

বাড়ীতে হাহাকার পড়িয়া গেল। যদিও তাঁহারা একান্নবর্ত্তী ছিলেন না, তবুও পৈতৃক বসতবাড়ী তিন ভাগে বিভক্ত করিয়া পাশাপাশিই বাস করিতেছিলেন। কলি-যুগের রাম লক্ষ্মণ না হইলেও ভাইয়ে ভাইয়ে এখনও মুখ দেখাদেখি বন্ধ হয় নাই। জায়ে জায়ে ঝগড়া-বিবাদটাও খুব প্রবল ছিল না, কারণ তিন জনেরই অবস্থা প্রায় এক রকম, কাহাকেও অপরের ঐশ্বর্য্য দেখিয়া জ্বলিয়া মরিতে হইত না।

দুপুর বেলা। কমললোচনের গৃহিণী হৈমবতী মেঝের উপর শীতলপাটি পাতিয়া শুইয়া আছেন। তাঁহার পাশে বসিয়া একটি প্রৌঢ়া বিধবা মাথার চুলে বিলি দিয়া তাঁহাকে আরাম দিবার চেষ্টা করিতেছেন। এই মানুষটি হৈমবতীর বাপের বাড়ীর দূরসম্পর্কের আত্মীয়া, তাঁহার আশ্রয়েই বাস করেন, সংসারের কাজে সাহায্য করেন।

হৈমবতী খানিক এ-পাশ ও-পাশ করিয়া হঠাৎ উঠিয়া বসিলেন, বলিলেন, "নাঃ, এ পোড়া চোখে আর ঘুম আসবে না।"

কামিনী ঠাকুরাণী বলিলেন, "ওমা, এর পর শরীর ভেঙে পড়বে যে? কাল পরশু দু-দিন দু-রাত ত চোখে-পাতায় এক কর নি। এ রকম করলে চলবে কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "এ সব কি আর মানুষের হাতে ধরা গা? ঘুমুতে চাইলেই ঘুম আসবে কেন? ভয়ে বুকের রক্ত জল হয়ে আসছে না? পাশে দুই ঘরে এই সব কাণ্ড, আমারই বরাতে কি আছে কে জানে? মনে মনে খালি মা-মঙ্গলচণ্ডীকে ডাকছি। কখনও কারও অনিষ্ট করি নি বাপু, কিন্তু তা বললে শুনছে কে? ঐ দেখ আমার অদৃষ্টের নমুনা।

অন্ধ বিমল এমন সময় খোঁড়াইতে খোঁড়াইতে ঘরে আসিয়া ঢুকিল। বলিল, "খিদে পেয়েছে।"

তাহার মা বলিলেন, "দাও ত গা ওকে গোটা দুই আম। এখন এ মাসটা এর কষ্টেই যাবে। অশুচের মধ্যে

খালি খাই খাই করবে, মাছ ছাড়া ত এ ছেলের মুখে এক গ্রাস ভাত ওঠে না।"

কামিনী উঠিয়া গেলেন বিমলকে আম দিতে। সে আম লইয়া হাতড়াইতে হাতড়াইতে বাহির হইয়া গেল। ছেলেটির বয়স প্রায় কুড়ি, কিন্তু দেহ-মন দুই-ই বালকের মত। বুদ্ধিবৃত্তিরও বিশেষ বিকাশ হয় নাই।

কামিনী আবার ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আচার্য্যি মশাইয়ের কাছে লোক পাঠাবে বলেছিলে, তা পাঠালে না?"

হৈমবতী বলিলেন, "কখন পাঠাই বল! সকাল থেকে দিদির কাছ ছেড়ে কি নড়তে পেরেছি? হতভাগীর কি কপাল মাগো মা! পেটে ধরল ঐ মোটে একটা, এত বড়টা হ'ল, কত সাধ-আহ্লাদ ক'রে এই গেল বছর বিয়ে দিল, আর দেখ এখন দশা! বৌ আবাগীরই বা কি অদেষ্ট।"

কামিনী বলিল, "পোয়াতী, না?"

হৈমবতী বলিলেন, "এই ত সামনের মাসে ছেলে হবে। ঘটা ক'রে মেয়েকে নিয়ে গেল বুড়োবুড়ী, বলে হ'লেই বা আমাদের পাড়াগাঁ, তাই ব'লে প্রথম পোয়াতী মেয়ে বাপের বাড়ী আসবে না?"

কামিনী বলিলেন, "এখন একটি বেটাছেলে হয় তবে না বংশটা থাকে।"

দরজার বাহিরে দাঁড়াইয়া এক জন চাকর গলা খাঁকারি দিয়া বলিল, "বড় দাদাবাবু গোটা তিন টাকা চাইছেন মা।"

হৈমবতী বলিলেন, "তাকে ডাক দিকি এখানে, খালি টাকা আর টাকা। এই দুপুর রোদে কোথায় বেরবে সে?" চাকরটা চলিয়া গেল।

হৈমবতীর বড়ছেলে অমলের বয়স প্রায় পঁচিশ হইতে চলিল। ছেলেটি কেমন যেন অস্থিরমতি। সে একবার গেল এম্‌-এ পড়িতে, আবার গিয়া আইন পড়িতে ছুটিল। মাস পাঁচ-ছয়ের বেশী তাহাও অমলের ধাতে সহিল না, কারবারে শিক্ষানবিশী করিতে সে জ্যাঠামহাশয়ের দোকানে গিয়া ভিড়িল। ঘরে খাইবার-পরিবার কোনো ভাবনা নাই, বাপ এখনও দিব্য কর্ম্মক্ষম আছেন, নিজেরও সংসার হয় নাই, কাজেই উড়িয়া উড়িয়াই তাহার দিন কাটিয়া যাইতেছে।

মায়ের ডাকে অমল ভিতরে আসিয়া দরজার কাছে দাঁড়াইল। বলিল, "ডাকছ কেন?"

হৈমবতী বলিলেন, "তুই এই দুপুর রোদে কোথায় যাচ্ছিস শুনি? খালি পায়ে যাবিই বা কি ক'রে?"

অমল বলিল, "গাড়ী ভাড়া ক'রে যাব বলেই ত টাকা চাচ্ছি। আমায় পরেশের ওখানে এক বার যেতেই হবে।"

মা বলিলেন, "বাড়ীতে এই বিপদ, আর এখন পরেশ-নরেশ ক'রে হৈ হৈ ক'রে বেড়াবি? লোকেই বা বলে কি? তোর জ্যাঠাইমার কাছে ত আজ সকাল থেকে একবারও যাস নি?"

অমল বলিল, "আমি গিয়ে আর তাঁর কি স্বর্গে বাতি দিয়ে দেব? যা হবার তা ত হয়ে গেছে, দাদা ত আর ফিরবে না।"

মা বলিলেন, "তবু সমাজের নিয়ম মেনে ত চলতে হবে? অশুচের সময় কেউ লোকের বাড়ী বাড়ী ঘোরে না।"

অমল বলিল, "তা আমি চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে বন্ধ হয়ে থাকতে পারব না। আর যা বাড়ীর আবহাওয়া হয়েছে, কান্নার শব্দ ছাড়া আর কোনো আওয়াজ নেই। নিজেই বেঁচে আছি কি না সে-বিষয়ে সন্দেহ হচ্ছে।"

মা শিহরিয়া বলিয়া উঠিলেন, "ষাট, ষাট কি যে বলিস্ তার ঠিক নেই। নে বাপু, তোর টাকা নিয়ে যেখানে খুশী যা। রোদে টো-টো করবি না কিন্তু।"

"আচ্ছা", বলিয়া টাকা লইয়া অমল চলিয়া গেল। সে সুখী প্রকৃতির মানুষ, নিজের আরামের উপর জগতের কোনো জিনিষকে স্থান দেয় না। বাড়ীর এই শোকের আবহাওয়া, নিরন্তর কান্নাকাটি, দীর্ঘশ্বাস, তাহার ধাতে সহিতেছিল না। তাই কোনোমতে বাড়ী হইতে পলাইয়া গিয়া সে বাঁচিল। সিনেমায় যাইতে পারিলে মনটা সত্য সত্যই হাল্‌কা হইত, কিন্তু সেখানে যদি কেহ তাহাকে দেখিতে পাইয়া মাকে বলিয়া দেয়, তাহা হইলে আবার বকাবকির সীমা থাকিবে না। অগত্যা পরেশের বাড়ী গিয়া তাস খেলিয়া দিনটা কাটাইয়া দিয়া আসিবে স্থির করিয়া সে বাহির হইয়া গেল।

সে চলিয়া যাইতেই হৈমবতী উঠিয়া পড়িলেন। এক জন চাকরকে ডাকিয়া বলিলেন, "যা ত নারান আচাযি্য মশায়ের বাড়ী; আমার নাম ক'রে বলবি যে সন্ধ্যে নাগাদ একবার নিশ্চয় যেন আসেন। বিশেষ দরকার।"

কামিনী বলিলেন, "এক গেলাস সরবৎ ক'রে আনি দিদি? সকাল থেকে ত দু-গ্রাস ভাতে-ভাত ছাড়া মুখেও কিছু দিলে না!"

গৃহিণী বলিলেন, "তা দাও। মনটা বড় উতলা হয়ে রয়েছে বোন। ঐ একটির মুখ চেয়ে বেঁচে আছি এ সংসারে।"

কামিনী সরবৎ আগেই ভিজাইয়া রাখিয়াছিলেন। এখন দুইটি পাথরের গেলাস আনিয়া ঢালিয়া ঢালিয়া তাহা মিশাইতে লাগিলেন। বলিলেন, "বিয়ের যুগ্যি ছেলে হ'ল, বিয়ে দাও না কেন? ঘরে মন বসবে কেন? যখনকার যা তা ত চাই?"

হৈমবতী বলিলেন, "আমি ত দিতেই চাই, ওর বাপই মত করে না। বলে এখনও কাজকর্ম কিছুর ঠিক নেই, সাত-তাড়াতাড়ি বিয়ে কেন?"

কামিনী বলিলেন, "তাতে কি? তোমার ছেলে-বৌয়ের কি ভাত জুটবে না? এত সব কার জন্যে? পুরুষমানুষদের স্বভাবই ঐ, কোনো জিনিষ তারা সোজা চোখে দেখবে না। আমার শ্বশুর ছিলেন ঠিক ঐ ধাতের। দেওর ছোঁড়াটা বি-এ পাস করতে পারলে না, তা আর কিছুতেই তার বিয়ে দিলেন না। অথচ ঘরে ধান-চাল ত ছিল, দু-মুঠো খেতে নিশ্চয়ই পেত। তাতে লাভটা কি হ'ল শুনি, ছেলেটা একেবারে বয়ে গেল না?"

হৈমবতী সরবৎ খাইয়া মেঝেতে গেলাসটা নামাইয়া দিয়া বলিলেন, "দেখি আবার বুঝিয়ে সুজিয়ে। মেয়ে ত আমি এক রকম পছন্দ করেই রেখেছিলাম, নেহাৎ ওঁর অমতে এগোতে সাহস পাই নি।"

কামিনী বলিলেন, "ঐ পলাশপুরের মেয়ে ত? রং কিন্তু তার ফরসা না দিদি, এদের পছন্দ হ'লে হয়। তোমাদের বড় বৌয়ের পাশে দাঁড়াতে পারবে না। আমি অবিশ্যি সে মেয়েকে ছোট দেখেছি, বয়সকালে আর একটু রঙের জলুশ হবে, তা হ'লেও কতই বা?"

গৃহিণী বলিলেন, "রাখ তোমার রং বাপু। রং নিয়ে ত বড়বৌ কতই করলেন, বছর না যেতে হাতের নোয়া ঘুচে গেল। পলাশপুরের ওদের বংশে পাঁচ পুরুষে কেউ বিধবা হয় নি জান? সব কটা বৌ মাথায় সিঁদুর নিয়ে চিতায় উঠেছে। ওর ঠাকুরমা সহমরণে গেছে, ঠাকুরদাদার দুই কাকী সহমরণে গেছে। ও-ঘরের মেয়ে পয়মন্ত হবে তোমায় ব'লে দিলুম। আমি রূপও চাই না, টাকাও চাই না। আমার যা আছে তাই কে খায় তার ঠিকানা নেই।"

কামিনীর গায়ের রংটা ফরসা বটে; এজন্য তাঁহার মনে প্রচ্ছন্ন অহঙ্কার অনেকটাই ছিল, যাহাদের রং কালো তাহাদের তিনি রীতিমত কৃপার চক্ষে দেখিতেন। বৌ, ঝি, নিজেদের বাড়ীরই হোক বা পাড়াপড়শীর ঘরেরই হোক, তাঁহার সমালোচনার হাত হইতে কখনও নিষ্কৃতি পাইত না। খুঁটিয়া খুঁটিয়া প্রত্যেকের রূপের বিচার করিতে কামিনীর জুড়ি ছিল না। তবে বিধবা ও পরের আশ্রিতা বলিয়া মাঝে মাঝে তাঁহাকে মাঝপথে রাশ টানিতে হইত। হৈমবতীর নিজের রং ফরসা নয়, উজ্জ্বল শ্যামবর্ণ বড়জোর বলা চলে। তাই যখনই কামিনী ফরসা রঙের ওকালতী করিতে মাতিয়া উঠিতেন, হৈমবতী প্রায়ই মাঝপথে তাঁহাকে দমাইয়া দিতেন।

এবারেও কামিনীকে থামিয়া যাইতে হইল। গেলাস দুইটা উঠাইয়া লইয়া তিনি ঘর হইতে চলিয়া গেলেন। মনে মনে বলিলেন, "দিদির এক কথা, কালো রং হ'লেই পয়মন্ত হয় আর কি!"

বেলা গড়াইয়া আসিতেছিল, বিকাল বেলার কাজ আবার ধীরেসুস্থে আরম্ভ হইতেছে। অবশ্য, এই সব দুর্ঘটনার জন্য সকলেই যেন একটু মুষড়াইয়া পড়িয়াছে, ঝি-চাকরসুদ্ধ একটু মনমরা।

বাহিরের দালানটায় বালতি বালতি জল ঢালিয়া ক্ষেমা-ঝি ঝাঁটা চালাইতেছিল। এইখানে বসিয়া সারাটা সন্ধ্যা হৈমবতী কাটান, ঘরের ভিতরের পাখার হাওয়া তাঁহার ভাল লাগে না। বহুকাল যে শ্যামল পল্লীভবন তিনি ছাড়িয়া আসিয়াছেন, সেই বালিকা বয়সের স্মৃতি আবার তাঁহার জাগিয়া উঠে। সেখানে এমনি দাওয়ায় বসিয়া ঝিরঝিরে হাওয়ায় দেহ-মন কেমন জুড়াইয়া যাইত।

কামিনী-ঠাকুরাণী বলিলেন, "নে বাছা শীগগির ক'রে।"

ক্ষেমা বলিল, "শীগ্‌গির নেব কি মাসীমা, দেখচ নি কেমন হয়ে আছেন, যেন রাবণের চিতে। ঘড়া ঘড়া জল ঢাল্‌ছি ত তখুনি হুস্ ক'রে শুষে যাচ্ছেন।"

"রোদ ত পড়ে এল," বলিয়া কামিনী ভাঁড়ার-ঘরে ঢুকিয়া গেলেন। একরাশ ফল কাটিয়া বাছিয়া রাখিতে হইবে, বড়-কর্ত্তার বাড়ীতে ত হাঁড়ি চড়ে না, এ তিন দিন এ-বাড়ী হইতেই ফল, দুধ, মিষ্টান্ন প্রভৃতি যাইতেছে। ঐ যাওয়া পর্য্যন্তই, পুত্র-শোকাতুরা গৃহিণী কিছুই মুখে দেন না, কর্ত্তাকে বলিয়া কহিয়া সকলে একটু দুধ তবু খাওয়াইয়া দেয়, আর সব জিনিষ একেবারে ফেলা যায়। কামিনী একটু ভোজনবিলাসী মানুষ, পোড়া বৈধব্যের জ্বালায় সংসারের অর্দ্ধেক জিনিষ ত তাঁহার মুখে দিবারই জো নাই, কিন্তু যাহাও বা খাইতে পারেন, তাহাও চোখের সামনে এমনি করিয়া নষ্ট হইতে দেখিলে তাঁহার সর্ব্বাঙ্গ জ্বালা করে। কিন্তু পরের জিনিষ, তাঁহার বলিবার মুখ কোথায়? এত এককাঁড়ি না পাঠাইলে কি চণ্ডী অশুদ্ধ হয়?

বাহিরে খড়মের খট্‌খট্ শব্দ শোনা গেল। আচার্য্য মহাশয় নারাণের সঙ্গে সঙ্গেই আসিয়া উপস্থিত হইয়াছেন। কামিনী ভাঁড়ার-ঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "দিদি, আচায্যি-মশায় এসেছেন গো।"

হৈমবতী শুইবার ঘর হইতে উত্তর দিলেন, "দালানে আসন দাও, আমি যাচ্ছি।"

"অ মর, ক্ষেমীর কাজ দেখ, এখনও জল সপ্‌ সপ্‌ করছে," বলিয়া কামিনী বাহির হইয়া আসিয়া পুরোহিত মহাশয়কে প্রণাম করিলেন। "ওলো এখানটা চট্ ক'রে মুছে দে।"

ক্ষেমা তাড়াতাড়ি ছুটিয়া আসিয়া দালানের একটা কোণ মুছিয়া দিল। কামিনী আসন পাতিয়া ব্রাহ্মণকে বসাইয়া, তাঁহাকে প্রণাম করিয়া আবার নিজের কাজে চলিয়া গেলেন।

হৈমবতী আসিয়া আচার্য্য মহাশয়কে যথাবিধি প্রণাম করিয়া আর একখানা আসনে বসিলেন। বলিলেন, "মন বড় উতলা হয়ে আছে, আশীর্ব্বাদ করুন যেন সংসারে সব ক'জনকে রেখে যেতে পারি।"

আচার্য্য বলিলেন, "তা ত করছিই মা, দিনরাত ঠাকুরকে ডাকছি। তা যে স্বস্ত্যয়নটার কথা বলেছিলাম, তাতে মত আছে কি?"

হৈমবতী বলিলেন, "আমার অমত কিছু নেই। কর্ত্তার ধরণ জানেন ত, সাহেবী চাল তাঁর সব, তবু আমার কাজে বাধা দেন না তিনি। কিন্তু শ্রাদ্ধশান্তি না হ'য়ে গেলে ত সে-সব হবে না। তত দিন অমল বিমলের জন্যে মাদুলি কি কবচ কিছু দিলে হয় না? এখনই ধারণ করতে পারে।"

আচার্য্য মহাশয় বলিলেন, "তা দিয়ে দিতে পারি। খরচটা দিয়ে দিও।"

আরও কিছুক্ষণ বসিয়া, গুটিকতক টাকা লইয়া এবং অশেষ আশ্বাস দিয়া পুরোহিত-ঠাকুর বিদায় হইয়া গেলেন। কর্ত্তার ফিরিবার সময় হইয়াছে, গৃহিণী ফিরিয়া গিয়া শুইবার ঘরখানা গুছাইয়া রাখিতে লাগিলেন। যতই ঝি-চাকর রাখ, কোন কাজ ঠিকমত হইবার উপায় নাই। ঘরের মেঝেতে দুই ঘা ঝাঁটা লাগাইয়া তাহারা প্রস্থান করিবে, জিনিষপত্রে তিন কাঁড়ি ধুলা জমিয়া থাকিলেও চাহিয়া দেখিবে না। কমললোচন আবার পিটপিটে মানুষ, সারাদিন খাটিয়া সন্ধ্যায় আসিয়া ঘর-দোর নোংরা দেখিলে তাঁহার আর রাগের সীমা থাকে না।

মাঝে দুই-তিন দিন পারিবারিক দুর্ঘটনার খাতিরে তিনি বাহিরে যাইতে পারেন নাই, কিন্তু আর বসিয়া থাকা চলে না। রোগীরা ক্রমাগত তাগাদা দেয়, নূতন 'কল্' ফিরিয়া যায়, এ সব দেখিয়া আর কাঁহাতক সহ্য হয়? তাহা ছাড়া ডাক্তার কর্ত্তব্যপরায়ণ মানুষ, যাহাদের জীবন-মরণের ভার হাতে লইয়াছেন, তাহাদের এমন করিয়া উপেক্ষা করা অনুচিত তাঁহার মতে। আজ তাই সকালেই একটু জলযোগ করিয়া বাহির হইয়া গিয়াছেন।

হৈমবতী ঘর-দোর ঠিকঠাক করিয়া চা ও বৈকালিক জলযোগের আয়োজন করিতে ব্যস্ত হইলেন, কামিনীও আসিয়া যোগ দিলেন। জামাইবাবু মানুষ ভাল, কামিনী তাঁহাকে যথাসাধ্য যত্ন আদর করিতেন। দিদিও যে ভাল নয় এমন কথা তিনি বলেন না, তবে একটু যেন বেশী কঠোর প্রকৃতির, তাঁহার কাছে পান হইতে চুণ খসিবার জো নাই। এতটা আবার আজকালকার দিনে না করিলেও চলে। জামাইবাবুও এই লইয়া কত ঠাট্টা করেন।

ডাক্তারের মোটর আসিয়া বাড়ীর সামনে দাঁড়াইল। চাকর তাড়াতাড়ি ছুটিয়া গিয়া তাঁহার ব্যাগ নামাইয়া লইল। সেটা তাঁহার বাহিরের রোগী দেখিবার কামরায় রাখিয়া, আবার পিছন পিছন ছুটিল ভিতরের ঘরে, কর্তার জুতা খুলিয়া দিল, পোষাক ছাড়াইয়া দিল। অতঃপর হৈমবতী আসিয়া স্বামীসেবায় মনোনিবেশ করিলেন। কামিনী আর ক্ষেমা জলখাবার সাজাইয়া-গুছাইয়া দিয়া গেলেন, গৃহিণী বসিয়া খাওয়ার তত্ত্বাবধান করিতে লাগিলেন।

কমললোচন জিজ্ঞাসা করিলেন, "আজ বৌঠাকরুণকে কিছু খাওয়াতে পারলে?"

হৈমবতী বলিলেন, "কই আর খেল, কত ধরাধরি ক'রে তবে সরবতের গেলাসটা মুখের কাছে তুলেছিল, তখনই আবার চীৎকার ক'রে কেঁদে শুয়ে পড়ল। খেতে কি আর মুখে রোচে গো, এমন আঁতে ঘাও ভগবান দিলেন। সাতটা না, পাঁচটা না, ঐ একটি ছিল সম্বল"। বলিতে বলিতে তাঁহার নিজের গলাও ধরিয়া আসিল।

তাঁহার স্বামী বলিলেন, "বেঁচে থাকতে হ'লে না-খেলে চলবে কেন? সংসারে থাকতে গেলে এ-সব সইতেই হয়।"

হৈমবতী বলিলেন, "তা ত বটে, মানুষে কি না সইছে বল? তবু মায়ের মন সহজে মানে না, এখনও দু-চার দিন সময় নেবে।"

কমললোচন বলিলেন, "পুঁটু কেমন আছে?"

হৈমবতী বলিলেন, "সে তবু দু-চার গ্রাস আজ খেয়েছে, মেজগিন্নী নাকি তাকে নিয়ে শীগ্‌গিরই তীর্থ করতে যাবে।"

কর্তা বলিলেন, "তা যাক, ঘুরলে ফিরলে শরীর মন দুই-ই খানিক ভাল থাকবে। ছেলেরা কোথায়?"

হৈমবতী বলিলেন, "বিমলকে রতন ছাতে নিয়ে গেছে। আর অমল কিছুতেই বাড়ীতে থাকতে চাইল না, তার বন্ধু পরেশের বাড়ী গেছে। বললুম এমন দিনে বেরতে নেই, তা কে কার কথা শোনে?"

অমলের বাবা বলিলেন, "ছেলেটার কবে যে মতি স্থির হবে তা জানি না। বয়স ত পঁচিশ পার হ'ল, এখনও কোন দিকে ভিড়ল না। আমি ত চিরকাল বাঁচব না, এর পর ক'রে খেতে হবে ত? বিমলকেও দেখবার আর কেউ নেই।"

হৈমবতী বলিলেন, "আমি বলি বিয়েটা দিয়ে দেওয়া যাক। ঘাড়ে চাপ পড়লে নিজে থেকেই মতিগতি বদলাবে, ধীর শান্ত হ'তে শিখবে।"

কমললোচন বলিলেন, "দেখ যা বোঝ কর, চারি দিকের দেখে শুনে আর এ-সব বিষয়ে উৎসাহ হয় না।"

স্বামীকে নিমরাজী মত দেখিয়া হৈমবতী আরও চাপিয়া ধরিলেন, বলিলেন, "ওসব ভাগ্যের কথা, যার কপালে যা আছে। আজ আচায্যি-মশায়কে দুটো রক্ষাকবচের জন্যে ব'লে দিলুম, দুই ছেলের জন্যে। আর পলাশপুরের ঐ মেয়েটি আমার বড় পছন্দ, ওদের বংশে একটুও খুঁৎ নেই। আজও ওদেশে ওর ঠাকুরমা, আইমার নামে লোকে নমস্কার করে। এমন সতীলক্ষ্মী ক'টা গুষ্টীতে আছে? ও বংশের মেয়ে পয়মন্ত হবে, দেখে নিও। মেয়ের নামও রেখেছে সাবিত্রী। আমাদের ঘরে এমনি মেয়েই দরকার।"

কমললোচন একটু হাসিয়া বলিলেন, "মেয়ের নাম আর ঠাকুরমা, দিদিমা দেখলেই ত হবে না, আরও অনেক জিনিষ দেখবার আছে।"

হৈমবতী বলিলেন, "রূপ আর রূপো ত? ওসব দিকে নজর দিও না বাপু। ভগবানের আশীর্ব্বাদে আমাদের অভাব কিসের? আর মেয়ের রং শ্যামবর্ণ হ'লে কি হয়, মুখে ভারি শ্রী আছে।"

কমললোচন বলিলেন, "কামিনী-ঠাকরুণ ত নাক সিঁটকাবেন।"

হৈমবতী মুখ ঘুরাইয়া বলিলেন, "তা আর সিঁটকাবেন না? ফরসা রং নিয়ে ত কতই করলেন, পরের দোর ধ'রে পড়ে আছেন!"

কর্তা বলিলেন, "চুপ্, চুপ্, শুনতে পেলে মনে কষ্ট পাবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "সে যাক্ গে, এদিকের এ-সব চুকে-মুকে গেলে আমি তাহলে লোক পাঠাই পলাশপুরে? ঠিক-ঠাক করতে সময় ত লাগবে?"

কর্তা বলিলেন, "আর কিছু দিন যাক্ না? এই এমন দুটো দুর্ঘটনা ঘটে গেল, এখনই আবার বিয়ের ধুম কি বাড়ীতে মানাবে?"

গৃহিণী বলিলেন, "না গো তুমি আর বাগ্‌ড়া দিও না। এই বিয়েটা হয়ে গেলে আমি যেন একটু নিশ্চিন্তি হই।

ছেলের জন্যে আমার সারাদিন বুক ধুক্‌ধুক্‌ করছে। মেয়েটির কুষ্ঠী ভারি ভাল। জন্ম-এয়োস্ত্রী থাকবে ও।”

কর্ত্তা আর কিছু বলিলেন না। চায়ের পেয়ালা শেষ করিয়া, ইজিচেয়ারে গিয়া লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িলেন। চাকর নারাণ আসিয়া গড়গড়াটি রাখিয়া গেল।

হৈমবতী আবার একটু এদিক-সেদিক ঘুরিয়া আসিলেন, বড়-জা তেমনই পড়িয়া আছেন, দেশ হইতে তাঁহার বিধবা দিদি আসিয়া পৌঁছিয়াছেন, তাঁহাকে দেখিয়া দুর্ভাগিনী জননীর অশ্রুস্রোত আবার উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠিয়াছে। মেজ-জায়ের মেয়ে পুঁটু আজ যেন একটু শান্ত, দুপুর বেলা খাইয়া-দাইয়া শুইয়া পড়িয়াছে, বোধ হয় ঘুমাইয়া আছে। তাহাকে আর কেহ তোলে নাই।

পরদিনই আচার্য্য মহাশয় কবচ দুটি দিয়া গেলেন। যথা-নিয়মে, যথাকালে হৈমবতী কবচ দুটি ছেলেদের পরাইয়া দিলেন। অমল প্রথমে যথেষ্ট আপত্তি করিল, কিন্তু মায়ের চোখের জলের কাছে তাহাকেও অবশেষে হার মানিতে হইল। আচার্য্য মহাশয় বলিয়া গেলেন, কবচ ভারি শক্তিশালী, ধারণকারীর কোনো অনিষ্ট কোনো দুষ্ট গ্রহে করিতে পারিবে না। হৈমবতী এত দিনে একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিলেন।

দিনের পর দিন কাটিয়া চলিল, বিনয়ের শ্রাদ্ধশান্তিও অবশেষে চুকিয়া গেল। বড় গৃহিণী আর তত কাঁদেন কাটেন না, মাঝে গিয়া একদিন অন্তঃসত্ত্ব পুত্রবধূকে দেখিয়া আসিয়াছেন। তাঁহার বিনয়ের শেষচিহ্নটুকু দেখার আশায় যেন উদ্‌গ্রীব হইয়া দিন গণিতেছেন। মেজগিন্নী পুঁটুকে লইয়া তিন-চার মাসের জন্য তীর্থে চলিয়া গিয়াছেন।

পলাশপুরে ত লোক ছুটাছুটির বিরাম নাই। দিন ক্ষণ স্থির হইতেছে, কোষ্ঠী মিলান হইতেছে এবং যতই কেন না হৈমবতী দেনা-পাওনার কথাকে উপেক্ষা করুন, সে কথাও কিছু কিছু হইতেছে।

বিবাহে খুব বেশী ধুমধাম করা সাজিবে না, যাহা না হইলে নয়, সেইটুকুই হইবে। হৈমবতী ইহা লইয়া কাহাকেও কিছু বলিতে পারেন না, কিন্তু মনে মনে দুঃখ আছে। তাঁহার ঘরে আর ত বিবাহ কোনো দিন হইবে না, এই একটিকে লইয়াই সকল সাধ তাঁহাকে মিটাইতে হইবে।

অমলের এ বিবাহে বিশেষ উৎসাহ নাই।

সে শুনিয়াছে মেয়ে সুন্দরী নয়, আধুনিক মতে শিক্ষিতাও নয়। কিন্তু মায়ের সঙ্গে ত পারিয়া উঠিবার জো নাই? বকিয়া-ঝকিয়া, কাঁদিয়া, তিনি নিজের মত বজায় রাখিবেনই।

কামিনী-মাসীর কাছে গিয়া একদিন সে বলিল, “তোমরা বুঝি ত্রিসংসারে মেয়ে আর পেলে না? কেন কলকাতায় মেয়ে ছিল না?”

কামিনী ঠোঁট উল্টাইয়া বলিলেন, “আমরা কি করব, বাছা? তোমার মায়ের কথার উপর কথা বলতে গিয়ে কে মুখঝাম্‌টা খাবে? তাঁর ঐ কালো মেয়েই পছন্দ।”

অমল বলিল, “কি কারণে? কালো মেয়ে তাঁর স্বর্গে বাতি দেবে?”

কামিনী বলিল, “তিনিই জানেন, মেয়ের কুষ্ঠী নাকি খুব ভাল, দিদি তাই দেখেই মজে গেছেন।”

“রাবিশ!” বলিয়া অমল ঘর ছাড়িয়া চলিয়া গেল।

বিবাহের দিন ক্রমে অগ্রসর হইয়া আসিল। পাকা দেখার দিন সময় করিয়া কমললোচন একবার গিয়া যথাকর্ত্তব্য করিয়া আসিলেন। মা একবার ছেলেকে জিজ্ঞাসা করিলেন, “দেখতে-টেখতে চাস নাকি রে? বল্ ত তাহ'লে জোগাড় করি।”

অমল রাগ করিয়া বলিল, “আমার দরকার নেই, তুমি ব'সে ব'সে দেখ গিয়ে।”

কামিনী আড়ালে হৈমবতীকে বলিলেন, “তোমার ছেলের কিন্তু কনে পছন্দ হয় নি দিদি।”

হৈমবতী রাগ করিয়া বলিলেন, “ওর আবার পছন্দ! কোনো কাণ্ডজ্ঞান থাকলে তবে বুঝত কি জিনিষ আমি ওকে দিচ্ছি। তোমরা পাঁচ জনে ওকে আস্‌কারা দিও না বাপু।”

কামিনী গালে হাত দিয়া বলিলেন, “ওমা শোন কথা, আমরা কেন আস্‌কারা দিতে যাব? তোমার ছেলে বললে তাই না আমার বলতে আসা? থাক গে, কাজ কি বাপু আমার এ-সব কথায়,” বলিয়া তিনি ফর্ ফর্ করিয়া চলিয়া গেলেন।

কর্ত্তা রাত্রে খাইতে বসিয়া বলিলেন, “সত্যি মেয়েটির মুখে ভারি একটা শান্ত শ্রী আছে, দেখলে মায়া হয়।”

গৃহিণী উৎফুল্ল হইয়া বলিলেন, "দেখ আমি বলেছিলাম না ?

কর্ত্তা হাসিয়া বলিলেন, "কিন্তু রং সত্যিই কালো, তোমার চেয়েও কাল।"

গৃহিণী বলিলেন, "তা হোক। ফরসাদের কপাল দেখে অরুচি ধ'রে গেছে। কালো আছি আছিই, কিন্তু সংসারে কারও কাছে আজ অবধি মাথা হেঁট করতে হয় নি। এমনি পয় যেন আমার কালো বৌয়েরও হয়।"

বিবাহ হইয়া গেল। অমল যখন বৌ লইয়া বাড়ী ফিরিল, তখন তাহাকে আগের মত অতটা আর অসন্তুষ্ট দেখাইল না। বাস্তবিক নববধূর মুখখানি দেখিবার মত। যেন মূর্ত্তিমতী লক্ষ্মীঠাকুরাণী। হৈমবতী নিজের গলার দশ ভরির হার দিয়া বৌয়ের মুখ দেখিলেন। বরণান্তে বধূর মুখখানি তুলিয়া ধরিয়া সমাগতা প্রতিবেশিনীবৃন্দকে বলিলেন, "দেখ দেখি বাপু তোমরা, এ-জিনিষ কেউ নিন্দের বলবে ?"

অন্ততঃ তাহার সামনে কেহই নিন্দার বলিল না। আড়ালে অবশ্য সকলে মন খুলিয়াই কথা বলিল, যাহা হউক হৈমবতী তাহা শুনিতে পাইলেন না।

বিবাহে ধুমধাম হইবে না হইবে না করিয়াও নিতান্ত মন্দ হইল না। অমলের মাতামহের পরিবারটি বৃহৎ, একমাত্র দৌহিত্রের বিবাহে সকলে দল বাঁধিয়া আসিলেন। পাড়া-প্রতিবাসী, আত্মীয়, কুটুম্ব ও বিশেষ বন্ধুর দল, কাহাকেও বাদ দেওয়া গেল না। এ বাড়ীর শোকের আবহাওয়াও এই তিন মাসে খানিকটা কাটিয়া গিয়াছে। বিধবা পুঁটু জোর করিয়া মনকে বুঝাইয়া পড়াশুনায় ডুবিয়া গিয়াছে, সে নিজের পায়ের উপর দাঁড়াইতে চায়। বড়গিন্নীর একটি ফুটফুটে নাতি হইয়াছে, তাহাকে বুকে চাপিয়া তিনি বিনয়ের শোকও ভুলিবার চেষ্টা করিতেছেন। পুত্রবধূকে আর বাপের বাড়ী যাইতে দেন নাই, খোকা এক মুহূর্ত্ত চোখের আড়াল হইলে তিনি অন্ধকার দেখেন।

বৌ আসার পরদিন ঘটা করিয়াই বউভাত হইয়া গেল। ফুলশয্যাও সেই রাত্রে। রাত দুইটার পর হৈমবতী অনেক কষ্টে তরুণী ও বালিকার দলকে ঘর হইতে বাহির করিয়া নবদম্পতীকে ঘুমাইবার সুযোগ করিয়া দিলেন।

অমল বলিল, "বাপ রে বাপ, কে বলে স্ত্রীলোক অবলা ? এদের হাতে পড়ে যা নাস্তানাবুদ হ'তে হয় গোরাপল্টনের হাতেও এতটা হয় না।"

সাবিত্রী ফিক্ করিয়া হাসিয়া মুখ ফিরাইয়া লইল।

অমল বলিল, "হাস্‌চ কি ? যত উৎপাত সব আমার ঘাড় দিয়ে গেল ব'লে বুঝি ?"

সাবিত্রী বলিল, "না, তা কেন ?"

হঠাৎ জানালার ওপাশ হইতে কে বলিয়া উঠিল, "ওমা, লজ্জাবতী লতা ত বেশ বরের সঙ্গে কথা কইছে গো।" সাবিত্রী লজ্জা পাইয়া একেবারে চুপ করিয়া গেল, হাজার সাধ্যিসাধনা করিয়াও, সারারাতের মধ্যে অমল আর তাহাকে কথা কহাইতে পারিল না।

আত্মীয়কুটুম্বের দল কিছু বৌভাতের পরদিনই চলিয়া গেল না। মেয়েরা এমন করিয়া সারাদিন নববধূকে ছেঁকিয়া ধরিয়া থাকিত যে বেচারা অমল একেবারেই আমল পাইত না। রাত্রেও এত লোকের খাওয়া-দাওয়া সারিয়া শুইতে রাত এগারটা বাজিয়া যাইত। শ্বশুরশাশুড়ী শুইতে যাইবার আগে কোনো মতেই সাবিত্রীকে তাহার ঘরে পাঠান যাইত না।

হৈমবতী কাণ্ড দেখিয়া মনে মনে বিরক্ত হইতেন, কিন্তু কাহাকেও কিছু বলিতে পারিতেন না, সকলে যে তাঁহারই ঘরে অতিথি! তাঁহার ইচ্ছা ছিল বৌ ছেলে আরও একটু মেলামেশা করিবার সময় পায়। মেয়েটি সত্যই অশেষ গুণবতী, স্বভাবটিও মধুর, ভাল করিয়া পরিচয় পাইলে অমল কখনও এমন স্ত্রীর অনাদর করিবে না। কিন্তু অমল বেচারা ত স্ত্রীর ধারেকাছে আসিবারই অবসর পায় না ?

দেখিয়া শুনিয়া একদিন তিনি কামিনীর কাছে বলিলেন, "এর চেয়ে সাহেবদের নিয়ম ভাল বাপু, বিয়ের পর দুটো নিরিবিলিতে কোথাও গিয়ে মাসখানেক বেড়িয়ে আসে।"

কামিনী বলিলেন, "ওমা, তোমার আবার এ-সব মেম সাহেবী পছন্দ কবে থেকে হ'ল ?

হৈমবতী বলিলেন, "মেমসাহেবীর সবই কি আর ভাল বলছি, তা ব'লে সব মন্দও নয়। এই দেখ না, পনর দিন হ'ল বিয়ে হয়েছে, অমু বোধ হয় পনরটা কথাও বৌমার সঙ্গে বলতে পায় নি। এটা ভাল নয়।"

কামিনী বলিলেন, "বলব নাকি ছুঁড়িদের একটু আলগা হয়ে থাকতে ?"

হৈমবতী বলিলেন, "না বাপু, কিছু ব'লে কাজ নেই, আবার কে কি মনে করবে। আর ক'টা দিনই বা ?"

কয়েক দিন পরেই জোড় ভাঙিতে বরকন্যা মেয়ের বাপের বাড়ী চলিয়া গেল। অমল শীঘ্রই ফিরিয়া আসিল। বউ আরও দিনকতক পরে আসিবে বলিয়া শোনা গেল।

অমল এখন রোজ নিয়ম করিয়া জ্যাঠামহাশয়ের ব্যবসা-স্থলে যাইতে আরম্ভ করিল। সংসারী হইলই যখন, তখন সংসার করিবার যোগ্যতা ত অর্জ্জন করিতে হইবে ? কিন্তু কাজে মন যেন বসিতে চায় না, কেবল উড়ু উড়ু করে। স্ত্রীকে রোজ একখানা করিয়া উচ্ছ্বসিত চিঠি লেখে, কিন্তু উত্তর পায় নিতান্ত সাদাসিদা রকমের। সাবিত্রীর দিদি বৌদি কয়েকটিই আছে, তাহারা দস্তুরমত প্রেমপত্র লিখিতে অভ্যস্ত। সাবিত্রী অনুরোধ করিলেই বেশ ভাল রসে-ভরা চিঠি তাহারা লিখিয়া দিতে পারে, কিন্তু বেরসিক সাবিত্রীর ওরকম পরকে দিয়া চিঠি লেখান পছন্দ হয় না, সে নিজে যাহা পারে তাহাই লেখে।

হৈমবতী ছেলের উন্নতি দেখিয়া খুব খুশী, স্বামীকে বলিলেন, "দেখলে গো, আমার কথা ফলল কি না ? অমু বদলেছে না ? বৌমা আমার সাক্ষাৎ লক্ষ্মী।"

কমললোচন বলিলেন, "রোস, এখনও মাস পেরোয় নি, অত তাড়াতাড়ি সার্টিফিকেট দিয়ে ব'সো না। আবার রিল্যাপ্স করে কিনা দেখ।"

হৈমবতী বলিলেন, "তোমার যত বাজে কথা। মানুষের ভাল-মন্দ দু-দিন দেখলেই বোঝা যায়। অতটুকু মেয়ে ওকি আর নিজ মূর্ত্তি চাপা দিয়ে চলতে পারে ? এ-মেয়ে আমি দেখে-শুনে এনেছি কি না, তাই আর তোমাদের কারও ভাল বলতে মন উঠছে না।"

কর্ত্তা আর কথা না বাড়াইয়া নীরবে খাইতে লাগিলেন। হৈমবতী বলিয়া চলিলেন, "এবার শীগ্‌গির দিন দেখে বৌমাকে নিয়ে আসতে হবে। ছেলে কেমন যেন মনমরা হয়ে আছে, হবেই ত। যে বয়সের যা।"

কমললোচন হাসিয়া বলিলেন, "তোমার মত শাশুড়ী অনেক কপালগুণে পাওয়া যায়। আমাদের কালে বৌ-ছেলেকে বেশী বিরহকাতর হ'তে দেখলে মা-বাপরা নিদারুণ চটে যেত। বিয়ে করেছিস্ ঐ পর্য্যন্ত, তার বেশী কিছু সবই বেআইনী ছিল। অমুর কিন্তু মন নয় শুধু, শরীরটা একটু খারাপ ঠেকছে আমার কাছে।"

হৈমবতী উৎকণ্ঠিত হইয়া বলিলেন, "কেন গা ? কই কিছু ত বলে নি আমার কাছে ?"

কমললোচন বলিলেন, "অমনি ভয়ে আধমরা হয়ে যেও না। বেশী কিছুই হয় নি, ওর ত লিভার কোনো দিনই ভাল নয়, সেইটাই একটু জানান দিচ্ছে বোধ হয়, চেঞ্জে গিয়ে কিছুদিন থাকলেই সেরে যাবে এখন।"

হৈমবতী বলিলেন, "তাই দেব পাঠিয়ে, পুজোটা হয়ে গেলেই। যা আমাদের কপাল, অসুখ শুনলেই বুকের রক্ত জল হয়ে যায়। সবাই মিলে গেলেই হয়, কারও ত শরীর ভাল নয়।"

কর্ত্তা বলিলেন, "আমার যাওয়া এবার হবে না, এই সেদিন কাজকর্ম্মে এত ফাঁক গেল। তার উপর নূতন ডিস্‌পেন্সারিটা সবে খুলেছি, ওটাও গুছিয়ে নিতে হবে।"

গৃহিণী বলিলেন, "তবে ছেলে বউই যাবে, আমারও যাওয়া হবে না। আমি ঘরের বার হ'লেই ত তুমি নাওয়া-খাওয়া সব কিছুর পাট তুলে দেবে, তা হবে না বাপু। আর তুমি সঙ্গে না থাকলে খোকাকে নিয়ে কোথাও যেতেও আমার ভয় করে, ওর ত সারাক্ষণ পলকে প্রলয় হচ্ছে।"

সেদিনকার মত কথাটা ঐখান পর্য্যন্তই রহিল। কয়েক দিন পরেই শুভদিন দেখিয়া হৈমবতী বধূকে আনিতে লোক পাঠাইয়া দিলেন। সাবিত্রী আসিয়া এবার ঘরসংসার বুঝিয়া লইল। তাহাকে কেহই কাজ করিতে বলে না, সে যাচিয়া সকলের কাজ করিয়া বেড়ায়। ঝি ক্ষেমা হইতে আরম্ভ করিয়া কর্ত্তা কমললোচন পর্য্যন্ত বউয়ের প্রশংসায় পঞ্চমুখ হইয়া উঠিলেন। অমল অবশ্য কাহারও কাছে কিছু বলে না, কিন্তু তাহার ব্যবহারেই বোঝা যায় যে বউয়ের প্রতি মনোভাবটা তাহার আর যাহাই হউক বিরাগ নহে। কেবল কামিনী মুখ ফুটিয়া সাবিত্রীর কিছু সুখ্যাতি করেন না, তাহার মতে এ সবই কালো বউয়ের নাম কিনিবার ছল।

অমলের শরীর-খারাপটা কিন্তু এবার সকলেরই চোখে পড়িতে লাগিল। হৈমবতী ভয়ানক রকম ব্যস্ত হইয়া

উঠিলেন। তাঁহার তাড়ায় কর্ত্তাও ব্যস্ত হইয়া এধারে-ওধারে চিঠি লিখিয়া ছেলেবৌয়ের চেঞ্জে যাওয়ার ব্যবস্থা করিতে লাগিলেন। পূজা অবধি অপেক্ষা করিতেও হৈমবতী নারাজ। ছেলে আর বৌই যাইবে, সঙ্গে বাড়ীর পুরান চাকর নারাণ এবং ক্ষেমা যাইবে। গৃহিণী কিছুকাল নূতন লোক রাখিয়া কোনোমতে চালাইয়া লইবেন। পূজা এবার কার্ত্তিক মাসে, হয়ত তাহার ভিতর অমল ফিরিয়াও আসিতে পারে যদি শরীরটা ভাল থাকে।

মা, মাসী সকলে মিলিয়া এক সংসারের জিনিষপত্র বাঁধিয়া ছাঁদিয়া ছেলে বৌকে রওয়ানা করাইয়া দিলেন। তাহারা এখনকার মত পশ্চিমে চলিল। যাইবার সময় হৈমবতী প্রণতা বধূকে সাবধান করিয়া দিলেন, "দেখো মা অমুর যেন কোনো অনিয়ম না হয়, আমি যেমন ক'রে সব করি, ঠিক তেমনি ক'রে ক'রো। ছেলের শরীর সেরে আসা চাই।"

বধূ মৃদুস্বরে বলিল, "সেরেই আসবেন মা।"

বাড়ীটা ইহার পর বড় যেন খাঁ-খাঁ করিতে লাগিল। রোজ খবর পান, তবু হৈমবতীর দিন যেন কাটিতে চায় না। পূজার সময়ও ছেলে বৌ যদি না ফেরে তাহা হইলে পূজা সারিয়া গৃহিণী দিনকতকের মত তাহাদের কাছে থাকিয়া আসিবেন স্থির করিতে লাগিলেন। এখানে চাকরবাকর থাকিবে, কামিনী থাকিবেন, কর্ত্তার আর বিমলের তেমন কোনো অসুবিধা হইবে না।

সকাল বেলা স্নান করিয়া হৈমবতী পূজার ঘরে ঢুকিতেছেন এমন সময় বাহিরে সোরগোল শুনিয়া তাড়াতাড়ি দালানে বাহির হইয়া আসিলেন। সম্মুখে যে দৃশ্য দেখিলেন, তাহাতে আতঙ্কে মূর্চ্ছিতপ্রায় হইয়া সেইখানেই বসিয়া পড়িলেন! অস্ফুট স্বরে জিজ্ঞাসা করিলেন, "অমু, বৌমা?"

সামনে দাঁড়াইয়া ক্ষেমা আর নারাণ অজস্রধারে চোখের জল ফেলিতেছিল। ক্ষেমা কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "দাদাবাবু বাইরের ঘরে ব'সে আছেন মা, ভিতরে আসতে চাইছেন না। আমাদের সোনার বৌদিদিমণিকে রেখে আসতে হ'ল মা।"

তাহার ক্রন্দনে বাধা দিয়া কামিনী বলিয়া উঠিলেন, "কাঁদিস পরে বাছা, কাঁদবার দিন ফুরচ্ছে না, বৌমার কি হয়েছিল? কই আমরা ত অসুখের খবরও পেলাম না?"

নারাণ বলিল, "অসুখ কোথা মাসীমা? সতীলক্ষ্মী যেন স্বশরীরে স্বর্গে চলে গেলেন। রাত্রে শোবার ঘরে মস্ত কালো সাপ ঢুকেছিল মা। বিছানায় উঠে দাদাবাবুকে ছোবল দিতে যাবে এমন সময় বৌমা জেগে উঠে ডান হাত দিয়ে সাপের মুখ চেপে ধরলেন। আমরা গিয়ে সাপ মারতে না-মারতে তাঁর সময় এসে

হৈমবতী আর্ত্তনাদ করিয়

পায়ে, শুষ্ক মুখে অমল অ

কাছে গিয়া নিজের গ

দিয়া বলিল, "

কিছু হ'ল

কিন্তু তা

ম

উ

চন্দননগরের প্রদর্শনী দর্শনে

প্রত্যক্ষদর্শী

কিছু দিন পূর্ব্বে চন্দননগরে বিংশ বঙ্গীয় সাহিত্য-সম্মিলনের যখন অধিবেশন হয়, তখন তাহার সহিত একটি প্রদর্শনীর ব্যবস্থা হইয়াছিল। সে প্রদর্শনী আকারে ছিল ছোট, আড়ম্বরে সামান্য। তাহার মধ্যে ব্যবসায়ীর সাইনবোর্ডের চাকচিক্য ছিল না, হ্যাণ্ডবিলের ছড়াছড়ি, ক্রেতা-বিক্রেতার কলকোলাহল, শিল্পসৃষ্টির যান্ত্রিক ডিমনষ্ট্রেশন্ অথবা বিবিধ বর্ণের বিবিধ আলোকসজ্জা বা দর্শকদিগকে আকর্ষণের জন্য ক্রীড়া-কৌতুকের ব্যবস্থা,—এ-সব কিছুই ছিল না। বিরাটত্বের কোন নিদর্শনই তাহার মধ্যে না থাকিলেও, তাহা নিতান্ত সামান্য হইলেও, তাহাতে এমন কিছু ছিল যাহা প্রদর্শনীতে সাধারণতঃ দেখা যায় না। সেখানে কথা নাই, সচীৎকার ব্যাখ্যা নাই, কক্ষের পর কক্ষগুলিতে একটি প্রাচীন শহরের পরিচয়

...যা কিছু পাওয়া সম্ভব, যাহা দেখান

...র থরে সাজান ছিল; আর

...গণ দর্শকদিগকে তাহা দর্শনের

...নচ্যুত না হয় সেজন্য শুধু

...য়মান ছিল মাত্র।

...নিবাস" চন্দন-

...ন আলেখ্য

...বর্ত্তমান

...হইয়া

ক্রমে প্রাধান্য স্থাপনের জন্য লালায়িত হইয়া নিজেদের মধ্যে বিবাদবিসম্বাদে প্রবৃত্ত হইতেছিল, তখন ক্লাইভ সংশয়-দোদুল্যমান মনে ব্রিটিশ গৌরব প্রতিষ্ঠার জন্য যাত্রা করিয়াছিলেন। প্রথমেই ঐতিহাসিক প্রদর্শনী কক্ষে প্রবেশ করিয়া সম্মুখেই ক্লাইভ ও ডুপ্লের প্রতিকৃতির ও আরো... দুর্গপাদমূলে সেই ব্রিটিশ রণতরী টাইগার, কেণ্ট, ... বেরির ছবি এবং নিম্নে টেবিলের উপর চন্দননগর-বিজয়ী ক্লাইভের কতিপয় গোলা দেখিয়া সেই যুগের ইতিহাসের ঘটনাবলী, ক্লাইভ ও ওয়াটসনের বীরত্বের সহিত সহায়-সম্পদহীন ফরাসী গবর্ণর রেনোর বুদ্ধিকৌশল, ফরাসী সৈনিক টেরিনুর বিশ্বাসঘাতকতা ও চন্দননগরের পতন একে একে সমস্ত যেন নয়নসমক্ষে উদ্ভাসিত হইয়া উঠিয়াছিল আর সেই সঙ্গে মনে হইতেছিল এই ভূমেই সেই দি... আজিকার সসাগরা পৃথিবীর বৃহত্তম সাম্রাজ্যের অধিপতি ইংরেজের অদৃষ্ট পরীক্ষা হইয়াছিল।

তার পর পার্শ্বেই দেখি কানাইলাল ও যোগেন্দ্রন... সেনের ছবি, তাঁহাদের পার্থিব শেষ নিদর্শন, তাঁহাদের ব্যবহৃ... চশমা, ঘড়ি, স্বহস্তলিখিত পত্র প্রভৃতি কতিপয় দ্রব্য পড়িয়া আছে ডুপ্লের রাজোচিত আড়ম্বরের নিদর্শন রজ... নির্ম্মিত আশাসোঁটার পার্শ্বে। এখন এই উভয়ই আমার ... দর্শকের দৃষ্টিতে যেন একই অবস্থান্তরিত।

মনের মধ্যে অধিকক্ষণ সে কথা ভাবিবার অবসর ...

... পার্শ্বে ফিরিয়াই দেখি পশ্চিম দেওয়ালের ঠিক মধ্য...

...ভাবিশিষ্ট সুরম্য ভবনের ছবি। উহা অধু...

সাহেবের বাগানবাড়ীর ছবি। চন্দননগ...

...রে এই বাটীর সর্ব্বোচ্চ প্রকোষ্ঠেই একদিন ব...

সর্ব্বশ্রেষ্ঠ কবি ভারতরবি রবীন্দ্রনাথ ...

...সের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন, আর এই স্থানেই ...

...বিজীবনের শুভ উদ্বোধন হইয়াছিল। উভয় পার্শ্বে

... ...টি একটি

গৃহের, অন্যখানি একটি ছোট কুটীরের। কবি ভারতচন্দ্র যখন অজ্ঞাত অখ্যাত অবস্থায় ফরাসী দেওয়ান ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর নিকট উমেদারী করিতে আসিয়াছিলেন তখন তিনি প্রথমোক্ত দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের উক্ত গৃহেই বাস করিয়াছিলেন। পরে ইন্দ্রনারায়ণের অনুগ্রহেই কৃষ্ণনগরাধিপতি মহারাজা কৃষ্ণচন্দ্রের পৃষ্ঠপোষকতাতেই তাঁহার কবিপ্রতিভা জনসমাজে প্রচারিত হইয়া অমর হইয়া রহিয়াছে। অন্য গৃহে কথাশিল্পী শরৎচন্দ্রের বাল্যজীবনের কিছু অংশ অতিবাহিত হইয়াছিল। ঋষিকল্প ভূদেবের কর্ম্মজীবন চন্দননগরে তাঁহার প্রতিষ্ঠিত যে বিদ্যালয়ে আরম্ভ হইয়াছিল, তাহার ধ্বংসাবশেষের ছবিও দেখিলাম।

অসামান্য রূপলাবণ্যময়ী মাডাম্ গ্রাণ্ড, যিনি প্রথম যৌবনে চন্দননগরের অধিবাসিনী ছিলেন, যাঁহার রূপবহ্নি ভারত হইতে ফ্রান্স পর্য্যন্ত তদানীন্তন বহু প্রসিদ্ধ পুরুষকে দগ্ধ করিয়াছিল, যে রূপের জ্যোতি সম্রাট নেপোলিয়নের চক্ষেও প্রতিফলিত হইয়াছিল, তাঁহার প্রতিকৃতিও দেখিলাম। তাহার পর কত প্রাচীন মন্দির, অধুনালুপ্ত কত প্রতিষ্ঠান, কত বঙ্গগৌরব সাধক, দাতা, কর্ম্মবীর, বীর বাঙ্গালী স্বেচ্ছাসৈনিক প্রভৃতির প্রতিকৃতি; ডুপ্লে প্রভৃতি চন্দননগরের কত ইতিহাসপ্রসিদ্ধ লোকের হস্তলিপি, ব্যবহৃত সামগ্রী, প্রাচীন মুদ্রা, ফরাসী গভর্ণমেণ্ট প্রদত্ত ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরীর স্বর্ণপদক, মৃত্তিকাভ্যন্তর বা কূপ হইতে প্রাপ্ত সুবৃহৎ পাষাণময় মুণ্ডহীন বুদ্ধমূর্ত্তি, সুন্দর বিষ্ণুমূর্ত্তি, ধাতুময় সুঠাম দশভুজা মূর্ত্তি প্রভৃতি এই ফরাসী উপনিবেশের লুপ্ত ইতিহাসের কত চিহ্ন কত আকারে দেখিলাম।

সেখান হইতে কক্ষান্তরে গেলাম, সেটি চন্দননগরের সাহিত্য প্রদর্শনী। সারা ঘরটি জুড়িয়া টেবিলে সজ্জিত এখানকার লেখকদের রচিত গ্রন্থসমূহ। তন্মধ্যে দেখিলাম চন্দননগরের ফাদার গেঁর‍্যা কর্ত্তৃক পুনর্লিখিত বাঙ্গালা ভাষার প্রথম মুদ্রিত গ্রন্থ "কৃপারশাস্ত্রের অর্থবেদ" ও তাহার পরিশিষ্ট ১৮৩৬ হইতে ১৯৪০ এক শত পাঁচ বৎসরের গ্রহণ গণনা। দেওয়ালে দেখিলাম স্থানীয় গ্রন্থকারদের প্রতিকৃতি। একটি অন্য মেজেতে বহু অপ্রকাশিত হস্তলিখিত পাণ্ডুলিপি, অন্যত্র বিবিধ প্রাচীন ও আধুনিক সংবাদ ও সাময়িক পত্রিকার সমাবেশ। তাহার মধ্যে আছে ইংরেজী ১৮৮২ সালে চন্দননগর হইতে প্রকাশিত "প্রজাবন্ধু" হইতে আরম্ভ করিয়া বর্ত্তমান বাংলার অন্যতম মাসিকপত্র "প্রবর্ত্তক" পর্য্যন্ত।



দেওয়ান রামেশ্বর মুখোপাধ্যায়ের বাটীর ভগ্নাবশেষ, গোন্দলপাড়া। কবি ভারতচন্দ্র এই বাটীতে বাস করিতেন।

এই বিভাগে স্বতন্ত্র রক্ষিত প্রাচীন বাংলা সাহিত্যের মুদ্রিত গ্রন্থ ও হস্তলিখিত পুঁথির অপূর্ব্ব সংগ্রহ দেখিলাম। দেখিলাম ভদ্রার্জুন, তোতা ইতিহাস, হালহেডের ব্যাকরণ, প্রবোধ চন্দ্রোদয়, গঙ্গাভক্তিতরঙ্গিণী, 'সমাচার দর্পণ, দিগ্দর্শন, মনোদীক্ষা সুধাতরঙ্গিণী, সতীনাটক, রাজীবলোচন মুখোপাধ্যায় কৃত রাজা কৃষ্ণচন্দ্রের জীবনী, কেরীর বাংলা অভিধান, কেরীর রামায়ণ, এবং রাজাবলী প্রভৃতি অনেক দুষ্প্রাপ্য গ্রন্থ ও পুঁথি শ্রীরামপুর কলেজ লাইব্রেরী, উত্তরপাড়া সাধারণ গ্রন্থাগার, বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদ, দশভুজা সাহিত্যমন্দির, চন্দননগর পুস্তকাগার প্রভৃতি প্রতিষ্ঠান হইতে আসিয়াছে; কিন্তু সমস্ত ছাড়িয়া এখানকার মধ্যে যাহা সর্ব্বাগ্রে দৃষ্টি আকর্ষণ করে তাহা চুঁচুড়ার শ্রীযুত রমেশচন্দ্র মণ্ডল মহাশয়

প্রেরিত গীতগোবিন্দের সচিত্র পাণ্ডুলিপি ও শ্রীরামপুরের শ্রীযুত ফণীন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী মহাশয় প্রেরিত ১১৬৬ সালে লিখিত সচিত্র রাসপঞ্চাধ্যায় পুঁথি। ইহাদের বহু বর্ণের সুন্দর চিত্রগুলি না দেখিলে তাহার নৈপুণ্য উপলব্ধি করা দুরূহ।

তার পর শিল্পপ্রদর্শনী, তিনটি বিরাট কক্ষ চন্দননগরের ছোটবড় বিবিধ শিল্পে সজ্জিত, তন্মধ্যে একটি শুধু মহিলা শিল্পেই পূর্ণ। সুন্দর সুন্দর বহু প্রকার সূচীশিল্প ছাড়াও চিত্র, বেতের কাজ, চামড়ার কাজ, মাটির কাজ, পুঁতির কাজের বহুল নিদর্শন যাহা এখানে সজ্জিত করিয়া রাখা হইয়াছিল, তাহার মধ্যে কৃষ্ণভাবিনী নারী-শিক্ষা মন্দিরের ছাত্রীদের কাজ সকলের দৃষ্টি বিশেষ ভাবে আকর্ষণ করিয়াছিল।

অপর কক্ষদ্বয়ে পটুয়া অঙ্কিত ও সুবিখ্যাত বসন্তলাল মিত্র, বেণীমাধব পাল প্রভৃতি প্রাচীন ও শ্রীযুক্ত আশুতোষ মিত্র, গৌরচন্দ্র কুণ্ডু প্রভৃতি স্থানীয় আধুনিক বহু চিত্র-শিল্পীর অঙ্কিত সুন্দর চিত্র, তাঁতের কাপড়, খদ্দর, ধাতুনির্ম্মিত দ্রব্য, কামারের কাজ ও প্রসিদ্ধ আসবাবপত্র নির্ম্মাণকারকদিগের কারখানার দারুশিল্পের বিবিধ নিদর্শন, এখানকার তৈয়ারী এসেন্স, সাবান, সিগারেট দিয়াশলাই, ছবির ফ্রেম, ফ্রেটওয়ার্ক, শ্রীযুক্ত গোষ্ঠবিহারী দাস নির্ম্মিত মৃন্ময় প্রতিমূর্ত্তি ও অন্যান্য মৃৎশিল্পী কর্ত্তৃক প্রস্তুত মাটির কাজ, বাংলার নূতন শিল্প গ্রাইণ্ডষ্টোন, পিউমিক ষ্টোন, এমরি হুইল, পিউমিক ব্লক, তাপমান যন্ত্র, এসরাজ, কাঠের খেলনা, শাঁখা, স্বাস্থ্যবিষয়ক বিবিধ চার্ট প্রভৃতি শতাধিক বিষয়ের বহুসংখ্যক দ্রব্যসম্ভারের নমুনা রক্ষিত হইয়াছিল; কিন্তু তথাপি বলিতে হইতেছে, যে-ফরাসডাঙ্গা একদিন বস্ত্রশিল্পে এ-প্রদেশের মধ্যে শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিয়াছিল, নানা প্রকার পাড়ের বিভিন্ন ধরণের বস্ত্রাদি থাকিলেও মনে হইল ফরাসডাঙ্গার আজ সে-খ্যাতি কোথায়?

দারু-শিল্পের কতিপয় উৎকৃষ্ট নিদর্শন, প্রসিদ্ধ মিস্ত্রী নীলমণি নাথের প্রস্তুত অতি সুন্দর দারুময় জগদ্ধাত্রী মূর্ত্তি দেখিয়া এ-শিল্পের পূর্ব্ব গৌরবের কথঞ্চিৎ আভাস পাওয়া গেলেও পূর্ব্বেকার দড়ির কাজ, গালার কাজ, চুরুটের কাজ, রঞ্জনের কাজ এ সব লুপ্ত হইয়া গিয়াছে। ঐ সকল জিনিষের ধ্বংসাবশেষ কারখানাগুলির ক্ষুদ্র আলোকচিত্রগুলি এখন ঐতিহাসিক প্রদর্শনীর দ্রষ্টব্য হইয়াছে। প্রথম বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত বটকৃষ্ণ ঘোষের যে কাপড়ের কল ছিল তাহা হইতে উৎপন্ন বস্ত্র ও এখানকার বহু প্রাচীন টিক্কার প্রস্তুতির কারখানার ঔষধগুলি দেখিয়া এখানকার অধিবাসীদের মনে অবশ্য একটা আত্মপ্রসাদ আসে তাহাতে সন্দেহ নাই; কিন্তু দুঃখের বিষয় সে-সব কারখানা অনেক দিন লুপ্ত হইয়াছে। এই প্রসঙ্গে শ্রীযুক্ত ফটিকলাল দাস নির্ম্মিত নানাপ্রকার ফ্রেট-ওয়ার্ক ও শ্রীযুক্ত অদ্বৈত দাস বাবাজী কর্ত্তৃক নির্ম্মিত কাঠের চতুর্দ্দোলা ও কতিপয় জীবজন্তু যে শিল্পের উৎকৃষ্ট নমুনা, তাহা দর্শকমাত্রেই উপলব্ধি করিয়াছিলেন।

বহু প্রকার স্থানীয় শিল্পনিদর্শন ভিন্নও চন্দননগরের সম্পর্কযুক্ত এমন কতকগুলি দ্রব্য ছিল,—যেমন ডুপ্লের বিবাহ রেজিষ্টার, তাঁহার লিখিত পত্রের প্রতিলিপি, দাস-বিক্রয়ের দলিল, ডুপ্লে রেণো ইন্দ্রনারায়ণ চৌধুরী স্বাক্ষরিত একখানি দলিল, স্থানীয় কোন কোন ব্যক্তিকে লিখিত বঙ্কিমচন্দ্র, গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায়, সুরেশচন্দ্র সমাজপতি, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতির পত্র। এখানকার লোকের দ্বারা নিহত প্রকাণ্ড ব্যাঘ্র-চর্ম্ম, কুম্ভীর, এখানকার লোকের সংগৃহীত বহুসংখ্যক প্রাচীন মুদ্রা, বাংলা অক্ষরের ক্রম-বিবর্ত্তন চিত্র, বাংলার সম্পদ-চার্ট, ফরাসী ভারতের ব্রহ্মার ছবি অঙ্কিত ও অন্যান্য ডাকটিকিট, প্রকৃতির বহু অদ্ভুত খেয়ালের ফোটোগ্রাফ প্রভৃতি সকল দর্শকেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল।

রাসপঞ্চাধ্যায়ের পুঁথিরচিত্রাবলী







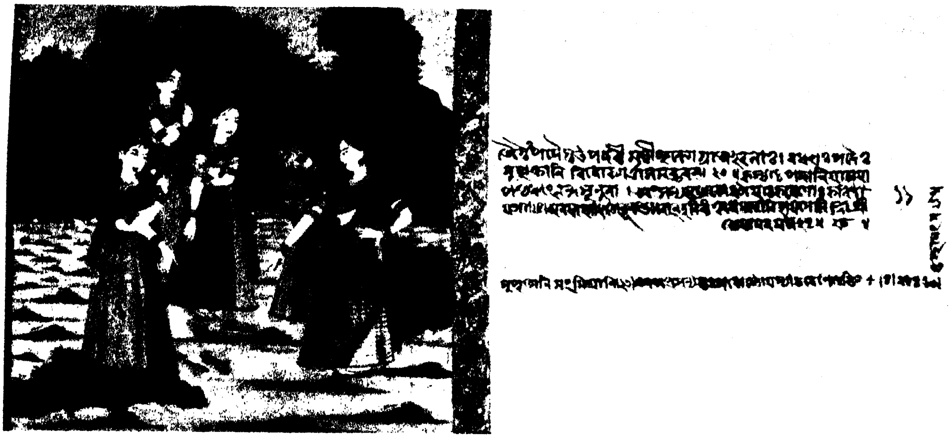








রাসপঞ্চাধ্যায়ের পুঁথির চিত্রাবলী







রাসপঞ্চাধ্যায়ের পুঁথির চিত্রাবলী



ভূদেব-প্রতিষ্ঠিত প্রাথমিক বিদ্যালয়ের ধ্বংসাবশেষ



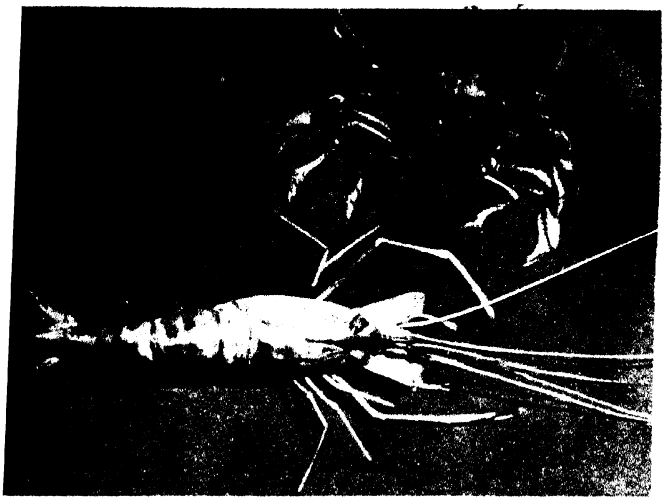
ভাগীরথীবক্ষে অর্লেয়াঁ দুর্গের পাদমূলে ব্রিটিশ রণতরী
টাইগার, কেন্ট ও সলসবেরি



অষ্টাদশ শতাব্দীর চন্দননগর



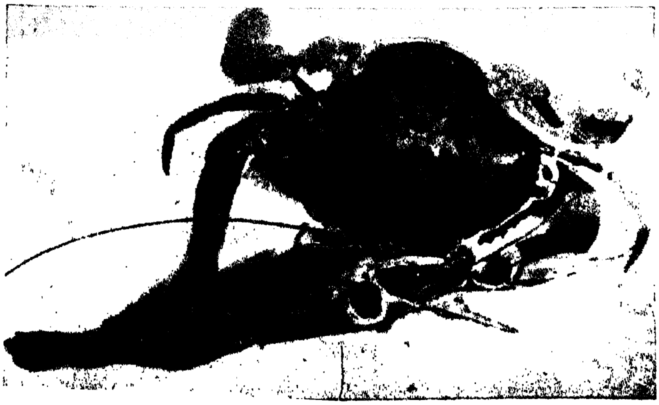
অধুনালুপ্ত মোরান সাহেবের বাগানবাড়ী, গোন্দলপাড়া



এক পাত্রে রক্ষিত চিংড়ি ও চিতি-কাঁকড়া হাটিয়া বেড়াইতেছে



আহারান্বেষণে ঘুরিতে ঘুরিতে হঠাৎ পরস্পর সম্মুখীন হইবার ফলে চিংড়ি ও চিতি-কাঁকড়ার লড়াই বাধিয়া গিয়াছে



অল্প জলে একই স্থানে রক্ষিত চিংড়ি ও কাঁকড়ার মারামারির ফলে চিংড়ি কাঁকড়ার হাতে প্রাণ হারাইয়াছে



জলের মধ্যে চিংড়ি ও কাঁকড়া আহারান্বেষণে ব্যস্ত





পঞ্চশস্য

চিংড়ির জীবনযাত্রা-প্রণালী

সাধারণতঃ অনেকেই চিংড়িকে এক জাতের মাছ বলিয়া মনে করেন। ইহারা মাছের মত জলে বাস করে বটে কিন্তু মাছের সঙ্গে কোন রক্তগত আত্মীয়তা নাই। প্রাণিজগতে কাঁকড়াকেই চিংড়ির নিকটতম আত্মীয় বলিয়া মনে হয়। পরিণত অবস্থায় উভয়ের দেহের আকৃতিতে যথেষ্ট বৈষম্য লক্ষিত হইলেও শিশু-অবস্থায় পরস্পরের মধ্যে যথেষ্ট সাদৃশ্য দেখিতে পাওয়া যায়। কাঁকড়ার 'মেগালোপা' বা শিশু অবস্থায় তাহার উদরভাগটি যখন লেজের মত পশ্চাদ্দিকে প্রসারিত থাকে তখন কাঁকড়া ও চিংড়ির মধ্যে সুস্পষ্ট সাদৃশ্য পরিলক্ষিত হয়। কিন্তু কিছুকাল পরেই কাঁকড়ার শিশু তাহার দেহের শক্ত খোলসের নীচের দিকে এই লেজটি গুটাইয়া লইয়া গোলাকার হইয়া যায়। চিংড়ি কিন্তু বরাবর এই উদরদেশ প্রসারিত অবস্থায় রাখিয়াই চলাফেরা করে। চিংড়ি ও কাঁকড়া প্রভৃতি প্রাণীরা 'ক্রাষ্টেশিয়া' শ্রেণীভুক্ত, পরস্পর সম্পর্কিত হইলেও উভয়ের চালচলন সম্পূর্ণ বিভিন্ন। কাঁকড়া পাশাপাশি হাঁটে ও সাঁতার কাটে। চিংড়ি কিন্তু ডাঙায় হাঁটিবার সময়েই হউক কিংবা জলে সাঁতার কাটিবার সময়েই হউক বরাবর সম্মুখের দিকেই অগ্রসর হয়। কাঁকড়া যেমন জলে স্থলে সর্ব্বত্রই অতি দ্রুতগতিতে পায়ে হাঁটিয়া বেড়াইতে পারে, চিংড়ি অত দ্রুত হাঁটিতে পারে না। মাছ যেমন পাখনা ও লেজের সাহায্যে জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় চিংড়ির সাঁতার দিবার ভঙ্গী তাহা অপেক্ষা সম্পূর্ণ বিভিন্ন। ইহাদের উদরের নিম্নদেশে দাঁড়ের মত পাঁচটি পাতলা উপাঙ্গ আছে। সেগুলিকে দ্রুত সঞ্চালন করিয়া একটানা খানিক দূর সাঁতার দিয়া যায় মাত্র। সাধারণ মাছের মত ইহাদের লেজ ঊর্দ্ধাধঃ ভাবে চওড়া নয়, পাখীর লেজের মত পাশাপাশি ভাবে চওড়া। সাঁতার কাটিবার সময় লেজের পাখনাগুলি প্রসারিত করিয়া ঠিক এরোপ্লেনের ধরণে চলিয়া থাকে, মাছের মত শরীর আঁকিয়া বাঁকিয়া যায় না। কিন্তু সাধারণ চলাফেরার কাজে পায়ের ব্যবহারই বেশী করিয়া থাকে।

কলিকাতা ও তাহার আশেপাশে গলদা বা মোচা, বাগদা, চাপড়া, কড়ানে, ঘোড়া, কুচা ও কাদা চিংড়ি নামক বিভিন্ন জাতীয় অসংখ্য রকমারি চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। এতদ্ব্যতীত আমাদের দেশীয় কুচো-চিংড়ির মধ্যে বর্ণ-বৈচিত্র্যে বিভিন্ন চিংড়ির সংখ্যাও কম নয়। বিভিন্ন জাতের চিংড়ির দৈহিক ক্রমবিকাশ ও জীবনযাত্রা-প্রণালীর মধ্যে বৈচিত্র্য থাকিলেও এস্থলে সাধারণ ভাবে তাহাদের জীবনযাত্রার কাহিনী উল্লেখ করিব।

বিচিত্র পারিপার্শ্বিক অবস্থার সহিত সঙ্গতি রক্ষা করিয়া বিভিন্ন জাতের চিংড়ি পৃথিবীর নানা স্থানে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছে। কয়েক প্রকার চিংড়ি নদী, পুষ্করিণী বা খালবিলের মিঠা জলেই বাস করিয়া থাকে। তাহারা কোন ক্রমে সমুদ্রের নোনা জলে আসিয়া পড়িলেই প্রাণ হারায়, আবার সামুদ্রিক নোনা জলের চিংড়িরাও মিঠা জলে প্রাণধারণ করিতে পারে না। গভীর সমুদ্রের চিংড়িদের প্রায়ই প্রবল শত্রুদের সঙ্গে একত্র বিচরণ করিতে হয়। এই জন্যই বোধ হয় তাহাদের দেহ অধিকাংশ ক্ষেত্রেই সুতীক্ষ্ণ কণ্টকাকীর্ণ ইহাদিগকে "কাঁটাচিংড়ি" বলাই অধিকতর সঙ্গত মনে হয়। অক্টোপাসের মত ভীষণ শত্রুকেও কাঁটার আঘাতে ইহারা সময়ে সময়ে ঘায়েল করিয়া দেয়। ইহা ছাড়াও গভীর সমুদ্রে এমন অনেক বিভিন্ন জাতের চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের আকৃতি-প্রকৃতি অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। কিন্তু এস্থলে আমরা কেবল দেশীয় পরিচিত চিংড়িদের বিষয়ই বর্ণনা করিব।

চিংড়ির ডিম নিষিক্ত হইবার পর এক প্রকার আঠালো পদার্থের দ্বারা পরস্পর সংযুক্ত হইয়া মায়ের উদরদেশে সংলগ্ন থাকে। স্ত্রী-চিংড়ি বুকে ডিম লইয়াই আহারান্বেষণে সর্ব্বত্র ঘুরিয়া বেড়ায়। ডিমের মধ্যস্থিত সঞ্চিত খাদ্যসাহায্যে ভ্রূণ পরিপুষ্ট হইয়া কিছু দিনের মধ্যেই 'নপ্লিয়াস্' নামক শিশু-অবস্থায় রূপান্তরিত হয় এবং জলের মধ্যে স্বাধীনভাবে চলাফেরা করিতে সুরু করে। তখন ইহাদের আকৃতি এমনই অদ্ভুত থাকে যে কিছুতেই চিংড়ির বাচ্চা বলিয়া চিনিতে পারা যায় না। নপ্লিয়াস্ অবস্থায় শরীরের উভয় পার্শ্বে ডালপালা-সমন্বিত তিনটি করিয়া পা থাকে, এবং মস্তকের সম্মুখভাগে একটি মাত্র চক্ষু দেখিতে পাওয়া যায়। নপ্লিয়াস্ অবস্থায় কিছু দিন চলাফেরা করিবার পর চিংড়ি-শিশু খোলস বদলাইয়া নূতন এক আকার প্রকার পরিগ্রহ করে। চিংড়ি-শিশুর এই অবস্থার নাম 'জোইয়া'। পরিণতাবস্থায় চিংড়ির খোলায় যেরূপ বিভিন্ন খণ্ড খণ্ড অংশ দেখিতে পাওয়া যায় এই জোইয়া অবস্থাতেই তাহা প্রথম আত্মপ্রকাশ করে। কিন্তু জোইয়ার সহিত পরিণত চিংড়ির আকারের বিশেষ কোনই সামঞ্জস্য নাই। এই সময় একটি চক্ষুর স্থলে দুইটি চক্ষু আত্মপ্রকাশ করে। জোইয়া অবস্থাতেই ইহার অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গের উন্মেষ হইতে থাকে, এবং আরও কয়েক বার খোলস পরিবর্ত্তন করিবার পর 'মাইজোপড' অবস্থায় রূপান্তরিত হয়। এই সময় ইহাকে অনেকটা পরিণত অবস্থার চিংড়ির মত দেখায়। কেবল উদরের নীচে দাঁড়ের মত পাতলা উপাঙ্গগুলি দেখিতে পাওয়া যায় না। পায়ের অগ্রভাগে আঙ্গুলের ন্যায় কতকগুলি ডালপালা থাকে। ইহাদের সাহায্যে অনায়াসেই জলের মধ্যে সাঁতার কাটিয়া বেড়াইতে পারে। তাহার পর কিছু দিন পর-পর খোলস বদলাইয়া সম্পূর্ণ পরিণত অবস্থা লাভ করে। নোনা জলের চিংড়ির মধ্যেই সাধারণতঃ এইরূপ বিভিন্ন অবস্থান্তর পরিলক্ষিত হয়, কিন্তু মিঠা জলের চিংড়ির ক্রমবিকাশপ্রণালী সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। অবশ্য কোন কোন ক্ষেত্রে তাহার বিপরীত ব্যবস্থাও পরিলক্ষিত হইতে পারে। মিঠা জলের চিংড়িরাও ডিম বুকে করিয়া ঘুরিয়া বেড়ায়; কিন্তু ডিম ফুটিয়া নপলিয়াস বা জোইয়ার আকার ধারণ করে না।

এই অবস্থাগুলি ডিমের মধ্যেই অতিবাহিত হয়। ইহাদের ডিম ফুটিয়া সোজাসুজি "সাইজোপড্" শিশু অবস্থায় বাহির হইয়া আসে এবং জলে সাঁতার কাটিয়া বেড়ায়। তাহার পর ক্রমশঃ খোলস বদলাইতে বদলাইতে পরিণত অবস্থা লাভ করে।

কাঁকড়া সাধারণতঃ জলেই বাস করিয়া থাকে কিন্তু প্রয়োজন মত ডাঙায় উঠিয়াও অনেক সময় কাটায়। চিংড়িরাও সেইরূপ প্রয়োজন মত সময় সময় ডাঙায় উঠিয়া হাঁটিয়া যায়; কিন্তু কাঁকড়ার মত অতক্ষণ ডাঙায় থাকিতে পারে না। যত ক্ষণ শরীর ভিজা থাকে তত ক্ষণ ডাঙায় ঘুরিয়া বেড়াইতে ইহাদের কোন কষ্ট হয় না, কিন্তু শরীর শুষ্ক হইলেই বিপদ। এই জন্য ইহারা প্রায়ই দিনের বেলায় রৌদ্রের মধ্যে ইচ্ছা করিয়া ডাঙায় আরোহণ করে না, এবং ভিজা মাটি বা কর্দমাক্ত স্থানে বেশীর ভাগ চলাফেরা করিয়া থাকে। ডাঙায় উঠিয়া শরীর শুষ্ক হইয়া গেলে ইহারা মুখ দিয়া থুথুর মত ফেনা বাহির করিয়া মুখের খানিকটা অংশ ভিজা রাখিতে চেষ্টা করে।

জলস্রোতের উজান বাহিয়া চলিবার একটা স্বাভাবিক প্রবৃত্তি যেমন মাছেদের মধ্যে দেখা যায়, চিংড়ির স্বভাবও ঠিক সেইরূপ। চিংড়ি ধরিবার জন্য জেলেরা স্রোতস্বতী খাল বা নালার মধ্যে কিছু দূর ব্যবধানে জানালার গরাদের মত সরু ফাঁকবিশিষ্ট কাঠির বেড়া পাশাপাশি পুঁতিয়া দিয়া তাহার মধ্যস্থলে ফাঁদ বা ঘুণি পাতিয়া রাখে। চিংড়িরা জলস্রোতে উজান বাহিয়া আসিয়া এই বেড়া অতিক্রম করিতে না পারিয়া কেহ কেহ ফাঁদের মধ্যে ঢুকিয়া আটকা পড়িয়া যায়। অনেকেই কিন্তু সহজে ফাঁদের মধ্যে ঢুকিতে চাহে না, তাহারা অদ্ভুত কৌশলে ফাঁদ বা বেড়া অতিক্রম করিয়া যায়। পাছে কেহ কোন স্থান দিয়া গলিয়া যায় এই ভয়ে বেড়াটাকে উঁচু পাড়ের সঙ্গে কোথাও একটু ফাঁক না রাখিয়া মিলাইয়া দেওয়া হয়। স্রোতের বিপরীত দিক্ হইতে আসিয়া চিংড়ি বেড়ার গায়ে ঠেকিলেই স্রোতের মধ্য দিকে লাগিয়া বেড়ার গা ঘেঁষিয়া কিনারার দিকে আসিতে থাকে। কিনারায় পৌঁছিয়া দাড়া ও পায়ের সাহায্যে পাড় বাহিয়া উপরে ওঠে এবং ডাঙার উপর হাঁটিয়া গিয়া পুনরায় জলে নামে। খালের পাশে উঁচু জমির উপর সময় সময় বৃষ্টি বা অন্য কোন কারণে সামান্য জল জমিয়া থাকিলে ইহারা ডাঙায় উঠিয়া রাস্তা ভুল করিয়া তাহার মধ্যেই ঘোরাফেরা করিতে থাকে। ইতিমধ্যে রাত্রি প্রভাত হইয়া গেলেই ঘাসপাতার তলায় আত্মগোপন করিয়া থাকে অথবা অনাবৃত অবস্থায়ই চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। অনেক সময় দেখা গিয়াছে দিক্‌ভ্রান্ত অবস্থায় একবার কোন একটা চিংড়ি রাস্তা পাইলেই পর-পর অনেকেই তাহার অনুসরণ করিয়া থাকে। কিন্তু কাঁকড়ারা যেমন জলের উপরে ও নীচে সমানভাবে দেখিতে পায় ইহারা ডাঙার উপর সেরূপ কিছু দেখিতে পায় বলিয়া মনে হয় না। কেবল দিশাহারা ভাবে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় মাত্র। কিন্তু রাত্রির অন্ধকারে ইহাদের দৃষ্টিশক্তি কিছু খোলে বলিয়া মনে হয়।

চিংড়িরা বড়ই কলহপ্রিয়। জলের নীচে একটির সঙ্গে আর একটির দেখা হইলে প্রায়ই কলহ বাধিয়া যায়, অপেক্ষাকৃত দুর্ব্বল প্রতিদ্বন্দ্বী যুদ্ধে পরাস্ত হইয়া দুই-একটা ছিন্ন ঠ্যাং ফেলিয়া রাখিয়া পলাইতে বাধ্য হয়। খোলস-পরিবর্ত্তনের সময় ছিন্ন অঙ্গ পুনরায় গজাইয়া থাকে। পলাইতে না পারিলে প্রবলের হাতে মৃত্যু অনিবার্য্য। বিজেতা পরাজিতের মৃতদেহ ধীরে ধীরে উদরসাৎ করে। স্বজাতির মৃতদেহ ইহারা অতি উপাদেয় বোধে আহার করিয়া থাকে, এমন কি নিজের সন্তানদিগকে পর্য্যন্ত বাদ দেয় না। ডিম না-ফোটা পর্য্যন্ত ইহাদের মাতৃস্নেহ প্রবল থাকে। সেই সময়ে ডিমের লোভে ইহাদের শত্রুও জোটে অনেক। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, স্ত্রী-চিংড়ি ডিম বুকে করিয়াই ঘুরিয়া বেড়ায়। সেই সময় ডিম খাইবার লোভে কই, শিঙ্গি প্রভৃতি নানা জাতীয় মাছ ইহাদিগকে আক্রমণ করিয়া নাস্তানাবুদ করিয়া থাকে। ইহাদের আক্রমণ হইতে পরিত্রাণ পাইবার নিমিত্ত চিংড়ি অনেক সময় লতাপাতা অথবা জল-নিমজ্জিত ইট, পাথরের খাঁজে বা গর্ত্তে এমন নিশ্চল ভাবে আত্ম-গোপন করিয়া থাকে যে দেখিলে একটা আবর্জ্জনা ছাড়া কোন প্রাণী বলিয়াই মনে হয় না। ইহাদের লেজে ভয়ানক জোর এবং তাহার মধ্যস্থলে কাঁটার মত সূক্ষ্মাগ্র ও শক্ত একটা উপাঙ্গ থাকে। শত্রু ইহাকে আঁকড়াইয়া ধরিলে লেজ বাঁকাইয়া হঠাৎ এমন জোরে ঝটকা মারে যে এক আঘাতেই শত্রু তাহাকে ছাড়িয়া দিতে বাধ্য হয়। ঝটকা মারিয়া একবারে ছাড়াইতে না পারিলে কাঁটাওয়ালা লম্বা দাড়া সাঁড়াশীর মত এমনভাবে চাপিয়া ধরে যে শত্রু পলাইতে পথ পায় না। অক্টোপাস-জাতীয় প্রাণীরা যেমন শত্রুর আক্রমণ এড়াইবার জন্য পিচ্‌কারির মত জোরে কালি ছুঁড়িয়া জল ঘোলা করিয়া দেয় এবং সঙ্গে সঙ্গে জলের চাপে দূরে ছিটকাইয়া চলিয়া যায়, চিংড়িরাও সেইরূপ জলের তলায় কোন প্রবল শত্রু দ্বারা আক্রান্ত হইবামাত্র লেজটাকে ধনুকের মত বাঁকাইয়া হঠাৎ জোরে সোজা করিয়া দেয়, তার ফলে জলের সঙ্গে ধাক্কা লাগিয়া দূরে ছিটকাইয়া পড়ে। ইহা ছাড়া শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষার জন্য ইহাদের মুখের সম্মুখস্থ করাতও যথেষ্ট সাহায্য করিয়া থাকে।

চিংড়ির বাচ্চারা কিন্তু শত্রুর কবল হইতে আত্মরক্ষার জন্য অন্য উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। বড় চিংড়ি বা অন্য কোন মাছেরা যদি ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে আসে তবে বাচ্চারা জল হইতে ছিটকাইয়া ডাঙ্গায় উঠিয়া পড়ে এবং সেখানে মড়ার মত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। কিছুক্ষণ পরে আবার জলে লাফাইয়া পড়ে। বড় বড় কাচপাত্রে বাচ্চা চিংড়ি ও অন্যান্য মাছ একত্র রাখিয়া দেখিয়াছি—শত্রুর ভয়ে ইহারা কাচের দেয়ালের গায়ে লাগিয়া চুপ করিয়া থাকে, কখনও জলের মধ্যস্থলে আসে না। কারণ মধ্যস্থলে আসিলেই ইহারা পরিষ্কার ভাবে শত্রুর নজরে পড়িয়া যায়; জলের কিনারায়, কাচের গায়ে বা জলের উপরের পর্দ্দার সঙ্গে এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে কোন রকমেই সহজে শত্রুর দৃষ্টিপথে পতিত হয় না। এ অবস্থায়ও শত্রুদ্বারা আক্রান্ত হইবার সম্ভাবনা দেখিলেই জলের উপরে লাফাইয়া উঠিয়া কাচের দেয়ালের গায়ে লাগিয়া মৃতের ন্যায় অবস্থান করে। দেহের চতুর্দ্দিকে যে একটু জল থাকে তাহা শুকাইয়া যাইবামাত্রই আবার লাফাইয়া জলে পড়িয়া যায়। অন্য কোন উপায় না দেখিলে জলের উপরে ভাসমান যে-কোন খড়-কুটার গাত্র সংলগ্ন হইয়া বেমালুম আত্ম-গোপন করিয়া অবস্থান করে, পরিষ্কার জলে কখনও যথেচ্ছ সাঁতার কাটিয়া বেড়ায় না। ছবিতে দেখা যাইতেছে—একটা বড়



কতকগুলি বাচ্চা চিংড়ি অন্য বড় মাছের ভয়ে শালুক-ডাঁটার গায়ে লাগিয়া আত্মগোপন করিবার চেষ্টা করিতেছে, কতকগুলি আবার লাফাইয়া উপরে উঠিয়া ট্যাঙ্কের গায়ে লাগিয়া ঠিক মড়ার মত পড়িয়া আছে

কাচের চৌবাচ্চার মধ্যে একটা মাত্র শালুক-ডাঁটার গায়ে ছোট ছোট চিংড়িগুলি সারবন্দীভাবে অবস্থান করিতেছে। জলের উপরে শুষ্ক দেয়ালের গায়েও গোটা দুই চিংড়িকে লাগিয়া থাকিতে দেখা যাইতেছে। পরিষ্কার জলের মধ্যে চিংড়িগুলির সঙ্গে একটা কইমাছ ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছিল। মাছটার ভয়ে ইহারা শালুক-ডাঁটার গায়ে আত্মগোপন করিয়া এবং কতক উপরে লাফাইয়া উঠিয়া দেয়ালে আটকাইয়া রহিয়াছে। এখানে ছবির একাংশমাত্র দেখান হইয়াছে, কাজেই কইমাছটিকে দেখা যাইতেছে না। অনেক সময় দেখা যায় ভাসমান ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র দুই-এক টুকরা আবর্জনার গায়ে অনেকগুলি বাচ্চা চিংড়ি একটির ঘাড়ে আর একটি চুপ করিয়া বসিয়া রহিয়াছে।

আমাদের দেশে সাধারণতঃ এক ইঞ্চি হইতে দেড় ইঞ্চি লম্বা যে-সকল কুচা-চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়, জীবন্ত অবস্থায় তাহাদের গায়ের রং প্রায়ই জলের রঙের সঙ্গে মিশিয়া থাকে। কাজেই তাহাদের পক্ষে শত্রুর হাত হইতে আত্মরক্ষা করা যদিও অনেকটা সহজ, তথাপি তাহারা নানা প্রকার লুকোচুরির আশ্রয় গ্রহণ করিয়া থাকে। প্রায় এক ইঞ্চি পরিমিত লাল, কালো ও সবুজ রঙের কয়েক প্রকার চিংড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা শরীরের রং অনুযায়ী বিভিন্ন জলজ উদ্ভিদের গায়ে এমন ভাবে বসিয়া থাকে যে হঠাৎ দেখিয়া উদ্ভিদাদির অঙ্গপ্রত্যঙ্গ ব্যতীত আর কিছুই মনে হয় না।

চিংড়িদের আহারপ্রণালীও অদ্ভুত। জলের তলায় কোন খাদ্যদ্রব্য দেখিতে পাইলে সাঁড়াশির মত দাড়ার সাহায্যে কুড়াইয়া লইয়া মুখে পুরিয়া দেয়। খাবার সময় চিংড়িদের দেখিলে ঠিক চীনাদের কাঠি দিয়া খাবার মুখে তুলিয়া দিবার দৃশ্য মনে পড়ে। খাদ্যসংগ্রহের জন্য দুইটি দাড়াই পর্য্যায়ক্রমে ব্যবহার করিয়া থাকে। জলের উপরে ভাসমান কোন খাদ্য সংগ্রহ করিতে হইলে চিংড়ি কিছু দূর ভাসিয়া উঠিয়া লতাপাতার আড়ালে আত্মগোপন করে এবং দূর হইতে দাড়া বাড়াইয়া তাহা টানিয়া লইয়া জলের নীচে অপেক্ষাকৃত নিরাপদ স্থানে রাখিয়া ধীরে ধীরে আহার করিয়া থাকে। বঁড়শিতে টোপ গাঁথিয়া ফাৎনার সাহায্যে তাহা ভাসাইয়া রাখিলে এই ব্যাপার পরিষ্কাররূপে দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ বঁড়শিতে হেঁচ্‌কা টান মারিয়া যেরূপে মাছ ধরা হয়, সেইরূপ হেঁচ্‌কা টানে চিংড়ি ধরা পড়ে না। চিংড়ি আস্তে আস্তে আসিয়া সাঁড়াশি বা দাড়ার সাহায্যে টোপ আঁকড়াইয়া ধরিয়া জলের নীচে নির্জ্জন স্থানে টানিয়া লইয়া যাইতে থাকে। তখন বঁড়শির সূতা টানের উপর রাখিয়া আস্তে আস্তে উপরের দিকে তুলিতে থাকিলে চিংড়ি টোপ আঁকড়াইয়া সূতার সঙ্গে ধীরে ধীরে উপরে আসিতে থাকে। কারণ সহজে সে খাবার ছাড়িয়া দিতে চায় না। যখন দেখে যে টোপ টানিয়া আর নীচে লইয়া যাইবার উপায় নাই এবং আর একটু হইলেই খাবার হাতছাড়া হইয়া যায় তখন তাড়াতাড়ি মুখে পুরিয়া গিলিয়া ফেলে, সূতা টান থাকিবার ফলে বঁড়শি তখন তাহার মুখে গাঁথিয়া যায়।

কোন খাদ্যবস্তু কঠিন আবরণে আবৃত থাকিলে চিংড়ি তাহার নাকের ডগার লম্বা করাতের সাহায্যে আবরণ ফুটা করিয়া ভিতরের জিনিষ আহরণের চেষ্টা করে। যে-সব পুকুরে কুচা-চিংড়ি প্রচুর পরিমাণে বাস করে সেই পুকুরের জলে নামিয়া একটু চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া থাকিলেই ইহার প্রমাণ পাওয়া যায়। পায়ের চতুর্দ্দিকে অসংখ্য কুচা-চিংড়ি মিলিয়া তাহাদের সূক্ষ্মাগ্র করাতের



চিতি-কাঁকড়ার দাড়ার চাপে চিংড়িটি মৃতপ্রায় হইয়া পড়িয়াছে

অগ্রভাগ দিয়া খোঁচাইতে থাকে। শরীরে অসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম সূচ বিঁধিবার মত যন্ত্রণা অনুভূত হয়।

চিংড়ি ও কাঁকড়ার মধ্যে নিকট সম্বন্ধ থাকিলেও পরস্পরের মধ্যে মোটেই বনিবনাও হয় না। উভয়ের মধ্যে খাদ্য-খাদক সম্বন্ধ। তাহা ছাড়া একে অন্যের আধিপত্য মোটেই সহ্য করিতে পারে না। বড় বড় কাচের জলাধারের মধ্যে কাঁকড়া ও চিংড়ি একত্র রাখিয়া দেখিয়াছি—প্রশস্ত স্থানে উভয়ে উভয়কে এড়াইয়া চলে; অপ্রশস্ত ছোট জলাধারে প্রায়ই ঝগড়া বাধিয়া যায় এবং পরস্পর মারামারির ফলে অধিকাংশ স্থলে চিংড়িই পরাভূত হয়। কাঁকড়া তাহার মৃতদেহ আংশিকভাবে ভক্ষণ করিয়া থাকে। কাচের জলাধারে একটি চিতি-কাঁকড়ার সঙ্গে কয়েকটি চিংড়ি রাখিয়াছিলাম। কয়েক দিন পর্য্যন্ত তাহারা বেশ নিরিবিলিতে কাটাইল—কোনই গোলমাল নাই। হঠাৎ একদিন দেখি, কোন রকমে একটি চিংড়ির সঙ্গে কাঁকড়াটার মুখোমুখি সাক্ষাৎ হইয়া গিয়াছে। অমনি লড়াই সুরু হইয়া গেল। পাঁচ-সাত মিনিটের মধ্যেই কাঁকড়া তাহার দাড়ার সাহায্যে চিংড়ির এক দিকের কয়েকটা পা ভীষণ জোরে চাপিয়া ধরিল। চিংড়ি প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াও ছাড়াইতে পারিল না। অবশেষে কিছুক্ষণ ঐ অবস্থাতেই ছটফট করিতে করিতে ধীরে ধীরে প্রাণত্যাগ করিল। একদিন অল্প জলের মধ্যে একটা নীলা-কাঁকড়া ও চিংড়ি রাখিবার কিছুক্ষণ বাদেই উভয়ে ভীষণ মারামারি সুরু করিয়া দিল। চিংড়ির দাড়া অপেক্ষা কাঁকড়ার দাড়া বেশী জোরালো ও তীক্ষ্ণ। কাঁকড়াটা তাহার সাঁড়াশির মত দাড়ার সাহায্যে চিংড়ির শরীরের মধ্যদেশ এমন ভাবে চাপিয়া ধরিল যে চিংড়িটা দুই-চার বার ছিটকাইয়া পড়িবার চেষ্টা করিয়াই একেবারে নির্জীব হইয়া গেল। খানিকক্ষণ বাদে কাঁকড়া মৃতদেহটাকে ছাড়িয়া দিয়া হাত পা গুটাইয়া এক স্থানে চুপ করিয়া বসিয়া রহিল।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

ভ্রম-সংশোধন

বৈশাখ, ১৩৪৪—"বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি"

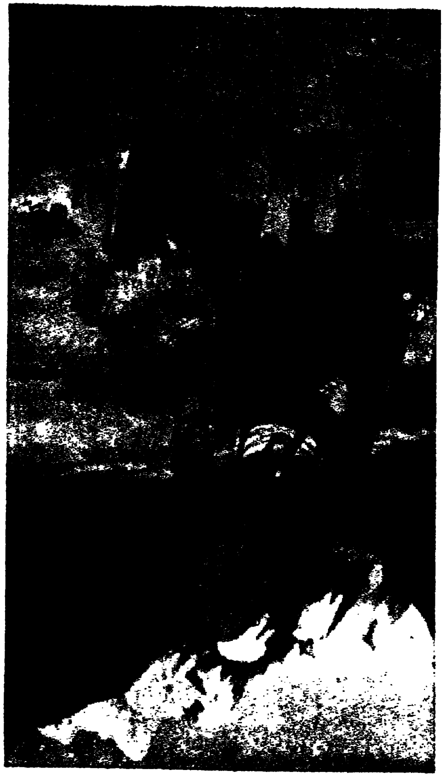
পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
১২৬	১	৯	১৮ই মে	১৮ই জুন
১২৭	১	১০	১৯৩০	১৯৩১
১৩৫	২	২	জুন-জুলাই	আগষ্ট
১৪১	২	৮	১লা	২রা

জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৪—"বাঙ্গালা বাণান"

পৃষ্ঠা	স্তম্ভ	পংক্তি	অশুদ্ধ	শুদ্ধ
২০২	২	৩৯	মুর্দ্ধণ্য	মূর্দ্ধন্য
২০৬	২	২৩	পা+ণি+চ্—ক্ত	পা+ণিচ্+ক্ত







অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

২১

স্কুল কলেজ থাকিলে সপ্তাহে এক দিনের বেশী হৈমন্তীদের বাড়ী যাওয়া হয় না। ঐ একটা দিনই ছিল সুধার প্রাত্যহিক রুটিনের বাহিরে মুক্তির দিন, কারণ তাহার মা পীড়িত বলিয়া তাঁহার সঙ্গে নিমন্ত্রণ-আমন্ত্রণ কি কোন উৎসব-আনন্দে যাইবার সুযোগ তাহার ঘটিত না। ঐ একটা দিনের জন্য সারা সপ্তাহ ধরিয়া উন্মুখ হইয়া থাকা সুধার নিয়ম দাঁড়াইয়া গিয়াছিল, কিন্তু সে দিনটা কখনও বাদ পড়িলে এমন কিছু দারুণ নৈরাশ্যের কারণ ঘটিত না। হৈমন্তীর সঙ্গে সপ্তাহের আর ছয়টা দিন ত দেখা হয়ই।

অকস্মাৎ ঐ দিনটার আশা-পথ চাহিয়া থাকায় সুধার আগ্রহ যে অনেক গুণ বাড়িয়া গিয়াছে তাহা সে আপনি দেখিয়া বিস্মিত হইল। একদিন সকালে উঠিয়া সে লক্ষ্য করিল যে, একটা রাত্রি কাটিয়া যাওয়াতে ছুটির দিনের কতটা কাছে সে আগাইয়া আসিয়াছে তাহা সে গুনিতে আরম্ভ করিয়াছে; সন্ধ্যাতেও সে একটা দিন শেষ হওয়ায় যেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। দিন ও রাত্রিকে দুই ভাগ করিয়া লইয়া দিনের বারোটা ঘণ্টা কাটিয়া গেলে তাহার আনন্দ যেন উপচিয়া পড়ে, কারণ রাত্রির বারোটা ঘণ্টা ত ঘুমাইয়াই কাটিয়া যাইবে। কখন যে তাহার আরম্ভ সেইটুকু জানিলেই চলিবে, শেষটার জন্য দীর্ঘ বারো ঘণ্টা সজ্ঞানে অপেক্ষা করিতে হইবে না।

কিন্তু কেন তাহার এই আগ্রহ? আগ্রহের কারণ বুঝিয়া আপনার কাছে আপনাকেই যেন সে অপরাধী বলিয়া মনে করিত। জীবনে উচ্চ আদর্শের, ত্যাগের আদর্শের, প্রতি সুধার টান ছিল। সে যে তাহার জীবনে বড় কিছু ত্যাগ করিতে পারে নাই ইহার জন্য তাহার মনে মনে একটা মস্ত লজ্জাও ছিল। তপনের গ্রামের স্কুল দেখিয়া আসিয়া তাহার সেই লজ্জাটা অনেকখানি বাড়িয়াছে। ইচ্ছা করে তপনের মত সেও তাহার নয়ানজোড় গ্রামের মেয়েদের লইয়া ইস্কুল পাঠশালা করে, মেয়েদের সততা ও মনুষ্যত্ব বৃদ্ধির জন্য বড় একটা পণ করিয়া কাজে ঝাঁপ দিয়া পড়ে। কিন্তু স্বার্থপর সে, তাহা পারিতেছে কই? নিকটে যাহারা তাহার মুখ চাহিয়া পড়িয়া আছে, রক্তের সম্পর্কের সেই কয়টি মানুষের সুখসুবিধা ভুলিয়া দূরের মানুষের জন্য জীবনের কিছু অংশও সে দিতেছে কই? অথচ তাহার আগ্রহের অন্ত নাই ঐ কর্ম্মী তপনের দেখা সপ্তাহান্তে একবার পাইবার জন্য। সুধার মনে করিতে লজ্জা করে, দুঃখ হয়, যখন সে চমকিত হইয়া নিজের দিকে চায়। সে ত তপনের গ্রাম-গঠনের কাহিনী শুনিবার জন্য দিনের পর দিন আশাপথ চাহিয়া থাকে না। সে চায় তপনের নবীন ভাস্করের মত উজ্জ্বল সুন্দর মূর্ত্তিটি বার বার দেখিতে, সে চায় তাহার জলকল্লোলের মত মধুর গভীর কণ্ঠস্বর প্রাণ ভরিয়া শুনিতে, সে চায় তপনের সহিত আর একটু নিকট বন্ধুর মত সম্পর্ক পাতাইতে। যাহার ত্যাগের এক কণাও সে নিজের জীবনে দেখাইতে পারিতেছে না, তাহার প্রতি এ অহেতুক আকর্ষণকে সুধা ভীত হইয়া ভাবে এ বুঝি তাহার পতন, এ বুঝি তাহার স্খলন!

এক এক বার মনে করে হৈমন্তীর বাড়ী এ সপ্তাহে যাইবে না। সে ত তপনের কোন কাজে সাহায্য করে নাই, তবে কেন সে তপনকে দেখিবার জন্য তাহার সঙ্গে বন্ধুত্ব পাতাইবার জন্য সুযোগ খুঁজিয়া বেড়াইবে? কিন্তু মনের এই ক্ষীণ ইচ্ছা টিঁকে না ওই বিপুল আগ্রহের কাছে। রবিবার বিকালে সুধা না গিয়া থাকিতে পারে না। তপন কি সব দিনই আসে? সব দিন সে আসে না। সুধা ঘণ্টা মিনিট গুনিয়া যখন নিরাশ হইয়া বাড়ী ফিরে, তখন রাত্রে শুইয়া শুইয়া মনে হয় কবে কোথায় তপনের সঙ্গে দেখা হইয়াছিল, কবে সে কি কথা বলিয়াছিল, কোন দিনকার কথাটা

যেন একটু আত্মীয়ের মত, যেন বিশেষ করিয়া সুধারই উদ্দেশে বলা। তাহাদের বাড়ীতে ইতিপূর্ব্বে তপন আসে নাই; আচ্ছা যদি সুধা তপনকে এক দিন এ-বাড়ীতে নিমন্ত্রণ করে, তবে কি তপন কিছু মনে করিবে? আসিলে সে সুধার কাছে মস্ত একটা কাজের ভবিষ্যৎ আশায়ই নিশ্চয় আসিবে, কিন্তু যখন দেখিবে সুধা কোন কাজই করিবার স্পষ্ট আশা দিতেছে না, কেবল চা খাওয়াইয়া গান শুনাইয়া বিদায় দিল, তখন সুধাকে কি একটা অপদার্থই না জানি সে মনে করিবে। ভয়ে ভয়ে সুধার সঙ্কল্প মনেই শুকাইয়া যাইত। কিন্তু তবু মন হইতে এ চিন্তাকে সে সরাইতে পারিত না। তপন কি দেশের সেবা ছাড়া জীবনে আর কোন কথা ভাবে না? মানুষ যে মানুষের সঙ্গ খুঁজিয়া বেড়ায়, মানুষের বন্ধুত্বের জন্য ব্যাকুল হইয়া ওঠে, সেই অতি সাধারণ মানব-ধর্ম্ম কি তপনের মধ্যে নাই? যদি না থাকে তবে সে গানের সুরের ভিতর দিয়া মানুষের প্রাণের কথাকে এমন করিয়া ব্যক্ত করে কি করিয়া? কেন ঐ বিষাদ-মধুর গানগুলিই তাহার কণ্ঠে এমন অপূর্ব্ব হইয়া ধ্বনিয়া ওঠে? কেন সে জ্ঞানবৃদ্ধ ঋষিদের সন্ধানে না ঘুরিয়া তাহাদের এই ক্ষুদ্র সান্ধ্যসভার তুচ্ছ হাসিগল্প হাল্কা কথার মাঝখানে এমন করিয়া জমিয়া যায়? সেখানে তপন ত মহেন্দ্রের মত গুরুগম্ভীর কথা বলিয়া আপনার মর্য্যাদা বৃদ্ধির কোন চেষ্টা করে না। সুধারা যতই সাধারণ মানুষ হউক না কেন, বোধ হয় তাহাদের সঙ্গ তপনের নিতান্ত মন্দ লাগে না। কিন্তু ঠিক যে কতটুকু ভাল লাগে, মনের কোন্ কোণে কোন্ বন্ধুর জন্য তাহার কত খানি স্থান আছে তাহা ত কিছু বোঝা যায় না।

ভাবিতে ভাবিতে আপনার উপর সুধার করুণা হয়। এই মাত্র অল্প কিছু দিন আগেই হৈমন্তীর উদাস মনোভাব চিন্তামগ্ন দৃষ্টি দেখিয়া সুধার অভিমান হইত, কেন তাহার মনের বেদনার কথা সে সুধাকে বলে না, কেন সে বন্ধুর সমবেদনার মাঝখানে আপনার বিষাদের বোঝা নামাইয়া ফেলিয়া মুক্ত হইতে চায় না। আর আজ সুধাও কি তাহাই করিতেছে না? সে ত আরোই বেশী করিতেছে। সপ্তাহান্তে হৈমন্তীর কাছে যখন সে যায় তখন তাহার অর্দ্ধেকের বেশী মন পড়িয়া থাকে হৈমন্তীর চেয়ে অনেক দূরে। অথচ হৈমন্তী মনে করে সুধা বুঝি শুধু তাহারই জন্য আকুল আগ্রহে এত দূর ছুটিয়া আসিয়াছে। কি জানি সুধার ইহা ন্যায়সঙ্গত কাজ হইতেছে কি না।

সুধা ঠিক করিল একটুখানি কিছু কাজ করিয়া তপনের বন্ধুত্ব লাভের যোগ্যতা তাহাকে অর্জ্জন করিতে হইবে। এই কলিকাতা শহরে ঘরে বসিয়া বাহিরের কিছু কাজও কি করা যায় না? নিশ্চয় যায়। সুধা ও শিবু মিলিয়া তাহাদের বাড়ীর চারতলার চিলেকোঠায় একটা পাঠশালা খুলিবে। ননীর মায়ের ছোট মেয়ে ফেনি আর মেথরাণীর মেয়ে কুসি ত রোজ দুই বেলা তাহাদের বাড়ী আসে। এই মেয়ে দুইটাকে লইয়া কাজ সুরু বেশ করা যায়। ইহাদের বর্ণপরিচয় ও ভদ্রতা শিক্ষা দিতে পারিলে পৃথিবীর দুইটা মানুষের ত উপকার করা হয়। সুধা সামান্য মানুষ। তাহার পক্ষে ইহাই যথেষ্ট না হইলেও কিছু ত বটে!

শিবু স্কুল হইতে আসিয়া খাওয়া-দাওয়া সারিয়া মস্ত দুখানা খাতায় পৃথিবীর নানা দেশের ষ্ট্যাম্প সুশৃঙ্খল করিয়া সাজাইতে ব্যস্ত ছিল। সুধাকে সে বলিয়াছিল তাহার বন্ধুবান্ধবদের নিকট হইতে কিছু কিছু ষ্ট্যাম্প যোগাড় করিয়া দিতে। সুধা এত দিন গা করে নাই। আজ সে অকস্মাৎ বলিল, "শিবু, তুই যদি ভাই, আমার একটা কাজ ক'রে দিস ত আমি তোকে অনেক ষ্ট্যাম্প এনে দেব।"

শিবু বলিল, "কি কাজ? মার্কেটে সাত বার জুতো বদ্‌লাতে যেতে হবে, না ক্লস সিল্ক এনে দিতে হবে, না ধোপা নাপিত কাউকে চাঁটি মারতে হবে? শেষের কাজটা বললেই পারব, অন্যগুলো হ'লে একটু দেরী হবে।"

সুধা হাসিয়া বলিল, "না বাপু না, আমার জুতো এই সবে গত মাসে কিনেছি আর ক্লস সিল্ক জন্মদিনে এক বাক্স পেয়েছিলাম গত বার। ও সব চাই না। ধোপাকে তুমি যদি চাঁটি মারতে ভালবাস আমার আপত্তি নেই, ও ভীষণ জ্বালাচ্ছে। কিন্তু তা ছাড়াও আর একটা কাজ আছে। আমাদের চারতলার টিনের ঘরে আমি একটা পাঠশালা করব হপ্তায় তিন সন্ধ্যা। তাতে ফেনি আর কুসি প্রথম ছাত্রী। তুই যদি আমাকে একটু সাহায্য করিস ত একটু কাজ হয়।"

শিবু নাকটা সিঁটকাইয়া বলিল, "রা—ম—চ—ন্দ্র!

ফেনি আর কুসি! পৃথিবীর সেরা দুটি পেত্নীকে পড়াবে আর আমি হাত গুটিয়ে তাদের মাষ্টারী করব? ওদের টিকি ছেঁড়বার জন্তে আমার হাত ত সারাক্ষণ নিস্‌পিস্‌ করবে, আর তুমি উপদেশ দেবে যে মেয়েদের গায়ে হাত তুলতে নেই! তার চেয়ে ধোপার ওই নম্বর ওয়ান্‌ পাজি ছেলেটাকে নাও না! পাড়ার ছেলেদের ঢিল মেরে কেমন বকধার্ম্মিকের মত মুখ ক'রে এসে আমাদের বাড়ীতে লুকোয়। ঢিল কাকে বলে তাই নাকি ও জানো না।"

সুধা উৎসাহিত হইয়া বলিল, "আচ্ছা, তুই যদি ওটাকে জোটাতে পারিস, আর ওর ভার নিতে পারিস, তাহ'লে ত ভালই হয়। পাঠশালের ছেলেমেয়ে বাড়াতে ত হবে!"

কুসির মাকে বলিবা মাত্র সে রাজি হইয়া গেল। "দাও না দিদিমণি, লক্ষ্মীছাড়ীটাকে মানুষ করে, তাহলে ত আমার হাড় জুড়োয়। সারাদিন রাস্তায় ধুলো মেখে আর আমাকে শুদ্ধ বাপ মা তুলে গাল দিয়ে ত দিন কাটাচ্ছে। ভদ্দর নোকের পায়ের কাছে বস্‌তে যদি পায়, সেও ত ওর সাত-জন্মের ভাগ্যি!"

কিন্তু ননীর মা ফেনিকে দিতে অত সহজে রাজী হইল না। মেথরের মেয়ের সঙ্গে তাহার মেয়ে একাসনে বসিয়া পড়িবে শুনিয়া সে ত প্রায় আকাশ হইতে পড়িল। "ঐ কী মেলেচ্ছ কাণ্ড দিদিমণি! আমরা গরীব লোক ব'লে আমাদের কি আর জাত জন্ম সব গেছে? মেথরের সঙ্গে পড়তে বসলে আর কোনও কালে কি ওর বে-থা হবে, না ওর হাতে কেউ জল খাবে? বই পড়ে ত মেয়ে চাকরী করবে না আপিসে, কিন্তু জাত গেলে যে সব যাবে।"

শেষে রফা হইল কুসি আলাদা চটের আসনে বসিবে। ফেনি ইচ্ছা করিলে নিজের জন্ম আসন আনিতে পারে অথবা সকলের সঙ্গে মাদুরেও বসিতে পারে।

রজকনন্দনকেও আসন সম্বন্ধে নিজ ইচ্ছামত ব্যবস্থা করিবার অনুমতি দেওয়া হইল। পাঠশালা সুরুর দিন দেখা গেল তিন জনেই তিন টুকরা ছেঁড়া চট আনিয়াছে বসিবার জন্ম। কিন্তু পাঠারম্ভের পর সকলেই ভূমি-আসন বেশী সুখকর মনে করিয়া চটের আসনের মায়া ত্যাগ করিল। দুই-চার বার পাঠশাল করিতে করিতে চট আনার অভ্যাস-টাও ক্রমে তাহারা ভুলিয়া গেল। পাড়ার আরও গোটা দুই ছেলে জুটিয়াছে, সবাই সবাইকার ঘাড়ে পড়িয়া মেজের উপর বসিয়াই পড়া শুনা করে। কে যে মেথর আর কে যে চামার তাহা অত মনে রাখিবার আর কাহারও আগ্রহ নাই।

সুধা ইস্কুল ভাল করিয়া সাজাইবার জন্ম নিজেদের ছেলে-বেলার যত ছেঁড়া গল্পের বই একটা কেরাসিন কাঠের তাকে আনিয়া জড়ো করিয়াছে। দুই-একখানা ছেঁড়া ধারাপাত কি বর্ণ-পরিচয়ের বইও তাহাদের শৈশবের অত্যাচার অতিক্রম করিয়া এতদিন টিঁকিয়া আছে। সুধার উৎসাহ দেখিয়া চন্দ্রকান্ত বলিয়াছেন এই বইগুলি সস্তায় তাঁহার ইস্কুলের দপ্তরীকে দিয়া বাঁধাইয়া দিবেন এবং যদি ছাত্রদের কাছে পুরানো বই কিছু পাওয়া যায় তাহাও আনিয়া দিবেন। মহামায়া বলিয়াছেন একটা নূতন হারিকেন লণ্ঠন তিনি সুধার ইস্কুলে উপহার দিতে রাজি আছেন। হৈমন্তী ত পারিলে তাহার সব বইখাতাই দান করিয়া বসে। সুধা লইতে আপত্তি করাতে সে ছেলেমেয়েদের ইংরেজী বই ও শ্লেট পেনসিল জোগাইবার ভার লইয়াছে। শিবু দানধ্যানের ধার ধারে না, তবে সে সপ্তাহে তিন সন্ধ্যায়ই সুযোগ্য শিক্ষকের মত কাজ করিয়া যায়।

পাঠশালের কাজ মহাউৎসাহে চলিতে লাগিল। ছেলে-মেয়েগুলা আকাট মূর্খ ছিল, এক মাসের মধ্যেই বর্ণ-পরিচয় সারিয়া একটু আধটু পড়িতে সুরু করিয়াছে, ইহাতে সুধার মনে গর্ব্বের ও আনন্দের সীমা নাই, কিন্তু ঐ আনন্দের উপর আরও একটা আনন্দের ক্ষুধাও যে তাহার আছে। ছোট বটে তাহার এই কাজটুকু, তবু ইহা তাহার দেখাইতে ইচ্ছা করে তপনকে। শুধু দেখানো বলিলেও ঠিক বলা হয় না, দেখাইবার উপলক্ষ্য করিয়া তপনকে একবার তাহাদের এই ছোট বাড়ীটিতে লইয়া আসিতে, তাহার মুখে দুই-একটা উৎসাহের কথা শুনিতে সুধার যতখানি আগ্রহ হয়, আর অন্ম কোন কাজে ততখানি হয় না। তপনের মুখের দিকে চাহিয়া সুধা বুঝিতে চায় সুধার এ কাজে তপন সত্যই খুশী হইয়াছে কি না। তপনের বন্ধু বলিয়া অভিহিত হইবার যোগ্যতা সুধা অর্জ্জন করিয়াছে কি না তাহা কোন উপায়ে সে একবার ভাল করিয়া জানিতে চায়। সুধা মনে করিয়াছিল তপনের প্রিয় কার্য্যের মধ্যে ডুবিয়া সে তপনকে

লইয়া অলস স্বপ্নের জাল বোনার অভ্যাস ভুলিতে পারিবে। কিন্তু দেখিল তাহার এ অনুমান মিথ্যা; "তস্মিন্ প্রীতি" ও "তস্য প্রিয় কার্য্য" তাহার জীবনে পরস্পরকে বাড়াইয়াই তুলিতেছে। কাজ ও অকাজের মাঝখানে ঐ চিন্তা যেন তাহাকে নেশার মত পাইয়া বসিতেছে।

মনে মনে কথা বলার অভ্যাস সুধার অনেক দিনের। সে অভ্যাস কিছু মাত্র দূর হয় নাই, কিন্তু তাহাতে একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিয়াছে। আগে সুধার মানস-নাট্যে কথা বলিত অনেক জন, এখন সেখানে ক্রমে দুইটি মানুষই প্রায় সমস্ত মঞ্চ জুড়িয়া বসিয়াছে। সুধা ও তপন মনে মনে প্রতিদিন যত কথা বলে, লিখিয়া রাখিতে পারিলে তাহাতে বহু কাব্য রচনা হইয়া যাইত। অবশ্য, তপনের কথাগুলিও বলে সুধাই, কিন্তু সুধাই তাহা এমন তন্ময় হইয়া শোনে যে, সে-ই যে নাট্যরচয়িত্রী তাহা তাহার নিজেরই মনে থাকে না। তপনকে লইয়া সুধা মনে মনে চলিয়া যায় তাহাদের সেই শৈশবের নয়ানজোড়ে। সেখানে বিশালকাণ্ড মহুয়া গাছের তলায় কালো পাথরের উপরে বসিয়া তাহারা দীঘি-পাড়ের বকেদের সাদা ডানার দ্যুতি দেখে আর কত তুচ্ছ কথায় জীবনের মাধুর্য্যকে উপভোগ করে। কথা বলিতে বলিতেই পট পরিবর্ত্তিত হয়, সুধা ও তপন চলিয়াছে রূপাই নদীর জলে পা ডুবাইয়া ওপারের ধানের ক্ষেতের দিকে। সেখানে তাহারা সাঁওতাল মেয়েদের নিকট দুধ কিনিয়া তৃষ্ণা নিবারণ করিতেছে। তপনের অঞ্জলিতে সুধা দুধ ঢালিয়া দিতেছে। তপন খাইতে খাইতে হাসিয়া ফেলাতে অর্দ্ধেক দুধ মাটিতে পড়িয়া গেল। সুধা সরোষে ভ্রূভঙ্গী করিল, কিন্তু রাগ তাহার আসে না যে! সেও হাসিয়া ফেলিল।

আবার পট-পরিবর্ত্তন। সুধা নয়ানজোড় হইতে হাঁটিয়া রতনজোড়ে যাইতে যাইতে ঘন মেঘ করিয়া চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। পথ খুঁজিয়া পাওয়া যায় না। সুধা অজানা পথে বিপথে চলিয়াছে, অন্ধকারে পথের মাঝখানে ত দাঁড়াইয়া থাকা যায় না। কে যেন গানের সুরের ভিতর সুধার নাম ধরিয়া ডাকিতেছে। এ ত তাহার পরিচিত কণ্ঠ। ঐ ত তপন! সে বলিতেছে, "সুধা, তোমার এত ভয়!"

মনের ভিতর এই সকল মনগড়া গল্প জমা হইতে হইতে কতক সে ভুলিয়া যাইত, কতক বার বার দেখা দিয়া যেন সত্য হইয়া উঠিয়া সমস্ত জীবনটা মধুর রসে ভরিয়া তুলিত। আপনি আপনার আনন্দ-নিকেতন গড়িয়া সে তাহার ভিতর সুখে বিচরণ করিত। কিন্তু জীবনের সমস্তটাই ত স্বপ্ন নয়, অর্দ্ধজাগ্রত মুহূর্ত্তের মালাও নয়। এই স্বপ্নাবেশ চোখ হইতে কাটিয়া গেলে প্রকৃত মানুষটাকে কাছে দেখিতে, বন্ধু বলিয়া জানিতে যে দুরন্ত আগ্রহ তাহাকে অস্থির করিয়া তুলিত, তাহাকে সে সহজে সামলাইতে পারিত না। কিন্তু প্রকৃতি তাহার শান্ত বলিয়া বাহিরে কোন প্রকাশ ছিল না।

তাহার মনে পড়িত শৈশবে-দেখা তাহার মাসিমা সুরধুনীর কথা। মাসিমার স্মৃতির সঙ্গে রাত্রির অন্ধকারে শোনা যে সব ছিন্নসূত্র গল্প ও বেদনার সুর তাহার মনের ভিতর এখনও জড়াইয়া আছে, তাহাতে মনে হইত যেন আপনাকে সে অনেকখানি সুরধুনীর সঙ্গেই মিলাইতে পারিতেছে। শৈশবে যে-সুরধুনীর দুঃখের কথা সে বুঝিতে পারিত না, কিন্তু যাঁহার ঐকান্তিকতার সুর, যাঁহার তন্ময়তার ছবি তাহার মনে মুদ্রিত হইয়া গিয়াছিল, সেই সুরধুনী এত-দিন পরে তাহার হৃদয়ে জীবন্ত হইয়া উঠিতেন, ছিন্নসূত্র সে সকল কাহিনী, গভীর মনোবেদনার সে ইতিহাস, আত্ম-বিলোপী সে অনুরাগ যে কেমন ছিল, সুধা তাহা আপনি গড়িয়া লইতে পারিত।

মনে পড়িত মিলিদিদির কথা; মিলিদিদি তাহার এত বিলাস আরাম ছাড়িয়া যোগিনী বেশে যে কোন্ দূরদেশে চলিয়া গেল, সে কি তাহার মত এই গভীর অনুরাগের জন্য? একবার মনে হয় তাহার মত এমন করিয়া উচ্চাসনে প্রিয়কে বসাইবার ক্ষমতা মিলিদিদির নাই, আবার মনে হয় মিলি-দিদির মত এমন করিয়া সব ভাসাইয়া চলিয়া যাইবার ক্ষমতা বোধ হয় সুধার নাই।

অনুরাগের ঐশ্বর্য্যে মিলি বড় কি সুধা বড়, কি তাহার মাসিমা সুরধুনীই বড় ছিলেন, ইহা ভাবিয়া বিশ্লেষণ করিয়া দেখিবার কোন প্রয়োজন ছিল না; এই তিন জনের অনুরাগ একই পর্য্যায়ের কিনা তাহাও সুধা সাহস করিয়া বলিতে পারে না। কিন্তু তবু তাহার মনে এ সকল কথা বারবার ঘুরিয়া ঘুরিয়া আসিত।

মনে পড়িত তাহাদের স্কুলে মনীষা ও স্নেহলতার তর্কের বিষয়। সেদিন সে ইহাদের তর্কে ঠিক কোন্ স্থানটি লইবে

বুঝিতে পারে নাই, কিন্তু আজ তাহার মন যেন স্নেহলতার দিকেই ঝুঁকিতেছে। বিবাহের আদর্শে প্রেম আগে কি বিবাহ আগে এ সব বড় কথা লইয়া তর্ক করিতে সে পারিবে না। কিন্তু বিবাহের আগে হউক আর পরেই হউক, এই একনিষ্ঠ প্রেমের অঞ্জলি পাইবার অধিকার যে প্রত্যেক নারীর জন্মস্বত্ব সে বিষয়ে তাহার সন্দেহ নাই। প্রত্যেক শিশু যেমন শিশুরূপে মার মনের নিঃস্বার্থ অনাবিল স্নেহ-ধারায় অভিসিঞ্চিত হইবার অধিকার লইয়াই জন্মায়, তেমনই তরুণ জীবনের প্রথম প্রভাতে কোন একজন পুরুষের নবজাগ্রত পূত প্রথম প্রেমের অর্ঘ্য পাইবার অধিকার লইয়াই প্রত্যেক নারী জন্মায়। বিধাতা কি সুধাকে সে অধিকার হইতে বঞ্চিত করিবেন?

সুধা নারী-মাধুর্য্যের প্রতিরূপ নয় সত্য; কিন্তু তবু তাহার ইচ্ছা করে তাহাকে দেখিয়া নারী-মাধুর্য্যের ও নারী-মহিমার প্রথম পরিচয়ে বিশেষ একজনের উন্মেষিত নবীন যৌবন বিস্ময়ে ও পুলক-হিল্লোলে চঞ্চল হইয়া উঠুক; সেই একজন নারীহৃদয়ের অক্ষয় সৌন্দর্য্য নির্ঝরের উৎস খুঁজিতে ও সেই সৌন্দর্য্যধারায় আপন অনন্ত তৃষা মিটাইতে বিশ্ব-সংসার ভুলিয়া অন্ধ আবেগে তাহারই দিকে ছুটিয়া আসুক। জীবনে একবার অন্তত এই আনন্দরসটুকু আস্বাদ করিবার অধিকার তাহার আছে।

বিবাহের কথা, প্রেমের কথা কোন দিন সে ভাবে নাই। কিন্তু ভাবিবার আগেই আপনার অজ্ঞাতে তাহার মন যে সূর্য্যমুখী ফুলের মত বিশেষ একদিকে ঘুরিয়া দাঁড়াইয়াছে। জানি না জীবনে ইহা তাহাকে কোন্ সমস্যার সম্মুখে আনিয়া ফেলিবে। জানি না আনন্দের অধিকার তাহার পূর্ণ হইবে কি সমস্যার ঘূর্ণিপাকে জীবনযাত্রা সঙ্কটময় হইয়া উঠিবে?

তপন সুন্দর, দেবমূর্ত্তির মত অপূর্ব্ব সুন্দর। সুধা ত সুন্দর নয়, পৃথিবীর মাপকাঠিতে সে ঐ স্তরে পৌঁছিবার অধিকার লইয়া আসে নাই। কিন্তু মানুষের সৌন্দর্য্য কি শুধু তাহার দেহে থাকে, দ্রষ্টার চোখেই যে তাহার অর্দ্ধেক অধিষ্ঠান! নহিলে এই সুধাকেই হৈমন্তী একদিন এত সুন্দর কি করিয়া ভাবিয়াছিল? শিশুর অসহায় কচিমুখে জননী যে-রূপ দেখিয়া আত্মহারা হইয়া যান, সে-রূপ কি শুধু শিশুর মুখের না সে জননীর স্নেহবিগলিত হৃদয়ের যৌগিক রসায়নে সৃষ্ট? নারীর নিষ্কলঙ্ক প্রেমের যে অম্লান দীপ্তি, মুগ্ধ প্রেমিকের দৃষ্টির স্পর্শমণিতে তাহাই ত নিমেষে শ্যামা ধরণীর শ্যামাঙ্গিনী মেয়েটিকে উর্ব্বশী করিয়া তোলে। সে রূপ জগতের সকলের চক্ষে ধরা দিবার জন্য নয়। সে শুধু তাহারই হৃদয়দেবতার আরাধনার পুষ্পাঞ্জলি। কৃষ্ণচূড়ার রক্ত স্তবকের মত পথের ধারে গাছ আলো করিয়া ফুটে নাই বলিয়া কি ক্ষুদ্র যূথিকার রূপ নাই? শ্যামপত্রের অন্তরালে মধু ও গন্ধে বুক ভরিয়া অমল শোভাতে যে লুকাইয়া জ্বলিতেছে, তাহার রূপের মূল্য বুঝিতে গুণীজনের প্রয়োজন আছে।

সে যে নিজের মনের কাছে নিজের হইয়া ওকালতি করিতেছে, ইহা মনে করিয়া সুধা লজ্জা পাইত, আপনাকে ধিক্কার দিত, আবার কাজের মাঝখানে গভীরভাবে ডুবিবার চেষ্টা করিত। তাহার কলেজের পড়া, গৃহসংসারের সেবা, চারতলার স্কুলের শিক্ষকতা—সবগুলিকে আবার দ্বিগুণ আগ্রহে চাপিয়া ধরিত।

২২

যেদিন হৈমন্তী ও সুধা তপনের ইস্কুল দেখিতে যায়, সেই দিনই তাহারা সুরেশের নিকট খবর পাইয়াছিল যে মিলি তাহার জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইতে পারিয়াছে। রেঙ্গুনে তাহার পিসিমা তাহাকে বছর তিনেক ধরিয়া জর্জ্জেটের শাড়ী, হাতকাটা জম্পার ও বুক পর্য্যন্ত লম্বা দুল পরাইয়া গালে রুজ, ঠোঁটে লিপষ্টিক দিয়া দুই কানের উপর দুই খোঁপা বাঁধিয়া, কখনও বা জোড়া বিনুনি দুলাইয়া তাহার পূর্ব্বতন ফ্যাসান-প্রিয়তাকে ফিরাইয়া আনিবার অনেক চেষ্টা করিয়াছিলেন। তাহাতে কিছুই যে তিনি সমর্থ হন নাই তাহা নহে। প্রথম প্রথম আপত্তির সহিত এই সমস্ত প্রসাধন সহ্য করিলেও শেষে মিলি ইহাতে সানন্দেই মন দিত। কিন্তু যে-মন লোকসমক্ষে প্রসাধনের ক্ষুদ্র আনন্দে গভীর দুঃখ ভুলিবার চেষ্টা করিত, সেই মনই লোকের চোখের আড়ালে আপনার অতীত আনন্দ ও বর্ত্তমান দুঃখকে লইয়া ভবিষ্যতের স্বপ্নজাল বুনিত ও দিনের পর দিন গুনিয়া চলিত। পিসিমা যখন সদ্য বিলাত-প্রত্যাগত কোন ব্যারিষ্টার কিম্বা বিলাত-না-যাওয়া কোন ধনকুবেরের সঙ্গে মিলির আলাপ করাইয়া দিতেন তখনই মিলি কেমন শামুকের মত তাহার অস্বাভাবিক

গাম্ভীর্য্যের খোলার ভিতর ঢুকিয়া পড়িত। গান গাহিতে বলিলে সে পদ ভুলিয়া যাইত, বাজনা বাজাইতে বলিলে তাহার হাত ব্যথা করিত এবং সকল বিষয়েই পিসিমার কন্যাকে আপনার চেয়ে শ্রেষ্ঠ বলিয়া প্রমাণ করিতে চেষ্টা করিত।

দেখিতে দেখিতে মিলির বয়স প্রায় বাইশ হইল, কিন্তু রেঙ্গুনে তাহার বিবাহ হইবার কোন আশা দেখা গেল না। পালিত-গৃহিণী মহা ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন, যেমন করিয়াই হউক মেয়ের বিবাহ দিতে হইবে। বেশী ভাল করিতে গিয়া শেষ পর্য্যন্ত মেয়ের যদি মোটে বিবাহই না হয়, তখন ও-মেয়ের দশা কি হইবে? তিনি তলে তলে খোঁজ লইতে লাগিলেন সুরেশ কিছু কাজকর্ম্ম করে কি না। শোনা গেল সে একটা আপিসে একশত টাকা মাহিনায় কাজে ঢুকিয়াছে। অন্য ছোটখাট কাজেও কিছু কিছু করিবার চেষ্টা করে। গভীর দীর্ঘনিশ্বাসের সহিত পালিত-গৃহিণী বলিলেন, "মেয়েটার অদৃষ্টে এই লেখা ছিল!"

দেবরের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি ঠিক করিলেন যে মিলিকে দেশে আনাইয়া সুরেশের সহিতই বিবাহ দিবেন। কিন্তু নরেশ্বর গেলেন ক্ষেপিয়া। তিনি বলিলেন, "আমি চললাম এদেশ ছেড়ে। তোমাদের যা খুশী তোমরা করগে যাও।"

রণেন্দ্র বলিলেন, "দাদা ভুলে যান যে তিনি যেমন জেদী, তাঁর মেয়েটিও ঠিক তেমনি হতে পারে। ওর কপালে টাকা নেই তুমি ত বলছই। এই বেলা বিয়ে দিয়ে দাও, তবু স্বামী ভদ্রলোক হবে, সে একটা সান্ত্বনা।"

মিলি আসিয়াছে, তাহার পিতা পলাতক। কিন্তু তৎসত্ত্বেও মহা ঘটা করিয়া বিবাহের আয়োজন লাগিয়া গিয়াছে। পালিত-গৃহিণী প্রথম শুভদিনেই বিবাহ দিবেন। আর একদিনও অকারণ নষ্ট করিবেন না। বাড়ীতে সকল জাতীয় কর্ম্মীরই খুব প্রয়োজন। কাজেই মিলি ও হৈমন্তীর যত বন্ধুবান্ধব আছে সকলেরই সর্ব্বক্ষণ আনাগোনা চলিতেছে। মেয়েরা দূরে থাকে, গাড়ী না পাইলে তাহাদের আসা শক্ত, সুতরাং তাহাদের চেয়ে ছেলেদেরই বেশী দেখা যায়। তপন, নিখিল, মহেন্দ্র প্রত্যহ দুই বেলাই আসে। আসবাব, খাবার, ফরাস, চেয়ার, আলো, পাখা, চিঠি, কবিতা, কত রকমের জিনিষের যে ঐ একদিনের ব্যাপারের জন্য প্রয়োজন তাহার ঠিক নাই। কাপড়-গহনাটা মেয়েদের এলাকায় পড়ে, কাজেই হৈমন্তী ও সুধা তাহার ভার লইয়াছে। আর বাকি সব কাজই ছেলেদের। চিঠির কাজটায় ছেলেরা ইচ্ছা করিয়া মেয়েদেরও দলে লইয়াছে। নিখিল বলে, "মেয়েদেরই হাতের লেখা ভাল। তাঁরা যদি চিঠির ঠিকানা লিখে দেন, তাহ'লে আমরা চিঠি ভাঁজ ক'রে পুরবার ভার নিতে পারি।"

হৈমন্তীর এরকম কার্য্য-বিভাগে আপত্তি। সে বলে, "তার মানে আপনারা শক্ত কাজগুলো আমাদের দিয়ে করিয়ে, নিজেরা খালি একটু হাত নাড়বেন।"

মহেন্দ্র বলিল, "তা নয়! পৃথিবীতে কাজ পুরুষেই করে। মেয়েরা কেবল একটু মিষ্টি কথা বলে তাদের মনটা খুশী রাখে।"

মিলি বলিল, "শুধু মিষ্টি কথা বলার ভার নিয়ে যদি সংসারে আমরা একবার বেরোই, তাহ'লে পরশুরামের পৃথিবী নিঃক্ষত্রিয় করার মত দু-দিনে পুরুষজাতি সব স্ত্রীলোকের মাথা কেটে রেখে দেবে।"

নিখিল বলিল, "বাপরে, বিয়ের কনে হয়ে আপনি পুরুষ-জাতির নামে এমন কথা বলছেন! আপনার চক্ষে কোনো মোহের অঞ্জন আছে বলে ত মনে হচ্ছে না।"

মিলি বলিল, "আছে বলেই ত জেনে শুনেও এমন পাগলামি করছি। ভাল মন্দ সব জেনেও মানুষের নিজের সম্বন্ধে সর্ব্বদাই মনে কতকগুলো দুরাশা থাকে।"

নিখিল বলিল, "আচ্ছা, একটা ভাগাভাগি করলে হয় না? আমরা যতক্ষণ কাজ করব ততক্ষণ আপনারা মিষ্টি কথা বলবেন অর্থাৎ গান করবেন, এবং আপনারা যতক্ষণ কাজ করবেন ততক্ষণ আমরা আমাদেরসাধ্যমত মিষ্টি কথা বলব।"

হৈমন্তী হাত জোড় করিয়া বলিল, "দোহাই নিখিলদা, আপনি ওকাজের ভার নেবেন না, তাহ'লে আমাদের সব ঠিকানা ভুল হয়ে যাবে।"

নিখিল বলিল, "আমি বুঝতে পেরেছি, তপন ছাড়া আর কারুর গান এ সভায় মঞ্জুর নয়।"

তপন লাল হইয়া উঠিয়া বলিল, "না, না, তা কেন? আপনার গানই আজ সকলের আগে শোনা হবে।"

সুধাও ব্যস্ত হইয়া বলিল, "সত্যি হৈমন্তী, এ তোমার অন্যায়। ওঁর অমন সুন্দর গলা, কেন তুমি ওঁকে যা তা বলছ? আপনাকে আজ গান করতেই হবে দেখুন। আপনি গান না করলে আমরা কিছুতেই ছাড়ব না।"

তপনের অনুরোধ নিখিল বিশেষ কর্ত্তব্যের মধ্যে আনে নাই, কিন্তু সুধার অনুরোধে সে আনন্দে ও লজ্জায় একটু যেন বিব্রত বোধ করিতে লাগিল।

এতগুলা কথা একসঙ্গে বলিয়া সুধাও ঘামিয়া উঠিবার যোগাড়। কিন্তু যখন একটা অনুরোধের ভার স্বেচ্ছায় গ্রহণ করিয়াছে, তখন মাঝপথে ত থামিয়া যাওয়া যায় না। নিখিল এক তাড়া চিঠি লইয়া সতরঞ্চির উপর উপুড় হইয়া পড়িয়া লাল কালিতে কলম ডুবাইয়া মহা উৎসাহে ঠিকানা লিখিতে আরম্ভ করিল, দেখিয়া সুধা আবার বলিল, "ওকি, এখন ত আপনার ঠিকানা লেখার পালা নয়, আপনাকে এখন গান শোনাতে হবে। চিঠির তাড়াটা আমায় দিন দেখি।"

নিখিল সুধাকে এমন জোরজবরদস্তি করিতে কখনও দেখে নাই, সে কতকটা নিরুপায় হইয়া এবং কতকটা খুশী হইয়াই কলমটা নামাইয়া রাখিল। বলিল, "আমি ত ভাল গান কিছুই জানি না। কি গাইব বলুন।"

সুধা বলিল, "আপনি ত সত্যেন দত্তর খুব ভক্ত, তাঁর একটা গান করুন না।"

নিখিলের গলাটা ছিল ভালই, কিন্তু তাহার একটা অপবাদ বন্ধুসমাজে ছিল যে, সে কখনও সঙ্গীত-রচয়িতার সুরের শাসন মানিত না। সকল গানের সুরই নাকি তাহার স্বরচিত। এই জন্যই তাহার গান বন্ধুবান্ধবদের ঠাট্টার বিষয় ছিল। কিন্তু আজ সুধাকে নাছোড়বান্দা দেখিয়া সে গান ধরিল,

"(হায়) তোমার আমি কেউ নহি গো,
সকল তুমি মোর।
(আজ) চাইলে তোমায় পাই যে কাছে
নাই যে তেমন জোর।
(ওগো) হৃদয় তবু হাহাকারে
(কেন) কেবল ডাকে হায় তোমারে
(আমার) আকুল আঁখি তোমায় খোঁজে
খোঁজে আঁখির লোর।
(এই) ভুবন-ভরা শূন্যতা আর সইতে পারি নে
অন্ধ-করা অন্ধকারের অন্ত হেরি নে,
(আমি) সকাল বেলা কেবল ভাবি
কোথাও কিছু নাইক দাবী
(হায়) বিনি সুতার মালা মোদের
(মাঝে) নাইরে বাঁধন ডোর।"

সুধা ও হৈমন্তী এক সঙ্গে বলিয়া উঠিল, "কি চমৎকার গানটা!" নিখিল বলিল, "কবির চোখের দৃষ্টি যাবার উপক্রম হওয়ার সময় এ গানটা লিখেছেন শুনেছি।"

মহেন্দ্র বলিল, "কিন্তু মনে হচ্ছে তুমি যেন,

লাজুক হৃদয় যে কথাটি নাহি কবে,
সুরের ভিতর লুকাইয়া কহ তাহারে।"

মিলি বলিল, "যদি তাই হয়, তাতে আপনার কি? মানুষকে অকারণে খোঁচা দিতে আপনার এত ভাল লাগে কেন?"

মহেন্দ্র ও নিখিল এক সঙ্গেই লাল হইয়া উঠিল। মহেন্দ্র তাহার ভিতরেই বলিল, "আপনার এলাকায় খোঁচাটা একটু লেগেছে ব'লে বুঝি আপনার এত রাগ?"

তপন বলিল, "ওহে মহেন্দ্র, শুভদিনে মূর্ত্তিমান নারদের মত তুমি যত তিক্ত রসের আমদানি করছ কেন বল দেখি?"

মহেন্দ্র বলিল, "আমার দুরদৃষ্ট! আমি যা বলি তাই তোমাদের কানে তেতো শোনায়। একজন গণৎকার আমার হাত দেখে বলেছিল যে আমি মানুষের মনোহরণ-বিদ্যায় খুব পারদর্শী হব। এটা বোধ হয় তারই প্রথম ধাপ।"

সকলে হাসিয়া উঠিল।

পালিত-গৃহিণী খেরো-বাঁধানো একটা লাল খাতা হাতে করিয়া ঘরে ঢুকিতে ঢুকিতে বলিলেন, "ওরে, আজ যে গয়না-কাপড় আনতে যাবার দিন, তোরা চিঠিপত্রগুলো খানিক সেরে একবার বেরুবি?"

মিলি নাকিসুরে বলিল, "আমি যেতে পারব না মা।"

মা বলিলেন, "তোর কি সব তাতে অনাছিষ্টি কাণ্ড! আজকাল ত সবাই যায় বাপু। নিজের জিনিষ নিজে পছন্দ করে নিতে দোষ কি?"

হৈমন্তী বলিল, "তুমি বলছ বটে জ্যাঠাইমা, কিন্তু জ্যাঠামশায় ত এখনও তোমার কথায় সায় দিলেন না।"

পালিত-গৃহিণী বলিলেন, "থাক্, থাক্, তোকে আর পাকামি করতে হবে না। তুই না হয় যা, ওর গয়না ক'টা উদ্ধার করে নিয়ে আয়।"

হৈমন্তী বলিল, "আচ্ছা, তাই না হয় যাচ্ছি। কিন্তু আমার সঙ্গে কে যাবে ?"

ছেলেরা পরস্পরের মুখের দিকে চাহিল। নিখিল বলিল, "যাকে আপনি হুকুম করবেন। আমরা সবাই রাজি আছি, কিন্তু যাকে আপনি না নিয়ে যাবেন সেই কাল থেকে কাজে আসা বন্ধ করবে।"

হৈমন্তী বিপদগ্রস্ত মুখ করিয়া বলিল, "তাহ'লে ত সকলকে নিয়ে যেতে হয় দেখছি। সেই ভাল, এখানকার কাজকর্ম্ম ফেলে সবাই যাওয়া যাক দিদির গয়না আনতে।"

সুধা একটু ইতস্তত: করিয়া বলিল, "আমি ভাই থাকছি। আমার দ্বারা যতটা হয় কাজ এগিয়ে রাখব।"

নিখিল বলিল, "আমি প্রথম আপনাকে সমস্যায় ফেলেছিলাম, আমিও থাকছি।"

হৈমন্তী ভীত মুখ করিয়া বলিল, "আস্তে আস্তে সবাই থেকে যেও না, আমি কি শেষে একলাই যাব।"

তপন ও মহেন্দ্র তখনও 'না' বলে নাই, সুতরাং তাহারাই দুইজনে যাইবে ঠিক হইল।

তপন চলিয়া গেল, হৈমন্তীও চলিয়া গেল। সুধার ইচ্ছা করিতেছিল সেও সঙ্গে সঙ্গে উঠিয়া চলিয়া যায়। কিন্তু সে যে কাজ করিবে কথা দিয়াছে এখন ত আর কথা ফিরানো যায় না। জোর করিয়া খুশী মুখ করিয়া সে কাগজকলম কালি লইয়া বসিল। দলের অর্দ্ধেক মানুষ উঠিয়া যাওয়াতে মিলিকেও একটু ম্লান দেখাইতেছিল। একমাত্র খুশী দেখা গেল নিখিলকেই। সে আবার একতাড়া খাম লইয়া কলম চালাইতে চালাইতে বলিল, "দিদি ত উমার তপস্যায় মগ্ন, আর সবাই মহোৎসাহে দিল দৌড়, ভাগ্যিস্ আপনি রইলেন, নাহ'লে আমি বেচারী একলা মাঠে মারা যেতাম।"

সুধা বলিল, "এমন উৎসব-আয়োজনের ঘটাকে আপনি মাঠ বলেন!" কিন্তু মনে মনে তাহারও উৎসব-গৃহকে আজ শূন্য মাঠ বলিয়া মনে হইতেছিল। হৈমন্তীদের বাড়ীর উৎসব এই কয়দিন ধরিয়া তাহারও নিকট যে উৎসব সমারোহে উজ্জ্বল হইয়া উঠিতেছিল তাহা ত এই বাহিরের আয়োজন দেখিয়া নয়। তাহার মনে যে একটা উৎসবের পর্ব্ব আসিয়াছে। এ-বাড়ীতে এই কয়দিন যতবার আসিয়াছে ততবারই তপনের দেখা মিলিয়াছে, তপনের সঙ্গে বসিয়া কাজ করিয়াছে, পরস্পর পরস্পরের সাহায্য করিয়াছে, ইহাই ত উৎসব সমারোহ!

গামলার ভিতর জল ঢালিয়া কিসমিস ভিজাইয়া তাহারা সকলে মিলিয়া কিসমিস বাছিয়া ডালায় তুলিত, তোলা রূপার বাসন বাহির করিয়া সকলে পালিশ করিত। তপনের পালিশ সকলের চেয়ে ভাল হইত, কারণ তাহার হাত-খাটানো অভ্যাস আছে। কিন্তু বাকি আর সকলের চেয়ে সুধারই কাজ হইত ভাল, ইহা ছিল সুধার একটা মস্ত আনন্দের বিষয়। অন্যদের হারানোর আনন্দের চেয়ে বেশী আনন্দ ছিল তাহার তপনের প্রায় সমকক্ষ হওয়ার আনন্দ। তপন বলিত, "আমার চেয়ে আপনারই কাজ ভাল।"

অবশ্য, সুধা তা স্বীকার করিত না। খামের ঠিকানা লিখিতে গিয়াও দেখা গেল সুধা ও তপনের হস্তাক্ষরই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ। নিখিল বলিত, "তোমরা আমাদের সব বিষয়ে হারাবে ঠিক করেছ ?"

এই যে দুইজনকে একসঙ্গে 'তোমরা' বলিয়া উল্লেখ করা ইহাতে সুধার মনে পুলকের শিহরণ খেলিয়া যাইত। যে কোন কারণেই হউক না কেন, তাহারা দুই-এক জায়গায় এক পর্য্যায়ের ত মানুষ। এই একজাতীয়তা যদি তাহাদের সর্ব্বত্র হইত!

সুধা আত্মচিন্তায় মগ্ন হইয়া গিয়াছিল। আপনার কথার উত্তরের অপেক্ষাও করে নাই। হঠাৎ তাহার চমক ভাঙিল নিখিলের কথায়। নিখিল বলিতেছে, "আপনি যেখানে আছেন তাকে আর মাঠ বলি কি ক'রে ? সে ত মালঞ্চ।"

সুধা বলিল, "আপনি সব কথাতে ঠাট্টা করেন।"

নিখিল বলিল, "মহেন্দ্রের মত আমারও কপাল খারাপ।

সে যা বলে সবাই তাতেই চটে যায়; আমি যা বলি সবই আপনাদের কানে ঠাট্টা শোনায়।"

সুধা বলিল, "সেটা মোটেই আপনার ঠিক ধারণা নয়। আমাদের এই দলের মধ্যে একমাত্র আপনিই ত ভাল ক'রে কথা বলতে পারেন। আমি ত না জানি চটাতে, না জানি হাসাতে, না জানি খুশী করতে।"

নিখিল বলিল, "তার চাইতেও ভাল হয়ত কিছু জানেন, সেটা যে কি আপনার নিজের ধরবার ক্ষমতা নেই।"

সুধা বলিল, "আচ্ছা, অত ক'রে আর মানুষকে বাড়াবেন না। যেটা আমার যোগ্য নিন্দা সেটা মেনে নিলে কিছু অভদ্রতা হয় না।"

নিখিল বলিল, "আমি হয় ঠাট্টা করি, নয় ভদ্রতা করি, এরকম একটা ধারণা আপনার কেন হয়েছে বলুন ত? এই দুটোর মাঝামাঝি সত্যি কথা বলা ব'লে যে একটা জিনিষ আছে, সেটা কি আমার মধ্যে একেবারেই খুঁজে পাওয়া যায় না?"

সুধা চুপ করিয়াই রহিল, মনে করিয়াছিল বলে, "আমি সামান্য মানুষ, আমার সম্বন্ধে এরকম সত্য কথা বিশ্বাস করতে সাহস হয় না।" কিন্তু কথা আর বাড়াইয়া লাভ কি, মনে করিয়া সেইখানেই থামিয়া গেল।

তাহার মন তখন ঘুরিতেছিল অন্য চিন্তায়। আজ মিলির বিবাহ, কিছুদিন পরে তাহাদেরও ত পালা আসিবে। এমনই ঘটা করিয়া তাহার বিবাহ হইবে কি? সেই বিবাহ-উৎসবে এমনই প্রত্যহ কি তপনকে দেখা যাইবে? সুধা আপন মনেই হাসিল। কাহার সঙ্গে বিবাহ হইবে সে কথা না ভাবিয়া উৎসব-গৃহে প্রত্যহ তপন আসিবে কি না এইটা তাহার মাথায় ঢুকিল আগে! সে পাগল। আপনার মনের কাছে আপনি অত্যন্ত সঙ্কুচিত হইয়া একবার যেন ভয়ে ভয়ে ভাবিল,—আচ্ছা, তপন বর হইলে কেমন হয়? মনে পড়িল দিন কয়েক আগে রাত্রে সে নিজের ,
ছিল, কিন্তু বরের মুখটা কিছুতেই দে
তাহার মুখটা মুসলমান বরের মত ঝাল
ছিল। সুধা সাহস করিয়া তুলিয়া দেখিতে পা
যদি তুলিয়া দেখিত তপন!

কিন্তু তাহা কি সম্ভব! তপন যে মস্ত বড়লোকে ছেলে। তাহার পিতামাতা আত্মীয়স্বজন কেহ ত সুধাকে চেনেন না। সুধার মত গরীবের কালো মেয়েকে অকস্মাৎ তাঁহারা কেন বউ করিয়া লইয়া যাইবেন? তাঁহাদের কাহারও কল্পনায়ই ইহা আসিবে না। এই বিবাহ-উৎসবের আগে স্পষ্ট করিয়া তপনের সহিত বিবাহের কথা সুধা কোন দিন ভাবে নাই। আজ তাহা ভাবিয়া দেখিতে মনটা ভয়ে ভাঙিয়া পড়িল। যদি তপনের আর কাহারও সঙ্গে বিবাহ হইয়া যায়। তবে তপন ত একেবারে পর হইয়া যাইবে। সুধা কি তাহা সহ্য করিতে পারিবে। চোখ বুজিয়া সুধা এই চিন্তাটাকে মন হইতে তাড়াইতে চেষ্টা করিল। না, না, তপন বিবাহ করিবে না। সে এমনই করিয়া গরীব-দুঃখীর সেবা করিয়া দেশের হিতচিন্তা করিয়া দিন কাটাইবে। সপ্তাহ-অন্তে একবার তাহাদের বন্ধুসভায় দেখা যাইবে তাহার প্রসন্ন মুখের ধ্যানমগ্নভাব। সুধা তাহাতেই খুশী থাকিবে।

নিখিল বলিতেছে, "আপনি বড় কম কথা বলেন। আপনার সঙ্গে গল্প জমানো যায় না।"

সুধা কাগজের পৃষ্ঠা হইতে মুখ তুলিয়া বলিল, "হুঁ।"

মিলি বাহিরে গিয়াছিল জামার মাপ দিতে। ঘরে ফিরিয়া আসিয়া বলিল, "আমাকেও এক তাড়া খাম দাও, আমারও কিছু কাজ করা উচিত।"

তিন জনেই নীরবে কলম চালাইতে লাগিল।

(ক্রমশঃ)

অচল সিকি

শ্রীঅজিতকৃষ্ণ বসু

শ্রীপতিবাবু একেবারে আকাশ হইতে পড়িলেন।

"অ্যাঁ, বলিস্ কি রে! অচল? একেবারেই চলবে না?"

"না বাবু। দেখছেন না, একেবারে সীসে!"

অগত্যা পানওয়ালাকে একটি সচল তাম্রমুদ্রা দিয়া পানের খিলিগুলি এবং সেই মেকী সিকিটা পকেটে ফেলিয়া শ্রীপতিবাবু পানের দোকান ত্যাগ করিলেন এবং তার আগে বলিয়া গেলেন, "দেখলি ত বাপু, ভালমানুষ পেলেই সবাই ঠকায়। কে যে কখন আমার ওপর চালিয়ে দিলে টেরই পেলুম না। যাক্ ভগবান আছেন।"

পানের দোকানটা কিছু দূর ছাড়াইয়া গিয়া পানের খিলিগুলি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়া দুঃখিতভাবে শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "এ পাইস্ হ্যাজ ডায়েড্ ইন দি ফীল্ড—একটা পয়সা একেবারে মাঠে মারা গেল। কিন্তু কি করব! পানগুলো ফেরত দিতে গেলে বেটা ঠিক বুঝত যে পান-কেনাটা অচল সিকি চালাবার ফন্দী মাত্র। যাক্ দেখি আর এক জায়গায়। ইফ য়্যাট ফার্ষ্ট ইউ ডোণ্ট সাকসীড,—তার পর কিনা?···একবারে না পার তো দেখ শতবার।"

বাস্-ষ্ট্যাণ্ডে একটা বাস্ প্রায় ছাড়িতেছিল, আর তাহারই কাছে একটা পান-সিগারেটের দোকান। শ্রীপতিবাবু ভাবিলেন, "নাঃ, এবার আর পান নয়। এবার সিগারেট—যদিও আমার কাছে দুই-ই সমান।" বলিয়া অত্যন্ত ত্রস্তভাবে দোকানীকে কহিলেন, "জল্‌দি দে ত বাবা একটা কাঁচি সিগারেট।" দোকানী কাঁচি সিগারেট দিল বটে, কিন্তু সিকিটা নিতে কিছুতেই রাজী হইল না। অগত্যা শ্রীপতিবাবুর আরও কিছু লোকসান হইল, সিকিটা পকেটেই রইল, এবং বাস্‌টা ছাড়িয়া গেল। শ্রীপতিবাবুর মতলব ছিল এই যে, বাস্ ধরিবার জন্য তাড়াতাড়ির ভাব দেখাইলে দোকানী তাড়াতাড়ি হয়ত সিকিটাকে মেকী বলিয়া নাও চিনিতে পারে। কিন্তু দোকানী ঝানু লোক, পান-সিগারেটওয়ালারা সাধারণতঃ ঝানুই হইয়া থাকে—তাহাকে ঠকান অত সহজ নয়। লোকটা হয়ত শ্রীপতিবাবুর মতলব বুঝিতে পারিয়াছিল। সে শ্রীপতিবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া মুখে কিছু না বলিলেও এমন বিশ্রীরকম হাসিল যে শ্রীপতিবাবুর—শ্রীপতিবাবুরও পর্য্যন্ত!—বিশ্রীরকম লজ্জা লাগিয়া গেল। তিনি তাড়াতাড়ি পা চালাইয়া দিয়া ভাবিতে লাগিলেন কি উপায়ে অচল সিকিটাকে চালান যায়। ইতিমধ্যে ত প্রায় এক আনা খরচ হইয়া গেল। নাঃ, এ উপায়ে আর চলিবে না। এ ভাবে পয়সা বাজে খরচ হইতে থাকিলে শেষকালে যদি সিকিটা চালানও যায় তবুও বিশেষ লাভ থাকিবে না।

এখানে বলিয়া রাখা দরকার যে শ্রীপতিবাবুকে ভালমানুষ পাইয়া কেহ তাহার কাছে সিকিটি চালাইয়া দিয়াছে—একথা কেহ মনে করিয়া থাকিলে অত্যন্ত ভুল করিয়াছেন। শ্রীপতিবাবু এত সোজা লোক নহেন যে তাঁহার কাছে কেহ অচল কিছু চালাইবে। এই অচল সিকিটি তিনি কুড়াইয়া পাইয়াছিলেন। একদিন এক ভদ্র লোক একটা সিকি কোন জায়গায় চালাইতে না পারিয়া অত্যন্ত চটিয়া উঠিয়াছিলেন, এবং 'ধেৎ তেরি' বলিয়া সিকিটি রাস্তায় ফেলিয়া দিয়াছিলেন। সুযোগমত শ্রীপতিবাবু সেই সিকিটি কুড়াইয়া লইয়াছিলেন। সেই সিকিটাই এই সিকি যাহার গল্প বলিতে সুরু করিয়াছি।

চলিতে চলিতে পথে পুরাতন বন্ধু গজানন বাবুর সঙ্গে দেখা হইয়া গেল। বহু দিন আগে এই গজাননের সঙ্গেই শ্রীপতিবাবু বার-বার তিনবার ফোর্থ ক্লাসে ফেল করিয়াছেন, এবং তাহার পর পড়া ছাড়িয়াছেন। পুরাতন বন্ধুকে দেখিয়া শ্রীপতিবাবু ভয়ানক খুশী হইয়া গেলেন এবং বন্ধুর পকেটে দু-একবার ঝনঝন আওয়াজ শুনিয়া আশ্বস্ত হইলেন।

পুলকে আকুল হইয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "আরে গজু যে! বহুদিন বাদে দেখা হ'ল। কেমন আছ ভাই? কি করছ এখন?"

"আছি কোন রকমে ভাই। দালালী করি।"

"দালালী! ওতে বেশ দু-পয়সা হচ্ছে?"

"দু-পয়সা কেন! তার বেশীই হচ্ছে। আজকাল চাকরির বাজার জান তো? এ রকম ইন্‌ডিপেন্‌ডেণ্ট ব্যবসায়ে না ঢুকতে পারলে আজকাল আর সুবিধে নেই। এই তো ধর না, আমার বড় শালার ছোট ছেলে এম-এ পাস ক'রে চাকরির জন্যে ফ্যাফ্যা ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছে বছরখানেক হ'ল। কোথাও কিছু সুবিধে ক'রে উঠতে পারলে না। শুনতো যদি আমার কথা তো হয়ে যেত একটা হিল্লে। তা, ভাল কথা তো শুনবে না!...তুমি এখন কি করছ ভাই?"

"চিকিচ্ছে করি, রোগ সারাই। আমার হতাশ-চিকিৎসালয়ের নাম শোন নি?"

"কই না তো! হ্যাঁ, মাঝে মাঝে বাংলা কাগজে বিজ্ঞাপন দেখি বটে। সেই যে 'গ্যারাণ্টি দিয়া হতাশ রোগীদিগকে আরোগ্য করি। পত্রাদি গোপনে রাখা হয়।' সেই তো?"

"হ্যাঁ ভাই, ঠিক ধরেছ।"

"এতে কেমন আয় হচ্ছে?"

"চলে তো যাচ্ছে দিব্বি ভগবানের কৃপায়।" বলিয়া শ্রীপতিবাবু পরম কৃপাময় ভগবানকে ভক্তিভরে প্রণাম করিলেন।

"কিন্তু তুমি আবার ডাক্তারী পাস করলে কবে হে?" অবাক হইয়া গজানন বাবু জিজ্ঞাসা করিলেন, "না কি কোনো কবরেজের য্যাসিষ্ট্যাণ্ট থেকে—"

"আরে ছোঃ!" শ্রীপতিবাবু বলিলেন, "ও সব কিচ্ছু না। আমার ওষুধগুলো কতক স্বপ্নাদ্য, কতক পেটেণ্ট, কতক মহাপুরুষ-প্রদত্ত। তা যাক্ গে—তোমার স্ত্রী কেমন আছেন?"

"থাকাথাকির বাইরে চলে গেছে।" গজাননবাবু বলিলেন। "কিন্তু কি দরকার তার কথা তুলে?"

শ্রীপতিবাবু গজাননবাবুর সহধর্ম্মিণীকে কোনদিন দেখেন নাই। তবু গজাননবাবুকে খুশী করিবার জন্য তাঁহার স্ত্রীর মৃত্যুসংবাদ জানিয়া অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া গেলেন। চোখে জল আনিবার বৃথা চেষ্টা করিয়া কহিলেন, "আহা হাঃ, বড় সতীলক্ষ্মী ছিলেন। অমন ভাল মানুষ আর হয় না। তোমার..."

চটিয়া গিয়া গজাননবাবু কহিলেন, "ভাল? তুমি কি ক'রে জানলে ভাল? দেখলে না শুনলে না কোন দিন।"

একটু থমকিয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, "লোকের মুখে শুনে জানি আর কি। সবাই বলে ভাল, তাই—"

"সবাই? কারা বলেছে ভাল ব'ল তো?" এইবার গজাননবাবু ক্ষেপিয়া উঠিলেন। "নাম কর তো তাদের। আর তাদের ঠিকানাগুলো দাও তো। সব শালাকে এই বক্সিং-করা হাতের গাঁট্টা কা'কে বলে বুঝিয়ে দিয়ে আসি।...ভাল? ভাল না হাতী! যদ্দিন বেঁচে ছিল জালিয়ে মেরেছে। মরেছে, না আমার হাড়ে বাতাস লেগেছে।"

"আহা হা, অত গরম হও কেন ভাই?" শ্রীপতিবাবু বলিলেন। "যে মানুষ ম'রে গেছে তার নিন্দে করতে নেই। ঐ যে কথায় বলে, হোয়েন দি ম্যান ইজ ডেড..." শ্রীপতিবাবু ইংরেজী কথাটা অসমাপ্ত রাখিলেন, কেন-না অসমাপ্ত কথার জোর বেশী হয়। মনে মনে তিনি অত্যন্ত দুঃখিত হইলেন, তাঁহার প্রথম অস্ত্রটিতে কোন কাজ হইল না, বরং হিতে বিপরীত হইল। পরলোকগতা স্ত্রীকে প্রশংসা করিয়া গজাননবাবুকে অত্যন্ত খুশী করিয়া পরে আস্তে আস্তে তাহার মন নরম করিয়া আনিবেন এবং সময় বুঝিয়া কার্য্যসিদ্ধি করিবেন, এই ছিল শ্রীপতিবাবুর মতলব। কিন্তু...

"যাক্, গতস্য শোচনা নাস্তি" শ্রীপতিবাবু ভাবিলেন, এবং বলিলেন, "যাক ভাই, অতীতের কথা তুলে আর লাভ নেই। কিন্তু...হ্যাঁ, অ্যাদ্দিন পরে তোমাকে দেখে কি আনন্দই যে লাভ করলুম ভাই সে আর বলবার কথা নয়। তোমায় দেখে অতীতের কত কান্না, কত হাসি—কত কি যে মনে পড়ে যাচ্ছে!..." বলিতে বলিতে, এবং তাহারই সঙ্গে চলিতে চলিতে, শ্রীপতিবাবুর চোখে প্রায় জল আসিয়া পড়িল।

তার পর—"সেই স্কুল পালানো, নৌকো বাইচ,

মাষ্টার মশায়ের কানমলা, সেই বটগাছ—সেই সব যেন চোখের সামনে ভাসছে। আমার কি মনে হয় জান ভাই গজু?—যেদিন চলে যায় সেদিন আর ফিরে আসে না।...”

তত ক্ষণে দু-জনে একটা অন্ধকার গলির মোড়ে আসিয়া পড়িয়াছেন। শ্রীপতিবাবু দেখিলেন এইখানেই সুবিধা। কাজ হাসিল হইবামাত্র ঝাঁ করিয়া গলির ভিতর ঢুকিয়া অদৃশ্য হইয়া যাইবেন কোনও অজুহাতে। এবং অজুহাতের জন্য শ্রীপতিবাবুকে কোনদিনই বিশেষ ভাবিতে হইত না—এ-বিষয়ে তিনি সিদ্ধহস্ত—অর্থাৎ সিদ্ধমুখ ছিলেন।

সেইখানেই দাঁড়াইয়া পড়িয়া হঠাৎ কি যেন ভাবিয়া শ্রীপতিবাবু কহিলেন, “হ্যাঁ ভাই গজু, তোমার কাছে একটা সিকির চেঞ্জ হবে?” কারণ ইতিপূর্ব্বে গজুবাবুর পকেটের আওয়াজ শুনিয়াই বুঝিয়াছিলেন তাহার পকেটে যথেষ্ট চেঞ্জ আছে এবং সিকির চেঞ্জ থাকার খুবই সম্ভাবনা। দেখা গেল শ্রীপতিবাবুর ওস্তাদ কান তাঁহাকে ভুল আন্দাজ দেয় নাই। গজাননবাবু বলিলেন, “তা হবে।” বলিয়া চারিটি আনি বাহির করিলেন। শ্রীপতিবাবু তাড়াতাড়ি আনি চারিটি লইয়া গজানন বাবুর হাতে সিকিটি দিয়া “তাহ’লে আসি ভাই, আবার দেখা হবে নিশ্চয়ই” বলিয়া সাঁ করিয়া গলির ভিতর অদৃশ্য হইবার উদ্যোগ করিতেছিলেন। কিন্তু গজাননবাবু দালাল মানুষ, মানুষ চরাইয়া খান। ঝানু তিনি পানওয়ালাদের চাইতে কম নহেন। সিকিটা হাতে পাইয়াই কহিলেন, “দাঁড়াও হে শ্রীপু, এ কি সিকি দিয়েছ! এ যে একেবারেই তোমার গিয়ে সীসে।”

শ্রীপতিবাবু আর একবার আকাশ হইতে পড়িলেন, বলিলেন, “অ্যাঁ, বল কি? সীসে? নাঃ, ভালমানুষ পেলে দেখছি সবাই ঠকায়। দুনিয়ায় দেখছি কাউকে বিশ্বাস করা যায় না!”

গজাননবাবুকে তাঁহার চারিটি আনি ফেরত দিতে হইল। গজাননবাবুও সেই পানওয়ালাটার মত এমন বিশ্রী রকম হাসিলেন যে এই অনেক দিনের পরে দেখা বন্ধুটির কাছে শ্রীপতিবাবুর অত্যন্ত লজ্জা করিতে লাগিল। সীতা দেবীর মত ধরণীকে দ্বিধা করিয়া তাঁহার পাতালে প্রবেশ করিতে একবার ইচ্ছা হইল। কিন্তু তাহা সম্ভব হইবে না বুঝিয়া পাশের গলিতে প্রবেশ করাই তিনি ঠিক করিলেন, এবং যাহা করা ঠিক করিলেন তাহা করিতে বিন্দুমাত্রও বিলম্ব করিলেন না। “এখানে আমার একটু বিশেষ কাজ আছে” বলিয়া তিনি গলিতে ঢুকিয়া পড়িলেন, এবং গজাননবাবু আপনার কাজে চলিয়া গেলেন।

“উঃ! গজুটা কি চামার হয়ে উঠেছে আজকাল!” অত্যন্ত দুঃখের সহিত ভাবিতে লাগিলেন শ্রীপতিবাবু। “আমি সিকিটা দিলুম সেটা বিশ্বাস ক’রে নিতে পারল না, বাজিয়ে দেখল! ওঃ! বন্ধু পর্য্যন্ত আজকাল বন্ধুকে বিশ্বাস করতে পারে না!” যে-পৃথিবীতে বন্ধু পর্য্যন্ত বন্ধুকে বিশ্বাস করিতে পারে না সে-পৃথিবীতে বাঁচিয়া থাকিয়া কোন লাভ আছে কি না, ইহাই চিন্তা করিতে করিতে এবং পৃথিবীটা যে কি ভয়ানক খারাপ হইয়া উঠিতেছে তাহা ভাবিয়া শ্রীপতিবাবুর দুটি চোখ সজল হইয়া উঠিল—সারাটা হৃদয় ব্যথায় আর্ত্তনাদ করিয়া উঠিল।

বলা বাহুল্য, গলিটির ভিতর শ্রীপতিবাবুর বিশেষ বা অবিশেষ কোন রকম কাজই ছিল না। কাজেই কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া যখন বুঝিলেন চামার গজানন অনেক দূর চলিয়া গিয়াছে তখন গলি হইতে বাহির হইয়া আবার বড় রাস্তায় চলা সুরু করিলেন এবং চলার সঙ্গে সঙ্গে ভাবিতে লাগিলেন, “এবারে কি করা যায়!”

খানিকটা অগ্রসর হইতেই দেখা হইল মণ্টু বাবুর সঙ্গে। শ্রীপতি বাবু ভারী খুশী হইয়া গেলেন, কেন-না মণ্টু বাবু অসাধারণ ভালমানুষ। তাঁহাকে পরম হংসও বলা যাইতে পারে—হাঁস যেমন দুধ এবং জলের মিশ্রণ হইতে দুধটুকুই গ্রহণ করে, মণ্টু বাবুও সেইরূপ লোকের দোষ ছাড়িয়া কেবল গুণটুকুই গ্রহণ করিতেন। মানুষ যে খারাপ হইতে পারে ইহা তাঁহার ধারণার অতীত, তাঁহার ধারণা এই যে মানুষমাত্রেই ধর্ম্মপুত্র যুধিষ্ঠির। ঘোর সত্যযুগের মাঝখানে ঘুমাইতে সুরু করিয়া ঘোর কলিযুগের মাঝখানে যেন মণ্টু বাবু সবেমাত্র তাহার রিপ্ ভ্যান উইঙ্কলকে হার-মানানো ঘুম হইতে জাগিয়াছেন। মণ্টু বাবুর কাছে হয়ত সিকির চেঞ্জ আছে, এবং যদি থাকে তাহা হইলে অচল সিকিটা তাহার ঘাড়ে অনায়াসেই চাপানো যাইবে, এ-কথা মনে করিয়া শ্রীপতি বাবুর মন এমন একটা

অবর্ণনীয় অভূতপূর্ব্ব আনন্দে পূর্ণ হইয়া উঠিল যে গান গাহিবার প্রবল ইচ্ছা চাপিয়া রাখিতে তাঁহাকে যথেষ্ট বেগ পাইতে হইল!

কিন্তু একটু গৌরচন্দ্রিকার অবতারণা না করিয়াই ফস্ করিয়া সিকির চেঞ্জ চাওয়াটা ঠিক ভাল মনে হইল না। কাজেই একথা-সেকথা বলিতে বলিতে কিছু দূর তিনি চলিলেন মণ্টু বাবুর সঙ্গে। আর একটা গলির সম্মুখে আসিয়া শ্রীপতি বাবু মণ্টু বাবুকে বলিলেন, "ভাল কথা, মণ্টু বাবু সিকির ভাঙানি হবে আপনার কাছে?"

মণ্টু বাবু একটু আগেই কোন একটি মহৎ ব্যক্তির নিকট হইতে একটা সিকি ভাঙাইয়া লইয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, "হ্যা আছে। দুটো দুয়ানি।"

"তাই দিন" বলিয়া অচল সিকিটা মণ্টু বাবুকে দিয়া দুয়ানি দুটি নিয়া শ্রীপতিবাবু তীরবেগে গলির ভিতর ঢুকিয়া গেলেন। তার পর দুয়ানি দুটির দিকে ভাল করিয়া নজর করিয়া শ্রীপতিবাবু হায় হায় করিয়া উঠিলেন। এ কি সর্ব্বনাশ! দুটিরই চেহারা উচ্চশিক্ষিত বেকার যুবকের চেহারার মত ম্লান—এমনি শোচনীয় চেহারা যে দেখিলে অতি কঠিন চোখেও অশ্রু আসে।

তত ক্ষণে মণ্টু বাবু অনেকটা পথ চলিয়া গিয়াছেন। শ্রীপতিবাবু উৰ্দ্ধশ্বাসে ছুটিলেন।

এ দুটি দুয়ানির চাইতে সেই সিকিটাই ছিল বরং ভাল। সিকিটা আসলে অপদার্থ হইলেও তাহার চেহারায় একটু জলুশ ছিল। এ দুটি দুয়ানির যে তাহাও নাই!

কিছুক্ষণ ছুটিয়া মণ্টু বাবুকে পাইয়া শ্রীপতিবাবু যেন হাতে স্বর্গ পাইলেন। তাঁহাকে ছুটিয়া আসিতে দেখিয়া মণ্টু বাবু অবাক হইয়া দাঁড়াইয়া পড়িলেন এবং জিজ্ঞাসা করিলেন, "কি হ'ল, শ্রীপতিবাবু?"

"হবে আর কি? আমার ভাঙানির দরকার নেই মশাই। আমার সিকি আমায় দিন, আপনার দুয়ানি দুটো আপনি নিন। আবার যেমন ছিল তেমনি হোক।"

অবিলম্বে যেমন ছিল তেমনি হইল। শ্রীপতিবাবু জানিতেন মণ্টু বাবু সিকিটিকে নিশ্চয়ই পরীক্ষা করিয়া দেখেন নাই। তিনি কহিলেন, "দুয়ানি দুটো আপনাকে স্রেফ্ ঠকিয়ে দিয়েছে। একেবারে অচল।"

"অচল? বলেন কি? তাই নাকি?" মণ্টু বাবু অবাক হইয়া কহিলেন। "তাহ'লে লোকটা নিশ্চয়ই ভুল ক'রে দিয়েছে।"

ভুল করিয়া যে এই দুটি অচল দুয়ানি দিয়াছে সে এতক্ষণে নিজের ভুল বুঝিতে পারিয়া হয়ত কত আপশোষ করিতেছে এ কথা ভাবিয়া মণ্টু বাবুর চোখ দুটি অশ্রুতে ভরিয়া উঠিল। তিনি সজল ছল-ছল চোখ দুটি রুমালে মুছিয়া ফেলিলেন।...

"নাঃ, এ আর চালানো যাবে না" হতাশভাবে বলিতে বলিতে শ্রীপতিবাবু অগ্রসর হইতে লাগিলেন। কিন্তু মুখে এ কথা বলিলেও মন এ কথায় সায় দিল না। অসম্ভবকে সম্ভব করিবার অর্থাৎ অচলকে সচল করিবার উপায় ভাবিতে লাগিলেন।

"সুরেন বাঁড়ুয্যে সেটল্ড ফ্যাক্ট আন্‌সেটল্ড্ করেছিল।" শ্রীপতিবাবু ভাবতে লাগলেন, "আর আমি একটা অচল সিকি চালাতে পারব না? দেখা যাক্; ঐ যে একটা হিন্দী কথা আছে না—হাল ছোড়েগা নেহি!"

হাল তিনি ছাড়ুন বা নাই ছাড়ুন, ফুটপাথের উপর একটা কলার ছোবড়া পড়িয়া ছিল—সেটি তাঁহাকে ছাড়িল না, এবং এই না-ছাড়ার ফলে এক অপ্রত্যাশিতপূর্ব্ব মুহূর্ত্তে শ্রীপতিবাবু দেখিলেন তিনি চীৎ হইয়া ফুটপাথের উপর শুইয়া আছেন, প্রায় সমস্ত শরীরেই একটু অদ্ভুত রকমের ব্যথা অনুভব করিতেছেন, এবং তাহার অবস্থা দেখিয়া কয়েক জন বাঙালী ভদ্রলোক সমবেত ভাবে প্রমাণ করিতেছেন যে বাঙালী হাসিতে জানে না, এ কথাটা একেবারে মিথ্যা। এক হিন্দুস্থানী ভদ্রলোক আসিয়া শ্রীপতিবাবুকে ধরিয়া তুলিলেন। শ্রীপতিবাবুর সারা গায়ে, বিশেষতঃ মাথায় ও পায়ে, ব্যথা বোধ হইতেছিল। তিনি বুঝিলেন হাঁটিয়া বাড়ী ফেরা তাঁহার পক্ষে অসম্ভব। অগত্যা একটা বাসেই উঠিতে হইল। বাসওয়ালার বরাতে ছিল ক'টা পয়সা—বিধিলিপি কে খণ্ডাইতে পারে?

শ্রীপতি বাবু একবার মনে করিলেন বাসের টিকিট কেনার সময় অচল সিকিটা চালাইয়া দিবেন। কিন্তু পাঞ্জাবী কণ্ডাক্টরকে দেখিয়া বিশেষ ভরসা পাইলেন না। শেষকালে

যদি ধরা পড়েন, তাহা হইলে হয়ত দু-চারিটা গালি শুনিতে হইবে—গাঁট্টাও খাইতে হইতে পারে। সুতরাং ভয়ে ভয়ে তিনি সাধু হইলেন, অর্থাৎ সচল পয়সা দিয়াই বাসের টিকিট কিনিলেন।

তখন বাঁকুড়া ও বর্দ্ধমানে অত্যন্ত দুর্ভিক্ষ লাগিয়াছে। কোন্ এক মিশনের জনৈক গেরুয়াধারী সেবক বাসে উঠিলেন দুর্ভিক্ষের সাহায্যের জন্য চাঁদা তুলিতে। তাঁহার হাতে একটি তালা-বন্ধ-করা কাঠের বাক্স, যাহার মাথায় একটি সরু ছিদ্র আছে পয়সা গলাইবার জন্য। বাসে গান গাওয়া অসুবিধা, তাহা না হইলে সেবকটি হয়ত "ভিক্ষা দাও গো···" ইত্যাদি বুক-কাঁপানো সুরে গাহিতে সুরু করিতেন। বাসের অভ্যন্তর এবং রাজপথ—এ দুয়ে অনেক তফাৎ। সুতরাং গেরুয়াধারী সেবক ভদ্রলোক গম্ভীর কণ্ঠে দুর্ভিক্ষের ভীষণতা বর্ণনা করিয়া বাঙালীর কর্ত্তব্য সম্বন্ধে বক্তৃতা করিতে লাগিলেন। কিন্তু বাঙালী জা'ত বক্তৃতা শুনিতে এত অভ্যস্ত যে বক্তৃতা জিনিষটা বাঙালীর মনে বিশেষ কাজ করে না। কাজেই সেবকটির বক্তৃতা প্রথম কয়েক মিনিট ধরিয়া অরণ্যে রোদন অপেক্ষাও অনর্থক হইল, কেন-না অরণ্যে রোদন করিলে বাঘ সিংহ হয়ত সাড়া দেয়, কিন্তু সেবকটির এই বাসে রোদনে বাসের কেহ সাড়া দিল না। বাক্স খালিই রহিল।

কিন্তু ভীষণ দুর্ভিক্ষের ভীষণতর বর্ণনা শুনিয়া শ্রীপতি বাবুর কোমল পরদুঃখকাতর হৃদয় আর ঠিক থাকিতে পারিল না। শ্রীপতিবাবু চোখে রুমাল চাপা দিয়া বালকের মত কাঁদিয়া উঠিয়া কহিলেন, "বলেন কি মশায়? এমন শোচনীয় অবস্থা? অনাহারে শুকিয়ে মরছে মানুষ সেখানে? ছেলের মুখের গ্রাস মা কেড়ে নিচ্ছে? উঃ, থামুন্ মশায়—আর যে সইতে পারি নে।" শ্রীপতি বাবু উচ্ছ্বসিত ভাবে কাঁদিয়া উঠিলেন। তাঁহার এই কান্নায় সেবকটি অত্যন্ত উৎসাহিত হইলেন। তিনি কোনদিকে কিছু সুবিধা করিতে না পারিয়া অগত্যা সেবকজীবন অবলম্বন করিয়াছিলেন—সে অনেক দিনের কথা। এই দীর্ঘ সেবকজীবনে এরূপ সাফল্যের আনন্দময় অভিজ্ঞতা তিনি আর কখনও লাভ করেন নাই। আনন্দে তাঁহারও দুটি চোখ সজল হইয়া উঠিল। তিনি দুর্ভিক্ষের অসহ্য কাহিনী আরও অসহ্য করিয়া তুলিবার জন্য দ্বিগুণ উৎসাহে বক্তৃতা সুরু করিলেন।

"ওঃ! এত কষ্টও ভগবান দেন মানুষকে?" কাঁদ-কাঁদ কণ্ঠে শ্রীপতিবাবু বলিতে লাগিলেন, "আমাদেরই বাংলা দেশের লোক দারুণ দুর্ভিক্ষে হাহাকার ক'রে কাঁদছে, আর আমরা কিনা দিব্বি—ওঃ!" শ্রীপতিবাবু আবার কাঁদিয়া বেসামাল হইয়া পড়িলেন। দেশবাসীর দুঃখে শ্রীপতি বাবুর এরূপ অসাধারণ সমবেদনা দেখিয়া বাসের সকলেই নিজেদের ঔদাসীন্যের কথা ভাবিয়া লজ্জিত হইয়া পড়িলেন। কেহ কেহ কাঁদিবার চেষ্টা করিতে লাগিলেন, কিন্তু "চেষ্টার অসাধ্য কিছু নাই" এ কথাটা অনেকে বলিলেও কথাটা সম্পূর্ণ সত্য নয়। চেষ্টা করিলেই সবাই কাঁদিয়া ভাসাইতে পারে না।

অনেক কষ্টে নিজেকে একটু সামলাইয়া লইয়া শ্রীপতি বাবু কহিলেন, "বাংলার ভাইদের, মা-বোনদের এত দুঃখ-দুর্দ্দশার কাহিনী শুনেও যারা এ বিষয়ে উদাসীন থাকতে পারে ধিক্ তাদের জীবনে।···" বলিয়া পকেট হইতে সেই সিকিটা বাহির করিলেন।

"সঙ্গে তো বিশেষ কিছু নেই। বাসভাড়া দিয়ে মাত্তোর এই সিকিটা আছে। তাই দিই এখন।" বলিয়াই যেন সবাই সিকিটা দেখিতে পায় এইভাবে, ঝট্ করিয়া বাক্সের ভিতর গলাইয়া দিলেন। একটা পয়সা নয়, দুটা পয়সা নয়—একেবারে একটা সিকি! এই অপূর্ব্ব বদান্যতা দেখিয়া বাসের সবাই, এবং বাক্সওয়ালা গেরুয়াবিলাসী সেবক ভদ্রলোকটি অবাক হইয়া গেলেন। পরে যখন 'সেই জীবনে ধিক' কথাটার একবার পুনরাবৃত্তি করিয়া দুর্ভিক্ষ-পীড়িতদের দুর্দ্দশার কথা ভাবিয়া চোখে রুমাল চাপিয়া শ্রীপতিবাবু ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিয়া উঠিতে লাগিলেন, তখন আত্মসম্মান রক্ষার জন্য এবং ধিক্কারের হাত হইতে জীবন বাঁচাইবার জন্য সকলে ব্যস্ত হইয়া উঠিলেন। সিকি, আধুলি, দুয়ানি ইত্যাদিতে বাক্সটি দেখিতে দেখিতে ভরিয়া উঠিল।···

বাস হইতে নামিয়া বাড়ীর দিকে চলিতে চলিতে শ্রীপতিবাবু ভাবিলেন, "যাক্—অচল সিকিটা একটা মহৎ কাজে লাগল।"

পুস্তক পরিচয়

জীবন-বাণী—শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ৩২৮ পৃষ্ঠা। কাপড়ে বাঁধান।

এই মূল্যবান পুস্তকখানিতে নিম্নলিখিত শিরোনামযুক্ত প্রবন্ধগুলি আছে, এবং তাহাদের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ আছে :—

সত্যসন্ধানের পন্থা, আদর্শসাহিত্য, স্বাধীনতায় বাধ, মরণ ভোল, জুজুর ভয় ছাড়, জীবনের দুইটি প্রধান শত্রু, ধর্ম্মবুদ্ধি, উত্তরাধিকার বা হিরেডিটি, জাতিভেদ, বিবাহবিধি, লজ্জা ও জুগুপ্সা, ভারত তবু কই, আবার তোরা মানুষ হ, আর্য্য নামের দাবি, ধর্ম্মের লড়াই, ভারতবাসীর। কি এক বেশন নয়, বঁধু কোথায়।

গ্রন্থকার পণ্ডিত, বাংলা-সাহিত্যের নানা বিভাগে কৃতিত্বশালী মনীষী। ইংরেজীতেও ঐতিহাসিক ও নৃতত্ত্ববিষয়ক কয়েকখানি বহি তিনি লিখিয়াছেন। যাঁহারা তাঁহার আলোচ্য উৎকৃষ্ট "জীবন-বাণী" বহিখানি পড়িবেন, তাঁহারা জ্ঞানলাভ করিবেন, আনন্দ পাইবেন, এবং তাঁহাদের মনে নানা বিষয়ে চিন্তার উদ্রেক হইবে।

সপ্তপর্ণী—সংকলয়িত্রী শ্রীনিত্যানন্দবিনোদ গোস্বামী। বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

বালকবালিকাদের সংস্কৃত শিখিবার সুবিধার জন্য এই পাঠগুলি সঙ্কলিত হইয়াছে। পাঠগুলি দেবনাগর অক্ষরে, শব্দার্থ, অনুশীলনী প্রভৃতি বাংলা অক্ষরে মুদ্রিত। কয়েকটি ছবিও আছে। সংকলয়িতা বিশ্বভারতীর এক জন অভিজ্ঞ অধ্যাপক।

জগদীশ সঙ্গে ত্রিশ বৎসর—শ্রীযোগেশচন্দ্র সেনগুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, এম্ এ, প্রিন্সিপ্যাল, ব্রজমোহন কলেজ, বরিশাল। আচার্য্য জগদীশ মুখোপাধ্যায় ও লেখকের দুইখানি চিত্র পুস্তকটিতে আছে।

এই পুস্তকে বরিশালের প্রসিদ্ধ ধর্ম্মাচার্য্য স্বর্গীয় জগদীশ মুখোপাধ্যায়ের পরিচয় আছে। পুস্তকখানির পরবর্ত্তী অংশ "বিদ্রোহী সেবকের পাগলামি" ও "বিদ্রোহী সেবকের প্রার্থনা" এই দুই খণ্ডে বিভক্ত। সর্ব্বশেষে লেখকের রচিত "বিংশ শতাব্দীর ধর্ম্ম" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ আছে।

পুস্তকখানি পাঠ করিলে আচার্য্য মহাশয়ের ধর্ম্মসম্বন্ধীয় মত ও আদর্শের কতক পরিচয় পাওয়া যায়, এবং তাঁহার শিষ্য লেখকের ব্যক্তিত্বের সম্বন্ধেও ধারণা জন্মে।

শিক্ষার ধারা—প্রকাশক শ্রীধীরেন্দ্রমোহন সেন, এম্-এ, পিএইচ-ডি, সেক্রেটারী, নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ, বঙ্গীয় শাখা, শান্তিনিকেতন। প্রাপ্তিস্থান—বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়, ২১০ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা, এবং নিউ এডুকেশন ফেলোশিপ আফিস সমূহ।

এই বইটিতে শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ," "শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে সঙ্গীতের স্থান" ও "আশ্রমের শিক্ষা", শ্রীযুক্ত ক্ষিতিমোহন সেন প্রণীত "শিক্ষার স্বদেশী রূপ", এবং শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু প্রণীত "শিক্ষাক্ষেত্রে শিল্পের স্থান" শীর্ষক প্রবন্ধগুলি আছে।

জ্ঞান, অভিজ্ঞতা ও মনন দ্বারা যাঁহারা যে যে বিষয়ে লিখিতে অধিকারী তাঁহারা সেই সেই বিষয়ে লিখিলে লেখা যেরূপ সারবান, হিতকর, ও মনোজ্ঞ হইবার কথা, এই প্রবন্ধগুলি তদ্রূপ। শিক্ষা সকল দেশেই আবশ্যক এবং সকল দেশেরই একটি বড় সমস্যা ; আমাদের দেশে একান্ত আবশ্যক এবং আমাদের দেশের একটি কঠিন সমস্যা। এই কারণে, শিক্ষা বিষয়ে জ্ঞানবান, মননশীল ও অভিজ্ঞ লেখকদিগের লিখিত এই প্রবন্ধগুলি লিখনপঠনক্ষম সকলের এবং বিশেষ করিয়া শিক্ষাদান কার্য্যের সহিত সম্পর্কযুক্ত ব্যক্তিদের পাঠ করা উচিত।

শতদল—ঢাকা-হল-বার্ষিকী চতুর্দ্দশসংখ্যা, ১৩৪৪। শ্রীভূপেশচন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত।

এই গ্রন্থটিতে ২৯টি রচনা আছে। রচনাগুলি নানাবিধ কবিতা, গল্প, প্রবন্ধ ও অভিভাষণ। কয়েকটি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপণ্ডিত অধ্যাপকদিগের লেখা। "মুখবন্ধ" এবং "সম্পাদকীয় মন্তব্য"ও ইহাতে আছে।

পরমহংস শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনচরিত—রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রমে প্রাপ্তব্য।

আমেরিকায় যে যোগানন্দস্বামী ধর্ম্ম প্রচার করেন, তিনি পরমহংস শ্যামাচরণ লাহিড়ী মহাশয়ের শিষ্য। রাঁচির যোগদা সৎসঙ্গ আশ্রম এবং ঐ আশ্রমে স্থিত ব্রহ্মচর্য্য বিদ্যালয়, এই পরমহংস মহোদয়ের শিষ্য ও অনুশিষ্যদিগের দ্বারা পরিচালিত। এই গ্রন্থখানি পাঠ করিলে তাঁহার সম্বন্ধে জ্ঞান লাভ করা যায়।

গল্পের ফোয়ারা—(যুক্তাক্ষর বর্জ্জিত) ; প্রথম বই। শ্রীজ্যোতিঃপ্রভা দেবী, এম্-এ, বি টি, Dipl. in Edn. (London)। প্রকাশক শ্রীরঞ্জিত সেন, ৪৪ হাজরা রোড, কলিকাতা।

ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত এই সচিত্র বহিখানিতে ৫৩টি গল্প আছে। গল্পগুলি তাহাদের ভাল লাগিবে এবং সেগুলি উপদেশপ্রদও বটে। ছবিগুলিও ভাল।

চ.

বীরভূমের ইতিহাস—প্রথম খণ্ড (ইংরেজ অধিকার কালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত) শ্রীগৌরীহর মিত্র, বি-এল, সঙ্কলিত। ১৩৪৩। মূল্য ১৲ (বাঁধাই ১।৹)। রতন লাইব্রেরী, সিউড়ী, বীরভূম। পৃঃ ।৵+২১০। ১৭টি চিত্র।

পুস্তকখানিতে লেখক জেলার অবস্থান ও সীমানা, প্রাকৃতিক পরিচয়, প্রভৃতি দিবার পর একটি "ধারাবাহিক ইতিহাস" অঙ্কন করিবার চেষ্টা করিয়াছেন। কিন্তু দুইটি কারণে তাঁহার চেষ্টা খুব সার্থক হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। গ্রন্থকার যথাযথভাবে ঐতিহাসিক তথ্যের দাম যাচাই করিতে পারেন নাই। ইংরেজিতে যাহাকে বলে, "ক্রিটিকাল সেন্স",

তাহার কিছু অভাব পরিলক্ষিত হয়। সেই জন্য গ্রন্থে বহু তথ্য একত্র সন্নিবেশিত হইলেও পাঠকের মনে তাহার দ্বারা বীরভূমের কোনও ধারাবাহিক ঐতিহাসিক চিত্র দৃঢ়রূপে অঙ্কিত হয় না।

একাদশ অধ্যায়ে তিনি বীরভূমের প্রাচীন সমাজের চিত্র অঙ্কন করিয়াছেন তাহা কল্পনাবাহুল্য দোষে দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছে। বরং পরবর্ত্তী অধ্যায়ে পুরাতন দলিলপত্র হইতে সে যুগের আরও বাস্তব এবং সত্য পরিচয় পাওয়া যায়। শেষোক্ত রূপটি একাদশ অধ্যায়ে বর্ণিত রূপ হইতে স্বতন্ত্র।

গ্রন্থের সম্পর্কে একটি বিষয় লক্ষ্য করিয়া আমরা দুঃখিত হইয়াছি। বীরভূমের ঐতিহাসিক তথ্য ইতিপূর্ব্বেও সংগ্রহের চেষ্টা হইয়াছে, কিন্তু বর্ত্তমান গ্রন্থকার পূর্ব্বগামিগণের ঋণ যথাযথভাবে স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া মনে হয় না।

সুখের বিষয় লেখকের অধ্যবসায় আছে এবং স্বীয় মাতৃভূমির প্রতি তাঁহার অনুরাগও বর্ত্তমান। আমরা আশা করি ইতিহাস পর্য্যালোচনার প্রকৃষ্ট বৈজ্ঞানিক পদ্ধতি অনুসরণ করিয়া তিনি ভবিষ্যতে তাঁহার সংগৃহীত তথ্যরাজির সাহায্যে বীরভূমের একখানি সর্ব্বাঙ্গসুন্দর ইতিহাস রচনা করিতে সমর্থ হইবেন।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

মহাভারতী—শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী। প্রকাশক: সেন ব্রাদার্স এণ্ড কোং ১৫, কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। মূল্য ১৷০

যতীন্দ্রমোহনের পরিণত বয়সের কয়েকটি কবিতা লইয়া মহাভারতী প্রকাশিত হইয়াছে। যৌবনের রচনা হইতে এই কবিচিত্তের মধ্যে কোন প্রবল সংশয়, কোন চঞ্চল দ্বিধার পরিচয় আমরা পাই না। এই কবি প্রধানতঃ বহিঃপ্রকৃতির ও অন্তঃপ্রকৃতির সৌন্দর্য্য এবং সুসংবদ্ধ গার্হস্থ্য জীবনের চিরন্তন সুখ দুঃখ, মিলন বিরহ আপনার স্বচ্ছন্দ সুন্দর দ্বিধাহীন ভাষায় চিরদিন অসঙ্কোচে ব্যক্ত করিয়া আসিতেছেন। কোন কঠিন দ্বন্দ্ব বা গভীর সমস্যা তাঁহাকে কোন দিন বিব্রত করে নাই। আজ পঞ্চাশোর্দ্ধে তাঁহার মধ্যে সেই নিঃসংশয়তা আর নাই, দ্বিধা দেখা দিয়াছে।

'পঞ্চাশোর্দ্ধে বনে যাবে—চলেছি তাই বনে,
মনটা তবু থেকে থেকে দুল্‌ছে ক্ষণে ক্ষণে।"

এই দোলা দ্বিধার দোলা; প্রেম ও বৈরাগ্যের মধ্যে দ্বন্দ্বের দোল। ইহাই আজ কবিচিত্তের স্থৈর্য্যকে ঈষৎ অব্যবস্থিত করিয়া তাহার সৃষ্টিকে নূতন রূপ দিয়াছে। জীবন ব্যাপারে পূর্ব্বের সেই অসন্দিগ্ধ একনিষ্ঠ দৃষ্টি আর নাই। কালপ্রভাবে বৈরাগ্যদৃষ্টি তীক্ষ্ণ হইয়া উঠিতেছে; অথচ কবির চিরদিনের সৌন্দর্য্যদৃষ্টি তাহাকে আচ্ছন্ন করিতে চাহিতেছে। একদিকে গৃহের টান, অপর দিকে বনের টান; কবিচিত্ত এই দোটানায় পড়িয়া উভয়ের মধ্যে সন্ধি করিবার চেষ্টায় ব্যাপৃত।

'মহাভারতী'তে কবিচিত্ত যে পথে চলিয়াছে, তাহা পূর্ব্বপরিচিত সুখের, আনন্দের বা প্রেমের পথ নহে, তাহার উভয় পার্শ্বে দুঃখ, বঞ্চনা, জ্বালা ও বৈরাগ্যের রুদ্র মূর্ত্তি দেখা দিয়াছে।

অথচ 'মহাভারতী'তে যে-বৈরাগ্যের সুরটি তীব্র হইয়া উঠিয়াছে, তাহা বাংলার অতিপরিচিত বাউলের একতারায় একটানা বৈরাগ্যের সুর নহে। ভাবার বৈচিত্র্যে, প্রকাশভঙ্গীর বিভেদে ও বিষয়-নির্ব্বাচনের ব্যাপকতায় মনে হয়, যেন দ্রুত অঙ্গুলি আঘাতে কড়ি কোমলকে স্পর্শ করিয়া ওস্তাদীহাতে সপ্তস্বরায় ভৈরবীর আলাপ চলিতেছে। এ বৈরাগ্য যেমন মিথ্যার ছায়ায় ভণ্ডামিপূর্ণ হয় নাই, তেমনি সত্যের রুদ্রালোকে অসুন্দর হইয়া উঠে নাই। এই সামঞ্জস্য সাধনেই পরিণত কবিচিত্তের পরিস্ফুট কৃতিত্ব প্রকাশ পাইয়াছে।

মধুব্রত

মুস্‌লিম বীরাঙ্গনা—মঈনুদ্দীন। প্রকাশিকা—বেগম রহিমা খানম, আলহাম্‌রা লাইব্রেরী, ১৮, মুসলমানপাড়া লেন, কলিকাতা। দাম—পাঁচ সিকা।

ইহাতে বীরমাতা আয়শা, বীর্য্যবতী উম্মে আমারা, বীরভগিনী খাওয়ালা, বীরজায়া হামিদা বানু বেগম, বীরকন্যা মাহতাবান, বীর-বালা সৈয়দা খাতুন, বীর সুলতানা রাজিয়া, বীরাঙ্গনা চাঁদ সুলতানা ও বীরনারী নূরজাহান্‌ বেগম প্রভৃতি ইতিহাস-প্রসিদ্ধ নয় জন মহীয়সী মহিলার বীর্য্যবত্তার কাহিনী লিখিত হইয়াছে। লেখা বাংলা দেশের কিশোর-কিশোরীদের মনোরঞ্জন করিবে বলিয়াই আমাদের বিশ্বাস। বইয়ের ছাপা-বাঁধাই ভাল।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বিষ্ণুভগবান ও বুদ্ধভগবান একই কিম্বা দুই?—২ নং পঞ্চক্রোশী রোড বেনারস সিটি হইতে শ্রীশ্রীশচন্দ্র শর্ম্মা কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৫৬।

বিষ্ণুভগবান ও বুদ্ধভগবান যে অভিন্ন, ইহাই পুস্তিকাখানির প্রতিপাদ্য বিষয়। এই অভিন্নতা প্রতিপাদন করিতে লেখক যে-সকল প্রমাণ প্রয়োগ করিয়াছেন, তাহা অতীব শিথিল।

শুদ্ধামাধুরী—শ্রীমৎ স্বামী সমাধিপ্রকাশ আরণ্য- লিখিত। প্রকাশক শ্রীমণীন্দ্র ব্রহ্মচারী, পোঃ বহরপুর, ফরিদপুর। পৃষ্ঠা ৬০। সাহায্য ।০ চারি আনা।

লেখক শ্রীমদ্ভাগবত, শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত প্রভৃতি গ্রন্থবর্ণিত কৃষ্ণলীলা ও গৌরাঙ্গলীলার সাহায্যে শুদ্ধ মধুর ভাবের বিশ্লেষণ ও ব্যাখ্যা করিয়াছেন। প্রসঙ্গত গ্রন্থশেষে ফরিদপুরের সাধকপ্রবর জগদ্বন্ধুর মধুর-রস-সিক্ত জীবনও আলোচিত হইয়াছে। পুস্তকের ভাষা গদ্য হইলেও কবিত্বময় ও মাঝে মাঝে বৈষ্ণব পদাবলীর ছাঁচে ঢালা। ভক্তিমার্গী সাধকগণের নিকট যে বইখানি সমাদৃত হইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। কাগজ ও ছাপা ভাল।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

ব্রিজ সঙ্কেত—হরতনের টেক্কা কথিত। প্রাপ্তিস্থান—বুক কোম্পানী লিমিটেড, কলিকাতা। মূল্য পাঁচ আনা।

এই পুস্তকে ব্রিজ খেলার প্রাথমিক নিয়ম ও সঙ্কেতগুলি সহজভাবে বর্ণিত হইয়াছে। শুধু বই পড়িয়া অবশ্য খেলা শেখা যায় না, কিন্তু যাঁহারা এই খেলাতে নূতন উৎসাহী বইটি তাঁহাদের কাজে লাগিতে পারে।

প

য়্যারিষ্টোক্রেসী—শ্রীনিতাইহরি ভট্টাচার্য্য। প্রকাশক-বরেন্দ্র লাইব্রেরী, ২০৪ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট কলিকাতা।

উপন্যাসখানি পড়িতে ভাল লাগিল। গল্প বেশ জমিয়াছে। আগাগোড়া পড়িবার আগ্রহ থাকে। পাত্রের চরিত্র আমাদের সহানুভূতি আকর্ষণ করে, কিন্তু মিঃ সেন ও ইলাকে কথঞ্চিৎ অস্বাভাবিক মনে হয়। লেখকের ভাষা সহজ ও সতেজ, তবে নির্দ্দোষ নয়। স্থানে স্থানে ভ্রম-প্রমাদ চোখে পড়ে। মোটের উপর বইখানি প্রশংসনীয়। গল্প বলিবার ভঙ্গী লেখক ভালভাবে আয়ত্ত করিয়াছেন। কিন্তু যে সমাজ লইয়া লেখক তাঁহার আখ্যানবস্তু গড়িয়া তুলিয়াছেন সেই সমাজের সহিত তাঁহার বাস্তব পরিচয় আছে বলিয়া মনে হয় না। উল্লিখিত চরিত্রগুলির চালচলন ও পারিবারিক জীবনে য়্যারিষ্টোক্রেসীর বৈশিষ্ট্য নাই, যদিও উপন্যাসের নামকরণে সেই সমাজকেই লক্ষ্য করা হইয়াছে।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

আলোচনা

"বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা"

১

১। 'মুর্শিদাবাদ জেলায় কান্দী গ্রামে রামেন্দ্র-স্মৃতিভবন নামক অতিথিশালা স্থানীয় ভদ্রলোকদের উদ্যোগে ও অর্থ-সাহায্যে প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে" বলিয়া গত বৎসর ফাল্গুনের প্রবাসীতে যাহা লিখিত হইয়াছে উহা প্রকৃত নহে। লালগোলার দানশৌণ্ড মহারাজা শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনারায়ণ রায় মহাশয়ের আগ্রহে ও সম্পূর্ণ ব্যয়ে দুর্গাদাস ত্রিবেদী মহাশয়ের তত্ত্বাবধানে কান্দী কোর্ট ও বিদ্যালয়ের সম্মুখে ৺আচার্য্য রামেন্দ্রসুন্দর ত্রিবেদী মহাশয়ের স্মৃতি রক্ষার্থে হিন্দু ও মুসলমানদিগের জন্য পৃথক্ দুইটি বাড়ীতে দুইটি রামেন্দ্র-পান্থনিবাস ও তাহার সম্মুখে একটি দীর্ঘিকা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

[শ্রীযুক্ত মদনমোহন ত্রিবেদীও লালগোলা হইতে রামেন্দ্রসুন্দর-স্মৃতিভবন সম্বন্ধে অনুরূপ বিবরণ লিখিয়া পাঠাইয়াছেন]

২। শ্রীরামপুর ষ্টেশনের নিকটে ক্ষেত্রমোহন সাহার নির্ম্মিত একটি বাঙালী ধর্ম্মশালা এবং হরিদ্বার-কনখলে বঙ্গবাসী কলেজের অধ্যক্ষ শ্রীযুক্ত গিরিশচন্দ্র বসু মহাশয়ের প্রতিষ্ঠিত একটি বাঙালী ধর্ম্মশালা আছে, প্রবন্ধে তাহার উল্লেখ নাই।

৩। কাশী বীরেশ্বর পাড়ে ধর্ম্মশালার স্থাপয়িতা ৺মনোমোহন পাড়ে মহাশয়ের সম্বন্ধে "তাঁহাদের বংশের বিবাহাদি ক্রিয়াও এ দেশীয়দিগের সহিত অনুষ্ঠিত হইয়া থাকে" বলিয়া যাহা লেখা হইয়াছে উহাও প্রকৃত নহে—যদিও সুদীর্ঘ কাল বঙ্গে বসবাস হেতু ভাষায়, আচারে, ব্যবহারে, সর্ব্বপ্রকারে তাঁহারা বাঙালীই হইয়া গিয়াছেন কিন্তু তাঁহাদের বিবাহাদি ক্রিয়া এখনও পর্য্যন্ত বঙ্গদেশবাসী তাঁহাদের সম্প্রদায়ের মধ্যেই হইয়া আসিতেছে।

শ্রীশীতলচন্দ্র রায়

২

ফাল্গুনের প্রবাসীতে প্রকাশিত প্রবন্ধে বর্ণিত ধর্ম্মশালাগুলি ছাড়া লক্ষ্ণৌয়ে একটি বাঙালী-প্রতিষ্ঠিত ধর্ম্মশালা আছে। এখানকার প্রসিদ্ধ ব্যবসায়ী ৺রাজেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয় তাঁর স্বর্গগত পত্নীর নামে 'সরোজিনী ধর্ম্মশালা' একটি বড় রাস্তার উপর (হিউয়েট রোড) কয়েক বৎসর আগে স্থাপন করেছেন। ধর্ম্মশালাটি একটি হাতার মধ্যে, কয়েকটি বসতবাড়ীর পাশে অবস্থিত। ঐ বাড়ী-গুলির ভাড়া থেকে এর খরচ চালান হয়। বাড়ীটি দোতালা, ড্রেন-পাইখানা ও বারান্দায় বিজলী-বাতি আছে। এখানে হিন্দু মাত্রেই সাত দিন থাকতে পান। নীচে একটি ঘরে রাজেন্দ্র বাবুর মধ্যম পুত্র শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ সান্যাল মহাশয়ের সৃষ্ট বাঙালী স্বেচ্ছা-সেবী দলের অফিস ও ব্যায়ামাগার আছে। দুঃস্থ ব্যক্তিদের সিধা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। তবে কোন কোন ধর্ম্মশালার মত বাসন প্রভৃতি দেবার নিয়ম নেই। ষ্টেশন থেকে হেঁটে প্রায় কুড়ি মিনিটের ও এক্কা বা টাঙ্গায় প্রায় দশ মিনিটের পথ। শুনলাম যে ই. আই. রেলের কর্ত্তাদের লেখা সত্ত্বেও টাইম-টেবলে ধর্ম্মশালাসমূহের তালিকার মধ্যে এটি অন্তর্ভুক্ত করা হয় নি। ৺রাজেন্দ্র বাবু এই ধর্ম্মশালা পরিচালনার জন্য একটি ট্রাষ্ট গঠন ক'রে গেছেন। ধর্ম্মশালাসংলগ্ন একটি শিবালয় আছে। সেখানে প্রত্যহ পূজা ও আরতি হয়। বাঙালী প্রতিষ্ঠিত অপর ধর্ম্মশালাগুলির কর্ত্তৃপক্ষদের চেষ্টা করা উচিত যাতে তাঁদের ধর্ম্মশালাগুলির নাম ও ঠিকানা রেলপথসমূহের টাইম-টেবল প্রভৃতিতে প্রকাশিত হয়।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র দে

"বিজয়া"

গত অগ্রহায়ণ সংখ্যার প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্যে "বিজয়া" সম্বন্ধে বলা হইয়াছে যে "অনেক হিন্দু বিশ্বাস করেন পরদারাপহারী রাবণ পরাজিত ও নিহত হইবার পর রামচন্দ্র যে শক্তিপূজা করিয়াছিলেন, বিজয়া অনুষ্ঠান সেই জয়োৎসব সমাপনের স্মারক।" ভগবান রামচন্দ্র রাবণকে নিহত বা পরাজিত করিবার পর শক্তি-পূজা করিয়াছিলেন, এ-কথা কোথাও লিপিবদ্ধ নাই, এবং কোন হিন্দু ইহা বিশ্বাস করেন না। শাস্ত্রে পুরাণে যথা দেবী-ভাগবত, কালিকাপুরাণ মহাভারত, মহাভাগবত এবং বৃহৎ নন্দিকেশ্বর-পুরাণে রামচন্দ্র কর্ত্তৃক দেবীর অকালে (শরৎকালে) পূজার কথা বর্ণিত আছে।

দেবী-ভাগবতে ব্যক্ত আছে, রামচন্দ্র রাজ্য এবং পত্নীহারা অবস্থায় ভ্রষ্টশ্রী হইয়া কিষ্কিন্ধ্যা অবস্থানকালে দেবর্ষি নারদের উপদেশে শারদীয় নবরাত্র ব্রত পালন করিয়াছিলেন। নারদ এই ব্রতের আচার্য্যের কর্ম্ম করিয়াছিলেন।

কালিকাপুরাণে ব্যক্ত আছে, রামচন্দ্রের সাহায্যার্থে ব্রহ্মা কর্ত্তৃক মহাদেবী বোধিতা ও পূজিতা হইয়াছিলেন। আরাধনার পর রামচন্দ্র বিজয়া-দশমী দিনে যুদ্ধযাত্রা করিয়াছিলেন, তাহারই স্মরণ স্বরূপ বিজয়া উৎসব এদেশে প্রতিপালিত হইতেছে।

রামচন্দ্র একবার শক্তিপূজা করিয়া নারীধর্ষণকারী রাবণকে বিনাশ করিয়াছিলেন। আমরা প্রতি বৎসর সাড়ম্বরে দেবীর পূজা করিয়া আসিতেছি, কিন্তু নারীধর্ষণের সংখ্যা ক্রমশঃ বাড়িয়া যাইতেছে। ইহাতে অনুমান হয়, আমাদের পূজা যথার্থভাবে অনুষ্ঠিত হয় না। আমরা যে পূজা করি তাহা রাজসিক তথা তামসিক। রাজসিক ও তামসিক পূজাতে আমাদের উদ্দেশ্য কখনও সিদ্ধ হইবে না। সাত্ত্বিকী পূজা করিতে শিখিলে আমাদের উদ্দেশ্য সাধিত হইবে। মা-দুর্গা আমাদের মঙ্গল বিধান করিবেন। একালে মা-দুর্গাকে বৈদেশিক সাজসজ্জায় ভূষিত করিয়া আমরা

পূজা করিতেছি, বাহ্যাড়ম্বর প্রদর্শনে আমরা বহু অর্থ অপব্যয় করিতেছি, এই অর্থ ও উৎসাহ দেশের মঙ্গলার্থ ব্যয় করিলে আমাদের মঙ্গল হইত।

গৃহলক্ষ্মীদিগকে কর্ম্মে, চরিত্রে এবং নিষ্ঠাপরতায় সুসজ্জিত করিতে পারিলে আমাদের দেশের নারীর অপমান লাঘব হইবে। গৃহলক্ষ্মীদিগকে প্রতিমা সাজাইবার মত না করিয়া শক্তিশালিনী করিতে হইবে।

নারীধর্ষণকারীদিগকে কঠোর দণ্ডে দণ্ডিত করার সঙ্গে সঙ্গে, যে-নারীরা পুরুষের চরিত্র নষ্ট করিয়া দেশের শত শত যুবক ও ক্ষমতাশালী ধনবানকে বিপথগামী করিতেছে ও হিন্দুর পবিত্র গার্হস্থ্য ধর্ম্ম ও একান্নবর্ত্তী প্রথার বিরুদ্ধে অগ্রসর হইতেছে, তাহাদের কঠোর শাসনের ব্যবস্থা না করিলে আমাদের মঙ্গল হইবে না। এ-কালের শিক্ষিতা মহিলারা নারীর মঙ্গলের নিমিত্ত নানাবিধ প্রস্তাব ও পন্থা অবধারণ করিতেছেন। কিন্তু পুরুষের সম্মুখে নানাবিধ প্রলোভন সৃষ্টি করিয়া পুরুষের পুরুষত্ব নষ্ট করিবার চেষ্টা ও উদ্যম নারীদের সর্ব্বত্র পরিলক্ষিত হয়। তাহার বিনাশনার্থে কোন স্থানে আয়োজন হইতেছে এরূপ শুনা যায় কি? পুরুষ নারীকে আবদ্ধা তথা পরাধীনা করিয়া রাখিয়াছে সত্য, কিন্তু নারী পুরুষকে নানা কৌশলে পশুভাবে রাখিয়া দেশের সর্ব্বনাশ করিতেছে, ইহারও প্রতিকার প্রয়োজন।

জগদ্বিখ্যাত বৈজ্ঞানিক এডিসনের সহধর্ম্মিণী এক স্থানে বলিয়াছেন, "A woman can make or break a man." তিনি অন্যত্র বলিয়াছেন, যে "মানুষকে বড় কিংবা ছোট করে, তার স্ত্রী; উদারচেতা কোন পুরুষকে দেখিলে অনুমান হইবে যে তাঁহার স্ত্রী মহামহিমময়ী।" নব্য ইটালীর গঠনকর্ত্তা বীর মুসোলিনী বলিয়াছেন যে স্ত্রীর মাতৃত্ব এবং পুরুষের বীরত্ব, এই দুইটি সার।

একালের শিক্ষিতা ললনাদের অন্যায় অপকর্ম্মের বিরুদ্ধে সংগ্রাম করা প্রয়োজন। পতিতা নৃত্যকারীর সংখ্যা দিন দিন বাড়িতেছে, অযথা নগ্নতার বীভৎসতা সমাজে প্রতিভাত হইতেছে, এই সকলের নিবারণ প্রয়োজন।

শ্রীবৃন্দাবননাথ শর্ম্মা

পদ্মচিহ্ন ও ইসলাম

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা-দিবস উপলক্ষে অনুষ্ঠিত উৎসবের পতাকা শ্রী, পদ্ম ও স্বস্তিক চিহ্নাঙ্কিত করা হইয়াছিল বলিয়া কলিকাতাস্থ ইসলামিয়া কলেজের মুসলমান ছাত্রবৃন্দ উহাতে হিন্দু-পৌত্তলিকতার গন্ধ পাইয়া ধর্ম্মহানির আশঙ্কায় প্রতিবাদ জানাইয়াছিলেন। বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষ এই বিষয়ে ইসলামিয়া কলেজের ছাত্রদের উক্ত প্রতিবাদের কি উত্তর দিয়াছিলেন, তাহা আমরা অবগত নহি। এ বিষয়ে প্রবাসী-সম্পাদক মহাশয় যে আলোচনা করিয়াছেন তাহার সহিত আমরা সম্পূর্ণ একমত। শ্রী, পদ্ম ও স্বস্তিক চিহ্ন যে কোন হিন্দু দেবদেবীর প্রতীক নহে, কিংবা কোন হিন্দু দেবদেবীর প্রতীকরূপে যে ঐ ঐ চিহ্ন উৎসব-পতাকায় অঙ্কিত হয় নাই—তাহা আমরা বেশ বুঝিতে পারি; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতার এই বিষাক্ত আবহাওয়ায় কাহারও কাহারও মনে শিল্পসুষমা বোধ এককালে অবলুপ্ত হইয়াছে দেখিয়া বিস্ময় বোধ করিতেছি। আমাদের বিস্ময় আরও বৃদ্ধি পাইয়াছে—তরুণ শিক্ষার্থিগণের এবম্বিধ মনোভাবের বিকাশ দেখিয়া। তরুণ বয়সে মনের যে প্রসার হয় অল্প কালে তাহা সম্ভবপর নয়। ইসলামিয়া কলেজের পাঠার্থিগণের যিনি বা যাঁহারা বর্ত্তমান কিংবা অনুরূপ ব্যাপারে ইস্‌লাম ধর্ম্মের অপহ্নব ও হিন্দুত্ব প্রতিষ্ঠার ষড়যন্ত্র উদ্‌ঘাটিত করিতে প্রয়াসী হন, তাঁহাদের শুভ বুদ্ধির প্রশংসা করিতে পারি না। সমাজের হিতাকাঙ্ক্ষায় (?) তাঁহারা যথাতথা ধর্ম্মের দোহাই দিয়া ভবিষ্যৎ বংশধরগণের মন যে কত দূর সঙ্কীর্ণ ও পঙ্গু করিয়া ফেলিতেছেন, তাহা বুঝিবার সময় অনেক দিন হইল আসিয়াছে। কিন্তু এই প্রসঙ্গে ইঁহাদের নিকট শুধু নৈতিক দোহাই পাড়িয়াই নিরস্ত হইতেছি না। মুসলমানের মসজিদ পদ্মচিহ্ন ধারণ করিয়াও অদ্যাপি ইসলামধর্ম্মের গৌরব ঘোষণা করিতেছে, তাহার দুইটি "পাথুরে প্রমাণ" উপস্থিত করিতেছি।

পুরাতত্ত্ব অনুসন্ধিৎসু ব্যক্তি মাত্রই হয়ত অবগত আছেন পাঠান যুগের বাংলার স্বাধীন সুলতানী আমলের যে-সকল মসজিদ অদ্যাপি কালের ভ্রূকুটি উপেক্ষা করিয়া নিজ অস্তিত্ব রক্ষা করিয়া আসিতেছে, তাহাদের স্থাপত্যরীতি ও গঠনসৌন্দর্য্য দেশীয় ও বিদেশীয় যাবতীয় শিল্পানুরাগিগণের সপ্রশংস দৃষ্টি আকর্ষণ করিতে সমর্থ হইয়াছে। মুসলমান স্থাপত্যরীতিতে মসজিদগাত্র পত্র পুষ্পাদিতে শোভিত করা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাই তখনকার ও তৎপরবর্ত্তী অনেক মসজিদের বহির্গাত্রে ও দ্বারদেশে পদ্ম উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়।

মসজিদের বহির্গাত্রেই যে এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ হইত তাহা নহে—মসজিদের অভ্যন্তরভাগেও মিহ্‌রাবের উপরিদেশ উৎকীর্ণ পদ্মে শোভিত করা হইত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর সুলতান সিকন্দর শাহ নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের মিহ্‌রাবেও এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। পদ্মচিহ্নের সহিত ইসলাম ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশের আশঙ্কা থাকিলে স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ কখনই তাহার প্রচলন অনুমোদন করিতেন না। অথচ বাংলার ইতিহাসে এই স্বাধীন সুলতানগণের যুগই সকল দিক্ হইতেই বাঙালীর স্মরণের যোগ্য, সমগ্র মুসলমান অধিকারের ভিতর এই সময়েই বাঙালীর প্রতিভা অপূর্ব্ব প্রেরণায় উদ্‌বুদ্ধ হইয়া শিল্প, স্থাপত্য সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভিনব বেশে আত্মপ্রকাশ করে। আজ ইসলাম ধর্ম্মের ক্ষুণ্ণতা আশঙ্কায় যাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা কি এই স্বাধীন সুলতানগণের গৌরবময় কাহিনী জাতির তরুণ শিক্ষার্থিগণকে বিস্মৃত হইতে বলেন? এই প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য বহু মসজিদে পদ্ম উৎকীর্ণ থাকার বিবরণ উল্লেখ করিতে বিরত থাকিয়া জনৈক ইসলামধর্ম্ম-প্রচারকের প্রতিষ্ঠিত (পদ্মচিহ্নশোভিত) মসজিদের বিবরণ পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিতেছি। বিগত ফাল্গুন

মাসে এই মসজিদ আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত অষ্টগ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং হিন্দু মুসলমান বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থান। পূর্ব্বোল্লিখিত গৌড়ীয় স্বাধীন সুলতানগণেরও পূর্ব্বে কুতুব নামধেয় জনৈক ইসলামধর্ম্ম-প্রচারক সিদ্ধমহাপুরুষ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এতদঞ্চলে ইসলাম ধর্ম্মের প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ অদ্যাপি অষ্টগ্রামে বর্ত্তমান আছে। উক্ত মসজিদের গাত্র ও দ্বারদেশের ইষ্টকশ্রেণী প্রস্ফুটিত পদ্মে সুশোভিত করা হইয়াছে। অদ্যাপি এই মসজিদে নিয়মিত জুম্মার নমাজ অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব বিভাগ এই প্রাচীন স্থাপত্যকীর্ত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অতঃপর মুসলমান শিক্ষার্থিগণের উপদেষ্টারা কি বলিতে চাহিবেন— ইসলামধর্ম্ম-প্রচারক মসজিদগাত্র প্রস্ফুটিত পদ্ম উৎকীর্ণ করিয়া তদীয় ধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি করিয়াছিলেন ?

শ্রীক্ষিতীশচন্দ্র সরকার



নৃত্যারতি

শ্রীপ্রভাত নিয়োগী



নৃত্যাদ্বৈত

শ্রীমন্দাকিনী চট্টোপাধ্যায়

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

আচার্য্য দীপঙ্কর থোলিং বিহারে নয় মাস কাল অবস্থান করেন, সেই সময় তিনি "বোধিপথ বিহার" নামক গ্রন্থ রচনা করেন এবং কয়েকখানি প্রসিদ্ধ ধর্ম্মগ্রন্থের অনুবাদ করান। ঙংরী প্রদেশে যে তিন বৎসর যাপন করেন তৎকালে অন্য বহু গ্রন্থের রচনা ও অনুবাদ শেষ করিবার পর দ্রুম-পুরুষ-বানর বর্ষে (হেমলম্ব, ১০৪৪ খ্রীঃ) তিনি পুরুঙে উপস্থিত হন। এই স্থানে অতিশার প্রিয় শিষ্য, গৃহস্থ ডোমতোন তাঁহার সহিত মিলিত হইলেন। সেই সময় হইতে অতিশার মৃত্যুকাল পর্য্যন্ত এই শিষ্য ছায়ার ন্যায় গুরুর অনুগামী ছিলেন এবং গুরুর দেহত্যাগের পর, "গুরু-গুণ ধর্ম্মাকর" নামে প্রসিদ্ধ, তাঁহার জীবন-চরিত লিখেন।

ভোটদেশের কোন কোন স্থানে কিছুকাল ধরিয়া অবস্থান করিলেও আচার্য্য প্রায় অধিকাংশ সময় ঘুরিয়া বেড়াইতেন, কিন্তু ধর্ম্মগ্রন্থ-প্রণয়ন অথবা অনুবাদের কার্য্য কখনও ক্ষান্ত থাকিত না। অগ্নি-পুরুষ-শূকর বর্ষে (সর্ব্বজিত, ১০৪৭ খ্রীঃ) সম্-য়ে বিহার এবং লোহ-পুরুষ-ব্যাঘ্র বর্ষে (বিকৃত, ১০৫০ খ্রীঃ) তিনি য়েরু-বা গিয়াছিলেন; এইরূপে চৌদ্দ বৎসর ভোটদেশে অবস্থানকালে তিনি তিন বৎসর ঙংরী প্রদেশে, চার বৎসর উই ও চাং প্রদেশে এবং ছয় বৎসর য়ে-থঙ্ প্রদেশে কাটাইয়াছিলেন। দ্রুম-পুরুষ-অশ্ব বর্ষের (জয়, ১০৫৪ খ্রীঃ) ভোটীয় নবম মাসের অষ্টাদশ তিথিতে (কার্ত্তিক-অগ্রহায়ণের কৃষ্ণ তৃতীয়া-চতুর্থী) য়ে-থঙ বিহারের তারা মন্দিরে ৭৩ বৎসর বয়সে এই মহাপুরুষ নশ্বর দেহ ত্যাগ করেন। প্রিয় শিষ্য ডোম-তোন তখন তাঁহার পার্শ্বেই ছিলেন। লাসা হইতে প্রত্যাবর্ত্তন-কালে ১৯৩০ সালের এপ্রিল মাসে আমি এই অতি পবিত্র স্থান দর্শন করি। অতিশার সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই মন্দিরের পরিবর্ত্তন অতি অল্পই হইয়াছে, তাহার সাক্ষ্য উহার বিশাল রক্ত-চন্দন স্তম্ভ। এখনও দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, ধর্ম্মকারক (কমণ্ডলু) ও খদির কাষ্ঠ নির্ম্মিত যষ্টি—ঐ মন্দিরে একটি রাজমুদ্রা-অঙ্কিত পিঞ্জরে সুরক্ষিত হইয়া জগৎকে জানাইতেছে যে সেদিন পর্য্যন্ত ভারতের বৃদ্ধ-অস্থিতে কি অদম্য সাহস ও কার্য্যক্ষমতা ছিল।

ভোটদেশের চারিটি ধর্ম্ম-সম্প্রদায়ই আচার্য্য দীপঙ্করকে একভাবে পূজনীয় জ্ঞান করে। শিষ্য ডোম-তোন-পা প্রবর্ত্তিত তান্ত্রিক ধর্ম্মসম্প্রদায়ের শিষ্যপরম্পরার মধ্যে চাঙ্-খ-পা একজন শিষ্য হইয়াছিলেন, তদনুবর্ত্তী পীত-টুপীধারী লামা-সম্প্রদায় ভোটদেশে ধর্ম্ম ও রাজকার্য্য দুই ব্যাপারেই প্রধান। ইঁহারা নিজেদের অতিশার অনুগামী বলেন এবং অতিশার শিষ্যপরম্পরা কা-দম্-পা-দিগের উত্তরাধিকারী নবীন কা-দম্-পা বলিয়া বর্ণনা করেন।

আচার্য্য দীপঙ্কর কৃত মূল সংস্কৃত ও মাতৃভাষায় রচিত গ্রন্থসকল লুপ্ত হইয়া গেলেও তাহার অনুবাদ এখনও তিব্বতী তঞ্জুরে সুরক্ষিত রহিয়াছে। ধর্ম্ম ও দর্শন সম্বন্ধে তিনি ৩৫ খানি বা ততোধিক গ্রন্থ প্রণয়ন করেন, তাঁহার তান্ত্রিক গ্রন্থের সংখ্যা ৭০এর অধিক, যদিও তাহার মধ্যে কয়েকটি ক্ষুদ্র নিবন্ধও আছে। তিব্বতী ভাষায় বহু গ্রন্থের অনুবাদও তিনি করিয়াছিলেন, তাহার মধ্যে কঞ্জুর-সংগ্রহে ভিন্ন ভিন্ন লোচবার (দ্বিভাষী) সহায়তায় অনূদিত নয়খানি গ্রন্থ আছে, তঞ্জুরের সূত্র-বিভাগে এইরূপ অনুবাদের সংখ্যা ২১টি ও ইহার রক্ত-বিভাগে ৩০এর উপর ভিন্ন ভিন্ন গ্রন্থের অনুবাদ আছে।

* * *

তিব্বতে শিক্ষা-প্রকরণ গৃহস্থ ও ভিক্ষু এই দুই শ্রেণীর জন্য বিভিন্নরূপে বিভক্ত আছে। ভিক্ষুদিগের শিক্ষার জন্য হাজার হাজার ছোট-বড় মঠ বা বিদ্যালয় আছে, তাহার কোন-কোনটিতে গৃহস্থ বিদ্যার্থী ব্যাকরণ, সাহিত্য বৈদ্য-শাস্ত্র বা জ্যোতিষে শিক্ষালাভ করিতে পারে—এরূপ সৌভাগ্য ধনী বা অভিজাত বংশের ব্যক্তি ভিন্ন অন্য কাহারও পক্ষে সম্ভব নহে। ইহা সত্য যে কখনও

কখনও সুশিক্ষিত ভিক্ষু পুনর্ব্বার গার্হস্থ্যাশ্রমে প্রবেশ করে এবং গৃহস্থশ্রেণী এইরূপে শিক্ষাদীক্ষা লাভ করে, এবং ইহাও সত্য যে মঠে শিক্ষিত ভিক্ষু ধনী গৃহস্থ বালকের শিক্ষক নিযুক্ত হয়, কিন্তু প্রচলিত নিয়মানুসারে যে সকল মঠে বৃহৎ বৃহৎ বিশ্ববিদ্যালয় আছে ধনী-দরিদ্র নির্ব্বিশেষে গৃহস্থ মাত্রেই তাহাতে প্রবেশ করিতে পায় না।

তিব্বত ভিক্ষুর দেশ। ইহা সত্য নহে যে সঙ্ঘের ভিক্ষুগণ প্রধান বা মঠাচার্য্যগণ দেশ শাসন করেন, কিন্তু দেশের জনসংখ্যার পঞ্চমাংশ গৃহত্যাগী-ভিক্ষুশ্রেণীভুক্ত। ক্বচিৎ এমন গ্রাম পাওয়া যায় যেখানে দুই একটি ভিক্ষুও নাই বা যাহার পার্শ্বস্থ পর্ব্বতবাহুতে ছোট মঠ স্থাপিত হয় নাই। আট হইতে বারো বৎসর বয়সের মধ্যে ভিক্ষু-সঙ্ঘপ্রবেশার্থী বালকেরা মঠে প্রবেশ করে। অবতারী লামা—অর্থাৎ যাঁহাদের লোকে কোন প্রসিদ্ধ মহাত্মা বা বোধিসত্ত্বের অবতার বলিয়া জ্ঞান করে—আরও অল্প বয়সে মঠে প্রবেশ করে। এই সকল বালক প্রথমে ছোট ছোট মঠে গুরুর নিকট বিদ্যাভ্যাস করে। প্রারম্ভে বিশেষ ভাবে সুন্দর অক্ষর - দাঁড়িযুক্ত ও দাঁড়িবিহীন —লিখনের অভ্যাস করানো হয়। হস্তলিপি-অভ্যাসে অধিক সময় দেওয়ায় সুশিক্ষিত তিব্বতীদের লিখন প্রায়ই সুন্দর। পড়ার মধ্যে প্রধান কার্য্য শ্লোক কণ্ঠস্থ করা। তিব্বতী ভাষায় ব্যাকরণ, কাব্য, তর্ক, ধর্ম্মশাস্ত্র সবই শ্লোকবদ্ধ, ইহাতে শিক্ষার্থীর পক্ষে সেগুলির অভ্যাস ও স্মরণ দুইই সহজ হয়। সাধারণ গণনার অতিরিক্ত গণিত প্রায়ই শিখানো হয় না, কেবল যাহারা জ্যোতিষী বা সরকারী দপ্তরের উচ্চ কর্ম্মচারী হইতে চাহে তাহারা বিশেষভাবে গণিত শিক্ষা করে। বিদ্যাশিক্ষায় বেত্রদণ্ডের সাহায্য খুবই লওয়া হয়। অবতারী লামা ভিন্ন অন্য ছাত্রমাত্রেই অধ্যাপকের সেবা-পরিচর্য্যা করে, অন্যদিকে বহু অধ্যাপক অনেক দরিদ্র ছাত্রের ভরণপোষণ পর্য্যন্ত করিয়া থাকেন।

লিখনপঠনে কুশলতা-লাভ ও কিছু ধর্ম্মগ্রন্থ কণ্ঠস্থ করিলে প্রাথমিক শিক্ষা শেষ হয়, তাহার পর ব্যাকরণ, নীতি ও ধর্ম্ম-বিষয়ক শ্লোক পাঠ আরম্ভ হয়। এই রূপে চার পাঁচ বৎসর কাটিলে উচ্চশিক্ষার পথে যাওয়া যায়। যদি মঠে উপযুক্ত অধ্যাপক না থাকে তবে বিদ্যার্থীকে বড় মঠে পাঠাইয়া দেওয়া হয়। উচ্চশিক্ষা-কেন্দ্রে যাইবার পূর্ব্বে মধ্যম শ্রেণীর কোনও মঠে উপযুক্ত শিক্ষকের নিকট আমাদের মাধ্যমিক শিক্ষার অনুরূপ বিদ্যাভ্যাস করা প্রয়োজন। তর্ক, বৌদ্ধদর্শন এবং কাব্যের প্রারম্ভিক গ্রন্থাদি এই সময় পড়ানো হয়। পুস্তকগুলি কণ্ঠস্থ করাই প্রধান কর্ত্তব্য। যদিও বিদ্যার্থিগণ ভিন্ন ভিন্ন শ্রেণীতে বিভক্ত হইয়া পাঠ শিক্ষা করে, পরীক্ষা বা উচ্চশ্রেণীতে উন্নয়নের কিন্তু কোনই ব্যবস্থা নাই, ইহার পরিবর্ত্তে ছাত্রেরা দল বাঁধিয়া স্ব স্ব বিষয়ে শাস্ত্রার্থ প্রভৃতি লইয়া প্রতিযোগিতা করে বা অধ্যাপক ছাত্রকে প্রশ্নাদি করেন, প্রশ্নোত্তর সন্তোষজনক না হইলে সেই ক্ষণেই দণ্ডদান করা হয় এবং নূতন বিষয়ে পাঠ স্থগিত রাখা হয়। এক গ্রন্থের পাঠ সমাপ্ত হইলে সেই বিষয়ের উচ্চতর গ্রন্থ পড়ানো হয় এবং বিদ্যার্থী যদি চিত্রণ, মূর্ত্তি-নির্ম্মাণ বা কাষ্ঠ-তক্ষণ ইত্যাদি কলাবিদ্যা শিক্ষা করিতে চাহে তবে তাহাকে সে শিক্ষাও দেওয়া হয়। সকল মঠেই এই সকল বিষয়ে শিক্ষার ব্যবস্থা আছে। উচ্চতম শিক্ষার জন্য চারটি মঠে বিশ্ববিদ্যালয় আছে। প্রথম গন্-দন (লাসা হইতে দুই দিনের পথ), দ্বিতীয় ডে-পুং (লাসার নিকট, ১৪১৬ খ্রীঃ স্থাপিত), তৃতীয় সে-র (লাসার নিকট, ১৪১৯ খ্রীঃ স্থাপিত), চতুর্থ ট-শি-ল্যুন-পো (চঙ্ প্রদেশে, ১৪৪৭ খ্রীঃ স্থাপিত)।

তিব্বতের প্রাচীনতম মঠ সম্-য়ে লাসা হইতে তিন দিনের পথ। নালন্দার মহান দার্শনিক আচার্য্য শান্তরক্ষিত ৭৭২ খ্রীষ্টাব্দে ইহার স্থাপনা করেন, কিন্তু এখন ইহার আর সে প্রাচীন গৌরব নাই। উপরিউক্ত চারিটি বিশ্ববিদ্যালয়ই মধ্য-তিব্বতে স্থিত, এতদ্ভিন্ন পূর্ব্ব তিব্বতের তেবুগী (১৫০৮ খ্রীঃ স্থাপিত) ও চীন সীমান্তস্থিত অম্-দো প্রদেশের স্কু-বুম (১৫৭৮ খ্রীঃ স্থাপিত) এই দুইটিও প্রসিদ্ধ বিদ্যাকেন্দ্র। এই সকল বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রচুর জায়গীর আছে, উপরন্তু যাত্রীরাও এই সকল মঠকে কিছু দান করা ধর্ম্মের অঙ্গ বলিয়া মনে করে। মঠ হইতে বিদ্যার্থিগণকে অবস্থামত আর্থিক সাহায্যও করা হয়। প্রতিভাশালী ছাত্রের যথেষ্ট সুযোগ-সুবিধা আছে, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপক ও ম্-খন্-পো (অধ্যক্ষ—ডীন) ঐরূপ ছাত্রকে অতি স্নেহ ও যত্নের সহিত দেখেন এবং তাহার উন্নতিতে নিজের ও নিজ প্রতিষ্ঠানের গৌরববৃদ্ধি অনুভব করেন। মাঝারি ছাত্রকে অনেকটা নিজ পরিবারের বা গুরুর সাহায্যের উপর নির্ভর করিতে হয়।

এই সকল বিশাল শিক্ষাকেন্দ্রে দূরদূরান্ত হইতে হাজার হাজার বিদ্যার্থী আসে। বৃহত্তর কেন্দ্র ডে-পুং, সেখানে সাত হাজার সাত শতাধিক বিদ্যার্থী আছে; তাহার পর সে-রা, যেখানে সাড়ে পাঁচ হাজার ছাত্র বিদ্যালাভ করে। গন্-দন্ ও ট-শী-ল্যুন-পো এই দুই কেন্দ্রের প্রত্যেকটিতে সাড়ে তিন হাজার ছাত্র আছে। টশী লামা দেশত্যাগী হওয়ায় ট-শী-ল্যুন-পো কিছু নীচে নামিয়াছে। এই সকল বিদ্যাপ্রতিষ্ঠানের কথা পরে আরও বলিবার ইচ্ছা আছে। এ-সকলে উত্তরের সাইবিরিয়া, পশ্চিমের অস্ত্রাখান (দক্ষিণ রুষ) ও পূর্ব্বাঞ্চলের চীন জেহোল প্রদেশের বহু বিদ্যার্থী দেখিতে পাওয়া যায়। মহাবিদ্যালয়ের মত ইহাদের ছাত্রাবাস, পুস্তকালয় ও দেবালয় আছে এবং প্রত্যেকটিতে পৃথক জায়গীর আছে—এমন কি ক্ষুদ্রতম ছাত্রাবাসেও।

উচ্চ শ্রেণীতে অধ্যয়ন প্রগাঢ়তর হয়, তবে গ্রন্থাদি মুখস্থ করার পারিপাট্য এখানেও চলে। আমাদের ছাত্রেরা ক্রিকেট ও ফুটবলে যে আনন্দ পায় এখানকার ছাত্রেরা ন্যায় ও দর্শন সম্বন্ধে শাস্ত্রার্থ করায় সেইরূপ উৎসাহ ও আনন্দ প্রকাশ করে। এখানকার উ-সঙ্ বা মহাবিদ্যালয়ের ম্-খন্-পো (ডীন) যদিও উচ্চশ্রেণীর পণ্ডিত ও বিদ্বানগণ হইতে গৃহীত হইয়া থাকেন কিন্তু অধ্যাপনার কার্য্য প্রধানতঃ গেব্-গেন্ (লেক্চরার) বা গে-শে (প্রোফেসার) গণই করিয়া থাকেন। অধ্যয়ন সমাপনান্তে বিদ্বন্মণ্ডলীর মত অনুকূল হইলে বিদ্যার্থী ল্য-রম্-প', অর্থাৎ ডক্টর, উপাধি পায়। তাহার পর সে নিজ মঠে ফিরিয়া যায় এবং যদি পঠনপাঠনে তাহার অধিক ইচ্ছা থাকে তবে সে নিজ বিশ্ববিদ্যালয়ে গে-শে বা গেব্-গেন্ হইতেও পারে।

তিব্বতে ভিক্ষুণীদিগেরও শত শত মঠ আছে, সেখানে ভিক্ষুণীদিগের বিদ্যালাভের ব্যবস্থা আছে। এই সকল মঠ ভিক্ষু-মঠ হইতে সম্পূর্ণ পৃথক ও দূরে অবস্থিত। সাধারণ শিক্ষার ব্যবস্থা যদিও এগুলিতে আছে, কিন্তু কোনও ভিক্ষুণী-বিশ্ববিদ্যালয় নাই এবং ভিক্ষুণী-বিদ্যার্থিনী ভিক্ষু-বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতেও পারে না। ইহাদের শিক্ষা প্রধানতঃ সাহিত্য, ধর্ম্ম ও পূজা-পাঠ সম্বন্ধীয় হইয়া থাকে।

যদিও গৃহস্থ-ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করিতে পারে না কিন্তু মঠে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ছাত্রের গৃহস্থের শিক্ষকতা করায় কোনও বাধা নাই। যে কোন গৃহস্থ-ছাত্র বিশ্ববিদ্যালয়ের পুস্তকাগারে গিয়া পুস্তক পাঠ করিতে পারে কিন্তু ছাত্রাবাসে তাহার থাকা নিষিদ্ধ হওয়ায় এই নিয়মে তাহার বিশেষ উপকার হয় না। অন্যদিকে উচ্চশিক্ষাপ্রাপ্ত ভিক্ষু অতি অল্প ক্ষেত্রেই পুনর্ব্বার গৃহস্থ হয়, কেননা বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং সরকারী কার্য্যে তাহাদের চাহিদা খুবই বেশী। বিশেষ নিয়মানুসারে সরকারী প্রত্যেক কর্ম্মক্ষেত্রে একজন গৃহস্থ ও একজন ভিক্ষু এইরূপ জোড়া জোড়া চাকুরী হওয়ায় ইহাদের উচ্চপদলাভ সহজেই হয়। উদাহরণস্বরূপ আমার বন্ধু কুশো-তন-দর ভিক্ষুর নাম করা যাইতে পারে, তিনি লাসার টেলিগ্রাফ অফিসের দুই জন অফিসারের অন্যতম।

ধনী বংশের বালকবালিকা নিজ গৃহের লামার নিকট শিক্ষালাভ করে। বালিকাদিগের এই প্রারম্ভিক শিক্ষাতেই সন্তুষ্ট থাকিতে হয়, তবে ভিক্ষুণী হইবার ইচ্ছা থাকিলে আরও কিছুদূর লেখাপড়া হইতে পারে। সাধারণ স্ত্রীলোকের লেখাপড়ার অভাবই অধিক। ধনীদিগের বালকগণ বিশেষভাবে নিযুক্ত অধ্যাপকের নিকট পড়িতে পারে, সাধারণ শ্রেণীর বালকের পক্ষে বয়োজ্যেষ্ঠদিগের নিকট অধ্যয়ন বা গ্রামস্থ মঠের পাঠশালা ভিন্ন বিদ্যাশিক্ষার অন্য কোনও পথ নাই। লাসা, শীগর্চে ইত্যাদি নগরে কোন কোন পণ্ডিত নিজ নিজ বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন যেখানে অল্প ব্যয়ে শিক্ষালাভ সম্ভব। এখানে শিক্ষার ক্রম ভিক্ষু-শিক্ষালয়েরই মত, তবে দর্শন ও ন্যায় একেবারেই শিখানো হয় না। লাসায় সরকারী কাজকর্ম্ম শিক্ষার জন্য চী-পন নামক বিদ্যালয় আছে সেখানে হিসাব-কিতাব ইত্যাদি রাখার পদ্ধতি শিখান হয় এবং এই বিদ্যালয় হইতেই উপযুক্ত লোক সরকারী পদের জন্য বাছিয়া লওয়া হয়। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে ভোট-সরকার গ্যাঙ্গিতে ইংরেজী স্কুল স্থাপন করিয়াছিলেন, এবং অনেক সর্দ্দার তাঁহাদের বালকদিগকে সেখানে শিক্ষার জন্য পাঠাইয়াছিলেন কিন্তু প্রারম্ভেই অতি উচ্চ বেতনে ইংরেজ ও অন্য শিক্ষক নিয়োগ করায় তাহা বেশী দিন ইঁহারা চালাইতে পারেন নাই। দুই-চারিটি বিদ্যার্থীকে সরকারী খরচে ইংলণ্ডেও পাঠানো হইয়াছিল কিন্তু তাহাদের শিক্ষাও আশানুরূপ না হওয়ায় সে পন্থাও স্থগিত আছে। সংক্ষেপে তিব্বতে শিক্ষার অবস্থা এইরূপ। অন্য বিষয়ের ন্যায় শিক্ষা-প্রকরণেও বহির্জগতের ছায়া এদেশে বিশেষ পড়ে নাই। তবে ইহাতে সন্দেহ নাই যে, যে-সকল ব্যবস্থা বর্ত্তমানে আছে সেগুলিতে নূতন বাতাস বহিলে, তিব্বতে আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি-বিস্তারে বিশেষ সময় লাগিবে না।

* * *

পূর্ব্ব দিকে চীন হইতে পশ্চিমে লদাখ পর্য্যন্ত বিস্তৃত ভূমিখণ্ড তিব্বত দেশ। ইহা পর্ব্বতমালায় বেষ্টিত এবং গড়ে সমুদ্র হইতে ১২,০০০ ফুট উচ্চে স্থিত। উচ্চতার দরুন এখানে শীতের আধিক্য ও বায়ুমণ্ডল লঘু হওয়ায় এদেশে বৃক্ষ-গুল্মের অভাব আছে। মে-জুন মাসের গ্রীষ্মকালেও লাসার চারি দিকের পাহাড় তুষারাচ্ছাদিত থাকে, শীতকালের ত কথাই নাই! হিমালয়ের বিশাল প্রাচীর পথরোধ করায় ভারতীয় সমুদ্রের মেঘমালা এখানে স্বচ্ছন্দে পৌঁছে না, সেই জন্য এদেশে বৃষ্টি কম, তুষারপাতই

অধিক। এ-দেশের শীত যেন অস্থিচ্ছেদ করিয়া দেহে প্রবেশ করে।

ঋতুর কঠোরতা হেতু দেশবাসীদিগকে অধিক পরিশ্রমী ও সাহসী হইতে হইয়াছে। সিংহলের ন্যায় এদেশে একটি সারোং (লুঙ্গী)-এ চলে না, এখানে বার মাসই মোটা পশমী পোষাকের প্রয়োজন। শীতকালে তাহাতেও কুলায় না, লোমযুক্ত পশুচর্ম্ম (পোস্তীন) ভিন্ন উপায় নাই। সাধারণ লোকে ভেড়ার চামড়া—লোম ভিতরে চর্ম্ম বাহিরে রাখিয়া—পরিয়া থাকে, অবস্থাপন্ন ব্যক্তিগণ বন্য শৃগাল, নেকড়ে, নেউল ইত্যাদি নানা জন্তুর চর্ম্ম ব্যবহার করেন, সেগুলির মূল্য অধিক। সংক্ষেপে এদেশে সাধারণ কাপড়ে প্রাণধারণ করা অসম্ভব। চামড়া ও উলের বুট জুতা (শোম্পা), তাহার উপর গরম পায়জামা, লম্বা গরম কোট (ছুপা) ও মস্তকে ফেল্ট-হ্যাট— ইহাই এ-দেশের পোষাক। ফেল্ট-হ্যাটের ব্যবহার পনর-ষোল বৎসর মাত্র চলিয়াছে, কিন্তু এখন উহার ব্যবহার বালক বৃদ্ধ, ধনী দরিদ্র সকলের মধ্যেই প্রচলিত। ইউরোপ হইতে লক্ষাধিক পুরনো হ্যাট ধোলাই করিয়া কলিকাতায় আসে এবং সেখান হইতে স্বল্প মূল্যে এদেশে চালান হয়।

স্ত্রীলোকদিগের পায়ে শোম্পা জুতা থাকে। দেহে ছুপা কোট, কিন্তু তাহাতে হাত থাকে না, কোটের নীচে হাতযুক্ত সূতী বা আসামী এণ্ডির কামিজ এবং সামনে কোমরের নীচে বিলাতী 'এপ্রন' জাতীয় বস্ত্রখণ্ড থাকে যাহা ঝাড়নের কাজ করে। তিব্বতী স্ত্রীলোকের শির-সজ্জায় ও ভূষণে অনেক যত্ন করা হয়। ভোটীয় গৃহস্থের সম্পত্তির অধিকাংশ তাহার স্ত্রীর মস্তকের উপর থাকে, ইহা বলা বিশেষ অত্যুক্তি নহে। শিরসজ্জার রূপ হইতে কোন্ স্ত্রীলোক কোন্ প্রদেশের তাহা বিচার করাও সহজ। টশী লামার প্রদেশের (চাঙ প্রদেশ) স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ ধনুকাকার; ইহা মূলতঃ একটি কাষ্ঠখণ্ডকে বাঁকাইয়া ও তাহাতে কাপড় জড়াইয়া তৈয়ারী করা হয়। ইহার উপর ফিরোজা ও প্রবালের গুচ্ছ ও লহর থাকে, ধনীগৃহে মুক্তার ব্যবহারও নীচের অংশে প্রচুর হইয়া থাকে। গহনাতেও ফিরোজা ও প্রবালের ব্যবহারই অধিক। লাসার স্ত্রীলোকের শিরোভূষণ ত্রিকোণাকার, ইহার উপর মুক্তা প্রবাল ফিরোজা উপরন্তু পরচুলার বেণীমালা কান হইতে পিঠ পর্য্যন্ত ঝুলিয়া থাকে। এই পরচুলার কেশ চীনদেশ হইতে আসে এবং লাসার ও তাহার আশপাশের অধিক সভ্য অঞ্চলের স্ত্রীলোকগণ এক এক জনে পঞ্চাশ-ষাট, এক শত দুই শত টাকা খরচ করিয়া এই বহুমূল্য অলঙ্কারে নিজেদের শোভা বৃদ্ধি করিয়া থাকে। কেশরাশি-সংলগ্ন বৃহৎ কর্ণভূষণ, গলায় ফিরোজাযুক্ত বৃহৎ চৌকোণ তাবিজদান—যাহা ভূত-প্রেত-নিবারণ-মন্ত্রে পরিপূর্ণ—তাবিজের পাশ হইতে বাহু ও কোমর পর্য্যন্ত ঝুলানো মুক্তাগুচ্ছ, ইহাই এদেশের স্ত্রীলোকের গহনা। মুসলমান ভিন্ন অন্য সকল স্ত্রীলোকেই দক্ষিণ হস্তে শঙ্খ পরিয়া থাকে। শঙ্খটিতে হাত গলাইবার মত পথ থাকে মাত্র, কোন মতেই তাহাকে চুড়ি বা বালা বলা যায় না।

* * *

পশমই ভোটদেশের প্রধান আয়ের বস্তু। উল, কস্তুরী, লোমযুক্ত চর্ম্ম (ফর্), ইহাই এখানকার প্রধান রপ্তানীর মাল এবং রপ্তানীর পথ প্রধানতঃ ভারতবর্ষের মুখে। গম, জব, যও (ওট্স্), মটর ও সরিষা এদেশে কিছু কিছু উৎপন্ন হয়। সম্বৎসরে একবার মাত্র ফসল হয়, তাহাও ভিন্ন উচ্চতায় ভিন্ন সময়ে পাকে। সেপ্টেম্বরের মধ্যে সর্ব্বত্রই ফসল কাটা হইয়া যায়। অক্টোবরে শরৎ ঋতুর আগমনে, গাছের পাতা পীতবর্ণ হইয়া ঝরিতে থাকে।

গম যথেষ্ট জন্মাইলেও ভোটিয়েরা রুটি খায় না। ইহারা গম যব ভাজিয়া পিষিয়া সত্তুতে (চম্বা) পরিণত করে এবং রাজা হইতে ভিক্ষুক পর্য্যন্ত সকলেরই ইহা প্রধান খাদ্য। লবণ, মাখন, মিশ্রী ইত্যাদি গরম চায়ে দিয়া তাহাতে চম্বা ঢালিয়া হাতে মাখিয়া খাওয়াই ইহাদের প্রথা। প্রত্যেকের পৃথক পেয়ালা থাকে, ইহা প্রধানতঃ কাষ্ঠনির্ম্মিত। এই পেয়ালাই তাহাদের রেকাব, থালা, গেলাস ইত্যাদির স্থান পূর্ণ করে। ভোজনের পর জিভ দিয়া চাটিয়া পেয়ালা পরিষ্কার করিয়া বুকের কাছে চোগার ভিতর তাহা রাখা হয়। দেহ, মুখ, হাত প্রভৃতি ধৌত করা কদাচিৎ হয়, এমন কি বিহারের ভিক্ষুদেরও মুখ ও হাতের উপর ময়লার মোটা স্তর জমিয়া থাকে। ভোটদেশে এরূপ লোক অনেক পাওয়া যায় যাহারা আজীবন শরীরে জলক্ষেপ করে নাই।

চা ও চম্বা ভিন্ন ইহাদের প্রধান খাদ্য মাংস এবং অধিকাংশ স্থলে তাহা কাঁচা বা কেবল রৌদ্রে শুকাইয়া খাওয়া হয়। মসলা ইত্যাদি দ্বারা মাংস পাক করার প্রথা শহরের ধনীদিগের মধ্যেই আবদ্ধ এবং ইহাও চীন ও নেপালী অফিসর বা সওদাগরদিগের প্রভাবের ফল। অভিজাত বংশের ভোটিয় চীনদেশের রীতিতে দুইটি কাষ্ঠশলাকা চামচের মত ব্যবহার করিয়া ভোজন করে এবং তাহাদের খাদ্যের মধ্যে আটা-ময়দাও স্থান পায়। চা এদেশে প্রচুর পরিমাণে পান করে, তাহার অধিকাংশই চীন দেশ হইতে আসে। চীনা চা চাপে জমাইয়া ইটের মত করা হয় এবং যদিও ইহা তিন মাসের পথ হইতে আসে তবুও ভারতের চা অপেক্ষা ইহা সস্তা। এখানে চায়ে দুধচিনির ব্যবহার প্রচলিত নহে। প্রথমে সোডা ও লবণের সহিত চা খুব ফুটাইয়া পরে তাহা বাঁশের বা কাঠের চোঙ্গায় ঢালিয়া মাখনের সঙ্গে মাখিয়া লইলেই তিব্বতী চা প্রস্তুত হইল। ইহা দেখিতে দুধ-মিশানো চায়েরই মত।

মহিলা-সংবাদ

অধ্যক্ষ এ. টি. মুখোপাধ্যায়ের কন্যা কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের বি. এসসি, পরীক্ষায় পদার্থবিজ্ঞানের অনার্সে প্রথম শ্রেণীতে প্রথম হইয়াছেন। ইঁহার ভগিনী কুমারী রমা মুখোপাধ্যায় পাটনা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের আই. এসসি. পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে অষ্টম স্থান অধিকার করিয়াছেন। কুমারী কলাবন্তী বাথিজা পাটনা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই. এসসি. পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।



কুমারী নীলিমা মুখোপাধ্যায়



কুমারী রমা মুখোপাধ্যায়



কুমারী কলাবন্তী বাথিজা



শ্রীমতী হেমপ্রভা মজুমদার
নবনির্বাচিত বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার সদস্যা ;
নিখিল-বঙ্গ মহিলা-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশনের সভানেত্রী

বিবিধ প্রসঙ্গ

ইংরেজরা ভারতবর্ষে কেন আছে

মিঃ এড্উইন বেভান ভারতবন্ধু বলিয়া আত্মপরিচয় দিয়া থাকেন। লণ্ডনে গাওয়ার ষ্ট্রীটে ভারতীয় ছাত্রদের জন্য খ্রীষ্টীয় সম্প্রদায়ের যে ছাত্রনিবাস ও ভোজনালয় আছে, ইনি তাহার কমিটির এক জন সদস্য। ইনি গত এপ্রিল মাসে লণ্ডনের টাইম্স্ কাগজে ইংরেজদের ভারতবর্ষ দখল করিয়া বসিয়া থাকিবার কারণ সম্বন্ধে যাহা লেখেন, রয়টার তাহা ১৭ই এপ্রিল ভারতবর্ষের দৈনিক কাগজসমূহে টেলিগ্রাফ করেন। তাহার তাৎপর্য্য এই :—

"যে-কেহ ব্রিটিশ জাতির বর্ত্তমান মেজাজ জানেন এবং আমাদের দেশের সম্প্রতি কয়েক বৎসরের কোন কোন কাজ বিবেচনা করিয়া দেখেন, তিনিই জানেন, যে, ইহা অনুমান করা অসঙ্গত (যেরূপ অনুমান মিঃ গান্ধী এখনও করেন বলিয়া বোধ হয়) যে, আমাদের জাতি অন্য দেশের উপর প্রভুত্ব করিবার সুখ বা সুবিধার জন্যই তাহার প্রভুত্ব তদ্দেশবাসী জনগণকে ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক। আমরা মিশর হইতে সরিয়া পড়িয়াছি। আমরা ইরাক হইতে সরিয়া পড়ি; সেখান হইতে খুব তাড়াতাড়ি সরিয়াছিলাম বলিয়া প্রমাণ হইয়াছে, কারণ আমাদের সরিয়া পড়ার পরই তথাকার আসীরীয়েরা, যাহাদিগকে রক্ষা করিতে আমরা বাধ্য ছিলাম, দলে দলে নিহত হয়।

"ইহা সম্পূর্ণ সত্য, যে, আমাদের জাতি এখনই ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া আসিতে অনিচ্ছুক। কিন্তু তাহা একারণে নহে, যে, ভারতীয়েরা চরিত্রে, বুদ্ধিতে বা সংস্কৃতিতে মিশরী বা ইরাকীদের চেয়ে নিকৃষ্ট; মোটেই তাহা সত্য নহে। কারণ এই, যে যে-সব দেশ একদেশত্ব (ঐক্য) লাভ করিবার উচ্চ আকাঙ্ক্ষা পোষণ করে, তাহাদের মধ্যে কোন দেশই ভারতবর্ষের মত এত বেশী পরিমাণে জাতি (রেস্), ধর্ম্মমত এবং বর্ণভেদ জনিত পরস্পরবিরোধিতা দ্বারা বহুধা বিভক্ত নহে।"

ইংরেজদের ভারতবর্ষ দখল করিয়া বসিয়া থাকিবার কারণ সম্বন্ধে মিঃ বেভান যাহা লিখিয়াছেন, তাহা নূতন কথা নহে। এরূপ কারণ বিভিন্ন শব্দ প্রয়োগ সহকারে অন্যেরাও আগে বহুবার জগতের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব অস্বীকার সম্বন্ধে ভারত-সচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড পার্লেমেণ্টে প্রথম যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে ঐ রকম একটা অজুহাতের আভাস থাকায়, আমরা মিঃ বেভানের মন্তব্য ভারতবর্ষে পৌঁছিবার পাঁচ দিন আগে প্রকাশিত বৈশাখের 'প্রবাসীতে' লিখিয়াছিলাম :—

"ব্রিটেনে অতি দীর্ঘকাল ইহুদী, রোমান কাথলিক এবং নন্কন্ফর্মিষ্ট খ্রীষ্টিয়ানদের উপর অবিচার ও অত্যাচার হইয়াছে। অন্য অনেক দেশেও এরূপ পক্ষপাতিত্ব আছে। কিন্তু তথাপি, অন্য কোন তথাকথিত নিরপেক্ষ জাতি তাহাদিগকে পদানত করুক, ইহা কোন প্রকৃত স্বাধীনতাপ্রিয় ব্যক্তি চাহিতে পারে না। প্রত্যেক জাতি নিজেদের দোষ নিজেরাই সারিয়া লউক, ইহাই আদর্শ। ইংরেজরা কি নিজেদের দেশের পূর্ব্বোল্লিখিত সম্প্রদায়গুলির প্রতি আচরণের উন্নতি করে নাই? ইংরেজরা যদি ভারতবর্ষে বাস্তবিকই নিরপেক্ষ হইতেন, তাহা হইলেও তাঁহারা চিরকাল এখানে প্রভুত্ব করিবেন ইহা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না। আমরা নিজেদের দোষ নিজেরা সারিয়া লইব, লইতেছি, এবং ইতিমধ্যে কতকটা লইয়াছিও।"

মিঃ বেভান মনে করেন, বা মনে করিবার ভান করিয়াছেন, যে, ইংরেজ জাতির বর্ত্তমান প্রকৃতি ও ব্রিটেনের খুব আধুনিক কোন কোন কাজ বিবেচনা করিলে এ ধারণা জন্মিবে না, যে, ইংরেজরা কেবল প্রভুত্বের সুখ ও মুনফার জন্যই ভারতবর্ষ দখল করিয়া বসিয়া আছে। আমরা কিন্তু ইংরেজ জাতির স্বভাবচরিত্রে ইংরেজাধীন জাতিদিগকে স্বাধীনতা দিবার দিকে ঝোঁকের কোন নব আবির্ভাব দেখিতে পাইতেছি না। খুব আধুনিক যে দুটা কাজের উল্লেখ তিনি করিয়াছেন, তাহার দ্বারাও তাঁহার মন্তব্য সমর্থিত হয় না।

ভারতবর্ষের উপর যেরূপ প্রভুত্ব ইংরেজরা যে ভাবে স্থাপন করিয়াছে, মিশরের উপর সেরূপ প্রভুত্ব সে ভাবে তাহারা কোন কালে স্থাপন করে নাই। ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব যত দীর্ঘ কালের, মিশরের উপর প্রভুত্ব তত দীর্ঘ কালের নয়। ভারতবর্ষের উপর প্রভুত্ব যত লাভজনক, মিশরেব উপর প্রভুত্ব তত লাভজনক কোন কালেই ছিল না। মিশরের আধুনিক ইতিহাস এই, যে, ইহা আদৌ

তুরস্ক সাম্রাজ্যের অংশ ছিল, এবং ১৯১৪ খ্রীষ্টাব্দের ১৮ই ডিসেম্বর ইহার উপর ব্রিটিশ রক্ষণাবেক্ষণের অধিকার (ব্রিটিশ প্রোটেক্টরেট্) স্থাপিত হইয়াছে ঘোষিত হয়। মিশর হইতে ব্রিটিশ সিংহের থাবা অপসৃত হইয়াছে, ইহা সত্য নহে। মিশরের উপর প্রভুত্ব কি প্রকারের ও কতটা ছিল, তাহা এখন আমাদের আলোচ্য নহে। ঐ প্রভুত্ব যে-সব উদ্দেশ্যে রাখা হইয়াছিল, মিশরের সহিত "সন্ধিতে" সেই সকল উদ্দেশ্য সাধনের ব্যবস্থা পূর্ণমাত্রায় রাখা হইয়াছে। এবং ব্রিটেন ও মিশরের সম্বন্ধে বাহ্যতঃ যেটুকু পরিবর্ত্তন হইয়াছে, ব্রিটেন মিশরীয় ও অন্তর্জাতিক পরিস্থিতির চাপে তাহা করিতে বাধ্য হইয়াছে, মহানুভবতার জন্য করে নাই।

ইরাকের আধুনিক ইতিহাস সংক্ষেপে এই, যে, গত মহাযুদ্ধে ইহা তুরস্কের অধীনতা-শৃঙ্খল হইতে মুক্ত হয়। তখন ইহাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া গণনা করা হয় এবং স্থির হয়, যে, লীগ অব নেশ্যন্সের আদেশপ্রাপ্ত কোন শক্তি ("ম্যাণ্ডেটরি পাওয়ার") ইহার অভিভাবক হইবেন। ব্রিটেনকে এই অভিভাবকত্ব দেওয়া হয়। ১৯২৭ সালের ১৪ই ডিসেম্বর ব্রিটেনে ও ইরাকে যে সন্ধি হয় তাহার ফলে ব্রিটেন ইরাককে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া মানিতে অঙ্গীকার করেন। ১৯৩২ সালের ৪ঠা অক্টোবর ইরাক লীগ অব নেশ্যন্সের সদস্য হয় এবং ব্রিটেনের অভিভাবকত্ব শেষ হয়। অতএব দেখা যাইতেছে, ভারতবর্ষের সহিত ব্রিটেনের যে সম্পর্ক, ইরাকের সহিত ব্রিটেনের সে সম্পর্ক কোন কালেই ছিল না। ইরাকের রক্ষণ হইতে ভক্ষণের যে সুযোগ ব্রিটেন পাইয়াছিল, তাহা প্রকারান্তরে এখনও আছে। ব্রিটেনের "অভিভাবকত্ব" যে ইরাকে লোপ পাইয়াছে, তাহা অন্তর্জাতিক পরিস্থিতির ফল, ব্রিটিশ মহানুভবতার দৃষ্টান্ত নহে।

ব্রিটেন স্বেচ্ছায়, সদাশয়তাবশতঃ, মানব মাত্রেরই স্বাধীনতার মূল্য ও প্রয়োজন বুঝিয়া, নিজের অধীনতা হইতে কোন জাতিকে ও দেশকে মুক্ত করিয়াছে, ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের ইতিহাসে এরূপ কোন দৃষ্টান্ত নাই। বাহির হইতে ভাসা ভাসা ভাবে দেখিলে যেখানে এরূপ মনে হইতে পারে, সেখানেও একটু তলাইয়া বিচার করিলে দেখা যাইবে, যে, অবস্থার চাপে পড়িয়া ব্রিটেন সদাশয় হইতে বাধ্য হইয়াছে। আয়ার্ল্যাণ্ড যদি স্বাধীন হয়, তাহার স্বাধীনতাও ব্রিটেন স্বীকার করিবে বাধ্য হইয়া, স্বেচ্ছায় নহে।

ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, যেখানে যেখানে ব্রিটেন নিজের অধীন দেশগুলিকে ঔপনিবেশিক স্বাধীনতা বা ডোমীনিয়নত্ব দিয়াছে, সেখানে শ্বেতকায়েরাই প্রভু; অশ্বেতদিগকে মালিক হইতে ব্রিটেন কোথাও দেয় নাই।

ব্রিটিশ জাতির মধ্যে কতকগুলি লোক আছেন যাঁহারা পরাধীন দেশসকলের, ভারতবর্ষেরও, স্বাধীনতার দাবী সমর্থন করেন। কিন্তু তাঁহারা যদি পার্লে্মেণ্টে তাঁহাদের সংখ্যাভূয়িষ্ঠ দল গড়িয়া তুলিয়া গবর্মেণ্ট হইয়া বসেন, তখন তাঁহাদের সদাশয়তা টিকিবে কিনা, তাহা ভবিষ্যৎ কালে বুঝা যাইবে।

মিঃ বেভান বলিতেছেন, অধীন দেশের উপর প্রভুত্ব করার সুখের বা প্রভুত্ব হইতে উৎপন্ন মুনফার জন্য ইংরেজরা অন্য দেশকে অধীন করিয়া রাখে না। অন্য একটা দেশকে অধীন করিয়া রাখিয়া তাহারা সুখ পায় কি না, তাহা তাহাদের মনের কথা। তাহাদের মনে আমাদের প্রবেশাধিকার নাই। অতএব সে বিষয়ে কিছু বলিব না। কিন্তু মুনফাটা বাহিরের ব্যাপার। সে বিষয়ে কিছু বলা যাইতে পারে।

ভারতবর্ষকে অধীনস্থ রাখিয়া ব্রিটেন প্রধানতঃ তিন রকমে লাভবান হয়।

ভারতবর্ষের সামরিক ও অসামরিক প্রধান চাকরিগুলি হইতে ইংরেজরা খুব বেশী বেশী বেতন, ভাতা ও পেন্স্যন পায়। যদি সেগুলির প্রতি তাহাদের লোভ না থাকিত তাহা হইলে তাহারা সেইগুলি নিজেদের হাতে রাখিবার জন্য নানা অন্যায় কৌশল ও উপায় অবলম্বন করিত না। সেই সব কাজের জন্য যদি যোগ্য ভারতীয় না পাওয়া যাইত, তাহা হইলে ইংরেজরা বলিতে পারিত, যে, ভারতবর্ষের রাষ্ট্রীয় কাজ চালাইবার জন্য তাহারা বাধ্য হইয়া এই সব কাজ নিজেরা করে। কিন্তু প্রকৃত অবস্থা অন্যরূপ। কয়েকটি দৃষ্টান্ত লউন।

ভারতীয় সিবিল সার্বিসের জন্য উপযুক্ত লোক বাছিয়া লইবার নিমিত্ত ইংরেজরাই একটি প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার প্রথা প্রবর্ত্তিত করে। তাহাতে জ্ঞানবিষয়ক

যোগ্যতার পরীক্ষা আছে, দৈহিক যোগ্যতার পরীক্ষাও আছে। তাহাতে ক্রমে ক্রমে ভারতীয়েরা অধিক হইতে অধিকতর সংখ্যায় ইংরেজ প্রতিযোগীদিগকে পরাস্ত করিয়া কাজ পাইতে থাকে। ইহা হইতে বুঝা যায়, যে, ইংরেজদেরই নির্দ্দিষ্ট যোগ্যতার মানদণ্ড অনুসারে বিস্তর ভারতীয় দেশের কাজ চালাইবার যোগ্য হইয়াছে এবং পরে আরও অধিকসংখ্যক লোক যোগ্য হইবে। (অবশ্য, আমরা এরূপ যুক্তিনিরপেক্ষ ভাবেই বিশ্বাস করি, যে, আমাদের দেশের কাজ চালাইবার অধিকার আমাদেরই আছে, এবং যোগ্যতাও আমাদের আছে।) কিন্তু ভারতবর্ষ অধিকার করিয়া প্রভুত্ব করিবার প্রতি ও চাকরিগুলির প্রতি লোভ থাকায়, ভারতীয়দের প্রমাণিত যোগ্যতা সত্ত্বেও ইংরেজরা এখন প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষার দ্বারা সিবিল সার্বিসের সব কাজগুলিতে লোক নিযুক্ত না করিয়া, মনোনয়ন দ্বারা অনেক ইংরেজ ছোকরাকে ইহাতে ঢুকাইতেছে।

সুতরাং ভারতকে অধীন রাখার মুনফার প্রতি ইংরেজের বেশ লোভ আছে।

চিকিৎসা-বিভাগের বড় চাকরিগুলি বেশীর ভাগ ইণ্ডিয়ান মেডিক্যাল সার্বিসের প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষায় উত্তীর্ণ লোকদিগকে দেওয়া হইয়া আসিতেছিল। কিন্তু ইহাতেও বেশী সংখ্যায় ভারতীয় যুবকেরা কৃতিত্ব প্রদর্শন করায় সেই প্রতিযোগিতামূলক পরীক্ষা দ্বারা লোক লওয়া হয় না। যে-কোন প্রকারে হউক, ইংরেজ ডাক্তারদের চাকরি দিতেই হইবে, এই জিদ হইতে মুনফার প্রতি লোভের প্রমাণ পাওয়া যাইতেছে।

ভারতবর্ষীয় সিপাহীরা কোনও দেশের সৈনিকদের চেয়ে সাহসে, শ্রমশক্তিতে, কষ্টসহিষ্ণুতায় ও রণকৌশলে নিকৃষ্ট নহে। গত মহাযুদ্ধে ইউরোপের রণক্ষেত্রেও ইহা প্রমাণিত হইয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষকে বহিরাক্রমণ হইতে রক্ষা করিবার নিমিত্ত ইংরেজ সৈন্য রাখা অনাবশ্যক। কিন্তু প্রভুত্বের উপর ও প্রভুত্বজনিত মুনফার উপর লোভ থাকায়, এক-এক জন সিপাহীর জন্য খরচের চারি গুণ খরচ এক-এক জন ইংরেজ সৈন্যের জন্য হইলেও, বিস্তর ইংরেজ সৈনিক ভারতবর্ষে রাখা হইয়াছে।

ভারতীয়দের মধ্যে সেনানায়কের কাজ করিবার যোগ্য লোকও বিস্তর আছে। গত মহাযুদ্ধে যখন খুব বেশী সংখ্যায় ইংরেজ সেনানায়কেরা হত হয়, তখন দেশী রাজ্য-সমূহের দেশী সেনা-নায়কেরা এবং ব্রিটিশ-ভারতবর্ষেরও দেশী সেনানায়কেরা ইংরেজদের পক্ষে বহু পরিমাণে সৈন্যদল-পরিচালনার কাজ যেরূপ সাহস ও দক্ষতার সহিত করিয়াছিল, তাহা অন্য কোন জাতির সেনানায়কদের চেয়ে কম নয়। কিন্তু সেনানায়কের কাজগুলিতে ভারতীয় লোক এত কম সংখ্যায় লওয়া হয়, যে, ভারতবর্ষ ইংরেজের অধীন থাকিতে কোন কালেই ভারতবর্ষের সমগ্র সৈন্যদল ভারতীয় নায়কদের পরিচালনাধীন হইবে না।

প্রভুত্বে ও প্রভুত্বজনিত মুনফায় লোভ বশতঃ ভারতীয় সৈনিক বিভাগে ব্রিটেন উপরিলিখিত অন্যায় ব্যবস্থা রাখিয়াছে।

ভারতবর্ষে কারখানা স্থাপন, ভারতবর্ষে ব্যবসা-বাণিজ্য করা, ব্রিটেন হইতে ভারতবর্ষের সহিত ব্যবসা বাণিজ্য চালান, এবং জাহাজ দ্বারা ভারতবর্ষে ও ভারতবর্ষ হইতে যাত্রী ও মাল আনয়ন ও প্রেরণ দ্বারা ব্রিটেন শত শত কোটি টাকা লাভ করিয়া আসিতেছে। নূতন ভারতশাসন আইনে এই লাভ রাখিবার ও বাড়াইবার জন্য নানা ধারা ও উপধারা নিবিষ্ট হইয়াছে। কোন দেশের আইনে অন্য একটা দেশকে লাভবান করিবার ও রাখিবার জন্য এরূপ ব্যবস্থা নাই। ১৯৩৫ সালের এই নূতন আইনের এইরূপ যে ব্যবস্থা করা হইয়াছে তাহা পূর্ব্ববর্ত্তী ১৯১৯ সালের ভারতশাসন আইনে ছিল না। ইহা হইতেই প্রমাণ হইতেছে, যে, ব্যবসাবাণিজ্য ও জাহাজ চালান হইতে লব্ধ প্রভূত লাভের উপর ব্রিটেনের লোভ এত বেশী যে, তাহা রক্ষা ও বৃদ্ধির জন্য ব্রিটেন নূতন আইনে অশ্রুতপূর্ব্ব অন্যায় ব্যবস্থা করিয়াছে।

এই সকল ধারা ও উপধারা সম্বন্ধে আমরা আগে আগে মডার্ণ রিভিয়ু ও প্রবাসীতে অনেক লিখিয়াছি। সম্প্রতিও আমরা আমেরিকার প্রসিদ্ধ মাসিক 'এশিয়া' পত্রিকার মে সংখ্যায় এ বিষয়ে প্রবন্ধ লিখিয়াছি। তাহা ভারতবর্ষে আসিয়াছে।

ব্রিটেন ভারতবর্ষ হইতে অতীত কালে লাভবান হইয়াছেন আর এক প্রকারে। পলাশির যুদ্ধের পর বাংলা দেশ হইতে যে কোটি কোটি টাকা বিলাতে যায়, তাহারই সাহায্যে

বিলাতের নব উদ্ভাবিত নানা কল চলিষ্ণু হয় এবং ব্রিটেন পণ্যশিল্পের ক্ষেত্রে প্রাধান্য লাভ করে। ইহার বিশেষ বৃত্তান্ত মেজর বামনদাস বসুর 'রুইন্ অব ইণ্ডিয়ান ট্রেড্ এণ্ড ইণ্ডাষ্ট্রীজ' বহিতে আছে।

ভারতবর্ষ হইতে ব্রিটেনের লাভের আর একটা মাত্র দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিব। বহুপরিমাণে ভারতবর্ষের ও ভারতবর্ষ হইতে লব্ধ জনবল ও অর্থবলের সাহায্যে ব্রিটেন বিশাল ব্রিটিশ সাম্রাজ্য গড়িয়া তুলিয়াছে। এই সাম্রাজ্য রক্ষার জন্য তাহার ভারতের প্রভু থাকা দরকার। এই কারণে ব্রিটেন হইতে ভারতবর্ষে আসিবার পথটা নিরাপদ রাখা আবশ্যক, আবার পূর্ব্বদিক হইতে সমুদ্রপথে কেহ ভারত আক্রমণ না করে, তাহাও দেখা দরকার। ভূমধ্য-সাগরে এখন ব্রিটেনের প্রভাব কমিয়াছে, ইটালীর বাড়িয়াছে। কাজেই জলপথে ভারতবর্ষ আসিবার উপায় ছাড়া অন্য উপায়ও ব্রিটেনকে স্থির করিতে হইতেছে। সেই জন্য নানা স্থানে বিমানঘাঁটির জায়গার কোন-না-কোন প্রকারে অধিকারী হইতে হইতেছে। পূর্ব্বদিক হইতে সমুদ্রপথে ভারতবর্ষ আক্রমণ নিবারণের জন্য সিঙ্গাপুরে রণতরীর বৃহৎ পোতাশ্রয় নির্ম্মিত হইয়াছে।

মিঃ বেভান বলিয়াছেন, ভারতবর্ষে নানা জাতি ("রেস্") নানা ধর্ম্মমত ("ক্রীড্") ও নানা জা'ত ("কাষ্ট্") থাকায় ও তাহাদের মধ্যে পরস্পরবিরোধিতা থাকায় ব্রিটেনকে ভারতবর্ষে থাকিতে হইতেছে। ইহার অর্থ এই, যে, বিরোধ ঘটিলে তাহা দমন করা ও থামান, এবং বিরোধের ও বিরোধের কারণের উচ্ছেদসাধন ব্রিটেনের উদ্দেশ্য। দাঙ্গা মারামারি হইলে লাঠি চালাইয়া এবং শেষ পর্য্যন্ত গুলি চালাইয়া তাহা থামাইবার চেষ্টা করা হয়, ইহা সত্য। তাহার পর কতকগুলি লোককে ধরিয়া আদালতে তাহাদের বিরুদ্ধে মোকদ্দমার শুনানির পর অনেকের শাস্তি দেওয়া হয়, ইহাও সত্য। লাঠি ও গুলি চালান এবং মোকদ্দমা চালান সাধারণতঃ নিরপেক্ষভাবে হয় কিনা, সে বিষয়ে আলোচনা না করিয়া বর্ত্তমান প্রসঙ্গে কেবল ইহাই বিবেচ্য, যে, এই সকল উপায় দ্বারা বিরোধের ও বিরোধের কারণসমূহের উচ্ছেদ সাধিত হইয়াছে বা হইতেছে কি? হয় নাই, হইতেছে না। কোন দেশে যদি খুব ম্যালেরিয়া জ্বর হয়, তাহা হইলে অনেক ডাক্তার ও প্রচুর পরিমাণে ঔষধ রাখিলেই যথেষ্ট ব্যবস্থা করা হইয়াছে বলা যায় না। ম্যালেরিয়া জ্বরটা যাহাতে না হয়, ম্যালেরিয়ার বিষটাই যাহাতে নষ্ট হয়, তাহা আর জন্মিতে না পারে, এরূপ ব্যবস্থাও করা আবশ্যক। সেইরূপ সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত বিরোধ ও দাঙ্গা মারামারি হয় বলিয়া যথেষ্ট পুলিস ও সৈন্য ও তাহাদের অস্ত্রশস্ত্র এবং ধৃত লোকদের বিচার ও শাস্তির জন্য যথেষ্ট বিচারক ও কারাগার রাখিলেই যথোচিত ব্যবস্থা হইয়াছে বলা যায় না। এরূপ আইন ও সরকারী অন্যবিধ ব্যবস্থা থাকা দরকার যাহাতে সাম্প্রদায়িক ঈর্ষ্যাদ্বেষ না বাড়িয়া কমে ও লোপ পায়। এরূপ কোন আইন ও অন্যবিধ সরকারী ব্যবস্থা আছে কি? যাহাতে সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে সম্প্রদায়ে সম্প্রদায়ে, শ্রেণীতে শ্রেণীতে ঈর্ষ্যাদ্বেষ বাড়ে, এরূপ আইন ও সরকারী অন্য ব্যবস্থা কোন মতেই হওয়া উচিত নয়। কিন্তু নূতন ভারতশাসন আইনে সাম্প্রদায়িক ও শ্রেণীগত ঈর্ষ্যাদ্বেষ ও অন্য অবাঞ্ছনীয় মনোভাব বাড়িয়াছে। যোগ্যতা কম বা বেশী যাহাই হউক, প্রদেশ-ভেদে কোন কোন সম্প্রদায় সংখ্যায় বেশী বা কম যাহাই হউক বিবেচনা না করিয়া, সর্ব্বত্র কোন কোন সম্প্রদায়ের লোকদিগকে নির্দ্দিষ্ট কতকগুলি চাকরি দিতেই হইবে, এরূপ সরকারী নিয়মেও ঈর্ষ্যাদ্বেষ বাড়িয়া চলিয়াছে। কোন্ ধর্ম্মসম্প্রদায় তাহাদের কোন্ ধর্ম্মানুষ্ঠান করিতে পারিবে বা না-পারিবে, তাহা নির্দ্ধারণ করিবার সময় নিষেধ ও অধিকারসঙ্কোচ একই মানদণ্ড অনুসারে সকল সম্প্রদায়ের প্রতিই প্রযুক্ত হওয়া উচিত। কিন্তু কার্য্যতঃ দেখা যায়, যে, নিষেধ ও অধিকারসঙ্কোচ হিন্দুদের ভাগ্যেই সর্ব্বত্র বা অধিকাংশ স্থলে ঘটিয়া থাকে। ইহাও দেশের মধ্যে মানসিক তিক্ততা ও ঈর্ষ্যাদ্বেষ বৃদ্ধির একটা কারণ।

ঈর্ষ্যাদ্বেষ বাড়িবার অন্য কারণও থাকিতে পারে। আমরা যে আইন ও নিয়মগুলিকে ঈর্ষ্যাদ্বেষ বৃদ্ধির কারণ বলিয়াছি, ইংরেজদের মতে যদি সেগুলি কারণ না হয়, তাহা হইলেও ঈর্ষ্যাদ্বেষ, ঝগড়া বিবাদ এবং দাঙ্গা মারামারি যে বাড়িয়াছে, তাহা সরকার পক্ষের খুব উচ্চ-পদস্থ ইংরেজ রাজপুরুষের দ্বারাও স্বীকৃত হইয়াছে। ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারত-গবর্ন্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব সর্ হেনরী ক্রেক কিছুদিন পূর্ব্বে বলেন, যে, গত পঁচিশ বৎসরে

সাম্প্রদায়িক অসদ্ভাব মনোমালিন্য প্রভৃতি যেরূপ ছিল, এখন তাহা অপেক্ষা অধিক হইয়াছে। ভারতীয়দের দ্বারা অনুমিত বা নির্দ্দিষ্ট কারণগুলা যদি সত্য কারণ না-হয়, তাহা হইলে সত্য কারণ কি? প্রতিকারই বা কি? ইংরেজ জাতি ব্যাধি নির্ণয়ের ও তাহার চিকিৎসার কি চেষ্টা করিয়াছেন বা করিতেছেন? তাঁহারা বলিতেছেন, ব্যাধিটা আছে বলিয়াই তাঁহারা ভারতবর্ষে আছেন। ব্যাধিটা চিরকাল থাকিবে, এবং হয়ত বাড়িয়া চলিবে এবং তাঁহারাও চিরকাল প্রভু হইয়া থাকিবেন, ইহা বাঞ্ছনীয় হইতে পারে না—অন্ততঃ আমরা আমাদের দিক্ হইতে ইহা বাঞ্ছনীয় মনে করি না। আমরা মনে করি, তাঁহারা যদি বাস্তবিক আমাদের ব্যাধির জন্যই এদেশে আছেন মানিয়া লইতে হয় তাহা হইলে তাঁহাদিগকে দেখাইতে হইবে, যে, তাঁহারা ব্যাধির মূল উচ্ছেদ করিতেছেন এবং সেই সাধু চেষ্টায় অন্ততঃ সামান্য পরিমাণেও কৃতকার্য্য হইয়াছেন।

মিঃ বেভান কি ইহা দেখাইতে পারেন? অন্য কোনও ইংরেজ দেখাইতে পারেন কি?

আমাদের কথা এই, যে. আমাদের ব্যাধির মত ব্যাধি অন্য অনেক দেশে ছিল, এখনও কোন কোন দেশে আছে। যেখানে যেখানে তাহার প্রতিকার ও উচ্ছেদ হইয়াছে বা হইতেছে, তাহা সেই সেই দেশের স্বাধীন অধিবাসীদিগের চেষ্টা দ্বারাই হইয়াছে ও হইতেছে, বাহির হইতে আগত এবং ব্যাধিটা হইতে লাভবান কোন প্রভুজাতি দ্বারা তাহা হয় নাই, হইতে পারে না।

মিঃ বেভান বলিয়াছেন, ইংরেজরা ইরাকের অভিভাবকত্ব ছাড়িয়া আসিবার পর তথাকার বিস্তর আসীরীয় (সংখ্যাগরিষ্ঠ মুসলমানদের দ্বারা) নিহত হইয়াছে। তিনি যাহা বলেন নাই, তাহা আমরা যোগ করিয়া দিতেছি। যথা—সমুদয় আসীরীয়কে অন্য কোন দেশে চালান করিয়া দিবার চেষ্টা হইয়া আসিতেছে, নতুবা তাহারা সংখ্যাগরিষ্ঠদের দ্বারা নির্ম্মূল হইতে পারে।

মিঃ বেভানের উক্তির মধ্যে এই ইঙ্গিত আছে, যে, ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে চলিয়া গেলে এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠ হিন্দুরা সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে নির্ম্মূল বা অন্য কোন দেশে চালান করিবে। জাতীয় প্রকৃতি হঠাৎ পরিবর্ত্তিত হয় না। ভারতবর্ষের ইতিহাসে ভারতীয় প্রকৃতির কি এরূপ পরিচয় পাওয়া যায়, যে, এখানকার সংখ্যাগরিষ্ঠেরা সংখ্যালঘিষ্ঠদিগকে নির্ম্মূল বা বিদেশে চালান করিয়াছে বা করিবার চেষ্টা করিয়াছে? বরং ইতিহাস কি ইহাই বলে না, যে, ধর্ম্মবিষয়ক ঔদার্য্য ও নানামতসহিষ্ণুতার প্রাচীনতম প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষেই পাওয়া যায়, এবং স্বাধীন ভারতে খ্রীষ্টীয় অব্দের গোড়ার দিক্ হইতে ইহুদী, সীরীয়, খ্রীষ্টিয়ান, পারসীক প্রভৃতি বিদেশী জাতিরা আতিথ্য ও আশ্রয় পাইয়াছে?

—

পুনার মারুতি মন্দিরে সত্যাগ্রহ

পুনার মারুতি মন্দিরে হিন্দুরা ঘণ্টা বাজাইয়া পূজা করেন। মারুতি মন্দির হইতে কিছু দূরে মুসলমানদের একটি মসজিদ আছে। সেই কারণে মুসলমানেরা হিন্দুদের এই ঘণ্টা বাজাইয়া পূজায় আপত্তি করে। অনেক জায়গায় মুসলমানেরা হিন্দুদের মন্দিরে, এমন কি হিন্দুদের নিজেদের বাড়ীতেও, শাঁখ বাজানতেও আপত্তি করে। কিন্তু মুসলমানদের মহরম পর্ব্বের সময় ঢাক বাজানতে হিন্দুরা আপত্তি করে বলিয়া শুনি নাই, কোথাও করিয়াছে বলিয়া মনে পড়িতেছে না—করিয়া থাকিলেও সচরাচর করে না। খ্রীষ্টিয়ানদের গীর্জ্জার কাছে মসজিদ থাকিলে গীর্জ্জার ঘণ্টাধ্বনিতে মুসলমানরা আপত্তি করে বলিয়া শুনি নাই। রেলগাড়ীর উচ্চ ও তীক্ষ্ণ সিটিধ্বনি, মোটর গাড়ীর শিঙ্গার শব্দ, ট্রাম গাড়ীর কর্কশ আওয়াজ নিশ্চয়ই অদূরবর্ত্তী মসজিদ হইতে শুনা যায়। কিন্তু এই সকল ধ্বনিতে মুসলমানেরা আপত্তি করে না। আপত্তি কেবল হিন্দুদের ঘণ্টাধ্বনি ও শঙ্খধ্বনিতে!

কোন দেশে নানা ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক বাস করিলে সকল সম্প্রদায়েরই ধর্ম্মানুষ্ঠান করিবার অধিকার সমভাবে রক্ষিত হওয়া উচিত। কোন অনুষ্ঠান সুনীতিবিরুদ্ধ বা সর্ব্বসাধারণের পক্ষে বিপজ্জনক হইলে তাহা নিষিদ্ধ হওয়া উচিত। ঘণ্টা ও শঙ্খের শব্দ তাহা নহে। অবশ্য তাহা কাহারও কাহারও অপ্রীতিকর হইতে পারে। কিন্তু অসাম্প্রদায়িক কানের দ্বারা বিচার করিলে তাহা মহরমের ঢাক, গীর্জ্জার ঘণ্টা, রেলগাড়ীর সিটি বা মোটর গাড়ীর শিঙ্গার চেয়ে

অপ্রীতিকর নহে। মুসলমানদের মতে শাঁখ ও ঘণ্টায় তাঁহাদের উপাসনায় ব্যাঘাত জন্মে। এরূপ প্রশ্ন হইতে পারে, যে, উপরিলিখিত অন্য শব্দগুলি দ্বারা তাহা কেন হয় না, বা হইলে তাহাতে কেন আপত্তি হয় না। মুসলমানদের পক্ষ হইতে এই যুক্তিও প্রযুক্ত হইতে পারে, যে, শাঁখ ও ঘণ্টা পৌত্তলিকদের পূজায় ব্যবহৃত হয় বলিয়া অপৌত্তলিক ধার্ম্মিক মুসলমানদের নমাজে তাহাতে ব্যাঘাত হয়। পৌত্তলিক কে বটে, কে নয়, তাহার বিচার রাষ্ট্র করিতে পারে না। রাষ্ট্র অসাম্প্রদায়িক, রাষ্ট্রের কাছে সব ধর্ম্ম সমান। তা ছাড়া এ তর্কও উঠিতে পারে, যে, যে-কেহ বিশেষ কোন প্রাকৃতিক বা মনুষ্যনির্ম্মিত জড় বস্তুকে যেরূপ পবিত্র মনে করে, অন্য সব জড় বস্তুকে সেরূপ পবিত্র মনে করে না, সে-ই কতকটা পৌত্তলিক। কিন্তু এ রকম তর্কের অনুসরণ আমরা করিব না। আমরা কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, সব ধর্ম্মসম্প্রদায় ও তাহাদের বিভিন্ন অনুষ্ঠান সম্বন্ধে ঈশ্বরের যে নিরপেক্ষতা, যে ঔদার্য্য, যে তিতিক্ষা আমরা অনুমান করি, সকল সম্প্রদায়ের ঈশ্বরোপাসকের তাহা অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করা উচিত। কোন যুক্তি দ্বারাই প্রমাণ করা যায় না, যে, মহরমের ঢাকের আওয়াজ পবিত্র আর হিন্দুর মন্দিরের ঘণ্টা ও শাঁখের ধ্বনি অপবিত্র। ইহা প্রমাণ করা আরও কঠিন, যে, নীলামকারীর ঘণ্টার আওয়াজ পবিত্র বা অপবিত্র কিছুই নয়, কিন্তু সেই ঘণ্টা বা সেইরূপ ঘণ্টা হিন্দুর পূজাতে ব্যবহৃত হইলেই তাহা অপবিত্র ও আপত্তিজনক হইয়া উঠে।

পুনায় হিন্দুদের পূজায় ব্যাঘাত জন্মাইয়া তথাকার ম্যাজিস্ট্রেট অত্যন্ত অন্যায় কাজ করিয়াছেন। তথাকার পুলিস যে পূজার জন্য মারুতি মন্দিরে গমনোন্মুখ হিন্দুদিগকে লাঠি মারিয়া তাড়াইয়া দিয়াছে, ইহা সম্পূর্ণ বর্ব্বরোচিত কাজ। এই হিন্দুরা কাহারও অনিষ্ট করিতে যাইতেছিল না, শান্তিপূর্ণ ভাবে পূজা করিতে যাইতেছিল। তাহাদিগকে প্রহার করা কাপুরুষতা। তথাকার পুলিস বলিতে পারে, তাহারা ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম লঙ্ঘন করিতে যাইতেছিল। এই হুকুমটাই যদিও ন্যায়বিরুদ্ধ, তথাপি তাহা আইনসঙ্গত বলিয়া মানিয়া লইলেও, পুলিসের লাঠি চালান কোন মতেই সমর্থন করা যায় না। পুলিস পূজার্থীদিগকে গ্রেপ্তার করিতে পারিত। তাহা হইলে তাহাদের বিচার হইত এবং শেষ পর্য্যন্ত জানা যাইতে পারিত ম্যাজিস্ট্রেটের হুকুম ভারতবর্ষের ইংরেজকৃত আইন অনুসারেও ন্যায্য হইয়াছিল কি না। অসহযোগ আন্দোলনের সময় সম্পূর্ণ অহিংস ও শান্ত হাজার হাজার সত্যাগ্রহীকে পুলিস প্রহার করিত। তাহা নিন্দনীয় হইলেও তাহার একটা কারণ এই ছিল, যে, জেলে আর জায়গা কুলাইতেছিল না! পুনার কর্ত্তারা কি অনুমান বা আশঙ্কা করিতেছেন, যে, পুলিস লাঠি না চালাইয়া গ্রেপ্তার করিলে জেলে মারুতিমন্দির সত্যাগ্রহীদের জন্য জায়গার অভাব হইবে?

কোনও ধর্ম্মসম্প্রদায়ের কোন ধর্ম্মানুষ্ঠান শান্ত ও সুনীতি-সঙ্গত ভাবে করিলে অন্য যে ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকেরা শান্তি-ভঙ্গ করিবে বলিয়া আশঙ্কা সরকারী কর্ম্মচারীদের হয়, সেই শান্তিভঙ্গকর-মনোবৃত্তি-বিশিষ্ট সম্প্রদায়কেই নিবৃত্ত করা ও রাখা গবর্ন্মেণ্টের উচিত। কোন নগরের, জেলার, প্রদেশের বা দেশের রাষ্ট্রীয় কর্ম্মচারীদের বা কর্তৃপক্ষের শান্তিভঙ্গোন্মুখদের প্রশ্রয়দাতা ও শান্তশিষ্টদের "দমনকর্ত্তা" হওয়া শুধু যে উচিত নয়, তাহা নহে, তাহা হওয়াতে বিপদ আছে। কারণ, অশান্তদের দৃষ্টান্ত হইতে শান্তরাও কালক্রমে অশান্ত হইয়া উঠিতে পারে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে।

আমরা উপরের কথাগুলি লিখিবার পর আজ ২৮শে বৈশাখের দৈনিকে দেখিতেছি, পুনায় প্রসিদ্ধ সাংবাদিক ও জননায়ক নরসিংহ চিন্তামন কেলকর মহাশয় মারুতি মন্দিরে ঘণ্টাধ্বনি সহকারে পূজা করায় পুলিস তাঁহাকে গ্রেপ্তার করিয়াছে। তাঁহার পূর্ব্বে আরও অনেক প্রসিদ্ধ ও নেতৃস্থানীয় ব্যক্তি ঐ কারণে ধৃত হইয়াছেন। কেলকার মহাশয় লোকমান্য বালগঙ্গাধর টিলকের প্রধান সহকারী ছিলেন। তিনি ৭০ বৎসরের অধিকবয়স্ক এবং সম্প্রতি সার্ব্বজনিক কার্য্যক্ষেত্র হইতে অবসর লইয়াছেন। কিন্তু পুনায় হিন্দুদের উপর নিষেধাজ্ঞাটা অত্যন্ত অন্যায় ও অপমানকর বোধ হওয়ায় এই কাজ কাহাকেও না জানাইয়া করিয়াছেন। না জানাইয়া করিবার কারণ, জানাইলে বিশাল জনতা মন্দির-পথে তাঁহার অনুগামী হইত ও পুলিস হয়ত লাঠি চালাইয়া জনতা ভাঙিয়া দিত।

কেলকর মহাশয় কংগ্রেসের অসহযোগ আন্দোলনে যোগ দেন নাই।

—

প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মেলন

গত মাসে বঙ্গের কয়েকটি জেলায় প্রাথমিক বিদ্যালয়-সমূহের শিক্ষকদিগের সম্মেলন হইয়া গিয়াছে। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলি দেশের শিক্ষাসৌধের ভিত্তীভূত। এই বিদ্যালয়-গুলিকে আদর্শানুরূপ করিতে হইলে তৎসমুদয়ে শিক্ষণীয় বিষয়-সমূহ এবং শিক্ষাপদ্ধতি ও প্রণালীর প্রতি যেমন মনোযোগ আবশ্যক, তাহাদের শিক্ষক মহাশয়দিগকে সন্তুষ্ট ও কার্য্যক্ষম করাও সেইরূপ আবশ্যক। এই জন্য এই শিক্ষক সম্মেলন-গুলির গুরুত্ব শিক্ষাসম্বন্ধীয় অন্য সম্মেলনগুলির চেয়ে কম নয়। কয়েকটি জেলার প্রাথমিক বিদ্যালয়ের শিক্ষক সম্মেলনের বিবরণ দৈনিক কাগজে বাহির হইয়াছে। তাহা হইতে বুঝিতেছি, সব জেলার এই শিক্ষকদের কতকগুলি অভাব আকাঙ্ক্ষা এক, কতকগুলি মতও এক। আমি এইরূপ একটি সম্মেলনে সভাপতিরূপে উপস্থিত থাকায় জানিতে পারিয়াছি, তাহাতে সমবেত শিক্ষকদের অভাব আকাঙ্ক্ষা ও মত অনেকটা অন্যান্য জেলার শিক্ষকদের সদৃশ। ইহার অধিবেশনে একটি সংবাদসংগ্রাহক এজেন্সীর প্রতিনিধি উপস্থিত ছিলেন ও কিছু কিছু তথ্য টুকিয়া লইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সম্মেলনের সম্পাদক একটি বাংলা ও একটি ইংরেজী দৈনিকে উহার বৃত্তান্ত লিখিয়া পাঠাইয়াছিলেন। কিন্তু কোথাও কিছু বাহির হয় নাই। সেই জন্য এই সম্মেলনটি সম্বন্ধে কয়েকটি কথা সম্পাদক মহাশয়ের প্রেরিত রিপোর্ট হইতে নীচে সংকলিত হইতেছে, সমগ্র রিপোর্টটি মাসিক কাগজে মুদ্রিত করা সম্ভবপর নহে।

গত ২রা বৈশাখ বিশ্বভারতীর সুরুল গ্রামে স্থিত শ্রীনিকেতনে শ্রীযুক্ত রামানন্দ চট্টোপাধ্যায়ের সভাপতিত্বে বীরভূম জেলার বোলপুর চক্রের প্রাথমিক বিদ্যালয় শিক্ষক সম্মেলনের অধিবেশন হয়। ভিন্ন ভিন্ন প্রাথমিক বিদ্যালয় হইতে প্রায় ৮০ জন প্রতিনিধি, শান্তিনিকেতনের কয়েক জন অধ্যাপক, শ্রীনিকেতনের কয়েক জন কর্ম্মী, এবং নিকটস্থ গ্রাম ও বোলপুর হইতে অনেক দর্শক উহাতে উপস্থিত ছিলেন। অধিবেশন হইয়াছিল একটি খোলা জায়গায় কতকগুলি আমগাছের ছায়ার নীচে। স্থানটি আলিপনা, পুষ্পমালা ও পতাকার দ্বারা ভূষিত হইয়াছিল। অধিবেশন প্রাতে সাড়ে সাতটার সময় আরম্ভ হয়। প্রথম অধিবেশনে সভাপতি, অধ্যাপক ক্ষিতিমোহন সেন, অধ্যাপক নেপালচন্দ্র রায়, ও শ্রীযুক্ত কালীমোহন ঘোষ বক্তৃতা করেন।

সাড়ে দশটার সময় প্রতিনিধিদিগকে শ্রীনিকেতনের ভিন্ন ভিন্ন বিভাগ দেখান হয়, এবং কৃষির ও গ্রামশিল্পের উন্নতির জন্য ও গ্রামের স্বাস্থ্য প্রভৃতির উন্নতির জন্য শ্রীনিকেতন কি করিতেছেন বুঝাইয়া দেওয়া হয়। তাহাতে শিক্ষকদের মনে বেশ ভাল ধারণা জন্মিয়াছিল মনে হয়।

অপরাহ্ণ আড়াইটার সময় দ্বিতীয় অধিবেশন হয়। তাহাতে সম্পাদক শ্রীযুক্ত তারকচন্দ্র ধর গত তিন বৎসরের রিপোর্ট পাঠ করেন। আলোচনার পর কয়েকটি প্রস্তাব সর্ব্বসম্মতিক্রমে গৃহীত হয়। তাহা হইতে কয়েকটি নীচে উদ্ধৃত হইতেছে।

২। দেশের বর্ত্তমান অবস্থায় শিক্ষাকর না বসাইয়া অচিরে অবৈতনিক আবশ্যিক প্রাথমিক শিক্ষা আইন কার্য্যে পরিণত করিবার জন্য এই সভা সরকার বাহাদুরকে অনুরোধ জানাইতেছে।

যদি কর দিতেই হয় তবে যাহাতে প্রত্যেক ছেলেমেয়েই শিক্ষা পাইবার সমান সুবিধা পায় তাহার সম্পূর্ণ ব্যবস্থা করিতে হইবে।

৩। এই সভা সরকার বাহাদুরের নিকট প্রস্তাব করিতেছে যে, নবপ্রবর্ত্তিত জেলা শিক্ষাবোর্ডের সভ্যনির্ব্বাচনে বিদ্যালয়ের শিক্ষকদিগকে ভোটাধিকার দেওয়া হউক।

৪। বাঙ্গালা সরকারের শিক্ষা-বিভাগের নূতন শিক্ষা সংস্কার পরিকল্পনায় প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসের যে প্রস্তাব করা হইয়াছে এই সমিতি তাহার তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

এই সমিতির অভিমত এই যে, বর্ত্তমান সংখ্যা ঠিক রাখিয়া প্রত্যেক য়ুনিয়নে একটি করিয়া আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপিত হউক।

৫। এই সমিতি প্রস্তাব করিতেছে যে, বর্ত্তমান প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলির উন্নতি বিধানার্থ এবং পূর্ব্ব প্রস্তাবিত আদর্শ প্রাথমিক বিদ্যালয় স্থাপনার্থ শিক্ষা-বিভাগের আগামী বজেটে যেন যথেষ্ট পরিমাণ অর্থের বরাদ্দ করা হয়।

৬। এই সমিতি প্রস্তাব করিতেছে যে প্রাইমারী পরীক্ষার্থীর শেষ পরীক্ষার জন্য সকল স্কুলেই প্রত্যেক বিষয়ের জন্য একই নির্দ্দিষ্ট পাঠ্যপুস্তক পড়াইবার নিয়ম করা হউক।

৭। এই সভা প্রত্যেক ট্রেনিং-পাস শিক্ষককে পঁচিশ টাকা হইতে ক্রম-বৃদ্ধি অনুসারে পঁয়ত্রিশ টাকা বেতন দিতে এবং প্রত্যেক বিদ্যালয়ে নন্-ট্রেণ্ড শিক্ষকের বেতন ন্যূনপক্ষে পনর টাকা করিতে স্কুলবোর্ড কর্ত্তৃপক্ষকে অনুরোধ করিতেছে।

৮। এই সভার অভিমত এই যে, প্রাথমিক বিদ্যালয়ে শ্রেণী-সংখ্যা যত থাকিবে, শিক্ষকসংখ্যাও তত রাখা আবশ্যক।

৯। এই সম্মেলন সাধারণ বিদ্যালয়ে ধর্ম্মশিক্ষা দানের তীব্র প্রতিবাদ জানাইতেছে।

—

অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়

অধ্যাপক শ্যামাদাস মুখোপাধ্যায়ের মৃত্যুতে বাংলা দেশ ও ভারতবর্ষ হইতে উচ্চ গণিতে বিশেষ জ্ঞানবান এক জন সুপণ্ডিত ব্যক্তির তিরোভাব হইল। তাঁহার সহিত আমার

পরিচয় দীর্ঘকালব্যাপী। আমি যখন এলাহাবাদে একটি কলেজে কাজ করিতাম, তাহার গোড়ার দিকে, বোধ হয় ১৯০০ সালের কিছু আগে, তিনি তখনও বিবাহ করেন নাই, তিনি এলাহাবাদ গিয়াছিলেন এবং তাঁহার ও আমার বন্ধু গণিতাধ্যাপক উমেশচন্দ্র ঘোষ মহাশয়ের বাসায় ছিলেন। তখন তাঁহার ফোটোগ্রাফীর সখ খুব বেশী ছিল। বরাবরই তাঁহার একটা-না-একটা সখ ছিল ও তিনি কিঞ্চিৎ খেয়ালী ছিলেন। তখন অনেক দৃশ্যের ও অনেক মানুষের ছবি তিনি তুলিতেন। পরে তাঁহার সখ হয় গোলাপ বাগানে ও গোলাপ ফুলের চাষে। আমাকে তিনি একবার বলিয়াছিলেন, মিহিজামে তাঁহার গোলাপ বাগানে যত রকম গোলাপ আছে, ওঅঞ্চলে বা অন্যত্র কোন বাগানে তাহা অপেক্ষা বেশী ও উৎকৃষ্ট শ্রেণীর গোলাপ নাই। তিনি নিজের ঢাক বাজাইতে অভ্যস্ত ও নিপুণ ছিলেন না বলিয়া এবং তিনি যে বিদ্যার যে উচ্চ অঙ্গের অনুশীলন করিয়া গবেষণা করিয়াছিলেন তাহা শিক্ষিত সাধারণেরও সহজবোধ্য ছিল না বলিয়া তাঁহার খ্যাতির ব্যাপ্তি তাঁহার বিদ্যাবত্তার অনুরূপ হয় নাই। তিনি কেবল গণিতজ্ঞ ছিলেন না, ইংরেজী সাহিত্য ও দর্শনের অধ্যাপকতাও করিয়াছিলেন। তিনি সুগৃহস্থ ছিলেন। তাঁহা অপেক্ষা কম আয়ের লোকও আজকাল নিজে বাজার করে না, কিন্তু সুস্থ অবস্থায় তিনি প্রত্যহ বাজার হইতে তরকারী কিনিয়া আনিতেন। তিনি অমায়িক ও সরল প্রকৃতির লোক ছিলেন।

—

ডাক্তার সুরেশচন্দ্র রায়

ইদানীং ভারত ইন্সিওরেন্স কোম্পানীর কলিকাতা আপিসের ভারপ্রাপ্ত ডিরেক্টর ও তাহার পূর্ব্বে নিউ ইণ্ডিয়া কোম্পানীর কলিকাতা আপিসের জীবনবীমা-বিভাগের ম্যানেজার ডাঃ সুরেশচন্দ্র রায় মহাশয়ের অকালমৃত্যুতে বীমার কার্য্যে বিশেষ অভিজ্ঞ এবং সাধারণতঃ ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ে বিচক্ষণ এক জন উদ্যোগী পুরুষকে বাংলা দেশ হারাইল। তিনি নিজের চেষ্টায় সমাজে নিজের স্থান করিয়া লইয়াছিলেন। রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে তিনি কংগ্রেসওয়ালা ছিলেন। কলিকাতার ভারতীয় সাংবাদিক সভার তিনি একজন সহকারী সভাপতি ছিলেন। জীবনবীমার কাজ শিখাইবার জন্য তিনি উক্ত বিষয়ে একটি শিক্ষালয় খুলিয়াছিলেন। জীবনবীমা ও অন্যান্য ব্যবসাবাণিজ্য বিষয়ক একখানি ইংরেজী ও একখানি বাংলা কাগজ তিনিই চালাইতেন। ভারত ইন্সিওর্যান্স কোম্পানীর কাজ লইবার পর তিনি "ভারত ম্যাগাজিন" নাম দিয়া একটি মাসিক প্রতিষ্ঠিত করেন। তাঁহার নিজের জীবন-চরিত ও সমসাময়িক ঘটনা-সমূহের ইতিহাসবিষয়ে তিনি একটি ইংরেজী বহির লেখক ও প্রকাশক। তিনি দীর্ঘকাল দিল্লী ও মীরাটে ছিলেন, এবং প্রবাসী বাঙালীদের সহিত তাঁহার গভীর সহানুভূতি ছিল। প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের গোরখপুর অধিবেশনে তিনিই সম্মেলনকে কলিকাতায় আহ্বান করেন, এবং ইহার কলিকাতার অধিবেশনের সুশৃঙ্খল বন্দোবস্ত প্রধানতঃ তাঁহারই উদ্যোগিতা ও পরিশ্রমে হইয়াছিল। তিনি সহৃদয় ও পরোপকারী ছিলেন। কেহ তাঁহার সাহায্য-প্রার্থী হইলে তিনি যথাসাধ্য তাহার উপকার করিতেন।

—

বাংলা বানান

বৈশাখের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত প্রভাতকুমার মুখোপাধ্যায়ের মূল্যবান্ ও অবশ্যপাঠ্য "রবীন্দ্র-জীবনী"র কিছু পরিচয় দান উপলক্ষ্যে ঐ পুস্তকের কিছু দোষত্রুটি উল্লিখিত হইয়াছিল। তাহার মধ্যে 'সর্ব্ব', 'পূর্ব্ব', 'কর্ত্তৃক' ইত্যাদি শব্দের বানানে রেফের নিম্নস্থিত ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব লোপের বিরুদ্ধে কিছু লেখা হইয়াছিল। যাহা লেখা হইয়াছিল, তাহার বিরুদ্ধেও কিছু বলিবার আছে। ইহা সত্য, যে, আমরা 'সরূব' বলি না, বলি, 'সরুব্ব', সুতরাং বানান উচ্চারণের অনুযায়ী করিতে হইলে, 'সর্ব্ব' লেখাই উচিত। কিন্তু আমরা লিখি 'তর্ক', কিন্তু উচ্চারণ করি 'তর্‌ক' 'তরুক' বলি না; লিখি "স্বর্গ", কিন্তু বলি 'স্বরুগ্গ'; ইত্যাদি। অতএব আমাদের বানানে ও উচ্চারণে সকল স্থলে সঙ্গতি নাই দেখা যাইতেছে। তাহা হইলে, আমাদের বোধ হয়, কেবল সেই সব স্থলেই রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব রাখা ভাল যেখানে ব্যুৎপত্তি বুঝাইবার জন্য তাহা আবশ্যক। অন্য সব স্থলে রেফের নীচে ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব পরিহার করা ভাল—উচ্চারণ যাহাই হউক।

'বানান' কথাটি কেহ কেহ লেখেন 'বাণান'। তাহার

কারণ বোধ হয় তাঁহাদের মতে শব্দটি 'বর্ণন' শব্দ হইতে উৎপন্ন। কিন্তু উহা কি প্রস্তুত করা, রচনা করা, তৈরি করা যে-'বানানো' শব্দটির অর্থ, তাহারই রূপান্তর হইতে পারে না? ইংরেজীতে যেমন word-building শব্দের প্রয়োগ আছে, তেমনি আমরাও মনে করিতে পারি, 'বানান' দ্বারা আমরা দেখাই, কি কি বর্ণের বা অক্ষরের সহযোগে এক একটি শব্দ 'বানানো' বা তৈরি করা বা রচনা করা হইয়াছে।

—

পাটকলের ধর্ম্মঘটের অবসান

বঙ্গের সরদার মন্ত্রী মৌলবী ফজলল হক সাহেব গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে কতকগুলি প্রতিশ্রুতি দেওয়ায় শ্রমিক নেতারা পাটকল শ্রমিকদিগকে কাজে যোগ দিতে উপদেশ দিয়াছেন। ধর্ম্মঘটের অবসান হইয়াছে। কিন্তু (২৮শে বৈশাখের দৈনিক কাগজে প্রকাশিত সংবাদ অনুসারে) এখনও সব কলে সকল শ্রমিক কাজে যোগ দেয় নাই। আশা করা যায়, ফজলল হক সাহেবের প্রতিশ্রুতি রক্ষিত হইলে সকলেই যোগ দিবে।

ভারতবর্ষে শ্রমিকদের পক্ষে ধর্ম্মঘট করা পাশ্চাত্য দেশসমূহের শ্রমিকদের ধর্ম্মঘটের চেয়ে গুরুতর ব্যাপার। পাশ্চাত্য দেশসমূহে শ্রমিকসংঘগুলি সুশৃঙ্খল ও সুপরিচালিত। তথাকার সংঘগুলির অর্থবলও আছে। কারণ তথাকার শ্রমিকদের আর্থিক অবস্থা এখানকার চেয়ে ভাল বলিয়া তাহারা সংঘে নিয়মিত ভাবে যথেষ্ট চাঁদা দিতে পারে। তাহাদের নিজেদেরও কিছু সঞ্চয় থাকে। এই সব কারণে, ধর্ম্মঘটের সময় পাশ্চাত্য শ্রমিকরা কতকটা নিজেদের পুঁজির উপর নির্ভর করিতে পারে এবং সংঘের কাছেও সাহায্য পায়। তথাকার জনসাধারণও অপেক্ষাকৃত সচ্ছল অবস্থা প্রযুক্ত সাহায্য করিতে পারে। তথায় জাতিভেদ কম থাকায়, এবং গণতান্ত্রিকতা ও সর্ব্বসাধারণের মধ্যে পরস্পর সহানুভূতি ও সংঘবদ্ধতা অধিক থাকায়, পাশ্চাত্য লোকেরা ধর্ম্মঘটীদিগকে সাহায্য দানে অধিকতর তৎপর বলিয়া মনে হয়। ভারতবর্ষে অবস্থা অন্য রূপ। এই জন্য দীর্ঘকাল ধরিয়া ধর্ম্মঘট চালান এ দেশে কঠিনতর। এই সমস্ত বিষয় বা অবস্থা বিবেচনা করিলে, চট কলের ধর্ম্মঘট কংগ্রেসওয়ালা ও কম্যুনিষ্টরা ঘটাইয়াছে, বস্তুতঃ শ্রমিকদের কোন অভাব অভিযোগ নাই, ধনিক ও সরকার পক্ষের এই উক্তি সত্য বলিয়া মনে হয় না। কংগ্রেসওয়ালা ও কম্যুনিষ্টদের প্রভাব যদি বাস্তবিক এত বেশী হয়, যে, কেবল তাহাদের পরামর্শ ও প্ররোচনাতেই দু-লাখের উপর অভাব-অভিযোগশূন্য সুপুষ্ট সুখী শ্রমিক ধর্ম্মঘট করিতে পারে, তাহা হইলে তাহাও গবর্ন্মেণ্টের চিন্তার বিষয় হওয়া উচিত। কম্যুনিষ্টদের পশ্চাতে পুলিস লাগাইয়া ও তাহাদের বিরুদ্ধে নানা প্রকার মোকদ্দমা রুজু করিয়াই তাহার প্রতিকার হইবে না।

—

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু ও মৌলবী ফজলল হক

মৌলবী ফজলল হক তাঁহার সম্বন্ধে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর দুটি উক্তির প্রতিবাদ করিয়া বলিয়াছেন, সে দুটি সম্পূর্ণ মিথ্যা। পণ্ডিতজী যে উত্তর দিয়াছেন, তাহা সংবাদ-পত্রপাঠকেরা অবগত আছেন।

স্মৃতিশক্তির বিশ্বাসযোগ্যতা ও সত্যনিষ্ঠা সম্বন্ধে পণ্ডিতজীর ও মৌলবী সাহেবের খ্যাতি এক প্রকারের নহে, ইহা মৌলবী সাহেবের মনে থাকিলে তাঁহার পক্ষে ভাল হইত। তাঁহার মনে থাকিতে পারে, গবর্ন্মেণ্ট পর্য্যন্ত পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর বিরুদ্ধে বার্ষিক রিপোর্টে একটা কথা লিখিয়া পরে তাহা প্রত্যাহার করিতে ও তজ্জন্য দুঃখ প্রকাশ করিতে বাধ্য হইয়াছিলেন।

চটকল শ্রমিকদের প্রকৃত অভিযোগ কিছু আছে মৌলবী সাহেব পণ্ডিতজীকে ইহা বলিয়াছিলেন বলিয়া প্রথমে অস্বীকার করেন। কিন্তু পরে তিনি স্বীকার করিয়াছেন, যে, তাহাদের কোন কোন বিষয়ে দুঃখ বাস্তবিক আছে। এখন তাহার প্রতিকার হইলেই মঙ্গল।

—

জাতীয় স্বাধীনতা ও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা

কোন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা থাকিলেই যে তথাকার মানুষদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিবেই, এমন বলা যায় না। রুশিয়ায়, জার্ম্মেনীতে ও ইটালীতে জাতীয় স্বাধীনতা আছে। ঐ দেশগুলি অন্য কোন দেশের অধীন নহে। কিন্তু ঐ দেশগুলির মানুষদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা কম। ব্রিটেনে

জাতীয় স্বাধীনতা আছে, ইংরেজদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতাও বোধ হয় অন্য যে-কোন দেশের লোকদের সমান—হয়ত বা অন্য যে-কোন দেশের লোকদের চেয়ে বেশী। তথাপি ব্রিটেনেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ আছে। সেই সংঘ ইংরেজদের ব্যক্তিগত স্বাধীনতার উপর ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ও গবর্মেণ্ট কর্ম্মচারীদের হস্তক্ষেপ বা আক্রমণ নিবারণের চেষ্টা করে।

পরাধীন ভারতবর্ষে জাতীয় স্বাধীনতা নাই, ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সাতিশয় সীমাবদ্ধ। বিশেষ করিয়া বাংলা দেশে উহা সাতিশয় সংকীর্ণ সীমার মধ্যে আবদ্ধ। এই জন্য বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ বিচারান্তে রাজনৈতিক বন্দীদের ও বিনাবিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দীদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা করিতেছেন। কাহারও দুঃখ মোচন করিতে হইলে প্রথমে তাহা জানা ও পরে তাহা সর্ব্বসাধারণের গোচর করা আবশ্যক। বঙ্গীয় ব্যক্তিগতস্বাধীনতা সংঘ এই কাজ করিতেছেন। রাজবন্দীদের পরিবারবর্গেরও বহু দুঃখ আছে। তাহাও সংঘ জানিতেছেন ও জানাইতেছেন।

যদি বিচারান্তে ও বিনাবিচারে রাজনৈতিক কারণে বন্দীকৃত লোকেরা মনুষ্যোচিত ব্যবহার পায়, এবং তাহাদের পরিবারবর্গও যথেষ্ট আর্থিক সাহায্য পায়, তাহা হইলেই সংঘের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না। বন্দীকৃত লোকদের মুক্তি সংঘ চান। কিন্তু রাজবন্দীদের মুক্তিও সংঘের চরম লক্ষ্য নহে। যে-সব রেগুলেশ্যন, আইন ও অর্ডিন্যান্সের জোরে গবর্মেণ্ট মানুষকে বিনা বিচারে অনির্দ্দিষ্ট কালের জন্য বন্দী করিয়া রাখিতে পারেন, সেই সকল ব্যবস্থা রদ হওয়া চাই। দণ্ডবিধিতে সিডিশ্যন প্রভৃতি সম্বন্ধে যে-সকল ধারা আছে এবং আদালতের বিচারে সেইগুলির কার্য্যতঃ প্রয়োগ যেরূপ হয়, তাহার পরিবর্ত্তন করিয়া তাহা আধুনিক সভ্য সমাজের দণ্ডনীতিবিদদিগের অনুমোদিত বিধির ও তাহার প্রয়োগের অনুরূপ করিতে হইবে।

ভারতবর্ষে—বিশেষতঃ বঙ্গে—মানুষের মত মৌখিক প্রকাশের অধিকার, বৈধ কার্য্যের ও আলোচনার জন্য প্রকাশ্য সভায় সমবেত হইবার অধিকার, পুস্তক ও সংবাদ-পত্রাদিতে মত প্রকাশের অধিকার কম। কেহ মুদ্রাযন্ত্র স্থাপন বা সংবাদপত্র প্রকাশ করিতে চাহিলে গবর্মেণ্ট জমানৎ চাহিতে ও লইতে এবং পরে তাহা বিনাবিচারে বাজেয়াপ্ত করিতে পারেন। যে মুদ্রাকর বা সম্পাদকের নিকট হইতে জমানৎ লওয়া হইয়াছে, বিনা বিচারে তাহা বাড়াইবার এবং যাহার নিকট জমানৎ লওয়া হয় নাই, তাহার নিকট বিনা বিচারে জমানৎ লইবার ক্ষমতাও গবর্মেণ্টের আছে। এই সকল বিষয়ে ভারতবর্ষের অবস্থা ইংলণ্ডের মত হওয়া উচিত।

ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘের কার্য্য ইহা অপেক্ষাও বহুদূরপ্রসারী। শুধু কতকগুলি রেগুলেশ্যন, আইন ও অর্ডিন্যান্স রদ এবং কোন কোন আইনের কোন কোন ধারা পরিবর্ত্তিত হইলেই সংঘ সন্তুষ্ট থাকিতে পারেন না। গবর্মেণ্ট যেরূপ অগণতান্ত্রিক ক্ষমতার বলে ঐরূপ সকল ব্যবস্থা করিতে পারিয়াছেন, সেরূপ ক্ষমতাই গবর্মেণ্টের থাকা অবাঞ্ছনীয়। অতএব গবর্মেণ্টকে সম্পূর্ণ গণতান্ত্রিক করিতে হইবে, জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিতে হইবে।

আমরা আগেই বলিয়াছি, কোন দেশে জাতীয় স্বাধীনতা থাকিলেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা না থাকিতে পারে, এবং তাহার দৃষ্টান্তও দিয়াছি। ইহাও বলিয়াছি, ব্রিটেনে পূর্ণ জাতীয় স্বাধীনতা এবং পৃথিবীর মধ্যে অধিকতম ব্যক্তিগত স্বাধীনতা থাকিলেও, সেখানেও ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ আছে।

অতএব, এখন ত বঙ্গে ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘের প্রয়োজন আছেই, দেশ যখন গণতান্ত্রিক জাতীয় স্বাধীনতা লাভ করিবে, তখনও ইহার প্রয়োজন থাকিতে পারে।

সকলে ইহার কার্য্যের মহত্ত্ব ও গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়া ইহার সহায় হউন এবং ইহাকে স্থায়ী দৃঢ় ভিত্তির উপর স্থাপিত করুন।

[বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘের পুস্তিকার জন্য লিখিত]

প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় বাঙালী

কয়েক বৎসর হইতে এইরূপ শুনা যাইতেছে এবং ইহা অনেকটা সত্য, যে, সরকারী নানা বিভাগের চাকরিতে কর্ম্মচারী নিয়োগের জন্য সমগ্রভারতব্যাপী এবং ভারতবর্ষ ও ব্রিটেন ব্যাপী যে যে সরকারী পরীক্ষা গৃহীত হয়, তাহাতে বাঙালী ছেলেরা আর আগেকার মত কৃতিত্ব

দেখাইতে পারিতেছে না। অন্য সব প্রদেশে শিক্ষার ক্রমবিস্তারবশতঃ এবং বাঙালী যুবকদের চাকরির প্রতি বিতৃষ্ণা ও ব্যবসা-বাণিজ্যের প্রতি অনুরাগ বাড়াতেও কতকটা ঐরূপ অবস্থার উদ্ভব হইয়া থাকিতে পারে। বঙ্গে প্রচলিত শিক্ষার ও পরীক্ষার কিছু কিছু দোষ আছে। বঙ্গে গবর্মেণ্ট অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় শিক্ষার জন্য ব্যয় কম করেন। বাংলা দেশে দমন-নীতির প্রাদুর্ভাবে এ পর্য্যন্ত কয়েক হাজার যুবক বন্দীকৃত হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে বেশ মেধাবী যুবক অনেক ছিলেন ও আছেন। যে-সব বালক ও যুবক বন্দী হয় নাই, দমননীতির চাপ তাহাদের মনের উপর পড়িয়া তাহার কুফল ফলাইয়াছে। হুজুকপ্রিয়তার ও হুজুকের আধিক্যে, আরাম-প্রিয়তার আধিক্যে, সিনেমা ও নানাবিধ ক্রীড়ায় আসক্তিতে, রাজনৈতিক উত্তেজনার আধিক্যে, এবং বাঙালী বড় বুদ্ধিমান ও শিক্ষায় অগ্রসর জাতি এই অহঙ্কারে বাঙালী যুবকদের খুব ক্ষতি হইয়াছে। তাহারা অনেকেই জ্ঞানলাভের জন্য যথেষ্ট পরিশ্রম করে না।

প্রতিযোগিতা-পরীক্ষায় তাহাদের কৃতকার্য্যতার আপেক্ষিক হ্রাস এই সব কারণে ঘটিয়া থাকিবে। কিন্তু বাঙালীর বুদ্ধি কমিয়া যায় নাই। সরকারী হিসাবরক্ষা ও হিসাবপরীক্ষা বিভাগগুলির এবং বাণিজ্যশুল্ক-বিভাগের সমগ্রভারতব্যাপী পরীক্ষার নিম্নমুদ্রিত ফল হইতে তাহা অনুমিত হইবে।

ALLAHABAD, April 21.

The results of the combined competitive examination for recruitment to the Indian Audit and Accounts Service, the Imperial Customs Service, the Military Accounts department and the Indian Railway Accounts Service, held in November last has been declared but the names of the candidates selected are not known definitely yet. The table of the results shows that the following obtained the first 20 positions, the names being given in order of merit :-

Akhil Chandra Bose (Rajputana), V. N. Sukul (U. P.), V. V. Vedanta Chari (Madras), Ramanath Krishnamurthy Ayyar (Travancore), Hari Das Dhir, Dharam Swarup Naka, Kundan Lal Ghei, Som Parkash Nanda, and Tirbhawan Nath Dar of the Punjab, Alim Ali (U. P.), Birendra Nath Banerji and Sachindranath Das Gupta of Bengal, Nirmalendu Roy (Bihar), S. Altaf Husain (Punjab), L. K. Narayanswamy (Assam), H. Krishnamurthi Rao (Madras), Krishna Dayal Bhargava (Ajmer-Merwara), Madan Kishore (U. P.), Abani Mohan Kusari (Bengal) and Bhagwan Das Toshniwal (Ajmer-Merwara).

উপরের তালিকাটিতে দেখা যাইবে, যে, পরীক্ষায় প্রথম কুড়ি জনের মধ্যে পাঁচ জন বাঙালী। রাজপুতানানিবাসী এক জন বাঙালী প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছে। বঙ্গদেশ-নিবাসী তিন জন বাঙালী ও বিহারনিবাসী এক জন বাঙালী এই তালিকায় স্থান পাইয়াছে।

শুধু বাংলা দেশের বাঙালীদিগকেই কেহ যদি বাঙালী বলিয়া ধরেন, তাহা হইলেও সমগ্র ভারতের ৩৫ কোটির উপর লোকদের মধ্যে বঙ্গের পাঁচ কোটি লোকদের মধ্য হইতে তিন জন ঐ তালিকায় স্থান পাইয়াছে। লোক-সংখ্যার অনুপাত অনুসারে ইহা মন্দ নয়। ৩৫ কোটির মধ্যে ২০ জন হইলে ৫ কোটির মধ্যে তিন জনের বেশী হয় না, কিছু কম হয়। যত লোক যে ভাষায় কথা বলে, সে দিক্ দিয়া বিচার করিলে দেখা যায়, পঁয়ত্রিশ কোটি ভারতীয়ের মধ্যে পাঁচ কোটির কিছু বেশী লোক বাংলা বলে। এই পাঁচ কোটি বাংলাভাষীর মধ্য হইতে পাঁচ জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। সংখ্যার অনুপাতে ইহা ভাল। কারণ, পঁয়ত্রিশ কোটির মধ্যে ২০ জন হইলে ৫ কোটির মধ্যে পাঁচ জন অনুপাত অনুসারে বেশী; তিন জন হইলেই যথেষ্ট হইত।

সমগ্র ভারতবর্ষে মুসলমানদের সংখ্যা আট কোটির কিছু কম। তাহাদের মধ্যে দুই জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা আড়াই কোটির কম। তাহাদের মধ্যে পাঁচ জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। সাম্প্রদায়িক সংখ্যার অনুপাত ধরিলে বাঙালী হিন্দুরা কম কৃতিত্ব দেখায় নাই।

সমগ্র ভারতের হিন্দুর সংখ্যা চব্বিশ কোটির কম, বাঙালী হিন্দুর সংখ্যা আড়াই কোটির কম। চব্বিশ কোটি লোকদের মধ্য হইতে আঠার জন তালিকায় স্থান পাইয়াছে। আড়াই কোটি তাহার প্রায় একদশমাংশ। অতএব আঠার জনের মধ্যে দু-জন বাঙালী হিন্দু থাকিলেও নিতান্ত কম হইত না। কিন্তু আছে পাঁচ জন। ইহা মন্দ নয়।

বাঙালী যুবকদের অহঙ্কার বাড়াইবার উদ্দেশ্যে আমরা এই সব চুলচেরা হিসাব দিলাম না। পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হওয়া ও তাহাতে উচ্চ স্থান লাভ করা একটা খুব বড় জিনিষ নয়। কিন্তু তাহা তুচ্ছও নয়। ছোট বড় চাকরি পাওয়া বড় জিনিষ নয়, তুচ্ছও নয়। বাঙালী ছেলেরা কোন কারণে নিরুৎসাহ না হন, অবসাদগ্রস্ত না হন বা না থাকেন, আমরা এই চাই।

—

ভারতবর্ষের সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা

ভারতবর্ষের রাষ্ট্রভাষা কি হওয়া উচিত, এই বিষয়ের আলোচনা নূতন নয়। কিন্তু প্রশ্নটির আলোচনা কলিকাতায় সম্প্রতি দু-তিনটি সভায় হইয়া গিয়াছে, খবরের কাগজেও হইয়াছে। অনেকেই বলিয়াছেন, বাংলারই সাধারণ ভাষা বা রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত। সাহিত্যের উৎকর্ষ, ভাষার সহজ-শিক্ষণীয়তা, ভাষার সর্ব্ববিধ ভাব, চিন্তা ও তথ্য প্রকাশ করিবার ক্ষমতা, বর্ণমালার উৎকর্ষ, এবং বহুলোকের দ্বারা ব্যবহার—এই সমস্ত গুণ একসঙ্গে বিবেচনা করিলে বাংলার সাধারণ ও রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী ভারতবর্ষীয় অন্য কোন ভাষার দাবী অপেক্ষা কম নহে। কিন্তু যাঁহারা হিন্দী-উর্দুর পক্ষপাতী, তাঁহারা এই গুণটির উপরই বেশী জোর দিয়া থাকেন, যে, হিন্দী-উর্দু অথবা হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকের মাতৃভাষা ও সকলের চেয়ে বেশী লোকে বুঝে। ইহা সত্য কথা, যদিও হিন্দুস্থানীর সমর্থকেরা, উহা কত লোকের মাতৃভাষা ও কত লোকে উহা বুঝে, সে বিষয়ে অত্যুক্তিপূর্ণ ও মিথ্যা দাবী করিয়া থাকেন। হিন্দুস্থানী ভারতবর্ষে সকলের চেয়ে বেশী লোকে বলে ও বুঝে, তাহার এই গুণটি ছাড়া আর সব বিষয়ে বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতায় আমরা বিশ্বাস করি।

হিন্দুস্থানীর যে রাষ্ট্রভাষা হওয়া উচিত, তাহা কংগ্রেসই বেশী জোর করিয়া বলেন এবং কংগ্রেসনেতারা কংগ্রেসের অধিবেশনসমূহে, হিন্দুস্থানী যাহারা বলিতে পারে না, তাহাদের মুখ-খোলা দুঃসাধ্য করিয়া তুলিয়াছেন। কেহ ইংরেজীতে কিছু বলিতে চাহিলে তাঁহারা দয়া করিয়া তাঁহাকে অনুমতি দিয়া থাকেন বটে, কিন্তু বাংলায় কেহ কিছু বলিতে চাহিলে কি ঘটিবে, কল্পনা করিতে পারি না। লীগ অব নেশুন্সের ভাষা ইংরেজী ও ফরাসী, কিন্তু যে-কেহ নিজের মাতৃভাষায় সেখানে বক্তৃতা করিতে পারে। আমরা সেখানে জার্ম্যান ভাষায় বক্তৃতা শুনিয়াছি।

বাংলার দাবী কংগ্রেস-নেতাদের কাছে কেহ উপস্থিত করিয়াছিলেন বলিয়া আমরা অবগত নহি। করিলেও তাহাতে বাঙালী ছাড়া কেহ কর্ণপাত করিতেন বলিয়া বিশ্বাস হয় না। অবাঙালী কংগ্রেস-নেতারা সাধারণতঃ বাংলা জানেন না, সুতরাং উহার দাবী তাঁহাদের হৃদয়ঙ্গম হইবে না। তদ্ভিন্ন, নানা কারণে বাংলা দেশ, বাঙালী, বাংলা ভাষা ইত্যাদি বঙ্গের বাহিরে লোকপ্রিয় নহে—যদিও বঙ্গ হইতে সংগৃহীত ধন সকলেরই প্রিয়। কেন এইরূপ হইয়াছে, সংক্ষেপে তাহার আলোচনা করা যাইবে না; সুতরাং সে চেষ্টা করিব না।

কয়েকটা কথা বাঙালীদিগকে জানান বা মনে পড়াইয়া দেওয়া আবশ্যক। হিন্দীর চেয়ে বাংলার সহিত বিহারের ভাষার সাদৃশ্য বেশী। বিহারের উপপ্রদেশ মিথিলার ভাষা বাংলার আরও নিকট। মিথিলার ও বাংলার বর্ণমালা এক। অথচ বিহারের লোকেরা নিজেদের ভাষাকে হিন্দী বলেন, এবং বিহারে বাঙালীর প্রতি বিরূপতা খুব বেশী। বিহারীরা বেশী সংখ্যায় বাংলা বুঝেন। আসামের ও বাংলার বর্ণমালা এক, আসামীয় বর্ণমালায় বেশীর মধ্যে আছে কেবল পেটকাটা ব। আসামের ও বাংলার ভাষার মধ্যে প্রভেদ কলিকাতার ও চট্টগ্রামের কথিত ভাষার প্রভেদের চেয়ে বেশী নয়। অথচ আসামীরা বাংলা ভালবাসে না, যদিও বুঝিতে পারে অনেকেই।

উড়িষ্যার ভাষা ও বাংলা ভাষার মধ্যে প্রভেদ কম। উড়িষ্যার বর্ণমালা পৃথক। কিন্তু বাংলা বর্ণমালায় উড়িষ্যার পুস্তক লিখিত হইলে, তাহা বাঙালীদের বুঝিতে কষ্ট হইবে না। শিক্ষিত উৎকলীয়েরা সাধারণতঃ বাংলা বুঝেন ও বলিতে পারেন। অশিক্ষিত অনেক উৎকলীয় সম্বন্ধেও এ কথা সত্য। অথচ উৎকলে বাঙালী বিরাগ-ভাজন।

বিহার, উড়িষ্যা ও আসামে বাংলার জ্ঞান বিস্তার করা হিন্দীর জ্ঞান বিস্তার করা অপেক্ষা ভাষার দিক্ দিয়া সহজতর, কিন্তু লোকের বিরাগ দূর করা অত্যন্ত কঠিন। বিহারে ত হিন্দী বিদ্যালয়ে ও বিশ্ববিদ্যালয়ে এবং আদালতে চলিয়াই গিয়াছে। উৎকলে ও আসামে লোকেরা বরং হিন্দী শিখিবে তবু বাংলা শিখিবে না। ইহার জন্য এই সকল প্রদেশের লোকদিগকে দোষ দেওয়া আমাদের অভিপ্রেত নহে।

বাঙালীদের মনে রাখা উচিত, যে, তাঁহারা বাঙালী ছাড়া অন্য লোকদিগকে নিজের ভাষা ও সাহিত্যের গুণগ্রাহী করিবার কোন চেষ্টা করেন নাই।

আমরা নানা কারণে বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার জন্য কোন আন্দোলন করি নাই। আমাদের ধারণা, এরূপ

আন্দোলন সফল হইবার কোন সম্ভাবনা নাই, অধিকন্তু এরূপ আন্দোলন করিলে বাংলার প্রতি বিরুদ্ধতা বাড়িবে। যেমন রাষ্ট্রীয় সাম্রাজ্যবাদী আছে, তেমনি ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী আছে। হিন্দুস্থানীর সমর্থকেরা সকলে ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী না হইতে পারেন, কিন্তু তাঁহাদের মধ্যে অনেকে ভাষিক সাম্রাজ্যবাদী। মিথিলায় যে মহামহোপাধ্যায় ডক্টর গঙ্গানাথ ঝার মত ধীর ও শান্ত মানুষও বলিতেছেন, যে, হিন্দী তাঁহাদের মাতৃভাষা নহে, মৈথিলী তাঁহাদের মাতৃভাষা, এবং তাঁহার মত সুপণ্ডিত লোকের নেতৃত্বে যে মৈথিলীকে স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ে চালাইবার চেষ্টা হইতেছে, বহু হিন্দুস্থানী সমর্থকের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদ তাহার পরোক্ষ কারণ বলিয়া মনে করি।

আমাদের ধারণা এই, যে, যদি বাংলাকে রাষ্ট্রভাষা করিবার প্রস্তাব কংগ্রেসমহলে আমল পাইত, তাহা হইলেও হিন্দীকে সুদূর মান্দ্রাজ প্রেসিডেন্সীতেও লোকদের বোধগম্য করিবার নিমিত্ত যে দলবদ্ধ সাগ্রহ ও সোৎসাহ চেষ্টা চলিতেছে ও যাহার ফলে ছয় লক্ষ মান্দ্রাজী ইতিমধ্যেই চলনসই হিন্দী শিখিয়াছে, বাঙালীদের পক্ষ হইতে সেরূপ কোন চেষ্টা হইত না। ইহা সুখের কথা নয়, গৌরবের কথা নয়, কিন্তু সত্য কথা।

হিন্দীকে যাহারা রাষ্ট্রভাষা করিতে চান, তাঁহারা অ-হিন্দীভাষীদিগকে হিন্দী শিখাইবার জন্য অনেক পুস্তক লিখিয়াছেন ও প্রকাশ করিয়াছেন। অবাঙালীদের বাংলা শিখিবার যে অল্পসংখ্যক বহি আছে, তাহার প্রকাশক ইংরেজ, এবং তৎসমুদয় ইউরোপীয়দিগের বাংলা শিখিবার সুবিধার জন্য লিখিত। ভারতীয় অবাঙালীদিগকে বাংলা শিখাইবার জন্য বাঙালীরা কয় খানি বহি লিখিয়াছেন জানি না। হিন্দীভাষীদের পক্ষে বাংলা শিখা খুব সহজ। অন্ততঃ তাঁহাদিগকে বাংলা শিখাইবার নিমিত্ত বাঙালীরা কোন চেষ্টা করিয়াছেন কি? অবাঙালীদিগকে বাংলা শিখানর কথা ছাড়িয়া দিয়া, বঙ্গের বাহিরে যে-সব বাঙালী বঙ্গদেশ হইতে দূরে বাস করেন, তাঁহাদের বাংলার জ্ঞান ও বঙ্গের সাহিত্য ও সংস্কৃতির সহিত ঘনিষ্ঠ যোগ স্থাপন ও রক্ষার জন্য প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের কয়েকটি অধিবেশনে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে। তদনুসারে কোন কাজ হইয়াছে বলিয়া আমরা অবগত নহি।

ভারতীয় এবং বিদেশী অবাঙালীদিগকে বাংলা সাহিত্যের সম্পদের ও উত্তরোত্তর সম্পদ বৃদ্ধির খবর জানাইবার প্রধান উপায়, ইংরেজী এরূপ সাময়িক পত্রিকাসমূহে বাংলা পুস্তকের সমালোচনা প্রকাশ যেরূপ পত্রিকা ভারতবর্ষের সব প্রদেশে ও ভারতবর্ষের বাহিরে গিয়া থাকে। বঙ্গের এরূপ একখানা ইংরেজী মাসিকে সম্পাদকীয় সমালোচনার্থ বাংলা বহি পাইবার চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। তাহার কারণ, বাংলা পুস্তক-প্রকাশকদিগের উক্ত মাসিকের সম্পাদকের আবেদনে অমনোযোগ। ঐ মাসিকে গুজরাটি, হিন্দী, তেলুগু প্রভৃতি বহির সমালোচনা বাহির হয়, বাংলা বহির প্রায়ই হয় না। বলা আবশ্যক, উক্ত সম্পাদকের বাংলা বহি পাইবার দরখাস্ত মঞ্জুর হইলে তাহার কোন লাভ হইত না। বহিগুলি সমালোচকদের হাতে যাইত, ও তাহাদের সম্পত্তি হইত।

আমরা যদি আমাদের সাহিত্যসম্পদ অপরকে জানাইবার ও অপরকে তাহার অংশী করিবার নিমিত্ত চেষ্টা না করি, কেবল নিজের ঘরে নিজের সাহিত্যিক গর্ব্ব লইয়া বসিয়া থাকি, এবং সঙ্গে সঙ্গে ক্ষোভ অভিমান ক্রোধ প্রকাশ করি, যে, কেন বাংলা ভাষাকে রাষ্ট্রভাষা বলিয়া অবাঙালীরা স্বীকার করিল না, তাহা হইলে এরূপ মনোভাবের ও বাহ্য আচরণের সঙ্গতির প্রশংসা করা যায় না।

আমরা উপরে হিন্দীর রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবীর সমর্থকদিগের অনেকের ভাষিক সাম্রাজ্যবাদের উল্লেখ করিয়াছি। তাহার একটি প্রমাণ এমন এক জন প্রসিদ্ধ নেতার লেখা হইতে দিতেছি যিনি স্বয়ং হিন্দুস্থানীর রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী সমর্থন করেন অথচ পূর্ব্বোক্ত সমর্থকদিগের মনোভাবের সমর্থন করেন না। তিনি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু। (ইহার নামের 'ব'টি অন্তঃস্থ 'ব'। এস্থলে আসামীয় পেটকাটা ব ব্যবহার করিলেই ভাল হয়।)

নেহরু মহাশয়ের ইংরেজী আত্মচরিত হইতে আমাদের দরকারী কথাগুলি আমাদিগকে অনুবাদ করিতে হইবে না। ঐ পুস্তকের যে সরল সহজপাঠ্য অনুবাদ শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রনাথ মজুমদার করিয়াছেন এবং যাহা পরিপাটীরূপে ছাপিয়া সুলভ মূল্যে শ্রীযুক্ত সুরেশচন্দ্র মজুমদার প্রকাশ করিয়াছেন, তাহা হইতেই কথাগুলি লইব। পণ্ডিতজী বলিয়াছেন,

"হিন্দুস্থানী যে ভারতের সাধারণ ভাষায় পরিণত হইবে,

এ বিষয়ে আমার বিন্দুমাত্র সন্দেহ নাই।" (পৃ. ৫২৫)।

পরে অন্য একটি ঘটনার প্রসঙ্গে লিখিয়াছেন :—

"প্রসঙ্গতঃ আমি উল্লেখ করিলাম যে আধুনিক হিন্দী অপেক্ষা, আধুনিক বাঙ্গালা, মারাঠী ও গুজরাটি ভাষা অধিক অগ্রসর বিশেষ ভাবে আধুনিক বাঙ্গালা-সাহিত্যের মৌলিকতা ও সৃজনী-প্রতিভা হিন্দী হইতে অনেক অধিক।

"এই সকল কথা বন্ধুভাবে আলোচনা করিয়া আমি ফিরিয়া আসিলাম। কিন্তু সভায়, উহা যে সংবাদপত্রে প্রকাশিত হইবে, এ ধারণাও আমার ছিল না কিন্তু উপস্থিত কোন ব্যক্তি উহার বিবরণ হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে প্রকাশ করিয়া দিলেন।

"আমার বিরুদ্ধে হিন্দী সংবাদপত্রগুলিতে তীব্র প্রতিবাদ উঠিল, যেহেতু আমি বাঙ্গালা, গুজরাটি ও মারাঠী অপেক্ষা হিন্দীকে হীন করিয়া সমালোচনা করিতে স্পর্দ্ধা প্রকাশ করিয়াছি। আমাকে গভীরভাবে অজ্ঞ—এ বিষয়ে আমি অজ্ঞ তাহাতে সন্দেহ কি?—ও আরও কঠিন কঠিন বিশেষণ দ্বারা পরাহত করা হইল। এই বাদানুবাদ পড়িবার আমি সময় পাই নাই। শুনিয়াছি কয়েক মাস ধরিয়া আমি পুনরায় কারাগারে না যাওয়া পর্য্যন্ত উহা চলিয়াছিল।

"এই ঘটনায় আমার একটা শিক্ষা হইল। আমি বুঝিলাম, হিন্দী সাহিত্যিক ও সাংবাদিকেরা অতিমাত্রায় অসহিষ্ণু এক জন হিতাকাঙ্ক্ষীর নিকট হইতেও তাঁহাদের সঙ্গত সমালোচনা শুনিবার মত ধৈর্য্য নাই। ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ রহিয়াছে।"

"এক জন হিতাকাঙ্ক্ষীর" কথায় হিন্দীভাষী জগতে ঝড় বহিয়াছিল। বাঙালীরা বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের শ্রেষ্ঠতা ভারতময় ঘোষণা করিলে কিরূপ তুফানের উদ্ভব হইতে পারে, তাহা সহজেই অনুমান করা যাইতে পারে। পণ্ডিতজীর ভাষায়, "ইহার পশ্চাতে নিশ্চয়ই হীনতাবোধ" থাকিতে পারে, কিন্তু সে-কথা বাঙালীরা বলিলে রক্ষা আছে কি? বাংলার রাষ্ট্রভাষা হইবার দাবী অবাঙালীরা কোন ক্রমেই মঞ্জুর করিবে না, তাহাতে কেবল হলাহল উঠিবে। অতএব ওরূপ চেষ্টা না করিয়া, সেইরূপ চেষ্টাই করা ভাল যাহাতে বাধা দিবার ক্ষমতা কাহারও নাই। সে-চেষ্টা, বাংলা সাহিত্যের সর্ব্বাঙ্গীণ সম্পদ বৃদ্ধির চেষ্টা, সেই সম্পদের বার্ত্তা বাংলায় সমালোচনা ও সর্ব্বত্র লাইব্রেরীর প্রতিষ্ঠার দ্বারা বাঙালীদিগকে জানান, এবং ইংরেজীতে বাংলা বহির সমালোচনা ও অনুবাদ দ্বারা অবাঙালীদিগকে জানান।

বাংলা ভাষা ও সাহিত্যের উৎকর্ষ কেবল আমরা বাঙালীরাই ঘোষণা করি না। শতাধিক বৎসর পূর্ব্বে পাদরী উইলিয়ম কেরী ইহা বলিয়াছিলেন, কয়েক বৎসর পূর্ব্বে কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের বাংলা অধ্যাপক ডক্টর জেমস ড্রমণ্ড এণ্ডার্স্ন টাইম্স্ কাগজে লিখিয়াছিলেন, "এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে দুটি উৎকৃষ্ট আধুনিক সাহিত্য আছে। তাহা ইংরেজী ও বাংলা"।

—

মন্ত্রিত্ব সম্বন্ধে কংগ্রেসের দাবী

যে ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসওয়ালা সদস্যেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইয়াছেন, তথায় কংগ্রেসী দলের মন্ত্রি-মণ্ডল গঠন করিবার আইনসঙ্গত অধিকার আছে। তাঁহারা মন্ত্রিত্বগ্রহণের পূর্ব্বে গবর্ণরদের নিকট হইতে এই প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছিলেন, যে, মন্ত্রীরা আইনসঙ্গত যে-সব কাজ করিবেন, তাহাতে গবর্ণররা বাধা দিবেন না। ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট গবর্ণরদিগকে এরূপ প্রতিশ্রুতি দিবার অনুমতি দেন নাই, গবর্ণররাও প্রতিশ্রুতি দেন নাই। তাহার পর সরকার পক্ষ ও কংগ্রেস পক্ষ বহু বক্তৃতা ও সংবাদপত্রে প্রকাশিত বহু মতবিবৃতি পরস্পরের উদ্দেশে নিক্ষেপ করিয়াছেন। কংগ্রেস পক্ষের শেষ কথা মোটামুটি এই :—"আমরা চাই, গবর্ণর আমাদের আইনসঙ্গত কোন কাজে বাধা দিবেন না; যদি তিনি কখনও মনে করেন আমরা ঠিক কাজ করিতেছি না, তখন তিনি আমাদিগকে বরখাস্ত করিবেন। তাঁহার সঙ্গে মতভেদ হইলে আমরা কাজে ইস্তফা দিব, এমন নয়; তিনিই সেস্থলে আমাদিগকে বরখাস্ত করিবেন।"

কংগ্রেস পক্ষের দাবী ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টারি রীতি সম্মত এবং ন্যায্য। এই প্রকার প্রতিশ্রুতি গবর্ণরেরা দিতে না-চাওয়ায় বুঝা যাইতেছে, যে, গবর্ণররা চান সব কাজ তাঁহাদের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া তাঁহাদের মত অনুসারে করা হউক, এবং তাঁহাদের মত অনুসারে চলিতে না পারিলে মন্ত্রীরা স্বয়ং পদত্যাগ করিবেন। অর্থাৎ নূতন ভারতশাসন আইন তাঁহাদিগকে যে সর্ব্বাঙ্গীণ প্রভুত্ব দিয়াছে, কথায় ও কাজে তাহা সম্পূর্ণ বজায় থাকিবে। কংগ্রেস ইহাতে সম্মত নহেন, সম্মত হইতে পারেন না। কারণ, ইহা সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটিশ জাতির মার্কামারা প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব হইলেও প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব নহে।

—

কংগ্রেসের আদর্শ মুসলমান জনসাধারণকে জানাইবার চেষ্টা

মিঃ মোহম্মদ আলি জিন্না কংগ্রেসের সঙ্গে একটা চুক্তি না হইলে নিজে কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করিতে প্রস্তুত নহেন, অন্য মুসলমানরাও কংগ্রেসের সহিত সহযোগিতা করে, এরূপ চান না। তিনি প্রকারান্তরে তাঁহার চৌদ্দ দফা দাবী কংগ্রেসকে মানাইয়া লইতে চান, অথবা সরকারী সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারাটা মানাইয়া লইতে চান। মৌলানা শৌকৎআলি তাঁহার অনেকটা সমর্থন করিয়াছেন। অধিকন্তু মৌলানা বলিয়াছেন, কংগ্রেস যদি মুসলমানদের সহযোগিতা চান, তাহা হইলে আসল মুসলমানদের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চালাইতে থাকুন, নতুবা হিতে বিপরীত হইবে। আসল মুসলমানের অর্থ অবশ্য তিনি, মিঃ জিন্না ও তদ্বিধ অন্যান্য ব্যক্তি। অন্য দিকে, আগ্রা-অযোধ্যার মুসলমান কংগ্রেস নেতা মিঃ রাফিদীন কিদোয়াই, অযোধ্যার চীফ কোর্টের ভূতপূর্ব্ব প্রধান জজ সর্ ওয়াজীর হাসান, পঞ্জাবের অন্যতম মুসলমান নেতা অধ্যাপক আবদুল মজীদ খান্ প্রভৃতি মিঃ জিন্নার মত সমূহের খণ্ডন করিয়াছেন।

কংগ্রেস মুসলমান জনসাধারণের নিকট নিজের মত ও আদর্শ প্রচার করিয়া তাঁহাদিগকে কংগ্রেসের দলভুক্ত করিতে চান। মুসলমানরা কংগ্রেসওয়ালা হইলে তাঁহাদের কোনই ক্ষতি নাই। কংগ্রেসের পঞ্চাশ বৎসরের ইতিহাসে মুসলমান বা অন্য কোন অহিন্দু সম্প্রদায়ের পক্ষে অনিষ্টকর কোন কংগ্রেসী প্রস্তাবের বা কার্য্যের বিষয় আমরা অবগত নহি। বরং কংগ্রেস মুসলমানদিগকে সন্তুষ্ট করিবার নিমিত্ত সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে এক পা "অ-গ্রহণ" নামক নৌকায় রাখিয়াছিলেন, এবং আর একটা পা রাখিয়াছিলেন "অ-বর্জ্জন" নামক নৌকার উপর। মুসলমানদের প্রতি কংগ্রেসের মনোভাব ও আচরণ এরূপ, যে, হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতা কংগ্রেসকে 'য়্যান্টি-হিন্দু' বা হিন্দুবিরোধী বলিয়াছেন।

সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোকই নির্ভয়ে অনায়াসে কংগ্রেসের সভ্য হইতে পারেন।

আমাদের আশঙ্কা অন্য রকমের। করাচী কংগ্রেসে ধর্ম্ম ও শ্রেণী নির্বিশেষে সকল ভারতীয়ের যে-সকল ভিত্তিগত অধিকার ("fundamental rights") স্বীকৃত হইয়াছে, তাহা ছোট বড় সকল সম্প্রদায়ের লোকদের পক্ষে যথেষ্ট। তাহার উপর কংগ্রেস যদি এক বা একাধিক সম্প্রদায়কে বিশেষ কোন রকম প্রতিশ্রুতি দেন, তাহা হইলে কংগ্রেস গণতান্ত্রিক না হইয়া সাম্প্রদায়িক হইয়া পড়িবেন। ইতিপূর্ব্বেই সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার অগ্রহণ-অবর্জ্জনহেতু কংগ্রেসে সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ লাগিয়াছে। সেই কারণেও কংগ্রেসকে বিশেষ সাবধান থাকিতে হইবে যাহাতে মুসলমানদিগকে দলভুক্ত করিবার আত্যন্তিক আগ্রহে গণতান্ত্রিক আদর্শ হইতে কংগ্রেসওয়ালারা বিন্দুমাত্রও বিচ্যুত না হন।

—

কংগ্রেসের অবাধ্যতার শাস্তি দিবার হিড়িক

কংগ্রেসের নিয়ম বা নির্দ্দেশ না মানিয়া অবাধ্যতা করার ওজুহাতে আগে বাংলা দেশের কয়েক জনের শাস্তি হইয়াছে; সম্প্রতি আরও কয়েক জনের হইয়াছে। এ বিষয়ে আমাদের ব্যক্তিগত কোন ভয় না থাকায় এবং আমরা বঙ্গের কংগ্রেসী দলাদলির কোন পক্ষেরই সমগ্র উক্তি না পড়ায়, কোন পক্ষ অবলম্বন না করিয়া বলিতে পারি, শুধু শাস্তি দ্বারা বঙ্গে কংগ্রেস শক্তিশালী হইতে পারিবেন না, মহৎ আদর্শ অনুসারে নিঃস্বার্থ ভাবে মহৎ কাজ বাঙালী কংগ্রেসওয়ালারা করিতে পারিলে বঙ্গে কংগ্রেস শক্তিশালী হইবে। দণ্ডনীতির প্রয়োগ কোন স্থলেই করা উচিত নয়, ইহা অবশ্য আমরা বলি না।

—

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর ব্রহ্মদেশ দর্শন

ব্রহ্মদেশে পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সমুচিত সম্বর্দ্ধনা হইতেছে। ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি বিষয়ে পুরাকালে ভারতবর্ষের সহিত ব্রহ্মদেশের ঘনিষ্ঠ যোগ ছিল। মধ্যে সেই যোগসূত্র ছিন্ন হইয়াছিল; ব্রিটিশ রাজত্বকালে, ব্রিটিশ জাতির অনভিপ্রেত ভাবে, তাহা আবার স্থাপিত হয়। এখন ব্রিটিশ সাম্রাজ্যবাদী ও বণিকদের সুবিধার নিমিত্ত ব্রহ্মদেশকে ভারতবর্ষ হইতে পৃথক করা সত্ত্বেও সেই সংস্কৃতির যোগ রক্ষা করিতে হইবে। ব্রহ্মদেশনিবাসী ভারতীয়দিগকেই

অবশ্য এ বিষয়ে বিশেষ সচেষ্ট থাকিতে হইবে। ভারতীয় নেতারা মধ্যে মধ্যে এদেশ হইতে ব্রহ্মদেশে গেলে তাঁহাদের উৎসাহ বাড়িবে ও সেই চেষ্টা সফল হইবার সম্ভাবনা বাড়িবে। চেষ্টা অবশ্য ব্রহ্মদেশীয় নেতাদের সহযোগিতায় করিতে হইবে।

এমন ভারতীয় আছেন যাঁহারা রাষ্ট্রনৈতিক ও সাংস্কৃতিক উভয় দিক্ দিয়াই নেতৃস্থানীয়। কেহ কেহ কেবল এক এক দিকে নেতা। সকল রকম নেতারই ব্রহ্মদেশে মধ্যে মধ্যে যাওয়া আবশ্যক।

পণ্ডিতজী ঠিকই বলিয়াছেন, যে, ব্রহ্মদেশের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় ভারতবর্ষকে তাহার সহায় হইতে হইবে, এবং ভারতবর্ষের স্বাধীনতা-প্রচেষ্টায় ব্রহ্মদেশকে তাহার সহায় হইতে হইবে।

এখানে একটা অবান্তর কথা বলি। ব্রহ্মদেশে যত ভারতীয় আছেন তাঁহাদের মধ্যে বাঙালীদের সংখ্যা অন্য কোন প্রদেশের লোকদের চেয়ে কম নয়—বোধ হয় বেশী। ব্রহ্মদেশনিবাসী শিক্ষিত সব বাঙালী সরকারী চাকর্যেও নহেন। কিন্তু রাষ্ট্রীয় বা অন্যবিধ সার্ব্বজনিক কাজে নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের মধ্যে বাঙালীর নাম প্রায়ই দেখিতে পাই না। পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর সম্বর্দ্ধনাদি ব্যাপারেও নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের নাম চোখে পড়ে নাই। ইহার কারণ কি?

জনসেবাসম্বন্ধীয় কাজে রামকৃষ্ণ মিশনের স্বামী শ্যামানন্দের কথা আমরা বিস্মৃত হইয়া কোন কথা লিখিতেছি না।

ভারতবর্ষ ও চীনের ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধীয় সম্পর্ক

বহু শতাব্দী পূর্ব্বে ভারতবর্ষীয় বৌদ্ধ ভিক্ষুরা বৌদ্ধধর্ম্ম শিক্ষা দিবার জন্য চীনদেশে গিয়াছিলেন। তাঁহারা সাম্রাজ্যস্থাপক কোন রাজা সম্রাট বা অন্য যোদ্ধার অগ্রদূত বা চর হইয়া যান নাই, কোন প্রভুজাতির মানুষ রূপেও তাহার সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ পৃষ্ঠপোষকতায় যান নাই। ভারতবর্ষীয় ধর্ম্মোপদেষ্টাদিগের অসহায় অবস্থায় নদী, গিরি, অরণ্য, মরুভূমি অতিক্রম করিয়া চীন যাত্রা বিস্ময়কর ঘটনা। ধর্ম্ম ভিন্ন অন্য নানা বিষয়েও—সাহিত্যে চিত্রকলায়, ভাস্কর্য্যে, স্থাপত্যেও—চীনের উপর ভারতবর্ষের প্রভাব লক্ষিত হয়। ভারতবর্ষের উপরও চীনের প্রভাব পড়িয়াছিল।

পুরাকালের এই আদানপ্রদান বরাবর রক্ষিত হয় নাই। আধুনিক সময়ে রবীন্দ্রনাথ কয়েক জন বয়ঃকনিষ্ঠ সহচরকে সঙ্গে লইয়া যে কয়েক বৎসর পূর্ব্বে চীনদেশে গিয়াছিলেন, তাহাই চীন ও ভারতের প্রাচীন সম্পর্ক পুনরুজ্জীবিত করিবার প্রথম প্রয়াস। বিশ্বভারতীতে চীনের ভাষা ও সাহিত্য অধ্যাপনার ব্যবস্থা সেই চেষ্টার অংশীভূত।

অধ্যাপক তান য়ুন-শান মহাশয়ের অধ্যবসায়ে ও চীনের সেনাপতি চিয়াংকাইশেক প্রমুখ রবীন্দ্রনাথের কয়েক জন চৈনিক বন্ধুর আনুকূল্যে শান্তিনিকেতনে একটি চীন-ভবন প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। গত ১লা বৈশাখ ইহার গৃহপ্রবেশ-উৎসব যথারীতি সম্পন্ন হয়। তদুপলক্ষ্যে বৈদিক মন্ত্রপাঠ ও সঙ্গীতের পর কবি তাঁহার অভিভাষণ পাঠ করেন। মহাত্মা গান্ধী, পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু প্রভৃতির বক্তব্য পঠিত হয়। চীনের বাণিজ্যদূত এবং অধ্যাপক তান য়ুন-শান বক্তৃতা করেন। উৎসবে যোগ দিবার নিমিত্ত কলিকাতা হইতে অনেক ভদ্রলোক ও ভদ্রমহিলা গিয়াছিলেন। এলাহাবাদ হইতে শ্রীমতী ইন্দিরা নেহরু তাঁহার পিতার বক্তব্য লইয়া আসিয়াছিলেন। অসুস্থতাবশতঃ পণ্ডিতজী আসিতে পারেন নাই। তাঁহারই সভাপতি হইবার এবং চীন-ভবনের দ্বারোদ্ঘাটন করিবার কথা ছিল।

দুটা জাতির মধ্যে মনকষাকষি ঝগড়া বিবাদ যুদ্ধ অপেক্ষা এই ঘটনার গুরুত্ব অনেক বেশী। অথচ ইহার সংবাদ পৃথিবীর সর্ব্বত্র প্রচারিত হইবার সম্ভাবনা কম।

চৈনিক ভবনটি নির্ম্মাণ করিতে শুনিয়াছি ৩৩০০০ টাকা খরচ হইয়াছে। পরিকল্পনাটি শ্রীযুত সুরেন্দ্রনাথ করের, নির্ম্মাতা শ্রীযুক্ত বীরেন্দ্রমোহন সেন। এই ভবনে চৈনিক সাহিত্য আদির অধ্যাপক ও ছাত্রদের থাকিবার স্থান আছে, ইহাতে বহু সহস্র চৈনিক গ্রন্থ থাকিবে, অনেক হাজার বহি ইতিমধ্যেই আসিয়াছে, এবং চীনের ললিতকলার অনেক প্রতিলিপিও ইহাতে রক্ষিত হইবে।

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব

রবীন্দ্রনাথের জন্মোৎসব নানা স্থানে হইয়াছে। তাহার মধ্যে বিশ্বভারতীর আশ্রমিক সংঘের উদ্যোগে কলিকাতায় শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্র সেনের বাড়ীতে শান্তিনিকেতনের প্রাক্তন ছাত্রদের যে সভা হইয়াছিল, তাহাতে উপস্থিত থাকিবার সুযোগ আমাদের হইয়াছিল। এই সভাতে শ্রীযুক্ত নেপাল চন্দ্র রায়, শ্রীযুক্ত পণ্ডিত বিধুশেখর শাস্ত্রী, শ্রীযুক্ত অনাথনাথ বসু, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রভূষণ গুপ্ত প্রভৃতি এবং অনেক প্রাক্তন ছাত্র-ছাত্রী ও অন্য ভদ্রমহিলা ও ভদ্রলোক উপস্থিত ছিলেন। সঙ্গীত ও সভাপতির বক্তব্যের পর মধ্যে মধ্যে আরও গান হয়, শ্রীমতী নিরুপমা দেবী একটি কবিতা পড়েন, তাঁহার নির্মিত ও কবিকে উপহৃত একটি সুন্দর পুস্তকাধার প্রদর্শিত হয়, শ্রীযুক্ত প্রভাতচন্দ্র গুপ্ত একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন, অনাথবাবু ও শাস্ত্রী মহাশয় কিছু বলেন, কবিকে প্রাক্তন ছাত্রছাত্রীরা যে প্রণামী গরদের ধুতিচাদর উপহার দিয়াছেন তাহা প্রদর্শিত হয়, সভাপতি আরও দুই বার কিছু বলেন, এবং জলযোগ ও ফোটোগ্রাফগ্রহণের পর রাত্রি ৯টার সময় সভা ভঙ্গ হয়।

—

"ফুকা" প্রথার বিরুদ্ধে আন্দোলন

কোন কোন গোয়ালা "ফুকা" দ্বারা মহিষ ও গোরুর দুধ শেষ ফোঁটাটি পর্য্যন্ত দুহিয়া লয়। এই প্রক্রিয়া অস্বাভাবিক, নৃশংসতাজনক ও জুগুপ্সিত। ইহার দ্বারা প্রাপ্ত দুগ্ধ কখনও স্বাস্থ্যকর হইতে পারে না। ইহার আরও একটা কুফল এই, যে, এই প্রক্রিয়া দ্বারা যে গোরু বা মহিষের দুগ্ধ দোহন করা হয়, তাহা প্রায়ই পুনর্ব্বার গর্ভবতী ও দুগ্ধবতী হয় না। সেই জন্য অনেক বহুমূল্য ও উৎকৃষ্ট গোরু ও মহিষ, ফুকার দ্বারা আর যখন দুধ পাওয়া যায় না, তখন কসাইদিগকে বিক্রী করিয়া ফেলা হয়। এইরূপ অনুমিত হইয়াছে, যে, প্রতি বৎসর এই প্রকারে প্রায় পঞ্চাশ হাজার ভাল গোরু ও মহিষ নিহত হয় যাহাদের দুগ্ধ স্বাভাবিক ভাবে দোহিত হইলে যাহারা আরও অনেক বার দুগ্ধবতী হইতে পারিত এবং যাহাদের উৎকৃষ্ট বাছুর অনেক বার হইত। কলিকাতা, বোম্বাই প্রভৃতি বড় শহরে এই জঘন্য ও অনিষ্টকর প্রথা প্রচলিত আছে। ইহার বিরুদ্ধে আইন আছে কিন্তু তাহা সত্ত্বেও ইহা চলিতেছে। এই জন্য আইন কঠোরতর করাইবার এবং তাহা কঠোরতর ভাবে প্রয়োগ করাইবার নিমিত্ত আন্দোলন হইতেছে। এই আন্দোলন সর্ব্বসাধারণের সম্পূর্ণ সমর্থন করা উচিত।

কেবল শাস্তির দ্বারাই এই কুৎসিত প্রথা রহিত করিবার চেষ্টা না করিয়া গোয়ালা-সমাজের মধ্যেও এরূপ আন্দোলন ও প্রচারকার্য্য চালান উচিত যাহাতে, ফুকা প্রক্রিয়া যাহারা অবলম্বন করে, তাহারা তাহা হইতে নিরস্ত হয়।

—

"কালান্তর"

রবীন্দ্রনাথের গত জন্মোৎসবের দিন তাঁহার "কালান্তর" নামক একটি নূতন প্রবন্ধসংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশিত হইয়াছে। ইহাতে পনরটি প্রবন্ধ আছে। যথা—কালান্তর, বিবেচনা ও অবিবেচনা, লোকহিত, লড়াইয়ের মূল, কর্ত্তার ইচ্ছায় কর্ম্ম, ছোটো ও বড়ো, বাতায়নিকের পত্র, শক্তিপূজা, সত্যের আহ্বান, সমস্যা, সমাধান, শূদ্রধর্ম্ম, বৃহত্তর ভারত, হিন্দু-মুসলমান, ও নারী।

প্রবন্ধগুলি নূতন লিখিত না হইলেও ইহার কোনটিই এমন কোন সমস্যা বা প্রশ্নের বিষয়ে লিখিত নহে, যাহার সমাধান হইয়া গিয়াছে। সুতরাং সবগুলিরই এখনও উপযোগিতা আছে। সবগুলি একখানি বহির মধ্যে পাওয়া সুবিধাজনক। একটি পাতা উল্টাইতে হঠাৎ চোখে পড়িল,

যা দেবী রাজ্যশাসনে
প্রেষ্টিজ্-রূপেণ সংস্থিতা
নমস্তস্যৈ নমস্তস্যৈ
নমস্তস্যৈ নমোনমঃ।

প্রেষ্টিজ্ যাইবার ভয়ে ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের প্রাদেশিক গবর্ণরেরা মন্ত্রী হইবার যোগ্য কংগ্রেসওয়ালাদিগকে এই প্রতিশ্রুতি দিতে পারিতেছেন না, যে, তাঁহাদের আইন-সঙ্গত কাজে বাধা দিবেন না।

—

"বঙ্গীয় মহাকোষ"

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ মহাশয়ের সম্পাদকতায় বঙ্গীয় মহাকোষের প্রথম খণ্ড সমাপ্ত হইয়া

দ্বিতীয় খণ্ডের প্রথম সংখ্যা বাহির হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে বারটি সংখ্যা ছিল। সর্ব্বসমেত তেরটি সংখ্যা বাহির হইল। সংখ্যাগুলি পূর্ব্ববৎ পাণ্ডিত্যের সহিত লিখিত ও সম্পাদিত এবং উৎকৃষ্ট কাগজে সুমুদ্রিত হইতেছে। বিদ্যাভূষণ মহাশয় যোগ্য বহু সহকারী সম্পাদক এবং শব্দগুলির সম্বন্ধে ক্ষুদ্র ও বৃহৎ প্রবন্ধ লিখিবার অনেক বিদ্বান লেখক সংগ্রহ করিয়াছেন। আশা করি নিয়মিত প্রকাশের আর্থিক ব্যবস্থাও হইয়াছে।

—

ফ্রান্স-অধিকৃত ভারতে বাল্যবিবাহ নিরোধ

১৮ বৎসরের কম বয়সের বালকের ও ১৪ বৎসরের কম বয়সের বালিকার বিবাহ ব্রিটিশ-ভারতে দণ্ডনীয় হওয়ার পর কোন কোন গোঁড়া হিন্দু ভারতবর্ষের ফ্রান্সের অধিকৃত কয়েকটি স্থানে গিয়া কম বয়সের ছেলেমেয়েদের বিবাহ দিত। বঙ্গের কেহ কেহ—বিশেষতঃ মাড়োয়ারীরা—চন্দননগরে গিয়া ইহা করিত। সম্প্রতি ভারতবর্ষে ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষ ব্রিটিশ আইনের অনুরূপ আইন পাস করিয়াছেন। অতএব এখন আর ফ্রান্স-অধিকৃত স্থানে গিয়া বাল্যবিবাহ-নিরোধ আইন লঙ্ঘন করা চলিবে না। ফরাসী কর্ত্তৃপক্ষের এই কাজটি বড় ভাল হইয়াছে।

—

ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জের স্বাধীনতালাভ নিকটতর

ত্রিশ-পঁয়ত্রিশ বৎসর আমেরিকার অধীন থাকিবার পূর্ব্বেই ফিলিপাইন দ্বীপপুঞ্জ তাহার আভ্যন্তরীণ বিষয়সমূহে আত্মকর্ত্তৃত্ব পাইয়াছিল। ১৯৪৬ সালে তাহার স্বাধীনতা-লাভ নিশ্চিত হইয়াছিল। সম্প্রতি সেই তারিখ আগাইয়া আনিয়া স্থির করা হইয়াছে, যে, ১৯৩৮-৩৯ সালে ফিলিপিনোরা স্বাধীনতা লাভ করিবে।

রবীন্দ্রনাথের একটি সুপ্রসিদ্ধ গানে আছে—

"দিন আগত ঐ, ভারত তবু কই ?"

প্রতিধ্বনি উত্তর দেয়, "কই, ভারত তবু কই ?"

—

নিখিল ভারতীয় প্রাচ্য কন্‌ফারেন্সে বাংলা ভাষার স্থান নাই

ত্রিবাঙ্কুড় রাজ্যের ত্রিবন্দ্রম্ শহরে আগামী ডিসেম্বর মাসে নিখিলভারতীয় প্রাচ্য কনফারেন্স হইবে। তাহাতে যে-সকল ভারতীয় ভাষা ব্যবহৃত হইতে পারিবে, বাংলা তাহাদের মধ্যে স্থান পায় নাই। সংস্কৃতির বাহনরূপে বাংলা ভারতীয় কোন ভাষার নিম্নস্থানীয় নহে। অতএব বাংলার এই অনাদর সমীচীন হয় নাই।

—

তোকিওর বিশ্বশিক্ষা-কন্‌ফারেন্সে ভারতীয় প্রতিনিধিবর্গ

আগামী আগষ্ট মাসে জাপানের রাজধানী তোকিও নগরে পৃথিবীর সব দেশের শিক্ষা কন্‌ফারেন্স বসিবে। তাহার জন্য বোম্বাই হইতে এক দল প্রতিনিধি রওনা হইয়াছেন। প্রতিনিধিদের সংখ্যা ৯। এই নয় জনের মধ্যে এক জন পুরুষ, তিনি মান্দ্রাজী। বাকী আট জন মহিলা, তন্মধ্যে এক জন মান্দ্রাজী মহিলা, সাত জন বোম্বাইয়ের। দলটির নেত্রী এক জন মহিলা। বাংলা হইতে পুরুষ বা মহিলা কেহ যাইবেন কি ? অধ্যাপক কালিদাস নাগকে ছয় মাসের জন্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হাওয়াই বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতবর্ষের প্রাচীন সংস্কৃতি বিষয়ে অধ্যাপকতা করিতে পাঠাইয়াছেন। তিনি ফিরিবার পথে বিশ্বশিক্ষা-কন্‌ফারেন্সে যোগ দিবেন।

—

গোরা সৈন্যদের পাঁচ বার আহার

বর্ত্তমানে ভারতবর্ষে গোরা সৈন্যেরা প্রত্যহ চারি বার আহার করে—অবশ্য ভারতবর্ষের টাকায়। অতঃপর গবর্ন্মেণ্ট তাহাদিগকে প্রত্যহ পাঁচ বার খাইতে দিবেন। সিপাহীরা অত বার খায় না, কিন্তু যুদ্ধ পৃথিবীর কোন দেশের সৈন্যদের চেয়ে মন্দ করে না।

এক এক জন গোরা সৈন্যের জন্য বেতনাদি বাবদে ভারতবর্ষের ব্যয় হয় এক এক জন সিপাহীর জন্য ব্যয়ের চারি গুণ। অতঃপর কত গুণ হইবে ?

—

বাখরগঞ্জ মহিলা সম্মেলনে গৃহীত প্রস্তাবসমূহ

শ্রীযুক্তা হেমপ্রভা মজুমদারের নেতৃত্বে বাখরগঞ্জ মহিলা সম্মেলনে যে-যে বিষয়ে প্রস্তাব গৃহীত হইয়াছে নীচে তাহার অধিকাংশ মুদ্রিত হইল।

(২) কংগ্রেসের নির্দ্দেশ অনুসারে পরিচালিত স্বাধীনতার অহিংস সংগ্রামে যোগদানের জন্য বাখরগঞ্জের নারীদিগকে আহ্বান; (৩) আর্থিক বিষয়ে অনুগ্রহজীবিত্ব হইতে মুক্তি কামনায় কুটির-শিল্পের উন্নতি সাধনের ব্রত গ্রহণ করিবার জন্য নারীজাতিকে অনুরোধ; (৪) অস্পৃশ্যতা দূরীকরণ; (৫) বালিকাদের জন্য বর্ত্তমানে যে শিক্ষাপদ্ধতি প্রচলিত রহিয়াছে তাহার নিন্দাবাদ এবং জাতীয়তার ভিত্তিতে উহার সংস্কারসাধনকল্পে আন্দোলন চালাইবার অনুরোধ; (৬) পল্লীসমূহে অবৈতনিক প্রাথমিক শিল্প-বিদ্যালয় ও ধাত্রী-বিদ্যালয় স্থাপনের দাবী; (৭) বালবিধবাদের পুনর্বিবাহ সমর্থন; (৯) বিনাবিচারে আটক বন্দীদিগকে অবিলম্বে মুক্তি দিবার দাবী; (১০) অনভিপ্রেত শাসনতন্ত্র দেশবাসীর উপর চাপাইয়া দিবার প্রতিবাদস্বরূপ সম্রাটের রাজ্যাভিষেক সম্পর্কিত সমস্ত উৎসব বর্জ্জনের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ, ও (১১) সাম্রাজ্যবাদী সংগ্রামের নিন্দাবাদ এবং কংগ্রেস সুভাষ ফণ্ডে অর্থসাহায্য দানের জন্য দেশবাসীকে অনুরোধ।

—

ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয়

ডাক্তার বি এস্ মুঞ্জে নাসিকের সামরিক বিদ্যালয় সম্বন্ধে অন্যান্য কথার মধ্যে জনসাধারণকে জানাইয়াছেন,

আমরা আগামী ১৪ই অক্টোবর বৃহস্পতিবার শুভ দশেরা দিন হইতে অশ্বারোহণ ও রাইফেল দ্বারা লক্ষ্যভেদ শিক্ষার কার্য্য আরম্ভ করিতে পারিব বলিয়া আশা করি।

১৫ই জুন হইতে ভোঁসলা সামরিক বিদ্যালয় খোলা হইবে। যাঁহারা এই স্কুলে ভর্ত্তি হইতে চাহেন, তাঁহাদিগকে দরখাস্ত করিবার জন্য অনুরোধ করা যাইতেছে।—ইউনাইটেড প্রেস

এই বিদ্যালয়ে বাঙালী হিন্দু ছাত্রেরাও ভর্ত্তি হইতে পারেন। তাঁহারাও দরখাস্ত করুন।

—

রাজা ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক

ইংলণ্ডে রাজা ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক খুব ধূমধামের সহিত হইয়াছে। সেখানে বক্তৃতায়, কাগজেপত্রে, ছবিতে সিংহাসনত্যাগী রাজা অষ্টম এডোয়ার্ডকে মুছিয়া ফেলা হইয়াছে—যেন একটা গোপনীয় উগ্র ষড়যন্ত্রের দ্বারা ইহা করা হইয়াছে। কিন্তু বহু ইংরেজ পুরুষ ও নারী নিশ্চয়ই মনে মনে অষ্টম এডোয়ার্ডের কথা ভাবিয়াছে।

ব্রিটেনে সাধারণতন্ত্রবাদী লোক আছে, সমাজতান্ত্রিক আছে, কম্যুনিষ্টও আছে। কিন্তু মোটের উপর তাহাদের সংখ্যা কম, বেশীর ভাগ লোক রাজা চায়। সুতরাং মনে মনে অষ্টম এডোয়ার্ডের জন্য দুঃখ করিলেও, ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উৎসবে আন্তরিক সুখ ও রাজানুগত্য ব্রিটেনে বিস্তর লোক অনুভব করিয়াছে। ডোমীনিয়নগুলিতে অর্থাৎ স্বরাজ্যের অধিকারভোগী দেশসমূহে, শ্বেতকায়েরা মালিক। ইংলণ্ডের রাজা তাহাদের উপর প্রভুত্ব করেন না ও প্রভুত্ব চালান না। সুতরাং তাহাদের তাঁহার উপর অসন্তুষ্ট হইবার কারণ নাই।

ভারতবর্ষের কথা স্বতন্ত্র। এখানে বড়লাট ভারতীয়দের নিকট হইতে প্রতিনিধিত্বের কোন অধিকার না-পাইয়াও তাহাদের পক্ষ হইতে অনেক কথা বলিয়াছেন। ভারত গবর্মেণ্টের বাণিজ্য-সচিব সর্ জাফরুল্লা খাঁও তাহা করিয়াছেন। এই সকল কথার মূল্য সবাই বুঝে। তৎসমুদয়ের সমালোচনা করা নিষ্প্রয়োজন।

ভারতবর্ষের লোকেরা রাজা ষষ্ঠ জর্জের রাজ্যাভিষেক উৎসবের সময় তাঁহার প্রতি কোন অসৌজন্য করিতে বা তাঁহাকে অসম্মান দেখাইতে আন্তরিক অনিচ্ছা পোষণ করে। কিন্তু তাহারা আপনাদের মনুষ্যোচিত অধিকার ও মর্য্যাদা রক্ষা করিতে চায়। তাহা করিবার অধিকার তাহাদের আছে। এই উদ্দেশ্যে ভারতবর্ষের প্রধান রাষ্ট্রনৈতিক সভা কংগ্রেস, কারণ দেখাইয়া, সকলকে রাজ্যাভিষেক উৎসবে যোগ দিতে নিষেধ করিয়াছে। কলিকাতা, হাবড়া, এবং অন্য কোন কোন মিউনিসিপালিটি প্রকাশ্য প্রস্তাব দ্বারা রাজ্যাভিষেক উৎসব বর্জ্জন করিয়াছে।

মন্ত্রপাঠ, হোম, পূজা, আতসবাজী, কাঙালীভোজন, জনতা ভারতবর্ষেও হইবে। তাহার অর্থ ও মূল্য চিন্তাশীল লোকেরা সবাই বুঝে।

—

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল

বঙ্গের মাধ্যমিক শিক্ষা বিল গোপনে গোপনে প্রস্তুত হইয়াছে। শিক্ষাবিভাগের বড় কর্ম্মচারীরা—সবাই বা

প্রায় সবাই মুসলমান, কারণ তাঁহারাই জগতে, ভারতে ও বঙ্গে শিক্ষায় অগ্রণী ও অগ্রসরতম—দার্জিলিঙে খসড়াটা পালিশ করিতেছেন, তাহাতে শান দিতেছেন। গবন্মেণ্ট কয়েক বৎসর হইতে বঙ্গের উচ্চ বিদ্যালয়গুলির সংখ্যা কমাইতে দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইয়াছেন; কিন্তু কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয় তাহাদিগকে প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য শিক্ষা দিবার ও ছাত্রছাত্রী পাঠাইবার যোগ্য বা অযোগ্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিবার মালিক থাকায় গবন্মেণ্ট নিজ উদ্দেশ্য সাধন করিতে পারেন নাই। এখন নূতন আইন করিয়া মাধ্যমিক শিক্ষার ও উচ্চ বিদ্যালয়গুলির কর্ত্তৃত্ব একটা বোর্ডের হাতে দেওয়া হইবে। বোর্ডটা শুধু শিখণ্ডী, বিশ্ববিদ্যালয়গুলির বিরুদ্ধে অভিযান শিক্ষাবিভাগের ডিরেক্টরই চালাইবেন। উচ্চ বিদ্যালয়গুলির অধিকাংশ বেসরকারী, দেশের লোকের টাকায় চলে। কিন্তু তাহাদের উপর সরকার প্রভুত্ব করিতে চান। অনেকগুলি বেশ কেজো নয়, সত্য। কিন্তু যথেষ্ট টাকা দিলেই কেজো হয়। সরকার তাহা করিবেন না, অনেকগুলিকে উঠাইয়া দিবেন। দুর্ভিক্ষের সময় দরিদ্র দেশবাসীরা সামান্য পরিমাণে মোটা ভাত নিরন্নদিগকে দিলে যদি কেহ বলে, "এটা ঠিক নয়, আমি কতকগুলি লোককে রাজভোগ দিব, তোমাদের মোটা ভাতের অন্নসত্র উঠাইয়া দিব—ওরকম খারাপ খাদ্য লোককে দেওয়া উচিত নয়," তাহা হইলে ব্যবহারটা যেমন হয়, শিক্ষাদুর্ভিক্ষগ্রস্ত এই দেশে অকেজোত্বের ওজুহাতে বহু বিদ্যালয় উঠাইয়া দেওয়াও সেইরূপ।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় প্রবেশিকাতে যে মাতৃভাষাকে বাহন করিয়াছে, সে ব্যবস্থা মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড সম্ভবতঃ সরকারী হুকুমে রদ করিবে। সম্পূর্ণ রদ যদি না-ও করে, তাহা হইলেও, যে-সব বাংলা বহি চলিবে, বঙ্গসাহিত্যে ও বঙ্গভাষায় অপ্রচলিত বহু আরবী-ফারসী শব্দে তাহা কণ্টকিত করা হইবে। মুসলমানপ্রধান মন্ত্রিসভা ও শিক্ষাবিভাগ "হিন্দু" বাংলা ভাষা বরদাস্ত করিবে না। আরও কি কি অনিষ্ট বিলটার দ্বারা হইতে পারে, তাহা পরে লিখিব, এখন সংক্ষেপে বলা চলিবে না।

বাংলা দেশে উচ্চ বিদ্যালয়ের সংখ্যা বড় বেশী এবং বড় বেশীসংখ্যক ছেলেমেয়ে প্রবেশিকা পরীক্ষায় পাস করে, এই ধারণাটা সম্পূর্ণ মিথ্যা। বর্ত্তমান বৎসরে পঞ্জাবে প্রবেশিকা ও তত্তুল্য পরীক্ষায় ২২৪৬৮ পরীক্ষার্থীর মধ্যে ১৭১৬৩ জন উত্তীর্ণ হইয়াছে, বঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটির অধিক, পঞ্জাবের লোকসংখ্যা আড়াই কোটির কম। অতএব, বঙ্গে অন্যূন ৪৫,০০০ ছাত্রছাত্রীর প্রবেশিকা পরীক্ষা দেওয়া উচিত। তাহা দেয় কি?

—

রেলের তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বৃদ্ধি

এই দুর্ভাগ্য দেশে সরকারী ব্যয় সঙ্কোচ বা আয় বৃদ্ধি করিতে হইলে দরিদ্রের উপরই কর্ত্তৃপক্ষের অনুগ্রহদৃষ্টি আগে পড়ে। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে আয় বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে তৃতীয় শ্রেণীর ভাড়া বাড়াইয়া দিয়াছেন। প্রতিবাদ অরণ্যে রোদন।

—

কৃষ্ণকুমার মিত্রের চিত্র প্রতিষ্ঠা

গত মাসে সিটি স্কুলের শিক্ষক ও ছাত্রগণ বিদ্যালয়ে স্বর্গত কৃষ্ণকুমার মিত্রের চিত্র প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন। সাহিত্যাচার্য্য হেরম্বচন্দ্র মৈত্রেয় মহাশয় সভাপতির আসন গ্রহণ করেন। অমৃতবাজার পত্রিকার প্রধান সম্পাদকীয় লেখক শ্রীযুক্ত মৃণালকান্তি বসু, কলিকাতার ভূতপূর্ব্ব মেয়র শ্রীযুক্ত সন্তোষ কুমার বসু, বঙ্গীয় রাষ্ট্রপরিষদের সভাপতি মাননীয় শ্রীযুক্ত সত্যেন্দ্রচন্দ্র মিত্র, অধ্যাপক শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ, আনন্দবাজার পত্রিকার বাণিজ্য-সম্পাদক শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য, প্রবাসী-সম্পাদক প্রভৃতি মিত্র মহাশয়ের ভগবদ্ভক্তি, দেশসেবা, সত্যনিষ্ঠা, নির্ভীকতা, যশস্পৃহার অভাব প্রভৃতি বিষয়ে বক্তৃতা করেন।

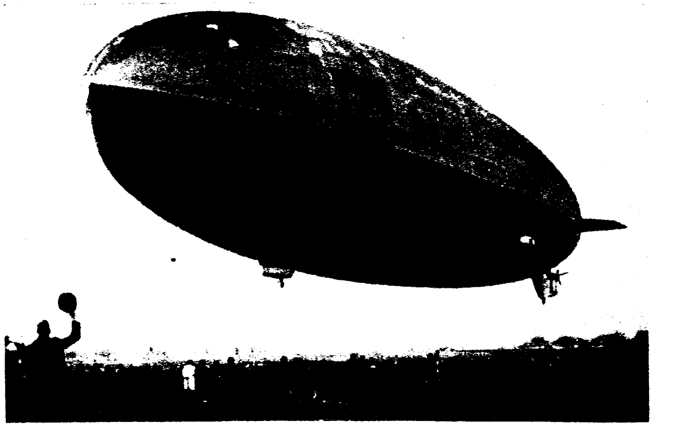
—

দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে ছাত্রছাত্রীদের কাজ

দীর্ঘ গ্রীষ্মাবকাশে ছাত্রছাত্রীরা বিশ্রাম ও খেলাধূলার দ্বারা স্বাস্থ্যের উন্নতি করিতে পারিলে তাহা সন্তোষের বিষয় হইবে। সঙ্গে সঙ্গে তাঁহারা দেশের দরিদ্র জনসাধারণের সহিত মিশিয়া তাহাদের প্রকৃত অবস্থা উপলব্ধি করিতে পারিলে তাঁহাদের ভবিষ্যৎ কর্ম্মজীবনে তাহা কাজে লাগিবে এবং বর্ত্তমানেও সমগ্র জাতির সকল শ্রেণীর লোকদের মধ্যে সদ্ভাব ও সংহতি বৃদ্ধি পাইবে। প্রত্যেক ছাত্র ও ছাত্রী এই দীর্ঘ অবকাশে দুই-এক জন করিয়া নিরক্ষর লোককে লিখিতে পড়িতে শিখাইয়া আত্মপ্রসাদ লাভ করুন। তাহা সুসাধ্য।



বার্লিনে হিটলারের জন্মোৎসব। হিটলার মোটরগাড়ীতে দাঁড়াইয়া সৈন্যদের অভিবাদন গ্রহণ করিতেছেন, দেখা যাইতেছে

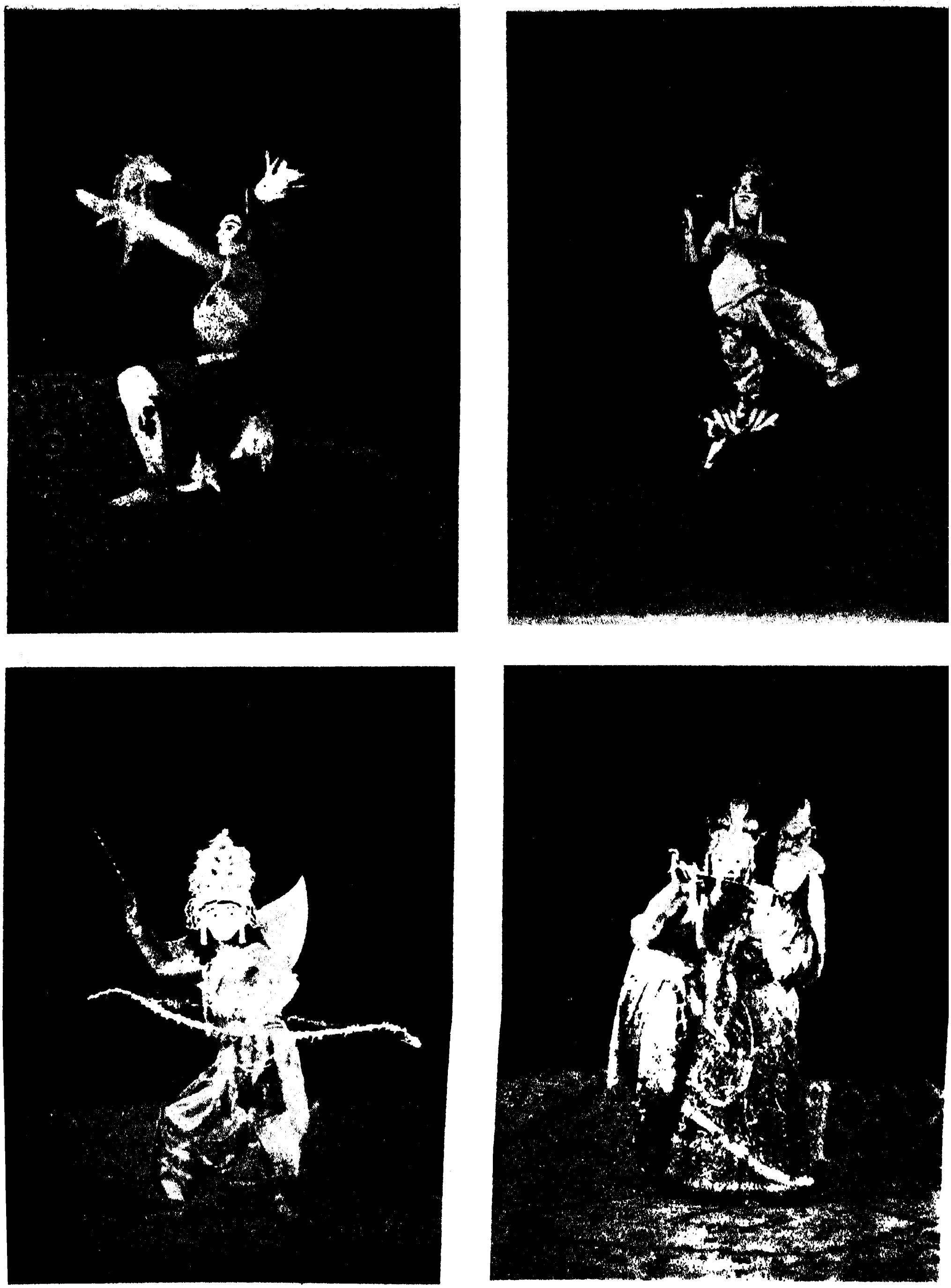


সুপ্রসিদ্ধ জর্ম্মন বিমানপোত 'হিণ্ডেনবুর্গ' ৬ই মে দৈবদুর্য্যোগে ধ্বংসপ্রাপ্ত হইয়াছে। ইহার পরিকল্পক ডক্টর একনারের মতে নাৎসী-বিরোধী ষড়যন্ত্রের ফলেই নাকি এইরূপ ঘটিয়াছে

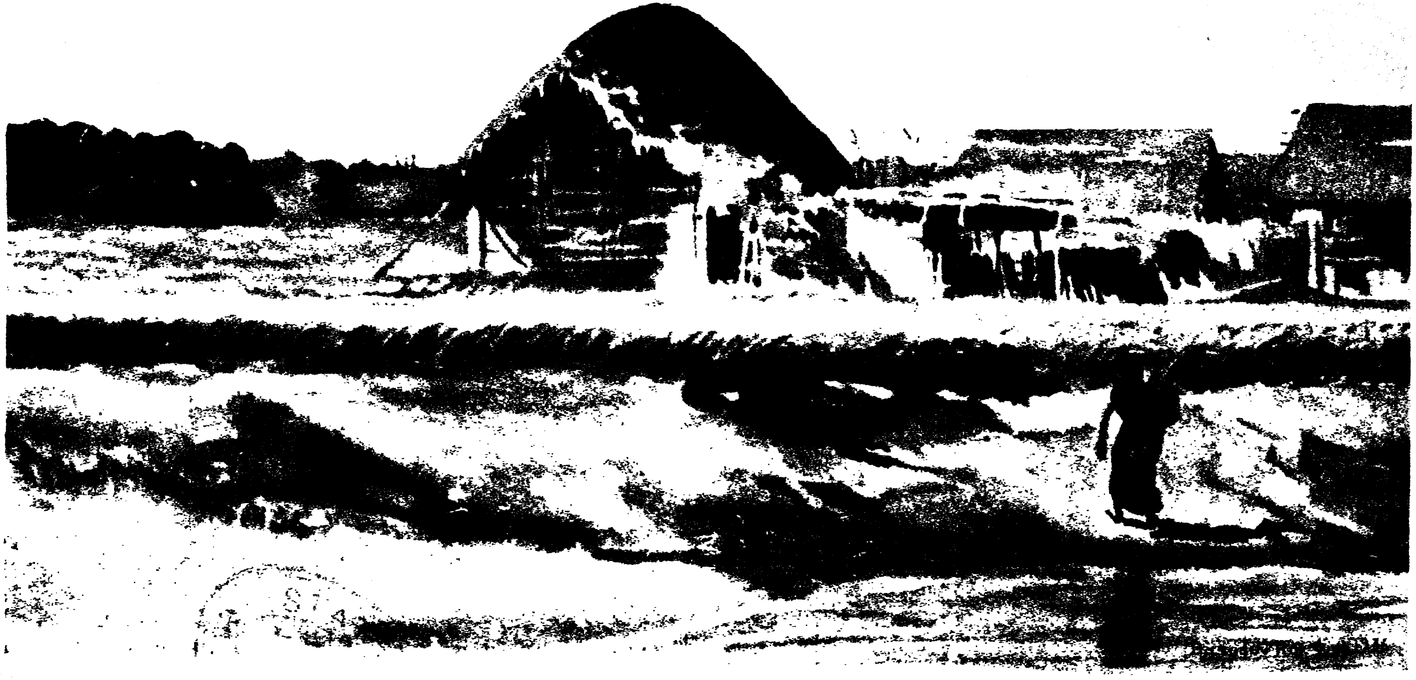


সম্রাট ষষ্ঠ জর্জ্জের রাজ্যাভিষেকে লণ্ডনে সমাগত নেপালের প্রতিনিধিবর্গ।





হভূমের অন্তর্গত সেরাইকেলায় চৈত্র মাসের অন্তে যে চৈত্র-পর্ব্ব বা বসন্তোৎসব অনুষ্ঠিত হয় তাহার প্রধান অঙ্গ 'ছো' বা মুখোস নৃত্য। তিন দিন ধরিয়া ধনীদরিদ্রনির্ব্বিশেষে সর্ব্বসাধারণে মিলিয়া এই নৃত্যোৎসব চলে। বিভিন্ন পৌরাণিককাহিনী এই নৃত্যের উপজীব্য। এই নৃত্যে শুধু পুরুষগণই অংশ গ্রহণ করেন।



পদ্মাপারে

শ্রীবাসুদেব রায়

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

আষাঢ়, ১৩৪৪

৩য় সংখ্যা

জন্মদিন

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

দৃষ্টিজালে জড়ায় ওকে হাজারখানা চোখ,
ধ্বনির ঝড়ে বিপন্ন ঐ লোক।
জন্মদিনের মুখর তিথি যারা ভুলেই থাকে,
দোহাই ওগো, তাদের দলে লও এ মানুষটাকে,
সজ্‌নে পাতার মতো যাদের হাল্‌কা পরিচয়,
ঝুলুক খসুক শব্দ নাহি হয়।

সবার মাঝে পৃথক ওযে ভিড়ের কারাগারে
খ্যাতি-বেড়ির নিরন্তর ঝঙ্কারে।
সবাই মিলে নানা রঙে রঙীন-করা ওরে
নিলাজমঞ্চে রাখচে তুলে ধ'রে,
আঙুল তুলে দেখাচ্চে দিনরাত,
লুকোয় কোথা, আড়াল ভূমিসাৎ।
দাও না ছেড়ে ওকে
স্নিগ্ধ আলো শ্যামল ছায়া বিরল কথার লোকে,
বেড়াবিহীন বিরাট ধূলি'পর,
সেই যেখানে মহাশিশুর আদিম খেলাঘর।

ভোরবেলাকার পাখীর ডাকে ঠেক্‌ল খেয়া এসে
সব প্রথমের চেনাশোনার দেশে ;
নাম্‌ল ঘাটে, তখন তারে সাজ রাখে নি ঢেকে,
ছুটির আলো নগ্ন গায়ে লাগ্‌ল আকাশ থেকে,
যেমন ক'রে লাগে তরীর পালে,
যেমন লাগে অশোক গাছের কচি পাতার ডালে।
নাম-ভোলা ফুল ফুটল ঘাসে ঘাসে
সেই প্রভাতের সহজ অবকাশে।
ছুটির যজ্ঞে পুষ্পহোমে জাগ্‌ল বকুলশাখা,
ছুটির শূন্যে ফাগুনবেলা মেল্‌ল সোনার পাখা।

ছুটির কোণে গোপনে তার নাম
আচম্‌কা সেই পেয়েছিল মিষ্টি সুরের দাম ;
কানে কানে সে নাম-ডাকার ব্যথা উদাস করে
চৈত্রদিনের স্তব্ধ দুই পহরে।
আজ সবুজ এই বনের পাতায় আলোর ঝিকিমিকি
সেই নিমেষের তারিখ দিল লিখি।

আজ কেন ওর মনে লাগে, এবার যাত্রাশেষে
নৌকো আবার পাড়ি দিল আরেক ছুটির দেশে।
এ-ঘাট থেকে বোঝাই ক'রে চলেছে স্রোত বাহি
সেই পসরা হিসাব যাহার নাহি :
আপনাতে যা আপনি অফুরান,
ভাঙা বাঁশির মৌন-পারে জমেছে যার গান।

তাহারে ডাক দিয়েছিল পদ্মানদীর ধারা,
কাঁপন-লাগা বেণুর শিরে দেখেছে শুকতারা ;
কাজলকালো মেঘের পুঞ্জ সজল সমীরণে
নীল ছায়াটি বিছিয়েছিল তটের বনে বনে ;

ও দেখেছে গ্রামের বাঁকা বাটে
কাঁখে কলস মুখর মেয়ে চলে স্নানের ঘাটে ;
সর্ষে-তিসির ক্ষেতে
দুই-রঙা সুর মিলেছিল অবাক আকাশেতে ;
তাই দেখেছে চেয়ে চেয়ে অস্তরবির রাগে
বলেছিল, এই তো ভাল লাগে ।
সেই যে ভাল-লাগাটি তার যাক্ সে রেখে পিছে
কীর্ত্তি যা সে গেঁথেছিল, হয় যদি হোক মিছে ;
না যদি রয় নাই রহিল নাম,
এই মাটিতে রইল তাহার বিস্মিত প্রণাম ॥

আলমোড়া
২[illegible] বৈশাখ, ১[illegible]৪[illegible]

বাঁকুড়ার দুটি স্মরণীয় ঘটনা

শ্রীযোগেশচন্দ্র রায় বিদ্যানিধি

(১) অপর্যাপ্ত ধান্য

সন ১৩৪১ ও ১৩৪২ সালে বাঁকুড়ায় উপরি উপরি দু-বছর বৃষ্টি স্বল্প হয়েছিল। দুর্ভিক্ষও হয়েছিল। ১৩৪১ সালের দুর্ভিক্ষ, জেলার সর্ব্বত্র হয় নাই, কিন্তু কোথাও সুভিক্ষও ছিল না। এই কারণে ১৩৪২ সালের দুর্ভিক্ষে সর্ব্বত্র হাহাকার উঠেছিল। বাঁকুড়া জেলার দক্ষিণে আরামবাগ, পূর্ব্বদিকে ও উত্তরে বর্দ্ধমান জেলার উত্তর ভাগ, তদুত্তরে বীরভূম জেলায় অনাবৃষ্টি ও আনুষঙ্গিক দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সে বার্ত্তা সবাই জানেন। কিন্তু গত বৎসর, অর্থাৎ ১৩৪৩ সালে, যেমন সুচারু বৃষ্টি তেমন সুচারু ধান্য জন্মে'ছিল। যেমন বৃষ্টি, তেমন শস্য ; এতে আর আশ্চর্য কি ?

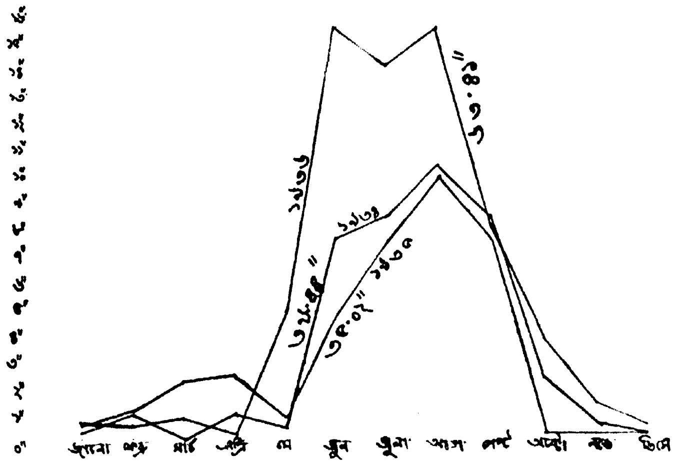
কিন্তু আশ্চর্যের কথা আছে। টোংরা জমিতেও প্রচুর ধান হয়েছিল। আমি গত দশ বৎসর দেখে আসছি, একবারও এত ধান ফ'লতে দেখি নি। ধানের গাছও এত লম্বা ও ঝাড়াল দেখি নি। সেই জমি, সেই চাষ, সেই সার ; কিসের গুণে এত ধান হ'ল ? যথাকালের প্রচুর বৃষ্টি ভিন্ন অন্য কারণ পাই না।

বাঁকুড়া নগরে গবর্মেণ্ট কৃষি-ক্ষেত্র আছে। সেখানে বৃষ্টিমান যন্ত্র আছে। ইং ১৯৩৪, ১৯৩৫ ও ১৯৩৬ সালের, গত তিন বছরের বৃষ্টিমান যথাক্রমে ৩৯·৪৪, ৩৫·০২, ৬৩·৪১ ইঞ্চি। বার্ষিক নির্দ্ধারিত ৫৫ ইঞ্চি। কিন্তু বার্ষিক বৃষ্টিমান দ্বারা প্রকৃত তথ্য পাওা যায় না। কোন্ মাসে কত, মাসের কখন্ কত, এই দুই জানা দরকার। প্রদর্শিত বৃষ্টিরেখ হ'তে জানতে পারা যাবে। কিন্তু কিসের গুণে ধান্য অপর্যাপ্ত হয়েছিল ? শুধু পরিমাণের গুণ নয়, বৃষ্টিধারার গুণ অবশ্য স্বীকার ক'রতে হবে। কৃষক মাত্রেই

জানে, ধানগাছের গোড়ায় খাল বিল পুকুরের জল সেঁচা আর গাছ ব'য়ে ধারাপাত, ফলে এক নয়।

ঋগ্‌বেদের ঋষি বৃষ্টিকে অমৃত মনে ক'রতেন। পঞ্জাবে বৃষ্টি অত্যন্ত অল্প হয়, কিন্তু যেটুকু হয় সেটুকু অমৃত। ধান্যাদি শস্যের প্রতি অমৃত। মানুষে নদীর ও কুআর জল পেত। দেখছি, শুষ্ক-বায়ু নীরস-মৃত্তিকা বাঁকুড়ার ধান্যাদির প্রতিও অমৃত।

হঠাৎ মনে হ'তে পারে জমি দু-বছর প্রায় পতিত ছিল, রৌদ্র ও বায়ুর গুণে মাটি তেজস্কর হয়েছিল। কিন্তু



ইং ১৯৩৪, ৩৫, ৩৬ সালে বাঁকুড়া নগরে বৃষ্টিমান

বাঁকুড়ার মাটি মাটিই নয়। বাঁকুড়া জেলার সব জায়গায় নয়। পূর্ব্ব ভাগের মাটি ভাল, কিন্তু তিন ভাগ এইরূপ। মোটা বালি, পাথুরে বালি, ছোট কোচ, এই সব মিশিয়ে তাতে শতকে দুই তিন ভাগ মৃত্তি থাকলে যে মাটি হয়, বাঁকুড়ার টোংরা জমির মাটি এইরূপ। মৃত্তি নাই; রৌদ্র বায়ু ও বিশ্রামফলও নাই। কোচপাথরকে হাজার রোদ খাওাই, সে স্ফটিক পাথরই থাকে। কচুর মত দেখতে এই হেতু নাম কোচপাথর। গুঁড়া ক'রলে খরশাণ বালি হবে। পাথুরে বালি চালের মত বড়। যাঁরা সর্বদা জুতা পরে' বেড়ান, তাঁরা এই সূচ্যগ্র বালি ও সূচ্যগ্র কোচপাথরের উপর দিয়ে দুপা চ'লতে পারবেন না। অনেক চাষী ম'ষ দিয়ে লাঙ্গল করে। বড় বড় ম'ষ; বর্ষা প'ড়বার কিছুদিন পরে দেখি, খুঁড়িয়ে খুঁড়িয়ে চ'লছে। জমির খরশাণ বালি ও কোণাল কোচপাথরে চলে' ম'ষের খুরের তলায় ঘা হয়, ম'ষ চ'লতে পারে না।

বাঁকুড়া জেলার সীমা, চ-অক্ষর উপর নীচে ক'রলে যেমন দেখায়, তেমন। এর পশ্চিমে চ-এর সোজা রেখা, ডাইনের কোণ বর্দ্ধমান জেলায় ঠেকেছে। পশ্চিম ভাগ বিন্ধ্যাচলের পূর্বপ্রান্ত। কোথাও মাটির সোসর, কোথাও বা কিছু নীচে পাতা আছে। পর্বতের অসংখ্য শিরা, কোথাও উত্তরদক্ষিণে, কোথাও কোণাচে রয়েছে। কামরাঙার যেমন শিরা, পাহাড়েরও তেমন শিরা। সে শিরাই ভেঙ্গেচুরে ডাঙ্গা হয়েছে। ডাঙ্গা থাকলে ডহরও থাকবে। বাঁকুড়া জেলার পশ্চিমভাগ ডাঙ্গা ও ডহর, ডহর ও ডাঙ্গা। সংস্কৃতে পাতোৎপাত। এখানে ডাঙ্গার নাম তড়া (তট), আর ডহরের নাম সোল (জোল)। ডাঙ্গার ঢালু পাশের নাম বাইদ (পাতী)। তড়ার ও বাইদের গড়ানি ও ধোয়াট পড়ে' ডহরের কতকটা ভরাট হয়েছে। বাইদের ক্ষেত পরে পরে নেমে নেমে সোলে পড়ে'ছে। যা কিছু ধান হয়, এই সোল জমিতেই হয়। বাইদে আউশ হয়, কিন্তু নাম মাত্র। আর বিস্তীর্ণ তড়া পড়ে' আছে। তাতে কাতিক মাস পর্যন্ত ঘাস দেখতে পাওা যায়। বাইদেও তাই। তার পর শুষ্ক মরুভূমি। আমি এই নিস্তেজ মরুভূমিকেই টোংরা (তুঙ্গ) জমি ব'লছি। এ সব জমিতে বৃষ্টিজল দাঁড়ায় না। বাঁধা আলের নীচে দিয়ে নীচের সোলে চলে' যায়। সে সঙ্গে মাটিতে যে একটু দ্রাব্য পদার্থ থাকে, যার গুণে ধান হয়, তাও চলে' যায়। এ সব জমি কৃষিকর্মের যোগ্য নয়। অল্পদিন পূর্বেও জঙ্গল ছিল; এখন লোকে পেটের দায়ে সে জমির বালি ও পাথর কামড়াচ্ছে। এইরূপ জমিরই ধানগাছ ও ফলন দেখে আশ্চর্য হয়েছি। *সাধারণ বছরে সোল জমিতে যেমন ধান হয়, এই নিস্তেজ পাথুরে বাইদ জমিতেও তেমন হয়েছিল।* সে ধান অবশ্য আউশ। কিন্তু কিসের গুণে?

সন ১৩২২ সালে দুর্ভিক্ষ হয়েছিল। সেই একই কারণ,

অনাবৃষ্টি। তার পর কুড়ি বছর চলে' গেছে। এর মধ্যে এমন ধান হয়েছিল কিনা, জানি না। 'ইনান বোডে' এসব খবর লিখে রাখা উচিত।

গত বৎসরের ধান্য-বৃদ্ধির দুতিন কারণ মনে আসছে। কিন্তু মনে আসা ও কার্যে প্রত্যক্ষ করা এক নয়।

বাঁকুড়া নগর, বাঁকুড়ার পশ্চিম ভাগের অন্তর্গত। এখানে বিন্ধ্যাচলের পূর্বাঞ্চলের লক্ষণ বর্তমান। সেই ডাঙ্গা আর ডহর। ডাঙ্গা হ'তে ডহর কোথাও আট হাত, কোথাও ষোল হাত নীচে। কোথাও কোথাও ডহর ভরাট হয়ে প্রায় ডাঙ্গার সামিল হয়েছে। ডহরে কুআ কাটলে অল্প নীচে জল পাওা যায়। না জেনে না বুঝে ডাঙ্গায় কাটলে পাথর কাটতে হয়। অনেক নীচে না গেলে জল পাওা যায় না। নগরের উত্তরে ও দক্ষিণে দুই নদী বয়ে গেছে। নদীর তলায় পাথরের চটান। নদীতে জল থাকে না। গবর্মেণ্ট কৃষিক্ষেত্রের দক্ষিণাংশ ডাঙ্গা, উত্তরাংশ বৃহৎ ডহর। ডহরের উত্তর ভাগ হ'তে দক্ষিণাংশের ডাঙ্গা দুতলার সমান উঁচু। ক্ষেত্রের পাথর বাছা হয়েছে, মাটি চালা হয়েছে, তবে চাষ হ'চ্ছে। মাটি লাল। এক অতীত যুগে যখন পাহাড় বনাচ্ছন্ন ছিল, তখন বনভূমির বৃষ্টিজল ডহরে জমা হ'ত, লালমাটি থিতিয়ে প'ড়ত। পূর্বকালের লালমাটি দক্ষিণে মেদিনীপুর পর্যন্ত বিস্তৃত আছে। এই লাল মাটিতে পাঁচ সাত ভাগ মৃত্তি আছে। এ মাটি মন্দ নয়। লাল-মাটির গায়ে স্থানে স্থানে মর্কট পাথর বিস্তীর্ণ হ'য়ে আছে। কোথাও চাঙ্গড়া, কোথাও চটান। এই পাথর লৌহময়। কিন্তু জল ও পাতা-পচানি পেলে গুঁড়া হ'য়ে যায়, অনেক বছর পরে লালমাটিতে পরিণত হয়। কিন্তু ছোট ছোট কাঁকর বহুকাল থাকে।

এই দুই মাটিই পশ্চিম বাঁকুড়ার মাটি। (১) একটাতেও পচাট (পচাপাত) নাই, জল ধরে না। দু শ., আড়াই শ. বছরের বড়্গাছ দূর হ'তে চিনতে পারা যায় না। পাতা ছোট ছোট, ডাল হ'তে যদি বা জটা ঝুলেছে, সে জটা শূন্যেই আছে, তলার মাটিতে ঠেকতে পারে নি। গাছের পাতা তলায় পড়ে। যদি সে পাতা সেখানেই থাকে, ঝড়ে উড়িয়ে নিয়ে না ফেলে, তাহ'লে সেখানকার মাটি রসা হয়। কিন্তু তেমন সুযোগ প্রায় ঘটে না। ডাঙ্গায় ঝড় বেশী লাগে।

(২) বর্ষা থেমে গেলে কার্তিক মাস হ'তে মাটি শুখাতে থাকে। আর এমন শুখায় যে কোদাল চলে না, মাটিতে যেন সিমেণ্ট মিশেছে। গাঁতিও চলে না। জল ঢেলে, তবে গাঁতি চালাতে হয়। বর্ষাকালে সে মাটিই সপ্-সপ করে।

(৩) শুখার দিনে বাতাস এত শুষ্ক হয় যে গাছের গোড়ায় জল ঢাললেও পাতা ঝামরে৷ যায়। শিকড় জল টেনে পাতায় পৌঁছিয়ে দিতে পারে না।

এই তিন দোষ, দুটি মাটির, একটি বায়ুর, গত বছরের বর্ষাতে কেটে গেছল। ডাঙ্গা ও বাইদ জমিতে বরাবর জল ছিল, গাছ শুখায় নি। বায়ু ভিজা ছিল, গাছকে গরমে হাঁফাতে হয় নি, গরম জলে গোড়া ডুবিয়ে থাকতে হয় নি। কিন্তু তার পর? মাটি উর্বরা হ'ল কি করে'?

জমিতে সার না দিলে ধান হয় না। আর সার মানেই গোবর, আর গোবর মানেই সার। খ'ল, হাড়গুঁড়া, বিলাতী মসলা, সে সব 'সার' নয়, গাছের দোহদ। বৃষ্টি-জলে সারের গুণ হ'ল কি করে'? ধানচাষের পক্ষে মৃত্তির ভাগ কম থাকলেও চলে। বালি-কুড়েও ধান জন্মাতে পারা যায়। কিন্তু সার দিতেই হবে। এত সার কোথায় পাওা যাবে? জমিতে ধনিচা কিম্বা শণ চাষ করে' মাটিতে পচিয়ে ফেলবার সময় পাওা যায় না। সে বুদ্ধি এ জেলায় চ'লবে না। বর্ষা দেরিতে নামে, ধানচাষেরই সময় বয়ে যায়। অতএব দেখছি, বন কেটে বাঁকুড়ার সর্বনাশ হয়েছে। ধান-চাষ ইন্দ্রের কৃপা ভিন্ন হ'তে পারে না।

(২) মেলেরিয়া-ত্রাস

পশ্চিমবঙ্গ মেলেরিয়ার জন্য উৎসন্ন হয়েছে। কি কারণে কে জানে প্রথমে বর্দ্ধমানে আরম্ভ হয়েছিল। সেখান হ'তে ক্রমে ক্রমে দক্ষিণে আরামবাগ দিয়ে মেদিনীপুরে এবং পূর্ব-দিকে বর্দ্ধমান ও হুগলী জেলায় ছড়িয়ে পড়ে'ছিল। কিছু দিন পর্যন্ত পশ্চিমের দেশ রক্ষা পেয়েছিল। তখন বীরভূম ও বাঁকুড়ায় মেলেরিয়া ছিল না।

বাঁকুড়া জেলার বিষ্ণুপুর সবডিভিজন বাঁকুড়া জেলার পূর্বভাগ। এটির প্রকৃতি পশ্চিম হ'তে সম্পূর্ণ ভিন্ন। মাটি পাথুরে নয়, ডাঙ্গা ডহরও নাই। এর পূর্বদিকে দামোদর ও বর্দ্ধমান জেলা, দক্ষিণে আরামবাগ। দুটাই

মেলেরিয়ার খনি। বিষ্ণুপুরে মেলেরিয়া ঢুকতে বেশীদিন লাগে নি। সেন্‌সাসে দেখা গেছে, লোক বাড়া দূরে থাক কমে'ছে। মুখ দেখলেই মেলেরিয়াভোগ বুঝতে পারা যায়। বিষ্ণুপুর হ'তে বাঁকুড়া নগরেও মেলেরিয়া এসেছিল।

আমি আরামবাগের মেলেরিয়ার কোপ দেখতাম, আর ভাবতাম এই দারুণ রোগ কোনও কালে আপনি অদৃশ্য হ'তে পারবে কি? কি কারণে এল আর কি কারণে যাবে, কে জানে? একেবারে যাবে কিনা, তাই বা কে ব'লতে পারে?

কিন্তু আশ্চর্যের বিষয় গত বৎসর প্রচুর বৃষ্টি সত্ত্বেও বিষ্ণুপুর ও বাঁকুড়ায় মেলেরিয়া ছিল না। ডাক্তাররা গ্রামে যেয়ে অন্য বছর মেলেরিয়া রোগী দেখতেন, কিন্তু গত বছর একটিও দেখতে পান নি। যে যে গ্রাম মেলেরিয়ার খনি ছিল, সে সে গ্রাম এখন মেলেরিয়া-শূন্য। সেই পচা ডোবা, সেই গড়িয়া, সেই বন, সেই জলময় ধান-জমি, অধিবাসীর সেই আহার, সেই কর্ম ছিল; কুইনিন-বিতরণ হয় নি, মেলেরিয়া-নিবারণী সমিতি হয় নি; কিন্তু মেলেরিয়া অদৃশ্য! এই বাঁকুড়া নগরেও মেলেরিয়া ছিল, কিন্তু কোন ডাক্তারে মেলেরিয়ারোগী পান নি। যে দু-একটি ছিল, তারা অন্য জায়গা থেকে এনেছিল। এই অদ্ভুত ঘটনা কি করে' হ'ল? একি ১৩৪২ সালের অনাবৃষ্টি ও শুখার ফল? কে জানে। যদি তাই হয়, তবে বীরভূম মেলেরিয়াশূন্য হ'য়ে থাকবে। কিন্তু জানি, আরামবাগেও শুখা হয়েছিল, কিন্তু মেলেরিয়া অদৃশ্য হয় নি। কারণ কি? যদি শুখা ও খরণ হ'লেই মেলেরিয়া যায়, তাহ'লে কুড়ি বছর পূর্বে যখন বাঁকুড়া জেলায় দুর্ভিক্ষ হয়েছিল, তার পর বছর বিষ্ণুপুরে কি মেলেরিয়া ছিল না? গবর্মেণ্ট স্বাস্থ্য-বিভাগের ডাক্তাররা খবর রেখে থাকবেন। কিন্তু জানতে পারলে আশ্বাস পাওয়া যায়, মেলেরিয়া মানুষের বিনা চেষ্টায় অদৃশ্য হ'তে পারে।

বাঁকুড়া জেলার পশ্চিম ভাগ পাহাড়ো পাথুরে। জাঙ্গল ত বটেই। কিন্তু মেলেরিয়া ছিল না, এখনও নাই। সে সব অঞ্চলের লোকে ঘরে বসে' থাকে, এমন নয়। বিষ্ণুপুরে যাচ্ছে, বাঁকুড়ায় আসছে, মেদিনীপুরে আরামবাগে যাচ্ছে, কিন্তু মেলেরিয়া ঢুকাতে পারে নি।

আর যদি বলি শুখাতে ও গরমে মেলেরিয়া-বাহক মশককুল ধ্বংস হয়েছিল, তাই বা কি করে' সম্ভব হয়? কারণ গত বছর মশা ক'মতে দেখি নি। আর বেছে বেছে শুধু মেলেরিয়া-বাহক মরে'ছিল তাও ত সম্ভবপর হয় না। এ সকল বিষয় স্বাস্থ্যবিভাগের ডাক্তারদের তদন্তের যোগ্য।

যদি বাস্তবিক এই সংবাদ সত্য হয়, তাহ'লে এই অবস্থা রাখতে পারা যাবে কি? ডিষ্টিক-বোড ও ইনান-বোড মনোযোগী হ'লে কিছু দিন রাখতে পারবেন। কোন গ্রামে দু-একটি রোগী দেখবামাত্র তাকে কুইনিন খাইয়ে হ'ক, আর যে কোন রকমে হ'ক, শীঘ্র রোগমুক্ত করা উচিত হবে। কিন্তু সে উদ্যোগ ঘ'টবে বলে' মনে হয় না। অতএব মেলেরিয়া-নাশের জন্য ইন্দ্রের অকৃপাই এক ভরসা। কিন্তু বিপদ এই, শুখা হ'লে ধান হয় না, লোকে খেতে পায় না। অতিবৃষ্টি হ'লে ধান হয়, পেটে পিলেও হয়। এখন মেলেরিয়ায় লোক তত ক্ষয় হয় না, জীবন্মৃত হয়ে থাকে। কিন্তু নিমোনিয়া হ'লে রক্ষা পায় না।

স্বয়ম্বরা

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

রাণুর বিবাহ। তিন দিন ধরিয়া রোশনচৌকির বাজনা,—বাড়ী-ঘর-দুয়ার সুরে সুরে ভরাট হইয়া গিয়াছে। সুর কি ভাবে মনের মধ্যে পর্য্যন্ত প্রবেশ করিয়া যেন রুণ্ রুণ্ করিতেছে।

গায়েহলুদের দিন মেয়েদের প্রীতিভোজ। যে-ব্যাপারটি সুরের মধ্য দিয়া আহূত সেটি যেন রাণুকে আরও পরিপাটি করিয়া ঘিরিয়া ফেলিতেছে। সে যতই সঙ্কুচিত হইয়া ঘরের কোণ খুঁজিতেছে, বাড়ীর যত প্রশ্ন, যত আহ্বান যেন তারই অভিমুখী হইয়া ঘুরিয়া বেড়াইতেছে,—"কোথায় গেল সে?" ..."ওমা! তুই নিশ্চিন্দি হয়ে একঠায় ব'সে আছিস?—কি ব'লে গেলাম এক্ষুণি?"...নিমন্ত্রিতদেরও ঐ এক খোঁজ—"রাণুকেই যে দেখছি না···এই যে!···দেখেছ? এক দিনেই কত বদলে যায়?" ..."হুঁ, পুষলে পাষলে, এবার কাটল মায়া; কিছু নাঃ, কাকের কোকিলছানা পোষা দিদি···"

শুধু রাণু, রাণু আর রাণু···

বিবাহের দিন সমস্ত ব্যাপারটি তাকে আরও নিবিড়তর ভাবে ঘিরিয়া ফেলিল। বর আসা থেকে আরম্ভ করিয়া সবাইকে দেওয়া-থোওয়া, বসান-খাওয়ানর মধ্যে যা কিছু উৎসব, ব্যস্ততা, চেঁচামেচি, হাসি, বচসা—সমস্তর মধ্যেই রাণু যেন কি একটা গূঢ় অলক্ষ্যে উপস্থিত আছে। তার পর আসল বিবাহের ব্যাপারটা,—রাণু তো সেখানে সর্ব্বেশ্বরী—সবাইকে যেন নিষ্প্রভ করিয়া দিয়াছে, ছোট বড়, গুরু লঘু সবাইকে।

অথচ এই রাণু সেদিন পর্য্যন্ত সংসারের আর সব ছেলে-মেয়েদের মধ্যে মাত্র অপর এক জন ছিল। সংসারের কাজে-কাজে আধময়লা কাপড় পরা—খোঁজ পড়িয়াছে ফরমাসের জন্য—কাজের অবহেলা কিংবা ভ্রান্তিতে খাইয়াছে বকুনি—মুখভার করিয়া ফিরিয়াছে; তাও কাজের তাগিদে কি মুখটাই বেশীক্ষণ বিষণ্ণ থাকিবার অবসর পাইয়াছে? আদরের কথা? হ্যাঁ, তা নেহাৎ যখন কাহারও অতিরিক্ত রকমের ফুরসৎ, বোধ হয় ডাকিয়া এদিক-ওদিক দুটো প্রশ্ন, দুটো মিষ্ট কথা...

বিবাহ জিনিষটা তাহা হইলে মন্দ নয়!—কেমন করিয়া যেন মনে হয় একটি প্রদীপ জ্বালার কথা,—গান, উৎসব, শঙ্খ, উলুধ্বনির সঙ্গে যেন একটি আরতির দীপ দেবতার সামনে আলোয় আলোয় ঝলমল করিয়া উঠিল।

আলোর কিন্তু একটা ছায়ার দিক আছে। ঠিক যেমন আছে একটা দীপ্তির দিক। এই কথাটি ভুলিলে চলিবে না, কেন না এই ছায়া-দীপ্তি লইয়াই তো জীবন।

বিবাহবাড়ীর দৃশ্যটা একবার ভাবুন, বিশেষ করিয়া চারি দিকে নানা বয়সের যে মেয়েগুলি চলাফেরা করিতেছে তাদের কথা।—সবচেয়ে ব্যস্ত, সবচেয়ে কলোচ্ছ্বসিত, কেহ না চাহিলেও শুধু নিজের আনন্দের অতি প্রাচুর্য্যে সর্ব্বত্র সঞ্চরিতা—মনে হয় এরাই যেন উৎসবের প্রাণ। কিন্তু সাধারণভাবে এ-কথাটা সত্য হইলেও একটু লক্ষ্য করিলেই দেখা যাইবে উৎসবের আলোটি সকলের মুখে সমান ভাবে ফোটে নাই। এমন কি একটু ভাল করিয়া লক্ষ্য করিলে এদের মধ্যে অনেকগুলি গম্ভীর, নিষ্প্রভ, এমন কি বিষণ্ণ মুখেরও সন্ধান পাওয়া যাইবে। এইগুলির উপর আলোর ছায়া পড়িয়াছে। এই ছায়াকে কি বলিবেন?—হিংসা? যাহা ইচ্ছা হয় বলুন, সংজ্ঞায় কিছু আসে যায় না; আমি এই ম্লানিমাটুকুকে ছায়াই বলিলাম। রাণুর বিবাহ উপলক্ষ্যে এই রকম একটি ছায়াপাতের কথা বলিব; অল্প কথা, কিন্তু বড়ই করুণ।

এই হাস্যোজ্জ্বল উৎসব-রজনীতে একটি মেয়ের চিত্ত ভারাতুর হইয়া উঠিয়াছে। তার কেন বিবাহ হয় নাই? কবে হইবে? কবে তার চারি দিকে এই বাদ্য, এই

কলোচ্ছ্বাস মুখর হইয়া উঠিবে? বিবাহ!—চিন্তাতেও সমস্ত চিত্ত এক মুহূর্ত্তে ভরিয়া উঠে যেন। রূপকথার এমন প্রত্যক্ষ রূপ আর দেখা যায় না; একটি রজনীর মোহন স্পর্শের মধ্য দিয়া তার সব নগণ্যতা ঘুচিয়া যাইবে; রাণুর মত সেও রাণী হইয়া জাগিয়া উঠিবে। সেদিন আসিবে নিশ্চয়, এই রকম একটি রজনীর সোনার মুকুট মাথায় পরিয়া। কিন্তু কবে?—বিলম্ব তো আর সহ্য করা যায় না···

কিন্তু কাহাকেই বা বলিবে, আর কেই বা বুঝিবে তার মর্ম্মের কথা? সখীদের?—তারা আজ নিজের লইয়াই উন্মত্ত, পরের কথা শুনিবার কি আর অবসর আছে? আর তা ছাড়া তাদের শুনাইয়া ফলই বা কি? তারা তো কোন সুরাহা করিতে পারিবে না।

তবুও চেষ্টা করিয়াছিল।—ওদের বাড়ীর রতি খুব সাজিয়াছে, মাথায় ঝকঝকে জরির ফিতা দিয়া রচিত খোঁপা, তাহাতে টকটকে একটা গোলাপ গোঁজা; ঘাঘরা-করিয়া-পরা কাপড়ের আঁচল গতির চঞ্চলতায় পিছনে ফর্‌ফর্‌ করিয়া উড়িতেছে, প্রজাপতির পাখনার মত; সিল্কের রুমাল,—কখন ব্লাউসে গোঁজা, কখন কোমরে, কখন হাতে। চুলের, রুমালের ও স্নো-ক্রিমের মিশ্র গন্ধ যেন ঢেউ তুলিয়া সঙ্গে সঙ্গে ঘুরিতেছে।

ইহাকে বলিবার অনেক সুবিধা, তার পর যদি কথাটা ঘুরিতে ফিরিতে বড়দের কানে পৌছায়—রতিকে উপলক্ষ্য করিয়া যাহা বলিল তাহা যদি নিজের অন্তরের দূতীর কাজ করে···

"ইস্‌,ভাবনে গেলি রতি!—কি ভেবেছিস্ বল দিকিন?"

"ওমা, ভাবব আবার কি? বিয়েবাড়ী, সবাই তোর মতন গোমড়া মুখ ক'রে বেড়াবে নাকি?"

"নাঃ, কিছু ভাবছ না! আমি ঠিক জানি মশাই। বলব কি ভাবছিস?—রতি ভাবছে—যদি রাণুর মত আমারও শ্বশুর এসে .."

ভিতর হইতে কে হাঁকিল, "মেয়েদের পাতা ক'রে ফেল···"

রতি সেই দিকে ছুটিয়া গেল, তার নিজের মনের রহস্য আর তাকে শোনান হইল না।

ভাজ অনেক সময় ঠাট্টা করে; এই সময় করিলে একটা উপকার হয়, লজ্জা-লজ্জা উত্তরের ছলে তবুও মনের ভাবটা কতকটা প্রকাশ করিয়া দেওয়া যায়। আজই কিছু বিবাহ হওয়া সম্ভব নয়, তবুও মনের অভিরুচিটা যদি জানা থাকে সবার তো···

তাকে পাওয়াই দুষ্কর। যদি পাওয়াই গেল তো এত ব্যস্ত যে ঠাট্টা করিবে কি? মরিবার ফুরসৎ নাই। তবুও একবার মুখটা ঘুরাইয়া প্রশ্ন করিল, "হ্যা রে, ওরকম শুকনো মুখ ক'রে ঘুরে বেড়াচ্ছিস যে? আজ রাণুর বিয়ে হচ্ছে তাইতেই এই রকম, দু-দিন পরে যখন নিজের···"

"যাও, ঠাট্টা ভাল লাগে না বৌদি!"

"ওমা, ঠাট্টা কি লা? দু-দিন পরে রাণু নিজের ঘর করতে যখন যাবে, মুখ শুকনো করা দূরে থাক, কেঁদেও কি রুখতে পারবি?"

আর তবে কাহার কাছেই বা আশা? বাপ, মা এদের কাছে তো আর বলা যায় না? বাকী থাকে দাদু আর ঠাকুমা, একটির বিদায়েই তাঁদের যা অবস্থা, ওখানে তো ঘেঁষাই যাইবে না। তাহা ভিন্ন ঠাট্টা-বিদ্রূপের মত মনে স্ফূর্ত্তি ফিরিয়া আসিতে ওঁদের ঢের দেরি এখনও, রাণুর জোড়ে ফিরিবার পূর্ব্বে তো নয়ই।

তখন মনে পড়িল মেজকা'র কথা। ও-লোকটা হালকা প্রকৃতির, কাজের যেমন উপযুক্তও নয়, তেমনি কাজের ভিড়ে ডাকও পড়ে না ওর। প্রচুর অবসর লইয়া কোন নিরিবিলি জায়গায় গা ঢালিয়া পড়িয়া আছে নিশ্চয়। আর একটা মস্তবড় সুবিধা এই যে বিবাহ-সংক্রান্ত কোন কথা ভাল করিয়া বোঝে না বলিয়া ওর কাছে কথাটা পাড়ায় কোন সঙ্কোচের বালাই থাকিবে না। কেন যে মেজকা'র কথাটা আগে মনে পড়ে নাই!—বোধ হয় অমন অ-দরকারী লোককে টপ্‌ করিয়া কারও মনে পড়ে না বলিয়াই।

অবশ্য, অতটা বেকার নই আমি; তবুও, লজ্জার কথা হইলেও বলিতে হইতেছে অত কাজের ভিড়েও একটু নির্লিপ্ততা সৃজন করিয়া সেটুকু উপভোগ করিতেছিলাম। নিজের ঘরের বিছানায় শুইয়া, একটু চক্ষু মুদিয়াও।

"মেজকা!" —ডাকে তন্দ্রাবেগটা কাটিয়া গেল। আশ্চর্য্য হইয়া জিজ্ঞাসা করিলাম, "তুই এখানে যে? মেয়েদের পাত করা হয়েছে, খেয়ে নিলি না কেন? রাত হয়েছে যে।"

"একেবারে খিদে নেই।"

"কেন?...আচ্ছা, একটু মাথার চুলগুলো ধ'রে আস্তে আস্তে টেনে দে দিকিন।"

একটু পরে।

"মেজকা!"

আলস্যের স্বরে উত্তর করিলাম, "হুঁ।"

"ঘুমুচ্ছ?"

উৎসাহিত করিবার জন্য বলিলাম, "হুঁ। বেশ মিষ্টি হাতটা রে তোর! জানতাম না।"

"না, সে কথা বলছি না।"

"তবে?"

আর একটু চুপচাপ গেল। আবার তন্দ্রাটা বেশ জমিয়া আসিতেছে।

"মেজকা, আমার বিয়ের জোগাড় ক'রে দেবে?"

তন্দ্রা ছুটিয়া একেবারে উঠিয়া বসিলাম। এ যে চার-পো কলি!

কিন্তু কেন তা বলিতে পারি না, কোন রূঢ় উত্তর দিতে কেমন যেন মন সরিল না। বোধ হয় মনে করিলাম এটা নিজ্‌লা নির্লজ্জতার নিদর্শন না-ও হইতে পারে; সম্ভবতঃ উৎসবের ছোঁয়াচ লাগিয়াছে; না হইলে—রাণুর চেয়েও ছোট—বিবাহের আর ও কি বোঝে?

উৎসবের সুরটি ভাঙিতে কেমন কেমন বোধ হইল। পরে এক দিন না-হয় সমস্ত বিষয়টির অনৌচিত্যটা বুঝাইয়া দিলেই হইবে। একটু নীরব থাকিয়া বলিলাম, "তোমার বিয়েটা হয়ে গেলেও তো আমরা আরও নিশ্চিন্দি হতাম। আজ, না-হয় কাল তো দিতেই হবে; কিন্তু সে তো আর অল্প কথায় হয় না মা। দেখলেই তো রাণুর বিয়েতে খরচের হিড়িকটা? নিজেদের খরচ তো আছেই, তা ভিন্ন তোমাদের শ্বশুরেরা তো হাঁ করেই আছেন, অল্প দিয়ে কি আর পেট ভরান যাবে? চাই এক কাঁড়ি পয়সা..."

"তুমি উঠে বসলে কেন মেজকা? শোও না ওদিকে মুখ ক'রে, আমি সুড়সুড়ি দিচ্ছি।"

বুঝিলাম মুখোমুখি হইয়া প্রসঙ্গটা চালাইতে পারিতেছে না। আহা, সত্যই কি এতটা বেহায়া হইতে পারে? হোক্ না এ-যুগ, হোক না সে মডার্ণ।

একটু প্রসন্নভাবেই শুইয়া পাশ ফিরিলাম। বুঝিলাম দু-জনের মধ্যে একটি লঘু তন্দ্রার পর্দ্দা সৃষ্টি করিবার চেষ্টা এটা। ভাল। একটু পরে ডাক হইল, "মেজকা, ঘুমুচ্ছ?"

কৃত্রিম জড়িত কণ্ঠে বলিলাম, "না—বল..."

একটু থামিয়া উত্তর হইল, "পয়সা আমি জোগাড় ক'রে রেখেছি মেজকা, তোমাদের ভাবতে হবে না।"

সর্ব্বনাশ! আমার বিস্ময় আমায় যেন ঠেলিয়া তুলিয়া দিল! দুই কনুইয়ের উপর ভর দিয়া অর্দ্ধশয়ান ভাবে উঠিয়া পড়িলাম এবং চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "পয়সা জোগাড় ক'রে রেখেছিস? সে কি রে!! তুই কবে থেকে এ-মতলব আঁটছিস? একটা বিয়ের খরচ জোগাড় করেছিস বলছিস; সে তো চাড্ডিখানি পয়সা নয়!"

নিশ্চয় একটা মস্তবড় বাহাদুরি ভাবিল; না হইলে এর পরে আর উত্তর দিত না।...আজকালকার মেয়ে!

একটু তেরছা হইয়া বসিয়া মুখটা ঘুরাইয়া লইল। তার পর ঘাড়টা ঈষৎ নীচু করিয়া বলিল, "অনে—ক আছে; অনেক দিন থেকে জমাচ্ছি।"

প্রবল কৌতূহল হইল। বলিলাম, "সত্যি নাকি? নিয়ে এসে দেখাতে পারিস? তোর কাছে; না তোর মার কাছে আছে?"

"না, আমার কাছেই আছে, আনছি।"

আপনাদের অবস্থাটা বুঝিতেছি; কিন্তু সাক্ষাৎদ্রষ্টা আমার তখনকার মনের অবস্থাটা কল্পনা করিতে পারেন কি? বিশ্বাস করিতে আপনাদের বোধ হয় মনের উপর খুব একটা ষ্ট্রেন্ পড়িতেছে। কিন্তু যা হাওয়া বহিতেছে, সবই সম্ভব। আজ যাহা শুনিতেছেন, কাল যদি তাহা নিজেই প্রত্যক্ষ করেন তো কিছুই আশ্চর্য্য হইবার নাই। গুরু-লঘু ভেদ আর ইহারা রাখিবে না; তা হা-হুতাশ করিলে আর উপায় কি?

একটু পরে একটি মাখনের রঙের ক্যাশবাক্স আসিয়া হাজির হইল। এটা চিনি, ওর বাপের দেওয়া; মেয়েটিকে বড় ভালবাসে। অত ভালবাসা, অত আস্কারারই বোধ হয় এই পরিণাম।

ডালা খুলিয়া বাক্সটা সামনে ঘুরাইয়া ধরিয়া স্মিতহাস্যের সহিত আমার মুখের উপর চক্ষু তুলিয়া চাহিল; বিজয়ের আনন্দে সঙ্কোচের অবশেষটুকুও অন্তর্হিত হইয়া গিয়াছে।

সত্যই! বাক্সের খোপে খোপে রুমাল, ন্যাকড়া আর কাগজের ছোট-বড় একরাশ মোড়ক; একটি জ্যালজেলে ফরসা নেকড়ার গ্রন্থির মধ্যে যেন সুপুষ্ট গিনির থাক্ ঝিক্‌মিক্ করিতেছে!!

ভূমিকাটা এই পর্য্যন্ত থাক। হ্যাঁ, এটা আমার গল্প নয়, একটা বিজ্ঞাপন মাত্র—এ-পর্য্যন্ত যাহা বলিলাম সেটা তার ভূমিকা।

নিজ বিজ্ঞাপনটি এই :—

আমার একটি সাত বৎসরের ভ্রাতুষ্পুত্রী বর্ত্তমান, নাম ডলী রাণী। ছিপছিপে শ্যামবর্ণ; পিঠের অর্দ্ধেক পর্য্যন্ত ঝাঁকড়া ঝাঁকড়া কেশ। এদিকে মেয়েটি খুব গোছাল, কেননা নিজের বিবাহের জন্যই পাই আধলা পয়সায় অনে—কগুলি তাম্রখণ্ড সঞ্চয় করিয়া রাখিয়াছে একুনে সওয়া এগার পয়সা! সুতরাং একেবারেই যে খালি হাতে কন্যা গ্রহণ করিতে হইবে এমন নয়। হৃদয়বান্ যদি কোন বরের বাপ থাকেন তো সম্মতি জানাইলে সুখী হইব।

একটু গোল আছে আবার এর মধ্যে, সেটাও পূর্ব্বাহ্নেই বলিয়া রাখা ভাল। শুধু হৃদয় থাকিলেই চলিবে না,—ডলীর ব্যক্তিগত ইচ্ছা শ্বশুরের খুব কালো রঙের উপর মাথায় খুব চক্‌চকে একটি টাক থাকা চাই। কি করা যায়? ভিন্নরুচির্হি লোকঃ।

তাই, যদি এরূপ ত্রিগুণাত্মক কেহ থাকেন তো আশা করি অবিলম্বেই পত্রাচার আরম্ভ করিয়া বাধিত করিবেন।

কথা

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

অনাদি সৃষ্টির মহালীলা যজ্ঞ-উৎসব ঘিরিয়া
যুগযুগান্তর ধরি যেই ধ্বনি উঠে নিশিদিন;
মন্ত্র হয়ে সাধনায় রূপ নিল মানবের মনে
লোকলোকান্তর ব্যাপি কালবক্ষে হয়ে র'ল লীন।
নিম্নে কোটি বস্তু ঘিরি উঠে নিত্য সংঘাতের নাদ;
ঊর্দ্ধে কোন্ যাদুকর তাই দিয়া বাজাইছে বীণা;
নরকণ্ঠে মুহুর্মুহু যে-ধ্বনিটি নিত্য থেমে যায়
গগনের বাক্‌যন্ত্রে নিত্য সে যে হয়ে রয় লীনা।

মর্ত্ত্য জপে ধ্যানমগ্ন মনে তার নিবিড় কল্পনা,
বাঞ্ছিতে ধরিতে গিয়া বন্দী হয় অম্বরের তলে;
ঊর্দ্ধে হাসে ভাবরাজ্য মর্ত্ত্যলোকে ঝঙ্কারিছে ভাষা
মৃত্তিকা ও শূন্যে এই লুকোচুরি নিত্য খেলা চলে।

শূন্যের অনাদি সুর মর্ত্ত্যলোকে বাজে হয়ে বাণী,
শ্রেষ্ঠ সেই কথা যেই তারি বাণী নিত্য দেয় আনি।

ভাষারহস্য

শ্রীবীরেশ্বর সেন

দাদা এবং দদাই একই শব্দ—স্থানবিশেষে ভিন্নরূপে উচ্চারিত হয়, কিন্তু বাঙ্গলা দেশে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে দাদা বলে আর আসামে এবং উড়িষ্যায় জ্যেষ্ঠতাতকে অর্থাৎ পিতার জ্যেষ্ঠভ্রাতাকে দদাই বলে। সেইরূপ, বাঙ্গলায় পিতার কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে কাকা বলে কিন্তু আসামে জ্যেষ্ঠ ভ্রাতাকে ককাই বলে। বাঙ্গলায় তাম্বুলের অর্থ পান কিন্তু আসামে তামুল অর্থাৎ তাম্বূল বলে সুপারিকে। বাঙ্গলায় নিকটবর্ত্তী স্থান বা বস্তু সম্বন্ধে এখানে, ইহা, এটা, এই প্রভৃতি শব্দ এবং দূরবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু শ্রীহট্টে নিকটবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ এবং দূরবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে এটা, ইহা, এই প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। শ্রীহট্টে বাক্সকে বলে আলমারি এবং মাংসের ব্যঞ্জনকে বলে মোরোব্বা। বিহারের শাহাবাদ জেলায় মাংসকে বলে কালিয়া।

আরও আশ্চর্য্য এই যে মলায়ালম্ ভাষায় মুখকে চোক্ এবং চক্ষুকে বলে মুখ, কানকে বলে নাক এবং নাককে বলে কান্।

রহস্যপ্রিয় বাঙ্গালীরা কৌতুক করিয়া বলিয়া থাকেন যে যে-সকল প্রদেশে বাঙ্গলায় প্রচলিত অর্থের বিপরীত অর্থে কোনও কোনও শব্দের প্রয়োগ হয় সে দেশে পূর্ব্বে কোনও ভাষাই ছিল না এবং সেই সকল প্রদেশ হইতে কয়েকটি লোক ভাষা শিক্ষা করিতে গিয়া স্ব স্ব প্রদেশে ফিরিয়া যাইতে যাইতে অনেক শব্দের অর্থ ভুলিয়া গিয়া তাহার বিপরীত অর্থ করিয়া স্বদেশবাসীকে ভুল শিক্ষা দিবার ফলে এইরূপ হইয়াছে। কিন্তু শিক্ষিত বাঙ্গালীরা কিঞ্চিৎ চিন্তা করিলে দেখিতে পাইবেন যে বাঙ্গালীরা যেমন বিপরীত এবং ভিন্ন অর্থে বহু শব্দ ব্যবহার করেন তেমন আর কোনও দেশের লোকই করেন না। আমরা রাগ বলি ক্রোধকে, কিন্তু রাগ শব্দের প্রকৃত অর্থ অনুরাগ বা ভালবাসা যাহা ক্রোধের সম্পূর্ণ বিপরীত। আমরা সংবাদ বলিলে বুঝি সমাচার, বার্ত্তা, খবর, কিন্তু সংবাদ শব্দের প্রকৃত অর্থ কথোপকথন। পূর্ব্বে বাঙ্গলা দেশেও কথোপকথন অর্থে এই শব্দটি প্রযুক্ত হইত। পঞ্জিকার হরপার্ব্বতীসংবাদ অনেকেই দেখিয়াছেন। উহার অর্থ হর ও পার্ব্বতীর মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল। গীতাকে কৃষ্ণার্জ্জুনসংবাদ বলে। ইহা গীতাতেই একাধিক বার উল্লিখিত আছে এবং ইহার অর্থ কৃষ্ণ ও অর্জ্জুনের মধ্যে যে কথোপকথন হইয়াছিল।

আমরা শ্যালককে সম্বন্ধী বলি, কিন্তু বাঙ্গলার বাহিরে সম্বন্ধী বলে পুত্র বা কন্যার শ্বশুরকে অর্থাৎ আমরা যাহাকে বৈবাহিক বলি। সংস্কৃত উত্তরচরিত নাটকেও দশরথ এবং জনক পরস্পর সম্বন্ধী ছিলেন বলিয়া উক্ত আছে।

আমরা ঘর্ম্ম এবং তাহার অপভ্রংশ ঘাম বলি স্বেদকে। কিন্তু ঘর্ম্ম শব্দে সংস্কৃতে উত্তাপ বুঝায়। হিন্দুস্থানে চলিত ভাষার অপভ্রংশে ঘাম বলিতেও উত্তাপ বা গরমই বুঝায়। হিন্দুস্থানীরা "বড়া ঘাম হায়" বলিলে বাঙ্গালীরা যেন এইরূপ না বোঝেন যে স্বেদের কথা বলা হইতেছে। সংস্কৃত ঘর্ম্ম শব্দের সদৃশ গ্রীক থের্ম্মস্, ইংরেজী ওয়ার্ম, ফার্সী উর্দ্দু বাঙ্গলা গরম শব্দ। আমার বোধ হয় কালিদাস মেঘদূতের ১৬২ শ্লোকে স্বেদ অর্থেই ঘর্ম্ম শব্দ চালাইতে ইচ্ছা করিয়াছিলেন। শ্লোকটার ব্যাখ্যা এই :—কৈলাস-শিখরে সুরযুবতীগণ একখণ্ড মেঘ ধরিয়া তাহাতে তাঁহাদের নিজের বলয়ের হীরকাংশ দিয়া ঠুকিয়া ঠুকিয়া জল বাহির করিতেছিল। সেই ঘর্ম্মলব্ধ মেঘকে যদি তাহারা ছাড়িয়া দিতে অনিচ্ছুক হয় তাহা হইলে মেঘ যেন গর্জ্জন করিয়া তাহাদিগকে ভয় দেখায়। টীকাকারেরা সকলেই এখানে ঘর্ম্ম শব্দের অর্থ গরম বলিয়া উল্লেখ করিয়াছেন। তথাপি আমার বোধ হয় যে সেই শ্লোকে স্বেদ বুঝিলে অর্থটা ভাল হয়। হিমালয়শিখরে উত্তাপ হওয়ার সম্ভাবনা বোধ হয় নাই, অন্য পক্ষে মাথার ঘাম অর্থাৎ স্বেদ পায়ে

ফেলিয়া উপার্জ্জনের কথা বলিয়া থাকি, ইংরেজীতে sweat of the brow, হিন্দীতে পেশানীকা পসিনা কথা আছে। অর্থাৎ যাহাতে এমন পরিশ্রম করিতে হয় যে তাহাতে স্বেদোদ্গম হয়। দেবকন্যারা এক খণ্ড মেঘ ধরিবার জন্য এরূপ পরিশ্রম করিয়াছিলেন যে তাহাতে তাঁহাদের স্বেদোদ্গম হইয়াছিল। এই অর্থটাই গরমের সময়ে মেঘ ধরার অর্থ অপেক্ষা ভাল বলিয়া আমার বোধ হয়। এই শ্লোকে কালিদাস যদি সাহস করিয়া স্বেদ অর্থে মেঘ শব্দ প্রয়োগ করিয়া থাকেন তাহা হইলে তিনি নিশ্চয়ই বাঙ্গালী ছিলেন।

আমরা কথোপকথন অথবা পরিচয় অর্থে 'আলাপ' শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি, কিন্তু আলাপের প্রকৃত অর্থ রাগ-রাগিণীর সাধন।

'আমোদ' শব্দের অর্থ সুগন্ধ, কিন্তু আমরা প্রমোদ বা রসিকতা অর্থে আমোদ বলিয়া থাকি।

'প্রশস্ত' শব্দের অর্থ ভাল, কিন্তু আমরা প্রস্ত অর্থাৎ চওড়া অর্থে শব্দটা প্রয়োগ করিয়া থাকি।

'সহজ' শব্দের অর্থ সঙ্গে জাত, কিন্তু আমরা অনায়াস বা অল্পায়াস সাধ্য অর্থে সহজ শব্দ ব্যবহার করিয়া থাকি। অতি সাবধান লেখকেরাও কোন-না-কোন রূপে উক্ত ভুল অর্থে সহজ শব্দের ব্যবহার হইতে মুক্ত নহেন। বাঙ্গলা দেশের এক জন সর্ব্বশ্রেষ্ঠ পণ্ডিত আমাকে বলিলেন যে তিনি কখনই ভুল অর্থে সহজ প্রয়োগ করেন না। কিন্তু তাঁহার লেখাতে আমি অনায়াস বা অল্পায়াস অর্থে অর্থাৎ adverb রূপে সহজ শব্দের প্রয়োগ দেখিয়াছি।

'সুতরাং' শব্দের অর্থ বিশেষরূপে বা অধিকরূপে; কিন্তু আমাদের সুতরাং শব্দের অর্থ অতএব বা এই হেতুতে। আমার কখনও কখনও মনে হইয়াছে যে আমাদের 'সুতরাং' শব্দ হয়ত প্রথমে a fortiori শব্দে প্রযুক্ত হইয়াছিল।

এক জন প্রধান কবি না-কি শেষরাত্রি অর্থে প্রদোষ শব্দ প্রয়োগ করিয়াছেন অথচ শব্দটার অর্থ সন্ধ্যাকাল।

'আদৌ' শব্দের অর্থ আদিতে, কিন্তু আমরা মোটেই বা কিছুমাত্র অর্থে শব্দটার প্রয়োগ করিয়া থাকি।

'হিংসা' শব্দের অর্থ বধ করা, কিন্তু আমরা দ্বেষ পোষণ করাকে হিংসা বলি।

'প্রমাদ' শব্দের অর্থ ভুল, কিন্তু আমাদের প্রমাদের অর্থ বিপদ। যে ব্যক্তি ভুল করিয়াছে তাহাকে প্রমত্ত বলা উচিত কিন্তু আমরা প্রমত্ত বলি অহংকৃত বা গর্ব্বিত লোককে।

যে করে সে কর্ত্তা। Nominative-কেও কখনও কখনও কর্ত্তা বলা হয়, কিন্তু আমরা কর্ত্তা বলি অধিকারী অর্থাৎ স্বামীকে। গৃহস্বামীকে বাড়ীর কর্ত্তা বলি। 'কর্ত্তা' শব্দের কথা লিখিতে লিখিতে একটা গল্প মনে পড়িল। এক পণ্ডিত কোন স্থানে যাইতে যাইতে দেখিলেন যে পথপার্শ্বে এক বাড়ীতে মহাভারতের কথা হইতেছে। পণ্ডিত কথা শুনিবার জন্য সেই বাড়ীতে প্রবেশ করিলেন এবং কথক মহাশয়ের ব্যাখ্যা শুনিয়া বুঝিলেন যে কথক সংস্কৃত কিছুই জানেন না। একটা শ্লোকের ব্যাখ্যা এত অদ্ভুতরূপে ভুল হইয়াছিল যে তাহা শুনিয়া পণ্ডিত থাকিতে না পারিয়া কথককে সম্বোধন করিয়া বলিলেন, মহাশয় আপনার ব্যাখ্যাটা ঠিক হয় নাই, দেখুন দেখি ঐ শ্লোকের মধ্যে কে কর্ত্তা। কথক শ্রোতাদিগকে বলিলেন, তোমরা কি এমন নির্ব্বোধ এবং মূর্খ আর কোথাও দেখিয়াছ? সমস্ত মহাভারতের কর্ত্তা বেদব্যাস। সমস্তের কর্ত্তা যিনি খণ্ডের কর্ত্তাও অবশ্যই তিনি। সুতরাং এ শ্লোকের কর্ত্তাও অবশ্যই বেদব্যাস। এ সামান্য কথাটাও এ লোকটা জানে না। ইহাকে মহাভারত শুনিতে দেওয়াও অনুচিত। তখন শ্রোতারা সকলে মিলিয়া সেই পণ্ডিতকে তাহাদের মধ্য হইতে বাহির করিয়া দিল।

'যথেষ্ট' শব্দের অর্থ যত প্রয়োজন ততমাত্র। কিন্তু সংবাদ-পত্রে সর্ব্বদাই দেখিতে পাই যে অত্যন্ত অর্থে শব্দটা ব্যবহৃত হইয়া থাকে। যেমন নিরপরাধ লোককে ধরিয়া যথেষ্ট প্রহার করা।

বাঙ্গলা দেশে প্রায় সকলেই পট্টিকে (puttiকে) বলে পুড়িং। 'ধার্ম্মিক' শব্দটা ব্যাকরণ অনুসারে মনুষ্যের প্রতি প্রযোজ্য, কিন্তু দুই জন শ্রেষ্ঠ লেখক 'ধার্ম্মিক কার্য্য' লিখিয়াছেন।

পূর্ব্বে মৃত ব্যক্তিকে ঈশ্বরপ্রাপ্ত বলা হইত। কয়েক বৎসর হইল তাহার পরিবর্ত্তে স্বর্গীয় লেখা হইতেছে। এইরূপ লেখা যে ভুল তাহা একটু ভাবিয়া দেখিলেই উপলব্ধ

হইবে। স্বর্গগত অথবা স্বর্গত বলিলে ভুল হয় না এবং সাবধান লেখকেরা তাহাই লিখিয়া থাকেন।

কাহারও মৃত্যু হইলে, বিশেষতঃ পিতা অথবা মাতার মৃত্যুর পর, কয়েক দিন বাঙ্গলা দেশের হিন্দুরা স্বীয় বিশ্বাস অনুসারে অতি শুচি ভাবে থাকেন, মাছ-মাংস খান না, নিম্নজাতীয় লোককে স্পর্শ করেন না, যেখানে সেখানে আহার করেন না অথচ সেই সময়টিকে বলেন অশৌচ—ইহাও একটা মস্ত ভুল। এই বিষয়ে আমি স্থানান্তরে বিস্তৃত ভাবে আলোচনা করিয়াছি।

এক প্রদেশেরই ভিন্ন ভিন্ন স্থানে কোন কোন শব্দ সম্পূর্ণ ভিন্ন অর্থে প্রযুক্ত হইয়া থাকে। আমরা কন্যাকে বলি মেয়ে, কিন্তু রাঢ়ে মেয়ে বলে স্ত্রীকে।

অনেক সময়ে লোকে নিজের দেশের কথা ভুলিয়া যায় এবং সেই সকল কথার নূতন অর্থ করিয়া থাকে। অবিবাহিত বালক-বালিকাকে আইবড় বা আইবুড় বলিত। কিন্তু পঞ্চাশ বৎসর পূর্ব্বে বিবাহের নিমন্ত্রণ-পত্রে আইবুড়-ভাত স্থলে আয়ুর্ব্বান্ন লেখা হইত, 'আইবুড়' শব্দটা যে অব্যূঢ় শব্দের অপভ্রংশ তাহাতে সন্দেহ মাত্র নাই এবং তাহার অর্থ অবিবাহিত।

এত বড় ঘর বড় আইবড় ঝি
বিবাহ না হ'লে পরে লোকে কবে কি।

এই কবিতার 'আইবড়' শব্দের অর্থ যে অবিবাহিত তাহা সম্পূর্ণ স্পষ্ট। আবার 'ঝি' শব্দের অর্থ যে কন্যা তাহাও এখানকার অনেক বাঙ্গালী ভুলিয়া গিয়াছেন। কয়েক বৎসর পূর্ব্বে এক জন বাঙ্গালী ষ্টেট্‌স্‌ম্যান পত্রে, ঝিকে মেরে বৌকে শেখান, এই কথাটার অর্থ করিতে গিয়া ঝি শব্দের অনুবাদ করিয়াছিলেন maid-servant। বাঙ্গালীরা বাড়ীর চাকরাণীকে ঝি বলিতে আরম্ভ করিয়াছিলেন যেহেতু চাকরাণীর প্রতি কন্যার মত ব্যবহার করা উচিত বলিয়া তাঁহারা মনে করিতেন। এই শব্দটিতে বাঙ্গালীদের মনের উচ্চ ভাবই প্রকাশ পায়।

'অহল্যাজার' ইন্দ্রের একটা নাম। কালে হিন্দুরা এই বৈদিক নামের অর্থ ভুলিয়া গিয়াছিলেন। পৌরাণিকেরা ইন্দ্রের নামে এক জঘন্য কলঙ্ক আরোপ করিয়া এক গল্প সৃষ্টি করিলেন। সেই গল্প এখন সকলেই বিশ্বাস করে। মহাপণ্ডিত কুমারিলভট্ট দেখাইয়াছেন যে 'অহল্যা' শব্দের অর্থ রাত্রি এবং পরম ঐশ্বর্য্য জ্ঞাপক ইদ্‌ ধাতু হইতে নিষ্পন্ন ইন্দ্র শব্দ সূর্য্যেরই নামান্তর। সেই সূর্য্য রাত্রিকে জীর্ণ অর্থাৎ ক্ষয় করেন বলিয়া তাঁহার এক নাম অহল্যাজার।

পূর্ব্বকালে মাংস দিয়া শ্রাদ্ধ হইত। কলিকালে পল-পৈত্রিক অথবা মাংসশ্রাদ্ধ নিষিদ্ধ, এই জন্য বাঙ্গলা দেশে মাংসের বিকল্প করিয়া কলা পোড়াইয়া দেওয়া হয়। সুতরাং তোমার গুষ্টির শ্রাদ্ধ করছি, তোমার পিণ্ডি চট্‌কাচ্ছি প্রভৃতি গালাগালি যে পর্য্যায়ের, কলা পোড়া খাও গালাগালিও সেই পর্য্যায়ের। বাঙ্গালীরা অনেকেই এই শেষ গালাগালিটার ব্যুৎপত্তি জানেন না।

সংস্কৃতের যে কত শব্দের অর্থ বিস্মৃত হওয়ায় সেইগুলির নূতন এবং অসম্ভব ব্যুৎপত্তি করা হইয়াছে তাহার ইয়ত্তা নাই। এ প্রবন্ধে আর অধিক দৃষ্টান্ত দিবার স্থান নাই, এই জন্য আমি ভাষা-বিষয়ে আর একটি মাত্র কথা বলিয়া এই প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

কয়েক বৎসর হইতে মধ্যে মধ্যে শুনা যাইতেছে যে আমাদের বাঙ্গলা ভাষা ত্যাগ করিয়া হিন্দী ভাষা অবলম্বন করা উচিত, এমন কি অন্ততঃ রাজনীতিবিষয়ক আলোচনার জন্য সমস্ত ভারতে ইংরেজীর পরিবর্ত্তে একমাত্র হিন্দী ভাষার প্রচলন হওয়া উচিত। এইরূপ চেষ্টা কংগ্রেস হইতে ইতিমধ্যেই আরম্ভ হইয়াছে। এই চেষ্টাটা কেবল যে কখনও সফল হইবার সম্ভাবনা নাই এমন নহে, এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত বলিয়াও আমি মনে করি না। ইচ্ছায় হউক বা অনিচ্ছায় হউক আমরা সকলেই ইংরেজী শিক্ষা করিয়া থাকি। ইহা যে কেবল অর্থ উপার্জ্জনের জন্য করি তাহা নহে, জ্ঞান শিক্ষার জন্যও করি। কেননা ইংরেজী সাহিত্য ভারতের যে-কোন ভাষার সাহিত্য অপেক্ষা সর্ব্ববিষয়ে শ্রেষ্ঠ। ইহা সমুদ্রসদৃশ বিশাল এবং গভীর। ইংরেজী ত্যাগ করিলে আমাদের জ্ঞানলাভের পথ রুদ্ধ হইয়া আমাদের সর্ব্বনাশ হইবে। আমাদের উভয় কূলই নষ্ট হইবে। যো ধ্রুবানি পরিত্যজ্য অধ্রুবানি নিষেবতে ইত্যাদি শ্লোকটা সকলেই জানেন। কেবল ভাষাবিষয়ক উৎকর্ষ অপকর্ষের কথাই ধরা যাউক। হিন্দীতে বাঙ্গলা ভাষা অপেক্ষা বিভক্তির সংখ্যা অনেক অল্প, এই জন্য বাঙ্গলা অপেক্ষা হিন্দীর প্রাধান্য

অবশ্যই স্বীকার করিতে হইবে। কিন্তু কোন কোন বিষয়ে বাঙ্গলা যেমন অঙ্গহীন, হিন্দীও তেমনই অঙ্গহীন ভাষা। বাঙ্গলার সর্ব্বনামেও যেমন লিঙ্গের পার্থক্য নাই, হিন্দীরও তেমনই। ইংরেজীতে He ও She এবং সংস্কৃত সঃ এবং সা একটা পুংলিঙ্গ আর একটা স্ত্রীলিঙ্গ। কিন্তু বাঙ্গলায় এবং হিন্দীতে কেবলমাত্র একটি শব্দেই পুংলিঙ্গ এবং স্ত্রীলিঙ্গ বুঝায়। হিন্দী ভাষার আরও একটা গুরুতর অসুবিধা শব্দের লিঙ্গভেদ। সংস্কৃত আত্মা, জয় প্রভৃতি শব্দ পুংলিঙ্গ, কিন্তু হিন্দীতে এগুলি স্ত্রীলিঙ্গ। এই জন্যই আমরা 'গঙ্গামায়ীকী জয়' শুনিতে পাই —অর্থাৎ জয় শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ বলিয়া তাহার বিশেষণও স্ত্রীলিঙ্গ। হিন্দীতে পুস্তক বহি প্রভৃতি অগণিত শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ। স্ত্রীবোধক শব্দ স্ত্রীলিঙ্গ এবং পুংবোধক শব্দ পুংলিঙ্গ হওয়া উচিত। কিন্তু অকারণে শব্দের লিঙ্গভেদ বড়ই যুক্তিহীন। সংস্কৃতে 'কলত্র' শব্দের অর্থ স্ত্রী, কিন্তু কলত্র শব্দটা ক্লীবলিঙ্গ। 'দার' শব্দের অর্থও স্ত্রী, কিন্তু দার শব্দটা পুংলিঙ্গ। এইরূপ যুক্তিহীন লিঙ্গ-সংবলিত হিন্দীভাষা আমাদের নিজেদের ভাষা ত্যাগ করিয়া কেন অবলম্বন করিব? হিন্দীর আর একটা অসুবিধাজনক বিশেষত্ব এই যে উহার ক্রিয়াপদেও কর্ত্তার লিঙ্গ দিতে হয়। নদীয়াঁ বহতী হৈঁ অর্থাৎ নদী সকল বহিতেছে।

এক জন শিক্ষিত হিন্দুস্থানীর সহিত আমার এই বিষয়ে কথা হইয়াছিল। তিনি বলিলেন, ইংরেজী বিদেশী ভাষা, এই জন্য ইংরেজীকে আমরা ভারতের সার্ব্বভৌম ভাষা করিতে চাহি না। ভারতের একটা ভাষাকেই সার্ব্বভৌম ভাষা করা উচিত এবং হিন্দী সেই ভাষা হইবার উপযুক্ত, যেহেতু তাহা অধিক লোকের ভাষা। তাঁহার এই উক্তির উত্তরে আমি বলিয়াছিলাম, কেবল বিস্তার দেখিয়াই একটা ভাষা গ্রহণ করা উচিত নহে। ভাষার যথাসম্ভব সুগমতা, সর্ব্বাঙ্গপূর্ণতা প্রভৃতি গুণ দেখিয়াই নির্ব্বাচন করা উচিত। সাহিত্যের কথা ছাড়িয়া দিয়া কেবল এই সকল গুণ দেখিয়া যদি ভাষা নির্ব্বাচন করিতে হয়, তাহা হইলে বোধ হয় খাসিয়া ভাষা সর্ব্বোৎকৃষ্ট। দুই মাসে যে-কোন যুবক ইহা শিখিতে পারে। ইহার গঠন স্বাভাবিক এবং ইহাতে বিভক্তির জঞ্জাল নাই। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের মত ভাষাবিৎ পণ্ডিতদিগের মত প্রকাশ করিতে অনুরোধ করি।

হয়ত

"বনফুল"

মুখেতে যে-কথা যায় নাক বলা
  চোখেতে সে-কথা কহে
চোখেও যে-কথা পারে না বলিতে
  বাতাসে সে-কথা বহে।

সাঁঝের বাতাসে হয়ত আজিকে
  তোমার মনের কথা
ভাসিয়া আসিয়া আজি মোর মনে
  তুলিয়াছে আকুলতা।

তাই আজি সখি অকারণে বুঝি
  মনেতে ফুটিছে ফুল
চোখের সমুখে দুলিছে তোমার
  কানের দোদুল দুল।

মহাষ্টমী

শ্রীতারাপদ রাহা

গড়াই হইতে আরম্ভ করিয়া নবগঙ্গা পর্য্যন্ত জলে একাকার হইয়া গেছে। গড়াইয়ের জল কুমারে, কুমারের জল নবগঙ্গায় মিশিতেছে। এক দিন যে এ পৃথিবীতে সবুজ তৃণ ও ধূসর মাটির পথ ছিল লোকে সে কথা প্রায় ভুলিতে বসিয়াছে। মেয়েদের জল আনিতে আর নদীতে যাইতে হয় না, বাড়ীর পাশে যেখানে একটু বেশী নীচু সেইখানে আর একটু খুঁড়িয়া কলসী ভরিবার ও স্নানের জায়গা করা হইয়াছে। যাহাদের বাড়ীর পাশ দিয়া 'নয়ন-জুলি' গিয়াছে তাহাদের আবার এ-কষ্টও করিতে হয় না, তাহারা নয়ন-জুলিতেই কলসী ডুবাইয়া জল ভরে, নয়ন-জুলিতেই স্নান করে আবার মাছ ধরিতে সেইখানেই 'বিত্তি', 'বেনে', 'দোয়াড়ি' পাতে। দক্ষিণে মাঠের দিকে যেখানে বিল আসিয়া চাষীদের বাড়ীর উঠানে গা ঢালিয়া দিয়াছে সেখানে লোকে তালের ডোঙায় যাতায়াত করে, যাহাদের ডোঙা নাই তাহারা বড় বড় কলাগাছ কাটিয়া বাঁশের গোঁজ দিয়া ভেলা তৈয়ার করিয়া লইয়াছে; বাঁশের লগি ঠোকরাইয়া ঠোকরাইয়া তাহাতেই এবাড়ী ওবাড়ী যায়, তাহাতেই হাট করিয়া ফিরে।

বড়দের অবর্ত্তমানে ছোটরা ভেলা ও ডোঙা লইয়া গলিতে গলিতে খেলা করিয়া বেড়ায়, এত বড় বন্যাতেও তাহাদের রক্ত ঠাণ্ডা হয় নাই।

কিন্তু বড়দের রক্ত একেবারে ঠাণ্ডা হইয়া যায়—যখন তাহারা তাকায় মাঠের দিকে। এত বড় যে বিল—'বড় বিলে'—তাহাতে একটু সবুজের আভা নাই, 'গো-বিলে',—'গড়ের-মাঠ'—'পদ্মবিলে'—সবই জলের তরঙ্গে ধূ-ধূ করিতেছে। মাঠের এত বড় বৈধব্যের বেশ গ্রামের অতি-বড় প্রাচীনেরাও না কি দেখেন নাই, এমন কি বাপঠাকুর্দ্দার কাছে শোনেন নাই পর্য্যন্ত।

'আকাল' এবার হইবেই, সুতরাং যাহাদের একটু বয়স হইয়াছে তাহারা জলের দিকে তাকাইয়া নিজের আর আপন জনের পেটের কথা ভাবে। প্রতিদিন সন্ধ্যায় গিঁটওয়ালা কঞ্চি পুঁতিয়া রাখা হয়, জলের সমতলে গিঁট; কিন্তু সকালে দেখা যায় গিঁট ছাড়িয়া জল একটুও কমে নাই, মাঝে মাঝে বরং গিঁট ডুবাইয়া দেয়।

চাষীরা মাথায় হাত দিয়া বসিয়াছে, আল্লা কি পানিই দিল! ভদ্র-গৃহস্থেরও শঙ্কার অন্ত নাই, তাহাদের অধিকাংশের নির্ভর ঐ দক্ষিণের মাঠ, যাহাদের স্বামী পুত্র বিদেশে চাকুরী করে তাহাদেরও তাকাইয়া থাকিতে হয় ঐ দক্ষিণের মাঠের দিকে, সুতরাং তাহারাও চিন্তিত। ছেলে-মহলেও চিন্তার অন্ত নাই—জল যদি এমনিই থাকে তবে দুর্গাপূজায় আমোদ এবার একেবারেই হইবে না,—কলিকাতা হইতে বরেন, সুধীর, প্রতুল সবাই আসিবে, কিন্তু থিয়েটার হইবে কোথায়? পঞ্চবটীর উঠানে ত এখন জল থইথই করিতেছে,—বাগচী-বাড়ীর উঠান ত এখন 'বড়-বিলে'র একটি অংশ।

রায়-বাড়ীর মেজবৌ শান্তিলতার স্বামী বিদেশে চাকুরী করেন, তবু সেও চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছে। আজকাল ভ্রূ তার সব সময়েই কুঞ্চিত হইয়া থাকে। বড়বৌ সেদিন তাহাকে সান্ত্বনা দিবার জন্য নিতান্ত ভাল মনেই বলিয়াছিল, অত ভাবিস্ নে লো, মেজবৌ, জীব দেছেন যিনি আহার দেবেন তিনি,—আমার ত সোনার ছাওর, কিন্তু এ সারা গাঁয়ের মানুষগুলোর কথা ভাব দেখি একবার!

ঠোঁট উল্টাইয়া শান্তিলতা বলিয়াছিল, মাথার ঘায়েই কুকুর পাগল; নিজের ভাবনা ভা'বেই থলকূল পাই নে,—আবার সারা গাঁয়ের ভাবনা! এট্টা লোকের উপর এতগুলো লোকের পেট,—ভা'বে দ্যাখো না। তোমার এট্টা,—আমার চারডে—ঐ রোগা ভাসুর,—আমরা তিন তিনডে,—চা'লির দাম ত বাড়লো বুলে,—এত সব আ'সে ক'নতে ভা'বে দ্যাখো না একবার!

বড়বৌয়ের স্বামী রসিকের পক্ষাঘাত হইয়া এক অঙ্গ পড়িয়া গিয়াছে, বাঁ-হাত ও বাঁ-পা তিনি নাড়িতে পারেন না,

মেয়ে পনর উত্তীর্ণ হইয়া ষোলয় পা দিয়াছে, বিবাহ না দিলে চলে না, অথচ স্বামী অশক্ত, নির্ভর করিতে হইবে দেবর হেমন্তের উপর—শান্তিলতার স্বামী। তাই কথাগুলি বড়বৌয়ের তত ভাল লাগিল না, কথা সে একটাও বলিল না, কিন্তু নিজেরও অজ্ঞাতে একটা দীর্ঘনিশ্বাস বাহির হইয়া আসিল, হায়, এবারই পূজায় সে কন্যা উষাকে একখানা ঢাকাই বুটীদার দিবে বলিয়া অঙ্গীকার করিয়াছে,—ভাগ্যিস রাঙা ঠাকুরপোকে সে এ অনুরোধ জানাইয়া চিঠি লেখে নাই।

ছোটবৌ সুহাসিনী একটি বেতের ধামিতে করিয়া চাল লইয়া এক হাতে পায়ের কাপড় তুলিয়া আধ হাঁটু জল বাঁচাইয়া রান্নাঘরে যাইতেছিল। মেজবৌয়ের রাগ পড়ে নাই, তাহাকে দেখিয়া আবার জ্বলিয়া উঠিল, ঐ ত এক জন দাদাদের কথা না শুনে সুন্দরী বৌ বিয়ে ক'রে আনলেন, কিন্তু খাতি দেয় কেডা—শুনি? কত দিন ত দুডোরেই পুষতি হ'ল—কই এক বছর ত রোজগার করতি গেছেন, এট্টা ফুটো পয়সা দিয়ে ত সাহায্য করতি পারলেন না! গা আমার জ্বলে যায়—

শান্তিলতার মেজাজ দেখিয়া বড়বৌ ও ছোটবৌ আশ্চর্য্য হইয়া যায়। স্বামী তার অন্নদাতা, সুতরাং মেজাজ তার হইবেই, কিন্তু জল বাড়তির সঙ্গে সঙ্গে মেজাজ তার দিন দিন যেন বাড়িয়া চলিয়াছে। পরের দেওয়া ভাত যখন খাইতে হয়, তখন কথা তাহার শুনিতে হইবেই, কিন্তু তাই বলিয়া দুঃখ কি লাগে না? রুগ্ন স্বামীর কানে কথাগুলি পৌঁছিয়াছে নিশ্চয়—বড়বৌ মুখ নীচু করিয়া তাহাদের পশ্চিমের ঘরে রওনা হইল। পক্ষাঘাতে তার স্বামীর অঙ্গ হয়ত চিরকালের জন্যই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে, কিন্তু কান ও মন হইয়াছে অধিকতর সজাগ।

রাঁধিতে বসিয়া সুহাসের বুকের ভিতরটা সেদিন কেবলই মোচড়াইতে লাগিল। প্রায় বৎসর ঘুরিয়া আসিল স্বামী তাহার বিদেশে গিয়াছে, এর মাঝে একখানাবই চিঠি সে পায় নি। এত দিনই সে চাকরি পায় নি—এটা কি সত্যি? আর কত দিন সে পরের দুয়ারে দাসী-বৃত্তি করিবে, পরের লাথিঝাঁটা খাইবে? বিশ টাকা মাহিনার চাকরিও কি এত দিন মিলিল না, তাহা দিয়াই যে সুহাস সংসার করিতে পারিত! একখানা চিঠি লেখার পয়সাও কি তাঁর জুটে না?—সুহাসের কান্না পাইতে লাগিল। কে জানে—হয়ত তাই! সে ত পরের লাথি খাইয়াও দু-বেলা দু-মুঠো খাইতে পাইতেছে, কিন্তু ঐ নিতান্ত অসহায় আয়েসী জীবটি কোথায় কি খাইয়া দিন কাটাইতেছে—কে জানে। যাবার সময় সে বলিয়া গিয়াছে, যত দিন কাজ না পাই বাড়ী আসব না, চিঠি লিখব না, তুমি ভেবো না। চিঠি না পেলে জেন—ভাল আছি,—অসুখ হ'লে খবর পাবে।

কিন্তু সুহাস বোঝে না—বিবাহের পর যে-লোক তার আঁচল ছাড়িয়া এক দিন কোথাও কাটাইতে পারিল না,—এক বৎসর ঘুরিয়া আসিল, এত দিন সুহাসকে না দেখিয়া, তার খবর না লইয়া সে কি করিয়া আছে!

দক্ষিণের ঘর রান্নাঘরের কাছে। সেখান হইতে কথা ভাসিয়া আসে, সুধা তার মায়ের কাছে আব্দার করিয়া বলিতেছে,—তা আমি কিছুতি শোনবো না—তা ক'য়ে দিচ্ছি,—সিল্কের ছাপা শাড়ী আর দুডো চুড়ী,—আর বছর তুমি ফাঁকি দিছো, এবার কিন্তু আমি কিছুতিই ছাড়বো না।

শান্তিলতা তাহাকে চাপা গলায় ধমক দিল, চুবো।

সুধা চুপ করিল কিন্তু মাণিক আবার সুর ধরিল—মা, আমার এট্টা সিল্কের জামা দেবা,—বাগচীগারে অমূল্যর মত—দেবা—কও!

আর একটি কচি কণ্ঠের স্বরও কানে আসিল—মা, আমাল দেবা এট্টা!

মা কি উত্তর দেয়, বোঝা যায় না, হয়ত আদর করিয়া গালটা একটু টিপিয়া দিয়াছে।

সুহাসের মনের আর কোথাও যেন ব্যথা লাগে: অমনি নরম তুলতুলে দুটি গাল…তাহার দিকে চাহিয়া বুঝি সুহাস আর এক বেদনা কিছু ভুলিতে পারিত। সহসা সুহাসের মনে হয়—সত্য আসিবে। বিজয়ার দিন শেষ রাত্রে আসন্ন বিরহের কথা স্মরণ করিয়া সুহাস যখন অস্থির হইয়া উঠিয়াছিল, বার-বার তার চোখের জল মুছাইয়া সত্য বলিয়াছিল—সে আসিবে, যেখানে যেরূপ অবস্থায় থাকে সে পূজায় তাহার সুহাসের পাশে আসিবে। মা প্রসন্ন হইলে সে সুহাসকে সঙ্গে লইয়া যাইবে। মা প্রসন্ন হইয়াছেন

বলিয়া ত মনে হয় না,—সুহাসের যা কপাল! একটা ছোট কাজ জুটিলেও কি সত্য এত দিন চিঠি লিখিত না! না লিখুক সে ফিরিয়া আসুক, তাহাকে না দেখিয়া সুহাস যে আর থাকিতে পারে না। পূজার আর কত দিন আছে—মনে মনে সুহাস একবার হিসাব করিতে থাকে, রান্নাঘরে উনানের পাশে বসিয়া দু-চোখ তাহার ঝাপসা হইয়া আসে।

আশ্বিনের শেষাশেষি নদী ও মাঠের জল কমিতে থাকে। কিন্তু এ কমায় আর লাভ কি? মাঠে চেষ্টা করিলেও সবুজের একটু আভাস দেখিতে পাওয়া যায় না—তা না যাক—দত্ত-বাড়ীর বৈঠকখানায় 'মহানিশা'র রিহার্সেল সুরু হইয়াছে। একহাঁটু কাদা মাখিয়া নদীতে জল আনিতে যাইবার সময় মেয়েরা দত্ত-বাড়ীর বৈঠকখানার পিছনে দাঁড়াইয়া তাহাদের ভাই, দেওর, স্বামীর কণ্ঠস্বর কান পাতিয়া শোনে।

সন্ধ্যাকালে জল আনিতে গিয়া সুহাস সেদিন কয়েক বার মহলার আওয়াজ শুনিয়া আসিল। দাঁড়াইয়া মহলা সে একেবারে শুনিতে পারে না: সত্য আজ বাড়ীতে নাই। গত বৎসর সত্য মহলা সারিয়া রাত্রি করিয়া বাড়ীতে আসিত বলিয়া তাহার কত কষ্ট হইত, কিন্তু সে কষ্ট এবারের তুলনায় কি?—সেদিন রাত্রে শুইয়া শুইয়া সুহাস কত কথা ভাবিল: সত্য লক্ষ্মণের পার্ট করিবার সময় উর্ম্মিলা 'প্রাণেশ্বর' বলিয়া ছুটিয়া আসিয়াছিল,—তাই লইয়া সত্যকে কি ঠাট্টা! কিন্তু ঠাট্টা করিতে গিয়া সুহাস কাঁদিয়া ফেলিয়াছিল। সত্য প্রথমে বুঝিতে না পারিয়া হতভম্ব হইয়া গেল, তার পর যখন বুঝিল, হাসিয়া বুকে টানিয়া লইয়া বলিল—এতেই লাগে?

সুহাস সত্যর আলিঙ্গন হইতে মুক্ত হইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, জানি নে, যাও!

সত্য কাতুকুতু দিয়া সুহাসকে হাসাইতে চেষ্টা করিয়া বলিয়াছিল, যদি আমি আবার বিয়ে করি—তা'লে কি কর?

সুহাস রাগিয়া বলিয়াছিল,—তুমি বুঝি মনে কর—আর একজন ঘরে আস্‌লি তার বাঁদী হয়ে থাকপো,—কুমোরে জল নেই!

সত্য সুহাসের মুখখানা দু-হাতে ধরিয়া ডিজ্ হারিকেনের স্তিমিত আলোকে তাহার চোখের দিকে একদৃষ্টে চাহিয়া থিয়েটারের ভঙ্গীতে বলিয়া উঠিয়াছিল, এত হিংসে!

কিন্তু ঠাট্টাই করুক আর যাহাই করুক, স্বামী তার লক্ষ্মণের পার্ট আর করে নাই,—নবমীর দিনও ত সীতা প্লে হইল!

পাগলী বুড়ী যখন পুঁটুলি খুলিয়া বসে, তখন তার সাত রাজার ধন মাণিক দেখিয়া দেখিয়া আশ আর মেটে না,—সুহাস সারা রাত ধরিয়া স্বামীর ভালবাসার কথা ভাবিল। দেরি আর সয় না, পূজার আর কত দেরি?

শান্তিলতার ঘুম হইতে উঠিতে একটু দেরি হয়, ছেলে-পিলে লইয়া বাস তার,—সুহাসই সকালে উঠিয়া ঘরের কাজ সারে, ফেন-ভাত রাঁধিয়া ছোটদের খাওয়ায়, নিজে খায়। কিন্তু সেদিন রৌদ্র উঠিলে মেজবৌ যখন ঘুম হইতে উঠিয়া গেল সুহাস তখন অকাতরে ঘুমাইতেছে, যাইবার সময় মেজবৌ ঠোঁট উল্টাইয়া একটা ভ্রূকুটি করিয়া গেল।

এত বেলায় সুহাস কোনদিন উঠে নাই, সারারাত ঘুম হয় নাই, প্রভাতের সময় চোখ দুইটি ভার হইয়া আসিয়াছিল। লজ্জিত সন্ত্রস্ত সুহাস ঘর হইতে বাহির হইয়াই দেখিল, পশ্চিমের ঘরের বারান্দায় বড়বৌ স্বামীর পায়ে তেল মালিশ করিতেছে, রান্নাঘরের দাওয়ায় সকলে ফেন-ভাত খাইতে বসিয়াছে—উষা ভাতে সিদ্ধ কাঁঠালের বিচিতে তেল-নুন মাখাইতেছে। শান্তিলতা একটা পিঁড়িতে বসিয়া তেল মাখিতে মাখিতে উষার উপর তর্জ্জন করিতেছেন,—বুড়ো ধাড়ি মেয়ে হ'লি, একটু কাজের কাজি হলি নে,—রাঁ'ধে দিলাম, মা'খে খাতি পারিস নে,—আগে নুনির সঙ্গে লঙ্কা চটকাতি হয় না?

আজ মেজবৌ নিজে ফেন-ভাত রাঁধিয়াছে, আবার তেল মাখিয়া দুপুরের রান্না রাঁধিবার জোগাড় করিতেছে,—সুহাস লজ্জায় মরিয়া ছুটিয়া গিয়া উষাকে বলিল, উষা সরো, আমি মাখ্‌তিছি।

শান্তিলতা অস্বাভাবিক গম্ভীর হইয়া বলিল—থাক্ থাক্, আর আধিক্যে দেখাতি হবি নে, ওই পারবে

—পরের ঘরে যা'য়ে ওর আর রাঁধতিও হবি নে,—আর এত কাল আমরা রাঁ'ধেও খাই নি!

ঊষা কাঁঠালের বিচি মাখিয়া ভাগ করিতেছিল, মেজবৌ তাহাকে ধমক দিয়া কহিল—ভাগ করতিও শেখো নি,—ওটা—ওটা কার ভাগ হ'ল শুনি,—তোমার ছোট-কাকীমার? তোমার ছোট-কাকীমার অতটুকু হলি হয় নাকি,—অত এক ড্যাং ভাত গেলা হ'বে নে কেমন ক'রে শুনি!

মেজবৌয়ের স্বামীর উপার্জ্জনের অন্ন তাহাকে গ্রহণ করিতে হয়—কিন্তু দুটি ভাত খাইতে দিয়া যে লোকে এমন করিয়া কথা শুনায়, তাহা ভাবিয়া সুহাসের কান্না পাইতে লাগিল। ছেলেবেলায় মা বাপ হারাইয়া গরিব পিসীর কাছে মানুষ হইয়াছে সে, কিন্তু ভাতের জন্য কথা কোনদিন শুনিতে হয় নাই তার, বরং কিসে দুটি ভাত বেশী করিয়া খাইবে চিরদিন সেই চেষ্টাই করিয়াছে পিসী। আজ সে ইহাদের কোন কাজ করিতে পারিল না—তাহাদের দেওয়া অনাদরের অন্ন সে কি করিয়া গ্রহণ করিবে? একটা মিথ্যা অসুখের অজুহাত দেখাইয়া সে এবেলা উপবাস করিবে কি-না সেই কথাই সে ভাবিতেছিল, এমন সময় মুক্তি দিল আসিয়া মিত্তির-বাড়ীর মেয়ে সুরমা। আহ্লাদে গলিয়া পড়িয়া সে বলিয়া উঠিল, ওগো রায় বাড়ীর লোকজন, কেমন আছ সব? তার পর সুহাসকে দেখিতে পাইয়া, তাহার গলা ধরিয়া বলিল, এই যে ছোটগিন্নী,—এই দিক্ আ'সো দেখি, এক ঘড়া জল দাও, পায়ে যা কাদা লাগিচে তা এক ঘটির কাম না—বলিয়া তাহাকে টানিতে টানিতে উত্তরের ঘরে লইয়া গেল। যাইতে যাইতে সুহাস বলিল, কবে আ'লে?

আমি আবার 'তুমি' হ'লাম নাকি তোর?—সুরমা বলিল—বলিয়া তার সুডৌল হাতে একটি চিমটি কাটিল।

সুহাসের মনটা হালকা হইয়া আসিতেছিল, এত দিন পরে মনের কথা বলিবার একটি লোক পাইয়া সে যেন একটু বাঁচিয়াছে, সেও একটি দুষ্টামির কথা বলিতে যাইতেছিল এমন সময় মেজবৌয়ের স্বর কানে গেল,—চল্‌লে ত!—আমারে একেবারে উদ্ধার করে গেলেই হ'ত—কেডা আবার ভাত আগলায়ে ব'সে থাকবি?

সুহাসের স্বচ্ছন্দ ভাব কাটিয়া গেল, সুরমার বাহুমুক্ত হইয়া দাঁড়াইয়া সে বলিল, ঊষা, আমার ভাত কয়ডা ঢা'কে রাখ্ মা, আমি পরে খাবো।

সুরমা তাহাতে আপত্তি করিতে যাইতেছিল, কিন্তু সে আর কিছু বলিতে সুযোগ পাইল না, রান্নাঘর হইতে মেজবৌয়ের তীরের ফলার মত চোখা-চোখা কথা কানে আসিয়া বিঁধিল, রাজরাণী আমাগারে—রাজরাণী হুকুম করতিছেন,—বুলি, কয়ডা দাসী বাঁদী আছে আপনার শুনি?—এক বাঁদী রাঁ'ধে দিল, এক বাঁদী ঢা'কে রাখপে—বাঁদীই আবার রাণীর খাবারের জোগাড় করতি চলল। নায়কা এ্যাহোন সই-সয়লা নিয়ে পীরিত করতি চললেন—তবু তোর সোয়ামীর অন্ন যদি খাতি হতো আমাগারে!—বুলি—

নি-নায়েরের নায়ের বড়
ঠ্যাটা ঢেঁকির বাড়্‌ছি বড়—

সেই বিত্তান্ত। পরের সোয়ামীর রোজগার খায়েই এই,—নিজির সোয়ামীর রোজগার যদি খাতি, তা'লি ত ধরাকে সরা জ্ঞানই করতি নে!

পরের মেয়ে সুরমা আজ এ-বাড়ীতে আসিয়াছে তাহার সম্মুখে সুহাস এতটা প্রত্যাশা করে নাই। সুরমার সম্মুখে তাহাকে কটূক্তি করিলে অপমানটা সুরমারও কম করা হয় না—সুহাস ফিরিয়া দাঁড়াইল। বড় ভাসুর পশ্চিমের বারান্দায় শুইয়া আছেন, জবাবটা এখান থেকে দেওয়া চলে না, সুহাস রান্নাঘরের দিকে আগাইয়া আসিয়া বাঁকা-বেড়া ছাড়াইয়া আসিল। কাল রাত্রিটা সুহাসের একেবারে ভাল কাটে নাই, এত দিনের সংযমের বাঁধ ভাসাইয়া সুহাসের মুখে কথার বান ছুটিল, দিদি, ঠ্যাটা ঢেঁকির বাড়্‌ছি বড়—এ কথা ঠিক, কিন্তু তাতে লাথি না মারলি ত বাজে না,—নায়েরও আমার বড় না,—নায়ের থাকলি আর আপনাদের এখানে থা'কে লাথি ঝাঁটা খা'তাম না,—দেওর আপনার রোজগার করতি পারে না, কিন্তু রোজগারের তল্লাসেই ত এক বছর বাড়ীছাড়া। আপনারাই বলেন, বয়স তার এই বিশ ছাড়াল, এ-বয়সে আপনাগেরে গায়ের কোন্ ছেলেডা চাকরি করে ঘরে টাকা আনতিছে শুনি? আপনার সোয়ামীর রোজগার খা'য়ে

পয়মাল করলাম—শুনতি শুনতি কান ঝালাপালা হয়ে গেল—মানষির গন্ধ পালি ডেমাক্‌ আপনার দশগুণ বা'ড়ে যায়—কিন্তু আপনি বুকি হাত দে বোলেন দেখি, তাঁর কয়ডা টাকা আমরা খা'য়ে থাকি ? টাকা যা আসে তা ত আপনি বাক্‌সে তোলেন। দুই হাটের দিন দু-চার পয়সার মাছ ছাড়া কি কেনা হয় আমাগেরে শুনি ? আমি জানি শ্বশুর-ঠাকুর স্বগ্‌গে যাবার আগে তিরিশ বিঘে মাঠান্‌ ক'রে গেছেন, তা'তে সোনার ফসল ফলে, বাগিচের আম কাঁঠাল বিক্রি ক'রে টাকা আসে, পাটের টাকা আসে, সে সব ক'নে যায় ?—পেট ত আমার এট্টি,—পাচটি নিয়ে আপনার যদি চলে, তা'লি আমার একার পেটও চলবি—আমার ভাগের আম কাঁঠালের, পাটের দামেই আমার তেল নুন কাপড়ের দাম চলে যাবি।

সুহাসের উত্তেজিত ভাব দেখিয়া সুরমা পাশে আসিয়া দাঁড়াইল। মেজবৌ তেলের বাটি ছুঁড়িয়া ফেলিয়া প্রায় লাফ দিয়া উঠানে নামিয়া আসিল, কি, কি বললি ?—ভেন্ন হতি চাও,—বেশ আসুক বাড়ী এবার, তাই ক'রে দেবো, দেবো, দেবো,—এই তিন সত্যি রলো ।

সুরমা সুহাসের হাত ধরিয়া টানিল, সুহাস নড়িতে চায় না, বলে, এ সংসারে চাড্ডি খাই, তাও মাগনা না,—সকাল থেকে রাত্তির দেড় পহর পর্য্যন্ত বাঁদীগিরি করি—তাই।

বড়বৌ পশ্চিমের বারান্দা হইতে স্বামীসেবায় ক্ষণেক বিরাম দিয়া নামিয়া আসিয়া সুহাসের হাত ধরিল,—ছোটবৌ, পাগল হলি তুই, আয় এদিকে আয়—বলিয়া এক প্রকার জোর করিয়াই তাহাকে টানিয়া লইয়া চলিল।

রুদ্ধ আক্রোশে মেজবৌ চীৎকার করিতে লাগিল, সব্বনাশী,—সব্বনাশী সংসারটারে একেবারে খাবি—ঠাকুরপোর সব্বনাশ করিছে—এবার সংসারটারে খাবি।

সুহাস বড়বৌয়ের হাত ছাড়াইয়া আবার ছুটিয়া আসিল, আপনার ঠাকুরপোর কি সব্বনাশ করলাম আমি—শুনি !

মেজবৌ আগাইয়া দাঁড়াইল,—করলি নে ? তুই আ'সে তার লেখাপড়া করতি দিলি ? তিন তিন বার ফেল করলো সে—এর আগে কোন দিন ফেল করিছে ? তোর রূপিই ত পুড়ে মলো সে !

সুহাস এবার কাঁদিয়া ফেলিল—তার নিজের স্বামীর সর্ব্বনাশের কারণ সে—স্বামী তার ফেল সত্যই করিয়াছে—এ কথা সে ঝগড়া করিতে গিয়াও উল্টাইবে কি করিয়া ? বড়বৌয়ের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া সে বলিল, আপনারা আমার এ-বাড়ীতে ক্যান আনিছিলেন ?

জবাব দিল মেজবৌ, ওলো ডাইনি—তোমারে এ বাড়ীতি আমরা কেউই আনি নি, তুমি যারে নজর দিছলে—কিপাদিষ্টি করিছিলে লো—সে-ই সঙ্গে ক'রে আনিছে।

সুহাস কি একটা জবাব দিতে যাইতেছিল সুরমা তার মুখ আটকাইয়া ধরিয়া বলিল—ফের কথা বলবি ত কিল খাবি,—বড়বৌদি—ওরে আমাগেরে বাড়ী নিয়ে চললাম, বিকেল বেলা দিয়ে যাবো—বলিয়া আর কারও কথা বলিবার সুযোগ না দিয়া জলকাদার পথে একরূপ হিড়হিড় করিয়াই টানিয়া লইয়া চলিল।

সুহাস যখন বৈকালে বাড়ী ফিরিয়া আসিল, তখন বাড়ীর সুর একেবারে বদলাইয়া গিয়াছে—মেজকর্ত্তা হেমন্ত বাড়ী আসিয়াছেন : মেজবৌয়ের মুখের কঠিন রেখা নিঃশেষে মুছিয়া গিয়াছে। একদিন বর্ষা পাইয়া—শীর্ণ নীরস পুঁইডাটা যেমনি করিয়া সজীব হইয়া উঠে মেজবৌয়ের মুখ আজ তাই ; সুহাসকে দেখিয়াই বলিয়া উঠিল,—ওলো তুই আইছিস, আমি ত উয়ারে পাঠানোর জোগাড় করতিছিলাম,—এমন নেমন্তন্নো খাওয়াও দেখি নি !…উনি ত আ'সেই খোঁজ করতিছেন ছোটবৌ কই—ছোটবৌ কই ?

মেজবৌয়ের আকস্মিক এ পরিবর্ত্তনের কারণ জানিবার মত বয়স সুহাসের হইয়াছে, সেও হাসিল, হাসিয়া ভাসুরের পায়ের কাছে গড় হইয়া প্রণাম করিল।

—আ'সো মা লক্ষ্মী, আ'সেই আমি মা লক্ষ্মীরে খুঁজিছি, শরীর ভালই আছে—না মা ?

সুহাস মাথা নাড়িয়া জানাইল, হাঁ,—লজ্জাও তাহার করিল,—শরীর তাহার তবে এমনই ভাল হইয়াছে যে জিজ্ঞাসা করিয়া জানিতে হয় না যে তুমি কেমন আছ ? সুরমা পোড়ারমুখী আবার তাহাকে চুল বাঁধিয়া স্নো ঘষিয়া সং সাজাইয়া দিয়াছে। নিজের স্বাস্থ্য-সৌন্দর্য্যের

কথা স্মরণ করিয়া মাথা তাহার আরও নীচু হইতে চলিল।

হেমন্ত তাহার অবস্থা দেখিয়া বলিলেন, আচ্ছা তুমি এখন আ'সো, মা। সুহাস চলিতে আরম্ভ করিল, সুরমা পোড়ারমুখী আবার এমন কাদার পথেও তাহাকে আলতা পরাইয়া দিয়াছে।

হেমন্ত জলচৌকীতে বসিয়া তামাক খাইতেছিলেন, ছোটবৌয়ের দিকে চাহিয়া, একবার ধূম উদ্গীরণ করিয়া পরম স্নেহে বলিলেন, মা লক্ষ্মী ত আমাগারে বাড়ী বাঁধাই পড়িছেন মেজবৌ—আমাগারে আবার ভাবনা কি?

মেজবৌয়ের মুখ ভার হইয়া উঠিল, সুহাস মুখ না ফিরাইয়াও তাহা বুঝিতে পারিল—তা উঠুক,—ভাসুরের স্নেহে তাহার চিত্ত ভরিয়া উঠিয়াছে। রান্নাঘরে যাইতে যাইতে সে শুনিতে পাইল ভাসুর জিজ্ঞাসা করিতেছেন,—সে পাগলাডা আসবি কবে—কিছু জান?

—কেডা জানে!

—চিঠিপত্তর ল্যাখে নি কোন?

—তাই বা জানবো কেমন ক'রে আমি?

—থিয়েটার হচ্ছে না গাঁয়ে?

—হুঁ।

সুহাস একটা প্রাণখোলা হাসি শুনিতে পাইল,—তা'লি আর না আসে পারতিছেন না বাছাধন!

সুহাসের মনটার কোথায় যেন একটু স্বস্তি হইতেছিল: অন্ততঃ একটি লোক এ-বাড়ীতে তাহার পক্ষে বলিয়া বোধ হইতেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েরা কাদা-ভরা উঠানেই আনন্দে নৃত্য করিয়া বেড়াইতেছে। তাহাদের নূতন কাপড় আসিয়াছে। মাণিক পিছন হইতে সুহাসের গলা জড়াইয়া ধরিয়া বলিল, কাকীম', কাকাবাবু আসপি কবে? কাকাবাবু থিয়েটার করবি নে এবার?

সুহাস তাহাকে কোলে লইয়া তাহার গালটা একবার টিপিয়া দিল। উষা রান্নাঘরের বারান্দার এক পাশে বসিয়া চুল বাঁধিতেছিল, দাঁতের এক পাশ দিয়া চুলের ফিতা কামড়াইয়া ধরিয়া আর এক পাশ দিয়া কহিল, কাকীমা তোমার একখানা খাসা বুটিদার আইছে,—নীল রঙের। আমার একখানা আইছে চাঁপা রঙের। বড় কাকাবাবু বল্‌লেন—তোর ছোট কাকীর রং ফরসা—তার নীল রঙে মানাবি ভাল।

এক জন তাহাকে এমন করিয়া আদর করে মনে মনে—সুহাসের আনন্দে কান্না পায়—চিরদুঃখিনী সে, আজ কত দিন পরে তাহার বাপের কথা মনে পড়ে। ভাসুরের এমন স্নেহ পাইয়াছে সে, মেজবৌয়ের সকল অপরাধ সে ক্ষমা করে, সকালের সকল গ্লানি ভুলিয়া যায়।

মেজবৌয়ের রাগ আর তেমন নাই, সুতরাং এবেলা আর সে জিদ করিয়া রাঁধিতে যাইবে না, সুতরাং সুহাস রাত্রের রান্নার জোগাড় করিতে উঠিবে, এমন সময় এক জন ভিখারী একহাঁটু কাদা মাখিয়া "হরেকৃষ্ণ!" বলিয়া উঠানে দাঁড়াইল। নীচের কাপড় তার উঠাইয়া কোমরে গোঁজা, সুতরাং কাদা ধুইবার প্রয়োজন বোধ না করিয়াই সে বেহালায় টান দিল,—চারি দিক হইতে ছেলেপিলে ছুটিয়া আসিল। বৈরাগী বেহালায় সুর দিয়া ধরিল—

—ওরে ছিদেম সখ -

বড়বৌ পশ্চিমের ঘরের বারান্দা হইতে বলিয়া উঠিল, বরোগী-ঠাকুর শোন!

বৈরাগী থামিল।

—এ্যাট্টা আগমনী গাও দেখি।

বৈরাগী বলিল, মা ঠাওরুন, তালি এক ঘটি জল আর একখানা আসন দ্যান।

উষার চুল বাঁধা হইয়াছিল, সে এক ঘটি জল আর একটা ছোট জলচৌকী আনিয়া দিল। বৈরাগী পা ধুইয়া আসনে বসিয়া চক্ষু মুদ্রিত করিয়া বেহালার সঙ্গে গাহিল—

গিরিবর হে, এই ত শরৎ আইল,
উমারে আনিবে কবে—স্বরূপে তাই বলো বলো
হেম শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষারি অন্ত
পঞ্চ ঋতুতে পঞ্চত্ব-প্রায় হয়েছিলাম—
দেখ্যেতে পাইব কণ্যে, প্রাণ ছিল সেই জন্যে
হেরিয়ে হইব ধন্যে সেই শ্রীমুখ মণ্ডল।
গিরিবর হে—এ—

বৈরাগীর গলা ভাল, গায়ও খুব দরদ দিয়া, শুনিয়া বয়স্কেরা চোখের জল মুছিল। সুহাস উঠিয়া রান্নাঘরে গেল।

সেদিন রাত্রে সুহাসকে উত্তরের ঘরে শুইতে হইল,—

ভাসুর বাড়ীতে আসিয়াছেন, আজ তার দক্ষিণের ঘরে মেজবৌয়ের কাছে শোওয়া চলে না। কিন্তু উত্তরের ঘরের যা অবস্থা তাহাতে দিনের বেলায়ও সেখানে ঢুকিতে গা ছম্‌ছম্‌ করে। কিছু দিন আগে বন্যায় কুমারের জলের ঢেউ লাগিয়া মেটে পোতা ধ্বসিয়া গিয়াছে, মাণিক একদিন কি খেলার জিনিষ খুঁজিতে আসিয়া এ ঘরে একটা শেয়াল দেখিয়া চীৎকার করিয়া উঠিয়াছিল। সেই প্রসঙ্গে শোনা গেল এতে আশ্চর্য্য হইবার কিছুই নাই, কারণ নদীর ওপারে জোঁকার চক্রবর্ত্তী-বাড়ীর দক্ষিণের পোতার ঘরে বাঘ ও সাপ একসঙ্গে নির্ব্বিবাদে বাস করিতেছে। বাঘটাকে এখনও কেহ মারে নাই বটে, কিন্তু সেও কাহাকে কিছু বলে নাই—বন্যায় সেও তার হিংসাবৃত্তি ভুলিয়া গিয়াছে।

এ সংবাদ সুহাসেরও জানা আছে, কিন্তু তাই বলিয়া একা সে উত্তরের ঘরে থাকিতে সাহস করে না, কারণ বাঘের চেয়ে হিংস্র জীবও জগতে আছে। প্রথমে কথা হইল উষা তাহার ছোটকাকীমার কাছে শুইবে, স্বীকারও সে করিয়াছিল, কিন্তু সন্ধ্যার আগে কেমন করিয়া কে জানে তাহার মতটা হঠাৎ বদলাইয়া গেল। সুহাস মনে মনে সত্যই একটু বিপদ গণিল।

কিন্তু বিপদে ভড়কাইয়া যাইবার মেয়ে সে নয়। ঘরের এক কোণে সাজানো কাঁঠালের বড় বড় পিড়িগুলি টানিয়া ধ্বসিয়া-যাওয়া ছিদ্রগুলি বন্ধ করিল, তক্তপোষের নীচের হাঁড়িগুলি ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া ঘরে এক পাশে রাখিল কতক বা বারান্দায় বাহির করিয়া দিল। এক বছর পরে সে এ ঘরে শুইতে আসিতেছে—এ ঘরে শেষ শুইয়াছে সে গত বিজয়া-দশমীর রাত্রে—পাশে ছিল তার স্বামী। আজ কাজ করিতে করিতে সেদিনের কথা তার কেবলই মনে পড়িতেছে, আর মনে পড়িতেছে তার বৈরাগী-ঠাকুরের কথাগুলি—

* * *

হেন শিশির বসন্ত, গ্রীষ্ম বরষারি অন্ত
পঞ্চ ঋতুতে পঞ্চত্ব-প্রায় হয়েছিলাম—

হেরিয়ে হইব ধন্য সেই শ্রীমুখমণ্ডল।

মা সে হয় নাই, কন্যার বিরহ সে জানে না, স্বামীর অদর্শন-যন্ত্রণা যে কি সে কথা ভাল করিয়াই সে জানে। সহসা তার মায়ের কথা মনে হইল, মা বাঁচিয়া থাকিলে সেও বুঝি তাহাকে দেখিবার জন্য এমনি করিয়া পাগল হইয়া উঠিত; তাহা হইলে মেজবৌয়ের এত কটূক্তি সে সহ্য করিত না। সুহাস সত্যই বড় দুঃখিনী।

সুহাসের মনের অবস্থা ক্রমেই এমন হইয়া আসিতেছিল যে এখনই হয়ত বিছানা করা রাখিয়া তক্তপোষের এক কোণে বসিয়া নির্জ্জন ঘরে সে কাঁদিতে বসিয়া যাইবে, কিন্তু তাহা আর হইল না, শীতান্তের দমকা হাওয়ার মত প্রবেশ করিল সুরমা।

—কই রে—কি কাপড় পালি তুই দেখি!

—কাপড়, কই পাই নি ত—তুমি শুনলে ক'নতে?

—চালাকি—এই উষা যে ঘাটে বুলে আ'লো তোমার জরির বুটীদার নীলাম্বরী আইছে—রাঙা রঙে মানাবি ভাল!

সুহাস কোন উত্তর দিল না। সন্ধ্যার আবছা অন্ধকারে সুরমা প্রথমে লক্ষ্য করিতে পারে নাই, এখন তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, তুই কাঁদতিছিস্ না কি রে, আবার কি হ'ল তোর—এ-ঘরে বিছানা করতিছিস্ ক্যান্?

—শোব।

—মাইরি?

ভাসুর ঠাকুর আইছেন যে, দক্ষিণির ঘরে শোব কেমন ক'রে?

—ভয় করবি না নে?

সুহাস হাসিল,—ভয় করলি আর কি করব বল।

সুরমা কহিল, আমি আজ আসে থাকপো, দুই-এক দিন আসে' থাকতি পারব—তার পরে কানের কাছে মুখ আনিয়া বলিল, উনি আসতিছেন কি না?

সুহাস একটু হাসিয়া বলিল, তাই না কি, কবে?

সুহাসের মুখের দিকে চাহিয়া সুরমা বলিল, কিন্তু তুই কি আজকের ডাকেও কোন চিঠি পালি নে?

সুহাস বলিল, না ভাই একখান ছাড়া চিঠি আর ল্যাখেন নি।

—তোর কি মনে হয় পুজোতে তিনি আসপেন না?

—মিছে কথা ত তিনি আমার কাছে বোলেন নি,—

বুলিছিলেন ত পুজোর সময় দেখা হবি।— সুহাসের চোখ হইতে দু-ফোঁটা জল গড়াইয়া পড়িল।

সুরমার স্বামী তাহাকে ছাড়িয়া দু-দিন থাকিতে পারে না, হয়ত কাল পরশু আসিয়া উপস্থিত হইবে—সুহাসকে সে কি বলিয়া সান্ত্বনা দিবে ভাবিতেছিল—এমন সময় মাণিক আসিয়া জামরঙের অতি সাধারণ একখানা শাড়ী সুহাসের হাতে দিয়া কহিল, কাকীমা, তোমার কাপড় ন্যাও।

সুরমা ও সুহাস দুই জনই অবাক হইয়া পরস্পরের মুখ চাওয়াচায়ি করিল।

—তোর এই কাপড় ?

সুহাস হাসিল, তাই ত দেখ্‌ছি।

—তয় যে শোনলাম তোর নীলাম্বরী আইছে।

—আমিও ত শুনিছিলাম ভাসুরের মুখে তাই।

—তুইও তাই শুনিছিলি ?—

মাণিক কাপড় দিয়া চলিয়া যাইতেছিল, তাহাকে ডাকিয়া সুরমা বলিল, মণি শোন!

মাণিক দাঁড়াইল।

সুরমা তাহাকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া তাহার গায়ে মাথায় হাত দিয়া জিজ্ঞাসা করিল, আচ্ছা মাণিক, একখানা নীলাম্বরী শাড়ী আইছিল, দেখিছিস তুই ?

মাণিক মাথা নাড়িয়া জানাইল—হঁ।

—সেখান কি হ'ল রে ?

—সেখান নীলু মাসীমার জন্যি মা বাক্‌সে উঠোয়ে থুইছে।

—তোর বাবা বুল্‌লো বুঝি ?

—না, মা ক'লো ওটা মাসীমারে দিবি, বাবা বারণ করলো, মা শুন্‌লো না। মা কতি মানা ক'রে দেছে।

সুরমা মাণিককে ছাড়িয়া দিয়া কহিল, আচ্ছা তুমি যাও, আমরা কারু কাছে কবো না।

কথাটা শুনিয়া সুহাস শুধু স্তব্ধ হইয়া রহিল, একটি কথাও তাহার মুখ হইতে বাহির হইল না।

পূজা আসিয়া পড়িয়াছে, সুহাসের জীবন আরও তিক্ত হইয়া উঠিয়াছে। ছোট ভাসুর হেমন্তের হাবভাব এ কয় দিনে অসম্ভব বদলাইয়া গিয়াছে: প্রথম দিন তাঁহার নিকট হইতে যে স্নেহের সুর সুহাস অনুভব করিয়াছিল, সে যেন স্বপ্নের কথা। সুহাসের বিরুদ্ধে অনেক কথা তাহার কানে গিয়াছে। সুরমা এত দিন সুহাসকে আগলাইতে আসিত, আজ পূজা আরম্ভ হইয়াছে, তাহার বর আসিয়াছে, সে রাত্রে আর আসিতে পারিবে না; তবুও সুখ-দুঃখের কথা কহিয়া রাত্রিটা এক প্রকার কাটিয়া যাইত! উষাকেও সুহাস ডাকিবে না।

আজ সপ্তমী—স্বামী পূজায় বাড়ী আসিবে এ প্রত্যাশা সুহাস ছাড়িয়া দিয়াছে, আসিলে এত দিন আসিত। আশ্চর্য্য!—সুহাসের হাসি পায়, এ জগতের সকলেই সমান! আশা সে আর করে না, তবু তার অবাধ্য মন দুটি মোটর-লঞ্চের ভেঁপু শুনিলে কর্দমাক্ত পথে নদীর ঘাটে ছুটিয়া আসে। কলসী কাঁখে লইয়া স্নান করিবার সময় সে এইটিই বাছিয়া লইয়াছে। শত অজুহাতে স্নান করিবার সময় সে পিছাইয়া দেয় এই ভেঁপু শুনিবার আশে।

সপ্তমীর দিনও সুহাস কলসী লইয়া জলে নামিল। মোটর লঞ্চ এখনও দূরে রহিয়াছে—সুহাস গলা পর্য্যন্ত জলে ডুবাইয়া একদৃষ্টে সেই দিকে তাকাইয়া রহিল। ক্রমে শব্দের তরঙ্গের সহিত জলের তরঙ্গ তুলিয়া বোট সুহাসের সম্মুখ দিয়া ষ্টেশন-ঘাটের দিকে ছুটিয়া চলিল, কে একটা লোক যেন ছাউনি হইতে বাহিরে আসিয়া দাঁড়াইল। সুহাসের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল—স্বামী তার কখনও মিছে কথা বলে না—না, এ সত্য ত নয়! লোকটি তবুও এই দিকে তাকাইয়া আছে—লোকটা বেহায়া ত কম নয়!—এই দিকে তাকাইয়াই সে চীৎকার করিয়া বলিল, যাবেন একবার, আপনাদের সত্যর খবর আছে। সুহাস পিছনে ফিরিয়া দেখে মেজবৌ কলসী কাঁখে করিয়া উপরে দাঁড়াইয়া আছে। লোকটি আরও কি যেন বলিল, কিন্তু ষ্টেশনের কাছাকাছি আসিয়া মোটর তখন ঘনঘন ভেঁপু বাজাইতেছে,—কথা কানে গেল না।

সুহাস একটু যেন বল পাইল, নিজের অজ্ঞাতেই একবার মেজবৌয়ের দিকে তাকাইল।

—আমি যাব বিকেলে খবর আনতি—চন্দর-বাড়ীর ভৈরবের বর ও,—ভৈরবের নিয়ে আ'লো বুঝি—

সুহাসের মন কৃতজ্ঞতায় ভরিয়া গেল। ভৈরব না কি সুহাসের চেয়ে সামান্য বড়। স্বামী তার সুহাসের স্বামীর সঙ্গে একত্র থিয়েটার করিয়াছে, সুহাসের ইচ্ছা করিতে

লাগিল সে নিজে গিয়াই খবরটা জানিয়া আসে, কিন্তু কি লজ্জা—নিজের স্বামী ?

বিকালে মাণিককে সঙ্গে করিয়া মেজবৌ চন্দ-বাড়ী গেল। সুহাস অধীর প্রতীক্ষায় কাল কাটাইতে লাগিল। মেজবৌ হয়ত আসিয়া বলিবে, ঠাকুরপো কাল আসপি,—অতুলির সঙ্গে দেখা হইছিল তার।—সুহাস মেজবৌয়ের পায়ে পড়িবে না কি—দিদি আমারে ক্ষমা করেন,—কত অপরাধ করিছি আপনার কাছে !

কিন্তু মেজবৌ আর আসে না!—সুরমা সন্ধ্যাকালে দিব্য সাজিয়া-গুজিয়া আসিয়া উপস্থিত—সকালে তার বর আসিয়াছে !

—কি গো ছোট গিন্নী,—বুলি খবর কি ?

সুহাস তার মুখের দিকে চাহিয়া একটু হাসিল। অনেক কাল পরে সুরমা সুহাসের মুখে হাসি দেখিল : কিছু খবর আইছে বুঝি ?

—না, খবর আনতি গেছেন।

—কেডা ?

—মেজদি।

—মেজদি ?

—হঁ।

—ক'নে গেলেন তিনি খবর আনতি ?

সুহাস সুরমাকে রান্নাঘরের বারান্দা হইতে উত্তরের ঘরে লইয়া গিয়া স্নান করিবার সময়কার সেই ছোট কথাটি ফেনাইয়া ফেনাইয়া বিস্তারিত করিয়া বলিল। সুরমা বলিল, তাই নাকি ?

সুহাস মৃদু হাসিয়া বলিল, হঁ।

মাণিকের কণ্ঠস্বর কানে গেল। দুই বন্ধু আকুল আগ্রহে সত্যর সংবাদ শুনিবার জন্য কান পাতিয়া রহিল, সুহাসের বুক ঢিব্‌ঢিব্ করিতে লাগিল, কিন্তু মেজবৌ একটি কথাও উচ্চারণ করিল না। একটু পরে শোনা গেল—বড়বৌয়ের সঙ্গে ফিস্ ফিস্ করিয়া কি কথা হইতেছে। সুরমা শেষে উঠিয়া গিয়া মেজবৌয়ের পাশে দাঁড়াইল।

—কোন খবর পালেন সত্যদার ?

মেজবৌ কোন উত্তর করিল না।

কি কথা বোলেন না যে !—সুরমা মেজবৌকে বাঁকা-বেড়ার ওদিকে আড়ালে লইয়া গেল ; সেখানে অনেক ক্ষণ দাঁড়াইয়া কি কথা হইল—সুহাস দম বন্ধ করিয়া পড়িয়া রহিল—এখন প্রাণে বাঁচিয়া থাকিলে হয়—সে বার-বার মা দুর্গার কাছে জানাইল।

সুরমা গম্ভীর মুখে ফিরিয়া আসিলে সুহাস তাহার চোখের দিকে একদৃষ্টে তাকাইয়া থাকিয়া বলিল, প্রাণে বাঁ'চে আছেন ত ?

সুরমা সুহাসের দিকে কাতর দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, হাঁ।

—আলেন না ক্যান ?

—তিনি হাজতে।

—ক্যান ?

—তা, আর না শুনলে।—সুরমা সুহাসের পাশে বসিয়া তাহার পিঠে ধীরে ধীরে হাত বুলাইয়া দিতে লাগিল।

সুহাস বলিল, তুমি ব'ল,—পাষাণ হয়ে গিছি আমি, বল।

সুরমা কিছু না বলিয়া সুহাসের পিঠের উপর নিজের মুখখানা নত করিল।

দুঃখ পাইলে ইন্দ্রিয়ের শক্তি বুঝি প্রখর হয় ; পশ্চিমের ঘর হইতে চাপা গলার কথা কানে ভাসিয়া আসিতে লাগিল : এমন কেলেঙ্কারী যে হবি তা আমি আগেই জানতাম,—সুন্দরের দিক টান কি ঠাকুরপোর !

—এই বংশে শেষে খুনী লোক জন্মালো ?

—না খুন আর করে নি, করতি গিছলো, খুন করলি ত ফাঁসিই হ'ত।

সুরমাও কিছু স্পষ্ট করিয়া বলিল না, বড়বৌ, মেজবৌও না, তবু সকলের ছোট ছোট আলোচনা হইতে সুহাস বুঝিল, স্বামী তাহার খবরের কাগজের ফিরি করিয়া দিন চালাইত। যেখানে থাকিত তাহার পাশে সুন্দরী বিধবা বোন লইয়া আর এক জন গরিব কেরাণী বাস করিত। সেই সুন্দরী বিধবা ও তার স্বামীর মাঝে প্রণয় হয়। স্বামী তাহাকে লইয়া পলাইয়া যায়, ধরা পড়ে,—মেয়েটির ভাইকে স্বামী মারিতে যায়, তার পর হয় মকদ্দমা, ফলে জেল দুই বৎসর।

শুনিয়া প্রথমে সুহাস পাষাণের মতই হইয়া গেল,

এক ফোঁটা চোখের জলও ফেলিল না। সুরমা তাহার পাশেই বসিয়া ছিল। প্রায় আধ ঘণ্টা পর সুরমাকে ডাকিতে লোক আসিল। সুরমা সুহাসের গায়ে মাথায় হাত বুলাইয়া বলিল, তা'লে ভাই আমি উঠি?

সুহাস দু-হাতে সুরমাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকে মুখ রাখিয়া ফুলিয়া ফুলিয়া কাঁদিতে লাগিল।

সুরমা যখন চলিয়া গেল তখন রাত্রি এক প্রহর কাটিয়া গিয়াছে। সে আজ পাশে থাকিলেই ভাল হইত, কিন্তু তাহা ত হইবে না, তাহার স্বামী আসিয়াছে। অনেক চেষ্টা করিয়াও সুহাসকে কিছু খাওয়ানো গেল না।

সকালবেলা ঘুম হইতে উঠিয়া উষা দেখিল কাকীমা ঘরে নাই। সে মনে করিল, কাকীমা হয়ত একটু আগে উঠিয়া গিয়াছে।

মেজবৌ উষাকে জিজ্ঞাসা করিল, তোর ছোট কাকী কই রে!

চোখ রগড়াইতে রগড়াইতে উষা বলিল, আমি উঠে তারে দেখি নি ত!

মেজবৌ তাড়াতাড়ি ঘরে ঢুকিয়া কি যেন খুঁজিল, তার পর তাহা না দেখিয়া ধীরে ধীরে কাঁঠালের পিঁড়িগুলি এক পাশে সরাইয়া সেখানকার মাটি পা দিয়া আরও খানিক খসাইয়া দিল।

শান্ত গাম্ভীর্য্য লইয়া ঘর হইতে একটা গেলাস হাতে করিয়া বাহিরে আসিয়া মেজবৌ উষাকে বলিল, তোর ছোট কাকী বোধ হয় সুরমাদের ওইনে গেছে।

হ'তি পারে।

যখন একটু রৌদ্র উঠিয়াছে, দত্ত-বাড়ীর সন্তোষ ছুটিয়া হাঁপাইতে হাঁপাইতে আসিয়া বলিল, ঘাটের ডা'ন দিক পিটেপোড়া গাছের ঠিক নীচে যে গইন্ জল না—স্যাখানে—ক্যাবোল কাছিম উঠতিছে! শুনিয়া মানিক ও সুধা ছুটিয়া গেল।

বড়বৌ খানিক পরে উত্তরের ঘরে গিয়া চীৎকার করিয়া উঠিল, তোমরা ছোট বৌয়েরও খোঁজ করলে না—এদি দ্যাখো—বেড়া ত একেবারে ফাঁক।

মেজকর্ত্তা, মেজবৌ, উষা সকলে ছুটিয়া আসিল।

তাই ত!

মেজবৌ মেজকর্ত্তার দিকে চাহিয়া বলিয়া উঠিল, কি সর্ব্বনাশ, কেলেঙ্কারীর আর অন্ত র'লো না,—কি দেখতিছো—তোমাদের লালমণ্ যে ছিকলী কাটিচেন।

মেজকর্ত্তার চক্ষু ক্রমে কপালে উঠিতেছিল।

বড়বৌ বলিল, একবার ঘাটটা খোঁজ ক'রে দেখতি হয়,—কাছিম উঠতিছে বলে…কাল বড় দুখখু পাইছে!

উঠানে শব্দ হইল,—ও: বৌদি।

বড়বৌ ও মেজকর্ত্তা আগাইয়া আসিল। উষা চীৎকার করিয়া উঠিল, ওমা,—ছোট কাকা যে!

সত্য একটা বড় কাপড়ের বোঁচকা বারান্দায় রাখিয়া বৌদি ও দাদাকে প্রণাম করিয়া হাসিয়া বলিল, একটা চাকরি এই পুজোর মাঝেই হবার কথা ছিল, তাই কাল অতুলের কাছে খবর পাঠাইছিলাম,—পুজোয় আর বাড়ী যাব না। তা কাজডা এখন আর হ'ল না—তাই চলে আলাম। নৌকোয় আলাম্ তাই সকাল সকাল। তার পর সব ভাল ত!

কাহারও মুখে আর কথা সরে না।

কাহারও কোন কথা বলিবার অবসর না দিয়া মেজবৌ একটা কলসী কাঁখে লইয়া বলিল, তোমরা ব'স আমি সুরমাদের অখান থে ছোটবৌয়ের একটা খবর দিয়ে চট্ ক'রে ডুবডা দিয়ে আসি—বলিয়া বিদ্যুৎ গতিতে বাড়ীর বাহির হইয়া গেল।

চন্দ-বাড়ী পূজা। ভৈরব একটা ঘরে বসিয়া নৈবেদ্যের জন্য ফল কাটিতেছিল। মেজবৌ পাগলের মত ঘরে ঢুকিয়া দোর বন্ধ করিয়া দিল, তার পর ভৈরবের পায়ের উপর পড়িয়া বলিয়া উঠিল, ভৈরব, তুই আমারে বাঁচা।

ভৈরব বঁটী ছাড়িয়া উঠিল, বুক তাহার কাঁপিতে লাগিল: এ কি কর বৌদি, তুমি কি পাগল হ'লে, কি হইছে?

মেজবৌ চাপা গলায় বলিল, অতুল ক'নে ?

—তিনি ত আজ সকালের মোটরে কলকাতা চলে গেছেন।

মেজবৌ এইবার একটু সামলাইয়া লইল, যা'ক অতুলকে ত সাক্ষী মানিতে পারিবে না।

মেজবৌ ভৈরবের দুটি হাত ধরিয়া এবার আব্দার করিয়া কহিল, এট্টা অনুরোধ রাখতি হবি ভৈরব, চিরকাল আমি কেনা হ'য়ে থাক্‌বো।

ভৈরব হাসিয়া বলিল, কি ?

মেজবৌ বলিল, ঠাকুরপো আজ এই মাত্র বাড়ী আইছে। আমি কাল ঠাকুরপো পূজোয় আসপে না শুনে বাড়ী যা'য়ে ঠাট্টা ক'রে বুলিছিলাম—তার জেল হইছে।

—তা'তে আর কি হইছে ?

—না কিছু হয় নি, ঠাকুরপো আবার জিজ্ঞাসা করতি আসতি পারে কি না !

—তা, আসে আসুক !

—তাই ত কচ্ছি,—যদি আসে তা'লি তোমার একটা কাজ করতি হবি।

—কি, বলো—ভৈরব মেজবৌয়ের অবস্থা দেখিয়া হাসিয়া ফেলিল।

মেজবৌয়ের বুকটা কাঁপিয়া উঠিল, যদি 'না' বলে ! তাহার পর জোর করিয়া ভৈরবের হাত ধরিয়া বলিল,—যদি আ'সে জিগ্‌গেস করে, দিদি লক্ষ্মী,—বলো—অতুলের কথা, বলো উনার বন্ধু কি না—উনি ঠাট্টা ক'রে কইছিলেন—জেল হইছে—বৌদি তাই সত্যি মনে করে গেছেন।

ভৈরব হাসিয়া বলিল, আচ্ছা।

—আচ্ছা না, বল দুগ্‌গার কিরে।

ভৈরব বলিল, দুগ্‌গার কিরে।

মেজবৌ এবার হাঁফ ছাড়িয়া বাঁচিল।

দুর্গামণ্ডপে সদ্যস্নাতা শুভ্রবসনা মেয়েরা পূজার নৈবেদ্য লইয়া ভিড় করিয়া দাঁড়াইয়াছে—আজ মহাষ্টমী। মেজবৌ গলায় কাপড় দিয়া এক পাশে নত হইয়া প্রার্থনা করিল, মা আজ মহাষ্টমী, যে যা কামনা করে তার সেই বাঞ্ছা পূরণ ক'রো তুমি। ছোটবৌ যে জলে ডুবে মরিছে—এতে যেন আমাগারে কোন অমঙ্গল হয় না, মা। তুমি ত জান সে মরবি বুলে এমন কথা কই নি আমি।

প্রার্থনা নিবেদনকালে মেজবৌ এক মুহূর্ত থামিল, তার পর বলিল, আর—আর ছোটবৌ যখন আর এ জগতে নেই, তখন ঠাকুরপোর মন শান্ত করে দাও তুমি, আর—আর মা জগজ্জননী গো—আমার ছোট বোন নীলি যেন আমাগারে ঘরে আসে—এবার যেন ঠাকুরপো তারে বিয়ে করতি আর 'না' না বরে।—ভাবাবেশে মেজবৌয়ের চোখ হইতে দু-ফোঁটা জল মাটিতে গড়াইয়া পড়িল।

প্রণাম শেষ করিয়া মেজবৌ যখন বাড়ী রওয়ানা হইল, তখন তাহার শরীর কাঁপিতেছে। এত বড় একটা সঙ্কট হইতে মা তাহাকে রক্ষা করিলেন, সঙ্গে সঙ্গে মনের গোপন কোণে নীলির আগমনী-সুর ধ্বনিত হইতেছিল। সৌভাগ্যের কথা—সুহাসের জন্য এ বাড়ীতে কাঁদিবার কেহ নাই, তাহার পর বেড়া ভাঙিয়া মাটি ধ্বসাইয়া ঘটনার যে রূপ সে গড়িয়া তুলিয়াছে তাহাতে বংশের একটু কলঙ্ক হইলেও দোষটা হইবে সুহাসের—তাহার নহে, দেবরের মনটাও সুহাসের স্মৃতির উপর বিরূপ হইয়া উঠিবে। মেজবৌয়ের মনটা যেন বেশ স্বচ্ছন্দ হইয়া উঠিল।

কিন্তু বাড়ীর উঠানে পা দিতেই তাহার দুই চোখ কপালে উঠিয়া গেল। সে কি স্বপ্ন দেখিতেছে ! বাড়ীতে যেন আনন্দের মেলা বসিয়াছে, সত্য ও কুমুদ দক্ষিণের ঘরে বসিয়া প্রাণ খুলিয়া গল্প করিয়া চলিয়াছে, স্বামী তাহার পোড়া তামাক ঢালিয়া আবার নূতন করিয়া সাজিতে বসিয়াছেন, মুখখানা তার আনন্দে ভরিয়া গিয়াছে। মেজবৌকে দেখিয়াই তিনি বলিয়া উঠিলেন, তুমি কি ভয়ডাই দেখাইছিলে, মেজ বৌ ! তাই ত বুলি—বৌমা আমার সতীলক্ষ্মী—এমনডা কি ক'রে হবি ?—সুরমা রাত্তিরে আ'সে বৌমারে নিয়ে গেছে। আচ্ছা দেখ দেখি পাগলীটার কাণ্ড !—নিয়ে যাবি ত ব'লে যাতি হয় !

উত্তরের ঘরের খোলা জানালার মাঝ দিয়া সুহাসের আঁচল দেখা যাইতেছে। সুরমা তাহার পাশে বসিয়া ফিস্ ফিস্ করিয়া কি যেন বলিয়া চলিয়াছে। মেজবৌকে আসিতে দেখিয়াই সে ছুটিয়া বাহিরে আসিল—বৌদি, কি খাওয়াবেন ক'ন ?

মেজবৌ তাহার মুখের দিকে তাকাইয়া প্রথমে একটু থতমত খাইল, তার পর একটু শুষ্ক হাসি হাসিয়া বলিল—কিন্তু তুই ওরে ক'নে পালি ?

সুরমা হাসিয়া বলিল, ক'নে আবার পাব ?—এই ঘরেরতে চুরি ক'রে নিয়ে গেছি। বৌ তোমাগারে চুরি করিছি আমি, কিন্তু ঐ কলসীডা নিয়ে গেছেন—আর এক জন।

আর এক জন তখন দক্ষিণের ঘর হইতে সিংহনাদ করিয়া উঠিল, ওর মিছে কথা শুনবেন না বৌদি—গ্রামের জামাই হয়ে আমি কখনও চুরি করতি পারি ?

মেজবৌ কুমুদের কথায় জবাব না দিয়া সরাসরি ঘরে উঠিল—সুরমা শোন—তুই যদি ছোটবৌরে নিয়ে গেলি—তয় এ বেড়া ভাঙল কেডা শুনি ? মাটি ধ্বসকালো কেডা ?

মেজবৌয়ের ইঙ্গিতটা সুরমা প্রথমে বুঝিতে পারে নাই, তার পর যখন বুঝিল—হাসি আর তার থামিতে চায় না—যেন কেহ একটা জলভরা কলসী উপুড় করিয়া ঢালিয়া দিয়াছে।

—হাসিস্ ক্যান পোড়ারমুখী ?

পোড়ারমুখী বলিল, রাগ করবেন না বৌদি—এ তা'লি আপনারই কীর্ত্তি। সুহাস আর কলসীডারে যখন নিয়ে গিছি তখন বেশী রাত্তির ত হয় নেই, আমগারে বাড়ীর সকলেই জানে। এত দিন পাহারা দিছি, কালও একলা থাকপি কেমন ক'রে—তাই নিয়ে গেছি। ও ঘরেও ত ঐ কলসীটা ছাড়া জিনিষপত্তর ছিল না। রাত্তিরে ও রাঙা পিসীর কাছে ছিল—তারে জিগ্‌গেসা করলিই জানতি পাবেন।

হাসি দিয়া আরম্ভ করিলেও প্রসঙ্গ এখন ক্রমেই অপ্রিয় হইয়া উঠিতেছে দেখিয়া সত্য দক্ষিণের ঘর হইতে বাহির হইয়া আসিল। কুমুদও তার পিছু পিছু আসিয়া সুরমাকে বলিল, এই দিকে আ'সো—বাড়ী চলো।

সুরমা পোড়ারমুখীর একটুও লজ্জা নাই, সে কুমুদের আহ্বানে আগাইয়া আসিতে আসিতে মেজবৌদির দিকে তাকাইয়া বলিল, কিন্তু যাই বোলেন বৌদি—আপনার বরাত ভাল—বৌ ফিরে পালেন, দেওরের চাকরি হ'ল—এবার আমাগারে মিঠেই মোণ্ডা খাওয়ান—মা দুগ্‌গার ওখানে ষোড়শোপচারে ভোগ দেন—মহাষ্টমী আপনার করাই সাজে।

মেজবৌ অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিল, চাকরি আবার ক'নে হ'ল ?

হেমন্ত ঘটনাকে একটু সহজ করিয়া লইতে বলিলেন, তা বুঝি শোন নি ?—শোন্‌বা ক'নতে—সত্য আলি ত তুমি ঘাটে গেলে ! আমাগারে সত্যর বেশ ভাল চাকরি হইছে—পুজোর পরেই যা'য়ে আরম্ভ করবি,—প্রথমেই একেবারে তিরিশ টাকা মাইনে। তুমি এক কাজ কর মেজবৌ—আমি চিনি সন্দেশ আনায়ে দিচ্ছি, তুমি থালা বাসনগুলো একবার জল দে নাও—মার ওখানে ডালা দিতি হবি।

মেজবৌ স্বামীর মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, যাই।

উত্তরের ঘরের বারান্দায় কুমুদের অপহৃত কলসীটার উপর রৌদ্র পড়িয়া জল জল করিতেছিল, মেজবৌয়ের ইচ্ছা করিতেছিল ঐ কলসীটা গলায় বাঁধিয়া সে নিজেই একবার ভরা-গাঙের তল কোথা দেখিয়া আসে।



ভারতীয় সভ্যতার প্রাচীনতা

শ্রীরাধাকুমুদ মুখোপাধ্যায়

ভারতবর্ষের ইতিহাস আলোচনা করিতে গেলেই প্রথমে একটি মূল কথা উত্থাপিত হয়, তাহা ঐ ইতিহাসের প্রাচীনত্ব লইয়া। প্রথমেই মনে এই প্রশ্নের উদয় হয় যে ভারতবর্ষের সভ্যতা কত দিনের এবং জগতে অন্যান্য দেশের অন্যান্য সুপ্রাচীন সভ্যতার তুলনায় ইহার স্থান কোথায়। এত দিন ঐতিহাসিকদের মধ্যে একটি বদ্ধ বিশ্বাস ছিল যে মানব-সভ্যতা বিকাশের ইতিহাসে সর্ব্বপ্রথম স্থান মিশরের কিংবা মেসোপটেমিয়ার যাহা প্রথমোক্ত দেশের নীল নদী কিংবা দ্বিতীয় দেশের টাইগ্রিস ও ইউফ্রেটিস নদীদ্বয়কে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছিল। স্রোতস্বতী যে শুধু জলস্রোত বহিয়া আনে তাহা নহে, উহা সভ্যতা-স্রোতেরও উৎস। নদীর জল ও প্লাবন উষর অকর্ষিত ভূমিকে সুজলা সুফলা করিয়া সভ্যতার ক্ষেত্র সৃজন করে, কিন্তু সেই নিয়ম অনুসারে সভ্যতা যে কেবল নীল নদী কিংবা টাইগ্রিস-ইউফ্রেটিসের ধারা অনুগমন করিয়া পৃথিবীতে সর্ব্বপ্রথম প্রবাহিত হইয়াছে, আর অন্য কোন নদীর ধারে উহার আবির্ভাব হয় নাই, এ-কথা এত দিন প্রমাণের অভাবে নির্ণীত হইতে পারে নাই। কিন্তু সম্প্রতি এই সন্দেহের ভঞ্জন, এই সমস্যার উত্তর আবিষ্কৃত হইয়াছে। সিন্ধুদেশের মরুভূমিতে পঞ্জাবের প্রাচীন শহর হারাপ্পা ও সিন্ধুদেশের মহেনজোদড়ো নগরে সভ্যতার যে নিদর্শনসমূহ পুঞ্জীভূত হইয়াছে তাহার পর্য্যালোচনার ফলে ইহাই সর্ব্ববাদিসম্মত হইয়াছে যে মানবজাতির সভ্যতার উন্মেষ ভারতবর্ষেই হইয়াছিল। সুতরাং ভারতীয় সভ্যতা জগতের অন্য কোন সভ্যতার অপেক্ষা অপ্রাচীন নহে। বাহিক বাস্তব প্রমাণের পরিচয় পাইবার পূর্ব্বেই কবির অন্তর্দৃষ্টি অনেক দিন আগে এই ঐতিহাসিক সত্যের ঘোষণা করিয়াছে :—

> প্রথম প্রভাত উদয় তব গগনে,
> প্রথম সামরব তব তপোবনে,
> প্রথম প্রচারিত তব বনভবনে
> জ্ঞান ধর্ম্ম কত কাব্যকাহিনী।

আজ মহেনজোদড়োর সুগভীর ভূগর্ভ-নিহিত সুপ্রাচীন সভ্যতার নানাবিধ উপকরণ-সামগ্রী ও নিদর্শননিচয় এই বাণীর প্রতিধ্বনি করিতেছে।

কিন্তু ঐতিহাসিকের দুর্ভাগ্য যে ভারতীয় সভ্যতার সৃষ্টিকর্ত্তারা তাঁহাদের সৃষ্টির দিন-ক্ষণ-তারিখ কোন রকমে লিপিবদ্ধ কিংবা তদ্বিষয়ে কোন প্রমাণ রাখিয়া যাইবার প্রয়োজন অনুভব করেন নাই। অনন্তের প্রতি বিশেষ দৃষ্টি থাকার জন্য কালের মহিমার প্রতি তাঁহাদের মনোযোগ ছিল না। শুধু কাল কেন, বাস্তব ও নশ্বর দৈহিক জীবনের ঘটনাবলীর প্রতি তাঁহারা স্বভাবতই উদাসীন ছিলেন। সেই জন্যই সংস্কৃত ভাষায় রচিত সহস্র সহস্র গ্রন্থের ভিতর অধিকাংশেরই রচনার কাল, এমন কি রচয়িতার নাম পর্য্যন্ত জানা যায় না। শুধু বেদ, ব্রাহ্মণ, উপনিষদ কেন, অপেক্ষাকৃত আধুনিক ভগবদ্‌গীতা বা শ্রীমদ্‌ভাগবত পুরাণের ন্যায় দর্শন ও ধর্ম্মের সর্ব্বোৎকৃষ্ট অবদানেরও কালনির্ণয় একরূপ অসম্ভব। এদিকে গুরুর মর্য্যাদারক্ষাকল্পে শিষ্যের গ্রন্থ গুরুচরণে সমর্পিত হইয়াছে। "ইতি মনু," "ইতি ভৃগু," "ইতি কাত্যায়ন," "ইতি কৌটিল্য" প্রভৃতি বচন নির্দ্দেশের দ্বারাই অনেক পরবর্ত্তী কালে রচিত শাস্ত্র ভক্তশিষ্য-পারম্পর্য্যের দ্বারা তাঁহাদের আদি গুরুর প্রতি আরোপিত হইয়াছে। সংস্কৃত সাহিত্যের প্রসিদ্ধ গ্রন্থের মধ্যে এক পাণিনির অষ্টাধ্যায়ী ও পতঞ্জলির মহাভাষ্য এই দুইটিরই গ্রন্থকার ব্যক্তিগতভাবে আমাদের পরিচিত।

চিন্তা ও সাহিত্য ক্ষেত্রে বাস্তবের প্রতি উদাসীনতার যে পরিচয় পাওয়া যায়, তাহার প্রভাব জাতীয় জীবনের সমস্ত ক্ষেত্রকেই আবহমান কাল হইতে নিয়মিত করিয়াছে। তাই হারাপ্পা ও মহেনজোদড়োতে সভ্যতার প্রথম প্রভাতের যে অতুলনীয় নিদর্শন সমগ্র জগতের ইতিহাসের এক নূতন অধ্যায় উদ্‌ঘাটিত করিয়াছে, তাহারও সঠিক কালনির্ণয়ের

জন্ম কোন প্রমাণ ঐ সকল নিদর্শনে নিহিত নাই। সেই প্রমাণের সন্ধান ভারতবর্ষের বাহিরে যে-সমস্ত দেশের সঙ্গে প্রাচীন ভারতের আদান-প্রদান ছিল সে-সমস্ত দেশে পাওয়া যায়। এই প্রকারে ভারতবর্ষের ইতিহাসের পুনরুদ্ধার অনেক স্থলে বিদেশে প্রাপ্ত প্রমাণ অবলম্বনে সাধিত হইয়াছে। তাই সর্ জন মার্শালের রচিত মহেনজোদড়ো-সম্বন্ধীয় বিপুল গ্রন্থে ভূগর্ভ-খনিত বিস্তর উপকরণ ও নিদর্শন সমাহিত হইয়াছে, কিন্তু তাহার মধ্যে কালনির্ণয়ের কোন নির্দিষ্ট প্রমাণ বা ইঙ্গিত সঠিক পাওয়া যায় না। কিন্তু উক্ত গ্রন্থ প্রকাশের কিছুদিন পরেই শিকাগো ওরিয়েণ্টাল ইনষ্টিটিউট প্রত্নতত্ত্ববিৎ লইয়া ইরাক দেশে একটি অভিযান প্রেরণ করিয়াছেন। ইঁহারা বোগদাদের নিকট টেল্-আস্মার নামক পুরাতত্ত্বনিদর্শনলাভের একটি আশাপ্রদ ক্ষেত্রে খনন-কার্য্য আরম্ভ করিয়া দেন। সেখানে প্রথম খননের ফলে ভূমির উপরের স্তরেই নানাবিধ পুরাতন সামগ্রী পাওয়া গিয়াছে। তাহার মধ্যে একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে। এই মুদ্রার উপর একটি লিপি উৎকীর্ণ আছে। লিপিটিতে একটি নাম, যথা, শু-দুর-উল (Shu-dur-ul) উল্লিখিত হইয়াছে। ইহা আক্কাদ্-এর সারগন-বংশীয় একটি রাজার নাম; ইনি ঐ বংশের শেষ রাজা এবং ইঁহার কাল আনুমানিক খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০। এই মুদ্রাটির সঙ্গে জড়িত আবার আর একটি মুদ্রা পাওয়া গিয়াছে যাহা নিঃসন্দেহ ভারতবর্ষের জিনিষ। তাহার প্রমাণ মুদ্রাটিতে এমন কয়েকটি জন্তুর প্রতিকৃতি উৎকীর্ণ রহিয়াছে যাহারা বাবিলন-জাত নহে। তাহাদের প্রত্যেকটি ভারতবর্ষের নিজস্ব জন্তু, যথা, হস্তী এবং গণ্ডার। ইহা হইতে নিশ্চিত ভাবে প্রমাণিত হইতেছে যে এই মুদ্রাটি সেই যুগে ভারতবর্ষ হইতে রপ্তানি হইয়া টেল্-আস্মার প্রদেশে নীত হইয়াছিল। এইরূপ আরও অনেক প্রমাণ ক্রমশ সেখানে আবিষ্কৃত হইতেছে। এদিকে এই ধরণের মুদ্রা মহেনজোদড়োর মধ্যবর্ত্তী স্তরে পাওয়া যায়। সুতরাং সেই স্তরের সময় অন্ততঃ খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০, এইরূপ অনুমান নিঃসন্দেহে করা যাইতে পারে। ইহা হইতে আরও অনুমান করা যাইতে পারে যে মহেনজোদড়ো-সভ্যতার উৎপত্তির কাল আরও প্রাচীন; কারণ এই সভ্যতার উৎপত্তির নিদর্শন নিম্নতম স্তরে নিহিত। মহেনজোদড়োতে খনন-কার্য্যের ফলে ভূমির নিম্নে ৪০ ফুটের অধিক নীচের স্তরে সভ্যতার নানাবিধ পরিচয় আবিষ্কৃত হইয়াছে। সেইগুলিকে ভাগ করিয়া প্রত্নতত্ত্ববিদেরা মনে করেন, যেন সাতটি পৃথক পৃথক শহর সেখানে স্তরে স্তরে সজ্জিত রহিয়াছে। সুতরাং মধ্যবর্ত্তী স্তরের আনুমানিক কাল যদি খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২৫০০ ধরা যায় তাহা হইলে নিম্নতম স্তর ও প্রাচীনতম সভ্যতা ও শহরের কাল অর্থাৎ ভারতের বাস্তব-প্রমাণিত সর্ব্বপ্রথম সভ্যতা যে অন্ততঃ ইহার এক হাজার বৎসর পূর্ব্বে উন্মেষিত হইয়াছিল, ইহা প্রত্নতত্ত্ববিদগণ নিঃসন্দেহেই অনুমান করেন। এই শ্রেণীর প্রমাণের দ্বারাই ভারতের ভাব ও সভ্যতার ইতিহাস ও ক্রমবিকাশ কালের অনুবর্ত্তী হইয়া ধারাবাহিক-রূপে প্রকটিত হইবার সম্ভাবনা হইয়াছে।

ভারত যে সভ্যতার আদি উৎপত্তির স্থল তাহার আরও প্রমাণ অন্যদিক হইতেও পাওয়া যায়। সে প্রমাণ ভূতত্ত্ব- ও নৃতত্ত্ব- বিদ্‌গণের অনুসন্ধান ও গবেষণার ফল। এই বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকগণের মতে মানুষের সভ্যতা কেন, আদিম মানুষই উত্তর-ভারতে হিমালয় অঞ্চলে আবির্ভূত হইয়াছে। প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণ অনুমান করেন যে প্রকৃতিদেবী অনেক দিন ধরিয়া যুগের পর যুগ, কল্পের পর কল্প মানুষের আবির্ভাবের জন্য অপেক্ষা করিয়া আসিতে-ছিলেন। বাস্তবিক জড় হইতে জীবনের প্রথম উন্মেষ যে অণু-পরমাণুতে প্রকাশিত হইয়াছে তাহা হইতে মানুষের মত উন্নত জীবের উদ্‌গম যে অপরিসীম কালসাপেক্ষ, তাহার সন্দেহ নাই। ডারউইন-প্রমুখ প্রাণিতত্ত্ববিদ্‌গণের মতে যে শ্রেণীর জীব মনুষ্যাকারে বিকশিত হইল তাহার পূর্ব্বের জীব বানর জাতি। পৃথিবীর ক্রমবিকাশের এক অবস্থায় ভারতের উত্তর ভাগ এক মহাসমুদ্রে বিলীন ছিল। সেই সুনীল জলধি হইতে যখন হিমালয়ের অভ্যুত্থান সংঘটিত হইতে আরম্ভ হয় তখন বানরজাতি এই অঞ্চলের নিবিড় বন বৃক্ষ অবলম্বন করিয়া এইখানেই এক রকম কেন্দ্রীভূত সমবেত হইয়া পড়িয়াছিল। তার পর যখন হিমালয়ে অভ্যুত্থানের সঙ্গে সমগ্র অটবী ও বিটপী নিম্নভূমির উষ্ণতা ছাড়িয়া উপরের শৈত্যে আসিয়া পড়িল, তখন সমগ্র উদ্ভি

সেই শীতে বিনষ্ট হইল। বনের বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে বন-বৃক্ষাশ্রিত বানরজাতি আশ্রয়হীন হইয়া জীবনসংগ্রামে আত্মরক্ষার নূতন উপায় উদ্ভাবন করিতে বাধ্য হইল। এত দিন তাহারা গাছে গাছে বিচরণ করিয়া জীবনধারণ করিতেছিল। এখন নূতন অবস্থায় বৃক্ষশাখা ছাড়িয়া তাহাদের সমতলভূমিতে বাস করিতে হইল। প্রকৃতি-দেবীর এই লীলার নিগূঢ় তত্ত্ব ক্রমশ প্রকাশিত হইতে লাগিল। চতুষ্পদ বানরকে তখন সমতলভূমির উপর বিচরণ ও বসবাসের উপায়স্বরূপ দ্বিপদ হইবার জন্য চেষ্টা করিতে হইল। সেই চেষ্টার ফলেই দ্বিপদ মানুষ জগতে প্রথম আবির্ভূত হয়। সুতরাং হিমালয়ের অভ্যুত্থান শুধু একটি ভৌগোলিক ঘটনা নয়। উহার সঙ্গে মানুষের অভ্যুত্থান ঘনিষ্ঠভাবে জড়িত। হিমালয় শুধু যে ভারতবর্ষকে পূর্ণাবয়ব করিল তাহা নহে, তাহার ভৌগোলিক রূপ ও পরিণতি সম্পাদনের সঙ্গে হিমালয় মানুষ ও মানুষের সভ্যতাকেও সৃষ্টি করিয়াছে। সুতরাং ভারতবর্ষই যখন মানুষের প্রথম জন্মস্থান বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে, তখন মানুষের প্রথম সভ্যতা যে ভারতভূমিকে আশ্রয় করিয়াই আবির্ভূত হইয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ।*

* উপরিউক্ত সিদ্ধান্ত সম্বন্ধে নিম্নে কয়েকটি বিশেষজ্ঞ বৈজ্ঞানিকের উক্তি উদ্ধৃত হইল :

(1) "Man and the Himalayas arose simultaneously, towards the end of the Miocene Period, over a million years ago." [Barell]

(2) "As the land arose, the temperature would be lowered and some of the apes, the ancestors of man, who had previously lived in warm forests, would be trapped to the north of the raised area." [Sir Arthur Smith Woodward]

(3) "As the forests shrank and gave place to plains, the ancestors of man had to face living on the ground. If they had remained arboreal, or semi-arboreal like the apes, there might never have been Man." [Thomson and Geddes]

(4) "The common ancestors of anthropoid apes and men probably occupied northern India during the Miocene Period." [Elliot Smith]

(5) "We have to go to the region north and south of the Himalayas to find peoples whose facial characteristics best resemble those of Cro-Magnon men, while their stature and bodily build are best displayed by the Sikhs." [Professor Lull]

কিন্তু উত্তর-ভারতই যে মানবজাতির প্রথম লীলাক্ষেত্র ও সভ্যতার উৎপত্তিস্থান তাহার আরও প্রমাণ অন্য আর এক শ্রেণীর বৈজ্ঞানিকগণ উদ্ভাবন করিয়াছেন। উদ্ভিদ্-বিদ্যার একটি শাখাবিজ্ঞান সম্প্রতি প্রচলিত হইয়াছে। এই নব বিজ্ঞানের উদ্দেশ্য উদ্ভিদের উৎপত্তিস্থান নির্ণয় করা। ইংরেজীতে ইহার নাম প্ল্যাণ্ট জেনেটিক্স্। সোভিয়েট রুশিয়ার কতিপয় বৈজ্ঞানিক এই বিদ্যার বিশেষ অনুশীলন করিতেছেন। ইঁহাদের নেতার নাম ভেভিলফ (Vavilov)। ইঁহারা দেখাইয়াছেন যে মানবের ইতিহাসে যতগুলি প্রধান প্রধান সভ্যতা আবির্ভূত হইয়াছে প্রত্যেক সভ্যতাই কৃষিকর্ম এবং কোন একটি বিশেষ উদ্ভিদকে অবলম্বন করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে। প্রত্যেক সভ্যতাই ভূমিজ ও উদ্ভিদমূলক। সভ্যতা ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত কিন্তু তাহাকে মাটির আশ্রয় লইতে হইবে আত্মপ্রকাশের জন্য। ভাবের সহিত ভবের মিলনেই সভ্যতা প্রসূত হয়। ইহা একটি স্থির সিদ্ধান্ত যে ইউরোপের সভ্যতা গমের কর্ষণ করিয়া গড়িয়া উঠিয়াছে, আর আমেরিকা তার বদলে ভুট্টা বা গোধূম (maize) অবলম্বন করিয়াছে, চীনদেশ ও দক্ষিণ-ভারত ব্রীহি-যব-ধান্য প্রভৃতির আশ্রয় লইয়াছে। এই সকল অন্নোপায়ের মধ্যে গমই সর্ব্বাপেক্ষা বলপ্রদ। রাসায়নিকগণ প্রমাণ করিয়াছেন যে গোধূম খাদ্য হিসাবে তত ভাল নয়, কারণ ইহাতে স্বাস্থ্যের প্রধান উপকরণ ভিটামিন পাওয়া যায় না। সেই জন্য গোধূম-প্রসূত-খাদ্য-জীবী জাতি সাধারণতঃ পেলাগ্রা নামক চর্ম্মরোগে আক্রান্ত হয় এবং অপেক্ষাকৃত নিস্তেজ হইয়া সভ্যতার উৎকর্ষ সাধনে সমর্থ হইতে পারে না। খাদ্য হিসাবে গমই সর্ব্ব-শ্রেষ্ঠ। ইউরোপীয় সভ্যতার সর্ব্বাপেক্ষা উন্নতি গমের উপর প্রতিষ্ঠিত। ভেভিলফ প্রমুখ রুশের বৈজ্ঞানিকগণ সেই গমের উৎপত্তিস্থান অনেক অনুসন্ধান করিয়া আবিষ্কার করিয়াছেন। ইহা আফগানিস্থান ও পঞ্জাব প্রদেশের উচ্চভূমিতে। এই সঙ্গে তাঁহারা আরও দেখাইয়াছেন যে মিশরের সভ্যতাও গমের উপর প্রতিষ্ঠিত, কিন্তু সেই গম ভারতীয় ও ইউরোপীয় গমের মত নয়। উহা ভিন্ন জাতীয় গম। উহার উৎপত্তি-স্থান আবিসীনিয়া। উহাকে বলে হার্ড হুইট, আর শ্রেষ্ঠ ভারতীয় গমের নাম ব্রেড-হুইট। সুতরাং এই সমস্ত বৈজ্ঞানিকের গবেষণা দ্বারা নিঃসন্দেহে নির্দ্ধারিত হইয়াছে

যে ভারতবর্ষ মানুষের শ্রেষ্ঠ খাদ্য প্রথম আবিষ্কার করিয়াছে এবং তৎসঙ্গে মানবসভ্যতার ভিত্তি প্রথম প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে। তাই আমরা দেখিতে পাই, মহেনজোদড়োর ভূগর্ভে যে গমচাষের পরিচয় পাওয়া গিয়াছে সেই গম আধুনিক পঞ্জাবজাত গমের পূর্ব্বরূপ ও মূলস্বরূপ। এই কথা বিশেষজ্ঞগণ স্বীকার করিয়াছেন এবং সর্ জন্ মার্শালের উপরিউক্ত গ্রন্থে লিপিবদ্ধ আছে।

উপসংহারে আর একটি কথার উল্লেখ করিতে চাই। অনেকে মনে করেন যে মহেনজোদড়োতে যে প্রাচীন সভ্যতা আবিষ্কৃত হইয়াছে তাহা না-কি বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীন এবং বৈদিক সভ্যতা উহার কাছে ঋণী। বৈদিক সভ্যতাই যে ভারতের এবং পৃথিবীর প্রাচীনতম আদি সভ্যতা তাহার প্রমাণ এখানে অবতারণা করিবার অবসর নাই। বেদবিৎ ডাক্তার লক্ষ্মণস্বরূপ বিশেষ ভাবে এই সিদ্ধান্তের প্রমাণ দিয়াছেন। এই বিষয়ে আমিও আমার নূতন 'হিন্দু সিবিলিজেশন' নামক গ্রন্থে কিঞ্চিৎ আভাস দিয়াছি। যাঁহারা সিন্ধু-সভ্যতাকে বৈদিক সভ্যতা অপেক্ষা প্রাচীনতর মনে করেন, তাঁহাদের একটি মূল প্রমাণ যে মহেনজোদড়োতে যোগীর প্রতিকৃতি পাওয়া যায়, কিন্তু ঋগ্বেদে যোগের কোন উল্লেখ পাওয়া যায় না। এই সিদ্ধান্ত ভ্রান্তিমূলক ও সম্পূর্ণ ভাবে হিন্দুধর্ম্মমতের বিরুদ্ধ। হিন্দু মাত্রেরই বিশ্বাস যে ঋগ্বেদ অপৌরুষেয় অতীন্দ্রিয় যোগ-সাধনা-লব্ধ-জ্ঞান-প্রসূত। এই বিশ্বাস যুগে যুগে সর্ব্বশাস্ত্রে ধারাবাহিক প্রকাশ পাইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান ক্ষেত্রে আমি এই বিশ্বাসের ভিত্তি-স্বরূপ ঋগ্বেদের কয়েকটি স্তোত্র মাত্র উল্লেখ করিব। ঋগ্বেদের ১।১৬৪।৪৫ স্তোত্রে যোগীরই উল্লেখ আছে যিনি মনীষী ব্রাহ্মণ বাগ্‌দেবীর বা শব্দ-ব্রহ্মের আরাধনা করেন ['মনীষিণঃ মনসঃ স্বামিনঃ স্বাধীনমনস্কা ব্রাহ্মণাঃ ব্রবাস্যস্য শব্দব্রহ্মণোঽধিগন্তারো যোগিনঃ' (সায়ণ)]। দশম মণ্ডলের নানা সূক্তে তপস্যার উল্লেখ আছে। ১০।১৪ স্তোত্রে সপ্তর্ষির কথা আছে যাঁহারা তপোনিবিষ্ট ('তপসে যে নিষেদুঃ')। ১৫৪।২ স্তোত্রে তপস্যার বিধি বর্ণিত আছে, যথা, 'কৃচ্ছ্রচান্দ্রায়ণ' যাহার দ্বারা তপস্বী "অনাধৃষ্য" হন। এই স্তোত্রে রাজসূয়, অশ্বমেধ, বা হিরণ্যগর্ভ-যোগ ইত্যাদিরও ইঙ্গিত সায়ণের মতে পাওয়া যায়। এই সকল উদাহরণ সায়ণাচার্য্য উল্লেখ করিয়াছেন। ঋগ্বেদে ইহার ইঙ্গিত মাত্র আছে। ১৬৭।১এ তপের উল্লেখ আছে ('স্বঃ তপঃ পরিতপ্য অজয়ঃ স্বঃ')। ১৩৬।২ স্তোত্রে বল্কলধারী মুনির বর্ণনা আছে ('পিশঙ্গা বসতে মলা') যিনি বায়ুর নির্বাধ গতি ও সূক্ষ্ম শরীর তপঃপ্রভাবে অর্জন করেন এবং যিনি সমাধিস্থ হইয়া থাকেন ['বাতস্য ধ্রাজিং (গতিং) মনুষংতি'; 'উন্মদিতা মৌনেয়েন (মুনিভাবেন লৌকিক সর্ববাবহারবিসর্জনোনোন্মদিতা উন্মত্তা) বাতান্ মা তস্থিম বয়ম্']। পরবর্ত্তী স্তোত্রদ্বয়ে মুনির আরও নির্দেশ আছে। তিনি বায়ুর ন্যায় সর্ব্বব্যাপী ('অন্তরীক্ষেণ পততি বিশ্বা রূপাবচাকসাৎ') সূর্য্যের ন্যায় সহস্রাক্ষ, সুকৃতিসম্পন্ন দেব-সখা, ও দেবেষিত অর্থাৎ দেবদুর্ল্লভ দেবেপ্সিত। ১৯০।১ স্তোত্রে ঋত ও সত্যকে তপস্যালব্ধ ফল এবং সমগ্র সৃষ্টিই ব্রহ্মের তপস্যাপ্রসূত বলিয়া বর্ণিত হইয়াছে ('ঋতং চ সত্যং চাভীদ্ধাত্তপসোধ্যজায়ত')। ঋগ্বেদের প্রথম মণ্ডলেও ৫৫।৪ স্তোত্রে ঋষির কথা আছে, যিনি বনবাসী হইয়া ভগবানের ধ্যান করেন। ঋগ্বেদের ৭।১০৩।১ স্তোত্রে 'ব্রতচারী ব্রাহ্মণে'র উল্লেখ আছে। যাস্কের মতে ব্রতচারীর অর্থ 'অব্রুবাণ' মৌনী (নিরুক্ত, ৯।৬)। দশম মণ্ডলের ৭১।১ স্তোত্রে স্পষ্টই যোগের কথা আছে যাহার দ্বারা "পরব্রহ্মজ্ঞানে"র সাধনা করিতে হয়। বক্তব্যের বিস্তার করার প্রয়োজন নাই। যাঁহারা যোগ-সাধনকে অনার্য্য-সাধন মনে করেন, আশা করি তাঁহারা ঋগ্বেদের এই সকল বচন প্রণিধান করিয়া তাঁহাদের সিদ্ধান্তের পুনর্বিচার করিবেন।

প্রবীণ পুরোহিত

ব্রাউনিঙের রাব্বি বেন এজরা হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

মোর সাথে হও বুড়া! সর্ব্বশ্রেষ্ঠ যাহা
এখনো যে বাকী আছে তাহা,
—জীবনের উত্তরার্দ্ধ, প্রথমার্দ্ধ সৃষ্ট যার তরে।
আমাদের পরমায়ু ধরিছেন যিনি নিজ করে
শোন বাণী তাঁর,
—"তোমার সম্পূর্ণ ছবি চিত্রলেখা মোর তুলিকার।
যৌবন আধেকমাত্র, হাতখানি রাখি মোর হাতে
চল আগে, দেখ সব শঙ্কালেশহীন আঁখিপাতে।"

নয়, নয়, তরুণের পুষ্প আহরণ,
মালঞ্চে উদ্‌ভ্রান্ত বিচরণ!
গোলাপের কোন্‌টিরে চয়ন করিবে?
কোন্ পদ্মটিরে ফেলি হাহুতাশে তাহারে স্মরিবে?
চাহিয়া নক্ষত্রপুঞ্জ পানে
প্রাণ তার তৃপ্তি নাহি মানে!
"চাহি না রোহিণী কৃত্তিকারে,
আমি চাই যারে
ইহারা ত সে তারকা নয়
হরিবে যে আমার হৃদয়!
এ নক্ষত্র-দীপালির সব শিখাগুলি
নিষ্প্রভ করিয়া কবে দাঁড়াবে সে তিমিরগুণ্ঠনখানি খুলি?"

স্বল্পায়ু এ যৌবনের দিনগুলি আশা আকাঙ্ক্ষায়
অপচয় করে যারা তাদেরে ভরি না ভর্ৎসনায়।
আমি শ্রদ্ধা করি হেন নিরাকুল সন্ত্রাস সংশয়,
যারা দীন ক্ষুদ্রাশয়, এ উদ্বেগ তাহাদের নয়।
তারা ত জানে না হায় কারে বলে যৌবন-বেদনা,
নিটোল মাটির তালে দীপ্তি নাহি ঢালে বহ্নিকণা।

বড় যে দরিদ্র রিক্ত এ জীবন হ'ত নিরবধি,
শুধু মাত্র সুখভোগ লাগি তার সৃষ্টি হ'ত যদি!
ইন্দ্রিয়ের ভূরিভোজ তরে
শুধু ফিরিতাম যদি লোলুপ অন্তরে,
সে ফলার হ'ত যবে শেষ,
রহিত না নরত্বের কোনো চিহ্নলেশ!
পাখীর কি থাকে খেদ ক্ষুধা মেটে যবে,
সংশয়বিহ্বল পশু ভরাপেটে হয়েছে বা কবে?

বল বল ধন্য এ জীবন,
নিত্যযুক্ত রয়েছি যে মোরা আমরণ
তারি সাথে, না লয়ে যে জানে শুধু দিতে
গ্রহণ করে না ফল, দেয় শুধু তাহারে ফলিতে।
এই মাটিভরা দেহে ফোটে দীপ্তিকণা,
তাই জানি যে বিধাতা পূরান প্রার্থনা
জ্যোতির স্ফুরণে মোরা তাঁর কাছে যাই,
যারা শুধু নিতে জানে তাদেরে এড়াই।
অচল প্রতিষ্ঠা এ বিশ্বাসে
কিছুতেই নাহি যেন নাশে।

সাদরে বরণ করি তবে,
বিমুখতা প্রত্যাখ্যান যত আছে ভবে।
এ ধরার মসৃণতা প্রতি ঘাতে করুক বন্ধুর
ক্ষতাঙ্ক-কর্ব্বুর।
যে দংশ অস্থির ক'রে দেয় না ক বসিতে দাঁড়াতে
ছুটি যেন তার বেদনাতে!
জীবনের সুখে যেন তিন ভাগ দুঃখ মিশে যায়,
প্রাণপণ চেষ্টা যেন শ্রমভার কভু না ডরায়।

গণনায় না আনি বেদনা
লভি শিক্ষা, আসুক যত না
যাতনার নিষ্পেষণ, নিঃশঙ্ক-অন্তর
হই অগ্রসর।

প্রাণে উপজয়
কৌতুকের সনে যেন সান্ত্বনার মধু সমন্বয়।
জীবনের বিফলতা মাঝে কণ্ঠে জয়মাল্য ধরি,
চেয়েছিনু হ'তে যাহা, সে ব্যর্থ প্রচেষ্টা ওঠে ভরি
প্রশান্তি কুশলে
সুখী আমি, পশুত্বের গুরুভারে ডুবি নি অতলে।
সে কি পশু নয়,
আত্মা যার অসি সম রক্ত-মাংসে কোষবদ্ধ রয় ?
বাসনা যাহার
ইন্দ্রিয়ের বনে বনে ব্যাঘ্র সম করিছে বিহার ?
যে মানুষ, প্রশ্ন কর তারে,
—দেহের চূড়ান্ত বেগ তাহার আত্মারে
সঙ্গীহীন যাত্রাপথে কত দূর লয়ে যেতে পারে ?

তবু যা পেয়েছি তার আছে ব্যবহার
জানি আমি ; কভু নাহি করি অস্বীকার
জীবন-সরণি 'পরে প্রতি বাঁকে বাঁকে
অতীত আমাকে
দিয়াছে যে কত শক্তি কত না পূর্ণতা
কত সার্থকতা !
এ নয়ন শ্রবণ-গাগরি
আমি যে লয়েছি ভরি ভরি !
স্মৃতির ভাণ্ডারে সব রয়েছে সঞ্চিত।
আনন্দ-স্পন্দিত
হিয়া মোর উঠিবে না পুলকে শিহরি,
বলিবে না,—"পেয়েছি শিখেছি কত এই দেহ ভরি ?"

একটিমাত্র প্রাণস্পন্দে বলিব না আমি
—"নমো নমঃ, ধন্য তুমি হে জীবনস্বামী !
তোমার পরিকল্পনা পূর্ণরূপে পাই দেখিবারে।
যেথা দেখিতাম শুধু শক্তিমাত্র তাহার মাঝারে
পাই যে প্রেমের নিদর্শন,
বিশুদ্ধ অপাপবিদ্ধ আনন্দগহন।

নাই খুঁৎ তব রচনার
নরজন্ম ধন্য যে আমার !
হে বিধাতা, ভেঙে চুরে তুমি মোরে গড় পুনরায়,
তুমি যে মঙ্গলময়, নাহিক সংশয়-লেশ তায়।

এই রক্তমাংস সুখে ভরা,
ফুল-ফাঁদে আছে যেন ধরা
আমাদের অন্তরাত্মা, সে বাঁধনে ধরা তারে টানে।
তবু শান্তি চায় প্রাণ তৃপ্তি নাহি মানে।
চায় সে পশুর এই সুবিপুল ঐশ্বর্য্যের সনে
অপার্থিব চিন্তামণি ধনে,
—মানবের প্রচেষ্টার উপলব্ধি সার
শ্রেষ্ঠ পুরস্কার।

সদা যেন এ কথা না বলি,
—যদিও এ রক্তমাংস ছলিছে কেবলি,
তবু আমি আত্মবলে করিয়াছি ইন্দ্রিয় বিজয়,
তাই প্রাণ নব নব সিদ্ধিপথে অগ্রসর হয়।
মুক্ত পক্ষে ধায় পাখী সুখে গান গায়,
তেমনি আনন্দে যেন কণ্ঠে উথলায়
এই বাণী--"যাহা কিছু আছে ভাল সকলি মোদের,
আনুকূল্য লভে দেহ আত্মা হ'তে, আত্মা পায় অঞ্জলি
দেহের।"

যৌবনের উত্তরাধিকার
তাই দাবী করি আমি সম্মুখে জরার।
জীবনের যুদ্ধ অবসানে
বিধাতার আশীর্ব্বাদ ধরি মোর প্রাণে।
পূর্ণাঙ্গ পশুর পদ পিছু ফেলি হয় অগ্রসর
দেবাংশসম্ভূত নর দেবের প্রবর।

বিশ্রামান্তে দুঃসাহসভরে
বাহিরিব আরবার অভিনব সংগ্রামের তরে।
নিরুদ্বিগ্ন নির্ভীক হৃদয়
চয়ন করিব পুন নূতন আয়ুধ বর্ম্মচয়।

যৌবনান্তে করিব বিচার
—জয় কিম্বা পরাজয় ঘটিল আমার।
ভস্মরাশি অপসারি কতটুকু সোনা আছে তলে
দেখিব পরখ করি তুলাদণ্ড কি ওজন বলে।
সেই অনুপাতে
স্তুতি নিন্দা যাহা হয় জীবন লভিবে মোর হাতে।
যৌবনে যা ছিল অনিশ্চিত
বার্দ্ধক্যে তাহার মূল্য করিতে পারিব নির্দ্ধারিত।

রেখো মনে, নামে যবে সাঁঝের আঁধার
রুদ্ধ হয় সায়াহ্নের কনক-দুয়ার,
আসে সে মাহেন্দ্রক্ষণ, কর্ম্মগ্রন্থি যবে ছিন্ন হয়,
ধূসর গুণ্ঠন তলে যে গৌরব কবরিত রয়
তারে তুলে আনে,
আসে অস্তাচল হ'তে অস্ফুট গুঞ্জনধ্বনি কানে,
—"আর এক দিনের আয়ু শেষ হ'ল এবে,
লহ ইহা আপনার পুঁজি মাঝে, আর দেখ ভেবে
কি মূল্য ইহার
জীবনে তোমার?"

জীবন হয় নি শেষ, তবু আজি দ্বন্দ্বের অতীত,
বিচারান্তে মীমাংসায় হ'তে হবে এবে উপনীত।
—"এক্ষেত্রে প্রমত্ত হওয়া অসঙ্গত নয়।"
"সে মৌন সম্মতি শুধু মিথ্যার আশ্রয়।"
"অতীতের অভিজ্ঞতাবলে,
ভবিষ্যেরে পেয়েছি কবলে।"

শুভ ফল হবে জানি যৌবনের অপটু চেষ্টায়
আত্মবলে আপনারে গড়িয়া তুলিতে যদি চায়।
বাঁধা পথে চলা যথা নবীনের ধর্ম্ম কভু নয়,
তেমনি প্রাচীন যেন স্থিতিশীল দ্বন্দ্বহীন হয়।

প্রতীক্ষায় সহিষ্ণুতা হে প্রবীণ করিও অর্জ্জন,
রহিও অকুতোভয়ে মরণেরে করিতে বরণ।

যথেষ্ট কি নয়
সত্য শিব ভূমা যিনি তাঁর পরিচয়
পেয়ে যদি থাক তুমি অনুভূতি মাঝে?
এই হাত-পা যে
তোমারি, তা জান যথা সংশয়বিহীন।
যুবজন-জটলার তর্কে অর্ব্বাচীন
নাহি যেন পারে কভু টলাতে তোমারে,
সঙ্গীহারা ভাবিও না কভু আপনারে।

ক্ষুদ্র চিত্ত, উদার হৃদয়,
স্বকীয় স্বাতন্ত্র্য মাঝে যেন ভিন্ন রয়।
বিঘোষিত হয় যেন তাহাদের কাছে
অতীতে তাদের স্থান কোন্‌খানে আছে।
আমার বিরুদ্ধে যারা অভিযোগ করে,
ঘৃণা করি যাহাদেরে অন্তরে অন্তরে,
তাদের, অথবা মোর,—সত্যাশ্রয় কার?
দিবে শান্তি প্রবীণের যথার্থ বিচার।

দশে যাহা ভালবাসে আমি তাহা ঠেলি ঘৃণাভরে,
আমি ছুটি যার পিছু তারে যে অবজ্ঞা তারা করে।
সসম্ভ্রমে করি যা গ্রহণ,
তুচ্ছ মনে করি তারা করে তা বর্জ্জন!
আমারি মতন তারা চোখ কান ধরে
তবু এ কী ব্যবধান মোদের ভিতরে!
আমি এক ভাবি হায়, তারা ভাবে আর,
কার হাতে বল তবে মীমাংসার ভার?

'কাজ' বলি বাজে মাল লোকে যাহা করিছে প্রচার,
নির্ভর রাখিয়া তায় ক'রো না বিচার।
চক্ষে যাহা পড়িল সহজে,
অমনি নগদ মূল্যে তারে কিনিছ যে!

নিম্নভূমি হ'তে যাহা ক্ষুদ্র মানবের হাতে আসে
তূর্ণ মনঃপূত হয়, মূল্যধার্য্য হয় অনায়াসে।
মানুষের ক্ষুদ্র মাপে পড়ে না যা ধরা
বৃথা ভাবে মূঢ় নর তাহারে ধর্ত্তব্য জ্ঞান করা।
অনুভূতি অপূর্ণ যেথায়,
সঙ্কল্প নহেক স্থির যেথা দৃঢ়তায়,
কাজের ঘরেতে শূন্য আছে শুধু যেথা লোকে ভাবে,
সেথায় কর্ম্মের ফল জমা হয় অদৃশ্য হিসাবে।

যে চিন্তা পড়ে না ধরা কর্ম্মের সঙ্কীর্ণ পর্ণপুটে,
পলাতকা যে কল্পনা ভাষার বন্ধনগ্রন্থি টুটে,
জীবনে যা ফুটিল না মোর,
এ জীবন ভোর
সবাকার উপেক্ষিত যাহা কিছু আছে মোর মাঝে,
বিধাতার চক্ষে তাহা অকুণ্ঠিত স্বাচ্ছন্দ্যে বিরাজে।
তাঁর কাছে উপেক্ষা লভি নি,
নিজচক্রে এই ঘট রচিলেন যিনি।

একবার ভেবে দেখ মনে,
এ উদাহরণে।
কেন কুমারের চাকে দেয় পাক ক্ষিপ্রাবেগে কাল,
পড়ে আছে তার পরে কেন বল এ মাটির তাল?
তোমারে ত মূর্খেরাই বলে,
তাহাদের হাতে হাতে সুরাপাত্র যবে দ্রুত চলে,
"চল-চঞ্চলতা ভরা ভঙ্গুর জীবন,
পলে পলে হের তার কি পরিবর্ত্তন!
এই ছিল এই আর নাই,
হাতে যা পেয়েছ আজ ধরে রাখ ভাই।"

ওরে মূঢ়, মন্দবুদ্ধি, যাহা কিছু আছে
চিরন্তন কাল তারা পূর্ণ করিয়াছে।
নিরাকৃত হবে না ত তারা,
হোক্ না সৃষ্টির স্রোত চির পরিবর্ত্তনের ধারা।
এই চল-চঞ্চলতা মাঝে
পরমাত্মা সনে তব আত্মা জেনো ধ্রুবত্বে বিরাজে,

তোমা মাঝে পশিয়াছে যারা
ছিল, আছে, নিত্যকাল রহিবে যে তারা।
কালচক্র ঘুরুক যেদিকে
এ-মাটি ও কুম্ভকার চিরদিন রহিবে যে টিঁকে।

এই নমনীয় মৃত্তিকার
আবর্ত্তন মাঝে কুম্ভকার
দিলেন তোমারে ঠাঁই; তুমি এই মুহূর্ত্তটি ধরি
যতই রাখিতে চাও অবিচল করি
ঘূর্ণীযন্ত্রভরে জাগে আত্মায় তোমার
প্রগতি ও প্রবণতা তার।
তোমারে পরখ করি পাকে পাকে পীড়িয়া পীড়িয়া
সে তোমারে তুলিছে গড়িয়া।

নাই বা ঘটের পাদমূলে
শিশুকন্দর্পের দল ঊর্দ্ধ পানে হাসিমুখ তুলে
জটলা বাঁধিয়া আর ক'রে ছুটাছুটি
সহসা থামিয়া গিয়া পড়ে না-ক লুটি
এ উহার গায়ে? যদি নৃ-কপালগুলি শোভা পায়
কানার চৌদিকে তার শুষ্কমুখে কিবা ক্ষতি তায়?
উঠুক তাহারা জাগি চাপে সুকঠিন,
তবুও হয়ো না শান্তিহীন।

চাহিও না নিম্নমুখে চাও ঊর্দ্ধপানে,
জাগুক্ নয়ানে,
—সুধার বদান্য ব্যবহার
ভোজের উদার ক্ষেত্র, শিখা দীপিকার
মধু তূর্য্যরব
অভিনব ফেনিল আসব
রক্তরাগ প্রভুর অধরে।
দেবের ভৃঙ্গার তুমি দেবতার করে,
এ ধরার চক্র'পরে আর
কেন দৃষ্টি রাখ বারংবার?

হে মোর দেবতা, আমি নিরবধি তোমারেই চাই,
যে তুমি আপন হাতে মানবেরে গড়িছ সদাই।
তোমার চক্রের ঘূর্ণী সর্ব্বাপেক্ষা ভীষণ যখন,
তোমারে ভুলি নি আমি, ছিনু যবে অর্দ্ধ-অচেতন
শৃঙ্খলিত চিত্রবর্ণ মৃত্তিকা-বন্ধনে
তখনো জাগিত মোর মনে,
—আমার চরম গতি আশা,
তৃপ্তি দিয়া মিটনো যে তোমার পিপাসা!

কর তবে আমারে গ্রহণ,
লও তারে নিজ কাজে যারে তুমি করিলে সৃজন।
কলঙ্ক কঙ্কর,
যা কিছু কুৎসিত অবান্তর
কর দূর। মোর আয়ু আছে হাতে তব,
মনের মতন করি গঠন-সৌষ্ঠব
দাও নিজ পানপাত্রটিরে।
আজি শুভ্রশিরে
জরা মোর যৌবনেরে জানাক্ আনতি
মরণে যৌবন মোর লভে যেন শ্রেষ্ঠ পরিণতি।

দ্বিজেন্দ্রলালের রসরচনা ও দেশপ্রীতি

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

মহাকালের পারের নৌকায় মানুষের স্থান নাই, শুধু তাহার কৃতকর্ম্মের—তাহার কীর্ত্তির স্থান আছে। কবির ভাষায় 'ঠাঁই নাই, ঠাঁই নাই, ছোট সে তরী, আমারই সোনার ধানে গিয়াছে ভরি'। তুমি আমি সে নৌকায় পার হইতে পারিব না; তবে সোনার ফসল যদি কিছু আমাদের থাকে, তাহাই কেবল সেখানে স্থান পাইবে।

দ্বিজেন্দ্রলাল আজ নাই, কিন্তু তাঁহার বহুমুখী প্রতিভার কীর্ত্তিকিরণে বঙ্গসাহিত্যাকাশের দিগ্দিগন্ত উদ্ভাসিত হইয়া আছে এবং যতদিন বঙ্গসাহিত্য থাকিবে, ততদিন বঙ্গবাসী তাঁহার সেই আনন্দালোকে আপনার অন্তরলোক উদ্দীপ্ত করিয়া লইবে।

গুণগ্রাহিতাই গুণী হইয়া উঠিবার সোপান। আজ বাঙালী যে প্রকৃত গুণীর গুণ গ্রহণ করিতে শিখিয়াছে, বাস্তবিকই তাহা জাতির পক্ষে আশার কথা।

দ্বিজেন্দ্রলালের দানের কথা স্মরণ করিতে গিয়া সর্ব্বাগ্রেই তাঁহার হাস্যরসরচনা ও দেশপ্রীতির কথা মনে পড়ে। হাস্যরস-সৃষ্টিতে, শুধু বঙ্গসাহিত্যে কেন, অনেক সাহিত্যেই, বোধ করি, তাঁহার তুলনা মিলে না। যে রচনা সম্বন্ধে গুণগান করিতে গিয়া রবীন্দ্রনাথের ন্যায় রসজ্ঞ সমালোচকও 'শুচিশুভ্র অনাবিল হাস্যের ধ্রুবনক্ষত্রপুঞ্জ' রচয়িতা বলিয়া তাঁহাকে অর্ঘ্যদান করিয়াছেন, সে সম্বন্ধে প্রশস্ততর প্রশস্তি সম্ভবে না; আমরা এখানে কেবল সেই হাস্যরচনার ভাষ্য রচনা করিবার চেষ্টা করিতে পারি মাত্র।

এই হাস্যরসে মানবজীবনের পরম প্রয়োজন। আবার সে জীবন যদি কেবল দুঃখ-দারিদ্র্যেরই দুর্ভোগস্থল হয়, তবে সে জীবন ধারণের পক্ষে হাস্যরসের প্রয়োজন অপরিহার্য্য। হোক্ সামান্য, হোক্ ক্ষণিক, সেই হাসি তাহার বাঁচিয়া থাকিবার পথের পরম পাথেয়। আমাদের মত বহুলাঞ্ছিত জাতির জীবনে সে হাসি যেন মৃতসঞ্জীবনীরই কাজ করে।

দ্বিজেন্দ্রলালের এই হাস্যরসরচনা মূলতঃ ত্রিধারায় বিভক্ত। প্রথম, নিছক হাস্য—যাহা কাহাকেও কিছুমাত্র আঘাত না করিয়া অন্তরের সহজ প্রস্রবণ হইতে আপনা-আপনি উচ্ছ্বসিত হইয়া উঠে ও মানুষকে কৌতুকরসে উদ্বুদ্ধ করিয়া আনন্দ দান করে।

দ্বিতীয়, ব্যঙ্গহাস্য বা উপহাস—যে হাসি ব্যক্তিগত বা সমাজগত দুর্ব্বলতা ও সঙ্কীর্ণতার প্রতি কটাক্ষ করিয়া

উপহাসের উপাদানরূপে উদ্গীরিত হয় এবং যাহা তাহার বিদ্রূপের বৈদ্যুতিক কশাঘাতে মানুষের সহজ চৈতন্যকে জাগ্রৎ করিয়া তুলে।

তৃতীয়, অট্টহাস্য—ব্যক্তি বা সমাজ, কাহাকেও ঠিক মুখ্য লক্ষ্য না করিয়া যে হাসি আপনার অন্তরস্থ প্রাণপুরুষ বা অদৃষ্টের পরিস্থিতিকে উপলক্ষ্য করিয়া প্রকাণ্ড মর্ম্মান্তিক পরিহাসরূপে হা-হা বা হায়-হায় করিয়া উঠে। আমাদের এই ধিক্কৃত জীবনের নিরুপায় দুর্দ্দৈবে যাহার জন্ম এবং মহাকালের অট্টহাস্যের সহিত যাহার কোথায়, বোধ করি, একটা মিল আছে। ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তিতে একই ভাবের বিভিন্ন অভিব্যক্তি জগতে দেখা যায়। হাসির কথা শুনিয়া কেহ-বা হো-হো করিয়া হাসিয়া উঠে, কেহ-বা মুখখানিকে ঈষৎ স্মিত বিকশিত করিয়া তুলে, আবার কাহারও বা মুখচোখ রক্তাভ হইয়া উঠে মাত্র, হাস্যের অন্য কোনও চিহ্ন প্রকাশ পায় না। বেদনা-ব্যাপারেও তেমনি। পুত্রহারা জননী—কেহ ক্রন্দনের চীৎকার শব্দে গগন বিদীর্ণ করেন, কেহ-বা অব্যক্ত হাহাকারে দরবিগলিতধারে অশ্রু বিসর্জ্জন করেন, আবার কেহ-বা ধন্দ হইয়া পাথরের মতন বসিয়া থাকেন, চোখে বা মুখে অশ্রুও নাই, শব্দও নাই। এমনও দেখা যায়, শোকের আকস্মিক আঘাতে কিয়ৎকালের জন্য কাহারো মুখে অসংবদ্ধ প্রলাপবাণী ও তাণ্ডবহাস্য দেখা দেয়। দ্বিজেন্দ্রলালের যে হাসির কথা আমরা এখানে বলিতেছি, তাহার সহিত সাধারণ হাস্যরসের বড় সম্বন্ধ নাই। তাহা অন্তরের সহজ আনন্দপ্রবাহের উচ্ছল অভিব্যক্তি নহে, তাহা রোদনেরই রূপান্তর মাত্র। সুগভীর দেশপ্রীতির অস্ফুট বেদনা রুদ্র হাস্যরূপে সেখানে যেন শব্দিত হইয়া উঠিতেছে। ইহা যেন তাঁহার স্বকীয় শক্তির শুক্তিগর্ভাবাসে হাসি ও অশ্রু-মিশ্র অপূর্ব্ব যমজ-মুক্তা। এ-হাসির পরিচয় আমরা শেক্সপিয়ারের 'কিং লিয়ার' নাটকে, গিরিশচন্দ্রের 'প্রফুল্ল' প্রভৃতি কোনও কোনও নাটকে এবং দ্বিজেন্দ্রলালেরই একাধিক নাটকে, বিশেষ করিয়া, তাঁহার 'সাজাহান' নাটকে পাইয়া থাকি।

এইবারে আমরা এই হাস্যত্রিবেণী হইতে এক-একটি ধারা ধরিয়া অতি সংক্ষেপে উদাহরণযোগে আমাদের বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার চেষ্টা করিব।

১। এ কি হেরি সর্ব্বনাশ, রাম তুই যাবি বনবাস!
তোরে ছেড়ে রবে না প্রাণ, আমার এ ধ্রুব বিশ্বাস।
যদি নিতান্ত যাবি রে বনে, সঙ্গে নে সীতা লক্ষ্মণে
ভাল দেখে দাবা এক জোড়, ভাল দু'জোড় তাস। ইত্যাদি

বনবাসের অপার দুঃখের মধ্যে রামচন্দ্রের মত নর-দেবতা তাস ও দাবা খেলিয়া তবু অনেক দুঃখ দূর হইতে পারে, এই ভরসা!

২। প্রাণ রাখিতে সদাই যে প্রাণান্ত!
জন্মিতে কে চাইত, সেটা আগে যদি জানত।
ভোরে উঠেই ঘুমটি নষ্ট, তার পরেতে যে সব কষ্ট—
বর্ণিতে অক্ষম আমি সে সকল বৃত্তান্ত।
স্নানাদির পর নিত্য নিত্য ক্ষুধায় জ্বলে যায় যে পিত্ত,
খেতে বসলে চর্ব্বণ করতে করতে পরিশ্রান্ত।
যদিই বা খাই যথাসাধ্য, খেলেই যায় ফুরায়ে খাদ্য,
পান্ত আনতে লবণ ফুরায় লবণ আনতে পান্ত!
কিনলে পরে কোনো দ্রব্য দাম চাহে যত অসভ্য,
রাস্তা জুড়ে বসে থাকে পাওনাদার দুর্দ্দান্ত।
বিয়ে করলেই পুত্র কন্যা আসে যেন প্রবল বন্যা,
পড়াতে আর বিয়ে দিতে হই যে সর্ব্বস্বান্ত!

বাঙালী-জীবনের কি নিখুঁত হাসির নকসা।

৩। বুড়োবুড়ী দু'জনাতে মনের মিলে সুখে থাকত।
বুড়ো ছিল পরম বৈষ্ণব, বুড়ী ছিল ভারি শাক্ত।
হ'ত যখন ঝগড়াঝাঁটি, হ'ত প্রায়ই লাঠালাঠি,
ব্যাপার দেখে ছুটোছুটি, পাড়ার লোকে পুলিশ ডাকত।
হঠাৎ একদিন 'দুত্তোর' ব'লে বুড়ো কোথায় গেল চ'লে,
বুড়ী তখন কেঁদে কেটে করলে চক্ষু লবণাক্ত।
শেষে বছর খানেক পরে বুড়ো ফিরে এল ঘরে,
বুড়ী তখন রেঁধে বেড়ে তাকে ভারি খুসি রাখত।
ঝগড়াঝাঁটি গেল থেমে, মনের মিলে গভীর প্রেমে
বুড়ী দিত দাঁতে মিশি, বুড়ো গালে সাবান মাখত!

বুড়োবুড়ীর জীবনযাপন ব্যাপারের কি সরল ও সরস হাস্যকর বর্ণনা!

৪। হোল কি! এ হোল কি!—এত ভারি আশ্চর্য্যি!
বিলেতফের্ত্তা টানছে হুঁকা, সিগারেট খাচ্ছে ভটচার্য্যি!
হোটেলফের্ত্তা মুন্সেফ ভাবছেন—'মধুসূদন কংসারি!
চট্ট চটির দোকান খুলে দস্তুর মতন সংসারী।

* * *

পক্ষীর মাংস লক্ষ্মীর মতন ছেলেবেলায় খান নি কে?
ভবনদীর পারে এসে বিড়াল বসছেন আহ্নিকে!

* * *

রাধাকৃষ্ণ রঙ্গমঞ্চে নাচছেন গিয়ে আনন্দে,—
ব্যাখ্যা করছেন হিন্দুধর্ম্ম হরিঘোষ আর প্রাণধন দে।

দীনবন্ধুর ভাষায় একাধারে 'মিল ও মজা'র অপূর্ব্ব কৌতুক রচনা। এ সকল গান প্রথম ধারার নিছক হাসি।

দ্বিতীয় ধারার হাস্যরচনাগুলি ব্যক্তি বা জাতিগত দুর্ব্বলতার অথবা সামাজিক রীতিনীতি ও ভণ্ডামির প্রতি কটাক্ষময় ব্যঙ্গকৌতুক।

১। নন্দলাল ত একদা একটা করিল ভীষণ পণ—
স্বদেশের তরে, যা ক'রেই হোক রাখিবেই সে জীবন।

* * *

নন্দর ভাই কলেরায় মরে, তাহারে দেখিবে কেবা!
সকলে বলিল, 'যাও না নন্দ, কর না ভায়ের সেবা!'
নন্দ বলিল, 'ভায়ের জন্য জীবনটা যদি দি—
না হয় দিলাম, কিন্তু অভাগা দেশের হইবে কি?
বাঁচাটা আমার অতি দরকার, ভেবে দেখি চারিদিক' ;—
সকলে তখন বলিল—'হাঁ হাঁ হাঁ, তা বটে, তা বটে, ঠিক'!

* * *

নন্দ বাড়ীর হ'ত না বাহির, কোথা কি ঘটে, কি জানি,
চড়িত না গাড়ী, কি জানি কখন উল্টায় গাড়ীখানি!
নৌকা ফি সন ডুবিছে ভীষণ, রেলে কলিসন হয়,
হাঁটিতে সর্প, কুকুর আর গাড়ীচাপা-পড়া ভয়;
তাই শুয়ে শুয়ে কষ্টে বাঁচিয়ে রহিল নন্দলাল;
সকলে বলিল, ভ্যালারে নন্দ, বেঁচে থাক চিরকাল।

২। আমরা বিলাতফের্ত্তা ক'ভাই, আমরা সাহেব সেজেছি সবাই,
তাই কি করি, নাচার, স্বদেশী আচার করিয়াছি সব জবাই।
আমরা বাংলা গিয়েছি ভুলি', আমরা শিখেছি বিলিতি বুলি,
(আমরা) চাকরকে ডাকি 'বেয়ারা' আর মুটেদের ডাকি 'কুলি'

* * *

রাম, কালীপদ, হরিচরণ,—নাম এ সব সেকেলে ধরণ,
তাই নিজেদের সব 'ডে,' 'রে' ও 'মিটার' করিয়াছি নামকরণ!

৩। পারো তো জন্মো না কেউ বিষ্যুৎবারের বারবেলা।
যদি জন্মাও তো সামলাতে পারবেনাকো তার ঠেলা।
দেখ, বিষ্যুৎবারের বারবেলাতে আমার জন্ম হৈল,
তাই দিল মোরে, কালো করে রোদে ধরে মাখিয়ে মাখিয়ে তৈল!

৪। Reformed Hindus এর (রিফর্ম্ড্ হিন্দুজ্ এর)
আমরা curious commodities, human oddities
denominated Baboos;
আমরা বক্তৃতায় যুঝি ও কবিতায় কাঁদি কিন্তু
কাজের সময় সব টুঁটু-s;
আমরা beautiful muddle, a queer amalgam
of শশধর, Huxley and goose!

তৃতীয় ধারায়:—

১। আমি যদি পীঠে তোর ঐ, লাথি একটা মারিই রাগে;
—তোর ত আস্পর্দ্ধা বড়, পীঠে যে তোর ব্যথা লাগে!
আমার পায়ে লাগলো সেটা—কিছুই বুঝি নয়কো বেটা?
নিজের জ্বালায় নিজে মরিস, নিজের কথাই ভাবিস আগে!
লাথি যদি না খাবি ত', জন্মেছিলি কিসের জন্যে?
আমি যদি না মারি ত', মেরে যাবে সেটা অন্যে।
আমার সেটা অনুগ্রহ—যদি লাথি মেরেই থাকি,—
লাথি যদি না মার্ত্তাম ত',—না মার্ত্তেও পার্ত্তাম না কি?
লাথি খেয়ে ওরে চাষা! বরং যে তোর উচিত হাসা'—
সে তোর কথাও মাঝে মাঝে, তবু আমার মনে জাগে।

(২) আমরা সব "রাজভক্ত" "রাজভক্ত" ব'লে চেঁচাই উচ্চ রবে
কারণ যেটার যতই অভাব, ততই সেটা ব'লতে হবে;
—আমাদের ভক্তি যা এ মানের, পেটের, প্রাণের দায়ে;
দেখে' সে রক্ত-আঁখি, ভক্তি যা তা ছুটে পলায়;
সাধে কি বাবা বলি, গুঁতোর চোটে বাবা বলায়!

(৩) পাঁচশ বছর এমনি ক'রে আসছি সয়ে সমুদায়;
এইটে কি আর সইবেনাক—দু'ঘা বেশী জুতার ঘায়?

(৪) আমরা ইরাণ দেশের কাজী—
আমরা এনেছি একটা নূতন আইন প্রচার করতে আজি—ইত্যাদি;

এইরূপ অজস্র গান ও হাসির কবিতা হইতে কবির অলোকসামান্য হাস্য-প্রতিভার বিস্তর উদাহরণ দেওয়া যাইতে পারে। এই সকল রচনার grim tragic humour—সাংঘাতিক পরিহাস মানবচিত্তের অন্তস্তল পর্য্যন্ত বিপর্য্যস্ত করিয়া তুলে।

Ludicrous বা হাস্যকর ব্যাপারের প্রতি কবির অন্তর্দৃষ্টি এতই প্রখর যে, দু-একটি কথায় তাহার রূপ যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করিয়া উঠে। কবি যখন বলেন, "স্ত্রীর চেয়ে কুমীর ভাল, বলে সর্ব্বশাস্ত্রী", তখন পাঠক বা শ্রোতা স্ত্রীর সঙ্গে হঠাৎ কুমীরের তুলনায় একান্ত বিস্মিত চিত্তে একটা কারণ খুঁজিতে চেষ্টা করে এবং পরক্ষণেই যখন শুনে, "কারণ, কুমীর ধর্‌লেও ছাড়ে কিন্তু (একবার) ধর্‌লে ছাড়ে না স্ত্রী," তখন ইহার অপূর্ব্ব মৌলিকতা, যৌক্তিকতা ও মিলের বাহাদুরীতে একেবারে স্তম্ভিত হইয়া যায়। আবার যখন, "পালাই ছুটে' ঊর্দ্ধশ্বাসে যেন বাঘে খেলে, চাদর এবং পরিবারে সমানভাবে ফেলে," তখন আমাদের পালাইবার ভঙ্গীটি যে পরিচয় দেয়, তাহা একান্ত উপভোগ্য।

"ইংরেজতাড়াহত থতমত অঙ্কলগ্ন স্ত্রীর,—
ভূতভয়গ্রস্ত পগারস্থ মস্ত মস্ত বীর"

—কি সকরুণ হাস্যকর দৃশ্য! এমনিতর,

"বিলেত দেশটা মাটির—সেটা সোনা রূপার নয়,
তার আকাশেতে সূর্য্যি উঠে, মেঘে বৃষ্টি হয়।

* * *

সেথা পুঁটি মাছে বিয়োয়নাক টিয়ে পাখীর ছা,
আর চতুষ্পদ সব জন্তুগুলোর চারটে চারটেই পা!

তবে সেথায়, স্বামী স্ত্রীতে ঝগড়া করে বিশুদ্ধ ইংলিশে,
আর করে সাদা হাতে চুরি ডাকাতি সে।
এই তফাৎ, এই তফাৎ, এই তফাৎ মাত্র ভাই,
আর আমাদের সঙ্গে তাদের কোনই তফাৎ নাই॥"

তখন সামান্য কথায় কবির রসসৃষ্টির পরিচয় পাইয়া অবাক হইতে হয়।

বাস্তবিকই তাঁহার 'হাসির গান' ও 'আষাঢ়ে' বঙ্গ-সাহিত্যের এক অভিনব সম্পদ। কি রসের দিকে, কি ভাষার দিকে, ইহা যেন ঝল্‌মল্‌ করিতেছে।

তাঁহার হাস্যরস-কবিতার রচনাভঙ্গী এমনই স্বতন্ত্র যে, তাহা বঙ্গভাষায় এক যুগান্তর আনিয়াছে বলিতে পারা যায়। আমরা একটিমাত্র উদাহরণে তাহা সংক্ষেপে নির্দ্দেশ করিতে চাই :—

"হরিনাথ দত্ত চড়ে' 'কর্ড'মেল ট্রেন,
দুর্গাপূজোর ছুটি, শ্বশুর বাড়ী যাচ্ছেন—
তবে এ কথা সত্য যে হরিনাথ দত্ত
পাটনাতে চাকরী করেন, সে চাকরীর কি অর্থ
বলা কিছু শক্ত।" ইত্যাদি

ইহা পদ্য কি গদ্য বুঝা কঠিন। অথচ চলিত ভাষায় এই অপরূপ বর্ণনাভঙ্গী ভাষায় একেবারে নূতন। ভাটপাড়ার পণ্ডিতসভা, অদল-বদল, নসীরাম পালের বক্তৃতা, গোপীনাথ দাস, গোমুটায় বাস—প্রভৃতি এইরূপ নানা কবিতার উল্লেখ করা যাইতে পারে।

এইবারে আমরা কবির অসাধারণ দেশপ্রীতির কথা বলিব। তাঁহার দেশপ্রেম এতই গভীর ও আন্তরিক ছিল যে, কবির রচনার সহিত যাঁহাদের কিছুমাত্র পরিচয় আছে, তাঁহারাই তাহা অবগত আছেন। বঙ্কিমচন্দ্র ও রবীন্দ্রনাথের বহু রচনাই যেমন দেশপ্রেমে ওতপ্রোত, দ্বিজেন্দ্রলালেরও তাহাই। তাঁহাদের মত তিনি দেশাত্মবোধের উদ্বোধনে সহস্র সহস্র নরনারীকে স্বদেশমন্ত্রে দীক্ষিত করিয়াছেন। "বঙ্গ আমার, জননী আমার, ধাত্রী আমার, আমার দেশ"! "তুমি কি মা সেই, তুমি কি মা সেই চিরগরীয়সী ধন্যা অয়ি মা!" "একবার গাল-ভরা মা-ডাকে, মা বলে' ডাক্, মা বলে' ডাক্, মা বলে' ডাক্ মাকে" কিংবা, "আবার তোরা মানুষ হ," প্রভৃতি গানের ন্যায় বহু পরিচিত গান ভাষায় নাই বলিলেও, বোধ করি, অত্যুক্তি হয় না। বাংলার শহরে, মফস্বলে, হাটে, মাঠে, গঞ্জে, সুদূর পল্লীতে পল্লীতে ইহাদের জোড়া দেখি নাই। বাংলার জাতীয় সঙ্গীত রচনায় দ্বিজেন্দ্রলাল এক প্রকার অপ্রতিদ্বন্দ্বী। কেবল গীত-রচনায় নহে, বঙ্গবাণীর বীণার তারে তাঁহার রচিত নূতন সুরের ঝঙ্কারও এক অভিনব দান।

কেহ কেহ বলেন, তাঁহার নাটকে অনেক নাটকীয় ত্রুটি আছে। আজ আমরা সে কথার বিচার করিতে বসি নাই। দোষ-ত্রুটি থাকিলেও, আমাদের বর্ত্তমান যে বক্তব্য, তাহাতে তাহার বিন্দুমাত্র ব্যত্যয় হইবে না। আমরা কবির জন্মভূমির প্রতি যে সুগভীর প্রীতির কথা বলিয়াছি, নাট্য-রচনার ত্রুটিতে তাহা ক্ষুণ্ণ হয় না।

সেদিন কি দিন ছিল, যখন পাঁচ-ছয় মাস অন্তর কবির দুর্গাদাস, রাণাপ্রতাপ, মেবার-পতন, সিংহল-বিজয়, চন্দ্রগুপ্ত, সাহাজাহান, প্রভৃতি নাটক পর পর প্রকাশিত ও রঙ্গমঞ্চে অভিনীত হইয়া লক্ষ লক্ষ লোককে দেশপ্রেমে উদ্বুদ্ধ করিয়াছে; সেদিন কি দিন ছিল, যেদিন 'ধনধান্যে পুষ্পে ভরা, আমাদের এই বসুন্ধরা', 'ভারতবর্ষ', 'বঙ্গ আমার জননী আমার', 'আবার তোরা মানুষ হ', প্রভৃতি বিচিত্র দেশাত্মবোধক গানে মাসের পর মাস নগর হইতে দূরতম পল্লী পর্য্যন্ত মুখরিত হইয়া উঠিত! বঙ্গভঙ্গের যুগের সে সকল কথা মনে হইয়া কবির সেই দেশ-প্রাণতার উন্মাদনা আজিও যেন চক্ষে দেখিতেছি। রচনায়, অভিনয়-প্রেক্ষাগৃহে, সমালোচনায় এবং পথে ঘাটে এই সকল গানের প্রচারে আমরা সেদিন কবির সঙ্গী ছিলাম, তাই বার-বার এ কথা মনে হইতেছে যে, বঙ্গসাহিত্যে তাঁহার দেশপ্রেম যেমন উদার তেমনি গভীর ও অজস্র ছিল। এই দেশপ্রীতি তাঁহার এমনই মজ্জাগত ধর্ম্ম ছিল যে, কর্ম্মজীবনে এজন্য বারম্বার তাঁহাকে গুরুতর দুর্ভোগ ভুগিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ বঙ্গের জাতীয় জাগরণ-যজ্ঞের তিনি এক জন প্রধান পুরোহিত ছিলেন। এবং মানুষের মধ্যে যাঁহারা জাগিয়া থাকিয়া স্বাধীনতার স্বপ্ন দেখেন, তিনি তাঁহাদেরই এক জন!

'লীরিক' কবিতায় তাঁহার হাত কতখানি মিষ্ট ছিল, কীর্ত্তন প্রভৃতি সঙ্গীত রচনায় কৃতিত্ব তাঁহার কতখানি,—মন্দ্রে, আলেখ্যে ও আর্য্যগাথায় তাহার পরিচয় আছে। 'ও কে

গান গেয়ে গেয়ে চলে' যায়, পথে পথে এই নদীয়ায়', 'পতিতোদ্ধারিণী গঙ্গে', 'মহাসিন্ধুর ওপার হ'তে', প্রভৃতি রচনা তাহার সাক্ষী। আমরা কবির যে বৈশিষ্ট্য—হাসির গান, ও কবিতা এবং দেশপ্রীতির কথা বলিয়াছিলাম, তাহারই কথা এখানে বলিবার চেষ্টা করিয়াছি। আর কিছুর না হউক, তাঁহার দুই হাতের এই দুই দিকের অনুষ্ঠিত দানই কবিকে বঙ্গসাহিত্যে অমর করিয়া রাখিবে, ইহা আমাদের বিশ্বাস।

জন্মদিন

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

বসন্তে সুন্দর প্রাতে
প্রকাশের বেদনাতে, উদ্বেলিত বুক
যে-পুষ্প আলোতে তুলে মুখ
রুক্ষ বৃক্ষশাখা হ'তে অপূর্ব্ব অমৃত
দিকে দিকে করে উৎসারিত
সে কি জানে কোথা হ'তে এল এই সুখ
প্রতিক্ষণে বিকাশ উন্মুখ
কেন এই কোরকের তলে
সুগন্ধ উছলে ?

তরুশাখা চেয়ে রয়
এ-কুসুম তারও নয়
এই রূপ নয়নাভিরাম
কে জাগাল বৃন্তে তার জানে না সে নাম—
অন্তরে গোপন ছিল অনন্তের ধন
প্রভাত-কিরণ
আর বসন্ত-সমীরে
সে ঐশ্বর্য্যে পূর্ণ করে মুগ্ধ বনানীরে।

আমার অন্তর হ'তে বাহিরিয়া এল যে রতন
এমনি আশ্চর্য্য তবু
নহে শুধু পুষ্পের মতন।
এ বিকাশ শুধু নয় ক্ষণিকের তরে
নিখিল চাহিয়া আছে এরি মুখ'পরে।
অপূর্ব্ব এ দান
পুলকিত করি দিল তনু মন প্রাণ
অন্তরের মাঝে এল একান্ত আমার
এই তবু শেষ নহে তার।

শুধু প্রকাশের লাগি এ প্রকাশ নয়
আপনাতে ফুটে-ওঠা আপন বিস্ময়!
নব নব অর্থভরা প্রাণ অন্তহীন
সুখে দুখে বিকশিতে হবে প্রতিদিন।
বক্ষে তার পূর্ণ আছে অক্ষয় ভাণ্ডার
সমাপ্তি হবে না কভু তার।
যাহা লয়ে আসিয়াছে যাহা আছে বাকী
নিখিল পরম সুখে ভরিবে সে ফাঁকি।

রূপে গন্ধে গানে
আনন্দ অমৃত তার ভরি দিবে প্রাণে।
সে ঐশ্বর্য্য চিত্তে তার নূতন সৌরভে
নব নব রূপ লবে আপন গৌরবে।
পরিপূর্ণ প্রাণ
প্রত্যহ ফিরাতে হবে নিখিলের দান।
আজিকার শুভদিন আজিকার নয়
নব নব কর্ম্মে তার হবে পরিচয়।
আমার অন্তর হ'তে এই জন্ম তার
নিত্য নব রূপ নিক্ আনন্দে অপার—
হে বৎস নবীন,
প্রত্যহ সার্থক হোক্ তব জন্মদিন।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৬০

নিখিলনাথ যখন সীমার আস্তানায় গিয়ে পৌঁছল রাত তখন অনেক হয়েছে। এত রাত্রে তাকে আসতে দেখে সীমা আশ্চর্য্য হ'য়ে বললে, "আপনি এত রাত্রে যে! কি ব্যাপার? এ কি? আপনার এমন চেহারা হয়েছে কি ক'রে? খাওয়া-দাওয়া হয় নি বুঝি?'

নিখিল নিজের মনের উত্তেজনা কষ্টে দমন ক'রে গম্ভীর মৃদু ক'ঠে বলতে লাগল, "সীমা, অত্যন্ত বিপদ উপস্থিত। ইন্‌সপেক্টর ভুলু দত্তর নাম শুনেছ নিশ্চয়। সত্যদার মৃত্যুর পর তোমাদের অনুসন্ধানে সে-ই শ্রীরামপুর গিয়েছিল। তোমাকে পায় নি বটে, কিন্তু তোমাকে ধরবার চেষ্টায় সে এতদিন অপেক্ষা ক'রে ছিল। আজ যেমন ক'রেই হোক সে তোমাদের আড্ডার সন্ধান পেয়েছে; এবং আজই সে তোমাদের বিরুদ্ধে বেশ বড় একটা চেষ্টা করবে। বিশেষ ক'রে তোমারই উপর তার আক্রোশ। আমার কথা শোনো; এখনি এখান থেকে পালাও। নইলে, ভুলু দত্তকে তুমি ভাল ক'রে জান না, সে কোনো কিছু করতেই পিছ-পা হবে না। তাকে তার নাছোড়বান্দা একগুঁয়েমির জন্যে কলেজে আমরা 'বুলডগ' বলে ডাকতাম, সে আমাদের ক্লাস-ফ্রেণ্ড ছিল। আমার একান্ত অনুরোধ; অকারণে ধরা প'ড়ে প্রাণ হারিয়ে কোন লাভ নেই, সীমা।"

সীমা হেসে বললে, "প্রাণ হারিয়েই ত লাভ। আজ দাদারা প্রাণ দিয়েছে ব'লে, প্রাণ হারানোর ভয় আমাদের ঘুচে গেছে। কিছু করবার শক্তি বা সুযোগ আমাদের নেই, তাই প্রাণটাকে পণ ক'রে দেশে প্রাণের সাড়া জাগাবার ব্রত নিয়েছি আমরা। ভুলু দত্তের সব খবরই আমি জানি। কোন একটা কারণে ভুলু দত্তের কৃপা আমাদের উপর পড়তে পারে জেনেই আপনাকে এখানে আসতে বারণ ক'রে দিয়েছিলাম। না শুনে আপনি ভাল করেন নি। এখন আপনাকে বাঁচাবার হাতও বোধ হয় আমার নেই। আমাদের বাড়ীর চতুর্দ্দিকে আজ সন্ধ্যে থেকেই পুলিসের পাহারা আছে জানবেন। বেরতে গেলেই ধরা পড়বেন।"

নিখিল সন্ত্রস্ত হতাশ স্বরে বললে, "জেনেও পালাও নি কেন তোমরা? এ কি করেছ তুমি? এখন কি উপায় করবে? আমার জন্যে আমি ভাবি না। এ আমার উপযুক্তই হয়েছে। তোমাদের থেকে আমার অপরাধ ত একটুও কম না। নন্দলালের হত্যা, শচীন সিংহের অপহরণের সম্ভাবনা, এ সব সংবাদ জেনেও আমি তার কোন প্রতীকার করি নি। আর আজ এই হত্যাকারী এনার্কিষ্টদের রক্ষা করবার জন্যেই গুপ্তচর হয়ে এসেছি ছুটে। তোমাদের ভাগ্যে যে শাস্তি আছে তার থেকে যদি আজ বঞ্চিত হই, তবে আমার চেয়ে দুর্ভাগ্য কেউ নেই। কিন্তু কোন উপায়ই কি নেই?" নিখিল ইচ্ছে ক'রেই শচীন্দ্রের কথা এড়িয়ে গেল পাছে তার কোন দুঃসংবাদ শুনতে হয়।

সীমা বললে, "উপায় আছে শুধু আমার পালাবার। কিন্তু আমার আরও পাঁচ জন ভাই এখানে আছে, তাদের কি গতি হবে? ওদের ছেড়ে ত যাওয়া চলবে না। পালানো আমার হবে না; নইলে অকারণে পুলিসের হাতে প্রাণ দেবারও আমাদের নিয়ম নেই। আর পালাবার ইচ্ছে আমার নেই; আমাদের নিজেদের মধ্যেই ঘুণ ধরেছে। নইলে আজকের এই অতর্কিত বিপদ ঘটবার সম্ভাবনা ছিল না, নিখিলবাবু!" সীমার স্বর ক্লান্ত গভীর মনস্তাপব্যঞ্জক।

"মানে?"

"মানে, যা বলছি তাই। নইলে যে ব্যবস্থা এবারকার আয়োজনে আমরা করেছিলাম, তাতে আপনার 'বুল ডগে'র সাধ্য ছিল না আমাদের নামগন্ধ পায়। কিন্তু সে যাই হোক, আপনার নিশ্চয় খাওয়া হয় নি। তার ব্যবস্থা কিছু করা যায় কি না আগে দেখি।"

নিখিল ব্যস্ত হ'য়ে বললে, "সীমা শোনো, খিদেটিদে আমার পায় নি। তুমি ওসব রেখে বাঁচবার চেষ্টা কর।

একদিনের জন্মেও অন্ততঃ আমার অনুরোধ রাখ, সীমা !"

সীমা হেসে বললে, "শ্রীরামপুরে যে পিণ্ডি খাইয়েছিলাম, তাই মনে ক'রে বুঝি ভয় পাচ্ছেন? এখানে তার চেয়ে কিছু ভাল ব্যবস্থা করতে পারব। বরং চলুন আমাকে যদি কিছু সাহায্য করতে পারেন। কি বলেন?"

সীমার পরিহাসের মধ্যে স্নেহের স্পর্শটুকু পেয়ে নিখিল মনে মনে কৃতার্থ বোধ করলে। কিন্তু এই সমূহ বিপদের সময় সীমার অসীম ঔদাসীন্যে অত্যন্ত বিচলিত হ'য়ে বললে, "সীমা, আজ রক্ষা পেলে তোমার নিমন্ত্রণ আমার তোলা রইল। চল, দেখি কোন উপায় করা যায় কি না।"

"বৃথা, নিখিলবাবু, চেষ্টার কোন রাস্তা নেই। আপনাকে ত বলেইছি যে আমাদের পালাবার উপায় একেবারে বন্ধ। ওসব কথা মিছে ভেবে কোন লাভ নেই আর। তার চেয়ে, আপনি ক্লান্ত হয়েছেন, চলুন আপনাকে শুইয়ে দিই। আপনি একটু বিশ্রাম ক'রে নিন ততক্ষণ। খাবার হ'লে আপনাকে ডেকে তুলব না-হয়।" ব'লে সীমা তাকে পাশের ঘরে নিয়ে গেল।

নিখিল সীমার মৃত্যুভয়হীন এই নিশ্চিন্ত দৃঢ়তার কাছে শেষে হার মানলে। মনে মনে প্রস্তুত হয়ে ভাবলে, আজ ওর সঙ্গে এক পরিণামের সৌভাগ্যই আমার জীবনের পরম সম্পদ হয়ে থাকুক। শান্ত চিত্তে মৃত্যু সাক্ষী ক'রে আজ আমাদের মিলন ঘটুক। এমন প্রত্যক্ষ জীবন্ত সত্য সাক্ষ্য কার ভাগ্যে আর জুটেছে!

সীমা সযত্নে পরিপাটি ক'রে বিছানা প্রস্তুত করলে। হাসতে হাসতে বললে, "আমাদের এনাকিষ্ট বলেই চিনে রেখেছেন; তাই আমরা যে মেয়ের জাত সে-কথা আপনাদের দৃষ্টি এড়িয়ে যায়। আপনি শ্রান্ত, চিন্তাক্লিষ্ট, ক্ষুধার্ত্ত হয়ে আমার কাছে এসেছেন, আর আমি কোন্ মুখে আপনার একটু সেবাযত্ন না ক'রে বিদায় দেব বলুন ত? আমাদের বাইরের এই কদাকার রূপটাই আপনারা দেখেন, ভিতরের মানুষটার উপর আপনাদের চোখ পড়ে না, না নিখিলবাবু?" ব'লে সে নিখিলের দিকে আর না ফিরেই দ্রুতপদে ঘর থেকে বেরিয়ে গেল।

পরিপূর্ণ পুলকে, গর্ব্বে, দুঃখে নিখিলের চোখ জলে ভ'রে এল। সীমার স্নেহ-সংরচিত শুভ্র শয্যায় তার ক্লান্ত দেহ এলিয়ে দিয়ে নিখিল মুদ্রিত নেত্রে সীমার অন্তরবাসিনী স্নিগ্ধ সত্তাকে নিবিড়ভাবে হৃদয়ে অনুভব করতে লাগল। সম্মুখের বিপদ, পশ্চাতের বিবেকের তাড়না, সমস্ত জগতের বাস্তব অনুভূতি তার কাছে মিলিয়ে এল এবং পরম নিশ্চিন্ত ও সুনিশ্চিত এক রসানুভূতিতে তার চিত্ত পরিপূর্ণ হ'য়ে উঠল।

* * *

দুশ্চিন্তা এবং সমস্ত দিনের ক্লান্তিতে নিখিল ঘুমিয়ে পড়েছিল। রান্না শেষ ক'রে সীমা যখন উঠল তখন রাত একটা বেজে গেছে। সে তাড়াতাড়ি স্নান সেরে শুচি হয়ে তার তনুদেহলতাটিকে একখানি কৌষেয় বস্ত্রে আবৃত ক'রে নিদ্রিত নিখিলের শয্যাপার্শ্বে এসে দাঁড়াল। আজ যেন এই এক রাত্রের আনন্দে তার সমস্ত জীবন যৌবন তার নিখিল ভুবন নারীত্বের গৌরবে পূর্ণ হয়ে উঠেছে। ঐ যে স্নেহশীল নিঃস্বার্থ মানুষটি তারই রচিত শুভ্র শয্যায় শুয়ে নিশ্চিন্ত আরামে ক্ষণকালের জন্যেও তার পরিবেশিত সেবা সম্ভোগ করতে পেরেছে, সীমার জীবনে এর চেয়ে পরিতৃপ্তির বস্তু যেন কিছুই সে মনে করতে পারে না। আজ সমস্ত জগৎ থেকে বিচ্ছিন্ন হয়ে এই মৃত্যুসাগরের বিস্মৃতির কূলে ওরা দুটিতে যেন একটি চিরস্মরণীয় স্নিগ্ধ কোমল শান্তিনীড় রচনা করেছে। নিখিলের নিদ্রিত শ্রান্ত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে তার চোখ দিয়ে দুই বিন্দু অশ্রু ধীরে ধীরে গড়িয়ে পড়ল। সে অশ্রু আসন্ন বিরহজনিত শোকের, না, পরিপূর্ণ আনন্দময় অনুভূতির, তা কে বলতে পারে! সাবধানে নয়ন মার্জ্জনা ক'রে গিয়ে সে নিখিলকে ডাকল। নিখিল চোখ খুলে দেখলে তার সামনে দাঁড়িয়ে সীমা—সদ্যস্নাত, শুচি-বস্ত্রপরিহিত, স্নানসিক্ত মুক্তবেণী, শুভ্র, সুন্দর, শুচিস্মিতা পূজারিণীর ছবির মত যেন। মনে হ'ল আজকের এই উৎসব-রজনীর জন্য যেন সে সমস্ত জীবন, জন্ম-জন্ম প্রতীক্ষা ক'রে ব'সে ছিল। সার্থক তার এক রাত্রির পরম রজনী। পরিপূর্ণ পুলকিত শুদ্ধ হৃদয়ে নীরবে উঠে সে সীমার রচিত আসনে গিয়ে বসল। যেন দেবতার আসনে ভক্তের অর্ঘ্য গ্রহণ করবার সৌভাগ্য তার।

আহার শেষ হ'লে সীমা মৃদু হেসে বললে, "নিখিলবাবু,

ভবিষ্যতে এই দুরন্ত প্রগলভ মেয়েটাকে যদি কখনও মনে পড়ে তবে অনেক দিনের দুর্ব্যবহারের সঙ্গে, আজকের কথাটাও একটু মনে করবেন ত ?"

"সীমা, আজকের আনন্দ আমার সমস্ত জীবনের পরম সম্পদ হয়ে রইল। আমার দুঃখ এই যে, এমন অমূল্য জীবনটাকে জগতের সেবায় লাগাতে পারলাম না। আজ আমার ধারণা আরও দৃঢ় হয়েছে যে, ধ্বংসের দ্বারা মানুষের মুক্তি হয় না, মানুষের মুক্তি তার সৃষ্টিতে। সমস্ত বিশ্ব-প্রকৃতির মধ্যে তারই ইঙ্গিত ধ্বনিত হচ্ছে। গাছ তার পাতাকে ধ্বংস ক'রে সুন্দর হয় না, সে তার অন্তরের পরিপূর্ণ নূতন সৃষ্টির বিকাশের প্রেরণায় পুরাতনকে ঝরিয়ে দেয়। সেখানে পুরাতনের ধ্বংসের পশ্চাতে থাকে সৃজনের লীলা। সেই সৃষ্টির জোয়ারের মুখে পুরাতন আপনি খসে যায়। ধ্বংস ক'রে নিয়ে বাইরের থেকে সৃষ্টি করা চলে না। সৃষ্টির মধ্যে বিশ্বপ্রকৃতির মধ্যে তাই 'এনার্কি' কোথাও নেই। ওটা একটা সৃষ্টিছাড়া প্রকৃতিবিরুদ্ধ জিনিষ। তোমার মধ্যে-কার সেই সুন্দর স্বাভাবিক তেজোময়ী সৃজনশক্তিকে দেশের দুর্দ্দশা মোচনে লাগাতে পারলাম না, এই দুঃখই আমার রয়ে গেল।"

সীমা আজ কোন তর্ক করলে না। তার মন আজ যে-সুরে বাঁধা ছিল তর্কের তীব্রতা সেখানে গিয়ে পৌঁছয় না। সে হেসে বললে, "নিখিলবাবু, আপনি আজ আর আমার কথা ভেবে দুঃখ করবেন না। পরিপূর্ণ বিশ্বাস এবং নিষ্ঠার সঙ্গে যদি এ পথে কাজ ক'রে থাকি তবে বিশ্বাস এবং নিষ্ঠাটুকুর মঙ্গল প্রভাব থেকে আমার দেশ বঞ্চিত হবে না। আপনি আপনার অপরাজেয় দেশপ্রীতি দিয়ে নূতন মানুষ গ'ড়ে তুলুন—দেশকে যারা শান্তিতে আনন্দে মুক্তির পথে নিয়ে যাবে। কিন্তু তার আগে আপনার রক্ষার একটা ব্যবস্থা মনে এসেছে, সেইটুকু করতে হয়।"

"আমার রক্ষা! তোমাদের যা গতি আমি সেই গতিই আজ একান্ত মনে প্রার্থনা করছি। আমি—"

"তা হয় না, নিখিলবাবু। আপনার আরও কর্ত্তব্য আছে। আপনি ভুলে যাচ্ছেন যে হতভাগিনী জ্যোৎস্নার স্বামীকে উদ্ধার ক'রে তাকে সুখী করবার ভার আপনারই। শুনুন, আপনাকে বলা হয় নি। কিন্তু আর ত সময় নেই। তাই আপনাকে জানাচ্ছি। শচীনবাবু আমার এখানেই বন্দী আছেন।"

"শচীনবাবু এখনও বেঁচে আছেন ?" নিখিলের একটা দুশ্চিন্তা যেন নেমে গেল।

"হ্যাঁ। আমি ভেবেছি, তাঁর ঘরে আপনাকে একই সঙ্গে বন্দী ক'রে রেখে দিই। তা হ'লে পুলিস এসে আর আপনাকে আমাদের দলের ব'লে অত্যাচার করবার কোনও কারণ পাবে না।"

নিখিল এবার জোর দিয়েই বললে, "তা কিছুতেই হবে না, সীমা। তোমাকে এই বিপদের মুখে ফেলে এক পাও নড়ব না। মিছামিছি ও অনুরোধ আমাকে ক'রে কোন লাভ নেই।"

বহু চেষ্টা সত্ত্বেও সীমা নিখিলকে কিছুতেই সম্মত করতে পারল না।

এমন সময় স্তব্ধ রজনীকে সচকিত ক'রে একটা বন্দুকের আওয়াজ গর্জ্জে উঠল। নিখিল ত্রস্ত হ'য়ে উঠে দাঁড়াল।

সীমা হেসে বললে, "বসুন, আমি আসছি। এ বন্দুক আমাদের ছাদ থেকেই ছোঁড়া হয়েছে। রঙ্গদার উৎসব সুরু হ'ল। এরই জন্যে বেচারা এত দিন অপেক্ষা করেছে।" ব'লে সে বেরিয়ে গিয়ে সব দরজা ভাল ক'রে বন্ধ ক'রে দিয়ে এসে বসল।

৬১

রঙ্গলাল তার অনুচরদের নিয়ে সমস্ত রাত যথাসাধ্য বিস্তৃত আয়োজন ক'রে ছাদে অপেক্ষা করছিল। ভুলু দত্তকে সে যে বর্ণনা দিয়েছিল তাতে একটা প্রকাণ্ড দলের বিরুদ্ধে যে পুলিসকে লড়াই করতে হবে এমনি একটা আভাস দেওয়া ছিল। কোন ছোটখাট ছিটকে ব্যাপারে আয়োজনটার গুরুত্ব এবং উত্তেজনা লঘুক্রিয়ায় পরিসমাপ্ত না-হয়, এ-বিষয়ে রঙ্গলাল চেষ্টার ত্রুটি করে নি। ভুলু দত্তও প্রকাণ্ড আশায় বিপুল বাহিনী নিয়ে এসে উপস্থিত হয়েছিল।

একটা বৃহৎ বাগান। বড় বড় প্রাচীন পাদপশ্রেণীতে রাত্রে প্রায় অরণ্যের মত মনে হয়। গাছের আড়ালে আড়ালে নিজেদের রক্ষা ক'রে বাড়ীর দিকে অগ্রসর হওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ ও নিরাপদ। বাড়ীর কাছাকাছি

পৌছে একটা স্বল্পাধিক বিস্তৃত উন্মুক্ত অঙ্গন। সেইখানটা-তেই বিপদের সম্ভাবনা জেনে ভুলু দত্ত বাড়ীর চতুর্দ্দিক বেষ্টন ক'রে বড় বড় গাছের গুঁড়ির অন্তরালে যথাসম্ভব নিজের বাহিনীকে সংযোজিত ক'রে রাখলে।

শেষরাত্রের দিকে গোপনে অগ্রসর হয়ে অকস্মাৎ আক্রমণ করা যায় কি না ভেবে সে একবার এগোবার চেষ্টা করলে। রঙ্গলাল প্রস্তুতই ছিল। সে দ্বিধামাত্র না ক'রে ছাদের উপর থেকে এক মুহূর্ত্তে আক্রমণ স্থরু করলে। দত্ত দেখলে গুলির মুখে এগিয়ে গেলে অকারণে নরহত্যার তথা বলক্ষয়ের সম্ভাবনা। সে আবার হ'টে গাছের আড়ালে চ'লে গেল এবং নির্ব্বিবাদে ছাদ লক্ষ্য ক'রে গুলি চালাবার হুকুম দিলে। তার ইচ্ছা ছিল যে যদি অগ্রসর হ'তে নাও পারা যায় তবে শত্রুপক্ষের গুলির রসদকে এই উপায়ে ক্রমে নিঃশেষ ক'রে ফেলবে।

তার এই মতলব ব্যর্থ হ'ল না। রঙ্গলালদের গোলাগুলির আয়োজন অত্যন্ত অধিক ছিল না। যুদ্ধ ব্যাপারে তার অভিজ্ঞতাও কিছুমাত্র নেই। সীমা একদিন ঠিকই বলেছিল যে, "দুঃসাহস তার যতটা আছে, বুদ্ধি যদি তার ততটা থাকত তবে ভারতবর্ষে তার তুলনা থাকত না।" সে প্রথম ভুল করেছিল ছাদের উপর আশ্রয় নিয়ে। মৃত্যু আকাঙ্ক্ষা ক'রে যে পুলিসবাহিনী স্থবোধ ছেলের মত মুক্ত অঙ্গনে অকারণে তাদের বন্দুকের 'চাঁদমারি' হ'তে এগিয়ে এসে লড়াই করবে না এটা তার মাথায় আসে নি। ছাদের উপর থেকে গুলি চালাতে গেলে গাছের বিস্তীর্ণ শাখাপল্লবাশ্রয়কে ভেদ ক'রে যে আক্রমণ করা সম্ভব নয় অথচ বৃক্ষকাণ্ডের অন্তরালে নিজেদের রক্ষা ক'রে শাখাপল্লবের অবকাশ-পথে তাদের প্রত্যভিবাদন করা যে পুলিসের পক্ষে অপেক্ষাকৃত সহজ, সে কথা পূর্ব্বে তার মস্তিষ্কে প্রবেশ ক'রে নি। প্রবেশ যখন করল, তখন তার ক্ষীণসঞ্চয় রসদের আর অল্পই অবশিষ্ট আছে। পুলিশ যে তাদের বিষম আক্রমণে হ'টে গিয়ে পেছিয়ে গেল, এই আনন্দেই সে প্রথমটা বিপুল বিক্রমে গুলি চালিয়ে যাচ্ছিল। কিন্তু প্রতিপক্ষের আক্রমণও নিরস্ত ছিল না। ছাদের আলিশার প্রত্যেকটি রন্ধ্র লক্ষ্য ক'রে অনবরত গুলির পর গুলি তারা ছাড়ছিল। তাতে ফল নিতান্ত খারপ হয় নি। রঙ্গলালের দলের এক জন মৃত ও অন্য সকলেই অল্পবিস্তর আহত হয়েছিল। ঘণ্টা দুয়েক এমনি যুদ্ধ চলবার পর তাদের দলের একটি ছেলে সাহস ক'রে বললে, "রঙ্গদা, গুলি ত প্রায় ফুরিয়ে এল। ওদেরও যে বিশেষ অনিষ্ট করা গেছে, এমন ত বোধ হয় না। শেষে কি খালি হাতে গিয়ে ওদের কাছে ধরা দিতে হবে?"

ধরা দেবার কথাতেই রঙ্গলালের সব চেয়ে আতঙ্ক, সব চেয়ে আপত্তি। সে বললে, "কি করতে চাও বল।"

"নীচের ঘরে চল; জানলা দিয়ে গুলি চালাবে। তাতে না হ'লে বেরিয়ে পড়ব। মরতে ত হবেই?"

রঙ্গলাল উৎসাহিত হ'য়ে বললে, "বেশ ভাই, চল। বিনা রক্তপাতে মরা হবে না।"

যুদ্ধের অভিজ্ঞতা দু-জনেরই সমান।

নীচের ঘরের দরজা জানালার আড়ালে ব'সে নূতন ক'রে তারা আক্রমণ স্থরু করলে। অজস্র রক্তপাতে রঙ্গলাল এবং তার সঙ্গীদের দেহ ক্রমে অবসন্ন হ'য়ে আসছিল; কিন্তু উৎসাহের তাদের অন্ত ছিল না। কিন্তু জীবনীশক্তি ক্রমেই তাদের ক্ষয় হয়ে আসছিল। রসদও প্রায় নিঃশেষপ্রায়। দুটি ছেলে সংজ্ঞা হারিয়ে রঙ্গলালের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল। রঙ্গলাল পলকের জন্য তাদের দিকে ফিরে তাকাল। এতক্ষণে রঙ্গলাল তাদের ভুল বুঝতে পারল। ছাদের উপর থেকে বাড়ীর চতুর্দ্দিকের আক্রমণকে প্রতিহত করা সহজ ছিল। কিন্তু সকলেই ছাদ থেকে নেমে এসে মাত্র একটি দিকের উপর তাদের প্রভুত্ব রইল। এই ত্রুটিটুকু ভুলু দত্তের লক্ষ্য করতে বিলম্ব হয় নি। পশ্চাৎ দিক থেকে বাড়ী চড়াও করার এই স্থযোগ সে ছাড়লে না। অল্প কয়েকজনকে সামনে মোতায়েন রেখে সে নিজে ঘুরে বাড়ীর পিছন দিক থেকে গিয়ে দরজা ভেঙে বাড়ীতে প্রবেশ করলে।

রঙ্গলাল দেখলে, আর কোন আশা নেই। তখন দুই জনে নিজেদের সমস্ত শক্তি সংহত ক'রে নিয়ে, দরজা খুলে সেই মুক্ত প্রাঙ্গণে অজস্র গুলির মুখে নিশ্চিত মৃত্যুর আলিঙ্গনের মধ্যে বিপুল বিক্রমে ঝাঁপ দিয়ে পড়ল। একটা গুলির চোট খেয়ে তার সঙ্গী অনিল চেঁচিয়ে বললে, "রঙ্গদা', চললাম। গুড্ বাই।"

রঙ্গলাল তার শেষ গুলিটা বন্দুকে ভরতে ভরতে

বললে, "না গুড্‌ বাই নয়, একটু সবুর, এই এলাম ব'লে।"

সীমার তুই চোখ দিয়ে আগুন বেরচ্ছে যেন। তার অনুচরদের সে নিজের ভায়েরই মতই ভাল বাসত। অনিল ও রজলালের কথা স্পষ্ট তার কানে এল। প্রত্যেকটি মৃত্যু সে যেন প্রত্যক্ষ দেখতে পাচ্ছে। রিভলভারটা হাতে ক'রে সে সোজা হ'য়ে দাঁড়িয়ে উঠল। তার পর নিখিলের দিকে ফিরে বললে, "এমন কোথাও দেখেছেন? দাদাদের কথা আজ মনে পড়ছে। মৃত্যু যেন একটা মুহূর্ত্তেকের পরিহাস। এবার আমাকে বিদায় দিন। প্রার্থনা করুন, যেন ফিরেবার স্বাধীন ভারতে জন্ম নিতে পারি।"

এমন সময় বন্ধ দ্বারে ভীষণ তাড়নায় দরজা ভাঙবার উপক্রম হ'ল। সীমা ফিরে রিভলভার একবার দরজার দিকে লক্ষ্য ক'রে দাঁড়াল। তার পর নিখিলের দিকে ফিরে তারই কথার পুনরাবৃত্তি ক'রে হেসে বললে, "কি হবে একটা তুটো খুন ক'রে, কি বলেন?" সেই মুহূর্ত্তে দরজা ভেঙে পড়ল এবং পর মুহূর্ত্তেই সীমা নিজের বুকের উপর গুলি চালিয়ে দিয়ে নিখিলের পায়ের কাছে লুটিয়ে পড়ল।

পুলিসবাহিনীর দিকে কিছুমাত্র লক্ষ্য না ক'রে পাগলের মত নিখিল হাঁটু গেড়ে সীমার উপর ঝুঁকে পড়েছে। "সীমা, সীমা, এ কি করলে, সীমা! এমনি ক'রে কিসের শোধ নিলে তুমি? সীমা, সীমা, সীমা," ব'লে সে ক্রমাগত ডাকতে লাগল। মরণোন্মুখ সীমার মুখে অল্প একটু হাসির রেখা ফুটে মিলিয়ে গেল।

ভুলু দত্ত ঘরে ঢুকেই "সীমা" নাম শুনে বললে, "সীমা! কই সীমা?"

নিখিল হাহাহাহা করে একটা উন্মাদের হাসি হেসে দাঁড়িয়ে উঠে ভুলু দত্তকে বলতে লাগল, "বুল ডগ, পারলে না, পালিয়েছে। তোমার দাঁতের ধার আর পরীক্ষা করবার সুযোগ দিলে না। হা হা হা হা।"

"একি নিখিল! তুমি এখানে! তুমিও?"

"হ্যাঁ, আমিও। একটুও দয়া ক'রো না আমাকে, একটুও না। তোমাদের বন্দুকে কি একটাও গুলি আর বাকী নেই? ওদের চেয়েও অপরাধী আমি। ওদের অপরাধ বিশ্বাসে, আর আমার পাপ লোভে। কিছু দয়া ক'রো না আমাকে।"

ভুলু দত্ত দেখলে যে নিখিলের মস্তিষ্ক কিছু উত্তেজিত হ'য়েছে। আর বাক্যব্যয় না ক'রে সে তাকে গ্রেফতারের হুকুম দিয়ে অত্যন্ত গম্ভীর চিন্তিত মুখে সে সমস্ত বাড়ীটা অনুসন্ধানের জন্যে বেরিয়ে গেল।

আজকের অভিযানে ব্যক্তিগত আনন্দের ও জয়ের যে আত্মপ্রসাদ, তা যেন কিসের ছায়াপাতে ম্লান হয়ে গিয়েছে।

* * *

তু-এক দিনের মধ্যেই নিখিল শান্ত হয়েছিল। হাজতে একদিন ভুলু দত্তকে ডেকে নিয়ে সে বললে, "আমার একটা অনুরোধ তোমার কাছে আছে; শচীন সিংহ সম্বন্ধে। যদি হাজতে তাঁকে আমার সঙ্গে দেখা করতে দাও তবে তাঁকেই সব বলব। নইলে অগত্যা তোমাকেই ব'লে যেতে হবে।"

ভুলু দত্ত বললে, "সে হুকুম ত এখন আমি দিতে পারব না। আমাকে বলতে যদি তোমার আপত্তি না থাকে তবে বলতে পার।"

নিখিল তখন তাকে জ্যোৎস্নার মোটামুটি ইতিহাস সংক্ষেপে ব'লে বললে, "ডাক্তার হিসেবে বলছি, হঠাৎ শচীনবাবুকে নিয়ে সেখানে উপস্থিত ক'রো না। তাদের বৃদ্ধ ভৃত্য ভোলানাথ—"

ভুলু বললে, "হ্যাঁ, হ্যাঁ ম্যানেজারের সঙ্গে ঐ নামের একজন এসেছিল বটে। লম্বাচৌড়া বুড়ো মানুষ।"

"হ্যাঁ, তাকে দিয়ে সাবধানে সংবাদ দিও। নইলে, হঠাৎ সংবাদ দিলে ফল ভাল নাও হ'তে পারে। আমার বন্ধু হিসাবে ঐটুকু ব্যবস্থা তুমি ক'রো।" সম্মত হ'য়ে ভুলু দত্ত চলে গেল।

৬২

কমলার সংবাদে শচীন্দ্রনাথের চিত্ত যে পরিমাণ আনন্দের উত্তেজনায় উদ্বেলিত হয়ে ওঠবার কথা সেই বাধাবিহীন আনন্দ যেন তার চিত্তে সেই উচ্ছ্বসিত অভ্যর্থনা লাভ করলে না। বহুদিনের পর তার একান্ত বাঞ্ছিতের পরমরমণীয় মিলনের

তৃষ্ণা, তার মিলনের সুনিশ্চিত সম্ভাবনার আকস্মিক আঘাতে কেমন নিস্তেজ হ'য়ে পড়ল। এতদিন তার জীবনে যে বিরাট তীব্র বিরহকে নিজের চিত্তের একান্ত অবলম্বনরূপে জাগিয়ে-রাখা দুঃসাধ্য-সাধনার আত্মপ্রসাদে সে মগ্ন ছিল, সহসা তার সেই মহত্ত্বের অধিকারে অপ্রত্যাশিতভাবে বঞ্চিত হয়ে, পাওয়ার আনন্দের মধ্যেও একটা সৃষ্টিছাড়া কর্ম্মসূত্রবিচ্ছিন্ন নিরবলম্বতা তার চিত্তকে এসে অধিকার করলে। কয়েক মুহূর্ত্ত সে চিন্তালেশশূন্য নিষ্ক্রিয় চিত্তে স্থির হয়ে বসে রইল।

নিখিলনাথের কাছ থেকে শোনা কমলার অভূতপূর্ব্ব কাহিনী শেষ ক'রে ভুলু দত্ত বললে, 'শচীনবাবু, নিখিল একটা অনুরোধ জানিয়েছে আপনাকে ডাক্তারি হিসেবে। আপনি হঠাৎ গিয়ে দেখা করলে আপনার স্ত্রীর পক্ষে সেটা ক্ষতিকর হওয়া সম্ভব। আচমকা একটা অভাবনীয় আনন্দের ঘা খেলে তাঁর স্মৃতি কিম্বা তাঁর স্নায়ু সে আঘাত সহ্য নাও করতে পারে। তাই আপনাদের চাকর ভোলানাথের সহায়তায় ধীরে ধীরে সাবধানে একটু এগোনো দরকার। আনন্দ-উৎসব ত পড়েই রয়েছে—কি বলেন? কিন্তু কি অদ্ভুত ব্যাপার বলুন ত? ভাগ্যিস আমি ঠিক সময়ে গিয়ে পড়েছিলাম, নইলে হাঃ হাঃ হাঃ একেই বলে কারু পৌষ মাস কারু সর্ব্বনাশ। আমি তা হ'লে আসি এখন। নমস্কার।"

ভুলু দত্তের কথার ধাক্কায় যেন সচেতন হয়ে সে অতিরিক্ত ক'রে ভুলুকে ধন্যবাদ এবং কৃতজ্ঞতা জানাতে লাগল, এবং এক প্রকার লজ্জিত হয়েই যেন নিতান্ত অপ্রাসঙ্গিকভাবে কমলার জন্যে এই কয় বছর যে সে কি রকম মনোবেদনা সহ্য করেছে, এবং স্ত্রী যে তার সমস্ত জীবনের কতখানি অধিকার ক'রে ছিল, এমন কি তার প্রতি একান্ত প্রেমে সে যে কমলাপুরী নারী-প্রতিষ্ঠানের স্মৃতিমন্দির রচনা ক'রে একান্ত চিত্তে তারই ধ্যানে নিমগ্ন ছিল এই কথা বলতে বলতে তার স্তিমিতপ্রায় প্রেমকে যেন সে সঞ্জীবিত ক'রে তুল...

ভুলু দত্ত মনে মনে একটু অশ্রদ্ধাপূর্ণ কৌতুক অনুভব ক'রে ভাবলে, "আচ্ছা বৌ-পাগলা লোক ত! খেয়ে দেয়ে কাজ নেই। পয়সা থাকলে কত সখই না যায়।"

ভুলু দত্ত বিদায় হয়ে গেলে সে ম্যানেজার এবং ভোলানাথকে ডেকে দস্তুরমত উচ্ছ্বসিত হয়ে উত্তেজিত কণ্ঠে কমলার সংবাদ জানালে। ম্যানেজারকে তখন কমলাপুরী পাঠিয়ে দিলে পার্ব্বতীর কাছে সংবাদ বহন ক'রে এবং একটা বিরাট উৎসবের আয়োজন করতে। এতদিনের হারানো স্ত্রীপুত্রকে পাওয়ার আনন্দের নেশায় সে রীতিমত নিজেকে মাতিয়ে তুললে। বললে, "ভোলাদা, তোমাকেই ত সব করতে হবে। কি করব না-করব আমি কিছু ভেবে পাচ্ছি নে। এখনি চল, যাওয়া যাক। তুমি কিন্তু মাথা ঠিক রেখ ভোলাদা, নইলে আবার একটা কি কাণ্ড হবে। বুঝতেই ত পারছ।"

ভোলানাথ তার কাছ থেকে প্রথম শুনেই হেসে কেঁদে একেবারে অস্থির হয়ে উঠেছিল। "খোকন বাবু? আহা কত বড়টি হয়েছে না জানি। মা কি ছেড়ে যেতে পারে বাবু? আহা মা আমার জগদ্ধাত্রী! মাথায় ক'রে নে আসব'খন। খোকন বাবু কি চিনতে পারবে? কত পুণ্যি করেছিলেম, বাবু, যে আবার মাকে খোকনবাবুকে ফিরে পেলাম।" ইত্যাদি

শচীন বললে, "ভোলাদা, সেই ওরা হারানোর দিন কি রকম পোষাক তোমার ছিল মনে আছে? ঠিক সেই রকমটি সেজে তোমায় যেতে হবে। নইলে,—ওর আবার সব ভুল হয়ে গেছে কি না। কি জানি শেষকালে যদি চিনতে না পারে!"

শচীন্দ্রনাথের নিজের মনে এতদিনকার অদর্শনজনিত অপরিচয়ের যে দ্বিধা সঞ্চিত হয়ে উঠছিল ভোলানাথের উচ্ছ্বসিত চিত্তে কমলা সম্বন্ধে সে সন্দেহ তার লেশমাত্র ছিল না। সে সগর্ব্বে বললে, "মা কি ছেলেকে ভুলতে পারে বাবু? দেখো, আমি গিয়ে একবার মা ব'লে ডাকলে সব মনে পড়ে যাবে। কিন্তু খোকন বাবু কি চিনতে পারবে? বড্ডই ছেলেমানুষ ছিল কি না।"

খোকন যে চিনতে পারবে না সে সম্বন্ধে ভোলানাথের সঙ্গে শচীন্দ্রের মতদ্বৈধ ছিল না। কিন্তু কমলার মন এতদিনের পরও তার প্রতি আসক্ত থাকবে বা তাকে ফিরে পেতে চাইবে তার নিশ্চয়তা কি? এমন কি এতদিনকার বিস্মৃত পরিত্যক্ত গার্হস্থ্য জীবনের বন্ধনকে যে

আবার স্বীকার করে নিতে সে আগ্রহান্বিত হবে তাই বা কে বলতে পারে? শ্রীরামচন্দ্রের উত্তরাধিকারীর মন আধুনিক শিক্ষা যুক্তি এবং প্রেমের মুক্তিমন্ত্রে দীক্ষিত হ'লেও সীতাহরণের গ্লানি এবং অবসাদ বোধ করি সম্পূর্ণরূপে কাটিয়ে উঠতে পারছিল না। তবু কমলার প্রতি তার অভ্যস্ত প্রেমের স্মৃতিপটে কমলার যে নয়নাভিরাম সৌন্দর্য্য এবং একান্ত নির্ভরপরায়ণা নারীর যে চিত্তগ্রাহী মূর্ত্তি অঙ্কিত ছিল এই অভিনব আবিষ্কারের রহস্যমাধুর্য্যে অন্তরে অন্তরে তার আকর্ষণ প্রবল হয়ে উঠছিল। সে নিজের দ্বিধার দুর্ব্বলতাকে মনে মনে উপহাস এবং অস্বীকার ক'রে কমলার সন্ধানে যাবার জন্য প্রস্তুত হ'তে লাগল। এই সমস্ত চিন্তা, দ্বিধা, দ্বন্দ্ব, উচ্ছ্বাস এবং মিলনের আয়োজনের অন্তরালে, সর্ব্বক্ষণ নিজের অজ্ঞাতে, পার্ব্বতীর প্রতি তার স্নেহসরস চিত্তের আকাঙ্ক্ষা যেন বিসর্জ্জন-রজনীর দূরাগত শানাইয়ের স্নিগ্ধকোমল স্বপ্নসমাচ্ছন্ন বেদনার সুরের মত তার মগ্নচৈতন্যকে করুণরসধারায় আচ্ছন্ন ক'রে রইল; কিন্তু সে কথা যেন আজ কিছুতেই সে স্পষ্ট ক'রে প্রত্যক্ষ করতে ভরসা পেল না।

তবু তার মনের মধ্যে অপস্রিয়মান যৌবনের দোলায় অতীত যুগের সমস্ত স্মৃতিসম্ভারপূর্ণ কমলার প্রতি তার প্রেম কমলার প্রস্ফুরিত কমনীয় যৌবনলাবণ্যস্মৃতিকে আশ্রয় ক'রে ধীরে ধীরে তার দেহমনকে উন্মুখ ক'রে তুলছিল। কত দিনের কত তুচ্ছ কথা, কমলার একান্ত সমর্পিত প্রেম ও রূপের কত অপরূপ ছন্দোবিলাস, তার সন্তানের তরুণী জননী কমলার সলজ্জসুখাবেশতৃপ্ত আননের স্নিগ্ধকোমল অরুণিমা, নিশ্চিন্তনির্ভরে উৎসর্গিত পূজার পুষ্পাঞ্জলির মত তার দেহমনহৃদয়ের পবিত্র সৌরভ যেন ক্রমে ক্রমে শচীন্দ্রের চিত্তে তার আসন্ন মিলনের আকাঙ্ক্ষাকে সজীব ক'রে, উদ্‌গ্রীব ক'রে তুলতে লাগল। তার দ্বিধা শঙ্কা সঙ্কোচ আত্মাভিমান দক্ষিণ-পবন-স্পর্শে মেঘের মত অপসারিত হয়ে গেল।

আয়নার সামনে দাঁড়িয়ে প্রসাধনের অবকাশে সে আজ প্রথম যেন লক্ষ্য করলে তার কপালের রেখা, বিস্তৃত গভীর তার চোখের নিষ্প্রভ সঙ্কুচিত দৃষ্টি, সমস্ত মুখের উপর তার আসন্ন যৌবন-বিদায়ের সুনিশ্চিত ছায়া। একটা ম্লান হাসিতে তার মুখটা একটু করুণ হয়ে এল। বেশবাসের প্রতি অতিরিক্ত অনুরক্তিপ্রসূত কুরুচি তার কোন কালে ছিল না; কিন্তু আজ বিশেষ যত্নে মুখের অবসন্ন যৌবনের কালিমা দূর ক'রে মধ্যের এই কয়েক বৎসর কালের নিষ্ঠুরতার চিহ্ন সে মুছে ফেলতে চায়। বলতে চায় যেন

এখনও বিদায় নহে, রহ বন্ধু রহ ক্ষণকাল
হে মোর যৌবন।

বৃদ্ধ ভোলানাথ তার বাবুর কথায় একটুও কান দেয় নি। আজ তার পক্ষে তার জীবনের সব চেয়ে বড় আনন্দের দিন। এত বড় উৎসব শচীন্দ্রের বিবাহের দিনও তার কাছে মনে হয় নি। আজ প্রথম দর্শনেই সে খোকনবাবুর মনোহরণ করবার উচ্ছ্বসিত আশায় তার সব চেয়ে মূল্যবান রঙীন পোষাক সে পরেছে। মাথায় ফিরোজা রঙের পাগড়ী, ধোপদুরস্ত কাপড়ের উপর সাদা সাটিনের আচকান, (পায়জামা সে কোনকালে পরতে পারে না), শুঁড়তোলা নাগরা। হাতে একটা রূপাবাঁধানো সোঁটা—দেখলে হঠাৎ একটা পশ্চিমা রাজারাজড়ার মত মনে হয়। তার প্রকাণ্ড দেহও আজ যেন আর ন্যুব্জ দেখায় না।

শচীন্দ্র তাকে দেখে হেসে ফেললে, "ও কি ভোলাদা, করেছ কি, তোমার বৌমা তোমাকে চিনতেই পারবে না যে! ভাববে কোন রাজাবাদশাই বা এল হঠাৎ।"

ভোলানাথ সগর্ব্বে বললে, "চিনবে না কি! চিনতেই হবে যে। আর আমরা নফর মানুষ; তা পরের বাড়ী যাচ্ছি, তারা একবারটি চোখ মেলে দেখুক যে কেমন বাড়ীর বৌরে তারা ঘরে ঠাঁই দেবার ভাগ্যি পেয়েছে। ঘরে ঠাঁই দেওয়া, সে কি সোজা কথা বাবু?—মা আমার রাজরাণী।"

শচীন্দ্র মনে মনে হেসে ব্যাপারটি বুঝল; আর কথা বাড়াল না। তার রাজরাণী বৌমাকে যে লোকেরা সামান্য ভেবে কৃপা ক'রে আশ্রয় দেবার স্পর্দ্ধা রাখবে এ তার পক্ষে অসহ্য। তাই আশ্রয়দাতার স্পর্দ্ধার বিরুদ্ধে এ যেন তার যুদ্ধসাজ।

একটা ট্যাক্‌সি ক'রে দুজনে বেরিয়ে পড়ল। ভোলানাথের উৎসাহ যেন বাঁধ মানতে চাইছে না। কি ক'রে এক মুহূর্ত্তেই খোকনবাবুর মনটা জয় ক'রে তার পূর্ব্ব গৌরব প্রতিষ্ঠিত রাখবে এই তার এক সমস্যা। সামনের

সাঁট থেকে ঘুরে বললে, "বাবু, খোকনবাবুর জন্যে একটু মেঠাই কিনে নিয়ে যাই। আর একটা বড় কাঠের ঘোড়া। আমার পিঠে ঘোড়া-ঘোড়া খেলতে বড় ভালবাসত।"

বৃদ্ধের কল্পনা খোকনের সেই শিশুকালকে অতিক্রম ক'রে এগোতে পারে না। তার রকম দেখে শচীন্দ্র হেসে বললে, "খোকন কি আর এতটুকুনটি আছে? কাঠের ঘোড়ায় তার মানহানি হবে যে।" তবু সে বৃদ্ধের উৎসাহকে ক্ষুণ্ণ না ক'রে কিছু মিষ্টি, চকোলেট, এয়ারগান্ প্রভৃতি উপহার-দ্রব্য কিনে দিল। কমলার জন্যেও কিছু কিনবার ইচ্ছায় তার মনটা উদ্‌গ্রীব হ'লেও দ্বিধায় সঙ্কোচে সে কিছু কিনতে পারলে না। কে জানে কমলার পছন্দ এখন কেমন হয়েছে, হয়ত কিছু দিতে গিয়ে লজ্জাই পেতে হবে। দেবার ত সময় বয়ে যাচ্ছে না।

৬৩

শচীন্দ্র ও ভোলানাথ যখন গিয়ে মালতীদের বাড়ী পৌঁছল তখন দ্বিপ্রহরের দীর্ঘ দিবানিদ্রা সমাপন ক'রে মালতীর মাতুল বাইরের ঘরে উবু হয়ে ব'সে, হাঁটুর কাপড় খসিয়ে একটি থেলো হুঁকায় তাম্রকূট সেবনে আলস্যচর্চ্চায় রত। নন্দলালের হত্যার ত্রাসে সর্ব্বদাই তার প্রাণে একটা আতঙ্ক জেগে ছিল। পারতপক্ষে সে নিদ্রার সময় রাত্রে বা দিনে ঘরের জানালা দরজা মুক্ত রাখত না। আজও অভ্যাসমত চতুর্দ্দিক বন্ধ ক'রেই অন্ধকূপের কূপমণ্ডূকের মত সে তাম্রকূট ধ্বংস করছিল। কড়া নাড়ার আওয়াজে অকস্মাৎ চকিত হয়ে তার হাত কেঁপে কলকে থেকে জ্বলন্ত কয়লা বিছানার উপর পড়ে গেল। বিছানা ঝাড়তে, কাপড় সামলাতে ব্যতিব্যস্ত হয়ে হুঁকার জল ফেলে একটা কাণ্ডই বাধিয়ে দিলে সে। নন্দলালের হত্যাকারীদের কেউ যে দরজায় উপস্থিত সুতরাং তার যে প্রাণ সংশয়, এ-বিষয় তার সন্দেহ মাত্র ছিল না। কড়া নাড়ার কোনও প্রকার প্রত্যুত্তর দেওয়া সে সমীচীন বোধ করলে না। ভিতরদিকের দরজা খুলে কাপড়ের খুঁট গুঁজতে গুঁজতে সটান্ সে মালতীর দরজায় গিয়ে উপস্থিত হ'ল।

বঁটি পেতে মালতী অজয়ের জন্য ফল ছাড়িয়ে থালায় সাজাচ্ছিল। মাতুলও নিত্য এই ফলের অংশীদার। মালতী তার ভাব দেখে অবাক হয়ে বললে, "কি মামা, ব্যাপার কি? কিছু চাই নাকি?"

মালতীকে দেখে কতকটা সম্বিত ফিরে পেয়ে, সে বেশ জুত ক'রে দরজার বাইরে একটা মোড়ায় জমে ব'সে বললে, "কাল যে সেই খাজুর দিইছিলে, তা একটু টক্ হলি কি হয়, খাতি বড় সরেশ। আছে নাকি দুটো?" বাইরের ঘটনা যে প্রণিধানযোগ্য তা তার ব্যবহারে প্রকাশ পেল না। দুটি নারী ও একটি শিশুর সে রক্ষক। দিবা দ্বিপ্রহরে কড়া নাড়ার আওয়াজে যে সে আতঙ্কিত হয়ে পলায়ন করেছে এ-কথা প্রকাশ করা দুরূহ। সুতরাং ইতিহাসে এমন ঘটনা ঘটে নি এই তার ভাব।

মালতী একটু হেসে গোটা কয়েক প্রুণ তার হাতে তুলে দিলে। তারই গোটা দুই সে গালে ফেলে দিয়ে রসচর্চ্চায় সবে মন দিয়েছে এমন সময় বিরক্ত ভোলানাথের হাতের কঠিন তাড়নে কড়া কর্কশ নিনাদে পাড়া চকিত ক'রে তুললে। মাতুল দুই হাতে কান ঢেকে মাথা নীচু ক'রে চর্ব্বণের অবসরে বললে, "হম্‌ন্, হম্‌ন্ ঐ আবার নাড়তি লেগেছে। হাম্‌ন্, নেছে নেছে, সব কটারে নেছে এবার। হাম্‌ন্, হাম্‌ন্।"

মালতী বললে, "কে ডাক্‌ছে যে মামা। কি বকছ বিড়বিড় ক'রে। যাও খুলে দেখ গে, কে ডাকে!"

"আরে দেখিছি! বুঝ্‌তি পারছ না? নেবে, এবার সব কটারে নেবে। আমারেও ছাড়বে না।"

মালতী এতক্ষণে ব্যাপারটা কতকটা বুঝতে পেরে হেসে ফেললে, "ও তাই বুঝি ভয়ে পালিয়ে এসেছ? ভালা লোককে আমাদের পাহারায় দিয়ে গেছেন নিখিলবাবু। অজয় আয় ত বাবা দেখি, কে। হয় ত নিখিলবাবুই এসে থাকবেন। বাইরে দাঁড়িয়ে, বেচারা কি ভাবছেন বল ত মামা?"

নিখিলের কথাটা মাতুলের মনে উদয় হয় নি। সে তৎক্ষণাৎ আশ্বস্ত হ'য়ে বললে, "ও তাই কও। [illegible] তাই কই। আমি থাকৃতি কোন [illegible] করবে। চল চল, আমি যাব [illegible] দোরটা খুলে দেব।"

মালতী চটে বললে, "থাক্, তোমার আর আদিখ্যেতায় কাজ নেই। আয় অজয়।"

"আরে, চট ক্যান্। চারদিক সামাল দিতি হয় ত ?"

* * *

কড়া নাড়া ও গোলমাল শুনে কমলাও বাইরের ঘরের দরজার আড়ালে মালতীর কাছে এসে দাঁড়িয়েছিল।

অজয় দরজা খুলে ভোলানাথকে দেখে একটু থমকে গেল। প্রকাণ্ড রঙীন পাগড়ী, প্রকাণ্ড চেহারা, চক্‌চকে পোষাকে ভোলানাথকে দেখে সে সসম্ভ্রমে একটু পিছিয়ে এল। উঁকি মেরে, "এ আবাঁর কেডা!" ব'লে মাতুল ঘরের এক কোণে গিয়ে আশ্রয় নিলে।

ভোলানাথ অজয়কে আশ্চর্য্য হয়ে দেখছিল। সেই শিশুকালের শচীন্দ্রনাথ যেন আরও সুন্দর হয়ে ফিরে এসেছে। সেই নাক চোখ, সেই মুখ, গালের উপর তিলটি পর্য্যন্ত হুবহু এক। দুই হাতে বুকের মধ্যে জড়িয়ে ধরে তাকে আদর করবার জন্যে ভোলানাথের মন আকুল হয়ে উঠছিল। তবু, বাবুর কথামত নিজেকে সামলে রেখে সে অজয়কে জিজ্ঞাসা করলে, "খোকাবাবু, এটা কি নিখিলবাবুর বাড়ী বাবা ?"

"হ্যাঁ।"

ভোলানাথের গলার প্রথম আওয়াজ শুনেই কমলা যেন কেমন হয়ে গেল। অবরুদ্ধ স্মৃতির দুয়ারে ঘা পড়ল যেন। সমস্ত অতীত যুগের চেনা কণ্ঠস্বর যেন তার স্মৃতিকে মথিত ক'রে চার দিক থেকে মৃত্যুপারের ইতিহাসকে সজীব প্রত্যক্ষ ক'রে তুলতে চাইছে। এই কণ্ঠস্বরের ছায়াপথ অবলম্বন ক'রে পরপারের নির্ব্বাসিত কূল থেকে তার মনটা পৃথিবীর আত্মীয় লোকের কূলে উপনীত হবার জন্যে আকুল হয়ে উঠছে। কপাল কুঞ্চিত ক'রে সে তার মনের অন্ধকার কক্ষগুলির মধ্যে যেন তার দৃষ্টিকে কঠিন বলে প্রত্যক্ষ করবার প্রেরণায় নিয়োজিত করতে চাইছে।

ভো... নাথ ততক্ষণে ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। প্রথম যেন লক্ষ্য ক... লতী সভয় কৌতূহলে এই রাজসিক সজ্জায় তার চোখের নিষ্প্রভ সঙ্কোচ... । কমলা ভোলানাথের উষ্ণীষ-আসন্ন যৌবন-বিদায়ের সুনিশ্চি... সঙ্গে কোন যোগাযোগ সাধন করতে পারছিল না। এমন সময় ভোলানাথের দৃষ্টি কমলের উপর পতিত হ'তেই সে তার পাগড়ী উন্মোচন ক'রে এগিয়ে এল এবং "মা, মাগো, আমায় চিনতে পারছ না মা ? আমি যে তোমার ছেলে, ভোলানাথ।" ব'লে আশাসোঁটা জামা-জামিয়ার সুদ্ধ প্রকাণ্ড দেহ নিয়ে সাষ্টাঙ্গে মাটিতে পড়ে কমলাকে প্রণাম ক'রে উঠে দাঁড়াল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে কমলার স্মৃতির অবরুদ্ধ দ্বার খুলে গেল। সে চীৎকার ক'রে "ভোলাদা!" বলেই হতচেতন হয়ে লুটিয়ে পড়ল মাটিতে।

"কি হ'ল! কি হ'ল! দিদি, দিদি গো!" ব'লে ডাকতে ডাকতে কমলার মাথাটা কোলে তুলে মালতী ব'সে পড়ে বললে "জল, জল। অজয়, বাবা, দৌড়ে একটু জল নিয়ে আয়। ওগো একি হ'ল! দিদি ও দিদি কথা কও ?" ব'লে সে হাপুস নয়নে কাঁদতে লাগল। অজয় দৌড়ে গেল জল আনতে।

ভোলানাথ থতমত খেয়ে তাড়াতাড়ি বেরিয়ে অদূরে ট্যাক্সিতে উপবিষ্ট শচীন্দ্রকে ডেকে বললে, "বাবু শিগ্‌গির এস। মা যেন কেমন হয়ে পড়ছে। ভীমি গেছে।"

মাতুল ব্যস্ত সমস্ত হ'য়ে শুধু "তাইত, তাইত" ক'রে অকারণে সমস্ত ঘর চামচিকের মত ঘোরাঘুরি ক'রে বেড়াতে লাগল।

কমলা—এবং সে অজ্ঞান হয়ে প'ড়েছে শুনে শচীন্দ্রের মনে এতক্ষণ যে দ্বিধা সঙ্কোচ জড়তা ছিল এক নিমেষে সব ঘুচে গিয়ে কূলে উপনীত নিমজ্জমান তরীর আরোহীর যে মনোভাব হয় সেই হতাশা পূর্ণ কূলের আগ্রহে সে ছুটে এল কমলার কাছে।

মালতীর কোলে শিথিল দেহার্দ্ধ ন্যস্ত ক'রে মেঝের উপর লুটিয়ে পড়ে আছে কমলা ছিন্নবৃন্ত শতদলের মত। মন্দসমীরস্পর্শে আকুঞ্চিত দীঘিকার বারিরাশির মত ছড়িয়ে পড়েছে তার বিপুল কেশভার। লজ্জা-সঙ্কোচ-ভাবব্যঞ্জনাবর্জ্জিত দীর্ঘপল্লব-ছায়ারেখাঙ্কিত শুভ্র কপোলে নিমীলিত নেত্রে তার মুখ অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করেছে। শচীন্দ্র মুহূর্ত্তকাল নির্ব্বাক নিস্পন্দ হয়ে এই অপরূপ রূপশ্রী নিরীক্ষণ করতে লাগল।

কমলাকে দেখে তার মনের মধ্যে তার পুরাতন পরিপূর্ণ প্রেম উদ্বেল হয়ে উঠল। তার মনে হ'তে লাগল যে এই দীর্ঘ প্রতীক্ষার পর তার সাধনার ধন যদি এমনি ক'রে তাকে



আশ্রয়

শ্রীযতুপতি বসু

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

বঞ্চিত ক'রে যায় তবে সে বিরহ তার পক্ষে সহ্য করা যে কেমন ক'রে সম্ভব হবে তা সে ভেবে উঠতে পারে না। পার্ব্বতীর প্রেম কমলার স্থান পূরণ করতে পারবে না। কখনই না। তার মনে হ'ল, এ নিশ্চয় তারই পাপের প্রায়শ্চিত্ত। পার্ব্বতীর প্রতি তার দুর্ব্বল চিত্তের উন্মুখীনতার জন্যে তার মনে তীব্র অনুতাপের উদয় হ'ল।

ভদ্রতার কথা সে এক মুহূর্ত্তের জন্যে ভুলেই গিয়েছিল। তার পর নিজেকে সংযত ক'রে নিয়ে সে মাতুলকে সম্বোধন ক'রে বললে, "দেখুন, এঁকে আপনারা জ্যোৎস্না ব'লে জানেন। এঁর নাম কমলা। ইনি আমার পত্নী। আমার সঙ্গী এই এঁর কাছ থেকে সব জানবেন। আমি একজন ডাক্তার ডেকে নিয়ে আসি তাড়াতাড়ি।"

মাতুল শচীন্দ্রের পিছন পিছন দরজা পর্য্যন্ত গিয়ে "তাই ত, তাই ত" বলতে বলতে ফিরে এল।

তাড়াতাড়ি তার আচকানটা খুলে রেখে একটা পাখা-হাতে ভোলানাথ সঙ্কুচিত অবগুণ্ঠনবতী মালতীকে বললে, "মা, আমারে লজ্জা কো'র না। আমি মায়ের সন্তান, নফর ভোলানাথ। মা আমার রাজরাণী অন্নপুন্ন, ছল ক'রে তোমার বাড়ী আশ্রয় নিইছিল।" ব'লে মাতৃসেবায় মন দিলে। বহুক্ষণ চোখে মুখে জলের ছিটে দিয়ে বাতাস করতে করতে কমলা একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলে একবার শূন্য দৃষ্টিতে চারিদিকে চেয়ে আবার চক্ষু মুদ্রিত ক'রে প'ড়ে রইল। তার মস্তিষ্কের স্মৃতিফলকে অতীতের অজস্র ছবি রক্তধারার বেগে প্রতিফলিত হয়ে চলেছে; সে অজস্রতার বেগ যেন তার দুর্ব্বল মস্তিষ্ক সহ্য করতে পারছে না। এক-একবার এক-একটা উদ্বেলিত দীর্ঘশ্বাসে তার স্নায়ুর শ্রান্তিকে প্রকাশ করছে যেন। এমনি ভাবে বহুক্ষণ যাবার পর কমলার জ্ঞান ফিরে না এলেও তার নিশ্বাসপ্রশ্বাস অনেকটা স্বাভাবিক হয়ে এল।

জীবনের ধারাবাহিক লক্ষণে আশ্বস্ত হয়েই হোক বা তার এই অস্বস্তিকর অবস্থা সম্বন্ধে সচেতন হয়েই হোক মালতী অজয়কে কানে কানে বললে, "যা ত বাবা, একটা বালিশ নিয়ে আয়। আমি উঠে মার জন্যে একটা বিছানা ক'রে রাখি।"

মালতী উঠে ভিতরে গেলে, গ্রামের খোলা বাতাসে অভ্যস্ত ভোলানাথ এই বদ্ধ ঘরে হাঁপিয়ে উঠেই বোধ করি, কিছুমাত্র ভদ্রতা না ক'রে মাতুলের দিকে চেয়ে বললে, "ধর দিনি বাবু এটটু পাখাটা, জানলা ক'টা খুলে দি। ঘরটা যে একেবারে পায়রার খোপ ক'রে থুয়েছো। এ ঘরে ঢুকলে মানুষ যে এমনিতেই ভীর্ম্মি যায়।"

মাতুল ব্যস্তসমস্ত হ'য়ে "ঠিক কইছ। অমুউ তা তাই কই। আমুউ ত তাই কই।" বলতে বলতে জানালাগুলি খুলে দিতে লাগল।

এমন সময় ডাক্তার নিয়ে শচীন্দ্রনাথ ফিরে এল।

(ক্রমশঃ)

গণতন্ত্রের স্বরূপ

শ্রীযতীন্দ্রকুমার মজুমদার, এম-এ, পিএইচ-ডি, বার-এট্-ল

বর্ত্তমান যুগে গণতান্ত্রিক শাসনপ্রণালী উদ্ভাবনের জনক ইংলণ্ডকেই বলা হইয়া থাকে। এই গণতান্ত্রিক শাসন-প্রণালী মূর্ত্ত হইয়াছে পার্লামেণ্টরী শাসনতন্ত্রে। এরূপ শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবন এক দিনে বা হঠাৎ হয় নাই, বহু কালের বিরোধ-বিসম্বাদের পর ইহার পত্তন সম্ভব হইয়াছিল। উক্ত বিরোধ-বিসম্বাদের ফলে এরূপ এক উদার ভিত্তির উপর প্রতিষ্ঠিত শাসনতন্ত্রের উদ্ভাবন এতকাল সভ্য জগতের প্রশংসা ও আদর লাভ করিয়া আসিয়াছে। ইংলণ্ডের আদর্শে ও অনুপ্রেরণায় ইউরোপের বহু দেশও অনুরূপ শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত করিতে চেষ্টান্বিত ও অনেকাংশে সফলও হইয়াছিলেন, এবং যেখানে ইহা প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে নাই, সেখানেও ইহার আদর্শ দৃষ্টির বহির্ভূত হইয়া যায় নাই। কথিত হইয়াছে, এরূপ গণতন্ত্র শাসনপ্রণালীই ইউরোপকে সভ্যতার এক উচ্চ স্তরে প্রতিষ্ঠিত করিয়াছে।

কিন্তু ইহার এক প্রতিক্রিয়া এক্ষণে উপস্থিত। বিগত মহাযুদ্ধের সময় রুষ বিদ্রোহের পর যে কম্যুনিজম্ মাথা তুলিয়া উঠিয়াছে তাহাই উক্ত শাসনতন্ত্রের প্রধান শত্রু ও সমালোচক বলা যায়। রুষ বিদ্রোহের প্রধান নেতা ও কম্যুনিজমের প্রধান প্রতিষ্ঠাতা লেনিন্ উচ্চ কণ্ঠে ঘোষণা করিলেন যে, ইংলণ্ড প্রভৃতি দেশে যে গণতন্ত্র প্রতিষ্ঠিত তাহা প্রকৃত গণতন্ত্র নহে, উহা এক নিছক ক্যাপিটালিষ্টতন্ত্র, শ্রমিকদের শোষণের এক বিরাট ষড়যন্ত্র মাত্র। প্রকৃত গণতন্ত্র যদি পৃথিবীতে প্রতিষ্ঠিত করিতে হয় ত তাহা একমাত্র সম্ভব উক্ত তথাকথিত গণতন্ত্রকে উচ্ছেদ করিয়া, এবং তাহা কম্যুনিজমের দ্বারাই একমাত্র সম্ভব। এই জন্য গোড়া হইতেই কম্যুনিষ্টদের অভিযান হইয়াছে উক্ত গণতান্ত্রিকতার বিরুদ্ধে। লেনিনের মৃত্যুর পর তাঁহার শিষ্যেরাও এক্ষণে উক্ত ভাবেরই প্রতিধ্বনি করিতেছেন, তাঁহারা বর্ত্তমান গণতন্ত্রের দোষ দেখাইয়া যতদূর সম্ভব প্রচার করিতেছেন যে ইহার মধ্যে ভাল কিছুই নাই। বর্ত্তমান গণতন্ত্রের যেরূপ এক দার্শনিক ভিত্তি আছে কম্যুনিষ্টরাও নিজেদের মতকে সম্মানার্হ করিবার জন্য উহা যে কেবল এক অর্থনৈতিক তত্ত্বের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়াছেন তাহা নহে, উহাকে এক দার্শনিক ভিত্তির উপরও প্রতিষ্ঠিত করা হইয়াছে। কম্যুনিষ্ট দর্শন ঘোর জড়বাদমূলক।

রাশিয়ায় জারদের শাসনকালে যেরূপ অনাচার-অত্যাচার হইত ও নিম্নশ্রেণীর লোকেরা যে ভাবে নিপীড়িত হইত তাহাতে উক্ত জার-শাসনের ধ্বংসে অনেকেই যে কেবল আনন্দিত হইয়াছিলেন তাহা নহে, ইহা পৃথিবীর বহু লোকেরই সহানুভূতি লাভ করিয়াছিল। কম্যুনিষ্টরা নিপীড়িতদের উদ্ধারের জন্য চেষ্টান্বিত ও বদ্ধপরিকর, এই বলিয়া প্রচার করায় বহু লোকের ইহার প্রতি সহানুভূতিসম্পন্ন হওয়া কিছু আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। তাঁহারা আরও প্রচার করিলেন যে, কেবল নিজ দেশে নহে, কম্যুনিষ্টরা জগতের সর্ব্বত্রই নিপীড়িত ও অধঃপতিতদের উদ্ধারে চেষ্টান্বিত ও সহানুভূতি-সম্পন্ন। বিগত মহাযুদ্ধের অবসানে বহু দেশেরই ক্লিষ্ট মানবের অন্তরে উহার দ্বারা নব আশার উদ্রেক হওয়া আশ্চর্য্যের বিষয় ছিল না। এই জন্য ইউরোপ ও এশিয়ার বহু দেশেই কম্যুনিজম্ ভিত্তি গাড়িতে আরম্ভ করিয়াছিল। কিন্তু কম্যুনিষ্টদের প্রোগ্রাম প্রধানতঃ সংগ্রামমূলক হওয়ায় এই নিপীড়িত ও অধঃপতিতদের উদ্ধার সর্ব্বত্রই এক মহা সংগ্রাম ও বিরোধ বিভিন্ন শ্রেণীর মধ্যে জাগ্রত করিয়া তুলে। ইহাতে সর্ব্বত্রই যেরূপ অনাচার-অত্যাচার ঘটিতে থাকে তাহাতে কম্যুনিজমের ঘোর শত্রুতা জাগ্রত হইতে কালবিলম্ব ঘটে না। ইহাই এক্ষণে ফ্যাসিজম্ বা নাৎসিজমের মধ্যে ওতপ্রোত, এবং এই দুই দলের মধ্যে এক্ষণে যেরূপ ভীষণ শত্রুতা ও সংগ্রাম চলিতেছে তাহা দেখিলে সকলেরই আতঙ্ক হয় ইহার ফলে বা জগতের সভ্যতা বিনাশপ্রাপ্ত হয়।

যাহা হউক, এ-বিষয়ের আলোচনা এখানে আমাদের

উদ্দেশ্য নহে। এখানে একটা বিষয় বিশেষরূপে লক্ষ্য করিতে হইবে এই যে, জগতে নিপীড়িত বা অধঃপতিতদের উদ্ধার বা অবস্থোন্নতির চেষ্টা এক্ষণে কিছু নূতন নহে। সোস্যালিজম্—যাহা হইতে বর্ত্তমান কম্যুনিজমের উদ্ভব, তাহা জগতে বহুকাল পূর্ব্বেই উত্থিত হইয়াছে। সোস্যালিজমের মূলমন্ত্র এই বলা যায় যে, সকলের মধ্যে ধন বা অর্থের বণ্টন যতদূর সম্ভব ন্যায়সঙ্গত হয়। বলা যায়, ক্যাপিটালিজমের বিরোধীরূপে সোস্যালিজমের উদ্ভব বহুকাল পূর্ব্বেই হইয়াছে। যাঁহাদের চিত্তেই সহানুভবতা ও উদারতা আছে তাঁহারাই নিপীড়িতদের দুঃখে কাতর না হইয়া থাকিতে পারেন নাই, এবং তাঁহাদের চেষ্টাও হইয়াছে জগতে এরূপ অসামঞ্জস্য দূর করা। কিন্তু বর্ত্তমান কম্যুনিষ্টদের ও সোস্যালিষ্টদের মত ও পথে অনেক পার্থক্য আছে। কম্যুনিষ্টদের পন্থা বা উপায় প্রধানতঃ সংগ্রামমূলক। তাঁহারা বিশ্বাস করেন যে নিপীড়িত বা অধঃপতিতদের উদ্ধারের জন্য শ্রেণীবিরোধ অবশ্যম্ভাবী ও একান্ত আবশ্যক। ধনিক-সম্প্রদায়ের সমূলে বিনাশ তাঁহাদের উদ্দেশ্য এবং এরূপ করিতে পারিলে এক বর্গহীন বা শ্রেণীহীন সমাজ ও রাষ্ট্র স্থাপনের কল্পনা সফল হয়। নিম্নশ্রেণীকে উঠাইতে গিয়া উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর এই ধ্বংসসাধনের চেষ্টাটি ভয়াবহ, ফ্যাসিষ্ট বা নাৎসিরা ইহা নিবারণ করিতে চাহেন। তাঁহারাও যে শ্রমিক ও কৃষাণদের দুঃখে দুঃখিত নহেন তাহা নহে, কিন্তু তাঁহারা উচ্চ বা মধ্যবিত্ত শ্রেণীর ধ্বংস চাহেন না। এই জন্যই ফ্যাসিষ্টরা কম্যুনিষ্টদের প্রধান শত্রু হইয়াছেন, এবং একে অন্যের ধ্বংস-সাধনে বদ্ধপরিকর।

আমাদের দেশেও কম্যুনিজমের ঢেউ ও প্রভাব যথেষ্ট আসিয়া পড়িয়াছে এবং উহার উক্ত ভাবও যথেষ্ট প্রচারিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। আমাদের দেশের কম্যুনিষ্টরাও প্রচার করিতে আরম্ভ করিয়াছেন যে বর্ত্তমান গণতন্ত্র প্রকৃত গণতন্ত্র নহে, উহা ধনিকদের সঙ্ঘ, উহাকে ধ্বংস করিয়া উহার স্থানে এক সোস্যালিষ্ট রাষ্ট্র ও সমাজ প্রতিষ্ঠিত করিতে হইবে। ইঁহারা ব্রিটিশ গণতন্ত্রকে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র নামে অভিহিত করিয়া থাকেন। ইহার অর্থ এই যে, ফ্যাসিষ্টতন্ত্র যেরূপ গণতন্ত্রের বিলোপ সাধন করিয়াছে, ব্রিটিশতন্ত্রও অনুরূপ। একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, পৃথিবীর কোনও ব্যবস্থাই সম্পূর্ণ নহে, দোষযুক্ত। যদি এই কথা ধরা যায় ত অবশ্য স্বীকার করিতে হইবে যে ব্রিটিশ গণতন্ত্রও দোষশূন্য নহে। কিন্তু একথা সকল নিরপেক্ষ ব্যক্তিকেই স্বীকার করিতে হইবে যে, বাস্তবিক গণতন্ত্র বলিতে যদি কিছু জগতে থাকে ত তাহার আভাস ব্রিটেনে ব্রিটিশতন্ত্রেই পাওয়া যায়। গণতন্ত্রের সোজা কথায় অর্থ এই যে, যাহাতে সকল সম্প্রদায়ের মত স্থান পায় ও আদরণীয় হয়। ব্রিটিশতন্ত্রের সহিত যাঁহারা পরিচিত তাঁহারা জানেন ইহা কতদূর সত্য। ব্রিটিশতন্ত্র ব্রিটেনে গণতন্ত্রের পথে অধিক হইতে অধিকতর অগ্রসর হইতেছে, এবং ইহা সত্য বলিয়াই ব্রিটেনে আজ অবধি কম্যুনিজম্ বা ফ্যাসিজম্ কোন মতেরই প্রাবল্য দেখা যায় না, এবং দেখা যাইবে বলিয়াও মনে হয় না। কারণ, ইংরাজ জাতির এটুকু সহজ বুদ্ধি আছে যে, বর্ত্তমান কম্যুনিজম্ ও ফ্যাসিজম্ অর্থে গণতন্ত্রের যে অস্বীকৃতি বুঝায় ইহা তাঁহারা বুঝেন। ইংরাজ জাতি ব্যক্তিগত স্বাধীনতাকে এত মূল্যবান মনে করেন বলিয়াই ইংলণ্ডে গণতন্ত্র সফল হইয়াছে। অন্য যে-সব দেশে তাহা নাই তথায় গণতন্ত্র ব্যর্থ হইয়া গিয়া ডিক্টেটরত্ব প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে।

আমাদের দেশের যাঁহারা ব্রিটেনের ব্রিটিশতন্ত্রকে ঘৃণ্য ফ্যাসিষ্টতন্ত্র বলেন তাঁহাদের যুক্তি ন্যায়সঙ্গত বলিয়া মনে হয় না। ইঁহাদের নিকট একমাত্র কম্যুনিষ্টতন্ত্রই গণতন্ত্রের স্বরূপ। কিন্তু কম্যুনিষ্টতন্ত্রও যে ফ্যাসিষ্টতন্ত্র অপেক্ষা কোন অংশে ভাল নয় একথা তাঁহারা বুঝেন কি-না জানি না। সম্প্রতি আয়র্লণ্ডের ডাব্লিন শহরে যে নিখিল-আয়র্লণ্ড শ্রমিক সম্মেলন হইয়া গেল তাহাতে ফ্যাসিজম্‌কে নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব উত্থাপিত হইলে একজন শ্রমিক সভ্য উঠিয়া বলেন যে, কম্যুনিজম্‌কেও নিন্দা করিয়া এক প্রস্তাব গ্রহণ করা হউক। ইহা উক্ত সম্মেলনে প্রথমবার প্রস্তাবিত হইল। এতকাল উঁহারা ফ্যাসিজম্‌কেই নিন্দা করিয়া আসিতেছিলেন অ-গণতান্ত্রিক বলিয়া, এইবার কম্যুনিজম্‌কেও অনুরূপ অ-গণতান্ত্রিক বলিয়া প্রথম নিন্দা করা হইল। ইহা যে অতি সত্য সে বিষয়ে সন্দেহ করিবার কিছু নাই। ডিক্টেটরত্ব যেখানে বহাল, সেখানে গণতন্ত্র কখনই থাকিতে পারে না; দুইটি একেবারেই অসমঞ্জস। অনেকে ফ্যাসিজম্ অপেক্ষা কম্যুনিজম্ যে অধিকতর শ্রেষ্ঠ এই কথা দেখাইবার জন্য

বলিয়া থাকেন যে, রাশিয়ার লোকেরা বড় সুখী, এ-কথা সত্য নহে। রাশিয়ার সকলেই যদি সুখী হইত তাহা হইলে যে-সব অনাচার-অত্যাচার এখনও ঘটিতেছে, তাহার কোনও স্থান থাকিত না। অবশ্য, এ-কথা বলা যায় যে, শ্রেণী বা সম্প্রদায় বিশেষ সুখী হইতে পারেন, কারণ রাষ্ট্র- বা সমাজ-ব্যবস্থায় তাঁহারাই অধিকতর সুখ-সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন, অথবা অধিকারী হইয়া না থাকিলেও হইবার আশা রাখেন। ইহা ফ্যাসিষ্টতন্ত্রের পক্ষেও সত্য। মুসোলিনী বা হিট্‌লারের অধীনে তাঁহাদের শিষ্য বা মতাবলম্বী লোকেরা অধিক সুখ-সুবিধার অধিকারী হইয়াছেন বা হইবার আশা রাখেন বলিয়া তাঁহারা সর্ব্বান্তঃকরণে উক্ত শাসনতন্ত্র সমর্থন করেন ও তাহা রক্ষা করিবার জন্যও বদ্ধপরিকর। কাজেই লোকের সন্তোষ বা সন্তোষের আশা যদি তদধীনস্থ শাসনতন্ত্রের উৎকর্ষের পরিচায়ক হয় তাহা হইলে কম্যুনিষ্টতন্ত্র ও ফ্যাসিষ্টতন্ত্রে কোনও প্রভেদ নাই। সুতরাং উক্তরূপ যুক্তি যে কতদূর অসঙ্গত তাহা সহজেই অনুমেয়। এ-কথা স্বচ্ছন্দেই বলা যায় যে, গণতন্ত্রের স্বরূপের আভাস আমরা ফ্যাসিষ্টতন্ত্র বা কম্যুনিষ্টতন্ত্রে পাই না। এই জন্যই ইয়োরোপে এখনও ব্রিটিশ ও ফরাসী তন্ত্র গণতন্ত্র বলিয়া উচ্চ ও সম্মানের স্থান অধিকার করিয়া আছে। যদিও ফ্রান্সে এক্ষণে কম্যুনিষ্ট গভর্ণমেণ্ট প্রতিষ্ঠিত হওয়ায় লোকেরা পূর্ব্বে যে অবাধ ব্যক্তিগত স্বাধীনতা উপভোগ করিতেন তাহার খর্ব্বতা সাধনের চেষ্টা হইতেছে শুনা যায়।

কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রম ও হিন্দুর বিবাহ-সমস্যা

শ্রীসরসীলাল সরকার, এম-এ, এল-এম-এস

যে-সকল হিন্দু বালক-বালিকা নিরাশ্রয়, যাহাদের জীবন-ধারণের, খাদ্য ও বস্ত্র প্রভৃতি সংগ্রহের কোনই উপায় নাই, তাহারাই কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রমে স্থান পাইতে পারে। দশ বৎসরের অধিকবয়স্ক কোনও বালক বা বালিকাকে আশ্রমে লওয়া হয় না এবং বেশ্যালয় হইতে উদ্ধারপ্রাপ্ত কোনও বালিকার বয়স সাত বৎসরের অধিক হইলে সে এই আশ্রমে স্থান পাইতে পারে না।

কুড়ি বৎসর বয়স পর্য্যন্ত ছেলেদের আশ্রমে রাখা যাইতে পারে। মেয়েরা যত দিন বিবাহিতা না হয় তত দিন আশ্রমে থাকিতে পারে। তবে যদি আশ্রমের কর্তৃপক্ষ মনে করেন যে কোন মেয়ে বিবাহিতা না হইলেও নিজের জীবিকা অর্জ্জন করিবার মত উপযুক্ত হইয়াছে, তাহা হইলে তাহাকে আশ্রম হইতে বিদায় দেওয়া যাইতে পারে।

আশ্রমে সাধারণ ভাবে লেখাপড়া শেখান হয় এবং অর্থকরী বিদ্যা শিক্ষা দেওয়ারও ব্যবস্থা আছে। ছেলেদের পুস্তক বাঁধাই, বেতের কাজ, বস্ত্র-বয়ন ও সেলাই শিক্ষা দেওয়া হয়। মেয়েদের বস্ত্র-বয়ন, সেলাই এবং অর্থকরী কারুশিল্প শিক্ষা দেওয়া হয়।

আশ্রমে অল্পবয়স্কা কুমারী বালিকারা ভর্ত্তি হয়, সুতরাং তাহাদের বিবাহের ভারও আশ্রমের কর্তৃপক্ষের। এই বিবাহ-সমস্যা আজকালকার দিনের একটি গুরুতর সমস্যায় দাঁড়াইয়াছে। বর্ত্তমানে আর্থিক দুর্দ্দশা ও পারিপার্শ্বিক অবস্থার পরিবর্ত্তনের জন্য হিন্দু পরিবারে মেয়ের বিবাহ দেওয়া বড়ই কঠিন হইয়াছে। কায়স্থ, ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য প্রভৃতি জাতির মধ্যে গৃহে গৃহে অধিকবয়স্কা অবিবাহিতা কুমারী দেখা যায়। লেখক স্বয়ং প্রাচীন হিন্দুসমাজভুক্ত কায়স্থ। কায়স্থ-সমাজের মধ্যবিত্ত পরিবারের অবস্থা তাঁহার ভাল করিয়াই জানা আছে।

ইহা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় যে আর্থিক অভাবের জন্যই আজকালকার ছেলেরা সহজে বিবাহ করিতে চাহে না। দরিদ্র ও মধ্যবিত্ত কায়স্থ-গৃহের কন্যাভারগ্রস্ত পিতামাতার দুর্দ্দশা অবর্ণনীয়। কায়স্থ-সভা হইতে প্রকাশিত কায়স্থ

পত্রিকায় একটি ঘটনার বিবরণ বাহির হইয়াছিল, যে, ১০।৮০ টাকা মাহিনার চাকুরে কোন কায়স্থ ভদ্রলোকের উপরি উপরি চারটি কন্যার পর পঞ্চম কন্যা জন্মগ্রহণ করিলে মেয়েটিকে গোপনে হাড়িনী ধাত্রীকে দিয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং মেয়েটি মারা গিয়াছে এই কথা প্রকাশ করা হইয়াছিল। পরে সত্য ঘটনা প্রকাশ পায়।

হিন্দু পরিবারে কন্যা জন্মগ্রহণ ব্যাপারটিই যে দুঃখের, বিবাহ-সমস্যা তাহার একটি বিশেষ কারণ।

হিন্দু সমাজে এই বিবাহ-সমস্যা এত গুরুতর আকার ধারণ করিয়াছে যে ইহার ফলে সমাজ দিন দিনই অবনতির দিকে অগ্রসর হইতেছে। স্নেহলতার ন্যায় অনেক কুমারী সমস্যা-পূরণের অন্য উপায় না পাইয়া আত্মহত্যা করিয়াছে ও করিতেছে। অপর পক্ষে আবার কেহ কেহ গৃহত্যাগ করিয়া চলিয়া গিয়াছে। ইহাও একরূপ আত্মহত্যা ছাড়া আর কি? যে-সমাজে কন্যার বিবাহের দায়ে কন্যাকে হাড়িনীর নিকট বিলাইয়া দিতে হয়, সে-সমাজে হিন্দুত্বের গর্ব্ব করিবার কি আছে? আরও একটি ঘটনার কথা এখানে উল্লেখ করিতেছি। মফস্বলে ডাকাতির সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিবার জন্য পুলিস একটি মুসলমান গ্রামে যায় এবং তথায় এক মুসলমানের গৃহ হইতে একটি অল্পবয়স্কা হিন্দু যুবতীকে উদ্ধার করে। তাহার পরিচয় লইয়া জানা যায় যে, সে কোন সম্ভ্রান্তবংশীয়া কায়স্থ-কন্যা। তাহার পিতার অবস্থা এখন আর পূর্ব্বের মত নাই, এজন্য বিবাহের বয়স হইলেও কন্যার বিবাহ দিতে পারেন নাই। এই বিবাহ লইয়া তাহার পিতা ও মাতাতে প্রায়ই কথাকাটাকাটি হইত। একদিন কন্যা শুনিতে পাইল, তাহার বিবাহ লইয়া অপর ঘরে পিতা ও মাতার মধ্যে বিতর্ক হইতেছে। পিতা ক্রুদ্ধ হইয়া মাতাকে বলিতেছেন, "মেয়ের বিবাহ শুধু-হাতে হয় না, তাতে টাকা চাই। মেয়ের বিয়ে দিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে সপরিবারে উপোস ক'রে কি আমায় মরতে বল? তা আমি পারব না, এতে মেয়ের বিয়ে হোক্ আর নাই হোক্।" এই কথা শুনিয়া তাহার মনে এত দুঃখ, ঘৃণা ও অভিমান হইল যে, সে সেই রাত্রে বাড়ী ছাড়িয়া বাহির হইল এবং অবশেষে এক মুসলমানের হাতে পড়িল।

মেয়েরা অবশ্য ইচ্ছা করিয়া কুমারী থাকে না, অথচ বিবাহ না হওয়ার অপরাধে তাহাদের ঘরে বাহিরে লাঞ্ছনা নির্যাতন ও নিন্দার সীমা থাকে না। পল্লীর মন্দ ছেলেরা এই সুযোগে যথাসাধ্য উৎপাত করিবার চেষ্টা করে, ও প্রতিবেশীগণ নিন্দা রটনা করিবার জন্যই উৎসুক হন। এমন অবস্থা অসহ্য হইলে যদি সে আত্মহত্যা করে তাহাতেও তাহার নিন্দা, এবং ঘরের বাহির হইয়া গেলে তো কথাই নাই।

এখানে বিশেষ করিয়া কায়স্থ-সমাজের কথাই বলিলাম। ব্রাহ্মণ ও বৈদ্য সমাজের অবস্থাও যে ইহা অপেক্ষা ভাল তাহা নয়। আমার হাতে একটি ছাপানো আবেদনপত্র আসিয়াছে, তাহা হইতে কয়েক লাইন এখানে উদ্ধৃত করিতেছি,

> সবিনয়াবেদন, একটি দুঃস্থ ধর্ম্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত ব্রাহ্মণের কন্যাদায় হইতে উদ্ধারের জন্য আপনার সাহায্যপ্রার্থী হইতেছি। এই ব্রাহ্মণ আমাদের এবং কলিকাতার শিক্ষিত-সমাজের বিশেষ পরিচিত। কায়ক্লেশে সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ ব্যতীত তিনি কন্যাদায় হইতে উদ্ধারের কোনই পন্থা এতদিন স্থির করিতে পারেন নাই বলিয়া একেবারে হতাশ হইয়া পড়িয়াছেন, ইত্যাদি।

"অনাথ আশ্রমে পাঠাইলে মেয়ের বিবাহের দায় হইতে মুক্তি পাওয়া যাইবে," এইরূপ চিন্তা কোন অভিভাবকের মনে উদয় হয় কিনা আমরা তাহা জানি না; কিন্তু যেখানে সদ্যোজাতা কন্যাকে হাড়িনীর হাতে দিয়া পিতা দায়মুক্ত হন (অবশ্য, মাতার এ-ব্যাপারে কোন কর্ত্তৃত্ব ছিল না), সে-সমাজে এরূপ ঘটাও অসম্ভব নয়।

রাস্তায় কুড়াইয়া-পাওয়া কতকগুলি মেয়ে আলোচ্য অনাথ-আশ্রমে আছে। তাহাদের মধ্যে একটি মেয়ের ইতিহাস হইতে জানিলাম, যখন তাহার বয়স অনুমান ছয় বৎসর তখন সে একটি বাটি ও একটি পয়সা লইয়া দোকানে গুড় কিনিতে আসিয়া পথ হারাইয়া ফেলে। পুলিস তাহাকে অসহায় অবস্থায় ঘুরিতে দেখিয়া থানায় লইয়া যায়, কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে কোনও অভিভাবক তাহার অনুসন্ধান করিতে আসিল না। অগত্যা তাহাকে অনাথ-আশ্রমে পাঠানো হইল। পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া মেয়েদের অনেকের ইতিহাস হইতে ইহাই বুঝা যায়, যে, এই সব শিশুর প্রতি তাহাদের অভিভাবকগণের

স্নেহ ও ভালবাসার একান্ত অভাব ছিল। একটুও স্নেহ থাকিলে কেহ ঐরূপ অবোধ বালিকাদের কলিকাতার মত জনবহুল নগরীর পথে একা ছাড়িয়া দেয় না, এবং হারাইয়া যাইবার পর তাহাদের ফিরিয়া পাইবার জন্য আন্তরিকভাবে চেষ্টা না করিয়া থাকিতে পারে না।

এইরূপ পথে-কুড়াইয়া-পাওয়া মেয়ের ভিতর উচ্চবংশের মেয়েও আছে। এক জন নিজের যে পরিচয় দিয়াছিল তাহাতে বুঝা গিয়াছিল যে সে ব্রাহ্মণকন্যা। এই মেয়েটি সংস্বভাবা ও সুন্দরী ছিল। লেখাপড়া ও অন্যান্য শিক্ষায় সে বেশ পারদর্শিতার পরিচয় দিয়াছিল। এক জন বাঙালী ব্রাহ্মণ ইহাকে বিবাহ করেন।

পথে-কুড়ানো মেয়ে ছাড়া বেশ্যালয় হইতে উদ্ধার করা অনেক বালিকা অনাথ-আশ্রমে আসিয়াছে। অনাথ-আশ্রমের অধিকাংশ বালিকাই বেশ্যালয় হইতে উদ্ধার করা মেয়ে। বাংলা দেশে এইভাবে পাপ-ব্যবসায়ের বলিস্বরূপ কত পবিত্র নিষ্পাপ শিশু উৎসর্গীকৃত হইতেছে, হিন্দু সমাজে কে তাহার খবর রাখে? এ বিষয়ে হিন্দু সমাজের একান্ত ঔদাসীন্য দেখিয়া বুঝা যায় যে, এরূপ কতকগুলি মেয়ে যায় বা থাকে তাহাতে সমাজের কিছু যায় আসে না। ধর্ম্মসাধনা করিয়া নিজের মুক্তির একটা পথ পাইলেই হইল। বেশ্যালয় হইতে সংগৃহীত এই সমস্ত মেয়ের মধ্যে ব্রাহ্মণ কায়স্থ প্রভৃতি উচ্চ বর্ণের কন্যাও আছে, অনাথ-আশ্রমের খাতাপত্রে আমরা ইহাই কেবল জানিতে পারি। কিন্তু কি কারণে ঐ বালিকাগুলি বেশ্যালয়ে বেশ্যার হাতে গিয়া পড়িয়াছিল তাহার রহস্য কিছুই জানিতে পারি না।

আমি একটি ঘটনা জানি যে, কোন এক সম্ভ্রান্ত পরিবার অর্থাভাবে ও ম্যালেরিয়ায় একেবারে উৎসন্ন হইয়া গেলে পরিশেষে কেবল এক জন বৃদ্ধ ও একটি অল্পবয়স্কা বালিকা সেই পরিবারে অবশিষ্ট স্বরূপ ছিল। বৃদ্ধের আর সংসারে থাকিবার ইচ্ছা ছিল না। তিনি বালিকাটিকে এক বন্ধু-পরিবারের আশ্রয়ে রাখিয়া এবং তাহার ভরণ-পোষণ ও বিবাহের ব্যয়ের জন্য কিছু টাকা তাঁহাদের নিকট গচ্ছিত রাখিয়া কাশীধামে যাত্রা করিলেন। কিন্তু তিনি যাইবার পর এই গচ্ছিত টাকা আশ্রয়দাতা নিজের জন্যই খরচ করিয়া ফেলিলেন এবং কন্যাটি এক স্থান হইতে অন্য স্থানে স্থানান্তরিত হইতে হইতে অবশেষে বেশ্যালয়ে স্থানপ্রাপ্ত হইল। বস্তুতঃ এই বাংলা দেশে এরূপ কোন আশ্রম নাই যেখানে শিশুকন্যার একমাত্র অভিভাবক মৃত্যুকালে অথবা প্রবাসে যাত্রার সময় উপযুক্ত অর্থ দিয়া কন্যার ভরণপোষণের ও শিক্ষা এবং বিবাহের ভার দিয়া নিশ্চিন্ত হইতে পারেন।

বেশ্যাগণ এইরূপ শিশুকন্যাকে ক্রয় করিবার জন্য বহু অর্থ ব্যয় করিয়া থাকে। আশ্রমের সহকারী অধ্যক্ষ আমাকে বলেন যে, একবার একটি শিশুকন্যাকে বেশ্যালয় হইতে উদ্ধার করিয়া অনাথ-আশ্রমে পাঠানোর পর এই বালিকাটি যে-বেশ্যার অধিকারে ছিল সে ইহাকে ফিরিয়া পাইবার জন্য মোকদ্দমা করে। যখন মোকদ্দমায় হারিয়া গেল, তখন সে গোপন ভাবে অনাথ-আশ্রম হইতে মেয়েটিকে ফিরাইয়া লইবার জন্য সহকারী অধ্যক্ষের নিকট দুই সহস্র মুদ্রা ঘুষ দিবার প্রস্তাব করিয়াছিল। ইহা হইতেই বুঝা যায় যে, ব্যবসায়ের জন্য মেয়ে সংগ্রহ করিতে পতিতারা কিরূপ ভাবে টাকা খরচ করে। আর এই দরিদ্র দেশে পয়সা খরচ করিলে মেয়ে সংগ্রহ করা তাহাদের পক্ষে কঠিন হয় না।

বিভিন্ন জেলার ম্যাজিস্ট্রেটগণ মধ্যে মধ্যে এই আশ্রমে মেয়ে পাঠাইয়া দেন। একটি মেয়ের ইতিহাস এই যে, ম্যাজিস্ট্রেট তাহার মা ও বাবা উভয়কেই জেলে পাঠান, সুতরাং শিশুটিকে আশ্রমে পাঠানো ছাড়া উপায়ান্তর ছিল না।

আমি যখন মেডিক্যাল কলেজে কাজ করিতাম সেই সময় কোন রোগিণীর হাসপাতালে মৃত্যু হইলে তাহার যে-শিশু মায়ের সহিত হাসপাতালে ভর্ত্তি হইয়াছিল, খ্রীষ্টিয়ান মিশনরী আসিয়া তাহাকে লইয়া যাইত, এইরূপ দেখিয়াছিলাম। কিন্তু এই আশ্রমে দেখিলাম, সোশ্যাল সার্ভিস লীগের স্থাপয়িতা ডাক্তার দ্বিজেন্দ্রনাথ মৈত্র মেয়ো হাসপাতাল হইতে এইরূপ মাতৃহীন একটি ছোট ছেলে ও মেয়েকে এখানে পাঠাইয়াছেন। কলিকাতায় ক্যামাক ষ্ট্রীটে ভারতবর্ষের শিশুরক্ষিণী প্রতিষ্ঠান (Society for Protection of Children in India) হইতেও অনেকগুলি ছেলেমেয়ে অনাথ-আশ্রমে পাঠানো হইয়াছে।

গভর্ণমেণ্ট কিংবা কোন প্রতিষ্ঠানের সহিত সংশ্লিষ্ট নহেন এরূপ কোন ভদ্রলোক কর্ত্তৃক প্রেরিত মেয়ে এই আশ্রমে খুবই কম। যে কয়টি মেয়ে এরূপ ভাবে প্রেরিত হইয়া আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে তাহাদের তালিকা এই:

১৮৯৬ খ্রীষ্টাব্দে সরোজিনী নামে একটি সাত বৎসর বয়স্কা কায়স্থের মেয়ে সাতক্ষীরা হইতে শ্রীনীরোদচন্দ্র ঘোষ কর্ত্তৃক প্রেরিত হয়।

১৯০২ খ্রীষ্টাব্দে কুসুমকুমারী নামে একটি ১১ বৎসরের ব্রাহ্মণের মেয়ে আশ্রমে আসে। প্রেরকের নাম শ্রীদীননাথ মজুমদার।

১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে দেশবিখ্যাত স্বর্গীয় সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় ৭ ও ৯ বৎসরের দুটি ব্রাহ্মণ-কন্যাকে আশ্রমে পাঠান। ইহাদের নাম শৈলবালা দেবী ও বিদ্যুৎলতা দেবী।

১৯২৩ খ্রীষ্টাব্দে পার্ব্বতীবালা সরকার নামে সাড়ে চারি বৎসরের একটি কায়স্থ কন্যা আশ্রমে আসে। ইহাকে দেরাদুন হইতে রায় সাহেব ঈশানচন্দ্র দেব পাঠাইয়াছিলেন।

১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ডাঃ কুমারী যামিনী সেনের প্রতিপালিত দুটি মেয়েকে তাঁহার মৃত্যুর পর আশ্রমে পাঠানো হয়। ইহাদের নাম অরুণা গুপ্ত ও উমা গুপ্ত; বয়স যথাক্রমে দশ ও এগার। স্বর্গীয়া যামিনী সেন হাসপাতাল হইতে এই অনাথা বালিকা দুটিকে গৃহে আনিয়া কন্যানির্ব্বিশেষে পালন করেন এবং যত দিন না মেয়ে দুটির বিবাহ হয় তত দিন তাহারা মাসিক ১৫ টাকা করিয়া বৃত্তি পাইবে, তাঁহার উইলে এইরূপ ব্যবস্থা করিয়া যান।

৪৫ বৎসর এই আশ্রমটি প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। জনসাধারণের পক্ষ হইতে এই দীর্ঘকালে মাত্র সাতটি মেয়েকে আশ্রমে গ্রহণ করা হইয়াছে। ইহার কারণ ঠিক বুঝা যায় না। হয়ত হিন্দু সমাজে অনাথা বালিকাকে আশ্রমে পাঠাইবার মত উদ্যোগী লোকের অভাব আছে, অথবা আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ গভর্ণমেণ্টের তরফ হইতে যে-সকল মেয়ে আসে সেই সকল মেয়েকে আশ্রয় দিয়া আর অধিক মেয়েকে স্থান দিতে সমর্থ হন নাই, এই দুই কারণই হইতে পারে।

হিন্দু সমাজের এই বিবাহ-সমস্যা সম্বন্ধে অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণ কিরূপ ব্যবস্থা করিয়াছেন তাহাই পাঠকদিগের সম্মুখে উপস্থিত করিতেছি।

প্রথমতঃ, হিন্দু সমাজের জাতিভেদ, আবার এক জাতির মধ্যেও শ্রেণীভেদ, করণীয় ও অকরণীয়ের বিচার, এই গুলিতে বিবাহের গণ্ডী বিশেষভাবে সংকীর্ণসীমাবদ্ধ হইয়াছে। দ্বিতীয়তঃ, উচ্চ জাতির মধ্যে বৈদিক ব্রাহ্মণ ব্যতীত সর্ব্বত্রই প্রায় বরপণ প্রচলিত, এবং নিম্নজাতির মধ্যে অধিকাংশ স্থলে কন্যাপণ দিয়া বধূকে গৃহে আনিতে হয়, এই দুই কারণে বিবাহ-সমস্যা অধিকতর জটিল হইয়াছে। অনাথ-আশ্রম জনসাধারণের আশ্রম বলিয়া ইহার কর্ত্তৃপক্ষ প্রথম প্রথম সামাজিক প্রথানুসারে জাতিভেদ বজায় রাখিয়া বিবাহ দিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। নিম্নশ্রেণীর মধ্যে যেখানে কন্যাপণ আছে সেরূপ মেয়ের স্বজাতীয় পাত্রে বিবাহ দেওয়া কতক পরিমাণে সম্ভব হইয়াছিল; কারণ এরূপ স্থলে বরপক্ষ বিনা-পণে কন্যা পাইল, আবার লেখাপড়া-জানা মেয়েও পাইল, কাজেই বিবাহে তাহাদের আপত্তি হয় নাই। ক্রমশঃ কর্ত্তৃপক্ষ যখন দেখিলেন জাতিভেদ রাখিতে গেলে মেয়েদের বিবাহ হয় না, তখন তাঁহারা উচ্চজাতীয়া কন্যাদের নিম্নজাতীয় পাত্রের সহিতও বিবাহ দিতে লাগিলেন। পাত্র-নির্ব্বাচনে পাত্রের আর্থিক সঙ্গতির দিকেই তাঁহারা বিশেষ লক্ষ্য রাখিতে লাগিলেন, পাত্র যেন বিবাহ করিয়া ভাবী পত্নীর ও সন্তানদের ভরণপোষণ করিতে পারে। ক্রমশঃ বাংলা দেশে এরূপ পাত্র সংগ্রহ করিতে পারাও আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণের পক্ষে কঠিন হইয়া উঠিল।

এদিকে বিবাহ না হওয়াতে বিবাহযোগ্যা মেয়েদের মধ্যে অশান্তি ও বিদ্রোহের ভাব দেখা যাইতে লাগিল। দু-তিনটি মেয়ে বাড়ীর ড্রেনের নর্দ্দামার জল বাহির হইবার পথ খুঁড়িয়া বড় করিয়া তাহার ভিতর দিয়া পলাইয়া গেল। ইহার পর ড্রেন এমন শক্ত করিয়া গাঁথা হইল যাহাতে আর ভাঙা না যায়। আশ্রমের প্রাচীরের উপর হইতে পাশের বাড়ীর প্রাচীরের উপর তক্তা ফেলিয়া একটি মেয়ে তাহারই উপর দিয়া পলাইল। তাহার পর আশ্রমের প্রাচীর উচ্চ করা হয়। আর একটি মেয়ে কার্নিসের উপর দিয়া পলাইবার চেষ্টা করে, ইহার ফলে বাড়ীর চারি দিকের কার্নিস ভাঙিয়া ফেলা হয়।

মেয়েদের লোহার গরাদ দিয়া তৈরি দরজাওয়ালা আলাদা বাড়ীতে পরিদর্শিকার অধীনে রাখা হইল। সেখানে গিয়া দু-এক জন মেয়ে বিবাহ-ব্যাপার লইয়া অনশন আরম্ভ করিল। এই ঘটনায় আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ বাধ্য হইয়া পুলিসে খবর দেন।

মেয়েদের যদি বরের অভাবে বিবাহ না হয় তবে তাহাদের সম্বন্ধে আর কি ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ অতঃপর সেই সম্বন্ধে বিবেচনা করিতে লাগিলেন।

ছেলেদের বিভাগে অনেক উচ্চবর্ণের মেধাবী বালক

শিক্ষালাভ করিয়া সুযোগ্য হইয়া উঠিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে এক জন ব্রাহ্মণ-বংশীয় বালক য়্যাডভোকেট হইয়া এখন প্রভূত অর্থ উপার্জ্জন করিতেছেন এবং এখনও অনাথ-আশ্রমে অর্থ সাহায্য করেন। তিনটি সহোদর ব্রাহ্মণ-বালক অনাথ-আশ্রমে আসে। ইহাদের মধ্যে এক জন ডাক্তারী পাস করিয়া গভর্ণমেণ্টের চাকুরী পাইয়াছেন, এক জন মার্চেণ্ট আপিসে চাকুরী করেন, আর এক জন কম্পাউণ্ডার হইয়াছেন। একটি ছেলে বি-এল পাস করিয়া ওকালতি করিতেছেন, আর এক জন রেলওয়েতে চাকুরী করেন, অপর এক জন রামকৃষ্ণ-মিশনে গিয়া ব্রহ্মচারী হইয়াছেন। এই শেষের তিনটি ছেলে কায়স্থ।

ছেলেরা যদি শিক্ষা পাইয়া এমন উন্নতি করিতে পারে, তাহা হইলে মেয়েরা শিক্ষা পাইয়া স্বাবলম্বী হইতে পারে কি না সে-বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত, আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ এইরূপ বিবেচনা করিয়া কয়েকটি মেয়েকে বাহিরে শিক্ষার জন্য বিভিন্ন শিক্ষালয়ে ভর্ত্তি করিয়া দেন। নগেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায়ের কন্যা শৈলবালা দেবী শিক্ষিত হইয়া ঘাটালে একটি বালিকা-বিদ্যালয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ পান। বাণী নামে একটি বালিকা বয়ন-বিদ্যার পরীক্ষায় পাস হইয়া চুঁচুড়ার একটি বয়ন-বিদ্যালয়ে কাজ পান। লতিকা ও অপর একটি মেয়েকে লেডি ডফরিন হাসপাতালে নার্সের কাজ শিখিবার জন্য পাঠানো হয়। উঁহারা ঐ কাজ শিক্ষার পর মেয়ো হাসপাতালে চাকুরী পান।

ইঁহারা চাকুরী পাইয়া নিজের উপার্জ্জনে নিজের খরচ চালাইতে সমর্থ হইলেন, কিন্তু কোন অভিভাবক না থাকাতে এই চাকুরী তাহাদের পক্ষে বিড়ম্বনা-স্বরূপ হইল। ইঁহারা সকলেই কিছু দিন চাকুরী করিবার পর আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষকে জানাইলেন, ইহা অপেক্ষা বিবাহিত জীবন বরং তাহাদের পক্ষে সহজ। কারণ অভিভাবকহীনা এই সকল মেয়ের উপর পুরুষের উৎপাত সর্ব্বদাই রহিয়াছে। প্রায়ই প্রেম-নিবেদন উপস্থিত হয়, কিন্তু সে-নিবেদনে বিবাহের কোন প্রস্তাব নাই। কারণ নিবেদনকারিগণের জাতি আছে, সমাজ ও আত্মীয়-কুটুম্ব আছে, ইহাদের উপেক্ষা করিয়া তাহারা এরূপ অনাথা কন্যাকে বিবাহ করিতে পারে না। এইরূপ প্রেম-নিবেদনের উৎপাতে তাহাদের জীবন অতিষ্ঠ হইয়া উঠিয়াছে।

শৈলবালা শিক্ষয়িত্রীর কাজ করিয়া সামান্য বেতন পাইতেন, তথাপি তিনি আশ্রমে মাসে এক টাকা করিয়া সাহায্য করিয়া তাঁহার কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করিতেন। অবশেষে বর্দ্ধমান জেলার এক বয়স্ক বিপত্নীক ব্রাহ্মণ তাঁহাকে বিবাহ করেন ও তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছাড়িয়া দেন। ব্রাহ্মণের প্রথম পক্ষের একটি ছেলে ছিল। তিনি ছেলেটিকে সন্তানের ন্যায় স্নেহে পালন করিতেন। কিন্তু দুর্ভাগ্যবশতঃ কিছু দিন পরে তাহার স্বামীর মৃত্যু হইল ও বাড়ীর অন্যান্য মেয়েদের ব্যবহারে তাঁহাকে স্বামীর বাড়ী ছাড়িয়া আবার একটি স্কুলে চাকুরী জুটাইয়া লইতে হইল। বীণা বয়ন-শিক্ষয়িত্রীর কাজ ছাড়িয়া এক জন পাঞ্জাবী যুবককে বিবাহ করেন। হাসপাতালের নার্স দুটির মধ্যে এক জন একটি সিন্ধুদেশীয় যুবককে বিবাহ করেন, অপরের সংবাদ জানা নাই।

এই সব ঘটনায় বুঝা যায় আমাদের দেশের ও সমাজের বর্ত্তমান অবস্থায় কোন অভিভাবকহীনা হিন্দু কুমারীর পক্ষে স্বাধীন ভাবে জীবিকা অর্জ্জন করা সুকঠিন। মুখে আমরা যতই হিন্দুসভ্যতা সম্বন্ধে গৌরব করি না কেন, মাতৃ-জাতির প্রতি যথার্থ শ্রদ্ধা, সম্ভ্রম ও স্নেহ-করুণা এখনও হিন্দু পুরুষের মনে জাগ্রত হয় নাই। পুরুষদের উৎপাত হইতে এই সকল অনাথা স্বাবলম্বিনী বালিকাকে রক্ষা করিবার জন্য হিন্দু মহিলাগণের প্রতিষ্ঠিত যদি কোন সমিতি তাহাদের অভিভাবকত্বের ভার গ্রহণ করেন তাহা হইলে বোধ হয় এ-সমস্যার কতকটা সমাধান হইতে পারে।

অনেক কায়স্থ-বালিকা এই আশ্রমে আশ্রয় পাইয়াছে; আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষগণের মধ্যেও কায়স্থ পরিচালক সর্ব্বাপেক্ষা অধিক, এবং ইঁহাদের অনেকেই ধনে মানে সুবিখ্যাত ও সমাজের নেতৃস্থানীয়; তথাপি এই আশ্রমের কায়স্থ-কুমারী-গণের বিবাহের জন্য স্বজাতীয় বর জুটে না, তাহাদের নমঃশূদ্র প্রভৃতি জাতীয় ছেলেদের সহিতই বিবাহ হয়।

কায়স্থ জাতির উন্নতির জন্যই বঙ্গদেশীয় কায়স্থ-সমাজ ও কায়স্থ-সভা এই দুইটি প্রতিষ্ঠান স্থাপিত হইয়াছে। কিন্তু অনাথা অসহায়া কায়স্থ-কুমারীদিগের সম্বন্ধে তাঁহারা উদাসীন হইয়া রহিয়াছেন।

আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ ঘটনাবিশেষে বুঝিয়াছিলেন, নারায়ণ-শিলা সমক্ষে হিন্দুমতে অসবর্ণ বিবাহ হইলেও বিবাহের



স্বর্গীয় আচার্য্য প্রাণকৃষ্ণ দত্ত,
কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাতা।



আচার্য্য প্রাণকৃষ্ণ দত্তের সহধর্ম্মিণী
স্বর্গীয়া শ্রীমতী কান্তমণি দত্ত, অনাথ-আশ্রমের প্রতিষ্ঠাত্রী।

বৈধতা লইয়া অবশেষে গোল বাধিতে পারে। সেই জন্য এই হিন্দু-প্রতিষ্ঠানে হিন্দু-বিবাহ প্রচলিত হয় নাই। পূর্ব্বে ১৮৭২ সালের তিন আইন অনুসারে বিবাহ হইত, বর্ত্তমানে (ঐ আইনের পরিবর্ত্তিত রূপ) ১৯২৩ সালের ত্রিশ অ্যাক্ট অনুসারে হিন্দু অসবর্ণ বিবাহ হইয়া থাকে।

১৯২৪ সালে যখন আশ্রমে বিবাহযোগ্যা অনেকগুলি অবিবাহিতা কুমারী ছিল, অথচ তাহাদের পাত্র খুঁজিয়া পাওয়া কঠিন হইয়াছিল, তখন আশ্রম-কর্ত্তৃপক্ষ একটি নূতন উপায়ের সন্ধান পাইলেন। সেই সময় সিন্ধু প্রদেশের এক জন নেতা হীরাসিং মেধাসিং মাসন্দ্ অমৃত বাজার পত্রিকার তৎকালীন সম্পাদক স্বর্গীয় মতিলাল ঘোষ মহাশয়ের নিকট কংগ্রেসের কার্য্যোপলক্ষে আসিয়াছিলেন। তিনি কথায় কথায় জানান যে তাঁহার দুই ভাই আছে, বিবাহযোগ্যা বাঙালী মেয়ে পাইলে তিনি বিবাহ দিতে প্রস্তুত আছেন, কারণ তাঁহাদের দেশে মেয়ের সংখ্যা কম, বিবাহের জন্য কন্যা পাওয়া সেই জন্য অনেক সময় কঠিন হয় এবং পাত্রীর অভাবে ছেলেদের অবিবাহিত থাকিতে হয়। ঘোষ মহাশয় এই কথা অনাথ-আশ্রমের সম্পাদক রায় বাহাদুর ডাঃ চুণীলাল বসু মহাশয়কে জানান। চুণীবাবু এই সংবাদ শুনিয়া হীরাসিংয়ের সহিত দেখা করেন ও তাঁহাকে বলেন যে তাঁহার আশ্রমে দুটি শিক্ষিতা মেয়ে আছে, তাহারা লোয়ার প্রাইমারী পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়া স্কলারশিপ পাইয়াছে। তবে বিবাহের পূর্ব্বে তিনি ছেলেদের আর্থিক অবস্থা এবং অন্যান্য বিষয়ে সংবাদ লইতে চাহেন। ইহাতে হীরা সিং ই বি রেলওয়ের কণ্ট্রাক্টর তাঁহার নিকট-সম্পর্কীয় খুসীরাম রঘুমল মাসন্দার নাম করেন। ইনি কার্য্যোপলক্ষে বহুকাল কলিকাতায় বাস করিতেছেন, সম্ভ্রান্ত লোক ও চুণীবাবুর পরিচিত। চুণীবাবু খুসীরাম রঘুমলের নিকট পাত্রদের সম্বন্ধে খোঁজখবর লইয়া ঐ দুই সিন্ধী যুবকের সহিত আশ্রমের মেয়ে দুটির বিবাহ দিয়াছিলেন। এই সময় আশ্রমে যতগুলি বিবাহযোগ্যা কুমারী ছিল ১৯২৫ সালের মধ্যে সকলেরই সিন্ধী যুবকদের সহিত বিবাহ হইয়া গেল। এই সময় হইতে এ পর্য্যন্ত আশ্রমের যত মেয়ের বিবাহ হইয়াছে, একটি ছাড়া সকলেরই সিন্ধী যুবকদিগের সহিত বিবাহ হইয়াছে। এই সব মেয়ে বিবাহিতা হইয়া সিন্ধুদেশে গিয়া সেখান হইতে প্রায়ই আশ্রমে পত্র লেখে। আমি তাহাদের

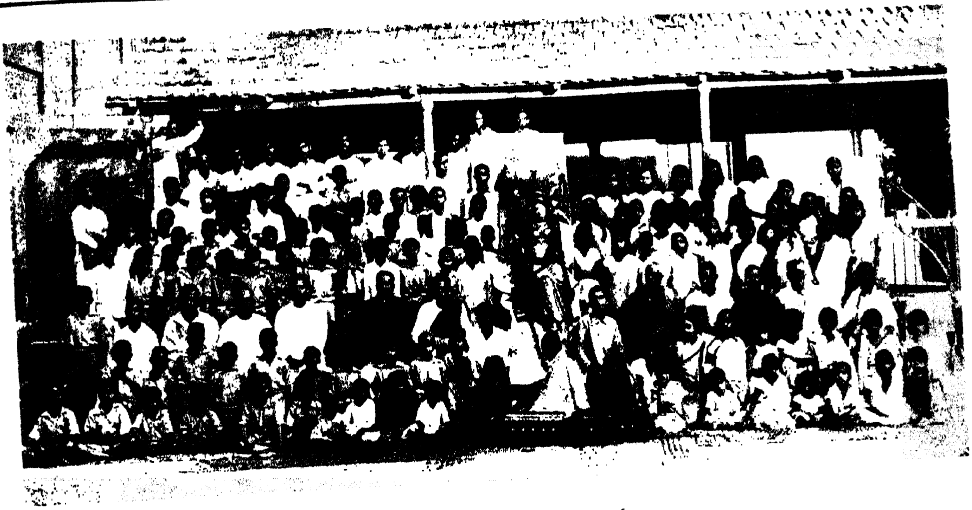
লিখিত অনেকগুলি পত্র পড়িয়াছি। পত্র পড়িয়া বুঝা যায় যে তাহারা স্বামিগৃহে গিয়া সুখেই আছে, তাহাদের পারিবারিক জীবনে কোন অশান্তি নাই। এই পত্রগুলিতে বিবাহযোগ্য পাত্রের সংবাদ আছে, যে-পরিবারে তাহার বিবাহ হইয়াছে যদি সেই পরিবারে ভাল পাত্রের বিষয় সে জানিতে পারে তখনই আশ্রম-কর্তৃপক্ষকে তাহা জানায়, এই জন্য আশ্রম-কর্তৃপক্ষের আর এখন পাত্রের জন্য অধিক খোঁজখবর করিতে হয় না।

১৯২৪ সালের পর একমাত্র যে মেয়েটির সিন্ধু প্রদেশে বিবাহ হয় নাই সেটিও সম্ভ্রান্ত বংশের কায়স্থ-কন্যা, বাড়ী হুগলী জেলায় বাঁশবেড়ে গ্রামে। ইহার পিতা স্ত্রীর মৃত্যুর পর সংসারে আর্থিক অনটন উপস্থিত হইতে দেখিয়া সাড়ে চারি বৎসরের মাতৃহীনা কন্যাকে অসহায়া অবস্থায় ত্যাগ করিয়া নিজের পারলৌকিক মুক্তির জন্য 'কৃষ্ণলাল স্বামী' এই নাম গ্রহণ করিয়া সন্ন্যাসাশ্রম গ্রহণ করেন। কোন প্রতিবেশী কন্যাটিকে অনাথ-আশ্রমে পাঠাইয়া দেয়। কন্যাটি বয়স্থা হইবার পর আশ্রম-কর্তৃপক্ষ তাহার বিবাহের চেষ্টা করিলে সে সিন্ধী-বিবাহে অসম্মতি জানায়। কিন্তু অনেক অনুসন্ধান করিয়াও তাহার জন্য কোন বাঙালী পাত্র পাওয়া যায় নাই। অবশেষে বীরভূম জেলার এক কুম্ভকারের সহিত তাহার বিবাহ দেওয়া হয়। এই পাত্রটি পটার্স বুরো নামে একটি চীনামাটির কারখানায় কাজ করে। বিবাহের পর তাহার স্ত্রী তাহার স্বামীর কাজের সাহায্য করিতে আরম্ভ করিল এবং সেই পল্লীর ছোট ছেলেমেয়েদের শিক্ষাদানের কার্য্যও সে গ্রহণ করিয়াছে। এই মেয়েটির জীবনের ইতিহাসে দুটি বিষয় আমরা লক্ষ্য করি। প্রথম, হিন্দুজাতির পারলৌকিক মুক্তির লোভে ইহলোকের কর্ত্তব্যে অবহেলা অথবা কর্ত্তব্য-বিমুখতা। দ্বিতীয়, কায়স্থ-সমাজের উপবীত গ্রহণ করিয়া ক্ষত্রিয়ত্ব-গর্ব্বের মোহ এবং যথার্থ অবনতির প্রতিকার চেষ্টার সম্পর্কে উদাসীনতা।

বিবাহ দিবার পরও আশ্রমের পক্ষ হইতে বিবাহিতা মেয়েদের খোঁজখবর লওয়া হয় এবং কলিকাতার কাছাকাছি স্থানে যে-সমস্ত বিবাহিতা মেয়ে আছে তাহাদিগকে অন্য কোন বিবাহ উপস্থিত হইলে নিমন্ত্রণ করা হয়। পাত্রপক্ষ হইতে আশ্রমের ছেলেমেয়েদের ও নিমন্ত্রিতা মেয়েদের ভোজ দেওয়া হয়। আশ্রমের ছেলেমেয়েরা এইরূপ ক্রিয়াকলাপ উপলক্ষেই মাছ খাইবার সৌভাগ্য লাভ করে। কারণ প্রথমতঃ মাছ দিতে গেলে ব্যয়ে কুলায় না, দ্বিতীয়ত, অনেক জৈনধর্ম্মাবলম্বী মাড়োয়ারী ভদ্রলোক আশ্রমে চাঁদা দেন, তাঁহারা তাঁহাদের প্রদত্ত অর্থে মাছ কেনায় আপত্তি করেন। তবে বাহির হইতে যদি কোন ভদ্রলোক ছেলেমেয়েদের জন্য মাছ পাঠাইয়া দেন তাহা হইলে আশ্রমের ছেলেমেয়েরা মাছ খাইতে পারে।

আশ্রমে সিন্ধী বিবাহ প্রচলিত হইবার পর একটি নিয়ম করা হইয়াছে যে, বিদেশে বিবাহিতা মেয়েরা কিরূপ অবস্থায় আছে, আশ্রমের এক জন কর্ম্মচারী মাঝে মাঝে গিয়া তাহার খোঁজ লইয়া আসিবেন। এই নিয়ম অনুসারে ১৯২৬ সালে সহকারী অধ্যক্ষ শ্রীরাধিকানাথ চৌধুরী যখন মধ্যপ্রদেশ ও সিন্ধু প্রদেশে যাত্রা করেন তখন আশ্রমের একটি একচক্ষুহীনা বালিকা তাঁহাকে অনুনয় করিয়া বলে, "কাকাবাবু, সকলেরই বর জুটল, আমিই কি কেবল প'ড়ে থাকলাম?" রাধিকাবাবু তাহাকে আশ্বাস দিয়া বলেন যে এইবার তাহারও একটি বর খুঁজিয়া আনিবেন। সিন্ধুদেশে গিয়া তিনি একটি অবিবাহিত যুবক পাইলেন, তাহারও এক চোখ কানা। তাহাকে কলিকাতায় আনিয়া ঐ মেয়েটির সহিত বিবাহ দিলেন।

রাধিকাবাবু প্রথমে ১৯২৬ সালে, পরে আবার ১৯৩৪ সালে সিন্ধু প্রদেশে গিয়াছিলেন। তিনি অন্যান্য প্রদেশের তুলনায় সিন্ধু প্রদেশের একটি বিশেষত্ব লক্ষ্য করিয়াছিলেন যে, অন্য প্রদেশে পাত্রের বাড়ী গেলে বাড়ীর লোকেরা তাঁহাকে বিশেষ করিয়া বারণ করিয়া দিত যে তাহাদের বধূ যে অনাথ-আশ্রমের মেয়ে এবং তিনি যে অনাথ-আশ্রমের কর্ম্মচারী, ইহা যেন প্রকাশ না পায়। প্রকাশ পাইলে তাহাদের মর্য্যাদা হানি হইবে। কিন্তু তিনি যখন সিন্ধু প্রদেশে পাত্রের বাড়ী গিয়াছেন তখন যেমন আদর-অভ্যর্থনা পাইয়াছেন, এরূপ আর কোন স্থানে পান নাই; পাত্রের বাড়ীর লোকেরা অনাথ-আশ্রমের মেয়ে বিবাহ করিয়া আনিয়াছে একথা গোপন তো করেই নাই, বরং সগৌরবে সকলের নিকটেই প্রচার করিয়াছে। অধ্যক্ষকে সঙ্গে লইয়া তাহারা পরিচিত ব্যক্তিগণের ও আত্মীয়স্বজনের



কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রমের বালক-বালিকাগণ

বাড়ী বাড়ী লইয়া গিয়া পরিচয় করাইয়া দিয়াছে যে ইনিই সেই অনাথ-আশ্রমের অধ্যক্ষ, যেখান হইতে বধূ আনা হইয়াছে। ইহার পর অধ্যক্ষ অনেক বাড়ী হইতে নিমন্ত্রণ ও জলযোগের আহ্বান ও আদর-আপ্যায়ন পাইয়াছেন। সিন্ধু প্রদেশের কোন পাত্র অনাথ-আশ্রমের দু-একটি বাঙালী বালককে কাজ জুটাইয়া দিয়াছে। অধ্যক্ষ বলেন, সিন্ধু-দেশবাসীর বাঙালী জাতির প্রতি একটি আন্তরিক শ্রদ্ধার ভাব ও সহানুভূতি আছে যাহা অন্য প্রদেশবাসীর মধ্যে ক্বচিৎ দেখা যায়।

১৯২৯ সালে ইন্দিরা নামে একটি ২৭ বৎসর বয়স্ক সুন্দরী কায়স্থ-বালিকার সহিত সিন্ধুদেশের এক অবস্থাপন্ন যুবকের বিবাহ হয়। একটি সন্তান হওয়ার পর মেয়েটি যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয় ও ১৯৩৪ সালে মারা যায়। ইহার অসুখের সময় আশ্রমের অধ্যক্ষ ইহাকে দেখিতে গিয়া-ছিলেন। তিনি গিয়া দেখিলেন, মেয়েটির স্বামী স্ত্রীর চিকিৎসা ও সেবার জন্য যথেষ্ট যত্ন ও অর্থব্যয় করিতেছে। মেয়েটি আশ্রমের অধ্যক্ষকে দেখিয়া অতিশয় আনন্দিত হইল, এবং অধ্যক্ষের ফিরিবার সময় তাহার কথামত তাহার স্বামী আশ্রমের ছেলেমেয়েদের মাছ খাওয়াইবার জন্য অধ্যক্ষের নিকট দশটি টাকা দিয়াছিল।

আর একটি বিষয় অধ্যক্ষ লক্ষ্য করেন যে, বাঙালী মেয়েরা সিন্ধুদেশে গিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যেই সেই দেশের ভাষায় পারদর্শী হইয়া উঠিয়াছে। মাত্র তিন মাস পূর্ব্বে এক জনের বিবাহ হইয়াছে; সিন্ধুদেশে গিয়া অধ্যক্ষ দেখিলেন, এই তিন মাসেই সে চলনসই রকম সিন্ধী ভাষা শিখিয়া ফেলিয়াছে। অনেকে আবার মাতৃভাষা এমন ভাবে ভুলিয়া যায় যে তাহার সহিত বাংলায় কথা বলা কঠিন হয়। অধ্যক্ষ সিন্ধুদেশ পরিদর্শন করিয়া যে রিপোর্ট দিয়াছে তাহাতে বুঝা যায়, ঐ দেশে বিবাহ হইয়া বাঙালী মেয়ের অসুখী হয় নাই, বরং সুখে-স্বচ্ছন্দেই গার্হস্থ্য-জীবন যাপ করিতেছে।

আমাদের দেশে হিন্দু সমাজে প্রতি গৃহে কন্যার বিব লইয়া যে কঠিন সমস্যা উপস্থিত, অনাথ-আশ্রমের কর্ত্তৃপক্ষ বৎসর ধরিয়া অনাথা হিন্দু কুমারীগণের বিবাহ-ব্যাপারে সমস্যা সমাধানের উপায় নির্দ্ধারণের চেষ্টা ও পরীক্ষা করি ছেন। ইঁহারা সকলেই সমাজের গণ্যমান্য ব্যক্তি, আশ্র মেয়েদের মঙ্গল ভিন্ন এই বিবাহ-সমস্যা সমাধানের পরী তাহাদের অন্য কোন স্বার্থ বা উদ্দেশ্য নাই। তাঁ পরীক্ষার দ্বারা যে সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছেন শিক্ষা বি দেওয়াই সেই সিদ্ধান্ত। হিন্দুসমাজে অনেক মেয়েই ত

যাহাদের অভিভাবকগণ বিবাহের কোন উপায়ই করিতে পারেন নাই। এমন অবস্থায় সেই সকল মেয়ের যদি সিন্ধু প্রদেশে উপযুক্ত পাত্রে বিবাহ দেওয়া হয় তাহা হইলে বিবাহ-সমস্যা কি কতক নিবারণ হয় না? এ-বিষয়ে সমাজনেতারা কি চিন্তা করিয়া দেখিবেন?

ক্রমশঃ হিন্দু সমাজের যে কিরূপ অবস্থা দাঁড়াইতেছে, কিরূপ অতিদ্রুত হিন্দুজাতি ধ্বংসের অভিমুখে চলিয়াছে, তাহা ৬০ বৎসরের আদম-সুমারীর রিপোর্ট হইতে বুঝা যায়। এই রিপোর্টে প্রত্যেক দশ বৎসর অন্তর বাংলা দেশের হিন্দু ও মুসলমানের সংখ্যার হ্রাস-বৃদ্ধি পরিমাণ লিখিত আছে। রিপোর্টটি এইরূপ:

বৎসর	হিন্দু	মুসলমান
১৮৭২	১৭১ লক্ষ	১৬৭ লক্ষ
১৮৮১	১৭২'৫ "	১৭৯ "
১৮৯১	১৮০ "	১৯৬ "
১৯০১	২০৪ "	২২০ "
১৯১১	২০৬ লক্ষ	২৪২ লক্ষ
১৯২১	২০৮ "	২৫২ "
১৯৩১	২১৫ "	২৭৫ "

এই তালিকায় দেখা যায়, ১৮৭২ খ্রীষ্টাব্দে বাংলা দেশে মুসলমান অপেক্ষা হিন্দুর সংখ্যা চারি লক্ষ অধিক ছিল। কিন্তু ১৯৩১ খ্রীষ্টাব্দে মুসলমানের সংখ্যা হিন্দু হইতে ৬০ লক্ষ অধিক হইয়াছে। বিবাহ-সমস্যার সহিত হিন্দু সমাজের সংখ্যাল্পতার যে বিশেষ যোগ আছে ইহাতে সন্দেহ নাই। সুতরাং হিন্দু সমাজে আন্তঃপ্রাদেশিক বিবাহ প্রবর্ত্তিত করিয়া এই সমস্যা সমাধানের কোন প্রতিকার হয় কি না সে-বিষয়ে চেষ্টা করিয়া দেখা উচিত। সেই সঙ্গে সিন্ধু প্রদেশের সহিত যাহাতে বাংলা দেশের মেলামেশা বৃদ্ধি হয়, যাহাতে বাঙালী মেয়েরা পুরাপুরি সিন্ধী হইয়া না-যায় বরং সিন্ধু প্রদেশে বঙ্গদেশীয় সভ্যতার বিস্তার হয়, তাহারও চেষ্টা করা উচিত।

কাশীর মানমন্দির

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ, এম-এ, পিএইচ-ডি

হিন্দুদিগের শ্রেষ্ঠ তীর্থ কাশীধামে গঙ্গানদীর তটে মণিকর্ণিকা-ঘাটের অনতিদূরে দক্ষিণ-পশ্চিম দিকে কাশীর মানমন্দিরটি প্রতিষ্ঠিত। ইহা প্রথমে রাজপুতানার অম্বররাজ মানসিংহ কর্ত্তৃক মণিকর্ণিকা-ঘাটে নির্ম্মিত হয়। যদিও দিল্লীনগরীর মানমন্দিরের ন্যায় ইহা সুন্দর ও সুগঠিত নহে, তথাপি পারিপার্শ্বিক প্রাকৃতিক দৃশ্যের মধ্যে ও গঙ্গাতটে অবস্থিত বলিয়া ইহার বহির্দৃশ্য অনেকাংশে মনোহারী হইয়াছে। রাজা মানসিংহের তিরোধানের প্রায় পঞ্চাশ বৎসর পরে, তাঁহার সিংহাসনাধিকারী মহাপ্রতাপশালী রাজা জয়সিংহ কর্ত্তৃক এইখানেই গ্রহ-নক্ষত্রাদি দর্শনের জন্য অনেকগুলি যন্ত্র নির্ম্মিত হয়। এই যন্ত্রাদির বিবরণ, ব্যবহার-পদ্ধতি ও বর্ত্তমান অবস্থা নিম্নে বিশদভাবে বিবৃত হইল।

(১) ভিত্তি-যন্ত্র (a mural quadrant)—মানমন্দিরে প্রবেশকালে এই ভিত্তি-যন্ত্র প্রথমেই দর্শনপথে পতিত হয়। ইহা ইষ্টক, চূণ ও প্রস্তর দ্বারা নির্ম্মিত একটি প্রাচীর-বিশেষ। মাধ্যাহ্নিকের সমতলেই এই প্রাচীর অবস্থিত। ইহা ৯ ফুট ১ ইঞ্চি দীর্ঘ, ১ ফুট ১/৪ ইঞ্চি প্রশস্ত ও ১১ ফুট উচ্চ। এই প্রাচীরের পূর্ব্ব পার্শ্ব সমান এবং অতি সুন্দর চূর্ণ-রঞ্জিত। পূর্ব্ব পার্শ্বের উপরিস্থিত দুই কোণে বড় বড় দুইটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে। কীলক দুইটি ভূমিতল হইতে ১০ ফুট ৪॥ ইঞ্চি উচ্চ; আর উহাদের পরস্পরের দূরত্ব ৭ ফুট ৯॥ ইঞ্চি। যে-বিন্দু দুইটিতে কীলক প্রোথিত, সেই বিন্দু দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া এবং দুইটি কীলকের অন্তরকে ত্রিজ্যা করিয়া দুইটি বৃত্তচতুর্থ (quadrant) অঙ্কিত করা হইয়াছে। এই বৃত্তচতুর্থ দুইটি পরস্পরকে ছেদ করিয়াছে।

উক্ত কীলক দুইটিকে কেন্দ্র করিয়া তিন-তিনটি সমকেন্দ্রিক ধনু অঙ্কিত করা হইয়াছে; এবং উহারা এমন ভাবে বিভক্ত যে বাহিরের ধনুর এক-একটি বিভাগে ৬ অংশ, তাহার নিম্নের ধনুর (অর্থাৎ দ্বিতীয়টির) এক-একটি বিভাগ এক অংশ, এবং তৃতীয় ধনুর এক-একটি বিভাগ ৬ কলা হইয়াছে।



অম্বরাধিপতি সওয়াই জয়সিংহ

এই যন্ত্রের দ্বারা মধ্যাহ্নকালে সূর্য্যের নতাংশ ও উন্নতাংশ অবগত হওয়া যায়। সূর্য্য মাধ্যাহ্নিকে আসিলে কীলকের ছায়া ধনুর কোন্ বিভাগে আসিয়া পড়ে, তাহা দেখিতে হইবে। কাশীতে খমধ্যের উত্তরে সূর্য্য কখনও আসে না; সুতরাং সূর্য্যের নতাংশ ও উন্নতাংশ দেখিতে হইলে দক্ষিণ দিকের কীলককে কেন্দ্র করিয়া যে বৃত্তপাদ অঙ্কিত হইয়াছে, সেই বৃত্তপাদের বিভাগকেই দেখিতে হয়। এই বিভাগের দ্বারা সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক নতাংশ, সুতরাং উন্নতাংশও অবগত হওয়া যায়। আরও খমধ্যের দক্ষিণ দিক্ দিয়া যে-সকল নক্ষত্র মাধ্যাহ্নিক অতিক্রম করে, সেই সকল নক্ষত্রের মাধ্যাহ্নিক উন্নতাংশও এই বৃত্তপাদের সাহায্যে দৃষ্ট হয়। আবার, যে বৃত্তপাদের কেন্দ্র উত্তর দিকে অবস্থিত তাহার দ্বারা খমধ্যের উত্তর দিক্ দিয়া যে-সকল নক্ষত্র মাধ্যাহ্নিক অতিক্রম করে, তাহাদের উন্নতাংশ অবগত হওয়া যায়। এই যন্ত্রের সাহায্যে সূর্য্যের পরমাক্রান্তি (greatest declination) ও ইষ্টদেশের অক্ষাংশ (latitude of the place) নিম্নলিখিত উপায়ে নির্ণয় করা যাইতে পারে। সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিকের নতাংশ ক্রমান্বয়ে পর্য্যবেক্ষণ করিতে হয় এবং তাহা এক স্থানে লিপিবদ্ধ করিয়া রাখিতে হয়; এখন দেখিতে হইবে, সূর্য্যের সর্ব্বাপেক্ষা অধিক নতাংশ ও সর্ব্বাপেক্ষা কম নতাংশ কত হয়। সূর্য্যের এই অধিকতম ও ন্যূনতম নতাংশদ্বয়ের বিয়োগার্দ্ধই রবিপরমাক্রান্তি (greatest declination of the sun)। অধিকতম নতাংশ হইতে এই রবিপরমাক্রান্তি বিয়োগ করিলে অথবা ন্যূনতম নতাংশে এই রবিপরমাক্রান্তি যোগ করিলে, এই বিয়োগফল বা যোগফলই ইষ্টস্থানের অক্ষাংশ। কাশীতে যখন সূর্য্য খমধ্যের উত্তরে একেবারেই আসে না, তখন কেবল এই উপায়ে গণনা করিয়া রবিপরমাক্রান্তি ও স্থানীয় অক্ষাংশ নির্ণীত হয়। এই যন্ত্রের সাহায্যে মহারাজ জয়সিংহ রবিপরমাক্রান্তি ২৩ অংশ ২৮ কলা নির্ণয় করিয়াছিলেন।

এখন ইষ্টস্থানের অক্ষাংশ অবগত হইলে, ইহা হইতে এবং কোনও মধ্যাহ্নে সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক নতাংশ হইতে অতি সহজেই সূর্য্যের ক্রান্তি অবগত হওয়া যায়। প্রথমে স্থানীয় অক্ষাংশ ও সূর্য্যের মাধ্যাহ্নিক নতাংশের অন্তর বাহির করিতে হইবে, এই অন্তরই সেই মধ্যাহ্নে সূর্য্যের ক্রান্তি। এক্ষণে যদি অক্ষাংশ হইতে নতাংশ অপেক্ষাকৃত অল্প হয় তাহা হইলে ক্রান্তি উত্তর হইবে, এবং যদি অক্ষাংশ অপেক্ষা নতাংশ অধিক হয়, তাহা হইলে ক্রান্তি দক্ষিণ হইবে। এই উপায়ে প্রাপ্ত ক্রান্তি ও রবিপরমাক্রান্তি হইতে সূর্য্যের ভুজাংশ (longitude) সহজেই বাহির করা যাইতে পারে।

এই যন্ত্রের অতি নিকটে ও পূর্ব্ব দিকে একটি মসৃণ স্থান রহিয়াছে। এক্ষণে কালবশে ইহা অনেকটা রুক্ষ হইয়া পড়িয়াছে। ভিত্তি-যন্ত্রের প্রাচীরের যতটুকু প্রস্থ, এই স্থানের প্রস্থও ততটুকু; এবং ইহা ১০ ফুট ৩ ইঞ্চি লম্বা। এই স্থানের পূর্ব্ব দিকের কোণে ছুইটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে এবং কীলকের উপরে এক-একটি ছিদ্র রহিয়াছে। প্রাচীরের পূর্ব্বোক্ত ছুইটি কীলকের সম্মুখেই এই কীলক ছুইটি প্রোথিত আছে। এই মসৃণ স্থানের কীলক ছুইটির মধ্যে দক্ষিণ দিকের কীলকটি উঠিয়া গিয়াছে, কিন্তু উত্তর দিকের কীলকটি পূর্ব্ববৎ রহিয়াছে। কি অভিপ্রায়ে এই কীলক ছুইটি প্রোথিত হইয়াছিল, তাহা এক্ষণে বুঝিতে পারা যায় না। তবে ইহা নিশ্চিত যে, কোন পর্য্যবেক্ষণের সুবিধার জন্য ইহাদের প্রয়োজন হইয়াছিল।

এই স্থানের নিকট ছুইটি বৃত্ত রচিত আছে। প্রথম বৃত্তটি চূণে তৈয়ারী ও দ্বিতীয় বৃত্তটি প্রস্তর-নির্ম্মিত। প্রথম বৃত্তটির ব্যাস ২ ফুট ৮ ইঞ্চি এবং দ্বিতীয় বৃত্তটির ব্যাস ৩ ফুট ৫ ইঞ্চি। ইহা ভিন্ন একটি প্রস্তর-গঠিত সমচতুষ্কোণ নির্ম্মিত আছে। ইহার এক-একটি বাহু ২ ফুট ২ ইঞ্চি দীর্ঘ। এই ছুইটি বৃত্ত ও সমচতুষ্কোণের যে কি আবশ্যকতা ছিল, তাহা এক্ষণে ঠিক অনুমান করা যায় না। তবে ইহা হইতে পারে যে, সূর্য্য কর্ত্তৃক শঙ্কুচ্ছায়া ও কোটি-অগ্রা (degrees of azimuth) ইহাদিগের দ্বারা নির্ণীত হইতে পারিত। ইহাদের উপর পূর্ব্বে কতকগুলি চিহ্ন অঙ্কিত ছিল বলিয়া মনে হয়, তাহা এক্ষণে মিলাইয়া গিয়াছে।

(২) যন্ত্র-সম্রাট্ বা সম্রাট্-যন্ত্র। ভিত্তি-যন্ত্রের উত্তর-পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ যন্ত্র নির্ম্মিত রহিয়াছে। এই যন্ত্রকে যন্ত্র-সম্রাট্ বলা হয়। ইহাও চূণ- ও ইষ্টক-নির্ম্মিত একটি প্রাচীরবিশেষ। ইহা ঠিক মাধ্যাহ্নিকের সমতলে স্থাপিত। ইহা ৩৬ ফুট দীর্ঘ ও ৪ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। ইহার উপরিভাগ প্রস্তরমণ্ডিত, ক্রমশঃ-অবনত ভাবে গঠিত এবং উত্তর-ধ্রুবতারা নির্দ্দেশ করিয়া অবস্থিত। ইহার দক্ষিণ দিক্ ৬ ফুট ৪½ ইঞ্চি উচ্চ এবং উত্তর দিক্ ২২ ফুট ৩½ ইঞ্চি উচ্চ। এই প্রাচীরকে শঙ্কু (gnomon) বলা হইয়া থাকে। ইহার মধ্যভাগে উপরে উঠিবার জন্য সোপান-শ্রেণী নির্ম্মিত রহিয়াছে। শঙ্কুর ছুই পার্শ্বে অর্থাৎ পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে প্রস্তরনির্ম্মিত ছুইটি ধনু অঙ্কিত রহিয়াছে; এই ধনু বৃত্তচতুর্থ অপেক্ষা কিছু অধিক ইহার দৈর্ঘ্য ৫ ফুট ১১ ইঞ্চি, প্রস্থ ৭½ ইঞ্চি এই ছুইটি ধনুর প্রত্যেকটির ছুই পার্শ্বে ছয়-ছ অংশ করিয়া ঘটিকা চিহ্নিত করা হইয়াছে। এ ছয় অংশ ঘটিকাকে আবার ছয় সমান ভাগে বিভ করা হইয়াছে। এই শেষোক্ত ষষ্ঠ অংশ ছুই ইঁ প্রস্থ। প্রত্যেক ধনুর ছুই বৃত্তাকার পার্শ্বের ছুইটি কে শঙ্কুর উপরের পার্শ্বে (কিনারায়) অবস্থিত। এই কেন্দ্রগুলি প্রত্যেকটিতে এক-একটি লোহার ছোট কড়া সংলগ্ন আছে প্রত্যেক ধনুর নিম্নের পার্শ্বের ব্যাসার্দ্ধ ৯ ফুট ৮½ ইঁ এই যন্ত্রের ধনুর যে অংশে শঙ্কুচ্ছায়া পতিত হ উহার দ্বারা নতঘটি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন হইতে কত স অতিবাহিত হইয়াছে, তাহাই অবগত হওয়া যায়। মধ্যাহ্ন পূর্ব্বে যদি শঙ্কুচ্ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে এই ঘটিকাস উত্তীর্ণ হইলে পর মধ্যাহ্ন হইবে; আবার যদি মধ্যাহ্ন পরে শঙ্কুচ্ছায়া দৃষ্ট হয়, তাহা হইলে ঐ সময়ের পূ মধ্যাহ্ন অতিক্রান্ত হইয়াছে বুঝিতে হইবে। শঙ্কুচ্ছ উত্তমরূপে পর্য্যবেক্ষণের জন্য প্রত্যেক ধনুর ছুই দিকে প্র নির্ম্মিত সোপান নির্ম্মিত হইয়াছে। সূর্য্যের শঙ্কুচ্ছায়া যে স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হয়, চন্দ্রের বা গ্রহাদির শঙ্কুচ্ছ তেমন স্পষ্ট দৃষ্ট হয় না, এবং ক্ষুদ্র গ্রহাদির ও নক্ষত্রের আদৌ প্রতিবিম্বিত হয় না। সুতরাং চন্দ্র, গ্রহাদি নক্ষত্রের নতঘটি অর্থাৎ মধ্যাহ্ন হইতে অতিবাহিত

পর্য্যবেক্ষণ করিবার বিভিন্ন উপায় উদ্ভাবিত হইয়াছে। এই যন্ত্রের উপরে একটি লৌহ-তার বা একটি সরল নল স্থাপিত করিতে হইবে, ইহার একটি প্রান্ত ধনুর পার্শ্বে থাকিবে এবং অপর প্রান্ত শঙ্কুর উপরে থাকিবে। পরে ধনুর পার্শ্বে যে প্রান্তটি রহিয়াছে, তাহার মধ্য দিয়া দ্রষ্টব্য গ্রহ বা তারকা লক্ষ্য করিতে হইবে। এমন ভাবে লৌহ-নলটি স্থাপন করিতে হইবে যে, ইহার ঠিক মধ্য দিয়া গ্রহ বা তারকাটি দৃষ্ট হইবে। এই প্রকারে ধনুর যে ধারটি অন্য ধারটির অপেক্ষা নিম্নে অবস্থিত, তাহার যে চিহ্নটি নলের দ্বারা বিভক্ত হইয়াছে, তাহাই গ্রহ বা নক্ষত্রের মাধ্যাহ্নিক হইতে নতঘটি হইবে। শঙ্কুর পার্শ্বের যে-অংশ ধনুর কেন্দ্র আর নলের প্রান্তের অন্তরে স্থিত, সেই অংশই গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তির স্পর্শজ্যা (tangent of the declination)। সুতরাং নতঘটি ও ক্রান্তি এই যন্ত্রের দ্বারা অবগত হওয়া যায়। কোন নক্ষত্রের ভুজাংশও (longitude) এই যন্ত্রের সাহায্যে নিম্নলিখিত উপায়ে জ্ঞাত হওয়া অল্পায়াসসাধ্য। সূর্য্য অস্তগমন করিবার সময়ে মাধ্যাহ্নিক হইতে সূর্য্যের নতাংশ বাহির করিতে হইবে। এই সময় হইতে যে-পর্য্যন্ত না নক্ষত্রটি (যাহার ভুজাংশ বাহির করিতে হইবে) আকাশে স্পষ্ট উদিত দৃষ্টিগোচর হয়, সেই পর্য্যন্ত যে সময় তাহা স্থির করিতে হইবে। এই সময় মাধ্যাহ্নিক হইতে সূর্য্যের নতঘটিতে যোগ দিতে হইবে। এইরূপে প্রাপ্ত সময়ই সেই সময়ের মাধ্যাহ্নিক হইতে সূর্য্যের নতাংশ। পরে এই সময়ে সূর্য্যের বিষুবাংশ গণনা করিতে হইবে এবং প্রাপ্ত ফলের সহিত মাধ্যাহ্নিক হইতে সূর্য্যের নতাংশ যোগ করিতে হইবে। তাহা হইলে মধ্যলগ্নের (culminating point of the ecliptic) বিষুবাংশ প্রাপ্ত হওয়া যাইবে। এক্ষণে যন্ত্রের সাহায্যে নক্ষত্রের নতঘটিকা বাহির করিয়া মধ্যলগ্নের বিষুবাংশে যোগ বা বিয়োগ করিতে হইবে। তাহা হইলে নক্ষত্রের জ্ঞাতব্য ভুজাংশ পাওয়া যাইবে। পূর্ব্ব-গোলে নক্ষত্র থাকিলে বিষুবাংশ যোগ করিতে হইবে, আর পশ্চিম-গোলে নক্ষত্র থাকিলে বিষুবাংশ বিয়োগ করিতে হইবে।

সম্রাট্-যন্ত্রের শঙ্কুর পূর্ব্ব দিকে যুগ্ম ভিত্তি-যন্ত্র (double mural quadrant) নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহার নির্ম্মাণ-প্রণালী প্রথমোক্ত ভিত্তি-যন্ত্রের ন্যায়। প্রভেদের মধ্যে এই যে, এই যন্ত্রে কীলক দুইটির অন্তর ১০ ফুট ৪½ ইঞ্চি।

(৩) বিষুবচক্র-যন্ত্র—সম্রাট্-যন্ত্রের পূর্ব্ব দিকে একটি বিষুবচক্র (equinoctial circle) নামক যন্ত্র অবস্থিত। ইহা প্রস্তর-নির্ম্মিত এবং বিষুববৃত্তের সমতলে রক্ষিত। এই যন্ত্রের উত্তর পার্শ্বে ৪ ফুট ৭½ ইঞ্চি ব্যাসের একটি বৃত্ত অঙ্কিত আছে। এই বৃত্তে একটি ব্যাস ক্ষিতিজের (horizon) সমানান্তর, আর একটি ইহার উপর লম্বভাবে অবস্থিত। সুতরাং ইহাদের দ্বারা এই বৃত্তটি সমান চারি অংশে বিভক্ত। এই চারিটির প্রত্যেকটি আবার সমান ৯০ অংশে বিভক্ত। এই বৃত্তের কেন্দ্রে একটি লৌহকীলক প্রোথিত রহিয়াছে। কীলকটি উত্তর-ধ্রুবের দিকে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত। যখন উত্তর-গোলে সূর্য্য বা নক্ষত্র থাকে, তখন কীলকের যে ছায়া পড়ে, তাহা হইতে সূর্য্যের বা কোন নক্ষত্রের নতাংশ অবগত হওয়া যায়। দক্ষিণ-গোলে যখন সূর্য্য বা কোন নক্ষত্র থাকে, তখনকার নতাংশ নির্ণয় করিবার জন্য ২ ফুট ৩½ ইঞ্চি ব্যাসের একটি ক্ষুদ্র বৃত্ত দক্ষিণ পার্শ্বে অঙ্কিত রহিয়াছে। পূর্ব্বোক্ত বৃত্তের ন্যায় এই বৃত্তকেও দুই পরস্পর লম্ব ব্যাসের দ্বারা চারি সমান ভাগে এবং বৃত্তপাদকে ৯০ সমান খণ্ডে বিভক্ত করা হইয়াছে।

(৪) ছোট যন্ত্র-সম্রাট্—যন্ত্র-সম্রাটের ন্যায় আর একটি ছোট যন্ত্র-সম্রাট্ বিষুব-চক্রের পূর্ব্ব দিকে অবস্থিত। এই যন্ত্রের শঙ্কু ১০ ফুট ১ ইঞ্চি দীর্ঘ; ইহার প্রশস্ততা ১ ফুট ৩ ইঞ্চি। দক্ষিণ দিকের উচ্চতা ৩ ফুট ৬½ ইঞ্চি, আর উপর দিকের উচ্চতা ৮ ফুট ৩ ইঞ্চি। প্রত্যেকটি ধনুর প্রস্থ ১ ফুট ৯½ ইঞ্চি, আর স্থূলতা ৩½ ইঞ্চি; এবং ধনুর নিম্নদিকস্থ পার্শ্বের ব্যাস ৩ ফুট ৫½ ইঞ্চি।

(৫) চক্র-যন্ত্র—সম্রাট্-যন্ত্রের নিকটে আর একটি যন্ত্র দুইটি প্রাচীরের মধ্যে অবস্থিত। ইহাকে চক্র-যন্ত্র বলা হইয়া থাকে। ইহা একটি গতিশীল লৌহচক্র, ইহার প্রস্থ এক ইঞ্চি এবং ইহার সম্মুখ ভাগ ½ ইঞ্চি গভীর পিতলের পাত দিয়া আবৃত। ইহা একটি অক্ষদণ্ডের চতুর্দ্দিকে পরিক্রম করে; এই অক্ষদণ্ড দুইটি প্রাচীরে সংলগ্ন এবং উত্তরদিগভিমুখে লক্ষ্য করিয়া অবস্থিত। এই

চক্রের ধার বা নেমি (rim of the circle) ২ ফুট প্রশস্ত। ইহার পরিধিকে সমান ৩৬০ অংশে বিভক্ত করা হইয়াছে, সুতরাং এক-একটি ছোট বিভাগ ১$\frac{1}{8}$ ইঞ্চি প্রস্থ। এই চক্রের কেন্দ্রে একটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে এবং এই কীলকে একটি পিত্তল-নির্ম্মিত কাঁটা (index) সংলগ্ন রহিয়াছে। এই কাঁটা ২ ইঞ্চি প্রস্থ এবং কেন্দ্র হইতে অঙ্কিত একটি রেখা এই কাঁটার মধ্যে চিহ্নিত রহিয়াছে।

এই যন্ত্রের সাহায্যে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তি নির্ণয় করিতে হইলে এই চক্র আর কাঁটাটিকে এমন ভাবে স্থাপিত করিতে হইবে যে, ঐ গ্রহ বা নক্ষত্র কাঁটার ঠিক মধ্য-রেখাতে আসিয়া পড়ে। তখন অক্ষের লম্বভাবে যে ব্যাসটি অবস্থিত, তাহা হইতে কাঁটাটি যত অংশ দূরে রহিয়াছে, তত অংশই গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তি। বোধ হয়, এই যন্ত্রে অন্যান্য বৃত্তও অঙ্কিত ছিল, যেমন অয়নান্ত বৃত্ত, বিষুব বৃত্ত প্রভৃতি। ইহাদের দ্বারা মাধ্যাহ্নিক হইতে কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের দূরত্ব নির্ণীত হইতে পারিত। এক্ষণে কালবশে সেই বৃত্তগুলি নষ্ট হইয়া গিয়াছে এবং কাঁটাটিও বাঁকিয়া গিয়াছে, সুতরাং এখন আর এই যন্ত্রের দ্বারা গ্রহ বা নক্ষত্রের ক্রান্তি নির্ণয় করিতে পারা যায় না।

(৬) দিগংশ-যন্ত্র (Alt-Azimuth Instrument) —চক্র-যন্ত্রের পূর্ব্ব দিকে একটি বৃহৎ দিগংশ-যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। ইহার মধ্যে বেলনাকার (cylindrical) একটি স্তম্ভ নির্ম্মিত হইয়াছে। এই স্তম্ভটি ৪ ফুট ২ ইঞ্চি উচ্চ এবং ইহার ব্যাস ৩ ফুট ৭$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। এই স্তম্ভের মধ্যে একটি লৌহনির্ম্মিত কীলক (iron spike) দৃঢ়ভাবে সংবদ্ধ রহিয়াছে। এই কীলকের উপরিভাগে একটি ছিদ্র করা হইয়াছে। এই স্তম্ভের চতুর্দ্দিকে এবং ইহা হইতে ৭ ফুট ৩$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দূরে একটি বৃত্তাকার প্রাচীর নির্ম্মিত হইয়াছে। স্তম্ভ যত উচ্চ, প্রাচীরও তত উচ্চ। ইহা ১ ফুট ৬ ইঞ্চি প্রশস্ত। এই প্রাচীর হইতে ৩ ফুট ২$\frac{1}{2}$ ইঞ্চি দূরে আর একটি বৃহৎ বৃত্তাকার প্রাচীর নির্ম্মিত রহিয়াছে। ইহা প্রথম প্রাচীরের দ্বিগুণ উচ্চ ; ইহার প্রস্থ ২ ফুট $\frac{1}{2}$ ইঞ্চি। এই দুইটি প্রাচীরের উপরিভাগে কম্পাসের বিন্দুদ্বয় অর্থাৎ উত্তর-দক্ষিণ বিন্দু চিহ্নিত আছে এবং বাহিরের প্রাচীরের উপরে উত্তর, দক্ষিণ, পূর্ব্ব, পশ্চিম এই চারিটি বিন্দুতে চারিটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে। এই যন্ত্রের দ্বারা কোন গ্রহ বা নক্ষত্রের কোটি-অগ্রা (degrees of azimuth) বাহির করিতে পারা যায়। নিম্নলিখিত উপায়ে কোটি-অগ্রা নির্ণয় করিতে হয়। প্রথমে বাহিরের প্রাচীরের উপরে যে চারিটি কীলক প্রোথিত রহিয়াছে, তাহাদের পূর্ব্ব-পশ্চিমের দুইটিতে একটি সূত্র এবং উত্তর-দক্ষিণের দুইটিতে আর একটি সূত্র বাঁধিয়া দিতে হইবে। স্তম্ভের কেন্দ্রের উপরে এই দুইটি সূত্রকে ছেদ করিবে এমন একটি সূত্র লইতে হইবে ; এই শেষোক্ত সূত্রের এক দিক্ স্তম্ভের কেন্দ্রে শক্ত করিয়া বাঁধিতে হইবে এবং আর একটি দিক্ বাহিরের প্রাচীরের উপরে টানিয়া আনিতে হইবে। পরে মধ্যবর্ত্তী প্রাচীরের পরিধির উপর চক্ষু স্থাপন করিয়া যে গ্রহ বা নক্ষত্রের কোটি-অগ্রা নির্ণয় করিতে হইবে তাহার দিকে দৃষ্টিপাত করিতে হইবে। এখন চক্ষুর সঙ্গে সঙ্গে স্তম্ভের কেন্দ্র হইতে বাহিরের প্রাচীরের উপরে স্থাপিত সূত্রটি এমন করিয়া সরাইতে হইবে যে, গ্রহ বা নক্ষত্র এবং পূর্ব্বোক্ত সূত্র দুইটির ছেদবিন্দু এই শেষোক্ত সূত্রটির (যাহা সরান হইতেছে) উপর আসিয়া পড়ে। এই অবস্থায় যে সূত্রটি সরান হইতেছে উহা উত্তর কিংবা দক্ষিণ বিন্দু হইতে যত অংশ অন্তর হইবে, তত অংশই গ্রহ বা নক্ষত্রের কোটি-অগ্রা হইবে।

(৭) বৃহৎ বিষুবচক্র-যন্ত্র—দিগংশ-যন্ত্রের দক্ষিণ দিকে আর একটি বিষুবচক্র-যন্ত্র নিম্মিত রহিয়াছে। ইহা পূর্ব্বোক্ত বিষুবচক্র-যন্ত্রের ন্যায় গঠিত হইলেও অপেক্ষাকৃত বৃহৎ। ইহার ব্যাস ৬ ফুট ৩ ইঞ্চি। কিন্তু ইহা এক্ষণে অকর্ম্মণ্য হইয়া পড়িয়াছে। কেন্দ্রের কীলকটি লোপ পাইয়াছে, ইহার উপরের চিহ্নাদি অন্তর্হিত হইয়াছে, যন্ত্রের আর আর বিভাগগুলি মিলাইয়া গিয়াছে, যন্ত্রাদির অংশ স্থানে স্থানে ভাঙিয়া পড়িয়াছে এবং কোথাও কোথাও বা ইহা বাঁকিয়া আসিয়াছে।

(৮) নাড়ীবলয় বা উত্তর-দক্ষিণ গোলযন্ত্র—বৃহৎ বিষুবচক্র-যন্ত্রের পার্শ্বে এই যন্ত্র স্থাপিত রহিয়াছে। ইহা একটি বেলনাকার গোলযন্ত্র। ইহার অক্ষদণ্ড উত্তর-দক্ষিণ দিক্ নির্দ্দেশ করিয়া অবস্থিত এবং ইহার উত্তর ও দক্ষিণ মুখ নিরক্ষতলের সমানান্তরালে রহিয়াছে। প্রত্যেক মুখের

কেন্দ্রে এবং ইহার লম্বভাবে একটি লৌহশলাকা সংবদ্ধ আছে। ইহার চতুর্দ্দিকে একটি করিয়া বৃত্ত অঙ্কিত রহিয়াছে। বাহিরের বৃত্তটিতে ঘণ্টা প্রভৃতি এবং ভিতরের বৃত্তটিতে ঘটি, পল প্রভৃতি চিহ্ন ক্ষোদিত। ইহা ব্যতীত যন্ত্রটিতে অয়নান্ত বিন্দুদ্বয় চিহ্নিত রহিয়াছে; কারণ, সূর্য্য যখন নিরক্ষতলের উত্তরে থাকে, তখনই কেবল পর্য্যবেক্ষণের জন্য উত্তর মুখটি ব্যবহৃত হয়। যন্ত্রটিতে এই লিপি ক্ষোদিত আছে—নাড়ীবলয় বা উত্তর-দক্ষিণ গোল। এই যন্ত্রের দ্বারা জ্যোতিষ্কসমূহ উত্তর গোলার্দ্ধে কি দক্ষিণ গোলার্দ্ধে অবস্থিত, তাহা অবগত হওয়া যায়। ইহাতে সময়ও নির্ণীত হইতে পারে।

কাশীর মানমন্দিরের ইহাই সংক্ষিপ্ত বিবরণী। এই মানমন্দিরে স্থাপিত যন্ত্রসমূহের গঠনপ্রণালী ও তাহাদের ব্যবহারবিধি অল্পবিস্তর বিবৃত হইল। এই যন্ত্রগুলি সূর্য্য-সিদ্ধান্তের মূলসূত্র অনুসারে নির্ম্মিত হইয়াছে।

সপ্তদশ শতাব্দীর প্রথম ভাগে মহারাজ মানসিংহ এই মানমন্দিরটির নির্ম্মাণকার্য্য আরম্ভ করেন। ইহার পঞ্চাশ বৎসর পরে মহারাজ জয়সিংহ পূর্ব্বপুরুষের এই বিশিষ্ট কীর্ত্তির সংস্কার ও উৎকর্ষ সাধন করিয়া অনেক নূতন যন্ত্রের সমাবেশের দ্বারা উহার বিশেষ উন্নতি করিয়া তুলেন। যদিও ইহার বর্ত্তমান পারিপার্শ্বিক অবস্থা পর্য্যবেক্ষণের পক্ষে তেমন অনুকূল নহে, তথাপি ইহা জয়সিংহের এক অক্ষয় কীর্ত্তি।

সুপ্তির সীমায়

শ্রীরসময় দাশ

জাগরণ মিশে যেথা সুপ্তির সীমায়,
সেইখানে চেতনার সর্ব্বপ্রান্ততীরে
তোমারে কি দেখিলাম দীপ্ত মহিমায়?—
কনক-কিরণ ফুটে ওই তনু ঘিরে!

নিদ্রারূপে অন্ধকার ধীরে আসে ছেয়ে,
মিলায় সোনার আলো সন্ধ্যা-পারাবারে;
এ কি ভ্রান্তি? স্বপ্ন এ কি?—কি দেখিনু চেয়ে,—
সুদূরের বন্ধু এলে হৃদয়ের দ্বারে!

তন্দ্রাতুর আঁখি দুটি, শ্লথ কলেবর,
শিথিল চৈতন্য 'পরে ঘুম আসে নামি;
বহি আরতির ধ্বনি সমীর মন্থর
জাগরণ-কোলাহল ধীরে গেল থামি।

ভাল ক'রে দেখি নাই, বলি নাই কথা;
সুপ্তি এসে টানি দিল স্তব্ধ নীরবতা!

শহুরে মেয়ে

শ্রীসীতা দেবী

মালতী মধ্যবিত্ত গৃহস্থঘরের মেয়ে, দুই বোনের পর তাহার জন্ম। নিতান্ত মা-ষষ্ঠীর কৃপায় তাহার পরে মায়ের কোলে খোকা নিতুর আবির্ভাব ঘটিয়াছিল, না হইলে শুধু কন্যা গর্ভে ধারণ করার লজ্জায় মালতীর মাকে চিরকালই মাটির সঙ্গে মিশিয়া থাকিতে হইত। শাশুড়ী, ননদ, বড় জা, এমন কি নিজের বাপের বাড়ীর লোকের কাছেও তাঁহার লজ্জার সীমা ছিল না। উভয় বংশের কোন নারীরই নাকি এতবড় দুর্ভাগ্য কোনদিন ঘটে নাই। নিত্যানন্দ আসিয়া যেন মাকে আকাশের চাঁদ হাতে তুলিয়া দিল, অবাঞ্ছিতা মেয়ের দলের অগৌরব আরও একটু বাড়িয়া গেল বই কমিল না। কাজেই শৈশব ও বাল্য জীবনে মালতীর যে আদরের বান ডাকিয়া যায় নাই, তাহা না বলিয়া দিলেও চলে।

কিন্তু হাজার হউক কলিকাতায় তাহারা থাকিত ত? আশেপাশে পাড়াপড়শী ঢের, সবাই বাঙালী, তাহাদের কাছে হাঁড়ির কোনও খবর লুকাইবার উপায় নাই। সুতরাং নিতাইকে এক সের দুধ দিলে, মেয়ে-তিনটাকেও ভাতের সঙ্গে মুড়ির সঙ্গে মাখিয়া এক-আধ হাতা দুধ দিতে হয়। ঠাকুরমা এ-খরচটুকু বাঁচাইতে চান, ধেড়ে ধিঙ্গী মেয়ে সব, দু-পাটি করিয়া দাঁত, তাহাদের অত দুধ খাওয়ার ঘটা কেন? সব জিনিষই ত তাহারা খাইতে পারে? উহাদের বয়সে তাঁহারা দুধের বাটি ইচ্ছা করিয়া ঠেলিয়া ফেলিয়া দিয়াছেন, লোহার কড়াই সুদ্ধ চিবাইয়া খাইয়াছেন, আর এ-মেয়েদের রকম দেখ না, খুকীরা আজন্ম খুকীই থাকিবেন।

মাও তেমনি। মেয়েগুলির নোলা যা বাড়িয়াছে তাহা বলিবার নয়। সারাক্ষণ খাইতে দিলে অমনি অভ্যাস হইবেই ত? শ্বশুরবাড়ী গিয়া যখন খালি ঝাঁটা আর উনানের ছাই খাইতে পাইবে, তখন মায়ের সোহাগ থাকিবে কোথায়? মেয়েছেলেকে সর্ব্বদা পেট কাঁদাইয়া খাইতে দিতে হয়, না হইলে পরজীবনে অশেষ দুঃখ।

এহেন মহীয়সী ঠাকুরমা থাকা সত্ত্বেও অজ্ঞ বাপ-মায়ের বোকামিতে মেয়ে-তিনটা দুধ, ভাত, তরকারি, মাছ সবই খাইত।

মালতীর বাপের রোজগারেই সংসারটা চলে, কাজেই তাঁহাদের মতামত একেবারে উড়াইয়া দেওয়া যায় না। পৈতৃক সম্পত্তির মধ্যে এই ছোট একতলা বাড়ীখানি, কোনওমতে মাথা গুঁজিয়া থাকা চলে। যাহাই হউক, নিজের ঘর, মাসে মাসে ভাড়া গুনিতে হয় না, কল, চৌবাচ্চা লইয়া পাশের ঘরের ভাড়াটের সঙ্গে সারা দিন-রাত ঝগড়াও করিতে হয় না।

পাড়ায় কর্পোরেশনের অবৈতনিক স্কুল আছে, বছর ছয় বয়স হইতে-না-হইতে মালতীও দিদিদের সঙ্গে সেখানে পড়িতে চলিল। আজকালকার দিনে উৎপাতের ত অন্ত নাই! শ্বশুরবাড়ী গিয়া যে-বউকে চব্বিশ ঘণ্টা খালি বাসন মাজিতে ও ভাত সিদ্ধ করিতে হইবে, তাহাকেও দেখিতে আসিয়া বরপক্ষ প্রথম জিজ্ঞাসা করিবেন, "মেয়ে পড়েছে কতদূর? গানবাজনা জানে কি না?" কাজেই মেয়েকে স্কুলে দেওয়া ছাড়া উপায় কি?

বাড়ীতে থাকিলে না-হয় তিনটাকে গামছা বা মা-খুড়ীর ছেঁড়া শাড়ীর টুক্‌রা পরাইয়া রাখা চলে, কিন্তু স্কুলে ত যথোপযুক্ত বেশভূষা না হইলে পাঠান চলে না? ফ্রক হোক বা শাড়ী জামা হোক, কিনিয়া দিতেই হইবে। অবশ্য, সত্যের খাতিরে স্বীকার করিতে হয় যে, এ দিকে মালতীর মা-বাপ বিন্দুমাত্র বদান্যতা দেখাইতেন না, যথাসম্ভব খেলো সস্তা জিনিষই দিতেন। একই শাড়ী পরিয়া সরযূ আর বিমলা দিনের পর দিন স্কুলে যাইত। শাড়ীর আঁচলে মুখ-হাত মুছিয়া সেটাকে আশ্চর্য্য চিত্রবিচিত্র করিয়া তুলিত, জামার পিঠে চুলের তেল আর ময়লা লাগিয়া বেশ পুরু একটি কাল স্তর জমা হইয়া উঠিত, কিন্তু সেদিকে কাহারও

লক্ষ্য ছিল না। মালতীর ঘরে-তৈরি ছিটের ফ্রকের অবস্থাও তাহার চেয়ে কিছু উৎকৃষ্ট ছিল না, তবে সেটা মা মধ্যে মধ্যে স্নানের সময় কাচিয়া দিতেন এই যা রক্ষা।

কিন্তু স্কুলে কত রকম মেয়ে আসে, কত রকম তাহাদের বেশভূষা। তাহারা মাথায় লাল, নীল, হল্‌দে, কত রকম ফিতা বাঁধে, হাতে গোছা গোছা রেশমী কাঁচের চুড়ি পরে, ঝুঁটা মণিমুক্তার ব্রোচ, ইয়ারিং ও আংটিতে গা সাজাইয়া আসে। শস্তায় আজকাল রং-বেরঙের কত রকম শাড়ী জামা পাওয়া যায়, তাহাও যথাসাধ্য জুটাইয়া পরে। সরযূ, বিমলা, মালতীই বা দেখিয়া না শিখিবে কেন? তাহাদেরও ত মানুষের প্রাণ!

সন্ধ্যাবেলা বাড়ী ফিরিয়াই বিমলা সুর তুলিল, "কাল আমি ওই শাড়ী প'রে কিছুতে যাব না। সবাই নাক সিঁটকায়, ঘেন্না করে। কেন আমরা কি ভদ্দর লোক না? এক মাস এক কাপড় প'রে যাব কেন?"

মা এধার-ওধার চাহিয়া বলিলেন, "চুপ কর্, এখনি তোর ঠাকুরমা শুনলে বক্‌বক্ ক'রে মরবে। কাল ভোরে আমি তোর শাড়ী সোডা দিয়ে কেচে দেব।"

বিমলা দুষ্টু টাট্টু ঘোড়ার মত ঘাড় বাঁকাইয়া বলিল, "কেচে দিলেও আমি পরব না। আমার একটা লাল কাবেরী শাড়ী চাই।"

মা বেচারী মেয়েদের দুঃখ বুঝিতে পারেন, কিন্তু তাঁহার ক্ষমতাই বা কতখানি? বলেন, "সে পুজোর সময় দেব এখন। যখন তখন কি আর আমরা অত শাড়ী কিনতে পারি?"

বিমলা কিছু বলিবার আগেই সরযূ নাকিসুরে গর্জ্জন করিয়া ওঠে, "রোঁজ রোঁজ একটা তেঁলচিটে কাপড়ের পাড় দিয়ে চুল বাঁধব কেন? আমার লাল রিবন্ চাই।"

মা এইবারে চটিয়া বলিলেন, "দেব কোথা থেকে? আমার মুণ্ডু থেকে? দেখছ না আমি কেমন দিনরাত রিবন্ আর কাবেরী শাড়ী প'রে আছি?"

মালতী তৎক্ষণাৎ বলিয়া উঠিল, "তোমার গায়ে ত গাদা গাদা গয়না? আমাদের তুমি কিচ্ছু দেও না।"

মা দুঃখের হাসি হাসিয়া বলিলেন, "খুব গাদা গাদা দেখেছিস বাছা। যা দু-এক টুক্‌রো আছে, তা তোমাদের তিন বোনকে পার করতে কোথায় ভেসে যাবে। এতেই কুলোত ত বর্ত্তে যেতাম। এখন ভিটেটুকু বজায় থাকে তাহলেই বাঁচি।"

মেয়েদের তখন বিবাহ বা ভিটের ভাবনা বিশেষ কিছু ছিল না। তাহারা সমানে নাকে কাঁদিতে লাগিল। ফল যে একেবারে কিছু না হইল তাহা নহে। বিমলা মায়ের বহুকাল-পরিত্যক্ত একটা ছেঁড়া গরদের শাড়ীর ছেঁড়া অংশটুকু বাদ দিয়া পরিয়া ফেলিল। রেশমের কাপড় ত? না-হয় একটা দিক ছেঁড়াই ছিল, সেটা কে বা দেখিতে আসিতেছে? আনন্দের আতিশয্যে মেয়ে সেদিন খাইতেই ভুলিয়া গেল।

সরযূ কাঁদিয়া কাটিয়া কাকীমার কাছ হইতে সত্যকারের একটা রিবনই আদায় করিয়া ফেলিল। কাকীমাটির খুব বেশীদিন বিবাহ হয় নাই, কাজেই নববধূজীবনের সম্পদ্ এখনও কিছু কিছু বাক্স-প্যাটরার ভিতর আবিষ্কার করা যায়।

মালতীকে মা দুগাছা নূতন কাচের লাল টুকটুকে চুড়ি কিনিয়া শান্ত করিয়া দিলেন। এই রকম যখন তখন চলে। কখনও বা হীরা চাহিয়া মেয়েরা জীরা পায়, কখনও বা পায় শুধু চড় চাপড়, গালাগালি। যাহা হউক, দিন এক রকম তাহাদের কাটিয়া যায়, সব সময়েই যে দুঃখে কাটে তাহা নয়। বাহিরের উপকরণের অভাব তাহারা অন্তরের কল্পনার সম্পদ্ দিয়া পূর্ণ করিয়া তোলে। মা-বাপের স্নেহ যতটুকু পায় ততটুকুই তাহাদের কাছে অমূল্য। তাহা ছাড়া সঙ্গী-সাথীর অভাব নাই, বাঙালীপাড়া, সারাক্ষণই এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া খেলা করিয়া বেড়ান যায়।

কিন্তু এ-সুখই বা বাঙালীর মেয়ের জীবনে কতদিন থাকে? সরযূ বারো ছাড়াইয়া তেরোয় পা দিতে-না-দিতেই তাহার বাপ-মায়ের কান ঝালাপালা হইয়া গেল। ঘরে-বাহিরে খোঁটার অবধি রহিল না। "ও মা, মেয়ে যে পেল্লায় হয়ে উঠেছে গো! বাপ-মায়ের গলা দিয়ে ভাত গলছে কি ক'রে? সময়ে বিয়ে দিলে যে ছেলের মা হত! আমরা ত ও-বয়সে কাঁকে কোলে ছেলে নিয়ে স্বামীর ঘর করেছি।"

এসব বাক্যবাণ ত নিয়তই সরযূর মায়ের কানে বর্ষিত হইতেছিল। জ্বালার উপর তাঁহার আর-এক জ্বালা

হইয়াছিল শাশুড়ীর উৎপাত। নাতনীকে দেখিলেই বৃদ্ধা যেন ধনুষ্টঙ্কারের মত বাজিয়া উঠিতেন, "বাবাঃ, সোহাগ ক'রে খাইয়ে খাইয়ে মেয়ের চেহারা করেছে দেখ না? যেন চব্বিশ বছরের ধিঙ্গী মেয়েমানুষ। গরীবের কথা বাসি হ'লে মিষ্টি লাগে, তখন বলেছিলাম না যে আদর ক'রে অত গিলিও না গো, গিলিও না। এখন মেয়ের মাথায় কুলো ঠেকাও, যদি বাড় কমে।"

কুলো ঠেকাইতে হইল না। ঠাকুরমা, পিসীমা ও প্রতিবেশিনীদের সুমধুর বাক্যের মহিমায় সরযূ এমনিই শুকাইয়া যাইতে আরম্ভ করিল। মা দেখিয়া শুনিয়া এবার বাপের পিছনে লাগিলেন, "মেয়েটার যেমন হোক একটা বিয়ে দিয়ে দাও গো, নইলে বাক্যির জ্বালা দিয়ে দিয়েই ওরা ওকে মেরে ফেলবে।"

বাপ বলিলেন, "বিয়ে দিয়ে দাও বললেই অমনি বিয়ে হয়ে যায় কি না? টাকা কোথায় তোমার?"

গৃহিণী বলিলেন, "গরীবের মেয়েরাও ত আজন্ম আইবুড়ো থাকে না, তাদেরও ত বিয়ে হয়? আমি ত আর জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট জামাই চাচ্ছি না? আমায় যে ঘরে-বাইরে অতিষ্ঠ ক'রে তুলেছে।"

সরযূর বাবা বলিলেন, "হুঁ।" বলিয়া খাওয়া সারিয়া, পাড়ার চৌধুরীদের বাড়ী তাস খেলিতে চলিয়া গেলেন। কিন্তু গৃহিণীর কথাটা তাঁহার মনে রহিল। পাত্রের সন্ধানে নিজেও মন দিলেন, বন্ধুবান্ধব, আত্মীয়স্বজন সকলকেই অনুরোধ উপরোধ করিতে লাগিলেন।

সরযূর বর জুটিয়া গেল। জজ, ম্যাজিষ্ট্রেট সত্যই আসিল না। আসিল যে, সে একটি গবর্ণমেণ্ট অফিসের কেরাণী, বিপত্নীক, প্রথম পক্ষের একটি ছেলেও আছে। বয়স ছত্রিশ-সাঁইত্রিশের কম হইবে না। ভালর মধ্যে এইটুকু যে চাকুরীতে উন্নতির সম্ভাবনা আছে।

জামাই কাহারও পছন্দ হইল না, হইবার কথাও নয়। সরযূ বেচারী বিবাহের আয়োজনের মধ্যে এবং গায়ে-হলুদের তত্ত্বের ভিতর কয়েকখানা রেশমের শাড়ী এবং প্রসাধনের কতকগুলি উপকরণ দেখিয়া খানিকক্ষণ খুব খুসি হইল। এত জিনিষ, এত কাপড় জামা তাহার জন্য? কিন্তু বিবাহের সময় বরের বিশাল ভুঁড়ি, এবং সুপুষ্ট গোঁপ জোড়া দেখিয়া তাহার সকল আনন্দ কর্পূরের মত উবিয়া গেল। বিবাহের পরদিনই সরযূ বাপের বাড়ী ত্যাগ করিল, এবং আর কোনদিন সেখানে রাত কাটাইবার অনুমতি পাইল না। তাহাকেই সংসারের গৃহিণীর পদ গ্রহণ করিতে হইল যখন, তাহার কি আর তখন হট হট করিয়া খালি বাপের বাড়ী যাওয়া পোষায়?

বিমলার রংটা একটু মাজাঘষা ছিল, গোধূলির আলোয় পাউডার স্নো মাখাইয়া দাঁড় করাইয়া দিলে ফরশা বলিয়া চালাইয়া দেওয়া যায়। কপালটাও বোধ হয় তাহার দিদির চেয়ে কিছু ভাল ছিল। সরযূর বিবাহের বছর-দেড় পরে, ভগ্নীপতিই তাহার জন্য একটি বর জুটাইয়া দিল। ছেলেটি মোটের উপর ভালই। বি-এ পাস করিয়া চাকরিতে ঢুকিয়াছে। মাহিনা বেশী নয়, কিন্তু বাড়ীর অবস্থা ভাল। দেশে জমিজমা, বাড়ীঘর আছে। মাত্র একটি ছেলে সে বাপমায়ের, বোন একটি আছে বটে, কিন্তু তাহারও বিবাহ হইয়া গিয়াছে। শ্বশুর বাঁচিয়া আছেন শাশুড়ী নাই। বিমলার বিবাহে সকলেই খুসি হইল।

কিন্তু দুই মেয়ে পার করিতে বাপ মায়ের ত হাঁড়ি শিকায় উঠিবার জোগাড়। গায়ের গহনা দিয়াই কিছু মালতীর মা দুই-দুইটি মেয়ে পার করিতে পারেন নাই। বাড়ী বাঁধা দিয়া টাকা কৰ্জ্জ করিয়া আনিতে হইয়াছে। ঋণ শোধ করিয়া বাড়ী যে কোনও দিন মহাজনের কবলমুক্ত করিতে পারিবেন, এ-আশা আর যাহারই থাক, মালতীর বাবার নাই।

ঠাকুরমা ক্রমাগত গজগজ করেন। "মুখপুড়ীদের বিয়ে দিতেই আমার ভিটেমাটি সব উচ্ছন্ন যাবে গো! আমার সোনার চাঁদ নিতুকে রাক্কুসীরা পথে বসাবে গো! এমন শত্তুরও সব ঘরে জন্ম নিয়েছিল!"

কিন্তু এখনও মালতীর বিবাহ বাকি। তাহাকে যে কি দিয়া পার করা হইবে তাহা পিতামাতা ভাবিয়া পান না। বাড়ীখানা বিক্রয় করিয়া ফেলিলে হয়ত হাজার-দেড় টাকা আরও পাওয়া যায়, কিন্তু খোকাকে কি সত্যই পথে বসাইবেন? আর বুড়ী ঠাকুরমা ত তাহা হইলে স্বামীর ভিটার শোকে দাঁড়াইয়া মারা যাইবেন। মালতীর বাবার সামান্য কিছু মাহিনা বাড়িয়াছে, সুদ মাসে মাসে

দিতেছেন, আসলেরও কিছু হয়ত সামনের বছর দিতে পারিবেন। কিন্তু ইতিমধ্যে মালতী যে তেরো পার হইয়া চৌদ্দয় পা দিতে চলিল! নিতান্ত সে ছোটখাট দেখিতে তাই রক্ষা। পাড়াপড়শীর চোখ এখনও তাহার উপর তেমন তীব্রভাবে পড়ে নাই।

মালতীর রংটা আবার তিন বোনের ভিতর সকলের চেয়ে কাল। তবে মুখখানিতে খুব লাবণ্য আছে, বড় বড় চোখ দুটি দর্শক মাত্রকেই মুগ্ধ করে। মাথায় চুলও একরাশ। কিন্তু এসব দেখিতে আসিবে কে? হাড়গিলার মত চেহারা হইলেও যদি চামড়াটা একটু শাদা থাকিত, তাহা হইলে মা-বাপের দুর্ভাবনা অনেকখানিই কম হইত।

বিবাহ যখন হইতেছে না তখন শুধু শুধু ঘরে বসিয়া থাকিয়া লাভ কি? মালতী এখনও স্কুলে যায়। কর্পোরেশন স্কুলে যতখানি বিদ্যালাভ করা যায়, তাহা অর্জ্জন করা তাহার চুকিয়া গিয়াছে। পাড়ায় নূতন একটা হাই ইংলিশ স্কুল হইয়াছে, সেইখানেই সে পড়ে। মেয়ে পড়ায় মন্দ না, তাই বাপ সেক্রেটারীকে ধরাধরি করিয়া অর্দ্ধেক মাহিনায় তাহাকে ঢুকাইয়া দিয়াছেন। স্কুলের গাড়ীতে সে চড়ে না, ঝিয়ের সঙ্গে হাঁটিয়াই যায়, বেশী ত দূর না।

এখন আর তাঁহার বাল্যকালের মত পোষাক-পরিচ্ছদের দৈন্য নাই। তবে খুব যে প্রাচুর্য্য আসিয়াছে তাহাও নয়। তবু সপ্তাহে সপ্তাহে এখন সে কাপড়-জামা বদলাইতে পায়। স্কুলে শেলাই শিখিয়াছে, ব্লাউজ সেমিজ চলনসই রকম শেলাই করিতে পারে। দিদিদের কাছ হইতেও যখন তখন এটা সেটা উপহার পায়। ভগ্নীপতি দুইজনই ছোট শালীটিকে সুনজরে দেখে, কাজেই দিদিরা পূজার সময় ছোট বোনকে একখানা রঙীন শাড়ী কিনিয়া দিতে চাহিলে অনুমতির অভাব হয় না।

মালতীর মন এখন কিশোরীর অকারণ আনন্দ ও অকারণ বিষাদে সারাক্ষণ দোলায়মান। কেনই যে তাহার চিত্ত একদিন কানায় কানায় ভরিয়া উঠে তাহা সে বুঝিতে পারে না, আবার কেনই যে আর-একদিন বিশ্বসংসার তাহার চোখে কাল হইয়া যায়, তাহারও কারণ সে খুঁজিয়া পায় না। সে যেন স্বপ্নলোকের মধ্য দিয়া চলিয়াছে, সব অবাস্তব, সব রহস্যময়। তাহার জাগরণ কিসের অপেক্ষা করিয়া আছে কে জানে?

মা মাঝে মাঝে রাত্রে ফিশফিশ করিয়া স্বামীকে বলেন, "ওগো, লতি যে পনেরোয় পড়তে চলল।"

বাপ চটিয়া বলেন, "তা চলল ত কি করব? দড়ি বেঁধে তার বয়সটাকে পিছন দিকে টেনে ধ'রে রাখব?"

মা চটিয়া বলেন, "আহা, কি বা কথার ছিরি!"

বাপ বলেন, "চেষ্টা ত যথাসাধ্য করছি। বিনা পয়সার চেষ্টায় কি বা হয়? এক ভরি সোনাও ত আর ঘর ঝেঁটলে বেরবে না?"

মা বিষণ্ন দৃষ্টিতে নিজের শাঁখাপরা হাত দুইটার দিকে তাকাইয়া থাকেন।

মালতীর দুই দিদি যে-বয়সে ছেলের মা হইয়াছে, সে সেই বয়সেও স্কুলে পড়িতে লাগিল। আর একটা বছর যদি মানে মানে কাটিয়া যায়, তাহা হইলে ত সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিয়া পড়িবে। পরীক্ষাটা দিতে পারিলে চমৎকার হয়।

কিন্তু এ-বাড়ীর মেয়ের অদৃষ্টে অতখানি আর সহিল না। তাহারও বিবাহ হইয়া গেল।

মালতীর বড় পিসীমার বেশ অবস্থাপন্ন ঘরে বিবাহ হইয়াছিল। বাপের বাড়ীর অবস্থা পড়িয়া গিয়াছে, কাজেই বড় মানুষের বউ এদিকে বড় একটা আসিতে পাইতেন না। কালেভদ্রে দেখাসাক্ষাৎ হইত। স্বামীর সঙ্গে বিদেশেই তাঁহার দিন বেশীর ভাগ কাটিয়া যাইত। একটি মাত্র ছেলে, সেও বিবাহ করিয়া সংসারী হইয়াছে। বউও বড় মানুষের মেয়ে, শাশুড়ীকে খুব যে একটা মানিয়া চলে তাহা নহে।

প্রৌঢ় বয়সে হঠাৎ বিধবা হইয়া মালতীর পিসী কেমন যেন অবলম্বনহীন হইয়া পড়িলেন। শ্বশুরবাড়ীর সংসারটা যেন মরীচিকার মত অকস্মাৎ মিলাইয়া গেল, কিছুতেই আর এটাকে নিজের বলিয়া তাঁহার মনে হইল না। বহুকাল পরে আবার শোকাতুর চিত্তে তাই তিনি নিজের বাল্যজীবনের ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। হাজার হউক, মা ত এখনও বাঁচিয়া আছেন?

দিন কতক অবিশ্রাম কান্নাকাটির পর মোহিনী-ঠাকুরাণীর মনটা যখন একটু শান্ত হইল, তখন তিনি একবার ভাল করিয়া বহুদিন-পরিত্যক্ত বাপের বাড়ীর সংসারটার দিকে তাকাইয়া দেখিলেন। সব চেয়ে বড় হইয়া এবার তাঁহার চোখে পড়িল অনূঢ়া মালতী।

মোহিনী মাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "লতির এখনও বিয়ে দাও নি কেন গা? মস্ত ডাগর মেয়ে হয়েছে যে? আমার শ্বশুরের গুষ্ঠীর কোনো মেয়ে ত ন' পেরিয়ে দশে পা দিতে পায় নি। কর্ত্তা বলতেন, সময় মত মেয়ের বিয়ে না দিলে নিমিত্তের ভাগী হতে হয়।"

মা বলিলেন, "নিমিত্তের ভাগী হ'লেই বা করছি কি? তোকে দুঃখের কথা বলব কি মা, ভিটেটুকু সুদ্ধ বাঁধা পড়েছে বড় দুই আবাগীকে পার করতে। আমার হীরের টুক্‌রো নিতু বুঝি এবার পথে বসে। এখনও ত এ রাক্ষসী বাকি।" গলা নামাইয়া বলিলেন, "শত্তুরের মুখে ছাই দিয়ে এটা ত পনর পূরতে চলল, যতই লুকোই ছাপাই লোকে বিশ্বাস করবে কেন? তাদেরও ত চোখ আছে?"

মোহিনী গালে হাত দিয়া বলিলেন, "ওমা, কোথায় যাব গো। শীগগির একে পার কর, কখন বুঝি বা কি অনর্থ হয়।"

মা বলিলেন, "পাত্তর কোথা? বিনে পয়সায় ত বুড়ো-হাবড়া দোজবরেও ঘরে নিতে চায় না।"

মোহিনী খানিক ভাবিয়া বলিলেন, "ছেলে একটি আছে, তা কি আর তোমাদের পছন্দ হবে? টাকার থাঁইও তাদের বড় নেই, আমি ধরাধরি করলে বিনা পণেই হয়ে যেতে পারে।"

মা বলিলেন, "বলে ও ক্যাংলা ভাত খাবি, না হাত ধোব কোথায়? তুই নাম ঠিকানা দে দেখি, কেমন না ওরা মেয়ের বিয়ে দ্যায় তাই আমি দেখব। টাকা নেই যার, তার আবার পছন্দ অপছন্দ কি? কোনমতে মেয়ে উচ্ছুগ্গু হয়ে গেলে হয়।"

মোহিনী ঠিকানা দিলেন। ছেলে দূর সম্পর্কে তাঁহার ভাগিনেয় হয়। আই-এ পাস, চাকরি-বাকরি করে না। দেশে জমিজমা বাড়ীঘর সব আছে, তাহাই দেখাশুনা করে। বাবা মা নাই, দুটি ছোট ছোট ভাই আছে ও রুগ্ন জ্যেঠা-মহাশয় আছেন। সংসার গৃহিণী-অভাবে অচল, তাই তাহারা বড়সড় মেয়ে খুঁজিতেছে। পছন্দমত মেয়ে হইলে তাহারা পণ চায় না। তবে গহনাগাঁটি দু-একখানা, বরাভরণ, বাসন-কোসন এসব চাহিবে বই কি? এ না হইলে কি বিবাহ হয়?

মালতীর মা বলিলেন, "তাই বা আমি কোথা থেকে দিচ্ছি?"

শাশুড়ী ননদ একবাক্যে বলিয়া উঠিলেন, "তা বললে চলবে কেন? তিন-তিনটে মেয়ে গর্ভে ধরেছ যখন, তখন মাথার চুল বাঁধা দিয়েও টাকা আনতে হবে।"

পাত্রপক্ষের সঙ্গে কথাবার্ত্তা চলিতে লাগিল। গ্রাম-সম্পর্কে এক খুড়াকে সঙ্গে লইয়া পাত্র একদিন স্বয়ং আসিয়া মেয়েকে দেখিয়া গেল। তাহার পছন্দই হইল। পাড়াগাঁয়ে এ বউ অমানান হইবে না। বড়সড় আছে, কাজকর্ম্মও শিখিয়াছে। গরীবের ঘরের মেয়ে, নিজের অবস্থায় সন্তুষ্ট থাকিবে। পণ তাহারা চায় না, তবে মেয়েকে খান-তিনেক গহনা দিতে হইবে, বরকেও আংটি ও রিষ্টওয়াচ দিতে হইবে।

পিসীমা আবার বরের দিকেরও সম্পর্কিতা, তিনি বলিলেন, "কিছু অন্যায্য বলছে না বাপু। কাজ নাইবা করল, খেতে পরতে দিতে ত পারবে?"

বড় জ্বালায় মালতীর মায়ের কথা ফুটিল, তিনি বলিলেন, "কিছু লুকিয়ে ছাপিয়ে রাখিনি ঠাকুরঝি, তুমি বরং বাক্স ডেক্স খুলে দেখ। কোথাও এক কুচি সোনা কি রূপো নেই। মা বাড়ী বেচবার নামে আত্মঘাতী হ'তে চা'ন, এখন তোমরাই পাঁচ জনে বল কোথা থেকে আমি গহনা দিই আর বরাভরণ দিই? যেমন ক'রে হোক হাজার টাকা বার না করলে, এসব হচ্ছে কি ক'রে? আত্মীয় কুটুম সব আসবে, তাদের পাতেও দুমুঠো দিতে হবে। মেয়েকেও খানকয়েক কাপড় জামা ক'রে না দিলে সে গিয়ে শ্বশুরবাড়ী দাঁড়ায় কি ক'রে?"

মোহিনী অনেকক্ষণ চুপ করিয়া ভাবিলেন। গহনাগাঁটি তাঁহার আছে অনেকগুলাই, কিন্তু পরার দিন আর নাই। পুত্রবধূর উপর তিনি বিন্দুমাত্রও সন্তুষ্ট নন, তাহার দেমাক বড় বেশী। তাহাকে এসব দিয়া যাওয়ার চিন্তা তিনি স্বপ্নেও করেন না। তবে নাতি নাতনী একটি একটি করিয়া ঘরে আসিতেছে, তাহারা প্রত্যাশা করিবে ত? আর বুড়া বয়সে নিজের বলিতে এই ক'খানাই ত, আর কিসে বা তাঁহার অধিকার? কাজেই সব বেহাত করা চলে না।

তবু ভাইঝিটার বিবাহ না দিলেই নয়, উহার দিকে যে আর চাওয়া যায় না? তাঁহাদের দিনের গহনা ছিল সব

ভারি ভারি, তিনি মানুষটাও দশাসই চেহারার। তাঁহার একখানা গহনা ভাঙিলে লতির তিনখানা হইবে। ভাবিয়া-চিন্তিয়া তিনি ভাজকে ডাকিয়া বলিলেন, "দেখ বাপু, গহনা তিনখানা না-হয় আমি দিচ্ছি, হাজার হ'লেও তোমাদের দায় আমারও দায়। বাপের বাড়ীর দুর্নাম কে শুনতে পারে? বাকিটা জোটাতে পারবে ত?"

এতক্ষণে মালতীর মায়ের বিবর্ণ মুখে হাসি ফুটিল, তিনি হেঁট হইয়া ননদের পায়ের ধূলা লইয়া বলিলেন, "তা দিতে হবেই যেমন ক'রে হোক।"

অতএব বিবাহের দিনক্ষণ দেখা হইতে লাগিল, কথাবার্ত্তা পাকা হইয়া গেল। সরযূ আসিল, বিমলাও আসিল। বরের আংটি সরযূই দিবে বলিল, দ্বিতীয় পক্ষের গৃহিণী সে, তাহার একটু খাতির বেশী। বিমলা বিবাহের শাড়ী জামা দিল, লুকাইয়া অন্য কাপড়চোপড়ও কিছু কিছু দিল। মালতীর দুই মামার কাছে আবেদন নিবেদন করিয়া তাহার মা কিছু টাকা আদায় করিলেন, তাহাতে ঘড়ি আর বাসন-কোসন জোগাড় হইল। মালতীর মা গোছানী গৃহিণী, ছেঁড়া কাপড় দিয়া বাটি ঘটি প্রায়ই তিনি কিনিয়া রাখিতেন। সেগুলি এবার কাজে লাগিল। কিছু টাকা ধার হইল বটে, তবে সে সামান্য, তাহার জন্য বাড়ী বিক্রয় হইবে না।

মোটের উপর সবাই খুসি হইল এই বিবাহে, বিয়ের ক'নে ছাড়া। তাহার কল্পনার রাজপুত্র বর কোথায় হাওয়ায় মিলাইয়া গেল, তাহার বদলে আসিল কি না এই অজ পাড়াগেঁয়ে ব্যক্তি? মাগো, কি করিয়া সে অমন স্থানে বাস করিবে? সাপে তাহাকে খাইয়া ফেলিবে, ম্যালেরিয়া হইয়া সে মরিয়া যাইবে। ওদেশে ত স্নানের ঘর নাই, কত কি নাই। মাগো মা, সে বাঁচিবে কি করিয়া? মালতী পাড়াগাঁ কখনও চোখে দেখে নাই, তাহার কল্পনায় সেটা একটা বিভীষিকার রাজ্য হইয়া দেখা দিল। তাহার চোখে জল আসিয়া পড়িল, মুখ ভার হইয়া গেল।

বিমলা বলিল, "ওকি লো, আজ বাদে কাল বর আসছে, তুই অমন মুখ হাঁড়ি ক'রে বেড়াচ্ছিস কেন? ছেলে ত ভাল শুনলাম।"

মালতী গাল ফুলাইয়া বলিল, "ছাই ভাল! দেখ এখন ঐ পাড়াগাঁয়ে গিয়েই আমি ম'রে যাব। শহরে বুঝি আর ছেলে ছিল না?"

সরযূ বলিল, "বিদুষী মেয়ে কি না তাই তাঁর মন উঠছে না। আমাদের বাপু বাপ-মায়ে যেমন ধ'রে দিয়েছে তেমন নিয়েই আছি। সাধে বলে মেয়ে মানুষের বেশী পড়াশুনো করতে নেই?"

বিমলা বলিল, "সব তোর বাড়াবাড়ি বাপু, পাড়াগাঁয়ে গেলেই মানুষ অমনি ম'রে যায় কি না? এই ত ও-বছর পূজোর সময় আমরা মাস খানিক পুরো আমার মামাশ্বশুরের গ্রামে গিয়ে থেকে এলাম। কই, সবাই কি গেছি ম'রে?"

সরযূ বলিল, "যেমন কথা মেয়ের, গরীবের ঘরের মেয়ের অত খোঁট ধরলে চলবে কেন? চল্, তোর গহনা এসেছে দেখবি চল্। পিসীমার গতরকে ধন্যি, তার বালা জোড়া ভেঙেই লতির চুড়ি, হার আর আর্ম্মলেট্ তিনটাই হয়ে গেল প্রায়। মাত্র আর দু-ভরি ভাঙতি সোনা দিয়েছেন।" কিন্তু গহনার খবরেও মালতীর মুখের আঁধার কাটিল না।

তা নাই কাটুক, বিবাহ তাহার হইয়াই গেল। বাসর-ঘরে মেয়ের ভীড়ে বর তাহার সঙ্গে কথা বলিবার কোন সুবিধাই পাইল না, সুতরাং মালতী যে কতখানি চটিয়া আছে তাহাও সে জানিতে পারিল না।

পরদিন তাহাকে যাত্রা করিতে হইল এই অবাঞ্ছিত বরের সহিত, তাহার পাড়াগাঁয়ের ঘরে। বর, ক'নে, বরযাত্রী সব এক গাড়ীতেই উঠিল। বেশী দূর নয়, কলিকাতা হইতে ঘণ্টা দুয়েকের পথ। সঙ্গে মা একটা ঝি দিয়াছিলেন তাই রক্ষা, না হইলে ঘোমটা টানিয়া, ঘাড় গুঁজিয়া বসিয়া বসিয়া মালতীর ঘাড়ে মাথায় ব্যথা ধরিয়া যাইত। ঝি থাকাতে সে তবু দু-চারটা কথা বলিল, গোটা দুই মিষ্টি মুখে দিয়া এক গেলাস জলও খাইল। পাড়াগাঁয়ের ষ্টেশনে এমন হুড়মুড় করিয়া তাহাকে নামিতে হইল যে দশ-বার মিনিট তাহার বুকটা কেবলই ঢিপ ঢিপ করিতে লাগিল।

ছোট্ট ষ্টেশন, মালতী লাল বেনারসীর ঘোমটা ফাঁক করিয়া দেখিতে লাগিল। তাহার চারিদিকে ধানের ক্ষেত, মাঝে মাঝে কুঁড়েঘর, পুকুর, বাঁশঝাড়। বিকাল হইয়া আসিয়াছে, পশ্চিমাকাশে একেবারে রঙের প্লাবন। কিন্তু রাস্তাঘাট নাই, গাড়ীঘোড়া কিছু নাই। ঐ সরু আলের

উপর দিয়া মানুষগুলি যেমন হাঁটিয়া যাইতেছে, তাহাকেও অমনি যাইতে হইবে নাকি ? বাপ রে, ঐ কাদার ভিতর যদি সে পড়িয়া যায় ?

কিন্তু হাঁটিয়া তাহাকে যাইতে হইল না। হুম্ হুম্ করিতে করিতে একখানি পালকী আসিয়া হাজির হইল। মালতী ও বর তাহাতে চড়িয়া বসিল, আর সকলে হাঁটিয়া চলিল।

কয়েক মিনিটের মধ্যেই তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌছিল। বাড়ীতে গৃহিণী কেহ নাই, তবে শুভকর্ম্ম নিয়ম মত সম্পন্ন করিতে লোকের অভাব হইল না। পাড়া-পড়শী সকলে আসিয়া জুটিল, রীতিমত বরণ করিয়া বউ ঘরে তোলা হইল। বুড়ো জ্যাঠা মহাশয় এক জোড়া মকরমুখো বালা দিয়া মালতীর মুখ দেখিলেন।

দেখিতে দেখিতে সন্ধ্যা হইয়া আসিল। এখানে ত বিজলীর বাতি নাই, মিটমিটে হারিকেন লণ্ঠনে যতদূর আঁধার দূর হয় ততটাই হইল। মালতীর মনের ভিতরটাও কাল হইয়া আসিতে লাগিল। খড়ের চাল, মাটির দেওয়াল, ইহার ভিতর মানুষ থাকে কি করিয়া ? তবু ভাল যে উঠানে দরমার বেড়া দিয়া ঘিরিয়া নূতন বউয়ের জন্য একটা স্নানের ঘর হইয়াছে। বরের যে এতটুকু বিবেচনা আছে তাহাতে মালতীর মন একটু কৃতজ্ঞ না হইয়া থাকিতে পারিল না।

পাড়াপড়শী ক্রমে চলিয়া যাইতে আরম্ভ করিল, খালি রহিয়া গেলেন একজন বৃদ্ধা। ইনি বর সুরেন্দ্রের দূর-সম্পর্কের মাসীমা, বউকে একটু দেখাইয়া শুনাইয়া গৃহিণীপদে অধিষ্ঠিত করিয়া দিয়া তবে যাইবেন। আজ রাতটা ইঁহারই সঙ্গে শুইয়া মালতীর কাটিয়া গেল। দুই-তিন দিনের গোলমালে সে ক্লান্ত হইয়াছিল যথেষ্টই, কাজেই নূতন ঘরে শোওয়া সত্ত্বেও সে ঘুমাইয়া পড়িল।

পরদিন সাদাসিধা ভাবে একটা বৌভাতও হইয়া গেল। মালতীকে পরিবেশন করিতে হইল, তা সে ভাল ভাবেই করিল। কলিকাতায় থাকিয়া এত বড় হইয়াছে বলিয়া কি সে কাজ জানে না ? কাজ যথেষ্টই তাহাকে করিতে হইয়াছে। বৌভাতে উপহার পাইল সে খানকতক তাঁতের শাড়ী, কাঠের লাল সিঁদুর-কৌটা এবং গোটা কতক টাকা। তাহার সঙ্গিনীদের কাছে যে কত রকম গল্প শুনিয়াছিল, তাহার সঙ্গে কিছুই মিলিল না।

রাত্রে ফুলশয্যা। এইবার বরের সঙ্গে খানিক আলাপ-পরিচয় হইল। মালতী মনে করিয়াছিল খুব শক্ত হইয়া থাকিবে, এই পাড়াগেঁয়ে লোকটার কাছে একেবারেই ধরা দিবে না। কিন্তু হঠাৎ দেখিল মানুষটার মিষ্ট কথাবার্ত্তায় আর আদরে তাহার মন যথেষ্টই নরম হইয়া আসিয়াছে, বেশ ভাল ভাবেই সে বরের সঙ্গে কথা বলিতেছে।

সুরেন্দ্র জিজ্ঞাসা করিল, "আচ্ছা লতু, পাড়াগাঁয়ে থাকতে তোমার খুব কষ্ট হবে না ? জন্মে কখনও ত শহর ছেড়ে নড় নি ?"

মালতী বিজ্ঞভাবে বলিল, "কষ্ট হ'লেই আর কি করছি বল ? নিজের ঘর ত আর ফে'লে দেওয়া যায় না ? আচ্ছা, তুমি আমার ডাকনাম জানলে কি ক'রে ?"

সুরেন্দ্র বলিল, "কেন জানব না ? আমার কি কান নেই ? বাসরে সবাই লতি লতি ক'রে কথা বলছিল না ?"

মালতী বলিল, "ও তাই।" কথাবার্ত্তা সে-রাত্রে আর খুব বেশী অগ্রসর হইল না।

সকালে তাহাদের যেমন সময় উঠা অভ্যাস তাহার ঢের আগে সুরেন্দ্র তাহাকে জাগাইয়া দিল। বলিল, "গাঁয়ের মানুষ খুব ভোরে ওঠে, বিশেষ ক'রে মেয়েরা। মাসীমা পাশের ঘরে খুট্ খুট্ করছেন, শুনছ না ? তোমার আর শুয়ে থাকলে ভাল দেখাবে না।"

তা মালতীর ভোরে উঠিতে ভালই লাগে, সে উঠিয়া পড়িল। মাসীমা অবশ্য সেইদিনই তাহাকে কাজের ঘানিতে জুতিয়া দিলেন না। বলিলেন, "এর পর সবই ত করতে হবে তোমায় মা, তবে দুচার দিন যাক্।"

কাজ না করিলেও সারাদিনের ভিতর মালতীর সঙ্গে আর সুরেন্দ্রের দেখা হইল না। মালতীকে পাড়ার যত বৌঝি আসিয়া ছাঁকিয়া ধরিল। তাহাদের পাল্লায় পড়িয়া মালতীকে পুকুরে স্নান সুদ্ধ করিয়া আসিতে হইল। ভয়ে তাহার হাত পা ঠক্‌ঠক্ করিয়া কাঁপিতেছিল, এই বুঝি একেবারে ডুবিয়া মরে। কিন্তু প্রাণে বাঁচিয়াই সে ফিরিয়া আসিল, অবশ্য দুই-এক ঢোক জল যে না খাইল তাহা নয়। নানাদিকে অসুবিধা যে তাহার যথেষ্টই হইবে তাহা সে বুঝিতে পারিল। কিন্তু সহ্য করা ছাড়া উপায় কি ? সে ত আর বড়মানুষের মেয়ে

নয় যে গাড়ী বাড়ী করিয়া দিয়া বাপ তাহাকে কলিকাতায় বসাইয়া দিবেন ?

রাত্রে স্বামীকে সে জিজ্ঞাসা করিল, "তুমি কখনও কি কলকাতায় থাক নি ?"

সুরেন্দ্র বলিল, "তা থাকব না কেন, যখন কলেজে পড়তাম তখন ত কলকাতায়ই ছিলাম। কেন ?"

মালতী বলিল, "এমনি জিজ্ঞেস করছি। তোমার কলকাতা ভাল লাগে না ?"

সুরেন্দ্র বলিল, "তা যে না লাগে তা নয়। তবে গ্রামও ভাল লাগে।"

মালতী বলিল, "চাকরী-বাকরীর চেষ্টা করলে না কেন ?"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "বিদ্যে ত আই-এ পাস, তাতে আর কি জজিয়তি মিলত ? বেয়ারাগিরি করার চেয়ে নিজের জমিজমা দেখাই ভাল মনে করলাম। চ'লে ত যাচ্ছে, কারও কাছে হাত পাততে হয় না। ভাই দুটোকেও পড়াচ্ছি।"

মালতী বলিল, "পাসেই সব হয় নাকি ? কলকাতায় কত মানুষ টাকার পাহাড়ের উপর ব'সে আছে যারা ম্যাট্রিকও পাস করে নি।"

সুরেন্দ্র বলিল, "তেমন কপাল আমার নয়। যাক্ গে, তোমারও কিছুদিন পরে সয়ে যাবে অত ভাবছ কেন ? শহরেরই কি আর সব ভাল ?"

মালতী বলিল, "তা নয় অবিশ্যি। কিন্তু অবস্থার উন্নতি করতে ত চেষ্টা করা উচিত ?"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "আচ্ছা মেয়ে যা হোক। দু-দিন হ'ল ত বিয়ে হয়েছে, এরই মধ্যে সব ফে'লে ইকনমিক্সের প্রফেসরের মত বক্তৃতা দিতে সুরু করেছ। আর কি কোন কথা নেই ?" বলিয়া সে বধূকে কাছে টানিয়া লইল।

কিন্তু স্বামী ঠাট্টা করিলে কি হইবে, মালতীর মন হইতে যে এ চিন্তা যায় না। স্বামীর প্রতি ভালবাসা সঞ্চারের সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে লইয়া শহরে ঘর বাঁধার সাধ আরও তাহার প্রগাঢ় হইয়া উঠিতে লাগিল। সুরেন্দ্রের কাছে বলিতে সাহস হয় না কিন্তু মালতীর প্রাণ এখানে খালি ছট্‌ফট্ করে। পাড়াগাঁ দেখিতে সুন্দর বটে, কিন্তু এখানে থাকিতে ত ভাল লাগে না। কিছুতে যে সে আরাম পায় না।

কয়দিন পরে জোড় ভাঙিতে মালতী বাপের বাড়ী ফিরিয়া গেল। জলের মাছকে যেন ডাঙায় তোলা হইয়াছিল, জলে ফিরিয়া গিয়া সে প্রাণ পাইল। বর দিন-দুই থাকিয়া গ্রামে ফিরিয়া গেল। মালতী এখন কিছুদিন থাকিয়া তাহার পর ভাল দিন দেখিয়া যাইবে।

বিমলা আর সরযূ বোনের আসার খবর পাইয়া দেখা করিতে আসিল। মালতীর কোমল গাল দুটি টিপিয়া দিয়া বিমলা জিজ্ঞাসা করিল, "কি রে লতি, পাড়াগেঁয়ে বর পছন্দ হ'ল ?"

মালতী বলিল, "বর পছন্দ হয়েছে, পাড়াগাঁ পছন্দ হয় নি।"

সরযূ বলিল, "তাহলেই হ'ল। ঐ একটা পছন্দ হ'লেই, সঙ্গে সঙ্গে সব পছন্দ হয়ে যাবে।"

সরযূর স্বামী এখন ভাল কাজই করে, বিমলার অবস্থার অবশ্য বিশেষ পরিবর্তন হয় নাই। কিন্তু মালতীর চেয়ে ভাল ত ? কলিকাতা ছাড়িয়া ত তাহাকে যাইতে হয় নাই ? মালতী দুই দিদিকেই ধরিয়া পড়িল, "ভাই বড়দি, ভাই ছোড়দি, জামাইবাবুদের ধ'রে ওর যেমন হোক একটা কাজ এখানে ক'রে দাও না ? সত্যি বলছি ভাই, ওখানে বেশী দিন থাকতে হ'লে আমি ভেপ্‌সে মরে যাব। সে যা কাণ্ড, জান না ত ?"

বিমলা বলিল, "জানি লো জানি ! তাতে কি, দু-দিনে সয়ে যাবে। পরের গোলামী ভারি ভাল কি না ?"

মালতী বলিল, "সংসারে সবাই ত তাই করছে, ও করলেই বা ক্ষতি কি ? তোদের পায়ে পড়ি ভাই, আমার কথাটা মনে রাখিস।"

সরযূ বলিল, "বলব এখন তাকে। কিন্তু কাজ দাও বললেই কি আর কাজ হয় ? এই ত ওর ভাগ্নেটা ব'সে ব'সে খাচ্ছে, আজ অবধি কাজে ঢোকাতে পারলেন না।"

বিমলা বলিল, "তুই ত বলছিস্, তোর বর যদি রাজী না হয় ?"

মালতী হাসিয়া বলিল, "সে ভার আমার।" বরকে রাজী করা যে তাহার পক্ষে বিশেষ শক্ত হইবে না তাহা সে ইহারই মধ্যে বুঝিতে পারিয়াছে।

দিদিরা কথা দিয়া গেল যে যথাসাধ্য চেষ্টা করিবে।

মালতী তাগিদের ক্রটি রাখিল না, যতবারই দেখা হয় একই কথা বলে। সুরেন্দ্রকেও চিঠিতে জানাইয়া দিল যে তাহার চাকরীর চেষ্টা চলিতেছে। সুরেন্দ্র উত্তরে লিখিল যে স্ত্রী এবং শালীদের চেষ্টা সফল হইবার বিন্দুমাত্রও সম্ভাবনা নাই। কত শত এম-এ, বি-এ বলে কাজের অভাবে ফ্যা-ফ্যা করিয়া বেড়াইতেছে।

কিন্তু কাজ একটা জুটিয়া গেল। বিমলা একদিন দুপুর-বেলা বেড়াইতে আসিয়া জিজ্ঞাসা করিল, "হ্যাঁ রে, সুরেন রেলের কাজ করবে?"

মালতী বলিল, "তা করবে না কেন? কেন ছোড়দি, কাজ খালি আছে?"

ছোড়দি বলিল, "আছে ত একটা ছোটমোট। আমার জাঠতুতো ভাসুর রেলে কাজ করেন না? তিনি জংশনে থাকেন। চার জন নতুন লোক নেওয়া হবে, এখন মাইনে খুব কম, পঁচিশ টাকা মোটে। মাস-ছয় পরে কাজ পাকা হবে, মাইনেও বাড়বে। বলিস ত সুরেনের কথা বলি। তাকে অবিশ্যি কাজের জন্যে দরখাস্ত করতে হবে।"

না হ'লই বা কলিকাতা?—জংশনও মস্ত জায়গা, সেখানে কলের জল, বিজলী বাতি, গাড়ী মোটর সব আছে। এমন কি সিনেমাও আছে। মালতী সেইখানে থাকিতে পাইলেই বর্ত্তাইয়া যায়। সুরেন্দ্রকে এবার সে বিধিমত আক্রমণ করিল। শুধু চিঠিতে হইবে না মনে করিয়া তাহাকে কলিকাতায় ডাকাইয়া আনিয়া সরাসরি যুদ্ধে নামিয়া পড়িল।

একসঙ্গে অনুনয়, বিনয়, চোখের জল, মুখের হাসিতে বেচারা সুরেন্দ্রকে পরাজয় স্বীকার করিতে হইল। সে বলিল, "আচ্ছা না-হয় মালগাড়ীর গার্ডের কাজই নিলাম, কিন্তু তুমি একলা থাকতে পারবে? তোমাকে ত আর দশ দিন পরেই ওখানে যেতে হবে?"

মালতী বলিল, "তা আশায় আশায় থাকব এখন। দেওররা এমন কিছু ছোট নয়, জ্যাঠামহাশয়ও রয়েছেন। কাজ পাকা হ'লে ত কোয়ার্টার্স পাবে। তখন সবাই মিলে তোমার কাছে যাব।"

অগত্যা তাই। নববিবাহিতা পত্নী, মুখখানিও বড় সুন্দর, তাহার কথা ঠেলা যায় কি করিয়া? আর চিরজন্ম পাড়াগাঁয়ে ভূত হইয়া থাকিতে মনে মনে সুরেন্দ্রেরও একটু অনিচ্ছা ছিল।

মালতীও শ্বশুরবাড়ী গেল, সঙ্গে সঙ্গে তাহার স্বামীকেও কর্ম্মস্থলে চলিয়া যাইতে হইল। মালতীর দুই চোখ জলে ভরিয়া আসে, তবু সে জোর করিয়া ঠেকাইয়া রাখে, এখন ভাঙিয়া পড়িলে চলিবে না, ভবিষ্যতের দিকে চাহিয়া তাহাকে শক্ত হইতে হইবে। দিন কোনও মতে কাটিয়া যাইবে।

প্রথম প্রথম চিঠিপত্র খুব আসিতে লাগিল। সুরেন্দ্র কত রকম বর্ণনা দিয়া লেখে, জায়গাটা কেমন, কর্ম্মচারীদের বাড়ীঘর কেমন, লোকজন কেমন। মালতীর মন কল্পনায় কত ছবি আঁকে। ঐ রকম লাল একটি ছোট বাড়ীতে সে সুরেন্দ্রকে লইয়া সংসার পাতিয়াছে, কত সুখে তাহারা আছে।

কিন্তু ক্রমে সুরেন্দ্রের সুর বদলাইতে লাগিল। চিঠিও যেন কমিতে আরম্ভ করিয়াছে। এত খাটুনি তাহার সহ্য হয় না, নিজের গ্রামের জন্য মন কেমন করে। বড় কর্ম্মচারীরা তাহাদের মানুষের মধ্যেই গণ্য করে না। মালতী যথাসাধ্য তাহাকে সান্ত্বনা দেয়, কিন্তু নিজের মনেও তাহার সন্দেহ মাথা তুলিয়া উঠে। সে ভুলই করিল নাকি?

সকালে উঠিয়া, কাপড় কাচিয়া সবে সে রান্নাঘরে ঢুকিতেছে এমন সময় তাহার দেবর একখানা খবরের কাগজ হাতে করিয়া ছুটিয়া আসিল, বলিল, "বৌদি, ভীষণ কাণ্ড হয়ে গেছে।"

মালতীর হাত হইতে জলের ঘটিটা ঠন্ করিয়া পড়িয়া গেল। বিবর্ণ মুখে জিজ্ঞাসা করিল, "কি হয়েছে? কাগজ কোথা পেলে?"

ছেলেটি বলিল, "নন্টু-খুড়োর কাগজ, তিনি দিলেন।—জংসনে গাড়ীতে গাড়ীতে ভয়ানক কলিশন্ হয়েছে। লোক ঢের জখম হয়েছে, এক জন নাকি মারাও গেছে।"

মালতী দরজা ধরিয়া দাঁড়াইয়া ঠকঠক্ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। অস্ফুটস্বরে বলিল, "কি হবে ঠাকুরপো?"

ঠাকুরপো প্রায় মালতীরই বয়সী, সে বলিল, "গোটা-চার টাকা দাও, আমি সাড়ে আটটার গাড়ীতে চ'লে যাই। সন্ধ্যের মধ্যে হয় ফিরে আসব, না-হয় তার করব।"

মালতী বলিল, "আমাকেও নিয়ে চল।"

দেবর বলিল, "সে হয় না, একলাই আমার যাওয়া ভাল।" টাকা লইয়া সে যেমন অবস্থায় ছিল বাহির হইয়া গেল।

বুড়া জ্যাঠামহাশয়কে আর ছোট দেবরকে কোন মতে দুইটা ভাতে ভাত সিদ্ধ করিয়া দিয়া মালতী সারাদিন অনাহারে বসিয়া রহিল। বার-বার ঠাকুরঘরে গিয়া মাথা খুঁড়িয়া প্রার্থনা জানাইতে লাগিল স্বামীকে যেন অক্ষত দেহে ফিরিয়া পায়, সে আর কোনদিন শহরে যাইতে চাহিবে না।

সন্ধ্যার সময় কপালে ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া ভাইয়ের সঙ্গে সুরেন্দ্র ফিরিয়া আসিল। তাহার বিশেষ আঘাত লাগে নাই, কিন্তু সাংঘাতিক আঘাতও অনেকের লাগিয়াছে।

মালতী কাঁদিয়া তাহাকে জড়াইয়া ধরিল, বলিল, "অমন সর্ব্বনেশে কাজে আর তোমায় যেতে দেব না।"

সুরেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "ভয়টা কেটে গেলেই আবার মত বদলে যাবে ত? তখন শহরের জন্যে সব স্বীকার করবে।"

মালতী কাঁদিতে কাঁদিতে বলিল, "না, আমাদের পাড়া-গাঁই ভাল। তুমি কাজ ছেড়ে দাও।"

সুরেন্দ্র বলিল, "কালও যদি এ-মত থাকে, তাহলে না-হয় ছাড়বার কথা ভাবা যাবে।"

পুস্তক পরিচয়

শ্রীমদ্ভগবদ্গীতা—চতুর্থ সংস্করণ ; মূল, অন্বয়মুখে স্বামীকৃত সমগ্র টীকা ও বঙ্গানুবাদ সহ। ব্রহ্মচারী প্রাণেশকুমার কর্ত্তৃক অনূদিত ; পণ্ডিত শ্রীরাজেন্দ্রনাথ ঘোষ বেদান্তভূষণ কর্ত্তৃক সম্পাদিত ; শ্রীবিভূতিভূষণ দে কর্ত্তৃক ঢাকা সেনট্রাল ব্যাঙ্ক বিল্ডিং হইতে প্রকাশিত। মূল্য ॥৵০, সুলভ সংস্করণ ॥০ আনা।

ইহা গীতার অল্পমূল্যের এক উৎকৃষ্ট সংস্করণ। পূর্ব্বের ন্যায় ইহাতেও শ্রীধরস্বামীর টীকা অন্বয়মুখে সন্নিবেশিত হইয়াছে ; সুতরাং ইহাও পাঠকগণের সমাদর লাভ করিবে আশা করি।

শ্রীঈশানচন্দ্র রায়

ইক্‌ড়ি-মিক্‌ড়ি—শ্রীবিকাশ দত্ত প্রণীত। চারুসাহিত্য কুটীর, মাণিকতলা স্পার্, কলিকাতা। দাম দশ আনা।

আরশুলার গল্প, কবি নেংটে কুট্‌কুট্ মিয়াঁর গল্প, বিল্লীটাবরণের গল্প, রং সাহেব আর তাঁর গানের ক্লাস, কোলা কবিরাজ, ব্যাঙ্ পণ্ডিত—শিশুচিত্তের উপভোগ্য কৌতুক কাহিনী—শহরের ছেলেমেয়েরা পড়িয়া আনন্দ পাইবে। ত্রৈলোক্য মুখোপাধ্যায় মহাশয় হইতে শিশুসাহিত্যের এই ভঙ্গীর সূত্রপাত, সুকুমার রায় মহাশয়ের হাতে ইহা আরও সুকুমার হইয়া উঠিয়াছিল। ইকড়ি-মিকড়ির লেখক এ শ্রেণীর রচনায় সুনাম অর্জ্জন করিয়াছেন, পদ্যরচনায়ও যে তাঁহার হাত আছে তাহার পরিচয় এই বইখানি হইতে পাওয়া যায়।

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

কৈশোরিকা—কবিতাগ্রন্থ। শ্রীরমেশচন্দ্র রায় প্রণীত। ১ নং রমানাথ মজুমদার ষ্ট্রীটস্থ সরস্বতী প্রেস হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৲ টাকা।

ভূমিকায় দুই জন ভদ্রলোক লিখিতেছেন, "আমাদের সনির্ব্বন্ধ অনুরোধে কবিবন্ধু…১৬ থেকে ২০ বছর বয়সের লেখা কবিতার কয়েকটি ছাপাতে রাজি হয়েছেন।" আমরা কিন্তু কোন কবির জন্য এরূপ ওকালতি সমর্থন করি না।

"আমি শুধু ব্যর্থ অর্ঘ্য বাহি" 'নাহি'র সঙ্গে মিলাইবার জন্য ?। "উন্মাদন সঙ্গীতেরে সিক্ত করি চিত্তপন রসে" অর্থ ? "জীর্ণ আলোকে রহিবে এ-লোকে যাহা ফাঁকি"—ইহার সহিত "কেন মিছামিছি বহিব ভরা এ কলসটাকে ?" এক ছন্দে পড়া যায় না অথবা "পথের ভৌতিকা" [অর্থ ?] "এমন আঁধার রাতে" দিয়া আরম্ভ করিয়া শেষে "মুখে জোছনা কিরণ মাখা" অথবা "অভাব ছুটে আসে প্রাণের পর" "ফড়িং আশে পাশে আজও নাচে" "নাচিত সুখে কেকা এ পোড়া বুকে" "শাশ্বতে বৃথা ধরিবারে চাই এই ক্ষণিকের চটের ছায়" প্রভৃতি যৌবন বয়সে লেখা সত্ত্বেও ক্ষমাযোগ্য নহে।

শ্রীপরিমল গোস্বামী

জীবনায়ন—শ্রীমণীন্দ্রলাল বসু। পি, সি, সরকার এণ্ড কোং। ১৮ শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ২॥০।

জীবন তাহার সুখ-দুঃখে আশা-আকাঙ্ক্ষার বিচিত্র বর্ণসম্ভারে একটি কুতূহলী কিশোরচিত্তে প্রতিফলিত হইতেছে। এই কিশোর অরুণ। স্কুলজীবনে, অর্থাৎ যে-সময়টা অনভিজ্ঞতার শুচিতায় প্রাণশক্তি প্রবল, সে-সময় এই জীবনের দিকে অ্যাটিটিউড্ অপূর্ব্ব ধরণের। কৈশোর-জীবনের রূপকথার যুগ—অ্যাড্‌ভেঞ্চার বা জয়যাত্রার যুগ—অনুভূতির মধ্যে স্বপ্নের আমেজ—যা সুখকে তুলিয়া ধরে এক অতি-বাস্তবতার কোঠায় ; দুঃখ-আশঙ্কাকে প্রাণের উত্তাপে গলাইয়া অবাস্তবের, অগ্রাহ্যের স্তরে নামাইয়া আনে। অনুধর্মী সঙ্গিগণের সঙ্গে জীবন চলে তর্‌তর্ বেগে, অনকূল বাতাসে পাল-তোলা তরণীর মত। এই জীবনাংশে আবার প্রেমও আছে ; কিশোর অরুণ ভালবাসিল কিশোরী উমাকে। রূপকথার প্রেম, ব্যথাহীন এক অপূর্ব্ব অনুভূতি।

যৌবনের সঙ্গে পরিবর্ত্তন আসে। দৃষ্টিকোণ সম্পূর্ণ বদলাইয়া যায়। কস্তুরীমৃগের মত চিত্ত এক অস্পষ্টানুভূত সত্যের উন্মাদনায় ব্যাকুল, উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়ে। এই সময়টি পুরাতনের সঙ্গে বিচ্ছেদ এবং নূতনের সঙ্গে নব পরিচয়ের যুগ। কিন্তু এর ট্রাজেডি এই যে নূতনের সঙ্গে যোগসূত্র কখনই দৃঢ় হয় না ; কেননা জাগ্রত, অতিজিজ্ঞাসু মন আর কৈশোরের সেই তরল মন নয়, সম্বন্ধ-স্থাপনের মন নয়। যৌবনের এই সাধারণ ট্রাজেডি ; অরুণের মত ইনটেলেকচুয়াল বা বুদ্ধিধর্মী মনের পক্ষে এ-ট্রাজেডি আরও করুণ। সব চেয়ে ট্রাজেডি এই যে উমার সঙ্গে প্রেমও এই সময় বেদনাময় ; কেনন। সেটা হইয়া পড়িয়াছে সত্য, আর রূপকথার অ্যাড্‌ভেঞ্চার মাত্র নয়।

এই প্রেম প্রতিদান পাইল না। তাহার কারণ উমা (সেও বুদ্ধি-বিলাসিনী) মনে করে—'ভালবাসার সম্বন্ধের চেয়ে বন্ধুত্বের সম্পর্ক হচ্ছে বড়, সত্যিকার।' উমা বন্ধুত্বের দাম রাখিতে চায়, কমরেড হইতে চায়।

কিন্তু যে ভালবাসিল তাহার জীবনে প্রেম কখনও বিফল নয়। অনেক সময় বিশেষ করিয়া অরুণের মত জিজ্ঞাসু মনের পক্ষে, প্রতিদান পাইল কি না-পাইল, সে কথাটা এক রকম অবান্তর। সে ভালবাসিয়াছে। এই ভালবাসা জীবনের মহা অবলম্বন। তাহা প্রেমাস্পদাকে আনিয়া দিতে পারে নাই, কিন্তু জীবনসত্যের রহস্য প্রস্ফুট করিয়া দিয়াছে। এটা কেমন করিয়া হয়, প্রকৃতির রাজ্যে রাসায়নিক ক্রিয়ার মত তাহা অবোধ্য ; কিন্তু হয়, অরুণের জীবনেও হইল। সে যে-বন্ধন খুঁজিয়াছিল তাহা না পাওয়ার তীব্র বেদনার মধ্য দিয়া মহামুক্তির সন্ধান পাইল।

অরুণ-উমার জীবনের সমান্তরালে অরুণের কাকার জীবনটি করুণ-সুন্দর। সেখানেও প্রেমের ট্রাজেডি—বেদনার এক অভিনব রূপ। এই দুইটি চিত্র পরস্পরকে খুব ফুটাইয়াছে।

বইয়ের লিপিকুশলতা খুব সুন্দর। তবে বর্ণনা ও রিফ্লেক্‌শনগুলির এক এক জায়গায় মাত্রাধিক্য হইয়া যাওয়ায় ক্লান্তি আসে। ৩০৩ পাতার একখানি বই যে-পাঠককে পড়িতে হইবে তাহার ধৈর্য্যের দিকে লক্ষ্য রাখাও আর্টের একটা অঙ্গ।

ক্ষণবসন্ত—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ২০৪। মূল্য ১॥০।

ছোটগল্পের বই। দশটি গল্প আছে। ইতিপূর্ব্বে "মনের গহনে" সমালোচনায়, যতটা চোখে পড়িয়াছে, সরোজবাবুর লেখার বৈশিষ্ট্যগুলির পরিচয় দিয়াছি; একই ধরণের বই বলিয়া আর পুনরুক্তি করিলাম না। সরোজবাবুর ভক্তেরা, অথবা অন্য দিক দিয়া বলিতে গেলে, যাঁহারা প্রকৃত ভাল গল্পের রসিক তাঁহারা, এই বইখানির নিশ্চয় সমাদর করিবেন। "কৃতজ্ঞতার বিড়ম্বনা" গল্পটি চলতি ভাষায় লেখা। একই বইয়ে ভাষার দুই রকম প্রয়োগ না করিলেই যেন ভাল ছিল। সূচী না থাকায় একটু অসুবিধা হয়।

বনফুলের গল্প—শ্রীবলাইচাঁদ মুখোপাধ্যায়। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স। মূল্য ১৷৷০।

১৯২ পৃষ্ঠায় ৩৪টি গল্প, এই থেকেই গল্পগুলির কায় সম্বন্ধে অনেকটা ধারণা হইবে। অবশ্য শেষে কয়েকটি মাঝারি-গোছের গল্পও আছে এবং সর্ব্বশেষের গল্পটি ৫৮ পৃষ্ঠাব্যাপী—ছোট একটি উপন্যাস বলিলেও চলে।

এক, দুই, তিন পাতায় সম্পূর্ণ ক্ষুদ্র গল্পগুলি যেন এক-একটি জুঁই ফুলের মত—গন্ধে আর সুসমঞ্জস রূপে একেবারে আত্মসম্পূর্ণ; এক কণা মধুর চারি দিকে জুঁইফুলটির মতই এক-একটি ক্ষুদ্র অথচ মর্ম্মস্পর্শী আইডিয়া আশ্রয় করিয়া প্রস্ফুট। লেখক দরদ দিয়া জীবনকে দেখিয়াছেন, বুঝিয়াছেন এবং আপাতদৃষ্টিতে যা নিতান্ত ক্ষুদ্র এবং অকিঞ্চিৎকর এমন সব ঘটনার মধ্যেও রসের সন্ধান পাইয়া সেগুলি সাহিত্যের অঙ্গীভূত করিয়া লইয়াছেন। সাহিত্যের প্রাণ-বস্তুটির সহিত পরিচয় না থাকিলে এটা সম্ভব হয় না। এই যে অতি-অল্পকে অল্প কথায় মহনীয় করিয়া ফুটাইয়া তোলা, অবজ্ঞাতকে বর্ণসুষমা দিয়া পরিচিত করা, ইহাতেই "বনফুল"-এর কৃতিত্ব। এই ছোটদের পরিচয়-গৌরবেই তিনি "বনফুল" নাম লইয়াছেন। এ-নাম তাঁহার সার্থক হইয়াছে।

বড় গল্পটিতেও তাঁর শক্তি অব্যাহত আছে। তবে এটি এ-বইয়ে সন্নিবিষ্ট না করিলেই যেন নির্ব্বাচনের ধারাটি বজায় থাকিত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

শ্রুতিসংগ্রহ—শ্রীমৎস্বামিকমলেশ্বরানন্দ সঙ্কলিত। প্রাপ্তিস্থান—৬৪ নং শম্ভুনাথ পণ্ডিত ষ্ট্রীট, ভবানীপুর, কলিকাতা। মূল্য ।৶০।

বৈদিক সাহিত্যের উৎকৃষ্ট নিদর্শনগুলির সংকলন সাধারণের মধ্যে প্রচার করিবার প্রশংসনীয় প্রয়াস বর্ত্তমানে নানা স্থানে লক্ষিত হইতেছে। আলোচ্য গ্রন্থে ঋগ্বেদের দশম মণ্ডল হইতে তিনটি প্রসিদ্ধ সূক্ত (নাসদীয় সূক্ত, হিরণ্যগর্ভসূক্ত ও পুরুষসূক্ত) ও শতপথব্রাহ্মণের স্বাধ্যায়প্রশংসা নামক অংশ সন্নিবেশিত হইয়াছে। সাধারণের বোধসৌকর্যার্থে পদব্যাখ্যা, বঙ্গানুবাদ, বিনিয়োগ ও ব্যাকরণবিচারবাদে সায়ণভাষ্যের অবশিষ্ট অংশ ও ভাষ্যানুবাদ ইহাতে প্রকাশিত হইয়াছে। সৃষ্টি, স্থিতি, প্রলয় ও পরমেশ্বর প্রভৃতি সম্বন্ধে ঋগ্‌বেদে যে তত্ত্ব বর্ণিত হইয়াছে তাহার পরিচয় এই গ্রন্থ পাঠ করিলে সহজেই পাওয়া যাইবে। সুতরাং ইহা দার্শনিক তত্ত্বজিজ্ঞাসু ব্যক্তির নিকট বিশেষ আদৃত হইবে সন্দেহ নাই। অন্যান্য সূক্তের ন্যায় পুরুষসূক্তের মূলও মোটা অক্ষরে মুদ্রিত হইলে সামঞ্জস্য রক্ষিত হইত। গ্রন্থমধ্যে বিশেষতঃ মূল অংশে কতকগুলি মুদ্রাকরপ্রমাদ পরিদৃষ্ট হইল। সংস্কৃত অংশের বর্ণবিন্যাস বিষয়ে বঙ্গে অপ্রচলিত কিছু কিছু নূতন রীতি অবলম্বিত হইয়াছে। সংযোগস্থলে বর্গের পঞ্চমবর্ণ স্থানে অনুস্বার ব্যবহার অধিকাংশ ক্ষেত্রেই বাঙ্গালীর নিকট দৃষ্টি-বিরুদ্ধ। বস্তুতঃ ইহা সর্ব্বত্র (অংতরিক্ষ, জনয়ংতি, অয়জংত) ব্যাকরণশুদ্ধও নহে। রেফোত্তরবর্ণের দ্বিত্ববর্জন সম্বন্ধে নিয়মানুবর্ত্তিতার অভাব লক্ষণীয়—তাই, 'কর্ত্তৃস্ব' ও 'বর্তির্দে'র যুগপৎপ্রয়োগ দৃষ্ট হয়।

বৈদিক সাহিত্যে বহুলব্যবহৃত লকারের মূর্দ্ধন্যরূপকে শুদ্ধ লকার দ্বারা নির্দেশে স্থানে স্থানে বিশেষ অসুবিধায় পড়িতে হয়। তাই কেহ কেহ ইহাকে বিন্দুযুক্ত করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন অথবা 'ড' 'ঢ' বর্ণের সাহায্যে কাজ চালাইয়া থাকেন। বর্ত্তমান গ্রন্থে এরূপ কিছুই করা হয় নাই। আশা করি, ভবিষ্যৎ সংস্করণে প্রকাশক মহাশয় এই সকল দিকে দৃষ্টি দিবেন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

ভারত ও মধ্য-এশিয়া—শ্রীপ্রবোধচন্দ্র বাগচী। আর্য্য ভবন, ২৪।৫এ কলেজ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা। পৃ [illegible] + ১১৬। মানচিত্র +২৩ ছবি।

আলোচ্য পুস্তকে পাঁচ অধ্যায় ও এক পরিশিষ্ট আছে। তাহাতে যথাক্রমে নিম্নলিখিত বিষয়গুলি আলোচিত হইয়াছে—পথ ঘাটের কথা, মধ্য-এশিয়ার প্রান্তভূমি, কাশগর ও খোটান, তুন হোয়াংএর পথে, কুচী ও অগ্নিদেশ। উল্লিখিত স্থানসমূহের প্রাচীন সংস্কৃতির সহিত ভারতীয় সভ্যতা এবং আংশিকভাবে চীন, গ্রীস ও পারস্যের সভ্যতার কোথায় কোথায় যোগ আছে তাহা সবিস্তারে বর্ণিত হইয়াছে। পরিশিষ্টে মধ্য-এশিয়ার প্রাচীন সভ্যতার সম্বন্ধে বিভিন্ন দেশের পণ্ডিতগণের গবেষণার সূচী ও সামান্য বর্ণন প্রদত্ত হইয়াছে।

অধীত বিষয়ের প্রতি গ্রন্থকারের আন্তরিক অনুরাগ আছে বলিয়া বইখানি মনোরম হইয়াছে। হয়ত তাঁহার ভাষায় ৺হরপ্রসাদ শাস্ত্রীর ভাষার মত সাহিত্যরসের প্রাচুর্য নাই, কিন্তু ইহার সাবলীল গতিতে পাঠকের মনকে কোথাও ক্লান্ত হইতে দেয় না। ছবিগুলি মধ্য এশিয়ার শিল্পকলার সুন্দর পরিচয় প্রদান করে।

একখানি সূচীপত্র থাকিলে এবং মানচিত্রখানি আরও স্পষ্ট হইলে পাঠকের সুবিধা হইত।

মোটের উপর বইখানি আমরা বাঙ্গালী পাঠকমাত্রকে পড়িয়া দেখিতে অনুরোধ করি।

পালিতের বাঁকুড়ার ভূগোল ও ইতিবৃত্ত—শ্রীসুধীরকুমার পালিত প্রণীত। এস. কে. পালিত এণ্ড কোং, পুস্তক বিক্রেতা, বাঁকুড়া। মূল্য ছয় আনা।

প্রায় বার বৎসর আগে শ্রীরামানুজ কর প্রণীত "বাঁকুড়া জেলার বিবরণ" নামে একখানি উৎকৃষ্ট তথ্যবহুল গ্রন্থ বাহির হইয়াছিল। কিন্তু তাহা ছাত্রদের জন্য লেখা হয় নাই, বর্ত্তমান গ্রন্থখানি বিশেষভাবে স্কুলের ছাত্রদের জন্য লিখিত। এরূপ চেষ্টা প্রশংসনীয়। ইহাতে জেলার সম্বন্ধে অনেক সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

সুগন্ধ রসায়ন—শ্রীসতীশচন্দ্র রায়, বি এস-সি। প্রাপ্তিস্থান ১১৭, বারাণসী ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃ. ৩২। মূল্য ।৶০।

পুস্তকখানিতে লেখক নিজের অভিজ্ঞতাপ্রসূত কেশতৈল, পাউডার প্রভৃতি নানাবিধ সুগন্ধি দ্রব্য প্রস্তুত প্রণালী এবং তাহাদের যথাযথ উপকরণ ও পরিমাণ লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। যাঁহারা এই সমস্ত জিনিষ প্রস্তুত করিতে আগ্রহান্বিত, পুস্তকখানি তাঁহাদের যথেষ্ট কাজে লাগিবে।

আঁট ও আসক্তি—শ্রীরাজেন্দ্রলাল দে। আলবার্ট লাইব্রেরী, ঢাকা। পৃ. ৫৫+১০, মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি রসায়নশাস্ত্রের পুস্তক, কিন্তু নাম দেখিয়া প্রথমে অন্যরূপ ধারণার সৃষ্টি হয়। লেখক cohesionকে বাংলায় আঁট ও affinityকে আসক্তি বলিয়াছেন। পুস্তকের এই অল্প কয়েকখানি পৃষ্ঠার মধ্যেই লেখক—"পুটিতকরণ, রাসায়নিক তৌলযন্ত্র, ল্যাভোসিয়রের পরীক্ষা, অক্সিজানের পরিমাণ নির্ণয়, অক্সিজান প্রস্তুত ও তাহার মধ্যে দহনক্রিয়া, ডালটন অনুবাদ, গায়লুসাকের আবিষ্কার, আভোগাদরোর অণুকণাবাদ" হইতে মায় ইস্তক "Young's Modulus" পর্য্যন্ত কিছুই বাদ রাখেন নাই। একে নবোদ্ভাবিত পারিভাষিক শব্দের বাহুল্য, তাহাতে আগাগোড়া ভাষার অসহনীয় জড়তা—কেবল শিক্ষার্থী নয় বহু প্রবীণ শিক্ষককেও নাকাল করিয়া ছাড়িবে। পরিভাষার একটি নমুনা : লেখক 'U-Tube'-এর পরিভাষা করিয়াছেন "'উ'-আকার পাত্র"। ইংরেজী 'U' ও বাংলা 'উ' অক্ষরের মধ্যে আকৃতিগত কোন সামঞ্জস্য আছে কি ?

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

বেদান্ত-প্রবেশ—প্রণেতা রায়-বাহাদুর শ্রীযুক্ত রামপদ চট্টোপাধ্যায়, বেদান্তবিদ্যার্ণব। জয়নগর, পোঃ জয়নগর-মজিলপুর, জেলা ২৪-পরগণা। ১৮০ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা।

এই বইখানি গ্রন্থকারের একটি বৃহত্তর বইয়ের ভূমিকাস্বরূপ লিখিত হইয়াছিল; কিন্তু আপাততঃ স্বতন্ত্র ভাবে মুদ্রিত ও প্রকাশিত হইয়াছে। সাধারণভাবে বেদান্ত-তত্ত্বের ব্যাখ্যা এবং বিশেষভাবে শ্রীমদ্ভাগবত ও বেদান্তের ঐক্য প্রতিপাদন করাই এই গ্রন্থের উদ্দেশ্য।

গ্রন্থকারের লেখার ভঙ্গিটি একটু মধ্যযুগীয় বলিয়া মনে হয়। ঈশ্বরের শক্তির বাহিরে আমরা বাঁচিতে পারি না, ইহা ঠিক; কিন্তু তথাপি আহারে, বিহারে, শয়নে ও স্বপনে—কথায় কথায় আমরা ঈশ্বরের দোহাই দিয়া অগ্রসর হই না। ঈশ্বরে ভক্তি হ্রাসের জন্য নয়, আধুনিক রীতিই ইহা। সুতরাং বর্ত্তমান রুচি অনুসারে প্রতিপদে "ভগবচ্চরণে ভক্তিভাবে দণ্ডবৎ প্রণাম করিয়া তাঁহার কৃপা ভিক্ষা করতঃ গন্তব্য পথে অগ্রসর হইতেছি" (৯ পৃ) এইরূপ বলা, ভগবদ্-ভক্তির অনাবশ্যক বিজ্ঞাপন।

ভাগবত ও বেদান্ত একার্থদ্যোতক কিনা, তাহা লইয়া মতভেদ আছে। অদ্বৈতবাদও বেদান্তে প্রতিষ্ঠিত, দ্বৈতবাদও তাই; কিন্তু উভয়ে এক নয়। ভাগবত নিজেকে বেদান্তের টীকা বলিয়া প্রচার করিয়াছেন; গোবিন্দ-ভাষ্য প্রভৃতি এই মত মানিয়া লইয়াছেন। কিন্তু অদ্বৈতবাদী প্রকাশ্যে ভাগবতের বিরুদ্ধে কিছু না বলিয়াও এই মত অগ্রাহ্য করিতে পারেন। প্রাচীন কালে তাহা ঘটিয়াছে, বর্ত্তমানেও অসম্ভব নয়। সুতরাং সকল বিষয়ে আলোচ্য গ্রন্থকারের সহিত মতের ঐক্য আমাদের হয় ত নাই; কিন্তু তাঁহার গভীর পাণ্ডিত্য ও বিপুল অধ্যয়নশীলতার যে-পরিচয় বইখানিতে আমরা পাই, তাহার প্রশংসা না করিয়া পারি না।

বইখানা বেদান্ত-চর্চ্চার সহায়ক হইবে, এ-বিষয়ে কোন সন্দেহ নাই, আর, যে বৃহত্তর গ্রন্থের ইহা অঙ্গ, আশা করি গ্রন্থকার অবিলম্বে তাহাও প্রকাশ করিয়া বেদান্ত-পাঠকের আরও উপকার করিতে সমর্থ হইবেন। আমরা অকপটে তাঁহার বিদ্যাবত্তার ও গভীর জ্ঞানের সুখ্যাতি করি।

সমাজ ও সাহিত্য—কাজী আবদুল ওদুদ প্রণীত। মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং হাউস্‌, ৩ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১৮৬ + ।৶০। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে সমাজ ও সাহিত্য সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে লিখিত কতকগুলি প্রবন্ধ সমাবিষ্ট হইয়াছে; তবে এই প্রবন্ধগুলির ভিতর একটা সাধারণ সুর সহজেই অনুভব করা যায়। কাজী সাহেব মানুষের বুদ্ধির মুক্তিকামীদের মধ্যে এক জন; এবং প্রধানতঃ এই কথাটাই নানা ভঙ্গিতে তিনি এই বইয়েতে প্রকাশ করিয়াছেন।

দুই-একটি প্রবন্ধের বক্তব্য বিষয় লইয়া মতভেদ অসম্ভব নহে। 'পথ ও পাথেয়' নামক প্রবন্ধে গ্রন্থকার ইকবাল সম্বন্ধে যাহা বলিয়াছেন, ইকবাল সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞেরা হয়ত তাহা স্বীকার করিবেন না। তা ছাড়া ইসলামের ঐতিহাসিক অভিব্যক্তির যে ব্যাখ্যা তিনি দিয়াছেন তাহাও সকল মুসলমানেরই মনঃপূত হইবে কি না, সন্দেহ। তথাপি একথা পাঠক মাত্রেই স্বীকার করিবেন যে, কাজী আবদুল ওদুদ সাহেব এক জন ভাবগ্রাহী এবং চিন্তাশীল লেখক; আর তাঁহার ভাষায় প্রাণ আছে এবং ওজস্বিতা আছে। বাংলার বর্ত্তমান সঙ্কটের দিনে এই শ্রেণীর লেখা এবং লেখকের প্রয়োজন প্রচুর।

শ্রীউমেশচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

সরল হিন্দী শিক্ষা—শ্রীগোপালচন্দ্র বেদান্তশাস্ত্রী প্রণীত। হিন্দীপ্রচার কার্য্যালয়, ২ নং মহামায়া লেন, কলিকাতা। ২৫৮ পৃষ্ঠা। মূল্য পাঁচ সিকা।

যে-সকল বাংলাভাষী হিন্দী শিখিতে চান, বহিটি তাঁহাদের পক্ষে উপযোগী। লেখক জ্ঞাতব্য বিষয় সরলভাবে বুঝাইয়া বলিতে পারিয়াছেন এবং শব্দাবলী ও তাহার অনুবাদ, ব্যাকরণ ও তাহার প্রয়োগ ইত্যাদি সমাবেশ করিয়া শিক্ষার্থীদের অনেক সুবিধা করিয়া দিয়াছেন।

শ্রীধন্যকুমার জৈন

আকাশ-পাতাল—শ্রীসৌরীন্দ্র মজুমদার। প্রকাশক—গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। দাম দুই টাকা।

মিলের শ্রমিকদের বস্তি-জীবন লইয়া লেখক এই কাহিনী লিখিয়াছেন। পল্লী হইতে শহরে আসিয়া সরল গ্রাম্যযুবক কানাই অধঃপতনের পঙ্কিল স্রোতে ভাসিয়া গেল, আপন সাধ্বী স্ত্রী গঙ্গাবতীকে অর্থ-আদায়ের যন্ত্র-স্বরূপ জ্ঞান করিয়া সময়ে-অসময়ে কত প্রকারেই না নির্যাতন করিতে লাগিল, এমন কি স্ত্রীকে ধনিক কামুকের কামানলে আহুতি দিবার চেষ্টাও তাহার বাধিল না; পরে আপন হাতে গলা টিপিয়া সন্তান পর্য্যন্ত সে হত্যা করিল! ব্যর্থ ও প্রেমিক কবি রজত ঘটনাচক্রে ঐ মিলেই চাকুরী লইয়া গঙ্গাবতীর ভ্রাতৃস্থান অধিকার করিয়া তাহাকে বহু প্রকারে সাহায্য করিতে লাগিল। শ্রমিকদের সঙ্ঘবদ্ধ করিবার জন্য তাহার প্রাণপণ চেষ্টা ও ধনিকের চক্রান্তে কারাবরণ। কারামুক্ত হইয়া দুস্থ গঙ্গাবতীকে বাঁচাইবার জন্য সে টাকা চুরি করিল ও মোটর চাপা পড়িল। দুঃখের আবর্ত্তে চারিটি সন্তান হারাইয়া গঙ্গাবতীও অবশেষে পাগলিনী হইল। দুঃখের কাহিনীকে ঘোরাল করিবার যত কিছু পন্থা, লেখক কোনটাই উপেক্ষা করেন নাই, অথচ যে রসজ্ঞান ও লিপিকুশলতা থাকিলে সর্ব্বহারাদের বেদনা মানুষের মনে চিরন্তন রেখাপাত করে, তাহারই অভাব অত্যন্ত বেশী। অনাবশ্যক দীর্ঘ বর্ণনা মনকে পীড়িত করিয়া তুলে

বচন-বিন্যাসে নাটকীয় ভাব এবং উত্তমপুরুষের মত-প্রাধান্য উপন্যাসের রসসৃষ্টির প্রধান অন্তরায়। ছাপার ভুল ও উপমার অসামঞ্জস্য কিছু কিছু আছে, কিন্তু 'আলগোছা', 'ছড়িয়ে দিয়ে আস', 'গোষ্ঠীশুদ্ধ', 'পিতার স্নেহময়ী কোল', 'চাবকিয়ে দাঁত ভাঙবে', 'টঙ্গু', 'বাঞ্চনীয়', 'পতিব্রত দেখিও না', উদ্বেলিত হয়ে উতলিয়ে পড়তে লাগলো', 'মুচ্ছে মুচ্ছে', 'কিমার মত ক্ষত বিক্ষত' প্রভৃতি (বাহুল্যভয়ে বেশী উল্লেখ করা গেল না) সত্যই মারাত্মক (অবশ্য যদি ছাপারই ভুল হয়!)। প্রচ্ছদপটের পরিকল্পনাটি সুন্দর।

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

বুদ্ধের অভিধান—প্রজ্ঞানন্দ স্থবির সঙ্কলিত ও ব্রহ্ম-প্রবাসী চট্টল-বৌদ্ধদের অর্থানুকূল্যে প্রকাশিত। মূল্য ২৲ টাকা।

গ্রন্থকার বহু পালি গ্রন্থ হইতে বুদ্ধদেবের জীবনকাহিনী ও দেবদত্তের জীবনী লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। দেবদত্ত বহুদিন বুদ্ধের প্রতিদ্বন্দ্বিতা করিয়াছিলেন, অবশেষে তিনি সম্মান, প্রতিপত্তি, সহচর সমস্ত হারাইয়া দুরারোগ্য পীড়ায় আক্রান্ত হইয়া ভীষণ যন্ত্রণা ভোগ করিয়াছিলেন। পূর্ব্বকৃত অপরাধের নিমিত্ত তাঁহার অনুশোচনা উপস্থিত হইলে, তিনি বুদ্ধদেবের নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করিবার অভিপ্রায়ে তাঁহাকে দর্শন করিবার জন্য অধীর হইয়াছিলেন, কিন্তু বুদ্ধদেবের দর্শনলাভ করিতে পারেন নাই, পৃথিবী তাঁহাকে গ্রাস করিয়াছিলেন। প্রশ্নোত্তর ও উপদেশচ্ছলে এই গ্রন্থে বুদ্ধদেবের বাণী সরল ভাষায় বর্ণিত হইয়াছে। এই গ্রন্থপাঠে বৌদ্ধধর্ম্ম সম্বন্ধে অনেক জ্ঞান লাভ হয়। গ্রন্থের পরিশিষ্টে সাধারণের জ্ঞাতব্য প্রাচীন ভারতের নগর ও জনপদের ভৌগোলিক নির্দ্দেশ আছে।

শ্রীজিতেন্দ্রনাথ বসু

আই হ্যাজ—শ্রীকেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য ২৲ টাকা মাত্র।

রসসাহিত্যিক কেদারনাথ বাংলাসাহিত্যক্ষেত্রে সুপরিচিত; তাঁহার "আই হ্যাজ" আগ্রহের সহিত পড়িলাম। বইখানি পড়িয়া ভালই লাগিল; অবশ্য, কেদারবাবুর বইগুলি কতকটা একই ছাঁচে ঢালা, তাঁহার হাস্যরসও কতকটা একই ধরণের; চরিত্রগুলিও অনেকটা এক রকমের; সুতরাং মাঝে মাঝে পড়িতে পড়িতে হয়ত ক্লান্তি আসে। কিন্তু তাহার জন্য অপরাধ লেখকের নহে, লেখক যে ছবি আঁকিতে চাহিয়াছেন তাহার উপজীব্যের। কেদারবাবু জীবনটাকে সমগ্ররূপে যেভাবে দেখিয়াছেন সেইভাবে তাহার ছবিটি দিতে চাহিয়াছেন; তিনি তাহা হইতে বাছিয়া সাজাইয়া উপন্যাস রচনা করিতে বসেন নাই। তাঁহার "কোষ্ঠীর ফলাফল," "আই হ্যাজ" প্রভৃতি গ্রন্থগুলিকে উপন্যাস না বলিয়া চিত্রসমষ্টি বলিলেই ভাল হয়; এই চিত্রগুলির পরস্পরের মধ্যে যোগ রহিয়াছে, একই জিনিষ বিভিন্ন ছবিতে বার-বার একই রূপে দেখা দিয়াছে; কিন্তু তবুও সেগুলিকে স্বতন্ত্রভাবেও দেখা চলে। "আই হ্যাজ" একটানা পড়িতে গেলে ক্লান্তি আসে; কিন্তু অবসরক্ষণে মাঝে মাঝে একটু করিয়া পড়িলে এক-একটি ছবি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। তখন জীবন যে সাধারণত একান্ত বৈচিত্র্যহীন একথা আর মনে হয় না। অথচ কেহ যদি ঐতিহাসিকের দৃষ্টিতে জীবনকে দেখে তবে তাহার মধ্যে বেশীর ভাগই বৈচিত্র্যহীন পুনরাবৃত্তি দেখিবে; সকলেই একই ভাবে জীবনের সহিত বোঝাপড়া করিবার চেষ্টা করিতেছে; সে রঙ্গমঞ্চে নটগুলির বেশ বিভিন্ন হইতে পারে, কিন্তু শেষ বোঝাপড়ার মধ্যে প্রকৃতিগত কোন প্রভেদ নাই। লেখকের চোখে জীবননাট্যের সেই দিকটি চোখে পড়িয়াছে যেখানে মানুষ অভাবের তাড়নায় জানিয়া-শুনিয়াও সত্যের সহিত আপোষরফা করিয়া চলে, মিথ্যাচারের আশ্রয় লয়। শিবু লেখাপড়া শিখিয়াও "আই হ্যাজ" বলিত; কারণ "হ্যাভ" বলিলে ব্যাকরণসম্মত হয় বটে কিন্তু বড়বাবু সম্মত হন না, চাকরি মেলে না। সুতরাং মিথ্যা বিনয়ের আশ্রয় গ্রহণ করিতে হয়। জীবনদরদী লেখকের লেখায় জীবনের ট্রাজেডির এই ছবি সকরুণ হাস্যে উজ্জ্বল হইয়া ফুটিয়া উঠিয়াছে; তাই তাঁহার হাসির মধ্যে বিদ্রূপের কশাঘাত নাই, অশ্রুস্নিগ্ধ করুণার রশ্মিসম্পাতে তাহা মধুর হইয়া উঠিয়াছে। হাসি-কান্নার আলোছায়াময় এই জীবনকে বিদ্রূপ করা সহজ; কিন্তু তাহাকে দরদ দিয়া দেখা কঠিন। সে দৃষ্টি থাকিলেই তবে এই মিথ্যাচারের পিছনে যে খাঁটি মানুষ আছে তাহা চোখে পড়ে। লেখক সে-মানুষকে দেখিয়াছেন, তাহাকে ভালবাসিয়াছেন, শ্রদ্ধা করিয়াছেন; তাই তাঁহার লেখা ভাল লাগে।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

পাঁচমিশালী গল্প—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত, বি-এ, প্রণীত। বৃন্দাবন ধর এণ্ড সন্স লি কর্তৃক ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য আট আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ নয়টি গল্প মুদ্রিত হইয়াছে; ইহাদের সকলগুলিই শিশুপাঠ্য মাসিক পত্রিকা 'শিশুসাথী'তে পূর্ব্বে প্রকাশিত হইয়াছিল, সম্প্রতি উহারা একত্রে সংবদ্ধ হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। লেখক মহাশয় শিশুসাহিত্যের রচয়িতা হিসাবে বিশেষ প্রসিদ্ধিলাভ করিয়াছেন এবং এই পুস্তকের কয়েকটি গল্পে তাঁহার সেই সুযশ অক্ষুণ্ণ রহিয়াছে; বিশেষতঃ "খোদার উপর কেরামতী" ও "বোকার রোজগার" অতিশয় মনোরম হইয়াছে। কিন্তু দুই-একটি গল্প কিছু নীরস হইয়াছে এবং মনে হয় উহারা শিশুদিগের মনোরঞ্জন করিতে পারিবে না। শিশুসাহিত্যকে একাধারে চিত্তাকর্ষক ও শিক্ষাপ্রদ করাই প্রয়োজন এবং সে আদর্শ যেখানে ক্ষুণ্ণ হইবে, সেইখানেই শিশুসাহিত্য রচনা নিরর্থক। এই হিসাবে লেখকের রচনা প্রশংসালাভ করিবে সন্দেহ নাই।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

প্রাপ্তিস্বীকার

খাদ্যবিচার—শ্রীবিষ্ণুপদ চক্রবর্ত্তী সঙ্কলিত। মূল্য এক আনা প্রাপ্তিস্থান—সাহিত্য-ভবন প্রেস, ২৬, সীতারাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভারতীয় মতে খাদ্যবিচার, খাদ্যদ্রব্যের গুণাগুণ, পাশ্চাত্য মতে খাদ্যবিচার, ভিটামিন ও তাহার প্রাপ্তিস্থান, আহার সম্বন্ধীয় কয়েকটি বিধিনিষেধ ইত্যাদি এই পুস্তকে আলোচিত হইয়াছে।

উত্থানের পথ—শ্রীমন্মথনাথ স্মৃতিরত্ন ভট্টাচার্য্য প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—১০৫ অপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। ব্রহ্মচর্য্যশিক্ষাসম্বন্ধীয় পুস্তক।

সোহরাব-রোস্তম—এ. এইচ. এম. বসির উদ্দিন, বি-এল, প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান—প্রভিন্সিয়াল লাইব্রেরী ও ইসলামিয়া লাইব্রেরী, ঢাকা।

বালকদিগের জন্য লিখিত একাঙ্ক নাটক।

জেজুরের মিত্র-বংশ—শ্রীসুধীরকুমার মিত্র বর্ম্মা প্রণীত। মূল্য আট আনা। প্রাপ্তিস্থান ৫নং ললিত মিত্র লেন, কলিকাতা।

হুগলী জেলার অন্তর্গত জেজুর গ্রামের মিত্র-বংশের সংক্ষিপ্ত ইতিহাস—সন ১০৫০ সাল হইতে সন ১৩৪০ সাল পর্য্যন্ত।

যুগান্তর

"বনফুল"

১

এককড়ির প্রপৌত্র, দু'কড়ির পৌত্র, তিনকড়ির পুত্র বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার স্বীয় পুত্র ছ'কড়িকে লইয়া একটু বিব্রত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

হরিণহাটি গ্রামে পাঁচকড়ি পোদ্দারকে সকলেই যথেষ্ট খাতির করিত। বস্তুত তিনি উক্ত গ্রামের মধ্যমণি-স্বরূপ ছিলেন। সকল বিষয়ে তাঁহার মতটাই প্রামাণ্য বলিয়া স্বীকৃত হইত। সকল বিষয়ে মতামত প্রকাশ করিবার মত মানসিক স্থিতিস্থাপকতাও তাঁহার যথেষ্ট ছিল। যে-কোন বিষয়ে—সঙ্গীত, সাহিত্য, চিত্রকলা, সিনেমা, বর্ত্তমান সামাজিক অবস্থা, স্ত্রীশিক্ষা, পাটের দর, কয়লা-ব্যবসায়ের ভবিষ্যৎ, মহাত্মা গান্ধী, রবীন্দ্রনাথ—যে-কোন বিষয়ে স্বকীয় মতবাদ যখন তিনি তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া জাহির করিতেন তখন হরিণহাটি গ্রামের সকলেই তাহা সানন্দে মানিয়া লইতেন এবং মানিয়া লইয়া নিজেদের ধন্য জ্ঞান করিতেন।

অন্য উপায় ছিল না।

পাঁচকড়ি পোদ্দার প্রচুর ধনসম্পত্তিশালী মহাজন এবং গ্রামের ইতর-ভদ্র প্রায় সকলেই তাঁহার খাতক। সুতরাং হরিণহাটি গ্রামে সঙ্গীত, সাহিত্য, রবীন্দ্রনাথ, মহাত্মা গান্ধী প্রভৃতি যে-কোন বিষয় সম্বন্ধে বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দারের মতামতই চূড়ান্ত ও অপ্রতিহত। ইহাতে যাঁহারা বিস্ময় বোধ করিতেছেন তাঁহাদের কিছুকাল হরিণহাটি গ্রামে গিয়া বাস করিতে অনুরোধ করি। দেখিবেন জল না থাকিলে যেমন পুষ্করিণী অচল, পোদ্দার মহাশয় না থাকিলে হরিণহাটি গ্রামও তেমনি অচল। পোদ্দার মহাশয় তাঁহার সমস্ত ধনসম্ভার উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করাতে সারা-জীবনটা ভরিয়া নানা প্রকার মতবাদ গঠন করিবার সুযোগ পাইয়াছিলেন এবং এই মতবাদগুলি লইয়া যেখানে-সেখানে যখন-তখন আস্ফালন করিয়া বেড়ানোটাই তাঁহার জীবনের প্রধান বিলাস ছিল। মতবাদগুলির বিস্তৃত আলোচনা এই গল্পের পক্ষে নিষ্প্রয়োজন। সংক্ষেপে এইটুকু শুধু জানিয়া রাখুন বাবু পাঁচকড়ি পোদ্দার যে-কোন প্রকার আধুনিকতার বিরুদ্ধবাদী। এমন কি, তিনি বোতামের বদলে ফিতা ব্যবহার করেন। ফিতা-বাঁধা ফতুয়াই তাঁহার সাধারণ অঙ্গচ্ছদ। অদ্যাবধি কেহ তাঁহাকে জুতা পরিতে দেখে নাই। খড়মই চিরকাল তাঁহার চরণ রক্ষা করিয়া আসিতেছে।

এ-হেন পাঁচকড়ি পোদ্দার পুত্র ছ'কড়ির নিকট ঘা খাইলেন। কনিষ্ঠ পুত্র সাতকড়ি মারা যাওয়ার পর হইতে আদর দিয়া দিয়া গৃহিণী ছ'কড়ির মাথাটি এমন ভাবে খাইয়াছেন যে পুত্রটি মুণ্ডহীন কেতুর ন্যায় মর্ম্মান্তিক হইয়া উঠিয়াছে। যখনই সে কলিকাতায় পড়াশোনা করিতে যায় দূরদর্শী পোদ্দার মহাশয় তখনই আপত্তি করিয়াছিলেন। বি-এ, এম-এ, পাস করিয়া দশটা মুণ্ড, বিশটা হাত কিছুই গজাইবে না। তর্কের খাতিরে যদি ধরাই যায় যে গজাইবে—তাহাতেই বা কি? এই বাজারে অতগুলো বাড়তি হাত ও মুণ্ড লইয়া হইবে কি! কিন্তু গৃহিণী শুনিলেন না এবং মেয়েমানুষের বুদ্ধিতে পড়িয়া তিনিও মত দিয়া ফেলিলেন—এখন নাও—ছেলে 'লভে' পড়িয়াছে!

২

ছেলে যে 'লভে' পড়িয়াছে এ-কথাটা প্রথমত পোদ্দার মহাশয় বুঝিতেই পারেন নাই। তাঁহার প্রিয় বয়স্য মাধব কুণ্ডুর সাহায্য লইয়া তবে তিনি পুত্রের পত্রের প্রকৃত তাৎপর্য্য হৃদয়ঙ্গম করিয়াছেন।

ঘটনাটি এইরূপ:

একদা পাঁচকড়ি পোদ্দার চিন্তা করিয়া দেখিলেন যে

ছ'কড়ির বয়স বাইশ উত্তীর্ণ হইয়া গেল অথচ তাহার বিবাহ এখনও দেওয়া গেল না, ইহা অত্যন্তই অন্যায় হইতেছে। বিবাহ-প্রসঙ্গ উত্থাপন করিলেই ছ'কড়ি লেখাপড়ার অজুহাত উপস্থিত করে। কিন্তু পোদ্দার মহাশয় ভাবিয়া দেখিলেন এবং মাধব কুণ্ডুও সে-কথা সমর্থন করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে ছ'কড়ি কিছুতেই বিবাহ করিবে না এবং এই যৌবনকালে বিবাহ না করিলে নানা প্রকার অঘটন ঘটিতে পারে—বিশেষতঃ কলিকাতার মত শহরে।

পোদ্দার মহাশয়ের স্বজাতি ও বাল্যবন্ধু বিশ্বনাথের মেয়েকেই তিনি ছ'কড়ির জন্য মনোনীত করিয়া রাখিয়াছেন। বহু দিন পূর্ব্বেই বিশ্বনাথের সহিত তাঁহার কথাবার্ত্তা গোপনে পাকা হইয়া আছে।

বিশ্বনাথ কলিকাতায় বেশ ফলাও ব্যবসা করেন, লোকও ভাল, পোদ্দার মহাশয়ের ভারি পছন্দ। তাছাড়া বাল্যবন্ধু। সর্ব্বোপরি বছর-চারেক পূর্ব্বে বিশ্বনাথ যখন দেশে আসিয়াছিল তখন তিনি তাহাকে এক রকম পাকা কথাই দিয়াছেন। সুতরাং ঐখানেই বিবাহ দেওয়া ঠিক। মাধব কুণ্ডুও এ বিষয়ে এক মত। পাকা কথা দেওয়ার পর হইতেই—অর্থাৎ প্রায় চারি বৎসর ধরিয়া—পোদ্দার মহাশয় ও বিশ্বনাথের পত্রযোগে বিবাহ-সম্বন্ধীয় নানারূপ আলাপ-আলোচনাও চলিতেছিল। পোদ্দার মহাশয় ভাবী পুত্রবধূ সম্বন্ধে বিশ্বনাথকে প্রায়ই লিখিতেন—

"দেখিও ভায়া, মেয়েটিকে যেন ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। ইস্কুলে-পড়া হাল-ফেশিয়ানি মেয়েদের কাণ্ড-কারখানার কথা শুনিলে গায়ে জ্বর আসে। বউমাটিকে গৃহকর্ম্মনিপুণা কর। আমার সহধর্ম্মিণী এখনও ঢেঁকিতে পাড় দিতে পারেন এবং দশটা যজ্ঞির রান্না একাই রাঁধিতে পারেন। তাঁহার দেওয়া বড়ি ও আমসত্ত গ্রামসুদ্ধ লোক খাইয়া প্রশংসা করেন। দেখিও ভায়া, বউমাটি যেন এই চাল বজায় রাখিতে পারে—"

উত্তরে বিশ্বনাথ লিখিতেন—

"ভায়া, তুমি মোটেই চিন্তিত হইও না। মেয়েকে সংসারধর্ম্মে সুনিপুণা করিতে আমার চেষ্টার কোন ত্রুটি নাই। তোমার বউমা মশলা বাঁটা, কাপড় কাচা হইতে আরম্ভ করিয়া সর্ব্বপ্রকার গৃহকর্ম্ম নিয়মিত ভাবে করিয়া থাকে। সম্প্রতি সে উল-বোনা ও জরির কার্য্য করিতেও শিখিয়াছে। সেদিন সে একটি রেশমের কাপড়ে রঙীন সুতা দিয়া এমন সুন্দর একটি হংস আঁকিয়াছে যে দেখিলে সত্যই অবাক হইতে হয়—"

ইহার উত্তরে পোদ্দার মহাশয় জবাব দিতেন--

'উল-বোনা ও জরির কার্য্য সাধারণ গৃহস্থালীর কোন প্রয়োজনে আসে না। রেশম বস্ত্রে অঙ্কিত রঙীন হংসই বা কি এমন উপকারে আসিবে বুঝি না। তুমি বুদ্ধিমান ব্যক্তি, লেখাপড়া শিখিয়াছ, তোমাকে উপদেশ দেওয়া আমার সাজে না। কিন্তু তোমাকে পুনঃ পুনঃ আমি এই অনুরোধ জানাইতেছি, বউমাটিকে ফেশিয়ান-দুরস্ত করিও না। কালের গতিক সুবিধার নহে। মাধব কুণ্ডু খবরের কাগজ পড়িয়া আজকালকার হালচাল সম্বন্ধে যে সমস্ত মন্তব্য করে তাহাতে আমাদের মত মূর্খ লোকের আক্কেল গুড়ুম্ হইয়া যায়—"

ফেরত ডাকেই বিশ্বনাথের জবাব আসিত—

"উল-বোনা ও জরির কার্য্য বন্ধ করিলাম। রেশম বস্ত্রে কোন প্রকার চিত্রাদিও আর আঁকা হইবে না—"

এই ভাবে চারি বৎসর চলিতেছিল।

ছ'কড়ি বিন্দুবিসর্গ জানে না।

সে কলিকাতায় মেসে থাকিয়া পড়াশোনা করে বিবাহের কথা উঠিলে বলে যে পড়াশোনা শেষ করিয়া তবে সে বিবাহ করিবে—তৎপূর্ব্বে নয়।

কিন্তু মাধব কুণ্ডুর পরামর্শ অনুযায়ী পোদ্দার মহাশয় ঠিক করিলেন যে জোর করিয়া বিবাহ না দিলে স্বেচ্ছায় ছ'কড়ি বিবাহ করিবে না। আজকালকার ছেলেছোকরাদের কাণ্ডকারখানাই আলাদা রকমের। এই প্রসঙ্গে মাধব কুণ্ডু বর্ত্তমান পাশ্চাত্য শিক্ষার দোষগুলি লইয়া সবিশেষ আলোচনা করিলেন।

পরদিনই পোদ্দার মহাশয় মাধব কুণ্ডুর নির্দ্দেশমত ছ'কড়িকে পত্র দিলেন যে আগামী মাসের ১৭ই তারিখে বিবাহের দিনস্থির হইয়া গিয়াছে, সে যেন অবিলম্বে বাড়ী চলিয়া আসে।

৩

ইহার উত্তরে ছ'কড়ি যাহা লিখিল তাহাতে পাঁচকড়ি

আকাশ হইতে পড়িলেন। পাশ্চাত্য শিক্ষার প্রভাব যে এত দূর ভয়ঙ্কর হইতে পারে তাহা তাঁহার ধারণার অতীত ছিল। তিনি অবিলম্বে মাধব কুণ্ডুকে ডাকিতে পাঠাইলেন। কি করিয়া এমন ব্যাপার ঘটিতে পারে তাহা তাঁহার মাথায় আসিতেছিল না।

ছ'কড়ি লিখিয়াছে—

"বাবা, আমাকে ক্ষমা করিবেন। আমি প্রায় ছয় মাস পূর্ব্বেই বিবাহ করিয়াছি। আপনাকে এ-কথা জানাই নাই তাহার কারণ আপনি স্ত্রীশিক্ষার ঘোর বিরোধী। মেয়েটি লেখাপড়া কিছু জানে। ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে। আমাকে ক্ষমা করিবেন। যদি অভয় দেন আমরা উভয়ে গিয়া আপনাদের প্রণাম করিব ও সকল কথা খুলিয়া বলিব।"

কুণ্ডু আসিলে তিনি পত্রটি তাহার হাতে দিলেন এবং বলিলেন, "ছ'কড়ির চিঠি! পড়ে দেখ—এর মানে আমি কিছু বুঝতে পারছি না। পোদ্দার-বংশে এমন কুলাঙ্গার জন্মায়!"

কুণ্ডু নীরবে পত্রখানি পাঠ করিলেন এবং আরও কিছুক্ষণ নীরব থাকিয়া বলিলেন, "লভে পড়েছে—"

"কিসে পড়েছে?"

"লভে—লভে—মানে প্রেমে—"

পোদ্দার মহাশয় শুনিয়া স্তম্ভিত হইয়া গেলেন। তাহার পর বলিলেন, "এর মূলে কি আছে জান?"

কুণ্ডু বলিলেন, "পাশ্চাত্য শিক্ষা—"

"না, আমার গিন্নি। ওরই পরামর্শে আমি ছেলেটাকে কলকাতায় পড়তে পাঠাই—দাও চিঠিখানা—"

পোদ্দার পত্রখানি লইয়া খড়ম চট্‌চট্ করিতে করিতে অন্তঃপুরে চলিয়া গেলেন। গৃহিণীর সহিত তাঁহার যে বচন-বিনিময় হইল তাহা প্রকাশ করিতে সঙ্কুচিত হইতেছি।

পরদিন আর এক কাণ্ড ঘটিল এবং তাহার ফলে পোদ্দার মহাশয়কে হরিণহাটি ত্যাগ করিতে হইল। কাণ্ডটি এই—বিশ্বনাথেরও একটি পত্র আসিল। তিনি পরদিন আসিতেছেন।

দিশাহারা পোদ্দার মাধব কুণ্ডুর নিকট ব্যক্ত করিলেন যে বিশ্বনাথের নিকট তিনি মুখ দেখাইতে পারিবেন না। তাঁহার পক্ষে হরিণহাটিতে আত্মগোপন করা আরও শক্ত। কুণ্ডু বলিলেন, "চলুন না, এই সময় বৃন্দাবনের তীর্থটা সেরে আসা যাক। এক ঢিলে দুই পাখীই মরবে—" পাঁচকড়ি পোদ্দার তীর্থযাত্রা করিলেন। কুণ্ডু সঙ্গী।

৪

দীর্ঘ ছয় মাস পোদ্দার মহাশয় তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করিয়া বেড়াইলেন। কুণ্ডু সঙ্গে থাকাতে ভ্রমণটা মনোরমই হইয়াছিল। ফিরিবার পথে কাশীতে তিনি বিশ্বনাথের এক পত্র পাইলেন। বিশ্বনাথ লিখিতেছেন—

"ভায়া, হরিণহাটিতে গিয়া তোমার নাগাল পাই নাই। তুমি বাড়ীতে কোন ঠিকানাও রাখিয়া যাও নাই যে তোমাকে চিঠি লিখি। সম্প্রতি শুনিলাম তুমি না-কি কাশীতে আছ এবং সেখানে কিছুদিন থাকিবার বাসনা করিয়াছ এবং এই মধ্যে হরিণহাটিতে কুণ্ডু মহাশয় একখানি পত্রও না-কি লিখিয়াছেন। সেই পত্র হইতে তোমার ঠিকানা জোগাড় করিয়া তোমাকে এই পত্র লিখিতেছি। তোমাকে সব কথা খুলিয়া বলিবার সময় পাই নাই। এখন অকপটে সমস্ত খুলিয়া লিখিতেছি এবং তোমার মার্জ্জনা ভিক্ষা করিতেছি।

"তুমি স্ত্রীশিক্ষার ঘোরতর বিরোধী বলিয়া তোমাকে আমি জানাই নাই যে আমার মেয়েকে আমি স্কুলে পড়াইতেছিলাম। ভাবিয়াছিলাম তোমার সহিত দেখা হইলে জিনিষটা ধীরেসুস্থে তোমাকে বুঝাইয়া বলিব। আমি নিজে বিশ্বাস করি লেখাপড়া শেখা প্রত্যেকেরই কর্ত্তব্য। ইহাতে নিন্দার কিছু থাকিতে পারে না।

"শ্রীমান ছ'কড়ি কলিকাতায় থাকিতে আমার বাসায় প্রায়ই যাতায়াত করিত এবং কুসুমের সহিত তাহার বেশ ভাবও হইয়াছিল। কুসুম ভবিষ্যতে তাহার পত্নী হইবে ভাবিয়া আমিও তাহাদের মেলামেশায় কোন বাধা দিই নাই। কিন্তু একদিন আমার স্ত্রীর মুখে শুনিলাম যে মেলামেশাটা একটু বেশী রকম ঘনিষ্ঠ হইয়া পড়িতেছে—বিবাহ না দিলে আর ভাল দেখায় না। শ্রীমান ছ'কড়িকে আমি সে-কথা একদিন স্পষ্টতই বলিলাম। তাহাতে সে বলিল যে সে অবিলম্বে কুসুমকে বিবাহ করিতে প্রস্তুত এবং ইহাও সে বলিল যে তুমি যদি জানিতে পার যে মেয়ে স্কুলে গিয়া

লেখাপড়া শিখিয়া ম্যাট্রিক পাস করিয়াছে তাহা হইলে কুণ্ডু মহাশয়ের প্ররোচনায় পড়িয়া তুমি কিছুতেই বিবাহ ঘটিতে দিবে না। তোমাকে ত আমিও চিনি। তুমি একগুঁয়ে লোক—হয়ত বাঁকিয়া বসিবে। নানারূপ ভাবিয়া-চিন্তিয়া তোমাকে গোপন করিয়াই আমি কুসুমকে শ্রীমান ছ'কড়ির হস্তে সমর্পণ করিলাম। ছয় মাস নির্বিঘ্নেই কাটিল। তাহার পর যখন তুমি ছ'কড়িকে পত্র লিখিলে যে তাহার বিবাহের দিনস্থির হইয়াছে এবং ছ'কড়ি যখন তোমাকে জানাইল যে সে বিবাহ করিয়া ফেলিয়াছে তখন আমি ভাবিয়া দেখিলাম যে এইবার সমস্ত ব্যাপারটা তোমাকে খুলিয়া জানানো দরকার। সেই উদ্দেশ্যেই আমি হরিণহাটি গিয়াছিলাম। কিন্তু সেখানে গিয়া শুনিলাম তুমি বৃন্দাবন যাত্রা করিয়াছ।

"সমস্ত কথাই তোমাকে লিখিলাম। আমি তোমার বাল্যবন্ধু। আমাকে ক্ষমা করা যদি তোমার পক্ষে নিতান্তই শক্ত হয়, আমাকে না-হয় দু ঘা মারিয়া যাও। কিন্তু ছেলে-বউকে অবহেলা করিও না। কুসুম স্কুলে পড়িলেও সত্যই গৃহকর্ম্মনিপুণা হইয়াছে। নিজে আসিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার..." ইত্যাদি

৫

বহুদিন পরে পোদ্দার মহাশয় হরিণহাটিতে প্রবেশ করিলেন। গ্রামে প্রবেশ করিয়া দেখিলেন যে তাঁহার দীর্ঘ অনুপস্থিতির সুযোগ লইয়া গ্রামের কয়েকটি ছোকরা বাটার-ফ্লাই ফ্যাশানে গোঁফ ছাঁটিয়াছে এবং মল্লিক-বাড়ীর বৈঠক-খানার বারান্দায় বিলাতী মরশুমী ফুলের কয়েকটি টবও বসান হইয়াছে। পোদ্দার মহাশয় কিছু না বলিয়া কুণ্ডুর মুখের দিকে শুধু একবার চাহিলেন।

কুণ্ডু হাসিয়া বলিলেন, "সব লক্ষ্য করছি—"

* * *

অন্তঃপুরে প্রবেশ করিয়া পোদ্দার মহাশয় দেখিলেন যে তাঁহার গৃহিণী একটি সুন্দরীর বেণী রচনা করিতেছেন। বৌ!

পোদ্দারকে দেখিয়া পোদ্দার-গৃহিণী অসম্বৃত বেশবাস সম্বরণ করিয়া তাড়াতাড়ি দাঁড়াইয়া উঠিলেন। বধূ ছুটিয়া গৃহমধ্যে গিয়া আশ্রয় লইল।

গৃহিণী প্রশ্ন করিলেন, "হঠাৎ খবরটবর না দিয়ে এসে পড়লে যে। যাক্—এলে বাঁচলাম। ভাল ছিলে ত বেশ?"

পোদ্দার মহাশয় এ-সব প্রশ্নের জবাব না দিয়া অদূরে টাঙানো দোলনাটি দেখাইয়া বলিলেন, "ওটা কি?"

"ওমা, ছ'কড়ির খোকা হয়েছে যে! অমলকুমার—"

"কি?"

"অমলকুমার! বৌমা ছেলের নাম রেখেছে অমলকুমার।"

পোদ্দার স্তম্ভিত।

বিস্ময় কাটিলে তিনি বলিলেন, "অমলকুমারকে নিয়ে থাক তোমরা! আমি কাশী ফিরে চললাম—"

বলিয়া তিনি সত্যই ফিরিলেন।

পথরোধ করিয়া গৃহিণী বলিলেন, "ওমা, সে কি কথা গো—"

"অমলকুমার নাম আমি বরদাস্ত করতে পারব না—"

"বেশ ত তুমিই একটা নাম দাও না।"

"ন'কড়ি—"

"বেশ তাই হবে—"

পোদ্দার মহাশয় ঘুরিয়া দোলনার দিকে অগ্রসর হইলেন।

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

২৫

গহনার দোকানে নামিয়া গহনার বাক্সগুলি খুলিয়া নাড়িয়া-চাড়িয়া হৈমন্তী একেবারে তন্ময় হইয়া গেল। মহেন্দ্র বলিল, "তুমি কবিতা পড়, লুকিয়ে লেখও কিছু কিছু এই ত জানতাম। গহনার যে তুমি এত ভক্ত তা ত জানতাম না। বাহিরে যে যেমনই দেখাক্, স্ত্রীলোকেরা এক জায়গায় সব এক রকম। শুধু গহনার গল্প করে আর গহনা দেখেই তারা এক যুগ কাটিয়ে দিতে পারে।"

হৈমন্তী সে কথায় কান না দিয়া একটা মস্ত সরস্বতী-হার ছুই হাতে তুলিয়া ধরিয়া বলিল, "মহেন্দ্র-দা, Isn't it a beauty ?" হারের দিকে তিন-চার মিনিট সে একদৃষ্টে তাকাইয়া রহিল।

মহেন্দ্র বলিল, "সুন্দর বটে, তবে তোমার চোখ দিয়ে ত আমি দেখতে পাই না। জানি না তোমরা এক তাল সোনা কি এক সার মুক্তোর ভিতর কি খুঁজে পাও।

হৈমন্তী বলিল, "work of art তারিফ করতে হ'লে মনটাকে তেমনি করে তৈরি করতে হয়। আগে থেকেই গহনার প্রশংসায় স্ত্রীজনোচিত দুর্ব্বলতা আছে মনে ক'রে চোখ বুজে থাকলে দেখতে পাবেন কি ক'রে ?"

মহেন্দ্র বলিল, "তোমার এই হারটা ভয়ানক ভাল লেগেছে দেখ্‌ছি, পেলে একটা নাও ?"

হৈমন্তী বলিল, "নিশ্চয়, একশ বার নিই।"

মহেন্দ্র একটু মিষ্ট হাসিবার চেষ্টা করিয়া বলিল, "আচ্ছা, দেখি আমি একটা দিতে পারি কি না।"

হৈমন্তী মুখটা লাল করিয়া বলিল, "থাক্, আপনাকে আর আমায় সরস্বতী-হার দিতে হবে না।"

গহনা লইয়া তর্কবিতর্কে তপন বিশেষ যোগ দিতে পারিতেছিল না। বাক্সগুলা গাড়ীতে তুলিয়া সে বলিল, "আমার ইস্কুলে জন কতক বাইরের লোককে দিয়ে মাঝে মাঝে কিছু বলাব ঠিক করেছি। আজ তাঁদের সঙ্গে আমাকে একবার দেখা করতে হবে। আমি সে কাজটা সেরে রাত্রে খাবার সময় ঠিক এসে যথাস্থানে হাজির হব। আমাকে খানিক ক্ষণের জন্য মাপ করবেন।"

তপন গাড়ী ছাড়িয়া পায়ে হাঁটিয়াই চলিয়া গেল। মহেন্দ্র গাড়ীতে উঠিয়া বলিল, "আচ্ছা, গাড়ীটা যদি এক চক্কর গড়ের মাঠ দিয়ে ঘুরে যায়, তোমার আপত্তি আছে ?"

হৈমন্তী মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া বলিল, "না, আপত্তি ঠিক নেই, কিন্তু প্রয়োজন কি ?"

মহেন্দ্র যেন একটু রাগিয়াই বলিল, "প্রয়োজন আমার এই মাথাটাকে একটু ঠাণ্ডা করা। তোমরা ত আমাকে নারদ মুনি ব'লে নিশ্চিন্ত, কিন্তু আমার ঘাড় থেকে তিক্ত রসের বোঝাটা নামাতে ত কাউকে একটু চেষ্টা করতে দেখলাম না।"

হৈমন্তী অপরাধীর মত মুখ করিয়া বলিল, "আমি কি করব বলুন না, মহেন্দ্র-দা, আমি ত কোন অন্যায় জেনেশুনে করি নি।"

মহেন্দ্র হৈমন্তীর মুখের দিকে পূর্ণ দৃষ্টিতে চাহিয়া বলিল, "অন্যায় কর নি বটে, কিন্তু ন্যায়ই বা কি করেছ ? আমি যে একটা মানুষ পৃথিবীতে আছি, তোমাদের দরজায় রোজ এসে ঘুরছি, তা তোমরা কি একবার দেখতেও পাও না ? কবিতা পড়ে এই বুঝি মানুষের মন বুঝতে শিখেছ ?"

হৈমন্তী চুপ করিয়া মুখ নীচু করিয়া রহিল। মহেন্দ্র জোর দিয়া বলিল, "বল না, তোমারও কি আমাকে একটা ঝগড়ুটে তাকিক ছাড়া আর কিছু মনে হয় না ? আমি ত তোমাকে কত দিন ধরে পড়িয়েছি, কত কাছে থেকে তুমি আমায় দেখেছ, তখন কি আমি কেবল ঝগড়াই করতাম ? তার চেয়ে ভাল কোন গুণ তুমিও কি আমার মধ্যে দেখ নি ?"

হৈমন্তী সহাস্যে বলিল, "ও কি কথা মহেন্দ্র-দা, আপনি

আমাকে কত যত্ন ক'রে মেঘদূত পড়িয়েছিলেন, কত ভাল ভাল কন্টিনেন্টাল বই এনে দিয়েছেন, আমি তা একদিনের জন্যেও ভুলি নি।"

মহেন্দ্র হৈমন্তীর কাছে সরিয়া আসিয়া বলিল, "দেখ, আমি ভূমিকা ক'রে কথা বলতে জানি না, তুমি ত জানই আমি অসহিষ্ণু মানুষ। তা ছাড়া আমার বসে বসে দিন গোন্‌বার সময়ও নেই। এই বছরই আমি জার্ম্মানীতে পড়তে চলে যাব ঠিক হয়েছে। তার আগে আমি আমার অদৃষ্টটা জেনে নিতে চাই। তুমি কি সে কাজে আমায় একটু সাহায্য করবে?"

হৈমন্তী চুপ করিয়াই রহিল। মহেন্দ্র বলিল, "মনে ক'রো না আমার মধ্যে আনন্দ দেবার কোন ক্ষমতাই নেই। এই তেতো খোলার আড়ালে মধুর রসও কিছু আছে। যে দয়া ক'রে কাছে আসবে তাকে সুখী করতে পারব ব'লে মনে মনে একটা অহঙ্কার আছে। তুমি আমাকে সে সুযোগ একবার দিয়ে দেখবে কি হৈমন্তী?"

পথের ধারের কৃষ্ণচূড়া গাছের সারির দিকে হৈমন্তী নিস্তব্ধ হইয়া তাকাইয়াছিল। দক্ষিণ সমীরণ লাল ফুলের তোড়া আর সবুজ পাতার রাশির ভিতর মাতামাতি লাগাইয়াছিল। তাহারও ভিতর থামিয়া উঠিয়া হৈমন্তী বলিল, "মহেন্দ্র-দা, এককথায় জবাব আমি দিতে পারব না। আপনাকে আমি পরে বলব।"

মহেন্দ্র বলিল, "অন্ধ, তোমরা অন্ধ। পরে বলবার কি আছে এতে? আমাকে কি তুমি এত দিন ধরে দেখ নি? আমার ভিতর কোন যোগ্যতা খুঁজে পাও নি? আরও কি বাজিয়ে দেখতে চাও? বিশ্বাস কর আমার কাছে তুমি যা চাইবে আমি বিনাবাক্যে তা ক'রে যেতে পারব। আমাকে সন্দেহ করবার তোমার কোন কারণ নেই। যদি এত দিনে না বুঝে থাক, আজ একবার আমার দিকে তাকিয়ে দেখ, বুঝতে পারবে।"

হৈমন্তী বলিল, "মহেন্দ্র-দা, আপনি রাগ করবেন না। কিন্তু সব মানুষের সময় একসঙ্গে আসে না; তাই ব'লে তার দ্বারা আর একজনের অযোগ্যতা প্রমাণ হয় না। আমরা অন্ধ বইকি অনেক দিকে। কিন্তু সে অন্ধতার মায়া কাটিয়ে ওঠবার ক্ষমতাও যে আমাদের নেই।"

মহেন্দ্র বলিল, "সময় যদি না এসে থাকে আমি আরও কিছুদিন অপেক্ষা করব। দুঃখ অনেক সয়েছি, না-হয় আর কিছুদিন সইব। আমার অযোগ্যতার প্রমাণ যদি না পেয়ে থাক, তবে যোগ্যতার প্রমাণ পাওয়া অসম্ভব নয় কেন মনে করছ না? কেন তোমার অন্ধতাকেই দুই হাতে এমন ক'রে চেপে ধরে রাখতে চাইছ। ওই সুন্দর চোখ দুটির ভিতর দৃষ্টির এতটা অভাবই কি আমাকে বিশ্বাস করতে হবে?"

হৈমন্তী বলিল, "সব কথারই কি সব সময় জবাব দিতে হবে, মহেন্দ্র-দা? আপনার যা শুনতে ভাল লাগবে, তা যখন বলতে পারছি না, তখন শুনতে খারাপ লাগবে এমন কথা না হয় কিছু নাই বললাম।"

মহেন্দ্র ঝুঁকিয়া পড়িয়া বলিল, "আমি অদৃষ্টকে অত ভয় করি না হৈমন্তী। অপ্রিয় সত্যই যদি তোমার বলবার থাকে, তবে আমি তাই শুনতে চাই।"

হৈমন্তীর চোখে জল আসিয়া গেল। সে বলিল, "মহেন্দ্র-দা, আপনি আমাদের অনেক দিনের বন্ধু। আমাদের বন্ধু-সভার এত দিনের ব্যবহার, তারও আগে যখন আপনার ছাত্রী ছিলাম, তখন কোনও দিন কি অপ্রিয় কিছু বলতে আমায় উন্মুখ দেখেছেন? আপনাকে আমরা ঠাট্টা করি বটে, কিন্তু সে যে শত্রুর ঠাট্টা নয় তা কি আপনি বোঝেন না? মানুষের বন্ধুত্বের মূল্য সামান্য নয়, কিন্তু সখ্য যা তা সখ্য, তার চেয়ে বেশী সেক্ষেত্রে কিছু আশা করা যায় না। কেন যে কখন্ চলে না তা বলাও যায় না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তুমি যদি আমার সম্বন্ধে তোমার সখ্যকে স্বীকার কর, তবে সেই সখ্যের চেয়ে আর একটু উপরে ওঠা, তাকে আর একটু বড় করে দেখা কি তোমার পক্ষে একেবারে অসম্ভব?"

হৈমন্তী বলিল, "মহেন্দ্র-দা, আপনার হাতে ধরে বলছি, আপনি আমাকে আর তর্কে টানবেন না। মানুষ তর্কশাস্ত্র সৃষ্টি করেছে বটে, কিন্তু সর্ব্বক্ষেত্রেই সে তাকে মেনে চলতে পারে না। ঐ দেখুন, আকাশে মেঘ ক'রে আসছে। প্রচণ্ড গরমের পর আজ বোধ হয় বৃষ্টি দেখা দেবে। আমাদের এখনই বাড়ী ফেরা উচিত, না হ'লে লোকে মনে করবে হয় আমরা ডাকাতের হাতে পড়েছি, নয় গাড়ী চাপা পড়েছি।"

মহেন্দ্র তখনও আপন মনেই কথা বলিতে বলিতে চলিল। সে বলিল, "আমি বেশ বুঝতে পারছি যে তুমি আমার প্রশ্নের উত্তর এড়িয়ে যাচ্ছ। আমার সঙ্গে তোমার সখ্য, সেটা একটা কথার কথা মাত্র। আলাপী সবাইকেই ত লোকে বন্ধু বলে। কিন্তু তোমার মন চলেছে অন্য দিকে, না? তুমি কি জান যে আজ চার পাঁচ বৎসর ধ'রে এই চিন্তাই আমার মনে দিবারাত্রি অঙ্কুরের মত ধীরে ধীরে বেড়ে উঠ্‌ছে? এত দিন বলবার অবস্থায় আসে নি, আজ দিন এসেছে মনে ক'রে তোমায় এ কথা বললাম। কিন্তু আমার দুর্ভাগ্য তুমি তার ওজন একটুও বুঝতে পারলে না। মমতার একটু চিহ্নও তোমার মধ্যে দেখলাম না।"

হৈমন্তী বলিল, "আপনি বিশ্বাস করুন, মহেন্দ্র-দা, আমি আপনাকে আঘাত দেবার জন্যে ইচ্ছা ক'রে কোন চেষ্টা করি নি। আপনি আর আমি সিঁড়ির ভিন্ন ভিন্ন ধাপে রয়েছি, কাজেই এ জিনিষকে এক ভাবে দেখে এক উত্তর দেওয়া ত দু-জনের পক্ষে সম্ভব নয়।"

মহেন্দ্র বলিল, "এবারেও ত সেই একই উত্তর। তুমি আমার প্রশ্নের ত জবাব দিলে না।"

হৈমন্তী বলিল, "আজ আমাকে আর পীড়ন করবেন না, লক্ষ্মীটি। একদিন আমি উত্তর দেব, তবে কবে তা বলতে পারি না।"

মহেন্দ্রর কথা ফুরাইতে চাহিতেছিল না। সে বলিল, "তুমি কি জবাব দেবে আমি কি বুঝি নি, হৈমন্তী? আজ যে কঠিন কথাটা আমার মুখের উপর বলতে তোমার বাধছে, সেই কথাটাই একদিন হাল্কা করে আমায় জানিয়ে দিতে চাও, তা আমি বুঝেছি। তোমরা কথা বলতে জান, নিষ্ঠুর আঘাতকেও নরম কথায় মুড়ে সামনে এনে ধরবে; কিন্তু আমি মূর্খ, আমার মনের শ্রেষ্ঠ কথাটাও তোমায় সাজিয়ে বলতে পারলাম কই? যা বলতে চেয়েছিলাম, মনে হচ্ছে তার কিছুই বলতে পারি নি, মনের যেখানটা তোমায় দেখাতে চেয়েছিলাম তোমার দৃষ্টিই সেখানে আনতে পারলাম না। হয়ত আমারই মূর্খতায় তুমি আমায় কিছুই বুঝলে না। হৈমন্তী, যদি জানতে কত কাল ধ'রে কত কথা এই বোবা মনের ভিতর জমা হয়ে মাথা খুঁড়ছে, তাহ'লে হয়ত এতখানি কঠিন হতে না।"

হৈমন্তী আর কথা বলিবার চেষ্টা করিল না। সে আরক্ত মুখ নত করিয়াই কোন রকমে মুহূর্ত্তগুলা গুনিয়া সময় কাটাইতেছিল। মহেন্দ্রের প্রতি তাহার একটা টান ছিল, তাই নিজে মহেন্দ্রের কষ্টের কারণ হইতে তাহার মনে একটা অপরাধ বোধ হয় খোঁচা দিতেছিল।

বাড়ীতে নামিয়াই যেন মুক্তির নিশ্বাস ফেলিয়া হৈমন্তী তাহার বেগুনফুলি রঙের মান্দ্রাজী শাড়ীর উপর কোমরে একটা ফরসা তোয়ালে জড়াইয়া রান্নাঘর হইতে এক ট্রে খাবার ও সরবৎ আনিয়া বসিবার ঘরে হাজির করিল। মহেন্দ্রকে খাইতে ডাকিয়া কোনও সদুত্তর পাওয়া গেল না। সে আজ গহনা বিষয়ে মস্ত বিশেষজ্ঞের মত মিলিকে নানা কথা বুঝাইতে বসিয়াছে।

নিখিল বলিল, "আমরা সেই কখন থেকে বসে বসে হাত চালাচ্ছি, আমাদের আপনি এক গেলাস সরবৎ দিতে পারলেন না, সবার আগে দিতে গেলেন মহেন্দ্রকে। সে ত প্রচুর হাওয়া খেয়ে এল এইমাত্র।"

মহেন্দ্র আজ ঠাট্টার জবাব দিল না। বাঙালীর গায়ের রঙে মুক্তা যে মানায় না এই বিষয়ে দ্বিগুণ উৎসাহে সে মিলিকে বক্তৃতা শুনাইতে লাগিল। মিলি বলিল, "না মানায়, না মানাক্, আপনার বৌকে না-হয় আপনি একটাও মুক্তো পরতে দেবেন না। আমরা কালো রঙেই প্রাণে যা সখ আছে পরে নেব।"

হৈমন্তী একটা সরবতের গেলাস আনিয়া মহেন্দ্রর হাতের ভিতর গুঁজিয়া দিল। মহেন্দ্র ফিরাইয়া দিতে যাইতে ছিল, নিখিল বলিল, "আর কদিনই বা এত আদরযত্ন পাবে, এখন বেশী চাল দেখিও না! বেশ কাটছে এই দিনগুলো! একান্নবর্তী পরিবারের মত, রোজ একসঙ্গে খাওয়া-দাওয়া, কাজ, গল্পগাছা, ঝগড়াঝাঁটি সব নিয়ে জিনিষটা জমেছে ভাল। দুঃখ এই যে, দিন ফুরিয়ে এল।"

মহেন্দ্র এতক্ষণে ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, "তুমি কার সঙ্গে একান্নে থেতে চাও বল না, আমি যথাসাধ্য চেষ্টা ক'রে দেখব কিছু করা যায় কি না। পরোপকার কখনও করি নি, তোমরা মহৎ লোক, তোমাদের উপকার করলে আমারও পুণ্য হবে কিছু।"

মিলি বলিল, "আপনার হাতে অন্নচিন্তার ভার অর্পণ

করতে ওঁর বিশেষ ভরসা নেই, নিজের চেষ্টা নিজেই না-হয় তিনি দেখুন।"

তপন আসিয়া সবে ঘরে দাঁড়াইয়াছে। মহেন্দ্র তাহার দিকে মুখ করিয়া বলিল, "আর তোমার মতলব কি হে তপন, অন্ন না নিরন্ন?"

তপন বলিল, "মতলব ত মানুষের কতই থাকে। কিন্তু অন্ন কি আর বিধাতা সকলের অদৃষ্টে লেখেন?"

মহেন্দ্র যেন মার খাইয়া পাল্টা মার দিবার জন্য উগ্র হইয়া বলিল, "আমাদের মত অভাজনদের অদৃষ্টে না থাকতে পারে, কিন্তু তোমার মত ভাগ্যবান পুরুষের অদৃষ্ট নিশ্চয়ই সুপ্রসন্ন হবে। বিধাতার বিচারেও পক্ষপাত আছে।"

তপন বিস্মিত হইয়া মহেন্দ্রের মুখের দিকে তাকাইয়া ভাবিতে লাগিল, সামান্য একটা ঠাট্টার কথায় মহেন্দ্রর এত চটিয়া উঠিবার কি কারণ হইল? সে যেন কি একটা গায়ের জ্বালা মিটাইবার জন্য একবার তপন ও একবার নিখিলকে ধরিয়া মাথা ঠুকিয়া দিতে উদ্যত হইয়াছে। নিখিল তাহার কি করিয়াছে জানা নাই, কিন্তু তপন ত জানত মহেন্দ্রর কোন অনিষ্ট করে নাই। তাহাদের কথা-কাটাকাটি প্রায়ই চলে বটে, কিন্তু একে ত তাহাতে তপনের দিকটা হয় খুবই হাল্কা, তার উপর সে সব তর্কের শিকড় ত একটুও গভীর বলিয়া কোন দিন মনে হয় নাই। মহেন্দ্র যে অগ্নিশর্ম্মা হইয়া আসিয়াছে তাহা স্পষ্টই বোঝা যাইতেছে। তপন তাহাকে ঠাণ্ডা করিবার জন্য বলিল, "কি এমন হৃদয়বিদারক ব্যাপার এর মধ্যে ঘটে গেল যে নিজেকে একেবারে অভাজনের দলে চালিয়ে দিচ্ছ?"

মহেন্দ্র বলিল, "হৃদয় টৃদয় ওসব তোমাদের আছে, গরীব লোকের ওসব থাকে না।"

হৈমন্তী অকারণেই লাল হইয়া সেখান হইতে উঠিয়া চলিয়া গেল। সুধা তাহা লক্ষ্য করিয়া একটু ব্যগ্র হইয়া উঠিল। মহেন্দ্রর কথাগুলি যে রুদ্ধ অভিমানে ফুলিয়া ফুলিয়া উঠিতেছে, তাহা বুঝিতে সুধার দেরী হইল না। কেন সে এমন কথা বলিতেছে? তাহার মনে কি কোন নিরাশার বেদনা বিঁধিয়া আছে? অথবা হয়ত কোন আশাই তাহার মনে জাগিয়াছে যাহার পল্লবিত রূপ দেখিবার পূর্ব্বে মনের সংশয়কে সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে সে পারিতেছে না। মহেন্দ্রর মত এমন প্রকৃতির মানুষেরও কি সুধার মত অবস্থা? সুধারই মত কি সে মনে মনে আকাশকুসুম রচনা করিয়া কবিতার ছন্দে ও গানের সুরে আপনার জীবনকাব্যকে ঝঙ্কৃত করিয়া তুলিয়াছে? হৈমন্তীর উপর বুঝি মহেন্দ্রর মন ঝুঁকিয়াছে?

সুধার মনে পড়িল আজ কতদিন ধরিয়াই হৈমন্তীকে সে কেমন যেন উন্মনা দেখিতেছে, কিন্তু মহেন্দ্রর কথা সুধার একবারও মনে হয় নাই। চিত্রকরের তুলির মুখ হইতে হৈমন্তী যেন বাহির হইয়া আসিয়াছে, তাহাকে মহেন্দ্রর মত মূর্ত্তিমান তর্কশাস্ত্রের পাশে কি রকম মানাইবে? সুধার মন এতটুকুও সায় দিল না। মহেন্দ্র সম্বন্ধে তাহার এ অনুমানটাকে মিথ্যা মনে করিয়াই সে উহার হাত এড়াইতে চেষ্টা করিল। অথবা মহেন্দ্রর নিজের দিকে সত্য হইলেও হৈমন্তীর দিকে ইহা মিথ্যা হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী। কিন্তু কে সে, কাহার আশায় হৈমন্তী তাহার হৃদয়-শতদলে আসন পাতিয়া রাখিয়াছে, কাহার পিছনে দূরে দূরান্তরে তাহার উতলা মন উড়িয়া চলিয়া যায়, নিকটের সকল কিছু ভুলিয়া? তাহাদের এই ক্ষুদ্র বন্ধু-সভার বাহিরেও ত হৈমন্তীর আনাগোনা আছে। এই ত সেদিন বিকালের চায়ে দেখা গেল নবীন অধ্যাপক বিমলকান্তি দত্তকে আর তরুণ চিকিৎসক খ্যাতনামা অমরপ্রিয় দেবকে। হৈমন্তীর তাহাদের সঙ্গে খুবই আলাপ আছে বোঝা যায়, তাহারা মাঝে মাঝে আসেও এ-বাড়ীতে, হৈমন্তীকেও ত অমরপ্রিয়ের মা দুদিন নিমন্ত্রণ করিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। ভারী সুন্দর শিষ্ট সংযত কথাবার্ত্তা এই ভদ্র-লোকটির। হৈমন্তীর মন এদিকে গিয়াছে কি? কি জানি? সুধার মনটা কি ভাবিয়া একবার কাঁপিয়া উঠিল। আবার সে-চিন্তা সে মন হইতে দূর করিয়া দিল জোর করিয়া। দুই হাতে যেন কি একটা ভয়াবহ জিনিষকে সে দূরে ঠেলিয়া দিতেছে এমনি ভাবে মনটাকে শক্ত করিয়া তুলিল। সেই চেষ্টায় তাহার দুই চক্ষু একবার যেন পলকের জন্য বন্ধ হইয়া আসিল। আবার সে আপনার কাজে মন দিল।

মিলি তাহার হাত হইতে কাগজগুলা কাড়িয়া লইয়া বলিল, "আজ বন্ধ কর ভাই, আর ত বেশী নেই। ওক'টা কালকে করলেও চলবে, তোমরা আজ ভয়ানক খেটেছ। একটু গানেগল্পে খেলাধুলোয় সময়টা কাটালে হ'ত না।"

মহেন্দ্র বলিল, "আপনার যেমন দিবারাত্রি গান ভাল

লাগে, আর সকলের তা না লাগতে পারে। অবশ্য, আমি যে সকলের মন জানি না সেটাও ঠিক কথা।”

মিলি বলিল, “গানই যে করতে হবে এমন কথা আমি বলি নি। ইচ্ছে করলে স্নেকস্ এণ্ড ল্যাডার্স কিম্বা আগডুম-বাগডুম খেলতেও পারেন। আমি কেবল বাক্স বন্ধ করতে চেয়েছিলাম। সেইটুকু মাত্র আমার উদ্দেশ্য।”

মহেন্দ্র আর কিছু বলিল না। তাহার মনের ভিতর মস্ত একটা তোলপাড় চলিতেছিল। বহুদিন ধরিয়া এই যে প্রিয় চিন্তাটিকে ধীরে ধীরে সে পরিণতির দিকে আনিতেছিল, তাহা যে এমন একটা বাধার গায়ে আসিয়া ঘা খাইবে ইহা সে আশা করে নাই। তাহার বলিবার ভাষা মোলায়েম নয়, ধরণধারণ সুকোমল নয়, কিন্তু মনে যে তাহার প্রচণ্ড একটা ঝড় উঠিয়াছে ইহা নিশ্চয়ই সে হৈমন্তীকে বুঝাইতে পারিয়াছে। ভালবাসার এতখানি আবেগকে মেয়েরা অনায়াসে প্রত্যাখ্যান করিতে পারে না বলিয়াই মহেন্দ্রর বিশ্বাস, যদি না ইতিমধ্যে তাহার মনে আর কেহ আসন পাতিয়া বসিয়া থাকে। তা ছাড়া, উনিশ-কুড়ি বৎসরের মেয়ের মন একেবারে শূন্য, বালিকার খেলার খেয়ালে সে দিন কাটাইতেছে, ইহাও মহেন্দ্র বিশ্বাস করে না। হৈমন্তী কেন বলিল, তাহার সময় আসে নাই? যে এসব কথা এমন গুছাইয়া বলিতে পারে তাহার মনে এ-চিন্তা নিশ্চয়ই প্রবেশ করিয়াছে। নিশ্চয় সে আর কাহারও দিকে মনের মোড় ফিরাইতেছে। সেই ত্রয়োদশী বালিকা হৈমন্তীকে মহেন্দ্র যখন প্রথমে দেখে তখন ত ইহারা কেহ তাহার ধারে-কাছে ছিল না। তাহার এতদিনের পরিচয় এতকালের প্রভাবকে অনায়াসে ডিঙাইয়া গেল কে, জানিবার জন্য মহেন্দ্রের মন ছটফট করিতে লাগিল। সভ্য সমাজে সর্ব্বত্রই সভ্য হইয়া চলিতে হয়, না হইলে তাহার মাথাটা সে একবার অন্তত দেয়ালে ঠুকিয়া দিয়া কিছু আনন্দ সংগ্রহ করিত। মূর্খ মানুষগুলার ভিতর ত সব মরুভূমি, কিন্তু বাহিরে মমতার নির্ঝর ছুটাইয়া অনভিজ্ঞ মেয়েগুলিকে হাত করিয়া লইতে তাহাদের পাণ্ডিত্যের অভাব দেখা যায় না! সত্যকার যোগ্যতা অর্জ্জন করিবার দিকে মন না দিয়া মহেন্দ্রও যদি এই ভুয়া পালিশের দিকে মন দিত তাহা হইলে হয়ত তাহাকে আজ এমন করিয়া প্রত্যাখ্যাত হইতে হইত না। সংস্কৃত সাহিত্যে তাহার বয়সে এতখানি অধিকার আজকালকার কোন ছেলের নাই, ইংরেজী সাহিত্যের খোঁজই বা তাহার সমান কে রাখে? কিন্তু বিধাতা তাহার কথার সঙ্গে সঙ্গে কণ্ঠটাও করিয়াছেন কর্কশ, পথে ঘাটে সর্ ওয়াল্টার র‍্যালির মত গায়ের জামা খুলিয়া প্রেয়সীর পদতলে পাতিয়া দিবার বিদ্যাও সে আয়ত্ত করে নাই, এই সব অপরাধেই হয়ত তাহাকে অযোগ্যতার শাস্তি মাথায় বহিয়া ফিরিতে হইবে।

(২৬)

বেলতলার দিকে প্রকাণ্ড একটা ময়দানওয়ালা বাড়ী। বহুকাল পূর্ব্বে তপনের পিতামহ তাহারই কোন্ মক্কেলের নিকট হইতে মাটির দরে এই জমিটা কিনিয়াছিলেন। বাড়ীর অর্দ্ধেকটা তিনিই করিয়াছিলেন, বাকি অর্দ্ধেকটা তপনের পিতা। তপনের পিতার বাগানের সখ ছিল বলিয়া বাড়ীটার দিকে খুব বেশী ঝোঁক তিনি দেন নাই, জমি বেচিয়া লক্ষপতি হইবার চেষ্টাও করেন নাই। তাঁহার সখ ছিল বড় বড় গাছের; কৃষ্ণচূড়া, সোনাল, বিলাতী নিম, বকুল, কাঠচাঁপা, কনকচাঁপা ইত্যাদি সব রকম বড় ফুলের গাছ পথের দুই ধারে তিনি লাগাইয়াছিলেন। আম, কাঁঠাল, দেবদারু, ইউকালিপ্টসের অভাবও সেখানে ছিল না।

বাড়ীটার বেশীর ভাগ একতলা, দোতলায় খান তিনেক মাত্র ঘর। একদিকে চওড়া ঢাকা বারাণ্ডা, অন্যদিকে মস্ত চৌকা গাড়ীবারাণ্ডার ছাদ লোহার রেলিং দিয়া ঘেরা। দক্ষিণের এই গাড়ীবারান্দার দিকে মুখ করিয়া তপনের ঘর। ঘরে খাট নাই, পুরু গদির উপর পাতা বিছানা মস্ত একটা সুচিত্রিত কাঁথা দিয়া ঢাকা, আর একদিকে হাত খানিক উঁচু একটা টেবিলের সামনে বড় একটা পিঁড়ির উপর সালুর তৈরি ঐ মাপের ছোট একটি তোষক। পাশে একটা কাচহীন বই রাখিবার তাক, দেখিলেই বোঝা যায় বইগুলি সর্ব্বদা নাড়াচাড়া হয়। সংস্কৃত ও বাংলা রামায়ণ মহাভারত ছাড়া রবীন্দ্রনাথের সমস্ত কাব্যগ্রন্থ ও গানের বই তাহাতে সাজানো। টলষ্টয়, মহাত্মা গান্ধী, শ্রীঅরবিন্দ প্রভৃতির দুই-চারিখানা করিয়া বই তাহাতে আছে আর আছে গীতা ও উপনিষদ্। নীচের

দিকে কৃষক নামক বাংলা মাসিক পত্র, বাগান সম্বন্ধে ইংরেজী কয়েকটা বই, ও ছুতার, কামার ইত্যাদির যন্ত্রপাতি সমেত সুচিক্কণ একটি কাঠের বাক্স। তাকের মাথায় কুমারটুলির গড়া একটি লক্ষ্মীমূর্ত্তির দুই পাশে দুইটি মাজা পিতলের ঘটিতে তাজা ফুল। নীচু টেবিলটায় শ্বেত পাথরের ছোট একটি রেকাবীতে মোটা মোটা অনেকগুলি বেলফুল। একটা সুচিত্রিত মাটির ছোট ঘটে অনেকগুলি কলম ও পেনসিল মুখ উঁচু করিয়া আছে আর একটা রংকরা গোল কাঠের কৌটায় নিব, রবার আলপিন ইত্যাদি ভরা। দেয়ালে প্রকাণ্ড একখানি রেখাচিত্র—একটি গ্রাম্য বালিকা কোমরে কাপড় জড়াইয়া খোড়ো ঘরের বাহিরের দেয়ালে আলপনা দিতেছে, চিত্রকরের নাম লেখা নাই। ঘরের একেবারে কোণে ছোট একটি কাঠের আলনায় দুই-চারিটা সাদা জামা কাপড়।

তপন সকালে উঠিয়া গাড়ীবারান্দায় ভোরের সূর্য্যের আলোর দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়াছিল। ফুলের গন্ধে বাতাস ভারী হইয়া উঠিয়াছে, পাখীর ডাকে ইহাকে আর কলিকাতা শহর মনে হইতেছে না। তপনের ইচ্ছা করিতেছিল না যে এখান হইতে সরিয়া যায়। কিছু দিন হইতে তাহার মনটা কেন জানি না কাজে বসিতে চায় না।

মনে হয় তাহার ওই গ্রামের ইস্কুল, ওই ক্ষেত বাগান—এ ত তাহার জীবনে কই সত্য হইয়া উঠে নাই। ছেলেবেলা যেমন সে পুতুল লইয়া, খেলনা লইয়া খেলা করিত, বড় হইয়া তেমনি যেন মানুষ, ক্ষেত, খামার লইয়া খেলা করিতেছে। পুরুষ বুঝি সারাজীবনই এমনি খেলা করে, নিত্য নূতন নূতন খেলা রচনা করিয়া তাহাকে বড় বড় নাম দিয়া আপনাকে ও পরকে ভোলায়। এই খেলার উন্মাদনাই আসল তাহাদের কাছে। কয়জনের কাছে কাজ সত্য হইয়া উঠিয়া জীবনের পরতে পরতে মিশিয়া যায়?

দৌড়ধাপের খেলায় প্রথম হইবার উন্মাদনা ও বাহবা পাইবার নেশা যেমন ছেলেদের মাতাইয়া তুলে, আজ মনে হইতেছে তেমনি একটা বড় রকম বাহবা পাইবার লোভেই যেন সে এ-খেলায় নামিয়াছিল। এখন ইচ্ছা করিতেছে এই পুরাতন খেলা ফেলিয়া দিয়া জীবনের আর এক দিকের আহ্বানের প্রতি সে তাহার মনটা একটু দেয়। এই পাখীর ডাক, এই ফুলের গন্ধ, এই বসন্ত সঙ্গীত গ্রামের মাটিতে বসিয়াও তাহার জীবনে কি এত দিন মিথ্যা ছিল না? আজ কে যেন এই ইটকাঠে-গড়া কঠিন কলিকাতার বুকে বসিয়াই বসন্তের সিংহদ্বার তাহার চোখের সম্মুখে খুলিয়া ধরিয়াছে। ফলশস্যশ্যামলা পল্লীশ্রী তাহার ফলফুলপত্রের ডালা তুলিয়া ধরিয়া এত দিন তাহাকে যাহা দেখাইতে পারে নাই, নগরীর একটি শ্যামাঙ্গিনী বালিকা তাহার স্নিগ্ধ রূপের ভিতর দিয়াই কেমন করিয়া সে অনন্ত সৌন্দর্য্য তপনের দৃষ্টিপথে আনিয়া দিয়াছে। এই রূপের পসরা তাহাকে মাতাইয়া তুলিয়াছে। ইচ্ছা করে ইহারই ভিতর ডুবিয়া থাকিতে, কাজ-কাজ খেলায় তাই আর মন বসে না।

ইচ্ছা করে মানুষের গড়া এই ঘড়ির শাসনকে দিন কয়েকের জন্য উপেক্ষা করিয়া তাহার আনন্দ উপলব্ধির অতলে সব ভুলিয়া তলাইয়া যাইতে। কেন কাজের দিন তিনটা না বাজিলে কাজ ছাড়িয়া যাওয়া যাইবে না, কেন বিদায়বেলায় ঢং ঢং করিয়া ঘড়ি বাজিলেই আর সকলের সঙ্গে সমতালে পা ফেলিয়া তাহাকেও আপনার নিরানন্দ গৃহকোণে ফিরিয়া আসিতে হইবে? ভোরবেলা এই গন্ধ-বিধুর সমীরণের মাঝখানে নীরবে দাঁড়াইয়া কল্পনায় তাহার চুলের মালার গন্ধটুকু অনুভব করিতে গেলে, সেই স্মিতহাস্যজড়িত মুখখানি মনে করিতে গেলে কেন তাহার কাজ তাহা সহ্য করিবে না? যে-বন্ধনে আপনাকে আপনি সে স্বেচ্ছায় বাঁধিয়াছে, তাহাই কেন তাহার প্রভু হইয়া জীবনকে নিয়ন্ত্রিত করিবে?

কিন্তু মন বিদ্রোহ করিলে কি হয়? পৃথিবীতে কয়টা পুরুষ মনের ক্ষুধায় তাহার দৈনন্দিন কাজ ফেলিয়া চলিয়া যাইতে পারিয়াছে? ইহা যেন স্ত্রীলোকেরই ধর্ম্ম। পুরুষ চিরদিন স্ত্রীলোককে বলিয়াছে,--প্রেমেই তোমার জীবন, আমার জীবনে উহা দিনান্তের বিশ্রামস্থান মাত্র। নব-যৌবনের এই উন্মাদনা কাটিয়া গেলে তপনও কি তাহাই বলিবে না? আজিকার এই কাজ যদি জীবনে সত্য না হয়, তাহা হইলে শিশুর খেলনার মত তাহা দূরে ফেলিয়া দিলেও নূতন একটা গড়িয়া তুলিতে কতক্ষণ? প্রেম ভুলিয়া তখন তাহাতেই হয়ত সে ডুবিয়া যাইবে!

তপন আপনাকে পুরুষধর্ম্ম বুঝাইতেছিল, কিন্তু ভোরের

ফুলদলের সৌরভের ভিতর দিয়া সেই মুখখানির ছায়া ভাসিয়া উঠিয়া তাহাকে বলিতেছিল,—আমাকে তুমি ভুলিতে পারিবে না, তোমার সকল খেলা সকল কাজে বাধা দিয়া আমি তোমাকে বসন্ত-সমারোহের স্বপ্নের মাঝখানে টানিয়া লইয়া যাইব। নারীর জীবনই প্রেমে, পুরুষের নয়! মিথ্যা কথা! তবে পৃথিবীর এত কাব্যে, এত চিত্রে, এত গানে পুরুষই কেন নারীকে প্রেমের পুষ্পাঞ্জলি দিয়া আসিয়াছে? তোমার কণ্ঠের ঐ গানের প্রাণ কে ফুটাইয়া তুলিয়াছে সত্য করিয়া বল দেখি! দু-দিনের উন্মাদনা এই আকুলতা কি আনিতে পারে?

কিন্তু ফুলের গন্ধে যে ছায়াময়ী তাহার সহিত কথা বলিয়া যায় তাহার কাছে আপনার মনের একটা কথাও তপন বলিতে পারে কই? এ কি তাহার ভীরুতা? ভীরুতাই বা কি করিয়া বলে? এ তাহার যোগ্যতার অভাব। ক্ষেতে লাঙল চষে সে, সত্যই ত সে কাব্যের নায়ক নয়, প্রেমের দায়িত্ববোধ তাহার আছে, তাহার অনুরাগের বাতি যথাস্থানে জ্বালিয়া রাখিবার অধিকার কি তাহার আছে? সে বুঝিতে পারে না কি করিয়া আপনার অধিকার প্রমাণ করা যায়। এই প্রমাণ না দিয়া কাঙালের মত কাছে গিয়া দাঁড়াইতে যে তাহার আত্মসম্মানে লাগে।

এ যদি প্রাচীন উপন্যাসের যুগ হইত তবে বর্ষার তরঙ্গ-সঙ্কুল নদীর বুকে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া প্রাণ তুচ্ছ করিয়া ওই পুষ্পকোমলার প্রাণ বাঁচাইতে সে অনায়াসে যাইতে পারিত; যদি মহাভারতের যুগ হইত সুভদ্রার মত রথে বসাইয়া না-হয় তাহাকে হরণ করিত, অথবা আপনার ভাগ্য পরীক্ষার আশায় স্বয়ংবর সভায় ধনুর্বিদ্যার পরীক্ষা দিত, ইউরোপের নাইটদের যুগ হইলে বন্দিনী রাজকুমারীকে উদ্ধার করিতে হয়ত সকল বিপদ বরণ করিত।

কিন্তু এই আধুনিক কলিকাতায় তাহার যে কোন সুযোগই নাই। যে যোগ্যতা এখানকার মানুষের চোখে তাহার আছে, তাহা যে আর পাঁচ জনেরও নাই একথা ত তপন বলিতে পারে না।

শুধু এইটুকু সে বলিতে পারে যে তাহার অন্তরের বাতায়নের মত ওই উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে চাহিলে তপন যে শুভ্র যূথিকাদলের মত হৃদয়ের ছবিটি দেখিতে পায় আর কেহ তাহা দেখিতে পায় নাই। ওই শুভ্রতাকে বাহিরের আবরণের অন্তরালে খুঁজিয়া পাইবার ক্ষমতা সকলের নাই। তপন আপনার অন্তরের আলো দিয়াই তাহাকে চিনিয়া বাহির করিয়াছে। আপনার অনুরাগের অঞ্জলি স্তরে স্তরে ঢালিয়া মাটির পৃথিবীর চেয়ে অনেক ঊর্দ্ধে সে যে-বেদী রচনা করিয়া হৃদয়লক্ষ্মীকে বসাইয়াছে সে-বেদী রচনা করিবার ক্ষমতা সকলের নাই। আপনাদের বাজারদরের তৌল-দাঁড়িতে যাহারা এই লক্ষ্মীপ্রতিমার মূল্য যাচাই করিবে তাহাদের কাছেও সে-প্রতিমা তুচ্ছ নয় তাহা তপন জানে, কিন্তু তপন যে-তুলাদণ্ডে তাহাকে ওজন করিয়াছে তাহা সত্যভামার তুলাদণ্ডের মত। এক দিকে তাহার অন্তরলক্ষ্মী, অন্য দিকে পৃথিবীর সমস্ত সম্পদকে হার মানাইয়া ওই লক্ষ্মীরূপিণীর নামের অক্ষর কয়টি মাত্র। তাহার তুল্য শুধু সেই।

রোদের ঝাঁজে সমস্ত গাড়ীবারাণ্ডা ভরিয়া গিয়াছে। আর বেলা করা যায় না। তপনকে কাজে যাইতেই হইবে। সকাল সকাল গ্রামের কাজ সারিয়া বিবাহ-উৎসবের আয়োজনে ইন্ধন যোগাইতে আবার যথাকালে ছুটিয়া আসিতে হইবে। মিলির বিবাহ-সভাকে ঘিরিয়া তাহাদের সকলের মনের উৎসব-দেবতারা যে মর্ত্ত্যলোকে দেখা দিয়াছেন।

মা ডাকিয়া পাঠাইয়াছেন, খাবার সাজানো হইয়াছে। তপন তাড়াতাড়ি নীচে চলিয়া গেল। সকালবেলা এক রাশ ডাল ভাত মাছ খাইতে সে ভালবাসিত না। পিঁড়ির সামনে শ্বেত পাথরের থালায় চার খানা লুচি, কালজিরা ও কাঁচা লঙ্কা ফোড়ন-দেওয়া বিনা মশলার একটা তরকারি, ছোট একটা বাটিতে ঘন ক্ষীর ও ছোট রেকাবিতে কাটা গোলাপী খরমুজা। খাওয়াদাওয়া সারিয়া মোটা এক খানা ধোপ কাপড়ের উপর পাশে ফিতা-বাঁধা সাদা মারাঠী জামা পরিয়া ও পুরু কাবুলী চটি পায়ে দিয়া তপন কাজে বাহির হইয়া চলিয়া গেল।

গ্রামের ষ্টেশনে তাহার একটা সাইক্‌ল থাকে, গাড়ী হইতে নামিয়া তাহাতে চড়িয়াই সে স্কুলে যায়। আবার ফিরিবার সময় ষ্টেশনে সেটি জমা রাখিয়া ট্রেন ধরে।

গ্রামের পথে বৃষ্টি-বাদল হইলে কি খানাখন্দ পড়িলে

তাহার বাহন তাহারই স্কন্ধে আরোহণ করে। তবু মোটের উপর জিনিষটার সাহায্যে তাহার পথ একটু সংক্ষিপ্ত হয়।

তপন পথে চলিয়াছে, গ্রামের মেয়েরা স্নান সারিয়া জলের কলসী লইয়া বাড়ী চলিয়াছে, মেছুনীরা টুকরীতে রূপার মত ঝক্‌ঝকে ছোট ছোট মাছগুলি শালপাতার তলায় ঢাকা দিয়া বেচিতে চলিয়াছে, চাষীরা প্রথম বৃষ্টির পরেই মাঠে লাঙল চষিতে সুরু করিয়াছে, প্রচণ্ড গ্রীষ্মের পর প্রথম ধারাস্নানে প্রকৃতির শ্যামশ্রী ফুটিয়া উঠিয়াছে। তপনের চোখে এই মাটির পৃথিবীকে আজ যেন অনন্ত ঐশ্বর্য্যশালিনী মনে হইতেছে। তাহার চোখে সে বুঝি মায়ার অঞ্জন পরিয়া আসিয়াছে! সে বিস্মিত হইয়া ভাবে এই কলসীর ছলছল, এই মলিন অঞ্চলের তলে সিক্ত কেশপাশ, এই লাঙলের ফলার দুপাশে ভাঙিয়া-পড়া মাটির ডেলা, এই পুকুরঘাটের শ্যাওলা-পড়া পাথর সে ত জন্মাবধি দেখিতেছে, কিন্তু তাহা অনবদ্য হইয়া উঠিল আজ এতকাল পরে! একজনের চোখে একদিন এগুলি সুন্দর লাগিয়াছিল সে জানে, সেই দিন হইতে তপনও ইহাদের সুন্দর বলিয়া চিনিতে পারিয়াছে। সেই চোখ দুটি যাহা দেখিয়াছে তাহাতেই বুঝি আপনার দৃষ্টির অমৃত বুলাইয়া দিয়া গিয়াছে!

কাল মিলির গায়েহলুদ, পরশু বিবাহ। তার পর এই জমাট উৎসব-আয়োজন ছিন্নভিন্ন ছত্রভঙ্গ হইয়া যাইবে। কেহ কাহারও দেখা আর সহজে পাইবে কি না কে জানে? কি ছল করিলে কাহার সন্ধান পাওয়া যায় তাহা নিত্য নূতন করিয়া ভাবিতে হইবে। তবুও হয় ত নিত্য দেখা করিবার সাহস সঞ্চিত হইয়া উঠিতে লাগিবে বহু দীর্ঘ কাল। তাহার ভিতর পৃথিবীতে ত কতই অভাবনীয় পরিবর্ত্তন ঘটিয়া যাইতে পারে। পৃথিবীতে শুধু প্রলয়, মহামারী, আকস্মিক দুর্ঘটনাই যে ঘটে তাহা নয়, তপনের অপেক্ষা দুঃসাহসিক মানুষ, যোগ্য মানুষও পৃথিবীতে অনেক আছে। তাহারা যে ইতিমধ্যে তপনের অন্তরলক্ষ্মীকে জয় করিবার চেষ্টা না করিতে পারে এমন নয়। বাঙালীর মেয়ের পিতামাতাও তাহার ভবিষ্যৎ ভাবেন, তাঁহারাও হয়ত কত কল্পনাজল্পনায় ব্যস্ত আছেন, যাহা দুই দিন পরে প্রাকৃতিক দুর্ঘটনার মতই তপনের চিত্তাকাশ অন্ধকার করিয়া মূর্ত্ত হইয়া উঠিবে। ভাবিতে ভাবিতে তপনের মন চঞ্চল হইয়া উঠিল।

ক্রমশঃ

অন্ধ্র দেশ

শ্রীবীরেন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়

মাদ্রাজ মেল বেজওয়াডায় পৌঁছায় নটা ত্রিশ মিনিটে।

মাইলখানেক দূর হইতেই অসংখ্য আলোয় উজ্জ্বল ষ্টেশন দেখিতে পাওয়া গেল। গাড়ী প্ল্যাটফর্মে ঢুকিতেই দূরে বাবাকে দেখিতে পাইলাম। কিন্তু তাঁহার পাশে এক অতিশয় স্থূলকায়া মাদ্রাজী মহিলাকে দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। ভুল ভাঙিল তাঁহার কণ্ঠস্বর শুনিয়া। ট্রেন হইতে নামিয়া বাবাকে প্রণাম করিতেছি,—শুনিলাম, উদ্বিগ্ন বিস্মিত কণ্ঠে মা বলিতেছেন, "ও মা, এ কি চেহারা হয়ে গেছে, বাবা?"

চেহারা যে বাস্তবিক বেশী কিছু খারাপ হইয়াছিল তাহা নয়। আত্মীয়স্বজনের কাছ হইতে দূরে থাকিয়া বাঙালীর ছেলে পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে থাকিলে শরীর যতটুকু খারাপ হওয়া উচিত তাহার বেশী নয়। যাহা হউক, মা আশ্বাস দিলেন, এখানকার কৃষ্ণার জল খুব ভাল; অতি শীঘ্রই আমাকে নূতন মানুষ তৈয়ার করিয়া দিবেন। তাঁহার পানে চাহিয়া সে কথা আমার অবিশ্বাস হইল না। বস্তুতঃ আমি বেজওয়াডায় প্রথম দুই মাসেই পঁচিশ পাউণ্ড ওজনে বাড়িয়াছিলাম, এবং পরে কলিকাতায়

আসিলে আমার বন্ধুরা অনেকে আমাকে চিনিতে পারেন নাই।

যথারীতি টিকিট দিয়া এবং মালপত্র লইয়া ষ্টেশনের বাহিরে আসিলাম। বাহিরে গাড়ী অপেক্ষা করিতেছিল ;—অবিলম্বে বাড়ী পৌছিলাম, এবং সকাল সকাল আহার সারিয়া শুইয়া পড়িলাম। দীর্ঘকাল রাত্রি জাগরণের পর, মায়ের স্বহস্ত-প্রস্তুত বিছানায় একান্ত নিশ্চিন্ত মনে নিদ্রা গেলাম।

অন্ধ্র দেশের সহিত এই আমার প্রথম পরিচয়।

পরিচয়টা পাকা করিয়া লইবার জন্য পরদিন সকালে বাহির হইলাম।

রাস্তায় পা দিয়াই মনে পড়িল,—এ বাংলা দেশ নয়। শুধু তাই নয়, এই দক্ষিণ দেশের দ্রাবিড় সভ্যতা উত্তরা পথের আর্য্য (?) সভ্যতা হইতে সম্পূর্ণ পৃথক।

বেশ মোটা—এবং সেই জন্য দেখিতে বেঁটে—অগণিত মহিলা চলিয়াছেন ; মাথায় অবগুণ্ঠন নাই ; গতিভঙ্গী দৃপ্ত ও অকুণ্ঠিত। মনে হইতেছে রবিবর্ম্মার অঙ্কিত পৌরাণিক চিত্রের ভিতর হইতে এইমাত্র বাহির হইয়া আসিলেন। তাঁহাদের অসংখ্য প্রকার বিভিন্ন রঙের শাড়ী ও চাদরের প্রভায় পথ রঙীন ও উজ্জ্বল হইয়া উঠিয়াছে।...এই বর্ণ-বৈচিত্র্যময় দক্ষিণ দেশের সহিত বাংলা দেশের তুলনা করিয়া মনে আঘাত পাইলাম। বাঙালীর জীবনে সহজ আনন্দের অভাব ঘটিয়াছে।

চোখ ভরিয়া এই রঙের লীলা দেখিতে লাগিলাম।

নীল আকাশ হইতে সোনালী রোদ ঝরিয়া পড়িতেছে।

...বেগুনী পাহাড়ে ঘেরা ছোট্ট শহরটি। লাল টালির ছাদ-দেওয়া ছোট ছোট জানালাবিহীন বাড়ী, সরু সরু রাস্তা,—আর চারিদিকে—রঙ—রঙ—রঙ। সবুজ, নীল, হলদে, ফিরোজা, কমলা, লাল—যত রকম রঙ কল্পনা করা যায়—এই সবরকম রঙের ওড়না বাতাসে উড়িতেছে। কালো রঙের অথবা রক্তবর্ণের শাড়ীর রূপালী জরির পাড় হইতে, মহিলাদের হাতের স্বুবর্ণ-কঙ্কণ ও কোমরের চওড়া সোনার বেল্ট হইতে সূর্য্যের কিরণ ঠিকরাইতেছে।...চমৎকার!

কিন্তু ভাবুকতা বেশীক্ষণ রহিল না। বিরক্ত কণ্ঠে মা বলিলেন—"মা গো, হাঁ ক'রে দেখছে দ্যাখো। কেন রে বাপু, আমরা চিড়িয়াখানা থেকে বেরিয়ে এলাম না কি?"

কথাটা ঠিক। আমরা উহাদের যতটা আশ্চর্য্য হইয়া দেখিতাম,—উহারা তার চেয়ে ঢের বেশী আশ্চর্য্য হইয়া আমাদের দিকে চাহিয়া থাকিত। বেচারীদের দোষ নাই। উহারা বাঙালীর নাম বহুৎ শুনিয়াছে, কিন্তু চাক্ষুষ পরিচয় বেশী পায় নাই।

এক জায়গায় দেখিলাম, অন্ধ্র-মহিলারা পথে কল তলায় স্নান করিয়া জল লইয়া যাইতেছেন। কোমরে হাত দিয়া দিব্য সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাণ্ড ঘড়ায় করিয়া জল লইয়া চলিয়াছেন। বঙ্গ-মহিলার কাঁখে কলসী লইয়া ধীর মরাল-গমন নহে। কাঁধে ঘড়া বসাইয়া, কোনও দিকে দৃকপাত না করিয়া, দৃপ্ত-অকুণ্ঠিত সুন্দর গতিভঙ্গী। চোখে ইহা অপরূপ ঠেকিল ; মনে মনে সংশয় জন্মিল,—হয়ত ইহাদের ভাষায় 'অবলা' শব্দটা নাই।

অবশ্য, নিঃসংশয়ও হইয়াছিলাম ; কিন্তু অনেক দিন পরে। একটু অবান্তর হইলেও, ঘটনাটি এখানে বলিতেছি। আমি তখন পিতৃদেবের অধীনে অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনীয়ার নিযুক্ত হইয়াছি। রাস্তায় 'লাইন-মার্ক' করিতে বাহির হইয়াছি ; এবং সমস্ত সকালটা খাটিয়া, অনেকগুলা ঝাণ্ডা পুঁতিয়া একটা দীর্ঘ লাইন 'রেঞ্জ' করিয়াছি। কাজ প্রায় শেষ করিয়া আনিয়াছি ; মনে করিতেছি, এই বারে ঝাণ্ডাগুলা তুলিয়া খোঁটা বসাইয়া চলিয়া যাইব। কিন্তু বিপত্তি ঘটিল। পল্লীস্থ একটা বালক আসিয়া, হঠাৎ কি মনে করিয়া একটা ঝাণ্ডা তুলিয়া লইয়া প্রস্থান করিল। আমার সঙ্গের এক জন অ্যাপ্রেন্টিসের ইহাতে ধৈর্য্যচ্যুতি ঘটিল। সে ছুটিয়া গিয়া ছেলেটার দুই গালে চপেটাঘাত করিল।

ফল ফলিতে দেরী হইল না। ছেলেটার গগনভেদী চীৎকারের সঙ্গে সঙ্গে চারি দিক হইতে অসংখ্য মহিলা, এবং কয়েকটি পুরুষ ছুটিয়া আসিলেন ; এবং আমাদেরই ঝাণ্ডাগুলি তুলিয়া লইয়া বিনা বাক্যব্যয়ে আমাদের পিটিতে সুরু করিলেন। আমার দলে পাঁচ জন কুলি, চার জন অ্যাপ্রেন্টিস এবং আমি নিজে ছিলাম। কিন্তু পাছে স্ত্রীলোকের গায়ে হাত লাগে, এই ভয়ে তাহাদের দলের পুরুষদেরও মারিতে পারিলাম না।

আমি হিন্দীতে, ইংরেজীতে এবং অবশেষে বাংলায় তাহাদের ব্যাপারটা বুঝাইবার প্রয়াস পাইলাম, কিন্তু তাহারা সে সকল কিছুই বুঝিতে পারিল না ; এবং সম্ভবতঃ সেই আক্রোশেই আরও বেশী করিয়া পিটিতে সুরু করিল। অতএব দাঁড়াইয়া মার ত খাইলামই ; উপরন্তু প্ল্যান, কাগজ-পত্র ইত্যাদি ছিঁড়িয়া হারাইয়া গেল। নিরুপায়!

এই ব্যাপারে সব চেয়ে মজার কাণ্ড করিয়াছিল, আয়েঙ্গার নামে একটি অ্যাসিষ্ট্যাণ্ট। এই ছেলেটি তামিল ; অতএব অন্ধ্র দেশে এও আমার মত বিদেশী। মারামারির প্রারম্ভেই ইহাকে আমি সাইকেলে পিতৃদেবের নিকট খবর দিতে পাঠাইয়াছিলাম। কিন্তু মারামারি থামিয়া গেলেও যখন তিনি আসিয়া পৌছিলেন না, তখন খুব আশ্চর্য্য হইয়াছিলাম। কারণটা পরে জানিলাম।



অন্ধ্র-মহিলারা সাবলীল ভঙ্গীতে প্রকাণ্ড ঘড়ায় করিয়া জল লইয়া চলিয়াছেন

আয়েঙ্গার ঝড়ের বেগে বাবার কাছে গিয়া উপস্থিত হইয়াছে। কিন্তু তাঁহার বারম্বার প্রশ্নের উত্তরে সে কেবলই বলিয়াছে—"সার, গ্রেট ফাইট !" বেচারা হঠাৎ মেয়েদের হাতে মার খাইয়া এতই উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া পড়িয়াছিল যে আধ ঘণ্টা কাল আর কিছুই বলিতে পারে নাই !

শহরের ঠিক মাঝখানে বিশপস্ হিল একটি ছোট্ট পাহাড়। আমরা ষ্টেশনে রেলের পুল পার হইয়া গিয়া, বিশপস্-হিলে উঠিলাম। উহার মধ্য পথে এক বিশপের বাংলো। পাহাড়ের চূড়ায় আগে কোনো রাজার একটি প্রাসাদ ছিল,—এখন তাহা ভাঙিয়া পড়িয়া গিয়াছে। ইট-পাথরের স্তূপের মধ্যে কোন জায়গায় জায়গায় ছাদবিহীন দেয়ালগুলো খাড়া হইয়া রহিয়াছে।...

...এই যেখানে আমরা রহিয়াছি, এখান হইতে বহু দূরের দৃশ্য দেখা যাইতেছে। দক্ষিণে দুইটি পাহাড়ের মধ্যে অ্যানিকাটের উপর দিয়া লাফাইয়া পড়িয়া কৃষ্ণা চঞ্চল গতিতে সমুদ্রের পানে ছুটিয়াছে। তাহার গৈরিক অঞ্চল ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত হইতেছে। পূর্ব্বে যতদূর দেখা যায়—মাঠ আর পাহাড়,—পাহাড় আর মাঠ। উত্তরে রেল লাইন। ভারতের সব বড় বড় নগর হইতেই রেল লাইন আসিয়া এখানে মিলিত হইয়াছে। কলিকাতা, বোম্বাই, মাদ্রাজ, লাহোর—সর্ব্বত্রই ট্রেন না বদলাইয়াই এখান হইতে যাওয়া যায়। পশ্চিমে অর্জ্জুন-হিল। এখানে মহাত্মা পার্থ যুদ্ধে মহাদেবকে সন্তুষ্ট করিয়া পাশুপত অস্ত্র লাভ করেন। তাই নাম হইয়াছে—বিজয়-ওয়াডা (ওয়াডা মানে কি?)। উর্দ্ধে নীলাকাশ আর পায়ের নীচে বিশপস্-হিলকে আংটির মত বেষ্টন করিয়া বেজওয়াডা শহর। লাল ছাদ-ওয়ালা ছোট ছোট বাড়ীর মধ্যবর্ত্তী ধূসর বর্ণের পথের উপর রঙীন কাপড় পরিয়া পুরুষ এবং মেয়েরা চলিয়াছে। উহাদের ঠিক পিঁপড়ার মত ছোট ছোট দেখাইতেছে। দূরে অর্জ্জুন-হিলের গায়ে কনক-দুর্গার মন্দির। নীচে কৃষ্ণার ধারে শিব মন্দিরের গোপুরম! উঁচু, বৃহৎ গোপুরম। সমস্তই এখান হইতে দেখা যাইতেছে। ...বেশ চমৎকার দেখা যাইতেছে।

পাহাড় হইতে নামিয়া বাজার ঘুরিয়া কৃষ্ণার তীরে উপস্থিত হইলাম।

…কৃষ্ণা ? কৃষ্ণা ? ভারতবর্ষে যে এমন অপরূপ নামের তটপ্লাবী নদী আছে,—তাহা হয়ত জানিতামই না। রেবা, সিপ্রা, কাবেরী, যমুনা,—এ সব নাম তো পরিচিত। কিন্তু কে জানিত এই অন্ধ্র প্রদেশে অর্জ্জুন-হিলকে বেষ্টন করিয়া কৃষ্ণা প্রবাহিত হইয়াছে !…অ্যানিকাটের উপরে জল, স্থির, মসৃণ,—ঠিক বিস্তৃত কাঁচের মত। উহাতে পরপারের ছোট ছোট পাহাড়গুলি পরিষ্কার প্রতিফলিত হইয়াছে।

বাজারে ঝটকা দেখিলাম। ইহাই এখানকার মানুষের একমাত্র বাহন। আমরা ছয় জনে যে কি করিয়া তাহাতে আঁটিলাম তাহা আমার তত আশ্চর্য্য বোধ হইল না। কিন্তু মা যখন বলিলেন, "এই ঝটকাওয়ালা, তোয়ারেগা পো"—তখন ঐ গাড়ীর ক্ষুদ্র ও শীর্ণকায় অশ্ব চালকের ইঙ্গিতে যে বিদ্যুদ্বেগে ছুটিল তাহা বিস্ময়-জনক।… একটা কথা মনে হইতেছে। যে কবি লিখিয়াছেন "বেহারে বেঘোরে চড়িনু একা।" তিনি নিশ্চয়ই দক্ষিণ ভারতে আসেন নাই। না, কখনই আসেন নাই ; আমি বাজি রাখিতে পারি।

অন্ধ্র দেশের সহিত আমার এই পরিচয় ঘনিষ্ঠতায় পরিণত হইতে চলিল। অন্ধ্র দেশ আমার ভাল লাগিয়াছে।…

প্রথম যাঁহার সহিত আলাপ হইল, তাঁহার নাম শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া। এই ভদ্রলোক পরদিন সকালে আসিয়া আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—আমি কলিকাতা হইতে প্রত্যাশিত মিষ্টার চ্যাটার্জ্জীর জ্যেষ্ঠ পুত্র কি না, এবং উত্তরের অপেক্ষা না করিয়াই আমাকে তাঁহার গৃহে 'ডিনারের' নিমন্ত্রণ করিলেন।

তার পরে তিনি তাঁহার সঙ্গী ভদ্রলোকটির সহিত পরিচয় করিয়া দিলেন। শ্রীযুক্ত সোমনাথ ভেলেটোর—কবি।

কবি মহাশয় বলিলেন, "নমস্কারম্।"

আমি বলিলাম, "আনন্দিত হলাম। দুঃখের বিষয় আমি আপনাদের ভাষা জানি না। আপনার কাব্য উপভোগের সৌভাগ্য—"

না, তিনি ইংরেজী ভাষায় কবিতা লিখিয়া থাকেন। দুঃখিত হইবার কারণ নাই। মসলিপট্টমে আর একজন আছেন, মিষ্টার ভূষণম্—তিনি শুধু ইংরেজীতে কবিতাই লেখেন না ; ছোট গল্পও লিখিয়া থাকেন। রিয়্যালি ? ওয়াণ্ডারফুল !

যথাসময়ে ডিনারে উপস্থিত হইলাম। মিষ্টার রামশেষাইয়া গারু অতিশয় ভদ্রলোক। নিজে আসিয়া সঙ্গে করিয়া লইয়া গেলেন। দেখিলাম, তাঁহার গৃহে এই অখ্যাত বঙ্গ-সন্তানকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য যাঁহারা সমবেত হইয়াছেন তাঁহারা কেহই সাধারণ লোক নহেন। কবি, ঔপন্যাসিক, একজন আর্টিষ্ট, ব্যায়ামাচার্য্য, কংগ্রেসনেতা, মিউনিসিপ্যাল কাউন্সিলার,—এই সকলেই উপস্থিত রহিয়াছেন।



কবি মহাশয় বলিলেন, "নমস্কারম্"

ডিনার চলিতে লাগিল। আয়োজন অপ্রচুর নহে। যথাসাধ্য খাইবার চেষ্টা করিতেছি।…একটা বড় আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে। আমার ধারণা ছিল পূর্ব্ববঙ্গে রান্নায় ঝালের ব্যবহার বেশী। কিন্তু লঙ্কার ঝালকে পাঁচ-ছয় গুণ তীব্র করিবার রাসায়নিক প্রক্রিয়া সম্ভবতঃ তাঁহাদের জানা নাই।

কবি বলিলেন, "আমরা অধিক ঝাল খাই না ; তামিলরা—ওঃ সে 'হরিবল্'—"

বিনয় সহকারে বলিলাম, "বটেই ত।" এবং আমারও যে মোটেই ঝাল লাগিতেছে না,—ইহা প্রমাণ করিবার জন্য এক গ্রাস জলন্ত অঙ্গার মুখে পুরিয়া দিলাম। কিন্তু চোখের জল আটকাইয়া রাখিতে পারিলাম না। তাড়াতাড়ি মুছিয়া ফেলিয়াছিলাম ; কেহ দেখিতে পায় নাই !

অতঃপর রসম্ আনীত হইল। ইহা তেঁতুল, লঙ্কা এবং এক প্রকার গন্ধ-পাতার সংমিশ্রণে প্রস্তুত।

ব্যায়ামাচার্য্য মহাশয় কহিলেন, এই সমুদ্রতীরস্থ গরম দেশে এটি একটি অতি প্রয়োজনীয় বস্তু। শরীর স্নিগ্ধ রাখিতে ইহার তুল্য আর কিছুই নয়।

কহিলাম, "নিশ্চয়ই।"

কিন্তু তার পরদিন পর্য্যন্ত পাকস্থলীতে জ্বালা বোধ করিয়াছিলাম। ও কিছু নয়; নিশ্চয়ই গরম দেশ বলিয়া—

আহারের পর তাঁহারা আমাকে গান গাহিতে অনুরোধ করিলেন। আমি যখন বাঙালী তখন নিশ্চয়ই 'টেগোরস্ সঙ' গাহিতে পারি। সবিনয়ে প্রতিবাদ করিয়া কহিলাম, যদিও আমি বাঙালীই বটে, তথাপি বাঙালী মাত্রেই 'টেগোরস্ সঙ' গাহিতে পারে মনে করিলে 'টেগোরস্ সঙ'-এর প্রতি সুবিচার করা হইবে না। কিন্তু সে কথা তাঁহারা বিশ্বাস করিলেন না।

শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া বলিলেন, তিনি বাঙলা ভাষা শিক্ষা করিতেছেন, এবং বঙ্কিমের গ্রন্থাবলী পাঠ করিয়াছেন। আর কবি বাংলা না জানিলেও, অসঙ্কোচে "জন-গণ-মন অধিনায়ক জয় হে"—গানটি তাঁহার নিজস্ব সুরে (!) গাহিয়া শুনাইলেন। কবি সগর্ব্বে কহিলেন, তিনি এই গানটির "দ্রাবিড়-উৎকল-বঙ্গ" এই পদটিকে "দ্রাবিড়-উৎকল-অন্ধ্র" এইরূপে পরিবর্ত্তিত করিয়া লইয়াছেন।

নিশ্চয়ই! তাঁহার ত অধিকারই আছে। রবীন্দ্রনাথ ত কেবল মাত্র বাঙালীর কবি নহেন। তিনি ভারতীয় কবি। তিনি যে বাংলা ভাষায় কবিতা লিখিয়াছেন—তাহা না করিয়া যে কোনও ভাষাতেই লিখিতে পারিতেন; তাহাতে কিছু আসিয়া যাইত না। কারণ কাব্য ত আর লিখিত হয় না; উহা 'রেকর্ডেড' হয়। উহার কাব্য-গুণ ভাষা-বিশেষের উপর মোটেই নির্ভর করে না!

ঔপন্যাসিক কহিলেন, কয়েক বৎসর হইতে তাঁহাদের শিল্পে ও সাহিত্যে নবযুগের সূত্রপাত হইয়াছে। এ-বিষয়ে বাংলা দেশই তাঁহাদের পথ-প্রদর্শক। ভারতীয় চিত্রকলায় নূতন ভাবে শিক্ষা লাভ করিবার জন্য বাঙালী শিল্পীদের অন্ধ্র জাতীয় কলাশালায় আনয়ন করিয়াছিলেন। আচ্ছা, আপনার বাঙালীর চোখে আমাদের এই 'রেনেশাঁস' কেমন ঠেকিতেছে?…না, না, বলুন, আপনার অভিমতের একটা মূল্য আছে বইকি!

আচ্ছা, সি. আর. দাশ যখন মসলিপট্টমে আসিয়াছিলেন, তখন পট্টভি সীতারামায়াকে কি বলিয়াছিলেন জানেন কি? আর—

বেশ জমিয়া উঠিতেছে। এই সভায় আমি সি. আর. দাশ, বঙ্কিমচন্দ্র ও বিবেকানন্দের সমশ্রেণীর!…বাঙালী।

ভাল কথা! বিবেকানন্দকে কে প্রথম আমেরিকা যাইবার টাকা তুলিয়া দিয়াছিল—আপনি জানেন কি? —অন্ধ্র দেশ! আর মাইকেল মধুসূদন দত্ত ত তাঁহার প্রথম কাব্য 'ক্যাপটিভ লেডি'—এখানেই—এই মাদ্রাজেই লেখেন।…

…একটি মহিলা গান করিলেন। ভাষা বুঝিতেছি না। কেবল আশ্চর্য্য বিচিত্র সুর এবং দুই-একটা পরিচিত শব্দ মিলিয়া হেমন্ত রাত্রির জ্যোৎস্নাচ্ছন্ন কুয়াসার ন্যায় একটা অদ্ভুত অর্দ্ধ-পরিস্ফুট রহস্যলোকের আবহাওয়া সৃষ্টি করিতেছে।…

চমৎকার লাগিতেছে।… এই সব অমায়িক ভদ্রলোক। এই অভিনব অন্ধ্র-ডিনার।…এই বিচিত্র রঙীন-বসনা মহিলারা।… বেশ!…

দিন কাটিতেছে,—জলের মতন। দীর্ঘকাল ব্যাপী কঠিন পরিশ্রমের পর নিরুদ্বেগ ছোট ছোট দিনগুলি। জীবনের অনাড়ম্বর আনন্দে পূর্ণ ছুটির দিনগুলি।

সকালে ঘুম ভাঙিতে দেরী হয়। সুবা-আম্মা 'টি-য়া' লইয়া আসিয়া ঘুম ভাঙায়। চা খাইয়া বাহির হইয়া পড়ি। দল বাঁধিয়া কলরব করিতে করিতে শহরটা বেড়াইয়া আসি।

এতক্ষণে ছেলে-বুড়ো সকলেই যে যাহার কাজে লাগিয়াছে। বড় বড় গরুর গাড়ীতে বস্তা-বোঝাই ধান্য চলিয়াছে। ক্যানালগুলা নৌকায় কণ্টকাকীর্ণ (!)। একখানা প্রকাণ্ড বজরা, দুইটা ছোট ছেলে কেমন গুণ টানিয়া লইয়া চলিয়াছে দেখিলে তুমি নিশ্চয়ই খুশী হইতে।… বজরাখানা অবিচ্ছিন্ন মন্থর গতিতে চলিয়াছে।

ঝম্ ঝম্ শব্দ করিতে করিতে একখানা ঝটকা আসিয়া পড়িয়াছে। —"বাণ্ডি—বাণ্ডি—বাণ্ডি"—। পথ ছাড়িয়া দাঁড়াইলাম। গাড়ীর মধ্যে বুট-পরিহিত দুইটা সাহেব বসিয়া আছে। নীচু ছইয়ের তলায় মাথা হেঁট করিয়া উহারা আমাদের মতন আসন-পিঁড়ি হইয়া বসিবার চেষ্টা করিতেছে। দেখিলে হাসি পায়।

বাজনার শব্দের সহিত একটি ছোট দল দেখা গেল। দুইটি সুরূপা বালিকা…তাহাদের পিছনে কয়েকটা লোক বাজনা বাজাইয়া চলিয়াছে। বালিকা দুইটি বাড়ীতে বাড়ীতে ঢুকিয়া নিমন্ত্রণ করিয়া যাইতেছে। বিবাহের নিমন্ত্রণ!

বিবাহের মরশুম লাগিয়া গিয়াছে। শর্দা-বিল বোধ হয় পাশ হইবে। তাই সকলেই তাড়াতাড়ি ছেলেমেয়ের বিবাহ সারিয়া লইতেছে। ধর্ম্ম-রক্ষা করিতে ইহাদের ব্যাকুল আগ্রহ। এই মাসের মধ্যেই বোধ হয় সাত হাজার বিবাহ হইবে।

…এই একটি বর চলিয়াছে। দেখিতে অদ্ভুত আট জন লোকের দ্বারা বাহিত একটা তাঞ্জামে বর চুপ করিয়া বসিয়া আছে। বয়স ছয় বৎসরের বেশী নয়। আগে

আগে একদল শানাই, আর পিছনে মেয়ের দল। বিচিত্র বর্ণের, বিভিন্ন বর্ণের শাড়ী কাঁচুলী ও গাত্রাবরণ পরিহিত মহিলার দল। তাঁহাদের কোমরে চওড়া সোনার বেল্ট, গলায় মোটা হার, পা হরিদ্রারঞ্জিত। প্রায় দেড় শত মহিলা বরের তাঞ্জামের পিছনে হাঁটিয়া চলিয়াছেন। বরের সহিত হাঁটিয়া চলিয়াছেন। কেহ কেহ গান ধরিয়াছেন।

·· দূরে নীল আকাশের গাত্র-সংলগ্ন নীলাভ পাহাড়, আর এই খানে লাল পথের উপর পাটল বর্ণের ধূলি উড়াইয়া বর-যাত্রিণী সহ বর চলিয়াছে।···

শীত আসিয়া পড়িয়াছে। কিন্তু ঠিক আমাদের বাংলা দেশের শরৎ কাল। হাওয়া চালাইয়াছে; উত্ত্রেও নয়, ঠাণ্ডাও নয়, বেশ আরামদায়ক। বারান্দায় বসিয়া চাহিয়া থাকি।···ছবির মত দক্ষিণ দেশ্।

ধীরে ধীরে আর একখানি ছবি চোখের উপর ভাসিয়া উঠে। এই শীতের অপরাহ্ণ তাহার উপর কুয়াসার আবরণ টানিয়া দিয়াছে। চোখে জল আসিতে চায়।

কবি আসিলেন। বলিলেন, শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া আমাদের 'অন্ধ্র-ভিলেজ' দেখাইবার বন্দোবস্ত করিয়াছেন। কাল প্রত্যূষে মোটরে রওনা হইতে হইবে! সেখানে প্রথমে আমরা ছেলে ও মেয়েদের স্কুল পরিদর্শন করিব, এবং গ্রাম দেখিব। তার পরে অপরাহ্ণে মিটিং। তাহাতে শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া সভাপতির আসন গ্রহণ করিবেন।

মোটরে পৌঁছিতে প্রায় ঘণ্টা তিনেক লাগিল। দুই ধারে অড়হর আর 'বেঙ্গল-গ্র্যাম'-এর ক্ষেত। মাঝে মাঝে ধানের, ক্বচিৎ আখের ক্ষেতও চোখে পড়িতেছে। আর তাহার ভিতর দিয়া গাড়ী চলিয়াছে। কাঁচা রাস্তা, কখনো বা পাকা রাস্তা, চষা মাঠ, ক্যানালের পাড়—এই সবের উপর দিয়া শর্ট-কাট করিয়া গাড়ী চলিয়াছে। এই পুরাণো ঝড়ঝড়ে গাড়ীতে ঝাঁকুনির চোটে পরস্পর ধাক্কা খাইতে খাইতে চলিয়াছি।

পেনামাকুর ছোট্ট গ্রাম। দুই শত ঘরের বেশী লোক বাস করে না। খড়ের ঘরগুলার মধ্যে মধ্যে দুই-একটা টালি-ছাওয়া পাকা ঘর এখানে ওখানে বিক্ষিপ্ত রহিয়াছে। এই ছোট গ্রামের মধ্যেই ইহারা দুইটা স্কুল করিয়াছে, এবং সকলে বসিয়া আলাপ আলোচনা করিবার জন্য জলাশয়ের ধারে একটা সুন্দর চাতাল বাঁধাইয়া রাখিয়াছে। ইহাদের অতিশয় উদ্যোগী বলিয়া মনে হইতেছে। মেয়েরা অভ্যর্থনা-সঙ্গীত গাহিতেছে। ছেলেরা সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিতেছে। বর্ষীয়ানগণ আমাদের আহার এবং বিশ্রামের ব্যবস্থায় ব্যস্ত ভাবে ঘুরিতেছেন। সমগ্র গ্রামখানাকে একটা বৃহৎ পরিবার বলিয়া মনে হইতেছে।

স্কুল পরিদর্শন হইয়া গেল।···ইহারা আমাদের মনে করিয়াছে কি? ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে চাহে নাকি? আসিয়া পৌঁছাইতেই ত একবার 'কফি' হইয়া গিয়াছে।··· এখন এটা মধ্যাহ্নভোজনের আগে সামান্য একটু টিফিন! শালপাতার ঠোঙায় করিয়া মসলা-দেওয়া ডালভাজা আর নানারকম খাবার দিয়াছে। তাহার ভিতরে অমৃতি আর বোঁদে দেখিতেছি। কিন্তু বোঁদেতে লঙ্কার গুঁড়া দিয়াছে।—অসম্ভব ঝাল!

মেয়েরা গান গাহিয়া সভার উদ্বোধন করিল। ইহারাই সকালে গান গাহিয়া আমাদের অভ্যর্থনা করিয়াছিল।

বক্তৃতা সবই তেলেগু ভাষায় হইতেছে। দু-একটা কথা ছাড়া আর সবই দুর্ব্বোধ্য। উহারা তালুক বোর্ডের প্রেসিডেন্টের কাছে গ্রামের উন্নতির জন্য সাহায্য এবং পরামর্শ প্রার্থনা করিতেছে।···কিন্তু উপন্যাস কথাটা বার বার কানে আসিতেছে কেন?

একটি বালিকা দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতেছে। বালিকা বিদ্যালয়েরই ছাত্রী। সুঠাম ভঙ্গীতে হাত প্রসারিত করিয়া বড় বড় টানা চোখ দর্শকদের প্রতি মেলিয়া, বলিতেছে। কি বলিতেছে কিছুই বুঝিতেছি না। কেবল ভাষাহীন সঙ্গীতের মত একটা ব্যাকুলতার আভাস পাইতেছি।·কে জানে এই বালিকা কি বলিতেছে।···

সন্ধ্যার অনেক পরে রওনা হইলাম। গ্রামের লোকেরা অনেক দূর পর্য্যন্ত সঙ্গে সঙ্গে আসিয়া বিদায় দিল। যখন আমরা তাহাদের ছাড়িয়া চলিলাম, তখন তাহারা এই সম্মানিত অতিথিবর্গের নামে জয়-ধ্বনি করিয়া উঠিল। পেনামাকুর পিছনে রাখিয়া আমরা অগ্রসর হইলাম।

চমৎকার রাত্রি! একটা উঁচু পাড়ের উপর দিয়া মোটর চলিয়াছে। পাশেই ক্যানাল। পরিষ্কার জ্যোৎস্নায় ক্যানালের জলে গাছের উল্টা ছায়াগুলা সুন্দর দেখাইতেছে। কুয়াসা একেবারে নাই। একটু শীত লাগিতেছে।

শ্রীযুক্ত রামশেষাইয়া কহিলেন, "জানেন মিষ্টার চ্যাটার্জী, আগে আমাদের দেশে চাষের অত্যন্ত অসুবিধা ছিল। এই ক্যানালগুলি কাটানর ফলে কৃষ্ণা-ডিষ্ট্রিক্ট এখন ধনধান্যে পূর্ণ।"

কবি কহিলেন, "আজকার আনন্দের স্মৃতি ভুলবার নয়।"

—নিশ্চয়ই! এ-বিষয়ে কোনও সন্দেহ নাই।

রামশেষাইয়া কহিলেন, "এ-গ্রামটার বিশেষত্ব হচ্ছে—এখানে দলাদলি নেই। আর এখানকার লোকেরা সব দিকেই খুব অগ্রসর। দুঃখের বিষয় সব গ্রামই এই রকম নয়।"

কবি বলিলেন, "আচ্ছা, আমাদের গ্রামের চেয়ে বাংলা দেশের গ্রাম কি দেখতে সুন্দর ?"

আমি কহিলাম—"বাস্তবিক চমৎকার আপনাদের গ্রাম, আর তার চেয়ে চমৎকার এই সরল উৎসাহী লোকগুলি।"

বাড়ী পৌঁছাইতে রাত্রি বারোটা হইল।

শ্রীযুক্ত বৈকুণ্ঠ রাও-এর সহিত আলাপ হইল—একটা টি-পার্টিতে। চমৎকার বাংলা বলিতে পারেন। রবীন্দ্রনাথের গ্রন্থাবলী অন্ধ্র ভাষায় অনুবাদ করিতেছেন। ভারি অমায়িক ভদ্রলোক। অতিশয় মিহি হাসিয়া কহিলেন, "বাংলা লিটারেচারের মত—উঁহু—ওরকম পরিপূর্ণ— আমাদের তেলেগু লিটারেচারে কি-ই বা আর আছে—।"

কবি কহিলেন, "কেন আমাদেরও ত সাহিত্য গড়ে উঠছে। কত নতুন নতুন লেখক হচ্ছেন। কত আর্টিষ্ট—"

—আচ্ছা, প্রভাত মুখোপাধ্যায়ের সেই উপন্যাসটার নাম কি ? কঙ্কুম-ভরণী—সিন্দুর-কৌটা ?—সিন্দুর-কৌটা ?— আমরা কঙ্কুম-ভরণী নাম দিয়া উহা অন্ধ্র ভাষায় অনুবাদ করিয়াছি। চমৎকার বই! আচ্ছা, অবনীন্দ্রনাথ কি রবীন্দ্রনাথের ভাই, না ভাইপো ? আর স্যার আশুতোষ না কি—।

এমনি করিয়া অন্ধ্র দেশে আমার দিন কাটিতেছে। এমনি করিয়া অন্ধ্র-জাতির সহিত পরিচয় নিবিড়তর হইতেছে।

কোন দিন মিনিষ্টারের টি-পার্টিতে নিমন্ত্রণ পাইতেছি। লাট সাহেবের একজন মন্ত্রী,—তাঁহার সম্মানার্থ শহরবাসিগণ এই টি-পার্টি দিতেছেন। সমাজের উচ্চতম স্তরের ব্যক্তিগণ এইখানে আজ সম্মিলিত হইবেন।

মাননীয় নিমন্ত্রিতগণ একে একে আসিতেছেন। ইংরেজী, অন্ধ্র আর মুসলমানী—এই সব সজ্জার যত রকম সংমিশ্রণ হইতে পারে,—তাহার সব কয়টাই দেখিতেছি। এক জন ব্যাঙ্কার মোটর ড্রাইভ করিয়া আসিলেন। আর একজন রাও-সাহেব টম্-টম্ হাঁকাইয়া আসিলেন। তিনি হাতে একগাছি হাণ্টার লইয়া যখন লাফাইয়া নামিলেন,—তুমি দেখিলে নিশ্চয়ই হাসিয়া ফেলিতে; কিন্তু আমি একটুও হাসি নাই। শপথ করিয়া বলিতেছি—একটুও হাসি নাই!

মাঝখানের সাদা চাদর পাতা টেবিলটায় মাননীয় মন্ত্রী মহাশয় বসিয়াছেন। মাথায় জরির পাড়-দেওয়া চমৎকার পাগড়ী,—আর কানে সোনার রিং। তাঁহার পাশে উপবিষ্ট একটি অতিশয় সুন্দরী মালয়ালী বালিকার সহিত হাসিয়া হাসিয়া কথা কহিতেছেন। তাহাতে তাঁহার কানের সোনার রিং দুলিতেছে।

চা 'সার্ভ' করিয়া গেল। ছোট ছোট শালপাতার ঠোঙায় দুইটি করিয়া ডালমুট আর দুইটি করিয়া চাঁপা কলা দিয়াছে। কানা-বাহির-করা পিত্তলের গেলাসে করিয়া বয়রা কফি লইয়া যাইতেছে।—"এ বাণ্ডি—, কফি-ই—?"

কোনদিন মঙ্গল-গিরির মন্দির দেখিতে যাই। দূর মোটে আট মাইল। কিন্তু মিটার-গেজ ট্রেনে সময় লাগে এক ঘণ্টারও উপর। ষ্টেশনের ধারেই একটি পাহাড়;— তাহার পাদদেশে একটি মন্দির। চারি দিকে চারিটি বৃহৎ গোপুরম্; তাহাদের মাঝখানে ছোট মন্দির। পাহাড়ের গায়ে পাঁচ-শ' ধাপ সিঁড়ি উঠিয়া আর একটি মন্দির।

নীচেকার মন্দিরটির গোপুরম চারিটি এগারো-তলা। দেওয়ালে অসংখ্য দেবদেবীর মূর্ত্তি রহিয়াছে। নৃসিংহ-মূর্ত্তি, আর গরুড়-মূর্ত্তি দেখিতেছি।...এখানে একটা সোনার হনুমান-মূর্ত্তি রহিয়াছে। বীরত্বব্যঞ্জক প্রকাণ্ড মূর্ত্তি।

গর্ভগৃহের ভিতর অন্ধকার। কিছু দেখা যাইতেছে না। একটি তন্বঙ্গী বালিকা মেঝের উপর সটান পড়িয়া রহিয়াছে। বোধ হয় সে দেবমন্দিরে হত্যা দিয়াছে।

আমরা একটা গোপুরমে উঠিলাম। এগারো তলায় উঠিয়া পরিশ্রান্ত হইয়া খোলা বাতায়নের ধারে বসিলাম। প্রায় দেড় শত ফুট উপরে উঠিয়াছি। এখান হইতে বহু দূরের পাহাড় দেখা যাইতেছে। পাণ্ডা কহিলেন, এখান হইতে সমুদ্র দেখা যায়। ও—ই যেখানে দূরে মাঠ আর আকাশ মিশিয়া ধূ ধূ করিতেছে—ওই খানেই সমুদ্র!

পাণ্ডাজী বলিতেছেন, কিছুদিন আগেও এখানে প্রত্যহ বহু যাত্রীসমাগম হইত। ধর্ম্মপ্রাণ নরনারীগণের আনীত অর্ঘ্যভারে মন্দির ভরিয়া উঠিত। দেবতা ফুলের তলায় হারাইয়া যাইতেন।

আমার চোখের উপর হইতে একখানা পর্দ্দা সরিয়া যায়।... প্রশস্ত রাজপথের উপর দিয়া অগণ্য নরনারী চলিয়াছে। পথের দুই ধারে বিবিধ অর্ঘ্য সাজাইয়া বিপণিশ্রেণী, আর তাহার মাঝখান দিয়া বিশ্বাসী ভক্তিমান নরনারী অসীম আগ্রহে চলিয়াছে। সুকুমার তন্বঙ্গী বালিকা, গৌরাঙ্গী স্বাস্থ্যবতী যুবতী এবং প্রৌঢ়া দলে দলে চলিয়াছে। তাহাদের পরিধানে বিচিত্র বর্ণের রঙীন শাড়ী,—অঙ্গে সুবর্ণ আভরণ... ঠিক ছবির মত দেখাইতেছে। উহাদের সকলেই অবগুণ্ঠন-হীন মাথায় ফুল পরিয়াছে। উহারা দেবতার নির্ম্মাল্যের মত পবিত্র এবং সুন্দর।



এক-এক জন কৃষ্ণবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষ চলিয়াছে। উহাদের পরিধানে রক্ত বস্ত্র, কানে কুণ্ডল, হাতে স্বর্ণ-বলয়। কাহারও প্রশস্ত বুকের উপর উত্তরীয়। তাহার চওড়া সোনার পাড় উজ্জ্বল সূর্য্য-কিরণে জ্বলিতেছে⋯।

ঐ সম্মুখে বিশাল গোপুরম। দেবতা-মন্দিরের প্রবেশ পথ। উহা উচ্চ, প্রকাণ্ড, অপূর্ব্ব কারুকার্য্যমণ্ডিত, অতিশয় জমকালো। কিন্তু ভিতরে যেখানে দেবতা রহিয়াছেন, সেই মন্দির অত বড় নয়। সাধাসিধা, অনাড়ম্বর।⋯বাহির হইতে তাহা চোখেই পড়ে না। এই নিভৃত স্বল্পালোক মন্দির হইতে দেবতা ডাক দিয়াছেন। সে ডাক যাহাদের কানে পৌঁছিয়াছে তাহারা আসিতেছে। দীর্ঘ পথ বাহিয়া, বৃহৎ গোপুরম্ অতিক্রম করিয়া তাহারা আসিতেছে, অবিচ্ছিন্ন প্রবাহে আসিতেছে।⋯

ভাবুকতা ছুটিয়া গেল, বন্ধু-মহাশয়ের কথায়। তিনি তাড়া দিয়া বলিলেন, "আর দেরি করলে ট্রেন ধরতে পারব না।" সুতরাং আমরা ফিরিতেছি। পথে একটা আতা গাছ হইতে নামু আতা পাড়িয়াছিল বলিয়া একটা স্ত্রীলোক যেরূপ তাড়া করিয়া আসিয়াছিল,—সে কথা মনে পড়িলে হাসি পায়। তাহার ক্রুদ্ধ সিংহীর মত মূর্ত্তি এখনো আমার চোখের উপর ভাসিতেছে।

অন্ধ্র দেশে আমাদের অনেক দিন কাটিয়া গেল। এখানকার কাজ শেষ হইয়াছে। এইবারে দেশে ফিরিতে হইবে। ভিতরে ভিতরে আমার বাংলা দেশের জন্য মন-কেমন করিতেছিল।

লাটসাহেব আসিয়া সোনার তালা খুলিয়া 'পাওয়ার হাউসে'র দ্বারোদ্ঘাটন করিলেন। বিভিন্ন স্থান হইতে আমাদের বিদায়-ভোজ এবং পিতৃদেবকে বিদায়-অভিনন্দন দিতেছে। আমাদের ছাড়িয়া দিতে ইহারা বাস্তবিকই কষ্ট অনুভব করিতেছে। অবশেষে এক প্রত্যূষে ট্রেনে চড়িলাম।

ট্রেন চলিয়াছে। দুই ধারে ছোট ছোট পাহাড়। ক্বচিৎ তালগাছ আর কলার বাগান। ⋯দু-একটা ছোট ছেলে আমাদের ট্রেনের দিকে তাকাইয়া আছে।

ছাড়িয়া চলিয়াছি। এই সুন্দর সম্পন্ন বর্ণবৈচিত্র্যময় দক্ষিণ দেশ। এই দক্ষিণ দেশ—যাহার অপূর্ব্ব সমৃদ্ধির কথা শুনিয়া শিবাজী এই দেশ জয় করিতে প্রলুব্ধ হইয়াছিলেন। যেখানে মধ্যযুগে মহাপরাক্রান্ত বিজয়নগর সাম্রাজ্য ছিল এবং তাহার সম্রাট ছিলেন রাজচক্রবর্ত্তী কৃষ্ণ-দেবরায়—যিনি বীর্য্যবান যোদ্ধা হইয়াও শক্তিমান লেখক ছিলেন, কূট রাজনীতিজ্ঞ হইয়াও শ্রেষ্ঠ কবি ছিলেন, যাঁহার সহিত সর্ব্বদা বার সহস্র রাণী থাকিতেন এবং চারি সহস্র হস্তী অনুগমন করিত,—যিনি অন্ধ্র দেশের বিক্রমাদিত্য বলিয়া কীর্ত্তিত! এই দক্ষিণ দেশ,—যেখানে মাধবাচার্য্য, সায়ণ এবং শঙ্কর জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।⋯

হয়ত ইহাই রামায়ণে বর্ণিত কিষ্কিন্ধ্যা দেশ! কে বলিতে পারে? এইখানেই তো গোদাবরী নদী রহিয়াছে। পম্পা সরোবর, তুঙ্গভদ্রা—সেও তো এখানেই। ⋯হয়ত এই কৃষ্ণকায় বিশাল-বক্ষ স্বর্ণ-কুণ্ডল ও স্বর্ণ-বলয় পরিহিত সরলচিত্ত লোকগুলিই এক বন্ধুহীন, প্রিয়জনের জন্য কাতর, উত্তরাপথের রাজপুত্রের সহায় হইয়াছিল, তাঁহাকে সান্ত্বনা দান করিয়াছিল, এবং অবশেষে তাঁহার জন্য সমুদ্রে সেতু নির্ম্মাণ করিয়া, যুদ্ধ করিয়া লঙ্কাদ্বীপ জয় করিয়াছিল। ⋯এই দক্ষিণ দেশ!

পরদিন বেলা বারটায় কলিকাতায় পৌঁছিলাম। দীর্ঘকালের অনভ্যস্ত চোখে বাংলা দেশ নূতন ঠেকিতেছে।



বানান-বিধি

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

কিছুদিন পূর্বে ইংরেজি বানান সংস্কার সম্বন্ধে গিলবর্ট মারের একটি পত্র কাগজে প্রকাশিত হয়েছিল। তিনি বলেছেন, ইংরেজি ভাষার যেমন ক্রমশপরিবর্তন হয়েছে, তেমনি মাঝে মাঝে তার বানান সংস্কার ঘটেছে। সচল ভাষাব অচল বানান অস্বাভাবিক। আধুনিক ইংরেজিতে আর একবার বানান শোধনের প্রয়োজন হয়েছে এই তাঁর মত। এই উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁরা একটি সভাও স্থাপন করেন।

ঠিক যে সময়ে বাংলা ভাষায় এই রকম চেষ্টার প্রবর্তন হয়েছে, সেই সময়ে গিলবর্ট মারের এই চিঠিখানি পড়ে আমাকে ভাবিয়ে দিয়েছে। বস্তুত ভাবনা অনেক দিন থেকেই আমাকে পেয়ে বসেছিল, এই চিঠিতে আরো যেন একটু ধাক্কা দিল।

সুদীর্ঘকালের সাহিত্যিক ব্যবহারে ইংরেজি ভাষা পাকা হয়ে উঠেছে। এই ভাষায় বহুলক্ষ বই ছাপার অক্ষরে আত্মপ্রকাশ করেছে, তা ছাড়া ইস্কুলে য়ুনিভর্সিটিতে বক্তৃতামঞ্চে এই ভাষা ও সাহিত্য সম্বন্ধে আলোচনার অন্ত নেই। উচ্চারণের অবস্থা যাই হোক সর্বত্রই এর বানানের সাম্য সুপ্রতিষ্ঠিত। যে ভাষার লিখিত মূর্তি দেশে কালে এমন পরিব্যাপ্ত তাকে অল্পমাত্র নাড়া দেওয়াও সহজ নয়, ghost শব্দের gost বানানের প্রস্তাবে নানা সমুদ্রের নানা তীর বাদে প্রতিবাদে কী রকম ধ্বনিত প্রতিধ্বনিত হয়ে উঠতে পারে সে কথা কল্পনা করলে দুঃসাহসিকের মন স্তম্ভিত হয়। কিন্তু ওদেশে বাধা যেমন দূরব্যাপী, সাহসও তেমনি প্রবল। বস্তুত আমেরিকায় ইংরেজি ভাষার বানানে যে পরিবর্তন ঘটানো হয়েছে তাতে কম স্পর্ধা প্রকাশ পায় নি।

মার্কিন দেশীয় বানানে through শব্দ থেকে তিনটে বেকার অক্ষর বর্জন ক'রে বর্ণবিন্যাসে যে পাগলামির উপশম করা হোলো আমাদের রাজত্বে সেটা গ্রহণ করবার যদি বাধা না থাকত তাহলে সেই সঙ্গে বাঙালির ছেলের অজীর্ণ রোগের সেই পরিমাণ উপশম হতে পারত। কিন্তু ইংরেজ আচারনিষ্ঠ, বাঙালির কথা বলাই বাহুল্য। নইলে মাপ ও ওজন সম্বন্ধে যে দাশমিক মাত্রা য়ুরোপের অন্যত্র স্বীকৃত হওয়াতে ভূরি পরিমাণ পরিশ্রম ও হিসাবের জটিলতা কমে গিয়েছে ইংলণ্ডেই তা গ্রাহ্য হয় নি, কেবলমাত্র সেখানেই তাপ পরিমাপে সেন্টিগ্রেডের স্থলে ফারেনহাইট অচল হয়ে আছে। কাজ সহজ করবার অভিপ্রায়ে আচারের পরিবর্তন ঘটাতে গেলে অভ্যাসে আসক্ত মনের আরামে যেটুকু হস্তক্ষেপ করা হয় সেটুকু ওরা সহ্য করতে পারে না। এই সম্বন্ধে রাজায় প্রজায় মনোভাবের সামঞ্জস্য দেখা যায়।

যা হোক তবুও ওদেশে অযথার বিরুদ্ধে বিদ্রোহী বুদ্ধির উৎসাহ দেখতে পাওয়া যায়। গিলবর্ট মারের মতো মনস্বীর প্রচেষ্টা তারি লক্ষণ।

সংস্কৃত বাংলা অর্থাৎ যাকে আমরা সাধুভাষা বলে থাকি তার মধ্যে তৎসম শব্দের চলন খুবই বেশি। তা ছাড়া সেই সব শব্দের সঙ্গে ভঙ্গীর মিল ক'রে অল্প কিছুকাল মাত্র পূর্বে গড়-উইলিয়মের গোরাদের উৎসাহে পণ্ডিতেরা যে কৃত্রিম গদ্য বানিয়ে তুলেছেন তাতে বাংলার ক্রিয়াপদগুলিকে আড়ষ্ট করে দিয়ে তাকে যেন একটা ক্লাসিকাল মুখোস পরিয়ে সান্ত্বনা পেয়েছেন; বলতে পেরেছেন, এটা সংস্কৃত নয় বটে, কিন্তু তেমনি প্রাকৃতও নয়। যা হোক ঐ ভাষা নিতান্ত অল্পবয়স্ক হলেও হঠাৎ সাধু উপাধি নিয়ে প্রবীণের গদিতে অচল হয়ে বসেছেন। অন্ধভক্তির দেশে উপাধির মূল্য আছে।

সৌভাগ্যক্রমে কিছুকাল থেকে প্রাকৃত বাংলা আচার-নিষ্ঠদের পাহারা পার হয়ে গিয়ে সাহিত্যের সভায় নিজের স্বাভাবিক আসন নিতে পেরেছে। সেই আসনের পরিসর প্রতিদিন বাড়ছে, অবশেষে—থাক্, যা অনিবার্য তা তো

ঘটবেই, সকল দেশেই ঘটেছে, আগেভাগে সনাতনপন্থীদের বিচলিত করে লাভ নেই।

এই হচ্ছে সময় যখন উচ্চারণের সঙ্গে মিল করে প্রাকৃত বাংলার বানান অপেক্ষাকৃত নিরাপদে নির্দিষ্ট করা যেতে পারে। আমাদের দেশের পূর্বতন আদর্শ খুব বিশুদ্ধ। বানানের এমন খাঁটি নিয়ম পৃথিবীর অন্য কোনো ভাষায় আছে বলে জানি নে। সংস্কৃত ভাষা খুব সূক্ষ্ম বিচার করে উচ্চারণের সঙ্গে বানানের সদ্ব্যবহার রক্ষা করেছেন। একেই বলা যায় honesty, যথার্থ সাধুতা। বাংলা সাধুভাষাকে honest ভাষা বলা চলে না, মাতৃভাষাকে সে প্রবঞ্চনা করেছে।

প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা যখন লিপিবদ্ধ হয়েছে তখন সে যে ছদ্মবেশে সংস্কৃত ভাষা, পণ্ডিতেরা এমন অভিমান রাখেন নি; তাঁদের যথার্থ পাণ্ডিত্য প্রমাণ হয়েছে বানানের যাথার্থ্যে।

সেই সনাতন সদৃষ্টান্ত গ্রহণ করবার উপযুক্ত সময় এসেছে। এখনো প্রাকৃত বাংলায় বানানের পাকা দলিল তৈরি হয় নি। এই সময়ে যদি উচ্চারণের প্রতি সম্পূর্ণ সম্মান রক্ষা করে বানানের ব্যবস্থা হতে পারত তাহলে কোনো পক্ষ থেকেই নালিশ-ফরিয়াদের যে কোনো আশঙ্কা থাকত না তা বলি নে, কিন্তু তার ধাক্কা হোতো অনেক কম।

চিঠিপত্রে প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার কিছুকাল পূর্বেও ছিল না, কিন্তু আমি যতটা প্রমাণ পেয়েছি তাতে বলতে পারি যে আজকাল এই ভাষা ব্যবহারের ব্যতিক্রম প্রায় নেই বললেই হয়। মেয়েদের চিঠি যা পেয়ে থাকি তাতে দেখতে পাই যে উচ্চারণ রক্ষা করে বানান করাকে অপরাধের কোঠায় গণ্য করা হয়েছে, সে সম্বন্ধে তাঁদের হুঁস নেই। আমি সাধারণ মেয়েদের কথাই বলছি, বাংলায় যাঁরা এম্-এ পরীক্ষার্থিনী তাঁদের চিঠি আম খুব বেশি পাই নি। একটি মেয়ের চিঠিতে যখন কোলকাতা বানান দেখলুম তখন মনে ভারী আনন্দ হোলো। এই রকম মেয়েদের কাউকে বানান সংস্কার সমিতিতে রাখা উচিত ছিল। কেননা প্রাকৃত বাংলা বানান-বিচারে পুরুষদেরই প্রাধান্য একথা আমি স্বীকার করি নে। এপর্যন্ত অলিখিত প্রাকৃত বাংলা ভাষায় রস জুগিয়ে এসেছে মেয়েরাই, ছেলেবেলায় যখন রূপকথা শুনেছি তখন তার প্রমাণ পেয়েছি প্রতি সন্ধ্যাবেলায়। ব্রত-কথার বাংলা ভাষার প্রতি লক্ষ্য করলেও আমার কথা স্পষ্ট হবে। এটা জানা যাবে প্রাকৃত বাংলা যেটুকু সাহিত্যরূপ নিয়েছে সে অনেকটাই মেয়েদের মুখে। অবশেষে সত্যের অনুরোধে ময়মনসিংহ গীতিকা উপলক্ষে পুরুষের জয় ঘোষণা করতে হবে। এমন অকৃত্রিম ভাবরসে ভরা কাব্য বাংলা ভাষায় বিরল।

যে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্প্রতি সাহিত্যে হরিজনবর্গ থেকে উপরের পংক্তিতে উঠেছে, তার উচ্চারণ ওকার-বহুল একথা মানতে হবে। অনেক মেয়েদের চিঠিতে দেখেছি তাঁদের ওকার-ভীতি একেবারেই নেই। তাঁরা মুখে বলেন 'হোলো', লেখাতেও লেখেন তাই। কোরচি, কোরবো, লিখতে তাঁদের কলম কাঁপে না। ওকারের স্থলে অর্ধকুণ্ডলী ইলেকচিহ্ন ব্যবহার করে তাঁরা ঐ নিরপরাধ স্বরবর্ণটার চেহারা চাপা দিতে চান না। বাংলা প্রাকৃতের বিশেষত্ব ঘোষণার প্রধান নকিব হোলো ঐ ওকার, ইলেকচিহ্নে বা অচিহ্নে ওর মুখ চাপা দেবার যড়যন্ত্র আমার কাছে সঙ্গত বোধ হয় না।

সেদিন নতুন বানান বিধি অনুসারে লিখিত কোনো বইয়ে যখন "কাল" শব্দ চোখে পড়ল তখন অতি অল্প একটু সময়ের জন্য আমার খট্‌কা লাগল। পরক্ষণেই বুঝতে পারলুম লেখক বলতে চান কালো, লিখতে চান কাল। কর্তৃপক্ষের অনুশাসন আমি নম্রভাবে মেনে নিতে পারতুম কিন্তু কালো উচ্চারণের ওকার প্রাকৃত বাংলার একটি মূল তত্ত্বের সঙ্গে জড়িত। তত্ত্বটি এই যে দুই অক্ষরবিশিষ্ট বিশেষণ পদ এই ভাষায় প্রায়ই স্বরান্ত হয়ে থাকে। তার কোনো ব্যতিক্রম নেই তা নয়, কিন্তু সেগুলি সংখ্যায় অল্প। সেই ব্যতিক্রমের দৃষ্টান্ত যতগুলি আমার মনে পড়ল আগে তার তালিকা লিখে দিচ্ছি। রং বোঝায় এমন বিশেষণ, যেমন "লাল" ("নীল" তৎসম শব্দ)। স্বাদ বোঝায় যে শব্দে, যেমন টক, ঝাল। তার পরে সংখ্যাবাচক শব্দ, এক থেকে দশ, ও তার পরে বিশ, ত্রিশ ও ষাট। এইখানে একটি কথা বলা আবশ্যক। আমাদের ভাষায় এই সংখ্যাবাচক শব্দ কেবলমাত্র সমাসে চলে, যেমন একজন, দশঘর, দুইমুখো, তিনহপ্তা। কিন্তু

বিশেষ্য শব্দের সঙ্গে জোড়া না লাগিয়ে ব্যবহার করতে হলেই আমরা সংখ্যাবাচক শব্দের সঙ্গে টি বা টা যোগ করি, এর অন্যথা হয় না। কখনো কখনো ই স্বর যোগ করতে হয়, যেমন একই লোক, দুইই বোকা। কখনো কখনো সংখ্যাবাচক শব্দে বাক্যের শেষে স্বাতন্ত্র্য দেওয়া হয়, যেমন হরি ও হর এক। এখানে "এক" বিশেষ্যপদ, তার অর্থ, এক-সত্তা, এক হরিহর নয়। আরো দুটো সংখ্যাসূচক শব্দ আছে যেমন, আধ এবং দেড়। কিন্তু এরাও সমাসের সঙ্গী, যেমন আধখানা, দেড়খানা। ও দুটো শব্দ যখন স্বাতন্ত্র্য পায় তখন ওরা হয় আধা, দেড়া। আর একটা সমাসসংশ্লিষ্ট শব্দের দৃষ্টান্ত দেখাই, যেমন জোড়, সমাসে ব্যবহার করি জোড়হাত; সমাসবন্ধন ছুটিয়ে দিলে ওটা হয় জোড়া হাত। "হেঁট" বিশেষণ শব্দটির ব্যবহার খুব সঙ্কীর্ণ। এক হোলো হেঁটমুণ্ড, সেখানে ওটা সমাসের অঙ্গ। তা ছাড়া, হেঁট হওয়া হেঁট করা। কিন্তু সাধারণ বিশেষণরূপে ওকে আমরা ব্যবহার করি নে, যেমন আমরা বলি নে, হেঁট মানুষ। বস্তুত হেঁট হওয়া, হেঁট করা জোড়া ক্রিয়াপদ, জুড়ে লেখাই উচিত। "মাঝ" শব্দটাও এই জাতের, বলি মাঝখানে, মাঝদরিয়া, এ হোলো সমাস, আর বলি মাঝ থেকে, সেটা হোলো প্রত্যয়যুক্ত, ওকে ছাড়িয়ে নিয়ে কাজে লাগাতে পারি নে; বলা যায় না, মাঝ গোরু বা মাঝ ঘর। আর একটা ফার্সি শব্দ মনে পড়ছে "সাফ্"। অধিকাংশ স্থলে বিশেষণ মাত্রই সমাসের অন্তর্গত, যেমন সাফ কাপড়, কিন্তু ওটা যে স্বাতন্ত্র্যবান বিশেষণ শব্দ তার প্রমাণ হয়, যখন বলা যায় কাপড়টা সাফ। কিন্তু বলা যায় না "কথা এক," বলতে হয়, 'কথা একটা", কিম্বা, "কথা একই"। বলি, "মোট কথা এই," কিন্তু বলি নে "এই কথাটাই মোট।" যাই হোক, দুই অক্ষরের হসন্ত বাংলা বিশেষণ হয়তো ভেবে ভেবে আরো মনে আনা যেতে পারে, কিন্তু যথেষ্ট ভাবতে হয়।

অপর পক্ষে বেশী খুঁজতে হয় না যথা, বড়ো, ছোটো, মেঝো, সেজো, ভালো, কালো, ধলো, রাঙা, সাদা, ফিকে, খাটো, রোগা, মোটা, বেঁটে, কুঁজো, ত্যাড়া, বাঁকা, সিধে, কানা, খোঁড়া, বোঁচা, নুলো, ন্যাকা, হাঁদা, খাঁদা, টেরা, কটা, গ্যাঁটা, গোটা, ভোঁদা, ন্যাড়া, ক্ষ্যাপা, মিঠে, ডাঁসা, কষা, খাসা, তোফা, কাঁচা, পাকা, সোঁদা, বোদা, খাঁটি, মেকি, কড়া, মিঠে, চোখা, রোখা, আঁটা, ফাটা, পোড়া, ভিজে, হাজা, শুকো, গুঁড়ো, বুড়ো, ছোঁড়া, গোঁড়া, ওঁচা, খেলো, ছ্যাদা, ঝুঁটো, ভীতু, আগা, গোড়া, উঁচু, নিচু ইত্যাদি। মত শব্দটা বিশেষ্য, ঐটে থেকে বিশেষণ জন্ম নিতেই সে হোলো মতো।

কেন আমি বাংলা দুই অক্ষরের বিশেষণ পদ থেকে তার অন্তস্বর লোপ করতে পারব না তার কৈফিয়ৎ আমার এই খানেই রইল।

বাংলা শব্দে কতকগুলি মুদ্রাভঙ্গী আছে। ভঙ্গীসঙ্কেত যেমন অঙ্গের সঙ্গে অবিচ্ছেদে যুক্ত এগুলিও তেমনি। যে মানুষ রেগেছে তার হাত থেকে ছুরিটা নেওয়া চলে, কিন্তু ভ্রূর থেকে ভ্রূকুটি নেওয়া যায় না। যেমনি, তখনি, আমারো, কারো, কোনো, কখনো শব্দে ইকার এবং ওকার কেবলমাত্র ঝোঁক দেবার জন্যে, ওরা শব্দের অনুবর্তী না হয়ে, যথাসম্ভব তার অঙ্গীভূত থাকাই ভালো। যথাসম্ভব বলতে হোলো এই জন্যে যে স্বরান্ত শব্দে সঙ্কেত স্বরগুলি অগত্যা সঙ্গে থাকে, মিলে থাকে না, যেমন তোমরাও, আমরাই। কিন্তু যেখানে উচ্চারণের মধ্যে মিলনের বাধা নেই, সেখানে আমি ওদের মিলিয়ে রাখব। কেন আমি বিশেষ ভাবে মিলনের পক্ষপাতী একটা ছড়া দিয়ে বুঝিয়ে দেব।

"যেমনি যখনি দেখা দিই তার ঘরে
অমনি তখনি মিথ্যা কলহ করে।
কোনো কোনো দিন কহে সে নোলক নাড়ি'
কারো কারো সাথে জন্মের মতো আড়ি॥"

যদি বানান করি যেমনই, যখনই, অমনই, তখনই, কোনও, কারও, দৃষ্টিকটুত্বের নালিশ হয়তো গ্রাহ্য না হতে পারে। কিন্তু "যখনই" বানানের স্বাভাবিক যে উচ্চারণ, ছন্দের অনুরোধে সেটা রক্ষা করতে চায় এমন কবি হয়তো জন্মাতেও পারে, কেন না কাল নিরবধি এবং বিপুলা চ পৃথ্বী। যথা :—

"যখনই দেখা হয় তখনই হাসে,
হয়তো সে হাসি তার খুসি পরকাশে।
কখনও ভাবি, ওগো শ্রীমতী নবীনা,
কোনও কারণে এটা বিদ্রূপ কিনা॥"

আপাতত জানিয়ে রাখছি কেবল পদ্যে নয়, গদ্যেও আমি উচ্চারণ অনুগত করে কোনো, কখনো, যখনি, তখনি লিখব। এইখানে একটা প্রশ্ন তোলা যেতে পারে যে, "কখনই আমি যাব না" এবং তখনি আমি গিয়েছিলেম এ দুই জায়গায় কি একি বানান থাকা সঙ্গত?

উপসংহারে এই কথাটি বলতে চাই বানানের বিধিপালনে আপাতত হয়তো মোটের উপরে আমরা "বাধ্যতামূলক" নীতি অনুসরণ করে একান্ত উচ্ছৃঙ্খলতা দমনে যোগ দেব। কিন্তু এই দ্বিধাগ্রস্ত মধ্যপথে ব্যাপারটা থামবে না। অচিরে এমন সাহসিকের সমাগম হবে যাঁরা নিঃসঙ্কোচে বানানকে দিয়ে সম্পূর্ণ ভাবেই উচ্চারণের সত্য রক্ষা করবেন।

বানান সংস্কার ব্যাপারে বিশেষভাবে একটা বিষয়ে কর্তৃপক্ষেরা যে সাহস দেখিয়েছেন সেজন্যে আমি তাঁদের ভূরি ভূরি সাধুবাদ দিই। কী কারণে জানি নে, হয়ত উড়িষ্যার হাওয়া লেগে আধুনিক বাঙালী অকস্মাৎ মূর্ধণ্য নয়ের প্রতি অহৈতুক অনুরাগ প্রকাশ করছেন। আমি এমন চিঠি পাই যাতে লেখক শনিবার এবং শূন্য শব্দে মূর্ধণ্য ন দিয়ে লেখেন। এটাতে ব্যাধির সংক্রামকতার লক্ষণ প্রকাশ পায়। কর্নেল, গবর্নর, জর্নাল প্রভৃতি বিদেশী শব্দে তাঁরা দেবভাষার ণত্ববিধি প্রয়োগ করে তার শুদ্ধিতা সাধন করেন। তাতে বোপদেবের সম্মতি থাকতেও পারে। কিন্তু আজকাল যখন খবরের কাগজে দেখতে পাই কানপুরে মূর্ধণ্য ন চড়েচে তখন বোপদেবের মতো বৈয়াকরণিককে তো দায়ী করতে পারি নে। কানপুরের কান শব্দের দুটো ব্যুৎপত্তি থাকতে পারে, এক কর্ণ শব্দ থেকে। ব্যাকরণের নিয়ম অনুসারে রেফের সংসর্গে নয়ের মূর্ধণ্যতা ঘটে। কর্ণ শব্দের 'র' গেলেই মূর্ধণ্যতার অস্তিত্বের কৈফিয়ৎ যায় চলে। কানপুরের কান শব্দ হয়তো কানাই শব্দের অপভ্রংশ। কৃষ্ণ থেকে কান ও কানাই শব্দের আগমন। কৃষ্ণ শব্দে ঋফলার পরে মূর্ধণ্য ষ, ও উভয়ের প্রভাবে শেষের ন মূর্ধণ্য হয়েছে। আধুনিক প্রাকৃত থেকে সেই ঋ ফলা হয়েছে উৎপাটিত। তখন থেকে বোধ করি ভারতের সকল ভাষা হতেই কানাই শব্দে মূর্ধণ্যের আক্রমণের আশঙ্কা চলে গেছে। কিন্তু নতুন উপক্রমণিকা-পড়া বাঙালি হয়তো কোন্ দিন কানাই শব্দে মূর্ধণ্য ন চালিয়ে তৃপ্তিবোধ করবেন। এই রকম দুটো একটা শব্দ তাঁদের চোখ এড়িয়ে গেছে। স্বর্ণের রেফহীন অপভ্রংশ সোনায় তাঁরা মূর্ধণ্য ন আঁকড়িয়ে আছেন, অথচ শ্রবণের অপভ্রংশ শোনা তাঁদের মূর্ধণ্যপক্ষপাতী তীক্ষ্ণ দৃষ্টি এড়িয়ে গেছে। ব্যাকরণের তর্ক থাক, ওটাতে চিরদিন আমার দুর্বল অধিকার। কৃষ্ণ শব্দের অপভ্রংশে কোনো প্রাকৃতে কাণ্হ বা কাণ থাকতেও পারে, যদি থাকে সেখানে সেটা উচ্চারণের অনুগত। সেখানে কেবল লেখবার বেলা কাণ্হ এবং বলবার বেলা কান্হ কখনই আদিষ্ট হয় নি। কিন্তু প্রাকৃত বাংলায় তো মূর্ধণ্য নয়ের সাড়া নেই কোথাও। মুদ্রাযন্ত্রকে দিয়ে সবই ছাপানো যায় কিন্তু রসনাকে দিয়ে তো সবই বলানো যায় না। কিন্তু যে মূর্ধণ্য নয়ের উচ্চারণ প্রাকৃত বাংলায় একেবারেই নেই, গায়ে পড়ে তার আনুগত্য স্বীকার করতে যাব কেন? এই পাণ্ডিত্যের অভিমানে শিশুপালদের প্রতি যে অত্যাচার করা যায় সেটা মার্জনীয় নয়। প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধণ্য নয়ের স্থান কোনো খানেই নেই এমন কথা যে-সাহসে কর্তৃপক্ষ ঘোষণা করতে পেরেছেন সেই সাহস এখনো আরো কত দূর তাঁদের ব্যবহার করতে হবে। এখনো শেষ হয় নি কাজ। *

* আমি "প্রাকৃত বাংলা" শব্দটি ব্যবহার করে আসছি। সেদিন এর একটা পুরাতন নজির পেয়ে আশ্বস্ত হয়েছি বুলবুল নামক পত্রে।



আলোচনা

"বঙ্গে নারী-নির্যাতন ও তাহার প্রতিকার"

শ্রীসুকমল দাশগুপ্ত

গত বর্ষের চৈত্র সংখ্যা 'প্রবাসী'তে কাজী আনিসর রহমান মহাশয়ের 'বঙ্গে নারী-নির্যাতন ও তাহার প্রতিকার' সম্বন্ধে যে মর্ম্মস্পর্শী রচনাটি প্রকাশিত হইয়াছে তাহা পাঠ করিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। তবে প্রতিকার সম্বন্ধে তিনি যে কথাগুলি বলিয়াছেন সে সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করিতে চাই।

সম্পূর্ণ লেখাটি পড়িয়া মনে হয় লেখক শুধু ইহাই বলিতে চান যে আমাদের দেশের এই ঘৃণ্য কলুষিত অত্যাচার কখনই কমিবে না, পক্ষান্তরে আমাদেরই তাহা হইতে রক্ষা লাভ করিবার চেষ্টা করিতে হইবে। উপায়গুলি সংক্ষেপে এই—

(১) মহিলাদিগকে ছোরা ও লাঠি খেলা শিখিতে হইবে,

(২) পাপীকে, জাতিভেদ না করিয়া, শাস্তি দিতে হইবে,

(৩) পাহারাদারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে, এবং

(৪) পল্লীবধূদের সিক্তবসনাবৃতা হইয়া লজ্জায় সঙ্কুচিত অবস্থায় পুকুরপাড়ে না আসিতে দিবার ব্যবস্থা করিতে হইবে। অথচ প্রকৃতপক্ষে যাহা প্রয়োজন তাহা তিনি বলেন নাই। আজ বঙ্গদেশ যে অবস্থায় আসিয়া পৌছিয়াছে তাহাতে চারি দিক বিবেচনা করিয়া নারীরক্ষা অপেক্ষা পুরুষ-রক্ষাই অধিকতর প্রয়োজনীয় হইয়া উঠিতেছে। যে-সকল দুর্ব্বৃত্ত অশিক্ষা-যবনিকার অন্তরালে আপনাদিগকে লুকাইয়া রাখিয়া ক্রমশঃ গভীর হইতে গভীরতর অন্ধকারে মগ্ন হইতেছে তাহাদের রক্ষা করাই আজ আমাদের সর্ব্বপ্রথম ও সর্ব্বপ্রধান কার্য্য।

ইহাও ত আমাদের ভাবিতে হইবে, যে, সেই আততায়ীগণ আমাদেরই দেশবাসী; সুতরাং তাহাদের বিভীষিকা মনে করিয়া অস্ত্রশস্ত্র লইয়া আমাদের সুসজ্জিত থাকিতে হইবে না, পাহারাদারের বন্দোবস্ত করিতে হইবে না সভাসমিতি খুলিতে হইবে না—পল্লীবধূদের সভয় অন্তরালে প্রবেশ করাইবার প্রয়োজন হইবে না, শুধু প্রয়োজন তাহাদের অন্তরের সেই পাশবিক ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-লালসাকে নির্ম্মূল করা। 'প্রবাসী'র পৃষ্ঠায় আমাদের রচনা প্রকাশিত হউক, আর ময়দানে সভা করিয়া বড় বড় বক্তৃতা হউক—ইহাতে তাহাদের কিছুই আসে যায় না। তাহারা সেই পুকুর-পাড়ের আনাচে-কানাচে সিক্তবসনাবৃতা পল্লীবধূর খোঁজে সকাল হইতে সন্ধ্যা অবধি, এবং নিরাশ্রয়া পল্লীবালিকার ক্ষুদ্র কুটীরের চারি পার্শ্বে সন্ধ্যা হইতে সকাল অবধি ঘুরিয়া মরিবে।

এইবার রহমান সাহেব যে চারিটি প্রতিকারের কথা বলিয়াছেন তাহা লইয়া একে একে আলোচনা করিতে চাই।

(১) আমাদের দেশের মহিলাদিগের লাঠি ও ছোরা খেলা শিক্ষা করা সত্যই প্রয়োজনীয়। ইহাতে আত্মনির্ভর, বুকের বল ও উপস্থিত বুদ্ধি বাড়ে, সে বিষয়ে সন্দেহ নাই এবং অনেক ক্ষেত্রে এইরূপ বাধা পাইয়া দুষ্ট আততায়ীগণ জব্দ হইয়াছে তাহারও একাধিক উদাহরণ খবরের কাগজে পাওয়া যায়। কিন্তু বঙ্গদেশের বর্ত্তমান অবস্থায় ইহা কত দূর সম্ভব সে বিষয়ে বিশেষ সন্দেহ আছে। দুশ্চরিত্র আততায়ীর নিকট হইতে আপনার মান রক্ষা করিতে গিয়া পল্লীবধূদের হয়ত বা (বিপ্লবী দল বিবেচিত হইয়া) চরিত্রবান্ পুলিসের হাজতে বন্দী হইতে হইবে। সাহিত্য ও সংবাদপত্রের ভিতর দিয়া নারীনির্যাতন-সমস্যা লইয়া দেশ-বাসীর দৃষ্টি আকর্ষণ করা, শিক্ষিত সমাজে ইহা লইয়া চাঞ্চল্য উপস্থিত করা হয়ত বা কিছু মঙ্গলকর হইতে পারে, কিন্তু বলিতে লজ্জা করে যে সেই সকল শিক্ষিত লোকের সংখ্যা অপেক্ষা অশিক্ষিত আততায়ীর সংখ্যা আমাদের দেশে অনেক বেশী।

রহমান সাহেব লিখিয়াছেন, "আজ যাঁরা সংবাদপত্রে নারী-নির্যাতন প্রসঙ্গের উপর দলবদ্ধ ভাবে কৌতুকোৎসাহে ঝুঁকে পড়েছেন, হয়ত কাল তাঁরাই ওই একই সংবাদে ঘৃণায় ক্রোধে লজ্জায় অস্থির বোধ করবেন।" শিক্ষিত সমাজে যে দুই-চারি জন ভদ্র দুর্ব্বৃত্ত বাঁচিয়া আছেন কথাগুলি হয়ত তাঁহাদের পক্ষে খাটিতে পারে। আমার বলিবার উদ্দেশ্য এই, যে, খবরের কাগজে প্রকাশ করিবার পূর্ব্বে আততায়ীদিগকে খবরের কাগজ পড়ান শিখাইতে হইবে, নতুবা এ লেখালেখির কোনই মূল্য নাই।

(২) দ্বিতীয়তঃ তিনি যাহা বলিয়াছেন তাহাতে তাঁহার শিক্ষা, সংস্কার ও সমবেদনার পরিচয় পাইয়াছি সত্য, কিন্তু আজ আমাদের "অত্যাচারের বক্ষে পড়িয়া হানিতে তীক্ষ্ণ ছুরি" করিলে চলিবে না। তাহাদেরও দলে টানিতে হইবে। যে রমণীদের সর্ব্বনাশ করিবার জন্য আজ তাহারা এই জঘন্য প্রবৃত্তি-গুলিকে নির্ব্বিচারে প্রশ্রয় দিয়া চলিতেছে কাল কি তাহারাই "গাল-ভরা মা ডাকে" ডাকিতে পারে না? সে শিক্ষাটুকু দিবার কি আমাদের শক্তি নাই? তাহাদের শাস্তি দিবার জন্য উঠিয়া-পড়িয়া না লাগিয়া সেই সময়টুকু যদি শিক্ষাপ্রচারে ব্যয় করিতে পারি তাহা হইলে ভবিষ্যতে আমরাই লাভবান হইব। অন্যায়ের শাস্তি চাই, কিন্তু যে প্রকারের শাস্তি আমাদের দেশে প্রচলিত তাহাতে তাহাদের নৈতিক জীবনের পক্ষে উহা হিতকর হইবে বলিয়া আমার মনে হয় না, পরন্তু শাস্তির ভয়টুকুও তাহাদের থাকিবে না—মরিয়া হইয়া অন্যায়ের পর অন্যায় করিয়া চলিবে এবং সে অন্যায়ের পরিসমাপ্তি কোথায় তাহাও কেহ বলিতে পারে না। এই ইন্দ্রিয়-পরিতৃপ্তি-লালসার মূলে তিনটি কারণ রহিয়াছে: (১) মনে শিক্ষা নাই, (২) উদরে অন্ন নাই, (৩) হাতে কাজ নাই। তাই এই পঙ্কিল প্রবৃত্তিগুলি তাহাদের পাগল করিয়া তুলিতেছে। আমরা যদি পল্লীতে পল্লীতে শিক্ষা ও কোন প্রকার কাজে লিপ্ত থাকিবার (কুটীরশিল্প প্রভৃতির) ব্যবস্থা করিয়া দিতে পারি, তাহা হইলে

হয় ত ইহার কিছু উপশম হইতে পারে; নতুবা অলস ব্যক্তির মস্তিষ্ক শয়তানের কারখানা হইয়াই থাকিবে।

(৩) তৃতীয়তঃ তিনি যাহা বলিয়াছেন সে বিষয়ে শুধু ইহাই বলিতে চাই যে, গবর্ণমেণ্টকে এ-বিষয়ে সাহায্য করিবার জন্য অনুরোধ করিবার পূর্ব্বে তাঁহারাই হয়ত আমাদের অনুরোধ করিয়া বসিবেন যে এইরূপ আব্দারে-অনুরোধ যেন আমরা না-করি। এমনি করিয়াই হয়ত মাসের পর মাস এসেম্ব্লির বৈঠকে অনুরোধ ও প্রতিরোধ চলিতে থাকিবে, অন্য দিকে বিচারালয়-দ্বারে বহু নরনারী আশ্রয় ও শাস্তির অপেক্ষায় সময় কাটাইবে।

গবর্ণমেণ্টের আজ টাকা নাই, এবং বাংলা দেশকে লইয়া অনেক বিষয় ভাবিতে ভাবিতে তাঁহাদের চুল পাকিয়া গিয়াছে, সুতরাং আর ভাবিবার শক্তি ও অবসর নাই। যদি সত্যই কিছু করিতে হয় তাহা হইলে বক্তৃতা ও লেখালেখি বন্ধ করিয়া শিক্ষিত হিন্দু-মুসলমানকে একত্র হইয়া শিক্ষাবিস্তারের জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিতে হইবে।

আমার মনে হয়, আমরা হিন্দু-মুসলমান বাঙালী, যাহারা অল্প-বিস্তর কিছু কিছু শিক্ষা লাভ করিয়াছি, তাহারা এক এক জনে যদি গ্রামে গ্রামে দশ-বারটি ছাত্র সংগ্রহ করিয়া শিক্ষা দিবার বন্দোবস্ত করি, তাহা হইলে দশ-বার বৎসরে হয়ত বাংলার অবস্থার পরিবর্ত্তন হইতে পারে; নতুবা দশ শত বৎসরেও কিছু হইবে না। ইহা অতি সহজ তাহা বলিতেছি না, তবে হয়ত সম্ভব।

—

"বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি"

শ্রীশৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ

'প্রবাসী'র গত বৈশাখ সংখ্যায় শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল মহাশয় লিখিত বর্ত্তমান "আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি" শীর্ষক প্রবন্ধে কতকগুলি ত্রুটিবিচ্যুতি দেখিতে পাইলাম। ১২৬ পৃষ্ঠায় বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন:—"এমন সময় এরূপ একটি ঘটনা ঘটিল যাহা পরবর্ত্তী যাবতীয় আলাপ-আলোচনার মোড় ফিরাইয়া দিল। এই ব্যাপারটি হইল ১৯৩৫ সনের ১৮ই মে অন্যনিরপেক্ষ ভাবে ব্রিটেন ও জার্ম্মাণীর মধ্যে ১০০ : ৩৫ আনুপাতিক নৌচুক্তি। এই নৌচুক্তির কথা প্রকাশ হইবা মাত্র সকলেরই টনক নড়িল। জার্ম্মাণীর চিরশত্রু ফ্রান্স বিচলিত হইল সকলের চেয়ে বেশী। যাহাকে সে এতকাল পরমাত্মীয় বলিয়া মনে করিয়াছে সেই ব্রিটেনকে ছাড়িয়া অতঃপর সে ইটালীর দিকে মুখ ফিরাইল, ইহার কর্ণধার মুসোলিনী-কেই বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল। ব্রিটেন-জার্ম্মাণীর নৌচুক্তির বিরুদ্ধে এই যে ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত, এক-কথায় বলিতে গেলে ইহাই ইটালীর আবিসীনিয়া-বিজয়ের মূলে, রাষ্ট্রসঙ্ঘের নিষ্ক্রিয়তা তথা ব্যর্থতার মূলে, আবার ইহাই পরবর্ত্তী স্পেন-বিদ্রোহ ও অন্যবিধ ব্যাপার-গুলি সম্ভব করিয়া দিয়াছে।" গত দুই তিন বৎসরের আন্তর্জ্জাতিক অবস্থা সম্বন্ধে যাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন তাঁহারা দেখিতে পাইবেন এই কথাগুলিতে প্রকৃত ঘটনা কিরূপ বিকৃত অবস্থা প্রাপ্ত হইয়াছে। বাগল মহাশয় লিখিয়াছেন যে ব্রিটেন ও জার্ম্মাণীর মধ্যে আনুপাতিক নৌচুক্তি নিষ্পন্ন হওয়ার পর ফ্রান্স মুসোলিনীকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিল ও ইটালীর সহিত সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইল। কথাটি আদৌ সত্য নহে এবং প্রকৃত ঘটনার সম্পূর্ণ বিপরীত। কারণ আমরা দেখিতে পাই যে ১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারী ফ্রান্স ও ইটালী পরস্পর সন্ধি করিয়া সখ্যসূত্রে আবদ্ধ হইয়াছিল; সুতরাং ব্রিটেন ও জার্ম্মাণীর মধ্যে নৌচুক্তি হওয়ার পরে ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত হইয়াছে লেখা ভুল। বিশেষতঃ লেখক মহাশয় নৌচুক্তির তারিখটি পর্য্যন্ত ভুল লিখিয়াছেন। উহা ১৮ই মে না লিখিয়া ১৮ই জুন লিখিলে শুদ্ধ হইত। ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত ১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারী সংঘটিত হইয়াছে। ঐ বৎসর ১৮ই জুন ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌচুক্তি হওয়ার পর ও আবিসীনিয়া যুদ্ধ আরম্ভ হওয়ার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আর কোনও ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান সন্ধি হয় নাই।

প্রকৃত ঘটনাটি হইয়াছিল এইরূপ:—১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারী মঃ লাভাল ও মুসোলিনী আফ্রিকায় পরস্পরের স্বার্থ সংরক্ষণের ব্যবস্থা করিয়া ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত (a treaty of friendship) স্থাপন করেন। ফ্রান্স ইটালীকে ইটালীয়ান-ইরিত্রিয়া ও ফ্রান্স-সোমালীল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী কতকটা স্থান এবং জীবুতি হইতে আদ্দিস-আবাবা পর্য্যন্ত ফরাসী রেলওয়ে লাইনের কিছু অংশ ও অন্যান্য কতকগুলি সুযোগসুবিধা প্রদান করে। বিনিময়ে ফ্রান্স ইটালীকে ইউরোপে পুনঃ সমর-সজ্জায় সজ্জিত চিরশত্রু জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে মিত্ররূপে পায়। এই সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হওয়াতেই ফ্রান্স আবিসীনিয়ায় ইটালীর কোনও কার্য্যে হস্তক্ষেপ করে নাই। মহাযুদ্ধের পর হইতে ফ্রান্স নানারূপ সন্ধি ও চুক্তি দ্বারা জার্ম্মাণীকে হতমান করিয়াও জার্ম্মাণ-ভীতি সম্পূর্ণরূপে দূর করিতে পারিতেছিল না। নানা কারণে ব্রিটেনের উপরও সে বিশেষ আস্থা স্থাপন করিতে পারে নাই; তাই ইটালীকে বন্ধুরূপে পাইয়া সে কতকটা নিশ্চিন্ত হইয়াছিল। কারণ তাহার আশঙ্কা ছিল পাছে ইটালী জার্ম্মাণীর সহিত মিলিত হয়। এই সম্বন্ধে 'মডার্ণ রিভিয়ু' পত্রিকার ১৯৩৬ সনের জানুয়ারী সংখ্যায় শ্রীযুক্ত তারকনাথ দাস মহাশয় যাহা লিখিয়াছেন, তাহা বিশেষ প্রণিধানযোগ্য। সংক্ষেপে তাহার তাৎপর্য্য এই—"মহাযুদ্ধ অবসানের পর ব্রিটিশ কর্ত্তৃপক্ষ যত দিন আফ্রিকায় ও ভূমধ্যসাগরে ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে প্রতিদ্বন্দ্বিতা ছিল তত দিন পর্য্যন্ত ইটালীকেই সমর্থন করিয়াছে। কিন্তু ফ্রান্স ও ইটালী পরস্পর সন্ধিসূত্রে আবদ্ধ হইতেই ব্রিটেন ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত ভাঙ্গিয়া দিতে মনস্থ করিল। কারণ ইটালী ও ফ্রান্স একত্র মিলিত হইলে ভূমধ্যসাগরে ব্রিটেনের নৌশক্তির প্রাধান্য খর্ব্ব করিতে পারিত। ফরাসীর উপর প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্রিটেন ষ্ট্রেসা (Stressa) চুক্তি অমান্য করিয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে নৌচুক্তি করিয়া বসিল। এই চুক্তির সর্ত্ত অনুযায়ী জার্ম্মাণীর সম্বন্ধে ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালীর একযোগে কার্য্য করিবার কথা ছিল।"

ব্রিটেন যখন দেখিতে পাইল যে ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত সৃষ্টি হওয়ার ফলে ইটালী পূর্ব্ব-আফ্রিকায় ও ভূমধ্যসাগরে ভবিষ্যতে অধিকতর শক্তিশালী হইয়া উঠিতে পারে ও তাহার প্রাচ্য সাম্রাজ্যে যাতায়াতে বাধা সৃষ্টি করিতে পারে, তখনই নিজের স্বার্থ চিন্তা করিয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে নৌচুক্তি করিয়াছিল। এই সন্ধি

স্বাক্ষরিত হওয়ার পর Le Temps, Journal des Debats, Le Matin প্রভৃতি ফরাসী পত্রিকাগুলি ও ইটালীয়ান পত্রিকা Popolo d'Italia ব্রিটেনের বিরুদ্ধে তীব্র মন্তব্য প্রকাশ করিয়াছিল। কারণ এই নৌচুক্তি ষ্ট্রেসা'ই সন্ধি সত্ত্বেও বিরোধী ছিল। ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌচুক্তির পর ফ্রান্স ব্রিটেন ও ইটালীর মধ্যে কাহাকে বন্ধু বলিয়া গ্রহণ করিবে এই চিন্তায় অত্যন্ত বিব্রত হইয়া পড়িল। পরে কি কি কারণে ইটালীকে ছাড়িয়া ক্রমশঃ সে ব্রিটেনের অনুরাগী হইয়া উঠিল তাহা লেখক বর্ণনা করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগলের উত্তর

শ্রীযুক্ত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ কৃত আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদ পাঠ করিলাম। আমি ১৯৩৫ সনের ১৮ই জুন তারিখে বিধিবদ্ধ ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তিকে বর্ত্তমান আন্তর্জাতিক অবস্থার একটি বিশিষ্ট ব্যাপার বলিয়া মনে করি। ইহার পরে যতগুলি গুরুত্বপূর্ণ আন্তর্জাতিক ব্যাপার ঘটিয়াছে তাহার জন্য প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ ভাবে ইহাই কমবেশী দায়ী বলিয়াছিলাম। এই চুক্তিটিই আমার প্রবন্ধে প্রধান আলোচ্য বিষয় ছিল না, সেজন্য আমার উক্তির সমর্থনে যুক্তির অবতারণা করি নাই। আবার "গত দুই-তিন বৎসরের আন্তর্জাতিক ব্যাপারগুলি যাঁহারা সবিশেষ অবগত আছেন" তাঁহাদের নিকট ইহার উল্লেখ তো বাহুল্য মাত্র; তথাপি আমার এই অভিমত সম্পর্কে যখন প্রশ্ন উঠিয়াছে তখন ইহার সমর্থনের যুক্তিগুলি উল্লেখ করিতেছি।

শৈলেন্দ্রবাবু লিখিয়াছেন, ১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারী ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে একটি সন্ধি হয় এবং ইহার কয়েকটি সর্ত্ত দ্বারা আবিসীনিয়ায় ফ্রান্স ইটালীকে কিছু সুযোগ-সুবিধা দান করে। (ফ্রান্স পূর্ব্বেকার লণ্ডন চুক্তি অনুসারে লিবিয়ার পার্শ্ববর্ত্তী তাহার উপনিবেশের খানিকটা, এরিত্রিয়া ও ফরাসী সোমালিল্যাণ্ডের মধ্যবর্ত্তী খানিকটা, ডুমিরা দ্বীপ এবং আদ্দিসআবাবা-জিবুতি রেলওয়ের কতকটা অংশ ইটালীকে দেয়—(Keesing's Contemporary Archives, 1934-37, pp. 1502—03.) ইহা সত্য। তবে আবিসীনিয়ার উপর আধিপত্য স্থাপনে গত প্রায় পঞ্চাশ বৎসর যাবৎ সাম্রাজ্যবাদী রাষ্ট্রগুলির (ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী) তরফ হইতে এত চেষ্টা চলিতে থাকে যে, ফ্রান্স ও ইটালীর মধ্যে বিধিবদ্ধ উক্ত চুক্তির আবিসীনিয়া অংশের উপর এই সময়ে ব্রিটেন বিশেষ গুরুত্ব আরোপ করে নাই। যদি বিশেষ কোন গুরুত্ব আরোপ করাই হইত এবং ফ্রান্সের সঙ্গে ব্রিটেনের মন-কষাকষি হইত তাহা হইলে এক মাস যাইতে-না-যাইতেই (৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৯৩৫) ব্রিটেন ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তিকে এরূপ সাধারণ ভাবে অভিনন্দিত করিত না ও ফ্রান্সের সঙ্গে চুক্তিবদ্ধ হইত না। এই সম্বন্ধে উক্ত Keesing's Contemporary Archives (পৃঃ ১৫৩৪)এ আছে,—

"With reference to the Franco-Italian Agreement recently reached in Rome the British Ministers, on behalf of H. M. Government in the United Kingdom, cordially welcomed the declaration by which the French and Italian Governments have asserted their intention to develop the traditional friendship which united the two nations, and associated H. M. Government with the intention of the French and Italian Governments to collaborate in a spirit of mutual trust in the maintenance of general peace."

ফ্রাঙ্কো-ইটালীয় চুক্তি এইরূপে মানিয়া লইয়া ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইটালীর সঙ্গে একযোগে সৈন্য-সংখ্যা নিয়ন্ত্রণ করিবার জন্য জার্ম্মানীকে অনুরোধ করিয়া পাঠায়। জার্ম্মাণী সে অনুরোধ উপেক্ষা করিয়া পরবর্ত্তী ১৬ই মার্চ্চ অধিবাসীদের পক্ষে সৈন্যদলে যোগদান বাধ্যতামূলক (conscription) বলিয়া ঘোষণা করে। এইরূপ এক তরফা ভের্সাই সন্ধির সর্ত্ত ভঙ্গ করা ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী কিছুতেই বরদাস্ত করিতে পারিল না। ইহারা পরবর্ত্তী ১১ই ও ১৪ই এপ্রিল ষ্ট্রেসায় সম্মিলিত হইয়া ঘোষণা করিল,—

"The three Powers the object of whose policy is the collective maintenance of peace within the framework of the League of Nations, find themselves in complete agreement in opposing by all practicable means any unilateral repudiation of treaties which may endanger the peace of Europe, and will act in close and cordial collaboration for this purpose." (Keesing's Contemporary Archives, p. 1616.)

১৪ এপ্রিল ফ্রান্স এই সিদ্ধান্ত সহ একটি নোট রাষ্ট্রসঙ্ঘকে প্রেরণ করে। পরবর্ত্তী ১৭ এপ্রিল জেনেভার রাষ্ট্রসঙ্ঘ-পরিষদে এই বিষয় আলোচনা হয় ও উহাদের উক্ত সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। কোন সন্ধি এক তরফা ভঙ্গ করা হইলে ভঙ্গকারী রাষ্ট্রের বিরুদ্ধে কিরূপ শাস্তি বিধানের ব্যবস্থা করা যাইতে পারে, ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী তাহারও আলোচনা করিয়াছিলেন। বলা বাহুল্য সন্ধিভঙ্গকারী জার্ম্মাণীই ইহাদের লক্ষ্য ছিল। ইহার পর ব্রিটেন, ফ্রান্স ও ইটালী কাহাকেও না জানাইয়া অকস্মাৎ ১৮ই জুন সন্ধিভঙ্গকারী জার্ম্মাণীর সঙ্গে একটা নৌচুক্তি করিয়া বসিল! এই চুক্তির কথা প্রকাশ হইবার পর ইউরোপের বিভিন্ন রাষ্ট্রে কিরূপ আলোড়ন উপস্থিত হইয়াছিল আন্তর্জাতিক ঘটনাগুলি যাঁহারা কিঞ্চিৎ যত্নসহকারে অনুধাবন করিয়াছেন তাঁহাদেরই স্মরণ হইবে। ফ্রান্স, ইটালী, রুশিয়া, ছোট আঁতাত ইংরেজের এই ডিগ্‌বাজীর তীব্র নিন্দা করিতে থাকে। এই চুক্তি সম্পর্কে প্যারিসের বিখ্যাত 'ইকো-দ্য-পারি' পত্রিকার রাজনীতিবিষয়ক লেখক André Géraud 'ফরেন অ্যাফেয়ার্স' ত্রৈমাসিকের ১৯৩৫, অক্টোবর সংখ্যায় একটি সুচিন্তিত প্রবন্ধ লেখেন। তাহাতে তিনি বলেন,—

"Throughout this diplomatic activity on behalf of European peace British policy was not continuous and uniform···Instead it wandered about, apparently troubled partly by conflicting currents in domestic public opinion, partly by the cool

reception given the proposed treaty [at Stressa] by the Dominions. At one moment the Cabinet adhered to the plan of February 3, at another it abandoned it ;—The indicision of the British Cabinet between February and June will certainly one day have to be examined and described in detail."

উক্ত লেখক আরও বলেন,—

"At Stressa on April 11 and at Geneva on April 17 Great Britain officially censored unilateral repudiation of the signatory of an international treaty. Yet less than two months later Great Britain made herself an accomplice in the denunciation of the naval clauses of the Treaty of Versailles. What is at issue here is not a signature given on June 28, 1919, and which because of the long evolution of events Great Britain now considers void, but a promise given spontaneously as recently as February 3, 1935—nor let us forget that *it was Sir John Simon himself who took the initiative in inviting the French ministers to meet him on that occasion.* The promise made in February was repeated at Stressa and Geneva under the most formal circumstances. Two months later came the Anglo-German Naval Agreement. (পৃ. ৫৯, ইটালিক্‌স্ আমার)

১৯৩৫ সনের ৩রা ফেব্রুয়ারী, ১৩-১৪ই এপ্রিল ও ১৭ই এপ্রিল যে-ব্রিটেন ফ্রান্স ও ইটালীর সঙ্গে এতটা এক মত হইয়া জার্ম্মাণীর বিরুদ্ধে কাজ করিয়াছিল, দুই মাস পরেই সে সকলের অজ্ঞাতসারে জার্ম্মাণীর সঙ্গে একক ভাবে নৌচুক্তিতে আবদ্ধ হইল! ফ্রান্সের জার্ম্মাণ-ভীতি বহু দিনের। এই জন্য ব্রিটেন ছাড়া অন্য রাষ্ট্রের সঙ্গেও চুক্তিবদ্ধ হইতে কসুর করে নাই।. তবে ব্রিটেনের উপরই নির্ভর তাহার সব চেয়ে বেশী। এহেন ব্রিটেন যখন জার্ম্মাণীর দিকে এইরূপ অপ্রত্যাশিত ভাবে ঝুঁকিয়া পড়িল তখন ইটালীর সঙ্গে অত্যধিক ঘনিষ্ঠতা করা ছাড়া তাহার উপায়ান্তর ছিল না। ইহার ফল কি বিষময় হইয়াছে তাহা সকলেই অবগত আছেন।

আমার প্রবন্ধের উদ্ধৃত অংশের 'ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান আঁতাত' কথাটি শৈলেন্দ্র বাবু যে অর্থে ব্যবহার করিয়াছেন, আমি সেরূপ অর্থে ব্যবহার করি নাই। কথাগুলি পূর্ব্বাপর মনোযোগ সহকারে পাঠ করিলে ইহা দ্বারা উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে সন্ধি বা treaty বা *entente* (আঁতাত)এর বিষয় যে ব্যক্ত করি নাই তাহা বুঝা যাইবে, উভয় রাষ্ট্রের মধ্যে অত্যধিক ঘনিষ্ঠতার কথাই বুঝাইয়াছি। আঁতাত কথাটি এখন 'সন্ধি' অর্থ ছাড়া এরূপ ব্যাপক অর্থেও ব্যবহৃত হয়। যেমন, আমরা বলি, রাম ও শ্যামের মধ্যে আঁতাত, জাপান-জার্ম্মাণীর মধ্যে আঁতাত, ইত্যাদি।

শৈলেন্দ্র বাবু আমার প্রবন্ধের প্রতিবাদের সমর্থনে ডক্টর তারকনাথ দাসের একটি উক্তির মর্ম্ম উল্লেখ করিয়াছেন। ডক্টর দাসের উক্তির মধ্যে কিরূপ অসঙ্গতি আছে তাহার একটি মাত্র উল্লেখ করিয়া আমার বক্তব্য শেষ করিব। তিনি এই মর্ম্মে বলিয়াছেন যে, ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তির প্রতিশোধ লইবার জন্য ব্রিটেন ষ্ট্রেসা চুক্তি ভঙ্গ করিয়া জার্ম্মাণীর সঙ্গে নৌ-চুক্তিতে আবদ্ধ হইল। ১৯৩৫ সনের ৭ই জানুয়ারীর ফ্রাঙ্কো-ইটালীয়ান চুক্তি যদি ব্রিটেনকে এতই চটাইবে তাহা হইলে পরবর্ত্তী এপ্রিল মাসে ষ্ট্রেসা চুক্তি করাই বা কেন, আবার তাহা ভঙ্গ করাই বা কেন? বস্তুতঃ ১৯৩৫ ১৮ই জুন তারিখের ইঙ্গ-জার্ম্মাণ নৌ-চুক্তিই যত নষ্টের মূল হইয়াছে।

—

ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ও ব্রহ্মদেশে পণ্ডিত জবাহরলালের অভ্যর্থনা

শ্রীসুশীলকুমার দাশগুপ্ত

১

বিগত জ্যৈষ্ঠ সংখ্যা 'প্রবাসী'তে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে প্রবাসীর সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রশ্ন ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালীদের সম্বন্ধে কতকটা ভ্রান্ত ধারণার সৃষ্টি করিতে পারে। তথ্যহিসাবে ঐ সম্বন্ধে দু-একটি কথা জানান দরকার। সম্পাদকীয় মন্তব্য ও প্রশ্ন আংশিকভাবে সত্য হইলেও পূর্ণ সত্য নহে।

এখানে বাঙালীদের মধ্যে যাঁহারা নেতৃস্থানীয় বলিয়া পরিগণিত তাঁহাদের সম্বন্ধে একথা স্বীকার করা যাইতে পারে যে রাষ্ট্রীয় ও অন্যবিধ সার্ব্বজনিক কাজে তাঁহাদের যথেষ্ট পরিমাণ উৎসাহ, উদ্যম, কর্ম্মকুশলতা ও সর্ব্বোপরি স্বার্থত্যাগের অভাব অনুভূত হইয়া থাকে, এবং সম্ভবতঃ এই কারণেই এই সকল কাজে এখানকার নেতৃস্থানীয় ভারতীয়দের ভিতরে তাঁহাদের নাম দেখিতে পাওয়া যায় না; কিন্তু এখানকার বাঙালী জনসাধারণ, বিশেষ করিয়া বাঙালী যুবকেরা, রাষ্ট্রীয় ও সার্ব্বজনিক অন্যবিধ কাজে পশ্চাৎপদ ত নহেই, বরং ঐ সকল কাজে তাঁহাদের কর্ম্মকুশলতা, সঙ্ঘশক্তি, স্বার্থত্যাগ ও বুদ্ধিমত্তা অন্যান্য ভারতীয়দেরও শ্রদ্ধা আকর্ষণ করিয়া থাকে।

ব্রহ্মদেশীয় প্রতিনিধি-সভার বিগত নির্ব্বাচনে এই কথা বিশেষরূপে প্রমাণিত হইয়াছে। ব্রহ্মদেশে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ও অবাঙালী ভারতীয়দের ইহা একটা সৌভাগ্যের কথা যে এখানে সঙ্কীর্ণ সাম্প্রদায়িকতা ও প্রাদেশিকতা একরূপ নাই বলিলেই চলে। এই কারণেই এখানকার সাধারণ বাঙালীরা ভারতীয়দের ভিতরে বাঙালী কিংবা অবাঙালী যাঁহাকেই উপযুক্ত মনে করেন, তাঁহাকেই সমর্থন করিয়া নেতৃত্বে বরণ করেন।

পণ্ডিত জবাহরলালের সম্বর্দ্ধনাদি ব্যাপারেও নেতৃস্থানীয় বাঙালীদের নাম এই কারণেই প্রবাসী-সম্পাদকের চোখে পড়ে নাই। যদিও পণ্ডিতজীর সম্বর্দ্ধনার্থে গঠিত কার্য্যকরী সমিতিতে নেতৃস্থানীয় কয়েক জন বাঙালীর নাম ছিল, যে কোন কারণে হউক তাঁহারা ঐ সমিতির কাজে বিশেষ উৎসাহের সহিত যোগ

দেন নাই। বাঙালী জনসাধারণ—বিশেষতঃ বাঙালী যুবকেরা কিন্তু সব সময়ই আশা করিতেছিলেন যে কার্য্যকরী সমিতির এই নেতৃস্থানীয় বাঙালীরাই অগ্রণী হইয়া বাঙালীদের পক্ষ হইতে পণ্ডিতজীর সম্বর্দ্ধনার আয়োজন করিবেন। সত্য হিসাবে এখানে একথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে পণ্ডিতজী নিজেই প্রথমে প্রাদেশি অথবা সাম্প্রদায়িক ভাবে কোনরূপ অভ্যর্থনা গ্রহণের বিরোধী ছিলেন বলিয়াই প্রচারিত হইয়াছিল। যাহা হউক, নেতৃস্থানীয়দের নিশ্চেষ্টতায় ও অবাঙালী ভারতীয়দের বাঙালীর এই ব্যাপারে ঔদাসীন্যের নিন্দাবাদে অধৈর্য্য হইয়া কতিপয় যুবক শ্রদ্ধাস্পদ স্বামী শ্যামানন্দজীকে অগ্রণী করিয়া তাঁহাদের অক্লান্ত চেষ্টায় পণ্ডিতজীর অভ্যর্থনার আয়োজন করেন এবং মাত্র ২৪ ঘণ্টার ভিতরেই সহস্রাধিক মুদ্রা সংগ্রহ করিয়া পণ্ডিতজীকে মানপত্র এবং তৎসঙ্গে একটি পূর্ণমুদ্রাধার প্রদান করেন। এই সম্বর্দ্ধনা-উৎসব এত সুন্দর ভাবে অনুষ্ঠিত হইয়াছিল যে সকলে জানিয়া সুখী হইবেন, পণ্ডিতজী অন্যত্র সেই রাত্রেই বিভিন্ন স্থানে বাঙালীদের এই অভ্যর্থনার সৌন্দর্য্য ও শৃঙ্খলার ভূয়সী প্রশংসা করেন, এবং এই অভিমত প্রকাশ করেন যে বাঙালীদের এই সম্বর্দ্ধনাই তাঁহার কাছে সর্ব্বাপেক্ষা প্রীতিপ্রদ বলিয়া মনে হইয়াছে।

রেঙ্গুন

২

বেসিন হইতে শ্রীমতী মিনতি সিংহ বেসিনে পণ্ডিত জবাহরলালের অভ্যর্থনার একটি সচিত্র বিবরণ ও পত্র আমাদের নিকট পাঠাইয়াছেন। উক্ত পত্রে শ্রীমতী সিংহ লিখিতেছেন, "...অনেকে মনে করেন যে দেশছাড়া হইয়া বাঙালী ও ভারতবাসীরা, মাতৃভূমির প্রতি তাঁহাদের যে কর্ত্তব্য আছে, দেশনেতাদের প্রতি যে সম্মান প্রদর্শন করিবার আছে, সে-কথা ভুলিয়া গিয়াছেন। এ-ধারণা অতি ভ্রান্ত, এবং প্রেরিত বিবরণ হইতে সকলেই বুঝিবেন যে ব্রহ্ম-প্রবাসী বাঙালী ভারতীয়েরা দেশনেতাদের যথোপযুক্ত সম্মান প্রদর্শন করিয়া থাকেন, এবং এ-বিষয়ে তাঁহাদের উৎসাহ এখনও অটুট আছে।"

বিবরণটির সারমর্ম্ম নিম্নে মুদ্রিত হইল। বেসিনে জবাহরলালের অভ্যর্থনার চিত্রগুলি ৩৮৭-৮৮ পৃষ্ঠায় দ্রষ্টব্য। —প্রবাসী-সম্পাদক

বেসিনে জবাহরলাল

পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর ব্রহ্ম-ভ্রমণের সংবাদে ব্রহ্মের দ্বিতীয় বন্দর বেসিনও নীরব থাকে নাই। পণ্ডিতজীর যথোচিত অভ্যর্থনার জন্য একটি সমিতি গঠিত হয়। ব্রহ্মদেশের জাতীয় নেতা উ-কুন মহাশয় এই সমিতির সভাপতি, এবং উ-অন-সাইড নামক এক জন চীনা ভদ্রলোক ও শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহ সমিতির যুগ্ম-সম্পাদক নিযুক্ত হন। এই সমিতিতে বর্ম্মী, বাঙালী, গুজরাতী, পঞ্জাবী, মান্দ্রাজী প্রভৃতি সর্ব্বপ্রদেশীয় লোকেই সভ্য ছিলেন। এই সমিতির অধীনে শ্রীমতী সুরভি সিংহ একটি স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী গঠন করিয়াছিলেন, এই বাহিনীতে সকল প্রদেশের মহিলাই যোগ



শ্রীঅতুলপ্রতাপ সিংহ

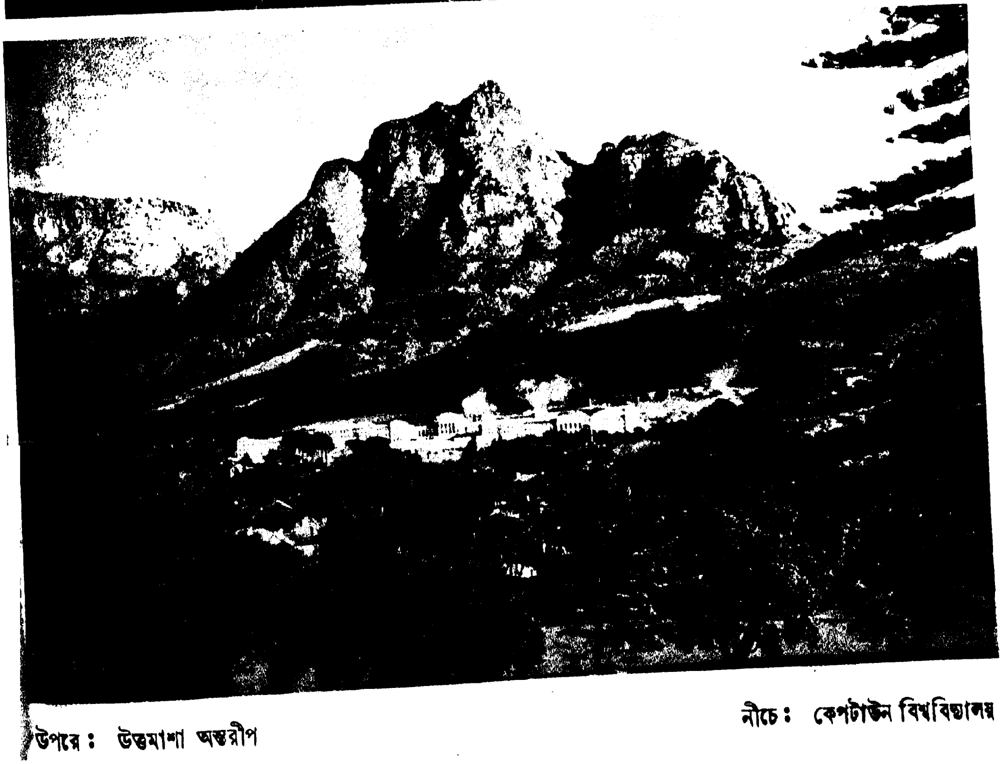
সম্পাদক, জবাহরলাল-অভ্যর্থনা-সমিতি, বেসিন

দিয়াছিলেন। ১৩ই মে পণ্ডিতজী বেসিনে উপস্থিত হন—ঐ দিন তাঁহার অভ্যর্থনার জন্য বিচিত্র শোভাযাত্রার আয়োজন হইয়াছিল। শোভাযাত্রার পুরোভাগে নীল-সার্ট-পরিহিত বর্ম্মী স্বেচ্ছাসেবকগণ, তৎপরে সবুজ-লুঙ্গি-পরিহিতা বর্ম্মী মহিলাগণ, গৈরিকবাসে ভারতীয় মহিলাগণ ও স্বেচ্ছাসেবকগণ, তাহার পরে শুভ্রবাসে ভারতীয় স্বেচ্ছাসেবকগণ দাঁড়াইয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবক ও সেবিকার দলকে এরূপভাবে সাজান হইয়াছিল যেন উপর হইতে দেখিলে বর্ণসামঞ্জস্যে একখানি জাতীয় পতাকা বলিয়া মনে হয়। যে-জেটিতে পণ্ডিতজীকে লইয়া সী-প্লেন আসিবে তাহার দুই দিকে লাইন করিয়া শোভাযাত্রা দাঁড়াইল। সাড়ে দশ ঘটিকার সময় পণ্ডিতজীর সী-প্লেন দৃষ্টিগোচর হইলে তোপধ্বনি করিয়া তাঁহার আগমনবার্ত্তা বিঘোষিত হইল। শঙ্খ ও জয়-ধ্বনির মধ্যে পণ্ডিতজী ও তাঁহার কন্যা অবতরণ করিলে শ্রীমতী সুরভি সিংহ ও শ্রীমতী সবিতা দেবী তাঁহাদিগকে বরণ করিলেন ও শ্রীড-সো মিন ও শ্রীড-এনচি তাঁহাদিগকে মালাভূষিত করিলেন। তাহার পর শোভাযাত্রা করিয়া পণ্ডিতজীকে ফায়াতে (প্যাগোডা) লইয়া আসা হয়, সেইখানে বৌদ্ধ ভিক্ষুগণ তাঁহাকে আশীর্ব্বাদ করেন এবং ইংরেজী ও বর্ম্মী ভাষায় লিখিত মানপত্র প্রদত্ত হয়। পণ্ডিতজীর সারগর্ভ অভিভাষণের পর পুনরায় শোভাযাত্রা করিয়া পণ্ডিতজীকে চৌ-দেউলে আনা হয়, এইখানে তিনি বিশ্রাম করেন।

বেসিনে স্বেচ্ছাসেবিকা-বাহিনী ও ভারতীয় প্রথায় অভ্যর্থনায় পণ্ডিতজী বিশেষ প্রীত হইয়াছেন ও অভ্যর্থনা-সমিতির প্রধান উদ্যোক্তা শ্রীযুক্ত অতুলপ্রতাপ সিংহকে সেজন্য ধন্যবাদ জানাইয়াছেন।

দক্ষিণ-আফ্রিকা—দেশ





নীচে : কেপটাউন বিশ্ববিদ্যালয়

উপরে : উত্তমাশা অন্তরীপ







ভারতের বেলাভূমি

দক্ষিণ-আফ্রিকা—যাহাদের দেশ









দক্ষিণ-আফ্রিকা—যাহারা ভোগ করিতেছে





উপরে : এলফ ষ্ট্রীট, জোহানেসবার্গ নীচে : অবসর-বিলাস

পঞ্চশস্য

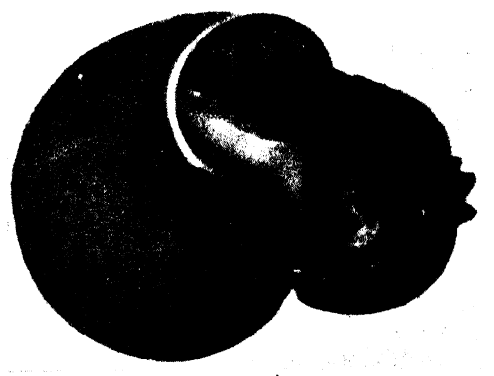
জল-শামুক

অস্থিহীনজীবপর্য্যায়ভুক্ত শামুক এক প্রকার অদ্ভুত প্রাণী। আমাদের দেশে জলে স্থলে নানা জাতের শামুক দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের শরীর কোমল মাংসপিণ্ডে গঠিত। বিভিন্ন জাতের শামুকের মাংসপিণ্ড নানা ভাবে প্যাঁচান এক-একটা শক্ত খোলায় আবৃত থাকে। অবশ্য, শামুক-জাতীয় অপর কয়েক প্রকারের জীব দেখিতে পাওয়া যায় যাহাদের শরীর কোনরূপ শক্ত খোলায় আবৃত থাকে না। শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত হয়ত এমিবা-জাতীয় কোন জীবের শরীরের চতুর্দ্দিকের শক্ত আবরণের ক্রমবিকাশ ঘটিয়া শামুকের উৎপত্তি হইয়াছিল। প্রাগৈতিহাসিক যুগের প্রস্তরীভূত শামুকের যে-সব দেহাবশেষ আবিস্কৃত হইয়াছে, তাহাদের বিরাট আকৃতি দেখিলে বিস্ময়ে অবাক হইয়া হইতে হয়। তাহাদের কোন-কোনটার আকৃতি প্রকাণ্ড এক-একটি গাড়ীর চাকার মত। তাহাদের বিরাট আকৃতি ও সংখ্যার প্রাচুর্য্য দেখিয়া সহজেই অনুমিত হয় যে, এককালে বোধ হয় শামুকেরাই পৃথিবীতে আধিপত্য বিস্তার করিয়াছিল। পরে পারিপার্শ্বিক অবস্থার সঙ্গে সামঞ্জস্য রক্ষা করিতে গিয়া এবং নানা প্রকার প্রতিকূল অবস্থায় পড়িয়া ক্রমশঃ বর্ত্তমান আকার ধারণ করিতে বাধ্য হইয়াছে। কিন্তু দৈহিক আকৃতিতে যথেষ্ট ক্ষুদ্র হইয়া থাকিলেও আজও পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের শামুকের যথেষ্ট প্রাচুর্য্য লক্ষিত হয়।

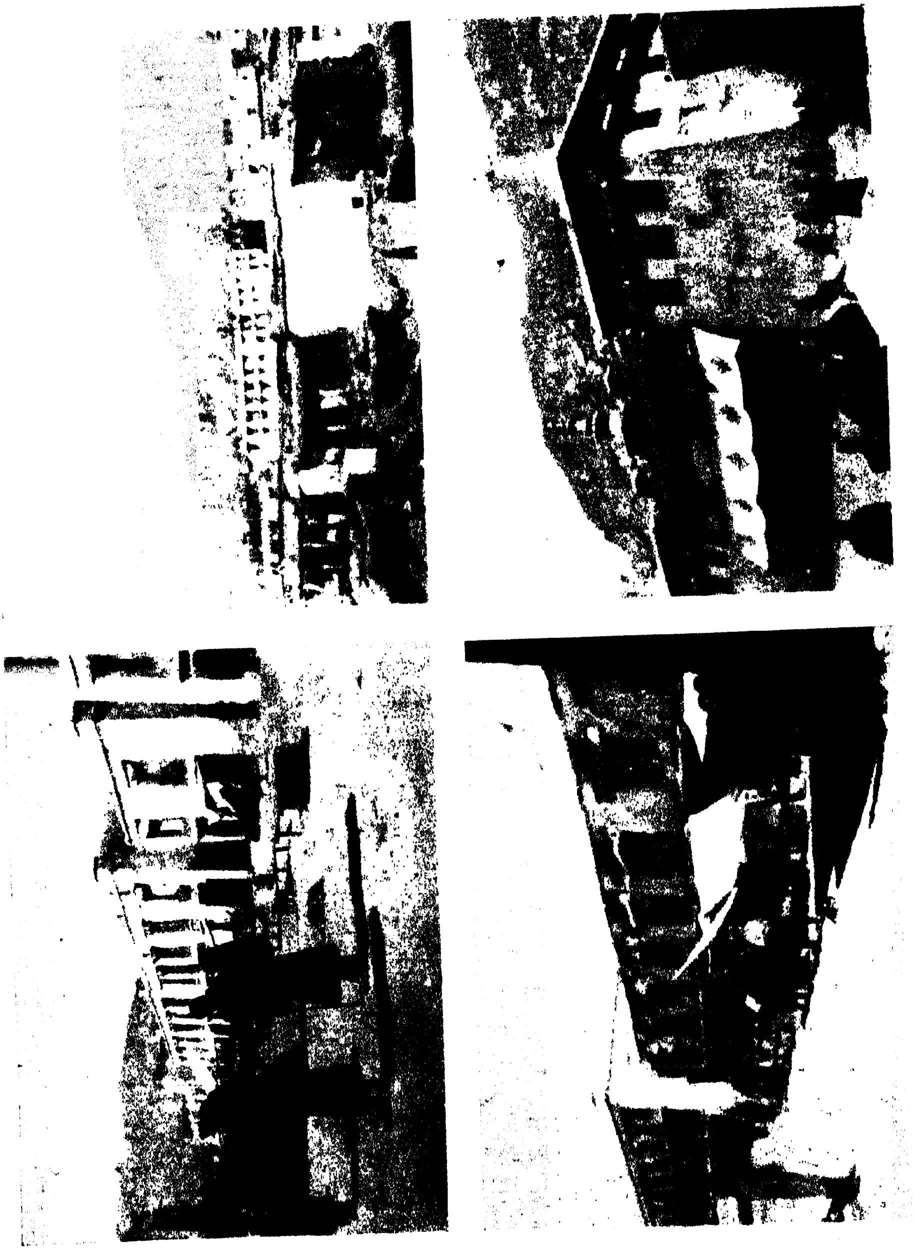


জলপূর্ণ কাচের ট্যাঙ্কে রক্ষিত শামুক আহারান্বেষণে কাচের গা বাহিয়া উপরে উঠিতেছে।

আপাতদৃষ্টিতে মানুষের পক্ষে শামুকের তেমন কোন প্রয়োজনীয়তা লক্ষিত না হইলেও ইহারা মানুষের কম প্রয়োজনে আসে না। কাক, চিল, সারস, হাঁস প্রভৃতি পাখীরা শামুকের মাংস যেরূপ উপাদেয়বোধে আহার করিয়া থাকে পৃথিবীর অনেক সভ্য দেশের লোকেরাও তেমন শামুকের মাংস রসনাতৃপ্তিকর বলিয়া মনে করে। প্লিনি প্রভৃতি প্রাচীন লেখকদের লেখা হইতে দেখা যায় যে, প্রাচীন রোম প্রভৃতি সভ্য দেশের লোকেরা শামুকের মাংস অতি উপাদেয়বোধে আহার করিত। আজকালও সভ্য জগতের লোকেরা শামুক, ঝিনুক, গুগ্‌লি প্রভৃতির মাংস অতি তৃপ্তির সহিত আহার করিয়া থাকে। অতিপূর্ব্বে জল-শামুকই বেশীর ভাগ আহার্য্যরূপে ব্যবহৃত হইত। পরে ক্রমে ক্রমে ডাঙ্গার শামুকও ব্যবহৃত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে জার্ম্মানী, ফ্রান্স প্রভৃতি অঞ্চলে প্রচুর পরিমাণে সুখাদ্য শামুকের চাষ হইতেছে। প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড জমি সম্পূর্ণরূপে বেড়ায় ঘেরিয়া ঐ সকল দেশের লোকেরা তাহার মধ্যে অসংখ্য শামুক প্রতিপালন করে এবং দেশের লোকের



শামুককে চিৎ করিয়া রাখা হইয়াছিল; সে গলা বাড়াইয়া মাটি আঁকড়াইয়া উপুড় হইবার উপক্রম করিতেছে।



লাসার দৃশ্যাবলী

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১৪

এদেশে অতিথি-সৎকারের প্রথম পর্য্যায়ে শুষ্ক মাংস, চা বা কাঁচা মদ (ছং) দেওয়া হয়। চা এখানে ঘরে ঘরে সর্ব্বদাই প্রস্তুত থাকে এবং গৃহস্থ, ভিক্ষু, দোকানদার, সেনানায়ক সকলেরই ইহা সর্ব্বক্ষণ প্রয়োজন। যব পচাইয়া মদ তৈয়ারী করা হয় এবং যদিও এক-আধ হাজার ভিন্ন অন্য সকল তিব্বতীয় বৌদ্ধ তথাপি পীতটুপী-পরিহিত গেলুক্-পা সম্প্রদায় ভিন্ন সকলেই অবাধে মদ্য পান করে। মদ্য বিনা ইহাদের পূজা হয় না, এমন কি গেলুক্-পা ভিক্ষুরাও পূজার সময় দেবতার প্রসাদ হিসাবে সামান্য পরিমাণে মদ্য পান করিয়া দেবতার ক্রোধ নিবারণ করে। এদেশে উপোসথ পঞ্চশীল অষ্টশীল ইত্যাদি ব্রত বা নিয়মের কোন জ্ঞানই নাই, অতি-শিশুও প্রতিদিন মদ্য পান করে; বস্তুতঃ জগতে এরূপ মদ্যপায়ী জাতি আর আছে কিনা সন্দেহ।

এদেশের উলের কাপড় মোটা, মজবুত ও সুন্দর। এখনও কাপড় বুনার প্রথা পুরাকালের মতই আছে, সুতরাং অল্প প্রসারের কাপড়ই তৈয়ারী হয়, বড় বহরের তাঁত খাটান হয় না। মোজা, দস্তানা, গেঞ্জি প্রভৃতি এখানে বিশেষ হয় না, কেবলমাত্র লাসায় নেপালী সওদাগরদিগের প্রভাবে আজকাল ঐ সব জিনিষ অল্পস্বল্প তৈয়ারী হইতেছে এবং তাহাও নিকৃষ্ট ধরণের। এদেশের উল স্বভাবতই নরম ও চিক্কণ এবং সেই জন্য প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার পশম ভারতে রপ্তানী হওয়ায় কাপড়ের দর কিছু চড়িয়াছে, তবে এই চড়া দরও বিদেশের তুলনায় সস্তা।

শিক্ষা বা অন্য অনেক বিষয়ে পশ্চাৎপদ হইলেও ললিত-কলায় তিব্বতবাসীর দক্ষতা ও অনুরাগ প্রশংসনীয়। লাসার নিকটস্থ অঞ্চলে বিস্তর আখ্‌রোট বৃক্ষ জন্মায়, তাহার কাষ্ঠ অতিশয় দৃঢ় এবং মসৃণ। ধনীর গৃহে ও মঠে-বিহারে আখ্‌রোট-কাষ্ঠের উপর সূক্ষ্ম ও সুন্দর কারুকার্য্য ইহাদের কলানৈপুণ্যের পরিচয় প্রদান করে। ত্রিপিটক ও অট্ঠ-কথার ন্যায় বৃহৎ পুস্তকগুলিও ঐ আখ্‌রোটের পাটায় খোদাই করিয়া ছাপা হয়।

এদেশের চিত্রকলার সহিত আমাদের অজন্টা ও সিগিরিয়ার শুদ্ধ আর্য্য চিত্রকলার অবিচ্ছিন্ন সম্বন্ধ আছে। তিব্বতীয়েরা বর্ণসমাবেশে বিশেষ কুশলী, তবে এখন বিদেশী রং প্রচলিত হওয়ায় চিত্রাবলী পূর্ব্বের ন্যায় স্থায়ী হইবে কিনা সন্দেহ। এই চিত্রণ-প্রথাও বৌদ্ধধর্ম্মের সঙ্গে নালন্দা ও বিক্রমশীলা হইতে এদেশে আসিয়াছিল। নিয়ম ও রীতির বন্ধনে বাঁধা বলিয়া তিব্বতীয় শিল্পে আর সেরূপ স্বাচ্ছন্দ্য নাই এবং ভোটীয়-চিত্রকর-অঙ্কিত প্রাকৃতিক দৃশ্যের প্রতিচ্ছবি গতানুগতিকতায় কল্পিত প্রতিমাযুক্ত চিত্র-মাত্রে পর্য্যবসিত হয় ইহা সত্য, তবুও বর্ত্তমান ভারত বা সিংহলের তুলনায় সে শিল্পের স্থান যে এখনও অনেক উচ্চে তাহাতে সন্দেহ নাই। এদেশের চারুশিল্পের বৈশিষ্ট্য তাহার সার্ব্বজনীনতায়। ধাতু বা মৃন্ময় মূর্ত্তি প্রায় সবই অতি সুন্দর। এই বিষয়ের শিক্ষার্থী এখনও প্রাচীন কালের ন্যায় বহু বৎসর শিল্পাচার্য্যের সেবাশুশ্রূষা করিয়া শিষ্যত্বে ব্রতী থাকে। প্রকৃতপক্ষে আমাদের দেশের শিল্প ও কলার পুনর্জাগরণে ইহাদের বিশেষ সহায়তা পাওয়া যাইতে পারে যদিও এদেশের শিল্পের ধারা এখন পূর্ব্বকালের ন্যায় স্বচ্ছন্দ ও উন্মুক্ত নহে। সত্য বটে, গৃহ, গৃহস্থ ও বস্ত্র—সকলেরই উপর একটা পুরু ময়লার আবরণ, তৎসত্ত্বেও তিব্বতীয় গৃহসজ্জার রুচি নিকৃষ্ট বলা যায় না। ঘরের ছাদে ও জানালায় ফুলের টবের সারি, ঘরের ভিতরে রঙীন ঝালর, আভ্যন্তরীণ গৃহগাত্রে রঙীন রেখাঙ্কন, জানালায় জালিদার কাগজ বা কাপড়ের পাল্লা, চায়ের চৌকীর উপর নানা বর্ণের আলপনা—এ সকলই ইহাদের কলা-প্রেমের পরিচয় দেয়।

খাদ্যের পর্য্যায়ে মাংস-মাখন এবং বস্ত্রের জন্য উল-পশম

ভোটিয়ের পক্ষে বিশেষ আবশ্যক, সেই জন্য এদেশে কৃষি অপেক্ষা পশুপালন অধিকতর উপযোগী। ভেড়া, ছাগল ও চমরী (য়াক) এখানকার প্রধান গৃহপালিত পশু। ভেড়া ও ছাগল—মাংস চামড়া ও পশমের সংস্থান ভিন্ন ভারবহন-কার্য্যেও উপযোগী, বিশেষতঃ দুর্গম স্থলে। চমরী, দুধ, মাখন, মাংস ও মোটা পশম দেয়, উপরন্তু উনিশ-কুড়ি হাজার ফুট উচ্চে—যেখানে বায়ুমণ্ডল অতি ক্ষীণ—বিলক্ষণ বোঝা লইয়া অনায়াসমন্থরগতিতে দুর্গম পর্ব্বতে যাইতে পারে। এদেশে ঘোড়া, খচ্চর ও গাধা বিস্তর আছে কিন্তু ভেড়ার পরই চমরী এদেশের সর্ব্বাপেক্ষা প্রয়োজনীয় পশু। এদেশে রেল, মোটর বা অন্য যান নাই, সুতরাং সকল জিনিষই পশুপৃষ্ঠে লইতে হয়। ঘোড়াগুলি ছোট বটে কিন্তু পর্ব্বত-পথের বিশেষ উপযোগী এবং সতেজ ও সুন্দর। খচ্চর মঙ্গোলীয়া ও চীনদেশের সীলিঙ্গ অঞ্চল হইতে আসে। গৃহপালিত পশুর মধ্যে কুকুরের স্থান উচ্চে। পশুপালকের প্রধান সহায় এই বিশ্বস্ত জন্তু। এদেশের অধিকাংশ কুকুরই কৃষ্ণবর্ণ ও নীলচক্ষু। আকারে ইহারা নেকড়ে অপেক্ষা বৃহৎ, ইহাদের সর্ব্বাঙ্গ ভল্লুকের ন্যায় লম্বা কর্কশ লোমে আবৃত এবং ইহারা স্বভাবতই হিংস্র। পশুপালকদিগের পক্ষে কুকুর অত্যাবশ্যক এবং গৃহাদির রক্ষণাবেক্ষণে ইহারা অতুলনীয়। একটি কুকুর সঙ্গে থাকিলেই গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে, কেননা অপরিচিত লোকের সাধ্য নাই তাহার এলাকায় পা দেয়। তিব্বতে আগন্তুকের পক্ষে এইরূপ কুকুরের সম্বন্ধে সাবধান হওয়া বিশেষ প্রয়োজন। তিব্বতীয়েরা মাংসের সঙ্গে অস্থি পর্য্যন্ত চূর্ণ করিয়া স্তূপ করিয়া খায়; সুতরাং সকাল সন্ধ্যায় সামান্য সত্তু-গোলা খাইয়া এই সকল প্রভুভক্ত কুকুর দিবারাত্র রক্ষণকার্য্য করে। শিকলে বাঁধা বাঘের মতই ইহারা ভীষণ এবং ইহাদের নিকট যাওয়া বাঘের খাঁচায় প্রবেশ করার মতই বিপজ্জনক। এই সকল বৃহৎ রক্ষী কুকুর ছাড়া লোমাবৃত ছোট ও সুন্দর কুকুর লাসা ও অন্য স্থানের ধনীদিগের গৃহে থাকে। এখানে তিন টাকায় যে কুকুর পাওয়া যায় দার্জ্জিলিঙে ষাট-সত্তর টাকায় তাহা পাওয়া দুষ্কর।

* * *

নেপাল ও তিব্বতের সম্বন্ধ অতি প্রাচীন। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতাব্দীতে তিব্বতের ঐতিহাসিক যুগের আরম্ভ। ঐ সময়ই ভোটরাজ স্রোং-চন্-গম্বো এক দিকে নেপালে নিজ বিজয়-বৈজয়ন্তী উড়াইয়া সেখানকার রাজকুমারীকে বিবাহ করেন, অন্য দিকে চীন-সাম্রাজ্যের বহু প্রদেশ তিব্বতের অধীনে আনিয়া এবং চীন-সম্রাটকে কন্যাদানে বাধ্য করিয়া চীন-রাজকুমারীকেও পরিণয়পাশে আবদ্ধ করেন। শোনা যায় ইহার পূর্ব্বে ভোটদেশে লিখনপদ্ধতি অজ্ঞাত ছিল, স্রোং-চন্ সম্ভোটাকে অক্ষর-লিখন শিক্ষার জন্য নেপাল প্রেরণ করেন এবং তিনিই সেখানে উহা শিক্ষা করিয়া প্রথম তিব্বতী অক্ষর নির্ম্মাণ করেন। নেপাল-রাজকুমারীর সঙ্গেই বৌদ্ধধর্ম্ম এদেশে প্রবেশ করে এবং ক্রমে রাজনৈতিক জয়কে ধর্ম্মক্ষেত্রে পরাজয়ে পরিণত করে। আজিও নেপাল-দুহিতা তারাদেবী এদেশে অবতারের ন্যায় পূজা পাইতেছেন। তিব্বতের সভ্যতার দীক্ষায় প্রধান সহায়ক যে নেপাল সে-বিষয়ে সন্দেহ নাই।

নেপাল-উপত্যকার পুরাতন অধিবাসী নেবারদিগের ভাষা তিব্বতী ভাষার অনুরূপ এবং ভাষাতত্ত্ববিদেরা উহাকে তিব্বত-বর্ম্মা ভাষার অন্তর্গত বলিয়া নির্দ্ধারণ করিয়াছেন। তিব্বতী "সিউ মা রী" (কেহ নাই) নেবারীতে "সু-মারো"। ইহাতে অনুমান হয় যে তিব্বত ও নেপালের সম্বন্ধ প্রাগৈতিহাসিক।

সম্রাট স্রোং-চন লাসায় রাজধানী স্থাপন করেন এবং তাঁহার শত বর্ষ পরে ভোটরাজ স্রোং-দে-চন্ নালন্দা হইতে আচার্য্য শান্তরক্ষিতকে আনয়ন করেন। এইরূপে ভারত হইতে ধর্ম্মপ্রচারের জন্য যে দ্বার উন্মুক্ত হয় তাহা দ্বাদশ শতাব্দীতে মুসলমান-বিজয়ে নালন্দা, বিক্রমশীলা প্রভৃতির ধ্বংসকাল পর্য্যন্ত অবারিত ছিল। সে-সময় বর্ত্তমান কালের দার্জ্জিলিং-লাসা পথ জানা ছিল না। ধর্ম্মপ্রচার বা বাণিজ্য ব্যাপার সবই নেপালের পথে হইত এবং এইরূপে বহু শতাব্দী যাবৎ নেপাল ভারত ও তিব্বতের মধ্যে ধর্ম্মপ্রচার ও বাণিজ্য এই দুই কার্য্যেই নেপাল মধ্যবর্ত্তী রূপে বিরাজ করিয়াছে। সংস্কৃত হইতে ভোট ভাষায় বৌদ্ধ গ্রন্থের অনুবাদে নেপালী পণ্ডিতদিগের হাত ভারতীয় বা কাশ্মীরী পণ্ডিতদিগের মত সিদ্ধ না হইলেও শান্তিভদ্র, অনন্তশ্রী, জেতকর্ণ, দেব পুণ্যমতি, সুমতি-কীর্ত্তি প্রভৃতি নেপালী বৌদ্ধ পণ্ডিতদিগের

নাম স্মরণীয়। নবম ও দশম শতাব্দীতে বহু গ্রন্থের, বিশেষতঃ তন্ত্র-গ্রন্থের অনুবাদে ইঁহাদের পরিচয় পাওয়া যায়। আরও অধিক পরিচয় না পাওয়ার কারণ বোধ হয় সে সময় ভারত হইতে উচ্চ শ্রেণীর পণ্ডিত পাওয়া সহজ ছিল।

ইহাতে সন্দেহ নাই যে লাসায় রাজধানী স্থাপনের সঙ্গে সঙ্গেই সেখানে নেপালী বণিকেরা আসে। তিব্বতের ইতিহাসের প্রধান উৎস ধর্ম্মগ্রন্থ এবং ধর্ম্মগ্রন্থে বাণিজ্য-ব্যাপারের স্থান বড় নাই, সুতরাং ইহাদের বিশেষ উল্লেখ তাহাতে পাওয়া সম্ভব বা স্বাভাবিক নহে। রোমান ক্যাথলিক খ্রীষ্টানদিগের ক্যাপুচিন সম্প্রদায় ১৬৬১ হইতে ১৭৪৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত লাসায় প্রচারকার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। তাঁহাদের পাদরীদিগের বৃত্তান্তে সেকালের নেপালী সওদাগরদিগের লাসায় থাকার কথা এবং কয়েক জন নেপালীর খ্রীষ্টান হওয়ার কথা লিখিত আছে। ১৯০৫ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ "মিশন" লাসায় ঐ পাদরীদিগের গীর্জ্জার একটি ঘণ্টা হস্তগত করে। ঐ বৃত্তান্ত লিখিত হওয়ার ৪৫ বৎসর পরে নেপালী সওদাগরদিগের উপর অত্যাচারের অভিযোগেই নেপালরাজ ১৭৯০ খ্রীষ্টাব্দে তিব্বত আক্রমণ করেন।

আজকাল তিব্বতে ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেপালী ব্যাপারীদিগের কয়েকটি বিশেষ অধিকার আছে। ঐ সকল অধিকার ১৭৯০ এবং ১৮৫৬ খ্রীষ্টাব্দে যে দুই বার নেপাল-তিব্বতে যুদ্ধ হয় তাহারই ফল। প্রথম যুদ্ধে নেপালী সৈন্যদল গিরিসঙ্কট জয় করিয়া লাসা হইতে সাত দিনের পথ দূরে শিগচীতে (টশীল্যুম্পো) পৌঁছায়। এমন সময় অগণিত চীন-সেনা তাহাদের আক্রমণ করিয়া হটাইতে হটাইতে নেপালে কাঠমাণ্ডু পর্য্যন্ত লইয়া যাওয়ায় নেপাল ও তিব্বত উভয়েই চীন-সম্রাটের অধীনতা স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়া শান্তি স্থাপন করে। এই যুদ্ধ-বিজয়ের উপলক্ষে উৎকীর্ণ চীন-সম্রাটের অনুশাসন এখনও লাসায় পোতলার সম্মুখে বর্ত্তমান। নেপালের বর্ত্তমান মহামন্ত্রি-বংশের সংস্থাপক মহারাজা জঙ্ বাহাদুরের সময় (১৮৫৬ খ্রীঃ) দ্বিতীয় যুদ্ধ অনুষ্ঠিত হয়। এই যুদ্ধকালে নেপালরাজের সেনাদল সীমাস্থিত গিরিসঙ্কট পার হইবার পূর্ব্বেই, চীন-সম্রাটের মধ্যবর্ত্তিতায় কয়েকটি সর্ত্তে উভয় দেশের মধ্যে শান্তি স্থাপিত হয়। ইহার ফলে ভারত-সরকারকে প্রতিবর্ষে নেপালরাজসদনে দশ হাজার টাকা দিতে হয়। শান্তিস্থাপনের সর্ত্তমধ্যে এই চারিটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য :— (১) বিপদকালে পারস্পরিক সাহায্যের অঙ্গীকার, (২) ব্যবসায়ক্ষেত্রে উভয় দেশের মধ্যে ব্যাপারীদিগের অবাধ বাণিজ্যের অধিকার, (৩) লাসায় নেপালী রাজদূত নিয়োগের এবং (৪) তিব্বতে নেপালী ন্যায়াধীশ দ্বারা নেপালী প্রজার বিচারের অধিকার। এইরূপে, ইয়োরোপীয়েরা চীনদেশে যে-অধিকার পরে লাভ করে এবং যাহা দূর করিতে সম্প্রতি চীন এত চেষ্টা করিতেছে, তিব্বতে নেপাল ঠিক সেইরূপ বহির্দ্দেশীয় প্রভুত্ব (extra-territorial rights) লাভ করিয়াছে।

দ্বিতীয় যুদ্ধের পূর্ব্বে লাসায় নেপালী ব্যবসায়িগণ দশটি দলে বিভক্ত ছিল। প্রত্যেক দলের এক-এক জন সর্দ্দার নির্ব্বাচিত হইত এবং প্রত্যেকটি সঙ্ঘের একটি করিয়া বৈঠকের স্থান নির্দ্দিষ্ট ছিল। এই দলপতিদিগের নাম "ঠাকুলী" ও বৈঠকের স্থানের নাম "পালা"। যদিও সংখ্যায় এখন সাতটি মাত্র সেই ঠাকুলি আছে এবং যদিও দুইয়েরই পূর্ব্ব মাহাত্ম্য বা অধিকার হ্রাস পাইয়াছে, তথাপি তাহাদের "পালা" এখনও বর্ত্তমান। লাসার নেপালী বণিকেরা প্রায় সকলেই তান্ত্রিক বৌদ্ধ, সুতরাং এই সকল পালায় তাহাদের তান্ত্রিক পূজার স্থান আছে এবং সেই হেতু প্রায় প্রত্যেকটিতেই লাসায় লিখিত শত শত বৎসরের পুরাতন সংস্কৃত পুথি দশ বিশ খানি করিয়া আছে। এখন নেপাল-সরকারের পক্ষ হইতে লাসায় একজন রাজদূত (বকীল), একজন ন্যায়াধীশ (ডীঠা) এবং কিছু সৈন্য আছে। ইহা ছাড়া গ্যাঞ্চী, শীগর্চী, নেনয়ু (কুতী) ও কেরঙ্‌তেও নেপালী প্রজার বিচার ও তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য এক-এক জন ডীঠা আছে। নেপালী বলিতে কেবলমাত্র নেপালী ব্যবসায়ী বুঝায় না, উপরন্তু তাহাদের ভোটীয়-রক্ষিতা-জাত সন্তানদিগকেও ধরা হয়। এইরূপে লাসায় খাঁটি নেপালীর সংখ্যা দুই শতের অধিক না হইলেও সেখানকার নেপালী প্রজার সংখ্যা কয়েক হাজার। নেপালের নিয়ম অনুসারে নেপালীর পুত্র জন্মাইলেই সে নেপালের প্রজা, যদিও এইরূপ ভোটীয়া স্ত্রীর বা স্ত্রীর পুত্র-

কন্যার তাহার সম্পত্তির উপর কোনও অধিকার নাই। নেপালী সওদাগর ইচ্ছা করিলে কিছু দিতে পারে নতুবা তাহাদের প্রাপ্য কিছুই নয়। সন্তান জন্মাইবার পর পিতৃত্ব অস্বীকার করিয়া স্ত্রীকে দূর করিয়া দেওয়া নেপালী সওদাগরদিগের মধ্যে সাধারণ ব্যাপার। তিব্বতে বহুভর্তৃক বিবাহের প্রচলন থাকায় ভোটীয় পুরুষের সহিত ভ্রাতৃ-সম্বন্ধ পাতাইয়া তাহার স্ত্রীকে গ্রহণ করাও তিব্বতের নেপালী বাসিন্দাদিগের সাধারণ প্রথা। নেপালের রাজনিয়ম অনুসারে কোন নেপালী তাহার স্ত্রীকে তিব্বতে লইয়া যাইতে পারে না, এই কারণেই এত দুর্নীতির সৃষ্টি। অন্য অনেক বিষয়েও এখানে আগন্তুক নেপালী দেশের আচার-ব্যবহার হইতে ভ্রষ্ট হয়। উদাহরণস্বরূপ খাওয়া-ছোঁয়ার ব্যাপারের কথা বলা যাইতে পারে। নেপালে ছুঁৎমার্গের জ্ঞান যথেষ্ট আছে, এখানে সে বালাই দেখা যায় না, অবশ্য, মদ্যপানবিষয়ে দুইটি দেশের লোকের মধ্যে প্রভেদ দেখা যায় না। পাচক ত ভোটিয়া হয়ই, উপরন্তু মুসলমানের রুটি খাওয়ায় ইহাদের কোন আপত্তি নাই। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় যে নেপালী ব্যবসায়ী চমরীর মাংস খাইতেও কুণ্ঠাবোধ করে না—তাহারা বলে চমরী "গাই" নহে, যদিও নেপালে ইহা সম্ভব নহে। এই সকল ব্যাপারই নেপালে ভয়ানক অপরাধ বলিয়া গণ্য। সাধারণতঃ এই সব ব্যবসায়ীর পক্ষে তিন-চার বৎসর পূর্ব্বে দেশে ফিরিবার সুযোগ হয় না, এবং ফিরিবামাত্রই নির্দ্দিষ্ট পরিমাণ টাকা দিয়া প্রায়শ্চিত্ত করিতে সকলেই বাধ্য।

নেপালী নেবারগণ ব্যবসায়ে বিশেষ পটু। যদিও পাশ্চাত্য শিক্ষার অভাবে ইহারা সুযোগ-অনুরূপ ব্যবসায়ের প্রসার করিতে পারে নাই কিন্তু এই দেশের যানবাহন আদান-প্রদানের অবস্থার কথা ভাবিলে ইহা নিশ্চয়ই স্বীকার্য্য যে ইহাদের ব্যবসায়নৈপুণ্য প্রশংসনীয়। কলিকাতায় নেপালী সওদাগরদিগের অধিকাংশ কুঠির শাখা আছে, অনেকের শীগর্চী, গ্যাঞ্চী, ফরিজোঙ, কুতী ইত্যাদি স্থানেও শাখা আছে। এই ব্যবসায়ের আদান-প্রদানের মধ্যে আমদানী প্রবাল, মুক্তা, বারাণসী ও চীনের রেশমী বস্ত্র, বিলাতী ও জাপানী সুতার কাপড়, কাচের দ্রব্য, খেলনা প্রভৃতি ; রপ্তানীর হিসাবে "ফর্" কস্তুরী, উল, পশম এইরূপ অন্যান্য দ্রব্য আমদানীর জিনিষ-গুলির উৎপত্তিস্থলের সহিত কারবারের উপায় না জানায় ইহারা কলিকাতায় সে সব কিনিয়া এখানে বেচে। ইহাদের সৌভাগ্য যে সেরূপ উদ্যোগী কোন প্রতিদ্বন্দ্বী এখানে নাই, কেননা এখানকার মুসলমান ব্যাপারীদিগেরও কারবারের ধারা এই প্রকার। চীনের প্রভুত্ব-লোপের সঙ্গে-সঙ্গেই চীনা ব্যাপারীর অস্তিত্ব লোপ পাইয়াছে, ভারতীয় ব্যবসায়ীদিগের পক্ষে ত এদেশে প্রবেশ করাই অসম্ভব।

নেপালী ব্যবসায়ীর মধ্যে এমন কিছু সাধনা আছে যাহাতে সে অল্প পরিশ্রমেই তাহার কারবারের উন্নতি করিতে পারে। উদাহরণস্বরূপ ধর্ম্মমান সাহুর কুঠির কথা বলা যায়। এই কুঠি দেড়শত বৎসর পূর্ব্বে লাসায় স্থাপিত হয়, এখন ইহার শাখা গ্যাঞ্চী, ফরি, কাঠমাণ্ডু, লদাখ ও কলিকাতায় আছে। প্রতি বৎসর বহু লক্ষ টাকার আমদানী রপ্তানী ইহাদের বাঁধা ব্যাপার, মূলধনের প্রমাণও প্রচুর। ইচ্ছা করিলেই চীন, জাপান, মঙ্গোলিয়া, চীনা তুর্কিস্থান, সিংহল ইত্যাদি স্থানে ইনি কারবার চালাইতে পারেন, কিন্তু সেদিকে চেষ্টা বা উৎসাহের অভাব।

ব্যবসায়ক্ষেত্রে নেপালীরা অতি সৎ এবং ইহাদের ব্যবহার ভাল। উপরন্তু ধর্ম্ম এক প্রকার হওয়ায় ইহারা লামাদিগকে সম্মান করে এবং মঠে ও মন্দিরে পূজাপাঠে ও দক্ষিণা প্রদান প্রভৃতি ব্যাপারে ইহারা ভোটিয়দিগেরই মত। এই সকল কারণে এবং ইহারা 'যস্মিন্ দেশে যদাচার' বিষয়ে বিশেষ সিদ্ধ হওয়ায় এদেশে ইহাদের স্থান ভারতে মাড়োয়ারীর বা সিংহলে গুজরাটি মুসলমানের তুল্য। বেশভূষা ও খাদ্য-প্রকরণেও পূর্ব্বে ইহারা ভোটিয়দিগের অনুকরণ করিত। সম্প্রতি ইহাদের মধ্যে একদল "নবীন" হ্যাটকোট বুট ইত্যাদি পরিতে আরম্ভ করিয়াছে।

* * *

১৯০৪ সালের ব্রিটিশ মিশনের পর হইতে তিব্বতের প্রধান বাণিজ্য-মার্গ কালিম্পং (দার্জ্জিলিঙের নিকট) হইতে লাসার পথে হইয়াছে। ইহা গ্যাঞ্চী পর্য্যন্ত ইংরেজের রক্ষণাধীন এবং গ্যাঞ্চীতে ব্রিটিশ ডাকঘর ও টেলিগ্রাফ অফিস আছে। গ্যাঞ্চীর পর ভোট-সরকারের নিজস্ব ডাক টেলিফোন ও তার বিভাগ আছে। কিছু চা ও চীনা রেশমী কাপড় ভিন্ন প্রায় সমস্ত আমদানী রপ্তানী এই পথেই হয়। এই পথের এক দিকে (পশ্চিমে) কিছু দূরে নেপাল, অন্য দিকে

(পূর্ব্বে) কিছু দূরে ভুটান। লাসায় নেপালী উকীলের মত ভুটানেরও উকীল থাকে। তিব্বতী ও ভুটানী ভাষা অত্যন্ত নিকট-সম্পর্কিত; ইহাদের ধর্ম্ম, ধর্ম্মাচরণ ও ধর্ম্ম-পুস্তক এক। ভুটান হইতে কালিম্পং, লাসার পথ ও লাসা উভয়ই নেপাল অপেক্ষা অনেক নিকটে এবং বাণিজ্যব্যাপারে নেপাল ও ভুটান দুইয়েরই অধিকার এক প্রকার। এ সকল সুবিধা সত্ত্বেও ভুটানীরা যে তিব্বতের সহিত ব্যবসায়ে নেপালীদিগের নিকট হটিয়া গিয়াছে তাহার কারণ তাহাদের ব্যবসায়বুদ্ধির অভাব। ভুটানীদেরও প্রধান ব্যবসায়ক্ষেত্র তিব্বতে কিন্তু নেপালী ও লদাখী মুসলমানদিগের মত দোকানপাট ইহাদের কিছুই নাই। ইহারা নিজেদের দেশের জিনিষ লাসার বাজারে আনে এবং তাহার বিনিময়ে নিজেদের প্রয়োজনীয় দ্রব্যাদি লইয়াই দেশের পথ দেখে। ইহাদের বাণিজ্যে বিনিময়ের বস্তু প্রধানতঃ একদিকে আসাম ও ভুটানের এণ্ডী রেশম, অন্যদিকে তিব্বতী পশম ও উলের কাপড়।

লাসার বাজারে শীতের দিনে দেশ-বিদেশের লোক দেখা যায়। উত্তরে মঙ্গোলিয়া-সাইবিরিয়া, পূর্ব্বে চীন ও পশ্চিমে লদাখ এবং নিজ-তিব্বতের প্রতি কোণ হইতে লোকজন ঐ সময় লাসায় আসে। ভুটানীরাও এ সময় অনেকে এখানে আসে। বিশাল দেহ, স্ত্রীপুরুষনির্ব্বিশেষে মুণ্ডিত শির, দীর্ঘ চোগা ও নগ্ন পদ (বিশেষ শীত ছাড়া)—দূর হইতেই তাহাদের জাতিত্ব নির্ণয় করিয়া দেয়। ভোটীয় ভাষায় ভুটানীদিগের নাম ব্রুগ্‌-পা (চলিত উচ্চারণে ডুগ্‌পা) ও তাহাদের ভাষার নাম ব্রুগ্‌-য়ুল। ভুটানীরা ধর্ম্মে ঘোর তান্ত্রিক এবং তিব্বতী বৌদ্ধধর্ম্মে এক সম্প্রদায়ের নাম ডুগ্‌পা। লাসায় ভুটানী দূতাগার ও ফৌজ দুই-ই আছে, কিন্তু প্রজার সংখ্যা ও কার্য্য-পরিমাণ অনেক কম বলিয়া নেপালী দূতাগারের সহিত তাহার তুলনা হয় না।

* * *

তিব্বতের প্রথম ঐতিহাসিক সম্রাট স্রোং-চন্‌-গম্বো নেপালবিজয় ও নেপালরাজ অংশুবর্ম্মার কন্যা তারাদেবীকে বিবাহ করার পর হইতে এই দুই প্রতিবেশী রাজ্যের পরস্পরের সহিত সম্বন্ধ ইতিহাস ও বাণিজ্যের ধারার সহিত সমানে চলিয়া আসিতেছে। সিপাহী-বিদ্রোহের কিছু পূর্ব্বে নেপালের মহারাজ জঙ্গ-বাহাদুর তিব্বতে যুদ্ধ অভিযান করেন। এই অভিযানের প্রারম্ভে বহু সাফল্য লাভ সত্ত্বেও চীন-সম্রাট মধ্যস্থ হওয়ায় জঙ্গ-বাহাদুরকে নিবৃত্ত হইতে হয়, তবে ইহার ফলে অন্য বহু অধিকারের সহিত নেপাল প্রতি বৎসর ভেটস্বরূপ ৪০ হাজার টাকা তিব্বত হইতে পাইয়া থাকে। সেই সময় হইতে আজ পর্য্যন্ত এই দুই দেশের সম্বন্ধ মৈত্রীপূর্ণই আছে কিন্তু ১৯২৯ সালে কয়েকটি ঘটনায় ইহাদের মধ্যে এরূপ মনান্তর হয় যে যুদ্ধ প্রায় আসন্ন হইয়া উঠে।

নেপালীদিগের বক্তব্য ছিল যে, (১) ভোটীয় অফিসর ও সেনাগণ অকারণ নেপালীদিগের উপর উৎপাত করে। উদাহরণ স্বরূপ, তাহারা বলে যে নেপালের পূর্ব্বপ্রান্তের নিকটস্থ ধনকুটা নামক স্থানের ভোটীয় প্রজাগণ ভোটীয় সৈনিক ও অফিসরের অত্যাচারে বিরত হইয়া দেশ ছাড়িয়া নেপালের সীমানার ভিতরের এক গ্রামে গিয়া বসতি করে। ইহার পর নেপাল-সরকারকে না জানাইয়া ভোটীয় সৈন্যাধ্যক্ষ ও সৈনিকগণ সীমানা পার হইয়া ঐ গ্রাম লুট ও সেখানকার নূতন পুরাতন সকল প্রজার উপর যথেচ্ছ অত্যাচার করে; (২) গ্যাঞ্চীতে নেপালী দূতাবাসের এক জন সিপাহীকে কোন তিব্বতী প্রজা হত্যা করে কিন্তু বহুবার বলা সত্ত্বেও ভোট-সরকার এ বিষয়ে দৃষ্টিপাত করেন নাই; (৩) তিব্বতে কারবারী নেপালী মাত্রেরই তিব্বতী স্ত্রী আছে এবং নেপালীগণ নিজ অবস্থামত তাহাদিগকে সুখে-স্বচ্ছন্দে রাখে। লাসার রাজকর্ম্মচারিগণ নেপালীদিগকে বিশেষ ভাবে জব্দ করার জন্য এই সকল স্ত্রীলোককে গ্রেপ্তার করাইয়া তাহাদিগের দ্বারা সরকারী গৃহনির্ম্মাণের জন্য পাথর বহাইয়াছে; (৪) নেপালের উত্তর অঞ্চলে বহু ভোটভাষা-ভাষী প্রজা আছে। তাহাদের মধ্যে অনেকে ব্যবসায়কার্য্যে তিব্বতে বাস করে। বাহ্যদেশিক অধিকার হইতে তাহাদিগকে বঞ্চিত করিবার জন্য তিব্বতী কর্ম্মচারিগণ ক্রমাগত তাহাদিগকে তিব্বতী প্রজারূপে গণনা করেন। এইরূপ ব্যবহারের জলন্ত উদাহরণ-স্বরূপ লাসার শর্বা গ্যেল্লো ব্যাপারীর কথা তাহারা বলে। শর্বা গ্যেল্লো ধনী ও উন্নতিশীল ব্যবসায়ী ছিল। নেপালীদিগের মতে সে নেপালের প্রজা এবং সে নিজেও ঐ ধারণায়

প্রবৃত্ত হইয়া ভোট দেশের উচ্চ কর্ম্মচারীর এবং পরাক্রান্ত লোকদিগের সম্বন্ধে নানা প্রকার মন্তব্য প্রকাশ করিত। ঐ সকল পরাক্রান্ত লোক এইরূপ টীকাটিপ্পনীর বিষয় জানিতে পারিয়া অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া সুযোগের প্রতীক্ষা করিতে থাকে। কিছুদিন পরে ইহারা চক্রান্ত করিয়া দলাই লামার কাছে আবেদন করে যে, শর্বা গ্যেল্লো ভোট-রাজ-সরকার সম্বন্ধে কটুকাটব্য করিয়াছে। সেই সঙ্গে উহারা শর্বার জন্মস্থানবাসী কয়েকটি শত্রুকে হাত করিয়া তাহাদের দিয়া বলায় যে শর্বা বস্তুতঃ ভোট-প্রজা, নেপালী নহে। ফলে শর্বা তৎক্ষণাৎ গ্রেপ্তার ও ভোটীয় কারাগারে আবদ্ধ হয়। লাসার নেপালী রাজদূত এ-বিষয়ে ভোট-সরকারকে বুঝাইতে অসমর্থ হওয়ায় নেপাল-সরকার স্বয়ং জানান যে শর্বা নেপালী প্রজা। ভোট-সরকার তাহার উত্তরে বলেন যে সে ভোট-প্রজা, সুতরাং তাহার বিষয়ে হস্তক্ষেপ করার কোনও অধিকার নেপাল-সরকারের নাই। ইহাতে নেপাল-সরকার ভোট-সরকারকে শর্বার জন্মস্থানে নিজে কর্ম্মচারী পাঠাইয়া তাহার প্রজাস্বত্ব নির্দ্ধারণ করিতে বলেন। ভোটরাজ এই অনুরোধ অবহেলা করেন এবং ইতিমধ্যে শর্বা প্রায় দুই বৎসর জেলে পচিতে থাকে।

১৯২৯ খ্রীঃ জুলাই মাসের তৃতীয় সপ্তাহে আমি লাসায় পৌছাই, সে সময় শর্বা জেলে বা গারদে আবদ্ধ ছিল। আগষ্ট মাসের দ্বিতীয় সপ্তাহে সিপাহী-রক্ষিগণ অসাবধান থাকায় সে পলাইয়া নেপালী দূতাবাসে আশ্রয় লয়। ১৪ই আগষ্ট আমি নেপালী দূতের সহিত দেখা করিতে গিয়া আঙ্গিনায় এক দীর্ঘকায় গৌরবর্ণ বলিষ্ঠ পুরুষকে ঘুরিতে দেখি, শুনিলাম সেই শর্বা গ্যেল্লো। শর্বার পলায়নে যে-সকল ভোটরাজপুরুষ তাহার উপর অপ্রসন্ন ছিল তাহারা বিশেষ লজ্জিত ও ক্ষুণ্ণ হইয়া প্রথমে তাহার রক্ষী সিপাহী ও কর্ম্মচারীদিগের দণ্ড দেন এবং পরে মহাগুরুর (দলাই লামার) নিকট আবেদন-অনুরোধের চূড়ান্ত করেন। ফলে নেপাল-রাজদূতের নিকট আদেশ আসিল, "শর্বাকে এই মুহূর্ত্তে আমাদের হস্তে সমর্পণ কর।"



রান্নাঘরে
শ্রীনন্দলাল বসু



মণিপুরী-রমণী
শ্রীধীরেন্দ্রকৃষ্ণ দেববর্ম্মা

বিবিধ প্রসঙ্গ

মহাত্মা গান্ধী, কংগ্রেস ও মন্ত্রিত্বগ্রহণ

ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসপক্ষীয় সদস্যেরা সংখ্যায় সর্ব্বাধিক হওয়ায় আইন ও প্রচলিত পার্লেমেণ্টারী রীতি অনুসারে তাঁহাদের নেতাদেরই ঐ সকল প্রদেশে মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার কথা। গবর্ণরেরা তাঁহাদিগকে তাহা করিতে ডাকিয়াওছিলেন। কিন্তু তাঁহারা কংগ্রেস-কার্য্যনির্ব্বাহক সভার প্রতিজ্ঞা অনুসারে গবর্ণরদিগের নিকট এইরূপ প্রতিশ্রুতি চান, যে, তাঁহারা ভারতশাসন আইনের অনুযায়ী যাহা কিছু করিবেন, তাহাতে গবর্ণরেরা বাধা দিবেন না, হস্তক্ষেপ করিবেন না। গবর্ণরেরা নানা কারণ দেখাইয়া ঐরূপ প্রতিশ্রুতি দেন নাই। সহজেই ও স্বভাবতঃ ইহা অনুমিত হইয়াছিল, যে, ভারতসচিবের আদেশ বা উপদেশ অনুসারে গবর্ণরেরা ঐরূপ কাজ করিয়াছিলেন। ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড এ-বিষয়ে পার্লেমেণ্টে প্রথম যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি প্রতিশ্রুতিদান সম্বন্ধে গবর্ণরদের কাজের সমর্থন করেন, এবং প্রভুত্ববোধবান্ লোকদের চিরাভ্যস্ত সুরে কথা বলেন। তাহার উপযুক্ত জবাব মহাত্মা গান্ধী ও কংগ্রেসের অন্য কোন কোন নেতা দিয়াছিলেন। লর্ড জেটল্যাণ্ড পার্লেমেণ্টে এ-বিষয়ে আবার যখন মুখ খুলেন, তখন সুরটা নরম হইয়াছে বুঝা গেল। তাহার পর কংগ্রেসপক্ষ হইতে বলা হয়, যে, গবর্ণরের সহিত মন্ত্রিমণ্ডলের গুরুতর মতভেদ হইলে, গবর্ণর মন্ত্রীদিগকে বরখাস্ত করিবেন, এইরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদান করুন। কংগ্রেসের সমালোচকেরা বলেন, "এরূপ প্রতিশ্রুতির কি প্রয়োজন? গবর্ণর যদি আপনাদের কোন কাজে আপত্তি করেন বা বাধা দেন,তাহা হইলে আপনারা ত নিজেই কাজে ইস্তফা দিতে পারেন?" এ-বিষয়ে অনেক খবরের কাগজে বহু আলোচনা ও তর্কবিতর্ক হইয়াছে। মাসিক পত্রে বিস্তারিত আলোচনা সঙ্গত হইবে না, স্থানেরও অভাব আছে। আমরা সংক্ষেপে কেবল ইহাই বলিতে চাই, যে, মন্ত্রীরা স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া ইস্তফা দিলে, তাঁহারা যে-যে কারণ দেখাইয়াই পদত্যাগ করুন না কেন, তাহার কদর্থ এই হইতে পারিবে, যে, তাঁহারা কাজ চালাইতে পারিলেন না। অথচ বাস্তবিক তাঁহারা কাজ চালাইতে সমর্থ ও প্রস্তুত ছিলেন। গবর্ণর তাঁহাদিগকে বরখাস্ত করিলে তাহার সহজ অর্থ ও ঠিক অর্থ এই হইবে, যে,তিনি মন্ত্রীদিগকে আইনসঙ্গত এবং বৈধ কাজও করিতে দিলেন না ও দিবেন না।

মহাত্মা গান্ধী সম্প্রতি বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যদিও কর্ম্মচ্যুতির দাবীই করা হইয়াছে বটে, তবে ব্যক্তিগতভাবে তিনি সন্তুষ্ট হইবেন যদি মন্ত্রীদিগের সহিত মতভেদ ঘটিলে গবর্ণর তাহাদের ইস্তফা দাবী করেন। কংগ্রেসের সমালোচকেরা বলিতে পারেন, এটা খুব সামান্য ব্যাপার। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে গবন্মেণ্ট এই সামান্য জিনিষটুকু কংগ্রেসকে দেন্ না। এ পর্য্যন্ত উভয় পক্ষের মিলন ঘটাইবার নিমিত্ত অগ্রসর হইয়াছেন কংগ্রেসই। কংগ্রেস যত দূর অগ্রসর হইতে পারেন, তত দূর হইয়াছেন। এখন গবন্মেণ্ট একটু আগাইয়া আসুন না? গবন্মেণ্ট যদি সত্য সত্যই চান যে কংগ্রেস মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করেন, তাহা হইলে সামান্য একটা প্রতিশ্রুতি দিলেই ত চুকিয়া যায়? কংগ্রেসের পক্ষ হইতে যাহা চাওয়া হইতেছে তাহার দ্বারা গবন্মেণ্টের সরলতা ও আন্তরিকতা পরীক্ষিত হইবে।

কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিলে তাহার ফলে অচল অবস্থার উদ্ভবে গবর্ণররা শাসনবিধি স্থগিত রাখিতে (কন্সটিটিউশ্যন সস্‌পেণ্ড করিতে) বাধ্য হইবেন। মহাত্মা গান্ধী তাহার জন্য ও তাহার ফলাফলের জন্য প্রস্তুত। কিন্তু তিনি তাহা চান না। কারণ, তাহাতে ব্রিটেন ও ভারতবর্ষের মধ্যে এখন যে ঘৃণাদ্বেষ ও তিক্ততা আছে তাহা বাড়িবে। তিনি দুঃখকর এরূপ অবস্থা নিবারণার্থ প্রাণপণ চেষ্টা করিবেন, কিন্তু এমন সময় আসিবেই যখন তাঁহার চেষ্টা নিষ্ফল হইবে।

কংগ্রেস বরাবর বলিয়া আসিতেছেন, যে, তাঁহারা বর্ত্তমান কন্সটিটিউশ্যনটা ধ্বংস করিতে চান। কংগ্রেস-দলের

লোকেরা যে ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ করিয়াছেন, ধ্বংসই তাহার উদ্দেশ্য বলিয়া উক্ত হইয়াছে। সুতরাং কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠন করিবার ও তদ্দ্বারা আইনানুযায়ী কাজ করিবার আগ্রহ দেখিয়া সমালোচকেরা নানা কথা বলিতেছেন। কিন্তু কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত না হইলে এবং কংগ্রেস রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নিজের মতে দৃঢ় থাকিলে, পুনর্ব্বার আইনলঙ্ঘন-প্রচেষ্টার প্রবর্ত্তন ও পরিচালন অবশ্যম্ভাবী। অহিংস ও সত্যনিষ্ঠ ভাবে সাহস ও অধ্যবসায় সহকারে ইহা চালাইবার জন্য দেশ কতটা প্রস্তুত, তাহা গান্ধীজী অন্য কাহারও চেয়ে কম জানেন না। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল গঠিত হইলে সেই উপায়ে দেশকে কতটা প্রস্তুত করিতে পারা যাইবে, তাহাও তিনি অন্য কাহারও চেয়ে কম জানেন না। অতএব, বাস্তবঅবস্থানিবিশেষে কেবল যুক্তির অনুসরণ করিয়া যদিও আমরা কংগ্রেস ও অন্য সকল দলেরই মন্ত্রিত্ব গ্রহণের বিরোধী বরাবর ছিলাম এবং এখনও আছি, তথাপি স্বাধীনতাসংগ্রামে যিনি কার্য্যক্ষেত্রে নেতৃত্ব করিয়াছেন, এখনও করিতে প্রস্তুত এবং প্রয়োজন হইলে নিশ্চয় আবার করিবেন, তাঁহার রণকৌশলের বিরোধিতা করিবার আস্পর্দ্ধা আমাদের নাই। কারণ, আমরা ঘরে বসিয়া লিখিয়াছি, বক্তৃতামঞ্চে দাঁড়াইয়া বক্তৃতাও করিয়াছি, কিন্তু অহিংস স্বরাজসংগ্রামের রণক্ষেত্রে কখনও পদক্ষেপ করি নাই, ভবিষ্যতেও করিবার সৌভাগ্য অর্জ্জনের আশা নাই।

—

কংগ্রেসের প্রতি ভারতসচিবের অনুরোধ

৩১শে মে ১৭ই জ্যৈষ্ঠ রাত্রে পার্লেমেণ্টের রক্ষণশীল সদস্যদের একটি ঘরোয়া বৈঠক হয়। তাহাতে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড যাহা বলেন, তৎসম্বন্ধে নিম্নমুদ্রিত সংবাদটি ব্রিটিশ বেতার-ব্যবস্থা যোগে ভারতবর্ষে পর দিন আসে।

গতকল্য রাত্রিতে পার্লেমেণ্টের রক্ষণশীল সদস্যদের এক ঘরোয়া বৈঠকে ভারতসচিব লর্ড জেটল্যাণ্ড ভারতের কংগ্রেসী দলকে মন্ত্রিত্ব ও গবর্ণমেণ্টের দায়িত্ব গ্রহণের জন্য পুনরায় অনুরোধ জানান।

লর্ড জেটল্যাণ্ড বলেন, "হিন্দুদের মহৎ গুণাবলীতে, বিশেষভাবে তাহাদের গঠনপ্রতিভাতে, আমার স্থায়ী বিশ্বাস আছে। বহু উৎসাহ-হানিকর অবস্থা সত্ত্বেও আমার এখনও এই বিশ্বাস আছে যে, হিন্দুরা তাহাদের শক্তি ও দক্ষতা ভারতের সেবায় নিয়োজিত করিবেন। গ্রেট ব্রিটেন আন্তরিকতার সহিত তাঁহাদিগের সহিত সহযোগিতা করার যে প্রস্তাব করিয়াছে তাঁহারা যেন তাহা অবহেলা না করেন অথবা গ্রেট ব্রিটেন তাঁহাদিগকে উভয়ের একটি সাধারণ কর্তব্য সম্পাদনের জন্য সহযোগিতার যে অনুরোধ জানাইয়াছে, তাঁহারা যেন তাহা অবজ্ঞার সহিত প্রত্যাখ্যান না করেন, এরূপ অনুরোধ করা কি বেশী হইবে? এই কর্ত্তব্য সম্পাদনের জন্য এই দুই জাতিকে যে সমবেত ভাবে কাজ করিতে হইবে তাহা যে কেবল তাহাদের মিলিত চেষ্টার যোগ্য তাহা নহে, পরন্তু ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলেই দেখা যাইবে যে, ইহা তাহাদের স্পষ্ট নিয়তি বা ভাগ্যলিপি। আমাদের উভয় জাতির ইতিহাসের সঙ্কট সময়ে উভয় জাতির নিকট ইহাই আমার আবেদন।"

লর্ড জেটল্যাণ্ডের নিজের মনের যে ভাব এই কথাগুলিতে ব্যক্ত হইয়াছে, তাহা বাস্তবিক তাঁহার হৃদয় হইতে উত্থিত নহে, এরূপ কোন ইঙ্গিত মাত্রও আমরা করিতেছি না। কিন্তু গ্রেট ব্রিটেন ১৯৩৫ সালের ভারত-শাসন আইন দ্বারা আমাদের সহযোগিতা চাহিয়াছে, ইহা আমরা বিন্দু মাত্রও বিশ্বাস করি না। গ্রেট ব্রিটেন চাহিয়াছে ভারতবর্ষের উপর নিজের নিরঙ্কুশ প্রভুত্ব রক্ষা করিতে এবং ভারতবর্ষ হইতে সকল প্রকারে ধন আহরণের অবাধ উপায় রক্ষা করিতে।

ভারতসচিব মহাত্মা গান্ধীর সামান্য দাবীটুকু মানিয়া লইলেই কংগ্রেসের "সহযোগিতা" পাইতে পারেন। মানিয়া লউন না? ইহা মানিয়া লইতে আইনের কোন পরিবর্তন আবশ্যক হইবে না, মানিয়া লইলে আইন কোন প্রকারে লঙ্ঘিত বা পরিবর্ত্তিত হইবে না। ইহা মানিয়া লইলে বুঝা যাইবে যে, ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট সত্য সত্যই কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব-গ্রহণ ও সহযোগিতা চান, না মানিয়া লইলে বুঝা যাইবে, গবর্মেণ্ট, মন্দ যাহা ঘটিয়াছে বা ঘটিবে, তাহার দোষটা কংগ্রেসের ঘাড়ে চাপাইতে চান। মহাত্মা গান্ধী ঠিকই বলিয়াছেন,

গবর্মেণ্ট কংগ্রেসের সহিত কথা না চালাইয়া কংগ্রেসের সম্বন্ধে (পৃথিবীর লোকদের সঙ্গে) কথা চালাইতেছেন। মনে হইতেছে যেন ব্রিটিশ রাজনীতিব্যাপারীরা ও প্রাদেশিক গবর্ণরেরা জগদ্বাসীদিগকে সম্বোধন করিয়া কথা বলিতেছেন, কংগ্রেসকে নহে। বস্তুতঃ, বরাবর যেরূপ হইয়াছে, সেইরূপ এখনও তাঁহাদের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ আনা যায়, যে, তাঁহারা কংগ্রেসকে অপদস্থ ও

খ্যাতিভাজন এবং জনগণের সহিত সংযোগচ্যুত ও তাঁহাদের সমর্থন হইতে বঞ্চিত করিতে চাহিতেছেন।"

লর্ড জেট্‌ল্যাণ্ড মানুষটির বিরুদ্ধে আমাদের কিছু বলিবার অভিপ্রায় না থাকিলেও, আমাদের মনের এই প্রশ্নটা চাপা দিতে পারিতেছি না, যে, তিনি হঠাৎ (?) এই সময়ে কেন হিন্দুদের গুণগানে প্রবৃত্ত হইলেন। অবশ্য, তিনি এদেশে থাকিতেও হিন্দু দর্শন ও সংস্কৃতির সহিত পরিচিত হইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন এবং হিন্দুর সংস্কৃতিবিষয়ক বহিও লেখিয়াছিলেন। ইহাও সত্য, যে, তিনি ভারতশাসন আইনে বঙ্গের হিন্দুদের প্রতি যে ঘোরতর অবিচার করা হইয়াছে, তাহার প্রতিকারের চেষ্টাও করিয়াছিলেন। তাঁহাকে ভারতবর্ষের লোকদের মধ্যে বিশেষ করিয়া হিন্দুদের শত্রু বা বিদ্বেষ্টা বলা যায় না। সুতরাং হিন্দুদের সম্বন্ধে তাঁহার যে উক্তিগুলির আলোচনা হইতেছে, তাহার সম্বন্ধে ইঙ্গিতে আমরা এরূপ কোন প্রশ্ন করিতেছি না, যে, শত্রু কেমন করিয়া স্তাবক হইলেন। তিনি হিন্দুর গুণগান এখন কেন করিলেন, তাহাই জিজ্ঞাস্য। আমাদের বোধ হয়, যে ছয়টি প্রদেশে কংগ্রেসী দল ব্যবস্থাপক সভায় সংখ্যাভূয়িষ্ঠ হইয়াছে সেগুলি হিন্দুপ্রধান প্রদেশ এবং কংগ্রেসী সদস্যদের মধ্যে প্রায় সবাই হিন্দু; সেই জন্য হিন্দুদিগকে মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া তিনি কার্য্য উদ্ধার করিতে চাহিয়াছেন। কিন্তু 'কথায় চিঁড়া ভিজে না'। কংগ্রেস সামান্য যাহা দাবী করিতেছে তিনি তাহা দিয়া ফেলুন না?

তিনি বলিতেছেন, তিনি আশা করেন হিন্দুরা দেশের সেবায় আত্মনিয়োগ করিবে। যেন তাহারা কখনও তাহা করে নাই, এবং এখনও করিতেছে না! দেশের সেবা হিন্দুরা ত চিরকাল করিয়া আসিতেছে। হিন্দু-বৌদ্ধ যুগে করিয়াছে, মোগল-পাঠানশাসিত প্রদেশসমূহে মোগলপাঠান যুগে করিয়াছে, ব্রিটিশ রাজত্বকালে হিন্দুদের মধ্যে সর্ব্বাঙ্গীন দেশসেবা রামমোহন রায় হইতে আরম্ভ করিয়া এ পর্য্যন্ত বিখ্যাত অবিখ্যাত অগণিত হিন্দু করিয়াছেন। তাঁহাদের সম্মিলিত দেশসেবা অবশ্য এখনও প্রয়োজনানুরূপ ও যথেষ্ট হয় নাই। কিন্তু তাঁহাদের চেয়ে অধিক দেশসেবা কোন অহিন্দু করেন নাই।

বোধ হয় লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিতে চান, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের ও গবর্ণরদের প্রভাবাধীন হইয়া নূতন ভারতশাসন আইনটাকে 'চালু' করিলে তবে হিন্দুদের দেশসেবা দেশসেবা বলিয়া ইংরেজরা মানিবে। কিন্তু আমরা যাহাকে দেশসেবা মনে করি ও বলি, ইংরেজরা তাহাকে দেশসেবা নাই বা বলিল? তাহাদের মতে দেশসেবক বিবেচিত হইতে অন্ততঃ কংগ্রেসী হিন্দুরা ব্যগ্র নহে।

[বিবিধ প্রসঙ্গের এগার পৃষ্ঠা লিখিত হইয়া ছাপার হরফে উঠিবার পর ১০ই জুন দৈনিক কাগজে পড়িলাম, ভারতসচিব পার্লেমেণ্টে বলিয়াছেন, গান্ধীজী ব্যক্তিগত ভাবে যেরূপ প্রতিশ্রুতি চাহিয়াছেন তাহা দেওয়া যাইতে পারে না। এ বিষয়ে আমরা পরে কিছু লিখিব।]

—

আগামী কংগ্রেসের সভাপতি কে হইবেন?

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশন গুজরাটের যে গ্রামটিতে হইবে, সেখানে কংগ্রেসপুরী নির্ম্মাণের চেষ্টা আরম্ভ হইয়া গিয়াছে। গান্ধীজীর আহ্বানে শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু স্থানটি দেখিয়া আসিয়াছেন। বোধ হয় পুরীটি যাহাতে শোভন হয় সে বিষয়ে তাঁহার পরামর্শ গ্রহণ তাঁহাকে আহ্বানের উদ্দেশ্য। এই দিকে আয়োজন যেমন চলিয়াছে, অন্য একটি বড় আয়োজনের সূত্রপাতও তদ্রূপ করা আবশ্যক। তাহা কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি মনোনয়ন।

ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষে বড় প্রদেশ সাতটি আছে। আগেকার ছোট এবং পরে স্বতন্ত্র প্রদেশ বলিয়া গণিত ছোট প্রদেশগুলি ধরিলে মোট এগারটি প্রদেশ হয়। যদি এইরূপ মনে করা যায়, যে, প্রত্যেক বড় প্রদেশ হইতে পর্য্যায়ক্রমে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক, তাহা হইলে গত পনর বৎসরে বাংলা দেশ হইতে দু-জন বাঙালীকে সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত ছিল। যদি মনে করা যায়, যে, ছোট বড় সকল প্রদেশ হইতেই পর্য্যায়ক্রমে সভাপতি মনোনীত করা উচিত, তাহা হইলেও গত পনর বৎসরের মধ্যে এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত ছিল। আর যদি মনে করা যায়, যে, ওরূপ পালা বা ভাগ-বাটোয়ারা ঠিক্ নয়, যে-যে প্রদেশ স্বাধীনতা-সংগ্রামে সাহস ও স্বার্থত্যাগের সহিত বিশেষরূপে যোগ দিয়াছে এবং

দুঃখভোগ করিয়াছে, সভাপতি নির্ব্বাচন সেই সব প্রদেশ হইতেই করা উচিত, তাহা হইলেও বাংলা দেশকে ও বাঙালীকে দীর্ঘকাল বাদ দেওয়া যায় না ; কারণ, বাংলা দেশের ও বাঙালীর স্থান এ-বিষয়ে কাহারও নীচে নয়। সুতরাং গত পনর বৎসরে অন্ততঃ এক জন বাঙালীকে কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচিত করা উচিত ছিল। আর এক দিক দিয়া বঙ্গের দাবী বিবেচিত হইতে পারে। ব্রহ্মদেশকে সবে আড়াই মাস হইল ভারতবর্ষ হইতে পৃথক্ করা হইয়াছে। ব্রহ্মদেশ সমেত সমগ্র ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা আগে ছিল পঁয়ত্রিশ কোটি। তাহার মধ্যে বঙ্গের লোকসংখ্যা পাঁচ কোটি। সুতরাং প্রতি সাত বৎসরে এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত। সে হিসাবে গত পনর বৎসরে দু-বার বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত ছিল। যদি শুধু ব্রিটিশ-শাসিত ব্রহ্মদেশবর্জ্জিত ভারতবর্ষের লোকসংখ্যা ধরা যায়, তাহা হইলে তাহা পঁচিশ কোটির বেশী হয় না। পাঁচ কোটি তাহার এক পঞ্চমাংশ। সুতরাং প্রতি পাঁচ বৎসরে এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা উচিত। সে হিসাবে গত পনর বৎসরে বাঙালীকে তিনবার সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত ছিল।

কিন্তু বাঙালীকে যে-হিসাবে যত বার কংগ্রেসের সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত হউক না কেন, বাস্তবিক গত পনর বৎসর এক জন বাঙালীকেও একবারও নির্ব্বাচন করা হয় নাই।

অতএব, আমরা চাই, এবার এক জন বাঙালীকে সভাপতি করা হউক।

কোন প্রদেশকে বাদ দিয়া ভারতবর্ষ বা ভারতবর্ষের বাকী অংশ অগ্রসর হইতে পারে না। কোন প্রদেশও অন্যসমুদয়প্রদেশনিরপেক্ষ ভাবে অগ্রসর হইতে পারে না। সেই কারণে আমরা বলি, বাংলা দেশকে সঙ্গে লইয়া ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশ অগ্রসর হউন, বাংলা দেশও অন্যান্য প্রদেশের সহিত সার্ব্বজনিক কাজে যোগ দিয়া অগ্রসর হউন।

তাহার সুযোগ আমরা চাহিতেছি। কংগ্রেসের নীতি ও পন্থা স্থির আর সবাই করিবে, বাঙালী করিবার সুযোগ পাইবে না, ইহা হইতে পারে না। মধ্যে মধ্যে সভাপতি না হইলে এই সুযোগ যথোচিত রূপে পাওয়া যায় না। অতএব মধ্যে মধ্যে বাঙালীকে সভাপতি করিতে হইবে।

আর একটি কারণে বাঙালীর এখন সভাপতি হওয়া আবশ্যক। অষ্টাদশ শতাব্দীর শেষার্দ্ধে, উনবিংশ শতাব্দীতে এবং বিংশ শতাব্দীর প্রথম কুড়ি একুশ বৎসরে বঙ্গের দুঃখ-দুর্দ্দশার কথা আমরা তুলিতে চাই না। গত পনর ষোল বৎসরে বঙ্গের যে অবস্থা ঘটিয়াছে, বঙ্গের উপর যে ঝড় বহিয়া গিয়াছে ও এখনও বহিতেছে, তাহা বঙ্গের বাহিরের লোকেরা ত ভাল করিয়া জানেনই না, অগণিত বাঙালীও জানেন না। সেই দুঃখের কথা একবার ভারতবর্ষের জনগণের দরবারে সভাপতির মুখ হইতে বর্ণিত হওয়া চাই। তাহা বাঙালী ভিন্ন কেহ সব জানিয়া বুঝিয়া যথোচিতরূপে দরদের সহিত বলিতে পারিবে না।

কিন্তু যোগ্য বাঙালী কেহ আছে কি ?

না থাকিলে আমরা এত কথা লিখিতাম না।

আমাদের বিবেচনায় শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি নির্ব্বাচন করা উচিত। এ কাজের জন্য তাঁহার যথেষ্ট বিদ্যা ও বুদ্ধি আছে। তিনি কলেজে ভাল ছাত্র ছিলেন, পাস ভাল করিয়াছিলেন। তাহার পর সিভিল সার্ভিসের পরীক্ষা-প্রতিযোগিতার ফলে সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইয়াছিলেন। সুশৃঙ্খলভাবে কাজ করিবার ও করাইবার ক্ষমতা তাঁহার বেশ আছে। বস্তুতঃ, ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় ভারত-গবর্মেণ্টের স্বরাষ্ট্র-সচিব তাঁহাকে আটক করিয়া রাখিবার কারণ সম্বন্ধে যে বক্তৃতা করেন, তাহা হইতে স্পষ্টই বুঝা যায়, যে, গবর্মেণ্ট তাঁহাকে খুব বুদ্ধিমান এবং দল বাঁধিতে ও সুশৃঙ্খলভাবে দলকে চালাইতে সুদক্ষ মনে করেন। কলিকাতা মিউনিসিপালিটির প্রধান কর্ম্মকর্ত্তারূপে তিনি এই সব গুণের পরিচয় দিয়াছিলেন। তিনি স্বেচ্ছায় সিভিল সার্ভিসের চাকরী ছাড়িয়া দিয়া স্বার্থত্যাগের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছেন। যাহাতে অর্থাগম হয় তিনি এখন এরূপ কোন চাকরী করেন না ও ভবিষ্যতে করিবেন না, এবং পরিবারপালনের ভারগ্রস্ত তিনি নহেন। সুতরাং তিনি তাঁহার সমুদয় সময় ও শক্তি দেশের কাজে নিয়োগ করিতে সমর্থ। দুঃখবরণ ও দুঃখসহনে

মানুষ গড়িয়া উঠে। তাঁহার জীবনে দুঃখভোগ খুব ঘটিয়াছে, এবং তাহা ঘটিয়াছে তিনি দেশের সেবক বলিয়া। ইউরোপে থাকিতে তিনি প্রভুত্বকামী ও স্বাধীনতাকামী বিভিন্ন মনোবৃত্তিশালী নানা দলের কর্ম্মপন্থার সহিত পরিচিত হইয়াছেন। তাহা স্বাধীনতা-সংগ্রামে দেশের কাজে লাগিবে। ভারতবর্ষের আমদানী ও রপ্তানী বাণিজ্যের সুযোগে বিদেশে কোন্ কোন্ দেশের সহিত কিরূপ চুক্তি করিলে ভারতবর্ষের কতকগুলি যুবক ভিন্ন ভিন্ন রকম শিল্প ও যন্ত্রনির্ম্মাণবিদ্যা শিখিতে পারে, তাহা তিনি ইউরোপে থাকিতেই অনেক বার লিখিয়াছেন। রাষ্ট্রীয় সংগ্রামের সহিত জাতীয় সংস্কৃতির যোগ আছে। যে সকল ভারতীয় ছাত্র ছাত্রী বিদ্যালাভের জন্য ইউরোপে আছেন, সুভাষবাবু সুযোগ পাইলেই এই সকল বিষয়ে তাঁহাদিগকে পরামর্শ দিয়াছেন। তিনি বৃদ্ধ নহেন, প্রৌঢ়ও নহেন। সেই কারণেও তিনি কংগ্রেসী নূতন দলের সমর্থন লাভ করিতে পারিবেন।

—

বিলাতে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে প্রবেশার্থী

আগে ভারতীয় সিভিল সার্ভিসে চাকরী পাইতে হইলে কেবল বিলাতে পরীক্ষা দিবার বন্দোবস্ত ছিল। কয়েক বৎসর হইতে বিলাতে ও এদেশে উভয়ত্রই পরীক্ষা লওয়া হইতেছে। তা ছাড়া, গত বৎসর হইতে মনোনয়ন দ্বারাও বিলাতে কতকগুলি লোক লওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে।

লণ্ডনের পরীক্ষার জন্য ১৯৩৫ সালে আবেদন করিয়াছিল ইউরোপীয় ৮৩ জন ও ভারতবর্ষীয় ২৫১ জন; ১৯৩৬ সালে পরীক্ষার্থী ছিল ১৪৫ জন ইউরোপীয় ও ২৪৮ ভারতীয়; কিন্তু এবার, ১৯৩৭ সালে প্রবেশার্থী হইয়াছে ৩২২ জন ইউরোপীয় ও ১৪৯ জন ভারতীয়। ভারতীয় পরীক্ষার্থীদের সংখ্যার ক্রমিক হ্রাসের কারণ, এখন সিভিল সার্ভিসের সব পদগুলি ত পরীক্ষায় উচ্চ স্থান লাভ যাহারা করিবে তাহাদিগকে দেওয়া হইবে না, কতকগুলি চাকরী মনোনীত ইংরেজ ছোকরাদিগকে দেওয়া হইবে, কেননা ইংরেজ ছোকরারা প্রতিযোগিতায় ভারতীয়দের চেয়ে মোটের উপর অধিকতর পারদর্শিতা দেখাইতে পারিতেছিল না। এবার যে ৩২২ জন ইউরোপীয় যুবক পদপ্রার্থী হইয়াছে, তাহাদের মধ্যে ৮৯ জন নিয়োগ চাহিয়াছে কেবল পরীক্ষার জোরে, ১০০ জন পরীক্ষা দিবে মনোনয়নও চায়, বাকী ১৩৩ জন কেবল মনোনয়নের অনুগ্রহে চাকরী চায়। ইহা হইতে দেখা যাইতেছে, যে, ইংরেজ পদপ্রার্থীদের মধ্যে যাহাদের পৌরুষ আছে তাহাদের সংখ্যা কম, যাহারা অনুগ্রহ চায় তাহাদের সংখ্যা অনেক বেশী।

—

ভারতের কার্পাস এবং ম্যাঞ্চেষ্টারের সুতা ও কাপড়

"ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের কার্পাস উৎপাদন সমিতি"র বার্ষিক অধিবেশনে লর্ড ডারবি সম্প্রতি এক বক্তৃতায় বলিয়াছেন:—

"আমরা ভারতের কাপাস ক্রমশঃ অধিক পরিমাণে আমদানী করিতেছি। ইহার দ্বারা ভারতের কৃষকদিগকে সাহায্য করা হইতেছে। ম্যাঞ্চেষ্টারের সুতা ও কাপড় যথাসাধ্য ক্রয় করা ভারতবাসীদের কর্ত্তব্য। উভয় দেশের মধ্যে প্রীতির সম্বন্ধ স্থাপিত হওয়া উচিত। কিন্তু কেবল ইংলণ্ডের সদিচ্ছাতে তাহা হইবে না, উভয় দেশের লোকেরই পরস্পরের প্রতি সদ্ভাব থাকা চাই।"

ইংরেজরা যে ভারতবর্ষের তুলা কেনে, সেটা নিজের গরজে কেনে; তাহা হইতে কাপড় প্রস্তুত করিয়া বিক্রয় করিয়া লাভ করিবার জন্য কেনে। ভারতীয় কৃষকদিগকে সাহায্য করিবার অভিপ্রায় ইহার মধ্যে নাই, ভারতবর্ষের প্রতি সদ্ভাবও ইহার মধ্যে নাই। ইংরেজরা ভারতবর্ষ হইতে যে তুলা ক্রয় করে, সেই রকম তুলা তার চেয়ে কম দামে অন্যত্র পাইলে সেখান হইতেই ইংরেজরা কিনিত।

ভারতবর্ষের তুলা ক্রয়ের মধ্যে যদি ভারতবর্ষের প্রতি ইংলণ্ডের সদ্ভাব থাকে, তাহা হইলে ইংলণ্ডের হাজার হাজার লোককে যে আমরা বেতন দিয়া ও বহু লক্ষ লোককে যে তাহাদের তৈরি জিনিষ কিনিয়া বাঁচাইয়া রাখি ও ধনী করি, তাহার মধ্যেও আমাদের ইংরেজ-প্রীতি আছে! বস্তুতঃ, এই উভয় ব্যাপারের মধ্যে প্রীতির নামগন্ধও নাই। ইংলণ্ড অগত্যা ভারতবর্ষের তুলা কেনে, আমরাও বাধ্য হই মোটা বেতনের ইংরেজ চাকর্যে রাখিতে ও আমাদের চেয়ে অনেক অধিক সম্পত্তিপন্ন ইংরেজদের তৈরি জিনিষ কিনিতে।

ভারতবর্ষের লোকেরা যখন নিজেদের পরিধেয় সব কার্পাস-বস্ত্র নিজেরা ভারতবর্ষের তুলা হইতে প্রস্তুত করিতে

পারিবে, তখন সেই অবস্থা সন্তোষকর হইবে। আমাদের কাপড়ের জন্ম যত তুলা আবশ্যক তার চেয়ে বেশী তুলা তখন ভারতবর্ষে জন্মিলে বিদেশী লোকেরা তাহাদের আবশ্যক হইলে কিনিতে পারিবে। "আমরা তোমাদের যত তুলা যত দামে কিনি, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক দামে তাহা হইতে উৎপন্ন সুতা ও কাপড় তোমাদিগকে বিক্রী করি, অতএব আমরা তোমাদের বন্ধু, এবং সেই বন্ধুত্বের খাতিরে তোমরা আরও বেশী করিয়া আমাদের তৈরি সুতা ও কাপড় ক্রয় কর," ইহা বড় চমৎকার যুক্তি। এই প্রকার বন্ধুত্বের এই প্রকার প্রতিদান করিতে বলার মানে, "তোমরা চিরকাল কাপড়ের জন্ম আমাদের মুখাপেক্ষী হইয়া থাক।" ভারতবর্ষ কাপড় সম্বন্ধে আগে কোন কালেই পরমুখাপেক্ষী ছিল না; ইংরেজ রাজত্বের প্রারম্ভকাল পর্য্যন্ত নিজের কাপড় নিজেই উৎপন্ন করিত, অধিকন্তু অনেক কাপড় বিদেশে রপ্তানী করিত।

ম্যাঞ্চেষ্টারের বণিকগণ জানিয়া রাখুন, ভারতবর্ষের স্বরাজ্য লাভে সাহায্য করিলে, অন্ততঃ তাহাতে সম্মতি দিলে, তাহার দ্বারাই ইংরেজরা ভারতীয়দের প্রতি সদ্ভাব দেখাইতে ও তাহাদের সদ্ভাব লাভ করিতে পারিবেন, নতুবা নহে।

—

"হিন্দু" ও "পৌত্তলিক" ভাষা

রংপুরের টাউনহলে কিছু দিন পূর্ব্বে মৌলানা মোহম্মদ আকরম খাঁ যে বক্তৃতা করেন, তাহাতে তিনি হাণ্টার সাহেবের নিম্নমুদ্রিত কথাগুলি উদ্ধৃত করিয়াছিলেন ও তাহার বাংলা অনুবাদ দিয়াছিলেন বলিয়া 'সঞ্জীবনী'তে দেখিলাম।

"The language of our Government schools in Lower Bengal is Hindu, and the masters are Hindus. The higher sort of Musalmans spurned the instructions of idolators through the medium of the language of idolatry." অর্থাৎ, "বাংলা দেশে আমাদের সরকারী স্কুলগুলির ভাষা হিন্দু এবং সে ভাষার শিক্ষকেরাও হিন্দু। পৌত্তলিক শিক্ষকদিগের দ্বারা পৌত্তলিক ভাষার মধ্যবর্ত্তিতায় প্রদত্ত এই শিক্ষাকে উচ্চশ্রেণীর মুসলমানেরা ঘৃণার সহিত বর্জ্জন করিয়াছেন!" (অনুবাদ বক্তার)।

ইংরেজী বাক্যগুলি হাণ্টারের কোন্ বহির কোন্ পৃষ্ঠা হইতে উদ্ধৃত, তাহা লেখা নাই।

হাণ্টার সাহেব ইহলোকে নাই। তিনি জীবিত থাকিলে তাঁহাকে কয়েকটা প্রশ্ন করা চলিত। বাংলা ভাষাটা "হিন্দু" ভাষা ও "পৌত্তলিক" ভাষা এবং সব হিন্দু "পৌত্তলিক" ইহা সম্পূর্ণ সত্য না হইলেও যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, এবং মুসলমানদের আধুনিক শিক্ষা বর্জ্জনের যে কারণ হাণ্টার দেখাইয়াছেন, তাহা যদি সত্য বলিয়া মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও মুসলমানরা অহিন্দু ও অপৌত্তলিক ইংরেজী ও উর্দু ভাষার সাহায্যে কেন আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে সেরূপ ব্যগ্র হয় নাই, "পৌত্তলিক" হিন্দুরা "পৌত্তলিক হিন্দু" বাংলা ভাষার ও অপৌত্তলিক ইংরেজী ভাষার সাহায্যে আধুনিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে যেরূপ ব্যগ্র হইয়াছে, তাহা হাণ্টারের উক্তি দ্বারা অব্যাখ্যাত থাকে। ধরিয়া লওয়া যাক্, হিন্দু শিক্ষকরা সবাই পৌত্তলিক ছিলেন (যদিও ইহা সত্য নহে), কিন্তু মিশনরী স্কুলকলেজসমূহের দেশী ও বিলাতী খ্রীষ্টিয়ান শিক্ষক ও অধ্যাপকেরা ত অনেকেই "অপৌত্তলিক" ছিলেন, এবং প্রথম প্রথম সরকারী সব কলেজেও অধিকাংশ অধ্যাপক ছিলেন "অপৌত্তলিক" খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজ। এই সকল শিক্ষা-প্রতিষ্ঠানেও মুসলমান ছাত্র কেন কম ছিল এবং অধিকাংশ ছাত্রই কেন হিন্দু ছিল, তাহার কারণ হাণ্টারের উক্তিতে পাওয়া যায় না।

যদি বলেন, ইংরেজ রাজত্বে মুসলমানদের আর্থিক অবস্থা খারাপ হইয়া যায়, বা মুসলমানরা ধর্ম্মশিক্ষাশূন্য পাশ্চাত্য শিক্ষা গ্রহণে ধর্ম্মহানির ভয়ে তাহা অপৌত্তলিক উর্দু ও ইংরেজীর সাহায্যে অপৌত্তলিক শিক্ষকদের সাহায্যে প্রদত্ত হইলেও তাহা গ্রহণ করে নাই, তাহা হইলে বাংলা ভাষার সাহায্যে হিন্দুশিক্ষকদের দ্বারা প্রদত্ত শিক্ষা গ্রহণ না করিবার কারণও ত তাহাই ছিল মনে করা যুক্তিসঙ্গত; "হিন্দু" ও "পৌত্তলিক" ভাষা এবং "পৌত্তলিক" শিক্ষকদিগকে অকারণ এই কারণব্যাখ্যার মধ্যে টানিয়া আনা অনাবশ্যক এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ জন্মাইবার উদ্দেশ্যে তাহা করা হইয়াছে।

কলেজগুলির শিক্ষার বাহন এখনও "পৌত্তলিক" "হিন্দু" ভাষা বাংলা নহে, আগে ত কলেজে বাংলা পড়ানই হইত না। কলেজী শিক্ষার বাহন অপৌত্তলিক ইংরেজী ভাষা। কলেজগুলিতে দলে দলে মুসলমান ছেলেরা কেন যায় নাই

ও যায় না? যে-যে কলেজে মুসলমান ছাত্রেরা খুব অল্প খরচে শিক্ষা পাইতে পারে, সেখানেও মুসলমান ছাত্র যথেষ্ট কেন হয় না?

এসব প্রশ্নের উত্তর হাণ্টারের উক্তিতে পাওয়া যায় না।

হিন্দুমুসলমানের মধ্যে বিদ্বেষ জন্মাইবার ও বাড়াইবার চেষ্টার উর্দ্ধে যে-সকল মহৎ লোক ছিলেন ও আছেন, হাণ্টার তাহাদের মধ্যে নিশ্চয় অন্যতম, এরূপ মনে করিবার যথেষ্ট কারণ নাই।

ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগর "বোধোদয়" নামক বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকে লিখিয়াছিলেন, "ঈশ্বর নিরাকার চৈতন্যস্বরূপ", "পুত্তলিকার চক্ষু আছে দেখিতে পায় না, কর্ণ আছে শুনিতে পায় না" ইত্যাদি। এহেন "অপৌত্তলিক" বহি মুসলমান ছাত্রেরা দলে দলে কেন আগ্রহ সহকারে পড়ে নাই? অক্ষয়কুমার দত্তের চারুপাঠ তিন ভাগ ও অন্যান্য বহির কোথাও পৌত্তলিকতা নাই। আরও অনেক বিদ্যালয়পাঠ্য বাংলা বহির কোথাও পৌত্তলিকতা নাই। পৌত্তলিকতার প্রচারক বা সমর্থক কোন বিদ্যালয়পাঠ্য পুস্তকের কথাই আমাদের মনে পড়িতেছে না। লক্ষ লক্ষ হিন্দু বালক-বালিকা এই সকল অপৌত্তলিক বহি পড়িয়া বিদ্যালাভ করিয়াছে। অধিকতর আগ্রহসহকারে অধিকতরসংখ্যক মুসলমান ছাত্র ঐ সকল বহি পড়িয়াছেন কি? সমুদয় বাংলা সাহিত্যকে ও বাংলা ভাষাকে পৌত্তলিক বলিতে পারে তাহারাই যাহারা উহার সহিত পরিচিত নহে, বা যাহারা ধর্ম্মান্ধ।

বাংলা অনেক গ্রন্থে দেবদেবীর কথা ও উল্লেখ আছে, সত্য। কিন্তু এরূপ বহিও ত অনেক আছে যাহাতে দেব-দেবীর কথা নাই। যে-সব অহিন্দু ইউরোপীয় ইংরেজী ও অন্যান্য সাহিত্যে গ্রীক, রোমান, টিউটনিক ও স্কাণ্ডিনেভীয় দেবদেবীর গল্প ও উল্লেখ পড়িতে কোন দ্বিধা বা সঙ্কোচ বোধ করে না, তাহারা হিন্দু দেবদেবীর কথা না-পড়িতে পারে—তাহাদের সহিত তর্ক করা বৃথা। কিন্তু যে-সব বাংলা বহিতে দেবদেবীর কথা নাই, তাহা পড়িতে আপত্তি কি? আমরা অবশ্য দেবদেবীর গল্প বা উল্লেখ সম্বলিত কোন দেশের বা কোন ভাষার বহিই শুধু সেই কারণেই পাঠের অযোগ্য ত মনে করিই না, প্রত্যুত এরূপ নানা গ্রন্থে কাব্যরস ব্যতীত বহু উপদেশও পাওয়া যায় ও যাইতে পারে মনে করি। বিশেষ বিশেষ দেবতার উপাসকেরা বা উপাসকদের উপদেষ্টারা অনেক স্থলে পরমাত্মারই কোন-না-কোন স্বরূপকে বিশেষ বিশেষ দেবতার রূপ দিয়াছেন। তাহা তাঁহাদের বুদ্ধি ও কল্পনার সীমাবদ্ধতা বশতঃ হইয়াছে। তাহা বাঞ্ছনীয় নহে। অখণ্ড সত্তারূপে পরমাত্মার উপাসনাই শ্রেষ্ঠ ও কর্ত্তব্য। কিন্তু একেশ্বরবাদীরাও ত সকলে সেরূপ উপাসনা করেন না বা করিতে পারেন না। আমরা ইহা বহুদেববাদের সমর্থন বা ব্যাখ্যা বা কৈফিয়ৎ রূপে বলিতেছি না। মুখে-একেশ্বর-বাদীদের গর্ব্বিত ও দাম্ভিক না হইয়া কি হেতু বিনয়ী, দীনাত্মা হওয়া উচিত, তাহারই আভাস দিতেছি।

আমরা উপরে উর্দ্দুকে "অপৌত্তলিক" ভাষা বলিয়াছি। কিন্তু হিন্দুরা বাংলা ভাষা ব্যবহার করে বলিয়া তাহা যদি "হিন্দু" ভাষা ও "পৌত্তলিক" ভাষা হয়, তাহা হইলে উর্দ্দু ও হিন্দুরা ব্যবহার করে বলিয়া তাহাও "হিন্দু" ভাষা ও "পৌত্তলিক" ভাষা। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশেই উর্দ্দুর ব্যবহার বেশী। সেখানকার অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা ১৪ জন মাত্র মুসলমান, বাকী প্রধানতঃ হিন্দু। বেশীসংখ্যক শিক্ষিত হিন্দু—বিশেষতঃ কায়স্থেরা—উর্দ্দু ব্যবহার করে। অনেক বিখ্যাত উর্দ্দু-লেখক—যেমন পণ্ডিত রতননাথ—হিন্দু। হিন্দু মহাসভার অন্যতম নেতা ভাই পরমানন্দ একখানি বিখ্যাত উর্দ্দু সংবাদপত্রের সম্পাদক।

বস্তুতঃ হিন্দুরা ব্যবহার করিলেই যদি কোন ভারতীয় ভাষা "হিন্দু" ও "পৌত্তলিক" হইয়া যায়, তাহা হইলে ভারতবর্ষের সব ভাষাই "হিন্দু" ও "পৌত্তলিক," এবং সেগুলি যদি সেই কারণে মুসলমান ভারতীয়দের অব্যবহার্য্য হয়, তাহা হইলে তাহাদের কোনও ভারতীয় ভাষায় কথা বলা ও লেখা বন্ধ করিতে হয়, এবং আরবী ব্যবহার করিতে হয়। কিন্তু দুঃখের বিষয় "পৌত্তলিক" অনেক হিন্দু অতীত কালে তাহা শিখিয়া ও লিখিয়া তাহাকে কিঞ্চিৎ "অশুচি" করিয়াছে, এবং এখনও সেরূপ হিন্দু আছে।

যে মুসলমান ধর্ম্ম মুসলমানরা জীবনে মানিয়া চলে, যে খ্রীষ্টিয়ান ধর্ম্ম খ্রীষ্টিয়ানেরা জীবনে মানিয়া চলে, তাহার মধ্যে পৌত্তলিকতা আছে কিনা, তাহার আলোচনা আমরা করিব না। 'প্রবাসী' ধর্ম্মমত বিচারের কাগজ নহে, এবং

কোন অহিন্দু হিন্দুদিগকে আক্রমণ করিলে, অহিন্দুকে উণ্টা তদ্রূপ আক্রমণ সমুচিত উত্তরও নহে।

প্রত্যেক ধর্ম্মের বিচার হওয়া উচিত তাহার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রের দ্বারা। রামমোহন রায় এক শতাব্দীরও পূর্ব্বে ইংরেজীতে "A Defence of Hindu Theism" নামক পুস্তিকা লিখিয়া এবং বাংলাতেও তদ্রূপ পুস্তিকা লিখিয়া অহিন্দুদিগকে দেখাইয়াছিলেন যে হিন্দুধর্ম্মের শ্রেষ্ঠ উপদেশ পৌত্তলিকতার উপদেশ নহে। যাঁহারা হিন্দুধর্ম্মকে পৌত্তলিক ধর্ম্ম মনে করেন তাঁহারা এই পুস্তিকাগুলি এবং রাজনারায়ণ বসুর 'হিন্দু-ধর্ম্মের শ্রেষ্ঠতা' নামক পুস্তিকাটি পড়িয়া দেখিবেন। এই শেষোক্ত বক্তৃতাটিতে খ্রীষ্টিয়ানদিগের মধ্যে এরূপ সাড়া পড়িয়া গিয়াছিল, যে, উহার সংক্ষিপ্তসার ইংরেজীতে লণ্ডনের বিখ্যাত দৈনিক টাইমসে প্রেরিত ও প্রকাশিত হইয়াছিল।

বাংলা ভাষা যদি "হিন্দু" ভাষা ও "পৌত্তলিক" ভাষাই হয়, তাহা হইলে "অপৌত্তলিক" বাঙালী মুসলমানেরা ও "অপৌত্তলিক" বাঙালী খ্রীষ্টিয়ানেরা কেন এই ভাষায় কথা বলিতেন ও বলেন, অনেক বহি ও প্রবন্ধও কেন ঐ ভাষাতে লিখিতেন ও লেখেন, হাণ্টার সাহেব পরলোকে এই প্রশ্নের উত্তর নিজের মনকে দিবেন; আমরা উত্তর চাই না। কোন ভাষার ছোঁয়াচ শুধু স্কুলে সেই ভাষার বহি পড়িলেই লাগে না, তাহাতে কথা বলিলেও ত ছোঁয়াচ লাগে!

—

পদ্মফুলের ছবি ও "শ্রী"

মৌলানা আকরম খাঁর বক্তৃতা হইতে আমরা আর কয়েকটি বাক্য উদ্ধৃত করিতেছি।

এতদিন পৌত্তলিকতার মহিমাপ্রচার করা হইয়াছিল শুধু পুথি-পুস্তকের মধ্য দিয়া। প্রতিষ্ঠা দিবস উপলক্ষে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ সঙ্কল্প করিলেন এই শিক্ষাকে বাস্তব রূপ দিতে। এই উদ্দেশ্যে তাঁহারা যে পতাকা-অভিবাদনের অনুষ্ঠান করিলেন, তাহার একমাত্র বৈশিষ্ট্য ছিল—কমলদলবিহারিণী কমলার প্রতীক পদ্ম ও শ্রী; আদেশ হইল বিশ্ববিদ্যালয়ের সমস্ত ছাত্র এই কমল ও কমলা শোভিত পতাকাকে অভিবাদন করিবেন।

ইহা সত্য নহে, যে, কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় কখনও পৌত্তলিকতার মহিমা প্রচার করিতেছিল বা এখন করে।

পদ্ম কমলদলবিহারিণী কমলার আসন বটে, "প্রতীক" নহে; কিন্তু যেখানে পদ্মের ছবি থাকিবে সেখানেই লক্ষ্মী বা সরস্বতীর চিত্র উহ্য আছে, এরূপ কল্পনা করা উচিত নহে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পতাকায় কোনও দেবীর ছবি নাই, ছিল না।

ললিতকলা সম্বন্ধে বিশেষজ্ঞ শ্রীযুক্ত অর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায় মহাশয়ের প্রমুখাৎ অবগত হইয়াছি ইসলামিক স্থাপত্যে পদ্ম প্রাসাদ সমাধি মসজিদ আদিতে কোথাও কোথাও আছে। প্রয়োজন হইলে তিনি তাহার দৃষ্টান্তের উল্লেখ করিতে পারেন।

শ্রীযুক্ত ক্ষিতীশচন্দ্র সরকার গত জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতে লিখিয়াছেন (পৃ. ২৮০-২৮১):—

"মুসলমান স্থাপত্যরীতিতে মসজিদগাত্র পত্রপুষ্পাদিতে শোভিত করা দোষাবহ বলিয়া বিবেচিত হইত না। তাই তখনকার ও তৎপরবর্ত্তী অনেক মসজিদের বহির্গাত্রে ও দ্বারদেশে পদ্ম উৎকীর্ণ দেখিতে পাওয়া যায়। মসজিদের বহির্গাত্রেই যে এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ হইত তাহা নহে—মসজিদের অভ্যন্তরভাগেও মিহরাবের উপরিদেশ উৎকীর্ণ পদ্মে সুশোভিত করা হইত। খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে গৌড়েশ্বর সুলতান সিকন্দর শাহ নির্ম্মিত সুপ্রসিদ্ধ আদিনা মসজিদের মিহরাবেও এইরূপ পদ্ম উৎকীর্ণ আছে। পদ্ম-চিহ্নের সহিত ইসলাম ধর্ম্মে পৌত্তলিকতা প্রবেশের আশঙ্কা থাকিলে স্বাধীন মুসলমান সুলতানগণ কখনই তাহার প্রচলন অনুমোদন করিতেন না। অথচ বাংলার ইতিহাসে এই স্বাধীন সুলতানগণের যুগই সকল দিক হইতেই বাঙালীর স্মরণের যোগ্য, সমগ্র মুসলমান অধিকারের ভিতর এই সময়েই বাঙালীর প্রতিভা অপূর্ব্ব প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ হইয়া শিল্প, স্থাপত্য, সাহিত্য ও সংস্কৃতির ক্ষেত্রে এক অভিনব বেশে আত্মপ্রকাশ করে। আজ ইসলাম ধর্ম্মের ক্ষুণ্নতা আশঙ্কায় যাঁহারা অস্থির হইয়া পড়িয়াছেন, তাঁহারা কি এই স্বাধীন সুলতান-গণের গৌরবময় কাহিনী জাতির তরুণ শিক্ষার্থিগণকে বিস্মৃত হইতে বলেন? এই প্রসঙ্গে আমরা অন্যান্য বহু মসজিদে পদ্ম উৎকীর্ণ থাকার বিবরণ উল্লেখ করিতে বিরত থাকিয়া জনৈক ইসলামধর্ম্ম-প্রচারকের প্রতিষ্ঠিত (পদ্মচিহ্নশোভিত) মসজিদের বিবরণ পাঠকগণের নিকট বিবৃত করিতেছি। বিগত ফাল্গুন মাসে এই মসজিদ আমি স্বচক্ষে দর্শন করিয়াছি। ময়মনসিংহ জেলার কিশোরগঞ্জ উপবিভাগের অন্তর্গত অষ্টগ্রাম একটি প্রাচীন ও প্রসিদ্ধ গ্রাম এবং হিন্দু মুসলমান বহু শিক্ষিত ও সম্ভ্রান্ত লোকের বাসস্থান। পূর্ব্বোল্লিখিত গৌড়ীয় স্বাধীন সুলতানগণেরও পূর্ব্বে কুতুবনামধেয় জনৈক ইসলামধর্ম্মপ্রচারক সিদ্ধ মহাপুরুষ এই স্থানে উপস্থিত হইয়া এতদঞ্চলে ইসলামধর্ম্মের প্রচারকার্য্য আরম্ভ করেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত মসজিদ অদ্যাপি অষ্টগ্রামে বর্ত্তমান আছে। উক্ত মসজিদের গাত্র ও দ্বারদেশের ইষ্টকশ্রেণী প্রস্ফুটিত পদ্মে সুশোভিত করা হইয়াছে। অদ্যাপি এই মসজিদে নিয়মিত জুম্মার নমাজ

অনুষ্ঠিত হয় এবং গ্রামবাসী স্বধর্ম্মনিষ্ঠ সম্ভ্রান্ত মুসলমান ভূম্যধিকারী ও শিক্ষিত ব্যক্তিগণ তাহাতে যোগদান করিয়া আসিতেছেন। তাঁহাদেরই চেষ্টার ফলে সরকারী প্রত্নতত্ত্ব-বিভাগ এই প্রাচীন স্থাপত্যকীর্ত্তি রক্ষার ব্যবস্থা করিয়া জাতির ধন্যবাদার্হ হইয়াছেন। অতঃপর মুসলমান শিক্ষার্থিগণের উপদেষ্টারা কি বলিতে চাহিবেন, ইসলামধর্ম্মপ্রচারক মসজিদগাত্রে পদ্ম উৎকীর্ণ করিয়া তদীয় ধর্ম্মের মর্য্যাদাহানি করিয়াছিলেন ?"

ভারতবর্ষে অতীত কালে মুসলমানদের দ্বারা তাঁহাদের ধর্ম্মালয়ে পদ্মচিহ্ন ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিলাম। এখন অন্যত্র বর্ত্তমান কালে মুসলমানের দ্বারা মুকুটে পদ্মালঙ্কার ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দিতেছি। গত ১৯শে মে তারিখের অমৃত বাজার পত্রিকার কলিকাতা সংস্করণে নবম পৃষ্ঠায় নিম্নমুদ্রিত টেলিগ্রামটি প্রকাশিত হয়।

CAIRO, May 17.

The Egyptian authorities are now busy with the preparation of a crown for coronating King Farouq. The crown will have the symbol of the lotus flower with the three stars and crescent. The work on this is expected to be finished as the coronation of King Farouq will take place somewhere in July next. It will be recalled here that the late King Fuad wanted to have a special crown for himself and had ordered one to be made for him but unfortunately he died three months later. Now King Farouq wanted the new crown to be prepared on the same model as the one ordered by his late august father.

ইহাতে দেখা যাইতেছে, যে, মিশর দেশের ভূতপূর্ব্ব রাজা ফুয়াদ নিজের জন্য পদ্মচিহ্নশোভিত একটি মুকুট নির্ম্মাণ করাইতে চান। তাহা নির্ম্মিত হইবার পূর্ব্বেই তাঁহার মৃত্যু হয়। এখন মিশরের বর্ত্তমান রাজা ফারুক তাঁহার পিতার অভিলাষানুরূপ পদ্মালঙ্কৃত মুকুট প্রস্তুত করাইতেছেন।

"শ্রী"

এখন "শ্রী" শব্দটি সম্বন্ধে কিছু বলি।

আপ্‌টে-প্রণীত সংস্কৃত-ইংরেজী অভিধান হইতে ইহার সমুদয় অর্থ উদ্ধৃত করিতেছি।

1. Wealth, riches, affluence, prosperity, plenty. 2. Royalty, majesty, royal wealth. 3. Dignity, high position, state. 4. Beauty, grace, splendour, lustre. 5. Colour, aspect. 6. The goddess of wealth; Lakshmi, the wife of Vishnu. 7. Any virtue or excellence. 8. Decoration. 9. Intellect, understanding. 10. Superhuman power. 11. The three objects of human existence taken collectively [namely, dharma, artha, and kama]. 12. The Sarala tree. 13. The Vilva tree. 14. Cloves. 15. A lotus. 16. The twelfth digit of the moon. 17. Name of Sarasvati. 18. Speech. 19. Fame, glory. 20. Name of one of the six Ragas or musical modes.

"শ্রী" শব্দের এই কুড়ি রকম অর্থের মধ্যে কেবল দুটি লক্ষ্মী ও সরস্বতীর নাম। বাকী অর্থগুলির মধ্যে আছে ধনসম্পদ, অভ্যুদয়, প্রাচুর্য্য, রাজকীয় মহিমা, মানসম্ভ্রম, প্রতিষ্ঠা, উচ্চপদ, সৌন্দর্য্য, ঔজ্জ্বল্য, বর্ণ, যে-কোন সদ্‌গুণ, সজ্জা, বুদ্ধি, বোধ, অতিমানব শক্তি, ধর্ম্ম-অর্থ-কাম, পদ্ম, বাণী, যশ। আপত্তিকারী মুসলমানদের মতে এগুলির মধ্যে কোনটিই কি প্রার্থনীয় নহে। যদি শ্রী বলিতে দুইটি দেবীকে বুঝায় বলিয়া উহার ব্যবহার বর্জ্জনীয় হয়, তাহা হইলে সংস্কৃত ও বাংলা বর্ণমালার বহু বর্ণ ত্যাগ করিতে হইবে। বিসমিল্লা-তেই গলদ—"অ"-এরই মানে, বিষ্ণু, শিব, ব্রহ্মা, বৈশ্বানর!

আগেকার মুসলমানেরা যে সবাই নিজেদের নামের আগে শ্রী ব্যবহারে আপত্তি করিতেন না, তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। রাজশাহীর বরেন্দ্র-অনুসন্ধান-সমিতির মিউজিয়ামে রক্ষিত একখানা প্রাচীন পাথরের গায়ে পুরাতন বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় এই লেখাটি উৎকীর্ণ আছে। ইহা প্রায় ৫ বৎসর আগে আমি দেখিয়াছিলাম।

শ্রীরস্তু
শাকে পঞ্চপঞ্চা-
শতধিক চতুর্দ্দ-
শ শতাব্দিতে মধ্যৌ
শ্রীশ্রীমন্মহামুদ সা-
হ নৃপতেঃ সময়ে নৃ-
র বাজ খান পুত্র ম-
হা পাত্রাধিপাত্র শ্রীম-
ৎ ফরাস খানেন সংক্র-
মোয়ং নিনির্ম্মিত ইতি।

১৪৫৫ শকাব্দে অর্থাৎ মোটামুটি চারি শত বৎসর পূর্ব্বে শ্রীশ্রীমন্ মহামুদ শাহ নামক এক মুসলমান নৃপতির সময়ে শ্রীমৎ করাস খাঁন নামক এক জন অমাত্য একটি সংক্রাম অর্থাৎ সাঁকো নির্ম্মাণ করাইয়াছিলেন। পাথরে খোদিত লেখাটি তাহার দলিল। ইহা হইতে বুঝা যায়, চারি শত বৎসর পূর্ব্বে সম্ভ্রান্ত মুসলমান বাঙালীরা বাংলা অক্ষরে সংস্কৃত ভাষায় নিজেদের কীর্ত্তির বিবরণ লিপিবদ্ধ করা স্বাভাবিক মনে করিতেন এবং নিজেদের নামের আগে "শ্রী" ব্যবহার ইসলাম-বিরুদ্ধ মনে করিতেন না।

উক্ত লিপিযুক্ত পাথরটি ধুরাইল গ্রাম হইতে প্রাপ্ত।

বর্ত্তমান সময়েও মুসলমানদের নামের আগে "শ্রী" ব্যবহারের কিছু দৃষ্টান্ত পাওয়া যায়।

বর্ত্তমান বৎসরের ১৩ই মে প্রকাশিত চতুর্থসংখ্যক কংগ্রেস বুলেটিনে কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটির ও নিখিলভারত কংগ্রেস কমিটির সভ্যদের নামের তালিকা আছে। তাহাতে নির্বিচারে হিন্দু মুসলমান খ্রীষ্টিয়ান পারসী সকলের নামের আগে শ্রী ব্যবহৃত হয় নাই। যেমন,মুসলমানদের মধ্যে মৌলানা আবুল কলাম আজাদের নামের আগে শ্রী নাই। তাহাতে বুঝা যায়, শ্রীব্যবহারে যাঁহাদের সম্মতি আছে, তাঁহাদের নামের আগেই শ্রী সংযুক্ত হইয়াছে। হিন্দুদের শ্রী ব্যবহারের দৃষ্টান্ত দেওয়া অনাবশ্যক। মুসলমানদের "শ্রী"-যুক্ত এই নামগুলি পাইলাম :—

Shri Abdul Ghaffar Khan, c/o Mahatma Gandhi, Maganwadi, Wardha (C. P.)

Shri Syed Ahmad, Sohagpur, District Hoshangabad.

Shri V. Abdul Ghafoor, Roshen Company, Vellore, (North Arcot District).

Shri Rafi Ahmad Kidwai, 5 Lalbagh Road, Lucknow.

Shri Muzaffar Husain, 56 Chak, Allahabad.

ইঁহারা অল্পাধিক বিখ্যাত লোক। অবিখ্যাত অনেক মুসলমান—বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমান—যে নামের আগে শ্রী ব্যবহার করিতেন ও করেন, তাহাতে সন্দেহ নাই। "বিশেষতঃ বাঙালী মুসলমান" বলিতেছি এই জন্য, যে বাঙালী ভদ্রলোকের ধরণে ধুতি পরা ও বাঙালী মহিলাদের ধরণের শাড়ী পরা যেমন বঙ্গদেশ হইতে নানা স্থানে ছড়াইয়াছে, তেমনি "শ্রী"র ব্যবহারও বাংলা দেশ হইতে ছড়াইয়াছে।

কংগ্রেস কমিটি দুটির সদস্যদের তালিকা দুটিতে পারসী ও খ্রীষ্টিয়ানদের নামের আগে "শ্রী"ব্যবহারের দৃষ্টান্তও পাওয়া যায়। যেমন—

Shri K. F. Nariman, Readymoney Terrace, New Worli, Bombay 18.

Shri R. K. Sidhwa, Victoria Road, Karachi.

Shri George Joseph, Bar-at-Law, Madura.

—

মুসলমানদের কংগ্রেসে যোগ না দিবার কারণ

১৮৮৫ খ্রীষ্টাব্দে যখন কংগ্রেস প্রতিষ্ঠিত হয়, তখন হইতে ইহার দ্বার সকল ধর্ম্মাবলম্বী সকল শ্রেণীভুক্ত ভারতবাসীর নিকট সমভাবে মুক্ত আছে। এবং কংগ্রেসে কখনও কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের অসুবিধাজনক কোন প্রস্তাব গৃহীত হয় নাই। তথাপি যে মুসলমানরা তাহাদের মোট লোকসংখ্যার অনুপাতে যথেষ্ট সংখ্যায় কংগ্রেসে যোগ দেয় নাই, তাহার নানা কারণ আছে। তাহাদের অনেক নেতা নিজেদের সুবিধার জন্য এবং কোন কোন স্থলে সাম্প্রদায়িক স্বার্থসিদ্ধির খাতিরে তাহাদিগকে কংগ্রেসে যোগ দেওয়া হইতে নিবৃত্ত রাখিয়াছে। গবর্মেণ্ট মুসলমানদিগকে বিশেষ অনুগ্রহ দেখাইয়া নিবৃত্ত রাখিয়াছে, কেন-না হিন্দু-মুসলমানের সম্মিলিত স্বাধীনতালাভচেষ্টা ব্রিটেনের পক্ষে অবাঞ্ছনীয়। অনেক মুসলমান নেতা এবং বহু ইংরেজ মুসলমানদের মনে হিন্দুর প্রতি অবিশ্বাস বাড়াইবার চেষ্টা করিয়া আসিতেছে। মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার বিস্তার কম হইয়াছে। এই রূপ আরও কোন কোন কারণ দেখাইতে পারা যায়। সম্প্রতি কিছু দিন হইতে মুসলমান জনগণকে কংগ্রেসের লক্ষ্য ও কার্য্যপ্রণালী জানাইয়া তাহাদের মধ্য হইতে বহু ব্যক্তিকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করিবার চেষ্টা হইতেছে। তাহাতে মিঃ জিন্না, মৌলানা শৌকৎআলী, সর্ মোহাম্মদ য়াকুব প্রভৃতি মুসলমান নেতারা প্রমাদ গণিতেছেন ও অসন্তুষ্ট হইয়াছেন। সর্ মোহাম্মদ য়াকুব বিলাতের প্রসিদ্ধ দৈনিক 'ম্যাঞ্চেষ্টার গার্ডিয়ানে' একখানা চিঠি লিখিয়া বলিতেছেন,

কংগ্রেসনেতারা যাহাই বলুন, কংগ্রেসের প্রতি মুসলমানদের মনের ভাব কিছুই বদলায় নাই—যদিও ছাত্রশ্রেণীর কতকগুলি ভাবপ্রবণ সরলচিত্ত যুবা মুসলমান, সংসারের অভিজ্ঞতা না-থাকায়, স্বাধীনতার উন্মত্ত ধারণার প্রভাবে কংগ্রেসের দিকে আকৃষ্ট হইতেছে। তাহার পর সর্ মোহাম্মদ য়াকুব বলিতেছেন :—

"Since the advent of Mr. Gandhi the Congress has become saturated with Hindu culture, Hindu civilisation and Hindu sentiments. In the present circumstances the Moslems will find it difficult to sign the Congress creed, but we are prepared to co-operate and collaborate on terms of equality with any political organisation in the country which aims at the elevation of our status to that of equal partner in the British Commonwealth of nations by constitutional means."—Reuter

তাৎপর্য্য। কংগ্রেসের কার্য্যক্ষেত্রে গান্ধীজীর আবির্ভাবের পর হইতে কংগ্রেস হিন্দু সংস্কৃতি, হিন্দু সভ্যতা ও হিন্দু ভাবধারায় ভরপূর হইয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থায় মুসলমানদের কংগ্রেসের মতসমূহ গ্রহণ করা কঠিন। কিন্তু যে-কোন রাষ্ট্রীয় দল ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ভারতবর্ষকে অন্যান্য অংশের সমান মর্য্যাদাবিশিষ্ট অংশীদার করিতে আইনানুগ উপায়ে চেষ্টা করিবে, আমরা তাহার অন্য সভ্যদের সমান গণিত হইলে সহযোগিতা করিয়া সহশ্রমী হইতে প্রস্তুত।"

সর্ মোহাম্মদ যাহাই বলুন, প্রকৃত কথা এই, যে, গান্ধীজী কংগ্রেসনেতা হইবার পর হইতে কংগ্রেসের মুসলমান-অনুরাগ বাড়িয়াছে। মুসলমানদিগকে কংগ্রেসনেতারা খুশি করিবার অত্যধিক চেষ্টা করায় হিন্দু মহাসভার কোন কোন নেতা কংগ্রেসকে হিন্দুবিরোধী পর্য্যন্ত বলিয়াছে। আমরা এই অভিযোগ সত্য মনে করি না। কিন্তু ইহা সত্য, যে, মুসলমানদিগকে খুশি করিবার জন্য কংগ্রেস গণতান্ত্রিক ও স্বাজাতিক নীতির বিপরীত আচরণ করিয়া সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা সম্বন্ধে অ-গ্রহণ ও অ-বর্জ্জন রূপ সিদ্ধান্ত প্রকাশ করিয়াছিলেন।

সর্ মোহাম্মদ য়াকুব এখন যে-কারণে গান্ধীপ্রভাবিত ও গান্ধীচালিত কংগ্রেসে মুসলমানেরা যোগ দিতে পারে না বলিতেছেন তাহা সত্য না হইলেও সত্য বলিয়া মানিয়া লইয়া জিজ্ঞাসা করি, কংগ্রেসে গান্ধীজীর আবির্ভাবের আগে তাহাতে মুসলমানেরা কেন যোগ দেন নাই? কেন অতি অল্প সংখ্যায় যোগ দিয়াছিলেন? এখন মুসলমানেরা যেরূপ রাজনৈতিক দলে যোগ দিতে পারেন তিনি বলিতেছেন, ভারতীয় জাতীয় উদারনৈতিক সংঘ ঠিক্ সেইরূপ দল। তাহাতে সকল ধর্ম্মসম্প্রদায়ের লোক যোগ দিতে পারে, এবং তাহাতে মুসলমানকে বা অন্য কোন ধর্ম্মাবলম্বী লোককে হিন্দুদের চেয়ে বা অন্য কোন ধর্ম্মের লোকদের চেয়ে নিকৃষ্ট মনে করা হয় না; সকলকে সমান ও সমনাগরিক মনে করিয়া সমান অধিকার দেওয়া হয়। (কংগ্রেসেও সকল ধর্ম্মের লোকদের মর্য্যাদা ও অধিকার সমান।) উদারনৈতিক সংঘে মুসলমানেরা কেন যোগ দেন নাই?

প্রকৃত কথা এই, যে, সর্ মোহাম্মদ য়াকুবের মত মুসলমান নেতারা নিজেদের প্রতি ও নিজেদের সম্প্রদায়ের প্রতি গবর্মেণ্টের অনুগ্রহ বজায় রাখিতে চান। এই জন্য তাঁহারা এমন কোন রাষ্ট্রীয় প্রচেষ্টা ও আন্দোলনের সহিত যুক্ত হইতে চান না, ইংরেজ আমলাতন্ত্রের ক্ষমতা হ্রাস এবং ভারতবর্ষের উপর ব্রিটেনের প্রভুত্ব হ্রাস যাহার লক্ষ্য।

—

পঞ্জাবে জলসেচনের জন্য আবার নয় কোটি টাকা ব্যয়

১৯৩৩-৩৪ সাল পর্য্যন্ত কৃষিক্ষেত্রে জলসেচনের জন্য লাভজনক (productive) কৃত্রিম খাল খননে মান্দ্রাজে ১৪,৭০,০২,৩৬৭ টাকা, বোম্বাইয়ে ২৬,৬২,৮২,৬৮৮ টাকা, বঙ্গে ১,১০,৩৭,০৫৩ টাকা, আগ্রা-অযোধ্যায় ২২,১৮,২০,৯৬৯ টাকা, এবং পঞ্জাবে ৩৩,৭০,৫৭,০৬৭ টাকা মূলধন ব্যয়িত হইয়াছিল। তাহার পর ঐ উদ্দেশ্যে আরও কত মূলধন অন্যত্র ব্যয় করা হইয়াছে, তাহার হিসাব এখনও বাহির হয় নাই। কিন্তু ইহা জানি, বঙ্গে এমন কিছু ব্যয় হয় নাই যাহাতে বাংলা দেশ জলসেচনবিষয়ে উল্লিখিত প্রদেশগুলির অতি সামান্যরূপেও সমসুবিধাভাগী হইয়াছে মনে করিতে পারে। অথচ বঙ্গের বহু জেলায়—বাঁকুড়া, মেদিনীপুর, বীরভূম প্রভৃতিতে—জলের অভাব খুবই অনুভূত হয়। বঙ্গের প্রতি সুনজরের অভাবের নানা কারণ আছে। সবগুলি জানি না, যাহা অনুমান করি তাহাও বলা সহজ নয়। একটা কারণ এই ধারণা, বাংলা জলের দেশ, নদীর দেশ। সে কথাটা পূর্ববঙ্গের কয়েকটি জেলার পক্ষে সত্য, অধিকাংশ জেলার পক্ষে সত্য নহে। আর একটি কারণ, ব্রিটেনের,

ইংরেজদের, যে-যে শস্য বেশী দরকার, যেমন তুলা ও গম, তাহা ইংরেজরা অন্য কোন কোন প্রদেশ হইতে যথেষ্ট জলসেচন ব্যবস্থা দ্বারা পাইয়া থাকে; সুতরাং বঙ্গের দিকে দৃষ্টি নাই। বঙ্গের জন্য কিছু না-করিবার একটা সোজা অজুহাত ও কৈফিয়ৎ আছে—সরকারী তহবিলে টাকা নাই। অথচ বাংলা দেশ হইতে বরাবর পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের চেয়ে খুব বেশী রাজস্ব আদায় হইয়া আসিতেছে, এখনও হয়। বঙ্গের রাজকোষে টাকার অভাবের কারণ, বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্ব হইতে ভারত-গবর্মেণ্টের খুব বেশী পরিমাণ টাকা—প্রায় দুই-তৃতীয়াংশ—টানিয়া লওয়া। বাংলা গবর্মেণ্টের দারিদ্র্যের ইহাই একমাত্র, অন্ততঃ প্রধান, কারণ।

ব্রহ্মদেশে ২,০৬,০৫,৫০০ টাকা এবং উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশে ৭৫,৮৯,০৬১ টাকা খরচ হইয়াছে। মোট ব্যয় সমগ্র ব্রিটিশ ভারত ও ব্রহ্মে হইয়াছে ১০১,১৩,৯৪,৭১৭ টাকা। সমগ্র ব্রিটিশ ভারত ও ব্রহ্মদেশের এক-পঞ্চমাংশ লোক বঙ্গে বাস করে। সে হিসাবে বঙ্গে জলসেচন পূর্ত্ত-কার্য্যের জন্য ন্যূনকল্পে কুড়ি কোটি টাকা ব্যয়িত হওয়া উচিত ছিল, কিন্তু হইয়াছে এক কোটি! কোম্পানীর আমল হইতে বঙ্গের টাকার প্রভূত অংশ ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তারের নিমিত্ত ও অন্যান্য কার্য্যে বঙ্গের বাহিরে ভারতের অন্যত্র নিয়োজিত হইয়া আসিয়াছে। সেই জন্য বঙ্গের যথেষ্ট উন্নতি হইতে পারে নাই।

উপরে যে-অঙ্কগুলি দিয়াছি, তাহা হইতে দৃষ্ট হইবে, যে, জলসেচন ব্যবস্থার জন্য সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ব্যয় হইয়াছে পঞ্জাবে। সম্প্রতি ৮ই জুন লাহোর হইতে প্রেরিত সংবাদে জানা গেল, ঐ প্রদেশে আরও দুটি জলসেচন-প্রণালীর ব্যবস্থার জন্য আনুমানিক নয় কোটি টাকা গবর্মেণ্ট ব্যয় করিবেন।

অন্য সকল প্রদেশের সুবিধা ও ঐশ্বর্য্য বাড়ুক। তাহাতে বঙ্গের কোন দুঃখের কারণ নাই। কিন্তু কি অপরাধে বাংলা দেশ ব্রিটিশ গবর্মেণ্টকে ও ইংরেজ জাতিকে খুব বেশী পরিমাণে টাকা দিয়াও তাহার বিনিময়ে উপযুক্তরূপ সুবিধা পায় না, তাই ভাবি।

—

বঙ্গে যাতায়াতের অসুবিধা

যাত্রীরা হাবড়া ষ্টেশনে রেলগাড়ীতে উঠিয়া কোথাও না নামিয়া দিল্লী লাহোর পেশাওয়ার বোম্বাই মান্দ্রাজ যাইতে পারে, কিন্তু বঙ্গে কলিকাতা হইতে নিকটবর্ত্তী কোথাও যাইতে চাহিলেও অত সহজে যাওয়া যায় না। আর্থিক দিক দিয়া—এবং অন্য দিক্ দিয়াও—বঙ্গের ও বাঙালীর উন্নতি না হইবার ইহা একটি কারণ। আমরা যেন এই বিশাল সচল সদাচঞ্চল পৃথিবীতে পাড়াগেঁয়ে ও স্থাণুবৎ হইয়া আছি। আমাদের গত মাসের একটু অভিজ্ঞতা হইতে বঙ্গের কোন কোন স্থানে যাতায়াতের অসুবিধার দৃষ্টান্ত দিতেছি।

আমাদিগকে কার্য্যোপলক্ষে ময়মনসিংহ জেলার টাঙ্গাইল যাইতে হইয়াছিল। সিরাজগঞ্জ পর্য্যন্ত গেলাম রেলওয়ে ট্রেনে। সেখানে ষ্টীমারে উঠিয়া চারাবাড়ী ঘাট পর্য্যন্ত গেলাম জলপথে। সেখানে নামিয়া সামান্য ২০ মিনিটের পথ হাঁটিয়া আলিসাকান্দা গ্রামে গেলাম। সেখান হইতে বিন্নাফৈর যাই পাল্কীতে। অন্য সকলের মত হাঁটিয়া যাইতেও পারিতাম, কিন্তু বন্ধুরা হাঁটিতে দিলেন না। রাত্রি ও পর দিন বিকাল পর্য্যন্ত বিন্নাফৈরে থাকিয়া সেখান হইতে মোটর বাসে টাঙ্গাইল রওনা হইলাম। যানটির চেহারা বর্ণনা করিব না। চালক আমাদের অধিকাংশ মাল লইলেন না। তাহা দ্বিতীয় খেপে বাকী যাত্রীদের সঙ্গে গিয়াছিল। শুনিলাম, বিন্নাফৈর হইতে টাঙ্গাইল ৪ মাইল দূরবর্ত্তী—ঠিক কত দূর জানি না। রাস্তা ভাল হইলে ইহা ১০।১৫ মিনিটে যাওয়া যায়, কিন্তু বোধ হয় ঘণ্টা দুই লাগিয়াছিল। কাঁচা রাস্তা। মধ্যে মধ্যে কাদায় গাড়ীর চাকার কতকটা ডুবিয়া যাইতেছিল। কখন কখন গাড়ী এরূপ কা'ত হইতেছিল যে মনে হইতেছিল এবার বুঝি গাড়ী উল্টিয়া যায়। তিন জায়গায় বাঁশের সেতু প্রায় ভাঙিয়া যাওয়ায় আমাদিগকে নামিয়া পদব্রজে তাহা অতিক্রম করিতে হইল। একটা জায়গায় সাঁকোর বাঁশ এত নামিয়া গিয়াছে যে গাড়ী কেমন করিয়া পার হইল জানি না। ইহার পর একটা নদী পার হইতে হইল হাঁটিয়া; যেখানে পার হইলাম নদীতে সেখানে এক ফোঁটাও জল ছিল না। গাড়ী কেবল চালক ও তাহার সহকারীকে লইয়া পার হইল।

টাঙ্গাইল হইতে ফিরিবার সময় শুনিলাম, বিন্নাফৈর

হইতে যে রাস্তা দিয়া টাঙ্গাইল আসিয়াছিলাম, টাঙ্গাইল হইতে সে রাস্তা দিয়া চারাবাড়ী ষ্টীমার ষ্টেশনে যাওয়া যাইবে না, অন্য পথ ধরিতে হইবে। তাহাই করা হইল। টাঙ্গাইল হইতে ঘোড়ার গাড়ীতে একটা নদী পর্য্যন্ত আসিলাম। মধ্যে একদিন ঝড়বৃষ্টি হওয়ায় নদী জলপূর্ণ। খেয়ানৌকায় পার হইলাম। ওপারে সেই মোটর বাস। তাহা অন্য রাস্তা দিয়া সন্তোষ নামক গ্রামের পাশ দিয়া আমাদিগকে লইয়া চলিল। অদূরে কয়েকটা প্রাসাদ দেখিতে দেখিতে চলিলাম। কোন শ্রী নাই, জনাকীর্ণতা নাই। দেখিয়া দুঃখ হইল। জমিদাররা বোধ হয় কলিকাতায় থাকেন। চারাবাড়ী ষ্টীমার ঘাট হইতে প্রায় মাইল খানেক দূরে পৌছিয়া মোটর বাস থামিল। আর রাস্তা নাই। আমরা হাঁটিয়া ঘাটে পৌছিলাম। মাল সব ভারবাহী ঘোড়ার পিঠে আসিল। এখানকার এই রীতি।

আমি কোন অসুবিধা বোধ করি নাই। কিন্তু বড় সময় নষ্ট হয়, খরচও বাড়ে। ছেলেপিলে পরিবারবর্গ লইয়া যাঁহারা যাওয়া-আসা করেন, তাঁহারা নিশ্চয়ই খুব অসুবিধা ভোগ করেন।

যতগুলি জায়গায় যাঁহাদের আশ্রয়ে ছিলাম, তাঁহাদের আতিথেয়তার কেবল এই খুঁতটি ধরা যায়, যে, তাঁহারা অতিথিদিগকে যেমন বাক্যবিশারদ সেইরূপ ভোজননিপুণও মনে করেন। টাঙ্গাইলে সকল সম্প্রদায়ের যে-সকল লোকের সহিত আলাপ পরিচয় হইল তাঁহাদের সৌজন্য মানুষকে তৃপ্তি দেয়, কৃতজ্ঞ করে। এসব দিক্ দিয়া দুঃখ করিবার কিছুই নাই। কিন্তু পথঘাট এমন কেন? এ অঞ্চলে হিন্দু ও মুসলমান ধনী জমিদার ও ব্যবসাদার আছেন। খুব বিশ্বস্তসূত্রে অবগত হইলাম ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডেরও আয় বেশ আছে। রাস্তাঘাট সম্বন্ধে বাংলা-গবর্মেণ্ট ও বঙ্গের ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডগুলি নিজেদের কর্ত্তব্য যথাসাধ্য করেন নাই।

একটা অবান্তর কথা বলি। শুনিলাম, ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের নূতন ব্যবস্থায় বালিকা-বিদ্যালয়গুলি উঠিয়া যাইবার উপক্রম হইয়াছে। ইহা সত্য হইলে ডিষ্ট্রিক্ট বোর্ডের সভ্যদের কি পুরস্কার হওয়া উচিত, ঠিক্ করিতে পারিতেছি না।

জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত

খবরের কাগজে দেখিলাম, বঙ্গে জমীর খাজনা ও প্রজাদের অধিকার সম্বন্ধে নানা রকম পরিবর্ত্তনের পরিকল্পনা চলিতেছে। বঙ্গে ও আরও দু-একটি প্রদেশে খাজনার যে স্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, প্রাদেশিক গবর্ণর তাহার কোন পরিবর্ত্তনসাধক কোন আইনে সম্মতি দিতে পারেন না, তাঁহাকে গবর্ণর-জেনারাালের নিকট উহা পাঠাইতে হইবে। আবার গবর্ণর-জেনার‍্যালও সম্মতি দিতে পারেন না। তাঁহাকে উহা বিলাতে, ইংলণ্ডেশ্বরের বিবেচনার জন্য, পাঠাইতে হইবে। ইংলণ্ডেশ্বরের সম্মতি প্রাপ্তি ভারত-সচিবের ও ব্রিটিশ মন্ত্রীমণ্ডলের সম্মতির উপর নির্ভর করে। বিষয়টি পার্লেমেণ্টে উপস্থিত করিতে হইবে কি না, জানি না।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের কোন পরিবর্ত্তনে গবর্ণর ও গবর্ণর-জেনার‍্যাল যে সম্মতি দিতে পারিবেন না, ইহা তাঁহাদের প্রতি ইংলণ্ডেশ্বরের উপদেশাবলীর দলিলে (Instrument of Instructions-এ) আছে।

প্রজাদের অবস্থার উন্নতি হওয়া নিশ্চয়ই উচিত। তাহাদের উপর অত্যাচারও নিবারিত হওয়া উচিত। কিন্তু জমীদারী প্রথা ও চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত নির্ম্মূল করিলেই তাহা হইবে কি? জমীদাররা রায়তদের নিকট হইতে যত খাজনা আদায় করেন, গবর্মেণ্ট তার চেয়ে কম খাজনা লইবেন কি? অনেক জমীদারের কর্ম্মচারীরা জমীদারদের জ্ঞাতসারে ও হুকুমে বা তাহাদের অজ্ঞাতসারে প্রজাদের উপর অত্যাচার করে ও খাজনা অপেক্ষা বেশী টাকা আদায় করে শুনিয়াছি। রায়তদের নিকট হইতে গবর্মেণ্ট সাক্ষাৎ ভাবে খাজনা আদায় করিলে নিম্নপদস্থ সরকারী কর্ম্মচারীরা অত্যাচার করিবে না কি? আমরা জমীদার নহি, রায়তও নহি। এই সব প্রশ্নের উত্তর দিতে পারি না। জমীর খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত ও জমীদারী প্রথা উঠাইয়া দিবার সপক্ষে একটা এই যুক্তি শুনিয়াছি, যে, তাহা হইলে প্রভূত আয়-বিশিষ্ট অথচ ঋণী বিলাসী উদ্যমহীন অলস এক শ্রেণীর লোকের পরিবর্ত্তে বঙ্গে উদ্যমশীল, পরিশ্রমী, ব্যবসাবাণিজ্যে নিরত এক শ্রেণীর লোকের অভ্যুদয় হইবে। তাহা হইলে ভাল।

বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে, তাহার মূলে সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীদের চেষ্টা থাকিতে পারে; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাও আছে। কারণ, বঙ্গে অধিকাংশ জমীদার হিন্দু, অধিকাংশ কৃষক ও রায়ত মুসলমান।

বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু পঞ্জাবে খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। তাহার একটা কারণ বোধ হয় এই, যে, বঙ্গে জমীদাররা (অধিকাংশ স্থলে হিন্দু) খাজনা আদায় করে, পঞ্জাবে গবর্মেণ্ট খাজনা আদায় করে ও মধ্যে মধ্যে বাড়ায়।

—

বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ও ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায়ভেদ

ধর্ম্মের এই একটা নিন্দা সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা করিয়া থাকে, যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ খুনাখুনি দাঙ্গা যুদ্ধ প্রভৃতি বহু দেশে হইয়াছে ও হয়। তাহারা বলে, যে, মানুষ যদি বৃত্তি অনুসারে, আয়ের উপায় অনুসারে, শ্রেণী ও দল বাঁধে, তাহা হইলে এক এক শ্রেণী ও দলে নানা ধর্ম্মের লোক থাকিবে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকিবে না। ইহা হইতে পারে না বলিতেছি না। কোন কোন স্থলে ইহা হইয়াছে। কিন্তু স্থল-বিশেষে আবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের কৃষকেরা বা কারখানার মিলের মজুরেরা বা অন্য বৃত্তির লোকেরা কি আলাদা আলাদা দল বাঁধে নাই ?

সাম্প্রদায়িকতার আগুনে শ্রেণীগত বিদ্বেষ ইন্ধন জোগাইয়াছে, বা শ্রেণীগত বিদ্বেষের আগুনে সাম্প্রদায়িকতা ঘি ঢালিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে বিরল নহে। মহাজন ও খাতক আলাদা আলাদা শ্রেণী। পঞ্জাবে ও বঙ্গে অনেক স্থলেই মহাজন হিন্দু এবং ঋণী কৃষক মুসলমান। মহাজন ও খাতকে উভয় প্রদেশে যে অসদ্ভাব, তাহার মধ্যে শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দুই-ই থাকায় বিরোধের ভীষণতা বৃদ্ধি পায়। পঞ্জাবে মহাজন খুন অনেক হয়। বঙ্গে মধ্যে মধ্যে যাহা হইয়া থাকে, তাহা বাঙালীর অবিদিত নহে।

বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ যে ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায়ভেদ অপেক্ষা পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের প্রকৃষ্টতর উপায়, ইতিহাস ত এরূপ বলিতেছে না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব এরূপ সাক্ষ্য দেয় না। রুশিয়ার অভিজাত ও ধনিকদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের কৃষকদের ও মজুরদের যুদ্ধের চেয়ে কোন ধর্ম্মমতভেদমূলক যুদ্ধ কোথাও ব্যাপকতর ও নিদারুণতর হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। রুশিয়ায় এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে একেবারে নির্মূল বা নির্বাসিত করিয়াছে। স্পেনে দুই শ্রেণীতে অতি নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলিতেছে। জার্মেনীতে, ইটালীতে নিষ্ঠুর উপায়ে এক শ্রেণী অন্য এক শ্রেণীর উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু যাহারা এখন প্রভু তাহারা আগ্নেয়গিরির উপর আসন পাতিয়া বসিয়া নাই, কে বলিতে পারে? শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ শান্তির দিক দিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের চেয়ে বিন্দুমাত্রও ভাল নহে। ভারতবর্ষে যাঁহারা জমীদারে কৃষকে ধনিকে শ্রমিকে বিরোধে কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না; কারণ উদ্দেশ্যটি কি নিশ্চিত জানা সুকঠিন, অনুমান করা সহজ। তাহা ভাল হইতে পারে। কিন্তু এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যে, এই বিরোধ হওয়াতে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ একটুও কমিয়াছে, ইহা মনে করিলে বা বলিলে ভ্রম হইবে।

ধর্ম্মমতঘটিত বিরোধ এখনও পৃথিবীতে আছে। কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য, যে, সেরূপ বিরোধের উগ্রতা কমিয়াছে। এখন কোন ধর্ম্মের লোকসমষ্টিই অন্য ধর্ম্মের লোকসমষ্টিকে পুড়াইয়া বা অন্য প্রকারে মারিয়া ফেলা উচিত বা আবশ্যক মনে করে না। অতীত কালে ইউরোপের খ্রীষ্টিয়ানেরা যেমন প্যালেষ্টাইনে ক্রুজেড্ নামক ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বহু শতাব্দী হয় নাই, ভবিষ্যতে আর কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানদের দ্বারা জেহাদ বস্তুতঃ যাহা হইয়াছে তাহা অতীত যুগের কথা। এখন জেহাদের কথা কেহ কেহ বলিলেও কোনও মুসলমানপ্রধান স্বাধীন দেশের গবর্মেণ্ট যে ভবিষ্যতে জেহাদ করিবে তাহার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু আর্থিক যে শ্রেণীবিভাগ, ধন-উৎপাদক ও ধন-ভোক্তার মধ্যে যে ভেদ, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে যে ভেদ, কৃষক ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে ভেদ,

অভিজাত ও সাধারণ লোক এবং মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে ভেদ—তাহা হইতে উৎপন্ন যুদ্ধ বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই বিরোধের প্রকৃত অবসান, বাহিরে অবসান এবং মানুষের হৃদয়ে অবসান, কেমন করিয়া হইবে, জানি না। কেবল আশা করি মাত্র, ভগবানের দিকে চাহিয়া।

জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বুদ্ধিতে কেহ উন্নত হইতে চাহিলে অন্য কাহাকেও বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত না করিয়া তিনি উন্নত হইতে পারেন। এক জন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সত্যবাদী, সাত্ত্বিক, ন্যায়পরায়ণ, নানা সদ্‌গুণশালী হইলে তাহা অন্য কাহারও জ্ঞানী ও সদ্‌গুণশালী. হওয়ার ব্যাঘাত জন্মায় না। আধ্যাত্মিকতা, সাত্ত্বিকতা, মনুষ্যত্ব, যে-কোন সদ্‌গুণ, জড়বস্তু নহে, যে, কেহ বা কোন শ্রেণীর লোকেরা তাহা অর্জ্জন করিলে অন্যের ভাগে কম পড়িয়া যাইবে। সুতরাং ধর্ম্মজগতে সকলেই যথাসাধ্য উন্নত এবং আত্মা ও হৃদয়মনের সম্পৎশালী হইতে পারেন। কিন্তু জড়পদার্থের আকারে যত রকম সম্পত্তি আছে, তাহা সীমাবদ্ধ। ভূমি, শস্য, টাকাকড়ি, বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজসপত্র, ঘরবাড়ী, যানবাহন, পশু প্রভৃতি সব মানুষকে সমান সমান করিয়া ভাগ করিয়া দিবার কোন উপায় এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। রুশিয়াতেও সকলের আয় সমান সমান নহে, সকলের সম্পত্তি সমান নহে; কাহারও কম, কাহারও বেশী। সর্ব্বত্র এইরূপ। জড়সম্পত্তির প্রকৃতিই এইরূপ, যে, এক জন বেশী পাইলে অন্য জনের ভাগে কম পড়ে। কিন্তু আত্মিক সম্পদের প্রকৃতি এরূপ নয়, যে, এক জন ধার্ম্মিক হইলে অন্যকে অধার্ম্মিক বা কম ধার্ম্মিক হইতে হইবে, এক জন বীর হইলে অন্যকে কাপুরুষ হইতে হইবে, এক জন সত্যবাদী হইলে অন্যকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে, এক জন সংযমী ও মিতাচারী হইলে অন্যকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইবে,…। প্রত্যেকেই অপর কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া ধার্ম্মিক, বীর, সত্যবাদী, সংযমী, …হইতে পারেন, হইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

দারিদ্র্য যাহাতে না-থাকে, অন্ততঃ খুব কমে, তাহা আমরা চাই। প্রত্যেক মানুষের সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার এবং জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবার অধিকার যাহাতে কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয়, আমরা এরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাই। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা উৎপাদিত ধনের ন্যায্য বণ্টন আমরা চাই। ভূম্যধিকারী ও ধনিকের বিলাসিতার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে, আর কৃষক ও শ্রমিকের ভাগ্যে পড়িবে কদর্য্য অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনুপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্র, রোগে চিকিৎসার অভাব, এবং সন্তানদের যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগের অভাব—এরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলোপসাধন করিতে হইবে।

কিন্তু এই বিলোপসাধনের চেষ্টা ঈর্ষ্যাদ্বেষ পরিহার করিয়া করিতে হইবে। জড়সম্পদকে পরমার্থ না ভাবিয়া আত্মিক সম্পদ ও হৃদয়মনের ঐশ্বর্য্যকে পরমার্থ মনে করিতে হইবে। দারিদ্র্য, রোগ, নিরানন্দ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এইরূপ মনের ভাব লইয়া না চালাইলে সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহাতে জগতে অশান্তি বাড়িতেই থাকিবে।

ধর্ম্মজগতে, কম হইলেও, মিলনের ভাব দেখা যাইতেছে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের কোটা হইতে ধর্ম্মসমূহের পার্লেমেণ্ট সর্ব্বধর্ম্মমতের কংগ্রেস প্রভৃতি নামের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভায় নানা ধর্ম্মের লোকেরা সমবেত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত শিষ্টভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবাদী, ধনিক ও শ্রমিক, পুঁজিবাদী ও শ্রমিক-নেতৃত্ববাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী, ফাসিষ্ট ও পুঁজিবাদী —সদ্ভাবে ইহাদের কোন পার্লেমেণ্ট বা কংগ্রেস জগতে এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কি?

—

কংগ্রেস ও হিন্দুসমাজ

কংগ্রেসের সহিত কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই বিরোধ নাই। কংগ্রেস ইচ্ছাপূর্ব্বক বা জ্ঞাতসারে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর কিছু করেন না। কিন্তু ইহা সত্য, যে, যে-সকল প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় ন্যূন, সেখানে হিন্দুদের অসুবিধা, হিন্দুদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার, হিন্দুনারীদের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস বিশেষ কিছু করেন না। (আমরা যাহা জানি তাহা হইতে আমাদের ধারণা যেরূপ হইয়াছে তাহাই লিখিলাম। আমরা

বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে, তাহার মূলে সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীদের চেষ্টা থাকিতে পারে; কিন্তু সাম্প্রদায়িকতাও আছে। কারণ, বঙ্গে অধিকাংশ জমীদার হিন্দু, অধিকাংশ কৃষক ও রায়ত মুসলমান।

বঙ্গে চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের বিরুদ্ধে আন্দোলন হইতেছে, কিন্তু পঞ্জাবে খাজনার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত যাহাতে হয়, তাহার চেষ্টা হইতেছে। তাহার একটা কারণ বোধ হয় এই, যে, বঙ্গে জমীদাররা (অধিকাংশ স্থলে হিন্দু) খাজনা আদায় করে, পঞ্জাবে গবর্মেণ্ট খাজনা আদায় করে ও মধ্যে মধ্যে বাড়ায়।

—

বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ ও ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায়ভেদ

ধর্ম্মের এই একটা নিন্দা সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা করিয়া থাকে, যে, ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মসম্প্রদায়ের মধ্যে ঝগড়া-বিবাদ খুনাখুনি দাঙ্গা যুদ্ধ প্রভৃতি বহু দেশে হইয়াছে ও হয়। তাহারা বলে, যে, মানুষ যদি বৃত্তি অনুসারে, আয়ের উপায় অনুসারে, শ্রেণী ও দল বাঁধে, তাহা হইলে এক এক শ্রেণী ও দলে নানা ধর্ম্মের লোক থাকিবে, সুতরাং তাহাদের মধ্যে সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ থাকিবে না। ইহা হইতে পারে না বলিতেছি না। কোন কোন স্থলে ইহা হইয়াছে। কিন্তু স্থল-বিশেষে আবার ভিন্ন ভিন্ন ধর্ম্মের কৃষকেরা বা কারখানার মিলের মজুরেরা বা অন্য বৃত্তির লোকেরা কি আলাদা আলাদা দল বাঁধে নাই?

সাম্প্রদায়িকতার আগুনে শ্রেণীগত বিদ্বেষ ইন্ধন জোগাইয়াছে, বা শ্রেণীগত বিদ্বেষের আগুনে সাম্প্রদায়িকতা ঘি ঢালিয়াছে, ইহার দৃষ্টান্ত ভারতবর্ষে বিরল নহে। মহাজন ও খাতক আলাদা আলাদা শ্রেণী। পঞ্জাবে ও বঙ্গে অনেক স্থলেই মহাজন হিন্দু এবং ঋণী কৃষক মুসলমান। মহাজন ও খাতকে উভয় প্রদেশে যে অসদ্ভাব, তাহার মধ্যে শ্রেণীগত বিদ্বেষ এবং সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ দুই-ই থাকায় বিরোধের ভীষণতা বৃদ্ধি পায়। পঞ্জাবে মহাজন খুন অনেক হয়। বঙ্গে মধ্যে মধ্যে যাহা হইয়া থাকে, তাহা বাঙালীর অবিদিত নহে।

বৃত্তিগত শ্রেণীবিভাগ যে ধর্ম্মমূলক সম্প্রদায়ভেদ অপেক্ষা পৃথিবীতে শান্তিস্থাপনের প্রকৃষ্টতর উপায়, ইতিহাস ত এরূপ বলিতেছে না। ফরাসী রাষ্ট্রবিপ্লব এরূপ সাক্ষ্য দেয় না। রুশিয়ার অভিজাত ও ধনিকদের বিরুদ্ধে সাধারণ লোকদের কৃষকদের ও মজুরদের যুদ্ধের চেয়ে কোন ধর্ম্মমতভেদমূলক যুদ্ধ কোথাও ব্যাপকতর ও নিদারুণতর হইয়াছিল বলিয়া অবগত নহি। রুশিয়ায় এক শ্রেণী অন্য শ্রেণীকে একেবারে নির্ম্মূল বা নির্বাসিত করিয়াছে। স্পেনে দুই শ্রেণীতে অতি নিষ্ঠুর যুদ্ধ চলিতেছে। জার্ম্মেনীতে, ইটালীতে নিষ্ঠুর উপায়ে এক শ্রেণী অন্য এক শ্রেণীর উপর প্রাধান্য স্থাপন করিয়াছে। কিন্তু যাহারা এখন প্রভু তাহারা আগ্নেয়গিরির উপর আসন পাতিয়া বসিয়া নাই, কে বলিতে পারে? শ্রেণীতে শ্রেণীতে বিরোধ শান্তির দিক দিয়া সাম্প্রদায়িক বিরোধের চেয়ে বিন্দুমাত্রও ভাল নহে। ভারতবর্ষে যাহারা জমীদারে কৃষকে ধনিকে শ্রমিকে বিরোধে কোনও পক্ষ অবলম্বন করেন, তাঁহাদের উদ্দেশ্য সম্বন্ধে আমরা কিছু বলিতে চাই না; কারণ উদ্দেশ্যটি কি নিশ্চিত জানা সুকঠিন, অনুমান করা সহজ। তাহা ভাল হইতে পারে। কিন্তু এ কথা আমরা নিঃসংশয়ে বলিতে পারি, যে, এই বিরোধ হওয়াতে দেশে শান্তি স্থাপিত হইয়াছে বা সাম্প্রদায়িক বিদ্বেষ ও বিরোধ একটুও কমিয়াছে, ইহা মনে করিলে বা বলিলে ভ্রম হইবে।

ধর্ম্মমতঘটিত বিরোধ এখনও পৃথিবীতে আছে। কিন্তু ইহা বোধ হয় সত্য, যে, সেরূপ বিরোধের উগ্রতা কমিয়াছে। এখন কোন ধর্ম্মের লোকসমষ্টিই অন্য ধর্ম্মের লোকসমষ্টিকে পুড়াইয়া বা অন্য প্রকারে মারিয়া ফেলা উচিত বা আবশ্যক মনে করে না। অতীত কালে ইউরোপের খ্রীষ্টিয়ানেরা যেমন প্যালেষ্টাইনে ক্রুজেড্ নামক ধর্ম্মযুদ্ধ করিয়াছিল, তাহা বহু শতাব্দী হয় নাই, ভবিষ্যতে আর কখনও হইবে বলিয়া মনে হয় না। মুসলমানদের দ্বারা জেহাদ বস্তুতঃ যাহা হইয়াছে তাহা অতীত যুগের কথা। এখন জেহাদের কথা কেহ কেহ বলিলেও কোনও মুসলমানপ্রধান স্বাধীন দেশের গবর্মেণ্ট যে ভবিষ্যতে জেহাদ করিবে তাহার সম্ভাবনা কম।

কিন্তু আর্থিক যে শ্রেণীবিভাগ, ধন-উৎপাদক ও ধন-ভোক্তার মধ্যে যে ভেদ, শ্রমিক ও ধনিকের মধ্যে যে ভেদ, কৃষক ও ভূম্যধিকারীর মধ্যে যে ভেদ,

অভিজাত ও সাধারণ লোক এবং মধ্যবিত্ত ও সাধারণ লোকের মধ্যে যে ভেদ—তাহা হইতে উৎপন্ন যুদ্ধ বর্ত্তমান খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতে অশ্রুতপূর্ব্ব ভীষণ আকার ধারণ করিয়াছে। এই বিরোধের প্রকৃত অবসান, বাহিরে অবসান এবং মানুষের হৃদয়ে অবসান, কেমন করিয়া হইবে, জানি না। কেবল আশা করি মাত্র, ভগবানের দিকে চাহিয়া।

জ্ঞানে, ধর্ম্মে, বুদ্ধিতে কেহ উন্নত হইতে চাহিলে অন্য কাহাকেও বিন্দুমাত্রও বঞ্চিত না করিয়া তিনি উন্নত হইতে পারেন। এক জন বুদ্ধিমান, জ্ঞানী, সত্যবাদী, সাত্ত্বিক, ন্যায়পরায়ণ, নানা সদ্‌গুণশালী হইলে তাহা অন্য কাহারও জ্ঞানী ও সদ্‌গুণশালী হওয়ার ব্যাঘাত জন্মায় না। আধ্যাত্মিকতা, সাত্ত্বিকতা, মনুষ্যত্ব, যে-কোন সদ্‌গুণ, জড়বস্তু নহে, যে, কেহ বা কোন শ্রেণীর লোকেরা তাহা অর্জ্জন করিলে অন্যের ভাগে কম পড়িয়া যাইবে। সুতরাং ধর্ম্মজগতে সকলেই যথাসাধ্য উন্নত এবং আত্মা ও হৃদয়-মনের সম্পৎশালী হইতে পারেন। কিন্তু জড়পদার্থের আকারে যত রকম সম্পত্তি আছে, তাহা সীমাবদ্ধ। ভূমি, শস্য, টাকাকড়ি, বস্ত্র, অলঙ্কার, তৈজসপত্র, ঘরবাড়ী, যান-বাহন, পশু প্রভৃতি সব মানুষকে সমান সমান করিয়া ভাগ করিয়া দিবার কোন উপায় এপর্য্যন্ত আবিষ্কৃত হয় নাই। রুশিয়াতেও সকলের আয় সমান সমান নহে, সকলের সম্পত্তি সমান নহে; কাহারও কম, কাহারও বেশী। সর্ব্বত্র এইরূপ। জড়সম্পত্তির প্রকৃতিই এইরূপ, যে, এক জন বেশী পাইলে অন্য জনের ভাগে কম পড়ে। কিন্তু আত্মিক সম্পদের প্রকৃতি এরূপ নয়, যে, এক জন ধার্ম্মিক হইলে অন্যকে অধার্ম্মিক বা কম ধার্ম্মিক হইতে হইবে, এক জন বীর হইলে অন্যকে কাপুরুষ হইতে হইবে, এক জন সত্যবাদী হইলে অন্যকে মিথ্যাবাদী হইতে হইবে, এক জন সংযমী ও মিতাচারী হইলে অন্যকে উচ্ছৃঙ্খল হইতে হইবে,…। প্রত্যেকেই অপর কাহাকেও বঞ্চিত না করিয়া ধার্ম্মিক, বীর, সত্যবাদী, সংযমী, …হইতে পারেন, হইবার চেষ্টা করিতে পারেন।

দারিদ্র্য যাহাতে না-থাকে, অন্ততঃ খুব কমে, তাহা আমরা চাই। প্রত্যেক মানুষের সুস্থ শরীরে বাঁচিয়া থাকিবার এবং জ্ঞান ও আনন্দ লাভ করিবার অধিকার যাহাতে কার্য্যতঃ স্বীকৃত হয়, আমরা এরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থা চাই। কৃষি-শিল্প-বাণিজ্য দ্বারা উৎপাদিত ধনের ন্যায্য বণ্টন আমরা চাই। ভূম্যধিকারী ও ধনিকের বিলাসিতার ব্যবস্থা পর্য্যন্ত হইতে পারিবে, আর কৃষক ও শ্রমিকের ভাগ্যে পড়িবে কদর্য্য অস্বাস্থ্যকর বাসগৃহ, অতিরিক্ত পরিশ্রম, অনুপযুক্ত খাদ্য ও বস্ত্র, রোগে চিকিৎসার অভাব, এবং সন্তানদের যথেষ্ট শিক্ষার সুযোগের অভাব—এরূপ সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় ব্যবস্থার বিলোপসাধন করিতে হইবে।

কিন্তু এই বিলোপসাধনের চেষ্টা ঈর্ষ্যাদ্বেষ পরিহার করিয়া করিতে হইবে। জড়সম্পদকে পরমার্থ না ভাবিয়া আত্মিক সম্পদ ও হৃদয়মনের ঐশ্বর্য্যকে পরমার্থ মনে করিতে হইবে। দারিদ্র্য, রোগ, নিরানন্দ ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধে সংগ্রাম এইরূপ মনের ভাব লইয়া না চালাইলে সমাজতন্ত্রবাদী ও সাম্যবাদীরা যে সংগ্রাম চালাইতেছেন তাহাতে জগতে অশান্তি বাড়িতেই থাকিবে।

ধর্ম্মজগতে, কম হইলেও, মিলনের ভাব দেখা যাইতেছে। গত শতাব্দীর নব্বইয়ের কোটা হইতে ধর্ম্মসমূহের পার্লেমেণ্ট সর্ব্বধর্ম্মমতের কংগ্রেস প্রভৃতি নামের ধর্ম্ম সম্বন্ধীয় সভায় নানা ধর্ম্মের লোকেরা সমবেত হইয়া নিজ নিজ ধর্ম্মমত শিষ্টভাবে বর্ণনা ও ব্যাখ্যা করিতেছেন। কিন্তু সাম্রাজ্যবাদী ও গণতন্ত্রবাদী, ধনিক ও শ্রমিক, পুঁজিবাদী ও শ্রমিক-নেতৃত্ববাদী, পুঁজিবাদী ও সাম্যবাদী, ফাসিষ্ট ও পুঁজিবাদী —সদ্ভাবে ইহাদের কোন পার্লেমেণ্ট বা কংগ্রেস জগতে এখনও হয় নাই। কখনও হইবে কি?

—

কংগ্রেস ও হিন্দুসমাজ

কংগ্রেসের সহিত কোন ধর্ম্মসম্প্রদায়েরই বিরোধ নাই। কংগ্রেস ইচ্ছাপূর্ব্বক বা জ্ঞাতসারে কোন সম্প্রদায়ের ক্ষতিকর ও অকল্যাণকর কিছু করেন না। কিন্তু ইহা সত্য, যে, যে-সকল প্রদেশে হিন্দুরা সংখ্যায় ন্যূন, সেখানে হিন্দুদের অসুবিধা, হিন্দুদের প্রতি অবিচার ও অত্যাচার, হিন্দুনারীদের প্রতি অত্যাচার প্রভৃতির প্রতিকারের জন্য কংগ্রেস বিশেষ কিছু করেন না। (আমরা যাহা জানি তাহা হইতে আমাদের ধারণা যেরূপ হইয়াছে তাহাই লিখিলাম। আমরা

হইলে এখন প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় মন্ত্রীদিগকে সুধাইতে হইবে, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্ট এখন আর তদ্বিষয়ক প্রশ্নোত্তরের স্থান নহে, ইত্যাদি। অর্থাৎ এ-যাবৎ ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের প্রদেশগুলিতে কোন অত্যাচার, জুলুম, জবরদস্তী, অবিচার, পক্ষপাতিত্ব ইত্যাদি হইলে তৎসম্বন্ধে পার্লেমেণ্টে প্রশ্ন হইতে পারিত এবং তাহার একটা (প্রায়ই অসন্তোষকর কৌশলপূর্ণ) উত্তর পাওয়া যাইত। তাহাতে কোন প্রতিকার হউক বা না-হউক, ব্যাপারটা প্রকাশ পাইত ও জানা যাইত। অতঃপর তাহাও হইবে না। কারণ, আমরা নাকি স্বশাসক হইয়াছি ও আমাদের প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলার মারফৎ আমরা মন্ত্রীদিগের ও গবর্মেণ্টের কৈফিয়ৎ লইতে ও তাহাদিগকে জবাবদিহি অর্থাৎ দায়ী করিতে পারিব! সাবাস ব্রিটিশ রাজনৈতিক চালিয়াতী! পার্লেমেণ্টে একটা প্রশ্নোত্তর-ঢিলে দুটা পাখী শিকার করা হইল। ব্রিটেন ভারতবর্ষকে স্বরাজ দেয় নাই, কোন অ-ব্রিটেনের এরূপ সন্দেহ থাকিলে তাহা বিনাশ করা হইল (যদিও বাস্তবিক সন্দেহটা বেশ বাঁচিয়াই রহিল ও থাকিবে) এবং ভারতীয়দের ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টে প্রতিকার পাইবার ইচ্ছার ও আশার প্রাণবধ করা হইল। এই শেষোক্ত জীবহত্যাটাকে পুণ্যকর্ম্ম মনে করা যাইতে পারে। কারণ প্রতিকারের ক্ষমতা কোন জাতির নিজের হাতে না-আসিলে প্রকৃত প্রতিকার কখনও হয় না। পরমুখাপেক্ষিতার মস্তকে লগুড়াঘাত যত হয়, ততই ভাল।

—

কলিকাতা ইসলামিয়া কলেজের উন্নতিচেষ্টা

সংস্কৃতের বিশেষ চর্চ্চার জন্য সংস্কৃত কলেজ ও স্কুল রক্ষা, আরবী ও ফারসীর বিশেষ চর্চ্চার জন্য কলিকাতা মাদ্রাসা রক্ষা—ইহার অর্থ বুঝিতে পারি। কিন্তু সাধারণ যেরূপ শিক্ষা সাধারণ সরকারী, সরকারীসাহায্যপ্রাপ্ত, ও বেসরকারী কলেজসমূহে দেওয়া হয়, শুধু তাহা দিবার নিমিত্ত ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের জন্য সরকারী ব্যয়ে কলেজ চালান অনুচিত। ইহাতে অর্থের অপব্যয় হয়, এবং শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা প্রসার লাভ করে। এই সকল কারণে আমরা কলিকাতার ইসলামিয়া কলেজ প্রতিষ্ঠা ও পরিচালনের সমর্থক নহি। কিন্তু ইহা প্রতিষ্ঠিত হইয়া গিয়াছে, এবং পরিচালিত হইবেও। সুতরাং, কলেজটি যদি রাখিতেই হয়, তাহা হইলে ভাল অবস্থায় রাখা উচিত। সেই জন্য শিক্ষামন্ত্রী ও প্রধান মন্ত্রী, মৌলবী ফজলল হক, কলেজটির উন্নতির জন্য চেষ্টা করিবেন, এই গুজব সু-খবর। গুজব এই, তিনি অমুসলমান ছাত্রদিগকেও ইহাতে পড়িতে দিবেন। তাহা হইলে, ভিন্ন ভিন্ন সম্প্রদায়ের ছাত্রদের মধ্যে বন্ধুত্ব হইতে পারিবে ও সাম্প্রদায়িক সংকীর্ণতা কমিতে পারিবে। ছাত্র পাইবার ক্ষেত্র বিস্তৃততর হইলে ভাল ছাত্র পাইবার সম্ভাবনা বাড়ে, এবং ভাল ছাত্র থাকিলে অন্য ছাত্রদের ও অধ্যাপকদের উৎসাহ বাড়ে। এরূপ গুজবও রটিয়াছে, যে, ভাল অধ্যাপক পাইবার জন্য যদি হিন্দু অধ্যাপকও লইতে হয়, মৌলবী ফজলল হক তাহা লইবেন। বস্তুতঃ খ্রীষ্টিয়ান ইংরেজকে যদি লওয়া চলে, তাহা হইলে হিন্দু বাঙালীকে কেন লওয়া চলিবে না?

—

ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন

খবরের কাগজে এইরূপ গুজবও বাহির হইয়াছে, যে, মৌলবী ফজলল হক প্রতিবৎসর শরৎকালে ঢাকায় বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করাইয়া ঢাকাকে পুনর্ব্বার বঙ্গের দ্বিতীয় রাজধানীর সম্মান দিতে চান। আমরা এই প্রস্তাবের বিরোধী নহি। কিন্তু তিনটি বাধা আছে। একটি, ব্যয়বৃদ্ধি। কলিকাতায় অধিবেশন করিলে যে-সব সদস্যকে পাথেয় ও ভাতা দিতে হয় না, ঢাকায় অধিবেশন করিলে তাঁহাদিগকে পাথেয় ও ভাতা দিতে হইবে। আনুষঙ্গিক সরকারী অতিরিক্ত ব্যয়ও কিছু হইবে। দ্বিতীয় প্রশ্ন, কয়েক শত সদস্য ঢাকায় গিয়া থাকিবেন কোথায়? সকলের সচ্ছল অবস্থার বা সাধারণ অবস্থারও আত্মীয় ঢাকায় নাই, যথেষ্ট হোটেল নাই, অল্প কয়েক দিনের জন্য ভাড়া লইবার মত যথেষ্টসংখ্যক বাড়ীও খালি পাওয়া যাইবে না। তৃতীয় প্রশ্ন, ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করিবার মত বড় হল ও সংলগ্ন আপিস-কক্ষাদি কোথায়? পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম স্বতন্ত্র প্রদেশ থাকিবার সময় যে-

বড় বড় সরকারী বাড়ী নির্ম্মিত হইয়াছিল, সেগুলি ত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে দেওয়া হইয়া গিয়াছে।

যদি আপিস আদালতের এবং স্কুল কলেজ বিশ্ববিদ্যালয়ের পূজার ছুটির সময় ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করা হয়, তাহা হইলে কোন কোন বাধা অতিক্রান্ত হইতে পারে বটে; কিন্তু যখন আর সবাই ছুটি ভোগ করিবে, তখন মন্ত্রীদিগকে, ব্যবস্থাপক সভার সভাপতি ও সদস্যদিগকে এবং ব্যবস্থাপক সভা-সম্পর্কিত সরকারী কর্ম্মচারীদিগকে পরিশ্রম করিতে বলা চলিবে কি?

—

রাজবন্দীদের মুক্তির প্রশ্ন

ব্রহ্মদেশের ইতিহাসে যে একটা নূতন অধ্যায় আরম্ভ হইয়াছে, তাহা তথাকার লোকেরা মন্দ ও ভাল দুই দিক দিয়া বুঝিতে পারিতেছে। মন্দ দিক্, ভারতবর্ষের সহিত যোগরক্ষা কঠিনতর করা হইয়াছে,—যেমন রাষ্ট্রীয় ভাবে ব্রহ্মকে ভারতবর্ষ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া, উভয় দেশের মধ্যে ডাকমাশুল বৃদ্ধি করিয়া, ব্রহ্মের ভাষা না জানিলে তথাকার বিশ্ববিদ্যালয়ে ভারতীয় ছাত্রীদের অধ্যয়ন অসাধ্য করিয়া, ইত্যাদি। ভালর দিক্ দিয়া নূতন অধ্যায় আরম্ভ করা হইয়াছে, দমননীতি স্থগিত ও কতকটা বর্জ্জন করিয়া।

ব্রহ্মদেশের কতকগুলি ছাপাখানা ও সংবাদপত্রের জমানৎ তাহাদিগকে ফেরত দেওয়া হইয়াছে। বেআইনী বলিয়া ঘোষিত এক শত সভাসমিতির বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রত্যাহৃত হইয়াছে। দুই শত পঁচাত্তর জন রাজনৈতিক বন্দীকে মুক্তি দেওয়া হইয়াছে। তাহাদের মধ্যে ২৭০ জন, ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে ব্রহ্মে যে দীর্ঘকালব্যাপী বিদ্রোহ ও যুদ্ধ হইয়াছিল, তাহাতে ধৃত হইয়া বিচারান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছিল। অন্য পাঁচ জনও বিচারান্তে জেলে প্রেরিত হইয়াছিল। সম্প্রতি ব্রহ্মদেশের গবর্ন্মেণ্ট আণ্ডামান দ্বীপে বন্দী আরও ৪৫ জনকে মুক্তি দিতে সঙ্কল্প করিয়াছেন।

ভারতবর্ষে, বঙ্গে, যত রাজবন্দী আছে, তাহাদের অধিকাংশ বিনাবিচারে স্বাধীনতায় বঞ্চিত হইয়া আছে। যে-সব রাজবন্দী বিচারান্তে কারারুদ্ধ হইয়াছিল, তাহারা ব্রহ্মদেশের বিদ্রোহীদের মত গবর্ন্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে নাই—ভারতবর্ষে সেরূপ কোন বিদ্রোহ ও যুদ্ধ অধুনা হয় নাই। অতএব, ভারতবর্ষে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া ব্রহ্মদেশের তদ্রূপ বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া অপেক্ষা কঠিনতর কাজ নয়।

বঙ্গে রাজবন্দীদিগকে, অন্ততঃ কতকগুলিকে, মুক্তি দিবার কল্পনা জল্পনা আলোচনা চলিতেছে। বঙ্গের মন্ত্রীদের কাহারও এদিকে আগ্রহ নাই বা দৃষ্টি নাই, নিশ্চয় করিয়া এরূপ বলিতে পারি না, এরূপ অনুমান করাও সহজ নহে। কিন্তু তাঁহাদের আগ্রহ বা দৃষ্টি যে আছে, কেবল গুজব দ্বারা তাহা প্রমাণিত হইবে না। কাজে কিছু হইলে প্রমাণ পাওয়া যাইবে। মুক্তি সকলকেই দেওয়া উচিত এবং যাহাদিগকে বিনাবিচারে বন্দী করিয়া রাখিয়া সকল দিক দিয়া পঙ্গু ও ক্ষতিগ্রস্ত করা হইয়াছে, তাহাদিগকে ২।৩ বৎসর ভাতা দিয়া উপার্জ্জক হইবার সুযোগ দেওয়া উচিত। ইহা ন্যূনতম ক্ষতিপূরণ। একটু কোথাও কিছু বেআইনী কাজ হইলেই আবার মুক্তিপ্রাপ্ত লোকদের মধ্যে কাহাকেও কাহাকেও বা অনেককে বিনাবিচারে কারারুদ্ধ করিবার কুনীতি ও কুরীতি বর্জ্জন করিতে হইবে। বস্তুতঃ বিনাবিচারে স্বাধীনতা হরণের কুনীতি বর্জ্জিত না হইলে দেশের উন্নতি হইবে না।

রাজবন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া মন্ত্রীদের পক্ষে সোজা কাজ, ইহা আমরা মনে করি না, বলি না। টিকটিকি-বিভাগের কর্ত্তারা ইহাতে সহজে সম্মত হইবেন না, জেলার শাসককর্ত্তারা ও পুলিসও সহজে রাজী হইবেন না। রাজবন্দী-দিগকে খালাস দেওয়া হইলে বঙ্গে এমন কিছু কিছু ঘটনা ঘটাইবার লোকের অভাব না থাকিতে পারে যেরূপ ঘটনা দ্বারা মন্ত্রীদিগকে বেকুব বনিতে হইতে পারে। এই লোকগুলা স্বয়ং সন্ত্রাসক না হইতে পারে। এই সমস্ত বিবেচনা করিয়াও মন্ত্রীদিগকে সাহসে ভর দিয়া শ্রেষ্ঠ রাষ্ট্রনৈতিক পথের পথিক হইতে হইবে। সন্ত্রাসনের উচ্ছেদ অবশ্যই করিতে হইবে। কিন্তু বঙ্গে প্রচলিত দমননীতিও বর্জ্জনীয়।

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ (Bengal Civil Liberties Union) বিনাবিচারে বন্দীকৃত পুরুষ ও নারীদের ও তাহাদের আত্মীয়স্বজনদের দুঃখদুর্দ্দশা সর্ব্ব-

হইতে পারে, এবং সরকারী প্রস্তাবক বা প্রস্তাবকেরা বলিতে পারেন, "তুমি যে রকম প্রস্তাবের সমালোচনা করিয়াছ সে রকম প্রস্তাব ত করা হয় নাই।"

নানা কাগজে দেখিতেছি, বর্ত্তমান শিক্ষামন্ত্রী একটি সেকণ্ডরী এডুকেশ্যন বোর্ড গঠন করিতে চান। প্রস্তাবটি নূতন নয়। এই মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড কি ভাবে গঠিত হইবে, তাহার সরকারী ও বেসরকারী সভ্য কত জন হইবেন, কি প্রকারে তাঁহারা নির্ব্বাচিত বা মনোনীত হইবেন, বোর্ডের কর্ত্তব্য ও অধিকার কি কি হইবে, তাহার অধীনস্থ জেলাবোর্ডগুলি কি ভাবে গঠিত হইবে ও তাহাদের কর্ত্তব্য ও অধিকার কি হইবে তাহাও কোন কোন কাগজে দেখিয়াছি। মূল কাগজপত্র কিন্তু আমাদের হাতে আসে নাই। সেই জন্য সাধারণ ভাবে কিছু মন্তব্য করিতেছি।

ইতিপূর্ব্বে বঙ্গের বার শত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় কমাইয়া চারি শত করিবার সরকারী প্রস্তাব যে তরফ হইতে উত্থাপিত হইয়াছিল, আলোচ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ডের প্রস্তাবও সেই তরফ হইতে হইয়াছে। এই জন্য ইহাকে ভয়ের কারণ মনে করি। কারণ, বঙ্গে স্থানবিশেষে এক-আধটা বেশী উচ্চ বিদ্যালয় থাকিলেও মোটের উপর স্কুল কমানর চেয়ে বাড়ানরই দরকার আছে। কিন্তু প্রস্তাবিত বোর্ডের হাতে স্কুলকে রেকগ্নিশ্যন দেওয়া না-দেওয়া বা তাহা প্রত্যাহার করার ক্ষমতা থাকিবে, এবং বোর্ডের যে বিদ্যালয়ের সংখ্যা হ্রাসের দিকেই ঝোঁক থাকিবে তাহা উহার ইংরেজ জনকের প্রবৃত্তি হইতেই অনুমিত হয়। বোর্ড এইরূপ প্রবৃত্তিজাত না হইলে, বঙ্গে বিদ্যালয়ের উচ্চ শিক্ষার উৎকর্ষ ও বিস্তৃতি সাধনের ইচ্ছা ইহার মূল আদি ও প্রধান কারণ হইলে আমরা বোর্ড গঠনের সমর্থক হইতাম। কেন-না, বঙ্গীয় উচ্চ বিদ্যালয়গুলি সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য তাহা করিবার মত লোকবল, অর্থবল ও আইনবল কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নাই। কিন্তু অনুমোদনযোগ্য মাধ্যমিক শিক্ষাবোর্ড না হইলে, উচ্চ বিদ্যালয়গুলির ভার কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের হাতে আপাততঃ থাকাই শ্রেয় বলিয়া মনে করি।

বোর্ডের সদস্যদের মনোনয়ন ও নির্ব্বাচন যে প্রকারে হইবে তাহার মধ্যে সাম্প্রদায়িকতা ঢুকান হইয়াছে। আমরা ইহার বিরোধী। যোগ্যতম লোকদিগকেই সদস্য করা উচিত। শিক্ষাক্ষেত্রে সদস্যদের চারিত্রিক, জ্ঞানগত ও শৈক্ষিক যোগ্যতাই বিচার্য্য, ধর্ম্মমত বিবেচ্য হওয়া উচিত নয়।

যদি ধর্ম্মসম্প্রদায় অনুসারে সদস্য লইতেই হয়, তাহা হইলে যে সম্প্রদায় যত বিদ্যালয় চালাইতেছেন, বিদ্যালয়ে শিক্ষা দিবার নিমিত্ত যে সম্প্রদায় যত টাকা দিতেছেন, তাহা বিবেচনা করিয়া এক এক সম্প্রদায় হইতে নির্দ্দিষ্ট অনুপাতে সদস্য লওয়া উচিত। মন্দের ভাল হিসাবে আমরা ইহা বলিতেছি. এই প্রণালীরও আমরা সমর্থক নহি।

বোর্ডে উনত্রিশ জন সদস্য থাকিবেন; চৌদ্দ জন গবর্ন্মেণ্টের নিযুক্ত ও মনোনীত, পনর জন নির্ব্বাচিত। কিন্তু বেসরকারী সদস্যদের এই সামান্য সংখ্যাধিক্য ভ্রান্তিজনক। বস্তুতঃ এংলো-ইণ্ডিয়ান এডুকেশ্যন বোর্ডের প্রতিনিধি এবং বেঙ্গল উইমেন্স এডুকেশ্যন অ্যাডভাইসরী বোর্ডের প্রতিনিধি সরকারী সদস্যদের পক্ষেই সাধারণতঃ ভোট দিবেন, এবং যাঁহারা নির্ব্বাচিত সদস্য হইবেন গবর্ন্মেণ্টের প্রভাব বশতঃ তাঁহাদের মধ্যেই কেহ কেহ নামে বেসরকারী কিন্তু বাস্তবিক সরকারী অনুগ্রহার্থী থাকিবেন। এরূপ সরকারী প্রভাবাধীন বোর্ড আমরা চাই না।

এই মত আমরা কেবল ভাল লাগা না-লাগার জন্য পোষণ করি না, এবং প্রকাশ করিতেছি না। শিক্ষাতত্ত্ব-জিজ্ঞাসু প্রত্যেক বাঙালী জানে, ভারতবর্ষের প্রদেশগুলির মধ্যে কেবল বঙ্গেই মোট শিক্ষাব্যয়ের অধিক অংশ ছাত্র-ছাত্রীদের অভিভাবকেরা ও সর্ব্বসাধারণ বহন করেন, গবর্ন্মেণ্ট বহন করেন কম অংশ; অন্যান্য প্রদেশে গবর্ন্মেণ্টই অধিক অংশ বহন করেন। ইংরেজীতে একটা কথা আছে, "বাদ্যকরের মজুরীটা যে দেয় গতের ফরমাইস করিবার অধিকার তাহার"। বঙ্গে কিন্তু শিক্ষাক্ষেত্রে বিপরীত ব্যবস্থা কায়েম হইতে যাইতেছে। বেশীর ভাগ টাকাটা দিই ও দিব আমরা, কিন্তু প্রভুত্ব ও মুরুব্বিয়ানা করিবেন সরকারী লোকেরা! ইহা কখনই ন্যায়সঙ্গত নহে। বেসরকারী লোকদেরই ক্ষমতা বেশী হওয়া উচিত। বঙ্গে যত উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয় আছে তাহার অধিকাংশ বেসরকারী জনসাধারণের ব্যয়ে স্থাপিত ও পরিচালিত।

এই কারণে উচ্চ ইংরেজী বিদ্যালয়সমূহের প্রধা-

শিক্ষকদিগকে যে আপনাদের মধ্য হইতে কয়েক জন সদস্য নির্বাচন করিবার অধিকার দেওয়া হইয়াছে, তাহার অনুপাত সরকারী ও বেসরকারী বিদ্যালয়সমূহের সংখ্যা অনুসারে নির্দিষ্ট হওয়া উচিত। অধিকাংশ সদস্য বেসরকারী স্কুলগুলি হইতে নির্বাচিত হওয়া উচিত। মোট তিন জন সদস্য হেডমাষ্টারেরা নির্বাচন করিবেন। ইহা যথেষ্ট নহে, এবং সদস্যের ভাগ-বাঁটোয়ারার পক্ষেও ইহা অসুবিধাজনক। হেডমাষ্টার-প্রতিনিধির সংখ্যা বাড়ান উচিত। বলা হইয়াছে, তিনজন হেডমাষ্টার-প্রতিনিধির মধ্যে এক জন মুসলমান হওয়া চাই-ই। আমরা শিক্ষাক্ষেত্রে সাম্প্রদায়িকতা আমদানী করার বিরুদ্ধে আগেই মত প্রকাশ করিয়াছি। আবার সেই কথা বলিতেছি। যদি সাম্প্রদায়িক ভাগ-বাঁটোয়ারা করিতেই হয়, তাহা হইলে ১২০০ স্কুলের মধ্যে যত স্কুল মুসলমানরা চালান, তাহাদের প্রতিনিধির সংখ্যা তদনুসারে নির্দ্ধারিত হওয়া উচিত। তাঁহারা ১২০০ বিদ্যালয়ের মধ্যে ৮০০ বিদ্যালয় চালান না, সুতরাং তিন জন হেডমাষ্টারের মধ্যে এক জন মুসলমান হইবেন, ইহা ন্যায়সঙ্গত নহে।

বিদ্যালয়সমূহের অনুমোদন, রেকগ্নিশুন, সরকারী সাহায্যপ্রাপ্তি ইত্যাদি বিষয়ে বোর্ডকে পরামর্শ দিবার নিমিত্ত জেলায় জেলায় জেলাবোর্ড গঠনের আমরা বিরোধী। এরকম পরামর্শ ত স্কুল পরিদর্শন বিভাগের ইনস্পেক্টররাই দিয়া থাকেন। জেলাবোর্ড-সকলে স্থানীয় শাসন ও পুলিস বিভাগের কর্ত্তাদের প্রভুত্ব ও প্রভাব সর্ব্বাতিভাবী হইবে। বিদ্যালয়সমূহে হাকিম ও পুলিসের রাজত্ব কায়েম করার আমরা বিরোধী।

অনুমোদন, রেকগ্নিশুন ও সরকারী সাহায্য পাইতে হইলে কি কি সর্ত্ত ও নিয়ম পালন করিতে হইবে, তাহা বিশদভাবে লিখিত থাকা উচিত; এবং কোন বিদ্যালয় ঐ ঐ সুবিধা না পাইলে বা পূর্ব্বে প্রাপ্ত উক্ত সুবিধা হইতে বঞ্চিত হইলে, তাহার কারণগুলিও পরিষ্কার ভাষায় লিখিত ও প্রকাশিত হওয়া উচিত। গোপনীয় অপ্রকাশ্য অপ্রকাশিত কোন রিপোর্টের উপর কোন কাজ হওয়া অনুচিত।

—

রেঙ্গুন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে দ্বন্দ্ব

ভারতবর্ষের বিশ্ববিদ্যালয়গুলির কাহারও কাহারও মধ্যে কখন কখন শিক্ষণীয় বিষয়ের ও পরীক্ষার মান (standard) ও কাঠিন্য লইয়া ঝগড়া হয়। এ বলে আমি বড়, ও বলে আমি বড়। কিছুদিন আগে মান্দ্রাজে ও বোম্বাইয়ে এইরূপ ঝগড়া হইয়াছিল। অল্পকাল পূর্ব্বে বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কলিকাতার ব্যাচিলর অব কমার্স পরীক্ষা ও উপাধি তাহাদের সমতুল্য বলিয়া স্বীকার করিতে অসম্মত হন। এখন রেঙ্গুন ও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বিরোধ হইয়াছে। ব্যাপারটা সংক্ষেপে এইরূপ :—

১৯৩৭ সালের পরীক্ষা পর্য্যন্ত ব্রহ্মনিবাসী বাঙালী ছাত্রদিগকে তথাকার এংলো-ভার্ণাকুলার স্কুলগুলিতে এবং এংলো-ভার্ণাকুলার হাইস্কুল পরীক্ষা পর্য্যন্ত বাংলা ভাষাকে তাহাদের মাতৃভাষা হিসাবে লইতে দেওয়া হইত। কিন্তু ১৯৩৮ সালের পরীক্ষায় ব্রহ্মনিবাসী বাঙালী ছাত্রদিগকে ব্রহ্মের স্কুলগুলিতে আবশ্যিকভাবে বাংলা ব্যতীত নির্দিষ্ট একটি মান অনুযায়ী বর্ম্মী ভাষাও (Burmese of a prescribed standard) পড়িতে হইবে।

আর একটি নিয়ম হইয়াছে এই যে রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ ও আই-এস্‌সি কোর্সে বর্ম্মীভাষা সাধারণতঃ অবশ্যপাঠ্য বলিয়া গণ্য হইবে; তবে যে সকল ছাত্র ব্রহ্মের বাহির হইতে (অথবা ব্রহ্মের এমন কোন অঞ্চল হইতে) আসিবে যেখানে বর্ম্মী ভাষায় সাধারণতঃ কথা বলা হয় না, তাহাদিগকে বর্ম্মী ভাষার পরিবর্ত্তে ইংরেজীতে একটা বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে। এই সুবিধার জন্য রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রারের নিকট আবেদন করিতে হইবে।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা এইরূপ :—

ব্রহ্মদেশপ্রবাসী ছাত্রদিগকে অথবা সাময়িকভাবে যে সব ছাত্র ব্রহ্মদেশে আছে তাহাদিগকে ম্যাট্রিক অথবা আই-এ ও আই-এস্‌সি পরীক্ষায় বাংলা, হিন্দী অথবা উর্দ্দু অবশ্যপাঠ্যরূপে পড়িতে হইবে। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিক অথবা হাই স্কুল পাশকরা ছাত্রগণ যদি ইংরেজীতে একটি বিশেষ পরীক্ষা পাস না করে, তবে তাহাদিগকে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের আই-এ অথবা আই-এস্‌সি পরীক্ষা দিতে দেওয়া হইবে না। যে সব ছাত্র কলেজে ভর্ত্তি হইয়া পরীক্ষা দিবে তাহাদের সম্পর্কেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। নন-কলেজিয়েট হিসাবে যাহারা পরীক্ষা দিবে, তাহাদিগকে ইংরেজীতে এই বিশেষ পরীক্ষা দিতে হইবে না।

কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যদি প্রতিবাদ ও প্রতিশোধ হিসাবে এইরূপ নিয়ম করিয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহাদের উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইবে না; কারণ, বর্ম্মী খুব কম ছাত্রই কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্ভূত কলেজে পড়ে বা কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের পরীক্ষা দেয়। অন্য দিকে ব্রহ্মদেশে বাঙালীর সংখ্যা কয়েক লক্ষ এবং বাঙালী ছাত্রও কয়েক হাজার হইবে। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় তাহাদের খুব অসুবিধা করিয়া দিয়াছে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় যে ভারতবর্ষের (ও ব্রহ্মদেশের) সমুদয় প্রধান ভাষাকে উপযুক্ত মর্য্যাদা দিয়াছে, তাহা বিবেচনা করিয়া রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয়ের উদারনীতি অবলম্বন করা উচিত ছিল।

যে-মানুষ যে-দেশে বসবাস করে, তাহার সেই দেশের ভাষা জানা উচিত বটে। কিন্তু হঠাৎ একটা নিয়ম জারী করা উচিত নয়। রেঙ্গুন বিশ্ববিদ্যালয় যে-নিয়ম করিয়াছেন তাহা একান্ত আবশ্যক বিবেচিত হইয়া থাকিলে তাহা এখন

প্রকাশ করিয়া ১৯৪২ বা ১৯৪৩ সাল হইতে অবশ্যপালনীয় হইবে এইরূপ ব্যবস্থা করিলে ঠিক্ হইত।

—

বঙ্গের লবণশিল্প

বঙ্গের লবণশিল্প সম্বন্ধে কিছুদিন পূর্ব্বে যে সরকারী বিবৃতি ও বিজ্ঞপ্তি বাহির হইয়াছিল, তাহা সন্তোষজনক মনে করি না। তাহাকে এ-বিষয়ে শেষ কথা মনে করা যাইতে পারে না। যে-জিনিষ আগে বঙ্গে প্রচুর প্রস্তুত হইত ও যাহার ব্যবসা চলিত, তাহা প্রস্তুত হইতে পারে না, এখন বলিলে তাহা বিশ্বাস করিতে প্রবৃত্তি হয় না। বঙ্গে লবণপ্রস্তুতিকার্য্যে ব্যাপৃত ব্যক্তিগণ এবিষয়ে সরকারী ভাবগতিক স্বভাবতই উৎসাহজনক মনে করেন নাই। বাংলা গবন্মেণ্ট লবণশুল্ক হইতে প্রাপ্য টাকার কিছু অংশ ভারত-গবন্মেণ্টের নিকট হইতে এই সর্ত্তে পাইয়াছিলেন, যে, তাহা বঙ্গে লবণশিল্পের উন্নতিসাধনার্থ ব্যয়িত হইবে। এই সর্ত্ত যথাযথ পালিত হইয়াছে বলিয়া বঙ্গের লবণ-কারখানাওয়ালারা মনে করেন না। তাঁহারা বঙ্গের উপযোগী প্রণালী শিক্ষা বা উদ্ভাবন করিয়া কাজ চালাইতে থাকুন।

—

বঙ্গের ব্যবসাক্ষেত্রে বাঙালী ও অবাঙালী

অনেক বাঙালীর একটা ধারণা আছে, যে, অবাঙালীরা বঙ্গে আসিয়া বাঙালীদের ব্যবসাগুলা দখল করিয়া বসিয়াছে। ইহা অনেক ক্ষেত্রে সত্য, কিন্তু সকল ক্ষেত্রে সত্য নহে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলার অধ্যাপক রমেশচন্দ্র মজুমদার কিছুদিন পূর্ব্বে বক্তৃতায় ঠিক্ বলিয়াছিলেন, যে, (ব্যবসায়ীর চোখওয়ালা ব্যবসা-বুদ্ধিসম্পন্ন অবাঙালীরা) বঙ্গে অর্থ উপার্জ্জনের কোন কোন নূতন পথ নূতন উপায় আবিষ্কার করিয়াছে। বাঙালীরা চাকরী ওকালতী প্রভৃতিতে দৃষ্টি নিবদ্ধ ও আবদ্ধ রাখায় সে পথ জানিত না, দেখিতে পায় নাই।

ব্যবসাবাণিজ্যে কৃতী হইতে হইলে বুদ্ধির যতটা দরকার, বাঙালীর তাহা যথেষ্ট আছে; কেবল সেটা ব্যবসাবাণিজ্যে খাটান আবশ্যক। আর চাই খুব পরিশ্রমী ও মিতব্যয়ী হওয়া। কোন ব্যবসাকেই ছোট মনে করা উচিত নয়। অনিশ্চিতকে ভয় করিলে ব্যবসাতে সাফল্য লাভ করা যায় না।

রাষ্ট্রনৈতিক ক্ষমতা হস্তগত না হইলে কোন জাতি ব্যবসা-বাণিজ্যে বড় হইতে পারে না সত্য। কিন্তু পরাধীনতা সত্ত্বেও অবাঙালীরা ব্যবসাবাণিজ্যে যতটা অগ্রসর হইতেছে, বাঙালীদেরও ততটা অগ্রসর হওয়া উচিত।

—

"প্রত্যেক শহরে উদ্ধার-আশ্রম চাই"

ভারতের নানা প্রদেশে নারীহরণের প্রাদুর্ভাব দেখিয়া এলাহাবাদের শ্রীমতী এল আর জুৎশী (কাশ্মীরী মহিলা) একটি আবেদনে বলিতেছেন, "প্রত্যেক শহরে উদ্ধার-আশ্রম চাই।" অতি সত্য কথা।

ভারত-রক্ষা সম্বন্ধে ভারতের ভূতপূর্ব্ব জঙ্গী লাট

সর্ ফিলিপ চেট্‌উড ভারতবর্ষের প্রধান সেনাপতি ছিলেন। তিনি মাসাধিক পূর্ব্বে লণ্ডনে এক বক্তৃতায় ভারতীয়দের উদ্দেশে দেশরক্ষা বিষয়ে বলিয়াছেন, "one day you may have to stand on your own legs for quite a long time," "একদিন তোমাদিগকে খুব দীর্ঘকালের জন্য নিজের পায়ে দাঁড়াইতে হইতে পারে।" অর্থাৎ তখন ব্রিটেন আর ভারত রক্ষা করিতে পারিবে না, তোমাদিগকে করিতে হইবে। তামাসা মন্দ নয়! ভারতবর্ষের সব প্রদেশের লোকেরা দেশরক্ষা বিষয়ে নিজের পায়েই ত দাঁড়াইতে চাহিয়াছে। সর্ ফিলিপের মত লোকেরা অধিকাংশ প্রদেশের লোক-দিগকে সৈনিক হইতে দেন নাই। তাহাদিগকে পঙ্গু করিয়া রাখিয়া এখন বলা হইতেছে, নিজের পায়ে দাঁড়াও।

—

বঙ্গের বাহিরে ফল রক্ষার চেষ্টা

ভারতবর্ষের অনেক প্রদেশেই [illegible] এমন অনেক ফল জন্মে যাহা বৈজ্ঞানিক উপায়ে রক্ষিত হইলে সারা বৎসর ব্যবহৃত হইতে পারে এবং দূরবর্ত্তী স্থানে চালানও হইতে পারে। বোম্বাই প্রদেশে আম রক্ষার জন্য বৃহৎ কারখানা হইতেছে। আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশে প্রতি বৎসর এলাহাবাদে ফলরক্ষণ শিক্ষাদানের নিমিত্ত ক্লাস খোলা হয়। তাহাতে অনেক পুরুষ ও মহিলা রক্ষণ-প্রণালীগুলি শিখিয়া নিজ নিজ পরিবারের জন্য ফল রক্ষা করে, ছোটখাট ব্যবসাও করে। পণ্ডিত মূলচাঁদ মালবীয় এই ফলরক্ষণ শিক্ষা ব্যবস্থার প্রবর্ত্তক। বঙ্গেও এইরূপ চেষ্টা হওয়া উচিত। এখানেও নানা রকম ফল জন্মে। বঙ্গে ফল-রক্ষণের কারখানা একটিও নাই, এমন নয়। কিন্তু আমরা যতটা জানি, ফলরক্ষণ কোথাও রীতিমত শেখান হয় না।

—

সিনেমাতে নৃত্য

কলিকাতা মিউনিসিপালিটি সিনেমাতে নৃত্য নিয়ন্ত্রণের উদ্দেশ্যে যে নিয়ম করিয়াছেন, তাহা সম্পূর্ণ সমর্থনযোগ্য। যাহাতে পাশবপ্রবৃত্তি উত্তেজিত হয় বা প্রশ্রয় পায়, এরূপ নৃত্য সাতিশয় নিন্দনীয়। সিনেমার ফিল্মে অনেক সময় গল্পের সঙ্গে সম্পূর্ণ সম্বন্ধ-বর্জ্জিত নৃত্য দেখান হয়। অনেক স্থলে তাহা সুরুচি ও সুনীতির বিরুদ্ধ। নৃত্যকে সম্পূর্ণ সুনীতিসঙ্গত ও সুরুচিসঙ্গত রাখিতে হইলে কটিদেশের অব্যবহিত নিম্নস্থানীয় দেহাংশের সঞ্চালন ও ভঙ্গীসমূহ সর্ব্বপ্রযত্নে বর্জ্জনীয়। অনেক সভায় কেবল দর্শকদের মনোরঞ্জনের জন্য বালিকা ও কিশোরীদের এরূপ নৃত্য দেখান হয় যাহা বাই-নাচের কতকটা অনুকরণ। ইহা নিন্দনীয়। নৃত্য সুরুচিসম্মত হইলেও যে-সব সভার কাজের সহিত নৃত্যের কোনই সঙ্গতি, সংলগ্নতা ও সম্পর্ক নাই, তথায় তাহা প্রদর্শিত হওয়া অনুচিত।

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ, ১ম খণ্ড — শ্রাবণ, ১৩৪৪ — ৪র্থ সংখ্যা

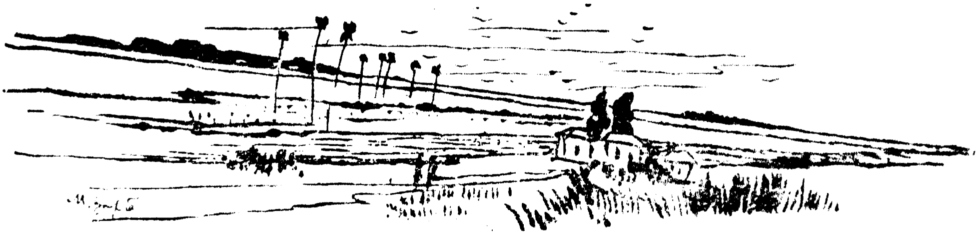
ক্যাণ্ডীয় নাচ

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

সিংহলে সেই দেখেছিলেম ক্যাণ্ডিদলের নাচ ;
শিকড়গুলোর শিকল ছিঁড়ে যেন শালের গাছ
পেরিয়ে এলো মুক্তি-মাতাল ক্ষ্যাপা
হুঙ্কার তার ছুটল আকাশ-ব্যাপা।
ডালপালা সব ছড়্‌দাড়িয়ে ঘূর্ণি হাওয়ায় কহে—
নহে, নহে, নহে.—
নহে বাধা, নহে বাঁধন, নহে পিছন-ফেরা,
নহে আবেগ স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা,
নহে মৃদু লতার দোলা, নহে পাতার কাঁপন,
আগুন হয়ে জ্বলে ওঠা এ যে তপের তাপন।
ওদের ডেকে বলেছিল সমুদ্দুরের ঢেউ
আমার ছন্দ রক্তে আছে এমন আছে কেউ।
ঝঞ্ঝা ওদের বলেছিল, মঞ্জীর তোর আছে
ঝঙ্কারে যার লাগাবে লয় আমার প্রলয় নাচে।

ঐ যে পাগল দেহখানা, শূন্যে ওঠে বাহু,
যেন কোথায় হাঁ করেছে রাহু,
লুব্ধ তাহার ক্ষুধার থেকে চাঁদকে করবে ত্রাণ,
পূর্ণিমাকে ফিরিয়ে দেবে প্রাণ।
মহাদেবের তপোভঙ্গে যেন বিষম বেগে
নন্দী উঠল জেগে,
শিবের ক্রোধের সঙ্গে
উঠল জ্বলে দুর্দাম তা'র প্রতি অঙ্গে অঙ্গে
নাচের বহ্নিশিখা
নির্দয়া নির্ভীকা।
খুঁজতে ছোটে মোহ-মদের বাহন কোথায় আছে
দাহন করবে এই নিদারুণ আনন্দময় নাচে।
নটরাজ যে পুরুষ তিনি, তাণ্ডবে তাঁর সাধন,
আপন শক্তি মুক্ত করে ছেঁড়েন আপন বাঁধন,
দুঃখবেগে জাগিয়ে তোলেন সকল ভয়ের ভয়,
জয়ের নৃত্যে আপনাকে তাঁর জয়॥

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ ১৩৪৪



কাব্যবিচারে প্লেটো

শ্রীমহেন্দ্রচন্দ্র রায়

প্লেটোর নাম শিক্ষিত সমাজে সুপরিচিত। তত্ত্বজ্ঞানী সক্রেটিসের শিষ্য প্লেটো জগতের এক জন শ্রেষ্ঠ চিন্তাবীর। সক্রেটিসের চিন্তাধারা এথেন্স নগরীতে যে বিপ্লব আনয়ন করছিল তা তখনকার সমাজ সহ্য করতে পারে নি; তাই তারা জ্ঞানের সাধক পবিত্রচেতা সক্রেটিসকে ধর্মনাশ করবার অভিযোগে অভিযুক্ত ক'রে বিষপানের দণ্ড দান করেছিল। তাতে তাঁর দেহের মৃত্যু হ'ল, কিন্তু তাঁর আত্মা অমর হয়েই রইল। বিশ বছর বয়সে প্লেটো সক্রেটিসের শিষ্যত্ব গ্রহণ ক'রে প্রায় দশ বছর তাঁর নিকট শিক্ষা গ্রহণ করেন। প্রায় চল্লিশ বছর বয়সে এথেন্স নগরীর একাডেমাস কুঞ্জে তিনি নিজের টোল প্রতিষ্ঠা করেন এবং জীবনের অবশিষ্ট চল্লিশ বৎসর কাল এইখানেই অধ্যাপনায় অতিবাহিত করেন।

প্লেটো মুখ্যতঃ দার্শনিক কিন্তু তাঁর রচনাবলীর সঙ্গে যাঁদের পরিচয় আছে তাঁরা একবাক্যে স্বীকার করেন যে প্লেটো সাহিত্যিক ও কবি ছিলেন। 'কথোপকথন' এবং 'সিম্পোসিয়াম' গ্রন্থ দুখানির রচনারীতি, ভাষার সৌন্দর্য্য, ভাবপ্রকাশের আশ্চর্য্য সরস ভঙ্গী, এবং বার্ত্তালাপরীতির উৎকর্ষ তাঁকে নিত্যকালের জন্য সাহিত্যিকের আসনে প্রতিষ্ঠিত ক'রে রাখবে। প্লেটোর আলোচনার প্রধান লক্ষ্য ছিল সক্রেটিসের ভাব ও চিন্তাধারাকে এবং তাঁর বিশিষ্ট চিন্তারীতিটিকে ভাষায় নিবদ্ধ করা এবং সেই ভাবধারাটিকে পরিপুষ্ট করা। সক্রেটিসের চিন্তার মূলসূত্র ছিল তিনটি: প্রথম, মানবজীবনের চরম লক্ষ্য হচ্ছে দোষশূন্যতা (virtue), একে পূর্ণতাও বলা যেতে পারে; দ্বিতীয়, জ্ঞানই এই পূর্ণতার নামান্তর, অর্থাৎ যার জ্ঞান হয়েছে সে কখনও অসৎ বা অন্যায় কর্ম করতে পারে না; তৃতীয়, এই জ্ঞানপ্রাপ্তির ইন্দ্রিয় হচ্ছে বুদ্ধি (intellect)। এই সূত্র অনুসরণ ক'রে প্লেটো 'রিপব্লিক', 'রাজনীতিজ্ঞ' এবং 'শাসন-শাস্ত্র' নামক তিনখানি গ্রন্থে তাঁর মতবাদটিকে পরিস্ফুট ক'রে দেখিয়েছেন।

প্লেটোর রচনা সবই কথোপকথনের ভঙ্গীতে রচিত। এ-পদ্ধতি কিন্তু প্লেটোর উদ্ভাবিত নয়; তাঁর পূর্ব্বে এই কথোপকথনের ভঙ্গীতে এক রকমের হাস্যরসাত্মক কমেডি লেখার রীতি ছিল। প্লেটো এই পদ্ধতির সাহায্যে হাস্য-রসাত্মক চিত্র না এঁকে, তাঁর গুরু সক্রেটিসের ভাবধারাটিকে ব্যক্ত করবার চেষ্টা করেছেন। এই সব মতবাদের কতখানি সক্রেটিসের আর কতখানি তাঁর নিজস্ব চিন্তার ফল তা বলা কঠিন। সে যাই হোক, প্লেটোর লেখায় যে-সব মত সক্রেটিসের নামে প্রকাশিত হয়েছে এখানে আমরা তার জন্য প্লেটোকেই দায়ী ক'রে আমাদের আলোচনায় অগ্রসর হব।

রিপব্লিক গ্রন্থে প্লেটো একটি আদর্শ রাষ্ট্রসমাজের পরিকল্পনাকে রূপ দিয়েছেন। তাঁর অভিনব মতবাদ সম্বন্ধে আলোচনা এই প্রবন্ধের উদ্দেশ্য নয়; রাষ্ট্রনীতির আলোচনার মূলে প্লেটোর একটি আদর্শ মতবাদ আছে এবং প্লেটোকে তা নিয়ে আলোচনা করতে হয়েছে, কিন্তু তা নিয়ে আলোচনা আমাদের লক্ষ্য নয়। রিপব্লিক গ্রন্থে এবং অন্যত্র আর্ট অর্থাৎ চারুকলা ও কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে প্লেটো তাঁর মতামত প্রকাশ করেছেন; এখানে তার পরিচয় দেওয়াই এই নিবন্ধের উদ্দেশ্য।

প্লেটোর কাব্যসাহিত্য সম্বন্ধে মতামতের যুক্তিগত ভিত্তি বুঝতে হ'লে তাঁর জীবন-দর্শনের সঙ্গে পরিচিত হওয়া প্রয়োজন। সেই জন্য এখানে তাঁর একটি প্রসিদ্ধ দার্শনিক মতবাদের সামান্য বিবৃতি আবশ্যক। রিপব্লিকের সপ্তম অধ্যায়ে তিনি এই মতবাদটিকে একটি সুন্দর রূপকের সাহায্যে বোঝাবার চেষ্টা করেছেন। তিনি বলেন যে, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য যে-সব বস্তুকে আমরা সত্য ব'লে জানি ও মনে করি সে-সব বস্তু বস্তুতঃ সত্য নয়, সত্য বস্তুর খণ্ড অনুকৃতি মাত্র। একটা দৃষ্টান্ত দিলেই কথাটি স্পষ্ট হবে। রাম, শ্যাম, হরি এরা সকলেই মানুষ; এদের দেখেই মানুষ

সম্বন্ধে আমাদের জ্ঞান হয়েছে মনে হয়। কিন্তু রাম, শ্যাম, হরি এদের কারও মাঝেই মানুষের সব বৈশিষ্ট্য এবং বৈচিত্র্য নিঃশেষিত নয়, হতেও পারে না, অথচ অন্য একটি মানুষ যদুকে দেখেও আমাদের মানুষ ব'লে চিনে নিতে কষ্ট হয় না। এই জন্য প্লেটো বলেন যে রাম, শ্যাম, হরি ইত্যাদি সকলেই 'মানুষ'-ভাবের এক-একটি প্রতিরূপ মাত্র। ভগবান্ আসল 'মানুষ'-ভাব রূপটিকে সৃষ্টি করেছেন; এই জগতে, অর্থাৎ ইন্দ্রিয়জগতে আমরা কেবল তারই নানা রকমের অসম্পূর্ণ প্রতিচ্ছবি দেখতে পাই মাত্র। ভাবরূপের রাজ্যটি ইন্দ্রিয়জগতের বহু ঊর্দ্ধে। আমাদের অমর আত্মা জন্মের পূর্ব্বে সেই ভাবজগতে ইন্দ্রিয়জগতের সকল বস্তুর ভাবরূপটিকে প্রত্যক্ষ করেছে ব'লেই এখানে এসে ইন্দ্রিয়-জগতে এই ছায়ামূর্ত্তিকে জানতে পারে। ভাবজগতই সত্য জগৎ, শাশ্বত এবং নিত্য। বিশুদ্ধ বুদ্ধির উজ্জ্বল আলোকে আমরা সেই ভাবমূর্ত্তিকে দেখতে পাই। সুতরাং প্লেটোর মতে ইন্দ্রিয়জগৎ একটা ছায়া-সত্তার জগৎ, এখানে কোন বস্তুকেই তার সত্য রূপে দেখা যায় না, যেতে পারে না।

অতএব এই ছায়ার জগতের কোন কিছুর জন্যই ব্যাকুল হওয়া মানুষের লক্ষ্য হ'তে পারে না। মানুষের লক্ষ্য সত্যজ্ঞান অর্জ্জন করা; সত্যজ্ঞান হলেই মানুষের হৃদয়ে অবিচল শান্তি প্রতিষ্ঠিত হবে, মানুষ হাসিকান্নার দুঃখদ্বন্দ্বের ঊর্দ্ধে আপনাকে প্রতিষ্ঠিত করতে পারবে। 'দুঃখেষনুদ্বিগ্নমনাঃ সুখেষু বিগতস্পৃহঃ' এই ষ্টোইক (Stoic) আদর্শই প্লেটোর কাম্য। নিরুদ্বেগ অচঞ্চল মনের অবস্থাই হ'ল মানুষের লক্ষ্য। এই লক্ষ্যকে সামনে রেখে প্লেটো কাব্যকলার প্রয়োজন নির্ণয়ের চেষ্টা করেছেন।

এই জগতের সমস্ত বস্তুই যেমন শাশ্বত ভাবজগতের একটি অত্যন্ত অসম্পূর্ণ ছায়ামাত্র, তেমনি কাব্য এবং চিত্রশিল্পও হচ্ছে এই ইন্দ্রিয়জগতেরই একটা অসম্পূর্ণ অনুকরণমাত্র। অনুকৃতি মাত্রই অসম্পূর্ণ জ্ঞানের ফল। যে একটা ফলের ছবি আঁকবে তার পক্ষে ফল সম্বন্ধে বিশেষ কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, বাইরের রূপটাই তার অনুকরণের বস্তু। স্থান-কাল-পাত্রভেদে প্রত্যেক বস্তুরই প্রতীয়মান রূপের ভিন্নতা ঘটে, সুতরাং শিল্পী প্রতীয়মান রূপের অনুকরণ ক'রে প্রাকৃত জনকে মুগ্ধ করলেও, এ কথা স্বীকার্য্য যে শিল্পীর পক্ষে বস্তুর সত্যজ্ঞান অনিবার্য্য নয়, এমন কি প্রয়োজনও নয়। তার পর শিল্প মাত্রই—যথা চিত্র ও কাব্য—ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য জগতের অনুকরণ হওয়ায় তা অনুকরণের অনুকরণ এবং এই জন্য সত্য থেকে অনেক দূরে। তাই প্লেটো বলেন যে কবি এবং চিত্রকরেরা অনুকরণ করেন কতকগুলি মিথ্যা প্রতীতির, সুতরাং কখনও তাঁরা সত্যজ্ঞান দিতে পারেন না। অনুকরণ একটা প্রমোদ মাত্র, কোন গভীর সাধনা নয়।

চিত্রশিল্পী কোন বস্তুকে তার পারিপ্রেক্ষিক অনুযায়ী আঁকতে বাধ্য; তাতে বস্তুর বাস্তবিক আয়তন সম্বন্ধে কোন জ্ঞানের প্রয়োজন নেই, কেবল প্রতীয়মান আকৃতি (যা অঙ্কশাস্ত্রের সাক্ষ্য অনুযায়ী মিথ্যা) নিয়েই তার কারবার। অনুকরণ ব্যাপারটাই প্রথমতঃ ভ্রান্ত, তার ওপর প্রতীতি অর্থাৎ ভ্রান্তির অনুকরণ হওয়ায় প্লেটো চিত্রশিল্পকে দ্বিগুণিত মিথ্যা ব'লে মনে করেন।

কবি সম্বন্ধেও তাঁর ধারণা যে এর চেয়ে ভাল তা নয়। প্রথমতঃ, কাব্যসাহিত্যকে প্লেটো তিনটি শ্রেণীতে ভাগ করেছেন। ভাষায় কবি তাঁর বক্তব্যকে দুটি উপায়ে প্রকাশ করতে পারেন এবং ক'রে থাকেন; প্রথম হ'ল অনুকরণ-মূলক অর্থাৎ নাটকীয় পদ্ধতিতে চরিত্রবিশেষের মাঝ দিয়ে, আর দ্বিতীয় হ'ল বিবরণমূলক অর্থাৎ দ্রষ্টার বর্ণনা দ্বারা। তাতে কাব্যের তিনটি শ্রেণী দাঁড়াল; প্রথম, অনুকরণ-মূলক ট্রাজেডি এবং কমেডি, যাতে কবি গোপন থেকে কতকগুলি কল্পিত মানবচরিত্রের বার্ত্তালাপ এবং কর্ম্মের দ্বারা বক্তব্যকে পরিস্ফুট ক'রে তোলেন; দ্বিতীয়, কবি কতকগুলি ব্যাপারকে নিজের মুখে বর্ণনা ক'রে যান; এই শ্রেণীতে প্রাচীন কালের প্রশস্তিগীতি (Dithyrambus) এবং আধুনিক কালের গীতিকবিতা এবং কাহিনী পড়তে পারে; তৃতীয়, মহাকাব্য যাতে কোথাও কোথাও নাটকীয় ভঙ্গীতে বার্ত্তালাপও আছে, আবার কোথাও কোথাও কবির নিজস্ব বর্ণনাও আছে। আধুনিক গল্প-উপন্যাসও এই শ্রেণীতেই পড়ে। এই তিন শ্রেণীর মধ্যে কোন্ শ্রেণীর কাব্য উৎকৃষ্ট তা নিয়ে প্লেটো আলোচনা করেছেন। সে কথা পরে বলব।

কবি ভাষায় প্রকাশ করেন মানবজীবনেরই একটা প্রতিচ্ছায়া বা অনুকৃতি।

"Poetic imitation imitates men acting either voluntarily or involuntarily, and imagining that in their acting they have done either well or ill, and, in all these cases, receiving either pain or pleasure."

কাব্যসাহিত্য সমালোচনায় নাটকীয় সাহিত্য এবং মহাকাব্যই বিশেষ ভাবে প্লেটোর লক্ষ্য ছিল ব'লে মনে হয়। তাই তিনি উদ্ধৃত অংশে বলছেন যে কাব্যে কবি দেখান কতকগুলো মানুষকে যারা ইচ্ছায় অনিচ্ছায় কতকগুলো কাজ করে এবং তারা 'ভাল করেছি,' 'মন্দ করেছি' এই রকম মনে করে এবং সুখ কিংবা দুঃখ ভোগ ক'রে থাকে। ফল কথা, কবি মানুষেরই বাস্তব জীবনের একটা অনুকৃতি রচনা ক'রে থাকেন।

এখানে প্লেটোর সমালোচনাটি লক্ষ্য করবার বিষয়। তিনি বলেন যে প্রাকৃত মানুষের প্রায় প্রত্যেক কর্মই নৈতিক দ্বিধাগ্রস্ত। প্রত্যেক কর্মের মুখেই তাকে একটা দোটানায় পড়তে হয়; এক দিক থেকে বিচার এবং নিয়ম (সংযম) তাকে টেনে ধরে আর অন্য দিক থেকে প্রবৃত্তি-তাকে দুর্দমনীয় প্রলোভন দেখিয়ে আকর্ষণ করতে থাকে। বিচার এবং জ্ঞান মানুষকে শান্ত করে; জ্ঞানী মনুষ্যের কর্ম বৈচিত্র্যহীন এবং সাধারণ মানুষের নিকট দুর্বোধ্য। কিন্তু প্রবৃত্তির টানে মানুষের কর্মে আসে বহুল বিচিত্রতা, যদিও তা অনুকরণীয় নয়। প্রাকৃতজন কিন্তু প্রবৃত্তিমূলক কর্ম দেখতেই ভালবাসে এবং কবিও তাই মানবাত্মার প্রবৃত্তি পরিচালিত বিচিত্র রূপ (the passionate and the multiform part of the soul) দেখাতেই চেষ্টা করেন। কবি মানুষের প্রবৃত্তিকে (যা বিচারবিরোধী) উত্তেজিত এবং পুষ্ট করেন আর বিচারবুদ্ধিকে নষ্ট করেন। এই জন্যই কবি জীবনের অনুকরণের দ্বারা এক রকম মিথ্যাকেই অনুকরণ করেন। সুতরাং কবির রচনা আদর্শ মানব-সমাজের পক্ষে কিছুতেই কল্যাণকর হ'তে পারে না।

কি ট্র্যাজেডি, কি কমেডি—উভয় প্রকারের নাটকই যে মানুষের সত্যলাভের অন্তরায় তা প্লেটো যুক্তিপ্রয়োগের দ্বারা প্রমাণ করেছেন। ট্র্যাজেডির লক্ষ্য হচ্ছে কোন ভালমানুষের দুর্গতির অবস্থা দেখিয়ে আমাদের মনকে দুঃখের দ্বারা অভিভূত করা এবং হৃদয়কে করুণায় গলিয়ে দেওয়া। প্লেটো বলেন, পরের দুর্দশায় দুঃখ করতে যদি আমরা অভ্যস্ত হই তা হ'লে নিজের দুঃখেই বা অভিভূত হবার প্রবণতা হবে না কেন? অথচ দুঃখের দ্বারা অভিভূত হবার সাধনা মানুষের নয়, মানুষের সাধনা হচ্ছে দুঃখকে জয় করবার।

কমেডির লক্ষ্য হচ্ছে হাস্যরসের সৃষ্টি করা; কোন-না-কোন মানুষের দ্বারা অনুষ্ঠিত অসদাচরণের প্রতি সহানুভূতি না ঘটলে হাস্য সৃষ্টি হ'তে পারে না। পরের দ্বারা অনুষ্ঠিত অবাঞ্ছনীয় কর্মের দিকে তাকিয়ে এই যে আনন্দ উপভোগ, তা কখনও জীবনের আদর্শ হ'তে পারে না।

"It nourishes and waters those things which ought to be parched and constitutes as our governor those which ought to be governed in order to become better and happier."—Republic Bk. X.

তবে কি প্লেটো কোন রকম কাব্যসাহিত্যেরই প্রয়োজন স্বীকার করেন না? পূর্ব্বেই যে তিন শ্রেণীর কাব্যের কথা বলা হয়েছে সেটা প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে, বিষয়বস্তুর দিক থেকে নয়। প্রকাশভঙ্গীর দিক থেকে মহাকাব্য-শ্রেণীর রচনা যে মনোরঞ্জন করে এবং প্রাকৃত জীবনের অনুকৃতিমূলক নাট্যসাহিত্য যে শিশু এবং জনসাধারণকে অত্যন্ত আনন্দ দেয় সে কথা প্লেটো মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করেছেন। তথাপি রিপব্লিকের আদর্শ রক্ষার জন্য প্লেটোকে যেন দীর্ঘনিশ্বাস ফেলেই ঐ সমস্ত কাব্যকে বর্জ্জন করতে দেখি।

"But nevertheless let it be said that if any one show reason for it, that the poetry and the imitation which are calculated for pleasure ought to be in a well-regulated city, we for our part shall gladly admit them, as we are at least conscious to ourselves that we are charmed by them. But to betray what appears to be truth were an unholy thing."—Republic, Bk. X.

কি করুণ সত্যনিষ্ঠা!

প্লেটোর মতে যা-কিছু মানুষের ব্যক্তিগত জীবনে অনুকরণীয় নয়, নাটকেও তার অনুকরণ কোন সৎ ব্যক্তিই

করতে পারে না। এই কারণে প্লেটো মহাকাব্যের পক্ষপাতী, কেননা মহাকাব্যের অধিকাংশই বর্ণনাত্মক এবং যেখানে আদর্শ আচরণের চিত্র থাকে তা যদি নাটকীয় ভঙ্গীতে রচিত হয় তা হ'লে তার অনুকরণ ক'রে কথক বা অভিনেতা সৎ ভাবের দ্বারাই অনুপ্রাণিত হবেন। অনুকরণ যদি করতেই হয় ত সাহসী, সংযত, পবিত্র, স্বাধীনচেতা ব্যক্তির জীবনের অনুকরণই বাঞ্ছনীয় (Republic, Bk. III)।

প্লেটোর নিকট সাহিত্যের প্রকাশরূপ (form) বড় কথা নয়, সাহিত্যের বিষয়বস্তু বা ভাবই (thought) হচ্ছে প্রধান বিবেচনার কথা। সাহিত্যের ভাব প্রকাশের মধ্যে যে গুরুতর নৈতিক দায়িত্ব রয়েছে সে-কথা প্লেটো কিছুতেই বিস্মৃত হ'তে পারেন নি।

ভাবাবেগ, প্রবৃত্তি এ সব জীবনে চাঞ্চল্য আনে, জীবনের সামঞ্জস্যকে নষ্ট ক'রে দেয়। প্লেটো যে গ্রীক ছিলেন সে কথা মনে রাখা দরকার। গ্রীকের সৌন্দর্য্যপ্রিয়তা প্লেটোর শিরায় শিরায়, কিন্তু তাই ব'লে তিনি সৌন্দর্য্যপ্রিয়তাকে সামঞ্জস্যহীন, ছন্দহীন বিলাসে পরিণত করবার পক্ষপাতী মোটেই ছিলেন না। বুদ্ধিকে তাই তিনি হৃদয়ের উপরে স্থান দিয়েছিলেন। এক দিকে তিনি যেমন সঙ্গীতকে সর্ব্বশ্রেষ্ঠ স্থান দিয়েছেন এই ব'লে যে সঙ্গীতশিক্ষা হচ্ছে অত্যন্ত দরকার,

"...because that the measure and harmony enter in the strongest manner into the inward part of the soul, and most powerfully affect it, introducing decency along with it into the mind, and making everyone decent if he is properly educated, and the reverse if he is not."—Republic, Bk. III.

তেমনি এ কথাও বলতে হয়েছে যে আমরা কখনও গায়ক হতেই পারব না যদি সংযম, ধৈর্য্য, উদারতা প্রভৃতি সদ্‌গুণ আমাদের মধ্যে না থাকে।

আর্টের সঙ্গে শিল্পীর চিত্তোৎকর্ষের ঘনিষ্ঠ যোগ আছে ব'লেই প্লেটো মনে করতেন। গ্রীকশিল্পে আমরা যে পরম সুন্দর সামঞ্জস্য, সুষমা এবং অচল স্থৈর্য্য দেখতে পাই তাহা গ্রীকচিত্তেরই উৎকর্ষের প্রতিচ্ছবি। প্লেটোর মতে শিল্পের রূপ, ছন্দ, সামঞ্জস্য শিল্পীর চরিত্রগত উৎকর্ষের সঙ্গে ঘনিষ্ঠ ভাবে সম্বদ্ধ। যেখানে চরিত্রে নেই সামঞ্জস্য, নেই সমন্বয়, নেই চিন্তার স্পষ্টতা, নেই সংযম, সেখানে শিল্পসৃষ্টিতেও ছন্দহীনতা, রূপের অস্পষ্টতা, রচনার সামঞ্জস্যহীনতা দেখা দেবেই ;

"...and the impropriety, discord, and dissonance are the sisters of ill expression and ill sentiment and their opposites are the sisters and imitations of sober and good sentiment."—Republic, Bk. III.

যুব-মনের উপর সাহিত্যের প্রভাব গভীর ব'লেই প্লেটো কবি, সাহিত্যিক ও শিল্পীদের উপর এত কঠোর হয়েছিলেন। সমস্ত রকমের শিল্পীদের লক্ষ্য করেই তিনি বলছেন,

"But we must seek out such workmen as are able by the help of a good natural genius to trace the nature of the beautiful and the decent that our youth dwelling as it were in a healthful place, may be profited at all hands; whence from the beautiful works something will be conveyed to the sight and hearing, as a breeze bringing health from salutary places, imperceptibly leading them on directly from childhood to the resemblance, friendship and harmony with right reason" —Republic, Bk. III.

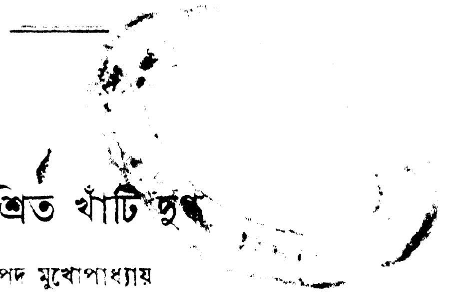
চরিত্রের উপর শিবসুন্দরের এত বড় প্রভাব স্বীকার করেছিলেন ব'লেই প্লেটো সঙ্গীতকেও এত বড় স্থান দিয়েছিলেন ; কিন্তু সঙ্গীতেও সুরসমন্বয় এবং ছন্দ ছাড়া ভাবাবেগ (sentiment) ব'লে একটা বস্তু আছে। তাই এখানেও প্লেটো সেই সব ভাবাবেগ এবং তাদের প্রকাশক সুর এবং ছন্দকে বর্জ্জন করবার কথা না ব'লে পারেন নি। শেষ পর্য্যন্ত দুঃখের সঙ্গে প্লেটো কবিকে তাঁর নব সমাজ থেকে নির্ব্বাসিত করতে বাধ্য হয়েছেন। একমাত্র ভগবৎ-স্তুতি আর সৎকর্ম্মের প্রশস্তিকাব্য ছাড়া আর কোন কাব্যকেই প্লেটো অনুমোদন করতে প্রস্তুত হন নি।

কোনও এক জনের পক্ষে একটি বিষয়কেও সম্পূর্ণরূপে জানা কত কঠিন। অথচ কবিকে তাঁর কাব্যে, নাটকে কত রকমের চরিত্র এবং বিষয় নিয়েই আলোচনা করতে হয়, কত বিভিন্ন রকমের বিভিন্ন বৃত্তির মানুষের জীবনকে অঙ্কিত করতে হয়। নানা যুক্তিপরম্পরার সাহায্যে প্লেটো তাঁর রিপবলিক গ্রন্থে কবির এই সমস্ত চেষ্টাকে মিথ্যা অনুকরণ

ব'লে প্রমাণ করেছেন এবং কবি যে যে-কোন বিষয়ে সত্যজ্ঞান-বর্জ্জিত এবং কেবল বাহ্য ভাবের অনুকরণকারী তা দেখিয়ে কাব্যকে বর্জ্জন করবার যুক্তি প্রদর্শন করেছেন। কিন্তু প্লেটো মনে মনে কবির রচনাকে এ রকম মিথ্যা মনে করতে দ্বিধাগ্রস্ত ছিলেন ব'লেই মনে হয়। হোমারকে নিন্দা ক'রেও তিনি মনে মনে হোমারের রচনায় মুগ্ধ ছিলেন এবং তা যে মিথ্যা জ্ঞানের ফল তাও স্বীকার করতে পারেন নি। প্লেটোর আয়ন (Ion) বা ইলিয়াড নামক কথোপকথন-নাট্য থেকে আমরা তাই তাঁর মুখে অন্য রকমের উক্তি পাই। এখানে তার উল্লেখ অপ্রাসঙ্গিক হবে না। যদিও কবির পক্ষে নানা বিষয়ে জ্ঞানসম্পন্ন হওয়া প্রাকৃতিক উপায়ে অসম্ভব, তবু কবি যে দৈব শক্তির প্রেরণায় নানা বিষয়ে গভীর এবং সত্য অন্তর্দৃষ্টি দেখিয়ে থাকেন, তা প্লেটোকে স্বীকার করতে হয়েছে। তাই তিনি বলছেন,

"For the authors of those great poems which we admire, do not attain to excellence through the rules of any art but they utter their beautiful melodies of verse in a state of inspiration and, as it were, possessed by a spirit not their own."—Ion.

"For a poet is indeed a thing ethereally light, winged and sacred, nor can he compose anything worth calling poetry until he becomes inspired, and, as it were, mad, or whilst any reason remains in him. For whilst a man retains any portion of the thing called reason, he is utterly incompetent to produce poetry or to vaticinate."—Ion.



জলমিশ্রিত খাঁটি দুগ্ধ

শ্রীরামপদ মুখোপাধ্যায়

অনেক শহর এবং পাড়াগাঁয়ের জল খাইয়া এমন এক জায়গায় বদলি হইলাম যেখানে পান করিবার মত ভাল জলও সুপ্রাপ্য নহে।

নিতান্ত পাড়াগাঁ; মানুষের অপ্রাচুর্য্য ও বনের বিস্তৃতি প্রথম দর্শনেই মনকে ভয়ে ভরাইয়া তুলে। দশ মাইলের মধ্যে রেল-লাইন নাই, সপ্তাহে একদিন হাট বসে, হাই স্কুল যাইতে হইলে দেড়ক্রোশব্যাপী প্রকাণ্ড এক মাঠ এবং মাইলব্যাপী বন পার হইয়াও নিস্তার নাই, সামনে এক নদী পড়ে; খেয়ার কড়ি দিয়া সেটুকু পার হইতেই হয়। অথচ এমন জায়গায় পোষ্ট আপিস আছে! এবং পোষ্ট আপিস আছে বলিয়াই এই কাহিনীর সূত্রপাত।

প্রথম হইতেই সুরু করি। চাকরি গ্রহণের সঙ্গে সঙ্গে যাযাবরবৃত্তি আরম্ভ হইয়াছে, কোথাও একটা বছর ধীরেসুস্থে বাস করিতে পাইলাম না। সম্মুখপানে সে অনবরত অগ্রসর হইবার তাগিদ দিতেছে; সেই তাগিদেই এক দিন এই অখ্যাতনামা পল্লীতে আসিয়া পৌঁছিলাম। রেল-ষ্টেশন হইতে পল্লীর দূরত্ব দশ মাইলেরও বেশী। অবশ্য, গাড়োয়ান বলিয়াছিল, 'কোশ দুই, বাবু।' সে ক্রোশ অধিকাংশ স্থলে 'ডালভাঙা' হইতে বাধ্য। ক্রোশ 'ডালভাঙা' হইলেও গাড়ীর ভাড়া 'গিনিবেঁধা' হয় না, এইটুকুই যা সান্ত্বনা। শহরের 'পাথর-বওয়া' মাইলের মধ্যে যে সান্ত্বনাটুকু নাই!

কিন্তু এই তেপান্তরের মাঠে এমন একখানি গো-যান যে মিলিবে এ দুরাশা স্বপ্নেও ভাবি নাই; কাজেই গাড়োয়ানকে জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমরা রোজ ট্রেনের সময় হাজির থাক বুঝি?"

গাড়োয়ান হাসিয়া বলিল, "না বাবু, গাঙ্গুলী বাবু বললেন, ম্যাষ্টের আসবে আজ, মধু তুই যা।"

সবিস্ময়ে বলিলাম, "কিন্তু আমি ত কাউকে আসবার কথা জানিয়ে চিঠি লিখি নি মধু?"

মধু পুনরায় হাসিয়া উত্তর দিল, "এজ্ঞে ঠাকুর যে মোদের অন্তর্যামিনী। তিনি সব বুঝতে পারে।"

"কিন্তু তিনি কে — তাই যে জানি নে।"

"গেলেই জানতে পারবা, বাবু। তিনি না থাকলে গাঁয়ে কেউ তিষ্ঠুতে পারতো! কত নেকানিকি ক'রে ডাক আপিস বসালে।"

মধুর বাক্যস্রোতের মধ্যেই আমি সপরিবারে গো-যানে চাপিয়া বসিলাম এবং আশু বিপদের দায় হইতে রেহাই পাইয়া সেই 'অন্তর্যামিনী' গাঙ্গুলী ঠাকুরের উদ্দেশে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম।

* * *

গ্রামের প্রান্ত সীমায় চেঁচাবেড়া দিয়া ঘেরা ছোট একখানি বাড়ী। বাড়ীতে খান তিন চার কুঠরি আছে, সব ক-খানিই খড়ের চালা। বাহিরের বড় ঘরখানিতে বসে পোষ্ট আপিস, ভিতরের ছোট কুঠরি দুখানি মাষ্টারের বাসগৃহ অর্থাৎ কোয়ার্টার। চাকরি লইয়া অবধি বহু বাসগৃহের আস্বাদ লওয়া গিয়াছে, সুতরাং চালা দেখিয়া বিশেষ চিন্তিত হইলাম না।

যাঁহাকে অবসর দিতে আসিয়াছি তিনি বাহিরের বড় চালাখানিতে অর্থাৎ আপিস-ঘরে দড়ির খাটিয়ায় কাঁথা মুড়ি দিয়া পড়িয়া ছিলেন। ভাদ্র মাসে কাঁথামুড়ি দেওয়ার অর্থ মফস্বলবাসীদের বিশেষ করিয়া ব্যাখ্যা করিয়া দিতে হয় না। ভদ্রলোক মাসের প্রথম হইতেই 'সিক' রিপোর্ট করার ফলে মাসকাবারে 'রিলিফ' আসিয়া পৌঁছিয়াছে।

খাটিয়ার পাশে উঁচু টুলে যিনি বসিয়াছিলেন তিনিই আমাদের 'অন্তর্যামিনী' গাঙ্গুলী মহাশয়। বয়স ৪৫।৪৬, চেহারার জৌলুষ আছে। ফরসা এবং গোলগাল। স্থূলত্ব-হেতু খর্ব্বাকৃতি। মাথায় টাক এবং মুখে হাসি; লোকটি সৌম্যদর্শন।

আমাকে দেখিয়াই চিনিলেন এবং যুক্তকর ললাটে ঠেকাইয়া বলিলেন, "নমস্কার। পথে অনেক কষ্ট হয়েছে নিশ্চয়, কিন্তু উপায় কি বলুন?"

পরে গো-যানের পানে চাহিয়া ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "পরিবার নিয়েই এসেছেন? বেশ, বেশ। যান, ওঁদের বাড়ীর ভেতরে যেতে বলুন। এঁর কেউ নেই,—ব্যাচিলার কিনা। তাই দেখুন না, নিজে নাওয়া-খাওয়া ছেড়ে দিনরাত রুগীর পাশে ব'সে আছি। এদিকে আপিসের কাজ তাও আমায় করতে হয়। বিদেশবিভূঁই—আমরা না দেখলে কে দেখে বলুন?"

প্রথম দর্শনেই লোকটির উপর শ্রদ্ধা হইল। বিদেশে এত বড় সাহায্য ঈশ্বরের দয়া ছাড়া মেলে না। এই রুগ্ন লোকটির সেবা যত না হউক, পোষ্ট আপিসের কাজগুলি সারিয়া দিয়া উঁহার ভবিষ্যতের ভাবনাটুকু যে দূর করিয়া দিয়াছেন সেজন্য ভাষায় কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা চলে না। রোগ দু-দিন পরে সারিয়া যাইবে, কিন্তু চাকরি গেলে ইহজীবনে সে-ধন আর মিলিবে না।

নমস্কার করিতেই হাত ধরিয়া হাসিয়া বলিলেন, "থাক, ভায়া, থাক। ওরে বিন্দু, বিন্দু, বৌমাদের বাড়ীর ভেতর নিয়ে যা। হাতমুখ ধোবার জল তোলা আছে ত? ঘরদোর সব দেখিয়ে দে। আর দেখ, চট ক'রে রাখু ঘোষকে খবর দে—সেরটাক দুধ এখনই চাই। ছোট ছেলে রয়েছে, দুধ না হ'লে ত চলবে না।"

বিন্দু মেয়েদের ঘরদোর চিনাইয়া দিয়া দুধের খোঁজে গেল। গাঙ্গুলী আমাকে বলিলেন, "এক ঘণ্টা পরে আপিস খুলবে। তুমি ভাই হাত মুখ ধুয়ে কিছু জলটল খেয়ে এখানে এসে ব'স। আমি ততক্ষণে এঁকে ষ্টেশনে পৌঁছে দেবার ব্যবস্থা করি। এই গাড়ীতে না গেলে ট্রেন ধরতে পারব না।"

রুগ্ন ব্যক্তি হাত নাড়িয়া বলিল, "চার্জ্জ বুঝিয়ে দিতে হবে।"

গাঙ্গুলী হাসিয়া বলিলেন, "চার্জ্জ! বলে আপনি বাঁচলে বাপের নাম! এই যে ক-দিন বেহুঁস হয়ে পড়েছিলে—চোরডাকাতে সব লুটেপুটে নিলে কি করতে? কাকে বুঝিয়ে দিতে চার্জ্জ? ভারি ত পাঁচ সিকের হিসেব, তার আবার বুঝিয়ে দেওয়া? নাও, চটপট সই কর, তুমিও সই কর ভায়া। ফিরে এসে আমিই বুঝিয়ে দেব চার্জ্জ—সিন্দুকের চাবি আমার কাছেই রইল।"

গাঙ্গুলী মহাশয় রোগীকে লইয়া গাড়ীতে উঠিলেন, আমি এধার ওধার ঘুরিয়া ডাকঘরের সম্পত্তি দেখিতে লাগিলাম।

যে-ভদ্রলোক অফিসের চার্জ্জে ছিলেন তিনি রুগ্ন বলিয়াই ঘরখানিতে বিশৃঙ্খলা বর্ত্তমান। পূর্ব্ব কোণে স্তূপাকৃতি ফর্ম্ম এবং তার গায়েই অনেকগুলি ব্যাগ। এখানে-ওখানে গালা ও বাতির টুক্‌রা ছড়ানো, সিল-মোহর মেঝেয় গড়াগড়ি খাইতেছে। টেবিলটার উপর কালির দোয়াতটা উল্টানো এবং একমাত্র ব্লটিংখানির কোথাও সাদা রং নাই। ঘরের ঘড়িটা দম দেওয়ার আলস্য হেতু বন্ধ হইয়া গিয়াছে। মেঝেয় পোতা লোহার সিন্দুকটা যে আছে উহাই যথেষ্ট।

বাড়ীর মধ্যে না গিয়া এইগুলির শৃঙ্খলাবিধানে মনোনিবেশ করিলাম। টানা-ড্রয়ার খোলাই ছিল, টানিয়া দেখিলাম—খাম, পোষ্টকার্ড ও টিকিটগুলির মধ্যেও যথেষ্ট গোলমাল। উহারই মধ্যে খানকতক মনিঅর্ডারের ফর্ম্মও গোঁজা রহিয়াছে। একখানি ফর্ম্মে চক্ষু বুলাইতেই চক্ষু আমার কপালে উঠিল। আনাড়ী গাঙ্গুলী করিয়াছেন কি? তিন দিন আগেকার ফর্ম্মগুলি ডেস্‌প্যাচ করেন নাই! আর মনিঅর্ডারের মাশুল যা লইয়াছেন তা পোষ্ট আপিসের কোন আইনেই লিপিবদ্ধ নাই। ত্রিশ টাকার মাশুল লইয়াছেন চার আনা—দশ টাকায় এক আনা! খাম, পোষ্টকার্ড ও টিকিট বোধ হয় শাক-বেগুনের মতই বেচিয়াছেন! ছোট খাতায় কোন হিসাব পর্য্যন্ত নাই।

কিন্তু সেজন্য ভদ্রলোককে দোষ দেওয়া চলে না। পরের হইয়া খাটিয়া চাকরিটুকু যে বজায় রাখিয়াছেন এই যথেষ্ট। যথাসময়ে ডাক চালান দিয়াছেন ও বিলির ব্যবস্থা করিয়াছেন, জিনিষ কিনিতে আসিয়া কেহ খালি হাতে ফেরে নাই বা মনিঅর্ডারে ব্যর্থমনোরথ হয় নাই। যেমন করিয়া হউক, অভিযোগ তাহাদের মিটাইয়াছেন।

জমার খাতা ও মজুত মালে মিলাইয়া এক টাকা সাড়ে চৌদ্দ আনা কম হইল, মনিঅর্ডার কমিশনেও এক টাকা শর্ট। এই ত গেল মোটামুটি হিসাব। লোহার সিন্দুক না খুলিলে ক্যাসের ভাগ্যে কি আছে কে বলিবে? অল্প মাহিনা, কাজেই চিন্তিত হইয়া পড়িলাম।

এমন সময় ছেলে আসিয়া ডাকিল, "বাবা, গয়লা এসেছে।"

ঘরের দুয়ার বন্ধ করিয়া বাড়ীর ভিতর প্রবেশ করিলাম।

* * *

আমাকে দেখিয়া গয়লা ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিল। লোকটির বয়স হইয়াছে। গলায় ত্রিকণ্ঠী তুলসীর মালা, কপালে ও কানে ছোট কয়েকটি ফোঁটা, বেশ ভক্তিমান। বলিল, "দুধ যা দেব বাবু এ তল্লাটে কোথাও এমনটি পাবেন না। খেঁড়ো গাইয়ের দুধ—খেতে যেন মধু। যতটুকু খাবেন খোকারা, ততটুকু রক্ত বাড়বে। কিন্তু দামের বেলায় বাবু, পাঁচ সেরের বেশী হবে না।" শহরে টাকায় তিন সের দুধও কিনিতে হইয়াছে, পাঁচ সেরে আপত্তি করিব কেন?

বলিলাম, "দেখি তোমার দুধ?"

গোয়ালা হাসিমুখে ভাঁড় তুলিয়া ধরিল।

কিন্তু ভাঁড় নাড়ানাড়িতে দুধে যে ফেনা জমিয়াছে তাহাতে ভেজাল কিছু বোঝা গেল না, তীক্ষ্ণদৃষ্টিতে সেদিকে চাহিয়াই রহিলাম।

ঘোষের পো খপ করিয়া আমার ডান হাতখানি টানিয়া ভাঁড়ের মধ্যে চুবাইয়া দিল এবং হাসিমুখে কহিল, "দেখ বাবু।"

সাদা হাত দেখিয়াও এইটুকু বুঝিলাম, দুধ খাঁটি হইতে পারে কিন্তু একটু বেশী মাত্রায় তরল যেন। সে-কথা বলিলাম।

ঘোষের পো বলিল, "ওই ত বাবু খেঁড়ো গাইয়ের মজা। দুধ পাতলা অথচ খেতে মিষ্টি। আপনারা দেবতা, আপনাদের কি ঠকাতে পারি! রাম! রাম! সে ব্যবসা আমার দ্বারা হবে না। এতে যদি দু-বেলা পেট ভ'রে না জোটে, নাই জুটল। দুধে জল দিলে কি হয় জানেন? গামছা দুধের রংই বার হয়। রাম! রাম! ধর্ম্মপথে থাকলে আদ্ধেক রাত্তিরে ভাতের ভাবনা? রাধে কৃষ্ণ!"

সুতরাং রাধু ঘোষই বাহাল হইল।

* * *

গ্রামখানি ছোট হইলেও পোষ্ট আপিসে ভিড় নেহাৎ মন্দ জমে না। একমাত্র পিওন বিপিনকে খাম-পোষ্টকার্ডের বাক্স সাজাইয়া দিয়া বলিলাম, "বাইরে ব'সে বেচ গে।"

বিপিন খুশী মনে বলিল, "এ-কদিন গাঙ্গুলী ঠাকুর বাক্সোয় হাত দিতে দেয় নি, আর খদ্দেরের সঙ্গে কি দর-কষাকষি! যেন কোষ্টার (পাটের) বাজার পেয়েছেন। আরে কোম্পানী আইন করেছে—এক পয়সা কম হ'লে রক্ষে আছে! হ'লও তেমনি, লাভের গুড় পিঁপড়েয় খেলো। আজ আট বছর পিওনি করছি—হাঁঃ, লেখাপড়া জানলেই আর এ-কাজ করতে হয় না।"

এ-বেলার কাজ এক রকমে চলিয়া গেল, গাঙ্গুলী মহাশয় আসিলেন না। লোহার সিন্দুকটা একবার খুলিয়া জিনিষ-গুলি মিলাইতে পারিলেই নিশ্চিন্ত হইতাম!

বৈকালে পোষ্ট আপিস বন্ধ করিব কিনা ভাবিতেছি এমন সময় হাসিতে হাসিতে গাঙ্গুলী আসিলেন ও আপন স্বভাবসিদ্ধ মিষ্ট স্বরে বলিলেন, "দুটোয় ফিরে ওবেলা আর আসতে পারলাম না, ভাই। বুড়ো মানুষ, চারটি না-খেয়ে ও একটু না-ঘুমিয়ে—তার ওপর দু-দিন রাত জাগা ...তা ভায়া, কাজকর্ম্মের অসুবিধা কিছু হয় নি ত? হবে কোত্থেকে, গুছিয়েই ত রেখেছিলাম সব।"

একটু ইতস্তত করিয়া বলিলাম, "না তেমন অসুবিধে কিছু হয় নি—কেবল—"

গাঙ্গুলী ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, "হাঁ, ভাল কথা। রাখু ঘোষ দুধ দিয়ে গেছে ত? বাজারহাটের অসুবিধা—"

"আজ্ঞে, সে সব কিছু হয় নি। কেবল পোষ্ট আপিসের ক্যাশ—"

গাঙ্গুলী পরম নিশ্চিন্তের মত হাসিলেন, "আরে রাম বল—ক্যাশ! তোমাদের পোষ্ট আপিসের ছোকরাদের ওই এক ভাবনা—ক্যাশ! ভারি ত ন-শ পঞ্চাশ টাকা আছে সিন্দুকে—কেবল ডালা তুলে হাতব্যথাই সার! শোন তবে। সে-বার সদর জেলায় খুলল কৃষিপ্রদর্শনী। আমাদের গাঁ থেকে চাষারা আমায় করলে প্রেসিডেণ্ট। ভাল ভাল জিনিষ খুঁজে-পেতে পাঠানো গেল তাতে—আর চাঁদা যা উঠল তাও জমা রইল আমার কাছে। বড় কম টাকা নয়, তিন-শ কুড়ি টাকা ন-আনা দেড় পয়সা। একজিবিশন শেষ হয়েছে আজ তিন বছর—টাকা আমার কাছে এখনও জমা আছে। তার হিসেব রাখতে হয় আমাকে, জান?"

গাঙ্গুলী যেন দম-দেওয়া গ্রামোফোন; কোন বিষয়ের কিছু পাইলেই হইল, শেষ বক্তব্য না বলিয়া থামিবেন না।

কিন্তু আমি কথার স্রোতে খেই হারাইলাম না। ক্যাশ ন-শ পঞ্চাশ টাকার না হইলেও দায়িত্ব যথেষ্ট। পোষ্ট আপিসের সারপ্রাইজ ভিজিটের ঠেলা কিরূপ জানি, একটি পয়সার ঘাটতি হইলে জেলখানার দরজা আপনা হইতে ফাঁক হইয়া যায়।

বলিলাম, "সে জন্য নয়। আপনি কাজ করেছেন পরের উপকারই করেছেন, কিন্তু মনিঅর্ডারের ফী কিছু কম নিয়েছেন।"

পরম বিস্ময়ে চক্ষু কপালে তুলিয়া গাঙ্গুলী বলিলেন, "অ্যাঁ, বল কি! কম নিয়েছি ফী? আরে, মাষ্টার ছোকরা যে শুয়ে শুয়ে আমায় সব ব'লে দিত। হা আমার কপাল! জ্বরের ঘোরে মানুষের এমন ভুলও হয়।" সত্য সত্যই তিনি কপালে করাঘাত করিলেন।

বিব্রত হইয়া বলিলাম, "আহা-হা! আপনার দোষ কি! আপনি কি জানেন ওর। ও সামান্য পয়সা, ওতে কিছু যাবে আসবে না। তা ছাড়া খাম-পোষ্টকার্ড বিক্রীর পয়সাও কিছু কম পড়েছে।"

"তবে ত ভাল করেই পিণ্ডি চটকেছি দেখছি। হা তোর বরাত! চাষাদের হয়ে একজিবিশনে গিয়েও অমনি ভুল ক'রে মরেছিলাম। যে হৈ-হৈ হট্টগোল—আলো, বাজনা, নাচ, গান, খদ্দেরের ভিড়—দশ-দশটা টাকা পকেট থেকে দিলাম গুনাগার, তার পর মরি কেঁদে। চাষারা বলে—কাঁদ কেন দেবতা, দশটা টাকা বইত না।...আবার বলতে দুঃখও হয়, হাসিও পায়—ওই যে টাকা জমা আছে আমার কাছে প্রত্যেক মাসে ওর সুদ ফেলে দিই কিনা। প্রায়ই ভুল। ছ-আনার জায়গায় দিয়ে বসি দশ আনা, পোনে হয়ে যায় চোক! তা ভায়া, কত গরমিল হ'ল?"

"বেশী নয়—প্রায় গোটা-তিনেক টাকা।"

গাঙ্গুলী পুনরায় কপালে করাঘাত করিয়া কহিলেন, "এ ত গেল তিন দিনের ক্যাশ—যা ড্রয়ারে ছিল। আরও সাত দিন পিণ্ডি চটকেছি যে! খোল, খোল, ভায়া সিন্দুক, তোমার ক্যাশ মেলাও ত। ক্যাশের যে এত হাঙ্গাম তা কে জানত!" বলিয়া বৃহৎ চাবিটা ঠকাস্ করিয়া টেবিলের

উপর রাখিলেন। হিসাবে গাঙ্গুলীর ভুল হয় নাই, সমস্ত মিলাইয়া পুরাপুরি দশটি টাকাই কম হইল। গাঙ্গুলী সেই যে হাঁ করিয়া মাথায় হাত দিয়া বসিলেন, পোষ্ট আপিসের বাতি না নিবানো পর্য্যন্ত রাম গঙ্গা কিছুই বলিলেন না। বাতি নিবাইয়া তাঁহাকে ডাকিবামাত্র প্রচণ্ড এক দীর্ঘ-নিশ্বাস ফেলিয়া ভগ্নকণ্ঠে বলিলেন, "কি হবে, ভায়া ?"

বলিলাম, "ক্যাশ পূরণ করে রাখতেই হবে—যেমন ক'রে হোক।"

গাঙ্গুলী হতাশার ভঙ্গী করিয়া বলিলেন, "তাই ত! এই রাত্তিরে কার কাছে হাত পাতি বল ? এক-আধটা নয়, দশ-দশটা টাকা।"

পরের উপকার করিতে গিয়া ভদ্রলোকের এই দুর্গতি! ঘাটতির কথা জানাইয়া নিজেরই আমার লজ্জায় মাথা কাটা গেল। এমন উপকারী বন্ধু, না বলিতে তেপান্তরের মাঠে যিনি গরুর গাড়ী পাঠাইয়া দিয়াছেন, পাছে কোন অসুবিধায় পড়ি এই জন্য ঘরদুয়ার সাফ করাইয়া, ঝির ব্যবস্থা করিয়া, গয়লা ডাকাইয়া, আনাজপাতি চাল-ডাল কাঠকুটা কিনিয়া আত্মীয়ের অধিক পরিশ্রম করিয়াছেন,—সামান্য কয়টা টাকার কথা তাঁহাকে না জানাইলেই মনুষ্যোচিত কাজ হইত।

তাঁহার হাত ধরিয়া বলিলাম, "আপনি কিছু ভাববেন না, আমার কাছে যা আছে দিয়ে ঘাটতি পুরিয়ে রাখব—পরে ও-ভদ্রলোকের কাছ থেকে চেয়ে নিলেই হবে। আমাদের কাজের গলতিতে আপনি কেন 'সাফার' করবেন ?"

গাঙ্গুলী মাথা নাড়িয়া বলিলেন, "না, না, দোষ ত আমারই। না জেনে সব কাজে যেমন এগিয়ে যাই, তেমনি ফলও ফলে হাতে হাতে। অথচ লোকসান হবে জেনেও কারু দুঃখ-কষ্ট দেখলে মনটা আমার বোঝে কই ? যাই হোক ভায়া, আজ তুমি দাও, যেমন ক'রে পারি ও-টাকা আমি শুধবই। রোগা লোককে চিঠি লিখে এ-বিষয় না জানানোই ভাল!"

"আপনি কেন দেবেন ?"

তিনি খপ্ করিয়া আমার হাত ধরিয়া বলিলেন, "ধর্ম্মতঃ এ দায় আমারই। না জেনে আগুনে হাত দিলে হাত কি পোড়ে না, ভায়া ? পোড়ে। তেমনি না বুঝে লোকসান যদি ক'রে থাকি, সে দায় আমার। খবরদার কথাটি কয়ো না। এই পৈতে ছুঁয়ে বলছি,—এ দায় আমার, আমার, আমার। এ লোকসান আমাকেই পোষাতে হবে, না হ'লে ধর্ম্মের কাছে আমি খাটো হয়ে যাব যে ভাই। তবে দু-দিন দেরি হ'তে পারে।"

পরার্থে অম্লানবদনে ক্ষতি স্বীকার করিয়া এক মুহূর্ত্তে গাঙ্গুলী আমার কাছে দেবতা হইয়া গেলেন।

হঠাৎ তাঁহার পায়ে হাত দিতেই তিনি আমাকে বুকে জড়াইয়া ধরিয়া গদগদ কণ্ঠে মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া কহিলেন, "পাগল!"

* * *

পরের দিন গাঙ্গুলীবাড়ী হইতে বড় একটা বারকোশে করিয়া যে সিধা আসিল তাহা আমাদের ক্ষুদ্র সংসারের চার দিনের খোরাক, এবং তার পর উপর্য্যুপরি কয় দিনই গাছের লাউ, কুমড়ার ডাঁটা, পুঁইশাক, পুকুরের মাছ, গরুর দুধ, এমন কি এক দিন মাংসও আসিয়া হাজির। আপত্তি বৃথা।

গাঙ্গুলী মৃদু ভর্ৎসনা করিয়া বলিতেন, "কি বলব, আমার যদি একটা ছোট ভাই থাকত ত এমন আপত্তি করত না! আপত্তি করলেই মনে হয়, যাকে আপন করতে চাই—সে দূরে সরে দাঁড়ায়।"

কথাশেষে দুটি চোখ তাঁহার অশ্রুভারাক্রান্ত হইয়া উঠিত, কোঁচার খুঁটে চোখ ঢাকিয়া তিনি খানিক চুপ করিয়া থাকিতেন।

ইহার পর যাহার এতটুকু হৃদয় আছে সে কি অযাচিত উপঢৌকনে কোন আপত্তি তুলিতে পারে ?

গ্রামের অধিকাংশই চাষাভুষা—লোকগুলি সরল। খাম-পোষ্টকার্ড কিনিতে আসিয়া বা মনিঅর্ডার ও পার্শ্বেল করিতে আসিয়া তাহাদের গ্রাম্যসুলভ কথাবার্ত্তায় বড়ই আমোদ উপভোগ করিতাম।

এক দিন বিপিনের অসুখ হওয়াতে নিজেই খাম-পোষ্ট-কার্ডের বাক্স লইয়া বসিয়াছিলাম। আধবুড়ো-গোছের একটি লোক একটা টাকা ফেলিয়া দুখানি পোষ্টকার্ড চাহিল। পোষ্টকার্ড ও পয়সা ফেরত দিতেই লোকটা সিকি দুয়ানি-

গুলি গুনিয়া বাজাইয়া লইল; পয়সার এ-পিঠ ও-পিঠ দেখিল এবং আমার দিকে চাহিয়া কি যেন বলিবার চেষ্টাও করিল।

মাথা তুলিয়া তাহার বিস্ময়ভাব লক্ষ্য করিয়া প্রশ্ন করিলাম, "কি গো মোড়লের পো, দাঁড়িয়ে কেন? পয়সা মিলেছে ত?"

সে ঘাড় নাড়িয়া বলিল, "এজ্ঞে না কর্ত্তা, এই তিনটে পয়সা বেশী দিয়েছ আপনি।" বলিয়া হাত বাড়াইয়া পয়সা তিনটি আমার টেবিলের উপর রাখিল।

সবিস্ময়ে বলিলাম, "না হে কর্ত্তা, তোমারই ভুল। দুখানা কার্ডের দাম ছ-পয়সা কেটে নিয়ে সাড়ে চোদ্দ আনা ফেরত দিয়েছি তোমাকে।" কথাশেষে পয়সা কয়টি তাহাকে ফেরত দিলাম।

সে অধিকতর বিস্মিত হইয়া কহিল, "বল কি বাবু, এবার ধান-চালের দর কমেছে বলে কোম্পানী বুঝি কার্টের দর চস্তা (সস্তা) করেছে?"

হাসিয়া বলিলাম, "না কর্ত্তা, ও-দাম শীগ্‌গির কমে না, বাড়ে না। অনেক বছর ধরে এই দাম চলছে।"

সে খানিকক্ষণ অবাক হইয়া আমার পানে চাহিয়া বলিল, "তবে যে গাঙ্গুলী ঠাকুর সেদিন বললে, একখানা কার্ট পাঁচ পয়সা—দুখানা ন-পয়সা?"

"তিনি বুড়ো মানুষ, জানেন না, কি বলতে কি বলেছেন।"

"তাই বটে। বড় ভাল মনিষ্যি গো। ঠাকুর না থাকলে মোদের গেরামের যে কি অবস্তাই হ'ত!"

প্রফুল্ল মনে সে চলিয়া গেল।

মনি-অর্ডারের কমিশন দিয়াও অনেকে বিস্মিত ভাবে আমাকে প্রশ্ন করিল, কোম্পানী কবে হইতে গরিবের মুখ চাহিয়া দাম কমাইয়াছেন এবং ধান পাট চাল প্রভৃতির মূল্য হ্রাসের সঙ্গে ইহার কোনরূপ সম্বন্ধ আছে কি না?

সকলকেই এক উত্তর দিলাম এবং কার্য্যশেষে মনের মধ্যে অল্প একটু মেঘ আসিয়া জমিল। দশ দিনের হিসাবে গাঙ্গুলী যে গোলমালটুকু করিয়া বসিয়াছিলেন, ইহাদের কথা হইতে বোঝা যায়, তাহাতে ক্যাশ শর্ট পড়িবার কথা নহে, উপরন্তু অনেক বাড়িবার কথা! অজ্ঞতাবশতই যে গাঙ্গুলী এইরূপ হিসাবের গোলমাল করিয়াছেন তাহা ত মনে হইতেছে না। অনেক ইতস্ততঃ করিয়া অবশেষে সে-কথা তাঁহাকে জানাইলাম।

তিনি অভিযোগ শুনিয়া খানিক স্তব্ধ হইয়া রহিলেন, পরে আপন স্বভাবসিদ্ধ হাসি হাসিয়া বলিলেন, "মুখ্যু ব্যাটারা বলেছে বুঝি ওই কথা? হা আমার কপাল! আমি বলে কোথায় দু-আনার জায়গায় চার পয়সা নিয়ে ক্যাশের দিকে চটেছি! বলি, আহা গরিব মানুষ নিক দু-পয়সা কম—দয়া দাক্ষিণ্য করতে গিয়েই ত তোমার কাছে দেনদার হয়েছি, ভায়া! আর ওরা বলে গাঙ্গুলী ঠকিয়ে নিয়েছে? হায়রে কলিকাল রে!"

অপ্রতিভ হইয়া বলিলাম, "না, না, তা বলে নি ওরা। ওরা জিজ্ঞাসা করছিল—ধান-চালের দর কম হওয়াতে খাম-পোষ্টকার্ডের দাম কমেছে বুঝি?"

গাঙ্গুলী হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন।

"বলছিল বুঝি? মুখ্যু ব্যাটারা। বলবে না কেন, হাঁ কমেছে। চাষার বুদ্ধি কি না, মহাজনে জোঁকের মত রক্ত চুষে খাচ্ছে—টাকায় দু-আনা সুদ—আর খাম-পোষ্ট-কার্ডে দুটো একটা পয়সা দিতে মাথায় বাজ পড়ে। হাড়োর ভালমানুষের নিকুচি করেছে। নিতে হয়, দু-পয়সা বেশী ক'রে আদায় করাই উচিত। এই আপিস বসানোর কম পরিশ্রম—কম খরচ! কত কলম ভেঙেছে, কালি ফুরিয়েছে, কাগজ কিনতে হয়েছে? জানে ওরা? হাড়হাবাতে মুখ্যু চাষার দল জানে সে-সব কথা?"

গাঙ্গুলীর অহৈতুক হাসি ও অকারণ ক্রোধ দেখিয়া আমি বিব্রত হইয়া পড়িলাম। কহিলাম, "যাই বলুন, বড় সরল ওরা।"

গাঙ্গুলী ঘৃতপুষ্ট পাবকশিখার মত দপ্‌ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন, "সরল! ভারি সরল! দেখ নি ত জ্বালা জমিদারের খাজনা দেবার সময়! অম্লানবদনে মিথ্যে কথা বলে, কাছার খুঁটে টাকা লুকিয়ে কান্না জুড়ে দেয়, তাদের জমি থেকে রাতারাতি ধান সরিয়ে গোলা ভর্ত্তি করে। নিমকহারাম বেইমান সব।" রাগ করিয়া গাঙ্গুলী উঠিয়া গেলেন।

* * *

গাঙ্গুলী ত রাগ করিয়া উঠিয়া গেলেন, বাড়ীর মধ্যে গিয়া

দেখি, সেখানকার আকাশেও মেঘ যথেষ্ট। গৃহিণী আসনপিঁড়ি হইয়া বসিয়া ছোট ছেলেটিকে দুধ খাওয়াইবার জন্য কুস্তি-কসরৎ করিতেছেন। দামাল ছেলে হাত-পা নাড়িতেছে আর নবোদ্গত চারিটি দাঁতে মাড়ি চাপিয়া দুগ্ধপানের প্রবল আপত্তি জানাইতেছে, ঝিনুক দিয়া গাল ফাঁক করিয়া দুধ খাওয়াইবার মুহূর্তে চীৎকারও যা করিতেছে তাহাতে ব্রহ্মরন্ধ্র বিদীর্ণ হওয়া কিছুমাত্র আশ্চর্য নহে। আমাকে দেখিয়া ঝিনুক ফেলিয়া ছেলের পিঠে দুম করিয়া একটি কিল বসাইয়া গৃহিণী মন্তব্য প্রকাশ করিলেন, "যেমন হতচ্ছাড়া ছেলে তেমনি তোমার রাখু গয়লার দুধ! ছেলে খাবে কোন্ স্বাদে?"

কচি ছেলের জিহ্বা যে এতটা স্বাদ বোঝে তাহা জানিতাম না। কিন্তু সেজন্য ততটা আশ্চর্য বোধ না করিলেও দুধের ভেজাল অপবাদ আমাকে কম আশ্চর্য করিল না। গৃহিণী বলেন কি! রাখু ঘোষ—গলায় যার তিন থাক মোটা তুলসীর মালা, মুখে যার ধর্মপ্রসঙ্গ ছাড়া কথা নাই, যার খেঁড়ো গাইয়ের পাতলা দুধ চিনির পানার মত মিষ্ট—না, বেশী করিয়া জল মিশাইয়া গৃহিণীই হয়ত এই বিভ্রাট বাধাইয়াছেন। সত্য সত্যই বলিয়া ফেলিলাম, "খোকার দুধে আজ বেশী জল দিয়েছ বোধ হয়।"

"হাঁ তোমার রাখুর কল্যাণে জল আর দুধে ঢালতে হয় না। মুখপোড়া বাতাসা মিশিয়ে দুধ মিষ্টি ক'রে রাখে। যেমন মুখ মিষ্টি, তেমনি মিষ্টি জলো দুধ। মরণ!" কিন্তু অভিযোগ বৃথা।

রাখুকে ছাড়াইয়া আর যাহাকে রাখিব সে যে আধ সের দুধে আধ সের জল মিশাইবে না, তারই বা নিশ্চয়তা কি! এই ছোট্ট গাঁয়ে অনবরত গয়লা বদল করিবার সুযোগই বা কই? শেষে দু-চার জন মিলিয়া ধর্মঘট করিলে যেটুকু সাদা রং মিলিতেছে তাহারও দফা শেষ! যাক্ হউক, গাঙ্গুলীকে বলিয়া কাল ইহার প্রতীকার হয় কিনা দেখিব।

চিন্তিত মনে ঘরের মধ্যে ঢুকিতেই কাপড়ের খস্ খস্ শব্দ কানে গেল। থান কাপড়ের আধ-ঘোমটা দেওয়া অবস্থায় এক জন মহিলা মেঝের উপর বসিয়াছিলেন, আমাকে ঘরে ঢুকিতে দেখিয়া হয়ত তাড়াতাড়ি উঠিয়া দাঁড়াইয়াছেন। প্রথম দৃষ্টিপাতে চোখে পড়িল, তিনি তরুণ সুন্দরী এবং অপরিচিতাও বটে।

পিছাইয়া আসিতেছিলাম, মহিলাটি মৃদুস্বরে কাপড়ের খসখসানি চাপা দিয়া কহিলেন, "একটু দাঁড়াও, বাবা, একটা কথা আছে।"

দাঁড়াইতে হইল।

বলিলেন, "ভূদেব তোমার সঙ্গে খুব মেশামিশি করে দেখতে পাই, তাকে আমার হয়ে একটি কথা জিজ্ঞেস করবে, বাবা?"

"কে ভূদেব, জানি না ত!"

"ওই যে যাকে তোমরা গাঙ্গুলী মশায় বল। তাকে একবার জিজ্ঞেস ক'রো তো বাবা, আর কত কাল হা-পিত্যেশ ক'রে বসে থাকবো? তিন বছর হয়ে গেলে হাতচিঠি তামাদি হয়ে যাবে যে। আমি বিধবা মানুষ, আদালত কোন্ মুখো কখনও দেখি নি, তিনি ভাল চান ত এক মাসের মধ্যে টাকাটা যেন ফেলে দেন। বলবে ত, বাবা? একটু থামিয়া বলিলেন, "আর টাকা যদি না-ই দিতে পারে হাত-চিঠি যেন বদলে দেয়। আজ নয়, কাল নয়, এখন মেয়ের অসুখ, তখন জামাই মর মর, ও-সব কথা আর কত দিন শুনব? আমায় ত কেউ উপায় ক'রে দিতে নেই।"

মহিলাটি চলিয়া গেলে স্ত্রীকে জিজ্ঞাসা করলাম, "ব্যাপার কি?"

স্ত্রী বলিলেন, "মেয়ের বিয়ের সময় গাঙ্গুলী মশায় ওঁর কাছ থেকে টাকা ধার করেন, আজও শুধতে পারেন নি। উনি ত বলেন বুড়োর টাকা আছে, না শোধবার মতলব। নইলে দোতলা ঘর উঠছে, পুকুর কাটানো, বাগান তৈরি, ধেনো জমি বন্ধক রাখা—কোন্‌টা না করছেন, যত বায়নাক্কা টাকা শোধ দেবার বেলায়? কি জানি বাপু, তোমাদের কাণ্ড! মেয়েমানুষের টাকা ফেলে দিলেই ত লেঠা চুকে যায়।"

পরের দিন সকালে সে-কথা গাঙ্গুলীকে বলিতেই তিনি হাউ-হাউ করিয়া কাঁদিয়া উঠিলেন। বলিলেন, "কাগজে সুদখোর মহাজনের যে-সব কীর্তিকাহিনী বেরোয় তা সত্যি কি মিথ্যে আপন চোখে পরখ কর, ভাই। ভাল লোকেরই মরণ! কেন দোতলা ওঠে সে-খবর লোকে জানবে

কোত্থেকে। জামাই বাড়ী এলে শুতে দেবার একখানা ঘর নেই, তাই ধারের ওপর ধার ক'রে ঘর তুলতে হয়েছে। লোকে পুকুর কাটানো, বাগান কেনাই দেখে, ভেতরের খবর ত রাখে না। এই যে আজ সাত সকালে তোমার কাছে ছুটে এলাম কেন? জামাই মাসখানেক ধ'রে ভুগছেন, রোগ কি ধরা পড়ে না, অথচ দিন দিন শুকিয়ে সল্‌তেটি হয়ে যাচ্ছেন। শহর থেকে ভাল ডাক্তার না আনালে মেয়েটা সারা জন্ম ঘাড়ে পড়বে। তাও শাক-ভাত যা জোটে তাই না-হয় দিলাম, কিন্তু মনের কষ্ট? সে কি ঘুচবে সারা জীবনে? তাই ত ভায়া, তোমার কাছে এলাম, দশটা টাকা আমার চাই, আসছে মাসের পয়লাই দিয়ে দেব।"

বলিতে বলিতে তিনি খপ্‌ করিয়া আমার হাত ধরিয়া ঝর ঝর করিয়া চোখের জল ফেলিতে লাগিলেন। 'না' বলিবার কোন পথই আর রহিল না।

* * *

কিন্তু আশ্চর্য্য—সেই দিন হইতে গাঙ্গুলী মহাশয়ও বিরল হইয়া উঠিলেন। না বলিতে দশবার আসিয়া যিনি তত্ত্ব-তল্লাস করিতেন, তামাকের ধোঁয়ায় আর খোসগল্পের ঠাসবুনানিতে যিনি পোষ্ট আপিসের ঘর সর্ব্বক্ষণ আচ্ছন্ন করিয়া রাখিতেন—এই কয় দিন অনুপস্থিতিতে তাঁহাকে বেশী করিয়াই মনে পড়িল। ফাঁকা জীবনের পক্ষে তাঁহার সাহচর্য্য যে কত প্রয়োজন, সে-কথা বলিই বা কাহাকে? ভাবিলাম, রুগ্ন জামাইয়ের সেবাশুশ্রূষা লইয়া ভদ্রলোক হয়ত বড়ই বিব্রত হইয়া পড়িয়াছেন,—একবার সন্ধান লইতে দোষ কি।

সন্ধ্যাবেলায় কাজ শেষ করিয়া জলযোগ করিয়া হারিকেন জ্বালাইয়া গাঙ্গুলীবাড়ীর উদ্দেশেই চলিলাম। বাড়ীর সামনে খানিকটা ফুলের বাগান, খানিকটা ফলের। চীনা-জুঁই গোলাপের মাঝখানে লাউডাঁটা দিব্য লতাইয়া চলিয়াছে, মরশুমী ফুলের পাশে পালঙ শাকের ক্ষেত, সূর্য্যমুখী ও সবুজ ঢ্যাঁড়স গায়ে গায়ে শোভা পাইতেছে। সখ ও সঞ্চয় দুটি জিনিষ একই সঙ্গে নজরে পড়ে। রাত্রি বলিয়া সে-সব বিশেষ দেখা গেল না, কেবল বাহিরের বৈঠকখানা ঘরে 'ছ-তিন-নয়ের' কোলাহল শোনা গেল। গাঙ্গুলী মহাশয়ের গলাটাই সপ্তমে উঠিয়াছে, পাশার পড়তা বোধ হয় তাঁহারই দিকে। উপরে রুগ্ন জামাতা অথচ নীচে এই হৃদয়ভেদী উল্লাসধ্বনি? আমাকে দেখিয়া গাঙ্গুলী ঈষৎ অপ্রস্তুত হইয়া পড়িলেন যেন। কিন্তু সে-ভাব তাঁহার বেশীক্ষণ স্থায়ী হইল না। হাসিয়া বলিলেন, "আসুন আসুন, মাষ্টার মশায়। পূবের সূয্যি যে আজ পশ্চিমে উদয়?"

লণ্ঠনের দম কমাইয়া মেঝের উপর রাখিতে রাখিতে বলিলাম, "জানেন ত আমাদের কাজ!"

গাঙ্গুলী প্রাণখোলা উচ্চহাসি হাসিয়া বলিলেন, "ঠিক, ঠিক।"

বলিলাম, "আপনার জামাই কেমন আছেন?"

গাঙ্গুলী পাশার ঝোঁকেই হয়ত বলিলেন, "জামাই! কই তার ত কিছুই হয় নি। এই পোয়া বার তের—পোয়া বার তের—দুত্তোরি পঞ্জুরি!"

"কেন, তাঁর যে অসুখ ব'লে—"

"ও—হ্যাঁ।" পাশার বে-পড়তায় কিংবা অন্য হেতুতে মুখখানি তাঁহার কেমন ফ্যাকাশে বোধ হইল। একটু থামিয়া ঢোক গিলিয়া বলিলেন, "তা সে সেরে উঠে বাড়ী চলে গেছে। তবে কি জান, ভায়া, তোমার টাকাটা এখন দিতে পারছি নে—দিন পনর দেরি হবে বোধ হয়।"

"কি বিপদ! আমি কি সেই জন্য এখানে এলাম? কে কেমন আছেন, আর ত পায়ের ধুলো দেন না, তাই জানতে এলাম।"

"আমাদের আর থাকা-থাকি, ভাই। আছি এই পর্য্যন্ত। চার দিকে অভাব-অভিযোগ, তোমাদের মত বাঁধা মাইনে হ'ত ত বুক ফুলিয়ে বলতে পারতাম, 'কুছ পরোয়া নেই'। ওরে খেঁদি, খেঁদি, তোর ডাক-কাকা এসেছে রে—পান নিয়ে আয়। পান···সে পাঞ্জা—সে পাঞ্জা—দুত্তোরি কচে বার।"

পান খাইয়া, খানিক পাশা খেলা দেখিয়া ও তাঁহাকে পদধূলি দিবার অনুরোধ জানাইয়া উঠিলাম। আসিবার সময় আলোটা উস্কাইয়া দিয়া বাড়ীটা আবছা যতটা দেখা যায় দেখিবার চেষ্টা করিলাম। উপরে যদি একখানি ঘর হয় ত ঘরখানি দৈর্ঘ্যে ও প্রস্থে বড়ই বলিতে হইবে, নীচের ঘরও ত অনেকগুলি, অথচ জামাই আসিলে ঘরসঙ্কুলান হয় না!

* * *

দু-তিন দিনের মধ্যে গাঙ্গুলী কিন্তু আসিলেন না। শুনিলাম, তিনি বড়ই ব্যস্ত আছেন। আবার কোথায় মাসব্যাপী স্বদেশী মেলা বসিবে—সেখানে ভাল জিনিষ পাঠাইবার আয়োজনে মাতিয়াছেন।

বিপিনই খবরটা দিল, "শুনেছেন বাবু, গাঙ্গুলী যে আবার মেলায় চলল। আজ দেখে এলাম চাষাবাড়ী ঘুরে ঘুরে টাকা আদায় করছে।"

"টাকা আদায় কেন? তাঁর কাছে ত জমা আছে অনেক টাকা?"

"উনি বলছে সে-টাকা জমা থাক, এবারেও চাঁদা চাই। খরচ-খরচা বাদ দিয়ে যা থাকবে দুই টাকা মিলিয়ে গাঁয়ে একটা মন্দির পিতিষ্ঠে ক'রে দেবেন। পুণ্যি কাজে গাঙ্গুলী খুব ওস্তাদ কি না।"

"মেলায় জিনিষ নিয়ে গেলে চাষাদের কি লাভ হয়, বিপিন?"

"লাভ কচু। অনেক সাহেব-বিবি আসে, জজ-ব্যালিষ্টর, বাবু, মা-ঠাকুরুণ। হাত দিয়ে জিনিষ টিপে দেখে কত সুখ্যেত করে। কেউ মেডেল দেয়, কেউ কাগজে খানিক লিখে দেয়। গাঙ্গুলীর বাক্‌সে এত জমা আছে; কাগজ আর মেডেল। লাভ ওইটুকু।"

হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলাম, "তোমার গাঙ্গুলী কেমন লোক, বিপিন?"

বিপিন চিঠির তাড়ায় ঘটাঘট শব্দ করিয়া ষ্ট্যাম্প দিতে লাগিল—উত্তর দিল না।

"বল না, বিপিন?"

"কি বলব, বাবু, আপনি কি জান না? দিনরাত্তির মেশামেশি, হাসি-গল্প, তামাক টানা—"

হাসিয়া বলিলাম, "তাহ'লেও আমি বাইরের লোক, তোরা এ-গাঁয়ের বাসিন্দে—"

বিপিন রাগ করিয়াই উত্তর দিল, "বাইরের লোকের অত খবরেই বা দরকার কি বাপু।"

তাহাকে আর একটু রাগাইবার জন্যই বলিলাম, "আমার ত মনে হয় খুব ভাল লোক। এত ভাল যে বোকা বললেই হয়। তিন পয়সার পোষ্টকার্ডখানা দু-পয়সায় বেচেছেন।"

বিপিন ঈষৎ উচ্চকণ্ঠে রাগ প্রকাশ করিল, "তবে আর কি, কোম্পানীর ক্ষেতি ক'রে ভারি আমার ভাল রে! কই নিজের ত এক পয়সা সুদ ছাড়তে দেখি নে। বলে—

> ন্যাকা ন্যাকা কথা কয়
> এক পোণ দিয়ে তিন পোণ নেয়।

আমাদের উনিও তাই।"

"বলিস কিরে, গাঙ্গুলী টাকা ধার দেয়?"

"না, তা দেবে কেনে, দান-খয়রাত করে! মুখে দিনরাত ধান শুকোয় ব'লে কি···না, থাক বাবু—তুমিই আবার তামাক টানতে টানতে কখন বলবে ওই কথা, আর আমার প্রাণ যাক!"

শত চেষ্টায়ও বিপিন আর মুখ খুলিল না।

গাঙ্গুলীর স্বরূপ কিছু কিছু বুঝিয়াছি, কিন্তু তিনি যে অতখানি ইহা ত স্বপ্নেও ভাবিতে পারি নাই, অথবা এই মুহূর্ত্তে তাঁহাকে মন্দ ভাবিয়াই বা করিতেছি কি? তাঁহার সঙ্গে কথা কহিবার জন্য মনের মধ্যে যথেষ্ট ব্যাকুলতা রহিয়াছে। নিঃসঙ্গ জীবন মানুষের পক্ষে অসহ্য। যেখানে চৈত্রের দুপুরে পুকুর শুকাইয়া পাঁকে পরিণত হইয়াছে, তৃষ্ণা দূর করিবার অন্য উপায় না থাকিলে পেঁকো-জলই পরম রমণীয় জ্ঞানে পান করা ছাড়া গত্যন্তর কি!

* * *

পনর দিন কাটিল, এক মাসও কাটিল—গাঙ্গুলী আসিলেন না। অবশেষে এক দিন বদলির পরোয়ানা আসিল।

আর এক বার গাঙ্গুলীর সন্ধানে চলিলাম।

পথেই দেখা। হাসি ও কুশল-প্রশ্নের পালা সাঙ্গ করিয়া কহিলাম, "একখানা গরুর গাড়ী যে ঠিক ক'রে দিতে হবে, দাদা? কালই রওনা হচ্ছি।"

গাঙ্গুলীর মুখে চোখে উল্লাসের চিহ্ন সুপরিস্ফুট হইয়া উঠিল। এক গাল হাসিয়া বলিলেন, "ক-দিনের ছুটি মিলল?"

"ছুটি নয়, একেবারে রওনা—মানে বদলি।"

মুহূর্ত্তে তাঁহার মুখের ভাব বদলাইয়া গেল। ম্লানহাস্যে কহিলেন, "মাস-দুই এমন ব্যস্ত ছিলাম, তোমাদের খোঁজ নিতে পারি নি, ভাই। আহা, কত কষ্টই না হয়েছে!—

গিয়ে এই বুড়োরই নিন্দে করবে ত? তা আমার অদৃষ্ট, শেষ কোন জিনিষেরই রাখতে পারি নে। এই দেখ না, চাষারা এসে ধরলে, 'না' বলতে পারলাম না। শত কাজ ফেলে ওদের ভাল নিয়েই মেতে আছি। ছি ছি, নেহাৎ অমানুষের মত কাজ হ'ল। ছোট্ট ভাইটির মত ছিলে—একবার এসে খোঁজখবর নিতে পারি নি—এ দুঃখ আমার মলেও যাবে না, ভাই।"

"না, না, কষ্ট কিছুই হয় নি, বরং আপনার যত্নে—"

"ছাই যত্ন! সদ্বংশের ছেলে তাই বলছ ও-কথা। খুব কষ্ট গেছে—খুব কষ্ট হয়েছে তোমার। আর কি পা দেবে এই হাঘরের দেশে? কেনই বা দেবে শুনি!"

"তা ঘুরতে ঘুরতে দশ-পনর বছর বাদে আসতেও পারি।"

"হাঃ—সবাই বলে ওই কথা। তোমাকে নিয়ে হ'ল চার। কেউ কি ফিরে এলেন আর।" একটু থামিয়া বলিলেন, "তা ভায়া, অপরাধী ক'রে রেখে গেলে এই বুড়োকে।"

"কেন, কেন, কিসের অপরাধ?"

"মনে ক'রে দেখ। দশ আর দশ কুড়ি টাকা—"

"কুড়ি কিসের? পোষ্ট আপিসের যে-দশ টাকা গরমিল হয়েছে—সে দায় ন্যায়তঃ ধর্ম্মতঃ আপনার নয়।"

গাঙ্গুলী হাসিবার ভঙ্গীতে বলিলেন, "নয়? ভাল, আর দশ যা তোমার কাছ থেকে ধার নিয়েছি, তা শোধবার উপায় কি হবে? আর তিনটে দিন কি থেকে যেতে পার না?"

"না দাদা, হাকিম নড়ে ত হুকুম নড়ে না। টাকার জন্য ব্যস্ত হবেন না, আমি পৌঁছে ঠিকানা দিয়ে আপনাকে চিঠি দেব, যখন সুবিধে হয় পাঠিয়ে দেবেন।"

গাঙ্গুলী হাসিতে ফাটিয়া পড়িলেন, "তা বটে! তা বটে! তোমরা পোষ্ট আপিসে কাজ কর, তোমাদের টাকা পাঠাতে ত আর ফী লাগবে না। এখানে দেওয়াও যা, ডাকে দেওয়াও তাই, অথচ দেখ টাকা শোধের ভাবনায় এ ক'দিন ভাল ক'রে ঘুমুতে পারি নি।"

গাঙ্গুলীর ভুল (?) আর ভাঙিলাম না, শুধু বলিলাম, "গাড়ী একখানা ঠিক ক'রে দেবেন, কাল খাওয়া-দাওয়া ক'রেই রওনা হব।"

"নিশ্চয়, নিশ্চয়। নতুন মাষ্টার যে-গাড়ীতে আসবেন সেই গাড়ীতেই রওনা হবে।" বলিয়া গাঙ্গুলী আনন্দে কি আশু বিয়োগ-বেদনায় জানি না, প্রথম দিনের মতই আমাকে বুকে চাপিয়া ধরিলেন। টপ্ টপ্ করিয়া কয়েক ফোঁটা জল আমার জামার উপর পড়িল।

* * *

ক্যাঁচ-কোঁচ শব্দে গরুর গাড়ী চলিতেছিল।

খড়ের বিছানায় শুইয়া আকাশপানে চাহিয়া এলোমেলো কত কি ভাবিতেছিলাম।

সংসারে থাকিতে হইলে শুধু খাঁটি জিনিষ লইয়া কারবার চলে না, যেমন খাটি সোনায় খাদ না মিশাইলে গহনা হয় না। গাঙ্গুলী স্বদেশী মেলায় নিজ গ্রামের কৃষিজাত দ্রব্য লইয়া চলিয়াছেন, প্রশংসাপত্র, মেডেল অনেক মিলিবে। ইতিমধ্যে প্রকৃত দেশভক্ত বলিয়া খ্যাতিও তাঁহার যথেষ্ট রটিয়াছে।...রাখু ঘোষ দুধের পুরা দামই আদায় করিয়াছে, ধর্ম্মের নামে শপথ ও ক্রন্দন যুগপৎ চলিয়াছিল।...পোষ্ট আপিসের তহবিলে মাঝে মাঝে অমন হিসাবের গরমিল হয়ই।...বিধবার হাতচিঠি বদল না হইলেও আমার দশটি টাকা একদিন ফিরিয়া পাইব, বড়জোর কমিশনটা বাদ যাইতে পারে। গাঙ্গুলী কি কথার খেলাপ করিবেন? ভবিষ্যতে তিনি যা-ই করুন, বর্ত্তমানে এ আশা পোষণ করিতে দোষ কি! মন্দ জানিয়াও সব জিনিষ এক দণ্ডে পরিত্যাগ করিতে পারা যায় কি?

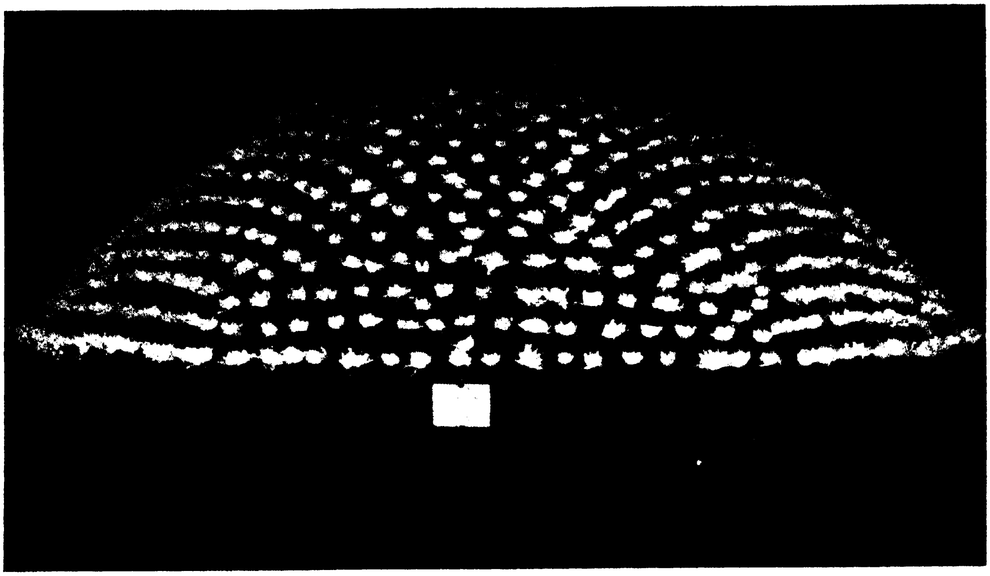
রাখু ঘোষের দুধে আর আমাদের জীবনে যে যথেষ্ট মিল রহিয়াছে!



টৌকিওর একটি উদ্যানে চেরীফুল-দর্শনার্থী নরনারীগণ



চেরীফুলের উৎসবে নৃত্যগীত



জাপানের চন্দ্রমল্লিকা। একই গাছে ৬০৫টি ফুল ফুটিয়াছে



বিচিত্র পত্রপুষ্পে সজ্জিত ফুলদানি



ফুল সাজাইতে রত তরুণী

জাপানে ফুল সাজানো মহিলাদের সযত্নে শিক্ষণীয় একটি বিশিষ্ট শিল্প বলিয়া পরিগণিত। ফুল, পাতা, এমন কি ছোট ছোট ফল সহ ডালও এই কাজে ব্যবহৃত হয়।

জাপানের পুষ্পোৎসব

শ্রীচারুবালা মিত্র

জাপানকে 'ল্যাণ্ড অব ফ্লাওয়াস' বা ফুলের রাজ্য বলা হয়। কারণ বার মাসই এখানে কোন-না-কোন ফুল ফুটে দেশটাকে আলো ক'রে রাখে। এসব ফুল যে শুধু লোকের বাগানে ফোটে তা নয়, মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে, পাহাড়ে-পর্ব্বতে, রাস্তার দু-ধারে, নদীর দু-তীরে এক-এক ঋতুতে এক-এক রকম ফুল ফুটে দেশটাকে ফুলের রাজ্য ক'রে তোলে। এক-একটি জায়গা বিশেষ বিশেষ ফুলের জন্য বিখ্যাত। প্রতি মাসে যখন যেখানে ফুল ফোটে জাপানীরা সুন্দর সুন্দর পোষাক প'রে দলে দলে সেখানে যায় ফুলের উৎসবে।

১লা জানুয়ারি এদের নববর্ষের উৎসব। এই সময় প্রচণ্ড শীতে কোন গাছে ফুল ফোটে না, দু-একটি গাছ ছাড়া কোন গাছে পাতা থাকে না। সেজন্য তারা ফুলের বদলে বাঁশ ও পাইনগাছ কলাগাছের মত দরজার দু-পাশে লাগিয়ে বাড়ী-ঘর সাজায়। জাপানে পাইনগাছ দীর্ঘজীবন ও সৌভাগ্যের প্রতীক, আর বাঁশগাছ সোজা হয়ে ওঠে ব'লে তাকে সরল ও সাধু ব্যবহারের সহিত তুলনা করা হয়। নববর্ষে প্রত্যেক বাড়ীতে বামন-জাতীয় পাইন, বাঁশ ও প্লামগাছ চীনেমাটির পাত্রে সাজিয়ে রাখে, এটি নববর্ষে শ্রেষ্ঠ উপহার ও সুখসৌভাগ্য-সম্পদের প্রতীক। এই গাছগুলি এক হাত দেড় হাতের বেশী লম্বা হয় না, সামান্য মাটিতে অনেক দিন পর্য্যন্ত জীবিত থাকে এবং সেই বামন প্লামগাছে কিছুদিন পরে সুন্দর ফুল ফোটে।

ফেব্রুয়ারি মাস থেকে এদের আসল ফুলের উৎসব আরম্ভ হয়। এই সময় প্লামফুল ফোটে, শুকনো ডালে হঠাৎ এক দিন সুন্দর শাদা ফুলগুলি ফুটে চারি দিক আলোকিত করে। দুরন্ত শীতে যখন চারি দিক বরফে ঢাকা, সেই সময় এই ফুল ফোটে ব'লে একে বলেছে সাহস ও অধ্যবসায়ের প্রতীক। এই সকল গুণ যেন পায় এই আশা ক'রে জাপানে অনেক মেয়ের নাম রাখে 'উমে' অর্থাৎ প্লামফুল। সমুদ্রের ধারে আতামী ব'লে স্থান প্লামফুলের শোভার জন্যে বিখ্যাত; ছুটির দিনে সবাই প্লামফুলের উৎসব করতে সেখানে যায়। টোকিওর কামাইদোতে সিন্টো মন্দিরে অনেক কালের পুরনো প্লামগাছকে সযত্নে এমন ভাবে তৈরি করেছে যে, মাটিতে লতার মত এঁকে-বেঁকে গিয়েছে, সাপের মত দেখতে মনে হয়। কতকগুলি গাছের ডালপালা খানিকটা লতিয়ে খানিকটা উপর দিকে মাথা উঁচু করে আছে, সেজন্য তাদের নাম দিয়েছে অর্দ্ধশায়িত ড্রাগন।

তার পর মার্চ্চ মাসে পীচফুল—এ হচ্ছে শান্তি, সৌম্য, নম্রতা, বিনয় ও সৌজন্যের প্রতীক। এই মাসে 'হিনা-মাৎসুরী' বা মেয়েদের ফুলের উৎসব হয়; পীচফুলের সঙ্গে এই উৎসবের সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ। জাপানী মেয়েদের পুতুলের উৎসব পীচফুল ছাড়া সুসম্পন্ন হয় না, মেয়েরা নিজেরা জীবনেও এই ফুলের মত শান্ত, নম্র ও বিনয়ী হবার কামনা করে।

এপ্রিল মাস আসে চেরীফুলের ঐশ্বর্য্যসম্ভার নিয়ে। চেরীফুল ছাড়া জাপানকে কল্পনা করা যায় না; জাপানের আর একটি নাম তাই চেরীল্যাণ্ড। পৃথিবীর কোথাও চেরী-ফুলের এ রকম সৌন্দর্য্য দেখা যায় না। দেশ-বিদেশ থেকে হাজার হাজার দর্শক জাপানে আসে শুধু এই চেরীফুলের সৌন্দর্য্য উপভোগ করতে।

এখানে যত বিভিন্ন জাতের চেরীগাছ আছে, অন্য কোন দেশে সে রকম দেখতে পাওয়া যায় না। পাহাড়ে-পর্ব্বতে, বনে-জঙ্গলে চেরীর বন ত আছেই, তাছাড়া যাতে সকলে সব জায়গায় এই ফুল ফুটতে দেখে আনন্দ লাভ করতে পারে, সেজন্য বহুকাল থেকে এরা এই চেরী-গাছ শহরের মধ্যে, রাস্তার দু-ধারে, বাগানে, পার্কে, মন্দিরের চত্বরে, নদীর দু-ধারে সারি ক'রে পুঁতে দিয়েছে। নানা উপায়ে ফুলগুলিকে আরও সুন্দর করবার, নানা জাতের ফুল সৃষ্টি করবার চেষ্টা করেছে। এক টোকিও



পুষ্পিত চেরীগাছ

ও তার চার পাশের গ্রামে ২২০০০ চেরীগাছ আছে। এপ্রিল মাসে পত্রহীন ডালে যখন এই সুন্দর ফুলগুলি ফুটে ওঠে, তখন টোকিও শহর এক অপূর্ব্ব শ্রী ধারণ করে। টোকিওতে 'উয়েনো' পার্কে অসংখ্য জাতের চেরী-গাছ আছে। এদোগাওয়া নদীর ধারে দু-মাইল ধরে একটি-পাপড়িওয়ালা চেরীগাছের সুন্দর বীথিকা রয়েছে। আসুকাইয়ামা পাহাড় চেরীফুলের জন্য প্রসিদ্ধ।

সুমিদা নদীর ধারে, দুই মাইল ধ'রে, এক হাজার চেরীগাছের সুন্দর বীথিকা। এখানে বিয়াল্লিশ জাতের গাছ আছে, ফুলে বিচিত্র রঙের আভা, এমন কি সবুজ আভাও দেখা যায়।

'ইয়ামা-সকুরা' (ইয়ামা=পাহাড়; সকুরা=চেরী) বনে-জঙ্গলে ও পাহাড়ে খুব বেশী জন্মায়। এগুলি বনফুলের মত ফুটে পাহাড়-পর্ব্বতকে নন্দন-কানন ক'রে তোলে। এই ফুলের উৎসব, এই ফুল দেখতে যাওয়াকে এরা বলে 'ওহানামি' (হানা=ফুল; মি=দেখা)। এটা সামাজিক জীবনের একটি বিশেষ অঙ্গ।

চেরীফুল সবচেয়ে সুন্দর দেখায় ভোরবেলা যখন প্রথম সূর্য্যের কিরণ তার উপর এসে পড়ে। আর এই ফুল আধফুটন্ত অবস্থায়, অর্থাৎ যখন ফুলগুলির দুই-তৃতীয়াংশ ভাগ ফোটে আর এক-তৃতীয়াংশ কুঁড়ি থাকে, দেখতে ভাল। কিন্তু সবচেয়ে পাহাড়ী চেরীই দেখতে ভাল, কারণ সুন্দর কচি লাল পাতায় ডালগুলি ভরে যায় ও শাদা ফুলে তাদের স্নিগ্ধ শ্রী দান করে।

টোকিওর কাছে কোগানাই ব'লে একটি গ্রামে চেরীফুলের উৎসব মহাসমারোহে সম্পন্ন হয়। এখানে দুই মাইল লম্বা চেরী-বীথিকা আছে। গাছের তলায় নানা রকম খাবার, চা ও সাকের (এক রকম মদ) দোকান বসে। রাত্রে গাছে গাছে কাগজের লণ্ঠন ঝুলিয়ে দেয়, সুন্দরী মেয়েরা প্রজাপতির মত নানা রঙের পোষাক প'রে ঘুরে বেড়ায়। লোকেরা দাড়ি গোঁফ প'রে সং সেজে ও কোন কোন গায়কের দল রাস্তা দিয়ে বাজনা বাজিয়ে মজার হাসির গান ক'রে যায় ও সমস্ত লোককে মাতিয়ে তোলে। সকাল থেকে রাত অবধি এখানে হাসির ফোয়ারা ছোটে। বুড়ীরা তাদের বার্দ্ধক্য ও জরা ভুলে গিয়ে সারাদিন নেচে কাটিয়ে দেয়। ছেলেমেয়ে বুড়োবুড়ী সবাই চেরীফুলের উৎসবে যোগ দেয়। দুঃখ দৈন্য কষ্ট সব দূরে ফেলে দিয়ে সবাই আসে চেরীফুলের উৎসবে।

সৌন্দর্য্যের উপাসক জাপানীরা চেরীফুলকে জাতীয় ফুল ব'লে গণ্য করে। ফুলের রাণী হয়ে চেরীফুল বিরাজ করছে। সাহিত্য, কলা ও শিল্পে এই ফুলই বেশী স্থান পেয়েছে।

মিয়াকো-ওদোরী অর্থাৎ চেরীনাচও চেরীফুলের মত একটি দেখবার জিনিষ। ১লা এপ্রিল থেকে কিয়োটোতে এই নাচ আরম্ভ হয় ও এক মাস ধ'রে চলে। সুন্দরী নর্ত্তকীরা বহুমূল্য বিচিত্র কিমনো প'রে ও পুরাতন প্রথামত মস্তকভূষণে সজ্জিত হয়ে সামিসেন বা জাপানী বাদ্যযন্ত্রের সঙ্গে তালে তালে নাচে।

মে মাসে ফোটে পিওনী (Peony) উইষ্টেরিয়া (Wistaria) ও এজেলিয়া (Azalea)।

জুন মাসে আইরিস (Iris) ফুল ফুটলে ছেলেদের আনন্দ, কারণ পীচফুল দিয়ে যেমন মেয়েদের পুতুলের



পিওনী ফুল

উৎসব হয় তেমনি আইরিস ফুলে হয় ছেলেদের একটি উৎসব।

আইরিস ফুলের পাতা দেখতে ঠিক তলোয়ারের মত। ছোট ছেলেদের মনে তলোয়ারের মত এই পাতা সাহসী ও বীর হবার আকাঙ্ক্ষা জাগিয়ে দেয়।

জুলাই-আগষ্ট মাসে সমস্ত খাল বিল পুকুর ভ'রে যায় পদ্মফুলে। পার্কে, মন্দিরের প্রাঙ্গণে যেখানে ছোটখাট জলাশয় আছে সেখানেও এই ফুল ফুটে সবাইকে মুগ্ধ করে। এই ফুলকে উপলক্ষ্য ক'রে কোন উৎসব নেই। সকলেই শ্রদ্ধা ও ভক্তির অর্ঘ্য নিয়ে বৌদ্ধধর্ম্মের প্রতীক এই ফুল দেখতে যায়। তার পর শরৎকালের সঙ্গে সঙ্গে মেপ্‌লগাছের পাতা খসবার আগে সব পাতা লাল হয়ে যায়। মেপ্‌লের সৌন্দর্য্য পাতায়; রাস্তার দু-ধারের ও পাহাড়ের গায়ের সব মেপ্‌লগাছ যখন লাল পাতায় আচ্ছন্ন হয়ে যায় তখন তাকে আর পাতা ব'লে চেনা যায় না। মনে হয় লাল ফুল ফুটে আছে। পাহাড়ে পাহাড়ে এই মেপ্‌লগাছ চিরসবুজ পাইনের সঙ্গে এমন ক'রে মিশিয়ে আছে যে সবুজে ও লালে এক অপূর্ব্ব সৌন্দর্য্যের সৃষ্টি হয়েছে।

এত বড় জাপান দেশ, তার পাহাড়-পর্ব্বত ক্ষেত-খামার সবই সুন্দর বাগান; এমন কি এদেশের ধান এবং চায়ের ক্ষেতও দেখবার জিনিষ।

নবেম্বর মাসে আসে চন্দ্রমল্লিকা। ষোলটি পাপড়িযুক্ত চন্দ্রমল্লিকা রাজার শিরোভূষণ রূপে ব্যবহৃত হয়। পুরাকালে জাপানীরা চন্দ্রমল্লিকার অলৌকিক শক্তিতে বিশ্বাস করত। প্রবাদ আছে, এই ফুলের উপরকার কয়েক ফোঁটা শিশিরবিন্দু খেলে দীর্ঘজীবন লাভ করা যেত।

বড় বড় পার্কে চন্দ্রমল্লিকার প্রদর্শনী ও পুরস্কার-প্রতিযোগিতা হয়। কত বিভিন্ন প্রকারের যে ফুল হয় তার ঠিক নেই, কোনটা গোল একেবারে বলের মত, কোনটা পদ্মের মত, কোনটা আনারসের মত, কোনটা সাপের ফণার মত। তাদের রঙেরই বা কি বাহার—সাদা, গোলাপী,



আইরিস-বন

সোনালী, হলদে, হাল্কা সবুজ আরও কত রং। চোখ ফেরাতে ইচ্ছা করে না।

এদেশের মালীরা সতত চেষ্টা করে কি ক'রে গাছে অনেক ফুল ফোটাবে। নানা আকারে তাকে বাড়িয়ে তোলে। একটি গাছে এক-শ কুড়ি-পঁচিশটি পর্য্যন্ত বড় ফুল হ'তে দেখেছি। এক রকম চন্দ্রমল্লিকা গাছে এক হাজার দেড় হাজার ছোট ছোট ফুল তারার মত ফুটে থাকে। মালীর সারা দিনের যত্ন, তত্ত্বাবধান ও পরিশ্রমে এটা সম্ভব হয়। টোকিওতে একটি প্রকাণ্ড বাড়ীতে চন্দ্রমল্লিকার উৎসব হয়। সেটা একটা দেখবার জিনিষ। চন্দ্রমল্লিকার গাছ দিয়ে মানুষ, ঘোড়া, জাহাজ, নৌকা, ট্রাম, বাড়ীঘর পর্য্যন্ত তৈরি করে। চোখে না দেখলে বিশ্বাস করা যায় না কি ক'রে এটা সম্ভব হ'ল।



টবে উৎপন্ন চন্দ্রমল্লিকা

প্রথমে তার দিয়ে কাঠামো করে, তার পর গাছগুলি যত বড় হ'তে থাকে, তাদের কাঠামোর সঙ্গে আটকে দিয়ে বাড়তে সাহায্য করে, আস্তে আস্তে গাছগুলি কাঠামো অনুযায়ী রূপ নেয়। এখানে বিভিন্ন রকমের ছোটবড় চন্দ্রমল্লিকার গাছ এনে রাখা হয়। তাছাড়া ছোট ছোট ফুল দিয়ে পৌরাণিক ও ঐতিহাসিক নানা রকম মূর্ত্তি ক'রে তাদের পোষাক তৈরি করে। এমন কি ছোট ফুল দিয়ে নানা রকম প্রাকৃতিক দৃশ্য পর্য্যন্ত তৈরি করে। আর এই সঙ্গে অনেক রকম জিনিষ ও খাবারের দোকান বসে। চন্দ্রমল্লিকার উৎসবে থিয়েটার, ম্যাজিক ইত্যাদি আমোদ উপভোগেরও ব্যবস্থা থাকে। এই রকম ক'রে সারা বৎসর ধরে কোন-না-কোন ফুলের উৎসব চলে। এই জন্যই বলে জাপান ফুলের রাজ্য।

এরা শুধু ফুলের উৎসব করেই ক্ষান্ত নয়, ফুল কি ক'রে সাজাতে হয় সেটাও এদেশের মেয়েদের একটা বিশেষ শিক্ষণীয় বিষয়। সাধারণ মেয়েরা ত এ-বিদ্যা শেখেই, বড়ঘরের মেয়েরাও এটা আয়ত্ত করতে না পারলে তাদের শিক্ষা অসম্পূর্ণ থেকে যায়। শুধু ফুল সাজান শেখবার জন্য অনেক শিক্ষালয় আছে। কি রকম ক'রে ফুল সাজাতে হয়, ফুল অনেক দিন রাখতে হ'লে ফুলের ডাঁটাগুলি একটু পুড়িয়ে জলে নুন দিয়ে রাখলে কেমন ক'রে অনেক দিন রাখা যায়, গাছের পাতাসুদ্ধ ডালও কেমন সুন্দর ক'রে দুয়ে মুচে ছেটেকেটে সাজিয়ে রাখা যায়—এই সব বিষয় শেখান হয়। আমাদের অনেকের ধারণা অনেক ফুল না হ'লে বাড়ী সাজান যায় না, কিন্তু দু-চারটি ফুল দিয়ে একটি ফুলদানি এমন ক'রে সাজান যায় যে ঘরটির তাতেই শোভা হয়। আমাদের দেশে অনেক গাছ আছে যার পাতা দেখতে সুন্দর, সে পাতাও ভাল ক'রে সাজাতে পারলে সুন্দর দেখায়।

আমাদের দেশেই কি ফুলেরই অভাব? বিভিন্ন ঋতুতে আমাদের দেশের মাঠে-ঘাটে, বনে-জঙ্গলে ঝিলে-বিলে কি ফুলের কম সমারোহ? আমাদের যদি এদিকে একটু লক্ষ্য থাকত তাহ'লে আমরাও আমাদের দেশকে ফুলের রাজ্য ক'রে তুলতে পারতাম।

দেশ-বিদেশ থেকে লোকে জাপানে যায় চেরীফুল, চন্দ্রমল্লিকার শোভা দেখতে—সেটা বহুদিনের যত্ন ও পরিশ্রমেই সম্ভব হ'তে পেরেছে। আমাদের কৃষ্ণচূড়া, অশোক, পলাশ, শিউলি কিছু কম সুন্দর নয়। আমরা যদি এর যত্ন করি, দেশকে সুন্দর ক'রে তোলবার চেষ্টা করি, তাহ'লে আমাদের দেশেও দেশ-বিদেশ থেকে কত পুষ্পবিলাসী দর্শক এসে ভিড় করতে পারত।

স্রোতের মুখে

শ্রীসুরেশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী

আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালিকে সে-কথা হবে বড় পুরাতন।
যে-প্রেমে আজিকে আঁখিদুটি ঢল ঢল
ফুরায়ে যে যাবে ফুরাইলে দুটি ক্ষণ।
সন্ধ্যামালতী সন্ধ্যার কোল ভরি
প্রভাতে শিথিল অবশ পড়ে যে ঝরি।
শেফালির মালা গাঁথিয়া কণ্ঠে ধরি
রাখিবে কি আজীবন ?
আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালি যে সে-কথা হবে বড় পুরাতন।

আজিকার ব্যথা আজিকেই ভুলে চল
কালিকে সে-ব্যথা হবে বড় পুরাতন।
আঁখির পাতায় অশ্রু যে টল টল
মুক্তা তো নয় রবে না সে চির-ধন।
বাদলে বাদলে গিয়াছে ধরণী ভরি
পিছে পিছে তার আলো ঝলমল করি
বাঁশরী বাজায়ে আসে যে শরৎ, হরি'
নিতে তনু-প্রাণ-মন।
আজিকার ব্যথা আজিকেই ভুলে চল
কালি যে সে-ব্যথা হবে বড় পুরাতন।

আজিকার সুখে আজিকেই গেয়ে চল
কালিকে সে-সুখ হবে বড় পুরাতন।
ঠোঁটের কিনারে আজি যেই হাসি—বল
ধরিয়া রাখিতে পারিবে কি সারাক্ষণ ?
তৃণে তৃণে যেই শিশির শিহরে মরি
শুকায়ে যে যাবে কিম্বা পড়িবে ঝরি ;
কোন গত-সুখ শুধু মনে স্মরি স্মরি
রাখা যায় আজীবন !
আজিকার সুখে আজিকেই গেয়ে চল
কালি যে সে-সুখ হবে বড় পুরাতন।

আজিকার মালা আজিকেই গেঁথে তোল
কালিকে সে-মালা হবে বড় পুরাতন।
সুখ-সুরে আজি নদী চলে ছল ছল
সেথায় কালিকে ধূধূ মরু কাঁটাবন।
আজিকে ফাগুনে পৃথিবীর বুক মরি
মরকত-চুনি-নীলা-রঙে গেছে ভরি,
উদাস ঊষর বৈশাখ অবতরি
জ্বালি দিবে হুতাশন।
আজিকার মালা আজিকেই গেঁথে তোল
কালি যে সে-মালা হবে বড় পুরাতন।

আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালিকে সে-কথা হবে বড় পুরাতন,
আজিকার এই 'আজি'টা কোথায়, বল,
কাল খুঁজে পাবে, পাবে এই হিয়া মন !
হায় যে সকলি স্রোতের টানেতে সরি
চলে চলে যায়—নূতনের নব তরী
প্রতি ক্ষণে আসে নব নব বেশ ধরি
নিয়ে নব আয়োজন।
আজিকার কথা আজিকেই বল, বল,
কালি যে সে-কথা হবে বড় পুরাতন।

আমাদের জনশক্তি ও কর্ম্মশক্তি

শ্রীসুশীলকুমার বসু

গত ১৯৩১ সালের লোকগণনার সময় ভারতের জনসংখ্যা ছিল ৩৫,২৮,৩৭,৭৭৮ জন। ১৯২১ হইতে ১৯৩১ সালের মধ্যে জনসংখ্যার বৃদ্ধি হইয়াছিল শতকরা ১০.৬ হারে। কাজেই অনুমান করা যাইতে পারে যে, ভারতের জনসংখ্যা বর্ত্তমানে ৩৭ কোটির কাছাকাছি দাঁড়াইয়াছে। সমগ্র পৃথিবীর অধিবাসীদের প্রায় এক-ষষ্ঠাংশ লোক ভারতবাসী। দেশসমূহের মধ্যে জনশক্তিতে ভারতবর্ষ দ্বিতীয় স্থানীয়। চীনের রাষ্ট্রিক সীমা ও সংহতির অনিশ্চয়তার কথা এবং লোকগণনার ত্রুটিপূর্ণ ব্যবস্থার কথা বিবেচনা করিলে এ সন্দেহ করা অন্যায় হইবে না যে, জনসংখ্যার দিক্ দিয়া ভারতের স্থান সর্ব্বোচ্চ হইবার আশা আছে।

অনেক শক্তিশালী স্বাধীন দেশের জনসংখ্যা অপেক্ষা ভারতের একটি ছোট প্রদেশে অধিকসংখ্যক লোক বাস করে। এক রাশিয়া এবং জার্ম্মানী ব্যতীত ইউরোপের কোন দেশের জনসংখ্যা বাংলা অপেক্ষা বেশী নহে। যে শক্তিশালী দেশগুলি সারা পৃথিবীর রাজনৈতিক ভাগ্য নিয়ন্ত্রিত করিতেছে, তাহার মধ্যে ব্রিটিশ দ্বীপপুঞ্জ, ফ্রান্স এবং ইটালী অপেক্ষা বাংলার জনসংখ্যা অধিক।

কিন্তু আমাদের এই বিপুল জনশক্তিতে কর্ম্মশক্তির পরিমাপ বলিয়া মনে করিলে বিশেষ ভুল করা হইবে।

আমরা সহজে এ কথা মনে করিতে পারি যে, ভারতের কর্ম্মশক্তি রাশিয়া বাদে সমগ্র ইউরোপের প্রায় সমান; শক্তিশালী দেশগুলির কাহারও চার-পাঁচ গুণ, কাহারও ছয়-সাত গুণ, কাহারও আট-নয় গুণ এবং এমন কোন দেশ নাই (এক চীন ব্যতীত) ভারতের কর্ম্মশক্তি অন্ততঃ যাহার আড়াই-তিন গুণ হইবে না।

কিন্তু জনসংখ্যার সঙ্কেত অনুসারে ভারতের কর্ম্মশক্তি নির্ণয় করা যাইবে না।

অনেকে হয়ত বলিবেন, ভারতবাসীরা কর্ম্মক্ষেত্রে যে বিশেষ পশ্চাদ্বর্ত্তী রহিয়াছেন, ইহা তাঁহাদের শক্তির দৈন্যের পরিচয় নহে। ইহার দ্বারা ইহাই সূচিত হয় যে, তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা অব্যবহৃত রহিয়া গিয়াছে, অথবা অপব্যয়ে তাহা নষ্ট হইতেছে। তাঁহাদের শক্তিপ্রয়োগের ক্ষেত্র প্রস্তুত হইলে, এবং তজ্জন্য তাঁহাদিগকে যথাযথভাবে প্রস্তুত করিয়া তুলিতে পারিলে, তাঁহারা আত্মশক্তি প্রমাণে সমর্থ হইবেন। দেশে আজও বৈজ্ঞানিক জ্ঞানের বিস্তার ঘটে নাই, অজ্ঞতা ও অশিক্ষা দেশ জুড়িয়া আছে, জনশক্তির অর্দ্ধাংশ নারীরা অবরোধের মধ্যে নেপথ্যে রহিয়া গিয়াছেন। এই সকল ত্রুটি সংশোধিত হইলে তবে শক্তির উপযুক্ত ব্যবহার হইতে পারিবে। এ সকল অপেক্ষাও আমাদের বড় দৈন্য হইতেছে যে, সংঘবদ্ধ হইবার, অনেকে মিলিয়া একসঙ্গে কাজ করিবার শিক্ষা বা ক্ষমতা আমাদের একেবারেই নাই। ভারতবাসীরা যদি সংঘবদ্ধ হইতে পারিতেন, তবে কর্ম্মের বিভিন্ন ক্ষেত্রে তাঁহারা অনেক বেশী সাফল্য লাভ করিতে পারিতেন এবং প্রমাণ করিতে পারিতেন যে কর্ম্মক্ষমতায় তাঁহারা কাহারও অপেক্ষা নিকৃষ্ট নহেন।

সম্ভবতঃ ইঁহারা ইতিহাসের নজির দেখাইয়া বলিবেন যে, প্রাচীন কাল হইতে আরম্ভ করিয়া অত্যাধুনিক কাল পর্য্যন্ত সংখ্যাল্প সংঘবদ্ধ জনমণ্ডলী কর্ত্তৃকই পৃথিবীর ইতিহাসের গতি নির্ণীত হইয়াছে। বর্ত্তমান ব্রিটিশ সাম্রাজ্যের তিন-চতুর্থাংশ লোক ভারতবাসী, অথচ ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তাঁহাদের স্থান কোথায় তাহা আমরা জানি। ভারতের রাজনীতিক ক্ষেত্রে শিখেরা ও মুসলমানেরা যে গুরুত্ব পাইয়াছেন তাহার মূলে রহিয়াছে তাঁহাদের সংঘবদ্ধতার শক্তি। ভারতবর্ষে প্রথম যুগে ক্ষত্রিয়দের আধিপত্য, এবং পরবর্ত্তী যুগে রাজপুত, শিখ ও মহারাষ্ট্রীয়দের আধিপত্যের দ্বারা এই কথাই প্রমাণিত হয়। পাঠানেরা যখন ভারতবর্ষ জয় করেন তখন সমগ্র আফগানিস্থানের জনসংখ্যা, অথবা যে-সকল স্থান হইতে মুসলমান আক্রমণকারীরা সৈন্য সংগ্রহ করিতেন

তাহার সম্মিলিত জনসংখ্যা ভারতের জনসংখ্যার সামান্য ভগ্নাংশ মাত্র ছিল।

এ সকল নজির এবং যুক্তি সম্পর্কে এ কথা বলা যায় যে সংঘবদ্ধতা পূর্ব্বোক্তদের শক্তি ও সাফল্যের অন্যতম প্রধান কারণ হইলেও এবং আমরা অধিকতর সংঘবদ্ধ হইতে পারিলে সর্ব্বদিকে আমাদের অনেকটা সাফল্য সুনিশ্চিত হইলেও, সঙ্গে সঙ্গে এ কথাও সত্য যে সংঘবদ্ধ হইলেও এবং অন্যান্য ত্রুটি সংশোধিত হইলেও আমাদের দেশের একটা নির্দ্দিষ্টসংখ্যক লোক যত সময়ে যতটা কাজ করিতে পারিবেন, অন্য দেশের ঠিক তত লোক ততটা সময়ে তদপেক্ষা অনেক বেশী কাজ করিতে পারিবেন, শ্রান্ত না হইয়া অন্যান্য দেশের লোকের পক্ষে যত ক্ষণ কাজ করা সম্ভব, আমাদের দেশের লোকের পক্ষে তাহা সম্ভব নহে, এবং অন্যান্য দেশে জনসংখ্যার অনুপাতে কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা আমাদের দেশের অনুরূপ সংখ্যা অপেক্ষা অধিক হইবে। এ কথা ভারতের অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলা সম্পর্কে অধিক সত্য।

পাশ্চাত্য দেশ অপেক্ষা যে আমাদের দেশের লোকের কর্ম্মক্ষমতা কম, ইহা শুধু অনুমানের কথা নহে। ১৯২৬-২৭ সালে ইন্টারন্যাশনাল টেকস্‌টাইল ইউনিয়নের যে-সকল প্রতিনিধি ভারতবর্ষ পরিদর্শন করেন, তাঁহারা বোম্বাই প্রদেশের কাপড়ের কলসমূহে নিযুক্ত ভারতীয়ের ৩৪ জনের কাজকে ল্যাঙ্কাশায়ারের ১২ জন লোকের কাজের সমান বলিয়া ধরিয়াছেন। অন্যান্য প্রামাণ্য লোকে অবশ্য ভারতীয় যোগ্যতার মাপ ইহা অপেক্ষা কিছু বেশী ধরিয়াছেন। টাটা ষ্টীল ওয়ার্কসের কর্ত্তৃপক্ষ এক জন ভারতীয় শ্রমিককে এক জন ইউরোপীয় শ্রমিকের দুই-তৃতীয়াংশ বলিয়া ধরিয়া থাকেন, অর্থাৎ ৩ জন ভারতীয় শ্রমিক ২ জন ইউরোপীয়ের সমান কাজ করে বলিয়া ধরা হয়।

শুধু বাঙালী শ্রমিকের হিসাব লইলে তাঁহাদের কর্ম্মক্ষমতা আরও ন্যূন বলিয়া দেখা যাইত। প্রায়ই রোগভোগের ফলে ক্ষীণ এবং অনাহারে অপুষ্ট শরীর যে আমাদের ক্ষীণ কর্ম্মশক্তির কারণ তাহাতে সন্দেহ নাই। পাশ্চাত্য দেশের লোক অপেক্ষা আমাদের দেশের লোকের শরীর যে অপটু ও দুর্ব্বল তাহা আমরা জানি। কিন্তু চারি পাশে ক্ষীণ শরীর দেখিতে দেখিতে আমাদের চোখ অভ্যস্ত হইয়া গিয়াছে বলিয়া অপুষ্ট ক্ষীণ শরীরকেই আমরা সাধারণ সুস্থ শরীর বলিয়া মনে করিয়া থাকি। কাজেই আমাদের স্বাস্থ্য ও শারীরিক গঠনের প্রকৃত অবস্থাটা বিদেশীর দৃষ্টির কাছে এবং তাঁহাদের তুলনামূলক বিচারের কাছেই সত্যসত্য ধরা পড়িতে পারে। কোন বিখ্যাত পুস্তকের ইংরেজ লেখক এদেশবাসীর স্বাস্থ্য দেখিয়া বলিয়াছেন,—

"এক পঞ্জাব ব্যতীত, কৃষকদিগেরও (আমাদের দেশের সর্ব্ব-শ্রেণীর লোকের মধ্যে ইহারাই সর্ব্বাপেক্ষা স্বাস্থ্যবান ও বলিষ্ঠ।—লেখক) শারীরিক শক্তি ইউরোপীয় শ্রমিকের প্রায় অর্দ্ধেক। ...শহরের কুলীরা এবং দরিদ্রতর জেলাগুলির গ্রামবাসীরা আকারে খর্ব্ব, তাহাদের শারীরিক গঠন শোচনীয় রকমের ক্ষীণ এবং পেশী-সকল নিতান্ত অপুষ্ট—এক কথায় ইহারা মানুষের ভগ্নাংশ মাত্র। প্রকৃতি এমন এক ক্ষীণাবয়ব জাতির সৃষ্টি করিয়াছেন, যাহারা সর্ব্বনিম্ন পরিমাণে প্রোটিড ও ভিটামিন খাইয়া স্বল্প কালের জন্য তাহাদের দুঃখময় জীবন ধারণে সমর্থ হয়। ভারতীয়দের আয়ুষ্কাল গড়পড়তা ২৩.৫ বৎসর, বিলাতের অধিবাসীদের পক্ষে এই অঙ্ক ৫৪ বৎসর।"

মনে রাখিতে হইবে যে, ক্ষীণ শরীরের এই বর্ণনা বাঙালীদের সম্পর্কে নহে, ভারতের যে-সকল স্থানের স্বাস্থ্য ও অধিবাসীদের শরীর আমরা ভাল বলিয়া জানি, এ উক্তি তাঁহাদের সম্পর্কে।

ইহা গেল এ দেশের কর্ম্মরত সুস্থ লোকদের কাজ করিবার কম ক্ষমতার কথা। কিন্তু আমাদের রোগ-প্রবণতার কথা ও শক্তিক্ষয়কারী নানা ব্যাধির উৎপাতের কথা হিসাব করিলে দেখা যাইবে যে, পাশ্চাত্য দেশের এক জন পূর্ণবয়স্ক কর্ম্মক্ষম ব্যক্তি বৎসরের যতটা সময় সুস্থ থাকিতে পারেন আমাদের দেশে সুস্থ থাকিবার সময় তদপেক্ষা অনেক কম এবং শহর অপেক্ষা পল্লীতে, অন্যান্য প্রদেশ অপেক্ষা বাংলায়, ও সমাজের অন্যান্য শ্রেণীর তুলনায় কৃষকদের পক্ষে এই কথা অধিক সত্য। অন্যান্য সভ্য দেশের লোকেরা যে-সকল ব্যাধির হাত হইতে অনেক দিন পূর্ব্বে মুক্তি পাইয়াছেন, সেই সকল ব্যাধি আমাদের যত লোককে বৎসরের যতটা সময় অকর্ম্মণ্য করিয়া রাখে এবং তাহার ফলে আমাদের কর্ম্মশক্তির যে মোট অপচয় ঘটে তাহার পরিমাণ বিপুল। অনেক ক্ষেত্রে চিরস্থায়ী ভাবে বা অনেক দিনের জন্য যে ইহা আমাদের কর্ম্মশক্তিকে পঙ্গু করিয়া রাখে, উৎসাহ-উদ্যম হরণ করে, তাহার প্রত্যক্ষ

ও পরোক্ষ প্রভাবেও আমাদের কর্ম্মশক্তির কম অপচয় ঘটে না। সব সময়েই আমাদের অনেক লোক কোন-না-কোন অসুখে ভুগিয়া থাকেন বলিয়া এবং রোগে অকর্ম্মণ্য লোকের সংখ্যা অত্যধিক বলিয়া, জনসংখ্যার অনুপাতে অন্যান্য দেশ অপেক্ষা এদেশে কর্ম্মক্ষম লোকের সংখ্যা অনেক কম।

অগ্রবর্ত্তী দেশগুলির গড় আয়ুষ্কাল আমাদের দেশের দুই হইতে আড়াই গুণ। আমাদের দেশে গড় আয়ু কম; তাহার অর্থ এই যে, দীর্ঘায়ু লোকের সংখ্যা অত্যন্ত কম, পূর্ণবয়স্কদের সংখ্যাও কম এবং অল্পবয়স্কদের মধ্যে মৃত্যু-সংখ্যা এত অধিক যে, গড় হিসাবে দীর্ঘায়ু ও মধ্যায়ুদের গড় আয়ুর পরিমাণ কমিয়া গিয়া এত নিম্নে পৌঁছিয়াছে। তুলনায় অনেক অধিক সংখ্যক লোক পূর্ণ বয়স প্রাপ্ত হইবার পূর্ব্বেই মারা যান বলিয়া, এদেশে অপ্রাপ্তবয়স্কদের আনুপাতিক সংখ্যা অত্যন্ত বেশী। এই অপ্রাপ্তবয়স্কদের একটা বড় অংশ (যাঁহারা অকালে মারা যান) জনসংখ্যার অঙ্ক বৃদ্ধি করিলেও, শক্তি বৃদ্ধি করে না, বরং এক হিসাবে শক্তি হ্রাস করে। যাঁহারা কর্ম্মক্ষম হইবার পূর্ব্বেই মারা যান, তাঁহাদের কর্ম্মের দ্বারা দেশ কিছুমাত্র লাভবান হয় না; অথচ, তাঁহাদের লালনপালন করিবার জন্য যে শক্তি ব্যয়িত হয় তাহা সহজে অন্যত্র প্রযুক্ত হইতে পারিত। এই অপব্যয়ের মধ্যে আমাদের অনেকখানি কর্ম্মশক্তি অকেজো হইয়া আবদ্ধ হইয়া আছে।

যাঁহারা বৃদ্ধ বা পূর্ণ বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিয়া থাকেন অনুপাতে তাঁহাদের সংখ্যা কম হওয়ায় তাঁহাদের প্রতিপাল্যের সংখ্যা অত্যন্ত বেশী থাকে এবং ইহাদিগকে খাওয়াইবার পরাইবার সুস্থ রাখিবার ও যোগ্য করিয়া তুলিবার জন্য তাঁহাদের এতটা শক্তি ব্যয় করিতে হয় যাহাতে শক্তি, উদ্যম, অধ্যবসায় ও দায়িত্ব সাপেক্ষ কোন কাজ করিবার মত ক্ষমতা তাঁহাদের আর অবশিষ্ট থাকে না।

নারীরা আমাদের জনসংখ্যার অর্দ্ধাংশ। অবরোধের মধ্যে থাকায় তাঁহাদের শক্তি ত অব্যবহৃত থাকিয়াই যাইতেছে। তাঁহারা পূর্ণ সুযোগ পাইলেও, যে-সকল কারণে পুরুষদের কর্ম্মশক্তি অপেক্ষাকৃত কম, সে-সকল কারণ তাঁহাদের পক্ষেও সমভাবে বর্ত্তমান থাকিত। অধিকন্তু, বাল্য-মাতৃত্ব, নানা সামাজিক কুপ্রথা, স্বাস্থ্যের উপর অবরোধের ফল প্রভৃতির জন্য পুরুষদের অপেক্ষা তাঁহাদের অবস্থা আরও শোচনীয় এবং পুরুষদের অপেক্ষা অন্যান্য দেশের তুলনায় তাঁহাদের কর্ম্মশক্তি আরও কম। শিখ, মারাঠা প্রভৃতি যে-সকল বলিষ্ঠ জাতির পুরুষেরা শারীরিক শক্তিতে অন্যান্য দেশের পুরুষদের সমান, তাঁহাদেরও নারীদের স্বাস্থ্য আশানুরূপ নহে বলিয়া বিদেশীদের চোখে ঠেকিয়াছে।

কাজেই, আমাদের জনসংখ্যাকে আমাদের কর্ম্মশক্তির পরিমাপ বলিয়া ধরা যায় না। আমরা যখন আমাদের বিপুল সংখ্যার কথা সগৌরবে উল্লেখ করিয়া থাকি, তখন মনে আমাদের বিপুল কর্ম্মশক্তির কথাই জাগিয়া থাকে। কিন্তু, প্রকৃতপক্ষে হয়ত আমাদের কর্ম্মশক্তি একটি ছোট দেশের সমান হইবে মাত্র।

আলোকের পুত্র

শ্রীহেমলতা দেবী

ব্রিষ্টলে রাজা রামমোহনের সমাধিদর্শনে

চক্ষু মোর করিলে দর্শন!
কভু কি ইহার লাগি দেখিলে স্বপন?
ভেবেছি কত না কথা দূরান্তরে থাকি,
লোকান্তর হ'তে তাই আনিলে কি ডাকি,
যেথা তব অঙ্গরেণু সুরভি বিলায়ে
মাটি সাথে মাটি হয়ে রয়েছে মিলায়ে;
নিবিড় পরশে যার ধন্য হ'ল প্রাণ,
পিতৃগুরু, বংশগুরু, হে গুরুপ্রধান।

নির্ব্বাক সমাধিতল—বিস্মৃত বেদনা,
পরশিতে চায় সেই অপূর্ব্ব চেতনা,
মানব-ঐক্যের রূপ উঠি যাহে ভাসি
তমসার পারে আনে আলোকের রাশি।
বিবেক-বিধৌত চিত্তে সত্য-সমন্বয়
আলোকের বরপুত্র দৃষ্টি জ্যোতির্ম্ময়॥

ব্রিষ্টল
৩. ৬. ৩৭

কনে-দেখা

শ্রীআশালতা সিংহ

১

লীলার স্বামী অ্যাসিসট্যাণ্ট-সার্জ্জেন, বড় বড় শহরে বদলি হন। পাড়াগাঁয়ে পৈত্রিক বাড়ীর সহিত সম্বন্ধ প্রায় নাই বলিলেও চলে। স্ত্রীও থাকেন স্বামীর চাকরির জায়গায়। অনেক দিন পরে দেশের বাড়ীতে আসিয়াছেন, বড়দাদার ছেলের অন্নপ্রাশন উপলক্ষ্যে। লীলার এখানে চমৎকার লাগিতেছে। তাহার গভীর ভাবুক প্রকৃতি পল্লীর স্নিগ্ধ শান্ত আবহাওয়ার সহিত ভারি চমৎকার খাপ খাইয়াছে। এখানে পরনিন্দা আছে, কোন্দল আছে, অযথা লোকের গায়ে পড়িয়া ঝগড়া আছে, কিন্তু লীলার বিশ্লেষণশীল মন এ সকলের মাঝেই নিজেকে জড়াইয়া না ফেলিয়া বিচার করিয়া দেখিতে পারে। দর্শকের মত জীবনপ্রবাহের অভিনয়ে লিপ্ত না হইয়াও তাহার স্রোতের গতিবিধি বিচ্ছিন্ন হইয়া উপভোগ করিবার দুর্লভ ক্ষমতা তাহার ছিল।

সকালবেলায় চায়ের বাসন সুমুখে লইয়া বড়বৌ চা তৈয়ারী করিতেছেন, আশেপাশে অনেকেই সমবেত হইয়াছেন। লীলা এ-বাড়ীর মেজবৌ। চায়ের পেয়ালাগুলি সে জল দিয়া ধুইয়া পরিষ্কার করিয়া সামনে আগাইয়া দিতেছিল।

বড়বৌ কহিলেন, "আহা থাক না মেজবৌ। তুমি দু-দিনের জন্ম এসেছ, তোমার দিবারাত্র এত পরিশ্রম করবার কি দরকার? ঐ ত এত লোক রয়েছে। দে না নীলু চায়ের বাসনগুলো সব ঠিকঠাক ক'রে।"

নীলু ওরফে নীলিমা এ-বাড়ীর একটি বিধবা অল্পবয়সী আত্মীয়া। সে তটস্থ হইয়া লীলার হাতের কাজ কাড়িয়া লইবার উপক্রম করিতেই লীলা মৃদুমধুর হাসিয়া কহিল, "দু-দিনের জন্যে আসি নি ভাই বড়দি, আমি যে মনে ক'রেছি গরম কালটা এখানেই কাটিয়ে বর্ষার গোড়ার দিকে ফিরে যাব। যান উনি একাই ফিরে। পশ্চিমের সেই গরমের কল্পনাও তোমরা করতে পারবে না বড়দি।"

লীলা একে বড় চাকুরে কৃতী স্বামীর স্ত্রী, তদুপরি বহু দূর পশ্চিম প্রবাসে থাকে। তাই তাহার সম্বন্ধে সম্ভ্রম এবং নানা প্রকার অলৌকিক গুজব সত্যকে বহুদূরে ফেলিয়া রাখিয়া গিয়াছিল।

অসীমা বড় বড় চক্ষু বিস্ফারিত করিয়া কহিল, "আচ্ছা মেজ কাকীমা, তুমি কি এখানে থাকতে পারবে?"

"কেন পারব না রে?"

কেন যে পারিবে না সে বিষয়ে অসীমা কোনই সদুত্তর দিতে পারিল না। কিন্তু লীলার চূর্ণকুন্তল স্বেদসিক্ত হইয়া কপোলের উপর পড়িয়া আছে, তাহার গলার সরু এক টুকরা চেনহার এবং হাস্যবিভাসিত মুখখানি—এ সমস্ত লইয়া তাহাকে যেন আশেপাশে সকলের হইতে বড় সুদূর বলিয়া মনে হয়। এই গাঁয়ে এই পচা শ্যাওলাধরা পুকুর এই দলাদলির হিংস্র আবহাওয়ায় তাহাকে মানায় না।

অসীমার মা অবাক স্বরে কহিলেন, "শোন, মেয়ের কথা শোন একবার! নিজের শ্বশুরের ভিটে, এখানে থাকতে পারবে না কেন শুনি? হ'লই বা চাকুরে-বাকুরে বড়লোক, নিজের ঘর বলতে তো এই।"

ক্রমে চায়ের পর্ব্ব চুকিয়া আসিল, কেবল ছেলের দল তখনও এক-একটা গেলাস বা বাটি হাতে লইয়া করুণ স্বরে আবেদন জানাইতেছিল, "আমি আর একটু চা নেব বড়মা, আমাকে আর অল্প দাও কাকীমা।..."

অতি অল্প বয়স হইতে চা খাইলে লিভার খারাপ হয় এই কথাটা নানা প্রকারে ছেলেদের বুঝাইতে বুঝাইতে লীলা বেশী দুধ দিয়া পাতলা চা ঢালিয়া দিতেছিল।

বিধবা খুড়শাশুড়ী দোক্তা দিয়া পান সাজিতে বসিয়াছিলেন। মুরুব্বির স্বরে কহিলেন, "হ্যাঁ, মেজবৌমা, তুমিও যেমন বাছা। এই হ্যাংলা ছেলেগুলোকে আবার তত্ত্বকথা বোঝাতে এলে। ওরা ত সব কথাই বুঝতে পারছে তোমার, আর সব শুনে ব'সে আছে।...যা যা তোরা সব

বাইরে গিয়ে খেলাধুলো কর গে।" তিনি একটা প্রবল হুঙ্কার ছাড়িলেন।

নিমেষে ছেলের দল গেলাস-বাটি হাতে অন্তর্দ্ধান হইল।

লীলা একবার ব্যথিত দৃষ্টিতে ঊর্দ্ধশ্বাসে পলায়নপর ছেলেদের দিকে চাহিয়া অন্য কাজে মন দিল। ততক্ষণে বড় বড় ধামা-চুপড়ি বঁটি-বারকোশ বার হইয়াছে। তরকারি কুটিবার কাজে ইতিমধ্যে কয়েক জন বসিয়া গিয়াছে। তরকারি কুটিতে বসিয়া মেয়েদের আলোচনা যেমন জমে এমনটি আর কিছুতেই জমে না।

ও-পাড়ার চাটুজ্জেদের মেয়ে বিমলার কথা উঠিল। মেয়েটির বয়েস সতর পার হইতে চলিল অথচ এখনও কোথাও বিবাহের ঠিক হয় নাই। পল্লী-ইতিহাসে এমনতর ভয়াবহ কাণ্ড আরও দুই-চারিটা যে না ঘটিয়াছে এমন নয়। এই যে সেদিন মিত্তিরদের মনোরমার আঠার বছরে বিবাহ হইল। হ্যাঁ...পাকা আঠার বছর বয়স। ন-খুড়ীমাকে ঠকাইবার জো কি! তিনি হিসাব করিয়া সমস্তই বলিয়া দিতে পারেন। যে ভাদ্রে তাঁহার বিশ্বনাথ দু-বছরেরটি হইয়া মারা যায় সেই ভাদ্রের পরের ভাদ্রে মনোরমার জন্ম হয়। তবেই দেখ না কেন হিসাব করিয়া ধাড়ী মেয়ের বয়সখানা, মা-মাগী যতই কেননা কমাইয়া বলুক। তার পর বোসেদের দামিনী...তাহারও কোন্ না ষোল পার হইয়া বিয়ের ফুল ফুটিয়াছিল। কিন্তু উপস্থিত তাহারা সমালোচনা-কেন্দ্রের বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। কারণ যত বড় বয়সেই হোক, উপস্থিত তাহাদের বিবাহ হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বিমলা... মাগো অবাক কাণ্ড! ঐ ত বাপের অবস্থা, আজ খাইতে কাল নাই, তবুও মা-মাগীর দেমাক দেখ না, পাত্র পছন্দ হয় না। য-হয় একটা খুঁজিয়া-পাতিয়া মেয়ে উচ্ছুগ্গু করিয়া দে, তা নয় উনি আবার বর্ণবিচার করিতে বসিলেন।

লীলা ঝোলের আলুর খোসা ছাড়াইতে ছাড়াইতে কহিল, "কিন্তু খুড়ীমা, যেখানে-সেখানে মেয়েকে বিয়ে দিলে তার পরে সারাজীবনই ত কষ্ট। তার চেয়ে যদি ভাল পাত্র খুঁজতে একটু দেরিই হয়ে যায়, ক্ষতি কি?"

খুড়ী মা চট্ করিয়া একটা প্রতিবাদ করিতে পারিলেন না, কারণ লীলাকে সকলেই একটু সমীহ করিয়া চলিত। কিন্তু তাই বলিয়া তাঁহার মতেরও যে খুব একটা পরিবর্ত্তন হইল তা নয়। সেই দিনই দুপুরবেলায় স্নানের ঘাটে হরি পালিতের স্ত্রীকে তিনি হাত-পা নাড়িয়া বিধিমতে বুঝাইতে চেষ্টা করিতেছিলেন, "হ্যাঁ, দেখো তোমরা, আমি ব'লে দিলাম ঐ মেয়েটি কম নয়। সোয়ামীর সঙ্গে বিদেশে বিদেশে ঘোরে, বলতে গেলে একেবারে ম্লেচ্ছ হয়ে দাঁড়িয়েছে। আজ আমাকে বলে কি না বিমলার বিয়েতে যদি ওর মা-বাপ দেরি ক'রেই থাকে, বেশ করেছে। মেয়েমানুষের বিয়ে ভাল পাত্র দেখে দিতে গেলে অমন দেরি হয়েই থাকে। কে বলেছে?...ও মা, বুঝতে পারছ না, আমাদের বাড়ীর মেজবৌমা, লীলেবতী না কি নাম।"

প্রত্যুত্তরে প্রতিবেশিনী গালে হাত দিয়া তাঁহার বিস্ময়ের মাত্রা যথোপযুক্ত ভাষায় ব্যক্ত করিলেন। বলিলেন, এমনটি যে হইবে সে বিষয়ে আগে হইতেই তাঁহার সন্দেহ ছিল। এখন ঐ মেজবৌয়ের পাল্লায় পড়িয়া বাড়ীর অন্য ঝি-বৌগুলা এক রকমের না হইয়া গেলে বাঁচি!

২

রায়েদের গৃহদেবতা রাধাগোবিন্দ জীউর প্রস্তরনির্ম্মিত মন্দির গ্রামের মধ্যস্থলে। সন্ধ্যারতির সময় সুবিস্তৃত আটচালায় গ্রামের সকল স্ত্রীলোকেই প্রায় আরতি দর্শন করিতে আসেন। আরতির যথানির্দ্দিষ্ট সময়ের অনেকক্ষণ আগে হইতেই তাঁহারা আসিতে সুরু করেন, সান্ধ্য মজলিসে এমন সকল কথার আলোচনা হয় যাহার সহিত ভগবানের আরতির কোনই সম্পর্ক নাই।

লীলাও আরতি দেখিতে আসিয়াছে। আসিয়া দেখিল, আটচালার পূর্ব্ব কোণে একটি মেয়ে অতিশয় নিস্তব্ধ এবং সঙ্কুচিত ভাবে বসিয়া আছে। মেয়েটির বয়স বছর ত্রিশ বা দু-এক বছর বেশী হইবে। সধবা। আধময়লা লাল-পাড়ের শাড়ী পরনে। দুঃখদৈন্যের সঙ্গে অবিরত লড়াই করিয়া একটা রুক্ষ কঠোরতার ছাপ মুখে দেদীপ্যমান হইয়া রহিয়াছে। সে লীলার একটু কাছে সরিয়া বসিয়া কহিল, "ভাই তুমি নাকি ভারি সুন্দর সুন্দর সেলাই জান। আমার মেয়ের শিখবার বড্ড সখ, কিন্তু সুবিধে পায় না। সে যদি দুপুরে তোমার বাড়ী যায়, অবসরমত একটু শেখাবে?"

"আপনার মেয়ে? কি নাম তাঁর?"—লীলা প্রশ্ন করিল।

"বিমলা। তুমি বোধ হয় চেন না। কিন্তু নাম শুনলেই বুঝতে পারবে।"— বিমলার মা একটুখানি হাসিয়া আবার বলিলেন, "অন্ততঃ বুঝতে পারবার কথাই ত বটে। মুখে মুখে যা আলোচনা চলেছে।"

লীলা এতক্ষণে বুঝিতে পারিল, এই সেই বিমলা যাহার কথা লইয়া সকালবেলায় এত আলোচনার ঢেউ বহিয়া গেল। মৃদু হাসিয়া সে বলিল, "আমি যেটুকু জানি নিশ্চয় শেখাব দিদি। আমি তো দু-মাস এখন এখানেই রইলাম। তাকে আসতে বলবেন।"

বিমলার মা আর কোন কথা বলিল না। কিন্তু তাহার শীর্ণ মুখের উপর একটি কৃতজ্ঞতা এবং নিঃশব্দ প্রীতির ছায়া ভাসিয়া গেল। তখন আরতি আরম্ভ হইয়া গিয়াছে, আর কোন কথাবার্তার অবসর হইল না। তথাপি লীলা যেন কেমন করিয়া বুঝিতে পারিল এই স্বল্পভাষিণী সাধারণ মেয়েটির মধ্যে অসামান্যতা কিছু আছে, যাহাতে তাহাকে অদূরে সমাগতা ঐ সব মহিলামণ্ডলীর সহিত এক করিয়া দেখা যায় না কিছুতেই।

পরের দিন খাওয়া-দাওয়ার পর লীলা নিজের ঘরে বসিয়া রবীন্দ্রনাথের গল্পগুচ্ছ হইতে "রাসমণির ছেলে" গল্পটি বাহির করিয়া পড়িতেছিল, এমন সময় দুয়ারের কাছে একটা ছায়া পড়িল। সে বাহির হইয়া আসিয়া ডাকিলে বিমলা ঘরে ঢুকিল। বয়স তাহার পনর-ষোলর বেশী কিছুতেই হইবে না। চমৎকার সুশ্রী দেখিতে। আর সবচেয়ে লীলার ভাল লাগিল চোখে মুখে একটি তীক্ষ্ণ বুদ্ধির আভা, যে-বস্তুটা এখানে এত মেয়ের সহিত আলাপ হইয়াছে কাহারও মধ্যে সে লক্ষ্য করে নাই। সকলেরই মধ্যে প্রাণহীন একটা জড়তার ভাব। এই জড়ত্বের স্থূল অবলেপ অনেক সুন্দরী মেয়েকেও আকর্ষণীয় করিয়া তুলিতে পারে নাই। বিমলার বেলায় কিন্তু ঠিক ইহার বিপরীত। সে সুন্দরী খুব নয়, কিন্তু তাহার জোড়া ভুরুতে, ঘনকালো তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টিতে অত্যন্ত সপ্রতিভ বুদ্ধির একটা রশ্মি বিচ্ছুরিত। লীলার সম্মুখস্থ বইটি লইয়া নাড়াচাড়া করিতে করিতে সে মৃদুস্বরে কহিল, "রাসমণির ছেলে গল্পটা আমি যে কতবার পড়েছি। এত ভাল লাগে!"

লীলা বিস্মিত হইয়া কহিল, "তুমি এ সব বই পড়?"

বলিয়া ফেলিয়াই কিন্তু সে লজ্জিত হইল। মনে হইল, হয়ত বিমলা মনে করিতে পারে জগতের ভাল বই একমাত্র সে ছাড়া আর কেহই উপভোগ করিতে পারে না। কিন্তু বস্তুত সেরূপ মনোভাব লইয়া সে জিজ্ঞাসা করে নাই। এখানে মেয়েদের মুখে অহরহ যে ধরণের আলোচনা ও পরকুৎসার প্রবণতা লক্ষ্য করিয়াছে তাহাতে অবাক হইয়া মাঝে মাঝে সে ভাবিয়াছে, ইহারা কখনও কি তারার আলোর দিকে তাকায় না?

বিমলা নতমুখে কহিল, "আমার মা যে খুব ভাল লেখাপড়া জানেন। তিনিই অনেক যত্নে আমাদের শিখিয়েছেন।"

"সে আমি তাঁর সঙ্গে অল্প একটুক্ষণ কথাবার্তা বলেই বুঝতে পেরেছিলুম।"—লীলা সেলাইয়ের কলের চাবিটা খুলিতে খুলিতে বলিল।

সেদিন দুপুরবেলায় অনেকক্ষণ ধরিয়া একত্রে সেলাই করিতে করিতে বিমলার সঙ্গে লীলার অনেক কথাই হইল। এই শান্ত সপ্রতিভ অনূঢ়া মেয়েটির মধ্যে একটা তেজ এবং প্রবল আত্মাভিমান রহিয়াছে, অথচ যেখানে সত্যকার সহানুভূতি থাকে মানুষ অজ্ঞাতসারেই সেখানে হৃদয়ের দ্বার খুলিয়া দেয়। তাই বিমলা নিজেকে যথাসম্ভব চাপিয়া রাখিয়াও কখন এক সময় লীলাকে বলিতেছিল, "দেখুন, আমার নিজের কথা বাদ দিন, আমার অনেক বয়স অবধি বিয়ে হচ্ছে না ব'লে লোকে যা তা বলছে, তাতে আমার এক বিন্দুও আসে যায় না। কিন্তু এই সব নির্দয় সমালোচনায় আমার মাকে ব্যথা পেতে হয়।"

একটু পরে বিদায় লইয়া চলিয়া গেল। নম্রসুরে কহিল, "আপনার কাছে কয়েকটা ছাটকাট শিখে নেব। কিন্তু তার জন্যে মাঝে মাঝে এলেই হবে। রোজ যদি আসি আপনারও বোধ হয় অসুবিধে হবে।"

"না অসুবিধে কিছুই হবে না। তুমি রোজই এস। ...আমি সারা দুপুর একা থাকি। উনি তো নিজের কাজের জায়গায় ফিরে গেছেন। আমারই বরঞ্চ সময় কাটে না।"

বিমলা মুখ নীচু করিয়াছিল। মুখ তুলিয়া হাসিয়া ফেলিল।

"হাসলে কেন?"

"বুঝতে পারলেন না? সত্যি?"

"না।"

"আমি এখানে রোজ যদি আসি, হয়ত আপনাকে অনেক অপ্রীতিকর কথা শুনতে হবে। দরকার কি?"

শেষের দিকে তাহার কণ্ঠস্বর যেন অভিমানে ছল ছল করিয়া উঠিল। আর বিশেষ কিছু না বলিয়া ক্ষুদ্র একটি নমস্কার করিয়া সে দ্রুতপদে চলিয়া গেল।

৩

বিকালবেলায় পুকুরে গা ধুইতে গিয়া লীলা একাকী একটি ছায়াচ্ছন্ন বনপথ দিয়া বিমলাদের বাড়ীতে গিয়া উঠিল। বিমলার মা দাওয়ায় বসিয়া ছেঁড়া কাপড় সেলাই করিতেছিলেন। বিমলা ছোট একটি নিড়ানি হাতে উঠানের শাকের ক্ষেত এবং বেগুনের চারাগুলির তত্ত্বাবধান করিতেছিল।

লীলাকে দেখিয়া সে হাতের কাজ রাখিয়া স্নিগ্ধ হাস্যে একখানি জীর্ণ আসন পাতিয়া দিল। তার পর আবার আপন কাজে প্রবৃত্ত হইল। বিমলার মা মৃদুস্বরে তাহার সহিত সাংসারিক সুখদুঃখের নানাবিধ গল্প সুরু করিলেন। লীলা দেখিয়া অবাক হইল, তাঁহার ব্যবহার এবং কথাবার্ত্তা কি সুন্দর সহজ এবং স্বচ্ছ। এক ধনীর গৃহিণী দরিদ্রের কুটীরে আসিয়াছেন বেড়াইতে; তবু না আছে কোন লোক-দেখানো হৈচৈ, না আছে কোন বৃথা লজ্জা বা সঙ্কোচের ভান।

বিমলার মা নিজের শৈশবজীবনের কথা গল্প করিতেছিলেন। তাঁর বাবা ছিলেন এক জন বিখ্যাত অধ্যাপক। ছেলে এবং মেয়েতে কখনও তফাৎ করেন নাই। তাঁদের দুই বোনকে যথাসাধ্য যত্নে শিক্ষা দিয়াছিলেন। হঠাৎ তিনি মারা গেলেন। তবুও বিমলার মায়ের যখন বিবাহ হয়, তখন তাঁহাদের শ্বশুরবাড়ীর অবস্থা এত খারাপ ছিল না। ওঁর স্বামী তখন কলিকাতার কলেজে বি-এ পড়েন। তার পর ভাগ্যের আবর্ত্তনে সবই বদলাইয়া গেল। সরিকী মামলায় অত্যন্ত জেদী প্রকৃতির শ্বশুর বিষয়-সম্পত্তির অধিকাংশই প্রায় উড়াইয়া ফেলিলেন। স্বামীর নিউমোনিয়া ধরিল শক্ত করিয়া। যদিবা অনেক কষ্টে প্রাণটা বাঁচিল, সেই হইতে চিররুগ্ন হইয়া আছেন।

লেখাপড়ার কথা ওঠায় কহিলেন, "দেখুন, ছেলেমেয়ের সুখদুঃখ সে তো তাদের ভাগ্য। বাপ-মা হাজার চেষ্টা করলেও ভাগ্য বদলে দিতে পারে না। আমার জীবনেই তার প্রমাণ দেখলেন। কিন্তু ছেলেমেয়েকে একটা বস্তু মা-বাবা দান ক'রে যেতে পারেন—সেটা শিক্ষা। জীবনে যেমন ভাবে যে অবস্থাতেই থাক, যথার্থ শিক্ষিত হ'লে অসুন্দরতাকে সে প্রাণপণে পরিহার ক'রে চলবেই। বিমলাকে ম্যাট্রিক আই-এ পাস না করাতে পারি, এইটুকু শিক্ষাই আমি যথাসাধ্য দিতে চেষ্টা করেছি।"

সন্ধ্যা হইয়া আসিয়াছে। বিমলাদের ছোট তুলসী-প্রাঙ্গণে একটি মাটির প্রদীপ মৃদু জ্বলিতেছে। বিমলার মা বলিলেন, "বিমলা যাও তোমার মাসীমাকে পৌঁছে দিয়ে এস। সন্ধ্যে হয়ে গেল, অচেনা পথ। না-হয় মন্দির অবধি পৌঁছে দিয়ে এস। সেখানে এতক্ষণ হয়ত আরতি সুরু হয়ে গেছে। আমি আজ আর আরতি দেখতে যাব না। ওঁর শরীরটা ভাল নেই।"

প্রথম শুক্লপক্ষের মৃদুস্ফুট জ্যোৎস্না আঁকাবাঁকা রাস্তা ও তেঁতুলের ঝাড়, বাঁশঝাড়ের উপর পড়িয়া কি এক রকম দেখাইতেছিল। নির্জ্জন রাস্তায় চলিতে চলিতে লীলার মনটি তৃপ্তিতে ভরিয়া উঠিল। এখানে আসার পর হইতে এখন এমন এক বাড়ীর সহিত আলাপ হইল যেখানে আসা-যাওয়া করিলে যথার্থ তৃপ্তি ও আনন্দ পাইবে। বিমলার মায়ের মুখের কথাটি তাহার বারংবার মনে পড়িতে লাগিল, মা বাপ একটি বস্তু সন্তানকে দান করিতে পারেন, সে এমন শিক্ষা যাহা জীবনে সকল অবস্থাতেই সৌন্দর্য্যকে স্বীকার করে। কোন প্রকারেই যেন অসুন্দরতাকে মানিয়া না লয়। বিমলাদের বাড়ীর সহিত তুলনা করিতেই এ-কথাটার অর্থ পরিস্ফুট হইয়া উঠে। সেদিন পাশের বাড়ীতে সেজখুড়ীমাদের ওখানে বেড়াইতে গিয়াছিল। তখন বাড়ীতে একটা হুলস্থূল বাধিয়া গিয়াছে। সেজ-খুড়ীমা একটা আট হাত শুভ্র কাপড় পরিয়া রণরঙ্গিণী মূর্ত্তিতে কুয়াতলায় চরকিবাজীর মত ঘুরিতেছিলেন। তাঁহার

পুত্রবধূ ম্লান ভীত মুখে সুমুখে দাঁড়াইয়াছিল। ব্যাপার হইয়াছিল, নীচ জাতীয়া ঝিয়ের মাজিয়া-আনা বাসন আর একবার ভাল করিয়া জল ঢালিয়া ঘরে তোলা হয়। ছোট বৌটি সেই কাজেই রত ছিল। কিন্তু সেজখুড়ীমার কেমন করিয়া মনে হইয়াছে যে, যথোপযুক্তরূপে জল ঢালা হয় নাই, অতএব জাতজন্ম সবই গিয়াছে। তুচ্ছ একটা ব্যাপার লইয়া কি তুমুল কলরব, শান্তিভঙ্গ, মনঃকষ্ট! জীবনের সকল মাধুর্য্য অবমানিত হইয়া ফিরিয়া গিয়াছে।

৪

স্নান করিয়া আসিয়া লীলা পান সাজিতে বসিয়াছিল। বড়বৌ পাশে বসিয়া জাঁতি দিয়া সুপারি কাটিয়া স্তূপাকার করিতেছিলেন। একটুখানি হাসিয়া কহিলেন, "এত দিন পরে বোধ করি বিমলার বিয়ের ফুল ফুটল। শুনছি কোন্ এক জায়গা থেকে নাকি দেখতে এসেছে। তারা কাল রাত্রির ট্রেনে এসেছে। গরুর গাড়ী ক'রে এখানে পৌঁছতে সেই যাকে বলে গিয়ে রাত এগারটা। আজ সকালে বুঝি কনে দেখান হবে।"

লীলা উৎসুক হইয়া উঠিয়া কহিল, "তাই নাকি? আচ্ছা কেমন জায়গায় সম্বন্ধ হচ্ছে দিদি?"

"নেহাৎ মন্দ নয়। পাত্রটি ম্যাট্রিকুলেশন পর্য্যন্ত পড়েছে। গাঁয়ে জমীজমা আছে। মোটা ভাত-কাপড়ের কষ্ট নেই। তবুও কি খাঁই কম! একটি হাজার টাকা পণ নেবে। তা ছাড়া অলঙ্কার গয়নাগাঁটি, বিয়ের খরচ। কত জায়গায় খুঁজে দেখলে। এর চেয়ে কমে কি আর মেয়ের বিয়ে হয়।"

পাড়ার কৌতূহলী মেয়ের দল, যাহারা কোনদিন গ্রামের একপ্রান্তে বিমলাদের গৃহে পদার্পণ করে না, আজ একেবারে দলে দলে ভাঙিয়া পড়িয়াছিল। লীলাও গেল। পাশের ঘর হইতে দেখিল, সদরের তক্তপোষের উপর একটি পরিষ্কার চাদর পাতা। বর তাহার এক জন বন্ধুকে লইয়া দেখিতে আসিয়াছে। বিমলা একখানি সাদাসিদে ধোয়ান কালোপাড়ের কাপড় পরিয়া পিতার সহিত গেল। অত্যন্ত বাহুল্যবর্জ্জিত বেশ। অলঙ্কার বা প্রসাধন কিংবা জর্জ্জেট বেনারসীর একান্তই অভাব। তথাপি ঐ বেশেই তাহাকে কি চমৎকার মানাইয়াছে। শান্ত মুখচ্ছবিতে একটি আত্ম-সমাহিত ভাব। কপালের সিন্দুর-বিন্দুটি জল জল করিতেছে। জীবনের দুঃখদৈন্যকে জানিয়া শুনিয়া বরণ করিয়া লইয়াও ঐ সিঁদুরের টিপটি যেন একটি রক্তগোলাপ হইয়া ফুটিয়া আছে।

বরের বন্ধু কলিকাতার ছেলে, গ্রাজুয়েট। আজকালকার অত্যন্ত নব্য এবং চতুর যুবক। সমস্ত জিনিষের বাজারদর যাচাই করিয়া বাজাইয়া লইতে পারে। তাই বিশেষ নির্ব্বন্ধ করিয়া তাহাকে এ ব্যাপারে আনা।

বন্ধুটি একটা সিগারেট ধরাইয়া কহিল, "আচ্ছা আপনি ক'রকম সেলাই জানেন? এম্‌ব্রয়ডারি, কাশ্মীরী ষ্টিচ?... পিক্‌টোগ্রাফ?...আচ্ছা বলুন দেখি মাছের কোপ্তা কেমন ক'রে রাঁধে? মুড়ি ভাজতে জানেন? রাঁধাবাড়া বাটনা-বাটা এসব?...ভাতের ফেন কেমন ক'রে ঝরায় বলুন দেখি?...আচ্ছা গান? গান কি এস্রাজ বাজিয়ে করেন, না হার্ম্মোনিয়াম?"

বিমলা বিশেষ কোন কথার জবাব না দিয়া স্মিতমুখে নমস্কার করিয়া উঠিয়া আসিবার সময় কহিল, "সাধারণ অল্পআয়ের অধিকাংশ বাঙালী গৃহস্থঘর চালাতে গেলে যা যা শিখতে হয় সেইটুকু মাত্র শিখেছি। তার বেশী জানি নে।"

শোনা গেল, কন্যা পছন্দ হইয়াছে। বরের বন্ধু রায় দিয়াছেন, অত্যন্ত সেকেলে, যদিও চেহারা মন্দ নয়। কিন্তু স্বয়ং পাত্র বলিয়াছেন, "যাদের দু'খানা হালের জমিতে সংসার চালাতে হয় তাদের স্ত্রী এস্রাজ বাজিয়ে গান গায়, না হার্ম্মোনিয়ামের সঙ্গে গায়, এ-কথাটা সম্পূর্ণ অপ্রাসঙ্গিক।"

লীলার মনটা খুঁৎ খুঁৎ করিতেছিল। কিন্তু সেদিন দুপুরবেলায় যথানিয়মিত সেলাই শিখিতে আসিয়া বিমলা একটু হাসিয়া কহিল, "তুমি কেন মিথ্যে দুঃখ পাচ্ছ মাসীমা। ভেবে দেখ বাংলা দেশের নিরানব্বই জন মেয়ের ত এমনই ক'রে অর্দ্ধসচ্ছল সংসারে কায়ক্লেশে দিন কেটে যায়। আমি তাদেরই এক জন—একথা ভাবতে আমার মনে কোন কষ্ট নেই। কিন্তু এই মনে ক'রে কেবল আমার হাসি পাচ্ছে যে, বাংলা-দেশে কনে-দেখা বস্তুটা কি রকম প্রহসনের ব্যাপার! মেয়েটিকে যাচাই করতে এসে জহরি এক নিঃশ্বাসে প্রশ্ন করবেন, তুমি শেলী, কীট্‌স্, বায়রণ পড়েছ?...তুমি ঘুঁটে দিতে পার? অথচ এর হাস্যকরতা, নিষ্ফলতা আর অসঙ্গতির দিকটা তাদের চোখে পড়ে না।"

মেঘালোকে

শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী

আমাদের মধ্যে যাঁরা ব্যবসায়ী, যাঁরা কাজের লোক,—বাহিরের বিষয়বুদ্ধি যাঁদের প্রখর, তাঁদের হালখাতা হয় শুভ বৈশাখের পয়লা তারিখে; আর যাঁরা অব্যবসায়ী, অকর্ম্মা, চিত্তবৃত্তি ও কল্পনা লইয়াই যাঁদের কারবার, তাঁদের হালখাতা, বোধ করি, আষাঢ় মাসের পয়লায়,—মহাকবি কালিদাস যেদিনটিকে তাঁর বিরহকাব্য মেঘদূতে অমর করিয়া গিয়াছেন। পয়লা বৈশাখের বদলে, আষাঢ়স্য প্রথম দিবসেই যেন সেই হইতে প্রণয়ীজনের প্রীতিচর্চ্চার শুভসুযোগ সূচিত হইয়া আছে।

মেঘে-মেঘে যেদিন আকাশ ছাওয়া, দিকে-দিকে যেদিন সজল হাওয়া, পথে-পথে যেদিন দুস্তর কাদা, বাহির হইবার যেদিন বিস্তর বাধা, প্রাত্যহিক কাজকর্ম্মের কথা ভুলিয়া চিত্ত সেদিন স্বভাবতই অন্তর্মুখী হইয়া উঠে এবং আপনার ঘরের কথা, অন্তরের কথা, ভালবাসার কথা, প্রিয়জনের কথা এবং হৃদয়ের সুখদুঃখের কথাই তাহার মনে পড়ে। ছড়ানো মনকে মানুষ যেন সেদিন কুড়াইয়া পায় এবং নিভৃত গৃহের কর্ম্মহীন নর্ম্মশয্যায় তাই দিয়া সে যেন মালা গাঁথিতে বসে।

এই পয়লা আষাঢ় উৎসব করিবার দিন বটে, কিন্তু সে উৎসব বাহিরের আড়ম্বর লইয়া নয়, অন্তরের অনুভূতি লইয়া। মেঘৈর্মেদুরমম্বরং বনভুবঃ শ্যামাস্তমালদ্রুমৈঃ যেদিন, সেদিন নিভৃত নিকুঞ্জমিলনের আকাঙ্ক্ষাই রাধার একমাত্র আকর্ষণ। সেদিন অন্য চিন্তার অবসর নাই। "নীল নবঘনে আষাঢ়-গগনে তিল ঠাঁই আর নাহিরে, ওরে তোরা আজ যাস্‌নে ঘরের বাহিরে" যেদিন, সেদিন ঘরই একমাত্র কাম্য।

দিনের সঙ্গে রাত্রির যে সম্বন্ধ, অন্যান্য ঋতুপর্য্যায়ের সঙ্গে বর্ষার সম্বন্ধ অনেকটা তাই।

> 'ওরা দুপুরেতে আজ রজনী শ্রাবণ মেঘের গুণে,
> সে যে দিবালোক দিল নিবায়ে কাজল বসন বুনে;
> শালের শ্যামল ছায়ায় শীতল বাদল হাওয়ায়
> দিবস আজিকে ঘুমায় মেঘের মৃদং শুনে'।

রাত্রির মত অন্ধকারাবৃত বর্ষাদিনে প্রকৃতির যেন সত্যকার নেপথ্যবিধান! এমন দিনে পুরাকালের তপোবন-গুরুগৃহে অনধ্যায়ের বিধান ছিল। সংসার-তপোবনের কর্ম্মহীন দিবসেও সেই বিধিই, বোধ করি, স্বাভাবিক ও সুসম্মত।

দিনরাত্রির প্রভেদ সম্বন্ধে রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছেন:—

> "শক্তিতে আমাদের গতি, প্রেমে আমাদের স্থিতি; শক্তি কর্ম্মের মধ্যে আপনাকে ধাবিত করে, প্রেম বিশ্রামের মধ্যে আপনাকে পুঞ্জীভূত করে। শক্তি আপনাকে বিক্ষিপ্ত করিতে থাকে—সে চঞ্চল; প্রেম আপনাকে সংহত করিয়া আনে—সে স্থির। এই জন্য দিবাবসানে আমাদের প্রয়োজন যখন শেষ হয়, আমাদের কর্ম্মের বেগ যখন শান্ত হয়, তখনই সমস্ত আবশ্যকের অতীত যে প্রেম সে আপনার যথার্থ অবকাশ পায়। আমাদের কর্ম্মের সহায় যে ইন্দ্রিয়বোধ, সে যখন অন্ধকারে আবৃত হইয়া পড়ে, তখন ব্যাঘাতহীন আমাদের হৃদয়ের শক্তি বাড়িয়া উঠে; তখন আমাদের স্নেহ প্রেম সহজ হয়, আমাদের মিলন সম্পূর্ণ হয়।...আবার যখন দেখি, আমাদের এক যায়, আমরা আর পাই এবং যায় বলিয়াই আমরা তাহা পাইতে পারি। দিনে সংসারক্ষেত্রে আমাদের শক্তিপ্রয়োগের সুখ, রাত্রে তাহা অভিভূত হয় বলিয়াই নিখিলের মধ্যে আমরা আত্মসমর্পণের আনন্দ পাই। দিনে স্বার্থসাধনচেষ্টায় আমাদের কর্ত্তৃত্বাভিমান তৃপ্ত হয়, রাত্রি তাহাকে খর্ব্ব করে বলিয়াই প্রেম এবং শান্তির অধিকার লাভ করি। দিনে আলোকে পরিচ্ছিন্ন এই পৃথিবীকে আমরা উজ্জ্বলরূপে পাই, রাত্রে তাহা ম্লান হয় বলিয়াই অগণ্য জ্যোতিষ্কলোক উদ্‌ঘাটিত হইয়া যায়।"

অন্যান্য ঋতুর সহিত বর্ষা-ঋতুর প্রকৃতিগত পার্থক্য, দিন-রাত্রির এই প্রাকৃতিক প্রভেদের মতন সুস্পষ্ট—ইহা একটু লক্ষ্য করিলেই বুঝা যাইবে।

মেঘদূতের

> 'মেঘালোকে ভবতি সুখিনোঽপ্যন্যথাবৃত্তি চেতঃ,
> কণ্ঠাশ্লেষপ্রণয়িনিজনে কিং পুনর্দূরসংস্থে।'

প্রণয়বেদের চরম মন্ত্র। এই যে আকুতি, এই যে অতৃপ্তি, এই যে বিরহমিলনে চিত্তবিকার, ইহাই প্রেমের সহজ ধর্ম্ম। বৈষ্ণব-কবিতাতেও এই অন্তর্দাহের পরিচয় পাই।

> 'কানুর পিরীতি বলিতে বলিতে পাঁজর ফাটিয়া উঠে,
> শঙ্খবণিকের করাত যেমন আসিতে যাইতে কাটে।'

পাপশঙ্কী প্রেমিকচিত্তে সর্ব্বদাই অস্বস্তি, সর্ব্বদাই ভয়।

> 'বুকেতে রাখিতে গেলে খসে পড়ে' যায়,
> পিঠেতে রাখিতে লাগে দুরদেশ তায়।
> স্বপনে হারায়ে যায়, জাগ্রতে সংশয়,
> আপনারে অবিশ্বাস, আপনারে ভয়।'

সুধাবিষে মিশ্রিত এই প্রেমমর্ম্ম কথাই মন্ত্রবাণী পাইয়াছে চণ্ডীদাসের পদে :—যেখানে

'পিরীতি বলিয়া এ তিন আখর ভুবনে আনিল কে!
অমিয়া বলিয়া ছানিয়া খাইনু তিতায় তিতিল দে'; অথবা
'পিরীতি পিরীতি সবজন কহে পিরীতি সহজ কথা?
বিরিখের ফল নহে ত পিরীতি, মিলয়ে যে যথাতথা' ইত্যাদি।

বিরহ এই প্রেমের নিকষ-প্রস্তর। ইহারই গায়ে কষিয়া প্রেমমণির স্বরূপ নির্ণীত হয়। 'সুজনকি প্রেম হেম সমতুল। দাহিতে কনক দ্বিগুণ হয় মুল'॥

'সঙ্গম বিরহবিকল্পে বরমিহ বিরহ ন সঙ্গমস্তস্যাঃ।
সঙ্গে সৈব তথৈকা ত্রিভুবনমপি তন্ময়ং তদ্বিরহে'॥

এই যে প্রেমানুভূতি, এই যে বিরহদুঃখ,—বর্ষাঋতুই যেন তাহাকে বিশিষ্টরূপে সুনিবিড় ও রসঘন করিয়া তুলে! বাহিরে যখন মেঘে-মেঘে চরাচর আচ্ছন্ন, আলোকাভাবে কর্ম্মেন্দ্রিয়গ্রাম যখন অচলপ্রায়,—চক্ষের দৃষ্টিটি পর্য্যন্ত অভিভূত, বারিধারার অবিশ্রান্ত রিমিঝিমি বর্ষণশব্দে শ্রবণ যখন প্রায় লুপ্তধর্ম্মা, নাসিকা যখন ধারাপাতজনিত মেদিনীগন্ধে বিহ্বল, তেমন দিনে, তেমন ক্ষণে মনের যে মানসিক অভিসার! আপনার জনের জন্য মন-কেমন না করিয়া কি সেদিন থাকিতে পারে? তাই বুঝি কবির কণ্ঠে :—

এমন দিনে তারে বলা যায়, এমন ঘনঘোর বরিষায়,—
এমন মেঘস্বরে, বাদর ঝরঝরে, তপনহীন ঘন তমসায়।

বর্ষার সঙ্গে প্রেমের যেন একটা নিত্য সম্বন্ধ। সে সম্বন্ধ অনুভূতির। এই অনুভূতির প্রগাঢ়তায় প্রীতিরস যেন রূপ পায়, প্রেমের কাব্য যেন মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। অন্যান্য ঋতুর কথা ছাড়িয়া দিয়া, ঋতুরাজ যে বসন্ত, তাহারই কথা ধরি। পিককণ্ঠে সে যতই মধু ঢালিয়া দিক্, বিচিত্র পুষ্প-সম্ভারে যতই বর্ণসৌরভের সমারোহ সে সজ্জিত করুক, মলয়ের মৃদুমারুতহিল্লোলে যতই মানুষের চিত্তবিমোহন ঘটুক না কেন মধু-উৎসাহী বুভুক্ষিত প্রেমকে সে তেমন করিয়া প্রবুদ্ধ করিতে পারে না, যেমন বর্ষায় পারে। কারণ, বসন্ত বাহিরের চোখ ভুলাইবার আয়োজনমাত্র; প্রাণের ভিক্ষা-পাত্র তাহাতে ভরিয়া উঠে না। সেও, যেন মনে হয়, 'এহ বাহ্য, আগে কহ আর'। তাই বুঝি বিদ্যাপতির 'আজু কাজরে সাজর রাতি,' এবং সেই সঙ্গে

দুখের নাহিক ওর—

এ ভর বাদর, মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর।
ঝঞ্ঝাঘন গরজন্তি সন্ততি ভুবন ভরি বরিখন্তিয়া,
কান্ত পাহুন, বিরহ দারুণ সঘন খরশর হন্তিয়া।
কুলিশ শতশত পাতমোদিত ময়ূর নাচত মাতিয়া,
মত্ত দাদুরী, ডাকে ডাহুকী, ফাটি যাওত ছাতিয়া।
তিমির দিগ ভরি ঘোর যামিনী, অথির বিজুরি কি পাঁতিয়া,
বিদ্যাপতি কহে ক্যায়সে গোঁয়াইবু হরিবিনে দিনরাতিয়া?

—এ গানের তুলনা নাই। এই গানের শব্দে ও ছন্দে বাদরধারার রিমিঝিমিধ্বনি যেন সুরেলয়ে ঝঙ্কৃত হইয়া উঠিতেছে। ভাবে ও রসে বর্ষার একান্ত অন্তরবেদনা যেন ঝরিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে!

ইহার পরেও বুঝি আরও একটি স্তর আছে, বাণী যেখানে মূক হইয়া যায়; যাহা বচনীয়, তাহা অনির্ব্বচনীয় হইয়া উঠে। তাই, সেখানে আমরা দেখিতে পাই—চণ্ডীদাসের ভাষায়—

রাধার কি হৈল অন্তরব্যথা!
তৃষিত নয়নে চাহে মেঘপানে, কহিতে পারে না কথা।

—সেখানে সকল কথা বন্ধ হইয়া যায়—শশীশেখরের ভাষায় শুধু 'রসের পাথার, না জানে সাঁতার, ডুবিল শেখর রায়।'

যাঁহারা বর্ষার সিদ্ধ কবি, যেমন কালিদাস, বিদ্যাপতি, রবীন্দ্রনাথ প্রভৃতি,—তাঁহারা যুগপৎ প্রাণের, প্রেমের ও প্রকৃতির পরিপূর্ণ প্রতিচ্ছবি আঁকিয়া তাহাকে রূপদান করিয়াছেন। এবং বর্ষাকে, প্রেমকে ও প্রাণকে তাঁহারা শুধু রূপে রূপায়িত করিয়াই ক্ষান্ত হন নাই, একেবারে রসে রসায়িত করিয়াছেন।

বর্ষার সেই শ্যামসমারোহাচ্ছন্ন মেঘচ্ছায়ায় বসিয়া আজ কেতকীকুটজকদম্বপুষ্পসম্ভারে পর্জ্জন্যদেবকে অর্ঘ্যদান করি।

ইংলণ্ডে ভারতীয় ছাত্র

শ্রীসরোজেন্দ্রনাথ রায়

আমরা ইংলণ্ড-ফেরত ভারতীয় ছাত্রদের সঙ্গে এত পরিচিত এবং তাদের কাছ থেকে এত কথা শুনি যে আমার পক্ষে তাদের বিষয়ে নূতন কিছু বলা এক রকম অসম্ভব। তবুও সেই পুরনো কথাই আবার পাঁচ জনের কাছে উপস্থিত করছি। শুধু তফাৎ এই যে, সেগুলো আমার চোখ দিয়ে দেখা ও আমার মনের রঙে রঙান।

ভারতীয় ছাত্র এত উদ্দেশ্য ও আকাঙ্ক্ষা নিয়ে বিদেশে যান যে তাঁদের সকলের সম্বন্ধে প্রযোজ্য একটা কিছু বলা একেবারেই সহজ নয়। আমাদের বিভিন্ন প্রদেশ, শহর ও নানা স্তরের পরিবার থেকে প্রায় আড়াই হাজার ছাত্র বিভিন্ন বিষয় অধিগত করবার উদ্দেশ্যে ইংলণ্ডে যান। বলতে গেলে এঁদের দিকে তাকালে সারা ভারতে একটা রূপ যেন চোখের সামনে ভেসে ওঠে। কেউ যান আই-সি-এস পরীক্ষা দিতে; কেউ যান একাউন্টেন্সির জন্য; আবার কেউ যান ডাক্তারী, আইন, বিজ্ঞান, শিক্ষা-বিজ্ঞান ও গবেষণার উদ্দেশ্যে; আবার কেউ কেউ যান শুধু আর্টস বিষয়ের ডিগ্রী নিতে। এ ছাড়া আছে নানা রকম টেক্নিক্যাল বিদ্যা।

অনেকে যান "যা-হয় কিছু একটা" শিখে আসতে—অর্থাৎ বিলেত-ফেরত হ'তে। এঁদের হয়ত এদেশেই পাস করার অভ্যাস কোন দিন ছিল না, অথচ ভাবেন যে ইউরোপে গেলে একটা কিছু হয়ে যাবে। এদেশে এঁরা পড়েছেন 'হাফ এন্ আওয়ার উইথ ইংলিশ হিষ্ট্রি, ইকনমিক্স সিরিজ।' ওদেশে গিয়ে 'কোয়ার্টার অব এন্ আওয়ার' সিরিজের সন্ধানে ফেরেন। এই শ্রেণীর একটি ছেলের সঙ্গে আমার পরিচয় হয়েছিল। সে দু-বছর লণ্ডনে থেকে নানা রকম বিষয়ের খোঁজ নিল, কিন্তু বিষয়-নির্ব্বাচন করা আর হয়ে উঠল না। বিলেত-ফেরত ছেলেদের বাপ-মায়েরও ধৈর্য্যের সীমা আছে। এই ছেলেটির বাপ-মা প্রথম প্রথম অনেক কড়া কড়া চিঠি লিখলেন। ফল কিছু হ'ল না। অবশেষে দেশ থেকে কেব্‌ল্ গেল—মাদার সীরিয়াসলি ইল্, কাম্ বাই দি ফার্ষ্ট বোট। সে এবার মরিয়া হয়ে উঠে ব্যারিষ্টারী থেকে আরম্ভ ক'রে সিনেমা-অভিনয় পর্য্যন্ত নানা রকম বিষয়ের খোঁজে বেরল। বাড়ীতে লিখল যে, এবার সে সত্যি সত্যিই "যা হয় কিছু একটা" পড়বে। কিন্তু নিষ্ঠুর পিতামাতা টমাস্ কুক মারফৎ পাঠালেন শুধু একটা পি. এণ্ড. ও.র বোম্বে পর্য্যন্ত টিকিট। নিদারুণ বুকফাটা ব্যথা নিয়ে ফিরতে হ'ল তাকে দেশে। হাওড়া ষ্টেশন ছেড়েছিল চোখের জলে, আবার লণ্ডনের ভিক্টোরিয়া ষ্টেশনের শেষ চূড়াও তার চোখের জলে আবছা হয়ে গেল।*

আব্‌ছা তারই শুধু একার হয় নি। সেই কথাটাই একটু বিশদ ক'রে বলছি। আমরা যখন এদেশ থেকে যাই, কত সংকল্প নিয়েই না যাই! জগতের সম্মুখে ভারতকে সব চাইতে বড় ক'রে ধরব। জগৎকে আমার কিছু দেবার আছে! দেশাচারকেই সর্ব্বশ্রেষ্ঠ আচার ব'লে ধরব! দেশের কিছুর জন্যে লজ্জিত ত হবই না, বরঞ্চ তাকেই আরও উঁচু ক'রে ধরব। পৈতে, গঙ্গাজল, গীতা, পুরোহিত-দর্পণ, উপনিষদ, বেদান্ত, ধুতি ও চাদর, পাগড়ি, গোল্‌টুপি প্রভৃতি কত না বর্ম্মে দেহ আবৃত ক'রে আমরা ভারতের সংগ্রামে প্রবৃত্ত হই! আমি যখন ক্রমওয়েল রোডের ভারতীয় ছাত্রাবাসে উঠলাম, তখন দেখি আমার ঘরে হায়দ্রাবাদের একটি মুসলমান ছেলে ভোর রাত্রে পাটি পেড়ে নমাজ করছে। পাটিখানাও দেশ থেকে সে বয়ে নিয়ে গেছে! আচ্‌কান ও শেরোয়ানি প'রে আমাদের হিন্দুস্থানী

---

*প্রায় এমনি অবস্থায় আর একটি ছেলে পোর্ট সৈয়দের কাছাকাছি থেকে লণ্ডনে তার বান্ধবীর কাছে লিখেছিল, "জাহাজ চলেছে পুব মুখে। মনে হচ্ছে যেন সভ্যতার উজ্জ্বল আলোক পেছনে ফেলে ঘন অন্ধকারের মধ্যে ধীরে ধীরে প্রবেশ করছি।" বলা বাহুল্য, এই চিঠি পেয়ে তার বান্ধবীও হেসেছিল।

ভাইরা তাঁদের স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখেন। ভয়, পাছে কেউ আমাদেরকে ইংরেজ ব'লে ভুল করে!

এমনি ক'রে অক্টোবর মাসটা শেষ হয়ে আসে। ইতিমধ্যে শীত প'ড়ে যায়। মেরুদণ্ডের ভেতরে কনকন ক'রে ওঠে। ভারী মোটা কাপড় না হ'লে আর চলে না। মৃত্যুভয়ে স্বদেশপ্রেম বিশীর্ণ হয়ে যায়। তা ছাড়া, ভারতীয় ছাত্রের 'অ্যালিস ইন ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড'-এর ভাবটাও কেটে আসে। কাটছাঁট ও রঙের দিকে চোখ খোলে। নীল ও কালো, লাল ও ব্রাউনের তফাৎটা সে বুঝতে শেখে। ভারতীয়েরা তখন দর্জ্জির দোকানের জানালা দেখে দেখে বেড়ায়। বাড়ীতে বাড়ীতে ব্রেকফাষ্ট টেবিলে ও ক্রমওয়েল রোডে বা গাওয়ার ষ্ট্রীটের ভারতীয় ছাত্রাবাসে কাটছাঁটের ত্রুটির জন্য পরস্পর পরস্পরকে নিষ্ঠুর পরিহাস করতে আরম্ভ করে। তখন সবাই এত সচেতন যে সামান্য গাফিলতিটিও কারুর চোখ এড়াবার জো নেই। কে টাই-এর নটটা কেমন বেঁধেছে, কে কোন্ মেকারের টুপি পরছে, ওভার-কোটের সঙ্গে কোটের রং বা জুতার সঙ্গে মোজার রং ম্যাচ্ করছে কি না—এই সব দারুণ সমালোচনায় ডাইনিং-হল মুখরিত। ভীষণ সময় এই! এই সময়ে আপনি যদি উৎরে গেলেন ত আপনার আর ভাবনা নেই, নতুবা চিরদিনের জন্য অশ্রদ্ধা আপনার পেছনে পেছনে চলল। পোষাকে হ'ল এই। তার পর আহারে। কে স্যুপ খাওয়ার সময় কত জোরে সুড়ুক সুড়ুক শব্দ করছে, কে কাঁটা ডান হাতে ধরেছে ও ছুরি বাঁ-হাতে ধরেছে, এ সব নিয়ে ভারতীয় মহল ক্রূর বিদ্রূপের হাস্যরোলে মুখরিত। এ সব বিষয়ে যে আবার একটু বেশী পেকেছে সে সদ্য আমদানীকে রাস্তাঘাটে এড়িয়ে চলে, কি জানি পাছে তাকে কেউ ভারতীয় ব'লে ধরে ফেলে! যাদের এদেশেই কাঁটা-চামচের সঙ্গে পরিচয় ছিল তারা ত সব অ্যারিষ্টোক্র্যাট!

এ সময় নূতন নূতন তরকারির নাম ও তার পাকপ্রণালী আপনাকে ঠিক ঠিক জানতে হবে, নতুবা অক্ষয় অকীর্ত্তি। আমাদের সঙ্গে একটি ছেলের পরিচয় হয়েছিল, সে বিলিতী রান্নার বই মুখস্থ ক'রে এসে আমাদের তাক্ লাগিয়ে দিত। তাকে দেখে মনে হ'ত সে যেন কোন হোটেলে শেফের কাজ ক'রে গেছে। অনেকে এই সময় নানা হাস্যকর ভুলেও পড়েন। যেমন, ধর্ম্মনিষ্ঠ হিন্দুসন্তান যিনি বাড়ী থেকে প্রতিজ্ঞা ক'রে গেছেন যে গোমাংস কোনদিন স্পর্শ করবেন না, তিনি মেনু থেকে বেছে বেছে ষ্টেকের অর্ডার দেন। জানেন না যে ষ্টেক গোমাংসের নামান্তর মাত্র। ধর্ম্মনিষ্ঠ মুসলমানও তেমনি প্রাতরাশের সময় প্রাণপণে বেকনকে প্রতিহত ক'রে সসেজের জন্য লালায়িত হন। যদি জানতেন যে সসেজ শূকরমাংসের রূপান্তর মাত্র, তা হ'লে কি রকম একটা তোবাধ্বনি উত্থিত হ'ত সেটা কল্পনার বিষয়। এ সময়ে আরও মজার ব্যাপার হয়। একটি ছেলের সঙ্গে পরিচয় হয়েছিল। তার বয়েস প্রায় একুশ-বাইশ বছর। বি-এ পড়তে পড়তে গিয়েছিল। বাপ-মায়ের কনিষ্ঠ সন্তান। কোনদিন একলা শোয় নি। যত দিন দেশে ছিল মায়ের সঙ্গে শুত। এক রাশ তাবিজকবচ হাতে বেঁধে ভারতসাগর পার হয়ে গেল। রাত্রিতে একলা ঘরে ঘুমতে পারে না—ভূতের ভয়ে। দুর্গানাম জপ ক'রে, তাবিজ ধ'রে রাত কাটায়। দেশ থেকে ডাকে ডাকে তাবিজ, কবচ, মায়ের পায়ের ধুলো যায়। একদিন মধ্যরাত্রে 'বাবা রে মা রে' ক'রে চীৎকার করতে করতে ল্যাণ্ডলেডীর ঘরে গিয়ে উপস্থিত। আমি শুনেছি যে এই ছেলেটির যখন ফিরবার সময় হ'ল, তখন ভূত আর তার ঘাড়ে চাপ্ত না—বরঞ্চ উল্টো। নানা রকমের পোজের ফটো তুলে সে নাকি পাঠিয়েছিল হলিউডে সিনেমা-ষ্টারদের সঙ্গে পাল্লা দেবার জন্যে।

পোষাকের কথা বলতে বলতে একটা কথা মনে হ'ল। পোষাকের দাম সত্যি ক'রে বলা অতিশয় ইতরের মত কাজ। যথা, আপনি যদি সাড়ে তিন গিনি দিয়ে পোষাক করান তবে আপনাকে বলতে হবে দশ গিনি। যদি বার্টন বা ফিফ্‌টি শিলিং টেলর্স প্রভৃতি সস্তা দরজীর দোকানে পোষাক করিয়ে থাকেন তবে আপনাকে বলতে হবে ওয়েষ্ট এণ্ড-এর বড় বড় দোকানের নাম। নইলে জাত থাকবে না।

এই রকম ভাবে দু-এক মাসের মধ্যেই নবেম্বরের দারুণ 'ফগ' আসে ও সাত হাজার মাইল দূরের দুঃখিনী ভারত-মাতার ছবিখানি অস্পষ্ট ক'রে তোলে। শীতের সময়টি ভারতীয় ছাত্রের জীবনে অতি সঙ্কটময় সময়। সঙ্কটময় দেহের দিক দিয়ে—সঙ্কটময় মনের দিক দিয়ে। প্রকৃতির ক্রন্দনময়ী মূর্ত্তি। স্লেটের মত কালো আকাশ। সারা

দিনরাত টিপটিপ বৃষ্টি। সারা ইউরোপের বরফের উপর দিয়ে আসে পূবে হাওয়া, মেরুদণ্ডের মধ্যে বেঁধে শাণিত ফলার মত। যেখানে লাগে, ফোস্কা প'ড়ে যায় যেন। রাত্রি এসে কখন যে মেশে দিনের মোহনায় তার দিশে পাওয়া যায় না। ফগ্—ফগ্—ফগ্—কালো, হলদে, সাদা। বাইরের আকাশে ফগ্— চিত্তাকাশে গভীরতর ফগ্। যার পয়সা আছে ও ছুটি আছে সে পালায় রিভিয়েরা, মণ্টিকার্লো, স্পেন, ইটালী—অন্ততপক্ষে ডেভন্‌শায়ার, সাসেক্স। সূর্য্যদেবও পালান তাদের সঙ্গে সঙ্গে দক্ষিণ-সমুদ্রের উপকূলে। চন্দ্র যদিই বা কোন দিন দেখা দেন ত মনে হয় যেন একটা তারে ঝুলান কুমড়োর ফালি। রাত্রি আসে তার বিরাট শূন্যতা নিয়ে। গ্যাসের আগুনের সাম্‌নে ব'সে ব'সে বিদেশী ছাত্র ভাবে, জীবনটা একটা বিরাট আঁধার—ফাঁকা, অর্থহীন। গ্যাসের আগুনের কুণ্ডলীকৃত রক্তশিখার মধ্যে জেগে ওঠে তার প্রিয় মুখগুলো—তার ক্ষুধার্ত্ত চিত্ত বিষিয়ে যায় ভালবাসার ব্যথায়। মনে পড়ে সেই গঙ্গার কূল; মনে পড়ে তরল রোদে-ভরা সেই হাসি-হাসি মুখ বাংলা দেশ,—সবুজ শ্যামল।

গাঙ্গং বারি মনোহারি মুরারি চরণচ্যুতং।
বরমিহ গঙ্গাতীরে শরট করট কৃশ শুনীতনয়
ন পুনর্দূরতরস্থ গজেন্দ্র করিবর কোটীশ্বর নৃপতি।

মনে হয় ঐ গঙ্গাতীরে টিক্‌টিকি, গিরগিটি, শুক্‌নো কুকুরের বাচ্চা হ'য়ে থাক্‌ব, তবুও দূর দেশে কোটিহস্তিযুক্ত রাজা হব না। তার অন্তরের শিরা-উপশিরাগুলো যেন মুচড়ে ওঠে। যদি তার শক্তি থাকত দেশে ফিরে আসত। কিন্তু তখন উপায়-হীন। গিয়েছে সামনের দরজা দিয়ে, খিড়কী দিয়ে ফিরবে কেমন ক'রে। একটি ছেলের সঙ্গে কিছুদিন ছিলাম—বয়স তার খুব কম ছিল—মনটাও ছিল নরম। রাত আটটা হ'লে বেচারা যেন ছট্‌ফট্ করত। কিছুতেই ওর মন পড়াশুনায় বসত না। আর একটি ছেলেও দেখা হ'লেই বল্‌ত, "জীবনটা বৃথা হ'য়ে গেল। মনে হয় যেন মরে যাই।" যারা এই সময় ঠিক থাকে, তারা শুধু পড়ার চাপে ও পরীক্ষার ভয়ে, অথবা যাদের গোনা দিন ও গোনা টাকা ফুরিয়ে আসছে। কাজ শেষ ক'রে দেশে ফিরে আত্মীয়-স্বজনকে খাওয়াতে হবে। আর কি হাড়ভাঙা পরিশ্রমই তাদের করতে হয়! শুধু ঠাণ্ডা দেশ ও পুষ্টিকর খাবার পায় ব'লেই বেঁচে থাকে। এদেশে ওরকম খাটা অসম্ভব। কিন্তু যাদের অবসর ও টাকা আছে, তারাই ধরা দেয় ফাঁদে। আর সারা নগর জুড়ে ফাঁদও আছে কত রকম! কালো আকাশের অন্ধকার পেট থেকে ফুটে ওঠে আগুনের অক্ষরে নানা প্রকারের লালনীল আহ্বান। ক্লাব বলে, আমি তোমার জন্যে গরম ঘর ও নরম হৃদয় নিয়ে ব'সে আছি। এস আমার কাছে। পাব (Pub) বলে, প্রচুর আগুন পাবে গা গরম কর্‌তে। সস্তা ভাল ভাল খাবার পাবে। আর আকণ্ঠ পান কর্‌তে পাবে উষ্ণ পানীয়। নৃত্যশালা পোঁ পোঁ পোঁ ক'রে ডেকে বলে—থেক না তোমার ঠাণ্ডা ঘরের কোণায় প'ড়ে। রুম্বা নাচের তালে লম্বা বাত খাটো ক'রে দাও। গা ভাসিয়ে দাও যৌবন-জোয়ারে। নাট্যশালা, ছবিঘর, ভোজনালয়—সবাই আপনার জন্য ভাবছে—আপনার দুঃখের দরদী! সবাই পাঠাচ্ছে সাদর নিমন্ত্রণ আপনার ঘরের বাধা-ভরা কোণটিতে। প্রতি সন্ধ্যায় সহস্র সহস্র নরনারী আসছে সেই ডাকে তাদের বিচিত্র জীবনধারা ব'য়ে:—

এ যৌবন জল-তরঙ্গ রোধিবে কে
হরে মুরারে হরে মুরারে।

বিরাট নগর একটা বিরাট মরুভূমি। তাই সেই মরুভূমিতে একটু শীতল ওয়েসিসের খোঁজে আসে লক্ষ লক্ষ নরনারী। শান্তি কোথায়? শান্তি কোথায়? একটুখানি স্পর্শ—একটুখানি ছোঁয়া—একটু বিনিময়—স্মৃতির ফলকে একটা দাগ আর সব শূন্য—গভীর অন্ধকার।

দেখতে দেখতে আসে বড়দিন। এত দিনে ভারতীয় ছাত্রের জীবনের গতি খানিকটে ঠিক হ'য়ে আসে। কলেজের প্রথম টার্ম শেষ হয়ে গেছে। পড়াশুনায় যার মন বসে, সে তাই নিয়ে আরও ব্যস্ত হয়। ছুটিটার প্রত্যেক মিনিট কাজে লাগিয়ে দেবার চেষ্টায় থাকে। আর যারা লাইফ দেখতে যায় তারা লাইফের পেছনে পেছনে ছোটে।... গায়ের রং এক পোঁচ পাতলা হয়ে এসেছে। এখন মুখের দিকে তাকানো যায়। টাইবাঁধা, ছুরিধরা, সুপ-খাওয়ার কঠিন পরীক্ষায় এখন অন্ততপক্ষে দ্বিতীয় বিভাগে পাস করবে। ইংরেজী কথা এক দিনে বুঝতে শিখেছে—তার কথাও এখন বোঝা যায়। খ্রীষ্টমাস উৎসবে সে পায়

প্রথম হেল্‌থ ড্রিঙ্কিঙের আস্বাদ*। নাচের আসরেও দীক্ষা হয়। তার চিত্তে রঙের ছোপ ধরে।

সুইনবার্ণ তাঁর "এ্যাটালাণ্টা ইন ক্যালিডন" নাটকে শীতের মাসকে সীজন্‌ অব সীন্স (Season of Sins) বলেছেন। ভিক্টোরিয়ান কবি যাকে সিন ব'লেছেন এখন অবশ্য আমরা তাকে সিন আর বলি না। বলি অভিজ্ঞতা বা অন্য কিছু। যা হোক, শীতের অন্ধকারে মানুষের হৃদয় খোঁজে রং, শীতের একটানা একঘেয়েমির মধ্যে খোঁজে বৈচিত্র্য। বড়দিনে ভারতীয় ছাত্র প্রথম চোখ খুলে দেখে যে আরও এক রকম জীবন আছে—যা তার চিরপরিচিত জীবন থেকে সম্পূর্ণ পৃথক। তার মন এবার ভারতের উপবাসক্লিষ্ট আদর্শের দিকে মোড় ফেরে। ভোগসুখের রেসখেলায় সে তার থলি উজাড় করে। জীবনের দ্রাক্ষারস নিঃশেষে পান করবে ব'লে প্রস্তুত হয়। কিন্তু হায়! সুখ কোথায়? সুখ কোথায়? দেশে পিতামাতা মন্দিরে মন্দিরে ধন্না দিচ্ছেন, দরগায় দরগায় সিন্নি দিচ্ছেন—কিন্তু শীতের কগে সে দুঃখাতুর আকুল মুখগুলো আবছা হয়ে গেছে। ভারতের ব্যথার বেহাগ ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে আরব-সাগরের তীরে তীরে প্রতিহত হয়ে ফিরে। আটলাণ্টিকের উপকূলে তখন উৎসবের বোধন লেগে গেছে। 'লা কুকরাচ্চা'র মাতাল সুরে চিত্ত তখন উতল।

ইউরোপীয় জীবনে ও প্রকৃতিতে একটা মাদকতা আছে। জীবনে যেমন যৌবনের উপাসনা, তেমনি প্রকৃতিতেও একটা সজীবতার সাধনা চলেছে। ইউরোপীয় নরনারী আমাদের মত পঁচিশ হাজার বছরের সভ্যতার চাপে পীড়িত নয়। তারা চলেছে সামনের দিকে যাত্রাপথের আনন্দগান গেয়ে। জন্ম ও মৃত্যু এ দুটো সত্যকে ধ্রুবসত্য ব'লে মেনে নিয়েছে—তাকে এড়াবার কোন বৃথা চেষ্টা করে না। তাই তারা এত মাতে রণাঙ্গনে মরণের হোলিখেলায়। তারা জীবনকে দূরে সরায় না, মরণকেও পর ক'রে ভাবে না। তাই তাদের জীবনে এত আনন্দ। তাই তাদের হৃদয় এত হাল্কা।

* আমি একাধিক বাঙালী ছেলের কাছে শুনেছি এদেশেই তাদের পান অভ্যাস ছিল। অনেকে আবার বলে যে বাবার কাছে শিখেছে। এরকম বাবা মা অবিশ্যি আমি দেখি নি। তাছাড়া বহুকাল ধ'রে ছাত্র-সমাজের সঙ্গে যুক্ত থাকা সত্ত্বেও আমাদের ছাত্রদের মধ্যে যে পানাভ্যাস এত দূর আছে তা আমার জানা ছিল না বা এখনও নেই।

ইউরোপীয় নরনারীর রূপ আছে, রূপের সাধনাও করতে জানে। শুধু নরনারী কেন? প্রকৃতিই বা কি অপূর্ব্ব মোহন রূপ ধরে প্রতি বসন্তে, গ্রীষ্মে ও শরতে। সে পাগল-করা রূপ বর্ণনা করা আমার সাধ্য নেই। সবুজ ঘাস আমাদের দেশেও অনেক দেখেছি, কিন্তু এমন প্রাণমাতান রূপ আমি ইউরোপ ছাড়া আর কোথাও দেখি নি। জানি নে রবীন্দ্রনাথ "সোনালি রূপালি সবুজে সুনীলে" গাঁথা যে বিচিত্র মায়ারূপ দর্শন করেছিলেন তা কোন্‌ দেশে! কিন্তু আমি একদিন তা দেখেছিলাম লেক উইণ্ডারমিয়ারের তীরে। আর একদিন ষ্ট্রাটফোর্ড-অন-এভনে, আরও একদিন লেক লুজার্ণের উপকূলে। লেক উইণ্ডারমিয়ারের মৃদু তরঙ্গভঙ্গে আন্দোলিত কাচশুভ্র জলরাশি, পাইন ও ওক গাছের কচি-পাতার শৈশবচঞ্চলতা ও আধভাষ, আর দিগন্তব্যাপী সবুজ কাঁচা ঘাস অস্তমান সূর্য্যের তরল আলোয় আমার চোখে কি যে অপরূপ মায়া সৃষ্টি করেছিল তা কোনদিন ভুলব না। আর একদিনের কথাও মনে থাকবে চিরদিন—যেদিন আমি ষ্ট্রাটফোর্ড-অন্‌-এভন দেখতে গিয়েছিলাম। ঘাস—ঘাস—ঘাস—সমস্ত মিডল্যাণ্ডসের গিরিবনউপত্যকা সবুজের নেশায় মাতাল। সেদিন প্রভাতে আপেল-বাগানের অগণিত পুষ্পস্তবকে কে যেন আবির খেলেছিল। অন্ততঃ একদিনের জন্য আমার চিত্ত মাতাল হয়েছিল। তাই বলি এত প্রকারের মাদকতার মধ্যে যদি আমাদের ভারতীয় ছাত্র একটু পথ হারিয়ে ফেলে, তার জন্য আপনারা একটু চোখের জল ফেলবেন—ঘৃণা করবেন না।

আমি অনেক ভারতীয় ছাত্র দেখেছি যারা দিনান্তে এক মুঠো খাবার পায় না—অন্ধকার স্যাঁৎসেঁতে বেসমেণ্ট ঘরে বাস করে। হয়ত না-খেয়ে খেয়ে সেই প্রচণ্ড শীতে দুরারোগ্য যক্ষ্মারোগে আক্রান্ত হয়ে সেই বিদেশে প্রাণ দেয়, তবুও স্বদেশে আত্মীয়স্বজনের কাছে ফিরতে চায় না। কত কষ্ট ক'রেই যে তারা দিন কাটায় ভাবলে চোখে জল আসে। কয়েকটা ভারতীয় খাবারের দোকান আছে তাতে ওয়েটার-এর কাজ করে। নতুবা ফিরি ক'রে টাই ও খেলনা বিক্রী করে—নয়ত মোটর গ্যারাজে মোটরকার ধুয়ে দিনে বড়জোর এক শিলিং রোজগার করে। কেউ কেউ ভিক্ষা করে। আর দিনের পর দিন না খেয়ে থাকে। যখন

দু-এক আনা পয়সা পায়, মদ খেয়ে ভুলে থাকবার চেষ্টা করে, কিন্তু তবুও দেশে আসতে চায় না। তার কারণ, প্রথম, তারা জানে তারা বাবার অপরাধী সন্তান। কত না আশা ক'রে সেই বিদেশে গিয়েছিল। পিতামাতা কত ক'রে তাদের খরচ চালিয়ে চালিয়ে সর্ব্বস্বান্ত হয়ে পড়েছেন। কোন্ লজ্জায় আবার এই মুখ বাপ-মার কাছে--স্বদেশবাসীর কাছে দেখাবে! দ্বিতীয়, ঐ স্বাধীনতা, ঐ যৌবনমত্ততা, ঐ রূপোৎসব, ঐ বিরাট মুক্তি ভারতবর্ষে কোথায় পাবে? কোন্ মুক্ত বিহঙ্গম আবার স্বেচ্ছায় তার পিঞ্জরে ঢুকতে চায়?

ভারতীয় ছাত্রের জীবনে এই যে ঘোর ট্রাজেডি, এর জন্য সে-ই যে একমাত্র দায়ী তা নয়। তার পিতামাতা, আত্মীয়-স্বজন যাঁরা তার শিক্ষাব্যাপারে চিরদিনই অন্ধের মত চালিত হয়েছেন তাঁরাই বেশী। শিক্ষাক্ষেত্রে শিক্ষকের দায়িত্বের কথাই আমরা সব সময়ে শুনি, কিন্তু পিতামাতার মূর্খতার কথাটা কেউ বলে না। কেননা, সমালোচক সব সময়েই অভিভাবক। বহু ছাত্র কি পড়বে তা ঠিক না ক'রেই বিদেশে যায়। তার পর সেখানে গিয়ে কোন ইউনিভার্সিটিতে স্থান হবে কি না তার খোঁজও আগে থেকে নেয় না। এখানে যাদের বি-এ পাস করবার যোগ্যতা নেই তারা যায় সেখানে বি-এ পড়তে। এখানকার ম্যাট্রিক পাস ক'রে সেখানে ব্যারিষ্টার হ'তে যায়। তার পর লণ্ডন-ম্যাট্রিক পাস করার চেষ্টায় কয়েক বছর পয়সা নষ্ট ক'রে ফিরে আসে। তেমনি ইনকর্পোরেটেড একাউনটেন্সি। বহু ছাত্র যায় একাউনটেন্সি পরীক্ষা দিতে যারা এখানে অনেক কষ্টে বি-এ পাস করেছে। শুধু ধনীর সন্তান ব'লে প্রিমিয়াম দিয়ে একাউনটেন্সি ফার্ম্মে ভর্ত্তি হ'তে পেরেছে। ফলে এই হয় যে, যারা নিজ জীবনে এত দূর বেহিসাবী তারা হিসাবের সীমান্তদেশ কোনদিনই অতিক্রম করতে পারে না। আই-সি-এস পরীক্ষার জন্য যে তিন চার-শ ছেলে প্রতি বছর যায়, তাদের জীবনেরও একই করুণ কাহিনী। জীবনগুলো কেমন ক'রে যে ব্যর্থ হয়ে যায়, তা দেখলে চোখে জল না এসে থাকতে পারে না। পরাজয়ের টীকা ললাটে বহন ক'রে আবার তারা দেশে ফিরে আসে। কিন্তু যেমনটি গিয়েছিল তেমনটি কি আর সে হ'তে পারে? চিরদিন অপমানিত সঙ্কুচিত জীবন নিয়ে সে পালিয়ে পালিয়ে বেড়ায়। কোন দিন আর সগর্ব্বে উন্নতশিরে সমাজের কাছে তারা মাথা তুলে দাঁড়াতে পারে না।

কিন্তু যারা হাড়ভাঙা পরিশ্রম ক'রে কঠিন কঠিন পরীক্ষা-গুলো পাস ক'রে আসে তাদেরই বা কি হয়? কত আশা, কত আকাঙ্ক্ষা নিয়ে ভারতীয় ছাত্র সর্ব্বস্ব পণ ক'রে বিদেশের শিক্ষাভাণ্ডার লুঠ করতে যায়। সম্মুখে তার দারুণ বিভীষিকা, পশ্চাতে ক্রূর ব্যঙ্গ। তার মনটা যেন সম্রাট্ বাবরের মত। সম্রাট্ বাবর যখন পঞ্জাব জয় ক'রে দিল্লী পর্য্যন্ত এলেন, তখন দেখলেন দুর্দ্ধর্ষ রাজপুতবাহিনী সুসজ্জিত অবস্থায় তাঁর জন্য অপেক্ষা করছে। তাঁর ও তাঁর সৈন্যদের চিত্ত পরাজয়ের ভয়ে কাতর হয়ে উঠল। সকলে বলতে লাগল যে আফগানিস্থানে ফিরে চল। সম্রাট্ বিক্ষুব্ধচিত্তে নীরবে খোদার কাছে ধন্না দিয়ে রইলেন। তাঁর কাছে এল ভগবানের বাণী। তিনি বললেন যে, যদি এক-পা পেছনে ফিরি তবে রাজপুতের হাতে একটিও মোগল সৈন্য প্রাণ নিয়ে ফিরে যেতে পারবে না। যদি ফিরতে হয় তবে জয়ের সদর দুয়ার দিয়ে ফিরতে হবে। যে ভারতীয় ছাত্র সহস্র দুঃখ, বাধা ও প্রলোভনের মধ্যে নিজ মস্তক উন্নত ক'রে দেশে ফেরে, সে শুধু সেই বাণীটিকে বরণ করে। সে জানে, জীবনে ত সহস্র দুঃখ ও লাঞ্ছনা আছেই, কিন্তু পরাজয়ের চাইতে মরণ ভাল। আরব-সাগরের মধ্য দিয়ে জাহাজ যখন চলে, তখন নৃশংস কুমীর হাঙর তার পিছনে পিছনে চলে। তারা প্রত্যেক মুহূর্ত্তে এই প্রার্থনা করে, যেন একটি যাত্রীও ডেক থেকে পা পিছলে পড়ে। সর্ব্বদা জাগ্রত দৃষ্টি তাদের ঐ ডেকের দিকে। ভারতীয় ছাত্র যে বীর, দৃঢ়চিত্ত, সে জানে যে তার পিছনে পিছনে ভারতসাগরের উপকূল থেকে সচেতন শার্কের দল সারি বেঁধে চলেছে। তাই সে চিত্তকে কঠিন শৃঙ্খলে বাঁধে। হৃদয়ে তার একটি মন্ত্র। মন্ত্রের সাধন কিংবা শরীরপতন।

আমাদের দেশে একটা চিরন্তন মনোভাব আছে। সেটা হচ্ছে "আমরা বেশ আছি"। আমাদের আর কিছু নূতন শেখবার নেই। আমরা সব জানি। গ্রীক, শক, হুন, পাঠান, মোগল, ইংরেজ বাহুবলে বা বুদ্ধিবলে এই দেশটা জয় ক'রে দাসত্ববন্ধনে আবদ্ধ করেছে—কঠিন শাস্তি দিয়েছে, তবুও ভারতীয় আত্মা বলেছে—"আমি বেশ আছি," "আমি

সনাতন, সর্ব্বশ্রেষ্ঠ।" "অপরের কাছ থেকে আমার কিছু শেখবার বা জানবার নেই।" সে চিরকাল চোখ বুজে রয়েছে, স্বেচ্ছায় কিছু শেখে নি, যা শিখেছে তাও বিলম্বে, নয় ইচ্ছার বিরুদ্ধে মনিবের হুকুমে। উনবিংশ শতাব্দীতে ভারতবর্ষ যে একটা সর্ব্বাঙ্গীণ প্রসারের চেষ্টায় চোখ চেয়ে দেখেছিল, তার ফলে সে জেনেছিল যে তার অনেক কিছু শেখবার আছে। কিন্তু আমাদের বিশ্বপণ্ডিতেরা আবার অষ্ট্রিচের মত বালির মধ্যে মাথা গুঁজেছেন। বিদেশযাত্রার সব চাইতে বড় সমালোচক তাঁরাই।

অবশ্য এ-কথা মেনে নিতে হবে যে, ইউরোপ-প্রবাসী ছাত্রদের নিজেদের দোষে তারা দেশবাসীর শ্রদ্ধা হারিয়েছে। বিদেশপ্রত্যাগত ছাত্র ভাল জিনিষ অনেক আনে বটে, কিন্তু আবর্জ্জনাও আনে অনেক। এই আবর্জ্জনার দূষিত গন্ধে দেশের হাওয়া মলিন হয়। তাই যদি সে অপরের কাছে নিন্দিত হয়, তবে আশ্চর্য্য বা দুঃখিত হবার কিছু নেই।

আর এক কারণে ইউরোপ-প্রত্যাগত ছাত্র অশ্রদ্ধাভাজন হয়। যারা এদেশে চোখ বুজে চলে তাদের পক্ষে ইউরোপ গিয়ে কোন লাভ নেই। আমি লণ্ডনবাসকালে এক জন বাঙালী ভদ্রলোকের সঙ্গে পরিচিত হয়েছিলাম যিনি ইউরোপ যাবার আগে কোনদিন ফায়ার ব্রিগেডের গাড়ী দেখেন নি, অথচ ইনি হ্যারিসন রোডে কিছুকাল বাস করেছিলেন। ইনি একটি প্রাচীন ভাষা পাঠ করতেন ও ব্যাকরণের মধ্যে মুখ গুঁজে প'ড়ে থাকতেন। এক দিন বিকেলে আমরা দু-জন বেড়াচ্ছিলাম; হঠাৎ গুম্ গুম্ ঠং ঠং শব্দে লাল লাল ভারি ভারি গাড়ীগুলো আমাদের সামনের রাস্তা দিয়ে তীরবেগে ছুটে গেল। অস্তমান সূর্য্যের শেষরশ্মিতে ব্রিগেডবাহিনীর পিতলের হেলমেট্ জ্বল জ্বল ক'রে উঠল। বিস্ময়ে আমার সঙ্গীর চক্ষু বিস্ফারিত—নাসিকায় ঘন ঘন শ্বাস। উদ্বেগ ও আবেগের সঙ্গে ব'লে উঠলেন, "যুদ্ধ আরম্ভ হয়ে গেল নাকি?" আমি জিজ্ঞেস করলাম, "তার মানে?" তিনি শুধু গাড়ীগুলোর দিকে আঙুল দিয়ে দেখিয়ে দিলেন। গ্র্যামেরিয়ান হ'তে হ'লে হয়ত এমনি লোকেরই দরকার। কিন্তু এ রকম লোক অত পয়সা খরচ ক'রে বিদেশে না গেলেও পারেন। এঁদের দ্বারা দেশের সত্যিকার কিছু লাভ হয় না। এঁরা যেমন যান, তেমনিটি ফেরেন। যে-লোক ইউরোপীয় সভ্যতার কঠোর সংঘাতে কিছু বদলায় না, সে জড়পদার্থ। প্রাণের ধর্ম্মই এই যে, হয় সে ইচ্ছায় কোন কিছু গ্রহণ করে, নয় অভিনব শক্তির হাত হ'তে আত্মরক্ষা করতে গিয়ে নূতন নূতন শক্তি সংগ্রহ করে। যে কোন ভাবেই হোক সে বদলায়। কিন্তু যে বদলায় না, সে হয় কাঠ কিংবা পাথর। তার সনাতন ধর্ম্মের খুঁটিটি ধ'রে চোখে ঠুলি লাগিয়ে এই দেশেই বাস করা উচিত।

আর এক কারণেও ইউরোপীয় শিক্ষার দিকে আমাদের দেশের লোকের চিত্ত বিরূপ হয়ে উঠছে। সেটা হচ্ছে সস্তা ডিগ্রী পাবার লোভ। এককালে ছিল যখন ইউরোপের যে-কোন ইউনিভার্সিটি থেকে একটা ডিগ্রী নিয়ে এলে এদেশে ভাল চাকরি হ'ত। আমাদের কলকাতা শহরে লণ্ডন ইউনিভার্সিটির বহু পিএইচ-ডি ও ডি-লিট্ আছেন। কিন্তু আপনারা বোধ হয় জানেন না যে এঁদের শতকরা নিরেনব্বই জন বাংলা, সংস্কৃত, পালি, ভারতীয় ইতিহাস ও দর্শন অধ্যয়ন করবার জন্যে ইংলণ্ড গিয়েছিলেন। এ সব বিষয়ে ইউরোপ যাবার যে খুব দরকার আছে তা অনেকে মনে করেন না। নানা কারণে লোকে মনে করে যে এ সব বিষয়ে ইউরোপীয় ডিগ্রী সহজলভ্য। আমার মনে হয়, ইউরোপ গেলে ইউরোপীয় কোন বিষয় শিখে আসা উচিত। তবে এ-কথাও স্বীকার করতে হবে যে আমাদের দেশে এমন কোন লাইব্রেরি নেই যেখানে কোন গবেষণা চলতে পারে। ছাত্রেরা ব্রিটিশ মিউজিয়ামে বা ইণ্ডিয়া অফিস লাইব্রেরিতে যে-সব উপকরণ বা সাহায্য পায় তা এদেশে কোথাও পাবে না। তা ছাড়া ইউরোপীয় অধ্যাপকদের এ সব বিষয়ে প্রগাঢ় পাণ্ডিত্য না থাকলেও একটা থরোনেস্ ও মেথড্ আছে, একটা দৃষ্টি, একটা প্রপোর্শন-জ্ঞান আছে, যা দ্বারা ছাত্রদের প্রভূত উপকার হয়।

মেকী মালের কথা আর তুলব না। সব দেশেই মেকী আছে। যে কোন দিন একটা ফ্যাক্টরির ভেতরের চেহারাটা দেখে নি, সে এদেশে সাজে এক্সপার্ট। আর এই সব এক্সপার্ট যারা একবার দেখে তারা বিলেত নাম শুনলে চটে, ভাবে বুঝি সবই মেকী।

ভারতবর্ষ থেকে যত ছাত্র বিদেশে যায় তার শতকরা ৫০ জনের যাওয়া উচিত নয়। এই ৫০ জন হয় বুদ্ধির দিক দিয়ে অযোগ্য, নয় চরিত্রের দিক্ দিয়ে অযোগ্য। এরাই ভারতের কলঙ্ক বিদেশে প্রচার করে ও স্বদেশে বয়ে আনে ইউরোপীয় সমাজের যত ব্যভিচার। এদের জন্যই স্বদেশবাসীর কাছে ইউরোপ-প্রত্যাগত ছাত্রের যত নিন্দা। এরা সত্যি সত্যি ছাত্র নয়। ছাত্র নাম নিয়ে বিদেশে যায় বটে, কিন্তু আজকাল ভারতবর্ষ থেকে বহু টুরিষ্ট যেমন ইউরোপে যায়—কেউ স্বাস্থ্যের খোঁজে, কেউ বিলাসের লালসায়, কেউ অন্য মতলবে—এরাও তাই। এদের অনেকে বিদ্যালয়ে ভর্ত্তিই হয় না, বা হ'লেও দু-এক টার্ম প'ড়ে ছেড়ে দেয়। এরা কয়েক জনে মিলে একটা মিউচুয়াল অ্যাডমিরেশন্ সোসাইটি খাড়া ক'রে পরস্পর পরস্পরের প্রশংসা ক'রে দেশে পত্র লেখে। অভিভাবকদের কাছে পরস্পরের গুণাবলী ও কৃতকার্য্যতা বর্ণনা ক'রে তাঁদের মনে যদি কোন সন্দেহের রেখাপাত হয় তা দূর করে। এমনও হয় যে দুই ভাই কেউ কিছু করে না—অথচ পরস্পরের প্রশংসা ক'রে বাবাকে লেখে। এমনি ক'রে স্বদেশ থেকে টাকা নিয়ে গিয়ে সবাই মিলে ভাগ ক'রে খায় ও থাকে। এরা থাকেও বহুদিন, শেখেও কম। শিখবে কি? ইংলণ্ডের সঙ্গে এদের পরিচয় শুধু রাত্রিবেলা। দিনের বেলা ঘুমিয়ে কাটিয়ে দেয়।

কিন্তু সত্যিকারের ছাত্র যারা তাদের কি কঠোর ব্রত! কি দুর্গম পথের যাত্রী তারা! তারাই হয়ত আবার দরিদ্র। সব্যসাচীর মত তারা এক হাতে সংগ্রাম করে দারিদ্র্যের সঙ্গে—আর এক হাতে নিরাশা ও ভয়ের সঙ্গে। কত আশা ও কত সংকল্প তাদের—কত মনোহর স্বপ্ন তাদের চিত্তকে আকুল করে। যখন আনন্দে সকল দেশ ছেয়ে যায়, তখন আনন্দময়ীর সেই মন্দির-প্রাঙ্গণে তারা ভিখারিণীর মেয়ের মত আঁচল পেতে ব'সে থাকে। দেখে তাদের জন্মভূমি কত দুঃখিনী কত তাদের শিখবার আছে—বহন ক'রে আনতে হবে। দেশে ফিরে গিয়ে কত তাদের সংগ্রাম করতে হবে—কত তাদের লড়তে হবে—ধূলির উপর স্বর্গ গড়তে হবে। তারা যায় দৈত্যগৃহে কচের মত—তারা যায় সুদূর মিথিলায় রঘুনন্দনের মত। তাদের কি বিশ্রাম আছে? কিন্তু কি তাদের পুরস্কার বিদেশে কঠোর সংগ্রাম—স্বদেশেও পদে পদে অকারণ নির্যাতন—অহৈতুকী হিংসা। জীবনের সহস্র বাধা ও সংগ্রামের মধ্যে একটি আশা তাদেরকে বাঁচিয়ে রাখে—তাদের কিছু দেবার আছে—স্বদেশবাসীকে সেইটি দিতে যাবে। সপ্ত সিন্ধুর ওপার থেকে মায়ের রাঙা চরণে দেবে ব'লে এনেছে সে একটি নীল কমল, সেইটি দিয়ে যাবে এই তাদের আশা, এই তাদের আকাঙ্ক্ষা।

আমি এতক্ষণ পরিচিত, চিরপুরাতন পথ এড়িয়ে এড়িয়ে চলেছি। যে-সব কথা আপনাদের জানা তা আর নূতন ক'রে তুলে কি হবে? কিন্তু আমার মনে হ'ল যে পুরনো কথা সম্বন্ধেও অনেকের কৌতূহল আছে। প্রায় এক বছর হ'ল দেশে এসেছি. এর মধ্যে আমাকে অনেক অভিভাবক ও বিদেশগমনপ্রয়াসী ছাত্র বহু কেজো কথা জিজ্ঞেস করেছেন। আমাদের কলকাতা শহরে সিনেট-হলে একটা ইনফরমেশ্যন ব্যুরো আছে। তার এক জন সেক্রেটরী আছেন। আজকালকার কথা জানি নে, কিন্তু আমি যখন গিয়েছিলাম তখন ত বিশেষ কোন উপকার পাই নি সেখান থেকে। তখনকার সেক্রেটরীর মেজাজ ছিল হাকিমী রকমের। আমি বিলেত যাবার আগে অনেকের কাছে অনেক রকম খোঁজ ক'রে তবে যাবার ভরসা করেছিলাম। কিন্তু দু-এক জন ছাড়া আর সকলেই ভুল খবর দিয়েছিলেন। ইউরোপ গিয়ে কত খরচ হয়, এ-কথাটার উত্তর আমি ঠিক ঠিক কোন দিন পাই নি। এক-এক জনের এক-এক রকম অভিজ্ঞতা। আমি ধনীদের কথা ভাবছি না। আমাদের মত অবস্থার ছেলেরাও নানা জনে নানা কথা বলেছে। মনে হ'লে হাসি পায়, আমার এক জন বন্ধুকে আমি জিজ্ঞেস করেছিলাম প্রথমে গিয়ে কোথায় উঠব। সে তার উত্তরে বলেছিল—গ্রোভিনার হোটেল বা ডরচেষ্টারে উঠো। সে নিজে যে কোন দিন এ-সব হোটেলের সীমার মধ্যেও ঢুকেছিল এ-বিষয়ে আমার গভীর সন্দেহ আছে। আমাদের দেশের রাজা-মহারাজারা হয়ত সে-সব জায়গায় উঠতে পারেন, কিন্তু কোন ছাত্র এ রকম জায়গায় ওঠে ব'লে শুনি নি। আপনাদের যদি কেউ মফস্বল থেকে চিঠি লেখে, কলকাতা গিয়ে কলেজে ভর্ত্তি হবার আগে কোথায়

উঠব ? আপনারা নিশ্চয়ই গ্র্যাণ্ড হোটেল বা গ্রেট ইষ্টার্ণ হোটেলের থাকা খাওয়ার দর তাকে পাঠিয়ে দেন না।

ভারতীয় ছাত্রেরা প্রথমে গিয়ে ওঠে হয় গাওয়ার ষ্ট্রীটের খ্রীষ্টিয়ান ভারতীয় ছাত্রাবাসে, নতুবা কোন জানা লোকের বাসায়, নয় ব্লুমস্‌বেরির কোন বোর্ডিং-হাউসে। ২১ নং ক্রমওয়েল রোডে ভারত-গবর্ণমেণ্ট বহুকাল একটা ভারতীয় ছাত্রাবাস রেখেছিলেন। কিন্তু এক বৎসর হ'ল ব্যয়বাহুল্যের অজুহাতে সেটা পরলোকগত সর্ ভূপেন্দ্রনাথ মিত্রের কাঁধাকালে উঠে গেছে। এ জায়গাটায় বন্দোবস্ত খুব ভাল ছিল না, কিন্তু তবুও নূতন ছেলেদের পক্ষে এটা সাগরগর্ভে একটা পোতাশ্রয়ের মত ছিল। এখানে উঠে ছাত্রেরা সুবিধামত নানা স্থানে ছড়িয়ে পড়ত। ওয়াই. এম. সি. এর অধীন গাওয়ার ষ্ট্রীটের ইণ্ডিয়ান ষ্টুডেণ্টস ইউনিয়ন একটি অতি সুন্দর স্থান। এ-স্থানটি অনেক ছেলেকে বাঁচিয়ে রেখেছে। মনের গভীর অবসাদের সময় সমব্যথী আরও কয়েকটি লোককে এখানে পাওয়া যায়। এখানকার নির্দ্দোষ আমোদ-প্রমোদ ও সখ্য বহু ছেলেকে বহু প্রকারের প্রলোভন থেকে রক্ষা করে। ৩২ নং রাসেল ষ্ট্রীটের ইণ্টারন্যাশনাল ষ্টুডেণ্টস্ হাউসও এই রকম একটি সুন্দর স্থান যেখানে ভারতীয় ছাত্র অপর দেশীয় ছাত্রছাত্রীর সঙ্গে পরিচিত ও বন্ধুত্বসূত্রে আবদ্ধ হ'তে পারে। যারা কোন নির্দ্দিষ্ট কলেজে পড়ে তারা সেখানেই খেলাধুলো ও নানাবিধ আমোদ-প্রমোদের সুযোগ-সুবিধা পায়। প্রত্যেক কলেজের ইউনিয়ন সোসাইটি খেলাধুলো, গান, অভিনয়, ভ্রমণ, নাচ, পার্টি, ডিবেটিং প্রভৃতি দ্বারা নানাভাবে ছাত্রের মন প্রফুল্ল রাখবার চেষ্টা করে। প্রত্যেক কলেজকে ছাত্রের ঘরবাড়ী বললে ভুল হয় না, অক্সফোর্ড কেম্ব্রিজ ত বটেই। সকালবেলায় খেয়ে ছাত্র-ছাত্রী ৯।১০টায় কলেজে যায়। সেখানেই সে রাত আটটা পর্য্যন্ত থাকে। লাঞ্চ ও চা সেখানেই খায়, সেখানেই সে পড়াশুনা আমোদ-আহ্লাদ করে। কাজেই কলেজের সঙ্গে তার যে একটা আন্তরিক যোগ প্রতিষ্ঠিত হবে, তাতে আর আশ্চর্য্যের বিষয় কি ?

ইংলণ্ডে বর্ণবিদ্বেষ বেশ আছে। কিন্তু সেটা ভদ্রতার আবরণে ঢাকা থাকে। আমাদের দেশে উচ্চবর্ণের লোকেরা নিম্নবর্ণীয়দের সঙ্গে যে হৃদয়হীন ব্যবহার করে তার তুলনায় তা কিছুই নয়। অনেক সময়ে আমাদের প্রতি অনেক খারাপ ব্যবহারের জন্ম আমরাই দায়ী। আমরা বিদেশী লোক সে দেশে অতিথি। আতিথ্যধর্ম্ম রক্ষা করা আমাদের সর্ব্বদা কর্ত্তব্য। তাদের সদ্ব্যবহারের সুবিধা নিয়ে আমরা যদি নানা প্রকারের শঠতা, প্রবঞ্চনা করি তাহ'লে আমাদের প্রতি সদ্ব্যবহার করবে কেন ? আমি এক জন ছাত্রকে জানতাম। তার বাড়ী-বদলান একটা ব্যবসা ছিল। সে এক বন্ধুর কাছে তার বাক্সপ্যাটরা রেখে একটা বোর্ডিং-হাউসে উঠত। সেখানে ভাড়া বাকী ফেলে, না ব'লে আর একটা বাড়ীতে গিয়ে উঠত। এমনি ক'রে সে বহুদিন লণ্ডনে ছিল ও অনেক ল্যাণ্ডলেডীকে ফাঁকি দিয়েছিল। যে-সব বোর্ডিং-হাউস বা ল্যাণ্ডলেডী এ রকম ভারতীয় ভাড়াটে পেয়েছে তারা যে ভবিষ্যতে আর অন্য ভারতীয় ভাড়াটে রাখবে না তাতে আশ্চর্য্য কি ? আপার বেড্‌ফোর্ড ষ্ট্রীটে একটা নাম-করা সুইস্ হোটেল আছে, সেখানে ভারতীয় ছাত্রেরা এমন উচ্ছৃঙ্খল ব্যবহার করেছিল যে ঐ হোটেলে আর ভারতীয় নেয় না। ঐ রাস্তায় মায়ার্স হোটেল ব'লে আর একটি স্থান আছে সেটা পারসী ছেলেদের আড্ডা। এখানে ইউরোপীয় অনেক দেশের লোক থাকে। অধ্যাপক শিশির-কুমার মিত্র কিছু দিনের জন্ম এখানে থাকতেন। তাঁর কাছে ম্যানেজার ও অপরদেশীয় বাসিন্দারা ভারতীয় ছাত্রদের বহু নিন্দা করেছে। ডাঃ মিত্রও ঐসব ছাত্রের হট্টগোলে ও অসভ্যতায় উত্যক্ত হয়ে পড়েছিলেন। ভারতীয় ছাত্র যখন অসংযত বা অসাধু ব্যবহার করে, তখন ভুলে যায় যে সে তার কাজের দ্বারা দেশের মুখে কালি দিচ্ছে।

কিন্তু তবুও ভারতীয় বা সমুদ্রপারের বিদেশীয় ছাত্রদের কল্যাণকামনায় কত ইংরেজ পুরুষ ও নারী কত সময় ও অর্থ ব্যয় করছেন! হ্যাম্পষ্টেড ইষ্ট এণ্ড ওয়েষ্ট এসোসিয়েশন—যার কেন্দ্র হচ্ছেন সহৃদয়া ভগিনী মিস বার্নেট, মিস এওরুজ ও মিস টারিং ; ইউষ্টন-এর কোয়েকার সমিতি, বেড্‌লায়ন স্কোয়ারের প্রীতিসম্মিলনী ও পুণ্যশ্লোকা ডাঃ মড রয়ডেন-প্রতিষ্ঠিত গিল্ড হাউসে ভারতবন্ধু সভা, এই সকলের ভারতীয় ছাত্রছাত্রী ও অপরাপর ভারতীয় যাত্রীদের বিদেশ-বাসের দুঃখ যাতে লাঘব হয় তার জন্ম প্রাণপণে পরিশ্রম করছেন। যাতে ভারতীয়েরা ইংলণ্ডের ঘরবাড়ী দেখতে

পায়, ইংলণ্ডের লোকদের সম্বন্ধে প্রীতির ভাব পোষণ করে ও ইংলণ্ডের ভদ্র পরিবারের সঙ্গে যুক্ত হ'তে পারে তার জন্য তাদের কত না আয়োজন! মানুষকে একটু আনন্দ বা প্রীতি দান করাই এঁরা জীবনের একমাত্র ব্রত ব'লে গ্রহণ করেছেন।

আমাদের দেশের কোন কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় ইংলণ্ডে ধর্ম্ম-প্রচারের কেন্দ্র খুলেছেন। এঁদের মধ্যে গৌড়ীয় বৈষ্ণবমঠ খুব অর্থশালী। এঁরা লণ্ডনে ছয় লক্ষ টাকা খরচ ক'রে একটা মন্দির প্রতিষ্ঠা করছেন। এঁদের খুব কার্য্যোৎসাহ। জানি না কোন দিন এঁদের চেষ্টায় ইংলণ্ডের পুরুষরা ট্রাউজারের বদলে কৌপীন ও বহির্বাস পরবে কি না, তাদের হ্যাটের তলায় টিকি দেখা যাবে কি না, চন্দনের রসকলি-কাটা মেয়েদের ফ্যাসান হবে কিনা, তবে তাঁরা কিংবা রামকৃষ্ণ মঠ, ও অন্যান্য প্রচার সমিতি যদি তাঁদের মূল্যবান সময়ের একটু অংশ ভারতীয় ছাত্রদের কল্যাণে ব্যয় করতেন, তবে অনেক ছাত্রছাত্রী হয়ত বেঁচে যেত।

আমি অনেক নিরাশা ও সংগ্রামের কথা বলেছি। ভারতীয় ছাত্রদের বা ছাত্রনামধারীদের অনেক দুর্ব্বলতার ছবি এঁকেছি। এর পরে আমাকে কেউ কেউ জিজ্ঞেস করতে পারেন—অনেকে করেছেনও—যে, ভারতীয় ছাত্রের ইংলণ্ড বা ইউরোপ যাবার কোন প্রয়োজনীয়তা আছে কি? আমি মনে করি যে ভারতবর্ষকে যদি অন্য দেশের সমকক্ষ হ'তে হয় বা থাকতে হয়, তবে চিরকালই ইউরোপ, আমেরিকার বা অন্য কোন দেশের যদি কিছু দেবার থাকে তবে তা সম্পূর্ণভাবে নিতে হবে। আপনারা সেটাকে অনুকরণ ব'লে নিন্দা করতে পারেন বা ধার-করা ব'লে বিমুখ হ'তে পারেন। কিন্তু যে জীবন্ত সে প্রতিমুহূর্ত্তে অপরের কাছ থেকে নেয়; জেনে শুনে জোর ক'রে নেয়, তার জন্য সে লজ্জিত নয়। কেননা সে জানে এ বিশ্বে কেউ কোন দিন অপরের কাছ থেকে না-নিয়ে বড় হয় নি। যে বীর সে বাহুবলে নেয়—আবার পরিপূর্ণতার প্রসন্নতায় তার ভাণ্ডারের প্রাচুর্য্য থেকে অজস্র দান করে। সে-ই কুণ্ঠিত যে চিরকাল ঋণী। প্রাচীন ভারতের ব্রাহ্মণ্য সভ্যতা জগতের একটি শ্রেষ্ঠ সৃষ্টি। আমাদের প্রাচীন দর্শন ও ধর্ম্মশাস্ত্র অমর। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার সংঘাতে ভারতে যে নূতন একটি সভ্যতার সৃষ্টি হচ্ছে, সে-সভ্যতা এখনও মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে নি, কিন্তু তার পূর্ব্বাভাস আমরা পেয়েছি। সে সভ্যতা শুধু ব্রাহ্মণ বা ক্ষত্রিয়ের বা হিন্দুর হবে না, কিন্তু তার আগমনী বাজবে মন্দিরের ঘণ্টাধ্বনিতে, মসজিদের আজানরবে, গীর্জ্জার গম্ভীর ঐকতানে—সে-সভ্যতা উঠবে বজ্র-তেজে মুচি-মেথরেরও হৃদয় মথিত ক'রে। আর এই সভ্যতার পুরোহিত হবে তারাই যারা প্রাচী ও প্রতীচীর যে পুরাতন ভেদ তাকে অস্বীকার করবে। ইউরোপ-প্রত্যাগত ছাত্রের জীবন ব্যর্থতায় মরুভূমি হয়ে যাবে হয়ত, কিন্তু তার মনে এইটুকু সন্তোষ থাকবে যে সে এক দিন এই পুরাতন নিষেধের নিগড় ভেঙেছিল—এক দিন সে ভারতমাতার রথচক্রতলে তার বুকখানি পেতে দিতে চেয়েছিল।

[শিবনাথ স্মৃতিভবনে পঠিত]



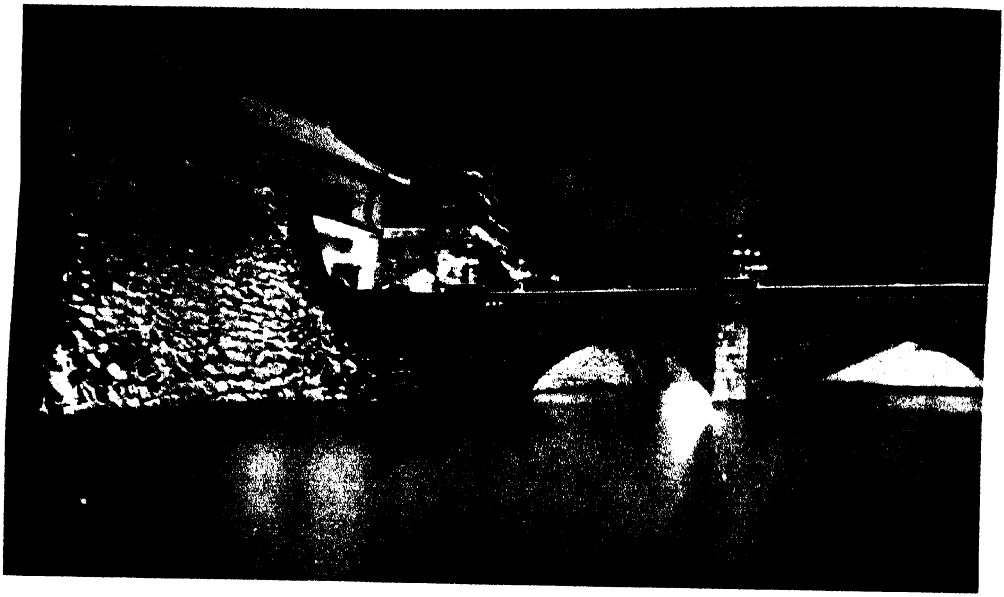




কাম্বোডিয়ার নৃত্য

উপরে : কিন্নরী-নৃত্য

নীচে : গরুড়-নৃত্য



জাপান-সম্রাটের প্রাসাদে প্রবেশের সেতু



জাপানের নিয়ন্ত্রণাধীন দ্বীপে জাপানী সভ্যতা বিস্তার। আদিম অধিবাসীদের ঘরবাড়ী দোকানপাটের বদলে আধুনিক ব্যবস্থার প্রচলন এবং তার ও বেতারের আবির্ভাব হইয়াছে।

ত্রিবেণী

শ্রীজীবনময় রায়

৬৪

সীমার কাছে বিদায় নিয়ে পার্ব্বতী কমলাপুরীতে ফিরে গেল। লঞ্চের নিরানন্দ কেবিনে প্রবেশ ক'রে তার মনে বারম্বার এই কথাটাই আঘাত ক'রে ফিরতে লাগল, যে শচীন্দ্রের উপর তার প্রেমের স্বাভাবিক অধিকারকে সে মনে মনে এমন নিঃসংশয়ে স্বীকার ক'রে নিতে পারে নি যার বলে সমস্ত দ্বিধা সঙ্কোচ অভিমান পরিত্যাগ ক'রে শচীন্দ্রের পরিতপ্ত শ্রান্ত চিত্তকে সে সেবাসমাদরে গ্রহণ করতে সংস্কারবিমুক্ত চিত্তে অগ্রসর হতে পারে। সে তার প্রেমের-পরিণাম-বিচারশূন্য কর্ত্তব্য থেকে বিচ্যুত হয়েছে ; হাঁ, হয়েছে সে। শচীন্দ্রের দ্বিধাকুণ্ঠিত মনকে সে যে অভিমানের বশবর্ত্তী হয়েই স্বার্থপরের মত তার নিঃসঙ্গতার দুঃসহ শ্মশান-বৈরাগ্যের মধ্যে পরিত্যাগ করতে পশ্চাৎপদ হয় নি। প্রেমাস্পদের প্রতি তার এই কঠিন নিষ্ঠুরতায় মনে তার তীব্র অনুশোচনার সঞ্চার হতে লাগল। কমলার প্রতি শচীন্দ্রের প্রেমের স্মৃতি যে কেবল স্মৃতিমাত্রে পর্য্যবসিত হয়েছে এ-কথা নিশ্চয় ক'রে জেনেও কেন সে শচীন্দ্রের দুর্ব্বল চিত্তের প্রেমাভিনয়ের শাস্তি বিধান করতে প্রবৃত্ত হ'ল ? কেন সে সুনিশ্চিত দৃঢ়তা এবং প্রেমের নিশ্চিন্ত অধিকারের বলে অনায়াসে অগ্রসর হয়ে তার দয়িতের নিরাশ্রয় ভ্রাম্যমান চিত্তকে পরিপূর্ণ দায়িত্বে নিজের প্রেমের নিঃসংশয় আশ্রয়ের মধ্যে টেনে নিতে বাধা পাচ্ছে ? এ কি ক্ষুদ্রাশয় বণিকবৃত্তি তার প্রেমে ? নিজেকে সে কঠিন তিরস্কারে নির্যাতিত করতে লাগল। মনে মনে প্রতিজ্ঞা করলে যে, আর নয়। এমনি ক'রে নিজের আত্মাভিমানের আবরণে, অকারণে ব্যবধান সৃষ্টি ক'রে আত্মসম্মানের তুচ্ছ প্রসাদ লাভের আকাঙ্ক্ষায় সে চিরদিন সত্যকে অস্বীকার ক'রে ফিরবে না আর। এবারে সে শচীন্দ্রের কাছে নিজেকে উৎসর্গ করবে নিজেরই প্রেমের অবিচলিত মর্য্যাদায়। সংসারে তার নিজের প্রেমের মূল্যে সে শচীন্দ্রকে নবজীবনের পরিপূর্ণ মহিমায় প্রতিষ্ঠিত করবে নবীনতর গৌরবে।

এই সংকল্প স্থির ক'রে নিয়ে মন তার এক অভিনব আনন্দরসে পূর্ণ হয়ে উঠতে লাগল। অনুশোচনার বেদনা দূর হয়ে গিয়ে তার অপরিতৃপ্ত তৃষিত চিত্ত রূপে রসে আনন্দে সরস ও সমুজ্জ্বল এক নূতন গৃহসংসার সংরচনের মনোহর কল্পনায় নিমজ্জিত হয়ে গেল। মায়ের সংসারের গৃহব্যবস্থার শৃঙ্খলার কথা সে স্মরণে আনতে পারে না। কিন্তু পিতৃগৃহপরিচালনের যে সামান্য অভিজ্ঞতা তার স্মৃতিতে সঞ্চিত ছিল, তাকেই সে কল্পনার অবাধ আতিশয্যের সম্ভারে, নিজের ভাবীগৃহশিল্পরচনায় নিয়োজিত করলে।

চিন্তার আবেগে সে রুদ্ধবায়ু কেবিনের অন্ধ কোটর থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে এসে বারান্দার রেলিঙের কাছে দাঁড়িয়েছিল। বাংলার শান্ত নদীতট ; পর্ব্বতগুহা থেকে অকস্মাৎ বহির্গত নদীর ধারার মত, আম্রবনচ্ছায়ামুক্ত বিসর্পিত গ্রাম্য পথ ; দিগন্তবিস্তৃত প্রান্তরের বক্ষে সঙ্গীহীন গরুর গাড়ীর আচ্ছাদনের অবকাশে অজ্ঞাত পথিকবধূর উৎসুক ভঙ্গী ; সমস্তই আজ তার চোখে রহস্যাবৃত সৌন্দর্য্য-লোকের অপরূপ আকাঙ্ক্ষাকে রূপায়িত ক'রে তুলেছে।

কমলাপুরী পৌঁছে সে তার ভাবী জীবনের অনাবিষ্কৃত কল্পরাজ্যের পরিবেশের মধ্যে শচীন্দ্রকে অভ্যর্থনা করবার আনন্দময় পরিকল্পনায় তার অতীত দুঃখের ইতিহাস বিস্মৃত হয়ে গেল। তার মনে কোন সংশয় কোন দৈন্য আর তাকে বিচলিত করতে পারলে না। শচীন্দ্রের বিরহবিধুর জীবনকে সে আবার আশায় আনন্দে উৎসাহে কর্ম্মের প্রেরণায় উদ্বুদ্ধ ক'রে তুলতে পারবে ; কমলাপুরীকে পরস্পরের সংহত শক্তির নবীন গতিবেগে আরও বৃহত্তর ক'রে বাংলার নারীদের প্রকৃত কর্ম্মক্ষেত্র, নিশ্চিন্ত আশ্রয়, এবং স্বচ্ছন্দ জীবনযাত্রার প্রতিষ্ঠাভূমিতে পরিণত করতে পারবে। এই চিন্তায় সে অধিকতর উৎসাহে কর্ম্মে নিজেকে প্রবৃত্ত

করলে। কল্পনার মায়ায় কয় দিন এমনি ক'রে মোহের আবেশে তার কেটে গেল।

এমন সময় ম্যানেজার এসে পৌঁছল কমলের প্রত্যাগমনের সংবাদ নিয়ে। সুখস্বপ্নের মধ্যে অকস্মাৎ একটা রূঢ় আঘাতে সে যেন বাস্তব জগতের পরিবেষ্টনের নীরস গ্লানি নিয়ে জেগে উঠল। এক মুহূর্ত্তের মধ্যে স্বপ্নের ঘোর কেটে গিয়ে নিজের অসহায়, ভবিষ্যৎ-আশাপরিশূন্য, অপমানিত মূর্ত্তি তার চোখের উপর ভেসে উঠল। শচীন্দ্রের কাছে অকস্মাৎ সে অকাম্য অস্পৃশ্য হয়ে গেছে। নিজের বাসনায় রচিত আবর্ত্তের মধ্যে তাকে সমস্ত জীবনে সঙ্গীবিহীন নিরবলম্ব তৃণখণ্ডের মত আবর্ত্তিত হয়ে কোন্ বিপর্য্যস্তভাগ্য অন্ধকার ভবিষ্যতের করুণার উপর মুক্তির উৎকণ্ঠায় কালযাপন করতে হবে তা কে বলতে পারে!

চিন্তার উত্তেজনায় ঘর থেকে বেরিয়ে নদীর ধারে তার একটা প্রিয় নির্জ্জন স্থানে নিজেকে সুসম্বৃত ক'রে নেবার জন্যে গিয়ে সে বসল। উৎসবের আয়োজন তাকেই করতে হবে; সুতরাং অলস কল্পনাবিলাসে কালাতিপাত করবার সময় তার নেই। নিজের দুর্ব্বলতার কাছে নিজেকে বিসর্জ্জন দিয়ে শোক পরিতাপ সম্ভোগ করবার স্বভাবও তার নয়। সে ভেবে দেখলে যে শচীন্দ্র ত কোন দিনই তার কাছে এমন ক'রে আত্মোৎসর্গ করতে প্রবৃত্ত হয় নি যার মধ্যে তার একান্ত প্রেমের অকুণ্ঠ আনন্দ প্রকাশ পায়। তার প্রেমের মধ্যে পার্ব্বতীর প্রতি কর্ত্তব্যের করুণা কি বহুলাংশে মিশ্রিত নয়? পার্ব্বতী যে কোন দিনই তাকে অগ্রসর হবার উৎসাহ দান করতে পারে নি তার গূঢ় তত্ত্ব কি এই নয় যে শচীন্দ্রের চিত্ত কখনও অনন্য হয়ে তার প্রেমভিক্ষা করেছে বলে তার মনে হয় নি? নিজের আকাঙ্ক্ষার প্রলোভনে সে যে শচীন্দ্রের ভবিষ্যৎকে অবরুদ্ধ করে নি সেজন্যে সে মনে মনে নিজেকে ধন্যবাদ না দিয়ে থাকতে পারল না। অনেক ক্ষণ নদীর ধারে কাটিয়ে সে নিজের ভবিষ্যৎ কর্ম্মপন্থা নির্দ্ধারণ ক'রে নিয়ে উঠে পড়ল। হেসে বললে, "পূজার চেয়ে বিসর্জ্জনের উৎসবই আমার জীবনের পুরস্কার হোক।"

শচীন্দ্রনাথ তাঁর প্রিয়াকে ফিরিয়ে পেয়ে এত দিনের দুঃখ সার্থক আনন্দে পরিণত করতে পেরেছে, সে কথা কল্পনা ক'রেও সে নিজেকে সান্ত্বনা দিলে। ভাবলে, 'শচীন্দ্রকে সুখী করাই ত তার প্রাণের অভিলাষ—তা সে পার্ব্বতীর দ্বারাই হোক বা কমলার দ্বারাই হোক তাতে কি আসে যায়?' কিন্তু মনের মধ্যে সর্ব্বহারা নিঃস্বতার বেদনা অন্তরে অন্তরে তার জমা হয়ে উঠতে লাগল। সেই সঙ্কীর্ণমান রিক্ততার দুঃখকে মনে মনে অস্বীকার এবং উপেক্ষা করবার প্রয়াসে অতিরিক্ত উদ্যম ও উৎসাহে অভ্যর্থনা-উৎসবের আয়োজনে সে লেগে গেল। পাছে কোথাও কিছু ত্রুটি থেকে যায়, পাছে উৎসবের দেয়ালির উজ্জ্বল আলোকমালার একটি দীপও দীপ্তিহীন দেখায়, পাছে শচীন্দ্রের কল্পনায় কোন কারণে, অবহেলাজনিত অব্যবস্থার কোন সন্দেহের ছায়া তার আনন্দের উৎসাহকে ম্লান করে, এই আশঙ্কায় সে প্রত্যেকটি বিষয়, প্রত্যেকটি ব্যাপার সম্পূর্ণ নিজের তত্ত্বাবধানে অনন্যসাধারণ রুচি এবং পারিপাট্যের সঙ্গে রচনা ক'রে তুলতে তার সমগ্র চিন্তা এবং শক্তি নিয়োগ করলে। এমনি ক'রে সে তার বিসর্জ্জনের মহোৎসবকে মহিমান্বিত ক'রে তুলতে চেষ্টা করতে লাগল।

এই চেষ্টা যে তার জীবনের সত্যকে শচীন্দ্রের করুণার নিষ্ঠুরতা থেকে আবৃত করবার প্রয়াস, এই চেষ্টা যে সত্যের পরিবর্ত্তে আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখবার আত্মপ্রতারণা, একথা তার মনে রইল না। এই আত্মত্যাগের অন্তরালে নিজের আত্মসম্মানকে প্রতিষ্ঠিত রাখবার এক প্রকার আত্মপ্রসাদও অন্তরে অন্তরে অনুভব করতে লাগল।

উৎসব-অনুষ্ঠানের কোথাও কোন বিচ্যুতি ছিল না। পার্ব্বতীর অভিনব কর্ম্মসূচির আনন্দ-আয়োজনে শিথিলতা লক্ষিত হয় নি, তবু যে দু-দিন তারা কমলাপুরীতে ছিল তার মধ্যে শচীন্দ্রনাথ কেন যে পার্ব্বতীর দৃষ্টিকে প্রাণপণে অতিক্রম ক'রে ফিরেছে, তা কে বলতে পারে! এই এড়িয়ে-চলার প্রয়াস পার্ব্বতীর সচেতন দৃষ্টির কাছে কিছুমাত্র অগোচর ছিল না, কিন্তু পাছে এই সঙ্কোচের আব্রুটুকু তার দৃষ্টির আঘাতে লজ্জা পায় সেইজন্যে সে তার শতকর্ম্মের মধ্যেও পূর্ব্বের মত স্বচ্ছন্দ পরিহাসে, আলাপে এবং পরামর্শ গ্রহণের অছিলায় শচীন্দ্রের মনকে নিশ্চিন্ত নিঃশঙ্ক সহজ ক'রে তোলবার চেষ্টার ত্রুটি করে নি।

এই দু-দিনের জন্য নিজের গৃহদ্বার কমলাদের ছেড়ে

দিয়ে, নর্মদা নাম্নী তার কোন কর্মচারিণীর গৃহে, সে নিজের ব্যবস্থা ক'রে নিয়েছিল; এবং কমলা বা মালতী পাছে কোন কারণে নূতন পরিবেষ্টনের আড়ষ্টতা কিছুমাত্র অনুভব করে, সর্ব্বদাই সেজন্যে সে তার সতর্ক আত্মীয়তার স্বচ্ছন্দ ভাবকে সজাগ রেখেছিল।

একদা তার নিরবচ্ছিন্ন কর্ম্মের মধ্যে একটু অবকাশ পেয়ে শচীন্দ্রের অন্বেষণে সে তার বাড়ী গেল। শচীন্দ্র অন্যমনে একটা খবরের কাগজ হাতে বাইরের বারান্দায় ব'সেছিল। পার্ব্বতী গিয়ে বললে, "বেশ ত, আমরা খেটে খেটে হয়রান হয়ে যাব আর আপনি আড়ালে ব'সে আরাম ক'রে মজা দেখবেন! সেটি হচ্ছে না। একে আপনি হিরোইনের স্বামী, তাতে কমলাপুরীর প্রতিষ্ঠাতা; আপনি লুকিয়ে থাকলে, আপনাকে ছাড়ব না কি? তা কিছুতেই হবে না। তার পর যত বদনামের ভাগী হব আমি, না?"

শচীন্দ্র অবশ্য এই সহজ সরল কৌতুকের সঙ্গে যোগ রক্ষা করবার প্রাণপণ চেষ্টা করলে।

একটু অবাক হওয়ার ভান ক'রে দুষ্টু হেসে সে বললে, "কেন! তোমার নাইট-এ্যাণ্ট ভাগীদার ভোলাদা কি তোমায়—?"

কথা শেষ হ'তে না দিয়ে পার্ব্বতী কৃত্রিম ক্রোধে তর্জ্জন ক'রে বললে, "শাট আপ। ডোণ্ট বি সিলি। এখন উঠুন ত মশাই। বায়না ক'রে ফাঁকি দেবার মৎলব, না?

শচীন্দ্র আবার একটু হেসে বললে, "আরে বুঝতে পারছ না যে, সাড়ম্বরে যার শ্রাদ্ধের আয়োজন করছিলাম তিনি স্বয়ং শ্রাদ্ধবাসরে এসে হাজির। তাই লজ্জায় মুখ দেখাতে পারছি নে।"

এই কৌতুক হাস্যের চেষ্টার অন্তরালেও সে সত্যিই তার লজ্জাকে চাপা দিতে পারছিল না এবং পার্ব্বতীর কাছে তা অগোচরও ছিল না, তবু পার্ব্বতী নিজের দিক থেকে তার কোন আভাস দিলে না।

সে বললে, "না না, সত্যি একটু দরকার আছে। আজ রাত্রে একটা সভার আয়োজন করেছি। আজ শুক্লা চতুর্দ্দশী কিনা। আজ—"

"তুমি কি ক'রে জানলে?"

"এ ত কলকাতায় শহর না, যে ইলেট্রিক লাইটের পর্দ্দা টাঙিয়ে আমরা অমাবস্যা পূর্ণিমা সব আড়াল ক'রে ব'সে আছি। তা ছাড়া হিন্দু বিধবাদের একাদশী পূর্ণিমা হিসেব ক'রে চলতে হয় মশাই, নইলে আপনারাই নিজেদের বেলা আঁস্তাকুড়ে-ফেলে-দেওয়া মনুর শাস্ত্র কুড়িয়ে এনে মার মার ক'রে তেড়ে আসবেন'খন। আপনার আশ্রমটা যে বিধবাদের, তা কি ভুলে গেছেন নাকি।"

"আশ্রমটা যে আমার তা আর ভুলতে দিচ্ছ কই? নইলে—"

"নইলে কি? নইলে ফাঁকি দিয়ে গায়ে ফুঁ দিয়ে বেড়াতাম। না? তা হচ্ছে না। শুনুন, একটা মতভেদ ঘটেছে। সভার জায়গাটা কেউ বলছে ফুল দিয়ে আটচালাটাকে সাজিয়ে তার মধ্যে করতে; আবার কেউ বলছে, চাঁদনী রাত, নদীর ধারে খোলা মাঠে করতে। আপনি কি বলেন?"

"আমি বলি, একটা মতভেদ ঘটেছে তাই ভাল, ওর মধ্যে আবার দুটো ঘটিয়ে বিশেষ লাভ নেই।"

"কথার জাহাজ! মতভেদ যে বাড়াতেই হবে, তারই বা মানে কি?"

"বেশ, ওর মধ্যে কোন্ মতটা দিলে মতভেদ বাড়বে না অর্থাৎ কোন্‌টা তোমার তাই বলে দাও। ব্যস চুকে যাক।"

"আহা, কি আমার বাধ্য ছেলে! আমি ব'লে দিলেই উনি আমার মতে—"

"না না, তা বলছি না। তোমারটা জানলে অন্যটাতে মত দিতে আর ভুল হবে না। মতভেদ তাহ'লে একটাই থেকে যাবে, আর বাড়বে না। তাই বলছি।"

"থাক, তাই আর বলতে হবে না। এখন চলুন দেখি!"

পার্ব্বতী এমনি ক'রে সহজ স্বাভাবিকতার আবহাওয়া সৃজন করবার চেষ্টা করেছে। কিন্তু পার্ব্বতী যে অক্ষুণ্ণ এমন কি আনন্দিত চিত্তে শচীন্দ্রের বিচ্ছেদকে গ্রহণ করেছে এ-কথা মনে মনে সম্পূর্ণ বিশ্বাস না করলেও, কল্পনা ক'রে একদিকে শচীন্দ্রের অভিমান আহত হয়েছিল; আবার অকস্মাৎ পার্ব্বতীকে শূন্যতার মধ্যে বিসর্জ্জন দিয়ে তারই সামনে কমলাকে নিয়ে "সুখে স্বচ্ছন্দে ঘরকন্না"র উল্লাসে মত্ত হওয়ার চিত্রটাও তাকে লজ্জিত করছিল। সুতরাং পার্ব্বতীর চেষ্টা সত্ত্বেও সে কিছুতেই নিজেকে বিস্মৃত হ'তে পারছিল

না। দুদিন সাধ্যমত পার্ব্বতীর দৃষ্টি সে এড়িয়েই বেড়াতে লাগল।

৬৫

তার পর কিছু দিন অতীত হয়েছে। কমলাপুরী ও বল্লভপুরের আনন্দ-উৎসবের কূলপ্লাবী বন্যাকলোচ্ছ্বাস গ্রাম্য জীবনস্রোতের স্বাভাবিক ধারা-প্রবাহের তটসীমার মধ্যে শান্তরূপ ধারণ করেছে। শচীন্দ্রনাথ নূতন আনন্দে নবীন আশায় নবতর উদ্দীপনার উৎসাহ নিয়ে সংসারে প্রবেশ করেছে। কমলাকে ফিরে-পাওয়ার রূপকে সে নিজের অন্তরের মধ্যে এবং বাহিরের জীবনব্যাপারে পরিপূর্ণ ক'রে উপলব্ধি করবে এই তার পণ। প্রতিদিনের প্রতি মুহূর্ত্তকে সে কমলার প্রত্যক্ষ অনুভূতি দিয়ে আবৃত ক'রে গেঁথে তুলতে চায়। তাকে নানাভাবে সাজিয়ে, নূতন নূতন উপহার-দ্রব্যে পরিতুষ্ট ক'রে, অবসরকালে চিত্তবিনোদনের নানা তুচ্ছ আয়োজন ক'রে সে তার হৃদয়ের বহুদিনপরিত্যক্ত তৃষিত মধুচক্রকে রন্ধ্রে রন্ধ্রে পরিপূর্ণ ক'রে তুলতে চায় তাদের মিলনরসমধুপ্রবাহে। প্রমাণ করতে চায় যেন যে, এই দীর্ঘ বিরহ তার চিত্তকে কমলার একান্ত মিলনাকাঙ্ক্ষায় উন্মুখ ক'রে রেখেছে, অন্য তুচ্ছ আকর্ষণে অন্য কোনও আনন্দরসে তা তৃপ্ত হবার নয়। উচ্ছ্বসিত প্রমাণের আবশ্যক কমলার ছিল না, আবশ্যক তারই। সুতরাং এই প্রমাণের আতিশয্য কমলার পক্ষে অত্যাচারে পর্য্যবসিত হবে কিনা এ-কথা চিন্তা করবার মত মোহমুক্ত অন্তর তার নয়।

কমলা স্বভাবতঃ শান্ত ও অন্তর্ম্মুখী। এই অত্যধিক উচ্ছ্বাসবেগের সঙ্গে ছন্দ রক্ষা ক'রে চলার মত গতিবেগ সে আপনার অন্তরে সংগ্রহ করতে পারে না। তার চিরদিনের শান্ত নির্ব্বাক চিত্ত নানা বিপর্য্যয়ের আঘাতে আরও প্রকাশ-বিমুখ হয়ে গিয়েছে। বাহিরের অতিরিক্ত উচ্ছ্বাসের আবেগে তার নিশ্চিন্ত জীবনযাত্রা যেন হাঁপিয়ে উঠতে চায়। সে শচীন্দ্রের দুর্ব্বার হৃদয়ের সমাদরকে তার উপযুক্ত মূল্য দিতে পারে না। নিজের দৈন্য অনুভব ক'রে মনে মনে সে শচীন্দ্রের জন্য শঙ্কিত হয়ে ওঠে। বারম্বার অনুভব করে যে তার কাছ থেকে উপযুক্ত সাড়া না পেয়ে শচীন্দ্র ক্ষুণ্ণ হয়ে ফিরে যায়। শচীন্দ্র মুখে অবশ্য কোনও নালিশ জানায় না এবং আরও অজস্ররূপে প্রকাশ ক'রে কমলাকে সে অভিভূত করতে চায়। কমলাও তার আদরে, তার উদ্বেল হৃদয়ের প্লাবনে অভিভূত হয়; কৃতজ্ঞতায় তার মন ভরে ওঠে, কিন্তু নিজেকে সে তেমন ক'রে দিতে পারে না।

বস্তুত এত আনন্দের মধ্যেও মন তার সর্ব্বদা সুস্থ নয়। সীমার মৃত্যু, নিখিলনাথের কারাবাস, নন্দলালের নিষ্ঠুর হত্যা এবং সর্ব্বোপরি মালতীর বৈধব্য তার হৃদয়ের উৎসবের আয়োজনে মাঝে মাঝে গভীর ছায়াপাত করেছে। বিশেষতঃ মালতীর ভাগ্যবিপর্য্যয়ে তাঁর নিজের অদৃষ্টের সৌভাগ্যোদয় কল্পনা ক'রে মালতীর প্রতি করুণায় এবং এক প্রকার সঙ্কোচে তার মন বিধবা মালতীর চোখের উপর নিজ ভাগ্যের এই অপর্য্যাপ্ত দাক্ষিণ্য সম্ভোগ করতে যেন নিষ্ঠুরতার লজ্জা অনুভব করে।

শচীন্দ্রের হাত থেকে মুক্তি পেলেই সে মালতীর কাছে গিয়ে বসে। সংসারের নানা কথায় তার অনভ্যস্ত পরিবেশকে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করে। নিজের অনভিজ্ঞতার নিদর্শন দেখিয়ে কর্ত্রীপদে মালতীকে প্রতিষ্ঠিত করবার এবং তার আজ্ঞাবহ হয়ে চলার অভিনয় করে। এমনি ক'রে নিজেকেও সে কতকটা সান্ত্বনা দেয়, মালতীর সঙ্কোচ এবং নূতন জায়গায় অনাত্মীয় বোধের দ্বিধা দূর করবারও চেষ্টা করে।

সরলা মালতী হেসে বলে, "সে কি ভাই, এ সব কি আমি পারি? এ রকম মেলায় বাড়ী ভাই আমি জন্মে দেখি নি। তোমার রাজত্বি তুমিই দেখ।"

কমলা বলে, "তার চেয়ে বল না যে আমি কেমন নাকাল হই তাই দাঁড়িয়ে একটু রঙ্গ দেখছ। আমি কি ছাই সংসারের কিছু জানি? তা হবে না দিদি, তুমি এরই মধ্যে আমাকে পর ভাবতে সুরু করলে আমি বাঁচি কি ক'রে বলত?"

তার পর হেসে বলে, "ছেলেটিকে ত পর করেইছ, ছেলে ও মাসী বলতে অজ্ঞান।"

মালতী বলে, "হ্যাঁ, অজ্ঞান! ভোলাদাকে পেয়ে ছেলে আর বাড়ীর মধ্যে পা দেওয়াই বন্ধ করেছে।"

কমলা হেসে বলে, "ঐ রকম নেমকহারামই ওরা।"

খোকনের চরিত্রেও পরিবর্ত্তন বড় কম হয় নি। মা এবং মাসী দুজনেই এখন অবান্তর হয়ে পড়েছে। ভোলানাথের আসরেই এখন তার প্রধান আড্ডা। তার উপর তার জন্য নূতন একটা টাট্টু ঘোড়া কেনা হয়েছে। তাই নিয়েই সে দিবারাত্র একেবারে মেতে আছে। ভোলানাথ বলেছে, "আর অল্প কিছু দিন অভ্যাস করতে পারলেই একেবারে ফৌজে গিয়ে সেপাই হবে।" সেই মহদুদ্দেশ্যে এখন-থেকে ঘোড়ার অভ্যাসও চলেছে।

ভোলানাথের সাহায্যে মালতী কোনও মতে ধরপাকড় ক'রে তাকে স্নানাহারে প্রবৃত্ত করে। দুধের বাটিতে অর্দ্ধেক দুধ প'ড়ে থাকে, তেল মাখার ধৈর্য্য তার সয় না। সাফসোফ ক'রে পোষাক পরিয়ে দিতে গিয়ে দেরী হ'লে হাত পা ছুঁড়ে অস্থির ক'রে তোলে। মালতী আর তাকে আয়ত্তের মধ্যে রাখতে পারে না। কেবল সমস্ত দিন হুটোপাটি ক'রে সন্ধ্যার সময় যখন চোখ ঢুলে আসে তখন পোষা বেরাল-ছানাটির মত বিছানায় এখনও মাসীর কোল ঘেঁসে না শুলে তার চলে না। "মাসী পিঠ চুলকে দাও" বলতে বলতে মাসীর গায়ে কচি হাতটি রেখে ঘুমে অচৈতন্য হয়ে পড়ে।

বেকার মালতী অগত্যা ধীরে ধীরে শচীন্দ্রের সংসারের মধ্যে আচ্ছন্ন হয়ে পড়ল এক পরে এক দিন তার কথা বড় আর কারও মনে রইল না।

কেবল মাঝে মাঝে শ্রান্ত বিমর্ষ চিত্ত নিয়ে কমলা তার কাছে এসে বসে। সীমা ও নিখিলনাথের গল্প, হাসপাতালের গল্প, তাদের নূতন পরিচিত বন্ধু পার্ব্বতীর গল্প করে।

মালতী বলে, "পার্ব্বতী ভাই কেমন সায়েব সায়েব। ঘরদোর সব মেমসাহেবদের মত। অত ধোপদুরস্ত হ'লে ঘরে ঢুকতে গা ছম ছম করে। আবার নাইবার ঘরে—"

শুনতে শুনতে অন্যমনা হয়ে কমলা ভাবে শচীন্দ্র তার কাছ থেকে আহত হয়ে শুষ্ক মুখে ফিরে গেছে। কিন্তু সে কি করবে? স্বামীর নবীন হৃদয়াবেগের উদ্দাম বন্যাস্রোতে ঝাঁপিয়ে পড়বার শক্তি এবং উৎসাহ সে কেমন ক'রে পাবে?

আসল কথা, শচীন্দ্রনাথ যদি ধীরে সুস্থে সন্তর্পণে, কমলার নূতন জীবনের বন্ধনগুলির উপর সহানুভূতি রেখে, অনুকূল আবহাওয়া সৃজন করতে পারত, তবে হয়ত একদিন সে তার সরসস্নিগ্ধ হৃদয়ের স্পর্শ পেয়ে ধন্য হত। কিন্তু বহু দিনের শুষ্ক তৃষিত পাত্রকে এক মুহূর্ত্তের উত্তেজনার সুরায় ফেনিয়ে তুলে আকণ্ঠ পান ক'রে সে মত্ত হতে চায়। বিপুল বাসনার আঘাতে কমলার সুপ্ত হৃদয়কে জাগিয়ে তুলতে চায়। কিন্তু নিজেকে অন্তরাল করায় অভ্যস্ত কমলার অন্তঃকরণ প্রকাশের অক্ষমতার সঙ্কোচে আপনাকে যেন আরও আবৃত ক'রে ফেলে শামুকের মত।

কমলা মনে মনে ভীত হয়ে দেখে যে, যে-শচীন্দ্র পূর্ব্বে তার কাছে পরিচিত ছিল এ যেন সে-শচীন্দ্র নয়। কিসের একটা অতৃপ্ত ক্ষুধা এর অন্তরে তীব্র হয়ে জাগ্রত হয়ে আছে যার স্বরূপ কমল কিছুতেই স্থির ক'রে উঠতে পারে না। এই কয় বৎসরের ব্যবধানে তার মধ্যে কিসের একটা তীব্র অভাবের তাড়না সঞ্চিত হয়ে উঠেছে কমলার শান্ত অনুচ্ছ্বসিত প্রেম যা পূরণ করতে পারছে না। কিসের এই অভাব! কি চায় সে কমলার মধ্যে! কমলা বুঝতে পারে না। একটা অজানা আতঙ্কে সমস্ত শরীর-মন তার সঙ্কুচিত হয়ে ওঠে। কেবলই মনে হয় "এ নয়, এ নয়। যার স্মরণে সে এই দীর্ঘকাল অপেক্ষা করেছিল, এর মধ্যে তার সেই শান্ত, আত্মস্থ, স্নিগ্ধ, সুসংযত স্বামিত্বের পরিচয় যেন নেই।" ভাবতে ভাবতে এক এক সময় তার স্বাভাবিক দুর্ব্বল মস্তিষ্কের কল্পনার ঘোরে তার মনে হয়, যেন কোন এক যাদুমন্ত্রের প্রভাবে সে তার স্বামীর দেশে এসে পড়েছে। সেখানে স্বামী তার নেই, বিদেশে তারই সন্ধানে তিনি ঘুরে ফিরছেন। আর সেই অবকাশে যেন তার স্বামীর ছদ্মবেশে এ কোন অপরিচিত তার প্রেমের ভিক্ষুক হয়ে এসেছে তার কাছে।

অপরিচিত পুরুষের প্রতি একদিনকার অভিজ্ঞতায় অর্জ্জিত তার স্বাভাবিক বিরূপতা যেন তার চিত্তে আছে আজে কি এক রকম বাধার সৃষ্টি করতে চায়। ভয়ে সে দিশা পায় না, তার নিজের মানসিক অবস্থা দেখে। ভয়, পাছে তার মুখে, তার আচরণে কোনমতে এই বিরূপতা প্রকাশ হয়ে পড়ে। অথচ শচীন্দ্রের প্রতি তার একান্ত সমর্পিত

প্রাণে সে তাকে তৃপ্ত করবার শক্তি পাবার জন্যে মনে মনে তার দেবতার কাছে কাতর প্রার্থনা জানায়।

কমলাকে হারাবার পূর্ব্বে ত এমন দিন ছিল না। প্রতি-দানের তৃষ্ণা শচীন্দ্রের চিত্তে তখন তীব্র হয়ে জাগত না। মনে হ'ত না যে কমলা নিজের বাসনায় নূতন নূতন আবেগ তার মধ্যে জাগিয়ে দিয়ে সম্ভোগের আনন্দকে তীব্রতর ক'রে তুলুক। তখনকার দিনে শচীন্দ্র কমলাকে নিজের ইচ্ছায় খেলার পুতুলের মত ক'রে সম্ভোগ ক'রেই সুখ পেত অপর্য্যাপ্ত। স্মিত আনন্দে, নিরাপত্তিতে, কমলা যে অবাধে শুধু গ্রহণই করত, সেই গ্রহণেই বিকশিত হয়ে উঠত তার প্রতিদান, নবনারীত্ববিকাশের মহান্ সম্পদে। এখন এই অক্রিয় প্রতিদানে আর সে তৃপ্ত হতে পারে না। কমলার কাছ থেকেও দুর্দ্দমনীয়, ইচ্ছাময় ব্যক্তিত্বের সাড়া সে পেতে চায়—যে তাকে নিজের মত ক'রে উপভোগ করবার উত্তেজনায় নব নব বাসনার আবেগে তাকে গ'ড়ে নেবে; যে তার কাছে শুধু পোষমানা প্রাণীর আত্মবিসর্জ্জন নিয়ে উপস্থিত হবে না; যে আসবে নিজের প্রেমের প্রবল শক্তিতে, তার ইচ্ছার বিরুদ্ধে ইচ্ছার জয়ধ্বজ বহন ক'রে; ব্যক্তিত্বের বিপুল সংঘাতে যে তার মধ্যে রূপায়িত ক'রে তুলতে চাইবে নূতনতর সৃষ্টিকে। কমলার মধ্যে তীব্র উৎসারিত আত্মার সেই সর্ব্বজয়ী অস্তিত্বের কোন চিহ্ন সে পায় না—রাজ্ঞীর মত যে নিজের মনোহর প্রভুত্বের অপ্রতিহত মহিমায় প্রতিষ্ঠিত।

শুষ্ক দারুখণ্ড যেমন নিজের অন্তর্নিহিত অগ্নিতে বহ্নিমান হয়ে নিজেকে সম্পূর্ণ নিঃশেষ করে, শচীন্দ্রের চিত্তও তেমনি তার নিজের প্রদীপ্ত অন্তর-জ্বালায় নিজেকে দগ্ধ ক'রে ক্রমে নিস্তেজ হয়ে এল। তার মনে হ'তে লাগল যে, কমলা যেন তার পক্ষে জীবলোকের সম্পর্কশূন্য অনায়ত্তগম্য অস্তিত্ব মাত্র; যে-মৃত্যুর সমাধিগহ্বর থেকে সে এই পৃথিবীর আলোর মধ্যে উঠে এসেছে সেখানকার শোণিতোত্তাপবিহীন হৃৎপিণ্ড যেন ঐ রক্তমাংসের নারীদেহকে পরিণত করেছে প্রাণহীন মর্ম্মরপ্রতিমায়—মানবের সুখসম্পদ আশা উচ্ছ্বাসের তপ্ত-জীবনধারা সেখানে প্রবাহিত হয় না; জীবনকে সে উত্তাপ দান করে না; বিদ্যুৎপ্রবাহে মানুষকে নূতন ক'রে অভিনব ক'রে সৃজন করবার প্রাণশক্তি ওখানে সুপ্ত। ওর মধ্যে নেই মানুষের আত্ম-আবরণ থেকে শতদলের মত সৌরভে সৌন্দর্য্যে বিকশিত ক'রে তোলবার প্রাণময় সৌরকর।

কমলা এবং শচীন্দ্রনাথের পরস্পরের সম্পর্কে এই সমালোচনা ও বিশ্লেষণের দৃষ্টি পরস্পরের মধ্যে, নিজেদের সম্পূর্ণ অজ্ঞাতসারে, যে-ব্যবধান সৃজন ক'রে তুললে তাতে তাদের বাইরের সংসারযাত্রা সুস্পষ্টভাবে আক্রান্ত না হ'লেও অন্তরে অন্তরে অস্বস্তির মেঘ এবং অতৃপ্তির বিদ্যুৎ জমা হয়ে উঠছিল। কমলার স্বভাবত অন্তঃশীলচিত্ত নিজেকে প্রকাশ করতে বাধা পেয়ে আরও বেশী ক'রে যেন নিজের আবরণের মধ্যে গিয়ে প্রবেশ করলে এবং শচীন্দ্র উত্তরোত্তর নিজেকে প্রতিহত ব্যর্থ অনুভব ক'রে অশান্ত বিক্ষোভে শান্তি ও সান্ত্বনার পথ খুঁজে ফিরতে লাগল।

মধ্যের যে কয় বৎসর সে কমলাপুরী প্রতিষ্ঠানের কর্ম্ম-প্রেরণার উৎসাহে, চেষ্টায়, পরিশ্রমে সৃজনের আনন্দ-রসের মধ্যে নিমজ্জিত হয়েছিল, সেই স্বল্পকাল পূর্ব্বের স্খলিত অতীতের স্মৃতিসূত্রকে খুঁজে নেবার জন্যে আবার তার মনের পরিত্যক্ত নিভৃতে গিয়ে সে উপস্থিত হ'ল। কমলাকে ফিরে-পাওয়ার উত্তেজনায় পার্ব্বতীর কথা সে সম্পূর্ণ উপেক্ষা ক'রে চলেছিল তার মনে; এবং এই মিথ্যাচার তার সহজ জীবনযাত্রার শান্তি ও সন্তোষকে উত্তেজনা ও আতিশয্যের বিক্ষোভে কমলার মধ্যে নিজেকে সমাহিত করবার অবসর দেয় নি। পার্ব্বতীর নিজের হাতে নূতন-ক'রে-গড়ে-তোলা তার গত কয়েক বৎসরের মনকে আপনার প্রেমাভিনয়ের উত্তেজনার মধ্যে ভুলতে চেয়েছিল বলেই পার্ব্বতীকে সে কোনমতে বিস্মৃত হ'তে পারলে না; এবং দিনে দিনে চিন্তাস্রোত সম্পূর্ণ পরিবর্ত্তিত হয়ে পার্ব্বতীর প্রতি তার চিত্তের গোপন আকর্ষণ ক্রমে ক্রমে তার কাছে প্রবল হয়ে উঠতে লাগল। মনে পড়ল, কমলার অভ্যর্থনা-উৎসবের সময় সে প্রাণপণে পার্ব্বতীকে এড়িয়ে চলতে চেষ্টা করেছিল; তবু উৎসবের আনন্দ-কোলাহলের মধ্যে অক্লান্ত পার্ব্বতীকে সে কখনও ম্লান হতে দেখে নি। যে-কয়দিন তারা কমলাপুরীতে ছিল তার মধ্যে এর জন্যে সে শচীন্দ্রকে কখনও অনুযোগও করে নি। বরং তার অতিপিনদ্ধ

কার্য্যক্রমের মধ্যে অবকাশ অন্বেষণ ক'রে নিয়ে, কমলা, মালতী ও শচীন্দ্রের সঙ্গে এসে কত গল্প পরিহাস করেছে, সহজ কৌতুলপূর্ণ নির্লিপ্ত প্রফুল্লতায় সরস ক'রে। পরস্পরের বিচিত্র ইতিহাস নিয়ে আলোচনা করেছে। কত সহানুভূতি নিয়ে বারবার ক'রে কমলার অলৌকিক রূপলাবণ্যের প্রশংসা ক'রে, সভার দিন নিজে হাতে তাকে সাজিয়ে, তাকে হাসপাতাল প্রভৃতি দেখিয়ে বেড়িয়ে, তার পরামর্শ জিজ্ঞাসা ক'রে কমলার বন্ধুতা সে সহজেই অর্জ্জন করেছে।

কিন্তু প্রতিদ্বন্দ্বীর অভ্যর্থনা-উৎসবে তার প্রফুল্ল মৈত্রীত্বের অন্তরালে যে বিকৃত চিত্র কল্পনা ক'রে লজ্জায় সে পার্ব্বতীকে এড়িয়ে চলেছিল তারই নিষ্ঠুরতার স্মৃতি আজ বারম্বার তার মনে এসে আঘাত করতে লাগল। সে সুস্পষ্টভাবে আজ উপলব্ধি করতে পারলে যে তার বিস্রস্ত জীবনকে পার্ব্বতী স্নেহে, শক্তিতে, সংযমে, আত্মত্যাগে তিল তিল ক'রে অপরূপ দক্ষতায় গ'ড়ে তুলেছিল। তার যে-শোককে ছিন্নমূল স্রোতের ফুলের মত সে তার ভাববাষ্পাকুল চিত্তপবনের বিলাসের বস্তু ক'রে রেখেছিল, পার্ব্বতী তাকে সার্থক ক'রে মহীয়ান ক'রে তুলেছে। সে বুঝতে পারলে যে সংসারটা নিছক সত্যের উপাদানে গঠিত। এতটুকু মিথ্যার ভর এখানে সয় না। সেই মিথ্যার মুখোস প'রে জগৎকে যত টুকু প্রবঞ্চনা করা যায় তত টুকু প্রবঞ্চিত হ'তে হয় নিজেকেই একদিন। কমলার প্রতি তার প্রেমের গর্ব্বে পার্ব্বতীর প্রতি তার অন্তরের সত্যকে সে প্রাণপণে অস্বীকার ক'রে চলেছে। কিন্তু যে-প্রেম দিনের পর দিন, অল্পে অল্পে, লৌকিকতার বাধা লঙ্ঘন ক'রে, মনের অন্ধকার উদয়াচলে, তার চিত্তাকাশ উদ্ভাসিত ক'রে দেখা দিল, দুঃখ-রাতের পারে সূর্য্যোদয়ের মত, তাকে জীবনে অস্বীকার করলে জীবন ত তার তমসাচ্ছন্ন হয়ে উঠবেই। সে আজ পরিষ্কার ক'রে বুঝতে পারল যে, ঐ যে নারীপ্রতিষ্ঠানের বিস্তৃত সফলতা বৎসরের পর বৎসর অক্লান্ত একাগ্রতায় সে সম্ভব ক'রে তুলতে পেরেছে, কখনই তা সম্ভব হ'ত না, যদি পার্ব্বতীর সাহচর্য্য এবং প্রেমের সঞ্জীবনীরসে এই কর্ম্মের মধ্যে সে অপরিমেয় মাধুর্য্যের আস্বাদন লাভ না করত। এই প্রতিষ্ঠানের মধ্যে দিয়েই ত জীবনে যা-কিছু সার্থকতা সে লাভ করেছে—কিন্তু কমলার প্রেম কি সেখানে উপলক্ষ এমন কি অবান্তর হয়ে ওঠে নি?

কমলার প্রেম ধরিত্রীর মত, বীজকে যে আপনার হৃদয়ে গুহায়িত ক'রে রেখে দেয়। কমলার প্রেম তার অন্তরকে চায় আবরণের আচ্ছাদনে, নিভৃতে, অনুভূতির সমাধিগহ্বরে আবৃত ক'রে। যেখানে প্রকাশের উচ্ছ্বাস নেই, প্রস্ফুরণের অবকাশ নেই, জীবনের চঞ্চল গতিবেগ যার মধ্যে সুপ্ত অথচ প্রাণরসে নিবিড়—চিরন্তন। আর পার্ব্বতীর প্রেম? সে আকাশের মত, বীজের জীবনপ্রবাহকে যে তামসলোক হ'তে জ্যোতিরুৎসবে আহ্বান ক'রে নেয়। জীবনলীলারসের মাধুর্য্যকে যে বিকশিত ক'রে, সার্থক ক'রে তোলে পত্রপুষ্পফলে। তার মনে হতে লাগল, এই ত সত্য। কমলার প্রেমের রসধারা কখনই তার জীবনে সার্থক হয়ে উঠবে না, পার্ব্বতীর মুক্তিমন্ত্রের আহ্বানে যদি তার জীবনবীজ শাখায় পুষ্পে পল্লবে উৎসের মত উৎসারিত না হয়ে উঠতে পায়, মেদিনীর অন্ধ আবরণ ভেদ ক'রে, অবারিত আকাশের পানে, আলোকোজ্জ্বল ধরণীর উন্মুক্ত প্রাঙ্গণে।

এমনি ক'রে শোভন উপমা এবং গভীর তত্ত্ব আবিষ্কারের মোহে নিজের পথের সন্ধানে সে প্রবৃত্ত হ'ল। তার ক্ষুধার্ত্ত চিত্তের প্রেমাভিব্যক্তির আতিশয্যে কমলার প্রতি শ্রান্ত তার হৃদয় যে পার্ব্বতীর প্রচ্ছন্ন আকর্ষণের মোহে তার দিকে ধাবিত হ'তে চায়, এ-কথা চায় না সে মানতে। না গো না, এ তার মোহ নয়। এ যে তার সার্থকতার অনিবার্য্য আহ্বানরূপ—পার্ব্বতীর এই আকর্ষণ। এই ত তার জীবনকে পরিপূর্ণতা দান করবে, তার প্রেমের মূলকে বিস্তৃত ও গভীররূপে কমলার অন্তরে প্রবেশের প্রেরণা দেবে।

চিন্তায় চিন্তায় তাকে বিভ্রান্ত ক'রে তুললে। পার্ব্বতীর কাছে নিজেকে নিবেদন করবার আকুলতা তাকে আচ্ছন্ন ক'রে ধরল। সে আর ব'সে থাকতে পারল না। বাড়ীর বিস্তৃত ছাদের উপর বহুক্ষণ সে অস্থির চিত্তে পায়চারি ক'রে বেড়াতে লাগল। কিন্তু যে-গৃহ তাকে তার জীবনের সার্থকতা থেকে দূরে সরিয়ে বন্দী ক'রে রেখেছে সেই গৃহের চতুঃসীমানার পরিবেষ্টন সে যেন আর সহ্য করতে পারছে না। বাড়ীর দেয়ালের গণ্ডী তার কাছে প্রতিভাত হ'তে লাগল বন্দীশালার মত। অস্থির হয়ে বেরিয়ে পড়ল সে মুক্ত প্রান্তরের মধ্যে যেখানে সমস্তই অবারিত; চলা যেখানে

প্রতিপদে প্রতিহত হয় না; মানুষের শাসন যেখানে স্বচ্ছন্দ আত্মার উপর প্রহরী নিযুক্ত ক'রে রাখে নি।

বাড়ী থেকে বেরবার সময় ম্যানেজার নমস্কার ক'রে বললে, "বাবু বায়সার প্রজারা আজ—"

শচীন তাকে থামিয়ে বললে, "আজ থাক।"

"কাল আসতে বলব কি?"

"না, পরে।"

"আপনি কি যাচ্ছেন কোথাও?"

এই প্রশ্নে সে মুহূর্ত্তকাল থমকে থেমে, ম্যানেজারের দিকে ফিরে বললে, "হাঁ, কমলাপুরী।"

ঠিক অব্যবহিত পূর্ব্ব মুহূর্ত্ত পর্য্যন্তও কোন বিশেষ জায়গায় যাবার উদ্দেশ্য তার মনে ছিল না। প্রশ্নের আঘাতেই তার চাপা-দেওয়া মনের বাসনাটা অকস্মাৎ মূর্ত্তি নিলে। শুধু ঘোড়াটুকু টিপবার অপেক্ষা যেন—তার পর জলন্ত গুলি ঊর্দ্ধশ্বাসে ছোটে তার লক্ষ্যের দিকে।

"তা নৌকো ঠিক ক'রে দেব, বাবু?"

"না।"

"লোকজন কেউ—"

"দরকার নেই।" ব'লে দ্রুতপদে সে এগিয়ে গেল। ম্যানেজার তার খেয়ালী মনিবটিকে বিশেষ ক'রেই চিনত, সুতরাং আর বেশী ঘাঁটাতে সাহস করলে না। শুধু কর্ত্তব্যবোধেই বোধ করি বাড়ীর ভিতরে সংবাদটি পাঠিয়ে দিলে।

শুনে কমলা চুপ ক'রে রইল। তার নিজের অদৃষ্টাকাশে যে একটা কিছু ঘনিয়ে উঠছে তা সে বুঝতে পারলে। এ সম্বন্ধে মেয়েদের ষষ্ঠ ইন্দ্রিয়টি প্রবল, এ-কথা মানতেই হবে।

মালতী উদ্বিগ্ন হয়ে কোলাহল ক'রে বলতে লাগল, "ওমা, না খেয়েদেয়ে এত রোদে একলা! এ কি খেয়াল বাপু? তুমিই বা কি মেয়ে বাছা, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইলে? তোমায় ব'লে গেছেন? জানতে তুমি যাবে?"

অন্যদিকে চেয়ে কমলা বললে, "হ্যাঁ।"

"জানতে, আর একলা যেতে দিলে! ভোলাদাকে না হয় পাঠিয়ে দাও সঙ্গে।"

"না, থাক।" ব'লে সে ঘরে গেল।

মালতী এইবার যেন কি একটা অনুভব ক'রে চুপ করলে কিন্তু মনটা তার খারাপ হয়ে গেল। 'লোকটা এই রোদ্দুরে, না খেয়ে, চলে গেল!'

সুস্পষ্ট কোন চিন্তার আকার না নিলেও কমলার মস্তিষ্কের মধ্যে "কমলাপুরী" ও "পার্ব্বতী" এই দুটো কথা এলোমেলো ভাবে ঘোরাফেরা করতে লাগল। কিছুতেই সে ঐ দুটো কথার শব্দসীমানা ছাড়িয়ে উঠতে পারছিল না।

রাত্রে মালতী তার কাছে শুতে এলে এক সময় সে বললে, "দিদি, খোকনকে নিয়ে তুমি এখানে থাক।"

মালতী কিছু না বুঝতে পেরে বললে, "তার মানে?"

"আমি কমলাপুরী গিয়ে পার্ব্বতীর সঙ্গে কাজ করতে চাই। এখানে বিনা কাজে ঘরের মধ্যে ব'সে আমার নিঃশ্বাস বন্ধ হয়ে আসছে। একটা কাজের মধ্যে থাকতে চাই।"

মালতী রাগ ক'রে ঝাঁজিয়ে উঠল, "যত অনাছিষ্টি আবদার তোমার। রাজরাণী হয়েও তোমার মন ওঠে না। যত খৃষ্টানী" ইত্যাদি ইত্যাদি।

কমলা কোন জবাব দিলে না। একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে পাশ ফিরে শুয়ে রইল। নিঃশব্দ অশ্রুজলে তার উপাধান সিক্ত হয়ে গেল।

৬৬

গভীর রাত্রি পর্য্যন্ত পার্ব্বতী তার কাজকর্ম্ম ক'রে অবশেষে শ্রান্ত হয়ে এসে শুয়ে পড়ত নদীর ধারের বারান্দায় তার প্রিয় আরাম-চেয়ারখানির উপর দেহ এলিয়ে দিয়ে। তার নিজের বঞ্চিত জীবনকে সে মানবের সেবায় আরো বেশী ক'রে দেবার এবং কমলাপুরীকে বৃহত্তর নারীকল্যাণের প্রতিষ্ঠানে পরিণত করবার পরিকল্পনা সে প্রস্তুত ক'রেছিল। কমলাপুরীর স্বল্পপরিসর আশ্রমের যাবতীয় ব্যাপার যন্ত্র-চালিতবৎ সুনিয়ন্ত্রিত হওয়ায় অবসর এখন তার প্রচুর; অর্থাৎ ঐটুকু কাজেই সে সন্তুষ্ট থাকতে চায় না। নিজেকে সে মুহূর্ত্ত-মাত্র অবসর দেবে না এই তার পণ। শচীন্দ্রের কর্ম্মযজ্ঞের অগ্নিতে নিজেকে আহুতি দিয়ে শচীন্দ্রের সঙ্গে তার বাহ্য বিচ্ছেদকে সে পরিপূর্ণ মিলনে পরিণত করবে। প্রতিমুহূর্ত্তে তার প্রিয়তমকে সম্মুখে জেনে প্রত্যক্ষ সান্নিধ্যের অনুভূতিতে

সে নিজেকে অনুপ্রাণিত ক'রে রাখতে চায়। বিধবার নিশ্চেষ্ট পূজা তার নয়, কুমারীর কমনীয় কামনাকেও সে জীবনে চায় না; সাধকের ধ্যানলোকে সে তার দয়িতের অধীনসত্তার কর্ম্মসহচরী। যেখানে তার চেষ্টা বাসনায় কলুষিত নয়, মোহে অবিবেকী নয় এবং শচীন্দ্রের স্থূল সত্তা যেখানে তার স্বতঃস্ফূর্ত্ত অজেয় আত্মাকে খণ্ডিত করে না।

এই দুই মাসের মধ্যেই সে নারীজগতের নানা মঙ্গল-প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে নিজের যোগসূত্র স্থাপনের চেষ্টা করেছে। ভারতবর্ষের বিভিন্ন স্থান থেকে সে ইতিমধ্যেই যথেষ্ট উৎসাহ ও প্রতিশ্রুতি পেয়েছে। তার ইচ্ছা যে ভারতের নানা কেন্দ্রে নিজে উপস্থিত হয়ে সকল প্রগতিশীল কর্ম্মী নারীকুলের সঙ্গে সে প্রত্যক্ষ পরিচয় ও যোগ স্থাপন করবে। সকলের সঙ্গে সহযোগে এক বিরাট নারীমঙ্গল প্রতিষ্ঠানে সকলকে অনুপ্রাণিত ক'রে তুলবে। শচীন্দ্রের কল্যাণে অর্থের অনটন তার ছিল না। তার অনুপস্থিতিতে কমলাপুরীর কার্য্যপরিচালনের সুবন্দোবস্ত সে ক'রে রেখেছিল। কাল প্রত্যূষে কলকাতায় যাবে বলে স্থির ক'রে সে আদেশ দিয়েছিল কক্ষ প্রস্তুত রাখতে। তার নিখিল-ভারত ভ্রমণের ভূমিকাস্বরূপ কলকাতার কয়েকটি বিশিষ্ট ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানের সঙ্গে সে পরিচিত হতে চায়।

সমস্ত কাজকর্ম্মের অবসানে নিত্যকার অভ্যাসমত সে বারান্দায় তার আসনটিতে এসে বসল। কাল যে বিরাট উদ্দেশ্য নিয়ে সে সম্পূর্ণ অপরিচিত জগতের মধ্যে নির্ব্বান্ধব হয়ে প্রবেশ করতে যাচ্ছে, তার নিঃসঙ্গ একাকীত্বের গুরুভার অজ্ঞাতসারে তার চিত্তকে অধিকার ক'রেছিল; এবং চিত্তের গোপন অন্তরালে প্রচ্ছন্নরূপে, তার সমস্ত সুশাসিত সাধনার আদর্শকে পরিহাস ক'রে, কখন যে শচীন্দ্রের বিরহবেদনা ধীরে ধীরে অন্তরের মধ্যে সংক্রামিত হয়েছে তা সে লক্ষ্যও করে নি। লণ্ডনে পীড়িত শচীন্দ্রের সেই অসহায় রোগতাপিত মূর্ত্তি, ইউরোপের নানা দেশ ভ্রমণের অবসরে পরস্পরের ঘনিষ্ঠতার রসায়নে নূতন জীবনে পরস্পরকে সঞ্জীবিত ক'রে তোলার সেই স্বর্ণমণ্ডিত দিনগুলির ইতিহাস, কমলাপুরীতে দ্বিধাবিচলিত শচীন্দ্রের আত্মসমর্পণের করুণ কোমল রহস্য, সমস্তই তার চিত্তে গভীর বিরহতপ্ত অশ্রুসজল বেদনায় আজ প্রতিফলিত হয়ে উঠেছে। নিমীলিত নেত্রের বারিধারা আর কূলের বাধা মানে না; অসহায় আকুল চিত্ত তার প্রেমাস্পদের আকাঙ্ক্ষাকেও নিবারণ ক'রে রাখতে পারে না। নিরুপায় অনাথের মত সে নিজের শোকের কবলে নিজেকে বিসর্জ্জন দিলে।

এমনি শাসনমুক্ত, শিথিলগ্রন্থি, বেদনাবিধুর চিত্তে অশ্রুবিগলিত মুদ্রিত নয়নে সে শচীন্দ্রকে তার নিজের সমগ্র চেতনা দিয়ে অনুভব করবার আবেশে স্থির হয়ে পড়ে রইল।

রাত্রি পূর্ণিমা। সমস্ত জলস্থল আকাশ জ্যোৎস্নার প্লাবনে যেন জোয়ারের সমুদ্রের মত উদ্বেল। ওপারের চাষীগ্রামের সুপ্তদীপ পর্ণকুটীর থেকে রোমন্থনসুখাবিষ্ট গাভীর কণ্ঠলগ্ন মৃদু ঘণ্টাধ্বনি যেন দূর স্বপ্নালোকের রাগিণী বহন ক'রে আনছে। কিন্তু বহির্জ্জগতের এই অনুপম সুন্দর রসস্রোত পার্ব্বতীর গভীর বেদনার তলে আজ নিলীন।

সহসা পদশব্দে চকিত হয়ে সে উঠে বসল। সামনে শচীন্দ্র—বিস্রস্ত বেশবেশ, উদ্‌ভ্রান্ত মূর্ত্তি, স্খলিত চরণ। এ কি স্বপ্ন? চোখকে যেন বিশ্বাস করা যায় না। শাস্ত্রে বলে যে, একান্ত ধ্যানপরায়ণ একাগ্রচিত্তে আরাধনা করলে, দেবতা মূর্ত্তি পরিগ্রহ ক'রে সম্মুখে আবির্ভূত হন। এ কি তার হৃদয়বাসী দয়িতের বিগ্রহমূর্ত্তি? এ সময় এ ভাবে! এ কি সম্ভব! কিন্তু এ কি বিধ্বস্ত, ক্লান্ত, পীড়িত মূর্ত্তি শচীন্দ্রের! এই শচীন্দ্র! যাকে কমলার সাহচর্য্যসুখে পরিতৃপ্ত কল্পনা ক'রে সে মনে মনে সান্ত্বনা লাভ করবার প্রয়াস পেয়েছে; যার আপ্তকাম, সুখতৃপ্ত আননের হাস্যোজ্জ্বল প্রভা দেখার আশায় সে তার প্রতিষ্ঠানের দুয়ারে অপেক্ষা ক'রে আছে—এ ত সে নয়। শ্রান্তিতে অবসাদে শচীন্দ্র যেন আর দাঁড়াতে পারছে না—এখনি শ্লথ ভগ্ন ছিন্নমূল হয়ে পড়ে যাবে।

পার্ব্বতী তার এই ঝঞ্ঝাহত মূর্ত্তি দেখে স্থানকাল ভুলে ত্রস্তপদে উঠে তার দিকে এগিয়ে গেল। দুই বাহু প্রসারিত ক'রে শচীন্দ্র তার শিথিলমূল কম্পমান দেহকে পার্ব্বতীর

দেহের উপর গুস্ত ক'রে বললে, "আমাকে ক্ষমা কর পার্ব্বতী—"

পার্ব্বতী তার মুখের উপর হাত চাপা দিয়ে, নিজের উপর শান্ত দৃঢ় নির্ভরে, শচীন্দ্রের অজ্ঞাত দুঃখের গভীর করুণায়, নিরভিমান নিঃসঙ্কোচে ধীরে ধীরে নিয়ে গিয়ে তাকে আরাম-চেয়ারে শুইয়ে দিলে। তার পর একটা মোড়া এনে পাশে বসে পরিপূর্ণ স্নেহে তার পীড়িত উত্তপ্ত ললাটে তার বিপর্য্যস্ত কেশের মধ্যে নিজের কোমল শীতল সান্ত্বনায় স্নিগ্ধ অঙ্গুলি পরিবেশন করতে লাগল।

অনেক ক্ষণ এমনি নিশ্চেষ্ট নির্ব্বাক হয়ে প'ড়ে থেকে পার্ব্বতীর স্নেহহস্তের সেবায় কতকটা সুস্থ বোধ ক'রে, তার বক্তব্যের ভূমিকাস্বরূপ শচীন্দ্র ধীরে ধীরে পার্ব্বতীর হাতটা নিজের করতলের মধ্যে টেনে নিলে। সমস্ত রাস্তা সে পদব্রজে অতিক্রম ক'রে এসেছিল। তৃষ্ণায় তার কণ্ঠতল যে শুষ্ক হয়ে গিয়েছে এতক্ষণ সে কথা মনে ছিল না। পার্ব্বতীর স্নেহের ছায়ায় নিজের উৎকণ্ঠিত চিত্ত শান্ত হতেই ক্ষুধাতৃষ্ণার স্বাভাবিক তাড়না তার মধ্যে জেগে উঠল। তবু এমন অসময়ে অকস্মাৎ আবির্ভাব এবং তার পর স্থূল ক্ষুৎপিপাসার আবেদন এই দুইয়ের লজ্জায় স্মিত হাস্যে পার্ব্বতীর দিকে চেয়ে বললে, "রোদ্দুরে যে কষ্ট হচ্ছিল, পথের মধ্যে তা খেয়াল ছিল না। একটু ঠাণ্ডা জল—"

পার্ব্বতী সন্ত্রস্ত বিস্ময়ে বললে, "ওকি! আপনি এই পথ হেঁটে এসেছেন এই রোদে? ইস, করেছেন কি? আর এতক্ষণ বলেন নি? এখন একটা অসুখবিসুখ না করলেই বাঁচি। বসুন, জল আনছি। স্নান করবেন ত? না না-কিছু সঙ্কোচ করবেন না। আমি সব ঠিক ক'রে দিচ্ছি।" ব'লে সে দ্রুতপদে চলে গেল এবং অল্পক্ষণ পরেই একটা তেপায়ার উপর সাজিয়ে মেয়েদের তৈরি কিঞ্চিৎ মিষ্টান্ন এবং জল নিয়ে এল। হেসে বললে, "দেরি ত সইবে না, নইলে ষ্টোভ জেলে দুখানা লুচি ভেজে দিতে পারতাম। আর অল্প একটু অপেক্ষা করুন।" ব'লে ফিরে গিয়ে এক বালতি জল, একটা মগ, তোয়ালে, সাবান নিয়ে এসে বললে, "উঃ, কি রোদটাই না খেতে হয়েছে! নিন, একটু হাতমুখটা ধুয়ে নিন। চলুন।" ব'লে শচীন্দ্রের উদ্যত আপত্তির অপেক্ষা না রেখে, তার হাত ধরে নিয়ে কাছে একটা মোড়ার উপর বসাল। তার পর তোয়ালেটা তার গলায় জড়িয়ে দিয়ে, মাথাটা নিজের হাতে সযত্নে ধুইয়ে দিতে লাগল। শচীন্দ্রের আবেশজড়িত মৃদু আপত্তিতে কোন ফল হ'ল না। হাতপা ধোয়া শেষ হ'লে সে পার্ব্বতীর দিকে চেয়ে স্নেহমিশ্রিত পরিহাসের সুরে বললে, "নার্সের টুপি পরেই জন্মেছিলে বোধ হয়। আঃ, কি আরাম যে হ'ল। সমস্ত মাথাটায় যেন আগুন ধরিয়ে দিয়েছিল।" পার্ব্বতীর স্নেহে তার হৃদয় পূর্ণ হয়ে উঠেছিল।

গৃহ থেকে কমলাপুরীর পথে যখন সে নিষ্ক্রান্ত, তখন তার মনে সংশয়, সঙ্কোচ এবং পার্ব্বতীর প্রতি নিষ্ঠুরতার অপরাধজনিত ভয়ের অন্ত ছিল না। কিন্তু পার্ব্বতীর চিরজাগ্রত প্রীতির নিদর্শনে তার হৃদয় উদ্বেল হয়ে উঠেছিল! তার নিশ্চিন্ত নির্ভরের এই পরম রমণীয় আশ্রয়টুকু যেন সে নূতন ক'রে আবিষ্কার করলে।

তৃপ্তিদানের পরিতোষে পার্ব্বতীর আনন আনন্দে ব্রাড়ায় ও সুখাবেশে রঞ্জিত হয়েছে। পার্ব্বতীর সেই স্নেহশঙ্কা-লজ্জা-বিজড়িত মুখের দিকে চেয়ে চেয়ে শচীন্দ্র তার এত দিনের বঞ্চিত ক্ষুধাকে আর সংযত রাখতে পারলে না। হৃদয়ের অন্তস্তলে পার্ব্বতীকে আজ সে পেয়েছে অনন্য রূপে। তার হৃদয় দিতে চায় অন্তরে বাহিরে সেই পরম অনন্যতার অভিব্যক্তি। অত্যন্ত সমাদরে দুই করতলের মধ্যে পার্ব্বতীর মুখটা নিয়ে, সম্পূর্ণ দ্বিধাশূন্য সহজ প্রেমের আবেগে সে তার মুখচুম্বন ক'রে তাকে নিবিড় আলিঙ্গনে তার বুকের মধ্যে টেনে নিলে।

আজ পার্ব্বতী কিছুমাত্র আপত্তি জানাল না। তার নিজের মনে বাসনার বাধা লেশমাত্র ছিল না; তাই কোনরূপ বাধা সৃজন ক'রে, সে ঐ একান্ত সমর্পিত সহজ উৎসর্গের দানকে অপমান করলে না।

ঐ যে পুরুষটি আজ তার সমস্ত পৌরুষের অভিমান বিসর্জ্জন দিয়ে পীড়িত তাপিত চিত্ত নিয়ে একান্ত নির্ভরে একান্তরূপে তার কাছে এসেছে তার সহজ মুক্ত প্রাণের স্বাভাবিক প্রেরণায়—এই কথাটাই তার স্নেহকরুণ চিত্তকে মথিত করতে লাগল। আজ সে কমলার প্রেমে দ্বিধা-কুণ্ঠিত মন নিয়ে তার কাছে আসে নি। তার নিঃসংশয় অকুণ্ঠ আত্মবিসর্জ্জনের সেই সহজ প্রকাশের উপলব্ধি-মুহূর্ত্তে পার্ব্বতীর

অন্তর থেকে বাহিরের সমস্ত বাধাকে দূর ক'রে দিলে। যদিও পার্ব্বতী জানে না যে কি তার দুঃখ, তবু দুঃখ যে তার গভীর, অসহনীয়, এ-বিষয়ে পার্ব্বতীর সংশয়মাত্র ছিল না; এবং শচীন্দ্রকে শান্ত সুস্থ নিরাময় ক'রে তোলবার জন্যে সে নিঃসঙ্কোচে নিজেকে উৎসর্গ করলে।

শচীন্দ্রের জীবনে এই প্রথম, পার্ব্বতী তার সমাদরকে প্রত্যাখ্যান করে নি; এবং আপনার আত্মোৎসর্গের এই প্রসাদ লাভ ক'রে শচীন্দ্রের হৃদয় আনন্দরসে মধুময় হয়ে উঠেছিল।

তার মনে কৃতজ্ঞতাপূর্ণ আনন্দের সঙ্গে গুনগুন সুরে গুঞ্জন ক'রে ফিরছিল,

"তোমার বীণা যেমনি বাজে আঁধার মাঝে
অমনি ফোটে তারা।"

ভাবলে, আজ দুঃখের আঘাতে নিজেকে বিস্মৃত হয়ে পার্ব্বতীর কাছে দিতে পেরেছিলাম বলেই ওর মধ্যে এই সাড়া সহজে পেলাম: এই সাড়া যেন জাগিয়ে রাখতে পারি। আর যেন হারাতে না হয়।

আয়ত্ততার প্রলোভন ক্ষীণ আভাসে ধীরে ধীরে তার মনে জেগে উঠছে। নিজেকে ভোলার এই বিশ্লেষণের সূত্রে নিজের সম্বন্ধে আবার সে সজাগ হয়ে উঠতে লাগল।

আহারান্তে পার্ব্বতী বললে, "আপনি শ্রান্ত। চলুন, শুয়ে শুয়ে কথা বলবেন। আমি নর্ম্মদার ঘরে গিয়ে শোব'খন।"

ক্লান্তদেহ বিহ্বলচিত্ত শচীন্দ্রকে অধিক অনুরোধ করতে হ'ল না। পার্ব্বতী তাকে সযত্নে শুইয়ে দিয়ে, তার পাশে ব'সে গায়ে মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে লাগল। কোমল শুভ্র শয্যার সুশীতল স্নিগ্ধ ক্রোড়ে আরামে দেহ বিকীর্ণ ক'রে দিয়ে, উচ্ছ্বসিত প্রাণের কলধ্বনির আবেগে সে মুক্ত ক'রে দিলে অজস্র কথার স্রোতে তার হৃদয়ের গোপন উৎস। পার্ব্বতী নিঃশব্দে তার কাহিনী শুনে যেতে লাগল। এই দুই মাস যাবৎ কমলাকে ফিরে-পাওয়ার ব্যর্থ প্রয়াসের ইতিহাস থেকে সুরু ক'রে আজকের পরিতৃপ্ত কৃতজ্ঞ হৃদয়ের নিবিড় আনন্দের অনুভূতি পর্য্যন্ত কোন কথাই আজ শচীন্দ্র অপ্রকাশ্য ব'লে মনে করলে না। বলতে বলতে মনের এবং রসনার জড়তা তার দূর হ'য়ে গেল। বললে, "পার্ব্বতী, আজ আমার নিজেকে পরিপূর্ণ ক'রে পাবার দিন এল। আমি অনেক ভেবে দেখেছি, তোমাকে জীবনে না লাভ করলে জীবন আমার জ্যোতির্বিহীন হয়ে পড়বে; কমলাকে পাওয়ার পরিপূর্ণ রূপ আমার কাছে প্রকাশ পাবে না। তাতে কমলাও ব্যর্থ হবে, আমিও। তোমার মধ্যে প্রাণের বিদ্যুৎ-প্রবাহ অপর্য্যাপ্ত সৃজনী শক্তিতে বেগবান। তুমি আমাদের আত্মার এই জড়স্তূপকে জগতের প্রাণস্রোতের মধ্যে টেনে বের ক'রে আন—নূতন ক'রে গড়ে তোল কর্ম্মে, প্রাণে, কল্যাণে। কমলার অন্তরের মধুরসকে উৎসারিত ক'রে তোল; মুক্ত ক'রে দাও আমার জীবনযজ্ঞের প্রাঙ্গণে।" বলতে বলতে সে পার্ব্বতীকে নিবিড় ক'রে আকর্ষণ ক'রে নিলে নিজের কাছে।

মুহূর্ত্তকাল মধ্যে পার্ব্বতী সস্নেহ, শান্ত অথচ সুনিশ্চিত ভঙ্গীতে শচীন্দ্রের আলিঙ্গনের কবল থেকে নিজেকে মুক্ত ক'রে নিয়ে তার মাথায় হাত বুলিয়ে দিতে দিতে বললে, "বড্ড শ্রান্ত হয়েছেন, এবার ঘুমিয়ে পড়ুন, কেমন? আমি হাত বুলিয়ে দি।"

কথার সুরে স্নিগ্ধতা ব্যতীত অন্য কিছুই ছিল না, তবু একটা মৃদু ভর্ৎসনার ঢেউ যেন শচীন্দ্রের বুকে গিয়ে লাগল। সে নয়ন মুদ্রিত ক'রে পার্ব্বতীর কঠিন অচঞ্চল গাম্ভীর্য্য ও নিবিড় প্রেমপূর্ণ মধুময় সত্তাকে নিজের পাশে অনুভব করতে লাগল। ধীরে ধীরে নিদ্রায় আচ্ছন্ন হ'য়ে পড়ল সে এবং এক পরিপূর্ণ স্নিগ্ধ শান্তি ও তৃপ্তিতে প্রাণ তার পূর্ণ হ'য়ে গেল।

শেষ রাত্রে লঞ্চ ছেড়ে গেছে। শ্রান্ত, বীততাপ, পরিতৃপ্ত শচীন্দ্রনাথ তখন গভীর নিদ্রায় অচেতন। মনের সংগ্রাম তার শান্ত, চিত্ত তার নিরাময়, সমস্ত দেহ-মন-আত্মা এক নিবিড় আনন্দরসে পরিপ্লুত।

সকালে বিছানার উপর যখন সে উঠে বসল, বেলা তখন অনেক। পূর্ব্ব রজনীর সুখাবেশ তখনও তার দেহমনের উপর জড়িয়ে রয়েছে। একটি আলসমধুর স্মিতহাস্য লেগে আছে তার ওষ্ঠে স্বপ্নের মত সেই স্মৃতির কুহকে। পার্ব্বতী এখনও এসে উপস্থিত হয় নি। রাত্রিজাগরণের ক্লান্তিতে সে নিশ্চয়ই এখনও নিদ্রিত। শচীন্দ্র শয্যা পরিত্যাগ ক'রে উঠে বারান্দায় গেল। দীপ্ত প্রভাতের উজ্জ্বল কিরণে নদীর ঢেউ, দিগন্তপ্রসারিত শস্যক্ষেত্র, মেঘলেশবিহীন আকাশের অজন হাসির জোয়ারে প্লাবিত। বনতুলসীর গন্ধে মন্থর স্নিগ্ধস্পর্শ

মৃদুসমীরণে কিসের যেন ইঙ্গিত। সমস্ত চরাচর প্রসন্ন, মুগ্ধ, রোমাঞ্চিত যেন।

পুলকিত স্বপ্নাবিষ্ট নয়নে রেলিং ধরে দাঁড়িয়ে মধুক্ষরিত ধরণীর এই সৌন্দর্য্যসুধা পানে সে আবিষ্ট ছিল অনেকক্ষণ।

"কই পার্ব্বতী ত এল না এখনও! পার্ব্বতী, পার্ব্বতী, আকাশের নীলিমার মত রহস্যময়ী পার্ব্বতী।"

পার্ব্বতী যে দেহাত্মবাদিনী নন, শচীন্দ্র এখনও তা বুঝতে পারে নি।

আবার সে গেল ঘরে ফিরে। বিছানার দিকে একবার চেয়ে সে চোখ ফিরিয়ে নিলে। কেন কি জানি, আয়নায় নিজেকে দেখবার বাসনায় সে দেরাজের কাছে এসে চেয়ে দেখলে আয়নার ভিতরে। অযত্নবিন্যস্ত কেশবেশ, ক্লান্ত আবেশ নয়নে। অল্প একটু সলজ্জ হাসি ফুটে উঠল তার মুখে। সমস্ত স্থানটা জুড়ে যেন পার্ব্বতীর সত্তার একটি মৃদু সৌরভ। ছোট ছোট প্রসাধনের জিনিষ, এলোমেলো ক'রে দেরাজের উপর রাখা। চন্দনকাঠের একটা বাণবিদ্ধ রাজহাঁস, যন্ত্রণায় স্খলিত গ্রীবা নুয়ে পড়েছে। বোধ হয় কাগজ-চাপা। একটা চিঠি। একি! তারই নাম লেখা যে! পার্ব্বতীর লেখা পত্র। খুলে পড়তে পড়তে তার মুখের সেই উদ্ভাসিত তৃপ্ত প্রসন্নোজ্জ্বল কান্তি কোথায় মিলিয়ে গেল যেন। চিঠিতে লেখা—

"প্রিয়তম, এত দিন তোমাকে নিজের গভীর অন্তরে ঐ সম্বোধনে ডেকেছি। আজ শেষবার প্রকাশ্যে ডাকছি তোমায় ঐ প্রিয় নামে—তোমারই মুহূর্ত্তেকের পরিপূর্ণ আত্মদানের অধিকারে।

"এখানে অবসান হয়েছে আমার কাজের। আমার উপস্থিতিতে অকারণ জটিলতার সৃষ্টি ক'রে লাভ নেই। তোমাকে পাওয়া আজ আমার পূর্ণ হয়েছে। কমলার মধ্যে আমাকে পাওয়া তোমার আজ থেকে সুরু হোক। আমাকে তুমি অনেক দিয়েছ—তা-ই আমার প্রাণ পূর্ণ ক'রে রইল। তোমাকে যা দিতে পারি নি, আপন আত্মার ঐশ্বর্য্যে তুমি আপনারে মধ্যে তা পূর্ণ ক'রে পাও। অন্যের মধ্যে পাওয়ার অপেক্ষায় তার থেকে বঞ্চিত ক'র না নিজেকে। তুমি শান্ত হও, নিজের অন্তরে প্রতিষ্ঠিত হও, তোমার অন্তরের প্রাণ-সম্পদে দূর হয়ে যাক তোমার সকল দৈন্য, এই আমার প্রার্থনা।

"অকারণ অনুসন্ধানে সময় ও অর্থ নষ্ট ক'র না। আমাকে খুঁজে পেলেও, আমাকে ফিরে পাবে না। তুমি আমার পরিপূর্ণ প্রাণের চিরসঞ্চিত প্রেম গ্রহণ কর।

পার্ব্বতী।"

সমাপ্ত

সংশয়

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

তোমারে বেসেছি ভাল, এ কি শুধু তোমারি সম্মান?
নিত্য নব ছন্দে তব উদ্দেশেতে গাহিলাম গান,
নানা কল্পনার বর্ণে চিত্তপটে আঁকিয়াছি ছবি,
কিছু কি তাহার মোর সৃষ্টি নহে? আমিও যে কবি।
প্রস্ফুট জীবন তব, সে আমারি প্রেমের গৌরব;
তোমারে করিতে রাণী শূন্য মোর প্রাণের বৈভব!
দূর, বহুদূর হ'তে দেখিয়াছি, আজও দেখি তোমা
তখনো বলেছি আজও বলি 'তব নাহিক উপমা।'
জানি না তবুও কেন মাঝে মাঝে মনে ভয় পাই
নিকট যেদিন যাব হয়ত দেখিব তুমি নাই!

আলোচনা

"ভাষা-রহস্য"

শ্রীযতীন্দ্রকুমার পাল চৌধুরী

আষাঢ় সংখ্যা প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত বীরেশ্বর সেন মহাশয় "ভাষা-রহস্য" শীর্ষক যে প্রবন্ধ লিখিয়াছেন, তাহাতে উল্লিখিত হইয়াছে "বাঙ্গলায় নিকটবর্ত্তী স্থান বা বস্তু সম্বন্ধে এখানে, ইহা, এটা, এই প্রভৃতি শব্দ এবং দূরবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় কিন্তু শ্রীহট্টে নিকটবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে ওখানে, উহা, ওটা, ঐ এবং দূরবর্ত্তী স্থান সম্বন্ধে এটা, ইহা, এই প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয় এবং মাংসের ব্যঞ্জনকে বলে মারোব্বা।" শ্রীযুক্ত সেন মহাশয় কিরূপ অভিজ্ঞতা হইতে এই তথ্য সংগ্রহ করিয়াছেন জানি না, কিন্তু তাঁহার প্রদত্ত এই বিবরণ সম্পূর্ণ ভুল। শ্রীহট্ট বিস্তৃত জেলা এবং তাহার বিভিন্ন অংশে ভাষায় পার্থক্য আছে। আমি শ্রীহট্টেরই অধিবাসী এবং আমার কর্ম্মস্থানও শ্রীহট্টে। সৌহার্দ্য ও আত্মীয়তা সূত্রে আমি জেলার সর্ব্বত্রই গিয়া থাকি, কিন্তু কোথাও সেন মহাশয়ের বিবরণের অনুকূল ভাষা শুনি নাই। এখানে, ইহা, এটা, এই এবং ওখানে, উহা, ওটা, ঐ প্রভৃতি শব্দ "বাঙ্গলায়" ও "শ্রীহট্টে" একই অর্থে ব্যবহৃত হয় এবং মাংসের ব্যঞ্জনকে যে মারোব্বা বলে, ইহা শ্রীহট্টবাসী কোন বাতুলের প্রলাপেও শুনি নাই।

আর একটি কথায় আমরা মনে আঘাত পাই। প্রত্যেক শিক্ষিত বাঙালীই জানেন, শ্রীহট্ট বাংলা দেশেরই একটি অংশ এবং মোগল আমল হইতে ১৮৭৩ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত এই জেলা বাংলা দেশের একটি অবিচ্ছিন্ন অংশ ছিল। ইংরেজরা রাজনৈতিক প্রয়োজনে, একটি কৃত্রিম সীমারেখা দ্বারা আমাদিগকে আসামের সঙ্গে জুড়িয়া দিয়াছে, কিন্তু কি ভাষায়, কি সংস্কৃতিতে, কি আত্মীয়তাসূত্রে, শ্রীহট্টের লোক বাংলার সঙ্গে অভিন্ন। বস্তুতঃ আসামপ্রদেশবাসী প্রকৃত অসমীয়ারা "বঙাল" অর্থাৎ বাঙালী বলিয়া শ্রীহট্টবাসীকে ঈর্ষা করে এবং প্রাদেশিকতাবাদী অসমীয়া নেতাদের "বঙাল-খেদা" আন্দোলন সংবাদপত্র-পাঠকদের অবিদিত নয়। কংগ্রেসী প্রদেশ-বিভাগে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলা বঙ্গীয় প্রাদেশিক রাষ্ট্রীয় সমিতির অন্তর্ভুক্ত।

অ-বাঙালী বা বাঙালীদের ভিতরও এই সব খবর যাঁহাদের জানা নাই, সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ পাঠে তাঁহাদের ধারণা হইতে পারে যে "বিহারের শাহাবাদ জেলার" লোকের ন্যায় শ্রীহট্টের লোকও বুঝি অ-বাঙালী—মানে আসামী। শ্রীহট্ট সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিতে হইলে, তাঁহার লেখা উচিত ছিল "বাঙ্গালার পশ্চিমাংশে বা উত্তরাংশে বা দক্ষিণাংশে এইরূপ ভাষা এবং পূর্ব্বপ্রান্তবর্ত্তী শ্রীহট্ট জেলায় অন্যরূপ ভাষা প্রচলিত," ইত্যাদি

সুতরাং তথ্য এবং বর্ণনা উভয় দিক দিয়াই সেন মহাশয় শ্রীহট্টের উপর অবিচার করিয়াছেন। তাঁহার ন্যায় জ্ঞানী লোক ভবিষ্যতে এই ভ্রম সংশোধন করিলে সুখী হইব।

"ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন"

শ্রীসুবিমল দাস

গত আষাঢ় মাসের 'বিবিধ প্রসঙ্গে' ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন সম্বন্ধে সম্পাদকীয় মন্তব্যে লিখিত হইয়াছিল, "কলিকাতায় অধিবেশন করিলে যে-সব সদস্যকে পাথেয় ও ভাতা দিতে হয় না, ঢাকায় অধিবেশন করিলে তাঁহাদিগকে পাথেয় ও ভাতা দিতে হইবে।" ইহার উত্তরে এই বলিতে পারি যে, ঢাকা-শহরে ও সন্নিহিত অঞ্চলে নির্ব্বাচন-কেন্দ্র অনেক আছে; এবং সে-সব কেন্দ্র হইতে যাঁহারা এম. এল. এ. হইয়াছেন, সংখ্যার দিক্ হইতে তাঁহারা নগণ্য নহেন। ঢাকায় ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন হইলে ইঁহাদের পাথেয় ও ভাতা বাঁচিয়া যাইবে। আরও, কলিকাতায় অধিবেশন করিলে কলিকাতার কেন্দ্রগুলি হইতে নির্ব্বাচিত হন নাই, এই প্রকারের সদস্যরা যেমন বিনা-টিকেটে কলিকাতায় আসা-যাওয়া করিবেন না, তেমন তাঁহাদিগকে ঢাকায় পাঠাইবার জন্য অর্থব্যয় করিলে আপত্তির কোন কারণ থাকিতে পারে না।

[ইহা ঠিক্। কলিকাতা বা ঢাকা, কোথায় অধিবেশন করিলে, খরচ কত কম বা বেশী হইবে, তাহাও কিন্তু বিবেচ্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

দ্বিতীয় প্রশ্ন, "কয়েক শত সদস্য ঢাকায় গিয়া থাকিবেন কোথা?" সত্যি কথা, কলিকাতার প্রসিদ্ধ হোটেলগুলির ন্যায় আহার- ও আশ্রয়-স্থান ঢাকা-শহরে নাই। কিন্তু ইহাও সত্য যে, এখানে ঢাকা হল, জগন্নাথ হল ও সলিমুল্লা মুসলিম হল নামক বিশ্ববিদ্যালয়ের যে তিনটি হল আছে, আহার-আশ্রয় দানে ইহাদের উৎকর্ষ সন্দেহাতীত। আশা করি, স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষ এই তিনটি 'হলে' সদস্যদিগের স্নানাহারের বন্দোবস্ত করিবেন।

[হলগুলিতে যত ছাত্র থাকেন, তাহার উপর আরও কতকগুলি লোকের জায়গা তথায় হইবে কি না, এবং হইলেও বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও গবর্ণ্মেণ্ট ছাত্রদের সহিত রাজনীতি-বিশারদদের একত্র বাস ও ঘনিষ্ঠতা অনুমোদন করিবেন কি না, বিবেচ্য।—প্রবাসীর সম্পাদক।]

তৃতীয় প্রশ্ন, "ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন করিবার মত বড় হল ও সংলগ্ন আপিস-কক্ষাদি কোথায়।" উত্তরে বলিতে চাই, নিম্ন-পরিষদের অধিবেশন কার্জ্জন হলে অনুষ্ঠিত হইতে পারে। উচ্চ-পরিষদের অধিবেশন ঢাকা ইণ্টারমীডিয়েট কলেজের অ্যাসেম্ব্লি হলে হইতে পারে। আজ পর্য্যন্ত, এই হলে প্রতি বৎসর গবর্ণরের ঢাকা-বাসের সময়ে 'বল্'-নৃত্য

অনুষ্ঠিত হয়। এইরূপ একটি হলে উচ্চ-পরিষদের অধিবেশন করিলে কিছুই ক্ষতি হইবে না, এবং যদি এই হলটিতে অধিবেশন করা সম্ভব হয়, তাহা হইলে কলেজটির বামপার্শ্বস্থ গৃহে যেমন ঢাকা বোর্ড অব ইণ্টারমীডিয়েট এণ্ড সেকেণ্ডারি এডুকেশ্যনের আপিস বসান হইয়াছে, তেমন দক্ষিণপার্শ্বস্থ গৃহে পরিষদের আপিস বসান যাইতে পারে।

[আমরা ঢাকায় অধিবেশনে আপত্তি করি নাই, বরং উহা সম্ভব হইলে সন্তুষ্টই হইব। ছুটির সময় ভিন্ন অন্য সময়ে ব্যবস্থাপক সভার অধিবেশন এই দুই প্রাসাদে বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্ত্তৃপক্ষ ও গবর্মেণ্ট হইতে দিবেন কি? ছুটির সময় অধিবেশন চলিতে পারে তাহা তাহা আমরা লিখিয়াছিলাম।—প্রঃ সঃ।]

চতুর্থতঃ যেহেতু ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে রাষ্ট্রবিজ্ঞান একটি অবশ্য শিক্ষণীয় বিষয়, সুতরাং ঢাকা-শহরে ব্যবস্থা-পরিষদের অধিবেশন প্রত্যক্ষপূর্ব্বক, ব্যবহারিক রাজনীতি সম্বন্ধে প্রত্যক্ষ জ্ঞান লাভ করিয়া ছাত্রগণ এমন কি অধ্যাপকেরাও উপকৃত হইতে পারেন।

[তাহা পারেন; কিন্তু গবর্মেণ্ট পারিতে দিবেন কি —প্রঃ সঃ।]

সিদ্ধকাম

ব্রাউনিঙের 'দি পোপ এণ্ড দি নেট' হইতে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনিঙ-রসিক পণ্ডিতদের অধিকাংশের মতে পোপ পঞ্চম সিক্‌স্টাস্ (Pope Sixtus V)এর জীবনচরিত অবলম্বন ক'রে এই কবিতাটি লিখিত। তবে ঐতিহাসিক সিক্‌স্টাস্ ছিলেন রাখাল-বালক, ব্রাউনিঙের পোপ জেলের পো। বিনয়ের ভেকস্বরূপ মাছধরা-জালটি পদোন্নতির শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়েছিল। পোপ বা মোহন্তের পদোন্নতির শেষ পর্য্যায় পর্য্যন্ত রক্ষিত হয়েছিল। পোপ বা মোহন্তের পদপ্রাপ্তির পরে পূর্ব্বাবস্থার স্মারকচিহ্নটি ধারণ করবার প্রয়োজন আর রইল না, শিকার সংগ্রহের পরে ব্যাধ যেমন ফাঁদটা গুটিয়ে নেয়, এই সহজ কথাটি উপসংহারে কবি পোপের জবানীতে বলেছেন।

কি বলিছ? মোরা সকলে মিলিয়া মোহন্ত মহারাজ
করিনু যাহারে, একদিন তার ছিল ধীবরের সাজ?
মাছ-ধরা তার পৈত্রিক পেশা, ছিল না অন্য কাজ?

পুঁথি ঘেঁটে ঘেঁটে সে জেলের পো সাধুবাবা হ'ল শেষে,
মঠের পাণ্ডা পূজারী হয়ে সে সবার মাথায় এসে
গাড়িল আসন, মোরা গড় করি শ্রীচরণ-উদ্দেশে।

কেহ হাসে কেহ দেয় টিট্‌কারি, মারে কনুই-এর ঠেলা
এ উহার গায়ে। বামুন বনেছে মৎসজীবীর-চেলা,
নাহিক লজ্জা, মাছ ধরিবার জালখানি তবু মেলা।

নাহি সঙ্কোচ নাহি কোনো ভয় বিনয়ে নম্র অতি,
জেলেডিঙি হতে পৌরোহিত্যে এ কি লীলাময় গতি!
পূর্ব্বদশার স্মরণচিহ্ন ধরিছেন তবু যতি।

বিপুল প্রাসাদে দেয়ালে-টাঙানো দেবতার ছবি সনে
মাছ-ধরা জাল রয়েছে ঝুলানো; ব্যাঘ্রচর্ম্মাসনে
বসিয়া গুরুজী দেখেন চাহিয়া, দেখে আর সব জনে।

যাহারা মিলিয়া করিল তাঁহারে মোহন্ত মহারাজ,
খড়মের ধূলা লভিবার আশে এল প্রাসাদের মাঝ,
বিস্ময়ভরে দেখে জালখানি দেয়ালে নাহিক আজ!

হাঁ-করিয়া যবে চেয়ে রয় সবে হতভম্বের দল,
"জালখানি কোথা?" সাহস করিয়া শুধানু আমি কেবল।
গুরু কন, "বাবা, ধরিয়াছি মাছ, জালে এবে কিবা ফল?"

এক যে ছিল নারী, ও নগরী

শ্রীরজত সেন

ক্ষণের খোলা জানলা দিয়ে ঘরে এসে পড়ল সূর্য্যের ালো আর এক ঝলক ভোরের বাতাস। কল্যাণকুমারের ন্দ্রাভঙ্গ হ'ল। রাত্রির ঘুম-সমুদ্র অতিক্রম ক'রে জাগরণের ারে অবতরণ করবার তার সময় হ'ল। পাশে শ্বেত-াথরের টেবিল থেকে আয়না তুলে নিয়ে সে মুখ দেখল। মস্ত রাত্রি কার কাছে ছিল সে? জাগরিত ইন্দ্রিয় াকে সেই রাজকন্যার সঙ্গ থেকে বঞ্চিত করেছে।

দরজায় কে টোকা মারছে। শয্যায় ব'সে সে ডাকল, সে।'

ঘরে যে প্রবেশ করল সে-ই হ'তে পারত কল্যাণ-মারের রাজকুমারী। কল্যাণকুমার এক বর্ষার অপরাহ্নে মঘদূত প'ড়ে শুনিয়েছিল কাকে?

'এসো বৌদি। তুমিই আমার প্রথম চিন্তা!'

'তুমি যে মিথ্যা কথায় অভ্যস্ত এ-কথা আমার জানা াছে।'

'কি সংবাদ? হাতে পত্রিকা কেন?'

'সংবাদ আছে।' তরুণীর হাসিতে কত যুগান্তরের প্ন! 'দেখ, আমি তোমার মেঘদূত!'

নির্দ্দিষ্ট স্থানে চোখ রেখে কল্যাণকুমার মুখের ওপর ত্রিকা তুলে ধরলো। শেষ স্তম্ভের গোড়ার দিকে এক ও ক্ষুদ্র বার্ত্তা প্রকাশিত হয়েছে: মাননীয় বিচারপতি স্যর্ ক. সি. গাঙ্গুলীর সুন্দরী এবং বিদুষী কন্যা কুমারী অশোকা াঙ্গুলী নগর-জীবনে ক্লান্ত হয়ে নির্জ্জন পল্লীগ্রামের ছায়াশীতল াবেষ্টনে দিন কাটাবেন ব'লে কলকাতা ত্যাগ করছেন। সংখ্য নিমন্ত্রণ, উৎসব, প্রমোদ-পার্টি ইত্যাদিতে তিনি িষ্ঠ হয়ে উঠেছেন, অতএব ইত্যাদি ইত্যাদি!

সংবাদ পাঠ শেষ ক'রে কল্যাণকুমার লাফিয়ে উঠে দলে, 'বৌদি ধন্যবাদ তোমাকে! আমারও ক'দিন ধ'রে -কথাই মনে হচ্ছিল।'

'কি?'

'শহর আর ভাল লাগছে না!'

'অতএব?'

'যাচ্ছি গ্রামে, তার সঙ্গে!'

তরুণ অধ্যাপক আদিত্যনাথের প্ল্যাটিনাম ফ্রেমের চশমায় কোথা থেকে এক ঝলক ধুলো এসে লাগল। পকেট থেকে সিল্কের রুমাল বার ক'রে তিনি চশমা পরিষ্কার করতে লাগলেন। টেবিলের ওপর নানা আকারের রাশীকৃত পুস্তকের পাতা খোলা। কোন বইয়ে দাগ দিচ্ছেন, কোনটা থেকে নোট লিখছেন। সমস্ত সকালটা তিনি এই কাজ ক'রে আপাততঃ ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। সময়ের অভাবে পত্রিকাখানা এখনও অপঠিত। দু-হাতে বই ঠেলে রেখে তিনি পত্রিকাখানা টেনে নিলেন। এক স্থানে জষ্টিস্ কে. সি. গাঙ্গুলীর সুন্দরী কন্যার সম্বন্ধে সংবাদটা তাঁর চোখে পড়ল। গত শনিবারেও অশোকা গাঙ্গুলীর জন্মতিথি উপলক্ষে জষ্টিস্ গাঙ্গুলীর সুরম্য অট্টালিকাতে তাঁর নিমন্ত্রণ ছিল। বিচারপতি মশায় আদিত্যনাথকে যে শুধু স্নেহ করেন তা নয়, সে যে এক জন পণ্ডিত ব্যক্তি এবং তার সুচিন্তিত প্রবন্ধগুলো যে বিলিতি কাগজওয়ালারা রীতিমত পয়সা দিয়ে তাদের কাগজে ছাপে এ-বার্ত্তাও জষ্টিস্ গাঙ্গুলীর অবিদিত নেই।

কাগজটা এক পাশে রেখে আদিত্যনাথ মনে মনে ব'লে উঠল, 'নাঃ, আর পারা যায় না, শহরের এই একঘেয়ে জীবনে ক্লান্তি এসে গেছে! নগরের এ কোলাহলের অনেক দূরে কত মহৎ জিনিষের প্রেরণা পেতে পারি!' আদিত্যনাথ হঠাৎ শিস্ দিয়ে উঠল।

সেক্রেটারিয়েট টেবিলে ভবেশচন্দ্র হঠাৎ একটা প্রচণ্ড কিল মেরে ডাকল, 'বেয়ারা!'

পাশের ঘরে দু-জন কেরাণী, এক জন টাইপিষ্ট সবাই

একসঙ্গে চমকে উঠল; বেয়ারা এল ছুটে। সাহেবের এ-রকম ডাকবার কায়দায় বেচারা অভ্যস্ত ছিল না। টুং-টাং ক'রে কলিং-বেল বেজে উঠত আর সেও দু-চার মিনিট পরে গিয়ে উপস্থিত হ'ত; কিন্তু আজ এ একেবারে অপ্রত্যাশিত। চাকরি আর রইল না বোধ হয়।

'হুজুর!'

'পাঙ্খা আউর জোরসে।' ভবেশচন্দ্র আঙুল দিয়ে মাথার ওপরে চলন্ত পাখাটা দেখিয়ে দিলে। বেয়ারা রেগুলেটর শেষ পর্য্যন্ত ঘুরিয়ে দিলে।

'আঃ', ভবেশচন্দ্র গলার নেকটাইটা ঈষৎ আলগা ক'রে দিয়ে বললে, 'ভাল লাগে না ছাই, দিনরাত খালি কাজ! শুধু টাকা আর টাকা! আশ্চর্য্য! কি ক'রে মানুষ এত টাকা দিয়ে—?

সেন এণ্ড লাহিড়ী কোম্পানীর সিনিয়র পাটনার মিঃ ভবেশচন্দ্র সেন হাতের এক ঝটকায় টেবিলের সমস্ত কাগজপত্র মাটিতে ফেলে দিয়ে উঠে দাঁড়াল। দেখা যাক্ আজকের সংবাদপত্রে কি আছে। পাশেই আরাম-কেদারায় চিৎ হ'য়ে শুয়ে ভবেশচন্দ্র পত্রিকা খুলে পড়তে লাগল, তৃতীয় পৃষ্ঠায় এক জায়গায় দেখল জষ্টিস্ সর্ কে. সি. গাঙ্গুলীর কন্যা কুমারী অশোকা গাঙ্গুলী কলকাতা ছেড়ে পল্লীগ্রামে চলে যাচ্ছে। ভবেশচন্দ্র পত্রিকাখানা ফেলে দিলে ছুঁড়ে। উঠে দাঁড়াল চেয়ার ছেড়ে। ট্রাউজারের পকেট থেকে সোনার সিগারেট-কেস্ বার ক'রে আপন মনে ভাবলে, কি হ'বে আর টাকা রোজগার ক'রে, কে আছে তার? কার জন্যে সে অসুরের মত দিনরাত পরিশ্রম ক'রে মরছে? আর শহরের এই ধুলো, ধোঁয়া আর মোটরের হর্ণ! তার মোটরখানা কালই বেচে দেবে সে! পাড়াগাঁর মেঠো রাস্তা দিয়ে গরুর গাড়ী চ'ড়ে যাওয়ার মধ্যে অনেক মাধুর্য্য, অনেক সত্যিকারের থ্রিল! পায়ের কাছে কাগজের ঝুড়িতে একটা লাথি মেরে ভবেশচন্দ্র বাইরে বেরিয়ে এল।

পরদিনের কাহিনী।

উত্তর কলকাতার কোন এক রাস্তা থেকে কল্যাণকুমারের টু-সীটারখানা বড় রাস্তায় এসে পড়ল। সকাল আটটা হ'বে। পথে গাড়ীঘোড়ার বাহুল্য নেই। উড়ে চলল কল্যাণকুমারের গাড়ী; মন তার উড়ে গেছে আরও আগে। চাদরের প্রান্ত তার উড়ছে চঞ্চল বাতাসে।

জষ্টিস্ কে. সে. গাঙ্গুলীর বাগানের পুষ্পরাশি আহরিত হচ্ছে; প্রাঙ্গণ ত্যাগ ক'রে তারা যাবে প্রাচীর-অভ্যন্তরে।

'ঐ বড় গোলাপটা আমায় দাও।' গাড়ী থামিয়ে কল্যাণকুমার মালীকে বললে।

সুদর্শন এবং সুবেশ তরুণের আদেশ পালন ক'রে বাগান-পরিচারক কৃতার্থ হ'ল।

কল্যাণকুমার প্রাসাদোপম অট্টালিকার সিঁড়ি অতিক্রম ক'রে উপরে উঠে এল্। অশোকার সন্ধান পেতে তার দেরি হ'ল না। পরিষ্কার এক মেয়ে, পরিচ্ছন্ন—পালিশ-করা নিখুঁত জীবন্ত এক পুতুল। প্রথম দৃষ্টিতে স্তম্ভিত এবং বিলম্বে বিস্মিত হবার কথা। ওর দেহকে কমনীয় এবং রমণীয় ক'রে তোলবার জন্যে যে পরিচ্ছদ এবং আভরণ তার উপযোগী, কেবলমাত্র সে-উপকরণ দ্বারাই অশোকা উন্মেষ করেছে নিজেকে! অভাব নেই, বাহুল্যও নেই।

ওদের সাক্ষাৎ হ'ল। 'আমি যেন কি ভাবছিলাম, তুমি আসবার আগে বুঝতে পারি নি।' অশোকা বল্লে, 'এমন সময়ে তুমি ত আস না কখনও।'

'ভাবছিলে তুমি,' কল্যাণকুমার বললে, 'একা একা পাড়াগাঁ গিয়ে দিন কাটাবে কি ক'রে! আমি এমন সময়ে কখনও আসি নি বটে, কিন্তু ভাবলাম এ সময়েই তোমাকে একটু নিরিবিলি পাওয়া যাবে। আপাততঃ ফুলটা নাও, তোমারই জন্যে!'

অশোকা হাত বাড়িয়ে ফুলটা গ্রহণ করল, এক মুহূর্ত্ত তুলে ধরল নাকের কাছে; তার পর অন্যমনস্কের মত ঠোঁট দিয়ে মৃদু স্পর্শ করল।

'তোমার সঙ্গে আরও কথা আছে!' কল্যাণকুমার বললে।

'বল না!' অশোকা ঈষৎ গ্রীবাভঙ্গী করল।

'তোমার সম্বন্ধে সংবাদটা কাগজে দেখেছি; আমিও হঠাৎ আবিষ্কার ক'রে ফেলেছি যে আমারও মনটা শান্তি চায়, আর চায় নির্জ্জনতা! আমাকে তোমার সঙ্গে নাও অশোকা!' কয়েক মুহূর্ত্তের ছেদ। 'আমার মন তোমার

অজানা নেই, আমাকে ধন্য হবার একটা সুযোগ দাও, পৃথিবীর এক অজ্ঞাত কোণে চল আমরা পালিয়ে যাই !'

কয়েক মিনিটের ছেদ।

'পরশু ঠিক এমনি সময়ে এস,' অশোকা বললে, 'মাঝখানে একটা দিন আমাকে ভাবতে দাও।'

ওদের মধ্যে তাই স্থির হ'ল।

কয়েক মিনিট পরে দেখা গেল কল্যাণকুমারের টু-সীটার ফিরে যাচ্ছে ; মাঝখানে একটা মাত্র দিন !

•

তরুণ অধ্যাপক আদিত্যনাথকে দেখা গেল নির্জ্জন দ্বিপ্রহরে জষ্টিস্ কে. সি. গাঙ্গুলীর বাড়ীতে প্রবেশ করছে। সিল্কের চাদর তার মাটিতে লুটচ্ছে !

দ্বিতলের একটি কক্ষের রুদ্ধ দরজায় আদিত্যনাথ মৃদু করাঘাত করল ; কোন শব্দ নেই। তিনতলা থেকে গ্রামোফোনে গানের শব্দ শোনা যাচ্ছে। এক জন ভৃত্য বারান্দা অতিক্রম করছিল। বহু উৎসব এবং উল্লাস উপলক্ষে এ-বাড়ীতে আদিত্যনাথের উপস্থিতি সে লক্ষ্য করেছে।

আদিত্যনাথ বন্ধ দরজায় পুনরায় করাঘাত করল। ভেতরে অস্পষ্ট শব্দ শোনা গেল, দরজা খুলল। আদিত্য-নাথকে দেখে অশোকার মুখে উদ্ভাসিত হ'য়ে উঠল এক টুকরো হাসি। পিঠের ওপর দিয়ে রঙীন শাড়ীখানা মেঝেতে লুটচ্ছে ; চোখে তার তখনও ঘুমের আবেশ। 'এস না ভেতরে।' অশোকা আদিত্যনাথকে আহ্বান করল।

আদিত্যনাথের চশমার কাচে সূর্য্যের আলো চিক্ চিক্ ক'রে উঠল। অশোকার শয়নকক্ষ ; ওর পড়াশুনো এবং অলস সময় ক্ষেপণ করবার ঘর স্বতন্ত্র। এ-ঘরে অতিথির কোন আসন নেই। 'ব'স না বিছানায়' অশোকা বললে, 'এমন অসময়ে ?'

'কিছু মনে কর নি ত ?' সঙ্কুচিত কণ্ঠে আদিত্যনাথ বললে, 'এমন সময়ে এসেছি ?'

'এসে যখন পড়েছ তখন আর উপায় নেই,' শিথিল হাস্যে অশোকা বললে। গৌর অঙ্গ তার লুটিয়ে পড়ল শয্যায়।

'দেখলাম, নাগরিক জীবনে তোমার ক্লান্তি এসেছে,' আদিত্যনাথ আর সময়ের অপব্যবহার না-ক'রে বললে, 'অবিশ্রাম আনন্দের হৈ চৈ আর তোমার ভাল লাগছে না।' আদিত্যনাথের শান্ত নম্র কথাগুলো হাওয়ায় কাঁপতে লাগল যেন।

'বাস্তবিক আর ভাল লাগে না,' নিস্তেজ কণ্ঠে অশোকা বললে, 'দিনরাত পার্টি, পিকনিক্, ট্রিপ, ডান্স, কি বিশ্রী এখানকার জীবন। এখান থেকে পালাতে পারলে বাঁচতাম।'

'চল না আমাদের দেশে !' আদিত্যনাথ হঠাৎ খুশীর সুরে বললে, 'যাবে ? নদীর ধারে গাছপালার ছায়ায় আমাদের বাড়ী, ধোঁয়া, ধুলো নেই, মোটরের শব্দ নেই, গ্রামোফোন নেই ! শুধু নদীর ছলছল শব্দ ; প্রকাণ্ড গাছগুলোর সোঁ সোঁ গর্জ্জন। চল যাই সেখানে আমার ঘরের লক্ষ্মী হবে। শহরের এই তামাটে রং, এর পৈশাচিক উল্লাসের কবল থেকে চল আমি তোমাকে নিয়ে যাই। আমারও ত অভাব নেই কিছু ; অধ্যাপনা থেকে বিশ্রাম নেওয়া যাক ; তোমাকে কাছে পেলে পৃথিবী অনেক মহৎ জিনিষ আমার কাছে পেতে পারে হয়ত ! চল আমরা যাই।'

কয়েক মিনিটের ছেদ। দ্বিপ্রহরে নির্জ্জন এই ঘরের মধ্যে আদিত্যনাথের কথাগুলো শব্দ-সমুদ্র অতিক্রম করেছে বটে, কিন্তু এখনও তারা ভেসে বেড়াচ্ছে বাতাসে।

অশোকা উঠে বসল। বললে, 'বুঝেছি তোমার কথা, আমি জানি, পল্লীগ্রামের নিঃসঙ্গতায় তুমি আমাকে জাগিয়ে রাখবে, কিন্তু আজ আমাকে দিয়ে কিছু স্বীকার করিয়ে নিও না। একটা দিন আমায় ভাববার সময় দাও ; পরশু এস এমনি সময়ে, বলব তোমাকে। এস নিশ্চয়।' কবরী তার আলুলায়িত হ'ল।

সন্ধ্যা অতিক্রান্ত। জষ্টিস কে. সি. গাঙ্গুলীর প্রাসাদোপম অট্টালিকার সামনে প্রকাণ্ড একখানা লাল-রঙের গাড়ী অপেক্ষা করছিল। হুইলের ওপর হাত রেখে গাড়ীর মধ্যে উপবিষ্ট এক তরুণ। ফুটবোর্ডে পা রেখে কুমারী অশোকা তার সঙ্গে কথা বলছিল ; মৃদু অস্পষ্ট আলাপ, অশোকা মাঝে মাঝে রূপালী কণ্ঠে হেসে উঠছিল ; কলকাতার নির্জ্জন এক রাস্তা। মাঝে মাঝে দু-একখানা মোটর অতিক্রম করছিল।

দূর থেকে একটা গাড়ী আর্ত্তনাদ করতে করতে এগিয়ে এল, সেদিকে মনোযোগ ছিল না এ দুটি তরুণ তরুণীর। হঠাৎ পশ্চাৎ থেকে মোটরখানা এ-গাড়ীখানাকে প্রচণ্ড এক ধাক্কা মারল। পা হড়কে গিয়ে অশোকা পড়ল মাটিতে কাৎ হয়ে! গাড়ীর মধ্যে উপবিষ্ট যুবক কোন রকমে একটা সাঙ্ঘাতিক আঘাত থেকে সামলে নিলে নিজেকে। মুখের পাইপটা তার ছিটকে পড়েছিল ট্রাউজারে, তামাকের অগ্নি-সংস্পর্শে ট্রাউজার চক্ষের নিমেষে কালো হয়ে গেল। গায়ের চামড়াটা কোন রকমে বাঁচিয়ে নেমে পড়ল গাড়ী থেকে।

পশ্চাতের মোটর থেকেও যে যুবকটির অবতরণ ঘটল সে আমাদেরই ভবেশচন্দ্র। তার প্রকাণ্ড হাডসন্ গাড়ীর হেডলাইট দুটো তখনও জ্বলছিল। সেই তীব্র আলোকে অশোকাকে চিনতে তার এক মুহূর্ত্তও লাগল না। সে ছুটে গেল অশোকার সাহায্যে। অশোকা তখন উঠে দাঁড়িয়েছে।

'গাড়ীটা কি চুরি ক'রে এনেছেন?' পূর্ব্ব-কথিত যুবক ভবেশচন্দ্রকে ক্ষিপ্ত কণ্ঠে বললে।

'আজ্ঞে না', ভবেশচন্দ্র উত্তর দিলে, 'লাইসেন্সটা সঙ্গে রয়েছে, দেখবেন?'

'রিক্সা টানা খুব সোজা, ঝঞ্ঝাট নেই কোন!' অপরিচিত তেমনি উত্তপ্ত কণ্ঠে বললে।

'কিছু না-টানা আরও সোজা!' ভবেশচন্দ্র উত্তর দিলে তার সার্টের কলারটা উল্টে দিয়ে!'

'আপনাকে আমি পুলিসে দেব, জানেন?'

ভবেশচন্দ্র তার পকেট থেকে ভিজিটিং কার্ড একখানা এগিয়ে দিয়ে বললে, 'এই নিন, এতে নাম-ঠিকানা পাবেন।' তার পর অশোকার দিকে তাকিয়ে, 'তুমি যদি শরীরে আঘাত পেয়ে থাক ত তার জন্যে আমায় দোষ দিও না, কিন্তু চল আপাততঃ, তোমার সঙ্গে কথা আছে আমার, এস।' অশোকার হাত ধ'রে ঈষৎ আকর্ষণ ক'রে, 'ওঠ গাড়ীতে।' অশোকা উঠে পড়ল; সঙ্গে সঙ্গে ভবেশচন্দ্রও। গাড়ী ব্যাক করতে করতে অপর যুবকের উদ্দেশে সে বললে, আচ্ছা নমস্কার! কাল ত আবার পুলিস কোর্টে দেখা হচ্ছে!' ভবেশচন্দ্রের গাড়ীখানা একটা পাক খেয়ে হুস্ ক'রে ছুটে চলল।

যান-বহুল রাস্তা দিয়ে ভবেশচন্দ্রের মোটর ঊর্দ্ধশ্বাসে ছুটেছে; রাত্রির অন্ধকার এসেছে ঘন হয়ে। ডান হাতটা হুইলের ওপর রেখে বাঁ-হাতে অশোকার একখানা হাত তুলে নিয়ে ভবেশচন্দ্র বললে, 'শোন দুষ্টু মেয়ে, তোমার কোন কথা আমি শুনছি নে, আজ আমায় কথা দিতেই হবে, না-হ'লে এই যে ছুটলাম তোমায় নিয়ে আর ফিরে আসব না! বল।'

'কি?' অশোকা তার দিকে তাকিয়ে জিজ্ঞেস করলে।

'আমাকে বিয়ে কর, মানে এস আমরা বিয়ে করি।'

'আর একটু আস্তে চালাও না,' অশোকা আরও কাছে স'রে এসে বললে, যা স্পীডে ছুটেছ বিয়ে পর্য্যন্ত প্রাণে বাঁচব ব'লে মনে হচ্ছে না।'

'শোন, ঠাট্টা নয়!' ভবেশচন্দ্র গম্ভীর কণ্ঠে বললে, 'আজ আর আমার কথা এড়িয়ে যেতে দিচ্ছি নে তোমায়, আমাকে বিয়ে করতে তোমার আপত্তি কি? আমি তোমার চাইতে কম বড়লোক নয়; সম্রান্ত ঘরের ছেলে, বিশ্ববিদ্যালয়ের সর্ব্বোচ্চ পরীক্ষায় সর্ব্বপ্রথম, চেহারা আমার খারাপ নয়; তোমাকে বিয়ে করবার যোগ্যতা আমার কিসে কম সে-কথা তুমি আমায় বল। চিরকুমারী থাকবে এমন কঠিন ব্রত যখন তোমার নেই বা কাউকে মন দান যখন কর নি, তখন কেন আমায় বিয়ে করবে না?'

কোন উত্তর নেই।

গাড়ী ছুটে চলেছে ঝোড়ো হাওয়ার মত নগরের প্রান্ত অতিক্রম ক'রে। ছুটে চলেছে রাত্রির অন্ধকার আর আকাশের অগণিত তারকা। আর ক্ষীণতর হয়ে আসছে দূরের কোলাহল।

'উত্তর দাও।' ভবেশচন্দ্রের ব্যাকুল কণ্ঠে প্রতিধ্বনিত হ'ল, 'চুপ ক'রে থেক না অশোকা। নগরের নিত্য প্রয়োজনে তোমার আত্মমর্য্যাদা ক্ষুণ্ণ হচ্ছে প্রতিদিন; চল আমরা যাই, শান্ত নির্জ্জন এক গ্রামের মধ্যে গিয়ে অনুভব করি যে আমরা বাস্তবিক বেঁচে আছি। বল, কথা বল অশোকা, অমন চুপ ক'রে থেক না, প্রস্তরমূর্ত্তির সঙ্গে তোমার পার্থক্য আছে।'

আবার কয়েক মিনিটের বিরতি।

'শুধু কালকের দিনটা আমায় ভাবতে দাও,' অশোকা

বললে, 'পরশু রাত্রে তুমি এস আমার কাছে; কিন্তু আজ চল, ফেরা যাক্, রাত হ'ল অনেক।'

পরদিন কল্যাণকুমারের সকাল, আদিত্যনাথের অপরাহ্ন এবং ভবেশচন্দ্রের সন্ধ্যা অতিবাহিত হ'ল। কোন একটা দিনের আগমন-প্রতীক্ষায় এরা পূর্ব্বে কেউ প্রহর গণনা করেছে কি না কে জানে।

দিন অতিবাহিত হয়ে গেল।

পরদিন তিনখানা মোটর পর পর জষ্টিস্ কে. সি. গাঙ্গুলীর প্রকাণ্ড বাড়ীর গেটের সামনে দাঁড়াল, অসময়ে। ভবেশচন্দ্র এবং আদিত্যনাথের নির্দ্দিষ্ট সময়ে নয়; কিন্তু কল্যাণকুমারের খানিকটা সম্ভাবনা তবু ছিল। তখন সবেমাত্র ভোর হয়েছে।

মোটর থেকে নেমে তিন জনেই প্রায় একই সময়ে খোলা গেট দিয়ে বাড়ীর বহিঃপ্রাঙ্গণে প্রবেশ করল। প্রৌঢ় জজসাহেব সংলগ্ন উদ্যানে প্রভাতের মুক্ত বায়ু সেবন করছিলেন। এমনি সময়ে তিন জন যুবককে একসঙ্গে বাড়ীতে ঢুকতে দেখে তিনি বিস্মিত হলেন, এগিয়ে এলেন নিকটে; স্মিতহাস্যে বললেন, 'এস, এস, মনে হচ্ছে কত দিন তোমরা আস নি, কিন্তু একটু আশ্চর্য্য হচ্ছি তোমাদের তিন জনকে একসঙ্গে ত আমাদের বাড়ীতে কোনদিন দেখি নি।' জজসাহেব নাকের কাছে সদ্য-আহরিত গোলাপফুলটা তুলে ধরলেন। কল্যাণকুমার তার ঘড়িতে দেখল সাড়ে-ছ'টা। প্রোফেসার আদিত্যনাথ চশমাটা একবার চাদরের প্রান্তে মুছে নিয়ে দোতলার খোলা জানলার দিকে তাকালেন। ভবেশচন্দ্র নিজের এবং অন্য দুই সহগামীর শুভ ইচ্ছার্থে জজসাহেবকে বললেন,'হ্যাঁ, দেখুন, কিছু মনে করবেন না, আমরা বড্ড অসময়ে—'

জজসাহেব যেন উৎসাহ পেলেন, হঠাৎ বললেন, 'কিছু না, কিছু না, আমার দুষ্ট মেয়েটাই তোমাদের আসতে বলেছিল, না? দমদমের বাগানে শিকার করতে? কিন্তু মেয়ে আমার! সে-কথা কি তার মনে আছে? সে ত কাল রাত্রেই বাকস-প্যাটরা নিয়ে ট্রেন ধরেছে।'

'কাল রাত্রে?' কল্যাণকুমার হাঁ করল।

'ফিরবেন কবে?' আদিত্যনাথ এক পা এগিয়ে এল।

'গেছেন কোথায়?' ভবেশচন্দ্র এক পা পেছিয়ে এল।

'কোথায় গেছে সে আর কেন জিজ্ঞেস করছ' জজসাহেব ফুলটা ছিঁড়তে ছিঁড়তে বললেন, 'সম্প্রতি গেছেন কালিম্পঙে, সেখানে এক নাচের মজলিসে যোগদান করবে, তার পর সেখান থেকে নাকি সোজা যোধপুর; ওখানে যোধপুরের রাজকন্যা এক পার্টিতে নিমন্ত্রণ করেছে ওকে; কিন্তু ও নেই ব'লে তোমরা আজ অনাদরে ফিরে যাবে তা হবে না; এস, আজ আমরা একসঙ্গে চা খাই। এস ভিতরে।

বাংলার কুটীরশিল্পে ঘি-উৎপাদন

শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

বাংলায় ভয়সা ঘির ব্যবহার

বাংলার ঘি-ব্যবসা ভয়সা ঘির উপর প্রতিষ্ঠিত। বাঙালীর নিকট গাওয়া ঘি উপাদেয় কিন্তু উহা দুষ্প্রাপ্য। ঘোষদের নিকট অল্প পরিমাণে গাওয়া ঘি ও মাখন পাওয়া যায় কিন্তু তাহার মূল্য অধিক, আবার উহা অনেক সময়েই ভেজাল বস্তু হইয়া থাকে। বাংলার ঘরে ঘরে রান্নার জন্য প্রায় সর্ব্বতোভাবেই ভয়সা ঘি ব্যবহৃত হয়। বাংলায় মহিষের প্রচলন এক প্রকার নাই বলিলেই চলে। এই হেতু বাংলায় ভয়সা ঘি মানেই বাংলার বাহির হইতে আমদানী ঘি। কলিকাতা হইয়া এই ঘি বাংলার সুদূর গ্রামে গ্রামে বিক্রয়ের জন্য আসে। এমনি করিয়া বৎসরে অনুমান পৌনে দুই কোটি টাকা বাহির হইয়া যায়। যদি বাংলার প্রয়োজনীয় ঘি বাংলাতেই উৎপন্ন হইত, তবে ঘি বাদে টানা দুধের অন্য জিনিষে মোট তিন-চার কোটি টাকার উৎপাদন বাংলায় বাড়িত এবং বাঙালীর শরীর ও শিল্প ইহা দ্বারা পুষ্ট হইত ও বাঙালীর আর্থিক অসচ্ছলতা অপেক্ষাকৃত কম হইত। নানা ভাবে বাংলার প্রায় সমুদয় কুটীরশিল্প নষ্ট হইয়াছে। ভদ্র ও চাষী বেকার হইয়া পড়িয়াছে এবং কর্ম্মহীনতা বাড়িয়াই চলিয়াছে। ঘি প্রস্তুতের ও অন্য গব্যের মত এত বড় একটা কৃষিনির্ভর শিল্প কোনও দেশের পক্ষেই উপেক্ষণীয় নহে। বাংলার পক্ষে উহার প্রয়োজনীয়তা খুবই বেশী।

বাংলার রুচি যখন গাওয়া ঘির দিকে, বাংলা যখন গো-প্রধান দেশ তখন বাংলায় নিজস্ব গাওয়া ঘি কেন প্রচলিত হইবে না, কেনই বা বাহিরের ভয়সা ঘি আমদানী হইতে থাকিবে? বাংলায় এই অশেষ কল্যাণকর শিল্প প্রবর্ত্তন করা সম্ভব এবং যে-সকল অন্তরায় আজ আছে সে সকল অতিক্রম করিয়া কতকগুলি নিয়ম পালন করিলে ইহা দ্রুত প্রসারিত করা যায়।

বাংলার গ্রামে গ্রামে যে সামান্য ঘি উৎপন্ন হয় না তাহা নহে, ভয়সা ঘিও যে বাংলায় একেবারে হয় না তাহা নহে। আবার বাংলার কতক গাওয়া-ভয়সা মিশ্রিত ঘি সুবিধামত গাওয়া বা ভয়সা ঘি বলিয়া বিক্রীত হয়। কিন্তু ব্যবসায়ে উহার স্থান নগণ্য। ব্যাপক ব্যবসায়ের ঘি মাত্রই ভয়সা ঘি। দৈনিক পত্রিকাগুলিতে বাজারদরের তালিকায় ঘির বাজার-দর দেওয়া হয়; এক দিনের পত্রিকা হইতে উদ্ধৃত করিতেছি—

ঘির দর :

ভারতী ৫২৲ মণ, খুরজ ৫৩৲ মণ, সিকোয়াবাদ ৫০৲ মণ
শ্রী ৫৮৲ মণ, বুটল ৪৩।০ মণ, বান্দাসাগর ৪৩৲ মণ

'আনন্দবাজার পত্রিকা,' ২২শে জুন, মঙ্গলবার

যে দর দেওয়া হইয়াছে, এ সমস্তই ভয়সা ঘির দর এবং এ সমস্তই বাংলার বাহির হইতে আমদানী ঘি। উহা যে ভয়সা ঘি তাহা উল্লেখ করার প্রয়োজন হয় নাই। কেননা সকলেই জানেন যে বাজারের ঘি মাত্রেই ভয়সা ঘি। গাওয়া ঘি হইলেই তাহার বিশেষ উল্লেখ প্রয়োজন। যেমন, বাংলায় রান্নার সম্পর্কে তেল বলিতেই আমরা সরিষার তেল বুঝি, উহার উল্লেখ পর্য্যন্ত নিষ্প্রয়োজন—এ তেমনি।

গাওয়া ঘি প্রাপ্তির অন্তরায় ও প্রতিকার

গাওয়া ঘির দুষ্প্রাপ্যতার একটা হেতু শুনিয়া আসিতেছিলাম যে উহা ভয়সা ঘির মত বেশী দিন টিকে না এবং টিনে বন্ধ করিয়া রাখিলেও উহার স্বাদ ও গন্ধ অল্পকালেই বিকৃত হয়। কিন্তু কথাটা ঠিক নহে। ভাল ভাবে তৈরি গাওয়া ঘি দীর্ঘ দিন অবিকৃত অবস্থায় রাখা যায়। অবশ্য, গাওয়া ও ভয়সা উভয়ের সম্বন্ধেই একথা বলা যায় যে যত টাটকা উহা ব্যবহার করা যায় ততই ভাল। কিন্তু গাওয়া ঘি ভয়সা অপেক্ষা সহজে বিকৃত হয় এ প্রকার পরিচয় আমি পরীক্ষা করিয়া পাই নাই। অবিকৃতি নির্ভর করে

উৎপাদনে কুশলতা, জাল দেওয়া এবং পাত্রাদির পরিচ্ছন্নতা ও বায়ুশূন্যতার উপর।

গাওয়া ঘি বাংলায় উৎপন্ন না-হওয়ার আর একটা বহুজ্ঞাত কারণ এই যে বাংলায় গাইয়ের দুধই দুষ্প্রাপ্য। দুধ পাইতে হইলে বাংলার গো-বংশ উন্নত করা দরকার। এ জন্য পশ্চিমা ষাঁড় আমদানী করার চেষ্টাও চলিতেছে। পশ্চিমা ষাঁড় আমদানী করিয়া যে সঙ্কর জাতের সৃষ্টি হইবে তাহা কয়েক পুরুষ ধরিয়া পরীক্ষা করিতে হইবে। পশ্চিমের ভাল ষাঁড় আনিলেই যে বাংলার গরু ভাল হইবে, ইহা ধ্রুব সত্য নাও হইতে পারে। কাজেই ষাঁড় আমদানী করা একটা পরীক্ষণীয় পথ মাত্র। সেই পরীক্ষা নিষ্ফল হইলে কথাই নাই। সফল হইলে বাংলার সমস্ত গরুকে ঐ নূতন সঙ্কর জাতিতে পরিণত করা যে বিরাট ব্যাপার তাহার উপযুক্ত ব্যবস্থা বা হাতিয়ার আমাদের হাতে নাই।

বাংলায় গো- পালন ও -বৃদ্ধির প্রশ্নের সহিত একটা বিষম উদ্বেগের বিষয় রহিয়াছে, বাংলায় গো-খাদ্যের অভাব। এক কালে বাংলায় গোচারণের মাঠ ছিল, যাহা সেটলমেণ্টের হিসাবপত্রে সাধারণের সম্পত্তি বলিয়া উল্লিখিত ছিল, মানুষ ও গো সাধারণকে বঞ্চিত করিয়া তাহাও বিলি হইয়া গিয়াছে বা হইতেছে। গোচারণের মাঠ নাই বলিলেই হয়। গো পালনের ইহা এক বিষম অন্তরায়। যে সকল গরু আছে, খাদ্যাভাবে তাহারা শীর্ণ এবং দুধও নামমাত্র দেয়। ঐ সকল মাঠ বা ইহার বিকল্পে অনুরূপ জমি দিতে জমিদারদিগকে বাধ্য করিয়া গোচারণের মাঠ সৃষ্টি এবং তাহার পর গাইয়ের দুধ পাওয়ার উপায় করিতে হইলে আমাদিগকে অনির্দ্দিষ্ট কাল অপেক্ষা করিতে হইবে। বাংলায় গরুর জাত খারাপ এবং বাংলায় গো-খাদ্য কম—এই সকল অন্তরায় মানিয়া লইয়াই আমাদিগকে অগ্রসর হইতে হইবে।

কি করিলে বাংলার গো-জাতি রক্ষা করা যায় এবং বাংলার গরুর দুধ বাড়ান যায় এই বিষয় চিন্তা করিয়া ও কিছু কিছু পরীক্ষা করিয়া এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি যে, গো-জাতির সর্ব্বপ্রকার উন্নতির জন্য প্রাথমিক আবশ্যক হইতেছে দুধ বা গব্যের চাহিদা বাড়ান। যে স্থানে চাহিদা বাড়িয়াছে সে স্থানেই ধীরে ধীরে উহা মিটাইবার মত দুধের উৎপাদন বাড়িয়াছে। ইহার প্রমাণ দই-সন্দেশ, রসগোল্লা প্রভৃতির খ্যাতনামা কেন্দ্রগুলি। ঢাকার কোনও অঞ্চলের পাতক্ষীর প্রসিদ্ধ। অনুসন্ধান করিলে দেখিবেন যে সেই অঞ্চলের গাই অধিক দুধ দেয় এবং পুষ্ট। সেখানকার লোকের অসচ্ছলতাও কিছু কম। উহার কাছাকাছি স্থানে, যেখানে গরুর জাত একই প্রকার এবং গো-খাদ্য সমান দুষ্প্রাপ্য সেখানে দেখিবেন চাহিদা নাই বলিয়া গাই কম দুধ দেয়। নাটোরের গব্য প্রসিদ্ধ। নাটোরের কাঁচাগোল্লার খ্যাতি সমস্ত উত্তর-বঙ্গকে আকৃষ্ট করে। নাটোরের আট-দশ মাইলের ভিতর স্থানগুলি অনুসন্ধান করিয়া জানিবেন যে উহার প্রাকৃতিক অবস্থা কিঞ্চিৎ দূরবর্ত্তী অন্যান্য স্থানের সমান হইলেও তুলনায় নাটোরের গাই পুষ্ট ও অধিক দুগ্ধবতী। এইরূপে দেখা যাইবে যে, যেখানেই গব্যের চাহিদা আছে সেই স্থানেই দুধও উৎপন্ন হইতেছে। আমার অভিজ্ঞতা এই যে, গরুর দুধ দেওয়ার পরিমাণ সাধারণতঃ চাহিদার অনুবর্ত্তন করে। সকল গব্যের চাহিদার মধ্যে ঘির চাহিদাই অধিক ফলপ্রদ, কেননা উহার সাময়িক উঠা-পড়া কম। ছানা বা দইয়ের চাহিদা বিবাহ বা পর্ব্বাদি উপলক্ষ্যে বাড়ে কমে; সেই জন্য যাহারা গো পালন করে তাহারা সকল সময় সমান দাম পায় না। যেখানে বার মাসের জন্য গোয়ালা গৃহস্থের সহিত দুধের বন্দোবস্ত করিয়া লয় সেখানে চাহিদার কম-বেশী অনুমান করিয়া একটা একটানা সস্তা দরে চুক্তি করিয়া লয়। উহাতে দুগ্ধের উত্তেজনা পুরা পাওয়া যায় না। গব্যের ভিতর ঘি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী দিন টিকে; সেই জন্য যেখানে ঘির ব্যবসাই প্রধান, ছানা বা দইয়ের ব্যবসা গৌণ, সেখানে দুধের দাম একটানা চড়া থাকে, গৃহস্থের আয় বেশী হয়, গরুর যত্ন বেশী হয়, গরু অধিক দুগ্ধবতী হয়।

এমন স্থান কল্পনা করা যাইতে পারে যেখানে গো-খাদ্য কিছুই পাওয়া যায় না, যেখানে গরু রাখাই বিড়ম্বনা। এমন কল্পিত স্থানে গব্যের চাহিদা সৃষ্টি করিলেও কোনও সাড়া না পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু সাধারণতঃ যেখানে লোকে চাষ-আবাদ করিয়া থাকে সেই স্থানে গরুও অবশ্যই থাকিতে পারে, নচেৎ চাষ-আবাদ সম্ভব হইত না, এবং এইরূপ স্থানে একটানা নির্ভরযোগ্য গব্যের চাহিদা উপস্থিত হওয়ার

সঙ্গে সঙ্গেই দুধের উৎপাদন বাড়িতে থাকে। এইরূপ ঘটাই স্বাভাবিকও বটে। গৃহস্থ নিজে নিরন্ন। গরুকেও অর্দ্ধাহারে রাখে। গরুর যত্নও কম হয় এবং দুধ কম হয়। যতটুকু দুধ হয় গৃহস্থ তাহা বেচিতে চাহিলে তাহারও নিয়মিত ক্রেতা নাই। এজন্য গৃহস্থ গরুর যত্ন কম করে, খাদ্য জোগাইবার জন্য কম ব্যাকুল হয়। কিন্তু যখনই গৃহস্থ দেখে যে গরুকে ভাল করিয়া খাওয়াইলে দুধ বাড়ে, পয়সাও পাওয়া যায়, তখন নানা ফিকির করিয়া সে গরুকে খাওয়াইবার চেষ্টা করে। দুধ বেচিয়া যে পয়সা পায় তাহা হইতেও গরুকে খাওয়াইবার জন্য ব্যয় করে, ভাল করিয়া জল ঘাস ও জাব দেয়, যত্ন করিয়া চরায়, অনেক সময় ছেলেপিলে বা নিজেদের চেয়ে দুগ্ধবতী গাইকে বেশী যত্ন করে। উহাতে গোজাতির উন্নতির সোপান প্রস্তুত হয়। গোজাতির যত্নই গোজাতির উন্নতির প্রথম সোপান। গব্যের নির্ভরযোগ্য চাহিদা সেই সোপান প্রস্তুত করে।

অন্য দিক হইতেও এই দৃষ্টি সমর্থন লাভ করে। পূর্ব্বে যেখানে চিনির কল ছিল না, সেখানে লোকে দু-চার খানা ক্ষেতে মাত্র আখ বুনিত। এরূপ স্থানে চিনির কল বসাইবার সময় জমি নির্ব্বাচনকালে কলওয়ালা দেখে যে উহা আখের উপযুক্ত কিনা। যদি অনুকূল হয় তবে চাষার সহিত পরামর্শ করে না, চুক্তি করে না, সে নিজের বিচারে কল বসাইয়া আখের চাহিদার সৃষ্টি করে এবং চাষার তীক্ষ্ণ স্বার্থবুদ্ধির উপর নির্ভর করে। আখের চাষে লাভ আছে একথা চাষা যখন জানে তখন চাহিদার মুখে আখ উৎপন্ন করিয়া কলওয়ালার উপর নির্ভর করে। ঠিক তেমনি গব্যের বেলায়। আখ কোথায় হইতে পারে বা না-পারে, ইহা লইয়া কত আলোচনা হইয়াছে, কিন্তু রাজশাহীর গোপালপুরে মিল বসাইবার পর দেখিতেছি যে চাহিদার চাপে আখ পর্য্যন্ত ধানের মত জলজ হইতে আরম্ভ করিয়াছে। সেখানে এক কোমর জলেও আখের ক্ষেত দেখিবেন। যেখানে এক কোমর জল বর্ষায় উঠে সে-ক্ষেতে যে আখ হয় একথা কয়জন জানিতেন আর আজই বা কয়জন জানেন। কিন্তু চাহিদা এমন জিনিষ যে রাজশাহীর কোন্ জমিতে আখ হইতে পারে ইহা চাষাকে চেষ্টা করিয়া শিখাইতে হয় নাই। চাহিদাই তাহার আগ্রহ সৃষ্টি করিয়াছে ও নূতন পথে প্রবৃত্ত করাইয়াছে।

ঘির চাহিদার স্থিরতা

গব্যের চাহিদার ভিতর ঘির চাহিদাই শ্রেষ্ঠ একথা পূর্ব্বে বলিয়াছি কেননা উহা সাময়িক নয়। কেহ ঘি উৎপাদন করিতে গ্রামে বসিয়া গেলে তিনি জানাইয়া দিতে পারেন যে, যতটা দুধ যেদিন যে জোগাইবে তাহাই লওয়া হইবে। গৃহস্থের যেদিন নিজের অধিক প্রয়োজন সেদিন দুধ কম দিবে; তাহাতে ক্ষতি নাই। আজ গ্রামে বিবাহ বা উৎসব, দুধ উদ্বর্ত্ত হইবে না, ঘি-ব্যবসায়ীর তাহাতে অসন্তোষ নাই— সে কাল দুধ পাইবে। গ্রামের যাহা উদ্বর্ত্ত তাহা সে লইবে এবং নিশ্চিতই লইবে। যতটা দুধ উদ্বর্ত্ত হউক না কেন সে কোনও দিন কাহাকেও ফিরাইবে না এমন আশ্বাস ঘি-ব্যবসায়ী যত অকুণ্ঠার সহিত দিতে পারে ছানা বা দধির ব্যবসায়ী তাহা পারে না। এই জন্য দুধ উৎপাদন প্ররোচিত করিতে ঘি-ব্যবসা শ্রেষ্ঠ। কিন্তু ঘির জন্য যে দুধ লওয়া হয় তাহার মাখন বা ননীই ঘিতে পরিণত হয়, বাকী যে টানা দুধটা পড়িয়া রহিল তাহার কি হইবে? সে ব্যবস্থা ঘি-ব্যবসায়ীকেই করিতে হইবে। টানা দুধের দই প্রস্তুত করিয়া, ক্ষীর, ছানা, কেজিন বা জমাট দুগ্ধ, যাহা হউক কিছু করিয়া উহা ব্যবহার করিয়া দুধের প্রায় অর্দ্ধেক দাম তুলিতে হইবে।

বাংলার গো-সম্পদ

পূর্ব্বে বলিয়াছি, অনুমান যে পৌনে দুই কোটি টাকার ভয়সা ঘি বাংলায় আসে উহার পরিবর্ত্তে অতটা গাওয়া ঘি বাংলাতেই প্রস্তুত হইতে পারে। বাংলার গাভীকেই ত এই প্রয়োজনীয় দুধ দিতে হইবে। বাংলায় প্রয়োজন মিটাইবার মত গাভী আছে কিনা দেখা যাক। এজন্য বিহার, যুক্তপ্রদেশ ও পাঞ্জাব প্রভৃতি যে কয়টি প্রদেশ হইতে বাংলায় ঘি আমদানী হয় তাহার সহিত তুলনামূলক আলোচনা করিলেই বিষয়টি স্পষ্ট হইবে।

১৯৩৪-৩৫ সালের গবর্ণমেণ্টের কৃষি-বিভাগের

হিসাবে নিম্ন সংখ্যাগুলি পাওয়া যায়। ঐ হিসাবে গবাদি পশু, এবং ভিন্ন করিয়া গাভী ষাঁড় বলদ বাছুর এবং মহিষের ষাঁড় বলদ স্ত্রী-মহিষ ও বাছুরের সংখ্যা দেখান আছে। উহা হইতে আমি কেবল গাভী ও স্ত্রী-মহিষের সংখ্যা লইয়া তুলনা করিতেছি।

	বাংলা		বিহার উড়িষ্যা		যুক্তপ্রদেশ		পাঞ্জাব	
যত লক্ষ একর জমি চাষ হয়···	২৩৩		২৪১		৩৫৬		২৬৫	
যত লক্ষ গাভী আছে ···	৮২	৮৪	৫৭	৭৩	৬০	১০২	২৬	৫৬
যত লক্ষ স্ত্রী-মহিষ আছে···	২		১৬		৪২		৩০	
প্রতি একশত কর্ষিত বিঘায় গাভী ও স্ত্রী-মহিষের সংখ্যা···	৩৬		৩৪		৩০		২১	

এই হিসাব হইতে দেখা যাইবে যে শত বিঘা কর্ষিত জমির অনুপাতে গাভী ও স্ত্রী-মহিষ আছে বাংলায় ৩৬, বিহারে ৩৪, যুক্তপ্রদেশে ৩০, ও পাঞ্জাবে ২১। বাংলার অনুপাত সব চেয়ে বেশী অথচ বাংলা সব চেয়ে কম দুধ পায়। বাংলার পরেই, বিহার ও উড়িষ্যার অবস্থা খারাপ। বিহারের সহিত উড়িষ্যা যুক্ত হওয়ায় এই অবস্থা দেখা যাইতেছে, নচেৎ বিহারের অবস্থা বাংলা হইতে ভাল এবং উড়িষ্যার অবস্থা বাংলা অপেক্ষা খারাপ। বিহারেও গরু-মহিষের যত্ন কম। বিহারে স্ত্রী-মহিষের দুধ লওয়া হয় বটে, কিন্তু মাত্র তিন-চার সের দুধ পাওয়া যায়। তবুও বিহার বাংলায় ঘি পাঠায়। বিহারে মহিষের দুধ হইতে দই প্রস্তুত করিয়া উপরের মাখনটা গালাইয়া ঘি তৈরি করে। পাঞ্জাবে অল্প গাভী-মহিষে যত বেশী দুধ পাওয়া যায় তত আর কোথাও পাওয়া যায় না। পাঞ্জাবে গরুর জাত ও যত্ন দুই-ই ভাল। বাড়ীতে কোনও কিছু ভাল খাদ্য হইলে লোকে যেমন ছেলেপিলেকে তাহা খাওয়াইতে আগ্রহ করে ও খাইলে আনন্দ পায়, পাঞ্জাবের গৃহস্থের গরুর জন্য সেই ধরণের একটা আগ্রহ আছে। কিন্তু বাংলায় এক পাল দুধশূন্য শীর্ণ দুর্ব্বল গাই অযত্নে রাখিয়া আমরা নিজেরাও দুঃখ পাইতেছি গরুকেও দুঃখ দিতেছি। বাংলায় গরুর সংখ্যা যথেষ্ট আছে। বাংলার জমি অন্য কোনও দেশ অপেক্ষা কম উর্ব্বর নয়। বাংলার চাষাও অলস নয়। কিন্তু গো-সেবা যে কি বস্তু তাহা বাংলার চাষা না জানায় বাংলার দুঃখ চলিতেছে।

বাংলার গরুকে যত্ন করিলে দিনে দুইবার দোহন করা যায় এবং দুই বারের বিয়ানের পর চার সের ও শেষ দিকে এক সের এবং গড়ে দুই সের করিয়া দুধ পাওয়া যায়। গড়ে এক বিয়ানে দিনে দুই সের হিসাবে ছয় মাস দুধ পাওয়া যাইবে ধরা যায়। বাকী ছয় মাস গরু দুধ দিবে না। তাহা হইলে একটা গাই এক বৎসরে বা এক বিয়ানে ১৮০ দিন দুই সের হিসাবে ৩৬০ সের বা নয় মণ দুধ দিবে।

বাংলার মোট গরুর মধ্যে বিরাশী লক্ষ গাই। ইহাদের মধ্যে যদি তিন ভাগের এক ভাগ মাত্র নিয়মিত দুধ দেয় তবে দাঁড়ায় সাতাশ লক্ষেরও বেশী দুগ্ধবতী গাই। উহারা প্রত্যেকে নয় মণ করিয়া দুধ দিলে বৎসরে ২৪৩ লক্ষ মণ দুধ দিবে। ইহার অর্দ্ধেকটায় বর্ত্তমান দুধের আবশ্যকতা মিটাইলে বাকী অর্দ্ধেক অর্থাৎ ১২০ লক্ষ মণ দুধ উদ্বৃত্ত হয়। কুড়ি মণ দুধে এক মণ ঘি হইতে পারে, সে হিসাবে ১২০ লক্ষ মণ দুধে ছয় লক্ষ মণ ঘি হইবে।

রেল ও ষ্টীমার পথে আমদানী ১৯৩৪-৩৫ সালের গবর্ণমেণ্টের দেওয়া হিসাবে পাওয়া যায় যে বাংলায় ঐ বৎসর ঘি আসিয়াছে ৩৪৪ হাজার মণ। উহা হইতে রপ্তানী ১২ হাজার মণ বাদে বাংলায় ব্যবহৃত আমদানী ঘির পরিমাণ দাঁড়ায় ৩৩০ হাজার মণ। কিন্তু রেল ও ষ্টীমার ব্যতীত মোটর যোগে অনেক ঘি আমদানী হয়। উহার হিসাব নাই। উহা কুড়ি হাজার মণ ধরিলে, ঘির আমদানী সাড়ে তিন লক্ষ মণ হয়। আর এক বৎসরে আমরা বাংলার গাই হইতে সমস্ত প্রয়োজন মিটাইয়া ছয় লক্ষ মণ উদ্বৃত্ত ঘি পাইতে পারি। কাজেই বাংলার আমদানী সাড়ে তিন লক্ষ মণ ঘি ঘরেই তৈয়ার করিয়া লওয়ার অন্তরায় কিছু নাই। বাংলার গো-সম্পদ হইতে বাঙালী স্বার্থসিদ্ধি করিতে শিখিলে বর্ত্তমান আমদানী পৌনে দুই কোটি টাকার ঘি ত নিজে উৎপাদন করিতে পারিবেই, বরঞ্চ অন্যত্র আরও অনেক ঘি রপ্তানী করিতে পারিবে।

বাংলার তিন ভাগের এক ভাগ গাই গড়ে দিনে দুই সের দুধ দিবে বলিয়া আমি ধরিয়াছি। কিন্তু যত্ন করিলে অধিকাংশ গাই ইহা অপেক্ষা অধিক দুধ দিবে ইহাই আমার ধারণা। যত্ন করিলে যে দুধ বাড়ে ইহার পরীক্ষা আমি নানা ক্ষেত্রে নানা ভাবে করিয়া দেখিয়াছি। একটা দৃষ্টান্ত

দিতেছি। আমি যখন দ্বিতীয়বার আলিপুর সেণ্ট্রাল জেলের কয়েদী হইয়াছি সেই সময় জেল-সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট জেলের গোশালা সম্বন্ধে উদ্বেগ বোধ করিতেছিলেন। অনেক গরু ছিল, অথচ দুধ না-হওয়ার মত। একটি সাহেব-কয়েদীর হাতে গোশালার ভার ছিল, তাহার কাজে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সন্তুষ্ট হইতে পারিতেছিলেন না। একদিন সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট মেজর পাটনী সঙ্কোচের সহিত প্রস্তাব করেন যদি গোশালার ভার আমি লই। আমি আগ্রহের সহিত স্বীকার করি। তখন দেখি, গোশালায় মাত্র আট সের দুধ হয় অথচ গোশালে সব মিলিয়া সংখ্যায় গরু আছে চল্লিশটি। বাছুর মরিয়া যাইত। বৎসর ধরিয়া গাইকে খাওয়াইয়া যত্ন করিয়া দুধ পাওয়ার সময় হইলে বাছুর মরিয়া যাওয়ায় সমস্ত শ্রম ও ব্যয় পণ্ড হইত। বাছুর মরার মত অপরাধ গোশালায় দ্বিতীয় নাই। সেই অপরাধ পুনঃপুনঃ ঘটিত এবং জেলে বাছুর বাঁচিত না, দুধও হইত না। অন্য কারণও ছিল। উহাদের খাদ্যের সংস্কার সাধন করা, ষাঁড়ের ব্যবস্থা করা ইত্যাদির দিকে দৃষ্টি দিই। সংস্কার করিতে প্রতি পদে জেল-আইনের বাধা আসিত। কিন্তু মেজর পাটনী সমস্ত আইনের দায়িত্ব নিজে লইয়া গোপালনের রাস্তা সাফ করিয়া দেন। গোশালার উন্নতি আরম্ভ হয়। নূতন ধরণে খাতাপত্র রাখা আরম্ভ হয়। ফর্ম্ম ও হিসাব-পদ্ধতি বদলাইয়া যায়। গোশালার অবস্থান নিম্ন ভূমিতে ছিল, উহার পরিবর্ত্তন করার চেষ্টা হয়। গো-খাদ্যের কণ্ট্রাক্টরের অন্যায় উপার্জ্জন বন্ধ হয়। কবে কে গর্ভিণী হইয়াছিল তাহা হইতে পূর্ব্বেই প্রসবের আনুমানিক তারিখ স্থির করিয়া প্রসবকালে গরুর যথাযোগ্য যত্ন লওয়ার ব্যবস্থা হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি, আমি যখন গোশালার ভার লই তখন দুধের পরিমাণ দৈনিক আট সের ছিল। নয় মাস পরে আমি যখন চলিয়া আসি তখন দুধের পরিমাণ দশ গুণ হইয়াছে—দিনে দুই মণ দুধ হইত। ইতিমধ্যে ইনস্পেক্টর-জেনারল মিঃ ফ্লাওয়ার ডিড দুইবার আসেন। শেষবারে সমাদরের সহিত বলেন যে আমাকে আর মুক্তি দেওয়াই হইবে না। পরক্ষণেই কৃতজ্ঞভাবে বলেন যে আমি যেন আর জেলে ফিরিয়া না আসি। তাঁহার হাতে কয়েদীকে নির্দ্দিষ্ট সময়ের পূর্ব্বে খালাস দেওয়ার যতটা অধিকার ছিল তাহা ব্যবহার করিয়া নয় মাসেই আমাকে এক বৎসরের জেল পূর্ণ করিয়া খালাস দেন। তাঁহার কৃতজ্ঞতার কোনও কারণ ছিল না—আমি কয়েদী, কাজ করিয়া গিয়াছি। কৃতজ্ঞতার হেতু আমার পক্ষেই ছিল—তাঁহারা যে গো-সেবার অপূর্ব্ব অবকাশ দিয়াছিলেন সেজন্য। বস্তুতঃ গো-সেবার আনন্দের আতিশয্যে জেল আমার নিকট রম্যস্থান হইয়া পড়িয়াছিল।

জেলে যেমন সেবা দ্বারা তাৎকালিক দুধের পরিমাণ বাড়াইতে পারিয়াছি অন্যত্রও তেমনি বিশেষ ফল পাইয়াছি। জেলের গরুগুলি সবই পশ্চিমা জাতের ছিল—অযত্নে খারাপ হইয়াছিল। দেশী গাইয়ের দুধ দৈনিক আধ সের হইতে দুই সের পর্য্যন্ত বাড়াইবার সুযোগ আমার ঘটিয়াছে। আবার এমন গো-বাথান দেখিয়াছি সেখানে পৌষ-মাঘ মাসে বাথানের গাই প্রতি দৈনিক গড়ে চার সের দুধ দাঁড়ায়। জেলে চৌয়ারী নামে একটি গাই আমি থাকাকালে এক-বারকার বিয়ানে মোট পাঁচ হাজার পাউণ্ড বা ষাট মণ দুধ দিয়াছে। খাদি প্রতিষ্ঠানের সোদপুর গোশালায় আমরা পশ্চিমা গাই হইতে এক বিয়ানে ৩৮ হইতে ৪৫ মণ দুধ পাইয়া থাকি। সে-স্থলে একটা দেশী গাই হইতে আমি এক বিয়ানে মাত্র নয় মণ দুধ প্রত্যাশা করিতেছি।

ঘি প্রস্তুত—দুধটানা

দুধ বা দই মন্থন করিয়া ননী বা মাখন বাহির করা যায়। উহা উপযুক্ত তাপে গলাইয়া ঘি হয়। দুধ মন্থন করিয়া বা টানিয়া ঘি প্রস্তুত করা কিছু ক্লেশসাধ্য হইলেও উহাই উৎকৃষ্টতর। সেপারেটর মেশিন ব্যবহার করিলে সহজেই দুধ হইতে ননী তোলা যায়, কিন্তু সকলের পক্ষে সেপারেটর মেশিন বসান সম্ভব বা যুক্তিযুক্ত হইবে না। হাতে টানার জন্য দুধ একটু গরম করিয়া তাহার পরে নদী বা পুকুরের জলে পাত্রটি ভাসাইয়া তাড়াতাড়ি ঠাণ্ডা করিয়া লইতে হয়। একটা পরিষ্কার কেরোসিনের টিনে ঠাণ্ডা দুধ ঢালিয়া মন্থন-দণ্ড দিয়া টানিতে হয়। উহাতে ননী ভাসিয়া উঠে এবং ননী গালাইয়া ঘি প্রস্তুত করা হয়। ননী উঠাইয়া লইলে যে দুধ রহিল উহাই ননী-তোলা বা টানা দুধ।



খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার গরুর পাল



খাদি প্রতিষ্ঠানের ঘি-উৎপাদন কেন্দ্রের গো-বাথান

ননীতোলা বা টানা দুধ

টানা দুধ একটি শ্রেষ্ঠ খাদ্য। টানা দুধ সাধারণতঃ একটা অবজ্ঞার পদার্থ বলিয়া গণ্য হয়। কিন্তু ঘি প্রস্তুত করিতে হইলে টানা দুধ ব্যবহার করিতে হইবে এবং উহার যোগ্য মূল্যও দিতে হইবে। টানা দুধ সম্বন্ধে গান্ধীজী সম্প্রতি আমার নিকট হইতে কিছু জানিতে চাহেন। পরে শ্রীযুত মহাদেব দেশাই 'হরিজনে' এ-সম্বন্ধে দুইখানি পত্র প্রকাশিত করিয়াছেন—একখানি বিশ্ববিখ্যাত শারীরিক পুষ্টিবিজ্ঞান-বিশারদ ডাক্তার এক্রয়ডের, অপর পত্রখানি আমার।

'হরিজন', ২৯শে মে ১৯৩৭

টানা দুধ

কুন্নুর পুষ্টি-গবেষণার ডিরেক্টর ডাক্তার এক্রয়েড্ এবং শ্রীযুত সতীশচন্দ্র দাসগুপ্তের নিকট আমি টানা দুধের সুবিধা-অসুবিধার বিষয় কতকগুলি প্রশ্ন এবং উহা জনপ্রিয় করার উপায় সম্বন্ধে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলাম। উভয়েই তাঁহাদের মত জানাইয়াছেন। ম দে

ডাক্তার এক্রয়ডের পত্রের মর্ম্ম

আপনি টানা দুধ ও মাখনের দুধ সম্বন্ধে কয়েকটি প্রশ্ন করিয়াছেন। টানা দুধের পুষ্টি-মূল্য খুব বেশী, কেননা খাঁটি দুধে যাহা আছে এক চর্বি ও ভিটামিন 'এ' ছাড়া আর সমস্তই টানা দুধে থাকে। খাঁটি দুধ টানা দুধের চাইতে ভাল; কেন না উহাতে ভিটামিন এ থাকে। কিন্তু ভারতীয় ছেলেদিগের যে খাদ্য খায় তাহাতে, ভাত বা বজরাই বেশী থাকে, দুধ বা ডিম বড় থাকে না, শাকসব্জীও অল্পই থাকে। তাহাদের পক্ষে যে টানা দুধ খাওয়াইলে খুবই ভাল হইবে সে বিষয়ে কোন কথাই নাই। টানা দুধের একটা বিশেষ সুবিধা এই যে উহা খাঁটি দুধ অপেক্ষা সস্তা।

আমরা অনেকগুলি পরীক্ষায় বিদেশী শুষ্ক-করা টানা দুধের ব্যবহার করিয়াছি। যে সকল ছেলেদিগকে দৈনিক এক আউন্স করিয়া শুষ্ক টানা দুধের গুঁড়া ৩-৪ মাস ধরিয়া খাওয়ান হইয়াছে তাহারা ওজনে এবং দৈর্ঘ্যে সেই সকল শিশুর চাইতে বেশী বাড়িয়াছে যাহাদিগকে টানা দুধ ছাড়া আর সব ঠিক একরকম খাদ্যই খাওয়ান হইয়াছে। ঐ দুধ যে-ছেলেদিগকে খাওয়ান হইয়াছিল তাহাদের স্বাস্থ্যের বিশেষ উন্নতি দেখা গিয়াছিল। টানা দুধের শুকনা গুঁড়া ৮ গুণ জলের সহিত মিশাইয়া তরল দুধ তৈয়ার করা হইয়াছিল।

গুঁড়া দুধ ত তরল দুধ শুকাইয়াই প্রস্তুত, এজন্য গুঁড়া দুধ দিয়া যে ফল পাওয়া গিয়াছে টানা তরল দুধ দিয়াও সেই কাজই হইবে। টানা দুধের অপচয় হইতে দেওয়া কদাচ উচিত হইবে না, একটু চেষ্টা দ্বারাই স্কুলের ছাত্রদিগকে উহা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা যাইতে পারে।

স্বাদ সম্বন্ধে আমরা দেখিয়াছি যে ছেলেদিগকে টানা দুধের গুঁড়ার তৈরি দুধ খাওয়াইতে কোনও কষ্ট হয় নাই। উহারা উহা পছন্দই করে বলিয়া বোধ হয়।

একটা বিশেষ কথা মনে রাখা দরকার যে টানা দুধ শিশুদের একমাত্র খাদ্য হওয়ার যোগ্য নয়, কেননা উহাতে ভিটামিন 'এ' থাকে না। যদি শিশুদিগকে দেওয়া হয় তবে উহার সহিত ভিটামিন 'এ' পূর্ণ কোনও খাদ্য যেমন কড্‌লিভার অয়েল—দেওয়া উচিত। একেবারে কচি শিশুর চেয়ে, যাহারা বড় হইয়াছে সে সকল ছোট ছেলেদিগকে টানা দুধ দেওয়ায় উপকার হইবে, কেনন তাহাদের খাদ্য শস্যাদি দ্বারাই প্রস্তুত, শাকসব্জি থাকে না বা কোনও জানা জাতীয় জান্তব পদার্থও থাকে না। এই সকল অবস্থায় একেবারে দুধ না দিতে পারার চেয়ে টানা দুধ দেওয়া অনেক ভাল। ছেলেদিগের পক্ষে উহার উপকারিতা আমরা পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছি। সন্তানসম্ভবা বা প্রসূতিদের খাদ্যের সহিত টানা দুধ দেওয়া ভাল।

লেখকের পত্রের মর্ম্ম

মাখন ও ভিটামিন 'এ' ছাড়া খাঁটি দুধের অপর সমস্ত পদার্থই টানা দুধে বর্ত্তমান। যদি আমাকে গরম করা দুধের মূল্য নির্দ্দেশ করিতে হয় তবে আমি উহার উপকরণের এই প্রকার মূল্য দিব

ক	মাখন ও ভিটামিন 'এ'—	আট আনা
খ	ছানা পদার্থ—	পাঁচ আনা
গ	শর্করা, ধাতব পদার্থ ও ভিটামিন 'বি'—	তিন আনা

যদি খাঁটি দুধকে ষোল আনা ধরা হয় তবে খ ও গ এর সমষ্টি, টানা দুধের মূল্য আট আনা ধরা যায়। বস্তুত উহা অপেক্ষাও কম দামে বিক্রয় হয়



নীলা
খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার মূলতানী গাই। এক বিয়ানে দশ মাসে ৪৪॥৪৫০ দুধ দিয়াছে।



কৃষ্ণ
খাদিপ্রতিষ্ঠান গোশালার মুলতানী ষাঁড়। প্রতিষ্ঠানের গোশালায় জন্মিয়াছে ও পালিত হইয়াছে।

বলিয়া টানা দুধ গরীবদের পক্ষে একটা মূল্যবান খাদ্য, কেননা মূল্য অধিক বলিয়া খাঁটি দুধ তাহারা পায় না।

টানা দুধ হইতে উৎকৃষ্ট দই হয়, উহা ন্যায্য মূল্যে বিক্রয়-যোগ্য। দুধ ব্যবহারের আর একটি শ্রেষ্ঠ উপায়, উহা জমাট করিয়া বিক্রয় করা। কুটীর-আয়োজনেই উহা জমাট করা যায়। উহা হইতে ছানা কাটিয়া বা ক্ষীর করিয়া ননী তোলা ছানা বা ক্ষীর বলিয়াও বিক্রয় করা যায়। যে প্রকারেই হউক উহা হইতে ন্যায্য মূল্য পাওয়ার ব্যবস্থা করা প্রয়োজন হইবে। টানা দুধের উপকারিতা ও খাদ্য মূল্য সম্বন্ধে লোকের ঠিক ধারণা হইলে উহার অধিকতর ব্যবহার সম্ভব হইতে পারে। টানাদুধ বা টানাদুধের দই ছানা ক্ষীর প্রভৃতি যোগ্য মূল্যে না বেচিতে পারিলে ঘি উৎপাদনে বিঘ্ন হইবে।

ভয়সা ও গাওয়া ঘি

খাদ্যহিসাবে ঘি বিশেষ করিয়া গাওয়া ঘির স্থান খুব উচ্চে। গাওয়া ঘি সহজপাচ্য। ইহার তাপমূল্যও খুব বেশী। ভাল করিয়া গলাইলে ইহাতে দুধের প্রায় সবটা ভিটামিন 'এ' থাকিয়া যায়। ভিটামিন 'এ' পোষণকারী ও রোগ প্রতিশেধক ও সংরক্ষক। ভিটামিন 'এ'র অভাবে শরীরের বৃদ্ধি বন্ধ হইয়া যায়। কডলিভার অয়েলে ভিটামিন 'এ' আছে বলিয়া ডাক্তারেরা উহার ব্যবস্থা করেন। গাওয়া ঘি হইতেও অনুরূপ ফল পাওয়া যায়। কত লোকে কষ্ট করিয়া কডলিভার অয়েলের মত দুর্গন্ধ মাছের তেল খাইয়া থাকেন কিন্তু তাঁহারা ভাল ভাবে তৈরি গাওয়া ঘির উপকারিতার কথা জানেন না। শরীর পোষণের ও অল্প-বয়স্কদিগের বৃদ্ধি ও মাতৃগর্ভস্থ সন্তানের বৃদ্ধির জন্য গাওয়া ঘির মত উপকারী পদার্থ অল্পই আছে। কাহারও এ প্রকার বিশ্বাস আছে যে গাওয়া ঘির দ্বারা ভাজার কাজ করিলে জলতি বেশী যাইবে। কিন্তু এই ধারণা ভুল। কাঁচাপাকের ঘি হইলেই জলতি বেশী যাইবে, গাওয়াই হউক আর ভয়সাই হউক।

গুণে শ্রেষ্ঠ হইলেও গাওয়া ঘির দর ভয়সা ঘির কাছাকাছি না হইলে সাধারণের পক্ষে তাহা ব্যবহার করা কঠিন। খাদি প্রতিষ্ঠান গাওয়া ঘির উৎপাদন হাতে লওয়ার পূর্ব্বে গাওয়া ঘির নির্দ্দিষ্ট কিছু দর ছিল না। কেননা চাহিদাও তেমন ছিল না। এখন গাওয়া ঘির দর ধীরে ধীরে নিয়ন্ত্রিত

হইতেছে। বর্ত্তমানে গাওয়া ঘির দর ভয়সা অপেক্ষা প্রতি সের চার আনা মাত্র বেশী। কিন্তু চাহিদা বাড়িলে দুধও বাড়িতে থাকিবে এবং সঙ্গে সঙ্গে যদি টানা দুধের দই বা জমাট দুগ্ধ প্রভৃতি করিয়া লাভজনক ভাবে বিক্রয় করা যায় তবে ক্রমশঃ বাংলার উৎপন্ন গাওয়া ঘি আমদানী করা ভয়সা ঘির সমান অথবা প্রায় সমান দামে বিক্রীত হইতে পারিবে। তেমন দিন আসিলে বাংলার সমস্ত ঘি বাংলার গাই হইতেই পাওয়া যাইবে।

ঘি-শিল্প প্রসারের প্রভাব

যদি কোন একটা কুটীরশিল্পের প্রসার হয়, তবে নানা দিক দিয়া অন্যান্য শিল্প উত্তেজনা লাভ করে। বাংলায় যেদিন ভয়সা ঘির পরিবর্ত্তে গাওয়া ঘির প্রচলন সুরু হইবে তখন দিকে দিকে তাহার উৎপাদনের উত্তেজনার প্রতিক্রিয়া চলিতে থাকিবে। টানা দুধের বিক্রয় বাড়িবে আবার সেই দই বিক্রয় করিতে কত লোক নিয়োজিত হইবে। দই হইলেই কুমারের গড়া পাত্র চাই। কুমারেরা কাজ পাইবে। নদীপথে দই বহন করার জন্য হয়ত কিছু নৌকার প্রয়োজন বাড়িবে এবং নৌকা গড়ায় ছুতার কাজ পাইবে। গরুকে অধিক বিচালি দেওয়ার গরজে চাষা ইচ্ছা করিয়া ধানের জমি ধানকেই ফিরাইয়া দিবে। পাট কম বুনিবে। যাহার দাম কেবল দেশ-বিদেশের দর উঠ্‌তি-পড়্‌তি খেলার উপর নির্ভর করে, উৎপাদনের সহিত যাহার দরের সম্পূর্ণ যোগ নাই, পাটের মত এমন দ্রব্যের উপর চাষা যত কম নির্ভর করে তত ভাল। দুধের চাহিদা বাড়িলে পাটের চাষ স্বতই কমিয়া ধানের চাষ বাড়িবে ও চাষার কল্যাণ হইবে।

কেবল বিচালি নয় খইলও গরুকে দিতে হইবে। তাহাতে খইলের চাহিদা গ্রামে বাড়িবে। যে কলুরা আজ কেবল কলের তেল কিনিয়া বেচে তাহারা ঘানি চালাইবার উৎসাহ পাইবে, ফলে কলের তেলের ব্যবহার কমিয়া কিছু ঘানির তেলও চলিতে পারে।

স্বাস্থ্যের দিক দিয়া আশ্চর্য্য পরিবর্ত্তনের সম্ভাবনায় এই উদ্যম পূর্ণ। ডেনমার্কে দুধের ব্যবহার যথেষ্ট হইত কিন্তু যুদ্ধের চাহিদায়, দুধ মাখন হইয়া বিদেশে রপ্তানী হইতে আরম্ভ করে। উহার ফলে শিশুদের ভিটামিনের অভাব ঘটে, চক্ষু হইতে জল পড়িতে, চক্ষু বন্ধ হইয়া পাকিয়া নষ্ট হইতে আরম্ভ হয়, শিশুদের অকালমৃত্যু হইতে থাকে। তখন ডেনমার্কের গবর্ণমেণ্ট মাখন রপ্তানী বন্ধ করিয়া দেন। সঙ্গে সঙ্গেই শিশুদের রোগ ও অকালমৃত্যু বন্ধ হয়।



শুক্লা
খাদি প্রতিষ্ঠান গোশালার সঙ্কর গাই—মাতা দেশী, পিতা মুলতানী। তৃতীয় বিয়ানে দশ মাসে ৩৩/৯৬০ দুধ দিয়াছে।

বাংলায় যদি ১২০ লক্ষ মণ দুধ বৎসরে অধিক উৎপন্ন হয় তাহার ফলে বাঙালী জাতি ৪ কোটি টাকা ঘরে রাখিবে এবং স্বাস্থ্যশীল ও স্বাবলম্বী হইয়া পড়িবে। মস্তিষ্কের অপব্যবহার না করিয়া সদ্ব্যবহার করিবার সামর্থ্য পাইবে। বস্তুতঃ এই ঘি-শিল্পের উদ্যম দ্বারা বাংলায় নবজীবনের সূত্রপাত হইতে পারে। আমি যাহা আশা করিতেছি তাহা আকাশ-কুসুম নয়। খাদি প্রতিষ্ঠান হইতে কিছু কিছু পরীক্ষা করার পর এই প্রকার আশা পোষণ করিতেছি। খাদি প্রতিষ্ঠান আমাদের পরীক্ষার সুযোগ দিয়াছে। এই সংস্থা খাদির ও কুটীরশিল্পের উন্নতির জন্য গঠিত। ইহা ১৮৬৮ সালের ২১ এক্ট অনুসারে দাতব্য সংস্থা (Charitable Trust) বলিয়া রেজেষ্ট্রীকৃত। আজ ১২ বৎসর গ্রামশিল্প সংগঠনের কার্য্য এই সংস্থার ভিতর দিয়াও হইতেছে। এ পর্য্যন্ত এই সংস্থা হইতে কুটীরশিল্প ও খাদির প্ররোচনার জন্য তিন লক্ষ টাকা ব্যয় করা হইয়াছে। কেবল আদর্শ সম্বন্ধে যুক্তি-তর্ক না করিয়া কাজ করিয়া দেখান প্রতিষ্ঠানের

কাম্য। কয়েক মাস হইতে প্রতিষ্ঠানের গাওয়া ঘি প্রবর্ত্তনের চেষ্টায় যে সফলতা লাভ করা গিয়াছে তাহা হইতেই এই আশা করা যায় যে প্রকৃত যোগাযোগ হইলে এই পৌনে দুই কোটি টাকার ঘি ও সমপরিমাণ টাকার টানা দুধের উৎপাদন বাংলা করিতে পারে।

দুধ বাড়ান ও ঘি প্রস্তুতের সমস্ত আবশ্যক উপকরণই বাংলার সাধারণ গৃহস্থের আয়ত্তের মধ্যে। আসল কথা এই যে, গাওয়া ঘির ব্যবহার প্রচলনের জন্য বাঙ্গালীকে আগ্রহশীল হইতে হইবে। গাওয়া ও ভয়সা ঘির মূল্য সেরকরা চার-ছয় আনা বেশী হইলেও উহা দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে এবং গোপালনের দিকে সর্ব্বদা সতর্ক দৃষ্টি রাখিতে হইবে। ভেজাল ঘি, সস্তা ঘি কিনিতে গিয়া ক্রেতার নিঃসন্দেহ হওয়া আবশ্যক যে ভেজাল জিনিষ তিনি কিনিতেছেন না। 'বলুর ঘানি' প্রবন্ধে আমি দেখাইয়াছি যে সস্তায় ভেজাল জিনিষ নির্বিচারে কেনার ফলে একটা বড় গ্রাম্য শিল্প দিনে দিনে নষ্ট হইতেছে এবং গ্রামগ্রামান্তরে শহরের কলের তেল ও ভেজাল তেল লইতেছে। ঘি-সম্পর্কেও ভেজালের প্রশ্রয় দিলে—অর্থাৎ সস্তা ঘি কিনিতে চাহিলে—এই শিল্প কখনও বাংলায় প্রতিষ্ঠিত হইবে না। গন্ধশূন্য জমাট তেলকে ঘির রং ও গন্ধ দিয়া বেমালুম ঘি বলিয়া চালান হইতেছে। ভয়সা ঘি মফঃস্বল হইতে কলিকাতায় খাঁটি অবস্থায় আসিয়াও পরে ভেজাল-মিশ্রিত হইয়া বাংলার সর্ব্বত্র চলিতেছে। সে দিক দিয়া দেখিতে গেলে বাংলায় ভয়সা ঘির আমদানি পৌনে দুই কোটি টাকার হইলেও ভেজাল হওয়ার পর মোট মূল্য অনেক বেশী দাঁড়ায়। গাওয়া ঘি সম্বন্ধে গান্ধীজী ১৯৩৫, ২রা নবেম্বরের 'হরিজনে' লিখিয়াছেন :—

যাহারা পারে তাহারা ঘি ব্যবহার করিতে ভালবাসে। প্রায় সকল প্রকার মিষ্টান্নেই ঘি থাকে। কিন্তু তবুও হয়ত এই কারণেই ঘিতে সব চাইতে বেশী ভেজাল দেওয়া হয়। বাজারে যত ঘি পাওয়া যায় তাহার খুব বেশী অংশ নিঃসন্দেহ ভেজাল। কতকগুলি ঘি যদিবা অধিকাংশ ঘিই না হউক, এমন হানিকর পদার্থ দ্বারা ভেজাল দেওয়া হয় যাহা অমাংসাশীরা খাইতে পারে না। তেল দ্বারাও ঘি ভেজাল করা হয়।

মগন-বাড়ীকে আমরা কেবলমাত্র গাওয়া ঘি সংগ্রহ করার জন্য নির্দ্দিষ্ট করিয়াছি। ইহাতে আমাদের অনেক অসুবিধা হইয়াছে, দামও দিতে হইতেছে খুব। মণকরা ১০০৲ টাকা দাম, তাহার উপর রেলভাড়া আমরা দিতেছি।

* * *

ব্যক্তিগত লাভের জন্য ব্যবসা চালাইতে যে কুশলতার প্রয়োগ করা হয় তাহার অর্দ্ধেক যদি জনসাধারণের স্বার্থে প্রতিষ্ঠিত গোশালা বা খাদ্যদ্রব্যের দোকান চালাইবার জন্য নিয়োজিত হইত তবে সেগুলি স্বাবলম্বী হইতে পারিত। এই প্রকার অনুষ্ঠানের স্বাবলম্বী হওয়ার পথে একমাত্র বাধা এই যে জনসাধারণ এই সকল অনুষ্ঠানে কুশলতা বা মূলধন নিয়োগ করিতে নারাজ; বরং অন্নসত্র খুলিয়া অলস ভিখারীর সংখ্যা বাড়াইতে ধনীর সহৃদয়তা ব্যয় হইয়া যায়।...

বাংলায় খাদি প্রতিষ্ঠান গান্ধীজীর কল্পিত এই কার্য্য হাতে লইয়াছে। বিশুদ্ধ ভেজাল-শূন্য গাওয়া ঘি পাওয়ার দিকে দেশবাসীর সতর্ক সাগ্রহ দৃষ্টি পড়িলে বাংলার আর্থিক অবস্থা ও স্বাস্থ্যের যে বিপুল উন্নতি হইবে সেবিষয়ে সংশয় নাই। বাংলায় ম্যালেরিয়া, নিউমোনিয়া, কলেরা ও ক্ষয় রোগের প্রকোপ বাড়িয়াই চলিয়াছে। ডাক্তারখানা ও হাসপাতাল এ সকল রোগ প্রতিষেধ করিতে পারে নাই। সাধারণ স্বাস্থ্যের উন্নতির সঙ্গে সঙ্গে এ সকল রোগ ও অন্যান্য ভাবে অকালমৃত্যু কমিয়া গিয়া বাংলাকে স্বাস্থ্যে শিল্পে আনন্দে পূর্ণ করিয়া তুলিতে পারে। পৌনে দুই কোটি টাকার ঘি অন্য প্রদেশ হইতে আমদানী বন্ধ করিয়া প্রায় চার কোটি টাকার ঘি বাংলার কুটীরে বৎসর বৎসর উৎপাদন করা ও তাহার দ্বারা স্বাস্থ্য লাভ করা ও বেকারত্ব দূর করার মত একটা বড় কুটীরশিল্পের দিকে বাঙালীর দৃষ্টি আকৃষ্ট হওয়া আবশ্যক।

পুস্তক পরিচয়

হনুমানের স্বপ্ন ইত্যাদি গল্প—পরশুরাম রচিত ও শ্রীযতীন্দ্রকুমার সেন বিচিত্রিত। এম. সি. সরকার এণ্ড সন্স লিঃ। মূল্য দেড় টাকা।

বাঙালী পাঠকের নিকট পরশুরামের পরিচয় নিষ্প্রয়োজন। প্রচ্ছন্ন শ্লেষের তীব্র রসে সিক্ত বিমল রসসাহিত্যের পরিবেশনে ইনি সাক্ষাৎ নলরাজ। আলোচ্য পুস্তকটির একমাত্র দোষ ইহা বড়ই শীঘ্র শেষ হইয়া যায়। "হনুমানের স্বপ্ন" ও "প্রেমচক্র" এই দুইটিই সাহিত্যরসিক মাত্রেই উপভোগ করিবেন। অন্য গল্পগুলিও পাঠককে বিশেষ আনন্দ দান করিবে। এবারকার গল্পসমষ্টিতে আধুনিক ও পৌরাণিক প্রসঙ্গের "বঙ্গ-তরণ" সংস্করণই অধিক। পরশুরামের অনুপম ভাষার সমতায় পৌরাণিক ও আধুনিকের মধ্যে সেতুবন্ধ হইয়াছে।

পরশুরামের গল্পগুলি তাঁহার অন্য কারবারেও ঔষধ-হিসাবে প্রচলন করা উচিত। দুরারোগ্য "বিরহ ব্যাধি"ও ইহার প্রয়োগে উপশম হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। অন্য রোগেও এই বইখানির আটটি গল্প অষ্টরসায়নের কাজ করিবে। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রকুমার সেনের অঙ্কিত চিত্রগুলি রসের সৌষ্ঠব বৃদ্ধি করিয়াছে।

ক. চ.

বাপুর প্রথম ভাগ (গল্পসঞ্চয়ন) শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় প্রণীত। ১৮৩ পৃষ্ঠা, মূল্য দেড় টাকা। প্রকাশক—রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, ২৫।২ মোহন বাগান রো, কলিকাতা।

শ্রীযুক্ত বিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায় বাংলা সাহিত্যে সুপরিচিত। সুপরিচিত বলিলেই সবটা বলা হয় না, স্বকীয় বৈশিষ্ট্য এবং লিপিকুশলতার জন্য তিনি খ্যাতিমান লেখক। তাঁহার কারবার প্রধানত ব্যঙ্গ-কৌতুকোজ্জ্বল হাস্যরস লইয়া। বাংলা সাহিত্যে হাস্যরসের কারবারীর সংখ্যা বড় বেশী নয়। রবীন্দ্রোত্তর যুগের এ রসের কারবারীর কথা আলোচনা করিতে গেলে স্বর্গীয় প্রভাতকুমারের নাম সর্বাগ্রে মনে পড়ে। তাঁহার পর খ্যাতিমান পরশুরাম এবং সুরসিক শ্রীযুক্ত কেদারনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় আপন আপন বৈশিষ্ট্য অনুসারে স্বকীয় ভঙ্গীতে এই রসস্রোতকে আরও পুষ্ট করিয়াছেন। বিভূতি বাবু তাঁহাদের পরে আসিয়া সে প্রবাহকে আরও পুষ্ট করিতেছেন। বিভূতি বাবুর ধারা এবং বৈশিষ্ট্য তাঁহার পূর্ব্বগামিগণ হইতে সম্পূর্ণরূপে বিভিন্ন, একান্তভাবে সে তাঁহার স্বকীয়। সেই তাঁহার সব চেয়ে বড় পরিচয়।

বইখানির প্রত্যেকটি গল্প হাস্যোজ্জ্বল মধুর রসে নিটোল আঙুরের মত সুন্দর এবং উপাদেয়। দুঃখপীড়িত বাঙালীর ম্রিয়মান মনে তাঁহার এ পরিবেশন স্নিগ্ধ অমৃত পরিবেশন, বাঙালী পাঠক-পাঠিকার মুখে পুলকের হাসি ফুটিয়া উঠিবে।

বাপুর প্রথম ভাগ গল্পটি খুব উচ্চশ্রেণীর গল্প— এই গল্পটি পূর্বে প্রবাসীর গল্পপ্রতিযোগিতায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিল। গল্পটির পরিশেষের করুণ অথচ সুমধুর বেদনা মনের মধ্যে এমন একটি রেখা টানিয়া দেয় যাহা মুছিবার নয়। অকালবোধন গল্পটি অনুরূপ সুন্দর।

পৃথ্বীরাজ, বি. এন. ডব্লু. র ব্রাঞ্চ লাইন, একরাত্রি, গল্পভুক্ত প্রভৃতি গল্পগুলিও প্রথম শ্রেণীতে স্থান পাইবার যোগ্য। বিভূতি বাবুর দ্বিতীয় পুস্তকের অপেক্ষায় বাঙালী পাঠকসমাজ উদ্গ্রীব হইয়া থাকিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

মহারাষ্ট্রীয় উপকথা—শ্রীঅমিতা কুমারী বসু। আশুতোষ লাইব্রেরী, কলিকাতা। মূল্য দশ আনা।

ভারতবর্ষের সকল প্রদেশের উপকথা সংগৃহীত হইয়া বাংলা ভাষায় লিখিত হওয়া আবশ্যক। কতকগুলি হিন্দুস্থানী উপকথা কয়েক বৎসর হইল বাংলায় লিখিত হইয়া পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়াছে। আলোচ্য পুস্তকখানিতে কয়েকটি মহারাষ্ট্রীয় উপকথা সংগৃহীত হইয়াছে। বহিখানি ছেলেমেয়েদের জন্য তাহাদের উপযোগী ভাষায় লিখিত। আমরা দেখিয়াছি, তাহারা ইহা আগ্রহের সহিত পড়ে। ইহাতে অনেকগুলি ছবি আছে। চিত্রগুলি ইহার আকর্ষণ বৃদ্ধি করিয়াছে।

চ.

মারাঠা জাতির বিকাশ—(সরল কাহিনী) সর্ যদুনাথ সরকার, এম. এ., ডি. লিট্. প্রণীত। রঞ্জন পাব্লিশিং হাউস, ২৫।২ মোহনবাগান রো, কলিকাতা, ১৩৪৩। পৃ. ৮০, মূল্য ॥৹

মহারাষ্ট্র দেশের জাতীয় বিকাশের ইতিহাস উদ্ধারের কার্য্য বর্ত্তমান যুগের ভারতীয় ঐতিহাসিক গবেষণার একটি বিশেষ উল্লেখযোগ্য ঘটনা। বহু কর্ম্মীর অশ্রান্ত পরিশ্রমে এই উদ্ধারকার্য্য সম্পন্ন হইয়াছে এবং হইতেছে। এইরূপ কার্য্য অন্য সব প্রদেশে এখনও হয় নাই। সুতরাং মহারাষ্ট্রে ঐ কার্য্য কিরূপে অনুষ্ঠিত হইয়াছে তাহা জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। সেই জন্য সর্ যদুনাথের মত বিশেষজ্ঞ ব্যক্তি এই সরল কাহিনী লিখিয়া সাধারণের কৌতূহল বৃদ্ধি করিয়া উপকার সাধন করিয়াছেন। মারাঠা জাতি, শিবাজী, পেশোয়াগণ এবং মারাঠী ঐতিহাসিক সাহিত্য বিষয়ে তিনি বঙ্গীয়-সাহিত্য-পরিষদে যে সব বক্তৃতা করিয়াছিলেন তাহা পুস্তকাকারে প্রকাশিত হইয়া সাধারণ পাঠককে ঐতিহাসিক সাহিত্যের দিকে অধিকতর আকৃষ্ট করিবে আশা করা যায়।

শ্রীরমেশ বসু

বৈতরণী তীরে—"বনফুল"। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃষ্ঠা সংখ্যা ১৪৬। মূল্য ১।৹

ডাক্তারের নিদ্রাহীন চোখের সামনে মৃতেরা আসিয়া দাঁড়াইয়াছে, সব অপহৃত অশরীরী তাহাদের পরিচয় দিয়া যাইতেছে। আখ্যানভাগের একটি এই। পটভূমিকা—বর্ষারজনী, দূরে ভুজঙ্গকবলিত একটি ভেকের আর্তস্বর।

পাশাপাশি ডাক্তারের নিজের জীবনের বিষাদময় কাহিনী চলিয়াছে

সমস্ত বইখানির মূলরস করুণরস, সঙ্গে সঙ্গে বীভৎস রসের মিশ্রণ আছে এবং এক-এক জায়গায় তাহাই মুখ্য হইয়া পড়িয়াছে। লেখক জীবনের ট্র্যাজেডির দিকটা নানা বিচিত্রতায় দেখাইয়াছেন, আর জীবনাতীত একটি অবস্থার মধ্য দিয়া দেখাইয়াছেন বলিয়া সেই ট্র্যাজেডি

এমন একটি অস্বস্তিকর আলোয় ফুটিয়া উঠিয়াছে যাহাকে ইংরেজীতে বলা হয় আনক্যানি (uncanny)।

এই সত্য এক এক স্থানে অসহ্য, অথচ লেখার এমন মুন্সিয়ানা যে অসহ্য হইলেও তাহা অমোঘ আকর্ষণে টানে।

ভাষা বেশ সুললিত, মাঝে মাঝে ছন্দের ঝঙ্কার তাহার সুরটি আরও মিষ্ট করিয়া তুলিয়াছে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বালীর ইতিহাসের ভূমিকা—শ্রীপ্রভাসচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায় বি-এ। গ্রন্থকার কর্ত্তৃক পঞ্চাননতলা ষ্ট্রীট, বালী পোঃ, জেলা হাওড়া হইতে প্রকাশিত। মূল্য এক আনা।

কলিকাতার সন্নিহিত অনতিপ্রাচীন কালে পাণ্ডিত্যের জন্য সুপ্রসিদ্ধ বালী নামক স্থানের প্রাচীন ইতিবৃত্তের দিগ্‌দর্শন এই পুস্তিকার উদ্দেশ্য। তাই ইহার মধ্যে স্থানীয় প্রাচীন গৌরবের সমস্ত নিদর্শনের বিস্তৃত বিবরণ থাকিতে পারে না বা নাই। তবে যতটুকু বিবরণ দেওয়া হইয়াছে তাহা হইতেই স্থানটির বৈশিষ্ট্য সম্বন্ধে একটা ধারণা জন্মে। আশা করি গ্রন্থকার ভবিষ্যতে আরও উপকরণ সংগ্রহ করিয়া একটি বিস্তৃততর ও অপেক্ষাকৃত পূর্ণাঙ্গ বিবরণ প্রকাশ করিয়া পাঠকের কৌতূহল নিবৃত্তি করিবেন। ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্থানের এইরূপ বিবরণ সংকলিত হইলে সমগ্র দেশের ইতিহাস রচনার সুবিধা হইবে—স্থানীয় স্কুল-পাঠশালার ছাত্রদের মধ্যে এই জাতীয় পুস্তকের বহুল প্রচারের ব্যবস্থা করিলে তাহাদের অনেক উপকার হইবে—ইতিহাস আলোচনা করিতে তাহাদের আগ্রহ বাড়িবে।

আয়ুর্ব্বিজ্ঞান রত্নাকরঃ—কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দর্শনশাস্ত্রী তর্কদর্শনতীর্থায়ুর্ব্বেদাচার্য্যেণ প্রণীতঃ। শ্রীজ্যোতিরিন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্যেণ প্রকাশিতঃ। কলিকাতা, পি ৪৬নং মাণিকতলা স্পার। মূল্য ৩৲ টাকা।

চিকিৎসাক্ষেত্রে লব্ধপ্রতিষ্ঠ কবিরাজ শ্রীযোগেন্দ্রনাথ দর্শনতীর্থ মহাশয় আলোচ্য গ্রন্থে সরল বিশুদ্ধ সংস্কৃত ভাষায় আয়ুর্ব্বেদের মূল তত্ত্ব বায়ু, পিত্ত ও কফের রহস্য বিবৃত করিয়াছেন। বায়ু, পিত্ত ও কফের নানারূপ বিকারে মানবদেহে যে বিভিন্ন অসুস্থতার লক্ষণ প্রকাশ পায় তাহা নির্দ্দেশ করিয়া গ্রন্থকার একে একে সাধারণ ভাবে তাহাদের প্রতীকারের উপায় নিরূপণ করিয়াছেন। গ্রন্থের প্রামাণ্যবৃদ্ধির জন্য স্থানে স্থানে আয়ুর্ব্বেদের মূল গ্রন্থের বচন উদ্ধৃত হইয়াছে। সাধারণের বোধসৌকর্য্যার্থে প্রত্যেক সন্দর্ভের পর একটি আক্ষরিক বঙ্গানুবাদ দেওয়া হইয়াছে। ফলে গ্রন্থখানি যে কেবল আয়ুর্ব্বেদের প্রথম শিক্ষার্থীর উপকারে আসিবে তাহা নহে, সাধারণ গৃহস্থও ইহা পাঠ করিয়া স্বাস্থ্য সম্বন্ধে অনেক অবশ্য-জ্ঞাতব্য বৈজ্ঞানিক তথ্য জানিতে পারিবেন। দুঃখের বিষয়, গ্রন্থের সংস্কৃত অংশ বঙ্গাক্ষরে মুদ্রিত হওয়ায় ইহার আশানুরূপ প্রচার বাধাপ্রাপ্ত হইবে—অবাঙালী ইহার রসাস্বাদনে বঞ্চিত থাকিবে। দুরূহ শব্দের টিপ্পনী সহ নাগরী অক্ষরে একটি সংস্করণ প্রকাশিত হইলে ইহার প্রচার বৃদ্ধি পাইবে—সমগ্র ভারতের আয়ুর্ব্বেদানুরাগী ব্যক্তিগণের মধ্যে ইহার আদর হইবে এবং গ্রন্থকারের শ্রম সফল হইবে। আশা করি, গ্রন্থকার ও প্রকাশক মহাশয় এইরূপ আর একটি সংস্করণ প্রকাশের উপযোগিতা বিচার করিয়া দেখিবেন।

যাজ্ঞবল্ক্যের অদ্বৈতবাদ—শ্রীহীরেন্দ্রনাথ দত্ত, এম-এ, বি-এল প্রণীত। প্রকাশক—শ্রীসৌরীন্দ্রনাথ দত্ত, ১৩৯ বি, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য ১৷৹।

বৃহদারণ্যক উপনিষদে যাজ্ঞবল্ক্যের যে দার্শনিক মতবাদ বিবৃত হইয়াছে, আলোচ্য গ্রন্থে শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রবাবু তাঁহার স্বাভাবিক সরল ভঙ্গীতে তাহারই বিস্তৃত বিশ্লেষণ করিয়াছেন। বক্তব্য পরিস্ফুট করিবার জন্য প্রসঙ্গক্রমে স্থানে স্থানে অন্যান্য গ্রন্থ হইতে যাজ্ঞবল্ক্যের অনুরূপ উক্তি উদ্ধৃত ও আলোচিত হইয়াছে। গ্রন্থের উপক্রমাংশে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্যক্তিগত জীবনবৃত্তান্ত ও অদ্বৈতবাদের মূল তত্ত্ব প্রতিপাদন করিয়া পরবর্ত্তী অংশে অদ্বৈতবাদপ্রসঙ্গে যাজ্ঞবল্ক্যের মতবাদ উপস্থাপিত ও বিচারিত হইয়াছে। উপক্রমাংশ ব্যতীত গ্রন্থের বাকী অংশ তিন খণ্ডে বিভক্ত। প্রথম খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের ব্রহ্মবাদের আলোচনা ও প্রসঙ্গতঃ জগৎ বা জড় যে তাঁহার অদ্বৈত দৃষ্টিতে মায়ামাত্র তাহা প্রদর্শন করা হইয়াছে। দ্বিতীয় খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের জীববাদ আলোচিত হইয়াছে এবং জীব ও ব্রহ্মের পরস্পরসম্বন্ধ ও জীবের বিভিন্ন অবস্থার বিবরণ দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় খণ্ডে যাজ্ঞবল্ক্যের মোক্ষবাদের বিশ্লেষণ-প্রসঙ্গে মুক্তির স্বরূপ, মুক্তের অবস্থা প্রভৃতি বিষয় আলোচিত হইয়াছে। বৃহদারণ্যক উপনিষদের যে সুশৃঙ্খল দার্শনিক সমালোচনা বর্ত্তমান গ্রন্থে করা হইয়াছে তাহাতে উপনিষৎ-সাহিত্যের প্রকৃত রহস্য বুঝিবার সুবিধা হইবে—পাঠকের চিত্ত আকৃষ্ট হইবে। প্রাচীন গ্রন্থ ও গ্রন্থকারের মতবাদ-বিশ্লেষণ নিমিত্ত রচিত এ জাতীয় গ্রন্থ বাঙালী পাঠকের আদরের বস্তু—বাংলা সাহিত্যের গৌরবের ধন।

শ্রীচিন্তাহরণ চক্রবর্ত্তী

পারস্য-প্রতিভা—মোহম্মদ বর্কতুল্লাহ্, এম এ, বি এল্, বি-সি-এস প্রণীত। প্রকাশক মোহাম্মদ আলতাফ হোসেন, সিরাজগঞ্জ, পাবনা। প্রথম খণ্ড, তৃতীয় সংস্করণ, মূল্য পাঁচ সিকা। দ্বিতীয় খণ্ড, প্রথম সংস্করণ, মূল্য ঐ।

পারস্য-প্রতিভা, প্রথম খণ্ডের ইতিমধ্যেই তৃতীয় সংস্করণ হইয়া গিয়াছে। ইহা হইতেই বুঝা যায় পুস্তকখানি কিরূপ লোকপ্রিয় হইয়াছে। ইহাতে পারস্য-সাহিত্য, কবি ফের্দৌসী, ওমর খাইয়াম, শেখ সাদী, কবি হাফেজ ও জালালুদ্দীন রুমী এই ছয়টি প্রবন্ধ স্থান পাইয়াছে। লেখকের ভাব চমৎকার, গতি সাবলীল, বিষয় বিশ্লেষণ সুন্দর। ইদানীং মুসলমানী বাংলার মরুভূমির মধ্যে এরূপ সাহিত্যরচনা বাস্তবিকই সাহসের পরিচয়। কয়েক ছত্র উদ্ধৃত করিতেছি, "আলেকজান্দার ফিলিপ্সের পাদমূল হইতে পারস্য-সাগরের উপকূল পর্য্যন্ত প্রসারিত বিশাল পারস্যভূমি কতকাল পূর্ব্বে সভ্যতার আলোকে উদ্ভাসিত হইয়াছিল, ইতিহাস সহস্র চেষ্টা করিয়াও তাহা নির্ণয় করিতে পারে নাই। আর্য্য-অধ্যুষিত এই ইরানভূমিতে যখন বেদ ও গায়ত্রীর সুমধুর স্তোকমালা গীত হইত, আর্য্যবৃন্দগণ যখন সামগান নিনাদিত করিয়া গৃহে গৃহে সন্ধ্যা-আরতি প্রদান করিত, সেদিনের ইতিহাস বহুদেবও ভালরূপে বলিতে পারে না।"

পারস্য-প্রতিভা, দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্যের উন্নত যুগ, ফরিদুদ্দীন আত্তার, নাসির খসরু ও ইসমাইলী মত, নেজামী, জামী, সুফীমত ও বেদান্ত, সুফীমত ও নিও-প্লেটোনিজম—এই সাতটি প্রবন্ধ সন্নিবিষ্ট হইয়াছে। প্রথম খণ্ডে যেমন পারস্য কবিদের ও তাঁহাদের কাব্যের পরিচয় মিলিবে, দ্বিতীয় খণ্ডে পারস্য দার্শনিক কবি মনীষীদের জীবন ও মতামত আলোচিত হইয়াছে। এই দুই খণ্ড একত্রে পাঠ করিলে মধ্যযুগে পারস্যে যে অমর কাব্য ও দর্শন-তত্ত্ব সৃষ্টি হইয়াছিল তাহার সঙ্গে শিক্ষিত জনের পরিচয় হইবে। পারস্য-প্রতিভা বাস্তবিকই বঙ্গসাহিত্যের গৌরব বৃদ্ধি করিয়াছে।

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

কালনিদ্রা—শ্রীচারুচন্দ্র রায় প্রণীত, চন্দননগর হইতে প্রকাশিত।

গ্রন্থটি কয়েকটি ছোটগল্পের সমষ্টি; লেখক চিন্তাশীল ও রসিক প্রবন্ধকাররূপে বাংলা সাহিত্যের ক্ষেত্রে সুপরিচিত। কথাসাহিত্যের ক্ষেত্রে তাঁহার নূতন প্রবেশ; গল্পগুলি কতকটা, যাহাকে আধুনিক পাঠক বলিবেন, সেকেলে ধরণের, অর্থাৎ নিছক গল্প; তাহাদের মধ্যে মনস্তত্ত্বের সুদীর্ঘ বর্ণনা, চতুর চরিত্রবিশ্লেষণ ইত্যাদি নাই। সকল গল্পের মধ্যে একটি যোগসূত্র চোখে পড়িল, তাহা মানুষের প্রতি লেখকের দরদ, যে-দরদ দেশকাল পাত্রের অপেক্ষা রাখে না। সেই দরদই রঙ্গরসের ভিতর দিয়া তাঁহার অন্য রচনায় ফুটিয়া উঠিয়াছে। ভবিষ্যতে লোকে হয়ত প্রবন্ধকাররূপেই তাঁহাকে স্মরণ করিবে, কিন্তু বর্ত্তমান কালের লোকে তাঁহার গল্পগুলি পড়িয়া তৃপ্তি পাইবে, সন্দেহ নাই।

শ্রীঅনাথনাথ বসু

বিজ্ঞানের জয়যাত্রা — শ্রীক্ষিতীন্দ্রনারায়ণ ভট্টাচার্য্য, এম্-এস্‌সি প্রণীত। রামধনু-কার্য্যালয়, ১৬ নং টাউনসেণ্ড রোড, কলিকাতা হইতে শ্রীবিভূতিভূষণ চট্টোপাধ্যায় কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ৬০। দাম দশ আনা।

এই বিজ্ঞানের বইখানিতে 'আলকাৎরার গুণ', 'আবর্জ্জনার দাম', 'জলের কাণ্ড,' 'ঘরের বাজে', 'মুখিমামা', 'ঘড়ির কথা' প্রভৃতি দশটি বৈজ্ঞানিক নিবন্ধ আছে। এই নিবন্ধগুলি অতি সরল ভাষায় ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত। এই সব বৈজ্ঞানিক আবিষ্কারের কাহিনী পড়িয়া যে তাহারা আনন্দ পাইবে, তদ্বিষয়ে সন্দেহ নাই। শেষের প্রবন্ধটির নাম 'ওরা ও আমরা' দিবার সার্থকতা কি বুঝিতে পারিলাম না।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

লীয়ারের কথা—শ্রীসুনীতিরমণ ঠাকুর। প্রকাশক—ক্যালকাটা পাব্‌লিশার্স, ১৯এ, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। মূল্য আট আনা।

উইলিয়ম শেক্‌স্‌পীয়রের কিং লীয়ার অবলম্বনে লেখক বইখানি ছেলে-মেয়েদের জন্য লিখিয়াছেন। বিশ্বসাহিত্যের উল্লেখযোগ্য বইগুলির এইরূপ সংস্করণ বালক-বালিকাদের নিকট বিশেষ আদরণীয় হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই। লেখকের চেষ্টা প্রশংসনীয়। বইখানি পড়িতে ভাল লাগিয়াছে। কিন্তু ভাষা শিশুবোধ্য হইয়াছে বলিয়া মনে হইল না। ছেলেমেয়েদের জন্য লিখিত বইয়ের ভাষা আরও সহজ ও তরল হওয়া দরকার।

শ্রীহীরেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

বাসন্তী গীতা—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ ভাগবতরত্ন প্রণীত। ১২ নং পেয়ারাবাগান ষ্ট্রীট, কলিকাতা এই ঠিকানায় গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা ও দশ আনা। এই সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

কাব্যময় গদ্যে লিখিত এই চিন্তাগুচ্ছ বহু বর্ষ পূর্ব্বে 'নব্যভারতে' প্রকাশিত হইলে বহু রসজ্ঞ ব্যক্তির দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। বর্ত্তমানে ইহা গ্রন্থাকারে মুদ্রিত হইয়াছে।

অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ ও প্রভুপাদ শ্রীমৎ সত্যানন্দ গোস্বামী সিদ্ধান্তরত্ন এই গ্রন্থের ভূমিকা লিখিয়াছেন।

প্রণতি—শ্রীশ্রীশচন্দ্র বেদান্তভূষণ, ভাগবতরত্ন প্রণীত। গ্রন্থকারের নিকট প্রাপ্তব্য। মূল্য আট আনা ও দশ আনা। এই সংস্করণের বিক্রয়লব্ধ অর্থ ত্রিপুরা হিতসাধিনী সভার গৃহনির্ম্মাণ ভাণ্ডারে অর্পিত হইবে।

ভক্তিরসাপ্লুত এই কবিতাগুচ্ছ ভক্তচিত্তের প্রীতিকর হইবে। 'পরিচিতি' উপলক্ষ্যে শ্রীযতীন্দ্রমোহন বাগচী লিখিয়াছেন, "ছন্দোবন্ধে ব রচনারীতিতে বৈচিত্র্য সৌষ্ঠবের ন্যূনতা থাকিলেও তাঁহার উপাসনামন্ত্রে আবিলতা নাই; তাঁহার ভগবৎপ্রেমের কবিতাগুলি তাই সরল, স্বচ্ছ ও চিত্তগ্রাহী।" 'পরিচায়িকা'য় শ্রীকালিদাস রায় লিখিয়াছেন, "দেবতার প্রসাদ যেমন ভক্তবৃন্দের মধ্যে বিতীর্ণ হয়, হাটবাজারে বিকীর্ণ হয় না… এই কবিতাগুলিও সেইরূপ ভক্তজনের জন্য উদ্দিষ্ট—সাহিত্যের গঞ্জবাজারের জন্য নহে।"

ঐতিহাসিক গল্প-সঞ্চয়ন—শ্রীগজেন্দ্রকুমার মিত্র ও শ্রীসুমথনাথ ঘোষ কর্ত্তৃক সম্পাদিত। প্রাপ্তিস্থান মিত্র এণ্ড ঘোষ, ১০ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা। পৃ. ১০০। মূল্য পাঁচ সিকা। সচিত্র।

এই বহির প্রকাশকের উদ্যোগ প্রশংসাই। বালক-বালিকাদের জন্য রচিত পুস্তকের সংখ্যা আমাদের দেশে গত কয়েক বৎসরে অনেক বাড়িয়াছে, কিন্তু তাহার অধিকাংশই একই ধরণের রচনা, তাহাতে বৈচিত্র্য ও শিক্ষাপ্রদ বিষয়ের প্রাচুর্য্য নাই। এই বহির অধিকাংশ রচনায় হিতকারী ও মনোহরের সমাবেশ হইয়াছে। স্যর্ যদুনাথ সরকার-প্রমুখ প্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও খ্যাতনামা সাহিত্যিকগণের রচিত বহি হইতে কিশোরবয়স্কদিগের চিত্তাকর্ষক ঐতিহাসিক বিবরণ ও কাহিনী এই পুস্তকে গ্রথিত হইয়াছে, অনেকগুলি নূতন রচনাও আছে।

পঠন-পাঠনের দোষে ইতিহাস অনেক সময় গণিতের তুল্য হইয়া দাঁড়ায়। এই ধরণের বহি সেই ইতিহাসভীতি দূর করিতে সহায়তা করিবে।

অবশ্য, এই পুস্তকে প্রকাশিত সবগুলি রচনাই উচ্চশ্রেণীর নয়। কোন কোনটিতে যে-সকল তথ্য তারিখ দেওয়া হইয়াছে তাহা নির্ভুল নয়। 'বাঙ্গাল গেজেট' ১৮১৮ খ্রীষ্টাব্দে প্রকাশিত হয়,—১৮১৬ খ্রীষ্টাব্দে নয়। বাংলা সংবাদপত্র সম্বন্ধে বিশেষ আলোচনায় সম্প্রতি স্থির হইয়াছে যে, 'সমাচার দর্পণ' প্রথম বাংলা সংবাদপত্র,—'বাঙ্গাল গেজেট' নয়। "ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগের পূর্ব্বেই ভারতবর্ষের অন্যান্য প্রদেশে সংবাদপত্র দেখা দিতে আরম্ভ করে।" কোন কোন রচনা অত্যন্ত সংক্ষিপ্ত, এইরূপ রচনা এই বহির পাঠক-পাঠিকাদের প্রীতিকর হইবে না। 'বাঙালীর বৈশিষ্ট্য' প্রবন্ধে বাঙালীর যে-সব দোষের অভাব বা গুণের কথা সাধারণ ভাবে উল্লিখিত হইয়াছে তাহার যে-কোন একটির সম্বন্ধে কোন কাহিনী একটু বিস্তারিত করিয়া লিখিলে রচনাটি অধিক চিত্তগ্রাহী হইত।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

আদর্শ ফলকর—শ্রীঅমরনাথ রায় প্রণীত। প্রকাশক—ঘোষ নার্সারী, কলেজ ষ্ট্রীট মার্কেট, কলিকাতা। মূল্য ১৷০ টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানিতে অনেক জ্ঞাতব্য তথ্য থাকিলেও ইহা গ্রন্থকারের অন্যান্য পুস্তকের ন্যায় সুখপাঠ্য হয় নাই। ইহাতে এমন অনেক কথা আছে যাহা লেখকের অভিজ্ঞতাপ্রসূত নহে; অল্পবিস্তর ভুলও আছে। মোটের উপর বইখানি ভাল।

শ্রীযতীন্দ্রমোহন দত্ত

কেশবচন্দ্র ও বঙ্গসাহিত্য—শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত প্রণীত। প্রকাশক ইণ্ডিয়ান পাবলিশিং হাউস। মূল্য তিন টাকা।

'শিশু'-সাহিত্যিক ও সুপণ্ডিত ঐতিহাসিক শ্রীযুক্ত যোগেন্দ্রনাথ গুপ্ত কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে যে কথাগুলি বর্ত্তমান বাঙালী সমাজকে নূতন করিয়া শুনাইয়াছেন তাহা অতিশয় সময়োচিত হইয়াছে। কেশবচন্দ্রের ধর্ম্মজীবন ও কর্ম্মজীবনের সুনিপুণ ও সুবিস্তৃত আলোচনা এককালে যথেষ্টই হইয়াছিল, এবং এই মহাপুরুষের মর্ত্তালীলা একদা সমগ্র দেশে যেভাবে যজ্ঞাগ্নির মত ভাস্বর হইয়া উঠিয়াছিল তাহাও স্মরণাতীত নহে; কিন্তু তাঁহার সেই অমর ভাব-মূর্ত্তি এক্ষণে কেবলমাত্র সম্প্রদায়-বিশেষের গুরু ও প্রতিষ্ঠাতারূপে পর্য্যবসিত হইয়াছে—জাতির ইতিহাসে, বৃহত্তর ক্ষেত্রে, তাঁহার আসন ভাল করিয়া নির্দ্দিষ্ট না হওয়ায়, তাঁহার সেই মূর্ত্তি ইদানীন্তন কালে যেন কতকটা আড়ালে পড়িয়াছে—বাঙালী আজ আর তাঁহাকে তেমন করিয়া স্মরণ করে না। গত শতাব্দীর বাঙালী-সমাজে যে-সকল যুগন্ধর প্রতিভাশালী ব্যক্তির আবির্ভাব হইয়াছিল, যাঁহাদের চরিত্র, মনীষা, ও প্রতিভার বলে বাঙালী জাতির অভাবনীয় অভ্যুদয় ঘটিয়াছিল, কেশবচন্দ্র তাঁহাদের অন্যতম—বর্ত্তমানের উপাসক আধুনিক বাঙালীকে সেই কথা স্মরণ করাইবার জন্য এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে। যোগেন্দ্র বাবু পুরাতন গ্রন্থ ও অধুনাতন বহু রচনা হইতে তথ্য সঙ্কলন করিয়া যে কেশব-কথা গ্রন্থন করিয়াছেন তাহাতে এই পুস্তকখানি অপেক্ষাকৃত স্বল্প পরিসরে এবং সহজ আবেগময়ী ভাষায় একালের শ্রম-বিমুখ পাঠক-সম্প্রদায়ের জ্ঞানার্জ্জন ও চিত্তবিনোদনের উপযোগী হইয়াছে; এজন্য লেখককে অভিনন্দিত করিতেছি।

কিন্তু সমালোচনা-প্রসঙ্গে কয়েকটি কথা এই স্থানে না বলিলে কর্ত্তব্য-হানি হয়। প্রথমতঃ এই গ্রন্থে কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে লেখকের যে একটু গোঁড়ামি বা special pleading প্রকাশ পাইয়াছে তাহা না থাকিলেই ভাল হইত। তিনি কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে শিক্ষিত সমাজের উপেক্ষা ও ঔদাসীন্য প্রভৃতির যে অভিযোগ করিয়াছেন তাহাতে স্বতঃই মনে হইতে পারে এত বড় প্রতিভা ও মহত্ত্ব সত্ত্বেও কেশবচন্দ্র জাতির চিত্ত অধিকার করিতে পারেন নাই। কথাটা আদৌ ভাল নহে। কারণ ইহা যদি সত্য হয়, তবে তাহার কারণ সন্ধান করিতেও হয়; এবং কেবলমাত্র সম্প্রদায় বা মণ্ডলীবিশেষের অনুদারতাই তাহার কারণ এমন কথা বলিলে, বাঙালী জাতি ও কেশবচন্দ্র উভয়ের প্রতি অবিচার করা হয়। গ্রন্থকার কেবল এক তরফা গাহিয়াছেন সে কারণসন্ধানের প্রবৃত্তি বা অবসর তাঁহার ঘটে নাই। দ্বিতীয়তঃ, লেখক বঙ্গসাহিত্যে কেশবচন্দ্রের জন্য যে অত্যুচ্চ স্থান দাবী করিয়াছেন, এ গ্রন্থে সে পক্ষে যে যুক্তি ও প্রমাণ আছে তাহা আদৌ বিশ্বাসজনক নহে; এবং সে সম্বন্ধে যতটুকু আলোচনা করিয়াছেন তাহাও গ্রন্থের নামকরণের পক্ষে অতিশয় অপ্রতুল বলিতে হইবে। কেশবচন্দ্রের মহত্ত্ব—তাঁহার চরিত্রে, তাঁহার অপূর্ব্ব কর্ম্মপ্রেরণায় এবং ভগবৎ-প্রেমের এক অভিনব আদর্শস্থাপনে। তাঁহার বাগ্মিতা, সংবাদপত্র-পরিচালনা ও উপদেশদান বা ধর্ম্মব্যাখ্যান-শক্তি তাঁহার সেই বিশিষ্ট কর্ম্ম-প্রচেষ্টার সহায়ক হইয়াছিল, এবং এ সকল তাঁহার লোকোত্তর প্রতিভার নিদর্শন বটে। কিন্তু সে প্রতিভা ঠিক সাহিত্যিক প্রতিভা নহে। তাঁহার বক্তৃতাগুলিতে ইংরাজী ভাষা ও সাহিত্যে তাঁহার অসাধারণ ব্যুৎপত্তির পরিচয় পাওয়া যায়; এবং তাঁহার বাংলাতেও এই ইংরেজী প্রভাব—বিশেষ করিয়া ইংরাজী বাইবেল ও তজ্জাতীয় সাহিত্যের প্রভাব—অতিমাত্রায় পরিস্ফুট হওয়ায়, অধিকাংশ স্থলে তাহা মিশনরী বাংলা হইয়া উঠিয়াছে। এজন্য, pulpit oratoryর মত, তাঁহার ভাষায় একটি অভিনব ভঙ্গী থাকিলেও, এবং বাক্যযোজনা হিসাবে তাহা সরল হইলেও তাঁহার সেই রচনা বাংলা গদ্যসাহিত্যের পুষ্টিসাধন করে নাই। বরং তাঁহার শিষ্যগণ তাঁহার অনুপ্রেরণায় যে এক ধরণের সাহিত্য রচনা করিয়াছেন তাহাই বিষয়গুণে কতকটা উল্লেখযোগ্য। কেশবচন্দ্রের প্রতিভা ঠিকমত বুঝিতে পারিলে বাংলা-সাহিত্যে তাঁহার স্থান লইয়া কলহ বা বিতর্কের কোনও কারণ ঘটিবে না; কারণ সাহিত্যিক রূপে বরণীয় না হইলে তাঁহার মহিমার হ্রাস হয় না। এই জন্য, লেখক কেশবচন্দ্রকে একেবারে বঙ্কিমচন্দ্রের সমকক্ষ রূপে দাঁড় করাইতে গিয়া একটু অবিবেচনার কাজ করিয়াছেন।

এই গ্রন্থে তথ্য- ও তারিখ-ঘটিত ভ্রমপ্রমাদ আছে—তাহার অনেকগুলি অনবধানতাবশতঃ ঘটিয়াছে বলিয়া মনে হয়। আশা করি দ্বিতীয় সংস্করণে গ্রন্থকার এগুলি সংশোধন করিয়া দিবেন। পরিশেষে গ্রন্থকারকে একটি অনুরোধ জানাইতেছি—কেশবচন্দ্র সম্বন্ধে এই অতিশয় সময়োপযোগী ও চিত্তাকর্ষক গ্রন্থখানি যাহাতে কোনওরূপ ভ্রান্তি উৎপাদন না করে, সেজন্য পরবর্ত্তী সংস্করণে ইহার নামটিও পরিবর্ত্তিত করিলে ভাল হয়; তাহাতে গ্রন্থের মর্য্যাদা কিছুমাত্র ক্ষুণ্ণ হইবে না বরং পাঠকের ভুল ধারণাই দূর হইবে। কারণ, এই গ্রন্থে কেশবের ব্যক্তিত্ব, প্রতিভা, এবং ধর্ম্ম- ও কর্ম্ম-জীবনের কাহিনীই বিশেষভাবে কীর্ত্তিত হইয়াছে; এবং তৎসহ বঙ্গসাহিত্য সম্বন্ধে যে তথ্য ও তত্ত্বালোচনা আছে তাহা যেমন অবান্তর, তেমনই কেশবচন্দ্রের সাহিত্যিক পরিচয়ও তেমন গুরুতর নহে।

শ্রীমোহিতলাল মজুমদার

প্রাপ্তিস্বীকার

বিজ্ঞানে বিরোধ—(?)—বায়ু। শ্রীযতীন্দ্রনাথ রায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

বায়ু সম্বন্ধে বৈজ্ঞানিক আলোচনা।

দরদী—গল্পকার আবদুল বশির, বি-এল, প্রণীত। মূল্য চার আনা। গ্রন্থকারের নিকট টাঙ্গাইলে প্রাপ্তব্য। কাব্যগ্রন্থ।

বাংলার শ্রমিক—রমণীরঞ্জন গুহ-রায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা। প্রাপ্তিস্থান—২১, বাগবাজার ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

মায়া—শ্রীনারায়ণদাস মুখার্জ্জী প্রণীত। মূল্য চারি আনা। প্রাপ্তিস্থান—গ্রন্থগৃহ, ৯৯ বি, রাসবিহারী এভিনিউ, কলিকাতা। ছোটগল্প।

মনঃশক্তি-প্রভাব শিক্ষা—শ্রীরামানন্দ ঠাকুর প্রণীত। মূল্য বার আনা। প্রাপ্তিস্থান—১৮ বি, আশুতোষ দে লেন, কলিকাতা।

চিঠিতে সাধনা ও উপলব্ধি কথা—শ্রীনরেন্দ্রনাথ ব্রহ্মচারী সঙ্কলিত। মূল্য বার আনা। আধ্যাত্মিক বিষয়ে চিঠিপত্রের সংকলন।

শ্রীমদ্ ব্রহ্মবিজ্ঞান শ্রীশিবেন্দ্রকিশোর রায় চৌধুরী প্রণীত। মূল্য এক টাকা। প্রাপ্তিস্থান—শ্রীসচ্চিদানন্দ পুরী, মগুলা, ময়মনসিংহ।

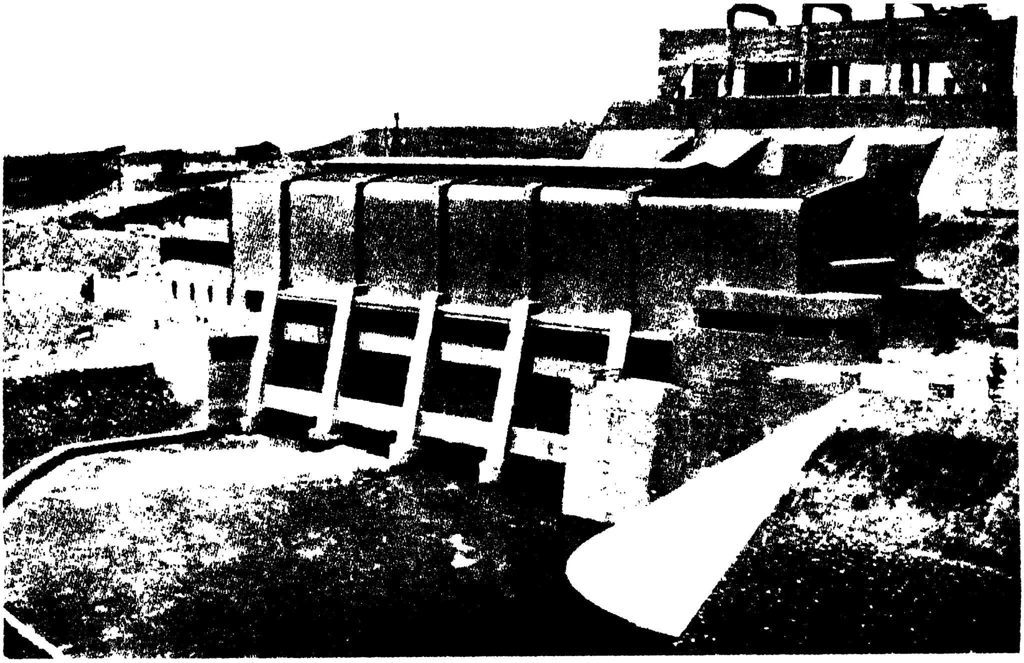
ব্রহ্ম ও আত্মা, অধ্যাত্মতত্ত্ব, উপাসক ও মুমুক্ষুদিগের কর্ত্তব্য প্রভৃতি বিষয়ের আলোচনা।

সত্যের পথ বা 'আমি'র সন্ধান—শ্রীনরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। মূল্য ছয় আনা।

'আত্মা' বা 'আমি' কি বস্তু, জীবনে উহাকে পাইতে হইলে কি ভাবে জীবন পরিচালিত করিতে হইবে......তাহারই নির্দ্দেশ।"

সত্য-গ্রন্থ—গজেন্দ্রমোহন মজুমদার প্রণীত। মূল্য এক আনা। প্রাপ্তিস্থান—৪১১ নং গোঁসাইপাড়া লেন, কলিকাতা।

পরশমণি—শ্রীমৎ সমাধিপ্রকাশ আরণ্য প্রণীত। মূল্য দুই আনা।



ইহুদীদের উদ্যোগে প্যালেষ্টাইনের অনেক আর্থিক উন্নতি সাধিত হইয়াছে। এই হাইড্রো-ইলেকট্রিক পাওয়ার ষ্টেশনে জর্ডনকে কাজে লাগানো হইয়াছে।



প্যালেষ্টাইনের ইহুদী উপনিবেশে আধুনিক যন্ত্রাদির সাহায্যে নিষ্ফলা পতিত জমিও কাজে লাগানো হইতেছে। প্যালেষ্টাইন-কমিশন সম্প্রতি সুপারিশ করিয়াছেন, প্যালেষ্টাইনের এক অংশে স্বতন্ত্র ইহুদী রাষ্ট্র স্থাপিত হউক।



প্যালেষ্টাইনের যাযাবর বেদুইন। পশুপালনই ইহাদের জীবিকার অবলম্বন।



প্যালেষ্টাইনের ‘ফেলাহীন’—আরব পার্ব্বত্য গ্রামে ইহাদের বাস, চাষবাস ইহাদের জীবিকার উপায়।



ট্রান্স-জর্ডনের শাসনকর্ত্তা আমীর আবদুল্লা (উপরে) ও তাঁহার রক্ষীবৃন্দ। প্যালেষ্টাইন-কমিশন সম্প্রতি সুপারিশ করিয়াছেন যে প্যালেষ্টাইনের এক অংশ ট্রান্স-জর্ডনের সহিত যোগে স্বতন্ত্র আরব-রাষ্ট্র গঠিত হইবে।



মস্কটে ডাক-ষ্টীমার



তুরস্কের বুর্সা নগরের দৃশ্য



সিরিয়ার টেল-বিশের বিচিত্র মৃন্ময় গৃহাবলী

বাসা-বদল

শ্রীবিজয় গুপ্ত

কলকাতার ভাড়াবাড়ী। আজ এখানে কাল ওখানে, যেন ঘূর্ণী ঝড়ে শুকনো পাতা। এ যাযাবর-বৃত্তির শেষ নেই। এর মধ্যে নূতনত্ব আছে, কিন্তু সোয়াস্তি নেই। মাইনে কমে গেছে, চৌদ্দ টাকা ভাড়া দিয়ে আর পোষায় না। ক'টা রোববার খুঁজে খুঁজে একটা বাড়ী বার করেছি,—বাড়ী নয়, বাড়ীওয়ালার অপ্রয়োজনীয় একটা ছোট ঘর, তারই কোণের একটা সঙ্কীর্ণ বারান্দায় দরমা-দিয়ে-ঘেরা রান্নাঘর। গরিবদের জন্যে কলকাতার ভাড়াবাড়ীর কি বিচিত্র কৌশল! বাড়ীওয়ালা ভাড়া দিতে চান নি, যেতেই বললেন, 'দেখুন, আমি ঝঞ্ঝাট পছন্দ করি নে, একটি নির্ঝঞ্ঝাট ভাড়াটে খুঁজছি। ভাড়া যে দিতেই হবে এমন কোন কথা নেই, তবে ঝঞ্ঝাট আমি সহ্য করতে পারি নে।'

বললাম, 'ঝঞ্ঝাট আমার নেই, আমরা দুটি মানুষ।'

বাড়ীওয়ালা একটু চুপ ক'রে থেকে বললেন, 'তাহ'লে মন্দ নয়—এর আগে একজনদের ভাড়া রেখেছিলাম, তারা রাবণের গুষ্টি—এ একটা ঘরে বস্তার মত গাদাগাদি ক'রে থাকত, আর ছেলেগুলো যেমন গোলমাল করত তেমনি পাজী। তা বেশ আসবেন, কিন্তু ঘরগুলো তারা যাবার পর থেকে অপরিষ্কারই প'ড়ে আছে, উপস্থিত আসতে পারেন, তবে একটু পরিষ্কার—'

বাধা দিয়ে বললাম, 'দেখুন, ও আমরা ক'রে নেব, কাল রবিবার আছে, না এলে আবার এক মাস ভাড়া গুনতে হবে।'

বাড়ী ঠিক হয়ে গেল, শুনলাম এর আগে যারা ছিল তারা দিন-পনর হ'ল, বাংলা মাসকাবারেই চলে গেছে। আজ শনিবার, আপিস-ফেরতা বেরিয়ে একটা মস্তবড় প্রয়োজনীয় কাজ সারা হ'ল।

...বাড়ীটায় অনেক দিন ছিলাম। কালই ও-বাড়ীর সঙ্গে সব সম্পর্ক চুকে যাবে। এত দিনের পরিচয়, এত দিনের ঘনিষ্ঠতা সব শেষ ক'রে দিয়ে আসতে হবে। আমার যত না কষ্ট হোক, কাঞ্চনের তার চেয়ে বেশী হবে। আমার যদি কষ্ট হয় ত সে পান্নালালের জন্য। পান্নালাল বাড়ীওয়ালার একমাত্র ভাইপো। পান্নালাল নেশাভাং করে কিন্তু তার মনটি চমৎকার। সেবার কাঞ্চনের অসুখটা খুব বাড়াবাড়ি হ'ল। মাসকাবারের কাছাকাছি, মুখ শুকনো ক'রে সামনের দালানটিতে ব'সে ভাবছি—তাই ত কি করা যায়। দেখি পান্নালাল গিলে-করা আদ্দির পাঞ্জাবী প'রে বাবু সেজে বেরুচ্ছে। আমায় দেখে ব'লে উঠল, 'কি গো রাজুদা, অমন মুখ-শুকনো কেন? হাসতে কি তোমরা জান না?,

বললাম, 'ভগবান কি পৃথিবীতে হাসবার জন্য পাঠিয়েছেন?'

'কেন কি হ'ল?'—পান্নালাল একটা হাল্কা হাসি হাসল।

বললাম, 'চার দিন হ'ল ওর জ্বর হয়েছে, কিছুতেই সারছে না, বোধ হয় বেঁকে দাঁড়াবে।...মাসকাবারের মুখ, একটি পয়সা হাতে নেই। দেবে পাঁচটা টাকা?' গলার স্বরটা যেন নিজের কাছেই করুণ শোনাল।

পান্নালাল আবার খানিকটা হাসল, বললে, 'তা দিতে হবে বইকি, নিশ্চয়ই। কিন্তু মাইরি বলছি, রোজ রোজ ধেনো খেয়ে খেয়ে কেমন মুখ মেরে গেছে, ভেবেছিলাম আজ একটা বিলিতী খাব—তা না হয় নাই হবে, কিন্তু মাইরি ভাই, এই দেখ তোমায় পাঁচ টাকা দিলে আমার ধেনোর দামটাও থাকে না।'

পান্নালাল পকেট থেকে বার ক'রে দেখাল।

'দেখ রাজুদা, এই চারটে টাকা নাও ভাই, কাল বরঞ্চ ধাপ্পাটাপ্পা দিয়ে খুড়ীর কাছ থেকে কিছু এনে দিয়ে যাব।'

পান্নালাল চারটে টাকা আমার হাতে গুঁজে দিয়ে দ্রুতপদে বেরিয়ে গেল। একবার ফিরে চাইলও না,

জিজ্ঞেসও করলে না কবে দেবে। ... সে টাকাটা পান্নালাল আর চায় নি। বোধ হয় ভুলে গিয়ে থাকবে, অথবা কখনও ফিরে চাইবে না ব'লেই বোধ হয় ও ধার দেয়। আমার যদি কষ্ট হয় ত এই পান্নালালের জন্যেই হবে। সময়ে-অসময়ে ওর কাছ থেকে কিছু পেতাম ব'লে নয়, ওর ওই চমৎকার মনটির জন্যে। অনেক দিন পরে কাঞ্চন সেরে উঠলে ওকে পান্নালালের কথা বলেছিলাম। বাজারের পয়সা থেকে অনেক-কষ্টে-জমানো চারটি টাকা এক দিন কাঞ্চন আমার হাতে দিয়ে বলেছিল, 'ও হয়ত ভুলে গেছে, কিন্তু তোমার তো মনে আছে, টাকাকটা দিয়ে দিও।' --সে টাকাটা তবুও পান্নালালকে দেব-দেব ক'রে দিতে পারি নি।

...এক দিক দিয়ে আমাদের নিষ্ঠুর কঠিন-হৃদয় বলা চলে। এত দিন যাদের সঙ্গে একত্র বাস করলাম, তাদের সঙ্গে সব সম্বন্ধ শেষ ক'রে চলে যেতে হবে। একবারও তাদের মনে রইল না। তার পর নূতন সঙ্গী এল নূতন প্রতিবেশী হ'ল—তারা গেল হারিয়ে। অবচেতন মনের একটি পুরানো পরিচ্ছেদে তারা চাপা প'ড়ে রইল। যদি কখনও কোন সূত্রে মনে পড়ে ত মনে হবে এ যেন মনের অতিশয় বিলাসিতা, কল্পনার অকারণ সৌখীনতা।

আজ রবিবার। দুপুরের আগেই যেতে হবে। সকাল থেকে ক্রমাগতঃ জিনিষ বয়ে ও-বাড়ীতে রেখে এসেছি। জিনিষপত্র এমন কিছু বিশেষ নেই;—আর থাকবেই বা কেমন ক'রে, চৌদ্দ টাকা ভাড়া দেবার সামর্থ্য যার নেই, তার জিনিষপত্র বেশীই বা হবে কি ক'রে? যে-ঘরে আমরা থাকি সে-ঘরে এক জন ভাড়াটে আসবে ব'লে ঠিক হয়ে গেছে। আজ দুপুরেই তারা আসবে। তাদের জিনিষপত্র সব মুটেরা বয়ে এনে কলতলার পাশে ছোট খুপরির মত জায়গাটায় জমা করছে। দুটো টিনের সুটকেস, এক বাণ্ডিল বিছানা, একটা ঝুড়িতে কতকগুলো শিশি-বোতল ও তিনখানা ছেঁড়া মাসিকপত্র। আরও একটা ছোট ঝুড়িতে টিনের কৌটো কতকগুলো, আচারের ছোট ছোট জার, পুরনো কতকগুলো কালির দোয়াত ইত্যাদি। আমাদের জিনিষপত্র গোছানর ফাঁকে ফাঁকে দেখছিলাম। আজ একান্ত উদাসীন নিস্পৃহের মত যে-জায়গা আমরা পরিত্যাগ ক'রে যাব, কাল সেই জায়গাই ওরা আন্তরিকতা ও সহানুভূতি দিয়ে ভরিয়ে তুলবে। ধ্বংসের শেষই সৃষ্টির সূচনা—একের যেখানে শেষ, অপরের সেখানে আরম্ভ। হয়ত আমরা যেদিকটায় বিছানা পাততাম, ওরা সেদিকটায় একটা টেবিল রাখবে, এরা হয়ত ঐ কোণে আলমারিটা রাখবে,—বাক্স-পেটরা সেই উত্তর দিকের দেয়ালের কাছে রাখবে। সবার রুচি সমান নয়।

...যাবার সময় হয়ে এল। সেই কোন্ সকালে রান্না হয়েছে, কাঞ্চনের তাগাদায় শীগগির শীগগির খেয়ে নিলাম। আমরা চ'লে যাচ্ছি,—বাড়ীওয়ালা-গিন্নী ওপর থেকে নেমে এল—পূব দিকের ভাড়াটে মিত্তির-জ্যাঠাইমা এলেন, তাদের মেয়েরা এল—বিন্দু, লক্ষ্মী, কল্যাণী। দোতলার রমণীবাবুর স্ত্রী এলেন, তাঁর মেয়ে পুঁটুও এল। পুঁটু নাকি বৌদিকে বড্ড ভালবাসে, তাই দুপুরে না ঘুমিয়ে বৌদি চ'লে যাবার আগে দেখতে এসেছে। আরও সব অনেক ছোট ছোট ছেলেমেয়ে ভীড় ক'রে দাঁড়াল।

বাড়ীওয়ালা-গিন্নী বললেন, 'তা হ'লে চললে?'

কাঞ্চন জবাব দিলে, 'হ্যাঁ মা।'

বৌয়েরা আধঘোমটা দিয়ে দাঁড়িয়ে ছিল, চাপা গলায় বললে, 'রোববারে রোববারে বেড়াতে এস এখানে।'

পুঁটু এগিয়ে এসে ফ্রকটা টেনে ধ'রে বললে, 'এই এমনি আর একটা আমায় ক'রে দিও বৌদি।'

'দোব, নিশ্চয়ই দোব।'—কাঞ্চন পুঁটুকে কোলে তুলে চুমু খেল। কাঞ্চন ছোট ছেলেমেয়েদের জামা বেশ ভাল করতে পারে। এ-বাড়ীর অনেক ছেলেমেয়ের জামা সে তৈরি ক'রে দিয়েছে। ঘরে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগলাম ওদের বিদায়ের পালা। সত্যি, এদের মাঝে কাঞ্চন একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করেছিল, ওদের ছেড়ে যেতে নিশ্চয়ই ওর বেদনা বোধ হচ্ছে।

মিত্তির জ্যাঠাইমা কাঞ্চনের হাতটা ধ'রে বললেন, 'মাঝে মাঝে এস বৌমা, বুঝলে?'—চোখদুটো তাঁর ছল ছল ক'রে উঠল।

বাড়ীওয়ালা-গিন্নী বললেন, 'কর্ত্তার কেমন ঐ জেদ, দুটো টাকা আর কিছুতেই কমাতে পারলেন না।'

লক্ষ্মীর এখনও বিয়ে হয় নি, তার সঙ্গে কাঞ্চনের খুব

ভাব, বললে, 'তুমি যে সত্যি এ বাড়ী ছেড়ে যাবে, এমন কথা ভাবি নি বৌদি। কাঞ্চন লক্ষ্মীকে জড়িয়ে ধরল, বললে, 'তোমার বিয়ের সময় নেমন্তন্ন ক'রো, আসব ঠাকুরঝি।'

বাড়ীওয়ালা-গিন্নী সেই কথাই ভাবছেন, বললেন, 'তুমি যাচ্ছ যাও বৌমা, কিন্তু এ ভাড়া তুলে দিয়ে ঐ বারো টাকাতেই আবার নিয়ে আসব তোমায়, তখন কিন্তু না বলতে পারবে না।'

কাঞ্চন জবাব দিলে, 'না বলবো, আমি ত তাহ'লে বেঁচে যাই।' কোণে একটা ছোট টুল ছিল, সেই টুলখানার ওপর ব'সে ঘরের চার দিকটা তাকিয়ে দেখলাম, ঘরটা সম্পূর্ণ খালি হয়ে গেছে। পূব দিকের জানলার কাছে তক্তপোষটা ছিল, সেটা পাঠিয়ে দিয়েছি। তার পায়ার তলায় সঙ্গতি রক্ষার জন্ম যে ইটগুলো ছিল, সেগুলো প'ড়ে আছে। আজ এত বড় অসঙ্গতির দিনেও ওরা স্মৃতির সঙ্গতিটুকু রক্ষা করছে। ইটের ফাঁকে ফাঁকে কাঠের টুকরো দেওয়া ছিল, সেগুলো পর্য্যন্ত ঠিক আছে। আলমারির চারটে পায়ার ছাপ এখনও সুস্পষ্ট। সামনের দেয়ালে একটা দেয়ালগিরি টাঙানো থাকত, তার ভুষোর ছাপটুকু ঠিক শিল্পীর তুলির আঁচড়ের মত দেখাচ্ছে—ঐ দিকে চেয়ে কেমন একটা মায়া হয়। দোরের সামনের দেয়ালে একখানা রাধাকৃষ্ণের বাঁধানো ছবি ছিল, সেখানে পেরেকের দাগগুলো দেখা যাচ্ছে। কি বিরাট শূন্যতা। কাল সন্ধ্যের সময়ও এসে দেখেছি, সমস্ত পরিপূর্ণ। সংসারের প্রতি খুঁটিনাটি বস্তুটিই ঘর জুড়ে আছে।···রিক্শওয়ালা অনেক ক্ষণ দাঁড়িয়ে আছে, ঘন্টির আওয়াজে তার তাগাদার কথা বোঝা যায়। বাইরে বেরিয়ে কাঞ্চনকে বললাম, 'আর দেরি ক'রো না, চল।' কাঞ্চন বলল, 'দাঁড়াও, রান্নাঘরটা দেখে আসি।' বললাম, 'আমি দেখছি, তুমি বরঞ্চ এ-ঘরটা একবার দেখে নাও।'

রান্নাঘরে ঢুকলাম। আজ ষ্টোভে রান্না হয়েছে, কাজেই রান্নাঘর পরিষ্কার। উনানের শিকগুলো খুলে নিয়েছে, উনানটা দিয়েছে ভেঙে। এদিক থেকে ওদিক পর্য্যন্ত তাকিয়ে দেখলাম, কোথাও এতটুকু জিনিষ প'ড়ে নেই, সমস্ত ও খুঁটিয়ে কাঞ্চন তুলে নিয়ে গেছে। ঘরের চৌকাঠ ডিঙিয়ে যেন বেরুতে ইচ্ছে করে না। মনে হয় ঐখানটায় আসন নিয়ে ব'সে পড়ি, যেমন ক'রে কাল রাত্তিরেও ব'সে আহার শেষ করেছি।

···দোরের কাছে সবাই ঘিরে দাঁড়াল। রমা, লক্ষ্মী, কল্যাণী, বিন্দু এরা সব কাঞ্চনের পায়ের ধুলো নিলে। কাঞ্চন তাদের সবাইকে জড়িয়ে ধ'রে নিবিড় আলিঙ্গন করলে। এইবার বাড়ীওয়ালা-গিন্নীর পায়ের ধুলো নিয়ে কাঞ্চন উঠে দাঁড়াল, তাঁরও চোখদুটো ছল ছল ক'রে উঠেছে। ছোট ছোট ছেলেমেয়েদের কোলে তুলে আদর ক'রে কাঞ্চন পেছন ফিরল। আঁচলে টান পড়তেই কাঞ্চন ফিরে দেখে লক্ষ্মী তার আঁচলটা ধ'রে আছে, চোখদুটো তার জলে ভ'রে গেছে। গলাটা জড়িয়ে ধ'রে কাঞ্চন বললে, 'ছি, কাঁদে না।' লক্ষ্মীর চোখ দিয়ে ফোঁটা ফোঁটা জল গড়িয়ে পড়ল। কাঞ্চন আঁচল দিয়ে চোখ মুছিয়ে দিতে দিতে বললে, 'আবার আসব, তোমার বিয়ের সময় তিন দিন থাকব, খবর দিও।'

যাবে ব'লে পা বাড়িয়েছে, এমন সময় পুঁটু কোথা থেকে ছুটে এসে বৌদির পায়ে মাথাটা লুটিয়ে দিলে। 'থাক, খুব হয়েছে, পুঁটুরাণী'—ব'লে কাঞ্চন কোলে তুলে চুমু খেলে।

তাড়া দিয়ে বললাম, 'বড় দেরি হয়ে যাচ্ছে।'

'হাঁ হয়ে গেছে'—কাঞ্চন এসে রিক্শয় উঠল। রিক্শখানা গলি পার হ'ল, তখনও কিন্তু ওরা দোরের কাছে মুখ বাড়িয়ে আছে দেখলাম।

কাঞ্চন বললে, 'সব জিনিষ আনা হয়েছে, কিছু ফেলে আসি নি ত?'

জবাব দিলাম, 'ভুলে আসবার যো আছে কি, উনানের শিকগুলো পর্য্যন্ত খুলে এনেছ তো দেখলাম···আচ্ছা উনানটা অমন ক'রে ভেঙে গুঁড়িয়ে দিলে কেন, না ভাঙলে যারা আসছে ওদের অন্ততঃ কাজে লাগত।'

কাঞ্চন জবাব দিলে, 'তা বুঝি রাখতে আছে।'

'কেন রাখতে নেই?'

'কেন, যা রাখতে নেই, তা নেই।' কাঞ্চন এত জানে! এই ত সবে তার তিন বছর বিয়ে হয়েছে।

কাঞ্চনের সঙ্গে কথা কইতে কইতে একটু আগে ওর বিদায়ের দৃশ্যটার কথা মনে পড়ল। কতক্ষণ, বোধ হয়

পাঁচ মিনিট আগেও ওর চোখ দুটো ভিজে উঠেছিল। বিদায়-পূর্ব্বের বেদনা করুণ হয়ে মনের মাঝে উঠেছিল জমে। এরই মধ্যে কেমন ক'রে ও যে সাংসারিক তুচ্ছ কথার শাখা বিস্তার করতে পারল এই ভেবে আমি আশ্চর্য্য হয়ে যাই। মেয়েরা পারে, তারা সময়োপযোগী অবস্থার সঙ্গে চমৎকার খাপ খাইয়ে নিতে পারে। স্নেহ, মায়া ওদের আছে, কিন্তু তার আতিশয্যকে ওরা প্রকাশ করতে চায় না। হয়ত একটি অবসর-সময়ে এই বিচ্ছেদবেদনা নিয়ে, ও সযত্নে লালনপালন করবে, ওদের পূর্ব্ববর্ত্তী দিনের কথা স্মরণ ক'রে কল্পনারাজত্বে বিলাস ক'রে বেড়াবে।

...বেলা প্রায় চারটে, নূতন বাড়ীর দোরের কাছে রিক্‌শ এসে দাঁড়াল। চাবি খুলে ঘরে ঢুকলাম, জিনিষপত্র-গুলো সব ঠাসাঠাসি ক'রে রাখা হয়েছে। কাঞ্চন সব গোছাতে লাগল। দরমা-দিয়ে-ঘেরা রান্নাঘরে উঁকি মেরে দেখি কাঞ্চনের কথাই সত্যি, এরাও যাবার সময় উনান ভেঙে দিয়ে গেছে, শিকগুলো খুলে নিয়ে গেছে। ঘুরে ঘুরে সমস্ত ঘরটা দেখতে আরম্ভ করলাম, কাঞ্চন তত ক্ষণ ঘর ঝাঁট দিতে আরম্ভ করেছে। ঘরের তাকগুলো খালি প'ড়ে আছে। মেঝেটা ধুলোবালিতে অপরিষ্কার। এক কোণে একটা দাঁড়াভাঙা চিরুণী, মাথার একটা মরচে-ধরা কাঁটা, গোটা দুই তিন পেরেক। কাঞ্চন পেরেকগুলো কুড়িয়ে রাখল, বললে, 'তুলে রাখি, ছবিগুলো টাঙাবার সময় কাজে লাগতে পারে।'

পেরেক, চিরুণী, মাথার কাঁটা এ সব আগের ভাড়াটেদের স্মৃতিচিহ্ন। আমার কেমন ওগুলো যত্ন ক'রে তুলে রাখতে ইচ্ছে করে। ঘুরতে ঘুরতে দেখি দেওয়ালের গায়ে একটা ছুঁচ বেঁধা, খানিকটা সুতোও তাতে পরানো আছে। সূক্ষ্ম জিনিষ পাছে হারিয়ে যায় ব'লে বোধ হয় দেয়ালে গুঁজে রেখেছিল,—ওরা বোধ হয় ভাবে নি যে বাড়ী বদল করবার সময় ভুলে যেতে পারে। ওধারে ছেলেদের বইয়ের একখানা ছেঁড়া মলাট পড়েছিল, সেইটে ফেলে দিতে গিয়ে দেখি দেওয়ালের গায়ে আঁকাবাঁকা অক্ষরে লেখা রয়েছে, দিদি বড় দুষ্টু, ইতি রেখা। হয়তো এর আগে যারা ছিল, তাদেরই কোন মেয়ে দিদির নামে এই অভিযোগের লিপি দেওয়ালে লিখে গেছে। কপাটের গায়ে অনেকগুলো দাঁড়িকাটা খড়ির দাগ দেখে কাঞ্চনকে বলি, 'দেখ, আগের ভাড়াটেরা বড্ড নোংরা ছিল কিন্তু, কপাটের গায়ে কত খড়ির দাগ কেটেছে দেখ না।'

'কই দেখি' কাঞ্চন উঠে এল—'ওগুলো নোংরামি নয়, কেরোসিন তেলের হিসেব। দেখ এক-একটা দাঁড়ি মানে এক এক বোতল তেল। দেখছ না, কতকগুলো দাঁড়ি দাগ টেনে কেটে দিয়েছে, কতকগুলো মুছে দিয়েছে ; তার মানে ওগুলোর হিসেব মিটে গেছে।'

কাঞ্চন ঘর গুছোতে লাগল। রাত্রে আমরা কোন রকমে বিছানা পেতে শুলাম, যেন ভোরের গাড়ী ধরব ব'লে মুসাফিরখানায় অপেক্ষা করছি। সমস্ত রাত জিনিষ-পত্র গুছোন হয় নি। মাথার কাছে বাক্স-পেঁটরা তিন-চারটে পুঁটুলি আগোছাল ভাবে প'ড়ে আছে।

পরদিন সকালবেলা কাঞ্চন ঠিক সময় মত আপিসের ভাত জোগালে। উনানটা এখনও সম্পূর্ণ হয় নি, তাই ষ্টোভের সাহায্যে কাজ সারতে হ'ল।

...প্রায় সন্ধ্যা হয়-হয়, আপিস থেকে ফিরছি ধর্ম্মতলা দিয়ে। ক্যাশিয়ারের সঙ্গে আজ ভয়ানক ঝগড়া হয়ে গেছে, মনটা তাই জটিল। নানান চিন্তা মনের মধ্যে ঘুরে বেড়াচ্ছে। যত বার ঝগড়ার কথাটা মনে হচ্ছে, তত বারই রাগে সমস্ত দেহটা জ্বলে উঠছে। শুধু কাঞ্চনের জন্যে কিছু বলি নি, নয়ত ঘা-কতক উত্তম-মধ্যম দিয়ে আজই চাকরিতে ইস্তফা দিয়ে আসতাম। কি মনে হ'ল, ওয়েলিংটন স্কোয়ারে ঢুকলাম। নানান চিন্তা জড়িয়ে ধরতে লাগল। ছেড়ে দেব এ-চাকরি—কাজের ভাবনা কি! এই ত নিতাই হালদার ইন্সিওরেন্সের দালালি ক'রে বড়লোক হয়ে গেল। তাই করব, ইন্সিওরেন্সের দালালি, পাটের দালালি, অর্ডার সাপ্লাই—কত কাজ আছে, অভাব কি! এ-সবে বরং উন্নতির আশা আছে। ত্রিশ টাকা মাইনেয় কলম-পিষে কি আর উন্নতি হবে!...সামান্য কিছু টাকার দরকার। পান্নালালকে বলব—দেবে নিশ্চয়ই। ও তো কত টাকা উড়িয়ে দেয়, এই সামান্য টাকাটা দেবে না! একেবারে নয়, ধার হিসেবে।

প্রায় আটটা বেজে গেল। ভাবতে ভাবতে বাড়ীর দিকে পা চালিয়ে দিলাম। পথের দোকানগুলো খরিদ্দারে ভর্ত্তি,

বেচাকেনা বেশ পুরোদমে চলেছে। চাকরির চেয়ে এ অনেক ভাল, বেশ আছে ওরা। ভাবতে ভাবতে কেমন অন্যমনস্ক হয়ে গেছি।

...কলতলার পাশ দিয়ে ঘরের মধ্যে ঢুকলাম। এ কোথায় এসেছি! খেয়ালই নেই, অন্যমনস্ক হয়ে পুরনো বাড়ীর সেই ঘরখানায় ঢুকে পড়েছি। একটি মেয়ে একমনে টেবিলের কাছে ব'সে সেলাই করছে, মাথার ঘোমটা তার মনোযোগের একাগ্রতায় খসে পড়েছে। জুতোর শব্দ পেয়ে চোখ না তুলেই জিজ্ঞেস করলে, 'হ্যাঁ গা, আজ এত দেরি হ'ল যে?' বড় মুস্কিলে পড়ে গেছি, ভাবছি পালাব কি না, কিন্তু সে সব ভাববার আগেই ও ফিরে চেয়েছে। সঙ্গে সঙ্গে এক হাত ঘোমটা টেনে মেয়েটি সভয়ে চীৎকার ক'রে উঠল,—'ওমা, এ কে গো...'

ভয়ে আমার তখন গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। স্বরটা অসম্ভব রকম করুণ ক'রে বললাম, 'দেখুন, ভয়ের কোন কারণ নেই, সবেমাত্র কাল এ-বাড়ী থেকে উঠে গেছি, তাই হঠাৎ অন্যমনস্ক হয়ে...' বলতে বলতে পিছু হেঁটে চৌকাঠ ডিঙিয়ে একদৌড়ে রাস্তায় এসে পড়লাম।

কি সর্বনেশে বিপদেই পড়েছিলাম। খুব বেঁচে গেছি। কি ভাগ্যি ওর চীৎকারটা কেউ শুনতে পায় নি! মেয়েটি আমাকে তার স্বামী ভেবেছিল। সে ধারণাই করতে পারে নি যে এমন সময় তার স্বামী ছাড়া আর কোন পুরুষ-মানুষ এ-ঘরে ঢুকতে পারে! কাঞ্চনও হয়তো রান্না শেষ ক'রে অমনি কোন একটা সেলাইয়ের কাজ নিয়ে বসেছে—গেলেই বলবে, 'হ্যাঁ গা, এত রাত হ'ল যে।'...তাড়াতাড়ি পা ফেলতে লাগলাম।

নূতন জায়গায় একলা কাঞ্চনের নানা অসুবিধা হচ্ছে নিশ্চয়ই। একা মানুষ সে,—আজ আমার উচিত ছিল শীগগির শীগগির ফিরে ঘর-গুছোনর কাজে তাকে সাহায্য করা।

সিঁড়ি দিয়ে উপরে উঠছি, বাড়ীওয়ালা হেঁকে বললে, 'কে?'

বললাম, 'আমি রাজেন'।

'ও, রাজেন বাবু।'

উপরে উঠে গেলাম। দেখি, কাঞ্চন তখনও রাঁধছে। জুতোর শব্দ পেয়ে বললে, 'হ্যাঁ গা, ক'টা বেজেছে?'

'সাড়ে আটটা!'

'এত রাত হয়ে গেছে! ঘরদোর ধুয়ে মুছে পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে-গুছিয়ে রাখতে রাখতে বড্ড দেরি হয়ে গেল।'

উঠে এসে বললে, 'খিদে পেয়েছে খুব?' আমার উত্তরের অপেক্ষা না ক'রেই বললে, 'পাবে না, সেই কোন্ সকালে দুটো ঝোলভাত মুখে দিয়ে গেছ।' তাড়াতাড়ি গিয়ে তরকারি নাড়তে নাড়তে বললে, 'নাও, হাতমুখ ধুয়ে নাও, আমার ততক্ষণে হয়ে যাবে।'

সত্যি, কাঞ্চন সমস্ত ঘরদোর পরিষ্কার ক'রে সাজিয়ে ফেলেছে, যেখানে যেটি মানায়। মনে হচ্ছে, এরা যেন ঐখানেই বহুদিন ধ'রে আছে। নূতন জায়গা ব'লে একটুও বাধো-বাধো ঠেকছে না। মেয়েদের রুচি আছে, এরা জানে কেমন ক'রে তাদের ছোট পৃথিবীটিকে গ'ড়ে তুলতে হয়।

রাত্রে শুয়ে গল্প করতে করতে এক সময় জিগ্যেস করলাম, 'কাঞ্চন, পুঁটুর কথা তোমার মনে পড়ছে?'

কাঞ্চন জবাব দিলে, 'ভাড়াটে আমরা, মায়া ক'রে লাভ কি বল না—আজ আছি কাল নেই।'



অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

(২৭)

মিলির গায়ে-হলুদে মহা কোলাহল। সকালবেলাই সকলের চেয়ে জমাট উৎসব লাগিয়াছে। সুধা ও হৈমন্তী ত প্রত্যহই আছে, তাহার উপর মিলির স্নানযাত্রার সমারোহ বৃদ্ধি করিবার জন্য আসিয়াছে স্নেহলতা, মনীষা, ইন্দুপ্রভা, পঙ্কজিনী, ইত্যাদি সখীর দল। আত্মীয়-গোষ্ঠীর দুই-চারিজন মেয়েও জুটিয়াছে। বাকী বন্ধুবান্ধব আত্মীয়-কুটুম্ব সকলেই নিমন্ত্রণের সময় মত আসিবেন। বিবাহ-উৎসবের দিনে বড় সভায় সামাজিক আইন-কানুনের বাঁধনের ভিতর যাহাদের সংযত হইয়া চলিতে হইবে, আজিকার ঘরোয়া উৎসবে সেই তরুণী সখীর দল আদিম মানবীদের মত উন্মত্ত উৎসবে মাতিয়া উঠিয়াছে। তাহারা ভদ্রতার মুখোস টানিয়া ফেলিয়া দিয়াছে। এ যেন হোলির উৎসবের রং-খেলা। মনীষা ও ইন্দুপ্রভার কিছুদিন পূর্ব্বে বিবাহ হইয়া গিয়াছে, সুতরাং তাহারাই নেত্রী হইয়া এক-একতাল হলুদ লইয়া মেয়েমহলে বিভীষিকার সঞ্চার করিয়া বেড়াইতেছে। যে তাহাদের সম্মুখে পড়িবে তাহার আর রক্ষা নাই, আগাগোড়া তাহাকে রাঙাইয়া দিয়া তবে ছাড়িবে। বয়স্যাদের ভিতর সুধা, হৈমন্তী ও স্নেহলতারই সকলের চেয়ে দুর্গতি বেশী। এখনও অবিবাহিতা থাকার অপরাধের প্রায়শ্চিত্তস্বরূপ মনীষা ও ইন্দুপ্রভার সকল অত্যাচার তাহাদের সহিতে হইতেছে। মিলির গায়ে হলুদ দিয়াই যাহার হাতে যত হলুদ ছিল সব গিয়া পড়িল সুধা, হৈমন্তী ও স্নেহলতার মাথায়। বেচারী স্নেহলতা স্ত্রী-আচারের শাস্ত্রে অনভিজ্ঞা, তাই একখানা সুন্দর ঢাকাই শাড়ী ও রেশমের পাড়-তোলা ব্লাউস পরিয়া আসিয়াছিল। সখীদের অত্যাচারে তাহার সখের কাপড়-জামার যা চেহারা হইল তাহাতে সাত ধোপেও সেগুলি আর ভদ্র-সমাজে পরিবার মত হইবে না।

হৈমন্তী বলিয়াছিল, "বেচারীর ভাল কাপড়খানা নষ্ট ক'রে দিলে ?" মনীষা দুই হাতে দুই তাল হলুদ লইয়া মাথায় ঝুঁটি বাঁধিয়া মুখ নাড়া দিয়া বলিল, "গেলই বা একখানা ভাল কাপড়! এখনও ত ওর বিয়েই হয় নি। বিয়ে হ'লে কত কাপড়-জামা পাবে, একখানার কথা অত মনেও থাকবে না। এই হলুদ গায়ে পড়া কত ভাগ্যি, ওর পয়েই বিয়ে এগিয়ে আসবে।"

সুধা বলিল, "ভাগ্যি হোক বা না-হোক, তোমার মত রণরঙ্গিণীর সঙ্গে ত আর ও পারবে না!"

মনীষা বলিল, "ভুলে গিয়েছিলাম তোর কথা। এখনও অর্দ্ধেক কাপড় সাদা, আবার পরের হয়ে ওকালতি। দাঁড়া, তোকে একটু ভাল ক'রে ছুপিয়ে দি। স্নেহর মুখখানাও একটু সোনার বরণ না হ'লে ভাল দেখাচ্ছে না।"

ছুটাছুটি হুড়াহুড়ি অনেক হইল, কিন্তু মনীষার হাত হইতে কেহ নিষ্কৃতি পাইল না।

স্নেহলতা বেচারীর কাপড় ত গিয়াইছিল, তাহার উপর সমস্ত মুখখানাও হলুদে রাঙা হইয়া গেল। সুধার শাড়ীর পিঠটুকু বাকী ছিল, এবার সেটুকুও রহিল না। পালিত-গৃহিণী বলিতে আসিয়াছিলেন, "ওরে, যারা ভাল কাপড়-চোপড় প'রে এসেছে তাদের শুধু একটা ক'রে কপালে টিপ দিয়ে ছে'ড়ে দিবি, অমন ক'রে সব ধ্বংস ক'রে দিস নে।"

মনীষা বলিল, "তা বইকি জ্যাঠাইমা, বিয়ে মেয়ে-মানুষের একবারই হয়, জেনে শুনে যারা ভাল কাপড় প'রে আসে তাদের কাপড় বাঁচাতে গেলে আমাদের আর ফুর্ত্তি করা কপালে হয় না। ওদের ত দেবই সং সাজিয়ে, আপনাকেও আজ অমনি ছাড়ব না।"

জ্যাঠাইমা বলিলেন, "ওমা, আমাকেও কি ছেলেমানুষ পেলি ? কুটুমবাড়ীর লোকের সামনে বেরোব কি ক'রে ওই মূর্ত্তি ক'রে ?"

ইন্দুপ্রভা বলিল, "আহা, কুটুমবাড়ীর লোকেরা সব বিলেতের জাহাজ থেকে এই নামল কিনা, গায়ে হলুদ কা'?

বলে জানে না। আজকের দিনে কারুর কাপড় সাদা থাকতে নেই।"

এমন একটা হল্লোড়ের ব্যাপার দেখিয়া সতু এবং শিবুও মেয়েদের দলে ভিড়িয়া গেল। অন্য মেয়েদের গায়ে রং দিবার সাহস তাহাদের ততটা ছিল না। কি আর করে? খানিকক্ষণ দুই বন্ধু পরস্পরকেই হলুদ মাখাইল। সুধা, হৈমন্তী ও জ্যাঠাইমার গায়ে হলুদ মাখাইবার আর স্থান ছিল না, মনীষা ও ইন্দুপ্রভার কল্যাণে তাঁহাদের গায়ের রং কিংবা কাপড়ের রং চেনাও শক্ত। তবু শিবু ও সতু সেখানে গিয়াও কিছু হুটোপাটি করিল। কিন্তু তেলা মাথায় তেল দিয়া কি সুখ? মেয়েদের আশা ছাড়িয়া দিয়া তাহারা বাহির-বাড়ীতে ছুটিল। সকলে ফর্দ মিলাইতে জিনিষ সামলাইতে ব্যস্ত, পিছনে চাহিয়া কেহ দেখে নাই। অকস্মাৎ তপন, নিখিল ও মহেন্দ্রকে সচকিত করিয়া শিবু ও সতু তাহাদের তিন জনের মাথায় এক-এক ঘটি হলুদ-জল ঢালিয়া দিল।

এমন অতর্কিতে আক্রান্ত হইয়া যদিও তাহারা একটু বিস্মিত হইয়াছিল, তবু উপস্থিত-বুদ্ধি যোগাইতে নিখিলের দেরি হইল না। সে দুই হাতে লাল ও কালো কালির দোয়াত দুইটা তুলিয়া দুই জনের মাথায় উপুড় করিয়া দিল।

মহেন্দ্র কেবল বলিল, "ছি, ছি, শুভদিনে কালো কালিটা ঢেলে কি বিশ্রী কাণ্ড করলে!"

তপন বলিল, "মূর্তিমান অমঙ্গলদের মাথায় কালো কালি ঢাললেই মানুষের কিছু শুভ হবার সম্ভাবনা থাকে।"

শিবু বলিল, "আমি অত ঠাণ্ডা ছেলে নই, এক দোয়াত কালি ঢেলেই আমায় দমিয়ে দিতে পারবেন না। যুদ্ধ ঘোষণা আজ আমিই করেছি, আমার প্রতিশোধ নেওয়া সাজে না, না হ'লে আরও অনেক সুদৃশ্য ও সুগন্ধি জিনিষ ছুঁড়তে আমি পারি।"

নিখিল শিবুকে কাছে ডাকিয়া কানে কানে অথচ সজোরে বলিল, "এই কার্তিক গণেশ দুটিকে হলুদ মেখে ত দিব্যি দেখাচ্ছে। আজ অনেক ফুলের মালা এসেছে। দু-জনের হাতে দু-ছড়া দিয়ে ভিতরে নিয়ে যাও না। হয়ত ওদেরও অদৃষ্ট প্রসন্ন হ'তে পারে। মহেন্দ্র আর তপন দু-জনেরই অবস্থা সঙ্গীন।"

শিবু বলিল, "বাপ রে, ওসব বাঁদরামি করতে গেলে আমায় সবাই মিলে মেরে শেষ ক'রে রাখবে।"

মেয়েরা উঁকি দিয়া বাহিরের ব্যাপার দেখিল, কিছু আন্দাজ করিল, কিন্তু কেহ কাছে আসিল না।

দুপুরেই নিমন্ত্রিতাদের আহারের পাট, কাজেই ভোরের পালা বেলা বারোটায় শেষ করিয়া এই দিকেই সকলকে মন দিতে হইল। কলিকাতার মেয়েযজ্ঞি, সহজে ত নিষ্কৃতি পাওয়া যাইবে না। যাঁহার বাড়ীতে যে সময়ে নিমন্ত্রণ খাওয়ার রীতি, কিংবা যাঁহার সংসারে যখন ছাড়া বাহিরে যাওয়া চলে না, তিনি সেই সময় আসিবেন। বারোটা-একটার পর হইতে রাত্রি নয়টা পর্য্যন্ত যাহার যখন খুশী আসিয়া হাজির, কতবার যে খাবার আসন পড়িল তাহার ঠিক নাই। সেদিনকার মত বাড়ীর লোকেদের মধ্যাহ্নভোজনটা বাদ গেল; সেই রাত দুপুরে তাহাদের প্রথম ও শেষ আহার। ছেলেরা পাত পাড়িয়া বসিতে না পাইলেও পরিবেষণ করার ফাঁকে ফাঁকে সুবিধা পাইলেই বেগুনীভাজা, সন্দেশ ও চা দিয়া জঠরাগ্নিকে অনেকখানি সংযত রাখিয়াছিল, মেয়েদের অনেকের ভাগ্যে সেটুকুও জোটে নাই।

মহিলা-সভায় একদল আসিয়াছিলেন বাড়ী হইতে খাইয়া, নিমন্ত্রণ-বাড়ীতে শুধু গহনা-কাপড় দেখিতে ও দেখাইতে। তাঁহারা অলঙ্কারের দ্যুতি চারিধারে ঠিকরাইয়া একটু দ্রুত গতিতেই বাড়ীতে ফিরিয়া গেলেন। আর একদল বাড়ীর সকল ঝি-বৌকে একত্রে জুটাইয়া আনিয়া সাধ্যমত খাইয়া ও সাধ্যমত বাঁধিয়া লইয়া গেলেন। তৃতীয় দল ক্ষুধার মুখে যতখানি ভাল লাগিল মুখে দিয়া, বহুকাল পরে বন্ধুবান্ধবের সহিত সুদীর্ঘ আলাপে মনটা খুশীতে হাল্কা করিয়া মন্থর গতিতে বাড়ী ফিরিলেন।

এই সকল দলের মেয়েদের যথাযোগ্য আদর-অভ্যর্থনা মিটাইয়া যখন বাড়ীর ছেলেমেয়েদের একসঙ্গে পাত পড়িল তখন খাইবার ইচ্ছা বিশেষ কাহারও না থাকিলেও একসঙ্গে বসিবার আগ্রহেই সকলে বসিল। মনীষা ও ইন্দুপ্রভা পরের বাড়ীর বৌ, তাহাদের সকাল সকাল খাওয়াইয়া বিদায় দেওয়া হইয়াছে। পঙ্কজিনী ও স্নেহলতার খাওয়া হইলেই এই বাড়ীর গাড়ীতেই তাহাদের পৌঁছাইয়া দিবে। সুধাকে কিন্তু হৈমন্তী যাইতে দিবে না। সুধা এত বছরের মধ্যে একরাত্রিও

হৈমন্তীদের বাড়ীতে কাটায় নাই, আজ তাহাকে থাকিতেই হইবে। হৈমন্তীর একলার ঘরে পুরু গদি-দেওয়া প্রকাণ্ড পালঙ্কের উপর পাখা চলিতেছে, সেইখানে দুই বন্ধুতে শুইয়া আজিকার রাত্রিটা গল্পে কাটাইয়া দিলে কি আনন্দেরই না হয়। কতক্ষণই বা আর রাত আছে। এই কয়টা ঘণ্টা এমনি গল্পেগুজবে কাটিলে মিলিদিদির বিয়েটা চিরকাল মনে থাকিবে। এই বয়সের গল্প সহজে ত ফুরাইতে চাহে না, তাহা পাখীর মত ডানা মেলিয়া কত দেশদেশান্তরে কাল-কালান্তরে ঘুরিবে।

সুধা রাজী হইল সহজেই। হয়ত এ সুযোগ আর আসিবে না, দুই দিন বাদে হৈমন্তীরও বিবাহ হইয়া যাইবে, তখন আর এ-বাড়ীর সঙ্গে তাহার কিসের সম্পর্ক থাকিবে? জীবনের এই দ্বিতীয় পর্ব্বটা শেষ হওয়ার সূচনা যেন আজ হাওয়ায় ভাসিতেছে।

শিবু এখন মস্ত ছেলে, সে ঘর-সংসারের কাজ মেয়েদের মতই বুঝিয়া-সুঝিয়া করিতে পারে। সুধা তাহাকে সকাল হইতেই বলিয়া রাখিয়াছিল, আজ যদি তাহার বাড়ী ফেরা না হয়, শিবু যেন সব কাজকর্ম্ম একটু দেখে। শিবু বলিল, "ওই-টুকু কাজের জন্য এত ভাবছ কেন? তুমি দু-দিনই থাক না, আমি তোমার তেল ঘি চিনি আটা বেশ সামলাতে পারব। ফিরে এসে দেখো এখন সংসার ছারখার হয়ে যায় নি।"

তার পর একটু থামিয়া বলিল, "নিখিল-দারা কি সব বলাবলি করছে; ইচ্ছে কর ত মিলিদির সঙ্গে তোমরা দু-জনেও লাগিয়ে দিতে পার, তাহলে আর ভাঁড়ারের চাবি ফিরে নিতে হবে না।"

সুধা একবার চমকাইয়া উঠিয়া পরক্ষণেই শিবুকে ধমক দিয়া বলিল, "একরত্তি ছেলের বাঁদরামি করতে হবে না, থাম।"

খাওয়া-দাওয়ার পর সুধা ও হৈমন্তী সেই দক্ষিণের বারান্দাওয়ালা ঘরখানায় শুইতে গেল। বাড়ীতে আজ বাহিরের লোক আরও আছে, কিন্তু হৈমন্তী বেশীর ভাগকে জ্যাঠাইমার ঘরে চালান করিয়াছে। নিতান্ত যাহাদের কুলায় নাই তাহারা বসিবার ঘরে ঢালা বিছানায় স্থান লইয়াছে। হৈমন্তীর ঘরে শুধু সুধা থাকিবে। হলুদ-পর্ব্বের পর সকলেই নূতন করিয়া সাজসজ্জা করিয়াছিল, সুধা তেমন ভাল কাপড় আনে নাই বলিয়া হৈমন্তীরই একখানা চাঁপা-রঙের বেনারসী সে তাহাকে সখ করিয়া পরাইয়াছিল। এখানা তাহার সব চেয়ে প্রিয় কাপড়।

আলনার উপর বেনারসীখানা রাখিতে রাখিতে সুধা বলিল, "কি সুন্দর শাড়ী ভাই এখানা, আমার কেবলই ভয় হচ্ছিল, কখন বুঝি ডাল ঝোল কিছু একটা ফে'লে বসি। অনভ্যাসের ফোঁটায় কপাল চড় চড় করে।"

হৈমন্তী তাহার গাল টিপিয়া দিয়া বলিল, "ওঃ, বড় যে মুখে কথা ফুটেছে তোমার! শীগগির অভ্যেস হবে দেখো। দিদির পালা হয়ে গেল, এই বেলা ত তোমার পালা।"

সুধা একখানা ডুরে কাপড় পরিয়া খাটের উপর পা ঝুলাইয়া বসিয়া বলিল, "আহা, কি যে বল তার ঠিক নেই। তুমি থাকতে আমি আগে? কোন্ গুণে শুনি?"

হৈমন্তী সুধার এলো-খোঁপার কাঁটাগুলা খুলিয়া চিরুণী দিয়া তাহার চুলের গোছা আঁচড়াইতে আঁচড়াইতে বলিল, "গুণ তোমার বোঝবার দরকার নেই। যে তোমায় নিয়ে যাবে সে ভাল ক'রেই বুঝবে কোন্ গুণে তার ঘর আলো হবে। সত্যি ভাই, তোমার যে বর হবে সে যদি একেবারে সাগর-ছেঁচা মাণিকও হয় তবু আমার মনে হবে না তোমার উপযুক্ত হয়েছে।"

সুধা বলিল, "এমন একটি অমূল্য রত্ন কোথায় পাওয়া যায় শুনি? তাও ত আবার একটি হ'লে হবে না। তোমারও কি আর যেমন-তেমন একটা হ'লে আমি তার হাতে তোমায় দিতে পারব? তোমার আগে সংসার সাজিয়ে দিয়ে তবে ত আমি নিজের কথা ভাবব। তুমি কি মনে কর, তোমায় একেবারে ভুলে সাগর-ছেঁচার সঙ্গে সাগরে তলিয়ে যেতে আমি পারব?"

হৈমন্তী সুধার লম্বা বিনুনীর আগায় নীল রঙের চওড়া ফিতা বাঁধিতে বাঁধিতে বলিল, "তবে তোমার আর আমার বিয়ে এক দিনে দু-দিকে দুটো সভা সাজিয়ে হবে, কেমন? তাতে রাজী আছ ত?"

সুধা বলিল, "আমার রাজী থাকার উপরেই সব নির্ভর করছে কি না! যা দেখছি, তুমি একলার সভাই শীগগির সাজাবে। সেদিন মহেন্দ্রদার সঙ্গে তোমার কি একটা মানভঞ্জনের পালা হয়ে গেল! কি বল দিখি! তাঁকে

দেখে আমার কেমন যেন লাগল। কিন্তু ভাই যদি তোমার আমাকে বলতে আপত্তি না থাকে তাহলেই ব'লো, আমি জোর ক'রে শুনতে চাইছি না।"

সুধার চুল বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল, হৈমন্তী নিজের চুলগুলা এলাইয়া, দুই হাতে সুধার গলা জড়াইয়া ধরিয়া তাহার দুই চোখের ভিতর তাকাইয়া, একটু দুষ্টু দুষ্টু হাসিয়া বলিল, "তোমাকে বলি নি ব'লে তোমার অভিমান হয়েছে বুঝি? তুমি নাকি আবার রাগ করতে জান না!"

সুধা হাসিয়া বলিল, "রাগ কেন করব? তুমি কি আর আজকাল সব কথাই আমাকে বল? বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে মানুষ নিজের চিন্তা নিয়ে নিজে থাকে, তখন যে সব কথায়ই অন্য লোকের কৌতূহল দেখানো ভাল নয় এইটুকু কি আর আমি জানি না?"

হৈমন্তী হাসিয়া সুধার গায়ের উপর লুটাইয়া পড়িয়া বলিল, "ও, তুমি বুঝি এখন অন্য লোক হয়েছ? আচ্ছা, আমি নিজেই অন্য লোককে সব বলব।"

সুধা বলিল, "এস আগে তোমার চুলটা আমি বেঁধে দি। পরে ওসব কথা হবে এখন।"

হৈমন্তী কিন্তু কথা থামাইল না। "মহেন্দ্র-দার ওই ত নারদমুনির মত ধরণ-ধারণ, কিন্তু মানুষটা ভাই ভারি সেন্টিমেন্টাল। তুমি ভাবতেই পার না কি রকম বিপদে ওকে নিয়ে পড়েছিলাম।"

সুধা বলিল, "কি আবার বিপদে পড়লে? বেশ ত আস্ত ফিরে এলে দেখলাম দু-জনেই।"

হৈমন্তী বলিল, "আস্ত ত এলাম। কিন্তু দিদির বিয়ের গয়না গড়াতে গিয়ে নিজের বিয়ের ভাবনা ভাবতে হবে তা ত ভাবি নি। মহেন্দ্র-দাকে আমি খুবই পছন্দ করি, ওকে নিয়ে ঠাট্টার সুরে কথা বলতে যে আমার ভাল লাগে তা নয়। কিন্তু এ সব কথার দুটো মাত্র সুর আছে, যদি মত থাকে তবে গভীর সুর, আর যদি মত না থাকে তাহলেই ঠাট্টা। সুতরাং আমার কথাগুলো ঠাট্টার মত শোনালেও ওকে আমি ঠাট্টা করছি মনে ক'রো না।"

সুধা বলিল, "বেচারীর মনের যেটা সত্যি কথা সেটা নিয়ে ঠাট্টা তুমি করছ এ আমি কখনই ভাবতে পারি না।"

হৈমন্তীরও চুল বাঁধা শেষ হইয়া গিয়াছিল। জানালার দিকে মাথা করিয়া দুই জনে লম্বা হইয়া শুইয়া পড়িল। বর্ষার জলো-হাওয়া ঘরের ভিতর হু হু করিয়া বহিয়া আসিতেছিল। দুই বন্ধুর বিনিদ্র চোখে হাওয়াটা ভালই লাগিতেছিল। হৈমন্তী বলিতে লাগিল, "মহেন্দ্র-দা জার্মানী চ'লে যাবে ব'লে ভয়ানক মাথা গোলমাল ক'রে ব'সে আছে। তার নাকি যাবার আগেই এদিক্‌কার সব ব্যবস্থা ক'রে যাওয়া দরকার। কিন্তু দরকার এক জনের হ'লেই ত পৃথিবীতে সব জিনিষ সেই মত হয় না?"

সুধা হাসিয়া বলিল, "কিন্তু কি তার দরকার হয়েছে বিশেষ ক'রে? তোমাকে দরকার ত?"

হৈমন্তী একটু লাল হইয়া বলিল, "তাই ত মনে হচ্ছে। আমি ভাই, মহেন্দ্র-দার সম্বন্ধে এ সব কথা কখনও ভাবি নি। ওর কাছে পড়েছি, ওর সঙ্গে বেড়িয়ে গল্প ক'রে কত দিন কাটিয়েছি, ও যেন আমাদেরই এক জন হয়ে গিয়েছে। ওকে দুঃখ দিতে ইচ্ছা করে না, কিন্তু তবু আমার পক্ষে ওর ইচ্ছা পূর্ণ করা যে সম্ভব নয় এটা আমাকে বলতেই হবে।"

সুধা বলিল, "তুমি কি তাঁকে কিছুই বল নি? তাঁকে দে'খে ত তা মনে হ'ল না। একটা কিছু প্রলয় কাণ্ড ঘটেছেই বরং মনে হ'ল।"

হৈমন্তী বলিল, "স্পষ্ট কথাটা উচ্চারণ ক'রে বলি নি বটে, কিন্তু যতভাবে কথাটাকে এড়িয়ে চলেছি তাতে কার আর বুঝতে বাকী থাকে? মহেন্দ্র-দা রেগেই অস্থির। আমি কি ক'রে যে বাড়ী পালিয়ে আসব ভেবে পাচ্ছিলাম না।"

সুধা বলিল, "বেচারী মহেন্দ্র-দা! তোমার মত জিনিষের উপর তার যে লোভ হয়েছে তাতে তাকে দোষ দেওয়া যায় না। কথায় বলে বটে জহুরীই মাণিক চেনে। কিন্তু সত্যি মাণিক এক্ষেত্রে জহুরী না হ'লেও চেনা যায়। সে ত চাইবেই ভাল জিনিষ। তবে সংসারে মেয়ের পছন্দটার কথাও ত ভাবতে হবে? ছেলেবেলা বুঝতে পারতাম না। কিন্তু এখন ত দেখছি···"

সুধা কথা বলিতে বলিতে থামিয়া গেল। হৈমন্তী তাহাকে নাড়া দিয়া বলিল, "এখন কি দেখছ? বললে না যে বড়!"

সুধা হৈমন্তীর দিকে মুখ ফিরাইয়া বলিল, "এই মিলিদিকে দেখলাম, তোমাকে দেখছি।" একটুখানি

হাসিয়া সুধা আবার বলিল, "কয়েক বছর আগেও আমি কি ভীষণ হাবা ছিলাম। বাইরের একটা মানুষের জন্যে মানুষ কি ক'রে যে এত মাথা ঘামাতে পারে, আর কেনই বা এত মাথা-কোটাকুটি তার জন্যে চলে তা ভেবেই পেতাম না।"

হৈমন্তী তাহার চিবুকটা নাড়া দিয়া বলিল, "এখন সব বুঝতে পেরেছ ত? আর কিছুদিন যাক্ না, একেবারে হাতে-কলমে শিখবে।"

সুধা বলিল, "ও সব জিনিষ যত না-শেখা যায় ততই পৃথিবীতে সুখে থাকা যায়। দেখছ না মহেন্দ্র-দার অবস্থা!"

হৈমন্তী বলিল, "সত্যি, বেচারীর জন্যে বড় দুঃখ হয়। মিলিদির বিয়ে হয়ে গেলে ও বোধ হয় রাগ ক'রে আর আমাদের বাড়ী আসবেই না। ও না এলে ওকে খুবই 'মিস্' করি আমি।"

সুধা বলিল, "তবে আর একবার ভেব দেখ না, ওর কথায় রাজী হওয়া যায় কি না। মহেন্দ্র-দা ত হাতে স্বর্গ পাবেন।"

হৈমন্তী সুধাকে জড়াইয়া ধরিয়া তাহার বুকের ভিতর মাথাটা গুঁজিয়া দিয়া বলিল, "সে যে আমার সাধ্যের অতীত হয়ে গেছে ভাই, কোন উপায়েই তা আর হয় না। আমাকে দে'খে যে বুঝেছ বল, ঠিক জিনিষটা কি বুঝতে পেরেছ? বল ত কে সে?"

সুধার বুকের ভিতরটা কাঁপিয়া উঠিল। চোখ বুজিয়া যে-সত্যের ছায়াকে একদিন সে এড়াইতে চাহিয়াছিল, তাহা আজ চোখের সম্মুখে আগুনের মত উজ্জ্বল হইয়া জ্বলিয়া উঠিল। তাহার কথার সুরে যে-হতাশা ধ্বনিয়া উঠিল তাহা হৈমন্তী বুঝিতে পারিল না। সে বলিল, "ঠিক কি ক'রে বলব ভাই? আন্দাজে যা তা বলতে চাই না।"

হৈমন্তী মুখ না তুলিয়াই বলিল, "তাকে তুমি প্রতিদিনই ত দেখছ। তুমি উদাসীন কবি, তাই এত দিন আমার এত কাছে থেকেও বুঝতে পার নি। আমার সমস্ত মন জুড়ে যে আকাশের আলো রয়েছে তাকে চেন না? তপন..."

সুধার বুকের ভিতর হাতুড়ির ঘায়ের মত একটা আঘাত সজোরে লাগিল। এক মুহূর্ত্তে যেন তাহার সমস্ত সংজ্ঞা লোপ পাইয়া গেল। সে শুইয়া না থাকিলে পড়িয়া যাইত। হৈমন্তীর অনেকগুলি কথাই সুধার কানে আসে নাই। হঠাৎ সে শুনিল হৈমন্তী বলিতেছে, "আমি বক্‌বক্ ক'রে অনেক ব'কে গেলাম, তুমি আমার একটা কথারও জবাব দিলে না। তোমাকে এত দিন কিছুই বলি নি ব'লে খুব কি রাগ করেছ? এক-তরফা ব্যাপারের কথা বলতে মানুষের সব সময় সাহসে কুলোয় না। কোনও দিন বলতে পারব ভাবি নি, আজ তোমার কাছে আপনি কথা বেরিয়ে এল।"

সুধা আপনাকে সামলাইয়া লইয়া সজাগ হইয়া বলিল, "না ভাই, আমি একটুও রাগ করি নি। আমি কি এমনই মূর্খ যে এতেও রাগ করব? তুমি যে আজ আমায় বললে এই ত আমার মহাভাগ্য! আমাকে যদি তুমি আগের চোখে না দেখতে তাহ'লে বলতে পারতে না।"

হৈমন্তী বলিল, "যে-কথা কাউকে বলা যায় না, তা তোমাকে বলতে পেরে আমার মনটা হাল্কা হ'ল। আর যাকে বলা যায় সে নিজে না শুনতে চাইলে আমি ত বলতে পারব না। কিন্তু তার উদাসীন দৃষ্টি, তার বিশ্বভোলা ধরণ দে'খে মনে ত হয় না যে সে কোনও দিন আমার এ-কথা শুনতে চাইবে। এ আমার দুঃখ ও সুখের বোঝা আমি একলাই বয়ে বেড়াব।"

সুধা কথা বলিল না, সুদীর্ঘ একটা নিঃশ্বাস ফেলিল। হৈমন্তী তাহার বুকের আরও কাছে সরিয়া আসিল। সুধা হৈমন্তীর ঘন চুলের উপর ধীরে হাত বুলাইতে লাগিল। চূর্ণ বৃষ্টির কণা হাওয়ায় ভাসিয়া আসিয়া তাহাদের মুখেচোখে পড়িতে লাগিল, কেহ উঠিয়া জানালা বন্ধ করিল না। ঘরের মেঝেতে অন্ধকারে জল গড়াইয়া চলিতে লাগিল। বাহিরে বৃষ্টির ঝর-ঝর শব্দে শহরের শেষরাত্রের অন্য সব শব্দ ডুবিয়া গিয়াছে।

সুধার চোখের জলে হৈমন্তীর অর্দ্ধসিক্ত চুলগুলি আরও ভিজিয়া উঠিতেছিল। অকস্মাৎ হৈমন্তী মুখ তুলিয়া সুধার দিকে চাহিয়া বলিল, "সুধা, তুমি কাঁদছ? ছি ভাই, তোমার মন এত নরম জানলে তোমাকে কোন কথা আমি বলতাম না। পৃথিবীতে সুখদুঃখ এক সুতোয় গাঁথা, তাকে চোখে দেখার সুখ এত বড় ব'লেই, না-দেখতে পাওয়ার সম্ভাবনায় আমার এত ভয়। এর জন্য কেঁদো না। দুঃখ যদি কম পেতাম তাহ'লে সুখও এমন গভীর ক'রে জানতাম না, এটা মনে রাখতে হবে।"

হৈমন্তী সুধার কপালের উপর একটি চুম্বন করিল। তাহাদের দুই জনের চোখের জল একত্রে মিশিয়া ঝরিয়া পড়িল।

সুধা আঁচল দিয়া চোখ মুছিয়া বলিল, "রাত শেষ হয়ে এল, তুমি ঘুমোও ভাই, আর আমি কাঁদব না। আমাদের নিছক হাসির দিন শেষ হয়েছে, এবার জীবনে আঘাতের পালা, পরীক্ষার পালা। তাতে ভেঙে পড়লে চলবে কেন?"

হৈমন্তী বলিল, "কাল মিলিদির বিয়ে, ভুলে গিয়েছিলাম। চোখের জল ফে'লে তার অকল্যাণ করব না। আমার পাগলামিতে তোমাকে সুদ্ধ কাঁদালাম।"

(২৮)

মিলির বিবাহের পর সুধা ও হৈমন্তীর সঙ্গে তপন-নিখিলদের দেখাশুনা কিছুদিন হয়ত হইবে না, এই জন্য তাহারা সকলেই মনে মনে একটু চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল। মহেন্দ্র ত মনের কথা প্রকাশ করিয়াই ফেলিয়াছিল, তপন-নিখিলও ওই কথাই মনে মনে জপ করিতেছিল।

দক্ষিণেশ্বরের বাগানে তোলা বহু পুরাতন একখানা ছবি হইতে একটি মুখ এনলার্জ করাইয়া তপন আপনার দেরাজের ভিতর রাখিয়াছিল। দিনে দুই বেলা সেই ছবির উজ্জ্বল চোখ দুটির দিকে তাকাইয়া সে বলিত, "তোমাকে আমার পূজার অর্ঘ্য আজও নিবেদন করতে পারলাম না। জানি না কত দিনে আমার সে ইচ্ছা পূর্ণ হবে।"

মিলির বিবাহের দিন ভোরবেলা উঠিয়া তপন ছবিখানি বাহির করিয়াছিল। একটু বেলা হইলেই আজ ও-বাড়ী যাইতে হইবে। তাহার আগে নিরিবিলিতে সে ছবিখানি একবার দেখিয়া লইতেছিল। চাহিয়া চাহিয়া তাহার চোখের তৃষ্ণা মিটিতেছিল না। তপন বলিল, "তুমি এতই সুন্দর যে তোমার চেয়ে সুন্দর পৃথিবীতে কিছু আছে কিনা এটা ভাববার অবসর কি ইচ্ছাও আমার হয় না।"

হঠাৎ দরজার পিছনে কাহার পদধ্বনি শুনিয়া তপন চমকাইয়া উঠিল। ফিরিয়া দেখিল, সহাস্য মুখে নিখিল দাঁড়াইয়া। তপন ছবিখানি উল্টাইয়া আবার দেরাজের ভিতর রাখিল।

নিখিল বলিল, "কার ছবি দেখছিলে দেখি না?"

তপন একটু মৃদু হাসিয়া বলিল, "নাই বা দেখলে! না দেখলে কিছু ক্ষতি হবে না।"

নিখিল বলিল, "তথাস্তু। তবে ভোরবেলা যা মনে ক'রে তোমার বাড়ী এসেছিলাম তা সত্যিই প্রমাণ হ'ল। 'হেড ওভার ইয়ার্স ইন লভ্,' কি বল?"

তপন শুধু হাসিল। নিখিল বলিল, "যৌবনের ধর্ম্ম, তার হাত থেকে রক্ষা পাওয়া শক্ত। আমিও যে পেয়েছি তা বলতে পারি না, তবে ঠিক তোমাদের মত নয়।"

তপন বেশী কৌতূহল না দেখাইয়া বলিল, "নানা রকম হওয়াই ত জগতের নিয়ম। সব যদি এক রকম হ'ত তাহ'লে পৃথিবীতে কোনও নূতনত্ব থাকত না।"

নিখিল বলিল, "আমার ওই দুটি মেয়েকেই ভারী চমৎকার লাগে। কোন্ দিকে যে মন দেব তা বুঝতে পারি না। তবে আমি জানি, মনটা স্থির করতে পারলে আমার মধ্যে একনিষ্ঠতার অভাব হবে না। যদি একান্তই কাউকেই না পাই, তা হ'লেও আমি বিবাগী হয়ে বেরিয়ে যাব না। নিজের অদৃষ্টলিপিতে সন্তুষ্ট থাকতে আমি জানি। তা ছাড়া যাকে একান্ত নিজের ক'রে চাওয়া যায় তাকে তেমন ক'রে না পেলেও আজীবন বন্ধুত্ব রক্ষা ক'রে যাওয়ার একটা সৌন্দর্য্য আছে। আমার সম্পত্তি সে হ'ল না ব'লে তাকে একেবারে ভুলতে চেষ্টা কেন করব?'

তপন বলিল, "ভুলতে না চাও ভুলো না; তবে মানুষ যেখানে দুরন্ত আগ্রহে কাউকে চায়, সেখানে না পেলে অধিকাংশ মানুষই বন্ধুত্বের সীমার মধ্যে নিজের মনকে স্বাভাবিক ভাবে প্রথম প্রথম শান্ত ক'রে রাখতে পারে না। তাই একেবারে পলায়নের পথ তারা ধরে। যার নিজেকে নিজের হাতের মুঠির ভিতর রাখবার ক্ষমতা আছে তার বন্ধুকে সম্পূর্ণ পর ক'রে দেবার প্রয়োজন হয় না।"

নিখিল বিছানার উপর বসিয়া পড়িয়া বলিল, "আচ্ছা, তবে তাই হবে। এস, তোমার সঙ্গে একটা সর্ত্ত করা যাক্। বেশী ভূমিকা করব না, আমি জানি তুমি আর মহেন্দ্র দু-জনেই হৈমন্তীকে ভালবাস। হৈমন্তীর মত মেয়েকে সকলেই যে চাইবে তাতে আশ্চর্য্য হবার কিছু নেই। কিন্তু সুধার মধ্যে যে ঝরণার জলের মত একটা 'ফ্রেশনেস্' আর নির্ম্মলতা

আছে, সেটার তুলনা হয় না। ওর উপর কালি ঢেলে দিলেও এক ফোঁটা দাঁড়াবে না। আবার দেখবে বরফগলা জলের মত ঝলমল করছে। কিন্তু আশ্চর্য্য যে ও নিজে নিজের এ অপূর্ব্ব শ্রী কখনও দেখতে পায় না। হয়ত দেখতে পেলে এটা থাকত না।"

তপন একটুখানি হাসিয়া বলিল, "তুমি মন স্থির করতে পার নি ব'লে ত মনে হচ্ছে না, বেশ ত পেরেছ দেখছি।"

নিখিল বলিল, "তা নয়। পৃথিবীতে অথবা তার চেয়ে অনেক ছোট গণ্ডীর ভিতর একটি মাত্র ভাল জিনিষ অথবা একটি মাত্র আশ্চর্য্য মেয়ে আছে যারা বলে, তারা মিথ্যা কথা বলে। ওরা দু-জনেই আশ্চর্য্য সুন্দর দু-দিক দিয়ে। কিন্তু হৈমন্তীর কথা আমি বলব না, তোমরা 'জেলস্' হবে। মানুষ ঘর বাঁধে এক জনকে নিয়ে এবং তাকে এতটা আপনার ক'রে তোলে ও তার কাছে এতখানি পায় যে পৃথিবীতে আর সব আশ্চর্য্য জিনিষ সম্বন্ধে তার মন উদাসীন হয়ে যায়। অবশ্য, যদি তার ভাগ্য ভাল না হয় তবে এটা ঘটে না।"

তপন বলিল, "আচ্ছা, তাই যেন হ'ল, কিন্তু তোমার আসল বক্তব্য কি?"

নিখিল বলিল, "আমার আসল বক্তব্য হচ্ছে যে তোমরা দু-জনেই ত একদিকে ঝুঁকেছ! কিন্তু মনে রেখো, দু-জনের মধ্যে যে সাধনায় সিদ্ধি লাভ করবে না, তাকে হাসিমুখে নিজের দুর্ভাগ্য সহ্য করতে হবে। আমি তোমাদের তৃতীয় 'রাইভ্যাল' হ'তে চাই না, তাই আমি চেষ্টা ক'রে দেখব সুধার কৃপাদৃষ্টি আমার উপর পড়ে কি না। তোমরা কিন্তু ওখান থেকে তাড়া খেয়ে এদিকে আসতে পাবে না। এ কথাটা দিতে পারবে আমাকে? মহেন্দ্রকে এখন বলতে গেলে সে আমার মাথা ভেঙে দেবে, তাই তাকে আপাততঃ কিছু বললাম না, শুধু তোমাকেই বলছি। তুমি এই সহজ কাজটুকু পারবে কি না বল!"

তপন বলিল, "কাজ সহজ হ'লে পারা ত উচিত। তবে তোমার নিজের মনটাকে ভাল ক'রে বুঝে নিয়ে এ-কাজে হাত দিও। পৃথিবীতে অনেক আশ্চর্য্য ও অপূর্ব্ব জিনিষ থাকতে পারে, কিন্তু প্রত্যেক মানুষের পছন্দ ও ভাল-লাগার একটু বিশেষত্ব থাকে। সব ভাল জিনিষই সকলের কাছে ঠিক সমান ওজনে দেখা দেয় না, কাউকে একটা জিনিষ আকর্ষণ করে বেশী, কাউকে আর একটা। তোমার ভাললাগার মধ্যে ওজনের কম-বেশী কি আর নেই? আমার বুদ্ধি আর মন দিয়ে বুঝতে চেষ্টা করলে আমার ত মনে হয় কোথাও একটু কম-বেশী আছেই। যদি তা থাকে তবে তাকে অগ্রাহ্য ক'রো না। যে খুব পেটুক সেও অনেক সুখাদ্য পেলে তার ভিতর একটা আগে বাছবার চেষ্টা করে। মহেন্দ্রর কথা আমি জানি না, কিন্তু আমি কারুর পাণিপ্রার্থী হয়েছি এটা তুমি আগে-ভাগে ধ'রে নিও না। তুমি নিজের মনের প্রয়োজন বুঝে কাজ ক'রো। তার পর কোথাও কৃতকার্য্য হ'লে বা না-হ'লে না-হয় আমাকে ব'লো। তোমার মন যদি হৈমন্তীর দিকে ঝুঁকে থাকে, আমাদের কথা না ভেবে নিজের ভাগ্যপরীক্ষা ক'রে দেখ, যদি সুধার দিকে ঝুঁকে থাকে তাহ'লে সেখানেই চেষ্টা ক'রে দেখতে পার। আমি তোমার পথে বাধা হয়ে দাঁড়াব না।"

নিখিল তপনের বিছানায় উপুড় হইয়া শুইয়া পড়িয়া নিজের দুই হাতের ভিতর মুখখানা অনেকক্ষণ রাখিয়া শেষে বলিল, "কাজটা বড় শক্ত। এখন যদি নূতন ক'রে আবার ভাবতে বসি, হয়ত আমার প্ল্যান সব ওলটপালট হয়ে যাবে। তার চেয়ে যেখানে তিন জনে ঢুঁসোঢুঁসি করবার সম্ভাবনা নেই, সেইখানে যাওয়াই ভাল। সত্যি কথা বলতে কি, আমার পক্ষে উনিশ-বিশ ঠিক করা সহজ নয়।"

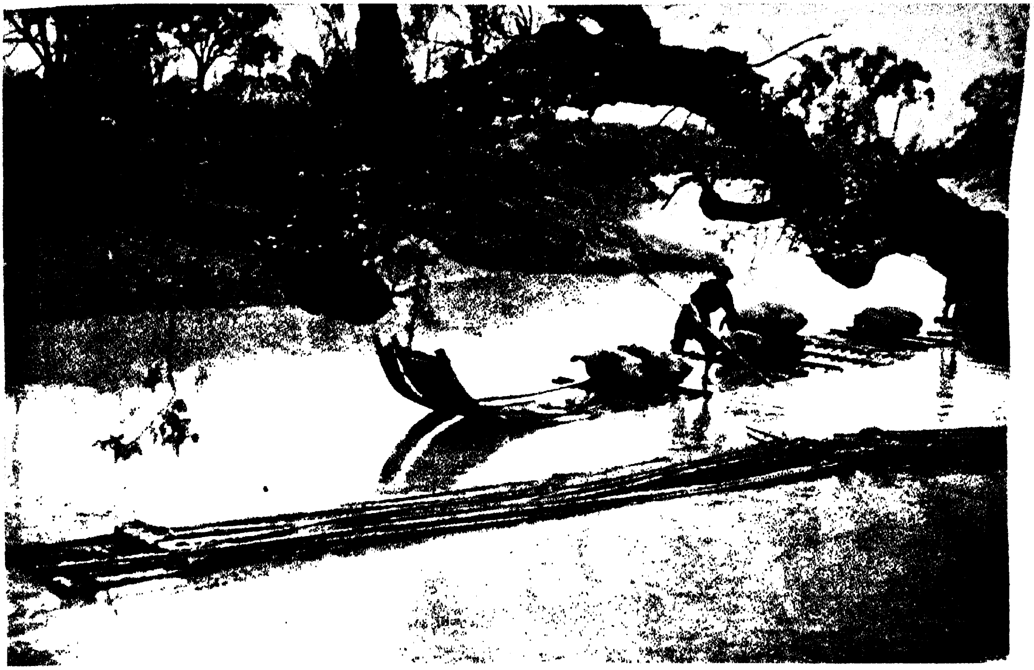
তপন বলিল, "তুমি যে এমন অদ্ভুত মানুষ তা জানতাম না। তোমাকেই আমাদের মধ্যে সব চেয়ে স্বাভাবিক আমি মনে করতাম।"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "হ্যাঁ, আমি অদ্ভুত সে ত মেনেই নিচ্ছি। তবে আমি জানি পৃথিবীতে আমার মত মানুষ আরও আছে। সে যাই হোক, তোমার কাছে আমি এক মাসের সময় চাই, তার পর আমার ভাগ্যে জয়পরাজয় যাই থাক, তোমার সঙ্গে আমার বন্ধুত্ব অক্ষুণ্ণ থাকবে। তুমি যে দরজায়ই প্রার্থী হয়ে দাঁড়াও না, আমি সেখানে বন্ধুভাবে তোমার সাহায্য করব।"

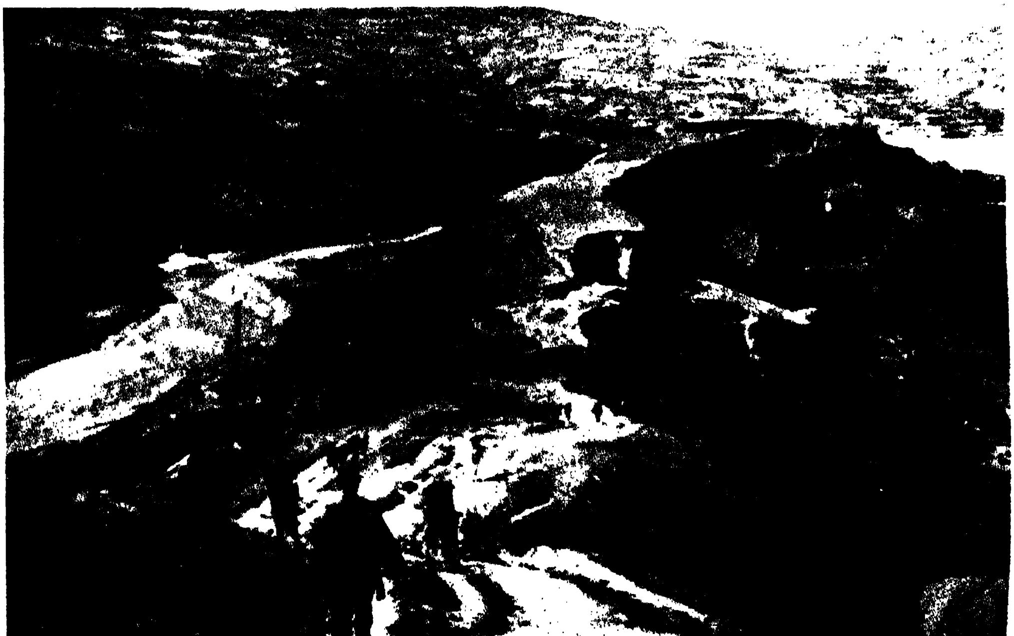
তপন হাসিয়া বলিল, "আমার কথা অত নাই ভাবলে!"

নিখিল তপনের একটা হাত ধরিয়া ঝাঁকাইয়া দিয়া বলিল, "ভাবছি কই? আমিই ত তোমার কাছে সাহায্য-ভিক্ষা করছি।"

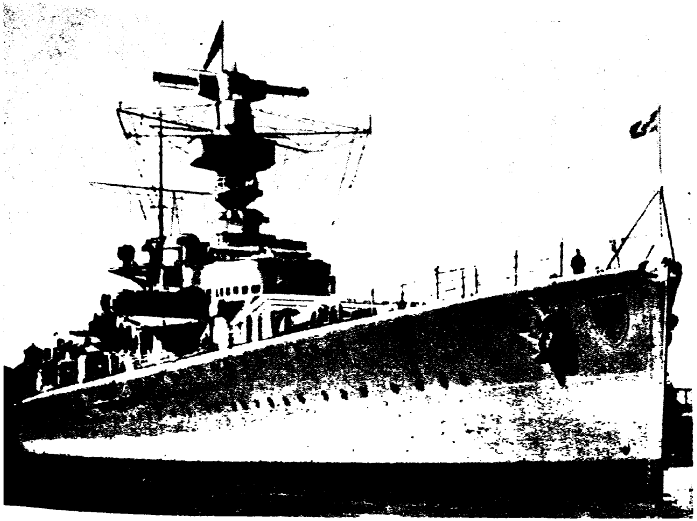
(ক্রমশঃ)



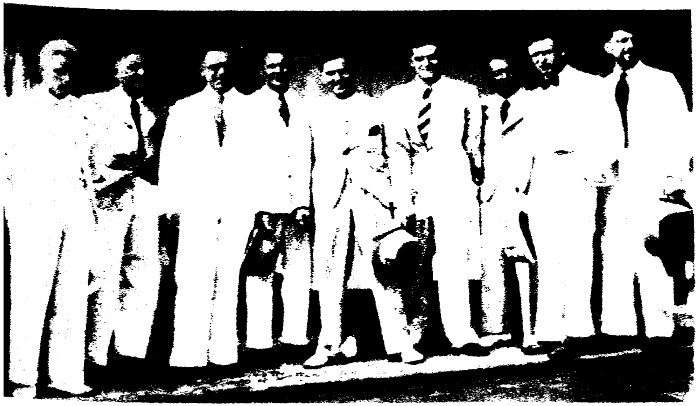
বাঁশের তৈরি চীনদেশীয় বিচিত্র ভেলা



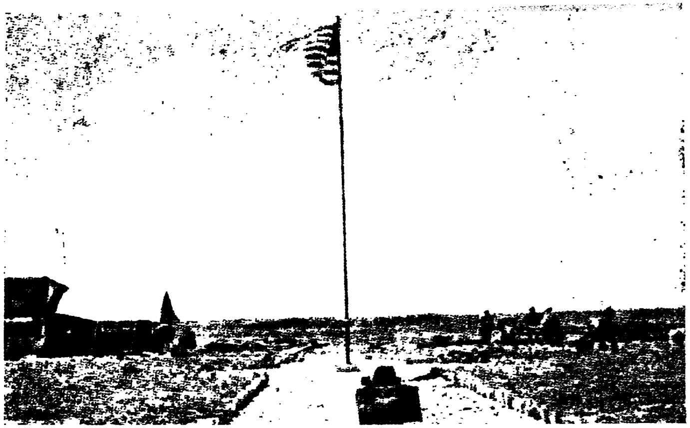
চীনে দক্ষিণ-পূর্ব্ব কান্‌সুর দৃশ্য



জর্ম্মন রণতরী 'ডয়েশল্যাণ্ড'—স্পেনের সরকার-পক্ষীয় বিমানপোত ইহার উপর বোমা ফেলায় জর্ম্মনির প্রতিবাদে নূতন আন্তর্জাতিক বিপদের সূচনা হয়।



নাঙ্গাপর্ব্বত-অভিযানে ধ্বংসপ্রাপ্ত দুর্ভাগা জার্ম্মন দল



হাওলাণ্ড দ্বীপ—আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্রের 'এয়ার-বেস'। এখানে একটি স্থায়ী 'এয়ার পোর্টে'র ভিত্তি স্থাপিত হইয়াছে। মিস্ এমেলিয়া ইয়ারহার্টের বিমান এখানেই নিরুদ্দেশ হইয়াছে।



অন্তর্মোঙ্গোলিয়ায় যাযাবর জাতির আবাস ও পশুচারণ

বানান-বিধি

শ্রীযুক্ত দেবপ্রসাদ ঘোষ মহাশয়কে লিখিত পত্র

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

১

ওঁ

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

বানান সম্বন্ধে আপনার মন্তব্য পড়েছি।

প্রথমেই বলা আবশ্যক ব্যাকরণে আমি নিতান্তই কাঁচা, তার একটা প্রমাণ 'মূর্দ্ধন্য'-শব্দে আমার ণ-কার ব্যবহার। এ সম্বন্ধে নিয়ম জানা ছিল কিন্তু বোধ হয় ণ-কারের বাহনত্ব স্বীকার করাতে ঐ শব্দটা সম্বন্ধে বরাবর আমার মন প্রমাদগ্রস্ত হয়েছিল। বস্তুত শিক্ষার বনিয়াদের দোষেই এ রকম ঘটে থাকে। ব্যাকরণে আমার বনিয়াদ পাকা নয় এ কথা গোপন করতে গেলেও ধরা পড়বার আশঙ্কা আছে।

বাংলা বানানের নিয়ম বিধিবদ্ধ করবার জন্য আমি বিশ্ববিদ্যালয়ের কর্তৃপক্ষের কাছে আবেদন করেছিলুম। তার কারণ এই, যে, প্রাকৃত বাংলার ব্যবহার সাহিত্যে অবাধে প্রচলিত হয়ে চলেছে কিন্তু এর বানান সম্বন্ধে স্বেচ্ছাচার ক্রমশই প্রবল হয়ে উঠছে দেখে চিন্তিত হয়েছিলুম। এ সম্বন্ধে আমার আচরণেও উচ্ছৃঙ্খলতা প্রকাশ পায় সে আমি জানি, এবং তার জন্য আমি প্রশ্রয় দাবি করি নে। এ রকম অব্যবস্থা দূর করবার একমাত্র উপায় শিক্ষা-বিভাগের প্রধান নিয়ন্তাদের হাতে বানান সম্বন্ধে চরম শাসনের ভার সমর্পণ করা।

বাংলা ভাষার উচ্চারণে তৎসম শব্দের মর্যাদা রক্ষা হয় বলে আমি জানি নে। কেবল মাত্র অক্ষর বিন্যাসেই তৎসমতার ভান করা হয় মাত্র, সেটা সহজ কাজ। বাংলা লেখায় অক্ষর বানানের নির্জীব বাহন—কিন্তু রসনা নির্জীব নয়। অক্ষর যাই লিখুক, রসনা আপন সংস্কার মতোই উচ্চারণ করে চলে। সে দিকে লক্ষ্য করে দেখলে বলতেই হবে যে, অক্ষরের দোহাই দিয়ে যাদের তৎসম খেতাব দিয়ে থাকি, সেই সকল শব্দের প্রায় ষোল আনাই অপভ্রংশ। যদি প্রাচীন ব্যাকরণকর্তাদের সাহস ও অধিকার আমার থাকত, এই ছদ্মবেশীদের উপাধি লোপ করে দিয়ে সত্য বানানে এদের স্বরূপ প্রকাশ করবার চেষ্টা করতে পারতুম। প্রাকৃত বাংলা ব্যাকরণের কেমাল পাশা হবার দুরাশা আমার নেই কিন্তু কালোহ্যয়ং নিরবধিঃ। উক্ত পাশা এদেশেও দেহান্তর গ্রহণ করতে পারেন।

এমন কি, যে সকল অবিসংবাদিত তদ্‌ভব শব্দ অনেকখানি তৎসম-ঘেঁষা তাদের প্রতি হস্তক্ষেপ করতে গেলেও পদে পদে গৃহবিচ্ছেদের আশঙ্কা আছে। এরা উচ্চারণে প্রাকৃত কিন্তু লেখনে সংস্কৃত আইনের দাবি করে। এ সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতি কতকটা পরিমাণে সাহস দেখিয়েছেন, সে জন্যে আমি কৃতজ্ঞ। কিন্তু তাঁদের মনেও ভয় ভয় আছে, তার প্রমাণ পাওয়া যায়।

প্রাকৃত বাংলায় তদ্‌ভব শব্দ বিভাগে উচ্চারণের সম্পূর্ণ আনুগত্য যেন চলে এই আমার একান্ত ইচ্ছা ছিল। কিন্তু যদি নিতান্তই সম্পূর্ণ সেই ভিত্তিতে বানানের প্রতিষ্ঠা নাও হয় তবু এমন একটা অনুশাসনের দরকার যাতে প্রাকৃত বাংলার লিখনে বানানের সাম্য সর্বত্র রক্ষিত হতে পারে। সংস্কৃত এবং প্রাচীন প্রাকৃত ভাষা ছাড়া সভ্য জগতের অন্য কোনো ভাষারই লিখনব্যবহারে বোধ করি উচ্চারণ ও বানানের সম্পূর্ণ সামঞ্জস্য নেই কিন্তু নানা অসংগতিদোষ থাকা সত্ত্বেও এ সম্বন্ধে একটা অমোঘ শাসন দাঁড়িয়ে গেছে। কাজ চলবার পক্ষে সেটার দরকার আছে। বাংলা লেখনেও সেই কাজ চালাবার উপযুক্ত নির্দিষ্ট বিধির প্রয়োজন মানি, আমরা প্রত্যেকেই বিধানকর্তা হয়ে উঠলে ব্যাপারটা প্রত্যেক ব্যক্তির ঘড়িকে তার স্বনিয়মিত সময়ের ব্যক্তিগত স্বাধীনতা দেবার মতো হয়।

সমিতির বিধানকর্তা হবার মতো জোর আছে। এই ক্ষেত্রে যুক্তির জোরের চেয়ে সেই জোরেরই জোর বেশি এ কথা আমরা মানতে বাধ্য।

রেফের পর ব্যঞ্জনের দ্বিত্ব বর্জন সম্বন্ধে বিশ্ববিদ্যালয় যে নিয়ম নির্ধারণ করে দিয়েছেন তা' নিয়ে বেশি তর্ক করবার দরকার আছে বলে মনে করি নে। যাঁরা নিয়মে স্বাক্ষর দিয়েছেন তাঁদের মধ্যে অনেক বড়ো বড়ো পণ্ডিতের নাম দেখেছি। আপনি যদি মনে করেন তাঁরা অন্যায় করেছেন তবুও তাঁদের পক্ষভুক্ত হওয়াই আমি নিরাপদ মনে করি। অন্তত তৎসম শব্দের ব্যবহারে তাঁদের নেতৃত্ব স্বীকার করতে কোনো ভয় নেই, লজ্জাও নেই। শুনেছি 'সৃজন' শব্দটা ব্যাকরণের বিধি অতিক্রম করেছে, কিন্তু যখন বিদ্যাসাগরের মতো পণ্ডিত কথাটা চালিয়েছেন তখন দায় তাঁরই, আমার কোনো ভাবনা নেই। অনেক পণ্ডিত 'ইতিমধ্যে' কথাটা চালিয়ে এসেছেন, 'ইতোমধ্যে' কথাটার ওকালতি উপলক্ষ্যে আইনের বই ঘাঁটবার প্রয়োজন দেখি নে—অর্থাৎ এখন ঐ 'ইতিমধ্যে' শব্দটার ব্যবহার সম্বন্ধে দায়িত্ব-বিচারের দিন আমাদের হাত থেকে চলে গেছে। বিশ্ববিদ্যালয়-বানান-সমিতিতে তৎসম শব্দ সম্বন্ধে যাঁরা বিধান দেবার দায়িত্ব নিয়েছেন, এ নিয়ে দ্বিধা করবার দায়িত্ব-ভার থেকে তাঁরা আমাদের মুক্তি দিয়েছেন। এখন থেকে কার্ত্তিক, কর্ত্তা প্রভৃতি দুই ত-ওয়ালা শব্দ থেকে এক ত আমরা নিশ্চিন্ত মনে ছেদন করে নিতে পারি, সেটা সাংঘাতিক হবে না। হাতের লেখায় অভ্যাস ছাড়তে পারব বলে প্রতিশ্রুতি দিতে পারব না, কিন্তু ছাপার অক্ষরে পারব। এখন থেকে ভট্টাচার্য্য শব্দের থেকে য-ফলা লোপ করতে নির্বিকার চিত্তে নির্মম হতে পারব, কারণ নব্য বানান-বিধাতাদের মধ্যে তিন জন বড়ো বড়ো ভট্টাচার্য্য-বংশীয় তাঁদের উপাধিকে য-ফলা বঞ্চিত করতে সম্মতি দিয়েছেন। এখন থেকে আর্য্য এবং অনার্য্য উভয়েই অপক্ষপাতে য-ফলা মোচন করতে পারবেন, যেমন আধুনিক মাঞ্চু ও চীনা উভয়েরই বেণী গেছে কাটা।

তৎসম শব্দ সম্বন্ধে আমি নমশুদের নমস্কার জানাব। কিন্তু তদ্‌ভব শব্দে অপণ্ডিতের অধিকারই প্রবল, অতএব এখানে আমার মতো মানুষেরও কথা চলবে—কিছু কিছু চালাচ্ছিও। যেখানে মতে মিলছি নে সেখানে আমি নিরক্ষরদের সাক্ষ্য মানছি। কেন না অক্ষরকৃত অসত্যভাষণের দ্বারা তাদের মন মোহগ্রস্ত হয় নি। বিশ্ববিদ্যালয়ের বানান-সমিতির চেয়েও তাদের কথার প্রামাণিকতা যে কম তা আমি বলব না—এমন কি হয়তো—থাক আর কাজ নেই।

তাহোক, উপায় নেই। আমি হয়তো একগুঁয়েমি করে কোনো কোনো বানানে নিজের মত চালাবো। অবশেষে হার মান্‌তে হবে তাও জানি। কেন না শুধু যে তাঁরা আইন সৃষ্টি করেন তা নয়, আইন মানাবার উপায়ও তাঁদের হাতে আছে। সেটা থাকাই ভালো, নইলে কথা বেড়ে যায়, কাজ বন্ধ থাকে। অতএব তাঁদেরই জয় হোক, আমি তো কেবল তর্কই করতে পারব, তাঁরা পারবেন ব্যবস্থা করতে। মুদ্রাযন্ত্র-বিভাগে ও শিক্ষা-বিভাগে শান্তি ও শৃঙ্খলা রক্ষার পক্ষে সেই ব্যবস্থার দৃঢ়তা নিতান্ত আবশ্যক।

আমি এখানে স্বপ্রদেশ থেকে দূরে এসে বিশ্রামচর্চার জন্য অত্যন্ত ব্যস্ত আছি। কিন্তু প্রারব্ধ কর্মের ফল সর্বত্রই অনুসরণ করে। আমার যেটুকু কৈফিয়ৎ দেবার সেটা না দিয়ে নিষ্কৃতি নেই। কিন্তু এই যে দুঃখ স্বীকার করলুম এর ফল কেবল একলা আপনাকে নিবেদন করলে বিশ্রামের অপব্যয়টা অনেক পরিমাণেই অনর্থক হবে। অতএব এই পত্রখানি আমি প্রকাশ করতে পাঠালুম। কেন না এই বানান-বিধি ব্যাপারে যাঁরা অসন্তুষ্ট তাঁরা আমাকে কতটা পরিমাণে দায়ী করতে পারেন সে তাঁদের জানা আবশ্যক। আমি পণ্ডিত নই, অতএব বিধানে যেখানে পাণ্ডিত্য আছে সেখানে নম্রভাবেই অনুসরণের পথ গ্রহণ করব, যে অংশটা পাণ্ডিত্যবর্জ্জিত দেশে পড়ে সে অংশে যতটা শক্তি বাচালতা করব কিন্তু নিশ্চিত জানব, যে একদা "অন্যে বাক্য কবে কিন্তু তুমি রবে নিরুত্তর।"

আলমোড়া, ১২।৬।৩১

২

ওঁ

বিনয়সম্ভাষণপূর্বক নিবেদন,

আলোচ্য বিষয়টি শুরু করবার পূর্বে অপ্রাসঙ্গিক ছোটো কথাটিকে সেরে নেওয়া যাক। আপনি লক্ষ্য করেছেন যে আপনার পত্রে আমি 'দায়ী' শব্দে হ্রস্ব ইকার প্রয়োগ করেছি।

যদি আপনি ঠিকমতো পড়ে থাকেন তবে আমার পক্ষে বক্তব্য এই যে ঐ শব্দটির স্বরলাঘব আমার দ্বারা আর কখনোই ঘটে নি। আপনার চিঠিতেই প্রথম এই স্খলন হোলো তার দুটি কারণ থাকতে পারে, এক বেপথু, আর এক জরাজনিত মনোযোগের দুর্বলতা। বোধ করি শেষোক্ত কারণটিই সত্য। আজকাল এরকম প্রমাদ আমার সর্বদাই ঘটে থাকে, সে জন্যে আমি ক্ষমার যোগ্য। আপনার ৭৭ বছর বয়সের জন্যে আমি অপেক্ষা করতে পারব না—যদি পারতুম তবে আপনার পত্রের এই অংশের প্রত্যুত্তর দেবার উপলক্ষ্য তখন হয়তো পাওয়া যেত।

আমি পূর্বেই কবুল করেছি যে, কী সংস্কৃত ভাষায় কী ইংরেজিতে আমি ব্যাকরণে কাঁচা। অতএব প্রাকৃত বাংলায় তৎসম শব্দের বানান নিয়ে তর্ক করবার অধিকার আমার নেই। সৌভাগ্যের বিষয় এই যে, এই বানানের বিচার আমার মতের অপেক্ষা করে না। কেবল আমার মতো অনভিজ্ঞ ও নতুন পোড়োদের পক্ষ থেকে পণ্ডিতদের কাছে আমি এই আবেদন করে থাকি যে, ব্যাকরণ বাঁচিয়ে যেখানেই বানান সরল করা সম্ভব হয় সেখানে সেটা করাই কর্তব্য তাতে জীবে দয়ার প্রমাণ হয়। এ ক্ষেত্রে প্রবীণদের অভ্যাস ও আচারনিষ্ঠতার প্রতি সম্মান করতে যাওয়া দুর্বলতা। যেখানে তাঁদের অবিসংবাদিত অধিকার সেখানে তাঁদের অধিনায়কত্ব স্বীকার করতেই হবে। অন্যত্র নয়। বানানসংস্কার-সমিতি বোপদেবের তিরস্কার বাঁচিয়েও রেফের পর দ্বিত্ব বর্জনের যে বিধান দিয়েছেন সে জন্য নবজাত ও অজাত প্রজাবর্গের হয়ে তাঁদের কাছে আমার নমস্কার নিবেদন করি।

বিশেষজ্ঞতা সকল ক্ষেত্রেই দুর্লভ। ব্যাকরণে বিশেষজ্ঞের সংখ্যা খুবই কম এ কথা মানতেই হবে। অথচ তাঁদের অনেকেরি অন্য এমন গুণ থাকতে পারে যাতে একোহি দোষো গুণসন্নিপাতের জন্য সাহিত্য ব্যবহার থেকে তাঁদের নির্বাসন দেওয়া চলবে না। এঁদের জন্যেই কোনো একটি প্রামাণ্য শাসনকেন্দ্র থেকে সাহিত্যে বানান প্রভৃতি সম্বন্ধে কার্যবিধি প্রবর্তনের ব্যবস্থা থাকা একান্ত দরকার। আইন বানাবার অধিকার তাঁদেরই আছে আইন মানাবার ক্ষমতা আছে যাঁদের হাতে। আইনবিদ্যায় যাঁদের জুড়ি কেউ নেই ঘরে বসে তাঁরা আইনকর্তাদের 'পরে কটাক্ষপাত করতে পারেন কিন্তু কর্তাদের বিরুদ্ধে দাঁড়িয়ে আইন তাঁরা চালাতে পারবেন না। এই কথাটা চিন্তা করেই বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যক্ষদের কাছে বানানবিধি পাকা করে দেবার জন্যে দরখাস্ত জানিয়েছিলেম। অনেক দিন ধরে বানান সম্বন্ধে যথেচ্ছাচার নিজেও করেছি অন্যকেও করতে দেখেছি। কিন্তু অপরাধ করবার অবাধ স্বাধীনতাকে অপরাধীও মনে মনে নিন্দা করে, আমিও করে এসেছি। সর্বসাধারণের হয়ে এর প্রতিবিধান-ভার ব্যক্তিবিশেষের উপর দেওয়া চলে না—সেই জন্যেই পীড়িত চিত্তে মহতের শরণাপন্ন হতে হোলো। আপনার চিঠির ভাষার ইঙ্গিত থেকে বোঝা গেল যে বানানসংস্কার-সমিতির "হোমরাচোমরা" "পণ্ডিত"দের প্রতি আপনার যথেষ্ট শ্রদ্ধা নেই। এই অশ্রদ্ধা আপনাকেই সাজে কিন্তু আমাকে তো সাজে না, আর আমার মতো বিপুলসংখ্যক অভাজনদেরও সাজে না। নিজে হাল ধরতে শিখি নি, কর্ণধারকে খুঁজি—যে-সে এসে নিজেকে কর্ণধার বলে ঘোষণা করলেও তাদের হাতে হাল ছেড়ে দিতে সাহস হয় না, কেননা, এতে প্রাণের দায় আছে।

এমন সন্দেহ আপনার মনে হতেও পারে যে সমিতির সকল সদস্যই সকল বিধিরই যে অনুমোদন করেন তা সত্য নয়। না হওয়াই সম্ভব। কিন্তু আপোসে নিষ্পত্তি করেছেন। তাঁদের সম্মিলিত স্বাক্ষরের দ্বারা এই কথারই প্রমাণ হয় যে এতে তাঁদের সম্মিলিত সমর্থন আছে। যৌথ কারবারের অধিনেতারা সকলেই সকল বিষয়েই একমত কি না, এবং তাঁরা কেউ কেউ কর্তব্যে ঔদাস্য করেছেন কি না সে খুঁটিনাটি সাধারণে জানেও না জানতে পারেও না। তারা এইটুকুই জানে যে স্বাক্ষরদাতা ডিরেক্টরদের প্রত্যেকেরই সম্মিলিত দায়িত্ব আছে। (বশিত্ব কৃতিত্ব প্রভৃতি ইন্‌ভাগান্ত শব্দে যদি হ্রস্ব ইকার প্রয়োগই বিধিসম্মত হয় তবে দায়িত্ব শব্দেও ইকার খাটতে পারে বলে আমি অনুমান করি) আমরাও বানান-সমিতিকে এক বলে গণ্য করছি এবং তাঁদের বিধান মেনে নিতে প্রস্তুত হচ্ছি। যেখানে স্বত্বপ্রধান দেবতা অনেক আছে সেখানে কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম। অতএব বাংলা তৎসম শব্দের বানানে রেফের পরে

বিস্ববর্জনের যে বিধান বিশ্ববিদ্যালয়ে স্বীকৃত হয়েছে সেটা সবিনয়ে আমিও স্বীকার করে নেব।

কিন্তু যে-প্রস্তাবটি ছিল বানান-সমিতি স্থাপনের মূলে, সেটা প্রধানত তৎসম শব্দসম্পর্কীয় নয়। প্রাকৃত বাংলা যখন থেকেই সাহিত্যে প্রবেশ ও বিস্তার লাভ করল তখন থেকেই তার বানানসাম্য নির্দিষ্ট করে দেবার সমস্যা প্রবল হয়ে উঠেছে। প্রাকৃত বাংলার সংস্কৃত অংশের বানান সম্বন্ধে বেশি দুশ্চিন্তার কারণ নেই—যাঁরা সতর্ক হতে চান হাতের কাছে একটা নির্ভরযোগ্য অভিধান রাখলেই তাঁরা বিপদ এড়িয়ে চলতে পারেন। কিন্তু প্রাকৃত বাংলার প্রামাণ্য অভিধান এখনও হয় নি, কেননা, আজও তার প্রামাণিকতার প্রতিষ্ঠাই হতে পারে নি। কিন্তু এই বানানের ভিত পাকা করার কাজ শুরু করবার সময় এসেছে। এত দিন এই নিয়ে আমি দ্বিধাগ্রস্ত ভাবেই কাটিয়েছি। তখনও কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাংলা ভাষা প্রাধান্য লাভ করে নি। এই কারণে সুনীতিকেই এই ভার নেবার জন্যে অনুরোধ করেছিলেম। তিনি মোটামুটি একটা আইনের খসড়া তৈরি করে দিয়েছিলেন। কিন্তু আইনের জোর কেবল যুক্তির জোর নয় পুলিসেরও জোর। সেই জন্যে তিনি দ্বিধা ঘোচাতে পারলেন না। এমন কি আমার নিজের ব্যবহারে শৈথিল্য পূর্বের মতোই চলল। আমার সংস্কার, প্রুফশোধকের সংস্কার, কাপিকারকের সংস্কার, কম্পোজিটরের সংস্কার, এবং যে সব পত্রিকায় লেখা পাঠানো যেত তার সম্পাদকদের সংস্কার এই সব মিলে পাঁচ ভূতের কীর্তন চলত। উপরওয়ালা যদি কেউ থাকেন এবং তিনিই যদি নিয়ামক হন, এবং দণ্ডপুরস্কারের দ্বারা তাঁর নিয়ন্তৃত্ব যদি বল পায় তাহলেই বানানের রাজ্যে একটা শৃঙ্খলা হতে পারে। নইলে ব্যক্তিগত ভাবে আপনাদের মতো বিচক্ষণ লোকের দ্বারে দ্বারে মত সংগ্রহ করে বেড়ানো শিক্ষার পক্ষে যতই উপযোগী হোক কাজের পক্ষে হয় না।

কেন যে মুশকিল হয় তার একটা দৃষ্টান্ত দিই। বর্ণন শব্দে আপনি যখন মূর্ধন্য ণ লাগান তখন সেটাকে যে মেনে নিই সে আপনার খাতিরে নয়, সংস্কৃত শব্দের বানান প্রতিষ্ঠিত স্বে মহিম্নি—নিজের মহিমায়। কিন্তু আপনি যখন বানান শব্দের মাঝখানটাতে মূর্ধন্য ণ চড়িয়ে দেন তখন ওটাকে আমি মানতে বাধ্য নই। প্রথমত এই বানানে আপনার বিধানকর্তা আপনি নিজেই। দ্বিতীয়ত আপনি কখনো বলেন প্রচলিত বানান মেনে নেওয়াই ভালো আবার যখন দেখি মূর্ধন্য ণ-লোলুপ 'নয়া' বাংলা বানান-বিধিতে আপনার ব্যক্তিগত আসক্তিকে সমর্থনের বেলায় আপনি দীর্ঘকাল-প্রচলিত বানানকে উপেক্ষা করে উক্ত শব্দের বুকের উপর নবাগত মূর্ধন্য ণয়ের জয়ধ্বজা তুলে দিয়েছেন তখন বুঝতে পারি নে আপনি কোন্ মতে চলেন। জানি নে কানপুর শব্দের কানের উপর আপনার ব্যবহার নব্য মতে বা পুরাতন মতে। আমি এই সহজ কথাটা বুঝি যে প্রাকৃত বাংলায় মূর্ধন্য ণয়ের স্থান কোথাও নেই, নির্জীব ও নিরর্থক অক্ষরের সাহায্যে ঐ অক্ষরের বহুল আমদানি করে আপনাদের পাণ্ডিত্য কাকে সন্তুষ্ট করছে, বোপদেবকে না কাত্যায়নকে। দুর্ভাগ্যক্রমে বানান-সমিতিরও যদি ণ-এর প্রতি অহৈতুক অনুরাগ থাকত তাহলে দণ্ডবিধির জোরে সেই বানানবিধি আমিও মেনে নিতুম। কেননা, আমি জানি আমি চিরকাল বাঁচব না কিন্তু পাঠ্যপুস্তকের ভিতর দিয়ে যারা বিশ্ববিদ্যালয়ের বানানে শিক্ষালাভ করবে তাদের আয়ু আমার জীবনের মেয়াদকে ছাড়িয়ে যাবে।

মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী মহাশয়ের সঙ্গে প্রাকৃত বাংলা ভাষা সম্বন্ধে আমার আলোচনা হয়েছিল। তিনি প্রাকৃত বাংলা ভাষার স্বতন্ত্র রূপ স্বীকার করবার পক্ষপাতী ছিলেন এ কথা বোধ হয় সকলের জানা আছে। সেকালকার যে সকল ব্রাহ্মণ পণ্ডিতের সংস্কৃত ভাষায় বিশুদ্ধ পাণ্ডিত্য ছিল, তাঁদের কারো কারো হাতের লেখা বাংলা বানান আমার দেখা আছে। বানান-সমিতির কাজ সহজ হোতো তাঁরা যদি উপস্থিত থাকতেন। সংস্কৃত ভাষা ভালো করে জানা না থাকলে বাংলা ভাষা ব্যবহারের যোগ্যতা থাকবেই না, ভাষাকে এই অস্বাভাবিক অত্যাচারে বাধ্য করা পাণ্ডিত্যাভিমানী বাঙালির এক নূতন কীর্তি। যত শীঘ্র পারা যায় এই কঠোর বন্ধন শিথিল করে দেওয়া উচিত। বস্তুত একেই বলে ভূতের বোঝা বওয়া। এত কাল ধরে সংস্কৃত ব্যাকরণের সাহায্য না নিয়ে যে বহুকোটি বাঙালি প্রতিদিন মাতৃভাষা ব্যবহার করে এসেছে এতকাল পরে আজ তাদের সেই ভাষাই বাংলা



বনে ভোজন
শ্রীশান্তি গুহ

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সাহিত্যে প্রবেশের অধিকার পেয়েছে। এই জন্ত তাদের সেই খাঁটি বাংলার প্রকৃত বানান নির্ণয়ের সময় উপস্থিত হয়েছে। এক কালে প্রাচীন ভারতের কোনো কোনো ধর্মসম্প্রদায় যখন প্রাকৃত ভাষায় পালি ভাষায় আপন আপন শাস্ত্রগ্রন্থ প্রচার করতে প্রবৃত্ত হয়েছিল তখন ঠিক এই সমস্যাই উঠেছিল। যাঁরা সমাধান করেছিলেন তাঁরা অসাধারণ পণ্ডিত ছিলেন ; তাঁদের পাণ্ডিত্য তাঁরা বোঝার মতো চাপিয়ে যান নি জনসাধারণের 'পরে। যে অসংখ্য পাঠক ও লেখক পণ্ডিত নয় তাদের পথ তাঁরা অকৃত্রিম সত্যপন্থায় সরল করেই দিয়েছিলেন। নিজের পাণ্ডিত্য তাঁরা নিজের মধ্যে সম্পূর্ণ পরিপাক করেছিলেন বলেই এমনটি ঘটা সম্ভব হয়েছিল।

আপনার চিঠিতে ইংরেজি ফরাসি প্রভৃতি ভাষার নজির দেখিয়ে আপনি বলেন ঐ সকল ভাষায় উচ্চারণে বানানে সামঞ্জস্য নেই। কিন্তু এই নজিরের সার্থকতা আছে বলে আমি মনে করি নে। ঐ সকল ভাষার লিখিত রূপ অতি দীর্ঘকাল ধরে চলে আসছে, এই পরিণতির মুখে কালে কালে যে সকল অসংগতি ঘটেছে হঠাৎ তার সংশোধন দুঃসাধ্য। প্রাকৃত বাংলা ছাপার অক্ষরের এলেকায় এই সম্প্রতি পাসপোর্ট পেয়েছে। এখন ওর বানান নির্ধারণে একটা কোনো নীতি অবলম্বন করতে হবে তো। কালে কালে পুরোনো বাড়ীর মতো বৃষ্টিতে রৌদ্রে তাতে নানা রকম দাগ ধরবে, সেই দাগগুলি সনাতনত্বের কৌলিন্য দাবী করতেও পারে। কিন্তু রাজমিস্ত্রি কি গোড়াতেই নানা লোকের নানা অভিমত ও অভিরুচি অনুসরণ করে ইমারতে পুরাতন দাগের নকল করতে থাকবে। য়ুরোপীয় ভাষাগুলি যখন প্রথম লিখিত হচ্ছিল তখন কাজটা কী রকম করে আরম্ভ হয়েছিল তার ইতিহাস আমি জানি নে। আন্দাজ করছি কতকগুলি খামখেয়ালি লোকে মিলে এ কাজ করেন নি, যথাসম্ভব কানের সঙ্গে কলমের যোগ রক্ষা করেই শুরু করেছিলেন। তাও খুব সহজ নয়, এর মধ্যেও কারো কারো স্বেচ্ছাচার যে চলে নি তা বলতে পারি নে। কিন্তু স্বেচ্ছাচারকে তো আদর্শ বলে ধরে নেওয়া যায় না—অতএব ব্যক্তিগত অভিরুচির অতীত কোনো নীতিকে যদি স্বীকার করা কর্তব্য মনে করি তবে উচ্চারণকেই সামনে রেখে বানানকে গড়ে তোলা ভালো। প্রাচীন ব্যাকরণকর্তারা সেই কাজ করেছেন, তাঁরা অন্য কোনো ভাষার নজির মিলিয়ে কর্তব্য সহজ করেন নি।

এ প্রশ্ন করতে পারেন বানানবিধিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিচারকে মেনে নেওয়াকেই যদি আমি শ্রেয় মনে করি তাহলে মাঝে প্রতিবাদ করি কেন? প্রতিবাদ করি বিচারকদের সহায়তা করবার জন্যেই, বিদ্রোহ করবার জন্যে নয়। এখনো সংস্কার কাজের গাঁথুনি কাঁচা রয়েছে, এখনো পরিবর্তন চলবে, কিন্তু পরিবর্তন তাঁরাই করবেন আমি করব না। তাঁরা আমার কথা যদি কিছু মেনে নেবার যোগ্য মনে করেন সে ভালোই, যদি না মনে করেন তবে তাঁদের বিচারই আমি মেনে নেব। আমি সাধারণ ভাবে তাঁদের কাছে কেবল এই কথাটি জানিয়ে রাখব যে প্রাকৃত ভাষার স্বভাবকে পীড়িত করে তার উপরে সংস্কৃত ব্যাকরণের মোচড় দেওয়াকে যথার্থ পাণ্ডিত্য বলে না। একটা তুচ্ছ দৃষ্টান্ত দেব। প্রচলিত উচ্চারণে আমরা বলি কোলকাতা, কলিকাতাও যদি কেউ বলতে ইচ্ছা করেন বলতে পারেন, যদিও তাতে কিঞ্চিৎ হাসির উদ্রেক করবে। কিন্তু ইংরেজ এই শহরটাকে উচ্চারণ করে ক্যালক্যাটা এবং লেখেও সেই অনুসারে। আপনিও বোধ হয় ইংরেজিতে এই শহরের ঠিকানা লেখবার সময় ক্যালক্যাটাই লেখেন, অথবা ক্যালক্যাটা লিখে কলিকাতা উচ্চারণ করেন না—অর্থাৎ যে জোরে প্রাকৃত বাংলায় আপনারা যত্ব ণত্ব মেশীন-গান চালাতে চেষ্টা করেন, সে জোর এখানে প্রয়োগ করেন না। আপনি বোধ করি ইংরেজিতে চিটাগংকে চট্টগ্রাম সিলোনকে সিংহল বানান করে বানান ও উচ্চারণে গঙ্গা-জলের ছিটে দেন না। ইংরেজি ভাষা ব্যবহার করবামাত্রই যশোরকে আপনারা জেসোর বলেন, এমন কি, মিত্রকে মিটার লেখার মধ্যে অশুচিতা অনুভব করেন না। অতএব চোখে অঞ্জন দিলে কেউ নিন্দে করবে না, মুখে দিলে করবে। প্রাকৃত বাংলায় যা শুচি, সংস্কৃত ভাষায় তাই অশুচি।

আপনি আমার একটি কথা নিয়ে কিছু হাস্য করেছেন কিন্তু হাসি তো যুক্তি নয়। আমি বলেছিলেম বর্তমান সাধু বাংলা গদ্য ভাষার ক্রিয়াপদগুলি গড় উইলিয়মের

পণ্ডিতদের হাতে ক্লাসিক ভঙ্গীর কাঠিন্য নিয়েছে। আপনি বলতে চান তা সত্য নয়। কিন্তু আপনার এই উক্তি তো সংস্কৃত ব্যাকরণের অন্তর্গত নয় অতএব আপনার কথায় আমি যদি সংশয় প্রকাশ করি রাগ করবেন না। বিষয়টা আলোচনার যোগ্য। এককালে প্রাচীন বাংলা আমি মন দিয়ে এবং আনন্দের সঙ্গেই পড়েছিলুম। সেই সাহিত্যে সাধু বাংলায় প্রচলিত ক্রিয়াপদের অভাব লক্ষ্য করেছিলুম। হয়তো ভুল করেছিলুম। দয়া করে দৃষ্টান্ত দেখাবেন। একটা কথা মনে রাখবেন ছাপাখানা চলন হবার পরে প্রাচীন গ্রন্থের উপর দিয়ে যে শুদ্ধির প্রক্রিয়া চলে এসেছে সেটা বাঁচিয়ে দৃষ্টান্ত সংগ্রহ করবেন।

আর একটি কথা। ইলেক। আপনি বলেন লুপ্ত স্বরের চিহ্ন বলে ওটা স্বীকার্য কেননা ইংরেজিতে তার নজির আছে। "করিয়া" শব্দ থেকে ইকার বিদায় নিয়েছে অতএব তার স্মৃতিচিহ্ন স্বরূপে ইলেকের স্থাপনা। ইকারে আকারে মিলে একার হয়—সেই নিয়মে ইকার আকারের যোগে "করিয়া" থেকে "কোরে" হয়েছে। প্রথম বর্ণের ওকারটিও পরবর্তী ইকারের দ্বারা প্রভাবিত। যেখানে যথার্থই কোনো স্বর লুপ্ত হয়েছে অথচ অন্য স্বরের রূপান্তর ঘটায় নি এমন দৃষ্টান্তও আছে, যেমন ডাহিন দিক থেকে ডান দিক, বহিন থেকে বোন, বৈশাখ থেকে বোশেখ। এখনো এই সব লুপ্ত স্বরের স্মরণচিহ্ন ব্যবহার ঘটে নি। গোধূম থেকে গম হয়েছে এখানেও লুপ্ত উকারের শোকচিহ্ন দেখি নে। যে সকল শব্দে, স্বরবর্ণ কেন, গোটা ব্যঞ্জনবর্ণ অন্তর্ধান করেছে সেখানেও চিহ্নের উপদ্রব নেই। মুখোপাধ্যায়ের পা-শব্দটি দৌড় দিয়ে নিজের অর্থরক্ষা করেছে, পদচিহ্নমাত্র পিছনে ফেলে রাখে নি,—এই সমস্ত তিরোভাবকে চিহ্নিত করবার জন্যে সমুদ্রপার থেকে চিহ্নের আমদানি করার প্রয়োজন আছে কি। ইলেক না দিলে ওকার ব্যবহার করতে হয়, নইলে অসমাপিকার সূচনা হয় না। তাতে দোষ কী আছে।

পুনর্বার বলি আমি উকিল মাত্র, জজ নই। যুক্তি দেবার কাজ আমি করব, রায় দেবার পদ আমি পাই নি। রায় দেবার ভার যাঁরা পেয়েছেন আমার মতে তাঁরা শ্রদ্ধেয়।

বোধ হচ্ছে আর একটিমাত্র কথা বাকি আছে। এখনি তখনি আমারো তোমারো শব্দের ইকার ওকারকে ঝোঁক দেবার কাজে একটা ইঙ্গিতের মধ্যে গণ্য করে ওদুটোকে শব্দের অন্তর্ভুক্ত করবার প্রস্তাব করেছিলেম। তার প্রতিবাদে আপনি পরিহাসের সুরে বলেছেন, তবে কি বলতে হবে, আমরা ভাতি খাই রুটি খাই নে। দুই প্রয়োগের মধ্যে যে প্রভেদ আছে সেটা আপনি ধরতে পারেন নি। শব্দের উপরে ঝোঁক দেবার ভার কোনো না-কোনো স্বরবর্ণ গ্রহণ করে। এখন আমরা বলতে চাই বাঙালি ভাতই খায় তখন ঝোঁকটা পড়ে আকারের পরে ইকারের পরে নয়। সেই ঝোঁকবিশিষ্ট আকারটা শব্দের ভিতরেই আছে স্বতন্ত্র নেই। এমন নিয়ম করা যেতে পারত যাতে ভাত শব্দের ভা-এর পরে একটা হাইফেন স্বতন্ত্র চিহ্নরূপে ব্যবহৃত হোতো—যথা বাঙালি ভা-তই খায়। ইকার এখানে হয়তো অন্য কাজ করছে, কিন্তু ঝোঁক দেবার কাজ তার নয়। তেমনি "খুবই" শব্দ এর ঝোঁকটা উকারের উপর। যদি "তীর" শব্দের উপর ঝোঁক দিতে হয়, যদি বলতে চাই বুকে তীরই বিঁধেছে তাহলে ঐ দীর্ঘ ঈকারটাই হবে ঝোঁকের বাহন। দুধটাই ভালো কিম্বা তেলটাই খারাপ এর ঝোঁকগুলো শব্দের প্রথম স্বরবর্ণেই। সুতরাং ঝোঁকের চিহ্ন অন্য স্বরবর্ণে দিলে বেখাপ হবে। অতএব ভাতি খাব বানান লিখে আমার প্রতি লক্ষ্য করে যে-হাসিটা হেসেছেন সেটা প্রত্যাহরণ করবেন। ওটা ভুল বানান, এবং আমার বানান নয়। বলা বাহুল্য "এখনি" শব্দের ঝোঁক ইকারেরি পরে, খ-এর অকারের উপরে নয়।

এখনি তখনি শব্দের বানান সম্বন্ধে আরো একটি কথা বলবার আছে। যখন বলি কখনই যাব না, আর যখন বলি এখনি যাব দুইয়ের মধ্যে যে প্রভেদ আছে তা ভিন্ন বানানে নির্দেশ করা উচিত। কারো শব্দের বানান সম্বন্ধেও ভাববার বিষয় আছে। "কারো কারো মতে শুক্রবারে শুভকর্ম প্রশস্ত" অথবা "শুক্রবারে বিবাহে কারোই মত নেই", এই দুইটি বাক্যে ওকারকে কোথায় স্থাপন করা উচিত? এখানে কি বানান করতে হবে, কারও কারও, এবং কারওই?

আপনার চিঠির একটা জায়গায় ভাষার ভঙ্গীতে মনে হোলো ক-এ দীর্ঘ ঈকার যোগে যে কী আমি ব্যবহার করে থাকি সে আপনার অনুমোদিত নয়। আমার বক্তব্য এই যে, অব্যয় শব্দ "কি" এবং সর্বনাম শব্দ "কী" এই দুইটি শব্দের সার্থকতা সম্পূর্ণ স্বতন্ত্র। তাদের ভিন্ন বানান না থাকলে অনেক স্থলেই অর্থ বুঝতে বাধা ঘটে। এমন কি প্রসঙ্গ বিচার করেও বাধা দূর হয় না। "তুমি কি জানো সে আমার কত প্রিয়" আর "তুমি কী জানো সে আমার কত প্রিয়," এই দুই বাক্যের একটাতে জানা সম্বন্ধে প্রশ্ন করা হচ্ছে আর একটাতে সন্দেহ প্রকাশ করা হচ্ছে জানার প্রকৃতি বা পরিমাণ সম্বন্ধে, এখানে বানানের তফাৎ না থাকলে ভাবের তফাৎ নিশ্চিতরূপে আন্দাজ করা যায় না।

শ্রীচৈতন্য ও ওড়িয়া জাতি

শ্রীকুমুদবন্ধু সেন

পরলোকগত সুপ্রসিদ্ধ ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্ববিশারদ রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁহার উড়িষ্যার ইতিহাস (*History of Orissa*) গ্রন্থে বলিয়াছেন যে ওড়িয়া জাতির অধঃপতনের মূল কারণ শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণব ধর্ম্ম। এই কথাটা আজকাল প্রায়ই শিক্ষিত ওড়িয়া ও বাঙালীদের মুখে শোনা যায়। উৎকল-নেতা পণ্ডিত নীলকণ্ঠ দাস-প্রমুখ ব্যক্তিগণ তাঁহাদের প্রবন্ধে ও বক্তৃতায় ইহাই প্রচার করিয়া থাকেন। রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের মত প্রবীণ ও বিচক্ষণ ঐতিহাসিক যখন এইরূপ উক্তি করিয়াছেন তখন ইহা ধ্রুবসত্য বলিয়া অনেকের বিশ্বাস হইবে তাহাতে আর আশ্চর্য্য কি? বিশেষতঃ আমাদের আধুনিক শিক্ষিতমণ্ডলীর ধারণা যে ধর্ম্মই একমাত্র ভারতের অধঃপতনের কারণ। তাহার উপর প্রেম ও রসধর্ম্ম যাঁহারা প্রচার করেন তাঁহারা যে দেশ ও জাতির সর্ব্বনাশ সাধন করিতেছেন তাহাতে তাঁহাদের আর সন্দেহ নাই। উৎকলের কেশরী-রাজবংশীয় হইতে গঙ্গা-বংশীয় নরপতিবৃন্দের পরাক্রম ও রণকুশলতা কে না জানে? ইঁহাদের দিগ্বিজয় ইতিহাস-প্রসিদ্ধ। যে-মহারাজা প্রতাপরুদ্র গজপতির হুঙ্কারে উত্তর ও দক্ষিণাঞ্চলের রাজকুলের হৃৎকম্প উপস্থিত হইত, যিনি অমিত বাহুবলে মান্দ্রাজ প্রদেশের নেলোর হইতে গৌড়দেশের প্রায় সাগর-সঙ্গম-সীমান্ত পর্য্যন্ত প্রসারিত সাম্রাজ্যের শাসন করিতেন এবং যিনি রণনৈপুণ্যে ও অস্ত্রবিদ্যায় অদ্ভুত কুশলী ছিলেন, তিনি শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিয়া নিজেকে, দেশকে ও সমগ্র জাতিকে একেবারে ছারেখারে দিলেন—ইহাই শিক্ষিত উৎকল- ও বঙ্গ- বাসীর ধারণা। তাঁহাদের দৃঢ় বিশ্বাস যে বৈষ্ণবধর্ম্ম গ্রহণ করাতেই জাতির বীরত্ব-বহ্নি নির্ব্বাপিত হইল—তেজ গর্ব্ব সব খর্ব্ব হইয়া গেল, এবং সমগ্র জাতি ক্রমে ক্রমে হতবীর্য্য, ভীরু ও কাপুরুষ হইল। শ্রীচৈতন্যের সংস্পর্শে আসিয়া যেন সমগ্র ওড়িয়া জাতির বল, বীর্য্য, সিংহবিক্রম, দিগ্বিজয় ও বাহুবলের আস্ফালন সব লোপ পাইল; সমগ্র জাতির ভিতরে যে সামরিক তেজবহ্নি ছিল তাহা নির্ব্বাপিত হইল এবং ধর্ম্মের আবরণে একটা স্ত্রীজনোচিত কোমলতা ও ভীরুতা আসিয়া সমগ্র জাতির অধঃপতনের সূচনা করিল। উৎকল জাতি যে সামরিক উন্মাদনায় বীরগর্ব্বে সমরক্ষেত্রে ধাবিত হইত, সে উন্মাদনা বৈষ্ণবধর্ম্মের ভাবোচ্ছ্বাসে পরিণত হইল। সুতীক্ষ্ণবুদ্ধি ঐতিহাসিক ও প্রত্নতত্ত্বগবেষক রাখালদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় নির্দ্দেশ করিয়াছেন যে উৎকল জাতির ও দেশের এই সর্ব্বনাশের মূল শ্রীচৈতন্যের প্রচারিত বৈষ্ণবধর্ম্ম। মহারাজা প্রতাপরুদ্র যদি চৈতন্যের ধর্ম্ম গ্রহণ না করিতেন তবে উক্ত দেশ ও জাতির এতটা অধঃপতন হইত না—তাহারা এতটা নির্ব্বীর্য্য হইত না, এতটা স্ত্রীজনোচিত ভীরু ও কোমল হইত না। সত্যই কি তাই? সত্যই কি উড়িষ্যার এতটা অনিষ্ট করিয়াছেন শ্রীচৈতন্য ও তাঁহার প্রবর্ত্তিত ধর্ম্ম? সত্যই কি মধ্যযুগে চৈতন্যের ধর্ম্ম উড়িষ্যার শুভ্রোজ্জ্বল কীর্ত্তি-পটে এতটা কলঙ্ক কালিমা লেপিয়া দিয়াছে?

উড়িষ্যার মধ্যযুগের আভ্যন্তরীণ ইতিহাস কিন্তু এই উক্তির প্রতিবাদ করিয়া থাকে। শ্রীচৈতন্যের সমসাময়িক বিবরণ ও উড়িষ্যার প্রাচীন ইতিবৃত্ত ওড়িয়া জাতির অধঃপতনের অপর কারণ নির্দ্দেশ করে। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, রাখালবাবুর ন্যায় ঐতিহাসিক পণ্ডিতের এদিকে আদৌ দৃষ্টি পড়ে নাই। সেই ঐতিহাসিক প্রসঙ্গের কিঞ্চিৎ অবতারণা করিয়া আমরা দেখাইতে চেষ্টা করিব যে রাখালবাবুর এই উক্তি কতটা ভ্রান্তিপূর্ণ, নিরর্থক ও অপ্রামাণিক।

গৌড়ের পাঠান রাজগণ সুযোগ ও সুবিধা পাইলেই উড়িষ্যা রাজ্য আক্রমণ করিতেন এবং উড়িষ্যার নরপতিবৃন্দও সেইরূপ গৌড়রাজ্য আক্রমণ করিতে দ্বিধা করিতেন না। এইরূপে যুদ্ধের জয় ও পরাজয় অনুসারে রাজ্যের সীমা নির্দ্দিষ্ট হইত। যখন পাঠানেরা পরস্পর বিবাদে মত্ত থাকিত তখন উড়িষ্যার রাজাদের সুবিধা ছিল। বখ্‌তিয়ারের বঙ্গবিজয়ের পর গৌড়রাজ্য ক্রমশঃ দিল্লীর বাদশাহদের করতলগত হয় এবং তাঁহাদের অধীনে পাঠান শাসনকর্ত্তা গৌড়রাজ্য শাসন করিতেন। কিন্তু এই ভাবে বেশী দিন চলিল না—তুগরাল খাঁ গৌড়রাজ্যের স্বাধীনতা ঘোষণা করিলেন কিন্তু বুলবন আসিয়া তাহা অচিরে দমন করিয়া গেলেন। এই ভাবে স্থানে স্থানে বিদ্রোহ হইতে লাগিল। অবশেষে ইলিয়াস শাহ্ আপনাকে গৌড় বাংলার স্বাধীন নরপতি বলিয়া ঘোষণা করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন এবং বহু যুদ্ধের পর দিল্লীর বাদশাহ তাঁহাকে সেই ভাবে স্বীকার করিতে বাধ্য হইলেন। এই ভাবে ইংরেজী ত্রয়োদশ, চতুর্দ্দশ ও পঞ্চদশ শতাব্দী সুদীর্ঘ যুদ্ধ, হত্যা, আত্মকলহ ও ষড়যন্ত্রের ইতিহাস। উড়িষ্যার গঙ্গা-বংশীয় রাজারা এই অরাজকতার সময় গৌড়রাজ্যের অভ্যন্তরে প্রবেশ করিয়া ভাগীরথীতীর পর্য্যন্ত রাজ্য বিস্তৃত করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। ছত্রভোগ হইতে নৌকাযোগে গঙ্গার অপর কূলে শ্রীচৈতন্য উৎকল দেশে পৌঁছিলেন—ইহা বৃন্দাবনদাস শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতে বর্ণনা করিয়াছেন। দুই রাজ্যের মধ্যে ভাগীরথী প্রবাহিতা, কিন্তু তাহার বক্ষ যাত্রীদের পক্ষে নিরাপদ ছিল না। জলদস্যুর উৎপাত যথেষ্ট ছিল। শ্রীশ্রীচৈতন্যভাগবতের অন্ত্যখণ্ডে দ্বিতীয় অধ্যায়ে আছে—

"প্রভুর আজ্ঞায় শ্রীমুকুন্দ মহাশয়।
কীর্ত্তন করেন প্রভু নৌকায় বিজয়॥
অবুধ নাইয়া বোলে "হইল সংশয়।
বুঝিলাঙ আজি আর প্রাণ নাহি রয়॥
কূলে উঠিলে সে বাঘে লইয়া পলায়।
জলে পড়িলে সে বোল কুম্ভীরেই খায়॥
নিরন্তর এ পানীতে ডাকাইত ফিরে।
পাইলেই ধনপ্রাণ দুই নাশ করে॥
এতেক যাবত উড়িয়ার দেশ পাই।
তাবত নীরব হও সকল গোসাঞি॥"

ইহা ছাড়া—

"হেনমতে মহাপ্রভু সঙ্কীর্ত্তন রসে।
প্রবেশ হইলা আসি শ্রীউৎকলদেশে॥
উত্তরিলা গিয়া নৌকা শ্রীপ্রয়াগ ঘাটে।
নৌকা হইতে মহাপ্রভু উঠিলেন তটে॥
প্রবেশ করিলা গৌরচন্দ্র ওড্র দেশে।
ইহা যে শুনয়ে সে ভাসয়ে প্রেমরসে॥"

কিন্তু এই ভাবে গৌড়ে উড়িষ্যার রাজ্য থাকিল না। কারণ পাঠানরাজ হুসেন শাহ হৃতরাজ্য উদ্ধার করিতে দৃঢ়সংকল্প করিলেন। এই ভাবে উড়িষ্যা ও গৌড়রাজ্যের মধ্যে ক্রমাগত শতাব্দীর পর শতাব্দী যুদ্ধ চলিয়াছিল—ইহাও বলক্ষয়ের ও জাতির দুর্ব্বলতার একটা কারণ। Domingo Paes—যিনি সম্ভবতঃ তাঁহার বিবরণ ১৫২০ খ্রীষ্টাব্দে লিপিবদ্ধ করিয়াছেন—বলিয়াছেন যে,

"And this kingdom of Orya of which I have spoken above is said to be much larger...since it marches with all Bengal and is at war with her."

প্রতাপরুদ্রকে শুধু গৌড়রাজ্যের সহিত যুদ্ধ করিতে হয় নাই। এক দিকে গৌড়ের পাঠানেরা, অপর দিকে বিজয়নগর এবং অন্য দিকে দক্ষিণের বিজাপুর আদিলশাহী, নিজামশাহী ও কুতবশাহী রাজ্যের মুসলমান আক্রমণ। প্রতাপরুদ্রের পূর্ব্বে রাজন্যেরা যখন বিজয়নগর সাম্রাজ্যের কতকাংশ জয় করিয়াছিলেন, তখন দক্ষিণী মুসলমানদের শান্ত করিতে কিছু কর দিতে হইত। আদিলশাহী দুর্দ্ধর্ষ মুসলমানেরা সময়ে সময়ে অধিকতর অর্থাদি সংগ্রহের জন্য যুদ্ধ করিত এবং মহারাজা প্রতাপরুদ্রকে সিংহাসনে অধিরোহণের কিছু পরে যুদ্ধযাত্রা করিতে হইয়াছিল। মাদলাপঞ্জীতে আছে যে,

এ রাজাঙ্ক ৮ অঙ্কে সেতুবন্ধ কটকাই কলে।
গড় বিদ্যানগর ভাজি ঘউরাই দেলে।

অর্থাৎ মহারাজ প্রতাপরুদ্রদেবের রাজত্বের ষষ্ঠ বর্ষে সেতুবন্ধ আক্রমণ করিল। বিদ্যানগর কেল্লা ভাঙিয়া ভূমিসাৎ করিয়া দিল। আবার মহারাজা প্রতাপরুদ্রের রাজত্বের চতুর্দ্দশ বৎসরে দেখা যায় যে গৌড় হইতে পাঠানেরা আক্রমণ করিল। রাজধানী কটকের নিকটে ছাউনি ফেলিল। সে সময় প্রতাপরুদ্র কটকে ছিলেন না, তিনি দক্ষিণে বিজয়নগরের সহিত সংগ্রামে গিয়াছিলেন। বিজয়নগর তখন প্রতাপরুদ্রের স্ত্রীপুত্রকে বন্দী করিয়া লইয়া গিয়াছিল এবং লোকমুখে বন্দী পুত্রের নিধনবার্ত্তাও পাইয়াছিলেন। ইহা ছাড়া গোদাবরীতীরস্থ বিদ্যানগর বিজয়নগরের অধিকৃত। সেই ভীষণ যুদ্ধে উড়িষ্যা রাজা একেবারে হৃতবল ও দুর্ব্বল হইয়া পড়িয়াছিল। কন্যা সম্প্রদান করিয়া প্রতাপরুদ্র বিজয়নগরের সঙ্গে সন্ধি করিয়া রাজ্যের কিয়দংশ উদ্ধার করিতে পারিয়াছিলেন। বিজয়নগরের সহিত যুদ্ধকালে রাজ্যের ভার দিয়া গিয়াছিলেন ভোই বিদ্যাধরের উপর। ভোই বিদ্যাধর ছিল বিশ্বাসঘাতক ও রাজ্যলোভী। গৌড় পাতশাহের ফৌজ যখন কটকে প্রবেশ করিল, বিদ্যাধর তখন সারঙ্গ-গড়ে থাকিল। পাঠানেরা শ্রীক্ষেত্রে ৺পুরীধামে প্রবেশ করিল, তৎপূর্ব্বে শ্রীশ্রীজগন্নাথকে নৌকাযোগে চিল্কাহ্রদের নিকটে পর্ব্বতগুহায় লুকাইয়া রাখা হইয়াছিল। পাঠানেরা শ্রীমন্দিরে প্রবেশ করিয়া দেবদেবীমূর্ত্তি সব ভাঙিয়া চূরিয়া ফেলিল। বিদ্যাধর গৌড়ের পাতশাহের আশ্রয় গ্রহণ করিল। সংবাদ শুনিয়া ক্রোধে প্রতাপরুদ্র এক মাসের পথ দশ দিনে অতিক্রম করিয়া অমিত বিক্রমে পাঠানদের আক্রমণ করিলেন। মাদলাপঞ্জী বলেন যে গড়মান্দারণ পর্য্যন্ত পাঠান-সৈন্যদিগকে তাড়াইয়া লইয়া গিয়াছিলেন। শেষে ভোই বিদ্যাধরের বিশ্বাসঘাতকতায় প্রতাপরুদ্র অবরুদ্ধ হন। বিদ্যাধরের মধ্যস্থতায় গৌড় ও উড়িষ্যায় সন্ধি হয়। সেই সন্ধির মূলে প্রকৃত রাজ্যশাসনভার বিদ্যাধরের উপর অর্পিত হইল, এবং প্রতাপরুদ্র নামে মাত্র রাজা থাকিলেন। এই সময়ে প্রতাপরুদ্র শ্রীশ্রীনীলাচল-নাথকে পুনঃপ্রতিষ্ঠা করিয়া অধিকাংশ সময়ে ৺পুরীধামে বাস করিতে লাগিলেন। মাঝে মাঝে কটকে যাইতেন। মানুষ দুরবস্থায় বা বিপদে পড়িলে ধর্ম্মের শরণ লইয়া থাকে ইহা নূতন নহে। প্রতাপরুদ্রও তাই করিয়াছিলেন। প্রতাপরুদ্রের মৃত্যুর পর তাঁহার পুত্রদিগকে নিহত করিয়া বিদ্যাধর ভোই-রাজবংশ প্রতিষ্ঠা করিয়াছিলেন। এইরূপে পর পর রাজবংশে হত্যা, বিশ্বাসঘাতকতা, ষড়যন্ত্র ও মুসলমান আক্রমণে সমগ্র ওড়িয়া জাতিকে একেবারে নিষ্পেষিত করিয়া ফেলিল। তেলেঙ্গা মুকুন্দদেব একবার উড়িষ্যা রাজ্যকে পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করিতে প্রয়াসী হইয়াছিলেন, কিন্তু কালাপাহাড়ের প্রবল আক্রমণে এবং অন্তর্বিপ্লবে উড়িষ্যার রাজলক্ষ্মী অন্তর্হিত হইল। ইহা বৈষ্ণবধর্ম্মের দোষ নয়—ইহা অদৃষ্টের বিকট পরিহাস।

শ্রীচৈতন্য উৎকলে বৈষ্ণবধর্ম্মের নূতন প্রচারক ছিলেন না। তাহার সাক্ষী শ্রীমন্দির ও শ্রীবিগ্রহের সেবা শ্রীচৈতন্যের বহু শতাব্দীর পূর্ব্বে প্রচলিত ছিল। প্রতাপরুদ্র সিংহাসনে আরোহণ করিবার অব্যবহিত পরে উৎকীর্ণ শিলালিপিতে ঘোষণা করেন যে উনপঞ্চাশ জন বৈরাগী সাধু শ্রীমন্দিরে জয়দেবের গীতগোবিন্দ হইতে গীত গাহিবেন—সেই সময় অপর লোক তাঁহাদের স্বরের অনুসরণ করিয়া যোগদান করিতে পারেন কিন্তু তাঁহাদের গাহিবার সময়ে কিংবা গীতের পূর্ব্বে কেহ গাহিতে পারিবেন না। সুতরাং শ্রীচৈতন্যের আমলের পূর্ব্বে প্রতাপরুদ্র বৈষ্ণব ছিলেন। তাহা ছাড়া পঞ্চসখা বা পঞ্চশাখা বৈষ্ণবেরা ছিলেন—তাঁহাদের প্রভাব উড়িষ্যায় কিছু কম ছিল না। শ্রীশ্রীজগন্নাথ-চরিতামৃতে আছে ওড়িয়া ভাগবতপ্রণেতা পঞ্চশাখার অন্যতম শ্রীজগন্নাথদাস প্রতাপরুদ্র-মহিষীর গুরু ও উপদেষ্টা ছিলেন। স্বয়ং রাজা প্রতাপরুদ্র জগন্নাথদাসকে অনুরোধ করেন। শ্রীচৈতন্যের নীলাচলে বহুবর্ষ বাসের পরে তাঁহার জীবিত কালেই এই ঘটনা ঘটিয়াছিল। প্রতাপরুদ্র শুধু শ্রীচৈতন্যের ভক্ত ছিলেন না—তৎকালে জীবিত সকল মহাত্মাদেরই তিনি সমাদর, ভক্তি ও অর্চ্চনা করিতেন। যে উড়িষ্যার রাজ্যসীমা ভাগীরথী-তীর পর্য্যন্ত বিস্তৃত ছিল তাহা গৌড়-উড়িষ্যায় সন্ধিকালে রহিল না। গৌড়রাজ্য তখন বালেশ্বর পর্য্যন্ত বিস্তৃত হইয়াছিল। এই সন্ধিকালে প্রতাপরুদ্র ও চৈতন্যের মিলন হয় নাই এবং শ্রীচৈতন্য-প্রবর্ত্তিত বৈষ্ণবধর্ম্মও তখন উড়িষ্যায় প্রবেশ করে নাই।

জাতির অধঃপতন হয় আত্মকলহে, স্বার্থপরতায়, অনৈক্যে এবং চরিত্রহীনতায়। অনবরত যুদ্ধবিগ্রহে কোনও জাতি উন্নত হইতে পারে না। উড়িষ্যার ভাগ্যে তাহাই ঘটিয়াছিল। যদি বিজয়নগর ও উড়িষ্যা যুদ্ধবিগ্রহে নিরত না হইয়া মুসলমানদের বিরুদ্ধে সমবেতভাবে দণ্ডায়মান হইত, তবে শুধু উড়িষ্যা কেন সমগ্র দক্ষিণ-ভারত ও বাংলার ইতিহাস অন্যরূপ হইত। ইহা ঐতিহাসিক হাণ্টার সাহেবও ইঙ্গিত করিয়া গিয়াছেন।

শ্রীচৈতন্যের প্রভাবে ওড়িয়া জাতি বৈষ্ণবধর্ম্মকে অবলম্বন করিয়াছিল বলিয়াই অন্যান্য প্রদেশের অপেক্ষা উড়িষ্যায় ইসলাম-ধর্ম্মাবলম্বীর সংখ্যা সর্ব্বাপেক্ষা কম। তথায় সহজে কেহ ধর্ম্মান্তরগ্রহণ করে নাই এবং জোর করিয়া ধর্ম্মান্তর ঘটাইলেও তাহারা আবার বৈষ্ণবধর্ম্ম অবলম্বন করিতে পারিত। ইহা জাতির দৃঢ়তা রাখিতে কম সাহায্য করে না।

প্রেমের মৃত্যু

শ্রীসুকুমার চক্রবর্ত্তী

শ্রাবণের স্তব্ধ রাত্রি। পুঞ্জীভূত মেঘে
সমাচ্ছন্ন নভস্তল। রহি রহি বেগে
বহিছে পূবালি বায়ু। শ্যামল বনানী
আসন্ন দুর্য্যোগ হেরি করে কানাকানি
পরস্পর অস্ফুট মর্ম্মরে। ঝিল্লীদল
নবীন বরষাপাতে আনন্দ-চঞ্চল
পঞ্চমে তুলেছে তান ; প্রসুপ্ত ধরণী
মৌন মূক ; কর্ম্মক্লান্ত বিপুল সরণী
স্তব্ধ, অচেতন। পথ-কুকুরেরা ভুলি
কোলাহল, ইতস্ততঃ রচিয়া কুণ্ডলী
অন্ধকারে ভগ্নস্তূপ ইষ্টকের প্রায়
প্রশান্ত সুষুপ্তিমগ্ন ধূলির শয্যায়।
শুধু আমি নিদ্রাহীন অপলক আঁখি
জাগি বিভাবরী একা। বাতায়নে রাখি
মোর অতন্দ্র নয়ন ভাবি কত কথা,
কত সুখ, কত দুঃখ, বিরহের ব্যথা,
ঘৃণা, প্রেম, নিন্দা, স্তুতি, অপযশ গ্লানি
কত আশা-নিরাশার করুণ কাহিনী
একে একে উঠে ভাসি।

কি জানি কখন
কল্পনার দ্রুত রথে ধেয়ে চলে মন
সুদূর অলকাপুরে। বিরহিণী প্রিয়া
হৃদয়-বল্লভ লাগি উৎকণ্ঠিত হিয়া
যেথা একাকিনী নিশি যাপে অশ্রুজলে,
নবীন মেঘেরে যেথা বার্ত্তাবহ-ছলে
পাঠাতে চাহিয়াছিল প্রিয়ার বিরহে
ব্যথিত ব্যাকুল যক্ষ—যে ব্যথায় দহে
অহর্নিশ বক্ষ তার। কল্পনায় হেরি
শোকাচ্ছন্ন সে অলকা—ভবন-ময়ূরী
ভুলিয়া আনন্দ-নৃত্য স্বর্ণদণ্ড'পরে
নিস্তব্ধ রয়েছে বসি। পদ্ম-সরোবরে
পৃষ্ঠ'পরে চঞ্চু রাখি ভুলে জলকেলি
শোকভারে বাক্যহত মরাল-মরালী।
কনক-পালঙ্কোপরি বিষাদ-প্রতিমা
যক্ষবধূ, মূর্ত্তিমতী শোক, নাহি সীমা
দুঃসহ সে বেদনার, কোমল অন্তরে
প্রিয়ের বিচ্ছেদ-ব্যথা নিয়ত সন্তরে।

নামিল বাদল-ধারা—স্বপ্ন গেল টুটি
বাস্তবের নগ্নমূর্ত্তি সম্মুখেতে ফুটি
উঠিল সহসা। আজি বড় নিঃস্ব আমি,
বড় একা, ব্যথা মোর জানে অন্তর্যামী।
জীবনে যা-কিছু কাম্য, স্নেহ, প্রেম, প্রীতি,
আনন্দ-উজ্জ্বল ধরা, কোকিলের গীতি
স্বপন আমার কাছে। দূরে, বহু দূরে,
আঁখির আড়ালে রহি মোর অন্তঃপুরে
কামনা ফেলিছে ছায়া, নির্ম্মম রাক্ষসী,
যত বাঁধিবারে চাই তত উঠে হাসি
নিষ্ঠুর উল্লাসে। জানি, এ শুধুই মায়া,
আমারে ছলিছে আজি মূর্ত্তিহীন ছায়া।
অভিশপ্ত যক্ষ আমি—নহে মোর তরে
বজত জোছনা-ধারা। যদি প্রেমভরে
কেহ দেয় কণ্ঠে মোর কুসুমের হার,
ঢেকে দেয় অনুরাগে চরণ আমার
ফুলে ফুলে পূর্ণ করি শ্যামল অঞ্চল,
দলিয়া আসিতে হবে চাপি অশ্রুজল
প্রেমের অঞ্জলি সেই।

তাই ভাবি মনে
চিত্ত মোর পরিপূর্ণ কোন্ অন্ধ ক্ষণে
বিশ্বের রিক্ততা দিয়ে ? মলয়-হিল্লোল
মর্ম্মে যদি দিয়ে যায় হিন্দোলার দোল
তবুও রহিতে হবে মূক ; যদি দহে
বক্ষ মোর বাসনা-বহ্নিতে, তবু নহে
মোর তরে প্রেয়সীর অধর-চুম্বন,
নহে মোর প্রিয়া সনে প্রেম-সম্ভাষণ।
রূপ, রস, গন্ধ, স্পর্শ, নয়নের ভাষা,
বুকভরা অনুরাগ, যত উচ্চ আশা
মিথ্যা মোর কাছে আজি। ছিন্ন করি মালা
দলি সে অঞ্জলি তাই চলেছি একেলা
সংসারের মরুপথে ক্লান্তিহীন যাত্রী,
সম্মুখে ঘনায়ে আসে দুর্যোগের রাত্রি।
নিরাশার ছায়াপাতে জীবন আঁধার,
প্রেমের পরম মৃত্যু আজিকে আমার।
এ জীবন ব্যর্থ, সুপ্ত বক্ষের আগুন
নিষ্ফল যৌবন-স্বপ্ন, বিফল ফাগুন।

সঞ্চশস্য

পিঁপড়ে-মাকড়সার জীবন-বৈচিত্র্য

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

প্রাণীজগতে নিম্নশ্রেণীর কীটপতঙ্গের মধ্যেই অত্যধিক পরিমাণে অনুকরণপ্রিয়তা পরিলক্ষিত হয়, এবং অনেক ক্ষেত্রেই তাহারা এমন নিখুঁত অনুকরণ-শক্তির পরিচয় দেয় যে বিশেষভাবে লক্ষ্য করিয়াও তাহাদের স্বরূপ উপলব্ধি করা কষ্টসাধ্য হয়। বিভিন্ন জাতের ফড়িং, প্রজাপতি, টিকটিকি, ব্যাং ও অন্যান্য বিচিত্র কীট-পতঙ্গ, পোকামাকড় নানা ভাবে অবস্থান করিয়া অথবা পারিপার্শ্বিক বর্ণাবলীর সহিত দৈহিক বর্ণের সামঞ্জস্য সাধন করিয়া আত্মরক্ষাকল্পে সর্ব্বদাই শত্রুকে ফাঁকি দিতে চেষ্টা করিয়া থাকে। আবার কোন কোন প্রাণী যেন জন্মগত সংস্কারবশেই অনুকরণ-প্রিয় হইয়া থাকে, যদিও তাহাদের অনুকরণ-প্রণালী অনেকটা নিকৃষ্ট ধরণের।

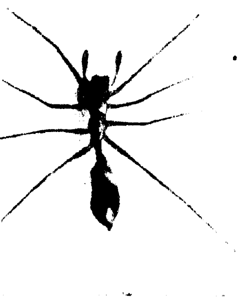
দিনরাত শত্রুর ভয়ে উদ্বিগ্ন থাকিয়া এবং শত্রুর হস্তে নানাভাবে লাঞ্ছিত হইয়া কোন কোন কীটপতঙ্গ এমন অদ্ভুত অনুকরণ-শক্তি আয়ত্ত করিয়াছে যে তাহাদের শারীরিক গঠন ও গতিবিধি প্রত্যক্ষ করিলে বিস্ময়ে অবাক হইতে হয়। দৃষ্টান্ত-স্বরূপ, মাকড়সাদের কথা বলি। মাকড়সাদের পদে পদে শত্রু। ঘরের দেওয়ালে, কার্নিসে, অথবা কপাটের আড়ালে, বোলতার মত আকৃতি-বিশিষ্ট নানা জাতের বিচিত্র পোকাকে মাটি দিয়া বাসা তৈয়ারী করিতে দেখিতে পাওয়া যায়। ইহারা সাধারণত কুমরে পোকা নামে পরিচিত। হাজার হাজার বিভিন্ন শ্রেণীর বিচিত্র মাকড়সার মত, বিভিন্ন জাতের কুমরে পোকারও অভাব নাই। মাকড়সাদের প্রধান শত্রু এই কুমরে পোকা। ইহারা সর্ব্বদাই মাকড়সার সন্ধানে ঘুরিয়া বেড়ায়, এবং হঠাৎ মাকড়সাকে একবার দেখিতে পাইলেই তৎক্ষণাৎ উড়িয়া গিয়া তাড়া করে ধরিতে পারিলে কামড়াইয়া মাকড়সার শরীরে এক প্রকার বিষ ঢালিয়া দেয়। ইহাতে মাকড়সাটা মরিয়া যায় না বটে, কিন্তু একেবারে অসাড় ও নিস্পন্দ হইয়া পড়ে। তখন কুমরে পোকা তাহাকে টানিয়া অথবা মুখে করিয়া উড়িয়া বাসায় লইয়া যায়। এইরূপে পাঁচ-সাতটা মাকড়সা সংগ্রহ করিয়া এক-একটা কুঠরিতে রাখিয়া প্রত্যেক কুঠরিতে একটা-একটা ডিম পাড়ে এবং কুঠরির মুখ মাটি দিয়া বন্ধ করিয়া সরিয়া পড়ে। ডিম ফুটিয়া কীড়া বাহির হইলে তাহারা সেই মাকড়সাগুলিকে খাইয়া বড় হইতে থাকে। খাদ্য নিঃশেষ হইলে কীড়া মুখ হইতে সুতা বাহির করিয়া গুটি প্রস্তুত করে এবং তাহার মধ্যে নিশ্চেষ্ট ভাবে অবস্থান করে। কিছুদিন এই ভাবে থাকিবার পর গুটির মধ্যেই কীড়া পুত্তলীতে পরিণত হয় এবং অবশেষে পূর্ণাঙ্গ কুমরে পোকা হইয়া কুঠরির মুখে ছিদ্র করিয়া উড়িয়া যায়। যে-সকল মাকড়সা জাল বা ফাঁদ পাতিয়া অবস্থান করে তাহাদের অপেক্ষা যাহারা শিকারান্বেষণে ইতস্ততঃ ঘুরিয়া বেড়ায় তাহাদেরই কুমরে পোকার আক্রমণের ভয় বেশী। এই ভ্রমণশীল মাকড়সারাও বহুসংখ্যক বিভিন্ন শ্রেণী-উপশ্রেণীতে বিভক্ত। হয়ত শত্রুর হস্ত হইতে আত্মরক্ষার নিমিত্ত এই জাতের মাকড়সার মধ্যে অনেকেই ক্রমবিকাশের ফলে বিভিন্ন জাতের পিপীলিকার দৈহিক গঠন অতি নিপুণভাবে অনুকরণ করিয়াছে। ইহাদের অনুকরণ-শক্তি এতই নিখুঁত যে, গায়ের রং, দৈহিক গঠন এবং চালচলন দেখিয়া সহজে পিপীলিকা ব্যতীত মাকড়সা বলিয়া চিনিবার কোন উপায় নাই। বাংলা দেশের বিভিন্ন অঞ্চল হইতে এ-পর্য্যন্ত আমি বিভিন্ন জাতের ত্রিশটির অধিক পিঁপড়ে-মাকড়সার অস্তিত্ব খুঁজিয়া বাহির করিয়াছি। কলিকাতা এবং তাহার আশেপাশে বহুস্থানে বিভিন্ন ধরণের পিঁপড়ে-মাকড়সার অভাব নাই। আমার মনে হয়—যত রকম বিচিত্র পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায় প্রায় তত রকমেরই পিঁপড়ে-মাকড়সার অস্তিত্ব রহিয়াছে। অনেক ক্ষেত্রে দেখা যায় দুই বা ততোধিক বিভিন্ন জাতীয় মাকড়সা একই জাতীয় পিপীলিকার দৈহিক গঠন শরীরের রং বা চালচলন অনুকরণ করিয়াছে। আত্মরক্ষামূলক অনুকরণ-প্রিয়তার প্রসঙ্গে ইহা বলা আবশ্যক যে যদিও কোন কোন জাতের কুমরে পোকাকে কেবল বাছিয়া বাছিয়া পিঁপড়ে-মাকড়সাই সংগ্রহ করিতে দেখা যায় তথাপি এই অদ্ভুত অনুকরণ-শক্তি ইহাদিগকে নানা ভাবে আত্মরক্ষায় সাহায্য করিয়া থাকে, কারণ অনুকরণকারী পিঁপড়ে-মাকড়সারা সাধারণতঃ পিঁপড়েদের মধ্যেই চলাফেরা করিয়া থাকে। ইহাতে পিঁপড়েদের ভয়েও শত্রুরা সহজে ইহাদিগকে আক্রমণ করিতে সাহসী হয় না এবং অনেক সময়ে ভুলও করিয়া থাকে। লাল, কালো, হলদে ও নানাবিধ বিচিত্র বর্ণের বহুবিধ পিপীলিকার অনুরূপ মাকড়সার এ দেশে অভাব নাই। এ স্থলে আমাদের দেশীয় সহজলভ্য নালসো বা লাল-পিঁপড়ের অনুকরণকারী মাকড়সাদের কথা আলোচনা করিব।

বাংলা দেশের প্রায় সর্ব্বত্র এবং কলিকাতার আশেপাশে বিভিন্ন অঞ্চলে গাছের উপর লাল রঙের এক প্রকার পিপীলিকা দেখিতে পাওয়া যায়। সাধারণতঃ ইহারা নালসো-পিঁপড়ে নামে পরিচিত। ইহাদের দংশন অত্যন্ত যন্ত্রণাদায়ক। আম, জাম প্রভৃতি গাছের উঁচু ডালে অনেক সবুজ পাতা একত্র জুড়িয়া গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে এবং হাজার হাজার পিপীলিকা তাহার ভিতর একত্র বাস করিয়া থাকে। আহারান্বেষণে সারি বাঁধিয়া দলে দলে যাতায়াত করে এবং সময় সময় মাটির উপরও নামিয়া আসে। বিষাক্ত দংশনের ভয়ে কেহই ইহাদের কাছে ঘেঁষিতে ভরসা পায় না। ইহারা এমনই দুর্দ্ধর্ষ যে, শত্রু প্রবলই হউক আর দুর্ব্বলই হউক, আয়ত্তের মধ্যে আসিলে তাহাকে আক্রমণ করিবেই, প্রাণের ভয় মোটেই করে না। প্রবল শত্রুর আক্রমণে ইহারা দলে দলে মৃত্যুকে বরণ করিবে তথাপি বিনা

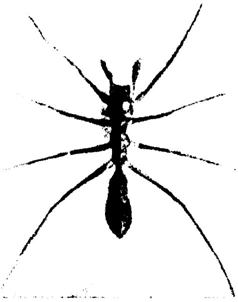
বাধায় তাহাকে একচুল অগ্রসর হইতে দিবে না। ফড়িং বা প্রজাপতিকে কোন রকমে একবার কায়দায় পাইলে দলে দলে আসিয়া আক্রমণ করে; কিন্তু তাহাদের তুলনায় অত বড় একটা প্রাণীর সঙ্গে তাহারা প্রথমে বড়-একটা কৃতকার্য্য হইতে না পারিলেও হতাশ হইয়া পিছু হটে না; একটিই হউক কি দুই-তিনটিই হউক লেজে বা পায়ে কামড়াইয়া ধরিয়া থাকে। ফড়িং এই অবস্থায় যন্ত্রণায় অস্থির হইয়া ক্রমাগত ছুটাছুটি করিতে করিতে অবশেষে ক্লান্ত হইয়া প্রাণত্যাগ করে। ইহাদের এই উগ্র প্রকৃতির সুযোগ লইয়া কোন কোন মাকড়সা শত্রুকে ফাঁকি দিবার জন্য তাহাদের আকৃতির হুবহু অনুকরণ করিয়াছে। এ পর্য্যন্ত যত দূর জানা গিয়াছে তাহাতে দেখা যায় তিন জাতীয় বিভিন্ন ভ্রাম্যমান মাকড়সা এই নালসো-পিঁপড়েকে অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহাদের মধ্যে 'প্ল্যাটালিয়ডস্' নামক এক জাতীয় মাকড়সার অনুকরণ-শক্তি সম্পূর্ণ নিখুঁত। নালসো-পিঁপড়ে ও 'প্ল্যাটালিয়ডস্' মাকড়সার গায়ের রঙে কোনই পার্থক্য বুঝিতে পারা যায় না; উভয়ের রংই ইটের রঙের মত লাল। একমাত্র গলদেশ ব্যতীত উভয়ের দৈহিক গঠনে সম্পূর্ণ সাদৃশ্য বিদ্যমান। কিন্তু পিপীলিকা ও মাকড়সার পা ও চক্ষুর সংখ্যা সমান নহে। পিপীলিকা প্রভৃতি কীটপতঙ্গের তিন জোড়া পা ও এক জোড়া চোখ থাকে। মাকড়সাদের কিন্তু চার জোড়া পা ও সাধারণতঃ চার জোড়া করিয়া চোখ থাকে। পিঁপড়ে-মাকড়সাদের মস্তকের উপর চারটি এবং সম্মুখ ভাগে চারটি চোখ আছে। সম্মুখের এই চারটি চোখের মধ্যের দুইটি সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং সম্পূর্ণ গোলাকার এবং মনে হয় যেন মোটরের হেড-লাইটের মত জ্বলিতেছে। এই চোখ দুইটার রং প্রায়ই বদলাইতে দেখা যায়। কখনও উজ্জ্বল নীল, কখনও ঈষৎ লাল, কখনও বা কালো বলিয়া মনে হয়। পোকামাকড় প্রভৃতি শিকারেরা এই উজ্জ্বল চোখ দুইটার সামনে পড়িলে যেন ভয়ে অভিভূত হইয়া পড়ে। মাকড়সা ও পিপীলিকাদের মধ্যে চক্ষু ও পায়ের সংখ্যার পার্থক্য থাকিলেও মাকড়সারা অতি অদ্ভুত কৌশলে পিপীলিকার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া চলে। পিপীলিকার মাথার উপর এক জোড়া করিয়া শুঁড় থাকে; কিন্তু মাকড়সাদের ঐরূপ কোন শুঁড় নাই, পিপীলিকারা সর্ব্বদাই শুঁড় নাড়িয়া নাড়িয়া চলে এবং এই শুঁড় সুস্পষ্টরূপে দৃষ্টিগোচর হয়। শুঁড় দেখিয়া সহজেই অন্যান্য কীটপতঙ্গ হইতে পিঁপড়েকে চিনিয়া লইতে পারা যায়। অনুকরণকারী মাকড়সারা অতি সরল ও সংক্ষিপ্ত উপায়ে এই শুঁড়ের ব্যবস্থা করিয়া লইয়াছে। চলিবার সময় সম্মুখের দুইখানা পা সর্ব্বদাই তাহারা পিঁপড়ের শুঁড়ের মত মাথার উপর তুলিয়া ধরিয়া নাড়াইতে থাকে। একে তো পিঁপড়ের গায়ের রং ও আকৃতির সঙ্গে ইহাদের কোনই তফাৎ নাই, তাহাতে শুঁড়ের মত করিয়া ঠ্যাং দুইটাকে নাড়াইতে থাকিলে শত্রু মিত্র কাহারও সাধ্য নাই যে সহজে এই অনুকরণকারী মাকড়সাকে চিনিয়া উঠিতে পারে। লাল-পিঁপড়েরা যেখানে চলাফেরা করে অথবা যে-গাছে বাসা বাঁধে তাহার আশেপাশেই এবং অনেক সময় এক প্রকার তাহাদের দলে মিশিয়াই এই 'প্ল্যাটালিয়ডস্' মাকড়সারা ঘোরাফেরা করিয়া থাকে। কাজেই সাধারণতঃ লোকে ইহাদিগকে পিপীলিকা বলিয়াই মনে করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের কতকগুলি চাল-চলন পিঁপড়েদের হইতে স্বতন্ত্র। ইহারা যেরূপ দ্রুতবেগে চলাফেরা করিতে পারে নালসো-পিঁপড়েরা সেরূপ পারে না। সাধারণতঃ আস্তে আস্তে ঘোরাঘুরি করিতে করিতে হঠাৎ কোন কিছু আব্ছাগোছ দেখিলেই তৎক্ষণাৎ ঘুরিয়া দাঁড়ায় এবং বিপদ বুঝিলে চক্ষের নিমেষে ছুটিয়া পলায় অথবা পাতার আড়ালে আত্মগোপন করিয়া থাকে, কিন্তু নালসো-পিঁপড়েরা সেরূপ কিছুই করে না। অনেক সময় ইহাদের গতিবিধি দেখিয়া লোকে অবাক হইয়া ভাবে—দুই-একটা নাল্সো-পিঁপড়ের এরূপ অদ্ভুত গতিবিধি কেন? তাহারা বুঝিতেই পারে না যে, ইহারা মোটেই পিঁপড়ে নয়। চলিতে চলিতে আবার সময় সময় ঘাড় বাঁকাইয়া এদিক-ওদিক দেখিয়া লয়. নেহাৎ কেহ অনুসরণ করিলে একান্ত হয়রাণ হইয়া পাতা অথবা ডালের গায়ে সুতা আটকাইয়া নীচে ঝুলিয়া পড়ে।

স্ত্রী 'প্ল্যাটালিয়ডস্' মাকড়সার আকৃতি পরিণত ও অপরিণত উভয় বয়সেই ঠিক নালসো-পিঁপড়ের অনুরূপ; কিন্তু পুরুষ-মাকড়সা অপরিণত বয়সে ঠিক স্ত্রী-মাকড়সার মত হইলেও শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর সম্পূর্ণ বিপরীত মূর্ত্তি পরিগ্রহ করে। প্রায় ছয় বার খোলস পরিত্যাগের পর ইহারা পরিণতবয়স্ক হইয়া থাকে। পঞ্চমবার খোলস বদলাইবার পরও স্ত্রী ও পুরুষ মাকড়সার মধ্যে কিছুই পার্থক্য দেখা যায় না; সবাইকে স্ত্রী-মাকড়সা বলিয়াই মনে হয়। ষষ্ঠবার খোলস পরিত্যাগের সময় স্ত্রীরূপী পুরুষ-মাকড়সার হঠাৎ একটা অদ্ভুত পরিবর্ত্তন দেখিতে পাওয়া যায়। এই সময় মাকড়সা কিছু সুতা বুনিয়া তাহার উপর চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। তার পর স্ত্রীরূপী পুরুষ-মাকড়সার মস্তকের দিকের শক্ত খোলসটি যেন কব্জাওয়ালা ঢাকনার মত উঠিয়া আসে। তাহার মধ্য হইতে প্রায় ৫।৭ মিনিটের মধ্যেই একটা 'ডবল' নালসো-পিঁপড়ের মত অদ্ভুত বিকটাকার প্রাণী বাহির হইয়া আসে। প্রত্যক্ষ না করিলে ইহা বিশ্বাস করিতেই প্রবৃত্তি হয় না যে এরূপ একটা ডবল সাইজের প্রাণী, মুগুরের মত এক জোড়া লম্বা ঠোঁট লইয়া এই ছোট খোলসটার মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসিতে পারে। ব্যাপারটা এমনই অদ্ভুত যে আরব্যোপন্যাসের সেই কলসীর দৈত্যের কথাই স্মরণ করাইয়া দেয়। ছোট ছোট বিষ-দাঁত দুইটির মধ্য হইতে বাহির হইয়া আসে প্রকাণ্ড মুগুরের মত দুইটি যন্ত্র। কুমীরের লম্বা ঠোঁটের দুই দিকের দাঁতের মত এই মুগুরের প্রত্যেকটিতে লম্বালম্বি দুই সারি করিয়া দাঁত থাকে। মুগুরের মাথায় বাঁকানো লম্বা লম্বা দুইটি সূচিকা। এই বৃহৎ সূচিকা দুইটিকে মুগুরের খাঁজে ভাঁজ করিয়া রাখে। কাহাকেও আক্রমণ করিবার সময় এই বিরাট ঠোঁট দুইটিকে পাশাপাশি ভাবে ফাঁক করিয়া অগ্রসর হয়, বড় করিয়া দেখিলে এই বিরাট মুখগহ্বরটি দেখিয়া অতি বড় সাহসী ব্যক্তিরও হৃদয় কম্পিত হয়। পূর্ব্বেই বলিয়াছি—পুরুষ-মাকড়সার সর্ব্বশেষবার খোলস পরিত্যাগ করিয়া এই নব কলেবর ধারণ করিতে ৫।৭ মিনিটের বেশী সময় লাগে না। এইরূপ অভিনব আকৃতি ধারণ করিবার পর পুরুষ-মাকড়সা প্রায় এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টাকাল চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ইতিমধ্যে শরীর ক্রমশঃ শক্ত হইয়া গায়ের রং গাঢ়

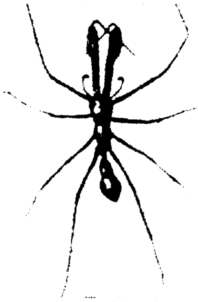
লাল হইয়া থাকে। ইহার পর সে আহারান্বেষণে বাহির হয় এবং স্ত্রী-মাকড়সার সন্ধান করে। ইহারা সুতা প্রস্তুত করিতে পারিলেও বাসা-নির্ম্মাণের বড়-একটা ধার ধারে না, পুরনো পরিত্যক্ত বাসায় অথবা স্ত্রী-মাকড়সার সন্ধান পাইলে তাহারই বাসায় অনেক সময় কাটাইয়া দেয়। স্ত্রী-মাকড়সা সাধারণতঃ সবুজ পাতার নিম্নপৃষ্ঠে সুতা বুনিয়া কম্বাটে ধরণের গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করে এবং তাহার মধ্যে দশ-বারটা ছোট ছোট সরিষার মত হলদে রঙের ডিম পাড়ে। ডিম না-ফোটা পর্য্যন্ত বাসার উপরেই অবস্থান করে অবশ্য স্ত্রী-মাকড়সাকে আলাদা করিয়া রাখিলেও সময়মত ডিম হইতে বাচ্চা বাহির হইয়া থাকে। দশ-পনর দিন পরে ডিম ফুটিয়া বাচ্চা বাহির হয়। বাচ্চাগুলি দেখিতে অবিকল ক্ষুদে পিপীলিকার মত। কোন কিছু না-খাইয়া বাচ্চাগুলি বাসার মধ্যে পাঁচ-সাত দিন অবস্থান করিবার পর আহারান্বেষণে ইতস্ততঃ বহির্গত হয়। পরিণতবয়স্ক মাকড়সা অপেক্ষা এই বাচ্চাগুলি অধিকতর দ্রুতগতিতে ছুটাছুটি করিয়া থাকে। ইহাদের শরীরের গঠন পরিণতবয়স্কদের মত হইলেও গায়ের রং থাকে সম্পূর্ণ ভিন্ন রকমের। মাথার দিক কালো কিন্তু পিছনের দিক অর্দ্ধেক হলদে ও অর্দ্ধেক কাল—ঠিক ক্ষুদে পিপীলিকার মত। তৃতীয়বার খোলস পরিত্যাগের সময় পর্য্যন্ত বাচ্চাগুলি ক্ষুদে পিপীলিকাদিগকে অনুকরণ করিয়া চলে। তৃতীয়বার খোলস বদলাইবার পর হইতেই ইহাদের শরীরের রং সম্পূর্ণ লাল হইয়া যায়। তখন ইহারা উইবাজ নামক আর এক জাতীয় পিপীলিকার অনুকরণ করিয়া তাহাদের সঙ্গেই চলাফেরা করে। চতুর্থ অথবা কোন কোন ক্ষেত্রে পঞ্চমবার খোলস পরিত্যাগের পর ইহারা নাল্‌সো-পিপড়েকে অনুকরণ করে এবং তাহাদের দলের আশে-পাশেই ঘোরাঘুরি করিয়া থাকে। ইহাদের হালচাল দেখিয়া মনে হয় কেবলমাত্র শত্রুর চক্ষে ধূলি নিক্ষেপের জন্যই এই অনুকরণ-শক্তির উন্মেষ হইয়াছে।



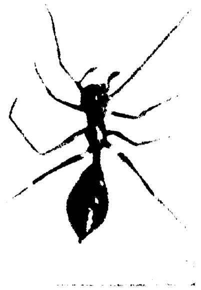
অপরিণতবয়স্ক পুরুষ প্ল্যাটালিয়ডস মাকড়সা। ইহাদিগকে প্রত্যেকেই নালসো-পিপড়ে বলিয়া ভুল করে।



অপরিণতবয়স্ক স্ত্রী প্ল্যাটালিয়ডস মাকড়সা। ইহাদিগকেও নালসো-পিপড়ে বলিয়া ভুল হয়।

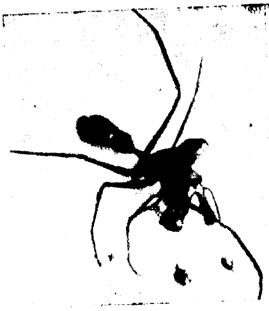


পরিণতবয়স্ক পুরুষ প্ল্যাটালিয়ডস মাকড়সা। ইহাদের মুখের সম্মুখস্থ লম্বা ঠোঁট দুইটির জন্য কেহ কেহ 'ডবল-পিপড়ে' বলে।

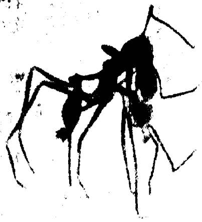


পরিণতবয়স্ক স্ত্রী প্ল্যাটালিয়ডস মাকড়সা।

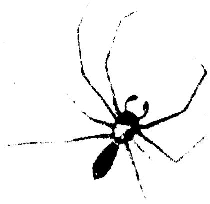
লাল-পিঁপড়েদের অনুকরণকারী অপর এক জাতীয় লাল মাকড়সা আমাদের দেশের বনে-জঙ্গলে সচরাচর দেখিতে পাওয়া যায়; ইহাদের নাম—'ফরটিসেপ্‌স্‌' মাকড়সা। ইহাদের দেহের গঠন ঠিক পিঁপড়েদের মত না হইলেও এমন ভাবে চলাফেরা করে যে, হঠাৎ দেখিয়া নাল্‌সো-পিঁপড়ে বলিয়াই ভ্রম হয়। গায়ের রং নালসোর মতই লাল। শরীরের পশ্চাদ্ভাগে এমন ভাবে দুইটি কালো ফোঁটা অবস্থিত যে দেখিয়া ঠিক নাল্‌সো-পিঁপড়ের চোখ দুইটির মতই মনে হয়। ইহাদের অনুকরণপ্রিয়তা ঠিক আত্মরক্ষা-মূলক নহে। পরিণত বয়সে এই ফরটিসেপস্‌' মাকড়সারা লাল পিঁপড়েদের শরীরের রস চুষিয়া খাইয়াই জীবনধারণ করিয়া থাকে। কিন্তু ইহাদের পক্ষে নাল্‌সো-পিঁপড়ে শিকার করা খুব সহজসাধ্য নহে। বিশেষতঃ ইহারা নাল্‌সোকে এত ভয় করে যে সহজে উহাদের কাছে যাইতে ভরসা পায় না। এই জন্যই বোধ হয় ইহাদের অনুকরণপ্রিয়তার উন্মেষ ঘটিয়াছে। যেখানে নাল্‌সোরা দলে দলে বিচরণ করে তাহার আশেপাশেই 'ফরটিসেপ্‌স্‌' মাকড়সা সম্মুখের চারখানা ঠ্যাং উঁচু করিয়া চুপ করিয়া বসিয়া থাকে। ঘণ্টার পর ঘণ্টা এই ভাবে ফরটিসেপস্‌কে' নাল্‌সো-শিকারের প্রত্যাশায় চুপ করিয়া বসিয়া থাকিতে দেখা যায়। এক-স্থান হইতে অন্য স্থানে যাইতে হইলেও একটানা চলে না—থামিয়া থামিয়া অগ্রসর হয়। নালসোদের কেহ কেহ দল ছাড়িয়া মাঝে মাঝে এদিক-ওদিক ঘুরিয়া ফিরিয়া আশপাশের অবস্থা তদারক করে; আবার নতুন খাদ্যের সন্ধানেও কেহ কেহ দল ছাড়িয়া বাহির হয়—কিন্তু বেশী দূর যায় না। দূর হইতে এরূপ দল-ছাড়া দুই-একটা নাল্‌সো ফরটিসেপস্‌কে দেখিয়া স্বজাতীয় পিঁপড়ে বলিয়া ভুলক্রমে কাছে অগ্রসর হইলেই আর রক্ষা নাই। ফরটিসেপ্‌স্‌ সুযোগ বুঝিয়া তাহার উপর লাফাইয়া পড়িয়াই একেবারে ঘাড় কামড়াইয়া ধরে। তখন অনেক ধ্বস্তাধ্বস্তির পর মাকড়সার বিষে ক্রমশঃ নিজীব হইয়া পড়িলে শিকারী তাহাকে মুখে করিয়া



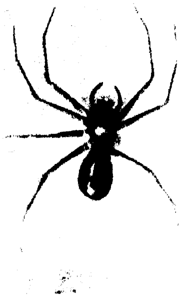
স্ত্রী-জাতীয় বলিয়া প্রতীয়মান মাকড়সা খোলস বদলাইয়া পুরুষ-মাকড়সায় পরিণত হইতেছে।



প্ল্যাটালিয়ডস' মাকড়সা শেষবারের মত খোলস বদলাইতেছে।

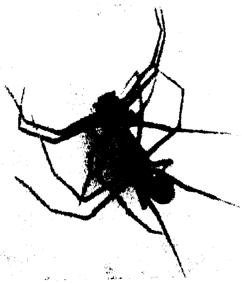


ফরটিসেপস' নামক পুরুষ লাল মাকড়সা—নালসো-পিঁপড়ের অনুকরণকারী।



ফরটিসেপস' স্ত্রী মাকড়সা নালসো-পিঁপড়ের অনুকরণকারী।

কোন নির্জ্জন স্থানে লইয়া গিয়া রস চুষিয়া খাইয়া দেহটা ফেলিয়া দেয়। সময় সময় ডালের উপর পিঁপড়ের সারের মধ্য হইতেও ইহারা এক-একটা পিঁপড়েকে ছোঁ মারিয়া ধরিয়া আনে; তখন কিন্তু অন্য পিপীলিকারা দুষ্কৃতকারীর পশ্চাদ্ধাবন করে। তখন বেগতিক দেখিয়া পিঁপড়েটাকে মুখে লইয়া সুতা ছাড়িয়া ডাল হইতে ঝুলিয়া পড়ে। অনুসরণকারী পিঁপড়েরা তখন হতভম্ব হইয়া কিছুক্ষণ নীচের দিকে চাহিয়া থাকে, অবশেষে হতাশ ভাবে ফিরিয়া যায়।



'ফরটিসেপস'-মাকড়সার মিলন



স্ত্রী-'ফরটিসেপ্‌স্' পাতার উপর ডিমের থলি পাহারা দিতেছে

যে-গাছে নালসো-পিঁপড়ে বাসা বাঁধে তাহার আশেপাশে ছোট ছোট গাছের পাতার উপর সুতা বুনিয়া ইহারা গোলাকার বাসা নির্ম্মাণ করিয়া থাকে। ইহাদের স্ত্রী পুরুষ উভয়কেই দেখিতে প্রায় একই রকম। তবে পুরুষেরা অপেক্ষাকৃত কৃশ হয়। ইহাদের মস্তক গোলাকার এবং তাহাতে চার জোড়া চোখ আছে। কিন্তু মাঝের চক্ষু জোড়াই সর্ব্বাপেক্ষা বৃহৎ এবং ইহার সাহায্যেই দেখাশোনা করিয়া থাকে। একযোগে ইহাদের ... পনরটি করিয়া বাচ্চা হয়। বাচ্চাগুলির গায়ের রং ... সাধারণতঃ সবুজাভ থাকে। তার পর দুই তিন বার খোলস পাল্টাইবার পর সম্মুখের দুই জোড়া পায়ের রং সবুজ ও মেরুণ রংয়ের ডোরাকাটা দেখা যায়। শেষবার খোলস পরিত্যাগের পর ইহাদের দেহের বর্ণ সম্পূর্ণ লাল হইয়া যায়, কেবল পায়ের অগ্রভাগ ... হয়। চলিবার সময় থামিয়া থামিয়া যখন পা কাঁপাইতে থাকে তখন খুব সুন্দর দেখায়।

আমাদের দেশে আর এক জাতীয় লাল মাকড়সা দেখিতে পাওয়া যায়—ইহারাও আত্মরক্ষাকল্পে নালসো-পিঁপড়েকে অনুকরণ করিয়া থাকে। ইহারা দেখিতে কতকটা 'ফরটিসেপ্‌স্' মাকড়সার মত, কিন্তু পেটের দিকটা প্রায় গোলাকার এবং পিঠের উপর চারদিকে চারিটি কালো রঙের বুঁদ আছে। মাথাটা একটু লম্বাটে ধরণের, মাথার উপর দুই সারিতে আটটা চোখ রহিয়াছে। ইহাদিগকে 'রেনাই' নামে অভিহিত করা হইয়াছে। ইহারা গাছের উপর ত্রিকোণাকার জাল বুনিয়া অবস্থান করে এবং বোঁটায় ঝুলান একটি থলিতে প্রায় পঁচিশ ত্রিশ বা ততোধিক ডিম পাড়িয়া থাকে।

[প্রবন্ধের সহিত প্রকাশিত চিত্রগুলি লেখক কর্ত্তৃক গৃহীত ।

মহিলা-সংবাদ

শ্রীমতী তরুলতা সেন কলিকাতা সেণ্ট্রাল কোর্টের অবৈতনিক ম্যাজিষ্ট্রেট নিযুক্ত হইয়াছেন।

শ্রীমতী মালতী চৌধুরী উড়িষ্যার অন্যতম রাষ্ট্রনেত্রী-রূপে সুপরিচিতা। সম্প্রতি উড়িষ্যায় কৃষক-সম্মেলনে তিনি সভানেত্রীর আসন গ্রহণ করিয়াছিলেন।



শ্রীমতী তরুলতা সেন



শ্রীমতী মালতী চৌধুরী



শ্রীমতী মনীষা সেন



শ্রীমতী তারা দেবদাস

শ্রীমতী মনীষা সেন কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের গত বি-এ পরীক্ষায় ইংরেজী অনার্সে দ্বিতীয় শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। (প্রথম শ্রেণীতে কেহই উত্তীর্ণ হন নাই)। শ্রীমতী সেন ইণ্টারমীডিয়েট পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছিলেন।

শ্রীমতী তারা দেবরাস নাগপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন পরীক্ষায় প্রথম স্থান অধিকার করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অপর কোন পরীক্ষার্থিনী এই কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন নাই।



শ্রীমতী নাগাম্মা পাটিল
বোম্বাই ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যা



বেগম হবিব-উল্লা
যুক্তপ্রদেশ ব্যবস্থাপক-সভার সদস্যা

দ্রষ্টব্য

প্রবাসীর সম্পাদকের বক্তব্য। শ্রীযুক্ত যোগেশচন্দ্র বাগল বৈশাখের প্রবাসীতে "বর্ত্তমান আন্তর্জ্জাতিক অবস্থার গতি ও প্রকৃতি" সম্বন্ধে যে প্রবন্ধটি লেখেন, শ্রীযুত শৈলেন্দ্রনাথ ঘোষ তাহার আলোচনা করেন। যোগেশবাবুর উত্তরসহ তাহা আষাঢ়ের প্রবাসীতে বাহির হইয়াছে। শৈলেন্দ্রবাবুর লেখাটি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই বাহির হইতে পারিত। তিনি তাহা যথাসময়ে আমাকে পাঠাইয়াছিলেন। তাহাতে তিনি যোগেশবাবুর কয়েকটি ভুল দেখাইয়াছিলেন। শৈলেন্দ্রবাবুর আলোচনাটির উত্তর দিবার সুযোগ যোগেশবাবুকে দিবার নিমিত্ত তাঁহাকে আলোচনাটি পাঠান হইয়াছিল। যোগেশবাবু শৈলেন্দ্রবাবুর প্রদর্শিত ভ্রমগুলির সংশোধন জ্যৈষ্ঠ সংখ্যাতেই করায় আষাঢ় সংখ্যায় এ-বিষয়ে কিছু লেখা হয় নাই।

এই তথ্যটি জ্যৈষ্ঠের প্রবাসীতেই মুদ্রিত হওয়া উচিত ছিল।

শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, প্রবাসীর সম্পাদক।

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

(১৫)

শর্ব্বাকে ভোট-সরকারের হস্তে অর্পণ করার কড়া হুকুম আসিলে নেপাল-রাজদূত নাচার অবস্থায় পড়িলেন। লাসায় ছোটবড় প্রায় এক শত নেপালী কারবার আছে, তাহাদের মালিকের দল এই ঘটনার ফেরে মহা শঙ্কিত হইয়া উঠিল। তাহাদের বক্তব্য ছিল যে যদি শর্ব্বাকে সমর্পণ করা না হয় তবে ভোট-সরকার জোর-জবরদস্তি করিলে যে অবস্থার সৃষ্টি হইবে তাহার ফলে নেপাল রাজদূত ও তাঁহার অনুচরদিগকে ধরিতে বাঁধিতে অথবা মারিতে হয়ত কিছু সময় লাগিতে পারে, কিন্তু অন্যান্য নেপালী প্রজার ধন-প্রাণ দুই-ই শেষ হইতে এক প্রহরও লাগিবে না। এই রকম অবস্থায় ২৩শে আগষ্ট প্যারেড-কালে ভোটীয় সৈনিকদিগের নিজেদের মধ্যে দাঙ্গা বাধে। শহরে রাষ্ট্র হইয়া গেল যে সৈন্যেরা নেপাল দূতাবাসে শর্ব্বাকে গ্রেপ্তার করিতে গিয়াছে। আর যায় কোথায়? মুহূর্ত্তের মধ্যে সমস্ত নেপালী সন্ত্রস্ত ও ব্যস্ত ভাবে দোকানপাট বন্ধ করিয়া ছাদে উঠিয়া লুঠপাট ও অত্যাচারের প্রতীক্ষা করিতে লাগিল। সে সময়ের কথা বলিবার নয়। আমি নিজে নেপালীদিগের সঙ্গে ছিলাম এবং অধিকাংশ লোকেই আমাকে নেপালী বলিয়া জানিত। সুতরাং আমি নিজে নেপালীদিগের মনের অবস্থা প্রত্যক্ষভাবে অনুভব করিয়াছিলাম।

বেলা দুইটার সময় দোকানপাট বন্ধ হইল। আমাদের লোকজন যেন মহাপ্রলয় আগতপ্রায় ভাবিয়া প্রস্তুত হইতে লাগিল। যাহা হউক, সেই দিন ও রাত বিনা উপদ্রবে কাটিয়া গেলে পরদিন আবার দোকান খোলা হইল। এই ভাবে অনিশ্চিতের মধ্যে কয়দিন কাটিল। ২৭শে আগষ্ট বেলা বারটায় আমি ছু-শিং-শর (যে কুঠীতে আমি আশ্রয় লইয়াছিলাম) দোকানের ছাদে বসিয়া আছি এমন সময়ে দেখিলাম দক্ষিণ দিক হইতে দোকানের সারি দ্রুত বন্ধ হইয়া আসিতেছে। যে-সকল নরনারী পথের উপর বেসাতি বিছাইয়া ছিল তাহারা কোন প্রকারে নিজেদের জিনিষপত্র উঠাইয়া ঘরের দিকে ছুটিতেছে, কেহ কাহাকেও জিজ্ঞাসাবাদ করিবার পর্য্যন্ত সময় পাইতেছে না। কিছুক্ষণ পরে কোন সরকারী লোকের কাছে শোনা গেল যে শর্ব্বাকে ধরিতে নেপালী দূতাবাসে ভোট সৈন্যদল গিয়াছে।



তিব্বতী কয়েদী, লাসা

শুনিয়াই নেপালীরা বলিল এইবার লুট আরম্ভ হইবে। পূর্ব্বেই বলিয়াছি প্রায় সকল নেপালী সওদাগরই বৌদ্ধ এবং সেই কারণে ইহাদের প্রত্যেকেরই এমন অনেক ভোটীয় বন্ধু আছে যাহারা ভয় অপেক্ষা ভরসারই পাত্র। কিন্তু লুট করে গুণ্ডায়, সুতরাং লুটের সময় সে-সব বন্ধু নিজেদের

সম্পত্তি সামলাইতেই ব্যস্ত থাকিবে, তখন নেপালী বন্ধুদের সাহায্য করিবার অবসর কোথায় ?

সন্ধ্যার মুখে সঠিক খবর পাওয়া গেল যে নেপাল-রাজদূত শর্ব্বাকে ভোট-সরকারের হাতে সমর্পণ করিয়া দিয়াছেন এবং তাহাকে রক্ষা করিবার জন্য কোন প্রকার সশস্ত্র চেষ্টা করেন নাই। চারি দিকে রাজদূতের বিচারবুদ্ধির প্রশংসা শোনা গেল। দুই-তিন শত নেপালীকে সজ্জিত করার মত গোলাবারুদ ও বন্দুক রাজদূতের হাতে ছিল, বস্তুতঃ চেষ্টা করিলে নেপাল-রাজদূত তাঁহার পঁচিশ-ত্রিশ জন সৈনিক এবং এই দুই-তিন শত অন্য নেপালী প্রজার সাহায্যে ভোট-সরকারকে বিলক্ষণ বেগ দিতে পারিতেন, কেননা নেপালীরা ভোটিয়দিগের তুলনায় অনেক অধিক যুদ্ধকুশল এবং দূতাবাস শহরের মধ্যে অবস্থিত বলিয়া তাহার উপর গোলা চালাইলে শহরের ক্ষতি অবশ্যম্ভাবী ; এ অবস্থায় সহস্রাধিক নেপালী প্রজার রক্ষণাবেক্ষণ কেমন করিয়া করা যায় ইহাই ছিল তাঁহার প্রধান সমস্যা। শর্ব্বাকে কিছু কালের জন্য বাঁচাইতে এতগুলি প্রজার ধনে প্রাণে সর্ব্বনাশ করিতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। সুতরাং শর্ব্বাকে ভোটিয়দিগের হস্তে অর্পণ করা হইল। তাহার উপর শাস্তি বিধান হইল দুই শত বেত্রাঘাত। বেতের আঘাতে তাহার দেহ কাটিয়া মাংস পর্য্যন্ত উঠিয়া গেলেও জ্ঞান যতক্ষণ ছিল সে একবারও শব্দমাত্র উচ্চারণ করিয়া কাতরতা প্রকাশ করে নাই। এইরূপ নির্দ্দয় প্রহারের ফলে ১৭ই সেপ্টেম্বর শর্ব্বা গোল্লো মারা যায়।

এদিকে লাসায় বাজার বন্ধ হওয়ায় কেবল শহরে নয় দূরস্থ অঞ্চলেও নানা প্রকার গুজব রটিয়া উপদ্রবের আশঙ্কা বাড়িতেছিল। শর্ব্বা পুনর্ব্বার গ্রেপ্তার হওয়ার পর শহরের কর্ত্তৃপক্ষ কড়া হুকুম জারি করিলেন যে দোকান বন্ধ করিলে বা গুজব রটাইলে কঠিন শাস্তি দেওয়া হইবে। এই বিজ্ঞাপনের ফলে বাজার আর বন্ধ হইল না। এদিকে পূর্ব্ব হইতেই উভয় পক্ষের রণসজ্জা হইতেছিল, এখন তো যুদ্ধ আসন্নপ্রায় দেখা গেল। তিব্বতে সংবাদপত্র নাই, সমস্ত খবরই মুখে মুখে প্রচারিত হয়। তবে ইহা বলিলে ভুল হইবে না যে এইরূপ উড়া খবর বিলাতী খবরের কাগজের খবর অপেক্ষা অধিকতর বিশ্বাসযোগ্য। ৩১শে আগষ্ট সংবাদ আসিল যে নেপাল ও তিব্বতের এই বিবাদে সিকিমের ব্রিটিশ রেসিডেণ্ট মধ্যস্থ হইতে আসিতেছেন। পরদিন শোনা গেল যে দলাই লামা তাঁহাকে তিব্বত-প্রবেশের অনুমতি দেন নাই। আমি দর্জ্জীর দোকানে শীতবস্ত্রের বরাত দিতে গিয়া শুনিলাম, ভোট-সরকার শহরের যত জিন কাপড় খরিদ করিয়াছেন। শহরে জোর গুজব রটিল যে চীন ও রুষ তিব্বতের সহায়তা করিতে অগ্রসর হইয়াছে। নেপাল হইতে খবর পাওয়া গেল যে ধনকুটা, কুতী, কেরোং প্রভৃতি অঞ্চলে যে চারটি পথে তিব্বতে প্রবেশ করা যায় সে-সকল পথ মেরামত করাইয়া সৈনিকদিগের ছাউনি ফেলা হইয়াছে এবং অগ্রসর হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে তার লাগাইবার জন্য টেলিগ্রাফের তার ও থাম মজুত রাখা হইয়াছে।

লাসা শহরের কথা আর বলিবেন না! রোজ সকাল দশটায় রাজপথে পল্টনের কুচ-কাওয়াজ চলিয়াছে। সৈন্যদের যুদ্ধকৌশল বর্ণনার অতীত। প্রায় সকলেই ইউরোপীয় সৈন্যের পরিত্যক্ত রাইফেলে সুসজ্জিত কিন্তু দেখা গেল বন্দুক ছুঁড়িবার সময় সকলেই চক্ষু বুজিয়া মুখ ফিরাইয়া লয়। ছোট ছেলের দল তো সারাদিনই পথে পথে 'রাইট-লেফ্‌ট' করিয়া বেড়াইতেছে আবার সৈন্যদের মধ্যেও দুই-তিন জন করিয়া স্থানে স্থানে ঐরূপ রাইট-লেফ্‌ট চালাইতেছে। এই মন্ত্রে ইহাদের এত আস্থার কারণ এই যে, ভোট-সৈন্যদলের যুদ্ধবিদ্যা-শিক্ষার ভোটীয় প্রোফেসরবর্গ প্রায় সকলেই গ্যাঙ্গীতে দুই-তিন সপ্তাহ থাকিয়া পাশ্চাত্য যুদ্ধবিদ্যা আয়ত্ত (!) করিবার সময় ইহা শিক্ষা করিয়াছে। এদিকে কলিকাতা হইতে প্রত্যেক নেপালী কুঠীতে প্রত্যহই লাসা ছাড়িয়া যাইবার জন্য 'তার' আসিতে লাগিল। ২০শে সেপ্টেম্বর ছু-শিং-শর কুঠীর অধিকারীর জ্যেষ্ঠ পুত্র ত্রিরত্নমান সাহু লাসা ত্যাগ করিয়া চলিয়া গেলেন ও যাইবার কালে ছোট ভাই ও অন্য সকলকে বলিয়া গেলেন যে অমুক সঙ্কেতযুক্ত তার পাইলেই সকলে যেন চলিয়া যায়, কুঠী বা দোকানে যে লক্ষ লক্ষ টাকার সামগ্রী আছে তাহা রক্ষা করিবার কোন চেষ্টায় তাহারা যেন দেরি না করে। এই মরসুমে লাসায় মঙ্গোলীয়া হইতে বহু মুসলমান সওদাগর আসে, শোনা গেল এইবার তাহারা বিক্রয়ের জন্য যত খচ্চর আনিয়াছিল সবই ভোট-সরকার স্বয়ং ক্রয় করিয়াছেন।

৩রা অক্টোবর শুনিলাম ফৌজের জন্য লাসায় লোক গণনা চলিয়াছে।

এদিকে দুই সরকারে তারযোগে কথাবার্ত্তা চলিতেছিল। অক্টোবরের গোড়ায় ম্রিয়মান তাহার ভাইকে সব ছাড়িয়া চলিয়া আসিবার জন্য কলিকাতা হইতে তারযোগে খবর পাঠাইলেন। ভাই জ্ঞানমান সাহু যাইতে প্রস্তুত ছিলেন না কিন্তু এদিকে থাকিলে কি ভীষণ ব্যাপার হইতে পারে তাহাও স্পষ্টই বুঝিতেছিলেন। ইতিমধ্যেই কিছু সৈন্য নেপালসীমান্তে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল এবং ছোটবড় জায়গীরদারদিগের জমীদারী-অনুযায়ী লোক-লস্কর আসিতেছিল। তিব্বতে কৃষিযোগ্য জমীর প্রায় সবই এইরূপ জায়গীরে বিভক্ত এবং যুদ্ধের সময় এই সব জায়গীরদার (তাহাদের মধ্যে অনেক মঠাধিকারীও আছে) নিজেদের এলাকার আয়তন মত সেপাই যোগাইতে বাধ্য। ১৯০৪ সালের ব্রিটিশ অভিযানের সঙ্গে যুদ্ধের সময় এইরূপ জায়গীরের সেপাই নিজেদের অস্ত্রশস্ত্র ও গোলাবারুদ সঙ্গে আনিয়াছিল কিন্তু সে অস্ত্রশস্ত্র আজকালকার যুদ্ধের উপযোগী নহে জানিয়া এখন অস্ত্র-সরবরাহের ভার খোদ ভোট-সরকারই হাতে লইয়াছেন। যাহা হউক এই ফৌজের সেপাই দেখিয়া পুরাণ-বর্ণিত বাবা ভোলানাথ মহাদেবের পল্টনের কথা মনে পড়িল। কোথাও ষাট বৎসরের পিতামহ বন্দুক-কাঁধে চলিয়াছেন, তাঁর পাশেই নাতির বয়সী পনর বছরের ফাজিল ছোকরা, কাহারো পরনে ছেঁড়া চোগা, পায়ে শততালিযুক্ত বিলাতী গোরার বুট, কেহবা এই শীতের মধ্যে 'চাল' দেখাইবার জন্য খাকীরঙের পল্টনী পুরনো সুতী কোট-প্যাণ্টের সঙ্গে ছেঁড়া ভুটিয়া জুতা পরিয়া চলিয়াছে।

৪ঠা নবেম্বর কয়েকটি পল্টন সীমান্তে চলিয়া গেল। প্রতি দশ-দশ জন সেপাই-পিছু একটি তাবু ও চায়ের জন্য বিরাট তামার পাত্র দেওয়া হইল। এক জন ভোট-ফৌজী অফিসর বলিলেন, "লাসায় যে-সকল সৈনিক আছে তাহারাও যুদ্ধ-ক্ষেত্রে যাইতে উৎসুক এবং এখানে থাকায় অসন্তুষ্ট।"

আমি বলিলাম, "ইহাদের বীরত্ব প্রশংসনীয়, মৃত্যু ইহাদের নিকট নববধূতুল্য।" তিনি বলিলেন, "ছাই বীরত্ব! ইহারা জানে লাসা হইতে তিন-চারি দিনের পথ গেলেই অস্ত্রশস্ত্র লইয়া চম্পট দেওয়া সহজ। এখানে থাকা খাওয়ার কষ্ট, পলাইলে লুঠপাটের সুবিধা আছে। এদেশে পুলিস পাহারাও নাই, সুতরাং নিজ ঘরে ফিরিলে পরে পলাতক সেপাই গ্রেপ্তার হইতে পারে। কিন্তু পশ্চিমদেশের লোক পূর্ব্বদেশে পলাইলে তাহাদের চিনিবেই বা কে, ধরিবেই বা কে?"

২০শে নবেম্বর সিংহল হইতে ভদন্ত আনন্দের পত্রে পড়িলাম, তিব্বতের এইরূপ অনিশ্চিত অবস্থা শুনিয়া আমার শ্রদ্ধেয় আচার্য্য উপাধ্যায় শ্রীধর্ম্মানন্দ মহাস্থবির আনন্দকে খবর লইতে বলিয়াছেন যে আমাকে লাসা হইতে লইয়া যাইবার জন্য এরোপ্লেন পাঠানো সম্ভব কি না। আমি বন্ধুদের বলিলাম, "হয় মন্দ নয়, যদি এখানে হাওয়াই জাহাজ আসে। এদেশের লোককে রেলগাড়ী কি ব্যাপার বুঝাইতে হইলে বলিতে হয় তাহা এক প্রকার ঘরবাড়ী যাহা দৌড়াইতে পারে। যাদুর খেলা ছাড়া অন্য কিছু বলিয়া এরোপ্লেন তো বুঝাইতে পারা যাইবে না!"

ভোট-সরকারের টেলিগ্রাফের মেরামতাদি কার্য্যে সাহায্যের জন্য ভারতীয় ডাক-বিভাগের এক জন অফিসর শ্রীযুক্ত রোজমেয়র এই সময় লাসায় ছিলেন। তিনি আমার সঙ্গে দেখা-সাক্ষাতের সময় একদিন বলিলেন যে ভারত-সরকার তাঁহার এই দুই বন্ধুর মধ্যে যুদ্ধ বাধিতে দিবেন না। কথাটা সঙ্গত, কিন্তু এক দিকে চীন ও রুষের নিকট সাহায্যলাভের স্বপ্নে বিভোর হইয়া ভোট-সরকার ব্যাপার গুরুতর করিয়া তুলিতেছিল, অপর দিকে এই সব প্রতিকূল আচরণে অত্যন্ত ক্রুদ্ধ হইয়া নেপালরাজ তিব্বতের উপর প্রতিহিংসার জন্য অধীর হইয়া উঠিতেছিলেন। সুতরাং ঘটনার স্রোত মোটেই মিটমাটের দিকে ছিল না। রুষের সাহায্যের প্রসঙ্গে আমি এক দিন এক ভোট-রাজকর্ম্মচারীকে বলিয়াছিলাম, "সে দেশের সঙ্গে আপনাদের তো তার বা ডাকের ব্যবস্থা নাই, কাজেই আপনাদের চিঠি মস্কো পৌঁছিতে পৌঁছিতে নেপালীরা সারা তিব্বতে ছুটিয়া বেড়াইবে।"

এদিকে গুজবের ধোঁয়ায় চারিদিক অন্ধকার হইয়া গেল। একবার খবর রটিল যে সন্ধি হইয়া গিয়াছে, বীরগঞ্জ (নেপাল) হইতে এক টেলিগ্রাম আসিল, "নেপালের সঙ্গে সম্বন্ধ উত্তম, কোন ভয় নাই, কাজ চালাও।" সকল নেপালী এই খবর

পাইয়া আশ্বস্ত হইতেছে এমন সময় সংবাদ আসিল যুদ্ধ আসন্নপ্রায়। ইতিমধ্যে নেপালের মহামন্ত্রী মহারাজ চন্দ্রশমসের স্বর্গারোহণ করিলেন। এক সপ্তাহ পরে ২রা ডিসেম্বরে এ-খবর লাসায় পৌঁছিতেই শহরময় বলাবলি চলিল, "দেখেছ লামাদের মন্ত্রবল, কি ভয়ানক পুরশ্চরণের ক্ষমতা!" তাহার পরেই ভারতে মহাসমরের সময় সৈনিকেরা যেমন ষ্টেশনের মিঠাইয়ের ঝুড়ি লুট করিয়াছিল, লাসার সৈনিকেরাও তেমনই আরম্ভ করিল। এক জন সেপাই খাওয়ার পরে খাবারের দোকানে পয়সা না দিয়া চলিয়া আসিতেছিল, দোকানী দামের প্রশ্ন তুলিতেই দেশরক্ষক বীর তাহার পেটে ছোরার আঘাত দিয়া প্রশ্নের উত্তর দিল।

১৯৩০ সালের ১৮ই জানুয়ারী শোনা গেল যে চীন-রাষ্ট্রপতির পত্র লইয়া দূত আসিয়াছেন এবং তাঁহাকে অভ্যর্থনা করিবার জন্য পাঁচ-শ সৈনিকের শোভাযাত্রার এবং যেরূপ পূর্ব্বকালে চীন-সম্রাটের পত্রবাহী দূতের জন্য করা হইত তদ্রূপ নৃত্যগীতাদির ব্যবস্থা হইয়াছে। শুনিলাম, পত্রে তিব্বত ও চীনের সহস্র বৎসরের সম্বন্ধের কথা তুলিয়া পুনর্ব্বার সে-সম্বন্ধ স্থাপনের জন্য স্নানকিনে প্রতিনিধি পাঠাইবার কথা বলা হইয়াছে। এক সপ্তাহ পরে এক ভোটিয়া কুমারী চীনের সাহায্যবার্ত্তা লইয়া আসিলেন। ইনি জাতিতে তিব্বতীয়া হইলেও চীনের প্রজাতন্ত্রের (কুয়োমিণ্টাঙের) সদস্যা ছিলেন। মোহনিদ্রা ভঙ্গ হইলে তিব্বতীয়েরা কি হইতে পারে, ইনি ছিলেন তাহারই নিদর্শন।

এখন চীনের এই ভাব ব্রিটিশ সরকারের পক্ষে উদ্বেগের কারণ হইয়া উঠিল। বহির্জ্জগতে খবর পৌঁছান সম্ভব যদি না হইত তবে নেপালীরা তিব্বত জয় করিলে কিছু হইত না, কিন্তু এখন ঐরূপ ঘটিলে চীন ও অন্যান্য রাষ্ট্রে রটিবে যে নেপাল ইংরেজেরই অস্ত্রবিশেষ, সুতরাং ঐরূপ ব্যাপারে বাধা দেওয়া প্রয়োজন। ৭ই ফেব্রুয়ারী খবর আসিল যে দুই বিবাদীর মধ্যে সন্ধি-স্থাপনের জন্য ব্রিটিশ সরকার সরদার-বাহাদুর লে-দন-লাকে পাঠাইতেছেন। এদিকে সন্ধি ও যুদ্ধের উদ্বেগ-উচ্ছ্বাসে তিন মাস কাটিয়াছে; ১১ই ফেব্রুয়ারী সন্ধির প্রমাণ আরও পাওয়া গেল যখন লাসা হইতে বাহিরে যাইবার সকল পথে সৈনিক পাহারা বসিল এবং কড়া হুকুম জারি হইল যে, কোন নেপালী প্রজা লাসার বাহিরে যাইতে পাইবে না। এত দিন পথে বন্দুক-হাতে সিপাহী চলিতেছিল, এখন তোপ কামান দেখা দিল। গ্যাঞ্চী, শির্গচী সকল শহরেই এই অবস্থা, সে-কথা পরে জানা গেল। লাসার নেপালীরা এত দিন সন্ধির আশায় এদেশ ছাড়ে নাই, নেপাল ও কলিকাতা হইতে লাসা ত্যাগের জন্য জরুরি আদেশ-অনুরোধ সবই তাহারা উপেক্ষা করিয়াছে, এখন অবস্থা দেখিয়া তাহারা মাথায় হাত দিয়া বসিল। ভোটিয়েরা বলিতে লাগিল, "চীনাদূত যখন আসিয়াছে তখন আর ভয় কি? আমরা এখন আর অসহায় নই।"

আজ শুনিলাম লে-দন্-লা লাসা হইতে দু-দিনের পথ ছুশুর পৌঁছিয়াছেন, কিন্তু সন্ধির কোন আশা দেখা গেল না। শোনা গেল মহাগুরু (দলাই লামা) পূর্ব্বেই লে-দন্-লার উপর অপ্রসন্ন হইয়াছিলেন। এখন সন্ধির কথা দূরে থাক তাহার সহিত দেখা করিতেও স্বীকৃত হইবেন কিনা সন্দেহ। নেপালীরা অদৃষ্টের উপর সকল বরাত ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া রহিল। এদিকে খবর আসিল যে নেপালের নূতন রাণা ভীম শমসের ফাল্গুনের পূর্ণিমা পর্য্যন্ত সময় দিয়া তিব্বতের কাছে জবাবদিহি তলব করিয়াছেন।

১৬ই ফেব্রুয়ারী সরদার-বাহাদুর লে-দন-লা লাসায় পৌঁছিলেন। সেদিন সন্ধ্যায় শোনা গেল, তিনি তিন ঘণ্টা-কাল মহাগুরুর সহিত নিভৃতে আলাপ করিবার পর ভোট-মন্ত্রিদলের সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলিয়াছেন। তার পর প্রতিদিনই এইরূপ মহাগুরুর সহিত বাক্যালাপের খবর আসিতে লাগিল কিন্তু সন্ধির কোনও চিহ্ন দেখা গেল না। সে বৎসর ১লা মার্চ্চ, মাঘ-প্রতিপদে ভোটীয় নব বৎসর আরম্ভ হইল, কিন্তু লোকের মুখে বা মনে কোন আশার ছায়া পাওয়া গেল না। চারিদিকে অন্ধকারই দেখা গেল। ১১ই মার্চ্চ শুনিলাম, সরদার-বাহাদুরের চেষ্টা সফল হইয়াছে, ভোট-সরকার নেপাল-রাজকে সন্ধিপত্র পাঠাইতেছেন, কিন্তু ১৬ই মার্চ্চ শুনিলাম তিনি বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া যাইতেছেন। পরদিন সে খবরও খণ্ডিত হইল। ১৮ই মার্চ্চে আমার ডায়েরীতে লিখিয়াছিলাম, "যুদ্ধের সম্ভাবনাই অধিক, তবে বহু বিশেষজ্ঞ বলিতেছেন সন্ধি হইবে।" ১৯শে মার্চ্চ

নেপালী ব্যাপারীদের কাছে কলিকাতা হইতে অনুরোধ আসিল, "সব ছাড়িয়া যে-কোন উপায়ে পলাইয়া এস।" সব-শেষে ২২শে মার্চ্চ ভোট-সরকার ঘোষণা করিলেন যে সন্ধি স্থাপিত হইয়াছে। এই ঘোষণায় নেপালী প্রজাদের আনন্দের অবধি রহিল না। ৩০শে মার্চ্চ পথঘাট খুলিয়া দেওয়া হইল।

তিব্বতে এই সাতমাসব্যাপী যুদ্ধের বাদল কাটিবার প্রধান কারণ সরদার-বাহাদুর লে-দন-লার যোগ্যতা ও ধৈর্য্য। তিব্বতীয়দিগের কার্য্যকলাপ, বিচারক্ষমতা, রাজনীতি ও রাষ্ট্রীয় পদ্ধতি সম্বন্ধে তাঁহার জ্ঞান অতি সূক্ষ্ম ও ব্যাপক ছিল, উপরন্তু তিনি জাতি ও ধর্ম্মে সিকিমী ভোট, সুতরাং তিব্বতীয় জাতির নাড়ীজ্ঞান তাঁহার মধ্যে ছিল এবং তাহাদের সকল বিশেষত্বও তাঁহার জানা ছিল। যে-সময় তিনি লাসায় আসেন সে-সময় যুদ্ধ অনিবার্য্য বলিয়াই সকলে জানিত এবং তিনি যে সন্ধি-স্থাপনে সমর্থ হইবেন এ-কথা কেহই বিশ্বাস করে নাই। তিনি তিব্বতে না আসিলে কি হইত জানি না, কিন্তু সাধারণের সমক্ষে দাঁড়াইয়া ক্ষমাপ্রার্থনা ও অপরাধী কর্ম্মচারীদের দণ্ডদান আদি নেপালরাজ-নির্দ্দিষ্ট সন্ধি-সর্ত্তসমূহ যে ভোট-সরকার স্বীকার করিতেন না ইহাতে সন্দেহ নাই। লে-দন্-লা ইংরেজ হইলে 'নাইট' খেতাব পাইতেন এবং বহুতর পারিতোষিকও যে তাঁহার করতলগত হইত ইহা নিশ্চয়, কেননা এই সন্ধি না হইলে চীন-রুষ প্রভৃতি রাষ্ট্রের সঙ্গে ইংরেজের মনোমালিন্য ঘটার যথেষ্ট সম্ভাবনা ছিল। আমি এই সকল ঘটনার বিবরণ যাহা দিয়াছি তাহা অন্য পাঁচ জনের মতই সংগ্রহ করিয়াছিলাম, কেবল প্রভেদ এই ছিল যে, "অন্ধের দেশে কানা রাজা"-হিসাবে প্রত্যহই অনেকে আমার পরামর্শ লইতে আসিত। যাহা হউক, এই সন্ধির ফলে সহস্রাধিক নেপালী প্রজা এবং তাহাদের সঙ্গে আমিও ধনে-প্রাণে বাঁচিয়া গেলাম।

* * *

আমি লাসায় উপস্থিত হই ১৯২৯ সালের ১৭ই জুলাই এবং ১৯৩০ সালের ২৪শে এপ্রিল ঐ রহস্যময়ী নগরী ছাড়িয়া চলিয়া যাই। মহাগুরু দলাই লামার নিকট হইতে লাসায় থাকিবার অনুমতিলাভের পর আমার লেখাপড়ার কাজ আরম্ভ হয়। আমার উদ্দেশ্য ছিল এদেশে তিন বৎসর থাকিয়া অধ্যয়ন শেষ করিয়া চীন জাপান ঘুরিয়া দেশে ফেরা। তিব্বতে আসিবার পূর্ব্বে পুস্তকের সাহায্যে এদেশের ভাষা কিছু শিখিয়াছিলাম এবং লাসার পথে শুধু ভোট ভাষায় কথাবার্ত্তা চালাইতে চেষ্টা করায় এ দেশের কথিতভাষার উপর কিঞ্চিৎ অধিকারও জন্মিয়াছিল, কিন্তু আমার প্রয়োজন ছিল লিখিত ভাষা ও সাহিত্য আয়ত্ত করা, কেননা তাহার মধ্যেই আমাদের দেশের সংস্কৃত ভাষার অনেক প্রাচীন অমূল্য রত্ন সুরক্ষিত আছে। সুতরাং আমি ঠিক করিলাম যে, যে-সব গ্রন্থের সংস্কৃত ও তিব্বতী উভয় সংস্করণই পাওয়া যায় সেইগুলি প্রথমে পড়িয়া ফেলিব। আমার কাছে বোধিচর্য্যাবতার গ্রন্থের সংস্কৃত সংস্করণ ছিল, তাহার ভোটীয় অনুবাদ ক্রয় করিতে এক দিন বাজারে গেলাম। দেখিলাম, এক জায়গায় কতকগুলি লোক পুঁথির রাশি লইয়া বসিয়া আছে। ইহারা পর্-বা অর্থাৎ ছাপাওয়ালা এবং পুস্তকবিক্রেতা।

মুদ্রণ-প্রথার প্রথম আবিষ্কার হয় চীনদেশে। শীল-মোহরের পদ্ধতিতে কাঠের ফলকে উল্টা অক্ষর খোদাই করিয়া বোধ হয় ইহার সূচনা হয়। খ্রীষ্টীয় সপ্তম শতকে ভোট-সম্রাট্ স্রোং-চন-গম-পো চীন-রাজকন্যাকে বিবাহ করিলে চীন ও তিব্বতের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক স্থাপিত হয়। অদ্যাবধি সে সম্বন্ধ বর্ত্তমান এবং তাহার ফলে বেশভূষা, পানভোজন আদি সমস্ত আধিভৌতিক ব্যাপারে তিব্বত চীনদেশের নিকট ততটা ঋণী—আধ্যাত্মিক ব্যাপারে ভারতের নিকট তাহার ঋণ যতটা। এই ঘনিষ্ঠতার পথেই তিব্বতে চৈনিক ছাপার বিদ্যা আসে। ইহা তিব্বতীয়েরা কোন্ সময় আয়ত্ত করে তাহা বলা কঠিন, তবে বিশ লক্ষ শ্লোক-যুক্ত কন্-জুর (ব্‌কঙ্‌-হ্গ্যুর—বুদ্ধবচন-অনুবাদ) এবং তন্-জুর (স্তন্-হ্গ্যুর=শাস্ত্র-অনুবাদ) নামক দুই বিরাট সংগ্রহ (দুই এক হাজার শ্লোক ভিন্ন যাহাদের সমগ্র অবশিষ্ট অংশই ভারতীয় সাহিত্যের অনুবাদ) পঞ্চম দলাই লামা সুমতি-সাগর (খৃঃ ১৬১৬-১৬৮১) কাষ্ঠফলকে খোদাই করাইয়াছিলেন বলিয়া জানা যায়। আজকাল প্রায় সকল মঠেই ঐরূপ মুদ্রণ-ফলক আছে, সামান্য দক্ষিণা দিলেই পর্-বা অর্থাৎ মুদ্রাকরগণ নিজেদের পরিশ্রম, কাগজ ও কালির খরচে

সেইগুলি হইতে পুস্তক ছাপিতে পায়। ইহারাই পুস্তক-বিক্রেতা। জো-খঙ নামে লাসার প্রধানতম ও প্রাচীনতম মন্দিরের উত্তর দ্বারের পাশে ঐরূপ কুড়ি-পঁচিশটি পর্-বার দোকান আছে।

ভোট-সাহিত্য অধ্যয়নের সময় আমি ঠিক করিয়াছিলাম যে পাঠের সঙ্গে সঙ্গে সংস্কৃত ও ভোট শব্দ-প্রতিশব্দ সংগ্রহ করিব, পরে যাহাতে ভোট-সংস্কৃত মহাকোষ লিখিতে পারি। ১৩ই আগষ্ট হইতে ঐ কার্য্য আরম্ভ করিয়া কয়েক মাসের মধ্যেই বোধিচর্য্যাবতার, স্রগ্ধরাস্তোত্র, ললিতবিস্তার, সদ্ধর্ম্মপুণ্ডরীক, অমরকোষ প্রভৃতি আটখানি গ্রন্থ অধ্যয়ন করিয়া ফেলিলাম। ইহার মধ্যে কয়েকখানি পুস্তক আমার ছিল, অন্যগুলির হস্তলিখিত প্রাচীন সংস্কৃত পুঁথি ছু-শিঙ-শাকে মন্দিরে পাই। তখনও আমার সূত্র, বিনয়, তন্ত্র, ন্যায় প্রভৃতির প্রায় পঞ্চাশখানি পুস্তক এবং বহু শত ছোট-বড় নিবন্ধ দেখা বাকী, কিন্তু যথাসময়ের পূর্ব্বেই আমাকে ভারতে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে হইল। আমার শব্দকোষে পঞ্চাশ হাজার শব্দ সংগ্রহ করিবার ইচ্ছা ছিল, পনর হাজার শব্দ মাত্র তখন সংগ্রহ হইয়াছে, যদিও কোন মুদ্রিত তিব্বতী-ইংরেজী কোষে এত শব্দ এখনও পর্য্যন্ত সংগৃহীত হয় নাই।

শব্দসংগ্রহের সময় আমি কন্-জুর ও তন্-জুর দেখিতে আরম্ভ করিলাম। লাসা নগরের মুরু মঠের কর্ম্মনিষ্ঠতা প্রসিদ্ধ, ইহা চোঙ-খ-পার গদীতে আসীন ঠি-রিন্-পোছের অধীন; আমি মঠের হস্তলিখিত তন্-জুর পাঠের অনুমতি পাইয়া সেখানে গেলাম। কিন্তু একে পুস্তকাগার অন্ধকার, তাহার উপর অক্টোবরের শীতে সর্দ্দি-কাশি সুরু হইল, সুতরাং দুই-তিন দিন সেখানে যাইবার পরই গ্রন্থগুলি নিজের বাড়ীতে লইবার অনুমতি চাহিলাম। অনুমতি পাইলে পনর-কুড়ি খণ্ড করিয়া পুস্তক ঘরে লইয়া যাইতে আরম্ভ করিলাম। সমগ্র সংগ্রহ ২৩৫টি বেষ্টনীতে বদ্ধ।

আমার আশ্রয় ধর্ম্মমান সাহুর গৃহে তাহার বৈঠকখানার পাশে ছিল। বহুদিন থাকিতে হইবে জানিয়া আমার নিকট খরচ গ্রহণ করিতে সাহুকে রাজী করাইলাম। আমার ঘরটিতে সকালের রোদ আসিত, সুতরাং অপেক্ষাকৃত গরম ছিল, কিন্তু তৎসত্ত্বেও শীতের প্রকোপ বুঝিয়া লাসার পুরনো বাজার হইতে ২০-৩০ সাং দিয়া একটি মঙ্গোলীয় পোস্তীন কিনিলাম, ভিতরে ছাগলের বাচ্ছার লোমযুক্ত চামড়া বাহিরে মোটা লাল চীনা-রেশম কাপড়। যতই মোটা হউক এখানকার শীতের পক্ষে পশমী কাপড় তুচ্ছ। ঐ পোস্তীনের উপর মোলায়েম লম্বাপশমযুক্ত চুক্‌টু, মাথায় উলের কানটোপ—এই সবে দেহের শীত নিবারণ হইল বটে, কিন্তু অক্টোবর-শেষের দারুণ শীতে আঙুল ফাটিয়া রক্ত পড়িতে লাগিল উটের পশমের মঙ্গোলীয় দস্তানা পরিয়া লেখাপড়া চলিত ডিসেম্বরের দ্বিপ্রহরে তাপমান ৪০° ফারেনহাইট মাত্র উঠিত, জানুয়ারীর মাঝামাঝি তাহা ২০° ডিগ্রিতে দাঁড়াইল। দিনে দ্বিপ্রহরে এইরূপ শীত, রাত্রে কিরূপ হইত বুঝিতেই পারেন জল তো জমিয়াই যাইত, ফাউণ্টেন পেন ব্যবহারের পূর্ব্বে লেখাও অসম্ভব হইয়া উঠিল, কেননা শীতে দোয়াতের কালি জমিয়া যাইত। অক্টোবরেই গাছের পাতা ঝরিয়া পড়িল এবং মাসখানেকের মধ্যে বৃক্ষলতাগুল্ম সব শুকাইয়া গেল, শ্যামলতার লেশমাত্রও দেখা যাইত না।

* * *

তিব্বতের রাজধানী লাসা এখন ব্রিটিশ, রুষ ও চীন রাজনীতির লীলাক্ষেত্র। লাসার সে-রা, ডে-পুঙ প্রভৃতি মঠে রুষ-এলাকার মঙ্গোল বাস করে, তাহাদের সকলে বা অধিকাংশই যে রাজনৈতিক কার্য্যে ব্যস্ত সে-কথা বলা চলে না। তবে এ-বিষয়ে সন্দেহ নাই যে তাহাদের দ্বারা রাজনীতির গুপ্ত চাল চলিতে পারে। আমি যে-সময় লাসায় ছিলাম সেই সময় এক জন রুষ-মোঙ্গল অতিশয় আড়ম্বরের সহিত তথায় জীবন যাপন করিতেছিল, পরে জানিয়াছিলাম যে সে 'শ্বেত' রুষ, 'লাল' বলশেভিক নহে। ব্রিটিশ-সরকারের তরফে এক জন রায়-বাহাদুর প্রকাশ্যে এবং আরও অনেকে গুপ্ত ভাবে চরের কার্য্যে ব্যস্ত ছিলেন। লাসায় পৌঁছিবার পরই প্রকাশ করিয়াছিলাম যে আমি ভারতীয়, চিঠিপত্রেও আমার সকল কথাই সোজা ভাবে লেখা থাকিত, সুতরাং আমার প্রতি দৃষ্টি পড়িতে দেরি হইল না। তবে আমি ছিলাম সাংস্কৃতিক বিদ্যার্থী, সুতরাং তিব্বতীয়দের সম্বন্ধে অনধিকারচর্চ্চা করার সময় বা ইচ্ছা আমার হয় নাই। পূর্ব্বোক্ত রোজমেয়র সাহেবও প্রথম-সাক্ষাতে আমি কি করিতেছি সে-সম্বন্ধে বহু প্রশ্নাদি করেন, কিন্তু পরে তিনি আমার প্রতি অতি সজ্জনের মত ব্যবহার

করিয়াছিলেন। বিশেষতঃ তিনি আমাকে পর্সি-ল্যাণ্ডনের সদ্য-ছাপা 'নেপাল' গ্রন্থের দুই খণ্ড ধার দিয়া ঋণী করিয়াছিলেন। উক্ত প্রামাণ্য পুস্তকে আমি বহু জ্ঞাতব্য বিষয় জানিয়া উপকৃত হই।

মহাসমরের পূর্ব্বে তিব্বতীয়েরা যখন চীনাদিগকে বিতাড়িত করে তখন সে-দেশে ইংরেজের প্রভাব পূর্ণমাত্রায় বর্ত্তমান। তাহারও কিছু দিন পূর্ব্বে দলাই লামা লাসা ছাড়িয়া ভারতে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইয়াছিলেন এবং সে-সময় ইংরেজ-সরকার তাঁহাকে অনেক সাহায্য করেন। এই সকল ব্যাপারের জন্য দলাই লামা বিশেষ কৃতজ্ঞ থাকায় ১৯২৪ সাল পর্য্যন্ত ইংরেজ এ-দেশে অতি প্রভাবশালী ছিলেন। চীনাগণ বিতাড়িত হইলেও ভোটবাসিগণ জানিত যে চীনারা যখন নিজের দেশের ব্যাপার হইতে মুক্ত হইয়া এদিকে নজর দিতে পারিবে তখন তাহাদের গতি রোধ করা দুঃসাধ্য হইবে। সেই দিনের প্রতীক্ষায় মাঝে পুলিস ও ফৌজ শক্তিশালী করিবার এক চেষ্টা হয়। পুলিসের ব্যবস্থা করিতে সর্দ্দার-বাহাদুর লে-দন-লা দার্জ্জিলিং হইতে এখানে প্রেরিত হইয়াছিলেন। চীন আম্বান (রাজপ্রতিনিধি) যে য়া-মী প্রাসাদে ছিলেন তথায় তাঁহার বাসস্থান নির্দ্দিষ্ট হয়। পূর্ব্বে এদেশে পুলিসের কোন ব্যবস্থা ছিল না, সর্দ্দার-বাহাদুরকে উর্দ্দী অর্থাৎ ইয়ুনিফর্ম্ম হইতে আরম্ভ করিয়া সকল জিনিষের গোড়াপত্তন করিতে হয়। যাহা হউক, পুলিসের ব্যবস্থা করিতে এতটা ঝঞ্চাট পোহাইতে হয় নাই, বিপদ হইল সেনাদলসংগঠনে। তিব্বত বিরাট দেশ, কাশ্মীর হইতে চীন, এবং বর্ম্মা হইতে রুষ ও চীনা-তুর্কীস্থান পর্য্যন্ত ইহার সীমা বিস্তৃত, এ-হেন এলাকার রক্ষার জন্য কমপক্ষে ত্রিশ-চল্লিশ হাজার সৈন্য আবশ্যক। প্রাচীন প্রথা ছিল যুদ্ধের সময় জায়গীরদারদিগের সিপাহীদলগুলির একত্র সমাবেশ করা, কিন্তু আধুনিক প্রথায় শিক্ষিত চীনা-সৈন্যের সম্মুখে সেরূপ 'পাড়াগেঁয়ে' ভূতের সমষ্টি কয় মুহূর্ত্ত দাঁড়াইতে পারে? কিন্তু সেনাদলকে সুশিক্ষিত ও সংগঠিত করিতে যে-অর্থবলের প্রয়োজন তাহাই বা আসে কোথা হইতে? সমস্ত দেশের জায়গা-জমী ছোটবড় জমীদারীতে বিভক্ত, অধিকাংশ বড় জায়গীর মঠগুলির অধিকারে। মঠ হইতে টাকা চাওয়ায় তাঁহারা জানাইলেন যে ধর্ম্মকর্ম্ম, পূজাপর্ব্বের খরচই তাঁহারা কুলাইতে পারেন না, টাকা দিবেন কিরূপে? এই উত্তর অগ্রাহ্য করিয়া ভোট-সরকার চাপ দেওয়ায় মঠের অধিকারিগণ খোঁজ লইয়া বুঝিলেন এ-কার্য্য ইংরেজ-রাজদূতের প্রেরণায় হইতেছে। বলা বাহুল্য, ইংরেজ-প্রীতির স্রোত তৎক্ষণাৎ বিপরীতমুখী হইল, সর্ চার্লস বেল এক বৎসর লাসায় থাকিয়া বিফল হইয়া ফিরিলেন। এদিকে টাকার জন্য জোর তাগিদের ফলে ভোট-সরকার ও টশী লামার মধ্যে মনান্তর হওয়ায়, টশী লামা (পন্-ছেন-রিম্পোছে) দেশ ছাড়িয়া চীনদেশে আশ্রয় লইতে বাধ্য হইলেন, আজিও তিনি প্রবাসে আছেন। ব্রিটিশ-সরকার ভোট-ফৌজের জন্য মহাযুদ্ধে পরিত্যক্ত কয়েক সহস্র পুরনো রাইফেল সরবরাহ করিয়াছিলেন, এখনও তাহার সম্পূর্ণ দাম পাইয়াছেন কি না সন্দেহ।

সর্দ্দার-বাহাদুর পুলিসগঠনে এত দিন কোন বাধা পান নাই, এখন এই বিপরীত হাওয়ার ঝাপটা তাঁহাকেও ব্যস্ত করিল। পুলিসদল সুসজ্জিত করিবার জন্য তিনি তাহাদের লম্বা টিকি কাটাইয়াছিলেন। ভোটদেশে লামাগণ মুণ্ডিতকেশ, অন্য সকলেই মধ্যযুগের ইউরোপীয় বা ঊনবিংশ শতাব্দীর চীনাদের মত বেণী ধারণ করে, সুতরাং এক অজ্ঞাত কবি গান বাঁধিলেন "লেদন লামা ম-রে—পু-লিস্ ভাবা ম-রে—য়া-মী গোম্বা ম-রে—ট-শর..." ইত্যাদি, অর্থাৎ 'লে-দন্ লামা নহেন, পুলিসেরা ভিক্ষু নহে, য়া-মী প্রাসাদ মঠও নহে, তবে চুল কাটান কি কারণে?' এই রূপে তাঁহার বিরুদ্ধে অভিযান-গীতের সুরে দেশ ছাইয়া গেল। ভোটদেশে খবরের কাগজের বদলে এইরূপ গানের পালায় সরেস খবর সারা দেশে ছড়াইয়া পড়ে। লাসার শো-গঙ নামে এক সুপ্রতিষ্ঠিত ও ধনী বংশ আছে। তাহার বর্ত্তমান কর্ত্তা লাসায় সরকারী 'দে-পোন' অর্থাৎ জেনারেল ছিল। ঘরে সুন্দরী স্ত্রী ও সন্তানাদি থাকা সত্ত্বেও শো-গঙ অন্যতে আসক্ত হয়। তাহার স্ত্রী বিষম ক্রুদ্ধ হইয়া সমাজে ও আদালতে টানাটানি করিয়া শো-গঙকে সর্ব্বস্বান্ত করে। পূর্ব্বেকার রাজসিক ঠাট ছাড়িয়া লাসার এক কোণে একটি ছোট বাড়ীতে সেই স্ত্রীলোকটিকে লইয়া শো-গঙ দিন কাটাইতে থাকে। এই সময় কোন গুপ্ত কবি সমস্ত

ব্যাপারটিকে গানের পালায় বাঁধিয়া সাধারণে প্রকাশ করে। সমাজে আদালতে এত টানাটানি সত্ত্বেও শো-গণ্ড অম্লান বদনে সকল কষ্ট সহ্য করিয়াছিল, কিন্তু পথে-ঘাটে ঐ গানের গর্‌রায় তাহার পক্ষে বাড়ীর বাহির হওয়া পর্য্যন্ত কিছু দিনের জন্য বন্ধ হইয়া গেল।

* * *

লাসার ডাক-ঘর ও তার-ঘর একই ভবনে অবস্থিত। যেখানে এই বাড়ীটি আছে সেখানে পূর্ব্বে গুন্-দগে-লিং নামে প্রসিদ্ধ মঠ ছিল। উক্ত মঠের এবং বর্ত্তমান অন্য তিনটির (কুন্-লদে-লিং, ছে-মো-লিং, ছে-মুছোগ-লিং) মোহন্তগণ দলাই লামার নাবালক অবস্থায় ভোটদেশ-শাসনের অধিকার পায়। বিগত চীন-ভোট যুদ্ধের সময় এই মঠের মোহন্ত চৈনিকদের সাহায্য করে, ফলে মোহন্তের প্রাণদণ্ড এবং প্রত্যেকটি ইট খুলিয়া মঠের অস্তিত্ব লোপ করা হয়। একদিন তার-ঘরে গিয়া খবর পাইলাম তাহার পাশে লাসার রাজবৈদ্য (এবং লাসার বৈদ্যশাস্ত্রপীঠের অধ্যক্ষ) থাকেন। দেখা করিয়া বুঝিলাম তিনি জ্যোতিষী ও সারস্বতে অধিকারী। ইনি তখন বাৎসরিক পঞ্জিকার কাষ্ঠ-ফলক খোদাই করাইতেছিলেন। কথাবার্ত্তায় বুঝিলাম, যদিও সংস্কৃত ভাষার এক অক্ষরও ইঁহার জানা নাই তবুও সারস্বতের সমস্ত সূত্র এখনও ইঁহার কণ্ঠস্থ। এইরূপ আর এক বিদ্বানের সহিত আলাপ হইয়াছিল যাঁহার সমস্ত চান্দ্র ব্যাকরণ কণ্ঠস্থ।

ডে-পুঙ মঠ আগেই দেখা হইয়াছিল, ১২ই অক্টোবর সে-রা মঠ দেখা স্থির করিলাম। ১৫ই সেপ্টেম্বর হইতে এক মাস এদেশে ঘুড়ি উড়াইবার সময়। এ-ব্যাপারে নেপালীরা বিশেষ পটু, বোধ হয় তাহারাই এ-খেলা এদেশে আনিয়াছে (কিংবা চীনদেশ হইতে এই দুই দেশই শিখিয়াছে)। এদেশে আমাদের দেশের মত প্রত্যেক খেলার বিভিন্ন মরশুম আছে। ঘুড়ি কাটা গেলে তাহা ধরিতে সকলে ছুটাছুটি করে। এক দিন শুনিলাম ঐরূপ ঘুড়ি ধরায় এক ঢাবা (সাধু) ও এক সিপাহীতে ঝগড়া হওয়ায় সিপাহীপ্রবর ঢাবাকে এক পাথরের আঘাতে চিরদিনের জন্য ক্ষান্ত করিয়াছে।

সে-রা মঠ লাসা হইতে তিন মাইল উত্তরে। ফসল কাটা শেষ হইয়াছে, শূন্য মঠের পাশ দিয়া চলিলাম। স্থানে স্থানে চমরী ও বলদ দিয়া মাড়াইয়া শস্যের তুষ ছাড়ানো হইতেছে। ভোটবাসী সাধারণতঃ প্রসন্ন-মন, সুতরাং ফসল ঝাড়া, ঘুড়ি ওড়ানো, চা প্রস্তুত করা প্রভৃতি সকল ব্যাপারেই গানের ঢেউ উঠিতেছে।

শস্যের ক্ষেতের সারি পার হইবার পূর্ব্বেই বিস্তৃত হাতা-যুক্ত এক বিরাট অট্টালিকা দেখা দিল। চীনা শাসনের আমলে ইহা চৈনিক ভিক্ষুদিগের বাসস্থান ছিল। তখন লোকজনে ইহা গম্‌গম্ করিত, এখন নির্জ্জন পুরী। বালুময় প্রান্তর পার হইয়া পাহাড়ের মূলে পৌঁছিলাম, সামনে বিখ্যাত সে-রা বিহার। ডে-পুঙ-এর ন্যায় ইহাকেও পাঁচ ছয় হাজার লোকের আবাসযোগ্য ছোট শহর বলা চলে। জম্-যঙ নামে মহান্ চোঙ-খ-পার এক শিষ্য ১৪১৫ খ্রীষ্টাব্দে ডে-পুঙ বিহার নির্ম্মাণ করেন। ১৪১৮ খ্রীষ্টাব্দে অন্য এক শিষ্য শাক্য-যে-শে সে-রা বিহার স্থাপন করেন। তাঁহার তৃতীয় শিষ্য এবং প্রথম দলাই লামা গেং-দুন্-গ্যাং-ছো ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে টশী-ল্হুন-পো মঠ স্থাপিত করেন। সে-রা মঠে সাড়ে পাঁচ হাজার ভিক্ষুর বাস, তবে ছাত্রসংখ্যার হিসাবে ইহার স্থান ডে-পুঙের নীচে। এখানে পাঁচ জন অধ্যক্ষ (মৃখন্-পো) আছেন কিন্তু ড-ছঙ (গ্রব-ছঙ অর্থাৎ বিদ্যালয়খণ্ড) তিনটি মাত্র, 'গ্যে' (গোং-ব্যেস্-মৃখস্-মঙ্), 'মে' (স্মদ্-থোস-বসম্-লিং) ও 'ঙগ্-পা'। সে-রা মঠে ৩৪টি খম্-সন্ আছে। এই খম্-সনগুলি অক্সফোর্ড বা কেম্ব্রিজ বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্তর্গত কলেজগুলির মত। উপরিউক্ত বিদ্যালয়-বিভাগগুলির মধ্যে 'গ্যে'তে ২২টি খম্-সন্ ও 'মে'তে ১২টি খম্-সন্ আছে। ঙগ্-পা-তে বিশাল পাঠশালা আছে, সেখানে বিশেষ তন্ত্র পড়ানো হয়, কিন্তু খম্-সন্ একটিও নাই। ডে-পুঙ মঠে ঐরূপ ৩৭টি খম্-সন্ আছে, উহা দুইটি বিদ্যালয়খণ্ডে বিভক্ত।

কেম্ব্রিজ বা অক্সফোর্ডের কলেজগুলির মতই খম্-সনে ছাত্রদের পড়িবার ও থাকিবার স্থান আছে। নিম্নপদস্থ অধ্যাপকদিগের নাম গে-গ্যেন (লেক্‌চারার) ও উচ্চ শ্রেণীস্থদিগের নাম গে-শে (প্রোফেসর)। বিশ্ববিদ্যালয়ের এলাকায় স্থানে স্থানে চারি দিকে দেওয়ালে-ঘেরা ফলের বাগান আছে, সেখানে বসিয়া ছাত্রেরা পাঠ কণ্ঠস্থ করে, কখনও বা ধর্ম্মকীর্ত্তির 'প্রমাণবার্ত্তিক' ইত্যাদির শাস্ত্রার্থ বিচার করে। স্মরণ রাখা উচিত, যদিও এই বিহার নালন্দা ও

বিক্রমশিলা ধ্বংস হইবার দুই শত বৎসর পরে প্রতিষ্ঠিত তবুও উঁহাদেরই ছাঁচে ইহা নির্ম্মিত হইয়াছিল। ভোট-ছাত্রগণ বিক্রমশিলা মহাবিহারে কয়েক শতাব্দী ধরিয়া অধ্যয়ন করিয়াছিল, সম-য়ে বিহার ত একেবারে উডন্ত-পুরী বিহারের নমুনায় নির্ম্মিত। এইরূপে উক্ত বিহারকে অনেক বিষয়ে নালন্দা-বিক্রমশিলার জীবন্ত নিদর্শন বলা চলে। আজও পড়াইবার সময় সেখানকার অধ্যাপকবর্গ ভারতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রপরম্পরায় প্রাপ্ত বসুবন্ধু, দিঙনাগ ও ধর্ম্মকীর্ত্তি সম্বন্ধীয় অনেক প্রসঙ্গের অবতারণা করেন। দুঃখের বিষয়, এখন এই সব বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রদের মধ্যে অর্দ্ধেক একেবারে নিষ্কর্ম্মা, বাকী অর্দ্ধাংশের শিক্ষা তাহাদের মতিগতি ও অভিরুচির উপর নির্ভর করে। বিদ্যালয়-প্রবেশকালে ছাত্রদের ড-চঙে নাম লিখাইতে হয় এবং নিয়মিত রূপে সকলের সঙ্গে পানভোজনাদি করিতে হয়, কিন্তু অধ্যয়নে মন দেওয়ার প্রশ্ন আসে না। জন কয়েক ছাত্র ও অধ্যাপকের বিদ্যোৎসাহ আছে সন্দেহ নাই, সেটা কিন্তু এখন অপবাদে দাঁড়াইয়াছে! এই সকল ড-চঙের অধ্যক্ষ খন্‌-পোগণ পূর্ব্বকালে যোগ্যতা অনুসারে নিযুক্ত হইতেন, কিছুকাল যাবৎ ঐরূপ যোগ্যতার দিকে মোটেই দৃষ্টি দেওয়া হয় না। আমার লাসা-বাসকালে সে-রা মঠে একটি খন্‌-পোর পদ খালি হয়। সে-রা মঠের শ্রেষ্ঠ বিদ্বান (ন্যায়শাস্ত্রে সে-রা সমস্ত তিব্বত ও মঙ্গোলিয়া প্রদেশের মধ্যে সর্ব্বোচ্চ স্থান অধিকার করে) এক মঙ্গোল গে-শে-কে তাঁহার ছাত্রেরা এই পদের প্রার্থী হইতে বলে। বলা বাহুল্য উমেদার অনেকে ছিলেন, এবং ঐ পদপ্রার্থীদিগের মধ্যে শাস্ত্রার্থপ্রতিযোগিতায় মঙ্গোল গে-শেই বিজয়ী হইয়াছিলেন। কিন্তু নির্ব্বাচন ও নিয়োগের সিদ্ধান্তের অধিকার স্বয়ং দলাই লামার হস্তে, সেখানে মহাগুরুর মোসাহেব-দিগকে সন্তুষ্ট করিতে অর্থের বিশেষ প্রয়োজন। মঙ্গোল বিদ্বান তাঁহার ছাত্রদের বলেন যে তিনি যত দূর উচিত ততটা চেষ্টা করিয়াছেন, কিন্তু উৎকোচ দিয়া খন-পো হওয়া তাঁহার বিবেকবিরুদ্ধ। শেষে কি হইল জানি না, কিন্তু সকলেই বলিত যে অন্য কেহ রৌপ্য-অর্থবলে শাস্ত্রার্থকে পরাজিত করিয়া ঐ পদ পাইবে। আমি নিজে ঙদ্-ড-ছঙের খন্-পোর নিকট এক দিন গিয়াছিলাম, তাঁহাকে দেখিলেই বুঝা যাইত যে খন্-পো নিয়োগে যোগ্যতার কোন প্রশ্ন আসে না।

এখনও এই সকল বিহারে প্রাচীন সভ্যতা এবং সুদীর্ঘ ইতিহাসের সজীব ধারা প্রবাহিত হইতেছে। যদি ইহাদের ত্রুটি দূর করা যায় তবে এখানে অধ্যয়ন-অধ্যাপনা নিয়মিত হইবে তাহাতে সন্দেহ নাই, তখন ইহাদের দ্বারা রাষ্ট্রের সেবা ও উপকার আধুনিক বিশ্ববিদ্যালয়ের মতই হইবে। প্রত্যেক বিহারের অধিকারে বিশাল জমীদারী আছে, রাজনীতির ক্ষেত্রেও ইহাদের অধিকার যথেষ্ট, সুতরাং রাজনৈতিক ব্যাপারেও মঠাধ্যক্ষদিগের পরামর্শের মূল্য কম নহে. বড় বড় মঠের মন্দিরে-দেবালয়ে এক মণ দুই মণ ওজনের স্বর্ণ ও রৌপ্যের অসংখ্য দীপ দিবারাত্র জ্বলে এবং দেবমূর্ত্তির ভূষণে স্বর্ণ-রৌপ্যের স্তূপের সহিত মণি-মুক্তার রাশি ঝলকিত হইতে থাকে। পাঠক সহজেই বুঝিতে পারিতেছেন যে মঠাধ্যক্ষগণ বিষয়-ব্যাপারেই সমস্ত সময় না দিয়া যদি অবসরের কিয়দংশও যথাকর্ত্তব্য পালনে ব্যয় করিতেন তাহা হইলে এই বিহারগুলি কিরূপ বিদ্যার আকর হইয়া উঠিত। মঠের বিদ্যালয়ে প্রধানতঃ বিনয়কারিকা, অভিসময়ালঙ্কার, অভিধর্ম্মকোষ, মাধ্যমিককারিকা ও প্রমাণবার্ত্তিকা পড়ানো হয়।

* * *

সে-রায় থাকিতে, ১৩ই অক্টোবর খবর পাইলাম যে রে-ডিঙ মঠের অবতারী লামা এখানে বিদ্যালাভের জন্য রহিয়াছেন। অতিশার প্রধান শিষ্য ডোম-তোন-পা গুরুর মৃত্যুর পর ১০৫৮ খ্রীষ্টাব্দে এই মঠ স্থাপন করেন। লোকমুখে শুনিয়াছিলাম, ঐ মঠে ভারত হইতে আনীত সংস্কৃত পুঁথির বেশ বড় রকমের সংগ্রহ আছে; কিন্তু বিশেষ খোঁজ করিয়া জানিলাম মঠের নিকটস্থ প্রস্তরস্তূপের একটি বিশিষ্ট আকার থাকায় লোকে তাহাকেই প্রস্তরময় পুঁথির রাশি বলে। যাহা হউক, এ সমস্যার যথার্থ-সমাধানের জন্য এই অবতারী লামার সঙ্গে আলাপ করিলাম। অবতারী লামার বয়স আঠার-উনিশ বৎসর মাত্র, তাঁহাকে বেশ তীক্ষ্ণবুদ্ধি বলিয়া মনে হইল। এদেশে অবতারী লামার শিক্ষাদীক্ষা ভারতের রাজকুমারদের মত হইয়া থাকে। অবস্থা-অনুযায়ী ভৃত্য ও অনুচরবর্গ-

সহ ইঁহারা মহা আড়ম্বরে জীবন-যাপন করেন এবং শিক্ষকের সঙ্গেও রাজকুমারের মতই ব্যবহার করেন, সুতরাং লেখাপড়া কতটা হয় বুঝিতেই পারেন। অবতারী লামা বলিলেন, "পুঁথি বেশী নাই, তবে এক হাত লম্বা ও এক বিঘৎ পরিমাণ একটি মোটা পুলিন্দায় অতিশার স্বহস্তলিখিত তালপত্রের পুঁথি আছে; ইহা ডোম-তোন-পা স্বয়ং মঠে দান করেন। আমি দেড় বৎসর বাদে মঠে ফিরিয়া যাইব, আপনি আমার সঙ্গে যদি যান তবে সে সবই আপনাকে দেখাইব।" এত দিনে প্রামাণ্য খবর পাওয়া গেল। যাইবার জন্যও মন উৎসুক হইয়াছিল বটে, কিন্তু দুঃখের বিষয় দেড় বৎসরের পূর্ব্বেই আমাকে দেশে ফিরিতে হইল। ঐ পুঁথিগুলি সত্যই যদি অতিশার হাতে লেখা হয়, তবে তন্মধ্যে তাঁহার রচিত হিন্দী গীত থাকাও সম্ভব।

২৪শে নভেম্বর, ভোটীয় দশম মাসের নবমী তিথিতে সে-রা সংস্থাপক জম-যঙের মৃত্যুতিথি ছিল। সে রাত্রে সারা শহরে ও আশেপাশের পর্ব্বতগাত্রে বহু দীপ জ্বালানো হইয়াছিল। পর দিন স্বয়ং মহান্ চোঙ-খ-পার মৃত্যুতিথি, সুতরাং সেদিন শহর ও নিকটবর্ত্তী পাহাড়ের উপর ছোট-বড় মঠগুলি দেওয়ালীর মত দীপমালায় সুসজ্জিত হইয়াছিল। মহান্ সংস্কারকের সম্মান যোগ্যভাবেই দেওয়া হয়। পথে-ঘাটে দীপশোভা দেখিতে বহু লোক আসে, দুঃখের বিষয় সেই রাত্রে যাহারা একেলা বা দুই-এক জন সখীর সহিত বাহির হইয়াছিল এইরূপ অনেক স্ত্রীলোকের উপর অশেষ অত্যাচার হয়। এইরূপ দুরবস্থার কারণ বোধ হয় শহরে লড়াইয়ের জন্য যে-সব সৈন্য একত্র করা হইয়াছিল তাহাদের উপর নিয়ম বা শাসনের অভাব।

ডিসেম্বরের মাঝামাঝি এক জন নূতন নেপালী ডীঠা অর্থাৎ ন্যায়াধীশ এখানে বদলী হইয়া আসিলেন। ইনি ইংরেজী জানিতেন, আমার সঙ্গে আলাপ হইলে ইনি ইঁহার পুত্রকে সংস্কৃত শিখাইয়া দিতে আমাকে অনুরোধ করিলেন। ছেলেটি মেধাবী, আমার নিকট পুস্তক ছিল না, সুতরাং লিখিয়া পাঠাভ্যাস করিত। এই সময় আমার আর এক জন ছাত্র জুটিল। এ-ব্যক্তি চীনা, অর্থাৎ ইহার পিতা চীনদেশীয় ছিলেন, বিশুদ্ধ চীনা ত এখন এদেশে নাই বলিলেই হয়। এই লোকটি অন্য অর্দ্ধ-চীনা বালকদের পড়াইয়া এবং সরকার-তরফে চীনা চিঠিপত্র অনুবাদ করিয়া গ্রাসাচ্ছাদন করিত। আমার সঙ্গে ব্যবস্থা হইল আমি তাহাকে ইংরেজী শিখাইব, সে তাহার বদলে আমাকে চীনা শিখাইবে।

ক্রমশঃ

কাব্য-বিচারের নিকষ-পাথর

শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়

কোন্ কবিতা সুন্দর আর কোন্ কবিতা অসুন্দর তা নির্ণয় করবার সহজতম মাপকাঠি হচ্ছে পাঠকের ভাল লাগা এবং না-লাগা। গরম জলে হাত লাগামাত্র যেমন তার উষ্ণতা আমরা অনুভব করি, ভাল কবিতা পাঠ করার সঙ্গে সঙ্গে তার সৌন্দর্য্যকেও তেমনি আমরা উপলব্ধি ক'রে থাকি। অনবদ্য কবিতা আমাদের অন্তরে জাগায় এমন একটি আনন্দের অনুভূতি যা অনির্ব্বচনীয়।

পাঠক-পাঠিকার চিত্তে অনির্ব্বচনীয় আনন্দের এই অনুভূতিটিকে জাগানোর জন্য কবিতার মধ্যে থাকা চাই কতকগুলি গুণ। এই গুণগুলি যেখানে বর্ত্তমান, সেখানে কাব্যের মধ্যে আমাদের চিত্ত পায় অমৃতরসের আস্বাদন।

ভাল কবিতার প্রথম লক্ষণ হচ্ছে শব্দ-প্রয়োগের অসাধারণ নৈপুণ্য। ভাষার মধ্যে থাকা চাই একটি আশ্চর্য্য মোহিনী শক্তি। কবিতার চরণগুলি কানে বাজার সঙ্গে সঙ্গে মনে হবে, 'চমৎকার! এমনটি ত কখনও শুনি নি জীবনে! মাটির কোলে এ যেন সঙ্গীতের ইন্দ্রজাল!' ভাষার এই মোহিনী শক্তি মনের মধ্যে ধ্বনির নীহারিকা সৃষ্টি ক'রেই নিঃশেষ হয়ে যাবে না। কারণ শব্দের মাধুর্য্য

দিয়ে পাঠকের হৃদয়কে মুগ্ধ করাই কবিতার একমাত্র কাজ নয়। কথার যাদু বলতে ভাষার সেই অনির্ব্বচনীয় শক্তিকেই বোঝায় যার স্পর্শে আমাদের মনে জাগে সুতীব্র চেতনা। যাদের অস্তিত্ব সম্পর্কে আমাদের মন ছিল অচেতন, ভাষার তাড়িত-স্পর্শে অকস্মাৎ তারা আমাদের চেতনায় জীবন্ত হয়ে দেখা দেয়। শব্দের সোনার কাঠি ছুঁইয়ে কবি আমাদের অনুভূতিকে করেন জড়তা থেকে মুক্ত। যে-ছবি কখনও চোখ মেলে আমরা দেখি নি, যে-গান আমরা কান পেতে কখনও শুনি নি—বাক্যের মেরু-জ্যোতিকে আশ্রয় ক'রে আমাদের চিত্তলোকে তারা অপূর্ব্ব মহিমায় উদ্ভাসিত হয়ে ওঠে। তার পর থেকে যত বার আমরা সেই ছবি দেখি, সেই গান শুনি, তত বার আমাদের মনের মধ্যে গুঞ্জরিত হয়ে ওঠে কবিতার সেই চরণগুলি যারা অনাবিষ্কৃত জগতের দ্বারোদ্ঘাটন ক'রে প্রকৃতির সৌন্দর্য্যের সঙ্গে আমাদের প্রথম পরিচয় ক'রে দিয়েছিল।

আমাদের বক্তব্য বিষয়টিকে আরও সুস্পষ্ট করবার জন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের কবিতা থেকে কিছু কিছু দৃষ্টান্ত দেওয়া গেল। 'বর্ষামঙ্গল' নামক বিখ্যাত কবিতাটির প্রথমেই আছে—

ঐ আসে ঐ অতি ভৈরব হরষে
জলসিঞ্চিত ক্ষিতিসৌরভ-রভসে
ঘনগৌরবে নবযৌবনা বরষা
শ্যামগম্ভীর সরসা।
গুরুগর্জ্জনে নীপমঞ্জরী শিহরে,
শিখীদম্পতি কেকা-কল্লোলে বিহরে।
দিগ্বধূ-চিত হরষা
ঘন গৌরবে আসে উন্মদ বরষা।

এখানে শব্দের অপূর্ব্ব ঐশ্বর্য্য আমাদের অন্তরে পুলকের শিহরণ জাগিয়েই আপনার ক্ষমতাকে নিঃশেষ ক'রে ফেলে নি। নববর্ষার রূপের একটি বর্ণনা দিয়েই ভাষার শক্তি এখানে লুপ্ত হয়ে গেল না। শব্দের সমারোহকে অবলম্বন ক'রে নূতন বর্ষার এমন একটি মূর্ত্তি আমাদের চিত্তপটে অঙ্কিত হয়ে রইল যা কোন কালেই মুছবার নয়।

'বলাকা'র এই কয়েকটি চরণ উদ্ধৃত ক'রেও আমাদের বক্তব্য বিষয়টি আরও পরিষ্কার করতে পারি—

শূন্য প্রান্তরের গান বাজে ওই একা ছায়াবটে;
নদীর এপারে ঢালু তটে
চাষী করিতেছে চাষ;
উড়ে চলিয়াছে হাঁস
ওপারের জনশূন্য তৃণশূন্য বালুতীরতলে।
চলে কি না চলে
ক্লান্তস্রোত শীর্ণ নদী, নিমেষ-নিহত
আধ-জাগা নয়নের মত।
পথখানি বাঁকা
বহুশত বরষের পদচিহ্ন আঁকা
চলেছে মাঠের ধারে—ফসল-ক্ষেতের যেন মিত'
নদীসাথে কুটীরের বহে কুটুম্বিতা।

এখানে নববর্ষার ছবির পরিবর্ত্তে আর একটি ছবিকে কবি ছন্দের সাহায্যে আমাদের মনের মধ্যে জীবন্ত ক'রে তুলেছেন। আগের কবিতায় মেঘের গুরুগর্জ্জন, নীপমঞ্জরীর শিহরণ, শিখীদম্পতীর কেকা-কল্লোল, ভিজে মাটির সৌরভ প্রভৃতি নানা উপাদানসম্ভার নিয়ে নবীন বর্ষার পরিপূর্ণ রূপ আমাদের চিত্তকে অধিকার করেছিল। পরবর্ত্তী কবিতার চরণগুলিতে যে-ছবি আঁকা হয়েছে সেখানে আছে ফসলের ক্ষেত, জনহীন বালুচর, উড়ন্ত বুনো হাঁস, দিগন্তব্যাপী প্রান্তরের নিঃসঙ্গ ছায়াবট, বহুবর্ষের পদচিহ্ন-আঁকা পথখানি এবং আধজাগা নয়নের মত শীর্ণ ও ক্লান্ত-স্রোত নদীটি। এই সমস্ত দৃশ্যকে আশ্রয় ক'রে এমন একটি সম্পূর্ণ চিত্র আমাদের মনশ্চক্ষের সম্মুখে মূর্ত্ত হয়ে উঠল যা একেবারেই উপেক্ষার বস্তু নয়। প্রকাশের অনিন্দনীয় ভঙ্গিমা পাঠকের মনে আনন্দের হিল্লোল তুলেই আপনার ক্ষমতার পুঁজিকে নিঃশেষ হ'তে দিল না। বঙ্গদেশের পল্লী-অঞ্চলের যে-দৃশ্যটি এখানে ফুটে উঠেছে তাও "গরুর দুটি শিং, একটি লেজ এবং চারিটি পা আছে" এই কথাসমষ্টির মত একটি বর্ণনা মাত্র নয়। বর্ণনা এখানে মনের উপরে এমন একটি ছাপ রাখে যা মুছে ফেলা কঠিন। একদা ফাল্গুনের কোন অপরাহ্ণবেলায় পদ্মার বুকে চলতে চলতে যে-ছবিখানি কবির মনের মধ্যে জাগিয়েছিল অপূর্ব্ব একটি অনুভূতি সেই ছবিখানিকে তিনি ছন্দের মধ্যে রেখে দিলেন শাশ্বত ক'রে। কথার এমন যাদু দিয়ে পল্লীর এই নিভৃত রূপটিকে তিনি রচনা করলেন যে সেই রূপ শুধু একটি বর্ণনা হয়েই রইল না। কবিতার চরণগুলি পাঠ করবার সঙ্গে সঙ্গেই পদ্মার তটভূমি, তার খেয়াঘাট আর নীল নদীরেখা, শূন্য মাঠ

আর চখাচখীর কাকলি-কল্লোল নিয়ে পাঠকের অনুভূতির মধ্যে জীবন্ত হয়ে দেখা দিল। সেই তটভূমির বিচিত্র দৃশ্য একদিন যে 'আনন্দ-বেদনায়' কবির জীবনকে উদাস ক'রে তুলেছিল, সেই আনন্দ-বেদনার নিবিড় অনুভূতিতে পাঠকের চিত্তও পূর্ণ হয়ে যায়। কবিতার এই বিশিষ্ট লক্ষণটির দিকে দৃষ্টি রেখেই অ্যাবারক্রম্বি (Abercrombie) লিখেছেন—

Poetry differs from the rest of literature precisely in this : it does not merely tell us what a man experienced, it makes his very experience itself live again in our minds by means of what I have called the incantation of its words.

অর্থাৎ সাহিত্যের অন্যান্য অঙ্গ থেকে কাব্যের তফাৎ হ'ল শুধু এইখানে : মানুষ যা দেখেছে, যা শুনেছে, যা উপলব্ধি করেছে, কবিতা তার শুধু বর্ণনা দিয়েই ক্ষান্ত থাকে না। কথার যাদুকে আশ্রয় ক'রে কবির অভিজ্ঞতা আমাদের অনুভূতির মধ্যে নূতন ক'রে বাঁচে।

এই সত্যটিকে আরও স্পষ্ট ক'রে দেখাবার জন্য এখানে রবীন্দ্রনাথের আরও কয়েকটি কবিতার অংশবিশেষ উদ্ধৃত ক'রে দিচ্ছি। 'বধূ' নামক কবিতাটিতে আছে,—

কলসী ল'য়ে কাঁখে পথ সে বাঁকা,
বামেতে মাঠ শুধু সদাই করে ধুধু
ডাহিনে বাঁশবন হেলায়ে শাখা।
দীঘির কালো জলে সাঁঝের আলো ঝলে,
দু'ধারে ঘন বন ছায়ায় ঢাকা।
গভীর থির নীরে ভাসিয়া যাই ধীরে
কোকিল ডাকে তীরে অমিয়-মাখা।
আসিতে পথে ফিরে আঁধার তরু-শিরে
সহসা দেখি চাঁদ আকাশে আঁকা!

এই লাইনগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা শহরের পারিপার্শ্বিক দৃশ্যগুলিকে কিছুক্ষণের জন্য বিস্মৃত হ'য়ে একটি নূতন জগতে প্রবেশ করি। এই নূতন জগতে রাজধানীর পাষাণ-কায়ার পরিবর্ত্তে আছে খোলা মাঠ আর পাখীর গান, বনের ছায়া আর দীঘির জল, করবী ফুল আর চাঁদের আলো। যে অপার আনন্দের অনুভূতি নিয়ে কবি দেখেছিলেন বাংলা দেশের প্রকৃতির সৌন্দর্য্যরাশিকে আর তাদের রূপ দিয়েছিলেন কবিতায়, উপরের লাইনগুলি পড়বার সময়ে সেই আনন্দের অনুভূতি পাঠকের মনেও সঞ্চারিত হয়ে যায়। বাসের হুঙ্কার আর ট্রামের ঘর্ঘরধ্বনি, ধূমমলিন আকাশ আর ইট-পাথরের অট্টালিকাকে ভুলিয়ে দিয়ে কবি পাঠকের চিত্তকে এমন একটি অভূতপূর্ব্ব আনন্দের মধ্যে মুক্তি দিলেন যে আনন্দ আকাশের নীলিমার পানে তাকিয়ে থাকার আনন্দ, অরণ্যের শ্যামশ্রীর মধ্যে চোখ দুটি ডুবিয়ে দেওয়ার আনন্দ।

ঠিক এমনি ক'রেই আমাদের চেতনার উপরে অরুণোদয়ের অপরূপ মহিমাটি মনোহর মূর্ত্তি নিয়ে আবির্ভূত হয় যখন আমরা পাঠ করি—

আকাশতলে উঠ্‌ল ফুটে
আলোর শতদল।
পাপড়িগুলি থরে থরে
ছড়াল দিক-দিগন্তরে
ঢেকে গেল অন্ধকারের
নিবিড় কালো জল।

আবার যখন পাঠ করি—

শোন শোন ওই পারে যাবে বলে কে ডাকিছে বুঝি মাঝিরে।
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।
পূবে হাওয়া বয়, কূলে নেই কেউ,
দুকূল বাহিয়া ওঠে পড়ে ঢেউ,
দরদর বেগে জলে পড়ি জল ছল-ছল উঠে বাজি রে,
খেয়া পারাপার বন্ধ হয়েছে আজি রে।

তখনও আমাদের চেতনাকে অধিকার ক'রে এসে দাঁড়ায় বর্ষণমুখর আষাঢ়ের সেই চির-পরিচিত ছবিটি। শীতের কুয়াসাচ্ছন্ন সন্ধ্যায় লণ্ডন শহরের বুকে কোন বাঙালীর ছেলে যদি উপরের লাইনগুলি পাঠ করে, সঙ্গে সঙ্গে তার মনে প'ড়ে যাবে বঙ্গদেশের একটি মেঘকজ্জল দিবসের স্মৃতি যখন আকাশ থেকে জল ঝ'রে পড়ছে অনিবার, ঝাপসা হয়ে গেছে ওপারের তরুশ্রেণী, নদীর কূলে কূলে জেগেছে উচ্ছল জলের কলরোদন, বিদায় নিয়েছে খেয়াঘাটের মাঝি, আর একাকী পথিক শূন্যঘাটে প্রাণপণে ডাকছে তাকে পার ক'রে দেওয়ার জন্য।

ঝরে ঘনধারা নব পল্লবে,
কাঁপিছে কানন ঝিল্লীর রবে,
তীর ছাপি নদী কলকল্লোলে
এলো পল্লীর কাছে রে।

এই লাইন কয়টির মধ্যেও শব্দের এমন একটি যাদু আছে যে পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা যেন শুনতে পাই, বর্ষণমুখর

সন্ধ্যায় পিছনের আম্র-কানন ঝিল্লীরবে মুখরিত হয়ে উঠেছে আর পল্লবে পল্লবে বাজছে বৃষ্টি-পড়ার সুমধুর ধ্বনি।

ধেয়ে চলে আসে বাদলের ধারা,
নবীন ধান্য দুলে দুলে সারা,
কুলায়ে কাঁপিছে কাতর কপোত
দাদুরী ডাকিছে সঘনে,
গুরু গুরু মেঘ গুমরি গুমরি
গরজে গগনে গগনে।

এ কেবল কথা দিয়ে কথার মালা গাঁথা নয়। এখানে শব্দের মোহিনী শক্তির বিদ্যুৎ-স্পর্শে বর্ষার প্রকৃতি জীবন্ত হয়ে উঠেছে আমাদের চোখের সামনে। ধ্বনির পর ধ্বনি আমাদের মর্মে যেমন প্রবেশ করতে লাগল, ছবির পর ছবিও তেমনি মনের মধ্যে আঁকা হয়ে গেল। কবিতার চরণগুলি পড়বার সঙ্গে সঙ্গে আমরা স্পষ্ট যেন দেখতে পাই, মেঘাচ্ছন্ন আকাশের নীচে পড়ে আছে দিগন্তব্যাপী শ্যামল প্রান্তর; শূন্য থেকে পৃথিবীতে নামছে বৃষ্টির ধারা আর সেই বৃষ্টিধারা প্রান্তরের উপর দিয়ে ছুটে আসছে দূরের গাছপালাগুলিকে অস্পষ্টতায় ঢেকে দিয়ে; সঙ্গে সঙ্গে মাঠে মাঠে সবুজ ধানের নৃত্য হয়েছে সুরু, মাথা দুলিয়ে দুলিয়ে তাদের নাচের আর বিরাম নেই। চোখ যখন এই দৃশ্য দেখছে, কান তখন শুনছে শ্রাবণ-মেঘের গুরু-গুরু ধ্বনি এবং তার সঙ্গে দাদুরীর ডাক।

'পলাতকা'য় কালো মেয়ে নন্দরাণীর কুমারী-হৃদয়ের সৌন্দর্য্যের বর্ণনা দিতে গিয়ে কবি লিখেছেন—

আমি যে ওর হৃদয়খানি চোখের 'পরে স্পষ্ট দেখি আঁকা;—
ও যেন যুঁইফুলের বাগান সন্ধ্যা-ছায়ায় ঢাকা;
একটুখানি চাঁদের রেখা কৃষ্ণপক্ষে স্তব্ধ নিশীথ রাতে
কালো জলের গহন কিনারাতে।
লাজুক ভীরু ঝরণাখানি ঝিরি ঝিরি
কালোপাথর বেয়ে বেয়ে লুকিয়ে ঝরে ধীরি ধীরি।
রাতজাগা এক পাখী,
মৃদুকরুণ কাকুতি তা'র তারার মাঝে মিলায় থাকি থাকি।
ও যেন কোন্ ভোরের স্বপন কান্নাভরা,
ঘনঘুমের নীলাঞ্চলের বাঁধন দিয়ে ধরা।

একটি কালো মেয়ের লাজুক ভীরু অকলঙ্ক মনের ছবি আঁকতে গিয়ে এই যে উপমার পর উপমার ঐশ্বর্য্য—এই ঐশ্বর্য্যের মধ্যে নন্দরাণী চিরন্তন হয়ে রইল পাঠকের মনে। রবীন্দ্রনাথের দরদী মনের বিপুল স্নেহের অধিকারিণী নন্দরাণী অসংখ্য পাঠক-পাঠিকার চিত্তেও এমন একটি স্থান অধিকার ক'রে বস্‌ল যা কোন কালেই হারাবার নয়। একেই বলে কথার যাদু, একেই বলে শব্দের ইন্দ্রজাল রচনা।

উপরের কথাগুলিকে অন্য রকম ক'রে বললে দাঁড়ায় এই—আমাদের চোখের সামনে বিশ্বের বিপুল জীবন দিবানিশি তরঙ্গিত হচ্ছে বিচিত্র মূর্ত্তি নিয়ে। এই বিচিত্র রূপ সকলের মনকে সমানভাবে নাড়া দেয় না, কারণ দেখবার ক্ষমতা ত সকলের সমান নয়। কেউ দেখে কেবল বাহিরের চোখ দুটি দিয়ে; তাদের দেখা হ'ল ভাসা-ভাসা। আবার কেউ বা দেখে সমস্ত অন্তর দিয়ে, সমস্ত সত্তা দিয়ে। যারা সমস্ত অন্তর দিয়ে দেখতে পারে তাদেরই দৃষ্টি হ'ল কবির দৃষ্টি। তাদেরই অভিজ্ঞতা কথার যাদুকে আশ্রয় ক'রে কবিতায় কুসুমিত হয়ে ওঠে। মনের সঙ্গে মনের তফাৎ ত আর কোথাও নয়, সে তফাৎ শুধু দেখবার ক্ষমতার মধ্যে। কবিদের মন এমন উপাদানে তৈরি যে সেই মন যাকেই দেখুক না কেন, তাকে অবলোকন করে অসীম কৌতূহল নিয়ে। আকাশের তারা থেকে আরম্ভ ক'রে সকলের অনাদৃত 'ছেলেটা' পর্য্যন্ত কেউ সেই মনের কাছে তুচ্ছ নয়। এই প্রসঙ্গে পাঠককে স্মরণ করতে বলি 'পুনশ্চ' গ্রন্থের 'ছেলেটা'র ছবি। ভাঙা বেড়ার ধারে আগাছার মত পরের ঘরে মানুষ সে। কুল পাড়তে গিয়ে হাত ভাঙে, রথ দেখতে গিয়ে হারিয়ে যায়, মার খায় দমাদম, ছাড়া পেলেই আবার দেয় দৌড়; বক্সীদের ফলের বাগানে চুরি ক'রে খায় জাম, পাকড়াশিদের কাচ-পরানো চোং নিয়ে আসে না ব'লে, ইস্কুলে যায় পকেটে নিয়ে কাঠবিড়ালী, হেলে সাপ রাখে মাষ্টারের ডেস্কে, কোলা ব্যাঙ আর গুবরে পোকা পোষে সযত্নে, সিধু গয়লানির গরুর দড়ি দেয় কেটে। চুরি ক'রে হাঁড়ি খেতে গিয়ে পোষা কুকুরটার যখন দেহান্তর ঘটল তখন অকস্মাৎ আমাদের দৃষ্টির সামনে প্রতিভাত হ'ল এই মাতৃহীন অশান্ত ছেলেটার অন্তরের মাধুর্য্য। কুকুরের শোকে দু-দিন সে লুকিয়ে লুকিয়ে কেঁদে ফিরল, মুখে তার অন্নজল রুচল না। বক্সীদের বাগানে পাকা করমচা চুরি করতেও সে বিন্দুমাত্র উৎসাহ অনুভব করল না। পাড়াগাঁয়ের একটি মাতৃহীন অশান্ত বালকের সমস্ত দুরন্তপনার মধ্যে যে-দৃষ্টি

আবিষ্কার করল তার সারল্য-মণ্ডিত শুভ্রহৃদয়ের গোপন সৌন্দর্য্যকে—সে-দৃষ্টি আছে শুধু কবির চোখে। অন্যের চোখে ঐ ছেলেটা একটা অসভ্য বাঁদর ছাড়া আর কিছুই নয়। সাধারণের দৃষ্টির সঙ্গে কবির দৃষ্টির এই পার্থক্য হ'ল ছেলেটাকে দেখবার ভঙ্গিমা নিয়ে। রবীন্দ্রনাথের কাছে বালক একটা দুষ্ট বালক মাত্র নয়, সে একটা মহামূল্য সম্পদের মতই আদরের সামগ্রী। অন্যেও যদি কবির মত ক'রেই তাকে দেখতে পারত, তবে বালক তাদের কাছেও পেত অনাদরের পরিবর্ত্তে অযাচিত স্নেহ।

তবে দাঁড়াল এই। ভাল কবিতার প্রধান লক্ষণ হচ্ছে ভাষার অনুপম যাদু। সে যাদু লেখকের অন্তরের অনুভূতিকে পাঠকের মনের মধ্যে জীবন্ত ক'রে তুলবে। আর ভাষার মধ্যে যাদু নিয়ে আসা তখনই হয় সম্ভব, যখন এই পৃথিবীর সব-কিছুই আমাদের চেতনায় এসে দাঁড়ায় অপরূপ সৌন্দর্য্যে মণ্ডিত হয়ে। যে অভিজ্ঞতাই আমরা লাভ করি না কেন, আমাদের চেতনায় তাকে গ্রহণ করতে হবে হৃদয়ের সবটুকু শক্তি দিয়ে। রূপ-রস-শব্দ-গন্ধ-স্পর্শ নিয়ে এই বিচিত্র জগৎ ক্ষণে ক্ষণে আমাদের হৃদয়ের দুয়ারে করছে করাঘাত। যাদের জাগ্রত মন মুহূর্ত্তে মুহূর্ত্তে এই আহ্বানে সাড়া দিতে পারে তাদেরই কবিতা আমাদের কল্পনাকে নাড়া দেয়। আমাদের অভিজ্ঞতা যদি কেবল ভাসা-ভাসা হয়, তার মধ্যে যদি না-থাকে অনুভূতির তীব্রতা, তবে আমাদের কবিতা কখনও পারবে না পাঠকের মনে গভীর রেখাপাত করতে। পাঠকের চেতনার উপর দিয়ে আমাদের ভাষার প্রবাহ চলে যাবে তেমনি ক'রে, যেমন ক'রে জলধারা চলে যায় হাঁসের পাখার উপর দিয়ে।

ছোটনাগপুরের আদিম অধিবাসীদের প্রেমসঙ্গীতগুলির মধ্যে আছে একটি অনির্ব্বচনীয় মাধুর্য্য। এই মাধুর্য্যের মূলে রয়েছে প্রেমের নিবিড় অনুভূতি। পাহাড়ের উপত্যকায় ঝরণার ধারে শালের বনে যে মুণ্ডা যুবকটি প্রেমে ডুবে তার প্রণয়িনীর কালো কেশে পরিয়ে দেয় রক্ত-পলাশের গুচ্ছ—তার অনুভূতির মধ্যে গভীরতার অভাব নেই। এই জন্যই তার মিলনের আনন্দ অথবা বিরহের বেদনা যখন সঙ্গীতের মধ্যে আত্মপ্রকাশ করে, সে সঙ্গীত সহজেই আমাদের অন্তরকে দেয় নাড়া। কলেজে-পড়া শিক্ষিত যুবকদের প্রেমের কবিতাগুলির অধিকাংশই যে পাঠকের চিত্তকে স্পর্শ করে না তার কারণও অনুভূতির দীনতার মধ্যে। প্রেম আসে শুধু কল্পনাকে আশ্রয় ক'রে, জীবনের নিবিড়তম অভিজ্ঞতার সঙ্গে নেই তার নাড়ীর যোগ। এই জন্যই সেই প্রেম থেকে আসে না কবিতার মত কবিতা। দুষ্মন্ত-শকুন্তলা অথবা রোমিও-জুলিয়েটের ভালবাসার কাহিনী প'ড়ে লেখা হয়েছে যে প্রেমের কবিতা, সে কবিতার মধ্যে মানুষের জীবন্ত অনুভূতির স্পন্দনকে খুঁজে পাব কোথা থেকে? ইংরেজীতে যাকে বলে experience—সেই experience-এর মধ্যে থাকা চাই হৃদয়ের সবটুকু দরদ, প্রাণের সবটুকু অনুভূতি। তবেই জীবনের অভিজ্ঞতা ভাষার যাদুকে আশ্রয় ক'রে অনুপম কবিতা হয়ে প্রকাশ পাবে। নইলে কবিতা হবে শুধু কথার সমষ্টি—তার মধ্যে ঝঙ্কার থাকতে পারে, কিন্তু প্রাণ থাকে না।

অনুবাদ-সাহিত্যের মধ্যে মূল কবিতার সৌন্দর্য্যকে আমরা যে খুঁজে পাই না তারও কারণ জীবন্ত অনুভূতির অভাব। অনুবাদ অভিজ্ঞতার বিষয়টিকে শুধু প্রকাশ করতে পারে। সেই অভিজ্ঞতার সঙ্গে কবির অন্তরের যে গভীর অনুভূতি জড়িত হয়ে আছে অনুবাদের মধ্যে তা প্রকাশ পাবে কেমন ক'রে? যে কবি আনন্দকে অথবা বেদনাকে সমস্ত হৃদয় দিয়ে প্রথম অনুভব করেছিল, আপন অনুভূতিকে অপরের মনে জীবন্ত রাখবার জন্য কি ভাষা ব্যবহার করতে হবে সে রহস্য কেবল তারই ছিল জানা। আর এক জনের অনুবাদের মধ্যে মূল কবিতার সেই ভাষার মোহিনীশক্তিকে দেখবার আশা করা বাতুলতা মাত্র। আলিপুরের চিড়িয়াখানার বাঘের মধ্যে সুন্দরবনের বাঘ দেখবার যে আশা করে, তাকে কি বলব? দুটোই বাঘ সন্দেহ নেই, কিন্তু খাঁচার বাঘ বনের বাঘের অনুবাদ মাত্র। অনুবাদে মূলের সৌন্দর্য্য ক্ষুণ্ণ না হয়ে যায় না।

এইবার প্রবন্ধের উপসংহার করি। ভাল কবিতা এমনই একটা দুর্লভ সম্পদ যার সৌন্দর্য্যকে বিশ্লেষণ ক'রে বোঝানো যায় না। তার মহিমা শুধু অন্তরের উপলব্ধির বিষয়। তবুও কাব্যকে বিচার করবার জন্য বাহিরের একটি নিকষ-পাথর থাকা মন্দ নয়। সেই নিকষ-পাথর সব সময় নির্ভুল না হ'লেও সেখানে যাচাই ক'রে কাব্যের মূল্য নির্দ্ধারণ করার একটা সার্থকতা আছে। এই প্রবন্ধে এই রকম একটা নিকষ-পাথরের কথাই বলা হয়েছে।

বিবিধ প্রসঙ্গ

কংগ্রেসের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ—"ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা ?" না, "She stoops to conquer ?"

বর্ধায় কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির গত অধিবেশনে নিম্নমুদ্রিত প্রস্তাবটি গৃহীত হইয়াছে।

"The All-India Congress Committee at its meeting held in Delhi on March 18th, 1937, passed a resolution affirming the basis of the Congress policy in regard to the New Constitution and laying down the programme to be followed inside and outside the legislatures by Congress members of such legislatures.

It further directed that in pursuance of that policy permission should be given for Congressmen to accept office in provinces where the Congress commanded a majority in the legislature if the Leader of the Congress Party was satisfied and could state publicly that the Governor would not use his special powers of interference or set aside the advice of Ministers in regard to their constitutional activities.

In accordance with these directions the Leaders of Congress Parties who were invited by the Governors to form Ministries asked for the necessary assurances.

These not having been given, the Leaders expressed their inability to undertake the formation of Ministries; but since the meeting of the Working Committee on the 28th April last, Lord Zetland, Lord Stanley and the Viceroy have made declarations on this issue on behalf of the British Government.

The Working Committee has carefully considered these declarations and is of opinion that though they exhibit a desire to make an approach to the Congress demand, they fall short of the assurance demanded in terms of the A. I. C. C. resolution as interpreted by the Working Committee resolution of the 28th April. Again, the Working Committee is unable to subscribe to the doctrine of partnership propounded in some of the aforesaid declarations. The proper description of the existing relationship between the British Government and the people of India is that of the exploiter and the exploited and hence they have a different outlook upon almost everything of vital importance.

The Committee feels, however, that the situation created as a result of the circumstances and events that have since occurred warrants the belief that it will not be easy for the Governors to use their special powers.

The Committee has, moreover, considered the views of Congress members of the legislatures and of Congressmen generally.

The Committee has, therefore, come to the conclusion and resolves that Congressmen be permitted to accept office where they may be invited thereto, but it desires to make it clear that office is to be accepted and utilized for the purpose of working in accordance with the lines laid down in the Congress election manifesto and to further, in every possible way, the Congress policy of combating the New Act on the one hand and of prosecuting the constructive programme on the other.

The Working Committee is confident that it has the support and backing of the A. I. C. C. in this decision and that this resolution is in furtherance of the general policy laid down by the Congress and the A. I. C. C.

The Committee would have welcomed the opportunity of taking the direction of the A. I. C. C. in this matter, but it is of opinion that delay in taking a decision at this stage would be injurious to the country's interests and would create confusion in the public mind at a time when prompt and decisive action is necessary.—*United Press.*

বাংলায় প্রস্তাবটির তাৎপর্য্য এইরূপ :—

১৯৩৭ সালের ১৮ই মার্চ্চ তারিখে দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির যে অধিবেশন হইয়াছিল, তাহাতে নূতন শাসনতন্ত্র সম্পর্কে কংগ্রেসের নীতির ভিত্তি নির্দ্দেশ করা হয় এবং ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যগণ কর্ত্তৃক তাহার ভিতরে ও বাহিরে অনুসরণের জন্য কর্ম্মতালিকা নির্দ্দিষ্ট করা হয়।

উক্ত অধিবেশনে এই নির্দ্দেশও প্রদত্ত হয় যে, উক্ত কর্ম্মনীতি অনুসারে যে সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসীগণ সংখ্যাগরিষ্ঠতা লাভ করিয়াছেন, ঐ সকল প্রদেশের কংগ্রেসী দলপতিগণ যদি এ বিষয়ে সন্তুষ্ট থাকেন এবং প্রকাশ্যভাবে এইরূপ ঘোষণা করিতে পারেন যে, গবর্ণর তাঁহার বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করিবেন না বা তাঁহাদের নিয়মতান্ত্রিক কার্য্য-কলাপ সম্পর্কে মন্ত্রীদের পরামর্শ গবর্ণর উপেক্ষা করিবেন না, তাহা হইলে ঐ সকল প্রদেশে কংগ্রেসীগণকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে অনুমতি দেওয়া যাইবে।

এই নির্দ্দেশ অনুযায়ী যে সকল কংগ্রেসী নেতাগণকে গবর্ণরগণ মন্ত্রীমণ্ডলী গঠন জন্য আমন্ত্রণ করিয়াছিলেন, তাঁহারা গবর্ণরদের নিকট হইতে মন্ত্রিত্ব গ্রহণপক্ষে প্রয়োজনীয় প্রতিশ্রুতি চাহেন। ঐরূপ প্রতিশ্রুতি প্রদত্ত না হওয়ায় নেতৃগণ মন্ত্রিমণ্ডলী গঠনের দায়িত্ব লইতে অক্ষমতা জ্ঞাপন করেন। কিন্তু কার্য্যকরী সমিতির গত ২৮শে এপ্রিলের অধিবেশনের পর লর্ড জেটল্যাণ্ড, লর্ড ষ্ট্যানলী ও বড়লাট ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের পক্ষ হইতে এতৎসম্পর্কে মত ঘোষণা করিয়াছেন। কার্য্যকরী সমিতি বিশেষ সতর্কতার সহিত ঐ সকল ঘোষণা বিবেচনা করিয়া দেখিয়াছেন এবং এই মত প্রকাশ করিতেছেন যে, তাঁহাদের ঘোষণায় তাঁহারা কংগ্রেসের দাবী মানিয়া লইবার পথে কিছুদূর অগ্রসর হইতে ইচ্ছা প্রদর্শন করিয়াছেন বটে, কিন্তু নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির প্রস্তাবের ওয়ার্কিং কমিটির ২৮শে এপ্রিলের অধিবেশনের প্রস্তাবে কৃত ব্যাখ্যানুযায়ী কংগ্রেস যে প্রতিশ্রুতি দাবী করিয়াছে, ঐ ঘোষণাগুলি তাহা পূর্ণ করিবার নিকটেও যায় নাই—অনেক দূরে রহিয়াছে। এতদ্ব্যতীত ঐ সকল ঘোষণা-বাণীর কোন কোনটিতে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট ও ভারতীয়দের যে অংশীদারিত্বের কথা বলা হইয়াছে, কার্য্যকরী সমিতি তাহাতে সায় দিতে অসমর্থ। ব্রিটিশ সরকার এবং ভারতবাসীদের মধ্যে যে সম্পর্ক বিদ্যমান, উহার যথার্থ বর্ণনা শোষক ও শোষিতের সম্পর্ক। কাজেই ভারতের জীবন-মরণ যাহার উপর নির্ভর করে এরূপ প্রত্যেকটি বিষয়কেই তাঁহারা বিভিন্ন দৃষ্টিতে দেখিবেন। যাহা হউক, কমিটির অভিমত এই যে,

ঘটনাচক্রের বিবর্ত্তনে এবং অবস্থার পরিবর্ত্তনে বর্ত্তমানে যে অবস্থায় আসিয়া পৌঁছান গিয়াছে, তাহাতে এরূপ বিশ্বাস করা যাইতে পারে যে, গবর্ণরদের পক্ষে তাঁহাদের বিশেষ ক্ষমতাসমূহ প্রয়োগ করা সহজসাধ্য হইবে না।

অধিকন্তু, মন্ত্রিত্বগ্রহণ প্রশ্ন সম্বন্ধে কমিটি বিভিন্ন ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদের এবং সাধারণভাবে কংগ্রেসীদের মত বিবেচনা করিয়াছেন। অতএব, কমিটি এই সিদ্ধান্তে পৌঁছিয়াছেন ও এই প্রস্তাব করিতেছেন, যে, মন্ত্রিত্বগ্রহণের জন্য কংগ্রেসীগণকে কোথাও আমন্ত্রণ করা হইলে কংগ্রেসীগণ তথায় মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে পারিবেন, কিন্তু কমিটি ইহা স্পষ্ট করিয়াই জানাইয়া দিতেছেন যে, কংগ্রেসের নির্ব্বাচনী ইস্তাহারে বর্ণিত পন্থা অনুযায়ী কার্য্য করিবার জন্য এবং এক দিকে নূতন শাসনতন্ত্রের বিরুদ্ধে সংগ্রাম চালনার ও অন্য দিকে গঠনমূলক কার্য্যতালিকা অনুসরণের কংগ্রেসী নীতি যত প্রকারে সম্ভব অনুসরণের জন্যই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে এবং মন্ত্রীর পদের সুব্যবহার করিতে হইবে।

ওয়ার্কিং কমিটির অর্থাৎ কার্য্যকরী সমিতির দৃঢ় বিশ্বাস এই, যে, ওয়ার্কিং কমিটির এই সিদ্ধান্তে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির সমর্থন আছে এবং এই প্রস্তাব কংগ্রেসের এবং নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দিষ্ট সাধারণ নীতির পরিপোষক। এ-বিষয়ে ওয়ার্কিং কমিটি যদি নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির নির্দ্দেশ গ্রহণের সুযোগ পাইতেন, তাহা হইলে ভালই হইত, কিন্তু কমিটির মত এই, যে, বর্ত্তমান অবস্থায় মন্ত্রিত্বগ্রহণ সম্বন্ধে সিদ্ধান্তে উপনীত হইতে বিলম্ব করিলে, তাহা দেশের স্বার্থহানিকর হইবে এবং যে সময়ে ক্ষিপ্রতার সহিত সুস্পষ্ট সিদ্ধান্ত গ্রহণ প্রয়োজন, সেই সময় জনসাধারণের মনে একটা বিভ্রমের সৃষ্টি করিবে।"—ইউনাইটেড প্রেস।

ওয়ার্দ্ধায় যে-সকল কংগ্রেসনেতা সমবেত হইয়াছিলেন, কাগজে বাহির হইয়াছে, যে, তাঁহারা বলিয়াছেন, কংগ্রেসের পতাকা উঁচু করিয়া রাখিতে হইবে। তাহা আমাদিগকে সেই হিন্দী গানটি মনে পড়াইয়া দিয়াছে যাহার গোড়ায় বলা হইয়াছে, "ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা"। কিন্তু ইহাও ভুলিতে পারা যায় না, যে, কংগ্রেস বলিয়াছিলেন, নূতন ভারতশাসন আইন গ্রহণযোগ্য নহে, উহা কাজে লাগাইয়া যা-কিছু লাভ হয় তাহার আশায় উহা কাজে লাগান উচিত নয়, উহা ধ্বংস করিবারই যোগ্য। সেই জন্য, এক দিকে যেমন "ঝণ্ডা উঁচা রহে হমারা" মনে পড়িয়াছে, তেমনি অন্য দিকে মনে এই প্রশ্ন উঠিয়াছে কংগ্রেস কি (গোল্ড-স্মিথের নাটকটির নামে সূচিত) "শী ষ্টুপস্ টু কঙ্কার" নীতির অনুসরণ করিতেছেন? কংগ্রেসের মাথার নতি কি বিজয়গৌরবে মাথা উঁচু করিবার অগ্রগামী ভঙ্গী?

কংগ্রেস কোন্ পথে যাইবেন, তাহা স্থির করা যে অত্যন্ত কঠিন, ঘরে পাখার নীচে আরামে বসিয়া তাহা অস্বীকার করা সহজ হইলেও, তাহা করিলে সত্যের অনুসরণ করা হইবে না। কংগ্রেস মন্ত্রিত্ব গ্রহণ না করিলে তাহার ফল হইবে, ছয়টি প্রদেশে ভারতশাসন আইন অনুসারে শাসন স্থগিত করিয়া গবর্ণরদের স্বৈরশাসন প্রবর্ত্তন, এবং কংগ্রেস-ওয়ালাদের আবার অহিংস অসহযোগ ও আইনলঙ্ঘনে প্রবৃত্ত হওয়া। কিন্তু লক্ষণ দেখিয়া মনে হয়, বিগত সংগ্রামের ক্লান্তি ও অবসাদ এখনও দূর হয় নাই। তবে, আমাদের মত যাহারা এই সংগ্রামে যোগ দেয় নাই, তাহাদের পক্ষে এ-বিষয়ে কিছু বলা অনধিকারচর্চ্চা। কিন্তু ইহা বলিলে অন্যায় হইবে না, যে, অসহযোগ ও আইন-লঙ্ঘনপ্রচেষ্টা স্থগিত করায় অন্ততঃ এইটুকু বুঝা গিয়াছিল, যে, যোদ্ধারা তখন আর যুদ্ধক্ষম ছিলেন না—তাহা যে-কারণেই হউক। কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতির প্রস্তাবেই পরোক্ষ প্রমাণ রহিয়াছে, যে, এখন ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদের ও অন্য কংগ্রেসীদের অধিকাংশ আইন-তান্ত্রিক মতে কাজ করিতে চান, অহিংস বিদ্রোহের পথে চলিতে চান না—তাহার কারণ যাহাই হউক।

বর্ত্তমান ১৯৩৭ সালের ১৮ই মার্চ দিল্লীতে নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি কেবল সেই ছয়টি প্রদেশেই ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদিগের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলেন যেখানে ঐ সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ এবং গবর্ণরদের প্রতিশ্রুতি পাইলে তাঁহাদিগকে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুমতি দিয়াছিলেন। গবর্ণরদের প্রতিশ্রুতি না-পাওয়ায় তাঁহারা মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করেন নাই।

এখন কংগ্রেসের কার্য্যকরী সমিতি ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদিগকে যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন, তাহা কেবল পূর্ব্বোক্ত ছয়টি প্রদেশের সদস্যদিগকেই দেন নাই, সাধারণভাবে ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যমাত্রকেই দিয়াছেন বলিয়া মনে করা যাইতে পারে। কারণ, যে বাক্যটিতে অনুমতি দেওয়া হইয়াছে, তাহাতে অনুমতিটিকে যেমন গবর্ণরের নিকট হইতে প্রতিশ্রুতি-প্রাপ্তিরূপ সর্ত্তের অধীন করা হয় নাই, তেমনি ইহাও বলা হয় নাই, যে, অনুমতিটি উক্ত ছয়টি প্রদেশের সদস্যদেরই জন্য। কেবল বলা হইয়াছে, যে, যেখানে কংগ্রেসওয়ালা সদস্যেরা মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হইবেন, সেখানে তাঁহারা তাহা লইতে পারিবেন। যে-সকল প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দল সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে, সেখানেও কোন-না-কোন কংগ্রেসী সদস্যের মন্ত্রিত্ব গ্রহণের জন্য আমন্ত্রিত হওয়া অসম্ভব নহে। কিন্তু এরূপ আমন্ত্রণের সম্ভাবনা থাকিলেও অন্য একটি বাধা রহিয়াছে। ওয়ার্কিং কমিটির প্রস্তাবে স্পষ্ট ভাষায় বলা হইয়াছে, কংগ্রেসের নির্ব্বাচন-জ্ঞাপনীতে (ইলেকশ্যন ম্যানিফেষ্টোতে) নির্দ্দিষ্ট গঠনার্থ ও বিনাশার্থ, উভয়বিধ, কার্য্য করিবার নিমিত্তই মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতে হইবে। যে-যে ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ, তথাকার সব মন্ত্রীর পদই কংগ্রেসীরা পাইবেন। সুতরাং তাঁহাদের

পক্ষে কংগ্রেসের নীতির অনুসরণ করা চলিবে—তাহা করিতে গিয়া গবর্ণরদের সহিত তাঁহাদের বিরোধ, ও ফলে মন্ত্রিত্বের অবসান ঘটিবে কি না তাহা স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু যে-সব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যেরা সংখ্যাগরিষ্ঠ নহে, সেখানকার মন্ত্রিমণ্ডলে এক বা একাধিক মন্ত্রী কংগ্রেসী হইলেও, অন্যেরা অকংগ্রেসী থাকিবেন। তাঁহাদের সকল বিষয়ে কংগ্রেসের বিমুখ নীতির অনুসরণ করিবার সম্ভাবনা কম—নাই বলিলেও চলে। সুতরাং এই সকল প্রদেশে কংগ্রেসের সভ্যদের মন্ত্রী হওয়া চলিবে না। তা ছাড়া আরও এই একটি বাধা রহিয়াছে, যে, ইতিপূর্ব্বে কংগ্রেসের সভাপতি পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরু নিয়ম জারি করিয়া দিয়াছেন, যে, ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী দল অন্য কোন দলের সঙ্গে কো-য়ালিশন বা সম্মিলন স্থাপন করিতে পারিবেন না।

এ-অবস্থায়, কংগ্রেসী সদস্যদের মন্ত্রিত্ব গ্রহণ হইতে যদি কোন সুফল ফলে, তাহার দ্বারা কেবল ছয়টি প্রদেশ উপকৃত হইবে, অন্য পাঁচটি প্রদেশ উপকৃত হইবে না। পরোক্ষভাবে তাহাদের উপকৃত হইবার সম্ভাবনা যে কিছুই নাই, এমন নয়। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এবং অ-কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের মধ্যে যদি দেশ-হিতকর কার্য্যসম্পাদনে প্রতিযোগিতা হয়, তাহা হইলে কিছু সুফল হইতে পারে। কিন্তু এরূপ প্রতিযোগিতা যে হইবেই, তাহা কে বলিতে পারে? বর্ত্তমান শাসনবিধি প্রদেশগুলিতে প্রচলিত হইবার পূর্ব্বেও সর্ব্বত্র প্রাদেশিক মন্ত্রিমণ্ডল ছিল। তাহাদের ও বর্ত্তমান মন্ত্রিমণ্ডলসকলের ক্ষমতা ও অধিকারে অবশ্য প্রভেদ আছে। তাহা হইলেও ইহা সত্য, যে, ইতিপূর্ব্বে কোন কোন প্রদেশের মন্ত্রীদের ভাল চেষ্টা অন্যান্য প্রদেশের মন্ত্রীদিগকে সচেতন ও প্রতিযোগিতোন্মুখ করে নাই। সুতরাং এখন যে করিবেই এমন আশা করা যায় না।

বস্তুতঃ নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটি ও ওয়ার্কিং কমিটি ছয়টি প্রদেশের কথাই ভাবিয়াছেন, বাকী পাঁচটি প্রদেশের কথা তেমন করিয়া ভাবেন নাই। সাধারণ মানবচরিত্র বিবেচনা করিলে ইহাই স্বাভাবিক। কংগ্রেসে, নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটিতে এবং ওয়ার্কিং কমিটিতে সেই সকল প্রদেশের কংগ্রেসীদেরই প্রভাব ও প্রাধান্য বেশী যে-সব প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী দল সংখ্যাভূয়িষ্ঠ। সুতরাং তাঁহারা ঐ প্রদেশগুলির ইষ্টানিষ্টই বিশেষ করিয়া চিন্তা করেন, অন্যগুলির কথা তেমন করিয়া ভাবেন না। তাঁহাদিগকে দোষ দিবার জন্য ইহা বলিতেছি না। তাঁহারা সকলেই অসাধারণ মানুষ হইলে, নিখিলভারতপ্রেমিক হইলে, অন্যের কথাও ভাবিতেন। কেবল ছয়টি প্রদেশেই কংগ্রেসী দলের সংখ্যাগরিষ্ঠ হইবার কারণ এই, যে, ঐ প্রদেশগুলি হিন্দুপ্রধান, এবং হিন্দুরাই প্রধানতঃ উৎসাহী ও আত্মোৎসর্গপরায়ণ কংগ্রেস-সভ্য। তাহা হইলেও, যুগপৎ কৌতুকাবহ ও দুঃখকর একটি ব্যাপার এই, যে, হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির হিন্দুরা অন্য পাঁচটি প্রদেশের হিন্দুদের অসুবিধায় এবং উৎপীড়িত ও লাঞ্ছিত অবস্থায় যথেষ্ট সমবেদনা অনুভব ও প্রকাশ করেন না। কিন্তু যে-সকল প্রদেশে মুসলমানেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ ও অন্যত্র যেখানে তাহারা সংখ্যায় কম, সব জায়গার মুসলমানদেরই পরস্পরের সহিত যোগ ও সহানুভূতি হিন্দুদের চেয়ে বেশী।

কংগ্রেস ওয়ার্কিং কমিটি বলিয়াছেন, গবর্ণরদের বিশেষ ক্ষমতা প্রয়োগ করা সহজ হইবে না। এরূপ বিশ্বাসের কারণ তাঁহারা খুলিয়া বলেন নাই। অনুমান হয়, ভারত-সচিব, সহকারী ভারতসচিব ও বড়লাটের বক্তৃতা ও মন্তব্যগুলিতে তাঁহারা ঐ মর্ম্মের আশ্বাস দেওয়ায় কমিটির ঐরূপ ধারণা হইয়াছে। কিন্তু কংগ্রেসী সদস্যেরা একবার মাকড়সার বৈঠকখানায় অর্থাৎ শাসনকলের মধ্যে আসিয়া পড়িলে, তৎক্ষণাৎ না হউক, কিছু পরে গবর্ণরেরা যে বিশেষ ক্ষমতাগুলিকে আইনের পৃষ্ঠার মধ্যেই থাকিতে দিবেন, তাহা না হইতেও পারে। তাঁহারা তখন আইনে পরিকল্পিত তাঁহাদের নিজমূর্ত্তি ধরিতেও পারেন। গবর্ণরেরা গত তিন মাস কোথাও মন্ত্রিমণ্ডলকে অগ্রাহ্য না করায় কমিটির ঐ প্রকার ধারণা হইয়াছে বলিয়া মনে হয় না। কারণ, কমিটির সভ্যেরা রাজনীতির অভিজ্ঞতাবিশিষ্ট ও বুদ্ধিমান্‌। তাঁহারা বুঝেন, যে, এই তিন মাস কোথাও গবর্ণরে ও মন্ত্রিমণ্ডলে ঠোকাঠুকি না হওয়ার কারণ, হয় মন্ত্রীরা প্রধান প্রধান বিষয়ে গবর্ণরের পরামর্শ অনুসারে চলিয়াছেন, নয় সাবধানে সব বিষয়ে গবর্ণরের ও আমলাতন্ত্রের মন জোগাইয়া চলিয়াছেন। পঞ্জাবে ত এ-পর্য্যন্ত মন্ত্রিমণ্ডলের প্রত্যেক সভায় গবর্ণর সভাপতিত্ব করিয়াছেন। বঙ্গের কথা ঠিক্‌ জানি না।

কংগ্রেসের দাবী অনুযায়ী প্রতিশ্রুতি না পাওয়া সত্ত্বেও, কমিটি যে মন্ত্রিত্বগ্রহণের অনুমতি দিয়াছেন, তাহার আর একটি কারণ এই দেখান হইয়াছে, যে, ব্যবস্থাপক সভার সদস্য কংগ্রেসীরা এবং অন্য কংগ্রেসীরাও মন্ত্রিত্বগ্রহণের পক্ষপাতী। যাঁহারা জনপ্রতিনিধি, জনগণ সম্বন্ধে তাঁহাদিগকে দুটি কাজ করিতে হয়;—সময়বিশেষে জনগণের মত গঠন ও মতকে সুপথে চালিত করিতে হয়, এবং কখনও বা জনগণের মত অনুসারে চলিতে হয়। ওয়ার্কিং কমিটি জনপ্রতিনিধি। কমিটি যাঁহাদের প্রতিনিধি, মন্ত্রিত্বগ্রহণ বিষয়ে সেই জনগণের মতের অনুবর্ত্তন করিয়াছেন বলিয়াছেন।

কংগ্রেস যখন নূতন আইন অনুসারে গঠিত ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে সদস্যরূপে কংগ্রেসীদের প্রবেশ বাঞ্ছনীয় মনে করেন, তখনই কোন কোন প্রদেশে মন্ত্রিত্বগ্রহণ বলিতে গেলে

অনিবার্য্য হইয়া উঠে। কারণ, সদস্য নির্ব্বাচিত হইতে হইলে আগে হইতে নির্ব্বাচক ভোটদাতাদিগকে বলিতে হইবে নির্ব্বাচনপ্রার্থী নির্ব্বাচিত হইলে কি করিবেন। এই বলার কাজটি, এই অঙ্গীকার করার কাজটি, করিতে হয় বক্তৃতা দ্বারা ও মুদ্রিত ম্যানিফেষ্টো বা মতজ্ঞাপনী দ্বারা। কংগ্রেসী নির্ব্বাচনপ্রার্থীদের পক্ষের বক্তৃতা ও ম্যানিফেষ্টোতে বলা হয়, যে, তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলে কৃষকদের ও শ্রমিকদের দুঃখ দূর করিবেন, ও অন্য কোন কোন শ্রেণীর লোকদেরও অভাব অভিযোগে মন দিবেন, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দিবেন, ইত্যাদি। কংগ্রেসের সভাপতির বক্তৃতায় এবং কংগ্রেসের নির্ব্বাচন-ম্যানিফেষ্টোতে নূতন ভারতশাসন আইন বিনষ্ট বা রদ করিয়া গণতান্ত্রিক ও স্বাজাতিক ধরণের শাসনতন্ত্র প্রতিষ্ঠার, স্বরাজ্যস্থাপনের ও স্বাধীনতা লাভের অঙ্গীকারও ছিল। এই শেষোক্ত অঙ্গীকারগুলি পালন ব্যবস্থাপক সভায় প্রবেশ না করিয়াও করা সম্পূর্ণ অসম্ভব নহে, এবং জাতিকে স্বরাট ও স্বাধীন করিতে পারিলে সকল শ্রেণীর লোকেরই অভাব অভিযোগ ও দুঃখে মন দেওয়া অপেক্ষাকৃত সহজ হয়। কিন্তু যে-সকল কৃষক মজুর ও অন্য লোক দুঃখদূরীকরণের আশায় কংগ্রেসীদিগকে ভোট দিয়াছে, তাহারা ভবিষ্যতে স্বরাজ্য ও স্বাধীনতা লব্ধ হইলে তবে সুখস্বাচ্ছন্দ্য পাইবে, এ আশায় বসিয়া থাকিতে পারে না। তাহাদিগকে সদ্য সদ্য দেখান আবশ্যক, যে, তাহাদের দুঃখ দূরীকরণের চেষ্টা হইতেছে। ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী সদস্যদের পক্ষে এরূপ চেষ্টা করা যতটা সম্ভবপর, মন্ত্রিত্বগ্রহণ না করিলে তাহা করা যায় না। এই জন্যই বলিতেছিলাম, কংগ্রেসের ম্যানিফেষ্টোই মন্ত্রিত্বগ্রহণ প্রকারান্তরে অনিবার্য্য করিয়াছিল।

এখন কথা হইতেছে, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল ম্যানিফেষ্টোর অঙ্গীকার রক্ষা করিতে পারিবেন কি ?

দেশহিতসাধনে মন্ত্রিমণ্ডলের সামর্থ্য

কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল ও অন্য মন্ত্রিমণ্ডলসমূহের দেশহিত-সাধন করিবার সামর্থ্য নির্ভর করিবে তাঁহাদের দেশহিতৈষণার উপর, দেশহিত করিবার মত জ্ঞান ও বুদ্ধির উপর, প্রাদেশিক ধনভাণ্ডারে যথেষ্ট টাকা থাকার উপর, সেই টাকা ব্যয় করিবার তাঁহাদের ক্ষমতার উপর, এবং দেশহিত-সাধনার্থ কোন কোন প্রকার আইন প্রণয়ন করিবার তাঁহাদের সামর্থ্যের উপর। দেশের হিত করিবার ইচ্ছা এবং তাহার নিমিত্ত পন্থা নির্দ্দেশ ও উপায় নির্ব্বাচনের মত জ্ঞান ও বুদ্ধি তাঁহাদের আছে, মানিয়া লওয়া হউক। অন্য যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা আছে কি না বিবেচনা করা যাউক।

দেশহিতসাধনের নিমিত্ত আবশ্যক যথেষ্ট টাকা কোন প্রদেশের ধনভাণ্ডারেই নাই, যদিও যাহা আছে তদ্বারা কিছু দেশহিত অবশ্যই হইতে পারে। বঙ্গের প্রাদেশিক সরকারী কোষে ত যথেষ্ট টাকা নাই-ই।

ভারতশাসন আইনের ৭৮ ধারা অনুসারে গবর্ণর প্রতিবৎসর প্রাদেশিক আয়ব্যয়ের একটি বিবৃতি ব্যবস্থাপক সভায় পেশ করাইবেন। ব্যয় দুটি প্রধান ভাগে বিভক্ত হইবে। একটি ভাগ সেই সকল খরচের যাহার 'চার্জ' প্রাদেশিক রাজস্বের উপর স্থাপিত ("expenditure charged upon the revenues of the Province")। ইহার দফাগুলি উক্ত ধারার ও উপধারায় দেওয়া হইয়াছে। প্রাদেশিক রাজস্বের ব্যয়ের এই ভাগটি ব্যবস্থাপক সভার ভোটের দ্বারা বাড়াইতে বা কমাইতে পারা যাইবে না। ইহা রাজস্বের বেশ একটি মোটা অংশ। এই ভাগটির কোন কোন ব্যয় গবর্ণরের একার বিবেচনার উপর নির্ভর করিবে। তাঁহার বিশেষ দায়িত্বগুলি অনুসারে কাজ করিবার জন্য কত টাকা আবশ্যক, তাহাও তিনি স্থির করিয়া দিবেন।

তাহার পর দ্বিতীয় ভাগটিতে আসিবে সেই সব খরচ যাহার হ্রাসবৃদ্ধি ব্যবস্থাপক সভার সদস্যদের ভোটের উপর নির্ভর করিবে, কিন্তু তাহাও চূড়ান্ত ভাবে নহে। প্রথমতঃ ত কোন বরাদ্দের দাবীই (demand for a grant) গবর্ণরের সুপারিশ ব্যতীত ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত করা যাইবে না। দ্বিতীয়তঃ, কোন কোন স্থলে তিনি ব্যবস্থাপক সভার দ্বারা কমান বা নামঞ্জুর বরাদ্দ আবার বজেটে পুনঃস্থাপিত করিতে পারিবেন।

আইনের এই প্রকার সব ব্যবস্থা হইতে বুঝা যাইবে, যে, অযথেষ্ট প্রাদেশিক রাজস্ব হইতে মন্ত্রিমণ্ডল দেশহিত-সাধনার্থ নিজ বিবেচনা অনুসারে আবশ্যক টাকা খরচ করিতে পাইবেন না ও পারিবেন না, তাঁহাদিগকে গবর্ণরের মরজির উপর নির্ভর করিতে হইবে।

নূতন ট্যাক্স বসাইয়া বা বর্ত্তমান কোন ট্যাক্সের হার বাড়াইয়া রাজস্ব বৃদ্ধির পথেও বাধা আছে। দেশের লোকদের আরও বেশী ট্যাক্স দিবার সামর্থ্য কত আছে, বিবেচ্য। বাংলা দেশে প্রাথমিক শিক্ষাবিস্তারকল্পে ট্যাক্স বসাইবার ক্ষমতা কয়েক বৎসর আগে প্রণীত একটি আইনে গবর্মেণ্টকে দেওয়া আছে। কিন্তু সেই আইন অনুসারে ট্যাক্স কার্য্যতঃ বসাইবার চেষ্টার প্রতিবাদ হইতেছে।

নূতন ট্যাক্স বসান বা বর্ত্তমান কোন ট্যাক্সের হার বাড়ান আর এক কারণে সহজ নয়। ইহা করিতে হইলে যেরূপ আইনের প্রয়োজন হইবে, তাহার খসড়া গবর্ণরের সুপারিশ ভিন্ন ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থিত পর্য্যন্ত করা চলিবে না, পাস করা ত দূরের কথা।

ট্যাক্স সম্বন্ধীয় কোন বিল বা অন্য যে কোন রকম বিল প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভায় পাস হইলেই তাহা আইনে পরিণত হইবে না; গবর্ণরের, গবর্ণর-জেনার‍্যালের, বা ইংলণ্ডেশ্বরের তাহা মঞ্জুর না করিবার আইনসঙ্গত ক্ষমতা আছে। ভূমির রাজস্ব সম্বন্ধে বঙ্গের যে চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত আছে, তাহার রদ বা কোন পরিবর্ত্তন যদি কোন বিলে করা হয়, তাহাতে গবর্ণর নিজেই মত দিতে পারিবেন না, ইহা গবর্ণরদের প্রতি উপদেশের দলিলে (Instrument of Instructions to Governorsএ) স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে।

চাষীদের ও কারখানার শ্রমিকদের দুঃখ ও অসুবিধার প্রতিকার করিতে হইলে যে-সকল আইন করিতে হইবে, তাহাতে জমিদার ও ধনিকদের স্বার্থের সহিত সংঘর্ষ ঘটিবে। ব্রিটিশ গবর্মেণ্ট নিজ শক্তি ও প্রভাব রক্ষার নিমিত্ত এই দুই শ্রেণীর লোকদের আনুগত্য ও সমর্থনের উপর কতকটা নির্ভর করেন। জমিদারদের মধ্যে ইংরেজ একেবারেই নাই এমন নয়, এবং ধনিকদের মধ্যে ইংরেজ অনেক। ভারতবর্ষের সাধারণ স্বার্থ এবং সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজদের স্বার্থের বৈপরীত্যও আছে। এই সব বিবেচ্য বিষয়ের উপর দৃষ্টি রাখিলে বুঝা যাইবে, যে, চাষী ও শ্রমিকদের সুবিধার জন্য আইন করিবার ইচ্ছা যদি কোন মন্ত্রিমণ্ডলের থাকে, তাহা হইলেও আইন করা খুব সহজ হইবে না।

—

ভাঙিবার নিমিত্ত গড়া

নূতন ভারতশাসন আইন ও তাহাতে বিধিবদ্ধ নূতন শাসনতন্ত্র কংগ্রেস গ্রহণের অযোগ্য ও বর্জ্জনীয় এবং বিনাশেরই যোগ্য মনে করেন এবং সেই জন্য তাহা বিনাশ করিবার চেষ্টাই করিবেন, ইহা কংগ্রেস সভাপতির মুখ দিয়া ও অন্যান্য প্রকারে বহুবার বলিয়াছেন। সুতরাং এখন সেই আইন ও শাসনতন্ত্র মন্ত্রিত্বগ্রহণ দ্বারা কতকটা সচল করিতে যাওয়ায় কংগ্রেসের কথায় ও কাজে কতকটা গরমিল হইতেছে, তাহা অস্বীকার করা যায় না। কিন্তু তথাপি কংগ্রেস বলিতেছেন, মন্ত্রিত্বগ্রহণ শাসনতন্ত্রটাকে 'চালু' করিবার জন্য নহে, উহার ধ্বংসসাধনেরই নিমিত্ত। তাহার অর্থের কিছু আভাসও সভাপতি এবং অন্য কোন কোন কংগ্রেস-নেতা দিয়াছেন। আভাস এইরূপ। কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল এমন সব গঠনমূলক আইন করিবেন, এমন সব গঠনমূলক কাজ করিবেন, যাহার দ্বারা জনগণ বলিষ্ঠ হইবে, উদ্বুদ্ধ হইবে, সচেতন হইবে। সুতরাং জনগণ এখন যতটা কংগ্রেসের অনুরাগী আছে, ভবিষ্যতে তদপেক্ষা আরও অনুরাগী হইবে। এই উদ্বুদ্ধ বলিষ্ঠ জনগণের সাহায্যে কংগ্রেস স্বরাজপ্রচেষ্টা নূতন উদ্যম ও উৎসাহের সহিত চালাইবেন। কংগ্রেসের সভাপতি নেহরু মহাশয় ইহাও বলিয়াছেন, যে, ফেডারেশনকে বাস্তবে পরিণত হইতে বাধা দিবার চেষ্টা করা, এবং তদ্দ্বারা কন্‌ষ্টিটিউশনটাকে ব্যর্থ ও হাস্যকর করা এবং এই প্রকারে ভবিষ্যৎ শাসনবিধি প্রণয়নার্থ জনসভার আহ্বানের জন্য ও স্বাধীনতার জন্য দেশকে প্রস্তুত করা মন্ত্রিত্বগ্রহণের উদ্দেশ্য।

গ্রহণের অযোগ্য ও বিনাশেরই যোগ্য শাসনতন্ত্রের অধীনে কংগ্রেসী ব্যবস্থাপক সদস্যেরা কি কারণে ও উদ্দেশ্যে মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিতেছেন, তাহার ব্যাখ্যা আমরা ঐরূপ বুঝিয়াছি। আমরা যদি ঠিক্ বুঝিয়া থাকি, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী বেসরকারী ইংরেজরা এবং ভারতশাসনসংশ্লিষ্ট সাম্রাজ্যবাদী ইংরেজ আমলারা তাহা ধরিতে ও বুঝিতে পারিবেন না, মনে করি না। রাষ্ট্রনীতি আমাদের চেয়ে তাঁরা কম বুঝেন না। সুতরাং প্রশ্ন এই, শাসনতন্ত্রকে ভাঙিবার উপায়রূপে ব্যবহারের অভিপ্রায়ে কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল যদি কিছু গড়িয়া তুলিবার চেষ্টা করেন, সে চেষ্টা ব্যর্থ করিবার ক্ষমতা কর্ত্তৃপক্ষের হাতে থাকা সত্ত্বেও কর্ত্তৃপক্ষ সেই ক্ষমতার প্রয়োগ করিবেন না, ইহা কি আশা করা যাইতে পারে?

—

কংগ্রেস কর্ত্তৃক ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী কার্য্য নিয়ন্ত্রণ

প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাসমূহে কংগ্রেসী দল কি ভাবে কাজ করিবেন, কংগ্রেসী মন্ত্রিমণ্ডল কি প্রকারে গঠিত হইবে, এবম্প্রকার বিষয়সমূহের তত্ত্বাবধান ও নিয়ন্ত্রণের ভার আছে সাধারণ ভাবে কংগ্রেস পার্লেমেণ্টারী বোর্ডের উপর। তা ছাড়া, কার্য্যসৌকর্য্যার্থে বোর্ডের এক এক জন সভ্যের উপর কয়েকটি প্রদেশের ভার আছে। যেমন সরদার বল্লভভাই পটেল চোখ রাখিবেন বোম্বাই, মান্দ্রাজ ও মধ্য-প্রদেশের উপর, বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ বিহার, উড়িষ্যা ও আসামের উপর, এবং মৌলানা আবুল কালাম আজাদ আগ্রা-অযোধ্যা প্রদেশ, বাংলা, পঞ্জাব, উত্তরপশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ ও সিন্ধুদেশের উপর।

অনেক কংগ্রেস-নেতা মনে করেন এবং কেহ কেহ বলেনও, যে, কংগ্রেসের কোন সাম্প্রদায়িক পক্ষপাতিত্ব ও ঝোঁক নাই, অন্যদের আছে বা থাকিতে পারে। কংগ্রেস যে অসাম্প্রদায়িক সমিতি, ইহা তাহার নিয়ম অনুসারে ও সাধারণভাবে সত্য। কিন্তু সাম্প্রদায়িকতা পরিহার করিবার ও সাম্প্রদায়িকতার ছোঁয়াচ হইতে আত্মরক্ষা করিবার শুচিবাই কখন কখন অজ্ঞাতসারে ও অনভিপ্রেত ভাবে কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত করে। উপরে বর্ণিত বন্দোবস্তটাতে ইহার গন্ধ পাওয়া যায়।

ভারতবর্ষের জনগণের মধ্যে মুসলমানেরা সংখ্যাভূয়িষ্ঠ নহে, কংগ্রেসের সভ্যদের মধ্যেও মুসলমানের সংখ্যা বেশী নয়। কিন্তু পাছে মুসলমানেরা কংগ্রেসকে সাম্প্রদায়িক বলে সেই অপবাদ হইতে আত্মরক্ষার জন্তই কি মুসলমানদিগকে কংগ্রেসে অযথা প্রাধান্ত দেওয়া হয়? সরদার বল্লভভাই পটেল ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ কেহই যোগ্যতা, শক্তি, ও দেশসেবায় মৌলানা আবুল কালাম আজাদের চেয়ে নিম্নস্থানীয় নহেন। তাঁহারা প্রত্যেকে পাইলেন তিন-তিনটি প্রদেশের ভার, এবং আজাদ সাহেব পাইলেন এমন পাঁচটি প্রদেশের ভার যাহার মধ্যে দুটি ভারতবর্ষে সর্ব্বাপেক্ষা জনবহুল। সরদার পটেল ও বাবু রাজেন্দ্র প্রসাদ আজাদ সাহেবের চেয়ে কম নিরপেক্ষ ও অসাম্প্রদায়িক নহেন। কিন্তু তাঁহারা হিন্দু বলিয়াই কি একটিও মুসলমানপ্রধান প্রদেশের ভার তাঁহাদের উপর দেওয়া হয় নাই? মুসলমানপ্রধান সব প্রদেশগুলির ভার ত আজাদ সাহেবের উপর দেওয়া হইয়াছেই, অধিকন্তু হিন্দুপ্রধান প্রদেশগুলির মধ্যে সকলের চেয়ে জনবহুল আগ্রা-অযোধ্যা যুক্তপ্রদেশেটিরও অভিভাবক তাঁহাকে করা হইয়াছে!

—

পরাধীন জাতি ও আন্তর্জাতিক বিধি

পরস্পর যুদ্ধের সময় সভ্য জাতিরাও আবশ্যকমত আন্তর্জাতিক বিধি (ইণ্টারন্তাশন্তাল ল) লঙ্ঘন করিয়া থাকে। শান্তির সময়ে কিন্তু ইউরোপের প্রবলতম জাতিরাও সেই মহাদেশের ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্বাধীন দেশের লোকদের সম্বন্ধে ব্যবহারেও সাধারণতঃ আন্তর্জাতিক বিধি মানিয়া চলে। পরাধীন জাতির লোকদের সম্বন্ধে কিন্তু ইউরোপীয় প্রবল স্বাধীন জাতিরা সব সময়ে আন্তর্জাতিক বিধি মানে না। তাহার একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি। ভূমিকাস্বরূপ বলা দরকার, যে, ভারতবর্ষে ফ্রান্সের অধীন যে কয়টি জায়গা আছে, তথাকার অধিবাসীরা ফ্রান্সের রাষ্ট্রবিধি অনুসারে ফ্রেঞ্চদের মতই স্বাধীন নাগরিক। কিন্তু বস্তুতঃ তাহারা ভারতীয় ব্রিটিশ প্রজাদেরই মত পরাধীন। ফরাসী চন্দননগরের পাঁচ জন যুবক ব্রিটিশ-অধিকৃত স্থানে বঙ্গীয় সংশোধিত ফৌজদারী আইন অনুসারে বাংলা গবন্মেণ্ট কর্তৃক ধৃত হইয়া বিনাবিচারে বন্দী হন। তাঁহাদের মধ্যে দুই জন মুক্তিলাভ করিয়াছেন। এখনও তিন জন বন্দী অবস্থায় ব্রিটিশ-ভারতে আছেন। ইঁহারা সকলেই ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে ধৃত হইয়াছিলেন। বন্দীদিগের মধ্যে শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষ দেউলী বন্দীশালা হইতে খুলনায় এক গ্রামে 'অন্তরীণ' হন। কিন্তু তাঁহার দুঃসাধ্য পীড়ার জন্ত তাঁহাকে প্রেসিডেন্সী জেলে আনা হইয়াছে।* বন্দী শ্রীযুক্ত তিনকড়ি মুখোপাধ্যা দেউলীতেই আছেন এবং শ্রীযুক্ত প্রকাশচন্দ্র দাস দমদমা কৃষিশালায় কৃষিকার্য্য শিখিতেছেন।

ফরাসী ভারতে কথা উঠিয়াছে যে এরূপ ভাবে ফরাসী নাগরিককে অন্তত্র বন্দী রাখা আন্তর্জাতিক বিধি অনুসারে বে-আইনী। ইহার জন্ত ফরাসী নাগরিকগণ একটি সাধার সভায় এই বিষয়ে চূড়ান্ত নিষ্পত্তির জন্ত ফরাসী কঁসেই জেনেরাল সভার সদস্য শ্রীযুক্ত হীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায়ে ভারার্পণ করিয়াছেন এবং স্থির করিয়াছেন যে মধ্যে মধ্যে সভা করিয়া বন্দীদিগের মুক্তির দাবী করিবেন ও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্ট কর্তৃক এরূপ বন্দীকরণ বে-আইনী বলিয় আন্দোলন করিবেন।

বন্দীকৃত যুবক তিন জন জাতিতে ফরাসী হইলে বিনা বিচারে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে তাহাদের কারাবাস ঘটিত না।

এ-বিষয়ে চন্দননগরের 'প্রজাশক্তি' গত ১৩ই আষাঢ়ে সংখ্যায় লিখিয়াছেন :—

> চন্দননগরের কতিপয় যুবক এবং ফরাসী প্রজা কয়েক বৎসর যাবৎ বিনাবিচারে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের হস্তে বন্দী। এ ... এদেশেই সম্ভব।
>
> এই বন্দীগণের মুক্তিলাভের প্রথম ধারাবাহিক প্রচেষ্টা শ্রীসত্যেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয়ের দ্বারা আরম্ভ হয়। এই ব্যাপারটির গুরুত্বের প্রতি তিনি প্রথমে গবর্ণর জুলানো এবং পরে গবর্ণর সলোমিয়াকের দৃষ্টি আকর্ষণ করেন। সত্যেন বাবু ও গবর্ণরদ্বয়ের মধ্যে অনেকগুলি পত্রব্যবহার হয়। ফলে ফরাসী সরকার বাংলার সরকারের সহিত এই বিষয়ে আলোচনা আরম্ভ করেন। সত্যেন বাবুর চেষ্টার ফলে বন্দী সন্তোষকুমার ... কানাইলাল পাল মুক্তি পাইলেন। কিন্তু বাকী কয়েক জনের ভাগ্যপরিবর্ত্তন হইল না।
>
> ১৯৩৪ সালের কঁসেই-জেনেরাল নির্ব্বাচনের পর হইতে শ্রীহীরেন্দ্রকুমার চট্টোপাধ্যায় এই ব্যাপারটিতে তাঁহার সকল শক্তি নিয়োজিত করিলেন। হীরেনবাবুর চেষ্টায় চন্দননগরের এই রাজবন্দীদের ব্যাপারটি সর্ব্বপ্রথম ভারতের অন্তান্ত ফরাসী উপনিবেশের প্রতিনিধিগণের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া সারা ফরাসী ভারতীয় ব্যাপারে পরিণত হইল। কঁসেই-জেনেরাল সভার ১৯ জন সদস্য গবর্ণর বাহাদুরের নিকট এই রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তির দাবী করিলেন। ফলে ১৯৩৪ সালের ডিসেম্বর মাসের শেষ সপ্তাহে তৎকালীন গবর্ণর মঃ সলোমিয়াক বাংলার লাটসাহেব ও পণ্ডিচারীস্থ ইংরেজ কন্‌সাল মহোদয়দের নিকট এই বন্দীদের মুক্তির কথা তুলিলেন। ১৯৩৫ সালের জানুয়ারী মাসের প্রথম সপ্তাহে বাংলার লাটসাহেবের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া এই সকল বন্দী ফরাসী প্রজার মুক্তি সম্বন্ধে আলোচনা করেন এবং উক্ত আলোচনার ফলে তিনি

* ইহা লিখিত হইবার পর অবগত হইলাম, গত ৮ই জুলাই শ্রীযুক্ত কালীচরণ ঘোষকে কি একটি সর্ত্তে আবদ্ধ করিয়া মুক্তি দেওয়া হইয়াছে।

আশা করিয়াছিলেন কয়েক মাসের মধ্যেই বন্দী ফরাসী প্রজারা মুক্তি পাইবে। বৎসর ঘুরিতে চলিল দেখিয়া হীরেন বাবু গবর্ণর বাহাদুরকে পত্রযোগে আবার বন্দীগণের মুক্তি সম্বন্ধে লিখিলেন; উত্তরে গবর্ণর বাংলার লাটের পত্রের কপি পাঠাইলেন। সে পত্রে মুক্তির কোন আশ্বাসই নাই।

এক দিকে বন্দীদের স্বাস্থ্য ভগ্ন হইতেছে—বিশেষতঃ বন্দী কালীচরণের। চন্দননগরে সাধারণ সভায় তাহাদের মুক্তির দাবী উপস্থাপিত করা হইল। কালীচরণের বৃদ্ধা মাতা বাংলার লাটের নিকট তাঁহার পুত্রের ভগ্ন স্বাস্থ্যের কথা জানাইয়া তাহার মুক্তি প্রার্থনা করিলেন। পণ্ডীচারীর লাটসাহেবকেও তিনি তাঁহার পুত্রের স্বাস্থ্যের কথা জানাইয়া হীরেন বাবুর মারফৎ দরখাস্ত করিলেন। গবর্ণর আবার জানাইলেন তাঁহার যথাসাধ্য তিনি করিতেছেন এবং করিবেন। কিন্তু কালীচরণ সেই ব্রিটিশ জেলে রোগশয্যায় সময় কাটাইতে লাগিল।

হীরেন বাবু অনন্যোপায় হইয়া ফ্রান্সের ঔপনিবেশিক মন্ত্রী ও পররাষ্ট্র-সচিবের দৃষ্টি আকর্ষণ করিবার উদ্দেশ্যে কঁসেই-জেনেরালের অধিবেশনে ব্রিটিশ সরকার কর্ত্তৃক ফরাসী প্রজার এই বিনাবিচারে বন্দীকরণের তীব্র প্রতিবাদ করিয়া এবং তাহাদের মুক্তির দাবী করিয়া এক প্রস্তাব পেশ করিলেন। মঃ দাভিদ ও মঃ আমব্রোয়াজ এই প্রস্তাব উপলক্ষে ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্টের এই কার্য্যকে বে-আইনী বলিয়া শুধু ঘোষণা করিলেন না—প্রমাণ করিলেন। কঁসেই-জেনেরালের ফরাসী গবর্ণমেণ্টের প্রতিনিধি মহাশয়ও এই প্রতিবাদ ও মুক্তিদাবী প্রস্তাবের সহিত সহানুভূতি প্রকাশ করিয়া প্রতিশ্রুতি দিলেন—গবর্ণমেণ্ট বন্দীদের মুক্ত করিতে কোনও চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না এবং প্রয়োজন হইলে ফ্রান্সে ঔপনিবেশিক মন্ত্রীর নিকট এই ব্যাপার উপস্থাপিত করিবেন। তৎপরে হীরেন বাবু এই ব্যাপার ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার অন্যতম সদস্য মিঃ বি. দাস ও বাংলার অন্যতম নেতা শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসুর গোচরীভূত করেন। তাঁহারা উভয়েই নিজ নিজ ব্যবস্থাপরিষদে এই ব্যাপারের আলোচনা করিবেন বলিয়া প্রতিশ্রুতি দিয়াছেন। হীরেন বাবু ইতিমধ্যে ফ্রান্সে Ligue des droits de l'homme-এর সভাপতিকেও এই সকল ঘটনা জানাইয়া প্রতিকার প্রার্থনা করিয়া পত্র দেন ও বিলাতের পার্লামেণ্টের শ্রমিকদলের সভ্য মার্ডি জোন্স সাহেবকেও এই ব্যাপার জানাইয়া তাঁহার সাহায্য ভিক্ষা করেন, এবং সর্ব্বশেষে বাংলার প্রধান মন্ত্রী মিঃ ফজলুল হক্‌কেও বিনা-বিচারে বন্দী এই সকল ফরাসী প্রজাদের মুক্তির দাবী করিয়া পত্র লিখিয়াছেন। এতদ্ব্যতীত নিখিল-ভারত কংগ্রেস কমিটির পররাষ্ট্র-বিভাগের সম্পাদক লোহিয়া মহাশয়ও কালীচরণের ভ্রাতার অনুরোধে চন্দননগরের ফরাসী রাজবন্দী প্রজাদের মুক্তির জন্য চেষ্টা করিতেছেন।

—

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি

কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি কাহাকে করা উচিত, এই প্রশ্নের উত্থাপন এই বৎসর বোধ হয় আমরাই প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ুতে ও পরে প্রবাসীতে করি। আমরা শ্রীযুক্ত সুভাষচন্দ্র বসুর নাম করিয়াছিলাম, কি কি কারণে করিয়াছিলাম, তাহাও বলিয়াছিলাম। তিনি বাঙালী, অথবা বাংলা দেশের কাহাকেও ১৫ বৎসর সভাপতি করা হয় নাই, শুধু এই কারণেই যে আমরা তাঁহার নাম করিয়াছিলাম, তাহা নহে। সমগ্র ভারতবর্ষেও যোগ্যতম কয়েক জন লোকের মধ্যে তিনি। আমাদের প্রস্তাব মডার্ণ রিভিয়ুর নাম করিয়া লাহোরের ট্রিবিউন ও করাচীর একটি কমিটি সমর্থন করিয়াছিলেন এবং অমৃতবাজার পত্রিকা ট্রিবিউনের প্রস্তাবের (আমাদের নহে।) সমর্থন করিয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন সুভাষ বাবুর নাম আহমদাবাদ ও পুনায় সমর্থিত হইয়াছিল। আর কোথাও হইয়াছিল কি না, আমরা লক্ষ্য করি নাই।

মান্দ্রাজ হইতে প্রেরিত গত ৮ই জুলাইয়ের এসোসিয়েটেড্ প্রেসের একটি টেলিগ্রামে দেখিলাম, মান্দ্রাজের সত্যমূর্ত্তি মহাশয় প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনে সভাপতিত্ব করিবার জন্য আমন্ত্রণ করা হউক। সত্যমূর্ত্তি মহোদয়ের প্রস্তাবটি তাঁহার প্রদত্ত যুক্তিসমেত নীচে উদ্ধৃত করিতেছি।

'I suggest that Mahatma Gandhi should be invited to preside over the next session of the Congress. Congress Ministers will have their difficulties at that time next year and his wise guidance as the President of the Congress will be invaluable to them. Moreover, as the sole author of the A.-I. C. C. formula on acceptance of office by the Congress, which has been substantially conceded but not completely, he is the best person to guide and counsel Congress Ministers. His presence at the helm of affairs during that critical year will make the Governors of the provinces hesitate many times before they interfere with Congress Ministers. It will also hearten and give tone to Congress Ministers themselves. Above all, his magnetic personality will help the Congress minorities in the other five provinces to become Congress majorities. That is the most urgent and important problem before the country today. An all-India tour by Mahatma Gandhi as the President of the Congress next year will electrify the nation and make provincial autonomy real. Perhaps it will make Federation still-born and will prepare the nation for the last fight for Swaraj. We may even get Swaraj without another fight. I appeal to all fellow-Congressmen in India whole-heartedly to support this proposal.'—*A. P. I.*

গত তিন বৎসর বা তাহার আগেও গান্ধীজীর নাম কেন সভাপতিত্বের জন্য প্রস্তাবিত হয় নাই, জানিতে চাই। তখনও—বিশেষ করিয়া যখন তাঁহারই প্রণীত কংগ্রেসের নূতন কন্সটিটিউশন প্রবর্ত্তিত হয়—তিনি যোগ্যতম ব্যক্তি ছিলেন।

মহাত্মা গান্ধীকে কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের সভাপতি করিবার প্রস্তাবের উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিব না; কারণ উদ্দেশ্য বা অভিসন্ধি সম্বন্ধে কিছু বলিলে তাহা অনুমানমাত্র হইবে, তাহার কোন প্রত্যক্ষ প্রমাণ দিতে পারা যাইবে না। সেই জন্য শ্রীযুক্ত

সত্যমূর্ত্তি যে যে কারণে গান্ধীজীকে সভাপতি করিতে চান, সেইগুলি শুধু পরীক্ষা করা যাইতে পারে।

তাহা করিবার পূর্ব্বে বলা আবশ্যক, যে, তিনি রাষ্ট্রনীতি-ক্ষেত্র হইতে সরিয়া গিয়াছেন, কেবল সঙ্কটসময়ে ২।৪ দিনের নিমিত্ত আসরে নামিয়া নিজের কাজ করিয়া আবার সরিয়া যান। তাঁহাকে কংগ্রেস-সভাপতি করিলে অন্ততঃ একটি বৎসর তাঁহাকে রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে থাকিয়া কংগ্রেসের কাজে ব্যাপৃত থাকিতে হইবে। শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি গান্ধীজীকে প্রশ্ন করিয়া জানিয়া লইয়াছেন কি, যে, তিনি আবার রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে অবতীর্ণ হইয়া অন্ততঃ একটি বৎসর কংগ্রেসের কাজ করিবেন?

দ্বিতীয় বিবেচ্য বিষয়, যিনি যে প্রদেশের মানুষ সেই প্রদেশে কংগ্রেসের অধিবেশন হইলে তাঁহাকে সেই অধিবেশনের সভাপতি না-করিবার যে একটি রীতি বরাবর ছিল, কেবল পণ্ডিত জবাহরলাল নেহরুর লক্ষ্ণৌ অধিবেশনের সভাপতিত্বের বেলায় সেই রীতির ব্যতিক্রম হয়। কিন্তু বার-বার রীতিটা ভঙ্গ করা কি উচিত?

তৃতীয় বিবেচ্য বিষয়, গান্ধীজী কংগ্রেসের সঙ্কটসময়ে কার্য্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হন। মন্ত্রিত্ব গ্রহণ বা অ-গ্রহণ সমস্যার মীমাংসা ত হইয়া গেল। তাহার পরও সঙ্কট অবস্থা কি লাগিয়াই থাকিবে? আমরা ইংরেজ আমলাতন্ত্রের বিরুদ্ধে এই অভিযোগ করি, তাঁহারা ইমার্জেন্সী বা সঙ্কট অবস্থার দোহাই দিয়া বিনাবিচারে বন্দী করিবার এবং আরও অনেক কিছু করিবার আইন পাস ও অর্ডিনান্স জারি করান। কিন্তু সেই সঙ্কট অবস্থা আর কাটে না, বৎসরের পর বৎসর চলিয়া আসিতেছে। কংগ্রেসের কর্ত্তারাও কি আমলাতন্ত্রের পথের পথিক হইবেন? ইমার্জেন্সীবাদী হইবেন?

গান্ধীজী সভাপতি হইলে যাহা যাহা করিতে পারিবেন বলিয়াছেন, সভাপতি না হইলেও ত তাহা করিতে পারেন। সভাপতি হইলেই তাঁহার বুদ্ধি, কার্য্যকারিতা ও প্রভাব বাড়িয়া যাইবে, সভাপতি না হইলে তাঁহার বুদ্ধি, কার্য্যকারিতা ও প্রভাব কম হইবে, কেন এমন মনে করা হয়? গোলাপ ফুলের নাম অন্য কিছু রাখিলেও তাহার সৌরভ কমে না।

"আগামী বৎসর কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বড় কঠিন সময় হইবে, তখন সভাপতিরূপে গান্ধীজীর পরিচালনা তাহাদের পক্ষে অমূল্য হইবে।" আগামী বৎসর অপেক্ষা প্রথম ছয় মাসই ত কঠিনতম, অন্ততঃ কঠিনতর, সময় হইবে। তখন সভাপতি গান্ধীজীর চালকত্ব ব্যতিরেকেও যদি কংগ্রেসী মন্ত্রীরা চলিতে পারেন, তাহা হইলে পরবর্ত্তী বৎসর কেন পারিবেন না? সভাপতি না হইয়াও অবশ্য গান্ধীজী এই কয় মাস মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ দিতে পারেন। কিন্তু এখন যদি অ-সভাপতি গান্ধীজী সেরূপ পরামর্শ দিতে পারেন, তাহা হইলে অ-সভাপতি গান্ধীজী পরে কেন তাহা পারিবেন না?

"তিনি মন্ত্রিত্ব গ্রহণ সম্বন্ধীয় সূত্রটির একমাত্র রচয়িতা অতএব তিনি মন্ত্রীদিগকে পরামর্শ দিবার যোগ্যতম ব্যক্তি।" সত্য, কিন্তু তিনি সভাপতি না হইয়াও ত সূত্রটি রচনা করিয়াছেন ও তাহা অন্য কংগ্রেস-নেতারা মানিয়া লইয়াছেন। সভাপতি না হইলে তিনি কেন পরামর্শ দিতে অসমর্থ হইবেন বুঝা যায় না। মন্ত্রীদের কার্য্যকালের প্রথম ছয় মাস ত তিনি সভাপতি হইতেই পারেন না। তখন মন্ত্রীদিগকে কে পরামর্শ দিবে?

"তিনি কংগ্রেসের কর্ণধার থাকিলে গবর্ণরদিগকে মন্ত্রীদের কাজে হস্তক্ষেপ করিবার আগে অনেক বার ভাবিতে ও দ্বিধা বোধ করিতে হইবে।" সভাপতি হইলে তবে গান্ধীজী কংগ্রেসের কর্ণধার হইবেন, এখন কর্ণধার নহেন, ইহা স্বীকার্য্য না হইলেও স্বীকার করা যাক্। তাহা হইলে, কংগ্রেসের আগামী অধিবেশনের পূর্ব্বের ছয় মাসের মধ্যে, গান্ধীজীর অ-কর্ণধারত্বের আমলে গবর্ণরেরা কি বিনা ভাবনাচিন্তায় বিনাদ্বিধায় মন্ত্রীদের পরামর্শে ও কাজে হস্তক্ষেপ করিবেন?

"গান্ধীজীর কর্ণধারত্ব মন্ত্রীদিগকে উৎসাহিত করিবে ও বলিষ্ঠ করিবে।" প্রথম ছয় মাস তবে তাঁহারা উৎসাহহীন ও দুর্বল থাকিবেন?

"সর্ব্বোপরি তাঁহার চৌম্বক ব্যক্তিত্ব অন্য পাঁচটি প্রদেশের কংগ্রেস সংখ্যালঘুত্বকে সংখ্যাগরিষ্ঠত্বে পরিণত করিতে সাহায্য করিবে। ইহাই এখন দেশের পক্ষে সর্ব্বাপেক্ষা জরুরি ও গুরুত্বপূর্ণ সমস্যা।" গান্ধীজীর চৌম্বক ব্যক্তিত্ব কি তাঁহার সভাপতি হওয়ার উপর নির্ভর করে? তিনি ত দীর্ঘকাল সভাপতি নাই। কিন্তু কংগ্রেসের গত কয়েকটি অধিবেশনে এবং মন্ত্রিত্বগ্রহণ সমস্যার সমাধানে তাঁহার ব্যক্তিত্ব কি সর্ব্বাভিভাবী হয় নাই? তাহা যদি হইয়া থাকে, তাহা হইলে তিনি সভাপতি না হইলেও সকলের চেয়ে প্রভাবশালী থাকিবেন।

"আগামী বৎসর মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস-সভাপতিরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিলে তাহা জাতিকে বৈদ্যুতিক তেজোময় করিবে, প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্বকে সত্য করিবে, হয়ত ফেডারেশন মৃত অবস্থায় ভূমিষ্ঠ হইবে, এবং জাতিকে শেষ স্বরাজসংগ্রামের জন্য প্রস্তুত করিবে, এমন কি আমরা আর একবার যুদ্ধ না করিয়াও স্বরাজ পাইব।" মহাত্মা গান্ধী কংগ্রেস-সভাপতিরূপে সমগ্র ভারতবর্ষে ভ্রমণ করিলে যদি এই সকল মহা ফল ফলে, তাহা হইলে শুধু অ-সভাপতি মহাত্মা গান্ধীরূপে তিনি ভারত ভ্রমণ করিলে সেই সকল ফল কেন ফলিবে না, তাহা বুঝা যাইতেছে না।

মহাত্মা গান্ধী যদি আগামী অধিবেশনে সভাপতি হইতে সম্মত হন, তাহা হইলে তাহাতে কোন কংগ্রেস কমিটি

আপত্তি করিবে মনে হয় না, অধিকাংশ কমিটি ত আপত্তি নিশ্চয়ই করিবে না। কিন্তু শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তির একটি যুক্তিকেও অমূল্য, অকাট্য বা প্রবল মনে করিবার কোন কারণ দেখিতেছি না।

গান্ধীজী রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে নূতন চিন্তাধারা ও নূতন কর্ম্মপন্থা প্রবর্ত্তিত করিয়াছেন। তাঁহার প্রভাবে কংগ্রেস তাহা গ্রহণ করিয়াছে। কংগ্রেসে এখনও তাঁহার প্রভাব অনতিক্রান্ত, কাহারও প্রভাব তাঁহার সমান নয়—যদিও কোন কোন বিষয়ে তাঁহার বিরুদ্ধবাদী কেহ কেহ আছেন। সুতরাং এখন কেহ যদি তাঁহাকে কংগ্রেসের আজীবন আমৃত্যু সভাপতি করিবার প্রস্তাব করেন, তাহাও আশ্চর্য্যের বিষয় হইবে না। যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া প্রতিবৎসরই তাঁহার নাম প্রস্তাবিত হইতে পারে। কিন্তু অন্য কোন যোগ্য ব্যক্তিকে সভাপতি নির্ব্বাচনে বাধা দিবার নিমিত্ত কেহ তাঁহার নাম প্রস্তাব করিলে আমরা তাহার প্রতিবাদ করিব।

—

"ভারতমাতা আমাদের সৎ-মা"

ভারতবর্ষীয় ব্যবস্থাপক সভায় পঞ্জাবের একটি সদস্যের পদ খালি হওয়ায় গত জুন মাসে সেই পদটির জন্য মৌলানা জাফর আলি খাঁ নির্ব্বাচিত হন। নির্ব্বাচনের পর তিনি লাহোরের বাদশাহী মসজিদে একটি বক্তৃতা করেন। তাঁহার বক্তৃতার একটি অংশের রিপোর্ট লাহোরের ১৫ই জুনের ট্রিবিউন পত্রিকায় নিম্নলিখিত কথায় দেওয়া হইয়াছে।

He claimed that the Muslims were more anxious to win freedom than any other people. The only difference was that they worshipped Islam as their real Mother and Bharat Mata came next in their love, for Bharat Mata was after all their step-mother."

অর্থাৎ "তিনি দাবী করেন যে, মুসলমানেরা স্বাধীনতা জিনিয়া লইতে অন্য সব লোকদের চেয়ে অধিক ব্যগ্র। প্রভেদ কেবল এই, যে, মুসলমানেরা ইস্‌লামকে (মুসলমান-ধর্ম্মকে) তাহাদের প্রকৃত মা বলিয়া পূজা করে, এবং ভারতমাতা তাহাদের ভালবাসায় পরবর্ত্তী স্থানীয়; কেন না, যাহাই বলা হউক না কেন, ভারতমাতা তাহাদের সৎ-মা।"

মুসলমানেরা যে অন্য সকলের চেয়ে অধিক স্বাধীনতাকামী, তাহা তাঁহাদের আচরণে প্রমাণিত হইলে তাঁহারা সকলের অনুকরণযোগ্য হইবেন।

মৌলানা সাহেবের অন্য কথাগুলিতে যে মনোভাব প্রকাশিত হইয়াছে, তাহা অন্য অনেক মুসলমানেরও আছে বলিয়া অনুমান হয়। তিনি খুলিয়া সত্য কথা বলায় ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। কিন্তু তাঁহার উক্তিতে একটু খুঁৎ আছে। তাহা দেখাইয়া দেওয়া আবশ্যক মনে করি।

স্বাধীন ও পরাধীন সভ্যদেশসমূহের লোকেরা আলঙ্কারিক ভাষায়, রূপক ভাষায়, নিজ নিজ জন্মভূমিকে "পিতৃভূমি" বা "মাতৃভূমি" বলিয়া থাকেন। জার্ম্যানরা জার্ম্মেনীকে পিতৃভূমি বলেন। আমরা জন্মভূমিকে মাতৃভূমি বলি। এই জন্য কবিত্বের ভাষায় জন্মভূমিকে কোন দেশে পিতা কোন দেশে বা মাতা বলা হয়। দেশকেই কবিত্বের ভাষায় মাতৃসম্বোধন বা পিতৃসম্বোধন করা হয়, ধর্ম্মকে নহে। ভারতবর্ষের ভারতোদ্ভব হিন্দু, জৈন, বৌদ্ধ, শিখ প্রভৃতি কোন ধর্ম্মসম্প্রদায় নিজ নিজ ধর্ম্মকে মাতা বলেন না, সম্মতি থাকিলে ও ইচ্ছা হইলে জন্মভূমিকেই মাতৃসম্বোধন করেন। যদি তাঁহারা বলিতেন, হিন্দুধর্ম্ম, জৈনধর্ম্ম, বৌদ্ধধর্ম্ম বা শিখধর্ম্ম আমাদের মা, তাহা হইলে মৌলানা সাহেবের বলা সাজিত, "ইস্‌লাম আমাদের মা।" কিন্তু যেহেতু ভারতবর্ষের অন্যান্য ধর্ম্মাবলম্বীরা নিজ নিজ সম্মতি ও ইচ্ছা অনুসারে একটি দেশকেই কবিত্বের ভাষায় মা বলেন, সেই জন্য মৌলানা সাহেবকেও বলিতে হইবে কোন্ দেশ তাঁহার মা। আমরা যে ভারতবর্ষকে আমাদের মা বলি, তাহা নিতান্ত কবিকল্পনাও নহে। ভারতবর্ষের অন্নজলে বাতাসে আমাদের দেহের পুষ্টি ও প্রাণরক্ষা হয় এবং হৃদয়মনআত্মার খাদ্য প্রধানতঃ এইখানে থাকিয়া ও এইখান হইতেই আমরা পাই। ভারতবর্ষের বাহিরের বিশ্বের সহিতও আমাদেরও যোগ আছে। কিন্তু ঘনিষ্ঠতম যোগ ভারতবর্ষের সহিত। এই জন্য ভারতবর্ষ আমাদের মা।

—

'Vernacular' মানে কি দাস-ভাষা?

আমরা গত বৎসর কার্ত্তিক মাসের প্রবাসীতে এবং নবেম্বর মাসের মডার্ন রিভিয়ুতে উপরিলিখিত প্রশ্নের আলোচনা করিয়াছিলাম এই জন্য, যে, মান্দ্রাজের শ্রীযুক্ত সত্যমূর্ত্তি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় vernacular-এর অর্থ দাস-ভাষা এই ধুয়া তুলিয়া সরকারী রিপোর্ট কাগজপত্র ইত্যাদিতে উহার ব্যবহার বন্ধ করিবার দাবী করিয়াছিলেন। সম্প্রতি কলিকাতার Advance কাগজে ও একটি বাংলা কাগজে দেখিলাম, আবার সেই যুক্তি ও দাবীর পুনরুত্থান হইয়াছে। ইংরেজী আমাদের মাতৃভাষা নহে। এই জন্য কোন্ ইংরেজী কথার মানে কি তাহা জানিতে হইলে কোন ভারতীয় রাজনীতিব্যাপারীর কথা প্রামাণিক মনে করা চলে না, প্রসিদ্ধ ইংরেজী অভিধান দেখিতে হয়। সকলের চেয়ে প্রামাণিক ইংরেজী অভিধান আমেরিকায় ওয়েবষ্টারের অভিধানের নূতন সংস্করণ, এবং ইংলণ্ডে মারের অক্সফোর্ড অভিধান, যাহা ইংরেজী বৃহত্তম অভিধান। এই দুটি অভিধানে vernacular মানে দাস-ভাষা এরূপ কিছু লেখা নাই। যাহা লেখা আছে, তাহা উদ্ধৃত করিতেছি। ওয়েবষ্টারে আছে :—

Vernacular, adj. [L. vernaculus born in one's house, native, fr. *verna* a slave born in his master's house, a

native, of uncert. origin.] 1. Belonging to, developed in, and spoken or used by, the people of a particular place, region, or country; native; indigenous;—now almost solely of language; as, English is our *vernacular* tongue; hence, of or pertaining to the native or indigenous speech of a place; written in the native, as opposed to the literary language; as, the *vernacular* literature, poetry; *vernacular* expression, words, or forms.

Which in our *vernacular* idiom may be thus interpreted. *Pope.*

2. Characteristic of a locality; local; as, a house of *vernacular* construction. "A *vernacular* disease." *Harvey.*

3. Of persons, that use the native, as contrasted with the literary, language of a place; as, *vernacular* poets; *vernacular* interpreters.

Vernacular, *n.* The vernacular language, esp. as a spoken language; one's mother tongue; often the common mode of expression in a particular locality or, by extension, in a particular trade, etc.

মারের অক্সফোর্ড অভিধানে আছে :—

Vernacular

[f. L. *vernacul-us* domestic, native indigenous (hence jt. *vernacolo* Pg. *vernaculo*), f. *verna* a home-born slave, a native.

Adj. 1. That writes, uses, or speaks the native or indigenous language of a country or district.

2. Of a language or dialect. That is naturally spoken by the people of a particular country or district; native, indigenous.

3. Of literary works, etc. Written or spoken in, translated into, the native language of a particular country or people.

4. Of words, etc. Of or pertaining to, forming part of, the native language.

5. Connected or concerned with the native language.

6. Of arts, or features of these: Native or peculiar to a particular country or locality.

7. Of diseases: Characteristic of, occurring in, a particular country or a district; endemic. *Obs.*

8. Of a slave: That is born on his master's estate; home-born. *rare.*

9. Personal, private.

B. sb. 1. The native speech or language of a particular country or district.

2. A native or indigenous language.

3. transf. The phraseology or idiom of a particular profession, trade, etc.

অতএব পাঠকেরা দেখিবেন, vernacular মানে দাস-ভাষা নহে; ইহার মানে কাহারও মাতৃভাষা। ওয়েবষ্টারে প্রসিদ্ধ ইংরেজ কবি পোপের লেখা হইতে এই অর্থে কথাটি ব্যবহারের দৃষ্টান্ত পর্য্যন্ত দেওয়া হইয়াছে।

ওয়েবষ্টারে শব্দটির ইংরেজী যে-কয়টি অর্থ দেওয়া হইয়াছে 'দাস-ভাষা' তাহার একটিও নহে। বরং অর্থ বুঝাইবার জন্য বলা হইয়াছে, "as, English is our vernacular tongue," "যেমন, ইংরেজী আমাদের বর্ন্যাকুলার ভাষা।" আমেরিকানরা বা ইংরেজরা দাস নহে। শব্দটির অর্থ দাস-ভাষা হইলে আমেরিকান বা ইংরেজ কোন কোষকার এরূপ দৃষ্টান্ত দিতেন না।

শব্দটির সঙ্গে দাসের সম্পর্ক কেবলমাত্র এইটুকু যে, উহার ব্যুৎপত্তিস্থলে বলা হইয়াছে, যে, উহা বের্না (verna) হইতে উৎপন্ন যাহার মানে 'নিজ প্রভুর গৃহে জাত দাস,' 'নেটিভ,' কিন্তু তাহার পরেই বলা হইয়াছে, ইহার উৎপত্তি অনিশ্চিত।

কোন শব্দের ব্যুৎপত্তি বা উৎপত্তি যাহাই হউক, প্রচলিত অর্থ কি তাহাই দেখিতে হইবে। সংক্ষিপ্ত অক্সফোর্ড অভিধানও দেখিলাম, শব্দটির দাস-ভাষা অর্থ পাইলাম না। খ্রীষ্টিয়ান শব্দটি প্রথমতঃ অবজ্ঞাসূচক ছিল, কোয়েকার শব্দটি বিদ্রূপাত্মক ছিল। কিন্তু সেগুলির সঙ্গে এখন অবজ্ঞা ও বিদ্রূপের ভাব জড়িত নাই। বাইবেলের লাটিন অনুবাদকে ইংরেজীতে 'ভল্গেট' (Vulgate) বলে। এই কথাটি, এবং 'নীচ' 'অভদ্র' যাহার মানে সেই 'ভল্গার' (Vulgar) কথাটার উৎপত্তি একই লাটিন কথা হইতে। কিন্তু সে কারণে কেহ ভল্গেট শব্দের অব্যবহার ইচ্ছা করে না।

চীন ও জাপানে আবার যুদ্ধ

চীন ও জাপানে আবার যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছে, এই সংবাদ অতিশয় ভয়াবহ। ইউরোপে নামে কেবলমাত্র স্পেনের গবর্মেণ্ট ও স্পেনের ফাসিষ্ট বিদ্রোহীদের মধ্যে যুদ্ধ হইতেছে, কিন্তু বস্তুতঃ ইউরোপের দুটি শক্তিশালী দেশ, ইটালী ও জার্মেনী, বিদ্রোহীদের সাহায্য করিতেছে। রাশিয়া স্পেনের গবর্মেণ্টকে অল্পস্বল্প সাহায্য করিয়াছে বলিয়া শুনা যায়। ইংলণ্ড কোন প্রকারে অ-হস্তক্ষেপ (Non-intervention) নীতির ব্যপদেশে যুদ্ধক্ষেত্রে কোন পক্ষে যোগ দিতে বিরত আছে। তথাপি, অনেকে মনে করে, জার্মেনী ও ইংলণ্ড প্রস্তুত হইলেই ইউরোপে একটা মহাযুদ্ধ বাধিবে। কে কোন্ পক্ষ অবলম্বন করিবে, তাহা এখন অনুমানের বিষয়। ইউরোপের অবস্থা ত এইরূপ। এশিয়ার বড় দুটি জাতির মধ্যে যুদ্ধ শুধু এই কারণেই দুঃসংবাদ যে যুদ্ধে বহু নরহত্যা ও অন্যবিধ অনর্থপাত ঘটে। অধিকন্তু ইহা এই কারণেও দুঃসংবাদ, যে, ইহা শীঘ্র থামিয়া না গেলে অন্য অনেক দেশও—যথা আমেরিকার যুক্তরাষ্ট্র এবং ইউরোপের রাশিয়া, ব্রিটেন, ফ্রান্স, জার্মেনী ও ইটালী—ইহাতে জড়িত হইতে পারে। তাহা হইলে ইহা পৃথিবীব্যাপী মহাযুদ্ধে পরিণত হইবে।

চীনের প্রতি যদ্দ্বারা ন্যায্য ব্যবহার হয় এরূপ কোন সর্ত্তে যুদ্ধ মিটিয়া গেলে বড় ভাল হয়। কিন্তু সালিসী করিবে এমন কোন্ প্রবল জাতি আছে যাহার এতটা মানবপ্রেম, ন্যায়নিষ্ঠা ও নিঃস্বার্থতা আছে এবং যাহার এরূপ শক্তি আছে, যে, তাহার নিষ্পত্তি উভয় পক্ষ স্বচ্ছন্দচিত্তে মানিয়া লইবে, কিংবা মানিয়া লইতে বাধ্য হইবে? এমন কোন জাতি বা জাতি-সমষ্টি ত দেখিতেছি না। সুতরাং যদি এখন চীনের যথেষ্ট শক্তি থাকে বা ভবিষ্যতে চীন যথেষ্ট শক্তি সঞ্চয় করিতে পারে, তাহা হইলেই তাহার অখণ্ডত্বের ও স্বাধীনতার

পুনরুদ্ধার ও রক্ষা আততায়ী জাপানের বিরুদ্ধে যুদ্ধ দ্বারা হইতে পারিবে, নতুবা নহে।

অন্য কোন দেশের সাহায্য ব্যতিরেকে চীনে ও জাপানে ন্যায়সঙ্গত সর্ত্তে সন্ধি হইলে সকলের চেয়ে ভাল হয়।

—

আমাদের প্রতিবাদ মিথ্যা হইল

অনেক মাস পূর্ব্বে যখন লর্ড জেটল্যাণ্ড বলিয়াছিলেন, ভারতীয় নেতারা যদিও এখন নূতন ভারতশাসন আইনটি অগ্রহণীয় বলিতেছেন তথাপি তাঁহারা উহা গ্রহণ করিবেন ও তদনুসারে দেশের কাজ চালাইবেন, তখন আমরা তাঁহার কথার প্রতিবাদ করিয়াছিলাম। কিন্তু তাঁহার কথাই সত্য হইল। রাজনীতিব্যাপারীদের মানসিক বিবর্ত্তন তিনি আমাদের চেয়ে ভাল বুঝেন।

—

নিষিদ্ধ পুস্তক—সেকালের ও একালের

একটা ধারণা চলিত আছে, এবং তাহার সমর্থক শাস্ত্র-বচনও আছে শুনিয়াছি, যে, শূদ্র ও নারীদের বেদ শ্রবণ ও অধ্যয়ন নিষিদ্ধ। পুঁথিতে ও-রকম নিষেধ থাকিলেও, বাস্তবিকই কোন কালে প্রত্যেক নারী ও প্রত্যেক শূদ্র বেদ শ্রবণে ও অধ্যয়নে বঞ্চিত ছিল কি না জানি না। একালে ত ও-নিষেধের কোন মানেই নাই। কারণ, বেদ ছাপা হইয়া গিয়াছে; যে-কেহ কিনিয়া বা সাধারণ লাইব্রেরীতে গিয়া তাহা বা তাহার অনুবাদ পড়িতে পারে।

বেদের জ্ঞান কেন দ্বিজদের মধ্যে আবদ্ধ রাখিবার চেষ্টা হইয়াছিল, তাহার কারণ আলোচনা করিব না। কেবল দ্বিজদের বিরুদ্ধে একটা যে স্বার্থপরতাপ্রসূত অভিসন্ধি আরোপ করা হইত, এবং হয়ত এখনও হয়, তাহারই উল্লেখ মাত্র করিব—তাহার সপক্ষে বা বিপক্ষে কিছু বলিব না। সে অভিসন্ধিটা এই, যে, বেদ জানিলে মানুষগুলা বড় হয়, অতএব শূদ্র ও নারীদিগকে বড় হইবার সেই উপায় হইতে বঞ্চিত রাখা চাই!

আজকাল আমাদের গবর্মে‌ণ্ট কোন কোন ইংরেজী বহি ভারতবর্ষে আসিতে দেন না, তাহা আনা নিষিদ্ধ। যদি হঠাৎ আসিয়া পড়ে, তাহা হইলে গবর্মেণ্ট তাহা জানিতে পারিলে যেথানে পান বাজেয়াপ্ত করেন। ইহার কারণ কি? ধরিয়া লওয়া যাক্, সেকালের দ্বিজেরা অদ্বিজ ও নারীরা পাছে মানুষ হইয়া যায় সেই জন্যই তাহাদিগকে বেদের জ্ঞানে বঞ্চিত রাখিতেন। একালে কিন্তু যে-সব ইংরেজী বহি গবর্মেণ্ট "নিষিদ্ধ" পর্য্যায়ে ফেলেন, সেগুলি ত বেদ নয়—যদিও বেদ ছাড়া অন্য বহি পড়িয়াও লোকে মানুষ হয়। এবং আমরা পাছে মানুষ হইয়া যাই সে ভয়ে গবর্মেণ্ট সেগুলি নিষিদ্ধ কেন করিতে যাইবেন? সরকার বাহাদুরের যদি এরূপ অভিপ্রায় থাকিত যে আমরা যেন মানুষ না-হই, তাহা হইলে বিশ্ববিদ্যালয়, কলেজ, স্কুল, পাঠশালা, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন—এসব ত কিছুই হইতে দিতেন না।

তাহা হইলে এই সকল বহি ভারতবর্ষে কেন "নিষিদ্ধ" হয়? বহিগুলা পাঠকদের পক্ষে অনিষ্টকর? যদি তাহাই হয়, তাহা হইলে সেগুলা ত ইংরেজ পাঠকদের পক্ষেও অনিষ্টকর। কিন্তু ইংলণ্ডে ত সেগুলা নিষিদ্ধ নয়। যে-অনিষ্ট হইতে ইংরেজ গবর্মেণ্ট আমাদিগকে রক্ষা করিতে চান, সে-অনিষ্ট হইতে নিজেদের জা'তভাই ইংরেজদিগকে রক্ষা করিতে চান না, তাহা ত হইতে পারে না।

তাহা হইলে বোধ হয় বহিগুলা "নিষিদ্ধ" করা হয় এই আশঙ্কায় যে তাহা পড়িয়া আমরা গবর্মেণ্টটা উল্টাইয়া দিতে বা তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিতে চেষ্টা করিব। হাঁ, এটা একটা ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের ভাবিবার কথা বটে। কিন্তু এখানেও একটা খট্‌কা বাধিতেছে। গবর্মেণ্ট উল্টাইয়া দিবার বা অন্ততঃ তাহার আমূল পরিবর্ত্তন করিবার শক্তি আমাদের চেয়ে ব্রিটেনের লোকদের বেশী আছে; এবং তাহা করিবার পার্লেমেণ্টারী আইনসঙ্গত ক্ষমতা আমাদের কিছুই নাই, ব্রিটেনের লোকদেরই আছে। সুতরাং কোন বহি পড়িয়া পাঠকদের যদি ভারতবর্ষের গবর্মেণ্ট বদলাইবার ইচ্ছা জন্মে, এবং এরূপ পরিবর্ত্তন যদি গবর্মেণ্টের মতে অবাঞ্ছনীয় হয়, তাহা হইলে বহিখানা ভারতবর্ষের চেয়ে ইংলণ্ডেই "নিষিদ্ধ" বেশী হওয়া উচিত। এই যুক্তির বিরুদ্ধে এই কথা বলা হইতে পারে, ইংরেজ পাঠক কেন ভারতবর্ষে ব্রিটিশ গবর্মেণ্টের উচ্ছেদ বা পরিবর্ত্তন চাহিবে? তাহার উত্তরে প্রশ্ন করা যাইতে পারে, সব ইংরেজই কি সাম্রাজ্যবাদী?

যাহা হউক, এ নিষ্ফল আলোচনা এখানেই শেষ করি। যে-কারণে এত কথা লিখিলাম, তাহা এই, যে, রেজিন্যাল্ড রেনল্ড্‌স্ নামক এক জন ইংরেজের লেখা "The White Sahibs of India" ("ভারতবর্ষের শ্বেত সাহেবান্") নামক একখানা বহির এদেশে আগমন ও আনয়ন নিষিদ্ধ হইয়াছে। এই গ্রন্থকারের মারফৎ গান্ধীজী কয়েক বৎসর পূর্ব্বে তাঁহার প্রসিদ্ধ চিঠি তৎকালীন বড়লাটকে পাঠাইয়াছিলেন। সম্ভবতঃ বহিখানা এদেশের সরকারী ও বেসরকারী ইংরেজদের পক্ষে অপ্রীতিকর। সেই জন্য তাহা নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু মেয়ো বিবির "মাদার ইণ্ডিয়া"ও ত আমাদের পক্ষে অপ্রীতিকর? তাহা কেন নিষিদ্ধ হয় নাই? উত্তরে কোন "নিরপেক্ষ" জাতির লোক বলিতে পারেন, তোমরা ও ইংরেজরা কি সমপর্য্যায়ের জীব? তোমাদের হৃদয়-মন (যদি থাকে) কি ইংরেজদের হৃদয়-মনের মত?

—

আরও দু-এক রকম সাহিত্যিক নিষেধ

সরকারী সাহিত্যিক নিষেধ আরও কয়েক রকমের আছে। দৃষ্টান্ত দি।

রবীন্দ্রনাথের রাশিয়ার চিঠি আমরা ছাপিয়াছিলাম। তাহা বহি হইয়া প্রকাশিত হইয়া বিদ্যমান আছে। তাহার উপর যে কোন হস্তক্ষেপ হয় নাই, তাহা ঠিকই হইয়াছে। কিন্তু যাই বহিখানির একটি অধ্যায়ের ইংরেজী অনুবাদ মডার্ণ রিভিয়ুতে বাহির হইল, অমনি গবন্মেণ্ট বলিলেন, আর উহার অনুবাদ ছাপিতে পারিবে না। কিন্তু এখন ত আমেরিকায় উহার সমগ্র অনুবাদ শিকাগোর য়ুনিটি কাগজে বাহির হইয়া গিয়াছে, অনুবাদক বসন্তকুমার রায় উহা পুস্তকাকারেও বাহির করিবেন এবং তাহা ইংলণ্ডেও যাইবে। তাহাতে ভারত বা বাংলা গবন্মেণ্ট বাধা দিতে পারিবেন?

সুপ্রসিদ্ধ ইংরেজী সাহিত্যিক জর্জ বার্নার্ড শ-এর সোশ্যালিজ্‌ম্ সম্বন্ধে একটি সুপরিচিত বহি আছে। তাহার গতিবিধি সর্ব্বত্র অবারিত—এমন কি ভারতবর্ষেও। কিন্তু যাই বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় "সাম্যবাদের গোড়ার কথা" নাম দিয়া ঐ বহির মর্ম্মানুবাদ বাহির করিলেন, অমনি তাহা বাজেয়াপ্ত হইল।

অতএব, কোন কোন বাংলা বহির ইংরেজী করা নিষিদ্ধ, আবার কোন কোন ইংরেজী বহির বাংলা করা নিষিদ্ধ।

আর একটা নিষেধের কথা বলিয়া ফর্দ শেষ করি।

রবীন্দ্রনাথ আছেন—আরও অন্ততঃ বিশ পঁচিশ বৎসর ইহলোকে থাকিয়া জগদ্বাসীকে নূতন জিনিষ দিতে থাকুন—এবং তাঁহার গ্রন্থাবলীও আছে। তিনি ধর্ম্ম, সমাজনীতি, শিক্ষানীতি, রাষ্ট্রনীতি, সাহিত্য, ললিতকলা ইত্যাদি কোন ক্ষেত্রেই গতানুগতিকের সমর্থন করেন নাই, গোলে হরিবোল দেন নাই, তথাস্তু বলেন নাই; বিরুদ্ধবাদ বিদ্রোহিতা অনেক করিয়াছেন। তাহা হইতে পাঠকেরা ভবিষ্যতে অনির্দ্দিষ্ট দীর্ঘকাল তাঁহার ভাবের ভাবুক হইবে, অনুপ্রাণিত হইবে—কেহ বাধা দিতে পারিবে না। কিন্তু যাই পূর্ব্বোক্ত বিজয় চট্টোপাধ্যায় রবীন্দ্রনাথের বিরুদ্ধ-বাদিতার ব্যাখ্যা করিয়া একখানি বহি ছাপাইলেন, অমনি তাহা "নিষিদ্ধ" হইয়া গেল।

এখন বাঙালীরাই মন্ত্রী। প্রাদেশিক আত্মকর্ত্তৃত্ব যদি বাস্তবিক হয়, তাহা হইলে এখন অন্ততঃ বাংলা বহি সম্বন্ধে সুবিবেচনা হওয়া উচিত, অন্ততঃ এ রকম বাংলা বহি "নিষিদ্ধ" থাকা বা হওয়া উচিত নয়, যাহার লিখিত বিষয়ের সত্যতা রবীন্দ্রনাথ স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া জানাইয়াছেন।

দৌলতপুর কৃষি-প্রতিষ্ঠান

খুলনা জেলার দৌলতপুর হিন্দু য়্যাকাডেমী সুবিদিত শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। দৌলতপুরে আধুনিক বিজ্ঞানসম্মত প্রণালীতে কৃষি ও কৃষির সহিত সম্পর্কযুক্ত নানা ব্যবসায় শিখাইবার নিমিত্ত একটি প্রতিষ্ঠান খোলা হইয়াছে। যাঁহারা আই-এস্‌সি পরীক্ষার রসায়নী বিদ্যা, গণিত, পদার্থ-বিদ্যা ও উদ্ভিদ-বিদ্যার শিক্ষণীয় বিষয় শিখিয়াছেন, তাঁহারা ভর্ত্তি হইতে পারিবেন। এ বৎসর ২১শে জুলাই পর্য্যন্ত ভর্ত্তি হইবার দরখাস্ত লওয়া হইবে এবং ২রা আগষ্ট শিক্ষার কার্য্য আরম্ভ হইবে। Principal, Daulatpur Agricultural Institute, Daulatpur, এই ঠিকানায় দরখাস্ত করিতে হইবে। মাসিক বেতন ৪ টাকা, ভর্ত্তি ফী ৪ টাকা, পাচক ও ভৃত্যের বেতন ২৲, আহার্য্যের বন্দোবস্ত ছাত্রেরা নিজে করিবেন। ছাত্রনিবাসে থাকিতে হইবে, তাহার কোন ভাড়া লাগিবে না।

শিক্ষিত যুবকদের কৃষির দিকে খুব ঝোঁক হওয়া আবশ্যক। "ফিরে চল্ মাটীর টানে।" যে লোকসমষ্টি মাটীর সঙ্গে সম্পর্ক রাখে না, দুর্ব্বলতা তাহার উপযুক্ত শাস্তি। কৃষি-প্রতিষ্ঠানে যাঁহারা শিক্ষা পাইবেন, তাঁহারা মজুর নিযুক্ত করিয়া লাভ করিবেন ও সেই লাভের টাকায় কলিকাতায় বাবু সাজিয়া থাকিবেন, প্রতিষ্ঠানটির উদ্দেশ্য এরূপ নয়। যাঁহারা নিজে খাটিবেন অপরকেও খাটাইবেন, এইরূপ লোক চাই।

রাঁচির বালিকা শিক্ষাভবন

গত বৎসর রাঁচিতে প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন উপলক্ষ্যে তথাকার বালিকা-শিক্ষাভবন দেখিয়া সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম। এখানে বাঙালী বালিকারা শিক্ষা পাইয়া কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রবেশিকা পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হন। এ বৎসর ১৭টি বালিকা পরীক্ষা দিয়াছিলেন। তাহার মধ্যে ৪ জন প্রথম বিভাগে, ৪ জন দ্বিতীয় বিভাগে ও ৩ জন তৃতীয় বিভাগে উত্তীর্ণ হইয়াছেন। আগে রাঁচি বাংলা প্রদেশের অন্তর্গত ছিল। আরও অনেক স্বাস্থ্যকর স্থান বাংলা প্রদেশের মধ্যে ছিল। এখন সেগুলি অন্য প্রদেশে গিয়াছে। এখন বাঙালীরা কন্যাদিগকে কোন স্বাস্থ্যকর স্থানে রাখিয়া শিক্ষা দিতে চাহিলে সহজে তাহার সুবিধা পান না। রাঁচি স্বাস্থ্যকর স্থান, এবং এখানকার বালিকা-শিক্ষাভবনে বাংলা ভাষা ব্যবহৃত হয়। ইহার সঙ্গে একটি ছাত্রীনিবাস থাকিলে অন্য জায়গা হইতে কন্যারা আসিয়া স্বাস্থ্যের সহিত শিক্ষাও লাভ করিতে পারেন। ছাত্রীনিবাস স্থাপন করিবার ইহার কর্ত্তৃপক্ষের সঙ্কল্প আছে ও তাহার চেষ্টাও হইতেছে। সঙ্কল্প অনুসারে কাজ হইলে ইহা আশ্রম-বিদ্যালয়ে পরিণত হইবে। ইহার জন্য রাঁচির বাহিরের বাঙালীদের সাহায্য আবশ্যক। সম্পাদক শ্রীযুক্ত লালমোহন ধর চৌধুরীকে চিঠি লিখিলে তিনি সমুদয় বৃত্তান্ত জানাইবেন।

বঙ্গীয় মৎস্যজীবীদের বিদ্যালয়

গত ২৬শে আষাঢ় চাঁদপুরের অন্তর্গত মেহেরনে বঙ্গীয় মৎস্যজীবী সমবায় সমিতির অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। প্রাতে প্রধান মন্ত্রী মৌলবী আবুল কাশেম ফজলল হক্ মৎস্যজীবীদের বিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপন করেন। তাহার পর কৃষি ও শিল্প বিভাগের মন্ত্রী নবাব খাজা হবিবুল্লা মৎস্যশিল্পপ্রদর্শনীর উদ্বোধন করেন। শেষে ১১টার সময় রাজস্বসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার মৎস্যজীবীদের সভার অধিবেশনে সভাপতির কাজ করেন।

মৎস্যজীবীদের বিদ্যালয়টির জন্য ভূমি ও অন্যান্য যাহা কিছু আবশ্যক হইবে, তাহা মেহরনের দাস দালাল জমিদারেরা দান করিয়াছেন। তজ্জন্য তাঁহারা ধন্যবাদভাজন। এই বিদ্যালয়ের উদ্দেশ্য এইরূপ বর্ণিত হইয়াছে :—

> এই বিদ্যালয়ে ৩০০ শিক্ষার্থী যাহাতে শিক্ষা লাভ করিতে পারে তাহার ব্যবস্থা করা হইবে। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ম্যাট্রিকুলেশন্ পর্য্যন্ত সাধারণ-শিক্ষাদানের ব্যবস্থা থাকিবে।
>
> এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিভিন্ন স্তরে মৎস্যসংরক্ষণ, পরিবর্দ্ধন ও বিভিন্ন প্রকারের মৎস্যশিল্প এবং আধুনিকতম অর্থনীতি-শাস্ত্রের ভিত্তিতে মৎস্যব্যবসাসংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য করা হইবে। এবম্প্রকারের শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষা-দান করাই এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।

ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি প্রার্থনীয়।

—

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ের অবসর গ্রহণ

আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় অর্দ্ধ শতাব্দী দেশের যুবকদিগকে শিক্ষা দিবার কার্য্যে ব্রতী থাকিয়া সম্প্রতি অবসর গ্রহণ করিয়াছেন। প্রথমে তিনি প্রেসিডেন্সী কলেজে কাজ করিতেন, পেন্সান লইবার পর তিনি কলিকাতা বিশ্ব-বিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজে রসায়নীবিদ্যার অধ্যাপকের পদে নিযুক্ত হন। তিনি কি প্রকারে অধ্যাপনা করিয়াছেন, কেমন করিয়া নিজের গবেষণা ও নিজ ছাত্রদের গবেষণা দ্বারা ঐ বিদ্যাকে পুষ্ট করিয়াছেন, কেমন করিয়া তাঁহার শিক্ষা, দৃষ্টান্ত ও অনুপ্রেরণায় দেশে কতকগুলি রাসায়নিক ও অন্য বৈজ্ঞানিকের উদ্ভব হইয়াছে, অধ্যাপনার সঙ্গে সঙ্গে তিনি কেমন করিয়া দেশে পণ্যশিল্পের প্রবর্ত্তন, কারখানা স্থাপন, নানা স্থানে চরখা ও হাতের তাঁতের প্রবর্ত্তন করিয়াছেন, বন্যাদুর্ভিক্ষাদিতে বিপন্ন লোকদের সাহায্যার্থ কিরূপে তিনি আত্মনিয়োগ করিয়াছেন, বাঙালীদিগকে কেমন করিয়া তিনি শিল্পবাণিজ্যকৃষিকার্য্যে ব্যাপৃত হইতে অবিরত বলিয়া আসিতেছেন, কেমন করিয়া তাঁহার তাপসোচিত জীবন অনুকরণীয় হইয়া রহিয়াছে—এই সকল এবং তাঁহার সম্বন্ধে আরও অনেক কথা এখন সুবিদিত।

তিনি গত পনর বৎসর তাঁহার বিশ্ববিদ্যালয়ের অধ্যাপকতার মাসিক বেতন ১০০০ টাকা গ্রহণ করেন নাই। তাহার সমস্তই নানা প্রকারে বিজ্ঞানের অনুশীলনার্থ নিয়োজিত হইয়াছে। তাঁহার সরকারী চাকরির বেতন ও পেন্সানও বহু পরিমাণে বিদ্যার্থীদিগকে ও অন্য অভাবগ্রস্ত লোকদিগকে সাহায্য দিবার নিমিত্ত ব্যয়িত হইয়া আসিতেছে। বেঙ্গল কেমিক্যাল ওয়ার্কস্ হইতেও তিনি অর্থ গ্রহণ করেন নাই।

তিনি অতঃপর গ্রামসমূহের পুনরুজ্জীবন ও পুনর্গঠনে আত্মনিয়োগ করিবেন। এই কাজ তিনি আগে হইতেই করিয়া আসিতেছেন।

তাঁহার জায়গায় বিশ্ববিদ্যালয় কাহাকে অধ্যাপক নিযুক্ত করিয়াছেন বা করিবেন, জানি না। যোগ্য লোককেই করা হইয়া থাকিবে বা হইবে।

সর্ তারকনাথ পালিতের যে প্রভূত দান হইতে রসায়নাদির অধ্যাপকদিগের বেতন দেওয়া হয়, তাহার ট্রষ্ট-ডীডে স্পষ্ট করিয়া লেখা আছে, যে, তাঁহার স্বদেশ-বাসীদের মধ্যে বিশুদ্ধ ও ফলিত বিজ্ঞানের জ্ঞানবিস্তার দাতার উদ্দেশ্য ("the object of the Founder is the promotion and diffusion of scientific and technical education and the cultivation and advancement of Science, pure and applied, among his countrymen by and through indigenous agency)। ছাত্রদিগকে শিক্ষা দেওয়ার দ্বারা এই কাজ হয় বটে। অধিকন্তু সর্ব্বসাধারণের বোধগম্যভাবে অন্যদের জ্ঞানলাভার্থ যদি বিশ্ববিদ্যালয় অধ্যাপকদিগের দ্বারা বক্তৃতা দেওয়াইবার ব্যবস্থা করেন, তাহা হইলে আরও ভাল হয়।

—

ভারতীয় ললিতকলার অধ্যাপকের পদ

ডাক্তার অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম "রাণী বাগেশ্বরী ভারতীয়-ললিতকলা-অধ্যাপক" নিযুক্ত হন। তিনি ১৯২১ সালে নিয়ম অনুসারে পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তাহার পর আবার ১৯২৬ সালে নিযুক্ত হইয়া ১৯২৯ পর্য্যন্ত তিন বৎসর কাজ করেন। অবনীন্দ্র বাবুর পর ১৯৩২ পর্য্যন্ত আর কোন ললিতকলা-অধ্যাপকের নাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যালেণ্ডারে নাই। ১৯৩২ সালে মিঃ শহীদ সুহ্রাবর্দী পাঁচ বৎসরের জন্য নিযুক্ত হন। তাঁহার নিয়োগের পূর্ব্বে আমরা দেখাইয়াছিলাম, যে, তাঁহার অনুরূপ যোগ্যতা থাকিলেও, "ভারতীয় ললিত-কলা"র অধ্যাপনা ও তদ্বিষয়ক গবেষণা করিবার মত জ্ঞান ও যোগ্যতা তাঁহার নাই, এবং যোগ্য ও যোগ্যতর অন্য লোক আছেন। তথাপি, সুপারিশের জোরে তিনিই পদটি পান।

সম্প্রতি তাঁহাকে তাঁহার ষাট বৎসর বয়স হওয়া পর্য্যন্ত পুনর্নিযুক্ত করা হইয়াছে। ক্যালেণ্ডারে আছে, যে, প্রথম নিয়োগের পর নিয়োগটি স্থায়ী করা যাইতে পারে ("may be made permanent"), কিন্তু এরূপ লেখা নাই, যে, স্থায়ী করিতেই হইবে। "May"র জায়গায় "shall" থাকিলে নিয়মটির মানে তাহাই হইত।

যাহা হউক, গত পাঁচ বৎসরে সুহ্রাবর্দী সাহেব "ভারতীয়" ললিতকলা বিষয়ে কি জ্ঞান ও যোগ্যতা অর্জ্জন করিয়াছেন, কি গবেষণা করিয়াছেন, কি গবেষণামূলক গ্রন্থ রচনা করিয়াছেন, যাহার প্রভাবে তাঁহার পদ স্থায়ী হইল, বিশ্ববিদ্যালয় সর্ব্বসাধারণকে তাহা জানান নাই। ক্যালেণ্ডারে এই বাগেশ্বরী অধ্যাপকদের যে সব কর্ত্তব্য লেখা আছে, তাহার মধ্যে দুইটি উদ্ধৃত করিতেছি।

(*a*) To devote himself to original research in the subject in which he has been appointed with a view to extend the bounds of knowledge.

(*b*) To take steps to disseminate the knowledge of his special subject with a view to foster its study and application.

পূর্ব্বেই লিখিয়াছি, বর্ত্তমান অধ্যাপক ললিতকলা বিষয়ে মানবের জ্ঞানের পরিধি বিস্তৃততর করিবার নিমিত্ত কি গবেষণা করিয়াছেন, সর্ব্বসাধারণ তাহা অবগত নহে। তিনি উহার জ্ঞান সর্ব্বসাধারণকে বিতরণের জন্য কি করিয়াছেন, তাহাও অজ্ঞাত। অবনীন্দ্রবাবু বাংলায় কতকগুলি বক্তৃতা করিতেন যাহা শুনিবার অধিকার সকলেরই ছিল। বর্ত্তমান অধ্যাপক ছাত্রদিগকে তাহাদের শ্রেণীতে হয়ত পড়ান—নিশ্চয়ই পড়ান কি না জানি না। কিন্তু সর্ব্বসাধারণের শ্রোতব্য তাঁহার বক্তৃতাবলীর কথা মনে পড়িতেছে না।

যোগ্য লোক থাকিতে অযোগ্য বা কম যোগ্য লোকের নিয়োগ নিন্দনীয়।

—

"সে"

বিশ্বভারতী গ্রন্থালয় সম্প্রতি রবীন্দ্রনাথের একখানি নূতন সচিত্র গ্রন্থ প্রকাশ করিয়াছেন। নাম, "সে"। একটু বিস্তারিত পরিচয় পরে দিবার ইচ্ছা রহিল। এখন কেবল বলি, ভারি মজার বই! লেখা ও ছবি দুই-ই কবির হাতের। ইহার মজা ছেলে বুড়ো উভয়েই পাইবে; নিগূঢ় রস ও রহস্তের সন্ধান বোধ করি বুড়োরাই বেশী পাইবে।

বাংলা দেশে এক সময়ে আমাদের কবি ও ঔপন্যাসিকদিগকে কোন-না-কোন বিলাতী গ্রন্থকারের সদৃশ বলিলে সম্মান করা হয়, এইরূপ একটা ধারণা ছিল—এখনও আছে কি না জানি না। অমুক বঙ্গের মিল্টন, অমুক স্কট, অমুক বায়রণ, অমুক শেলী···। সেইরূপ ধারণার বশবর্ত্তী হইয়া কেহ যদি বলেন, রবীন্দ্রনাথ ত বহুরূপী, এবার কি বেশ ধরিয়াছেন? তাঁহার এই বহিখানি ইংরেজী কোন্ বইয়ের মত? উত্তরের আগেই বলিয়া রাখি, কেহ কাহারও নকল বলিলে নকল বলিয়া অভিহিত ব্যক্তিকে সম্মান করা হয় না, এবং কোন বাঙালী কবি বা অন্য সাহিত্যিক নকল করিয়া বড় হইয়াছেন ইহা সত্য নহে। অতঃপর প্রশ্নের উত্তরে বলি, রবীন্দ্রনাথের নূতন বহিটি কোন ইংরেজী বহির মত নয়। তবে, ইহা ঠিক্ যে ইহা পড়িতে বসিয়া হঠাৎ ইংরেজী "য়্যালিস্ ইন্ ওয়াণ্ডারল্যাণ্ড্" মনে পড়িয়া গেল। কেন পড়িল, কেমন করিয়া বলিব? উভয় পুস্তকেই অপ্রত্যাশিত মজা আছে। এবং একটিতে "য়্যালিস," অন্যটিতে "পুপে দিদি"। আর কোন মিল দেখিতেছি না।

—

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ বিনাবিচারে-বন্দীদের ও তাঁহাদের কাহারও কাহারও অভিভাবকদেরও দুঃখ-দুর্দশার বৃত্তান্ত সংগ্রহ করিয়া সে বিষয়ে দেশের লোকদের প্রকৃত জ্ঞানলাভের উপায় করিয়া দিতেছেন। এদেশে জনমত অনুসারে রাষ্ট্রীয় কার্য্য নির্ব্বাহিত হইলে এই জ্ঞানের ফলে তাঁহাদের দুঃখদুর্দশার প্রতিকার হইত। তথাপি, এদেশ জনমত অনুসারে শাসিত না-হইলেও, আশা করা যাক্, জ্ঞানবিস্তারের কিছু সুফল ফলিবে।

—

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের প্রতি কর্ত্তব্য

মুক্তিপ্রাপ্ত রাজবন্দীদের প্রতি গবর্মেণ্টের কর্ত্তব্য আছে, দেশের লোকদেরও কর্ত্তব্য আছে। তাঁহাদের অনেকের সাময়িক সাহায্যের প্রয়োজন আছে, কিন্তু যাহাতে রোজগার হয় তাঁহাদের এরূপ কাজ জুটাইয়া দেওয়াই প্রকৃত প্রতিকার। কেমন করিয়া যথেষ্ট সেরূপ কাজের সৃষ্টি হইতে পারে, তাহা চট্ করিয়া সংক্ষেপে বলা কঠিন।

—

গোরাদিগকে সেলাম করিতে ছাত্রদিগকে বাধ্য করা

কয়েক বৎসর হইতে গবর্মেণ্টের বিদিত কারণে বাংলা দেশের নানা জায়গায় গোরা সৈন্য রাখা হয় এবং সেই সৈনিকরা কখন কখন এক জায়গা হইতে অন্য জায়গায় দলবদ্ধভাবে মার্চ করে। এইরূপ উপলক্ষ্যে কোথাও কোথাও ইস্কুলের বালকদিগকে—শুনিয়াছি এক জায়গায় ইস্কুলের বালিকাদিগকেও!—দল বাঁধিয়া ঐ গোরাদিগকে সেলাম করান হইয়াছে। বাংলা দেশের ছেলেমেয়েদের মাথাগুলা কি এমনই অবজ্ঞেয় যে সেগুলাকে যার তার কাছে—বরকন্দাজ পাহারাওয়ালার কাছেও যদি তাদের চামড়াটা কটা হয়—হেঁট করাইতে হইবে?

শুনা যায় গত ফেব্রুয়ারী মাসে মুড়াগাছা উচ্চবিদ্যালয়ের হেডমাষ্টার ছাত্রদিগকে এইরূপ সেলাম করাইয়াছিলেন। তাহাতে ঐ ইস্কুলের কমিটির এক জন সভ্য, শ্রীযুক্ত অমিয়কুমার পাঠক, এম-এ, বি-এল, হেডমাষ্টার মহাশয়কে ভদ্র ভাষায় চিঠি লিখিয়া জানিতে চান, যে, ইহা সত্য কি না, এবং সত্য হইলে যে আদেশ অনুসারে ইহা করান হইয়াছে তাহার একটি নকল যেন তাঁহাকে দেওয়া হয়। হেডমাষ্টার উক্ত সভ্যের চিঠিটি সেক্রেটরীকে ও সেক্রেটরী তাহা তথাকার মহকুমা হাকিম প্রেসিডেণ্টকে পাঠান। কিন্তু কমিটির সভ্যটি একাধিক শিষ্ট তাগিদ দেওয়া সত্ত্বেও আদেশের নকল পান নাই, রূঢ় জবাব পাইয়াছেন। হেডমাষ্টারের ২১শে মে তারিখের চিঠিটি এই :—

With reference to your letter dated, Calcutta, the 2th April, 1937, I have the honour to inform you that the requisitions made in that letter being considered important, I referred the matter to the Secretary who, in his turn, referred it to the President. The President, in reply, has instructed the Secretary and the Headmaster to take no notice of such questions and to request you to refrain from disturbing the Headmaster with such unnecessary correspondence.

প্রেসিডেণ্টের পক্ষের ৪ঠা মে তারিখের যে চিঠির জোরে হেডমাষ্টার এই জবাব দিয়াছিলেন, তাহা এই :—

With reference to your letter No. 17, dated 23rd April, 1937, I have the honour to inform you that no notice should be taken of the requisition. The requisitionist may be asked that I do not consider it to be the duty of the Headmaster or the Secretary to attend to such frivolous queries and the requisitionist may be requested to refrain from disturbing the Headmaster with such unnecessary correspondence.

হাকিম বটে। কি কড়া মেজাজ !

—

জিন্না-রাজেন্দ্রপ্রসাদ সংবাদ

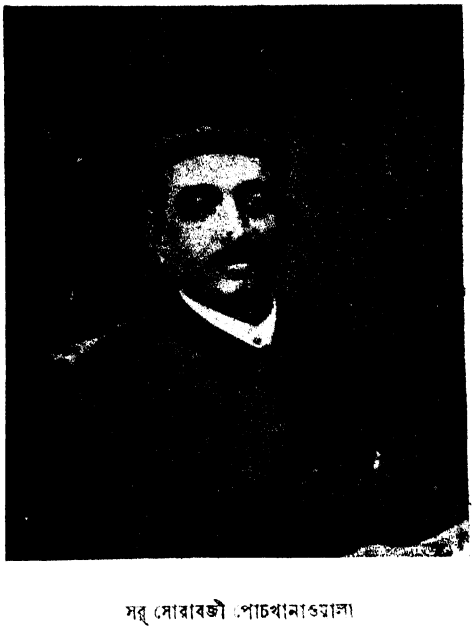
সম্প্রতি মিঃ জিন্না ও বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের মধ্যে একটি হিন্দু-মুসলমান চুক্তি সম্বন্ধে কিছু চিঠি লেখালেখি হইয়াছে। তাহাতে বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদ এই মর্ম্মের কথা বলিয়াছেন, যে, কংগ্রেসপক্ষীয় সকলেরই সম্মতি পাওয়া গিয়াছিল, কেবল মিঃ জিন্না হিন্দু মহাসভার পক্ষ হইতে পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সম্মতি চাওয়ায় এবং তাহা না পাওয়ায় চুক্তিটা হয় নাই। উক্ত চুক্তি সম্বন্ধে যখন দিল্লীতে আলোচনা হইতেছিল, আমরা তখন দিল্লীতে ছিলাম। আমরা কংগ্রেসের সভ্য নহি, হিন্দু মহাসভারও সভ্য নহি। তথাপি আমরা এ-বিষয়ের কিছু খবর পাইয়াছিলাম। আমাদের মনে পড়িতেছে, বঙ্গের কয়েক জন কংগ্রেসওয়ালা চুক্তিতে সম্মতি দেন নাই।

যাহা হউক, তাহা আমাদের প্রধান বক্তব্য নহে। আমাদের বক্তব্য এই, যে, কংগ্রেস হিন্দু, মুসলমান এবং অন্য সকল সম্প্রদায়েরই প্রতিনিধি, ইহা সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান নহে, কেবল হিন্দুর প্রতিষ্ঠান নহে। সুতরাং যদি মুসলমানদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান মুস্লিম লীগের পক্ষ হইতে কোন চুক্তিতে হিন্দুদের সম্মতি চাওয়া হয়, তাহা হইলে সে সম্মতি হিন্দুদের সাম্প্রদায়িক প্রতিষ্ঠান হিন্দুমহাসভা দিতে পারেন, কংগ্রেস পারেন না। কারণ, হিন্দুমহাসভা কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধি, কংগ্রেস কেবল হিন্দুদের প্রতিনিধি নহে। এই কারণে, মিঃ জিন্না যে হিন্দুমহাসভার অন্যতম নেতা পণ্ডিত মদনমোহন মালবীয়ের সম্মতি চাহিয়াছিলেন, তাহা ঠিকই করিয়াছিলেন। তাহাতে তাঁহার বাস্তবিক রাজনৈতিক পরিস্থিতির জ্ঞানের পরিচয় পাওয়া গিয়াছিল।

—

সর্ সোরাবজী পোচখানাওয়ালা

সর্ সোরাবজী নসেরওয়াঞ্জী পোচখানাওয়ালা ভারতবর্ষের প্রধান দেশী ব্যাঙ্ক সেণ্ট্রাল ব্যাঙ্ক অব্ ইণ্ডিয়ার প্রতিষ্ঠাতা ও ম্যানেজিং ডিরেক্টর ছিলেন। তাঁহার অকাল-মৃত্যুতে ভারতবর্ষের দেশী ব্যাঙ্কিং ব্যবসার এক জন



সর্ সোরাবজী পোচখানাওয়ালা

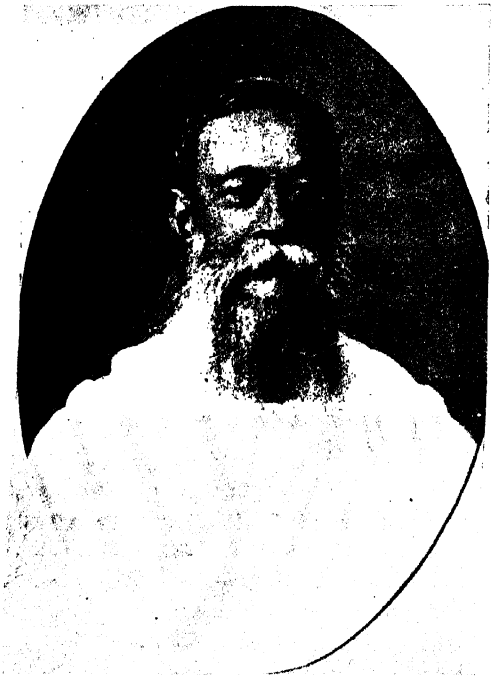
ধুরন্ধরের তিরোভাব হইল। তাঁহার উদ্যম, ব্যবসাবুদ্ধি ও শ্রমশক্তি অসাধারণ ছিল। তাঁহার প্রতিষ্ঠিত ব্যাঙ্কের ভারতবর্ষের প্রধান প্রধান জায়গায় শাখা ত আছেই, গত

বৎসর লণ্ডনেও একটি শাখা প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে। ভারতবর্ষের কোন দেশী ব্যাঙ্কের বিদেশে শাখা স্থাপন এই প্রথম। তাঁহার উদ্যোগিতার ইহা একটি প্রকৃষ্ট প্রমাণ।

—

কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক

শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসু যে নারীশিক্ষাসমিতির প্রতিষ্ঠাত্রী ও সম্পাদিকা, স্বর্গত কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক তাহার প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। তিনি কর্ম্মজীবনের প্রথম অংশে শিক্ষকতা করিতেন ও সুশিক্ষক ছিলেন। পরে তিনি লক্ষ্ণৌ শহরের তৎকালপ্রসিদ্ধ "য়্যাড্‌ভোকেট" নামক কাগজের সম্পাদক নিযুক্ত হন। পনর বৎসর উহার



কৃষ্ণপ্রসাদ বসাক

সম্পাদকতা করিয়া তিনি লক্ষ্ণৌ ত্যাগ করেন। যাঁহাদের উদ্যোগিতায় গিরিডিতে একটি উচ্চ-বালিকাবিদ্যালয় স্থাপিত হয়, তিনি তাঁহাদের মধ্যে এক জন প্রধান কর্ম্মী ছিলেন। ১৯১০ সালে ইহা স্থাপিত হয়। ইহার উন্নতি-কল্পে তিনি চারি বৎসর কঠোর পরিশ্রম করেন। কলিকাতায় নারীশিক্ষাসমিতির কার্য্যে তিনি শ্রীযুক্তা লেডী অবলা বসুর দক্ষিণহস্ত-স্বরূপ ছিলেন। ১৯১৬ সালে স্থাপিত এই সমিতি কলিকাতায় হিন্দু বিধবাদের শিক্ষার জন্য বিদ্যাসাগর বাণীভবন স্থাপন করিয়াছেন ও চালাইতেছেন। এখানে বিধবারা বিনাব্যয়ে শিক্ষয়িত্রীর কাজ ও নানা প্রকার গৃহশিল্প ও কুটীরশিল্প শিক্ষা করিয়া উপার্জ্জনক্ষম হইতে সমর্থ হন। মফস্বলে নারীশিক্ষাসমিতি প্রায় ২০০ বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন করিয়াছেন। বালিকা-বিদ্যালয় স্থাপন ও তৎসমুদয়ের তত্ত্বাবধান করিবার জন্য কৃষ্ণপ্রসাদ বাবু বৃদ্ধ বয়সেও গ্রামে গ্রামে কত যে ঘুরিয়াছেন, তাহার বৃত্তান্ত সর্ব্বসাধারণ জ্ঞাত নহেন। ফরিদপুরের পালঙে এইরূপ কাজ করিবার সময় তিনি পক্ষাঘাতগ্রস্ত হন। উনিশ মাস এই রোগে শয্যাশায়ী থাকিয়া তিনি ৭০ বৎসর ৭ মাস বয়সে পরলোকগত হইয়াছেন। কর্ত্তব্যপালন ও শ্রমপূর্ণ জীবনযাপন তাঁহার এরূপ স্বভাবসিদ্ধ ছিল, যে, তিনি শয্যাশায়ী থাকিয়াও নারীশিক্ষাসমিতির কাজ করিতেন। তিনি সদাপ্রফুল্ল, অদম্যউৎসাহশীল এবং নির্বিবাদ মানুষ ছিলেন।

—

শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তীর কৃতিত্ব

ভারতবর্ষে ও ইংলণ্ডে ভারতবর্ষীয় অনেক যুবক নানা বিদ্যায় জ্ঞানলাভ করেন। ইংরেজী সাহিত্যেও কেহ কেহ ব্যুৎপন্ন হন। কিন্তু একেবারে আধুনিক যে ইংরেজী সাহিত্য,



শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী



যোগীন্দ্রনাথ সরকার।

যাহার অনেক অংশ এই বিংশ শতাব্দীতে রচিত এবং যাহাতে এখনও নূতন নূতন জিনিষ সংযুক্ত হইতেছে, সে বিষয়ে পারদর্শিতা লাভ ইংরেজী-সাহিত্যাধ্যায়ী খুব কম বাঙালীই করিয়া থাকেন। সেই জন্য রবীন্দ্রনাথের ভূতপূর্ব্ব সাহিত্যিক সেক্রেটরী এবং বিশ্বভারতীর ভূতপূর্ব্ব অন্যতম অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অমিয়চন্দ্র চক্রবর্ত্তী যে খুব আধুনিক ইংরেজী সাহিত্য সম্বন্ধে অধ্যয়ন চিন্তা ও গবেষণা করিয়া দীর্ঘ প্রবন্ধ লিখিয়া অক্সফোর্ড বিশ্ববিদ্যালয়ের ডক্টর অব ফিলসফি উপাধি পাইয়াছেন এবং তাঁহার প্রবন্ধ যে তথাকার প্রসিদ্ধ এক প্রকাশক পুস্তকাকারে প্রকাশ করিবেন, ইহা বিশেষ উল্লেখযোগ্য কৃতিত্ব। তিনি ইংলণ্ড ও ইউরোপের অন্য নানা দেশে সাংস্কৃতিক বহু বিষয়ে বক্তৃতা করিয়া খ্যাতি লাভ করিয়াছেন। তাঁহার আর একটি বিশেষ কৃতিত্ব এই, যে, তিনি অক্সফোর্ডের ব্রেজ্‌নোজ্‌ কলেজের ফেলো মনোনীত হইয়াছেন। অক্সফোর্ডের ফেলো এ পর্য্যন্ত আর কোন ভারতীয়—বোধ হয় আর কোন এশিয়াবাসী—মনোনীত হন নাই। এই ফেলোশিপের কর্ত্তব্যস্বরূপ তিনি দেশে ফিরিয়া আসিয়া হিন্দু ও মুসলমান সংস্কৃতি সম্বন্ধে গবেষণা করিবেন। সম্প্রতি প্যারিসে সভ্য সমুদয় দেশের লেখকবর্গের যে কংগ্রেসের অধিবেশন (International P. E. N. Congress) হইয়া গিয়াছে, তিনি তাহাতে ভারতবর্ষের প্রতিনিধির কাজ করিয়াছিলেন। অধ্যাপক গিলবার্ট মারে, সর্ মাইকেল স্যাড্‌লার প্রভৃতি বিদ্বান ও গুণী ব্যক্তি তাঁহার যোগ্যতা সম্বন্ধে অনেক কথা লিখিয়াছেন। তিনি ভারতবর্ষের যে-কোন বিশ্ববিদ্যালয়ে, যে-কোন সরকারী বা বেসরকারী কলেজে, ইংরেজী সাহিত্যের অধ্যাপক নিযুক্ত হইবেন, তাহাই লাভবান হইবে।

—

যোগীন্দ্রনাথ সরকার

শিশুদের বন্ধু, শিশুদের আনন্দদাতা, বহু বাল্যপাঠ্য সচিত্র পুস্তকের প্রণেতা, সঙ্কলয়িতা ও প্রকাশক শ্রীযুক্ত যোগীন্দ্রনাথ সরকার পরলোকযাত্রা করিয়াছেন। তিনি ডাক্তার সর্ নীলরতন সরকার মহাশয়ের চতুর্থ ভ্রাতা ছিলেন। তিনি ছোট ছেলেমেয়েদিগকে আনন্দ ও জ্ঞান দিবার নিমিত্ত প্রায় চল্লিশখানি বহি প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। সিটিবুক সোসাইটী নামক পুস্তকের দোকান তাঁহার দ্বারা প্রতিষ্ঠিত হয়। তাঁহার পূর্ব্বে অন্নদাচরণ সেন "সখা" নামক মাসিক পত্র ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য প্রকাশ করিয়াছিলেন বটে, কিন্তু তাঁহার অকালমৃত্যু হওয়ায় শিশুদের জন্য অন্য বড় কিছু তিনি করিয়া যাইতে পারেন নাই। যোগীন্দ্রনাথ ছোট ছেলেমেয়েদের জন্য অনেক পুস্তক প্রকাশ করিয়া গিয়াছেন। তদ্ভিন্ন, প্রায় ৪০ বৎসর পূর্ব্বে তিনিই উদ্যোগী হইয়া পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয়ের সম্পাদকতায় বালক-বালিকাদের জন্য "মুকুল" নামক মাসিক পত্র স্থাপন করান। তিনি ইহার অন্যতম সহকারী সম্পাদক ছিলেন, এবং প্রবন্ধ গল্প কবিতা ছবি সংগ্রহ করিতে তিনি দক্ষতম ছিলেন। আচার্য্য জগদীশচন্দ্র বসু মহাশয়ের ভগিনী পরলোকগতা শ্রীযুক্তা লাবণ্যপ্রভা সরকারও মুকুলের সহকারী সম্পাদক ছিলেন। আমাদেরও এই কাগজটির সহিত যোগ ছিল। কয়েক জন বন্ধুর সহযোগিতায় আরও একখানি মাসিক যোগীন্দ্রনাথ কিছুদিন চালাইয়াছিলেন। তাহার নাম এখন মনে পড়িতেছে না। আমরা যখন প্রথম সিটি-কলেজে অধ্যাপকতায় প্রবৃত্ত হই, সেই সময়ে

যোগীন্দ্রনাথ আমাদের ছাত্র ছিলেন। পরে তিনি সিটি-স্কুলে শিক্ষকতা করিয়াছিলেন।

তিনি হাস্যকৌতুকপ্রিয়, নির্বিবাদ, ঈর্ষাদ্বেষশূন্য মানুষ ছিলেন। তাঁহার স্বভাব বালকের মত ছিল বলিয়াই তাহাদের মনোরঞ্জনে তিনি এরূপ সাফল্য লাভ করিতে সমর্থ হইয়াছিলেন। শিশু-সাহিত্যে তাঁহার বহিগুলি এখনও একটি বিশিষ্ট স্থান অধিকার করিয়া আছে।

বঙ্গভঙ্গ ও স্বদেশী আন্দোলনের সময় তিনি "বন্দেমাতরম্" নাম দিয়া "স্বদেশী" ও "জাতীয়" সংগীতের একটি সংগ্রহ-পুস্তক প্রকাশ করেন। তাহা খুব সমাদৃত হইয়াছিল। মূল্য খুব কম রাখায় উহার বিক্রী বেশ হইত। কিন্তু পুলিসের নজর উহার উপর পড়ায় যোগীন্দ্র বাবু স্বতঃপ্রবৃত্ত হইয়া উহার বিক্রী বন্ধ করিয়া দেন।

কলিকাতা তাঁহার ভাল লাগিত না। গিরিডিতে তিনি বাড়ীঘর, বাগান, পুকুর করিয়াছিলেন।

তিনি প্রায় ১৪ বৎসর পক্ষাঘাতে ভুগিয়াছেন। তাহার মধ্যেও তাঁহার প্রিয় কাজ করিতেন। অন্য নানা ব্যাধিও তাঁহাকে আক্রমণ করিয়াছিল। কিন্তু তাঁহার ধৈর্য্য ও মানসিক বল অপরাজিত ছিল। ৭০ বৎসর বয়সে তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে।

—

প্যালেস্টাইন ত্রিখণ্ডিত করিবার প্রস্তাব

প্যালেষ্টাইনে আরবদের বাস, ইহুদীদেরও উহা প্রাচীন পিতৃমাতৃভূমি। আরবরা প্রধানতঃ মুসলমান, কতক খ্রীষ্টিয়ান। ইহুদীরা বহু শতাব্দী পূর্ব্বে পৃথিবীর নানা দেশে ছড়াইয়া পড়ে এবং প্রায় সর্ব্বত্র নির্যাতিত হয়। তাহারা বহু বৎসর হইতে একটি স্বজাতীয় বাসভূমি পাইবার চেষ্টা করিতেছে। ব্রিটিশ জাতির সাহায্যে তাহারা তাহাদের পূর্ব্ব পিতৃমাতৃভূমি প্যালেষ্টাইনকেই জাতীয় বাসভূমি করিবার সুযোগ পায়, এবং দলে দলে সেখানে আসিয়া ঘরবাড়ী করিতেছে ও চাষবাস বাণিজ্য কারখানা-পরিচালন করিতেছে। তাহাদের সংখ্যা ক্রমশঃ বৃদ্ধি পাওয়ায় ও তাহাদের শ্রীবৃদ্ধি হওয়ায় আরবদের আশঙ্কা ও ঈর্ষ্যা বাড়িয়া চলিতে থাকে। ক্রমে তাহা দাঙ্গা হাঙ্গামা রক্তপাতে পরিণত হয়। ব্রিটেন লীগ অব্ নেশ্যন্সের নিকট হইতে প্যালেষ্টাইনের অভিভাবকত্ব পাইয়াছেন। আরব-ইহুদী দাঙ্গা হাঙ্গামা দমন ও বিরোধ ভঞ্জন তাহাকেই করিতে হইতেছে। ব্রিটেন একটি রয়্যাল কমিশন বসান। সেই কমিশন তাহার রিপোর্টে প্রস্তাব করিয়াছেন, যে, প্যালেষ্টাইনকে তিন ভাগে বিভক্ত করা হইবে। এক ভাগ আরবদিগকে ও এক ভাগ ইহুদীদিগকে দেওয়া হইবে, এবং বাকী এক ভাগ ইংরেজদের হাতে থাকিবে। ইহাতে আরব ইহুদী কেহই সন্তুষ্ট নয়। আরবেরা বলে, তাহাদিগকে উর্ব্বর ভূমি ও সমুদ্রতটস্থ বন্দরগুলি হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে, ইহুদীরা বলে তাহাদিগকে আরবদের চেয়ে ছোট ভূখণ্ড দেওয়া হইয়াছে এবং এরূপ সব জায়গা হইতে বঞ্চিত করা হইয়াছে যাহাতে এখন চাষ হয় না কিন্তু যাহাতে সেঁচের বন্দোবস্ত করিলে প্রভূত শস্য হইতে পারে। উভয় পক্ষেরই ইহাও একটি অভিযোগ যে ব্রিটেন সব বন্দর এবং অন্য ঘাঁটি নিজের হাতে রাখিয়াছে। কিন্তু তা বলিলে কি হয়? আরব ও ইহুদী যদি ঝগড়া করে, তাহা হইলে সাম্রাজ্যবাদী ব্রিটেন নিজের সুবিধা কেন দেখিবে না, এবং নিজের সাম্রাজ্য নিরাপদ করিবার চেষ্টা কেন করিবে না? গৃহবিবাদের ফল এইরূপই হয়।

—

প্রাপ্তবয়স্কদিগের শিক্ষা

বাংলা-গবন্মেণ্ট নিরক্ষর ও অজ্ঞ প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগের শিক্ষার যে ব্যবস্থা রেজিষ্ট্রেশন-বিভাগের ইন্সপেক্টার-জেনার্যালের প্রস্তাব অনুসারে মঞ্জুর করিয়াছেন, নিরক্ষর প্রাপ্তবয়স্ক লোকদিগকে লিখনপঠনক্ষম করা তাহার একটি বিশিষ্ট অঙ্গ, এই কথাটির স্পষ্ট উল্লেখ আমরা তাহাতে যুক্ত দেখিতে চাই। নিরক্ষর ব্যক্তিরা লিখনপঠনক্ষম হইলে জ্ঞানলাভের জন্য সম্পূর্ণরূপে অন্যের মুখাপেক্ষী না থাকিয়া নিজেও পড়িয়া কিছু শিখিতে পারিবে। এই জন্য তাহাদিগকে লিখনপঠনক্ষম দেখিতে চাই।

—

মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাবের জয়

মোহমেডান স্পোর্টিং ক্লাব কলিকাতায় ফুটবল লীগ খেলায় এবারেও বিজয়ী হইয়াছেন। ইহার পূর্ব্বের তিন বৎসরও তাঁহারা লীগ খেলায় জয়লাভ করিয়াছিলেন। অন্য কোন ক্লাব এ-পর্য্যন্ত এরূপ কৃতিত্ব অর্জ্জন করিতে পারেন নাই। তাঁহাদের এই কৃতিত্বে ক্রীড়ার ক্ষেত্রে দেশ গৌরবান্বিত হইয়াছে।

—

বাঙালীর দ্বিতীয় পাটকল

গত ২০শে আষাঢ় হাবড়ার নিকটবর্ত্তী স্থানে শ্রীযুক্ত আলামোহন দাস কর্ত্তৃক স্থাপিত ভারত জুট মিল্‌সের উদ্বোধন আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় কর্ত্তৃক সম্পাদিত হয়। তাহার আগে এই পাটকলের সেক্রেটারী শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত একটি উচ্ছ্বাসপূর্ণ অথচ জ্ঞাতব্য তথ্যে পুষ্ট বক্তৃতা করেন। এই বক্তৃতা হইতে জানিতে পারি, আলামোহনবাবু এক সময়ে "থই মাথায় ক'রে কলকাতায় রাস্তায় রাস্তায় ফেরী করেছেন"।

এই নিঃস্ব ব্যক্তি একদিন তন্দ্রাঘোরে স্বপ্ন দেখ্‌ল যে বাঙালী যদি ইণ্ডাষ্ট্রীতে না নামে তা হ'লে তার আর বাঁচবার পথ নেই। এই ইণ্ডাষ্ট্রীর নেশায় পাগল হয়ে বেরিয়ে পড়লেন পথে। প্রথম তৈরি করলেন রেলগাড়ী ওজনের যন্ত্র, তার পর ছাপবার কল, চামড়া কষ করার কল, পাট কলের নানা যন্ত্র। যখন এই সব তৈরি করেন তখনই তার মনের কোণে ছিল বাঙালীর নিজস্ব একটি জুট মিল তৈরি করার স্বপ্ন।

১৯৩৫ সালের অক্টোবর মাসে বিজয়া দশমী তিথিতে যখন তিনি মিলের ভিত্তি প্রতিষ্ঠা করেন, তখন তাঁর সঙ্গে ছিলেন তাঁর বন্ধুবান্ধবের দল। দুর্জ্জয় সাহসে বুক বেঁধে দুর্ব্বার গতিতে ছুটে চলেছেন গন্তব্যের সন্ধানে। হঠাৎ পথের মাঝে কালবৈশাখীর ঝড় উঠল—মেঘের অন্ধকারে পথের আলো গেল নিবে—চারি দিকে শুধু নিকষ কালো অন্ধকারের লুকোচুরি চল্‌তে লাগ্‌ল। তাঁর বন্ধুস্থানীয় যাঁরা ছিলেন তাঁরা ধীরে ধীরে তাঁকে সেই অন্ধকার-ব্যূহের মধ্যে ফেলে সরে পড়লেন। সঙ্গে তখন তাঁর রইল মাত্র দু'-তিনটি সংসার-অনভিজ্ঞ ছেলে। তাদের হাত ধরেই তিনি সেই ঝড়ের রাতে চলেছেন। একদিনের জন্য চলা বন্ধ করেন নি। সেই ঝড়ের রাতে আমাদের পথ চলার কষ্ট দেখে যাঁরা কাতর হয়ে ঘরের বার হলেন আলো-হাতে তাঁরা হচ্ছেন স্বনামধন্য রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ, রাধিকামোহন সাহা জীবনকৃষ্ণ মিত্র প্রভৃতি। এই মিল-প্রতিষ্ঠার ইতিহাসে তাঁদের দান যে কারও চেয়ে কম নয় তা আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করছি। আরও একটা আনন্দের কথা এই যে ভারতবর্ষে জুট মিল তৈরি করার খরচের যে হিসাব পাওয়া যায় তাকে অনেক পশ্চাতে ফেলে আমরা চলে গিয়েছি। সাড়ে আট লাখ টাকায় দু-শ তাঁতের মেশিনারী, বাড়ী প্রভৃতি হয়েছে। আমাদের শেয়ার বিক্রী হয়েছে সাড়ে সাত লাখ টাকার, আর ডিবেঞ্চার বিক্রী হয়েছে তিন লাখ টাকার। মোট সাড়ে দশ লাখ টাকার মধ্যে সাড়ে আট লাখ টাকা ইমারতে ও যন্ত্রে খরচ হয়েছে। হাতে যে দু-লাখ টাকা আছে তা হচ্ছে কাজ চালাবার পুঁজি। যে দু-চার খানা মেশিন এখনও এসে পৌঁছয় নি তার দাম দেওয়া হয়ে গিয়েছে।

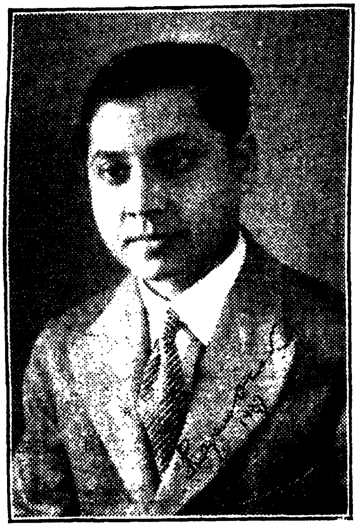
১৮৫২ সালে কল্‌কাতার উপকণ্ঠে ভাগীরথীর তীরে স্বর্গীয়



ভারত জুট মিল্‌সের উদ্বোধন-উৎসব

(১) আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র, (২) শ্রীরামানন্দ চট্টোপাধ্যায়, (৩) রায় দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ বাহাদুর, বোর্ড অব ডিরেক্টর্সে'র চেয়ারম্যান, (৪) শ্রীহরিদাস মজুমদার, ডিরেক্টর, (৫) শ্রীরজনীকান্ত দত্ত, সম্পাদক, (৬) শ্রীচন্দ্রলাল মল্লিক

বিশ্বম্ভর সেনের টাকায় অকল্যাণ্ড সাহেব জগতের প্রথম পাটকল স্থাপন করেন। আজ বাংলায় বিদেশীর পরিচালিত পাটকল হচ্ছে ৬৫টি, আর ভারতীয়দের হচ্ছে মাত্র ১৩টি। এই মিল-গুলিতে পঞ্চাশ কোটির উপর টাকা খাটছে। কিন্তু বল্‌তে পারেন, যে-ইণ্ডাষ্ট্রীর গোড়াপত্তন করেছিল বাঙালী, সেই ইণ্ডাষ্ট্রীতে বাঙালীর



শ্রীযুক্ত রজনীকান্ত দত্ত

কয় টাকা আছে? যদি বাঁচাই আমাদের প্রয়োজন হয়, তা হ'লে সারা তুনিয়া জুড়ে যন্ত্রশিল্পের যে অভিযান চলেছে, সেই অভিযানে তাল ঠুকে আমাদেরও চল্‌তে হবে। তা যদি না পারি, তা হ'লে আমাদের ধ্বংস অনিবার্য্য। কবীন্দ্র রবীন্দ্রনাথের ভাষায় বলি,

"পুরানো সঞ্চয় নিয়ে ফিরে ফিরে শুধু বেচা কেনা
আর চলিবে না,
বঞ্চনা বাড়িয়া ওঠে, ফুরায় সত্যের যত পুঁজি,
কাণ্ডারী ডাকিছে তাই বুঝি—
তুফানের মাঝখানে
নূতন সমুদ্রতীর পানে
দিতে হবে পাড়ি।"

রজনীবাবুর বক্তৃতা শেষ হইবার পর, "স্বদেশী"ত্ব যে আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায়ে মূর্ত্তিপরিগ্রহ করিয়াছে, তিনি বক্তৃতা করেন। স্বদেশী কোন পণ্যশিল্পের উদ্বোধন করিবার তিনি অন্যতম যোগ্যতম ব্যক্তি। তাঁহার বক্তৃতার তাৎপর্য্য এই—

মধ্যে মধ্যে আলামোহন দাসের কথা শুনেছি। এক ব্যক্তি পাটকলের যন্ত্র নির্ম্মাণ ক'রে পাটকল স্থাপন করতে যাচ্ছে শুনে ভাবতাম, লোকটির মাথা খারাপ আছে। পরে যখন শুনলাম মালগাড়ী ওজনের বড় বড় যন্ত্র তৈরি ক'রে বড় বড় রেলকে তিনি লক্ষ লক্ষ টাকার যন্ত্র বেচেছেন, তখন বুঝলাম এর মধ্যে সারবস্তু আছে। আমার এখানে এসে মনে হচ্ছে আমি শান্তিতে মরতে পারব। এক ব্যক্তি প্রথমে ফেরিওয়ালাগিরি করেছে ও এখ[ন] পাটকল স্থাপন করল, সে যে বাঙালী, এ সহজে বিশ্বাস হয় না। আমাদের মাড়ওয়ারী ভ্রাতাগণ সামান্য অবস্থা হ'তে উন্নতি করেন। ইউরোপ ও আমেরিকায়ও তা করে। এখন মনে হচ্ছে বাঙালী[র] এই অসামান্য প্রতিভা নর্দ্দামায় যাবে না। হয়ত বিধা[তা] বাঙালীকে বড় করবেন। উচ্চশিক্ষার মোহ ও চাকুরীর আকাঙ্[ক্ষা] আমাদের যুবকদের মনের তেজ কমিয়ে দেয়। ভাগ্যে স[ার] রাজেন্দ্র ইঞ্জিনিয়ারিং পাস করেন নাই, তাই এত কিছু ক[রে] গেলেন। আলামোহন বাবুও বেশী লেখাপড়া জানেন না, ত[বু] অসাধ্য সাধন করেছেন। রায় বাহাদুর দেবেন্দ্রনাথ বল্লভ (খু[ঁটি] তার পিঠে মেরে), পাটের সেই বল্লভ মার্কা, বেলির সঙ্গে যা প্রতি-যোগিতা করত, তা আজকাল দেখি না কেন? তার প্রায়শ্চিত্ত তু[মি] এই পাটের কলের চেয়ারম্যান হয়ে করলে। ইংরেজদের এক বা[ড়ি] কোম্পানীর ১১টি প্রকাণ্ড পাটকল। মাড়ওয়ারীদের বড় বড় কল হুকুমচাঁদ মিল ভারতের ও বোধ হয় পৃথিবীর মধ্যে বৃহত্তম পাটকল বাঙালী এতদিনে দুটি পাটকল করল।

বাঙালীর কম কথা বলবার সময় এসেছে। আমাদের মাড়-ওয়ারী ভ্রাতারা কি কখনও গোলদীঘিতে বক্তৃতা করেছেন ন[া] শুনেছেন? তাঁদের হুকুমচাঁদ, বিড়লা, সুরজমল পাটকল করেছেন মাড়ওয়ারী ভ্রাতারা সেদিন ৫ কোটি টাকা মূলধনের ব্যবসায়ের পত্ত[ন] করলেন। লর্ড জেটল্যাণ্ডের পুত্র তার এক ডিরেক্টর। আমাদে[র] এরূপ জিনিষ কই?



শ্রীআলামোহন দাস

অতঃপর আচার্য্য রায় একটি সুইচ টিপিয়া মিলের স[ব] তাঁতগুলি চালাইয়া দিলেন। সব তাঁত আলামোহ[ন] বাবুরাই নির্ম্মাণ করিয়াছেন। তাঁহারা মুদ্রাযন্ত্র, ওজনে[র] কল প্রভৃতিও নির্ম্মাণ করেন।

দেশ-বিদেশের কথা

আরবের পুনর্জন্ম

শ্রীযোগেশচন্দ্র বাগল

সাধারণের নিকট আরব একটি রহস্যপূর্ণ দেশ বলিয়া মনে হয়। 'আরব্য উপন্যাস'-এর বহু চমকপ্রদ কাহিনী এই দেশটিকে যুগে যুগে রহস্যের আবরণে ঢাকিয়া রাখিয়াছে। আরবের বাস্তব রূপ জানিতে কাহার না আগ্রহ? গত পঁচিশ বৎসরের ইতিহাস পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাই, আরবভূমি অতি দ্রুত যুগধর্ম্মের সঙ্গে খাপ খাওয়াইবার জন্য উঠিয়া পড়িয়া লাগিয়া গিয়াছে। এই কাহিনী বাস্তবিকই উপন্যাসের মত।

দিকে দিকে ধর্ম্মের বার্ত্তা প্রচারও তখন আরম্ভ হয়। এই সময় আরবের একটি বিশিষ্ট সভ্যতা ও সংস্কৃতি গড়িয়া উঠে। ইসলাম ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি কয়েক শতাব্দীর মধ্যে সমগ্র পশ্চিম, দক্ষিণ ও মধ্য এশিয়া, উত্তর আফ্রিকা দক্ষিণ ইউরোপ ও সুদূর স্পেন পর্য্যন্ত ছড়াইয়া পড়ে। ইস্‌লামের বিজয়বার্ত্তা বক্ষে ধারণ করিয়া তুর্কী সাম্রাজ্যও ক্রমে প্রতিষ্ঠিত হইল। ১৪৫৩ খ্রীষ্টাব্দে কনষ্ট্যান্টিনোপল অধিকার করিয়া পরোক্ষভাবে তুর্কী কিরূপে ইউরোপে নবযুগের সূচনা সম্ভব করিয়া দিয়াছিল ইতিহাসপাঠক মাত্রেই তাহা অবগত আছেন। আরবভূমিও শক্তিমান মুসলমান তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন হইয়া যায়।

আরবরা কিন্তু স্বাধীনতাকে ধর্ম্মের মতই প্রাণ দিয়া



সৌদী আরবের সৈন্যদল

আরব মুসলমান দেশ। যাযাবর বেদুইন এখানকার প্রধান অধিবাসী। ইহাদের নির্দ্দিষ্ট বাসস্থান নাই। প্রাচীন কালে শিক্ষা ও সভ্যতায় উন্নত হইলেও শেষ যুগে তাহার চিহ্ন বিলুপ্তপ্রায় হইয়াছিল। এই জাতি কিন্তু আগাগোড়া দুর্দ্ধর্ষ ও সংগ্রামপ্রবণই রহিয়া গিয়াছে। তখন মহম্মদের আবির্ভাব হয় নাই। সেই অতীত যুগেও কিন্তু ইহারা রোম সাম্রাজ্যের নিকট মস্তক বিলাইয়া দেয় নাই। আরবের উত্তর দিকে ভূমধ্যসাগরতীরে কতকটা ফালির মত জায়গা অধিকার করিয়াই সন্তুষ্ট থাকিতে হইয়াছিল. পরে ইসলাম ধর্ম্ম প্রচারিত হইলে আরবেরা নব প্রেরণা লাভ করে,

ভালবাসে। ইহাকে রক্ষার জন্য তাহারা বিসর্জ্জন না-দিতে পারে এমন কিছুই নাই। প্রবল তুর্কী সাম্রাজ্যের অধীন হইলেও তাহারা স্বাধীন চিত্তবৃত্তি কখনও হারায় নাই। বস্তুতঃ আরবের দূরদূরান্তে তুর্কী শাসন প্রবর্ত্তিত হইবার অবকাশ পায় নাই। ইতিমধ্যে জগতে শিল্পবাণিজ্য, শাসনপদ্ধতি প্রভৃতিতে যুগান্তর উপস্থিত হইয়াছে। বিজ্ঞান দূরকে নিকট করিয়াছে। বিভিন্ন দেশের অর্জ্জিত জ্ঞান এখন আর সেই সেই দেশেরই সম্পত্তি রহিল না, বিশ্বের সর্ব্বত্র তাহা ছড়াইয়া পড়িবার সুবিধা পাইল। তুর্কী এককালে ইউরোপে আতঙ্কের কারণ হইয়াছিল বটে, কিন্তু

পরবর্ত্তী কালে তাহা ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়ে। ইউরোপের জ্ঞান-বিজ্ঞান তাহাকে পিছনে ফেলিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। সে তখন ইউরোপের 'রুগ্ন মনুষ্য' বলিয়া পরিগণিত হইল। জ্ঞান-বিজ্ঞানের আলোক-বর্ত্তিকা ত আর একটি দেশের একচেটিয়া সম্পত্তি



আমীর আবদুল্ল, ট্রান্স-জর্ডানের শাসক

নয়। তুরস্কের যুবক সম্প্রদায় কিন্তু ক্রমশঃ ইহা দ্বারা উদ্ভাসিত হইল। তাহাদেরই চেষ্টায় সুলতানের স্বৈরশাসনের পরিবর্ত্তে একটি সংস্কৃত শাসন-ব্যবস্থা প্রবর্ত্তিত হয়। এই আন্দোলনের ঢেউ স্বাধীনতা-প্রিয় আরবদের মধ্যে পৌঁছাইতেও বিলম্ব হইল না। বিগত ১৯০৮ সনে তাহাদের মধ্যেও স্বায়ত্ত শাসনের ব্যবস্থা হইল। দেশ-শাসনে



রাগেব বে নাশাশিবি
জেরুসালেমে আরব-রক্ষা সমিতির সভাপতি

আরবদের দাবী স্বীকৃত হইবে বলিয়া ঘোষণা করা হইল। ... পরিবর্ত্তে আরবী ভাষাই রাষ্ট্র ভাষা বলিয়া গণ্য হইল। এখ...

বলিয়া রাখা আবশ্যক যে তুরস্কের যুব আন্দোলনের সাফল্য উপলক্ষ্য করিয়াই যদিও আরবের এই স্বাধীনতা আন্দোলন আরম্ভ হয়



হজ আমীন এল-হুসেনী, গ্র্যাণ্ড মুফতি

তথাপি ইহার সপক্ষে ইংরেজ ও ফরাসীদের প্রচারকার্য্যও কম সাহায্য করে নাই।

স্বাধীনতাপ্রিয় আরবজাতি অল্পেতেই সন্তুষ্ট হইয়া রহিল না, অধীনতার নাগপাশ বিমুক্ত হইবার জন্য আন্দোলন চালাইতে লাগিল। এই সময় মহাসমর বাধিয়া গেল। ইংরেজ, ফরাসী প্রভৃতি মিত্রশক্তিবর্গের চেষ্টা হইল, শত্রু তুরস্কের বিরুদ্ধে ইহাদিগকে উস্কাইয়া দিয়া স্বপক্ষে আনয়ন করা। তাহারা ইহাতে সফলকাম হইয়াছিল। তাহাদের এই কার্য্যে প্রধান সহায়ক হইয়াছিলেন কর্ণেল টি. ই. লরেন্স। আরবভূমি, বিশেষতঃ উত্তর-আরবকে, তিনি কিরূপে তুর্কীর বিরুদ্ধে এক করিয়াছিলেন তাহার বর্ণনা বহু পুস্তক-পুস্তিকায় প্রকাশিত হইয়াছে। লরেন্স সাহেবের পরবর্ত্তী কার্য্যকলাপে বুঝা গিয়াছিল, তুরস্কের নাগপাশ বিমুক্ত করিয়া যুদ্ধান্তে ইহাকে স্বাধীন রাষ্ট্র বলিয়া স্বীকার করা হইবে—আরবকে এই প্রতিশ্রুতি দেওয়া হইয়াছিল। ভের্সাই সন্ধির পর কয়েক বৎসরের মধ্যে তিনি যখন দেখিলেন তাঁহার এই প্রতিশ্রুতি প্রতিপালিত হইবার কোনই আশা নাই তখন তিনি সরকারী চাকরি ত্যাগ করিলেন, সরকারী পদক-পুরস্কার সকলই ফিরাইয়া দিলেন, এমন কি নাম পর্য্যন্ত বদলাইয়া ফেলিলেন। অতঃপর তিনি বিমানপোতের ইঞ্জিনিয়ারের কাজ শিখিয়া নিজেকে 'এয়ার-ম্যান শ' বলিয়া পরিচয় দিলেন।

কর্ণেল লরেন্সের এবম্বিধ প্রতিবাদের প্রত্যক্ষ ফল কিছু না ফলিলেও পরোক্ষভাবে ইহা দ্বারা আরবদের সুবিধা হইয়াছিল।

সিরিয়া প্যালেষ্টাইন মাত্র নিজ নিজ তাঁবেদারিতে রাখিয়া মিত্র-শক্তিবর্গ আরবের অন্যান্য অংশকে আভ্যন্তরীণ ব্যাপারে একরূপ স্বাধীন বলিয়া ঘোষণা করিলেন। মেসোপটেমিয়া ইরাক নামে একটি স্বতন্ত্র রাষ্ট্র হইল। ট্রান্সজর্ডানিয়াও অনুরূপ স্বাতন্ত্র্য লাভ করিল। ওদিকে দক্ষিণ-পূর্ব্ব আরবে সুনীতিপন্থী ওয়াহাবি সম্প্রদায়ের নেতারূপে ইব্‌ন্ সৌদ ক্রমশঃ শক্তিমান হইয়া উল্লিখিত কয়েকটি অঞ্চল বাদে সমগ্র আরবের একচ্ছত্র অধিপতি হইবার প্রয়াস পাইতে লাগিলেন। ইহাতে মিত্রশক্তিবর্গের আতঙ্ক উপস্থিত হয় নাই। বড়ই আশ্চর্য্যের বিষয় ইংরেজরা বরং নানা ভাবে ইব্‌ন্ সৌদকে সাহায্যই করিয়া আসিতেছে। দক্ষিণ-পশ্চিম আরবে ইমেন যদিও কতকটা স্বাতন্ত্র্য বজায় রাখিয়াছে তথাপি ইব্‌ন্ সৌদের প্রাধান্য স্বীকার করিতে কুণ্ঠা বোধ করে নাই। গত বৎসর ফ্রান্স কর্ত্তৃক সিরিয়ার স্বাধীনতা স্বীকৃত হইয়াছে। বর্ত্তমানে একমাত্র প্যালেষ্টাইন ছাড়া সমগ্র আরবভূমি স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে বলা যাইতে পারে।

ইউরোপে কতকগুলি রাষ্ট্র গত কয়েক বৎসরের মধ্যে ব্রিটেন ও ফ্রান্সের প্রতিদ্বন্দ্বী হইয়া উঠিয়াছে। একারণ ইহাদের সমগ্র আরবভূমিতে মৈত্রী ভাব বজায় রাখিবার ইচ্ছা প্রবল হওয়া স্বাভাবিক। হইয়াছেও তাহাই। লরেন্সের প্রতিবাদের ফলে ইহাদের চোখ খুলিয়াছিল বটে, কিন্তু বর্ত্তমান অবস্থার উদ্ভব না হইলে ইহারা আরবের প্রাধান্য লাভে এতটা তৎপর হইত কি না সন্দেহ। সে যাহা হউক, এবং যে কারণেই হউক, আরব আজ একটি সংহত, শক্তিমান রাষ্ট্রে পরিণত হইতে চলিয়াছে।



সৌদী আরবের রাজা ইব্‌ন সাউদ

ইহা শুধু মুসলমান সমাজের পক্ষেই গৌরবের বিষয় নহে প্রত্যেক স্বাধীনতাকামী দেশ ও জাতিই ইহাতে আহ্লাদিত হইবে। সাম্রাজ্যবাদীরা আরবকে সাম্রাজ্যের একটি মস্ত বড় ঘাঁটি বলিয়া ব্যবহার করিবার আশা হয়ত হৃদয়ে পোষণ করিতেছে, কিন্তু

স্বতন্ত্র আরব শেষ পর্য্যন্ত যে ইহাতে রাজী না-ও হইতে পারে তাহার সম্ভাবনাও রহিয়াছে।

ইব্‌ন্ সৌদের অদম্য চেষ্টার ফলে আরবে নবযুগের আবির্ভাব হইয়াছে। কে ভাবিয়াছিল যুদ্ধপ্রিয় স্বাধীন অশিক্ষিত যাযাবর জাতি আবার মনুষ্যসমাজে বাসা বাঁধিবে? মরুময় আরবভূমিতে রেলপথ, মোটর রাস্তা নির্ম্মিত হইবে ইহাই বা কে ধারণা করিয়াছিল? ইব্‌ন্ সৌদের আমলে অসম্ভব সম্ভব হইয়াছে। যাযাবর উপজাতিগুলি তাঁহার শাসনাধীন হইয়া সমাজবদ্ধ ভাবে বসবাস করিতেছে। বর্ত্তমান যুগোপযোগী নানা সুখস্বাচ্ছন্দ্যের ব্যবস্থা ত তাহাদের জন্য করা হইতেছেই, তাহারা যাহাতে সুখস্বাচ্ছন্দ্যলাভের অধিকারী হইতে পারে সেজন্যও সবিশেষ আয়োজন করা হইতেছে। ইহাদের সন্তানসন্ততিদের শিক্ষার ব্যবস্থা ইহার মধ্যে একটি। কৃষিশিল্পের উন্নতির চেষ্টা হইতেছে. রাস্তাঘাট নির্ম্মাণ করিয়া লোকের বিভিন্ন অঞ্চলে যাতায়াত ও ব্যবসা-বাণিজ্য সহজসাধ্য করা হইতেছে। রেল, মোটর, মোটর লরী, বাস প্রবর্ত্তিত হইতেছে। ডাক-বিভাগ তার- ও বেতার-বিভাগ খোলা হইয়াছে। ইহারা এখন হাজার মাইল দূরের খবর মুহূর্ত্তমধ্যে পাইয়া থাকে। গানবাজনা আমোদ-প্রমোদের ত কথাই নাই। এক কথায় সভ্য জগতের যতপ্রকার সুখসুবিধা আছে আরবগণ বর্ত্তমানে সকলই উপভোগ করিতেছে।

কিন্তু ইহারা এত সুখসুবিধার মধ্যে থাকিয়া ক্রমশঃ হীনবীর্য্য হইয়া পড়িতেছে না ত? এরূপ মনে করিবার কোন কারণ নাই। মিত্রশক্তিগুলির আওতায় বর্দ্ধিত হইলেও তাহারা দেশরক্ষার কথাও ভাবিতেছে। আরবদের মধ্যে আধুনিক বিজ্ঞান-সম্মত প্রণালীতে যুদ্ধবিদ্যা শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা হইয়াছে। তাহারা সেকালের ছোরা-তলোয়ার ছাড়িয়া কামান-বন্দুক চালনা শিক্ষা করিতেছে। যুদ্ধ-ট্যাঙ্ক কি পদার্থ তাহা এখন তাহারা ভাল রকমই জানে। বিমানপোতও আরবে আমদানী হইয়াছে। বিমান-পোতে আরোহণেও তাহাদের কম আনন্দ নয়। বিমানবাহিনীও ছোটখাট আকারে গঠিত হইয়াছে। সুতরাং দেশরক্ষা ব্যাপারে ইহারা এখন আর পরমুখাপেক্ষী নয়।

আরব বলিতে একটি উপদ্বীপের কথা আমাদের মনে জাগিলেও বস্তুতঃ মিশর হইতে ইরাক পর্য্যন্ত সমগ্র ভূখণ্ডকেই আরব-ভূমি বলা যাইতে পারে। কারণ এই অঞ্চলের অধিবাসীরা সকলেই এক জাতি ও এক আরবী ভাষাভাষী। আজ মিশর স্বাধীন হইতে চলিয়াছে। সিরিয়ার স্বাধীনতাও স্বীকৃত হইয়াছে। ইরাক বহু বৎসর পূর্ব্বেই স্বাতন্ত্র্য লাভ করিয়াছে। ইব্‌ন্ সৌদের নেতৃত্বে আরব উপদ্বীপ আজ ঐক্যবদ্ধ সংহত। প্যালেষ্টাইনই একমাত্র পরাধীন রহিয়াছে। বর্ত্তমান অবস্থার চাপে পড়িয়া মিত্র-শক্তিবর্গ আরবের স্বাতন্ত্র্য স্বীকার করিতে বাধ্য হইয়াছে বলিয়া সকলের ধারণা। যে কারণেই হউক, আরবের পুনর্জ্জন্মলাভ বাস্তবিকই আশাপ্রদ।

[প্যালেষ্টাইনে ইহুদী ও আরবদের মধ্যে সংঘর্ষের কারণ ও তাহার প্রতীকার সম্বন্ধে বিচার করিবার জন্য ১৯৩৬ সালের আগষ্ট মাসে যে রয়্যাল কমিশন নিযুক্ত হইয়াছিল সম্প্রতি তাহার প্রতিবেদন প্রকাশিত হইয়াছে। কমিশন সুপারিশ করিয়াছেন যে প্যালেষ্টাইনের এক অংশ ট্রান্স-জর্ডানের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটি স্বতন্ত্র আরব রাজ্য গঠিত হউক; পবিত্র তীর্থ জেরুসালেম ও বেথ-লেহেম নূতন একটি ম্যাণ্ডেটের অধীন থাকুক, এবং প্যালেষ্টাইনের অপর অংশ স্বতন্ত্র ইহুদী রাজ্য বলিয়া পরিগণিত হউক। এই প্রস্তাবে কোন পক্ষই সন্তুষ্ট হন নাই।]



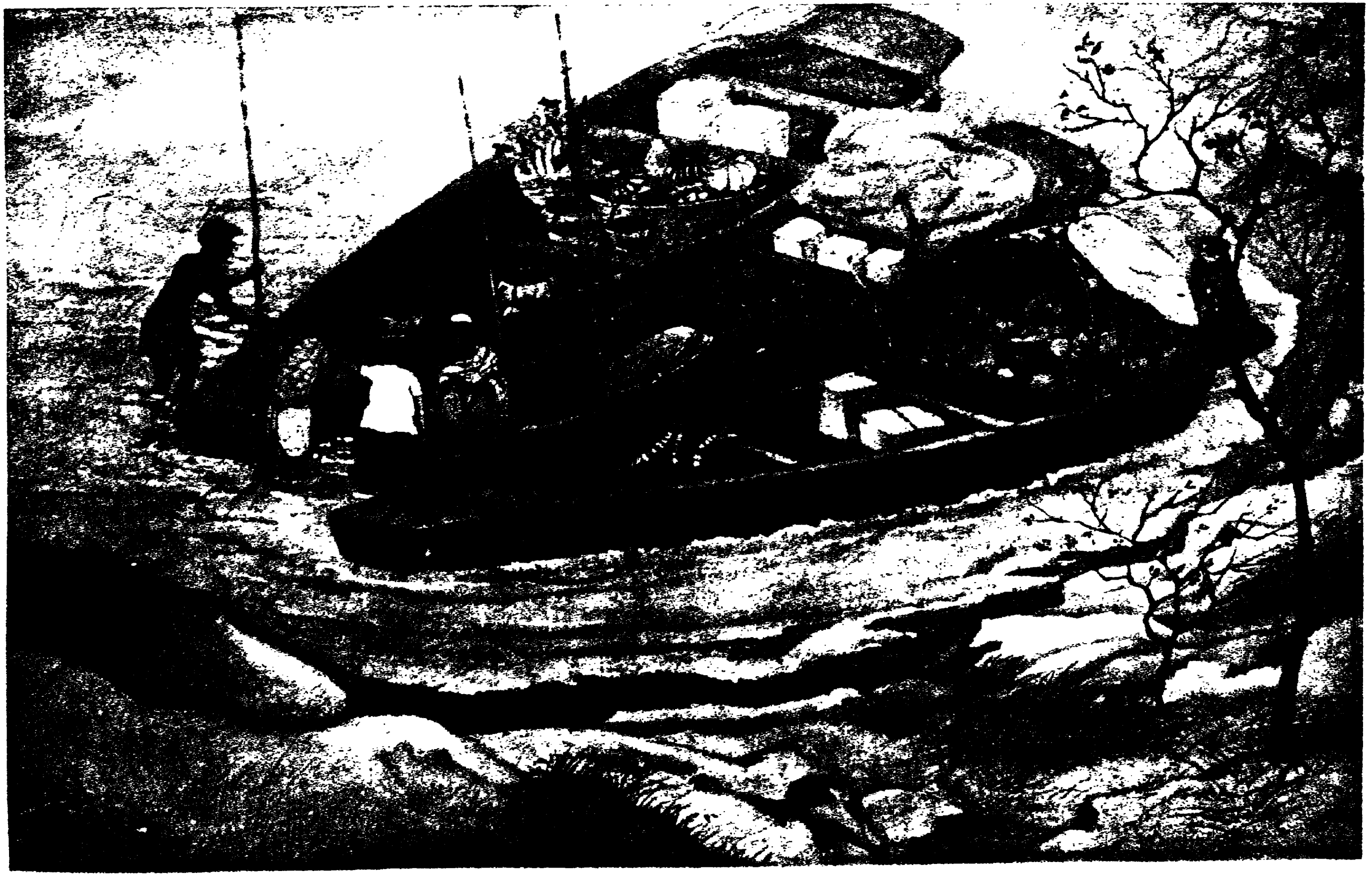
ডাঃ এস. কে. চন্দ

লীগ অব নেশন্সের অধীনে সিঙ্গাপুরে ম্যালেরিয়া-নিবারণ সম্বন্ধে বিশেষ শিক্ষালাভ করিয়া সম্প্রতি দেশে প্রত্যাগত হইয়াছেন।

দ্রষ্টব্য

গত আষাঢ়ের প্রবাসীতে শ্রীযুক্ত সরসীলাল সরকার মহাশয়ের "কলিকাতা হিন্দু অনাথ-আশ্রম" সম্বন্ধে প্রবন্ধ পাঠ করিয়া অনেকে এই আশ্রম সম্বন্ধে তথ্যান্বেষী হইয়াছেন. কেহ কেহ আমাদের নিকটও পত্র লিখিয়াছেন। লেখক মহাশয় তাঁহার প্রবন্ধে আশ্রমের ঠিকানা দেন নাই। আশ্রমের ঠিকানা—১২।১, বলরাম ঘোষ ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ঐ ঠিকানায় আশ্রমের অধ্যক্ষ মহাশয়ের নিকট পত্র লিখিলে বিস্তারিত বিবরণ অবগত হওয়া যাইবে।

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্ত্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



ঘাটে

শ্রীসত্যরঞ্জন মজুমদার

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

প্রবাসী

"সত্যম্ শিবম্ সুন্দরম্"

"নায়মাত্মা বলহীনেন লভ্যঃ"

৩৭শ ভাগ
১ম খণ্ড

ভাদ্র, ১৩৪৪

৫ম সংখ্যা

শনির দশা

রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর

আধবুড়ো ঐ মানুষটি মোর
নয় চেনা।
একলা বসে ভাবছে, কিম্বা
ভাবছে না
মুখ দেখে ওর সেই কথাটাই
ভাবছি,
মনে মনে আমি উহার
মনের মধ্যে নাবচি ।

হয়তো বা ওর মেঝো মেয়ে পাতা ছয়েক ব'কে
মাথার দিব্যি দিয়ে চিঠি পাঠিয়েছিল ওকে
আদরিণী উমারাণীর বিষম স্নেহের শাসন,
জানিয়েছিল, চতুর্থীতে খোকার অন্নপ্রাশন ;
জিদ ধরেছে, হোক না যেমন করেই
আসতে হবে শুক্রবার কি শনিবারের ভোরেই ।

আবেদনের পত্র একটি লিখে
পাঠিয়েছিল বুড়ো তাদের কর্তাবাবুটিকে।
বাবু বললে, হয় কখনো তা কি ?
মাসকাবারের ঝুড়ি ঝুড়ি হিসাব লেখা বাকি।
সাহেব শুনলে আগুন হবে চ'টে,
ছুটি নেবার সময় এ নয় মোটে।
মেয়ের ছঃখ ভেবে
বুড়ো বারেক ভেবেছিল কাজে জবাব দেবে।

সুবুদ্ধি তার কইল কানে, রাগ গেল যেই থামি
আসন্ন পেন্‌সনের আশা ছাড়াটা পাগলামি।
নিজেকে সে বললে, ওরে, এবার না হয় কিনিস্‌
ছোট ছেলের মনের মতো একটা কোনো জিনিস।
যেটার কথাই ভেবে দেখে, দামের কথায় শেষে
বাধায় ঠেকে এসে।
শেষকালে ওর পড়ল মনে জাপানি ঝুমঝুমি,
দেখলে খুসি হয়তো হবে উমি।
কেইবা জানবে দামটা যে তার কত,
বাইরে থেকে ঠিক দেখাবে খাঁটি রূপোর মতো।
এমনি করে সংশয়ে ওর কেবলি মন ঠেলে,
হাঁ-না নিয়ে ভাবনাস্রোতে জোয়ার ভাঁটা খেলে।
রোজ সে দেখে টাইম-টেবিলখানা,
ক'দিন থেকে ইষ্টিশনে প্রত্যহ দেয় হানা।
সামনে দিয়ে যায় আসে রোজ মেল,
গাড়িখানা প্রত্যহ হয় ফেল।

দ্বিধায় দোলা বিমর্ষ ওর মুখের ভাবটা দেখে
এম্‌নিতরো ছবি মনে নিয়েছিলেম এঁকে।

কৌতূহলে শেষে
একটুখানি উসখুসিয়ে, একটুখানি কেশে
বসে তাহার কাছে
শুধাই তারে, বাড়িতে কি মন্দ খবর আছে।
বললে বুড়ো, কিচ্ছুই নয় মশায়,
আসল কথা, আছি শনির দশায়।
তাই ভাবছি, কী করা যায় এবার
ঘোড়দৌড়ে দশটা টাকা বাজি ফেলে দেবার।
আপনি বলুন, কিনব টিকিট আজ কি ?
আমি বললেম, কাজ কী ?
রাগে বুড়োর গরম হোলো মাথা,
বললে, থামো, ঢের দেখেছি পরামর্শদাতা।
কেনার সময় নেই যে এবার
আজিকার এই দিন বই,
কিন্‌ব আমি, কিন্‌ব আমি,
যে করে হোক্ কিনবই।

আলমোড়া
জ্যৈষ্ঠ, ১৩৪৮



সংস্কৃতব্যাকরণের প্রাচীন ও নবীন পদ্ধতি

শ্রীবিধুশেখর ভট্টাচার্য

ব্যাকরণ না শিখিলে চলে না, ইহা শিখিতেই হইবে; কিন্তু কিরূপে শিখিতে হইবে ইহাই প্রশ্ন। এ প্রশ্ন নূতন নয়, পাণিনির মহাভাষ্য লিখিতে গিয়া পতঞ্জলি বলিতেছেন, শব্দানুশাসন তো করিতে হইবে, কিন্তু কিরূপে? গো, অশ্ব, পুরুষ, হস্তী, শকুনি, মৃগ, ব্রাহ্মণ ইত্যাদি রূপে এক-একটি শব্দ পাঠ করিলে হয় কি? হয় না; কারণ ইহা ঠিক উপায় নয়। শোনা যায় বৃহস্পতি ইন্দ্রকে এইরূপ এক-একটি শব্দ পাঠ করিয়া শিক্ষা দিয়াছিলেন—দেবতাদের পরিমাণে এক হাজার বৎসর পর্যন্ত, কিন্তু শেষ করিতে পারেন নাই। বৃহস্পতি ছিলেন অধ্যাপক, ইন্দ্র ছিলেন ছাত্র, আর দেবতাদের পরিমাণে হাজার বৎসর ধরিয়া পড়ান হইয়াছিল, তবুও শব্দপাঠ শেষ হয় নাই। আর আজকাল যদি কেহ দীর্ঘকাল বাঁচে তো এক শত বৎসর বাঁচিতে পারে। এই এক শত বৎসরে কি হয়? বিদ্যা ঠিক উপযুক্ত হয় চার প্রকারে; বিদ্যাকে লাভ করা, নিজে তাহা পাঠ করা, অন্যকেও পাঠ করান, আর তাহাকে কাজে লাগান। এ অবস্থায় বিদ্যাকে পাইতেই আয়ু শেষ হইয়া যায়। অতএব এরূপে শিক্ষা করিলে চলে না। কিসে চলে? এমন সামান্য ও বিশেষ লক্ষণ করিতে হইবে যাহাতে অল্প যত্নে মহা-মহা-শব্দসমূহ বুঝিতে পারা যায়। ইহাই অনুসরণ করিয়া পাণিনি প্রভৃতির ব্যাকরণে শব্দসমূহের লক্ষণ দেখান হইয়াছে।

আজকাল আবার প্রশ্ন উঠিয়াছে—এই সমস্ত ব্যাকরণে যাহা বলা হইয়াছে, যে পদ্ধতি দেখান হইয়াছে, অবিকল তাহাই অনুসরণ করিতে হইবে, অথবা তাহা অপেক্ষা কোন উৎকৃষ্টতর পদ্ধতি থাকিলে ইহাই অবলম্বন করিতে হইবে? বিদ্যার্থীদের জন্য এই কথাটাই নিম্নলিখিত কয়েক পঙ্‌ক্তিতে একটু আলোচনা করিয়া দেখা যাইবে। এ লেখাটি বিশেষজ্ঞদের জন্য নহে।

এখানে সংস্কৃত ব্যাকরণের কথা আলোচিত হইতেছে, কিন্তু তাহা হইলেও ইংরাজী জানা ছাত্রদের আলোচনার সুবিধা হইবে ভাবিয়া দুইটি ইংরাজী ক্রিয়াপদের উপমা দিতেছি। সকলেই জানে *go* ধাতু হইতে present tense-এ *go*, past tense-এ *went*, ও past participle *gone*। এখানে যদি প্রশ্ন করা হয় *go* হইতে *went* কিরূপে হয়, তবে তাহার উত্তরে বলিতে হইবে *go* হইতে উহা হয় নাই, উহা হইতেছে ঐ একই গমন অর্থে প্রযুক্ত *wend* ধাতু হইতে, *go* ধাতুর past tense-এ প্রয়োগ নাই। বলা হয় *be* ধাতুর উত্তম পুরুষে (first person) present tense-এ *am*, past tense-এ *was*, past participle *been*। বুঝা যায় *be* হইতে *been* হইতে পারে, কিন্তু কিরূপে *am* ও *was* হইল? বলিতে হইবে এই তিনটি পদই স্বতন্ত্র তিনটি ধাতু হইতে হইয়াছে; যথা, (১) Aryan *es-*, Gk. L. O Teut. *es-*, Skt. *as-* (অস্), ইহার অর্থ 'হওয়া' ('to be'); (২) O Teut. *wes-*, Skt. *vas-* (বস্), ইহার অর্থ 'থাকা' ('to remain'); আর (৩) Gk. *phu-*, L. *fu-*, Skt. *bhū*, (ভূ) ইহার অর্থ 'হওয়া' ('to become'). ইহাদের মধ্যে *am* হইয়াছে (১) প্রথম ধাতু হইতে (Gk. *es-mi*, Skt. *as-mi*); *was* (ও *were* প্রভৃতি) হইয়াছে (২) দ্বিতীয় ধাতু হইতে; এবং *been* (ও *being*) হইয়াছে (৩) তৃতীয় ধাতু হইতে। যাঁহারা ইংরাজী ভাষা বা তাহার ব্যাকরণ ভাল করিয়া পড়িতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের এইরূপই বিচার করিয়া পাঠ করা উচিত। অন্যথা তাঁহাদিগকে বিশেষজ্ঞ বলা যাইতে পারে না।

উল্লিখিত পদগুলি আলোচনা করিলে বুঝা যাইবে যে, প্রত্যেকটি ধাতুর ব্যাকরণের সাধারণ নিয়মানুসারে যত রকম সম্ভব সমস্ত পদই ভাষায় প্রযুক্ত হয় নাই, বিশেষ-বিশেষ পদেরই প্রয়োগ হয়। তথাপি সাধারণ শিক্ষার্থীর সুবিধা হইবে ভাবিয়া কেবল অর্থের দিকে লক্ষ্য রাখিয়া

বৈয়াকরণগণ বস্তুত ভিন্ন-ভিন্ন ধাতুর পদকে একটি ধাতুরই পদ বলিয়া প্রচার করিয়া গিয়াছেন।

সংস্কৃতেও ঠিক এইরূপ। কোন-কোন ধাতুর পূর্ণ রূপাবলী বস্তুত না থাকিলেও তাহা দেখাইবার উদ্দেশ্যে উহার মধ্যে অপর ধাতুর পদ অতি কৌশলে ঢুকাইয়া দেওয়া হইয়াছে। ইহা আমরা পরে বিশদ ভাবে দেখিতে পাইব[১]।

ধাতুর ন্যায় নামেরও এইরূপ করা হইয়াছে। এক শব্দের রূপকে অন্য শব্দের রূপ বলিয়া দেখান হইয়াছে। ইহা করিতে গিয়া বলা হইয়াছে, ইহার স্থানে উহা আ দে শ হয়। আ দে শ শব্দের চলতি মানে 'হুকুম'। বলা হয়, গত্যর্থক √ই ধাতুর স্থানে গা আ দে শ হয়। কিন্তু আদেশ করিলেই যে উহা হইবে তাহা হয় না। ঈশ্বরও যদি আদেশ করেন যে, আগুন দিয়া কাপড়গুলি ভিজাইতে হইবে, তবে তাহাও হইবার নহে। তাই শত আ দে শ থাকিলেও √ই √গা হইবে না।

কোন-কোন পাঠক ব্যাকরণের আ দে শ কে এইরূপ 'হুকুম' মনে করিতে পারেন, কিন্তু বস্তুত তাহা নহে। কাহারো কাহারো মতে এতাদৃশ স্থলে আ দে শ শব্দের অর্থ 'বিকার'। 'বিকার' বলিতে অপর আকার বা অবস্থা। এই ব্যাখ্যা আংশিক ভাবে ঠিক। ইকার স্থানে যকার আদেশ হয়, অথবা যকার স্থানে ইকার আদেশ হয়, ইহা বলিলে ইকার বা যকারের যথাক্রমে যকার বা ইকার এই বিকার হইতে পারে, হয়। কিন্তু যদি বলা হয় যে, (গত্যর্থক) ই-ধাতু স্থানে গা আদেশ হয়, তবে কখনই তাহা হইতে পারে না। ইকারের বিকার গা ইহা একবারেই অসম্ভব। তাই কেহ-কেহ বলেন আ দে শে র অর্থ হইতেছে 'পাঠ'; অর্থাৎ ইকার-স্থানে যকার, বা যকার-স্থানে ইকার, কিংবা ই-ধাতু স্থানে √গা পাঠ করিতে হইবে। ইহা পূর্বের ব্যাখ্যা হইতে ভাল, কিন্তু একবারে ঠিক নহে। কেন ঐরূপ পাঠ করিব? ইহার সন্তোষজনক উত্তর নাই। পরে আমরা দেখিতে পাইব, কেবল একটা (কাল্পনিক) সুবিধা মনে করিয়া সংস্কৃতব্যাকরণসমূহে এইরূপ অনেক করা হইয়াছে। ইহাতে পাঠকবর্গের মনে শব্দের প্রকৃত ব্যুৎপত্তি সম্বন্ধে একটা ভ্রান্ত ধারণা বরাবর থাকিয়া যায়। ইহা সাধারণ পাঠকগণের পক্ষে ক্ষমা করা যাইতে পারিলেও যাঁহারা বিশেষজ্ঞ, অথবা বিশেষজ্ঞ বলিয়া অভিমান করেন, তাঁহাদের পক্ষে উহা ক্ষমার্হ বলিয়া মনে হয় না। নিম্নে আমরা এ বিষয়ে কিঞ্চিৎ আলোচনা করিয়া দেখি।

পাণিনির (৬.১.৬৩) ও অন্যান্য অনেকের ব্যাকরণে বলা হইয়াছে যে, দ্বিতীয়ার বহুবচন প্রভৃতিতে[২] পা দ প্রভৃতি শব্দের স্থানে প দ্ প্রভৃতি আদেশ হয়[৩]। এখানে পা দ ও প দ্ এই দুইটি স্বতন্ত্র শব্দ বলিলে কোন ক্ষতি দেখা যায় না। এইরূপ প দা তি, প দ গ, প দ্ধ তি প্রভৃতি (৬.৩.৫২-৫৪) শব্দে পা দ্ শব্দের যোগ দেখা অপেক্ষা যথাসম্ভব প দ ও প দ্ শব্দের যোগ দেখাই সঙ্গত। এই প্রকার দ ন্ত ও দ ৎ,[৪] না সা (না সি কা) ও ন স্ ইত্যাদিকে স্বতন্ত্র ভাবে ধরা যাইতে পারে। ইহাদের সম্বন্ধে যাহাই হউক, ঐ সূত্র অনুসারেই উ দ ক স্থানে উ দ ন্ আদেশ করিবার কারণ নাই। উ দ ন্ একটি যে জলবাচী স্বতন্ত্র শব্দ তাহা উ দ ন্ব ৎ (উ দ ন্-ব ৎ অর্থাৎ যাহাতে প্রচুর উ দ ন্ 'জল' আছে) এই পদ দেখিলেই বুঝা যায়। এইরূপ অন্য পদও আছে, যেমন, উ দ ন্ত (ঋ গ্বে দ, ২. ৭. ৩) 'জলযুক্ত'; উ দ ন্যা 'পিপাসা' (উপনিষৎ ও লৌকিক সংস্কৃতে), উ দ ন্যু 'জলপ্রার্থী' (ঋ গ্বে দ, ৫.৫৭.১); ইত্যাদি। তাই বলিতে হয়

১। সমস্ত ধাতুরই যে সমস্ত পদ ভাষায় পাওয়া যায় না, যাস্ক (নি রু ক্ত, ২. ২.) প্রথমে ইহা ধরিয়া দেন। তিনি বলেন, কোন কোন প্রদেশে ধাতু ক্রিয়ারই আকারে প্রযুক্ত হয়, আবার কোথাও কোথাও ধাতু হইতে উৎপন্ন নামপদ প্রযুক্ত হয়। যেমন কম্বোজ দেশে গত্যর্থক √শ ব্ ধাতু ক্রিয়ারূপে দেখা যায়, কিন্তু আর্যেরা শ ব এই পদ প্রয়োগ করেন। প্রাচ্য দেশসমূহে ছেদন-অর্থে √দা (দো) ধাতু ক্রিয়ারূপে প্রযুক্ত হয়, কিন্তু উদীচ্য দেশসমূহে দা ত্র এই নামপদ পাওয়া যায়। ইত্যাদি। পতঞ্জলিও (১. ১. ১.) এইরূপ বলিয়া গিয়াছেন।

২। পতঞ্জলি বলিবেন অন্যত্রও হয়।

৩। পদ্-দন্-নো-মাস্-হৃন্-ছস্ প্রভৃতিষু।

৪। দ ন্ত স্থানে দ ৎ আদেশ করিতে গিয়া পাণিনিকে অন্যান্য আরও চারিটি সূত্র করিতে হইয়াছে :— বয়সি দন্তস্য দতৃ। ছন্দসি চ। স্ত্রিয়াং সংজ্ঞায়াম্। বিভাষা শ্যাবারোকাভ্যাম্। ৫. ৪. ১৪১—১৪৪।

উদবাহ, উদবাস, উদকুম্ভ, উদমন্থ, ইত্যাদি (৬.৩.৫৭-৬০) শব্দে উদ- হইয়াছে উদন্ হইতে উদক হইতে নহে।

ঐ সূত্রেই (৬.১.৬৩) হৃদয় শব্দ স্থানে হৃদ্ আদেশ করা হইয়াছে। ইহারও কোন প্রয়োজন ছিল না। মনে হয়, প্রথমা বিভক্তি ও দ্বিতীয়া বিভক্তির এক ও দ্বিবচনে ইহার রূপ না পাওয়ায় বৈয়াকরণেরা এইরূপ করিয়াছেন। ভাষায় সুহৃদ্ ও সুহৃদয়, এবং দুর্হৃদ্ ও দুর্হৃদয় উভয়ই দেখিতে পাওয়া যায়। এখানে বলা হইয়াছে, হৃদয় শব্দের স্থানে হৃদ্ আদেশ করিয়া সুহৃদ্ ও দুর্হৃদ হইয়াছে।[৫]

আরো বলা হইয়াছে যে, পরে যদি লেখ, ও লাস শব্দ, অথবা য (দ) ও অ (ণ্) প্রত্যয় থাকে তবে হৃদয় শব্দ হৃদ্ হইয়া যায় ("হৃদয়স্য হৃল্লেখযদণ্লাসেষু" ॥ ৬. ৩. ৫০) তদনুসারে হৃদয়লেখ হইতে হৃল্লেখ, হৃদয়লাস হইতে হৃল্লাস, হৃদয়-য হইতে হৃদ্য, এবং হৃদয়-অ হইতে হার্দ। এইরূপ হৃদয়শোক হইতে হৃচ্ছোক, হৃদয়রোগ হইতে হৃদ্রোগ, সুহৃদয়-য হইতে সৌহার্দ্য (৬. ৩. ৫১)। এরূপ বুৎপত্তির যুক্তি পাওয়া যায় না।

হৃদ্ ও হৃদয়, এই দুইটি যে স্বতন্ত্র শব্দ পরবর্তী কালে ইহা দেখান হইয়াছে। আমরা অমরকোশে (১. ৫. ৩১) পাই—"চিত্তং তু চেতো হৃদয়ং স্বান্তং হৃন্ মানসং মনঃ।" কাশিকাকারও (৬. ৩. ৫১) লিখিয়াছেন—"হৃদয়শব্দেন সমানার্থো হৃচ্ছব্দঃ প্রকৃত্যন্তরমস্তি। তেনৈব সিদ্ধে বিকল্পবিধানং প্রপঞ্চার্থম্।"

শিরস্ (পরবর্তী কালে কথন কথন শির), শীর্ষন্, ও শীর্ষ এই তিনটি শব্দেরই প্রয়োগ বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে আছে। এ অবস্থায়, যাহার আদিতে যকার আছে এমন তদ্ধিত প্রত্যয় পরে থাকিলে শিরস্ শব্দের স্থানে শীর্ষন্ আদেশ হয়,[৬] ইহা বলার কোন প্রয়োজন দেখা যায় না। অথবা উহার সহিত যে জুড়িয়া দেওয়া হইয়াছে—চুল বুঝাইলে শিরস্ শব্দের বিকল্পে শীর্ষন্ আদেশ হইবে;[৭] অথবা স্বর পরে থাকিলে তাহার স্থানে শীর্ষ আদেশ হয়;[৮] কিংবা বেদে তাহার স্থানে শীর্ষ হয়;[৯] —তাহারও কোন প্রয়োজন নাই।

ক্রোষ্টু আর ক্রোষ্টৃ একই ধাতু (√ক্রুশ্) হইতে বিভিন্ন প্রত্যয়ের (যথাক্রমে -তু ও -তৃ) যোগে দুইটি বিভিন্ন শব্দ। তথাপি এই দুইটিকে জুড়িয়া এক করিয়া দেওয়া হইয়াছে।[১০] এইরূপ করিবার ইহাই মূল যে ক্রোষ্টু শব্দের প্রথমায় ও দ্বিতীয়ার এক ও দ্বিবচনে প্রয়োগ না থাকিলেও ব্যাকরণকার একটি সমগ্র শব্দরূপ দিবার ইচ্ছা করিয়াছিলেন। ভাষায় স্ত্রীলিঙ্গে ক্রোষ্টু শব্দের মোটেই কোন প্রয়োগ না থাকায়, তাহার স্থানে ক্রোষ্টু শব্দেরই ক্রোষ্ট্রী রূপের বিধান করা হইয়াছে।[১১] এরূপ না করাই ঠিক ছিল।

ব্যাকরণে বলা হইয়াছে, তৃতীয়া হইতে সপ্তমী পর্যন্ত বিভক্তির কোন স্বর পরে থাকিলে অস্থি, দধি, সক্থি, ও অক্ষি এই কয়টি শব্দের শেষে অন্ আদেশ হয়, অর্থাৎ এই কয়টি শব্দ যথাক্রমে অস্থন্, দধন্, সক্থন্, ও অক্ষন্ হয়।[১২] বস্তুত ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন নাই, কেননা যেমন অস্থি, দধি, সক্থি, ও অক্ষি শব্দ আছে, সেইরূপ ঠিক ঐ অর্থেই যথাক্রমে অস্থন্, দধন্, সক্থন্, ও অক্ষন্ শব্দও আছে। তাই বাধ্য হইয়া আর একটি সূত্র[১৩] রচনা করিয়া ব্যাকরণকারকে প্রকারান্তরে ইহা স্বীকার

৫। সুহৃদ্দুর্হৃদৌ মিত্রামিত্রয়োঃ। পাণিনি, ৫. ৪. ১৫০।

ভাষার প্রয়োগ দেখিয়া পাণিনি এখানে বলিয়াছেন যে, 'মিত্র' অর্থাৎ বন্ধু বুঝাইলে সুহৃদ্, আর 'অমিত্র' অর্থাৎ শত্রু বুঝাইলে দুর্হৃদ্। যাঁহার হৃদয় ভাল তিনি সুহৃদয়, আর যাঁহার হৃদয় খারাপ তিনি দুর্হৃদয়। ইঁহারা যথাক্রমে বন্ধু ও শত্রু নাও হইতে পারেন।

৬। শীর্ষংশ্ছন্দসি। যে চ তদ্ধিতে। ৬. ১. ৬০—৬১।

৭। বা কেশেষু (যথা শীর্ষণ্যাঃ কেশাঃ, শিরস্যাঃ কেশাঃ)। ঐ সূত্রেরই বার্তিক ২।

৮। অচি শীর্ষঃ। ঐ সূত্রের বার্তিক ৩।

৯। ছন্দসি চ। ঐ সূত্রের বার্তিক, ৪।

১০। তৃজ্বৎ ক্রোষ্টুঃ। বিভাষা তৃতীয়াদিষচি। ৭. ১, ৯৫, ৯৭।

১১। স্ত্রিয়া চ। ৭. ১. ৯৬।

১২। অস্থিদধিসক্থ্যক্ষ্ণামনঙুদাত্তঃ। ৭. ১. ৭৫।

১৩। ছন্দস্যপি দৃশ্যতে। ৭. ১. ৭৬।

করিতে হইয়াছে। "ইন্দ্রো দধীচো অস্থভিঃ (ঋগ্বেদ, ১.৮৪.১৩)। এখানে অস্থভিঃ হইয়াছে অস্থন্ শব্দ হইতে। "অস্থন্বন্তং যদ্ অনস্থা বিভর্তি" (১.১৬৪.৪)। এখানে প্রথম ও তৃতীয় পদটি অস্থন্ হইতে। এইরূপ দধন্বৎ ("অচ্ছিদ্রসা দধন্বতঃ"—৬. ৪৮. ১৮); সক্থানি (৫.৬১.৩); অক্ষন্বৎ ("অক্ষন্বন্তঃ কর্ণবন্তঃ সখায়ঃ" —১০.৭১.৭; "ভদ্রং পশ্যেম অক্ষভিঃ" —১.৪৯.৮)।

সংস্কৃত সাহিত্য আলোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যাইবে উহাতে একই অর্থে (১) পথ্, (২) পথি, ও (৩) পন্থন্ এই তিনটি পৃথক্ শব্দ আছে। (১) পথ্ হইতে হইতে পথঃ, পথা ইত্যাদি; (২) পথি হইতে পথিভ্যাং ইত্যাদি;[১৪] এবং (৩) পন্থন্ হইতে পন্থানম্ ইত্যাদি।[১৫] কিন্তু এই সবকেই এক জায়গায় গাঁথিয়া কৃত্রিম উপায়ে পদ সমূহের সাধন প্রণালী দেখান হইয়াছে।[১৬]

একই ধাতু (√জৃ 'বয়োহানি', হইতে উৎপন্ন হইলেও প্রত্যয়ের ভেদে জরা ও জরস্ শব্দ ভিন্ন। রূপও ইহাদের ভিন্ন ভিন্ন। তথাপি বলা হইয়াছে [১৭] স্বরাদি বিভক্তি পরে থাকিলে জরা শব্দের স্থানে বিকল্পে জরস্ আদেশ হয়।

মঘবন্ ও মঘবৎ এই দুইটি শব্দও প্রত্যয়ের ভেদে (-বন্ ও -বৎ) ভিন্ন, তথাপি বলা হইয়াছে বহু স্থলে প্রথমটির স্থানে দ্বিতীয়টি আদেশ হয়।[১৮] মাঘবতী অথবা মাঘবত হইয়াছে মঘবন্ হইতে, ইহা বলা ঠিক নহে।

অর্বন্ ও অর্বৎ শব্দকেও একত্র যোগ করিয়া দেওয়া হইয়াছে।[১৯] অর্বন্ হইতে অর্বাণৌ হয়, কিন্তু অবন্তৌ হইতে পারে না।

পূর্বেই বলিয়াছি ও প্রাচীন আচার্যদের কথা উল্লেখ করিয়া দেখাইয়াছি যে, সব ধাতুরই সব পদ ভাষায় পাওয়া যায় না। তথাপি বৈয়াকরণেরা বহু ধাতুর সমগ্র রূপাবলী দেখাইবার জন্য এমন অনেক কল্পনা করিয়াছেন যাহা সমর্থন করা চলে না। এই সমস্ত কল্পনায় সাধারণ পাঠকেরা সহজেই ভ্রমে পতিত হন। আরো কয়েকটি উদাহরণ দেওয়া যাউক। গত্যর্থক √ই ধাতুর লুঙ্ লকারে, ণিজন্তে ও সনন্তে প্রয়োগ নাই, ইহা স্পষ্ট না বলিয়া বলা হইল যে, লুঙ্ লকারে ঐ ধাতুর স্থান √গা আদেশ হয় (২. ৪. ৪৫)।[২০] আর যদি 'অববোধন' (বুঝান) অর্থ বুঝায় তাহা হইলে ণিজন্ত ও সনন্তে তাহার স্থানে √গম্ আদেশ হয় (২. ৪. ৪৬ - ৪৭)।[২১] কিন্তু গময়তি ও জিগমিষতি পদ √গম্ ধাতুরই, √ই ধাতুর নহে, ইহা বলিলে কোন ক্ষতি হইত না।[২২]

এইরূপ আর্ধধাতুকে 'হওয়া' অর্থে √অস্ ধাতুর স্থানে √ভূ (২. ৪. ৫২)[২৩], 'বলা' অর্থে √ব্রূ ধাতুর স্থানে √বচ্ (২. ৪, ৫৩)[২৪], ও √চক্ষ্ ধাতুর স্থানে √খ্যা (২. ৪. ৫৪),[২৫] গত্যর্থক √অজ্ ধাতু স্থানে √বী (২. ৪. ৫৬—৫৭)[২৬], এবং 'ভোজন' অর্থে √অদ্ ধাতু স্থানে লিট্-প্রভৃতিতে √ঘস্ আদেশ (২.৪.৩৮-৪০)[২৭] সঙ্গত নহে।

√পা স্থানে পিব্, √ঘ্রা স্থানে জিঘ্র, √স্থা স্থানে তিষ্ঠ আদেশ হয় (৭.৩. ৩৮), ইহা না বলিয়া ঐ কয়টি ধাতু অভ্যস্ত বা দ্বিরুক্ত হয় ইহা বলিলেই ঠিক হইত।

১৪। পথি হইতে বৈদিক ভাষায় প্রথমার বহুবচনে পথয়ঃ, এবং ষষ্ঠীর বহুবচনে পথীনাং পদ পাওয়া যায়।

১৫। আবার পথ শব্দও আছে যেমন পথেস্থা (৫. ৫০. ৩; ১০. ৪০. ১৩) 'যে পথে থাকে'। অতি প্রাচীন ভাষায় (ঋগ্বেদে) আমরা পন্থা শব্দও পাই বস্তুত ইহা হইতে প্রথমার একবচনে পন্থাঃ, বহুবচনেও পন্থাঃ, এবং দ্বিতীয়ার একবচনে পন্থাম্ পদ পাওয়া যায়।

১৬। পাণিনি, ৭. ১. ৮৫-৮৮।

১৭। জরায়া জরস্ অন্যতরস্যাম্। ৭. ২. ১০১।

১৮। মঘবা বহুলম্। ৬. ৪. ১২৮।

১৯। অর্বণস্ত্রসাবনঞঃ। ৬. ৪.১২৭।

২০। ইণো গা লুঙি।

২১। ণৌ গমিরবোধনে। সনি চ।

২২। অধ্যয়নার্থক √ ইধাতুরও সম্বন্ধে এইরূপ। ইঙশ্চ। গাঙ্ লিটি। বিভাষা লুঙ্লঙোঃ। ণৌ চ সংশ্চঙোঃ। ২. ৪. ৪৮-৫১।

২৩। অস্তের্ভূঃ। কিন্তু বৈদিক ভাষায় লিটে আস, আসতুঃ; আসুঃ, ইত্যাদি প্রসিদ্ধ। আবার লৌকিক সংস্কৃতে ঈহাম্-আস্ ইত্যাদিও সুপ্রসিদ্ধ।

২৪। ব্রুবো বচিঃ।

২৫। চক্ষিঙঃ খ্যাঞ্। বা লিটি। ২. ৪. ৫৫।

২৬। অজের্ব্যঘঞপোঃ। বা যৌ।

২৭। অদো জগ্ধির্ল্যপ্তি কিতি। লুঙ্সনোর্ঘস্ৢ। ইত্যাদি।

ধাতুপাঠে ও ব্যাকরণে জক্ষ্, জাগৃ, দরিদ্রা, চকাস্ (দীধী ও বেবী) এই কয়টিকে স্বতন্ত্র ধাতু স্বীকার করিয়া ইহাদিগকে অভ্যস্ত সংজ্ঞা দেওয়া হইয়াছে (৬.১.৬)[২৮]। কিন্তু অভ্যস্ত সংজ্ঞা কেন? অভ্যস্ত বলিলেই তো হইত। √ঘস্ ধাতুর অভ্যাস বা দ্বিত্ব করিয়া জক্ষ্; এইরূপ √গৃ হইতে জাগৃ, √দ্রা হইতে দরিদ্রা, √কাস্ হইতে চকাস্, (√ধী হইতে √দীধী, √বী হইতে বেবী) ইহা বলিলেই চলিত। জক্ষ্ প্রভৃতিকে আমরা ধাতু বলিতে পারি না। কারণ শব্দের যে অংশকে আর ভাগ করা চলে না তাহাকেই আমরা ধাতু বলি। কিন্তু জক্ষ্ প্রভৃতিকে ভাগ করা চলে। ইহাদের অন্তর্গত √শাস্ ধাতুর অভ্যস্ত সংজ্ঞা সমর্থন করা যাইতে পারে।

বলা হইয়াছে √দৃশ্ স্থানে পশ্য (<√স্পশ্) আর √সৃ স্থানে ধাব আদেশ হয় (৭.৩.১৮), কিন্তু √স্পশ্ ও √ধাব্ স্বতন্ত্র স্বতন্ত্র ধাতু। √স্পশ্ হইতে স্পষ্ট, স্পশ ('চর'), ও পস্পশা (ব্যাকরণ-মহাভাষ্যের প্রথম আহ্নিক) পদ লৌকিক সংস্কৃতে আমাদের পরিচিত। √ধাব্ ধাতুও সকলের জানা। √দা হইতে দদাতি প্রভৃতি হইতে পারে, ইহার স্থানে যচ্ছ আদেশ সঙ্গত মনে হয় না, ইহা হইতেছে √যম্ হইতে, যেমন √গম্ হইতে হইয়াছে গচ্ছতি। কি করিয়া এখানে চ্ছ দেখা দিল তাহা এখানে ব্যখ্যা করিয়া কাজ নাই; উহা ভাষাতত্ত্বের বিষয়, তাহা আমরা আলোচনা করিতেছি না।

√বধ্ ধাতুর পদ বৈদিক[২৯] ও লৌকিক সংস্কৃতে যথেষ্ট পাওয়া যায়। √হন্ ধাতুও খুব প্রসিদ্ধ। তাহা হইলেও √হন্ ধাতুর স্থানে কখন কখন[৩০] √বধ আদেশ করা হইয়াছে।

বৈয়াকরণগণ বলেন, অ (নঞ্), দুস্, ও সু শব্দের সহিত বহুব্রীহি সমাস হইলে প্রজ্ঞা ও মেধা শব্দ যথাক্রমে প্রজস্ ও মেধস্ হয়।[৩১] যেমন সুপ্রজস্, সুমেধস্ ইত্যাদি। ইহা বলিবার কোন প্রয়োজন ছিল না। কেননা যেমন প্রজ্ঞা শব্দ আছে, তেমনি প্রজস্ শব্দও আছে, সেইরূপ যেমন মেধা শব্দ আছে, তেমনি মেধস্ শব্দও আছে। পাণিনি নিজে ইহা লক্ষ্য করিয়াছিলেন, ঋগ্বেদে (১, ১৬৮, ৩২) আছে বহুপ্রজস্ ("বহুপ্রজা নির্ঋতিমাবিবেশ")।[৩২]

এইরূপ ধর্ম ও ধর্মন্ ("তানি ধর্মাণি প্রথমান্যাসন্"; "অতো ধর্মাণি ধারয়ন্,"—ঋগ্বেদ, ১. ২২. ১৮ ই; ইত্যাদি ইত্যাদি) উভয়ই আছে। প্রিয়ধর্মন্, কল্যাণ-ধর্মন্ ইত্যাদি স্থলে ধর্মন্ শব্দেরই সহিত সমাস, ধর্ম শব্দের সহিত নহে। অতএব এরূপ স্থলে ধর্ম শব্দের পর অন্ প্রত্যয় হয়,[৩৩] ইহা বলিবার কোন কারণ নাই।

গাভীর 'পালান' অর্থে উধস্ ও উধন্[৩৪] এই উভয় শব্দই যখন পাওয়া যায় তখন বহুব্রীহি সমাসে উধস্ শব্দ স্থানে উধন্ আদেশ হয়,[৩৫] ইহা না বলিলেই ভাল হইত।

'ধনু' অর্থে ধনুস্ ও ধন্বন্ শব্দ বৈদিক ও লৌকিক সংস্কৃতে চলে। অতএব বহুব্রীহি সমাসে ধনুস্ শব্দ স্থানে ধন্বন্ আদেশ হয়।[৩৬] এইরূপ বলার কোন লাভ নাই, বরং ক্ষতি আছে।

২৮। জক্ষিত্যাদয়ঃ ষট্।

২৯। বধতি, বধেৎ, ইত্যাদি।

৩০। হনো বধো লিঙি। লুঙি চ। ২. ৪. ৪২-৪৪।

৩১। কথাটা ঠিক এইরূপ না হইলেও যাহা বলা গিয়াছে তাহার তাৎপর্য এইরূপ। মূল কথাটি এই—নিত্যমসিচ্ প্রজামেধয়োঃ। ৫. ৪. ১২২। পূর্বসূত্রের অনুবৃত্তি—নঞ্ দুস্-সুভ্যঃ।

৩২। বহুপ্রজশ্ছন্দসি। ৫. ৪. ১৩২।

৩৩। ধর্মাদনিচ্ কেবলাৎ। ৫. ৪. ১২৪। ঠিক এইরূপেই জম্ভ ও জম্ভন্ উভয় শব্দই আছে বলিলে পরবর্তী সূত্রটির (জম্ভা সুহরিতৃণসোমেভ্যঃ। ৫. ৪. ১২৫) প্রয়োজন হইত না।

৩৪। ঋগ্বেদ, ১. ১৫২. ৬; ইত্যাদি অনেক। বৈদিক ভাষায় কখন-কখন আবার উধর্ শব্দও পাওয়া যায়।

৩৫। উধসোঽনঙ্। ৫. ৪. ১৩১।

৩৬। ধনুষশ্চ। ৫. ৪. ১৩২॥ সংজ্ঞা বুঝাইলে এই বিধান বৈকল্পিক (বা সংজ্ঞায়াম্। ৫. ৪. ১৩৩।)। তাই শতধন্বঃ ও শতধন্বা দুইই হইতে পারে।

ব্যাকরণে[৩৭] বলা হইয়া থাকে উর্ধ্ব শব্দ স্থানে উপ হয়, আর তাহার পর -রি ও -স্তাৎ প্রত্যয় হওয়ায় যথাক্রমে উপরি ও উপরিষ্টাৎ পদ হইয়া থাকে। দুয়ের ও অধিকের মধ্যে কোনটি বেশী নীচে হইলে তাহাকে যেমন যথাক্রমে অধর ও অধম, অথবা অবর ও অবম বলা হয়, এইরূপ উঁচু বুঝাইতে হইলে যেমন যথাক্রমে উত্তর ও উত্তম বলা হয়, তেমনি যথাক্রমে উপর ও উপম শব্দও হয় উপ শব্দ হইতে। উর্ধ্বের সহিত এখানে কোন যোগ নাই। উপর হইতে উপরি, ইহা হইতে উপরিষ্টাৎ। সম্ভবত উপরে হইতে উপরি, যেমন বেদে অস্তে হইতে অস্তি।

বলা হয় পশ্চাৎ পদটি নিপাতনে সিদ্ধ। বিশেষ করিয়া বলা হয়, অপর শব্দের স্থানে পশ্চ হয়, এবং তাহার পর আৎ প্রত্যয়ে পশ্চাৎ হইয়া থাকে।[৩৮] আরও বলা হয় যে, অর্ধ শব্দ পরে থাকিলেও অপর হইয়া থাকে পশ্চ।[৩৯] এবং এইরূপে হয় পশ্চার্ধ। এ সবই কল্পনা-মাত্র। বস্তুত পশ্চ একটি মূল শব্দ, ইহারই পঞ্চমীর এক বচনে পশ্চাৎ। পশ্চ শব্দ বৈদিক ও লৌকিক উভয় সংস্কৃতেই প্রসিদ্ধ। বেদে ইহার তৃতীয়ার এক বচনে হয় পশ্চা।[৪০] পশ্চ হইতে পশ্চিম হয়। এই পদ আমাদের সকলেরই জানা। কিন্তু কিরূপে ইহা হইল? বার্তিককার বলিলেন পশ্চাৎ শব্দের উত্তর ইম ("ডিমচ") প্রত্যয় করিয়া।[৪১] একটা উত্তর দেওয়া হইল, কিন্তু ঠিক উত্তর ইহা নহে। আসল কথা হইতেছে এই যে, ইহা পশ্চ শব্দের উত্তর (পশ্চাৎ শব্দের উত্তর নহে) ম (-ইম) প্রত্যয়ের যোগে হইয়াছে।

সংস্কৃতে বলা হয় 'উত্তরাদ্ বসতি', 'দক্ষিণাদ্ বসতি'। ইহাদের অর্থ যথাক্রমে 'উত্তর দিকে বাস করিতেছে' ও 'দক্ষিণ দিকে বাস করিতেছে।' উত্তরাৎ ও দক্ষিণাৎ কি করিয়া হইল? বলা হইয়া থাকে এখানে উত্তর ও দক্ষিণ শব্দের উপর আৎ প্রত্যয় করা হইয়াছে। অধরাৎ শব্দ সম্বন্ধেও এই কথা।[৪২] ইহা না বলিলেই ভাল হইত। বস্তুত ঐ পদগুলি পঞ্চমী বিভক্তির এক বচনে হইয়াছে। প্রয়োগ-অনুসারে উহাদের অর্থ ব্যাখ্যা করিলেই পর্য্যাপ্ত হইত। বলিতে পারা যায় যে, যদিও ঐ সমস্ত পদ পঞ্চমীর এক বচনে হইয়াছে, তথাপি কোন কোন স্থানে তাহারা পঞ্চমীর ন্যায় প্রথমা ও সপ্তমীরও অর্থ প্রকাশ করিয়া থাকে।

বলা হয় 'দক্ষিণেন (এইরূপ উত্তরেণ, অধরেণ) বসতি' অর্থাৎ 'দক্ষিণ দিকে (উত্তর দিকে, নীচের দিকে) বাস করিতেছে।' এখানে দক্ষিণেন কিরূপে হইল? উত্তর দেওয়া গিয়াছে দক্ষিণ শব্দের উত্তর এন প্রত্যয়ের যোগে।[৪৩] বস্তুত এইরূপ স্থলেও দক্ষিণেন ইত্যাদি তৃতীয়ার এক বচনে। সপ্তমীর অর্থে তৃতীয়ার প্রয়োগ পালি ও প্রাকৃতেও প্রচুর।

'দক্ষিণা বসতি,' 'উত্তরা বসতি' ('দক্ষিণ দিকে বাস করিতেছে, উত্তর দিকে বাস করিতেছে')। এইরূপ স্থলে দক্ষিণা, উত্তরা পদ কিরূপে হয়? এই প্রশ্নের উত্তরে বলা হইয়া থাকে, এখানে ঐ দুই শব্দের পরে আ প্রত্যয় হইয়াছে।[৪৪] কিন্তু বস্তুত এখানেও ঐ দুই পদ তৃতীয়ার এক বচনে হইয়াছে। অথবা বলিতে পারা যায় উহা দক্ষিণা ও উত্তরা শব্দের সপ্তমী বিভক্তির পদ, যেমন ব্যোমনি অর্থে ব্যোমন্ (সুপাং সুলুক্‌॥ ৭. ১. ৩৯॥) অবশ্য ইহা বৈদিক প্রয়োগ। আমার মনে হয় এখানেও বৈদিক প্রয়োগই চলিয়া আসিয়াছে।

কখন কখন প্রয়োগ করা হইয়া থাকে 'দক্ষিণাহি বসতি,' 'উত্তরাহি বসতি' (দক্ষিণ দিকে বাস করিতেছে,

---

৩৭। উপর্য্যুপরিষ্টাৎ। ৫. ৩. ৩১। উর্ধ্বস্যোপভাবো রিলিষ্টাতিলৌ চ।"— ঐ মহাভাষ্য।

৩৮। পশ্চাৎ। ৫. ৩. ৩২। এই সূত্রেরই বার্তিকে উক্ত হইয়াছে—"অপরস্য পশ্চভাব আতিশ্চ প্রত্যয়ঃ।"

৩৯। "অর্ধে চ। অর্ধে চ পরতোঽপরস্য পশ্চভাবো বক্তব্যঃ।" ঐ মহাভাষ্য।

৪০। পশ্চা দঘ্যা যো অঘস্য ধাতা। ঋগ্বেদ, ১. ১২৩. ৫।

৪১। অগ্রাদিপশ্চাড্ ডিমচ্ স্মৃতঃ। অন্তাচ্চেতি বক্তব্যম্। — ৪. ৩. ২৩।

৪২। উত্তরাধরদক্ষিণাদাতিঃ। ৫. ৩. ৩৪।

৪৩। এনবন্যতরস্যামদূরেঽপঞ্চম্যাঃ। ৫. ৩. ৩৫। এই সূত্র অনুসারেই অন্যত্র বলিতে হইয়াছে "এনপা দ্বিতীয়া। ২. ৩. ৩১।

৪৪। দক্ষিণাদাচ্। ৫. ৩. ৩৬। উত্তরাচ্চ। ৫. ৩. ৩৮।

উত্তর দিকে বাস করিতেছে)। ব্যাকরণে বলা হইয়াছে দক্ষিণ ও উত্তর শব্দের পরে আহি প্রত্যয় করিয়া ঐ পদ দুইটি হইয়াছে।[৪৫] কিন্তু মনে করা যাইতে পারে যে, তৃতীয়ার এক বচনে (অথবা পূর্বোক্তরূপে সপ্তম্যর্থে) নিষ্পন্ন দক্ষিণা ও উত্তরা শব্দের পর হি শব্দ যোগ করায় ঐ পদ দুইটি হইয়াছে। পূর্বে দক্ষিণা ও উত্তরা শব্দ স্বতন্ত্র ছিল, হি শব্দও স্বতন্ত্র ছিল, পরে আর স্বতন্ত্র গণ্য না হইয়া তাহারা যথাক্রমে দক্ষিণাহি, উত্তরাহি এইরূপ এক-একটি শব্দে পরিণত হইয়াছে। এইরূপ দৃষ্টান্ত অনেক আছে। ন আর হি (উভয়ই উদাত্ত) দুইটি স্বতন্ত্র পদ, কিন্তু বৈদিক ভাষাতেই দেখা যায় নহি একটি পদ হইয়া গিয়াছে। একটি পদ হইয়াছে ইহার প্রমাণ এই যে, নহি শব্দের কেবল হি হইতেছে উদাত্ত। (একটি পদের মধ্যে একটি মাত্র স্বর উদাত্ত হয়।) এইরূপ ন ও ইদ্ (উভয়ই উদাত্ত) একত্র মিলিয়া নেদ্ হইয়া গিয়াছে। লৌকিক সংস্কৃতের চেদ্ (চেৎ) হইতেছে বস্তুত চ ও ইদ্ এই উভয়ের যোগে। উত্তর শব্দের উকার ছিল উদাত্ত, কিন্তু উত্তরাহি শব্দের কেবল আকার উদাত্ত। ইহাতে বুঝা যায় এই শব্দটি একটি পদ, স্বতন্ত্র দুইটি পদ নহে। দক্ষিণাহি সম্বন্ধেও এইরূপ বুঝিতে হইবে।

ব্যাকরণে বলা হইয়াছে যে, পূর্ব, অধর, ও অবর শব্দের উত্তর অস্ ও অস্তাৎ প্রত্যয় হয়, এবং তাহা হইলে উহাদের স্থানে যথাক্রমে পুর্, অধ্, ও অবস্ আদেশ হয়।[৪৬] এখানে বক্তব্য এই যে, যদি তাহার দি লক্ষ্য করা যায় তবে দেখিতে পাওয়া যাইবে, অস্তা ('অস্তাতিঃ') প্রত্যয় না বলিয়া আমাদের তাৎ (অ ব্যাকরণের রীতিতে তাতি) প্রত্যয় বলা উচি নিম্নলিখিত প্রয়োগগুলি লক্ষ্য করিলেই ইহা বুঝা যাইবে প্রাক্তাৎ, উদক্তাৎ তাবৎতাৎ; আ আরাৎতাৎ, উত্তরাৎতাৎ, পরাকাৎতা আবার পশ্চাৎতাৎ। আমরা ইহাও পাই—পুরস্তা অধস্তাৎ, অবস্তাৎ; তা ছাড়া পরস্তাৎ, বহিষ্টা আর ইহারই সাদৃশ্যে উপরিষ্টাৎ। পুরস্, অধস্, অবস্ (বৈদিক) প্রসিদ্ধ, পরস্ শব্দও প্রসিদ্ধ (যে লৌকিক সংস্কৃতে পরঃশত, পরঃসহস্র শব্দে), বহি শব্দও সকলের জানা। ইহাদের উত্তর -তাৎ প্র করিলে ঐ পূর্বোক্ত পদগুলি সিদ্ধ হয়। পুরস্, অধ ও অবস্ না ধরিয়া যথাক্রমে পুর্-অস্, অধ্- ও অব্-অস্ কল্পনাটা বড় বেশী বলিয়া মনে হয়। পুর্-অস্ ইহার অনুকূলে বোধ হয় কিছু বলা তুলনীয়—পুরা (পুর্-আ), পুর্ব (পুর্-ব অধ ও অধস্ দুই রূপই আছে। অধর, অধম দুই শব্দে আমরা অধ পাই। তেমনি অব ও অ দুইই আছে। অবর ও অবম শব্দে অব পাওয়া য তা ছাড়া অব উপসর্গ সুপ্রসিদ্ধ।

এবার এখানেই শেষ করা যাউক। বারান্তরে আ কিছু আলোচনা করিবার ইচ্ছা থাকিল।

৪৫। আহি চ দূরে। ৫.৩.৩৭। উত্তরাচ্চ। ৫.৩.৩৮।

৪৬। পূর্বাধরাবরাণামসি পুরধবশ্চৈষাম্। অস্তাতি বিভাষাবরস্য। ৫.৩.৩৯-৪১।



নুটু মোক্তারের সওয়াল

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

ইন্দ্রপ্রস্থে রাজসূয় যজ্ঞের সমারোহের মধ্যে কুরুক্ষেত্রের সূচনা হইয়াছিল, ত্রেতায় লঙ্কাকাণ্ডের সূচনাও রামচন্দ্রের যৌবরাজ্যে অভিষেকের সমারোহের মধ্যে। পুষ্পদলের মধ্যকমলনিবাসী কীটের মত এক একটা সমারোহের আনন্দ-কোলাহলের অন্তরালে লুকাইয়া থাকে অশান্তির সূচনা। কঙ্কণা গ্রামেও একটি অনুরূপ ঘটনা ঘটিয়া গেল। কঙ্কণা গ্রামের ধনী অধিবাসীদের দানে দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল, তাহারই উদ্বোধন-অনুষ্ঠানের সমারোহ উপলক্ষে নুটু মোক্তারের সহিত কঙ্কণার বাবুদের বিবাদ বাধিয়া উঠিল।

বর্দ্ধিষ্ণু গ্রাম কঙ্কণা, কঙ্কণার ধনের প্রসিদ্ধি এ দেশে বহু বিস্তৃত এবং বহু প্রসিদ্ধ। দূর হইতে কঙ্কণার দিকে তাকাইলে কঙ্কণাকে পল্লীগ্রাম বলিয়া মনে হয় না; কোন বিশিষ্ট শহরের অভিজাত পল্লী বলিয়া মনে হয়। বহুকাল হইতে প্রবাদ চলিয়া আসিতেছে যে, কঙ্কণায় না কি মা-লক্ষ্মী বাঁধা আছেন। কোন অতীত কালে মা-লক্ষ্মী ঐ পথ দিয়া যাইতেছিলেন; সহসা তাঁহার হাতের কঙ্কণ খসিয়া পথের ধুলার মধ্যে পড়িয়া যায়, সেই কঙ্কণের মমতায় আজও তিনি কঙ্কণা গ্রামের মধ্যে ঘুরিতেছেন। কঙ্কণ হইতেই গ্রামের নাম কঙ্কণা।

প্রবাদ চিরকাল প্রবাদই, কিন্তু প্রবাদ রটিবার একটা হেতু সর্ব্বত্রই থাকে, এ ক্ষেত্রেও হেতু একটা আছে। কঙ্কণা গ্রামের মুখুজ্জেরা বাংলা দেশের মধ্যে খ্যাতিমান্ ধনী। বাংলার বহু স্থানেই তাঁহাদের টাকা ছড়ান আছে। বহু জমিদার-পরিবারই মুখুজ্জেদের ঋণদায়ে আবদ্ধ। তাহার উপর মুখুজ্জেরা নিজেরাও জমিদার।

মুখুজ্জে-পরিবার এখন জনে বহুবিস্তৃত কিন্তু তাহাতেও তাহাদের ধনের পরিমাণ কমে নাই। সন্ততিবৃদ্ধির সঙ্গে সঙ্গে সুদও সমানে বাড়িয়া চলিয়াছে। লোকে অবশ্য বলে, মুখুজ্জেদের সিন্দুকে টাকার বাচ্চা হয়, কিন্তু সেটাও প্রবাদ। কঙ্কণার বাবুদের সুদের কারবার লক্ষ লক্ষ টাকার।

কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা, এমন একখানি ধনীর গ্রাম তবুও গ্রামের মধ্যে না-আছে স্কুল, না-আছে ডাক্তারখানা, এমন কি হাট-বাজার পর্য্যন্ত নাই। থাকিবার মধ্যে আছে খান-দুই মিষ্টির দোকান, কিন্তু মুড়ি-মুড়কি মণ্ডা-বাতাসা ছাড়া আর কোন কিছু দোকানে পাওয়া যায় না। অন্য কোন মিষ্টান্ন রাখিতে বাবুদের নিষেধ আছে, দোকানীরাও রাখে না।

বাবুরা বলেন,'মিষ্টি থাকলেই ছেলেরা খাবে, আর মিষ্টি খেলেই ছেলেদের পেটে কৃমি হবে।'

দোকানী বলে, 'আজ্ঞে সবই ধার, রেখে কি করব বলুন! খাজনায় আর কত কাটান যাবে। তা ছাড়া আমার দোকানে বাকী বাড়লে বাবুদের খাতায় খাজনার সুদ বাড়বে।'

হাটের কথায় কঙ্কণার বাবুরা বলেন—'হাট তো হ'ল লক্ষ্মী নিয়ে বেসাতি! মা-লক্ষ্মী চঞ্চলা হবেন যে!' স্কুলের কথায় তাঁহারা শিহরিয়া উঠেন, বলেন, 'সর্ব্বনাশ! মায়ের সতীন ঘরে আনব! ছেলেরা বাইরে লেখাপড়া শিখে আসুক, কিন্তু কঙ্কণায় সরস্বতীর আসন বসান হবে না।

ডাক্তারখানার বিরুদ্ধেও এমনই ধারা যুক্তিতর্ক নিশ্চয় প্রচলিত ছিল, কিন্তু সে যুক্তিতর্ক জেলার ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেবের নিকট টিকিল না। সাহেবের আদেশে বাবুদের চাঁদায় কঙ্কণায় এক দাতব্য চিকিৎসালয় প্রতিষ্ঠিত হইল।

সেই দাতব্য চিকিৎসালয় উদ্বোধনের দিন। সে এক মহাসমারোহের অনুষ্ঠান। ডাক্তারখানার নূতন বাড়ী-খানির সম্মুখেই চাঁদোয়া খাটাইয়া দেবদারুপাতা ও রঙীন কাগজের মালায় মণ্ডপ সাজান হইয়াছে। থানার জমাদার-বাবু হইতে জেলার জজ-ম্যাজিষ্ট্রেট পর্য্যন্ত সকলেই

আসিয়াছেন। সদরের ও মহকুমার উকীল-মোক্তারও অনেকে উপস্থিত আছেন। ভালকুটি গ্রামের মুচিদের ব্যাণ্ড বাজনা পর্য্যন্ত ভাড়া করা হইয়াছে। আবাহন, বরণ, পুষ্পবর্ষণ, মাল্যদান, স্তবগান শেষ হইতে হইতেই করতালিধ্বনিতে আসর বেশ জমিয়া উঠিল। সভামণ্ডপের একটা দিক্ অধিকার করিয়া সারি সারি চেয়ারে চোগা চাপকান পাগড়ী আংটি চেন ঘড়িতে সুশোভিত হইয়া মুখুজ্জে-কর্ত্তারা বসিয়া আছেন। কয় জন তরুণবয়স্কের পরিধানে হ্যাট কোট টাই, চোখে চশমা। কর্ত্তারা প্রত্যেক অনুষ্ঠানের শেষে ঘাড় নাড়িয়া মৃদু মৃদু হাসিতেছিলেন।

অতঃপর আসিল বক্তৃতা-পর্ব্ব। এইবার আসরটা যেন ঝিমাইয়া পড়িল। দেখা গেল সকলেই হাততালি দিবার লোক—বক্তৃতা দিবার লোক কেহ নাই। অবশেষে জেলার ফৌজদারী আদালতের এক জন উকীল উঠিয়া এই কমলাশ্রিত বংশটিকে কল্পতরুর সহিত তুলনা করিয়া বেশ খানিকটা বলিয়া আসরের মানরক্ষা করিলেন। সঙ্গে সঙ্গে করতালি-ধ্বনিতে আসর যেন ভাঙিয়া পড়িবার উপক্রম হইল।

তার পর সভা আবার নিস্তব্ধ। সভাপতি জেলার জজসাহেব চারি দিকে চাহিয়া বলিলেন—'বলুন, কেউ যদি কিছু বলবেন!'

কেহ সাড়া দিল না।

আবার সভাপতি বলিলেন, 'বলুন, বলুন যদি কেউ বলতে চান।'

রামপুর মহকুমার বৃদ্ধ মুন্সেফ বাবু এবার হুটুবাবুকে অনুরোধ করিলেন, 'হুটুবাবু, আপনি কিছু বলুন।'

হুটুবাবু (হুটবিহারী বন্দ্যোপাধ্যায়) রামপুর মহকুমার মোক্তার, সমবয়সী না হইলেও হুটুবাবুর সহিত মুন্সেফ বাবুর ঘনিষ্ঠ হৃদ্যতা। হুটুবাবু হাতজোড় করিয়া বলিলেন, 'মাফ করবেন আমাকে!'

সভাপতি কিন্তু মাফ করিলেন না, তিনি অনুরোধ করিয়া বলিলেন, 'না-না, বলুন না কিছু আপনি!'

হুটুবাবু এবার মোটা হুসুতী চাদরখানা খুলিয়া চেয়ারের হাতলের উপর রাখিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন। তার পর আরম্ভ করিলেন, "সভাপতি মশায়, এবং মহাশয়গণ, আপনারা সকলেই বোধ হয় জানেন যে শিশু ভূমিষ্ঠ হওয়ার পর তার মুখে প্রথমে দেয় মধু। লোকে বলে, আমার মা না কি আমা[র] মুখে নিমফুলের মধু দিয়েছিলেন। আমার কথাগুলো ব[ড়] তেতো। সেই জন্যেই আমি কোন কিছু বলতে নারা[জ] ছিলাম। তবে ভরসা আছে ব্যঞ্জনের মধ্যে উচ্ছে[র] একটা স্থান আছে এবং দেহে রসাধিক্য হ'লে তিক্তভক্ষ[ণ] বিধেয়, সেই জন্যেই বসন্তে নিম্বভক্ষণের ব্যবস্থা। কঙ্ক[ণ] গ্রামে দাতব্য চিকিৎসালয় স্থাপিত হ'ল আমাদে[র] ধনী মুখুজ্জে বাবুদের দানে, খুব সুখের কথা আনন্দের কথা-ভাল অবশ্য বলতেই হবে। কিন্তু আমার বার-বার ম[নে] হচ্ছে, এ হ'ল গরু মেরে জুতো দান আর জুতো-জোড়াটা মরা গরুর চামড়াতেই তৈরি। এ অঞ্চলের সেচের পুকুরে সেচ বন্ধ করেছেন এই বাবুরা—ফলে অজন্মাহেতু অনাহা[রে] চাষী আজ দুর্ব্বল—রোগের সহজ শিকার হয়েছে। সুদের সু[দ] তস্য সুদ তাদের কাছ থেকে আদায় ক'রে তাদের প[থে] বসিয়ে—।"

সমস্ত সভাটা চঞ্চল হইয়া উঠিল। সভায় উপস্থি[ত] মুখুজ্জে বাবুরা বসিয়া বসিয়া ঘামিতে আরম্ভ করিলে[ন]। তাঁহাদের হাসি তখন কোথায় মিলাইয়া গিয়াছে, পরস্পরে[র] মুখের দিকে চাহিয়া তাঁহারা পাষাণ-মূর্ত্তির মত নিশ্চল হ[ইয়া] বসিয়া রহিলেন। তাঁহাদের দিকে চাহিয়া সভাস্থ ভ[দ্র]মণ্ডলীও কেমন অস্বস্তি অনুভব করিতেছিলেন।

হুটুবাবু তখন অনেকটা অগ্রসর হইয়াছেন, তিনি বলিতে ছিলেন—"আমার পূর্ব্বের বক্তা মহাশয় এঁদের কল্পতরু সঙ্গে তুলনা করলেন। আমার মনে হয় তিনি এঁদের স[ঙ্গে] কিঞ্চিৎ রসিকতা করেছেন, কারণ বাস্তব সংসারে কল্পত[রু] অলীক বস্তু—আকাশ-কুসুমের পুষ্পাঞ্জলির মতই হাস্যকর আমার মনে হয় এঁদের তুলনা হয় একমাত্র খেজুরগাছে[র] সঙ্গে। মেসোপটেমিয়ার খেজুরগাছ নয়—আমাদের খাঁটি দে[শী] আঁটিসার খেজুরগাছের সঙ্গে। তলায় ব'সে ছায়া কে[উ] কখনও পায় না, ফল—তাও আঁটিসার, আর আলিঙ্গন করবে[ন] ত কথাই নেই, একেবারে শরশয্যা। এঁদের সুদের হা[র] চক্রবৃদ্ধি হারে, এঁদের প্রজার জন্যে বরাদ্দ দোকানে বরাত—আধ পয়সার মুড়ি, আধ পয়সার বাতাসা, আর কেউ য[দি] কাকুতি-মিনতি ক'রে সুদ-মাফের জন্যে জড়িয়ে ধরে ত[বে] কথার কাঁটায় তার শরশয্যাই হয়। তবে ভরসার মধ্যে

আমাদের 'হেঁসো'—খেজুরগাছের গলা কাটবার জন্তে খাঁটি ইস্পাতে তৈরি অস্ত্র—এই এঁরা।"

নুটুবাবু এবার সরকারী কর্ম্মচারীবৃন্দের দিকে হস্ত প্রসারিত করিয়া বুঝাইয়া দিলেন, এটা বলা হইতেছে তাঁহাদিগকে।

"খেজুরগাছের কাছে রস আদায় করতে হ'লে হেঁসো না হ'লে হয় না। হেঁসো চালালে গল্ গল্ ক'রে মিষ্ট রসে খেজুরগাছ কলসী পূর্ণ ক'রে দেয়। আজ তেমনই এক কলসী রস আমাদের বিলাতী পান-দেওয়া কাঞ্চননগরী হেঁসো এই ম্যাজিষ্ট্রেট সাহেব বাহাদুরের কল্যাণে এ অঞ্চলের লোকে পেয়েছে, তাতে তাদের বুকফাটা তৃষ্ণার খানিকটা নিবারণ হবে। এ জন্তে হেঁসো এবং খেজুরগাছ দু-তরফকেই ধন্তবাদ দিয়ে আমি আমার বক্তব্য শেষ করলাম।"

নুটুবাবু বসিলেন। কিন্তু করতালিধ্বনি বিশেষ উঠিল না, মাত্র কয়টা অবোধ ছেলে সোৎসাহে হাততালি দিয়া উঠিল। এতক্ষণে সভাস্থ সকলে হাতের উপর বারকয়েক হাত নাড়িলেন, কিন্তু শব্দ তাহাতে উঠিল না। তার পর সভা-প্রাঙ্গণ নিস্তব্ধ, সকলেই কেমন অস্বাচ্ছন্দ্য বোধ করিতেছিলেন। সমস্ত সভাটা বায়ুপ্রবাহহীন মেঘাচ্ছন্ন বর্ষারাত্রির মত ক্লেশকর হইয়া উঠিয়াছে। মুখুজ্জে বাবুরা মাথা হেঁট করিয়া রুদ্ধ রোষে অজগরের মত ফুলিতেছিলেন। কোন মতে সভা শেষ হইয়া গেল, অভ্যাগতরা সকলে বিদায় হইয়া গেলেন, তার পর মুখুজ্জেরা মাথা তুলিলেন। মাথা তুলিলেন বিষধর অজগরের মতই—নুটু মোক্তারকে ধ্বংস করিবার প্রতিজ্ঞা করিয়া তাঁহারা আপন আপন অন্দরে প্রবেশ করিলেন।

* * *

সংবাদটা কিন্তু নুটুবাবুর নিকট অজ্ঞাত রহিল না, যথাসময়ে রামপুরে বসিয়াই তিনি কল্পণার সংবাদ পাইলেন। বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুই তাঁহাকে সংবাদটা দিলেন, কথাটা তাঁহারই কানে আসিয়া পৌঁছিয়াছিল। সংবাদ শুনিয়া নুটুবাবু হাসিয়া হাতজোড় করিয়া কাহাকে প্রণাম জানাইলেন।

মুন্সেফবাবু বলিলেন, 'বাবুদের প্রণাম জানাচ্ছেন না কি?'

—না, মহর্ষি দুর্ব্বাসাকে প্রণাম জানালাম।

—তা হ'লে বলুন নিজেকেই নিজে প্রণাম করলেন, লোকে ত আপনাকেই বলে কলিযুগের দুর্ব্বাসা।

নুটুবাবু বলিলেন, 'না। তা হ'লে কোন দিন লক্ষ্মীর দম্ভ চূর্ণ করবার জন্য সাগরতলে তাকে আবার একবার নির্ব্বাসনে পাঠাতাম।'

* * *

নুটু মোক্তার ঐ এক ধারার মানুষ। তিনি যে সেদিন বলিয়াছিলেন, 'আমার মা আমার মুখে নিমের মধু দিয়েছিলেন' সে কথাটা তাঁহার অতিরঞ্জন নয়, কথাটা না হউক তাঁহার ইঙ্গিতটা নির্জ্জলা সত্য। বাল্যকাল হইতেই ঐ তাঁহার স্বভাব।

প্রথম জীবনে বি-এ পাস করিয়া নুটুবাবু স্কুল-মাষ্টারী গ্রহণ করিয়াছিলেন। মনে মনে কামনা ছিল শিক্ষকতার একটি আদর্শ তিনি স্থাপন করিয়া যাইবেন। কিন্তু ঐ স্বভাবের জন্যই তাঁহার সে কামনা পূর্ণ হয় নাই, শিক্ষকতা পরিত্যাগ করিয়া মোক্তারী ব্যবসায় অবলম্বনে বাধ্য হইয়াছেন।

ঘটনাটা ঘটিয়াছিল এইরূপ: সে-বার পূজার সময় তাঁহার গ্রামের ধনী এবং জমিদার চাটুজ্জেদের বাড়ীতে নিমন্ত্রণ খাইয়া আসিয়া তাঁহার স্ত্রী কাঁদিয়া ফেলিয়া বলিল, 'আর আমি কোথাও নেমন্তন্ন খেতে যাব না।'

নুটুবাবু কি একখানা বই পড়িতেছিলেন, তিনি মুখ তুলিয়া প্রশ্ন করিলেন—'কেন?'

এ 'কেন'র উত্তর তাঁহার স্ত্রী সহজে দিতে পারিল না, বলিতে গিয়া বার-বার সে কাঁদিয়া ফেলিল। বিরক্ত হইয়া নুটুবাবু বই বন্ধ করিয়া ভাল করিয়া উঠিয়া বসিলেন। প্রশ্নের পর প্রশ্ন করিয়া বহু কষ্টে অবশেষে জানিলেন, তাঁহার স্ত্রী দুর্ভাগ্যক্রমে গ্রামের বর্দ্ধিষ্ণু ঘরের সালঙ্কারা বধূদের পংক্তিতে খাইতে বসিয়াছিল, ফলে পরিবেশনের প্রতিটি দফাতেই সে অপমানিত হইয়াছে। যে ভাবে গৃহকর্ত্রী ও দাসীর প্রতি প্রত্যক্ষেই দুই ধারার ব্যবহার হইয়া থাকে সেই ভাবেই সে দাসীর মত ব্যবহারই পাইয়াছে।

নুটুবাবু কিছুক্ষণ চুপ করিয়া রহিলেন; তার পর আপন মনেই বলিলেন—দুর্ব্বাসা মিথ্যে তোমায় অভিসম্পাত দেয় নি! সে ঠিক করেছিল।

তাঁহার স্ত্রী কিছু বুঝিতে না পারিয়া স্বামীর মুখের দিকে হাঁ করিয়া চাহিয়া রহিল। মুটুবাবুর দৃষ্টি তাহার মুখের উপর নিবদ্ধ হইতেই সে আবার কাঁদিয়া ফেলিল।

মুটুবাবু বলিলেন, 'আচ্ছা, ছুটো বছর সময় আমাকে দাও। এর প্রতিকার আমি করব।'

তাহার পরই তিনি মোক্তারী পরীক্ষার জন্য প্রস্তুত হইতে আরম্ভ করিলেন। এক বৎসরেই মোক্তারী পাস করিয়া তিনি রামপুর মহকুমায় প্র্যাকটিস আরম্ভ করিয়া দিলেন। তৃতীয় বৎসরের পূজায় সধবা-ভোজনের সময় একটা অভাবনীয় কাণ্ড ঘটিয়া গেল। মাছ পরিবেশন চলিতেছিল, পরিবেশক মুটুবাবুর স্ত্রীর পাতার নিকট আসিতেই সে প্রকাণ্ড একটা টাকার তোড়া কাপড়ের ভিতর হইতে বাহির করিয়া সশব্দে নামাইয়া দিয়া বলিল, 'এই এঁদের সমান গহনাই আমার হবে, এই তার টাকা। এখন ওঁদের সমান মাছ আমাকে না দাও—একখানার চেয়ে কম আমাকে দিও না!'

পরিবেশকের হাত হইতে মাছের বালতিটা খসিয়া পড়িয়া গেল। তার পর গ্রাম জুড়িয়া দেশ জুড়িয়া সে এক তুমুল আন্দোলন। লোকে মুটুবাবুকেই দোষ দিয়া ক্ষান্ত হয় নাই তাহার উর্দ্ধতন পুরুষগণকেও দোষ দিয়া বলিয়াছিল, বিছুটির ঝাড়—গোড়া থেকে আগা পর্য্যন্ত সর্ব্বাঙ্গে হুল। জ্বালা-ধরান ওদের স্বভাব।

মুটুবাবুর পিতামহ ছিলেন শাস্ত্রজ্ঞ পণ্ডিত লোক, কিন্তু পাণ্ডিত্যের খ্যাতির তুলনায় অপ্রিয় সত্য ভাষণের অখ্যাতি ছিল বেশী। সে-আমলের কোন এক রাজবাড়ীতে শ্রাদ্ধ উপলক্ষে শাস্ত্র-বিচারের আসরে যুবরাজ তাঁহার নাসিকাগ্র প্রবেশ করাইয়া ফোড়ন দিতে দিতে গীতার একটা শ্লোক আওড়াইয়া উঠিয়াছিলেন—'মশায়, স্বয়ং ভগবান ব'লে গেছেন, যদা যদাহি ধর্ম্মস্ত—।'

মুটুবাবুর পিতামহ বাধা দিয়া বলিয়াছিলেন, 'জিহ্বার জড়তা দূর হয় নি আপনার, আরও মার্জ্জনা দরকার, জদা জদা নয়, যদা যদা।'

মুটুবাবুর পিতার নাম ছিল 'কুনো কালিপ্রসাদ'। তিনি বিদ্যায় বিশেষ পণ্ডিত ছিলেন না বা অন্য কোন বিশেষত্বও তাঁহার ছিল না। সমাজে তাঁহার কোন প্রতিষ্ঠাও হয় নাই, সেজন্য দাবিও কোন দিন তিনি করেন নাই। কিন্তু সমস্ত জীবনটা তিনি ঘরের কোণে বসিয়াই কাটাইয়া গিয়াছেন। শত্রুতা তিনি কাহারও সহিত কোন দিন করেন নাই, কিন্তু তবু লোকে বলিত—কি অহঙ্কার লোকটার!

যাক, ওসব পুরাতন কথা।

মুটুবাবু কঙ্কণার জমিদারদের শপথের কথা শুনিয়া বিচলিত হইলেন না। এদিকে কঙ্কণার বাবুরা তাঁহাদের চিরাচরিত প্রথায় প্রতিশোধ গ্রহণের পন্থা অবলম্বন করিলেন। কিন্তু তাঁহাদের চর বিফলমনোরথ হইয়া ফিরিয়া সংবাদ দিল মুটুবাবুর ঋণ কোথাও নাই। বাবুরা সংবাদ লইতেছিলেন কোথায় কাহার কাছে মুটু মোক্তারের হাণ্ডনোট বা তমসুক আছে। থাকিলে সেগুলি কিনিয়া ঋণজালে আবদ্ধ মুটুকে আয়ত্ত করিয়া তাহাকে বধ করিতেন।

মুখুজ্জেদের বড়কর্ত্তা অনেকক্ষণ চুপ করিয়া থাকিয়া তাঁহার কর্ম্মচারীকে প্রশ্ন করিলেন, 'লাট কমলপুরের জমিদারদের এখন অবস্থা কেমন?'

কমলপুরেই মুটুবাবুর বাড়ী, তাঁহার জমিজমা, পুকুর, বাগান যাহা কিছু সম্পত্তি সমস্তই কমলপুরের এলাকার মধ্যে

সরকার উত্তর দিল, 'অবস্থা অবিশ্যি তেমন ভাল নয়, তবে ওই চলে যায় কোন রকমে সব। দু-এক ঘরের অবস্থা একেবারেই ভাল নয়।'

কর্ত্তা বলিলেন, 'তবে কিনে ফেল তাদের অংশ। টাকা বেশী লাগে লাগুক। হ্যাঁ, তবে আমাদের সকল সরিককে একবার জিজ্ঞাসা কর।'

* * *

মাস-চারেক পর।

সন্ধ্যার সময় মুটুবাবু সন্ধ্যা উপাসনা করিতেছিলেন। তাঁহার স্ত্রী আসিয়া ঘরে প্রবেশ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মুটুবাবু কিন্তু দেখিয়াও দেখিলেন না। কিছুক্ষণ অপেক্ষা করিয়া স্ত্রী বলিল, 'ওগো, কমলপুর থেকে আমাদের মহাভারত মোড়ল এসেছে।'

মুটুবাবু চোখ বুজিয়া ধ্যানে বসিলেন।

স্ত্রী বলিল, 'তাকে না কি কঙ্কণার বাবুরা মারধর করেছে, তার পুকুর থেকে মাছ ধরিয়ে নিয়েছে, গরুগুলো খোঁয়াড়ে দিয়েছে!'

মুটুবাবু মুদ্রিত নেত্রেই নিশ্চল হইয়া বসিয়া রহিলেন। তাহার স্ত্রী এবার বিরক্ত হইয়া বাহির হইয়া গেল। নিয়ম-মত সন্ধ্যা উপাসনা শেষ করিয়া মুটুবাবু উঠিলেন। বাহিরে আসিয়া স্ত্রীকে বলিলেন, 'কই দুধ গরম হয়েছে?'

স্ত্রী আসিয়া দুধের বাটি নামাইয়া দিল, মুটুবাবু বলিলেন, 'দেখ ভগবানকে যখন মানুষ ডাকে তখন তাকে চঞ্চল করতে নেই।'

স্ত্রী বলিল, 'বেচারার যে হাপুস নয়নে কান্না; আমি আর থাকতে পারলাম না বাপু। মুখের খাবার বেচারার চোখের জলে নোন্তা হয়ে গেল।' মুখ ধুইয়া পান মুখে দিয়া মুটুবাবু বাহিরের ঘরে আসিতেই মহাভারত তাঁহার পায়ে আছাড় খাইয়া পড়িল। মুটুবাবু তাহার হাতে ধরিয়া আকর্ষণ করিয়া বলিলেন, 'ওঠ ওঠ। কি হয়েছে আগে বল, তার পর কাঁদবে।'

মহাভারতের কান্না আরও বাড়িয়া গেল।

মুটুবাবু এবার অত্যন্ত কঠিন স্বরে বলিলেন, 'বলি, উঠবে না কি?'

কণ্ঠস্বরের রূঢ়তায় ও কথার ভঙ্গিমায় মহাভারত এবার সসঙ্কোচে উঠিয়া বসিয়া করুণভাবে চোখের জল মুছিতে আরম্ভ করিল।

মুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'কি হয়েছে বল!'

—আজ্ঞে, কঙ্কণার বাবুরা আমার পুকুরের সমস্ত মাছ—এই হালি পোনা তিন ছটাক, এক পো ক'রে—।

—তিন ছটাক, এক পো এখন বাদ দাও। তোমার পুকুরের সমস্ত মাছ কি হ'ল তাই বল!

—আজ্ঞে, জোর ক'রে বাবুরা ধরিয়ে নিলেন।

—তার পর?

এ প্রশ্নে মহাভারত অবাক হইয়া তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া রহিল। মুটুবাবু আবার প্রশ্ন করিলেন, 'আর কি করেছেন?'

—আজ্ঞে, আমার গরু-বাছুর সব জোর ক'রে ধ'রে খোঁয়াড়ে দিয়েছেন।

—আর?

এবার মহাভারত আবার ফোঁপাইয়া কাঁদিয়া উঠিল, কাঁদিতে কাঁদিতেই বলিল, 'চাপরাসী দিয়ে ধরে বেঁধে আমাকে—।'

আর সে বলিতে পারিল না।

মুটুবাবু বলিলেন, 'হুঁ। কিন্তু কারণ কি? কিসের জন্ম তোমার ওপর বাবুরা এমন করলেন?'

কোনরূপে আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিতে মুছিতে মহাভারত বলিল, 'আজ্ঞে আমাকে ডেকে বাবুরা বললেন, মুটু মোক্তারের জমিজমা সব তুমিই ভাগে কর শুনেছি। তা তোমাকে ওসব জমি ছেড়ে দিতে হবে। মুটু মোক্তারের জমি এ চাকলায় কেউ চষতে পাবে না।'

মুটুবাবু বলিলেন, 'হুঁ, তার পর?'

—আজ্ঞে, আমি তাইতে জোড়হাত ক'রে বললাম, হুজুর তা আমি পারব না। তিনি বেরামভন—ভাল লোক—আমরা তিন পুরুষ ওনাদের জমি করছি—পুরনো মুনিব। — তাতেই আজ্ঞে—।

কান্নার আবেগে তাহার কণ্ঠস্বর রুদ্ধ হইয়া গেল, সে নীরবে রুদ্ধবাক্ হইয়া মাটির দিকে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

মুটুবাবু একটা দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, 'হুঁ। তোমাকে মামলা করতে হবে মহাভারত। খরচপত্র সমস্ত আমার, আসা-যাওয়া আদালত-খরচা সব আমি দেব, তুমি মামলা কর।...দেখ—ভেবে দেখ। কাল সকালে আমাকে জবাব দিয়ো। আর সে যদি না পার, তুমি আমার জমি ছেড়ে দাও। তাতে আমি একটুও দুঃখ করব না। ক্ষতি যা হয়েছে—তা আমি তোমার পূরণ ক'রে দেব।'

তার পর তিনি লণ্ঠনের আলোটা বাড়াইয়া দিয়া খান-কয়েক বই টানিয়া লইয়া বসিলেন। গভীর মনোযোগের সহিত আইনগুলি দেখিয়া বই বন্ধ করিয়া যখন উঠিলেন, তখন মহকুমা শহরটিও প্রায় নিস্তব্ধ হইয়া আসিয়াছে, অদূরবর্ত্তী জংসন ষ্টেশন ইয়ার্ডে মালগাড়ীর শাণ্টিঙের শব্দ গম্ভীর এবং উচ্চতর হইয়া উঠিয়াছে। মহাভারত তখনও পর্য্যন্ত নির্ব্বাক হইয়া মুটুবাবুর মুখের দিকে চাহিয়া বসিয়াছিল, তাহার দিকে দৃষ্টি পড়িতেই মুটুবাবু বলিলেন—'তুমি তখন থেকে ব'সে আছ মহাভারত? জল তো খেয়েছ—কই তামাক-টামাক ত খাও নি?'

মহাভারতের চোখ তখনও ছলছল করিতেছিল, সে

তাড়াতাড়ি চোখ মুছিয়া ঈষৎ লজ্জিতভাবে বলিল—'আজ্ঞে এই যাই!'

হুটুবাবু বলিলেন, 'তোমার ক্ষতি যা হয়েছে সে আমি পূরণ ক'রে দেব, কিন্তু অপমানের ক্ষতি পূরণ ত করতে পারব না। সেজন্যে তোমাকে মামলা করতে হবে, রাজার দোরে দাঁড়াতে হবে।'

মহাভারত এবার আবার কাঁদিয়া ফেলিল, হুটুবাবুর কণ্ঠস্বরের স্নেহস্পর্শে তাহার শোক যেন উথলিয়া উঠিল, বলিল, 'আজ্ঞে বাবু ছোট কচি মাছ, এই বছরের হালি-পোনা—এক পো, তিন ছটাকের বেশী নয়!'

হুটুবাবু এবার বিরক্ত হইলেন না, ক্রোধ প্রকাশ করিলেন না, হাসিলেন না, বলিলেন—'যাও, তামাক-টামাক খেয়ে ভাত খেয়ে নাও গিয়ে।'

মহাভারত চোখ মুছিতে মুছিতে চলিয়া গেল।

ভিতরে গিয়া হুটুবাবু স্ত্রীকে বলিলেন, 'আজ থেকে আর আমার বাড়ীতে লক্ষ্মীপূজো হবে না!'

সবিস্ময়ে স্ত্রী বলিয়া উঠিল—'সে কি? ও কি সব্বনেশে কথা!'

হুটুবাবু বলিলেন, 'না—হবে না।'

স্ত্রী প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না।

* * *

মোকদ্দমা দায়ের হইয়া গেল।

হুটুবাবুর পরিচালনাগুণে, তাঁহার তীক্ষ্ণধার প্রশ্নে প্রশ্নে সমগ্র ঘটনাটার উপরের সাজান আবরণ খান খান হইয়া খসিয়া পড়িয়া সত্যের নগ্নমূর্ত্তি প্রকাশিত হইয়া পড়িল। তাহার উপর তাঁহার সূক্ষ্ম এবং দৃঢ় যুক্তিতর্কের প্রভাবে কঙ্কণার বাবুদের গোমস্তা ও চাপরাসীকে বিচারক দোষী স্থির না করিয়া থাকিতে পারিলেন না। তিনি তাহাদের প্রতি কঠিন দণ্ড বিধান করিলেন। দেশময় একটা সাড়া পড়িয়া গেল। কিন্তু এইখানেই শেষ হইল না, কঙ্কণার বাবুরা জজ-আদালতে আপীল করিলেন।

সেদিন সন্ধ্যার সময় বৃদ্ধ মুন্সেফ বাবু আসিয়া বলিলেন, 'হুটুবাবু, যথেষ্ট হয়েছে, এইবার ব্যাপারটা মিটিয়ে ফেলুন।'

সবিস্ময়ে তাঁহার মুখের দিকে চাহিয়া হুটুবাবু বলিলেন, 'বলছেন কি আপনি?'

—ভালই বলছি। বিরোধের ত এইখানেই শেষ নয়, ধরুন জজ-আদালতেও যদি এই সাজাই বাহাল থাকে, তবে ওঁরা হাইকোর্ট যাবেন। তার পর ধরুন নতুন বিরোধ বাধতে পারে। ওদের ত পয়সার অভাব নেই। লোকে বলে কঙ্কণায় লক্ষ্মী বাঁধা আছেন।'

হুটুবাবু বলিলেন, 'বিরোধ ত আমার ওই লক্ষ্মীর সঙ্গে। ওই দেবতাটির অভ্যাস হ'ল লোকের মাথার ওপর পা দিয়ে চলা। তাঁর পা দুটি আমি মাটির ধুলোয় নামিয়ে দেব।'

মুন্সেফবাবু বলিলেন, 'ছি-ছি, কি যে বলেন আপনি হুটুবাবু!'

হুটুবাবু উত্তর দিলেন, 'ঠিকই বলি আমি মুন্সেফবাবু, কিন্তু আপনার ভাল লাগছে না।'

তার পর হাসিয়া আবার বলিলেন, 'না লাগবারই কথা। লক্ষ্মীর পা যে আপনার মাথায় চেপেছে, পায়ের পথ ত সঙ্কীর্ণ—রথ চলবার মত রাজপথ তৈরি হয়ে গিয়েছে। টাকটি আপনার বেশ প্রশস্ত!' মুন্সেফবাবু হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন, বলিলেন, 'কথাটা বলেছেন বড় ভাল। উঃ বড্ড বলেছেন মশাই।'

তার পর কিন্তু আর ও প্রসঙ্গে তিনি কোন কথা বলিলেন না। হাস্য পরিহাসের মধ্যে সন্ধ্যাটা কাটিয়া গেল।

কিন্তু লক্ষ্মীর পরাজয় এত সহজে হয় না, জজ-আদালতের আপীলে মামলাটা ডিসমিস্ হইয়া গেল। হুটুবাবু মুখ রাঙা করিয়া আদালত হইতে বাহির হইয়া আসিলেন। সত্যের অপমানে পরাজয়ে ক্ষোভ ও লজ্জার তাঁহার আর সীমা ছিল না। কিন্তু বিস্মিত তিনি হন নাই। জজ-আদালতের উকীলের সওয়াল শুনিয়াই তিনি এ পরিণতি বুঝিতে পারিয়াছিলেন।

সদর হইতে রামপুরে ফিরিয়া বাসায় আসিয়া সন্ধ্যায় নিয়মিত সন্ধ্যা-উপাসনায় বসিয়াছেন এমন সময় বাড়ীর বাহিরে বোধ করি খান-দশেক ঢাক একসঙ্গে তুমুল শব্দে বাজিয়া উঠিল। কয়েক মুহূর্ত্ত পরেই তাঁহার স্ত্রী বিস্ময়-বিহ্বলের মত আসিয়া বলিল, 'ওগো, কঙ্কণার বাবুরা দোরের সামনে ঢাক বাজাতে হুকুম দিয়েছে। ধেই ধেই ক'রে নাচছে গো সব!' হুটুবাবু কিছুমাত্র চাঞ্চল্য প্রকাশ

করিলেন না, যেমন ধ্যানে বসিয়াছিলেন তেমনি ভাবেই বসিয়া রহিলেন।

মাসখানেক পর কঙ্কণায় বাবুদের বাড়ীতে আবার একটা সমারোহ হইয়া গেল। কুরুক্ষেত্রের যুদ্ধে দুর্য্যোধন দ্বৈপায়ন হ্রদে আত্মগোপন করিলে পাণ্ডবেরা সমারোহ করেন নাই, কিন্তু মুটু মোক্তার পরাজয়ের লজ্জায় মোক্তারী পর্য্যন্ত ছাড়িয়া দিয়া কলিকাতায় পলাইয়া গেলে কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটি সমারোহ করিলেন। সেই সমারোহের মধ্যে তাঁহারা ঘোষণা করিলেন—বেটাকে ঢাক বাজিয়ে মোক্তারী ছাড়ালাম, এই বার টিন বাজিয়ে গাঁ থেকে তাড়াতে হবে।

বড়কর্ত্তা বলিলেন, 'তার আগে ওই বেটা মহাভারতকে শেষ কর, আঠার পর্ব্বের এক পর্ব্বও যেন বেটার না থাকে।'

* * *

বৎসর তিনেকের মধ্যেই কঙ্কণার বাবুদের সে প্রতিজ্ঞাও প্রায় পূর্ণ হইয়া আসিল। মহাভারত সর্ব্বস্বান্ত হইয়া মনে মনে নিষ্কৃতির একটা সহজ উপায় অনুসন্ধান করিতে লাগিল। কিন্তু আশ্চর্য্য গোঁয়ার মহাভারত, কিছুতেই বাবুদের পায়ে গড়াইয়া পড়িল না। মুটু মোক্তার সেই দেশ ছাড়িয়াছেন আজও ফেরেন নাই। স্ত্রী আছেন তাঁহার পিত্রালয়ে।

সেদিন জমিদারের হিতৈষী গ্রাম্য মণ্ডল আসিয়া মহাভারতকে বলিল, 'ওরে, বাবুদের পায়ে গিয়ে গড়িয়ে পড়। জলে বাস ক'রে কি কুমীরের সঙ্গে বাদ করা চলে?'

ছন্নমতি মহাভারত উত্তর দিল, 'কুমীরে বাদ করলেও খায়, না-করলেও খায়। তার চেয়ে বাদ ক'রে মরাই ভাল!'

মণ্ডল বিরক্ত হইয়া বলিল, 'আলক্ষ্মী ঘাড়ে ভর করলে মানুষের এমনি মতিই হয় কি না!'

মহাভারত বলিল, 'আলক্ষ্মীই আমার ভাল দাদা, উনি কাউকে ছেড়ে যান না।'

মণ্ডল অবাক হইয়া গেল, অবশেষে বলিল, 'তোর দোষ কি বল, নইলে— ব্রাহ্মণ—জমিদার—'

মহাভারত অকস্মাৎ যেন ক্ষিপ্ত হইয়া উঠিল, সে চীৎকার করিয়া হাত-পা নাড়িয়া ভঙ্গি করিয়া বলিল, 'চণ্ডাল—কসাই —চণ্ডাল—কসাই!'

দিন দুই পরই গভীর রাত্রে মহাভারতের ঘরের জীর্ণ চালে আগুন জ্বলিয়া উঠিল। নারী ও বালকের আর্ত্ত চীৎকারে লোকজন আসিয়া দেখিল, মহাভারতের ঘর জ্বলিতেছে, কিন্তু মহাভারতের সেদিকে ভ্রূক্ষেপ নাই, সে একজন দীর্ঘকায় কালো জোয়ানের বুকে নির্ম্মম ভাবে চাপিয়া বসিয়া আছে। বহু কষ্টে লোকটাকেই সর্ব্বাগ্রে মহাভারতের কবল মুক্ত করা হইল। সে হাঁপাইতে হাঁপাইতে ক্ষীণ কণ্ঠে বলিল—জল!

মহাভারত লাফ দিয়া গিয়া জ্বলন্ত চালের একগোছা খড় টানিয়া আনিয়া বলিল—খা!

ঐ লোকটাই মহাভারতের ঘরে আগুন দিয়াছে, লোকটা কঙ্কণার বাবুদের চাপরাসী। মহাভারত তাহাকে পুলিসের হাতে সমর্পণ করিল। পরদিন সে অত্যন্ত হৃষ্টচিত্তে দগ্ধ গৃহের অঙ্গার লইয়া তামাক সাজিয়া পরম তৃপ্তি সহকারে তামাক টানিতেছিল, এমন সময়ে কে তাহাকে ডাকিল— মহাভারত!

মহাভারত বাহিরে আসিয়া দেখিল, জমিদারের গোমস্তা দাঁড়াইয়া আছে। সে চীৎকার করিয়া উঠিল, 'মিটমাট আমি করব না হে! কি করতে এসেছ তুমি?'

গোমস্তা হাসিয়া বলিল, 'আরে শোন—শোন—।'

কোন কিছু না শুনিয়াই তাহার মুখের কাছে দুই হাতের বুড়া আঙুল ঘন ঘন নাড়িয়া মহাভারত বলিল, 'খট খট লবডঙ্কা—খট খট লবডঙ্কা—আর আমার করবি কি?'

গোমস্তা মুখ [illegible]াল করিয়া ফিরিয়া গেল, যাইবার সময় কিন্তু বলিয়া গেল, 'জানিস বেটা চাষা—পৃথিবীটা কার বশ?'

দিন দুয়েক পরেই রামপুর হইতে মুটুবাবুর পুরাতন মুহুরীটি আসিয়া মহাভারতকে লইয়া চলিয়া গেল।

সেই দিনই দ্বিপ্রহরে রামপুরের ফৌজদারী আদালতে মহাভারতকে সঙ্গে লইয়া মুটুবাবু উকীলের গাউন পরিয়া আদালতে প্রথম প্রবেশ করিলেন। তিনি উকীল হইয়া ফিরিয়াছেন। তিনি এত দিন কলিকাতায় আইন পড়িতেছিলেন।

* * *

এবার কঙ্কণার বাবুরা বেশ একটু চিন্তিত হইয়া

পড়িলেন। হুটুবাবুর তদ্বিরে তাঁহাকে স্বয়ং এস-ডি-ও ঘটনাস্থল পরিদর্শন করিয়া গেলেন এবং শেষ পর্য্যন্ত কঙ্কণার বাবুদের নায়েব গোমস্তাকে পর্য্যন্ত আসামী-শ্রেণী-ভুক্ত করিয়া মামলাটা দায়রা আদালতে বিচারার্থ পাঠাইয়া দিলেন। হুটুবাবু নিজেও সদরে গিয়া বসিলেন, শুধু বসিলেন নয়—সরকারী উকীলের সহযোগে নিজেই মামলা চালাইতে আরম্ভ করিলেন। কয়েক দিনের মধ্যেই নানা জনে বহু বিনীত অনুরোধ এবং বহু প্রকারে লোভনীয় প্রস্তাব লইয়া হুটুবাবুকে আসিয়া ধরিয়া বলিল, 'মিটিয়ে ফেলুন—তাতে আপনারই মর্য্যাদা বাড়বে।'

হুটুবাবু বলিলেন, 'বড়লোকের সঙ্গে গরিবের ঝগড়া কি আপোষে মেটে? কোন কালে মেটে নি—মিটবেও না।'

শেষ পর্য্যন্ত বলিলেন, 'বাবুরা যদি ঢাক কাঁধে ক'রে আদালতের সামনে বাজাতে পারে, কি মহাভারতের ঘরের চালে উঠে নিজেরা চাল ছাওয়াতে পারে, তবে না-হয় দেখি।'

প্রস্তাবকারীরা মুখ কাল করিয়া উঠিয়া গেল, বিচার চলিতে লাগিল। সাক্ষী-সাবুদ শেষ হইয়া গেলে সরকারী উকীলের সম্মতিক্রমে হুটুবাবু প্রথমে সওয়াল আরম্ভ করিলেন। সে যেন অকস্মাৎ আগ্নেয়গিরির মুখ খুলিয়া গেল। গভীর আন্তরিকতাপূর্ণ প্রদীপ্ত ভাষায় সমগ্র ঘটনা যেন চোখের সম্মুখে প্রত্যক্ষ হইয়া উঠিল—প্রবলের অত্যাচারে দুর্ব্বলের হাহাকার যেন রূপ পরিগ্রহ করিল। বিবাদের মূলসূত্র হইতে আরম্ভ করিয়া এই অগ্নিদাহ পর্য্যন্ত প্রতিটি ঘটনা সাক্ষীদের উক্তির সহিত মিলাইয়া দেখাইয়া অবশেষে বলিলেন, "আজ সমস্ত পৃথিবীময় ধনের মত্ততায় মত্ত ধনীর অত্যাচারে পৃথিবী জর্জ্জরিত হয়ে উঠেছে। এই বিচারাধীন ঘটনাটি তার একটি প্রকৃষ্ট দৃষ্টান্ত। কিন্তু একান্ত দুঃখের বিষয় যে ধনীর অপরাধে ধনীর অনুগ্রহপুষ্ট দুর্ব্বলের উপর দণ্ড বিধান করা ছাড়া আজ ধর্ম্মাধিকরণের গত্যন্তর নেই। কিন্তু সে বিচার এক জন করবেন, যিনি সর্ব্বজ্ঞ—সর্ব্বত্র বিরাজমান, সর্ব্বনিয়ন্তা—তিনি এর বিচার অবশ্যই করবেন। সে বিচারের রায়ের সামান্য একটু অংশ আমরা জানি, ঈশ্বরের পুত্র মহামানব যীশুখ্রীষ্ট জানিয়ে দিয়ে গেছেন, তিনি বলেছেন—It is easier for a came to go through the eye of a needle than for rich man to enter into the Kingdom of God."

[ধনীর স্বর্গরাজ্যে প্রবেশের অপেক্ষা সূচীমুখে উটে প্রবেশও সহজ]

তাঁহার সওয়ালের পর সরকারী উকীল আর কিছু ব প্রয়োজন মনে করিলেন না। বিচারে অপরাধীগণের কঠি দণ্ড হইয়া গেল। বিচারশেষে হুটুবাবু বাহিরে আসিতে তাঁহার মুহুরী বলিল, 'তিনটে মামলার কাগজ নিয়ে মক্কে ব'সে আছে।'

হুটুবাবুর মাথায় তখনও ঐ মোকদ্দমার কথা ঘুরিতেছিল, তিনি ললাট কুঞ্চিত করিয়া মুহুরীর দি চাহিলেন।

সে বলিল, 'একটা দায়রা, আর দুটো এস-ডি-ও কোর্টের মামলা। ফি বলেছি চার টাকা ক'রে—।'

পিছন হইতে এক জন পুরাতন মোক্তার-বন্ধু আসি অভিনন্দন জানাইয়া বলিল, 'চমৎকার আর্গুমেণ্ট হয়েছে এবার কিন্তু ছেঁড়া জুতো জামা পাণ্টাও ভাই। আমা হাতে একটা কেস্ আছে—তোমাকেই ওকালত-নামা দেব মক্কেল কিন্তু গরিব।' হুটুবাবু সঙ্গে সঙ্গে বলিলেন, 'পাঠি দিয়ো। পয়সার জন্যে কিছু এসে যাবে না!'

* * *

বিচিত্র পৃথিবী, কিন্তু সে বৈচিত্র্য অপেক্ষাও পৃথিবী বুকের ঘটনাপ্রবাহের ধারা বিচিত্রতর এবং বিস্ময়কর সেই বিচিত্র ধারার গতিতেই কঙ্কণার বাবুদের সহি হুটুবাবুর বিরোধ অকস্মাৎ একটা অসম্ভব পরিণতিতে আসিয়া শেষ হইয়া গেল।

পনর বৎসর পর। সেদিন হঠাৎ কঙ্কণার বাবুদে জুড়িটা আসিয়া হুটুবাবুর বাড়ীতে প্রবেশ করিয়া গাড়ীবারান্দায় দাঁড়াইল। গাড়ীর ভিতর হইতে নামিলেন কঙ্কণার বৃদ্ধ বড়কর্ত্তা, তাঁহার পুত্র এবং সেজতরফের কর্ত্তা। হুটুবাবুর দারোয়ান কায়দা-মাফিক সেলাম করিয়া দরজা খুলিয়া দিল। সঙ্গে সঙ্গে দুই জন খানসামা আসিয়া সসম্ভ্রমে অভিবাদন করিয়া ঝাড়ন দিয়া আসনগুলি ঝাড়িয়া দিয়া সরিয়া দাঁড়াইল। বৃদ্ধ

কর্ত্তা ঘরের চারি দিক চাহিয়া দেখিয়া বলিলেন, 'তাই তো হে, নুটু যে আমাদের ইন্দ্রপুরী বানিয়ে ফেলেছে—এঁ্যা! বাঃ—বাঃ—বাঃ বলিহারি—বলিহারি!

কর্ত্তার পুত্র এক জন খানসামাকে বলিলেন, 'একবার উকীলবাবুকে খবর দাও দেখি—বল কঙ্কণার বড়কর্ত্তা সেজকর্ত্তা এসেছেন।'

নুটুবাবু বিস্মিত হইলেন, এবং অত্যন্ত ব্যস্ত হইয়া নীচে নামিয়া আসিয়া বলিলেন, 'আসুন, আসুন, আসুন! মহাভাগ্য আমার আজ!'

বড়কর্ত্তা বলিলেন, 'সে তো না বলতেই এসেছি হে, এখন বসতে দেবে কি না বল, না তাড়িয়ে দেবে!'

নুটুবাবু একটু অপ্রস্তুত হইয়া বলিলেন, 'দেখুন দেখি, তাই কি আমি পারি, না কোন মানুষে পারে?'

বড়কর্ত্তা মুচকি হাসিয়া বলিলেন, 'আজ তোমার সঙ্গে সওয়াল করব, দাঁড়াও। দেশের মধ্যে তো তুমি এখন সব চেয়ে বড় উকীল—এ-জেলা ও-জেলা থেকেও তোমাকে নিয়ে যায়—দেখি কে হারে?'

নুটুবাবু ব্যস্ত হইয়া বলিলেন, 'বেশ এখন বসুন।'

বড়কর্ত্তা বলিলেন, 'ধর, তোমার বাড়ী ভিখারী এসেছে, তাকে বসতে বলে আর কি আপ্যায়িত করবে, যদি ভিক্ষেই তাকে না দাও!'

নুটুবাবু জোড়হাত করিয়া বলিলেন, 'আমার কাছে আপনারা ভিক্ষে চাইবেন, এ যে বড় অসম্ভব কথা', আশঙ্কার কথা! এ যে বলির দ্বারে বামনের ভিক্ষে চাওয়া। বেশ আগে বসুন।'

বড়কর্ত্তা বার-বার ঘাড় নাড়িয়া বলিলেন, 'উঁহু! আগে তুমি বল যে দেবে, তবে বসি—নইলে যাই।'

নুটুবাবু বলিলেন, 'বেশ বলুন, সাধ্যের মধ্যে যদি হয় তবে দেব আমি।'

বড়কর্ত্তা বলিলেন, 'তোমার ছেলেটিকে আমাকে ভিক্ষে দিতে হবে, আমার নাতনীটিকে তোমাকে আশ্রয় দিতে হবে।'

তাঁহার পুত্র আসিয়া নুটুবাবুর হাত দুটি চাপিয়া ধরিল, নুটুবাবু বিস্মিত হইয়া তাঁহাদের মুখের দিকে চাহিয়া রহিলেন।

সেজকর্ত্তা বলিলেন, 'তোমার ছেলে খুব ভাল, বি-এতে এম-এতে ফার্ষ্ট হয়েছে, তুমিও এখন মস্ত ধনী, বড় বড় জায়গা থেকে তোমার ছেলের সম্বন্ধ আসছে—সবই ঠিক। কিন্তু কঙ্কণার মুখুজ্জেদের বাড়ীর মেয়ে ধনে কুলে মানে অযোগ্য হবে না। রূপের কথা বলব না, সে তুমি নিজে দেখবে।'

নুটুবাবু বড়কর্ত্তার এবং সেজকর্ত্তার পায়ের ধুলা লইয়া বলিলেন, 'আপনাদের নাতনী আমার বাড়ী আসবে—সত্যিই সে আমার সৌভাগ্য।' সমারোহের মধ্যেই যে বিরোধের সূত্রপাত হইয়াছিল—সমারোহের মধ্যেই তাহার অবসান হইয়া গেল।

* * *

বিবাহ শেষ হইয়া গেল।

অনুষ্ঠান শেষ হইলেও উৎসবের শেষ তখনও হয় নাই। সমাগত আত্মীয়স্বজনদের সকলে এখনও বিদায় লয় নাই। কয়েকটি হাভাতে অতিলোভী আত্মীয় বিদায় লইবে বলিয়া বোধ হয় না। তাহাদের ছেলেগুলার জ্বালায় ছবি, ফুলদানীগুলি ভাঙিয়া প্রায় শেষ হইয়া আসিয়াছে।

নুটুবাবু প্রাতঃকালে একখানা ইজি-চেয়ারে শুইয়া তামাক টানিতে টানিতে ঐ কথাই ভাবিতেছিলেন। নিয়মের ব্যতিক্রমে, অপরিমিত পরিশ্রমে শরীর তাঁহার অসুস্থ - বেশ একটু জ্বরও যেন হইয়াছে। চাকরটা আসিয়া সংবাদ দিল—তাঁহার ফাউন্টেন পেনটা পাওয়া যাইতেছে না। নুটুবাবুর রক্ত যেন মাথায় চড়িয়া গেল। তিনি তৎক্ষণাৎ গৃহিণীকে ডাকিতে বলিলেন। গৃহিণী আসিতেই তিনি বলিলেন, 'রতনপুরের কালীর মাকে, পারুলের জ্যাঠা-ঠাকরুণকে আজই বাড়ী যেতে বলে দাও!'

সবিস্ময়ে গৃহিণী বলিল, 'তাই কি হয়? নিজ থেকে না গেলে কি যেতে বলা যায়! আপনার লোক—!'

নুটুবাবু বলিলেন, 'আপনার জনের হাত থেকে আমি নিস্তার পেতে চাই বাপু, দোহাই তোমার বিদেয় কর ওদের। বরং কিছু দিয়ে থুয়ে দাও—চলে যাক ওরা, নইলে ঘরদোর পর্য্যন্ত ভেঙে চুরমার ক'রে দেবে!'

গৃহিণী একটু বিব্রত ভাবেই অন্দরের দিকে চলিয়া গেলেন। নুটুবাবু ক্লান্তভাবেই চেয়ারে শুইয়া বোধ করি

পরিত্রাণেরই উপায় চিন্তা করিতে লাগিলেন। কিছুক্ষণ পরে মুহুরী আসিয়া একখানা রায়ের নথি সম্মুখের টেবিলটার উপর নামাইয়া দিয়া বলিল, 'রায়ের নকলটা কাল চেয়েছিলেন। কিন্তু বাজে খরচ কিছু বেশী হয়ে গেল।'

ফুটুবাবু সজাগ হইয়া উঠিয়া বসিলেন। একটা দায়রা মোকদ্দমার রায়ের নকল। মোকদ্দমাটায় ফুটুবাবুর অপ্রত্যাশিত ভাবে পরাজয় ঘটিয়াছে। তাঁহার কয়েকটি সূক্ষ্ম যুক্তি বিচারক অন্যায়ভাবে অগ্রাহ্য করিয়াছেন। ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া তিনি রায়খানা তুলিয়া লইলেন। মুহুরীটি চলিয়া গেল। রায়খানা পড়িতে পড়িতে ফুটুবাবুর মুখ চোখ রাঙা হইয়া উঠিল। বিচারকের মন্তব্য এবং বিচার-পদ্ধতির বক্রগতি দেখিয়া তাঁহার ক্রোধের আর পরিসীমা রহিল না। দারুণ উত্তেজনাবশে রায়খানা ছুঁড়িয়া ফেলিয়া দিয়া উঠিয়া ঘরের মধ্যে পায়চারি আরম্ভ করিলেন। উপরের ঘরটাতেই দুমদাম ছুটপাট শব্দে ঐ আত্মীয়দের ছেলেগুলি যেন মগের উপদ্রব আরম্ভ করিয়া দিয়াছে। ফুটুবাবু অত্যন্ত বিরক্তিভরে উপরের দিকে চাহিয়া বলিলেন, 'ভগবান, রক্ষে কর!' চাকরটা ঘরের মধ্যে আসিয়া কতকগুলা চিঠি টেবিলের উপর রাখিয়া দিল। চিঠিগুলা দেখিতে দেখিতে একখানা অতি পরিচিত হাতের লেখা খাম দেখিয়া সাগ্রহে খুলিয়া ফেলিলেন। হাঁ—পুরাতন বন্ধু সেই বৃদ্ধ মুন্সেফবাবুরই চিঠি! এই বিবাহে আসিতে অক্ষমতার জন্য ক্ষমা চাহিয়া তিনি লিখিয়াছেন—

"যাবার বাতিক অসম্ভব রূপে প্রবল হ'লেও বাতের সঙ্গে যুঝে উঠতে পারলাম না, পরাজয় মানতে হ'ল। বিছানায় শুয়ে শুয়েই আপনার ছেলে ও বৌমাকে আশীর্বাদ করছি। ডাকযোগে আশীর্বাদীও কিছু পাঠালাম, গ্রহণ করবেন।"

পরিশেষে লিখিয়াছেন, "আজ একটা কথা বলব, রাগ করবেন না। একদিন আপনি বলেছিলেন ম'-লক্ষ্মীর অভ্যেস হ'ল লোকের মাথার ওপর দিয়ে পথ করে চলা। তাঁর চরণ দুখানি আপনি পথের ধুলোয় নামাব বলেছিলেন। কিন্তু টেনে টেনে নিজের মাথাতেই চাপালেন যে! লজ্জা পাবেন না, চরণ দুখানি এমনই লোভনীয়ই বটে, মাথায় না ধরে পারা যায় না! মাথায় কি দেবীর রজত-রথের উপযোগী রাজপথ তৈরি হয়েছে, বলি টাক পড়েছে—টাক?"

চিঠিখানার কথাগুলি যেন তীরের মত তাঁহার মস্তিষ্কে গিয়া বিঁধিল। উত্তেজিত অসুস্থ মনের মধ্যে অকস্মাৎ একটি অদ্ভুত মুহূর্ত্ত আসিয়া গেল। সমগ্র জীবনটা এই মুহূর্ত্তের মধ্যে ছায়াছবির মত তাঁহার মনশ্চক্ষুর সম্মুখ দিয়া ভাসিয়া গেল। এই ঘর এই ঐশ্বর্য্য সমস্ত যেন কুৎসিত ব্যঙ্গে হিহি করিয়া হাসিতেছে। আবার মনে হইল, ঘরের দেওয়ালে ঝুলানো ছবিগুলির মধ্যে সমস্তগুলিতেই মুন্সেফ-বাবুর ব্যঙ্গ-হাস্য-বক্র মুখ ভাসিয়া উঠিয়াছে! রতনপুরের কালীর মা—পারুলের শ্যামাঠাকরুণ উপরতলায় বিজয়োল্লাসে কি তাণ্ডব নৃত্য জুড়িয়া দিয়াছে!

তিনি থর থর করিয়া কাঁপিতে কাঁপিতে একখানা আসনে বসিয়া লুটাইয়া পড়িলেন। চাকরটা শঙ্কিতভাবে ডাকিল, 'বাবু!' কোন উত্তর নাই। দেখিয়া শুনিয়া চাকরটা চীৎকার করিয়া উঠিল।

ডাক্তার আসিয়া বলিল, 'ব্রেন ফীভার।'

তিন দিনের দিন ফুটুবাবু মারা গেলেন। মৃত্যুর পূর্ব্বে সামান্যক্ষণের জন্য জ্ঞান ফিরিয়াছিল। প্রবীণ ব্যক্তিগণের অনুরোধে তাঁহার পুত্র তাঁহাকে বলিল, 'বাবা, ইষ্টদেবতাকে স্মরণ করুন।'

স্থির দৃষ্টিতে চাহিয়া ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া ফুটুবাবু বলিলেন, 'মনে পড়ছে না!'

এক জন বলিলেন, 'তুমি সরে বস, তোমার মাকে বসতে দাও। উনি বলে দিন কানে কানে ইষ্টমন্ত্র!'

গৃহিণী আসিয়া অশ্রুরুদ্ধকণ্ঠে স্বামীর কানে ইষ্টমন্ত্র উচ্চারণ করিলেন। কিন্তু ততক্ষণে ফুটুবাবু আবার জ্ঞান হারাইয়া প্রলাপ বকিতে আরম্ভ করিয়াছেন। প্রলাপের মধ্যেও তিনি যেন কোন মোকদ্দমার সওয়াল করিতে-ছিলেন—

"My Lord, it is easier for a camel to go through the eye of a needle than for a rich man to enter into the Kingdom of God," [ধনীর পক্ষে স্বর্গরাজ্যে প্রবেশ অপেক্ষা সূচের মুখে উটের প্রবেশও সহজ]

প্রাচীন ভারতের নারী-কবি শীলা ভট্টারিকা

ডক্টর শ্রীযতীন্দ্রবিমল চৌধুরী, পিএইচ-ডি (লণ্ডন)

জগতে কোনও জাতি যখন বড় হয়, তখন সে জাতি কেবল পুরুষ বা কেবল নারীকে নিয়ে বড় হয় না, হ'তে পারে না। নারী-শিক্ষার বাধা ঘটিয়ে নারীর স্বভাবতঃ বর্দ্ধনকুশল মঙ্গলপথ কণ্টকসঙ্কুল করার দীনহীন প্রচেষ্টা ক'রে প্রাচীন ভারতসমাজ নিজকে পঙ্গু করার উন্মত্ত অভিপ্রায় কখনও জ্ঞাপন করে নি।

এ প্রবন্ধে প্রাচীন ভারতের শুধু এক জন মহিলা কবির কথা বলব—তাঁর নাম শীলা ভট্টারিকা। তিনি হৃদয়োত্থ সূক্তিতে বহু শতাব্দী ধ'রে ভাবগ্রাহীবৃন্দের শ্রুতিরঞ্জন ও জ্ঞানপিপাসা নিবারণ করেছেন।

রাজশেখর ১ ও ধনদদেব২ শীলার স্তুতি-পাঠ ও ভক্তি-গর্ভ বন্দনা জ্ঞাপন করেছেন। সাহিত্য-মহারথীরাও৩ তাঁর বাণী উদ্ধৃত করেছেন। স্বতঃই তাঁর আবির্ভাব-সময় আমাদের হৃদয়ে কৌতূহলের সঞ্চার করে।

শীলা ভট্টারিকার "যঃ কৌমারহরঃ স এব হি" ইত্যাদি কবিতা রাজানক রুয্যক তাঁর অলঙ্কারসর্বস্ব৪ নামক গ্রন্থে উদ্ধৃত করেছেন। এই পুস্তক খ্রীষ্টীয় ১১৫০ অব্দে রচিত হয়। খুব সম্ভবতঃ এ পুস্তকের আরও কিছুকাল আগে কবীন্দ্র-বচন-সমুচ্চয় নামক গ্রন্থ সংগৃহীত হয়। এখানেও এ কবিতাটি দৃষ্ট হয়।১ "ইদমনুচিতমক্রমশ্চ পুংসাম্" ইত্যাদি কবিতাটি শীলা ভোজরাজের সঙ্গে শারি-ক্রীড়া করতে করতে কথোপ-কথনচ্ছলে রচনা করেন—শার্ঙ্গধর-পদ্ধতিতে এরূপ কথিত আছে।২ সুতরাং তিনি ভোজরাজের সমসাময়িক ছিলেন। আবার দেখা যায়—কবি রাজশেখর শীলার নাম উল্লেখ করেছেন।৩ সুতরাং শীলা রাজশেখরের সমসাময়িক বা পূর্ব্ববর্ত্তিনী ছিলেন। আমরা জানি যে রাজা মিহিরভোজ রাজশেখরের সমসাময়িক (যদিও বয়সে কিছু বড়)। নিশ্চয় এ ভোজরাজের সঙ্গেই শীলা কথোপকথন করছিলেন। সুতরাং শীলা খ্রীষ্টীয় নবম শতাব্দীতে বর্ত্তমান ছিলেন।

শীলার যুগের কবিশেখর রাজশেখর বলেছেন—সংস্কার আত্মার ধর্ম্ম; তাই কবিত্বে নারী ও পুরুষের সমান অধিকার; শোনাও যায়, দেখাও যায়—রাজদুহিতা প্রভৃতি অনেক মহিলা-কবি রয়েছেন।৪ নারীদের কবিত্ব-শক্তির উচ্চ আদর্শে অনুপ্রাণিত, বিজ্জা প্রভুদেবী লাটী সুভদ্রা প্রভৃতি মহিলা-কবিদের প্রাণের ভক্তি-পুষ্পাঞ্জলি-প্রদানকারী রাজশেখরের "দেখা যায়" এই কথার সবচেয়ে বড় সার্থকতা এক দিকে যেমন তাঁর অন্তঃপুরচারিণী কবি অবন্তি-সুন্দরী, অন্য দিকে তেমন তাঁর রাজসভার শ্রেষ্ঠ নারীকুল-শোভা শীলা ভট্টারিকা।

সকল দেশের ও সকল জাতির কাব্যের প্রাণ প্রেম। কবি শীলা ভট্টারিকাও এ চিরপুরাতন এবং চিরনবীন বিষয় নিয়ে কবিতা রচনা করেছেন। নর-নারীর প্রেম ও তদনুচর

(১) জহ্লনের সূক্তি-মুক্তাবলী-সংগ্রহ, ভাণ্ডারকর সংগৃহীত হস্তলিখিত ৩৭০ নং পুঁথি (পুনা ১৮৮৪-৮৫), ফলিও ২৩ খ; ভাণ্ডারকরের রিপোর্ট (১৮৮৭-৯১), ১৬থ।

(২) শার্ঙ্গধর পদ্ধতি, কবিতা-সংখ্যা ১৬৩।

(৩) পরবর্ত্তী পাদটীকাগুলি দেখুন।

(৪) কাব্য-মালা সীরিজে (১৮৯৩) দুর্গাপ্রসাদকৃত সংস্করণ, পৃঃ ১২৭-২৮, ২০০। অন্যান্য অলঙ্কার-গ্রন্থেও এ শ্লোক উদ্ধৃত হয়েছে; যথা, বিশ্বেশ্বর পণ্ডিতের অলঙ্কার-কৌস্তুভ, পণ্ডিত শিবদাসের সংস্করণ (১৮৯৮), পৃঃ ৩৩৬; শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকর, ত্রিবেন্দ্রাম সংস্করণ, (১৯১৬), ২৫৩ পৃঃ; রাজচূড়ামণি দীক্ষিতের কাব্য-দর্পণ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সংস্করণ, পৃঃ ১৩-১4; বিশ্বনাথ কবিরাজের সাহিত্যদর্পণ, কাণের সংস্করণ, পৃঃ ৩।

(১) বিব্লিওথেকা ইণ্ডিকা, গ্রন্থাঙ্ক ২০৮, পৃঃ ১৫১।

(২) কবিতা-সংখ্যা ৫৬৪। এই কবিতা মম্মটের কাব্য-প্রকাশ (বাণহট্টির সংস্করণ, পৃঃ ৩৪১) ও অন্যান্য অলঙ্কার-গ্রন্থেও উদ্ধৃত হয়েছে।

(৩) জহ্লনের সূক্তি-মুক্তাবলী-সংগ্রহ, ভাণ্ডারকার সংগৃহীত হস্তলিখিত ৩৭০ নং পুঁথি (পুনা ১৮৮৪-৮৫), ফলিও ২৩খ।

(৪) কাব্য-মীমাংসা, বড়োদা সংস্করণ (১৯১৬), পৃঃ ৫৩।

ঈর্ষা, মান, বিরহ প্রভৃতি কবির পীযূষ-বাণীতে মধুর ভাবে ব্যক্ত হয়েছে।

দুটি কবিতায় কবি নারীর প্রতি নারীর অন্তর্লীন এবং সদাআত্মপ্রকাশোন্মুখ সন্দেহ ও ঈর্ষার একটি সুন্দর চিত্র অঙ্কিত করেছেন। নায়িকা নায়কের কাছে দূতী প্রেরণ করছেন। সে দূতী তাঁর অতি প্রিয় ও বিশ্বস্ত সখী, তথাপি তাঁর সন্দেহের অভাব নেই। দূতীকে প্রিয়ের কাছে পাঠাবার সময়ে নায়িকা বলছেন—দূতি! তুমি তরুণী, সেও যুবা ও চঞ্চলচিত্ত, তোমার সঙ্গে তার দেখা হবে নির্জ্জন কাননে, দশ দিকও অন্ধকার হয়ে আসছে, বসন্ত-বাতাস মন হরণ ক'রে বইছে, আমার কাছ থেকে মধু-মিলনের বার্ত্তা বহন ক'রে তুমি তার কাছে যাও, তোমার দেবতারা তোমাকে রক্ষা করুন।[১] আবার দূতী যখন ক্লান্ত হয়ে ফিরে এল, তখন নায়িকার সন্দেহাকুল ও ঈর্ষাদগ্ধ চিত্ত বাধা মানল না—তিনি তখনই দূতীকে জেরা আরম্ভ ক'রে দিলেন—দূতি! তোমার দীর্ঘশ্বাসের কি কারণ, বেণী ঢ'লে পড়েছে কেন, মুখ ঘর্ম্মাক্ত কেন। দূতীও তাড়াতাড়ি উত্তর দিল—ত্বরিত প্রত্যাবর্ত্তন হেতু, শুভবার্ত্তা হেতু, ইত্যাদি। তথাপি নায়িকা মুখের উপর ব'লে দিলেন—দূতি! বাজে অজুহাত দিচ্ছ, তোমার অধরযুগল যে ম্লান পদ্মের আকার ধারণ করেছে, সে সম্বন্ধে তোমার কি বলবার আছে?[২] সুকোমল চিত্তবৃত্তির রাজ্যে নারীর হৃদয় প্রেমের শেষ সীমানাটুকু পর্য্যন্ত অকাতরে অনুদ্বেগে অধিকার ক'রে সগৌরবে বিজয়-পতাকা উড্ডীয়মান করে, পুরুষ এক্ষেত্রে যেন কোণ-ঠাসা। কিন্তু পুরুষে পুরুষে যে প্রীতির সৌধ অভ্রংলিহ হয়ে মাথা তুলে খাড়া থাকতে পারে, নারীতে নারীতে এ সম্পর্কের গঠন সে তুলনায় একেবারে কুঁড়ে-ঘর—তার পাতার ছাউনির ভিতর দিয়ে জল গড়িয়ে পড়ে। নারীর-হৃদয়—শতদল উদীয়মান রবির আবির্ভাব-গৌরবে এমনি এক দিকে ঝুঁকে পড়ে যে তা অন্য সব দিকের প্রতি আত্মবিস্মৃত হয়ে যায়—তাতে তার পূর্ব্ব-সঞ্চিত স্নেহপ্রীতির শিশির-কণা কিছু বা ঝরে যায়, কিছু বা রবি-রশ্মিতে শুকিয়ে যায়। এতে নারীর অগৌরবের কিছু নেই, এটি স্বাভাবিক। এই বৃহত্তর সত্য বিশ্লেষণ করতে করতে এ সত্যও ধরা পড়ে যে দৈনন্দিন কার্য্যক্ষেত্রে পুরুষ পুরুষকে যে-পরিমাণে বিশ্বাস করে, নারী নারীকে সে-পরিমাণে করে না, প্রেমের রাজ্যে তো কথাই নেই। কবি শীলা তাঁর নারীহৃদয় দিয়ে এই কথা উপলব্ধি করেছেন।

আর একটি কবিতায় শীলা একটি মজার কথা বলেছেন—সেটি হচ্ছে পুরুষের মান। কাব্যে নায়িকার মানের কথাই সর্ব্বত্র দৃষ্ট হয়—নায়ক মানিনী নায়িকার মান ভঙ্গ করেন। কিন্তু শীলার কবিতায় বিরহজর্জ্জরিত-তনু নায়িকাই নায়কের মান-ভঙ্গে রত। নায়িকা বলছেন—হে নাথ! বিরহানলে শরীর আমার জ্বলে পুড়ে শেষ হয়ে যাচ্ছে, নিষ্করুণ যমও আমায় ভুলে আছে, তুমিও মানব্যাধিগ্রস্ত হ'লে—এমন ক'রে কুসুমকোমল নারী আমি কি ক'রে বেঁচে থাকি?[৩]

মহিলা-কবি যে পুরুষের মানের কথাই শুধু বলেছেন তা নয়, পুরুষের বিরহ-অবস্থাও বর্ণন করেছেন। কবি বলেছেন—প্রিয়া-বিরহিত ব্যক্তির হৃদয়ে চিন্তা সমাগত হয়েছে, তা দেখে নিদ্রা ঐ ব্যক্তিকে ছেড়ে পলায়ন করেছে। অন্যান্য রাত্রিতে নিদ্রা থাকে একেশ্বরী দেবী হয়ে, আজ তার স্থান চিন্তা এসে অধিকার করেছে; তাই চিন্তাকে সতীন ভেবে নিদ্রা সেই কৃতঘ্ন পুরুষকে গ্রহণ করতে চাচ্ছে না।[৪] বিরহী পুরুষের মনস্তত্ত্ব-বিশ্লেষণে নারী-কবির এ আত্মনিয়োগ সুমধুর।

একটি সুমধুর কবিতায় কবি অসতী নারীর চাপল্য ও তরলতাপূর্ণ জীবনের বিষময় ফল দেখিয়েছেন। যে-নারীর

(১) শুভাষিত-রত্ন-সার. হস্তলিখিত পুঁথি. রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল—১০৫৬৬-১৩-সি-৭, ফলিও ৪০ (ক), কবিতা-সংখ্যা ৫৪, ইত্যাদি।

(২) সুভাষিত-সার-সমুচ্চয়, হস্তলিখিত পুঁথি, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল—১০৫৬৬-১৩-সি ৭, ফলিও ৪৫ (খ); বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী. কবিতা-সংখ্যা ১৪৪০; ইত্যাদি।

(৩) শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, কবিতা-সংখ্যা ৩৫৭২।

(৪) বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, কবিতা-সংখ্যা ১১৯৭।

চিত্ত বহুপুরুষাভিমুখ, তার জীবনে স্থিরতা, সুখ, শান্তি, কিছুই নেই। সুখের পিছনে সে ছোটে, সুখ তাকে দেখে সহস্র যোজন দূরে ছুটে পালায়। কবি বলছেন, সেই তরুণ জীবনের প্রণয়ী ও বর, সেই চৈত্র-রজনী, সেই উন্মীলিত মালতী-সৌরভ বিমিশ্র প্রেমোদ্দীপক কদম্বানিল, সেই রেবা-তট,[1] তথাপি অসতী নারীর মন ছোটে আর এক জন, আর এক জন ক'রে বহুর পিছু, মন তার আপাতমনোরম সুখের চাকচিক্যের পেছনেই লেগে থাকে[2]। যে স্মৃতিগুলির কথা কবি বলেছেন, তার প্রত্যেকটির মূল্য এক-খানা প্রণয়িনীর কাছে স্বজীবনের চেয়েও কোটি কোটি গুণ বেশী, বিশেষতঃ সেই রেবা-তট যে পথে চিত্রকূট-আম্রকূট-ভেদী যক্ষের মুহুর্মুহু দীর্ঘশ্বাস সমীরণের বুকে বুকে প্রিয়ার জন্য অলকার পথে দশার্ণের দিকে ছুটে চলেছে। স্নেহের বুকে স্মৃতির প্রতি কণা মাণিক হয়ে জল্ জল্ ক'রে শোভা পায়; উত্তর জীবনের একটানা দুঃখদৈন্যেও তা প্রভাহীন হয় না। নিতান্ত অধন্যা সে—যার বর্ত্তমান সমস্ত সম্বল, এমন কি স্মৃতির সম্বল স্বীয় উদ্দাম প্রবৃত্তির স্বল্প মূল্যে সাধারণ নিলামে বিক্রী হয়ে যায়।

রাজশেখর বলেছেন, শীলার ও বাণভট্টের লেখায় শব্দ ও অর্থের সমানতা হেতু তাঁদের রচনা পাঞ্চালী রীতির অন্তর্ভুক্ত।[3] অবশ্য, রাজশেখরোক্ত পাঞ্চালী রীতির এই লক্ষণ দর্পণকারাদির মত হ'তে ভিন্ন।[4] দর্পণকারের মতে পাঞ্চালী রীতি বৈদর্ভী ও গৌড়ী রীতির মধ্যবর্ত্তী ও সমস্ত লক্ষণও তাই—সমাসের দিক থেকে পাঁচ বা ছয় পদের সমাসই পাঞ্চালীতে বাঞ্ছনীয়।[1] শীলার রচনায় মাধুর্য্যব্যঞ্জক বর্ণের ব্যবহার অধিক। তাঁর রচনা সুকুমার অর্থযুক্ত এবং সমাসবিহীন বা অল্পসমাসযুক্ত। ফলতঃ, আমাদের প্রাপ্ত কবিতাগুলির উপর নির্ভর করতে গেলে কবিকে শেষোক্ত মতে বৈদর্ভী রীতির অন্তর্ভুক্ত করতে ইচ্ছা করে।

কবির রচনা প্রাঞ্জল ও প্রসিদ্ধ অর্থের অনুবর্ত্তন হেতু প্রসাদগুণ[2] বিশিষ্ট, বাক্যে ও বস্তুতে রসাধিক্যহেতু অত্যন্ত মধুর[3] ও কষ্টকল্পনার অভাবহেতু অর্থব্যক্তি[4]-গুণে সুমণ্ডিত। কবি কোথাও সমাধিগুণের[5] আশ্রয় গ্রহণ করেন নি—অর্থাৎ এক বস্তুর ধর্ম্ম অন্য বস্তুতে আরোপ ক'রে ভাব প্রকাশের চেষ্টা করেন নি।

কবিকে দু-এক ক্ষেত্রে অশ্লীলতাদোষে অভিযুক্ত করা চলে।[6] অন্যত্র এ-বিষয়ে আলঙ্কারিকদের মতদ্বৈধ ঘটবে।[7] একটি কবিতায়[8] দ্বিতীয় পাদে অধিক পদ প্রয়োগ ও প্রক্রমভঙ্গ দোষ ঘটেছে।

শীলার কবিতায় অলঙ্কার-প্রয়োগের আধিক্য নেই; প্রত্যুত অর্থান্তরন্যাস[9] বিভাবনা বিশেষোক্তি বিমিশ্র সন্দেহসঙ্কর,[10] অতিশয়োক্তি[11] প্রভৃতি অর্থালঙ্কার ও

(১) বর্ত্তমান নর্ম্মদা নদী।

(২) শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, কবিতা-সংখ্যা ৩৭৬৮; হরি কবির সুভাষিত-হারাবলী, হস্তলিখিত পুঁথি, (পিটার্সন, দ্বিতীয় রিপোর্ট, ৫৭-৬৪), ২৭৮; জহ্লনের সূক্তি-মুক্তাবলী-সংগ্রহ, পিটার্সনের তৃতীয় রিপোর্ট, ৩৭০ নং পুঁথি, পৃঃ ১২৬ (খ); ইত্যাদি।

(৩) জহ্লনের সূক্তি-মুক্তাবলী-সংগ্রহ, ভাণ্ডারকর-সংগৃহীত হস্তলিখিত ৩৭০ নং পুঁথি (পুনা ১৮৮৪-৮৫), ফলিও ২৩ (খ); ইত্যাদি।

(৪) সাহিত্য-দর্পণ, নির্ণয়-সাগর প্রেসের ৪র্থ সংস্করণ, পৃঃ ৩৬৭-৪৬৮; শিঙ্গভূপালের রসার্ণব-সুধাকর, ১ম বিলাস, ১২৯ শ্লোক।

(১) সাহিত্য-দর্পণের উপর্যুক্ত সংস্করণের ৪৫৩ পৃষ্ঠায় লক্ষণ দেখুন।

(২) প্রসাদ ও প্রসাদব্যঞ্জক শব্দ: সাহিত্য-দর্পণ, উপর্য্যুক্ত সংস্করণ, ৪৫৫-৫৬ পৃঃ; কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ, ৪৫-৪৬ শ্লোক।

(৩) লক্ষণ: কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ ৫১ শ্লোক।

(৪) লক্ষণ: কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ, ৭৩ শ্লোক।

(৫) লক্ষণ: কাব্যাদর্শ, ১ম সর্গ, ৯৩ শ্লোক।

(৬) যথা, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ৫৬৪ নং কবিতা।

(৭) যথা, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ৫৬৭ নং কবিতা।

(৮) সুভাষিত-রত্ন-ভাণ্ডাগার, দ্বিতীয় সংস্করণ, ২১৪ পৃ.

(৯) যথা, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১১৯৭ নং কবিতা।

(১০) যথা, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ৩৭৬৮ নং কবিতা। কোন কোন আলঙ্কারিক এ কবিতায় স্ফুট অলঙ্কারের অভাব দেখতে পান—যথা বিশ্বনাথ কবিরাজ, কাণের সংস্করণের ৩ পৃঃ; রাজচূড়ামণি দীক্ষিত, কাব্য-দর্পণ, সুব্রহ্মণ্য শাস্ত্রীর সংস্করণ, ১৩ পৃঃ, ইত্যাদি।

(১১) যথা, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১৬৩৩ নং কবিতা; সুভাষিত-সার-সমুচ্চয়, হস্তলিখিত পুঁথি, রয়্যাল এশিয়াটিক সোসাইটী অব বেঙ্গল ১০৫৬৬-১৩-সি ৭ নং পুঁথি, ফলিও ৪০ (খ), ৫৪ নং কবিতা।

অনুপ্রাস,[১] যমক[২] প্রভৃতি শব্দালঙ্কারের প্রয়োগে কাব্য-শোভা সুষ্ঠুভাবে বর্দ্ধিত হয়েছে।

শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত, অনুষ্টুভ, পুষ্পিতাগ্রা, হরিণী প্রভৃতি ছন্দ কবির প্রিয়।[৩]

কবির কাব্যোদ্যানের মাত্র কয়েকটি ইতস্ততঃ বিক্ষিপ্ত পুষ্পের সৌরভে আমাদের হৃদয়-মন ভাবাবেশে এত আপ্লুত হয়ে আসে যে আধুনালুপ্ত সম্পূর্ণ উদ্যানের স্পষ্ট আকৃতি, সমগ্র সৌন্দর্য্যের কথা ভাবতেই আমাদের চিত্তে একটা অজানা শিহরণ জাগে।

কবি শীলা বহুকাল আগে নারী-শিক্ষার যে অতুল কীর্ত্তিসৌধ নির্ম্মাণ ক'রে গেছেন, তার তুলনা কেবল ভারত-বর্ষেই মেলে, জগতের আর কোথাও পাওয়া যায় না, সংস্কারাভাবে এ সব সৌধ যদি আমরা জীর্ণ দীর্ণ ক'রে না ফেলতাম, তা হ'লে নারীর জ্ঞানকুশলতা ও কৃতিত্বে—কি বর্ত্তমানে, কি ভবিষ্যতে—জগতের কোনও জাতি আমাদের সমকক্ষ হ'তে পারত না। অতীতের যা অবশিষ্ট আছে, তা নিয়েও বর্ত্তমানে আমরা জগৎ-সভায় শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করবার প্রয়াস করতে পারি।

(১) যথা শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, ৩৫৭২ নং কবিতা।

(২) যথা, বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১৬৩৩ নং কবিতা।

(৩) শার্দ্দূল-বিক্রীড়িত—যথা, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি, কবিতা-সংখ্যা ৩৭৬৮এ; বল্লভদেবের সুভাষিতাবলী, ১৪৪০ নং কবিতায়। পুষ্পিতাগ্রা—যথা, শার্ঙ্গধর-পদ্ধতি ৫৬৪ নং কবিতায়।

সার্থক চেষ্টা

শ্রীসুধাকান্ত রায়চৌধুরী

নয়নের নীরে মম বিকশিত তব শতদল,
নহে সে ত লবণাম্বু অশ্রু, সে যে শিশিরের বারি;
ছিল দু-নয়নে মোর সৌর-কিরণের হেমঝারি
কনক-সিঞ্চনে তার তনু তব করে ঝলমল।

বাদল-আসারে মম সাগরের শুভ্র ফেনরাশি,—
মাধুর্য্যের পুষ্পপুঞ্জে ছন্দে ছন্দে উঠে গো বিকশি,
তোমার পেলব দল পুঞ্জ ফুলে উঠিছে উচ্ছ্বসি,
চুম্ব দিল সর্ব্ব অঙ্গে তার প্রভাতের সূর্য্য আসি।

প্রেমে মোর ছিল ওগো স্নিগ্ধ জ্যোতি হেমবর্ণ আলা
নাহি ছিল তাহে তীব্র কামনার বহ্নিভরা ব্যথা,
প্রস্ফুট প্রণয় লয়ে এলে তাই নামি এই মর্ত্ত্যে
রঞ্জিত প্রেমের রাগে নয়ন-দিঠিতে শান্তি ঢালা,
কপোলের রাঙিমায় তব স্বপনের শয্যা পাতা;
তোমারে ফুটাতে গিয়ে, ফুটে উঠি আমি প্রেম-সর্ত্তে।



খেলাঘর
শ্রীনরেন্দ্রনাথ ঘোষ

সায়াহ্ন

শ্রীপাঁচুগোপাল মুখোপাধ্যায়

হরিচরণ বাবুর বয়স প্রায় পঞ্চান্নর কাছাকাছি। তাঁহার মাথার চুলের অনেকগুলি আজ স্থানভ্রষ্ট, এবং যে কয়টি এখনও কোন রকমে টিকিয়া আছে, সেগুলিতে পাক ধরিতে আরম্ভ করিয়াছে। বয়সের অনুপাতে শরীরের বাঁধুনি এখনও শিথিল হয় নাই, এ-কথা হরিচরণ বাবু নিজেই ভাল করিয়া জানেন। রজার্সের বাড়ী তাঁর চাকরির ইতিহাস রজত-জয়ন্তী পার হইয়া স্বর্ণের পথে পা দিয়াছে। এই দীর্ঘকালের মধ্যে হরিচরণ বাবু আপিস কামাই করিয়াছেন মাত্র দিন কুড়ি-বাইশ। প্রথম বার দিন-সাতেকের জন্য;—একমাত্র শ্যালিকার বিবাহ-ব্যপদেশে সাত দিনের ছুটি লইয়া তাঁহাকে মুঙ্গের যাইতে হইয়াছিল। শ্বশুরবাড়ী তাঁর মুঙ্গের শহরে। আপিসে অনুপস্থিত থাকিয়া রজার্স কোম্পানীকে ঠকাইয়া বেতন লইবার বাসনা হরিচরণ বাবুর ছিল না; কিন্তু গৃহিণী সত্যবালা সে-বার নাছোড়বান্দা। তিনি স্পষ্টই জানাইয়া দিলেন যে পূজায় তাঁর গরদের শাড়ী না হইলেও চলিবে, সাবেক তাগাজোড়া ভাঙিয়া হাল-ফ্যাসানের আর্মলেট না বানাইলেও কোন ক্ষতি নাই, কিন্তু মুঙ্গের না গিয়া তিনি নিরস্ত হইবেন না। সাতটা নয়, পাঁচটা নয়, একটি মাত্র বোন—ইত্যাদি।

সুতরাং হরিচরণ বাবুকে সে-বার সুস্থ শরীরে এবং সজ্ঞানে আপিস কামাই করিতে হইয়াছিল। পরের ব্যাপারটা নিতান্তই দৈবাধীন। হঠাৎ একটু সর্দ্দি-কাশি যে এমন মারাত্মক হইয়া উঠিবে সে-কথা হরিচরণ বাবু ভাবিতে পারেন নাই। সকাল হইতে টিপ টিপ করিয়া বৃষ্টি পড়িতে-ছিল, কিন্তু সেদিকে দৃষ্টি না দিয়া তিনি ট্রাম ধরিবার জন্য ছুটিলেন। রজার্স কোম্পানীকে ফাঁকি দেওয়া হইল না বটে, কিন্তু বিকালের দিকে দেহের উত্তাপ সত্যি সত্যি বাড়িয়া গেল। তার পর রাত্রিতে বাসায় ফিরিয়া হরিচরণ বাবু প্রায় অচৈতন্য হইয়া পড়িলেন। ডাক্তার আসিলেন, ওষুধ আসিল, আইসব্যাগ আসিল—সমস্ত মিলিয়া ব্যাপারটা এমনই জটিল হইয়া উঠিল যে হরিচরণ বাবু ভুল বকিতে আরম্ভ করিলেন। কিন্তু সে-যাত্রা তাঁহার আপিসের চাকরিটা টিকিয়া গেল। হরিচরণ বাবু সারিয়া উঠিলেন।

এ-সব অনেক দিন আগের কথা। তার পর হরিচরণ বাবুর হাতে একটা গোটা সেক্‌সনের ভারই আসিয়া পড়িয়াছে। মাহিনা বাড়িয়াছে, এবং সেই সঙ্গে খরচও বড় কম বাড়ে নাই। আগে হরিচরণ বাবু গলাবন্ধ জিনের কোট পরিয়া যাইতেন, এখন সেই কোটের উপর পাকানো উড়্‌নী পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাঁধিতে হয়। পোনে দুই শত টাকা মাহিনার বড়বাবুর পক্ষে সেকেণ্ড ক্লাস ট্রামে যাতায়াত সমীচীন নয় মনে করিয়া হরিচরণ বাবু একদিন একটা মান্থ্‌লি টিকিটই কিনিয়া ফেলেন। সেই ব্যবস্থা আজও চলিতেছে।

ন'টা বাইশ মিনিটের সময় ট্রাম যখন ঠিক কালীতলার সামনে আসিয়া দাঁড়ায়, সেই সময় প্রতিদিন যাঁরা ঠেলাঠেলি করিয়া কোন মতে ট্রামে উঠিয়া একটু জায়গা খুঁজিয়া লন, তাঁদের মধ্যে আমাদের হরিবাবুর 'রেগুলার এটেণ্ডেন্স' একেবারে ফার্ষ্ট প্রাইজ। এ-কালের ছোকরাদের মধ্যে যারা আপিসে বা ব্যাঙ্কে চাকরি করে, তারা সবাই হরিচরণ বাবুকে চেনে। পরিচয় নাই, নামও জানা নাই, তবু ট্রাম যখন কালীতলার মোড়ে আসিয়া থামে, তখন সবাই বুঝিতে পারে যে, এইবার তিনি ট্রামে উঠিবেন। কোন মতে বসিবার মত একটু জায়গা করিয়া লইতে পারিলেই হরিচরণ বাবুর পকেট হইতে প্রকাণ্ড একটা কৌটা বাহির হইয়া আসে—গোটা দুই তিন পান পর-পর মুখের মধ্যে চলিয়া যায় এবং সঙ্গে খানিকটা গৃহজাত দোক্তা। পকেট হইতে ভাঁজকরা খাকী একখানি রুমাল বাহির করিয়া হরিচরণ বাবু কপালের ঘর্ম্মবিন্দুগুলি সযত্নে মুছিয়া ফেলেন। তার পর কি মন্ত্রে জানি না, হাতের রুমাল পকেটের মধ্যে আশ্রয় লইবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর চোখের পাতা গভীর ঘুমে আচ্ছন্ন হইয়া আসে, ট্রামের টপেজ, লোকজনের

ওঠানামা, পথচারী জনতার কোলাহল, মোটরের হর্ণ··· কিছুতেই তাঁর তন্দ্রার কোন ব্যাঘাত ঘটে না। মনে হয়, এই সময়টুকু ছাড়া জীবনে তাঁহার বিশ্রাম করিবার অবসর নাই···বাড়ী আর কর্ম্মস্থলের মধ্যে এই স্বল্প ব্যবধানটুকুই তাঁহার সমস্ত অবকাশ ও স্বপ্ন···

বিকালের ব্যাপারটা একটু অন্য রকম। ট্রাম ধরিবার তাড়া নাই বলিয়াই বোধ হয় হরিচরণ বাবু আপিস হইতে বাহির হন সকলের শেষে। খাতাপত্রগুলি গুছাইয়া, ক্যাশ মিলাইয়া, আপিস-ঘরের দরজা-জানালাগুলি ঠিকভাবে বন্ধ হইল কি না দেখিয়া লইয়া যখন তিনি রজার্স কোম্পানীর আপিসের তিনতলার ফ্ল্যাট হইতে নামিয়া আসেন, তখন পথের দুই ধারে সারি সারি আলো জলিয়া উঠিয়াছে। পথে আলো জলিতে দেখিয়া তিনি বাড়ী ফিরিবার সময় ঠিক করেন কি না বলিতে পারি না, কিন্তু ইহার ব্যতিক্রম ঘটে কদাচিৎ।

কখনও বা ট্রামে পরিচিত কোন বন্ধুর সঙ্গে দেখা হইয়া যায়। কখনও বা হয় না। যে-দিন সঙ্গী জুটিয়া যায়, সে-দিন হরিচরণ বাবুর বাড়ী ফিরিবার কথা আর যেন মনেই থাকে না। গল্পে এবং আলাপে সমস্ত পথ যেন ব্যালান্স-শীট অপেক্ষা রমণীয় হইয়া উঠে। আলোচনার বিষয়বস্তু অবশ্য বিবিধ—একটু বৃষ্টি হইলেই কালীতলার কাছটায় কি বিশ্রী জল জমিয়া উঠে, কর্পোরেশনের কর্ত্তাদের এ সব দিকে নিজেদের দৃষ্টি রাখা নিতান্তই কর্ত্তব্য, কলিকাতার শহরে পয়সা ফেলিয়া সিনেমা দেখিবার জন্য এত লোক কোথা হইতে আসে, তাঁহাদের সহপাঠী রামানুজ মিত্র আঠারো টাকায় পোষ্ট-আপিসে ঢুকিয়াছিল, আজ কিন্তু তার মাহিনাটা গিয়া পৌঁছিয়াছে ছয়-শ'র কাছাকাছি,—'তোমার বড়মেয়ের ছেলেপুলে ক'টি ?' 'মেজছেলেটাকে ইস্কুলে দিলে, না, এখনও পাড়ায় পাড়ায় তেমনি ডাকাতি ক'রে বেড়াচ্ছে ?'···এমনই বিবিধ প্রসঙ্গে এবং প্রশ্নে পথ যেন দেখিতে দেখিতে ফুরাইয়া যায়। শ্যামবাজার ট্রাম-ডিপোর কাছাকাছি হঠাৎ সচকিত হইয়া হরিচরণ বাবু ফিরতি ট্রাম ধরিবার জন্য নামিয়া পড়েন।

পরিচিত কাহারও সহিত যেদিন দেখা হয় না, সেদিন হরিচরণ বাবু হয় পুরা দামে একখানি বৈকালী কাগজ, কিংবা আধা দামে সেই দিনের প্রাতঃকালীন কাগজ কিনিয়া ফেলেন। পার্শ্ববর্ত্তী কাহারও হাতে যদি দৈবক্রমে সেদিনের একখানা কাগজ দেখিতে পান, তাহা হইলে পয়সা খরচ করিয়া কাগজ পড়িবার প্রয়োজন আর হয় না। কেমন একটু সৌজন্য এবং বিনয় প্রকাশ করিয়া কাগজখানি তিনি তৎক্ষণাৎ চাহিয়া লন। পাতা উল্টাইতেই সর্ব্বাগ্রে তাঁহার চোখ পড়িয়া যায় শেয়ার-মার্কেটের রিপোর্টগুলির উপর। বস্তুতঃ নারীহরণের মামলার চিত্তাকর্ষক বিবরণের তুলনায় এগুলি তাঁহার নিকট অনেক বেশী লোভনীয় মনে হয়। তাঁহার জন্য সকলের চেয়ে বড় খবর থাকে শুধু বিশেষ একটি পাতায়। জলতিবাড়ী চা-বাগানের শেয়ারের উপর এবার কত পার্সেণ্ট ডিভিডেণ্ড মিলিতে পারে তাহারই একটা আনুমানিক হিসাব কষিতে কষিতে তিনি উৎফুল্ল হইয়া উঠেন। কুমারধুবীর শেয়ারটা হঠাৎ একটু নামিয়া গেলে তিনি যাবতীয় অংশীদারের হইয়া দুঃখবোধ করিতে থাকেন। এই বিশেষ পৃষ্ঠার অতিতুচ্ছ বিবরণটুকুও যখন শেষ হইয়া যায়, তখন হরিচরণ বাবু বাধ্য হইয়া অন্যান্য পৃষ্ঠাগুলির প্রতি মনোনিবেশ করেন। খবরগুলি সব দিন পড়িয়া দেখিবার সময় নয় না, হেড-লাইনগুলির উপর একবার দৃষ্টিপাত করিয়াই তিনি যেন সব বুঝিয়া ফেলেন। তাঁহার ঠোঁটের প্রান্তে অবিশ্বাসের একটু ক্ষীণ হাসি দেখা দেয়। ট্রেনে ডাকলুঠের সংবাদ পড়িয়া বিস্মিত হইবার বয়স হরিচরণ বাবুর কবে কাটিয়া গিয়াছে; মনে মনে একটু হাসিয়া হরিচরণ বাবু ভাবেন: খাসা লিখিয়াছে। লিখিবার ক্ষমতা আছে, মাথায় কল্পনা আছে ছোকরাদের। নহিলে কাগজ বিক্রী হইবে কেন ?

বাড়ী ফিরিয়া মুখ হাত ধুইতে কোন দিন আধ ঘণ্টার বেশী সময় লাগে না। তার পর কাপড় ছাড়িয়া হরিচরণ বাবু আহ্নিকে বসেন। আহ্নিক সারিয়া উঠিতে উঠিতে রাত ন'টা। তার পর ছেলেমেয়েগুলির একটু খোঁজখবর, যখন যেটি সবচেয়ে ছোট তাহাকে কোলে লইয়া একটু আদর, বড় ছেলেমেয়েগুলির পড়াশুনার জন্য মাষ্টার যথাসময়ে আসিতেছেন কি না সে-সম্বন্ধে একটু কৌতূহল প্রকাশ—তার পরেই আহার-পর্ব্ব ! আহারাদি শেষ হইবার পূর্ব্বেই চাকর আসিয়া

গড়গড়াটি ঠিক মাথার শিয়রে রাখিয়া যায়; হাত-মুখ ধুইয়া হরিচরণ বাবু প্রজ্জ্বলিত কলিকার দিকে চাহিয়া অপরিসীম আনন্দ বোধ করেন। সকালে আপিসের তাড়ায় তামাক খাওয়া হয় না; সুতরাং তামাকের সুগন্ধে নিদ্রার পূর্ব্ব-মুহূর্ত্তগুলিকে সুরভিত করিবার কল্পনায় হরিচরণ বাবু রোমাঞ্চিত হইয়া উঠেন বলিলেও খুব বেশী বলা হয় না। তার পর এক সময়ে গড়গড়ার নল কেমন করিয়া জানি না, তাঁহার মুখ হইতে খসিয়া বালিশের উপর পড়িয়া যায়, তন্দ্রার ঘোরে হরিচরণ বাবু পাশবালিশটা আরও একটু কাছে টানিয়া আনেন, চাকরটা আসিয়া সেই অবসরে নলটা সরাইয়া নীচে নামাইয়া রাখে, সন্তর্পণে মশারিটা টানিয়া দিয়া ঘর হইতে বাহির হইয়া যায়···

রজার্স কোম্পানীর সেক্‌সন্‌-ইন্‌-চার্জ্জ হরিচরণ বাবুর দিনযাত্রা ঠিক এমনি করিয়াই নির্ব্বাহ হইতেছিল। কিন্তু এক দিন আপিসের খোদকর্ত্তা তাঁহাকে স্মরণ করাইয়া দিলেন যে বয়সের প্রতি বিবেচনা করিয়া এইবার তাঁহার অবসর গ্রহণের সময় হইয়াছে। অবশ্য, কোম্পানী তাঁহার প্রতি অবিচার করিবে না, থোক-থাক কিছু টাকা তাঁহাকে দেওয়া হইবে—

হরিচরণ বাবু আপত্তি করিলেন; বয়স যে তাঁহার সত্যই রিটায়ার করিবার মত হয় নাই সে-কথা প্রমাণ করিবার জন্য সাহেবের সম্মুখে এমন ভাবে হাত-পা নাড়িতে লাগিলেন যে মনে হইল, সত্যই বুঝিবা তাঁহার যৌবন ফিরিয়া আসিল! কিন্তু সাহেব ভীষণ কড়া লোক, মাত্র দুই মাস আগে ম্যানেজিং ডিরেক্টর হইয়া খাস স্কটল্যাণ্ড হইতে কলিকাতায় আসিয়াছেন—কোন প্রমাণই তাঁহার নিকট গ্রাহ্য হইল না। চাকরির মেয়াদ নির্দ্দিষ্ট হইয়া গেল। আর তিন মাস পরে তাঁহাকে অবসর লইতে হইবে।

হরিচরণ বাবু সাহেবের ঘর হইতে বাহির হইয়া নিজের টেবিলে আসিয়া বসিলেন। মাথার উপর পাখাটা সমানভাবে ঘুরিতেছে, কিন্তু হরিচরণ বাবুর পক্ষে পাখার হাওয়া যেন এখন যথেষ্ট নয়। বেয়ারাকে ডাকিয়া হরিচরণ বাবু এক গ্লাস জল দিতে বলিলেন। গ্লাসের জলে চোখ মুখ একবার ভাল করিয়া ধুইয়া ফেলিতে হইল। তার পর ফাইলগুলি লইয়া হরিচরণ বাবু নাড়াচাড়া করিতে লাগিলেন। ভাবিলেন, আজ হইতে ঠিক তিন মাস পরে এইখানে বসিয়া ফাইলগুলি নাড়িয়া-চাড়িয়া দেখিবার কোন অধিকারই তাঁহার থাকিবে না। তখন এই চেয়ারে বসিয়া কাজ করিবে তাঁহারই সহকারী রাধাকান্ত চাটুজ্জ্যে।

তা হোক, দুঃখ করিবার কোন কারণ নাই—হরিচরণ বাবু নিজেকে বুঝাইবার চেষ্টা করিলেন। বিশ্রামের বয়স না হোক, প্রয়োজন ত হইয়াছে। চিরকাল তাঁহাকে টাকার জন্য এই ঘানি টানিয়া যাইতে হইবে এমনও ত কোন কথা নাই! হঠাৎ মোটর চাপা পড়িয়া মারা গেলেও চাকরি এমনি ভাবে শেষ হইয়া যাইত।

তিন মাস দেখিতে দেখিতে কাটিয়া গেল। তার পর হরিবাবু যেদিন পাওনা-গণ্ডা চুকাইয়া লইবার জন্য আপিসে গেলেন, সেদিন রজার্স কোম্পানীর ফ্ল্যাটের চেহারাই যেন বদলাইয়া গিয়াছে। কেরানীদের হরিবাবু টেবিলে খুঁজিয়া পাইলেন না; দেখিলেন বেয়ারারা আপিসের চেয়ারগুলি লইয়া ইতস্ততঃ ছুটাছুটি করিতেছে। এত দিনের কারবার সত্যই উঠিয়া গেল কি না ভাবিতে ভাবিতে হরিবাবু সাহেবের কামরার সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইলেন। যাক্‌, তাঁহাকে তবু যথাস্থানে পাওয়া গিয়াছে।

হরিচরণ বাবু সাহেবের সামনে গিয়া দাঁড়াইতেই সাহেব তাঁহাকে হাত বাড়াইয়া চেয়ারে বসিতে বলিলেন। ত্রিশ বছর চাকরি করিলেও এমন একটা গর্হিত কাজ করিবার দুঃসাহস তাঁহার কোন দিন হয় নাই। তবু আজ সাহসে ভর করিয়া তিনি সাহেবের কথা রাখিয়া ফেলিলেন এবং সেই মুহূর্ত্তে তাঁহার মনে হইল, তিনি আর ম্যাকরজার্স জুনিয়ারের চাকর নহেন!

সাহেব কুশল প্রশ্নাদির পর মোটা টাকার একটা চেক লিখিয়া হরিচরণ বাবুর হাতে দিলেন এবং কথায় কথায় ইহাও জানাইয়া দিলেন যে তাঁহার ছেলেপুলেদের মধ্যে যদি কাহারও যথেষ্ট বয়স হইয়া থাকে তাহাকে এই আপিসে পাঠাইয়া দিলে তাহার জন্য তিনি চেষ্টার ত্রুটি করিবেন না। হরিচরণ বাবুর চোখের দৃষ্টি ঝাপসা হইয়া উঠিল, চেকের চার 'ডিজিটে'র অঙ্কটাও যেন অস্পষ্ট হইয়া আসিল; ধন্যবাদ

জানাইবার চেষ্টা করিলেন, কিন্তু মুখ দিয়া তাঁহার কথা বাহির হইল না।

সাহেব পুনশ্চ কহিলেন, আপিসের ষ্টাফের পক্ষ হইতে তাঁহাকে 'ফেয়ারওয়েল' দিবার সামান্য একটু আয়োজন হইয়াছে, সুতরাং তিনি যেন হঠাৎ বাড়ী চলিয়া না যান।

এ-পর্য্যন্ত সাহেবের সদাশয়তা হরিচরণ বাবুর ভালই লাগিতেছিল, কিন্তু এবার তিনি বিরক্ত বোধ করিতে লাগিলেন। মুখ ফুটিয়া সাহেবকে বলিয়াই ফেলিলেন যে ইহার কোন প্রয়োজন ছিল না।

কিন্তু বিদায়-অভিনন্দনের আয়োজন তখন অনেক দূর অগ্রসর হইয়াছে। সুতরাং হরিবাবুর আপত্তি টিকিবার কথা নয়। কিছুক্ষণ পরেই ঘটা করিয়া তাঁহার কর্ম্মজীবনের পরিসমাপ্তি আপিসসুদ্ধ লোকের সম্মুখে বিজ্ঞাপিত হইল। ফুলের মালা আসিল, রূপালী কাগজের উপর ছাপা বিদায়-অভিনন্দন পাঠ করা হইল, যথারীতি উদ্বোধন-সঙ্গীত হইয়া গেল এবং স্বয়ং সাহেব পর্য্যন্ত ছোটখাট একটি বক্তৃতা দিয়া ফেলিলেন। প্রকাণ্ড হল-ঘরের মধ্যে প্রায় পঞ্চাশ-ষাট জন কেরানী ও বেয়ারার মধ্যে হরিবাবু নির্ব্বোধের মত বসিয়া রহিলেন। মনে হইল, নিজের অন্ত্যেষ্টি-উৎসবই তিনি যেন নিজের চোখে দেখিতে আসিয়াছেন। যে-ছোকরা এই সভায় পঠিত অভিনন্দনপত্রখানি রচনা করিয়াছে, তাহার নাম জানিতে পারিলে তিনি বোধ হয় মনে মনে তাহাকে অভিশাপ দিতেন এবং ক্ষমতায় কুলাইলে তাহার ভবিষ্যৎ উন্নতির পথ বন্ধ করিয়া যাইতেন। অথচ তাঁহাকেই আবার এতগুলি লোকের মধ্যে দাঁড়াইয়া বিদায়-অভিনন্দনের একটা জবাবও দিতে হইল। ভাগ্যের পরিহাস যে এমনই শোচনীয় মূর্ত্তি লইয়া দেখা দেয় সে-কথা এত দিন পরে হরিচরণ বাবু যেন উপলব্ধি করিলেন।

তিন-চার দিন কোন মতে বাড়ীতে কাটিয়া গেল। রজার্স কোম্পানীর চেকখানি ব্যাঙ্কে গিয়া ক্যাশ করিতে হইল, তার পর প্লেস সিডনের বাড়ী হইতে শেয়ারের দর আনাইয়া, টাকাটা কোথায় নিরাপদে ইনভেষ্ট করা যায়, হরিবাবু তাহারই একটা হিসাব করিতে লাগিলেন। কিন্তু ইহার জন্য সময় কতক্ষণই বা লাগিতে পারে? সমস্ত কাজ শেষ হইবার পরেও হাতে যেন অনেকখানি সময় থাকিয়া যায়। ট্রামের মান্থলির মেয়াদ তখনও শেষ হয় নাই, বার-চারেক শ্যামবাজার-এসপ্লানেড ঘুরিয়া আসিলেও ঘণ্টা-দেড়েকের বেশী সময় লাগে না; উপরন্তু পরিচিত লোকজনের সহিত দেখা হইয়া গেলেই হরিচরণ বাবু যেন রীতিমত বিব্রত বোধ করেন। পৃথিবীসুদ্ধ লোক এখনও দশটা পাঁচটা খাটিয়া খাইতেছে, অথচ সুস্থ সবল শরীর লইয়া তিনি ইহারই ভিতর বাড়ীর গণ্ডীর মধ্যে বসিয়া নৈষ্কর্ম্মের সাধনা করিতেছেন, ত্রিশ বছরের কেরানীগিরির পর একথা হরিচরণ বাবুর মনে হওয়া এমন কিছু বিস্ময়কর নহে।

সন্ধ্যার মুখে হরিচরণ বাবু এক দিন পার্কে বেড়াইতে গিয়াছিলেন। সেখানে নিষ্কর্ম্মজীবনের করুণ রূপ দেখিয়া তাঁহার যেন ভয় ধরিয়া গেল। কেউ হাতে রূপা-বাঁধান লাঠি লইয়া প্রায় সামরিক ভঙ্গিমায় পা ফেলিতে ফেলিতে বিশ-ত্রিশ বার পার্কটি প্রদক্ষিণ করিতেছেন, কেউবা শীত পড়িবার আগেই বালাপোষ গায়ে জড়াইয়া এ-বৎসর শীতের প্রকোপ বড় ভীষণ হইতে পারে সে-সম্বন্ধে নিঃসংশয়ে ভবিষ্যদ্বাণী করিতেছেন, কেউবা তাঁহার সময়ের বড়সাহেবের কড়া মেজাজের সবিস্তার পরিচয় দিয়া উৎসুক শ্রোতৃমণ্ডলীর মনে ভীতিসঞ্চারের জন্য ব্যাকুল। দেখিয়া শুনিয়া হরিবাবু সেদিন আধ ঘণ্টার বেশী পার্কে থাকিতে পারেন নাই। পার্কটা তাঁহার কাছে পিঁজরাপোলের মত মনে হইয়াছিল; পৃথিবীতে যাহাদের কাজের কোন বালাই নাই, কর্ম্ম জীবনে যাহাদের অবসর মিলিয়াছে, তাহারাই যেন তাহাদের ক্লান্ত নিঃশ্বাসে সন্ধ্যার আকাশকে প্রতিনিয়ত ভারাক্রান্ত করিয়া তুলিতেছে! মরিতে হইবে বলিয়া কত না ইহাদের দুশ্চিন্তা এবং সেই নিশ্চিত মৃত্যুকে দিনকয়েকের মত ঠেকাইয়া রাখিবার জন্য কি করুণ তাহাদের প্রয়াস। সেদিন হইতে হরিচরণ বাবু আর পার্কের দিকে যাইবার চেষ্টা করেন নাই।

বাড়ীর আবহাওয়াও যেন দিন-দিন বিরক্তিকর হইয়া উঠিতে লাগিল। বাড়ীটি হরিচরণ বাবুর পৈতৃক সম্পত্তি। ছেলেবয়সে যেদিন তিনি প্রথম রজার্স কোম্পানীতে চাকরি করিতে গিয়াছিলেন, সেদিন মনে করিয়াছিলেন,

বিশ-পঁচিশ বছর পরে যেদিন এই দাসত্বের অবসান ঘটিবে সেদিন এই বাড়ীটিকে তিনি নূতন করিয়া গড়িবেন। ইহার অস্থিতে এবং মজ্জায় যে স্থবিরত্বের ছাপ লাগিয়া আছে তাহা ঘুচাইতে হইবে। সামনের দিকে একটা গাড়ী-বারান্দা বাহির করিতে হইবে, উপরে ঘর তুলিতে হইবে আরও দুই-তিনখানি। ঘরগুলির সামনে পড়িবে গাড়ী-বারান্দার ছাদ। সেই ছাদের উপর লতায় পাতায় এবং ফুলে স্নিগ্ধ একটি বাগান তাঁহাকে গড়িয়া তুলিতে হইবে। ছাদের মাঝখানে পড়িবে গোটা-কয়েক শাদা বেতের চেয়ার। বন্ধুরা আসিয়া সেখানে জটলা করিবে। ছেলেরা ফুল লইয়া করিবে কাড়াকাড়ি। হরিচরণ বাবু প্রশান্ত ঔদার্য্যে তাহাদের দুরন্তপনা ক্ষমা করিয়া যাইবেন। কিন্তু ত্রিশ বৎসর পরে সত্যই যেদিন তাঁহার কর্ম্মজীবনের উপর যবনিকা পড়িল, সেদিন সে-কল্পনাকে তিনি মনের মধ্যে খুঁজিয়া পাইলেন না। এত কাল রক্কার্স কোম্পানী যেন তাঁহার এবং তাঁহার এই বাড়ীর মধ্যে প্রকাণ্ড একটা আড়াল হইয়া ছিল। সে আড়াল ঘুচিয়া যাইতে হরিচরণ বাবু চারি দিকে ভাল করিয়া চাহিবার সময় খুঁজিয়া পাইলেন বটে, কিন্তু চোখের দৃষ্টি তখন এক রকম হইয়া গিয়াছে!

সংসারের ছোটখাট কতকগুলি দায়িত্ব এতকাল হরিচরণ বাবুকে বহন করিতে হয় নাই; যেমন ধোপা, নাপিত, দৈনিক বাজার-খরচ—ইত্যাদি। এখন সেগুলি একে একে তাঁহার ঘাড়ে আসিয়া পড়িতে লাগিল। আগে টাকা দিয়াই তিনি নিষ্কৃতি পাইতেন, এখন কোন্ ছেলেটার ক-খানা কাপড় রজকালয়ে গেল সে হিসাব পর্য্যন্ত তাঁহারই হাতে আসিয়া পড়িল। ছোট মেয়েটা হয়ত সবে জ্বর হইতে উঠিয়াছে, তাহার জন্য সুজির রুটি এবং সিঙ্গী মাছের ঝোলের ব্যবস্থা পর্য্যন্ত তাঁহাকে করিয়া দিতে হইবে।

সত্যবালা বলিলেন, বাঁচলাম বাপু এত দিনে, নিজের সংসারের ভার এইবার নিজের হাতে নাও।

হরিচরণ বাবু কেবল মুখ তুলিয়া গৃহিণীর দিকে চাহিলেন। সত্যবালার সীমন্তের দুই পাশের চুলে শুভ্রতার আভাস। চোখের কোণে কালি পড়িয়াছে। মুখে ক্লান্তির ছায়া। অনেক দিন, অনেক দিন হরিচরণ বাবু ভাল করিয়া এই মুখখানির দিকে চাহিয়া দেখেন নাই। কিন্তু সেদিন চাহিতে গিয়া তাঁহার মনে হইল, কুড়ি বৎসর আগের সেই নব-পরিণীতা মেয়েটি যেন কবে মরিয়া গিয়াছে। সংসারের চাকা ঘুরাইতে ঘুরাইতে তাঁহার নিকট হইতে সে বুঝি সরিয়া গিয়াছে বহুদূরে। কাছে টানিয়া তাহার নাগাল পাওয়া যাইবে না। চারি দিকে তাহার ছেলেমেয়েদের ভিড়, ঝি-চাকরের ভিড়, প্রতিদিনের প্রয়োজনের ভিড়। অবকাশকে অনুরঞ্জিত করিয়া তুলিবার ক্ষমতা আর তাহার নাই।

এখন অবসরবেলায় সত্যবালা তাঁহার নিকট বঙ্কিমের নভেলের কোন কঠিন-অংশের ব্যাখ্যা শুনিতে আসিবে না এবং শুনিতে আসিলেও ব্যাখ্যা করিবার মত উৎসাহ এবং আবেগ তিনি খুঁজিয়া পাইবেন না। অবসর পাইলে সত্যবালা তবু পাশের বাড়ীতে গিয়া মুন্সেফ-গৃহিণীর পুত্রবধূর এত দিনেও সন্তান হইল না কেন, সে-সম্বন্ধে আলোচনা করিয়া সময় কাটাইতে পারিবে। কিন্তু তিনি?

ছেলেদের মুখের দিকে চাহিয়া এ-কথা তাঁহার এক দিনও মনে হইল না যে তাহাদের জীবনে তাঁহার কোন প্রয়োজন ছিল। বড়ছেলেটা গোটা দুই টিউশনি করে এবং সন্ধ্যার সময় বি-কম পড়িতে যায়। সমস্ত দিনের মধ্যে ঘণ্টা-দুই তাহার দেখা মেলে। রাত্রিতে যখন পড়িয়া এবং পড়াইয়া বাড়ী ফেরে তখন হরিবাবু শুইয়া পড়িয়াছেন। ঘরের মধ্যে আসিয়া কোন দিন কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসার সময়ও তাহার হয় না। আর ছেলেমেয়েগুলির মধ্যে কেউবা স্কুলে যায়, কেউবা কলেজে। সকালে প্রাইভেট টিউটার আসেন। তার পর যে যাহার স্কুল-কলেজে চলিয়া যায়। বিকালে হয় ফুটবল, নয় সিনেমা। মেয়ে দুটি এবাড়ী ওবাড়ী ঘুরিয়া বেড়ায়। মাস শেষ হইবার মুখে কয়েক দিন তাঁহার সহিত সময় করিয়া দেখাসাক্ষাৎ করে, নির্দ্দিষ্ট দিনে মাহিনা চাই। বই কিনিবার সময় মাঝে মাঝে তাহাদের পিতৃভক্তির পরিচয় একটু মেলে, এই পর্য্যন্ত। ছেলেবেলা হইতে তাহারা বাবাকে দূর হইতে দেখিয়া আসিয়াছে, তাহারা জানে, বাবা ভীষণ কাজের মানুষ; কাজের তাগাদা ভিন্ন অকাজের বোঝা লইয়া অপ্রয়োজনে তাঁহার কাছে ঘেঁষিবার সাহস তাহাদের হয় না। সেজন্য তাহাদের মা

আছেন। কি কৌশলে তাঁহার নিকট সিনেমা বা ফুটবল খেলা দেখিবার টিকিটের পয়সা আদায় করিয়া লওয়া যায় সেটা তাহারা এত দিনে ভাল ভাবেই অভ্যাস করিয়াছে, এবং ছেলেদের এই সব ছোটবড় উপদ্রব সহ্য করিবার মত উৎসাহ এবং অধ্যবসায় সত্যবালার আছে।

হরিবাবু প্রতিবেশীদের সহিত ঘনিষ্ঠ হইবার চেষ্টা করিলেন। কিন্তু সে-ঘনিষ্ঠতার মধ্যেও কোথায় যেন ফাঁক থাকিয়া গেল। প্রতিবেশীদের মধ্যাহ্ন এবং অপরাহ্ণের দাবার আড্ডায় হরিচরণ বাবু নিঃসঙ্গ বোধ করিতে লাগিলেন। খেলিবার অধ্যবসায় তাঁহার ছিলই না, উপরন্তু মাত্র দুই জন খেলোয়াড়কে ঘিরিয়া আর আট-দশ জনের সহিত দল বাঁধিয়া দাঁড়াইয়া থাকিবার উৎসাহও তিনি পাইলেন না। অর্থাৎ ইহাদের মধ্যে কাজকর্ম্মের তাগাদা যাহাদের নাই, হরিবাবু দেখিলেন তাহারা আলস্য এবং কর্ম্মবিমুখতা কেমন অনায়াসে অভ্যাস করিয়া ফেলিয়াছে। খবরের কাগজের পাতায় আইন-আদালতের বিচিত্র বিবরণগুলি পড়িতে পড়িতে সমস্ত সকালটা কাটাইয়া দেওয়া ইহাদের পক্ষে যেমন সহজ, খবরের কাগজ যেদিন হাতের কাছে মেলে না, সেদিন অমুক সরকার হইতে অমুক বসুর কলঙ্কের আনুমানিক কাহিনীর বিচিত্রতর রস উপভোগ করিতে করিতে সময় কাটাইয়া দেওয়াও তাঁহাদের পক্ষে কঠিন হয় না। কিন্তু ত্রিশ বছর ধরিয়া হরিচরণ বাবু ঠিক ইহার উল্টা দিকে চলিয়া আসিয়াছেন, সুতরাং যাহাদের তিনি নিকটে আনিবার চেষ্টা করিলেন, তাহারা তাঁহাকে দূরে রাখিয়া দিল।

খবরের কাগজের উপর হরিচরণবাবুর আস্থা ছিল না। তবু সেদিন সকালে উঠিয়া তিনি সেজ ছেলেটাকে ডাকিয়া বলিয়া দিলেন, আজ থেকে ইংরিজী কাগজ একখানা রোজ আমার চাই, বুঝলি?

বেশী কোন কথা বলিবার প্রয়োজন ছিল না। ছেলেটি তখনই পয়সা লইয়া ছুটিয়া বাহির হইল, নগদ দামে একখানা কাগজ কিনিয়া আনিল এবং আগামী কাল হইতে রোজ সকালে বাড়ী বসিয়া যাহাতে কাগজ পাওয়া যায় তাহার ব্যবস্থা করিয়া আসিল।

হরিচরণ বাবু সেদিন সমস্ত দুপুর বিছানায় পড়িয়া কাগজ পড়িলেন। খবরগুলি একে একে পড়া হইল, সম্পাদকীয় প্রবন্ধগুলিও এক সময় ফুরাইয়া গেল, এমন কি 'ওয়াণ্টেড' কলম এবং বিজ্ঞাপনগুলি পর্য্যন্ত তিনি বাদ দিলেন না। পরদিন সকালে কাগজওয়ালার ডাক শুনিয়া হরিচরণবাবু বাহিরে আসিতেছিলেন, হঠাৎ তাঁহার মনে হইল, ডান পায়ের হাঁটুর কাছটা যেন কন্ কন্ করিতেছে। ঠাণ্ডায় বা শুইবার দোষে এমন হওয়া বিচিত্র নয় মনে করিয়া হরিচরণবাবু ব্যাপারটা গ্রাহ্য করিলেন না; বাহিরে গিয়া কাগজওয়ালার সহিত কথাবার্ত্তা কহিলেন এবং কাগজ লইয়া পড়িতে সুরু করিলেন। বেলা বাড়িতে লাগিল, কিন্তু হাঁটুর ব্যথা কমিবার কোন লক্ষণই দেখা গেল না। হরিচরণ বাবুর মুখে চিন্তার ছায়া পড়িল। কিছুক্ষণ তিনি রোদে পা ছড়াইয়া চুপচাপ বসিয়া রহিলেন, তার পর চাকরটাকে ডাকিয়া হুকুম দিলেন ভাল করিয়া তেল মালিশ করিবার। ব্যথা কিন্তু গেল না।

দুপুরবেলায় সত্যবালার সহিত দেখা হইল। সেই মাত্র ভাঁড়ার-ঘরে চাবি দিয়া তিনি লেপের ওয়াড় সেলাই করিতে বসিয়াছেন। হরিচরণ বাবু বিমর্ষ, করুণ মুখে তাঁহার নিকটেই বসিয়া পড়িলেন। এমন ব্যাপার অনেক দিন হয় নাই। সত্যবালার লজ্জা করিতে লাগিল···

হরিচরণ বাবু সবিস্তারে পায়ের ব্যথার ইতিহাসটা তাঁহার কাছে খুলিয়া বলিলেন। তিনি মনে মনে কল্পনা করিয়া আসিয়াছিলেন যে তাঁহার হাঁটুর এই কষ্টকর অবস্থার কথা শুনিয়া সত্যবালা আতঙ্কে বিহ্বল হইয়া পড়িবেন, এখনই ডাক্তার ডাকিবার জন্য ব্যস্ত হইয়া উঠিবেন। কিন্তু সে-রকম কোন লক্ষণ দেখা গেল না।

সত্যবালা বলিলেন, দিন-রাত বাড়ী ব'সে থাকলে এমনি হয় বইকি মানুষের। দেখ দেখি, বাঁড়ুজ্যেদের বড়কর্ত্তাকে। বয়সে তোমার চেয়ে দু-দশ বছরের বড়ই হবেন, তবু রোজ সকালে উঠে পায়ে হেঁটে যান গঙ্গাস্নান করতে। মানুষের নড়াচড়া একটু চাই-ই, নইলে বাতে ধরবে যে!

যে-আশঙ্কাটা হরিচরণ বাবু এতক্ষণ সযত্নে এড়াইয়া চলিতেছিলেন, সত্যবালার মুখের কথায় সেটা যেন একেবারে স্পষ্ট হইয়া উঠিল! হয়ত শেষ পর্য্যন্ত তাঁহাকে বাতেই ধরিল, নিশ্চয় করিয়া কিছুই বলা যায় না!

কথাবার্ত্তায় ছেদ পড়িল সেইখানেই। হরিচরণ বাবু বিছানায় আসিয়া শুইয়া পড়িলেন। না, রোজ সকালে উঠিয়া, দেড় মাইল রাস্তা পায়ে হাঁটিয়া গঙ্গাস্নান করিবার মত উৎসাহ তাঁহার কোন দিন হইবে না। কিন্তু উপায়ই বা কি? ঘরে বসিয়াই কি শেষ পর্য্যন্ত একদিন তিনি বাতে পঙ্গু হইবেন?— সে ত আরও অসহ্য!

সেইদিন সন্ধ্যাবেলায় মেজছেলে স্কুল হইতে ফিরিবার পর হরিচরণ বাবু তাহার হাতে একখানি চিঠি-সমেত খাম দিয়া বলিলেন, চুপি চুপি এটা ডাকবাক্সে ফেলে দিয়ে আয় দেখি বাবা। কাউকে কিছু বলিস নে যেন!

ছেলেটি খামখানি লইয়া বাহির হইয়া গেল। কাহাকেও সে কিছু বলিল না বটে, কিন্তু চিঠির গন্তব্যস্থানটা কোথায় সেটা দেখিয়া লইতে সে ভুলিল না। না ভুলিলেও ব্যাপারটা তাহার ঠিক বোধগম্য হইল না। সে শুধু দেখিল, কাল হইতে যে কাগজখানা তাহাদের বাড়ীতে আসিতেছে তাহারই কেয়ারে, বক্স নম্বর দিয়া তাহার বাবা চিঠি লিখিয়াছেন। কেন লিখিয়াছেন সে-কথা বুঝিবার বয়স তাহার নয়।

অন্তরীনের পত্র ঃ ভারত-শিল্পের অনুশীলন

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত ও শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

৪।৬।৩৭

মান্যবরেষু,

আমি আপনার কাছে কিঞ্চিৎ সাহায্যপ্রার্থী। বর্ত্তমান বেকারের যুগে এ কথা শুনে ভীত-সন্ত্রস্ত হয়ে ওঠা আশ্চর্য্য নয়। তাই প্রথমেই বলা প্রয়োজন যে আমি তথাকথিত বেকার নই। সরকারী ভাতায় কোন রকমে আমার দিন গুজরান হয়ে যায়। কাজেই সম্প্রতি পেট ভরাবার চিন্তা আমার নেই। তবে দিন আমার কাটে বিনা কাজেই বটে। অথচ শয়তানের কারখানা-ঘর ক'রে তোলবার জন্যে মস্তিষ্কটাকে তার হাতে সঁপে দেওয়াও কোন কাজের কথা নয়। তাই আর কোন কাজ না পেয়ে বই পড়াই সার করতে হয়েছে—দিনরাত পড়া, আর পড়া—এই নিয়ে থাকি।

কিন্তু একটা সুসম্বদ্ধ প্রণালীতে প'ড়ে যে কোন একটা বিষয় সম্বন্ধে ভাল ক'রে জানবার চেষ্টা করব, সে উপায় নেই। এক ত সুসম্বদ্ধ প্রণালী সম্বন্ধে কোন বিশেষজ্ঞের উপদেশ-লাভের সুবিধা আমার নেই। দ্বিতীয়তঃ, বই কিনে পড়বার সঙ্গতিও বিশেষ নেই, তবে কলকাতার ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরী থেকে মাসে মাসে চার খানা ক'রে বই পাওয়ার ব্যবস্থা আছে—এই যা। তার ফলে যদিও সময়মত ও আবশ্যক-মত সব বই মেলে না, তবু দশ খানা বইয়ের নাম লিখলে দু- এক খানা অন্ততঃ পাওয়া যায়।

এখন আসল কথাটা বলি। আমি শিল্পকলা সম্বন্ধে ভাল ক'রে জানতে ও বুঝতে চাই—বিশেষ ক'রে ভারতীয় শিল্পকলা। কিন্তু এ সম্বন্ধে ভাল বই কি আছে, কোন্ বইয়ের পরে কোন বই পড়া উচিত, পড়ার সময়ে কোন্ কোন্ বিষয়ে বিশেষ লক্ষ্য রাখতে হবে অর্থাৎ অধ্যয়নের সুষ্ঠু রীতি কি, এ সব বিষয়ে আমি কিছুই জানি নে। তাই বিশেষজ্ঞের উপদেশ আবশ্যক। আমি যত দূর জানি, তাতে শিল্পকলার বিশেষজ্ঞ সমালোচক হিসেবে ভারতীয়দের কারও নাম করতে হ'লে এক কুমারস্বামী ও আর এক আপনি। এন. সি. মেটা, কানাইয়ালাল ভকীল ও আরও দু-এক জনের নাম কাগজে পড়ি বটে, তবে তাঁরা বোধ হয় নাম করবার মত নয়। সে যাই হোক, এঁদের কারও সঙ্গেই আমি পরিচিত নই। তাই এঁদের কাছে আমার চিঠি লেখা চলে

না। আপনার সঙ্গে পরিচয় না থাকলেও একটা সম্বন্ধ আছে—আপনিও বাঙালী, আমিও বাঙালী। তাই ভরসা ক'রে আপনাকেই লিখছি। আপনার অমূল্য সময়ের উপর ভাগ বসাচ্ছি ব'লে আশা করি রুষ্ট হবেন না। আমার বিশেষ ক'রে দরকার বইয়ের নামের তালিকা ও কোন্‌খানার পরে কোন্‌খানা পড়তে হবে, তা জানা। এ ছাড়াও যদি অন্য কোন রকমে এ বিষয়ে সাহায্য করতে পারেন, বিশেষ বাধিত হব। আমি যে সব বই পড়েছি তার একটা তালিকা অপর পৃষ্ঠায় দিলাম। ইতি

বিনীত নিবেদক

শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

1. A. K. Coomarswamy—History of Indian & Indonesian Art.
2. E. B. Havell—Indian Sculpture and Painting.
3. L. Binyon—Painting in the Far East, 4th Edition.
4. N. C. Mehta—Studies in Indian Painting.
5. R. D. Banerji—Eastern Indian School of Mediæval Sculpture.
6. J. H. Cousins—Modern Indian Artist.
7. Mukul De—My Pilgrimage to Ajanta and Bagh.
8. B. Barua—Barhut, Bk. 1 (Stone as a story-teller)
9. Gladstone Solomon—The Women of the Ajanta caves.
10. C. L. Woolley—The Development of Sumerian Art.
11. Margaret Dobson—Art Appreciation.
12. Joseph Pijoan—History of Art, vol. I.
13. O. C. Ganguly—Indian Architecture.
14. „ „ —Love Poems in Hindi.
15. Four Arts Annual, 1935-36 and 1936-37.
16. Hirananda Sastry—Indian Pictorial Art as developed in Book-Illustrations.

১২জুন ১৯৩৭

সবিনয় নিবেদন,

আপনার অনুগ্রহলিপি পেয়ে সম্মানিত ও আনন্দিত হয়েছি।

যেদিন থেকে আপনি দেশ-মাতৃকার স্বরূপ দেখবার প্রচেষ্টায় ধ্যানের আসনে বসেছেন, দেশের সত্য-রূপ, দেশের দিব্য-প্রতিমা, যে অদ্ভুত ও অলৌকিক চারুকলা ও কারুকলার মধ্যে লুক্কায়িত আছে,—সেই শিল্প-দেবতার সাক্ষাৎ পরিচয়ের প্রতিজ্ঞা নিয়ে যেদিন আপনি ভক্তের আসনে বসেছেন, দেশ-ভক্তির শ্রেষ্ঠ আসন আপনি অধিকার করেছেন, দেশের শিল্পের ভক্ত—আপনাকে আমি নমস্কার করি। যাঁরা দেশের চারুকলা ও কারুকলাকে দৃষ্টির পথে হৃদয়ঙ্গম করছেন, যাঁরা দেশের শিল্প-দেবতাকে সৃষ্টির পথে সার্থক ক'রে তুলছেন, মূর্ত্তিমান ক'রে তুলছেন, আমি তাঁদের কাছে মাথা নত করি। আজ, আপনি দৃষ্টির পথে শিল্প-দেবতাকে অনুসন্ধান করছেন, কাল হয়ত সৃষ্টির পথে অনুসন্ধান করবেন, সুতরাং আপনি আমার নমস্য, আমি আপনাকে আবার নমস্কার করি।

আমি সারা জীবন কায়মনোবাক্যে দেশের শিল্প-দেবতাকে পূজা করতে চেষ্টা করেছি, আমার ভাগ্যে আজও তাঁর দর্শনলাভ ঘটে নি। শুনেছি, এই দিব্যদৃষ্টি বহু সাধনায় পাওয়া যায়। আমার পূজা ও সাধনার শক্তি অতি সামান্য, সেই জন্য আজও সিদ্ধিলাভ ঘটে নি।

আপনি আমার কাছে শিল্পসাধনার উপদেশ চেয়েছেন। আপনাকে উপদেশ দেবার অধিকার আমার নেই। মাত্র এক জীবনের স্বল্প চেষ্টায় যেটুকু পেয়েছি, অথবা পেয়েছি ব'লে মনে করেছি, সেইটুকুই আপনাকে জানাব।

আজীবন দেশের ও বিদেশের শিল্প সম্বন্ধে শত শত পুস্তক পড়েছি। আমার বিশ্বাস শিল্পদেবতাকে পুঁথির পথে পাওয়া যায় না। পটে, প্রতিমায়, মন্দিরে, মূর্ত্তিতে, আসনে, বসনে, রেখায়, নক্সায়, রূপে, বর্ণে,—দৃষ্টির পথে তাঁকে নিরন্তর চাক্ষুষ করতে হবে। চোখের ভিতর দিয়ে তিনি মরমে পশেন, কানের ভিতর দিয়ে, অক্ষরের ভিতর দিয়ে নয়, শব্দের ভিতর দিয়ে নয়। তিনি নিরক্ষরের দেবতা, রেখা-বর্ণে তাঁর প্রকাশ।

কোনও কোনও শিল্প সম্বন্ধীয় পুস্তকে কিছু কিছু হাফটোনের ছাপা প্রতিলিপি থাকে। কিন্তু এই প্রতিলিপি আসল মূর্ত্তি বা চিত্রের অতি অল্প অংশই আমাদের দিতে পারে।

ভাল ফটোগ্রাফ কিংবা বহু মূল্যের বৈজ্ঞানিক পদ্ধতিতে ছাপা বর্ণ-প্রতিলিপি (colour-facsimile) অনেকটা আমাদের দিতে পারে। কিন্তু সাধারণ সস্তা দামের পুস্তকে, উচ্চ শ্রেণীর শ্রেষ্ঠ প্রতিলিপি দেওয়া সম্ভব হয় না।

য়ুরোপে শ্রেষ্ঠ বৈজ্ঞানিক উপায়ে উৎকৃষ্ট চিত্রের হুবহু নকল ছাপা হয়। কোন কোন ভারতীয় চিত্রের উৎকৃষ্ট বর্ণ-প্রতিলিপি ছাপা হয়েছে। আমার মতে যাঁদের পক্ষে আসল চিত্র দেখবার সুযোগ নেই—এই সকল শ্রেষ্ঠ পদ্ধতির প্রতিলিপি বিশেষ উপযোগী। অনেক বই পড়ে, বা হাফটোন প্রতিলিপি ঘেঁটে যা না পাওয়া যায়, তার চেয়ে অনেক বেশী—এই শ্রেণীর হুবহু প্রতিলিপিতে আছে।

বিশেষজ্ঞের রচিত পুস্তকে শিল্পের তত্ত্বাংশ, দার্শনিক অংশ, শিল্পের উৎপত্তি, জীবন-চরিত, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব, কালনির্ণয় ইত্যাদি নানা অবান্তর কথা থাকে। তাহার দ্বারা শিল্পের স্বরূপনির্ণয় ও রসাস্বাদন হয় না। সাক্ষাৎ দৃষ্টির পথে, ছবি ও পুতুলের সঙ্গে মিতালি পাতাতে হবে। পুঁথির পাতায়, কিংবা খেলো হাফটোনের ছবিতে—শিল্পের মহিমা প্রায় খুঁজে পাওয়া যায় না। আসল প্রতিমা ও আসল চিত্র অনবরত দেখতে দেখতে তবে আমাদের দৃষ্টিশক্তি, শিল্পকে বুঝবার, তাহার রূপের যথার্থ অস্বাদনের সামর্থ্য গড়ে ওঠে। তত্ত্বাংশের লিখিত কথা-কাটাকাটির মধ্যে শিল্পের দেবতা অন্তর্হিত হন। শিল্প-সাধনার পথ নির্ব্বাক আরাধনার পথ। সাক্ষাৎ দৃষ্টির পথে তাহার রূপের আরাধনা করতে হবে। রূপ-বিদ্যা চক্ষু-গ্রাহ্য বিদ্যা। পুঁথি প'ড়ে এই বিদ্যা দখল করা যায় না। অনেক গান শুনতে শুনতে তবে সঙ্গীতের রসবোধশক্তি গ'ড়ে ওঠে। অনেক ছবি দেখতে দেখতে তবে ছবি দেখবার, তার রস আস্বাদন করবার শক্তি জন্মায়। ভারতের মর্ম্মস্থান তার শিল্পকলার মধ্যে নিহিত আছে। তার স্বরূপ দৃষ্টির অধিকারলাভ, মানব-জীবনের শ্রেষ্ঠ সাধনা, শ্রেষ্ঠ অধিকার। আপনারা সাধক, আপনারা ভক্ত, আপনারা সেই অধিকার নিয়ে জন্মেছেন। আপনারা সাধনার বলে ভারতের শিল্পদেবতার জ্যোতিঃদর্শন এক দিন নিশ্চয় লাভ করবেন। আমি দুর্ভাগ্য, আমার ভাগ্যে তা ঘটল না। আপনাদের মধ্যে যদি আপনার মত ভারতের শিল্পের ভক্ত ও সাধক অনেকে থাকেন, (আমার বিশ্বাস—হয়ত অনেকে আছেন),—তাঁদের সাধনার সহায়তার জন্য পুঁথির বদলে ভাল ভাল ছবির প্রতিলিপির পোর্টফলিয়ো পাঠানর ব্যবস্থা করা যেতে পারে। জানবার তৃষ্ণা বেশী হ'লে, তৃষ্ণার তৃপ্তির সুধা-বারির কখনও অভাব হয় না, এই আমার বিশ্বাস। তৃষ্ণা তীব্র হয়ে যখন গর্জ্জন ক'রে ওঠে, আকাশের বর্ষণ তখনই সুলভ হয়। আপনারা যদি এক-যোগে এই চিত্র-চর্চ্চার সুযোগ দাবি করেন—সরকারের পক্ষ থেকে কোন আপত্তি হবে বলে আমার মনে হয় না। আপনারা আমার এই প্রস্তাব গ্রহণ করলে মাঝে মাঝে ছবির মুকুখ্ খা (Portfolio of pictures) পাঠানর ব্যবস্থা করা যেতে পারে।

আপনি ভারতীয় শিল্প সম্বন্ধে অনেক পুস্তক পড়েছেন। আরও দু-চার খানা পুস্তকের ফর্দ্দ নীচে লিখে পাঠালুম, এবং এই সঙ্গে আমার লেখা দু-চার খানা পুস্তিকা ও প্রবন্ধ পাঠালুম। যদি ভাল লাগে প'ড়ে দেখবেন। আমি সাহিত্যিক নই, সুতরাং পণ্ডিত সমাজে আমার রচনা পঠনীয় নয়।

আপনারা কারাগার বরণ ক'রে যে মুক্তি পেয়েছেন, কর্ম্মের বন্ধন থেকে অন্ততঃ কিছু দিনের জন্য যে মোক্ষ লাভ করেছেন, বহু চেষ্টাতেও আমরা তথাকথিত স্বাধীন ও মুক্ত পুরুষ—তাহার কিছুই পাই নি। মধ্যে মধ্যে ছবি, পুতুল ও পুস্তকের প্রাচীর নির্ম্মাণ করে, রূপ সাধনার শৃঙ্খল নির্ম্মাণ ক'রে, সামাজিক ও কর্ম্মজীবনের মুক্ত ক্ষেত্র হ'তে পালিয়ে এসে, আপনার কুঠরির মধ্যে স্বেচ্ছায় কারাবরণ করি। কিন্তু আমার আত্মীয়স্বজন, বন্ধু-বান্ধব ও কর্ম্মজীবনের সহচরগণ দৌবারিকের মূর্ত্তি গ্রহণ ক'রে, ওয়ার্ডারের খাকী প'রে, আমার স্বরচিত চোরা-কুঠরি বা প্রিসন্-সেল থেকে ক্রমাগত টেনে বার করে, তথাকথিত মুক্তির পথে, কর্ম্মের অবরোধের পথে, সাধনার বাধার পথে। আমার এক বন্ধু আছেন, তিনি সর্ব্বদাই ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করেন যেন তিনি তাঁর হাত পা কেটে দিয়ে, চলা-ফেরার পথ বন্ধ করে দিয়ে—তাঁকে আসল মুক্তি দেন। চীনদেশে এক জন ভারতের ধর্ম্ম-সাধক গিয়েছিলেন ধর্ম্ম প্রচার করতে। অনেক মঠ ও মন্দির প্রতিষ্ঠিত ক'রে, শেষ জীবন তিনি তাঁর সাধন-মন্দিরে একটি ক্ষুদ্র কুঠরিতে

নিজেকে কারারুদ্ধ ক'রে আমরণ ধ্যানে বসেছিলেন। কর্ম্মের ডাকে তাঁর শেষ জীবনের যোগ-নিদ্রা ভাঙে নি।

আপনারা কারাগৃহের দেবতা, আপনারা আমায় আশীর্ব্বাদ করুন যেন আমার নিজের রচিত কারাগৃহ—সাধন-মন্দিরের মর্য্যাদা লাভ করুক, আমার ক্ষুদ্র সাধনা সিদ্ধির পথে সার্থক হয়ে উঠুক!

আপনি ভারতীয় শিল্পের ভক্ত, আপনি আমার নমস্য। আপনাকে আবার নমস্কার।

বিনীত
শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

২। ৭। ৩৭

মান্যবরেষু,

আপনার প্রেরিত পুস্তক, পুস্তিকা এবং বিশেষ ক'রে একান্ত আন্তরিকতাপূর্ণ ও সাহিত্যিক ভাব-রসে ভরপুর আপনার চিঠিখানার জন্যে শত শত ধন্যবাদ। "আমি সাহিত্যিক নই" ব'লে আপনি যতই সাফাই গাইবার চেষ্টা করুন না, আপনার প্রবন্ধ, পুস্তিকা ইত্যাদি ছাড়াও এই চিঠিখানাই নেমক-হারামি ক'রে আপনার বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছে। "সাহিত্য মানুষের মনের মধ্যে পরিচয়ের সৌমিত্র"—এই কথাটা যার কলম থেকে বেরিয়েছে, সাহিত্য-সভায় তার অন্য পরিচয় বাহুল্য মাত্র। তবে পণ্ডিত সমাজে আপনার রচনা পঠনীয় কি না, সে কথার জবাব যাঁরা পণ্ডিত, তাঁরা দেবেন—আমার সে ধৃষ্টতায় কাজ নেই।

আপনি যে বর্ণশ্রেষ্ঠ ব্রাহ্মণ হয়ে আমার মত একটা সাধারণ লোককে বার-বার নমস্কার জানিয়েছেন, তার ফলে চিত্রগুপ্তের খাতার পাতায় নিশ্চয় আমার অনিবার্য্য নিরয়-গমনের ব্যবস্থা পাকা হয়ে গেছে। সনাতনী চিত্রগুপ্ত কি আর 'শেষের সে দিনে' জাতি ব'লে খাতির করবে?—করবে না। তবে কথা এই যে আমি সে জন্যে কিছু মাত্র ভয় পাই নে—বোঝার উপরে এক গাছি তৃণের ভার বই ত নয়? নরকে যদি যেতেই হয়, তবে তার জন্যে অনেক কারণই জমা হয়ে আছে। কিন্তু নমস্কারটা আপাততঃ যে ব্যক্তি-বিশেষকে লক্ষ্য ক'রে দেওয়া হয়েছে, তার বিশ্বাস যে এটা নিতান্তই অহৈতুক। তবে, তৃণ হ'তেও সুনীচ হয়ে যদি অমানীকে মান দিতে চেয়ে থাকেন, তাহলে তার ফলে যে হরি-সঙ্কীর্ত্তনের পথ খোলসা হবে, তা আমার খরচায় (at my expense) হ'ল, মনে রাখবেন এবং তাতে ক'রে যে পুণ্যার্জ্জন হবে, আমারও তার ভাগ পাবার দাবি রইল।

তবে আপনার অমন উচ্ছ্বসিত নমস্কারের উপলক্ষ হ'লেও প্রকৃত লক্ষ্য যে আমি নই—এ কথাটা বুঝতে পারি নে, এতটা আহাম্মক নই। এর সবটাই যে কলাদেবীর পাদপদ্মে আপনার প্রাণের ঐকান্তিক ভক্তির পুষ্প-অর্ঘ্য, তাতে কিছুমাত্র ভুল নেই। শিল্পকলার প্রতি যে আপনার কতটা প্রীতি, কতখানি দরদ, ও, কি একনিষ্ঠ ভক্তি, এতেই তার পূর্ণ পরিচয় বিশেষ ক'রে স্পষ্ট হয়েছে।

তথাপি আমি একটা কথা বলব—বেয়াদবি মাপ করবেন। কথাটা এই যে আপনার বিনয়-প্রকাশের রকমটা সম্বন্ধে আপত্তি জানাতে চাই। আপনি এক বিষয়ের বিশেষজ্ঞ। অবনীন্দ্রনাথ যেমন 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট'-এর স্থাপয়িতা, আপনিও তেমনি 'বেঙ্গল স্কুল অব আর্ট-ক্রিটিসিজম' গ'ড়ে তুলবেন—এইটে আমরা প্রত্যাশা করি। তাতে এক দিকে যেমন একটা কাজের মত কাজ হবে—বাংলার এক দিকের একটা মস্ত অভাবের পরিপূরণ হবে, অন্য দিকে তেমনি দেশ-বিদেশে বাংলার সম্মান বাড়বে নবীন যুগে নব সংস্কৃতির পতাকা-বাহক হিসেবে। কিন্তু যাঁরা অগ্রদূত, বেশী বিনয় ক'রে কথা বললে, তাতে তাঁদের কথার মূল্য কমে—বিশেষ ক'রে অন্য প্রদেশের লোকের কাছে। সেটা মোটেই কাম্য নয়।

ভারতীয় শিল্পকলা সম্বন্ধে আমি কিছু কিছু জানতে বুঝতে চাই। আপনি লিখেছেন—বই পড়ে তা হবে না। আপনার কথার মানে আমি যা বুঝেছি, তা এই যে, কি শিল্প-সৃষ্টি (creation), কি শিল্প-আলোচনা (criticism)—উভয়েরই মূলে রস-বোধ এবং শিল্প-রসজ্ঞ হওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে—"সাক্ষাৎ দৃষ্টির পথে ছবি ও পুতুলের সঙ্গে মিতালি পাতানো"—আসল না মিললে, অন্ততঃ উঁচু দরের প্রতিলিপি। এই যদি হয়, তবে এ-রসে রসিক হওয়া আমার কর্ম্ম নয়। যেহেতু আমার পক্ষে তার সুযোগ-সুবিধা ক'রে

নেওয়া একেবারেই অসম্ভব। আপনি যে আশা করছেন—আমি হয়ত কোন দিন শিল্প-দেবতাকে সৃষ্টির পথেও অনুসন্ধান করব, তা আরও সুদূরপরাহত। এত দিন ভুলেও কখনও সে পথের কাছ ঘেঁষেও চলি নি। অথচ এ দুনিয়ার সঙ্গে কারবার সে নেহাৎ আজকের কথাও নয়। কারবার যত দিনের, তার অর্দ্ধেকটা গেছে পরীক্ষা-পাসের চেষ্টায়। অপর অর্দ্ধেকের তিন-চতুর্থাংশ গেছে জেলে জেলে। বাকী সময়টুকু কেটেছে রাজনীতির কচকচি ও রুজি-রোজগারের দাপাদাপিতে। ছবি ও পুতুলের সঙ্গে কোন দিনই আমার দেখা-সাক্ষাৎ নেই। কোন শিল্প-প্রদর্শনীর ছায়াও মাড়াই নি কোন দিন। এমন কি, এত বছর কলকাতায় থেকেও একটি বারের তরেও থিয়েটারে, কিংবা খেলার মাঠে যাওয়া হয়ে ওঠে নি বেউদা সময় নষ্ট হবে ব'লে। এই সব কারণে জীবনটা বড়ই একপেশে হয়ে গ'ড়ে উঠেছে। বয়সটা যা হয়েছে, তাতে এখন বন-গমনের উদ্যোগ করলেই হয়—বড়-জোর আর দু-তিন বছর জের টানা চলে। এখন আবার আগাগোড়া ভোল ফিরিয়ে জীবনটাকে নূতন ক'রে শিল্প-সৃষ্টির উপযুক্ত ক'রে তোলা—তা কি আর সম্ভব? রাজনীতির ঘোঁট পাকাবার ফাঁকে ফাঁকে কখনো মনে হয়েছে—দেশ বলতে কি বুঝি—আমাদের সংস্কৃতি বলতে কি বুঝি? তার ফলে পুরনো ভারতের পুঁজি খুঁজতে গিয়ে আর্ট-সাপ বেরিয়ে পড়েছে এবং তার বিষ-ক্রিয়াও কিছু কিছু আরম্ভ হয়েছে। তাই দু-চার খানা বই পড়েছি।

এখন বই-পড়া সম্বন্ধে আমার কিছু বক্তব্য আছে। ১৯২৭ সালে মাদ্রাজ কংগ্রেসের পরে ও-দেশের কতকগুলি প্রসিদ্ধ প্রসিদ্ধ স্থান দেখতে বেরিয়েছিলাম—তীর্থ করতে অবশ্য নয়। তীর্থের পরে আস্থা হারিয়েছি অনেক আগে, গয়ায় তীর্থ করতে গিয়ে। সে কথা যাক্। ফেরার পথে রামেশ্বর ষ্টেশনে যখন ময়মনসিংহের শ্রীযুক্ত অমরেন্দ্রনাথ ঘোষ মহাশয় বললেন, "ও মনোরঞ্জন! ঘুরলাম ত অনেক, কিন্তু দেখলাম কি?" তখন আমি জবাব দিয়েছিলাম, "দেখবার যে কিছু নেই, তা ত দেখলেন? একটা বিষয় সম্বন্ধে অন্ততঃ ল্যাঠা চুকলো!" অথচ সেবারে কাঞ্চি, মহাবলীপুরম্, তাঞ্জোর, ত্রিচিনাপল্লী, শ্রীরঙ্গম, মাদুরা, রামেশ্বর প্রভৃতি যে-সব স্থান দেখেছিলাম, সেখানে ভারতীয় শিল্পের শ্রেষ্ঠ নিদর্শনের অনেকগুলি এখনও অটুট অক্ষুণ্ণ আছে। দেখেছি সবই, অথচ শিল্পকলার সাক্ষাৎ মেলে নি কোথাও। না দেখেছি ভক্তের চোখে—না কলা-রসিকের চোখে। কিন্তু এখন কয়েকখানা বই প'ড়ে বুঝতে পারছি যে অমর বাবুর ল্যাঠা যদি সত্যি চুকেও থাকে, তবু আমার ল্যাঠা চোকে নি—মনে হচ্ছে, এখন যদি আর একবার যেতে পারতাম তবে হয়ত সত্যি দেখবার মত কিছু দেখতে পেতাম।

আসল ছবি ও আসল পুতুল কিংবা সে সকলের খুব ভাল প্রতিলিপি দেখা যে অত্যাবশ্যক, তাতে সন্দেহমাত্র নেই। কিন্তু আমার মনে হয়, আমার মত অনভিজ্ঞ অনুসন্ধিৎসুর পক্ষে বই প'ড়ে আর্ট সম্বন্ধে খানিকটা ধারণা ক'রে না নিলে, আর্টের রস গ্রহণ করা মুস্কিল। বই প'ড়ে শিল্প-সৃষ্টি হয় না সে আমি বুঝি। সত্যিকারের শিল্প-সৃষ্টি হয়ত কতকটা (unconscious creation) অব-চেতন মনের গভীরতা থেকে উদ্ভূত হয়ে আপনার গরজে আপনি ফুটে ওঠে কমল হয়ে চৈতন্য-সরোবরের প্রকাশ্যতায়। কিন্তু শিল্প-সৃষ্টির আস্পর্দ্ধা যার নেই—যে চায় শুধু শিল্পের মর্ম্মকথাটি বুঝতে ও সম্ভব হ'লে তার রসের ভাণ্ডার লুটতে, সে লোকের পক্ষে তা কেমন ক'রে সম্ভবপর হবে, ভাল মন্দ বুঝবার ক্ষমতা না থাকলে? ছবি দেখে সবাই—ভালও তাদের লাগে বটে; কিন্তু উচ্চতর শিল্প-সৃষ্টির রস-গ্রহণ সম্ভব কি শিল্পের তত্ত্বাংশ ও টেকনিক সম্বন্ধে কিছুমাত্র জ্ঞান না থাকলে? প্রথম-শিক্ষার্থীর পক্ষে এ সব নটখটে বিষয়ের ভিতরে ঢোকা শিক্ষার অনুকূল নয় মনে করেই বোধ হয় আপনি বইপড়া সম্বন্ধে উৎসাহ দেন নি। কিন্তু এ বিষয়ে আমার মনে যতটুকু রুচি জেগেছে, তার উৎস কোথা থেকে উৎসারিত জানেন?—আমরা আজ যদিও পতিত, তবু আমাদের গৌরব করার কিছু আছে কি না, তা জানবার আকাঙ্ক্ষা থেকে। তাই শিল্পের তত্ত্বাংশ, উৎপত্তি, ইতিহাস, পুরাতত্ত্ব ইত্যাদি সম্বন্ধে জানবার আগ্রহই আমার বেশী।

তবে আমি যে এ-রসের রসজ্ঞ হ'তে চাই নে, তা নয়, বরং সেদিকে একটা ঝোঁক আস্তে আস্তে ক্রমেই বাড়ছে। বর্ত্তমান অবস্থায় আমার পক্ষে যা সম্ভব, তা করবার চেষ্টাও আমি করি। বই প'ড়ে ও তার ভিতরকার খেলো

হাফটোনের ছবি দেখেও আমি আনন্দ পাই। আমার মনে হয়—কোন ভাল ছবির একটা ভাল সমালোচনা পাওয়া গেলে, হাফটোনের ছবি থেকেও তার রস বেশ কিছু পাওয়া যায়—অন্ততঃ রস-বোধের ক্ষমতা তাতেও খানিকটা বাড়বার সুযোগ পায়। কেননা, ছবির অসম্পূর্ণতা ও ত্রুটিপূরণের ক্ষমতা হয়ত মনের খানিকটা আছে। চোখ ছবি দেখে যেমনটি তেমন, কিন্তু মন তাকে কল্পনায় মণ্ডিত ক'রে নিয়ে আরও খানিকটা সৃষ্টি তার সঙ্গে যোগ করে, তবে গ্রহণ করে। তা ছাড়া আমার ত আর কোনও উপায়ই নেই। আসলের তো কথাই নেই—ভাল প্রতিলিপিই বা আমি কোথায় পাব? এখন আপনি যে মাঝে মাঝে ছবির পোর্টফলিও পাঠাবার প্রস্তাব করেছেন, তা কার্য্যে পরিণত করতে পারলে, আশা করা যায়, কিছু সুবিধা হবে।

আপনার এ-প্রস্তাবের জন্যে আমি আপনার কাছে বিশেষ ভাবে কৃতজ্ঞ। কিন্তু সরকার আমার চিত্র-চর্চ্চার কি সুযোগ ক'রে দেবে? নিজের পয়সায় করলে এ-চর্চ্চায় হয়ত তাদের আপত্তি হবে না। কিন্তু তাদের কাছে এ জন্যে পয়সা চাইতে গেলে, জবাব পেতে দু-মাস কেটে যাবে—তার পরে হয়ত দু-মাস পরে এক পসলা দুঃখ, অনুতাপ ইত্যাদির বর্ষণ হয়ে সব চুকেবুকে যাবে। তবে ইম্পিরিয়াল লাইব্রেরীর বই পাওয়ার যে তারা ব্যবস্থা করেছে, সে জন্যে ধন্যবাদ দিই।

সবাই মিলে চিত্র-চর্চ্চার সুযোগ দাবি করতে বলেছেন। কিন্তু 'সবাই' বলতে এখানে আমরা দুটি মাত্র প্রাণী। কাজেই তা হবে না। তবে আপনি দয়া ক'রে রেলওয়ে পার্সেলে যদি পাঠিয়ে দেন—C/o Superintendent, Central Prison, P. O. Nasik Road (Ry. Station—Nasik)—এই ঠিকানায়, তবে আমি এখানে মাশুল দিয়ে রাখতে পারি এবং পরে আবার মাশুল-শোধ পার্সেলে পাঠিয়ে দিতে পারি। এ ছাড়া যদি অন্য কোনও ব্যবস্থা আবশ্যক মনে করেন, তবে তা জানাবেন। এরূপ আনা-নেওয়া অবশ্য তিন মাসে একবারের বেশী সম্ভবপর হয়ে উঠবে না। ঠেকা অবশ্য টাকার, তা বলাই বাহুল্য।

আপনি হয়ত আমার চিঠি প'ড়ে নিরাশ হবেন—আমা হ'তে কিছু হবার নয়—এই মনে ক'রে। কিন্তু আপনাকে একটা লোভ দেখাতে পারি। আর্ট যারা সৃষ্টি করে, তাদের সকলের সৃষ্টিই কিছু আর উঁচুদরের নয়। উঁচুদরের স্রষ্টা দু-এক জন। বাকী সবাই সাধারণ পর্য্যায়ভুক্ত। তবু তাদের দানের মূল্যও কম নয়। কেননা, তারা প্রচলিত শিল্প-রীতির পরিপূর্ণতা আনয়ন করে—বিশেষ ক'রে তারা প্রবাহ রক্ষা করে এবং প্রবাহ রক্ষিত হয় বলেই মাঝে মাঝে তার উপরে বড় বড় ঢেউ জেগে উঠতে পারে। তার পরে যেখানে আর্টের আদর নেই, ভাল জহুরী নেই, সেখানে অনুকূল আবহাওয়ার অভাবে আর্ট স্ফূর্তি পায় না। তা ছাড়া এক যুগের সমালোচনার ফল, পরের যুগে পায়। আলোচনার ফলে রুচি জন্মায়—রুচি বদলায়। তার ফলে নূতন সৃষ্টি সম্ভব হয়। কিন্তু সকলেই ত আর উঁচুদরের সমালোচক বা ভাল জহুরী হ'তে পারে না! অধিকাংশ লোকেই মোটামুটি ভাবে খানিকটা বুঝে নিয়ে আর্টের আদর করে। আদর করাটাই বড় কথা। যারা করে, তারাই অনুকূল আবহাওয়ার প্রবাহ রক্ষা করে। আপনাকে যে লোভ দেখাতে চাচ্ছি, তা হচ্ছে এই যে আমি হয়ত এই দিকে খানিকটা কাজে আসতে পারি, যদি এ-বিষয়ে আমি নিজে কিছু শিক্ষা পাই। যাদের সংশ্রবে আমি আসব, তাদের যাতে আর্টের প্রতি টান বাড়ে, সে-চেষ্টা যে আমি অবশ্যই করব, তা বলাই বাহুল্য।

আমরা কারাগৃহের দেবতা? তা বটে—সনাতনীর কালী মাই—উচ্চবর্ণ ভিন্ন কারও প্রবেশ নিষেধ, অথবা ঠুঁটো জগন্নাথ—দারুভূত মুরারি হয়েই ত আছি। আপনার বন্ধুটি হাত পা কেটে দেওয়ার প্রার্থনা করেন—অর্থাৎ ঠুঁটো জগন্নাথ হ'তে চান। কিন্তু এ-কথা আমি জোর করেই বলতে পারি যে জগন্নাথ যদি কথা বলতে পারতেন, তবে তিনি নিশ্চয়ই তাঁর এ বিকলাঙ্গ হাস্যাস্পদ মূর্ত্তির জন্যে ঘোরতর আপত্তি করতেন। তবে তিনি জগন্নাথ—ভক্তের অভাব নেই—রথে চড়িয়ে টানবার লোকও অগণিত। কিন্তু আপনার বন্ধুটি ত আর জগন্নাথ নন—যা প্রার্থনা করেন, তা পূর্ণ হ'লে টেরটি পাবেন। আমরা কিন্তু তাঁর দলে নই। এত দিন যদিও দশ হাত দশ পায়ের জন্যে প্রার্থনা করি নি (কারণ পাছে তা গজিয়ে উঠে একটা বীভৎস ব্যাপার হয়ে দাঁড়ায়—এই ভয়!) তবে দশ হাতে যতটা

কাজ করা যায় ও দশ পায়ে যতটা পাড়া বেড়ান যায়, তা যদি পারতাম, তবে হয়ত কতকটা আকাঙ্ক্ষা মিটত। তাই বিধাতার কাছে কোনও দিন দেবতা হওয়ার প্রার্থনা করি নি। কিন্তু নাছোড়বান্দা বিধাতা সেই বরই দিয়ে দিলেন। এখন জলে জল ঢেলে দেবতার পূজা চলছে—হিন্দুর পূজার বিলিতী নমুনা। কি আর করা যায়, বলুন।

দেবতা হ'লেও আপনাকে আশীর্ব্বাদ করতে পারি, তেমন সঙ্গতি কঞ্জুস বিধাতা কিছু দেন নি। সাত বছরের গুরুপুত্রের পা বাড়িয়ে চরণামৃত দেবার মত ধৃষ্টতাও এখন পর্য্যন্ত জন্মায় নি। তবে যে সাধনায় আপনি প্রবৃত্ত তাতে পূর্ণ সিদ্ধি লাভ করুন—আপনার সিদ্ধিতে আমার বাংলা দেশের মুখ উজ্জ্বল হোক—এ প্রার্থনা একান্ত মনপ্রাণেই করি। ইতি—

নিবেদক শ্রীমনোরঞ্জন গুপ্ত

সবিনয় নিবেদন,

আপনার সুদীর্ঘ পত্র পেয়ে বড়ই আনন্দিত হয়েছি।

আমি আপনাকে ব্যক্তিগত অভিনন্দন জানিয়েছি তার জন্য আপনি প্রতিবাদ করেছেন। আমি 'ভক্তি'কে ও 'ভক্ত'কে বড় আসন দিতে চাই। ভগবানের চেয়ে ভগবানের ভক্ত বড়। তা ছাড়া ভারতবর্ষে ভারত-শিল্পের ভক্ত সংখ্যায় এত কম (সমস্ত ভারতে ৬ জনের বেশী আছে কিনা আমি জানি না), যে, নূতন ভক্তের সন্ধান পেলে আমরা আনন্দে আত্মহারা হই। নবীন উপাসককে অভিনন্দন জানাতে হয়ত মাত্রাজ্ঞান হারাই। আমাদের মন্দিরে উপাসকরা বড় আসতে চান না। আমরা উদ্‌গ্রীব হয়ে নূতন ভক্তের আশায় ব'সে আছি। নূতন ভক্ত ও নূতন উপাসক আমাদের বড় আদরের মানুষ, আমাদের সম্মানের বস্তু। ভারতের শ্রেষ্ঠ সাধনার মন্দিরে নূতন উপাসকের সম্মান ও সমাদরের মালা-চন্দনের বহর কত হবে—তার বিচারক নূতন উপাসকরা নন, যারা তাঁকে 'স্বাগত' করবে তাহার বিচারের ভার তাদের উপরই দিতে হবে। গৃহস্থের চোখে, প্রত্যেক অতিথির যথাযোগ্য মূল্য আছে,—এই মূল্য-বিচারের অধিকার অতিথির নয়, গৃহস্থের।

ভারতের শিল্প-সমুদ্রে আমার অভিজ্ঞতা সম্বন্ধে আমি বিনয়ের 'ভণিতা' করি নি। অতি-বিনয় দাম্ভিকতার নামান্তর। সুতরাং অতি-বিনয়টা পাপ। যে কোনও বিষয়ে—জ্ঞানের রাজ্যে যে যতটা এগিয়ে যায়—জ্ঞানের বিস্তৃত পরিধি হৃদয়ঙ্গম ক'রে সে ততটা বুঝতে পারে,—তার নিজের জ্ঞানের পরিধিটি কত স্বল্প, কত ক্ষুদ্র। যে যত এগোতে পারে তার আত্মগরিমা তত ছোট হয়ে আসে। এই জ্ঞানসমুদ্রের বিশালতার আঘাতে আমাদের অহঙ্কার সঙ্কুচিত হয়,—এই অহঙ্কারের সঙ্কোচ বিনয়ের 'ভণিতা' নয়, নিজের শক্তি ও জ্ঞান সম্বন্ধে নিষ্ঠুর সত্যবোধ। ভগবানের আশীর্ব্বাদে, 'বিশ্বরূপ' দেখতে পেলে, অর্জ্জুনের মত আমরা আমাদের ক্ষুদ্রতা, স্বল্পতা সম্পূর্ণরূপে উপলব্ধি করতে পারি।

ভারতের কলাশিল্পের নিদর্শন, ভারতের নানা স্থানে, আপনি প্রাচীন পুরাকীর্ত্তির অবশেষে অনেক চাক্ষুষ প্রত্যক্ষ করেছেন। যাঁরা বেশী বয়সে দেখতে আরম্ভ করেন, চোখের 'মর্চ্চে' ছাড়াতে অনেক দিন লাগে। অল্প বয়সে যখন মানুষের রূপ-রস-বোধশক্তি প্রখর ও সুতীক্ষ্ণ থাকে, তখন শিল্পবস্তুর অন্তরের সৌন্দর্য্য অতি সহজে প্রত্যক্ষ করা যায়। বেশী বয়সে, রূপবোধ-শক্তির প্রয়োগের অভাবে, আমাদের ঐ শক্তি ক্ষয়প্রাপ্ত হয়—দৃষ্টিশক্তির উপর 'ছানি' পড়ে। কেতাবী বিদ্যার চাপে আমাদের রস-বুদ্ধি শুষ্ক হ'তে থাকে। বেশী বয়সে এই শুষ্ক শক্তিকে সরস ও মঞ্জরিত করতে অনেক পরিশ্রম করতে হয়। তবে চেষ্টার অসাধ্য কাজ নেই।

ক্রমাগত ছবি দেখতে দেখতে ছবি দেখবার তৃতীয় চক্ষু একদিন খুলে যায়। যুক্তিতর্কের বাধা আপনি খসে পড়ে। যুক্তিতর্কের চাবি দিয়ে, অর্থাৎ প্রবন্ধ ও পুথি প'ড়ে, আর্টের দুয়ার খোলা যায় না, আর্টের স্বরূপ নির্ণয় করা যায় না। যুক্তির পথে তাকে পাওয়া যায় না,—ভক্তির পথে, দৃষ্টির পথে সে দেখা দেয়।

একটি প্যাকেটে রেজিষ্ট্রি ক'রে কয়েকখানি ভাল প্রতিলিপি পাঠাচ্ছি। চেষ্টা ক'রে দেখুন যদি এদের মধ্যে কিছু রস পান। আত্যন্তিক ভক্তির চক্ষে কোনও জিনিষই রুদ্ধ বা অবরুদ্ধ থাকে না। ভক্তের ভগবান। আপনি ভক্ত, শিল্পের ভগবান আপনার করতলগত। আমরা মন্দিরের চারি ধারে ঘুরে বেড়াচ্ছি ভগবানের দর্শন এখনও মেলে নি।

আপনি যেদিন ভারতের শিল্পের দেবতার সাক্ষাৎ পাবেন—অনুগ্রহ ক'রে একবার পিছন ফিরে পথের সন্ধানটা বলে দেবেন—আমরা আপনার পথ অনুসরণ করব।

বিনীত

৯ জুলাই ১৯৩৭ শ্রীঅর্দ্ধেন্দ্রকুমার গঙ্গোপাধ্যায়

তুমি মৃত্যুর শাশ্বত মহাদান

শ্রীঅশোক চৌধুরী

ওগো সাড়া দাও, বারেক দাঁড়াও আসি
আমাদের মাঝে এই ধরণীর বুকে ;
এস, ফিরে এস, এ মহাতিমিররাশি
অপসারি এস, হাসিয়া সকৌতুকে।
চেয়ে দেখ সবে ধূলায় পড়িয়া হায়,
আর্ত্তকণ্ঠে তোমারে ফিরায়ে চায় ;
এস এস ফিরে মহাতমিস্রা নাশি।

কাল ছিলে তুমি সকল ভুবন জুড়ে
ঐ ছোট ঘরে বিশ্ব যে ছিল লীন ;
আজ কোথা তুমি, বল—কত কত দূরে ?
নিখিল ভুবন আজি যে সংজ্ঞাহীন।
সবাকার প্রেম সবার কামনা দিয়ে
বাঁধিতে নারিনু ; অবোধ বাসনা নিয়ে
শুধু কাঁদি মোরা অসহায় নিশিদিন।

স্নেহে করুণায় চিরদিন সবা লাগি
কণা কণা ক'রে নিজেরে করেছ দান ;
তোমার সেবায় নিয়ত রহিত জাগি
বেদনায় ভরা আপনারে ভোলা প্রাণ।
আজিকে কেমনে পাশরিয়া প্রিয়জনে
রয়েছ আড়ালে একাকী অন্যমনে ?
শুনিতে কি পাও ? কে দিবে গো সন্ধান ?

এত আকুলতা এত ভালবাসা তব,
সে কি শুধু ছিল দু-দিনের খেলাঘরে ?
খেলার পুতুল ত্যজিয়া কি অভিনব
নবীন ভুবনে গেলে চলি হেলাভরে ?
তুহিন-মৃত্যু নিঠুর কঠিন বলে,
ছিন্ন করিয়া জীবনপদ্মদলে,
চিহ্ন কি তার মুছি দিল অন্তরে ?

না না মিথ্যা এ। সবার চিত্তমাঝে
আজি যে তোমার প্রকাশ নিরন্তর ;
এক মুহূর্ত্ত পাশরিতে পারে না যে
তব প্রেমরূপ—জীবনের নির্ভর।
আজি হেরি তাই সকল ভুবন ছাপি
তোমারি পরশ প্রাণে উঠিতেছে কাঁপি,
বেদনাবিধুর সকরুণ মনোহর।

বল একবার "এই ত রয়েছি আমি।"
তব স্নেহমাখা কণ্ঠ শুনাও সবে ;
নিবিড় সুধায় ভরি দাও দিনযামী,
অলখ প্রেমের নিত্য মহোৎসবে।
রূপ-অরূপের দ্বন্দ্ব দুর্নিবার,
জীবন-মরণ মিশে হোক একাকার,
অশ্রুত তব বাণীর বাঁশরী-রবে।

জীবনে যখন ছিলে আমাদের মাঝে,
পাওয়ার মাঝারে না-পাওয়ার ব্যবধান
ছিল ক্ষণে ক্ষণে ; তোমার সকল কাজে
তোমার প্রেমের পাই নি ত সন্ধান।
দেশের কালের ছিল সহস্র বাধা,
পেয়েছি কখনো, কভু বা লেগেছে ধাঁধা ;
শাশ্বত আজ তুমি মৃত্যুর দান।

তোমার সেবার মোহন অন্তরালে,
রেখেছিলে সবে নিত্য বিরহী ক'রে ;
সোহাগে আদরে লোভন স্বপনজালে,
অন্ধে ভুলায়ে রেখেছ মোহের ঘোরে।
আজিকে ঠেলিয়া রাখিবে কেমনে, হায়,
স্নেহ-লোভাতুর ভিক্ষুরে ছলনায় ?
বাঁধা যে পড়েছ অমোঘ মরণ-ডোরে।

নয়নের বাধা বচনের ধাঁধা দিয়ে
গড়েছি তোমারে মাটির প্রতিমা করি ;
আত্মবিলাস বাসনা-কলুষ নিয়ে
আপন-পূজায় আছিনু জীবন ভরি।
আজি ঘুচিয়াছে মিথ্যা পূজার ভান ;
দেবতার তবু মিলিল কি সন্ধান—
মহামৃত্যুর অকূল সিন্ধু তরি ?

তিমির-দুয়ার খুলে গেছে আজ মনে,
মরণ আজিকে নির্ম্মম নহে আর ;
জীবনের বাধা ঘুচে গেল কোন্ খনে
জীবনে-মরণে হ'ল আজ একাকার।
তুমি যে রয়েছ নিখিল ভুবন ঘিরে
আমার স্মরণ-বিস্মরণের তীরে
মহাজীবনের রচিয়াছ পারাবার।

ডিস্‌গাস্‌টিং

শ্রীবিধায়ক ভট্টাচার্য্য

প্রথম তাঁর সঙ্গে দেখা হয় হিন্দুস্থান রেষ্টরেন্টে। ছবি দেখে ক্ষুধার উদ্রেক হওয়ায় এই মহাপরিচয়ের সুযোগ লাভ করেছিলাম। আমার সঙ্গে যে বন্ধুটি ছিল, সেই আলাপ করিয়ে দিলে।

—এঁকে চিনিস্‌?

—না।

—সে কি রে! অতি-আধুনিক সাহিত্যিকদের ইনিই হচ্ছেন একমাত্র লোক,—যাঁর নাম বাংলা দেশের প্রত্যেকটি লোকই জানে। গল্প, কবিতা, প্রবন্ধ, আর গান রচনায় এঁর জুড়ি নেই। 'জিনিয়াস্‌' একটা।— উত্তেজনায় বন্ধুর চোখমুখ লাল হয়ে উঠেছে।

সামনে চেয়ে দেখি যাঁকে নিয়ে আমাদের এত মাথা-ব্যথা, তিনি পরম নিশ্চিন্তে একখানি কাট্‌লেটের সদ্‌গতি-সাধনে ব্যস্ত। ভদ্রলোকের বয়স বোধ করি ত্রিশের নীচেই। সমস্ত মুখে একটি ক্লান্তির কালিমা, সে কালিমা 'ক্রীম' ঘষে তোলা যায় না।

—আলাপ করবি? বন্ধু বললে।

—চল্‌। দাঁড়া, ওঁর নামটাই যে শোনা হয় নি আমার। সেটা বল্‌।

—ত্রিদিব সরকার।

দু-জনে এসে যখন ওঁর টেবিলের সম্মুখে ব'সে পড়লাম, উনি ম্লান একটু হেসে বললেন—আসুন। খাবেন কিছু?

—না, ধন্যবাদ। আমি বললাম।

—তবে সিগ্‌রেট নিন। এই ব'লে ভদ্রলোক পকেট থেকে একটি টিন বার ক'রে আমাদের সামনে ধরলেন। খুলে দেখি তাতে গোটা পাঁচ-ছয় 'পাসিং-শো' প'ড়ে রয়েছে।

ত্রিদিববাবু মুহূর্ত্তমধ্যে বলে উঠলেন—আর বলেন কেন! গিয়েছিলাম বেলেঘাটা একটু দরকারে। পথে আমার সিগ্‌রেট গেল ফুরিয়ে। আর সে মশায় এমন একটা জায়গা, যে-দোকানেই যাই—এক 'পাসিং-শো' ছাড়া আর দ্বিতীয় সিগ্‌রেট নেই। অবশেষে প্রাণের দায়ে—মানে এ ত আর সখ ক'রে খাওয়া নয়,— তাই কিনতে হ'ল। ডিস্‌গাস্‌টিং!

এর পর দু-একটা অলস কথাবার্ত্তার পর তিনি বললেন—এই কাফেটার উপর আমার মশায় কি যে ফ্যান্সি, রোজ একবার ক'রে না এসে পারি নে। কিছু খাই আর না খাই—অন্ততঃ এক খানা ফাউল কাট্‌লেট ত খেয়ে যেতেই হবে।

—আপনাকে বোধ হয় আমি হাতীবাগানে দেখেছি। আমি বললাম।

—খুব আশ্চর্য্য নয়। কারণ আমি ঐদিক্‌টাতেই থাকি।

—অথচ রোজ আসতে হয় এদিকে!

এ-কথার উত্তরে ত্রিদিববাবু একটু রহস্যময় হাসি হাসলেন। তার পর বললেন—নেশাতত্ত্ব সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা থাকলে আপনি এ-রকম কথা বলতেন না। এই রকম কাটলেট যদি ডায়মণ্ডহারবারে পাওয়া যেত তবে রোজই আমি সেখানে যেতাম। এ-সম্বন্ধে সম্প্রতি আমি কিছু আলোচনা করেছি আমার "পিয়াসিনী পিয়া" নামে একটি গল্পে। প'ড়ে দেখবেন।

—কোন্‌ কাগজে বেরচ্ছে?

—সূর্য্য-সাহারায়। এ মাসের।

—আচ্ছা দেখব।

—দেখবেন। তাতে আমি বলেছি যে, আমার ভাল-লাগার বস্তু যেখানে যত দূরেই থাক্‌ না কেন, চিরকাল সে আমার চাওয়ার ঐকান্তিকতার কাছে অনাবিষ্কৃত

থাকবে না। এই পৃথিবীর যে-কোন প্রান্ত থেকে আমি তাকে খুঁজে বার করব। তবেই সে আবিষ্কারের গর্ব্ব হবে আমার।

—সে ত ঠিক কথা।

—এ-রকম অনেক নূতন কথায় ওর প্রত্যেকটি অক্ষর ভর্ত্তি। না, না, আমি আপনাদের রামা শ্যামার মত—সহজ হাততালির বুলি কপচাতে ভালবাসি না। নইলে সেদিন দেখেছিলাম কে এক দিগিন্দ্র—ডিস্‌গাস্‌টিং!

—আচ্ছা আজ উঠি, ত্রিদিববাবু। রাত হয়েছে।

—চলুন আমিও যাব ঐদিকেই।

এর পরে ঠিক মাসখানেকই হবে বোধ করি। ত্রিদিববাবুর সঙ্গে আর দেখা হয় নি। অথচ মজা এই যে লোকটাকে আমি এক দিন দেখলেও তাকে ভুলি নি। ওর চলা-বলার মধ্যে যেমন ছিল একটা স্বাতন্ত্র্য-সৃষ্টির চেষ্টা, তেমনি ওর চোখের মধ্যে দেখেছিলাম একটা বুভুক্ষুকে উঁকি মারতে। আমার কেবলই মনে হয়েছে এই লোকটা সাধারণের সামনে যা বলে—ওর সমস্ত বলা সেইটাই নয়, তার বাইরে এমন একটা কিছু সত্য আছে যেটার ও প্রাণপণে কণ্ঠরোধ ক'রে রেখেছে। নইলে ওর দৃষ্টির মধ্যে এত ক্লান্তি কেন?

হঠাৎ এক দিন দেখা হয়ে গেল। হাতীবাগানের বাজারে ভদ্রলোক একটা ছেঁড়া গামছা নিয়ে বাজার করছিলেন···আচমকা আমার সঙ্গে দেখা। চেয়ে দেখলাম ডানহাতে একটা কচুপাতায় জড়ানো পয়সা-দুয়েকের কুচো চিংড়ি আর বাঁ-হাতের মুঠোয় ধরা সেই জীর্ণ গামছাটি। তার ভেতর দিয়ে চার গাছি সজনে ডাঁটা মাথা উঁচু ক'রে দাঁড়িয়ে।

—বাজার হয়ে গেল? আমি বললাম।

ভদ্রলোক চমকে আমার দিকে চাইলেন। তার পর বললেন—আর বলেন কেন? সারা জীবনে আমি নিজের বাজার কক্ষনো করলাম না, এখন পরের বোঝা ঘাড়ে পড়েছে। এক বুড়ী—মশায়, ওই ফুটপাথে আমাকে ধরে বসল—দয়া ক'রে তার বাজারটা ক'রে দিতে হবে। এত লোক থাকতে জগতে হঠাৎ আমাকেই বা সে পরোপকারী ব'লে ঠাওরাল কেন—বুঝতে পারলাম না! কিছু জানি নে দাদা, মার্কেটিঙের আমি কিছু জানি নে। ওটা ছেলেবেলা থেকে চাকরদেরই কাজ ব'লে জেনে এসেছি। ডিস্‌গাস্‌টিং! থাক গে—কেমন আছেন?

—ভাল আছি। আচ্ছা আসি এখন। আপনার তো আবার আপিস যেতে হবে—কেমন?

—আপিস! ত্রিদিববাবু এখানে আবার সেই রহস্যময় হাসি হাসিলেন।— আপিস আমাকে যেতে হয় না। লাভ কি বলুন—উদয়াস্ত পরিশ্রম ক'রে? আমার 'বেদুইন' কবিতাটায় আমি ঠিক এই আইডিয়াটাকেই ফোটাতে চেয়েছি।

—আচ্ছা আমি আজ আসি ত্রিদিববাবু, আমার আবার আপিসের বেলা হয়ে যাচ্ছে। নমস্কার!

—ও। আপনাকে বুঝি দৌড়তে হবে। আচ্ছা নমস্কার! আমি দেখি সেই বুড়ীটা আবার কোন্ দিকে গেল···

এর পরে আরও কিছু দিন কেটে গেছে। গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে ট্রাম থেকে নামতেই দেখি ত্রিদিববাবু ম্লান চোখে চার দিকে চাইছেন। চুলগুলো রুক্ষ—ঠোঁট দুটো শুকনো, কাপড়-জামাটাও বিশেষ পরিষ্কার নয়।

—নমস্কার ত্রিদিববাবু! পেছন থেকে বললাম।

—কে? ও, আপনি? নমস্কার!

—এ রকম শুকনো মুখে দাঁড়িয়ে যে! ব্যাপার কি?

—হঠাৎ একটু মুস্কিলে পড়েছি মশায়। অবশ্য, মুস্কিল আর কি? বাড়ীতে গেলেই ম্যানেজ হয়ে যাবে। হ্যাঁ বাই দি বাই, আপনার কাছে পাঁচটা টাকা আছে?

—আছে। কেন বলুন ত?

—তাহ'লে আমায় দিন। মানে, ব্যাপারটা কি জানেন? সেই যে বুড়ীটা—যার বাজার ক'রে দিয়েছিলাম সেদিন, সে আমার কাছে কিছু সাহায্য চেয়েছিল তাই। আমার হয়েছে দু-দিন থেকে জ্বর, চেহারা দেখছেন না? হঠাৎ আজ বিকেলে মনে হ'ল, তাই ত! বুড়ীটা হয়ত না খেয়ে আছে! শুয়ে থাকতে পারলাম না, পাঁচটা টাকা নিয়ে বেরিয়ে পড়লাম। কিন্তু এই মোড় অবধি এসে টের পেলাম

ব্যাগটি পকেট থেকে অন্তর্দ্ধান করেছে। আবার বাড়ী যাব, আবার টাকা আনব, এই অসুস্থ শরীরে সে হাঙ্গামাও ত কম নয়, তাই বলছিলাম যদি আপনার কাছে থাকে, তাহ'লে—। অবিশ্যি কালকেই—

—না, না সেজন্য ভাববেন না—এই নিন।

—থ্যাঙ্কস! আচ্ছা আমি যাই ভাই। বুড়ীটা আবার—ডিস্‌গাস্‌টিং! ত্রিদিববাবু দ্রুতপদে চ'লে গেলেন।

মনে কি রকম খটকা লাগল। ত্রিদিববাবুকে এত চঞ্চল হ'তে এর আগে ত দেখি নি! আস্তে আস্তে ওঁর অনুসরণ করলাম···

অন্ধকার নোংরা গলির মধ্যে ত্রিদিববাবু যে-বাড়ীটায় প্রবেশ করলেন সেটি একটি খোলার বাড়ী। রাস্তার দিকে একটি ছোট্ট জানলা-মত আছে, তারই নীচে গিয়ে চুপ ক'রে দাঁড়ালাম। একটু পরেই শুনতে পেলাম ত্রিদিববাবু কাকে যেন বলছেন—

—টাকা পেয়েছি গো! কি কি আনতে হবে বল?··· আঃ! কাঁদে না রমা! কেঁদে কি হবে বল? খোকন ঘুমিয়ে পড়েছে?

—হ্যাঁ, একটু আগেও আমার কাছে এসে কাঁদছিল আর বলছিল মা, ভাত না দাও, আমায় চাট্টি মুড়ি দাও; খিদেয় পেট জ্বলে গেল যে! ··· ওর আর দোষ কি বল? এই বয়সেই ও উপোস করতে শিখেছে।

কিছুক্ষণ আর কোন কথা শোনা গেল না।

—ওকে তুলে দাও, আমি আগে দোকান থেকে ওকে কিছু খাইয়ে আনি। আর কিছু খাবারও নিয়ে আসি, তুমিও খাও, তার পর আস্তে আস্তে রান্না করলেই হবে। ভেবে কোন লাভ নেই রমা, ভেবে কিছু হবে না। এই রকম ভাবে যে-কটা দিন কাটে।

এর উত্তরে রমা মেয়েটি আবার ফুঁপিয়ে কেঁদে উঠল।

প্রায় মাস-তিনেক পরে একটি সন্ধ্যা—

সেই গ্রে ষ্ট্রীটের মোড়ে দাঁড়িয়ে জরদা কিনছি। আমি অবশ্য জরদা খাই না, কিন্তু মাসখানেক হ'ল যিনি আমার অর্দ্ধাঙ্গিনী হয়েছেন, তিনি অত্যন্ত ভালবাসেন বলেই এই যত্ন ক'রে জরদা কেনা। হঠাৎ কানে এল—

—বল হরি হরিবোল!

পেছনে চেয়ে দেখি চার জন লোকে একটি সধবার মৃতদেহ বয়ে নিয়ে চলেছে। কি অপূর্ব্ব সুন্দরীই যে ছিল সে, মৃত্যুপাণ্ডুর মুখমণ্ডলে এখনও তার সুস্পষ্ট স্বাক্ষর রয়েছে। বয়স বোধ হয় বছর-বাইশের বেশী হবে না, পায়ে আলতা আর মাথায় জ্বলছে সিঁদুর; রোগে রোগে তার শরীরে আর কিছুই নেই, তবু এই শ্মশানযাত্রার কারুণ্যেও সে তার মহিমা হারায় নি। হঠাৎ লক্ষ্য পড়ল তার পেছনে পেছনে চলেছে ত্রিদিব। বুকটার মধ্যে কি রকম ক'রে উঠল—ওর সেই রমা নয়ত? ···ছুটে গিয়ে ওর কাছে দাঁড়ালাম।

—ত্রিদিববাবু!

ত্রিদিববাবু আমাকে দেখেই যেন একটু চমকে উঠলেন, তার পর সামলে নিয়ে বললেন—আর বলেন কেন, পাড়ার একটি মেয়ে, নাম রমা, আমাকে বড্ড ভালবাসত, হঠাৎ মারা গেল, তাই সঙ্গে চলেছি।

—আপনার চেহারা এমন হয়ে গেছে কেন?

—সেই জ্বর। কিছুতেই ছাড়ছে না। নীলরতন, বিধান রায় বাদ নেই কেউ। ভাবছি কাশ্মীরটাশ্মীর অঞ্চলে চেঞ্জে যাব। ডিস্‌গাস্‌টিং!—ও, হ্যাঁ দেখুন, আপনার টাকাটা—

—সে জন্যে ভাববেন না। আপনার সঙ্গে এই ছেলেটি কে?

ত্রিদিববাবু একটি বছর পাঁচ বয়সের ছেলের হাত ধরে নিয়ে যাচ্ছিলেন। আমার কথা শুনে তার দিকে চেয়ে একটু ম্লান হেসে বললেন—এ? ঐ রমারই ছেলে। আচ্ছা আসি এখন, নমস্কার!

ত্রিদিববাবু চলে গেলেন। অনেকক্ষণ একদৃষ্টিতে তাঁর যাওয়ার দিকে চেয়ে থাকতে থাকতে হঠাৎ এক সময় দেখতে পেলাম, তিনি কোঁচার খুঁট তুলে সেই রমার ছেলেটির চোখটা মুছিয়ে দিলেন। আরও মনে হ'ল, বোধ হয় তিনি নিজের চোখের উপরও কোঁচার খুঁটটা একবার ঠেকালেন। কিন্তু,—না, হয়ত ভুল দেখে থাকব।

এক বৎসরে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

ব্রাউনিঙের 'ইন্ এ ইয়ার' হইতে

১

জানি আমি এ-জীবনে আর
দেখিতে পাব না কভু মুখখানি তার
প্রাণে ভরা আগেকার মত।
ভালবাসা যদি তার হয় হিম-হত,
আমার আকুতি আশা সকলি বিফল
জানি, দোঁহে ভুজবন্ধে স্বাতন্ত্র্যে রহিব অবিচল।

২

কোন্ কথা কোন্ আচরণে
হ'ল বীতরাগ হেন? কর-পরশনে
অথবা এ-গ্রীবার ভঙ্গীতে
কি আছে, যা বিমুখতা আনে তার চিতে?
ইহারাই অনুরাগে তাহার হৃদয়
ভরেছিল! বুঝি না কিসে যে প্রেম নির্ব্বাপিত হয়!

৩

মনে পড়ে, যবে একমনে
সেলাই করিতে ব্যস্ত, কিম্বা চিত্রাঙ্কনে
রহিতাম, কি স্নিগ্ধ দৃষ্টিতে
চাহিত সে, মুগ্ধ যেন ত্রিদিব সঙ্গীতে!
কহিতাম কথা যবে, কানে শুনিবার
আগে তার গাল ভরি আভাস ফুটিত শোণিমার!

৪

বসিত সে মোর পদমূলে,
এক বায়ু দু-জনার নিঃশ্বাসে উথলে
—এ আনন্দে হ'ত সে মশ্গুল!
প্রেম মোর উথলিয়া, মাধুরীর কূল
প্লাবিত করিত যেন! সুখে মরিতাম
সেই মধুরিমা তারে দিয়া যদি যেতে পারিতাম!

৫

কহিত সে,—"বল একবার,
সবচেয়ে প্রিয়তম তুমি যে আমার!"
কহিতাম তারে, সুখে ভাসি'
—"দেখ বুঝি নিজ প্রেমে, কত ভালবাসি!"
"আজি আমি অকলঙ্ক, বুকে লও মোরে,
মোর ইহপরকাল থাক্ বাঁধা ওই বাহুডোরে।"

৬

সত্য যাহা, করিলে স্বীকার
অপরাধ হয় তায় কভু কি কাহার?
সর্ব্বস্ব সে দিয়াছিল মোরে,
ধন, রূপ, এ যৌবন তার হাত ভ'রে
দিনু আমি; ভালবাসা দিল আমারে সে,
মোর যাহা কিছু ছিল সব তারে দিলাম নিঃশেষে।

৭

যে বিক্ষোভ জাগায় সে বুকে,
ছিল সাধ, প্রশমিব তারে তৃপ্তি-সুখে,
তার কাছে রহিব না ঋণী,
বাসনা পুরাতে তাই কার্পণ্য করি নি।
সোনা ফেলি ধূলা যদি লয় সে মুঠায়,
আকাঙ্ক্ষার ধন তারে দিয়াছিনু, কি আশ্চর্য্য তায়?

৮

আরবার ভালবাসে যদি!
প্রেম তার দীপ্ত যদি রয় নিরবধি,
স্বপ্নাতীত ধনে শুধি ঋণ।
আরো প্রাণ পাই যদি তারে অনুদিন
দিই ঢালি। তার পর বুঝি মানিবে সে
হাসিমুখে,—কভু হেন আত্মদান করি নি নিঃশেষে।

৯

"কি বেদনা এত দিন ধরি
সহিয়াছে প্রিয়া মোর মরমে গুমরি!"
পুরুষের স্বতন্ত্র প্রণয়,
এ মন সকলবাড়া সৃষ্টিছাড়া নয়।
হাসিতে সে পারে বটে! "বুদ্বুদের প্রায়
পুরুষের করস্পর্শে নারী কি নিমেষে ফেটে যায়?"

১০

প্রিয়তম, এ মোর বেদনা
স্বল্পায়ু যে। যথা ইচ্ছা পুরাও বাসনা।
বিশ্বাস করিছে টলমল,
বিচার-বিমূঢ় চিত্ত বড় যে দুর্ব্বল।
হিমে ভরা মৃৎপিণ্ড পুরুষের প্রাণ
হোক্ চূর্ণ, তার পর? কি হেরিব? সে কি ভগবান্?

বর্ম্মার বনে-জঙ্গলে

শ্রীসুষমা বিদ

ফেব্রুয়ারি মাসের শেষাশেষি যেদিন আমাদের ব্রহ্মযাত্রার সময় আসন্ন হ'ল, সেদিন চোখের জল সম্বরণ করা দুঃসাধ্য হয়ে উঠল—বিপৎসঙ্কুল পথের ভাবনায় নয়, গৃহকোণের শিশুদের জন্য। যদি রেঙ্গুন প্রভৃতি বর্ম্মার বড় বড় শহরে যাবার অভিলাষ থাকত তবে আমরা তাদের সঙ্গে নিতাম, কিন্তু বর্ম্মার বনে-জঙ্গলে আমাদের ঘুরতে হবে অনেক দিন; তাই তাদের নিতে সাহস করলাম না।

সবার কাছে বিদায় নিয়ে ভারাক্রান্ত মনে জাহাজে উঠলাম। পাথরের প্রাচীরঘেরা নগরীর সীমানা ছাড়িয়ে ধীরে ধীরে আমাদের জাহাজ তৃণ-শস্পে-ভরা মাঠের কোল বেয়ে গঙ্গার সঙ্কীর্ণ বুক থেকে উদারতর মোহানার দিকে এগিয়ে চলেছে। আমরা ডেকের উপর ব'সে আছি চোখের সামনে থেকে শ্যামল বনরাজি ও ধরণী ধীরে ধীরে অন্তর্হিত হচ্ছে।...

আমাদের জাহাজটা ছিল প্যাসেঞ্জার বোট, তিন দিনে রেঙ্গুন পৌঁছায়।... সেদিন ভোরের আলোর সঙ্গে সঙ্গে আমরা রেঙ্গুনের বন্দরে প্রবেশ করলাম। জাহাজ থেকে দেখা যাচ্ছিল তীরের 'পরে সুন্দর শহর—লোকজন, বাড়ীঘর এবং প্যাগোডায় মিশে এক অপূর্ব্ব দৃশ্য,—আর জলে দেখা যাচ্ছিল, বর্ম্মীদের শাম্পান, অসংখ্য ষ্টীমার এবং জাহাজ। রেঙ্গুনের যেটুকু আভাস পেলাম তাতে শহরটা দেখবার প্রলোভন আরও বেড়ে যায়।

বন্দরে পৌঁছাতেই এল পুলিস, ডাক্তার। জিনিষপত্র পরীক্ষাও শেষ হ'ল। জাহাজ থেকে নেমে এসে দেখি আমাদের বন্ধু ডাঃ রায় মোটর নিয়ে অপেক্ষা করছেন।

পূর্ব্বেই বলেছি, বর্ম্মার গভীর জঙ্গলের মধ্যে যাব ব'লেই আমরা এবার বেরিয়েছি। শহরে তাই বেশী দিন থাকতে পারলাম না। এই অল্পদিন থাকার জন্যেই বোধ হয় রেঙ্গুনকে আমার আরও ভাল লেগেছিল। প্রথম দর্শনেই রেঙ্গুনের সৌন্দর্য্যে মুগ্ধ হয়েছিলাম। সুন্দর সবুজ গাছে ভরা শহর, বিচিত্র তার হর্ম্ম্যরাজি। কোথাও নারিকেলকুঞ্জ, কোথাও সারি সারি সুপারিগাছ, চোখের সামনে একটা ছবি এঁকে যাচ্ছে। আমরা এখানে থাকতেই একটা প্রদর্শনী হয়। তাতে ম্যাণ্ডালে, মেমিও প্রভৃতি নানা শহর থেকে প্রদর্শিত ব্রহ্মদেশের বিচিত্র শিল্পের নমুনা আমরা দেখতে পেয়েছিলাম। বাঁশ দিয়ে অনেক সুন্দর সুন্দর জিনিষ এরা প্রস্তুত করে।

রেঙ্গুন শহরে আরও ভাল লেগেছিল সেখানকার বাঙালী-সম্প্রদায়কে। এখানে দু-দিনেই তাঁরা আমাদের এমনি আপনার ক'রে নিয়েছিলেন যে ভুলেই গিয়েছিল অন্তর আমরা এখানে প্রবাসী। পর[illegible] মাত্র আমরা মেটাকাট বৃদ্ধি পায়, সেজন্যে [illegible]র দিন ভোরের বেলায় সেই ভয়াবহ এক দিন 'মুনলাইট লাম।



জঙ্গলের পথে রাত্রিযাপনের বাংলো



বেস্-ক্যাম্পের বাংলোর সম্মুখে মাল বাছাই ও ওজন হইতেছে

সুপ্রসন্ন থাকায় আমরা যখন রেঙ্গুনে পৌঁছেছিলাম তখন জ্যোৎস্নাপক্ষ ছিল। তাই সকলের সঙ্গে মিশে রয়্যাল লেকে 'স্যাণ্ডেল পয়েণ্টে' আমরা আনন্দের সঙ্গে পিকনিক ক'রে হাসি গান ও গল্পে, সে-রাত্রি যেমন উপভোগ করেছিলাম, তার স্মৃতি অনেক দিন মনে থাকবে।

প্যাগোডার দেশে এই রকম হৈচৈ ক'রে অল্প সময়ের মধ্যে যা-কিছু দেখা যায় তাই দেখে তিন-চার দিনের মধ্যেই আমাদের মৌলমিনের দিকে ধাওয়া করতে হ'ল। ইচ্ছা রইল ফেরার পথে বর্ম্মার এই সুন্দর শহরের নাড়ী-নক্ষত্রের পরিচয় নেব।

১লা মার্চ্চ রাত দশটার ট্রেনে আমরা মৌলমিনের উদ্দেশে যাত্রা করলাম। শ্যামদেশের সীমান্তে আমাদের গন্তব্যস্থলে যেতে হ'লে, মৌলমিন থেকে এক শত মাইল ষ্টীমারে গিয়ে চাইন-সেকজিতে পৌঁছতে হয়। সেখান থেকে এক শত মাইল গরুর গাড়ী, হাতী বা ঘোড়ার পিঠে চেপে বর্ম্মার নিবিড় জঙ্গলে-ঘেরা খনির দেশে ... যায়।

রেঙ্গুন থেকে বার হয়ে পরের দিন সকালে 'গাল্ফ ...ন' নামক ষ্টেশনে নেমে, ফেরি-ষ্টীমারে নদী পার — ... হ'লাম। শহরটি বড় নয়, কিন্তু "আজি আমি অকল..., মোর ইহপরকাল থাক্ বাধা হয়। এর মাঝখানে প্রকাণ্ড প্যাগোডা ; এক ধারে তার নদী, অপর দিকে বাড়ীঘর এবং সুন্দর সুন্দর রাস্তা ; যতই দেখি ততই মুগ্ধ হই।

শহরের মধ্যে একটি ধর্ম্মশালা আছে—তার নাম, রায় বাহাদুর রুকমানন্দর ধর্ম্মশালা। বড় চমৎকার দেখতে এটি। ভেতরটি যেমন পরিষ্কার তেমনি আলো এবং হাওয়ায় ভরা। বিদেশীরা এখানে অবাধে পাঁচ দিন পর্য্যন্ত থাকতে পারেন। প্রত্যেক ঘরের পাশে রান্নাঘর এবং ঘরে ঘরে কল আছে। সেই কলে দিনরাত জল থাকে।

এখানকার মিউনিসিপালিটির সেক্রেটরি মিঃ ভৌমিকের সঙ্গে আলাপ হ'ল। তিনি অতি সদাশয় ব্যক্তি এবং প্রবাসী বাঙালী মাত্রেরই জন্যে যথেষ্ট শ্রমস্বীকার করেন। তিনি তাঁর মোটর পাঠিয়ে দিয়েছিলেন আমাদের শহর প্রদক্ষিণ করবার জন্যে। এখান থেকে ৬ মাইল দূরে রায় বাহাদুর রুকমানন্দর একটি সুন্দর বাগান-বাড়ী আছে। অনেকটা অসমতল জায়গা নিয়ে এই মনোহর বাগান-বাড়ীটি অবস্থিত। বাগানের ভেতর দিয়ে একটা নদী গেছে—আর সেই নদীতে মাঝে মাঝে বাঁধ দিয়ে, লেকের মত ক'রে তাতে সাঁতারের বন্দোবস্ত করা হয়েছে। সেখানে বোট প্রভৃতিও রাখা হয়েছে জলবিহারের জন্যে। এ রকম পাঁচ-ছটি লেক আছে আর প্রত্যেক লেকের ধারে একটি ক'রে সুন্দর কাঠের বাংলো। ইচ্ছা করলে এই বাংলোয় থেকে পিকনিক করা যায়।

আমরা মৌলমিনে তিন দিন থেকে ৫ই মার্চ্চ সকালে ষ্টীমারে চাইন-সেকজির দিকে রওনা হলাম। ষ্টীমার চলেছে নদীর মধ্যে দিয়ে—তার দু-ধারে পাহাড় এবং জঙ্গল। মধ্যে মধ্যে দ্বীপের সন্ধানও মেলে। পূর্ব্বেই বলেছি এ-পথটা মাত্র এক শত মাইল, তাই বিকেল ৪টার ভিতর এখানে পৌঁছতে পারা যাবে ক্যাপ্টেনের কাছ থেকে এ-সংবাদ পাওয়া গেল। তীরে মাঝে মাঝে চূণের পাহাড় লক্ষ্য করছি—তার কোনটার মাথায় বা প্যাগোডা দেখা

যাচ্ছে। বাতাসে মাঝে মাঝে ঝাঁজর-ঘণ্টার শব্দ ভেসে আসছে। মন্দিরের ভেতর হয়ত উপাসকের দল গাইছে—বুদ্ধং শরণং গচ্ছামি। দূর থেকে ভারতবর্ষের সেই ধর্ম্মবীরের চরণোদ্দেশে প্রণাম জানালাম, যাঁর ধর্ম্ম-জ্যোতিতে বর্ম্মার এই অখ্যাত অঞ্চলও উদ্ভাসিত।



জঙ্গলের পথে ফরেষ্ট বাংলোয় রাত্রিযাপন

সেখান থেকে দৃষ্টি নেমে এল এবার নদীর মাঝখানে। দেখি, বড় বড় কাঠ ভাসিয়ে কতকগুলি মাঝি মনের আনন্দে গান গাইতে গাইতে মৌলমিনের দিকে চলেছে। বর্ম্মায় কাঠের ব্যবসার খুব ব্যাপক। এখানে অধিকাংশ লোক নদীপথে কাঠ চালান দিয়ে যথেষ্ট খরচ বাঁচায় ও লাভ ক'রে থাকে।

নির্দ্দিষ্ট সময়ে আমরা চাইন-সেকজিতে এসে পৌঁছলাম। এ একটা সদর গ্রাম। এখানে বহু লোকের বসবাস। পোষ্ট-আপিস, কোর্ট প্রভৃতিও আছে এবং প্রত্যহ সকালে বাজার বসে। এখানে একটি ব্রহ্মদেশীয়া মহিলার বাসায় আগে থেকেই আমাদের জন্যে ঘর ভাড়া নেওয়া হয়েছিল। এই মহিলাটি আমাদের খুব আদর-যত্নে আপ্যায়িত করেছিলেন। তিনি নিজে আমাদের সঙ্গে থেকে ফুঙ্গি-চঙে নিয়ে যান। এদেশে প্যাগোডায় ও ফুঙ্গি-চঙে গেলে, মোমবাতি জ্বেলে, ধূপে ও ফুলে প্রত্যেকে আপন আপন ইচ্ছামত বুদ্ধদেবের সামনে দাঁড়িয়ে পূজা ও প্রণাম ক'রে থাকেন। আমাদের দেশের মত পাণ্ডা বা পুরোহিতের হুড়োহুড়ি নেই বা ষোড়শোপচারে পূজার আয়োজনও নাই। দেখলাম, অনেকেই প্যাগোডায় গিয়ে মালা জপ ও স্তব পাঠ করছেন। কেউবা আপনার ইচ্ছামত চার দিক ঝাঁট দিচ্ছেন ও জল ছিটিয়ে যাচ্ছেন। ফুলের তোড়ায় কেউবা বুদ্ধদেবের চরণযুগল ভূষিত ক'রে দিচ্ছেন।

এদেশে চট্টগ্রামের অনেক মুসলমান বাস করে। তাদের অধিকাংশই বর্ম্মী মেয়ে বিয়ে ক'রে এখানে স্থায়ী হয়েছে। তারা এখানকার নানা রকম ব্যবসায়ের সঙ্গে ঘনিষ্ঠভাবে সংশ্লিষ্ট। আমরা এখানে দু-এক দিন থাকার পর পুনর্ব্বার যাত্রার আয়োজন করতে লাগলাম। এই সব মুসলমান গাড়োয়ানদের কাছ থেকে বারোখানা গরুর গাড়ী ভাড়া ক'রে এবং কুলি-মজুর দরোয়ান প্রভৃতি সর্ব্বসমেত চল্লিশ জন লোক সঙ্গে নিয়ে আমরা এইবার গভীরতর জঙ্গলে আমাদের প্রকৃত কর্ম্মস্থলের উদ্দেশে ৮ই মার্চ্চ ভোর ৫টার সময় রওনা হলাম। এতক্ষণ ছিলাম লোকালয়ে, মনে শঙ্কা ছিল না, এখন একটা অজানা ভয় মুহূর্ত্তেকের জন্যে হৃদয়ে দোলা দিয়ে গেল।

আমাদের এই এক শত মাইলের যাত্রায় প্রথম ছেদ পড়ল দুপুরবেলায়, যখন একটা শীর্ণকায়া ঝরণার সন্ধান মিলল। বনবৃক্ষের শীতল ছায়ায় ক্লান্ত গো-মহিষ ও মানবের দল, মরুবক্ষে আরামের সন্ধান পেল। সঙ্গে ছিল রান্নার উপকরণ; বনের কাঠে, ঝরণার জলে এবং ক্ষুধার্ত্তদের ঐকান্তিকতায় উদরের তৃপ্তি সাধনে খুব বেশী সময় লাগল না। দ্বিপ্রহরের সূর্য্যকে ফাঁকি দেবার জন্যে গাছের তলায় সতরঞ্চি বিছিয়ে আমরা স্নিগ্ধ হাওয়ার শরণাপন্ন হলাম। তার পর বেলা তিনটা নাগাদ আবার চলল গো-যান সন্ধ্যা পর্য্যন্ত। চাইন-সেকজি থেকে ৫০ মাইল পর্য্যন্ত পনর-কুড়ি মাইল অন্তর ফরেষ্ট বাংলো পাওয়া যায়। প্রথম রাত্রি আমরা মেটাকাট বাংলোয় কাটিয়ে পরের দিন ভোরের বেলায় সেই ভয়াবহ গো-যানে অধিরূঢ় হলাম।



রেঙ্গুনে জলক্রীড়া

মেটাকাট থেকে বেরিয়েই পাহাড় এবং জঙ্গলে ভরা একটা গিরিসঙ্কট পার হ'তে হয়। এই সঙ্কীর্ণ পথে প্রায় এক মাইল গিয়ে আমাদের গরুর গাড়ী নিবিড় জঙ্গলে পড়ল। এই জঙ্গলের মুখেই মাধ্যাহ্নিক ক্রিয়া সমাপন ক'রে পরে অগ্রসর হব ভেবে আবার একটা পাগলা-ঝোরার সন্ধান করলাম। এখানে একটা সামান্ত দুর্ঘটনা ঘটে। যদিও কতকগুলি গাড়ী আমাদের সঙ্গে এসেছিল কিন্তু রসদের গাড়ী পড়েছিল পিছিয়ে। প্রায় দু-ঘণ্টা অপেক্ষা করেও যখন তাদের সন্ধান পেলাম না তখন অন্যান্য গাড়োয়ানদের পাঠালাম তাদের খোঁজে। তারা গিয়ে দেখে, ঢালু পাহাড় বেছে বেছে আমাদের রসদের গাড়ীর সঙ্গেই রসিকতা করেছে। সেই বন্ধুর পথে গাড়ী গেছে উল্টে আর গাড়োয়ান ছিটকে এক ধারে পড়ে আছে। টুকরিতে যে-সব ফল এবং তরীতরকারি ছিল তা কর্দ্দমসিক্ত পথে প'ড়ে নষ্ট হয়ে গেছে। গাড়োয়ানটির বুকে সামান্য আঘাতও লেগেছিল। সেই উল্টানো গাড়ী সোজা ক'রে যখন আমাদের দলবল ফিরে এল, তখন সূর্য্যদেব পশ্চিম গগনে। ক্ষুধাতৃষ্ণায় তখন আমরা কাতর, সঙ্গে সামান্য যা কিছু ছিল তাই দিয়ে সবার ক্ষুন্নিবৃত্তি করা হয়। পথের এই অনিবার্য্য বিপদের জন্যে আজ আমরা আর বেশী দূর যেতে পারি নি। তিন-চার মাইল যাবার পরে 'কমথে' ফরেষ্ট বাংলোর সন্ধান পাওয়া গেল। সেখানে রাত্রি-যাপনের পর, পরের দিন বেলা বারটা নাগাদ চাইডো গ্রামে পৌছলাম।

চাইডো একটি সমৃদ্ধিশালী এবং বৃহৎ গ্রাম; বহু লোকের বাস। এখানকার ফরেষ্ট বাংলোয় আমরা সকলে উঠলাম। মেটাকাট থেকে চাইডো পর্য্যন্ত রাস্তা যে কি বিপজ্জনক তা চোখে না দেখলে কখনও ধারণা করা যায় না। প্রতি মুহূর্ত্তেই গাড়ী উল্টে যাবার সম্ভাবনা আছে। আমাদের গাড়ী দু-বার এমন গড়িয়ে এসেছিল যে আমরা আজও ভাবি, কেমন ক'রে জখম না হয়ে আমরা ফিরে আসতে পেরেছি। চড়াইয়ের সময় পিছন থেকে অনেকবারই কুলিদের গাড়ীটা ঠেলে দিতে হয়েছে।

চাইডোতে এসে আমরা দু-দিন বিশ্রামের জন্যে রয়ে গেলাম। ব্যবসায়-সংক্রান্ত আমাদের যা দু-একটা কাজ ছিল তা মিটিয়ে আমরা আবার গ্রাম-সীমান্তের দিকে অগ্রসর হলাম। পাহাড়-ঝরণা এবং গভীর জঙ্গল, সূর্য্যের আলোও সেখানে পথ হারিয়ে যায়; প্রকৃতির এই নির্জ্জনতার এক-টানা সুরে মন আবিষ্ট হয়ে ওঠে।

চাইডোতেই গ্রাম শেষ হ'ল। এখান থেকে আমাদের কর্ম্মস্থল আরও ৫০ মাইল দূরে। এই ৫০ মাইলের মধ্যে আর কোন গ্রাম বা জনমানবের সমাগম নেই। এপথে ফরেষ্ট বাংলোরও কোন সন্ধান নেই। আমাদের কাজের সুবিধার জন্যে স্থানে স্থানে রাত্রিবাসের উপযোগী ঘর আমরা করিয়ে নিয়েছি। সেখানেই আমাদের কর্ম্মচারীরা যাওয়া-আসার পথে রাত্রিকালে বিশ্রাম করে।

এখানে নানা রকমের বড় বড় গাছ মাথা উঁচু ক'রে কত দিন ধরেই না বিরাজ করছে। কতকগুলি গাছ শুকিয়ে গেছে, কতকগুলি কালের স্পর্শে এবং ঝড়ের প্রভাবে ভেঙে পড়ে আছে। বাঁশ, বেত এবং নানাবিধ লতায় পথ কি রকম দুর্গম ও জঙ্গলময় হয়ে আছে তা ধারণা করা যায় না। নিবিড় জঙ্গলের অন্ধকারের মধ্যে দিয়ে গো-যান দিনের পর দিন চলছে—মনে করতে পারি নে, রৌদ্রের আলো স্পষ্টভাবে এপথে এক দিনও দেখেছি কি না।

আমাদের গাড়ীর আগে আগে কুলিরা চলেছে, দা কুড়ুল, করাত, বর্শা এবং বন্দুক নিয়ে, কারণ এখানে বাঁধা রাস্তা ব'লে কিছু নেই; তারা চলেছে জঙ্গল কেটে কেটে গাড়ীর পথ করতে করতে। কোথাও বা গাছ প'ড়ে আছে সুমুখে, আর কোথাও বাঁশঝাড় চলার পথে মূর্ত্তিমান বিঘ্ন হয়ে দেখা দিয়েছে। এসব সাফ ক'রে এগিয়ে যাওয়া

কষ্টও আছে, আনন্দও আছে। চাইডো থেকে দু-তিন দিন এমনি চলে অবশেষে আমরা আমাদের কর্ম্মস্থলে এসে পৌঁছে হাঁফ ছেড়ে বাঁচলাম। জায়গাটি বড় চমৎকার। দুই দিকে উঁচু পাহাড় গর্ব্বোন্নত শিরে দাঁড়িয়ে আছে, আর তারই মাঝখানে এই উপত্যকা। এক দিকে পাহাড়ের গা বেয়ে একটি স্রোতস্বতী বয়ে যাচ্ছে। সেই সমতলভূমিতে আমাদের বাঁশের বাংলো—তার বেতপাতার ছাউনি। চারি দিকের পাহাড়ে জঙ্গলে কত রকমের অসংখ্য পাখীর কলরব দিন-রাতকে মুখরিত ক'রে রেখেছে। এখানে সকালবেলায় প্রাতরাশ শেষ ক'রে জঙ্গলে জঙ্গলে ঘুরে বেড়াতাম ও প্রয়োজনমত কাজের তদারক করতাম। বিকেলে স্বামী তাঁর বন্দুক নিয়ে শিকারের আশায় নিবিড়তর জঙ্গলে যেতেন, আমিও তাঁর সঙ্গী হতাম। সন্ধ্যায় ক্লান্তদেহে ফিরে এসে বাংলোয় ব'সে কর্ম্মচারীদের সঙ্গে গল্প করতাম।



আমাদের কর্ম্মস্থলের বাংলো

এখানে কেরিণ, চট্টগ্রামের মুসলমান ও শ্যামদেশীয় বহু নরনারী কাজ করে। এর মধ্যে কেরিণরাই কর্ম্মঠ। এরা দেখতে অনেকটা ভুটিয়াদের মত। নাক চওড়া এবং চেপ্টা। গায়ের রং ফর্সা। এদের গ্রামগুলি বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন এবং এরা খুব অতিথিবৎসল। এদের প্রত্যেক গ্রামে একটি ক'রে জিয়া (অর্থাৎ অতিথিশালা) আছে। তা ছাড়া যদি কোন অচেনা পথিক তাদের বাড়ীতে আসে, তারা তাদের যথাসাধ্য চাল, নুন, শুকনো মাংস ইত্যাদি দিয়ে অভ্যর্থনা এবং পরিতুষ্ট করে, রাত্রিবাসের জন্যে ঘর ছেড়ে দেয়। আমরা যখন তাদের গ্রামের মধ্যে দিয়ে আসি (আমাদের পথে কয়েকটা কেরিণ-বস্তি পড়েছিল) তখন কেউবা ডাব, কেউবা মুর্গী নিয়ে এসে আমাদের উপঢৌকন দেয়। কেরিণ ও শ্যামদেশীয়েরা সব রকম জীবজন্তু খায় এবং বড় জানোয়ার হ'লে তার মাংস শুকিয়ে রেখে দেয় ভবিষ্যতের রসদ হিসাবে। এসব বিক্রী ক'রে লাভবানও হয় তারা।

একটা গ্রামের মধ্যে দিয়ে আমরা যাচ্ছি। ঢোলের শব্দ ও গানের আওয়াজ খুব শোনা যাচ্ছে। কুলিরা বললে যে এই গ্রামের লুজির (মোড়লের) ছেলের বিয়ে হচ্ছে। আমরা গাড়ী থামিয়ে বিয়ে দেখতে গেলাম। দেখতে পেলাম, এক জায়গায় অনেক বরাহ বলি হয়েছে ও অপর জায়গায় সেগুলি পোড়ান হচ্ছে। গ্রামের সকল লোক এক-সঙ্গে এখানে মিলেছে। মদ খাচ্ছে, গানবাজনা করছে আর বরাহ-মাংস চিবচ্ছে। আমাদের এরা অভ্যর্থনা ক'রে নিয়ে বসাল। বর-কনেকে সাজিয়ে দেখাল। এদের প্রথা, মেয়ে যত দিন কুমারী থাকবে তত দিন একটা সাদা রঙের মোটা আলখাল্লা-ধরণের জামা প'রে থাকবে এবং বিয়ের পরদিন থেকেই রঙীন জামা ও লুঙ্গি ব্যবহার করবে। এদের মেয়ে-পুরুষ সকলের মুখেই সর্ব্বদা পাইপ লেগে আছে। বেশ সৌখীন জাত এরা। আমোদে হাসিতে গানে সব সময়ে ভরপুর।

এরা বাঁশের ভিতরের ফাঁপা জায়গায় চাল ও জল দিয়ে ভাত রান্না করে। তার নাম কাউনি ভাত—খেতে মন্দ লাগে না। এরা এক দিন নিমন্ত্রণ ক'রে আমাদের খাইয়েছিল।

এই রকম ভাবে দিন যখন আমাদের নানা আমোদ এবং বৈচিত্র্যের মধ্যে দিয়ে কাটছিল, তখন এক দিন আমার স্বামী একটা বাঘ শিকার করেন। কেরিণরা সেই বাঘের

মাংস নিয়ে কাড়াকাড়ি আরম্ভ ক'রে দিলে। কতক তারা রান্না ক'রে খেয়ে শেষ করল—কতক ভবিষ্যতের দুর্দ্দিনের জন্যে শুকিয়ে রাখল। আশ্চর্য্য এই জাত, কি না খায় এরা। ব্যাঙ তো দেখছি এদের উপাদেয় খাদ্য। এদেশের ব্যাঙগুলির ঠ্যাং শরীরের চাইতে দ্বিগুণ লম্বা। কেরিণরা রাতের বেলায় মিডাই (এরা পচা কাঠ ও গর্জ্জন তেল দিয়ে তৈরি মশাল) জেলে পাহাড়ের গর্ত্তে এবং নালায় ব্যাঙ খুঁজে খুঁজে বেড়ায়।

সভ্য জগৎ থেকে বহু দূরে এই আনন্দময় ধামে অগাধ শান্তির মধ্যে সপ্তাহ দুই কাটাবার পর দেশে ফিরবার দিন আমাদের ঘনিয়ে এল। দুস্তর জঙ্গল-সমুদ্র পার হয়ে যখন আমরা আবার মৌলমিনে ফিরে এলাম, তখন আমাদের অবস্থা প্রায় অর্দ্ধমৃতের মত। আট-দশ দিন পরে আমরা রেঙ্গুন যাত্রা করি। ইচ্ছা ছিল এখান থেকে পেগু, ম্যাণ্ডালে, মেমিও প্রভৃতি শহরে বেড়িয়ে তবে দেশে ফিরব। কিন্তু রেঙ্গুনে এসে দেখি এখানে বেশ গরম পড়েছে। তা ছাড়া শরীরও দুর্ব্বল থাকায় আমরা আর কোথাও যাওয়া সমীচীন বোধ না ক'রে এখানেই স্থিতিলাভ করলাম।

চৈত্র-সংক্রান্তির দিনে এখানে এক প্রকার জল-খেলা হয়—ঠিক তেমনই ভাবে, যেমন আমরা ফাগ খেলি। জল-খেলার সম্বন্ধে এদের দেশের রীতি এই যে, এরা বৎসরের শেষে, মেয়েপুরুষে, যার যে-বারে জন্ম সেই বারের নামে নাম-করা টুলে বসে পাঁচ-রকম ফুলের পাতা, মাথা-ঘসা ইত্যাদি দিয়ে স্নান করে। স্নানের পর নূতন পোষাক পরে তানাখা (এই দেশীয় চন্দন) মেখে বেশভূষা ক'রে বর্ষাকে আহ্বান করে। তাদের বিশ্বাস, এই সব ক্রিয়া এবং ক্রীড়ার পর অঝোর ধারায় বর্ষা নামে এবং তাতে ক'রে তাদের শরীর এবং মন থেকে গত বৎসরের পাপতাপ সব ধুয়ে মুছে যায়; সেই সঙ্গে দেশেরও মঙ্গল হয়। কৃষকদের ধান্য রোপণ এবং আবাদের প্রচুর সুবিধা হয়।

এরা সব এক-এক দিন এক-এক রকম পোষাক পরে। রাস্তার ধারে বড় বড় ট্যাঙ্ক বসিয়ে তাতে জল ভরে এবং কখনও কখনও তাতে বরফ মিশিয়ে ঠাণ্ডা ক'রে গাড়ী, ঘোড়া, ট্রামবাস, এবং পথচারী পথিকদের সর্ব্বাঙ্গ ভিজিয়ে দেয়। কেউ এতে প্রতিবাদ করে না। ছ-সাত দিন এই সমারোহ চলে এবং তার ফলে না কি এক দিন বৃষ্টিও নামে। বাল্‌তি বাল্‌তি জল লোকের গায়ে ঢেলে ওরা অদ্ভুত আমোদ উপভোগ করে। বাইরের নানা শহর থেকে লোকে পয়সা খরচ ক'রে এই জল-খেলার আনন্দ উপভোগ করতে আসে। শেষের দিনে গাড়ী ক'রে এরা একটা শোভাযাত্রা বার করে।

সোয়েডাগন প্যাগোডা সম্বন্ধে আগেই কিছু বলেছি। এই প্যাগোডার দেশে এসে আর একবার সে অপরূপ দৃশ্য না-দেখে মনে শান্তি পাচ্ছিলাম না। এ-সব প্যাগোডা যেন দুর্গবিশেষ। এর ভেতরে যাবার চারি দিকে চারিটি ফটক আছে। সেই ফটক পার হয়ে সিঁড়ি বেয়ে প্রায় দশ মিনিটের রাস্তা গেলে তবে মধ্যস্থলে পৌঁছান যায়। সিঁড়ির দুই পাশে দোকানের সারি, সেখানে এদেশের যাবতীয় জিনিষ (খেলনা থেকে আরম্ভ ক'রে ফুল প্রভৃতি সবই) কিনতে পাওয়া যায়। মনে হয় যেন ছোট একখানি গ্রাম। চারি দিক পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন। মার্ব্বেল পাথরের মেঝেতে সুন্দর বসনে আবৃত হয়ে ধনী নির্ধন বর্ম্মীরা দলে দলে, মেয়ে-পুরুষে এসে বসছে। সবারই হাসিখুশী মুখ, আর সেই মুখে তানাখা পাউডার মাখা। কেউবা ব'সে মালাজপ করছে, কেউবা প্রদক্ষিণ করছে। চারি দিকে ছোটবড় নানাবিধ বুদ্ধমূর্ত্তি—কোথাও বা শায়িত অবস্থায়, কোথাও বা দণ্ডায়মান। এখানে একটি বড় ঘণ্টা আছে। জনপ্রবাদ, সেটা বাজালে আবার তাকে বর্মায় ফিরে আসতে হবে। ব্রহ্মদেশ ঘোরা আমার অসম্পূর্ণ থেকে গেছে, তাই মনে ইচ্ছা রইল আবার ফিরে আসব। ঘণ্টা বাজালাম, ক্ষতি কি?

এদেশের পোয়ে-নৃত্য দেখতে অতি সুন্দর। অনেকে ব'লে থাকেন, এ-নাচ না দেখে গেলে, ব্রহ্মদেশ ভ্রমণই বৃথা হয়। আমরা স্থানীয় কর্পোরেশনের উদ্যানে এক শনিবার সন্ধ্যায় এই নাচ দেখবার সুযোগ পেয়েছিলাম।

রেঙ্গুন ছেড়ে দেশে ফিরতে মন তেমন সাড়া দিচ্ছিল না। কিন্তু দেশের মাটি, দেশের জলবাতাস এবং সব চাইতে দেশের লোক আমাদের টানছিল। তাই ১৩ই এপ্রিল শ্রীবুদ্ধের চরণ স্মরণ ক'রে আবার অর্ণবপোতে পাড়ি দিলাম। নব বৎসরের প্রারম্ভেই যখন গঙ্গার সুপরিচিত জেটিতে আপনার জনের স্মিত মুখ দেখতে পেলাম, তখন বাস্তবিকই প্রসন্নতায় আমাদের সমস্ত মন ভ'রে উঠেছিল।







মৌলমিনের বন্দর। (মধ্যে) মৌলমিন হইতে কর্মস্থলের পথের দৃশ্য।



ব্রহ্মের প্যাগোডায় বুদ্ধমূর্ত্তি



ব্রহ্মদেশের রাখাল



ব্রহ্মের চাষী



ব্রহ্মদেশের একটি গ্রাম



ব্রহ্মদেশের একটি পশুবিক্রয়শালা



ব্রহ্মদেশের একটি গ্রামের বাজার



ঘরমুখো চাষীদল

দেশী জুতার কালি কিনিয়াও ঐরূপ অভিজ্ঞতা হইয়াছে।

কয়েকটি বহুবিজ্ঞাপিত দেশী স্নো'তে গায়ে খড়ি পড়িতে দেখিয়াছি। একটিতে সুগন্ধের বিনিময়ে দুর্গন্ধ পাইয়াছি।

একটি বিখ্যাত দেশী কোম্পানীর দন্তমঞ্জনে মাড়িতে ফোস্কা পড়িয়াছে।

কয়েকটি দেশী 'ক্রিম' গ্রীষ্মকালে গলিয়া নষ্ট হইতে দেখিয়াছি। হঠাৎ একটা বিদেশী ক্রিম একদিন ব্যবহার করিয়া দেশী ও বিদেশী বস্তুর পার্থক্য দেখিয়া আশ্চর্য্যান্বিত হইলাম।

এক টিন উচ্চ মূল্যের দেশী চা কিনিয়া, তাহাতে সাধারণ মূল্যের চা হইতে কিছুমাত্র পার্থক্য বুঝিতে পারিলাম না।

আর একটি বিষয়ের উল্লেখ করি।

ব্যবসায়ে সফল হইতে হইলে নিত্য নূতনত্বের আবশ্যক হয়। এই নূতনত্ব প্যাকিং ও বোতলের নূতনত্ব নহে। দুঃখের বিষয় বাঙালী ব্যবসায়ীর ধারণা এই স্তর অতিক্রম করে নাই।

বিদেশী ফাউণ্টেন পেনের নিত্য নূতনত্বের কেমন প্রতিযোগিতা চলিতেছে, তাহা লক্ষ্য করিলে আমার বক্তব্য পরিস্ফুট হইবে।

পূর্ব্বে যেরূপ টিনে চা ভর্ত্তি করিয়া বিক্রয় করা হইত, "ভ্যাকুয়ম্" প্যাক্ করিয়া তাহা বিক্রয় করা হইল, ব্যবসায়ে লাভজনক নূতনত্ব।

পূর্ব্বে যে হারিকেন লণ্ঠন বিক্রয় হইত, নূতনতর লণ্ঠনে তাহার কয়েকটি বিষয়ে নূতনত্ব পরিস্ফুট হইতেছে।

মোটর গাড়ীর তীব্র প্রতিযোগিতার ক্ষেত্রে নিত্য নূতনত্ব লাগিয়াই আছে।

মোটের উপর, যে-বিষয়ে যে-অসুবিধা বা ত্রুটি লক্ষিত হয়, সেই অনুসারে পরিবর্ত্তনসাধনরূপ নূতনত্ব সাধনই হইতেছে ব্যবসায়ে লাভবান হইবার নূতনত্ব।

বাঙালী ব্যবসায়ক্ষেত্রে সবে মাত্র নামিয়াছে। সুতরাং ঐ বিদ্যা আয়ত্ত করিতে তাহার এখনও অনেক দেরি আছে বলিয়া মনে হয়।

আর একটি কথা বলিয়াই এ প্রবন্ধের উপসংহার করিব।

ব্যবসায়ীর জিনিষের উপযুক্ত বিজ্ঞাপন দিতে হয়। বাঙালী ইহা ভাল রূপ জানে বলিয়া মনে হয় না।

প্রত্যেক শিক্ষিত ব্যক্তিই কিছু কিছু পুস্তক নিয়মিত কিনিতে পারেন। কিন্তু তাঁহার রুচি অনুযায়ী পুস্তকের প্রকাশ তাঁহার নজরে আনা আবশ্যক। বোম্বাইয়ের এক বিখ্যাত ব্যবসায়ী বিবিধ পুস্তকের বর্ণনা সম্বলিত বিজ্ঞাপন আমাকে নিয়মিত পাঠাইয়া দেন। তাহার ফলে আমি আমার প্রয়োজনীয় ও রুচি অনুযায়ী পুস্তক তাঁহাদের নিকট হইতে আনাইয়া লই।

ঐরূপ কারণে আমি পঞ্জাবের এক ব্যবসায়ীর নিকট হইতে ঔষধ আনিয়া ব্যবহার করি।

ঠিক ঐরূপ কারণে বোম্বাইয়ের এক দোকান হইতে অন্য বিবিধ দ্রব্য মাঝে মাঝে আনাইয়া লই।

ঐ সকল বস্তু নিশ্চয় কলিকাতার বাঙালীর দোকানেও পাওয়া যাইবে। কিন্তু বাঙালী ব্যবসায়ী এখনও ক্রয়ার্থীর নিকট তাহার দ্রব্যাদির বিজ্ঞপ্তি উপযুক্ত ভাবে প্রচার করিতে শিখে নাই।

এই সব বিষয়েও সুদূর বোম্বাই ও পঞ্জাব প্রভৃতির ব্যবসায়ীদের নিকট বাঙালীর অনেক শিখিবার আছে।

[সম্পাদকের মন্তব্য। লেখক যাহা লিখিয়াছেন, তাহা অবশ্য সকল বাঙালী ব্যবসায়ীদের প্রতি প্রযোজ্য নহে। কিন্তু কাহারও প্রতি প্রযোজ্য না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।]

অসময়

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

এখনও আমার হয় নি সময়,
হয় নি রজনী ভোর ;
তবু নন্দনগন্ধ মাখিয়া
এসেছ বৎস মোর।
অমল ধবল নবনী কোমল
তরুণ অঙ্গভার,
যে অমৃত লয়ে এসেছ আলয়ে,
প্রকাশিছে কিছু তার।
জ্যোৎস্না ঝরিছে, গগন ভরিছে,
নব আনন্দভারে,
ঐ মুখময় ফুল চেয়ে রয়,
দেখে যেন আপনারে।
হৃদয় ভরিয়া এসেছ নবীন,
ভুবন ভরেছ গানে,
রুদ্ধ যা ছিল, হ'ল কি মুক্ত,
আকাশ এল কি প্রাণে ॥
তবু মনে হয়, এ নহে সময়,
এখনও রয়েছে বাকী
ঘুচাতে আমার মনের আঁধার
পূরাতে দৈন্য-ফাঁকি।
ঐ সুকোমল স্পর্শের তরে
কঠিন এ-কোল মোর,
এখনও ভাগ্য করে নি যোগ্য
লভিতে অঙ্গ তোর।
এখনও হৃদয় সুন্দর নয়,
অনেক দৈন্য-গ্লানি
লোভ মোহ পাপ ছোট ছোট সাপ
করিতেছে হানাহানি।
অপূর্ণ মন ক্ষুদ্র জীবন
ঘিরেছে তুচ্ছতায়,
হেরি মনোলোভা স্বর্গের শোভা
প্রাণ করে হায় হায়।
মোর 'পরে ভার গ'ড়ে তুলিবার
এ রূপ বিশ্বমাঝে ;
শুধু নহে আশা, দিতে হবে ভাষা
যাহা কিছু রহিয়াছে।
যেন মোর মায়া নাহি আনে ছায়া
যেন মলিনতা মম
আড়াল না-করে, রূপে রসে ভরে
বিকচ পুষ্প সম।
এই পাওয়া তোঁরে অন্তর ভ'রে
এইখানে শেষ নয়,
দিনে দিনে তব কাজে নব নব
হবে মম পরিচয়।
দেবদুর্লভ এই সৌরভ
আমার স্পর্শ পেয়ে
বিমুক্ত পথ না ভরে জগৎ
সুগন্ধে দিক ছেয়ে।
ব্যর্থ এ চাওয়া বুক ভ'রে পাওয়া,
তবে সবই মিছে হয়
তাই চেয়ে মুখে প্রাণ কাঁপে বুকে
অন্তরে লাগে ভয়।
শুধু ভালবাসা নাহি আনে আশা,
সে এক অন্ধপথ,
তারই সাথে সাথে হবে যে ঘুচাতে
তুচ্ছ যা মনোরথ।
ঐ অনুপম হাসি দেখে মম
বুকে বুকে লাগে বল,
শুধু মনে হয় যদি দেরি হয়,
চোখে ভ'রে আসে জল।
বন্দী রয়েছি নিজ শৃঙ্খলে,
হয় নি রজনী ভোর,
তবু নন্দনগন্ধ বহিয়া
এসেছ বৎস মোর।
চেয়ে মোর মুখে মনে হয় সুখে
যেন এ আশীর্ব্বাদ,
ভাঙিয়া শুক্তি লভিব মুক্তি,
এনেছে সে সংবাদ ॥

বর্ষায়

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

সন্ধ্যার পূর্ব্ব হইতেই বৃষ্টি নামিয়াছে, আড্ডা জমিল না। তিন জনে ছাড়া-ছাড়া ভাবে সময় কাটাইতেছিল—তারাপদ তাস ঘাঁটিতেছে, রাধানাথ সিনেমার বিজ্ঞাপন দেখিতেছে, শৈলেন হাত দুইটাকে বালিস করিয়া চিৎ হইয়া শুইয়া গুন্-গুন্ করিতেছে।

তারাপদ বলিল, "তোমার মাথার কাছের জানালা দিয়ে বৃষ্টির ছাট আসছে শৈলেন।"

শৈলেন বলিল, "আসুক্, বেশ লাগছে; সুবিধে-আরাম যখন সম্পূর্ণ ভাবে নিজের আয়ত্তাধীন, তখন ইচ্ছে ক'রেই একটু একটু অসুবিধে ভোগ করায় বেশ একটা তৃপ্তি আছে,—রাজারাজড়ার সখ ক'রে হেঁটে চলার মত।"

রাধানাথ একটি সংক্ষিপ্ত টিপ্পনী করিল—"কবি।"

তারাপদ বলিল, "তাহ'লে আর একটু অসুবিধার তৃপ্তি ভোগ করতে করতে তুমি না-হয় শুভেনকে ডেকে নিয়ে এস, চার জন হ'লে দিব্যি আরাম ক'রে তাসটা খেলা যায়।"

রাধানাথ বলিল, "আমি গিয়েছিলাম তার কাছে; সে আসবে না।"

"কেন?"

"তার দাদার শালী বেড়াতে আসবে।"

"আসুক না?"

"বললে, এ অবস্থায় আমার বাড়ী ছেড়ে যাওয়াটা নেহাৎ অভদ্রতা হবে না?"

তারাপদ ভ্রূ কুঞ্চিত করিয়া বলিল, "ও…অভদ্রতা!"

আবার চুপচাপ; শৈলেন গুনগুনানিটুকুও থামাইয়া দিয়াছে। একটু পরে তারাপদই আবার মৌন ভঙ্গ করিল; প্রশ্ন করিল, "তোমরা ভালবাসা জিনিষটায় বিশ্বাস কর?"

রাধানাথ বলিল, "যখন ভূতে করি তখন ভালবাসা আর কি দোষ করেছে,—দুটোই যখন ঘাড়ে চাপবার জিনিষ। তবে সব সময় করি না বিশ্বাস। ঘোর অন্ধকার রাত্রি, পোড়ো বাড়ী কিংবা একটানা মাঠের মাঝখানে একটা পুরনো গাছ—একলা প'ড়ে গেছি—এ-অবস্থায় ভূত বিশ্বাস করি; আর ভালবাসার কথা,—কবির ভাষায় এ-রকম 'অঝোর-ঝরা শাওন রাতি'—তোমার চা-টি দিব্যি হয়েছিল, আর ওদিকে বাড়িতে খিচুড়ী আর মাংসের খবর পেয়ে এসেছি, ভবিষ্যতের একটা আশ্বাস রয়েছে, এ-রকম অবস্থায় মনে হচ্ছে যেন প্রেম ব'লে একটা জিনিষ থাকা বিচিত্র নয়…এমন কি দাদার নেই-শালীর জন্যে একটা বিরহের ভাবও মনে জেগে উঠছে যেন।"

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "কবি কি বল?"

শৈলেন বলিল, "আমি যে রয়েছি, আরও প্রমাণ দিয়ে স্পষ্ট ক'রে বলতে গেলে—এখন, এ-ঘরে হাতে মাথা দিয়ে শুয়ে আছি—এটা বিশ্বাস কর?"

"করি বইকি—না ক'রে উপায় কি? বিশেষ ক'রে বৃষ্টির ছাটের সঙ্গে সঙ্গে তোমার শৈলেনত্বের প্রমাণ যখন…"

"তাহ'লে ভালবাসাকেও বিশ্বাস করতে হবে তোমাদের, কেন-না, আমি আর ভালবাসা সম-স্থিত, ইংরেজীতে তোমরা যাকে বলবে co-existent!"

তারাপদ তাস ঠুকিতে ঠুকিতে বলিল, "বটে! তা তোমার জীবনে যে একটা রহস্য আছে সে-সন্দেহ বরাবরই হয় বটে, তবে অ্যান্টি-শুকদেবের মত—আমি অ্যান্টি-ক্রাইষ্টের নজীরে কথাটা ব্যবহার করলাম—অ্যান্টি-শুকদেবের মত তুমি যে রমণী-প্রেম নিয়েই পৃথিবীতে অবতীর্ণ হয়েছ এতটা জানা ছিল না। ব্যাপারটা ভেঙে বল একটু।"

"বয়স যখন সাত-আটের মাঝামাঝি সেই সময় আমার ভালবাসার সূত্রপাত। ঠিক কোন লগ্নটিতে আরম্ভ হয়েছিল বলতে পারি না। অনভিজ্ঞেরা কাব্য-কাহিনীতে যা বলেন তা থেকে মনে হয় ভালবাসা জীবনের একটা নির্দ্দিষ্ট রেখা থেকে আরম্ভ হয়, যেমন মাঠের ওপর একটা চুণের রেখা কিংবা কোদালের দাগ থেকে আরম্ভ হয় বাজির দৌড়। ঐ যে শোন প্রথম দর্শন থেকেই প্রেম, কিংবা হাতের লেখা দেখেই ভালবেসে ফেলা, ও-সব কথা নিতান্তই বাজে। প্রেমকে একটি ফুল বলা চলে—ওর আরম্ভটা পাঁজির এলাকাভুক্ত নয়। কবে যে কেন্দ্রগত মধুকণাটুকু জমে উঠেছে, আর তাকে ঘিরে কঁচি দলগুলি কুঞ্চিত হয়ে উঠবে তার হিসেব হয় না; আমরা যখন টের পাই তখন যাত্রা-পথে অনেক দূর এগিয়েছে—সেটা বিকশিত দলের ব্যাকুল গন্ধের যুগ…

"এক দিন ঠাকুরমার কাছে গল্প শুনতে শুনতে আমি

ব্যাপারটুকুর সন্ধান পেলাম। সেদিনও বড় দুর্যোগ ছিল, ঝড়ঝাপটার ভাগটা আজকের চেয়েও বরং বেশী। রাজপুত্র অরূপকুমার কত দীর্ঘ পথ পিছনে রেখে, কত দীর্ঘতর পথ সামনে ক'রে চলেছেন। আহার নেই, নিদ্রা নেই ; ভয় নেই, শঙ্কা নেই ; সঙ্গী. বুকের মধ্যে একটি রূপের স্বপ্ন। যাত্রাপথের শেষে সাগরের অতল তলে মাণিকের তোরণ পেরিয়ে তাঁর পক্ষীরাজ ঘোড়া পৌঁছল রাজকুমারী কঙ্কাবতীর প্রবাল-পুরীর দ্বারে।

"এতটা হ'ল সাধারণ কথা, যাত্রাপথের দৈনন্দিন ইতিহাস।

"সেই বিশেষ রাত্রে অরূপকুমার আমি যখন সোনার কাঠি ছুঁইয়ে "

তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তুমি আবার কেমন ক'রে বয়স আর অবস্থা ডিঙিয়ে অরূপকুমার হয়ে পড়লে ?"

"সাত-আট বছর বয়সের একটা মস্তবড় সুবিধা এই যে, সে-সময় বয়স আর অবস্থা সম্বন্ধে কোন চৈতন্য থাকে না, সুতরাং যাকে মনে ধরে নির্ব্বিবাদে তার মধ্যে রূপান্তরিত হয়ে পড়া চলে। এখন তুমি যে অমুক আর তোমার বয়স যে সাঁয়ত্রিশ, এই চেতনা তোমার চারি পাশে গণ্ডী সৃষ্টি ক'রে তোমাকে একান্ত পক্ষে "তুমি" ক'রে রেখেছে,—একটু গণ্ডী কাটিয়ে রাজপুত্র কোটালপুত্র হয়ে নেওয়া তো দূরের কথা, মুহূর্ত্ত কয়েকের জন্য যে নিজে ছেলেবেলা থেকেই ঘুরে আসবে সেটাও দুষ্কর হয়ে ওঠে। জীবনের সাত-আট বছর বয়সটা হ'ল রূপকথারই যুগ এই তরলতার জন্য, যেমন সাঁইত্রিশ-আটত্রিশ বছর সময়টা তার নির্ব্বিকারত্বের জন্য সাহেব, বড়বাবু প্রভৃতির মধ্যে মুখ বুজে চাকরি করবার যুগ।...যাক, গল্পটাই শোন ; বর্ষা কেটে গেলে বায়ুমণ্ডলের এই ভিজে-ভিজে আমেজের ভাবটি যখন কেটে যাবে তখন আমি গল্পটা যে চালাতে পারব—এতে সন্দেহ আছে, কেন-না, তখন নিজে যা বলছি তা নিজেই বিশ্বাস করতে পারব কি না সন্দেহ আছে।

"সে-রাত্রে অতিমাত্র বিস্মিত হয়ে দেখলাম সোনার কাঠি ছোঁয়াতে রূপোর পালঙ্কে যে জেগে উঠল সে রাজকুমারী কঙ্কাবতী নয়—সে হচ্ছে আমার সেজবৌদিদির সই নয়নতারা।

"কঙ্কাবতী নয়—হাসিতে যার মুক্তা ঝরে, অশ্রুতে যার হীরে গ'লে পড়ে। সে চাঁদের বরণ কন্যের মেঘের বরণ চুল। জেগে উঠতেই যার চোখের দীপ্তিতে সাত মহলে আলো ঠিকরে পড়ে, সাত সখীতে যাকে চামর দোলায়, যার জন্যে সপ্তবীণায় ওঠে সপ্তসুরের মূর্চ্ছনা।

"তার জায়গায় আমার মুখের দিকে চোখ মেলে চাইলে নয়নতারা, যাকে বিনা উগ্র সাধনায়ই আমি প্রত্যহের কাজে-অকাজে রোজই দেখছি। আমাদের বাড়ীর কাছেই বোসপাড়ায় রেলের ধারে তাদের বাড়ী। সামনে পানায় ঢাকা ছোট একটা পুকুর, তাতে একটা বকুলগাছের ছায়ায় রাণাভাঙা সিঁড়ি নেমে গেছে। ঘাটের সামনেই খানিকটা দূর্ব্বাঘাসে ঢাকা জমি.…সেখানে শীতের শেষে বকুলে আর সজনেফুলে কায়ায়-গন্ধে মাখামাখি হয়ে প'ড়ে থাকত। তার পরেই একটা রকের পিছনে নয়নতারাদের বাড়ী—খানিকটা কোঠা, খানিকটা গোলপাতার। মোট কথা, সাগরতলের প্রবাল-মহলের সঙ্গে তার কোনই মিল ছিল না।

"না ছিল স্বয়ং কঙ্কাবতীর সঙ্গে নয়নতারার কোন মিল। প্রথমতঃ, নয়নতারা ছিল কালো—যা কোন রাজকন্যারই কখনও হবার কথা নয়। তবুও যে সে সে-রাত্রে আমার গল্পরাজ্যে অমন বিপর্য্যয় ঘটালে কি ক'রে, তা ভাবতে গেলে আমার মনে প'ড়ে যায় তার দুটি চোখ। অমন চোখ আমি আজ পর্য্যন্ত দেখি নি। তোমরা বোধ হয় স্বীকার করবে ফরসা মেয়ের চেয়ে কালো মেয়ের চোখই বেশী বাহারে হয়—সবুজ আবেষ্টনীর মধ্যে কালো জলের মত। পরে আমি ভাল চোখের লোভে অনেক কালো মেয়ের দিকে চেয়েছি, কিন্তু অমন দুটি চোখ আর দেখি নি। তার বিশেষত্ব ছিল তার অদ্ভুত দীপ্তি ; উগ্র দীপ্তি নয়, তার সঙ্গে সর্ব্বদাই একটা হাসি-হাসি ভাব মিশে থেকে সেটাকে প্রসন্ন ক'রে রাখত। নয়নতারা বেজায় হাসত—বেহায়ার মত। যখন হাসত তখন তার কালো শরীর থেকে যেন আলো ছড়িয়ে পড়তে থাকত ; যখন হাসত না, আমার মনে হ'ত তখনও যেন খানিকটা আলো আর খানিকটা হাসির অবশেষ ওর চোখে লেগে রয়েছে। আমি সে-দুটি চোখ বর্ণনা করতে পারলাম না, তা ভিন্ন শুধু চোখ নিয়ে প'ড়ে থাকলে আমার গল্প শেষ করাও হয়ে উঠবে না। আমি একবার শুধু সে-চোখের তুলনা পেয়েছিলাম,—কতকটা ; মানুষের মধ্যে নয়, পৃথিবীর কোন জিনিষেও নয়। যদি কখন শীতের প্রত্যূষে উঠে চক্রবালরেখার উপরে শুকতারা দেখ তো নয়নতারার চোখের কথা মনে ক'রো ; অর্থাৎ সে অপার্থিব চোখের তুলনা পৃথিবী থেকে অনেক দূরে—স্বর্গের কাছাকাছি।

"রেলের দিকে দেয়াল-দিয়ে-আড়াল-করা পানাপুকুরের ধারের জায়গাটিতে নয়নতারার সমবয়সী মেয়েদের আড্ডা জমত। পুরুষের মধ্যে প্রবেশাধিকার ছিল শুধু আমার, কারণ কয়েকটি কারণে আমি ঠিক সেই ধরণের ছেলে ছিলাম নবপরিণীতাদের যারা খুব কাজে লাগে। প্রথমতঃ,বয়সটা খুব অল্প ; দ্বিতীয়তঃ আমি ছিলাম খুব অল্পভাষী যার জন্যে বাইরে বাইরে আমায় খুব হাঁদা ব'লে বোধ

হ'ত, আর তৃতীয়তঃ আমার পুরুষ-অভিভাবক না থাকায় বাড়ীতে আমার অবসর ছিল সুপ্রচুর এবং ইচ্ছামত পাঠশালার বরাদ্দ থেকেও সময় কেটে অবসর বৃদ্ধি করবার মধ্যেও কোন বাধা ছিল না। ফলে ওরা যে আমায় শুধু দয়া ক'রে কাজে লাগাত এমন নয়; আমি না হ'লে ওদের কাজ অচল হয়ে যেত। সবচেয়ে বেশী এবং গুরুত্বপূর্ণ কাজ ছিল চিঠি নিয়ে; এক কথায় আমি এই সংসারটির ডাক-বিভাগের পূর্ণ চার্জে ছিলাম বলা চলে। খাম-টিকিট নিয়ে আসা, চিঠি ফেলে আসা, এমন কি প্রয়োজন-বিশেষে পোষ্ট আপিসে গিয়ে পিয়নের কাছ থেকে আগেভাগে চিঠি চেয়ে নিয়ে আসাও আমার কাজের সামিল ছিল; আর পাঁচ-সাত জন নবোঢ়ার খাম, টিকিট, চিঠির সংখ্যার আন্দাজ ক'রে নিতে তোমাদের কোন কষ্ট হবে না নিশ্চয়ই। এ ছাড়া বাজার থেকে এটা-ওটা-সেটা এনে দেওয়াও ছিল,—চিঠির কাগজ, কালির বড়ি, মাথার কাঁটা, ফিতে, চিরুণী···আড়ালে ডেকে বলত—'পতি পরমগুরু'—লেখা দেখে চিরুণীটা নিবি শৈল, লক্ষ্মী ভাই···আর এদের সামনে যখন ব'কব—'ও চিরুণী কেন মরতে নিয়ে এলি' ব'লে, তখন চুপ ক'রে থাকবি—থাকবি তো?···দুটো পয়সা নিয়ে ডালপুরী আলুর দম কিনে খেও, যাও···ভাগ্যিস শৈল ছিল আমাদের!"···

"এ ছাড়া সময়ের কাঁচা ফল, এবং সেগুলিকে তরুণীদের কাঁচা রসনার উপযোগী করবার নানা রকম মসলা আহরণ করাও আমার একটা বড় কাজ ছিল।···রাধানাথ, ও রকম নিঃশ্বাস ফেললে যে? হিংসে হচ্ছে?"

রাধানাথ বলিল, "নাঃ, হিংসে কিসের? এই আমিও তো আজ তিন ঘণ্টা ধ'রে গিন্নীর ফর্দ মিলিয়ে মিলিয়ে মাসকাবারি কিনে নিয়ে এলাম—মসলা, তেল, ওষুধ, বার্লি···গল্প চালাও।"

"সেদিন ঠাকুরমার গল্পে নয়নতারা কঙ্কাবতীর জায়গা দখল ক'রে মিলন-বিরহ, হাসি-কান্না, মান-অভিমানে সমস্ত গল্পটির মধ্যে একটা অপরূপ অভিনবত্ব ফুটিয়ে তুললে। রূপকথা আর সত্যের সে অদ্ভুত মিশ্রণ আমার আজ পর্য্যন্ত বেশ মনে আছে। সেদিন অরুণকুমারকে বিদায় দিতে কঙ্কাবতীর চোখে যখন মুক্তা ঝরল তখন আমার সমস্ত অন্তরাত্মা রেলের ধারের সেই বকুলতলাটিতে এসে অসহ্য বেদনা-ব্যাকুলতা নিয়ে ভোরের জন্য প্রতীক্ষা করতে লাগল।

"কিন্তু আশ্চর্য্যের কথা—অবশ্য, এখন আর সেটাকে মোটেই আশ্চর্য্য ব'লে ধরি না—তার পরদিন সকাল গেল, দুপুর গেল, বিকেল গেল, সন্ধ্যা গেল, নয়নতারাদের বাড়ীর দিকে কোনমতেই পা তুলতে পারলাম না। কেমন যেন মনে হ'তে লাগল, কালকের রাত্রের রূপকথাটা আমার চারি দিকে ছড়ান রয়েছে—ওদের সামনে গেলেই সব জানাজানি হয়ে যাবে। এখন লক্ষণ মিলিয়ে বুঝতে পারছি সেটা আর কিছু নয়; নূতন ভালবাসার প্রথম সঙ্কোচ।

"সেজবৌদি বললে—হ্যাঁ শৈলঠাকুরপো', আজ সমস্ত দিন তুমি ও-মুখো হও নি যে? নয়ন তোমায় খুঁজছিল।

"রাত্রি ছিল, আমি লজ্জাটা ঢাকলাম, কিন্তু কথাটা চাপতে পারলাম না, বললাম—যাও, খুঁজছিল না আরও কিছু।

"সেজবৌদি বললেন—ওমা! খুঁজছিল না? আমি মিছে বললাম? তিন-চার বার খোঁজ ক'রেছিল, কাল সকালে যেও একবার।

"বললাম—আমার ব'য়ে গেছে।

"ব'য়ে গেছে ত যেও না, আমায় বলতে বলেছিল, বললাম।—ব'লে বৌদি চলে গেলেন।

"সেদিন ঠাকুরমার ছিল একাদশী, গল্প হ'ল না,—অর্থাৎ তার আগের রাতে যে আগুনটুকু জ্বলেছিল তাতে আর ইন্ধন জোগাল না। পরের দিন অনেকটা সহজভাবে নয়নতারাদের বাড়ী গিয়ে উপস্থিত হলাম। সে তখন মেঝেয় উপুড় হয়ে চিঠি লিখছে। জিজ্ঞাসা করলাম—আমায় ডেকেছিলে নাকি···কাল?

"নয়নতারা মুখ তুলে বাঁ-গালটা কুঞ্চিত ক'রে বললে—যা যাঃ, দায় প'ড়ে গেছে ডাকতে, উনি না হ'লে যেন দিন যাবে না। দুটো চিঠির কাগজ এনে উপকার করবেন, তা···

"ওদের চড়টা-আসটাও মাঝে মাঝে হজম করতে হয়েছে, কিন্তু সেদিন এই কথা দুটোতেই এমন রূঢ় আঘাত দিলে যে মনের দারুণ অভিমানে বই-শ্লেট নিয়ে সেদিন পাঠশালায় চলে গেলাম,—মনে বৈরাগ্য উদয় হ'ল আর কি—জানই ত পাঠশালাটা হচ্ছে ছেলেবেলার বানপ্রস্থভূমি। সেখানে আগের দিন-চারেক অনুপস্থিত থাকবার জন্যে এবং সেদিনও দেরি হবার জন্যে বেশ একচোট উত্তম-মধ্যম হ'ল।

"এর ফলে বাল্য-মোহের কচি শিখাটি প্রায় নির্ব্বাপিত হয়েই এসেছিল, কিন্তু পাঠশালা থেকে ফেরবার পথে যখন রেল পেরিয়েছি, পুকুরের এপারে চালচিত্রের বেড়ার কাছে দাঁড়িয়ে নয়নতারা ডাকলে। আমি প্রথমটা গোঁজ হয়ে দাঁড়িয়ে রইলাম, তার পর নয়নতারা আর একবার ডাকতেই আগেকার দু-দিনের কথা, সকালের কথা, এবং পাঠশালের কথা একসঙ্গে সব মনে হুড়োহুড়ি ক'রে এসে কি ক'রে জানি না, আমার চোখ দুটো জলে ভরিয়ে দিলে। নয়নতারা বেরিয়ে এসে আমার হাতদুটো ধ'রে আশ্চর্য্য হয়ে বললে—ওমা, তুই কাঁদছিস শৈল? কেন রে, আয়, চল।

"বাড়ী নিয়ে গিয়ে খুব আদর-যত্ন করলে সেদিন। দুটো নারকেল-নাড়ু আঁচলের মধ্যে লুকিয়ে নিয়ে এসে বললে—তোর জন্যে চুরি ক'রে রেখেছিলাম শৈল, খা। তোকে সত্যি বড় ভালবাসি শৈল, তুই বিশ্বাস করবি নি। তোকে রাগের মাথায় তাড়িয়ে দিয়ে মনটা এমন হুহু করছিল!···মুয়ে আগুন নস্তের, অত খোসামোদ করিয়ে, একটা নাটাইয়ের দাম আদায় ক'রে, যদিবা কালকে চিঠির কাগজ দিলে এনে, আজ কোন মতেই চিঠিটা ফেলে দিলে না রে! গ'লে যাক অমন দুষমন গতর—বেইমানের।

"এদিক-ওদিক একটু চেয়ে শেমিজের মধ্যে থেকে একটা গোলাপী খাম বের ক'রে মিনতির সুরে বললে—সত্যি তোকে বড্ড ভালবাসি শৈল—বললে না পেত্যয় যাবি। এই চিঠিটা ভাই—বইয়ের মধ্যে লুকিয়ে নে। আর, একটু ঘুরে গিয়ে পোষ্টাপিসে ফেলে দিয়ে বাড়ী যেও; রোদটা একটু কড়া, কষ্ট হবে? হ্যাঁ, শৈলর আবার এ-কষ্ট কষ্ট! নস্তে কিনা এগারটা বেজে গেছে, বারটার সময় ডাক বেরিয়ে যাবে শৈল, লক্ষ্মীটি...

"আমি এখনও স্পষ্ট দেখতে পাচ্ছি,—পুকুরধারে, শানের বেঞ্চের পিছনে, বকুলগাছের আড়ালে আমার কাঁধে বাঁ-হাতটা দিয়ে নয়নতারা দাঁড়িয়ে আছে, আমার মুখের উপর ডাগর ভাসা-ভাসা চোখ দুটি নীচু ক'রে,—তাতে চিঠির গোপনতার একটু লজ্জা, খোশামোদের ধূর্ত্তামি, বোধ হয় একটু অনুতপ্ত স্নেহ, আর একটা কি জিনিষ—একটা অনির্ব্বচনীয় কি জিনিষ যা শুধু নবপরিণীতাদের চোখেই দেখেছি, আর যা এই রকম চিঠি-লেখা, চিঠি-পাওয়ার সময় যেন আরও বেশী ক'রে ফুটে ওঠে।

"এইখানে আমার ভালবাসার ইতিহাসের প্রথম অধ্যায় শেষ হ'ল, এই ফিরে যেতে যেতে আবার ঘুরে আসায়।···তোমাদের ঐ বয়সের মেয়েদের মজলিসের কোন অভিজ্ঞতা আছে?"

তারাপদ বলিল, "না।"

রাধানাথ বলিল, "কি ক'রে থাকবে বল? গার্জ্জেনের কণ্টকারণ্যে মানুষ হয়েছি। চক্ষু সর্ব্বদা বইয়ের অক্ষরলগ্ন থাকত, অক্ষরের রূপে যে মুগ্ধ ছিলাম তা নয়,—বই থেকে চোখ তুললেই বাবা কিংবা পাঁচ কাকার কেউ-না-কেউ চোখে পড়তেন। ছুটিছাটায় যদি দুই-এক জন বাইরে গেলেন তো সেই ছুটির সুযোগে মামা পিসেমশাইদের দল এসে আমার ভবিষ্যতের জন্য সতর্ক হয়ে উঠতেন। তাঁরা ছিলেন উভয়-পক্ষ মিলিয়ে সাত জন। শেষবারে এই তের জনে মাথা একত্র ক'রে বিয়ে দিলেন একটি নিষ্কণ্টক মেয়ের সঙ্গে, যার বাপের সম্পত্তিতে ভাগ বসাবার জন্যে না ছিল বোন, না-ছিল একটা ভাই যে একটি শালাজেরও সম্ভাবনা থাকবে।··· নাও, ব'লে যাও, আবার মজলিস! এত কড়াকড়ির মধ্যে যে একটি মেয়ে কোন রকমে ঢুকে পড়েছে এই ঢের।"

তারাপদ বলিল, "রাধানাথ চটেছে,—তা চটবার কথা বইকি···"

শৈলেন বলিল, "নয়নতারাদের মজলিসের কথা বলতে যাচ্ছিলাম। আগে বোধ হয় এক জায়গায় বলেছি যে এ-মজলিসে আমার মুক্তগতি ছিল। ছিল বটে, কিন্তু এর পূর্ব্বে আমি আমার ছাড়পত্রের পূর্ণ সদ্ব্যবহার করতাম না। তার কারণ ওদের কথা সব সময় ঠিকমত বুঝতামও না আর বুঝলেও সব সময় রস পেতাম না। আমার নিজেরও বয়স-সুলভ নেশা ছিল,—মাছ ধরা, ষ্টেশনের পাথার দিকে চেয়ে ট্রেনের প্রতীক্ষা করা, এবং ট্রেনের ধোঁয়া দেখা দিলে লাইনে পাথর সাজিয়ে রাখা, ঘুড়ি ওড়ান, এই সব। কিন্তু এবার থেকে আমার মস্ত একটা পরিবর্ত্তন দেখা দিল,—মাছ, ঘুড়ি, ট্রেনের প্রতি পক্ষপাতিত্ব গিয়ে সমস্ত মনটি নয়নতারাদের মজলিসে, নয়নতারার,—বিশেষ ক'রে নয়নতারার আশ্চর্য্য চোখ দু'টিতে কেন্দ্রীভূত হয়ে উঠল। সে যখন তাস খেলত আমি তার সামনে কারুর পাশে একটু জায়গা ক'রে নিয়ে ব'সে থাকতাম। নয়নতারা তাস দিচ্ছে, পিঠ ওঠাচ্ছে; তার চুড়িগুলি গড়িয়ে একবার মণিবন্ধের নীচে, একবার কনুইয়ের কাছে জড়াজড়ি ক'রে পড়ছে। কখন সে তার আনত চোখের ওপর ভ্রূ দুটি চেপে চিন্তিতভাবে মাথা দোলাচ্ছে, তার কপালের কাঁচপোকার ময়ূরকণ্ঠী রঙের টিপটি ঝিক্‌ঝিক্ ক'রে উঠছে, আমি ঠায় ব'সে ব'সে দেখতাম। তখন ছিল কাঁচপোকার টিপের যুগ, এখন বেচারি আর সুন্দর কপালে ঠাঁই পায় না, তার নিজেরই কপাল ভেঙেছে। ···আমি প্রতীক্ষা করতাম—জিতলে কখন্ নয়নতারার পান-খাওয়া ঠোঁটে হাসি ফুটবে; হারলে সে যে আমার কাছের মেয়েটিকে চোখ রাঙিয়ে কটুমন্দ বলবে সে-দৃশ্যও আমার কাছে কম লোভনীয় ছিল না। একটা কথা আমি স্বীকার করছি,—আজ যে-ভাবে বয়সের দূরত্ব থেকে নয়নতারাকে দেখছি, সে-সব দিন যে ঠিক সেই ভাবেই দেখতাম তা নয়। তখন তার সমস্ত কথাবার্ত্তা, চালচলন, হাসি-রাগ আমার কাছে এক মস্তবড় বিস্ময়কর ব্যাপার ব'লে বোধ হ'ত,—যে বিস্ময়ে মনের উপর একটা সম্মোহন বিস্তার ক'রে মনকে টানে। এ-দিক দিয়ে দেখতে গেলে মনোবিজ্ঞানের নিক্তির তৌলমত আমার মনোভাবটাকে ভালবাসা না ব'লে ভাল-লাগা বলাই উচিত ছিল। আমি ভালবাসা ব'লে যে শুরু করেছি তার কারণ এর মধ্যে ঐ মনস্তত্ত্বেরই পরথ-মত কিছু কিছু জটিলতা ছিল, সে-কথা পরে যথাস্থানে বলব।

"সেদিন তাসের মজলিস ছিল না, একটা বই পড়া

হচ্ছিল। বইটা যে ভাগবত কিংবা মনুসংহিতা নয় এ-কথা বোধ হয় তোমাদের ব'লে দিতে হবে না। আমি যে বসেছিলাম এটা ওরা গ্রাহ্যের মধ্যে আনে নি, তার প্রধান কারণ ওরা নিজেদের খেয়ালে সেদিন খুব বেশী রকম মশগুল ছিল, আর দ্বিতীয় কারণ—আগে বোধ হয় বলেছি—ওরা সাধারণতঃ আমায় এ-সব বিষয়ে জড়পদার্থের সামিল বলেই ধ'রে নিত। সেদিন আবার আমি একেবারেই জড়পদার্থ হ'য়ে গিয়েছিলাম, কেননা, নয়নতারাকে সেদিন যেন আরও অপরূপ দেখাচ্ছিল। আমি বোধ হয় বইটাও শুনছিলাম না, সেই জন্যে, তার বটতলা-মার্কা চেহারা মিলিয়ে মোটামুটি তোমাদের কাছে তার কুলশীলটা জানাতে পারলাম, তার নাম-ধামটা দিতে পারলাম না।

"এর মধ্যে একটি মেয়ে—নামটা বোধ হয় তার সুধা কি এই রকম কিছু, ঠিক মনে পড়ছে না—আমার দিকে চেয়ে বললে—শৈল, ভাই, যা না, আমার সেই কাজটা···দেরি হয়ে যাচ্ছে···

"অপর এক জন জিজ্ঞাসা করলে—কি কাজ রে?

"সুধা বললে—কিছু না।

"সেই মেয়েটা ঠোঁট উল্টে ভ্রূ নাচিয়ে বললে—ওরে ব্বাবা! 'শুধু আমি জানি আর আমার মন জানে!' জিগ্যেস ক'রে অপরাধ হয়েছে, মাফ চাইছি।

"তার রাগটা পড়ল আমার উপর। নাকটা কুঞ্চিত ক'রে বললে—তা তুই এখানে কচ্ছিস কি রে? আরে গেল! তুই কি বুঝিস এসব?

"অন্য এক জন বললে—তোর পাঠশালা নেই?

"কে উত্তর দিলে—পাঠশালে তো গুরুমশাই এসব কথা বলবে না, বলে তো দু-বেলা ছেড়ে তিন বেলা গিয়ে সেখানে ধন্না দেয়। ও মিন্‌মিনেকে চিনিস্ না তোরা।

"কথাটার জন্যেও এবং আমার মুখের ভ্যাবাচ্যাকা ভাবটার জন্যেও ওদের মধ্যে একটা হাসি প'ড়ে গেল।

"এক জন বললে—ওর আর দোষ কি? ওদের জাতটাই হ্যাংলা; কি রকম ক'রে চেয়ে রয়েছে দেখ না। যেন পায় তো সবগুলোকে এক এক গেরাসে গিলে খায়।

"আবার একচোট হাসি। তারই মধ্যে বললে—কাকে আগে ধরবি রে?

"আবার হাসি, আরও জোরে; সব ঢুলে ঢুলে গড়িয়ে পড়তে লাগল, ঝড়ে ঘনসন্নিবিষ্ট গাছগুলো যেমন এলোমেলো ভাবে পরস্পরের গায়ে লুটোপুটি খায়।

"হাসিতে যোগ দিলে না শুধু খন্নু। সে গম্ভীরভাবে বললে—আগে ধরবে নয়নকে; সেই থেকে ঠায় ওর মুখের দিকে কি ভাবে যে চেয়ে আছে! কি বয়াটে ছেলে গো মা! নয়ন আবার দেখেও দেখে না।

"এখন বুঝতে পারছি, তাকে ফেলে নয়নতারাকে দেখবার জন্যেই তার এত আক্রোশ। খন্নুর আসল নাম ছিল ক্ষণপ্রভা। সে ছিল খুব ফরসা, সুতরাং সুন্দরী। এই রঙে-নামে তার চরিত্রের মধ্যে ঈর্ষার ভাবটা প্রবল ক'রে তুলেছিল।

"নয়নতারা যেন একটু অপ্রতিভ হয়ে গেল; কিন্তু তখনই সে-ভাবটা সামলে নিয়ে বললে—দেখতে হয়ত তোকেই দেখবে, আমার মত কাল কুচ্ছিৎকে দেখতে যাবে কেন!

খন্নু বললে—আমায় দেখলে ঠাস্ ঠাস্ ক'রে ছোঁড়ার দু-গালে চার চড় কষিয়ে দিতাম—নগদ দক্ষিণে।

"নয়নতারা ততক্ষণে সপ্রতিভ ভাবটা বেশ ফিরিয়ে এনেছে। চকিতে ভ্রূ নামিয়ে বললে—পেট ভরে খাওয়ার পরেই দক্ষিণে হয়, আমায় দেখলে পেটও ভরবে না, দক্ষিণেও নেই।

"এটা প্রশংসা ছিল না, ঠাট্টা; কেন-না, রঙেই সুন্দরী হয় না। হাজার গুমর থাকা সত্ত্বেও খন্নুর যে এটা না-জানা ছিল এমন নয়। সে মুখটা ভার ক'রে রইল।

"তুলনায় নয়নতারাই সবচেয়ে সুন্দরী ব'লে—বিশেষ ক'রে কালো হয়েও সুন্দরী ব'লে—খন্নুর দলেও কয়েক জন মেয়ে ছিল। তার মধ্যে সুধা এক জন। সে অবজ্ঞাভরে ঘাড়টা একটু বেঁকিয়ে বললে—ঠাট্টা কর্ নয়ন; কিন্তু খন্নুর মত হ'তে পারলে বর্তে যেতিস—আমি হক্ কথা বলব।

"নয়নতারা গাম্ভীর্য্য মুখভার একেবারেই সহ্য করতে পারত না। গুমটটা কাটিয়ে মজলিসটায় হাসি ফোটাবার জন্যে মুখটা কপট-গম্ভীর ক'রে বললে—ওমা সে আর যেতাম না! সঙ্গে সঙ্গে খন্নুর দিকে হেলে প'ড়ে বললে—আয় তো খন্নু একটু গায়ে গা ঘষে নি।

"ফল কিন্তু উল্টো হ'ল। 'হয়েছে' ব'লে খন্নু হঠাৎ দাঁড়িয়ে উঠে মজলিস ছেড়ে চলে গেল। খানিকটা চুপচাপ গেল, তার পর নয়নতারা হঠাৎ রেগে উঠে আমার দিকে চেয়ে বললে—ফের যদি তুই কাল থেকে এখানে এসেছিস্ ত তোর আর কিছু বাকী রাখব না। তুই মেয়েদের মুখের দিকে হাঁ ক'রে কি দেখিস্ রে?...গলা টিপলে দুধ বেরয়···

"সবার হাসিঠাট্টা, ধমকানির মধ্যে আমার অবস্থা সঙ্গীন হয়ে উঠেছিল, কাঁদ-কাঁদ হয়ে বললাম—আমি কক্ষণও দেখি না।

"নয়নতারা বললে—দেখিস্; নিশ্চয় দেখিস্, তোর কোন গুণে ঘাট নেই। না যদি দেখিস্ ত এই যে খন্নী এক ডাঁই মিথ্যে ব'লে গেল, বোবার মত চুপ ক'রে গেলি কেন?

"সুধা শরীর দুলিয়ে দুলিয়ে উঠে প'ড়ে বললে—খন্নু মিথ্যে

বলে নি; দেখে ও ড্যাবড়া-ড্যাবড়া চোখ বের ক'রে। পাঁচ বছরেরই হোক আর পঞ্চাশ বছরেরই হোক—বেটা-ছেলেই ত? আমাদের চোখে কেমন লাগে তাই বলি; থাকলেই বলতে হয়, তার চেয়ে না থাকাই ভাল বাবা।

"সেদিন আড্ডা আর জমল না। কয়েক জন খন্দুর সঙ্গে মতৈক্যের জন্যে গেল; বাকী কয়েক জন কথাটা নিয়ে খানিকটা নাড়াচাড়া করলে, তার পর আকাশে মেঘের অবস্থা দেখে একে একে উঠে যেতে লাগল। আমার অবস্থা হয়ে পড়েছিল ন যযৌ ন তস্থৌ; আমাদের পাড়ার ননী উঠতে আমি কোন রকমে দাঁড়িয়ে উঠলাম।

"ননী মেয়েটি ছিল অত্যন্ত চাপা। সে যে কোন্ দিন কোন্ দলে, টপ্ ক'রে বোঝবার উপায় ছিল না। বোঝা যেত একেবারে শেষের দিকে, যখন সে নিজের নির্ব্বিকারত্ব পরিহার ক'রে তার অভীপ্সিত দলের একেবারে শেষ এবং মোক্ষম কথাটি ব'লে উঠে যেত। আমি উঠতেই বিস্মিতভাবে জিজ্ঞাসা করলে—তুইও যাচ্ছিস নাকি?

"বললাম—হুঁ।

"তা হ'লে দয়া ক'রে এগিয়ে যাও; ভাব ক'রে সঙ্গে গিয়ে কাজ নেই—আমি তোমার ভাবের লোক নই।·· না-হয়, তুই পরেই আসিস্'খন; দিব্যি দু-চোখ ভ'রে দেখ না ব'সে ব'সে, আর ত কেউ বলবার রইল না—ব'লে চাবির খোলো-বাঁধা আঁচলটা ঝনাৎ ক'রে পিঠে ফেলে হন্ হন্ ক'রে চলে গেল।

"আমি খানিকটা জড়ভরতের মত দাঁড়িয়ে রইলাম। ননী বেশ খানিকটা চলে গেলে শচী বললে—মুয়ে আগুন, গোমড়ামুখী!

"শচীও চলে গেল। বৃষ্টি তখন থামো-থামো হয়েছে। আমি পা বাড়াচ্ছি, নয়নতারা বললে—ভিজে যাবি শৈল, একটু থেমে যা; চল্, বাড়ীর ভেতর।

"সেদিনটি আমার স্পষ্ট মনে আছে, আশা করি কখনও অস্পষ্ট হবে না। তখনও ভাল ক'রে বিকেল হয় নি, কিন্তু আকাশে গাঢ় মেঘের জন্যে মনে হচ্ছিল যেন সন্ধ্যার আর দেরি নেই। মজলিস যখন ভাঙল সে সময় রেলের ওপারে বনের আড়াল থেকে একটা আরও কালো মেঘের ঢেউ যেন মেঘলা আকাশটায় ভেঙে পড়ল, মনে হ'ল দিনটাকে অতি শীঘ্র রাত ক'রে তোলবার জন্যে কোথায় যেন মস্ত বড় তাড়াহুড়ো প'ড়ে গেছে। একটু পরেই ঠাণ্ডা হাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বৃষ্টি নামল।

"রেলের দিকে নয়নতারাদের দুটো ঘর, একটা বড়, একটা অপেক্ষাকৃত ছোট। নয়নতারা একটু এদিক-ওদিক ক'রে এসে রেলের দিকে জানলাটির চৌকাঠের পাশে বসল। আমায় বললে—তুই এইখানটায় বোস্ শৈল, ভাগ্যিস যাস্ নি, না?

"বললাম—হ্যাঁ, ভিজে যেতাম।

"জানলাটা দিয়ে অল্প অল্প বৃষ্টির ছাট আসছিল, নয়নতারা হঠাৎ গুটিসুটি মেরে একটু হেসে বললে—একটু একটু বৃষ্টি এসে গায়ে লাগলে কিন্তু বেশ লাগে, তোর ভাল লাগে না শৈল?

"বললাম—না, ভিজে যেতে হয়।"

রাধানাথ বলিল, "তখন তাহ'লে তোমার মাথায় একটু সুবুদ্ধি ছিল বলতে হবে, এখন দেখছি···"

শৈলেন বলিল, "ভুল বলছ, তখন বৃষ্টিতে ভেজা বরং একটা রীতিমত উৎসব ছিল আমার পক্ষে, কিন্তু সে-সময় যা বললাম তা শুধু নয়নতারার কথা ভেবে,—তার ভেজা দেখে আমার কষ্ট হচ্ছিল।"

তারাপদ বলিল, "এত দূর?"

শৈলেন বলিয়া চলিল—"নয়নতারা ব'সে ব'সে অনেকক্ষণ ধ'রে বৃষ্টি দেখতে লাগল।···তার মুখের আধখানা দেখতে পাচ্ছি,—কি রকম অন্যমনস্ক হয়ে মুখটা একটু উঁচু ক'রে ব'সে আছে, মুখটাতে একটা ছায়া পড়েছে, বৃষ্টির ছাটের ছোট ছোট গুঁড়ি মুখের এখানে-সেখানে, চোখের কোঁকড়ান পাতার ডগায়, কপালের চুলে চিকচিক করছে। হঠাৎ কি ভেবে বললে—চার দিক মেঘে ঢেকে গেলে মনে হয় সব্বাই—যে যেখানে আছে—সব যেন এক জায়গায় রয়েছি, না রে শৈল?

"এখন মানে বুঝি, তখন একবারেই বুঝি নি; তবুও এত তন্ময় আর অন্যমনস্ক ছিলাম যে কিছু না ভেবেই ব'লে দিলাম—হ্যাঁ।

"নয়নতারা বোধ হয় নিজের ঘোরে বলেছিল কথাটা, কোন উত্তরের অপেক্ষায় বা আশায় নয়। আমার দিকে একটু চেয়ে রইল। আরও খানিকক্ষণ চুপচাপের পর হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিল—মেঘ তোর কেমন লাগে শৈল?

"সামান্য যেন একটু কুণ্ঠা, তার পরেই বললে—মেঘ কালো কিনা, তাই জিজ্ঞেস করছি, বিদ্যুৎ বরং ঢের সুন্দর···

"আমি উত্তর দিলাম—বেশ লাগে মেঘ।

"ঠিক মনে পড়ছে না, তবুও যেন বোধ হচ্ছে নয়নতারার চোখের তারা একটুখানির জন্যে কি রকম হয়ে গেল। হ'তে পারে এটা আমার আজকের সজাগ মনের ভুল বা অপসৃষ্টি, কিন্তু এই রকম বর্ষা পড়লেই সেদিনকার সেই ছবিটি যখন ফুটে ওঠে, দেখি নয়নতারার চোখ দুটি যেন একটু নরম হয়ে উঠল।

"একটু পরে আবার বললে—ক্ষণপ্রভা মানে বিদ্যুৎ—ঐ যে খেলে গেল···খনীর নাম···

"আমি সরস্বতী দেবীর অতটা বিরাগভাজন হ'লেও কি ক'রে জানি না—এই অসাধারণ কথাটার মানে অবগত ছিলাম। সেইটিই পরম উৎসাহে বলতে যাব এমন সময় নয়নতারা হঠাৎ জানলা থেকে নেমে এসে আমার সামনে ব'সে পড়ল, এবং আমার মুখের পানে কি এক রকম ভাবে চেয়ে ব'লে উঠল—তুই আমায় অত ক'রে দেখিস কেন রে শৈল? আমি তো কালো!...

"এখন আমিও বুঝছি, তোমরাও বুঝছ আসল ব্যাপারটা কি—অর্থাৎ নয়নতারাকে সেদিন বর্ষায় পেয়েছিল, নবোঢ়ার মন পাড়ি দিয়েছিল তার দয়িতের কাছে;—আকাশে ওদিকে বর্ষা, সে এদিকে মনে মনে শৃঙ্গার করছে, তার পরে আমার চোখের মুকুরে নিজের রূপটি দেখে নিয়ে সে যাবে,—সে কালো, তাই তার অপূর্ণতার ব্যথা, শশুর সঙ্গে তুলনা।

"সেদিন আমি এ-কথাটা বুঝি নি, বোঝবার সম্ভাবনাও ছিল না। সেদিন এই বুঝলাম যে আমার জন্যেই নয়নতারা এ প্রশ্নটা করছে, সে বলছে—তোমার যদি ভাল লাগে তাহ'লেই আমার রূপের আর জীবনের সার্থকতা—আমার সমস্ত জীবন-মরণ নির্ভর করছে তোমার একটি ছোট উত্তরের উপর।...

"আমি তখন যা ভেবেছিলাম তা গুছিয়ে বলতে গেলে এই দাঁড়ায় যে সেদিন নয়নতারা আমায় আমার বয়সের গণ্ডী থেকে তুলে নিয়ে আমায় পৌরুষের জয়টীকা পরিয়ে দিলে, আমার হ'ল প্রেমের অভিষেক।

"প্রবল কুণ্ঠায় এবং কেমন একটা সশঙ্ক আনন্দে আমি মুখটা নামিয়ে নিলাম, উত্তর দিতে পারলাম না। উত্তর দিলে কথাটা তখনই পরিষ্কার হয়ে যেত, কেন-না, নয়নতারা সেদিনকার নিভৃতে যেমন নিঃসঙ্কোচে আরম্ভ করেছিল তাতে সে ঘুরিয়ে ফিরিয়ে তার বরের কথা এনে ফেলত। যদি বলতাম—তবুও—অর্থাৎ কালো হ'লেও তুমি খুব সুন্দর—সে হয়ত বলত—তোর কথার সঙ্গে 'ওর' কথা মিলে গেছে, শৈল,—মেলে কি না তাই দেখবার জন্যে জিজ্ঞেস করছিলাম।—কিংবা এই রকম কিছু, কেন-না এই ধরণেরই একটা কথা তার মনে ঠেলে উঠছিল।

"ফলে, সত্যের আলোয় যে ধারণাটা তখনই নিরর্থক হয়ে যেতে পারত, মিথ্যার, অর্থাৎ ভ্রান্তির অন্ধকারে সেটা আমার জীবনে একটা অপূর্ব্ব সার্থকতা লাভ করলে। আমার ভালবাসার তন্তু এত দিন শূন্যে দুলছিল, আশ্রয়-শাখা এগিয়ে এসে তাকে স্পর্শ করলে। বোধ হয় এত দিন আমার শুধু ভাল লাগছিল মাত্র, সেদিন থেকে আমি নিঃসন্দেহ ভালবাসলাম, আমার ভালবাসবার ইতিহাসে দ্বিতীয় স্তর আরম্ভ হ'ল।"

তারাপদ বলিল, "তোমার গল্পটা মন্দ লাগছে না, তবে জিনিষটাকে ভালবাসা বলায় স্পর্দ্ধার গন্ধ আছে, যদিও এ ভ্রান্তির জন্য আমরা তোমায় ক্ষমা করতে রাজী আছি, কেন-না ভ্রান্তিই কবির ধর্ম্ম।"

রাধানাথ বলিল, "কেন-না, কবি বিধাতার ভ্রান্তিই।

শৈলেন বলিল, "না, সেটা ভালবাসাই, কেন-না এবার থেকে যা লক্ষণ সব প্রকাশ পেতে লাগল তা ভালবাসার একেবারে নিজস্ব জিনিষ—ট্রেড-মার্কা দেওয়া। একটি গুরুতর লক্ষণ দাঁড়াল—ঈর্ষা।"

"হ্যাঁ, তার আগে সেদিনকার কথাটা শেষ ক'রে দিই। উত্তর না পেয়ে নয়নতারা আমার মুখটা দুটো আঙুল দিয়ে তুলে ধ'রে বললে—তোর বুঝি আবার লজ্জা হ'ল?

"বোধ হয় তার প্রশ্নের জটিলতাটা উপলব্ধি করলে এতক্ষণে। একটু কি ভাবলে, তার পর আমার হাতটা ধ'রে একটু গলা নামিয়ে বললে—আমি তোকে ও-কথাটা জিগ্যেস করেছি, কাউকে বলিস্ নি যেন শৈল, বলবি না তো? বোস্, আমি আসছি—ব'লে চলে গেল; অবশ্য আর এল না সেদিন।"

শৈলেন একটু চুপ করিল। রাধানাথ বলিল, "বৃষ্টি তোমার কবিত্বের গোড়ায় জল জোগাচ্ছে বটে শৈলেন, কিন্তু ওদিকে তারাপদর কার্পেটটা ভিজিয়ে তার সমূহ অপকার করছে, আতিথেয়তায় ত্রুটি হয় ব'লে বোধ হয় ও-বেচারা..."

তারাপদ তাড়াতাড়ি প্রতিবাদ করিতে যাইতেছিল, শৈলেন বলিল, "দাও বন্ধ ক'রে।"

বন্ধ জানালার উপর ধারাপাতের জন্য মনে হইল বৃষ্টিটা যেন হঠাৎ বাড়িয়া গেল। শৈলেন চোখ বুজিল, যেন কোথায় তলাইয়া গিয়াছে। তারাপদ আর

রাধানাথ বুঝিল সেদিন নয়নতারাকে যেমন বর্ষায় পাইয়াছিল আজ ঠিক সেই ভাবে পাইয়াছে শৈলেনকে। শৈলেনের গল্প আর বাহিরের বর্ষা বোধ হয় তাহাদের ভিতরের গদ্যাংশও কিছু কিছু তরল করিয়া আনিয়াছিল, তাহারা শৈলেনের মৌনতায় আর বাধা দিল না।

একটু পরে যেন একটা অতল তরলতা হইতে ভাসিয়া উঠিয়া শৈলেন বলিল, "হ্যাঁ, কি বলছিলাম? ঠিক, ঈর্ষার কথা। যখন আমার ভাল-লাগার খাদ মরে গিয়ে সেটা ভালবাসায় দাঁড়াল, সেই বরাবর থেকে একটি নির্দ্দোষ, নিরীহ লোক আমার শত্রু হ'য়ে দাঁড়াল,—সাক্ষাৎ ভাবে আমার কাছে কোন অপরাধ না ক'রেও। এই লোকটি নয়নতারার স্বামী অক্ষয়।

"অক্ষয়ের পরোক্ষ অপরাধ এই যে সে নয়নতারাকে বিবাহ করেছে। ঘটনাটি প্রায় এক বৎসরের পুরনো, কিন্তু এত দিন এতে ক্ষতিবৃদ্ধি ছিল না, কেন-না, অক্ষয় এত দিন একটি নির্বিঘ্ন নেপথ্যে অবস্থান করছিল। বর্ষায় সেদিন নয়নতারার যে নূতনতর আলো ফুটে উঠল সেই আলোতে হঠাৎ অক্ষয় দুর্নিরীক্ষ্য ভাবে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। অনেক কথা, যা কখনও ভাবিও নি, তা শুধু ভাবনার নয়, একেবারে দুর্ভাবনার বিষয় হয়ে উঠল। নয়নতারা আমায় খুবই ভালবাসে—আমার জন্যে নারকেল-নাড়ু চুরি ক'রে রাখে, ছেঁড়া কাপড়ের রুমাল তৈরি ক'রে তাতে রেশমের ফুল তুলে দেয়, ঘুড়ির, ডালপুরির পয়সা জোগায়, গুরুমশাইয়ের বেতের দাগ পড়লে আমার পিঠে হাত বুলিয়ে রুচিকর ভাষায় গুরুমশাইয়ের আদ্যশ্রাদ্ধের ব্যবস্থা করেছে—জীবনের অমূল্য সম্পদ এসব; কিন্তু তার সামান্য একটি চিঠি পাবার কি পাঠাবার আগ্রহ আজ হঠাৎ এসবকে যেন নিষ্প্রভ, অকিঞ্চিৎকর ক'রে দিলে। সে আগ্রহটা আমার প্রতি তার সাক্ষাৎ আচরণের কাছে সামান্যই একটা ব্যাপার—কে পৃথিবীর কোন্ এক কোণে প'ড়ে আছে, তার সঙ্গে দুটো অক্ষরের সম্বন্ধ, কিন্তু এটাও আমার অসহ্য হয়ে উঠতে লাগল। ষোল আনার মধ্যে সাড়ে পনর আনা আমিই পাচ্ছি, কিন্তু ওদিকে যে ঐ দুটো পয়সা যাচ্ছে ওটুকু বরদাস্ত করা—যতই দিন যেতে লাগল—ততই আমার পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠতে লাগল।

"ঠিক এই সময় একটি ব্যাপার ঘটল যা অবস্থাটিকে ঘনীভূত ক'রে তুললে।

"একদিন সুধার একটা খুব জরুরি চিঠি ডাকে দিতে যাচ্ছি। ষ্টেশনটা ছাড়িয়েছি, এমন সময় ষ্টেশনের গেট দিয়ে অক্ষয় বেরিয়ে এল। সেই ট্রেনে নেমেছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখ শুকনো। আমায় দেখেই থমকে দাঁড়িয়ে বললে—এই যে শৈলেনভায়া!—মানে—ইয়ে—এরা সব কেমন আছে বলতে পার?

"তখন 'এরা'-র মানে আমি বুঝি, না বুঝাই অস্বাভাবিক, বললাম—ভাল আছে।

"অক্ষয়ের মুখটা যেন অনেকটা পরিষ্কার হ'ল। আমার হাতটা ধ'রে জিজ্ঞাসা করলে—পথ্যি পেয়েছে?—কবে পেলে?—অ্যাঁ?

"আমি বিস্মিত হয়ে চুপ ক'রে রইলাম, তার পর বললাম—কই, তার তো অসুখই করে নি!

"—অসুখ করে নি! তবে?—ব'লে অক্ষয়ও খানিকটা আশ্চর্য্য হয়ে আমার মুখের দিকে চাইলে, আস্তে আস্তে চোখ ঘুরিয়ে কি ভাবলে, তার পর তার মুখটা হাসিতে উজ্জ্বল হয়ে উঠল। বললে, দেখ কাণ্ড! আচ্ছা তো!... তুমি বুঝি চিঠি ফেলতে যাচ্ছ?—কোন্ দময়ন্তীর?

"নয়নতারাকে লেখা পত্রে অক্ষয় আমার সম্বন্ধে প্রায়ই উল্লেখ করত—'হংসদূত' ব'লে, তা নিয়ে চিঠি পড়বার সময় চর্চা হ'ত। সুতরাং দময়ন্তী কথাটার অর্থ বুঝতে আমার অসুবিধে হ'ল না। বললাম—সুধাদিদির।

"ঐ তো লেটার-বক্স,—যাও ফেলে দিয়ে এস। এক সঙ্গে যাওয়া যাবেখ'ন।

"ভালবাসা যখন জমে আসছে, তার মধ্যে অক্ষয়ের এসে পড়াটা আমার মোটেই প্রীতিকর হয় নি। কিন্তু ফিরে আসতে আসতে যখন শুনলাম নয়নতারার এই মিথ্যাচরণের জন্যে তাকে কি নাকালটা ভোগ করেই চ'লে আসতে হয়েছে তখন আমার মনটা খুবই খুশী হয়ে উঠল। বেচারা আপিস থেকে বাড়ীও যেতে পারে নি; যখন ষ্টেশনে, তখন ফার্ষ্ট বেল হয়ে গেছে, ছুটতে ছুটতে শানবাঁধান প্লাটফর্ম্মে পিছ্‌লে প'ড়ে গিয়ে হাঁটুটা গেছে কেটে, হাতটা গেছে ছ'ড়ে; কাপড়ে রক্তের দাগ দেখিয়ে বললে—এই দেখ কাণ্ডটা।

"এটার আকস্মিকতাটা আমি আর ধরলাম না; আমার মনে হ'ল দারুণ দুর্ভাবনায় ফেলা থেকে নিয়ে প্লাটফর্মে আছাড়-খাওয়ান পর্য্যন্ত সমস্তই নয়নতারার কীর্ত্তি,—সৎ কীর্ত্তি। আমার মনটা নয়নতারার উপর প্রসন্নতায় ভ'রে উঠল এবং অক্ষয়কে চিঠি লেখবার জন্যে, আর তার চিঠির প্রতীক্ষা করবার জন্যে যে মনে মনে একটা অভিমান এবং আক্রোশের ভাব ঠেলে উঠছিল সেটা একেবারে কেটে গেল। বুঝলাম—এত যে চিঠি তার মধ্যে এই নিতান্ত অবাঞ্ছনীয় জীবটিকে প্লাটফর্মে আছাড় খাওয়াবার একটা গূঢ় অভিসন্ধি জমে উঠছিল। অক্ষয়ের প্রতি আমার মনের ভাবের সঙ্গে নয়নতারার মনের ভাবের এ-রকম আশ্চর্য্য মিল দেখে তার সঙ্গে বেশ একটা নিবিড়তর ঘনিষ্ঠতা উপলব্ধি করলাম।

"তার পরদিন দুপুরের মজলিস বেশ জমাট রকম হ'ল—প্রায় ফুল হাউস্। কিন্তু কথাবার্ত্তা প্রশ্নোত্তর বেশীর ভাগই চাপা গলায় হওয়ায় এবং বিতর্কের ভাগটা কম থাকায় গোলমাল বেশী হ'ল না। আমাকে সরিয়ে দেওয়া হয়েছিল। আমি পুকুরের ওপারে কামিনীতলায় ব'সে মাঝে মাঝে হাসির হর্‌রা শুনছিলাম আর অক্ষয়কে আমার এই নির্ব্বাসনের জন্য দায়ী ক'রে মনের নির্ব্বাণপ্রায় রাগের শিখাটিকে আবার পুষ্ট ক'রে তুলছিলাম।

"প্রথম পর্ব্ব শেষ হ'লে তাস পড়ল। নয়নতারা আমায় বাড়ী থেকে কি একটা আনতে বললে; এনে দিয়ে আমি দলের পাশে আমার জায়গাটিতে বসলাম। সুধা একবার আমার দিকে চেয়ে হেসে বললে—ছেলেটা কি গো!—তাড়ালে যায় না!

"কে বললে—জাতই ঐ রকম। এর পরে একবার 'তু' ক'রলে হাঁটু ছেঁচে, রক্ত-মাখামাখি হয়ে ছুটে যাবে।... আহা...

"তাসের দান দেওয়ার মধ্যে হাসির হর্‌রা ছুটল। খানিকক্ষণ কাটল।

"নয়নতারার চোখের আর একটা বিশেষত্ব এই ছিল যে, নীচের দিকে চাইলে চোখের সুপুষ্ট, মসৃণ পাতা দুটি এমন নিরবশেষভাবে চোখ দুটিকে ঢেকে ফেলত যে মনে হ'ত যেন সে চোখ বুজে আছে। পরে পত্রলেখা উপলক্ষ্যে আমি এই জিনিষটিকে কিশলয়ে-ঢাকা কুঁড়ির সঙ্গে তুলনা করেছি। বেশীক্ষণ এই ভাবে চিন্তা করলে মনে হ'ত যেন সে ঘুমচ্ছে; কিন্তু তার চোখের গড়নই অপরের চোখে এই দৃষ্টিবিভ্রম ঘটাত ব'লে কেউ বড়-একটা টুকত না। সেদিন কিন্তু হাতের তাসের দিকে নজর রেখে প্রায় মিনিট দু-তিন ওরকম ভাবে থাকবার পর নয়নতারার মাথাটা হঠাৎ সামনে ঢুলে পড়ল। খুসু বললে—ওমা, নয়ন, তুই যে সত্যিই ঘুমচ্ছিস না! আমরা ভাবছি...

"নয়নতারা একেবারে হকচকিয়ে উঠল; প্রথমটা অপ্রতিভ ভাবে বললে—ধ্যাৎ, কই যাঃ... সঙ্গে সঙ্গে মুখটা বিরক্তিতে কুঞ্চিত ক'রে বললে—না ভাই, সারারাত জাগিয়ে রাখা ভাল লাগে না। কবে যে যাবে—আপদ

"এইটুকুই যথেষ্ট ছিল; আমার মধ্যেকার নাইট্—যে-বীরকে তোমরা কঙ্কাবতীর সন্ধানে পাতালপুরীতে দেখে থাকবে—প্রতিহিংসায় ক্ষিপ্ত হয়ে উঠল। আমি আপদ-বিদায়ে একেবারে বদ্ধপরিকর হয়ে উঠলাম।

"সেদিন সন্ধ্যার সময় জামার মধ্যে হাত গলাতে গিয়ে দুটি লুকান বিছুটি-ডগার সংস্পর্শে যন্ত্রণা, আর শ্বশুর-বাড়ীতে সে-যন্ত্রণা চেপে রাখবার ভদ্রতার মাঝে প'ড়ে অক্ষয় অস্থির হয়ে পায়চারি করলে খানিকটা। তার পরে বোধ হয় ডাক ছেড়ে কাঁদবার সুবিধার জন্যে বেড়াতে যাওয়ার উদ্দেশ্যে যেই জুতোয় পা ঢোকাবে—'উঃ' ক'রে এক রকম চীৎকার ক'রেই পা-টা বের ক'রে নিলে—একমুঠো শেয়াল-কাঁটায় পা-টা সজারুর মত হয়ে উঠেছে।

"বাড়ীতে একটা হৈ-হৈ প'ড়ে গিয়ে সকলে সাবধান হয়ে পড়ায় আর তখন কিছু নূতন উপদ্রব হ'ল না; কিন্তু অক্ষয় সন্ধ্যার পর বেড়িয়ে যেই বাড়ীতে ঢুকবে, অন্ধকারে একটা ঢিল বোঁ ক'রে তার কানের কাছ দিয়ে বেরিয়ে গেল এবং সে চীৎকার ক'রে চালচিত্রের বেড়া টপকাবার আগেই আর একটা সজোরে এসে তার মাথায় লাগল।

"সে-সময় হাজার তল্লাস ক'রেও আততায়ীকে ঠাওরাতে পারা গেল না বটে, কিন্তু তোমাদের বোধ হয় বুঝতে বাকী নেই যে সে মহাপুরুষটি কে।

"তোমাদের যদি নিজের নিজের গায়ে হাত দিয়ে বলতে বলা হয় ত নিশ্চয়ই স্বীকার করবে যে আজন্ম কলিকাতা-

বাসীরা পৃথিবীর মধ্যে সবচেয়ে দুটি জিনিষকে বেশী ভয় করে,—সাপ আর ভূত; আর তাদের বিশ্বাস ওদিকে লিলুয়া আর এদিকে দমদমার পরে সমস্ত ভূভাগ এই দুই উপদ্রবে ঠাসা। অক্ষয় যখন নিঃসন্দেহ হ'ল যে এটা বাড়ীর কারুর ঠাট্টা নয়, তখন তার আর সন্দেহ রইল না যে সমস্ত ব্যাপারটা একেবারে ভৌতিক। সে রাতটা নিরুপায়ভাবে কোন রকমে কাটালে এবং তার পরদিন দুপুরে—অর্থাৎ রাত্রি হবার এবং তার সঙ্গে সেই উৎকট রকম ঠাট্টাপ্রিয় অশরীরীর আবির্ভাব হওয়ার ঝাড়া পাঁচ-ছয় ঘণ্টা পূর্ব্বে সে বেচারি হাবড়া-মুখো গাড়ীতে গিয়ে বসল।

"সেদিন আমি ওদিকে যেতে পারি নি—শেতলা-তলায় যাত্রার আসরের জন্যে কাগজের শেকল তৈরি করতে ধ'রে নিয়ে গেল।

"তার পরের দিন কিছু সকালেই আমি বিজয়ী বীরের মত গিয়ে নয়নতারাদের বাড়ীতে উপস্থিত হলাম। সে নিশ্চয়ই সমস্ত রাত নিরুপদ্রবে ঘুমিয়ে এতক্ষণ উঠেছে। এইবার গিয়ে তার ত্রাণকর্ত্তা যে কে সেটা জানিয়ে বিস্ময়ে, আহ্লাদে, কৃতজ্ঞতায় তাকে অভিভূত ক'রে ফেলতে হবে।

"গিয়ে যা দেখলাম তাতে আমার নিজেরই বিস্ময়ের সীমা রইল না।—পুকুরঘাটের শেষ রাণাটিতে, মুখ ধোওয়ার জন্যে বাঁ-হাতে খানিকটা ছাই নিয়ে নয়নতারা নিঝুম হয়ে ব'সে আছে। চুল উস্কখুস্ক, মুখটা খুব শুকনো, চোখ দুটো ফুলো-ফুলো আর রাঙা।

"আমি গিয়ে বসতে একবার ফিরে দেখলে, তার পর চিবুকটা হাঁটুর ওপর রেখে, চোখ নীচু ক'রে ব'সে রইল।

"প্রথমটা মনে হ'ল অক্ষয় সব আক্রোশ নয়নতারার উপর মিটিয়ে গেছে। কি ভাবে যে একটা কথা জিজ্ঞাসা করব ঠিক ক'রে উঠতে পারছিলাম না। চেয়ে আছি, হঠাৎ দেখি তার দু-চোখ বেয়ে ঝর ঝর ক'রে জল নামল। আশ্চর্য্যের ভাবটা চাপতে না পেরে ব'লে উঠলাম—কাঁদছ যে তুমি! —কাঁদছ কেন?

"—যাঃ, কাঁদছি কোথায়? —ব'লে নয়নতারা আঁচল তুলে চোখ দুটো মুছে ফেললে। একবার, দু-বার, তার পর বাঁধ-ভাঙা বন্যার মত এত জোরে অশ্রু নামল যে আর আঁচল সরাতে পারলে না, চোখ দুটো চেপে ধ'রে ব'সে রইল। একটু পরেই ফোঁপানির আওয়াজের সঙ্গে সঙ্গে সমস্ত শরীরটা দুলে দুলে উঠতে লাগল।

"খানিকক্ষণ এইভাবে গেলে বেগটা যখন কমে এল, আঁচলের মধ্যে থেকেই কান্নার ভাঙা ভাঙা স্বরে বললে—অত কাকুতিমিনতি ক'রে, মিথ্যে অসুখের কথা লিখে নিয়ে এলাম শৈল, মার খেয়ে গেল! কে মারলে বল দিকিন? —কার কি করেছিল সে?— নিরীহ, নির্দ্দোষ মানুষ···

"আর বলতে পারলে না, ভেঙে পড়ল।

"ঠিক সেই সময়টিতে নয়নতারার কান্নার মধ্যে বিনিয়ে-বিনিয়ে কথাগুলো শুনে, এবং কতকটা নিজের অপরাধের জ্ঞানের জন্যেও আমিও কান্নাটা থামাতে পারলাম না বটে, কিন্তু সেই দিনই কোন একটা সময় থেকে, নয়নতারার এই রকম পক্ষপাতিত্বের জন্যে অক্ষয়ের উপর বিদ্বেষ আর হিংসার ভাবটা একেবারে উৎকট হয়ে উঠল। ছেলেবেলার চিন্তাগুলো ঠিক গুছিয়ে মনে আসে না, অন্ততঃ যা মনে আসত তা এত দিনের ব্যবধান থেকে গুছিয়ে বলা যায় না। শুধু মনে পড়ছে এই পক্ষপাতিত্বের জন্যে—যেটা নিছক নয়নতারারই দোষ—আমি নয়নতারার উপর না চটে চটলাম অক্ষয়ের উপর। লোকটাকে যে নয়নতারা আসবার জন্যে সত্যিই কাকুতিমিনতি ক'রে লিখেছিল—প্লাটফর্মে আছাড় খাওয়াবার অভিপ্রায়ে যে ডাকে নি—তাকে যে নয়নতারা নির্দ্দোষ বলে—এই সব হ'ল অক্ষয়ের অমার্জ্জনীয় অপরাধ; আর সবচেয়ে বড় অপরাধ হ'ল তার বিবাহ করাটা, যার জন্যে সে তাকে কাকুতিমিনতি ক'রে ডেকেছে, আর আমি অত কষ্ট ক'রে তার মাথা ফাটালে তাকে নির্দ্দোষ বলেছে, তার জন্যে চোখে জল ফেলেছে।"

শৈলেন চুপ করিল। তারাপদ প্রশ্ন করিল, "তোমার গল্প শেষ হ'ল নাকি? উপসংহার কোথায়?"

শৈলেন বলিল, "ভালবাসা ত গল্প নয় যে উপসংহার থাকবে,—বইয়ের দুটি মলাটের মধ্যে তার আদি-অন্ত মুড়ে রাখা যাবে। তবুও যদি ভালবাসাকে গল্প-উপন্যাসের সঙ্গেই তুলনা কর তো বলা যায় তার উপসংহার নেই, অধ্যায় আছে; সে কোন এক অনির্দিষ্ট সময়ে একবার আরম্ভ হয়, তার পর অধ্যায়ের পর অধ্যায় সৃষ্টি করে তার অফুরন্ত গতি।···"

"সে সময়ের অধ্যায়টিই না-হয় শেষ কর।"

"সেটার শেষ ছিল একটা সামান্য চিঠি। একদিন নয়নতারা আমায় অক্ষয়ের নামে একটা চিঠি ডাকে ফেলে আসতে দিয়ে হঠাৎ থমকে মুখের দিকে চেয়ে বললে—হ্যাঁ রে, তুই চিঠি খুলে পড়িস্ নে তো? খবরদার; আর এই ৭৪॥ দেওয়া রইল, —বুকে ব্যথা হবে।

"আমার যে বুকে একটা ব্যথা ছিলই নয়নতারা সে খবর রাখত না।

"এর আগে কখনও কারুর চিঠি খুলি নি, কিন্তু সেদিন আমি পোষ্টাপিসের রাস্তাটা একটু ঘুরে বাড়ী এলাম এবং একটা নির্জ্জন জায়গা বেছে নিয়ে চিঠিটা খুললাম।

"৭৪॥এর দিব্যিটা আমার হাতে হাতে ফলল। সে যে কি বিনিয়ে-বিনিয়ে লেখা চিঠি—কত ব্যাকুলতা, কত আদর, কত আশ্বাস, ফিরে আসবার জন্যে কত মাথার দিব্যি!—এবার নয়নতারা তাকে বুকে করে রাখবে, যে শত্রুতা করেছে তার সমস্ত অত্যাচার নিজের সর্ব্বাঙ্গে মেখে নেবে; অক্ষয় ফিরে আসুক, —নয়নতারার চোখে ঘুম নেই—কেঁদে কেঁদে অন্ধ হয়েছে—এসে একবার দেখুক অক্ষয়, একবার দেখুক এসে তার অত আদরের নয়ন কি হয়ে গেছে···

"এত চায় সে অক্ষয়কে?—ক্ষোভে, ঈর্ষায় অসহায়তায় আমার বুকের মধ্যে একটাঅসহ্য যন্ত্রণা ঠেলে উঠতে লাগল। সেদিন ঢিল কুড়বার সময় কি ক'রে একটা পুরনো ভাঙা শাবল হাতে উঠেছিল। কি ভেবে সেইটেরই সদ্ব্যবহার করি নি। সেই আপশোষে ছটফট করতে লাগলাম।

"বোধ হয় সেদিনকার ঢিল ছোঁড়বার কথা মনে হওয়ার জন্যেই মনে পড়ে গেল যে অক্ষয় সমস্ত কাণ্ডটা ভৌতিক মনে ক'রেই তাড়াতাড়ি পালিয়েছিল। আমার মাথায় একটা সুবুদ্ধি এসে জুটল।

"আমি আস্তে আস্তে উঠে গিয়ে কালি-কলম নিয়ে এলাম এবং আমার লেখার খাতা থেকে খানিকটা কাগজ ছিঁড়ে খুব জোরে ঢিল ছুঁড়তে পারে এই রকম জবরদস্ত ভূতের হাতের উপযোগী মোটা মোটা অক্ষরে, চন্দ্রবিন্দুসংযুক্ত ভূতোচিত শুদ্ধ ভাষায় লিখলাম—খঁবরদার এঁবার এঁলে এঁকেবারে ঘাঁড় মঁটকে তোঁর রঁক্ত খাঁব—এবং আমি যে ভূত এটা প্রমাণ দিয়ে ভাল ক'রে বিশ্বাস করাবার জন্যে জুড়ে দিলাম—আঁমি থাঁমের মঁধ্যে ঢুঁকে সঁব পঁড়েছি। আঁমার সঁঙ্গে চাঁলাকি?

"তোমরা হাসছ? কিন্তু এর পরেই আমার অবস্থা অতিশয় করুণ হয়ে উঠল, কেন-না, এ-ভূতের নামধাম পরিচয় বের করতে খুব বেশী রকম বিচক্ষণ রোজার দরকার হ'ল না। তার ভূতপূর্ব্ব কীর্ত্তিও সব ধরা পড়ে গেল—ভূতপূর্ব্বই বল কিংবা অভূতপূর্ব্বই বল।...বৃষ্টিটা কি থেমে আসছে?"

শৈলেন আবার খানিকটা চুপ করিল। তার পর বলিল, "এর কয়েক দিন পরে এসে বাবা আমায় বিদেশে তাঁর কর্ম্মস্থানে নিয়ে গেলেন। তার পর আর নয়নতারার সঙ্গে দেখা নেই।"

তারাপদ বলিল, 'কিন্তু কি যেন অফুরন্ত অধ্যায়ের কথা বলছিলে?"

শৈলেন বাহিরের ম্রিয়মাণ বর্ষার বিলম্বিত মৃদঙ্গ কান পাতিয়া শুনিতেছিল, আত্মসমাহিত ভাবে বলিল, "হ্যাঁ, তবে একটু ভুল হয়েছিল,—অধ্যায় নয়, সর্গ,—জীবনের পাতা একটির পর একটি পূর্ণ ক'রে ভালবাসার করুণ গাথা সর্গের পর সর্গ সৃষ্টি ক'রে চলেছে···"

রাধানাথ বলিল—"তুমি কবি, হিসাবের গণ্ডকে নিশ্চয় এড়িয়ে চল; তাই মনে করিয়ে দিচ্ছি তোমার আট বৎসরের সময় নয়নতারার বয়স যদি পনর বৎসর ছিল তো তোমার এখন পঁয়ত্রিশ বৎসরে সে বিয়াল্লিশ বৎসর অতিক্রম ক'রে···"

শৈলেন উঠিয়া বসিল, বলিল, "ভুল বলছ তুমি,—নয়নতারার বয়স হয় না। আমার প্রেম তার স্ফুটনোন্মুখ যৌবনকে অমরত্ব দিয়েছে। তার পরের নয়নতারা—সে তো আমার জীবনে নেই। আমার নয়নতারা এখনও সেই পুকুরঘাটটিতে সখীপরিবৃতা হয়ে বসে; রূপে, রসে, পূর্ণতায় উজ্জ্বল। তার কত দিনের কত কথা, ভঙ্গী, তার আশ্চর্য্য চোখের পরমাশ্চর্য্য চাউনির খণ্ড খণ্ড স্মৃতি আমার জীবনে এক-একটি অখণ্ড কাব্যের মধ্যে রূপ ধ'রে উঠেছে। যখন আমি থাকি প্রফুল্ল—ত্রিশ বৎসরের দীর্ঘ ব্যবধানের ওপারে দেখি নয়নতারা হাসিতে, কপট গাম্ভীর্য্যে কিংবা অকপট কৌতুকপ্রিয়তায় ঝলমল করছে; তার চিক্কণ চুলের নীচে, ঘোরাল গালের প্রান্তে পারসী মাকড়িটা চঞ্চল হয়ে উঠেছে;—আমি যখন থাকি মৌন, বিমর্ষ, তখন বিকেলে নয়নতারার আকাশ ঘিরে বর্ষা নামে—রেলের ধারের ঘরটিতে মেঘের উপর চোখ তুলে নয়নতারা নির্ব্বাক হয়ে চেয়ে থাকে, মেঘবিলুপ্ত সান্ধ্য সূর্য্যের মত কানের পারসী মাকড়ি কেশের মধ্যে ঢাকা,আমার দিকে ফেরান গালটিতে একটা অশ্রুবিন্দু টলমল করছে···

"আমি জীবনে আর কাউকেই চাই নি, আমার জীবনের চিত্রপটে নয়নতারাকে অবলুপ্ত ক'রে আর কারুর ছবিই ফুটতে পায় নি। পনর বৎসরের অটুট যৌবনশ্রীতে প্রতিষ্ঠিত ক'রে তারই ওপর নিবদ্ধ দৃষ্টি আমি তাকে অতিক্রম ক'রে আমার পঁয়ত্রিশ বৎসরে এসে পড়েছি—সূর্য্য যেমন যৌবনশ্যামলা পৃথিবীকে অতিক্রম ক'রে অপরাহ্ণে হেলে পড়ে। আজকের এই বর্ষায় কি তোমরা কথাটা অবিশ্বাস করতে পারবে?"

তারাপদ বলিল, "আমরা স্বয়ং তোমার বিশ্বাসের জন্যে ভাবিত হয়ে উঠছি—কেন-না, বর্ষাটা গেছে থেমে।"

পুস্তক পরিচয়

স্মর-গরল—শ্রীমোহিতলাল মজুমদার প্রণীত এবং ২৭।২, মোহন-বাগান রো, কলিকাতা, রঞ্জন পাবলিশিং হাউস কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য তিন টাকা।

বাংলার কবি জয়দেব হইতে যুক্ত বাক্যটি আহরণ করিয়া শ্রীযুক্ত মোহিতলাল মজুমদার তাঁহার কাব্যগ্রন্থখানিকে যে-নামে অভিহিত করিয়াছেন, সেই নামকরণে বিশিষ্টতা প্রকাশ পাইয়াছে। প্রথম কবিতাটি "স্মর-গরল"।

আমি মদনের রচিনু দেউল দেহের দেহলী 'পরে,
পঞ্চশরের প্রিয় পাঁচ ফুল সাজাইনু থরে থরে।

কিন্তু

দেহেরি মাঝারে দেহাতীত কার ক্রন্দন-সঙ্গীত?

দেহের ভিতর দিয়া দেহাতীতের এষণা—এই কাব্যগ্রন্থের মূলকথা। বিবিধ কবিতার মধ্যে বিচিত্রভাবে এবং অনবদ্য ছন্দে এই ভাবটি প্রকাশ পাইয়াছে। উনবিংশ শতাব্দীর অনুভূতিময় ইংরেজী কাব্যে যে-দেহকে অবহেলা করা হইয়াছিল, বিংশ শতাব্দীর ভাবুকগণের নিকট তাহা আর নিতান্ত তুচ্ছ ও হেয় নয়। সারা জীবনে আমাদের সন্ধান শেষ হয় না। সীমা হইতে আমরা সীমান্তরে উপনীত হই। যাহার জন্য আমাদের হাহাকার তাহা হয়ত রূপকে অতিক্রম করিয়া যায়। তবুও রূপ সত্য।

আমি কবি—অন্তহীন রূপের পূজারী,
আমারো যে আছে প্রিয়া হৃদয়ের চির-তৃষাহারী,
এ কথা বুঝাই কারে, বুঝাতে কি পারি?

কিন্তু সে শুধু বাহিরের নহে, প্রিয়ার রূপ শুধু প্রিয়ার নিজের নহে,
আমারি ঐশ্বর্য্য তাই হেরি আমি তার দেহমাঝে।

তবু, শুধু রূপ লইয়া মন সন্তুষ্ট হয় না, মন চাহে মনের প্রতিদান, 'দেবদাসী' 'সুন্দর সুঠাম পাষাণ-দেবতাকে সম্বোধন করিয়া বেদনার ভাষায় বলিতেছে,

চিরদিন তুমি চাহিবে এমনি অপলক অচপল…
কভু টলিবে না? টুটিবে না মোর নিয়তির শৃঙ্খল?

যে আনন্দ জীবনাতীত, জীবনের আনন্দ কি তাহা অপেক্ষা অল্প? 'শেষ আরতি'তে কবি বলিতেছেন,

মের হতে মের পৃথ্বীশরীর পুলকে বেপথুমান,
প্রাণের পানীয় সেই সুরাসার আমি যে করেছি পান!

গ্রন্থখানিতে একত্রিশটি গীতি-কবিতা, আঠারটি সনেট এবং 'প্রেম ও ফুল' (প্রথম ও দ্বিতীয় পর্ব) নামক একটি বড় কবিতা আছে। শব্দচয়নে মোহিতলালের কৃতিত্ব অনন্যসাধারণ। 'রূপ-মোহ', 'বিভাবরী', 'নারী-স্তোত্র', 'রুদ্র-বোধন', 'চাঁদের বাসর', 'প্রেম ও জীবন', 'শেষ আরতি' প্রভৃতি কবিতার মধ্যে কল্পনা ও ভাবুকতার সঙ্গে হৃদয়াবেগের মিলন একান্ত উপভোগ্য। 'কবিধাত্রী'র তৃতীয় সনেটের শেষ শ্লোক এই,

যে সুর ফুরায়ে গেছে, ফিরিবে না কভু এ ভুবনে,
আজিকার গানে তার কিছু দিব—আমি সেই কবি।

'স্মর-গরল' কবির পূর্ব্বখ্যাতি অক্ষুণ্ণ রাখিয়াছে।

প্রাচীন গীতিকা হইতে—শ্রীপ্রমথনাথ বিশী প্রণীত এবং ২০৩ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে কাত্যায়নী বুক-ষ্টল কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

বইখানিতে তিনটি কথ-কবিতা আছে—'মহুয়া', 'দস্যু কেনারামের মুক্তি', 'মলুয়া'। পাশ্চাত্য সাহিত্যে আর্থার ও শার্লিমান সংক্রান্ত প্রাচীন উপাখ্যানগুলিকে অবলম্বন করিয়া আধুনিক কালের নানা কবি নানাবিধ নূতন কাব্য সৃষ্টি করিয়াছেন। আমাদের দেশেও পৌরাণিক আখ্যান লইয়া নাট্য ও কাব্য রচনার প্রথা আছে। 'ময়মনসিংহ-গীতিকা' হইতে গল্পগুলি সংগ্রহ করিয়া শ্রীপ্রমথনাথ বিশী নিজস্ব ভঙ্গীতে যে কথা-কাব্যের অবতারণা করিয়াছেন, তাহা কবিত্বপ্রিয় পাঠকের মনকে মুগ্ধ করিবে।

পরাগপাটলমাখা তারকার মধুমক্ষী যত
কনক চাঁপার মধু সযতনে রেখেছিল আনি
দ্যুলোকের দিব্যচক্রে; চুর্ণিয়াছ রসভারে নত
সে মধু মাধুরীমদ লক্ষস্রোতে ক্ষরিছে নিয়ত
স্বর্ণাম্বিত ত্রিভুবনে; হায় সৌম্য হে ওষধিপতি,
বুকে চাপি কাঁদে বিশ্ব চিরন্তন বেদনার ক্ষত।

কথ ও কাব্যের প্রবাহ অবাধ এবং অকুণ্ঠিত, বর্ণনার ধারা সৌন্দর্য্য এবং অজস্রতায় পরিপূর্ণ, ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য রূপের প্রকাশের জন্য শব্দগুলি অধীর।

প্রেম ফাঁদে একাকিনী বাসরের ফুলশয্যালীনা;
রূপ সে বিদ্যায়লগ্নী, অবিরাম অধরে অঙ্গুলি;
জীবনের দণ্ড পল ঝরে যেন মালা সূত্র বিনা।

অথবা

উঠিল নিশ্বসি
অগাধ অরণ্যতলে আদিম চিরন্তনী
পল্লবের মর্ম্মরণে।

অথবা

শাল্মলী রঙ্গনে রাঙা দিগ্বধূর নয়নের কোণ;
অধর-আসবগন্ধ-উন্মাদনে প্রমত্ত দ্যুলোক।

এমনই উপমাপ্রয়োগে, শব্দসম্পদে, রসে এবং মাধুর্য্যে কাব্যখানি মনোহর।

শ্রীশৈলেন্দ্রকৃষ্ণ লাহা

রিয়লিষ্ট রবীন্দ্রনাথ—বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়। নব-জীবন সংঘ, ২২৩-ডি আপার চিৎপুর রোড, কলিকাতা। এক টাকা।

কবি না হইলে কবিকে বুঝিয়া উঠা কঠিন ব্যাপার; পাঠক যত নীরস হউন, তাঁহাকে কবিকল্পনা বুঝিবার জন্য অন্ততঃ সাময়িকভাবে কবির সধর্ম্মী হইতে হইবে। রবীন্দ্রনাথকে আমরা যে কখনও কখনও "দুরূহ" "দুর্ব্বোধ্য" "হেঁয়ালি" বলিয়া ফেলিয়া রাখি, তাহার কারণ গালি দেওয়ার লোভ, এবং কল্পনা ও সরসতার অভাব। বিজয়লাল নিজে কবি, বহু বিচিত্র রসের গ্রাহক। তাঁহার রবীন্দ্রভক্তিও যথেষ্ট, সুতরাং রবীন্দ্রনাথ সম্বন্ধে তাঁহার আলোচনা উপভোগ্য হওয়ারই কথা। আলোচ

গ্রন্থে বিজয়লাল দুই বোন, মালঞ্চ, বাঁশরী, চার অধ্যায় ও শেষের কবিতা, রবীন্দ্রনাথের এই কয়টি উপন্যাস সম্বন্ধে আলোচনা করিয়াছেন। আলোচনা পরম উপাদেয় হইয়াছে। বিজয়লালের লেখা পড়িয়া রবীন্দ্রনাথের উপন্যাসগুলি পড়িতে আবার ইচ্ছা করে।

শুধু একটি বিষয়ে আপত্তি আছে,—কবির নামের পূর্ব্বে 'রিয়লিষ্ট' এই উপাধির প্রতি। নিরুপাধি রবীন্দ্রনাথ আমাদের কাছে আরও স্পষ্ট। বাঁশরীর মধ্যে এক জায়গায় আছে, 'রিয়লিষ্ট মেয়ের'। লেখক কোন্ অর্থে রিয়লিষ্ট কথাটা ব্যবহার করিয়াছেন? বিজয়লাল ভূমিকায় লিখিয়াছেন, "এবারে তাঁর লেখা সম্পর্কে আলোচনা করেছি কেবল মনোবিকলনতত্ত্বের দিক থেকে।" ফ্রয়েড যে নব্য বিজ্ঞান গড়িয়া তুলিয়াছেন তাহার বিচার বিশ্লেষণ ও সিদ্ধান্তের পরিচয় দুঃখের বিষয় এই পুস্তকে পাইলাম না। মনে হইল, মেয়ের রিয়লিষ্ট হইলেও রবীন্দ্রনাথ রিয়লিষ্ট নহেন,—যদিও তিনি মানুষের হৃদয়ে যে কত রকম লুকাচুরি তাহার জ্ঞানে ও অজ্ঞানে খেলে তাহা তিনি জানেন। মহামায়ার খেলা শ্রেষ্ঠ মনীষীদের কোনও কালেই অজ্ঞাত নহে, তাই বলিয়া 'রিয়লিষ্ট' বিশেষণে সকলকেই—রবীন্দ্রনাথকে তো নহেই—বিশেষিত করা যায় না। রলাঁকে বাদ দিয়া রামকৃষ্ণ বিবেকানন্দকে বোঝা যে 'অসম্ভব' তাহা চক্ষের সামনে দেখিতেছি; ফ্রয়েড না হইলে রবীন্দ্রনাথকে বোঝা কঠিন, অতঃপর কি ইহাই শুনিতে হইবে?

শ্রীপ্রিয়রঞ্জন সেন

প্রেম ও পাদুকা—শ্রীনন্দগোপাল সেনগুপ্ত। রসচক্র সাহিত্য সংসদ, ৯এ সাহানগর রোড, টালিগঞ্জ, কলিকাতা। মূল্য ১।০

হাস্যরসাত্মক ছোট গল্পের বই, আটটি গল্প আছে, সবগুলিই চিত্র-সমন্বিত। মোটামুটি বলা চলে হাস্যরসের উদ্ভব পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা-সংঘাতের অসামঞ্জস্যের মধ্যে। এই জিনিষটি ধরিবার মত সূক্ষ্ম অনুভূতি লেখকের আছে এবং সেই জন্য অনেক স্থানে প্রকৃত হিউমার বেশ ভাল ভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। এই সঙ্গে আর একটি জিনিষের যোগ হইলে বেশ ভাল হইত—তাহা সংযম। ইহার অভাবে পাত্রপাত্রী এবং ঘটনা-সমাবেশ সব স্থানে হাস্যরসের স্বচ্ছতা বজায় রাখিতে সমর্থ হয় নাই। কয়েক জায়গায় সুস্পষ্ট ব্যক্তিগত আক্ষেপ অপ্রিয় হইয়াছে। এ জাতীয় জিনিষ বাদ দিলেই লেখক ভাল করিবেন।

বইয়ের চিত্রগুলি ভাল, তবে প্রচ্ছদপটের চিত্রটি দৃষ্টি-আকর্ষক হইলেও সুরুচির পরিচায়ক হয় নাই।

মনের গহনে—শ্রীসরোজকুমার রায়চৌধুরী। রসচক্র সাহিত্য সংসদ, কলিকাতা। মূল্য ১।০

এখানি রসচক্র সাহিত্য সংসদের প্রকাশিত ছোট গল্পের বই, পাঁচটি ছোট গল্প আছে। এমন অনাড়ম্বর অথচ মিঠা ভাষায় লেখা গল্প প্রায় চোখে পড়ে না। বর্ণনাগুলি এতই সজীব যে বইখানি শেষ করিয়া মনে হয়, বই পড়া নয়—যেন নিজে সব দেখিয়া শুনিয়া ফিরিয়া আসিলাম। কাহিনীগুলির ঘটনাস্থল পল্লী-বাংলা। তাহার নিত্য জীবনের রূপ (সব ক্ষেত্রে স্বরূপ নয়) যথাযথভাবে ফুটিয়া উঠিয়াছে। ইহাদের মধ্যে "ম্যালেরিয়া" গল্পটি সম্বন্ধে বোধ হয় শত প্রশংসা করিলেও যথেষ্ট হয় না। ম্যালেরিয়ার একটি নিজ স্বরূপ আছে। অন্য ব্যাধির মত তাড়াহুড়া করিয়া সে অরসিকতার পরিচয় দেয় না; অল্পে অল্পে জীর্ণ করিয়া সংসারের রূপান্তর ঘটায়—কিশোরকে করে শিশু, যুবাকে করে কিশোর—অসুস্থ শিশু, অসুস্থ কিশোর মায়ের বুকে একটা অসাড়তার প্রলেপ দেয়; সবচেয়ে ওস্তাদি তাহার—বাড়ীর কর্ত্রী বিধবা পিসিমাকেও নয় বৎসরের কচি খুকীর মত কৎবেলের লোভী করিয়া তামাশা দেখে। গল্পটি পড়িতে পড়িতে চোখে অশ্রু জমিয়া উঠিয়া, মাঝে মাঝে অপ্রতিরোধ্য হাসির কাঁপনে ঝরিয়া পড়ে।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

বিক্রমপুরের মেয়েলি ব্রতকথা—শ্রীমতী হিরণবালা দেবী কর্ত্তৃক সংগৃহীত, দ্বিতীয় সংস্করণ। প্রকাশক—শ্রীপ্রকাশচন্দ্র সিংহ, ৬৬ নং পাথরহাট্টা, মোগলটুলী ঢাকা। পৃ. ১৫৭, মূল্য ॥৵

ব্রতকথা বাংলার মেয়েদের নিজস্ব জিনিষ ছিল। উহাতে বাংলা ভাষার এবং রচনা-রীতির একটি বিশেষ ভঙ্গী আছে। এই প্রাদেশিক ব্রতকথাগুলি লিখিয়া রাখিবার প্রয়োজন অনেকে উপলব্ধি করিয়াছেন এবং গ্রন্থও প্রকাশ করিয়াছেন। গ্রন্থকর্ত্রী নিজে এবং অন্যান্য লেখকের রচনা হইতে ৩৪টি 'কথা' সংগ্রহ করিয়াছেন। এই পুস্তকের দ্বিতীয় সংস্করণ হইয়াছে দেখিয়া আমরা সুখী হইয়াছি। এইরূপ পুস্তক হইতে বাংলার সামাজিক জীবনের বহু তথ্য সংগ্রহ করা যাইতে পারে। 'কথা'গুলির আরম্ভে গ্রন্থকর্ত্রী ব্রতগুলির পরিচয় দিয়াছেন। বিক্রমপুর অঞ্চলে প্রচলিত প্রাদেশিক শব্দগুলির অর্থ দেওয়া হইয়াছে। এই তালিকায় সমস্ত প্রয়োজনীয় শব্দের অর্থ নাই, যেমন, টেটন, নড়িয়া, ঢুপুলা, হালা, বোন্দ প্রভৃতি। এই গ্রন্থে কতকগুলি ধুয়া, ছড়া প্রভৃতি প্রাচীন সাহিত্যের নিদর্শনও সংগৃহীত হইয়াছে। বাংলার অন্যান্য অঞ্চল হইতেও এইরূপ সংগ্রহ প্রকাশিত হওয়া আবশ্যক।

শ্রীরমেশ বসু

তীর্থভ্রমণ—শ্রীমুরলীধর রায়। দাম এক টাকা।

আলোচ্য পুস্তকখানি ভারতের কয়েকটি প্রসিদ্ধ তীর্থের পরিচয় ও পথযাত্রার ইতিবৃত্ত। অনেকগুলি মন্দিরের ছবি আছে। ভাষা সহজ ও সরল। ভ্রমণকাহিনী হিসাবে বইখানি পড়িতে মন্দ লাগে না। তবে লেখকের পারিবারিক ইতিহাস এমন ওতপ্রোতভাবে কাহিনীর সহিত জড়িত যে, বইখানিকে সাহিত্যশ্রেণীভুক্ত করিতে মন সায় দেয় না।

শ্রীহারেন্দ্রনারায়ণ মুখোপাধ্যায়

জঙ্গ বাহাদুর (নাটক) শ্রীসঞ্জীব চৌধুরী। ১১৫ নং দয়াগঞ্জ রোড, ঢাকা হইতে গ্রন্থকার কর্ত্তৃক প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

নাটকখানি নেপালের ইতিহাস লইয়া রচিত। কিন্তু রচনা নিতান্ত বিশেষত্বহীন। এই ধরণের ব্যর্থ রচনা পুস্তকাকারে প্রকাশের কোন অর্থ হয় না, তবে লেখকের আত্মতৃপ্তি হয় এই পর্য্যন্ত।

বাধার জোয়ার (নাটক)—শ্রীচুণীলাল বাগ কর্ত্তৃক প্রণীত ও প্রকাশিত। মূল্য এক টাকা।

তিন অঙ্কে সমাপ্ত সামাজিক নাটক। লেখক নাট্যকার হইবার প্রচেষ্টা না করিলেই ভাল করিতেন। তাঁহার সমাজের সহিতও পরিচয় নাই—লেখনীতেও শক্তি নাই। বাস্তব জীবনের সহিত পরিচয় না থাকিলে নিছক কল্পনার উপর নির্ভর করিয়া লিখিতে গেলে সে রচনা কখনও সার্থক হয় না।

দিল্লীর লাড্ডু (প্রহসন)—ডাঃ হরেন্দ্রনাথ দাসগুপ্ত প্রণীত। প্রাপ্তিস্থান বীণা লাইব্রেরী। ১৫ কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা।

লেখক লোক হাসাইবার জন্য প্রাণপণ চেষ্টা করিয়াছেন—উদ্ভট

সঙ্গতিহীন রসিকতা ও ঘটনাসংস্থান, এমন কি বহুস্থানে অশ্লীল রসিকতা এবং অশ্লীল গান দিতেও কসুর করেন নাই। লোক হাসিবে—কিন্তু সে লেখকের ব্যর্থ চেষ্টা দেখিয়া। এরূপ রুচির পুস্তক প্রকাশিত না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

শ্রীতারাশঙ্কর বন্দ্যোপাধ্যায়

বৃহত্তর ভারতের পূজাপার্ব্বণ—স্বামী সদানন্দ কর্তৃক প্রণীত এবং চাতরা বাজার রোড, শ্রীরামপুর হইতে শ্রীদ্বিজেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় কর্তৃক প্রকাশিত।

স্বামী সদানন্দ গিরি তীর্থযাত্রায় বহির্গত হইয়া বৃহত্তর ভারতের বহু স্থানে ভ্রমণ করিয়াছেন এবং সরল ভাষায় নিজের অভিজ্ঞতার ফল এই পুস্তকে প্রকাশিত করিয়াছেন। ভারতকে সম্পূর্ণরূপে জানিতে হইলে বৃহত্তর ভারতের সাহিত্য, ধর্ম্ম, সমাজ, নীতি, শিল্প ও কলা প্রভৃতির বিষয় জানা আবশ্যক। অনেকের মধ্যে এই বিবরণ জানিবার একটা ঔৎসুক্য দেখা দিয়াছে। স্বামী সদানন্দ গিরি যবদ্বীপ, শ্যাম, বলিদ্বীপ, কাম্বোজ প্রভৃতি বৃহত্তর ভারতের অন্তর্গত স্থানসমূহে পরিভ্রমণ করিয়া উহাদের ইতিহাস, ধর্ম্ম ও সংস্কৃতি সম্বন্ধে নানা তথ্য সংগ্রহ করিয়া এই পুস্তকে সন্নিবিষ্ট করিয়াছেন। এই গ্রন্থে ঐ সকল দেশের নানা দেবমূর্ত্তির চিত্র প্রকাশিত হইয়া পাঠকের কৌতুহল চরিতার্থ করিয়াছে। এমন সহজ ভাবে বিষয়গুলি বর্ণিত হইয়াছে যে উহা পাঠকের মনে একটা মনোরম প্রভাব রাখিয়া যায়। বৃহত্তর ভারত সম্বন্ধে এই পুস্তকে অনেক বিবরণ পাওয়া যায়, ইহার জন্য স্বামীজী পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এইরূপ পুস্তকের প্রয়োজন যত অধিক, বাংলা ভাষায় উহার তত বেশী অভাব। সুতরাং নানা দিক্ দিয়া এই পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

অতীতের সন্ধানে—(আর্থিক, রাষ্ট্রিক ও সামাজিক তথ্যের আলেখ্য), প্রথম সর্গ শ্রীগোপীমোহন রায় (মৈত্র) লিখিত। শ্রীমতী মৃণালকুমারী রায় (মৈত্র-দুহিতা) কর্তৃক প্রকাশিত। প্রাপ্তিস্থান—অন্নদাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় লেন, হাওড়া। পৃষ্ঠা ১০৩+১৮। মূল্য এক টাকা।

লেখক এই পুস্তকে একটি ধারাবাহিক গল্প অবলম্বন করিয়া, 'স্ত্রী-পুরুষের সংসারযাত্রার ধারা', 'কুটীর-শিল্প', 'পল্লীজীবনের আদর্শ', 'জাতিভেদপ্রথা', 'হিন্দুধর্ম্ম ও তাহার শিক্ষা-দীক্ষা', 'নারী-প্রগতি', 'পাল-পার্ব্বণ' প্রভৃতি নানা বিষয়ের অবতারণা করিয়াছেন, এবং যুক্তি-সহকারে আমাদের প্রচলিত আচারানুষ্ঠানগুলি সমর্থন করিতে প্রয়াস পাইয়াছেন। গ্রন্থকারের সহিত সকল বিষয়ে একমত না হইলেও তিনি যে এ বিষয়ে অনেকাংশে সফলকাম হইয়াছেন তাহা নিঃসন্দেহে বলা যায়। পরিশিষ্টে পণ্ডিত দুর্গাদাস লাহিড়ী মহাশয়ের জীবনী ও তাঁহার 'পৃথিবীর ইতিহাস' ও 'চতুর্ব্বেদ' নামক গ্রন্থদ্বয়ের আলোচনা আছে। বইখানি পাঠকগণের নিকট আদৃত হইবে আশা করি।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

সুভদ্রাঙ্গী—ঐতিহাসিক উপন্যাস। শ্রীনলিনীমোহন সান্যাল। প্রকাশক ডি. এম্. লাইব্রেরী। দাম এক টাকা।

লেখক ভূমিকায় বলিয়াছেন, এই পুস্তকে প্রাচীন কালের এক আর্য্য-নারীর মহান্ চরিত্র বর্ণিত হইয়াছে এবং এই গুণবতী নারীর আখ্যায়িকা স্ত্রীলোকদিগের পক্ষে পরম হিতকর বলিয়া গৃহীত হইবে।

লেখকের উদ্যম সার্থক। প্রায় বাইশ শত বৎসর পূর্ব্বের সামাজিক সংস্থানের মনোরম চিত্র হিসাবে আখ্যায়িকাটি অমূল্য। বর্ত্তমান প্রয়োজন পঙ্কিল জীবনযাত্রার আবর্ত্ত হইতে কিঞ্চিৎ ক্ষণের জন্য মুক্তি পাইয়া যেন হাঁপ ছাড়িয়া বাঁচিলাম। লেখকের ভাষা অনাড়ম্বর, বর্ণনাভঙ্গী মর্ম্মস্পর্শী। এরূপ গ্রন্থের বহুল প্রচার সর্ব্বথা কাম্য। শুধু স্ত্রীলোকদিগের নহে, আবালবৃদ্ধবনিতার মনেই এরূপ গ্রন্থ স্বাস্থ্যপ্রদ আবহাওয়ার সৃষ্টি করিবে।

শ্রীমণীশ ঘটক

ব্রাউনীং পঞ্চাশিকা—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র, এম-এ (ক্যান্টাব), আই-ই-এস প্রণীত এবং ২০৩।১।১ কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা হইতে গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্তৃক প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

রসের নিবেদন তাঁহার কাছেই সার্থক যিনি রসিক। শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র রসজ্ঞ কবি। ব্রাউনিঙের কাব্য তাঁহার সরস অন্তরে যে ভাব ও চিন্তা উদ্বুদ্ধ করিয়াছে, মাতৃভাষার ছন্দে মৈত্র মহাশয় তাহাই লিপিবদ্ধ করিয়াছেন। অনুবাদ মাত্রই কঠিন। দেহান্তরে আত্মার সঞ্চারের মত। বিশেষতঃ ব্রাউনিঙের কবিতা তাঁহার নিজস্ব ভাষায় রচিত, সে ভাষার ভঙ্গী অনন্যসাধারণ, বেগ প্রখর, উপলহত, বক্ররপথগামী। ব্রাউনিঙের স্বদেশেও ভাষার এই প্রকাশভঙ্গিমা অপরিচিতপূর্ব্ব। মেঘনিবিড় রাত্রির ঘনান্ধকারে বজ্রধ্বনিত তীব্র বিদ্যুদ্দীপ্তির মত যে আকস্মিকতা প্রতীয়মান মনকে সচকিত এবং আলোকিত করিয়া তোলে সেই সহস-প্রকাশের তড়িন্ময় সুরে ব্রাউনিঙের বাক্যরীতি ছন্দিত। ইংরেজী সাহিত্যেও সে পদ্ধতির আর পুনরাবৃত্তি হয় নাই। ভক্ত-পূজিত হইলেও কাব্যলোকে ব্রাউনিং তাই চির-একাকী। তাঁহার কবিতা সুর-প্রধান নহে। একটি বিরাট বিদারণের মত প্রকাশিত হইয়া ব্রাউনিঙের ভাবরাশি মনের আকাশকে প্রখর দীপ্তিতে উদ্ভাসিত করিয়া তোলে। স্বদেশী ভাষা ও ছন্দের আবরণে মণ্ডিত করিয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র এই অদ্বিতীয় কবির ভাবমূর্ত্তিসমূহকে বাংলায় প্রতিষ্ঠিত করিতে ব্রতী হইয়াছেন। তাঁহার অনুবাদের শব্দে সুষমা ও লালিত্যের অভাব নাই। প্রথমদৃষ্টিতে এই নববেশসজ্জিত ভাবমূর্ত্তিগুলিকে নূতন বলিয়া বোধ হয়। তাহার পর পূর্ব্বপরিচিতের সহিত নবপরিচয়ে অন্তর উৎফুল্ল হইয়া উঠে।

The Last Ride Together কবিতাটি ধরা যাক। অশ্বপৃষ্ঠে অশ্বারোহণে যাত্রা, 'অশ্বপরিক্রমা', ঘোড়া ছুটাইয়া চলা প্রভৃতি কথা দিয়া বাংলায় ছোট *ride* শব্দটির অর্থ প্রকাশ করিতে হয়; অথচ এই শব্দটির উপর সমগ্র কবিতাটির অনেকখানি নির্ভর করে। এই সব বাধা কাটাইয়া সুরেন্দ্রবাবু এই কবিতাটি বাংলায় প্রকাশ করিতে সমর্থ হইয়াছেন। নাম দিয়াছেন, 'শেষবার'।

অশ্বপৃষ্ঠে মোরা দুজনায়
ছুটি যদি নিরবধি, গতিবেগ যদি না ফুরায়,
এ অমর প্রাণ যদি নবতর হয় পলে পলে
পুরাতন রূপে তার নবরূপ ফোটে দলে দলে
ক্ষণ যদি চিরন্তন হয়... ইত্যাদি।

'মুলেকি' প্রভৃতি গল্প-কবিতায় তিনি অনেকটা স্বাধীনতা পাইয়াছেন। *Love Among the Ruins*, *Two in The Campagna*, *Evelyn Hope*, *Love in a Life*, *Life in a Love*, *My Last Duchess*, *James Lee's Wife* প্রভৃতি ব্রাউনিঙের শ্রেষ্ঠ পঞ্চাশটি কবিতা তিনি সুললিত বাংলায় এবং সুমধুর ছন্দে রূপান্তরিত করিয়াছেন। কবি সুরেন্দ্রনাথ মৈত্রের এই অনন্যসাধারণ চেষ্টা অসার্থক হয় নাই। কঠিন, কর্কশ, কৃষ্ণশ্যাম পর্ব্বতশ্রেণীর মধ্যে পার্ব্বতীর আবির্ভাবে

মত ব্রাউনিঙের কাব্যে প্রেমের প্রকাশ। এই প্রেম-কবিতার অনেকগুলির সহিত বাংলার পাঠক-সমাজের পরিচয় স্থাপন করাইয়া শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ মৈত্র সাহিত্যরসিকগণের ধন্যবাদভাজন হইয়াছেন। 'ব্রাউনী পঞ্চাশিক' এর সম্পর্কে তাঁহার প্রথম আয়োজন। এই আয়োজনে তাঁহার রসজ্ঞ হৃদয়, কাব্যশক্তি, প্রকাশনৈপুণ্য ও আনন্দময় দুরূহ সাধনার পরিচয় পাইয়া আনন্দলাভ করিয়াছি।

শ্রীশৈলেন্দ্রকুমার লাহা

ভারত কোন্ পথে ?—শ্রীবারীন্দ্রকুমার ঘোষ প্রণীত। ১৩৩৬ সাল। ৪-বি, বৃন্দাবন পাল বাই-লেন, শ্যামবাজার হইতে গ্রন্থকার দ্বারা প্রকাশিত। মূল্য ।০ আনা। পৃঃ ১০৫।

"ভারত কোন্ পথে?" মানে শুধু ইহা নয়, ভারত কোন্ পথে চলিতেছে। ইহার আরও একটি অর্থ হইল ভারতের পক্ষে কোন পথে চলা উচিত। বারীনবাবু তাঁহার পুস্তকে দুইটি বিষয়ের প্রতিই লক্ষ্য রাখিয়াছেন। ভারতবর্ষের রাজনীতিক্ষেত্রে চরকা ও অস্পৃশ্যতা-নিবারণ, সন্ত্রাসবাদ এবং কম্যুনিজমের নূতন পাশ্চাত্য ধুয়ার বিষয় আলোচনা করিয়া তিনি দেখাইয়াছেন যে এই সকলের পশ্চাতে খাঁটি রাজনৈতিক জ্ঞান বা কর্ম্মকুশলতার পরিচয় পাওয়া যায় না। ইহার পিছনে আছে বুদ্ধির অপরিপক্বতা, বিজাতীয়ের প্রতি বিদ্বেষ, পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রতি অন্ধ মোহ অথবা নিজেদের অন্তরের প্রচ্ছন্ন কর্ম্মবিমুখতা। তিনি বিচারকালে আরও একটি বিষয় বিশদভাবে আলোচন করিয়াছেন। বারীনবাবু মানবের একত্বে বিশ্বাস করেন, তদ্ভিন্ন কেবলমাত্র দৈবী শক্তিই যে মানবের স্থায়ী কল্যাণসাধন করিতে সমর্থ ইহাই তাঁহার ধারণা। সেজন্য তিনি সর্ববিধ হিংসা ও অসহযোগিতার বিরুদ্ধে মত প্রকাশ করিয়াছেন। হিংসা মানুষের আসুরিক শক্তি, মানবকল্যাণের সৌধনিকেতন গড়িবার ক্ষমতা অসুরের নাই। সে ভাঙিতেই জানে, গড়িতে পারে না। সেইজন্য তিনি বারংবার অসহযোগিতা বর্জনের কথা বলিয়াছেন এবং অবশেষে লিখিয়াছেন

"শ্রীঅরবিন্দের জাতীয় শিক্ষা, দেশবন্ধুর পল্লীসংগঠন, মহাত্মাজীর অর্থনীতিক (নৈতিক?) প্রচেষ্টা ও অস্পৃশ্যত-নিবারণ সবই সমান ব্যর্থতায় পর্য্যবসিত হয়েছে, কারণ এঁরা সকলেই উপেক্ষা করেছিলেন দেশের শাসন-শক্তিকে, ব্যাবস্থাপক মণ্ডলীকে, legislative ও executive শক্তিকে। তাঁরা গেছিলেন হাওয়ায় রাজপ্রাসাদ গড়তে, ভাবের চোরাবালুর উপর দেশযজ্ঞের ভিত্তি রচনা করতে…এই কল্পনাশ্রী মনোবৃত্তির চাই আশু অবসান, নেতায় ও শাসকে আসা দরকার সহযোগিতা। তা' নইলে দেশব্যাপী গঠন আকাশকুসুম হয়েই থাকবে। দেশের শাসন-শক্তি যে নিতান্তই দেশের, জাতির ধন-জন বলেই তা গঠিত ও পুষ্ট, —তা হাজার বিদেশীর সাহায্যই সেখানে থাকুক, এই মোটা কথাটা দেশের কর্ম্মী ও নেতাদের বুঝবার দিন এসেছে। যারা তা' বুঝতে চায় না তারা চায় না দেশে খাঁটি কাজ…" তিনি আরও বলিয়াছেন, "কবে কোন অতীত যুগে বনিক (বণিক?) বেশে কয়েকজন ইংরাজ এসে অরাজকতার অবসরে পতিত এদেশ জয় করেছিল বলে সমগ্র ইংরাজ জাতিকে ঘৃণা করা বা শাস্তি দেওয়া…অসভ্য আফ্রিদির বংশপরম্পরাগত রক্তের নেশা blood feud এরই সগোত্র।" সে বিদ্বেষ পরিহার করিয়া আমাদিগকে বুঝিতে হইবে "যুগ-দেবতা বা জাতির জীবন-দেবতা তার নিগূঢ় বিধানেই ইংলণ্ড ও ভারতের মিলন ঘটিয়েছে, তার পিছনে আছে এক অন্তর্নিহিত উদ্দেশ্য।" "আজ যদি এরা অকালে চলে যায় তাহলে এতগুলি বিভিন্ন জাতি, ধর্ম্ম, শ্রেণী ও বর্ণের অরণ্য এই দেশে চলবে রক্তারক্তি, হানাহানি, গৃহ-বিচ্ছেদ, তার চিহ্ন সর্ব্বত্র এখনই সুস্পষ্ট দেদীপ্যমান।"

ইহা বারীনবাবুর স্বকীয় মত, যুক্তি নয়। অতএব তাহা লইয়া তর্ক করা চলে না। স্বীয় মত পোষণ করিবার অধিকার সকলেরই আছে, হয়ত যুগ-দেবতাই তাঁহাকে সে-মত পোষণ করিবার প্রত্যাদেশ দিয়াছেন। যাক্ সে কথা। তবে সমালোচক হিসাবে বারীনবাবুর পুস্তকে একটি বিষয় লইয়া আমরা শিক্ষা অপেক্ষা আমোদ বেশী অনুভব করিয়াছি। রাজনৈতিক ব্যাপারে বারীনবাবু সাম্যের উপাসক নন, তিনি বলিয়াছেন যে তিনি সামঞ্জস্যের পূজারী। ভাষার ক্ষেত্রেও তিনি যে সামঞ্জস্যবিধান করিয়াছেন তাহাতে আনন্দিত না হইয়া উপায় নাই। একদিকে তারুণ্যগুণসম্বলিত 'আদর্শালু' 'নবতর', 'মহানতর', 'সৃষ্টিপাগল', 'গঠন ক্ষেপা', অপর দিকে ঋষি এবং যোগিগণের দ্বারা ব্যবহৃত 'হৃদপদ্ম (হৃৎ?)', 'প্রাণকমল', 'মহতি (মহতী?)', 'বিনষ্টি', 'সিসৃক্ষু' প্রভৃতি শব্দের অপূর্ব যোগসাধন ঘটিয়াছে। তবে একটি বিষয়ে আগাগোড়া সাম্যের ছাপ থাকিয়া গিয়াছে, তাহা বানানের ব্যাপার লইয়া। বারীনবাবু বরাবর গুপ্তকে 'গুপ্ত' লিখিয়াছেন, শতাব্দীকে 'শতাব্দি' লিখিয়াছেন, উচ্ছ্বাসের ব-ফলা বাদ দিয়াছেন এবং পুনঃ পুনঃ ও পুনরায়ের পরিবর্ত্তে 'পুণ পুণ' ও 'পুণরায়' ব্যবহার করিয়াছেন। এক কথায় তাঁহার ভাষার মধ্যে সামঞ্জস্যবাদ এবং সাম্যবাদ উভয়েরই উৎকৃষ্ট উদাহরণ মিলিতেছে।

সাতসাগরের পারে—কুমারী অমলা নন্দী। ১০ চৌরঙ্গী রোড, কলিকাতা। পৃঃ ১২০, ৪৭ ছবি। দাম দুই টাকা।

লেখিকা ১৯৩১ সালে আন্তর্জাতিক কলোনিয়াল একজিবিশন উপলক্ষে প্যারিসে ছয়মাসকাল অবস্থান করিয়াছিলেন। পরে নৃত্যশিল্পী উদয়শঙ্করের সঙ্গে ইউরোপে বহু স্থানে ভ্রমণ করেন। পুস্তকখানিতে তাঁহার প্রবাসের কাহিনী লিপিবদ্ধ হইয়াছে।

লেখিকার বিশেষ কোনও দৃষ্টিভঙ্গী নাই। তদ্ভিন্ন তিনি বিশেষ কার্য্যোপলক্ষে দ্রুতবেগে দেশভ্রমণ করিয়াছিলেন বলিয়া গভীর ভাবে কিছু দেখিবারও সময় পান নাই। কিন্তু মোটের উপর ইউরোপ দেশটি তাঁহার ভাল লাগিয়াছিল।

আমরা আশা করি পুস্তকখানি সাধারণ পাঠকের কাছে আদৃত হইবে।

কেদার-বদরীর পথে—শ্রীমতী কাত্যায়নী দেবী। ১৯৫, মুক্তারাম বাবু ষ্ট্রীট, কলিকাতা। পৃঃ ৬×১৬৪ পৃঃ। মূল্য এক টাকা।

ভ্রমণ-কাহিনীর সাধারণ বই। ভাষা ঝরঝরে, পড়িতে ভালই লাগে। যাঁহারা কেদার-বদরীর পথে যাত্রা করিবেন তাঁহাদের উপযোগী অনেক সংবাদ দেওয়া হইয়াছে।

দুই-একখানি ছবির সম্বন্ধে গোল বাধিতেছে। ৯৬ পৃঃ "পর্ব্বত-গুহার" যে-ছবি মুদ্রিত হইয়াছে তাহা ভুবনেশ্বরের পার্শ্বস্থিত উদয়গিরির বিখ্যাত ব্যাঘ্রগুম্ফার ছবি। ১২ পৃঃ "হরিদ্বারের দৃশ্য" বলিয়া যে ছবিটি নীচের দিকে ছাপা হইয়াছে তাহা মধ্যভারতে নর্ম্মদাতীরে অবস্থিত ওঁকারেশ্বরের মন্দির। আমরা আশা করি এগুলি ভ্রান্তিবশতঃ ছাপা হইয়াছে।

শ্রীনির্ম্মলকুমার বসু

জড়ের রূপ

শ্রীঅশোককুমার বসু

চিরদিনই মানুষ প্রকৃতির রহস্যাবগুণ্ঠন মোচন করিতে চাহিয়াছে—মানুষের সংস্কার তাহার বৈজ্ঞানিক বুদ্ধির নিকট বার বার পরাজিত হইয়াছে। পুরাকাল হইতে মানুষ গ্রহ-নক্ষত্রের বিষয় চিন্তা করিতে করিতে ক্রমশঃ ইহার উপাদানের কথা কল্পনা করিতে আরম্ভ করিল। আজ বৈজ্ঞানিকের সাধনার বলে জড়কণার অসামান্য রূপের বিস্ময়কর আভাস পাওয়া গিয়াছে—একটি কণার ভিতর যেন এক বিশাল ব্রহ্মাণ্ড রহিয়াছে।

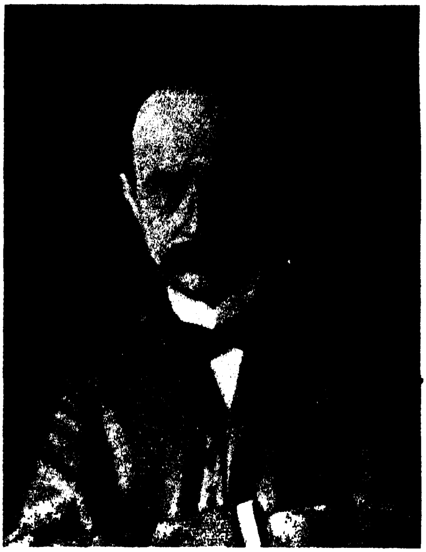
যুগ যুগ ধরিয়া মানুষ বিশ্বাস করিয়া আসিয়াছে যে এই পৃথিবীর যাবতীয় পদার্থ ক্ষিতি, অপ্, তেজ, মরুৎ, ব্যোম এই পাঁচটি মূল উপাদানে গঠিত। অষ্টাদশ শতাব্দীতে বিজ্ঞান-জগতে এক নূতন যুগ আসিল। কারলাইল ও নিকলসন দেখাইলেন যে, বিদ্যুৎ-প্রবাহ দ্বারা জলকে হাইড্রোজেন ও অক্সিজেন (জলজান এবং অম্লজান) এই দুইটি বায়বীয় পদার্থে পরিণত করা যায়। ইহাতে প্রমাণ হইল যে রাসায়নিক কিংবা জড়-ক্রিয়া (physical process) দ্বারা কোনও মূল উপাদানকে (element) বিশ্লিষ্ট করা যায় না। তাহার ফলে উনবিংশ শতাব্দীতে পরমাণুবাদ গড়িয়া উঠিল। ক্রমে ক্রমে দেখিতে পাওয়া গেল, সর্ব্বসমেত ৯২টি মূল উপাদান আছে। একটি উপাদানের পরমাণু অন্য উপাদানের পরমাণু হইতে ভিন্ন এবং প্রত্যেক পরমাণুর একটি বিশেষ ওজন, রাসায়নিক বিশেষত্ব এবং বিশিষ্ট বর্ণচ্ছত্র (spectrum) আছে। কিন্তু বর্ণচ্ছত্রের বিচিত্র জটিলতায় এবং এই আণবিক সম্বন্ধের কোনও সহজ অনুপাত না থাকায় পরমাণুর সরল গঠনের সম্বন্ধে বিজ্ঞান-জগৎ সন্দিহান হইয়া উঠিল। গত শতাব্দীতে মেনডেলিফ এবং লোথার মেয়ার সমস্ত মূল পদার্থকে একটি বিশেষ তালিকায় বিভিন্ন পর্য্যায়ে সাজাইলেন। ইহার মধ্যে আটটি উল্লম্ব (vertical) ঘর আছে—যে-সমস্ত পরমাণুর জড় এবং রাসায়নিক চরিত্র এক শ্রেণীর, সেই উপাদানগুলি এক একটি উল্লম্ব ঘরে সাজান হইল। বাম দিক হইতে ডান দিক পর্য্যন্ত আনুভূমিক (horizontal) ভাবে এক একটি করিয়া স্থান-সংখ্যা বাড়িয়া যাইতেছে—ইহাকে পরমাণবিক সংখ্যা (atomic number) বলে। এই সংখ্যা অনুসারে আনুভূমিক ভাবে বাম দিক হইতে ডান দিকে গেলে ক্রমশঃ আণবিক ওজনের সঙ্গে তাহাদের রাসায়নিক-এবং জড়-বিশেষত্ব বদলাইয়া যায়—কিন্তু যখন একটি আনুভূমিক শ্রেণী শেষ হয় তখন আবার উল্লম্ব ঘরে ফিরিয়া আসিলে পূর্ব্বের ন্যায় অণুর বিশেষত্ব লক্ষ্য করিতে পারা যায়। এই জন্য এই তালিকার নাম দেওয়া হইয়াছে পুনরাবৃত্তিক তালিকা (periodic table)।

উনবিংশ শতাব্দীর শেষভাগে সর্ উইলিয়ম ক্রুক একটি নিম্ন চাপের বায়ুতে পূর্ণ নলের ভিতর দিয়া তড়িৎ প্রবাহিত করিয়া অপূর্ব্ব রশ্মি লক্ষ্য করিলেন, এবং এই রশ্মি বায়ুচাপের তারতম্যের উপর নির্ভর করে দেখা গেল। সর্ জে. জে. টমসন বিশেষ পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণ করিলেন যে বিদ্যুৎ-কণাই হইতেছে এই রশ্মির কারণ—ইহার বৈদ্যুতিক চরিত্র ঋণাত্মক (negative) এবং ইহার ওজন জলজান-পরমাণুর ১৮০০ ভাগের এক ভাগ মাত্র। ইহার নামকরণ হইল বিদ্যুতিন। এই আবিষ্কারের ফলে বিজ্ঞান-জগতে নব নব আবিষ্কারের প্রেরণা আসিল।

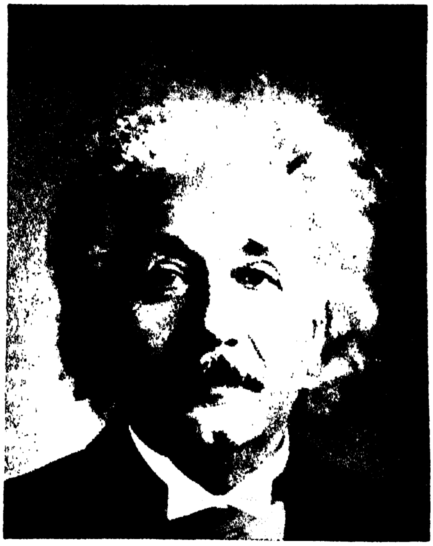
রাদারফোর্ড এবং বোর পরমাণুর এক অভিনব চিত্র আঁকিলেন। একটি ধনাত্মক ভরকে (mass) কেন্দ্র করিয়া বিদ্যুতিনগুলি অবিশ্রাম তাহাদের নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে। এদিকে তাপ-রশ্মির সমস্যা সমাধান করিতে গিয়া মনীষী প্লাঙ্ক পূর্ব্বপ্রচলিত মতের বিরোধিতা করিয়া বলিলেন যে একটি চলন্ত বিদ্যুতিন অবিশ্রাম রশ্মি বিকীরণ করে না—ইহা হইতে বিচ্ছিন্ন ভাবে এক এক খণ্ড শক্তি নির্গত হয়, এবং এই শক্তি নির্গত রশ্মির দ্রুততার (frequency) সহিত সমানুপাতিক (proportional)।



লর্ড রাদারফোর্ড



প্লাঙ্ক

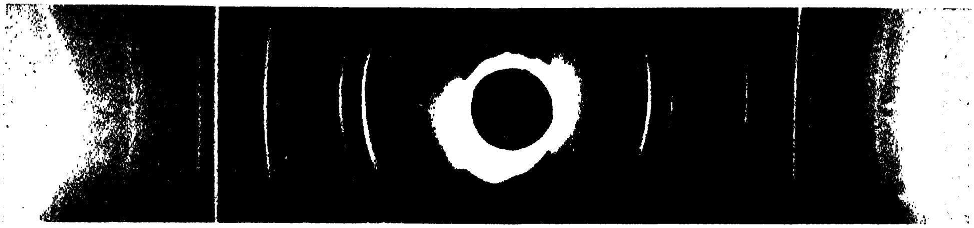


আইনষ্টাইন

প্লাঙ্কের এই তথ্যকে ভিত্তি করিয়া বোর আরও একটি মত প্রকাশ করিলেন—যত ক্ষণ একটি বিদ্যুতিন কোনও নির্দ্দিষ্ট কক্ষে ঘুরিতেছে তত ক্ষণ তাহা কোনও রশ্মি বিকীরণ করে না—কিন্তু যখনই ইহা একটি কক্ষ হইতে আর একটি কক্ষে যায় তখনই দুইটি কক্ষের শক্তির বিয়োগ-ফল তাহা হইতে নির্গত হয়।

আইনষ্টাইনের আপেক্ষিকবাদ বিজ্ঞান জগতে আবার পরিবর্ত্তন আনিল। এত দিন ধারণা ছিল যে ভর ধ্রুবক (constant)। নিউটনের এই মতের বিরুদ্ধে পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইল যে ভর বেগের উপর নির্ভর করে। এই নবপ্রমাণিত মতের দ্বারা সমারফেল্ড প্রমাণ করিলেন যে, বিদ্যুতিন শুধু যে বৃত্তাকারে ঘুরিতেছে তাহা নহে, উপবৃত্তাকারেও ঘুরিতেছে।

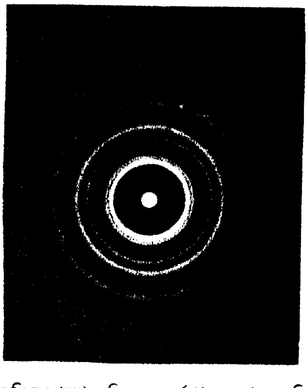
এই সময় কম্‌প্‌টন দেখাইলেন যে একটি এক্স-রশ্মি একটি কারবন-ফলকের ভিতর দিয়া প্রেরণ পূর্ব্বক রশ্মি-বর্ণ বিশ্লেষণ করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে দুইটি রশ্মির আবির্ভাব হইয়াছে—একটির তরঙ্গান্তর (difference of wave-length) একেবারে পূর্ব্বের ন্যায় এবং আর একটির তরঙ্গান্তর দীর্ঘতর। প্রতি পরমাণুর সর্ব্ববহির্ব্বর্ত্তী কক্ষে যে-সকল বিদ্যুতিন অবস্থান করে তাহাদের বন্ধন-শক্তি খুব কম। এইরূপ অনেক বাধাহীন (free) বিদ্যুতিন পরমাণুর মধ্যে অবস্থান করিতেছে। এক পরিমাণ (Quantum)



ঋণাত্মক-ধনাত্মক বিদ্যুতিনের পথরেখা। অধ্যাপক হরপ্রসাদ দে কর্তৃক গৃহীত আলোক-চিত্র

এক্স-রশ্মি যখন বিদ্যুতিনকে আঘাত করে তখন সেই বিদ্যুতিন ঐ রশ্মির খানিকটা শক্তি গ্রহণ করে এবং অবশিষ্ট শক্তিটুকু দুইটি বলের ধাক্কার ন্যায় আর এক দিকে চলিয়া যায়; ফলে দীর্ঘতর তরঙ্গান্তরের সৃষ্টি হয়। এখানে কম্পটন এক্স-রশ্মির কণা-চরিত্র কল্পনা পূর্ব্বক তাঁহার তথ্য প্রতিষ্ঠিত করিলেন।

এদিকে ডিব্রলি, জি. পি. টমসন প্রভৃতি মনীষিগণ নানা বাদানুবাদ ও পরীক্ষাদ্বারা এই সমস্যাকে আরও জটিল করিয়া তুলিলেন। আমরা জানি যে সূর্য্যের আলোক সাধারণতঃ একটি বিশেষ শক্তির তরঙ্গ। একটি আলোক-রশ্মি যখন কোনও সঙ্কীর্ণ পথ দিয়া যায় তখন সেই পথের প্রতিবিম্বের (image) দুই পার্শ্বে সারি সারি আলো-

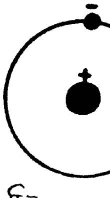


বিদ্যুতিন-রশ্মির আলোক-চিত্র : দর্পণপাতের দ্বারা প্রতিবিক্ষিপ্ত

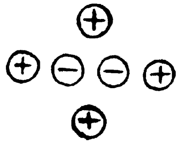
ছায়ার সৃষ্টি হইয়া আলোকের তরঙ্গবাদ দৃঢ়ভাবে প্রতিষ্ঠা করে। ঠিক এমনি ভাবেই যখন একটি স্ফটিকের ভিতর দিয়া বিদ্যুতিন-রশ্মি প্রেরণ করা হয় তখন একটি উজ্জ্বল কেন্দ্রকে বৃত্ত করিয়া আলো-ছায়ার সৃষ্টি হয়। আলোক-চিত্রের সাহায্যে ইহা দেখিতে পাওয়া যায়। পূর্ব্বে লাউয়ে (Laue)এর আবিষ্কারের ফলে জানা গিয়াছিল যে স্ফটিক মাত্রেরই বিশেষত্ব এই যে ইহাদের পরমাণু (atom) গুলি একটি বিশেষ প্রণালীতে একই ভাবে সাজান থাকে এবং দুইটি পরমাণুর মধ্যে যে-স্থল ফাঁকা থাকে তাহাই ঐ অনুপাতে ক্ষুদ্র তরঙ্গের আলোছায়া সৃষ্টি করিবার পক্ষে যথেষ্ট। ইহাতে প্রমাণ হইল যে বিদ্যুতিন একটি তরঙ্গ। পূর্ব্বেই কম্পটন-প্রতিষ্ঠিত তথ্যের ফলে তরঙ্গের কণা-রূপ জানিতে পারা গিয়াছিল, এখন কণার তরঙ্গ-রূপও প্রতিষ্ঠিত হইল। তাহা হইলে বিদ্যুতিন কি কণা এবং শক্তি উভয়ই? একটি নূতন বিজ্ঞান (ওয়েভ-মেকানিক্স) গড়িয়া উঠিল। ইহার পর হইতে প্রত্যেক ব্যাপারই তরঙ্গ-তত্ত্বের দৃষ্টিতে দেখিবার চেষ্টা হইতে লাগিল।

এইবারে আমরা ক্রমশঃ পরমাণুর অভ্যন্তরে প্রবেশ করিবার চেষ্টা করিব। আমরা জানি যে কয়েকটি তেজো-বিকীরক পদার্থ আছে—তাহারা সাধারণতঃ তিন প্রকার রশ্মি নির্গত করে, ক-রশ্মি, খ-রশ্মি ও গ-রশ্মি। পরীক্ষা দ্বারা প্রমাণিত হইয়াছে যে ক-রশ্মি ধনাত্মক, খ-রশ্মি ঋণাত্মক এবং গ-রশ্মি এক্স-রের ন্যায় তেজ মাত্র। পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে ঋণাত্মক বিদ্যুতিন একটি কেন্দ্রের চতুর্দ্দিকে অবিরাম ঘুরিতেছে। কিন্তু এই কেন্দ্রটি কোথায় অবস্থিত? ইহার আকার এবং বিশেষত্বই বা কিরূপ? পরমাণুর মধ্যে আছে ধনাত্মক বিদ্যুৎ, এ কথাও সত্য, কারণ বিদ্যুতিন ঋণাত্মক এবং অণুর বৈদ্যুতিক সাম্যের জন্য ধনাত্মক কেন্দ্রের কল্পনা অবশ্যম্ভাবী। রাদারফোর্ড ক-রশ্মিকে একটি পাতলা ধাতুর পাতের ভিতর দিয়া প্রেরণ করিয়া দেখেন যে ঐ রশ্মির অধিকাংশই কোন

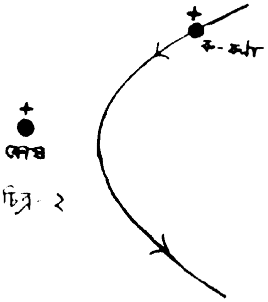
রকম দিক্ পরিবর্ত্তন করিতেছে না—কিন্তু কয়েকটি আবার সম্পূর্ণভাবেই দিক্ পরিবর্ত্তন করিতেছে। ইহার দ্বারা এই প্রমাণ হয় যে পরমাণুর ভিতর এমন কোনও বস্তু আছে যাহার ভর প্রায় ক-কণার (alpha-ray) ভরের সমান এবং উহা ক-কণারই ন্যায় ধনাত্মক। এইগুলি হইতেছে পরমাণু-কোষ (atomic nucleus)। রাদারফোর্ডের এই সুন্দর পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকগণ পরমাণুর বহু রহস্য উদ্ঘাটন করিতে সমর্থ হইয়াছেন। আরও কয়েকটি পরীক্ষার ফলে বৈজ্ঞানিকেরা বলিলেন যে ওজনই পরমাণুর প্রধান বিশেষত্ব নহে। পরমাণবিক সংখ্যাই (atomic number) রাদারফোর্ডের পরীক্ষিত ব্যাপারের প্রধান কারণ; ইহা পরমাণু-কোষের বৈদ্যুতিক চার্জ্জের সমান এবং ইহা পারিপার্শ্বিক বিদ্যুতিনের সংখ্যা ও পরমাণুর রাসায়নিক এবং জড়-ব্যবহার নির্ণয় করে। এইবারে আরও গভীর ভাবে পরমাণু-কোষের দিকে দেখিতে হইবে।



চিত্র-১



চিত্র-৩



চিত্র-২



চিত্র-৪

১। হাইড্রোজেন অণু

২। একটি ক-কণা পরমাণু-কোষের নিকট আসিবার সময় দিক্-পরিবর্ত্তন করিতেছে।

৩। হিলিয়াম-কোষ।

৪। আধুনিক কোষের চিত্র—দুইটি নিউট্রন এবং দুইটি প্রোটন পাশাপাশি রহিয়াছে।

হিলিয়ামের পরমাণবিক সংখ্যা হইতেছে ২ এবং ভর হইতেছে ৪। বৈদ্যুতিক সাম্য রক্ষা করিবার জন্য পরমাণু-কোষের বাহিরে মাত্র দুইটি বিদ্যুতিন আছে। তাহা হইলে কোষের মধ্যে আরও দুইটি ধনাত্মক বিদ্যুতিন থাকিবে—মোট চারিটি প্রোটন এবং দুইটি বিদ্যুতিন।

সর্ব্বাধুনিক পরীক্ষায় দেখা যায় যে প্রোটন এবং বিদ্যুতিন স্বাধীনভাবে পরমাণু-কোষের মধ্যে থাকিতে পারে না। বেশীর ভাগই ক-কণারূপে থাকে। বিদ্যুতিনের চৌম্বক ভ্রামক (magnetic movement) কল্পনা করিয়া ধারণা হইল এই যে যদি পরমাণু-কোষের মধ্যে কোন বিদ্যুতিন থাকেও তবে তাহার বিশেষত্ব বাহিরের বিদ্যুতিন হইতে পৃথক। পরমাণু-কোষের মধ্যে বাধাহীন বিদ্যুতিনের অস্তিত্বের বিরুদ্ধে আর একটি মত এই: আমরা জানি যে সমান চার্জ্জ বিকর্ষিত হয়—তবে কিরূপে পরমাণু-কোষের স্থায়িত্ব সম্ভব? তখন এই মত প্রকাশিত হইল যে খুব সম্ভব অতি নিকটে ঐ বিকর্ষণ আকর্ষণে পরিণত হয়। রাদারফোর্ড প্রভৃতি এক নূতন তথ্যে ইহার সমাধান করিলেন। তাঁহাদের মতে পরমাণু-কোষের চারি পাশে একটি পোটেন্সিয়াল (potential) প্রাচীর আছে। যখন বিদ্যুতিনকে কণা কল্পনা করা যায় তখন উহা ঐ পোটেন্সিয়াল প্রাচীর লঙ্ঘন করিতে অসমর্থ—কিন্তু তরঙ্গ কল্পনা করিলে উহা অনায়াসে ঐ প্রাচীর ভেদ করিতে পারে। এই তথ্য অনুসারে কোনও বিদ্যুতিন কোষের মধ্যে থাকিতে পারে না। তবে কিরূপে খ-রশ্মির আবির্ভাব হয়? তখন নীল্ বোর বলিলেন যে বিদ্যুতিন কোষের মধ্যে অবস্থান করে না সত্য, কিন্তু তেজ বিকীরণের বিচূর্ণ-ক্রিয়াতে উহা সৃষ্টি হয়।

আবার আমরা আমাদের পূর্ব্ব আলোচনায় ফিরিয়া যাইব। পুনরাবৃত্তিক তালিকার পরমাণবিক ওজনের দিকে লক্ষ্য করিলে দেখা যায় যে অনেক উপাদানের পরমাণবিক ওজন পূর্ণসংখ্যা নহে—যথা, ম্যাগনেসিয়াম ২৪·৩২ ইত্যাদি। পরীক্ষাদ্বারা এই তথ্যের সত্যতা প্রমাণিত হইয়াছে। দুইটি পরমাণু-কোষের চার্জ্জ সমান কিন্তু বিভিন্ন। ইহাদিগকে ইংরেজীতে আইসোটোপ

(isotope) বলে, (গ্রীক ভাষায় isos অর্থে সমান; topos অর্থে জায়গা, স্থান—অর্থাৎ যে সমস্ত মূল উপাদান পুনরাবৃত্তিক তালিকায় সমান স্থান অধিকার করে)। কোনও রাসায়নিক পরীক্ষার দ্বারা ইহাদের বিভিন্নতা লক্ষ্য করিবার উপায় নাই। সর্ জে. জে. টমসন এবং অ্যাস্টনের বিশেষ পরীক্ষার ফলে ইহাদের ভরের বিভিন্নতা সুন্দর ভাবে প্রমাণিত হইয়াছে। দুইটি আইসোটোপের সংমিশ্রণে ঐরূপ খণ্ড পরমাণবিক ওজন অসম্ভব নহে।

হিসাবের ফলে দেখা গিয়াছে যে, যে-শক্তিদ্বারা পরমাণু-কোষ এইরূপে রহিয়াছে তাহা প্রচণ্ড। কিরূপ বলের সৃষ্টিতে এইরূপ সম্ভব হইয়াছে? এবং এই বলের প্রভাবে কিরূপে এতগুলি কণা এইটুকু জায়গার মধ্যে ভীড় করিয়া রহিয়াছে? পরমাণু-কোষের মধ্যে প্রোটনের সংখ্যা অধিক পরিমাণে থাকিয়া কেনই বা কোষকে ধনাত্মক করিয়াছে? ঋণাত্মক পরমাণু-কোষ কি সম্ভব নহে? অন্ততঃপক্ষে এমন পরমাণু-কোষ যাহার মধ্যে প্রোটন এবং বিদ্যুতিন সমান সংখ্যায় অবস্থিত?

বিজ্ঞান-জগতে কোনও কিছু মাপিতে কিংবা হিসাব করিতে গেলে একটি একক (unit) প্রয়োজন। এত দিন পর্য্যন্ত অম্লজান এবং জলজান পরমাণু-কোষ (প্রোটন) যথাক্রমে পরমাণবিক ওজন এবং পরমাণবিক গঠনের একক রূপে স্বীকৃত হইত। কারণ ধারণা ছিল যে জলজান এবং অম্লজান বুঝি খাঁটি পদার্থ। কিন্তু এই বিশ্বাসে আঘাত পড়িল যেদিন প্রমাণিত হইল যে জলজান এবং অম্লজান আইসোটোপ্‌সের সংমিশ্রণ। অন্যান্য মূল উপাদানের আইসোটোপ্‌সের ভরের মধ্যে যে বিভিন্নতা থাকে তাহা সামান্য—কিন্তু জলজানের অতিবিরল আইসোটোপের ভর সাধারণ জলজানের দ্বিগুণ। ইহার নাম দেওয়া হইল ভারী জলজান অথবা ডয়ট্রন (Deauteron)। (গ্রীক ভাষায় প্রোটন অর্থে প্রথম—ডয়ট্রন অর্থে দ্বিতীয়)। ইহার চার্জ এক এবং ভর দুই। ইহাকে সংক্ষেপে D বলা হয়। আমরা জানি যে জলজান এবং অম্লজানের দ্বারা জল গঠিত। যখন ভারী জলজান পাওয়া যায় তখন ভারী জলও নিশ্চয়ই পাওয়া সম্ভব। বাস্তবিকই এখন ভারী জলও পাওয়া যায়। ইউরে (Urey) বর্ণচ্ছত্র বিশ্লেষণপূর্ব্বক এই ভারী হাইড্রোজেনের অস্তিত্ব নিখুঁত ভাবে প্রতিষ্ঠা করিয়াছেন।

১৯১৯ খ্রীষ্টাব্দে রাদারফোর্ড নিউট্রনের (Neutron) অস্তিত্ব কল্পনা করিলেন। জগতে কল্পনা প্রথম পথ আঁকিয়া দিয়া যায়, পরে হয় সেই অনুসারে কাজ হয়। একথা বিজ্ঞানের ক্ষেত্রেও বার বার প্রমাণিত হইয়াছে। বোর-এর হাইড্রোজেন-পরমাণুর চিত্র-অনুসারে ধনাত্মক ভরের চতুর্দ্দিকে একটি বিদ্যুতিন অবিশ্রাম ঘুরিতেছে। যদি কোনও উপায়ে ইহা কোষের মধ্যে আসিয়া পড়ে তবে উহার চার্জ শূন্যে পরিণত হইবে, কিন্তু ভর সমানই থাকিবে—কারণ বিদ্যুতিনের ভর নগণ্য। ১৯৩১ সালে জার্ম্মানীর বোঠে এবং বেকার তেজোবিকীরণকারী পদার্থ পোলোনিয়ম একটি বেরিলিয়াম পাতের সংস্পর্শে রাখিয়া দেখাইলেন



কুরি-জোলিওর পরীক্ষা—প্যারাফিন হইতে প্রোটন নির্গত হইতেছে।

যে খুব বেগবান্ ক-রশ্মি বেরিলিয়ম-কোষের মধ্যে প্রবেশ পূর্ব্বক উহাকে চূর্ণ করে এবং একেবারে নূতন রশ্মি নির্গত করে। গাইগার পরীক্ষা করিলেন যে ঐ রশ্মি খুব পুরু

পদার্থও ভেদ করিতে সমর্থ—ইহার তরঙ্গান্তর গ-রশ্মির তরঙ্গান্তর অপেক্ষাও ক্ষুদ্র এবং প্রচণ্ড শক্তিসম্পন্ন। কুরি এবং জোলিও ঐ রশ্মিকে হাইড্রোজেন-সমন্বিত প্যারাফিনের মধ্য দিয়া প্রেরণ করিয়া দেখাইলেন, ইহা প্রোটন নির্গত করিতে সমর্থ। তাঁহাদের মতে কমপ্‌টন-এফেক্টের ন্যায় ইহা হাইড্রোজেন-কোষের সংঘাতে বেগ দান করে। এই রশ্মি পূর্ব্বাপেক্ষা শক্তিমান বলিয়া লক্ষিত হইল। এইরূপে বিভিন্ন পদার্থ অনুসারে ইহার শক্তির বিভিন্নতা লক্ষিত হইল। চ্যাড্‌উইক্‌ তখন এই সমস্যার মীমাংসা পূর্ব্বক দেখাইলেন যে বেরিলিয়াম-রশ্মি গ-রশ্মি নহে, উহা বিদ্যুৎহীন কণামাত্র—বিভিন্ন পরমাণু-কোষের সংঘাতে তাহাদের বেগ দান করে। ইহার ভর রাদারফোর্ডের পূর্ব্ব কল্পিত জল-জানের ভরের সমান বলিয়া প্রমাণিত হইল। ক-রশ্মি বেরিলিয়াম-কোষের ভিতর প্রবেশ পূর্ব্বক নিউট্রন নির্গত করে।

কিন্তু একটা বিষয়ে সকলেরই মনে একটু খট্‌কা বাধিল। ঋণাত্মক বিদ্যুতিনগুলির ভর এত কম অথচ ধনাত্মকের মধ্যে সর্ব্বাপেক্ষা ক্ষুদ্র যে প্রোটন তাহার ভর ১৮৩৬ গুণ হইল কিরূপে? তাহা হইলে কি ধনাত্মক-কণা আরও ক্ষুদ্র হওয়া সম্ভব? ১৯৩২ খ্রীষ্টাব্দে পৃথিবীর বিভিন্ন দেশ হইতে একই তথ্যের মীমাংসার ফল বাহির হইল। ঠিক ঋণাত্মক বিদ্যুতিনের ন্যায় এক প্রকার বিদ্যুতিনের অস্তিত্ব প্রমাণিত হইল যাহার ভর বিদ্যুতিনের ভরের সমান কিন্তু চার্জ ধনাত্মক। লেনিনগ্রাডের স্কোবেলজীন সৃজন-রশ্মি (cosmic ray) দ্বারা ইহা দেখাইতে সমর্থ হইয়াছিলেন। এই সৃজন-রশ্মি এক প্রকার রহস্যময় রশ্মি। এই জগতে কিছুই স্থির নাই; এমন কি মহাশূন্যও অস্থির। সুদূর নক্ষত্র হইতে আলোক-তরঙ্গ আসিয়া সমস্ত শূন্যকে অনবরত অস্থির করিয়া তুলিতেছে।

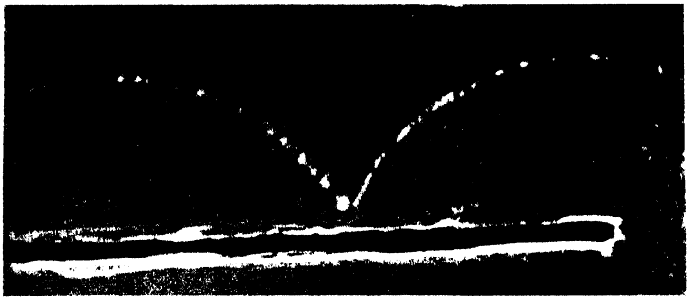
সূর্য্য হইতে অনবরত বিদ্যুতিন-রশ্মি নির্গত হইতেছে। এই বিদ্যুতিন রশ্মি যখন এই পৃথিবীর চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে আসিয়া পড়ে তখনই "অরোরা"র অদ্ভুত দৃশ্যের আবির্ভাব হয়। বাস্তবিক এই বিদ্যুতিন-রশ্মি পৃথিবীতে আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছায় না; বায়ুমণ্ডলের মধ্যে অন্য কোনও বস্তুর ভিতর দিয়া আসিবার সময় গ-রশ্মির ন্যায় এক প্রকার রশ্মি নির্গত করে, তাহাই আমাদের নিকট আসিয়া পৌঁছায়। প্রায় ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে কয়েক জন মার্কিন এবং য়ুরোপীয় বৈজ্ঞানিক বেলুনে চড়িয়া দেখিলেন যে একটি সুরক্ষিত বিদ্যুত-মাপ-যন্ত্র ক্রমশঃ ইহার বৈদ্যুতিক চার্জ হারাইয়া ফেলিতেছে।

স্কোবেলজীন এই সৃজন-রশ্মির আলোকচিত্র, খুব শক্তিশালী চৌম্বক ক্ষেত্রের মধ্যে রক্ষিত উইলসন-আধারের (Wilson-chamber) মধ্যে লইয়াছিলেন, এবং চিত্রে যে সমস্ত রেখা পাইয়াছিলেন সেগুলির বক্রতা এবং বিশেষত



মিলিকান

লক্ষ্য করিয়া কণার ভর এবং চার্জ পরিকল্পনা করা কঠিন নয়। কালিফোর্নিয়ার মিলিকান এবং এণ্ডারসন ও ইংলণ্ডের ব্ল্যাকেট অতি সহজ পরীক্ষা দ্বারা আরও গভীর ভাবে ইহার মীমাংসা করিতে আরম্ভ করিলেন। দুইটি শক্তিমান চৌম্বক মেরুর মধ্যে রক্ষিত একটি বায়বীয় পদার্থ-পূর্ণ আধারে (chamber) যখন সৃজন-রশ্মি সম্পাত করা হয় তখন এণ্ডারসন প্রথমে লক্ষ্য করিলেন, কয়েকটি রেখার বক্রতা, ঋণাত্মক বিদ্যুতিনের দ্বারা এত দিন যাহা লক্ষিত হইতেছিল তাহার বিপরীত। এণ্ডারসন ইহার নাম দিলেন ধনাত্মক বিদ্যুতিন (Positron)। অল্পদিনের মধ্যেই অন্য উপায়ে



তাম্রের দ্বারা প্রতিবিক্ষিপ্ত (Diffracted) রঞ্জন-রশ্মির আলোক চিত্র। লেখক-কর্ত্তৃক গৃহীত আলোকচিত্র

পজিট্রন উৎপন্ন করা সম্ভব হইল। যখন কোনও লঘু পদার্থ গ-রশ্মিদ্বারা আঘাত করা যায় তখন উইলসন-চেম্বারে বিদ্যুতিন-দ্বয়ের আবির্ভাব হয় এবং ইহাও বিশেষ ভাবে লক্ষিত হয় যে ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক বিদ্যুতিন একই স্থান হইতে নির্গত হইতেছে। এণ্ডারসন এবং কুরী প্রভৃতি দেখাইলেন যে এই দুইটি বিদ্যুত-কণার যুক্ত শক্তিমূল্য গ-রশ্মির শক্তির সমান। ব্ল্যাকেট বলিলেন যে গ-রশ্মি-কোষের অভ্যন্তরে প্রখর বৈদ্যুতিক এবং চৌম্বক ক্ষেত্রের প্রভাবে দুইটি বিপরীত চরিত্রের কণায় বিভক্ত হয়। একটি শক্তির পরিমাণ পদার্থে পরিণত হইল। আবার ইহার বিপরীত ব্যাপারও ঘটিতে দেখা গেল একটি ঋণাত্মক এবং ধনাত্মক কণা পরস্পরের সংঘাতে পরস্পরকে ধ্বংস করিয়া ফেলে এবং ইহার পরিবর্ত্তে এক প্রকার রশ্মি নির্গত হয়। তাহার নাম অ্যানিহিলেশন র‍্যাডিয়েশন (annihilation radiation)। পদার্থ ধ্বংস হইয়া শক্তিতে পরিণত হয় এবং শক্তির ধ্বংসের ফলে পদার্থের জন্ম হয়—এই সত্য আজ তত্ত্ব মাত্র নহে, একেবারে বৈজ্ঞানিক পরীক্ষা দ্বারা সুপ্রতিষ্ঠিত।

আলোচনা

শ্রাবণের প্রবাসীতে বিবিধ-প্রসঙ্গে যোগীন্দ্রনাথ সরকার সম্বন্ধে লিখিত বিষয়ে দুই একটি ভুল রহিয়াছে। মনস্বী কেশবচন্দ্র সেন মহাশয় ১৮০০ শকে সর্ব্বপ্রথম 'বালকবন্ধু' নামে শিশুদের জন্য একখানি পাক্ষিক পত্র প্রকাশ করেন। প্রায় ১২ বৎসর পরে উহা মাসিক পত্রিকারূপে প্রকাশিত হয়। 'সখা' নামক ছেলেদের মাসিকপত্র ১৮৮৩ খ্রীষ্টাব্দে প্রথম প্রকাশিত হয়। প্রমদা বাবু মাত্র দুই বৎসর উহার সম্পাদকতা করিতে পারিয়াছিলেন। তাঁহার মৃত্যুর পর ১৮৮৫ ও ১৮৮৬ এই দুই বৎসর কাল পর্য্যন্ত পণ্ডিত শিবনাথ শাস্ত্রী মহাশয় উহার সম্পাদক ছিলেন। অন্নদাচরণ সেন মহাশয় ১৮৮৭-১৮৯২ সন পর্য্যন্ত 'সখা' সম্পাদন করেন। শিশু-সাহিত্যের পাক্ষিক ও মাসিক পত্রিকার সম্পাদন সম্পর্কে কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের নাম সর্ব্বাগ্রে উল্লেখযোগ্য।

শ্রীসুধাংশু গুপ্ত

আমরা যাহা লিখিয়াছিলাম, তাহাতে "ভুল" কিছু আছে মনে করি না। তবে, উহা বাংলা শিশু-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস নহে, এবং পরলোকগত যোগীন্দ্রনাথ সরকারের সম্বন্ধে কিছু লিখিতে গিয়া শিশু-সাহিত্যের সম্পূর্ণ ইতিহাস লেখা আমাদের অভিপ্রেতও ছিল না, এবং তাহা লিখিবার প্রয়োজনও ছিল না। যোগীন্দ্র বাবুর ঠিক আগে কে কি করিয়াছিলেন তাহারই উল্লেখ মাত্র আমরা করিয়াছিলাম। ব্রহ্মানন্দ কেশবচন্দ্র সেন মহাশয়ের 'বালকবন্ধু' পত্রিকা সম্বন্ধে আমরা অনেক বার অনেক কথা বলিয়াছি। প্রবাসীর সম্পাদক।

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

২৯

রাত্রির অন্ধকারে একলা সুধার কাছে আপনার মনের কথা বলিয়া হৈমন্তী বুঝিতে পারে নাই দিনের আলোতে পাঁচ জনের সম্মুখে একথা ভাবিতে তাহার কি রকম লাগিবে। পরদিনই মিলির বিবাহ। চারিদিকে মহা ব্যস্ততা; হৈমন্তীও যে কিছু কম ব্যস্ত ছিল তাহা নয়।' কিন্তু আজ তাহার সুধা তপন মহেন্দ্র সকলের সম্বন্ধেই মনে একটা প্রবল সঙ্কোচ আসিয়া উপস্থিত হইয়াছে। ইচ্ছা করিতেছে বিবাহ-উৎসব ফেলিয়া দিন কতকের মত কোথাও পলাইয়া যায়। কিন্তু সে উপায় ত নাই। যথাসম্ভব দূরে দূরে থাকিয়াই কোন রকমে তাহাকে দিনটা কাটাইতে হইবে।

ছেলেদের অবস্থা ঠিক সে রকম না হইলেও সকলেই আগের দিনের তুলনায় একটু যেন সঙ্কুচিত। নিখিল তপনের নিকট সঙ্কুচিত, তপনও সুধা হৈমন্তীকে যথাসাধ্য এড়াইয়া চলিতেছে, পাছে নিখিল তাহার কোন ব্যবহার কি কথায় বিশেষ কিছু অর্থ ভাবিয়া বসে, পাছে সে মনে করে যে তপন তাড়াতাড়ি আপনার পথ পরিষ্কার করিয়া লইতেছে। মহেন্দ্রও রাগে এবং অভিমানে আজ কয়দিনই একটু বেশী গম্ভীর হইয়া থাকিতে চেষ্টা করিতেছে। সুধা ত মনে করিয়াছিল সকালবেলা উঠিয়াই সে বাড়ী চলিয়া যাইবে। সেখানে নির্জ্জনে নিজের মনের সঙ্গে যা-হয় একটা বোঝাপড়া তাহাকে সুরু করিতে হইবে। কিন্তু আজ মিলিদিদির বিবাহ। আজ বাড়ী চলিয়া গেলে লোকে তাহাকে বলিবে কি? সে কি কৈফিয়ৎ দিয়াই বা বাড়ী যাইতে পারে? বাড়ীতে অকস্মাৎ অঘটন ত কিছু ঘটে নাই। তাছাড়া এখানে সে আজ অনেক কাজের ভার লইয়াছিল, সে সব কাজই বা কাহার ঘাড়ে ফেলিয়া দিয়া যাওয়া যায়! তাহাকে আজ সকলের সঙ্গে মিলিয়া হাসিমুখেই সমস্ত কর্ত্তব্য ও আনন্দ-কোলাহলে যোগ দিতে হইবে। মনের একটা দিকে একেবারে চাবি বন্ধ করিয়া উৎসবের মাঝখানে তাহাকে নামিতেই হইবে।

কিন্তু একই বাড়ীতে যাহার সহিত প্রত্যেক কাজেই দেখা হইবে তাহাকে সম্পূর্ণ ভুলিয়া থাকিবে সে কি করিয়া? চোখ বুজিয়াও যাহাকে সুধা দেখিতে পায়, চোখের সম্মুখে তাহাকে দেখিয়া কে ভুলিয়া থাকিতে পারে? তপনের গ্রীক দেবতার মত সুন্দর মুখচ্ছবি তাহার মানস দর্পণে যে অঙ্কিত হইয়া গিয়াছে। তপন কি আশ্চর্য্য সুন্দর! সুধার মতই আর পাঁচ জনের যদি তপনকে ভাল লাগিয়া থাকে তাহাতে বিস্মিত হইবার কিছু নাই। সুন্দরকে কাহার না ভাল লাগে? মানুষ ত রূপের চাবি দিয়াই মানুষকে প্রথম যাচাই করে। পরিচয় পাইবার আগেই মানুষের চোখ অপরের একটা মূল্য নির্দ্ধারণ করিয়া রাখে ইহারই সাহায্যে। সুধাও কি তাহাই করিয়াছে? শুধু রূপের মোহেই কি সে এমন করিয়া আপনাকে জড়াইয়া ফেলিয়াছে? নিজের সম্বন্ধে একথা ভাবিতেও তাহার মাথা হেঁট হয়। যদি ইহা সত্য হয় তবে আপনার এ-মোহ সে চূর্ণ করিয়া চোখের জলের সহিত বিসর্জ্জন দিবে।

সুধা আপনাকে পরীক্ষা করিবার জন্য নীরবে আপনার মনেই নানা উপায় খুঁজিতে লাগিল। সে ভাবিতে চেষ্টা করিল যেন কোনও ভয়াবহ রোগে তপনের ঐ দেবকান্তি কালিমাময় হইয়া গিয়াছে, যেন আকস্মিক অগ্নির উৎপাতে তপনের মুখশ্রী আর মানুষের চিনিবার উপায় নাই। তখনও কি সুধা এমনই করিয়া ঐ বিগতশ্রী তপনের ধ্যান করিতে পারিবে? শঙ্কিত হইয়া সুধার মন যেন 'না' 'না' বলিয়া উঠিল। যে-তপন তপনই নয়, সম্পূর্ণ অন্য মানুষ, তাহাকে কি করিয়া সে অমন করিয়া ধ্যান করিতে পারে? কিন্তু তখনই লজ্জায় ধিক্কারে তাহার মন ভরিয়া উঠিল।

এই তাহার ভালবাসা? রূপের মুখোসটুকুকেই কি শুধু সে ভালবাসিয়াছিল, মুখোস খুলিয়া লইলেই আর সেদিকে ফিরিয়া তাকাইবে না? তবে তাহার এ ভালবাসার মূল্য কি?

কানে আসিয়া বাজিল জলকল্লোলের মত তপনের মধুর গম্ভীর কণ্ঠস্বর। সুধা ওই কণ্ঠস্বর কি ভুলিতে পারে? যদি পুড়িয়া ঝলসিয়া যায় ওই দেবকান্তি, যদি সুধার দুই চক্ষুও অন্ধ হইয়া যায়, তবু বুকের দরজায় আসিয়া আঘাত করিবে ওই পরিচিত কণ্ঠের মন-মাতানো স্বর। সুধা শুধু রূপ দেখিয়া মুগ্ধ হয় নাই। তাহা হইলে এত সহজেই রূপহীনতার ভয়কে কাটাইয়া উঠিতে পারিত না। মন প্রথম শাসনে শঙ্কিত হইয়াছিল বটে; কিন্তু পলকের মধ্যে সে ভয় কাটাইয়া উঠিতেছে কিরূপে? আপনার মনুষ্যত্বে সুধার বিশ্বাস আর একটুখানি দৃঢ় হইল, আপনার প্রতি অবজ্ঞা তাহার মন হইতে দূর হইয়া মনটা অনেকখানি হাল্কা বোধ হইল। তপনের কণ্ঠস্বরও যদি বিধাতা হরণ করিয়া লন, তবুও তপনকে সে ভুলিবে না, এ-কথা বলিবার যোগ্যতা যেন তাহার থাকে, মনে এই প্রার্থনা তাহার জাগিয়া উঠিল।

হৈমন্তীর প্রতি গভীর ভালবাসা ও মমতায় সুধা আপনার প্রেম বিশ্লেষণ করিয়া আপনাকে পরীক্ষা করিতে বসিয়াছিল। যদি তাহার প্রেমকে সে রূপের মোহ বলিয়া বুঝিতে পারে, তবে তখনই যেন হৈমন্তীর পথ উন্মুক্ত রাখিয়া দিয়া সে আপনি সরিয়া যাইতে পারে। কিন্তু পরীক্ষায় নামিয়া দেখিল আপনাকে ওই হীনপর্য্যায়ভুক্ত মনে করিতেই তাহার প্রেম যেন দ্বিগুণ বলীয়ান হইয়া উঠিতেছে। মানুষের রূপ-যৌবন দুদিনের, কিন্তু প্রেম অবিনাশী এ-কথা সে বহুবার পড়িয়াছে শুনিয়াছে, কিন্তু বয়োধর্ম্ম এ-কথা কখনও ভাবিবার ইচ্ছা কি অবসর তাহাকে দেয় নাই। আজ যেন প্রৌঢ়ত্বের তত্ত্বজ্ঞান তাহার মধ্যে জাগিয়া উঠিল—পুষ্পের সৌরভ ক্ষণিকের হইলেও অনন্তের কণা তাহার মধ্যে জাগিয়া আছে, ঝরা ফুল হারানো ফুলের স্মৃতির ভিতরেও সেই ক্ষণিক সৌরভ চিরদিন থাকে। মানুষের যে-রূপ আজ অতীতের গহ্বরে বিলীন হইয়া গিয়াছে, একদিন তাহা সত্য ছিল, তাহাকেই এই ধ্বংস-স্তূপের মধ্যে চিরদিন সত্য বলিয়া দেখিবে এ ক্ষমতা কেন তাহার থাকিবে না? তপনকে এমন করিয়া ভালবাসাতেই ত সুধার ভালবাসার গৌরব।

কিন্তু হৈমন্তী? সেও কি এমনই করিয়া ভালবাসে নাই! সুধার ভালবাসা পার্থিব অর্থে হৈমন্তীর দুঃখকামনা নয় কি? মানুষ ভালবাসার যে প্রতিদান চায়, পরস্পরের ভালবাসা পরস্পরকে জানাইবার নিবেদন করিবার যে চিরপুরাতন অপূর্ব্ব আনন্দটুকু চায়, তাহার ভিতর তৃতীয় ব্যক্তির স্থান নাই, তাহাতে ভাগ-বাঁটোয়ারা চালাইতে ত সে পারে না। কিন্তু বিধাতা যে তাহার ভাগ্যে তৃতীয় ব্যক্তিই লিখিয়াছেন। সুধা যদি সাধারণ মানুষের মত ভালবাসার আদান-প্রদানের আনন্দ কামনা করে তবে সে ত হৈমন্তীর দুঃখকামনাই করিতেছে। তপন সুধাকে ভালবাসুক এই ইচ্ছাই ত হৈমন্তীর দুঃখকামনা! হৈমন্তী সুধার মনের কথা জানে না, সে যদি আকুল আগ্রহে তপনকে চায়, তাহাকে পাইবার চেষ্টা আপ্রাণ করে, তবে তাহাকে প্রেমধর্ম্মের অনুকূল কামনাই বলিতে হইবে। কিন্তু সুধা যে হৈমন্তীর মনের কথা জানিয়াছে, সুধা যে এত দীর্ঘ দিন ধরিয়া হৈমন্তীকে এমন গভীরভাবে ভালবাসিয়াছে, সে যদি হৈমন্তীর মত কামনা করে, তবে আপনাকে যে অপরাধী মনে হয় আপন দেবতার নিকট। তপনকে আপনার অধিকারের গণ্ডী দিয়া ঘিরিয়া রাখিতে চাওয়া, তপনের কাছে যে কথা একদিন শুনিবার আশা সে করিয়াছিল সে কথা আর শুনিতে চাওয়া হৈমন্তীর মুখের দিকে চাহিয়া তাহাকে কি তবে ভুলিতে হইবে?

উৎসব-আয়োজনের মাঝখানে সুধার চোখে জল আসিল। মিলি তাহার জীবনের কঠিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইল শুধু ধৈর্য্যের জোরে, শুধু আপনার দৃঢ়চিত্ততার জোরে। হয়ত সুধাও একদিন পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইবে ধৈর্য্য ও দৃঢ়চিত্ততার জোরে। কিন্তু মিলির মত পুরস্কার কি তাহার জীবনে আসিবে? আজ ত তাহার পথ সে কোথাও দেখিতে পাইতেছে না। কেন বিধাতা তাহাকে এমন কঠিন পরীক্ষায় ফেলিলেন যাহাতে জীবনের প্রথম সুখস্বপ্নের মধ্যেই তাহাকে ত্যাগের মন্ত্র জপ করিতে হইবে? তাহার যে সোনার স্বপ্নের মধ্যে বিধাতার সৃষ্টির কি বিধানের

কোন অন্যথাচরণ নাই, কোন মানুষ কি জীবের অমঙ্গল কামনা নাই, তাহা এক মুহূর্ত্তে তাহারই মনের কাছে এমন অপরাধ হইয়া উঠিল কেন? কেন ইহা হইতে মুক্তির উপায় সে খুঁজিয়া পাইতেছে না?

শৈশবের স্বপ্নে একদিন যেমন সে তলাইয়া গিয়াছিল, তাহার এ যৌবন-স্বপ্নেও সে তেমনই করিয়া ডুবিয়া যাইবে বলিয়া কত মায়ায়, কত সাধে, কত রহস্যে ইহাকে সে অপূর্ব্ব করিয়া গড়িয়া তুলিতেছিল। এই প্রথম ধাপের পর হয়ত কত দীর্ঘ দিনের দীর্ঘ পথ পড়িয়াছিল বিস্ময়ে আনন্দে ও সৌন্দর্য্যে অপরূপ। কিন্তু মরীচিকার মত কোথায় মিলাইয়া যাইতেছে সে স্বপ্ন কাননের ছায়া?

তপনের মনে সুধা কি হৈমন্তী কাহারও সম্বন্ধে কোনও চিন্তা উঠিয়াছে কি না, জীবনে সঙ্গীর কোন প্রয়োজন কি আহ্বান সে অনুভব করিয়াছে কি না সুধা কিছুই জানে না। হইতে পারে সে এ-বিষয়ে কিছু ভাবে না, যদিও সুধার সে-কথা বিশ্বাস হয় না। তবে যাহার ধ্রুব প্রমাণ সে কিছু পায় নাই তাহা বিশ্বাস করিতে চেষ্টা করাই ভাল। হইতে পারে মহেন্দ্রের মত সেও ওই উপকথার রাজ-কন্যাটিকে দেখিয়া মুগ্ধ হইয়া ভালবাসিয়াছে। সুধা তাহা জানিবার জন্য ব্যগ্রতা দেখাইবে না। আপনি যখন তাহা সুধার নিকট প্রকাশ হইবে তখন ত সে জানিতেই পারিবে।

ভোরবেলা কখন বিছানা ছাড়িয়া হৈমন্তী চলিয়া গিয়াছিল, ভোরের সামান্য একটু ঘুমের মধ্যে সুধা তাহা জানিতে পারে নাই। সকালে বিছানা হইতে উঠিয়া এই সব চিন্তায় ঘরের বাহির হইতে তাহার দেরী হইয়া গিয়াছিল। তাড়াতাড়ি তৈয়ারী হইয়া লইয়া সে বাহির হইয়া পড়িল। হয়ত নীচে কাজকর্ম্ম সুরু হইয়া গিয়াছে, কত লোকজন আসিয়া পড়িয়াছে। হয়ত তপন নিখিলরাও আসিয়া কাজে লাগিয়াছে। সে সকলের চেয়ে দেরী করিয়া নীচে নামিলে লোকের কাছে বলিবে কি?

সকলেই কাজে ব্যস্ত দেখা গেল। কিন্তু আজ কেহ কাহারও সঙ্গে কথা বলিতেছে না। হৈমন্তী তরকারি কোটায় মোটেই অভ্যস্ত নয়। হয় লেখপড়ার কাজ, না-হয় ঘর সাজানো, এই দুইটার একটাতেই তাহার হাতযশ বেশী। কথা ছিল বাসরঘর সাজাইবার ভার সে লইবে, তাহার কথামতই ছেলেরা ঘর সাজাইবে। কিন্তু অকস্মাৎ সকালে উঠিয়া সে বলিল, "আমার অত হুড়োহুড়ির কাজ ভাল লাগছে না। আমি এক জায়গায় ব'সে তরকারি কুটি। স্নেহ এসেছে, ওর বেশ টেষ্ট আছে, ওই ঘর সাজাতে সাহায্য করতে পারবে।"

অগত্যা তপন স্নেহলতার সাহায্যেই ঘর সাজাইতে লাগিয়াছে। যতটা তাড়াতাড়ি সম্ভব কাজ সারিয়া সে চলিয়া যাইবে। আজ এ-বাড়ী বেশীক্ষণ সে থাকিবে না, সুরেশের বাড়ীতে বরযাত্রীর আদর-অভ্যর্থনার কাজেও তাহার প্রয়োজন আছে। সেখানে কাজ করিবার মানুষ বিশেষ কেহই নাই। এত দিন সকলে মিলিয়া মেয়ের বাড়ীর কাজে মাতিয়াছিল, একটা দিন অন্ততঃ কিছুক্ষণ বরের বাড়ীর কাজও করা দরকার। বিবাহ ব্যাপারে কন্যার স্থান যতই উপরে হউক, বরের অন্ততঃ সভা জাঁকাইয়া একবার আসার আয়োজন ত আছে।

সভায় চেয়ার সাজানো ও কার্পেট পাতার কাজে নিখিলের খুব যে প্রয়োজন ছিল তাহা নয়, কিন্তু সে গিয়া জুটিয়াছে সেইখানে। যত মুটের মাথা হইতে চেয়ার নামাইয়া ও কার্পেটের রোল খুলিয়া সে ঘর্ম্মাক্ত হইয়া উঠিয়াছে। হৈমন্তীদের গ্রামের আত্মীয় আর দুই-তিনটি ছেলে তাহার সহিত কাজে মাতিয়াছে; মানুষগুলি একেবারেই অচেনা বলিয়া নিখিলের সঙ্কুচিত ভাবটা অনেকখানিই এখানে কাটিয়া গিয়াছে।

মহেন্দ্র গিয়া সুরু করিয়াছে আহারের ঠাঁই করার কাজ। ছাত জুড়িয়া আসন পাতা, ফুটা গেলাস বাছিয়া ফেলা, ছোট ছেলেমেয়েরা ছেঁড়ান্যাকড়ায় করিয়া সব পাতা মুছিয়াছে কিনা তদারক করা, এই সব নানা কাজ। এখানে বেশীর ভাগই কুচোকাচার দল। সুধা আর সকলের অপেক্ষা মহেন্দ্রকেই আজ বেশী নিরাপদ মনে করিয়া এইখানেই গিয়া জুটিল।

কিছুক্ষণ দুই জনেই নীরবে কাজ করিল। তার পর মহেন্দ্রই নীরবতা ভঙ্গ করিয়া বলিল, "আপনাদের সভায় আমিই ছিলাম হংস মধ্যে বকো যথা, এবার ত আমি চললাম, আপনারা নিষ্কণ্টক হবেন।"

সুধা বলিল, "এরি মধ্যে আপনি আবার কোথায় চললেন?"

মহেন্দ্র বলিল, "আমি খুব শীগগিরই জার্মানী চলে যাচ্ছি। আগে মনে করেছিলাম কিছু দিন পরে গেলেও চলবে। এখন ভাবছি যত তাড়াতাড়ি যাওয়া যায় ততই ভাল। আপনার বন্ধুবান্ধবদের জানিয়ে দেবেন তাদের চক্ষুশূল কেউ আর থাকবে না।"

সুধা বলিল, "আপনি কি যে বলেন তার ঠিক নেই। আপনার সঙ্গে আমাদের কি ওই রকম সম্পর্ক? আমার ত কোন দিন তা মনে হয় নি।"

মহেন্দ্র বলিল, "আপনার না হতে পারে, আমারও এক সময় মনে হত না। কিন্তু এখন যতই দিন যাচ্ছে ততই সকলের হ্যাটিচুড দেখে তাই মনে হচ্ছে।"

দুঃখের ভিতরও সুধার হাসি আসিল। মহেন্দ্র "বন্ধু-বান্ধব, সকলে" ইত্যাদি সকল কথাতেই গৌরবে বহুবচন বসাইতেছে।

কাজ ফেলিয়া সে একবার ভাঁড়ার-ঘরের দিকে চলিল। হৈমন্তী তাহাকে এড়াইয়া চলিতেছে সুধা বুঝিয়াছিল, তবু মহেন্দ্র-বেচারার বিদায়বার্ত্তাটা তাহার নিজের মুখেই হৈমন্তীর শোনা উচিত মনে করিয়া সুধা তাহাকে একবার ছাদে ডাকিয়া আনিবে ঠিক করিল।

মস্ত বড় একটা পাকা কুমড়াকে দুইখানা করিবার চেষ্টায় হৈমন্তী তখন ব্যস্ত। পালিত-গৃহিণী তাহার কাজে বাধা দিতেছিলেন, কারণ স্ত্রীলোকের নাকি লাউ কুমড়া দুখানা করা শাস্ত্রে বারণ আছে। শাস্ত্রের কথা অমান্য করিবার জন্যই হৈমন্তীর জেদ বেশী।

সুধা আসিয়া বলিল, "একবারটি উপরে এস দেখি। ছাদে একটা কাজ আছে।"

কুমড়াটা তখনকার মত রাখিয়া হৈমন্তী সুধার পিছন পিছন চলিল। একবার সে জিজ্ঞাসুদৃষ্টিতে সুধার মুখের দিকে চাহিল, কিন্তু সুধা কোনই জবাব দিল না।

ছাদের দরজার পাশে চিলেকোঠায় মহেন্দ্র বড় বড় জালায় জল বোঝাই করাইতেছিল, উড়ে ভারীদের চীৎকার-চেঁচামেচিতে ছাদ তখন মুখরিত। অকস্মাৎ সুধা ও হৈমন্তীকে সেখানে দেখিয়া মহেন্দ্র কুঠরির বাহিরে বাহির হইয়া আসিল।

সুধা বলিল, "জালার ভিতর একটা ক'রে কর্পূরের ছোট পুঁটলি ফেলে রাখলে কেমন হয়? অনেকে বলে ওতে জল সুগন্ধিও হয়, আর জলের দোষও কেটে যায়।"

হৈমন্তী বলিল, "ভাল হয় বলেই ত আমারও মনে হচ্ছে।"

"আচ্ছা, দাঁড়াও আমি কিছু কর্পূর জোগাড় ক'রে আনি।" বলিয়া সুধা তখনই তাড়াতাড়ি সিঁড়ি দিয়া নামিয়া গেল।

সুধা চলিয়া যাইতেই মহেন্দ্র বলিল, "হৈমন্তী, তুমি সেদিন থেকে আমার সঙ্গে আর কথা বল না, আমার উপর তুমি খুব রাগ করেছ, না?"

হৈমন্তী বলিল, "রাগ কেন করব? রাগ আমি এক ফোঁটাও করি নি। আপনি কিছু অন্যায় কাজ ত আর করেন নি। আপনার সঙ্গে আমার যদি কোন বিষয়ে মতভেদ হয় তাতে কিছু রাগ করবার কারণ আছে ব'লে আমি মনে করি না।"

মহেন্দ্র হাসিয়া বলিল, "এটা ঠিক মতভেদ নয়। আমি তোমার দরজায় প্রার্থী হয়ে দাঁড়িয়েছিলাম, তুমি দরিদ্রের প্রার্থনা শুনতে রাজি নও এই তোমার আমার ঝগড়া। কিন্তু তা ব'লে আর কি এদিকে ফিরেও তাকাবে না?"

হৈমন্তী বলিল, "আপনার সব বাড়াবাড়ি কথা। আমি রোজই ত আপনার সঙ্গে কথা বলছি। কোন দিন কথা বলিনি বলুন।"

মহেন্দ্র বলিল, "হ্যাঁ বল বটে, পাঁচফোড়নের একফোড়নের মত। ওটা আমার সঙ্গে কথা বলাও যত আর ভেমো গোয়ালার সঙ্গে বলাও তত। আমি কানে তোমার গলার স্বরটা শুনতে পাই, এতে যদি আমার সঙ্গে কথা বলা হয় তবে নিশ্চয়ই বল।"

হৈমন্তী ম্লান হাসিয়া বলিল, "কি করব মহেন্দ্র-দা, আপনি আবার কিসে রাগ করে বসবেন; তাছাড়া ওইরকম সব কথার পর আমার কি রকম অপ্রস্তুত লাগে আগের মত বক্ বক্ করতে।"

মহেন্দ্র হঠাৎ কথার সুর বদলাইয়া বলিল, "হৈমন্তী, তুমি কি তোমার ভবিষ্যৎ ঠিক করে ফেলেছ? আমার এ কথা-টুকুর অন্তত ঠিক জবাব দিও।"

হৈমন্তী বলিল, "না, আমি কিছু ঠিক করে ফেলিনি। কোনদিন ঠিক করে ফেলব কি না তাও জানি না।"

মহেন্দ্র বলিল, "তবে আমি মনে একটু ক্ষীণ আশা রাখতে পারি না কি?"

হৈমন্তী বলিল, "একবার ত ওসব কথা হয়ে গিয়েছে মহেন্দ্র দা। আমার অনেক কাজ রয়েছে, আমি এখন নীচে যাই। আবার কেন মিথ্যা কথা কাটাকাটি ক'রে আপনাকে রাগাব?"

মহেন্দ্র বলিল, "না, তুমি এখন নীচে যাবে না। তোমাকে কয়েকটা কথা শুনে যেতেই হবে। তুমি আমার কথার জবাব দেবে না জানি, তবু আর একবার বলছি যদি আমার উপর বিন্দুমাত্র করুণাও তোমার হয়ে থাকে আমি চলে যাবার আগে আমায় সেটা জানতে দিও। আর এক মাসের মধ্যেই আমি দেশ ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তার ভিতর তোমার সঙ্গে দুই একদিনের বেশী বোধ হয় দেখাই হবে না। আমার দুরদৃষ্ট তার ভিতর প্রসন্ন হবে এমন আশা করি না। কিন্তু জেনো যতদিন তুমি নিতান্তই না পর হয়ে যাচ্ছ তত দিন যেখানেই থাকি না কেন তোমার আশা আমি ছেড়ে দেব না।"

হৈমন্তী বলিল, "আপনাকে কোনও কাজে কি চিন্তায় বাধা দেবার অধিকার ত আমার নেই, আমি আর কি বলব? আমি নিজেকে এমন মূল্যবান মনে করি না, যার জন্ম মিথ্যা আশায় আপনার মত মানুষের এত দীর্ঘকাল নষ্ট করা উচিত। আপনি বিদ্যালাভের আশায় বিদেশে যাচ্ছেন, বিদ্যা আপনার মনের এ-সব ক্ষোভ ভুলিয়ে দিক, এই প্রার্থনা করি।"

মহেন্দ্র বলিল, "তোমার শুভ্ উইশেসের জন্ম অনেক ধন্যবাদ। তবে আমার মনের ক্ষোভ আমার জিনিষ, আমি ভুলি না-ভুলি সে আমার ভাবনা। সে-বিষয়ে তোমার কোন সাহায্য আমি চাইছি না। একটা কথা তোমায় বলে রাখি, যদি ইচ্ছা হয় আমার এই অনুরোধটুকু রক্ষা ক'রো। আমি ত শীগগিরই চলে যাব, আমি চলে যাবার আগে কি পরে যদি তুমি নিজের সম্বন্ধে পাকা বন্দোবস্ত কিছু করে ফেল আমাকে দয়া করে জানিও। যত দিন তোমার কাছ থেকে খবর না পাব তোমার সম্বন্ধে দুরাশা আমার মন থেকে যাবে না।"

হৈমন্তী কিছুক্ষণ স্তব্ধ হইয়া থাকিয়া বলিল, "যদি জানবার মত কিছু ঘটে তবে জানাব। কিন্তু কেন আপনি বিশেষ করে ওই দিকে ঝোঁক দিচ্ছেন? আমি একলা কিছুকাল পৃথিবীতে বাস করতে কি পারি না?"

মহেন্দ্র বলিল, "তুমি করতে পার, তবে তোমাকে একলা না থাকতে দেবার লোক ঢের আছে।"

হৈমন্তী বলিল, "কে বলেছে আপনাকে এ-কথা?"

মহেন্দ্র বলিল, "কে আবার বলবে? আমি কি চোখে দেখতে পাই না? তপন নিখিল সকলেরই মনে ওই এক চিন্তা। আমি চলে গেলে ওদের পথ পরিষ্কার হবে।"

হৈমন্তীর বুকের ভিতর দুরু দুরু করিয়া কাঁপিয়া উঠিল। সে আপনাকে সামলাইয়া লইয়া শুধু বলিল, "আপনার মাথায় এতও আসে।"

মহেন্দ্র হৈমন্তীর আরও নিকটে সরিয়া আসিয়া বলিল, "না এসে উপায় কি হৈমন্তী? তুমি ছাড়া আমার যে দ্বিতীয় চিন্তা নেই। তোমাকে আমার চোখের উপর থেকে কে হরণ ক'রে নিয়ে যাবে তার খোঁজ আমি করব না ত কে করবে?"

হৈমন্তী চুপ করিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। মহেন্দ্র তাহার দুইটা হাত আপনার দুই মুঠার ভিতর চাপিয়া ধরিয়া বলিল, "হৈমন্তী, যদি মানুষের একাগ্রতার কি সাধনার কোনও মূল্য থাকে, তবে তোমাকে আমি আমার ক'রে পাবই, তুমি যতই কেন মুখ ফিরিয়ে সরে যাও না। আমি দূরে চলে যাচ্ছি, কিন্তু আমার সমস্ত মন এইখানে তোমাকে ঘিরে পড়ে থাকবে, তুমি অনুভব করবে, তুমি ভুলে যেতে পারবে না।"

হৈমন্তীর দুইখানা হাত মহেন্দ্রর হাতের ভিতর ঘামিয়া ও কাঁপিয়া উঠিল। সে ধীরে ধীরে হাত দুইখানা ছাড়াইয়া লইল।

৩০

উৎসব-সমারোহ শেষ হইয়া গিয়াছে। মিলি সুরেশ তাহাদের ক্ষুদ্র গৃহে নূতন সংসার পাতিয়াছে। তাহারা এখনও ঘর-সংসার গুছাইয়া উঠিতে পারে নাই। কিন্তু ইতিমধ্যেই একটা কর্ত্তব্যের দায়ে তাহাদের একটু ব্যস্ত

হইয়া উঠিতে হইয়াছে। মহেন্দ্র সত্যসত্যই দুই বৎসরের জন্ম জার্ম্মাণী চলিয়া যাইবে। মিলিদের বিবাহে যে কয়জন প্রাণপাত করিয়া পরিশ্রম করিয়াছিল, মহেন্দ্র তাহাদের মধ্যে এক জন। মহেন্দ্রকে বিদায়-বেলা একটু আদর অভ্যর্থনা করিয়া বাড়ীতে না ডাকিলে ভদ্রতা হয় না।

আজ মহেন্দ্রের বিদায় উপলক্ষ্যে সুরেশ তাহাদের ছোট দলটিকে নিজেদের বাড়ীতে ডাকিয়াছে। বাড়ীতে আসবাব খুব বেশী নাই, কাজেই ঘরের মেঝেতে ফরাস পাতিয়া বসিবার জায়গা করা হইয়াছে। হেলান দিয়া বসিবার জন্ম যথেষ্ট তাকিয়া নাই, মিলি আজ বিছানা হইতে মাথার বালিশ-গুলি তুলিয়া আনিয়া ফরাসের উপর সাজাইয়াছে। বাড়ীতে ট্রে মাত্র একটা, কিন্তু দানসামগ্রীতে বড় বড় থালা গোটা দুই পাওয়া গিয়াছে। সেই থালার উপরেই খাবারের রেকাবীগুলি সাজাইয়া খাবার পরিবেশন করা হইবে ঠিক হইল। মিলির হাতে একটা থালা সুরেশের হাতে আর একটি। রেকাবীগুলি কিন্তু কাঁসার পাওয়া যায় নাই, সেগুলি কাচেরই। তাহাদের জলখাবারের দুইখানা মাত্র কাঁসার রেকাবী আছে, তাহাতে পান মশলা সাজাইয়া টি-সেটের কাচের প্লেটগুলিই কাঁসার থালার উপর সাজান হইয়াছে। নিখিল বলিল, "তোমাদের ঘরের সাজসজ্জা সবই বেশ দেশী রকম হয়েছে, কেবল এই টি-সেটটা ছাড়া। এটা খাঁটি সাহেবের দোকান থেকে আমদানি।"

মিলি বলিল, "আমার পাথরবাটি জামবাটি সবই আছে, দিশী মতে তাতে চা দিতে পারতাম, কিন্তু খাবারগুলো ত হাতে হাতে তুলে দিতে পারি না; তাই দায়ে পড়ে বিলিতী সেটটাই বার করতে হল।"

নিখিল বলিল, "ফুলকাটা মাটির সরা পাওয়া যায়, তাইতে খাবার দিয়ে আর ষ্টেশনের হিন্দু চায়ের মত মাটির ভাঁড়ে চা দিলে কিছু মন্দ হ'ত না।"

মহেন্দ্র বলিল, "মানুষের স্বাস্থ্যের দিক দিয়ে দেখতে হ'লে ওইটাই সব চেয়ে ভাল প্রথা বলতে হবে। একবার উচ্ছিষ্ট বাসন আর না ব্যবহার করা এক মাটির জিনিষ ব্যবহার করলেই হয়।"

সুধা বলিল, "পাতার বাসন আরও ভাল। আমাদের দেশে পাতার থালা বাটি সবই লোকে ব্যবহার করে। এখানে শহরের মাঝখানে গাছই নেই ত পাতা কোথা থেকে আসবে?"

তপন বলিল, "গাছ নেই ব'লে পাতার অভাব আছে মনে করবেন না। বাজারে গেলেই যত পাতা চান কিনতে পাবেন। তবে আপনাদের দেশের মত শালপাতা নয়, কলার পাতা।"

হৈমন্তী বলিল, "পাতার বাসন, পাতার আসন দিয়ে একদিন পিকনিক করলে মন্দ হয় না।"

তপন বলিল, "দল যে রকম ছত্রভঙ্গ হয়ে গেল, এখন কি আর চট্ করে পিকনিক হবে?"

নিখিল হাসিয়া বলিল, "তা না হয় হৈমন্তী দেবীর গৃহ-প্রবেশের সময় আমরা সবাই পাতার বাসন গাঁথতে বসে যাব।"

হৈমন্তী বলিল, "অত সুদূর ভবিষ্যতের কথা না ভেবে সম্প্রতি একটা কিছু করবার ব্যবস্থা করলেই ত ভাল হয়।"

নিখিল বলিল, "যে রকম দিনকাল পড়েছে তাতে আপনাদের ভবিষ্যৎকে সুদূরপরাহত মনে করবার কোন কারণ দেখছি না।"

হৈমন্তী বলিল, "আচ্ছা, আপনি মস্ত ভবিষ্যদ্বক্তা হয়েছেন, আপনাকে আর বেশী ভবিষ্যদ্বাণী করতে হবে না।"

নিখিল তবুও হাসিয়া বলিল, "ডব্‌ল্-ব্যারেল্‌ড্ গানের সামনে পড়লে মানুষের প্রাণ আর কতক্ষণ টেঁকে? আপনি কি এতই বজ্রকঠিন?"

তপন ও মহেন্দ্র দুই জনেই নিখিলের দিকে কট্‌মট্ করিয়া তাকাইল। হৈমন্তী মুখ লাল করিয়া একবার তপনের দিকে চাহিয়া দেখিল। তপন তখন চোখ নামাইয়া মাটির দিকে চাহিয়া আছে। মহেন্দ্র গম্ভীর স্বরে বলিল, "সুরেশ-দা, তোমাদের প্রোগ্রামে এর চেয়ে ভাল আলোচ্য বিষয় কি কিছু নেই? যদি নিতান্তই কিছু না থাকে, না-হয় গ্রামোফোনটা বাজাও, যাবার আগে গোটা কয়েক ভাল গান শুনে যাই।"

মিলি বলিল, "গ্রামোফোনের গান শোনবার আগে কিছু আনারসের সরবৎ খেয়ে দেখুন, প্রোগ্রামে একটু বৈচিত্র্য অনুভব করতে পারেন।"

নিখিল ভরসা পাইয়া বলিল, "এমন ভাল জিনিষের কথা আগে বলেন নি কেন? তাহলে ব্রহ্মতেজে ভস্ম হবার সম্ভাবনাটা আমার একটু কমত।"

মিলি থালার উপর কতকগুলি কাল পাথরের উঁচু উঁচু বাটি বসাইয়া সরবৎ আনিয়া হাজির করিল। সুরেশ সেই সঙ্গেই তাহার পোর্টেবল্ গ্রামোফোনে রেকর্ড লাগাইয়া দিল,

"এ ভরা বাদর মাহ ভাদর, শূন্য মন্দির মোর—"

নিখিল চীৎকার করিয়া উঠিল, "সুরেশ-দা, কর কি, কর কি! এখুনি আদালতে তোমার নামে নালিশ রুজু হয়ে যাবে।"

সুরেশ বলিল, "এটা ত আমার 'অনারে' হচ্ছে না, তোমাদের জন্যেই হচ্ছে। তোমাদের তিন তিন জনের ভাবনার কাছে আমার একলার সুখদুঃখ অতি তুচ্ছ জিনিষ।"

মিলি বলিল, তার চেয়ে ওই গানটা দাও না—

"এমন দিনে তারে বলা যায়

এমন ঘন ঘোর বরিষায়—"

সুরেশ বলিল, "আচ্ছা, একে একে সবই হবে। যতগুলো বর্ষার গান আছে সব ক'টাই পরে পরে লাগিয়ে দেব।"

সরবৎ চা ও নিউমার্কেটের ডালমুটের সঙ্গে বহুক্ষণ গ্রামোফোন ও কণ্ঠসঙ্গীত চলিল। বহুদিন পরে যেন তাহাদের ছাদের সভা আবার সুরেশের ঘরে জাঁকিয়া উঠিল। মহেন্দ্র ইউরোপীয় স্ত্রী লইয়া দেশে ফিরিলে তাহাদের সভাকে কি রকম অবজ্ঞার চক্ষে দেখিবে তাহা লইয়া সুরেশ রসিকতার সূচনাও একবার করিয়াছিল, কিন্তু কাহারও নিকট উৎসাহ পাইল না।

তখন রাত্রি হইয়াছে। বাহিরে টিপ টিপ করিয়া একটানা বৃষ্টি হইয়া চলিয়াছে, কিন্তু ধারাবর্ষণ নাই। হৈমন্তী বলিল তাহার গাড়ীতে সে তাহাদের দলের সকলকে পৌঁছাইয়া দিতে পারে।

মহেন্দ্র ও তপন দুই জনেই সমস্বরে বলিল, "এইটুকু টিপটিপে বৃষ্টিতে গাড়ী চড়বার কিছু দরকার নেই। আমরা এমনই বেশ পাড়ি দিতে পারব। প্রায় সবটাই ত ট্রামে যাব, দুই-চার পা খালি হাঁটা।"

সুরেশ বলিল, "ওহে নিখিল, তুমি ত চিরকালের শিভালরাস জেণ্টলম্যান, এত রাত্রে বর্ষার দিনে ভদ্র মহিলাদের একলা ফেলে পালান তোমার উচিত নয়। তুমি না হয় যাও ওঁদের পৌঁছে দিয়ে এস।"

নিখিল বলিল, "আমায় হুকুম করলেই যাব। আমার ওতে মান্য বৃদ্ধিই হয়, হানি কিছু হয় না।"

মহেন্দ্র বলিল, "থাক্, এই সুযোগে নিজের দর কিছু বাড়িয়ে নিলে। তোমারই সুনাম থাক। সবাই মিলে গাড়ীতে ভিড় করলেও এখন ত আর আমাদের যশ হবে না।"

মহেন্দ্র ও তপন ছাতা মাথায় দিয়া বাহির হইয়া পড়িল। নিখিল সুধা ও হৈমন্তীর সঙ্গে গাড়ীতে উঠিল।

হৈমন্তীর গাড়ী, কাজেই সুধাকে আগে নামাইয়া দেওয়া ভদ্রতা। সুধাকে বাড়ীর দরজায় ছাতা ধরিয়া পৌঁছাইয়া দিয়া আসিয়া নিখিল বলিল, "এবার আপনাদের বাড়ী চলুন।"

হৈমন্তী বলিল, "আর আপনি?"

নিখিল বলিল, "আমি ত মস্ত লোক, আমার জন্যে আবার ভাবনা? আপনাকে নামিয়ে দিয়ে আমি সোজা দৌড় দিয়ে বাড়ী গিয়ে উঠব।"

হৈমন্তী তাহাতে রাজী হইল না। তখন ঠিক হইল হৈমন্তী নামিবার পর ঐ গাড়ীতেই নিখিল বাড়ী যাইবে।

গাড়ীতে নিখিল ও হৈমন্তী ছাড়া আর কেহ ছিল না। বর্ষার বিষণ্ণ রাত্রি। মানুষের মনে বাহিরের চেয়ে ভিতরের কথাই বেশী বড় হইয়া উঠে এমন সময়ে। হৈমন্তী ভাবিতেছিল আপনার অদৃষ্টচক্রের কথা। মন তাহাকে টানিতেছে এক দিকে, কিন্তু তাহার জন্য উদ্‌ভ্রান্ত হইয়া উঠিল আর এক জন। এই সমস্যার মাঝখানে আজ আবার নিখিল অকস্মাৎ নূতন কি একটা ঠাট্টা করিয়া বসিল। মহেন্দ্রও ত সেদিন এই ধরণেরই কথা বলিয়াছিল। হৈমন্তীকে একলা না থাকিতে দিবার লোকের নাকি অভাব নাই। তপন ও নিখিলেরও নাকি ওই একই চিন্তা। নিখিলের বিষয়ে কথাটা সম্পূর্ণই আন্দাজ বলিয়া মনে হয়। না হইলে সে নিজেই আবার হৈমন্তীকে ঠাট্টা করিবে কেন? কিন্তু মহেন্দ্র ও নিখিল দুই জনেই ত বলিতে চাহে যে

তপনেরও মন এই দিকে। নিখিলকে এ-বিষয়ে প্রশ্ন করা কি হৈমন্তীর উচিত? যদি নিখিল তাহাকে কিছু মনে করে? স্ত্রীলোকের পক্ষে এই জাতীয় প্রশ্ন করা ঠিক শালীনতার পর্য্যায়ে পড়ে কি না হৈমন্তী ঠিক করিতে পারিতেছিল না, অথচ তাহার মন অত্যন্ত চঞ্চল হইয়া উঠিয়াছিল নিখিলের ঠাট্টার কারণটা জানিবার জন্য। এ-কথাটা জানা তাহার নিতান্তই দরকার। যদি ইহা সত্য হয় তাহা হইলে শুধু যে হৈমন্তীর মনটা ঠাণ্ডা হইবে তাহা নয়, মহেন্দ্রকেও একথা স্পষ্ট করিয়া বলা হয়ত যাইবে। বেচারী মহেন্দ্র কেন দীর্ঘকাল ধরিয়া ওই ভাবনার পিছনে ঘুরিয়া মরিবে? হৈমন্তীও পথ খুঁজিয়া হায়রান হইয়া গেল কি করিয়া মহেন্দ্রর নিকট হইতে সে লুকাইতে পারে। দূর দেশে মহেন্দ্র যাইবে বটে, কিন্তু তাহাতেও সে হৈমন্তীকে নিষ্কৃতি দিবে না নিশ্চয়ই।

হৈমন্তী বলিয়া বসিল, "আপনি মিলিদির বাড়ীতে আমায় সকলের সামনে ওরকম ঠাট্টা কেন করছিলেন? বাইরের লোকও ত ছিল।"

নিখিল বলিল, "আমি ত কারুর নাম করি নি। আর মিথ্যে কথাও যে বলেছি তা মনে হয় না। তা থাকগে, আর ওসব কথা কখনও তুলব না, এবারকার মত আমায় মাপ করবেন। মহেন্দ্রর কথা আমি ধ্রুব সত্য ব'লে অবশ্য বলতে পারি না, কিন্তু তপনের বাড়ীতে আমি এ-কথা তাকে বলেছিলাম, সে ত অস্বীকার করে নি।"

হৈমন্তী একটু যেন বিরক্ত হইয়া বলিল, "এটা কি আপনাদের একটা আলোচনার বিষয়?"

নিখিল লজ্জিত হইয়া দুই হাত জোড় করিয়া বলিল, "না, না, সে কি কথা? সে কি কখনও হতে পারে? তপন আমার বিশেষ বন্ধু, আমি তার মন জানবার জন্যে একবার মাত্র এ-কথা বলেছিলাম। না হ'লে সে কখনও নিজে থেকে এ-কথা উচ্চারণ করে নি। তার বরং প্রতিজ্ঞাই আছে এ বিষয়ে কথায় কি ব্যবহারে কিছুকাল কোন মানুষের কাছেই সে কিছু প্রকাশ করবে না।"

হৈমন্তী আর কৌতূহল দেখাইতে পারিল না। যে আলোচনার জন্য নিখিলের প্রতি সে বিরক্ত হইতেছিল নিজেই তাহার সম্বন্ধে নানা প্রশ্ন করা তাহার অত্যন্তই অশোভন মনে হইল। কিন্তু তবু তাহার মনে এ প্রশ্ন জাগিতেছিল, নিখিলের মনে যদি এই কথাই আছে, তবে সে কাহারও কাছে কিছু প্রকাশ করিবে না কেন? যাহার কাছে প্রকাশ করাটা সকলের আগে স্বাভাবিক বলিয়া মনে হয়, সেও কেন বাদ যাইবে? নিখিলের কথা সত্য ত? মিথ্যা কথাই বা অকারণ কেন নিখিল বলিবে? হয়ত তপনের সকল কাজেই নিজস্ব এই রকম একটা ধরণ আছে। সে ত ঠিক সাধারণ আর পাঁচ জনের মত ব্যবহার কোন কাজেই করে না।

নিখিলের কথাকে সত্য বলিয়া গ্রহণ করিতে হৈমন্তীর মন আকুল হইয়া উঠিয়াছিল; সংশয়কে সে মনে স্থান দিতে পারিতেছিল না। পৃথিবীতে যাহা এত দেশে এত কালে সত্য হইয়া আসিয়াছে, তাহা তাহার বেলাই কেন সত্য হইবে না? একজনও স্পষ্ট করিয়া বলিবার আগে উভয়ে পরস্পরের প্রতি আকৃষ্ট হইয়াছে মানবপ্রেমের ইতিহাসে ইহা কি এমনই অভূতপূর্ব্ব ঘটনা? ইহাই ত স্বাভাবিক, ইহাকেই সত্য বলিয়া হৈমন্তী বিশ্বাস করিবে। সে ছেলেবেলায় বিলাতী আবহাওয়ায় মানুষ হইয়াছিল বলিয়া পুরুষজাতিকে যে রকম বিলাতী উপন্যাসের নায়কের মত মনে করে, বাঙালীর ঘরের স্বল্পবাক্ যুবক তপন সে রকম না হইতেই ত পারে। মনের কথা হৈমন্তীর কাছে প্রকাশ করিতে হয়ত তাহার অনেক দিন লাগিবে। কিন্তু হৈমন্তীর মনে তপনের প্রতি শ্রদ্ধা জন্মিলেও অভিমান হইল। নিখিলের কাছে এ-কথা স্বীকার করিবার তাহার কি প্রয়োজন ছিল? এই একটি কথা তাহার কি তপনের মুখে সর্ব্বপ্রথম শুনিবার অধিকার ছিল না? না-হয় সে দুই দিন পরে শুনিত, কিন্তু নিখিলের কাছে শোনার চেয়ে সে শোনার মূল্য যে অনেক বেশী ছিল। তপনের স্বাদেশিকতার আইনে কি বলে তপনই জানে, কিন্তু নিখিলের মাঝখানে আসিয়া পড়াটা হৈমন্তী কিছুতেই সহ্য করিতে পারিতেছে না।

ক্রমশঃ

ভক্তিধর্ম্মের বীজ ও বিকাশ

পণ্ডিত সীতানাথ তত্ত্বভূষণ

'প্রবাসী'র বিগত বৈশাখের সংখ্যায় "ঋষিকাহিনী ও ঋষিপন্থা" শীর্ষক প্রবন্ধে উপনিষদ ব্রহ্মর্ষি ও রাজর্ষিগণের আত্মজ্ঞান ও আত্মপ্রেমের মত যথাসাধ্য ব্যাখ্যা করেছি। তাতে আত্মপ্রেমের কথা অতি সংক্ষেপে বলা হয়েছে। এ-প্রবন্ধে সে বিষয় কিছু বিশেষভাবে বলব। বৃহদারণ্যক উপনিষদের "মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে" (২।৪ ও ৪।৫) আত্মপ্রেম সম্বন্ধে ব্রহ্মর্ষি যাজ্ঞবল্ক্য যা বলেছেন্ তাই ঐ উপনিষদের প্রথমাধ্যায় চতুর্থ ব্রাহ্মণে সংক্ষেপে বলা হয়েছে, যদিও সেখানে যাজ্ঞবল্ক্যের উল্লেখ নেই। শ্রুতিটি এই—

"তদেতৎ প্রেয়ঃ পুত্রাৎ প্রেয়ো বিত্তাৎ প্রেয়োঽন্যস্মাৎ সর্ব্বস্মাদ অন্তরতরং যদ অয়ম্ আত্মা। স যোঽন্যম্ আত্মনঃ প্রিয়ং ব্রুবাণং ব্রূয়াৎ প্রিয়ং রোৎস্যতীতীশ্বরো হ তথৈব স্যাৎ আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাসীত। স য আত্মানম্ এব প্রিয়ম্ উপাস্তে ন হাস্য প্রিয়ং প্রমায়ুকং ভবতি। (৮)

"এই যে অন্তরতর আত্মা, ইনি পুত্র অপেক্ষা প্রিয়, বিত্ত অপেক্ষা প্রিয়, এই সমুদায় অপেক্ষাই প্রিয়। যে ব্যক্তি আত্মা অপেক্ষা অন্য বস্তুকে প্রিয়তর বলিয়া মনে করে, তাহাকে যদি কোন (আত্মজ্ঞ) ব্যক্তি বলেন, 'তোমার প্রিয় বস্তু বিনাশপ্রাপ্ত হইবে' তিনি এপ্রকার বলিতে সমর্থ, এবং এই প্রকার ঘটিবেই। সুতরাং আত্মাকেই প্রিয়রূপে উপাসনা করিবে। যে আত্মাকে প্রিয়রূপে উপাসনা করে, তাহার প্রিয়বস্তু নিশ্চয়ই বিনাশপ্রাপ্ত হয় না"।

"মৈত্রেয়ী-ব্রাহ্মণে" এই আত্মপ্রেমতত্ত্ব কিছু বিস্তারিত আকারে ব্যাখ্যাত হয়েছে। যাজ্ঞবল্ক্য গৃহস্থাশ্রম পরিত্যাগ করতে ইচ্ছুক হয়ে তাঁর সম্পত্তি মৈত্রেয়ী ও কাত্যায়নী নাম্নী তাঁর দুই পত্নীর মধ্যে বিভাগ করে দেবার প্রস্তাব করলেন। মৈত্রেয়ী ছিলেন ব্রহ্মবাদিনী, কাত্যায়নী স্ত্রীপ্রজ্ঞা অর্থাৎ স্ত্রীলোকের বিশেষ জ্ঞাতব্য বিষয়ে অভিজ্ঞা। মৈত্রেয়ী নিজ প্রকৃতি অনুসারে স্বামীকে জিজ্ঞাসা করলেন, "ভগবন্, এই সমুদায় পৃথিবী যদি বিত্তদ্বারা পূর্ণ হয়, আমি কি তদ্দ্বারা অমর হইতে পারিব?" যাজ্ঞবল্ক্য বললেন, "না, উপকরণবান্ ব্যক্তিদিগের যেমন জীবন, তোমার জীবন সেই প্রকার হইবে। বিত্তদ্বারা অমৃতত্বের আশা নাই।" মৈত্রেয়ী বললেন,

"যেনাহং নামৃতা স্যাং কিমহং তেন কুর্য্যাম্? যদেব ভগবান্ বেদ তদেব মে ব্রূহীতি।"

—"যাহাদ্বারা আমি অমৃতা হইতে পারিব না, তাহাদ্বারা আমি কি করিব? ভগবান্ অমৃতত্ব সম্বন্ধে যাহা জানেন, তাহা আমাকে বলুন।"

ব্রহ্মর্ষি সন্ন্যাস অবলম্বন করতে প্রবৃত্ত। মনে হ'তে পারে যে তিনি ব্যক্তিগত প্রেমের অতীত। কিন্তু মৈত্রেয়ীর কথার উত্তরে তিনি যা বললেন তাতে দেখা যায় তাঁর হৃদয় পত্নীপ্রেমে পূর্ণ। তিনি মৈত্রেয়ীকে বললেন, "তুমি আমার প্রিয়াই ছিলে, (এখনও) প্রিয় বাক্যই বলিতেছ।" এই ব্রাহ্মণেরই দ্বিতীয় আকারে (৪।৫) তিনি বলছেন, "তুমি প্রিয়াই ছিলে, (এখন) প্রিয়ত্ব বর্দ্ধিত করলে।" এই ব'লে তিনি তাঁর প্রেমতত্ত্ব নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করলেন। এই তত্ত্বের সার কথা এই যে আত্মপ্রেমই মূল প্রেম, যেমন আত্মজ্ঞানই মূল জ্ঞান। আত্মা নিজেকে ভালবাসে, নিজের সুখ চায়, শ্রেয়ঃ চায়। যাতে নিজের সুখ ও শ্রেয়ঃ সাধিত হয়, এমন ব্যক্তি বা বস্তু চায় এবং এমন ব্যক্তি বা বস্তু পেলে তাকে ভালবাসে। এই তত্ত্ব যাজ্ঞবল্ক্য নানা দৃষ্টান্ত দিয়ে ব্যাখ্যা করছেন। তিনি বলছেন,—

"ন বা অরে পত্যুঃ কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি, আত্মনস্তু কামায় পতিঃ প্রিয়ো ভবতি। ন বা অরে জায়ায়ৈ কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি, আত্মনস্তু কামায় জায়া প্রিয়া ভবতি। ন বা অরে পুত্রাণাং কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় পুত্রাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে বিত্তস্য কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় বিত্তং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ব্রহ্মণঃ কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় ব্রহ্ম প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে ক্ষত্রস্য কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি আত্মনস্তু কামায় ক্ষত্রং প্রিয়ং ভবতি। ন বা অরে লোকানাং কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় লোকাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে দেবানাং কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় দেবাঃ প্রিয়া ভবন্তি। ন বা অরে ভূতানাং কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি, আত্মনস্তু কামায় ভূতানি প্রিয়াণি ভবন্তি। ন বা অরে সর্ব্বস্য কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি, আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি।"

—"অয়ি, পতির প্রতি প্রীতিবশতঃ পতি প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই পতি প্রিয় হয়। অয়ি, জায়ার প্রতি প্রীতিবশতঃ জায়া প্রিয়া হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই জায়া প্রিয়া হয়।" ইত্যাদি

এইরূপে পুত্র, বিত্ত, ব্রাহ্মণজাতি, ক্ষত্রিয়জাতি, স্বর্গাদি লোক, দেবতা, নানা প্রাণী, সর্ব্ববস্তু, এই সমস্ত এই সমস্তের প্রতি প্রীতি বশতঃ প্রিয় হয় না, আত্মপ্রীতির জন্যই, আত্মার সুখও শ্রেয়ের সাধনরূপেই, প্রিয় হয়। যে সকল বস্তু আত্মার বা শ্রেয় সাধনের উপযোগী বলিয়া বোধ হয় না, সে সকলের প্রতি প্রীতি আকৃষ্ট হয় না, বরঞ্চ ঘৃণা বা উপেক্ষাই হয়। কিন্তু আত্মজ্ঞান ও আত্মার সঙ্গে বিষয়ের সম্বন্ধজ্ঞান যতই স্পষ্ট ও উজ্জ্বল হয় ততই দেখা যায় কোনও ব্যক্তি বা বস্তুই আত্মার অতিরিক্ত নয় এবং আত্মসুখ ও আত্মশ্রেয়ের প্রতিকূল নয়। সুতরাং আত্মজ্ঞানের প্রসারের সঙ্গে সঙ্গে আত্মপ্রেমও প্রসারিত হয় এবং ক্রমশঃ "আত্মনস্তু কামায় সর্ব্বং প্রিয়ং ভবতি"—আত্মপ্রীতি বশতঃ সকলই প্রিয় হয়, কেহই ঘৃণার পাত্র থাকে না, "ততো ন বিজুগুপ্সতে"। (ঈশা ৬)। আত্মবিকাশের নিম্নাবস্থায় কেবল নিজ পরিবারের ব্যক্তিদিগকেই আপন মনে হয়। ক্রমশঃ নিজ বর্ণ, নিজ সম্প্রদায়, নিজ জাতি, নিজ দেশ, পর দেশ, সমগ্র মানবজাতি, প্রিয় হয়ে ওঠে। প্রেমের প্রসারের সঙ্গে প্রেমের সূক্ষ্মতা এবং গাঢ়তাও বাড়ে। প্রথমতঃ কেবল শারীরিক সুখ-স্বাস্থ্যই প্রিয় ব'লে বোধ হয়। ক্রমশঃ বিদ্যা, নৈতিক পবিত্রতা, নিঃস্বার্থ প্রেম, ভগবদ্-ভক্তি প্রভৃতি সূক্ষ্মতর, উচ্চতর বিষয়, প্রিয় হয়। অবশেষে একটি সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি বা মুক্তির আদর্শ জীবনব্যাপী সাধনের বিষয় হয়ে আত্মার সমক্ষে দণ্ডায়মান হয়।

এই তত্ত্ব সম্যকরূপে বুঝলে ব্রহ্মকে আর নির্বিষয়, নির্ব্বিশেষ, অচিন্তনীয়, অনির্ব্বচনীয় সত্তামাত্র ব'লে বোধ হয় না। তিনি যেমন অন্তরতম, তেমনি প্রিয়তম হয়ে দাঁড়ান। যে আত্মপ্রেম পরপ্রেমরূপে, বিশ্বপ্রেমরূপে, বিকশিত হয়, তা তো ব্রহ্মেরই নিজপ্রেম, ব্রহ্মেরই জীবপ্রেম। জ্ঞানে যেমন জ্ঞাতৃ-জ্ঞেয়ের, বিষয়-বিষয়ীর, ভেদাভেদ অবশ্যম্ভাবী, প্রেমে তেমনি প্রেমিক ও প্রেমপাত্রের ভেদাভেদ অবশ্যম্ভাবী। একান্ত অভেদ, একান্ত নির্ব্বিশেষ, যদি কোন বস্তু থাকতো, তবে তার সুখ, তার শ্রেয়ঃ, ব'লে কোন বস্তু থাকতো না। সুখ-সাধনের, শ্রেয়-সাধনের, ভিতরে ভেদাভেদ অবশ্যম্ভাবীরূপে বর্ত্তমান। সসীম জীব, যে নিজ সুখ, নিজ শ্রেয়ঃ সঙ্কল্প ক'রে সাধনের চেষ্টা ক'রে, া ভুলে যায়, এমন ভাবে ঘুমিয়ে যায় যে কার্য্যতঃ ক্তিত্ব কিছুই থাকে না, তার ভিতরে যদি সর্ব্বজ্ঞ, অ নিদ্র, চিরজাগ্রত, পূর্ণ প্রেমিক পুরুষ না থাকতেন, পুনরায় জাগত না, তার সঙ্কল্প পুনরায় স্মরণ সঙ্কল্পসাধনের চেষ্টা পুনরারব্ধ হ'ত না, সঙ্কল্প সাধিত ত না। আমাদের জীবনের প্রত্যেক ঘটনায় ব-ব্রহ্মের, পূর্ণ ও অপূর্ণের, ভেদাভেদ বর্ত্তমান। ভেদাভেদ-বোধ থাকাতেই আমাদের ধার্ম্মিকতা, আমাদের ধর্ম্মনিষ্ঠা, আমাদের আস্তিকতা; আর বোধ না থাকাতেই আমাদের ধর্ম্মহীনতা, নিষ্ঠাহীনতা, নাস্তিকতা।

'বিষ্ণুপুরাণ', 'ভাগবত' প্রভৃতি বেদান্তমূলক ভক্তিগ্র সমূহে উপনিষদ্-ব্যাখ্যাত আত্মপ্রেমকেই ভগবদ্-প্রীতি ও ভগবদ্-ভক্তিরূপে উপদেশ করা হয়েছে। কিন্তু এই আত্মপ্রেমকে যখনই নির্বিষয়, নির্ব্বিশেষ বলে ব্যাখ্যা করা হয়েছে, তখনই ইহা প্রকৃত প্রেমভক্তির আকার ছেড়ে নির্বিষয়, নির্ব্বিশেষ, অচিন্ত্য, অনির্ব্বচনীয় সত্তামাত্রে লীন হবার ইচ্ছারূপে প্রকাশ পেয়েছে, আর এই ইচ্ছাকে মুমুক্ষুত্ব, মুক্তির ইচ্ছা, রূপে ব্যাখ্যা করা হয়েছে। যে সকল পৌরাণিক বেদান্ত-ব্যাখ্যাতৃদিগের এই লয়বাদ বর্জ্জন ক'রে কার্য্যতঃ বেদান্তই বর্জ্জন করেছেন এবং প্রেমভক্তির সাধন সসীম মানুষেই আবদ্ধ রেখেছেন, তাঁদের হাতে প্রেমভক্তি বিকৃত আকার ধারণ ক'রে ব্যক্তিগত ও সামাজিক জীবনে প্রভূত অনিষ্ট সাধন করেছে। বৈদান্তিক ব্রহ্মবাদে স্পষ্ট ভেদাভেদ দর্শন ক'রে ইহাকে ভক্তিসাধনের ভিত্তি ক'লে উক্ত উভয়বিধ অনিষ্ট পরিহার করা যায়। বেদান্তমূলক ভেদাভেদবাদই প্রকৃতপক্ষে ভক্তিধর্ম্মের বীজ। এই বীজকে কর্ম্ম, প্রেম, জ্ঞান, রূপ সাধনত্রয়দ্বারা পোষণ করলেই ভক্তি পূর্ণরূপে বিকশিত হয়ে ব্যক্তিগত, জাতিগত ও অন্তর্জ জীবনকে সফল ও সার্থক করে। বিশুদ্ধ আত্মজ্ঞানে, আত্মপ্রেমে, যতই অগ্রসর হওয়া যায়, ততই ঈশ্বরকে হ'তে অধিকতর অন্তর, সুন্দর ও মধুর ব'লে অনুভূত এবং এই আন্তর্য্য, সৌন্দর্য্য ও মাধুর্য্য মানবপ্রেমে প্রসা য। ফলতঃ ঈশ্বরপ্রেম ও মানবপ্রেম মূলে একই সাধনক্ষেত্রে একে অন্যে চিরসঙ্গী, চিরসহায়।

পঞ্চশস্য

গঙ্গাফড়িং

কীটপতঙ্গাদি নিম্নশ্রেণীর প্রাণীদের মধ্যে গঙ্গাফড়িঙের মত এমন অদ্ভুত চালচলন ও শারীরিক গতিভঙ্গীবিশিষ্ট অপরূপ প্রাণী সহসা বড়-একটা নজরে পড়ে না। সাধারণ কীটপতঙ্গশ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত হইয়া ইহারা অভিব্যক্তির কোন্ ধারা অবলম্বনে এবং কিরূপ পারিপার্শ্বিক অবস্থার মধ্যে পড়িয়া বর্ত্তমান আকৃতি ও প্রকৃতি আয়ত্ত করিয়া লইয়াছিল তাহার ইতিহাস বিস্ময়োদ্দীপক হইবে সন্দেহ নাই। জীবজগতের ক্রমবিকাশের ধারা পর্য্যালোচনা করিলে দেখিতে পাওয়া যায়, আণুবীক্ষণিক আদি জীবেরা কেবল আহার-বিহারেই ব্যাপৃত থাকে। শত্রু কর্ত্তৃক আক্রান্ত হওয়ার আশঙ্কায় পূর্ব্বাহ্ণে আত্মরক্ষার প্রচেষ্টা তেমন কিছু দেখিতে পাওয়া যায় না। শত্রুর আক্রমণ স্পর্শেন্দ্রিয়-গোচর হইলে শরীর সঙ্কুচিত করিয়া প্রাণরক্ষার চেষ্টা করে মাত্র। দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাবই ইহার প্রধান কারণ হইতে পারে; কিন্তু সুনির্দ্দিষ্ট দর্শনেন্দ্রিয়ের অভাব হইলেও প্রকৃতপ্রস্তাবে দেখিতে পাওয়া যায় যে, ইহারা সর্ব্বদাই আলো-আঁধারের তারতম্য অথবা অস্তিত্ব অনুভব করিয়া থাকে। তথাপি উন্নতশ্রেণীর কৃমিকীটের মত ইহাদিগকে আত্মরক্ষার্থ তেমন সচেষ্ট দেখা যায় না। ইহাদের শত্রুর সংখ্যা যে কম, তাহাও বলা চলে না। সমজাতীয় শত্রু কম হইলেও অপেক্ষাকৃত উন্নতশ্রেণীর শত্রু অসংখ্য। তবে হয়ত ইহাদের বংশবৃদ্ধির হার ও সহজ উপায় এবং অপেক্ষাকৃত উন্নত জীবের উদরে প্রবেশ করিয়াও সময়ে সময়ে বংশবৃদ্ধি করিবার ক্ষমতা এই ত্রুটির পরিপূরক হইয়াছে। তার পর 'প্রোটোজোয়া' প্রভৃতি আর এক ধাপ উন্নত স্তরের জীবের বেলায়ও দেখিতে পাওয়া যায় যে, প্রকৃত-প্রস্তাবে আক্রান্ত না হইলে তাহারাও প্রতিক্রিয়ার কোন লক্ষণই প্রকাশ করে না; কিন্তু আক্রান্ত হইলে এক দিকে ছুটিয়া পলাইতে চেষ্টা করে। বিপদ এড়াইবার জন্য পূর্ব্বাহ্ণে স্থান ত্যাগ বা অন্য কোনরূপ আত্মরক্ষামূলক ব্যবস্থা অবলম্বন করিতে দেখা যায় না। এইরূপ যতই উন্নততর জীবের দিকে অগ্রসর হওয়া যায়, ততই দেখিতে পাওয়া যায় যে দর্শনেন্দ্রিয় অভিব্যক্ত হইয়া সুনির্দ্দিষ্ট স্থান গ্রহণ করিয়াছে এবং গতিবিধির স্বাধীনতা ও পরিধি যথেষ্ট বিস্তৃত হইয়াছে। সঙ্গে সঙ্গে দূর হইতে শত্রুর গতিবিধি টের পাইয়া, আক্রান্ত হইবার পূর্ব্বেই সাবধান হইবার উপায় অবলম্বন করিবার ব্যবস্থা করিয়াছে। কিন্তু এত দূর উন্নত হইলেও কীটপতঙ্গ প্রভৃতি অমেরুদণ্ডী প্রাণী কোন কোন বিষয়ে বুদ্ধিবৃত্তির উৎকর্ষের পরিচয় দিলেও ইহাদের শরীর ও অন্যান্য অঙ্গপ্রত্যঙ্গাদি এমন ভাবে গঠিত যে সম্মুখ দিকের বিপদআপদ বা শত্রুর গতিবিধি লক্ষ্য করিয়া পূর্ব্বাহ্ণে আত্মরক্ষার ব্যবস্থা করিতে পারে; কিন্তু পিছনে বা আশপাশের অবস্থা তদারক করিবার ক্ষমতা খুবই কম। কারণ কীট-পতঙ্গাদির চক্ষু বিভিন্ন ভাবে উন্নত ধরণে গঠিত হইলেও ইচ্ছামত ঘাড় বা মাথা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চারি দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করিবার শক্তি নাই। কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয়, সাধারণ কীটপতঙ্গ-শ্রেণীভুক্ত হইয়াও গঙ্গাফড়িং, মনুষ্য প্রভৃতি সর্ব্বোন্নত প্রাণীদের



সবুজ গঙ্গাফড়িং। শিকারান্বেষণে ব্যাপৃত।

গঙ্গাফড়িং ডানা মেলিয়া উড়িয়া যাইবার উপক্রম করিতেছে।

ন্যায় মাথা ও ঘাড় ঘুরাইয়া ফিরাইয়া এমন কি গলা বাড়াইয়া ও হেলাইয়া দোলাইয়া চতুর্দ্দিকের অবস্থা তদারক করিবার কৌশল আয়ত্ত করিয়া লইয়াছে। দূর হইতে আবছাগোছের কিছু একটা



তীরচিহ্নিত স্থানের ফড়িংটিকে শিকার করিবার জন্য সাঁড়াশি উদ্যত করিয়া গঙ্গাফড়িং প্রস্তুত।

পা বা হাত দুইখানি প্রসারিত করিয়া মাথা উঁচু করিয়া একদৃষ্টে চাহিয়া থাকে। বস্তুটা কি তাহা সম্যক্ উপলব্ধি করিতে না পারিলে—লম্বা কাঠির মত গলাটি হেলাইয়া দোলাইয়া এদিক ওদিক বেশ করিয়া দেখিবার চেষ্টা করে, কিন্তু পরিষ্কার ভাবে না বুঝিয়া সহসা নিকটস্থ হয় না। ইহাতেও সুবিধা না হইলে মাথাটি ঘুরাইয়া ফিরাইয়া চারি দিকের অবস্থা বিশেষ ভাবে তদন্ত করে। জিরাফের লম্বা গলা যেমন বহুদূর হইতে কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানের অবস্থা লক্ষ্য করিবার সহায়তা করে ইহাদেরও ঠিক তেমনি। সমগ্র শরীরের প্রায় অর্দ্ধেক লম্বা কাঠির মত গলা উঁচু করিয়া ইহারা জিরাফদের মতই দূর হইতে শিকার অথবা শত্রুর গতিবিধি পর্য্যবেক্ষণ করে। তখন ইহাদিগকে দেখিয়া মনে এক অদ্ভুত ভাবের উদয় হয়—নিম্নশ্রেণীর পতঙ্গ-জাতীয় প্রাণী বলিয়া কিছুতেই ধারণা করিতে প্রবৃত্তি হয় না।

পৃথিবীর প্রায় সকল দেশেই বিভিন্ন আকৃতির গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। সম্মুখের পা দুইখানি অনেকটা প্রার্থনারত মনুষ্যের যুক্ত-হস্তের মত ভাঁজ করিয়া রাখে বলিয়া সাধারণতঃ ইহারা "প্রার্থনারত ম্যাণ্টিস্" নামে অভিহিত হইয়া থাকে। এদেশে ইহাদিগকে গঙ্গা[illegible] বা গঙ্গাফড়িং বলিয়া থাকে। ফড়িঙের সঙ্গে ইহাদের [illegible] আকৃতির অনেকটা সামঞ্জস্য থাকিলেও গঙ্গাফড়িং নামের তাৎপর্য ঠিক বুঝা যায় না। পূর্ব্ববঙ্গের কোন কোন অঞ্চলে ইহাদিগকে "সাপের মাসী" বলিয়া থাকে এবং সাধারণ পতঙ্গ হইতে ভিন্ন ইহাদের অত্যদ্ভুত চালচলন দেখিয়া কতকটা ভীতিবিমিশ্রিত চোখে দেখে। সাপ যেমন ফণা তুলিয়া এদিক-ওদিক দুলিতে থাকে—ইহাদিগকেও ঠিক সেইরূপ দেখায়। বোধ হয় এই কারণেই 'সাপের মাসী' নামকরণ হইয়াছে।

পৃথিবীতে এপর্য্যন্ত প্রায় আট শতের উপর বিভিন্ন জাতীয়



গঙ্গাফড়িং শিকারটিকে সাঁড়াশি দ্বারা চাপিয়া ধরিয়া আহারের উদ্যোগ করিতেছে।



বামে, শুষ্কপত্র-অনুকরণকারী পুরুষ গঙ্গাফড়িং; দক্ষিণে, সবুজ, গঙ্গাফড়িং। উভয়ে দেখা হইবামাত্র লড়াই বাধিবার উপক্রম হইয়াছে।

দেখিতে পাইলেই যুক্তকরে প্রার্থনারত মানুষের মত সম্মুখের

গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। আমাদের দেশেই প্রায় বিশ-পঁচিশ রকমের বিভিন্ন শ্রেণীর গঙ্গাফড়িং দেখিতে পাওয়া যায়। তন্মধ্যে কচি কলাপাতার মত সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িংই সমধিক পরিচিত। এই প্রসঙ্গে আমরা সবুজ গঙ্গাফড়িঙের বিষয়ই আলোচনা করিতেছি। ইহারা প্রায় আড়াই হইতে তিন ইঞ্চি লম্বা হয়। ইহাদের দেহের আকৃতি অদ্ভুত; অন্যান্য সাধারণ ফড়িং বা পতঙ্গের মত নহে। পেটের দিক প্রায় দেড় ইঞ্চি লম্বা। সরু কাঠির মত গলাটিও এক ইঞ্চি দেড় ইঞ্চি লম্বা হয়। বড় বড় চোখওয়ালা ত্রিকোণাকার মস্তকটি যেন এই কাঠির মাথায় আলগাভাবে স্থাপিত রহিয়াছে। মাথার দুই পাশে শিঙের মত দুইটি শুঁড় আছে। কাঠির অগ্রভাগে মস্তকের ঠিক নিম্নেই এক জোড়া চ্যাপ্টা পা। এই পা-জোড়া বড়ই অদ্ভুত। উপরে নীচে করাতের দাঁতের মত সারবন্দীভাবে অনেকগুলি কাঁটা সজ্জিত। এই পা-জোড়া ঠিক সাঁড়াশির মত করিয়া হাতের কাজ করে। সর্বদাই দুইখানি পা জোড় করিয়া প্রার্থনার ভঙ্গীতে অবস্থান করে। পেটের সম্মুখভাগে বাকী চারখানি পা। ইহাদের গঠন সাধারণ কীট-পতঙ্গের পায়ের মত। প্রান্তভাগে সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বাঁকানো নখ আছে। এই চারিখানি পায়ের সাহায্যেই ইহারা লতাপাতার উপর চলাফেরা করে। সম্মুখের পা দুইখানির সাহায্যে শত্রুকে আক্রমণ শিকার ধরা বা আহার্য গলাধঃকরণ প্রভৃতি কাজ করিয়া থাকে। শিকার একবার এই সাঁড়াশির মত পায়ের কবলে পড়িলে আর পলাইবার উপায় থাকে না; তার পর শিকার মুখের কাছে লইয়া ঠিক হনুমানের মত ভঙ্গীতে ধীরে ধীরে ভক্ষণ করিয়া থাকে। ইহারা নানা জাতীয় ফড়িং, কীট-পতঙ্গ প্রভৃতি খাইয়া উজাড় করিয়া ফেলে। কোন কোন দেশে এমন গঙ্গাফড়িংও দেখিতে পাওয়া যায়, যাহারা ছোট ছোট পাখী, ব্যাং টিকটিকি প্রভৃতি ধরিয়া খাইয়া থাকে। এদেশীয় সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িংগুলি অপেক্ষাকৃত ছোট ছোট স্বজাতীয়দের খাইয়া থাকে। স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং সুবিধা পাইলে পুরুষদিগকে ধরিয়া খাইয়া ফেলে। ইহারা সাধারণতঃ লতাপাতার মধ্যে শিকার অন্বেষণে ঘুরিয়া বেড়ায়; প্রয়োজন বোধ করিলে ডানা মেলিয়া দূরতর স্থানে উড়িয়া যায়। ইহাদের গায়ের রং সবুজ লতাপাতার মধ্যে এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে, শত্রু কিংবা শিকার কেহই ইহাদিগের অস্তিত্ব টের পায় না। শিকার দেখিতে পাইলেই অতি সন্তর্পণে নিকটে আসিয়া সম্মুখের সাঁড়াশি উঁচাইয়া নিশ্চল ভাবে অবস্থান করে, এবং সুবিধামত আক্রমণ করিয়া সাঁড়াশি দিয়া চাপিয়া ধরিয়া ফেলে। এদেশীয় গঙ্গাইলাস্-গঙ্গাইলয়েডস্ ও সবুজ রঙের গঙ্গাফড়িংগুলি শিকার ধরিবার জন্য সময়ে সময়ে অদ্ভুত কৌশল অবলম্বন করিয়া থাকে। লতাপাতার গুচ্ছ বা পল্লবের উপর এমন ভাবে বসিয়া থাকে যেন এক জাতীয় ফুল বা কচিপাতার মত মনে হয়। মৃদু বাতাসে ফুল বা পাতাগুলি যেমন আস্তে আস্তে দোলে ইহারাও সেইরূপ গলা নাড়িয়া আস্তে আস্তে দোল খাইতে থাকে—অন্যান্য কীটপতঙ্গেরা ভ্রান্ত ধারণার বশবর্তী হইয়া এস্থানে অবতরণ করিবামাত্রই গঙ্গাফড়িঙের কবলে পড়িয়া প্রাণ হারায়। সাধারণতঃ গঙ্গাফড়িঙের অনুকরণশক্তি অত্যন্ত প্রবল এবং নিখুঁত। ব্রেজিল-দেশীয় এক জাতের গঙ্গাফড়িং উই ধরিয়া খায়, এজন্য তাহারা উইয়ের চেহারার অনুকরণ করিয়া থাকে। আমাদের দেশীয় সবুজ, কাল-ডোরাকাটা ও ধূসর রঙের গঙ্গাফড়িংকেও লতা-পাতার মধ্য হইতে চিনিয়া বাহির করা দুষ্কর। উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলের অনেক জাতীয় গঙ্গাফড়িংকে হাতে ধরিয়াও বুঝিতে পারা যায় না যে ইহারা শুষ্ক পত্র না জীবন্ত প্রাণী। এমনই ইহাদের দেহের কারিগরি যে দেখিলে অবাক হইয়া থাকিতে হয়। ছবিতে দেখা যাইতেছে এইরূপ এক জাতীয় পুরুষ-গঙ্গাফড়িংকে সবুজ গঙ্গাফড়িঙের নিকটে একই গাছে ছাড়িয়া দেওয়াতে লড়াই বাধিবার উপক্রম হইয়াছে। লড়াইয়ের ফলে অবশেষে গঙ্গাফড়িংটিকে সবুজ ফড়িংটির হাতে পড়িয়া প্রাণত্যাগ করিতে হইয়াছিল। আমাদের দেশে নালা, ডোবা ও পুকুরের মধ্যে অনেকটা গঙ্গাফড়িঙের অনুরূপ ধূসর রঙের এক জাতীয় পতঙ্গ দেখিতে পাওয়া যায়। ইহাদের মুখের সম্মুখে হাতের মত ভাঁজকরা দুইখানি সাঁড়াশি আছে; ইহার সাহায্যে তাহারা শিকার ধরে এবং গঙ্গাফড়িঙের মত ডানাও আছে—প্রয়োজন-মত এক জলাশয় হইতে অন্য জলাশয়ে উড়িয়া যাইতে পারে। শিকার ধরিবার কৌশলও ঠিক গঙ্গাফড়িঙের অনুরূপ। ইহাদিগকে অনেকে মেছো-গঙ্গাফড়িং বলিয়া থাকে। কারণ মাছই ইহাদের প্রধান শিকার।

স্ত্রী-গঙ্গাফড়িং সুপারির মত এক দিকে সরু একটি গুটীর মধ্যে ডিম পাড়িয়া তাহা গাছের ডালে আটকাইয়া রাখে। এক-একটা গুটীর মধ্যে ২৫।৩০ হইতে ৩০।৪০টা পর্যন্ত ডিম থাকে। সাধারণতঃ গ্রীষ্মের প্রারম্ভেই ডিম ফুটিয়া বাচ্চাগুলি গুটী হইতে বাহির হইয়া আসে। আকৃতি-প্রকৃতিতে বাচ্চাগুলিকে দেখিতে পরিণত বয়স্কদের মতই, কিন্তু ইহাদের ডানা থাকে না। আবদ্ধ স্থানে রাখিয়া ইহাদের ডিম ফুটাইয়া দেখিয়াছি—দলবদ্ধ ভাবে ইহাদের চালচলন ও গতিভঙ্গী অত্যন্ত কৌতূহলোদ্দীপক। আলিপুরের পশুশালায় নীল-গলাওয়ালা সারসগুলির গতিভঙ্গী বোধ হয় অনেকেই লক্ষ্য করিয়াছেন; কেহ এক দিক দিয়া অগ্রসর হইলেই উহারা সকলেই গলা বাড়াইয়া হেলিয়া দুলিয়া একসঙ্গে এক দিকে সরিয়া যায়। একটিতে যেরূপ করিবে অপরগুলিও ঠিক গড্ডলিকা-প্রবাহের মত সেইরূপই করিবে। এই গঙ্গাফড়িঙের বাচ্চাগুলিও ঠিক সেইরূপ—এক দিক দিয়া একটু ভয় দেখাইলে বা কোন কিছু আগাইয়া ধরিলে সারসগুলির মত গলা বাড়াইয়া ও হেলিয়া দুলিয়া দলবদ্ধভাবে অপর দিকে ছুটিয়া যায় এবং এক স্থানে জটলা করিয়া মাথা ও লম্বা গলা ঘুরাইয়া ফিরাইয়া অতি অদ্ভুত ভঙ্গীতে শত্রুর গতিবিধি পর্যবেক্ষণ করিতে থাকে। বায়স্কোপে আফ্রিকার জঙ্গলের জিরাফের দলকে যেরূপ ভাবে ছুটিতে দেখিয়াছি—গঙ্গাফড়িঙের বাচ্চাগুলির একযোগে পলায়ন দেখিতেও অনেকটা সেইরূপ।

গঙ্গাফড়িং সম্বন্ধে পৃথিবীর বিভিন্ন অঞ্চলে নানাবিধ অদ্ভুত ধারণা ও কুসংস্কার প্রচলিত আছে। প্রাচীন গ্রীকেরা ইহাদিগকে দৈবশক্তিসম্পন্ন এক অদ্ভুত প্রাণী মনে করিত। তুর্কী ও আরবীদের ধারণা যে ইহারা সর্বদাই মক্কার দিকে মুখ করিয়া প্রার্থনায় রত থাকে। ইহাদের অদ্ভুত আকৃতি-প্রকৃতি হইতেই এই সব নানাবিধ ধারণা সৃষ্টি হইয়াছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য

[এই প্রবন্ধের চিত্রগুলি লেখক কর্তৃক গৃহীত।]

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

(১)

রাত আটটার বেশী হয় নাই, কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ইহারই মধ্যে চারিদিক্ নিঝুম। মাঝে মাঝে কুকুরের ডাক বা দূরে শিয়ালের ডাক শোনা যায়, বা ঝিঁঝিঁপোকার ঝঙ্কার নীরবতার সাগরে মৃদু তরঙ্গ তুলিয়া যায়। কৃষ্ণপক্ষের রাত্রি, নিকষ কালো অন্ধকারের স্রোতে গ্রামখানি যেন নিশ্চিহ্ন হইয়া গিয়াছে। গৃহস্থবাড়ীতে কোথাও বা প্রদীপ জ্বলিতেছে, কোথাও বা ঘর আঁধার, সব কয়টি মানুষই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। শীতকাল, সন্ধ্যা হইতে-না-হইতে যাহা হউক কিছু খাইয়া, কাঁথা লেপ যাহার যা জুটিল তাহাই গায়ে দিয়া শুইয়া পড়িতে পারিলে সকলে বাঁচে। বড় শহর নয় যে দিনকে রাত করিয়া কোনও লাভ হইবে। দিনের বেলা অনেক কাজ থাকে, রাত্রে ঘুমানো ছাড়া আর যে কি করা যায় তাহা পাড়াগাঁয়ের লোক খুঁজিয়া পায় না। নিত্য আমোদ-প্রমোদের কোনও ব্যবস্থা এখানে নাই, নিতান্ত কাহারও বাড়ী বিবাহ, অন্নপ্রাশন বা পৈতা কিছু থাকিলে কয়েকটা দিন হৈচৈ করিয়া ইহাদের কাটে ভালই। পড়াশুনার অভ্যাস কাহারও বিশেষ নাই, সুতরাং অনর্থক তেল পোড়াইয়া লেখাপড়া করিতে কেহ তেমন বসে না। ওসব সখ যাহাদের আছে, তাহারা গ্রামে থাকিবে কোন্ দুঃখে? বড় বড় শহরগুলি তাহাদের জন্য পড়িয়া আছে। গ্রামের স্কুলে যাহারা পড়ে, তাহাদেরও রাত্রিতে পড়িবার প্রয়োজন পরীক্ষার আগের সপ্তাহ ছাড়া আর কোনও সময়েই হয় না।

তবু মল্লিকদের বাড়ীর বড় ঘরখানায় এখনও আলো জ্বলিতেছে। এই ঘরখানি এ-বাড়ীর মধ্যে সবচেয়ে বড় ও ভাল, আরও ছোট ছোট দুখানি ঘর আছে বটে, কিন্তু বিশেষ লোকজনের ঠেলাঠেলি না হইলে সেগুলিতে কেহ শুইতে যায় না। জিনিষপত্রে সর্ব্বদাই সেগুলি ঠাসা, কতক বা দরকারী জিনিষ, নিত্য ব্যবহার্য্য, কতক একেবারে অকেজো ভাঙাচোরা সাতকেলে পুরানো, তবু প্রাণ ধরিয়া গৃহস্থ সেগুলিকে বিদায় দিতে পারে নাই। সেগুলির সঙ্গে কত হারানো প্রিয়জনের, কত বিগত সুখের দিনের সহস্র স্মৃতি জড়িত। তাই তাহারা এখন ঘর জুড়িয়া আছে। বড় ঘরখানিতে মল্লিক-গৃহিণী সব কয়টি ছেলেমেয়ে লইয়া শয়ন করেন। কর্ত্তা নিতান্ত শীত বা বর্ষা পড়িলে তবে ঘরে ঢোকেন, ভিতরের দিকের দাওয়ায় তাহার তক্তাপোষখানি সদাসর্ব্বদা পাতা থাকে।

মৃণাল আলো জ্বালিয়া জিনিষ গুছাইতেছে। কাল দশটার গাড়ীতে তাহাকে কলিকাতা যাত্রা করিতে হইবে। পূজার ছুটি শেষ হইয়া গেল, তাহার স্কুল খুলিতে আর মাত্র দুই দিন দেরি। এবার পূজা পড়িয়াছিল কার্ত্তিকে, কাজেই ইহারই মধ্যে রীতিমত শীত দেখা দিয়াছে।

অনেক দিনের পুরানো রংচটা একটা ষ্টীল ট্রাঙ্কে মৃণাল নিজের বই খাতা, কাপড়চোপড় সব গুছাইয়া রাখিতেছিল। মামীমা তখন পাশের ঘরে কি যেন করিতেছেন, হাঁড়িকুঁড়ি নাড়ার শব্দ মাঝে মাঝে পাওয়া যাইতেছে। ছেলেমেয়ে চারিটিই ঘুমাইয়া পড়িয়াছে। ইহারা জাগিয়া থাকিলে কাহারও সাধ্য হয় না কোনও কাজ নিরিবিলিতে করিবার। গুছানো জিনিষ অগোছাল করিতে, জিনিষপত্র বাড়ীময় ছড়াইতে, প্রতি কাজে বাধা জন্মাইতে ইহারা অদ্বিতীয়। ছোট খোকা কানুকে তাহার মা কোমরে গামছা বাঁধিয়া তক্তাপোষের খুরার সহিত বাঁধিয়া রাখিয়া তবে রান্নাবান্নার কাজ করিতে পারেন। না হইলে তেলে ঘিয়ে মিশাইয়া, দুধের কড়া উল্টাইয়া ফেলিয়া, বাটনা লইয়া গায়ে মাখিয়া এবং তরকারির ডালা হইতে কাঁচা লঙ্কা তুলিয়া খাইয়া, সে বিধিমতে তাঁহাকে সাহায্য করিতে থাকে। তাহার বড় বোন দুটিও দুষ্টামিতে অদ্বিতীয়, তবে বেশী বাড়াবাড়ি

করিলে পিঠে দুই-চার ঘা বসাইয়া দিয়া তাহাদের বাড়ীর বাহির করিয়া দেওয়া যায়। ঘরের ভিতর যে দুরন্তপনা অসহ্য বোধ হয়, খোলা মাঠে, পুকুর-ঘাটে, জমিদারের পুরানো আমবাগানটায় তাহা দিব্য মানাইয়া যায়, কাহারও গায়ে তাহাতে ফোস্কা পড়ে না। টিনি আর চিনির হাত পা ছড়িয়া যায়, মাঝে মাঝে কাটিয়াও যায়, পরনের ডুরে শাড়ীতে অনেক জায়গায় খোঁচা লাগে, ধূলাকাদায় মাখামাখি হইয়া সেগুলি পরার অযোগ্যও হইয়া যায়, কিন্তু এ সব লইয়া কেহ মাথা ঘামাইতে বসে না। দুপুরবেলা মায়ের সঙ্গে পুকুরঘাটে গিয়া স্নান করিয়া তাহারা আবার বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন হইয়া আসে, কাদামাখা শাড়ীগুলিও মায়ের লক্ষ্মী-হস্তের স্পর্শ পাইয়া আবার শাদা ধবধবে হইয়া উঠে। টিনির বয়স হইবে বছর সাত, চিনি এখনও পাঁচের গণ্ডী পার হয় নাই। টিনির বড় ভাই গোপাল তাহার চেয়ে অনেক বড়, বছর চৌদ্দ তাহার বয়স হইবে। গ্রামের স্কুলের পড়া তাহার শেষ হইয়া গিয়াছে, বেলা আটটায় ভাত খাইয়া সে পাশের গ্রামের হাইস্কুলে পড়িতে যায়, বেলা একেবারে গড়াইয়া গেলে তবে ফিরিয়া আসে। গোপালের পর মল্লিক-গৃহিণীর যে-মেয়েটি হইয়াছিল, বাঁচিয়া থাকিলে সে এতদিনে বারো বৎসরের হইত।

মৃণাল মল্লিক-মহাশয়ের ছোট বোন শৈলজার মেয়ে। তাহার পাঁচ বৎসর বয়সে মা মারা গিয়াছে। বাবা মৃগাঙ্কমোহন বছর দুই পরেই আর একটি বিবাহ করিয়া বসিয়া, ভাঙা সংসার আবার পূর্ণ বিক্রমে জোড়া লাগাইতে সমর্থ হইয়াছেন। দ্বিতীয়া গৃহিণী অনেক ছেলেমেয়ের মা। মৃণালকে এই নূতন সংসারে মানায় না। নূতন মাও তাহাকে খুব বেশী সুনজরে দেখেন না।

মা মারা যাইবার পর সে মামার বাড়ীতেই মানুষ হইতেছিল। প্রবাদ-বাক্যের মামীর মত হুড়কা ঠ্যাঙা দিয়া মৃণালকে তাহার মামীমা আপ্যায়িত করিতেন না, বরং শান্তশিষ্ট বলিয়া এই মেয়েটির প্রতি তাঁহার একটা পক্ষপাতই ছিল। মৃণাল দেখিতে সুন্দরী নয়, অন্ততঃ বাঙালীর ঘরে তাহাকে কেহ সুন্দরী বলিত না, কারণ তাহার রংটা ছিল শ্যামবর্ণ। বিবাহের সময় মৃণাল যে আত্মীয়স্বজনকে অথৈ জলে ফেলিয়া দিবে এ-বিষয়ে সকলে একমত। তবু মামা মামী এই শ্যামবর্ণ মেয়েটিকে আন্তরিক স্নেহ করিতেন।

দ্বিতীয় বার বিবাহ করিবার পর মৃগাঙ্কমোহন চক্ষুলজ্জার খাতিরে একবার মৃণালকে লইয়া যাইতে আসিলেন। মৃণালকে পাঠাইতে মামা মামীর একেবারেই ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু যাহার মেয়ে সে যদি জোর করে তাহা হইলে তাঁহারা ধরিয়া রাখেন কি করিয়া? অনেকখানি ভয়মিশ্রিত কৌতূহল লইয়া মৃণাল তাহার বাবার সঙ্গে নূতন মায়ের সংসারে আসিয়া ঢুকিল।

সৎমা অবশ্য উপকথার সৎমার মত এক গ্রাসে সতীনঝিকে খাইয়া ফেলিতে চাহিলেন না, তবে খুব যে তুষ্ট হইলেন তাহাও নয়। যথেষ্ট বয়সে তাঁহার বিবাহ হইয়াছিল। আসিয়াই যাহাতে ঘরের গৃহিণী হইতে পারে সেই রকম বয়স্থা মেয়ে দেখিয়াই মৃগাঙ্ক বিবাহ করিয়াছিলেন। প্রিয়বালা আসিয়াই ঘর-সংসার বুঝিয়া লইলেন। বেশ সম্পন্ন সংসার, বাড়ীখানা মৃগাঙ্কের নিজের, অবশ্য পাকা-বাড়ী নয়। গোয়ালে গরু, মরাইয়ে ধান, ঘরের ভিতর জিনিষপত্র সবই আছে। তবে গৃহিণী-অভাবে সংসার বিশৃঙ্খল। সতীন যেন প্রিয়বালার জন্য সংসার পাতিয়া দিয়া চলিয়া গিয়াছে। প্রিয়বালা নিপুণ হাতে ঘরগৃহস্থালী সাজাইতে লাগিলেন। এ তাহার এক রকম ভালই হইল। অতি-দরিদ্র ঘরের মেয়ে তিনি। তাঁহার বাপ-মা এতই গরীব যে এই অতি সাধারণ গৃহস্থ ঘরে আসিয়া পড়িয়াই প্রিয়বালার মনে হইতে লাগিল কত যেন ধন-ঐশ্বর্য্যের ভাণ্ডারে আসিলেন। তাঁহার রূপ ছিল না, বিদ্যাও ছিল না। নিতান্ত দ্বিতীয় পক্ষের বিবাহ বলিয়াই মৃগাঙ্কমোহন অমন ঘরে বিবাহ করিলেন, না হইলে ফিরিয়াও তাকাইতেন না। তাঁহার আশা ছিল যে কৃতজ্ঞতার খাতিরে অন্ততঃ নূতন বৌ মৃণালকে একটু সুনজরে দেখিবেন।

কিন্তু "যে-বেটী সতীনে পড়ে, তারে বিধি ভিন্ন গড়ে।" মৃণালকে দেখিয়াই প্রিয়বালার মনে সুপ্ত সতীন-বিদ্বেষ জাগিয়া উঠিল। মৃণালের মা-ই এ-সংসার পাতিয়া গিয়াছেন, এখনও তাঁহার হাতের চিহ্ন এ-সংসার হইতে মুছিয়া যায় নাই। কত তৈজসপত্র, কত ছোট বড় জিনিষ,

তাঁহারই বিবাহের সময়কার পাওনা, এখনও সেগুলি নূতন রহিয়াছে। এ-সব দেখিয়া কি মৃগাঙ্ক দিনে দশ বার সেই হারানো গৃহলক্ষ্মীকে স্মরণ করেন না? ভাবিতেই প্রিয়বালার মনে যেন কাঁটা ফুটিয়া যাইত। খাইতে বসিয়া মনে হইত, এই থালা বাটি গেলাস, সবই ত সতীনের সঙ্গে আসিয়াছিল। শুইতে গিয়া মনে হইত, এই খাটেই শৈলজাও শুইতেন নিশ্চয়। নিজে বিবাহের সময় কিছুই পান নাই, শাঁখা-শাড়ী দিয়া তাঁহার পিতা কন্যাদায় হইতে অব্যাহতি পাইয়াছিলেন, তাহা না-হইলে প্রিয়বালা বোধ হয় এ-সব জিনিষে আগুন লাগাইয়া দিতেন। কিন্তু মনে যতই কাঁটা ফুটুক, এইগুলি দিয়াই তাঁহাকে নিজের সংসার গুছাইয়া পাতিতে হইল। ভালর মধ্যে ইহারা জড় পদার্থ, ইহাদের মুখে ভাষা নাই, চোখে দৃষ্টি নাই। কেহ যদি ইহাদের ভুলিতে চায়, ইহারা জোর করিয়া অতীতের স্মৃতি জাগাইয়া দেয় না। প্রিয়বালা জোর করিয়াই সব কথা ভুলিতে চেষ্টা করিতেছিলেন, স্বামীকেও আদর-যত্নে যতটা পারেন একেবারে নিজের করিয়া লইবার চেষ্টারও ত্রুটি ছিল না।

কিন্তু মৃণাল তাঁহার সংসারে একটা মূর্ত্তিমতী উৎপাতের মত আসিয়া উপস্থিত হইল। এ-যে মৃতা শৈলজার চোখ-মুখ গলার স্বর সব চুরি করিয়া লইয়া আসিয়াছে। নিজে কিছু নাই বলিল, কিন্তু কালো চোখের দৃষ্টিতে, গলার সুরে, হাত নাড়ার সুকুমার ভঙ্গীতে সে দিনে দশ বার করিয়া তাহার পিতাকে মনে পড়াইয়া দিতে লাগিল যে সে শৈলজার মেয়ে। প্রিয়বালা মনে মনে জ্বলিতে লাগিলেন। মৃণালকে মুখে কিছু বলিতে পারেন না, হাজার হউক সবে মাত্র তিনি এ-সংসারে আসিয়াছেন, তাঁহার দাবী আর কতটুকু? ইহার মা ত তবু পাঁচ-ছয় বৎসর স্বামীর ঘর করিয়া গিয়াছেন, সন্তানের জননীও হইয়া গিয়াছেন। মরিয়াও এখনও তিনিই জিতিয়া আছেন।

প্রিয়বালা মৃণালকে মুখে কিছু বলিলেন না বটে, তাহাকে খাইতেও দিতেন, লোকদেখানো যত্নও করিতেন, কিন্তু সংসারটা তাঁহার নিজের কাছে বিস্বাদ হইয়া গেল। তাঁহার খাইয়া সুখ নাই, শুইয়া সুখ নাই। চোখের দৃষ্টিতে মনের ঝাঁঝ যেন ঠিকরাইয়া পড়ে।

মৃগাঙ্ক ব্যাপার দেখিয়া দমিয়া গেলেন। দুই বৎসর একলা লক্ষ্মীছাড়া জীবন যাপন করিয়া তাঁহার অরুচি ধরিয়া গিয়াছিল। তাই বিবাহ করিয়াছিলেন, এবং আর কিছু না পান, আরাম পাইয়াছিলেন। শৈলজাকে বিবাহ করিয়া তাঁহাকে লইয়া প্রথম সংসার-রচনার যে অনির্ব্বচনীয় আনন্দ তিনি লাভ করিয়াছিলেন, এই দ্বিতীয়বার পাতা সংসারের মধ্যে, প্রিয়বালার সাহচর্য্যে সে আনন্দ অবশ্য তিনি প্রত্যাশা করেন নাই, পানও নাই। আরামটুকুর খাতিরেই তিনি নীচু ঘরে, অর্থের প্রত্যাশা না-রাখিয়াও বিবাহ করিয়াছিলেন।

নিশ্চিন্ত আরামের চেয়ে অধিক কাম্য তখন তাঁহার আর কিছুই ছিল না। সেই আরামই যদি টুটিয়া যায়, প্রিয়বালা যদি রাগ করিয়া সুক্তনিতে টক দিয়া দেন এবং উন্মনা হইয়া বিছানা ঝাড়িতে ভুলিয়া যান ও ভাল কথা বলিলেও ঝঙ্কার দিয়া উত্তর দেন, তাহা হইলে বিবাহ করিয়া আর লাভ হইল কি? তাহার চেয়ে মেয়ে যেমন মামার বাড়ীতে ছিল তাই না হয় থাক্। এমন ত নয় যে সেখানে কিছু অযত্ন হয়? মামা, মামী দুই জনেই তাহাকে যথেষ্ট স্নেহ করেন, তাঁহারা ত মৃণালকে এখানে পাঠাইতেই চান নাই। খরচও মৃগাঙ্ক দিতে রাজী, যদি মল্লিক-মশায় নিতে রাজী থাকেন। সারারাত ধূলাবালিভর্ত্তি বিছানায় শুইয়া, যত ঘুমের ব্যাঘাত হইতে লাগিল, ততই মেয়েকে অবিলম্বে মামার বাড়ী পাঠাইয়া দিবার সঙ্কল্প মৃগাঙ্কের মনে দৃঢ়তর হইতে লাগিল।

সকালে উঠিয়াই তিনি বলিলেন, "আমি বলি কি, খুকি তার মামার বাড়ীই থাকুক এখন কিছুদিন।"

প্রিয়বালাও ত তাই চান, কিন্তু তৎক্ষণাৎ রাজী হইয়া গেলে লোকে বলিবে কি? তাই বলিলেন, "এই সবে এল, দুদিন না থেকেই চ'লে যাবে? লোকে আমায়ই ত দুষবে, বলবে সৎমা-মাগী ঘরে ঢুকেই পর ক'রে দিলেক গা।"

মৃগাঙ্ক মনে মনে বলিলেন, "নিতান্ত মিথ্যা বলবে না," কিন্তু সুয়োরাণীর মুখের উপর আর সেকথা বলিতে তাঁহার সাহস হইল না। বলিলেন, "না, তা বলবে কেন? বলে ত বয়েই গেল। আমরা কারও খাইও না, পরিও না। খুকির একলা এখানে ভাল লাগে না, মামার বাড়ীতে ভাই বোনে মিশে বেশ থাকবে। তোমারও খাটুনি বাড়ে

ও থাকলে।" অতএব মৃণাল আবার ফিরিয়া চলিল। কিন্তু যাইবার সময় নিজের অজ্ঞাতে সৎমাকে আরও ভাল করিয়া চটাইয়া দিয়া গেল। শৈলজার পোষাকী কাপড়-চোপড়, আট গাছা সোনার চুড়ি, একটি হেঁসো হার, এক জোড়া অনন্ত আর কানের একজোড়া কানবালা, এই বাড়ীতেই একটি ছোট বাক্সে তোলা ছিল। সাবধানতার খাতিরে মৃগাঙ্ক আবার তাহা শুইবার ঘরে বড় আমকাঠের সিন্দুকটার ভিতর ঢুকাইয়া রাখিয়া দিয়াছিলেন। সিন্দুকের চাবি নূতন গৃহিণীর হাতে পড়িয়াছিল বটে, কিন্তু ছোট বাক্সের চাবিটা কর্ত্তা তাঁহার হাতে দেন নাই। প্রিয়বালা বুঝিতেন যে জিনিষগুলির উপর আইনতঃ তাঁহার কোনও অধিকার নাই, সতীনের মেয়ে যখন বাঁচিয়া আছে। কিন্তু বে-আইনী কাণ্ডও ত জগতে কম হয় না? তাঁহার প্রেমের বন্যায় ভাসিয়া গিয়া স্বামী হয়ত কোনদিন ঐ বাক্সটি তাঁহার হাতে তুলিয়া দিবেন, এ আশা তাঁহার মনে একেবারেই যে ছিল না তাহা বলা যায় না। কিন্তু মৃণাল যখন বিছানা কাপড় পুঁটুলি বাঁধিয়া গাড়ীতে উঠিয়া বসিল, তখন মৃগাঙ্ক সেই ছোট বাক্সটি হঠাৎ সিন্দুক হইতে বাহির করিয়া তাহার পাশে রাখিয়া দিলেন। বলিলেন, "খুব সাবধানে নিয়ে যাস্ মা, তোর মায়ের সব জিনিষ আছে ওর মধ্যে। গিয়ে মামীমার হাতে দিস্, তিনি তুলে রাখবেন।"

গরুর গাড়ী গ্রাম্য পথে ধূলা উড়াইয়া চলিতে লাগিল, মৃগাঙ্কও নিশ্চিন্ত হইয়া ঘরে ঢুকিলেন। মৃণাল সাগ্রহে পথ দেখিতে দেখিতে চলিল, কতক্ষণে পথটা যে শেষ হইবে কে জানে? মামার বাড়ী ফিরিয়া যাওয়ায় তাহার লেশমাত্র আপত্তি ছিল না। নূতন মায়ের সংসারে আসিয়া অবধি তাহার প্রাণ আইঢাই করিতেছিল। তাহার সমস্ত মন পড়িয়া ছিল মামার বাড়ীর দিকে। বাবা তাহার কাছে প্রায় অপরিচিতই ছিলেন, দুই জনের ভিতর ভালবাসার বন্ধনও বিশেষ দৃঢ় হয় নাই।

মামীমা সন্ধ্যার প্রদীপ জ্বালাইয়া তুলসীতলায় প্রণাম করিতেছেন এমন সময় মৃণাল ফিরিয়া আসিল। মামীমার কোলের খুকির মুখে তখন সবে ভাষা ফুটিয়াছে, সে কলরব তুলিল, "ডি ডি, আঃ আঃ।"

মামীমা আসিয়া মৃণালকে কোলের কাছে টানিয়া লইয়া বলিলেন, "হয়ে গেল বাপের বাড়ী বেড়ানো?"

মৃণাল ঝাঁকড়া চুল দোলাইয়া বলিল, "হুঁ"। তাহার পর ভাইবোনদের সঙ্গে খেলায় ভিড়িয়া গেল।

তাহার পর মৃণালকে আর কোনও দিন বাপের বাড়ী যাইতে হয় নাই, মৃগাঙ্কও আর তাহাকে ডাকেন নাই। প্রিয়বালার সংসারে এখন তাহারই পরিপূর্ণ দখল, অনেকগুলি ছেলেমেয়ে তাহার। এ-বাড়ীতে যে শৈলজার কন্যার আর কোনও স্থান নাই তাহা মৃগাঙ্ক ভাল করিয়াই বুঝিয়াছেন। জোর করিয়া এখন মৃণালকে এখানে জায়গা দিতে গেলে গৃহবিপ্লব বাধিয়া যাওয়া নিশ্চিত। তাহাতে মৃণালেরও সুখ হইবে না। কাজেই মৃণাল মামার বাড়ীতেই থাকিয়া গেল। বাবার কাছ হইতে মাসে মাসে কিছু খরচ পাইত, একেবারে পরের গলগ্রহ তাহাকে হইতে হইল না।

বছর দশ বয়স পর্য্যন্ত সে গ্রামেই ছিল। তাহার পর মৃগাঙ্কের নিকট হইতে অনুরোধ আসিল, মেয়েকে যেন কলিকাতার কোনও স্কুলে ভর্ত্তি করিয়া দেওয়া হয়, আজকাল-কার দিনে মেয়েছেলেরও লেখাপড়া শেখা বিশেষ দরকার। মৃগাঙ্ক অনেক ভাবিয়া এই সিদ্ধান্তে উপনীত হইয়াছিলেন। তিনি ধনী মানুষ নহেন এবং কন্যার সংখ্যা ক্রমেই বাড়িয়া চলিতেছে। টাকাকড়ি খরচ করিয়া কয় জনের বিবাহ দিতে পারিবেন কে জানে? একটাও যদি মানুষ হইয়া নিজের পথ নিজে করিয়া লইতে পারে ত মন্দ কি?

মৃণাল কাঁদিতে কাঁদিতে বোর্ডিঙে চলিল। কেন যে তাহার প্রতি এই দণ্ডবিধান হইল তাহা সে কিছুই বুঝিতে পারিল না। বৎসরের ভিতর যে দুই-তিন মাস মামার বাড়ী কাটাইতে পারিত, সেই মাস-কয়টির প্রত্যাশায় তাহার বৎসরের বাকি দিনগুলি কাটিয়া যাইত। ক্রমে সহিয়া গেল, অন্য মেয়েদের সঙ্গে ভাব হইল, রাজধানীতে বাস করার সুবিধার দিক্‌ও যে আছে তাহাও বুঝিল। তবু প্রাণের টান এখনও তাহার সেই শৈশবের লীলাভূমির প্রতি। এখনও ছুটির শেষে বোর্ডিঙে ফিরিতে তাহার কান্না পায়।

(২)

পাশের ঘরে মামীমার কাজ এতক্ষণ শেষ হইল। একটা বড় হাঁড়ি, মুখে তাহার পরিষ্কার ন্যাকড়া বাঁধা, ও একটা

বোতল হাতে করিয়া শুইবার ঘরে ফিরিয়া আসিলেন। মৃণাল পিছন ফিরিয়া তাকাইয়া বলিল, "ওতে কি মামীমা?"

মামীমা তাহার পাশে আসিয়া বসিয়া পড়িলেন, বলিলেন, "এবার আর বেশী কিছু ক'রে দিতে পারলাম না মা, যা জ্বালাতন করে খোকাটা। খানকতক চন্দ্রপুলি আর ক্ষীরের প্যাঁড়া দিলাম, খাস, আর এই বোতলটায় গাওয়া ঘি দিলাম, পাতে খেতে পারবি। কলকাতার খাওয়া খেয়ে মেয়ের যা ছিরি হচ্ছে, হাড় ক'খানা গোনা যায়। দেখি, বড়দিনের সময় যদি আনতে পারি।"

মৃণাল বিষণ্ণভাবে বলিল, "তখন কি আর বোর্ডিং থেকে ছাড়বে মামীমা? প্রাইজ আর স্পোর্টের জন্যে ধ'রে রাখতে চাইবে।"

মামীমা বলিলেন, "চিঠিপত্র লেখালেখি ক'রে দেখা যাবে তখন। দেড়টা মাস বই ত নয়, দেখতে দেখতে কেটে যাবে। ক'খানা কাপড় নিলি দেখি?"

মৃণাল বাক্স খুলিয়া উপরের বই খাতাগুলি উঠাইয়া ফেলিয়া কাপড়-জামাগুলি মামীমাকে দেখাইতে লাগিল। মামীমা বলিলেন, "মোটে দশখানা কাপড়, তাও সব আট-পৌরে, কোথাও যেতে-আসতে হ'লে কি পরবি? তোর সেই খয়েরী রঙের জামদানি শাড়ীটা কি হ'ল? বেশ ছিল কাপড়খানা, বেশী পুরনো ত নয়?"

মৃণাল বলিল, "প্রাইজের সময় গেল বছর সেটা নষ্ট হয়ে গেল যে মামীমা! মেয়েরা সবাই ঢের কাপড় দিয়েছিল ষ্টেজ সাজাতে, আমিও ওখানা দিয়েছিলাম। কে একরাশ কালি উল্টে ফেলে সেটার দফা সেরে দিলে।"

মামীমা বলিলেন, "তা বেশ; তারা সব শহুরে বড় মানুষের মেয়ে, তাদের ত ওসব গায়ে লাগে না? আমাদের যে কত কষ্ট ক'রে এক-একটা জিনিষ করতে হয়, তা ওরা বুঝবে কি ক'রে? তা এরকম ন্যাড়াবোঁচা হয়ে ত যাওয়া যায় না? আমার গরদের শাড়ীখানা দেব, নিয়ে যাবি?"

মৃণাল বলিল, "না মামীমা, তুমি তাহ'লে কোথাও যেতে-আসতে কি পরবে? তোমার ত আর নেই?"

মামীমা খানিক চুপ করিয়া রহিলেন, তাহার পর বলিলেন, "তাহ'লে এক কাজ কর্, তোর মায়ের বাক্সটা খুলে গোটা দুই শাড়ী বার ক'রে নিয়ে যা। ওগুলো তোরই ত পরবার কথা, বেশীদিন বাক্সে বন্ধ হয়ে প'ড়ে থাকলে নষ্ট হয়ে যাবে।"

মৃণাল বলিল, "ওগুলি নিয়ে পরতে কেমন যেন কষ্ট হয় মামীমা।"

মামীমা বলিলেন, "তা হোক, তুই পর্, তোর জন্যেই রেখে গেছে। তার আত্মাটা খুশী হবে। গহনা ক'খানাও তোর সঙ্গে দিয়ে দেব ভাবি, তার পর আবার মনে হয় বিয়ের জন্যে রেখে দিলেই ভাল। আমরা ত আর তখন বেশী কিছু দিতে পারব না, তোর বাপও বেশী হাত উপুড় করবে ব'লে মনে হয় না।"

মৃণাল নত মুখে বলিল, "ওসব এখন থাক, গয়না-টয়না স্কুলে তত কেউ পরে না।"

মামীমা সিন্দুকের ভিতর হইতে ছোট বাক্সটি বাহির করিয়া আনিলেন। আঁচলে-বাঁধা চাবির তাড়া হইতে বাছিয়া বাছিয়া একটা পুরাতন মরিচাপড়া চাবি বাহির করিয়া বাক্সটি খুলিয়া ফেলিলেন। বলিলেন, "দেখ্ কি নিবি, বেছে নে।"

বাক্সটি খুলিতেই ভিতর হইতে একটি মৃদু সৌরভ বাহির হইয়া আসিল। মৃণালের মনে হইতে লাগিল, তাহার পরলোকবাসিনী মাতার অঙ্গসৌরভই যেন তাঁহার পরিত্যক্ত পরিচ্ছদগুলি হইতে বাহির হইতেছে। মাকে তাহার মনে পড়ে না, শুধু একটা ছায়ামূর্ত্তি মধ্যে মধ্যে তাহার স্মৃতিতে ভাসিয়া উঠে, হয়ত সেটি মায়েরই ছবি। মামীমার কাছে শুনিয়াছে, মায়ের মুখ আর দেহের গঠন ভারি সুন্দর ছিল, অমন চোখ নাকি গ্রামে কাহারও ছিল না। রং অবশ্য ফরসা ছিল না।

বাক্সটিতে খান আট নয় শাড়ী, দুটি লেশ-বসানো জামা, রঙীন সেমিজ গোটা দুই তিন, তা ছাড়া টুকিটাকি আরও কয়েকটি সৌখীন জিনিষ। পল্লীযুবতীর বিশ বছরের জীবনের সঞ্চয়, কতই আর বেশী হইবে? একটি আধখালি এসেন্সের শিশি, ভিতরের এসেন্স জলের মত ফিকা হইয়া গিয়াছে, একটি তরল আলতার শিশি, একটি কাগজের মোড়ক, তাহাতে গোলাপী পাউডার। উহা শৈলবালার বিবাহের সময় কেনা। সিন্দুর-কৌটা দুইটি রহিয়াছে।

একটি লাল রং করা কাঠের, অন্যটি স্বামীর উপহার, রূপার। বড় একটি রূপার ডিবার ভিতরে তাহার গহনা কয়খানি রহিয়াছে। ডিবাটিও বিবাহের দানসামগ্রীর জিনিষ। গোটা দুই বই শৈলজা বিবাহে বা বৌভাতে উপহার পাইয়াছিল। সেগুলির পাতাও কাটা হয় নাই, যেমন আসিয়াছে তেমনই তোলা আছে। বাক্সের এক কোণে ন্যাকড়ায় বাঁধা কালজিরা, আর এক কোণে গুটি চার কর্পূরের দানা। কাপড়ে পোকামাকড় না লাগে তাহারই জন্য মামীমার এই ব্যবস্থা। সবার উপর পাট-করা একটি ফিকা সবুজ রঙের অল্পদামী শাল, সেটার স্থানে স্থানে ছিঁড়িয়া গিয়াছে।

মামীমা কাপড়গুলি হাত দিয়া নাড়িতে নাড়িতে বলিলেন, "ঠাকুরঝির বড় যত্ন ছিল জিনিষপত্রের; এমন গুছিয়ে রাখত যে দে'খে সুখ হ'ত। আমার আর ওর কত কাপড় একসঙ্গে কেনা হ'ত, আমারটা দু-দিন না যেতে যেতে বিচ্ছিরি হয়ে যেত, ওর খানা থাকত যেমনকে তেমন, পাট ভেঙে যে পরেছে তাও বোধ হ'ত না। নে, কোন্‌গুলো নিবি নে।"

মৃণাল কাপড়গুলি এক-একখানি করিয়া বাক্স হইতে বাহির করিয়া পাশে রাখিতে লাগিল। একখানি লাল বালুচরী শাড়ী, ইহা তাহার মায়ের বিবাহের কাপড়। লাল জমির উপর বড় বড় রেশমের ফুল তোলা। ফুলগুলি ফিকা সোনালী রঙের, আঁচলাটি বড়ই বাহারের, কত ছবিই যে নিপুণ কারিগর কাপড়ের গায়ে বুনিয়া দিয়াছে তাহার ঠিকানা নাই। ফুল আছে, বাগান আছে, বাঘ-সিংহ আছে, পাল্কি-বেহারা আছে। মৃণাল শিশুকালে এই শাড়ীখানি দেখিয়া বিস্ময়মুগ্ধ দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকিত। বারবার নরম রেশমের গায়ে হাত বুলাইয়া শাড়ীখানিকে সে আদর করিত। এমন স্নিগ্ধ রং, যেন দুই চক্ষু জুড়াইয়া যায়। আর ছবিগুলিই বা কি সুন্দর! কলিকাতা যাইবার পর কত রকম সুন্দর দামী শাড়ী দেখিয়াছে, কিন্তু এত সুন্দর তাহার চোখে আর কিছুই লাগে নাই। কাহারও কাছে মুখ ফুটিয়া সে একটি কথা বলে নাই, কিন্তু মনে মনে তাহার সঙ্কল্প ছিল, তাহার নিজের বিবাহ যদি কোনও দিন হয় তাহা হইলে এই শাড়ীখানি পরিয়াই যেন হয়।

আর একখানি হাল্কা নীল-রঙের পাসীশাড়ী মখমলের ফিতার উপর রেশমের কাজ-করা পাড় বসানো। এ-ধরণের শাড়ীর আজকাল বাংলা দেশে আর চলন নাই। মৃণালের এ-শাড়ীখানিও ভারি ভাল লাগিত। কলিকাতার মেয়েরা এই শাড়ী পরিলে নিশ্চয় তাহাকে ঠাট্টা করিবে, না হইলে মৃণাল কাপড়খানি লইয়া যাইত।

আর একখানি লালপেড়ে গরদ, ইহাও তাহার বয়সী মেয়েরা বিশেষ পরে না, গিন্নীবান্নী মানুষকেই উহা মানায়। তবু এই কাপড়খানিই মৃণাল নিজের বাক্সের ভিতর তুলিয়া লইল। ইহা পরিলে ক্লাসের মেয়েরা বড় জোর তাহাকে ঠাকুরমা বলিয়া ক্ষ্যাপাইবে, তাহার বেশী কিছু করিবে না।

আর একখানি সেই রকমই চওড়া পাড়ের তসরের শাড়ী, ইহা মৃণাল এবার রাখিয়া দিল, পরে কোনও সময় লইয়া যাইবে। আর দুখানি শান্তিপুরী শাড়ী, পাড়গুলি সুন্দর, তাহাই বাছিয়া বাহির করিয়া লইয়া সে বলিল, "এবার বাক্সটা বন্ধ ক'রে ফেল মামীমা, আর কাপড় চাই না। ঐ তিনখানা পোষাকী কাপড়েই আমার ঢের হবে। কোথায়ই বা আমি যাই?"

মামীমা ছোট বাক্সটিতে তালা বন্ধ করিয়া আবার তাহা সিন্দুকে তুলিলেন। একবার জিজ্ঞাসা করিলেন, "পাউডারটা নিবি? তোদের বোর্ডিঙের মেয়েরা মাখে না এ-সব?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "মাখবে না কেন মামীমা, খুব মাখে। এক-একজন এত মাখে যে মনে হয় যেন ময়দার বস্তা থেকে সবে বেরিয়েছে। আমার কিন্তু ভারি লজ্জা করে। যতই পাউডার মাখি, যে কেলে রং সেই কেলেই থেকে যাবে।"

মামীমা হাসিয়া বলিলেন, "তবে থাক্, নিস্ নে। ও সব শহরের মেয়েদেরই মানায়। তুই এতকাল কলকাতায় থেকেও শহুরে হ'তে পারলি না। সে-দিন মুখুজ্জে-গিন্নী বলছিল তার মেয়ে চিঠিতে লিখেছে, আজকাল কলকাতায় ভদ্রলোকের মেয়েরাও নাকি মুখে রং মেখে বেড়ায়।"

মৃণাল বলিল, "বেড়ায়ই ত, আমিই কত দেখেছি। আহা, যা ছিরি সব বেরোয়।"

মামীমা বলিলেন, "কালে কালে কতই হবে মা।

যাকৃগে, তুই এখন শো গিয়ে, অনেক ভোরে কাল উঠতে হবে।"

মৃণাল বাক্স বন্ধ করিয়া উঠিয়া পড়িল। ঘরের দুই দিকে দুইখানা বড় বড় খাট, তিন-চার জন করিয়া মানুষ এক-একটাতে বেশ শুইতে পারে। সম্প্রতি এখন এক খাটে শোয় মৃণাল, টিনি আর চিনি। অন্যটায় মামীমা গোপাল আর কানুকে লইয়া শয়ন করেন।

দু-খানা খাটেই মশারি টাঙানো, পাড়াগাঁয়ে মশার উৎপাত ত আছেই, তাহার উপর সাপেরও অভাব নাই, কাজেই মশারি বারো মাসই খাটানো থাকে। মামীমা বলিলেন, "নে তুই ঢুকে পড়, আমি মশারি গুঁজে দিচ্ছি। চিনির আবার যা পাতলা ঘুম, কানের কাছে একটা মশা ভন্‌ভন্ করলেই সে উঠে বসবে। না-হয় এমন পা ছুঁড়বে যে কাউকে আর ঘুমুতে হবে না।"

মৃণাল বিছানায় উঠিয়া পড়িল। জায়গার অভাব নাই, টিনি চিনি এক কোণে বিড়ালছানার মত পরস্পরকে আঁকড়াইয়া কুণ্ডলী পাকাইয়া আছে।

মামীমাও হারিকেন লণ্ঠনটা নিবাইয়া শুইয়া পড়িলেন। মৃণালের ঘুম আসিতেছিল না। আসন্ন বিচ্ছেদকাতর মনটা তাহার কেবলই ছটফট করিতেছিল। কিন্তু মামীমা সারাদিন খাটিয়া খুটিয়া শ্রান্ত হইয়া শুইয়াছেন, এখন বক্‌বক্ করিয়া তাঁহাকে জাগাইয়া রাখা ঠিক নয়। খানিক বাদে এ-পাশ ও-পাশ করিতে করিতে মৃণালও ঘুমাইয়া পড়িল।

ভোরের দিকে কেমন একটু শীত শীত করিতে লাগিল। চিনি গড়াইতে গড়াইতে মৃণালের কোলের কাছে আসিয়া তাহার আঁচল ধরিয়া টানাটানি করিতে লাগিল, সে গায়ে দিতে চায়। মৃণালের ঘুম ভাঙিয়া গেল, মাথার কাছে একখানা নক্সাকাটা কাঁথা ছিল, তাহাই টানিয়া আনিয়া সে বেশ করিয়া চিনির গায়ে জড়াইয়া দিল। চিনি আবার নিশ্চিন্তমনে ঘুমাইতে লাগিল। মৃণালের বালিশের তলায় একটা ইলেকট্রিক টর্চ্চ থাকিত, সেটা বাহির করিয়া পাশের টেবিলের উপর আলো ফেলিয়া দেখিল, পাঁচটা বাজিয়া গিয়াছে। ভোর হইতে আর দেরি নাই। উঠিয়া পড়িবে কিনা ভাবিতে লাগিল, এখন আবার ঘুমাইতে সুরু করিয়া লাভ নাই। কিন্তু শীতের রাত, লেপের মায়া সহজে ছাড়িতে ইচ্ছা করে না। শুধু শুধু অন্ধকার ঘরে জাগিয়া থাকিতেও ইচ্ছা করে না।

কিন্তু ইহারই মধ্যে মামীমারও ঘুম ভাঙিয়া গিয়াছে। তিনি ডাকিয়া জিজ্ঞাসা করিলেন, "মিনু উঠেছিস নাকি?"

মৃণাল বলিল, "উঠি নি, তবে জেগে আছি। যা শীত, আরও আধ ঘণ্টা খানেক পরে উঠব। সবে এখন পাঁচটা।"

মামীমা বলিলেন, "আচ্ছা তুই শো, আমি উঠি। দেখতে দেখতে সূয্যি উঠে যাবে, তোকে সকাল সকাল দুটো বেঁধে দিতে হবে ত? না খেয়ে ত আর যাওয়া হয় না? রাখী ছুঁড়িকে ভোরে আসতে বলেছিলাম আজ, এলে এখন বাঁচি।"

মামীমা বিছানা ছাড়িয়া নামিয়া পড়িলেন। মৃণালও বিছানায় উঠিয়া বসিয়া বলিল, "আমিও উঠলাম মামীমা, আমার আর শুতে ভাল লাগছে না।"

বাহিরে তখনও আকাশের গায়ে তারা ফুটিয়া আছে। মামাবাবুরও ঘুম ভাঙিয়াছে, তিনিও উঠিবার যোগাড় করিতেছেন। তাঁহার স্ত্রী তাঁহার সাড়া পাইয়া বলিলেন, "ধন্যি সহ্যি বাপু তোমার। এই দারুণ শীত, হাত পা যেন পেটের মধ্যে ঢুকে যাচ্ছে, কেমন ক'রে এই খোলা বারান্দায় শুয়ে থাক তাই ভাবি।"

মল্লিক-মহাশয় বিছানায় বসিয়া অন্ধকারে পা বাড়াইয়া চটি জুতা খুঁজিতেছিলেন, তিনি বলিলেন, "শীতে আমার কিছু এসে যায় না, কিন্তু আকাশ দেখতে না পেলে আমি বাঁচি না। বর্ষার দিন ক'টা আমার যে কি কষ্টে কাটে তা আর ব'লে কাজ নেই।"

মৃণাল বলিয়া উঠিল, "দিদিমাও এমনি ছিলেন, না মামাবাবু? তিনি ত ঘরে শুতেই পারতেন না? বৃষ্টির সময়ও না।"

মল্লিক-মহাশয় চটি পরিয়া উঠিয়া দাঁড়াইলেন, বলিলেন, "মায়ের জন্যে ত সব সময় একটা জানালার দু-একটা গরাদে কাটা থাকত, ঘরে শুলেও মাথাটা সেই ফাঁক দিয়ে বার ক'রে রাখতেন। তিনি মারা যাবার পর তোর মামীমা আবার সে জায়গাগুলো শিক বসিয়ে বন্ধ ক'রে দিয়েছেন।"

মামীমা বলিলেন, "যা বেরাল আর ভামের উৎপাত, বন্ধ না ক'রে করি কি? টিনি চিনিও ঠাকুরমার খাত

পেয়েছে খানিক খানিক, মশারির ভিতর কিছুতে শুতে চায় না।"

খিড়কির দরজার শিকলটা ঠিন্ ঠিন্ করিয়া বাজিয়া উঠিল। মামীমা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বলিলেন, "যাক্ রাধী এসেছে, বাঁচা গেল। আর কোনও কাজকে ডরাই নে বাছা, কিন্তু এই শীতের ভোরে ঘাটের কনকনে জলে নামতে আমার যেন রক্ত হিম হয়ে যায়।"

মল্লিক-মহাশয় উঠানে নামিয়া গিয়া দরজা খুলিয়া দিলেন। ভোরের অস্পষ্ট আলো তখন সবে জমাট অন্ধকারকে একটুখানি তরল করিয়া আনিতেছে। দেখা গেল, দুইটি নারীমূর্ত্তি আপাদমস্তক চাদর মুড়ি দিয়া বাহিরে দাঁড়াইয়া আছে। মল্লিক-মহাশয় লণ্ঠনটা হাতে করিয়া বাহির হইয়া গেলেন, স্ত্রীলোক দুইটি ভিতরে ঢুকিয়া আসিল।

মামীমা বলিলেন, "রাধীর মাও এসেছিস্ দেখি।"

রাধীর মা বুড়ী বলিল, "রেতেভিতে মেয়াটারে একলা ছাড়ি ক্যাম্‌নে মা ঠাকরুন্? শিয়াল দেখে উ বড় ডরায়, তাই সাথে এলাম।"

মামীমা বলিলেন, "তা বেশ করেছিস, নে-এঁটো সকড়ি বাসনগুলো উঠিয়ে নে। আমি কাপড় ছে'ড়ে উনুনটা ধরাই।"

শাশুড়ী বাঁচিয়া থাকিতে শীতকালে তাঁহার কি কষ্টটাই যাইত, মনে করিয়া গৃহিণীর হাসি আসিল। স্নান না সারিয়া ভাঁড়ার বা রান্নাঘরের ত্রিসীমানায় যাইবার জো ছিল না। শাশুড়ী এমনই মন্দ মানুষ ছিলেন না, কিন্তু আচারনিষ্ঠা ও শুচিবাই বড়ই বেশী ছিল তাঁহার। মামীমাকে একরাশ চুল লইয়া ভোরেই ডুব দিতে হইত বড় পুকুরে, আর ঘোমটার অন্তরালে সারাদিন সে চুলের কাঁড়ি শুকাইতও না, সেও এক কম জ্বালাতন ছিল না। এক-এক সময় রাগ করিয়া কাঁচি হাতে লইয়া বলিতেন, "দেব একেবারে এ জঞ্জাল শেষ ক'রে।" কিন্তু স্বামীর নির্ব্বন্ধাতিশয্যে তাহা কোনও দিনই করা হয় নাই। স্বামী বারণ না করিলেও তিনি কত দূর যে চুল কাটিতেন সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল, কারণ সধবা-মানুষের এমন কাণ্ড করা যে অতি অলক্ষণ, সে জ্ঞানের তাঁহার অভাব ছিল না।

রাধী ও রাধীর মা বাসন তুলিয়া লইয়া চলিয়া গেল। মামীমা বাসি কাপড় ছাড়িয়া রান্নাঘরে ঢুকিয়া গেলেন। মৃণাল বারান্দায় উদ্দেশ্যবিহীন ভাবে ঘুরিতে লাগিল।

অন্ধকার কাটিয়া গিয়াছে, পূর্ব্বদিকের আকাশে মুক্তার ন্যায় টলটলে স্বচ্ছতা ক্রমে আগুনের রঙে রাঙিয়া উঠিতেছে। এমন সুন্দর সকাল কলিকাতায় কেন হয় না? পাঁচতলা চারিতলা বাড়ীর আড়ালে সূর্য্যোদয় কোথায় হারাইয়া যায়, কেহ বুঝিতে পারে না। বুঝিতে চায়ও না বোধ হয়। কলিকাতায় দিনকে রাত ও রাতকে দিন করাই ত আভিজাত্যের লক্ষণ। সেখানে যে যত বেলা অবধি ঘুমাইয়া থাকিতে পারে, সে তত ভাগ্যবান। এতদিন কলিকাতায় বাস করিয়াও কিন্তু মৃণালের ভোরে-উঠা রোগ সারে নাই। বোর্ডিঙে সর্ব্বদা সকলের আগে সে উঠিয়া পড়ে। তখনও কোনও ঘণ্টা পড়ে না, কাজেই আপন মনে সে বারান্দায় ঘুরিয়া বেড়ায়, নীচে নামিবার তখনও হুকুম নাই।

মামীমার রান্না ইহারই মধ্যে চড়িয়া গিয়াছে। টিনি, চিনি, কানু সবাই উঠিয়া পড়িল, মৃণালকে তখন লাগিতে হইল তাহাদিগকে সামলাইবার কাজে। সে যখন থাকে না, তখন এই দুরন্ত শিশুগুলি মাকে না-জানি কি জ্বালানোই জ্বালায়। চিনি বড় হইলে তাহাকে সে কলিকাতায় লইয়া যাইবে একথা মৃণাল প্রায়ই মামীমাকে বলে। তিনি শুধু হাসেন। মৃণাল জানে, এসবে মামীমার মত নাই। মেয়ে-ছেলের উচ্চশিক্ষার যে কি প্রয়োজন তাহা মামীমা বুঝিতে পারেন না। মৃণাল পরের মেয়ে, তাহার উপর জোর নাই, তাই তাহার বাপের ইচ্ছামত তাহাকে স্কুলে পড়িতে দেওয়া হইয়াছে। মামীমার মেয়ে হইলে এতদিনে মাথায় লাল চেলীর ঘোমটা টানিয়া সে শ্বশুরবাড়ী চলিয়া যাইত, এ-কথা মৃণাল নিশ্চয় করিয়া জানে। ভাবিতেই তাহার মুখ রাঙা হইয়া উঠে।

ক্রমশঃ

কবি হুইটম্যানের বাণী

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন শাস্ত্রী

হুইটম্যান-স্মৃতিসভার সম্পাদক মহাশয়কে লিখিত পত্র

আপনার তাগিদ পত্রখানি পরশু পাইয়াই একটা লেখায় হাত দিয়াছিলাম। আপনি আমার একটি পুরাতন প্রবন্ধের কথা জানিতে চাহিয়াছেন। 'প্রবাসী'তে ১৩২৩ সালে তাহা বাহির হইয়াছিল।

সেই প্রবন্ধটির নাম হইল "চরৈবেতি চরৈবেতি"। ঋগ্বেদের ঐতরেয় ব্রাহ্মণের রচয়িতা ঋষি ঐতরেয় তাঁহার প্রখ্যাত ব্রাহ্মণ গ্রন্থের সপ্তম পঞ্চিকার তৃতীয় অধ্যায়ের তৃতীয় খণ্ডে ঋষি শুনঃশেপের উপাখ্যানের মধ্যে এমন পাঁচটি শ্লোকের অবতারণা করিয়াছেন যাহা মানবসাধনার নিত্য সচলতার, নিত্য অগ্রসর হওয়ার একটি শাশ্বত মহামন্ত্র। প্রত্যেকটি শ্লোকের অন্তেই আছে—হে রোহিত, "তুমি চলিতে থাক, চলিতে থাক"—অর্থাৎ "চরৈবেতি চরৈবেতি"। সেই জন্যই সেই প্রবন্ধটির নাম দেওয়া হইয়াছিল "চরৈবেতি চরৈবেতি"।

তার প্রথম শ্লোকেই আছে—

"শেরেঽস্য সর্বে পাপমানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ"

যে ব্যক্তি নিত্য অগ্রসর হইয়া চলে তাহার আর নিজের পাপ প্রভৃতি সব খুচরা সমস্যা লইয়া মাথা ঘামাইবার প্রয়োজন নাই। তাই ঐতরেয় বলিলেন, "তাহার সকল পাপ তাহার চলিবার উদ্যমের শ্রমে আপনি হতবীর্য্য হইয়া সেই চলার মুক্ত পথে শুইয়া পড়ে।" "প্র-পথ" হইল সেই পথ যাহা নিত্য আমাদিগকে সম্মুখ দিকে লইয়া চলে। এই বাণীটি কবি হুইটম্যানের বিখ্যাত "Open Road"-কেই স্মরণ করাইয়া দেয়। "চরৈবেতি চরৈবেতি" প্রবন্ধে উল্লিখিত, ঐতরেয়-ভাষিত পাঁচটি বাণীই সেই হিসাবে অপূর্ব্ব। সেই জন্য আমি এই দুই দিন ঐতরেয় ব্রাহ্মণের বাছা বাছা সব বাণীগুলি সাজাইয়া ঋষির অন্তরের মহাসত্যটির দ্বারা আমাদের চিত্ত-মন-প্রাণকে উদ্বোধিত করিতে চাহিয়াছিলাম।

দুই দিন ক্রমাগত খাটিয়াও তাহা লেখা পূর্ণ হইল না যদিও অনেকটা লেখা ইতিমধ্যে হইয়াছে। আর অত বড় একটা বিষয়কে এইরূপ যেমন-তেমন ভাবে সারিয়া দেওয়ার অর্থই হইল সেই বিষয়টিকে অপমান করা। তাই আমি ঐতরেয় ব্রাহ্মণের সেই ভিতরের কথাটি পরে ভাল করিয়া সবার কাছে উপস্থিত করিব। ইতিমধ্যে যাঁহারা চাহেন তাঁহারা আমার (প্রবাসীতে লেখা) "চরৈবেতি চরৈবেতি" নামক পুরাতন প্রবন্ধটি পড়িয়া দেখিতে পারেন।

এই ক্ষেত্রে আর একটি কথাও মনে আসিতেছে, তাহাও এখানেই বলা ভাল। ঋষিদের সমস্যা ছিল তাঁহাদের সমস্ত জীবনের পূর্ণতার সাধনা। সেই সাধনা যে কেমন করিয়া সত্য হইবে তাহা তাঁহারা নানা ভাবে পরখ করিয়া দেখিতে চাহিয়াছেন। তাই তাঁহাদের বাণী—

"কস্মৈ দেবায় হবিষা বিধেম"

"আমাদের শ্রদ্ধার আহুতিটি কোথায় সমর্পণ করি?"

যাগযজ্ঞে, ইষ্টকা-ব্যবস্থায়, তপস্যায়, কৃচ্ছ্রাচারে, ব্রহ্মচর্য্যে, ধ্যানে, মননে, নিদিধ্যাসনে, যোগে নানা ভাবে তাঁহারা নিজেদের সেই পূর্ণতাকেই ব্যাকুলভাবে খুঁজিয়াছেন। এই খোঁজার পথে আনুষঙ্গিকরূপে কিছু কিছু যে "বাণী" বাহির হইয়া পড়িয়াছে তাহা তাঁহাদের সাধনার মুখ্যবস্তু নয়, তাহা একান্তই গৌণ। তাঁহাদের প্রধান কথাই হইল মানবজীবনের পরিপূর্ণ সার্থকতার জন্য ব্যাকুল সন্ধান ও সাধনা।

আর সাহিত্যিকদের কথা স্বতন্ত্র। তাঁরা চান "বাণী"কেই পূর্ণ প্রকাশ দিতে। প্রকাশের নিখুঁত সম্পূর্ণতাই

(perfection of expression) হইল তাঁহাদের পরম ও চরম লক্ষ্য। আমাদের কালিদাস, ভবভূতি, বাণভট্ট প্রভৃতি কবিও এই দলের মধ্যে। পাশ্চাত্য দেশের শেক্সপীয়র, মিলটন প্রভৃতিও এই দলের। মানবজীবনের পরিপূর্ণ সমগ্র সার্থকতার সাধনা তাঁহাদের নহে। তাঁহাদের চাই গদ্যে পদ্যে ছন্দে কাব্যে সাহিত্যের পূর্ণ প্রকাশ। হুইটম্যানও এই দলেই।

ঋষিদের পক্ষে বাণীতে প্রকাশটি হইল গৌণ, আর সাহিত্যিকদের পক্ষে তাহাই তাঁহাদের সব-কিছু। কাজেই সাহিত্যিক কবি ও ঋষিদের পাশাপাশি রাখিয়া তুলনা করিলে অবিচার হওয়ার সম্ভাবন আছে।

মানবসাধনায় ভিন্ন ভিন্ন "লোক" আছে। আমি কাব্যলোককে উপেক্ষা করি বা তুচ্ছ করি এমন নহে, কিন্তু সেই সঙ্গে ইহাও যেন না ভুলি যে আমাদের প্রাচীন ঋষি ও সাধকদের লোক ছিল একেবারে ভিন্ন। এই দুইয়ের মধ্যে যেন গোল না পাকাইয়া বসি।

ঋষিদের সাধনাতেও এক-একটি যুগ আসিয়াছে তাহা হইল পুরাতন আচার সাধনা প্রভৃতির নিরর্থক জড়ভার হইতে মুক্তির জন্য বিদ্রোহ। সেই বিদ্রোহের বাণী আমরা দেখি মাঝে মাঝে সংহিতায় ও উপনিষদের ঋষিদের কণ্ঠে, গীতায়, ভাগবতে, মধ্যযুগের সাধকদের বাণীতে, আউল বাউল দরবেশদের গানে। ঐতরেয়ের কোন কোন বাণীতে উপনিষদের বাণীর মতই প্রাচীন বন্ধনের প্রতি বিদ্রোহের ভাব দেখা যায়। বিদ্রোহের একটি প্রচণ্ড উদ্যম তার মধ্যে থাকাতে এক এক সময় সাহিত্য-হিসাবেও সেই সব বাণী আমাদের কাছে এত উপাদেয় লাগে। কিন্তু এই ভাললাগাই তাহার শেষ কথা নয়। তাঁহাদের জীবনের পরিপূর্ণতার জন্য যে সাধনপথের সন্ধান, তাঁহাদের সর্ব্বস্ব উৎসর্গ করিয়া জীবনের সমগ্রতাকে সার্থক করিবার যে ব্যাকুলতা, তাহা যদি যথার্থরূপে হৃদয়ঙ্গম করিতে না পারি তবে কিছুই হইল না।

হুইটম্যান এক জন বিদ্রোহী কবি। পূর্ব্ববর্ত্তী সাহিত্যে ছন্দ-রীতি বর্ণনাভঙ্গী প্রভৃতির যে পাষাণ-প্রাচীর রচিত হইয়াছিল তিনি তাহাতে বিদ্রোহীর মত প্রচণ্ড আঘাত করিলেন। সাহিত্য-জগতের মিথ্যা আভিজাত্যের উপর তাঁর বজ্রাঘাতে এমন একটি সাহিত্য-রস সৃষ্ট হইল যাহাতে এক এক সময় ভারতীয় সেই সব বিদ্রোহী সাধক ঋষিদের কথা স্বতই মনে আসে। সেই জন্যই আমি হুইটম্যানের প্রচণ্ড বিদ্রোহ-বাণী শুনিয়াই মুগ্ধ হইয়াছিলাম। সেই সব বাণীর মধ্যে বিদ্রোহী ঋষিদের বাণীর মতই একটি অপূর্ব্ব শক্তি আছে। তাই আজ তাঁর জয়ন্তী দিনে কবি হুইটম্যানকে নমস্কার করি। সেই শ্রদ্ধার নমস্কার গঙ্গার তীর হইতে সুদূর আমেরিকাতে যাত্রা করুক। তবু যেন কখনও না ভুলি ঋষি ও কবি এক নহেন। ঋষির সাধনা হইল সমগ্র জীবনের সাধনার পরিপূর্ণতা, সাহিত্যিকদের সাধনা হইল বাঙ্ময়ী সাধনার চরিতার্থতা।

তবু উভয় দলের বিদ্রোহীদের বাণীর মধ্যে এমন একটি সমজাতীয়তা আছে যে একের কথা শুনিলে স্বভাবতই অন্যের কথা মনে আসে। তাই হুইটম্যানের জয়ন্তী তিথিতে আজ ঐতরেয় ব্রাহ্মণের ঋষির কথা ক্রমাগতই মনে আসিতেছে—"আগে চল, আগে চল, তোমার চলার উদ্যমে চলার বেগেই, সম্মুখে, তোমার মুক্ত পথে, তোমার সব পাপ শুইয়া পড়িবে হতবীর্য্য হইয়া। পাপতাপের সব ছোট ছোট সমস্যা লইয়া আর বৃথা মাথা ঘামাইতে হইবে না। আগে চল, আগে চল।"

শেরেঽস্য সর্বে পাপ্মানঃ শ্রমেণ প্রপথে হতাঃ
চরৈবেতি চরৈবেতি (ঐতরেয় ব্রাহ্মণ, ৭, ৩, ৩)

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

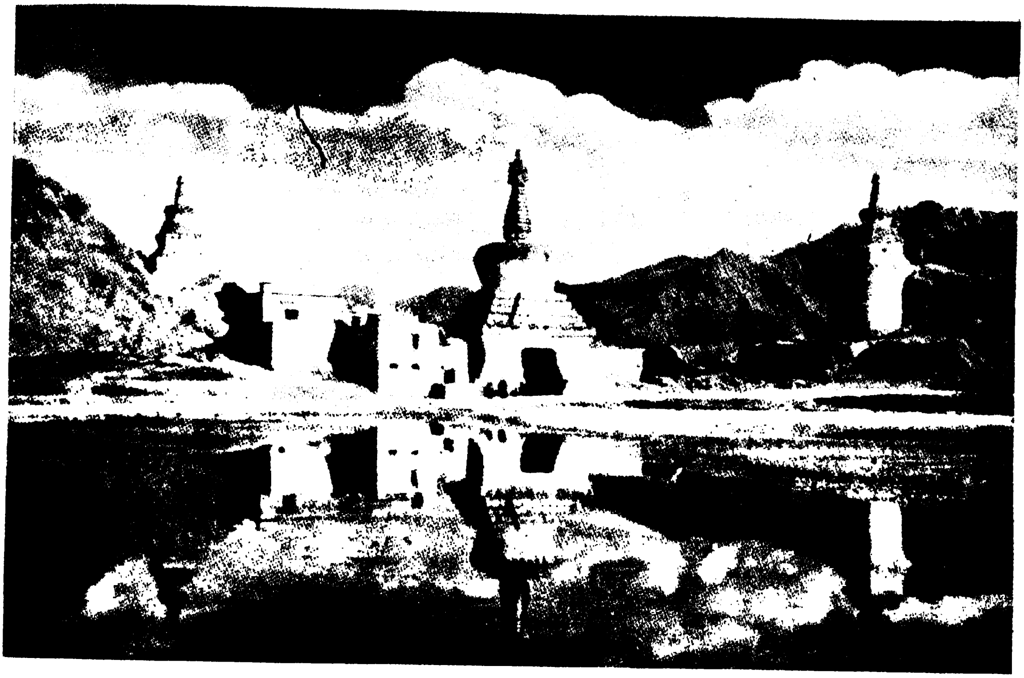
রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১৬

তিব্বতে খবরের কাগজ নাই কিন্তু প্রতি সপ্তাহে "মৌখিক বার্ত্তাবহ"তে এমন অনেক গুজব ও খবর রাষ্ট্র হয় যাহাতে জনসাধারণের মন তুষ্ট হয়। ১৯শে জানুয়ারি খবর পাওয়া গেল যে জনৈক চি-টুঙ (ভিক্ষু-অফিসর) এবং তাহার প্রিয়পাত্রী "কন্‌ছি লম্মর" গ্রেপ্তার হইয়া লাসায় আসিয়াছে। এই চি-টুঙ তিন বৎসর যাবৎ সপ্তম দলাইলামার স্তূপাগারের অধ্যক্ষ ছিল। এখানকার নিয়ম যে কোন দলাইলামার দেহান্ত হইলে পোতলা প্রাসাদের কোন গৃহে তাঁহার জন্য বৃহৎ স্বর্ণরৌপ্যময় স্তূপ নির্ম্মাণ করা হয় এবং তাঁহার জীবদ্দশায় তাঁহাকে যে-সব মণিমুক্তা ও অন্যান্য বহুমূল্য দ্রব্য ভেট দেওয়া হইয়াছিল সে-সবই সেই স্তূপমধ্যে প্রোথিত ও রক্ষিত থাকে। প্রতি তিন বৎসর অন্তর এইরূপ প্রত্যেক স্তূপে এক জন ভিক্ষু কর্ম্মচারী (চি-টুঙ) অধ্যক্ষ নিযুক্ত হন। ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে পঞ্চম দলাইলামা সুমতিসাগর (১৬১৬-১৬৮১ খ্রীঃ) ভোটরাজ্য নিজ অধিকারে পাইয়াছিলেন। তখন হইতে বর্ত্তমান ত্রয়োদশ দলাইলামা মুনিশাসনসাগর (থুব-বৃস্তন্-গ্যা-ম্‌ছো, জন্ম ১৮৭৪ খ্রীঃ) পর্য্যন্ত আট জন দলাইলামা দেশে অধিকার পাইয়া গিয়াছেন। ইঁহাদের মধ্যে সপ্তম দলাইলামা ভদ্রকল্পসাগর (স্কল্-বসঙ-গ্যা-ম্‌ছো, জন্ম ১৭০৮ খ্রীঃ) পূর্ণরূপে সংসার-বিরাগী সাধু ছিলেন। চিত্রে ইঁহার হস্তে শাসন-চিহ্ন চক্রের বদলে পুস্তক দেওয়া আছে; ইনি প্রাসাদ ছাড়িয়া, কোন রাজসেবক বা অনুচর সঙ্গে না লইয়াই পর্ব্বতে বাস করিতেন। চীন ও তিব্বত—উভয় দেশেই ইঁহার সম্মান সমরূপ ছিল।

সপ্তম দলাইলামার স্তূপে রক্ষিত মহামূল্য ধনরত্নাদি গত তিন বৎসর উক্ত চি-টুঙ-এর হস্তে ন্যস্ত ছিল। এই ঘটনার কিছুদিন পূর্ব্বে দার্জ্জিলিঙ হইতে কয়েকটি ভুটিয়ানী সুন্দরী রূপ-জীবিকার চেষ্টায় ও-দেশে যায়। তাহাদের মধ্যে কন্‌ছি লম্মর ও এই চি-টুঙের মধ্যে কি সম্পর্ক ছিল তাহা সকলেই জানিত। আশ্চর্য্যের বিষয়, কন্‌ছি প্রকাশ্য-ভাবে পঁচিশ হাজার টাকা মূল্যের মুক্তাময় শিরোভূষণ পরিয়া বেড়াইলেও উচ্চতম অধিকারীদিগের সন্দেহ হয় নাই যে উক্ত চি-টুঙ স্তূপ হইতে মণিরত্ন বিক্রয় করিতেছে। কয়েক সপ্তাহ পূর্ব্বে, তিন বৎসর পর যখন তাহার বদলির সময় ঘনাইয়া আসিল, তখন সে প্রাণ বাঁচাইবার জন্য পলায়নের পথ খুঁজিতে লাগিল। সে এবং কন্‌ছি লম্মর নির্ব্বোধের মত ঘোড়ায় চড়িয়া চীনদেশের পথে রওয়ানা হয়। যদি তাহারা দার্জ্জিলিং যাইবার চেষ্টা করিত তবে দশ দিনের মধ্যেই তাহাদের কার্য্যসিদ্ধি হইয়া যাইত, কেন-না, তাহারা পলাইবার তিন সপ্তাহ পরে উচ্চতম কর্ম্মচারী-দিগের হুঁস হয় যে ঐ চি-টুঙ কার্য্যস্থলে নাই। আরও নির্ব্বোধের মত তাহারা প্রায় দুই সপ্তাহ লাসা এবং আশপাশের জায়গায়, বন্ধুবান্ধবের ঘরে, পানাহারে ও প্রমোদে কাটায়। যখন খবর পাওয়া গেল যে খোঁজ আরম্ভ হইয়াছে তখন তাহারা চীনদেশের পথে, লাসা হইতে তিন-চার দিনের রাস্তায়, এক নির্জ্জন পর্ব্বতময় অঞ্চলে লুকাইয়া থাকে। কয়েক দিন লুকাইয়া থাকিবার পর খাদ্যের সন্ধানে এক গ্রামে যাইবার সময় দু-জনেই গ্রেপ্তার হয়।

লাসায় আসিলেই প্রথমে দু-জনের উপর নির্ম্মমভাবে বেত চলিতে আরম্ভ করে। চি-টুঙ ও কন্‌ছি সহজে কিছু কবুল করে না, বরঞ্চ বন্ধুবান্ধবের রক্ষার চেষ্টাই করে। কিন্তু "মারের চোটে ভূত ছাড়ে," সুতরাং নিরন্তর প্রহারের ফলে তাহারা লোকজনের নাম বলিতে আরম্ভ করে। দামী জিনিষের অধিকাংশ তত দিনে কলিকাতা—কি হয়ত সমুদ্রপারে লণ্ডন-প্যারিসে—পৌঁছিয়া গিয়াছে। একটি অতি মূল্যবান মুক্তার মালা লইয়া এক সওদাগর লাসা ছাড়িয়া নেপাল চলিয়া যায়, সেই মালার প্রশংসা চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। তবে অন্বেষণ করিয়া অনেক মণিরত্ন চি-টুঙের



লাসার উত্তর দ্বার



পশ্চিম-তিব্বতের বিহার



মহান চোং-খ-পার জন্মস্থলে (কুম্বুম বিহারে) উৎসব।
উৎসবে বিরাট চিত্রপট টাঙানো হয়।



তিব্বতের সিন্ধুনদের খেয়া

বন্ধুবান্ধবের নিকট ছিল, তাহাদের সকলের সর্ব্বনাশ হইয়া গেল। পঞ্চাশ-ষাট টাকার জিনিষের জন্য তাহাদের সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত হইল। এইরূপ যখন চলিতেছে তখন (৪ঠা এপ্রিল সন্ধ্যায়) আমি ছু-শিঙ্ কুঠিতে আমার ঘরে বসিয়া রাজপথে অনেক ঘোড়া চলার শব্দ শুনিতে পাইলাম। দেখিলাম, মহাগুরুর সর্ব্বোচ্চ কর্ম্মচারী দো-নির্-ছেনপো এবং ত্য-লামার সঙ্গে নেপাল-রাজদূত ও সৈন্যসামন্ত সকলেই মোতীরত্ন সওদাগরের দোকানের সম্মুখে দাঁড়াইয়া আছে। চি-টুঙ এখানে একটি বহুমূল্য পেয়ালা দেওয়ার কথা বলিয়াছিল এবং এখন স্বয়ং তল্লাসীর সাহায্য করিয়া সেটি বাহির করিয়া দিল। শোনা গেল, পলাইবার সময় উহারা দুই জনে দুই রাত্রি ঐ দোকানে একটি বড় সিন্দুকের মধ্যে লুকাইয়া ছিল। মোতীরত্ন গ্রেপ্তার হইয়া নেপালী গারদে চলিল। লাসার প্রধান থানার কোতোয়াল ও মোতীরত্নের একই স্ত্রী ছিল, কোতোয়াল ও তাহার স্ত্রীও জেলে চলিল।

* * *

গত ডিসেম্বর পর্য্যন্ত আমার এদেশে থাকা বা না-থাকা সম্বন্ধে কিছু ঠিক করিতে পারি নাই। লঙ্কা হইতে পত্র পাইয়াছিলাম যে আমাকে পুস্তক-ক্রয়ের জন্য টাকা পাঠানো হইবে, আমি ক্রয় শেষ করিয়াই যেন চলিয়া আসি। প্রথমে আমি সে প্রস্তাবে রাজী হই নাই, কিন্তু যখন চার মাসেও কোন বিহারে থাকিবার ব্যবস্থা হইল না এবং নেপাল-তিব্বত যুদ্ধের আশঙ্কা উত্তরোত্তর বাড়িয়াই চলিল, তখন আমি সেই প্রস্তাবই সমর্থন করিয়া পত্র দিয়াছিলাম। আশ্চর্য্য ব্যাপার, যখন নিরাশায় মন ক্লিষ্ট তখন নৈরাশ্যই চতুর্দ্দিকে, যখন আশার সঞ্চার আরম্ভ হয় তখন তাহাও অতিমাত্রায় আসে! পুস্তক-ক্রয় ও প্রত্যাগমনে স্বীকৃতি-পত্র পাঠাইবার পরেই মহান্ত আনন্দ লিখিলেন যে আমার প্রথম পত্র সিংহলের এক প্রসিদ্ধ দৈনিক "দিন্-মিন্" (দিনমণি) প্রকাশ করিয়াছে এবং জানাইয়াছে যে তাহারা প্রতি পত্রের জন্য ১৫৲ টাকা বা ততোধিক দিতে প্রস্তুত। প্রতি সপ্তাহে একটি লেখা লিখন ও প্রকাশ কোনটাই দুরূহ নহে এবং তাহাতেই আমার অর্থ-সমস্যার সমাধান সম্ভব। পূর্ব্বের পত্রেই আমাকে পুস্তক-ক্রয়ের জন্য টাকা শীঘ্রই পাঠানো হইতেছে এই সংবাদ আসিলে আমাকে প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য প্রস্তুত হইতে হইল; এমন সময় (১১ই ফেব্রুয়ারি) আচার্য্য নরেন্দ্র দেব লিখিলেন যে, কাশী বিদ্যাপীঠ আমাকে মাসিক ৫০৲ টাকা বৃত্তি ও পুস্তক-ক্রয়ের জন্য এককালীন ১৫০০৲ টাকা দেওয়া মঞ্জুর করিয়াছেন, সুতরাং আমার এদেশে বাস ও অধ্যয়নের আর কোনও সমস্যাই নাই। লাসায় এখন তিন বৎসর থাকিয়া অধ্যয়ন করার কোনই বাধা রহিল না কিন্তু এ সকল ব্যবস্থা তিন সপ্তাহ দেরিতে হওয়ায় আমাকে প্রতিশ্রুতি-মত ফিরিতে হইবে। কিরূপে এই সমস্যা পূরণ করা যায় ভাবিতেছি এমন সময় লঙ্কা হইতে টেলিগ্রাম আসিল যে ছু-শিঙ্ কুঠির কলিকাতাস্থ শাখায় ২০০০৲ টাকা তারযোগে পাঠান হইয়া গিয়াছে।

এখন পুস্তক সংগ্রহেই মনোনিবেশ করিলাম। তিব্বতী টঙ্কার মূল্য কমিতেছিল, সুতরাং আমার খরিদ করা সহজ হইল। আমার পুস্তক-ক্রয়ের কথা প্রচার হইলে ক্রমেই নূতন, পুরাতন, হস্তলিখিত, মুদ্রিত সকল প্রকার পুস্তক এবং দুই-চারিখানি চিত্রপটও নানা দিক্ হইতে আসিতে লাগিল। প্রথমে আমি চিত্র-ক্রয়ে রাজী ছিলাম না, কেন-না আমার চিত্র সম্বন্ধে জ্ঞান বা সংগ্রহেচ্ছা কোনটাই ছিল না, কিন্তু দুই-দশটি দেখিতে দেখিতে সেদিকে আমার আকর্ষণ বৃদ্ধি পাইতে লাগিল। এক দিন ঐরূপ তেরটি চিত্র-পট আমার কাছে আসিল। বিক্রেতা প্রতি চিত্রের জন্য এক দোজে' (২৫৲ টাকা) মূল্য চাহিল। নেপালী বন্ধুরা বলিলেন, দাম বেশী চাহিতেছে, কিন্তু দুই-এক দিন পরে সেগুলি হাতছাড়া হইবার ভয়ে আমি ঐ দামেই ক্রয় করিলাম। তখন সে চিত্রগুলির ঐতিহাসিক বা নগদ মূল্য সম্বন্ধে কিছুই বুঝি নাই কিন্তু পরে প্রকাশ পাইল যে লণ্ডন ও প্যারিসের চিত্রশালাগুলি ঐ তেরটি চিত্রের জন্য পঁচিশ-ত্রিশ হাজার টাকা দিতে প্রস্তুত, কেন-না, ঐ সংগ্রহে বারটি ঐতিহাসিক পুরুষের (প্রথম হইতে সপ্তম দলাইলামা, প্রথম তিব্বত-সম্রাট্ চোঙ-খ-পা প্রভৃতির) চিত্র আছে এবং ত্রয়োদশ ছবিখানিও অবলোকিতেশ্বর বোধিসত্ত্বের সুন্দর চিত্র। চিত্রগুলির মধ্যে একটির পৃষ্ঠের লিখন হইতে প্রকাশ পাইল যে এই সকল চিত্রই সপ্তম দলাইলামার সময় (খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে) অঙ্কিত হইয়াছিল। আমি সবসুদ্ধ প্রায় দেড় শত চিত্র সংগ্রহ করিয়াছিলাম,

তন্মধ্যে তিন-চারখানি মারবুর্গ ধার্ম্মিক-সংগ্রহালয়ে বন্ধুবর প্রফেসর রুদল্‌ফ্‌ অটো মারফৎ পাঠাইয়াছিলাম, আরও দুই-চারিটি প্রতিশ্রুতি-অনুযায়ী অন্য বন্ধুবান্ধবকে দিয়াছিলাম, বাকি ১৪০খানি চিত্রপট পাটনা মুাজিয়মকে দান করি, সেগুলি সেখানেই সুরক্ষিত। পুস্তকের মধ্যে খম্‌ (পূর্ব্ব-তিব্বত) মঙ্গোলিয়া ও সাইবিরিয়ায় ছাপা পুস্তকও সংগ্রহ করিয়াছিলাম।

* * *

১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের কাছাকাছি পঞ্চম দলাইলামা সুমতি-সাগর মঙ্গোল-রাজ গুশী খাঁ কর্ত্তৃক তিব্বতের রাজ্যাধিকার প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। তাহার পূর্ব্বে পঞ্চম দলাইলামা ডে-পুঙ বিহারের এক ড-ছঙে খন্‌-পো অর্থাৎ অধ্যক্ষ পণ্ডিত ছিলেন। পঞ্চম দলাইলামা নিজের মঠের খ্যাতি বৃদ্ধির জন্য প্রতি বর্ষে নববর্ষ-প্রারম্ভের ২৪ দিন পর্য্যন্ত লাসায় ডে-পুঙ মঠের ভিক্ষুদিগের রাজত্বের অধিকার দেওয়ার নিয়ম প্রবর্ত্তন করেন এবং অদ্যাবধি সেই নিয়ম বর্ত্তমান আছে। শাসনের জন্য দুই জন অধ্যক্ষ, এক জন ব্যাখ্যাতা এবং অন্য লোকজন নিযুক্ত হয়। ঐ ২৪ দিন লাসায় সরকারী পুলিস, আদালত প্রভৃতির অধিকার থাকে না এবং নেপালী ভিন্ন অন্য সকল দোকানদারকে কিছু শুল্ক দিয়া লাইসেন্স লইতে হয় এবং এই ব্যাপারে ভুলভ্রান্তি হইলেই জরিমানার অন্ত থাকে না। জরিমানা এদেশে সর্ব্বঘটে আছে, লোকে বলে এখানে জেল-দণ্ড হয় না, কেন-না, তাহাতে সরকারের কোন অর্থাগম নাই। সরকারী সকল উচ্চপদই ত অর্থবলে ক্রয় করিতে হয়।

অধিমাস এক সময় না হওয়ায় ভোট ও ভারতীয় চান্দ্র বর্ষ একসঙ্গে আরম্ভ হয় না। এইবার ভোট বৎসর পয়লা মার্চ্চে পড়ে এবং এই বৎসরে দুইটি নবম (শূকর) মাস ছিল। ডে-পুঙ মঠ হইতে ভারপ্রাপ্ত শাসকবর্গকে দলাইলামার নিকটে ২৪ দিন লাসা শাসন করিবার পরওয়ানা লইতে হয়। ২রা মার্চ্চ দেখিলাম রাস্তাঘাট শুধু পরিষ্কার নহে, উপরন্তু প্রত্যেককে নিজ গৃহের বা দোকানের সম্মুখস্থ অংশে শ্বেত মৃত্তিকায় "চৌকা" কাটিয়া সাজাইতে হইয়াছে। সেই দিনই লাসার অস্থায়ী শাসকদ্বয় ঘোড়ায় চড়িয়া সদলে লাসায় আসিয়া, আমার বাসস্থানের পূর্ব্বদিকে কিছু দূরে এক চত্বরে, নাগরিকদিগকে আহ্বান করিয়া ২৪ দিনের জন্য নূতন শাসন পদ্ধতি ঘোষণা করিয়া পোতলার প্রাচীন জো-খঙ মন্দিরে যাইলেন। শাসক-নির্ব্বাচনে বোধ হয় মানসিক অপেক্ষা দৈহিক বিস্তৃতির উপরই অধিক লক্ষ্য রাখা হয়, কেন-না, ইঁহারা দুই জনেই ছিলেন বিরাটকায় পুরুষ। ইঁহাদের সঙ্গের রক্ষীবর্গ সাড়ে-চার হাত লম্বা ও তিন-চার ইঞ্চি ব্যাসের লগুড় লইয়া "ফা ক্যু কো! পী কো মা শমো" (হটে যাও! টুপি খোলো) বলিয়া চীৎকার করিয়া চলিতেছিল। কাহারও যদি ভুলক্রমে আজ্ঞা-পালনে মুহূর্ত্তমাত্র বিলম্ব হইল ত তৎক্ষণাৎ তাহার পৃষ্ঠে ও মস্তকে উক্ত প্রচণ্ড "দুঃর্বভঞ্জন ঔষধ" পড়িল।

দলাইলামার "পোতলা" প্রাসাদে এই উপলক্ষ্যে মেলা বসে। দর্শকগণ সমতলভূমির অভাবে অলিগলি, সিঁড়ি, ছাদ ইত্যাদি সকল স্থানেই ভীড় করিয়া থাকে। চা-রুটি ও খাবারের দোকানও অনেক বসে। আমরা দেখিলাম একটি বিশ-পঁচিশ হাত উঁচু থামের উপর এক জন বাজীকর খেলা দেখাইতেছে, চারি দিকে লোকে লোকারণ্য, এবং স্বয়ং মহাগুরু তাঁহার বৈঠকের খিড়কিতে দুরবীন-হস্তে বসিয়া আছেন। ফিরিবার সময় দেখিলাম ডে-পুঙ মঠের সহস্রাধিক ভিক্ষু পিপীলিকার মত সারিবন্দীভাবে মোটঘাট লইয়া পোতলার সম্মুখ দিয়া লাসায় আসিতেছে। শুনিলাম ইঁহারা চব্বিশ দিন লাসায় থাকিবে। এই নববর্ষ-উৎসবে প্রায় চল্লিশ-পঞ্চাশ হাজার দর্শক ও তীর্থযাত্রী লাসায় আসে, সুতরাং রাস্তাঘাট পরিষ্কার করা ছাড়াও অনেক ব্যবস্থা করিতে হয়। পানীয় জলের ব্যবস্থা অতি অপরূপভাবে করা হয় নববর্ষের কয়দিন পূর্ব্ব হইতেই জল-সরবরাহের নালীর জল দিয়া শহরের যত গর্ত্ত পূর্ণ করা হয় যাহাতে সাধারণ কূপগুলি জলশূন্য না হয়। ব্যবস্থা উত্তম কিন্তু দুঃখের বিষয় জলভর্ত্তি করার পূর্ব্বে সেই গর্ত্তগুলি পরিষ্কার করা হয় না, সুতরাং মৃত পশুর গলিত দেহ হইতে আরম্ভ করিয়া সকল প্রকার মল-আবর্জ্জনাই ঐ জলে ভাসিয়া চতুর্দ্দিক দুর্গন্ধে পূর্ণ করে এবং সেই জল মাটির ভিতর দিয়া চুঁইয়া শহরের সাধারণ ব্যবহার্য্য অগভীর কাঁচা কূপগুলিতে যাওয়ায় নানা প্রকার ব্যাধিরও প্রকোপ বাড়ে। এই সময়

লাসায় প্রায় বিশ হাজার আগন্তুক ভিক্ষুর আগমন হয় এবং তাহাদের সেবার জন্য চায়ের সদাব্রতে দিনে তিন-চারি বার মাখনযুক্ত চা ইত্যাদি পরিবেশন করা হয়।

* * *

১লা মার্চ্চ আমি তের শত বৎসরের পুরাতন জো-খঙ্ মন্দির দেখিতে গেলাম। জো-খঙ শব্দের অর্থ "স্বামি-গৃহ"। এখানে স্বামী বলিতে সেই প্রাচীন চন্দনকাষ্ঠের বুদ্ধমূর্ত্তিকে বুঝায় যাহা মধ্য-এশিয়ার পথে ভারত হইতে চীনদেশে গিয়াছিল এবং যাহা লাসা-সংস্থাপক সম্রাট্ স্রোং-বৃর্চন্-সগম্-বো কর্ত্তৃক ৬৪১ খ্রীষ্টাব্দে চীনদেশে বিজয়-অভিযানের ফলে চীনরাজদুহিতার সঙ্গে যৌতুক হিসাবে তিব্বতে আনীত হইয়াছিল। সম্রাট লাসা নগরের কেন্দ্রে নিজ প্রাসাদ ও রাজকার্য্যালয়ের সঙ্গে এক মন্দির প্রতিষ্ঠা করিয়া এই মূর্ত্তি স্থাপন করেন, সুতরাং এদেশে বৌদ্ধধর্ম্ম এই মূর্ত্তির সঙ্গে আসিয়াছিল বলা যায়। ইহার প্রতিপত্তি এদেশে এখনও এতই প্রবল যে লাসার আধুনিক অবনত অবস্থায়ও এখানকার ব্যাপারীরা পর্য্যন্ত জো-বো নামে সহজে শপথ করিতে চাহে না—যদিও কথায় কথায় ত্রি-রত্ন শপথ করিতে তাহারা প্রস্তুত—এবং করিলে সে কথা তাহারা নিশ্চয় রাখে। জো-খঙ্ মন্দিরের উত্তর দ্বারের এক দেওয়ালে ছোট ছোট সুন্দর অক্ষরে আঙ্গিনার অভ্যন্তরস্থ ছোট-বড় সকল মন্দিরের ইতিহাস লিখিত আছে। এইরূপ ইতিহাস-লেখ এদেশের বহু সুপ্রতিষ্ঠিত মঠ-মন্দিরের দ্বারদেশে থাকে। ভারতের প্রধান তীর্থ ও মন্দিরে এইরূপ থাকিলে যাত্রীদিগের বিশেষ সুবিধা হইত।*

মন্দিরের পরিক্রমায় ও দেওয়ালের গায়ে অনেক সুন্দর চিত্রাবলী রহিয়াছে, কোনটা কোন প্রসিদ্ধ মঠের প্রাচীন দৃশ্য, কোনটায় স্বর্ণরঞ্জিত বুদ্ধ নিজের পূর্ব্বজন্মের আখ্যান বলিতেছেন। কোথাও ভগবান বুদ্ধের অন্তিম জীবনের দৃশ্যাবলী অঙ্কিত আছে, কোথাও বা ভারতের অশোক অথবা ভোটের স্রোং-বৃর্চন্ সগম্-বো চিত্রে অমরত্ব লাভ করিয়াছেন। সমস্ত চিত্রই সুন্দর এবং যদিও সকল মূর্ত্তিই সহস্রাধিক বৎসরের মলিনতার স্তরে ভূষিত, কিন্তু তাঁহাদের অঙ্গপ্রত্যঙ্গের মান, তাঁহাদের মুখমুদ্রা এবং রেখার লালিত্য অনুপম। প্রত্যেক দেবগৃহে অসংখ্য স্বর্ণরৌপ্যময় দীপ অবিরাম জ্বলিতেছে, রৌপ্য দীপের মধ্যে একটির ওজন আট শত ভরি, সেটি গত বৎসর ভুটান-রাজ পাঠাইয়াছেন। বহুমূল্য প্রস্তর ও ধাতু ত চতুর্দ্দিকে ছড়ানো আছে। ভগবান বুদ্ধের এই প্রধান মূর্ত্তি ভিন্ন চন্দন ও অন্য কাষ্ঠের অনেক মূর্ত্তি আশপাশের দেবালয়ে রহিয়াছে। প্রাচীন ভোটের কয়েক জন সম্রাটের মূর্ত্তিও এখানে আছে, তাহার মধ্যে প্রধান দেবালয়ের দ্বিতলে সম্রাট্ স্রোং-বৃর্চন্ ও তাঁহার নেপাল ও চীন দেশীয়া মহিষীদ্বয়ের মূর্ত্তি প্রসিদ্ধ। বস্তুত এই মন্দিরের প্রতি অণুপরমাণুতে ত্রয়োদশ শত বৎসরের ঐতিহাসিক কীর্ত্তি পরিব্যাপ্ত হইয়া রহিয়াছে।

মন্দির হইতে বাহিরে আসিয়া দেখিলাম এক প্রশস্ত আগারে তিন চারি শত ভিক্ষু উচ্চাসনে বসিয়া খর-স্বরে সূত্র পাঠ করিতেছেন। ইঁহাদের বস্ত্র মলিন ও জীর্ণ এবং প্রত্যেকের সম্মুখে লৌহময় ভিক্ষাপাত্র। শুনিলাম ইঁহারা লাসার সর্ব্বাপেক্ষা কর্ম্মনিষ্ঠ ভিক্ষু এবং ইঁহারা মুরু ও র-মো-ছে বিহারে থাকেন।

৪ঠা মার্চ্চ শুনিলাম মুরু মঠে ফো-রং-এর লামা ধর্ম্মোপদেশ দিবেন এবং দেখিলাম বহু লোক আগ্রহের সহিত তাহা শুনিতে যাইতেছে। এই ফো-রং-এর লামা অতি বিদ্বান এবং তিব্বতের মধ্যে শ্রেষ্ঠ ধর্ম্মব্যাখ্যাতা বলিয়া প্রসিদ্ধ। লোকে ইঁহাকে সর্ব্বজ্ঞ বলিয়া প্রশংসা করিয়া ইঁহার মনোহর শিক্ষাপ্রদ উপদেশের সহিত নববর্ষের ২৪ দিনের জন্য নিযুক্ত সরকারী উপদেশক মহাশয়ের ব্যাখ্যানের তুলনা করিতেছিল। সরকারী উপদেশক বেচারার দোষ কি? সে ত অনেক ভেট অনেক তোষামোদের ফলে এই পদ লাভ করিয়াছে। যাহা হউক, কৌতূহলের বশে এক দিন তাহার উপদেশ শুনিতে গেলাম। শুনিলাম উপদেশক মহাশয় বলিতেছেন, "ডাকিনী মাতার অদ্ভুত শক্তি, তাঁহাকে প্রণাম করা উচিত, তাঁহার পূজা দেওয়া উচিত। বজ্রযোগিনী মাতার অদ্ভুত ক্ষমতা ও প্রভাব, উঁহাকে পূজা ও নমস্কার করা উচিত।" ইহাই তাঁহার উপদেশের মূল কথা।

* * *

* সুবিধা হইত সন্দেহ নাই; কিন্তু তাহা হইলে নানা প্রকার রূপ-কথার বিলোপে পাণ্ডাদিগের বিশেষ অসুবিধা হইত।—সম্পাদক।

নূতন রাজত্বের নূতন লাইসেন্স লওয়ার দরুন কয় দিন বাজার এবং দোকানপাট বন্ধ ছিল, সেগুলি খোলার পর ৫ই মার্চ্চ সারা শহর পরিষ্কার করিবার ও সাজাইবার ঘটা পড়িয়া গেল। শুনিলাম পরদিন সকাল সাতটায় মহাগুরু দলাই-লামার শোভাযাত্রা বাহির হইবে। পরদিন শোভাযাত্রা দেখিতে গিয়া দেখি পথের দুই ধারে ভিড় করিয়া লোক দাঁড়াইয়া আছে এবং কড়া পাহারাও বসিয়াছে। শোভাযাত্রায় সর্ব্বপ্রথমে ছত্রাকার লাল টুপি পরিয়া মন্ত্রীদের অনুচরবর্গ আসিল, তাহার পর আসিলেন মন্ত্রিগণ, তাহার পরে পরে চলিলেন চি-টুঙ (ভিক্ষু-অফিসর), কুট (গৃহস্থ-অফিসর), নাগরিক বেশে সেনাপতি, সেনাপতির বেশে ছ-ক্ক মন্ত্রী, দুই জন ফৌজী জেনারেল (সূদে-দ্পোন), সৈনিক অফিসর বেশে সর্দ্দার বাহাদুর লে-দন্-লা এবং তাহার পর রেশমী পর্দ্দায় ঘেরা পালকীতে মহাগুরু (বলা বাহুল্য, অন্য সকলেই প্রায় ঘোড়ায় সওয়ার ছিল) এবং সঙ্গে নেপালী মোঙ্গল ও চৈনিক-বেশে বহু সৈন্যসামন্ত।

* * *

সিংহলে ফিরিবার আয়োজন করিতে হইল, পুঁথি পুস্তক প্রভৃতি কেনা চলিতেছিল কিন্তু পথে সৈনিক পাহারা তখনও ছিল এবং নেপালের সঙ্গে যুদ্ধের আশঙ্কাও সম্পূর্ণ দূর হয় নাই, সুতরাং প্রত্যাবর্ত্তনের সকল ব্যবস্থা ঠিক করা যাইতেছিল না। সেই জন্য ৭ই মার্চ্চ ডং-রী-রিন্‌পোছের নিকট গিয়া তাঁহাকে চারিটি বিষয় দলাইলামার নিকট নিবেদন করিতে অনুরোধ করিলাম, যথা—(১) সম্-য়ে যাইবার অনুমতি, (২) পোতলার যে-সকল পুস্তক মহাগুরুর অনুমতি ব্যতীত ছাপা হয় না সে সকল ছাপাইয়া দিতে অনুমতি, (৩) গ্যুতের-গির ছাপা একটি করিয়া সম্পূর্ণ কন্-গ্যুর ও তন্-গ্যুর, ও (৪) ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনের জন্য একটি ছাড়পত্র। তিনি বলিলেন, প্রথম দুইটি বিষয়ে আদেশ পাওয়া সহজ, তবে শেষের দুইটির সম্বন্ধে বিশেষ সন্দেহ আছে।

এই সময় লাসায় তুষারপাত চলিতেছিল। সেখানে তুষারপাত বেশী হয় না, কিন্তু মাটির ছাদ, সুতরাং রোদ প্রখর হইবার পূর্ব্বেই তুষাররাশি ছাদ হইতে সরাইতে হয়। ২৪ দিনের রাজত্বের মধ্যে ছাদের বরফ পথে ফেলিলে জরিমানার ব্যবস্থা আছে, সুতরাং লোকে তাহা উঠাইয়া কোণে অলিগলিতে ফেলিল। ২৫শে মার্চ্চ, পুরাতন শাসন যেদিন ফিরিয়া আসিল সেই দিন, প্রায় ১৬ আঙুল পরিমাণ বরফ পড়িল। লোকে বলিল সৌভাগ্যের বিষয় ২৪ দিনের রাজত্ব নাই এবং পথে ঘাটে ছাদের বরফ স্তূপাকার করিয়া ফেলিয়া রাখিল।

* * *

নববর্ষের সময় শাস্ত্রার্থ অর্থাৎ তর্কযুদ্ধ হইয়া থাকে। ১০ই মার্চ্চ জো-খঙ্ মন্দিরে শাস্ত্রার্থ দেখিতে গেলাম। মন্দির-প্রাঙ্গণে পণ্ডিতগণ শিষ্যমণ্ডলী লইয়া বসিয়াছিলেন, দুই জন বৃদ্ধ উচ্চাসনে বসিয়া মধ্যস্থরূপে বিরাজ করিতেছিলেন। প্রশ্নকর্ত্তা নিজ আসন হইতে উঠিয়া ঐ দুই বৃদ্ধকে বন্দনা করিয়া প্রশ্ন করিবার জন্য অনুমতি লইল এবং পরে ধর্ম্মকীর্ত্তির প্রমাণ-বার্ত্তিক সম্বন্ধে প্রশ্ন করিতে লাগিল। প্রশ্ন করিবার ধরণ বিচিত্র ছিল। প্রশ্ন করিতে করিতে সে কখনও অগ্রে কখনও পশ্চাতে পদক্ষেপ করিয়া, প্রতি প্রশ্নের শেষে সজোরে হাতে হাত চাপড়াইতে ছিল এবং এক এক প্রশ্নমালা শেষ হইলে তাহার জপমালা লইয়া ধনুক হইতে বাণ মোচনের ন্যায় নাট্যমুদ্রায় অঙ্গভঙ্গী করিতেছিল। তাহার স্ব-পক্ষের বিদ্যার্থী ও পণ্ডিত অতি প্রসন্নমুখে তাহার তর্কযুক্তি শুনিতেছিল, উত্তর-পক্ষীয় ছাত্রবর্গ বিদ্যার্থীদিগের বিচিত্র টুপি পরিয়া শান্ত ও শুষ্ক হইয়া বসিয়াছিল। এক পক্ষের ছাত্রের তর্ক অবতারণা শেষ হইলে বিপক্ষের ছাত্রও মধ্যস্থকে বন্দনা করিয়া তর্ক খণ্ডন করিয়া পূর্ব্ব-পক্ষকে তর্কে আক্রমণ আরম্ভ করিল। আক্রমণের সময় ঠিক পূর্ব্ববৎ যুদ্ধের অনুকরণে পদক্ষেপ, বাণক্ষেপ ইত্যাদি চলিল। এইরূপ তর্কের মধ্যে নাট্যাভিনয় কোথা হইতে আসিল জিজ্ঞাসা করায় এক বন্ধু বলিলেন, "ইহা নালন্দা বিক্রমশিলা হইতে আসিয়াছে, সুতরাং ইহার জন্য দায়ী তোমরা।" আমি মানিতে রাজী হইলাম না, কেননা, ইহা সত্য হইলে ভারতে কাশী ও মিথিলার পণ্ডিতমণ্ডলীর মধ্যে এইরূপ প্রথার কোনরূপ চিহ্নাবশেষ নিশ্চয়ই পাওয়া যাইত।

১২ই মার্চ্চ লাসার পঞ্চক্রোশী আরম্ভ হইলে আমিও গেলাম। এই পঞ্চক্রোশীতে নগরের অতিরিক্ত পোতলা

াসাদ, মহাগুরুর উদ্যান-গৃহ নোর্‌লিং-কা এবং অন্য অনেক ট্টালিকা আদি আছে, সুতরাং পরিক্রমা প্রায় পাঁচ মাইল :থর। দেখিলাম, কেহ কেহ (এক নেপালী সওদাগরও ল) দণ্ডবৎ হইয়া পরিক্রমা করিতেছে। পরিক্রমা শেষ লে র-মো-ছে-কে মন্দির দেখিতে গেলাম। ইহা া-খঙ্ মন্দিরের সমসাময়িক সাধারণত তিব্বতে দেব-র্ত্তি মৃত্তিকার উপর কঠিন প্রলেপ (প্লাষ্টার) দিয়া করা হয়। থানে কিছু প্রস্তরের কাজও দেখিলাম। আরও দেখিলাম দ্ধমূর্ত্তিকে মুকুটে ভূষিত করা হইয়াছে। শুনিলাম মহান্ সংস্কারক চোঙ-খ-পা এই প্রথার প্রবর্ত্তন করেন। বস্তুত এই থা চোঙ-খ-পা ভুলক্রমে প্রচলিত করেন। কারণ বুদ্ধদেব ক্ষু, তাই তিনি স্বয়ং ভিক্ষুদের ভূষণাদি ধারণ নিষেধ করিয়া য়াছেন। তবে এই প্রথা ভারত-নেপালেও বহু শতাব্দী াবৎ চলিয়া আসিতেছে।

১৪ই মার্চ্চ প্রাতে নগর-পরিক্রমার পথে বিশেষ ায়োজন চলিতেছে দেখিলাম। পথের পাশে কাঠের স্তম্ভ সাইয়া তাহার উপর আড়ভাবে তক্তা লাগানো হইতেছে। ারাদিন স্তম্ভগুলি পর্দ্দায় ঢাকা থাকায় সেখানে কি হইতেছে ানা গেল না। সূর্য্যাস্তের অল্প পূর্ব্বে পর্দ্দাগুলি সরাইলে দখিলাম প্রত্যেকটি স্তম্ভের উপর সুন্দর ত্রিতল মন্দির-বিমান তয়ারী হইয়াছে এবং সেগুলির গবাক্ষ ও অলিন্দে াখনের তৈরি সুন্দর সুন্দর দেবমূর্ত্তি বসাইয়া দেওয়া ইয়াছে। সমস্ত পরিক্রমা-পথ এইরূপে সুসজ্জিত হইয়াছিল। বোধ হয় ললিতকলাকে ভূমিসাৎ করার মত ঈশ্বরভক্তি ভারতে প্রবল হইবার পূর্ব্বে সেই পুণ্যভূমিতেও ভোটদেশের ন্যায় সার্ব্বজনীন কলানুরাগ ছিল। এখন তিব্বতের তুলনায় উরোপ প্রভৃতি পাশ্চাত্য দেশেও ললিতকলার আসন এত উচ্চ নহে, ভারতের কথায় কাজ কি?

বস্তুত এদেশে কলাশিল্প অতি সুব্যবস্থিত। একটি পিত্তলমূর্ত্তি-নির্ম্মাণে তিন জন দক্ষ কারিগরের কলাকৌশলের প্রয়োজন—প্রথম ব্যক্তি ছাঁচ প্রস্তুত করে, দ্বিতীয়টি ঢালাই করে এবং শেষ ব্যক্তি মূর্ত্তি খোদাই পালিশ ইত্যাদি করে।

১৫ই মার্চ্চ, আসল নববর্ষের দিনে লাসার লোকে পরস্পরের মঙ্গলকামনায় মঙ্গলগীতি গাহিয়া ও উপহার পাঠাইয়া উৎসব করিতেছিল। তবে দ্বিপ্রহরের পরে পান ও গান দুইয়েরই মাত্রা সীমা ছাড়াইয়া গেল। আজ আমার সত্তর বৎসরের বৃদ্ধ অখু (খুড়া) মহাশয়ও কিশোরের ন্যায় কিশোর-কিশোরীদিগের মধ্যে মহা উল্লাসে নৃত্য করিয়া দিন কাটাইলেন। এক দিকে হাতধরাধরি করিয়া সারি-বন্দী ছয়-সাতটি স্ত্রীলোক এবং তাহাদের সম্মুখে ঐরূপ এক সারি পুরুষ, সারির উভয় প্রান্তে স্ত্রী ও পুরুষ আবার হাত ধরিয়া দুই সারি যুক্ত করিয়া দুইটি চন্দ্রাকার অর্দ্ধবৃত্ত রচনা করিয়া গানের তালে তালে নাচিতে থাকে।

নৃত্যকলা দেখা সমাপ্ত হইল, এইবার চিত্রকলার পালা। ঐতিহাসিক ব্যক্তি ও সিদ্ধপুরুষের কয়েকখানি চিত্র আমার প্রয়োজন ছিল। এক জন তরুণ রাজ-চিত্রকর নিকটেই আছে জানিতে পারিয়া তাহার নিকট চলিলাম। দেখিলাম, তাহার হাত ভাল এবং সেই কারণেই সে মাত্র বাইশ-তেইশ বৎসর বয়সে পাঁচ জন রাজ-চিত্রকরের মধ্যে স্থান পাইয়াছে। শহরে আরও অনেক চিত্রকর আছে, ট্যাক্সের বদলে তাহাদের এই রাজ-চিত্রকরগণকে কাগজ কাপড় রং ইত্যাদি চিত্রণের সরঞ্জাম জোগাইতে হয়। পাঁচ জন রাজ-চিত্রকরের মধ্যে দুই জন বয়োজ্যেষ্ঠ বৃদ্ধ কেবল তত্ত্বাবধান করে। অন্যদের তিন বৎসর অন্তর চব্বিশটি চিত্র মহাগুরুকে দিতে হয়। ইহার জন্য তাহাদের জায়গীর নির্দ্দিষ্ট আছে যাহাতে ভরণপোষণের ভাবনা না থাকে। ভিক্ষু-চিত্রকরদিগের জন্য এরূপ ব্যবস্থা বা নির্দ্দিষ্ট কাষা কিছুই নাই। তরুণ চিত্রকর কুশলী কিন্তু ভোট দেশের চিত্রকলার কঠিন বিধি-বিধানে তাহার প্রতিভা জড়তাপ্রাপ্ত হইয়াছে।

২৩শে মার্চ্চ সপ্তদশ শতাব্দীর সৈনিকদের মিছিল বাহির হইল। প্রথমে সাঁজোয়া পোষাক পরিহিত ধনুর্ব্বাণ ও তূণীর যুক্ত, টুপিতে পালক, ঘোড়সওয়ারের দল চলিল, পরে বিচিত্র পোষাকে পলিতাযুক্ত-গাদা-বন্দুক-সজ্জিত পদাতিক-শ্রেণী। রাস্তা দেশী বারুদের গন্ধে ও গাদা-বন্দুকের শব্দে আমোদিত ও মুখরিত হইয়া গেল। এই সকল ধনুর্দ্ধারী ও খড়্গধারীর পিছনে প্রাচীন রাজবেশে সজ্জিত কয়েক জন লোককে দেখা গেল। কথিত আছে ভোট দেশের সকলে সামন্তরাজকে হারাইয়া দিবার পরে ১৬৪১ খ্রীষ্টাব্দের এই তারিখে মোঙ্গল-বিজেতা গু-শী খাঁ পঞ্চম দলাইলামাকে তিব্বত রাজ্য প্রদান করেন।

২৪শে মার্চ্চ অস্থায়ী রাজত্বের শেষ দিন, অতি প্রত্যুষে মৈত্রেয়র রথযাত্রা হইল। শোভাযাত্রার অগ্রভাগে শঙ্খ ঝাঁঝর লইয়া টুপি-পরিহিত ছাত্র-ভিক্ষুর দল চলিল, পরে চারিচক্রের রথে আরূঢ় মৈত্রেয়র সুন্দর প্রতিমা, পিছনে দুটি হাতী। এই হাতী দুটি শৈশবে এদেশে আসিয়াছে, শীতের দেশে ইহাদের কষ্ট নিশ্চয়ই হয় কিন্তু বড়ই তোয়াজে ইহাদের রাখা হয়।

* * *

যুদ্ধের আশঙ্কা দূর হইলে ৩০শে মার্চ্চ পথঘাট খুলিল। আমি আমার চিত্রপট পুথি সব দ্রুত জড় করিয়া দেশে ফিরিবার ব্যবস্থা করিতে লাগিলাম। মোঙ্গল ভিক্ষু ধর্ম্মকীর্ত্তি আমায় সকল কাজে অনেক সাহায্য করিলেন। ইনি ছয়-সাত বৎসর যাবৎ সে-রা মঠে ন্যায়শাস্ত্র পাঠ করিতেছিলেন। দৃঢ়শরীর এবং অধ্যয়নে মেধাবী এই ভিক্ষুকে আমি সিংহল লইয়া যাইব স্বীকার করিয়াছিলাম। সম্প্রতি তাঁহার সঙ্গে আচার্য্য শান্তরক্ষিত-স্থাপিত (৮২৬ খ্রীঃ, সম্রাট্ ঠি-স্রোং-দে-চন-এর সাহায্যে) এদেশের প্রথম বৌদ্ধবিহার সম্-য়ে দেখিতে যাইব স্থির হইল। লাসা হইতে সম্-য়ে স্থলপথে ত যাওয়া যায়ই, জলপথে চামড়ার নৌকায় লাসার নদী উ-ই-ছু দিয়া চাঙ-ছুর (চাঙ্-স-পো=ব্রহ্মপুত্র) সঙ্গমে এবং ব্রহ্মপুত্রের ক্রোড়ে সম্-য়ে হইতে তিন চার মাইল দূরের ঘাটে যাওয়া যায়। আমরা জলপথে যাওয়াই স্থির করিলাম। প্রত্যেক দিন নৌকা পাওয়া যায় না। ৫ই এপ্রিল খবর পাইয়া আমরা দুই জন নৌকার ঘাটে গিয়া একটি ক্ব (চামড়ার নৌকা) আরোহণ করিলাম। সঙ্গে এক বৃদ্ধা সহযাত্রিণী এবং এক জন তেইশ-চব্বিশ বৎসরের যুবক। আমি প্রথমে ভাবিয়াছিলাম ইহারা মাতাপুত্র, কিন্তু সৌভাগের বিষয় ঐরূপ কোন কথা প্রকাশ্যে বলি নাই, কেন-না যাত্রার দ্বিতীয় দিনে ধর্ম্মকীর্ত্তি বলিলেন এদেশে ঐ দুইটির মত অনেক স্বামী-স্ত্রী আছে, কারণ ধনী বৃদ্ধা বিধবার যুবক পতির অভাব হয় না।

এদেশের নৌকা উজান চলে না, স্রোতের সঙ্গেই চলে এবং ফিরিবার সময় নৌকার কাঠ ও চামড়ার খোল পৃথক করিয়া গাধার পিঠে বোঝাই করিয়া আনা হয়। এইরূপ চামড়ার নৌকা শুধু হাল্কা নহে, নদীগর্ভস্থ পাথরে ঠেকিয়া বানচাল হওয়ার ভয়ও ইহাতে কম। আমরা যাইতে যাইতে কয়েক বার ঐরূপ প্রস্তরের ঘর্ষণ অনুভব করিয়াছিলাম। নৌকার মাঝি ও লস্করের প্রধান কাজ নৌকাকে নদীর খরস্রোত স্থানের উচ্ছল জল ও প্রস্তররাজি হইতে তফাতে রাখা।

পথে প্রখর শীত-বাতাসে এবং কাঠফাটা রৌদ্রে কষ্ট যথেষ্ট ছিল। আমার ও ধর্ম্মকীর্ত্তির সঙ্গে দুইটি পিস্তল থাকায় অন্য ভয় ছিল না। আমাদের প্রতি সন্ধ্যায় তীরের নিকটস্থ কোনও গ্রামে রাত্রি যাপন করিতে হইত। এক গ্রামে এইরূপ রাত্রি-যাপনের সময় শুনিলাম বৃদ্ধার যুবক-পতির উপর দেবতার আবেশ হইয়াছে। শুনিলাম ইহাদের পেশা তাই এবং পরদিন অনেক বেলা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবার পর দেখিলাম স্বামী-স্ত্রী বিলক্ষণ উপহার ও ভেট লইয়া ভক্তবৃন্দের সহিত আসিতেছেন। তৃতীয় দিন অপরাহ্ণে তিব্বতের প্রাচীনতম বৌদ্ধ সম্প্রদায় নিগ্-মা-পাদিগের অন্যতম মঠ 'দোজ-ডক' দেখা দিল। ইহা ব্রহ্মপুত্রের পার্শ্বে একটি পর্ব্বতশিখরে স্থাপিত।

ব্রহ্মপুত্রের স্রোত সেরূপ প্রখর নহে, উপত্যকাও বিস্তৃত। দুই ধারে অনেক গ্রাম ও উদ্যান দেখা গেল। সন্ধ্যার সময় একটি শিলাময় পাহাড়ের নিকট পৌছিলাম। সকলে সশ্রদ্ধভাবে বলিল এই পাহাড় ভোট দেশের নহে, অতি পবিত্রজ্ঞানে ইহাকে ভারত হইতে আনা হইয়াছে। বাম দিকে নদীগর্ভে তিনটি ছোটবড় শিলা ছিল, শুনিলাম সেগুলি সো-নম, ফুন ও সুম্ (মাতা-পিতা-পুত্র) এবং কিম্বদন্তী আছে যে, সেগুলিও ভারত হইতে আগত। তবে ইহা ত সত্যই যে এ-সকলের নিকটেই সম্-য়ে বিহার যাহা ভারতের পণ্ডিতেরা স্বদেশের অনুকরণে নির্ম্মাণ করিয়াছিলেন। রাত্রে নদীর মধ্যের এক দ্বীপে আমরা নৌকা বাঁধিলাম, সে দ্বীপের উপর ঐরূপ আর একটি বিশাল শিলা রহিয়াছে যাহা উচ্চতায় প্রায় ১৫০ ফুট হইবে। এদেশে উৎসবের সময় বিহারের কোন উচ্চ ও বিস্তৃত দেওয়ালে বিশাল চিত্রপট বিলম্বিত করা হয়। এই শিলাটির সম্বন্ধে কিম্বদন্তী আছে যে সম্-য়ে বিহার নির্ম্মাণের সময় ঐরূপ চিত্রপট টাঙাইবার স্থান প্রয়োজন হইলে এই মহাশিলা ভারত হইতে আনা হয়। জুন জুলাই মাসের প্লাবনে

যখন এই দ্বীপটি ডুবিয়া যায় তখন ঐ বিরাট ত্রিকোণাকার শিলাটি মাত্র জাগিয়া থাকে।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া আমরা জম্-লিঙ গ্রামে পৌঁছিলাম। কিছু দূরে এক নালার কাছে নেপালের বৌদ্ধ স্তূপের মত একটি স্তূপ দেখা গেল। ব্রহ্মপুত্রের এই উপত্যকা অঞ্চল যথেষ্ট গরম এবং এখানে বহু আখরোটের বৃক্ষ আছে। চেষ্টা করিলে আরও অনেক ফল এখানে অনায়াসেই উৎপাদন করা যায় কিন্তু সনাতন ধর্ম্মের কৃপায় তাহা হওয়া সম্ভব নহে। নৌকার মাঝি বলিয়াছিল এখান হইতে সম্-য়ে লইয়া যাইবার লোক জোগাড় করিয়া দিবে কিন্তু কার্য্যতঃ তাহার কোনও লক্ষণ না দেখায় আমরা স্থির করিলাম যে তিন মাইল পথ মাত্র ব্যবধান পার হইয়া বিহারেই আশ্রয় লইব।

ব্রহ্মপুত্র ও উই-ছু নদীর ত্রিবেণীর উত্তরের অঞ্চলকে এদেশে উই-যুল (মধ্যদেশ) ও দক্ষিণে ছু-শরের নিকট ত্রিবেণীর নীচের অঞ্চলকে ল্হো-খা (দক্ষিণ দেশ) বলে। ব্রহ্মপুত্রের উপর পশ্চিম অঞ্চল টশীলামার চাঙ প্রদেশ ও পূর্ব্ব দিকে ল্হো-খা প্রদেশ। বর্ত্তমান (এখন গত) দলাইলামা ও টশীলামা উভয়েই এই প্রদেশে জন্মগ্রহণ করিয়াছেন।

নৌকা হইতে নামিয়া পাহাড়ের ধার দিয়া সম্-য়ের দিকে চলিলাম। পথে পর্ব্বতগাত্র হইতে খোদিত ছোট ছোট স্তূপ দেখিলাম, যেরূপ আমাদের দেশের গুহা বিহারে আছে। এই সব দেখিতে দেখিতে দুই ঘণ্টা চলিবার পর সম্-য়ে বিহার দেখা দিল। সমতল-ভূমির উপর চারি দিকে দেওয়াল-ঘেরা এই বিহার বস্তুতই ভোট অপেক্ষা ভারতেরই কথা মনে করাইয়া দেয়। বিহারের চতুর্দ্দিকে ফলহীন বৃক্ষের বাগানও আছে।

পশ্চিম দ্বার দিয়া প্রবেশ করিতে পরিক্রমায় চীনদেশের কালোচশমাযুক্ত এক ভিক্ষুর সঙ্গে দেখা হইল। ইনি সিকিম দেশের লোক এবং উর্গ্যেন-কুশো নামে পরিচিত। তিনি কিছুক্ষণ অতিশয় প্রীতির সহিত কথাবার্ত্তা কহিবার পর তাঁহার লোককে সঙ্গে দিয়া আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। সেদিন কেবলমাত্র আরামে শ্রান্তি দূর করিলাম।

ভোট দেশের গ্রন্থে লিখিত আছে যে, সম্-য়ে বিহার আচার্য্য শান্তরক্ষিত উডন্তপুরী বিহারের অনুকরণে করাইয়াছিলেন। উডন্তপুরী নির্ম্মাণ করেন মহারাজ ধর্ম্মপাল, তাঁহার শাসনকাল ৭৬১-৮০৯ খ্রীঃ পর্য্যন্ত। সম্-য়ে-নির্ম্মাতা সম্রাট্ ঠি-সোঙ দে-চন্ ভোট শাসন করিয়াছিলেন ৭৩০-৮৪ খ্রীষ্টাব্দে, এবং সম্-য়ে নির্ম্মিত হইয়াছিল ৭৫১-৬৩ খ্রীষ্টাব্দে। ভিতরের চারি কোণের চারি ইষ্টকময় স্তূপ (স্তূপ-শিখরে এখনও প্রাচীন ভারতের স্তূপের ন্যায় ছত্র বিরাজ করিতেছে) নিশ্চয়ই নবম শতাব্দীর মধ্যে নির্ম্মিত হইয়াছিল। আশেপাশে বহু চন্দ্র-সূর্য্যযুক্ত বজ্রযানী স্তূপ রহিয়াছে, এবং সকলের মধ্যে গ্চুগ্-লগ্-খঙ্ বিহার রহিয়াছে। একবার এখানের প্রায় সকল অট্টালিকাই অগ্নিদগ্ধ হইয়া যায়, পরে একাদশ শতাব্দীতে র-লোচ-ব পুনর্নির্ম্মাণ করেন। বিহার প্রায় চতুষ্কোণ এবং ছয়-সাত হাত উচ্চ দেওয়ালে ঘেরা, ইহার চার প্রধান দিক-কোণে চারটি দ্বার আছে। মধ্য-স্থলে প্রধান বিহার যাহার চারি দিকের পরিক্রমায় ভিক্ষুদিগের জন্য দ্বিতল আবাস আছে। মূলবিহার প্রায় সমস্তই দারুময় ও ত্রিতল, নীচের তলায় বুদ্ধমূর্ত্তিই প্রধান। বাহিরে আচার্য্য শান্তরক্ষিতের বৃদ্ধাবস্থার মূর্ত্তি আছে, সঙ্গে তাঁহার ভোট দেশীয় ভিক্ষু শিষ্য বৈরাচন ও গৃহস্থ শিষ্য সম্রাট্ ঠি-স্রোঙ-দে-চন্ এই দুই জনেরও মূর্ত্তি আছে। শত বৎসর বয়সে দেহরক্ষা করার পর বিহারের পূর্ব্ব দিকের এক পাহাড়ে এক স্তূপ নির্ম্মাণ করিয়া তাঁহার দেহ না জ্বালাইয়া রাখিয়া দেওয়া হয়। সার্দ্ধ দশ শতাব্দীর উপর ঐ স্তূপ হইতে তিনি নিজহস্তে রোপিত এই ক্ষেত্র দর্শন করিবার পর, চল্লিশ বৎসর পূর্ব্বে ঐ জীর্ণ স্তূপ ভাঙিয়া যায়। স্তূপের ভিতর হইতে তাঁহার কঙ্কাল ও করোটি বাহির হইয়া পড়িলে এখানের লোকে তাহা সযত্নে আনিয়া এক কাচময় আধারে স্থাপন করিয়া বিহারের প্রধান বুদ্ধমূর্ত্তির সম্মুখে রাখিয়া দেয়। যখন আমি সেই আধারের সম্মুখে দাঁড়াইয়া তাঁহার সেই বৃহৎ করোটি দেখিলাম তখন আমার মনের অবস্থা অবর্ণনীয়। ৭৫ বৎসর পার হইবার পর দুর্গম হিমালয় পার হইয়া ধর্ম্মবিজয়, এবং তদুপরি

ভারতীয় দর্শনশাস্ত্রের উজ্জ্বল দর্পণ নির্ম্মাণ (বড়োদার ছাপাখানার কৃপায় ইহা এতদিন পরে আবার জগতে প্রচার হইতেছে এ এক আশ্চর্য্য ব্যাপার !

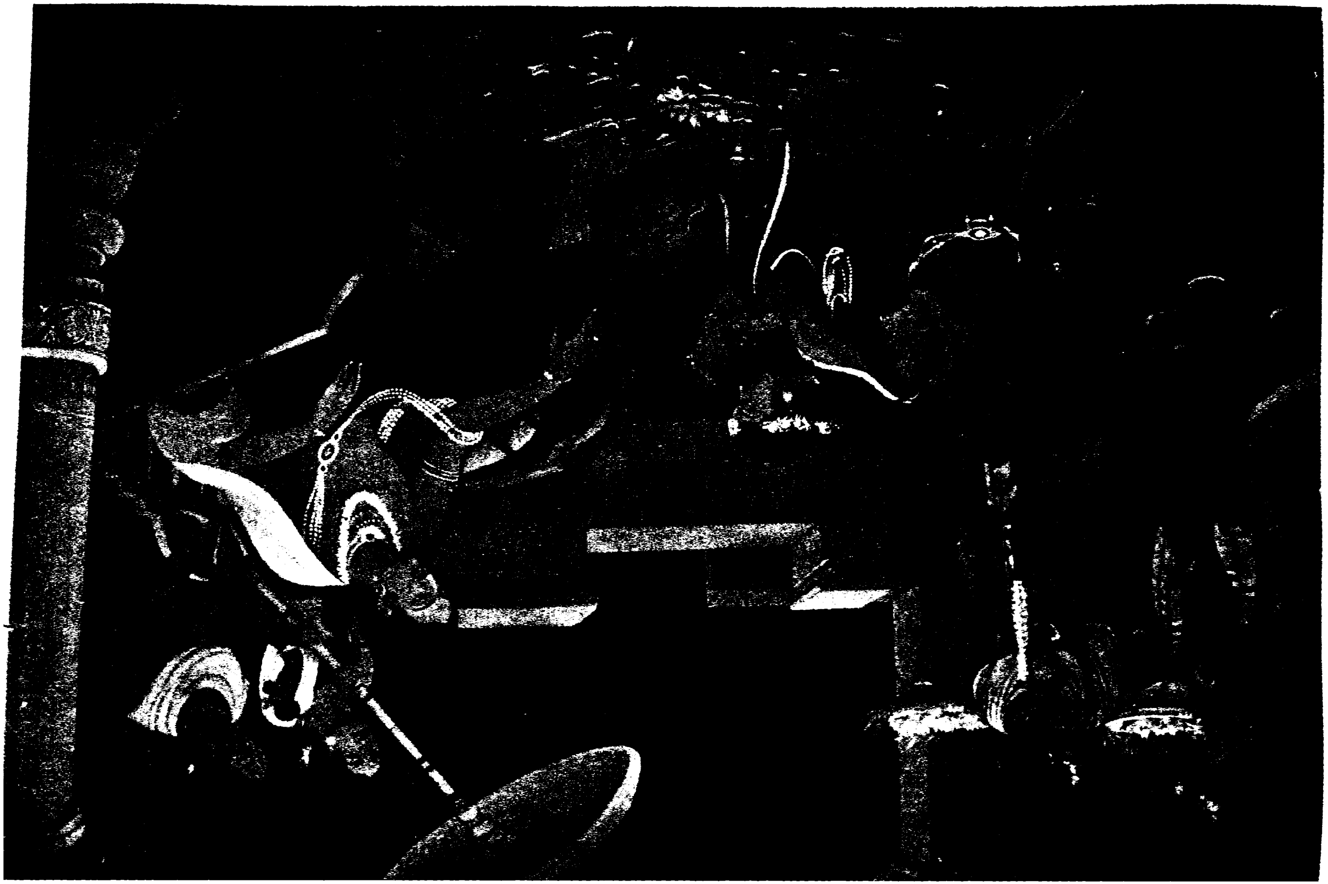
বিহারের দ্বিতীয় তলে অমিতায়ু মূর্ত্তি রহিয়াছে দেখিলাম, তৃতীয় তল শূন্য। তাহার পর "দ্বীপ"গুলি দেখিতে গেলাম। প্রথমে জম্বুদ্বীপ, এখানে অবলোকিতেশ্বর-মূর্ত্তি প্রতিষ্ঠিত এবং তাহার নিকট দ্বীপনির্ম্মাতা রাণী নেতুঙ-চুন্-মো চন্দনকাষ্ঠে বিরাজ করিতেছেন। তাহার পর গ্যাগর্-গ্লিঙ (ভারতদ্বীপ)। এইখানে সেই সর্ব্বজ্ঞ ভারতীয় পণ্ডিতগণ থাকিতেন যাঁহাদের পরিশ্রমের ফলে সহস্র ভোটগ্রন্থে এখনও মানব-দানব ও কালের অত্যাচারে ভারত হইতে লুপ্ত প্রাচীন ভারতীয় রত্নরাজি ভোটভাষায় বর্ত্তমান। ইহাদের সংস্কৃত গ্রন্থের সংগ্রহ দেখিয়া ১০৪৩ খ্রীষ্টাব্দেও আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান বিস্মিত হইয়া বলিয়াছিলেন—এখানে অনেক পুস্তক দেখিতেছি যাহা আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়েও দুষ্প্রাপ্য। দুঃখের বিষয়, পরবর্ত্তী নির্ব্বোধদিগের সময় ঐ অমূল্য গ্রন্থরাজি অগ্নিতে ভস্মীভূত হয়। এখন যাঁহারা এই বিহারের রক্ষক তাঁহাদের কথা না বলাই ভাল। আমার পক্ষে এদেশের তাম্রমুদ্রার ভার লইয়া চলাচল করা দুরূহ ছিল, সুতরাং কয়েকখানি চিত্র ও পুস্তক এখানে সংগৃহীত হইল। কিছু বেশী অর্থ সঙ্গে থাকিলে আরও অনেক জিনিষ পাইতে পারিতাম।

ক্রমশঃ

চিত্র-পরিচয়

"প্রিয়-প্রসাধন"

পুরুরবা কেশী দানবের হাত হইতে উর্ব্বশীকে রক্ষা করিলে ও তৎপর তাঁহারা পরস্পর অনুরক্ত হইলে পুরুরবার পাটরাণী রাজার প্রতি অভিমানবশত প্রস্থান করিলেন। পুরুরবার সহিত রাণীর বিবাদভঞ্জনের কাহিনী এই চিত্রে বর্ণিত আছে :···"এমন সময় চেটী আসিয়া খবর দিল, রাজার কাছ হইতে গিয়া অবধি রাণী উপবাস করিতেছেন। তাঁহার এক ব্রত আছে, সেই ব্রত আজ সাঙ্গ হইবে। কিন্তু রাজার নিকট না আসিলে সে ব্রত আজ উদ্‌যাপন হইবার কোনো সম্ভাবনা নাই। তাই তিনি অনুনয়-বিনয় করিয়া একবার দেখা করিবার জন্য বড় ব্যস্ত হইয়াছেন। ব্রতের কথা শুনিয়া রাজা বলিলেন, 'তিনি আসুন।' রাণী আসিলেন; সঙ্গে অনেক চেটী অনেক পূজার জিনিষ লইয়া আসিয়াছে। রাণী রাজাকে পূজা করিলেন। ফুল দিলেন, মালা দিলেন, চন্দন দিলেন, ভাল ভাল খাবার জিনিষ দিলেন।···রাণী আরতি করিলেন। পূজার অঙ্গ শেষ হইলে গলায় কাপড় দিয়া বলিলেন, 'আজ অবধি আমার স্বামী যাহাকে ভালবাসিবেন, আমিও তাহাকে ভালবাসিব; সে আমার ভগিনী হইবে। এই আমার ব্রত। এই ব্রতের নাম প্রিয়-প্রসাধন।"—হরপ্রসাদ শাস্ত্রী



বিবিধ প্রসঙ্গ

ভারতে "প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বে" ব্রিটেনের সুবিধা

১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের যে ভারতশাসন আইন হইয়াছে তাহার খসড়া প্রস্তুত করিবার নিমিত্ত কয়েক বৎসর ধরিয়া ভারতবর্ষে ও ব্রিটেনে নানা আয়োজন হইয়াছিল। ভারতবর্ষে সাইমন কমিশন ও তাহার সহায়ক একাধিক কমীটি বসিয়াছিল। ব্রিটেনে তথাকথিত ভারতসম্বন্ধীয় গোলটেবিল কনফারেন্স বসিয়াছিল। ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের হাউস অব্ কমন্স এবং হাউস অব্ লর্ডসের একটি বাছাই-করা সম্মিলিত কমীটিরও বহু অধিবেশন হইয়াছিল। এই জয়েণ্ট সিলেক্ট পার্লেমেণ্টারী কমীটি যে রিপোর্ট প্রকাশ করেন, তাহাতে নির্দ্দিষ্ট পলিসি অর্থাৎ নীতি অনুসারেই ১৯৩৫ খ্রীষ্টাব্দের ভারতশাসন আইন প্রধানতঃ প্রণীত হয়। এই রিপোর্টের এক স্থানে আছে, যে, ভারতবর্ষে ব্রিটিশ শাসনের প্রধান কীর্ত্তি ও কৃতিত্ব ভারতের একত্ব সম্পাদন, অর্থাৎ কিনা, ইংরেজরা ভারতবর্ষের প্রভু হইবার আগে ভারতবর্ষ কেবল একটা ভৌগোলিক নাম মাত্র ছিল; অনেকগুলা আলাদা আলাদা দেশের সমষ্টির নাম ছিল ভারতবর্ষ, কিন্তু তাহাদের মধ্যে কোন একত্ব ছিল না, ইংরেজরা প্রভু হইয়া তবে সেগুলাকে এক রাষ্ট্রে পরিণত করায় তবে সেগুলার সমষ্টিগত ভারতবর্ষ নাম সার্থক হইয়াছে। এখানে এ বিষয়ে কোন তর্কের উত্থাপন করিব না।

এইরূপ কথা বলিবার পর অন্য একটি প্যারাগ্রাফে কমীটি বলিয়াছেন, যে, তাঁহারা ভারতবর্ষের এই ব্রিটিশ-সম্পাদিত একত্বকে কমাইতে, বলিতে গেলে নষ্ট করিতে যাইতেছেন।* কি প্রকারে ও কেন এরূপ করিতে যাইতেছেন? ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশগুলিকে আত্মকর্তৃত্ব দিয়া ইহা করা হইতেছে, এবং তাহা করা হইতেছে এই জন্য, যে, যাহাতে প্রদেশগুলি স্বাধীনভাবে নিজ নিজ পথে বিকাশ লাভ করিতে পারে।

প্রদেশগুলি যদি বাস্তবিক আত্মকর্তৃত্ব লাভ করিত, যদি তাহাদের ব্যবস্থাপক সভাগুলিতে নির্ব্বাচিত জনপ্রতিনিধিদের প্রাদেশিক আয়ব্যয় ও আইন-প্রণয়ন সম্বন্ধে চূড়ান্ত ক্ষমতা থাকিত, তাহা হইলে প্রদেশগুলিকে আত্মকর্তৃত্ব-দানের উদ্দেশ্য যাহাই হউক, তদ্রূপ আত্মকর্তৃত্ব অনেকটা মূল্যবান হইত। কিন্তু যে-কেহ ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন পড়িয়াছেন তিনিই জানেন, কোন বিষয়েই প্রাদেশিক ব্যবস্থাপক সভাগুলির চূড়ান্ত ক্ষমতা নাই। প্রাদেশিক গবর্ণরের, তাঁহার উপর সমগ্র ভারতের গবর্ণর-জেনার‍্যালের এবং তাঁহার উপর ভারতসচিবের মরজির উপর প্রাদেশিক মন্ত্রীদিগের ও ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যকারিতা নির্ভর করে: প্রথমতঃ, গবর্ণর সম্মতি দিলে বা বাধা না-দিলে, এবং তাহার পর গবর্ণর-জেনার‍্যাল ও ভারতসচিব বাধা না দিলে, মন্ত্রীরা কিছু করিতে পারেন, ব্যবস্থাপক সভাও কিছু করিতে পারেন। ভারতশাসন আইন দ্বারা যে ভারতবর্ষকে খুব স্বশাসন-অধিকার দেওয়া হইয়াছে, ইহা প্রমাণ করিবার নিমিত্ত প্রথম প্রথম কর্তৃপক্ষ বাধা না-দিতে পারেন। কিন্তু যে-ক্ষমতা, যে-অধিকার অপরের মরজি-সাপেক্ষ, অপরের অনুগ্রহের উপর নির্ভর করে, তাহাকে স্বশাসন-ক্ষমতা বা স্বশাসন-অধিকার বলা যায় না।

যাহা হউক, ব্রিটিশ পার্লেমেণ্টের জয়েণ্ট সিলেক্ট কমীটির এই রিপোর্ট অনুসারে যে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্ব গবর্ণরশাসিত প্রদেশগুলিকে দেওয়া হইয়াছে, তাহা প্রকৃত আত্মকর্তৃত্ব বিবেচিত হইবার যোগ্য হইলেও তাহার দ্বারা যে ব্রিটিশ ভারতের একত্ব নষ্ট হইয়াছে বা বহু পরিমাণে হ্রাস পাইয়াছে, তাহা অস্বীকার করিবার জো নাই। সবে ত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের যুগ আরম্ভ হইয়াছে। এখনই দেখুন, এক এক প্রদেশের রাষ্ট্রীয় বা সরকারী কাজ এক এক

* Joint Committee Report on Indian Constitutional Reform, Vol. I, Pt. 1, p. 14.

রকমে সম্পাদিত হইতেছে। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের দ্বারা শাসিত প্রদেশগুলিতে তবু কাজের ধারা ও নীতিটার একটা মোটা বা সাধারণ রকমের একত্ব আছে। কিন্তু তাহার সহিত অবশিষ্ট পাঁচটি প্রদেশের শাসনকার্য্যের ধারা বা নীতির ঐক্য কোথায়? কেবলমাত্র একটি দৃষ্টান্ত লউন। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসিত প্রদেশগুলিতে রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া, প্রেস ও সংবাদপত্রের জমানৎ ফেরত দেওয়া, বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত সমিতি ও প্রতিষ্ঠানগুলির বিরুদ্ধে ঘোষণা প্রত্যাহার করা, যাহাদের নামে গবর্মেণ্টের পক্ষ থেকে রাজদ্রোহের মোকদ্দমা চলিতেছিল মোকদ্দমা প্রত্যাহার করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেওয়া—এবংবিধ নানা কাজ কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ছয়টি প্রদেশে করিতেছেন বা করিবার উদ্যোগ করিতেছেন। যে পাঁচটি প্রদেশে মন্ত্রীরা কংগ্রেসওয়ালা নহেন, সেখানে এরূপ কাজ ত হইতেছেই না, বরং তাহার বিপরীত কাজ হইতেছে। বঙ্গে বিনাবিচারে সন্দেহভাজন লোকদিগকে বন্দী করিবার ও বন্দী করিয়া রাখিবার প্রথার সমর্থন গবর্ণর ও প্রধান মন্ত্রী উভয়েই করিয়াছেন। বিনাবিচারে বন্দীকৃত লোকদিগকেও একসঙ্গে ছাড়িয়া দেওয়া যায় না, ইহাই অকংগ্রেসী বাংলা-গবর্মেণ্টের মত। কাহাকেও কাহাকেও ছাড়িয়া দেওয়া যায় কিনা, প্রত্যেকের কাগজপত্র দেখিয়া তাহা কর্তৃপক্ষ স্থির করিতেছেন, এইরূপ কথিত হইয়াছে। বিচারান্তে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদীদিগকে ছাড়িয়া দেওয়ার বিষয় তাঁহারা বিবেচনাও করিতেছেন না বলিয়া মনে হয়। বঙ্গে প্রেস ও সংবাদপত্রের জমানৎ ফেরত দেওয়া দূরে থাকুক, যে-বিষয়ে যেরূপ একটি প্রবন্ধের জন্য 'ঘ্যাডভান্স'-সম্পাদকের শাস্তি হইয়াছে (যাহার বিরুদ্ধে আপীল এখন হাইকোর্টের বিচারাধীন), সেই প্রবন্ধটির কয়েক দিন পরে এবং প্রথমোক্ত প্রবন্ধটির জন্য মোকদ্দমা হইবার অনেক দিন আগে লিখিত অন্য একটি প্রবন্ধের জন্য ঘ্যাডভান্সের নিকট হইতে জমানৎ লওয়া হইয়াছে, এবং বসুমতীর নিকট হইতে পূর্ব্বে গৃহীত জমানতের পাঁচ হাজার টাকা বাজেয়াপ্ত করা হইয়াছে। বে-আইনী বলিয়া ঘোষিত কোন সমিতি বা প্রতিষ্ঠানের বিরুদ্ধে ঘোষণা বঙ্গে প্রত্যাহৃত হয় নাই। রাজদ্রোহ, বিদ্রোহ বা তদর্থে ষড়যন্ত্রের অভিযোগে দায়ের কোন মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া হয় নাই—সেরূপ মোকদ্দমা চলিতেছে।

অন্যান্য অনেক বিষয়েও ছয়টি প্রদেশ ও পাঁচটি প্রদেশে পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। যথা—উড়িষ্যার মন্ত্রীরা ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইনের নিন্দা করিয়া তাহা নাকচ করিবার একটি সুপারিস্ পাস করিবেন স্থির করিয়াছেন। তাঁহাদের সুপারিস্ আরও এই হইবে, যে, মূল ভারতশাসনবিধি রচনা করিবার নিমিত্ত একটি কন্‌ষ্টিটিউয়েন্ট ঘ্যাসেম্‌ব্লী আহ্বান করা হউক। বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় ডাঃ নলিনাক্ষ সান্যাল ঠিক ঐ ধরণের নিম্নলিখিত প্রস্তাবটি উপস্থিত করিতে চাহিয়াছিলেন, কিন্তু গবর্ণর তাহা করিতে দেন নাই।

"This Assembly is of the opinion that the present constitution under the Government of India Act, 1935, is reactionary, undemocratic and anti-national and totally unacceptable to the people of India and that steps should be taken to secure framing of the constitution based on national independence by the people of India through the medium of a constituent assembly elected on adult franchise."

ব্যবস্থাপক সভা সম্বন্ধীয় নিয়মাবলীতে এবং স্থায়ী আদেশসমূহে গবর্ণরদিগকে যে-সব ক্ষমতা দেওয়া হইয়াছে, তাহার প্রয়োগ দ্বারা সার্ব্বজনিক কোন বিষয়সম্বন্ধীয় প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত করিতে না-দেওয়া এই প্রথম হইল।

বিহারে সভাসমিতিতে পুলিসের উপস্থিতি বন্ধ করা হইয়াছে। ডাকে প্রেরিত চিঠি প্রেরক ও প্রাপকের অজ্ঞাতসারে খুলিবার পড়িবার ও তাহার নকল রাখিবার প্রথা কোন কোন কংগ্রেসী মন্ত্রীশাসিত প্রদেশে রহিত হইয়াছে।

মান্দ্রাজের কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট সমুদয় কয়েদীকে দুধ দিতে সংকল্প করিয়াছেন। অকংগ্রেসী কোন গবর্মেণ্ট এরূপ কোন সংকল্প করেন নাই। কংগ্রেসী মন্ত্রীরা মাসিক ৫০০ টাকা বেতন লইতে সংকল্প করায় মান্দ্রাজের দেশী ও ইংরেজ সরকারী কর্ম্মচারীদের অনেকে স্বেচ্ছায় নিজ নিজ বেতনের শতকরা সাড়ে বারো টাকা কম লইতে সংকল্প

করিয়াছেন, শুনা যাইতেছে। অকংগ্রেসী মন্ত্রীদের শাসিত কোন প্রদেশে এরূপ কিছু হইবার সম্ভাবনা নাই। মান্দ্রাজের কংগ্রেসী গবর্মেণ্ট নেশার জন্ম সুরা এবং তাড়ি প্রভৃতি বিক্রয় ও সেবন সম্পূর্ণরূপে বন্ধ করিতে সংকল্প করিয়াছেন। প্রথমতঃ, তাঁহারা সালেম জেলায় এই শুভ কার্য্যের সূত্রপাত করিবেন। অকংগ্রেসী কোন গবর্মেণ্ট এরূপ কাজ করেন নাই।

ছয়টি প্রদেশে যাহা হইতেছে, তাহার বিপরীত অবস্থা কেবল যে বাংলা দেশেই ঘটিতেছে তাহা নহে, অন্যত্রও এইরূপ হইতেছে। বঙ্গে যেমন ১৪৪ ধারার প্রয়োগ হইতেছে, সেইরূপ অন্যত্রও হইতেছে। সম্প্রতিও করমসিং ধৃত নামক এক ব্যক্তি পঞ্জাব হইতে বহিষ্কৃত হইয়াছে, এবং রাজেশ্বর, শিবকুমার শারদা, ও বিজয়কুমার নামে তিন ব্যক্তিকে গ্রেপ্তার করিয়া লাহোর দুর্গে আটক করা হইয়াছে।

অতি অল্প দিন হইল কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কাজের ভার লইয়াছেন। ইতিমধ্যেই তাঁহাদের শাসিত প্রদেশগুলি ও অন্য প্রদেশগুলির শাসনকার্য্যের মধ্যে পার্থক্য লক্ষিত হইতেছে। কালক্রমে এই পার্থক্য বাড়িয়াই চলিবে। অবস্থাটা এইরূপ দাঁড়াইতেছে এবং আরও স্পষ্টভাবে ভবিষ্যতে দাঁড়াইতে পারে যেন ছয়টি প্রদেশ ভারতবর্ষের অংশ নহে, ভারতবর্ষে অবস্থিত নহে; কিংবা যেন ছয়টি এক দেশে অবস্থিত, বাকী পাঁচটি অন্য দেশে অবস্থিত; ছয়টি একবিধ শাসনতন্ত্রের অধীন একটি রাষ্ট্র, পাঁচটি অন্যবিধ শাসনতন্ত্রের অধীন অন্য একটি রাষ্ট্র।

এই জন্যই বলিতেছিলাম, তথাকথিত প্রাদেশিক "আত্মকর্তৃত্বের" দ্বারা যে ভারতবর্ষের একত্ব বিনষ্ট করিবার কথা জয়েণ্ট সিলেক্ট পার্লেমেণ্টারী কমীটির রিপোর্টে আছে, তাহার বাস্তব রূপ দৃষ্ট হইতে আরম্ভ হইয়াছে।

ছয়টি কংগ্রেসী প্রদেশের লোকেরা, ব্যবস্থাপক সভার সভ্যেরা, ও হয়ত মন্ত্রীরাও পাঁচটি প্রদেশের লোকদের সহিত কোন কোন সময়ে কোন কোন অবস্থায় সমবেদনা প্রকাশ সম্ভবতঃ করিবেন। কিন্তু তাহাতে অকংগ্রেসী প্রদেশগুলির সামান্য উপকারও হইবে কি না সন্দেহস্থল। ভারতবর্ষের লোকেরা আবিসীনিয়া, স্পেন ও প্যালেষ্টাইন সম্বন্ধেও ত উদ্বেগ প্রকাশ করিয়া থাকে। তাহাতে সেই সব দেশের লোকদের বুকে বল বাড়ে কিনা, জানি না।

প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের গুণাবলী ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা এই নূতন আবিষ্কার করেন নাই। বহু পূর্ব্বেই, গত খ্রীষ্টীয় শতাব্দীতেই, তাঁহারা ইহা আবিষ্কার করিয়াছিলেন। স্বর্গত মেজর বামনদাস বসু মহাশয় কর্তৃক প্রণীত "কন্সলিডেশ্যন অব দি ক্রিশ্চিয়ান পাওয়ার ইন ইণ্ডিয়া" নামক পুস্তক হইতে এ বিষয়ে কিছু জ্ঞান লাভ করা যায়।* ব্রিটিশ রাজনীতিজ্ঞেরা ভারতবর্ষে প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের এই একটি গুণ বুঝিতে পারিয়াছিলেন, যে, প্রদেশগুলি তাহা পাইলে সমগ্রদেশব্যাপী কোন একটা সাধারণ অভাব-অভিযোগ থাকিবে না, সুতরাং ভারতব্যাপী প্রবল কোন আন্দোলনও হইবে না, অতএব এরূপ অবস্থা ব্রিটিশ প্রভুত্ব রক্ষার অনুকূল হইবে।

---

* "Before the Parliamentary Committee on the Colonization and Settlement of the Britishers in India, Major G. Wingate, who appeared as a witness on 13th July, 1858, on being asked,

"7771. You speak of the dangers that arise from a central government and you say that it leads to a community of aims and feelings that might be dangerous ?" answered: "Yes, I think that if there be any one subject in which the whole population of India would be interested, that is more likely to be dangerous to the foreign authority than if a question were simply agitated in one division of the empire; if a question were agitated throughout the length and breadth of the empire, it would surely be much more dangerous to the foreign authority than a question which interested one Presidency only."

He gave expression to the feeling which was uppermost in the minds of the Britishers at that time, not to do anything which might "amalgamate" the different creeds and castes and provinces of India. So everything was being done to prevent the growing up of a community of feelings and interests throughout India which would make the peoples of India politically a nation" (pp. 76-77).

জয়েণ্ট পার্লেমেণ্টারী কমীটি তাঁহাদের রিপোর্টে এক দিকে যেমন ভারতবর্ষের একত্ব বিনাশ বা হ্রাসের কথা বলিয়াছেন, তেমনই কেন্দ্রীয় ফেডার‍্যাল গবর্মেণ্ট স্থাপন দ্বারা ভারতবর্ষের অখণ্ডত্ব রক্ষার কথাও বলিয়াছেন। কিন্তু কতকগুলা বিসদৃশ জিনিষকে এক জায়গায় রাখিয়া দিলেই সেগুলার অখণ্ড সত্তা রক্ষিত, উদ্ভূত বা প্রমাণিত হয় না। ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় ব্রিটিশ-শাসিত প্রদেশসমূহের অধিবাসীদের প্রতিনিধি থাকিবে, আবার দেশী রাজ্যসমূহের স্বৈরশাসক রাজা-মহারাজা-নবাব-নিজামদের মনোনীত লোক থাকিবে। দেশী রাজ্যসমূহের প্রজারা সে সব লোক নির্ব্বাচন করিবে না—এই প্রজাদের কোনই অধিকার নাই ও থাকিবে না। সুতরাং এই অদ্ভুত ফেডার‍্যাল ব্যবস্থাপক সভায় সেকেলে স্বৈরশাসকদের আজ্ঞাবহ লোকেরা থাকিবে, আবার কতকটা একেলে গণতান্ত্রিক রীতিতে ব্রিটিশ-শাসিত ভারতবর্ষের লোকদের দ্বারা নির্ব্বাচিত প্রতিনিধিও থাকিবে। তেলে জলে যেমন মিশ খায় না, তেমনি স্বৈরশাসন ও গণতান্ত্রিকতাতেও মিশ খায় না। যে ব্যবস্থাপক সভাতে এমন ভিন্নধর্ম্মী দু-রকম জিনিষের একত্র সমাবেশ হইবে, তাহার দ্বারা ভারতবর্ষের একত্ব ও অখণ্ডত্ব রক্ষিত হইতে পারে না।

উপরে "কতকটা একেলে গণতান্ত্রিক রীতি" শব্দগুলি প্রয়োগ করিয়াছি। তাহার কারণ, ভারতবর্ষে ঠিক্ গণতান্ত্রিক রীতি অনুসৃত হয় নাই। এদেশের মানুষদের পরিচয় ভারতশাসন আইনে এ নয়, যে, তাহারা এদেশের মানুষ। ১৯৩৫ সালের সারা ভারতশাসন আইনটার কোথাও অধিবাসীদিগকে ভারতীয় বা ইণ্ডিয়ান বলা হয় নাই। এমন কথা বলা হয় নাই, যে, ভারতীয়েরা এত জন প্রতিনিধি নির্ব্বাচন করিবে। বাংলা, মহারাষ্ট্র, পঞ্জাব প্রভৃতি প্রদেশের লোকেদের সম্বন্ধে যে-সকল ব্যবস্থা আছে, তাহাতে তাহাদের নির্ব্বাচনাধিকার প্রভৃতির উল্লেখের সময় বাঙালী, মরাঠা, পঞ্জাবী প্রভৃতি নামের প্রয়োগ নাই। ব্রিটিশ আইনের চক্ষে সমগ্র ভারতে আমরা ভারতীয় নহি, নিজ নিজ প্রদেশে আমরা বাঙালী, মরাঠা, পঞ্জাবী, বিহারী, উৎকলীয়, আসামী, অন্ধ্রদেশীয়, হিন্দুস্থানী, সিন্ধী, তামিল প্রভৃতি নহি। সর্ব্বত্র আমরা হিন্দু বা মুসলমান বা শিখ বা বৌদ্ধ বা খ্রীষ্টিয়ান বা জৈন বা আদিম নিবাসী, কিংবা শ্রমিক, বণিক, জমিদার ইত্যাদি।

সুতরাং কেবল যে তথাকথিত প্রাদেশিক আত্মকর্তৃত্বের দ্বারাই ভারতবর্ষের একত্বের ও অখণ্ডত্বের হ্রাস বা বিনাশ হইতেছে তাহা নহে, অন্যান্য উপায়েও তাহা সাধিত হইতেছে।

—

আণ্ডামানে বন্দীদের প্রায়োপবেশন

আণ্ডামানে ১৮৭ জন বন্দী স্বেচ্ছায় অন্নগ্রহণ ত্যাগ করিয়াছে, এই সংবাদে হৃদয়হীন মানুষ ছাড়া আর সকলেই বিচলিত হইবে। প্রত্যেক মানুষের কাছেই তাহার প্রাণ অতি প্রিয় ও মূল্যবান—অন্যের চক্ষে তাহা যাহাই হউক না কেন। এই জন্য খুব প্রিয় বুঝাইতে প্রাণপ্রিয়, প্রাণাধিক প্রভৃতি শব্দ ব্যবহৃত হয়। গুরুতর কারণ না-ঘটিলে মানুষ প্রাণের মায়া ছাড়িয়া কোন কিছুর জন্য প্রাণপণ করে না। উন্মাদদের আত্মহত্যার কথা এখানে হইতেছে না। হঠাৎ ১৮৭ জন মানুষ একসঙ্গে উন্মাদ হইয়া যায় নাই।

এই বন্দীদের প্রায়োপবেশনের কারণ বহু পরিমাণে একটা সরকারী জ্ঞাপনী হইতে বুঝা যায়। তাহাতে লিখিত হইয়াছে, যে, এই ১৮৭ জন ও আরও কয়েক জন বন্দী ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট অল্পদিন পূর্ব্বে একটি আবেদন পাঠায়। তাহাতে এই এই অনুরোধ জানায়, যে, সমগ্র ব্রিটিশ ভারতে (১) সমস্ত বিনা-বিচারে বন্দী, বিচারান্তে দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দী, এবং রাজবন্দীদিগকে খালাস দেওয়া হউক; (২) সমুদয় দমনমূলক আইন রদ করা হউক, এবং অন্তরায়িত করিবার সব আদেশ প্রত্যাহৃত হউক; (৩) আণ্ডামানে কারারুদ্ধ সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে দেশে ফিরাইয়া আনা হউক এবং ভবিষ্যতে আর কোন রাজনৈতিক বন্দীকে আন্দামানে প্রেরণ করা বন্ধ করা হউক; এবং (৪) সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে "বী" শ্রেণীর (দ্বিতীয় শ্রেণীর) কয়েদী বলিয়া গণ্য করা হউক।

সরকারী জ্ঞাপনীতে জানান হইয়াছে, যে, ভারত-গবর্মেণ্ট এই আবেদন না-মঞ্জুর করিয়াছেন। না-মঞ্জুর করিবার কারণ এইরূপ বলা হইয়াছে—

The Government of India are in no circum-

stances prepared to entertain mass petitions from convicted prisoners, particularly mass petitions on questions of broad policy of a general character, and accordingly they had no choice but to reject the petition in question.

তাৎপর্য্য। কোন অবস্থাতেই ভারত-গবর্মেণ্ট বিচারান্তে দোষী প্রমাণিত ও দণ্ডিত কয়েদীদের নিকট হইতে সমষ্টিগত বা দলবদ্ধ আবেদন গ্রহণ ও বিবেচনা করিতে প্রস্তুত নহেন—বিশেষতঃ সাধারণ রকমের ব্যাপক শাসননীতিবিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে দলবদ্ধ আবেদন। সুতরাং ঐ আবেদন না-মঞ্জুর করা ভিন্ন ভারত-গবর্মেণ্টের গত্যন্তর ছিল না।

ভারত-গবর্মেণ্ট আণ্ডামানের আবেদনকারী বন্দীদের আবেদন এই কারণে না-মঞ্জুর করিয়াছেন, যে, তাহা বিচারান্তে দণ্ডিত বন্দীদের দলবদ্ধ আবেদন এবং তাহা সাধারণ রকমের ব্যাপক শাসন-নীতিবিষয়ক প্রশ্ন সম্বন্ধে আবেদন। আবেদনকারী বন্দীদিগের সমষ্টিগত আবেদন অগ্রাহ্য হইবার পর তাহারা যদি প্রত্যেকে ঐ আবেদন আলাদা আলাদা পাঠাইত (এবং আবশ্যক হইলে তাহার ভাষা একটু পৃথক পৃথক করিয়া দিত), তাহা হইলে দলবদ্ধ ও সমষ্টিগত আবেদনের বিরুদ্ধে গবর্মেণ্টের যে আপত্তি, তাহা খণ্ডিত হইত কি না এবং গবর্মেণ্ট আবেদন-গুলি গ্রহণ ও বিবেচনা করিতেন কি না জানি না। এক এক জনের আলাদা আলাদা দরখাস্ত যদি গ্রহণ ও বিবেচনার যোগ্য হয়, তাহা হইলে সেই দরখাস্তে বহু ব্যক্তি দস্তখত করিলে তাহা কেন সেই কারণেই অগ্রাহ্য হইবে? বরং অনেক লোক কোন প্রার্থনা জানাইলে প্রার্থনার বিষয়টি গুরুতর, ইহাই ত মনে করা স্বাভাবিক। ব্রিটিশ সাম্রাজ্যে ও পৃথিবীর সভ্যদেশসমূহে কর্তৃপক্ষের নিকট প্রেরিত লক্ষ লক্ষ লোকের স্বাক্ষরযুক্ত আবেদন বিশেষ গুরুত্বপূর্ণ বিবেচিত হয়। এক এক জনের পৃথক পৃথক প্রার্থনা বিবেচনা করা যদি ধর্ম্মনীতিসংগত ও বৈধ হয়, তাহা হইলে বহু ব্যক্তির সম্মিলিত প্রার্থনা বিবেচনা করা ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ ও অবৈধ হইতে পারে না। জেলের বাহিরের লোকদের সম্মিলিত প্রার্থনা বিবেচনা করা যদি ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ ও অবৈধ না হয়, তাহা হইলে বিচারান্তে দণ্ডিত বন্দীদের তদ্রূপ প্রার্থনা কেন বিবেচনার অযোগ্য হইবে?

আবেদনটি অগ্রাহ্য করিবার অন্য এই কারণ গবর্মেণ্ট বলিয়াছেন, যে, উহা ব্যাপক শাসননীতিবিষয়ক প্রশ্ন-সম্বন্ধীয়। কিন্তু উহা জমীর খাজনা, বাণিজ্যশুল্ক, বা এরূপ কোন প্রশ্ন সম্বন্ধে নহে যাহার সহিত আণ্ডামানের বন্দীদের বিশেষ কোন সম্পর্ক নাই; উহা এরূপ প্রশ্ন সম্বন্ধে যাহার সহিত তাহাদের নিজের সুখ দুঃখ ও ভাগ্য জড়িত। সে রকম বিষয়ে তাহারা কেন আবেদন করিতে পারিবে না বুঝা যায় না।

তাহার পর ইহাও মনে রাখিতে হইবে, যে, ঐ বন্দীরা যে অনুরোধ জানাইয়াছে, তাহা ভারতবর্ষের নানা প্রদেশ হইতে জনসাধারণের পক্ষ হইতেও করা হইয়াছে, এবং দুই-একটি অনুরোধ অনুযায়ী কাজ, তাহারা অনুরোধ জানাইবার আগেই, কোন কোন প্রাদেশিক গবর্মেণ্ট কর্তৃক নিষ্পন্ন হইয়াছে; যেমন, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তিদান। পরে এই বিষয়ে আরও কিছু লিখিতেছি।

আণ্ডামানের ১৮৭ জন বন্দী প্রায়োপবেশন করায় সর্ব্বত্র জনগণের মন বিক্ষুব্ধ হইয়াছে। তাহা প্রথম প্রকাশ পায়, কলিকাতার টাউন-হলের বহু জনাকীর্ণ সভায় যাহাতে রবীন্দ্রনাথ তাঁহার মন্তব্য পাঠ করেন। মহাকবিরা যেমন তাঁহাদের অনেক রচনায় মানুষের হৃদয়-মনের নিগূঢ় কথা ব্যক্ত করেন, রবীন্দ্রনাথ সেইরূপ তাঁহার বাণীতে জনগণের মনের কথা তাঁহার অননুকরণীয় ভাষায় ব্যক্ত করিয়াছেন। বন্দীদের নিকট সভা হইতে এই টেলিগ্রাম গিয়াছে, যে, দেশ তাহাদের অনুরোধ সমর্থন করে। এই সভার পর কলিকাতায় আরও সভা হইয়াছে। ছাত্রদের শোভাযাত্রা হইয়াছে, এবং মফস্বলেও নানা স্থানে সভা হইয়াছে। সর্ব্বত্র যুক্তিপূর্ণ প্রস্তাব উপস্থাপিত ও গৃহীত হওয়া সমীচীন।

প্রায়োপবেশক বন্দীদের সম্বন্ধে একটি প্রস্তাব বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় উপস্থাপিত হইয়াছিল। কিন্তু তাহার পক্ষে ৭৫ এবং বিরুদ্ধে ১৫০ জন সদস্য ভোট দেওয়ায় তাহা অগ্রাহ্য হইয়াছে। প্রস্তাবটির পক্ষে অনেক সদস্য—বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত শ্যামাপ্রসাদ মুখোপাধ্যায়—যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করেন। শ্যামাপ্রসাদবাবু, প্রস্তাবটি কি ভাবে দেখিতে ও বুঝিতে হইবে, তাহা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দেন। তাহা সত্ত্বেও যে এত বেশীসংখ্যক সদস্য তাহার বিরুদ্ধে ভোট দেন, তাহার কারণ, উহাকে একটা সাম্প্রদায়িক প্রশ্ন, দলাদলির

ব্যাপার মনে করা হয় ; যেন "ইংরেজ বনাম কালা-আদমী" মোকদ্দমা হইতেছে, যেন মন্ত্রিমণ্ডলের সমর্থক দল এবং মন্ত্রিমণ্ডলের বিরোধী দলের একটা ঝগড়া হইতেছে, এইরূপ মনে করা হয়। বিষয়টি যে ন্যায়বুদ্ধির দিক্ হইতে যে উদার মানবিকতাপ্রণোদিত হৃদয়-মন লইয়া বিবেচনা করা উচিত ছিল, তাহা করা হয় নাই। অধিকাংশ মুসলমান সদস্য হয়ত ভাবিয়াছেন, প্রায়োপবেশকেরা ত সবাই বা প্রায় সবাই হিন্দু ; অতএব আমাদের তাহাতে কি আসে যায় ? ইংরেজ সদস্যেরা ভাবিয়া থাকিবেন ইহা বিদ্রোহী কালা-আদমীদের ব্যাপার, তাহাদিগকে সায়েস্তা করাই উচিত।

কাগজে দেখিলাম, প্রায়োপবেশকদের সংখ্যা ১৮৭ হইতে ২৫০-এ পৌঁছিয়াছে। পরে হয়ত আরও বাড়িবে। অনেক উপবাসীর অবস্থা সঙ্কটাপন্ন। জোর করিয়া খাওয়াইবার চেষ্টায় বা অন্য কারণে কত জনের প্রাণ সংশয় হইবে বা প্রাণ যাইবে, বলা যায় না।

গবর্মেণ্টকে ও জনগণকে মনে রাখিতে হইবে, যে, এই বন্দীরা প্রথমেই প্রায়োপবেশন করে নাই ; তাহারা প্রথমে দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহা মঞ্জুর না-হওয়ায় তাহারা অনাহারে প্রাণত্যাগ করিবে প্রতিজ্ঞা করিয়াছে। তাহারা যে বিচারান্তে দণ্ডিত ও বন্দীকৃত কয়েদী, এই কথার উপর জোর না-দিয়া, এই কথাটি ভুলিয়া গিয়া, কেবল ইহাই বিবেচনা করা উচিত, যে, কতকগুলি মানুষ কোন কারণে মৃত্যু পণ করিয়াছে। সেই কারণগুলি বিবেচ্য।

আগেই বলিয়াছি, তাহারা প্রথমেই প্রায়োপবেশন করে নাই ; প্রথমে দরখাস্ত করিয়াছিল, তাহা মঞ্জুর না-হওয়ায় প্রায়োপবেশন করিয়াছে।

মানুষ একা একা বা দলবদ্ধ ভাবে যদি রাষ্ট্রীয় বা শাসন-সম্বন্ধীয় কোন পরিবর্তন হওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করে, তাহা হইলে তাহা ঘটাইবার একাধিক পন্থা ও উপায় আছে। শান্তিপূর্ণ বা অহিংস একটা রীতি তদর্থে আন্দোলন ও কর্তৃপক্ষের নিকট তদর্থে আবেদন প্রেরণ। ইতিহাসে দেখা যায়, অনেক দেশে ভিন্ন ভিন্ন সময়ে এই উপায়ে সিদ্ধিলাভ না-হওয়ায় কিংবা জনগণের এই উপায় অবলম্বনে বাধা দেওয়ায় বা তাহারা এই উপায় অবলম্বন করিবার সুযোগ না-পাওয়ায়, সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লবচেষ্টা হইয়াছে, এবং তাহা কখন বা সফল কখন বা ব্যর্থ হইয়াছে। এই যে দ্বিতীয় উপায় ইহার পশ্চাতে এই মনোভাব থাকে, যে, "কর্তৃপক্ষ আমাদের কথা শুনিলেন না, সুতরাং আমরা বল-প্রয়োগদ্বারা আমাদের কথামত কাজ করিতে কর্তৃপক্ষকে বাধ্য করিব কিংবা কর্তৃপক্ষের উচ্ছেদসাধন করিব।" ভারতবর্ষে বর্তমান যুগে প্রথম উপায়ই অবলম্বিত হইয়া আসিতেছে। নেতৃস্থানীয় ব্যক্তিরা, কেহ বা অহিংসা তাঁহাদের ধর্মের একটি সার অংশ বলিয়া, কেহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ ও বিপ্লব বর্তমান অবস্থায় অসাধ্য ও অসমীচীন বলিয়া, আবার অন্য কেহ বা উভয়বিধ কারণে, দ্বিতীয় উপায় অর্থাৎ সশস্ত্র বিদ্রোহের পথ অবলম্বনের বিরোধী। আমরাও হিংসা-মূলক বিপ্লবচেষ্টার বিরোধী। তৃতীয় উপায়, অন্যকে দুঃখ না দিয়া, অন্যের প্রাণবধ না করিয়া, নিজেই দুঃখ সহা এবং প্রয়োজন হইলে মৃত্যুকে বরণ করা। ইতিহাস-প্রথিত বিদ্রোহ ও বিপ্লবসমূহে বিদ্রোহীরা যেন কর্তৃপক্ষকে বলিয়াছে, "তোমরা আমাদের কথা শুনিলে না, অতএব তোমাদিগকে বাধ্য করিবার নিমিত্ত বল প্রয়োগ করিব, দুঃখ দিব, প্রয়োজন হইলে তোমাদের বিনাশসাধন করিব।" এই প্রকার মনোভাব রাষ্ট্রনীতিক্ষেত্রে ভারতবর্ষের বর্তমান নেতৃবর্গের অনুমোদিত নহে। তাঁহারা, প্রয়োজন হইলে কর্তৃপক্ষকে দুঃখ না দিয়া স্বয়ং দুঃখ বরণ করিয়াছেন, কারাবরণ করিয়াছেন, লাঠির আঘাত সহিয়াছেন ; তাঁহাদের দলের লোকেরাও তাহা করিয়াছেন। কর্তৃপক্ষীয় কাহারও প্রাণ বধ না করিয়া তাঁহারা কেহ কেহ নিজে মৃত্যু বরণ করিতে প্রস্তুত। তপশীলভুক্ত জাতিদের এবং অন্য হিন্দু জাতির প্রতিনিধি নির্বাচন একেবারে পৃথক হইবে, সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারার প্রথম ব্যবস্থায় এইরূপ একটা বিধি ছিল। মহাত্মা গান্ধী হিন্দুসমাজকে দ্বিখণ্ডিত করিবার এই বিধি ও উপায়ের প্রতিবাদ করেন। প্রতিবাদ নিষ্ফল হওয়ায় তিনি পুনা জেলে প্রায়োপবেশন করেন। তখন কর্তৃপক্ষ সাম্প্রদায়িক বাঁটোয়ারা প্রথম যেভাবে করা হইয়াছিল, তাহার কিছু পরিবর্তন করেন।

আমরা আগে বলিয়াছি, আণ্ডামানের বন্দীরা যাহা করিয়াছে, তাহার বিচার করিতে হইলে, ইহা ভাবা উচিত

নয়, যে, তাহারা কয়েদী; তাঁবা উচিত, যে, তাহারা মানুষ, সুতরাং অন্য মানুষের পক্ষে যে উপায় অবলম্বন নিষিদ্ধ নহে, তাহারা বন্দী বলিয়াই তাহা নিষিদ্ধ হইতে পারে না। গবন্মেণ্টও বলিতে পারেন না, "আমরা প্রায়োপবেশকদের কোন কথা শুনিব না, শুনি না।" কারণ, গবন্মেণ্ট প্রায়োপবেশক মহাত্মা গান্ধীর কথা কিছু শুনিয়াছেন। অবশ্য, এ কথা উঠিতে পারে, যে, সবাই ত মহাত্মা গান্ধী নয়। কিন্তু কোন অনুরোধ বা প্রার্থনা যদি সঙ্গত ও যুক্তিযুক্ত হয়, তাহা হইলে অজ্ঞাত ও অখ্যাত লোকেরা করিয়াছে বলিয়াই বিবেচনার অযোগ্য হইতে পারে না।

বন্দী-প্রায়োপবেশক কাহারও কথা গবন্মেণ্ট কখন শুনেন নাই, ইহাও ঠিক নহে। যতীন্দ্রনাথ দাস জেলে রাজনৈতিক বন্দীদের দুর্গতি দূর করিবার জন্য প্রায়োপবেশন করিয়া প্রাণত্যাগ করিয়াছিলেন। তিনি বাঁচিয়া থাকিতে থাকিতে গবন্মেণ্ট কিছু করেন নাই বটে, কিন্তু তাঁহার আত্মবলিদানের ফলে যে আন্দোলন হইয়াছিল, তাহার প্রভাবে গবন্মেণ্টকে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে কিছু নূতন ব্যবস্থা করিতে হইয়াছিল—যদিও যতীন্দ্রনাথ দাস যাহা কিছু চাহিয়াছিলেন, সব এখনও করা হয় নাই।

আমরা এমন কথা বলি না, যে, অ-বন্দী বা বন্দী কেহ গবন্মেণ্টকে কিছু করিতে বলিয়া সফলকাম না হইলে যদি তাহার পর প্রায়োপবেশন করেন, তাহা হইলে গবন্মেণ্টের তাহা অবশ্যই করা উচিত। আমরা বলি, বন্দী বা অ-বন্দীর আবেদন, প্রার্থনা বা অনুরোধ যুক্তিসঙ্গত হইলে গবন্মেণ্টের তাহাতে কর্ণপাত করা উচিত—আবেদক প্রায়োপবেশন না-করিলেও করা উচিত, করিলেও করা উচিত। যদি আবেদন যুক্তিসংগত না-হয়, যদি প্রার্থিত বস্তুটি দেশহিতকর ও জনহিতকর না হয়, তাহা হইলে, কেহ প্রায়োপবেশন করুক বা না-করুক, গবন্মেণ্ট সেরূপ আবেদনে কর্ণপাত করিতে বাধ্য নহেন; কিন্তু আবেদন অগ্রাহ্য করিলে তাহার কারণ বিশদভাবে জনগণকে বুঝাইয়া বলা কর্তব্য।

"তুমি বা তোমরা প্রায়োপবেশন করিয়াছ, অতএব সেই কারণেই আমরা কিছু করিব না," কর্তৃপক্ষের মনের ভাব এরূপ হওয়া উচিত নয়। এই ভঙ্গীর পশ্চাতে যেন এই মনোভাব রহিয়াছে, যে, গবন্মেণ্ট বন্দীদের আবেদনে কর্ণপাত করিলে লোকে ভাবিবে গবন্মেণ্ট ভয় পাইয়াছে, গবন্মেণ্টকে দুর্ব্বল ভাবিবে, অতএব লোকের মনে যাহাতে এরূপ ধারণা না-জন্মে সেই জন্য প্রায়োপবেশকদের কোন কথায় কর্ণপাত না-করা উচিত। এরূপ মনোভাব ও যুক্তিকে "ছেলেমানুষী" বলা যাইতে পারে। কে না জানে, যে, সকল দেশের গবন্মেণ্টই নিজ বৈধ প্রভুত্ব এবং নিয়ম ও শৃঙ্খলা রক্ষার নিমিত্ত হাজার হাজার লোকের জীবনমরণকে তুচ্ছ ব্যাপার মনে করিতে অভ্যস্ত ও সমর্থ। দুই শত বা আড়াই শত বন্দীর প্রায়োপবেশনে ভীত হইয়া গবন্মেণ্ট একটা কিছু করিবেন, করিলেন, বা করিয়াছেন, মূঢ় ব্যক্তিরাই এরূপ ভাবিতে পারে।

বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বাংলা-গবন্মেণ্টের পক্ষ হইতে এইরূপ কথা বলা হইয়াছে, যে, "যত ক্ষণ প্রায়োপবেশন চলিবে, তত ক্ষণ কিছু করা হইবে না।" কিন্তু ইহার উত্তরে স্মরণ করাইয়া দিতে পারা যায়, যে, প্রায়োপবেশন যখন বন্দীরা করে নাই, যখন ভারত-গবন্মেণ্টের কাছে তাহারা শুধু দরখাস্ত করিয়াছিল তখন বাংলা-গবন্মেণ্টের উপরওয়ালা ভারত-গবন্মেণ্ট ত কিছু করেন নাই। এখন প্রায়োপবেশন ছাড়িয়া দিলে, বাংলা-গবন্মেণ্টও যে উপরওয়ালা ভারত-গবন্মেণ্টের পথের পথিক হইবে না, তাহার প্রমাণ কি আছে? তবে যদি সৌভাগ্যক্রমে ও সুবুদ্ধিবশতঃ বাংলা-গবন্মেণ্ট কিছু করেন, তাহা হইলে তাহা প্রায়োপবেশনের ফল বা অংশতঃ তাহার ফল মনে করা যাইতে পারিবে—তাহা গবন্মেণ্টের ভয়ের ফল কখনই মনে করা উচিত হইবে না। বরং ইহাই মনে করিতে হইবে, যে, এতগুলি লোক যাহার জন্য প্রাণ দিতে প্রস্তুত হইয়াছে বা হইয়াছিল তাহা খুব গুরুতর ব্যাপার বুঝিয়া গবন্মেণ্ট তাহার সম্বন্ধে সুবিবেচনা করিয়াছেন।

বস্তুতঃ, বন্দীদের প্রায়োপবেশনের উদ্দেশ্য গবন্মেণ্টকে ভয় দেখান নহে, উদ্দেশ্য গবন্মেণ্টকে তাহাদের অনুরোধগুলির গুরুত্ব অনুভব করান—আমরা এই রূপ বুঝিয়াছি। অনুরোধগুলি তাহাদের নানা দুঃখপীড়িত নিরাশ মনের খেয়াল মাত্র নহে, তাহাদের বিবেচনায় সেগুলি মানুষের প্রকৃত জীবনপদবাচ্য জীবনের সহিত জড়িত। এইটি

গবর্ন্মেণ্টকে অনুভব করাইবার নিমিত্ত তাহারা প্রায়োপবেশন করিয়াছে মনে হয়। ভারতবর্ষে অ-বন্দী আমরা অনেকে কাগজে লিখিয়া, সভা করিয়া, সমিতির অধিবেশন করিয়া গবর্ন্মেণ্টকে ঐরূপ অনুরোধ জানাইয়াছি বটে; কিন্তু গবর্ন্মেণ্ট সেই সব অনুরোধ রক্ষা না-করিলে আমরা প্রাণ রাখিব না, বিষয়গুলি এরূপ গুরুত্বপূর্ণ মনে করি নাই—অন্ততঃ মনে যে করি তাহার কোন প্রমাণ দিই নাই। বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের পক্ষ হইতে যে বলা হইতেছে, যে, প্রায়োপবেশন বন্ধ না হইলে তাঁহারা কিছু করিবেন না, তাহার মানে কি এই, যে, প্রায়োপবেশন না-করিলে তাঁহারা যুক্তিযুক্ত কথা শুনেন? তাহা হইলে অ-বন্দীদের ঠিক্ ঐরূপ অনুরোধগুলিতে এত দিন কর্ণপাত করেন নাই কেন? যদি বন্দীরা প্রায়োপবেশন ত্যাগ করিলে এখন কর্ণপাত করেন, তাহা হইলে বলিতে হইবে, প্রায়োপবেশনরূপ চাপের প্রয়োজন ছিল। জনগণের (তাহার মধ্যে আমরাও আছি) মনের উপরও যদি এই প্রায়োপবেশনের চাপের ফলে বিষয়গুলির ঠিক্ গুরুত্ববোধ জন্মে, তাহা হইলে বন্দীদের প্রায়োপবেশন বৃথা হইবে না। যথেষ্ট গুরুত্ববোধ জন্মিলে জনগণ ভাল করিয়া প্রতিকার চেষ্টা করিবে।

প্রশ্ন হইতে পারে, "তবে কি আপনি প্রায়োপবেশনকে অন্যের মন প্রভাবিত করিবার একটা বৈধ উপায় মনে করেন?" উত্তরে বলি, "সাধারণতঃ, মোটের উপর ইহাকে শ্রেষ্ঠ ও যুক্তিসঙ্গত উপায় মনে করি না।" কিন্তু তাহার সঙ্গে সঙ্গে ইহাও বলি, যে, আমাদের মত যাহারা পৃথিবীতে কোন বস্তুর জন্যই প্রাণপণ করে না, তাহারা, যাহারা কোন-না-কোন ইষ্টবস্তুর জন্য প্রাণপণ করে তাহাদিগকে পাঠ দিতে অধিকারী নহে। আবার প্রশ্ন হইতে পারে, "তাহা হইলে কি বিচারান্তে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত ও দণ্ডিত এই কয়েদীদিগকে মানবহিতৈষী স্বদেশপ্রেমিক বীর মনে করিতে হইবে?" উত্তরে নিবেদন করি, "আমরা অ-বন্দী, আমরা কখনও আদালতের বিচারে অপরাধী বলিয়া প্রমাণিত ও দণ্ডিত হই নাই, অতএব আমরা সকল বিষয়ে ঐ বন্দীদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ জীব, এবং তাহাদের মধ্যে ভাল কিছু থাকিতে পারে না, এই ভ্রান্ত অহঙ্কার ত্যাগ করুন। এক-একটি মানুষের সমগ্র ব্যক্তিত্বের বিচারকের উচ্চ আসনে বসিবেন না। কোন মানুষ বন্দী বা অ-বন্দী, দশ জনের চক্ষে পাপী বা পুণ্যাত্মা বলিয়া বিবেচিত, তাহার বিচার না-করিয়া তাহার কাজটি ভাল না মন্দ, অনুরোধটি ভাল না মন্দ, তাহাই ভাবিয়া দেখুন;—নাই বা সে মানবহিতৈষী স্বদেশ-প্রেমিক বীর হইল। আমেরিকার কবি লাওয়েল যে বলিয়া গিয়াছেন,

> 'Right for ever on the scaffold,
> Wrong for ever on the throne',

তাহা সর্ব্বত্র সর্ব্বদা ও সাধারণতঃ সত্য না-হইলেও দণ্ডিত ব্যক্তিদের সম্বন্ধে অদণ্ডিত ব্যক্তিদের বিনম্র মনোভাব উৎপাদনে সাহায্য করে।"

রাষ্ট্রীয় বা শাসনসম্বন্ধীয় পরিবর্ত্তন ঘটাইবার জন্য যে তিনটি পথ ও উপায়ের উল্লেখ আগে করিয়াছি, আণ্ডামানের বন্দীরা তাহার মধ্যে প্রথম উপায় অবলম্বন করিয়াছিল। তাহাতে সিদ্ধকাম না হইয়া তাহারা তৃতীয় উপায় অবলম্বন করিয়াছে। প্রথম বা তৃতীয়, কোন পথই ধর্ম্মনীতিবিরুদ্ধ অবৈধ উপায় নহে। তবে, কথা উঠিতে পারে, গবর্ন্মেণ্ট কিছুই করিবেন না, সুতরাং তাহাদের প্রাণপণ করা বৃথা এবং যদি তাহাদের প্রাণ যায়, তাহাও হইবে বৃথা; অতএব, প্রায়োপবেশন না-করাই উচিত ছিল। কিন্তু আমরা ত গবর্ন্মেণ্টের অনেক কাজের ও অনেক না-করার বাচনিক প্রতিবাদ করি। এই বন্দীরা যদি অন্যের ক্ষতি না-করিয়া নিজেদের প্রাণান্ত কার্য্যগত প্রতিবাদ করিতে দৃঢ়সংকল্প হইয়া থাকে, তাহা হইলে তোমার আমার কি বলিবার আছে? দুঃখভারপীড়িত নিরাশ জীবন এই ভাবে উৎসর্গ করা যদি তাহারা শ্রেয়ঃ ভাবিয়া থাকে, তাহা হইলে তাহাদিগকে নিবৃত্ত করিবার ইচ্ছা আমাদের মনে থাকিলেও উপদেশ দিবার অহঙ্কার নাই, এবং এ কথা বলিতেও আমাদের সঙ্কোচ বোধ হইতেছে, "তোমরা প্রায়োপবেশন ত্যাগ কর, আমরা তোমাদের ইচ্ছা পূর্ণ করিবার জন্য যথেষ্ট চেষ্টা প্রাণপণ চেষ্টা করিব।" কারণ, সেরূপ চেষ্টা হইতেছে বা হইবে কি? যেরূপ চেষ্টা হইতেছে, তাহা নিশ্চয়ই প্রশংসনীয়, কিন্তু তাহা যথেষ্ট, বলিতে পারি না।

—

প্রায়োপবেশক বন্দীদের আবেদনের বিচার

যেহেতু আণ্ডামানের বন্দীরা প্রায়োপবেশন করিয়াছে, অতএব তাহাদের সমুদয় অনুরোধ রক্ষা করিতে হইবে, ইহা আমরা বলি না। অন্য দিকে ইহাও বলি না, যে, যেহেতু তাহারা প্রায়োপবেশন করিয়াছে, অতএব তাহাদের আবেদন বিবেচনার অযোগ্য। দুর্ব্বল পক্ষই এরূপ ভাবে ও বলে। আমাদের মতে, তাহাদের আবেদনের যে-যে অনুরোধ ন্যায্য, তাহা পালন করা কর্ত্তব্য। অতএব তাহাদের অনুরোধ-গুলির ন্যায্যতা অন্যায্যতা বিচার করা উচিত। এরূপ আলোচনা করিবার পূর্ব্বে স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা সর্ নাজিমুদ্দিনের ব্যবস্থাপরিষদে উক্ত একটি কথা সম্বন্ধে কিছু বলিতে চাই।

খাজা সাহেব বলেন, "বাপ-মা শিশুকে মারিলে শিশু যদি ভাত খাইতে না-চায়, তাহা হইলে বাপ-মা কি করিয়া থাকেন? যে-সব বাপ-মা শিশুর দাবীতে সায় দেন, তাঁহাদের শিশু বদ্ হইয়া যায়। এই উপমা বর্ত্তমান ক্ষেত্রেও প্রযোজ্য।" আমাদের মতে প্রযোজ্য নহে। কারণ, (১) গবন্মেণ্ট অ-দণ্ডিত ও দণ্ডিত জনগণের প্রতি সেরূপ স্নেহশীল ও যত্নবান নহেন, বাপ-মা শিশুর প্রতি যেরূপ হইয়া থাকেন। (২) কোন বাপ-মা বদ্ শিশুকেও বাড়ী হইতে তাড়াইয়া দিয়া আণ্ডামানে পাঠাইয়া দেয় না; খুব কঠোর শাসক পিতা শাস্তির একটা অঙ্গস্বরূপ হয়ত বাড়ীরই একটা ঘরে শিশুকে কিছুক্ষণ বন্ধ করিয়া রাখে। (৩) আণ্ডামানের বন্দীরা শিশু নহে। (৪) তাহারা প্রহারের ফলে অর্থাৎ নিজেরা দণ্ডিত হইয়াছে বলিয়া প্রায়োপবেশন করে নাই, ভাত খাইব না বলে নাই; এবং তাহাদের "দাবী"তে সায় না দিলে তাহারা উপবাস ত্যাগ করিবে না, গোড়াতেই এমন কথা বলে নাই। তাহারা ভারত-গবন্মেণ্টের নিকট তাহাদের আবেদনে কতকগুলি অনুরোধ করিয়াছিল। ভারত-গবন্মেণ্ট সেই আবেদন সরাসরি অগ্রাহ্য করায় তাহারা প্রায়োপবেশন করিয়াছে। ভারত-গবন্মেণ্ট তাহাদের আবেদন সরাসরি না-মঞ্জুর না-করিয়া যদি অন্ততঃ বলিতেন, তাহাদের আবেদন বিবেচনা করা হইতেছে বা বিবেচনার জন্য কমিটি নিযুক্ত হইতেছে, তাহা হইলে সম্ভবতঃ তাহারা প্রায়োপবেশন করিত না।

সংক্ষেপে প্রায়োপবেশকদের "দাবী" চারিটি। (১) সমুদয় 'অন্তরীণ' ('ডেটেনু'), রাজবন্দী, এবং বিচারান্তে দোষী প্রমাণিত ও দণ্ডিত রাজনৈতিক বন্দীদের মুক্তি। (২) সমুদয় দমনমূলক আইন রদ করা এবং 'অন্তরীণ' করিবার সমুদয় আদেশ প্রত্যাহার। (৩) আণ্ডামানে বর্ত্তমান সময়ে কারারুদ্ধ সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে দেশে আনয়ন এবং ভবিষ্যতে আর কাহাকেও তথায় না-পাঠান। (৪) সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীকে "বী" (অর্থাৎ দ্বিতীয়) শ্রেণীভুক্ত করা।

এই সমুদয় "দাবী", একসঙ্গে না হইলেও, আলাদা আলাদা কোন-না-কোন সময়ে কংগ্রেস-নেতারা ও উদারনৈতিক সংঘের নেতারা করিয়াছেন। তাঁহারা আণ্ডামানের বন্দীদের প্রায়োপবেশনের আগে তাহা করিয়াছেন। গবন্মেণ্ট তাঁহাদের কথায় কান দেন নাই। দেশের হিত চান কেবল গবন্মেণ্ট-নামধেয় কয়েক জন বিদেশী-প্রমুখ ব্যক্তি, দেশের হিত বুঝেন কেবল তাঁহারা, ভারতীয় নেতারা চান না ও বুঝেন না, ইহা স্বতঃসিদ্ধ নহে। অতএব আণ্ডামানের বন্দীদের দাবী বিবেচনার অযোগ্য নহে।

তাহারা এইরূপ দাবী করিবার আগেই যুক্তপ্রদেশের (কংগ্রেসী) গবন্মেণ্ট ও অন্য কোন কোন (কংগ্রেসী) গবন্মেণ্ট রাজনৈতিক বন্দীদিগকে খালাস দিয়াছেন। অন্য কোন কোন (কংগ্রেসী) গবন্মেণ্ট এ-বিষয়ে বিবেচনা করিতেছেন। সুতরাং এই "দাবী"টি কেবলমাত্র অগ্রাহ্য হইবারই যোগ্য নহে।

দমনমূলক আইনসমূহের মধ্যে যেগুলি রদ করিবার ক্ষমতা ভারতশাসন আইন অনুসারে প্রাদেশিক গবন্মেণ্টসমূহের আছে, কংগ্রেসী গবন্মেণ্টসমূহ তাহা রদ করিবেন, কংগ্রেসের প্রস্তাব এবং নির্ব্বাচন-জ্ঞাপনী (ইলেকৃশুন ম্যানিফেষ্টো) অনুসারে ইহা আশা করা যায়।

ভারতশাসন আইন অনুসারে সমুদয় দমনমূলক আইন রদ করিবার ক্ষমতা ভারত-গবন্মেণ্টের আছে। সুতরাং ভারত-গবন্মেণ্টকে তাহা করিতে অনুরোধ করিয়া আণ্ডামানের বন্দীরা অযৌক্তিক বা অসঙ্গত কোন কাজ করে নাই।

১৯২১ সালে যখন সর উইলিয়ম ভিন্সেন্ট ...

গবর্ন্মেণ্টের স্বরাষ্ট্রসচিব ছিলেন, তখন ঐ গবর্ন্মেণ্ট যথাযোগ্য অনুসন্ধানান্তে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হন, যে, তাঁহারা আণ্ডামান দ্বীপপুঞ্জকে আর দণ্ডিতদের নির্ব্বাসনস্থানরূপে ব্যবহার করিবেন না। সর্ উইলিয়ম ভিন্সেণ্ট বিশেষ করিয়া বলিয়াছিলেন, রাজনৈতিক বন্দীদিগকে ও সর্ব্ববিধ বন্দিনীদিগকে সেখান হইতে ভারতবর্ষে আনা হইবে। সর্ উইলিয়ম বলেন, এই প্রকারে ভারতশাসনের একটি 'ব্লট্' বা কলঙ্ক মুছিয়া ফেলা হইবে। ভারত-গবর্ন্মেণ্ট এখন যাহাই বলুন, ১৫।১৬ বৎসরের মধ্যে আণ্ডামান-নরক ভূস্বর্গে পরিণত হয় নাই; এবং গত বৎসর গবর্ন্মেণ্ট কর্ত্তৃক প্রেরিত রায়জাদা হংসরাজ আণ্ডামান হইতে ফিরিয়া আসিয়া সেদিনও বলিয়াছেন, বন্দীদের তথায় বাস নরক-বাসের তুল্য।

যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট ভারত-গবর্ন্মেণ্টকে অনুরোধ করিয়াছেন, যে, যুক্তপ্রদেশের দণ্ডিত কয়েদীদের মধ্যে যাহারা আণ্ডামানে আছে তাহাদিগকে যুক্তপ্রদেশে ফিরাইয়া আনা হউক এবং ভবিষ্যতে যুক্তপ্রদেশের কাহাকেও তথায় আর যেন পাঠান না হয়। বিহার-গবর্ন্মেণ্টও এইরূপ অনুরোধ করিয়াছেন।

অতএব আণ্ডামানের বন্দীদের তৃতীয় দাবীটি অযৌক্তিক নহে।

সমুদয় বন্দীকে একশ্রেণীভুক্ত করিয়া সকলেরই গ্রাসাচ্ছাদন বাসগৃহ প্রভৃতির ব্যবস্থা উন্নততর করা হউক, এই "দাবী" বহুবার ভারতবর্ষের বহু নেতা করিয়াছেন। যুক্তপ্রদেশের গবর্ন্মেণ্ট সম্প্রতি তাঁহাদের যে কৃত্য-তালিকা (প্রোগ্র্যাম) প্রকাশ করিয়াছেন, জেলসমূহের এবং কয়েদীদের অবস্থার উন্নতি তাহার অন্তর্গত।

রাজনৈতিক বন্দীরা সাধারণতঃ সেই শ্রেণীর লোক যাহাদিগকে 'ভদ্রলোক' বলা হয়। গবর্ন্মেণ্ট যখন কয়েদীদের মধ্যে শ্রেণীবিভাগ করিয়াছেনই এবং যে নিজের বাড়ীতে যেরূপ গ্রাসাচ্ছাদনে অভ্যস্ত তাহাকে জেলেও কতকটা সেইরূপ গ্রাসাচ্ছাদন দেওয়া যখন এই শ্রেণীবিভাগের উদ্দেশ্য বলিয়া কথিত হইয়াছে, তখন রাজনৈতিক বন্দীদিগকে দ্বিতীয় শ্রেণীতে ফেলাই সঙ্গত।

"দাবী"গুলি সম্বন্ধে আমাদের শেষ একটি বক্তব্য আছে। যে-সকল সভ্য দেশে গণতন্ত্রমূলক স্বশাসন প্রবর্ত্তিত আছে, তথায় সাধারণ কয়েদী অন্য দেশেরই মত, অল্পাধিক, আছে। আমাদের দেশে যত রকম আইন, রেগুলেশ্যন, অর্ডিন্যান্স প্রভৃতির প্রয়োগ দ্বারা যত মানুষ দণ্ডিত ও কারারুদ্ধ হয়, ঐ সব দেশে তাহা হয় না। এই জন্য রাজনৈতিক বন্দী নামক এক শ্রেণীর বন্দী তথায় নাই, বা খুব অল্পসংখ্যক আছে। কোন দেশ স্বশাসন-অধিকার পাইলে তথাকার পূর্ব্বেকার আমলের রাজনৈতিক বন্দীরা, সশস্ত্র বিদ্রোহ অপরাধে দণ্ডিত কয়েদীরা পর্য্যন্ত, খালাস পায়—সর্ জন আণ্ডার্সনের পরামর্শে আয়ার্ল্যাণ্ডেও পাইয়াছিল। কংগ্রেসী প্রাদেশিক গবর্ন্মেণ্ট যে ছয়টি প্রদেশে প্রবর্ত্তিত হইয়াছে, তথাকার কংগ্রেসী নেতারা মনে করেন তাঁহারা স্বশাসন-অধিকার পাইয়াছেন। এই জন্য ঐ সব প্রদেশে রাজনৈতিক বন্দীরা খালাস পাইতেছে এবং স্বশাসক দেশের অন্যান্য সুবিধাও তথায় প্রবর্ত্তিত করিবার চেষ্টা হইতেছে। গত ২১শে শ্রাবণ বঙ্গীয় ব্যবস্থাপরিষদে স্বরাষ্ট্রসচিব খাজা সর্ নাজিমুদ্দিন বলেন, "আমি সদস্যদের নিকট এই নিবেদন করিতেছি, বর্ত্তমান শাসনতন্ত্রে আমরা সম্পূর্ণ স্বায়ত্তশাসন লাভ করিয়াছি; এক্ষণে শাসনকার্য্যের দায়িত্ব সম্পূর্ণ আমাদের।" তাহা হইলে বাংলা দেশও স্বশাসন-অধিকার পাইয়াছে। সুতরাং অন্য কোন দেশ ঐ অধিকার পাইলে তথায় যেরূপ রাজনৈতিক পরিবর্ত্তন ঘটে, বঙ্গেও সেইরূপ পরিবর্ত্তন ঘটুক, এরূপ অনুরোধ বা "দাবী" অযৌক্তিক বা বিবেচনার অযোগ্য নহে।

এখানে বলা আবশ্যক, যে, আমাদের মতে ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন ভারতবর্ষকে বা তাহার প্রদেশগুলিকে স্বশাসন-অধিকার দেয় নাই, যদিও সরকারী মত বলে, যে, দিয়াছে।

কোন দেশ স্বশাসন-অধিকার পাইলে রাজনৈতিক বন্দীদের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবার যে রীতি আছে, তাহার কারণ এই, যে, তাহারা দেশের জন্য স্বশাসন-অধিকার অর্জ্জন করিবার চেষ্টা করিয়াছিল—যদিও অবশ্য তাহা বে-আইনী উপায়ে করিয়াছিল।

—

বঙ্গের বজেট

বঙ্গের বজেট প্রতি বৎসর আলোচনা করিবার ইচ্ছা আমাদের বহু বৎসর হইতে আছে, এবং সেই ইচ্ছা থাকায় বজেট সম্বন্ধে প্রায় প্রতি বৎসরই দু-চার কথা বলিয়া থাকি। কিন্তু বজেট আলোচনা ভাল করিয়া করিবার উপায় আমাদের নাই। যে সরকারী মুদ্রিত ফিন্যান্স্যাল ষ্টেটমেণ্টটিতে সমুদয় আয়ব্যয় বিস্তারিত দেওয়া থাকে, তাহা আমরা পাই না, এবারেও পাই নাই। অর্থসচিবের তদ্বিষয়ক বক্তৃতা এবং খবরের কাগজে ব্যবস্থাপক সদস্যদের কোন কোন মন্তব্যের কোন কোন অংশ অবলম্বন করিয়া দু-চার কথা লিখিব।

ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর আমল হইতে বাংলা দেশে যত রাজস্ব সংগৃহীত হইয়া আসিতেছে, তাহার সম্পূর্ণ সুবিধা বাংলা দেশ কখনও পায় নাই। ঐ রাজস্বের কোটি কোটি টাকা ব্রিটিশ সাম্রাজ্য বিস্তার করিবার জন্য ব্যয়িত হইয়াছে, এবং বঙ্গের বাহিরের কোন কোন প্রদেশের ঘাটতি পুরাইতেও বঙ্গের বিস্তর টাকা খরচ করা হইয়াছে।

অপেক্ষাকৃত আধুনিক সময়ে যখন ভিন্ন ভিন্ন প্রদেশে সংগৃহীত নানা প্রকারের রাজস্বকে কেন্দ্রীয় ও প্রাদেশিক এই দুই ভাগে বিভক্ত করা হয়, তখন ভাগটা এমন ভাবে করা হয়, যে, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ কেন্দ্রীয় অর্থাৎ ভারত-গবর্ন্মেণ্ট গ্রহণ করেন। লর্ড মেষ্টন প্রধানতঃ এই বিভাজনের কর্ত্তা বলিয়া ইহাকে মেষ্টনী বন্দোবস্ত বলা হয়। অন্য যে-কোন প্রদেশের চেয়ে বঙ্গে অধিক রাজস্ব সংগৃহীত হইলেও, এই বন্দোবস্তের ফলে, বাংলা দেশের সরকারী ব্যয়ের জন্য বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের হাতে যুক্তপ্রদেশ, মান্দ্রাজ, পঞ্জাব ও বোম্বাই অপেক্ষা কম টাকা থাকাটা যেন একটা স্বাভাবিক ব্যাপার হইয়া দাঁড়ায়। তাহার পর স্থির হয়, ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন জারি হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে বাংলা-গবর্ন্মেণ্টের হাতে আগেকার চেয়ে কিছু বেশী টাকা থাকিতে দেওয়া হইবে। এই যে বেশী টাকা ইহা ভারতবর্ষের অন্য কোন প্রদেশে সংগৃহীত রাজস্বের অংশ নহে। ইহা বাংলা দেশে সংগৃহীত রাজস্বেরই অংশ। ১৯৩৫ সালের ভারতশাসন আইন জারি হইবার পূর্ব্বে বাংলা দেশকে তাহার রাজস্ব হইতে যতটা বঞ্চিত করা হইত, এখন ততটা বঞ্চিত করা হইবে না, প্রভেদ এই মাত্র। কিন্তু বঞ্চিত এখনও করা হইতেছে। অবস্থাটা এইরূপ, যে, যদি বাংলা দেশ একটা পৃথক্ স্বাধীন দেশ হইত, তাহা হইলে তাহার রাজস্ব সম্পূর্ণ তাহার হাতেই থাকিত। কিন্তু উহা ভারতবর্ষের অংশ বলিয়া এবং ভারতবর্ষ পরাধীন বলিয়া, বঙ্গের গবর্ন্মেণ্টকে গরীব সাজান হইয়াছে ও গরীব সাজিতে হইয়াছে। নতুবা বস্তুতঃ বাংলা দেশ আর্থিক বিষয়ে পরমুখাপেক্ষী, অন্য কোন প্রদেশ বা দেশের মুখাপেক্ষী, নহে।

বঙ্গের তহবিলে যে এবার বেশী টাকা আসিয়াছে, যাহার বলে অর্থসচিব শ্রীযুক্ত নলিনীরঞ্জন সরকার কিছু উদ্বৃত্ত দেখাইতে পারিয়াছেন,—এই বেশী অর্থাগমের প্রশংসা তাঁহার প্রাপ্য নহে, তাঁহার বেরাদর্ মন্ত্রীদের বা লাট-সাহেবেরও প্রাপ্য নহে। এই প্রশংসা যেমন বঙ্গের মন্ত্রি-মণ্ডলের প্রাপ্য নহে, তেমনই আগেকার আমলের মন্ত্রীদের বার্ষিক ৬৪০০০৲ টাকার চেয়ে তাঁহারা যে কম বেতন লইতেছেন তাহার প্রশংসাও তাঁহারা দাবী করিতে পারেন না। কারণ নূতন ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা-পরিষদের নানাবিধ ব্যয় আগেকার আমলের ব্যয়ের চেয়ে বার্ষিক এক লক্ষ ষাট হাজার টাকা বেশী হইয়াছে। তাহার পর বোধ হয় পার্লেমেণ্টারী সেক্রেটারী প্রভৃতির ব্যয় আছে। ১১ জন মন্ত্রী প্রত্যেকে ৬৪০০০৲ চাহিলে টাকা কোথা হইতে আসিত? তাঁহাদিগকে অগত্যা কম টাকা লইতে হইয়াছে। কিন্তু এই কমও কংগ্রেসী মন্ত্রীদের মাসিক ৫০০৲ বেতনের তুলনায় খুব বেশী। কংগ্রেসী মন্ত্রীদের বাড়ী ও গাড়ীর ভাতা ধরিলেও তাঁহারা মোট যত টাকা গ্রহণ করেন, বঙ্গের মন্ত্রীদের বেতনের তুলনায় তাহাও অনেক কম।

বঙ্গের মন্ত্রীদের মধ্যে কাহারও কাহারও আর্থিক অবস্থা এরূপ যে তাঁহারা ৫০০৲ বেতনে, এমন কি বিনা বেতনেও, কাজ করিতে পারিতেন। কিন্তু অন্যেরা তাহাতে রাজী হইতেন না। এবং কেহ কম বেতন লইবার জেদ করিলে অন্যেরা বলিতেন, "ভায়া, তুমি অন্য পথ দেখ; তোমার সঙ্গে আমাদের পোষাবে না।" এই কারণে বঙ্গের কোন কোন মন্ত্রী কম বেতন লইয়া যে বাহবা পাইতে পারিতেন, তাহা পাইতেছেন না।

যেমন কোন কোন বিষয়ে প্রশংসা বঙ্গের অর্থসচিব ও অন্য মন্ত্রীদিগের প্রাপ্য নহে, তেমনি কোন কোন নিন্দা হইতেও তাঁহারা অব্যাহতি দাবী করিতে পারেন। রাজস্বের একটা মোটা অংশ গবর্ণর আইন অনুসারে কতকগুলি ব্যয়ের জন্য আলাদা করিয়া রাখিতে বাধ্য। তাহার উপর মন্ত্রীদের কোন হাত নাই, ব্যবস্থাপক সভা ও ব্যবস্থা-পরিষদও তাহাতে হাত দিতে পারেন না। ইহা মনে রাখিলে বুঝা যাইবে, যে, ব্যয়সংক্ষেপের এই একটা সীমা আছে। তাহার পর, যেগুলি ইম্পিরিয়্যাল সার্ভিসের চাকরি, যেমন সিবিলিয়ান ম্যাজিষ্ট্রেট, জয়েণ্ট ম্যাজিষ্ট্রেট আদির, সিবিলিয়ান জজের, জেলার পুলিস সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট ও তাহার উপরের পুলিসের কর্ম্মচারীর পদ, জেলার আই-এম্-এস সিবিল সার্জ্জনের পদ, শিক্ষা-বিভাগের মোটা বেতনভোগী ডিরেক্টর প্রিন্সিপ্যাল অধ্যাপক ইন্সপেক্টরের পদ, সেচন-বিভাগের বড় কর্ম্মচারীদের পদ, ইত্যাদির বেতন মন্ত্রীরা কমাইতে পারেন না। এই দিক্ দিয়াও ব্যয় সংক্ষেপের একটা সীমা আছে। অবশ্য, কংগ্রেসনেতা, উদারনৈতিক নেতা ও অন্য অনেকের মতে এই সব দিকেই ব্যয় কমান যাইতে পারে এবং কমান উচিত। কিন্তু কমাইবার ক্ষমতা আইন ভারতসচিবের হাতে দিয়াছে, ভারত-গবন্মেণ্ট, প্রাদেশিক গবন্মেণ্ট বা প্রাদেশিক মন্ত্রীদের হাতে দেয় নাই। অতএব, যথেষ্ট ব্যয়সংক্ষেপ যে হইতেছে না তাহার জন্য ভারতশাসন আইন দায়ী, ভারতসচিব দায়ী, প্রাদেশিক মন্ত্রীরা দায়ী নহেন। কিন্তু যে-যে দিকে ব্যয়-সংক্ষেপের যে সীমারেখা আইন টানিয়া দিয়াছে, সেই সীমার মধ্যে থাকিয়াও কতকটা ব্যয়সংক্ষেপ অবশ্যই হইতে পারে। ব্যয় কত কমান যায়, তাহা বলিতে হইলে বিস্তারিত ফিন্যান্স্যাল ষ্টেটমেণ্ট সম্মুখে থাকা আবশ্যক। তাহা আমরা পাই নাই। ছয়টি প্রদেশের কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ব্যয় যথাসাধ্য কমাইতে চেষ্টা করিবেন। অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীরা ভয়ে ভয়ে কাজ করেন, কংগ্রেসী মন্ত্রীদের সে ভয় নাই। অতএব কংগ্রেসী মন্ত্রীরা নিজেদের বেতন ছাড়াও অন্য যে-যে দিকে ব্যয় কমাইবেন, তাহা জানিতে পারিলে অ-কংগ্রেসী মন্ত্রীরা কি করিতে পারিতেন, তাহার কতকটা আভাস পাওয়া যাইবে। কিন্তু তাঁহাদেরও কোন ফিন্যান্স্যাল ষ্টেটমেণ্ট আমাদের হস্তগত হয় নাই। অবশ্য, প্রত্যেক প্রদেশের রাজনৈতিক ও অন্যবিধ অবস্থা এক নহে। কিন্তু ইহা মনে রাখিলেও সাধারণতঃ ইহা বলা অন্যায় হইবে না, যে, বঙ্গের পুলিস-ব্যয়, সাধারণ শাসন-ব্যয় এবং আরও কোন কোন ব্যয় কমান যাইতে পারে। বঙ্গের মন্ত্রীরা আত্মপক্ষ সমর্থনার্থ কেবল এইটুকু বলিতে পারেন, যে, তাঁহারা কাজের ভার লইবার পূর্ব্বে ব্যয় নানা দিকে যে সীমায় পৌঁছিয়াছে, তাহার জন্য তাঁহারা দায়ী নহেন এবং পূর্ব্ব ব্যয়ের পরিমাণ প্রথম বৎসরেই খুব কমান যায় না। ইহা যদি মানিয়া লওয়া যায়, তাহা হইলেও ইহা বলা একটুও অন্যায় হইবে না, যে, ব্যয়সংক্ষেপের জন্য যেরূপ চেষ্টা করা উচিত ছিল, তাহা তাঁহারা করেন নাই।

অর্থসচিবের বজেট-বক্তৃতার দ্বিতীয় পরিশিষ্টে ১৯৩৭-৩৮ সালের বজেটে আগেকার বৎসর অপেক্ষা যত বেশী বরাদ্দ যে-যে বিভাগে করা হইয়াছে, তাহার তালিকা দেওয়া হইয়াছে। তাহার কিয়দংশ নীচে সঙ্কলিত হইল।

বিভাগ।	১৯৩৭-৩৮এর বরাদ্দ।	পূর্ব্বাপেক্ষা বরাদ্দ-বৃদ্ধির পরিমাণ।
শিক্ষা	১,৩৭,৭০,০০০	৪,৯০,০০০
চিকিৎসা	৫৮,৪৫,০০০	১,৫৭,০০০
সাধারণ স্বাস্থ্য	৩৩,৯৮,০০০	৬,৮৮,০০০
কৃষি	১১,৭৪,০০০	১,৩৮,০০০
সমবায় ঋণদান	১৩,৯৪,০০০	১,২৫,০০০
পণ্যশিল্প	১৬,৮৯,০০০	২,১০,০০০
ঋণসালিসী বোর্ড	১৬,৬২,০০০	১৪,৪৬,০০০
নূতন হাবড়া পুলের জন্য সাহায্য	৪,০০,০০০	৩,০০,০০০
রাস্তা বিস্তার	২২,১৩,০০০	৬,০৯,০০০
সিবিল ইমারৎ আদি	১,০৪,৯২,০০০	২১,৮১,০০০

শিক্ষা স্বাস্থ্য কৃষি পণ্যশিল্প রাস্তাবিস্তার প্রভৃতির জন্য যাহা বরাদ্দ করা হইয়াছে এবং বরাদ্দ যাহা বাড়িয়াছে তাহা মোটেই যথেষ্ট না হইলেও, "নাই মামার চেয়ে কানা মামা ভাল"।

অর্থসচিব স্বীকার করিয়াছেন,

"I may freely admit that our means are still far from adequate for the needs of national reconstruction."

'আমি মুক্তকণ্ঠে স্বীকার করিতে পারি, যে, জাতীয় পুনর্গঠনের

জন্য যত আয় আবশ্যক, আমাদের আয় তাহা অপেক্ষা এখনও অনেক কম।"

ব্যয়সংক্ষেপ দ্বারা জাতীয় পুনর্গঠনের জন্য যথেষ্ট টাকা পাইবার পথ ভারতশাসন আইন রাখে নাই, এবং সে-পথ রুদ্ধ না থাকিলেও কেবল সেই উপায়ে যথেষ্ট টাকা পাওয়া যাইত না। নূতন রকমের ট্যাক্স বসাইয়া আয় বাড়ান সহজ নহে এবং দরিদ্র দেশে নূতন ট্যাক্স বসাইলেও তাহা হইতে বেশী আয় হইবে না। বঙ্গের সরকারী আয় বৃদ্ধির উপায়ের আলোচনা সংক্ষেপে করা যাইবে না। সুতরাং সে-চেষ্টা এখানে করিব না।

সন্ত্রাসন দমনের ব্যয়

সন্ত্রাসন দমনের ব্যয় বাবদে অর্দ্ধ কোটির উপর টাকা বজেটে বরাদ্দ করা হইয়াছে। অর্থসচিব বলিতেছেন, যদি সমুদয় রাজনৈতিক বন্দীদিগকে মুক্তি দেওয়া যায়, তাহা হইলেও সদ্য সদ্যই ৫৪ লক্ষ টাকা বাঁচিবে না। কারণ, "অন্তরীণদের মুক্তি ও গবর্মেণ্ট-বিপর্য্যাসক সমুদয় প্রচেষ্টার তিরোভাব একার্থবোধক নহে এবং দুটি একসঙ্গে ঘটিবে না। এরূপ মুক্তি দিতে পারিবার কিছু কাল পর পর্য্যন্ত সন্ত্রাসন-প্রচেষ্টার পুনরাবির্ভাব কিংবা অন্যবিধ বিপর্য্যাসক প্রচেষ্টার আবির্ভাব নিবারণকল্পে কিছু বন্দোবস্ত রাখিতে হইবে।"

ইহা হইতে এই অনুমান করা অসঙ্গত হইবে না, যে, বাংলা-গবর্মেণ্টের মতে সন্ত্রাসন ও অন্যান্য বিপর্য্যাসক প্রচেষ্টার জড় মরে নাই, মূল বা বীজ নষ্ট হয় নাই। উহার জড়, মূল বা বীজ কি বা কোথায়? গবর্মেণ্টের মতে তাহা কি, তাহা গবর্মেণ্ট বলিতে পারেন। কিন্তু মনের কথা খুলিয়া বলা ত কোন দেশের গবর্মেণ্টেরই রীতি নহে। অনেক সময় তাঁহাদের আচরণ হইতে তাঁহাদের মতের আভাস সংগ্রহ করিতে হয়। বাংলা-গবর্মেণ্টের কার্য্যকলাপ হইতে মনে হইতে পারে, যে, বঙ্গে সন্ত্রাসনবাদের উৎপত্তি ও স্থিতির প্রধান কারণ, বঙ্গীয় যুবকবর্গের অধিকাংশের বেকার অবস্থা। তাহাই যদি হয়, তাহা হইলে বেকার-সমস্যার সমাধান না হইলে, দমনার্থ কঠোরতম আইনের প্রয়োগ ও প্রয়োজনাতিরিক্ত পুলিস কর্ম্মচারী নিয়োগ সত্ত্বেও বিপর্য্যাসক সন্ত্রাসনবাদ প্রভৃতির তিরোভাব ঘটিবে না। কিন্তু বেকার-সমস্যার সমাধানের জন্য গবর্মেণ্ট কি করিয়াছেন, করিতেছেন, করিবেন? কতকগুলি যুবককে ছাতা, সাবান, ছুরি, কাঁচি প্রস্তুত করিতে শিখাইলেই বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না। বস্তুতঃ "আনন্দবাজার পত্রিকা" অনুসন্ধান ও বিস্তারিত সমালোচনা দ্বারা দেখাইতে চেষ্টা করিয়াছেন, যে, সরকারী পণ্যশিল্প-বিভাগের এই চেষ্টা ব্যর্থ হইয়াছে। এখনও ইহার সরকারী কোন প্রতিবাদ দেখি নাই।

বড় বড় পণ্যশিল্পের কারখানা এবং বড় বড় ব্যবসা বঙ্গের বাঙালীরা স্থাপন ও পরিচালন না করিলে বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না। বঙ্গের অধিবাসীরা বাহিরে প্রস্তুত বা উৎপন্ন কাপড়, লোহালক্কড়, চিনি, লবণ, ঘৃত, তৈল ও তৈলবীজ প্রভৃতি কিনিবার জন্য প্রতি মাসে বহু কোটি টাকা খরচ করে। বঙ্গের প্রকৃত নিঃস্বার্থ নেতাদের দ্বারা পরিচালিত জাতীয় গবর্মেণ্ট কখনও বঙ্গে স্থাপিত হইলে, এই গবর্মেণ্ট জাপানের জাতীয় গবর্মেণ্টের মত নানা উপায়ে উক্ত সকল পণ্যশিল্প ও ব্যবসা স্থাপন ও পরিচালনে আর্থিক ও অন্য নানাবিধ সাহায্য করিবেন। বঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিব ত বলিয়াছেন, বাংলা দেশ স্বশাসক হইয়াছে। তিনি পণ্যশিল্প ব্যবসা ও কৃষি বিষয়ে জাপানী নীতি অনুসরণ করুন না? কিন্তু বলি কাহাকে? তিনি পুরুষানুক্রমে বঙ্গে বাস করিয়াও বোধ হয় বাংলা বলেন না, পড়েন না!

ছোট ছোট কুটীরশিল্প প্রভৃতিকে সাহায্য দিবার নিমিত্ত একটা আইন হইয়াছে ও কিছু টাকারও বরাদ্দ হইয়াছে জানি। কিন্তু বাহিরের বিরাট প্রতিযোগিতার বিরুদ্ধে লড়িবার পক্ষে ইহা যথেষ্ট নহে।

অর্থসচিব বলিয়াছেন, সরকারী নানা বিভাগে আরও দশ হাজার লোককে নিয়োগ করা হইবে। ইহা ভাল। কিন্তু ইহাতেও বেকার-সমস্যার সমাধান হইবে না।

বঙ্গের বহু যুবকের বেকার অবস্থা সন্ত্রাসনবাদের জড়, সরকারী এই মত অবলম্বন করিয়া সামান্য কিছু বলিলাম। আমাদের মত কিন্তু অন্য প্রকার। আমরা মনে করি, বিপর্য্যাসক প্রচেষ্টা-সমূহের উৎপত্তি হইয়াছে রাষ্ট্রনৈতিক কারণে। লর্ড কার্জনের আমলের আগে যে ব্রিটিশ

গবর্মেণ্টের কাজ দেশের লোকদের মত অনুসারে নির্ব্বাহিত হইত, তাহা নহে। কিন্তু লর্ড কার্জনই দেশের লোকের মতকে অবজ্ঞার সহিত উপেক্ষা করিয়া চলিতে ও তাহাকে দমন করিতে আরম্ভ করেন। তাহার প্রতিক্রিয়া-স্বরূপ দেশের লোকদের স্বমত-প্রতিষ্ঠার চেষ্টার ও বিদ্রোহী ভাবের সূত্রপাত হয়। দমন-ব্যবস্থাও উত্তরোত্তর কঠোরতর ও ব্যাপকতর হইতে থাকে।

সন্ত্রাসনপ্রচেষ্টা ও অন্যান্য বিপর্য্যাসক প্রচেষ্টার জড় খুঁজিতে হইলে রাষ্ট্রনীতিঘটিত এই সকল ব্যাপারের মধ্যে খুঁজিতে হইবে। সন্ত্রাসনবাদ-উৎপাদনে বেকার অবস্থা রাষ্ট্রনৈতিক কারণের উত্তরসাধক হইয়াছে বটে। তাহারও উচ্ছেদ আবশ্যক বটে। কিন্তু বিপর্য্যাসক সব প্রচেষ্টার মূলীভূত কারণ স্বশাসন-অধিকারের অভাব। স্বশাসন-অধিকার কার্য্যতঃ স্বীকৃত ও প্রতিষ্ঠিত না-হইলে বিপর্য্যাসক কোন প্রচেষ্টার বীজ সম্পূর্ণ নষ্ট হইবে না। এই প্রকার সকল প্রচেষ্টা বিনষ্ট করিবার যথাসাধ্য আয়োজন ও চেষ্টা করিয়াও যে বাংলা-গবর্মেণ্ট আশঙ্কা করিতেছেন, যে, তাহাদের পুনরাবির্ভাব ঘটিতে পারে, তাহা দ্বারা জ্ঞাতসারে বা অজ্ঞাতসারে স্বীকৃত হইতেছে, যে, জনগণের স্বশাসন-আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ হয় নাই।

কিন্তু এই আকাঙ্ক্ষা পূর্ণ করিবার ক্ষমতা প্রাদেশিক গবর্মেণ্টের ও মন্ত্রিমণ্ডলের নাই, ভারত-গবর্মেণ্টেরও নাই। কর্ত্তা ছয় হাজার মাইল দূরবর্ত্তী প্রধানতঃ বণিগ্‌বৃত্তি- ও প্রভুত্বদৃপ্ত ব্রিটিশ জাতি।

—

বাংলার টাকা বাংলাকে ধার দিয়া সুদ গ্রহণ

বঙ্গের বজেট-প্রসঙ্গে বলা হইয়াছে, যে, বঙ্গে সংগৃহীত রাজস্বের খুব বেশী অংশ ভারত-গবর্মেণ্ট লইতে থাকায় বাংলা-গবর্মেণ্ট দরিদ্র হইয়া পড়ে। ঘাটতি পুরাইয়া আয়-ব্যয়ের সমতা সাধন ও রক্ষার নিমিত্ত এই গবর্মেণ্ট ভারত-গবর্মেণ্টের নিকট টাকা ধার লইতে বাধ্য হন। ভারত-গবর্মেণ্ট যাহা ঋণস্বরূপ বাংলা-গবর্মেণ্টকে দেন, তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী টাকা বাংলা দেশ হইতেই লইতে-ছিলেন। সুতরাং বাংলার টাকা বাংলাকেই ধার দিতে লাগিলেন বলিলে অন্যায় বা মিথ্যা কিছু বলা হয় না। এই অপূর্ব্ব ঋণের সুদস্বরূপ ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলা-গবর্মেণ্টের নিকট হইতে লইয়াছেন ১৯৩২-৩৩ সালে বার লক্ষ, ১৯৩৩-৩৪ সালে আঠার লক্ষ, এবং ১৯৩৪-৩৫, ১৯৩৫-৩৬ ও ১৯৩৬-৩৭ সালে বাইশ লক্ষ করিয়া—মোট ছিয়ানব্বই লক্ষ টাকা। সব অটো নীমেয়ারের প্রস্তাব অনুসারে ভারত-গবর্মেণ্ট বাংলা-গবর্মেণ্টকে এই ঋণদায় হইতে মুক্ত করিয়াছেন।

—

বেকার-সমস্যা সমাধান সম্বন্ধে যৎকিঞ্চিৎ

ইহা সুবিদিত এবং ইহা বাঙালীদের একটা ঈর্ষ্যামিশ্রিত অভিযোগেরও বিষয়, যে, অনেক অ-বাঙালী নিঃস্ব ব্যক্তি বঙ্গে আসিয়া পরিশ্রম, মিতব্যয়িতা ও বুদ্ধিবলে নিজের ব্যয় নির্ব্বাহ ত করেই, অধিকন্তু পরিবার-প্রতিপালনের নিমিত্ত 'দেশে' টাকা পাঠায়, সঞ্চয় করে, এবং কেহ কেহ অনুতপতি লক্ষপতি ক্রোরপতি হয়। ব্রিটিশ জাতির প্রণীত আইন এবং অন্যান্য ব্যবস্থা ও রীতি বিশেষ করিয়া ব্রিটিশ ব্যবসাবাণিজ্যের শ্রীবৃদ্ধিসাধক এবং ভারতীয়দের ব্যবসা-বাণিজ্যের অবসাদজনক হইলেও, অ-বাঙালী ভারতীয়েরা বঙ্গে উপার্জ্জক, সঞ্চয়শীল ও বিত্তশালী হয়, অথচ সমর্থ বয়সের বুদ্ধিমান্ বাঙালীরা বেকার ও দরিদ্র থাকে ; ইহা হইতে বাঙালী-চরিত্রে কিছু খুঁৎ আছে অনুমান করা অন্যায় নহে। এই খুঁৎ যদি বঙ্গের মাটি জলবায়ু, বঙ্গের ম্যালেরিয়া এবং আমাদের পূর্ব্বজদিগের চাকরিজীবিতা মসীজীবিতা বচনজীবিতা হইতে জন্মিয়া থাকে, তাহা হইলেও আমরা যে তাহার সংশোধন ও পরিহার করিতে যথেষ্ট চেষ্টা করি না, ইহা আমাদের দোষ। ইচ্ছাশক্তির প্রয়োগ করিয়া দৃঢ়প্রতিজ্ঞ হইলেই শ্রমশীল হইতে পারা যায় এবং সদুপায়ে উপার্জ্জনশীল হইবার নিমিত্ত দৈহিক শ্রমকেও, লজ্জার কারণ মনে না করিয়া, স্বাভাবিক বলিয়া গ্রহণ করিতে পারা যায়।

—

তুই তুমি আপনি সে তিনি

যাহারা কাজ করিয়া উপার্জ্জন করিতে চায়, সব দোষটা যে তাহাদের তাহা নহে। আমরা পূর্ব্বে কখন কখন এরূপ লিখিয়াছি বলিয়া মনে হইতেছে, যে, পুলিস-বিভাগে যে ভদ্রলোকের ছেলেরা কাজ করিতে অনিচ্ছুক তাহার একটা কারণ তাহারা উপরওয়ালাদের নিকট হইতে শিষ্ট ব্যবহার

পায় না। সমান বেতনের মুহুরী, কেরানী, পেয়াদা, আরদালি, চাপরাসি, কনেষ্টবল, গুরুমহাশয় সমান শিক্ষিত ও সমান সামাজিক মর্য্যাদা-বিশিষ্ট হইলেও, গুরুমহাশয়, কেরানী ও মুহুরীকে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করা অনেকের অভ্যাস, কিন্তু চাপরাসি পাহারাওয়ালা প্রভৃতিকে "তুমি" বলা অভ্যাস। আপনি বলা অবশ্যই ঠিক। মাড়োয়ারী ও হিন্দুস্থানী লক্ষপতি বণিক্-জাতীয় কোন কোন ব্যবসাদারকে নিজের ব্রাহ্মণ দারোয়ানকে "পায় লাগি দরোয়ানজী", বলিয়া অভিবাদন করিতে শুনা গিয়াছে। পাচক ব্রাহ্মণকে ছাত্রদের কোন কোন মেসে ও কোন কোন ভদ্রলোকের বাড়ীতে "আপনি" বলিয়া সম্বোধন করিবার রীতি ছিল। এখন হয়ত কোথাও নাই।

বস্তুতঃ ভাষার মধ্যে, তুই তুমি আপনি এবং সে ও তিনি, এই প্রকার বিভিন্ন সর্ব্বনামের উৎপত্তি ও প্রয়োগে সুবিধা যাহাই হউক, অসুবিধাও অনেক হইয়াছে। ইহাদের পরিবর্ত্তে যদি শুধু তুমি বা আপনি এবং শুধু তিনি বা সে শব্দের প্রয়োগ থাকিত, তাহা হইলে তাহাতে অনেক সুবিধা হইত ও তাহা গণতান্ত্রিক যুগের অধিকতর উপযুক্ত হইত।

যাহাকে খুব স্নেহ করা হয়, খুব নিজের মনে করা হয়, বর্ত্তমান রীতি অনুসারে তাহাকে "তুই" বলিলে কোন দোষ হয় না। কিন্তু বাড়ীর চাকর বা আফিসের চাকরকে কি কেহ এত স্নেহ করেন, যে, তাহাকে তুই বলিলে এই সম্বোধন তাহার মিষ্ট লাগিতে পারে?

—

সামাজিক ব্যবহার ও অল্প পারিশ্রমিকের কাজ

মধ্যবিত্ত শ্রেণীর মধ্যে বেকারের সংখ্যা এত বাড়িয়াছে, যে, আমাদের কারবার সামান্য হইলেও গ্র্যাজুয়েটদের নিকট হইতেও আমরা এরূপ চিঠি খুব কম পাই না যাহাতে লেখকেরা কেবল গ্রাসাচ্ছাদনের বিনিময়ে যে-কোন সামান্য কাজও করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করেন।

অনেক সরকারী আফিসে, মিউনিসিপালিটি ডিষ্ট্রিক্ট-বোর্ডের আফিসে, সওদাগরী আফিসে, ডাকঘরে, বেসরকারী নানা দোকানে ও আফিসে অল্প বেতনের এমন বিস্তর কাজ আছে, যাহার পারিশ্রমিক বাস্তবিক অল্প বেতনের কেরানী-গিরি গুরুমহাশয়গিরি প্রভৃতির চেয়ে কম নয়। কিন্তু 'ভদ্র' শ্রেণীর ছেলেরা এই সব কাজ করিতে চায় না। তাহার একটা প্রধান কারণ এই সকল কাজকে মিনিয়্যাল বা ভৃত্যশ্রেণীর কাজ মনে করা হয়।

সমাজ-মন হইতে এই মনোভাব অবিলম্বে দূরীভূত হওয়া আবশ্যক।

মুটে মজুর দারোয়ান পেয়াদা চাপরাসি মাঠের চাষী—কাহারও যাহাতে অমর্য্যাদা হয় বা অমর্য্যাদা সূচিত হয়, এরূপ সম্বোধন ও ব্যবহার অবিলম্বে সম্পূর্ণ রহিত হওয়া উচিত ও আবশ্যক।

সকল মানুষেরই মর্য্যাদা যাহাতে রক্ষিত হয়, বঙ্গীয় সমাজে সর্ব্বত্র এইরূপ কথাবার্ত্তা ও ব্যবহারই শিষ্ট বলিয়া চলিত ও স্বীকৃত হইলে, অন্য অনেক সুবিধা ত হইবেই, প্রকৃত গণতান্ত্রিকতা ও স্বাজাতিকতা ত বাড়িবেই, অধিকন্তু এই লাভও হইবে, যে, বঙ্গের শিক্ষিত যুবকেরা অল্প বেতনের নানা রকম চাকরিও গ্রহণ করিতে এবং অল্প মজুরীর দৈহিক শ্রমের কাজও করিতে এখনকার চেয়ে কম কুণ্ঠিত ও সঙ্কুচিত হইবেন।

—

ব্যবসা ও বাণিজ্য এবং তুমি ও আপনি

এইরূপ গল্প চলিত আছে, যে, এক 'ভদ্রলোক' তাহা অপেক্ষা বহুগুণে ধনী এক স্যাকরাকে প্রশ্ন করিয়াছিলেন, "ওহে দ্বারিক, শুনছি তোমার একটি ছেলে নাকি বি-এ পাস করেছে ও তুমি তার জন্যে একটা কেরানীগিরি-টিরি চাচ্ছ? তুমি ত ওরকম মাইনের অনেক লোককে কর্ম্মচারী রাখতে পার, তোমার এ খেয়াল কেন?" স্যাকরা করজোড়ে নিবেদন করিলেন, "আজ্ঞে মশাই, আমাকে ত কেউ আপনি বলে না, ছেলেটাকে যদি বলে সেই চেষ্টা কচ্ছি।"

বস্তুতঃ নানা প্রকারের ছোট বড় ব্যবসা যাঁহারা করেন, তাঁহাদিগকে কেন যে সম্মান করা হইবে না, তাহার কোন সঙ্গত কারণ নাই। তাঁহাদের মর্য্যাদাবৃদ্ধি বেকার-সমস্যা সমাধানের অন্যতম পরোক্ষ উপায়।

বিলাতে টাকাওয়ালা শুঁড়ীরা পর্য্যন্ত লর্ড হইয়া অভিজাতশ্রেণীভুক্ত হয়। আমাদের দেশে আমরা তা চাই না। এ রকম উন্নয়নের আমরা পক্ষপাতী নহি।

বরং অবনমন আবশ্যক। এক জন ভদ্রলোক, বংশে তিনি শুঁড়ী, কিন্তু ডাক্তারী পাস করিয়া একটা জাহাজ কোম্পানীর লাইনে জাহাজে চিকিৎসকের কাজ করেন, একবার আমাদিগকে এই মর্ম্মের চিঠি লিখিয়াছিলেন, "মশায় আমাদের জা'তকে, শুঁড়ী জা'তকে, আপনারা অস্পৃশ্য অপাংক্তেয় ক'রে রেখেছেন, সেই সব শুঁড়ী-জাতীয় লোককেও জলচল করেন নাই যারা মদ বিক্রী ক'রে না, কিন্তু মুখুজ্যে চাটুজ্যে লাহা গোঁসাই সেন প্রভৃতি যারা মদ বিক্রী করে বা ক'রত, তারা সমাজে বেশ উঁচু স্থানেই থাকে। যদি আপনারা মদবিক্রীটা শুঁড়ীদের মধ্যেই আবদ্ধ রাখতে পারতেন এবং তাদেরকে সমাজে একটু স্থান দিয়ে বলতেন, 'তোমরা মদ বিক্রী ছাড়,' আমরা দল বেঁধে 'প্রোহিবিশুন' (নেশার জন্যে মদ বিক্রী বন্ধ করা) চালিয়ে দিতে পারতুম।" তা তাঁহারা পারিতেন কিংবা পারিতেন না, তাহা এখন আলোচ্য নহে, কিন্তু লেখক মহাশয়ের কথাগুলির অন্তর্নিহিত সত্য প্রণিধানযোগ্য।

—

সার্ব্বজনিক শিক্ষা ও বেকার-সমস্যা

কেহ কেহ হয়ত মনে করেন, দেশে শিক্ষার বিস্তারই বেকার-সমস্যার আবির্ভাবের একটা প্রধান কারণ। সেই জন্য শিক্ষাবিস্তারকে বেকার-সমস্যা সমাধানের একটা উপায় বলিলে তাঁহারা হাসিতে পারেন। কিন্তু যে-সকল সভ্য দেশে শিক্ষার বিস্তার আমাদের দেশের চেয়ে বেশী হইয়াছে, যেখানে আমাদের দেশের চেয়ে অধিবাসীদের মধ্যে শতকরা বেশী জন গ্র্যাড়ুয়েট, যেখানে নিতান্ত শিশু ছাড়া নিরক্ষর কেহ নাই, সেখানেও আমাদের দেশের মত এত বেশী লোক কর্ম্মহীন উপার্জ্জনহীন অলস জীবন যাপন করিতে বাধ্য হয় না। একথা সত্য, যে, আমাদের দেশে যত লোক পুস্তকগত বিদ্যাসাপেক্ষ কাজ চায়, তাহাদের সকলকে নিযুক্ত রাখিবার মত তত কাজ নাই। কিন্তু তাহারা নিরক্ষর থাকিলেই যে তাহাদের কাজ জুটিয়া যাইত, এমন নয়। অতএব নানা রকম শিক্ষা দেওয়া চাই। কাজও নানা রকম সৃষ্টি করা চাই।

শিক্ষা বন্ধ করিলে চলিবে না। বরং এরূপ শিক্ষার ব্যবস্থা করিতে হইবে, যাহাতে মানুষ কাজ পাইতে পারে, না-পাইলে কাজের সৃষ্টি করিতে পারে। এই বিষয়ে সমাজকে ও রাষ্ট্রকে মানুষের সহায় হইতে হইবে।

যাঁহারা আমাদের দেশের সাধারণ স্কুল-কলেজে শিক্ষা পাইয়াছেন অথচ বেকার আছেন, রাষ্ট্র ইচ্ছা করিলে তাঁহাদের অনেকের কাজের ব্যবস্থা করিতে পারেন। অবিলম্বে সার্ব্বজনীন শিক্ষা বিস্তারের জন্য যদি যথেষ্টসংখ্যক বিদ্যালয় স্থাপন করা যায়, যদি এরূপ ব্যবস্থা করা যায়, যে, জড়বুদ্ধি ও বিকলাঙ্গ ছাড়া পাঁচ-ছয় বৎসরের অধিকবয়স্ক কোন বালকবালিকা শিক্ষার সুযোগ হইতে বঞ্চিত থাকিবে না, তাহা হইলে অবিলম্বে এত হাজার বিদ্যালয় খুলিতে হইবে, এবং তাহার জন্য এত হাজার শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রী আবশ্যক হইবে, যে, শিক্ষিত বেকার অনেকেরই কাজ জুটিয়া যাইবে। তাহাতে প্রেসের, পুস্তক-রচনার ও প্রকাশকের কাজের, দপ্তরীর এবং কাগজের ব্যবসারও এত উন্নতি ও প্রসার হইবে, যে, তাহাতেও আরও অনেকের অন্ন হইবে।

বলিতে পারেন, এত বিদ্যালয় স্থাপনের জন্য ও শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদের বেতন দিবার জন্য টাকা কোথায় পাওয়া যাইবে? উত্তর এই, যে, একটা যুদ্ধ বাধিলে ত সরকার বহু কোটি টাকা ঋণ করিয়া যুদ্ধ চালাইয়া থাকেন; নিরক্ষরতা ও অজ্ঞতার বিরুদ্ধেও যুদ্ধ চালাইবার জন্য যত কোটি টাকা আবশ্যক ঋণ করুন এবং তাহার সুদ এবং আসল পরিশোধের কিস্তি দিবার ব্যবস্থা করুন—একটা সিঙ্কিং ফণ্ড করুন। অনেক সভ্য দেশে অনেক অত্যাবশ্যক বড় কাজ এই প্রকারে নির্ব্বাহিত হয়। আমাদের দেশেও হইতে পারে। কেবল ইচ্ছা, সাহস ও বুদ্ধি থাকিলেই হয়।

—

"লোকশিক্ষা-সংসদ"

মৌলবী আজিজুল হক শিক্ষামন্ত্রী থাকিবার সময় যে "শিক্ষাসপ্তাহ" হইয়াছিল, তাহার সংস্রবে রবীন্দ্রনাথ "শিক্ষার স্বাঙ্গীকরণ" শীর্ষক একটি প্রবন্ধ পাঠ করেন। সেই মুদ্রিত প্রবন্ধের শেষে 'পুনশ্চ' শিরোনাম দিয়া নিম্নলিখিত কথাগুলি ও অন্য কিছু কথা মুদ্রিত হইয়াছিল।

দেশের যে সকল পুরুষ ও স্ত্রীলোক নানা কারণে বিদ্যালয়ে শিক্ষালাভের সুযোগ থেকে বঞ্চিত, তাঁদের জন্য ছোট বড় প্রাদেশিক শহরগুলিতে যদি পরীক্ষাকেন্দ্র স্থাপন করা যায় তবে অনেকেই অবসরমত ঘরে বসে নিজেকে শিক্ষিত করতে উৎসাহিত হবেন। নিম্নতন থেকে উচ্চতন পর্ব পর্যান্ত তাঁদের পাঠ্যবিষয় নির্দিষ্ট ক'রে তাঁদের পাঠ্যপুস্তক বেঁধে দিলে সুবিহিতভাবে তাঁদের শিক্ষা নিয়ন্ত্রিত হ'তে পারবে। এই পরীক্ষার যোগে যে সকল উপাধির অধিকার পাওয়া যাবে সমাজের দিক থেকে তার সম্মান ও জীবিকার দিক থেকে তার প্রয়োজনীয়তার মূল্য আছে। এই উপলক্ষ্যে পাঠ্য-পুস্তক রচনার ক্ষেত্র প্রসারিত হয়ে জনসাধারণের মধ্যে বিদ্যাবিস্তারের উপাদান বেড়ে যাবে।

কবি অন্যত্র লিখিয়াছেন—

একদা আমাদের দেশে কাশী প্রভৃতি নগরে বড় বড় শিক্ষার কেন্দ্র ছিল। কিন্তু সাধারণভাবে দেশের সংস্কৃতিরক্ষা ও শিক্ষাচর্চা নানা প্রণালীতে পরিব্যাপ্ত ছিল গ্রামে গ্রামে সর্বত্র। আধুনিক কালের শিক্ষাকে কোনো উপায়ে এদেশে তেমন ক'রে যদি প্রসারিত ক'রে না দেওয়া যায় তবে এ যুগের মানবসমাজে আমরা নিজের

বিদ্যাগত যোগ রক্ষা করতে পারব না ; এবং না পারা আমাদের সকল প্রকার অকৃতার্থতা ও অপমানের কারণ হবে এ কথা বলা বাহুল্য।

এই সমুদয় কথায় ব্যক্ত কবির অভিপ্রায় অনুসারে বিশ্বভারতী "লোকশিক্ষা-সংসদ" গঠন করিয়াছেন। বিশ্বভারতীর কর্ম্মসচিব শ্রীযুক্ত রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর শান্তিনিকেতন হইতে লিখিয়াছেন—

দেশের জনসাধারণের চিত্তক্ষেত্রে বর্ত্তমান যুগের শিক্ষার ভূমিকা করিয়া দিবার যতটুকু চেষ্টা আমাদের দ্বারা সম্ভব সেই কাজে আমরা বিশ্বভারতী হইতে প্রবৃত্ত হইয়াছি। পাঠ্যবিষয় ও গ্রন্থের তালিকা আমরা নির্দিষ্ট করিয়া দিব। যথেষ্ট মনোযোগপূর্ব্বক পাঠ্যবিষয়ের অনুশীলন হইয়াছে কিনা এই প্রদেশব্যাপী নানা কেন্দ্রে পরীক্ষার দ্বারা তাহার প্রমাণ গ্রহণ হইবে। এই সকল কেন্দ্র স্থাপন ও পরীক্ষার ভার গ্রহণে যাঁহারা উৎসাহ বোধ করেন, তাঁহারা আপন অভিমতসহ পত্র লিখিয়া নিম্নস্বাক্ষরকারীকে জানাইলে উপকৃত হইব।

পরীক্ষা তিন ভাগে বিভক্ত ; প্রথম—আদ্য, দ্বিতীয়—মধ্য, তৃতীয়—উপাধি। প্রথমতঃ আদ্য পরীক্ষা গৃহীত হইবে। তাহার বিষয়—বাংলা ভাষা ও সাহিত্য, ইতিহাস, ভূগোল, ভারতশাসনপদ্ধতি ও সাধারণ জ্ঞান, পাটীগণিত, বিজ্ঞান, স্বাস্থ্যতত্ত্ব, গৃহস্থালী। প্রশ্নপত্রের সংখ্যা আট। পাঠ্যপুস্তকের তালিকা প্রকাশিত হইয়াছে। বঙ্গের ও বঙ্গের বাহিরের শিক্ষিত বাঙালী মহিলা ও পুরুষেরা উৎসাহী হইয়া বিশ্বভারতীর এই মহতী প্রচেষ্টাটিকে সাফল্যমণ্ডিত করিবার চেষ্টা করিলে দেশের বিশেষ উপকার হইবে।

—

ওয়াল্ট হুইটম্যান স্মৃতিসভা

গত ৩২শে আষাঢ় কলিকাতার সিটি কলেজ হলে প্রবাসীর সম্পাদকের সভাপতিত্বে আমেরিকার কবি ওয়াল্ট হুইটম্যানের স্মৃতিসভার অধিবেশন হয়। সভাস্থলে বহু বিদ্বজ্জনের ও ছাত্র-ছাত্রীমণ্ডলীর সমাবেশ হইয়াছিল। এই অনুষ্ঠানের উদ্যোগে সন্তোষ প্রকাশ করিয়া অনেকে চিঠি লিখিয়াছেন। রবীন্দ্রনাথ লিখিয়াছিলেন :—

ঔ

কল্যাণীয়েষু

শরীর ক্লান্ত দুর্ব্বল তার উপরে কাজের ভিড়—চিঠি লেখার কর্ত্তব্যে সর্ব্বদাই ত্রুটি হচ্ছে।

তোমাদের হুইটম্যানের কাব্যালোচনার প্রচেষ্টা জয়যুক্ত হোক্‌ এই ইচ্ছা করি। প্রকাণ্ড একটা খনি, ওর মধ্যে নানান কিছুর নির্বিচারে মিশাল আছে, এ রকম সর্বগ্রাসী বিমিশ্রণে প্রচুর শক্তি ও সাহসের প্রয়োজন—আদিম কালের বসুন্ধরার সেটা ছিল—তার কারণ তখন তার মধ্যে আগুন ছিল প্রচণ্ড—এই আগুনে নানা মূল্যের জিনিষ গলে মিশে যায়। হুইটম্যানের চিত্তে সেই আগুন যা তা কাণ্ড করে বসেছে। জাগতিক সৃষ্টিতে যে রকম নির্বাচন নেই, সংঘটন আছে, এ সেই রকম, ছন্দোবন্ধ সব লণ্ডভণ্ড—মাঝে মাঝে এক-একটা সুসংলগ্ন রূপ ফুটে ওঠে আবার যায় মিলিয়ে। যেখানে কোন যাচাই নেই, সেখানে আবর্জনাও নেই, সেখানে সকলের সব স্থানই স্বস্থান। একদৌড়ে সাহিত্যকে লঙ্ঘন করে গিয়েছে এই জন্যে সাহিত্যে এর জুড়ি নেই—মুখরতা অপরিমেয়—তার মধ্যে সাহিত্য অসাহিত্য দুই সঞ্চরণ করছে আদিম যুগের মহাকায় জন্তুদের মতো। এই অরণ্যে ভ্রমণ করতে হ'লে মরিয়া হওয়ার দরকার। ইতি—৩০ আষাঢ় ১৩৪৪।

রবীন্দ্রনাথের পত্র ও অন্যান্য পত্র পঠিত হইবার পর, শ্রীযুক্ত মণীন্দ্রকুমার দত্ত ও শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায় হুইটম্যানের কোন কোন কবিতার অনুবাদ পাঠ করেন এবং শ্রীযুক্ত বিমলকান্তি সমাদ্দার ও অধ্যাপক মণিমোহন ঘোষ কবির বিখ্যাত কবিতা "Oh Captain, My Captain……" আবৃত্তি করেন। শ্রীযুক্ত গিরীন্দ্র চক্রবর্ত্তী শ্রীযুক্ত সুশীল ঘোষ কর্ত্তৃক রচিত একটি গীত গান করেন। গানটি বিশেষভাবে এই উপলক্ষে লিখিত হইয়াছিল। অতঃপর অধ্যাপক নৃপেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয় "ওয়াল্ট হুইটম্যান—বিদ্রোহী ও গণতান্ত্রিক" শীর্ষক উৎকৃষ্ট প্রবন্ধ পাঠ করেন। ইহা "চারণ কবি হুইটম্যান" নামক পুস্তিকায় মুদ্রিত হইয়াছে।

অতঃপর পণ্ডিত ক্ষিতিমোহন সেন মহাশয়ের প্রবন্ধ-পত্রের কিয়দংশ পঠিত হয়।

ইহার পর সভাপতি কিছু বলেন। তাঁহার কোন কোন কথার তাৎপর্য্য নীচে দেওয়া হইল।

কবি হুইটম্যানকে বুঝা সহজ নয়। রবীন্দ্রনাথের কথায় বলতে গেলে তিনি ছিলেন খনির মত ; তাঁর মধ্যে সব রকমই আছে মিশিয়ে। সেই জন্য কেহ হয়ত এক জিনিষ পাবেন, অপর কেহ হয়ত ঠিক তার উল্টো জিনিষ পাবেন। তিনি ছিলেন পায়োনীয়র। পায়োনীয়রের কাজ হচ্ছে যে-পথ দিয়ে সৈন্যেরা অভিযান করবে তার রাস্তা তৈরি করা। হুইটম্যান সাহিত্যে এই রকম পায়োনীয়রের কাজ করে গেছেন। তিনি লিখেছেন যে কবিতা তার মধ্যে ধুলো, মাটি এবড়ো-খেবড়ো নানা রকম জিনিষ আছে—তার মধ্যে সব সময় লালিত্য পাওয়া যায় না ; সেই জন্য সেই লালিত্যের সন্ধানে যদি কেহ তাঁর কবিতা পড়তে চান, তা পাবেন না।

তিনি ছিলেন ভবিষ্যতের অগ্রদূত ; সেই জন্য তাঁর কবিতার মধ্যে আমরা পাই আগমনীর ধ্বনি। তিনি ছিলেন গণতন্ত্রের কবি। তিনি বলেছেন, সমান সুযোগ সব মানুষকে পেতে হবে এবং দিতে হবে ; তা দেবার জন্য বা পাবার জন্য যদি কিছু ভাঙতে হয়, ভাঙতে হবে। তিনি বলেছেন—আমি সে রকম কিছুই চাই না, যার মত আর কিছু অন্য লোকে না পেতে পারে। ন্যায়বিচার, জাতিতে জাতিতে মৈত্রী, এই ভাবটাই তিনি প্রচার করেছেন।

তিনি ষড়যন্ত্র চাল প্রভৃতিকে পৃথিবীর শান্তি ও অগ্রগতির পরিপন্থী মনে করতেন। রাজনীতির তলায় যে নৈতিক শক্তি রয়েছে, তার উপরই তিনি বিশেষ জোর দিতেন। তিনি মনে করতেন, যে, সমস্ত গবর্ন্মেণ্টের প্রধান উদ্দেশ্য হওয়া উচিত, প্রত্যেক মানুষের স্বাধীনতার ইচ্ছা ও আত্মসম্মানের গর্ব্ব যাতে বিকশিত হয় তার পথ ক'রে দেওয়া। তিনি নারীকে পুরুষের সমান ব'লে মনে করতেন। তিনি বলতেন,—It is as great to be a woman, as to be a man. তিনি আরও বলেছেন যে,—Nothing is greater than to be the mother of men. তিনি মনে করতেন যে—The best of every man is his mother. তিনি বলতেন,—বড় শহর তাকেই বলে, যেখানে বড় পুরুষ ও বড় মহিলা থাকেন এবং তাঁরা যদি গ্রামের মধ্যে থাকেন, তবে সেই হবে মহানগরী। মনের স্বাধীনতাকে তিনি খুব বড় ব'লে মনে করতেন। তিনি বলতেন,—Without emancipation of mind political freedom is more than useless.

হুইটম্যান চলেছিলেন একটা আদর্শ লক্ষ্য করে। আমাদেরও উচিত হবে আদর্শ লক্ষ্য ক'রে নিরলস গতিতে চলা—এই রকম যদি একটা কিছু আমরা করতে পারি, তবেই হুইটম্যান স্মৃতিসভা করা সার্থক হবে।

—

অভিযোগী শ্রমিক ও বিত্তহীন 'মধ্যবিত্ত' বেকার

ভারতবর্ষের বড়লাটেরও কিছু অভাব-অভিযোগ নিশ্চয়ই আছে। বাংলার লাট, সিবিলিয়ান কমিশনারগণ, প্রধান মন্ত্রী ও অন্য মন্ত্রীরা—ইঁহাদের সকলেরই অভাব-অভিযোগ আছে। এই সব অভাব-অভিযোগের প্রতিকারের নিমিত্ত আন্দোলন হইতে পারে। কিন্তু করে কে?

আর্থিক হিসাবে ইঁহাদের চেয়ে নিম্নস্তরের দুই শ্রেণীর অভাব-অভিযোগগ্রস্ত লোক আছেন যাঁহাদের সম্বন্ধে, বেশী বা অল্প, আন্দোলন ও খবরের কাগজে লেখালেখি হইয়া থাকে। কারখানার শ্রমিকদের জন্য আন্দোলন খুব হইয়া থাকে ও হইতেছে। 'মধ্যবিত্ত' বেকারদের জন্য আন্দোলন প্রায় হয় না বলিলেই চলে। শ্রমিকদের অবস্থা নিশ্চয়ই আরও উন্নত হইতে পারে ও হওয়া উচিত। কিন্তু তাহাদের ও 'মধ্যবিত্ত' বেকারদের মধ্যে প্রভেদটা মনে রাখা উচিত। এই শ্রমিকরা বেকার নহে, তাহাদের কিছু উপার্জ্জন আছে, তাহাতে তাহাদের গ্রাসাচ্ছাদন চলে, এবং উদ্বৃত্ত কিছু তাহারা বাড়ীতে পাঠায়—তা যত কম বা বেশীই হউক। শ্রমিকরা প্রায়ই নিরক্ষর। শিক্ষার জন্য তাহাদের পিতামাতা এক পয়সাও ব্যয় করেন নাই, তাহারা শিক্ষার জন্য কোন পরিশ্রম করে নাই। 'মধ্যবিত্ত' বেকাররা নামে মধ্যবিত্ত, কিন্তু ব্যক্তিগতভাবে তাহারা বিত্তহীন। তাহারা শিক্ষালাভের জন্য অনেক টাকা খরচ ও অনেক বৎসর পরিশ্রম করিয়াছে। তাহাদের কোন উপার্জ্জনই নাই, সুতরাং উদ্বৃত্তও নাই। তাহারা কেহ কেহ আত্মহত্যা করে। কোন শ্রমিককে রোজগারের অভাবে আত্মহত্যা করিতে হয় না।

অথচ শ্রমিকনেতারা শ্রমিকদের দুঃখে অভিভূত, কিন্তু মধ্যবিত্ত বেকারদের সম্বন্ধে নিশ্চেষ্ট ও নির্ব্বাক্। ইহার কারণ কি? বড়লাট হইতে আরম্ভ করিয়া সকলেরই দুঃখ-দুর্গতি দূরীকরণের চেষ্টা অবশ্যই হওয়া উচিত, কিন্তু মধ্যবিত্ত শিক্ষিত বেকাররা বাদ পড়ে কেন?

—

কাশীপ্রসাদ জায়সবাল

সুপণ্ডিত ডক্টর কাশীপ্রসাদ জায়সবালের মৃত্যুতে প্রাচীন ভারতবর্ষের ইতিহাস সম্বন্ধীয় গবেষণার ক্ষেত্রে এক জন বিদ্বান বুদ্ধিমান সুনিপুণ কর্ম্মীর তিরোভাব হইল। তাঁহার বয়স মাত্র ৬৬ বৎসর হইয়াছিল। তিনি ব্যারিষ্টারী করিতেন। তাহাতে তাঁহার পসারও খুব ছিল। হিন্দু আইন ও ইন্‌কম-ট্যাক্সের আইনে তিনি বিশেষজ্ঞ ছিলেন। কিন্তু তাঁহার প্রিয় কাজ ছিল ঐতিহাসিক গবেষণা। তাঁহার গবেষণা ও সূক্ষ্মদৃষ্টির ফলে প্রাচীন ভারতেতিহাসের অনেক তমসাচ্ছন্ন যুগে আলোক পড়িয়াছে। ভারতীয় প্রাচীন রাষ্ট্রনীতি বিষয়ে তাঁহার "হিন্দু পলিটি" নামক গ্রন্থ অপূর্ব্ব। তাহা পড়িলে বুঝা যায়, প্রাচীন ভারতে সব রকম শাসনপ্রণালীর পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। ইহার অনেক কথা তিনি প্রথমে মডার্ণ রিভিয়ু কাগজে প্রকাশ করেন। বিহার এণ্ড্ উড়িষ্যা রিসার্চ সোসাইটিজ্ জার্ণ্যালের তিনি সম্পাদক ও প্রাণ ছিলেন। তিনিই উদ্যোগী হইয়া ভিক্ষু রাহুল সাংকৃত্যায়নকে তিব্বতে পাঠান। তিনি নবীন গবেষকদিগকে ডাকিয়া তাঁহাদের সহিত আলাপ-পরিচয় করিতেন এবং তাঁহাদের গবেষণায় মূল্যবান্ কিছু দেখিলে তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতেন।

—

কৃষ্ণনগরে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলন

ইহা সন্তোষের বিষয় যে এ বৎসর কৃষ্ণনগরে যে বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের অধিবেশন হইবে, ইতিমধ্যেই তাহার আয়োজন আরম্ভ হইয়াছে। নদীয়া জেলার লোকদিগকে এ বিষয়ে একটি কথা স্মরণ করাইয়া দেওয়া অসঙ্গত হইবে না। এই কাজটি শুধু কৃষ্ণনগর শহরের লোকদেরই কাজ নয়। নদীয়া জেলায় যে-কেহ থাকেন, নদীয়া জেলার যে-কেহ অন্যত্র থাকেন, ইহা তাঁহাদের সকলেরই কাজ। যিনি যে ভাবে পারেন, কাজটি সুসম্পন্ন করিবার চেষ্টা করুন।

—

দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার

কলিকাতার দরিদ্র বান্ধব ভাণ্ডার একটি জনহিতসাধক প্রতিষ্ঠান। ইহা পনর বৎসর পূর্ব্বে প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীযুক্ত যতীন্দ্রনাথ বসু ইহার পৃষ্ঠপোষক মুরুব্বি এবং শ্রীযুক্ত সর্ হরিশঙ্কর পাল ইহার কার্য্যনির্ব্বাহক কমিটির সভাপতি। এই সমিতি জাতিধর্ম্ম-নির্ব্বিশেষে অভাবগ্রস্ত, দুর্গত, বিপন্ন ও পীড়িত লোকদের নানাবিধ সাহায্য করেন, এবং কলিকাতার বস্তীগুলির উন্নতির চেষ্টা করিয়া থাকেন। চাল সংগ্রহ করিয়া কতকগুলি পরিবারকে সমিতি প্রতি সপ্তাহে চাউল দেন। পূজার সময়ে ও আবশ্যক-মত অন্য সময়েও বস্ত্রদান ইহার আর একটি কাজ। ইহার চিকিৎসা ও ঔষধবিতরণ বিভাগ হইতে গত ১৯৩৬ সালে ৬২৭৫০ জন রোগী এলোপ্যাথী মতে এবং ৬৮৭৯৫ জন রোগী হোমিওপ্যাথী মতে ব্যবস্থা ও ঔষধ. পাইয়াছিল। কোন কোন রোগীকে সমিতি দুগ্ধপথ্যও দিয়াছেন। স্বাস্থ্যবিষয়ক প্রদর্শনী ইহার আর একটি কাজ। ইহার সাহিত্য-বিভাগের লাইব্রেরি ও পাঠাগার অনেকের অধ্যয়নস্পৃহা তৃপ্ত করে। সমিতি 'মাতৃমঙ্গল', 'শিশুমঙ্গল', 'বসন্তরোগ ও তাহার প্রতিকার', এবং 'আমাদের খাদ্য' – এই পুস্তিকাগুলি প্রকাশ করিয়াছেন। সমিতির কার্য্য প্রশংসনীয়। সর্ব্বসাধারণ ও কলিকাতা মিউনিসিপালিটি ইহাকে আরও সাহায্য করিলে ইহার হিতকর কার্য্য আরও ব্যাপক ও সুসম্পন্ন হইবে। এইরূপ সমিতি কলিকাতার সব পাড়ায় ও মফস্বলে থাকা উচিত। ইহার ঠিকানা— ১২-৫ নীলমণি মিত্র ষ্ট্রীট।

—

ধীবরদের উপর অত্যাচার

গত মাসে একটা সংবাদ রটিয়াছিল, যে, চাঁদপুরের ধীবরেরা ধর্ম্মঘট করিয়াছে এবং তাহার ফলে কলিকাতায় মাছ রপ্তানী কম হওয়ায় মাছের আমদানী কম হইয়াছে। প্রকৃত কথা তাহা নহে। ইজারাদারদের অত্যাচারে মৎস্য-জীবীরা ঘরবাড়ী ছাড়িয়া পলায়ন করে, ধর্ম্মঘট করে নাই। ইহার নিরপেক্ষ ও পুঙ্খানুপুঙ্খ তদন্ত হওয়া উচিত। ব্যবস্থাপক সভায় এ বিষয়ে প্রশ্নও হওয়া উচিত।

—

মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি কেন রেজিষ্টরী হইবে না ?

আইনে আছে, যে, মৎস্যজীবীদের সমবায় সমিতি থাকিলে মাছ ধরিবার ইজারা সেইরূপ সমিতিকেই দিতে হইবে; সেরূপ সমিতি না থাকিলে তবে অন্য লোককে দিতে হইবে। চাঁদপুরে মৎস্যজীবীদের একটি সমবায় সমিতি গঠিত হইয়াছে। কিন্তু কো-অপারেটিভ বিভাগের রেজিষ্ট্রার তাহাকে রেজিষ্টরী করিতেছেন না, সুতরাং সেই সমিতি ইজারা পাইবার চেষ্টাও করিতে পারিতেছে না। রেজিষ্ট্রার কেন এরূপ করিতেছেন, তাহার কারণ অনুসন্ধান হওয়া উচিত, এবং এ বিষয়ে ব্যবস্থাপক সভায় প্রশ্ন হওয়া উচিত।

—

বঙ্গীয় মৎস্যজীবী বিদ্যালয়

চাঁদপুরের অন্তর্গত মেহেরনে যে মৎস্যজীবী বিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হইতেছে, তাহাতে মৎস্যজীবীর ছেলেরা কেবল প্রবেশিকা পরীক্ষা পর্য্যন্ত সাধারণ শিক্ষা পাইবে, এমন নহে,

এই বিদ্যালয়ের প্রত্যেক ছাত্রকেই বিভিন্ন স্তরে মৎস্য সংরক্ষণ পরিবর্দ্ধন ও বিভিন্ন প্রকারের মৎস্যশিল্প এবং আধুনিকতম অর্থনীতি-শাস্ত্রের ভিত্তিতে মৎস্য-ব্যবসা-সংক্রান্ত যাবতীয় বিষয়ে শিক্ষালাভ করিতে বাধ্য করা হইবে। এবম্প্রকারের শিক্ষণীয় বিষয়ে শিক্ষাদান করাই এই বিদ্যালয়ের বৈশিষ্ট্য ও উদ্দেশ্য।

ইহার সর্ব্বাঙ্গীন উন্নতি ও সাফল্য বাঞ্ছনীয়।

—

বিহ্‌টায় রেলওয়ে দুর্ঘটনা

পাটনার নিকটবর্ত্তী ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ের বিহ্‌টা ষ্টেশনের কাছে গত মাসে যে ভীষণ রেলওয়ে দুর্ঘটনা হইয়া গিয়াছে, এরূপ দুর্ঘটনা ভারতবর্ষে আর কখনও হয় নাই। রেলওয়ে-কর্ত্তৃপক্ষের হিসাব-মতই শতাধিক স্ত্রীপুরুষ ও শিশুর মৃত্যু হইয়াছে, এবং দুই শতের অধিক ব্যক্তি আহত হইয়াছে। মৃত ব্যক্তিদের পরিবারবর্গকে এবং আহত জীবিত ব্যক্তি-গণকে যথেষ্ট ক্ষতিপূরণ দেওয়া উচিত। ঈষ্ট ইণ্ডিয়া রেলওয়ে সরকারী রেলওয়ে। কর্ত্তৃপক্ষ দুর্ঘটনার যে তদন্ত করিতেছেন, তাহাতে সর্ব্বসাধারণ সন্তুষ্ট হইতে পারিবে না। এই জন্য সর্ আবদুল হালিম গজনবী ও সর্ জিয়াউদ্দিন আহমদ ইহার তদন্তের জন্য সরকারী ও বেসরকারী সদস্য লইয়া একটি তদন্ত-কমিটি গঠন করিবার জন্য রেলওয়ে বোর্ডকে অনুরোধ করিয়াছেন। এরূপ কমিটি গঠিত হওয়া নিশ্চয়ই উচিত।

—

নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-সম্মেলন

গত মাসে কলিকাতায় আচার্য্য প্রফুল্লচন্দ্র রায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে নিখিলবঙ্গ প্রাথমিক শিক্ষক-সম্মেলনের দ্বিতীয় অধিবেশন হইয়া গিয়াছে। বাংলা দেশে যথেষ্টসংখ্যক প্রাথমিক বিদ্যালয় নাই। যতগুলি বিদ্যালয় আছে, তাহাদের অবস্থা ভাল নয়। বিদ্যালয়গৃহ, বিদ্যালয়ের আসবাব, শিক্ষাদানপ্রণালী, শিক্ষণীয় বিষয়সমূহ, পাঠ্য-পুস্তকাবলী—এই সমস্তই অসন্তোষজনক। লাইব্রেরি কোন বিদ্যালয়ের আছে কিনা সন্দেহ। প্রাথমিক শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীদিগের আর্থিক অবস্থা শোচনীয়। শহরের গৃহ-ভৃত্যদের আয়ও তাঁহাদের আয়ের চেয়ে অধিক। বাংলা

দেশের লোকসংখ্যা অন্য প্রত্যেক প্রদেশের চেয়ে বেশী; কিন্তু বাংলা-গবন্মেণ্ট বড় প্রদেশগুলির চেয়ে শিক্ষার জন্য ব্যয় করেন কম। ১৯৩৪-৩৫ সালে মান্দ্রাজ, বোম্বাই, যুক্তপ্রদেশ, পঞ্জাব ও বঙ্গের গবন্মেণ্ট শিক্ষার জন্য যথাক্রমে ২৫৫৩৭৯৮০, ১৭৬৪৩৫৪৭, ২০১৭৬১৩০, ১৫৯৯২৮৮৫, এবং ১৩৬১৯৪৪৫ টাকা খরচ করেন। বঙ্গের লোকসংখ্যা পঞ্জাবের ও বোম্বাইয়ের দুই গুণেরও অধিক। শিক্ষক-শিক্ষয়িত্রীগণ সংঘবদ্ধ হইয়া প্রভাবশালী ব্যক্তিদের পরিচালনায় ক্রমাগত চেষ্টা করিতে থাকিলে কিছু সুফল ফলিতে পারে। বালকদের শিক্ষার অবস্থার চেয়ে বালিকাদের শিক্ষার অবস্থা আরও শোচনীয়। শ্রীযুক্তা মীরা দত্তগুপ্ত, বেগম হাসিনা মোর্শেদ, বেগম মোমিন, এ-বিষয়ে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় বক্তৃতা করিয়াছেন। —

বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ

প্রধানতঃ বিনাবিচারে দণ্ডিত ব্যক্তিদের এবং কিয়ৎ পরিমাণে বিচারান্তে দণ্ডিত রাজনৈতিক কয়েদীদের দুর্দ্দশা সম্বন্ধে বঙ্গীয় ব্যক্তিগত স্বাধীনতা সংঘ সর্ব্বসাধারণের জ্ঞান বৃদ্ধি করিতেছেন। তাঁহারা দেখাইয়াছেন, যে, আণ্ডামানের বন্দীরা সবাই নরহত্যা প্রভৃতি গুরুতর অপরাধে দণ্ডিত হইয়াছে, বঙ্গের স্বরাষ্ট্রসচিবের এই উক্তি সর্ব্বাংশে সত্য নহে। —

পল্লী-উন্নয়নের জন্য ভারত-গবন্মেণ্টের দান

পল্লী-উন্নয়নের জন্য গত বৎসর ভারত-গবন্মেণ্ট বাংলাকে ১৭ লক্ষ টাকা দিয়াছিলেন, এ বৎসর আঠার লক্ষ টাকা দিয়াছেন। এক-একটা গ্রামে অল্প অল্প টাকা নানা কাজে খরচ করিলে কোন ফল পাওয়া যায় না। সুতরাং গত বৎসরে ১৭ লাখ টাকা কোথায় উড়িয়া গিয়াছে, তাহা কেহ লক্ষ্য করিতে পারে নাই। এ-বৎসরের টাকাও ঐরূপে ছড়াইলে কোন ফল হইবে না। দুই-একটা জেলায় দুই-একটা কাজে টাকা ব্যয় করিলে কিছু ফল হয়। এই ভাবে প্রতি বৎসর কাজ করিলে কালক্রমে সমগ্র বাংলা দেশ কিঞ্চিৎ উপকৃত হইতে পারে। —

আসাম হইতে শ্রীহট্ট বিচ্ছিন্ন করিবার চেষ্টা

বাংলাভাষী এবং প্রাকৃতিক বঙ্গের অংশ শ্রীহট্টকে আসাম হইতে বিচ্ছিন্ন করিবার জন্য অসমীয়ারা ব্যগ্র। তাহার প্রকৃত কারণ, শ্রীহট্টবাসীরা অধিকতর শিক্ষিত ও উদ্যোগী। তাহারা বাংলা বলে বলিয়াই যদি তাহাদিগকে তাড়াইতে হয়, তাহা হইলে কাছাড়, গোয়ালপাড়ার অনেক অংশ এবং ব্রহ্মপুত্র-উপত্যকার যে-যে অংশে বাঙালী বেশী সেই সকল অংশ আসাম প্রদেশ হইতে বিচ্ছিন্ন করিয়া বাংলা দেশে জুড়িয়া দেওয়া উচিত। তদ্ভিন্ন মানভূম জেলা, সিংহভূম জেলার অনেক অংশ, সাঁওতাল পরগণা জেলার অনেক অংশ প্রভৃতি বিহার প্রদেশ হইতে বাংলার মধ্যে আনা উচিত। —

নৌকায় চক্ষুচিকিৎসালয়

একটি নৌকাকে চক্ষুচিকিৎসার ঔষধ ও সরঞ্জামে পূর্ণ করিয়া ডাক্তারসহ পূর্ব্ববঙ্গের জেলায় জেলায় গবন্মেণ্ট পাঠাইতেছেন। ইহাতে লোকের উপকার হইতেছে। যে-সব জেলায় জলপথে যাতায়াতের সুবিধা নাই, তথায় বড় মোটর-বাস গাড়ী এইরূপ সজ্জিত করিয়া ডাক্তারসহ ঘুরাইয়া বেড়াইলে উপকার হইবে। —

বঙ্গের বাহিরে 'বন্দেমাতরম্'; বঙ্গে 'গন্ধে কাতরম্'?

"বন্দেমাতরম্" গানের উৎপত্তি বঙ্গে। বঙ্গে এই গান গাহিয়া বা এই শব্দ দুটি উচ্চারণ করিয়া পূর্ব্বে অনেকে প্রহৃত ও কারারুদ্ধ হইয়াছেন। এখন বঙ্গের বাহিরে ছয়টি প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভার কার্য্যারম্ভ হইয়াছে "বন্দেমাতরম্" গান করিয়া। বঙ্গে তাহা হয় নাই। বরং তাহার বিপরীত দমননীতির পুনরুত্থান হওয়ায় লোকে তাহার '(উগ্র) গন্ধে কাতরম্'। —

বোম্বাইয়ে কংগ্রেসীদের গৃহবিবাদ

বাংলার কংগ্রেসীরা গৃহবিবাদের জন্য এখনও কুখ্যাত হইয়া রহিয়াছে—যদিও কংগ্রেসী দলাদলি অন্যত্রও ছিল। সম্প্রতি বোম্বাইয়ে মিঃ নারিমানকে প্রধান মন্ত্রী বা কোন মন্ত্রী না-করিয়া মিঃ খেরকে প্রধান মন্ত্রী করায় তথায় খুব দলাদলি ও 'হাটে হাঁড়ি ভাঙা' চলিতেছে। —

আবগারীর আয় হইতে শিক্ষার ব্যয়নির্ব্বাহ!

মহাত্মা গান্ধী বলিয়াছেন, প্রাদেশিক গবন্মেণ্টগুলি আবগারীর আয় হইতে শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করেন অর্থাৎ কতকগুলা লোককে মাতাল করিয়া প্রদেশের কতক বালকবালিকাকে শিক্ষা দেওয়া হয়! চমৎকার ব্যবস্থা! তাঁহার মতে এবং সকল দেশহিতকামীর মতে সুরাপান ও নেশার জন্য সুরাবিক্রয় বন্ধ করা উচিত। তাহা হইলে শিক্ষার কি হইবে? তিনি বলেন, শিক্ষালয়গুলিকে স্বব্যয়নির্ব্বাহক্ষম করিতে হইবে। ধনী ছাড়া অন্য সকলকেও শিক্ষা দেওয়া উচিত, সুতরাং শিক্ষালয়গুলিকে স্বব্যয়নির্ব্বাহক্ষম করা সম্ভবপর নহে। প্রাদেশিক রাজস্ব অন্য উপায়ে বাড়াইয়া শিক্ষার ব্যয় নির্ব্বাহ করিতে হইবে। আমরা আগে কয়েকটি প্রদেশের গবন্মেণ্টের শিক্ষার ব্যয় দেখাইয়াছি। বড় প্রদেশগুলির আবগারীর আয় ১৯৩৩-৩৪ সালে কত হইয়াছিল, তাহা নীচে লিখিত হইল।

প্রদেশ।	লোকসংখ্যা।	আবগারীর আয়
মান্দ্রাজ	৪৬৭৪০১০৭	৪,২৮,৮২,৮৬১ টাকা
বোম্বাই	২১৯৩০৬০১	৩,৬৪,৩৭,৩৩৯ "
বাংলা	৫০১১৪০০২	১,৩৪,০৬,০২২ "
যুক্তপ্রদেশ	৪৮৪০৮৭৬৩	১,৩০,৯২,৪২৬ "
পঞ্জাব	২৩৫৮০৮৫২	৯৪,৩৫,৮৩০ "

দেশ-বিদেশের কথা

স্বর্গীয় জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

শ্রীনরেন্দ্রনাথ বসু

বাংলার যে সকল কৃতী সন্তান বঙ্গের বাহিরে স্বীয় শিক্ষা, সাধনা ও চরিত্রের বলে সকলের নিকট বিশেষ সম্মান লাভ করিয়া বাঙ্গালীর গৌরববর্দ্ধন করিয়াছেন, তাঁহাদের মধ্যে স্বর্গীয় ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী এম-এ, এলএল-বি, ডি-এস্‌সি, ডি-লিট, এফ-আর-এস-এ, আই-এস্-ও অন্যতম ছিলেন। কয়েক মাস পূর্ব্বে ৭৩ বৎসর বয়সে ইনি পরলোকগমন করিয়াছেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ ৮৬৩ খ্রীষ্টাব্দের ২রা অক্টোবর তারিখে কাশীধামে জন্মগ্রহণ করেন। ইনি কলিকাতা বাগবাজারের এক প্রাচীন সম্ভ্রান্ত রাঢ়ী শ্রেণীর ব্রাহ্মণ বংশের সন্তান। এই বংশের কালীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তীর নামে, বাগবাজারে একটি রাস্তা রহিয়াছে। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতামহ রাধানাথ চক্রবর্ত্তী ইংরেজী ও ফারসী উভয় ভাষাতেই সুপণ্ডিত ছিলেন। ইনি ঈষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানীর লবণ-বিভাগের দেওয়ানের উচ্চপদ প্রাপ্ত হইয়াছিলেন। রাধানাথ সপরিবারে কাশীতে আসিয়া বসবাস করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথের পিতা কাশীপ্রসাদ চক্রবর্ত্তী কাশীর কুইনস্ কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া, যুক্তপ্রদেশে মুন্সেফ পদে নিযুক্ত হইয়াছিলেন।

জ্ঞানেন্দ্রনাথ বাল্যে কাশীর মহারাজা জয়নারায়ণ হাইস্কুলে ও কুইনস কলেজে শিক্ষালাভ করিয়া ১৮৭৭ সালে প্রবেশিকা পরীক্ষায় প্রথম বিভাগে উত্তীর্ণ হন। ছাত্রবৃত্তি লাভ করিয়া তিনি এলাহাবাদের নবপ্রতিষ্ঠিত সরকারী মুর সেণ্ট্রাল কলেজে প্রবেশ করেন। এই কলেজ হইতে তিনি বিশেষ প্রশংসার সহিত এফ্-এ, বি-এ ও এম-এ পরীক্ষায় উত্তীর্ণ হইয়াছিলেন। এম-এ তে ফার্ষ্ট ক্লাস অনার্স পাইয়া জ্ঞানেন্দ্রনাথ সর্ব্বপ্রথম হইয়াছিলেন এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করিয়াছিলেন। এই সময়ে তাঁহার বয়স মাত্র ২০ বৎসর ছিল। জ্ঞানেন্দ্রনাথ কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে পদার্থ-বিজ্ঞানে এম-এ পরীক্ষায় দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের পদক লাভ করিয়াছিলেন। পরে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন পরীক্ষা এলএল-বি পাস করেন এবং তাহাতেও সর্ব্বপ্রথম স্থান প্রাপ্ত হন।

কলেজের শিক্ষা শেষ হইলে, ১৮৮৪ অব্দে জ্ঞানেন্দ্রনাথ বেরিলি



জ্ঞানেন্দ্রনাথ চক্রবর্ত্তী

কলেজের অধ্যাপকের পদ গ্রহণ করেন। তিনি ১৮৯০ পর্য্যন্ত ঐ কলেজের গণিত ও বিজ্ঞানের অধ্যাপক ছিলেন।

১৮৯১ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ উকিলরূপে এলাহাবাদ হাইকোর্টে যোগদান করেন, এজন্য তাঁহাকে প্রথানুযায়ী পূর্ব্বে জেলাকোর্টে শিক্ষানবিশী করিতে হয় নাই। তিনি এলএল বি পরীক্ষায় যেরূপ অসাধারণ কৃতিত্ব প্রদর্শন করিয়াছিলেন, তাহা বিবেচনা করিয়াই হাইকোর্ট তাঁহাকে এই বিশেষ সুযোগ প্রদান করিয়াছিলেন। ব্যক্তিগত দক্ষতা ও অসামান্য আইন-জ্ঞানের বলে তিনি অতি অল্পকালের মধ্যেই পশার জমাইয়া ফেলেন। প্রধান বিচারপতি ও অন্যান্য বিচারপতিগণ প্রকাশ্য আদালতে তাঁহার আইন-জ্ঞানের বিশেষ প্রশংসা করিলেও, এই পেশা তাঁহার মত চরিত্রের লোকের উপযোগী না হওয়ায়, তিনি তাহা পরিত্যাগ করেন।

১৮৯৩ সালেই জ্ঞানেন্দ্রনাথ 'পার্লামেণ্ট অফ্ রিলিজনস্'এর অধিবেশনে হিন্দুপ্রতিনিধি রূপে আমেরিকায় গমন করেন। এই সময় তাঁহার মিসেস্ এ্যানি বেসাণ্টের সহিত সৌহৃদ্য জন্মে—এই সৌহৃদ্য প্রায় চল্লিশ বৎসর কাল অক্ষুণ্ণ ছিল। আমেরিকায় বিভিন্ন রাষ্ট্রের অনেকগুলি প্রধান শহরে তিনি বক্তৃতা করিয়াছিলেন।

শিক্ষা-বিভাগের কার্য্য তাঁহার প্রকৃতির উপযোগী হওয়ায়, ভারতে ফিরিয়া আসিয়া, জ্ঞানেন্দ্রনাথ যুক্তপ্রদেশের বিদ্যালয়সমূহের পরিদর্শকের পদ গ্রহণ করেন।

এই সময়ে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয় এবং কাশীর হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয়ের কার্য্যের সহিত ঘনিষ্ঠভাবে যুক্ত ছিলেন। হিন্দু বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন

কার্য্যেও তিনি বিশেষ অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন এবং কিছুকাল তাহার প্রো-ভাইস-চ্যান্সেলর ছিলেন।

১৯২০ সালে জ্ঞানেন্দ্রনাথ এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিষ্ট্রার নিযুক্ত হন এবং তিনি ব্যবস্থাপক সভারও একজন সদস্য মনোনীত হইয়াছিলেন। ঐ বৎসর শেষ হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহাকে নব-প্রতিষ্ঠিত লক্ষ্ণৌ বিশ্ববিদ্যালয়ের ভাইস-চ্যান্সেলরের পদ প্রদানের প্রস্তাব করা হয় এবং তিনি তাহা গ্রহণ করেন। জ্ঞানেন্দ্রনাথ ১৯২৩ সাল পর্য্যন্ত বরাবরই ঐ পদে অধিষ্ঠিত ছিলেন। ১৯২৬ সালে পুনরায় তাঁহাকে সর্ব্বসম্মতিক্রমে ভাইস-চ্যান্সেলর পদ প্রদানের প্রস্তাব হইয়াছিল, কিন্তু স্বাস্থ্য ভঙ্গের জন্য তিনি তাহা গ্রহণ করেন নাই।

১৯১২ সালে তিনি এলাহাবাদ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিনিধিরূপে লণ্ডনে ব্রিটিশ সাম্রাজ্যস্থ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহের কংগ্রেসে যোগদান করিয়াছিলেন এবং রয়্যাল সোসাইটির শতবার্ষিকী উৎসবেও উপস্থিত ছিলেন। তিনি ইংলণ্ড ও স্কটলণ্ডের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয় হইতে বিশেষ ভাবে নিমন্ত্রিত হইয়া ঐ সকল পরিদর্শন করিয়াছিলেন।

তাঁহার অন্তরজীবনের প্রগাঢ়তার বিষয় ভাষায় প্রকাশ করা যায় না। কেবল তাঁহার অন্তরঙ্গ বন্ধুরাই তাঁহার জীবনের গভীর দিকটার কিছু ইঙ্গিত পাইতেন। শিশুর ন্যায় সরলতা, নিরহঙ্কারতা, সম্পূর্ণ স্বার্থহীনতা, কঠোর আত্মসংযম তাঁহার চরিত্রের বিশেষ গুণ ছিল।

পরলোকে মার্কনি

১৮৭৪ সালে ইটালীর অন্তর্গত বোলোনা শহরে গুলিয়েলমো মার্কনি জন্মগ্রহণ করেন। তাঁহার পিতা ছিলেন ইটালীয় এবং মাতা ছিলেন ইংরেজ মহিলা। বাল্যকাল হইতেই তাঁহার চিন্তাধারা বৈজ্ঞানিকোচিত ছিল। তিনি অসামান্য উদ্ভাবনী-প্রতিভাবলে ভবিষ্যৎজীবনে পৃথিবীর বৈজ্ঞানিক জগতে স্থান করিয়া লইতে সমর্থ হইয়াছিলেন।

ম্যাক্সওয়েল আলোকের সঙ্গে বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সম্বন্ধ গণিতের দ্বারা প্রতিষ্ঠিত করিয়া যান। হেনরিক্ হার্ৎজ্ সর্ব্বপ্রথম হাতে-কলমে ঐরূপ বৈদ্যুতিক তরঙ্গের সৃষ্টি করিলেন। তাহার পর অলিভার লজ এবং জগদীশচন্দ্র বসু প্রভৃতি মনীষিগণ বহু দিক হইতে হার্ৎজ্-তরঙ্গের গুণাবলী পরীক্ষা করিতে লাগিলেন। ১৯০১ সালে এই সকল বৈজ্ঞানিক গবেষণার ফল একত্র করিয়া মার্কনি সর্ব্বপ্রথম বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দ্বারা এক স্থান হইতে অন্য স্থানে সংবাদের আদান-প্রদান করিতে সমর্থ হইলেন। সর্ব্বপ্রথম মার্কনিই দীর্ঘ এবং অবিচ্ছিন্ন তরঙ্গের সৃষ্টি করিয়া সংবাদ-প্রেরণের অনেক সুবিধা করিয়াছেন। ১৯০০ সালে তিনি আরও কয়েকটি প্রয়োজনীয় বিষয়ের উদ্ভাবন করেন যেমন, জাহাজ এবং উড়ো-জাহাজগুলি যখন পরস্পরের খুব নিকটে আসে তখন আসন্ন বিপদের বার্ত্তা বিদ্যুৎ-তরঙ্গের দ্বারা (আলোক কিম্বা ঘণ্টাধ্বনির দ্বারা) সঙ্কেত জ্ঞাপন। তাঁহার অন্যান্য গবেষণাও মানুষের বৈজ্ঞানিক ভাণ্ডারকে সমৃদ্ধিশালী করিয়াছে।


মার্কনি

১৯০৫ সালে তিনি ইটালীর মন্ত্রণাসভার সভ্য নির্ব্বাচিত হন এবং ১৯০৯ সালে পদার্থবিদ্যায় নোবেল পুরস্কার প্রাপ্ত হন। ১৯৩২ সালে তিনি কেল্‌ভিন পদক প্রাপ্ত হন। তিনি ইটালীর জাতীয় গবেষণা সমিতির সভাপতি ছিলেন এবং সাধারণ অর্থে বৈজ্ঞানিক না হইলেও উচ্চস্তরের উদ্ভাবন-কর্ত্তা ছিলেন। তাঁহার মৃত্যুতে পৃথিবী ক্ষতিগ্রস্ত হইল।

তা. কু. ব.

বীরসিংহে বিদ্যাসাগর স্মৃতিবার্ষিকী

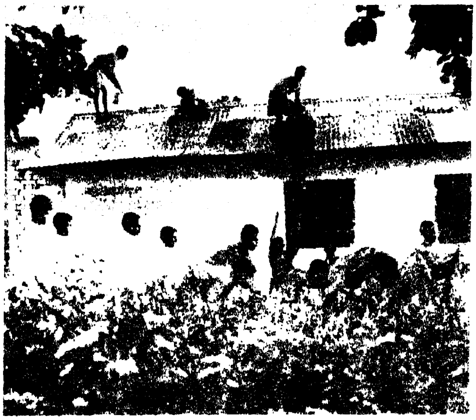
গত ২৯শে জুলাই বৃহস্পতিবার বিদ্যাসাগরের জন্মস্থান বীরসিংহে তাঁহার ৪৬শ মৃত্যুবার্ষিকী উৎসব অনুষ্ঠিত হইয়াছে। মেদিনীপুর সাহিত্য-পরিষদ ও জিলা ম্যাজিষ্ট্রেট শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনের উদ্যোগে স্থানীয় ও নিকটবর্ত্তী গ্রামসমূহের প্রায় তিন হাজার লোক বিদ্যাসাগর মহাশয়ের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করিবার জন্য সমবেত হইয়াছিল। এই উপলক্ষে প্রায় দেড় হাজার কাঙালীভোজন করান হয়। সভাপতি শ্রীযুক্ত সজনীকান্ত দাস একটি সুদীর্ঘ অভিভাষণে বিদ্যাসাগর-চরিত্রের ও বিদ্যাসাগরী ভাষার বিশেষত্ব সম্বন্ধে আলোচনা করেন।

বীরসিংহে বিদ্যাসাগর মহাশয়ের স্মৃতি চিরস্থায়ী করিবার জন্য শ্রীযুক্ত বি. আর. সেনকে সভাপতি করিয়া একটি কমিটি গঠিত হয়।

পরলোকে সারদাচরণ ঘোষ

সম্প্রতি ময়মনসিংহের খ্যাতনামা ব্যবহারজীব সদাশয় সারদাচরণ ঘোষ মহাশয়ের দেহান্ত ঘটিয়াছে। ঘোষ-মহাশয় বিচক্ষণ আইনজ্ঞ, সাধুপ্রকৃতি, নিরহঙ্কার ও দরিদ্র ছাত্রের বন্ধু ছিলেন। ময়মনসিংহে ঘোষ-মহাশয়ের শোকসভায় স্যর্ যদুনাথ সরকার মহাশয় বক্তৃতাপ্রসঙ্গে বলেন যে, বঙ্গীয় গবর্ণমেণ্টের উচ্চতম আইন-পরামর্শদাতাদের নিকট হইতে তিনি অবগত আছেন যে ঘোষ-মহাশয় ময়মনসিংহের সরকারী উকীল হইলেও প্রায় সমস্ত জটিল দেওয়ানী মোকদ্দমাতেই বঙ্গীয় সরকার তাঁহার পরামর্শ লইতেন। সরল জীবনযাত্রা ও উচ্চ চিন্তা তাঁহার জীবনে একত্র হইয়াছিল।

তিনি এক সময় ময়মনসিংহ সাহিত্য-পরিষৎ পরিচালনার ভার গ্রহণ করিয়াছিলেন ও ময়মনসিংহের (অধুনালুপ্ত) "আরতি" মাসিক পত্রের সম্পাদক ছিলেন।



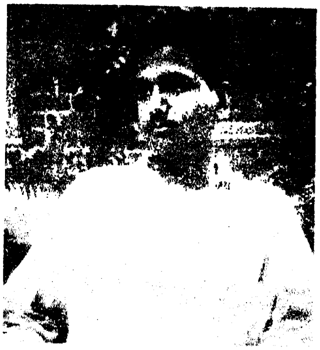
তাজহাটের বয়-স্কাউটগণ গৃহসংস্কার ও জঙ্গল-পরিষ্কারে রত

তাজহাট রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম

শ্রীরামকৃষ্ণ-শতবার্ষিকী উপলক্ষ্যে তাজহাটের রাণীসাহেবার প্রেরণায় তাজহাটে একটি রামকৃষ্ণ-সেবাশ্রম প্রতিষ্ঠিত হয়। তাজহাটের স্কাউট-মাষ্টার শ্রীভবানীপ্রসাদ রায় চৌধুরীর নেতৃত্বে তাঁহার বালকদল, তাজহাটের পুরাতন বিদ্যালয়ের দগ্ধাবশিষ্ট গৃহ ও জঙ্গলাকীর্ণ প্রাঙ্গণ সযত্নে পরিষ্কার করিয়া এই মনোরম আশ্রমটি নির্ম্মাণে সাহায্য করে। সম্প্রতি এই সেবাশ্রমের উদ্বোধন-উৎসব রংপুরের ম্যাজিষ্ট্রেট মিঃ এস. কে. ঘোষের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠিত হইয়াছে। এই বিবরণ ও তৎসহ মুদ্রিত চিত্র শ্রীযুক্ত শচীন্দ্রলাল রায়ের নিকট হইতে আমরা পাইয়াছি।



শ্রীঅবিনাশচন্দ্র বসু



শ্রীআমোদরঞ্জন সেন

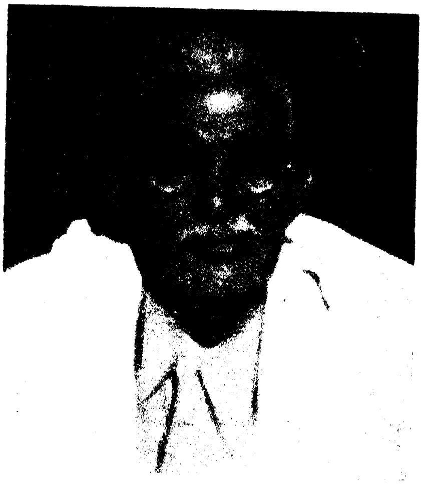


শ্রীবিধুরঞ্জন সেন

প্রবাসী বাঙালীর কথা

বোম্বাই প্রদেশের অন্তর্গত কোলাপুর রাজ্যের রাজারাম কলেজের ইংরেজী সাহিত্যের প্রধান অধ্যাপক শ্রীযুক্ত অবিনাশচন্দ্র বসু কোলাপুর ষ্টেট হইতে শিক্ষা-বিষয়ে উচ্চ গবেষণা জন্য ইউরোপে প্রেরিত হইয়াছেন। কোলাপুর রাজ্যে তিনিই প্রথম বাঙালী অধ্যাপক, এবং প্রথম বাঙালী কর্ম্মচারী।

লক্ষ্ণৌর কবিরাজ শ্রীসতীশচন্দ্র সেন কবিরঞ্জন মহাশয়ের কনিষ্ঠ পুত্র শ্রীআমোদরঞ্জন সেন এবং পৌত্র শ্রীবিধুরঞ্জন সেন লক্ষ্ণৌ বিশ্ব-বিদ্যালয়ের এম-এসসি পরীক্ষায় যথাক্রমে গণিতশাস্ত্রে প্রথম বিভাগে প্রথম স্থান এবং পদার্থ-বিজ্ঞানে প্রথম বিভাগে দ্বিতীয় স্থান অধিকার করিয়াছেন।



ক্ষীরোদেশ্বর বসু

পরিশ্রম, অধ্যবসায় ও সততার গুণে বিহার অঞ্চলে যে সকল প্রবাসী বাঙালী উন্নতি লাভ করিয়াছিলেন ক্ষীরোদেশ্বর বসু তাঁহাদের অন্যতম। সম্প্রতি তাঁহার মৃত্যু হইয়াছে। সদাশয়তা ও পরদুঃখকাতরতা প্রভৃতি বিবিধ গুণে তিনি সকলের শ্রদ্ধাভাজন ছিলেন।

কাশীতে স্বর্গতা বামাঙ্গিনা দেবী

শ্রীমতী নিস্তারিণী দেবীর মাতা শ্রীযুক্তা বামাঙ্গিনী দেবী সম্প্রতি ৯৪ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। ইনি গৃহস্থাশ্রমেই তপস্বিনী ছিলেন বলা যাইতে পারে। বস্ত্রালঙ্কারের অভাব তাঁহার না থাকিলেও তিনি ভোগবিলাসে নিস্পৃহ ছিলেন। দাস-দাসী পাচক-পাচিকা থাকা সত্ত্বেও তিনি গৃহকর্ম্মে সর্ব্বক্ষণ মনোযোগিনী ও শ্রমশীলা ছিলেন। পর-আপন জাতিধর্ম্মনির্ব্বিশেষে তিনি সকলকে ভালবাসিতে জানিতেন। আদর-অভ্যর্থনা যত্ন-সেবায় মুক্তপ্রাণ ও মুক্তহস্ত ছিলেন। অবস্থানুযায়ী দানে অকুণ্ঠ ছিলেন। অতিথিসেবায় হৃষ্টচিত্তে রাত্রি দ্বিপ্রহরেও অভ্যাগতকে স্বহস্তে পাক করিয়া ভোজন করাইতে পরিতৃপ্তি ছিল। তিনি সত্যবাদিনী ছিলেন.



হংসোয়াঙ্গি মন্দিরে বাঙালী চিত্রকরের শিল্প-প্রদর্শনী
বামে: জাপানের বিখ্যাত শিল্পী আরাই সান
দক্ষিণে: শিল্পী শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায়।



কাশীপ্রসাদ জায়সবাল
[বিবিধ প্রসঙ্গ দ্রষ্টব্য]

কখনও অনৃত বাক্য উচ্চারণ করেন নাই ; মান-অভিমান তাঁহার মনকে মলিন করে নাই। আত্মীয়বন্ধু দাসদাসী সকলকেই তাঁহার অন্তরের স্নেহ দিয়া পরিচর্য্যা করা স্বভাব ছিল। তিনি সংসারের সকল কার্য্য অক্ষুণ্ণ চিত্তে সমাধা করিয়া বেলা দ্বিপ্রহরে নিরম্বু হইয়া পূজায় বসিতেন। পূজাশেষে যখন ললাটে চন্দনবিন্দু সিঁথায় সিন্দূর ও কেশে নির্ম্মাল্য ধারণ পূর্ব্বক দেবতাকে ভূমিষ্ঠ হইয়া প্রণাম করিয়া উঠিতেন তখন যেন স্বর্গের শোভা মর্ত্ত্যে প্রকাশ পাইত।

বাঙালী অধ্যাপকের সম্মান

বড়োদা কলেজের ধর্ম্মতত্ত্বের অধ্যাপক ডক্টর সৈয়দ মুক্তাবা আলি পিএইচ. ডি. "ভারতবর্ষের সংস্কৃতির ধারা" সম্বন্ধে কয়েকটি বক্তৃতা দিবার জন্য বোম্বাই বিশ্ববিদ্যালয় কর্ত্তৃক আমন্ত্রিত হইয়াছেন।

চীন ও জাপানে বাঙালী শিল্পী

শান্তিনিকেতন কলাভবনের অধ্যাপক শ্রীবিনোদবিহারী মুখোপাধ্যায় জাপান ও চীনের শিল্পকলার সহিত প্রত্যক্ষ পরিচয়ের উদ্দেশ্যে কিছুকাল পূর্ব্বে ঐ সমুদয় দেশে গিয়াছিলেন। হংগোয়াঞ্জি মন্দিরে তাঁহার চিত্রাবলীর একটি প্রদর্শনী হয়। সম্প্রতি তিনি দেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

কলাভবনের ছাত্র শ্রীকিরণচন্দ্র সিংহও সম্প্রতি চীনদেশে গিয়াছেন।

কংগ্রেস-গরিষ্ঠ প্রদেশ সমূহের প্রধান মন্ত্রিগণ



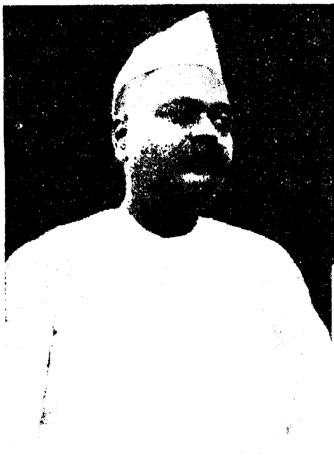
শ্রীযুক্ত এন. বি. খারে
মধ্যপ্রদেশ



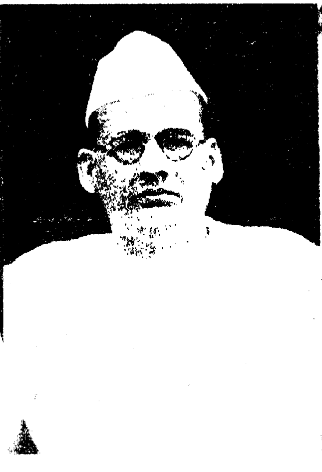
শ্রীযুক্ত বিশ্বনাথ দাস
উড়িষ্যা



শ্রীযুক্ত রাজাগোপালাচারী
মান্দ্রাজ



শ্রীযুক্ত গোবিন্দবল্লভ পন্থ
যুক্তপ্রদেশ



শ্রীযুক্ত শ্রীকৃষ্ণ সিংহ
বিহার



শ্রীযুক্ত বি. জি. খের
বোম্বাই

গ্রাহক ও বিজ্ঞাপনদাতাদের প্রতি

যাঁহারা কলিকাতার বাহিরের ব্যাঙ্কের চেক্ দ্বারা চাঁদা বা বিজ্ঞাপনের মূল্য প্রেরণ করিবেন, তাঁহারা অনুগ্রহপূর্ব্বক ঐরূপ প্রত্যেক চেকের সহিত অতিরিক্ত ৵০ আনা ব্যাঙ্কিং- চার্জ্জ স্বরূপ যোগ করিয়া বাধিত করিবেন।

কার্য্যাধ্যক্ষ—প্রবাসী কার্য্যালয়

১২০।২, আপার সার্কুলার রোড, কলিকাতা, প্রবাসী প্রেস হইতে শ্রীমাণিকচন্দ্র দাস কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত



মন্দিরের ঘাট

শ্রীমণিলাল বন্দ্যোপাধ্যায়

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

সুনয়নী শুইয়া পড়িবার উদ্যোগ করিলেন।

হাসি থামাইয়া মেয়েটি পুনরায় কহিল, 'আর মাসীর কথাটা শুনুন। ওই যে খয়ের স্কার্ট শাড়ী প'রে ঘুরে বেড়াচ্ছেন 'দস্যি'র মত, উনি। ও-মহলে গিয়েছিলেন কাজ করতে। বলেন, 'কাজের বাড়ী, গতর কোলে ক'রে ব'সে থাকা কি ভাল!' বউরাণী কি বলেছেন জানেন? বলেছেন, আপনারা নিকট-আত্মীয়, আপনাদের কি খাটাতে পারি। ও-সব ঠাকুর-চাকরের কাজ ওরাই করবে।'

কথাটার মানে বুঝিতে না পারিয়া সুনয়নী অবাক হইয়া চাহিয়া রহিলেন।

মেয়েটি হাসিতে ফাটিয়া পড়িয়া কহিল, 'আপনি ত ভারি বোকা! বুঝলেন না? পরকে কেউ কি বিশ্বাস ক'রে ভাঁড়ারে হাত দিতে দেয়! আমরা খুব নিকট-আত্মীয় কি না!'

সুনয়নী শুইয়া পড়িয়া কহিলেন, 'আঃ, মাথাটা ধা ধরেছে!' মেয়েটি হাসি থামাইয়া কহিল, 'টিপে দেব একটু? না, বেশ ত আপনি! ওঁরা বড়লোক, ওঁদের সঙ্গে সত্যিকারের সম্বন্ধ হয়ত গড়ে ওঠে না, কিন্তু আপনার আমার মধ্যে কেন ফাঁক থাকবে? দিই না টিপে?'

সুনয়নী বিরক্ত হইয়া ঝাঁঝিয়া উঠিলেন, 'না।'

অগত্যা মেয়েটি ক্ষুণ্ণমনে উঠিল এবং দুয়ারের বাহিরে পা দিয়াই হঠাৎ ফিরিয়া দাঁড়াইয়া কহিল, 'কিন্তু বললেন না ত—আপনি রমলাদির কে?'

ঝাঁঝের মুখেই সুনয়নী উত্তর দিলেন, 'কেউ নই।' মেয়েটি হাসিতে হাসিতে চলিয়া গেল।

৮

সুনয়নী ঝাঁঝের মুখে উত্তর দিলেন বটে 'কেউ নই', কিন্তু মন স্থির করিয়া আর একবার সম্বন্ধ-বন্ধনের কথাটা ভাবিতে বসিলেন।

কে বলিল, রমলার সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ওই পাতানো মাসী-পিসির মতই মৌখিক! রমলার মৃত্যুসংবাদ প্রাপ্তি মাত্র তিনি চীৎকার করিয়া কাঁদেন নাই সত্য, ইচ্ছা করিলে সেই মুহূর্ত্তে চোখে নদী বহাইয়া কাঁদাটা কিছু বিচিত্র ছিল না। স্নেহ না থাকিলে রমলা তাঁহাকে মাস-মাস টাকা পাঠাইত না। আর তিনিও কি ওই দুঃশীলা পিস্‌শাশুড়ীর মত কম প্রাপ্তির লোভে রমলার মেয়ে বউকে শাপান্ত করিতে পারিতেন? রমলার মেয়ে ও বউ যদিও ঐ সমস্ত মুখসর্ব্বস্ব আত্মীয়ের ব্যবহারে আসল-নকলের পার্থক্য বুঝিতে না পারিয়া তাঁহার বাসস্থানও এই অতিথিশালায় নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছে, তবু, আজ হউক কাল হউক, সে ভুল তাহাদের ভাঙিবেই। বাল্যের সাহচর্য্যে মধু বা বিষ কোনটাই দুই বোনের অন্তরে জমা ছিল না, যৌবনের হৃদ্যতায় আন্তরিকতা খানিকটা ছিল বইকি। যে দূর-সম্পর্কের খুড়তুত বোনের ঐশ্বর্য্য লইয়া তিনি পাঁচ জনের কাছে নিজেকে বিস্ফারিত করিয়া অতুল আনন্দ ও গৌরব উপভোগ করিয়াছেন, হয়ত নিরালা মুহূর্ত্তে সেই ঐশ্বর্য্যের অগ্নিশিখা নীরবে তাঁহাকে দগ্ধ করিয়াছে। দগ্ধ করিলেও সেই ভস্মরাশি তিনি কোন দিনই মুখে মাখেন নাই।

বাড়ী ফিরিয়া তিনি প্রতিবেশিনীদের কাছে গল্প করিবার অনেক কিছু পাইবেন। চোখোচোখি এমন সমারোহময় প্রাসাদ ও রাণীতুল্যা বউঝির দেখা কম ভাগ্যের কথা নহে। তিনি ভাগ্যবতী বলিয়াই এমনধারা একটা রাজসিক ব্যাপারে নিমন্ত্রিতা হইয়াছেন।

সঙ্গে সঙ্গে তিনি চক্ষু মুদিলেন ও কল্পনা করিলেন, এই প্রাসাদের চেয়ে সেই দুখানি স্যাঁতসেঁতে এক তলার চুণবালি-খসা অন্ধকারময় ঘরের মূল্য কতখানি। তুলনা করিলেন, এখানকার ফরসা চাদর, নূতন মাদুর ও বালিশ-তোষকের সঙ্গে সেই দুর্গন্ধযুক্ত ময়লা ছেঁড়া কাঁথা, ফুটা বালিশ ও ছেঁড়া মাদুর। এখানে দিনে পাঁচ তরকারি ভাত, রাত্রিতে লুচি আর সেখানে মোটা চালের সঙ্গে একটিমাত্র তরকারি, এক বেলার আয়োজনে দুই বেলা চলিয়া যায়।

আর লাভের কথা? এই কয় দিন রাজভোগ ছাড়া বিদায়কালের মোটা লাভটা,—এই বিছানা, বালিশ, মাদুর, চাদর, ঐ বালতি, ঘটি, গ্লাস, গামছা। আর পাঁচ টাকা মাসোহারার এককালীন পঞ্চাশ টাকা প্রাপ্তি। কাজ করিতে হইবে না, কাঁদিতে হইবে না, চাই কি, ওই পিস্‌শাশুড়ীর মত শাপমন্যি দিলেও এককালীন টাকাটা কেহ বন্ধ রাখিতে পারিবে না। খাতায় রমলার নিজের হাতের লেখা যে।...

কক্ষান্তরে মেয়েটির খিল খিল হাস্যধ্বনি শোনা গেল এবং স্থনয়নীর বুকে সেই হাসির শাণিত তীর সজোরে আসিয়া বিঁধিল। ছটফট করিতে করিতে তিনি উঠিয়া বসিলেন। ঐ হাসির বিষাক্ত তীর বাহির করিতে না পারিলে তাঁহার মৃত্যু বুঝি অনিবার্য্য! তাঁহার কেবলই মনে হইতে লাগিল, প্রাসাদের সমস্ত প্রসাদ ভোগ করিবেন, অথচ পাঁচ জনের কাছে সে কাহিনী বর্ণনা করিয়া সেই তীব্র সুখকে হয়ত আর উপভোগ করিতে পারিবেন না! এই হাসি তাঁহার আজন্মপোষিত মনোবৃত্তিকে পলে পলে ধ্বংস করিয়া দিতেছে।...

পুনরায় তিনি শুইয়া পড়িয়া দুই হাতে কান ঢাকিয়া রমলার ভালবাসা, সম্পদের আড়ম্বর এবং আপনার লাভকে প্রাণপণে স্মরণ করিতে লাগিলেন। কিন্তু আশ্চর্য্য, এই পরম প্রাপ্তির উল্লাসকে মনের মধ্যে যতই নিবিড় করিয়া রচনা করিতে লাগিলেন, স্থনয়নীর চোখের কোলের আর্দ্রতা ততই যেন বিন্দু রচনায় অদম্য হইয়া উঠিল।

নিবেদন

শ্রীনিরুপমা দেবী

তুমি কবি
তুমি আঁক ছবি
তুমি গাহ মধুময় গান
সকল মাধুর্য্য তুমি কর রসবান।
আমি লোভী
আমি নহি কবি
হৃদয় ভরিয়া করি পান
ভাবের নিঝর-ধারা তব মধু দান।
এই মত আজীবন
তুমি দাও আমি শুধু ভরে নিই মন!

তার পর
একদিন আমার অন্তর
তোমার গানের মায়াজালে
একান্ত আড়ালে
বুনিয়াছে যে স্বপনখানি,
তব বাণী
আনিয়াছে দূরাগত যে মোহন বাঁশী
গৃহছাড়া মরম উদাসী;
যে নিবিড় বনানীর ছায়া
স্বপ্নময়ী যে নিটোল কায়া
প্রণয়ের স্বরগের মায়ালোক হ'তে
ভাসিয়া আসিল মনে কল্পনার স্রোতে;
সে দিঠি উদাস,
সে ললিত তনুর বিলাস,
মোর কর-পরশনে
একদিন নিরজনে
রূপায়িত হ'ল মনে রূপের প্রকাশ!
বুঝিলাম তব গান
নিতে চাহে প্রাণ
নিতে চাহে রসময় রূপ
আমার পরশে ফোটে ও তোমার সুরের স্বরূপ!
অরূপের রসধারা
আত্মহারা
ছিল যাহা বাণী অমরায়
ধরা দিল কেন আসি রূপের কারায়?
ফুলে যাহা অপরূপ রূপ হয়ে রাজে
রসরূপে তাই ফিরি আসি ফলমাঝে
এক দিন ধরা দিয়ে যায়;
যে মাটি জোগায়
ফুলে রূপ ফলে রসরাশি
অরূপেরে স্বরূপে বিকাশি
সে মাটিরে করে নিবেদন
ফল তারি রসঝারি মধুর জীবন!
তোমার দানেতে ঋণী হয়ে
কবি আমি আনিয়াছি বয়ে
সেই মোর দান!
আমি দিব তুমি নিবে রাখিবে সম্মান!

দিব্য-প্রসঙ্গ

শ্রীউপেন্দ্রনাথ ঘোষাল, এম-এ, পিএইচ-ডি

একাদশ শতাব্দীর শেষ ভাগে বাঙ্গালার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চের অন্যতম শ্রেষ্ঠ অধিনায়ক দিব্যের চরিত্র ও কার্য্যাবলী সম্বন্ধে সম্প্রতি বাঙ্গালী ঐতিহাসিকদিগের মধ্যে বহু বাদানুবাদ চলিতেছে। কেহ কেহ তাঁহার অনুকূলে, কেহ বা তাঁহার প্রতিকূলে, যুক্তিতর্কের অবতারণা করিয়া রায় দিতেছেন। দিব্যের জীবনীর উপাদানের অপ্রাচুর্য্যই যে এই মতভেদের অন্যতম প্রধান কারণ, সন্দেহ নাই। স্বর্গীয় মহামহোপাধ্যায় হরপ্রসাদ শাস্ত্রী কর্ত্তৃক ১৮৯৭ সালে আবিষ্কৃত এবং ১৯১০ সালে বেঙ্গল (রয়্যাল) এশিয়াটিক সোসাইটির আনুকূল্যে প্রকাশিত 'রামচরিত' কাব্যই তাঁহার লুপ্ত ইতিহাস উদ্ধারের প্রধান উপকরণ। কবি সন্ধ্যাকর নন্দী রামপালের কনিষ্ঠ পুত্র মদনপালের রাজ্যকালেই এই মূল্যবান গ্রন্থ রচনা করেন। সন্ধ্যাকর নন্দীর পিতা পালরাজগণের অধীনে উচ্চ রাজকর্ম্মে নিযুক্ত ছিলেন এবং তজ্জন্য সমসাময়িক সত্য ঘটনা জানিবার তাঁহার যথেষ্ট অবকাশ ছিল। সুতরাং রামপালের রাজত্বকালের এবং উহার অব্যবহিত পূর্ব্ব ও পরবর্ত্তী ঘটনাবলী সম্বন্ধে 'রামচরিত' একটি শ্রেষ্ঠ প্রামাণিক গ্রন্থ, ইহা অনায়াসে স্বীকার করা যাইতে পারে। কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে গল্পে কথিত মনুষ্যচিত্রিত সিংহের ন্যায় ইহা এক পক্ষেরই উক্তি। তদুপরি 'রামচরিত' একটি কাব্য মাত্র। কেবল তাহাই নহে, ইহা রাঘব-পাণ্ডবীয়মের মত একটি দ্ব্যর্থ কাব্য। ইহার শ্লোকগুলি এক পক্ষে দশরথতনয় রামচন্দ্র ও অপর পক্ষে পালরাজ রামপালের প্রতি প্রযোজ্য। যেখানে কবি ঐতিহাসিকের আসন অধিকার করেন, সেখানে ইতিহাসের মর্য্যাদা সম্যক্ রক্ষিত হইবে, ইহা প্রত্যাশা করা যায় না। সুতরাং বর্ণনীয় ঘটনার স্থান ও কালের নির্দ্দেশ, ঘটনাপরম্পরার সুসম্বদ্ধ বিবরণ, প্রধান নায়কদিগের চরিত্রের সূক্ষ্ম বিশ্লেষণ প্রভৃতি ইতিহাস-সুলভ সাধারণ লক্ষণগুলি কাব্যে উপেক্ষিত হইবে, ইহাই ত স্বাভাবিক। রামচরিত কাব্যেও এই স্বাভাবিক নিয়মের ব্যতিক্রম হয় নাই। 'রামচরিত' দ্ব্যর্থ কাব্য হওয়ায় আর একটি ফল হইয়াছে যে, ইহার বর্ণিত তথ্যগুলি রামায়ণের পক্ষে সুবিদিত হইলেও সমসাময়িক ইতিহাসের পক্ষে একান্তই অস্পষ্ট। ফলতঃ এক অসম্পূর্ণ টীকার সাহায্যেই শেষোক্ত তথ্যগুলির অর্থ আমরা কিছু কিছু উপলব্ধি করিতে পারি।

এক্ষণে আমরা দিব্যকে কেন্দ্র করিয়া যে-সকল প্রশ্ন উত্থাপিত হইয়াছে, তাহাদের কথঞ্চিৎ মীমাংসা করিতে প্রয়াস পাইব।

দিব্যের জীবনের শ্রেষ্ঠ ঘটনা তৎকর্ত্তৃক বরেন্দ্রী গ্রহণ। যে হতভাগ্য পালনৃপতি তাঁহার 'জনকভূঃ'র (অর্থাৎ জন্মভূমির) অধিকার হইতে এইরূপে বঞ্চিত হইলেন, তিনি কি চরিত্রের লোক ছিলেন? রামচরিতের আটটি পরস্পরসম্বদ্ধ শ্লোকে (কুলকে) বর্ণিত হইয়াছে, কিরূপে জনকতনয়া সীতা রাবণ কর্ত্তৃক অপহৃত হইলেন এবং কি প্রকারে পালরাজের 'জনকভূঃ' বরেন্দ্রী দিব্য কর্ত্তৃক গৃহীত হইল। কুলকের আদ্য শ্লোকটি এই :—

> প্রথমমুপরতে পিতরি মহীপালে ভ্রাতরি ক্ষমাভারম্।
> বিভ্রত্যনীক। [রংভ] রতে রামাধিকারিতাং দধতি ॥ ১।৩১

রামপালপক্ষে ইহার অর্থ :—"প্রথমে পিতার পরলোক-গমনের পর ভ্রাতা মহীপাল রাজা হইয়া 'অনীতিক আরম্ভে' রত হইলে রামপাল অত্যধিক মানসিক ক্লেশ প্রাপ্ত হওয়ায়"—। এখানে তর্ক উঠিয়াছে, এই 'অনীতিক আরম্ভ' শব্দের ব্যুৎপত্তি লইয়া। এক পক্ষ ইহার টীকাসম্মত সাধারণ অর্থ গ্রহণ করিয়া বলিতেছেন, মহীপাল নীতিবিরুদ্ধ কার্য্যে রত ছিলেন। এই মতের অনুকূলে তাঁহারা আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত করিয়াছেন :—

> লোকান্তরপ্রণয়িনো দুর্নয়ভাজোঽগ্রজন্মনো ব্যসনাৎ।
> পতিতাম্বকারবত্যামুক্তাবাদুদহারি গোতমী তেন ॥ ১।৩২

ইহার ভাবার্থ :—রামপালের পরলোকগত দুর্নীতি-পরায়ণ জ্যেষ্ঠভ্রাতার ব্যসনের নিমিত্তই পৃথিবীর রাত্রি আপতিত হইয়াছিল। রামপাল নিজ প্রভাবে উহা উন্মূলিত করিয়াছিলেন। আলোচ্য মতের স্বপক্ষে উক্ত কুলকের অন্তর্গত আর একটি শ্লোক উদ্ধৃত হয় :—

রামে তু চিত্রকূটং বিকটোপলপটলকুট্টিমকঠোরম্।
ভূমিভৃতমাপতিতে তপস্বিনি মহাশয়েঽসহনে॥ ১।৩২

রামপালপক্ষে ইহার টীকা এইরূপ :—'চিত্রকূটং অদ্ভুতমায়ং শিলাকুট্টিমবৎ কর্কশং ভূভৃতং মহীপালং তপস্বিনি অনুকম্পার্হদশাপন্নে'। টীকাসম্মত ব্যাখ্যা অনুসারে এখানে মহীপালকে বলা হইয়াছে, তিনি অদ্ভুত মায়া সৃজন করিতে পারিতেন ও শিলাময় কুট্টিমের (মেঝের) মত কর্কশ ছিলেন। কুলকের আর একটি শ্লোক এইরূপ :—

বজনস্থানব্যূহে ভূতনয়াত্রাণযুক্তদায়াদে।
বিদ্যুদ্বিলাসচঞ্চলমায়ামৃগতৃষ্ণয়ান্তরিতে॥ ১।৩৬

এখানে মহীপালকে 'ভূতনয়াত্রাণযুক্ত' আখ্যা দেওয়া হইয়াছে। মুদ্রিত গ্রন্থানুসারে টীকাকার ইহার ব্যাখ্যা করিতেছেন 'ভূতং সত্যং নয়ো নীতং তয়োর (রর) ক্ষণে যুক্তঃ প্রসক্তঃ'। ইহার তাৎপর্য্য এইরূপ গৃহীত হইয়াছে, মহীপাল সত্য ও নীতির 'অরক্ষণে' নিযুক্ত ছিলেন।

এই ত গেল এক পক্ষের মত ও যুক্তি। এই মত অনুসারে মহীপাল দুর্নীতিপরায়ণ ছিলেন, ছলপ্রয়োগে তাঁহার অদ্ভুত শক্তি ছিল, তিনি শিলাকুট্টিমের মত কর্কশ ছিলেন, তিনি সত্য ও নীতির 'অরক্ষণে' সদাই ব্যাপৃত থাকিতেন। প্রতিপক্ষের মত ও যুক্তি ইহা হইতে সম্পূর্ণ ভিন্ন। পূর্ব্বোদ্ধৃত কুলকের আদ্যশ্লোকে 'অনীতিকারম্ভরতে' শব্দের ব্যাখ্যায় টীকাকার যাহা বলিতেছেন তাহার তাৎপর্য্য এইরূপ। মহীপাল ষাড়্গুণ্যযুক্ত মন্ত্রীর উপদেশ অবহেলা করিলেন। কিরূপে করিলেন? সম্মিলিত অনন্তসামন্তচক্রের চতুরঙ্গবলসমন্বিত সেনাদলের আক্রমণে তাঁহার সৈন্যগণ অতিশয় ভীত হইল। কেহ কেহ হস্তস্থিত অস্ত্র পরিত্যাগ করিল। কাহারও কাহারও বদ্ধ কুন্তল উন্মুক্ত হইল, কেহ কেহ পলায়নে উদ্যত হইল। যাহারা রহিল, তাহারা স্বেচ্ছায় অতিশয় ক্ষতি বরণ করিল। তথাপি মহীপাল শৌর্য্যবীর্য্যগুণে সম্যক্ পরিপুষ্ট না হইয়াই সামন্তচক্রের চতুরঙ্গবলের সহিত কষ্টতর সমর আরম্ভ করিলেন এবং তাহাতে নিমজ্জিত হইলেন। প্রতিপক্ষ বলিতেছেন, মহীপালের নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য ইহা ব্যতীত আর কিছুই নহে। তাঁহারা আরও বলেন ১।২২ শ্লোকে উদ্ধৃত 'দুর্নয়ভাক্' শব্দের দ্বারা যুদ্ধ বিষয়ে মহীপালের এই অপরিণামদর্শিতাই সূচিত হইতেছে এবং ১।৩২ শ্লোকে 'চিত্রকূট' ও 'বিকটোপলপটলকুট্টিমকঠোর' নামক যে দুইটি বিশেষণ প্রযুক্ত হইয়াছে, তথায় 'ভূমিভৃতে'র অর্থ মহীপাল নহে, ভূগর্ভস্থ কারাগার মাত্র। পরিশেষে তাঁহাদের ইহাই মত যে টীকার যথার্থ পাঠ ('তয়োররক্ষণে'র পরিবর্ত্তে 'তয়োরক্ষণে') অনুসারে ১।৩৬ শ্লোকের 'ভূতানয়াত্রাণযুক্তদায়াদ' শব্দের ব্যাখ্যা করিতে হইবে, মহীপাল সত্য ও নীতির রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন। সুতরাং প্রমাণিত হইল, মহীপাল নীতিজ্ঞ মন্ত্রীর উপদেশ লঙ্ঘন করিয়া পলায়নপর যৎসামান্য সৈন্যের সহিত প্রবল সামন্তচক্রসেনার সম্মুখীন হইয়াছিলেন, ইহাই ছিল তাঁহার নীতিবিরুদ্ধ কার্য্য। প্রকৃতপক্ষে তিনি সদাই সত্য ও নীতির রক্ষণে নিযুক্ত ছিলেন।

যে দুইটি বিরুদ্ধ মতের উল্লেখ করা গেল, তাহার যথাযথ বিচারের উপর নির্ভর করিতেছে দিব্যের চরিত্র সম্বন্ধে আমাদের যথার্থ ধারণা। যদি মহীপাল সত্য সত্যই এক জন দুর্নীতিপরায়ণ, ছলপ্রয়োগে অভ্যস্ত এবং সত্য ও নীতির লঙ্ঘনকারী রাজা হইয়া থাকেন, তাহা হইলে তাঁহার অধিকার হইতে যিনি বরেন্দ্রীর উদ্ধার সাধন করিয়াছিলেন, তিনি ত মহাপুরুষ। অপর পক্ষে যদি ইহাই সত্য হয় যে মহীপাল সত্য ও নীতির পথ অনুসরণ করিতেই অভ্যস্ত ছিলেন এবং মাত্র এক অসমযুদ্ধে অবতীর্ণ হইয়া তাহার ব্যতিক্রম করিয়াছিলেন, সে ক্ষেত্রে দিব্যের কার্য্য প্রশংসনীয় বলিয়া বিবেচিত নাও হইতে পারে। প্রতিপক্ষের অনুকূলে যে একটি যুক্তি আছে প্রথমে তাহারই উল্লেখ করিয়া বিচারে প্রবৃত্ত হওয়া যাউক। টীকাকার উপরে উদ্ধৃত ১।২২ শ্লোকে 'ব্যসনাৎ' শব্দের ব্যাখ্যা করিতেছেন 'যুদ্ধব্যসনাৎ'। সুতরাং মহীপালের 'যুদ্ধব্যসন' (অর্থাৎ যুদ্ধে অত্যধিক আসক্তি) তাঁহার অধঃপতনের মূল কারণ, ইহা নিঃসন্দেহ। এই যুদ্ধব্যসনই তাঁহাকে নীতিজ্ঞ মন্ত্রীর পরামর্শের বিরুদ্ধে বিশাল সামন্তচক্রের সহিত অসমসংগ্রামে প্রণোদিত করিয়াছিল,

ইহা অনায়াসে বলা যাইতে পারে। তবে কি প্রতিপক্ষের মতই সমীচীন? যদি তাহাই হইবে, তাহা হইলে ১৷৩১ শ্লোকে 'অনীতিকারম্ভরতে' পদে 'রতে' শব্দের সার্থকতা কি? প্রতিপক্ষ ১৷৩২ শ্লোকে 'ভূমিভৃত' শব্দের যে অপরূপ ব্যাখ্যা করিতেছেন, তাহার প্রমাণই বা কোথায়? রামচরিতের টীকা অতিক্রম করিবার আ...দের সামর্থ্য নাই, ইহাই যদি প্রতিপক্ষের সত্য মত হয়, তাহা হইলে শেষোক্ত শ্লোকের ব্যাখ্যায় তাহার ব্যতিক্রমের কারণ কি? ১৷৩৬ শ্লোকে মূল পুঁথিতে 'তয়োররক্ষণে' পাঠই আছে, আমাদের বক্তব্য। কিন্তু ৺শাস্ত্রী মহাশয় তাঁহার অনুসৃত সম্পাদন-নীতি অনুসারে ইহার সংশোধিত পাঠ দিয়াছেন 'তয়োরক্ষণে'। কেন দিয়াছেন তাহার কোনও যুক্তি প্রদর্শিত না হওয়ায় উহার বিচার করা অসম্ভব। এই প্রসঙ্গে ইহাও প্রণিধানযোগ্য যে টীকাকার 'ভূতনয়াত্রাণযুক্ত' পদের ব্যাখ্যায় 'যুক্ত' শব্দের অর্থ করিতেছেন 'প্রসক্ত'। উক্ত পদ যদি 'সত্য ও নীতির অরক্ষণে অত্যধিক আসক্ত' এই স্বাভাবিক অর্থেই গৃহীত হয়, তাহা হইলে কবির পরবর্ত্তী উক্তির সহিত ইহার এক সুন্দর সামঞ্জস্য পরিলক্ষিত হয়। যিনি সত্য ও নীতির মর্য্যাদা লঙ্ঘনে অত্যধিক আসক্ত, তিনি 'রামপাল আমার রাজলক্ষ্মী অপহরণ করিবে' এই মোহের বশবর্ত্তী হইয়া স্বীয় ভ্রাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিবেন, ইহা ত স্বাভাবিক। যদি রামপাল সত্য সত্যই ভ্রাতার রাজ্য অপহরণে প্রয়াসী হইতেন, তবে তাঁহার নির্যাতন হয়ত সত্যানুগ ও নীতিসম্মত হইত। কিন্তু কাহার কথায় মহীপাল ভ্রাতার নিকট এইরূপ সম্ভাবিত বিপদের আশঙ্কা করিলেন? কবি বলিতেছেন—'মান্মিধ্বনিনা' অর্থাৎ খল ব্যক্তিদের কথায়। যিনি সত্য ও নীতির অত্যধিক লঙ্ঘনে অভ্যস্ত, তিনি খল ব্যক্তিদিগের কথায় বিশ্বাস করিয়া নিরপরাধ কনিষ্ঠ ভ্রাতাকে অমানুষিক-ভাবে নির্যাতন করিবেন, ইহাই ত প্রত্যাশিত। পরিশেষে প্রতিপক্ষের প্রতি আমাদের জিজ্ঞাস্য, মহীপাল যদি কেবল যুদ্ধকার্য্যেই নীতিবিরুদ্ধ মার্গ আশ্রয় করিয়া থাকেন, তাহা হইলে কি কারণে অনন্তসামন্তচক্র তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইলেন এবং কেনই বা তাঁহারা তাঁহাকে সম্মিলিতভাবে আক্রমণ করিলেন?

এই মিলিত সামন্তচক্রের বিদ্রোহের সম্ভাবিত কারণ কি একটু অনুসন্ধান করিয়া দেখা যাউক। 'মিলিতানন্ত-সামন্তচক্রের' প্রয়োগ হইতে অনুমিত হইতে পারে, এই বিদ্রোহ একটি বা দুইটি প্রদেশে সীমাবদ্ধ ছিল না, বাঙ্গালার অধিকাংশ স্থান জুড়িয়া ইহা উত্থিত হইয়াছিল। এইরূপে সম্মিলিত অভ্যুত্থানের কারণ কি হইতে পারে? আমাদের মনে হয় মহীপাল কর্ত্তৃক সামন্তবর্গের অধিকারের হ্রাস বা বিলোপসাধনের চেষ্টাই ইহার মূল কারণ। যে দুর্নীতিপরায়ণ রাজা খলদিগের কথায় ভুলিয়া নির্দ্দোষ ভ্রাতাকে কারাগারে নিক্ষেপ করিতেও কুণ্ঠিত হন নাই, তিনি সামন্তদিগের সমবেত স্বার্থে হস্তক্ষেপ করিতে প্রয়াসী হইবেন ইহাতে বিস্মিত হইবার কারণ নাই। ইংলণ্ডের ইতিহাসে অনুরূপ ঘটনার অসদ্ভাব নাই। খ্রীষ্টীয় ত্রয়োদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে দুক্রিয়াসক্ত রাজা জন্ ভ্রাতুষ্পুত্র আর্থারকে গোপনে হত্যা করিয়া স্বরাজ্যে অত্যাচারের এরূপ তাণ্ডব-লীলার প্রবর্ত্তন করিলেন যে দেশের অভিজাতবর্গ তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইতে বাধ্য হইলেন। তাঁহারা কেবল স্বশ্রেণীর স্বার্থের দিকে লক্ষ্য না করিয়া সাধারণের স্বার্থ সংরক্ষণ করিয়াছিলেন, ইহাই তাঁহাদের বিশেষত্ব ও তাঁহাদের প্রধান গৌরব।

আমাদের এই যুক্তি যদি সত্য হয়, তাহা হইলে বলিতে হইবে যে মহীপালের বিরুদ্ধে সামন্তবর্গের অভ্যুত্থান মূলতঃ তাঁহাদের সমবেত স্বার্থসংরক্ষণের এক বিরাট প্রচেষ্টা। এই অনুমান সত্য কি না পরীক্ষা করিয়া দেখা যাউক। যদি সামন্তদিগের স্বার্থরক্ষাই এই বিদ্রোহের মূল কারণ হয়, তাহা হইলে তাঁহারা যুদ্ধে জয়ী হইয়া স্ব স্ব কেন্দ্রে অধিকার বৃদ্ধি করিতে উদ্যত হইবেন ইহাই ত স্বাভাবিক। সুতরাং মহীপালের ভ্রাতৃদ্বয় শূরপাল ও রামপাল তৎকর্ত্তৃক অকারণে নির্যাতনের জন্য যতই অনুকম্পার পাত্র হউন না কেন, তাঁহারা সামন্তবর্গের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইবেন এবং এক প্রকার নিরাশ্রয় হইয়া পড়িবেন, ইহাই ত স্বতঃসিদ্ধ। পরিশেষে রামপাল লুপ্ত পৈতৃক রাজ্যের উদ্ধারসাধনে উদ্যত হইয়া পুনরায় সামন্তবর্গের নিকট সাহায্য ভিক্ষা করিবেন এবং উক্ত সাহায্যের মূল্যস্বরূপ তাহাদিগকে ভূমি ও অর্থ দান করিতে বাধ্য হইবেন, ইহাতে

অর্থাৎ অসুরাক্রমণ-সঞ্জাত অতিশয় চিত্তচাঞ্চল্যে আন্দোলিত হইয়াও ইন্দ্র যেরূপ ধৈর্য্য ধারণ করিয়াছিলেন, দিব্যের পক্ষভুক্ত প্রজাবর্গের অতিশয় আক্রমণে আন্দোলিত হইয়াও রামপাল সেইরূপ ধৈর্য্য অবলম্বন করিয়াছিলেন। সম্ভবতঃ রামপাল দিব্যবংশের প্রজাবর্গের হস্ত হইতে বরেন্দ্রীর পুনরুদ্ধারের চেষ্টা করিয়া প্রচণ্ডভাবে পরাজিত হইয়াছিলেন। পুরাতন রাজবংশের বিরুদ্ধে বরেন্দ্রীর প্রজাবর্গের এইরূপ প্রচণ্ড উদ্যম কি ইহাই সূচনা করিতেছে না যে, তাঁহাদের হৃদয়ের সমস্ত শ্রদ্ধা নূতন নায়কদিগের প্রতি বর্ষিত হইয়াছিল? ইহার পর বরেন্দ্রী উদ্ধারের পূর্ব্বসূচনা-স্বরূপ রামপাল যখন "রাষ্ট্রকূটমাণিক্য" শিবরাজকে শত্রুরাজ্য আক্রমণ করিতে পাঠাইলেন, তখন শিবরাজ কিরূপ আচরণ করিলেন? দেবব্রাহ্মণভোগ্য ভূমিরক্ষার জন্যই তিনি বিষয় ও গ্রামের নাম জিজ্ঞাসা করিতে করিতে যাইলেন, তাঁহার অসিবলে বরেন্দ্রী বিপর্য্যস্ত হইল, তাঁহার প্রতাপে ভীমের রক্ষকব্যূহ বিনষ্ট হওয়ায় সর্ব্বত্রই ভীমের প্রভুত্ব বিলুপ্ত হইল, ফলে কোনও পুরীর অধিবাসিগণ স্বচ্ছন্দভাবে বাস করিতে সমর্থ হইল না। নবস্থাপিত রাজশক্তির প্রতি প্রজাবর্গের অতিশয় অনুরাগই কি আক্রমণকারীর এইরূপ নৃশংস বর্ব্বরতার কারণ নহে? ইহার পর যখন শিবরাজ তাঁহার রক্তাক্ত অভিযানের সাফল্য রাজসমীপে নিবেদন করিলেন, তখনও রামপাল নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। অতঃপর রামপাল যে বিরাট সমরায়োজন করিলেন তাহার বিপুলত্ব হইতে কি ইহাই প্রমাণিত হইতেছে না, যে বরেন্দ্রীর সমস্ত প্রজাশক্তি তাঁহার বিরুদ্ধে অভ্যুত্থিত হইয়াছিল? ইহার পর রামপালের বিশাল বাহিনীর সহিত ভীমের যে যুদ্ধ হইল তাহার বর্ণনা-প্রসঙ্গে বিরচিত রামচরিতের নয়টি পরস্পরসম্বন্ধ শ্লোকের (২।১২—২।২০) উল্লেখ করা যাইতে পারে। এই শ্লোকসমষ্টিতে এক পক্ষে সেতুবন্ধ-রচয়িতা রামচন্দ্র কর্ত্তৃক সমুদ্রবন্ধন ও অপর পক্ষে রণে নিযুক্ত রামপাল কর্ত্তৃক ভীম নৃপতির বন্ধন বর্ণিত হইয়াছে। ইহার শেষ শ্লোকটি এই—

> সম্যগনুগতরসাপেনাপ্রথমসহোদরেণ রাজ্ঞেন।
> ভীমঃ স সিন্ধুরগতোরণং রচয়তা কিলাবন্ধি ॥ ২।২০

এই শ্লোকটির এক পক্ষের অর্থ, রাক্ষসরাজ রাবণের 'অপ্রথম' (অর্থাৎ দ্বিতীয়) সহোদর বিভীষণকে সম্যক্‌রূপে অনুগতভাবে লাভ করিয়া এবং পর্ব্বতমালাদ্বারা সেতু রচনা করিয়া রামচন্দ্র ভয়ঙ্কর সমুদ্র বন্ধন করিলেন। অপর পক্ষে ইহার অর্থ, পৃথিবীর দিক্‌সমূহ সম্যক্‌রূপে প্রাপ্ত হইয়া এবং যুদ্ধে প্রবৃত্ত হইয়া রামপাল ভয়ে কাতর হস্তিপৃষ্ঠারূঢ় ভীমকে বন্ধন করিলেন। এখানে দেখা যাইতেছে, শত্রুপক্ষীয় কবি বিভীষণের প্রসঙ্গ উত্থাপন করিয়াও ভীমের পক্ষে অনুরূপ গৃহশত্রুর উল্লেখ করিতে সমর্থ হন নাই। ইহাই কি ভীমের প্রতি প্রজাবর্গের আন্তরিক অনুরাগের চূড়ান্ত প্রমাণ নহে?

আমরা দিব্যের প্রসঙ্গের অবতারণা করিতে গিয়া তদীয় কৃতী ভ্রাতুষ্পুত্র ভীমের উল্লেখ করিতে বাধ্য হইয়াছি। আমাদের মনে হয়, দিব্যের কীর্ত্তিকলাপের আলোচনায় ভীমকে বিস্মৃত হইলে কেবল যে তাঁহার প্রতি ঘোর অবিচার করা হয় তাহা নহে, দিব্যের চরিত্রেরও সম্যক্ বিশ্লেষণ সম্ভব হয় না। কিরূপে ভীম রাজ্যলাভ করিলেন, তাহা রামচরিতের একটি শ্লোকে বিবৃত হইয়াছে :—

> ত্রস্তানুজতনুজস্য চ ভীমস্য বিবরপ্রহরকৃতঃ।
> সাভিখ্যায়া বরেন্দ্রী ক্রিয়াক্ষমস্য খলু রক্ষণীয়াভূৎ ॥ ১।৩৯

রামপালপক্ষে টীকা :—"সা ভূমিঃ অভিখ্যায়া নাম্না বরেন্দ্রী ত্রস্তা অস্য দিব্যোকস্য যো অনুজো রুদোকঃ তদীয়তনয়স্য ভীমনাম্নঃ রন্ধ্রপ্রহারিণঃ ক্রিয়াক্ষমস্য অলংকর্ম্মীণস্য যথোক্তক্রমেণ রক্ষণীয়াভূৎ। স তত্র ভূপতিঃ বর্ত্তমানঃ।" অর্থাৎ দিব্যের পর তদীয় ভ্রাতা রুদোক এবং রুদোকের পর তৎপুত্র ভীম বরেন্দ্রীতে প্রভুত্বলাভ করিলেন। কিন্তু কি দিব্য কি রুদোক, কাহারও শাসন সুপ্রতিষ্ঠিত হয় নাই। দিব্য যাহা করিয়া যাইতে পারেন নাই, ভীম কর্ত্তৃক তাহা নিষ্পন্ন হইল। তিনি বরেন্দ্রী প্রদেশে স্বীয় প্রভুত্ব সম্যক্‌রূপে প্রতিষ্ঠিত করিলেন এবং 'রাজা' উপাধি গ্রহণ করিয়া তাহার যাথার্থ্য প্রতিপন্ন করিলেন। এই কার্য্য সম্পাদনে তাঁহার কিরূপ যোগ্যতা ছিল, তাহা উল্লিখিত শ্লোকে উদ্ধৃত 'ক্রিয়াক্ষম' ও 'বিবরপ্রহরকৃৎ' (অর্থাৎ রন্ধ্রপ্রহারী) বিশেষণ দ্বারাই প্রতিপন্ন হইতেছে। রামচরিত কাব্যের প্রারম্ভে রামপালের প্রশস্তি-প্রসঙ্গে উক্ত হইয়াছে :—

> হত্বা রাজপ্রবরং [ভূয়ো] ভুজবলং গৃহীতবকঃ।
> স নিরাবাধদর্পকলয়া রেহভ্রোবোর্ব্বিবিঃ খ্যাত্যম্ ॥ ১।২০

নিশীথে

শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র

হে তারকাবলি,
তোমরা কি মহাশূন্যে জোনাকি কেবলি,
আলোকের কীট শুধু, আঁধারে জ্বলিছ স্পন্দহারা ?
তোমরা কাহারা ?
ওই ক্ষীণ স্নিগ্ধোজ্জ্বল আলো
কেন এত বাসি আমি ভালো ?
কেন আমি প্রতি সন্ধ্যাবেলা
নীরবে একেলা
চেয়ে থাকি ঊর্দ্ধমুখে ? কেন ওই জ্যোতিষ্ক-জটিলা
করে মোরে স্বপ্নাতুর বিস্ময়ে উতলা,
হই আত্মহারা ?
আর কিছু নও, শুধু কিরণকন্দুক, শুধু তারা ?

তিমির সাগরবক্ষে লক্ষ লক্ষ আলোক-তরণী
ভাসিয়া চলেছে কোথা ? ক্ষুদ্র এই মৃন্ময়ী ধরণী
যুগ-যুগান্তর ধরি চেয়ে আছে কুহক-বিহ্বল
কত লক্ষ বরষের অফুরন্ত জিজ্ঞাসা কেবল
চঞ্চল করিছে তারে অন্তহীন কালে পলে পলে !
মাটির শিশুর বক্ষে তাই কি উথলে
সে অনন্ত প্রশ্ন-পরম্পরা
সসাগরা ধরা
লভিল না যে উত্তর, সন্তান তাহার
জ্যোতির্বেত্তা অভ্রান্ত গণিতে
অলক্ষ্যের বক্ষ হতে সদুত্তর পারিবে আনিতে ?
অজ্ঞান তিমিরে
ভ্রূণসম অন্ধআঁখি এই আমি, তবু মোরে ঘিরে
মাতৃ কুক্ষি-প্রবাহিণী জীবনের ধারা,
রহস্যে রহস্যে কূলহারা
উথলিছে অহর্নিশ নক্ষত্রের কিরণে কিরণে,
কাঁপিতেছে প্রশ্নভরা জীবনের স্পন্দনে স্পন্দনে।

কি প্রশ্ন সে ? কি জিজ্ঞাসা জাগে প্রাণে অসীমের লাগি ?
ক্ষুদ্র প্রাণ হয় যে বিবাগী !
জানি না বুঝি না যারে কাঁদি তার তরে ;
বুঝি যারে, জানি যারে রহস্যসাগরে
তারে আমি দিই বিসর্জন !
জানি সে মরালী মোর অকূলে করিবে সন্তরণ
কভু ডুবিবে না,
চির পরিচয় মাঝে হবে সে অচেনা
অসীম রহস্যপারাবারে।
ভূমার মাঝারে
হারায় সে ক্ষুদ্র সীমা, শাশ্বতী সুষমা
তাহারে যে করে নিরুপমা।
নক্ষত্র দীপালি,
হ'তে যদি আলিসার কম্প্রশিখা দীপাবলি খালি,
দীপ্তি ঢালি রাতে
পরদিন নিভিতে প্রভাতে,
তাহলে কি বিস্ময়ে গৌরবে
হ'ত কি এ মুগ্ধ হিয়া উদ্বেলিত বাণীহীন স্তবে ?
অন্তহীন দেশকালে জ্বলে কোটি শিখা,
নিকষে হিরণদীপ্তি আলোকের ঋকমন্ত্র লিখা।
অক্ষরে অক্ষরে তার বিলিখিত আলোক-পুরাণ
সৃষ্টিস্থিতিলয়ে অফুরান।
ঊর্দ্ধমুখে তাই থাকি চেয়ে,
দু-নয়ন বেয়ে
আনন্দের মন্দাকিনী ঝরে দরধারে,
তারকার কিরণ-আসারে
মিশে স্বতঃনিষ্যন্দিত মোর অন্তঃসলিলার বারি।
মনে হয় কোটি নরীহার পরি শ্যামাঙ্গিনী নারী
নগ্নবক্ষে মহাশূন্যে রয়েছে বসিয়া,
থাকি থাকি কণ্ঠহার হ'তে তারা পড়িছে খসিয়া

উল্কাবেগে ধরাপারে ধধূপরেখায়,
বাষ্পীভূত বহ্নি-দীপ্তি শূন্যে গলে যায়।
যদি সে ভস্মাবশেষ রত্নোপল লাগিত এ বুকে
মরিতাম সুখে।
প্রাণ মোর উড়ে যায় ঊর্দ্ধপানে আঁধারের পাখী,
ওই যে জ্বলিছে তারা, তারি পানে স্থির দৃষ্টি রাখি।
লক্ষ তারকার মাঝে কেন চাই তারে,
কে বলিতে পারে ?
প্রথম মেলিয়া আঁখি যেদিন চাহিনু শূন্যপানে,
করুণ নয়ানে
স্নিগ্ধদৃষ্টি ঢেলেছিল সে কি মুখপ'রে
বহু স্নেহভরে ?
মোর সদ্য চেতনায় সে দৃষ্টি কি গিয়াছিল মিশি ?
তাই প্রতিনিশি
সে আমারে ডাকে 'আয়' 'আয়,'
কিরণ-রণিত ইসারায় ?
তাই কি জীবনপথে চলিতে চলিতে
মনে হয় চকিতে চকিতে,
জ্বলিছে নিভিছে যেন অন্ধকারে নক্ষত্রনিচয়
এ বিপুল জনসঙ্ঘে নিত্য যারা ভিড় করি রয়
আমার চৌদিকে,
কেহ চায় অনিমেষে, কেহবা নিমিখে ?
নরনারী কভু নয় এরা,
শুধু আলোকের বিন্দু অন্ধকারে ঘেরা
জটলা বেঁধেছে চারিধারে,
ভেসে যায় কাতারে কাতারে
তিমির সাগরচক্রবালে।
সেই জনতার মাঝে কে যেন কিরণ-ইন্দ্রজালে
বন্দী করে মোরে,
কী অটুট ডোরে
পড়ি বাঁধা নয়নে নয়নে।

ওই সন্ধ্যাতারাসম দিগন্তের সুদূর গগনে
মনে হয় তারে,
নিশান্তের শুকতারকারে
কেন স্মরি, সে যখন অচল নয়ানে
চাহে মুখপানে ?

তোমরা ত নয় শুধু তারা,
তোমরা যে অনন্তের আলোক-ইসারা
মরতের প্রাণে !
নও শুষ্ক জ্বালাময় জ্যোতিষ্কমণ্ডলী
নিশান্তে নিভিয়া যাও সারা নিশি জ্বলি।
তোমরা পেয়েছ প্রাণ নরজন্মে এ মোর অন্তরে
গূঢ় চিদম্বরে।
বৃন্তহারা অবন্ধন আলোকের ফুল,
শূন্যেও গতিতে বদ্ধমূল।
তাই তোমাদের মাঝে ফিরি আমি আত্মীয়-সভায়
যাদেরে বেসেছি ভালো তারা দীপ্তি পায়
তোমাদের মাঝে।
রণিয়া রণিয়া বীণা বাজে
তোমাদের কিরণে কিরণে
প্রাণের গহনে।
বহু স্মৃতি অনুভূতি বিস্ফুরিত ফেনোচ্ছ্বাসরাশি
তোমরা যে, হৃদয়ের মহাশূন্যে উঠিতেছ ভাসি !
নভোনীলে ভাসমান আলোকের দীপপুঞ্জ নহ,
দরিয়ায় ভাসায়েছি জ্বালিয়া যে প্রদীপনিবহ
তোমরা তাহারা,
নহ শুধু গগনের ক্ষুদ্র গ্রহতারা।



নবনারীসমাজে নিবেদন

শ্রীবিজয়চন্দ্র মজুমদার

নারীজাতির গৌরব বাড়াইবার দিকে নানা উদ্যোগ চলিতেছে; এ-সংবাদ কয়েকখানি পত্রিকায় পড়িয়াছি, আর বিশেষভাবে লোকমুখে শুনিয়াছি,—নিজে দেখিয়া জানিবার সুবিধা আমার নাই। সমাজে নারীদের বিস্তৃত অধিকার দেওয়ার পক্ষে আগে পুরুষেরাই চেষ্টা করিতেন, আর পুরুষ অভিভাবকদের নির্দেশে ও উৎসাহে নারীরা নূতন পথে চলিতেন। শুনিতে পাই—এখন অনেক তরুণ বয়সের নারীরা স্বেচ্ছায় 'সনাতন প্রথার' পর্দা ও গোটাকতক রীতি ছাড়িতেছেন, পুরুষদের আশ্রয় না লইয়া প্রয়োজনে নানা স্থানে যাইতেছেন, উচ্চতম শিক্ষা পাইবার উদ্যোগে নিজেরাই শিক্ষাশালা বাছিয়া লইতেছেন, আর দশের কাজের অনেক প্রতিষ্ঠানে আপনাদের রুচি অনুসারে পুরুষদের সঙ্গে কর্মক্ষেত্রে জুটিতেছেন। যাঁহারা এইরূপে আপনাদের ব্যক্তিত্ব ও স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠায় অগ্রসর, আমার এই নিবেদনটুকু তাঁহাদেরই কাছে।

সারা বিশ্বের প্রকৃতির মধ্যে আছে এই নির্দেশের ইঙ্গিত ও তাড়না—আছে আমাদের শরীর-মনের উপাদানের মধ্যে এই নির্দেশের ইঙ্গিত ও তাড়না, আমরা আমাদের অসীম বিকাশের সম্ভাবনার দিকে এই টানের জোরে সকল বাধা পরাভূত করিয়া অবিরাম ছুটিয়া চলিব। আমরা প্রতিজনে ব্যক্তিত্বের বিশিষ্টতা ফুটাইব, প্রতি জীবনের গৌরবরক্ষায় কোন গোলামিতে ঘাড় না পাতিয়া আত্মসম্মান অক্ষুণ্ণ রাখিব আর যে আইন বা বিধান প্রকৃতির আঁতে আঁতে অচ্ছেদ্যরূপে গাঁথা আছে, তাহার সঙ্গে জীবনের গতি মিলাইয়া প্রফুল্ল মনে বাড়িয়া উঠিব—ইহাই প্রকৃতির আদেশ ও তাড়না; আর সেই তাড়নার অনুসরণকেই বলি স্বাধীনতার অনুসরণ।

এই স্বাধীনতার পথে বা লক্ষ্যে চলিতে হইলে যে-সকল ছোটখাট কাজ অবশ্য করা চাই, তাহার মধ্যে এই রকমের কাজগুলি পড়ে, যথা—পর্দা এড়াইয়া বাহিরের বাতাসে আসা, সাহস বাড়াইয়া চলাফেরা, যথাসাধ্য জ্ঞানবৃদ্ধির দিকে উদ্যোগ করা, ইত্যাদি। উদ্যোগের ছোটখাট পাদবিক্ষেপের দৃষ্টান্তে জ্ঞানলাভের উদ্যোগের দৃষ্টান্ত দিয়াছি; হয়ত সেইটি অনেকের মনের মত না হইতে পারে। কিন্তু তাঁহারা যদি মনে রাখেন যে শত উদ্যোগ করিলেও সকলের পক্ষে সকলের ভাগ্যে বহু জ্ঞান সঞ্চয়ের সুবিধা হয় না, আর পণ্ডিত না হইলেও মানুষ নিজের কর্তব্য পালন করিয়া সমানে স্বাধীনতার পথে চলিতে পারে, তবে স্বাধীনতার পথে চলিবার এই যে ছোট ছোট পদক্ষেপের কথা বলিয়াছি—উহাদের মূল্য লক্ষ্যপথের আদর্শের বিচারে এক কড়'-দু'কড়া বই নয়। স্বীকার করি, যখন জীবনের ছোটখাট কর্তব্য গুরুবুদ্ধিতে পালনীয়, তখন খুব কড়া হইয়া কড়া-ক্রান্তির হিসাব রাখিতে হইবে; তবে সাবধান—আমরা যেন না-হই কড়ায় কড়া আর কাহনে কানা।

যাঁহাদের কাছে আমার এই নিবেদন, তাঁহাদের খাটি স্বাধীনতালাভের সঙ্কল্প যখন পাকা, তখন নির্ভয়ে দেখাইয়া দেওয়া চলে যে অনেক সময়ে প্রাচীন কুসংস্কার প্রচ্ছন্ন পাপের মত অতর্কিতে মানুষকে গোলামির জালে জড়াইয়া দিতে পারে, অথবা প্রাচীন সংস্কারজনিত ভাবের মোহ মনের তলায় ফল্গুধারার মত স্বাধীনতার বিরোধী পথে টানিতে পারে। এ-সম্পর্কে সনাতন নিয়মের বিবাহ-বন্ধনের প্রথা খুব উপযোগী দৃষ্টান্ত। যাঁহারা বিবাহ করিবেন না—আপনাতে প্রতিষ্ঠিত থাকিয়াই পুণ্যের গৌরবে জীবনের কাজ চালাইবেন, তাঁহাদের পক্ষে এই বিবাহের দৃষ্টান্ত খাটিবে না।

বিবাহে জীবনের স্বত্ব ও অধিকার (status) প্রভৃতি বদলায়। আর সনাতন প্রথায় ব্রাহ্মণ্য-বিধানের বিবাহে জীবনের মৌলিক স্বাধীনতা অনেকখানি হারাইয়া গোলামির বাঁধন বরণ করিয়া লইতে হয়; কেন-না, আইনের বিধানে বাধ্য হইতেই হইবে যে—পুরুষ ইচ্ছা করিলেই অন্য বিবাহ

করিয়া পুরাতন স্ত্রীকে অসহায় ও অকর্মণ্য করিয়া দিতে পারে। পুরুষের যদি অর্থের সচ্ছলতা থাকে তবে মামলা করিয়া স্ত্রী কিঞ্চিৎ ভরণপোষণ পাইতে পারেন,—তাহা ছাড়া কোনও ধরণের স্বাধীনতা অর্জন বা ভোগ করিতে পারেন না; তবে স্বৈরিণী হইলে পারেন, কিন্তু সে ধরণের অবস্থার কোন বিচার এ-প্রবন্ধে করিব না, আর নব-নারীরাও সে ঘৃণিত অবস্থার বিচার করা অতি হেয় কাজ মনে করিবেন।

যাঁহাদের বিবাহ হয় নাই, কিন্তু আইনের বিধানে হইয়াছেন বাগ্দত্ত, তাঁহারা জিজ্ঞাসা করিতে পারেন—বিবাহের এমন অনুষ্ঠান আছে কি-না যাহাতে কোন-একটা বিশিষ্ট ধর্মে দীক্ষা না লইয়া, আর আপনাদের জন্মফলের জাতীয়ত্ব বা 'হিন্দুত্ব' বজায় রাখিয়া ব্যক্তিনিষ্ঠ প্রাকৃতিক স্বাধীনতা ক্ষুণ্ণ না করিয়া বিবাহ করা চলে। উত্তরে বলিব—আইনের বিধানে এইরূপ অনুষ্ঠান আছে। যাঁহারা শোনা-কথায় এই বিষয়ের আইনের নাম শুনিয়াছেন, তাঁহাদের হয়ত মনে পড়িতে পারে—১৮৭২ অব্দের তিন আইনের নাম, সেই আইনের বিকল্পে রচিত আইনের নাম, যাহা ব্যারিষ্টার গৌরের উদ্যোগে পাস হইয়াছে। এই দুইটি আইনের ব্যবস্থাতেই বিবাহ হয় একনিষ্ঠ, অর্থাৎ বিবাহিতেরা খামখেয়ালিতে একে অন্যকে ছাড়িয়া নূতন বিবাহ করিতে পারেন না,—স্ত্রীকে আইনের ব্যবস্থায় গোলামির বোঝা বহিতে হয় না। কোন বিশেষ-বিশেষ কারণে এই দুই আইনের ব্যবস্থায় আপত্তি না থাকিলেও কেহ-কেহ সরকারী আইনে বিবাহ রেজেষ্ট্রি করা উচিত মনে করেন না; তাঁহাদের আপত্তির বিচার অল্প দুই-একটি কথার বিচারের পরেই করিতেছি। প্রথমে উল্লিখিত আইন দুইটির কোন-কোন ব্যবস্থার তুলনায় বিচার করিব।

গৌর মহাশয়ের উদ্যোগে বিধিবদ্ধ আইনের নিয়মে বিবাহিতেরা ডাক ছাড়িয়া বলিতে পারেন—তাঁহারা 'হিন্দু'; সেখানে শব্দের অর্থ যাহাই হোক। এই আইনে বিবাহিতেরা ও তাঁহাদের সন্তানেরা কিন্তু সম্পত্তির অধিকার উত্তরাধিকার প্রভৃতিতে হিন্দু ল নামে প্রচলিত আইনে শাসিত হইবেন না,—শাসিত হইবেন সেই আইনে যাহাতে এদেশবাসী বিদেশীরা আর খ্রীষ্টিয়ানেরা শাসিত হন। তাহা ছাড়া এই আইনে বিবাহিত পুরুষের পিতা ইচ্ছা করিলেই তাহার স্থলে পোষ্যপুত্র লইতে পারেন। ১৮৭২ অব্দের গোড়াকার আইনে যাঁহারা বিবাহিত হন, তাঁহারা কিন্তু শাসিত হইতেছেন পাকা রকমে হিন্দু ল অনুসারে, অর্থাৎ 'জাতিতে' (ব্রাহ্মণ্য-বিধানের বর্ণে নয়) 'হিন্দু' বলিয়া স্বীকৃত হইয়া। কোনও বিবাহিতের পিতা ব্রাহ্মধর্ম না-মানার দরুন বিবাহিত পুত্রের স্থলে পোষ্যপুত্র লইতে পারেন না। গোড়াকার তিন আইনের বিধানে বলিতে হয়—বিবাহিতেরা হিন্দু রিলিজন্ মানেন না; অর্থাৎ যে সনাতন বিধি বা অনুষ্ঠানে আছে ব্রাহ্মণের প্রাধান্য আর যাহাতে বিবাহিত পুরুষ ইচ্ছা করিলেই বহু বিবাহ করিতে পারেন তাঁহারা সেই ধর্ম্ম বা রিলিজন্ মানেন না। ইহা না মানায় তাঁহারা জাতীয়ত্বের নামের হিন্দুত্ব হারান না আর কোনও প্রাচীন আইনগত অধিকার হইতে বঞ্চিত হন না। গৌর মহাশয়ের প্রবর্ত্তিত বিধানে ডাক ছাড়িয়া হিন্দু নাম জারি করিলেও বহু অধিকারে বঞ্চিত হইতে হয়, ইহা বলিয়াছি। গোড়ায় একথাও বলিয়াছি যে, উভয় আইনের বিবাহেই স্ত্রীজাতির স্বাধীনতা তুল্যরূপে বজায় থাকে।

গোড়াকার তিন আইন সম্বন্ধে অনেক শিক্ষিতদের মধ্যেও এই ভুল ধারণা চলিত আছে যে এই আইন ব্রাহ্মদের বিবাহের আইন,—যদিও আইনের মধ্যে কোথাও ব্রাহ্মধর্ম্মের নামগন্ধ নাই। ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ে না জুটিয়া নিজেদের স্বাধীন মত বজায় রাখিয়া এই আইনের মতে বিবাহ করিলে জাতীয়ত্বের হিন্দুত্ব ও একনিষ্ঠ বিবাহ রক্ষা করা চলে, তাহাই বুঝাইলাম। এখানে উল্লেখ করি—যুক্তপ্রদেশের এলাহাবাদ প্রভৃতি অঞ্চলে কয়েক জন অতি বিখ্যাত বনিয়াদি ব্রাহ্মণ-বংশের লোক প্রথম কিস্তির তিন আইন অনুসারে ছেলে-মেয়েদের বিবাহ দিয়াছেন। ইঁহারা ব্রাহ্ম নন বা ব্রাহ্ম-সম্প্রদায়ের সঙ্গে যোগ রাখেন না; কেবল তাঁহাদের মতে এই বিবাহে আদর্শ একনিষ্ঠ বিবাহ সম্পাদিত হয় বলিয়াই ঐ আইন অবলম্বিত হইয়াছে।

সরকারী আইনে রেজেষ্ট্রি করিয়া বিবাহ করায় জনকতক লোকের আপত্তি আছে; এখন সেই আপত্তির বিচার

করিব। নিজেদের সামাজিক ব্যবস্থার বেলায় বিদেশী সরকারের আইনের শাসন মানা যাঁহাদের মতে অন্যায়, তাঁহারা কি স্বীকার করিবেন না যে, সমাজে নূতন করিয়া কোন বিধি চালাইতে হইলে শাসনকর্তাদের রচিত আইন ছাড়া কোনও রকমে এই অমান্যকারীকে আইনের নিয়মে বাধ্য করা চলে না? যেখানে প্রার্থিত নিয়মভঙ্গের অপরাধীকে একটি অবশ্যপালনীয় শাসনের অধীন হইতে হয় না, সেখানে নূতন নিয়মকে কিছুতেই চালাইতে পারা যায় না। কেহ কেহ একথা বলিয়াও থাকেন—সমাজে এখন বহুপত্নী গ্রহণ উঠিয়া গিয়াছে বলিলেই হয়, আর অন্য দিকে বহুপতি গ্রহণের প্রথা একেবারেই নাই। উত্তরে বলিতে পারি যে, কোন্ অপরাধ অধিক আছে, বা নাই, এ বিচারে কেহ আইনের ব্যবস্থা উড়াইয়া দিতে পারে না। সমাজে সকল শ্রেণীর অপরাধেরই সম্ভাবনা আছে, আর যাঁহাকে অতিবড় বিশ্বাসী বা কর্তব্যনিষ্ঠ ভাবা যায়, তাঁহারও পদস্খলন আছে। এই সকল অবস্থা না থাকিলে উকিলের পয়সা হইত না,—আদালত টিকিত না। পরোক্ষে কাহারও কাহারও এই রকম উক্তির কথা শুনিয়াছি যে, তাঁহাদের প্রেম বড় পবিত্র; কাজেই বিনা রেজেষ্ট্রিতে কোন আশঙ্কা নাই, আর যদি থাকে—সে কপাল। এই ধরণের অতি কাঁচা ছেলেমানুষী উক্তির তলায় লুকাইয়া আছে প্রাচীন কুসংস্কার-পালনের প্রতি স্নেহ। স্বাধীনতার নামে শত বড়াই করিলেও অতর্কিতে প্রাচীন প্রথার দিকে প্রাণের তলায় এমন ঝোঁক আছে, যাহার উত্তেজনায় বা ভাবের মোহে প্রাচীন গোলামির 'নাকে-দড়ি' ও 'পায়ে-বেড়ি'-রূপ অলঙ্কার পরিবার জন্য শরীর উস্‌খুস্ করে। আমেরিকায় উন্নতির চালকেরা যখন নিগ্রোদের স্বাধীনতার নিশান উড়াইয়াছিলেন, তখন অনেক নিগ্রো বহুকালের গোলামির অভ্যাসে নিজেদের ইচ্ছায় গলায় শিকল খুলিতে কুণ্ঠিত হইয়াছিল। আমার এই নিবেদন যাঁহাদের কাছে, তাঁহারা যখন 'সনাতন' শব্দের মোহে আচ্ছন্ন নহেন, আর যাহা হিতকর তাহাকেই বরণ করিতে প্রস্তুত, তখন আশা হয়—তাঁহারা সুবুদ্ধিতেই সকল কথা বিচার করিবেন,—প্রাচীনের মান্য কোন শব্দের দোহাই দিয়া চলিবেন না।

এই প্রসঙ্গে একটা নূতন ধরণের অনুষ্ঠানের উল্লেখ করিতেছি; এমন রিপোর্ট পড়িয়াছি—ইউরোপের কয়েকটি মহিলা ব্রাহ্মণ্য প্রথার গুরুদের কাছে দীক্ষা লইয়া একেবারে ধর্মে ও জাতীয়ত্বে হিন্দু হইয়াছেন আর এদেশের লোককে বিবাহ করিয়াছেন, এই ইউরোপীয় মেয়েরা স্বাধীন বিচারে ব্রাহ্মণ্য ধর্ম অবলম্বন করিতে পারেন, আর খাঁটি প্রেমের আকর্ষণে ভারতের লোককে বিবাহ করিতে পারেন, কিন্তু তাঁহারা আপনাদের জাতীয়ত্ব বিসর্জন দিয়াছেন,—জন্মভূমির প্রতি তাঁহাদের কর্তব্য ঝাড়িয়া ফেলিয়াছেন, শুনিলে শিহরিতে হয়। বিবাহ করিলে এমন ভাবে স্বামীর গোলাম হইতে হইবে যে আপনার জন্মভূমির প্রতি যে প্রেম থাকা চাই, কর্তব্য থাকা চাই, তাহা পায়ে দলিতে হইবে, ইহাও অতিশয় ঘৃণ্য অতিশয় পাপময়। এমন বহু ইংরেজ আছেন যাঁহারা খ্রীষ্টিয়ানি মানেন না; খ্রীষ্টিয়ানি মানেন না বলিয়া তাঁহারা ইংরেজ নন বলা চলে না। বর্ণ ও জাতীয়ত্ব এক নয়। যাঁহারা ১৮৭২ অব্দের তিন আইনে বিবাহ করিয়া অথবা ধর্ম বিষয়ে নিজেদের স্বাধীন মতের ফলে ব্রাহ্মণ্যধর্ম মানেন না বা মানিবেন না অথবা প্রেমের পবিত্র টানে অন্য দেশের লোককে বিবাহ করিবেন, তাঁহারা যদি তিল পরিমাণে স্বদেশপ্রেম হারান তবে স্বাধীনতার সাধনার নামে মহাপাতক করিবেন। আমার নিবেদন, যে-নবনারীরা সনাতন অসনাতনের বিচার উপেক্ষা করিয়া জীবনবিকাশের জন্য স্বাধীনতা বরণ করিয়াছেন, তাঁহারা আমার কথাগুলি সানুগ্রহে বিচার করিবেন।



মেঘকন্যা

শ্রীদীনেশ মুখোপাধ্যায়

আকাশে আজ একটুও মেঘ নেই। রজনীগন্ধার মত শ্বেতশুভ্র আকাশ দিগন্তের সীমাহীন আঙিনায় গেছে ছড়িয়ে। কাল-রাত্রির মত দুর্যোগময়ী বর্ষার উত্তেজনা গেছে থেমে—কোলাহল হয়েছে নিস্তব্ধ, ঝড়ের হাওয়ায় এসেছে যবনিকা। বর্ষাস্নাত আকাশ এখন শান্ত শিশুর মত ঘুমিয়ে আছে।

সুকুমারের ভাল লাগছে। আজ তার ভাল লাগছে এই আকাশ, এই নির্মল প্রশান্তি আর এই লাবণ্যময় পরিপূর্ণ স্বচ্ছতাকে। বর্ষাকে সে ভয় করে—শুধু ভয় নয়, তার সমস্ত দেহ যেন কাঁপতে থাকে এক দীর্ঘ বিভীষিকায়, এক রহস্যময় অসহায়তায়। বর্ষা যেন নিয়ে আসে ওর কাছে এক তীক্ষ্ণ ষড়যন্ত্র—মাকড়শার জালের মত দুর্ভেদ্য জালে ও যায় আটকে। বর্ষার মধ্যে সে দেখতে পায় এক প্রলয়ের প্রতিরূপ—এক প্রচণ্ড বিপ্লবের সমস্ত ইতিহাস যেন লুকিয়ে আছে ঐ বর্ষার মধ্যে।

আজ আকাশে এক ফোঁটাও জল নেই। তাই ওর আজ ভাল লাগছে।

কিন্তু কল্যাণীকে সুকুমার কিছুতেই ভুলতে পারে না। কত দিন কত ভাবে কত দিক দিয়ে সে চেয়েছে ওকে ভুলতে, নিঃশেষে মুছে ফেলতে মন থেকে—পারে নি। সুকুমারের চোখের সম্মুখে ফুটে ওঠে কল্যাণীর কাজল-পরা কালো বিশাল দুটি চোখ আর শরতের শেফালির মত শীতল, সুন্দর একটি মুখ। সে মুখের মধ্যে একটি উদার স্বাচ্ছন্দ্য সে আজও দেখতে পায়। বর্ষাই ছিল কল্যাণীর সব চেয়ে প্রিয়, সব চেয়ে আদরের। আকাশে যখন দেখা দিত মেঘের কোলাহল, চার দিকে যখন ভরে উঠত অগুন্তি মেঘ-ঢেউ, কালো কালো টুকরো টুকরো মেঘমালা যখন আকাশের গায়ে জনতা সৃষ্টি করত, তখন কল্যাণী সুকুমারকে বলত—দেখছ কেমন আকাশ। বৃষ্টি হবে খুব, না?

—হ্যাঁ।

হাততালি দিয়ে ছোট মেয়ের মত নাচতে নাচতে মাথা দুলিয়ে গ্রীবা বাঁকিয়ে কল্যাণী বলত—চমৎকার হবে। আচ্ছা এমনি দিনেই হয়ত উজ্জয়িনীর কবি মেঘদূত লিখেছিলেন। না?

সুকুমার বলত—হ্যাঁ গো হ্যাঁ। এমনি এক উদার বর্ষার রাতে বোধ হয় কবি লিখেছিলেন মেঘদূত।

সুকুমারের পাশে ব'সে প'ড়ে কল্যাণী বলে—আচ্ছা, কালিদাসের প্রাণেও কি অমনি বিরহ জেগেছিল? না জাগলে কেমন ক'রে লিখলেন তিনি এত বড় এক জীবন্ত কাব্য।

সুকুমার বললে—উত্তর ত তুমিই দিলে। ঐ দেখ বৃষ্টি এসে গেছে। জামা-কাপড় কি সব রয়েছে ছাদে। নিয়ে এস, না-হয় ডাক কাউকে।

কল্যাণী মুখ ভার ক'রে বললে - না, থাক না, ভিজুক একটু। এমন মিষ্টি ঠাণ্ডা বর্ষা! ভিজুক না একটু। রোদ এলে আপনিই শুকিয়ে যাবে আবার। কিন্তু এই বর্ষা চলে গেলে হয়ত আর আসবেই না।

—আসবে, সুকুমার ক্লান্ত স্বরে বললে, আসবে গো আসবে। বর্ষার চোটে রাস্তায় বেরোনই যাচ্ছে না। চার দিকে জল থৈ থৈ করছে।

—কি চমৎকার, কল্যাণী বললে, আঃ। আমায় নিয়ে চল না একটু।

—কোথায়?

চাঁপাফুলের মত কোমল দুটি পা দুলিয়ে, একটু চোখ বুজে কল্যাণী বলত: রাস্তায়—রাস্তায় যাব। জলে ভিজতে আমার ভারী ভাল লাগে।

—এই ত সেদিন সবে জলে ভিজে জ্বর থেকে উঠলে—আবার!

কল্যাণী দমল না। বেপরোয়া ভাবে বললে—জ্বর ত

এমনিও হয়। না-হয় জলে ভিজেই হ'ল। কেমন জল পড়ছে দেখছ না।

কল্যাণী জানালা দিয়ে হাত বাড়িয়ে দিল। সমস্ত মন যেন কল্যাণীর লাবণ্যে আর প্রাবল্যে উপচে উঠেছে, খুশীতে ভরে উঠেছে সমস্ত প্রাণ—দেহে লেগেছে শিহরণ।

সুকুমার ধমক লাগাল—আবার তুমি জলে ভিজছ?

—বা! একে বুঝি ভেজা বলে? শিশুর মত সচকিত হয়ে কল্যাণী বলত, এই ত মোটে দুটো ফোঁটা পড়েছে হাতে। দেখ না এসে, মোটে ত দুটো ফোঁটা। অনুনয় ক'রে আবদারের ভঙ্গীতে আবার বলতে লাগল—তুমিও এস না, হাত দিয়ে ধরতে কি চমৎকার লাগে—এতেই ত বেশী মজা।

অবসন্ন ভাবে সুকুমার বলল—তোমাকে নিয়ে কিছুতেই পারা যায় না। আবার দেখছি অসুখ টেনে আনবে। আমাকেই ত পোয়াতে হবে হাঙ্গামা। এখানে এসে ব'স লক্ষীটি, কটা দিন যাক। আগে ভাল ক'রে ভাল হয়ে ওঠ। তার পর যা খুশী ক'রো কিছু বলব না।

মুখ ভার ক'রে কল্যাণী এসে সুকুমারের কাছে বসল।

পরের দিন সুকুমার আপিস থেকে ফিরে এসেই শুনল, কল্যাণী বাড়ী নেই। মা বললেন, এত ক'রে বললাম এই জল-ঝড়ে বেরিও না বৌমা কোথাও। শোনে কি আমার কথা?

—কোথায় গেল?

—কি জানি, এই জলের মধ্যেই চ'লে গেল। জল দেখলে যেন মেয়েটা লাফিয়ে ওঠে।

—তা কোথায় গেছে বলল না কিছু।

—কে জানে। ওর এক বন্ধুর কাছে না কোথায়।

—তুমি বারণ করলে না কেন?

—তুই কি যে বলিস সুকু! মা অবাক্ বিস্ময়ে বললেন, বারণ করি নি? কত ক'রে বললাম, যেও না বৌমা, যেও না, এই বাদলার মধ্যে যেও না, শুনল কি? পা জড়িয়ে ধ'রে বলল—এক্ষুনি আসব মা। ওকে ব'লো না, ওর আসার আগেই ফিরব।

সুকুমার ছাতার সন্ধান ক'রে বলল—একটা ছাতাও নিয়ে যায় নি। বর্ষাতিও ত ছিল। কেমন যে মেয়ে।

মা বললেন—ষাট! ও আমার লক্ষী মেয়ে। চব্বিশ ঘণ্টা ঘরে আটকান থাকে—একটু বেড়িয়ে আসতে গেছে, না করতে পারলাম না।

—তা ছাতা নিয়ে গেলেই ত পারত।

—তা কি জানি বাপু! কি যে দিনকাল হয়েছে। ছাতা নিয়ে কেউ বেরতে চায় না।

সুকুমার গজ গজ করতে লাগল—এতগুলো লোক বাড়ীতে, আর কারও খেয়াল নেই। এই সেদিন উঠল অসুখ থেকে—এরই মধ্যে ছেড়ে দিল। আর কল্যাণীটাও হয়েছে তেমনি, মায়ের কোলে উঠে, পা জড়িয়ে কত কায়দাই না যে জানে।

সুকুমার যেন কল্যাণীকে নিয়ে দস্তুরমত ঘেমে উঠেছে।

সুকুমার বিবর্ণ মুখে শুষ্ক হয়ে বসে রইল। ছোট বোন মিনুর স্কুলের গাড়ী এসে পৌছতে-না-পৌছতে সে লাফিয়ে এসে ঘরে ঢুকল—বৌদি! ঘরের মধ্যে বৌদিকে দেখতে না পেয়ে বলল—বৌদি কোথায় দাদা।

—জানি নে।

—মার ঘরে?

—বলছি জানি নে—তবু মার ঘরে! বিকৃত সুরে মিনুরই কথার প্রতিধ্বনি ক'রে বলল—মার ঘরে!

মিনু ঠোঁট উলটিয়ে বলল—বারে! তুমি মিছিমিছি আমায় বকছ কেন?

সুকুমার নিস্তেজ হয়ে পড়ল। সব মেয়েদের রকম দেখছি এক, কিছু না বলতেই ছোট বোনটা পর্য্যন্ত ক্ষেপে উঠেছে। না, আর টিকতে দেবে না কেউ!

অগত্যা গলা নামিয়ে সুকুমার বলল—বৌদিকে কেন?

—দরকার আছে।

—দরকার আছে, সুকুমার বলল, দরকার আছে সে ত বুঝতেই পারছি। কি দরকার?

মিনু বললে—রবি ঠাকুরের দুটো নূতন গান বেরিয়েছেন বৌদি আমায় লিখে আনতে বলেছিল।

—এনেছ?

মিনু একটা কাগজ বার ক'রে বললে—এনেছি।

—বেশ করেছ।

মিনু বললে—জান দাদা, বৌদি বলেছে গান দুটো আমায় শিখিয়ে দেবে। আর বর্ষার গান গাইতে বৌদির মত কেউ পারে না, ওর চোখে জল এসে যায়—জান দাদা—

—জান দাদা, ব'লে মিনু আবার কি গল্প সুরু করছিল। সুকুমার রেগে উঠল—আচ্ছা হয়েছে। তুই যা এবার।

—যাচ্ছিই ত। তোমার কাছে এসেছিলাম নাকি? তাড়িয়ে দিচ্ছ যে বড়! মিনু বেণী দোলাতে দোলাতে চলে গেল।

—না, ঘরেও থাকতে দেবে না। এরি মধ্যে চেলাও তৈরি করেছেন একটি। কি মেয়েই যে হয়েছে। সুকুমার মনে মনে গজরাতে লাগল—আসুক না আজ, বেশ ক'রে বুঝিয়ে দিতে হবে।

এদিকে বৃষ্টিটা কখন ধরে গেছে। এবার নিশ্চয় কল্যাণী ফিরবে। সুকুমার মনে মনে কি ভেবে জামা গায়ে দিয়ে তৈরি হয়ে নিল।

মা বললেন—কোথায় যাচ্ছিস সুকু?

—দরকার আছে।

—কখন ফিরবি?

—ফিরতে দেরি হবে। আমি খেয়ে আসব। নেমন্তন্ন আছে। ব'লে গজগজ করতে করতে সুকুমার বেড়িয়ে গেল।

সুকুমার এদিক-সেদিক বেড়িয়ে বাড়ী ফিরে এল অনেক রাত্রে। রাস্তায় ভাবতে ভাবতে এসেছে, কল্যাণী আজ কোন কথা জিজ্ঞেস করলে একটা কথারও উত্তর দেওয়া হবে না। যেমন মেয়ে তেমনি ব্যবহার করতে হবে। জল দেখলে যেন মেয়েটা পাগল হয়ে উঠে—সুকুমার ভেবেই পায় না, বর্ষার মধ্যে ও কি পায়, এমন ক'রে কেন মেতে ওঠে।

সুকুমার এসে বাড়ী ঢুকল। সমস্ত বাড়ীটা যেন অসম্ভব নিস্তব্ধ হয়ে আছে। সুকুমার ভাবল, এত রাত ক'রে কোন দিন সে ফেরে না বলেই বোধ হয় সবাই চিন্তিত হয়ে আছেন।

কিন্তু বাড়ীর মধ্যে ঢুকেই সে অবাক হয়ে গেল। যে মিনু সন্ধ্যা হ'তে-না-হ'তেই ঘুমোয়—এক ঘুম যার হয়ে যায় রাত দশটার আগে, সেই মিনু কি না বারান্দায় বসে আইস-ব্যাগে বরফ ভর্ত্তি করছে।

সুকুমারকে দেখে মিনু বললে—এতক্ষণ কোথায় ছিলে দাদা। বৌদির ভয়ানক জ্বর এসেছে।

—জ্বর হয়েছে? সুকুমার বিজ্ঞের মত বলতে লাগল, জ্বর হয়েছে, বেশ হয়েছে। জ্বর যে হবে এ যেন জানাই ছিল এমনি ভাব দেখিয়ে সুকুমার আবার বলতে লাগল—সারা দিন বৃষ্টিতে ভেজার মজা বুঝুক এবার।

মিনু কোন কথায় কান না দিয়ে আপন মনে কাজ ক'রে যেতে লাগল।

সুকুমার বললে—খুব জ্বর হয়েছে নাকি রে?

—যাও, তোমার সঙ্গে কথা বলব না। বৌদির জ্বর আর তুমি মজা দেখছ।

—দেখব না? জলে ভিজবে সারা দিন হৈ হৈ ক'রে—বললে কথা শুনবে না। হ্যাঁ রে, সত্যিই খুব বেশী জ্বর হয়েছে নাকি?

—যাও দেখ না গিয়ে—খুব জ্বর।

সুকুমার নিজের ঘরে ঢুকল।

মা কল্যাণীর পাশে ব'সে আছেন।

রাস্তায় আসবার সময় যেসব প্রতিজ্ঞার মহলা দেওয়া হয়েছে, তা ঠিক রাখতে হবে। সুকুমার ঘরের মধ্যে ঢুকেও কোন দিকে তাকাল না। ধীরে ধীরে অনেক সময় ব্যয় করে জামা খুলল। জুতোটা অনাবশ্যক ভাবে সাজিয়ে রাখল অনেকক্ষণ ধরে।

মা বললেন—এত দেরি করে আসতে হয়! এখন একটা ডাক্তার ডাক ত।

সুকুমার বলল—কি আর হয়েছে, একটু জ্বর—ও অমনিই সেরে যাবে।

—ওরে না, না, অসহিষ্ণু উদ্বিগ্ন হয়ে মা বললেন—তুই শীগগির ডাক্তার ডাক। জ্বর বেড়েই চলছে।

সুকুমার কঠিন ভাবে ভারিক্কি চালে বলতে লাগল—হবে না। কত ক'রে বললাম। তা এখনও খালি গায়ে রয়েছে কেন। একটা গরম জামাও গায়ে দিতে পারে নি।

সুকুমার নিজেই আলমারি থেকে গরম জামা টেনে বার ক'রে পরিয়ে দিলে কল্যাণীর গায়ে; তার পর ডাক্তার ডাকতে চলল।

ডাক্তার এল। তিনি বুক-পিঠ পরীক্ষা ক'রে চিরাচরিত প্রথায় অভয় দিলেন, ও কিছু না। কোন ভয় নেই—সাবধানে রাখবেন, ঠাণ্ডা যেন না লাগে।

সুকুমার এবার কাছে এসে বসল। মা উঠে গেলেন, ব'লে গেলেন—দরকার হ'লে ডাকিস্ আমাকে।

মিনু যাবার সময় শাসিয়ে গেল—বৌদিকে কিছু ব'ল না যেন।

সুকুমার কল্যাণীর চুলের মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—কেন গেলে? এমন ক'রে বৃষ্টিতে ভিজতে হয়?

কল্যাণীর মুখ এক বিচিত্র অপরূপ আভায় হেসে উঠল—আমার কি যে ভাল লাগে ঐ বৃষ্টির জল কি বলব। মনে হয়, মনে হয় কত যুগ-যুগান্তর ধরে আমি ঐ জল-তরঙ্গের মধ্য দিয়ে চলেছি—ঐ জলকল্লোল যেন আমার কত দিনের পরিচিত। আমি কিছুতেই চুপ ক'রে থাকতে পারি নে, মনে হয় হৃদয়ের দ্বারে কে যেন ঘন ঘন আঘাত করছে—আমি কেমনতরবা হয়ে যাই।

আদর ক'রে গায়ে হাত বুলোতে বুলোতে সুকুমার বললে—বেশ ত, বৃষ্টি ভাল লাগে, ঘরে ব'সে দেখলেই ত পার। বৃষ্টিতে ভেজা কি উচিত!

কল্যাণী প্রত্যয়ের সঙ্গে বলতে লাগল—তুমি জান না, বৃষ্টির কি মধুর স্পর্শ, যখন গায়ে এসে লাগে আমার মনে হয় আমি যেন কোন্ এক রাজ্যে চলে গেছি, যেখানে কোন দুঃখ নেই, কোন কষ্ট নেই, কোন ভাবনা নেই—

সুকুমার অবাক হয়ে তাকিয়ে রইল, জ্বরে প্রলাপ বকছে নাকি!

কথা বললেই কথার পিঠে কথা বেড়ে যাচ্ছে। সুকুমার বললে—তুমি এবার চুপ ক'রে একটু ঘুমোও। শোন ত লক্ষ্মি—ঘুমোও একটু।

কল্যাণী চুপ ক'রে রইল।

কল্যাণীর কালো কালো রেশমের মত চুলগুলির মধ্যে হাত বুলোতে বুলোতে বললে—শরীর খুব খারাপ লাগছে?

—না।

—বাতাস করব?

—না। কিছু করতে হবে না, তুমি শুধু একটিবার জানালাটা খুলে দাও।

—জানালা খুলব? বলছ কি তুমি? জলের ছাট আসবে যে।

কল্যাণী বললে—আসুক না।

—বলছ কি তুমি, সুকুমার ভয়ে ভাবনায় বিস্ময়ে বলতে লাগল—বলছ কি তুমি! সমস্ত দিন ভিজে এলে, আবার এখন যদি এমনি কর তবে আমি কি করব বল দেখি? চুপ ক'রে ঘুমোও লক্ষ্মীটি!

কল্যাণী কোন কথা বলল না। চুপ ক'রে পাশ ফিরে শুয়ে রইল।

সমস্ত রাত আর বৃষ্টি হয় নি। কল্যাণীও যেন নিশ্চিন্ত মনে ঘুমিয়ে পড়েছে, ওদিকে বিপুল সমারোহ নিয়ে দিবসের আলো জেগে উঠল। কল্যাণী ঘুমিয়ে আছে—মুখে ফুটে উঠেছে চমৎকার ক্লান্ত একটি রূপ। সমুদ্রের বুকে উত্তাল তরঙ্গের পর যেমন দেখা দেয় স্থির সৌন্দর্য্য।

সুকুমার কাছে দাঁড়িয়ে গায়ে হাত দিয়ে দেখল, জ্বর রয়েছে বেশ, গা গরম।

কল্যাণী এদিকে জেগে উঠেছে। কালো টানা টানা আয়ত চোখ দুটি কচলে বলল—ভোর হ'য়ে গেছে, না?

—হ্যাঁ, অনেকক্ষণ হ'ল।

—বা! আমাকে জাগাও নি কেন?

—এখন উঠবে কি ক'রে তুমি। তোমার যে অসুখ।

—অসুখ! অসুখ করেছে তাতে কি হয়েছে। সবাই কি ভাববেন বল ত?

—কিছু ভাববেন না।

—না, ভাববেন না আবার। বৌ-ঝি বুঝি ঘুমিয়ে থাকে এ সময়, আমি উঠব।

—দুষ্টুমি ক'র না। চুপ ক'রে শুয়ে থাক।

শরীরে জর—বেশী শক্তি নেই, কল্যাণী আর কিছু বলল না। শুয়ে রইল চুপ ক'রে।

মা এসে বললেন—কেমন আছে বৌমা। নিজেই হাত দিয়ে দেখলেন গায়ে, ঈস্, এখনও যে বেশ জ্বর। তুই ডাক্তারকে আবার ডাক দেখি একবার।

—কিছু হয় নি মা। মিছি মিছি ডাক্তার ডেকে এনো না, আমি এমনিই ভাল হয়ে উঠব।

—তা ত উঠবেই মা। তবু অসুখটা বেড়ে না যায়—তুই যা সুকু... আর দেখ, ভবানীপুরেও একবার যাস্—খবরটা দে।

কল্যাণী ব্যস্ত হ'য়ে বললে—না না, বাবাকে আবার কেন?

—না বৌমা, অসুখ-বিসুখে খবর না দিলে কি চলে। তুই যা সুকু, আর দেরি করিস নে।

সুকুমার ডাক্তারকে কল্ দিয়ে ভবানীপুর হয়ে ফিরে এল।

সিঁড়ি দিয়ে উঠতে উঠতে সুকুমারের কানে গেল, কল্যাণী গান গাইছে। বর্ষার কি একটা গান বোধ হয় হবে। সুকুমার মনে মনে ভাবতে লাগল—এই অসুখ, এর মধ্যে আবার গান চলছে। নাঃ!

ঘরে ঢুকে দেখল—মিনু বসে হারমোনিয়াম বাজাচ্ছে, আর কল্যাণী বিছানার উপর উঠে বসে সুর ক'রে তাকে গান শেখাচ্ছে,

আজি বরষণ মুখরিত শ্রাবণ-রাতি।

সুকুমার এক ভয়ঙ্কর অঙ্গভঙ্গী করে উঠল—তোমার না অসুখ? আর তুমি ব'সে গান গেয়ে যাচ্ছ।

—বাঃ অসুখ হলে বুঝি গান গাইতে নেই।

—বর্ষার গান ছাড়া বুঝি আর গান নেই—সুকুমার বলতে লাগল, বৃষ্টির ভিতর কি পাও বলত? কল্যাণী বর্ষাকে যতখানি ভালবাসে সুকুমার যেন ঠিক ততখানিই এড়িয়ে চলতে চায়—কিন্তু কল্যাণীর সঙ্গে কথা কাটাকাটি ক'রে লাভ নেই। অগত্যা ধরল মিনুকে—তুই কি হয়েছিস বল দেখি, পরে গান শিখলে হ'ত না। লেখা নেই, পড়া নেই, কিছু নেই, চব্বিশ ঘণ্টা কেবল টহল! মেরে—

মুখ কাঁচুমাচু ক'রে মিনু বলল: বৌদিই ত ডেকে এনেছে। বললে আয়। গান শিখিয়ে দেব আয়।

—আর অমনি ছুটে এলে, এমনি ডাকলে ত টিকিও দেখা যায় না—

—আমি গান শিখতে চাই নি, বৌদি আমায় জোর ক'রে শেখাচ্ছে।

—জোর ক'রে শেখাচ্ছে! পাজি মেয়ে কোথাকার! মাস মাস জলের মত টাকা যাচ্ছে—স্কুলের খরচ, আজ নীল শাড়ী, কাল ময়ূর-আঁকা হলদে কাপড়—আর শিখে শিখে হচ্ছে এই···যা পড়গে, যা

কল্যাণীর উপরে ঝালটা মিনুর উপর দিয়েই মিটল।

কল্যাণী বলল—ওকি, তুমি ওকে বকছ কেন। আমিই ত ওকে ডেকে এনেছি।

—পরে শেখালেও ত চলবে।

—চলুক। তুমি ওকে ব'কো না।

এমনি ক'রে দুদিন কাটল।

কল্যাণীর জ্বর কমে নি। কিন্তু আগেকার চেয়ে ভাল।

তৃতীয় দিনে সন্ধ্যা হ'তেই আবার চার দিক অন্ধকার ক'রে বৃষ্টি এল। আজকে যেন কল্যাণীকে আর কিছুতেই ধরে রাখা যাচ্ছে না। সুকুমার শুনেছে, কল্যাণীর জন্ম হয়েছিল এমনি এক গাঢ় নিশীথ রাত্রিতে, সেদিন আকাশের বুকেও নেমে এসেছিল বিদ্যুতের প্রচণ্ড গতিবেগ···ঠিক আজকার মত ঘন কালো রাত্রির উত্তাল ঝড়ো হাওয়ার মধ্যেই কল্যাণীর হয়েছিল জন্ম—নিজের জন্মের সঙ্গে সঙ্গে সে হারিয়েছিল তার প্রসূতিকে।

সমস্ত রাত্রি কল্যাণী একটুও ঘুমোল না। ওর মনের মধ্যে যেন নূতন দিনের সন্ধান জেগে উঠেছে। মাঝে মাঝে কেবল আপন মনে গুনগুন করে গান গায়:

গগনতল গিয়েছে মেঘে ভরি
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি
এ ঘোর রাতে কিসের লাগি
পরাণ-মন সহসা জাগি
এমন কেন করিছে মরি মরি
বাদল-জল পড়িছে ঝরি ঝরি—

সুকুমার বললে—কল্যাণী! কল্যাণী অমন করছ কেন? ঘুম আসছে না? ঘুমোও না।

কল্যাণী খানিকক্ষণ চুপ ক'রে রইল। তার পর বললে—কি বললে? ঘুম? ঘুম আসছে না আমার। আমি ঘুমতে চাই নে। আমায় কে যেন ডাকছে।

—কে? কে ডাকছে কল্যাণী?

কল্যাণী ফ্যাল ফ্যাল ক'রে খানিকক্ষণ তাকিয়ে রইল। বললে—কে!—কে ডাকছে তা ত জানি নে—ঐ বৃষ্টির শব্দ, আকাশের বিদ্যুৎ, তারাভরা নিশীথ-রাত্রির অবগুণ্ঠন সবাই ডাকছে, ঐ দেখ হাত বাড়িয়ে সবাই বলছে—আয় আয়।

—কোথাও কিছুই ত নেই—তুমি ঘুমোও।

বাইরে বজ্রের শব্দ হ'ল—

—ঘুম আমার আসছে না—ঐ শোন সবাই মিলে আমাকে নিতে এসেছেন, আমি যাই।

—কোথায় যাবে? কল্যাণী, অমন করছ কেন। সুকুমার চীৎকার ক'রে ডাকল মা—মা, মিনু!

কল্যাণী ব'লে চলেছে—আমি যাব। আমায় ছেড়ে দাও।

—কোথায় যাবে?

—ঐ বর্ষার কাছে। শুনছ না আমায় ডাকছে? ব'লে গুন্ গুন ক'রে গান আরম্ভ করল—

ডাকিছে মেঘ, ডাকিছে হাওয়া,
সময় গেলে হবে না যাওয়া···

···কল্যাণীর গায়ে যেন নববল এসেছে—সে উঠে বসবেই—

মা ঘরে এলেন:—কি রে?

—ভুল বকছে।

কল্যাণী বলতে লাগল—ভুল! সব ভুল—মা তুমি জানলাটা একবার খুলে দাও, ওগো তোমার পায়ে পড়ি, জানলাটা খোল একবার। একটিবার খোল জানলাটা, কল্যাণী সুকুমারের দিকে তাকিয়ে অনুরোধের সুরে বলল—একটিবার খোল, আর বলব না। খোল—আমি বাইরের নৃত্যমুখর বর্ষাকে দেখতে চাই—দেখতে চাই তার রূপ, তার অপরূপ বিচিত্র বিকাশ, যে বিকাশের পায়ে পায়ে সুর আর ছন্দ—খুলে দাও না।

কল্যাণী আবার উঠতে চেষ্টা করল। মা বললেন—খোল না একবার, অমন করছে যখন।

সুকুমার মায়ের দিকে তাকাল। তার পর কল্যাণীর দিকে ফিরে বলল—বেশ খুলছি, কিন্তু খুলেই বন্ধ করব। কাপড়-চোপড় ভাল করে গায়ে দাও।

—খুলবে সত্যি, শিশুর মত কল্যাণী খুশী হয়ে উঠল—এই দেখ আমি সব ভাল ক'রে গায়ে দিয়েছি।

সুকুমার জানলাটা খুলল। খুলতেই বাইরের এক ঝলক হাওয়া আর বৃষ্টি এসে ছাপিয়ে পড়ল ঘরের মধ্যে। কল্যাণী আয়াসে চোখটা একটু বুজল—আঃ! আমি যাই। ওগো তুমি কাছে এস।—বলতে বলতে কল্যাণী সুকুমারের পায়ের উপর মাথা রেখে প'ড়ে গেল।

ততক্ষণে নিরবয়ব দেহে মৃত্যু সম্মুখে এসে দাঁড়িয়েছে।

সেই থেকে সুকুমার বর্ষাকে ভয় করে।

আজকের এই নির্মেঘ আকাশ তাই ওর ভাল লাগছে।

ক'দিন ধরে ছিল অনবরত বৃষ্টি, এত দিন ওর মনে একটুকুও শান্তি ছিল না। ও যেন দেখতে পায় কল্যাণী তার কালো চুল মেলে বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে নামতে থাকে।

আজকের এই বর্ষাবিহীন নির্মেঘ আকাশের দিকে তাকিয়ে সে বেশ আরামে দাঁড়িয়েছিল। হঠাৎ সুকুমার দেখতে পেল এক খণ্ড কালো মেঘ এগিয়ে আসছে—গৃহ-প্রাঙ্গণের করবী-বীথি হাওয়ায় কেঁপে কেঁপে দুলে উঠল, বকুল গাছটা বর্ষার আগমনীতে যেন বিহ্বল পুলকিত হয়ে উঠেছে। ঝর ঝর ক'রে মেঘমালা গলে গলে মুক্তাবিন্দুর মত টুপ টুপ করে পড়তে সুরু করল। বাইরে চলেছে রীতিমত বর্ষার গান। চারি দিকে যেন শুধু কল্যাণীর প্রতিকৃতি, তারই রূপ, তারই সুর।

সুকুমার চীৎকার ক'রে উঠল—ওরে জানলাটা বন্ধ করে দে, ওরে জানলাটা বন্ধ কর শীগগির। কে কোথায় আছিস বন্ধ কর জানলা।

ডালভাতের ব্যবস্থা

শ্রীউপেন্দ্রনাথ সেন

বাংলার প্রধান মন্ত্রী মহাশয় নিরন্ন বাঙালীর ডালভাতের ব্যবস্থা করিবার সদিচ্ছা লইয়া মন্ত্রিত্ব গ্রহণ করিয়াছেন। তিনি নিশ্চয়ই উপায়-উদ্ভাবনের চিন্তা করিতেছেন। এই প্রবন্ধে বিষয়টির একটু আলোচনা করিলে তাঁহার এবং দেশনেতৃগণের চিন্তার সামগ্রী হইতে পারে।

বাংলার সপ্তকোটী লোকসংখ্যা এখন রাষ্ট্রবিধানে প্রায় পাঁচ কোটীতে দাঁড়াইয়াছে। সরকারী গণনায় হয় ৫,০১,২২,৫৫০। ইহা হইতে অস্থায়ী অবাঙালী অধিবাসীর সংখ্যা বাদ দিলেও বাংলার স্থায়ী অধিবাসীর সংখ্যা ৫ কোটী ধরিয়া লইয়া আলোচনা করা কর্ত্তব্য। এই ৫ কোটী লোকের মধ্যে কত সংখ্যক লোক কি কি বৃত্তি অবলম্বন করিয়া জীবিকা নির্ব্বাহের চেষ্টা করিয়া থাকে তাহার মোটামুটি আন্দাজ পাওয়া যায় ১৯২১-২২ সালের বাংলার বিস্তৃত শাসন-বিবরণীতে। এইখানে তাহার একটু বিশদ পরিচয় দেওয়া যাইতেছে। এই পনর-ষোল বৎসরে হয়ত এই সংখ্যার কিছু পরিবর্ত্তন হইয়া থাকিবে, কিন্তু তাহাতে অবস্থার পরিচয় লাভে বিশেষ ব্যাঘাত হইবে না।

কৃষি	৩,৭৪,২৯ হাজার (হাজারের নীচের অঙ্ক বাদ দেওয়া হইল)	
খনিজ সম্পদ	৯৭	,,
শ্রমশিল্প	৩৬,২১	,,
বাণিজ্য	২৪,৩৯	,,
যানবাহনাদি কার্য্যে নিযুক্ত	৭,৩৯	,,
শান্তিরক্ষা কার্য্যে নিযুক্ত পুলিস ইত্যাদি	১,৭৭	,,
সাধারণ শাসনকার্য্য	১,৪৪	,,
স্বাধীন ব্যবসায় (যেমন চিকিৎসা-আইন-ব্যবসায় ইত্যাদি)	৭,৮৩	,,
সঞ্চিত আয়ের উপর নির্ভরশীল	৩৭	,,
গৃহস্থের পরিচর্য্যায় নিযুক্ত চাকর বেহারা ইত্যাদি	৬,৮৮	,,
যে বৃত্তিতে দেশে ধন উৎপন্ন হয় না (unproductive)	৪,৫২	,,
বিবিধ	৯,৮০	,,

উপরিউক্ত অঙ্কগুলি বিশ্লেষণ করিলে দেখা যায়, কৃষিকর্ম্ম এবং কৃষকের নিকট হইতে কর গ্রহণ করিয়া বাংলার ৪/৫ অংশ লোক বাঁচিয়া থাকিবার আশা রাখে। খুব সম্ভব ইহাদের মধ্যে কতক লোকের অন্য উপায়েও উপার্জ্জনের চেষ্টা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান প্রবন্ধে এই সংখ্যার আন্দাজ দেওয়া সম্ভব নহে, সরকারী কাগজপত্রেও তাহার পরিচয় নাই। তবে শাসন-বিবরণীতে এইটুকু আন্দাজ আছে যে বাংলার লোকসংখ্যার ২/৩ অংশ সাধারণ কৃষক। শ্রমশিল্পে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ শতকরা ৭ ১/২ জন মাত্র। সরকারী শান্তিরক্ষা এবং শাসনকার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ দশমিক ০.৭ জন মাত্র। স্বাধীন ব্যবসায় শতকরা ১ ১/২ জন মাত্র। অপেক্ষাকৃত ধনী গৃহস্থের বাড়ীতে দাসদাসীর কার্য্য করিয়া জীবিকা অর্জ্জন করিয়া থাকে শতকরা ১ ১/২ জন লোক। আর দেশের দুর্দ্দশার চরম প্রমাণ এই যে, প্রতি ১০০ স্ত্রীপুরুষের মধ্যে এক জন হয় ভিক্ষাবৃত্তি, না-হয় অন্য অসদুপায়ে জীবিকা নির্ব্বাহ করিয়া থাকে। সরকারী কার্য্যে নিযুক্ত লোকসংখ্যার পরিমাণ (হাজারে ৭ জন মাত্র) দেখিয়া মনে হয় এই জন্যই কি আমরা হিন্দু-মুসলমানে কলহ-বিবাদ—প্যাক্ট করিয়া হয়রান হইয়া পড়িতেছি? অবশিষ্ট ৯৯৩ জন অধিবাসীর ডালভাতের ব্যবস্থার কথা এত দিন কেহ দুশ্চিন্তার বিষয় বলিয়া আন্তরিকতার সহিত গ্রহণও করে নাই। ভরসার কথা, এখন এই দিকে কংগ্রেসের আন্দোলনের ফলে বহু লোকের দৃষ্টি ও দরদের পরিচয় পাইতেছি।

যখন সর্ব্বাপেক্ষা অধিকসংখ্যক বাঙালীই কৃষিজীবী, তখন এই প্রবন্ধে এই শ্রেণীর কথাই আলোচনা করা যাক। ১৯২৯-৩০ সালের শাসন-বিবরণীতে বাংলা দেশের কত পরিমাণ ভূমি কোন্ কোন্ কৃষিকার্য্যে নিযুক্ত ছিল তাহার আন্দাজ দেওয়া আছে। যথা—

ধান্য	২,০২,২৪ হাজার একর
পাট	২৩.১০ ,, ,,
অন্যান্য খাদ্যশস্য	১৭,৮০ ,, ,,
তৈলোৎপাদক শস্য	১৩.৯৭ ,, ,,
তামাক	২,৪৫ ,, ,,
ইক্ষু	২,০০ ,, ,,
মোট	২ কোটী ৬১ লক্ষ ৫৬ হাজার একর

কৃষিকার্য্যরত লোকের সংখ্যা যদি ৩ কোটী ১৫ লক্ষ হয়, তাহা হইলে উপরের লিখিত বিভিন্ন শস্যের জন্য নির্দ্দিষ্ট জমির পরিমাণ দেখিলে অনুমান করা অন্যায় হয় না যে ধান্য এবং পাটের চাষে নিযুক্ত লোকসংখ্যা ৩ কোটী হইবে এবং অবশিষ্ট ১৫ লক্ষ লোক অন্যান্য শস্যাদি উৎপাদনে নিযুক্ত থাকে। এই অনুমান নির্ভুল নহে, কিন্তু আলোচনার পক্ষে যথেষ্ট কার্য্যকরী।

এখন প্রশ্নটি এইরূপ দাঁড়াইতেছে। এই ২ কোটী ২ লক্ষ একর জমীতে ধান্য এবং ২৩ লক্ষ একর জমীতে পাট উৎপাদন করিয়া বাংলার ৩ কোটী কৃষক কত টাকা আয় করিতে পারে। প্রথম ধানের কথা ধরুন। প্রতি একরে গড়পরতা ১৫ মণ ধান উৎপন্ন হইয়া থাকে। অবশ্য, কোনও জমীতে ধান্যশস্যের উৎপাদন-হার বেশী থাকিতে পারে, কিন্তু সমগ্র বাংলা দেশের হিসাবে প্রতি-একরে ১৫ মণ ধান অন্যায় আন্দাজ নহে। আজকাল এই কয় বৎসর ধরিয়া ১৫ মণ ধানের মূল্য ৩০৲ মাত্র। ইহা হইতে বীজ খরিদ ও কৃষি-কার্য্যের যাবতীয় খরচ বাদ দিলাম না। ধরিয়া লইলাম প্রতি-একরে উৎপন্ন ধান্য হইতে কৃষকগণ ৩০৲ আয় করিতে পারে। সুতরাং ২ কোটী ২ লক্ষ একর জমীতে ধান্য উৎপাদন করিয়া বাংলার কৃষক আন্দাজ ৬৬ কোটী টাকা আয় করে। এখন উৎপন্ন পাটের হিসাব দেখা যাক। ১৯২৯-৩০ সালের বার্ষিক শাসন-বিবরণীতে প্রকাশ ঐ বৎসর ২৯ লক্ষ একর জমীতে ৮৬,৫৬,৮৩৯ বস্তা পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। এক বস্তাতে ৫ মণ পাট থাকার কথা; সুতরাং কিঞ্চিদধিক ৪ কোটী ৩২ লক্ষ মণ পাট উৎপন্ন হইয়াছিল। পাটের বাজার-দর প্রতি-মণ কমবেশী ৬ টাকা; তাহা হইলে সমুদায় পাটের মূল্য কিঞ্চিদধিক ২৫ কোটী টাকা হয়। এখানেও পাট-আবাদের খরচ বাদ দিলাম না, দিলে মূল্যের অঙ্ক আরও কম হইয়া যায়। এখন ধানের আয় ৬৬ কোটী এবং পাটের আয় ২৫ কোটী—একুনে ৯১ কোটী টাকা বাংলায় ৩ কোটী কৃষক উপার্জ্জন করিতে পারে। এই ৯১ কোটী টাকা ৩ কোটী কৃষকের মধ্যে বণ্টন করিলে প্রতি কৃষকের আয় হয় কিঞ্চিদধিক ৩০৲ মাত্র। কিন্তু ইহার মধ্যে আর একটু হিসাব রহিয়াছে। কৃষিকার্য্যের খরচ আমাদের জানা নাই। সঠিক অঙ্ক পাওয়াও দুষ্কর, তবে ন্যূনতম অঙ্ক ধরিলেও শতকরা ১০৲র কম হইবে না। যদি এই চাষের খরচ বাদ দেওয়া হয় তবে জন-প্রতি আয়ের অঙ্ক হয় ২৭৲। আর একটা হিসাব এই—বাংলায় প্রজাদের দেয় খাজনার পরিমাণ বাৎসরিক ১৬ কোটী টাকা। হারাহারি ক্রমে ৩ কোটী কৃষকের দেয় খাজনার পরিমাণ প্রায় ১৪ কোটী টাকা হইবে। উপরিউক্ত ৯১ কোটী টাকা হইতে ১৪ কোটী বাদ দিলে অবশিষ্ট ৭৭ কোটী টাকা ৩ কোটী কৃষকের মধ্যে বণ্টন করিয়া প্রতি জনের গড়পরতা আয় হয় প্রায় ২৬৲ মাত্র। আবার ব্যাঙ্ক-তদন্ত-কমিটির সিদ্ধান্ত এই যে, বাংলার কৃষকের ঋণভারের পরিমাণ ১০০ কোটী টাকা এবং এজন্য বার্ষিক দেয় সুদ শতকরা ১২½ টাকা হিসাবে প্রায় ১২ কোটী টাকা। এখন অবস্থাটা এইরূপ—যে-কৃষকের গড়পড়তা আয় ২৬৲ কি ২৭৲ সে মালিকের খাজনা এবং মহাজনের সুদ কি আসল কেমন করিয়া দিতে পারে, এবং যদি দিতেও পারে তবে তাহার ভরণপোষণের জন্য বিশেষ কিছু অবশিষ্ট থাকে না। সুতরাং ঋণের অঙ্ক তাহার বাড়িয়াই চলিবে।

ভারতবর্ষের অধিবাসীর প্রতি জনের গড়পড়তা আয়ের আন্দাজ বহু লোকে করিয়াছেন। দাদাভাই নৌরজীর মতে বার্ষিক ২০৲; ইদানীং অনেকের মতে ৬৭৲, বহু ইংরেজের মতে ১১৬৲। এই সঙ্গে ইংলণ্ডের জন-প্রতি আয়ের অঙ্ক ১০০০৲, আমেরিকা যুক্তরাজ্যের ১৯২৫৲। তুলনা করিয়া দেখিলে বুঝিতে পারিব আমাদের কৃষককুল কত দরিদ্র। গড়পড়তা আয় ন্যূনতম আয় নহে। সুতরাং বাংলায় অনেক কৃষক আছে যাহার বার্ষিক আয় ২৫৲টাকারও কম। তাহারা কি প্রকারে বাঁচিয়া থাকে, তাহাদের মধ্যে গিয়া বসবাস না করিলে আমরা বুঝিতে পারিব না।

এখন যিনিই "ডালভাতের" ব্যবস্থার কথা চিন্তা

করিবেন তাঁহাকে সর্ব্বপ্রথমে কৃষকের ঋণ পরিশোধ এবং সঙ্গে সঙ্গে তাহার আয়বৃদ্ধির উপায় নির্দ্ধারণ করিতে হইবে। আয়বৃদ্ধি না হইলে ঋণপরিশোধ হইতে পারে না, তবে যদি গবর্ণমেণ্ট কৃষকের সমস্ত ঋণভার নিজের স্কন্ধে গ্রহণ করিয়া তাহাদিগকে অব্যাহতি দেন সে স্বতন্ত্র কথা। কিন্তু আশু তাহার সম্ভাবনা নাই। বর্ত্তমানে কৃষকের ঋণভার লাঘব করিবার জন্য যে আইন করা হইয়াছে তাহাতে কাগজপত্রে লঘুতার পরিচয় পাইব, কিন্তু যতই লঘু হউক না কেন কৃষক তাহাও দিয়া উঠিতে পারিবে না। যদি তাহাদের আশু আয়বৃদ্ধির উপায় করা হয় তাহা হইলে হয়ত ক্রমে ক্রমে বহু বৎসরে তাহারা ঋণমুক্ত হইতে পারে। কিন্তু ইহাদের আয়বৃদ্ধির উপায় কি, ইহাই বিবেচ্য।

ইংরেজ আমলের পূর্ব্ব হইতে নানা স্থানে বাংলায় যে-সকল কুটীরশিল্প ছিল তদ্দ্বারা বহু লোক অন্নসংস্থানের উপায় করিত; কিন্তু কুটীরশিল্পের উচ্ছেদসাধনের পর ঐ শ্রেণীর লোকেরা বাধ্য হইয়া কৃষিকর্ম্মে নিযুক্ত হইয়া পড়ে। ফলে ভূমির উপর অধিক মাত্রায় চাপ পড়ায় কৃষিজনিত আয়ের পরিমাণও অপ্রচুর হইয়া পড়িয়াছে, অর্থাৎ জমির উপর প্রয়োজনাতিরিক্ত লোক নির্ভরশীল হইয়াছে। যে-ভূমিখণ্ড চাষ করিয়া একটি লোক স্বচ্ছন্দে খাইয়া-পরিয়া থাকিতে পারিত, তাহা এখন হয়ত তিন-চার জনে চাষ করিতেছে। সুতরাং সকলের দৈন্যদশা উপস্থিত। সুতরাং কৃষিকার্য্য দ্বারা যাহাদের গ্রাসাচ্ছাদনের উপযুক্ত সংস্থান হইতেছে না অথবা হইবার সম্ভাবনা নাই, তাহাদিগকে এই বৃত্তিতে নিরস্ত করিয়া শিল্প ও বাণিজ্যে অর্থোপার্জ্জনের সুযোগ করিয়া দিতে হইবে। অর্থাৎ দেশে কুটীরশিল্প অথবা বৃহৎ কলকারখানা প্রতিষ্ঠিত করিয়া নিরন্ন লোকদের অর্থাগমের উপায় করিয়া দিতে হইবে। কিন্তু ইহা বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার। বর্ত্তমানে রাজকোষে ইহার জন্য অর্থ নাই।

কর্ষণযোগ্য ভূমির পরিমাণ ক্রমশঃ খরিদ বিক্রয় বা উত্তরাধিকারসূত্রে ক্ষুদ্র হইতে ক্ষুদ্রতর হইয়া আসিতেছে। ইহা নিরোধ করিতে হইবে। যাহাকে অর্থনীতিবিদ্‌গণ বৃহৎ ইকনমিক হোল্ডিং বলেন, তাহারই সৃজনের চেষ্টা করিতে হইবে। ইহাও বহুব্যয়সাধ্য ব্যাপার, কেবলমাত্র আইনের প্রচলন দ্বারা হইতে পারে না।

বৈজ্ঞানিক প্রণালী অবলম্বন করিয়া কৃষিজ ফসলের উৎকর্ষ সাধন ও পরিমাণ বৃদ্ধি করিতে হইবে। ইহাও ব্যয়সাধ্য ব্যাপার।

অবশেষে কৃষকগণ যাহাতে উৎপন্ন ফসলের উচিত মূল্য প্রাপ্ত হয় তাহার ব্যবস্থা করা সর্ব্বাগ্রে কর্ত্তব্য। অনেকে মনে করেন, রাষ্ট্রবিধানে শস্যাদির মূল্য ইচ্ছানুরূপ নিয়ন্ত্রিত করা সম্ভবপর নহে। কিন্তু বিভিন্ন দেশে রাষ্ট্রনীতিজ্ঞ বা অর্থনীতিবিশারদ্‌গণ এইরূপ নিয়ন্ত্রণের পক্ষপাতী। কেন্দ্রীয় ব্যাঙ্কের কর্ত্তৃপক্ষগণ সমস্ত সমৃদ্ধিশালী দেশেই পণ্য-দ্রব্যের মূল্য হ্রাসবৃদ্ধির জন্য সময়োচিত নীতি অবলম্বন করিয়া থাকেন। তবে এই নীতি তাঁহারা অবলম্বন করেন হয় অংশীদারগণের লভ্যবৃদ্ধির উদ্দেশ্যে, না-হয় রাজকোষের অর্থের সমতা-সামঞ্জস্য বা রাজস্ব-বৃদ্ধির উদ্দেশ্যে। পণ্য-উৎপাদনকারীদের স্বার্থরক্ষার জন্যও এই নীতি অবলম্বিত হইয়া থাকে। বাংলার মন্ত্রিগণ এই দিকে একটু চেষ্টা করিয়া দেখিতে পারেন এবং কি প্রকারে তাহা সম্ভব বা কার্য্যকরী হইতে পারে তাহা আলোচনা করিতেছি।

পাট বাংলার একচেটিয়া কৃষিজ পণ্য। ইহার চাহিদা ভারতবর্ষের বাহিরেও যথেষ্ট। ইহার রপ্তানী-শুল্কের উপর কেন্দ্রীয় গবর্ণমেণ্টের লোলুপদৃষ্টি এখনও সম্পূর্ণরূপে অপসারিত হয় নাই। আমার প্রস্তাব এই: গবর্ণমেণ্ট বিশেষ আইনের বলে বাংলার সমস্ত উৎপন্ন পাট ক্রয় করিয়া কলিকাতা, নারায়ণগঞ্জ, সিরাজগঞ্জ প্রভৃতি স্থানে সরকার-নির্ম্মিত গৃহে গুদামজাত করিয়া রাখুন এবং কেবল-মাত্র কৃষকের হিতার্থে উহা উচিত মূল্যে চটকলের মালিকদের এবং ঐ পণ্যের বহির্বাণিজ্য-ব্যবসায়ীর নিকট বিক্রয় করুন। বিক্রয়লব্ধ অর্থ গবর্ণমেণ্টের ন্যায্য খরচ বাদে কৃষকদের মধ্যে বণ্টন করিয়া দেওয়া হউক। এই বৃহৎ ব্যাপারে বহু বেকার শিক্ষিত যুবকের অন্ন-সংস্থান হইবে এবং পাট-চাষীরাও উচিত মূল্য পাইয়া রক্ষা পাইবে। হক-সাহেব এই একটিমাত্র কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়া দেখুন না সত্য সত্যই ডালভাতের ব্যবস্থা তিনি করিয়া উঠিতে পারিবেন কি না।

কাম্বোজ

[দেশ-বিদেশের কথা দ্রষ্টব্য]



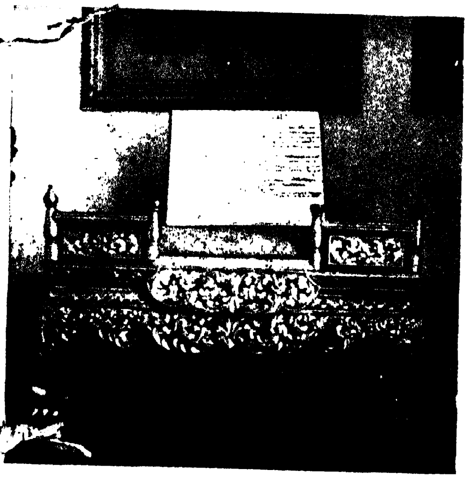


উপরে : কাম্বোজের রাজধানীতে পালি-বিদ্যালয়

নীচে : ইন্দো-চীনে বৌদ্ধ-প্রতিষ্ঠানের চলন্ত পুস্তকাগার



কিন্নরী-নৃত্য



রয়াল লাইব্রেরীর প্রবেশদ্বার



রয়াল লাইব্রেরীর চিত্রকর-অঙ্কিত বুদ্ধ-কাহিনী



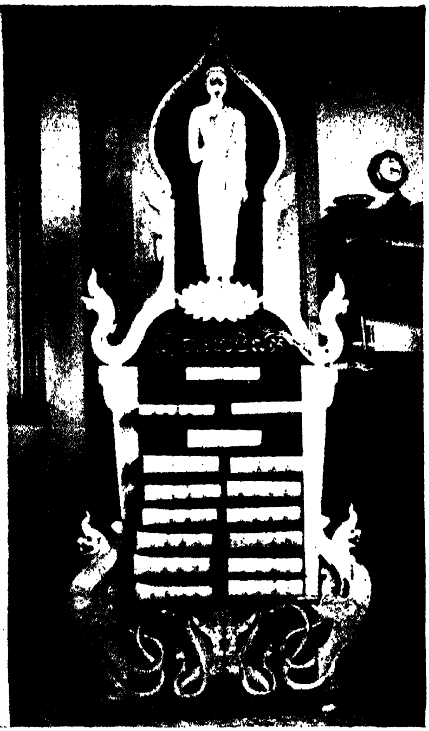
পালি-বিদ্যালয়



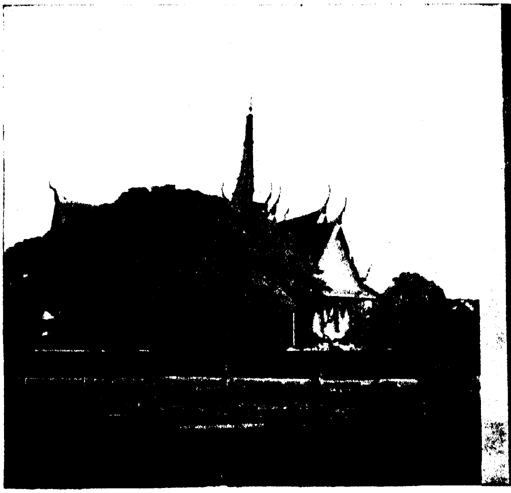
বৌদ্ধ শাস্ত্রচর্চ্চা ভবন



অরণ্যমধ্যে বুদ্ধমূর্তি



বিনয়-পিটক গ্রন্থ রক্ষণার্থ বিচিত্র পুস্তকাধার



রয়াল লাইব্রেরীর সাধারণ দৃশ্য



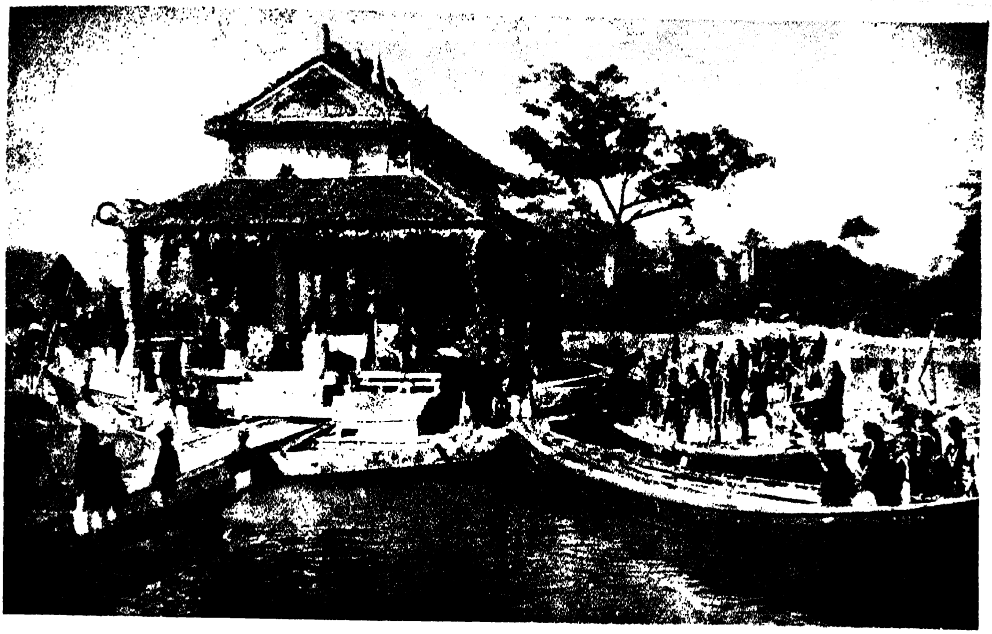
রয়াল লাইব্রেরীর সংলগ্ন উদ্যান



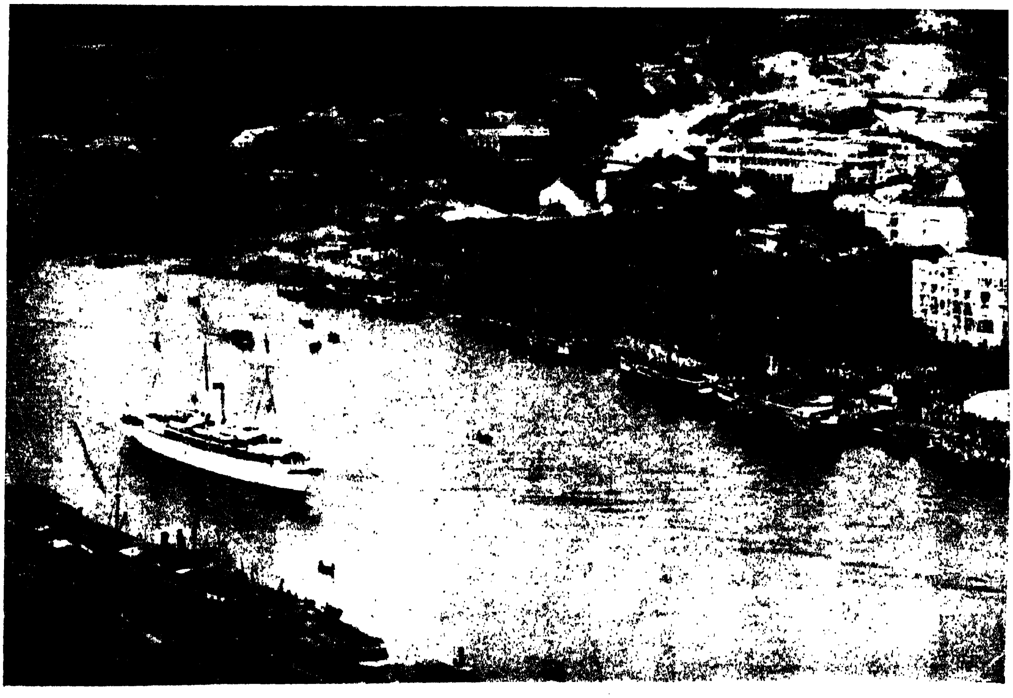
লুয়াং-প্রাবাঙ্গের রাজার রাজধানীর প্রধান মন্দিরে আগমন



শ্যাম-সীমান্তে শিকারী-দল



হোয়াং-মই-নদীতে পুষ্পতরী-উৎসব, আন্নাম



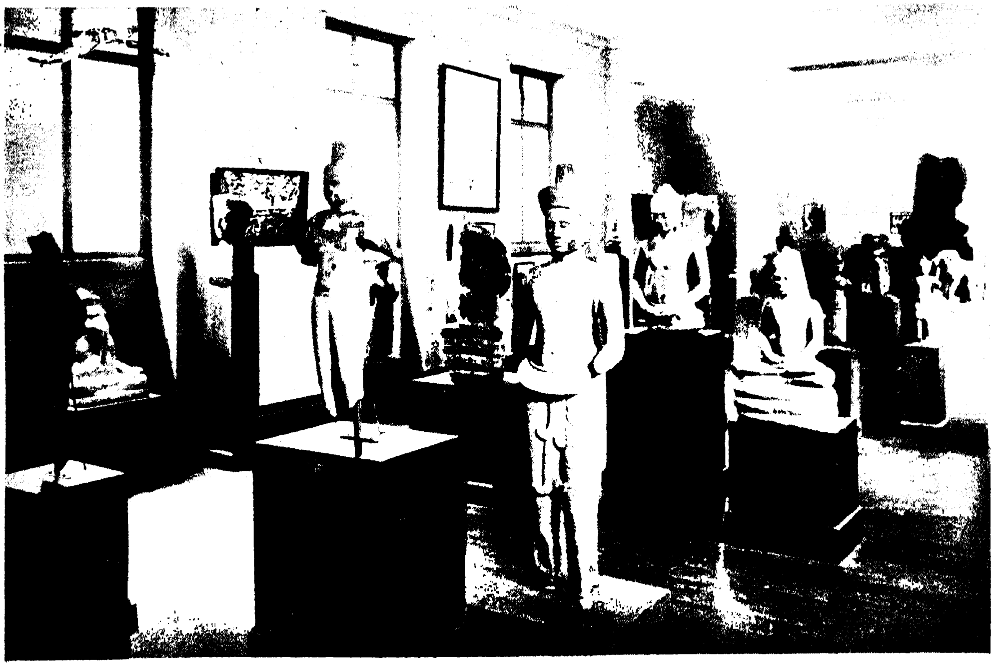
রাজতরী "মহাচক্রী" তীরে ভিড়িতেছে। সাইগন।



কাফিরিস্থানের গৃহে প্রবেশের বিচিত্র ব্যবস্থা



প্রবালখচিত রৌপ্যশিরোভূষণে সজ্জিতা মঙ্গোলীয় বধূ



'মিউজি গিমে'র বুদ্ধমূর্তিনিচয়

সঙ্কলন

অজগর পুষিবার বিচিত্র অভিজ্ঞতা

সাপ সম্বন্ধে অনেকেরই ঘৃণা, ভয়, বিদ্বেষ মিশ্রিত একটা বিসদৃশ ধারণা আছে। অদ্ভুত চালচলন ও দৈহিক গঠন, হিংস্র স্বভাব এবং মারাত্মক বিষ ইহাদিগকে সকলের নিকট অপ্রীতিকর করিয়া তুলিয়াছে। সাধারণের মধ্যে সাপ সম্বন্ধে এমন একটা ভয়াবহ ধারণা জন্মিয়া গিয়াছে যে সাপ মাত্রেই বিষাক্ত বলিয়া লোকে মনে করে এবং কেহই ইহাদের সংস্রবে আসিতে চায় না। পৃথিবীতে বিভিন্ন জাতের অসংখ্য সাপ আছে। কিন্তু তাহাদের অনেকেই বিষধর নহে। আমাদের দেশে ও অন্যান্য দেশে বেদেরা ও যাদুকরেরা অর্থোপার্জ্জনের আশায় বিষাক্ত ও অবিষাক্ত উভয় জাতের সাপই পুষিয়া থাকে। অনেকে আবার সখ করিয়াও সাপ পোষে। নির্ব্বিষ সাপের মধ্যে বোয়া, চিতি, পাইথন প্রভৃতি বৃহদাকৃতির অজগরই সহজে পোষ মানিয়া থাকে।

মাদ্রাজ লয়োলা কলেজ মিউজিয়মের কিউরেটার চার্লস লে-র কৌতূহলোদ্দীপক অভিজ্ঞতার কথা বলি। তিনি নিজে কখনও বিষধর সর্প পোষেন নাই; কিন্তু বৃহদাকার অজগর পুষিবার অভিজ্ঞতার ফলে এই অভিমত জ্ঞাপন করিয়াছেন যে, ইহাদিগকে নির্ব্বিঘ্নে পোষ মানানো যায়; অল্পদিনের মধ্যেই ইহারা শত্রু-মিত্র চিনিয়া লয়।

কিরূপে প্রথম তিনি অজগর পুষিতে উৎসাহিত হইয়া উঠেন সেই সম্বন্ধে তিনি লিখিতেছেন—একদিন সন্ধ্যাবেলায় আমার সাপুড়ের স্ত্রী মাথায় একটা মস্ত বোঝা লইয়া আসিয়া হাজির। তাহার স্বামী বোঝাটা খুলিলে দেখিলাম এক বিরাট পাহাড়িয়া সাপ—প্রায় আট হাত লম্বা একটা পাইথন। পাঁচ শিলিং দিয়া সেই বিপুলকায় অজগরটাকে কিনিয়া রাখিলাম। সাধারণ অবস্থায়, মিউজিয়মের কিছু আয় বাড়াইবার জন্য ইহার চামড়াটা বেচিয়া ফেলিতাম, কারণ ব্যাগ, জুতা প্রভৃতির জন্য এই চামড়ার খুবই চাহিদা। কিন্তু এই পাইথনটার পেটে ডিম আছে বুঝিয়া ইহাকে একটা বড় খাঁচার মধ্যে পুরিয়া রাখিয়া, কাক, চিল ও ছোট বড় নানা রকমের ইঁদুর প্রভৃতি নানাবিধ উপাদেয় খাদ্য জোগাইতে লাগিলাম; কিন্তু আশ্চর্য্যের বিষয় সে ইহার কিছুই স্পর্শ করিল না—দিনের পর দিন উপবাসে কাটাইতে লাগিল।

প্রায় একমাস পরে অজগরটা ডিম পাড়িল—প্রায় পৌনে দুই মাস ধরিয়া পাইথনটা ডিমের চতুর্দ্দিকে কুণ্ডলী পাকাইয়া, কোন খাদ্য গ্রহণ না করিয়া, দিনরাত্রি নিশ্চলভাবে পড়িয়া রহিল। ইহাদের শরীরে এত মেদ জমা থাকে যে, অনেক দিন কিছু না খাইলেও ঐ মেদ হইতে দেহরক্ষা হইয়া থাকে। সাত মাস অনাহারে থাকিয়াও একটা পাইথন বেশ জীবিত ছিল।

একদিন সকালবেলায় দেখা গেল—পাইথনটা আর পূর্ব্বের জায়গায় ডিম আগলাইয়া বসিয়া নাই। ডিম ছাড়িয়া সে খাঁচার অপর এক কোণে শুইয়া আছে। দেখা গেল—মানুষের হাতের মুঠার মত বড় কুড়িটা ডিম রহিয়াছে। প্রত্যেকটি ডিমের মুখে এক-একটা সরু ছিদ্র এবং সেই ছিদ্রের ভিতর দিয়া এক-একটি ছোট মাথা এই অচেনা নূতন জগতের প্রতি অবাক হইয়া চাহিয়া রহিয়াছে। তাহারা তাহাদের উপরের ঠোঁটের শক্ত সূচালো অগ্রভাগের সাহায্যে নিজেরাই ডিমের মুখে ছিদ্র করিয়া লইয়াছে। দুই দিনের মধ্যেই তাহারা ডিম ছাড়িয়া বাহিরে আসিয়া পড়িল। তৃতীয় দিন সকালে দেখিলাম ৪ আউন্স ওজনের, প্রায় ২৪ ইঞ্চি লম্বা সুপুষ্ট কতকগুলি বাচ্চা পরিত্যক্ত



এগার মাস বয়স্ক পাইথন পরিবেষ্টিত শ্রীযুক্ত লে

ডিমের খোলার আশেপাশে পড়িয়া রহিয়াছে। সাধারণ পাইথনের বাচ্চা হইতে এগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও ভারী ছিল। পরে আর একটি পোষা পাইথনের বাচ্চা হইয়াছিল, সেগুলি এত বড় ও ভারী হয় নাই।

ডিম ফুটিয়া বাহির হইবার পর হইতে ইহারা নিজেরাই নিজেদের ব্যবস্থা করিয়া লয়। এই দুইটি পাইথনের মধ্যে প্রথমটির বাচ্চাগুলির স্বাভাবিক সংস্কার অতি শীঘ্রই আত্মপ্রকাশ করিয়াছিল—তাহাদের কাছে একটু হাত নাড়িলেই রাগে ফুলিয়া উঠিয়া পরিণত সাপের মতই ছোবল মারিত। দ্বিতীয়টির বাচ্চাগুলি অপেক্ষাকৃত ঠাণ্ডা মেজাজের ছিল। তাহাদের মধ্য হইতেই একটাকে বাছিয়া রাখিলাম। এই বাচ্চাটাকেই পরে বেঞ্জামিন-নাম দিয়াছিলাম। এইগুলি পুষিবার এক অসুবিধা—ইহারা যখন-তখন কামড়াইতে চেষ্টা করে; কিন্তু এই বাচ্চাগুলির দাঁত এত ছোট যে চামড়া বিদ্ধ করিয়া আর বেশী দূর বসিতে পারে না। দুইটি পাইথনের এই চল্লিশটি বাচ্চাকে প্রতিদিন আহার জোগান সহজ ব্যাপার নহে—কাজেই ডজন-খানেক বাচ্চা রাখিয়া বাকীগুলিকে বোতলে ভরিয়া সুরক্ষিত করা হইল। দুই তিন দিন পর্য্যন্ত অতি সন্তর্পণে এইগুলিকে কাঁধে, পিঠে মাথায় চড়াইবার ফলে দেখা গেল যে ইহাদের হিংস্র স্বভাব অনেকটা দূর হইয়াছে। দু-চারটা কামড় যে আমরা খাই নাই তাহা নহে; কিন্তু তাহাতে পিন-ফোটার চেয়ে বেশী যন্ত্রণা বোধ হয় নাই।

স্বাধীন অবস্থায় এই বাচ্চাগুলি যে কি খাইয়া জীবন ধারণ করে তাহা আশ্চর্য্যের বিষয়, কারণ উপযোগী খাদ্য দিয়া দেখা গেল তাহারা খাইতে চায় না। অবশেষে জোর করিয়া খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিতে হইল। কতকগুলি ব্যাং টুকরা টুকরা করিয়া কাটিয়া লইলাম। এক জন পাইথন-শিশুর মাথা ও লেজ দুই হাতে ধরিয়া থাকিত, আর এক জন সাঁড়াশি দিয়া হাঁ করাইয়া তাহার মধ্যে ব্যাঙের টুকরাগুলি আস্তে আস্তে ঢুকাইয়া দিত। তার পর ধীরে ধীরে বাহির হইতে গলায় হাত বুলাইয়া খাদ্য উদরের মধ্যে ঠেলিয়া দেওয়া হইত। কিন্তু পরে দেখা গেল, একটা বাচ্চা সমস্ত খাদ্য উদ্গীরণ করিয়া ফেলিয়াছে এবং অপরগুলিও ঐরূপ করিবার চেষ্টায় আছে। তখন আবার নূতন ব্যবস্থা করিতে হইল—পূর্ব্বোক্ত উপায়ে খাওয়াইবার পর তাহাদের গলার চতুর্দ্দিকে এক একটি ফিতা বাঁধিয়া রাখিলাম, যেন ভুক্ত দ্রব্য উদ্গীরণ করিতে না পারে।

পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম—ব্যাঙের ছিন্ন অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ অপেক্ষা এক জাতীয় ছোট ছোট মাছই ইহারা সহজে জীর্ণ করিতে পারে। মাস-দুই পরে জোর করিয়া খাওয়ানো বন্ধ করিয়া খাঁচার মধ্যে জীবন্ত ইঁদুর ছাড়িয়া দিতে লাগিলাম। আশ্চর্য্য ইহাদের শিকার ধরিবার সহজাত সংস্কার। কেমন করিয়া শিকার ধরিতে হয় কখনও তাহা চোখে না দেখিলেও খাঁচার মধ্যে ইঁদুরটি ফেলিবামাত্রই ছুটিয়া আসিয়া ধরিয়া সঙ্গে সঙ্গে লেজ দিয়া শিকারের সর্ব্বাঙ্গ জড়াইয়া এমন ভাবে চাপ দিল যে ইঁদুরের ইহলীলা শেষ হইল।

এদিকে ক্রমশঃ এতগুলি প্রাণীর আহার সংগ্রহ করা এক বিষম সমস্যা হইয়া উঠিল। কাজেই উহার মধ্য হইতে কতকগুলিকে বিলি ব্যবস্থা করিয়া আটটা মাত্র রাখিলাম। এই আটটি অজগরের খোরাক জোগানও সহজ ব্যাপার নয়। এত ইঁদুর পাওয়া যায় কোথায়? বর্ষার সঙ্গে সঙ্গে ব্যাণ্ডিকুট নামক বিড়ালের মত বড় এক জাতের ইঁদুর পাওয়া গেল। ব্যাণ্ডিকুট একটা বিদকুটে ভয়াবহ জানোয়ার—গায়ে ভালুকের মত লোম ও শূকরছানার মত ঘোঁৎ ঘোঁৎ শব্দ করে। এইরূপ একটা পূর্ণবয়স্ক ব্যাণ্ডিকুটকে সাপের খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিতে ইতস্ততঃ করিতে লাগিলাম। যদি এটাই সাপকে আক্রমণ করে? হয়ত এটা আক্রমণ করিলে প্রায় দুই হাতেরও বেশী লম্বা একটা পাইথনের পিঠ ভাঙিয়া দিতে পারে। আবার মনে হইল—পাইথনের মত একটা হিংস্র প্রাণীর আত্মরক্ষা করিতে পারা উচিত। ভাবিয়া চিন্তিয়া শেষে ব্যাণ্ডিকুটটাকে খাঁচার মধ্যে ছাড়িয়া দিলাম। একটি ছাড়া অন্য সাতটি সাপই ফোঁস ফোঁস শব্দ করিয়া খাঁচার চতুর্দ্দিকে নড়াচড়া করিতে লাগিল। অন্যটি (ইহার নাম রাখিয়াছিলাম জ্যাকব) কিন্তু শত্রুর উপর কড়া নজর রাখিয়া অতি সন্তর্পণে ধীরে ধীরে অগ্রসর হইতে লাগিল। তখন ব্যাণ্ডিকুটটা আসন্ন বিপদ বুঝিতে পারিয়া, লাফাইয়া উঠিবামাত্রই জ্যাকব বিদ্যুদ্বেগে ছুটিয়া গিয়া তাহাকে শূন্যেই ধরিয়া ফেলিল। তার পর তাহার শরীরের চতুর্দ্দিকে লেজ জড়াইয়া ফেলিয়া আস্তে আস্তে প্যাঁচ কষিতে লাগিল। কয়েক মিনিটের মধ্যেই ব্যাণ্ডিকুটের মাথা ঝুলিয়া পড়িল, জ্যাকব মাথার দিক হইতে আরম্ভ করিয়া শিকারটাকে আস্তে আস্তে গলাধঃকরণ করিয়া ফেলিল।

কেহ যেন মনে না করেন ইহারা আমাদের একদিনও কামড়ায় নাই। কিন্তু কামড় খাইয়াছি প্রায়ই আমাদের নিজের দোষে। একটি সাধারণ ভুল হইতেছে—পাইথনের মুখের কাছে সোজাসুজি হাত বাড়াইয়া দেওয়া। কারণ ইহাদের সাধারণ সংস্কারই এই যে, কোন কিছু সম্মুখে উপস্থিত হইলেই হয় কামড়াইবে নয় জড়াইয়া ধরিবে।

এ কথাটা সর্ব্বদাই স্মরণ রাখা উচিত যে পোষা অজগরেরা কামড়াইলে তাহাদিগকে সেজন্য মার বা শাস্তি দেওয়া অনুচিত, কারণ দোষ তাহাদের নয়, আমাদেরই। তাহাদের স্বভাবচরিত্র বিশেষ ভাবে লক্ষ্য করিতে হইবে; কারণ তাহাদের স্বভাব সাধারণতঃ অনুরূপ অবস্থায় বিভিন্ন স্থানে বিভিন্ন রূপ হয় না। কাজেই একটু ভুল করিলেই সঙ্গে সঙ্গে খেসারৎ দিতেই হইবে। দৃষ্টান্তস্বরূপ, ইহাদের একটি স্বভাবের কথা বলা যায়—ঝাঁকুনি দিলেই ইহারা তৎক্ষণাৎ ফণা তুলিয়া ছোবল মারিবেই মারিবে।

সকল অজগরের আহারে রুচি এক প্রকার নহে। জ্যাকব ছিল খাওয়ার বিষয়ে কতকটা খুঁৎখুঁতে মেজাজের—তাহার পছন্দমত খাবার না হইলে সহজে রুচিত না; কিন্তু তাহার তুলনায় সাইমন (অপর একটি পোষা পাইথন-বাচ্চা) ছিল সর্ব্বভুক—জীবিত কি মৃত সবই সে গলাধঃকরণ করিত; অবশ্য, মৃত হইলেও সেটা টাটকা না হইলে চলিত না। কেবল একটা জিনিষকে সে পছন্দ করিত না—কুকুর-ছানাকে

যে দু-চক্ষে দেখিতে পারিত না। যত ছোটই হউক না কেন কুকুর-ছানা খাঁচার মধ্যে দেওয়ামাত্রই সে ক্রোধে উত্তেজিত হইয়া খাঁচার চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া ঘুরিয়া ফোঁস ফোঁস শব্দ করিতে থাকিত। কিন্তু বানর দেখিলে সে লোভ সম্বরণ করিতে পারিত না।

অনেক সাপের স্বজাতিভুক বলিয়া একটা দুর্নাম শোনা যায়। অজগরদের ভিতর কখন কখন এই অদ্ভুত স্বভাবের পরিচয় পাওয়া যায়। সাইমন একবার তাহার ভাই বেঞ্জামিনকে গিলিয়া এরূপ একটা অদ্ভুত স্বজাতিদেহ ভক্ষণের দৃষ্টান্ত দেখাইয়াছিল। তবে ব্যাপারটা যে নেহাৎ ভুলক্রমে ঘটিয়াছিল তাহা নিঃসন্দেহ। ঘটনাটা এই—আমি বেঞ্জামিনকে একটা খরগোস দিয়াছিলাম—তাহার অভ্যস্ত প্রথামত সে সেটাকে মাথা হইতে গিলিতে সুরু করিয়াছিল। অন্য কাজ থাকাতে প্রায় মিনিট পনর পর ফিরিয়া আসিয়া দেখি—কি ভীষণ কাণ্ড! সাইমন তো সর্ব্বনাশ করিয়াছে। সাইমন বেঞ্জামিনকে প্রায় সম্পূর্ণ গিলিয়া ফেলিয়াছে! বেঞ্জামিনের প্রায় ছয় ইঞ্চি পরিমাণ লেজমাত্র সাইমনের মুখের বাহিরে রহিয়াছে। আমি দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দেখিতে লাগিলাম, কারণ সেই সময়ে বাধা দিয়া কোনই ফল হইত না।

সাইমনের অবস্থা দেখিয়া বোধ হইল—কোথাও কিছু গলদ হইয়াছে ইহা যেন সে বুঝিতে পারিয়াছে, কারণ এমন একটা খরগোস তো কখনও তাহার নজরে পড়ে নাই যাহা গিলিতে তাহার এত সময় লাগিতে পারে। হয়ত সে তাহার বন্ধু বেঞ্জামিনকে মোটেই লক্ষ্য করে নাই। যাহা হউক, সে তাহার শরীরের পিছন দিক হইতে সম্মুখের দিকে ভুক্তদ্রব্য উদগীর্ণ করিবার মত এক প্রকার অদ্ভুত প্রক্রিয়া করিতে করিতে কয়েক মিনিটের মধ্যেই বেঞ্জামিনকে পুনরায় উদরের মধ্য হইতে বাহির করিয়া ফেলিল। বেঞ্জামিনও সাইমনের উদর হইতে বহির্গত হইয়া যেন কিছুই হয় নাই এই ভাবেই চলাফেরা করিতে লাগিল। কেমন করিয়া এরূপ ঘটনা ঘটিল তাহা অতি পরিষ্কার। যেই বেঞ্জামিন খরগোসটিকে সামান্য একটু গিলিয়াছে ঠিক সেই সময়ে সাইমন আসিয়া অন্য কোন দিক লক্ষ্য না করিয়াই খরগোসটার পিছন দিক হইতে গিলিতে সুরু করে, এবং অতিরিক্ত তাড়াহুড়া করিয়া গিলিবার ফলে বেঞ্জামিনের মুখশুদ্ধ তাহার পেটের ভিতর ঢুকিয়া পড়ে। তখন ধীরে ধীরে বেঞ্জামিনের সমস্ত শরীরটাই সাইমনের উদরের মধ্যে প্রবেশ করিতে থাকে। অবরুদ্ধ স্থানে থাকিলেও সাপেরা সহজে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মারা যায় না—জলের নীচেও তাই তাহারা অনেকক্ষণ ডুবিয়া থাকিতে পারে। এই জন্যই বোধ হয় সাইমনের পেটের মধ্যে এতক্ষণ থাকিয়াও বেঞ্জামিন কোন অস্বস্তি অনুভব করে নাই। তার পর জ্বালা-যন্ত্রণার বিষয়ে ইহারা যেন অনেকটা বোধশক্তিরহিত। এমন ঘটনার কথাও শুনা গিয়াছে যে ইঁদুরে এক-একটা জলজ্যান্ত সাপের কোন কোন স্থল হইতে মাংস খাইয়া ভিতরের পাঁজরা বাহির করিয়া ফেলিয়াছে—তথাপি তাহাদের লেশমাত্র অস্বস্তি বা যন্ত্রণার কোন লক্ষণ দেখিতে পাওয়া যায় নাই।

শিকারকে হত্যা করিবার জন্য সাপেরা বিভিন্ন উপায় অবলম্বন করিয়া থাকে। অনেকে আবার শিকারকে হত্যা করে না; গিলিবার সময়ই শিকারের পঞ্চত্বপ্রাপ্তি ঘটে। পাইথনদের শিকার ধরিবার কায়দার মধ্যেও বেশ বিশেষত্ব দেখিতে পাওয়া যায়। দূরে শিকার দেখিতে পাইলেই সে চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে এবং শিকার কাছে না-আসা পর্য্যন্ত সতর্ক দৃষ্টিতে চাহিয়া থাকে। শিকার কাছে আসিবামাত্রই হঠাৎ শিকারীর জিব অতি-দ্রুত কম্পিত হইতে থাকে। এসব লক্ষণ দেখিলেই বুঝিতে পারা যায় যে, এখনই ছুটিয়া পড়িয়া সে শিকারকে আক্রমণ করিবে। মাথাটা যেন তীরবেগে ছুটিয়া গিয়া ছোবল মারে ও দাঁতে কামড়াইয়া ধরে, আর সঙ্গে সঙ্গে কুণ্ডলী পাকাইয়া যায়। এই সমস্ত ব্যাপার চক্ষের নিমেষে ঘটিয়া থাকে। শিকারের গলা অথবা বুকের উপর লেজ জড়াইয়া এমন ভাবে চাপ দেয় যে মুহূর্ত্তের মধ্যেই সে শ্বাসরুদ্ধ হইয়া মৃত্যুমুখে পতিত হয়। পরিণত-বয়স্ক পাইথনেরা শিকার প্রভৃতি ধরিবার সময় যেরূপ করে, বাচ্চা-পাইথনেরাও ঠিক সেইরূপই করিয়া থাকে। বাল্যাবস্থায় অজগরেরা কখনও প্রচুর পরিমাণে খায়, আবার কখনও বা অনেক দিন পর্য্যন্ত উপবাস করিতে বাধ্য হয়। সাধারণতঃ দশ ফুট লম্বা



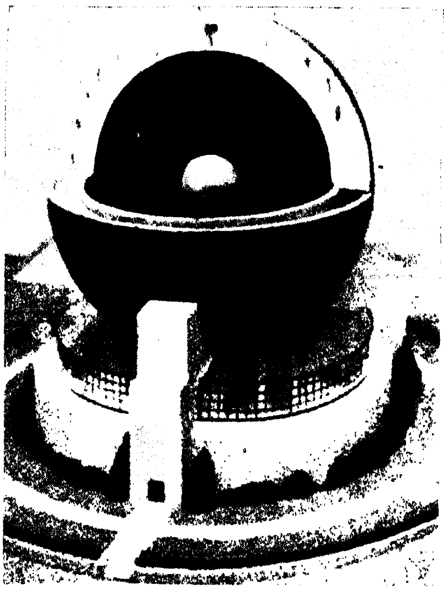
চারিটি পোষা পাইথন বেষ্টিত শ্রীযুক্ত লে

একটা পাইথনকে সপ্তাহে একটা মুরগী অথবা একটা খরগোস দিলেই সে একরূপ সতেজ থাকে। একবার একটা শিকার উদরস্থ হইলেই অজগর কুণ্ডলী পাকাইয়া, খাদ্যবস্তু পরিপাক না হওয়া পর্য্যন্ত চুপ করিয়া পড়িয়া থাকে। এই ব্যাপারে প্রায়ই সপ্তাহ খানেক, সময় সময় তারও অধিক দিন লাগিয়া থাকে। পাখীর বড় বড় শক্ত পালক ছাড়া হাড়, ঠোঁট, নখ ও অন্যান্য কোমল পালক প্রভৃতি ইহাদের উদরের পাচক রসে একেবারে ভস্মীভূত হইয়া যায়। মোটের উপর ইহারা যাহা গলাধঃকরণ করিয়া থাকে তাহা হইতে বিন্দু পরিমাণ খাদ্যবস্তুর অপচয় ঘটে না; উহাদের পরিপাক-যন্ত্রের এমনই ক্ষমতা যে অসারবস্তু হইতেও শরীর পোষণোপযোগী জিনিষ আহরণ করিয়া লইতে পারে। গিলিবার শক্তি ইহাদের অসাধারণ। যে সাপের গলার ব্যাসের পরিমাণ দুই ইঞ্চি সে অনায়াসেই তাহার চার পাঁচ গুণ বেশী মোটা একটা খরগোসকে গিলিয়া ফেলিতে পারে।

—

কস্‌মসেরিয়াম

বহুদিন পূর্ব্বে 'প্রবাসী' এবং অন্যান্য পত্রিকায় প্ল্যানেটেরিয়ামের বিরাট জটিল যন্ত্রের কথা আলোচিত হইয়াছিল। আকাশে গ্রহনক্ষত্রাদির তুলনামূলক গতিবিধি হুবহু চক্ষের সম্মুখে দেখিবার জন্য ইউরোপ ও আমেরিকার কয়েকটি স্থানে এই বিরাট যন্ত্র স্থাপিত হইয়াছে। সম্প্রতি পিটার জে. বিটারম্যান, প্ল্যানেটেরিয়ামের ধরণে কস্‌মসেরিয়াম নামে এক বিপুলকায় যন্ত্রের পরিকল্পনা করিয়াছেন। এই যন্ত্রের মডেলটি সম্প্রতি নিউইয়র্কের হেডেন প্ল্যানেটেরিয়ামে প্রদর্শিত হইয়াছে। শূন্যের মধ্যে পৃথিবী কি ভাবে অবস্থান করিতেছে তাহা, এবং তাহার ঘূর্ণনের ফলাফল, কস্‌মসেরিয়াম দেখিয়া সাধারণ লোকেরাও অতি সহজে উপলব্ধি করিতে পারিবে। অসীম শূন্যের মধ্যে ২০,০০০ মাইল দূরে থাকিয়া পৃথিবীর দিকে চাহিলে যেরূপ দেখায় এই কস্‌মসেরিয়ামটি ঠিক সেরূপ ভাবে নির্ম্মিত হইয়াছে। কংক্রিট-নির্ম্মিত একটি বিশাল গম্বুজের মধ্যে ১০০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট আর একটি প্রকাণ্ড গোলাকার স্থান আছে। এই গোলাকার স্থানটি পৃথিবীর চতুর্দ্দিকস্থ অসীম শূন্যের প্রতীক। ইহার মধ্যস্থলে ২০ ফুট ব্যাসবিশিষ্ট একটি গোলক পৃথিবীর শূন্যে অবস্থানের মত নিরালম্ব ভাবে রহিয়াছে বলিয়া প্রতীত হয়। ঠিক যেন তারকাখচিত আকাশের মধ্যে পৃথিবী আপন মেরুদণ্ডের উপর আবর্ত্তন করিতেছে। বাহিরের গম্বুজ ও



কস্‌মসেরিয়াম

ভিতরের এক শত ফুট ব্যাসবিশিষ্ট গোলাকার স্থানের মধ্যস্থলে কুণ্ডলীর মত দুইটি অবরোহণী চতুর্দ্দিক ঘিরিয়া আছে। এই অবরোহণীর বিভিন্ন স্থানে অবস্থান করিয়া দর্শকেরা বিভিন্ন উচ্চতা হইতে পৃথিবীর ঘূর্ণনের ফল প্রত্যক্ষ করিতে পারিবে। আমরা যেমন চন্দ্রের হ্রাসবৃদ্ধি দেখিতে পাই, সেইরূপ সূর্য্য হইতে আলো আসিয়া পৃথিবীর কোন্ অংশ কিরূপ ভাবে আলোকিত হয় তাহা, এবং তাহার ফলে বাহির হইতে চন্দ্রের ন্যায় হ্রাসবৃদ্ধি ও অন্যান্য অবস্থা অতি সুস্পষ্টভাবে পরিলক্ষিত হইবে। গোলকের উপর শহর-বন্দর, নদনদী সমানানুপাতিক ভাবে অঙ্কিত আছে। দূর হইতে পরিষ্কার ভাবে দেখিবার জন্য চতুর্দ্দিকেই বাইনোকুলারের ব্যবস্থা আছে।

শ্রীগোপালচন্দ্র ভট্টাচার্য্য



সেতু

শ্রীসুধানন্দ চট্টোপাধ্যায়, বি-এসসি, বি-ই

বৃহৎ নদী, ক্ষুদ্র জলধারা কিংবা পথের উপর দিয়া রাজপথ কিংবা রেলপথ নির্ম্মাণের গঠনই সেতু বা পুল। সমুদ্রমধ্যস্থ দুই দ্বীপের সংযোজক গঠনকেও সেতু বলা হয়, আবার বৃহৎ নালার উপর কোন গঠনকে ক্ষুদ্র সেতু বলে। সেতু নদীর ঠিক কোন্ স্থানে অতিক্রম করিবে এবং সেতুর বাহ্যিক আকৃতি কিরূপ হইবে, এই দুইটি বিষয় সেতু-নির্ম্মাণে সর্ব্বপ্রথম লক্ষণীয়। আকৃতিনির্ণয়ের সঙ্গে সঙ্গে সেতুর নির্ম্মাণের এবং সংরক্ষণের ব্যয়ও স্থির হয়, সেই সঙ্গে সেতুর আয়ু-নিরূপণও প্রয়োজন। কিরূপ আকৃতির সেতুর কিরূপ স্থায়িত্ব তাহা অভিজ্ঞতা দ্বারা জানা গিয়াছে। স্থাপত্য-বিদ্যার দিক দিয়া সেতুর বাহ্যিক রূপের প্রতি ইঞ্জিনিয়ারদের লক্ষ্য রাখিতে হয়। সেতুর মূল্য নির্ভর করে প্রথমতঃ উহার উপরের গঠনকার্য্যে—প্রকৃত সেতু বলিতে সাধারণে যাহা বুঝিয়া থাকে; দ্বিতীয়তঃ, নিম্নের গঠনকার্য্যে—স্তম্ভ এবং ভিত্তি প্রস্তুতকরণে।

যাঁহারা সেতুর উপর দিয়া নিত্য গমনাগমন করেন, তাঁহাদের মধ্যে অল্প লোকই জানেন, যে, সেতু-নির্ম্মাণের মোট ব্যয়ের প্রায় অর্দ্ধেক কি তদধিক অর্থ ব্যয়িত হয় সেতুর ভিত্তিতে ও নিম্নের গঠনকার্য্যে। সাধারণের অর্থ এইরূপ ভাবে যাঁহারা মৃত্তিকার মধ্যে প্রোথিত করেন সেই ইঞ্জিনিয়ারদের দায়িত্ব কম নহে।

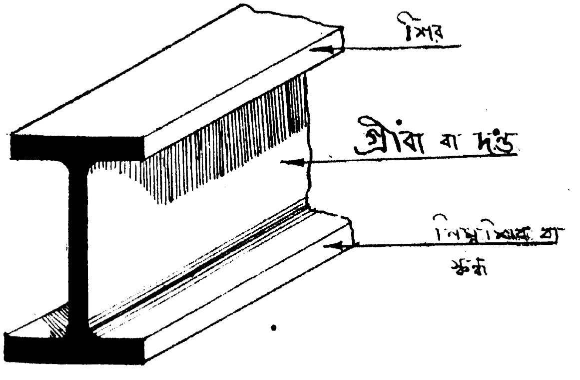
রেলপথ কিংবা যানপথ সেতুর বিভিন্ন অঙ্গে অবস্থিতি অনুযায়ী সেতুকে তিন শ্রেণীতে বিভক্ত করা যাইতে পারে—

১। শিরোগামী শ্রেণীর বা ডেক শ্রেণীর (Deck),

২। অর্দ্ধমধ্যগামী শ্রেণীর (Half through),

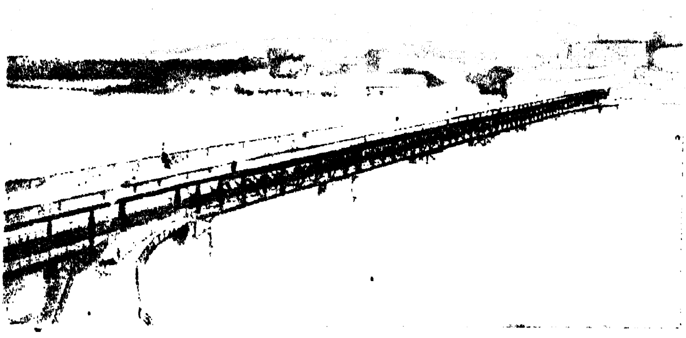
৩। পূর্ণমধ্যগামী শ্রেণীর (Full through)।

শ্রেণী-বিভাগের আলোচনার পূর্ব্বে গোড়ার কথা একটু অবতারণা করি। ছাদের ভার গ্রহণের জন্য কাষ্ঠের কড়ির স্থলে বর্ত্তমানে লোহার কড়ি দেওয়ার অত্যধিক প্রচলন। এই কড়িগুলি সাধারণতঃ ইংরেজী I-এর আকৃতির মত। অর্থাৎ উপরে ও নীচে চেপটা পাত এবং মধ্যস্থলে একটি সরলোন্নত দণ্ড বা গ্রীবা। উপরের পাটটিকে শির এবং নিম্নের পাটটিকে নিম্নশির বা স্কন্ধ এই আখ্যা দিব। সেতুনির্ম্মাণে দুইটি সমান এবং সমান্তরাল গঠন থাকে, প্রত্যেক গঠনকে গার্ডার বলা হয়। প্রত্যেক গার্ডারেরই শির, নিম্নশির বা স্কন্ধ ও গ্রীবা আছে, ইংরেজীতে যাহাকে যথাক্রমে upper flange, lower flange ও web বলে।



১। ডেক্ বা শিরোগামী শ্রেণীর সেতু।—যে-সেতুর উপর দিয়া রেলগাড়ী গমনকালে গাড়ীর সম্পূর্ণ ভার উপরের শিরের উপর প্রথমতঃ পতিত হয় এবং রেলগাড়ী সম্পূর্ণ বাহির হইতে দেখা যায় তাহাকে শিরোগামী বা ডেক্ শ্রেণীর সেতু বা পুল বলে।

২। অর্দ্ধমধ্যগামী শ্রেণীর সেতু।—যখন রেল-গাড়ীর ভার গ্রীবা বা দণ্ডের উপর অর্পিত হয় তখন তাহাকে অর্দ্ধমধ্যগামী সেতু বলে। এই শ্রেণীর



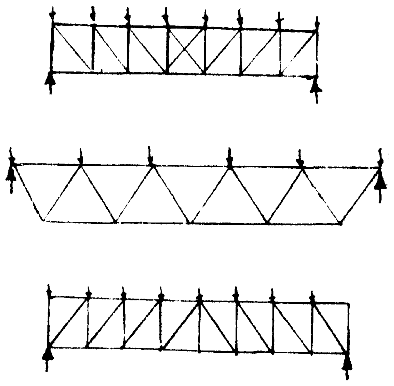
মধ্যগামী শ্রেণীর সেতু

সেতুর উপর দিয়া রেলগাড়ী গমনকালে উহার উপরের কিয়দংশ দৃষ্টিগোচর হয়।

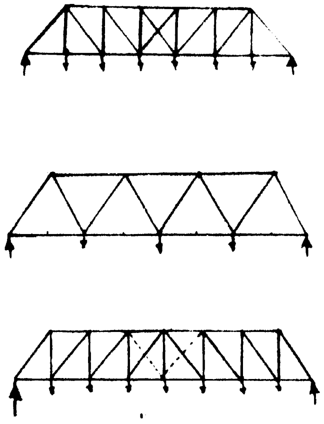
৩। পূর্ণমধ্যগামী শ্রেণীর সেতু।—যখন কোন চলিষ্ণু পদার্থের ভার নিম্নের শিরে বা স্কন্ধে ন্যস্ত হয় এবং গতিশীল পদার্থটি বাহির হইতে দৃষ্টিপথে পতিত হয় না তাহাকে পূর্ণমধ্যগামী শ্রেণীর সেতু কহে।

কোন কোন পূর্ত্ততত্ত্ববিদের মতে পূর্ণমধ্যগামী এবং অর্দ্ধমধ্যগামী এক পর্য্যায়ের অন্তর্ভুক্ত। তাঁহারা বলেন উপরের শিরে গতিশীল বস্তুর ভার প্রদান করিলে শিরোগামী এবং নিম্নের শিরে ভার ন্যস্ত হইলে মধ্যগামী। বিভিন্ন আকৃতির সেতু কখন-বা শিরোগামী এবং কখন-বা মধ্যগামী হইতে পারে। (নিম্নে চিত্র দ্রষ্টব্য)

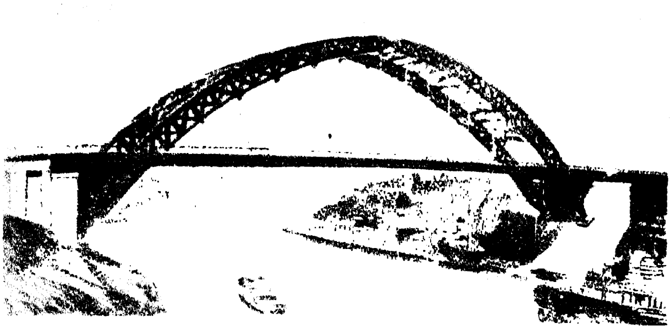
শিরোগামী বা ডেক শ্রেণীর সেতু নির্ম্মাণে অপেক্ষাকৃত অল্প অর্থ ব্যয় হয়, বিশেষতঃ রেলগাড়ী-চলাচলের সেতুতে, কারণ এই শ্রেণীর সেতুতে রেলগাড়ীর ভার গার্ডারের উপরের শিরে ন্যস্ত হয়। তাই কাঠের স্লীপার গোড়াগুড়ি গার্ডারের শিরোদেশে অল্পদূর ব্যবধানে আড়া-আড়ি ভাবে পাতিয়া লৌহশলাকা দ্বারা দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিলেই হইল, এবং তদুপরি লৌহবর্ত্ম সংলগ্ন করিলেই তাহার উপর দিয়া গাড়ী অনায়াসেই যাইতে পারে। কিন্তু মধ্যগামী শ্রেণীর সেতুতে যেখানে ভার নিম্নের শিরে নিক্ষিপ্ত হয় সেখানে আড়াআড়ি ভাবে গার্ডার মূল গার্ডারের গ্রীবায় দৃঢ়ভাবে সংলগ্ন করিতে হইবে এবং তৎপরে মূল গার্ডারের সমান্তরাল ভাবে লৌহের কড়ি নিবদ্ধ করিয়া তদুপরি কাষ্ঠের স্লীপার বসান যাইবে। এই সকল অতিরিক্ত কাজের জন্য খরচ অধিক পড়িয়া যায়। মধ্যগামী শ্রেণীর সেতুতে দুই মূল সমান্তরাল গার্ডারের দূরত্ব, গাড়ীর প্রস্থের তুলনায় অপেক্ষাকৃত বেশী করিতে হয়। ইহার ফলে নিম্নের ভারবাহী স্তম্ভের প্রস্থও অধিক করিতে হয়। ইহাতেও ব্যয়াধিক্য ঘটে। কিন্তু শিরোগামী শ্রেণীর সেতুতে দুই মূল গার্ডারের সমান্তরাল দূরত্ব গাড়ীর চাকার সমান্তরাল দূরত্বের



শিরোগামী



মধ্যগামী



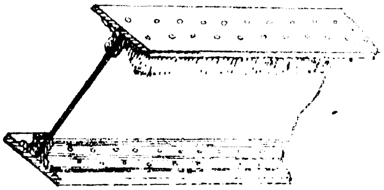
ওয়েরমাউথ সেতু। দৈর্ঘ্য ৬০০ ফুট।

কিছু বেশী বা সমান। বালীর সেতুতে (উইলিংডন ব্রিজ) গাড়ীর চাকার ভার পাটী-গার্ডারের (plate girder) শিরোদেশের কেন্দ্রে নিক্ষিপ্ত হইয়াছে, কিন্তু খ্যাতনামা পূর্ত্ততত্ত্ববিদ্‌গণ বলেন চাকার ভার দুই গার্ডারের ভিতরের দিকে একটু ঝুঁকিয়া পড়াই ভাল। উইলিংডন সেতুতে বালীর দিক হইতে জলের দিকে যাইবার অংশে দুইটি ১০০ ফুট লম্বা পাটী-গার্ডারের উপর এইরূপ ভাবেই ভার ন্যস্ত হইয়াছে।

সেতু শিরোগামী শ্রেণীর, না, মধ্যগামী শ্রেণীর হইবে তাহা নির্ভর করে দুই তীরের জমির উচ্চতার উপর আর জল এবং সেতুর মধ্যস্থ মুক্ত স্থান রাখার উপর। যেমন জল হইতে এক স্থলে অর্ণবপোত গমনাগমনের জন্য ৪০ ফুট মুক্ত স্থান রাখিতে হইবে, আর নদীর তীর পর্য্যন্ত রেলপথের উচ্চতা নদীর জল হইতে ৪৫ ফুট। এখন যদি গার্ডারের গভীরতা ৯ ফুট হয় তাহা হইলে আমরা শিরোগামী শ্রেণীর সেতু নির্ম্মাণ করিতে পারি না, কারণ রেলপথের উচ্চতা হইতে জলের উপরিভাগের উচ্চতা ৪৫ ফুট, তাহা হইতে ৯ ফুট গার্ডারের গভীরতা বাদ দিলে ৩৬ ফুট মুক্ত স্থান থাকে; কিন্তু আমাদিগকে ৪০ ফুট মুক্ত স্থান রাখিতেই হইবে। অতএব এই ক্ষেত্রে মধ্যগামী শ্রেণীর সেতু নির্ম্মাণ করিতে হইবে। নদীর জলের উচ্চতা প্লাবনের সময় সর্ব্বাপেক্ষা ঊর্দ্ধ পরিমাপ গ্রহণ করা হয়।

নির্ম্মাণ-প্রণালীর বিভিন্নতার দিক দিয়া বিচার করিলে দেখিতে পাওয়া যায় যে সেতু তিন প্রকারে :—১। লৌহ-চাদর-নির্ম্মিত কড়ি, পার্টি-গার্ডার ; ২। দৃঢ়ভাবে শলাকাসংলগ্ন লৌহের কাঠাম বা রিভেট-মারা ট্রাস ৩। শঙ্কু-নিবদ্ধ লৌহের কাঠাম বা পিন-দিয়া-জোড়া ট্রাস।

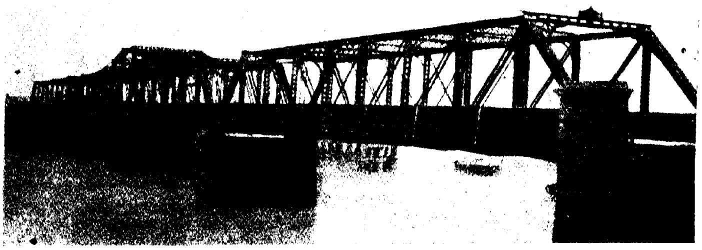
১। লৌহচাদর-নির্ম্মিত কড়ি বা পাটী-গার্ডার।—ইহা লৌহের কারখানায় প্রস্তুত I-এর মত কড়ির অনুকরণ মাত্র। টাটানগরে টাটা কোম্পানীর কিংবা ইংলণ্ডের ডরমান-লং কোম্পানীর কারখানায় প্রস্তুত সর্ব্বাপেক্ষা গভীর কড়ি হইতেছে ২৪ ইঞ্চি। ইহা অপেক্ষা গভীর কড়ি উত্তপ্ত লৌহের চাই হইতে টানিয়া বাহির করা হয় না। কিন্তু ১০ফুট গভীর I-এর অনুকৃতি কড়ি প্রস্তুতের জন্য ১০ ফুট গভীর লৌহের পাত এবং চারিটি সুদীর্ঘ লৌহের কোণ



পাটী-গার্ডার

(angle) দৃঢ়ভাবে শলাকা (rivets) দ্বারা চাদরের উপর ও নীচে দুই দিকে নিবদ্ধ করিয়া দিলে I-এর আকার ধারণ করে। যাহাতে গ্রীবার পাতটি বাঁকিয়া না যায়, তজ্জন্য পাতের দুই ধারে দুইটি কোণাকৃতি লৌহদণ্ড শলাকাদ্বারা সরলোন্নত-ভাবে গ্রথিত হয়। এই কোণাকৃতি যুগ্ম লৌহদণ্ডের গ্রীবার পাতের গায়ে সর্ব্বাপেক্ষা অধিক ক্রমিক দূরত্ব, পাতের গভীরতা পর্য্যন্ত হইতে পারে। এই জাতীয় সেতুতে প্রস্তুত-কারকের কিঞ্চিৎ ত্রুটিতে বিশেষ কিছু যায় আসে না।

১২০ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ সেতুর জন্য ইহা সস্তায় এবং সহজে প্রস্তুত করা যায়। আর এক সুবিধা যে ইহার সকল স্থানে রং লাগান যায় এবং ফলে সহজে মরিচা পড়ে না। এই কারণে

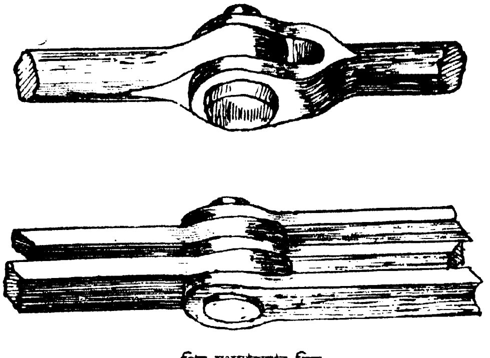


কার্দিফের রেরেন্স রাজপথের চিত্র

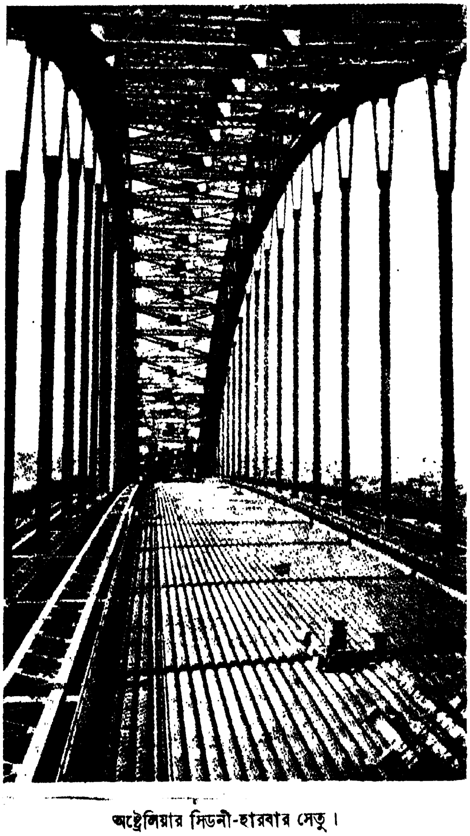
সেতুর জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৪৫০ ফুট। ইহাই বর্ত্তমানে ভারতের সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ জ্যায়ের সেতু।

৩। শঙ্কুনিবদ্ধ লৌহের কাঠাম বা পিন-দিয়া-জোড়া ট্রাস:—ইহা সাধারণতঃ ১৫০ ফুট হইতে ২০০ ফুট লম্বা জ্যায়ের জন্য ব্যবহৃত হয়। পূর্ব্বে আমেরিকায় ছোট ছোট সেতুর জন্য পিন-দিয়া-জোড়া সেতু নির্ম্মিত হইত। এই প্রকার সেতুর সুবিধা এই যে, ১। ইহা শীঘ্র প্রস্তুত করা যায়, ২। ইহা রিভেট-মারা পাটা-গার্ডারের আয়ু সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। ইহাতে কোন অপ্রাথমিক টান (secondary stress) আসে না। কর্ম্মস্থলে জোড়াতাড়ার কাজ খুব অল্পই করিতে হয়--প্রায় সকল কাজই কারখানায় হইয়া আসে।

২। শলাকা-সংলগ্ন লৌহের কাঠাম বা রিভেট-মারা কাঠামের সেতু:—ইহা সাধারণতঃ ১০০ ফুট হইতে ১৭৫ ফুট পর্য্যন্ত জ্যায়ের সেতুর জন্য ব্যবহৃত হইত। ১৯১০ খ্রীষ্টাব্দের পর আমেরিকাবাসিগণ আমেরিকা ও কানাডায় ২৫০ ফুট লম্বা সেতু শলাকা সংলগ্ন করিয়া প্রস্তুত করিয়াছে। বর্ত্তমানে ৪৫০ ফুট পর্য্যন্ত দীর্ঘ সেতুও প্রস্তুত হয়। উইলিংডন সেতুর জলের উপরের জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৩৫০ ফুট, সিন্দুনদের উপর কোত্রী সেতুর জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৩৬০ ফুট ৬ ইঞ্চি, এবং চেনাব নদীর উপর 'আখনুর' যান-চলাচলের



পিন-সংযোজনার চিত্র

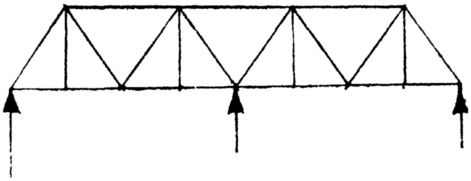


অষ্ট্রেলিয়ার সিডনী-হারবার সেতু।

সেতু অপেক্ষা অল্পব্যয়সাপেক্ষ, ৩। ইহা অপ্রাথমিক টান হইতে মুক্ত।

বিভিন্ন রীতিতে সেতুর ভার ভিত্তির উপর প্রদান করিবার উপর সেতুকে ছয় ভাগে বিভক্ত করা যায়:— ১। সহজভাবে বসান সেতু, ২। অবিচ্ছিন্ন কড়ি-নির্ম্মিত সেতু, ৩। বৃত্তাভাসাকৃতি সেতু, ৪। এক দিক সংলগ্ন ও অপর দিক মুক্ত সেতু, ৫। ঝুলন সেতু, ৬। ঝুলন কিংবা খিলানযুক্ত এক দিক সংলগ্ন অন্য দিক মুক্ত সেতু,

১। সহজভাবে বসান সেতু (simply supported girder):—একটি কড়ি অথবা কড়িজাতীয় লৌহের গঠনকে দুইটি সরলোন্নত স্তম্ভের অথবা কোন আধারের উপর স্থাপন করিলে কড়ির ভার দুই দিকে ঋজুভাবে ন্যস্ত হইবে, এইরূপ



অবিচ্ছিন্ন কড়ি-নির্ম্মিত সেতু।

সেতুকে সহজভাবে বসান সেতু বলে। সাধারণ ইস্পাতে ৬০০ ফুট এবং নিকেল-মিশ্রিত ইস্পাতে ৭৫০ ফুট সেতু এই শ্রেণীর হইয়া থাকে। ওহিয়ো নদীর উপর সেতুটি ৭২০ ফুট লম্বা জ্যা-বিশিষ্ট।

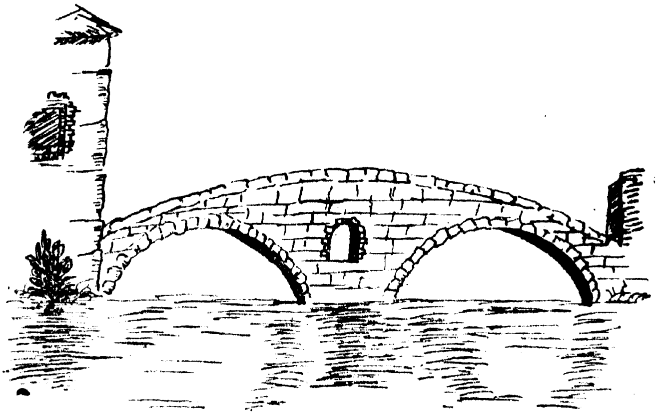
২। অবিচ্ছিন্ন কড়িনির্ম্মিত সেতু:— যদি একটি দীর্ঘ কড়ি তিন বা ততোধিক ভারগ্রাহী স্তম্ভের উপর স্থাপিত করা হয়, তাহাকে অবিচ্ছিন্ন ভাবে বসান কড়ি কহে। ইহাতে ভার ঋজুভাবে আসে, কিন্তু বক্রীকরণের শক্তি (bending moment) দুই স্তম্ভের মধ্যস্থলে সহজভাবে বসান কড়ি অপেক্ষা কম।

৩। বৃত্তাভাসাকৃতি সেতু:—ইহার আকৃতি বাড়ীর খিলানের অনুরূপ কিন্তু আকারে বৃহৎ। ইহা ইষ্টক কিংবা প্রস্তর কিংবা কঙ্করেষ্টক (concrete) কিংবা লৌহের কাঠামর হইতে পারে। ইহাতে ভার কতক ঋজুভাবে এবং কতক পার্শ্বভাবে ন্যস্ত হয়। নিকেল ইস্পাতের তৈয়ারী হইলে ৩০০০ ফুট জ্যায়ের পর্য্যন্ত করা যায়। নিউইয়র্কের হেলগেট সেতু ৬৯৭½ ফুট জ্যা-বিশিষ্ট। পার্শ্বের চাপ পার্শ্বস্থ ভূমি নিরাপদভাবে বহন করিতে পারিলে বৃত্তাভাসাকৃতি সেতুর আশ্রয় লওয়াই সমীচীন।

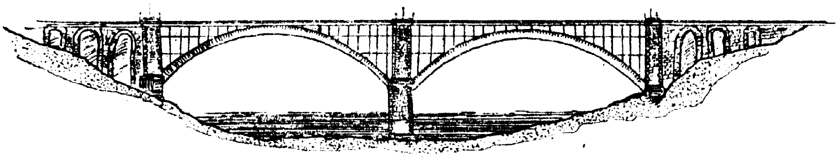
৪। এক দিক সংলগ্ন ও অপর দিক মুক্ত আকৃতির সেতু:—একটি স্তম্ভের গাত্র হইতে কোন গঠন সরলোন্নত ভাবে নির্গত হইলে এবং তাহার উপর কোন ভার ন্যস্ত হইলে স্তম্ভের অভিগতি হইবে ভারের দিকে ঝুঁকিয়া পড়া। কিন্তু স্তম্ভের দুই দিকে ঐরূপ গঠন বাহিরে নির্গত হইলে ভার ঋজুভাবে স্তম্ভের উপর পড়িবে। আবার কোন গঠন ক্রমিক দুই স্তম্ভের উপর দিয়া দুই স্তম্ভের দুই দিকে নির্গত হইলে তাহাকে উপরিউক্ত সেতু বলে। এক দিক সংলগ্ন ও অন্য দিক মুক্ত গঠনের প্রকৃষ্ট উদাহরণ বাটীর বাহিরস্থ অলিন্দ যাহার নীচে কোন ভারগ্রাহী গঠন নাই।

উল্লিখিত শ্রেণীর সেতুর প্রাচীন নির্দ্দেশ জাপানের নিক্কো শহরের 'সোগান' সেতুতে পাওয়া যায়। ইহা অনুমানিক খ্রীষ্টীয় চতুর্দ্দশ শতাব্দীতে নির্ম্মিত।

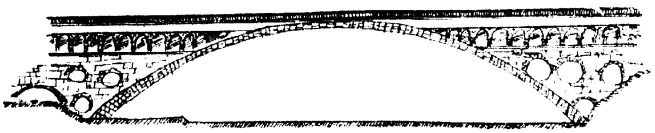
ভারত-সরকারের ইঞ্জিনিয়ার সর্ এ. এম. রেণ্ডেল পরিকল্পিত সিন্ধুনদের উপর "সুক্কুর সেতু" দৈর্ঘ্যে ৮২০ ফুট,



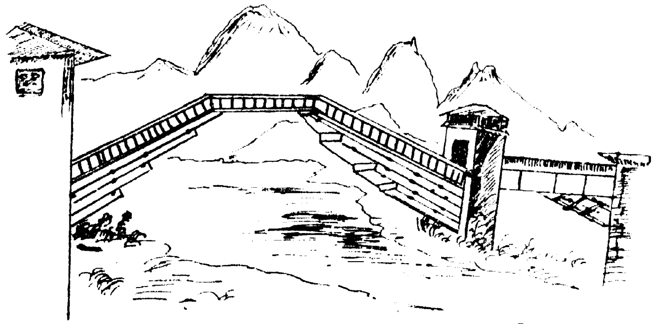
টাইবার নদীর উপর প্রাচীনতম প্রস্তরনির্ম্মিত সেতু। নির্ম্মাণকাল খ্রীষ্টপূর্ব্ব ২১ শতাব্দী। বর্ত্তমানেও ইহা ব্যবহৃত হইতেছে।



দুই ৫১০ ফুট জ্যা-বিশিষ্ট ইস্পাতের খিলান সেতু।



সিরিয়া নদীর উপর ২৯৫ ফুট ব্যবধানবিশিষ্ট ৫৬ ফুট উচ্চ প্রস্তর-নির্ম্মিত সেতু। ইহা বর্ত্তমানে প্রস্তরনির্ম্মিত সর্ব্ববৃহৎ খিলান-সেতু।



তিব্বতের ওয়ানাদপুরের ১১২ ফুট লম্বা সেতু। নির্ম্মাণকাল—১৬৫০ খ্রীষ্টাব্দ



কঙ্ক্রেটক বৃত্তাভাস সেতু।

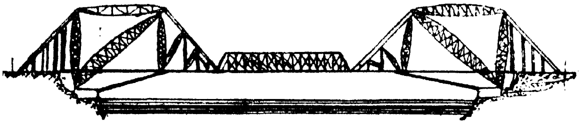
তন্মধ্যে দুই দিক হইতে প্রসারিত গঠন ৩১০ ফুট করিয়া এবং মধ্যস্থিত দোলায়মান গঠন ২০০ ফুট লম্বা। ইহার অংশগুলি বিলাতের কারখানায় প্রস্তুত বলিয়া ইহার ব্যয় অধিক পড়িয়াছে। (৬২৬০০০ ডলার)। হুগলীর জুবিলী সেতু (১৮৮৬-১৮৯০) উল্লিখিত শ্রেণীর অন্তর্ভুক্ত। ইহার উচ্চতা জলের উপরিভাগ হইতে ৫৩ ফুট। মধ্যস্থ ১২০ ফুট দূরস্থিত দুইটি স্তম্ভের উপর সন্নিবিষ্ট অনবিচ্ছিন্ন জ্যায়ের দৈর্ঘ্য ৩৬০ ফুট।

৫। ঝুলন সেতু:—নদীর দুই তীরস্থ দুই উচ্চ স্তম্ভের উপর দিয়া দুইটি সমান্তরাল লৌহ রজ্জু বা শৃঙ্খল হইতে দোলয়মা সেতুর নাম ঝুলন সেতু। জানি না, ইহা শ্রীকৃষ্ণের ঝুলনের পরিকল্পনায় প্রস্তুত কি না? বানর কেমন করিয়া নদী উত্তীর্ণ হয় তাহা অনেকে জানেন। কতকগুলি বানর সন্তরণ দ্বারা নদী পার হইয়া অন্য দিকের তীরস্থ একটি সুউচ্চ বৃক্ষে আরোহণ করিয়া পরের পর হস্ত দিয়া পদ ধারণ করিয়া লম্বা হইতে থাকে। এইরূপে দুই ধারে দীর্ঘ বানরের রজ্জু দোল খাইতে খাইতে দুই বানর রজ্জুর দুই প্রান্তভাগ ধারণ করিলে ঝুলন সেতু হইল। আর তখনই ছোট ছোট বানর ও বানরীরা শিশু বক্ষে করিয়া নদীর অপর প্রান্তে চলিয়া যায়। ইহা হইতে প্রতীয়মান হয় যে ঝুলন সেতু অতি প্রাচীন আকৃতির সেতু। কিন্তু ইহাকে বৃহত্তর কাজে লাগাইবার জন্য তেমন গবেষণা হয় নাই। প্রাচীন কালে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র স্রোতস্বিনীকে উল্লঙ্ঘন করিবার জন্য ভারতবর্ষ, চীন, জাপান, তিব্বত প্রভৃতি দেশে এই প্রকার সেতুর প্রচলন ছিল। একটি রজ্জু টাঙাইয়াও ঝুলন সেতু করা হইত। একটি রজ্জুতে কোন পাত্র ঝুলান থাকিত এবং তাহা আর একটি রজ্জু দ্বারা এপার ওপারে টানিয়া লওয়া হইত।

হরিদ্বারের লছমনঝোলা একটি ঝুলন সেতুর উদাহরণ, বালিগঞ্জ লেকের দ্বীপে যাইবার জন্য যে সেতু আছে তাহাও একটি ঝুলন সেতু। ত্রিবেণীর নিকট সরস্বতী নদী



ঝুলন সেতু



সুক্কুর সেতু

পার হইবার জন্য যে সেতু আছে তাহাও উপরিউক্ত শ্রেণীর।

কিন্তু জগতের মধ্যে বর্ত্তমানে সর্ব্বাপেক্ষা দীর্ঘ সেতু আমেরিকার স্যান্ ফ্রান্‌সিস্কো সেতু। ইহা ঝুলন শ্রেণীর। ইহা প্রস্তুত করিতে পূর্ণ চারি বৎসর অতিবাহিত হইয়াছে এবং ব্যয় হইয়াছে ৭৭,২০০,০০০ ডলার। ইহাতে পাশাপাশি ছয় সার গাড়ী যাতায়াত করিতে পারে। ইহাতে রেলপথের কোন সংস্থান নাই। ইহার দৈর্ঘ্য সাত মাইল।

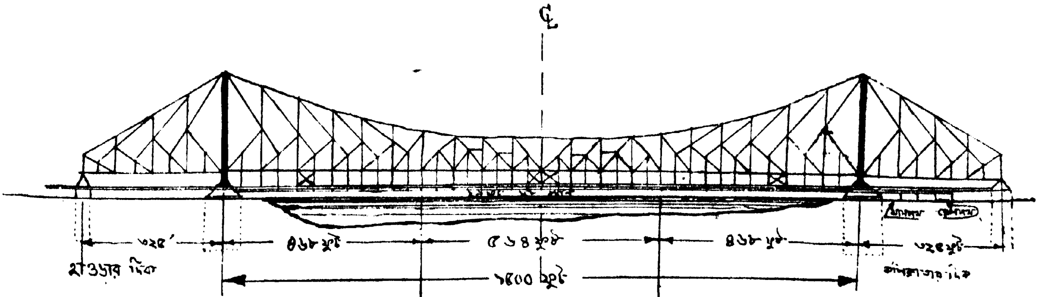
৬। ঝুলন অথবা খিলানযুক্ত এক দিক সংলগ্ন ও অন্য দিক মুক্ত সেতু।—বর্ত্তমানে হাবড়ার যে নূতন সেতুর নির্ম্মাণকার্য্য চলিতেছে, তাহা ঝুলনমিশ্রিত একদিক সংলগ্ন অন্য দিক যুক্ত শ্রেণীর সেতু। ইহার নদীতীরস্থ দুই দিক হইতে প্রসারিত বাহুর দৈর্ঘ্য ৪৬৮ ফুট এবং মধ্যস্থিত ঝুলমান অংশের দৈর্ঘ্য ৫৬৪ ফুট। মধ্যস্থিত অংশটি লৌহ-নিগড়ে শূন্যে ভাসমান থাকিবে। ফলে মোট দৈর্ঘ্য ১৫০০ ফুট। নিম্নে ইহার রেখাচিত্র দেওয়া হইল।

এতদ্ভিন্ন ভাসমান সেতু (Pontoon Bridge), কঙ্করেষ্টক সেতু, আয়ঙ্কঙ্করেষ্টক সেতু, কজাযুক্ত বৃত্তাভাস সেতু প্রভৃতি আছে।

ভাসমান সেতু।—ভাসমান সেতুর প্রথম পরিকল্পনা করেন শ্রীরামচন্দ্র। "শিলা ভাসে জলে" হওয়া অসম্ভব। যদি তাই সম্ভব হয়, তাহা হইলে শিলাকে ভাসাইবার কৌশল তিনি জানিতেন। তিনি বহু বৃক্ষকাণ্ডের উপর শিলা সংস্থাপন করিয়া ভারতবর্ষ ও লঙ্কাদ্বীপের মধ্যে গমনাগমনের পথ করিয়াছিলেন। সেতুটি ভাসমান বলিয়াই লক্ষ্মণ সীতা-উদ্ধারের পর বাণাঘাতেই কিয়দংশ বিচ্ছিন্ন করিতে পারিয়াছিলেন। তাই কিয়দংশ ভাসিয়া যায় এবং সেতুর কিয়দংশ আজিও বর্ত্তমান। এই পরিকল্পনাই জার্ম্মানীর কাইসারের মনে ছিল। তাই তিনি বিগত মহাযুদ্ধে স্থির করিয়াছিলেন ফরাসীকে জয় করিয়া ডোভার হইতে ক্যালে পর্য্যন্ত এই ভাসমান সেতু ত্বরিত প্রস্তুত করিয়া লইয়া ইংলণ্ড আক্রমণ করিবেন। পুরাতন হাবড়ার পুল ভারতের মধ্যে ভাসমান সেতুর উদাহরণ। হোমারের পুস্তকে এই ভাসমান সেতুর কথা আছে, নৌকা গায়ে গায়ে সংলগ্ন করিয়া প্রাচীন পারস্য, বাবিলন দেশের রাজারা যুদ্ধের সময় সৈন্য পার করিয়া লইয়া যাইতেন। সে আজ ২৫০০ বৎসর আগের কথা।

আমেরিকায় কঙ্করেষ্টক ও আয়ঙ্কঙ্করেষ্টক সেতুর বিশেষ চলন। ভারতবর্ষেও ঐ শ্রেণীর ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র সেতু প্রস্তুত হইতেছে।

কজাযুক্ত বৃত্তাভাস সেতু।—এই বৃত্তাভাসে দুই বা ততোধিক কজা সংলগ্ন করা যায়। এই প্রবন্ধের অন্তত্র ওয়েরমাউথ সেতুর যে চিত্র দেওয়া হইয়াছে তাহা এই শ্রেণীর। উহা দৈর্ঘ্যে ৬০০ ফুট।



হাবড়ার নূতন পুল

আলোচনা

অতীশ দীপঙ্করের জন্মস্থান

শ্রীনলিনীনাথ দাশগুপ্ত

গত বৈশাখ মাসের 'প্রবাসী'তে পণ্ডিতপ্রবর রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় প্রসঙ্গক্রমে অতীশ দীপঙ্করের বিবরণ লিখিয়াছেন। তিনি বলেন, "ইঁহারা দুই জনেই (শান্তরক্ষিত ও অতীশ দীপঙ্কর) সহোর প্রদেশের রাজবংশে উদ্ভূত। বাঙালী পণ্ডিতগণ 'অতিশা'কে বাঙালী প্রমাণ করেন। ...... যাহা হউক, সহোর বঙ্গদেশে নয় বিহারে বিক্রমশিলার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে; মুসলমানদিগের আগমনের পূর্ব্বে এ অঞ্চল 'ভাগল' নামে প্রসিদ্ধ ছিল। সহোর মাণ্ডলিক রাজ্য ছিল; উহার রাজধানী ছিল বর্ত্তমান কহলগ্রামের নিকটস্থ কোন স্থানে......" (পৃ. ১০৪)।

সহোর, সাহোর বা জাহোর নামক স্থানে অনেক প্রসিদ্ধ বৌদ্ধ পণ্ডিত উদ্ভূত হইয়াছিলেন, এইহেতু ইহার ভৌগোলিক অবস্থান সম্বন্ধে পণ্ডিতসমাজে কিছু কিছু আলোচনাও হইয়া গিয়াছে। আচার্য্য সিলভাঁ লেভির মতে, সাহোর হিন্দুস্থান (Le Nepal, ii, p. 177)। ডক্টর এ. এইচ. ফ্রাঙ্ক বলেন সাহোর পঞ্জাবের অন্তর্গত মণ্ডি (Antiquities of Indian Tibet, ii, p. 87)। আবার কেহ কেহ বলেন সাহোর ঢাকা জেলার সাভার অথবা যশোহর। নানা কারণে বিশেষতঃ বাংলার পাল-বংশীয় সম্রাট ধর্ম্মপালদেবকে তিব্বতীয় এক ঐতিহ্যে 'সাহোরের রাজা' বলিয়া বর্ণিত দেখিয়া, আমি অনুমান করিয়াছি, সাহোর বাংলারই (সম্ভবতঃ পশ্চিম-বাংলার) স্থানবিশেষ (Indian Historical Quarterly, March, 1935, pp. 143-144)। এ সকল অনুমানের একটিও যথার্থ না হইতে পারে, কিন্তু রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় কি করিয়া সুনিশ্চিত হইলেন যে সহোর বিহারে বিক্রমশিলার নিকটবর্ত্তী অঞ্চলে, তাহা প্রবন্ধে বলেন নাই।

অতীশ দীপঙ্করও সহোরে উদ্ভূত হইয়াছিলেন, একথা নিতান্তই নূতন। রাহুল সাংকৃত্যায়ন মহাশয় এই তথ্য কোন্ গ্রন্থ হইতে সংগ্রহ করিয়াছেন, এবং সেই গ্রন্থের ঐতিহাসিক মূল্য কি, সে-কথাও বলেন নাই। বাঙালী পণ্ডিতগণ কোনও বাঙালীর রচিত পুস্তক দেখিয়া অতীশকে বাঙালী প্রতিপন্ন করেন নাই, এ বিষয়ে তাঁহাদের উপজীব্য একাধিক তিব্বতীয় ইতিবৃত্তমূলক গ্রন্থ। ইহার কোন-খানিতে পাওয়া যায় অতীশ "বজ্রাসনের (বোধ্-গয়ার) পূর্ব্বে বাংলা দেশে বিক্রমণিপুরে গৌড়ের রাজবংশে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন, কোনখানিতে দেখি, তিনি "পূর্ব্বভারতের বাংলায় বিক্রমপুরে" জন্মিয়াছিলেন (Pag-Sam-Jon-Zang, p. xviii)। এ সকল গ্রন্থ আগাগোড়া প্রামাণিক নহে, এই হিসাবে অতীশের জন্মস্থান সম্বন্ধে এই সকল উক্তি হয়ত বিশ্বাসযোগ্য না-ও হইতে পারে। কিন্তু তেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'বোধিমার্গ-প্রদীপ-পঞ্জিকা নাম' বলিয়া অতীশের স্বরচিত একখানি গ্রন্থের যে বিবরণ আছে, তাহাতে অতীশের বর্ণনায় স্পষ্ট লেখা আছে যে তিনি "বাংলার রাজপরিবারে" জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন (Dipankara Srijnana de souche royale bengalie—Catalogue du Fonds Tibetain de la Bibliotheque Nationale, Troisieme Partie, par P. Cordier, p. 327)। তেঙ্গুরের ক্যাটালগে 'একবীর সাধন নাম' বলিয়া অতীশের যে অপর একখানি গ্রন্থের উল্লেখ আছে, তাহাতেও আচার্য্য পৈণ্ডপাতিক শ্রীদীপঙ্করকে 'বাংলার' (du Bengale) বলিয়া উক্ত হইয়াছে (*Ibid.*, Deuxieme Partie, p. 46)। অতএব, অতীশ বাঙালী ছিলেন না, একথা বলিবার হেতু দেখি না। কোনও গ্রন্থে অতীশের জন্মস্থান সহোর বলিয়া লেখা থাকিলে, উহা দ্বারা আরও প্রমাণিত হইবে যে সহোর বাংলারই স্থান-বিশেষ।

—

"শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক"

শ্রীদীনেশচন্দ্র সরকার, এম-এ, পিএইচ-ডি

ভাদ্র মাসের 'প্রবাসী'র ৬৬৭-৭৩ পৃষ্ঠায় শ্রীঅজিতকুমার মুখোপাধ্যায় "শেষ ব্রহ্মযুদ্ধে বীর বাঙালী সৈনিক" শীর্ষক একটি চমকপ্রদ প্রবন্ধ লিখিয়াছেন। দুঃখের সহিত জানাইতে হইতেছে, প্রবন্ধটি মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের অজ্ঞতাপ্রসূত, এবং উহাতে যাহা লিখিত হইয়াছে, তাহার সমস্তই ভুল। তিনি পরলোকগত রামলাল সরকার মহাশয়ের যে গ্রন্থের পাণ্ডুলিপি আবিষ্কার করিয়া আমাদিগকে গর্ব্ব অনুভব করিতে বলিয়াছেন, উহা "আত্মকাহিনী" নহে, উহা একখানি উপন্যাস মাত্র। উহার কাহিনী সম্পূর্ণ কাল্পনিক। "আমার জীবনের লক্ষ্য (উপন্যাস)" নামে ঐ গ্রন্থ বহুদিন পূর্ব্বেই প্রকাশিত হইয়াছে, এবং আমাদের অনেকের কাছেই উহা আছে। ঐ গ্রন্থে শ্রীকুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তী নামক এক জন কাল্পনিক বাঙালী বীরের কাহিনী উপন্যাসচ্ছলে বর্ণিত হইয়াছে। অবশ্যই পাণ্ডুলিপিতে প্রথম পুরুষের উক্তি দেখিয়া মুখোপাধ্যায় মহাশয় ভ্রমে পতিত হইয়াছেন। কিন্তু বস্তুতঃ উহাতে "আমি" বলিতে রামলালবাবু তাঁহার কল্পনাপ্রসূত শ্রীকুড়নচন্দ্র চক্রবর্ত্তীকে বুঝাইয়াছেন।

[শ্রীযুক্ত জিতেন্দ্রনাথ রায়ও এই মর্ম্মে আমাদের নিকট পত্র লিখিয়াছেন]

পুরুষের মন

শ্রীরথীন্দ্রনাথ ঠাকুর

ছিল এক সময়
যখন মেয়েদের উড়ে-পড়া আঁচলের ধারটুকু ভুলিয়ে
দিত মন,
তাদের এলোচুলের অল্প একটু ছোঁওয়া গায়ে দিত কাঁটা,
দেখতে কেমন, বয়স কচি না কাঁচা, ছিল না খেয়াল
কিন্তু লাগত ভালো।

যা ছিল রঙীন আবছায়া একদিন তাই
জমে উঠল মূর্তিতে,
মাধুরীর ছায়াপথে ফুটে উঠল কল্পনার একটি তারা,
কাজের ফাঁকে ফাঁকে দেখা দেয় আর ঢাকা
পড়ে তার মোহন ছবি,
মনকে ডুবিয়ে দেয় ধ্যানের অতলে,
মায়ামৃগী ভুলিয়ে নিয়ে যায় স্বপ্নের গহনে,
চমক লাগিয়ে দেয় প্রহরগুলিতে
ফেনিয়ে তোলে ভালোবাসার পাগ্‌লামি।

মল্লিকা যখন এল ঘরে
ভাবলুম যৌবনের সেই মরীচিকা
প্রিয়ার দেহ ধরে দাঁড়াল আমার পাশে।
কত তার ছলনা আমি তা বুঝি তবু বুঝি নে।
সে হয় ভারি খুশি।

মোহজালে জড়ালুম নিজেকে,
সোনার শিকল পরলুম পায়ে,
তাকে নিলুম টেনে এত কাছে
ফাঁক রইল না কোনোখানেই
কল্পনা ধরা দিয়েছে হাতে
এই আশ্বাসে বুক রইল ভরে
কানায় কানায়।

এখন সৃষ্টি হাৎড়িয়ে ভাবি সে আছে কি নেই।
যেন কুড়িয়ে পাই তাকে এখানে সেখানে।
কারো চোখের চাহনিতে সন্ধান পাই তার,
কারো একটুখানি হাসিতে পুরোনো হাসির
ঝলক লাগে,
কারো আচম্‌কা ছোঁওয়ায় স্বপ্ন দেয় জাগিয়ে,
মনে হয় আরেক যুগের আগাঁথা মালার মুক্তো সব,
প্রথম প্রেয়সীর ছড়ানো পরিচয়ের টুক্‌রো।
পাব কি কখনো ফিরে
স্থাপন করেছিলুম যাকে
স্পর্শে দ্রাণে ধ্যানে জ্ঞানে
আমারই প্রিয়ার মাঝে।
মল্লিকা কিছু বলে না, কেবল মুচকে হাসে,
ভাবে, পুরুষের মন সে জানে॥

মাটির বাসা

শ্রীসীতা দেবী

(৩)

ভোরের আলো ক্রমেই উজ্জ্বলতর হইয়া উঠিতেছে। কুয়াসার স্বচ্ছ আবরণ একেবারে অপসারিত হয় নাই, তবে ইহারই ফাঁকে ফাঁকে আলোর অঞ্জলি চারিদিকে ঝরিয়া পড়িতেছে। ছেলেমেয়েরা ঠেলাঠেলি মারামারি বাধাইয়া দিয়াছে রোদ পোহাইবার জন্য। ঘুম ভাঙিলে পাড়া-গাঁয়ের ছেলেমেয়ে আর বিছানায় শুইয়া ঝিমাইতে চায় না, তখনই উঠিয়া পড়ে। তাহাদের দামী শীতবস্ত্রের বালাইও বেশী নাই, কাঁথা মুড়ি দিতে আরাম লাগে বটে, কিন্তু শীতের হাওয়া যখন খোলা মাঠের উপর দিয়া হু হু করিয়া ছুটিয়া যায়, তখন এই জীর্ণ বস্ত্রের বর্ম্মের সাধ্য কি যে তাহাকে ঠেকাইয়া রাখে? ছেলেমেয়েদের হাড়ে হাড়ে কাঁপুনি ধরিয়া যায়। তখন রোদটুকুতে পিঠ পাতিয়া বসা ছাড়া উপায় কি? অতএব চিনি একখানা বড় পিঁড়ি পাতিয়া তাহার উপর উবু হইয়া বসিয়া আছে। সে চালাক মেয়ে, আগে-ভাগে ভাল জায়গাটুকু দখল করিয়া বসিয়া আছে। টিনি তত ভাল জায়গা পায় নাই, তাহাকে পিঁড়ি পাতিতে হইয়াছে একেবারে দাওয়ার সিঁড়ি ঘেঁষিয়া, বেশী নড়াচড়া করিতে গেলে গড়াইয়া উঠানে পড়িয়া যাওয়া অনিবার্য্য। তাই নিজের জায়গায় বসিয়াই দুই-একটা ঠেলা দিয়া সে দেখিতেছে, যে, চিনিকে তাহার সীমানা হইতে একটু হঠাইয়া দেওয়া যায় কি না। তবে এখন পর্য্যন্ত চিনি সদর্পে নিজের রাজ্য রক্ষা করিতেছে, একচুলও নড়ে নাই। তিনজনের মধ্যে কানুই আছে ভাল, এত সকালেই ত তাহাকে খাটের খুরার সঙ্গে বাঁধা যায় না, তাই তাহার মা তাহাকে কোলে লইয়াই রান্না করিতে বসিয়াছেন। আর একটু বেলা না হওয়া পর্য্যন্ত সে সেখানেই থাকিবে। শীতের ভোরে রান্নাঘরের মত আরামদায়ক জায়গা আর আছে কোথায়? কিন্তু মা বড় একচোখো, চিনি টিনিকে তিনি রান্নাঘরের ধারেকাছেও ঘেঁষিতে দেন না। তাহারা নাকি অতি নোংরা, তাহাদের কাপড়চোপড় বাসি।

মৃণাল ইহারই মধ্যে স্নান করিয়া ফেলিয়াছে, শীতের বাধা মানে নাই। এখানে গরম জলে স্নান করার নিয়ম নাই, যতই শীত হউক, খোলা পুকুর-ঘাটে, কনকনে ঠাণ্ডা জলেই স্নান করিতে হইবে। এইসব সময় মনে হয়, কলিকাতায় থাকিয়া আরাম আছে বটে, এক-একদিকে। চক্ষু, কর্ণ, মন সেখানে সারাক্ষণই পীড়িত হয়, কিন্তু শরীরটা আরাম পায়। ইচ্ছা না হয়, তুমি চব্বিশ ঘণ্টা খাট হইতে না নামিয়াই কাটাইয়া দিতে পার, সব-কিছুর ব্যবস্থাই হাতের কাছে পাওয়া যায়।

মামীমা কিন্তু শহরে যাহা-কিছু সমস্তেরই বিরোধী, বলেন, "মা গো মা, কি কাণ্ড! গা ঘিন্ ঘিন্ করে না গা? শোবার ঘরের পাশে ও সব কি? কে জানে বাপু, আমরা পাড়াগেঁয়ে মানুষ ও সব ভাল বুঝি না। তোর দিদিমা বেঁচে থাকলে অমন বাড়ীর চৌকাঠ মাড়াতে দিতেন না তোকে, যা বিচার ছিল তাঁর।"

মৃণাল হাসে, কিন্তু মনে মনে মামীমার কথা স্বীকার করে না। এত বৎসর কলিকাতায় থাকিয়া ত সে দেখিল? সত্যই আরাম এখানে পাওয়া যায়, যদি টাকা খরচ করিবার ক্ষমতা থাকে। গরীবের পক্ষে অবশ্য কলিকাতা নরকতুল্য। বিনা পয়সায় এখানে কিছুই পাওয়া যায় না, আলো না, বাতাস না, আকাশের দিকে তাকাইবার অধিকার পর্য্যন্ত না। পল্লীজননীর কোল সত্যই মায়ের কোল, এখানে ধনী-দরিদ্রের প্রভেদ তত উগ্র নয়। এখানে ভগবানের দেওয়া আলো-বাতাস হইতে কেহই বঞ্চিত নয়, খোলা আকাশের নীচে খোলা মাঠের বুকে বেড়াইবার অধিকার সকলেরই সমান। সকাল-সন্ধ্যায় কত যে বিচিত্র শোভার ভাণ্ডার চারিদিকে উন্মুক্ত হয়, তাহা

প্রাণ ভরিয়া উপভোগ করিবার অধিকার সকলেরই আছে। কিন্তু মহানগরী যেন রূপকথার বিমাতা, ধনীরা তাহার নিজের সন্তান, দরিদ্রের সঙ্গে তাহার সতীন-পুত্রের সম্পর্ক। কোনও মতে সুধাচ্ছলে বিষ পান করাইয়া তাহাদের শেষ করিয়া ফেলিতে পারিলেই রাক্ষসী বাঁচে।

পিঠের উপর দীর্ঘ ভিজা চুলের রাশি মেলিয়া দিয়া, রান্নাঘরের দাওয়ায় বসিয়া মৃণাল তরকারি কুটিতেছে। মামীমা এক হাতে কত আর করিবেন? তাহার উপর দুরন্ত খোকাটা তাঁহার কোলে, তাহাকে সামলাইয়া তবে তাঁহাকে কাজ করিতে হইতেছে। রাধী ঝি নীচু জাতের, বাহিরের কাজ, গোয়ালের কাজ ছাড়া তাহাকে আর কিছু করিতে দেওয়া হয় না। খোকাও আবার পরম রুচিবাগীশ, পারতপক্ষে রাধীর কোলে সে যাইতে চায় না।

মামীমা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ও মা মিনু, ঝোলের তরকারিটা নিয়ে আয়, চড়িয়ে দিই, বেলা হয়ে গেল।"

রৌদ্রের তেজ ক্রমেই বাড়িয়া উঠিতেছে, কুয়াসার শেষ চিহ্নটুকুও মুছিয়া যাইতেছে। এখন গাছের মাথায় বাঁশঝাড়ের উপরে পাতলা রেশমের ঘোমটার মত কুয়াসার টুকরা দেখা যায়, খানিক বাদে তাহাও আর থাকিবে না।

বাহিরে হুড়মুড় করিয়া একটা শব্দ হইল, সঙ্গে সঙ্গে চীৎকার, "হ, হ।"

চিনি ডাকিয়া বলিল, "দিদি তোমার গাড়ী এসে গেছে।"

মামীমা উত্তরে রান্নাঘর হইতে উচ্চকণ্ঠে বলিলেন, "যা ত চিনি, সিধুকে বলগে যা এখন গরু খুলে দিতে। দিদির এখনও খাওয়া হয়নি, কাপড় পড়া হয়নি, তোর বাবা এখনও বাড়ী ফেরেন নি। এখনও ঘণ্টাখানিক দেরি আছে।"

চিনি ঘাড়টা এ-ধার হইতে ও-ধারে দোলাইতে দোলাইতে বলিল, "উহুঁ, আমি যাব না ত।"

মামীমা বিরক্ত হইয়া বলিলেন, "কেন যাবি না লা? ধাড়ী মেয়ে, একে দিয়ে যদি একটু সাহায্যি হয়। ও বয়সে আমরা ঘর-করনার কত কাজ করেছি।"

চিনি বলিল, "হুঁ, আমি যাই, আর উ আমার জায়গাটি নিয়ে নিক।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "থাক গে মামীমা, তুমি ওদের ব'কো না এখন, নিজের নিজের সাম্রাজ্য রক্ষা নিয়ে ওরা ব্যস্ত আছে। আমি সিধুকে ব'লে আসছি। কানুকে দাও ত আমার কাছে, ওটা ত তোমায় জ্বালিয়ে মারল।"

খোকার দিদির কাছে যাইতে কোনও আপত্তি ছিল না, সে হাত বাড়াইয়া চলিয়া গেল।

বাহিরে খোলা মাঠের উপর সিধু গাড়ী আনিয়া দাঁড় করাইয়াছে। অতি সাধারণ ছই-দেওয়া গরুর গাড়ী। গ্রামে অন্য কোনপ্রকার যানের ব্যবস্থা নাই। পাশের গ্রামটি বর্দ্ধিষ্ণু, সেখানে নাকি একখানা ঘোড়ার গাড়ী আছে। এ গ্রামেও বেশী পর্দ্দানশীন বউ-ঝি কেহ আসিলে বা গেলে সেই গাড়ীখানিরই ডাক পড়ে। কিন্তু মৃণালের পর্দ্দার বালাই নাই, এই গরুর গাড়ীতেই তাহার চলিয়া যায়। হাঁটিয়া যাইতেও তাহার আপত্তি ছিল না, তবে সঙ্গে মোটঘাট থাকে এই যা। মৃণালকে দেখিয়া সিধু নিজেই জিজ্ঞাসা করিল, "আর কত দেরি গো দিদি? গরুদুটাকে খুলে দিব?"

মৃণাল বলিল, "তাই দাও, এখনও দেরি আছে ঘণ্টাখানিক।"

সিধু গরু-দুইটাকে মুক্তি দিল, দুই আঁটি খড়ও ছুঁড়িয়া দিল তাহাদের সামনে। গরু দেখিয়া কানুর বীরত্বের অনেকখানিই লোপ পাইয়াছিল, সে দিদির ঘাড়ে মুখ গুঁজিয়া ছিল। মৃণাল তাহাকে লইয়া ঘরের ভিতর চলিয়া আসিল। নিজের জিনিষপত্রের উপর আর একবার চোখ বুলাইয়া লইল। না, আর কিছু করিবার নাই। সবই গোছানো আছে।

মল্লিক-মহাশয় বাহিরে গিয়াছিলেন, এই সময় কচু-পাতায় মুড়িয়া কিছু টাটকা চুনো মাছ লইয়া ফিরিয়া আসিলেন। গৃহিণীকে ডাকিয়া বলিলেন, "বড় মাছ কিছু পাওয়া গেল না গো, এই ক'টিই তেঁতুল দিয়ে টক ক'রে দিও, বেশ হবে।"

মৃণালের মামীমা রান্নাঘর হইতে বাহির হইয়া আসিয়া

মাছগুলি স্বামীর হাত হইতে তুলিয়া লইলেন। বলিলেন, "ঐ বেশ, একটু আঁশমুখ ত করতে পারবে।"

মৃণালের মনটা ক্রমেই ভার হইয়া আসিতেছে। আর কতটুকু সময় বা বাকি? তাহার পরেই আবার সেই বোর্ডিং-বাস। মাগো, প্রাণটা তাহার যেন হাঁপাইয়া উঠে। মাতৃহীনা মেয়ে সে, কিন্তু মামীমার কোলে মানুষ হইয়া কোনও দিন সে দুঃখ তাহাকে অনুভব করিতে হয় নাই। এই ছোট গ্রামের গণ্ডির ভিতরই যদি তাহার জীবন কাটিয়া যাইত, তাহা হইলে দুঃখ ছিল কি? সত্য বটে, তাহা হইলে লেখাপড়া করা তাহার ঘটিয়া উঠিত না, বিশাল জগতের যেটুকু পরিচয় সে পাইয়াছে, তাহাও পাইত না। সেটা যে কতবড় ক্ষতি তাহা বুঝিবার মত বয়স ও জ্ঞান মৃণালের হইয়াছে। তবু মন তাহার যেন বুঝিতে চায় না। এই ত গ্রামে কত মেয়ে আছে, যাহাদের অক্ষর-পরিচয়ও হয় নাই, অথচ কি নিশ্চিন্ত সুখে তাহাদের দিন কাটিয়া যাইতেছে। মৃণালেরও কি তেমনই কাটিতে পারিত না? কিন্তু সুখ, শান্তি, নিশ্চিন্ততা, স্বাধীনতা কিছুই নাই, এমন মেয়েও সে কম দেখে নাই। তাহাদের দিক্ হইতে চোখ ফিরাইয়া লইলেই চলে না। যদি শিক্ষাদীক্ষা কিছুমাত্র এই মেয়েগুলির থাকিত, তাহা হইলে পরের হাতে এমন খেলার পুতুল হইয়া তাহাদের জীবন কাটিত না।

মোটের উপর সে স্বীকারই করে যে স্বাবলম্বনের পথে দাঁড় করাইয়া দিয়া পিতা তাহার পরম উপকারই করিয়াছেন। পথে অনেক কাঁটা, তা আর কি করা যাইবে? কোন্ পথে বা নাই? এই পথে ত তবু ভবিষ্যতে কিছু সুখের আভাস কল্পনা করা যায়। অন্য অনেকের ত সেটুকু সুখও নাই। চিনি-টিনিকে লেখাপড়া শিখাইতে তাহাদের মায়ের কেন যে এত আপত্তি, তাহা মৃণাল বুঝিতে পারে না। মামীমা নিজের শান্তির নীড়টুকুর বাহিরে কিছুই দেখিতে চান না, কিন্তু তাঁহার মেয়েদের অদৃষ্টও যে তাঁহারই মত সুপ্রসন্ন হইবে তাহার স্থিরতা কি?

মামীমা রান্নাঘর হইতে ডাকিয়া বলিলেন, "ওরে মিনু, আমার হয়ে গেছে, ঠাঁই করেছি, খাবি আয়।"

খোকাকে কোলে করিয়া মৃণাল রান্নাঘরের দাওয়ায় আসিয়া দাঁড়াইল। চিনি আর টিনিও মাছের টক দিয়া গরম ভাত খাইবার লোভে তাহার পিছন পিছন আসিয়া জুটিল। কিন্তু মা তাহাদের একেবারেই আমল দিলেন না, তৎক্ষণাৎ বিদায় করিয়া দিলেন।

মৃণালের ভাত বাড়িয়া দিয়া খোকাকে গৃহিণী ভাগ্নীর কোল হইতে টানিয়া লইলেন। মৃণাল খাইতে বসিল। বোর্ডিঙের খাওয়ায় পয়সা যথেষ্ট খরচ হয়, কিছু যে খারাপ খাইতে দেয় বা কম দেয় তাহাও নহে, তবু সেখানে পেট ভরে ত মন ভরে না। অন্য মেয়েরা রান্না লইয়া, রোজ একঘেয়ে তরকারি লইয়া খুব সমালোচনা করে, মৃণাল ততটা করিতে পারে না, তাহার লজ্জাই হয়। সে যে পাড়াগাঁয়ের মেয়ে, অতি সাধারণ গৃহস্থঘরের মেয়ে, তাহা ত সবাই জানে। সে বেশী সমালোচনা করিলে কেহ যদি উলটিয়া বলে, "বাড়ীতে তুমি দুবেলা কি পোলাও-কালিয়া খেতে গো?" তাহা হইলে সে কি উত্তর দিবে? কিন্তু মন তাহার অন্য মেয়েদের সমানই খুঁৎখুঁৎ করে।

মামীমা সামনে বসিয়া তাহাকে খাওয়াইতে লাগিলেন। এত সকালে মানুষে কত ভাতই বা খাইতে পারে? তবু বারবার অনুরোধ করিয়া এটা-সেটা পাতে তুলিয়া দিয়া, মামীমা তাহাকে খানিকটা খাওয়াই ছাড়িলেন।

মৃণাল হাত-মুখ ধুইয়া কাপড় পরিতে গেল। গ্রামে যত দিন থাকে, জুতামোজার সঙ্গে তাহার কোনও সম্পর্ক থাকে না, যতই শীত পড়ুক না কেন। কিন্তু কলিকাতার জীবনে এ-সব ত তাহার নিত্য সঙ্গী। তাহাকে জুতামোজা পরিতে দেখিয়া চিনি-টিনিও লাফালাফি করে, তাহারাও দিদির মত জুতামোজা পরিবে। হাতখরচের পয়সা জমাইয়া মৃণাল একবার তাহাদের জন্য দুই জোড়া জুতামোজা কিনিয়া আনিয়াছিল। কিন্তু ঐ লাফালাফি পর্য্যন্তই। জুতামোজা পরিলে ত অমন বনের হরিণের মত লাফাইয়া বেড়ানো যায় না? কাজেই জুতামোজা তাকেই তোলা থাকে, আছে যে সেই আনন্দই চিনিদের যথেষ্ট।

বাহিরে গরুর গাড়ী আবার জোতা হইল। মৃণালের নির্দ্দেশমত তাহার জিনিষপত্র গাড়োয়ান এক এক করিয়া গাড়ীতে তুলিয়া দিল। মামীমা জিজ্ঞাসা করিলেন, "হ্যাঁ রে, খান দু-চার চন্দ্রপুলি ছেঁড়া কানিতে বেঁধে দেব? পথে যেতে যদি খিদে পায়?"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "কিছু দরকার নেই মামীমা। এই ত পেট ভ'রে খেলাম, আর বিকেলবেলায়ই ত পৌঁছে যাব, আবার কখন খাব? আমি ত আর টিনি নয় যে আধ ঘণ্টা অন্তর না খেলে মারা যাব?"

মল্লিক-মহাশয় চাদর গায়ে দিয়া বাহির হইয়া আসিলেন, তিনি ভাগ্নিকে ট্রেনে তুলিয়া দিয়া আসিবেন। ষ্টেশন মাষ্টারের এক বোন এই ট্রেনে কলিকাতা যাইতেছেন, কাজেই ষ্টেশন পর্য্যন্ত পৌঁছাইয়া দিলেই তিনি নিশ্চিন্ত।

মামীমাকে প্রণাম করিয়া, ভাইবোনদের আদর করিয়া মৃণাল গাড়ীতে উঠিয়া বসিল। মুখটা অন্য দিকে ফিরাইয়া রাখিল, যাহাতে চোখের জল কেহ না দেখিতে পায়। পনর বৎসর বয়স ছাড়াইয়া গেল, এখনও প্রতি ছুটির শেষে বোর্ডিঙে ফিরিতে তাহার দুই চোখ জলে ভরিয়া উঠে।

চিনি ডাকিয়া বলিল, "এবার আসবার সময় ভাল দে'খে বেশী ক'রে চকোলেট নিয়ে এস।"

তাহার মা তাড়া দিয়া বলিলেন, "হ্যাঁ, তা আর নয়, দিদি একেবারে টাকার ছালার উপর ব'সে আছে, তোমাদের জন্যে বাক্স ভ'রে মিষ্টি নিয়ে আসবে।"

গ্রাম্য পথে ধূলা উড়াইয়া গরুর গাড়ী চলিতে লাগিল। মৃণাল খানিকক্ষণ মুখ ফিরাইয়া লইল, তাহার পর জোর করিয়া আত্মসম্বরণ করিয়া চোখ মুছিয়া ফেলিল। বাড়ীর দিকে তাকাইয়া দেখিল, মামীমা তখনও কানুকে কোলে করিয়া বাহিরের দাওয়ায় দাঁড়াইয়া আছেন। চিনি-টিনি অদৃশ্য হইয়া গিয়াছে।

দু-ধারে অতি-পরিচিত খড়ের ঘরগুলি, আঙিনায় ধূলিমলিন-দেহ বালকবালিকার নৃত্য, ছোট সঙ্গীতমুখর নদীটি, সব একে একে পার হইয়া গেল। ছোট গ্রাম্য বাজারের ভিতর দিয়া এখন গাড়ী চলিতেছে। দুই ধারের পথিক উৎসুক-দৃষ্টিতে চাহিয়া দেখিতেছে গাড়ীর ভিতর কে যায়। সকলের আসা-যাওয়া সম্বন্ধে এখানে সকলের কৌতূহল, পল্লীসমাজ যেন একটি বৃহৎ পরিবার, কেহ কাহারও অচেনা, অজানা নয়।

ক্রমে গাড়ী আসিয়া ষ্টেশনের বাহিরে দাঁড়াইল। একটি লাল পাথরের ঘর, একটা টিনের শেড্ আর লাল কাঁকর-বিছানো প্রকাণ্ড প্ল্যাটফর্ম্ম। গোটা-দুই বড় বড় অশ্বত্থ গাছ চারিদিকে ডালপালা ছড়াইয়া অনেকখানি জায়গা ছায়াশীতল করিয়া রাখিয়াছে, তাহারই তলায় যাত্রীর দল আড্ডা গাড়িয়াছে। এক জায়গায় একখানি লোহার বেঞ্চ, ষ্টেশন মাষ্টারের বোন সেইখানে নিজের ছেলেমেয়ে লইয়া বসিয়া আছেন। ঘরের ভিতর বড় গরম, পাখার কোনও ব্যবস্থা নাই, কাজেই পারতপক্ষে সেখানে কেহই বসে না।

মৃণালকে দেখিয়া তিনি ডাকিয়া বলিলেন, "এইখানে এস, তবু একটু ছায়া আছে।"

মৃণাল আসিয়া তাঁহার পাশে বসিল। বলিল, "গাড়ী আসতেও ত আর বেশী দেরি নেই।"

ভদ্রমহিলা বলিলেন, "এই এসে পড়ল ব'লে। এখন একরাশ পোঁটলাপুঁটলি উঠলে বাঁচি।"

ট্রেন সত্যই আসিয়া পড়িল। মৃণাল মামাবাবুকে প্রণাম করিয়া গাড়ীতে উঠিয়া গেল। এক মিনিট পরেই ট্রেন ছাড়িয়া দিল।

(৪)

কলিকাতা পৌঁছাইতে প্রায় বেলা গড়াইয়া গেল। শীত কালের দিন, চারিটা বাজিতে-না-বাজিতে যেন দিনের আলো ম্লান হইয়া আসিতে থাকে। তাহার পর নামিয়া আসে নগরের উপর ধোঁয়ার পর্দ্দা, দুই হাত দূরে মাত্র মানুষের দৃষ্টি চলে, রাস্তার আলোসুদ্ধ ঘোলাটে দেখাইতে থাকে। মন মুষড়িয়া পড়ে, নিঃশ্বাসের সঙ্গে সঙ্গে বুকের ভিতর এক অঞ্জলি করিয়া যেন কয়লার গুঁড়া ঢুকিয়া যায়।

মৃণাল ষ্টেশনে নামিয়া বলিল, "আমি কি আজ আপনাদের সঙ্গেই যাব, না আমাকে বোর্ডিঙে পৌঁছে দিয়ে আসতে পারবেন?"

তাহার সঙ্গিনীর মৃণালকে বাড়ী পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া যাইবার বিশেষ ইচ্ছা ছিল না। তাঁহার অতি ছোট বাড়ী, শুইবার ঘর মাত্র একখানি। বাহিরের লোক আসিলেই বিপদে পড়িতে হয়। পুরুষ-অতিথি হইলেও না-হয় তাহাকে যেখানে সেখানে শুইতে দেওয়া যায়, কিন্তু এ যে আবার স্ত্রীলোক!

তিনি একটু অনাবশ্যক ব্যস্ততার সঙ্গেই বলিলেন, "তোমাকে উনি পৌঁছেই দিয়ে আসুন ভাই, আমি খোকার

সঙ্গেই বেশ যেতে পারব, চেনা রাস্তা ত? বাড়ীঘর সব এক-হাঁটু হয়ে আছে, আমি এতদিন ছিলাম না।"

মৃণাল ভাবিল, সে ত মস্ত আয়েসী মানুষ, তাহার জন্য আবার ভাবনা! কিন্তু যাহার বাড়ী সেই যদি না রাখিতে চায় ত মৃণাল কি আর জোর করিয়া যাইবে? বোর্ডিঙেই যাওয়া যাক। যদিও আজকার রাত্রিটা অন্ততঃ বাহিরে কাটাইতে পারিলে তাহার ভাল লাগিত।

বলিল, "তা বেশ, আমাকে উনি দিয়েই আসুন।"

দুইখানা গাড়ী ডাকা হইল। মৃণাল নিজের অল্পস্বল্প জিনিষপত্র লইয়া একখানাতে উঠিয়া বসিল। ষ্টেশন-মাষ্টারের বোন নিজের ছেলেপিলে লটবহর লইয়া আর-একখানি অধিকার করিলেন। কুলীর চীৎকার, গাড়ীর ঘড়ঘড়ানি, ট্রাম-বাসের কোলাহলের ভিতর দিয়া গাড়ী চলিতে আরম্ভ করিল।

কি দানবীয় মূর্ত্তি এই কলিকাতা শহরটার। মৃণালের যেন বিশ্বাস করিতে ইচ্ছা করে না যে আর কয়েকটা মাত্র ঘণ্টা আগে সেই শ্যামল গাছের ছায়ার কোলে সাজানো ছোট সুন্দর গ্রামখানিতে সে ছিল। যেন মায়ের কোলের মত স্নিগ্ধ, ভোরের আলোর মত মনোহর। তাহার কাছে কলিকাতা যেন মায়াবিনী রাক্ষসী। চোখ ভুলাইবার, মন ভুলাইবার অসংখ্য উপকরণ তাহার কাছে, কিন্তু সে একবার এই মুখোস খুলিলে হয়, তখন সে সাক্ষাৎ মৃত্যু-রূপিণী পিশাচী। এখানে থাকিতে থাকিতে মানুষ কেন পাথর হইয়া যায় না, তাই মৃণাল ভাবে। খানিকটা হয় বই কি? পাড়াগাঁয়ের মানুষের মনে যতখানি স্নেহ-প্রীতি থাকে, এখানে ততটা সত্যই যেন থাকে না। অন্ততঃ মৃণালের তাহাই মনে হয়।

মামার বাড়ী হইতে ষ্টেশনে আসিতে মৃণাল চোখকে এক মুহূর্ত্তের জন্য বিশ্রাম দেয় নাই, সেই সহস্রবার-দেখা মাঠ, বন, নদী, খেলাঘরের মত সাজানো খড়ের ঘরগুলি, সব অতৃপ্ত চোখে দেখিতে দেখিতে আসিয়াছে। এখানে কিন্তু তাহার ইচ্ছা করিতে লাগিল, চোখ বুজিয়া রাস্তাগুলা পার হইয়া যায়। কিন্তু চোখ সে চাহিয়াই রহিল। ভাল লাগুক আর না-ই লাগুক, এই কলকোলাহল, এই মানুষের আর বিবিধ রকমের গাড়ী-ঘোড়ার স্রোত, ইহার দিক্ হইতে মনও ফিরে না, চোখও ফিরে না। দুই দিন বাদেও যদি কোথা হইতে ঘুরিয়া এস তাহা হইলে মনে হয় কলিকাতা অনেকখানিই যেন অন্য রকম হইয়া গিয়াছে। দোকানপাটের ত নিত্য পরিবর্ত্তন হইতেছে। রাস্তাঘাটও থাকিয়া থাকিয়া বদ্‌লাইয়া যায়। আর নূতন বাড়ীর ত সংখ্যাই করা যায় না, একটার পর একটা এমন দ্রুতবেগে গজাইয়া উঠিতে থাকে, যে, তাহাদের কল্যাণে দেখিতে দেখিতে সমস্ত জায়গাটারই চেহারা বদ্‌লাইয়া যায়।

হাওড়া হইতে বোর্ডিঙে পৌঁছাইতে মৃণালের প্রায় পুরা এক ঘণ্টাই কাটিয়া গেল। তাহার পর নিয়ম মত দরোয়ান আসিয়া গেট খুলিয়া দিল, কোন্ দিকে গাড়ী লইয়া যাইতে হইবে তাহাও গাড়োয়ানকে দেখাইয়া দিল। মৃণালের সঙ্গীটি এইবার নামিয়া পড়িয়া বিদায় গ্রহণ করিয়া চলিয়া গেলেন। মেয়েরা দুই-চারজন কে আসিয়াছে দেখিবার জন্য ছুটিয়া আসিয়া দাঁড়াইল। মৃণালকে দেখিয়া দুইজন আবার চলিয়া গেল, মৃণাল অন্য ক্লাসের মেয়ে, তাহার আসা-না-আসায় এই দুইজনের কিছু আসিয়া যায় না, আর দুইজন দাঁড়াইয়া রহিল, ইহারা তাহার বন্ধুর দলের।

মৃণাল নামিয়া পড়িতেই একজন বলিল, "খুব সময়ে এসে পড়েছিস, এখনই খাবার ঘণ্টা পড়বে। সারাটা দিন ট্রেনে না-খেয়ে এসেছিস ত? তোর নিয়ম আমার জানা আছে।"

মৃণাল একটু হাসিয়া তাহাদের সঙ্গে অগ্রসর হইয়া চলিল, পিছনে বেয়ারা তাহার বাক্স-বিছানা বহন করিয়া আনিতে লাগিল।

আবার সেই খাঁচায় বন্দী। আর সে মানুষ নয়, কলের পুতুলমাত্র। ঘণ্টা পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাহাকে উঠিতে বসিতে হইবে, শুইতে হইবে, ঘুমাইতে হইবে। ইচ্ছামত, যখন যাহা খুশী যে মানুষ করিতে পারে, তাহা একেবারে ভুলিয়া যাইতে হইবে।

কিন্তু এই জীবনেরও মূল্য আছে, এমন ভাবে কঠিন শাসনের অধীন হইয়া থাকারও প্রয়োজন আছে তাহা স্বীকার না-করিয়া মৃণাল থাকিতে পারে না। কিন্তু মন বুঝিতে চায় না, মৃণালের মন অন্য মেয়েদের চেয়ে যেন একটু বেশী

ঘরমুখী। ছেলেবেলা হইতে আপন ঘর তাহার নাই, পরের ঘরেই সে পালিত, তাই কি ঘরের দিকে এত বেশী তাহার মন পড়িয়া থাকে? বড় হইয়া কি সে করিবে, কেমন ভাবে জীবন যাপন করিবে? ভাবিতে গেলে ঐরকম একটি সুন্দর পল্লীভবনের ছবিই কেন সবার আগে তাহার মানস-নেত্রের সম্মুখে ভাসিয়া উঠে? আর কোনও রকম ভবিষ্যতের কল্পনা কেন সে করিতে পারে না?

ছুটির আগে একদিন বেড়াইবার সময় তিন বন্ধুতে গল্প হইতেছিল। আশা বলিল, "বাপ রে, কবে যে এই ঘানিতে ঘোরা শেষ হবে! আর পারা যায় না, এখনও হয়ত পাঁচ-ছ'টা বছর এরই মধ্যে কাটাতে হবে, ভাবলেই আমার প্রাণ যেন হাঁপিয়ে ওঠে।"

প্রমীলা বলিল, "আমি বাবা এই ম্যাট্রিক পর্য্যন্ত, তার পর আর এমুখো হচ্ছি নে। অত ব্লু ষ্টকিং হয়ে আমার দরকার নেই।"

মৃণাল হাসিয়া বলিল, "ও, সনাতন ধর্ম্ম অবলম্বন করবে বুঝি? সব ঠিক হয়ে আছে নাকি?"

প্রমীলা মুখ ঘুরাইয়া বলিল, "নাই বা ঠিক হ'ল? ঠিক হ'তে কতক্ষণ? আমার বাপু সোজা কথা, একটু পড়াশুনো না করলে আজকাল চলে না, লোকে মুখ্যু ব'লে ঠাট্টা করে, তাই পড়তে আসা। তার পর কলেজের পড়া পড়তে পড়তে পিঠ কুঁজো হয়ে যাক, চোখে চশমা উঠুক, তখন যা ছিরি হবে।"

আশার বাড়ীর সব মেয়েরাই উচ্চশিক্ষিতা। মা বি-এ পাস, দুই দিদি বি-এ পাস, তাহাকেও যে বি-এ পাস করিতে হইবে সে বিষয়ে কোনও সন্দেহই নাই, এবং তাহাতে আশার বিন্দুমাত্র আপত্তিও নাই। তাই প্রমীলার কথায় চটিয়া গিয়া বলিল, "হ্যাঁ গো হ্যাঁ, সবই পড়াশুনোর দোষ। তোমরা স্বাস্থ্যের কোনও একটা নিয়ম মেনে চলতে জানবে না, আর দোষ হবে পড়াশুনোর। আমার মায়ের ত তিনকাল গিয়ে এককালে ঠেকেছে, কোনওদিন তাঁকে চশমা পরতে দেখেছিস? বড়দি আর মেজদি ত তোর সামনেই এখান থেকে ড্যাং ড্যাং করতে করতে বি-এ পাস ক'রে বেরিয়ে গেল, তাদের পিঠে কত বড় কুঁজ ছিল? তাদের কেউ আর পোঁছে নি, না?"

আশার বড় বোন বিভা সুন্দরী, সুশিক্ষিতা, তাঁহার বিবাহ চট্ করিয়াই হইয়া গিয়াছে। মেজ বোন শুভাও বেশ জোর কোর্টশিপ চালাইতেছেন, কাজেই তাঁহাদের কেহ পোঁছে না একথা আর কি করিয়া বলা যায়? তবু প্রমীলা হটিবার মেয়ে নয়, বলিল, "দু-একটা 'এক্‌সেপ্‌শুন্' থাকলেই যে জিনিষটা অপ্রমাণ হয়ে যায় তা ত নয়? কত গণ্ডায় গণ্ডায় মেয়ে দেখেছি, উচ্চশিক্ষার ঠেলায় যাদের স্বাস্থ্য, সৌন্দর্য্য দুইই নষ্ট হয়ে গেছে।"

আশা বলিল, "আর আমি হাজারে হাজারে অশিক্ষিতা মেয়ে দেখেছি যাদের স্বাস্থ্যও নেই, সৌন্দর্য্যও নেই, আছে কেবল বোকার মত লম্বা লম্বা কথা, যা তারা স্বার্থপর পুরুষের কাছে শিখেছে এবং না বুঝে তোতা পাখীর মত আওড়াচ্ছে। আর আছে কোলে, পিঠে, কাঁখে, গণ্ডায় গণ্ডায় ছেলে।"

তর্কটা শেষে ঝগড়ায় পরিণত হইবার উপক্রম করিতেছে দেখিয়া মৃণাল বলিল, "যাকগে ভাই, ও নিয়ে তর্ক ক'রে কি হবে? তর্কেতে আর কি প্রমাণ হবে? দু-পক্ষেই ত ঢের কথা বলবার আছে।"

আশা বলিল, "আচ্ছা তোর নিজের মতলবখানা কি শুনি? তুই ম্যাট্রিক পাস ক'রেই বিয়ে করতে দৌড়বি, না কলেজে পড়বি?"

মৃণাল বলিল, "সবটাই কি আর আমার হাতে থাকবে ভাই? বাবা রয়েছেন, মামা রয়েছেন, তাঁদের কি মত হবে কে জানে? আমার নিজের অবশ্য ইচ্ছে যে কলেজেই পড়ি।"

আশা বলিল, "তবে দেখ, মৃণাল যে অত পাড়াগাঁয়ের ভক্ত, সেও মুখ্যু হয়ে থাকতে চায় না, আর তোর বাড়ী কলকাতায়, তোর এত সাত-তাড়াতাড়ি গোয়ালে ঢুকবার সখ কেন রে?"

প্রমীলা হাসিয়া বলিল, "তা আমার যদি সখ হয় বাপু ত কি করা যাবে? হাই-হীল জুতো প'রে, হাতে ব্যাগ নিয়ে, খট্ খট্ ক'রে ক্লাসে পড়াতে যাচ্ছি, কি ডাক্তারী করতে যাচ্ছি, তা ভাবতে আমার একটুও ভাল লাগে না। তার চেয়ে রান্নাবান্না ঘরকন্নার কাজ করছি ভাবতে ঢের বেশী ভাল লাগে।"

আশা বলিল, "আসল পয়েণ্টটা বাদ দিয়ে যাচ্ছ কেন?"

প্রমীলা বলিল, "বাদ দেওয়াদেয়ি আর কি? ঘর-সংসার যখন করব, তখন ঘরের কর্ত্তা একটা থাকবে, সে ত জানা কথা।"

মৃণাল বলিল, "আমার ভাই একটি ছোট সুন্দর খড়ের চাল-দেওয়া ঘর, আর চারিদিকে খোলা মাঠ, এই ভাবতেই চমৎকার লাগে। কিন্তু কর্ত্তাটর্ত্তার ভাবনা এখনও মনে আনতে পারি নে বাপু।"

প্রমীলা বলিল, "তা খড়ের ঘরে কি তুই একলা হাত পা ছড়িয়ে ব'সে থাকবি নাকি? যত অনাসৃষ্টি কথা, চিরকেলে খুকি এক তুই।"

এই সময় ঢং ঢং করিয়া ঘণ্টা পড়িয়া যাওয়ায় বেড়ানো এবং গল্প দুই-ই শেষ হইয়া গেল।

সত্যই মৃণাল ভাবিয়া ঠিক করিতে পারিত না যে ভবিষ্যৎ জীবনটা কি রকম হইলে তাহার পক্ষে সব চেয়ে সুখের হয়। শিক্ষা যতদূর পাওয়া সম্ভব সব সে পাইতে চায়, কাহারও গলগ্রহ হইয়া পরমুখাপেক্ষী হইয়া থাকিতেও সে চায় না, কিন্তু চিরকাল চাকরী করিয়া কাটাইতেছে ভাবিতেও তাহার ভাল লাগে না। শহরে থাকিতে সে চায় না, পল্লীভবনেই ফিরিয়া যাইতে চায়। কিন্তু সেখানে কেমন ভাবে থাকিবে, কি কাজে দিন কাটিবে, তাহা এখনও তাহার মনে স্পষ্ট হইয়া উঠে নাই। কিন্তু অদৃষ্টে তাহার কি আছে তাহা কেই বা বলিতে পারে? মামা-মামী ত উচ্চশিক্ষার একান্ত বিরোধী। বাবা যদিও তাহাকে পড়িতে পাঠাইয়াছেন, কিন্তু সেটা উচ্চশিক্ষার প্রতি অনুরাগবশতঃ নয়, অন্য কোনও উদ্দেশ্যে। মেয়ের যদি বিবাহ তিনি না দিতে পারেন, তাহা হইলে সে একেবারে অসহায় না হইয়া পড়ে, সেটা ত দেখিতে হইবে? সেই জন্যই তাহাকে পড়িতে দেওয়া। বিবাহ দিতে পারিলে ত তিনি দিবারই যথাসাধ্য চেষ্টা করিবেন, এবং মামা-মামীও তাঁহাকে সাহায্যই করিবেন।

ট্রেন হইতে নামিয়া মৃণালের মাথাটা কেমন যেন ধরিয়া উঠিয়াছিল। একবার স্নান করিতে পাইলে হইত। পাড়াগাঁয়ে সে দিব্য শীত উপভোগ করিয়া আসিয়াছে, কলিকাতায় কিন্তু এখনও বিশেষ শীত পড়ে নাই। কিন্তু বোর্ডিঙে ইচ্ছা করিতেছে বলিয়াই ত আর কিছু করিবার জো নাই? কাজেই হাতমুখ ধুইয়া, কাপড় বদলাইয়া সে খাইতে চলিল। আয়োজন বাড়ীর চেয়ে এখানে বেশী, তবু খাইয়া মন উঠে না। প্রতি টেবিলে একজন করিয়া শিক্ষয়িত্রী মেয়েদের সঙ্গে খাইতে বসেন, কাজেই হাজার অসন্তোষ মনের মধ্যে জমা হইয়া থাকিলেও মুখ ফুটিয়া কিছু বলিবার উপায় নাই। ভাল লাগুক বা মন্দ লাগুক, সব-কিছু মুখ বুজিয়া খাইয়া যাইতে হইবে।

খাওয়া চুকিয়া গেল, তাহার পর একটা একটা করিয়া ঘণ্টা পড়িবে, আর পুতুলনাচের পুতুলের মত মেয়েদের তালে তালে হাত-পা নাড়িতে হইবে। একেবারে শুইবার ঘণ্টা পড়িলে তখন এই নাট্যের শেষ। কাল হইতে সমানে ক্লাস আরম্ভ হইবে, তখন আর এসব ভাবিবার অত সময় থাকিবে না। মামার বাড়ী হইতে ফিরিয়া আসিয়া প্রথম কয়টা দিন বড় বেশী খারাপ লাগে, তাহার পর এখানকার কর্ম্মস্রোতে সে ভাসিয়া চলে, মন লইয়া নাড়াচাড়া করিবার অত সময়ও সে পায় না। বন্ধুবান্ধবদের সঙ্গও তাহাকে খানিকটা ভুলাইয়া রাখে। সামনে পরীক্ষা, তাহার ভাবনাও বড় কম নয়। এইবারে বাৎসরিক পরীক্ষায় পাস করিলে সে ম্যাট্রিক ক্লাসে উঠিবে, তাহার পর ত মস্ত বড় পরীক্ষা। তাহা কি মৃণাল পাস করিতে পারিবে, কে জানে? বয়স ত যথেষ্ট হইয়াছে, ফেল করিলে ছোট ছোট সব মেয়ের সঙ্গে পড়িতে হইবে, সে এক মহা লজ্জার কথা।

ম্যাট্রিকের পর বাবা তাহাকে পড়াইবেন কিনা কে জানে? মামা-মামী ত এইতেই বিরক্ত। ষোল বছরের মেয়ে হইতে চলিল, এখনও বিবাহের নামগন্ধ নাই। দ্বিতীয়পক্ষে বিবাহ ত অনেকেই করে, কিন্তু এমন পর হইয়া কেহ যায় না। নিতান্ত কয়েকটা টাকা না দিলে নয়, তাই ফেলিয়া দিয়াই মৃণালের বাবা খালাস। মেয়ের কাছে বৎসরে একখানা চিঠিও লেখেন কি না সন্দেহ, বিজয়ার সময় হয়ত লেখেন। মল্লিক-মহাশয়ের কাছে কখনও কখনও একটা করিয়া পোষ্টকার্ড আসে, এই পর্য্যন্ত।

মৃণাল জানে, তাহার অনেকগুলি ভাইবোন হইয়াছে,

কিন্তু কাহাকেও সে চোখে দেখে নাই, নামধামও বিশেষ কাহারও জানে না। বড় বোনটি বোধ হয় দশ বৎসরের হইবে। মাঝে মাঝে তাহাদের দেখিতে ইচ্ছা করে, বাবাকেও দেখিতে ইচ্ছা করে। যেমনই ব্যবহার করুন, তিনি বাবা ত বটে? ভাইবোনগুলিও আপনারই। কিন্তু মৃণাল জানে এ-সব সাধ পূর্ণ হইবার কোনও সম্ভাবনা নাই। কে তাহাকে সেখানে লইয়া যাইবে? বাবাও যে তাহাকে দেখিয়া খুশী হইবেন এমন কথা জোর করিয়া বলা যায় না। বিমাতা নিশ্চয়ই খুশী হইবেন না।

এবারে বাবার কাছ হইতে বিজয়ার সময় যে চিঠিখানা পাইয়াছে, তাহাতে তিনি লিখিয়াছিলেন, তাঁহার শরীর ভাল নাই। বেশী অসুখ কিনা কে জানে? মৃণাল চিঠির উত্তর দিয়াছিল, কিন্তু তাহার পর আর চিঠি পায় নাই।

[ক্রমশঃ]

উন্মুখ

শ্রীশান্তি পাল

আমার মরমে যে সুর বাজিছে
বাহির হইতে চায়,—
শত শত রূপে শত শত মুখে
গমকে মূর্চ্ছনায়।
সুর যে চিনিতে পারে
বিহ্বল করে তারে
বধির শ্রবণে ধরা নাহি দেয়
পলকে মিলায়ে যায়;
নীরব মূর্চ্ছনায়।

আমার এ-সুর আপনার হাতে সাধা
খর গান্ধারে বাঁধা
নিমেষে নিমেষে ঝঙ্কারি ওঠে
নূপুরের রোলে আধা;
এ যে পরাণে পরাণে বাঁধা।

আমার এ-সুর ধ্বনিছে শূন্যে বাতাসে,—
বিরহ-মিলনে হাসি ক্রন্দন হতাশে,
সকল প্রাণের সকাশে।
সকল রাগিণী পরখ করিয়া
মিশিছে আবার বিভাষে;
সুর ধৈবতে বিকাশে।

আমার এ-সুর ঝলমল করে নিশীথে
তট-অরণ্যে কল-কল্লোলে মিশিতে।
গ্রাম-প্রাঙ্গণে ছায়াঘন বনে
ঢেলে যায় বারি আপনার মনে,—
বর্ণে বর্ণে নীলনবঘনে
সিঞ্চিত করে তৃষিতে;
ওগো, প্রভাত প্রদোষে নিশীথে।

পুস্তক পরিচয়

সঞ্চয়িতা—শ্রীরবীন্দ্রনাথ ঠাকুর। তৃতীয় সংস্করণ। বিশ্বভারতী-গ্রন্থালয়, ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, কলিকাতা। ডিমাই আট পেজি, ৬৪০ পৃষ্ঠা। মূল্য—কাগজের মলাট ৪৲, বাঁধান ৫৲।

কবিদিগের কাব্য-গ্রন্থাবলী হইতে বাছিয়া কতকগুলি কবিতা নমুনার মত পাঠকসমাজে উপস্থিত করিবার কাজ সাধারণতঃ কবিরা নিজে করেন না, অন্যেরা করেন। রবীন্দ্রনাথ এই প্রথার ব্যতিক্রম করিবার কারণ এই বলিয়াছেন, "যাঁরা আমার কবিতা প্রকাশ করেন অনেক দিন থেকে তাঁদের সম্বন্ধে এই অনুভব করছি যে, আমার অল্প বয়সের যে সকল রচনা স্খলিত পদে চল্‌তে আরম্ভ করেছে মাত্র, যারা ঠিক কবিতার সীমার মধ্যে এসে পৌঁছয় নি, আমার গ্রন্থাবলীতে তাদের স্থান দেওয়া আমার প্রতি অবিচার।" "যে কবিতাগুলিকে আমি নিজে স্বীকার করি তার দ্বারা আমাকে দায়ী করলে আমার কোনো নালিশ থাকে না। বন্ধুরা বলেন ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা চাই। আমি বলি লেখা যখন কবিতা হয়ে উঠেছে তখন থেকেই তার ইতিহাস। এ নিয়ে অনেক তর্ক হোতে পারে সে কথা বলবার স্থান এ নয়।"

কোন কবির কাব্য-গ্রন্থাবলী প্রকাশ করিতে হইলে অল্প বয়সের সব মুদ্রিত কাঁচা লেখাও প্রকাশ করা, ইতিহাসের ধারা রক্ষা করা ছাড়া আর একটি কারণে আবশ্যক মনে হইতে পারে। তাহা কবির কবিত্বশক্তির ক্রমবিকাশ বুঝিবার ও বুঝাইবার সুবিধা। কিন্তু 'চয়নিকা' বা 'সঞ্চয়িতা'র মত সংকলন-গ্রন্থে ঐ প্রকার কাঁচা লেখা দেওয়া অনাবশ্যক, এবং কেহ দিলে তাহার সমর্থন করা যায় না। সুতরাং 'সঞ্চয়িতা' হইতে সেরূপ লেখা প্রায় বাদ দেওয়া সমীচীন হইয়াছে। কবির সমগ্র কাব্য-গ্রন্থাবলীর মধ্যে ঐরূপ সমস্ত লেখাই স্থান পাইলেও কোনও বুদ্ধিমান পাঠক সেগুলির জন্য কবিকে প্রতিভাহীন মনে করিবেন না।

'সন্ধ্যাসঙ্গীত,' 'প্রভাতসঙ্গীত,' ও 'ছবি ও গান' হইতে কবি "ইতিহাস রক্ষার খাতিরে এই সঙ্কলনে" মোট পাঁচটি কবিতাকে স্থান দিয়াছেন। তিনি লিখিয়াছেন, "তা ছাড়া ওদের থেকে আর কোন লেখাই আমি স্বীকার করতে পারব না।"

পুস্তকখানিতে ১৮৮টি কবিতা সঙ্কলিত হইয়াছে। কবি বলেন, "এই গ্রন্থে যে কবিতাগুলি দিতে ইচ্ছা করেছি তার অনেকগুলিই দেওয়া হোলো না। স্থান নেই। ছাপা অগ্রসর হোতে হোতে আয়তনের স্ফীতি দেখে ভীত মনে আত্মসংবরণ করেছি। এ রকম সংকলন কখনই সম্পূর্ণ হোতে পারে না।"

তাহা সত্য। কিন্তু এই সংকলনটি যেরূপ হইয়াছে, তাহাতে ইহা হইতেই রবীন্দ্রনাথের নানাবিধ খণ্ডকাব্য-রচনার প্রতিভা সম্বন্ধে যে ধারণা জন্মিবে তাহা ভ্রমসঙ্কুল হইবে না। ইহাতে বহু শ্রেষ্ঠ কবিতা স্থান পাইয়াছে।

বহি খানির ছাপা ও কাগজ উৎকৃষ্ট।

রামমোহন রায় ও মূর্ত্তিপূজা—শ্রীঅমরচন্দ্র ভট্টাচার্য্য। প্রথম সংস্করণ। পূর্ব্ব বাঙ্গালা ব্রাহ্মসমাজ, ঢাকা। মূল্য আট আনা। ডবল ক্রাউন ষোল পেজি পৃষ্ঠার (অর্থাৎ প্রবাসীর অর্দ্ধেক আকারের পৃষ্ঠার) ২১২ পৃষ্ঠা। ছাপা ভাল।

এরূপ বড় বহির আট আনা মূল্য খুব কম। গল্পের বহিও কচিৎ এত সস্তা হয়।

কয়েক দিন পূর্ব্বে বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভায় যখন এক জন মুসলমান সদস্য কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের নিশান ও সীলমোহরের মধ্যে 'শ্রী'-যুক্ত পদ্মের সমালোচনা প্রসঙ্গে হিন্দু ধর্ম্মকে পৌত্তলিকতা দোষদুষ্ট বলিতেছিলেন, তখন ব্যবস্থাপক সভার কংগ্রেসী দলের নেতা হিন্দু ধর্ম্মাবলম্বী শ্রীযুক্ত শরৎচন্দ্র বসু তাহাতে আপত্তি করিয়া এই মর্ম্মের কথা বলেন, যে, হিন্দুধর্ম্ম পৌত্তলিক ধর্ম্ম নহে, তাহার শ্রেষ্ঠ শাস্ত্রগুলি পৌত্তলিকতা শিক্ষা দেয় না। শ্রেষ্ঠ হিন্দু শাস্ত্রগুলি যে অপৌত্তলিক, ইহা সত্য কথা। খ্রীষ্টীয় মিশনারিদিগের আক্রমণের উত্তরে আধুনিক যুগে রামমোহন রায়ই প্রথমে প্রকৃত হিন্দুধর্ম্মের পক্ষ সমর্থন ও গৌরব ঘোষণা করেন। অথচ ইহা কালের বা অদৃষ্টের বা ইতিহাসের বা অন্য কিছুর ক্রূর পরিহাস, যে, সেই রামমোহন রায় তাঁহার জীবিত কাল হইতে এখন পর্য্যন্ত হিন্দুধর্ম্মের উক্তরূপ গৌরব ঘোষণা করিয়াছিলেন বলিয়া প্রশংসা অপেক্ষা নিন্দাই অধিক পাইয়া আসিতেছেন।

হিন্দুধর্ম্মের এবং অন্য সকল ধর্ম্মেরও—কেন্দ্রীভূত সত্যটির প্রচার ও প্রতিষ্ঠার চেষ্টা রামমোহনের জীবনের প্রধান কাজ। আটত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে বিচারপতি গুরুদাস বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের সভাপতিত্বে যে রামমোহন-স্মৃতিসভা হয়, তাহাতে সভাপতি মহাশয়কে ধন্যবাদ দিতে উঠিয়া বিখ্যাত হোমিওপ্যাথিক চিকিৎসক ডাক্তার মহেন্দ্রলাল সরকার বলেন, ঈশ্বরের একত্ব-প্রতিপাদন ও প্রচার-কার্য্যই রামমোহনের জীবনের মহত্তম লক্ষ্য ছিল।

তিনি নানা হিন্দু শাস্ত্রের নানা উক্তির সাহায্যে কি প্রকারে মূর্ত্তিপূজার অশ্রেষ্ঠত্ব ও নিরাকারোপাসনার শ্রেষ্ঠত্ব প্রতিপাদন করিয়াছিলেন, তাহা এই গ্রন্থে সুনিপুণভাবে দেখান হইয়াছে। যাঁহারা মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাস করেন, এবং রামমোহনের ভ্রম দেখাইতে চান, তাঁহাদের এই বহিখানি পড়া উচিত; আবার যাঁহারা মূর্ত্তিপূজায় বিশ্বাস করেন না—যেমন প্রটেষ্টাণ্ট খ্রীষ্টিয়ান, মুসলমান, ব্রাহ্ম ও আর্য্যসমাজীরা—তাঁহাদেরও ইহা পড়া উচিত। কাহারও "সব জানি" মনে করিয়া জ্ঞান লাভে বিরত থাকা উচিত নহে।

শ্রীযুক্ত সতীশচন্দ্র চক্রবর্ত্তী ইহার একটি উৎকৃষ্ট এগার পৃষ্ঠা ব্যাপী ভূমিকা লিখিয়া দিয়াছেন।

রামমোহন রায়ের সময়ের বাংলা অনেকের পক্ষেই এখন দুর্বোধ্য। গ্রন্থকার অনেক স্থলেই রামমোহনের যুক্তি আধুনিক বাংলায় পাঠকদিগের সমক্ষে উপস্থিত করিয়াছেন। তিনি সমুদয় যুক্তি সুন্দররূপে সাজাইয়াছেন। পুস্তকখানি ভারতীয় অন্যান্য প্রধান প্রধান ভাষায় ও ইংরেজীতে অনুবাদিত হইবার যোগ্য।

বঙ্গীয় মহাকোষ—প্রধান সম্পাদক শ্রীঅমূল্যচরণ বিদ্যাভূষণ। প্রকাশক শ্রীসতীশচন্দ্র শীল, ইণ্ডিয়ান রিসার্চ ইনষ্টিটিউটের

অবৈতনিক সাধারণ সম্পাদক। ১৭০, মানিকতলা স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রতি সংখ্যার মূল্য আট আনা।

এই মহাকোষের পঞ্চদশ সংখ্যা মুদ্রিত হইয়াছে। ইহার শেষ শব্দ 'অঙ্গুরী' ষোড়শ সংখ্যায় মুদ্রিত হইয়াছে।

এই গ্রন্থ পূর্ব্ববৎ দক্ষতার সহিত সংকলিত ও সম্পাদিত হইতেছে। কেবল বাংলা জানিলেও পাঠকেরা ইহা পড়িয়া সংস্কৃতিশালী হইতে পারিবেন।

চারণ কবি হুইটম্যান—হুইটম্যান-স্মৃতিসভা-কমীটি, ১৬ই জুলাই, ১৯৩৭। প্রকাশক শ্রীবিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়, ৪, ন্যায়রত্ন লেন, শ্যামবাজার, কলিকাতা। মূল্য এক আনা। প্রবাসীর পৃষ্ঠার অর্দ্ধেক মাপের ৩০ পৃষ্ঠা। এণ্টিক কাগজে সুমুদ্রিত।

গত ১৬ই জুলাই সিটি-কলেজ হলে যে হুইটম্যান-স্মৃতিসভার অধিবেশন হইয়াছিল, তদুপলক্ষে এই পুস্তিকাটি সুলভ মূল্যে প্রচারিত হয়। ইহাতে অধ্যাপক নৃপেন্দ্রচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়ের "ওয়াল্ট হুইটম্যান—বিদ্রোহী ও গণতান্ত্রিক" শীর্ষক সুচিন্তিত ও সুলিখিত প্রবন্ধটি, হুইটম্যানের জীবনকথা বিষয়ে শ্রীনৃপেন্দ্রকৃষ্ণ চট্টোপাধ্যায়ের একটি প্রবন্ধ, এবং শ্রীযুক্ত বিজয়লাল চট্টোপাধ্যায়কৃত হুইটম্যানের "Pioneers! O Pioneers", "Song of the Broad-Axe" এবং "To A Foiled European Revolutionaire" কবিতা তিনটির ওজস্বিতাপূর্ণ অনুবাদ আছে। বিদ্রোহী কথাটি গবর্মেণ্টের বিরুদ্ধে যুদ্ধকারী অর্থে ব্যবহৃত হয় নাই।

স্মৃতি-কণা—শ্রীজ্যোতিশ্চন্দ্র ঘোষ সম্পাদিত। মূল্য এক টাকা। ৩২।১০ পদ্মপুকুর রোড, ভবানীপুর, কলিকাতা, ঠিকানায় সম্পাদকের নিকট পাওয়া যায়।

ইহার কাগজ, ছাপা, বাঁধাই ও ছবি উৎকৃষ্ট। "সন্তানহারা পিতার নিদারুণ শোকে" রবীন্দ্রনাথ প্রমুখ বহু বিখ্যাত ও অন্য লোকদের সান্ত্বনা-বাক্য ও আশীর্ব্বাদ ইহাতে একসঙ্গে ছাপা হইয়াছে।

ড.

গোরা—শ্রীনরেশচন্দ্র মিত্র কর্তৃক নাটকাকারে গ্রথিত। প্রকাশক শ্রীকিশোরীমোহন সাঁতরা, বিশ্বভারতী গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ, ২১০ কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা। প্রথম সংস্করণ, ১৩৪৪ সাল। মূল্য ১৷৽।

রবীন্দ্রনাথের সুবৃহৎ উপন্যাস গোরা যে অভিনয়োপযোগী নাটকের রূপ পরিগ্রহ করিতে পারে একথা সম্ভবতঃ অনেকেরই মনে হয় নাই। মনে হইয়া থাকিলেও এ-কার্য্য একমাত্র রবীন্দ্রনাথেরই করণীয়, এবং তাঁহার পক্ষেই সহজসাধ্য, ইহাই স্বভাবতঃ সকলে ভাবিয়া থাকিবেন। শ্রীযুক্ত নরেশচন্দ্র মিত্র উদ্যোগী পুরুষ তাহাতে সন্দেহ নাই। তিনি সাহস করিয়া অতি দুঃসাধ্য কাজে হাত দিয়াছেন, এবং যতটা কৃতকার্য্য হইয়াছেন তাহার জন্যই প্রচুর প্রশংসা দাবী করিতে পারেন।

৬০০ পৃষ্ঠার একটি উপন্যাসকে ২০০ পৃষ্ঠার নাটকে রূপান্তরিত করিতে অবশ্যই জিনিষটাকে ভাঙিয়া গড়ার প্রয়োজন হইয়াছে, কিন্তু মালমশলার প্রায় সমস্তই নরেশবাবু মূল গ্রন্থ হইতে অবিকৃত ভাবে লইয়াছেন, ইহা অত্যন্ত বুদ্ধির কাজ হইয়াছে। কারণ, একথা বলিলে নিন্দার মত শোনানো উচিত নয় যে, গাঁথনিতে যেখানে যেখানে নরেশবাবুর স্বকীয় রচনার মিশাল দিতে হইয়াছে সেইস্থানগুলিতেই ভাল করিয়া জোড় বাঁধে নাই। কতকগুলি স্থানে মূলের সঙ্গে কিঞ্চিৎ অসঙ্গতি লক্ষ্য করিয়াছি, হয়ত ইহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু এ-বিষয়ে আরও একটু সাবধান হইলে নরেশবাবু ভাল করিতেন। দৃষ্টান্তস্বরূপ বলা যাইতে পারে, লাবণ্যকে দিয়া সামনের বছর বি-এ দেওয়াইবার কোনও বিশেষ গুরুতর প্রয়োজন ছিল বলিয়া আমাদের মনে হয় না। যদি ছিল, ত তাহাকে দিয়া একটা সেলাইকরা উলের টিয়াপাখী বিনয়কে দেখাইতে আনানো উচিত হয় নাই।

গোরার মধ্যে সূক্ষ্মমাত্র গল্পাংশ যেটুকু সেটুকুকে নরেশবাবু নাটকের আধারে ঠিকই ধরিয়া দিয়াছেন, কিন্তু গোরার যেটা Theme, যেটা তাহার মধ্যেকার সত্যকারের প্রাণবস্তু, সেটা কোথাও ভালরূপ ধরা পড়িয়াছে বলিয়া মনে হইল না। এমন কি গোরা-চরিত্রের মধ্যে সে যে প্রধানতঃ পূর্ণস্বরূপ ভারতবর্ষের উপাসক, দেশাচারের প্রতি তাহার শ্রদ্ধার মূলে আসলে যে একটা বিদ্রোহ, সে শ্রদ্ধা যে তাহার আজন্ম-সংস্কারের বিরোধী, তাহার হিন্দুয়ানী স্বয়ং রবীন্দ্রনাথের ভাষায় যে "নিজের ভক্তিবিশ্বাসের মধ্যে পর্য্যাপ্ত নহে", এই কথাগুলি আর একটু স্পষ্ট হইলে মূলের সম্মান রক্ষিত হইত। চরিত্রগুলির মধ্যে বিনয় যতটা রবীন্দ্রনাথের বিনয়, গোরা এইসব কারণে ততটা রবীন্দ্রনাথের গোরা রূপে প্রকাশ পায় নাই। পরেশবাবু ঠিক রবীন্দ্রনাথের পরেশবাবু নহেন। আনন্দময়ী, মহিম, হরিমোহিনী, প্রভৃতির চরিত্র লেখক ধরিতেও পারিয়াছেন বেশ এবং নাটকে সেগুলি ফুটিয়াছেও ভাল।

আর একটি কথা। উপন্যাসটি যখন প্রবাসীতে ধারাবাহিক রূপে বাহির হইয়াছিল তখন গোরার জন্মরহস্য সম্বন্ধে কোনও সুস্পষ্ট ইঙ্গিত সুরুর দিকে ছিল না, বই করিয়া ছাপিবার সময় বর্ত্তমানে যেটি ষষ্ঠ অধ্যায় সেটি রবীন্দ্রনাথ জুড়িয়া দিয়াছিলেন। বৃহদাকার উপন্যাসের পক্ষে ইহার প্রয়োজন ছিল, কিন্তু নাটকের শেষ পর্য্যন্ত রহস্যটিকে অনুদ্ঘাটিত রাখিয়া প্রকাশ করিলে হয়ত suspense বাড়িয়া নাটকটি আরও একটু বেশী জমিতে পারিত।

স. চ.

সে—রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রণীত। ২১০ নং কর্ণওয়ালিস স্ট্রীট, কলিকাতা, বিশ্বভারতী গ্রন্থালয়। মূল্য ২॥৽ টাকা, বাঁধান ৩৲ টাকা।

'নাৎনীর ফরমাসে মানুষ-গড়ার কাজে,' অর্থাৎ নিছক খেলার মানুষ তৈরির কাজে বইখানি রচিত। এই মানুষটি রাজা উজীর কেউ নয়, কেবলমাত্র সে। সে শ্রোত্রী ও রচয়িতার সঙ্গে সম্ভব অসম্ভব সকল দেশে ও কালে সম্ভব ও অসম্ভব নানা কাজে ঘুরে বেড়ায়। তাছাড়া বাঘ, শেয়াল প্রভৃতিরও অভাব এ বইটিতে নেই।

অনেক দিন আগে স্বর্গীয় সুকুমার রায় 'আবোল তাবোল' 'হ য ব র ল' প্রভৃতি রচনায় পদ্যে ও গদ্যে বাংলায় এই জাতীয় লেখা অনেক সৃষ্টি করেছিলেন। এখনও ছোট ছেলেমেয়েরা 'আবোল তাবোল' সানন্দে আবৃত্তি করে।

'সে' বইটিতে কবিতা বেশী নেই, অধিকাংশই গদ্য। তাকে মোটামুটি দুই ভাগে ভাগ করা যায়। এক অংশ শিশুদের উপভোগ্য, বাকিটি প্রধানতঃ বয়স্কদের। ''সুঁদর বনের কেঁদো বাঘ" প্রভৃতির মত কবিতা আরও কয়েকটি বেশী থাক্‌লে ছোট ছেলেমেয়েদের সুবিধা বাড়ত। ছবিগুলি ছোটদের বেশ পছন্দ। দ্বিতীয় পৃষ্ঠার রাঙা মাটির রাস্তার ছবিটি অনেক শিশুর মনোহরণ করেছে। ১৩৭ পৃষ্ঠার ছবিখানিও শিশুদের প্রিয়। ১০৬ পৃষ্ঠার বন-পথের ছবিটিও শিশুদের সার্টিফিকেট পেয়েছে। পাল্লারামের কাহিনী শিশুদের ভোটে উচ্চ স্থান পেয়েছে।

বইখানি ছোট ছেলেমেয়েদের জন্ম রচিত ব'লে তাদের পছন্দের কথাই বললাম। এর বাঁধাই ও অন্য সাজসজ্জা সুন্দর।

শতপর্ণী—শ্রীসুরেন্দ্রনাথ মৈত্র প্রণীত সনেট-শতক। কলিকাতার ২১০ নং কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট ভবনস্থিত বিশ্বভারতী গ্রন্থ-প্রকাশ বিভাগ হইতে প্রকাশিত। মূল্য ১৷৷০ টাকা।

বাংলা ভাষায় কেতাবী ভাষার অত্যাচার অত্যন্ত বেশী হওয়াতে তাহার বিরুদ্ধে একটি আন্দোলন কিছুকাল হইতে চলিতেছে। উদ্দেশ্য ভালই, কিন্তু ফলে সরস্বতীর কমলবনে কচুরীপানার চাষ সজোরে সুরু হওয়াতে বিপদ বাধিয়াছে। যাঁহারা লিখিতে জানেন তাঁহাদেরও যেখানে ঢুকিতে ভয় ছিল আজকাল সেখানে অক্ষর পরিচয় করিয়াই ঢুকিয়া পড়িতে সাহিত্যিকরা ভয় পান না। ইংরেজী ফরাসী প্রভৃতি ভাষার রূপ যুগে যুগে পরিবর্ত্তিত হইলেও তাহাতে ব্যাকরণ, শব্দের বংশমর্য্যাদা, পদলালিত্য, রচনা-সৌষ্ঠব, প্রভৃতি মানিয়া চলিতে হয় সাহিত্য রচনার সময়। অবশ্য, কিছুই মানেন না এমন লেখক যে একেবারেই নাই তাহা নয়। কিন্তু মোটামুটি বাঁধা পথ সেখানে একটা আছে। আমাদের বাংলা ভাষার সেই বাঁধা পথ খানাখন্দে বিপৎসঙ্কুল হইয়া যাইতেছে। সংস্কৃত ভাষা হইতেই বাংলা ভাষার শ্রীবৃদ্ধি হইলেও সংস্কৃতবহুল হওয়ার ভয়ে দেবী সরস্বতীর স্কন্ধে সারা পৃথিবীর অসংস্কৃত কথা অনায়াসে আসিয়া ভর করিতেছে। তাহারা বাংলা নয় কিন্তু অসংস্কৃত, এই তাহাদের ছাড়পত্র। রচনা পদ্ধতিতেও কোন দেশের ব্যাকরণে যাহা চলে না, তাহা বাংলায় চলিতেছে, কারণ তাহারা অসংস্কৃত!

এই রকম দিনে সাহিত্যকাননে-দিশাহারা পথিক মৈত্র মহাশয়ের কবিতাগুলি পড়িয়া আনন্দিত হইবেন, ভরসাও পাইবেন যে অন্যের প্রচুর ছাইচাপা পড়াসত্ত্বেও বাংলা ভাষার অপূর্ব্ব দীপ্তি ইঁহার লেখনীর ভিতর দিয়া আপনাকে প্রকাশ করিবে। তবে প্রবীণ কবির রচনাভঙ্গীকে প্রাচীন পন্থা মনে করিয়া নবীনেরা তাহার অনুসরণ না করিতেও পারেন।

এই সনেট-শতকের কতকগুলি কবিতা ত্রিশ বৎসর পূর্ব্বে ও অধিকাংশ গত পাঁচ বৎসরে রচিত। তিনি প্রধানতঃ পেট্রার্কের ও শেক্সপীয়ারের চতুর্দ্দশপদী কবিতা রচনারীতির অনুসরণ করিয়াছেন, এবং উভয় রীতিতেই সাফল্য লাভ করিয়াছেন। স্বপ্নালু, অন্বেষণ (২), ভবঘুরে, কৃতজ্ঞতা মুক্তিদা, বিজয়িনী, চিঠি (২), পলাতকা, দ্বন্দ্ব ইত্যাদি কবিতাগুলি সুন্দর ও সুমিষ্ট। অনেকগুলিতে ছবিও সুন্দর ফুটিয়াছে। বহু কবিতায় ভাবের প্রগাঢ়তা লক্ষিত হয়। মৈত্র মহাশয়ের নিপুণ লেখনী বহুমুখী হইয়া বাংলা ভাষাকে আরও অলঙ্কৃত করিলে আনন্দিত হইব।

শ্রীশান্তা দেবী

ব্যোমকেশের গল্প—শ্রীশরদিন্দু বন্দ্যোপাধ্যায় প্রণীত। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স কর্ত্তৃক ২০৩।১।১, কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য দুই টাকা।

এই গ্রন্থে ব্যোমকেশের অভিজ্ঞতার ফল চারিটি কাহিনী সন্নিবিষ্ট হইয়াছে—রক্তমুখী নীলা, অগ্নিবাণ, উপসংহার, ব্যোমকেশ ও বরদা। "ব্যোমকেশের ডায়েরী"-লেখক এই জাতীয় কাহিনী লিখিয়া যথেষ্ট প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছেন। বাংলা ভাষায় ডিটেকটিভ গল্পের ও উপন্যাসের অভাব নাই, তাহাদের অনেকগুলিই যে বৈশিষ্ট্য-বর্জ্জিত, এ কথা অবশ্য-স্বীকার্য্য, অসম্ভব ঘটনাসন্নিবেশে অথবা রুচিবিগর্হিত বর্ণনার প্রাচুর্য্যে সেগুলি সুপাঠ্য হয় নাই। এইরূপ ক্ষেত্রে শরদিন্দু বাবু এক নূতন ধরণের ডিটেকটিভ কাহিনী লইয়া পাঠক-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত হইয়াছেন। তাঁহার রচনা সরল ও সুপাঠ্য, তাঁহার কাহিনী চিত্তাকর্ষক ও সুরুচিসঙ্গত। ব্যোমকেশের গল্প এমন সুকল্পিত ও সুলিখিত যে উহা বালক, যুবক, বৃদ্ধ সকলের মনোরঞ্জন করিতে সমর্থ। পরিবারের সকলে মিলিয়া একসঙ্গে পাঠ করিয়া উহা হইতে আমোদ লাভ করিতে পারে, ইহা ব্যোমকেশের কাহিনীর একটা খুব বড় কৃতিত্ব। শার্লক হোমসের অনুসরণে বাংলা ভাষায় উচ্চাঙ্গের ডিটেকটিভ কাহিনী রচনা করিয়া শরদিন্দু বাবু পাঠকসমাজের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। এই পুস্তকের চারিটি কাহিনীই বেশ মনোজ্ঞ হইয়াছে, "রক্তমুখী নীলা"র চোরের শেষ পরিণাম ও "অগ্নিবাণে"র বিজ্ঞানাধ্যাপকের করুণ উপসংহার পাঠকের মনে বেশ একটা ছাপ রাখিয়া যায়।

টুলটুল—শ্রীকার্ত্তিকচন্দ্র দাশগুপ্ত। আশুতোষ লাইব্রেরী কর্ত্তৃক ৫ নং কলেজ স্কোয়ার, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ছয় আনা।

ইহা একখানি শিশুপাঠ্য গল্পপুস্তক। ইহাতে সর্ব্বশুদ্ধ সাতটি গল্প আছে, তন্মধ্যে 'মশারির জন্ম' পদ্যে আর বাকী কয়টি গদ্যে লিখিত। গল্পকয়টি ইংরেজী শিশুপাঠ্য গল্পের ছায়া অবলম্বনে লিখিত বলিয়া মনে হয়, কারণ ইংরেজী শিশুপাঠ্য পুস্তকে এইরূপ ধরণের গল্প অনেক আছে। ইহাদের মধ্যে 'মশারির জন্ম' পদ্য গল্পটি সর্ব্বাপেক্ষা অধিক উপভোগ্য। লেখকের ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী শিশুদের মনোরঞ্জন করিবে।

তপনকুমারের অভিযান—শ্রীহেমচন্দ্র বাগচী। ১৪-এ আশুতোষ মুখার্জ্জি রোড, কলিকাতা হইতে প্রকাশিত। মূল্য ৷৷০ আনা।

পুস্তকখানি ছোট বালক-বালিকাদের জন্য রচিত। তপনকুমার নামক একটি 'ম্যাড্ ভেঞ্চার'-প্রিয় বালকের কয়েকটি ছোটখাট অভিযানের কাহিনী। পুস্তকের প্রথমাংশে গল্পটি চিত্তাকর্ষক করিবার যেমন চেষ্টা করা হইয়াছে, শেষার্দ্ধে তেমন হয় নাই; সুতরাং 'ভাব চুরি' ও 'শব দাহ' প্রভৃতির বহুল বর্ণনা বেশী উপভোগ্য হয় নাই। গল্পের গতিও মন্থর হইয়া পড়িয়াছে। ভাষা ও বর্ণনাভঙ্গী সুন্দর হইলেও, শেষ পর্য্যন্ত গল্পটি জমে নাই।

স্পেনের ইতিহাস, ১ম খণ্ড—আবদুল কাদের, বি-এ, বি-সি-এস্ প্রণীত। মোস্‌লেম পাব্‌লিশিং কনসার্ণ কর্ত্তৃক ২৫ ভবানী দত্ত লেন, কলিকাতা, হইতে প্রকাশিত। মূল্য পাঁচ সিকা।

স্পেনের যে যুগে আরবেরা পশ্চিম ইউরোপের অধীশ্বর হইয়াছিল, এই পুস্তকে গ্রন্থকার সেই যুগের ইতিহাস বর্ণন করিয়াছেন। এক সময়ে আরবেরা ইউরোপের পশ্চিম প্রান্তে প্রাচ্য সভ্যতার এক বিরাট্ কেন্দ্র স্থাপন করিয়াছিল; এখনও স্পেন ও পর্ত্তুগালের সাহিত্যে, শিল্পকলায়, সামাজিক আচার-ব্যবহারে মুসলমান-সভ্যতার প্রভাব সুস্পষ্টরূপে বিদ্যমান রহিয়াছে। গ্রন্থকার আরবদিগের সেই লুপ্ত গৌরবের এক বিস্মৃতপ্রায় অধ্যায় পাঠক-সমাজের সম্মুখে উপস্থিত করিয়া আমাদের কৃতজ্ঞতাভাজন হইয়াছেন। গ্রন্থকারের বর্ণনাভঙ্গী মনোরম এবং ভাষাও প্রাঞ্জল। তিনি মাঝে মাঝে কয়েকটি উর্দ্দু কথা বেশী ব্যবহার করিয়াছেন, যেমন—তকলিফ; উহা না করিলে পুস্তকের সৌন্দর্য্য আরও বর্দ্ধিত হইত। এইরূপ পুস্তকের বহুল প্রচার বাঞ্ছনীয়। কয়েকটি সুন্দর চিত্র পুস্তকে সন্নিবিষ্ট হইয়া গ্রন্থের সৌন্দর্য্য বর্দ্ধিত করিয়াছে।

শ্রীসুকুমাররঞ্জন দাশ

কেল্লা-ফতে—শ্রীব্রজেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায়। ২য় সংস্করণ। রঞ্জন পাবলিশিং হাউস, কলিকাতা। পৃঃ ৫৭, মূল্য আট আনা। বোর্ড বাঁধাই, সচিত্র।

ভারতবর্ষে মুসলমান শাসনকালের রাজা-বাদশাদের জীবনের ও রাজত্বের অনেকগুলি চিত্তাকর্ষক ঘটনা এই বহিতে শিশুদের জন্য মনোরম করিয়া লিখিত হইয়াছে। অনেক উদ্ভট ও কষ্টকল্পিত এডভেঞ্চারের ও বুদ্ধিকৌশলের কাহিনী অপেক্ষা এই ঐতিহাসিক কাহিনীগুলি অধিকতর চিত্তাকর্ষক, রচনার গুণে আরও মনোমুগ্ধকর হইয়াছে। আমীর খাঁর স্ত্রী সাহিবজীর উপস্থিতবুদ্ধি ও সাহসের কাহিনী, শাজাহান বাদশার গরীবের প্রতি দয়ার দৃষ্টান্ত প্রভৃতি সাতটি গল্প এই বহিতে আছে।

শ্রীপুলিনবিহারী সেন

মনোমুকুর—শ্রীসাবিত্রীপ্রসন্ন চট্টোপাধ্যায়। গুরুদাস চট্টোপাধ্যায় এণ্ড সন্স, কলিকাতা। মূল্য এক টাকা।

ছোট বড় তেত্রিশটি কবিতার সমষ্টি। কবিতাগুলি যে মুখ্যত গীতি-কবিতা, গ্রন্থের নামেই তাহার আভাস পাওয়া যায়। জীবনের বিভিন্ন লগ্নে কবির হৃদয়-মুকুরে 'কবিতা-কল্পলতা'র ক্ষণে ক্ষণে যে ছায়া পড়িয়াছে এই কবিতাগুলিতে তাহারই প্রতিচ্ছবি আঁকা হইয়াছে। কবিতাগুলির ভাষা মধুর, ছন্দ সুললিত। সাবিত্রীবাবুর পুরাতন পরিচয় আলোচ্য-গ্রন্থের দ্বারা ক্ষুণ্ণ হইবে না। রবীন্দ্রকাব্যের ভাষা ও ভাবের প্রচুর পুনরাবৃত্তি সত্ত্বেও কয়েকটি কবিতা মনে থাকিয়া যায়। "প্রবাসনী", "সুন্দরী ভ্রম", "সম্মুখজোছনায়", "অন্তরলীন", "চন্দ্রাবতী অঘোরে ঘুমায়" প্রভৃতি কবিতা পড়িয়া তৃপ্তি পাইয়াছি।

প্রচ্ছদপটের সস্তা ছবিখানি দিয়া গ্রন্থের সৌষ্ঠব হানি করার কি সার্থকতা বুঝিলাম না।

শ্রীনির্ম্মলচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়

অতনুর তীর—শ্রীপ্রভাতকিরণ বসু। রঞ্জন প্রকাশালয়, ২৫।২, মোহনবাগান রো, কলিকাতা। মূল্য দুই টাকা।

অতনুর পঞ্চশরের প্রভাব অতিক্রম করিতে পারে কে? যোগীর যোগ সেখানে পরাভব মানিয়াছে, সমাজগত সাধারণ মানুষের আদর্শ যে সেখানে জয়ী হইবে এটা একরূপ দুরাশা। তবে এই পরাজয়ের মধ্যে যে গ্লানিই আছে তাহা নয়, কেননা, পঞ্চশরের মোহের দিকটা অতিক্রম করিতে পারিলে আসে প্রেমের অভিষেক, যে প্রেম বোধ হয় জীবনের যে-কোন শ্রেষ্ঠ আদর্শের সঙ্গে সমান আসনের অধিকারী।

এই বইয়ের প্রধান চরিত্র বিনায়কের জীবনের মধ্য দিয়া লেখক এই জিনিসটি ফুটাইয়া তুলিবার চেষ্টা করিয়াছেন। প্রসঙ্গক্রমে আসিয়া পড়িয়াছে অতিআধুনিক জীবনের একটা দিক যেখানে স্বাধীনতার নামে আসিয়াছে উচ্ছৃঙ্খলতা, ভালবাসার নামে আসিয়াছে ব্যভিচার। অনেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মতই লেখক সমাজের এই ক্লেদ-কালিমার জন্য ব্যথিত, গভীর অন্তর্দৃষ্টি দিয়া এটা দেখিয়াছেন এবং গাঢ় মসী দিয়া অঙ্কিত করিয়াছেন।

পাঞ্জল। লেখক কবি, তাঁহার উপন্যাসেও
ছে এবং সেটা শুধু ভাষাতেই নয়, ঘটনার স্থান-
কাশ পাইয়াছে।
দরকার। বিদ্যাসাগর, বিবেকানন্দ, পরমহংস-
জীবন গড়িয়া তুলিতে চাহিতেছে, অতনুর সঙ্গে
আমরা আরও কিছুক্ষণ মাথা উঁচু করিয়া দাঁড়াইয়া

থাকিতে দেখিব বলিয়া আশা করিয়াছিলাম। সে যেন অল্পেই পরাভব মানিয়া লইয়াছে; তাহাও দুই জায়গায়—অমিতার কাছে, আর, প্রায় সমান্তরালেই নীলার কাছেও।

ছায়াচ্ছন্ন ধরণী—রঞ্জন প্রকাশালয়। মূল্য ১॥০

বইখানি ওয়েন ফ্রানসিস্ ডাড্‌লের একখানি বিখ্যাত উপন্যাসের অনুবাদ। সাধারণ উপন্যাস বলিতে যাহা বুঝা যায় এটি কিন্তু সে জাতীয় নয়। ইহার বিষয়, জীবনের নানা ঘাত-প্রতিঘাতের মধ্য দিয়া আত্মার ঈশ্বরাভিমুখী অভিযান। জীবনের সুখ, দুঃখ প্রভৃতি নানা সমস্যার স্বরূপ নির্ণয়ের জন্য লেখক এক দিকে ক্যাথলিক ধর্ম্ম এবং অপর দিকে প্রটেষ্টাণ্ট ধর্ম্ম, খ্রীষ্টীয় বিজ্ঞান, এবং বিভিন্ন প্রতীচ্য দার্শনিকবাদের অবতারণা করিয়াছেন এবং শেষ পর্য্যন্ত ক্যাথলিক ধর্ম্মকে জয়টীকা পরাইয়াছেন। বইয়ের চরিত্রগুলি ক্যাথলিক পুরোহিত, নাস্তিক, সুখবাদী, দুঃখবাদী প্রভৃতি। যাহাকে কেন্দ্র করিয়া বইয়ের ঘটনাসমাবেশ সে এক জন পঙ্গু, সে সামান্য একটি দুর্দ্দৈবের জন্য সুখবিলাসের মধ্য হইতে একেবারে নৈরাশ্যের চিরান্ধকারে নিক্ষিপ্ত।

তত্ত্ববিচারই বইখানির উপজীব্য হইলেও human interest বা মানবীয়তার অভাব নাই। লেখাটির এইখানেই বিশেষত্ব। তবুও একথা স্বীকার করিতে হয়, নিতান্ত লঘুচিত্ত পাঠকের জন্য এ বই নয়। কিন্তু লঘুচিত্ত লইয়াই কি বাংলার পাঠকসমষ্টি? আমাদের মনে হয়, বইখানির কদর হইবে, কেননা, সাহিত্যের উন্নতি অর্থে আমরা বুঝি তাহার বহুমুখীনতা,—সে দিক দিয়া উপন্যাসেরও গতানুগতিকতা কাটাইয়া উঠা উচিত এবং মূল রচনার অবর্ত্তমানে যদি অনুবাদের মধ্য দিয়াও প্রকাশকেরা আমাদের সাহিত্যে এ ধারার প্রবর্ত্তন করেন ত তাঁহারা আমাদের কৃতজ্ঞতার অধিকারী।

অনুবাদ ভালই হইয়াছে, তবে স্থানে স্থানে মূল ইংরেজী ইডিয়ম হইতে আরও একটু মুক্ত থাকিলে ভাল হইত।

শ্রীবিভূতিভূষণ মুখোপাধ্যায়

অস্পৃশ্যা—শ্রীগিরিশচন্দ্র নাগ লিখিত। দি স্কুল সাপ্লাই কোং, পটুয়াটুলি, ঢাকা হইতে শ্রীশরৎচন্দ্র দে, বি এ, কর্ত্তৃক প্রকাশিত। পৃষ্ঠা ২১২। মূল্য ১৷০ মাত্র।

বইখানিতে তিনটি গল্প আছে মালির মেয়ে, অস্পৃশ্যা, ও কাঠের আত্মকথা। গল্পগুলি অস্পৃশ্যতার বিরুদ্ধে জনমত গঠনের উদ্দেশ্যে লিখিত। প্রথম গল্পটিতে শিক্ষা ও সংসর্গের প্রভাবে ভুঁইমালির ন্যায় নিম্নশ্রেণীর লোকও কিরূপে উন্নতির পথে অগ্রসর হইতে পারে তাহারই একটি চিত্র প্রদর্শিত হইয়াছে। একটি শিক্ষিতা গোঁড়া হিন্দুরমণী কিরূপে এক অস্পৃশ্য পরিবারের সংস্পর্শে আসিয়া অস্পৃশ্যতা বর্জন করিলেন—দ্বিতীয় গল্পটি তাহারই কাহিনী। তৃতীয়টিতে গ্রন্থকার একটি কাষ্ঠখণ্ডের আত্মকথা অবলম্বনে অর্দ্ধ শতাব্দী পূর্ব্বের বাংলার একটি পল্লীচিত্র অঙ্কিত করিয়াছেন। 'মালির মেয়ে' গল্পটিতে লেখক চরিত্রহীনা নারীর উচ্ছৃঙ্খলতার নগ্ন-চিত্রটির অবতারণা না করিলেই ভাল করিতেন তাহাতে গ্রন্থের অঙ্গহানি হইত না, বরং সৌষ্ঠব-বৃদ্ধি হইত। 'অস্পৃশ্যা'র আখ্যান-বিষয়টি বাস্তব-জীবনে সম্ভবপর নয়। বর্ণনা-চাতুর্য্যে 'কাঠের আত্মকথা' প্রথমোক্ত গল্প দুইটি অপেক্ষা অনেক ভাল। লেখকের লিখনভঙ্গী চলনসই, কিন্তু ভাষা মাঝে মাঝে প্রাদেশিকতা-দোষে দুষ্ট। কথাসাহিত্য-রচনায় সিদ্ধহস্ত না হইলেও লেখকের সদুদ্দেশ্য-প্রণোদিত প্রচেষ্টা প্রশংসনীয়।

শ্রীঅনঙ্গমোহন সাহা

আধেক উড়ে যায় সুদূর নীলিমায়

শ্রীমৈত্রেয়ী দেবী

নামে নি বরষার শীতল বারিধার
আষাঢ় আসে নি ঘন কালো
গভীর নীলিমায় মাধুরী ভেসে যায়
লাগিয়া নবীন মেঘে আলো।
মূরতি নানা রূপ ধরে সে অপরূপ
সুদূরে হেসে সে ভেসে যায়
সকল তারা রবি কখনো ম্লান ছবি
আড়াল করে সে নীলিমায়।
দেখে সে নানা বেশ নয়ন অনিমেষ
পাহাড় চাহিয়া রয় দূরে
এ মেঘে ঢেকে তার দেহের চাবি ধার
ভাসিতে চায় সে কোন্ সুরে।
ধরার হৃদিকুল ভেদিয়া শতমূল
মেলিয়া নিজেরে যেন বাঁধে
কঠিন দেহমাঝে আপন শত কাজে
নিজেরি তরে সে জাল ফাঁদে।
লভিতে চায় পাখা, তাই কি মেলে শাখা
নিজেরে চায় সে প্রসারিতে?
জলদ মায়াময় দেখে কি মনে হয়
কী আশা জাগে তার চিতে?
যে গতি মনোমাঝে বেদনা আনিয়াছে
যে নাচে হৃদয়ে লাগে দোল
সুদূর দেয় ডাক বাঁশীতে শত লাখ
গতির ছন্দে উতরোল।
পাহাড় দেখে তার হৃদয় গুরুভার
পাথরে পাথরে বাধা কেন?
সুদূর ব্যোমে হায় কি আশা ভেসে যায়
হাজার মূরতি এঁকে যেন।
দেখে সে চলিবার, ছন্দ অনিবার
ছোটে কী মর্ম্ম হ'তে নদী
তাহার মন আশা, সে বেগে পায় ভাষা
বাধায় মোহন তার গতি।
বদ্ধ মন হায় বাঁকিয়া ছুটে যায়
পাথরে পাথরে নেচে চলে
নিজের জাল ছিঁড়ে মুক্তি পায় কি যে
মর্ম্ম ভাসায়ে সেই জলে।
তবুও চায় দূরে উড়িতে ঘুরে ঘুরে
পরশ করিতে মেঘখানি
তাই সে তরুশাখা করিতে চায় পাখা
দোলায় পাগল বায়ু আনি।
আমার মনোমাঝে দেখি যে রহিয়াছে
ভাবনা এমনি কত শত
কখনো জাল ফেঁদে আমারে রাখে বেঁধে
হৃদয় গুমরে অবিরত।
চাহিয়া বহুদূরে সে চায় যেতে উড়ে
সংখ্যাবিহীন বাধা রয়
ছিঁড়িতে লাগে বল কঠিন শৃঙ্খল
তবু কি বাসনা মনোময়।
হৃদয়ে অপরূপ দেখি যে কত রূপ
আমারে নিয়ে যে চলে খেলা
কখনো ছেড়ে দিয়ে আকাশে যায় নিয়ে
মুক্ত বাতাসে ভাসে ভেলা।
কারণে-অকারণে কখনো আনে মনে
অচল গিরির মত স্থিতি
বাঁশীর সুরে সুরে সে চায় যেতে উড়ে
বেদনা কি বাজে নিতি নিতি।
নানান্ মনোরথ খোঁজে যে নানা পথ
নিজেরে তাই এ ভাঙাগড়া
আধেক উড়ে যায় সুদূর নীলিমায়
আধেক আঁকড়ি রয় ধরা।

মহিলা-সংবাদ



শ্রীমতী অনসূয়াবাঈ কালে
সহকারী সভাধ্যক্ষ, মধ্যপ্রদেশ ব্যবস্থাপক সভা



ডক্টর শ্রীমতী রমা বসু



শোভনা দেবী



বাম হইতে : শ্রীঅখিলচন্দ্র দত্ত, শ্রীমতী মিলার ও
শ্রীমতী হেমলতা দেবী, ভিয়েনা।

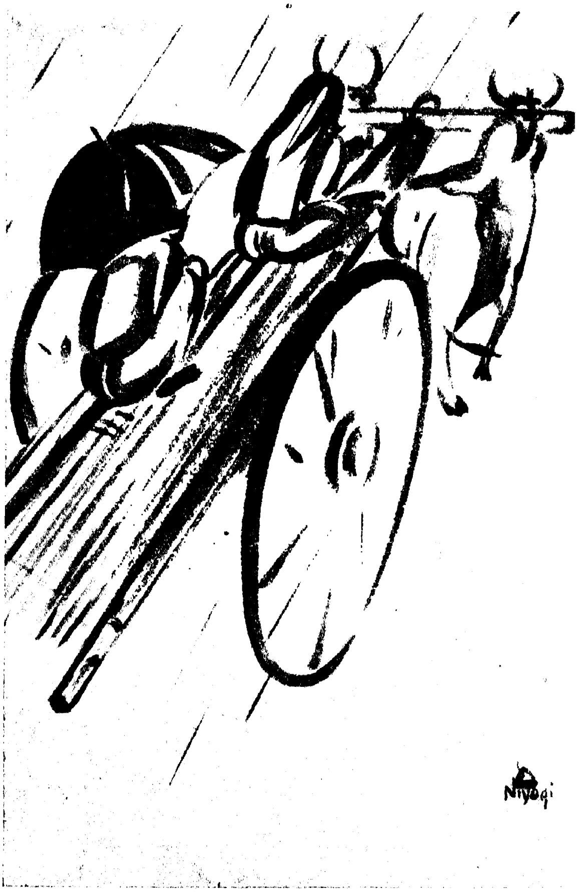
ডক্টর শ্রীমতী রমা বসু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয় হইতে দর্শনশাস্ত্রে এম-এ পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণীতে প্রথম স্থান অধিকার করিয়া দর্শনশাস্ত্রে গবেষণা করিতে অক্সফোর্ডে গিয়াছিলেন। তথায় ডি. ফিল. উপাধিলাভ করিয়া সম্প্রতি তিনি স্বদেশে প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন। ইতিপূর্ব্বে অন্য কোনও ভারতীয় মহিলা অক্সফোর্ড হইতে ডক্টরেট লাভ করেন নাই।

সরোজনলিনী নারীমঙ্গল সমিতির সম্পাদিকা শ্রীমতী হেমলতা দেবী ইউরোপের বিভিন্ন দেশে পরিভ্রমণ পূর্ব্বক নারীমঙ্গল-প্রতিষ্ঠান সম্বন্ধে বিশেষ অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া সম্প্রতি স্বদেশ প্রত্যাবর্ত্তন করিয়াছেন।

শ্রীযুক্ত রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর মহাশয়ের ভ্রাতুষ্পুত্রী শ্রীমতী শোভনা দেবী সম্প্রতি প্রায় ৬০ বৎসর বয়সে পরলোকগমন করিয়াছেন। তাঁহার রচিত বহু গ্রন্থ পাঠকের সমাদর লাভ করিয়াছিল; তন্মধ্যে ম্যাকমিলন কোম্পানী কর্ত্তৃক প্রকাশিত 'ওরিয়েণ্ট পার্ল্স' অন্যতম। অভিনয়ে ও সঙ্গীতে তিনি বিশেষ নিপুণা ছিলেন; ইংরেজী, ফরাসী, ইতালীয় বাংলা ও হিন্দুস্থানী সঙ্গীতে তাঁহার বিশেষ অধিকার ছিল



পথচারিণী
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী



বর্ষায়
শ্রীপ্রভাত নিয়োগী

সেল্‌মা ল্যাগেরলভ্‌

শ্রীলক্ষ্মীশ্বর সিংহ

সুইডেন দেশটি সাহিত্যজগতে বহু খ্যাতনামা লেখক-লেখিকার জন্মস্থান। তাঁহাদের মধ্যে শ্রীযুক্তা সেল্‌মা ল্যাগেরলভ্‌ একজন। সুইডেনের ভ্যার্মল্যাণ্ড প্রদেশের অন্তর্গত মোরবাক্কা নামক স্থানে ১৮৫৮ খ্রীষ্টাব্দের ২০শে নবেম্বর তিনি জন্মগ্রহণ করেন। বাল্যকালে তিনি রুগ্না ছিলেন। দৈহিক অসুস্থতার জন্য তিনি সমবয়স্কদের সহিত বয়সোচিত খেলাধূলা হইতে বঞ্চিত থাকিতেন। ছোটবেলা হইতেই তিনি গল্প শুনিতে ভালবাসিতেন এবং বাড়ীতে অধিকাংশ সময়ই নানা গল্পের বই পড়িয়া আনন্দ পাইতেন।

ভ্যার্মল্যাণ্ড প্রদেশের ফ্রকেন্‌-স্যারণা হ্রদ সৌন্দর্য্যের জন্য খ্যাত। এই পার্ব্বত্য হ্রদটি ৭৩ কিলোমিটার স্থান জুড়িয়া আছে। ইহার এক পাশে সেলমার পিতৃগৃহ মোরবাক্কা অবস্থিত। বড়দের মুখে শোনা, এই হ্রদের তীরবর্ত্তী আপন প্রদেশের অধিবাসীদের প্রাচীন কীর্ত্তি-কাহিনী তাঁহার কল্পনাপ্রবণ মনের উপর গভীর রেখাপাত করিত। অতি অল্প বয়সেই গল্প লেখার ইচ্ছা তাঁহার মনে জাগিয়াছিল। তাঁহার জীবনের প্রথম ভাগ নিজের শারীরিক অসুস্থতা ছাড়াও নানা পারিবারিক অবস্থা-বিপর্য্যয়ের মধ্যে কাটিয়াছিল। অদৃষ্ট তখন তাঁহার প্রতি প্রসন্ন ছিল না—তাঁহার প্রথম জীবনের বহু রচনা পত্রিকা-কার্য্যালয় হইতে অমনোনীত হইয়া ফিরিয়া আসিয়াছিল।

উচ্চবিদ্যালয়ে পড়িবার সময় এক দিন শিক্ষয়িত্রী সেল্‌মাকে তিরস্কার করিয়া বলিয়াছিলেন যে সেলমা ভাল সুইডিশ লিখিতে পারে না। অভিমানিনী সেল্‌মা তাহাতে অত্যন্ত মর্ম্মাহত হইয়াছিলেন। সেদিন যখন আবার ক্লাসের ঘণ্টা বাজিল, তখন দেখা গেল তিনি ক্লাসে অনুপস্থিত। সঙ্গিনীরা খোঁজ করিতে গিয়া দেখে যে ড্রইং-রুমের এক কোণে সেল্‌মা চুপ করিয়া বসিয়া আছেন, তাঁহার চোখে অবিরল জলের ধারা বহিতেছে। সঙ্গিনীদিগকে দেখিয়াই বাষ্পগদগদকণ্ঠে সেল্‌মা বলিয়া উঠিলেন—"শিক্ষয়িত্রীকে দেখাইব যে আমি সুইডিশ ভালই লিখিতে জানি, আমার অনেক গল্প লেখা আছে।" যে সেল্‌মা এক দিন ভাল সুইডিশ ভাষা না-লিখিতে পারার দরুন তিরস্কৃত হইয়াছিলেন, সেই সেলমাই পরে তাঁহার প্রথম বই "গোস্তা বেলিং সাগা" লিখিয়া বিশ্বের সাহিত্য-আসরে প্রতিষ্ঠা লাভ করেন।



সেল্‌মা ল্যাগেরলভ্‌

যৌবনেই তিনি নিজের সাধনার পথ বাছিয়া লইয়াছিলেন। তবুও ১৮৯৫ খ্রীষ্টাব্দ পর্য্যন্ত সুইডেনের দক্ষিণ প্রদেশে ল্যাণ্ডস্ক্রোনা নামক শহরে মেয়েদের উচ্চ-প্রাইমারী বিদ্যালয়ে তিনি শিক্ষয়িত্রীর কাজ করেন। ১৮৯১ খ্রীষ্টাব্দে একটি উল্লেখযোগ্য ঘটনা ঘটে। তখনকার দিনে ষ্টকহল্‌মের

বিখ্যাত সাপ্তাহিক 'ইডোন' সাহিত্য-প্রতিযোগিতার একটা পুরস্কার ঘোষণা করেন। উক্ত কাগজে বিজ্ঞাপন পড়িয়াই সেল্‌মার মনে হইল যে বাল্যকালে আপন প্রদেশের পূর্ব্বপুরুষদের সম্বন্ধে শোনা গল্পগুলি এইবার প্রকাশ করিবার সময় আসিয়াছে। ইহারই ফলে তাঁহার প্রথম রোমান্স "গোস্তা বের্লিং সাগা" বাহির হয়। এই পুস্তক লিখিয়া তিনি ইডোন পত্রিকার সর্ব্বোচ্চ পুরস্কার লাভ করেন এবং সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার নাম সমস্ত স্কান্‌ডিনেভিয়ায় ছড়াইয়া পড়ে। এই রোমান্সের প্রধান নায়ক যুবক 'গোস্তা বের্লিং'—এক জন সরলহৃদয় সাহসী ধর্ম্মযাজক। এই যুবক পুরোহিতের জীবনের উদ্দেশ্য অস্পষ্ট। নিজের মন যাহা চায়, যাহা করণীয়, একাধিক কারণে তাহা কার্য্যে পরিণত করার শক্তির তাঁহার অভাব; ফলে হৃদয় ম্রিয়মাণ, অকারণে ক্ষণে ক্ষণে মন উত্তেজিত হইয়া উঠে। এই ভাবে গোলক-ধাঁধাঁর মধ্যে জীবনটাকে কাটাইয়া দিতে গোস্তা বের্লিং নারাজ। ফলে, সুখের আশায় বন্ধুবান্ধবী-পরিবৃত হইয়া সুখভোগের মধ্যে আনন্দ খুঁজিয়া পাইবার নিষ্ফল চেষ্টা। মোরবাক্কা হইতে অনতিদূরে ফ্রকেন স্যারণার পরপারে টিলার উপর অবস্থিত মধ্যযুগের প্রাসাদ 'এক্কেবি' গোস্তা বের্লিং-এর জীবনলীলার প্রধান কেন্দ্র। ফলতঃ ১৮৮০ শতাব্দীর ভ্যার্মল্যাণ্ডের সামাজিক জীবন এই পুস্তকে চিত্রিত হইয়াছে।

সেল্‌মার আবেগময়ী লেখনী হইতে অনেক গল্প ও উপন্যাস বাহির হইয়াছে এবং সেগুলি বহু ভাষায় অনূদিত হইয়া সমাদর পাইয়াছে। গোস্তা বের্লিং-এর পর বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য 'জেরুজালেম'। ইহার প্রথম অংশ ১৯০১ খ্রীষ্টাব্দে ও দ্বিতীয় অংশ পর বৎসরে প্রকাশিত হয়। সুইডেনের ডালার্ণা প্রদেশে একবার ধর্ম্মান্দোলনের বন্যা আসিয়াছিল। এই আলোড়ন উক্ত প্রদেশবাসীদিগকে যে কি ভাবে অভিভূত করিয়াছিল, তাহাই প্রথম খণ্ডে চিত্রিত হইয়াছে। অনেক লোক পরিবার-পরিজনের কথা না ভাবিয়া ধর্ম্মস্থাপকের দেশ প্যালেষ্টাইনে চলিয়া যায় এবং দ্বিতীয় খণ্ডে সেই আখ্যায়িকাই বিবৃত হইয়াছে। এক দিকে লোকের ধর্ম্মব্যাকুলতা, অপর দিকে পরিবারবর্গ ও দেশের প্রতি কর্ত্তব্যবোধ—মনের এই দ্বন্দ্ব ডালার্ণার ব্যক্তিবিশেষের মুখ দিয়া এমন ভাবে ফুটাইয়াছেন যে যাঁহারা সেই দেশ ও দেশবাসীদের সঙ্গে পরিচিতও নহেন এমন বিদেশী পাঠকদের মনকেও গভীর ভাবে স্পর্শ করে।

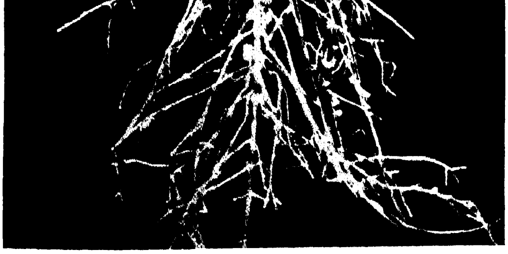
স্কানডিনেভিয়ার প্রাচীন ও আধুনিক লেখক-লেখিকাদের সঙ্গে তুলনা করিলে সকলকেই একবাক্যে স্বীকার করিতে হয় যে সেল্‌মার রচনাভঙ্গী একবারে স্বতন্ত্র রকমের। তিনি সত্যই ভ্যার্মল্যাণ্ড প্রদেশের লেখিকা এবং সেই প্রদেশের প্রকৃতির ও সভ্যতার সম্পদ তাঁহার সমস্ত জীবন ও কল্পনাকে প্রভাবান্বিত করিয়াছে। অতীত ও বর্ত্তমান যুগের ঐতিহাসিক ও অনৈতিহাসিক গল্প, লোকচরিত্র তাঁহার রচনার প্রধান বিষয়বস্তু। ভ্যার্মল্যাণ্ডের পোষাকপরা নায়ক-নায়িকার চরিত্র যেখানে বিশ্বমানবের মানসিক প্রগতির সঙ্গে এক সুরে গাঁথা, সেখানেই সেল্‌মার রচনা ও গল্প সত্য হইয়া উঠিয়াছে—বিশ্বাসের অযোগ্য বিষয়ও এমন মূর্ত্ত হইয়া উঠিয়াছে যে শেষ পর্য্যন্ত সত্যাসত্য বিচারের কথাও পাঠকের মনে স্থান পায় না। সেল্‌মার কল্পনা ও রচনার উৎস এখনও প্রবহমান।

১৯০৭ খ্রীষ্টাব্দে সুইডেনের উপ্‌শালা-বিশ্ববিদ্যালয় আপন দেশের গৌরব সেল্‌মাকে ডক্টর উপাধিতে ভূষিত করেন। ইহার দুই বৎসর পর অর্থাৎ ১৯০৯ খ্রীষ্টাব্দে তিনি নোবেল প্রাইজ পান, সঙ্গে সঙ্গে উক্ত প্রাইজ কমিটির সভ্যপদেও তিনি আমন্ত্রিত হন। তিনি সুইডেনের সাহিত্য-সংসদের সর্ব্বপ্রথম মহিলা সভ্য।

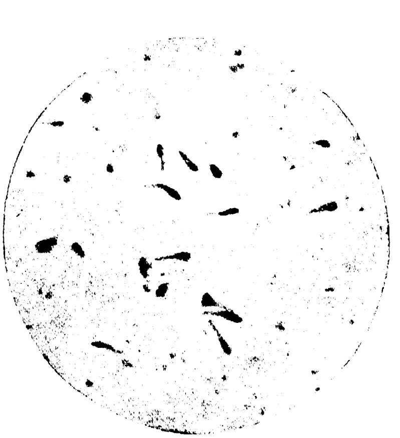
ফলিত রসায়ন চর্চ্চার নূতন দিক

শ্রীকানাইলাল মণ্ডল, এম-এসসি

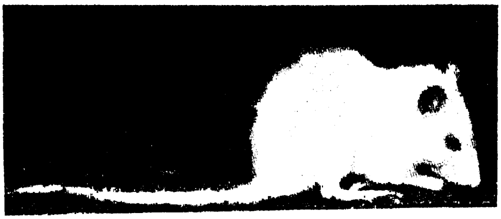
গত শতাব্দীতে ফলিত রসায়নের পরস্পর-সংলগ্ন দুই শাখা গড়িয়া উঠিয়া দুইটি বিশেষ দিকে পরিণতি লাভ করে। একটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে রং প্রস্তুত, পার্কিন কর্তৃক ১৮৫৬ সালে কোলটার বা আলকাতরা হইতে রং প্রস্তুত-প্রণালীর উদ্ভব হইতেই তাহার সূত্রপাত। অপরটি বৈজ্ঞানিক উপায়ে ঔষধ প্রস্তুত বা ঔষধের সিন্থেসিস্। পূর্ব্বে উদ্ভিজ্জ রং ও উদ্ভিজ্জ ঔষধ সাধারণতঃ ব্যবহৃত হইত। রসায়ন-বিজ্ঞানের উক্ত দুই শাখা গড়িয়া উঠায় এক দিকে যেমন ইচ্ছামত বর্ণবৈচিত্র্য সৃষ্টি করা সম্ভবপর হইল ও স্বভাবজাত রঙের প্রচলন প্রায় উঠিয়া গেল, অন্য দিকে তেমনি জীবদেহে বিশিষ্টরূপে ক্রিয়া করিতে পারে এরূপ বিশেষ গুণসম্পন্ন ঔষধ প্রস্তুত হওয়ায় স্বভাবজাত ঔষধের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম ঔষধগুলি বেশীর ভাগ ব্যবহৃত হইতে লাগিল। বর্ত্তমান শতাব্দীতে উদ্ভিদ- ও জীবজন্তু- সংক্রান্ত ব্যবহারিক রসায়নের একটি বিশেষ বিভাগ এইভাবেই প্রসার লাভ করিতেছে। ইহার এক দিক গড়িয়া উঠিতেছে জীবনপোষক কতকগুলি সামগ্রীকে লইয়া। দেহের পুষ্টির জন্য অতি অল্প পরিমাণেও এইরূপ দ্রব্য একান্ত প্রয়োজনীয়। এখনও পর্য্যন্ত কেবলমাত্র স্বভাবজাত উক্ত প্রকার দ্রব্যের দ্বারা উদ্ভিদ ও জীবের দেহের পোষণ ও বর্দ্ধনকার্য্য সাধিত হইতেছে। তবে রসায়ন-বিজ্ঞানের সাহায্যে দ্রব্যগুলি প্রস্তুত হইতে আরম্ভ হওয়ায় ও দেহের উপর তাহাদের ক্রিয়া স্বভাবজাত দ্রব্যের অনুরূপ হওয়ায় এবং কোন কোন ক্ষেত্রে অধিক কার্য্যকরী হওয়ায় পূর্ব্ব পূর্ব্ব দৃষ্টান্ত হইতে এরূপ অনুমান করা যায় যে কালে স্বভাবজাত দ্রব্যের পরিবর্ত্তে কৃত্রিম দ্রব্যসমূহ ব্যবহারের প্রসার ও প্রচলন হইবে। প্রসঙ্গক্রমে উভয়ের মধ্যে তুলনায় বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত জিনিষ-গুলি ব্যবহারের এই সুবিধার কথা উল্লেখ করা যাইতে পারে যে, স্বাভাবিক ভাবে উৎপন্ন দ্রব্যে নানা প্রকার জটিল প্রকৃতির জিনিষ এমন ভাবে মিশিয়া থাকে যে



কলাইগাছের শিকড়ে উৎপন্ন স্ফোটক ; ইহাতে যে বীজাণু জন্মে তাহা বায়ুর নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদ-খাদ্যে পরিণত করে।



অণুবীক্ষণে এজোব্যাক্‌টোরিয়া দেখা যাইতেছে

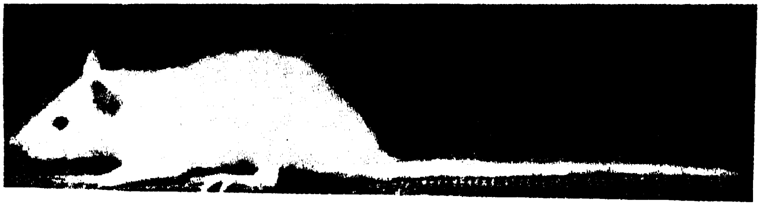


ভাইটামিন এ. লইয়া নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষা। ভাইটামিন এ.-বিহীন খাদ্য দেওয়ায় এই ইঁদুরটির লোম কর্কশ হইয়াছে, ওজন কমিয়াছে ও চক্ষুর রোগ জন্মিয়াছে।

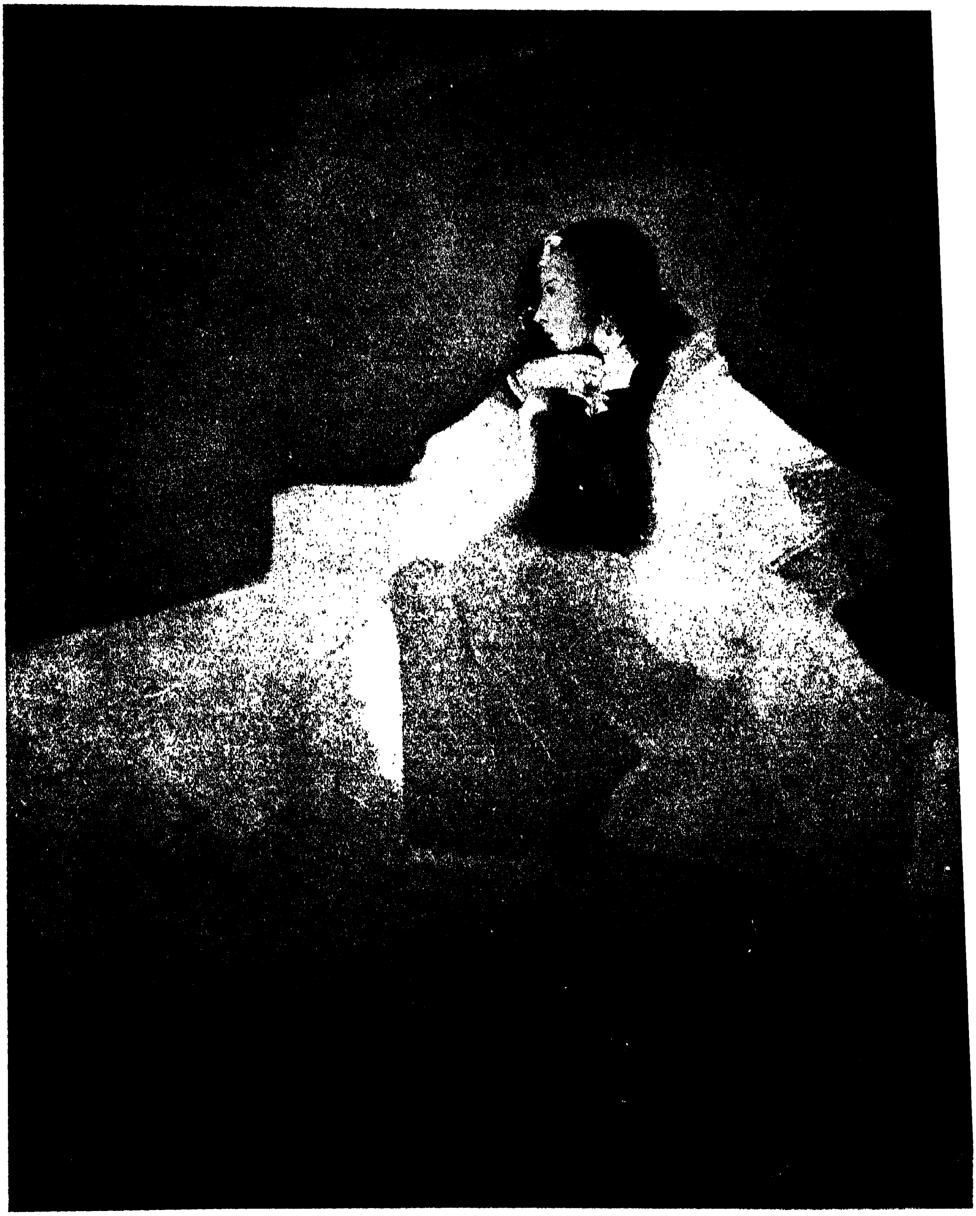
তাহাতে একসঙ্গে সকলগুলিই ব্যবহার করিতে হয়, সুতরাং বিশেষ ক্রিয়ার জন্য বিশেষ গুণসম্পন্ন কোন একটি, এবং উহার যতটুকু আবশ্যক সেই পরিমাণ, পাওয়া যায় না, কিন্তু কৃত্রিম দ্রব্যগুলির প্রত্যেকটি পৃথক্‌ভাবে এবং প্রয়োজনমত মাত্রায় ব্যবহৃত হইতে পারে; দ্বিতীয়তঃ, শেষোক্ত দ্রব্যগুলি অনায়াসলভ্য ও সুলভ হয়; তৃতীয়তঃ, এইগুলির প্রত্যেকটি রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কিছু কিছু গুণের পরিবর্ত্তন দ্বারা বিবিধ আকারে ব্যবহার করা চলে ও অনেক সময় উহাদিগকে বেশী শক্তিসম্পন্ন করিয়া তোলা যায়।

জীবনপোষক জিনিষগুলির এক শ্রেণীর নাম ভাইটামিন। ভাইটামিন এ. বি. প্রভৃতির কথা আমরা সকলেই কমবেশী শুনিয়াছি। উদ্ভিদের পক্ষে পুষ্টিকর অক্সিন্ (auxin) নামে আর এক শ্রেণীর দ্রব্য গত কয়েক বৎসরের মধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে। ভাইটামিন এ. বি. প্রভৃতির ন্যায় এইগুলিরও অক্সিন এ. বি. ইত্যাদি নাম দেওয়া হইয়াছে। তৃতীয় শ্রেণীর এইরূপ দ্রব্য জীবজন্তু ও উদ্ভিদ দেহে উৎপন্ন হর্ম্মোন্ (hormone)। বর্ত্তমানে এই তিন শ্রেণীর জিনিষ লইয়াই গবেষণা চলিতেছে। প্রত্যেক শ্রেণীর সামগ্রীগুলিকে এখন রাসায়নিক দ্রব্যের সমষ্টি বলিয়া চিনিতে পারা গিয়াছে। প্রতি শ্রেণীর জিনিষগুলি অত্যন্ত জটিল-প্রকৃতির এবং একসঙ্গে মিশিয়া থাকে। সুতরাং তাহাদিগকে পৃথক্ করা, বিশুদ্ধ করিয়া চিনিয়া লওয়া, তাহাদের প্রকৃতি ও গঠন নির্ণয় করা, দেহের উপর তাহাদের ক্রিয়া নিরূপণ করা বিশেষ বৈজ্ঞানিক দক্ষতাসাপেক্ষ। ইউরোপ ও আমেরিকায় বর্ত্তমানে সুদক্ষ ও বিচারবুদ্ধি-সম্পন্ন বৈজ্ঞানিকের অভাব না থাকায় এ বিষয়ে গবেষণা সকল দিক দিয়া অতি দ্রুত গতিতে অগ্রসর হইতেছে। অবশ্য, ব্যবহারিক জগতে কাজে লাগিবার মত অবস্থা হইতে এখনও দেরি আছে।

ভাইটামিন সম্বন্ধে কিছু না জানিয়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে নৌ-সার্জ্জেন লিণ্ড উহার ব্যবহার করিয়াছিলেন। ব্যবহারিক বিজ্ঞানে এরূপ উদাহরণ আরও পাওয়া যায়। যে-বীজাণুর বিষয় কিছু না জানিয়াও অষ্টাদশ শতাব্দীতে জেনার বসন্ত রোগে টীকা দেওয়া প্রথার প্রবর্ত্তন দ্বারা তাহার হাত হইতে নিষ্কৃতি পাওয়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, পরে সেই বীজাণুর আবিষ্কার করিয়া লুই পাস্তুর চিকিৎসাশাস্ত্রে বীজাণুতত্ত্বের নূতন শাখা সৃষ্টি করিয়াছিলেন। লিণ্ড স্কার্ভি রোগের কতকগুলি রোগীকে লেবুর রস খাওয়াইয়া এবং কতকগুলি রোগীকে তাহা না দিয়া ও অন্যান্য অবস্থা ঠিক সমান রাখিয়া প্রমাণ পাইলেন যে তাজা ফলের মধ্যে এমন কতকগুলি দ্রব্য আছে যাহা অতি অল্প পরিমাণে প্রয়োগ করিলে রোগ নিবারণ হয় এবং তাহাদের অভাবে রোগের উৎপত্তি হয়। বিংশ শতাব্দীতে উন্নত ধরণের এইরূপ কণ্ট্রোল্ড বা নিয়ন্ত্রিত পরীক্ষায় ভাইটামিনের আবিষ্কার সম্ভবপর হইয়াছে। ভাইটামিন এ. বি. প্রভৃতির প্রত্যেকটি একটি বিশেষ রাসায়নিক দ্রব্য এবং এই রাসায়নিক দ্রব্যটি



খাদ্যে ভাইটামিন এ. পাইয়া এই ইঁদুরটি স্বাভাবিক ভাবে বাড়িয়াছে।



শাহ্‌জাদী

শ্রীপরিতোষ সেন

প্রবাসী প্রেস, কলিকাতা

শরীরের অংশ-বিশেষের অথবা সমগ্র দেহের স্বাস্থ্যরক্ষায় একান্ত প্রয়োজনীয়। উদাহরণ-স্বরূপ ধরা যাইতে পারে ভাইটামিন সি.। স্কার্ভি-রোগ-প্রতিষেধক এই ভাইটামিন লেবুর রসে পাওয়া যায় এবং সম্প্রতি এস্করবিক এসিড (l-ascorbic acid) বলিয়া নির্দিষ্টরূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে। ভাইটামিন সি-র ন্যায় অন্যান্য ভাইটামিনের গঠন-নির্ণয়, ক্রিয়া নিরূপণ ও প্রস্তুতচেষ্টা ক্রমেই সফল হইতেছে। আমাদের দেশে কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান-কলেজের ফলিত রসায়নের বর্ত্তমান অধ্যাপক ডক্টর বি. সি. গুহ ভাইটামিন লইয়া কাজ করিয়া এবং কতকগুলি দেশী ফলের ভাইটামিনের প্রকৃতি, পরিমাণাদি ঠিক করিয়া সাধারণের নিকট পরিচিত হইয়াছেন।

অক্সিন লইয়া পরীক্ষা খুব বেশী দূর অগ্রসর না হইলেও উহা যে প্রকৃতিতে অনেকটা ভাইটামিনের সদৃশ এবং জীবদেহে ভাইটামিনের ন্যায় ইহা যে গাছের শাখা-প্রশাখা ও ফল-ফুলের উৎপাদন বাড়াইয়া দিয়া উদ্ভিদদেহে কার্য্য করে তাহা জানা গিয়াছে। অক্সিন্ এ. বি. প্রভৃতি ভাইটামিন এ. বি. ইত্যাদির ন্যায় এক-একটি রাসায়নিক দ্রব্য (chemical compound)। বিয়োগ-তড়িৎ-জাতীয় (electro-negative) জিনিষ বলিয়া অক্সিনকে গাছের মধ্য দিয়া তড়িৎ বহাইয়া দিয়া যুক্ত তড়িৎ ক্ষেত্রে চালান যায়। সুতরাং ইচ্ছানুযায়ী গাছের অংশ-বিশেষের পুষ্টি নিয়ন্ত্রণ করা চলে।

সেক্স হর্ম্মোন (Sex hormone) লইয়া গবেষণায় কৃতকার্য্যতা খুবই মূল্যবান। জীবদেহে উৎপন্ন হর্ম্মোনগুলিকে পৃথক করার চেষ্টা আশাপ্রদ। রুজিকা ও তাঁহার সহকর্ম্মিগণ পুং-হর্ম্মোনের (androsterone) অনুমিত গঠনের ১২৮টি সমরূপের (isomers) মধ্যে ৪টি কৃত্রিম উপায়ে প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে দুইটি স্বাভাবিক হর্ম্মোনের ন্যায় ক্রিয়াক্ষম। বিশেষ রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় কৃত্রিম হর্ম্মোনকে স্বভাবজাত হর্ম্মোন অপেক্ষা দুই-তিন গুণ বেশী শক্তিশালী করা যায় অর্থাৎ জীবদেহে প্রবেশ করাইয়া দিলে সেগুলি এমন ভাবে ক্রিয়া করে যে তাহাতে দেহের পুষ্টিকার্য্য দুই-তিন গুণ বেশী হয়। স্ত্রী-হর্ম্মোনের (oesterone) ন্যায় ক্রিয়াকারী কতকগুলি দ্রব্যও বর্ত্তমানে প্রস্তুত হইয়াছে। বৈজ্ঞানিক উপায়ে এইগুলিকেও স্বাভাবিক হর্ম্মোন অপেক্ষা দুই-তিন গুণ বেশী শক্তিশালী করা গিয়াছে। এদেশের ডক্টর যোগেন্দ্রচন্দ্র বর্দ্ধন এইরূপ একটি জিনিষ প্রস্তুত করিতে পারিয়াছেন। আর একটি হর্ম্মোন (luteosterone) লইয়াও গবেষণা হইতেছে। হর্ম্মোনগুলির মধ্যে সম্বন্ধ-নিরূপণের চেষ্টাও ফলবতী হইতেছে। উপরিউক্ত হর্ম্মোনগুলি, অন্যান্য হর্ম্মোন, অক্সিন, ও ভাইটামিন লইয়া পরীক্ষায় এমন সব তথ্য ইতিমধ্যে আবিষ্কৃত হইয়াছে যে তাহাতে সকল শ্রেণীর জিনিষগুলিই যে এক সম্বন্ধসূত্রে আবদ্ধ এরূপ অনুমান করিবার কারণ ঘটিয়াছে।

ফলিত রসায়নের আর যে দ্বিতীয় দিক গড়িয়া উঠিতেছে তাহা কৃষি-রসায়ন। রাসায়নিক সার প্রয়োগে শস্যের উৎপাদন বাড়িয়া যাওয়ায় ইউরোপ ও আমেরিকায় কৃষি-রসায়নের গবেষণায় উৎসাহ আসিয়াছে। জমিতে সার দিয়া তাহাকে উর্ব্বর করার প্রথা পুরাতন। ঊনবিংশ শতাব্দীর মাঝামাঝি সময়ে দেখা যায় ঐ সকল সার হইতে উদ্ভিদ তাহাদের জীবনধারণ ও পরিপুষ্টির জন্য নাইট্রোজেন-যুক্ত পদার্থ গ্রহণ করে। লিবিগের আমল হইতে উদ্ভিদেরা গ্রহণ করিতে পারে এরূপ নাইট্রোজেন-যুক্ত রাসায়নিক দ্রব্য জমিতে প্রয়োগ করা যাইতে লাগিল। প্রথমে স্বাভাবিক ভাবে প্রাপ্ত জিনিষগুলিই ব্যবহৃত হইত। পরে এমোনিয়া ও নাইট্রেট বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে প্রস্তুত হইতে থাকে। বর্ত্তমানে কোন্ রাসায়নিক পদার্থের কেমন অবস্থায় গাছের উপর কিরূপ ক্রিয়া হয় তাহা লইয়া গবেষণায় এবং জীবাণু কর্ত্তৃক নাইট্রোজেন-সারের উৎপাদন ও গাছের শাখা-প্রশাখা, ফুল ফল ও শস্য উৎপাদন ও নিয়ন্ত্রণ পরীক্ষায় বৈজ্ঞানিকের কিরূপ দৃষ্টি পড়িয়াছে নিম্নলিখিত বিবরণ হইতে তাহা বুঝা যাইবে।

যে মিডিয়ামে সার প্রয়োগ করা হইবে তাহা ক্ষার-জাতীয় কিংবা অম্ল-জাতীয়, তাহার উপর সারের ক্রিয়া অনেকাংশে নির্ভর করে। বিজ্ঞানের ভাষায় নির্দিষ্ট-সংখ্যক পি-এইচ (P. H.) সঙ্কেতের দ্বারা সার কতটুকু ক্ষার-প্রকৃতির বা অম্ল-প্রকৃতির তাহা ব্যক্ত করা হইয়া থাকে। দেখা যায় টমাটো প্রভৃতি গাছ ক্ষার মিডিয়ম

হইতে এমোনিয়া ও এসিড মিডিয়ম হইতে নাইট্রেট ভালরূপে গ্রহণ করিতে পারে। গাছ যত বড় হইতে থাকে তাহাদের দ্বারা এমোনিয়া গ্রহণ তত কমিয়া যায় এবং নাইট্রেট গ্রহণ বাড়িতে থাকে। জলে দ্রবণীয় চিনিশ্রেণীর জিনিষ বা কার্ব্বোহাইড্রেট সঙ্গে থাকিলে গাছের এমোনিয়া গ্রহণ শক্তি বাড়িয়া যায়। তবে ছোটবেলায় খুব বেশী কার্ব্বোহাইড্রেট থাকিলে উহাতে বাধা জন্মে। কার্ব্বোহাইড্রেট কম থাকিলে এমোনিয়া হইতে গাছের ক্ষতি হয়। উত্তাপমাত্রা কমাবাড়ার সঙ্গেও গাছের খাদ্যগ্রহণের সম্বন্ধ আছে। ৬ পি-এইচে এমোনিয়াম সালফেট ও ৪'৫এ সোডিয়াম নাইট্রেট হইতে আপেল ৯° উত্তাপমাত্রায় অন্ধকারে সোজা ধরণের প্রোটিন উৎপন্ন করিতে পারে। এমোনিয়া খাদ্যেই এই কার্য্য ভাল হয়। এই উত্তাপমাত্রায় প্রোটিন শিকড়ের দিকে থাকে বলিয়া গাছের ঐ অংশগুলি খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। ২১° উত্তাপমাত্রায় কুঁড়ির দিকে সোজা প্রোটিন বা এমিনো এসিড পাওয়া যায়। ঐ অংশগুলি তখন আবার খুব তাড়াতাড়ি বাড়ে। ধানগাছ কর্ত্তৃক এমোনিয়া গ্রহণ সালফেট, ফসফেট, নাইট্রেট ও ক্লোরাইড এই ধারায় কমিতে থাকে। ইক্ষুগাছে নাইট্রেট অপেক্ষা এমোনিয়ায় পাতার সবুজ রং ক্লোরোফিল কম উৎপন্ন হয়।

কেমন অবস্থায় কোন্ গাছের কোন্ অংশে কি কি দ্রব্য কিরূপ পরিমাণে থাকে, সে সম্বন্ধেও অনেক বিষয় জানা যাইতেছে। দ্রাক্ষাফল পাকিলে তাহাতে যে চিনি আসে তাহার বেশীর ভাগ দ্রাক্ষালতার প্রধান অংশে সঞ্চিত চিনি। ফলের চিনি গাছের সঞ্চিত চিনির পরিমাণের উপর নির্ভর করে। ঋতুর পরিবর্ত্তনে ও রোগের দ্বারা গাছের চিনির রকমের ও পরিমাণের বিভিন্নতা হয়।

গাছের পুষ্টিসাধন-ব্যাপারে ও রোগনিবারণে পটাসিয়াম, লোহা, ম্যাঙ্গানীজ, ক্যালসিয়াম, তামা প্রভৃতি ধাতব দ্রব্যের বিশেষ অংশ আছে। আলোর অভাবে গাছের যে পুষ্টিহীনতা হয় পটাসিয়াম খাওয়াইয়া তাহা অনেকাংশে শোধরান যায়। গ্রীষ্মপ্রধান দেশে কোন কোন জলপদ্মের রেণুকণা বাড়াইবার পক্ষে বোরিক এসিড খুব উপকারী। সোহাগায় ছোলার ফসল বাড়ে। অক্সিন এ. বি. প্রভৃতির ন্যায় রেণু হর্মোন এমন কি জন্তুর হর্মোন পর্য্যন্ত গাছের ফুল ফল, শাখা-প্রশাখা প্রভৃতি বাড়াইয়া দেয়। ভাইটামিন বি. এবং অক্সিন এ. বি. গাছের এমোনিয়া গ্রহণ কমাইয়া দেয় ও নাইট্রেট গ্রহণ বাড়াইয়া দেয়। 'থাইরয়েড' সামগ্রীর ইনজেকশ্যনে ফুল ও ফলের উৎপাদন বাড়িয়া যায়। পাতা বাড়াইতে থাইরক্সিন (thyroxin), মূলের বৃদ্ধিতে 'এড্রিন্যালিন' ও হাইপোফাইসিন (hypophysin), এবং কচুরীপানার ফুল ফোটানোয় 'ফলিকুলিন'কে ক্রিয়া করিতে দেখা গিয়াছে। ভাইটামিন বি.ও কোন কোন ক্ষেত্রে ফল-ফলান কার্য্যে সহায়তা করে।

বীজাণুর সাহায্যে বাতাসের নাইট্রোজেনকে উদ্ভিদের খাদ্যে পরিণত করা হয়। কতক প্রকার গাছের (leguminous plants) শিকড়ে স্ফোটকের মত হয়। ইহাতে বীজাণুসকল (rhizobia) বাস করিয়া বাতাস হইতে নাইট্রোজেন সংগ্রহপূর্ব্বক গাছের খাদ্যে পরিণত করিলে গাছ উহা গ্রহণ করে। বর্ত্তমানে বীজাণু-বিশেষ জন্মাইয়া (cultures) জমিতে ছড়াইয়া দেওয়া হয় এবং জমি তাহাতে নাইট্রেট-সারে সমৃদ্ধ হইয়া উঠে। গাছ না থাকিলেও কেবলমাত্র বীজাণু নাইট্রোজেন ধরিয়া লইতে পারে বলিয়া এত দিন যে ধারণা ছিল তাহা এখন ভুল বলিয়া প্রমাণিত হইয়াছে। ঐরূপে উৎপন্ন সার জমিতে ছড়াইয়া গেলে অন্য গাছেও উহা গ্রহণ করিতে পারে। উপযুক্ত পরিমাণ কার্ব্বনিক এসিড থাকিলে বীজাণুসকল সর্ব্বাপেক্ষা বেশী নাইট্রোজেন গ্রহণ করিতে পারে। সেই জন্য চিনি থাকিলে ক্রিয়া ভাল হয় (চিনি গাঁজিয়া গেলে তাহা হইতে কার্ব্বনিক এসিড উৎপন্ন হয়।) বাহিরে বীজাণু জন্মাইয়া তাহা জমিতে ছড়াইয়া দিবার সুবিধা এই যে তাহাতে কেবলমাত্র প্রয়োজনীয় বীজাণু থাকে, অপকারী বীজাণুগুলি বাদ পড়ে। উইলসন-প্রমুখ বৈজ্ঞানিকগণ কৃষি-রসায়নে বীজাণু-সংক্রান্ত গবেষণা করিতেছেন।

ভিন্ন ভিন্ন দেশে বৈজ্ঞানিকেরা কৃষি-রসায়নের গবেষণা করিয়া কৃষির উন্নতিসাধনে সাহায্য করিতেছেন, ভারতবর্ষ কৃষিপ্রধান দেশ হইলেও এখানে কৃষিকার্য্যে বিজ্ঞানের সাহায্য কম লওয়া হয়। বর্ত্তমানে গভর্ণমেণ্টের এদিকে কিছু দৃষ্টি পড়িয়াছে এবং এদেশেও কিছু কিছু কৃষি-রসায়নের

গবেষণা আরম্ভ হইয়াছে। অধ্যাপক ডক্টর নীলরতন ধর সারের জন্য ঝোলা গুড় ব্যবহার করিয়া ফল পাইতেছেন বলিয়া প্রকাশ করিতেছেন। বিভিন্ন উত্তাপমাত্রায় গাছের উপর সারের ক্রিয়া সম্বন্ধেও তিনি পরীক্ষাকার্য্য চালাইতেছেন। কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বিজ্ঞান কলেজের রসায়নের অধ্যাপক ডক্টর জ্ঞানেন্দ্রনাথ মুখোপাধ্যায় সম্প্রতি রসায়ন-বিজ্ঞানের এই দিকের গবেষণায় হাত দিয়াছেন। ফল ভবিষ্যতের গর্ভে। এদেশে ফলিত রসায়নে ডাক্তার স্যর ইউ. এন. ব্রহ্মচারী কর্ত্তৃক কালাজ্বরের এন্টিমনি-ঘটিত ঔষধ 'ইউরিয়া ষ্টিবামিন' আবিষ্কার ছাড়া উল্লেখযোগ্য কোন আবিষ্কার এ পর্য্যন্ত হয় নাই। কলিকাতা বিজ্ঞান কলেজের ফলিত রসায়নের অধ্যাপকরূপে ডক্টর এইচ. কে. সেন কিছুদিন পূর্ব্বে সস্তায় ম্যালকহল প্রস্তুত করিবার প্রণালী বাহির করিয়াছেন বলিয়া যে আশ্বাস দিয়াছিলেন, কার্য্যে তাহা ফল প্রসব করে নাই। কচুরী পানাকে ব্যবহারে আনিবার তাঁহার যে চেষ্টার কথা বহুল প্রচারিত হইয়াছিল তাহাও ব্যর্থ হইয়াছে ধরিয়া লওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এখন যাঁহারা জীব- ও উদ্ভিদ-সংক্রান্ত রসায়নের পরীক্ষায় নিযুক্ত আছেন তাঁহাদের গবেষণার ফল দেখিবার আগ্রহ অনেকেরই থাকা স্বাভাবিক।

যার লাগি ভোর…

শ্রীমনোজ গুপ্ত

মা মারা যাওয়ার পর সিতাংশুর প্রথম মনে হ'ল সামনের বিরাট বাধাহীন যাত্রাপথের কথা। মাকে সে যে ভালবাসত না, বা তাঁর মৃত্যুতে আঘাত পায় নি এ-কথা বলা চলে না। আর সকলের মতই সে মাকে ভালবাসত—হয়ত অনেকের চেয়ে বেশী ক'রেই ভালবাসত, কিন্তু সে জানত তার চলার পথে সবচেয়ে বড় বাধা তার মা। নিশার জন্যে সে মোটেই ব্যস্ত নয়—সে বোন; এক দিন তার বিয়ে হয়ে যাবে, তখন তার আর কোন দায়িত্ব থাকবে না। কিন্তু মার সমস্ত ভারই ত তার উপর। ভগবানের উপর তার এক এক সময় ভারি রাগ হ'ত। কত লোকের ত অনেক ছেলেমেয়ে, কেবল তারই বেলায় সে কি না মা'র একমাত্র ছেলে! যদি একটা ভাই থাকত! তাই মা যখন মারা যান তখন সে জানল তার মুক্তির পথ পাবার আশা আছে। অবশ্য, তাই ব'লে সে মা'র মৃত্যুকামনা করে নি। সে বিশ্বাস করত, জোর ক'রে কিছু করা চলে না, আর মা'র সুখ-সুবিধের দিকে দেখাও তার জীবনের একটা বড় কর্ত্তব্য। নিজে থেকে যখন সেই বন্ধন সরে গেল তখন সে অবশ্য ভগবানকে ধন্যবাদ দিয়েছিল।

এখন তার শেষ দায়িত্ব হ'ল নিশার বিয়ে। এর আগে মা যখন একথা বলেছেন তখন সে মোটেই ব্যস্ত হয় নি। তার প্রধান ভয় ছিল নিশা শ্বশুরবাড়ী চলে গেলেই মা একা পড়বেন আর তার উপর সুরু হ'বে বিয়ে করবার জন্যে অনুরোধ। অসম্ভব! বিয়ে সে করতে পারে না। তাই নিশার বিয়েরও কোন চেষ্টা করে নি, কিন্তু এখন আর সে বাধা নেই। হঠাৎ সে নিশার বিয়ের জন্যে এত ব্যস্ত হয়ে উঠল যে সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গেল। নিশা দাদাকে বরাবর ভয়ই ক'রে এসেছে; কোনদিন তার কাজের বিষয়ে কোন আলোচনা করতে সাহস ক'রে নি। সে চুপ ক'রে রইল। আত্মীয়দের মধ্যে অনেকেই বললেন, "এত তাড়াতাড়ি কেন? এই সেদিন মা গিয়েছে, এরই মধ্যে বিয়ে দিলে ও ভাববে তুমি ওর ভার সইতে রাজী নও। সিতাংশু কোন জবাব দেয় না—নিজের কাজ ক'রে চলে। সে যা একবার ভাল ব'লে ধরবে কেউ তা ছাড়াতে পারবে না।

* * *

মা'র অসুখের জন্যে সিতাংশু আপিস থেকে লম্বা ছুটি নিয়েছিল। ছুটির প্রথমেই মা মারা গেলেন, সে ঠিক করলে এই ছুটির মধ্যেই নিশার বিয়ে দেবে। সারাদিন সে ঘুরতে সুরু করলে। যেখানে ভাল ছেলের সন্ধান পায় সেখানেই ছোটে, কিন্তু সে ঠিক যা চায় তা পাওয়া সম্ভব হয়ে ওঠে না।

সে অবশ্য খুব বেশী কিছু চায় না—চাইলে চলবেই বা কেন ? নিশা দেখতে খুব ভাল নয়, লেখাপড়াও বেশী শেখে নি, আর তার জমান টাকাও খুব বেশী নেই। একটি মাত্র বোন, ধার ক'রে ভাল বিয়ে দেওয়া লোকের মতে হয়ত বা উচিত ছিল, কিন্তু সে তাতে রাজী নয়। ধার শোধ দেওয়া মানে আরও বেশ কিছু দিন চাকরি করা—তাই যদি করবে তা হ'লে আর···কাজেই সে চায় এমন কোন ছেলে যার স্বভাব-চরিত্র ভাল, ভদ্রসমাজে মিশবার মত লেখাপড়া শিখেছে আর নিজের সংসার চালাবার মত রোজগার করে। তার ধারণা ছিল এ এমন বেশী কিছু নয়, কিন্তু অন্য অনেক কিছুর মতই বিয়ের বাজারের সঙ্গেও পরিচয় তার কমই ছিল। এ রকম ছেলেরও বাজার-দর দেওয়া তার পক্ষে সহজ নয়, তা সে জানত না।

কোন কিছু ঠিক করতে না পেরে সিতাংশু বড় বেশী বিব্রত হয়ে পড়েছিল। তার এক আত্মীয় একটি ছেলের সন্ধান দিলেন। ছেলেটি তার এক বন্ধুর। অমন সুন্দর ব্যবহার না কি দেখতে পাওয়া যায় না। আজকালকার দিনে সিগারেটটি পর্য্যন্ত খায় না, বাপের একটিমাত্র ছেলে। তার বাপ থাকেন খুব সাদাসিধে ভাবে কিন্তু বেশ পয়সা আছে। সিতাংশু ভেবে দেখলে, মন্দ নয়। রাজী হ'ল। মেয়ে দেখে তাদের পছন্দও হ'ল, টাকা নিয়েও গোলমাল হ'ল না। ছেলের বাপ মেয়ে দেখে আশীর্ব্বাদের দিন ঠিক ক'রে গেলেন। এত সহজে যে সব ঠিক হয়ে যাবে সিতাংশু তা কল্পনাও ক'রে নি। বিয়েটা কোন রকমে দিয়ে দিতে পারলে হয়। আত্মীয়স্বজন সকলকেই বলতে হবে—কেই বা কি করে ? ছেলেকে একবার সে তার আপিসে গিয়ে দেখে এসেছিল, বেশ অমায়িক, লাজুক ছেলে, দেখতেও মন্দ নয়। ঠিক এই রকমটিই সে চাইছিল। এর হাতে নিশা যে সুখী হবে সে-বিষয়ে তার কোন সন্দেহ ছিল না। আসন্ন মুক্তির আশায় সিতাংশু নিঃশ্বাস ফেললে।

* * *

দুপুরবেলা সিতাংশু বাড়ী ফিরল খুব শ্রান্ত হয়ে। সোজা নিজের ঘরে যাচ্ছিল কিন্তু নিশা এত বেলা পর্য্যন্ত তার জন্যে না খেয়ে ব'সে আছে মনে হ'তে তার ঘরের দিকে গেল। তার শরীর ভাল ব'লে মনে হচ্ছিল না, এখনই খেতে যেতে পারবে না, নিশা যেন তার জন্যে অপেক্ষা না করে। ঘরে নিশা ছিল না কিন্তু সেদিকে লক্ষ্য করবার মত অবস্থাও তার ছিল না। সামনে এক জন লোক আছে আর সে যে নিশা ছাড়া আর কেউ হওয়া সম্ভব তাও ভেবে নেওয়ার কোন কারণ নেই, তাই সে বললে, "তুই এখনও খাস নি ত ? আমার জন্যে ব'সে থাকিস কেন বস্ ত ?"···কথা তার আর শেষ করা হ'ল না। যাকে উদ্দেশ ক'রে সে কথা বলছিল সে বললে, "নিশা নীচে গেছে, ডেকে দেব কি ?"

"না দরকার নেই,—আচ্ছা দাও—তুমি কখন এসেছ ?"

"একটু আগে—নিশা আপনার জন্যে বড্ড ভাবছিল, এইমাত্র নীচে গেল ঠাকুর চলে যাচ্ছে ব'লে।"

"তুমি আজকাল আর এস না, না ? তুমি এলে তবু ও একটা সঙ্গী পায়। আমি ত সারাদিন বাইরেই থাকি।"

"ওর বিয়ের পর আপনি···"

"কি করব ? বিশেষ কিছু ঠিক করি নি—দিন যে রকম ক'রে হোক চলে যাবে, ভেবে কি করব ?"

"নিশা বিয়েতে একটুও সুখী নয়, আপনার কথা ভেবে।"

"আমার কথা আমিই ভাবতে পারি—আমার শরীরটা বড্ড খারাপ লাগছে। তাকে ব'লো সে যেন খেয়ে নেয়, আমার জন্যে অপেক্ষা করতে হবে না।"

সিতাংশু চলে যেতেই নিশা এসে ঘরে ঢুকল। জিজ্ঞেস করলে, "দাদা কি বললে অমৃদি ?"

"তাঁর শরীর ভাল নয় ; তুই খেয়ে নিগে যা।"

"কি হয়েছে দাদার ?"

"জিজ্ঞেস করি নি।"

"তবে কি করেছ ? এতক্ষণ সময় পেয়ে কিছুই বল্‌লি না ? তোর কি কোন দিন মুখ ফুটবে না ?"

"মুখ ফুটে কি হবে বল ? যে পাথর সে কি কখনও জাগে ? শুধু শুধু নিজেকে ছোট করি কেন ? সম্মান যেখানে এক দিন ফিরে পাবার আশা আছে, সেখানেই তা হারান চলে।"

"দাদার সঙ্গে কোন দিন সাহস ক'রে কথা কই নি, এবার কিন্তু বলব !"

"পাগল হয়েছিস ? কি ভাববেন বল্ ত ?"

"তোর লজ্জা নিয়েই যদি থাকিস তাহ'লে ঠকবি। দাদা কি ঠিক করেছে জানিস ? চাকরি ছেড়ে দিয়ে সন্ন্যাসী হবে···"

"তাঁর যদি তাই ইচ্ছে হয়, কে বাধা দেবে বল্ ?"

"তুই না ওকে ভালবাসিস ?"

"হাঁ, এক দিকের—তাই দাম নেই। তিনি আমাকে ত একটুও চান না, হয়ত ঘৃণা করেন।"

"কেন, তোমার অপরাধ ?"

"সব সময় কি অপরাধ থাকে। না, না তুই ওসব কথা বলিস নে।"

"আচ্ছা, দাদা যদি সত্যি সংসার থেকে সরে দাঁড়ায় তাহ'লে তোর কি খুব দুঃখ হয় না ?"

"কি জানি ? তাঁর আদর্শ কত বড়।"

"আদর্শ কি সব সময় ধরা যায় ?"

"তবু চেষ্টা করতে ক্ষতি কি—মানুষের শক্তির ত পরিচয় চেষ্টাতে—সে কতটা সফল হয়েছে তাতে নয়। তুই ত বেশ মেয়ে! ওঁর যে শরীর খারাপ বললাম তা ভুলে গিয়েছিস?"

"না ভুলি নি, যাচ্ছি কিন্তু গিয়ে কি করব বল্? কোন কথাই শুনবেন না। রোজ বলি এত বেলা পর্য্যন্ত খাওয়া-দাওয়া না ক'রে বেড়িও না, তা সে কথা কানেই যায় না। কাল থেকে চোখের কি যন্ত্রণা হচ্ছে তাও স্পষ্ট ক'রে বলবেন না।…আমি আসছি, তুই যেন পালাস নি।"

* * *

নিশা তার দাদাকে খুব ভাল ক'রেই চিনত তাই বলেছিল, "গিয়ে কি করব?" সে ঘরে গিয়ে দেখলে দাদা তার চোখ বুজে শুয়ে আছে। তার মুখের দিকে তাকালেই বোঝা যায় সে অসুস্থ। নিশা শুধু তাকে ভয়ই ক'রে এসেছে—সাহস ক'রে কাছে যায় নি কোনদিন। আজও তার ভয় ভাঙে নি। অনেক কষ্টে সাহস সঞ্চয় ক'রে সে জিজ্ঞেস করলে, "কি হয়েছে দাদা?"

তার দিকে না চেয়েই সিতাংশু বললে, "কিছু না, তুই খেয়ে নিগে যা। কতদিন বলেছি আমার জন্যে তোকে ব'সে থাকতে হবে না।"

নিশা গেল না, চুপ ক'রে দাঁড়িয়ে রইল। অনেকক্ষণ পরে চোখ চেয়ে সিতাংশু বললে, "দাঁড়িয়ে রইলি কেন? কি? কিছু বলবি?"

নিশা চোখ নীচু ক'রে দাঁড়িয়েছিল, আস্তে আস্তে বললে, "আমায় তাড়াতে তুমি এত ব্যস্ত হয়েছ কেন দাদা? মা থাকলে কি…"

"মা থাকলে হয়ত ব্যস্ত হবার দরকার হ'ত না কিন্তু এখন হয়েছে। আমার ভবিষ্যতের কিছু ঠিক নেই—তাই তা থেকে তোমাকে আলাদা ক'রে দিতে চাই।"

"তুমি কি তাহ'লে আর আমার সঙ্গে কোন সম্পর্ক রাখবে না? আমার যে আর কেউ নেই।"

"হাঁ, এখন নেই কিন্তু হবে। যাতে হয় সেই চেষ্টাই ত করছি। তোমার বিয়ে দেওয়ার দায়িত্ব আমার, আমার যতটা সাধ্য সেই রকমই ব্যবস্থা করছি। সুখী হওয়া-না-হওয়া ত আর মানুষের নিজের হাত নয়। তোমার বরাতে সুখ থাকে তুমি সুখী হবে, আর যদি দুঃখ থাকে, তা থেকে আমি তোমায় বাঁচাতে পারব না।"

"ডাক্তারের কাছে গিয়েছিলে চোখ দেখাতে?"

"না, ওসব এ ক'দিন আর হবে না। পরে যা হয় করা যাবে।"

"আজ তোমার এমন কি কাজ ছিল যে একবার ডাক্তারের কাছে যেতে পারতে না?"

সিতাংশু নিশার মুখের দিকে চেয়ে রইল। যে কোন দিন তার কাছে আসতে সাহস ক'রে নি, হঠাৎ তার মুখে এত স্পষ্ট কথা শুনে সে আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল, কিন্তু নিশা আজ প্রাণপণ চেষ্টা ক'রে তার সব সঙ্কোচ জয় করেছে। যে-কথা সে বলতে এসেছে তা এবার তাকে বলতেই হবে। সিতাংশু কোন কথা বলবার আগেই সে বললে, "তোমার মুখের উপর কোন দিন কোন কথা বলতে সাহস করি নি দাদা, আমায় আজকের জন্যে ক্ষমা কর। তুমি এর পর কোথায় থাকবে?"

"তা ঠিক জানি নে—তবে এখানে নয়। এ-বাড়ী তোমার নামে লিখে দেব।"

"আমি আমার জন্যে জিজ্ঞেস করছি নে। বাড়ীর আমার দরকার নেই।"

সিতাংশুর বিস্ময়ের মাত্রা ক্রমেই বেড়ে যাচ্ছিল। সে জিজ্ঞেস করলে, "তবে কার জন্যে জিজ্ঞেস করছ?"

"অমুদির কি হবে?"

"তা আমি কি ক'রে বলব? তার সঙ্গে আমার এখানে থাকা না-থাকার সম্পর্ক কি? তুমি কি বলতে চাও, স্পষ্ট ক'রে বল ত।"

"তোমায় এত ক'রে বোঝাতে হবে তা আমি ভাবতেও পারি নি। অমুদির সম্বন্ধে কি তোমার কোন দায়িত্ব নেই?"

"আমার কোন দায়িত্ব থাকবার কারণ আছে ব'লে ত মনে হয় না। তার মা রয়েছেন, দাদা রয়েছেন, দু-দিন পরে তার বিয়ে হবে…"

"তুমি চুপ কর দাদা। তাদের উপর যতটা অন্যায় করেছ তাই যথেষ্ট—সেটাকে আর বাড়িও না।"

"অন্য কেউ আমায় এভাবে অপমান করতে সাহস করত না—তোমার অমুদিও না।"

"ঠিক সেই জন্যেই আমি সাহস করছি। ওর চোখের জল কি তোমার চলার পথ একটুও পিছল ক'রে দেবে না?"

"তুমি যাও আর তোমার অমুদিকে ব'লে দিও, তিনি এখানে না এলে আমি সুখী হব।"

"কোনদিন তোমার কাছে কোন অপরাধ করি নি দাদা, আমায় ক্ষমা কর। আমি যে ওকে বড্ড ভালবাসি, ওর দুঃখ সহ্য করতে কিছুতেই পারি না।"

কিছুক্ষণ চুপ ক'রে থেকে সিতাংশু জিজ্ঞেস করলে, "ওদের প্রতি আমি কি অন্যায় করেছি তা জানতে পারি?"

"মা ক'দিন আগেও যখন ওদের অত আশা দেন, তখন তুমি কেন তোমার অনিচ্ছা জানাও নি, তাহ'লেও ত ওরা সাবধান হয়ে যেত।"

"কথা মা দিয়েছিলেন, আমি নয়। আমার মতামতের জন্যে ত আর অপেক্ষা করেন নি।"

"কারণ মা জানতেন তুমি তাঁর কথা রাখবেই। এটা ধরে নেওয়া বোধ হয় তাঁর খুব অন্যায় হয় নি।"

"সব কিছু ধরে নিলে চলে না। মানুষের ব্যক্তিগত মতামতের দাম তার নিজের কাছে অনেক।"

"বেশ, তাহ'লে তুমি যে ধরে নিয়েছ এ বিয়েতে আমার অমত নেই, সেটা কি রকম হ'ল? আমি মেয়ে, তাই না?"

"তোমার ভার আমার উপর পড়েছে তাই সে ভার নামাতে চাই। তোমার আমার অবস্থা ঠিক এক রকম নয়। কিন্তু এ সব কথা কেন? যা অসম্ভব, তা নিয়ে মাথা ঘামিয়ে লাভ কি?"

"কেন অসম্ভব? তুমি কি সত্যিই মনে কর তুমি ওপথে চলতে পারবে?"

"সে আলোচনা তোমার সঙ্গে করতে ইচ্ছে করি নে।"

নিশার মুখটা লাল হয়ে উঠল, সে বললে, "না, তোমার সঙ্গে আলোচনা করার মত স্পর্দ্ধা রাখি না। শুধু জিজ্ঞেস করছিলাম।"

"বেশ, এখন যাও আর পার ত যে ক'দিন এখানে আছ, এ-সব কথা তুলো না। আমি ইচ্ছে ক'রে কারও কোন ক্ষতি করি নি, করতে চাইও নি। কেউ যদি ইচ্ছে ক'রে দুঃখ পায়, তাতে আমার হাত নেই।"

* * *

নিশার কোন আপত্তিই টিকল না, তার বিয়ের ঠিক হয়ে গেল। নিশা বেশ ভাল ক'রেই জানত সিতাংশু যা ভাল ব'লে মনে ক'রে বরাবরই সে তাই করে—কারও কথা তাকে টলাতে পারে না। তবু সে একবার চেষ্টা ক'রে দেখেছিল, কিন্তু ঐ এক দিন ছাড়া সিতাংশু তাকে অমলার সম্বন্ধে কোন কথা তুলতে দেয় নি। অমলা তার কাছে এসেছে, হেসে গল্প করেছে কিন্তু নিশা তার দিকে ভাল ক'রে চাইতে পারে নি। তার মনে হ'ত সে যেন নিজেই অমলার কাছে অপরাধী। অমলা তাকে বোঝাতে চেষ্টা করেছে, যা হয়েছে তাই ভাল কিন্তু সে কিছুতেই তা মেনে নিতে পারে নি। তার যেন বিশ্বাস হয়ে গিয়েছিল এ হ'তে পারে না, এ অসম্ভব, এর কোথাও একটা মস্তবড় ত্রুটি থেকে যাচ্ছে।

বিয়ের সময় আত্মীয়-অনাত্মীয় অনেকেই এসেছিলেন আর তাঁদের যা কাজ, সেই অযাচিত উপদেশ দিতে ছাড়েন নি। মেয়েরা বিয়ের কথা বললে সিতাংশু হেসে উড়িয়ে দিয়েছে; পুরুষরা বললে কথার জবাব না-দিয়ে সেখান থেকে চলে গিয়েছে। তার রকম দেখে সকলে শেষে ঠিক করলেন ওর মধ্যে এমন কোন রহস্য আছে যা ও লোকের কাছে প্রকাশ করতে সাহস করছে না। কেউ কেউ তার চরিত্র সম্বন্ধে সন্দেহ করতেও দ্বিধা করেন নি। সিতাংশুর কানে সবই আসত। এক-একবার তার মন হ'ত তাদের সব বিদেয় ক'রে দিয়ে জঞ্জাল দূর করে, কিন্তু তা পারত না। কতক্ষণই বা তারা বিরক্ত করবার অবসর পাবে? এই ত শেষ! শুধু-শুধু কেন লোকের মনে দুঃখ দেয়?

বিয়ের পর সে নিশার স্বামী শরৎকে ডেকে বললে, "তোমার হাতে নিশাকে দিয়ে আমি নিশ্চিন্ত হ'তে চাই। কোন দিন তার খবর নিতে পারব কি না জানি নে।" সে ভদ্রলোক আশ্চর্য্য হ'য়ে গিয়েছিল, জিজ্ঞেস করলে, "কেন?"

"আমি কোথায় থাকব, না-থাকব তার কিছু স্থিরতা নেই। কালই হয়ত এখান থেকে চলে যাব। আর একটা কথা। আমার থাকার মধ্যে আছে এই বাড়ীখানা। সেটাও তোমাদের নামে রেজেষ্ট্রী ক'রে রেখেছি—এখানা রেখে দাও। কিছু দিন নিশাকে এ-কথা জানিও না।"

"বাড়ীখানা আমাদের দেবার অর্থ? আপনার নিজের ব্যবস্থা কি করেছেন জানতে পারি?"

"না, তার দরকার নেই।"

"আপনার বাড়ীখানাতে যে আমার এমন বেশী দরকার তাও ত কই বলি নি।"

"আমার ওটাতে দরকার নেই, তোমাদের দরকার হ'তে পারে। আর ওটা না-হয় আমার বোনকেই দিচ্ছি ধ'রে নাও না।"

"তাকেই তবে দিন গে। তার হ'য়ে ও-দায়িত্ব আমি নিতে পারি নে।"

সিতাংশু তার দিকে কিছুক্ষণ চেয়ে রইল। সে আজ প্রথম বুঝল সাধারণ সংসারী লোকও অর্থের জন্যে সব কিছু ভোলে না। এ রকম স্বামীর হাতে পড়ে নিশা কষ্ট পাবে না নিশ্চয়—সিতাংশুর এতে বড় কম লাভ নয়। তার শেষ দায়িত্বটাও এত সহজে তার ঘাড় থেকে নেমে গেল দেখে তার আনন্দ হচ্ছিল।

শ্বশুরবাড়ী যাবার সময় নিশা এসে যখন সিতাংশুকে প্রণাম করল তখন অনেকেই ভেবেছিল, তার চোখে জল দেখতে পাবে; কিন্তু সে বেশ সহজ ভাবে বললে, "যেখানে যাচ্ছ, আজ থেকে সেই তোমার ঘর; সেখানে গিয়ে যদি সুখী হ'তে না পার তাহ'লে আর কোথাও সুখী হ'তে পারবে না।"

আজকালকার কোন ছেলের কাছে কণ্বমুনির মত উপদেশ শুনবে শরৎ তা আশা করে নি। সে ঠিক করতে পারলে না সিতাংশুর এর মধ্যে কতটা অভিনয় আছে।

* * *

সিতাংশুর কাণ্ড দেখে আপিস-সুদ্ধ লোক অবাক হয়ে গিয়েছিল। তার খুব বরাত জোর বলতে হবে যে সে অত

অল্প বয়সে অত বড় কাজ পেয়েছিল আর সেজন্যে অনেকেই তাকে ঈর্ষা করত। কেউ বললে, "লোকটার একেবারে মাথা খারাপ হয়ে গেছে।" কেউ বললে, "অন্য কোথাও বেশী টাকার লোভ দেখিয়েছে।"

সাহেব তাকে খুব ভালবাসত, অনেক বোঝাবার চেষ্টা করলে কিন্তু কিছু লাভ হ'ল না। সিতাংশু শেষ পর্য্যন্ত চাকরি ছেড়ে দিলে। নিশা বা শরৎ কেউই সে-কথা জানতে পারলে না।

সিতাংশুদের বাড়ীর দরজায় চাবি পড়তে সেটা সকলের আগে চোখে পড়েছিল অমলার। নিশার বিয়ে হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে যে তাদের বাড়ীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবে তা কেউ ভাবতেও পারে নি। অমলা ভেবেছিল সিতাংশু কিছু দিনের জন্যে বাইরে কোথাও গিয়েছে তাই সে নিশার শ্বশুরবাড়ী থেকে ফিরে আসা পর্য্যন্ত অপেক্ষা করছিল। অন্ততঃ আট দিনের আগে সে ফিরবে না। নিজেকে সে যতই ভুল বোঝাতে চেষ্টা করুক, ভুল বোঝান অত সহজ নয়।

তার বৌদি তাকে জিজ্ঞেস করলে, "এদের ব্যাপার কি বল ত ভাই? বোনের বিয়ে হ'ল ত ভাই হ'ল দেশ-ছাড়া…"

অমলা বললে, "আমি তার কি জানি? তুমিও যেখানে আমিও সেখানে।"

"ঠিক তাই কি? ওবাড়ীর কারও জন্যে মাথা না ঘামালেও আমার চলবে কিন্তু তোর…"

অমলা তাকে বাধা দিয়ে বললে, "তোমার পায়ে পড়ি বৌদি, তুমি চুপ কর।"

"ওকি তুই কাঁদছিস? আমি ঠাট্টা করছিলাম ভাই।"

"ও রকম ঠাট্টা মানুষ করে?"

"কিন্তু এ রকম ক'রে তুই ক'দিন থাকবি?"

"তা জানি নে।"

"তোর দাদা যদি জোর ক'রে বিয়ে দিয়ে দেন তাহ'লে কি করবি?"

"তাও জানি নে।"

"ও ছেলেমানুষী ছাড়তে চেষ্টা করাই ভাল। সময়ে সব ঠিক হয়ে যায়। কত মেয়েকে ত দেখলাম, বিয়ের পরে আগেকার জীবনটাকে মস্তবড় ভুল ব'লে স্বীকার করেছে।"

"কি ক'রে পারে বল ত?"

"কেন পারবে না? হিন্দুর মেয়েরা ছোটবেলা থেকে স্বামীর জন্যে মনের মধ্যে একটা স্থান ঠিক ক'রে রাখে, বিয়ে করার পর সেইখানে স্বামীকে প্রতিষ্ঠা করে। বিয়ের আগে যদি কাউকে ভাল লাগে তাকে সে ঠিক ঐ জায়গাটায় কিছুতেই বসাতে পারে না।"

"তোমার মত ক'রে ওসব কোন দিন ভেবে দেখি নি ভাই, ও আমি বুঝতেও পারি না।"

অমলার ওসব আলোচনা ভাল লাগছিল না। তার কথা নিয়ে কেউ আলোচনা করে, তাকে সহানুভূতি দেখায় এ সে সহ্য করতে পারত না। ছোটবেলা থেকে সে কখনও কোন বিষয়ে কারও কাছে অভিযোগ করে নি; কারও সাহায্য নিতে তার আত্মসম্মানে বাধত।

* * *

শরৎকে সঙ্গে নিয়ে নিশা অমলাদের বাড়ী আসতে সবাই একটু আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। শরৎ অশোকের মাকে বললে, "আপনারা বোধ হয় আশ্চর্য্য হয়ে যাচ্ছেন, কিন্তু কি করব বলুন? নিশার কে আছে যে তার কাছে নিয়ে যাব? এখন জানার মধ্যে এক আপনারা, তাই আপনাদের কাছে নিজেকে পরিচিত ক'রে নিতে এলাম।"

অশোকের মা ভারী খুশী হয়েছিলেন; বললেন, "তোমার মত ছেলেকে বলবার কিছু নেই। সিতাংশু নিশাকে ছেড়ে দূরে থাকতে পারে, কিন্তু আমরা পারি নে। ছোঁড়াটা কি করলে বল ত?"

"কিছুই ত বুঝতে পারছি নে। তিনি যদি নিজের উন্নতির জন্যে গিয়ে থাকেন তাতে বলবার কিছু নেই, তবু মনে হয় বড্ড ব্যস্ত হয়ে করার মত কাজ তিনি নেন নি। দু-দশ দিন বাদে ক'লকাতা ছেড়ে গেলে তার কি ক্ষতি হ'ত?"

"বুঝি না বাবা। ওর মা-ই ত ওর শত্রু! শুধু ওকে এসব খেয়াল শিখিয়ে যায় নি, আবার ঠিক এই সময়টিতে নিজে সরে গিয়ে ওকে একেবারে নির্ঝঞ্ঝাট ক'রে দিয়ে গেল।"

নিশা শরতের সঙ্গে অমলার পরিচয় ক'রে দিলে। শরৎ বললে, "সিতাংশুবাবুকে আমি মোটেই হিংসে করি না। তাঁর জীবনে অনেক দুঃখ আছে তা না হ'লে কেউ এসব ছেড়ে যায় না।"

নিশা অমলাকে চুপি চুপি বললে, "তোকে একটা কথা বলব ভাই কিছু মনে করিস নি। তুই বিয়ে কর্। যে তোর দাম বুঝলে না তার জন্যে…"

"আমি কারও জন্যে কিছু করছি নে। বিয়ে করব না এমন কথাও আমি বলি নে, আর তা বললেই বা চলবে কেন। নিজের পায়ে দাঁড়াবার মত শিক্ষা ত পাই নি।"

"সেই মতিই যেন তোর হয় ভাই। যদি কোন দিন তাঁকে এ-পথে ফিরতে হয় তাহ'লে যেন ভাবতে না পারেন কেউ তাঁর জন্যে পথ চেয়ে ব'সে ছিল।"

"যে যায় সে ফেরার জন্য যায় না।"

"কিন্তু যাওয়াটাই ত আর সবচেয়ে বড় কথা নয়, আর

সব যাওয়াই যে যাওয়ার জন্যে তাও আমি মানি নে—যাওয়ার লোভেই অনেকে যায়।"

"ও সব কথা থাক্। তোদের বাড়ীতে চাবি পড়ল কেন? ভাড়া দিয়ে দে না।"

"আমি কেন দিতে যাব? আমার কি গরজ? শুনলাম বিয়ের পর আমাদের দান ক'রে দিতে চেয়েছিলেন, নেয় নি, নিলেও আমি ফিরিয়ে দিতাম।"

অমলা চেয়েছিল কথাটা ঘুরিয়ে অন্য পথে নিয়ে যেতে, কিন্তু নিশার কাছে এ-কথাটাও অপ্রীতিকর হচ্ছে দেখে সে থেমে গেল। তার পর বললে, "সময় পেলেই আসিস। তোর বর ত বেশ ভাল লোক দেখছি, বললেই কথা শুনবে।"

"বিয়ের পর কিছুদিন সব বরই ভাল লোক আর সব বরই কথা শোনে।"

"না, তোর বর পরেও শুনবে।"

"তাই নাকি? একবার দেখেই চিনে নিয়েছিস? ব্যাপার ত ভাল নয়।"

"জ্বালাস নে। মা তোর শাশুড়ীকে লিখবেন নিশ্চয়।"

"শুধু লিখলেই ত হবে না। তুই না গেলে তোদের বাড়ী তারা আমায় পাঠাবে কেন?"

"আইবুড়ো মেয়ের বুঝি যেখানে-সেখানে যেতে আছে?"

"আইবুড়ো থাকবার জন্যে ত কেউ মাথার দিব্যি দিচ্ছে না। অশোকদাকে ব'লে যাচ্ছি···।"

"আচ্ছা, আর বাহাদুরি করতে হবে না। আমার ব্যবস্থা আমি নিজেই করতে পারব।"

* * *

শরৎকে দশটার মধ্যে আপিসে হাজির হ'তে হয়, তাই ন'টা বাজতে না বাজতে তার ছুটোছুটি সুরু হয়। বিয়ের কনে হয়ে এসেই নিশাকে স্বামীর কি কি দরকার তা ঠিক ক'রে রাখতে হ'ত। হঠাৎ দৈনন্দিন নিয়মে বাধা পড়ল দেখে বাড়ীসুদ্ধ সবাই আশ্চর্য্য হয়ে গিয়েছিল। ন'টা বেজে যাবার পরও শরতের দেখা নেই। তার মা এসে নিশাকে জিজ্ঞেস করলে, "হাঁ বৌমা, সে আজ আপিস যাবে না এ-রকম কিছু বলেছিল না কি?"

তাকে জিজ্ঞেস করায় নিশা একটু বিব্রত হয়ে পড়েছিল, বললে, "না।"

"কোথায় গেছে তাও বলে যায় নি ত?"

"না।"

"ঐ ছেলেই আমায় পাগল করলে। এখন কোথায় খুঁজতে পাঠাই বল ত? এ রকম ত সে কখন করে না।"

তার আর বেশী কিছু বলা হ'ল না। শরৎ বাড়ী ফিরল কতকগুলো কাগজ-বাঁধা বাণ্ডিল নিয়ে। মা কিছু বলবার আগেই সে বললে, "খুব রাগ করছিলে ত?"

"তা করব না? আপিসের দেরি হয়ে যাচ্ছে···"

"আজ আপিস যাব না।"

"সে কি? আপিস যাবি না কেন?"

"বিদেশ যেতে হবে তাই ছুটি নিয়েছি। এই জিনিষগুলো আর কতকগুলো কাপড় জামা একটা সুটকেসে দিয়ে দিতে হবে—বারটার ট্রেনে যাচ্ছি।"

"কোথায় যাচ্ছিস, কেন যাচ্ছিস কিছুই ত বললি না।"

"যাচ্ছি কাশী পর্য্যন্ত—বিশেষ কাজ পড়েছে ব'লে।"

"বেশী দিন থাকতে হবে না কি?"

"কাজ তাড়াতাড়ি হয়ে গেলে থাকতে হবে না। বাবাকে সব বুঝিয়ে বলেছি।"

মা চলে যেতেই শরৎ নিশাকে বললে, "মার কাছে জবাবদিহি ত শেষ হ'ল, এবার কি তোমার পালা না কি?" নিশা কোন জবাব দিলে না দেখে শরৎ বললে, "খুব রাগ হচ্ছে, না, একা যাচ্ছি ব'লে? লক্ষ্মীটি কিছু মনে ক'রো না; বড্ড দরকারী কাজ তাই যেতে হচ্ছে।"

নিশা সুটকেস সাজাতে লাগল। কিছুক্ষণ পরে বললে, "বিছানা নেবে না?"

"না, দরকার হবে না। এক জন লোকের বাড়ী যাচ্ছি; আর ক'দিনের জন্যে ওসব ঝঞ্ঝাট না বাড়ানই ভাল। হাঁ, তোমার ইচ্ছে হ'লেই তোমার বন্ধুর কাছে যেতে পার, বাবা-মা বারণ করবেন না।"

"অমুদির কাছে আমার যেতে সাহস হয় না।"

"এ কয়দিনে সে কথা ত অনেকবারই শুনেছি, কিন্তু কি উপায় আছে বল?"

নীচে থেকে মা বললেন, "আর দেরি করিস নি ভাত বাড়ছি।"

* * *

তখন এলাহাবাদে কুম্ভমেলার আয়োজন চলছিল। সারা দেশ থেকে সাধুর আমদানি সুরু হয়ে গিয়েছিল। কত রকমের সাধু! কেউ কাঁটার ওপর শুয়ে, কেউ চারদিকে আগুন জ্বেলে দিনরাত তার মাঝে ব'সে, কেউ একটা হাত উপর দিকে তুলে, কেউ মৌনী, কেউ লোককে ওষুধ দিচ্ছেন, কেউ পাঠ করছেন। সিতাংশু ভেবেছিল তার বরাত খুব ভাল। ঠিক যে সময় সমস্ত ভারতবর্ষের সাধু-সন্ন্যাসী একসঙ্গে এসে হাজির হয়েছেন, সেই সময়টিতে সেও মুক্তি পেয়েছে। সমস্ত দিনরাত সে সাধুদের সঙ্গে সঙ্গে ঘুরছে—আজ এক সাধুর কাছে যায়, তাঁর সেবা করে, তাঁর সঙ্গে কথাবার্ত্তা বলে কিন্তু কোথায় যেন তার মেলে না, তার পর দিন আর এক সাধুর কাছে যায়। ক'দিনে তার চেহারা এমন বিশ্রী হয়েছিল যে হঠাৎ কেউ তাকে চিনে নিতে পারত না, কিন্তু সেদিকে তাকাবার তার সময় ছিল না। এ রকম সুযোগ জীবনে আর আসবে না। তার সবচেয়ে বিপদ

হয়েছিল এই যে, যাঁকে দেখে ওর শ্রদ্ধা হয়েছিল তিনি ওকে মোটেই আমল দিচ্ছিলেন না; এমন বিরক্ত হয়ে উঠছিলেন যে সে চেষ্টা করেও তাঁর কাছে ব'সে থাকতে পারছিল না—তবু সে আশা ছাড়ে নি।

সন্ধ্যেবেলা সিতাংশু গঙ্গার দিকে যাচ্ছিল। সারাদিন সে কিছু খায় নি, খুব ক্লান্ত হয়ে পড়েছিল। তার সামনে দিয়ে দু-জন লোক চলছিল। আগে তারা অনেক দূরে ছিল কিন্তু এত আস্তে আস্তে যাচ্ছিল যে সিতাংশু কিছুক্ষণের মধ্যেই তাদের ঠিক পিছনে এসে পড়ল। তারা খুব আস্তে আস্তে কথা বলছিল কিন্তু সিতাংশুর বুঝতে একটুও অসুবিধে হ'ল না। তারা দু-জনেই বাঙালী, এক জন সুট প'রে ছিল।

সুট-পরা লোকটি বললে, "সাধুজী কুম্ভে এসেছেন অথচ ঐ রকম নির্জ্জন জায়গায় রয়েছেন কেন বল ত? সাধুদের সঙ্গে দেখাসাক্ষাৎ করেন না?"

"করেন কি না-করেন কি ক'রে বলব বল? ওঁর কতটুকুই বা জানি? হয়ত রাত্রে যাওয়া-আসা আছে।"

"তুমি যখন প্রথম-প্রথম ওর ক্ষমতার কথা বলতে, আমার মনে হ'ত তোমায় যাদু করেছে।"

"সেই জন্যেই তোমায় নিয়ে গেলাম। দেখলে ত কি অলৌকিক ক্ষমতা!"

"বাস্তবিক, চোখের সামনে লোহার চাকাটা সোনার হ'য়ে গেল, এ যে ধারণাও করা যায় না।" কথাটা বলেই ভদ্রলোকটি একটা সোনার চাকা পকেট থেকে বার করলেন।

অপর লোকটি বললে, "এবার বিশ্বাস কর ত, তোমার সম্বন্ধে তোমায় না-দেখে সব কথা বলা ওর সম্ভব?"

"নিশ্চয়।"

"মজা কি জান? তোমার মত যারা অবিশ্বাসী উনি কেবল তাদের কাছে ঐ রকম এক-একটা অলৌকিক ক্ষমতার পরিচয় দেন একবার মাত্র।"

সিতাংশুর পক্ষে আর চুপ ক'রে থাকা অসম্ভব হ'ল। সে এগিয়ে এসে বললে, "ক্ষমা করবেন, আপনাদের কথার কিছু কিছু কানে এসেছে। সাধুজীর ডেরাটা আমায় ব'লে দেবেন?"

লোক দুটি সিতাংশুকে দেখে চমকে উঠেছিলেন, বললেন, "আজ্ঞে সেটা ঠিক হবে না। তিনি বিরক্ত হবেন।"

"আমি তাঁকে বিরক্ত করব না। কুম্ভের প্রায় সব সাধুকেই দেখলাম, তাঁকেও দেখবার ইচ্ছে হচ্ছে।"

সুট-পরা লোকটি জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি সংসার ত্যাগ করেছেন? আশা করি জিজ্ঞেস করলাম ব'লে কিছু মনে করবেন না।"

"আজ্ঞে না, মনে কিছু করব না। হাঁ, সংসার প্রায় এক রকম ছেড়েই এসেছি।"

"আপনার মত লোক গেলে সাধুজী নিশ্চয় বিরক্ত হবেন না। আচ্ছা, আপনি এক কাজ করুন। কাল সকালে এই জায়গায় ঠিক সাতটার সময় আসবেন, আমরাও যাব, আপনাকে নিয়ে যাব।"

নমস্কার ক'রে সিতাংশু এগিয়ে চলে গেল।

*　　*　　*

শহরের বাইরে বেশ নির্জ্জন স্থানে স্বামী জটিলানন্দের অস্থায়ী আশ্রম। স্বামীজী সুখদুঃখবোধের বাইরে গেলেও প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যের প্রতি একেবারে উদাসীন নন তা বেশ বোঝা যায়। চেলা-সঙ্ঘের বালাই নেই, একটি মাত্র লোক তাঁর সঙ্গে আছে দেখা গেল। স্বামীজীর চুল আর দাড়ি ধবধবে সাদা, কিন্তু মুখের দিকে তাকালে মনে হয় বয়স বেশী হয় নি। সিতাংশু ভাবলে এই ত আসল সন্ন্যাসী। স্বামীজীকে দেখে তার আন্তরিক শ্রদ্ধা হচ্ছিল। সিতাংশু আর তার গত রাত্রের চেনা লোক দুটি স্বামীজীকে প্রণাম করতে তিনি হাত তুলে আশীর্ব্বাদ করলেন, তার পর সিতাংশুকে কাছে ডাকলেন। স্বামীজী ইসারা করতে পিছনের লোক দু-জন চলে গেল। সিতাংশুকে বললেন, "ক'দিন ত খুব ঘুরলে, কি পেলে?" সিতাংশু আশ্চর্য্য হয়ে জিজ্ঞেস করলে, "আপনি সে কথা জানেন?"

"কিছু কিছু জানতে পারি, যা তিনি দয়া ক'রে জানতে দেন তার বেশী জানতে চেষ্টাও করি না।"

"ঠাকুর, আমি হতাশ হই নি। দুঃখ দিয়ে তিনি পরীক্ষা ক'রে নেন, এ-কথা আমি বিশ্বাস করি।"

"ঘর ছেড়ে যে বাইরে এলে, মনে কর কি ঘরের জন্যে কখনও মন কাঁদবে না?"

"আজ্ঞে না।"

"তোমার ত খুব সাহস দেখছি। আমি ত তোমায় সাহায্য করতে পারব ব'লে মনে হয় না। পূর্ব্বগ্রামের জন্য এখনও মাঝে মাঝে মন চঞ্চল হয়।"

"আপনার কথা ত কিছুই জানি না, কিন্তু আমার ত কোন বাঁধন নেই।"

"বোনের বিয়ে হয়ে গেলেই কি বাঁধন খুলে যায়?"

সিতাংশুর বিস্ময় ক্রমশঃ সীমা ছাড়িয়ে যাচ্ছিল। স্বামীজী তা বুঝতে পেরে বললেন, "এতেই এত আশ্চর্য্য হচ্ছ? এ ত খুব ছোট জিনিষ; চেষ্টা করলে সবাই পারে।"

"আমি ঘরে ফিরতে আর চাই না।"

হাসতে হাসতে স্বামীজী বললেন, "ঘর ছেড়ে এসেছ কি যে ফিরতে চাই না বলছ ?"

"বাংলা থেকে এত দূর এসেছি⋯"

"তোমার দেহটা এসেছে, তুমি আস নি। আচ্ছা, সংসার ছেড়ে এসেছ, না ? তা বাড়ীর দলিল সঙ্গে কেন ?"

সিতাংশুর মনে পড়ে গেল সেটা কোটের পকেটেই আছে। বিব্রত হয়ে বললে, "যাকে দিতে চাইলাম সে নিলে না, কি করব বলুন ?"

"রাস্তায় ফেলে দিলেই পারতে।"

"রাস্তায় ? যে কেউ কুড়িয়ে⋯"

"তাতে তোমার কি ? তোমার কাছে ওর দাম থাকা উচিত নয়।"

"তাহ'লে এটা ফেলেই দি ?"

"ফেলব বললেই ফেলতে পারবে কি ?"

সিতাংশু পকেট থেকে বার ক'রে ঘরের মেঝেয় ফেলে দিলে। স্বামীজী হাসতে হাসতে বললেন, "হ'ল না ; ও ত তোমারই রয়ে গেল। কারও নামে লিখে দাও।"

সিতাংশু স্বামীজীর নামে লিখে দিল।

"বেশ ! কিন্তু এ ছাড়া আরও কিছু নেই কি ?"

"কই মনে ত হচ্ছে না ; আপনি বলে দিন।"

"কোন লোকের কথা মাঝে মাঝে মনে পড়ে ?"

"আজ্ঞে না।"

"অত তাড়াতাড়ি জবাব দিও না, ভেবে দেখ ! মনে হয় না কেউ হয়ত কাঁদছে, কার উপর হয়ত অন্যায় করেছ ?⋯ আমার যেন মনে হচ্ছে অনেক দূরে কোথাও কেউ তোমার জন্যে কাঁদছে।"

আমি ইচ্ছে ক'রে কাউকে দুঃখ দিই নি—কেউ যদি মন-গড়া দুঃখ নিয়ে কাঁদে, তার দিকে তাকাতে গেলে পথ চলব কি ক'রে ?"

"কারও দুঃখেই যদি কাঁদতে না শিখলে তাহ'লে পথ চলে লাভ ?"

সিতাংশু জবাব খুঁজে পেল না, কিছুক্ষণ চুপ ক'রে ব'সে রইল। স্বামীজী তার দিকে চেয়ে বললেন, "সত্যিই তাকে দুঃখ দাও নি—অন্ততঃ তার দুঃখের জন্যে সে কি তোমায় মোটেই দায়ী করতে পারে না ?"

সিতাংশুর মনে হ'ল সন্ন্যাসীর কথাগুলো তাকে অভিভূত ক'রে ফেলছে ; সে বললে, "আমায় ভাবতে সময় দিন।"

"আচ্ছা, আজ যাও, কিন্তু কথাগুলো স্থির মনে ভেবে দেখ, বিচার করো, তার পর এস।"

সিতাংশু প্রণাম ক'রে চলে গেল। তার সঙ্গীদের খোঁজ নেবার মত মনের অবস্থাও তার আর ছিল না। তার মনে হচ্ছিল, সন্ন্যাসী যাদুকর, তাকে সম্মোহন করেছেন। সে তার কথাগুলো যত ভুলবার চেষ্টা করেছিল সেগুলো তাকে ততই পেয়ে বসছিল। সে ভাবছিল, কয়দিন আগে নিশাও তাকে এই সব কথা বলেছিল, তখন সে তাকে ধমক দিয়েছিল।

* * *

ডাক্তার চ্যাটার্জীর বাড়ীর সামনে রোজ যেমন ভিড় হয় তেমনি হয়েছিল। ভোরবেলা থেকে লোক আসে আর বেলা একটা পর্য্যন্ত তাঁর নিঃশ্বাস ফেলবার সময় থাকে না। কত দূর দূর জায়গা থেকে লোক আসে, কাউকে ফেরালে চলে না। এক-এক দিন এত বেলা হয়ে যায় যে তাঁর মা রাগ করতে থাকেন। আগে আগে ডাক্তার হেসে উড়িয়ে দিতেন, কারণ তিনি সকাল-সকাল খেয়ে নিলেও তাঁর মার খেতে বসতে তিনটে বাজবেই ; কিন্তু আজকাল আর তা হয় না। মা ছাড়া আরও একজনকে আজকাল তার জন্যে অকারণ কষ্ট ভোগ করতে হয়। শুধু শুধু কাউকে কষ্ট দিতে তিনি রাজী নন।

বেলা দশটা বেজে গিয়েছিল তাই তিনি খুব তাড়াতাড়ি কাজ সেরে নিচ্ছিলেন। যে কয়জন লোক ছিল তাদের দেখে শেষ করতে আর বেশী সময় লাগবে না, কিন্তু তাদের দেখে শেষ করবার আগেই একটা গরুর গাড়ী এসে দাঁড়াল। ডাক্তার চ্যাটার্জি যে একটু বিরক্ত হন নি তা বলা যায় না। তিনি ভেবেছিলেন, ঐ দেশেরই কোন লোক, কিন্তু লোকটি অচেনা বাঙালী দেখে তিনি একটুও আশ্চর্য্য হলেন না। জিজ্ঞেস করলেন, "কোথা থেকে আসছেন ?"

"প্রায় ক্রোশ-ছয়েক দূর থেকে।"

"কি হয়েছে বলুন ত ?"

"ঠিক ত বুঝতে পারছি না, তবে চোখে অসহ্য যন্ত্রণা হচ্ছে।"

"আপনি ঘরে একটু বসুন, আমি এখনি যাচ্ছি।"

লোকটিকে পরীক্ষা ক'রে ডাক্তার চ্যাটার্জী জিজ্ঞেস করলেন, "আপনি কি এদিকেই থাকেন ?"

"না, সম্প্রতি এসেছি।"

"থাকেন কোথায় ?"

"কলকাতায় ?"

"দেখুন আপনাকে সব কথা স্পষ্ট ক'রে বলাই ভাল। অনেক আগেই আপনার চিকিৎসা করানো উচিত ছিল। যথেষ্ট সময় নষ্ট করেছেন, আর দেরি করবেন না। কলকাতায় যান; সেখানে ছাড়া আর কোথাও বোধ হয় এ 'কেস' নিতে পারবে না।" একটা ওষুধ দিচ্ছি, ট্রেনে ব্যবহার করবেন, কষ্টটা একটু কম থাকবে। কিন্তু এক দিনও দেরি করবেন না।

"অন্ধ হ'য়ে যাব না কি ?"

"না, না কি বলছেন। কলকাতায় যান, ভাল ক'রে চিকিৎসা করান, ভাল হয়ে যাবেন। এখানে আমরা ব্যবসাই করি, সব কিছু ত জোগাড় নেই।"

"এখান থেকে পোষ্ট আপিস কত দূরে ?"

"কেন ? আপনার কিছু দরকার আছে ?"

"একটা টেলিগ্রাম করতে চাই…"

"বেশ ত, আপনি লিখে দিন. আমি পাঠিয়ে দিচ্ছি। আচ্ছা, আপনি বলুন আমি লিখে দিচ্ছি।"

"শুধু শুধু আপনাকে কষ্ট দিচ্ছি।"

"আপনি এক জন বাঙালীর কাছে কি এটুকুও আশা করেন না ? বলুন কি লিখব ?"

"…শরৎ রায়,……অপার সার্কুলার রোড…" বাধা দিয়ে ডাক্তার চ্যাটার্জী বললেন, "শরৎ আপনার কেউ হয় ?"

"শরৎকে চেনেন নাকি ?"

"নিশ্চয়। আগে ছিলাম শুধু বন্ধু, এখন হয়েছি ভায়রা-ভাই—গ্রাম-সম্পর্কে আর কি !"

"ঠিক বুঝলাম না।"

"তার শ্বশুরবাড়ীর পাশেই আমার এক শালার বাড়ী কিনা তাই বললাম।"

"কাদের বাড়ী বলুন ত ?"

"কেন ? আপনি ওখানে কাউকে চেনেন নাকি ? চেনাই ত সম্ভব ! অশোকবাবু…"

"ও ! আপনার সঙ্গে পরিচিত হয়ে সুখী হলাম; আচ্ছা নমস্কার।"

চোখ থেকে চশমাটা খুলতে খুলতে ডাক্তার চ্যাটার্জী বললেন, "সে কি ? এখন কোথায় যাবেন ? ট্রেন…"

তাঁকে কথা শেষ করতে না দিয়ে সিতাংশু বললে, "আপনিই সেদিন আমায় সাধুর কাছে নিয়ে গিয়েছিলেন না ?"

"সেদিন একজনকে নিয়ে গিয়েছিলাম বটে, কিন্তু সে কি আপনি ?"

চেয়ার ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে সিতাংশু বললে, "মশায়ের কি ডাক্তারীর সঙ্গে অন্য ব্যবসাও চলে নাকি ?"

"তার মানে ?"

"মানে বুঝিয়ে দেবে পুলিস, আমি নই।"

"আপনি আমার বাড়ীতে ব'সে আমায় অপমান করছেন কোন্ অধিকারে ?"

"একটা জোচ্চোরকে সাধু সাজিয়ে তার কাছে আমায় নিয়ে গিয়েছিলেন কোন্ অধিকারে ?"

"স্বামী জটিলানন্দ জোচ্চোর ?"

"না ? বাড়ীটা জোর ক'রে নিজের নামে লিখিয়ে নিলে !"

"তা আপনি না দিলেই ত পারতেন ? আমি ত আর দিতে বলি নি ? বাড়ী দিয়েছেন তা কি হয়েছে ? চাইলেই তিনি দিয়ে দেবেন।"

"হাঁ দেবে ! কোথায় পালিয়েছে…"

"স্বামীজী কি তাহ'লে চলে গেছেন ?"

"হাঁ গেছেন ! কোথায় যান দেখছি…"

"আপনি তো সংসার ত্যাগ ক'রে এসেছেন। বাড়ীট যদি জোচ্চোরেই নেয়…"

"চুপ করুন মশাই, জ্বালাবেন না।" সিতাংশু ঘর থেকে চলে যাচ্ছে দেখে ডাক্তার চ্যাটার্জি বললেন, "বেশ লোক ত ? আপনার নামটা বলুন ? ওষুধ দিলাম, খাতায় লিখতে হবে ত, আর দামটা…"

জলন্ত দৃষ্টিতে ডাক্তারের দিকে চেয়ে সিতাংশু জিজ্ঞেস করলে, "কত দাম ?"

"বার আনা।"

সিতাংশু একটা টাকা ফেলে দিয়ে চলে গেল। পিছন থেকে ডাক্তার চ্যাটার্জ্জী বললেন, "ও মশাই, চেঞ্জটা নিয়ে যান।" কিন্তু সে ফিরল না।

* * *

শরৎ বাড়ী আসতে তার মা খুব বকতে সুরু করলেন। তার অপরাধ সে গিয়ে মাত্র একখানা চিঠি দিয়েছিল। নিশাও খুব রাগ করেছিল। শরৎ তাকে চুপি চুপি বললে, "ক-দিন বাদে আর রাগ করবে না।"

নিশা কিছুই বুঝতে পারলে না। শরৎ বললে, "দেখ আমাদের এখন কিছুদিন তোমার দাদার বাড়ী গিয়ে থাকতে হবে।"

"কেন ? না সেখানে আমি যাব না।"

"যা বলছি শোন না। তোমার দাদা কলকাতায় আসছেন।"

"দাদা ? সে কি ? তুমি কি ক'রে খবর পেলে ?"

"আমার এক বন্ধু টেলিগ্রাম করেছে।"

"তিনি দাদাকে চিনলেন কি ক'রে ?"

"কি বিপদ ! চেনা কি অসম্ভব ? সে চেনে তাই লিখেছে।"

সিতাংশু বাড়ী এসে শরৎ আর নিশাকে দেখে আশ্চর্য্য হয়ে গেল। শরৎ বললে, "কিছু মনে করবেন না, বাড়ীটা পড়েছিল কি না তাই..."

"বেশ করেছ। হাঁ, এলাহাবাদে তোমার কোন চেনা লোক আছে কি ? ডাক্তার..."

"সুনীল চ্যাটার্জ্জী—সে আমার বিশেষ বন্ধু। চমৎকার লোক..."

"আমার তা মনে হয় না।"

"বলেন কি ? চমৎকার লোক ! সে কি আপনার সঙ্গে খারাপ ব্যবহার করেছে ?"

"সে সব অনেক কথা, পরে হবে। নিশা কই ?" নিশা এসে তাঁকে নমস্কার ক'রে কাঁদতে লাগল। সিতাংশু তার মাথায় হাত দিয়ে বললে, "কাঁদছিস কেন ? ফিরে এসেছি ত। শরৎ গেল কোথায় ? আচ্ছা থাক্, তুই বোস।"

নিশার সঙ্গে এলাহাবাদের গল্প করতে করতে কতক্ষণ কেটেছিল বলা যায় না। হঠাৎ সামনে জটিলানন্দকে দেখে সিতাংশুর চমক্ ভাঙল। সে কিছু বলবার আগেই স্বামীজী বললেন, "তুমি বড় অবিশ্বাসী, সন্ন্যাস তোমার হবে না। এই নাও তোমার বাড়ীর দলিল।

দলিলটা দেখে নিয়ে সিতাংশু বললে, "এ কি করেছেন ? কার নামে......"

"যে সত্যি পাবে তারই নামে লিখে দিয়েছি। অমলাকে কাছে পেলে আশীর্ব্বাদ ক'রে যেতাম।"

নিশা সিতাংশুর কানে কানে বললে, "দাদা, ও সত্যি সন্ন্যাসী নয়, দেখ না ওর সাদা চুলের মধ্যে থেকে কাল কাল চুল দেখা যাচ্ছে।"

সিতাংশু টপ ক'রে জটিলানন্দের চুল ধ'রে টান দিলে।

সন্ন্যাসীর নূতন চেহারা দেখে নিশা মাথায় কাপড় টেনে দিলে। সিতাংশু বললে, "তোমার এই কীর্ত্তি !"

শরৎ হাসতে হাসতে বললে, "না ক'রে কি করি বলুন ; এদিকে নিশা কাঁদছে, ওদিকে অমলা দেবী কাঁদছেন ! আর দূরে...

"দূরে কি ?"

নিশা টানতে টানতে অমলাকে এনে হাজির করলে।



আদিম ধরণী

শ্রীশৌরীন্দ্রনাথ ভট্টাচার্য্য

হে আদি সরলা পৃথ্বি, সৃষ্টির সবুজ শতদল,
গন্ধে গীতে ছন্দে রসে পূর্ণা তুমি ছিলে মা নির্ম্মল!
অনাদি আনন্দতন্ত্র-গন্ধ হ'তে সাকার শরীরী,
অম্বরে প্রণব গান উঠেছিল তোরে ঘিরি ঘিরি।
আদিম রঙীন প্রাতে আদিত্যেরে করি প্রদক্ষিণ,
তোরি শ্যাম কটি-নৃত্যে জেগেছিল ছন্দ মা নবীন।
অরূপ রসের কেন্দ্রে ব্রহ্মরসে দানা বেঁধে অয়ি,
চিন্ময়-দুলালী তুই মৃন্ময়ে মা হলি রূপময়ী।
সৌরজগতের মধুরাসনৃত্য হিন্দোল-স্বপনে,
প্রথম ঝরিল মধু তোরি আদি শ্যামকুঞ্জবনে।
স্নিগ্ধ দেহে বহে যেত অবিরল আনন্দের ধার,
ঊষার কনকবন্যা চন্দ্রমার জ্যোছনা-পাথার,
ধুয়ে দিয়ে যেত নিত্য তব শ্যাম-সবুজ প্রাঙ্গণ;
বক্ষে তব নিরুদ্বেগে ছিল ওগো নিদ্রাজাগরণ।
বাধাবিঘ্নগ্লানিহীন তোমার শিশুর চিত্তক্ষুধা,
তোমারে অখণ্ড করি করিত মা ভোগ তব সুধা।
সে আনন্দসুধা তোর কে ভরিয়া দিল হলাহলে,
কোটি পাকে আজি তুই জর্জ্জরিতা শৃঙ্খলে শৃঙ্খলে।
তোর মৃত্তিকায় আজি ভোগলুব্ধ মানবের পাপে
কামবহ্নি জ্বলে উঠি ভরে দিল তোরে তাপে তাপে।
অনন্ত যুগের তাপে বক্ষে তোর উড়ে অগ্নিধূলি,
দগ্ধ মৃত্তিকায় তব আত্মা আজি উঠেছে আকুলি।
ক্ষুধিত সন্তান কাঁদে অন্য দিকে বিজ্ঞান-বিলাসী,
যন্ত্রের মালায় বাঁধি করিবারে চাহে তোমা দাসী।
তুই যে শক্তির কন্যা গর্জ্জে ওঠ্ আজি একবার,
বক্ষে তোর ঋষিপুত্র করিয়া উঠুক হুহুঙ্কার।
দম্ভী তমঃরাজসিক-বুভুক্ষার অনন্ত বাঁধন
ছিন্ন হোক। বিজ্ঞানের সর্ব্বগ্রাসী ক্ষুধা আয়োজন
চূর্ণ হোক রেণু সম। খণ্ড খণ্ড ভাগ করা কালি,
স্নিগ্ধ তব বক্ষ ঘেরি মহাকাশে হউক বিশাল।
তোর মৃত্তিকার 'পরে ধৌত করি পাপতাপগ্লানি,
পুনঃ মা পড়ুক মন্ত্র নব শিশু আনন্দসন্ধানী।
পুত্রকন্যা পুনঃ তোর দেবজন্ম লভি দেহে প্রাণে,
জীবন-উৎসব তার মিশাক মা তব ছন্দে গানে।
পুনঃ মাগো স্বর্গ হ'তে দেবদেবী সুধাপাত্র হাতে
বক্ষে তোর নেমে আসি স্মিতহাস্যে মানবের সাথে
বাঁধুক মিলন-গ্রন্থি। আবার আসুক শান্তি ফিরে
জড়াইয়া ধরি তব আদিম সে স্বপ্নরাজ্যটিরে।
নদীতীরে শৈলে বনে অপ্সরীরা পুনঃ জেগে উঠি
বীণ বাজাইয়া মাগো মেলে দিক মুগ্ধ আঁখি দুটি;
তোর সর্ব্বদেহ 'পরে খুলে যাক্ বৈকুণ্ঠের দ্বার,
জরা মৃত্যু জয় করি পুত্র তোর দাঁড়াক আবার;
গীতে গন্ধে সারা সৃষ্টি করিয়া উঠুক গুঞ্জরণ,
মুক্ত হয়ে খুলে যাক্ বক্ষে তোর অবাধ জীবন।
রঙীন সে স্বপ্নরাজ্যে দাঁড়া মা আবার কাব্যময়ি,
সৃষ্টির সকল মধু বক্ষে তোর ঝরে যাক্ অয়ি!
মা তোর আদিম গেহে ভেঙে যাক্ সকল বাঁধন,
অসীম জীবনে পুনঃ মাতা পুত্রে হোক আলিঙ্গন।



বিদেশী রাজকুমার

শ্রীসুশীল জানা

রূপকথার কুমারী স্বপ্ন দেখিতেছে।···

সোনার বরণ রাজপুত্র আসিবে নিভৃতে নির্জ্জন নিশীথে পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া—অদূরের গুবাক-তরুর শ্রেণী আকুল হইয়া উঠিবে তাহার আগমনে—আচমকা দম্‌কা হাওয়া বনবনান্তে এ-খবরটা জানাইয়া দিয়া আগে আগে ছুটিয়া আসিবে। ঘুমন্ত পুরীর প্রহরী শুধাইবে—কে যায়? ···বাতাস কুমারীর ঘরের ঝাড়লণ্ঠন ঠুন্ ঠুন্ করিয়া বাজাইয়া, কুমারীর মেঘবরণ চুল উতলা বিস্রস্ত করিয়া কানে কানে বলিবে—জাগো কন্যা জাগো, রাজকুমার আসিতেছে তোমাকে বরণ করিতে। বন্দিনী কুমারী তন্দ্রাচ্ছন্ন তমসায় জাগিয়া উঠে। কুঁচবরণ অঙ্গ তার মেঘ-বরণ চুল—আনন্দে পরিপাটি করিয়া সাজে—প্রিয়, তাহার রাজকুমার আসিবে যে! কুমারী কত আয়োজন করে। ওদিকে ঘুমন্ত পুরীতে সকলে জাগিয়া উঠে। সর্ব্বনাশ, সকলে জানিতে পারিয়াছে—বন্দিনীর বুঝি আর উদ্ধার হইল না। তরবারি ও খড়্গের ঝনৎকারে রণ-দেবতার আহ্বান শোনা যায় যেন। তার পর···

চন্দ্রলেখা এই রকম একটা গল্প বলিয়া চলিয়াছিল—হঠাৎ থম্‌কাইয়া বলিল—যাঃ, ভুলে গেলাম ত! থাম, মনে করি।··

মনে করিবার আর সুযোগ মিলিল না—ওধার হইতে দাদা নিমাইচরণের আহ্বান আসিল—চন্দ্র রে, ছু-ছিলিম তামাক বেশী দিস্—হারামাণিকের মাঠে রুইতে যাব। জলটা আজ ধরেছে যখন—দূরেরটা সেরে আসি।

শুধু হারামাণিকের মাঠে নয়—এমন আরও অনেক মাঠে নিমাইয়ের এখনও ধান্যরোপণের কাজ শেষ হয় নাই—চাষীদের মধ্যে সে খানিকটা পিছাইয়া আছে।

চন্দ্রলেখা গল্প ছাড়িয়া উঠিয়া দাঁড়াইল। শ্রোতা শঙ্খমালাকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুই ব'স্ শঙ্খ—আমি আসি···মনে করি ততক্ষণ। চন্দ্রলেখা বাহির হইয়া আসিল—আকাশের দিকে চাহিয়া দেখিল, জল থামিয়া গিয়াছে আজ দীর্ঘ পাঁচটি দিনের পর। আকাশের ঘোর ঘোর ভাবটা কাটিয়া গিয়াছে। পুঞ্জীভূত কালো মেঘের গুহায় সূর্য্যকে বহুদিন পরে দেখা যাইতেছে। চন্দ্রাকর দীঘির পাড়ে কয়েকটা সারস লাফাইয়া লাফাইয়া পোকা-মাকড় ধরিয়া খাইতেছিল—হঠাৎ আকাশের দিকে চাহিয়া-উড়িয়া গেল—বোধ করি বিগত বর্ষাঘন মেঘান্ধকার দিনগুলার কথা আচম্‌কা মনে পড়িয়া গিয়াছিল।

চন্দ্রলেখা নিমাইয়ের দিকে ফিরিয়া বলিল—অত জমি এখনও বাকী—এক জন লোক করছ না কেন দাদা!

নিমাই মুখ ভার করিয়া সঙ্গে সঙ্গে বলিল লোক করলে পয়সা চাই—অত খরচা করব কোথা থেকে! তোর বিয়ের জন্যে কিছু জমাতে হবে ত!

চন্দ্রলেখার আর শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না—দুম্ দুম্ করিয়া পা ফেলিয়া সেখান হইতে চলিয়া গেল। নিমাই সস্নেহে তাহার চলনের দিকে চাহিয়া মুখ টিপিয়া একটু হাসিল, তার পর বলিল—সত্যি কথা বললেই ত রাগ হবে! কিন্তু একা মানুষ খেটে খেটে মরে যাচ্ছি—আর পারি না। বলিয়া ফেলিয়াই নিমাই সভয়ে তাড়াতাড়ি সরিয়া পড়িল, চন্দ্রলেখার নিয়মিত সক্রোধ কান্নাকাটি শুনিবার জন্য আর দাঁড়াইতে ভরসা পাইল না। চন্দ্রলেখা ক্রুদ্ধ হইয়া কি একটা কথা বলিবার জন্য যেন ফিরিয়া দাঁড়াইয়াছিল কিন্তু দাদার রকম-সকম দেখিয়া সে রাগিতে গিয়া হাসিয়া ফেলিল।

নিমাই যতক্ষণ থাকে ততক্ষণ ইহাদের এমনি বিবাদ মিলনে, হাসি ও রাগে একটা কোলাহলের মধ্য দিয়া সময়টা কাটিয়া যায়, কিন্তু নিমাই মাঠের কাজে বাহির হইয়া গেলে চন্দ্রলেখার সময় যেন আর কাটে না। চরকা ঘুরাইয়া, তুলা পিঁজিয়া, পা ছড়াইয়া সশব্দে তেঁতুলের চাটনি কিছুক্ষণ খাইয়াও অনেকখানি সময় নিঃসঙ্গ নির্জ্জনে রহিয়া যায়।

সেদিন অবশ্য চন্দ্রলেখার ভারাক্রান্ত অবসরের ভয় ছিল না, কারণ গল্পের শ্রোতা শঙ্খমালা তখনও দুয়ারে বসিয়া।

চন্দ্রলেখাকে চুপচাপ বসিয়া থাকিতে দেখিয়া শঙ্খমালা বলিল—কই গো চন্দ্রদি—বলো গল্প!

চন্দ্রলেখা ভুলিয়া-যাওয়া গল্পটা কিছুক্ষণ মনে করিবার চেষ্টা করিয়া অবশেষে হতাশ হইয়া বলিল—ভুলে গেছি রে—মনে ত পড়ছে না। আজ থাক্—বরং চল্ বংশীদা'কে দেখে আসি—জলের জন্যে সকালে আজ যেতে পারি নি। জ্বর হয়েছে—কেউ নেই দেখবার। চল্ তাকে দু-জনে দেখে আসি।

বংশী ইহাদের প্রতিবেশী—অর্থাৎ এই সব প্রতিবেশীর সাড়া পাইতে হইলে গলা ফাটিয়া যাইবার উপক্রম। এত বড় কলমীলতা গ্রাম কিন্তু বড় জোর বিশ ঘর প্রজার বাস—সকলেরই বৃত্তি চাষ-আবাদ। ফাঁকে ফাঁকে ঘর—প্রতিবেশীর খোঁজ পাইতে হইলে রীতিমত কষ্ট স্বীকার করিতে হয়।

নিমাইচরণের এক পুরুষ দত্তদের এই চন্দ্রাকর দীঘি চৌকি দিয়া দীঘির পাড়েই কাটাইয়া গিয়াছে—তাহাকেও কাটাইতে হইবে। চন্দ্রাকরে বছর বছর নতুন মাছ ছাড়া হয় এবং কয়েক বছর বাদ দিয়া দিয়া মাছ ধরা হয়—ইহাতে বেশ দু-পয়সা দত্তরা উপার্জ্জন করে। কিন্তু পুকুরটা আবার এমনি ফাঁকা মাঠের মাঝখানে যে চৌকির ব্যবস্থা না করিলে পুকুরে একটা চাঁদা পুঁটিও থাকিবে না। কেহ যদি মাছের বদলে পুকুর চুরি করিয়া লইয়া যাইতে সমর্থ হয় তাহা হইলে কাকপক্ষীতেও খবরটা পাইবে না। তাই পুকুর হইতে যাহাতে ষোল আনাই লাভ হয় তাহার ব্যবস্থা করিতে গিয়া নিমাইচরণের বাবাকে কিছু জমি-জায়গা দিয়া দীঘির পাড়েই ঘর তুলিয়া দেওয়া হইয়াছিল—এবং সে ব্যবস্থা এখনও আছে।

চন্দ্রলেখা শঙ্খমালাকে বলিল—চল না যাই দু-জনে—কেমন? বংশীদা বেচারী…

বংশীর জ্বর হইয়াছে—দেখিবার তাহার কেহই নাই। নিঃসঙ্গ অবস্থায় একদিন সে এই গ্রামে আসিয়া উপস্থিত হইয়াছিল এবং আর দশ জনের মত দত্তদের প্রজা হইয়া চাষ-আবাদ সুরু করিয়াছিল। ইহা ছাড়া সে ছোটখাট একটি দোকানও নিজের চালাঘরের এক পাশে সুরু করিয়াছিল—বর্ষার প্রারম্ভে চাষের সময়টায় দোকান তাহার বন্ধ থাকিত। এ বৎসর চাষও তাহার বন্ধ ছিল—ম্যালেরিয়ায় তাহাকে কাবু করিয়া ফেলিয়াছে একেবারে। তাহার নিঃসঙ্গ মলিন রোগশয্যায় সে জ্বরের ঘোরে পড়িয়া থাকিত—জ্বর ছাড়িলে সামান্য খুঁটিনাটি কাজ-কর্ম্মগুলি কোনো রকমে সারিয়া রাখিত পুনরায় আগামী জ্বরের জন্য। কোনো কোনো দিন চন্দ্রলেখা আসিয়া তাহার সমস্ত অভাব-অভিযোগগুলি একে একে সারিয়া দিয়া যাইত।

সেদিন বংশী যখন জ্বরের ঘোরে পড়িয়াছিল তখন চন্দ্রলেখা শঙ্খমালাকে সঙ্গে লইয়া উপস্থিত হইল। বংশীর কোনো সাড়াশব্দ না পাইয়া চন্দ্রলেখা অপ্রতিভ হইয়া বলিল—বংশীদা কি ঘুমিয়েছ?

বংশী রক্তবর্ণ দুইটা চক্ষু মেলিয়া বলিল—কে চন্দ্র!…উঃ বড্ড শীত করছে রে!…একখানা কাঁথা দিতে পারিস্। একটাতে হচ্ছে না।

ক্রমাগত কয়েক দিন জলের জন্য মাটির মেঝে স্যাঁৎ স্যাঁৎ করিতেছে। সেই ভিজা মেঝের ওপরেই একখানা পাটি পাতিয়া একখানা শতছিন্ন কম্বল গায়ে মুড়ি দিয়া বংশী জ্বরের ঘোরে কাঁপিতেছে। এই লোকটা এই অবস্থায় যে কত অসহায় তাহা ভাবিয়া চন্দ্রলেখার অন্তর ব্যথিত হইয়া উঠিল। ঘরের চার দিকে একবার চোখ বুলাইয়া লইয়া বলিল—কই, কোনো কাঁথা ত দেখছি নে।

বংশী অপ্রতিভ হইয়া বলিল—তাই ত কাঁথা থাকবেই বা কোথা থেকে, কবেই বা আর সেলাই করলাম—আর ওসব কি আমি জানি ছাই। থাক্ তবে থাক্। বংশী কিছুক্ষণ হুঁ হুঁ করিয়া কাঁপিতে লাগিল। পুনরায় বলিল—আমাকে একটা কাঁথা তোর সময়মত সেলাই ক'রে দিস্ ত চন্দ্র—যা খরচ পড়বে আমি দেব।

এই বংশী লোকটা বড় অসহায়—এখন ত বটেই, তা ছাড়া যখন ভাল ছিল তখনও। অসহায় পুরুষের সাংসারিক নির্বুদ্ধিতা দেখিয়া চন্দ্রলেখার নারীত্বের মায়া গোড়া হইতেই বংশীর উপরে সঞ্চারিত হইয়াছিল। এই বংশী যখন প্রথম আসিয়াছিল, এই জনবিরল কলমীলতা গ্রামে যখন প্রথম সংসার পাতিবার উদ্যোগ করিয়াছিল, তখন

একদিন সে অতি দুঃখের সঙ্গেই নিমাইকে বলিয়াছিল—তোমাদের মত আমার একটা ভাল উনুন নাই—রান্না করতে এমন কষ্ট হয়! তৈরি করতে জানি নে তা কি করব! কেউ যদি তৈরি ক'রে দিত ত বড় ভাল হ'ত। পয়সা-কড়ি ত দিতে পারব না, তবে একবেলা জন খেটে দিতাম। দু-পহর আড়াই পহরের সময় খেটে খুটে ফিরি, খিদেয় পেট চোঁ চোঁ করে একে তার ওপরে উনুনের জন্যে রান্নার দেরি!···এই কথার পর নিমাইয়ের অনুমতিক্রমে চন্দ্রলেখা গিয়া বংশীর উনান তৈরি করিয়া দিয়া আসিয়াছিল এবং সেই হইতে অনেক সময় নিমাইয়ের অনুমতির অপেক্ষা না করিয়া এই অপটু লোকটির বহু কাজ-কর্ম সে করিয়া দিয়া যাইত। আজ আবার কাঁথার অভাবে বংশীর শীতের কষ্ট দেখিয়া সমবেদনায় চন্দ্রলেখার অন্তরটা নিরতিশয় ব্যথিত হইয়া উঠিল এবং তাহার মনে হইল, বংশীর এ-কষ্টের জন্য যেন সে-ই অনেকটা দায়ী। এই অবোধ লোকটির ত কোন দিকেই খেয়াল নাই, স্পৃহা নাই—চন্দ্রলেখারই উচিত ছিল, সময়মত একটা কি দুইটা কাঁথা তৈরি করিয়া দেওয়া।

চন্দ্রলেখা চঞ্চল হইয়া বলিল—ঘর থেকে আমি একটা কাঁথা নিয়ে আসি থাম।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রলেখা গোটা দুই কাঁথা এবং বালিশ লইয়া ফিরিয়া আসিল। ইত্যবসরে শঙ্খমালা আজ আর গল্প হইবে না—এই দুঃখে চলিয়া গিয়াছে। চন্দ্রলেখা বংশীকে উদ্দেশ করিয়া বলিল—তুমি একটু উঠে ব'স—আমি বিছানাটা পেতে দিই।

বংশী কম্বল জড়াইয়া উঠিয়া বসিল। চন্দ্রলেখা বিছানা পাতিতে গিয়া দেখিল—বংশী যাহা বালিশ হিসাবে ব্যবহার করিতেছিল তাহা একটা ন্যাকড়া-জড়ানো খড়ের বিড়া। চন্দ্রলেখা হাসিয়া বলিল—এইটে এত দিন মাথায় দেওয়া হ'ত!

বিছানা পাতা হইলে বংশী আসিয়া কাঁথা ও কম্বল মুড়ি দিয়া শুইয়া পড়িল। কিছুক্ষণ চুপচাপ শুইয়া থাকিবার পর পুনরায় সে হুঁ হুঁ করিতে লাগিল। চন্দ্রলেখা জিজ্ঞাসা করিল—সাবু-বার্লি কিছু খেয়েছ বংশীদা?

বংশী উত্তর দিল—কে আর তৈরি করে চন্দ্র—থাক্ ও-সব। জ্বরে জ্বরে ত শেষ রাত থেকে এ-পর্য্যন্ত কেটে গেল। খিদেও নেই।

—খিদে নেই, না তৈরি ক'রে খেতে পার নি। চন্দ্রলেখা কোমল কণ্ঠে বলিল, আমিও জলের জন্যে আর কাজের তাড়ায় সকালে আসতে পারি নি—তোমার যখন এমন তখন কারুর হাতে একটু খবর দিয়ে পাঠালে না কেন। এমন লোক আর কোথাও দেখি নি।

বংশী নিরুত্তরে কাঁপিতে লাগিল। চন্দ্রলেখা বলিল—এক কাজ কর তুমি বংশীদা—জ্বর যে-পর্য্যন্ত না সারে সে পর্য্যন্ত তুমি আমাদের ঘরে থাকবে চল। ডাক্তার-বদ্যি ডেকে···

বংশী এইবার কথা বলিল নিতান্ত হতাশায়—এ-গাঁয়ে ডাক্তার-বদ্যি কোথায় চন্দ্র—পাশা-পাশি চার-পাঁচটা গেরামেই নেই, যা আছে সেই গঞ্জের হাটে। কিন্তু তাদের আনতে অনেক টাকার দরকার চন্দ্র—অত টাকা আমার নাই। বছরের ধান বছরে কুলায় না, তার পর এ-সনে কি হবে কে জানে! মহাজনের কাছে মাথা নোয়ালে কি আর নিস্তার আছে!

চন্দ্রলেখা বলিল—তবু একটু ওষুধ-টষুদ···

বংশী উত্তর দিল—হাঁ, আমাদের আবার ওষুধ—মরলেই ফুরিয়ে গেল।

চন্দ্রলেখা বিরক্ত হইয়া বলিল—দাদার রোগে তোমাকেও ধরেছে তা হ'লে!

বংশী দীর্ঘনিঃশ্বাস ছাড়িয়া উত্তর দিল—সকলেরই ওই এক কথা চন্দ্র—গরীব লোক আমরা, মরণই আমাদের শেষ ওষুধ। তা ছাড়া কপালটা আমার বড় মন্দ—এই যে তোর একটু সেবাযত্ন পাই—এই যথেষ্ট চন্দ্র, এর বেশী কিছু ভাবতে ভগবান আমাকে দেয় নি। এইখানে বেশ আছি।

চন্দ্রলেখা অভিমানভরে বলিল—না দেয় নি। আমাদের ঘরে গেলে কি তোমার অপমান হবে!

বংশী নিরুত্তর।

কিছুক্ষণ পরে চন্দ্রলেখা চলিয়া গেল। বংশী তাহারই কথাগুলি ভাবিতে লাগিল। চন্দ্রলেখার আমন্ত্রণে সে সানন্দেই সম্মতি দিতে পারিত কিন্তু নিমাইয়ের বিনা মতে সে কেমন করিয়া ঝট্ করিয়া রাজী হইতে পারে!

বাহিরে তখন আগামী বর্ষার দুর্য্যোগ আবার ঘনাইয়া উঠিতেছিল। চন্দ্রাকরের পাড়ে সমস্ত গাছ আতঙ্কে যেন পাণ্ডুর হইয়া উঠিয়াছে—কৃষ্ণ-সবুজ রঙের পরিবর্ত্তে কেমন একটা ফ্যাকাসে রঙের আভা তাহাদের, আকাশে গাং-চিলের দল বাতাসের বেগে অস্থির ভাবে উড়িয়া বেড়াইতেছে, কালো কালো মেঘের দল তর্ তর্ করিয়া প্রখর সূর্য্যের উপর দিয়া ভাসিয়া গেল—তাহাদের চঞ্চল ছায়াগুলি ক্ষণিকের রৌদ্রদগ্ধ ধরণীর উপর দিয়া দ্রুতবেগে ছুটিয়া যাইতেছে, চন্দ্রাকরের গভীর নীল জল বাতাস লাগিয়া আয়নার মত সাদা ধব্ ধব্ করিতেছে, কোন বনে একটা ডাহুক আতঙ্কিত একটা ঘুঘুর সঙ্গে সানন্দে পাল্লা দিয়া চলিয়াছে অশ্রান্ত কণ্ঠে, নারিকেল গাছের শ্রেণীগুলি ডাল-পালা সমেত যেমন ভাবে একদিকে ঝুঁকিয়া পড়িয়াছে—মনে হয়, এই বুঝি ভাঙিয়া পড়িল। ঝড়ের বাঁশীর সুরে বর্ষার বিলাসচঞ্চল নৃত্য সুরু হইল।

সন্ধ্যার দিকে বংশীর জ্বরটা ছাড়িয়া গেল।

এই দুর্য্যোগে তাহারই ঘরের বাহিরে নিমাইয়ের কণ্ঠস্বর শুনিয়া সে ব্যস্ত হইয়া দুয়ার খুলিয়া দিল। জিজ্ঞাসা করিল—এমন সময়ে যে নিমাই!

—আর ভাই—টিকতে পারলাম না ঘরে। নিমাই ভণিতা করিয়া বলিল, চন্দ্রর কথা আর শুনতে পারলাম না। চল ভাই চল, তোমার লেপ-কাঁথাগুলো আমাকে দাও।

বংশী সাশ্চর্য্যে বলিল—কোথায় যাব?

—আমার আস্তানায়। হাসিয়া বলিল—আলসে লোক চন্দ্রর দু-চক্ষের বিষ, কিন্তু তোমার কি সৌভাগ্য, আজও তুমি তার একটুও বকুনি খেলে না, বরং আমিই খেলাম বকুনি।

বংশী আগাগোড়া সমস্ত বুঝিতে পারিল। বুঝিতে পারিল, তাহাকে লইয়া যাইবার জন্য চন্দ্রলেখা তাহার দাদাকে পাঠাইয়াছে। একটা অশরীরী পুলক বংশীর সারা রুগ্ন দেহে ধীরে ধীরে ছড়াইয়া পড়িল। তাহার ইচ্ছা হইল, এই ঝড়-বাদল মাথায় করিয়া এইক্ষণেই সে ছুটিয়া যায়। যদি মৃত্যু হয় ত সেইখানেই হইবে। নিমাইয়ের তাগাদা খাইয়া বংশী আত্মস্থ হইল, বলিল, রুগী মানুষ—এই ঝড়-জলে যাব কি ক'রে ভাই, বরং কাল সকালেই আমি যাব। তোমরা আছ বলেই বেঁচে আছি রে দাদা—চন্দ্রকে ব'লো, কাল যাব।

বংশী এক দিন নিমাইকে একান্তে পাইয়া বলিল—সংসারকে বড় ভয় করতাম নিমাই, কিন্তু তোমাদের আশ্রয়ে এসে আমার ভুল ভেঙে গেল।

নিমাই হাসিয়া বলিল—চন্দ্রর এখনও বকুনি খাও নি বংশী—খেলে ফের ভয় পেয়ে যেতে। আমি ত ওর ভয়ে সংসার এখনও করি নি। এক মেয়ের যে বকুনি, আরও এক জন এলে সামাল সামাল কাণ্ড। হতভাগীকে বিদায় করতে চাই—বলি, আর মায়া বাড়াস নি চন্দ্র, কিন্তু ও এমন ভাবে তাকায়!···কখনও বলে, আমাকে তাড়াতে চাও দাদা!—আবার কখনও বলে, তুমি বিয়ে কর—বৌকে আগে ঘর-সংসার বুঝিয়ে দিই···

বংশী বাধা দিয়া বলিল—এবার সেরে উঠলে আর দেরি না নিমাই—চন্দ্র আমার ভুল ভেঙে দিয়েছে। তখন তোমার কথায় কান দিই নি, কিন্তু এখন মনে হচ্ছে, ওর হাতের গড়া সংসারে দুঃখ থাকবে না।

নিমাই উৎসাহিত হইয়া বলিল—আমি বলছি বংশী, তুমি সুখী হবে—চন্দ্রও আমার সুখে থাকবে—আমারও কাঁধ থেকে একটা ভার নামে।

এমন সময় চন্দ্রলেখা এক বাটি সাবু লইয়া আসিয়া দাঁড়াইল। নিমাই কাজের ছুতায় উঠিয়া গেল। চন্দ্রলেখা বংশীর মুখের কাছে সাবুর বাটিটা তুলিয়া ধরিতে বংশী এক নিশ্বাসে সেটুকু খাইয়া ফেলিল। তার পর একটা তৃপ্তির নিশ্বাস ফেলিয়া বলিল—আরও এক বাটি খেতে পারি।

—আনব?

বংশী হাসিয়া বলিল—না না—এমনি বলছিলাম। আচ্ছা চন্দ্রলেখা, তোমার ঋণ আমি শোধ করব কি ক'রে বল ত?

চন্দ্রলেখার মুখ চোখ হঠাৎ চক্‌চক্ করিয়া উঠিল—বলিল, জানি না। বলিয়াই সে এক মুহূর্ত্ত মাত্র বংশীর দিকে কৌতুক-দৃষ্টিতে তাকাইয়া দ্রুতপদে চলিয়া গেল এবং ইহাতে তাহার সব জানা প্রকাশ হইয়া পড়িল যেন।

বংশী বসিয়া ছিল—শুইয়া পড়িল। এ কয়দিন তাহার স্বপ্নের মত কাটিয়া গিয়াছে। চন্দ্রলেখার পরিচর্য্যা তাহার

বৈরাগী অন্তরে কেমন এক রকম মধুর ঝঙ্কার তুলিয়া ভবিষ্যতের কত মনোরম ছবির পর ছবি সৃষ্টি করিয়া যায়। বংশীর যন্ত্রণাময় অস্বস্তিকর রোগশয্যা সুখ-স্বপ্নের শয্যায় পরিণত হয়।

সেদিন নিমাই মাঠ হইতে ফিরিয়া আসিয়া খবর দিল, দত্তবাবুদের বিরাট জমিদারীর একমাত্র মালিক সহদেব দত্ত চন্দ্রাকরে মাছ ধরিতে আসিবে। আসিবে আসিবে বলিয়াও সহদেব দত্ত যদিও কোনো দিন আসে নাই—তাহা হইলেও কলমীলতার প্রজারা প্রত্যেকবারই তাহার আগমন আশা করিয়াছে। বহু রকম তাহাদের খুঁটিনাটি অনুযোগ—যেগুলা সেই অনাগত প্রভুর প্রতিনিধিবর্গের দ্বারা পূর্ণ হয় নাই সেগুলা সকলেই এই সংবাদে এক-একবার মনে মনে ঝালাইয়া লইয়া এবারেও প্রস্তুত হইয়া রহিল। এবার আসিয়া পৌঁছিলে হয়।

নিমাইয়ের উৎসাহ দেখিয়া চন্দ্রলেখা বলিল—আসবে না আরও কিছু। মিথ্যে লাফালাফি।

নিমাই উত্তেজিত হইয়া বলিল—কি যে বলিস্! ঠিক আসবে—তাঁর কথা কখনও মিথ্যা হয় না। অমন লোক আর ত্রিভুবনে হয় না।

চন্দ্রলেখা হাসিয়া বলিল—দাদা অত গুণগান করছ—বাবু শুনতে পেলে তোমাকে শেষকালে এখন বারো চকের নায়েব ক'রে দেবে। তার পর আত্মগত হইয়া বলিল, তবু যদি তাঁকে চোখে দেখতে…।

এ অপমানে নিমাই রাগিয়া উঠিল। বলিয়া চলিল—দেখি নি কি রকম! আলবৎ দেখেছি। লম্বা রকম সুন্দর মত চেহারা—গোঁফ জোড়াটা দেখলেই ত মাথা ঘুরে যায়। তার পরেই নিমাই গোলমাল করিয়া ফেলিল। কতকগুলা মিথ্যা কথা বলিতে গিয়া, মনের মত অপরূপ করিতে গিয়া আকৃতি বর্ণনা একবার এক রকম বলিয়া পুনরায় তাহার উল্টাগুলা বলিয়া চন্দ্রলেখার উপরে ক্রুদ্ধ হইয়া লাফাইতে লাগিল। কিন্তু চন্দ্রলেখা সে-সমস্ত অগ্রাহ্য করিয়া নিজের কাজে চলিয়া গেলে পরাজিত নিমাই মুখ কালো করিয়া স্নান করিতে চলিয়া গেল।

পরে কিন্তু চন্দ্রলেখা তাহার দুর্ব্বল মুহূর্ত্তে নিমাইয়ের নিকট পরাজিত হইল। নিমাইয়ের কেমন রোক চাপিয়া গিয়াছিল—সে যে সহদেব দত্তকে দেখিয়াছে এ-কথা চন্দ্রলেখাকে স্বীকার করাইবেই।

চন্দ্রলেখা স্বীকার করিল—মুগ্ধ হইয়া শুনিল সহদেব দত্ত সম্বন্ধে কলমীলতা গ্রামে প্রচলিত সমস্ত অপূর্ব্ব গল্প। তাহার স্বপমুগ্ধ চক্ষে ফুটিয়া উঠিল অজ্ঞাত সহদেব দত্তের অপূর্ব্ব তরুণ মূর্ত্তি। অঙ্গের বর্ণ যাহার দুধ-আলতার রংকেও পরাজিত করিয়াছে, গভীর উদাস বৈরাগী দৃষ্টি যাহার সদানন্দে ঝলমল করিতেছে, কণ্ঠের স্বর যাহার গহন রাতের দূরাগত বাঁশীর সুরের মত ঘর-ছাড়ানো মুগ্ধকর, সুঠাম দেহে শক্তি যাহার অসীম তাহাকে চন্দ্রলেখার ভাল না লাগিয়া পারে কি করিয়া!

চন্দ্রলেখা উৎসুক কণ্ঠে বলিল—সত্যি কি তিনি আসবেন দাদা?

নিমাই বিজয়গর্ব্বে বুক চিতাইয়া বলিল—আসবে বইকি রে। চন্দ্রাকরে কতদিন আজ মাছ ধরা হয় নি—মাছের গায়ে নীল পড়ে গেল। ওই ঈশানকোণের দিকটায় হুজুরের জন্যে একটা মাচা বাঁধতে হবে—মাছ ওইখানটাতেই খাবে বোধ হয়। কিন্তু আসল কথা, গরীবের কুঁড়েঘরে হুজুরকে ওঠাব কি ক'রে!

চন্দ্রলেখা বিহ্বল হইয়া বলিল—কেন দাদা—তিনি ত কাছারিতে থাকবেন।

—তাই কি হয় রে! নিমাই গম্ভীর চালে হাসিয়া বলিল, জলবর্ষার দিন—মাছ ধরতে সন্ধ্যে ত হবেই। রাতে তিনি কি আর কাছারিতে ফিরবেন!

আয়োজন সুরু হইয়া গেল।

চন্দ্রাকরের ঈশানকোণে মাচা বাঁধা হইয়া গিয়াছে। পুকুর-পাড়ের আগাছা-জঙ্গল অল্পে অল্পে পরিষ্কার হইয়া গেল; সহদেব দত্ত এবার মাছ ধরিতে আসিবেই।

সেদিন কে একজন যেন ছোট্ট একখানি ছিপ লইয়া চন্দ্রাকরের এক কোণে বসিয়া মাছ ধরিতেছিল—চন্দ্রলেখা দেখিতে পাইয়া হাঁ হাঁ করিয়া ছুটিয়া গেল, মাছ এমনি পাঁচ ভূতের হাতে গেলে বাবু কি পুকুর দেখতে আসবেন নাকি!

লোকটি অপ্রতিভ হইয়া বলিল—এই পুঁটি মাছ দু-একটা…

—তা-ই বা ধরা হচ্ছে কোন হিসাবে! চন্দ্রলেখা রুখিয়া দাঁড়াইল। বলিল, নুন খাচ্ছি যার তার কাছে বেইমানী করতে পারব না। তুমি উঠে যাও—না হ'লে নায়েব বাবুকে জানাব।

লোকটি ভয়ে ভয়ে উঠিয়া গেল। চন্দ্রলেখা ফিরিয়া আসিল। সহদেব দত্ত আসিতেছে—এবং তাহাদেরই এই ঘরে। চন্দ্রলেখা মাতিয়া আছে। এই কয়দিনে বহুকষ্টে সে রূপশাল ধান সিদ্ধ করিয়া দুয়ারে বিছাইয়া বিছাইয়া শুকাইয়া লইতেছে—শীঘ্রই আবার ভাল করিয়া ছাঁটিয়া ভানিয়া লইতে হইবে; সৌখীন জমিদারের মুখে ত আর মোটা লাল চাল রুচিবে না!

চন্দ্রলেখা ফিরিয়া আসিয়া কাঁথা সেলাই করিতে বসিল। কাঁথাটা সহদেব দত্তের উদ্দেশ্যে সেলাই হইতেছে। বর্ষার দিনে রাত্রে হঠাৎ শীত করিলে হয়ত সেই অপরিচিত শীতাতুর লোকটির প্রয়োজনে লাগিতে পারে। চন্দ্রলেখা অতি-যত্নে কাঁথার উপরে ফুলের পর ফুল—সুন্দর সুন্দর লতাপাতা তুলিয়া চলিয়াছে। নক্সা করিতে করিতে চন্দ্রলেখা ভাবিল, বংশীকে সম্প্রতি সে যে-দুইটা কাঁথা সেলাই করিয়া দিয়াছে সেগুলা থাকিলে তাহাকে আজ আর এত কষ্ট করিতে হইত না। কিন্তু বংশী লোকটা যেদিনই কাঁথা পাইয়াছে সেই দিনই গায়ে জড়াইয়াছে। সেটা ত আর হুজুরকে দেওয়া চলিবে না। তাহা ছাড়া রোগীর ব্যবহৃত—যদি বিদেশ-বিভূঁয়ে তাঁহার কিছু একটা হইয়া পড়ে!

সহসা চন্দ্রলেখাকে সচকিত করিয়া বংশী ক্ষীণকণ্ঠে ডাকিল—চন্দ্র, একটু জল…

চন্দ্রলেখা বিরক্ত হইয়া উঠিয়া পড়িল। জল লইয়া বংশীর সম্মুখে উপস্থিত হইতেই বংশী বলিল—আজকাল এত কি কাজ পড়েছে চন্দ্র! ডাকলেও সাড়া পাই নে! বংশীর কণ্ঠস্বরে অভিমানের সুর বাজিয়া উঠিল।

উত্তরে চন্দ্রলেখা শুকাইতে-দেওয়া ধানগুলার দিকে চাহিয়া রুক্ষকণ্ঠে বলিয়া উঠিল—ধানের ওপরে জল অমন ভাবে ফেলল কে!

বংশীর মাথার কাছের দিকে চন্দ্রলেখা ধান শুকাইতে দিয়াছিল। বংশী অপ্রতিভ কণ্ঠে বলিল—ও আমিই ফেলেছি চন্দ্র। হাত লেগে হঠাৎ জলের গেলাসটা উল্টে…

চন্দ্রর আর কোন কথা শুনিবার ধৈর্য্য রহিল না। বিপুল বিরক্তিতে সে ভিজা ধানগুলার দিকে চাহিয়া রহিল। ধানগুলা অমনভাবে আজও ভিজিয়া থাকিলে কবেই বা সে এগুলা শুকাইবে, আর কবেই বা ভানিয়া চাল তৈরি করিবে। হুজুরের আসিবার দিন ঘনাইয়া আসিল যে!

নিমাই সেদিন সন্ধ্যায় বাড়ী ফিরিতেই চন্দ্রলেখা জিজ্ঞাসা করিল—হ্যাঁ দাদা, বাবু আসবেন কবে?

নিমাই বলিল—সবাই তো বলছে পরশু কাছারি বাড়ীতে এসে পৌঁছবে। তাহলে তার পর দিন সকালে আসবে মাছ ধরতে।

চন্দ্রলেখা চিন্তিত হইয়া বলে—কিছু শালিধানের চিঁড়ে যে করিয়ে রাখতে হয় দাদা।

নিমাই অপ্রতিভ হইয়া বলে—ঠিক বটে—আমার মনেই ছিল না।

সারা কলমীলতা গ্রামটা হঠাৎ যেন জাগিয়া উঠে—ঠিক এই চন্দ্রলেখার মত। প্রবলপ্রতাপান্বিত বিরাট ক্ষমতাশালী সেই অনাগত লোকটি আসিবে—প্রজাদের অভাব-অভিযোগ, দুঃখ-দুশ্চিন্তা বঞ্চিত জীর্ণ মলিন হৃদয়ে লক্ষ রূপে ফেনাইয়া উঠে।

কিন্তু বংশী ওই অনাগত লোকটির সম্বন্ধে কোনো কিছু ভাবিয়া উঠিতে পারে না। রোগশয্যায় শুইয়া শুইয়া সে কেবল নিজের কথাই ভাবে। তাহার মনে হয়, চন্দ্রলেখা তাহার যত সন্নিকটে আসিয়াছিল যেন তাহার দ্বিগুণ দূরে সরিয়া গেল। এই কয়েক দিনের মধ্যে তাহার যেন একটা মস্ত ক্ষতি হইয়া গিয়াছে। সেই অপরিচিত অনাগত লোকটির প্রতি একটা তীক্ষ্ণ-কুটিল ঈর্ষা তাহার দুই জ্বলন্ত চোখে জাগিয়া উঠে।

অত সব লক্ষ্য করিবার মত চন্দ্রলেখার এখন অবসর নাই। কর্ম্মব্যস্ত চন্দ্রলেখার হঠাৎ তখন মনে পড়িয়া গিয়াছিল—হাটে একবার যাইতে হইবে এবং দিন থাকিতে

সমস্ত জোগাড় করিয়া রাখিতে হইবে। বিশেষ করিয়া কিছু মহুয়া ফুল যেখান হইতেই হোক জোগাড় করিতে হইবে—না হইলে পিঠা সে কি দিয়া গড়িবে!

এমন সময় বংশীর আহ্বান আসে,—চন্দ্রলেখা!...

চন্দ্রলেখার স্বপ্নবিলাস ছুটিয়া গেল। সে উঠিয়া বংশীর সম্মুখে আসিয়া দাঁড়াইল। বলিল, আমাকে ডাকছিলে বংশীদা?

বংশী তাহার একাগ্র দৃষ্টি চন্দ্রলেখার মুখের উপরে স্থাপিত করিয়া বলিল, একটু ব'স না—সারাটা দিন কথা না বলতে পেয়ে মড়ার মত পড়ে আছি।

—এখন কেমন আছ—বলিয়া চন্দ্রলেখা বসিল। তার পর বলিল, আমার এখন মরবার ফুরসুৎ নাই বংশীদা—কথা বলব কি! এক্ষুণি আবার হাটে যেতে হবে। দাদার ত কোনো দিকে কিছু খেয়াল নেই। তুমি ঘর-টরটা একটু দেখো—আমাকে একবার গাঙতুলসীর হাটে যেতে হবে।

বংশী বলিল, জল-বর্ষার দিন—একলা কি ক'রে যাবি চন্দ্র? রাত হয়ে যাবে যে!

চন্দ্রলেখা চিন্তিত হইয়া বলিল—সত্যিই। তা হ'লে যাব না—কি বল? কাল বরং দাদাকে পাঁচথালির হাটে পাঠিয়ে দেব।

বংশী আবার যেন অতীত দিনগুলার সুর খুঁজিয়া পায়। ক্ষুধা না থাকিলেও সে তবু বলে, চন্দ্র, বড় খিদে পাচ্ছে রে।

চন্দ্রলেখা হাসিয়া বলিল—তবু ভাল যে আজ চেয়ে খেলে। কিন্তু চন্দ্রলেখা ভুলিয়া গেল যে, আজ কয়দিন বংশী চাহিয়াই খাইতেছে। সেদিন চন্দ্রলেখাকে হঠাৎ দেখিবার ইচ্ছা হওয়ায় বিশেষ কিছু না মনে পড়ায় খানিকটা নুন চাহিয়াই মুখ বিকৃত করিয়া কোনো রকমে খাইয়া ফেলিয়াছিল। সারা বিকালটা বংশী স্বপ্নের মধ্য দিয়া কাটাইয়া দিল।

কিন্তু বংশীর ফিরিয়া-পাওয়া সুর কাটিয়া গেল সন্ধ্যায়।

বংশী তাহার নির্দ্দিষ্ট ঘরে শুইয়া শুইয়া শুনিল—ওপাশের রান্নাঘরে চন্দ্রলেখা নিমাইকে বলিতেছে, ঘর ত আমাদের দুটি—বাবু এলে থাকবেন কোথায়!

উত্তরে নিমাই মাথা চুলকাইতে চন্দ্রলেখা বলিল—বংশীদা'কে বরং তার নিজের ঘরে এবার যেতে বল—তা হ'লে আর ভাবতে হবে না।

নিমাই তেমনি মাথা চুলকাইয়া বলিয়াছিল, বংশীকে বলি কি ক'রে!

চন্দ্রলেখা বলিয়াছিল, তা না হ'লে আর উপায় কি! তা ছাড়া যে রোগ, থাকলে বাবুকেও ত ধরতে পারে। না না দাদা—তুমি স্পষ্ট ব'লে দিও।

বংশী সমস্ত শুনিয়া তখনই ঠিক করিয়াছিল, সেই রাত্রেই সে চলিয়া যায়। কিন্তু হইয়া উঠে নাই—নানা কথা ভাবিতে ভাবিতে ঘুমাইয়া পড়িয়াছিল। সকালে উঠিয়া নিজেই সে নিমাইকে বলিল, আজকে আমি ঘরে যাই নিমাই—অসুখটা ত অনেকটা সেরেই এসেছে—আর মিথ্যে থেকে লাভ কি! চাষ ত এবার গেলই—এবার দোকানটা চালাই।

নিমাই অপ্রতিভ হইয়া কি যেন বলিতে যাইতেছিল—বংশী বাধা দিয়া বলিল, না না নিমাই—তা ছাড়া বাবু আসবেন। আমাকেও ত কিছু একটা খাওয়ার জোগাড় করতে হবে—শুয়ে থাকলে ত আর চলবে না ভাই!

বংশী চলিয়া গেল।

চন্দ্রলেখা একটু অপ্রতিভ হইল মাত্র—সাময়িক ভাবে।

সকাল গেল—বিকাল আসিল কিন্তু সহদেব দত্ত আসিল না। চন্দ্রলেখা না-আসার কারণ জিজ্ঞাসা করিতে যাইতে নিমাই বলিল, কাল বোধ হয় ঠিক আসবেন রে চন্দ্র—তুই সব জোগাড়-যন্তর ক'রে রাখ।

চন্দ্রলেখার এক দিনের আয়োজন ব্যর্থ হইল।

তার পরদিনটাও প্রায় কাটিয়া যাইতে বসিল—অনাগত লোকটি তবু আসিল না। সারা কলমীলতা গ্রামের প্রজারা কাজকর্ম্ম ছাড়িয়া বৃথাই হৈ-চৈ করিয়া বেড়াইতে লাগিল।

তৃতীয় দিন ভোর হইবার সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রলেখা ঘুম ভাঙিয়া উঠিয়া বসিল এবং তৎক্ষণাৎ তাহার মনে হইল—অনাগত লোকটি যেন আসিয়া গিয়াছে এবং তাহার তীব্র দৃষ্টি যেন আসিয়া পড়িয়াছে এই সদ্যজাগ্রত বিস্রস্তবসনা চন্দ্রলেখার উপরে। সঙ্গে সঙ্গে রক্তাভ সরমাভরণ চন্দ্রলেখার সারা দেহে তাহার উষ্ণ পরশ দিয়া গেল।

অনাগত আজ আসিবেই। চন্দ্রলেখা পরিপাটি করিয়া আয়োজন করিল। তার পর আয়োজনের থালা হাতে লইয়া অনাগত লোকটির জন্য নির্দ্দিষ্ট ঘরে একে একে সাজাইতে চলিল। দরজার সম্মুখে গিয়া হঠাৎ তাহার ভুল হইয়া গেল। মনে হইল, সেই লোকটি যেন ওই ঘরে, চন্দ্রলেখার শত-যত্নে-পাতা ওই বিছানার উপরে শুইয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে বিপুল লজ্জায় অঙ্গের বসন গুছাইতে গিয়া চন্দ্রলেখার হাতের থালা মাটিতে পড়িয়া গেল।

আশায় আশায় দ্বিপ্রহর উত্তীর্ণ হইয়া গেল।

সহদেব দত্তকে আগাইয়া আনিবার জন্য গ্রামের প্রবীণ কয়েক জন গঞ্জের হাট পর্য্যন্ত গিয়াছে—নিমাইও গিয়াছে। চন্দ্রলেখা গুন্ গুন্ করিয়া গান গাহিয়া স্নান করিতে চলিল, কিন্তু চন্দ্রাকরের জলে দেহ ডুবাইতেই তাহার মনে হইল, ওই পাশের ওই ঈশানকোণে সহদেব যেন বসিয়া আছে। সঙ্গে সঙ্গে চন্দ্রলেখার আর ভাল করিয়া স্নান করা হইল না।

বিকাল আসিল—প্রশান্ত কাজল ছায়া ধীরে ধীরে নামিয়া আসিল। চন্দ্রলেখা সুদূরপ্রসারী দৃষ্টি লইয়া খালের ধারে দাঁড়াইল—ভাবিল, হয়ত খেয়ালী সেই সহদেব লোকটি সোজা এইখানেই আসিবে—রূপসীর খালে খালে নৌকা করিয়া।

নিমাই কিন্তু হতাশ হইয়া ফিরিয়া আসিল। কলমীলতা গ্রামের সকলেই।

চন্দ্রলেখা ব্যাকুল হইয়া জিজ্ঞাসা করিল—কি হ'ল দাদা? এলেন না?

নিমাই বলিল, না—বারো চকের নায়েবের সঙ্গে দেখা হয়েছিল। বাবুর এবার নাকি আর আসা হ'ল না। খেয়ালী মানুষ—যখন যা খেয়াল হয়।

চন্দ্রলেখা ভাঙিয়া পড়িল। কেন জানি না, বোধ করি অনাগত'র নিষ্ঠুরতায় চন্দ্রলেখার চোখের কোণ বাহিয়া জল নামিয়া আসিল—গোপনে আঁচলে সে তাহা মুছিয়া ফেলিল। সহদেবের জন্য যে ঘরটা সাজাইয়া গুছাইয়া রাখা হইয়াছিল সেই ঘরে সে ধীরে ধীরে গিয়া ঢুকিল। পূর্ব্বের ছোট জানালাটা খুলিয়া দিল—বাদল সন্ধ্যার এক ঝলক বাতাস হু হু করিয়া ঢুকিয়া সহদেবের জন্য পাতা বিছানার চাদরটার এক প্রান্ত গুটাইয়া দিল। চন্দ্রলেখা সেই বিছানায় বসিয়া পড়িয়া ভাবিতে বসিল। সে-চিন্তার কোন ধারা নাই।

শঙ্খমালা এই সময়ে ভয়ে ভয়ে একবার সেই ঘরে উঁকি মারিল, তার পর ঢুকিয়া চন্দ্রলেখার সম্মুখে আসিয়া বলিল, চন্দ্র-দি—বাবু আসে নি, না?

চন্দ্রলেখা ভারাক্রান্ত দৃষ্টি লইয়া তাহার দিকে চাহিল—কোন উত্তর দিল না। নিমাই এই সময়ে সে ঘরে ঢুকিল। চন্দ্রলেখাকে বলিল, খাবার-টাবার যা তৈরি করেছিস সে-গুলো এবার বার কর চন্দ্র।—শঙ্খও আছে, আমাকেও কিছু দে—বড্ড খিদে পেয়েছে। সারাটা দিন আজ খাড়া পাহরায় দাঁড়িয়ে আছি।

চন্দ্রলেখা উঠিয়া দাঁড়াইল। মন্থর কণ্ঠে বলিল, বংশীদা'কেও ডাকবে দাদা—পিঠে খেতে সে বড্ড ভালবাসে।

নিমাই সাশ্চর্য্যে বলিল, সে কি আর এ-গাঁয়ে আছে নাকি! আমাদের এখান থেকে চলে যাওয়ার পর কোথায় যে সে গেল—কে জানে! আজ সাত দিন ত দেখা নেই। ঘরদোর সব খোলা, দোকানটাও তেমনি সাজানো, ছেঁড়া কম্বলটাও পড়ে আছে—খালি তোর সেই দু-খানা কাঁথা নেই। আমাদেরই দে—খেয়ে ফেলি—বলিয়া নিমাই বাহির হইয়া গেল।

চন্দ্রলেখা বসিয়া পড়িল—চোখের কোণ বাহিয়া ঝর্ ঝর্ করিয়া জল নামিয়া আসিল।

এক সময়ে চন্দ্রলেখাকে প্রকৃতিস্থ দেখিয়া শঙ্খমালা তাহার নোংরা চুলের রাশ দুলাইয়া বলিল, চন্দ্র-দি গল্প বলো না—সেই গল্পটা, সেদিন যেটা অর্দ্ধেক বলেছিলে···

চন্দ্রলেখা অন্যমনস্ক ভাবে বলিল—ভরসন্ধ্যায় গল্প শুনতে নেই শঙ্খ—দুঃখ হয়।

—না তুমি বলো চন্দ্রদি—শঙ্খ জেদ ধরিয়া বসিল, কিন্তু চন্দ্রলেখা 'মনে নাই', 'মন খারাপ' ইত্যাদি অজুহাত দিয়া এড়াইয়া গেল। শঙ্খমালা ভাবিতে বসিল, কি হইল সেই কুমারীর যাহাকে বিবাহ করিবার জন্য এক রাজকুমার তাহাকে বন্দী করিয়া রাখিয়াছিল! কি হইল সেই ভিন্‌দেশের রাজকুমারের—যাহাকে কুমারী স্বপ্ন দেখিয়াছিল, যেন সেই সোনার বরণ রাজকুমার তাহাকে উদ্ধার করিয়া লইয়া যাইতেছে! উদ্ধার করিয়া কি—লইয়া গিয়াছিল! পক্ষীরাজ ঘোড়ায় চড়িয়া এই পৃথিবী ছাড়িয়া ওই মেঘ-পাহাড়ের দেশে কি উড়িয়া গিয়াছিল! না, বন্দিনী রাজকুমারী কেবল স্বপ্নই দেখিয়াছিল!

অলখ-ঝোরা

শ্রীশান্তা দেবী

৩১

বর্ষা যাই-যাই করিয়াও যায় না। পথের ধারে খানায় খন্দে জল এখনও থই-থই করিতেছে, কিন্তু তাহার উপর রৌদ্রের হাসিও থাকিয়া থাকিয়া ঝরিয়া পড়িতেছে। আকাশে কালো মেঘের বুক চিরিয়া সূর্য্য-কিরণ ঝলসাইয়া উঠিতেছে।

হৈমন্তীর মনেও আলো-অন্ধকারের খেলা এমনই করিয়া চলিয়াছে। নিখিলের একটা আকস্মিক উক্তিতে তাহার মনে নূতন রং ধরিয়াছে, সংশয়ের মেঘ বারে বারে ছিন্ন হইয়া আশার দীপ্তি ফাটিয়া পড়িতেছে। কিন্তু পরের মুখের কথায় মনকে এতখানি নিঃসংশয় করা কি সহজ? হৈমন্তীর মনের কোণের আশার আলোটি উজ্জ্বল হইয়া উঠিতে উঠিতেই আবার ম্লান হইয়া যায়। তপন হৈমন্তীকে ত কিছুই বলে নাই, তবে তাহাকে নিজের মনের কথা হৈমন্তী কি করিয়া বলিবে? ভদ্রতার শাস্ত্রে শালীনতার শাস্ত্রে ইহা যে নিষিদ্ধ। এমন ত নয় যে তপনের মনের কথা বলিবার কোনই সুযোগ ঘটে নাই। পৃথিবীতে কত দুস্তর বাধা অতিক্রম করিয়া মানুষ কতবার এ-সুযোগ আপনি করিয়া লইয়াছে ইতিহাসে তাহার প্রমাণের অভাব নাই। সে তুলনায় তপন ত কত সুযোগ হেলায় হারাইয়াছে বলা যাইতে পারে। কিন্তু হয়ত সব মানুষ এক রকম নয়। এক ক্ষেত্রে যে বীরশ্রেষ্ঠ, অন্য ক্ষেত্রে তাহার ভীরুতার সীমা নাই, এমন মানুষ ত কত-শত আছে। তপন কি সেই রকম মানুষ হইতে পারে না? হয় ত তাহাই; না হইলে এই অকারণ নীরবতার প্রতিজ্ঞার কোনও অর্থ হয় না। মানুষ এই সঙ্কোচকে ভীরুতাই বলে বটে, কিন্তু হৈমন্তীর মন তাহা বলিতে চাহে না।

মিলির বিবাহের পর হইতেই বাড়ীটা কেমন যেন ঝিমাইয়া পড়িয়াছে। এ-বাড়ীতে কেহই আর আসে না। সুরেশের বাড়ীর পার্টির পর তপন এবং নিখিল একবারও এ বাড়ীতে আসে নাই। একটুখানি খবরের টুক্‌রা কি এককণা আশার ইঙ্গিতের জন্য হৈমন্তীর মন ছট্‌ফট্‌ করিতেছিল। কিন্তু কোথায়ও কোন সাড়া নাই। সুধা আসিলে তাহার কাছে মনের কথা বলিয়া হয়ত একটু মনটা হাল্কা হইত, অথবা একটুখানি সুপরামর্শ পাওয়া যাইত। কিন্তু সুধাও এখানে নাই, সে সুরেশদের পার্টির পরদিনই মহামায়াকে লইয়া নয়ানজোড়ে চলিয়া গিয়াছে। ঠিক কবে যে আসিবে, তাহাও বলিয়া যায় নাই।

মনে এতবড় একটা বোঝা লইয়া এই নিঃসঙ্গ দিনগুলা হৈমন্তী কি করিয়া কাটাইবে? তাহার মন অস্বাভাবিক রকম চঞ্চল হইয়া উঠিল। এতটুকু একটু খাঁটি খবর কি পাওয়া যায় না? তপন ছাড়া আর কে তাহা দিতে পারে? অন্যের মুখের কথা ত হৈমন্তী দুইবার শুনিয়াছে, কিন্তু তাহাতে মন ত ঠাণ্ডা হয় না। তপনের মনে এদিককার সম্বন্ধে হয়ত কোনও ভুল ধারণা আছে, হয়ত এমন কোনও বাধাকে সে দুরতিক্রমণীয় মনে করিতেছে, যাহা বাস্তবিক কোন বাধাই নয়; তাই যথাস্থানে তাহার মনের কথা আসিয়া পৌঁছিতেছে না। এমন সময় শালীনতার শাস্ত্রে হৈমন্তী যে আচরণ নিষিদ্ধ মনে করিতেছে, বাস্তবিক কি তাহা নিষিদ্ধ? যদি তপনের কোনও ভুল সে ভাঙিয়া দিতে পারে, যদি তাহার কোনও বাধা দূর করিয়া পথ সুগম করিয়া দিতে পারে, তাহা হইলে সে কার্য্যে হৈমন্তীর একটুখানি অগ্রসর হওয়াই ত ন্যায়সঙ্গত ও মনুষ্যজনোচিত কার্য্য। হৈমন্তী এই লইয়া আর বসিয়া বসিয়া ভাবিতে পারে না। যদি তাহার একটুখানি অগ্রসর হওয়া ভুলই হয়, তাহাতেই বা কি যায় আসে? মানুষ ভাল ভাবিয়া ভুল কি করে না? ভুল হইবার ভয়ে নিশ্চল বসিয়া থাকিলে শিশু ত কোনদিন হাঁটিতেও শিখিত না। তাছাড়া সে যাহার সম্বন্ধে ও যাহার কাছে ভুল করিবে, সে মানুষটি ত তপন ছাড়া আর কেহ নয়। হৈমন্তীর ভুলের ছুতা লইয়া হৈমন্তীকে লজ্জায় ফেলিবার মানুষ যে তপন নয়, এ-বিষয়ে হৈমন্তীর মনে এক কণাও সন্দেহ নাই।

হৈমন্তী তাহার সেই দক্ষিণের বারান্দায় বেতের চেয়ারে বসিয়া পুঞ্জ পুঞ্জ মেঘের অলস গতির দিকে চাহিয়াছিল। এই মেঘ যুগে যুগে কত বিরহীর কাতর দৃষ্টি ও নীরব প্রার্থনা বহন করিয়া লইয়া ফিরিয়াছে, কিন্তু যাহার নিকট পৌঁছাইয়া দিবার কথা তাহাকে কি কোনও দিন কোন ইসারা করিতে পারিয়াছে? হৈমন্তীর মন উড়ন্ত মেঘের পিছনে পিছনে ভাসিয়া চলিয়াছিল, কিন্তু কে তাহাদের পথ বলিয়া দিবে, কে তাহাদের ভাষায় মুখর করিয়া তুলিবে?

এই বাস্তব জগতের কঠিন লেখনীর কালো আঁচড়েই তাহার হৃদয়ের বেদনাকে রূপ দিতে হইল। সে কালির আঁচড়ে মনের ব্যাকুলতার এক কণাও কি ফুটিল? হৈমন্তী কি যে লিখিল, তাহা তাহার কিছুই মনে রহিল না। মনে হইল আপনাকে সে প্রকাশ করিয়া ফেলিয়াছে, এতখানি না বলিলেও চলিত। কিন্তু কতটুকু বলিলে, কি প্রশ্ন করিলে তপন হৈমন্তীর প্রার্থিত উত্তরটি দিবে, কতটুকু না বলিলেই ভাল দেখাইবে তাহা হৈমন্তী ঠিক করিতে পারিতেছিল না। সে দ্বিতীয়বার চিঠিখানা পড়িলও না, উত্তেজনার বশে যাহা লিখিল তাহাই খামে বন্ধ করিয়া ডাকে দিয়া যেন একটা স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলিয়া বাঁচিল। আর দুইটা দিন কাটিলে যাহা হউক কিছু একটা জবাব ত সে পাইবে। মন এমন করিয়া আর ভাসিয়া বেড়াইতে পারে না, সে একটা স্পষ্ট সত্য আঁকড়াইয়া ধরিতে চায়। তাহার ঈপ্সিত স্বর্গ তাহার হাতের মুঠির ভিতর আসিয়াছে, কি আকাশ-কুসুম শূন্যে মিলাইয়া গিয়াছে তাহা সে জানিতে চায়। নিষ্ঠুর সত্যকে সহ্য করিবার শক্তির অভাবে মিথ্যার মায়াকে বহুদিন ধরিয়া চোখের সম্মুখে ঝুলাইয়া রাখিতে প্রাণ ব্যাকুল হয় বটে, কিন্তু যাহা ছলনা তাহার উপর ভিত্তি করিয়া জীবনকে গড়িতে কি পারা যাইবে? তা ছাড়া হৈমন্তীর মনে আশা জাগিয়াছে, নিষ্ঠুর সত্য তাহাকে শুনিতে হইবে না, মধুর সত্যই সে শুনিবে। দু-দিন আগে-পিছের ব্যাপার ছাড়া আর বেশী কিছু সন্দেহকে সে মনে আমল দিবে না।

চিঠি চলিয়া গেল, হৈমন্তী দিন ঘণ্টা প্রহর গুণিতে লাগিল। কলিকাতার চিঠি কলিকাতাতে দুই-চার ঘণ্টাতেও পৌঁছায় আবার একদিন পরেও যায়। ঠিক যে কখন পৌঁছিবে বলা শক্ত হইলেও তৃতীয় দিনে একটা জবাবের আশা করা যাইতে পারে। ডাক-পিয়নের ময়লা খাকি পোষাক আর পাগড়ীটা যতবার পথের ধারে দেখা দিত ততবারই হৈমন্তী জানালার ধারে আসিয়া দেখিত মানুষটা তাহাদের বাড়ীতে আসে কি না। ডাকঘর হইতে বাহির হইবার আন্দাজ কত মিনিট পরে যে তাহাদের রাস্তার মোড়ে ওই ময়লা পাগড়ীটা দেখা যায় তাহা এক দিনেই হৈমন্তীর মুখস্থ হইয়া গেল। ডাকবাক্সে চিঠি মাঝে মাঝে পড়িল বটে, কিন্তু তাহা হৈমন্তীর চিঠি নয়।

উৎকণ্ঠাপূর্ণ নিঃসঙ্গ বিষণ্ণ দিন কাটিতে চাহে না, এক একটা ঘণ্টা যেন এক একটা যুগ, বুকের উপর দিয়া ভারী কাঁটার শৃঙ্খল টানিয়া টানিয়া চলিয়াছে। চিঠি লিখিয়াই উৎকণ্ঠা যেন দশ গুণ বাড়িয়া গিয়াছে। উত্তরের আশা আছে বলিয়াই নিরাশা এমন করিয়া মনকে পীড়ন করিতে পারিতেছে, চিঠি না লিখিলে এমন করিয়া প্রত্যেকটি মুহূর্ত্ত গুণিয়া প্রতীক্ষা করিবার প্রয়োজন ত থাকিত না। এক বৎসরে যতখানি আকুলতা মনের উপর ছড়াইয়া থাকিত, তাহা যেন দুই দিনে নিরেট ঠাসা হইয়া ব্যথায় টন্‌টন করিতেছে। হৈমন্তী কাহাকে জিজ্ঞাসা করিবে? আর একখানা চিঠি সে লিখিতে পারিবে না। নিখিলকে ডাকিয়া খোঁজ করিতে বলা তাহার পক্ষে অসম্ভব। সুধা এখানে নাই, থাকিলেও হয়ত কিছুই করিতে পারিত না। কিছু প্রশ্ন করা যেখানে চলিবে না সেই মিলিদের বাড়ী এক যাওয়া যায়, যদি কথায় কথায় কোন কথা বাহির হইয়া পড়ে।

সুরেশ ও মিলি দুই জনেই বাড়ীতে ছিল। হৈমন্তী নিজেকে যথাসাধ্য সংযত ও স্বাভাবিক করিবার চেষ্টা করিয়া চিঠি লিখিবার দিন চার পাঁচ পরে সেদিন তাহাদের বাড়ীতে সন্ধ্যায় গিয়া উপস্থিত হইল। সুরেশ ছুটিয়া নামিয়া আসিয়া বলিল, "গরীবের বাড়ী এত শীগ্‌গির তোমাদের পদধূলি আবার পড়বে তা আশা করি নি।"

হৈমন্তী বলিল, "জ্যাঠাইমা না-হয় দেশেই চলে গেছেন। তাই বলে মিলিদির সঙ্গে আমাদেরও কি সম্পর্ক চুকে গিয়েছে? একবারটিও ত আপনারা আর ও রাস্তা মাড়াবেন না। কাজেই আমি না এসে আর করি কি?"

মিলি সিঁড়ি দিয়া নামিতে নামিতে বলিল, "না রে না,

আমি কালই সকালে যাব ঠিক করেছিলাম তোর কাছে। কাকাবাবুও আমি না গেলে রাগ করেন জানি। কাল রবিবার আছে, তার উপর উনি সারাদিনই বাড়ী থাকবেন না, আমার ও-বাড়ী যাওয়াই ভাল।"

হৈমন্তী বলিল, "কেন সুরেশদার কি এখনও আমাদের বাড়ী যাওয়া বারণ? ওঁকেও নিয়ে চল না, অন্ত কোথায় আবার কি করতে যাবেন?"

সুরেশ বলিল, "পরের দায় এসে ঘাড়ে পড়েছে, না গিয়ে করি কি? কাল ট্রেন থেকে তপনের একটা চিঠি পেলাম তার কোন্ বন্ধুর অত্যন্ত জরুরী কাজ, সে বোম্বের দিকে যাচ্ছে। কবে কোথায় কত দিন থাকতে হবে তার ঠিক নেই। অকস্মাৎ যেতে হ'ল বলে গ্রামের ইস্কুলের ভাল বন্দোবস্ত ক'রে যেতে পারে নি। আমাদের উপর ভার দিয়েছে একটা বিলিব্যবস্থা করবার।"

হৈমন্তী সংক্ষেপে বলিল, "কি ব্যবস্থা করবেন?"

সুরেশ বলিল, "তপনের বদলে কয়েক মাসের জন্যে একজন মাষ্টার রেখে দিতে হবে, আর রবিবারে রবিবারে নিখিল আর আমি গিয়ে তদারক করব। ওদের ছুটি এমনিতেই শনিবারে, কারণ সেদিন হাট বসে। কাজেই কাজকর্ম্মের কোন অসুবিধা হবে না। হ্যাঁ, ভাল কথা, তপন কারও সঙ্গে দেখা ক'রে যেতে পারে নি ব'লে সকলের কাছে ক্ষমা চেয়ে পাঠিয়েছে। সকলের মধ্যে তুমিও একজন ব'লে তোমাকেও ব'লে রাখছি।"

মিলি বলিল, "দরজার গোড়ায় দাঁড়িয়ে আর বক্তৃতা না শুনিয়ে ঘরে নিয়ে বসাও না। আয় হিমু, তোকে আজ বড় শুকনো শুকনো দেখাচ্ছে। অসুখ করেছে না কি কিছু?"

হৈমন্তী বলিল, "না, অসুখ কিছু করে নি। বাড়ীতে জনপ্রাণী প্রায় কেউ নেই, একলা একলা বড় খারাপ লাগে। শুধু সতু আর বাবা খাবার সময় একবার ক'রে টেবিলে এসে বসেন, বাকি সময় সবাই নিজের নিজের কাজে।"

ঘরে আসিয়া বসিয়া মিলি বলিল, "সত্যি, সবাইকার যেন দেশ ছেড়ে পালাবার ধুম লেগে গিয়েছে। মাকে বাবার জন্যে দেশে যেতেই হ'ত, কিন্তু সুধা কলকাতায় থাকলে তোর সঙ্গীর অভাব হ'ত না, তা সেও কিনা ঠিক সময় বুঝে চলে গেল। তপনবাবুও আর বন্ধুর উপকার করবার সময় পেলেন না, দিন দেখে বেরিয়ে পড়লেন, পাছে কালে-ভদ্রে দুই-একটা গানটান শুনিয়ে মানুষের উপকার ক'রে ফেলেন। মহেন্দ্র-দা ত যাবার প্রায় সব ব্যবস্থাই ক'রে ফেলেছে, শুনছিলাম দেশ থেকে ঘুরে এসে হপ্তাখানিকের মধ্যেই সে বেরিয়ে পড়বে। যদি দেশ থেকে আসতে দেরী হয়, তাহলে দু'চার দিনেই সাগর পাড়ি দিতে বেরোতে হবে।"

সুরেশ অকস্মাৎ মহোৎসাহে বলিয়া উঠিল, "হ্যাঁ, কথা ছিল বটে, কিন্তু ওইখানে একটা গোলমাল বেধে গেছে। দেশ থেকে ফিরবার পর ওকে পার্টি দেওয়ার সুবিধা হয়ত হ'য়ে উঠবে না ব'লে আমরা আগেভাগে খাইয়ে দিলাম। কিন্তু এখন দেখছি পার্টিটা মহেন্দ্রকে না দিয়ে তপনকে দিলেই ভাল হ'ত। মহেন্দ্র কালই দেশ থেকে ফিরে এসেছে, আমার আপিসে এসেছিল দেখা করতে, বলছে সব কাজকর্ম্ম ভাল করে না গুছিয়ে এত হুড়োহুড়ি ক'রে যাওয়া ঠিক হবে না। এ জাহাজটা ও ছেড়ে দিচ্ছে, এর পর কোনটায় বুক্ করবে নিজের সব সুবিধা বুঝে ঠিক করবে।"

মিলি হাসিয়া বলিল, "তোমার বন্ধুদের সব মাথা খারাপ হয়ে গিয়েছে। যার কাজকর্ম্ম ভাল ক'রে গোছান উচিত ছিল সে রাতারাতি কোথায় দৌড় দিল তার ঠিক নেই, আর যার জাহাজ অবধি ঠিক হয়েছিল তারই অকস্মাৎ শুভমতি হ'ল কাজকর্ম্ম গোছাবার জন্যে। এবার বিলেতের টিকিট না কিনে ওকে রাঁচির টিকিট কিনতে বল।"

হৈমন্তী চুপ করিয়া বসিয়া শুনিতেছিল। তপনের খবর পাইবার ক্ষীণ আশা মনে লইয়া সে এ-বাড়ী আসিয়াছিল, এমন খবর পাইবে একবার কল্পনাও করে নাই। এই কথাবার্ত্তায় সে কি ভাবে যোগ দিবে? তাহার মাথায় ঘুরিতেছিল সেই চিঠিখানার কথা! পাগলের মত তাহাতে এলোমেলো কি যে সে লিখিয়াছিল তাহার স্পষ্ট কিছুই মনে নাই। উত্তেজনার মুহূর্ত্তে দ্বিতীয়বার পড়িয়াও দেখে নাই। চিঠির জবাব আসুক বা না-আসুক, তাহা তপনের হাতে পড়িয়াছে মনে এই একটা সান্ত্বনা ছিল। কিন্তু এখন তাহাও ত নিশ্চিত বলা যায় না। হৈমন্তী যখন ঘরে বসিয়া চিঠি লিখিতেছিল, হয়ত তখন তপন বিদেশযাত্রার জন্য

তন্নী বাঁধিতেছিল। চিঠিখানা তপনের বাড়ী পৌঁছিবার অনেক আগেই নিশ্চয় সে কলিকাতার বাহিরে চলিয়া গিয়াছে। তার পর তাহা কাহার হাতে পড়িয়াছে কে জানে? মানুষের কৌতূহলের সীমা নাই। কেহ যদি তপন বাড়ী নাই দেখিয়া চিঠিখানা খুলিয়া থাকে? লজ্জায় হৈমন্তীর মাথা হেঁট হইয়া আসিতেছিল। যাহারা হৈমন্তীকে ভাল করিয়া চেনে না, তাহাদের হাতে এ-চিঠি পড়িলে তাহারা কি-না ভাবিতে পারে। তাহার জীবনে যাহা পূজার ফুলের মত পবিত্র, মানুষের মক্ষিকাবৃত্তি তাহাকে কালিমাময় করিতে এতটুকুও ইতস্তত করিবে না।

মিলি আবার বলিল, "হিমু, আমরা এত ব'কে মরছি তুই ত কই কথা বলছিস্ না। নিশ্চয় তোর কিছু হয়েছে। দাঁড়া, চা ক'রে আনি, গরম গরম চা খেলে চাঙ্গা হ'য়ে উঠ্‌বি।"

পিছন হইতে নিখিল ডাকিয়া বলিল, "আমার জন্যেও এক পেয়ালা চা করবেন। অনেক জায়গায় নিরাশ হ'য়ে আজ প্রথম আপনার এখানে একটু আশার আলো দেখছি।"

হৈমন্তী এতক্ষণ চুপ করিয়াছিল, এইবার হাসিয়া বলিল, "কিসের সন্ধানে আপনি এত ব্যস্ত হ'য়ে ঘুরে বেড়াচ্ছেন?"

নিখিল বলিল, "মানুষের সন্ধানে। যার বাড়ী যাই সব দেখি ডেসার্টেড। পরশু তপনের বাড়ী গিয়ে দেখ্‌লাম সে পালিয়েছে। কাল আপনার বন্ধুর বাড়ী সাহস ক'রে গিয়ে দেখ্‌লাম, তিনিও নেই। আজ মরিয়া হ'য়ে একটু আগে আপনার ওখানে গিয়েছিলাম, আপনাকেও না-পেয়ে শেষে এইখানে শেষ চেষ্টায় এসেছি।"

হৈমন্তী বলিল, "সবাই কলকাতা ছেড়ে পালাচ্ছে, চলুন আমরাও পালাই।"

নিখিল বলিল, "বাস্তবিক, কলকাতাটা একেবারে মিয়োনো মুড়ির মত বিশ্রী হ'য়ে গিয়েছে।"

সুরেশ বলিল, "হিমু, ওর সঙ্গে আর কথা ব'লো না। আমরা এতগুলো মানুষ কলকাতায় রয়েছি আমাদের কি কোন দাম নেই? সুধাই কেবল এখানে সুধা সঞ্চার করতে পারে?"

নিখিল লাল হইয়া বলিল, "না, না, তেমন কোন কথা ত আমি বলি নি। আমার এত স্পর্দ্ধা নেই এবং এমন অর্ব্বাচীনও আমি নই। লোকে কেন পালাচ্ছে তাই বলছিলাম।"

নিখিল ও সুরেশ চেষ্টা করিল, কিন্তু চায়ের মজলিস আজ জমিল না। হৈমন্তীর মনে কেবল একই কথা ঘুরিতেছিল। তাহা ঠিক কি, না বুঝিলেও, নিখিল এটুকু বুঝিল যে মহেন্দ্রর বিদায়-উৎসবে সে হৈমন্তীকে যাহা বলিয়াছিল তাহারই ক্রিয়া হৈমন্তীর মনে চলিয়াছে। কিন্তু তপনের আচরণে নিখিলের কথা মিথ্যা হইয়া যাইবার জোগাড় হইয়াছে দেখিয়া নিখিল হৈমন্তীর নিকট নিজেকে কতকটা যেন মিথ্যাচারী বলিয়াই বোধ করিতেছিল।

ইহাদের কথায় হৈমন্তী বুঝিল তপন দীর্ঘকালও বাড়ী না ফিরিতে পারে। যাক, যদি তপন তাহার চিঠি না পাইয়া থাকে ভালই হইয়াছে; হৈমন্তী যাহা মনে করিয়াছিল তাহা সত্য হইলে এমন নিরাসক্তভাবে তপন কি চলিয়া যাইতে পারিত? নিকটে থাকিয়া নীরবতার প্রতিজ্ঞা রক্ষা করা না-হয় বুঝা যায় কিন্তু এমন করিয়া সকল বাঁধন ছিঁড়িয়া নিরুদ্দেশ যাত্রার অর্থ সে ত কিছুই বুঝিতেছে না।

৩২

মিলির বিবাহের পর বাড়ী ফিরিয়াই সুধা ঠিক করিয়াছিল মাকে লইয়া সে একবার নয়ানজোড়ে যাইবে। যে আবেষ্টনের ভিতর জন্ম হইতে শৈশবের সকল আনন্দ সে সংগ্রহ করিয়াছিল, যাহার উপর ভিত্তি করিয়াই তাহার জীবন গঠিত, বেদনার দিনে সেইখানেই সে জুড়াইতে যাইতে চায়। মানুষের সকল ব্যথার ক্রন্দনই যেমন 'মা'কে ডাকিয়া আশ্রয় চাওয়া, এই জন্মভূমির প্রতি আকর্ষণও তেমনই তাহার আশ্রয়ভিক্ষা। নূতন জীবনে সুখদুঃখ যাহা তাহার অদৃষ্টে ঘটিয়াছে তাহা এই শৈশবের নীড়ে আসিলে কিছুকালের মত অন্তত হাঁসের পালকের জলের মত তাহার চিত্ত হইতে ঝরিয়া পড়িবে। অতি দুঃখের দিনে আজকাল সে যখন রাত্রির স্বপ্নের ক্রোড়ে আপনার ব্যথাহত চিত্তটি লইয়া পলাইয়া যায়, তখন বহুবার দেখিয়াছে নিদ্রাদেবী তাহাকে পথ ভুলাইয়া লইয়া যান সেই স্বপ্নলোকে যেখানে তাহার দিদিমা ভুবনেশ্বরী সকালে উঠিয়া নাতি-নাতনীর দুধ মাপিতে বসেন, মা পক্ষাঘাতগ্রস্ত দেহ ভুলিয়া

পুকুরের জলে সখীদের সঙ্গে সাঁতার কাটেন, দাদামহাশয় দুই হাত বাড়াইয়া তাহাকে গাড়ী হইতে কোলে করিয়া নামাইতে চান। কোন্ মায়াস্পর্শে তাহার জীবনের এতগুলা বৎসর পিছাইয়া চলিয়া যায় সে বুঝিতে পারে না। তাহাদের গতির সমস্ত চিহ্ন মুছিয়া লইয়া পিছু হটিয়া নিঃশব্দে তাহারা চলিয়া যায়, সুধার জীবনের ছোটবড় ব্যথার ক্ষতগুলি রাত্রির অন্ধকারে জুড়াইয়া দিবার জন্য। নয়ানজোড়ের ধূমলেশহীন দিনের আলোও এই রাত্রির অন্ধকারকে অনেকখানি সাহায্য করিবে বলিয়া সুধার বিশ্বাস। তাই সুধা তাহার পঙ্গু মায়ের অনেক অসুবিধার সম্ভাবনা বুঝিয়াও তাঁহাকে সঙ্গে যাইতে রাজি করাইয়াছে। তাঁহাকে ফেলিয়া গেলে সেখানে ত সে নিশ্চিন্ত হইয়া থাকিতে পারিবে না।

শৈশব তাহাকে যে আনন্দ দিয়াছিল তাহাতে ছন্দের দোল দিবার জন্য দুঃখের কোনও আঘাত ছিল না, কিন্তু যৌবনের আনন্দে দুঃখবেদনার আঘাত তাহার সুখকে ছাপাইয়া উঠিতে চলিয়াছে। যদিও এই দুঃখের কষ্টিপাথরেই তাহার প্রেমকে সে চিনিয়াছে তবু ইহার হাত হইতে ক্ষণিকের মুক্তি যদি সে না পায়, তাহা হইলে হৃদয়তন্ত্রী তাহার টুটিয়া যাইবে।

শেষবর্ষণের ঘনঘটার মধ্যে সুধা নয়ানজোড়ে আসিয়া পৌঁছিল। গরুর গাড়ী করিয়া ষ্টেশন হইতে যখন তাহারা বাড়ী আসিয়া পৌঁছিল তখন ভরাবর্ষার কালো মেঘসাগরের বুকে চতুর্থীর চাঁদ ছোট একটি আলোর নৌকার মত ভাসিয়া চলিয়াছে। উন্মত্ত তরঙ্গের মত মেঘ কখনও তাহাকে গ্রাস করিয়া ফেলিতেছে, কখনও আবার সে জাগিয়া উঠিতেছে মেঘপুঞ্জের অন্তরাল হইতে। এ যেন গঙ্গাধর মহাদেবের জটাজালে দীপ্যমান শিশু শশী। বর্ষার এই ঘন কালো মেঘজালে ভাসমান চতুর্থীর চাঁদ কবে কোন্ আদি কবির মনে এ কল্পনা আনিয়া দিয়াছিল কে জানে? সুধার মনে হইল, শুষ্ক ধরার প্রাণদায়িনী গঙ্গা এই মেঘের জটা হইতে যেমন করিয়া ঝরিয়া পড়িয়াছিলেন, তেমনই করিয়া তাহার প্রাণেও এই ঘনবর্ষা শান্তিধারা ঢালিয়া দিতে পারিবে।

গরুর গাড়ী বাড়ীর দরজায় আসিয়া দাঁড়াইল। অন্ধকারে লণ্ঠন-হাতে হাড়ু সাঁওতাল আসিয়া বাক্স বিছানা নামাইতে লাগিল। মুখখানা কিছুমাত্র ম্লান না করিয়া সে প্রথমেই বিনা ভূমিকায় খবর দিল, "কঙ্কণাঝি মরে গেছে মা।"

মহামায়া বলিলেন, 'আহা, কি হয়েছিল বাছার?"

সুধার দুই চোখ জলে ভরিয়া আসিল। সে তাড়াতাড়ি মুখ ফিরাইয়া গাড়ী হইতে নামিয়া পড়িল। হাড়ু যে কি জবাব দিল তাহা সুধা শুনিল না। মৃগাঙ্ক ও হাড়ু মহামায়াকে ধরিয়া নামাইল। সুধা লণ্ঠনটা উঁচু করিয়া ধরিল। সেই ছেলেবেলার মৃগাঙ্কদাদা, এখন মস্ত এক জন ভদ্রলোক হইয়াছে, বলিল, "সুধা আর ত ডাগর হয় নি, মামীমা!" কিন্তু সুধার মনে হইল জীবনের অভিজ্ঞতায় সুধাই তাহার চেয়ে অনেক বাড়িয়া গিয়াছে। মৃগাঙ্কদাদার জীবনে এখনও ধান আদায়, গোলা বোঝাই ও জমি বিলি করা বছরে বছরে একই ভাবে ঘুরিয়া আসে, সুধার জীবন ইহার ভিতর কত দীর্ঘ পথের কাঁটা মাড়াইয়া ফুল কুড়াইয়া অগ্রসর হইয়া আসিয়াছে।

পিসিমা হৈমবতী অন্ধকারে ঘরের ভিতর বসিয়া হরিনামের ঝুলি লইয়া মালা করিতেছিলেন। সুধাদের দেখিয়া মালাটি মাথায় ঠেকাইয়া দেয়ালের পেরেকের গায়ে ঝুলাইয়া রাখিলেন। সেই তাহার তেজস্বিনী পিসিমার মুখে কি একটা অসহায় ভাব যেন ফুটিয়া উঠিয়াছে। যিনি পৃথিবীতে কাহারও সাহায্য ভিক্ষা করেন নাই, কাহারও অভাবে ভয় পান নাই, তিনি যেন এই অন্ধকারে হাতড়াইয়া সহায় খুঁজিয়া বেড়াইতেছেন। সুধার মনটা দমিয়া গেল। নয়ানজোড়কে সে যাহা মনে করিয়া আসিয়াছিল, তাহা ত ঠিক নাই। পৃথিবীতে দুঃখ কি শুধু তাহার জন্য, যে সে দুঃখের হাত হইতে পলাইয়া বাঁচিবে অপরের সুখশান্তি দেখিয়া? দুঃখ পৃথিবীর নিঃশ্বাস-বায়ুর ভিতর দিয়া বিশ্বজনের হৃদয়ে ঘুরিয়া ফিরিতেছে।

পিসিমার মুখের সতেজ রেখাগুলি বেদনায় যেন ঠোঁটের কোণে চোখের কোণে ভাঙিয়া পড়িয়াছে, পায়ের জোরে মাটি আর তেমন কাঁপিয়া উঠে না। পিসিমা দুই হাতে সুধাকে বুকের ভিতর জড়াইয়া ধরিলেন। মহামায়াকে দেখিয়া বলিলেন, "বৌ, তুমি সেদিনের মেয়ে, তোমাকে এমন দেখে যাওয়াও আমার অদৃষ্টে

ছিল ? কত দেখেছি, জানি না আর কত দেখতে হবে ?” এই বিষণ্ণতার আবহাওয়া সুধার ভাল লাগিতেছিল না, সে বলিল, “পিসিমা, আজ রাত হয়েছে মাকে শুইয়ে দিই, কাল দিনের আলোয় অনেক গল্প হবে এখন।”

যে-ঘরে সুধারা ছেলেবেলায় শুইত সে-ঘরটা জিনিষপত্রে ঠাসা পড়িয়া আছে, অনেক কাল তাহা খোলা হয় নাই। সুধারা পিসিমার ঘরের মেঝেতেই বিছানা পাতিয়া শুইল।

রাত্রি হইতেই বৃষ্টি সুরু হইয়াছিল, সারা রাত্রি কানের কাছে ঝর ঝর করিয়া বৃষ্টির শব্দ হইয়াছে। কখন যে সকাল হইয়া গিয়াছে সুধা টেরও পায় নাই। বেশ খানিকটা বেলায় বাহির হইয়া আসিয়া দেখিল, বৃষ্টির এখনও বিরাম নাই। সমস্ত আকাশ কান-ঢাকা ব্যালাক্লাভা ক্যাপের মত মেঘের টোপর পরিয়াছে; কোনখানে একটুও ফাঁক নাই। তাহা হইতেই ঝুরু ঝুরু বৃষ্টি গুঁড়া বালির মত ঝরিয়া চলিয়াছে। কলিকাতায় এমন বৃষ্টি মানুষের সহ্য হয় না, কিন্তু এখানে দিনের আলোয় সুধার মনটা প্রসন্ন হইয়াছিল, এ-বৃষ্টি তাহার ভালই লাগিল।

পশ্চিম দিকের সুবিস্তৃত ধানের ক্ষেতের পর যে শালবনটা ছিল, এবার সুধা দেখিল কোন্ কাঠের ব্যবসাদার আসিয়া তাহা নির্ম্মূল করিয়া কাটিয়া লইয়া গিয়াছে। পিছনের নদীর জলরেখা এখন দেখা যায়। বর্ষায় নদীর জল তাল-ক্ষীরের মত রাঙা হইয়া উঠিয়াছে, ফাঁপিয়াছে যেন ফুটন্ত দুধের কড়া। ওপারের বালুর চর ডুবাইয়া একেবারে সবুজ অরণ্যানীর বুকে গিয়া ঠেকিয়াছে স্ফীত রক্তাভ নদী। ঝাঁকে ঝাঁকে বক নদীর দিক হইতে উড়িয়া ওপারে কোথায় চলিয়াছে। তাহাদের শেষ নাই, কোথা হইতে আকাশের বুকে দোদুল্যমান এই বলাকার মালায় একের পর এক করিয়া পদ্মের মত শুভ্র বকগুলি গাঁথিয়া দেওয়া হইতেছে কেহ জানে না। ইহাদের ডানার দ্যুতি দেখিয়া দশ বৎসর পূর্ব্বেকার বালিকা সুধা যেন স্বপ্নময় ঘুম হইতে জাগিয়া উঠিল।

মনে হইল ওই শৈশবের দৃষ্টি দিয়া পৃথিবীর সহিত প্রথম যে বিস্ময়-ঘন পরিচয়, তাহাই সত্য, তাহাই শাশ্বত, যৌবন-বেদনার এ কোন্ দুঃখময় গহনবনে সে ঘুরিয়া মরিতেছিল ? ওদিকে আর ফিরিয়া না চাহিয়া এই হারানো শৈশবে সে যদি আবার চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত করিতে পারিত তাহা হইলে জীবনে কোনও সমস্যার পদতলে মাথা কুটিতে হইত না, আপনার কাছে আপনি নিরন্তর জবাবদিহি করিবার কোন ভাবনা থাকিত না। ওই বর্ষার মেঘ, ওই নদীর জল, ওই বকের ডানার দ্যুতি তাহারা আজও সেই অতীতের ধারাতেই চলিয়াছে, কেন মানুষের জীবনের মিথ্যা এ দুঃখময় পরিবর্ত্তন ?

তবু তাহার এ দুঃখকে সে ভুলিতে চাহে না, এই ধরণীর সৌন্দর্য্যের সহিত ছন্দ রাখিয়া তাহা তাহার অন্তরের ঐশ্বর্য্য হইয়া থাকুক। মাসীমা সুরধুনীর মত মনোমন্দিরেই চির-জাগর প্রদীপ জ্বালিয়া সে দেবতার আরতি করিয়া যাইবে। সে আরতিতে অশ্রুর অন্ধকার যদি না থাকিত, দুঃখজয়ের গৌরব যদি প্রদীপ-শিখার মত [illegible], তবেই সার্থক হইত তাহার প্রকৃতির ক্রোড়ে সাধনা।

কিন্তু এ পণ টিঁকে না। যে-মাটিতে দুঃখের ফসল ফলিয়াছিল তাহা ছাড়িয়া আসিয়া মনে একটু স্থৈর্য্য আসিয়াছে বটে, কিন্তু এই মূক পৃথিবীর সহিত প্রাণের কথার বিনিময় যে চলে না।

সুধা দিন গুনিতে লাগিল কবে কলিকাতায় ফিরিয়া যাইবে, কবে মানুষের আবেষ্টনে প্রাণে হাসিকান্নার ঢেউ আবার দুলিয়া উঠিবে। তপনের আশা সে হারাইয়াছে বিশ্বাস হয় না, দূরে আসিয়া মনে হয় হৈমন্তীর ঘরের সেই রাত্রির কাহিনী সবই বুঝি স্বপ্ন। কি করিয়া তাহা সে বলিতে পারে না, কিন্তু কোনপ্রকারে হয়ত সে স্বপ্ন তাহার টুটিয়া যাইবে।

ঘটনাবৈচিত্র্যহীন দিন কাটিতে লাগিল। সেদিন ভরা বর্ষার পর সূর্য্যের আলোতে আকাশ ছাইয়া গিয়াছে। কালো মেঘের পুঞ্জ সাদা হইয়া উঠিয়াছে। সূর্য্যরশ্মি মেঘের বুক চিরিয়া চিরিয়া আলোর তুবড়ীর মত সহস্রমুখী হইয়া ফাটিয়া বাহির হইতেছে, কোথায়ও বা মেঘের মাথায় মাথায় হীরার মুকুটের মত জ্বল জ্বল করিতেছে। মাঠে পুকুরে ক্ষেতে খালে বিলে জল টল টল করিতেছে। তাহার উপর সূর্য্যের তির্য্যকরশ্মি প্রতিফলিত হইয়া অকস্মাৎ প্রকৃতি যেন একটা বিরাট শিশমহল হইয়া উঠিয়াছে, যেন হাজার দর্পণের ভিতর দিয়া

সূর্য্যের আলো ঝলমল করিয়া উঠিতেছে। গাছের মাথায় পাতায় পাতায় অভ্রকণার মত জলবিন্দু জ্বলিতেছে। এক সূর্য্যের কোটি প্রতিবিম্ব।

চন্দ্রকান্ত ছাড়া কলিকাতা হইতে এই একমাসে সুধা কাহারও চিঠি পায় নাই, সুধা আজ সকলকে এক একখানা চিঠি লিখিয়া খবর লইবে ঠিক করিয়াছিল। কাগজ কলম লইয়া মাদুর পাতিয়া সে তাহার ছেলেবেলার সেই দাওয়ায় বসিয়াছিল। হাড়ু সাঁওতাল হাট হইতে ফিরিবার পথে মাদুরের উপর একখানা চিঠি ফেলিয়া দিয়া গেল।

সুধা চমকিয়া উঠিল, এ কাহার চিঠি? এ লেখার ছাঁদ ত সে ভুলিতে পারে না। কিন্তু তপন ত কখনও সুধাকে চিঠি লেখে নি। না জানি ইহাতে কি আছে? ভাল না মন্দ, হাসি না অশ্রু, কে বলিতে পারে?

এইখানে এই পথের ধারের দাওয়ায় বসিয়া সে চিঠি পড়িবে না। কে কখন আসিয়া পড়িবে, কোন্ অসময়ে মিথ্যা প্রশ্নে তাহাকে উত্যক্ত করিবে কে জানে? সুধা কাগজ কলম ঘরে রাখিয়া চিঠিখানা হাতে করিয়া সাঁওতাল-পাড়ার দিকে বেড়াইতে চলিয়া গেল।

তপন লিখিয়াছে,

"সুধা, তোমাকে নাম ধরে চিঠি লিখছি ক্ষমা ক'রো। আর কোনও সম্বোধন তোমাকে করতে পারি না, পারব না বলেই আজ চিঠি লিখছি। আমি পলাতক, আরও কতদিন পলাতক থাকব তা জানি না। হয়ত আমাকে নিয়ে নানা জল্পনা-কল্পনা চলেছে বন্ধুমহলে, তুমি শুনে থাকবে। যার মধ্যে কল্পনার স্থান নেই, যা খাঁটি সত্য সেইটুকু তোমাকে বলতে এসেছি। তোমার মনের কথা আমি কিছুই জানি না। না জেনে আমার অর্ঘ্য তোমায় নিবেদন করা উচিত কি অনুচিত ভাবতে বসব না, আমার যা বলবার তা বলা ছাড়া আজ উপায় নেই।

"তুমি জান আমি কথা কম বলি, চিঠিতেও বাক্যজাল বিস্তার করব না। আমার অন্তরের যে মণিকোঠায় তোমার জন্য দেবতার বেদী রচনা করছিলাম, সেটি যদি তোমায় খুলে দেখাতে পারতাম, আর ভাষার প্রয়োজন হ'ত না।

"কিন্তু মানুষের প্রথম যৌবনের অর্ঘ্য নিবেদনে সঙ্কোচ একটা বড় জিনিষ। আমার যোগ্যতার কথা তুলব না, যোগ্যতা যদি থাকতও, তবু এগিয়ে এসে দাঁড়াতে আমার ভীরু মন আরও কত দীর্ঘ দিন নিত জানি না। সে ভীরুতার শাস্তি আমি পেয়েছি, সকরুণ সে শাস্তি, তাই সুকঠিন।

"তোমার কাছে যা বলি নি, অপরের কাছে তা বলবার সুযোগ এসেছিল, প্রয়োজনও বোধ হয় ছিল। কিন্তু আমার সঙ্কোচ আমার মূর্খতা, সেখানেও আমাকে বোবা ক'রে রেখেছিল।

"বিধাতার শাস্তি নেমে এল পুষ্পমালার রূপ ধ'রে। এ শুধু আমার শাস্তি নয়, নিরপরাধিনী একটি বালিকারও শাস্তি। বুঝতে পারলাম না ভগবান কেন শাস্তি দিলেন তাকে যার মাথায় তাঁর অনন্ত আশীর্ব্বাদ ঝরে পড়া উচিত ছিল। বেদনায় বুক ফেটে আসতে লাগল, তবু গ্রহণ করতে পারলাম না সে পুষ্পমালা। মুখ দেখাব কি ক'রে সেখানে তার এই দুঃখের দিনে? তাই আমি পলাতক।

"একথা সে জানে না, আর কেউ জানে না, শুধু আমিই জানি আর আজ তুমি জানলে। আমার দুর্ভিক্ষপীড়িত মনের একমাত্র অন্ন যার ছায়াময়ী মূর্ত্তি, তাকে না জানিয়ে আর থাকতে পারলাম না।

"আমি জানি তুমি একথা কোথায়ও প্রকাশ করবে না। যদি আমার ভুল হয়ে থাকে—তোমার কাছে আসা, তবু তুমি ক্ষমা ক'রো। দীর্ঘদিন পথে পথে ঘুরব তুমি ক্ষমা করেছ এইটুকু সান্ত্বনা মনে নিয়ে। যদি কখনও সময় হয়, যদি কখনও ডাক দাও ফিরে আসব।"

সুধার চোখের জলে চিঠির পাতা ভিজিয়া গেল। এ তাহার সুখের দিনে দুঃখের অশ্রু না দুঃখের দিনে সুখের অশ্রু? সে আপনার শূন্য মন্দিরে যে নিভৃত পূজার আয়োজন করিতেছিল, তাহাতে আজ অসময়ে দেবতার আসন টলিল কেন? সে ত ডাকে নাই, সে ত চাহে নাই! যেদিন সে সমস্ত প্রাণ ভরিয়া চাহিয়াছিল, সেদিন কেহ সাড়া দিল না। যেদিন সে পথ ছাড়িয়া সরিয়া দাঁড়াইল, আপনার প্রার্থনাকে আপনি রুদ্ধবাক্ করিয়া টিপিয়া মারিতে বসিল, সেই দিনই এই সাড়া?

এ-চিঠির জবাব সে কি দিবে? বিধাতা নিজে হৈমন্তীর সুখের দিন না আনিয়া দিলে সুধা কি ইহার জবাব দিতে পারিবে?

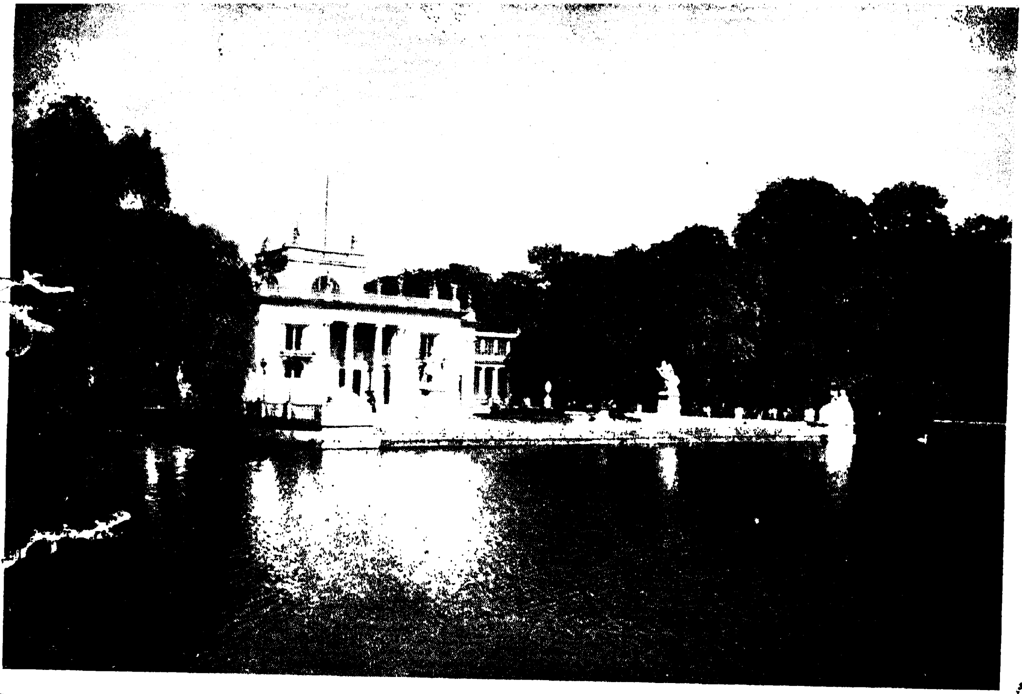
সমাপ্ত



পোল্যাণ্ডের লোক-নৃত্য



পোল্যাণ্ডের লোক-নৃত্য



লাজিন্‌কি প্রাসাদ ও উদ্যান



পোল্যাণ্ডের পূর্ব্বতন রাজপ্রাসাদ ; বর্ত্তমানে রাষ্ট্রপতির আবাস-ভবন

বর্ত্তমান জগদ্ব্যাপী দুর্গতি

(য়ুরোপের কোনো মরমী ভক্তকে লিখিত পত্র)

শ্রীক্ষিতিমোহন সেন

অনেক দিন হয় আপনার পত্র পেয়েছি। এত দিন উত্তর না-দেওয়া যে কত বড় অন্যায় হয়েছে তাই ভাবছি।

এতদিন আমি বাংলার সুদূর সব গ্রামে গ্রামে আউল-বাউল দরবেশ সাধুদের মধ্যে ছিলাম। তাঁদের সাধনা নিত্য কালের, কাজেই কালের তাগিদ সেখানে পরাহত। তাই পত্রের উত্তর না দেওয়ার জন্য আমাকে ক্ষমা করবেন আশা করি।

এক এক সময় মনে হয় এই সব সাধু-সন্তরা জগতের কি করছেন? জগতে যখন সাদাসিধা ভাবের (simplicity) যুগ ছিল তখন এই সব ভাবুকতা (mysticism) হয়তো বা মানাত। কিন্তু আজ জগৎ জুড়ে যে দুঃখ-দুর্গতির বন্যা চলেছে, পৃথিবীর বুকের উপর দিয়ে যে রুদ্রশক্তির তাণ্ডব লীলা চলেছে, তার মধ্যে এই সব ভাবুকতার কি কোনো স্থান আছে? মানবের হাতে মানব-সভ্যতার এই যে নিগ্রহ, এই যে সব দুঃখ-শোক-যাতনা, এর মধ্যে কি এই সব মিষ্টিক সাধনা একটা বিলাসিতা নয়?

পৃথিবীতে আগেকার যুগেও যুদ্ধবিগ্রহ ছিল। তখন পরস্পরে অনেক মারামারি কাটাকাটি হয়েছে। কিন্তু সে-সব জিনিষ আজকার বিপদের কাছে কিছুই নয়। আজ যে প্রলয় আসছে বিরাট তার আয়তন, বীভৎস তার ধ্বংসলীলা। যে প্রলয় আসছে তার কাছে সে-যুগের সে-সব যুদ্ধবিগ্রহ অতিশয় তুচ্ছ। এই বিশাল বিনিপাত যখন আসবে তখন এক সঙ্গে তাবৎ মানব-সভ্যতাকে ধ্বংস ক'রে তবে ছা[illegible]। এখনকার যুগের সমগ্র মানব-ইতিহাস যেন একটা দারু[illegible]র মত বিশ্ববিধাতার প্রচ্ছন্ন নির্ম্মম ঘা খেয়ে নি[illegible] ডুবে মরবার দিকে ধেয়ে চলেছে।

জগতে যখন সভ্যতার এতদূর উন্নতি (?) হয় নি তখন মানব-সভ্যতা যেন ছোট ছোট নৌকাতে যাতায়াত করত। তখন তার আয়তন, তার পাল-মাস্তল এত বিপুল ছিল না। যদি গুপ্ত শৈলের আঘাতে কোনো নৌকা ডুবে মরত তবে ক্ষতিটা এমন নিদারুণ হ'ত না, কারণ প্রত্যেকটি নৌকা ছিল আপন ক্ষুদ্রতায় সীমাবদ্ধ।

কিন্তু আজ মানব-সাধনার বিপুল বিস্তার দিন দিন বেড়েই চলেছে। তার এই সব বিস্তার, জাতীয়তা, সাম্রাজ্যবাদ প্রভৃতির নামে দিন দিন আপনাকে স্ফীত ক'রে তুলবে। জলদৈত্য অক্টোপসের মত তার বজ্রবাহু সারা জগৎকে পাশবদ্ধ ক'রে টেনে আনছে। মানব-সাধনার জাহাজ আজ বিপুলকায়। বিজ্ঞানের বলে তার পালগুলি আজ রসাতল হ'তে অন্তরীক্ষ পর্য্যন্ত পরিব্যাপ্ত। সর্ব্বভাবে আজ সে বিস্তারলাভ করেছে। পৃথিবীর যত সব নিগূঢ় শক্তি, সবগুলিকে মুক্ত ক'রে ঐ পালের উপর ঝড়ের বেগে এনে ফেলা হচ্ছে। সবই বিজ্ঞানের কাজ। শক্তির ও বেগের আর অন্ত নেই।

অথচ এই জাহাজে কোনো হাল দেখতে পাওয়া যাচ্ছে না। মানবসভ্যতার জাহাজ আজ কর্ণধারহীন—derelict। ধর্ম্মের বা নীতির কোনো চালনা এরা স্বীকার করতে নারাজ। গুপ্ত মৃত্যু-শৈলে ঘা খেলে এই জাহাজ সমস্ত জগৎকে নিয়ে ডুবে মরবে। তাতে যা প্রলয় হবে, টাইটানিক প্রভৃতির ধ্বংসলীলা তার কাছে কিছুই নয়। তার প্রলয়-সঙ্ঘর্ষে পৃথিবীর সব সভ্যতা চূর্ণবিচূর্ণ হবেই। রক্ষার আর কোনো পথ দেখা যাচ্ছে না। আজকার দিনের বিজ্ঞানের প্রলয় শক্তিকে ঠেকাবার সাধ্য কারো নেই।

পৃথিবীকে আজ এই কর্ণধারহীন এমন এক অন্ধ উচ্ছৃঙ্খল শক্তির হাতে সঁপে দেওয়া হয়েছে যা শুধু ধ্বংসই করতে জানে; সৃষ্টির সামর্থ্য, প্রাণ দেবার, গড়ে তুলবার, শক্তি যার

কবীরের একটি বাণী এই উপলক্ষ্যে আপনার কাছে উপস্থিত করতে চাই,—

কর্ বাহুবল আপনী ছাড়্ বিরানী আস।
জিসকে অাঁগন নদী বহে সে কুঁ্য মরে পিয়াস।

"নিজের বাহুবলের উপর নির্ভর কর্. বাহির হইতে অন্য কাহারও [illegible]তা আসিবে সেই ভরসা ছাড়্। ভয় কিসের? যাহার অঙ্গন [illegible] নিত্যধারা নদী সদা বহিয়া চলিয়াছে, সে কেন আবার মরে পাসায়!"

অনেক দিনের পর পত্র দিলাম। কিন্তু তাতে মনে করবেন না যে আজই আপনাকে স্মরণ করলাম। প্রতিদিনই আপনাকে স্মরণ করি। আপনার কাজ (mission), আপনার দুঃখ-অশান্তির কথা প্রতিদিনই ভাবি।

পরমাত্মা আপনাকে প্রেম দিন, সেবাতে অনুরাগ দিন, শক্তি দিন, ব্যর্থতার ভার বহনের মত শক্তি দিন।

আপনি অনেক দূরে, আমি অনেক দূরে, তবু সর্ব্ব-কায়মনোচিত্তে আপনার শুভ প্রার্থনা করি। আপনার নিজের শক্তি ও মৈত্রী নিরন্তর আপনার অন্তর ও বাহিরকে পূর্ণ ক'রে রাখুক, আপনার সকল তাপ হরণ করুক।

মধু-মঞ্জুষা

শ্রীরসিকলাল দাস

পেয়েছি তব পরম রমণীয়
সুধায় ভরা তৃষ্ণাহরা অমৃত-লিপি অনির্ব্বচনীয়।
গেঁথেছ যেন মমতা-ফুলমালা
দরদ-ভরা অন্তরের গভীরতম পরশ-সুধা-ঢালা।

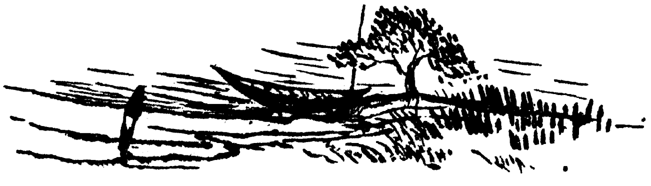
এসেছে তব পত্রখানি বেয়ে
উছল-প্রীতি-বন্যাজল, দিয়েছে মোর পরাণ-মন ছেয়ে।
চিঠিটি তব কতই সুমধুর
কতই প্রীতি মরম-মধু দরদ দিয়ে করেছ ভরপুর।

সাদরে বরি সে মধু-মঞ্জুষা
বিদূরি হৃদি-অন্ধকার এনেছে তাহা কনক-রাঙা উষা।

মর্ম্মতলে তাই ত এরে গণি
ব্যথা-দিগ্ধ অন্তরেতে আনন্দের পদ্মরাগ-মণি।

পড়িনু তারে আদরে কতবার,
যতই পড়ি ততই মম হৃদয়-মন আকুলি বার-বার—
বিধুর তব ছবিটি ওঠে ফুটি,
মুখটি তব করুণ-ম্লান ব্যথা-কাতর সজল আঁখি দুটি।

তখন মম পরাণ-তনু-মন
তোমার পানে নিগূঢ় টানে অসহ-বেগে টানে যে অনুখন।
মরম-সাথী, পাইতে তোমা পাশে
বাসনা জাগে অন্তরের নিতল-তলে তীব্র উচ্ছ্বাসে।

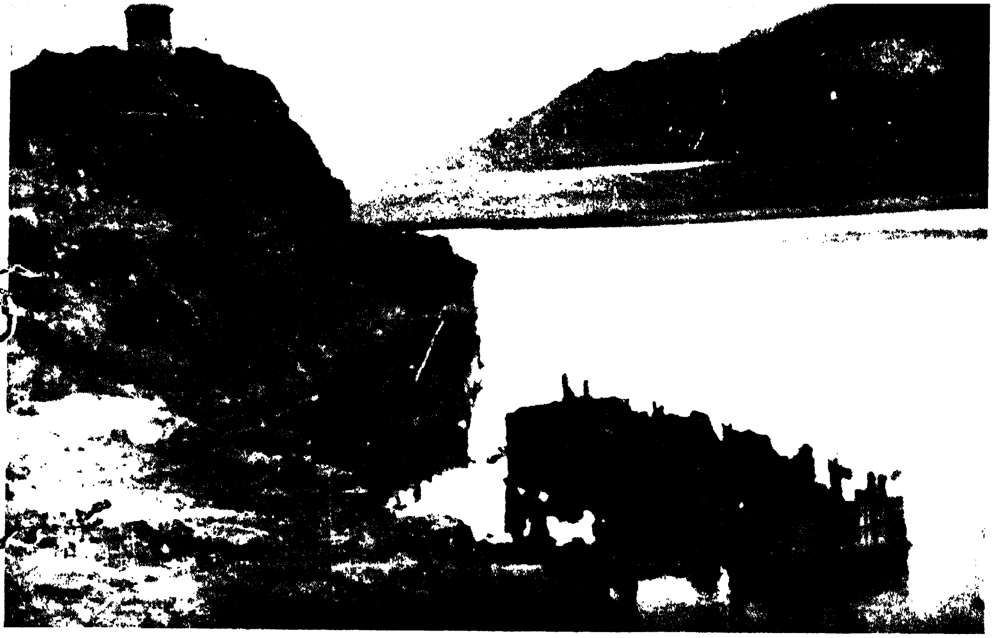




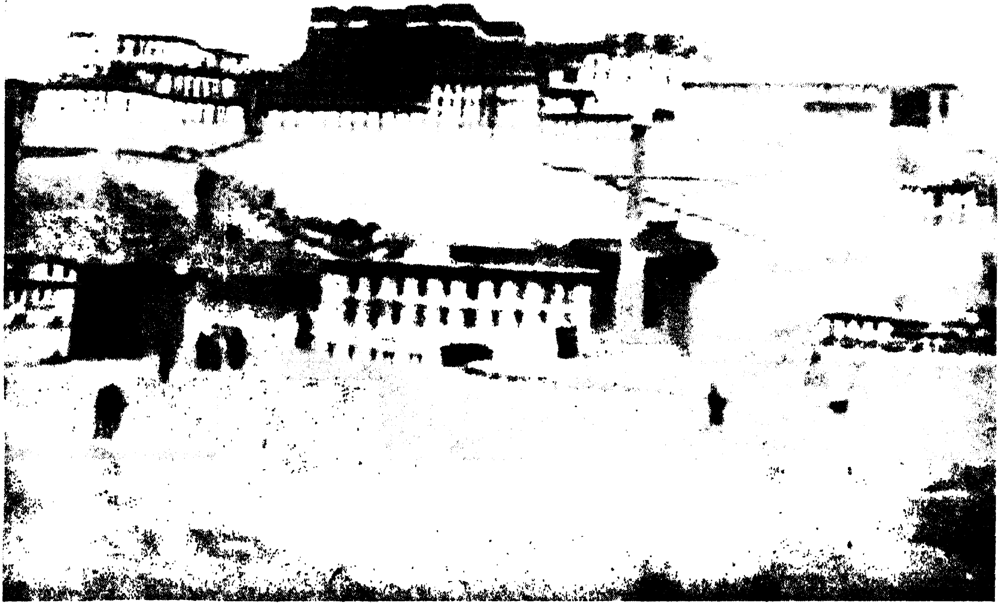


উপরে : পর্ব্বতগাত্রে টেরিম নগর

নীচে : হাড্রামাউটের প্রধান শহর, সেহুন



তিব্বতে ব্রহ্মপুত্র



দলাই লামার প্রাসাদ

['নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর' প্রবন্ধ দ্রষ্টব্য]

নিষিদ্ধ দেশে সওয়া বৎসর

রাহুল সাংকৃত্যায়ন

১৭

উর্গ্যেন কুশো ঘোড়ার ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। ১১ই এপ্রিল আচার্য্য শান্তরক্ষিতের কীর্ত্তি সম্-য়ে বিহারের উদ্দেশে প্রণাম করিয়া আমরা বিদায় লইলাম। চার-পাঁচ মাইল যাইবার পর হং-গো-চং-গং গ্রামের একটি লোকের সঙ্গে দেখা হইল, সে আমাদের ফিরিয়া যাইবার জন্য অনুরোধ করিয়া বলিল যে, পথ-খরচের টাকা সে দিবে। কিন্তু আমাদের পক্ষে ফিরিয়া যাওয়া সম্ভব ছিল না। এখানে পথ চড়াইয়ের এবং রাস্তা ভাল। দুই-তিন ঘণ্টা চলিবার পর নির্জ্জন স্থানে একটি এক-কক্ষযুক্ত গৃহ পাইলাম। এই গৃহে সম্-য়ে বিহার-নির্ম্মাতা সম্রাট ঠি-স্রোং-ল্দে-ব্‌চন্ জন্মগ্রহণ করিয়াছিলেন। আরও চলিবার পর একটি ধ্বংসোন্মুখ গ্রাম এবং তাহার পর হং-গো-চং-গং গ্রাম পাইলাম। শেষোক্ত গ্রামে রাত্রি যাপন করা হইল। কয়দিন স্নান হয় নাই, পরদিন প্রাতে গ্রামের সেচ-নালায় স্নান করিয়া গ্রাম-কর্ত্তার সৌজন্যে প্রাপ্ত দুইটি ঘোড়ায় চড়িয়া আমরা রওয়ানা হইলাম। পথে চড়াই কম এবং পনর হাজার ফুট উচ্চতার হিসাবে ঠাণ্ডাও কম। কিছু দূর যাইবার পর রাস্তার ডাহিনে একটি মঠের ধ্বংসাবশেষ দেখিলাম, শুনিলাম, ইহা তিব্বত-বিজেতা গুশি খানের মঙ্গোল-সেনার কার্য্য। সন্ধ্যা ৭টায় আমরা লাসার নদী উই-ছু তটে দে-ছেন-জোঙ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। এই গ্রাম চীন ও মঙ্গোলিয়ার সহিত তিব্বতের ব্যাপারিক মার্গে স্থিত।

এখান হইতে গং-দন্ মঠ এক দিনের পথ। প্রসিদ্ধ সংস্কারক চোং-খ-পা পঞ্চদশ শতাব্দীর প্রারম্ভে এই মঠকে নিজ পীঠস্থান করেন এবং এখানেই ১৪১৯ খ্রীষ্টাব্দে তাঁহার দেহান্ত হয়। তিব্বতের সংস্কারপন্থী পীতটুপিধারী সম্প্রদায় (টশীলামা ও দলাইলামা এই সম্প্রদায়ভুক্ত) এই মঠের নামে গং-দন্-পা বলিয়া খ্যাত। গং-দন্ মঠ দর্শন আমাদের কার্য্যাবলীর মধ্যে ছিল, সুতরাং ১৩ই এপ্রিল ধর্ম্মকীর্ত্তি পদব্রজে এবং আমি ঘোড়ায় চড়িয়া সেইদিকে রওয়ানা হইলাম। আমার সঙ্গের পুস্তকাদি বস্তাবন্দী করিয়া সীলমোহর লাগাইয়া রাখিয়া গেলাম। গং-দন্ মঠ পাহাড়ের শিখরে অবস্থিত, কাছে ঝরণা বা নদী নাই, সুতরাং জলের কষ্ট খুবই, পথেও যথেষ্ট চড়াই। চারি দিকে নগ্ন পাহাড়ের সারি।

মঠে পৌছিয়া প্রথমেই যে মন্দিরের ভিতরে এক স্তূপে চোং-খপার দেহাবশেষ রক্ষিত আছে তাহা দর্শন করিতে চলিলাম। স্তূপের উপর মঙ্গোল-সর্দ্দার প্রদত্ত শামিয়ানা বিস্তারিত। সঙ্গী বলিলেন, এখানে জে-রিন্ পোছের শির আছে। পরে যে কক্ষে মহান সংস্কারক থাকিতেন সেখানে তাঁহার কাষ্ঠাসন ও যে-সিন্দুকে তাঁহার স্বহস্তলিখিত গ্রন্থরাজি আছে তাহাও দেখিলাম। এ মন্দিরেও স্বর্ণ-রৌপ্যের ছড়াছড়ি। পরে নীচে ১০৮ স্তম্ভে সজ্জিত এক বিরাট উপসোথাগার দেখিলাম, সেখানে চোং-খ-পার সিংহাসন রহিয়াছে। অন্য আর এক স্থলে দেখিলাম এক সিংহাসনের উপর বর্ত্তমান দলাইলামার পুরুষপ্রমাণ মূর্ত্তি আসীন। আজকাল এই মঠে তিন হাজার ভিক্ষু থাকে। যে মঙ্গোল ভিক্ষু আমাদের স্থান দিয়াছেন, শুনিলাম, তিনি গুশি খানের বংশজ। চঙ্গেজ খানের বংশোদ্ভব বলিয়া তাঁহার সমাদরও অধিক।

১৪ই এপ্রিল গংদন হইতে দে-ছেন-জোঙে ফিরিলাম। পথে ধর্ম্মকীর্ত্তির পরিচিত এক মঙ্গোল ও তাহার সঙ্গিনী এক খম-দেশবাসিনীর সঙ্গে দেখা হওয়ায় আমরা স্থির করিলাম এখান হইতে লাসা ক (চামড়ার নৌকা)-যোগে যাইব। অতিপ্রত্যূষে যাত্রা করিব বলিয়া রাত্রিটা নৌকার মাঝির কুটীরেই কাটাইলাম। এদেশে যত কুটীর দেখিয়াছি তাহার মধ্যে ইহাই বোধ হয় সর্ব্বাপেক্ষা জীর্ণ ও দারিদ্র্যপূর্ণ কিন্তু ইহাতেও তিন-চারিখানি চিত্রপট ও দুই-তিনটি সুন্দর মূর্ত্তি আছে এবং মূর্ত্তিগুলি আমাদের দেশের অনেক বড় মন্দিরের

জয়পুরী মর্ম্মরের তৈরি বাজে মূর্ত্তি অপেক্ষা বহুগুণে সুন্দর। যথেষ্ট যাত্রী পায় নাই বলিয়া সকালে মাঝি নৌকা ছাড়িতে চাহিল না। শেষে ভাড়া দ্বিগুণের উপর কবুল করায় অনেক বেলায় নৌকা ছাড়িল। নদীপথে দুই পাশের গ্রাম ও পাহাড়ের শোভা দেখিতে দেখিতে চলিলাম। দুই ঘণ্টা চলিবার পর আচার্য্য দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞানের চরণধূলিপূত হের্-বা পাহাড় দেখা দিল। দ্বিপ্রহরে লাসা পৌঁছিলাম।

৫ই এপ্রিল লাসা ছাড়িয়াছিলাম, তখনও শীত আছে। ১৫ই এপ্রিল ফিরিয়া দেখিলাম গরম পড়িয়াছে। আরও দেখিলাম টাকার দাম চড়িয়াছে। আমার পক্ষে ইহা সুসংবাদ, কেননা টাকার বদলে তিব্বতীয় টঙ্কা অধিক পাওয়ায় পুস্তকাদি খরিদ করা সহজ হইল। এখন প্রত্যাবর্ত্তনের মুখ, বাঁধিতে লাগিলাম। দামী চিত্রপট ও পুস্তকাদি মোমজামায় মুড়িয়া কাঠের বাক্সে প্যাক করাইলাম। বাক্স প্রথমে চটে মুড়িয়া তাহার উপর য়াকের চামড়া ঢাকিয়া সেলাই করাইলাম। ইহার ফলে আমার কোনও জিনিষ নষ্ট হয় নাই।

* * *

২৩শে এপ্রিল প্রাতে লাসা হইতে বিদায় লইলাম। সওয়া-নয় মাস একত্রে থাকার ফলে ছুশিঙ-শা কুঠির স্বামী জ্ঞানমান সাহু, তাঁহার পত্নী, তাঁহার সহকারী শুভাজু ধীরেন্দ্র বজ্র প্রভৃতি সকলের সঙ্গে অত্যন্ত ঘনিষ্ঠতা হইয়াছিল। সে গৃহ যেন নিজের বলিয়া মনে হইত। তাঁহারা সকলে বিদায় দিতে শহরের বাহির পর্য্যন্ত আসিলেন। বিদায়ের কথা আর কি বলিব?

পথের জন্য দুইটি খচ্চর চৌদ্দ দোর্জে মূল্যে কিনিয়াছিলাম। বন্ধুগণ বলিয়াছিলেন ইহাতে পথ-চলার সুবিধা হইবে, উপরন্তু কালিম্পং বাজারে দাম যা পাওয়া যাইবে তাহাতে মায় পথের খরচ সবই আদায় হইয়া যাইবে। বন্ধুদের কাছে বিদায় লইবার পর পোতলা প্রাসাদের সম্মুখ দিয়া আমাদের সওয়ারী চলিল। এই পোতলা এক দিন স্বপ্নের মত মনে হইত, কয় মাস ধরিয়া ক্রমাগত দর্শনে ইহার মাহাত্ম্য অনেক কমিয়া গিয়াছে। খাওয়া পরা শোওয়া ইত্যাদির সরঞ্জাম বাদে আমরা প্রত্যেকে এক একটি পিস্তল লইয়াছিলাম। ধর্ম্মকীর্ত্তি পিস্তল ঝুলাইয়া কার্ত্তুজের মালায় উপবীত পরিয়া চলিতেন, আমিও প্রায় তাই। এ দেশের ডাকাতের উৎপাত খুবই বেশী এবং আমরা দুইজন মাত্র লোক, সেই জন্যই এত সজ্জা। আমাদের ইচ্ছা ছিল সোঁ-থঙ গিয়া যেখানে দীপঙ্কর শ্রীজ্ঞান দেহত্যাগ করিয়াছিলেন সেখানকার সেই তারা-মন্দির দর্শন করিব। দ্বিপ্রহরে গন্তব্যস্থলে উপস্থিত হইয়া যে-গৃহে লাসা যাইবার পথে ঠাঁই পাইয়াছিলাম সেখানেই উঠিলাম। গৃহস্বামী আমাকে চিনিতে পারিল না, যদিও তাহার বেশ মনে ছিল যে এই পথে কিছু দিন পূর্ব্বে এক লদাখী ভিখারীর বেশে লাসা গিয়াছিল।

কিঞ্চিৎ বিশ্রামের পর তারা-মন্দিরের কথা জিজ্ঞাসা করায় শুনিলাম তাহা নিকটেই, সুতরাং খচ্চরে চড়িয়া যাইবার প্রয়োজন নাই। ধর্ম্মকীর্ত্তি খচ্চরগুলির দানাপানির ব্যবস্থায় রহিলেন, পথপ্রদর্শিকারূপে একটি বালিকাকে সঙ্গে লইয়া আমি মন্দির দর্শনে চলিলাম। গ্রামের পরই একটি টিলা, তাহার উপর হইতে অদূরে মন্দির দেখা দিল। বস্তুত মন্দির প্রায় দুই মাইল দূরে, কিন্তু তিব্বতের স্বচ্ছ নির্ম্মল বায়ুতে এইরূপ নৈকট্য-ভ্রম হয়। এই মন্দিরও অন্য অনেক মহত্ত্বপূর্ণ স্থানের ন্যায় উপেক্ষিত ও জীর্ণ। ভিতরে তারা-দেবালয়, বাহিরে বিরাট রক্তচন্দন-কাষ্ঠের স্তম্ভাবলী, তাহাদের শুষ্ক কর্কশ রূপ আট-নয় শত বৎসরের প্রাচীনত্বের পূর্ণ পরিচয় দিতেছে। এখানকার সাধুমণ্ডলীর সকলেই বালক। পূজারী বালক ও তাহার সহায়কবর্গও বালক। আমি দুই-চারি আনা পয়সা বিতরণ করিতে তাহারা মহা উৎসাহে আমাকে সকল দ্রষ্টব্য দেখাইতে লাগিল। মন্দিরের ভিতরে দীপঙ্করের ইষ্ট ২১টি তারাদেবীর সুন্দর মূর্ত্তি রহিয়াছে। সেই মন্দিরেই বাম দিকে দলাই-লামার সীলমোহরযুক্ত বদ্ধ লৌহপিঞ্জরে দীপঙ্করের ভিক্ষাপাত্র, দণ্ড ও তাম্র-জলাধার (লোটা) রক্ষিত, সেই সঙ্গে কিছু রৌপ্যমুদ্রা ও শস্যও রাখা হইয়াছে। মন্দিরের পশ্চাদ্ভাগে তিনটি পিত্তলের স্তূপে যথাক্রমে দীপঙ্করের পাত্র, সিদ্ধ কারোপার হৃদয় ও দীপঙ্করের প্রিয় শিষ্য ডোম-তোন-পার বস্ত্র রক্ষিত। বামভাগে অমিতায়ুষের মন্দিরের বাহিরের দুইটি জীর্ণ পুরাতন স্তূপ দেখিতে গিয়া বোধ হইল সন্ধ্যা আগতপ্রায়, সুতরাং গৃহের দিকে ফিরিয়া আসিলাম।

২৫শে এপ্রিল রওয়ানা হইলাম। খচ্চর নিজের এবং সেগুলি বলিষ্ঠ, সুতরাং চার-পাঁচ দিনে গ্যাঙ্চী পৌঁছানো সম্ভব মনে হইল। এ-অঞ্চলে লাল উলের গুচ্ছে শোভিত য়াক দ্বারা চাষ চলিতেছিল। দ্বিপ্রহরে ছু-শরে উপস্থিত হইয়া দেখিলাম, ক্ষেতে বীজ অঙ্কুরিত হইয়াছে। এখানে গাছের পাতাও খুব বড় হইয়াছে দেখিলাম। এখন আমার আর ভিখারী-বেশ নাই, পরণে পোস্তিনের চোগা, মাথায় ফেল্ট হ্যাট। ছু-শরের শ্রেষ্ঠ বাড়ীর সর্ব্বোত্তম কক্ষে উঠিলাম, ঘরের অধিকারী মহা যত্নে সেবা করিতে লাগিল। গৃহ-স্বামিনী এক অর্দ্ধ-চীনার স্ত্রী। বহুদিন পতির কোনও সংবাদ সে পায় নাই, সুতরাং যখন শুনিল আমরা কালিম্পং যাইব তখন অশ্রুসিক্ত মুখে আমাদের বলিল যে, সে শুনিয়াছে, তাহার স্বামী সেখানে আছে এবং আমরা সেখানে কোনও খবর পাইলে যেন তাহাকে জানাই।

পরদিন প্রাতে যাত্রা করিয়া নিকটস্থ ব্রহ্মপুত্রের খেয়া-ঘাটে পৌঁছিলাম। এখানে স্রোতের বেগও অধিক নহে, নদীর বিস্তারও কম। নৌকায় উঠিতে উঠিতে আরও তিনটি সওয়ার আসিয়া জুটিল এবং পার হইয়া আমরা পাঁচজনে একত্রে চলিলাম। সঙ্গীদের তাড়াতাড়ি থাকায় দ্রুত চলিতে চলিতে খম্-বো-লা চড়াই পার হইলে পরে দেখিলাম এক দিকে ব্রহ্মপুত্রের ক্ষীণ ধারা দেখা যাইতেছে এবং অন্য দিকে ন-গ-চের বিশাল ঝিল। উৎরাইয়ের সময় খচ্চর ছাড়িয়া পদব্রজে চলিয়া হম্-লুঙ গ্রামে উপস্থিত হইলাম। সঙ্গীরা সওদাগর, এ-পথে তাহাদের সবই পরিচিত, সুতরাং রাত্রিযাপনের ব্যবস্থা সহজেই হইল। পরদিন ঝিলের পাশ দিয়া পথ চলিতে তীব্র শীত-বাতাসে বড়ই কষ্ট হইল। ১৩ হাজার ফুট উচ্চ এই ঝিলের কিনারায় ও জলনালীতে বরফের চাপ বাঁধিয়া আছে। পথ চলা দুরূহ দেখিয়া আমরা পথের ধারে এক গ্রামে আশ্রয় লইয়া আহারাদির পর কয়েক ঘণ্টা বিশ্রাম করিলাম। কিন্তু হাওয়া সমান তীব্র। আজ কোন উঁচু "লা" চড়াই নাই জানায় আমি মুখে হাতে ভেসেলিনের প্রলেপ দিই নাই, ফলে শরীরের সকল উন্মুক্ত স্থানের চামড়া শীতে জমিয়া কালো হইয়া গেল। ধর্ম্মকীর্ত্তির সেরূপ কিছু হয় নাই। যাহা হউক, কোন গতিকে বেলা সাড়ে তিনটায় আমরা ন-গা-চে গ্রামে পৌঁছিলাম। এখানকার ভেড়ার পশম অতি মোলায়েম হয় শুনিয়া আমি একটি কালো রঙের চুকটু কিনিলাম। শীতের আধিক্যে এখানে চাষ আরম্ভই হয় নাই।

২৮শে অতি প্রত্যূষের অন্ধকারে আমরা যাত্রারম্ভ করিলাম। চারি দিক তুষারাচ্ছন্ন, আমার সঙ্গিগণও শীতে আড়ষ্ট। দ্রুত চলিয়া সেদিন রাত্রে লোঙ-মর গ্রামের প্রধান ব্যক্তির গৃহে আশ্রয় লইলাম। পরদিনও প্রাতে শীতের মধ্যে রওয়ানা হইলাম। তখন ২৯শে এপ্রিল, কিন্তু এ-অঞ্চলের প্রখর শীতে গাছের পাতা জন্মায় নাই এবং সকালে সব জল-প্রণালী জমিয়া বরফ হইয়া আছে। লাসা হইতে যাত্রা করার সাড়ে পাঁচ দিন পরে সেদিন দ্বিপ্রহরে গ্যাঙ্চীতে পৌঁছিলাম। এখানে ছু-শিঙ-শা কুঠির ব্রাঞ্চ দোকান গ্যা-লিঙ-ছোম্পাতে উঠিলাম এবং দুই রাত্রি সেখানেই বিশ্রাম করা গেল।

গ্যাঙ্চীতে ইংরেজ-সরকারের ট্রেড-এজেন্সীর গৃহকে এখানে কেল্লা বলে। বিরাট পুরু দেওয়াল, শতাধিক সৈন্য, উপরন্তু ইংরেজ-দূতাবাসের জমিতে চাষ করার জন্য বহু গুর্খা আছে যাহারা পূর্ব্বে সৈনিক ছিল। তিব্বতের সহিত সন্ধির সর্ত্তানুসারে এদেশে ব্রিটিশ পোলিটিক্যাল এজেণ্ট থাকিতে পারে না। সেই জন্য এই ট্রেড-এজেণ্ট, তাঁহার সহকারী এজেণ্ট এবং এক জন ইংরেজ ডাক্তার এখানে আছেন। আশ্চর্য্যের বিষয় এই যে, এদেশে কি ভারতীয়, কি ব্রিটিশ কাহারও বাণিজ্যের অধিকার নাই। একজন মাড়ওয়ারী সজ্জন—সৈন্যদের রসদাদির ঠিকা লওয়ায় এখানে থাকেন, তিনিই একমাত্র ভারতীয় "ট্রেড"কারী। এখানকার খরচ কি ভারতবর্ষ দেয়? ব্রিটিশ ডাক- ও তার-ঘর কেল্লার ভিতর। ডাক এক দিন অন্তর আসিয়া থাকে।

১লা মে আমরা দুইজন টশী-লুন্‌পো রওয়ানা হইলাম। আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, পথ কুয়াসায় ঢাকা এবং তুষারপাত হইতেছিল। রাস্তা ত বিশেষ কিছু ছিল না, সুতরাং ক্ষেতের মধ্য দিয়া পথ খুঁজিয়া চলিতেছিলাম। দিগ্‌ভ্রম হইবার বেশী ভয় ছিল না, কেন-না, দক্ষিণে নদী ও বামে পর্ব্বতমালা পথরোধ করিয়াছিল। কিছুক্ষণ পরে এক গ্রামে পৌঁছিলাম। এখন আমি কু-শো (সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি), ভিখারী নহি,

সুতরাং আশ্রয় খুঁজিতে হয় না। একটি বড় বাড়ীতে চা, ডিমসিদ্ধ ইত্যাদি খাইয়া, সেখানে ভৃত্যবর্গকে কিছু ছঙ-রিঙ (মদ্যপানের পয়সা—বখশিশ) দিয়া পুনর্ব্বার চলিলাম। বেলা তিনটায় বরফ পড়া বাড়িল, বাতাসের বেগও তীব্র হইল, আমরা তো-সা গ্রামে আশ্রয় লইলাম। যাইবার সময় এই এক দিনের পথ তিন দিনে গিয়াছিলাম।

২রা মে প্রত্যুষে চলিয়া, রৌদ্র-প্রকাশের দুই ঘণ্টার মধ্যে পাতলা কুয়াসার চাদরে-ঘেরা টশী-ল্যুন্‌পো মহা-বিহার দেখিতে পাইলাম। আগের বারের যাত্রায় পথের দুই পাশে শ্যামল শস্যের ক্ষেত দেখিয়াছিলাম। এবার দেখিলাম ক্ষেতে লাঙ্গল দিবার উদ্যোগ হইতেছে মাত্র। বেলা একটায় শী-গর্চী পৌছিলাম। আমার পূর্ব্বপরিচিত ঢাকবা সাহু দোকান বন্ধ করিয়া নেপাল চলিয়া গিয়াছিলেন, সৌভাগ্যক্রমে মণিরত্ন সাহুর সঙ্গে সাক্ষাৎ হইতেই তিনি এক গৃহে আমার থাকিবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। আশ্রয়ের ব্যবস্থা হইলে পরে, যাহার মনিবের নিকট হইতে আমি আদেশপত্র আনিয়াছি সেই খম্‌-বা সওদাগরের সন্ধানে চলিলাম এই উদ্দেশ্যে যে, আমার আবশ্যকমত টাকা-পয়সা এই কুঠি হইতে লইতে পারি। সওদাগরকে তো খুঁজিয়া পাইলাম, কিন্তু সে পয়সাকড়ি দিতে ইতস্ততঃ করিল। সেদিন আমি বিশেষ পীড়াপীড়ি করি নাই, যদিও ব্যাপার দেখিয়া আমি চিন্তিত হইলাম, কেন-না, এখানে টাকা না পাইলে গ্যাঞ্চী ফিরিয়া টাকার জন্য টেলিগ্রাম করিতে হইবে। দ্বিতীয় দিনেও তাহার ঐরূপই ব্যবস্থা দেখিয়া আমি মণিরত্ন সাহুকে বলিলাম যে আমার পুস্তক-ক্রয়, স্তন্‌-গ্যুর ছাপানো সবই বন্ধ হইয়া আছে, সুতরাং আজই উহার নিকট হইতে "হাঁ" বা "না" জবাব আনিতে হইবে। তিনি প্রশ্ন করায় সে বলিল, 'পত্র ও সীলমোহর আমার মনিবের, কিন্তু অত টাকা দিতে সাহস হয় না। আচ্ছা, আমি টাকা দিব।' আমার মন প্রসন্ন হইল, কাজের ব্যবস্থা আরম্ভ হইল। কাগজ কালি ইত্যাদি ক্রয় করিয়া ছাপার আয়োজন করিলাম।

স্নর-থঙ বিহারে ছাপার খরচ ইত্যাদি স্থির করিয়া এক সপ্তাহ সময় দেওয়া গেল, তাহার মধ্যে ছাপা শেষ করিতে হইবে। মণিরত্ন সাহুর ভোটিয়া স্ত্রীর ভাই ঐ বিহারে ভিক্ষু, সুতরাং আশা ছিল যে কাজ সময়মত হইবে। পাঁচদিন পরে খবর লইয়া জানিলাম কাজ আরম্ভই হয় নাই। কাজেই আমি সেখানে গিয়া চাপিয়া বসিলাম। কাজ আরম্ভ হইল। এই বিহার আজকাল টশী-ল্যুন্‌পো বিহারের অধীন, কিন্তু ইহা ১১৫৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত এবং টশী-ল্যুন্‌পো বিহার ১৪৪৩ খ্রীষ্টাব্দে স্থাপিত হয়। সংস্কারের যুগে এই বিহারের ভিক্ষুগণ সংস্কারবাদ মানিয়া লওয়ায় এইরূপ অধীনতা আসে। একাদশ, দ্বাদশ ও ত্রয়োদশ শতাব্দীর বহু পিত্তল ও চন্দন-কাষ্ঠের মূর্ত্তি এখানে রহিয়াছে। ভারতীয় মূর্ত্তির আসনের নীচে মোটা পিত্তলের আংটা যুক্ত থাকে, তাহার ভিতরে বাঁশ গলাইয়া মূর্ত্তি বহন করিয়া দূরদেশে আনীত হইয়াছিল। থুব-বঙ ও খম্‌-সুম্‌ মন্দিরে অনেক পুরাতন মূর্ত্তি আছে। মন্দিরের বাহিরে প্রস্তরের পাটায় উৎকীর্ণ ৮৪ সিদ্ধের মূর্ত্তি আছে। পঞ্চম দলাই লামার অমাত্য ম-বঙ এই বিহারের বহু উন্নতিসাধন করিয়াছিলেন। এখানকার গ্রন্থসংগ্রহও বিরাট। সম্প্রতি টশী লামা প্রবাসে দীর্ঘকাল থাকায় এ অঞ্চলের সকল ব্যাপারেই অনাচার পূর্ণমাত্রায় চলিয়াছে।

আমরা লাসা হইতে এখানে পৌছিবার পরেও যুদ্ধভয়-শান্তির খবর এখানে ঠিকমত প্রচারিত হয় নাই। এদেশের খবরাখবর এইরূপ গুজবগল্পের মধ্যেই চলে, এমন কি দেশের শাসন, কর-আদায় প্রভৃতির ব্যবস্থাও এইরূপ ঢিলা। এখানের এক লামা মহাত্মা গান্ধীর অসহযোগ ইত্যাদির বিষয় শুনিয়া আমাকে গম্ভীরভাবে বলিলেন, "গন্‌-ডী মহারাজা লোবন রিম্পোছের (ভোট দেশে সর্ব্বত্র পূজিত এক ঘোর তান্ত্রিক লামার) অবতার।" তাহাতে আমি বলিলাম, "লোবোন রিম্পোছে মদ্যের সমুদ্র পান করিতেন এবং স্ত্রীলোক সম্বন্ধেও স্বচ্ছন্দবাদী ছিলেন, গন্‌-ডী মহারাজা ঐ বিষয়ে তো সম্পূর্ণ বিপরীত ভাব পোষণ করেন।" লামা মহাশয় এই কথায় একটু থামিয়া পরে বলিলেন, "জন্মান্তরে লোবোন রিম্পোছের মতান্তর হইয়াছে।" ইহার আর উত্তর কি? এখানে সিপাহীরা যুদ্ধের নামে যথেচ্ছাচার লাসার সিপাহী অপেক্ষা বহুগুণ বেশী করিয়াছে শুনিলাম। আমার নিজের কাজ কোনমতেই অগ্রসর হইতেছে না দেখিয়া ধর্ম্ম-কীর্ত্তিকে রাখিয়া ১২ই মে আমি শী-গার্চ ফিরিয়া আসিলাম। সেখানে শুনিলাম, সরকারী কর বাকী থাকায় টশী-ল্যুন্‌পোর

এক খম-জন (বিদ্যালয়) জরিমানায় দণ্ডিত হইয়াছে। অধিকারিগণ বিদ্যালয়ের সম্পত্তি বিক্রয় করিয়া সে-টাকা তুলিতেছেন। আমি সুবিধা দরে ২১টি অতি মূল্যবান চিত্রপট এই সুযোগে ক্রয় করিলাম। টাকা থাকিলে আরও ক্রয় করিতে পারিতাম। ১৬ই মে এক স্থানীয় লামা একটি তালপত্রের পুঁথি বিক্রয়ার্থে পাঠাইলেন। পুঁথির "কুটিল" অক্ষর দৃষ্টে বুঝিলাম ইহা খ্রীষ্টীয় দশম-একাদশ শতকের মহামূল্য গ্রন্থ। লামা ইহা আমাকে দান করিলেন। আমি পূর্ব্বেই লদাখে সন্ধান পাইয়াছিলাম যে টনী-লুন্‌পোর নিকটস্থ এক বিহারে ও স-ক্য বিহারে বহু তালপত্রের পুঁথি আছে। এবার তাহার চাক্ষুষ প্রমাণও পাইলাম কিন্তু দুঃখের বিষয়, এ-বিষয়ে অধিক অনুসন্ধান এ-যাত্রায় সম্ভব হইল না। ১৫ই মে আমার পুস্তক (গুন্-গ্যুর) ছাপিয়া আসিল। সেগুলি ও অন্যান্য পুস্তকাদি উত্তমরূপে বাঁধিয়া প্যাক করাইয়া গাধার পিঠে চাপাইয়া ফ-রী জোঙ রওয়ানা করাইয়া দিলাম। এখান হইতে ফ-রী যাইবার সোজা পথ আছে।

* * *

২১শে মে আমি ও ধর্ম্মকীর্ত্তি যাত্রা সুরু করিলাম। আমাদের পথের দুই-আড়াই মাইল অন্তরে প্রাচীন ভারতের নকলে নির্ম্মিত শা-লু বিহার আছে। আমরা সেখানে যাইয়া বহু প্রাচীন পুঁথি এবং অসংখ্য চন্দনকাষ্ঠের এবং পিত্তলের মূর্ত্তি দেখিলাম, সেগুলি পূর্ব্বকালে ভারত হইতে গিয়াছে। একটি মূর্ত্তি ব্রহ্মদেশের ধরণে চীবর-পরিহিত। বিহার-দর্শনের পর যাত্রা করিয়া সেই রাত্রে এক গ্রামে থাকিয়া ২২ মে সকাল ১১টায় গ্যাঞ্চী-পৌঁছিলাম। এক সপ্তাহের স্থলে বাইশ দিন শী-গর্চীতে থাকায় ভারত-প্রত্যাবর্ত্তনে দেরি হইল। আমার কোনও খবর না পাওয়ায় সিংহল হইতে ভদন্ত আনন্দ চিঠিপত্রে খোঁজ আরম্ভ করিয়া-ছিলেন। এবার সিংহলে ফিরিয়া আমাকে ভিক্ষুব্রত লইতে হইবে। এইরূপ ভিক্ষু-দীক্ষা দেওয়া সংঘের নিয়মানুসারে দুই-একবার মাত্র হয়। সে সময়েরও দেরি নাই, সুতরাং আমাকে দ্রুত ফিরিতে হইবে। একটি খচ্চর পীড়িত হওয়ায় আরও একদিন দেরি হইল। ২৩শে মে বিপ্রহরে প্রত্যাবর্ত্তনের যাত্রা আরম্ভ হইল।

গ্যাঞ্চী হইতে ভারতের পথ ইংরেজ-সরকারের দেখা-শুনার ফলে ভাল মেরামত থাকে। পথে পুল ও ডাক-বাংলা আদি আছে, টেলিফোনের ব্যবস্থাও আছে। পথের গ্রামগুলি অত্যন্ত দরিদ্র। ২৪শে মে নদীর পাশে পাশে চড়াইয়ের পথে চলিলাম, পাহাড় বৃক্ষগুল্মশূন্য। পাহাড়ের স্তর দেখিতে আশ্চর্য্যপ্রায় মনে হয়। নিশ্চয়ই ইহার মধ্যে মূল্যবান খনিজ আছে। এই সব দেখিতে দেখিতে ও ধর্ম্মকীর্ত্তির সহিত বাক্যালাপ-ধর্ম্মালাপ করিতে করিতে ৩০।৩১ মাইল পথ চলিয়া সন্-দা গ্রামে পৌঁছিলাম। এ-গ্রামটি অপেক্ষাকৃত অবস্থাপন্ন। ইহার পর পথে গ্রাম বসতি অতি অল্পই দেখিলাম। অধিকাংশ গ্রামই পতনো-ন্মুখ, ক্ষেতগুলিও পরিত্যক্ত। যত উপরে যাইতেছিলাম শীত ক্রমেই বৃদ্ধি পাইতেছিল। পথে একটি প্রাকৃতিক সরোবর দেখা দিল। গ্যাঞ্চী হইতে ৬৪ মাইল এইরূপে চলিবার পর হিমালয়ের হিমাচ্ছাদিত ধবল শিখর দর্শনে বুঝিলাম ভারতমাতার নিকটেই আসিয়াছি। সম্মুখের এক বিশাল সরোবর নয়ন তৃপ্ত করিতেছিল, যদিও বৃক্ষপত্রে শ্যামলিমার কোনও চিহ্ন ছিল না। ৭০ মাইল অঙ্কিত প্রস্তরের কাছে দোজিঙ গ্রাম এবং তাহার নিকট শুষ্ক জলাভূমি আছে। দোজিঙ গ্রামে আশ্রয় লওয়া গেল।

গ্রামে যে-গৃহে ছিলাম সেখানে দুই ভগ্নী এক পতির সহিত বাস করে। এদেশে বহুভর্তৃকাই অধিক, কিন্তু কয়েক স্থলে দেখিলাম কয়েক ভগ্নীর এক পতি। শুনিলাম, পুরুষ বা স্ত্রী যে নিজ পিত্রালয় ছাড়িয়া অন্যের ঘরে বাস করিতে রাজী হয় তাহার পারিতোষিক হিসাবে এইরূপ বহু পতি বা পত্নী জোটে। এইরূপ ব্যাপারের বৈজ্ঞানিক অর্থ এই যে, এদেশের ন্যায় অনুর্ব্বর স্থানে সম্পত্তি-বিভাগ রোধ করা একান্ত কর্ত্তব্য, সুতরাং পরিবার যাহাতে পৃথক না হয় তজ্জন্য এইরূপ ব্যবস্থা করা হয়। চারি ভ্রাতার এক স্ত্রী বা দুই ভগ্নীর এক পতি হওয়ায় পরিবার একই থাকিয়া যায়, সম্পত্তি বিভাগের প্রয়োজন হয় না।

এদিকে চাষ অপেক্ষা পশুপালনের চেষ্টাই অধিক। এখানে ছোট ছোট ছাগলও দেখা গেল. কিন্তু লোকে তাহা বেশী রাখে না, কেন-না, একে তো পশম হয় না, তার উপর ছাগলের মাংসে চর্ব্বি কম।

২৬শে মে সকালে রওয়ানা হইলাম। কিছুদূর চলিবার পর মহাসরোবরের শেষ দেখা গেল। তাহার পর বিস্তীর্ণ প্রান্তর, দূরে তুষারাচ্ছাদিত শৈলমালা, নিকটের পর্ব্বত নগ্ন ও শুষ্ক। পথে দেখিলাম তারের থামের উপরে চীনামাটির ইন্‌সুলেটর প্রায় সবই ঢিল ছুড়িয়া ভাঙিয়া দিয়াছে। এ-পথে প্রত্যেক ঘরই লাসা-কালিম্পংযাত্রী ব্যাপারীদিগের চটি বা সরাই। সম্মুখে এক বিশাল প্রান্তর, পথ তাহার মধ্য দিয়া চলিয়াছে। অল্পস্বল্প ঘাসযুক্ত ময়দানে ভেড়া চরিতেছে দেখিলাম। বামের অত্যুচ্চ ধবল শিখর দেখিয়া মনে হইল যদি তাহার উপর উঠিতে পারা যাইত তবে ভারত ও তিব্বতের দৃশ্য একসঙ্গে দেখিতে পাইতাম। আরও আগে ডাকবাহীদিগের ঘর ছাড়াইয়া একটি ছোট নালা পার হইলাম, তাহার পর একটি শুষ্ক খালের পাশ দিয়া দক্ষিণভাগে সমকোণে ঘুরিয়া একঘণ্টা চলিবার পর উৎরাই আরম্ভ হইল। এখন পাহাড়ের রং বদল হইল, ঘাসও অধিক হওয়ায় অনেক ভেড়ার পাল ও দুই-দশটি চমরীও দেখা গেল, কিন্তু বৃক্ষের চিহ্ন এখনও নাই। এই জনশূন্য দেশ ছাড়িয়া ফ-রী প্রদেশে (ফগ্‌-রী=বরাহ প্রদেশ) প্রবেশ করিয়া বেলা ৩৷০ টায় আমরা ফ-রী জোঙ পৌঁছিলাম।

এখানেও ছু-শিঙ-শার একটি শাখা আছে এবং সম্প্রতি শুভানুধ্যায়ী ধীরেন্দ্র বস্ত্র এখানে রহিয়াছেন, সুতরাং মহা সমাদরে অভ্যর্থনা হইল। এখানকার প্রায় সকল ঘরের মেজেই বাহিরের জমি হইতে নীচু এবং নিকটেই জঙ্গল থাকায় গৃহ-নির্ম্মাণে কাষ্ঠই অধিক পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। নিকটস্থ বরাহাকৃতি পাহাড়ের জন্য এখানকার নাম ফ-রী। পূর্ব্বে পাহাড়ের উপর দুর্গও ছিল, কিন্তু ১৯০৪ খ্রীষ্টাব্দে ব্রিটিশ অভিযানের ফলে তাহার ধ্বংস হয়। এখান হইতে ভুটান বাম দিকের পাহাড়ের পারে অর্দ্ধদিনের পথ, তাই প্রত্যহই ভুটানীর দল শাক-সব্জী, আনাজ, ফল ইত্যাদি লইয়া একটি অত্যন্ত নীচু-ছাদের অন্ধকার বাড়ীতে হাট বসাইয়া যায়। খবর পাইলাম, আমার মালপত্রের গাঁট প্রায় সবই আসিয়াছে। সতরটি খচ্চর ভাড়া লইয়া কালিম্পং যাত্রার আয়োজন করিলাম। আমার খচ্চরগুলির জন্য ২৭০৲ টাকা দর পাইয়াছিলাম, কিন্তু কালিম্পঙে আরও অধিক পাইবার আশায় বিক্রয় না-করায় শেষে কালিম্পং পৌঁছিয়া ২৪০৲ টাকায় বেচিতে হয়। নূতন ব্যবসায়ের এইরূপই ফল হয়! ফ-রী উপত্যকায় বর্ষা যথেষ্ট হয়, ঘাসও প্রচুর, কিন্তু শীতের প্রকোপে কৃষি সুবিধার হয় না।

২৯শে মে আমি যাত্রা আরম্ভ করিলাম। ছু-শিঙ-শার ফ-রী শাখার অবসরপ্রাপ্ত কর্ম্মচারী এবং সত্ত্বাধিকারীর ভাগিনেয় কাঞ্ছা আমার সঙ্গে চলিল। ইহার বয়স মাত্র আঠার-উনিশ ছিল বুদ্ধি-বিবেচনাও বিশেষ ছিল না। এদিকে তিব্বত, ভুটান ও ভারতের যত ধূর্ত্তের মিলনস্থল ফ-রীতে তাহাকে সর্ব্বেসর্ব্বা করা হইয়াছিল। নেপালী কারবারের ধরণ অনুযায়ী হিসাব-কিতাবের কোন কড়াকড়ি ছিল না, যখন হিসাব লওয়া হইল তখন দেখা গেল বহু সহস্র টাকা লোকসান। সকলে বলিল, জুয়া, মদ্য ও স্ত্রীলোকে সব গিয়াছে। এদেশে মদ্যের বিশেষ দাম নাই, স্ত্রীলোকও তথৈবচ, উপরন্তু কাঞ্ছার ভোটীয়ানী "স্ত্রী" বলিল, সে বিশেষ কিছুই লয় নাই, কেন-না, সে বয়সে বড় এবং এই ছোকরার উপর তাহার অত্যন্ত টান ছিল। তখন সকলে বলিল, টাকা জুয়াতেই গিয়াছে। আমি বলিলাম, "দোষ তোমাদের। এরূপ অপরিণত-বয়স্কের হাতে এত টাকা ছাড়িয়া দিয়া তাহার প্রলোভন ও কুপ্রবৃত্তির পথ তোমরাই পরিষ্কার করিয়াছ; আর যদি টাকা উড়াইয়াই থাকে তবে মামার টাকা ভাগিনেয় উড়াইয়াছে, সুতরাং কাহার কি বলিবার আছে।"

যাত্রার পথ প্রথম খানিকটা সমতল, তার পর উৎরাই। এবার ঝরণা ও নির্ঝরের ধারার সংখ্যা বাড়িয়া চলিল, সঙ্গে সঙ্গে শ্যামল তৃণময় উপত্যকা। তাহার পর উৎরাই দ্রুত নামিতে লাগিল এবং ক্রমে ঘণ্টা দুই-তিন পরে আমরা বনস্পতির রাজ্যে আসিলাম। মনে হইল আমরা যেন অন্য এক লোকে আসিয়াছি। পূর্ণ বৎসরাধিক পরে শ্যাম বনশ্রেণীর শোভা দেখিয়া এবং কাননবিহারী নানাবর্ণের পাখীর কলকূজন শুনিয়া চিত্ত পুলকিত হইল। দেবদারুর শ্রেণীতে প্রথমে ছোট ছোট গাছ পরে বিরাট বনস্পতি দেখা দিতে লাগিল। এখানের লোকজনের চেহারাও সুন্দর এবং তাহাদের শরীর ও বস্ত্র পরিষ্কার। বনের হরিৎ শোভা, বিহঙ্গের কাকলী ও পুষ্পের সুগন্ধে আনন্দিত মন লইয়া সন্ধ্যার সময়ে আমরা

কালিঙ-খা গ্রামে পৌছিলাম। এই গ্রামে শতাধিক ঘর, এবং গৃহগুলির ছাদ দেওয়াল এবং মেজে—সর্ব্বত্রই দেবদারু কাষ্ঠ প্রযোজিত হইয়াছে। কাঠের অভাব নাই, সুতরাং দিবারাত্র আগুন জ্বলিতেছে। অধিকাংশ ঘরই দ্বিতল। নিম্নতলে পশুরক্ষা এবং দ্বিতলে লোকজনের অবস্থান, দেবতা-স্থান ও ভাণ্ডার রাখাই নিয়ম। তিব্বতের তুলনায় এখানের লোক বহু গুণে পরিষ্কার। এখানের নারীরা গড়বাল ও কিনৌরের স্ত্রীলোকদিগের মত শাড়ী পরে। তাহারা সুন্দরী, রক্তিমগৌরবর্ণা এবং সুগঠন। হিমালয়ের তিন অঞ্চলের নিবাসিগণ দেবীর বরে সৌন্দর্য্য পাইয়াছে। আমি সৌন্দর্য্য বিষয়ে বিশেষজ্ঞ নহি, কিন্তু আমার মনে হয় ঐ তিন অঞ্চলে বাসভূমি ও অধিবাসী উভয়কেই প্রকৃতিদেবী মুক্তহস্তে অলঙ্কৃত করিয়াছেন। ইহাদের মধ্যে আমার মতে কনৌরের* স্ত্রীলোক সর্ব্বাপেক্ষা সুন্দরী, তাহার পর এই ডোমো প্রদেশের নারী এবং যম্নোবাসিনী। বর্ণ-গৌরবে যম্নোবাসিনী শ্রেষ্ঠা, কিন্তু কিন্নরীদের মুখশ্রী অতি মনোরম।

এই ডো-মো উপত্যকা অতি মনোহর। যদিও খচ্চর-সাহায্যে জিনিষ সরবরাহ করা এখানকার প্রধান পেশা, এখানে কৃষিকার্য্য খুবই প্রচলিত। এই অঞ্চল ভারত ও তিব্বতের মিলনকেন্দ্র। লোকের মুখাবয়বে আর্য্য- ও মঙ্গোল-রক্তের মিশ্রণ সুস্পষ্ট দেখা যায়। ভারতের কাক (তিব্বতের কাক বৃহৎ চিলের মত পাখী), কোয়েল ইত্যাদি এখানে দেখা দিল।

নদীর পাশ দিয়া পথ চলিয়াছে। এক ঘণ্টা পরে স্যাসিমা পৌছিলাম। এখানে ইংরেজের কুঠী, তার- ও ডাক- ঘর বাজার ও কিছু সৈন্য আছে। ১৯০৪ সালের অভিযানের পর ক্ষতিপূরণ হিসাবে ইংরেজ এই প্রদেশ দখল করেন কিন্তু চীন দেশ সেই ক্ষতিপূরণ টাকায় গণিয়া দিলে পরে ইহা তিব্বতকে ফিরাইয়া দেওয়া হয়। স্যাসিমার পর ছেমা গ্রামও সুন্দর, বড় বড় ঘরে ও বিশাল বনস্পতিতে পূর্ণ, তাহার পরের গ্রাম রিন্-ছেন-গঙ্ও বৃহৎ গণ্ডগ্রাম। খরচের হিসাবেও তিব্বত অপেক্ষা এখানে বেশী টাকা লাগে। এ-অঞ্চলের পোষাক—নেপালী কালো টুপী, নেপালী পায়জামা ও কোট।

* প্রাচীন কিন্নর দেশই এখন্ কিনৌর বা কনৌর নামে পরিচিত।

আজ রাত্রিবাস হইল থু-গঙ্ সরাইয়ে। পথে ধর্ম্মকীর্ত্তি খচ্চরের দল লইয়া আমাদের দলের সহিত আসিয়া মিলিত হইয়াছিলেন।

এই সরাইয়ে এক "দেববাহিনী" (যাহার উপর দেবতা আবিষ্ট হন) স্ত্রীলোক দেখিলাম। আমরা যে-কক্ষে ছিলাম সেখানে এক দম্পতী আসিয়া উপস্থিত হইল। সরাই-অধিকারিণী বৃদ্ধা তন্মধ্যে অতি সম্ভ্রমের সহিত স্ত্রীকে অভ্যর্থনা করায় বুঝিলাম ইহারা সাধারণ লোক নহে। সারাদিন ইহারা চা-পান, ভোজন ইত্যাদিতে কাটাইল, আমি জিজ্ঞাসা করায় বলিল তাহারা ফ-রী-বাসী, সম্প্রতি কালিম্পঙে ডো-মো-গে-শে লামার দর্শনে চলিয়াছে। সন্ধ্যার সময় দেখিলাম স্ত্রীলোকটি সর্ব্বাঙ্গ আড়ামোড়া দিতেছে। পুরুষটি কখনও তাহার হাত ধরিয়া শোয়াইবার চেষ্টা করিতেছে, কখনও তাহার মাথায় দেবতামূর্ত্তি ঠেকাইতেছে, কখনও বা হাত জোড় করিয়া বলিতেছে, "আজ ক্ষমা করুন।" বুঝিলাম, স্ত্রীলোকটি পেশাদার দেববাহিনী এবং সম্প্রতি দেবতা আসিবার উপক্রম হইয়াছে। কিছুক্ষণ পরে সে পুরুষটিকে ঝটিতি সরাইয়া দিয়া পার্শ্বের কক্ষে চলিয়া গেল। আমার কৌতূহল হওয়ায় পরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে সুন্দর আসনে সেই স্ত্রীলোকটি আপাদমস্তক বিচিত্র বসনভূষণে সজ্জিত হইয়া বসিয়া আছে এবং তাহার সম্মুখে পাঁচ-সাতটি ঘৃতদীপ জ্বলিতেছে। কিছুক্ষণ পরে পুরুষটি একটি চামড়ায়-মোড়া ভোটীয়া ডমরু তাহার সামনে ধরিলে সে ধনুকাকৃতি কাঠের দ্বারা তাহা বাজাইতে আরম্ভ করিল। তাহার জিহ্বায় যেন সাক্ষাৎ সরস্বতী আবির্ভূতা হইলেন। সে ক্রমাগত পদ্যে নানা কথা বলিতে লাগিল। প্রথম পদ্যে দেবতা নিজের পরিচয় দিলেন। তাহার পর প্রশ্নোত্তর আরম্ভ হইল। প্রশ্নকর্ত্তা দুই-এক আনা পয়সা রাখিয়া হাত জোড় করিয়া নিজ সমস্যা নিবেদন করিলে তাহার উত্তর পদ্যে আসিল, অধিকাংশই ভূতপ্রেতশান্তির ব্যবস্থা, মধ্যে মধ্যে ছঙ-পানও চলিল। আমি কাঞ্ছাকে বলিলাম, "প্রশ্ন কর তোমার ছেলের অসুখ, কি করা কর্ত্তব্য?" দুই আনা পয়সা নিবেদন করিয়া "উকিল" মারফৎ প্রশ্ন হইতে উত্তর হইল, নগরদেবতা রুষ্ট, অন্য দেবতাকে পূজায় সন্তুষ্ট করিয়া সালিশ মান, তিনি নগরদেবতাকে শান্ত করিলে ছেলের অসুখ সারিয়া

যাইয়ে।" কাহার বিবাহই হয় নাই, সুতরাং পুত্রের ব্যবস্থা কি করিবে? তবে যেখানে ভক্তের অভাব নাই সেখানে দৈবজ্ঞ-দেববাহীরও অভাব হয় না।

১লা জুন সিকিমের দিকে চড়াই আরম্ভ হইল। চড়াই কঠোর এবং জে-লপ-লা গিরিসঙ্কটে বরফ পাইলাম। ইহাই ব্রিটিশ সীমান্ত, সুতরাং ১লা জুনের শেষে আমি পুনর্ব্বার ব্রিটিশরাজ্যে প্রবেশ করিলাম। উৎরাই আরম্ভ হইল। এবার সিকিম-রাজ্যে আসিয়াছি, কিন্তু কৃষক প্রায় সবই প্রবাসী গোর্খা, চা-রুটির অধিকাংশ দোকানও নেপালীর। পথের বৃক্ষশ্রেণীর শোভা অবর্ণনীয়, এবং মাছির উৎপাতও সেইরূপ। কু-পুক, তু-কো-লা, ভেংলা, পদম-চেঙ হইয়া ৩রা জুন দ্বিপ্রহরে রো-লিঙ-ছু-গঙ পৌছিলাম। এখানে অনেক দোকান আছে যাহার মধ্যে একটিতে বহুদিন পরে ভোজপুরী ভাষার মধুর স্বর শুনিলাম। এখন দ্রুত যাইতে হইবে, সুতরাং পরিচয় দিতে পারিলাম না।

লোহার সেতুর উপর দিয়া নদী পার হইয়া চড়াই ভাঙিতে লাগিলাম। দেখিলাম, এদেশে সিকিমী অপেক্ষা আগন্তুক গোর্খাই বেশী। ৪ঠা জুন কঠিন উৎরাই পার হইয়া সিকিম ও দার্জ্জিলিঙের সীমানায় উপস্থিত হইলাম। সেখানে ভীম-লক্ষ্মী কন্যাবিদ্যালয়ের সাইনবোর্ড দেখিলাম। আবার চড়াই আরম্ভ হইল, তাহার পরই পে-দোঙ বাজার ও খ্রীষ্টান মিশনের বিদ্যালয়। পথ চলিতে কষ্ট হইতেছিল, কারণ নাল খুলিয়া যাওয়ায় আমার খচ্চর খোঁড়া হইয়াছিল, সুতরাং হাঁটিয়াই চলিতেছিলাম। দ্বিপ্রহরের পর অল-গর-হা গ্রামে পৌছিয়া এক দোকানে ভোজপুরী ভাষায় জল চাহিলাম। দোকানদার ভাবিয়াছিল আমি নেপালী, পরিচয় পাইয়া মহা আগ্রহে চা প্রস্তুত করিয়া অন্দরের খবর দিতে গেল। আমার জেলার এক মিশ্র মহারাজ এখানে ছিলেন, তাঁহার মিশ্রাইন আমার পাশের গ্রামের মেয়ে। সুতরাং পান-ভোজনের কিরূপ ব্যবস্থা হইল, বলা বাহুল্য। রাত্রিযাপনের অনুরোধ কাটাইয়া পুনর্ব্বার রওয়ানা হইয়া সূর্য্যাস্তের সময় কালিম্পং পৌছিলাম। সেখানে শ্রীধর্ম্মাদিত্য ধর্ম্মাচার্য্যের কাছে উঠিলাম। মালপত্র পুনর্ব্বার প্যাক করাইয়া অধিকাংশ ছু-শিঙ-শা মারফৎ পাঠাইবার ও কিছু সঙ্গে লইবার ব্যবস্থা করা গেল। ধর্ম্মকীর্ত্তি এখানকার গরমেই অত্যন্ত কষ্ট পাইতেছিলেন। ৬ই জুন ট্যাক্সি-যোগে শিলিগুড়ি পৌছিয়া তাঁহার অবস্থা দেখিয়া বুঝিলাম জুনের গরম তাঁহার পক্ষে অসহ্য। ক্ষুণ্ণমনে তাঁহাকে কালিম্পং ফেরৎ পাঠাইয়া দিলাম।

* * *

কলিকাতার ছু-শিঙ-শার শাখায় গিয়া শুনিলাম লঙ্কা হইতে আমার জন্য চারি শত টাকা আসিয়াছে। লাসায় তিন হাজার পাইয়াছিলাম। কলিকাতায় তখন সত্যাগ্রহের কল্প চলিয়াছে। কলিকাতা হইতে পাটনা ও কাশী গিয়া বন্ধুদিগের সহিত মিলিত হইয়া পুনর্ব্বার কলিকাতায় আসিলাম। সেখান হইতে পুস্তকাদি পাঠাইবার ব্যবস্থা করিয়া ১৬ই জুন রওয়ানা হইয়া ২০শে জুন সিংহলে উপস্থিত হইলাম।

* * *

২২শে জুন আমার ও ভদন্ত আনন্দের শ্রামণের প্রব্রজ্যার দিন ছিল। গুরুজনের আদেশে নাম পরিবর্ত্তন করিয়া রাহুল ও গোত্রানুসারে সাংকৃত্যায়ন যোগ করিলাম। ২৮শে জুন কাণ্ডিনগরে সংঘের সম্মুখে উপস্থিত হইয়া আমার উপসম্পদা (ভিক্ষুকরণ) পূর্ণ হইল।

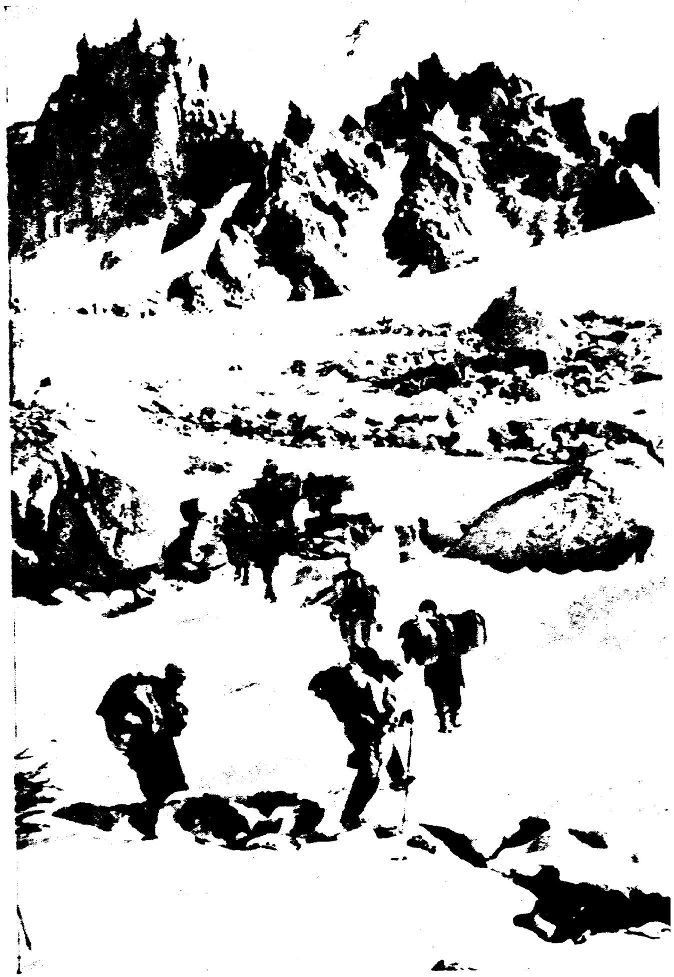
সমাপ্ত



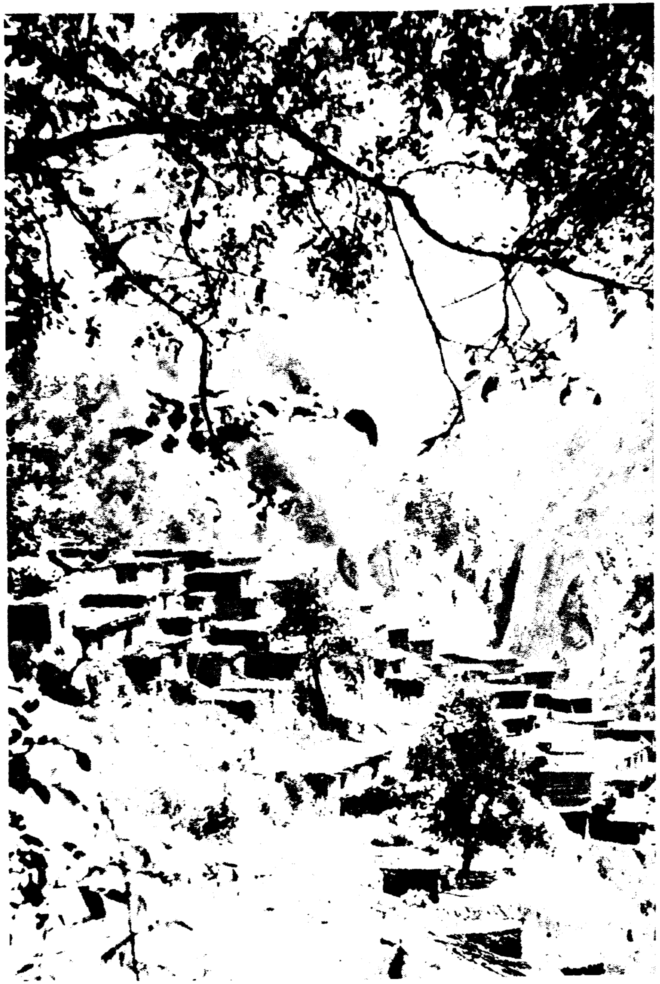
মঙ্গোলীয়দের উৎসব ও ক্রীড়াকৌতুক—উৎসব-মন্দিরের উদ্দেশে যাত্রীদল



মঙ্গোলীয় উৎসবের যাত্রীদল



হিন্দুকুশ পর্ব্বতের ঊর্দ্ধ সীমায়



কাফিরিস্থানের পাপ্রুক গ্রাম

বিবিধ প্রসঙ্গ

আবার শ্রী ও সরোজ

পদ্মফুল ও শ্রীর বিরুদ্ধে আধুনিক বঙ্গীয় মুসলমানদের (সকলেরই কিনা অজ্ঞাত) আপত্তি মরিতেছে না, মধ্যে মধ্যে চাঙ্গা হইয়া উঠিতেছে। আমরা এ বিষয়ে কয়েক বার কিঞ্চিৎ লিখিয়াছি। আবার লিখিতে হইতেছে।

সম্প্রতি বঙ্গীয় ব্যবস্থাপক সভার এক জন মুসলমান সদস্য ঐ সভায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের সরকারী সাহায্যের ছাঁটাই প্রস্তাব করেন, যেহেতু ঐ বিশ্ববিদ্যালয় পদ্মফুল ও শ্রী শব্দটি নিশানে ও সীলমোহরে 'প্রতীক' রূপে ব্যবহার করেন ও যেহেতু ঐ দুটি সাক্ষাৎ বা পরোক্ষ ভাবে হিন্দু পৌত্তলিকতার সহিত জড়িত। পদ্ম ও শ্রী সম্বন্ধে আগে আগে যাহা লিখিয়াছি, আবার আগাগোড়া তাহার পুনরাবৃত্তি করিতে চাই না। পদ্মফুল মুসলমানেরাও ভালবাসেন, এবং শ্রীর যতগুলি অর্থ আছে তাহার মধ্যে সৌন্দর্য্য, সম্পদ, অভ্যুদয় প্রভৃতি মুসলমানদেরও কাম্য। তথাপি যেহেতু শ্রীর মানে হিন্দু দেবীবিশেষও বটে এবং সেই দেবী পৌরাণিক মতে কমলাসনা, অতএব পদ্মের মধ্যে স্থিত "শ্রী" আপত্তিজনক। বঙ্গের প্রধান মন্ত্রী ফজলল হক সাহেব বলিয়াছেন, তাঁহার পদ্মে আপত্তি নাই, শ্রীতেও আপত্তি নাই, আপত্তি উভয়ের একত্র সংযোগে
কথায় অনেকে হাসিয়াছেন, কিন্
ডাইনামাইট নামক
রাসায়নিক

বর্ণমালাকেই বাদ দিতে হয়। অ হইতে আরম্ভ করিয়া সমুদয় বা প্রায় সমুদয় অক্ষরেরই অর্থ কোন দেবতা।

'প্রতীক' ব্যবহার মুসলমানেরাও করেন। তাঁহাদের নিশানে এবং মৌলানা সৌকৎ আলী প্রভৃতি খিলাফৎ কনফারেন্সের নেতাদের টুপিতে যে চন্দ্রকলা ("ক্রেসেণ্ট") দৃষ্ট হয়, তাহাও 'প্রতীক'। তাঁহারা বলিতে পারেন, তাঁহারা ঐ প্রতীকের পূজা করেন না। কিন্তু কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ও ত পদ্মের চিত্রের মধ্যস্থিত শ্রী শব্দটির পূজা করেন না, ধ্যান করেন না।

মুসলমান ধর্ম্মের প্রবর্ত্তন এবং চন্দ্রকলা ইস্‌লামের প্রতীক রূপে ব্যবহারের অগণিত বহুবৎসর পূর্ব্ব হইতে হিন্দুদিগের দেবতা শিব চন্দ্রশেখর বলিয়া বিদিত। তিনি ভালচন্দ্র, অর্থাৎ চন্দ্র তাঁহার ললাটের ভূষণ। যাঁহারা চন্দ্রকলাকে ইস্‌লামের প্রতীকরূপে প্রথম গ্রহণ করেন, তাঁহারা যদি জানিতেন যে হিন্দুর এও দেবতা চন্দ্রকলাকে ললাটে ধারণ করেন এবং যদি তাঁহারা সরোজশ্রী-বিরোধী বঙ্গীয় মুসলমান-দিগের মত হিন্দুফোবিয়া- বা হিন্দুআতঙ্ক- গ্রস্ত বা ঈর্ষ্যাপরায়ণ হইতেন, তাহা হইলে ক্রেসেণ্ট বা চন্দ্রকলাকে আপনাদের ধর্ম্মের সাম্প্রদায়িক চিহ্ন নির্ব্বাচন করিতেন না। আমরা
দেবের

আমাদের মুসলমান সহপাঠী ও বন্ধুদিগকে তাঁহাদের নামের আগে শ্রী ব্যবহার করিতে এবং চিঠিপত্রের শিরোদেশে 'শ্রীহকনাম' লিখিতে দেখিয়াছি। শুনিয়াছি, পল্লীগ্রামের অনেক মুসলমান এখনও তাহা করেন। মোহম্মদ ঘোরীর ভারতীয় মুদ্রাতে লক্ষ্মী দেবীর মূর্ত্তি আছে। তাঁহার মুদ্রার উল্টা পিঠে মুষলধারী হনুমানের মূর্ত্তি আছে। ইহা লইয়া প্রমথবাবু পরিহাস করিয়া বলেন, যে, মোহম্মদ ঘোরী রসিক পুরুষ, মুষলধারী হনুমানের মূর্ত্তি তিনি মুদ্রায় ছাপিয়া ইহাই বুঝাইতে চাহিয়াছিলেন যে তিনি এমন একটা দেশ শাসন করিতে আসিয়াছেন যেখানে বানর আছে—তিনি বানরদের উপরও রাজত্ব করিতে আসিয়াছেন! এই অর্থটা আমাদের ঠিক্ মনে হইতেছে না, কারণ মোহম্মদ ঘোরীর সময়ে ভারতবর্ষে বানরের চেয়ে গরু গাধা শিয়াল প্রভৃতিও বেশী ছিল এবং এখনও আছে।

বাংলা দেশে হনুমান নামটি, কি কারণে জানি না, ব্যঙ্গ বিদ্রূপ অবজ্ঞা প্রকাশের জন্য ব্যবহৃত হয়। কিন্তু বঙ্গের বাহিরে অনেক প্রদেশে হনুমান দেবতা বলিয়া পূজিত হন, পুনার মারুতি-মন্দিরের মত বহু মন্দির নানা স্থানে আছে, হনুমানপ্রসাদ, হনুমানসহায়, হনুমন্ত রাও অনেক সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিরও নাম। মোহম্মদ ঘোরী ভারতবর্ষের যে অংশ জয় করিয়াছিলেন, সেখানে হিন্দুরা এখনও হনুমানকে ভক্ত বীর বলিয়া পূজা করেন। সুতরাং মোহম্মদ ঘোরী কোন মুসলমান বীরের মূর্ত্তিও মুদ্রিত করিতে পারিতেন—কারণ মূর্ত্তি বা প্রতীক মাত্রেরই তিনি বিরোধী ছিলেন না। তবে যে তিনি পৌরাণিক এক হিন্দু বীরেরই মূর্ত্তি মুদ্রিত করিয়াছিলেন, তাহাতে বুঝা যায়, যে, পৌরাণিক হিন্দু ধর্ম্মে যাহা কিছু আছে সমস্তই মুসলমান ধর্ম্মে বাধে বা আঘাত করে তিনি এমন মনে করিয়া আঁতকাইয়া উঠিতেন না।

আমরা 'প্রবাসী'তে আগে লিখিয়াছি, অনেক মুসলমান মসজিদের গায়ে পদ্ম খোদিত আছে। প্রাচীন গৌড়ের যে-সব মসজিদ এখনও বিদ্যমান আছে, তাহার কোথাও কোথাও পদ্ম দৃষ্ট হয়।

বাংলা সাহিত্যের কোথায় পৌত্তলিকতার গন্ধ আছে, সাম্প্রদায়িকতাগ্রস্ত মুসলমানেরা তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে ব্যস্ত। কিন্তু ইংরেজী সাহিত্যে তাহা থাকিলে দোষ নাই! ইংরেজিতে 'Votary of the Muses' বলিলে তাঁহারা তাহাতে পৌত্তলিকতার গন্ধ পান না, কিন্তু বাংলায় 'বাণীর একনিষ্ঠ সেবক' শুনিলে তাঁহারা ভীতির ভান করেন। রাইটার্স বিল্ডিংসের সম্মুখভাগে গ্রীক দেবদেবীর মূর্ত্তি আছে। তাহার জন্য ঐ মুসলমানেরা উক্ত সরকারী ইমারত বা উহার চাকরি বয়কট করেন নাই—কেননা, উহা ত হিন্দু নয়। ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের টাকায় ও ব্রিটিশ গবর্ন্মেণ্টের নূতন ডাকটিকিটে পদ্মফুল আছে, কিন্তু তাহাও বয়কট করা চলে না। টাকা ... এবং তা ছাড়া মুষলের চেয়েও অব্যর্থ শক্তি-

পদ্ম ও শ্রী প্রতীক সম্বন্ধে একটি কনফারেন্সের ব্যবস্থা করিবেন বলায় কলিকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের বরাদ্দ ছাঁটাইয়ের প্রস্তাব প্রত্যাহৃত হয়। কন্‌ফারেন্সের ফল যথাসময়ে জানা যাইবে।

—

মুসোলিনীর মুষল

ব্রিটিশ রাষ্ট্রশক্তির প্রতি অবজ্ঞা প্রদর্শন মুসোলিনী অনেক দিন হইতে করিয়া আসিতেছেন। এখন তিনি ভূমধ্যসাগরে ব্রিটিশ জাহাজ আক্রমণ করাইতেছেন, এইরূপ সন্দেহ কেবল ইংরেজরা নয়, ফরাসী ও অন্যেরাও করিতেছেন। 'হ্যাভক' নামক একটা জাহাজকে সম্প্রতি একটা অজ্ঞাত সবমেরিন্ আক্রমণ করে, তাহার পর 'উডফোর্ড' নামক আর একটা জাহাজকে অজ্ঞাত কোন সবমেরিন টর্পেডো ছুড়িয়া আক্রমণ করে। তাহাতে উহার দ্বিতীয় এঞ্জিনিয়ার নিহত হয় ও আট জন অন্য লোক আহত হয় এবং জাহাজটি তিন ঘণ্টা পরে ডুবিয়া যায়। ইংরেজ ও ফরাসীরা বলিতেছেন, সকলে জোট বাঁধিয়া ভূমধ্যসাগরের বাণিজ্যপথ নিরাপদ করিতে হইবে।

মানুষ যদি মুষল সংগ্রহ করিতে সমর্থ হয়, তাহা হইলে তাহা ব্যবহার করিবার জন্য তাহার মনটা উসখুস করা আশ্চর্য্যের বিষয় নয়।

ইটালীর প্রভুর নাম মুষল হইতে মুসোলিনী হইয়াছে, এরূপ যেন কেহ মনে না করেন। ব্যাকরণ অনুসারে এরূপ অনুমানে একটা বাধাও আছে। সংস্কৃত ও বাংলায় নামের শেষে "ইনী" থাকিলে সেটা স্ত্রীলোকের নাম হয়। তবে আজকাল তার ব্যতিক্রমও হইতেছে। একটা কল্পিত দৃষ্টান্ত লউন। কোন বালকের নাম তাহার পিতামাতা "ভামিনী-রঞ্জন রাহা" রাখিলে পুত্র লায়েক হইবার পর নিজের নাম সহি করেন "ভামিনী রাহা"—লোকেও তাহাকে ভামিনী বলিয়া ডাকে। মুসোলিনীকে কিন্তু কোনক্রমেই কেহ ভামিনী মনে করিতে পারিবে না—যদিও স্বভাবটা তার কোপন বটে।

[এত দূর লিখিবার পর দেখিলাম, আরও একটি জাহাজ টর্পেডো করা হইয়াছে।]

—

জমিদার ও রায়ত

আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার, বাংলা, ও উড়িষ্যায় জমিদার ও রায়তের স্বার্থের বৈপরীত্য বহু পূর্ব্ব হইতেই লক্ষিত হইয়া আসিতেছে। বর্ত্তমান সময়ে আগ্রা-অযোধ্যা, বিহার ও উড়িষ্যা প্রদেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য হওয়ায় তথায় কংগ্রেস-গবর্মেণ্ট স্থাপিত হইয়াছে। ব্যবস্থাপক সভাগুলির সদস্য নির্ব্বাচনের সময় কংগ্রেসী প্রার্থীরা বলিয়াছিলেন তাঁহারা নির্ব্বাচিত হইলে রায়তদের দুঃখ মোচন করিবেন। বাংলা দেশের ব্যবস্থাপক সভায় কংগ্রেসী সদস্যদের সংখ্যাধিক্য হয় নাই বটে, কিন্তু, ভারত-শাসন আইনের ব্যবস্থা অনুসারে মুসলমান সদস্যদের সংখ্যা অন্য যে-কোন দলের সদস্যদের চেয়ে বেশী, এবং মুসলমান সদস্যদের মধ্যে অনেকেই কৃষক-প্রজা সমিতির সমর্থন পাইয়া নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। তদ্ভিন্ন, বঙ্গে রায়তদের মধ্যে মুসলমান বেশী ও জমিদারদের মধ্যে হিন্দু বেশী, মুসলমান কম। সেই জন্য বঙ্গে জমিদার ও রায়তের দ্বন্দ্ব অনেকটা হিন্দু-মুসলমান বিরোধের আকার ধারণ করিয়াছে। অন্য তিনটি প্রদেশে যেমন কংগ্রেসীদের প্রাধান্যবশতঃ রায়তদের দুঃখমোচনের চেষ্টা হইতেছে, বঙ্গে তেমনি মুসলমানদের ও কৃষক-প্রজাদের প্রাধান্যবশতঃ রায়তদের দুঃখমোচনের চেষ্টা হইতেছে।

রায়তদের দুঃখমোচন একান্ত আবশ্যক ও একান্ত কর্ত্তব্য। কিন্তু জমিদারদের ন্যায্য অধিকারে হস্তক্ষেপ না করিয়া তাহা করা উচিত। এ বিষয়ে কোনও পক্ষের প্রতি পক্ষপাতিত্ব করিবার কোন কারণ আমাদের মত এমন অনেক সম্পাদক ও সাংবাদিকের নাই যাঁহারা কোন পুরুষে জমিদার ছিলেন না এবং এখনও যাঁহারা জমিদার নহেন, রায়তও নহেন।

জমিদারদের মধ্যে অনেকে অলস ও অত্যাচারী ছিলেন ও আছেন, ইহা সত্য হইতে পারে। কিন্তু সকলের সম্বন্ধে ইহা বলা চলে না। অত্যাচার নিবারণ দৃঢ়তার সহিত করা গবর্মেণ্টের একান্ত কর্ত্তব্য। তাহার জন্য নূতন আইন প্রণয়ন আবশ্যক হইলে তাহাও করা উচিত। কিন্তু আইন করিয়া আলস্য দূরীভূত করা যায় না। অবশ্য, যদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক বিপ্লব দ্বারা এমন

অবস্থা ঘটান যায়, যে, যে খাটিবে না সে খাইতে পাইবে না—যেমন শুনিতে পাই রাশিয়ায় হইয়াছে, তাহা হইলে আলস্যের প্রতিকার হয় বটে ; কিন্তু যদি রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা এরূপ হয়, যে, যে খাটিবে না সে খাইতে পাইবে না, তাহা হইলে তাহার সঙ্গে সঙ্গে এই ব্যবস্থাও হওয়া চাই, যে, যে খাটিবে সে খাইতেও পাইবে এবং সকল মানুষকেই কিছু কাজ দিতে হইবে, কেহ বেকার থাকিবে না। শুনা যায়, রাশিয়ায় বেকার-সমস্যা নাই ; কিন্তু অন্য দিকে ইহাও শুনা যায়, যে, তথায় নূতন আমলেও দুর্ভিক্ষে বহু লক্ষ লোকের মৃত্যু হইয়াছে।

যাক্ সে কথা।

যে-কোন সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থার বলে পরিশ্রম না করিয়াও এক এক শ্রেণীর লোকের প্রভূত আয় হইতে পারে, তাহা এই কারণে অকল্যাণকর ও নিন্দনীয়, যে, তাহা আলস্য উৎপন্ন করে ও তাহাকে প্রশ্রয় দেয়। আলস্য বহু দোষের আকর। জমিদারি ঐরূপ সামাজিক ও অর্থনৈতিক ব্যবস্থা। উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত পুঁজি দ্বারা কোম্পানীর কাগজ কিনিয়া বা তাহা ব্যাঙ্কে জমা রাখিয়া তাহার সুদ হইতে অর্থলাভ ঐরূপ আর একটি আলস্যজনক প্রথা ও ব্যবস্থা।

ভারতবর্ষের যে কয়টি প্রদেশে রায়তদের দুঃখ মোচনের চেষ্টা হইতেছে, সেখানকার রায়তদের ও রায়তবন্ধুদের মনের ভাব যেন এইরূপ, যে, জমিদারদিগকে উৎখাত করিতে পারিলেই যেন রায়তদের কল্যাণ স্বতঃসিদ্ধ হইবে। তাহা কিন্তু সত্য নয়। ভারতবর্ষের যে-সব জায়গায় জমির চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের সুবিধাভোগী জমিদার নাই, সেখানেও প্রজাদের বহু দুঃখ আছে। অতএব রায়তদের উন্নতি বাস্তবিক কিসে কিসে হয় তাহা স্থির করিয়া সমুচিত উপায় অবলম্বন করিতে হইবে।

চিরস্থায়ী বন্দোবস্তের যেখানে প্রচলন সেখানকার প্রজারা অন্য সব স্থানের রায়তদের চেয়ে কম বা বেশী খাজনা দেয়, তাহাও দেখা উচিত।

যাহারা জমিদারদের স্বত্ব লোপ করিতে ইতস্ততঃ করে না, তাহাদের মনে রাখা উচিত, যে, অনেকে নিজে বা অনেকের পূর্ব্বপুরুষ অন্য উপায়ে (ওকালতী, ব্যারিষ্টরী, ডাক্তারী, এঞ্জিনিয়ারী, ঠিকাদারী, বা কোন প্রকার বাণিজ্য দ্বারা) টাকা রোজগার করিয়া সঞ্চিত টাকা দিয়া জমিদারী কিনিয়াছে। তাহাদের স্বত্ব লোপ করিতে হইলে খেসারৎ দেওয়া উচিত। যদি কেহ উত্তরাধিকারসূত্রেই জমিদারী পাইয়া থাকে, যদি কাহারও পূর্ব্বপুরুষ লর্ড কর্ণওয়ালিসের আমলে জমিদার হইয়া থাকে এবং তদবধি জমিদারীটা সেই বংশের সম্পত্তি হইয়া আসিয়া থাকে, তাহা হইলে এই উভয়-বিধ লোকের স্বত্বই বা বিনা-ক্ষতিপূরণে কেন কাড়িয়া লওয়া হইবে ? কাহারও পৈত্রিক ঘরবাড়ী বা উত্তরাধিকার-সূত্রে প্রাপ্ত ব্যবসা বা উত্তরাধিকারসূত্রে প্রাপ্ত টাকাকড়ি ত তুল্যমূল্য কিছু না-দিয়া কাড়িয়া লওয়া হয় না ?

আমরা একথা ভুলিয়া যাইতেছি না, যে, যে-সব রায়ত জমি চষে, তাহাদের পরিশ্রমের ফল তাহারা যথেষ্ট পরিমাণে পায় না। তাহা যথেষ্ট অবশ্যই করিয়া দেওয়া উচিত। কিন্তু কেহ জমি চষিলেই তাহাকে তাহার মালিক গণ্য করা যাইতে পারে না। ইহা বুঝাইবার নিমিত্ত একটি দৃষ্টান্ত দিতেছি।

এক জন লোক নিজের টাকায় কারখানার বাড়ী নির্ম্মাণ করাইল এবং পণ্যদ্রব্য উৎপাদনের জন্য যন্ত্রপাতি কিনিয়া কারখানার ঘরে বসাইল। পরে কারিগর ও মজুর লাগাইয়া সে পণ্যদ্রব্য উৎপন্ন করিয়া তাহা বিক্রী করিতে লাগিল। কারিগর ও মজুরেরা পরিশ্রম করিয়া পণ্যদ্রব্য উৎপাদন করিতেছে বলিয়া কারখানার বাড়ীটা ও যন্ত্রপাতি তাহাদের সম্পত্তি বিবেচিত হইতে পারে না—তাহারা কেবল যথেষ্ট পারিশ্রমিক দাবী করিতে পারে। ইহা সত্য বটে, যে, রাশিয়ার কারখানাগুলি রাষ্ট্রের সম্পত্তি, ব্যক্তিবিশেষের নহে। সেরূপ ব্যবস্থা বিপ্লবের ফলে ঘটিয়াছে। অন্যত্রও বিপ্লবের দ্বারা সেরূপ ব্যবস্থা হইতে পারে, কিংবা আইন করিয়া সমুদয় পণ্যশিল্পের কারখানা রাষ্ট্রীয় সম্পত্তিতে পরিণত হইতে পারে। সেরূপ আইন ন্যায়সঙ্গত ভাবে করিতে হইলে কারখানাসমূহের ভূতপূর্ব্ব মালিকদিগকে খেসারৎ দিতে হইবে।

এইরূপ, সমুদয় জমিও দুই প্রকারে রাষ্ট্রীয় সম্পত্তি হইতে পারে। বিপ্লবের ফলে হইতে পারে—যেমন শুনা যায় রাশিয়ায় কতকটা হইয়াছে, এবং আইনের দ্বারা জমিদার-দিগকে খেসারৎ দিয়া হইতে পারে। যদি ভোটের জোরে এমন

আইন করা যায়, যে, জমিদাররা কোন ক্ষতিপূরণ পাইবে না অথচ তাহাদের কোন একটা স্বত্ব বা সমুদয় স্বত্ব লুপ্ত হইবে, তাহা হইলে তাহা বিপ্লবেরই সমান।

—

বিপ্লব

"বেঁচে থাক্ বিপ্লব" "ইন্‌কিলাব জিন্দাবাদ—" শুনিতে বেশ, খুব হুজুক হয়। কিন্তু ইহার সঙ্গে কত নরহত্যা, কত রক্তপাত, কত অন্য দুষ্কার্য্য জড়িত থাকে, তাহা ভুলিলে চলিবে না। আজকাল ধর্ম্মের দোহাই বেশী লোকে মানিতে চায় না। কিন্তু ন্যায় ও অন্যায়ের মধ্যে প্রভেদ লুপ্ত হয় নাই। যাহা ন্যায়সঙ্গত নহে তাহা করিলে শীঘ্র বা বিলম্বে তাহার প্রতিক্রিয়া হইবেই। নরহত্যা ও রক্তপাত এক পক্ষ করিলে অন্য পক্ষও সুযোগ পাইলে তাহা করিবে।

বিপ্লবও দু-রকমের হয়। ফ্রান্সে খ্রীষ্টীয় অষ্টাদশ শতাব্দীতে যে বিপ্লবের সূত্রপাত হয়, বর্ত্তমান শতাব্দীতে রাশিয়ায় যে বিপ্লব হইয়াছে, তাহা সংখ্যাগরিষ্ঠ সাধারণ লোকদের বিপ্লব। অনেক নরহত্যা করিয়া তাহা ঘটাইতে হইয়াছে। রাশিয়ায় হত্যার জের এখনও মিটে নাই। যে-বিপ্লব রক্তপাত করিয়া ঘটান হইয়াছিল, তাহাকে রক্ষা করিবার নিমিত্ত আরও রক্তপাত চলিতেছে।

অন্যবিধ বিপ্লব সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব স্থাপনের জন্য বিপ্লব নহে, সংখ্যালঘু কতকগুলি লোকের প্রভুত্ব স্থাপন ও রক্ষার জন্য ইহা ঘটিয়া থাকে বা ঘটান হইয়া থাকে; যেমন ইটালীতে ফাসিষ্ট বিপ্লব, জার্ম্মেনীতে নাৎসী বিপ্লব। স্পেনে সংখ্যাগরিষ্ঠদের প্রভুত্ব স্থাপিত হইয়াছিল, কিন্তু এখন যুদ্ধ চলিতেছে ইটালীর ফাসিষ্ট ও জার্ম্মেনীর নাৎসী প্রভুত্বের মত সংখ্যালঘু এক শ্রেণীর প্রভুত্ব স্থাপনের উদ্দেশ্যে, এবং সেই জন্য স্পেনের বিদ্রোহীরা ইটালীর ও জার্ম্মেনীর সাহায্য পাইয়া আসিতেছে।

শুধু কারখানার শ্রমিকেরা ও তাহাদের মত লোকেরা রাষ্ট্রের নিয়ন্তা হইবে, কিংবা কারখানার শ্রমিক ও মাঠের চাষীরাই রাষ্ট্রে সর্ব্বেসর্ব্বা হইবে, আর কোন শ্রেণীর লোক থাকিবে না, এ রকম রাষ্ট্রীয় ও সামাজিক ব্যবস্থা রাশিয়াতে বা অন্য কোন দেশে এখনও কায়েম হয় নাই; আবার ইটালীর ফাসিষ্ট প্রভুত্ব বা জার্মেনীর নাৎসী প্রভুত্বও নিরাপদ হইয়াছে মনে হয় না। রাশিয়ার বিপ্লবীদের ও কার্ল মার্ক্স্ প্রভৃতি যাহাদের মতের অনুসরণ তাহারা করিয়াছে, তাহাদের আদর্শ শ্রেণীবিহীন সমাজ ("classless society)। সে আদর্শ রাশিয়াতেও বাস্তবে পরিণত হয় নাই।

বস্তুতঃ, কোন শ্রেণীর লোককে বিনষ্ট বা দেশ হইতে বিতাড়িত করিয়া নিশ্চিহ্ন করিয়া ফেলা বা এক শ্রেণীর লোককে প্রভু করিয়া অন্য সকলকে শক্তিহীন ও পদানত করা ও রাখা, যাহারা সংখ্যায় বেশী তাহাদের মত ও কাজকেই বিনা বিচারে ন্যায্য বলিয়া মানিয়া লওয়া—এবম্বিধ কোন পন্থা, আদর্শ, বা মত গ্রহণীয় ও অনুসরণীয় নহে। কেমন করিয়া যে সামাজিক সামঞ্জস্য রক্ষা করিয়া সমাজকে সুস্থ, জীবন্ত ও প্রগতিশীল রাখা যায়, তাহা বলা বড় কঠিন। যাহার প্রাণ আছে, তাহা বরাবর ঠিক্ এক অবস্থায় থাকিতে পারে না। জীবন্ত সমাজে পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। জীবন্ত রাষ্ট্রেও পরিবর্ত্তন অবশ্যম্ভাবী। রক্তাপ্লুত বিপ্লবের পথে না-গিয়া কেমন করিয়া এরূপ পরিবর্ত্তন করা যাইতে পারে, তাহা নির্দ্দেশ করা কঠিন—যদিও আদর্শ তাহাই হওয়া উচিত। ইউরোপে ফ্রান্স, রাশিয়া, ইটালী, জার্মেনী·· সশস্ত্র বল-প্রয়োগ দ্বারা পরিবর্ত্তন সাধন করিবার চেষ্টা করিয়াছে, পরিবর্ত্তন করিয়াছেও। কিন্তু কোথাও এখনও রক্তপাতের জের মিটে নাই। অন্য কয়েকটি দেশ প্রধানতঃ রক্তপাত ব্যতিরেকেই আধুনিক যুগে পরিবর্ত্তন করিয়াছে—যেমন ডেন্মার্ক, নরওয়ে, সুইডেন, বেলজিয়ম, ইংলণ্ড···—যদিও এমন কোন দেশ নাই যাহার ইতিহাসে কোন-না-কোন যুগে রক্তপাতসহকারে বিরাট পরিবর্ত্তন সাধিত হয় নাই। কিন্তু মানুষের ইতিহাসের গোড়ার দিকে যাহা ঘটিয়াছে, তাহাকে আদর্শ মনে করা যাইতে পারে না। মানুষের ক্রমোন্নতি বাঞ্ছনীয়।

ইতিহাসের অনেক ভীষণ বিপ্লবের সহিত জড়রাজ্যে ঝড় ভূমিকম্প অগ্ন্যুৎপাত জলপ্লাবনের সাদৃশ্য আছে। জড়রাজ্যে এই সকল উৎপাত বিনাশ করে অনেক কিছু। কিন্তু তাহারা যাহা বিনাশ করে, তাহার মধ্যে আবর্জ্জনা ক্লেদ রোগ-বীজ···অনেক থাকে। এবং বিনাশের সঙ্গে সঙ্গে নূতন সৃষ্টিও কিছু কিছু হয়। বহু বিপ্লব সম্বন্ধেও এইরূপ কথা বলা যায়।

—

পাটনায় প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের অধিবেশন

প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য সম্মেলনের আগামী অধিবেশন বিহারের রাজধানী পাটনায় হইবে। বিহার দীর্ঘকাল বঙ্গের সহিত এক প্রাদেশিক শাসনের অধীন ছিল এবং বঙ্গে পাশ্চাত্য শিক্ষার বিস্তার বিহারের আগে ও বিহারের চেয়ে বেশী হইয়াছিল। সেই জন্য, রাজকার্য্য উপলক্ষ্যে ও রাজকার্য্যসংশ্লিষ্ট ওকালতী আদি কাজে অনেক বাঙালী বিহারনিবাসী হইয়াছিলেন। তাহার পর, যখন বিহারকে বাংলা হইতে পৃথক শাসনের অধীন করা হইল, তখন বাংলাকে বঞ্চিত করিয়া মানভূম জেলা প্রভৃতি বঙ্গের কোন কোন অংশকে বিহারের সহিত জুড়িয়া দেওয়া হইল। এই কারণে, ব্রিটিশ গবন্মেণ্ট যাহাকে বিহার প্রদেশ বলেন, তদ্রূপ বহু লক্ষ বাঙালী তাহার অধিবাসী পরিগণিত হইলেন যাঁহাদের পূর্ব্বপুরুষেরা অনেক শতাব্দী ধরিয়া বঙ্গের অঙ্গীভূত নানা স্থানে বাস করিয়া আসিতেছিলেন।

বিহার প্রদেশে বহু লক্ষ বাঙালীর অবস্থিতির ইহাই ইতিহাস ও কারণ।

যে-প্রকারেই হউক, বিহারে অনেক বাঙালীর বসবাস ঘটিয়াছে। ব্যক্তিগতভাবে প্রত্যেক বাঙালী প্রত্যেক বিহারী অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ না হইলেও, বিহারীদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিপরাক্রমে শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি থাকিলেও, সমষ্টিগত ভাবে বাঙালীরা শিক্ষা ও সংস্কৃতিতে ঐ প্রদেশের লোকদের মধ্যে অগ্রগণ্য। তাঁহাদের মধ্যে বিদ্যাবুদ্ধিতে অগ্রগণ্য অনেক লোক আগে ছিলেন, এখনও আছেন। তাঁহারা বিত্তশালী নহেন। সম্প্রতি সর্ মন্মথনাথ মুখোপাধ্যায়, ডক্টর দ্বারকানাথ মিত্র প্রভৃতি পাটনায় গিয়া তাঁহাদের দল পুষ্ট করিয়াছেন। সুতরাং প্রবাসী বঙ্গসাহিত্য-সম্মেলনের পাটনা অধিবেশন সাফল্যমণ্ডিত ও স্মরণীয় করিবার নিমিত্ত যাহা কিছু আবশ্যক, তাহা বিহারে আছে, পাটনায় আছে। তথাকার বাঙালীরা কিরূপ আয়োজন করিতেছেন, সমগ্র ভারতের বাঙালীরা ক্রমে ক্রমে তাহা জানিতে পারিবে।

বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের কৃষ্ণনগরে অধিবেশন

ভবানীপুরে বঙ্গীয় সাহিত্য সম্মিলনের অধিবেশনের সাত বৎসর পরে চন্দননগরে তাহার অধিবেশন গত বৎসর হইয়াছিল। এ বৎসর কৃষ্ণনগরে তাহার অধিবেশন হইবে। কৃষ্ণনগরের পৌরজনেরা কাজের আরম্ভ ইতিমধ্যেই করিয়াছেন অবগত হইয়াছি। কৃষ্ণনগর শহর ছাড়া সমগ্র নদীয়া জেলারও যে এ বিষয়ে দায়িত্ব ও কর্ত্তব্য আছে, তাহা আগে একবার লিখিয়াছি। তাঁহারা সেই কর্ত্তব্যপালনে অবহিত হইলে কৃষ্ণনগরের লোকদের দায়িত্বভার কিছু কমিবে।

কলেজে না-পড়িয়া আই-এ ও বি-এ পরীক্ষা দেওয়া

কলিকাতা ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের বর্ত্তমান নিয়ম অনুসারে কোন ছাত্র যদি কলেজে না-পড়িয়া আই-এ বা বি-এ পরীক্ষা দিতে চায়, তাহা হইলে তাহাকে কোন বিদ্যালয়ে শিক্ষক হইতে হয়, নতুবা সে পরীক্ষা দিতে পায় না, এবং সে ন্যূনকল্পে ম্যাট্রিকের তিন বৎসর পরে আই-এ এবং আই-এর তিন বৎসর পরে বি-এ পরীক্ষা দিবার অধিকারী বিবেচিত হয়। তাহার পূর্ব্বে নহে। কলেজে না-পড়িয়া অন্ততঃ তিন বৎসর পরে পরীক্ষা দিবার অধিকারের এই যে নিয়ম, ইহা অযৌক্তিক নহে। কারণ, যে কলেজের ছাত্ররূপে পরীক্ষা দেয়, সে নিজের পড়াশুনা করিবার যত সময় পাইতে পারে, যে শিক্ষকরূপে পরীক্ষা দেয় পরীক্ষার বিষয় ও পুস্তকগুলি অধিগত করিবার তাহার তত অবকাশ থাকে না। কিন্তু শিক্ষকতা না করিলে কেহ কলেজে না-পড়িয়া পরীক্ষা দিতে পারিবে না, এইরূপ নিয়ম সম্পূর্ণ যুক্তিসঙ্গত নহে। ইহা একেবারেই অযৌক্তিক, এমন কথা অবশ্য বলা যায় না। কারণ, শিক্ষকের কাজ ভাল করিয়া করিতে হইলে, শিক্ষকের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান হওয়া আবশ্যক এবং এই ক্রমবর্দ্ধমান জ্ঞান পরোক্ষভাবে উচ্চতর পরীক্ষা-দানের যোগ্যতা বাড়ায়। কিন্তু শতকরা কয় জন শিক্ষকের জ্ঞান ক্রমবর্দ্ধমান?

অন্য দিকে, অল্পশিক্ষাপ্রাপ্ত যে-সব লোক শিক্ষকতা না-করিয়াও পুস্তক, সাময়িক পত্র ও সংবাদপত্র পড়িয়া নিজেদের জ্ঞান বাড়ায়, তাহাদের সংখ্যা নিতান্ত কম নয়। ইহাদের মধ্যে কতকগুলি লোক বেকার,